অভিসারিকা

২৯শ বর্ষ, ১ম খণ্ড ঃ
বৈশাখ ঃ ১৩৫৭ ১ম সংখ্যা

কথামৃত

"যেমন চটি জুতা ও ছেঁড়া কাপড় পরিধান করিয়া রাস্তায় বেড়াইলে সহজেই মনে দৈন্য ভাবের উদয় হয়, পেণ্ট্‌লন পরিলে ও বুট জুতা পায়ে দিয়া চলিলে সহজেই মন অহঙ্কৃত হইয়া উঠে, তদ্রূপ গেরুয়া বসন পরিলে ধর্ম্মসাধনের উপযোগী ভাব মনেতে সঞ্চার হয়। গেরুয়ার সঙ্গে পবিত্র ভাবের যোগ আছে।"

* * * * * *

"শাস্ত্রাদির কার্য্যকারিতা আছে। যেমন শুদ্ধ চাল পুতিলে গাছ হয় না, ধান পুততে হয়, তুষ পরিত্যাজ্য অসার হইলেও চালের উপরিভাগে তুষ না থাকিলে গাছ হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্রাদির বিধি পালন না করিলে ধর্ম্ম হয় না।"

* * * * * *

"ঝড় উঠিলে যেমন অশ্বত্থ গাছ বট গাছ চেনা যায় না, তদ্রূপ জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে জাতিভেদ থাকে না।"

* * * * * *

"যেমন মৌমাছি প্রথমে ফুলের চারি দিকে ভ্যান্‌-ভ্যান শব্দ করিয়া বেড়ায়, ফুলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যখন মধু পান করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন আর সে শব্দ করে না, তদ্রূপ প্রথমতঃ

লোকে জ্ঞান লইয়া অনেক কথা কয়, কোলাহল করে, কিন্তু ঈশ্বরের সহবাস-সুধা পানে প্রবৃত্ত হইলে সে ভক্তিতে একেবারে বিহ্বল ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে।”

* * * * * *

“অজ্ঞান মনুষ্য ছেলে মানুষের ন্যায়। ছেলে মানুষ একটা রাঙ্গা পুতুল দেখিতে পাইলে টাকা-মোহর ফেলিয়া সেই পুতুল পাইবার জন্য দৌড়িয়া যায়। বাল্যস্বভাব অজ্ঞান লোক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অসার সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ে।”

* * * * * *

“অন্ধকারের ধর্ম্মই খাঁটি ধর্ম্ম, আলোকের ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। যদি কেহ নির্জ্জন স্থানে সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া ঈশ্বর-ভয়ে তাহার প্রতি কুদৃষ্টি না করেন, তিনিই যথার্থ মানুষ।”

* * * * * *

“আলু ইত্যাদি সিদ্ধ হইলে যেমন কোমল হয়, সিদ্ধ-জীবনেও সেইরূপ কোমল ভাব প্রকাশ পায়।”

* * * * * *

“যে আল্লাকে প্রাপ্ত হয় সে মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ হইয়া যায়। যে আল্লাকে পায় নাই, সে-ই আল্লা আল্লা বলিয়া চীৎকার করে।”

* * * * * *

“যেমন জাহাজে কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাহাতে জাহাজের দিগ্‌ভ্রম হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া জীবন-তরী চালাইলে নিরাপদ।”

* * * * * *

শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইলে পর তাকিয়া ঠেসান দিয়া তামাক খাওয়া যেমন, নির্ভর সেইরূপ।

* * * * * *

সাধন হয়, কোণে, বনে, মনে।

* * * * * *

“আকাশের জল নির্ম্মল ও পরিষ্কার, যেমন ছাদ ও যেমন নল দিয়া বাহির হয় সেইরূপ হইয়া থাকে, ঘোলা বা পরিষ্কার। এইরূপ বিকৃত হৃদয়ে পড়িয়াই ধর্ম্ম বিকৃত হয়।”

* * * * * *

“তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পান।”

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এক

তোকে কলকাতায় নিয়ে এলাম। দেখছিস ?

মস্ত শহর কলকাতা। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। না দেখে উপায় কি ? এ কি আমাদের কামারপুকুরের মত নিঝঝুম ? নিরিবিলি ?

রামকুমার চিন্তিত মুখে বললেন, 'কলকাতায় এসে টোল খুললাম—'

তাও দেখতে পাচ্ছি বৈকি। তাছাড়া ঝামাপুকুরে কারু-কারু বাড়িতে দাদা তো পুরোতগিরিও করছেন। সব পেরে উঠছেন না। সময় কই ? টোলে টোল খেতে খেতেই দিন যায়।

'তাই তোকে নিয়ে এলাম এখানে।' বললেন রামকুমার, 'এবার একটু লেখাপড়া কর্।'

লেখাপড়া ? গদাধর সরল-বিশাল চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন দাদার দিকে।

'হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁ-ময় ঘুরে বেড়াস, নয়তো যাত্রা দলে গিয়ে শিব সাজিস। ও সবে পেট ভরবে না—' রামকুমারের কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ ফুটল।

তবে কি করতে হবে ?

মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স হলো তোর। ছিটে-ফোঁটা বিদ্যেও তোর পেটে নেই। আমার আয় দেখতে পাচ্ছিস তো ? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না—

তা আর অজানা নেই। কিন্তু শিখতে হবে কি ?

'শাস্ত্র—ব্যাকরণ—' গম্ভীর হোলেন রামকুমার : 'একটু মন লাগা। মার কাছছাড়া করে নিয়ে এসেছি তোকে। মার মুখ প্রসন্ন কর্।'

মার মুখ প্রসন্ন কর্। মার বিষণ্ণ মুখখানি মনে-মনে ধ্যান করলেন গদাধর। সে কি শুধু চন্দ্রমণির মুখ ?

সে মুখে অভয়প্রদা প্রসন্নতা। "সব্য হস্তে মুক্ত খড়্গ দক্ষিণে অভয়।"

'দাদা, চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কি হবে ? তা দিয়ে আমি কি করব ?'

তার মানে ? বিরক্ত হলেন রামকুমার।

তার মানে অর্থকরী বিদ্যে আমি চাই না। ঘর-সাজানো বিদ্যে।

'তবে তুই কি চাস ?'

'আমি চাই জ্ঞান।'

এ আবার কোন দিশি কথা ? কোন দিশি জ্ঞান ? এ জ্ঞানের অর্থ কি ?

এ জ্ঞানের অর্থ নেতি। নেতি-নেতি করে-করে একেবারে শেষকালে যা বাকি থাকে তাই। সেই এক জানাই জ্ঞান, আর অনেক জানা অজ্ঞান—

বুঝতে পারলেন না রামকুমার। কি করেই বা বুঝবেন ? সংসারের সুখভোগকে তুচ্ছ করে কেউ স্বপ্নবিলাসে মত্ত থাকতে পারে এ তাঁর কল্পনার অতীত। দরিদ্রের পক্ষে অভাবমোচনের চেষ্টার বাইরে আবার ব্যাকুলতা কী !

ছোট ভাইকে বকতে লাগলেন রামকুমার।

কিন্তু গদাধর চুপ। অবিচল।

যখন সত্যিকারের জ্ঞান হয় তখন স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। সত্যিকারের জ্ঞান মানেই ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন ধরো, একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, সঙ্গে এসেছে তার সমবয়স্ক বন্ধুরা। সবাই বাইরের ঘরে বসে গুলতানি করছে। এদিকে ঐ মেয়েটি আর তার সমবয়সী সখীরা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। মেয়েটির স্বামীকে চেনে না সখীরা। একজনকে দেখিয়ে জিগগেস করছে, ঐটি তোর বর ? মেয়েটি অল্প হেসে বলছে, না। ঐটি ? উঁহুঁ। ঐটি ? তাও না। এমনি চলছে নেতি-নেতি। শেষকালে ঠিক-ঠিক যখন স্বামীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে,

তবে এটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হাঁ-ও করে না, না-ও করে না, শুধু একটু ফিক করে হেসে চুপ করে থাকে। সখীরাও তখন বুঝতে পারে, কে বর? তেমনি যেখানেই ব্রহ্মজ্ঞান সেখানেই মৌন।

এ মৌনের ভুল মানে করলেন রামকুমার। ভাবলেন ছেলেটার মাথা বোধ হয় বিগড়েছে।

লেখাপড়া যখন শিখবে না তখন যা হয় একটু কিছু কাজ করুক। অন্তত দেবসেবার কাজ। বাড়িতে রঘুবীর আছেন, সেবা-পূজার কাজ তো সে জানে। তাই সেদিকে মন দিক। কিছু দক্ষিণার সাশ্রয় হোক।

ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার নিত্যপূজা। সেখানে গদাধরকে ঢুকিয়ে দিলেন রামকুমার।

গদাধর মহাখুশি। মনের মতন কাজ মিলেছে তার। যেন মনের মানুষ চলে এসেছে তার হাতের নাগালের মধ্যে।

যেমন দেখতে মনোহর তেমনি কণ্ঠস্বরে মধুঢালা। ভজন গায় গদাধর। যে দেখে যে শোনে সেই তদ্গত হয়ে যায়। মনে হয় কোথাকার কবেকার কে আপন লোক যেন পথ ভুলে চলে এসেছে। অভিজাত বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। সূর্যকে মুখ দেখাতে সংকোচ, কিন্তু এ যেন অন্ধকার ঘরের অন্তরঙ্গ আলো। সকলের বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। উদাসীন অথচ আনন্দময়।

দেবতার সামনে যখন বসে সবাই চমকে ওঠে দেবতাই এসে বসেছেন না কি সামনে?

কিন্তু এদিকে যার যখন দরকার ফুট-ফরমাজ খেটে দিচ্ছে গদাধর। আড্ডা দিচ্ছে অন্দরে-বাইরে। ছেলে-ছোকরার দল পাকিয়ে হৈ-হল্লা করছে। লেখাপড়ার নামে ঠনঠন।

কি হবে ও সব অবিদ্যায়?

অমৃত-সাগরে যাবার পথ খুঁজছি। যেমন করে হোক সাগরে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হলো। শুধু পৌঁছলে চলবে না, ডুবতে হবে। কেউ তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক বা নিজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়। ডুবতে হবে। যা ডোবায় না ভাসিয়ে রাখে, তা দিয়ে আমি কি করব?

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীও এ কথা বলেছিলেন। ধনধারিণী বসুন্ধরার যত সম্পদ হতে পারে সব এনে তাকে উপহার দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। মৈত্রেয়ী মমতাশূন্যের মত বললেন, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না তা নিয়ে আমি কি করব? 'যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম?'

শুধু পুঁথি পড়লে কি চৈতন্য হবে? চৈতন্য কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে দেহের মধ্যে। তাকে জাগানো চাই। কি করে জাগাবে? যোগে ব'সে। যোগ কি? যোগ মানে যুক্ত হয়ে থাকা। দীপশিখা দেখেছ? হাওয়া নেই যেখানে, সেই নিষ্কম্প দীপশিখা? সেই স্থির স্থিতি? তারই নাম যোগ। ঊর্ধ্বের সঙ্গে সংস্পর্শ। তারই প্রথম আসন এই দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে।

রামকুমার কি করেন? কার সাহায্যে স্বচ্ছল হবে তাঁর সংস্কার? কে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে?

'তুমি যা করো—' রঘুবীরকে স্মরণ করলেন রামকুমার। শ্যামল-শান্ত রঘুবীর।

দুই

রঘুবীর আছেন দেরে গ্রামে মানিকরাম চাটুজ্জের বাড়িতে। যে গ্রামের জমিদার প্রতাপপ্রবল রামানন্দ রায়। দৌরাত্ম্যই যার একমাত্র মাহাত্ম্য।

ক্ষুদিরাম মানিকরামের বড় ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আর রঘুবীরের সেবা করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সেই। দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন চন্দ্রমণিকে। যখন চন্দ্রমণির বয়স আট আর তাঁর নিজের বয়স পঁচিশ। বিয়ের ছ' বছর পরে জন্ম হল রামকুমারের। আর তার পাঁচ বছর পরে প্রথম মেয়ে কাত্যায়নীর।

'আপনাকে রাজা ডেকেছেন—' ক্ষুদিরামের ঘরের দরজায় জমিদারের পেয়াদা।

কি আর্জি হুজুরের? চোখ তুলে চাইলেন ক্ষুদিরাম।

আর্জি নয়, হুকুম। রাজার তরফ থেকে এক-নম্বর মামলা রুজু আছে আদালতে। আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। আপনি একজন ধার্মিক লোক। আপনার জবানবন্দির দাম আছে।

ব্যাপারটা শুনলেন বিশদ করে। বুঝলেন, মামলাটি মিথ্যে, তঞ্চকী।

'মিথ্যে মামলায় সাক্ষী হতে পারব না।' একবাক্যে না করলেন ক্ষুদিরাম।

পেয়াদা তো অবাক। ভাবতেও পারে না। এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যায়। এর পরিণাম কি হবে তা কি চাটুজ্জে মশায় জানেন না?

জানেন। কোপে পড়বেন জমিদারের। কিন্তু জমিদারের প্রশ্রয়ের চাইতে সত্যের আশ্রয়ে বেশি শান্তি।

অন্তরের মধ্যে একবার দেখলেন তাঁর রঘুবীরকে। সত্যে আর ন্যায়ে যিনি প্রতিষ্ঠিত সেই করুণাঘন রামচন্দ্রকে।

যা হবার তাই হল। রামানন্দ রায় উলটে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই মিথ্যে নালিশ করলেন। যার পক্ষে আমলা তার পক্ষেই মামলা। ডিক্রি পেয়ে গেলেন রামানন্দ। জারিতে ক্ষুদিরামের স্থাবর-অস্থাবর সব নিলেম হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালেন।

দেড়শো বিঘে মতন জমি ছিল। সব একটা রঙচঙে তামাসার মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিছুই কি রইল না আর পৃথিবীতে?

আছেন, রঘুবীর আছেন। অভয় আশ্রয়ের স্নিগ্ধ আতপচ্ছদ মেলে ধরেছেন আকাশে। যার কেউ নেই কিছু নেই তারো স্থান আছে। অন্তরে স্থান আছে। অনন্তে স্থান আছে।

ক্ষুদিরাম দেখলেন হঠাৎ এক জন বন্ধু এসে উপস্থিত।

'আমি কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী। চিনতে পার?'

'তোমায় চিনি না? তুমি আমার কত কালের বন্ধু।'

তুমি চলো কামারপুকুর। আমার বাড়ির একটেরে তুমি থাকবে। তোমায় জমি দিচ্ছি বিঘেটাক। কাটা ঘুড়ির সুতো ধরো আবার।

কামারপুকুরে গোস্বামীদের লাখেরাজী স্বত্ব। হৃদয়ও তেমনি নিষ্কর। নিষ্কণ্টক।

সপরিবারে ক্ষুদিরাম চলে এলেন কামারপুকুর। গোস্বামীদের বাড়ির একাংশে কয়েকখানি চালাঘরে বাস করতে লাগলেন। লক্ষ্মীজলায় ধানী জমি পেলেন এক বিঘে দশ ছটাক। চিরকালের অর্পণ। বর্তে গেলেন ক্ষুদিরাম। যিনি নেন তিনিই আবার ফিরিয়ে দেন। এক দোর দিয়ে যান হাজার দোর দিয়ে আসেন। নিত্যেও তিনি লীলায়ও তিনি।

মনে পড়ে, একদিন নিরুপায় কণ্ঠে বলেছিলেন চন্দ্রমণি: 'ঘরে আজ চাল নেই—'

তবু বিচলিত হননি ক্ষুদিরাম। বলেছিলেন, 'তাতে কি? রঘুবীর যদি উপোস করেন আমরাও উপোস করব।'

সৌম্যোজ্জ্বল চোখে হাসলেন রঘুবীর। বা, উপোস করব কেন?

লক্ষ্মীজলার মাঠে ধানী জমি সোনার ধানে ঝলমল করে উঠল। ক্ষুন্নিবৃত্তির তৃপ্তিতে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছেন দেবতা।

দুপুর বেলা। গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। ফেরবার সময় গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসেছেন। হঠাৎ কেমন যেন তন্দ্রার ঘোর লাগল। এলিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চন্দ্রের মত রমণীয় বলেই তো রামচন্দ্র। নবদূর্বাদলের মতই শ্যামল-স্নেহল। কিন্তু মুখখানি ম্লান কেন?

'আমি বড় অযত্নে আছি। অনেক দিন কিছু খাইনি।' বললে বালক, 'তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলো। বড় সাধ তোমার হাতের একটু সেবা পাই।'

অস্থির হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'আমি অধম, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'

'কোনো ভয় নেই। নিয়ে চল আমাকে। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে তার আমি ত্রুটি ধরি না।'

ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চার পাশে তাকিয়ে দেখলেন কেউ নেই। কিন্তু স্বপ্নে যে ধানখেত দেখেছিলেন ঐ তো সেই ধানখেত। নিশ্চয়ই ঐখানে লুকিয়েছেন। এগোলেন ক্ষুদিরাম। দেখলেন এক টুকরো পাথরের উপর এক বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। ঠাহর করে দেখলেন সামান্য পাথর নয়, শালগ্রাম শিলা। মনে হল স্বপ্ন মিথ্যা নয়, ঐ শিলাই তাঁর রামচন্দ্র, নইলে সাপ সহসা অন্তর্হিত হবে কেন? কিন্তু সাপ তো একেবারে হাওয়া হয়ে যায়নি, পাথরের মুখে যে গর্ত তারই মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। পাথর তুলে আনবার সময় হাতে যদি দংশন করে। ইতস্তত করতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু যিনি রাম তিনি

কি বিশ্বহরণ মন? 'জয় রঘুবীর' বলে ত্বরিতভঙ্গিতে তুলে নিলেন শিলা। সাপ কোথায় তা কে জানে।

লক্ষণ থেকে বুঝিলেন এ 'রঘুবীর' শিলা। তবে, আর সন্দেহ কি, এই শিলাই তাঁর জাগ্রত গৃহদেবতা। শুধু জাগ্রত নয়, স্বয়মাগত।

একদিন পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন মেদিনীপুর, কামারপুকুর থেকে কম-সে-কম চল্লিশ মাইল দূরে। অনুদয়ে বেরিয়েছেন, হেঁটেছেন প্রায় দশটা পর্যন্ত। হঠাৎ দেখলেন রাস্তার ধারে এক বেলগাছ। ফাল্গুনের রাশি-রাশি নতুন পাতায় সারা গাছ ঝলমল করছে। দেখে ক্ষুদিরামের মন ঐ কচি পাতার মতই নেচে উঠল। পাশের গাঁয়ে ঢুকে একটা ঝুড়ি আর গামছা কিনলেন তাড়াতাড়ি। সামনের পুকুরের জলে ধুয়ে নিলেন বেশ করে। পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঝুড়ি বোঝাই করলেন। ভিজে গামছাখানি চাপিয়ে দিলেন উপরে। মেদিনীপুর পড়ে রইল, পাতা নিয়ে বিকেল তিনটের সময় বাড়ি পৌঁছুলেন।

চন্দ্রমণি তো অবাক।

'অনেক—অনেক বেলপাতা পেয়েছি আজ। নতুন বেলপাতা। আজ প্রাণভরে শিবপুজো করব।'

'মেদিনীপুর? মেদিনীপুর গেলে না?'

'বেলপাতা দেখে সব ভুল হয়ে গেল। আবার যাব না-হয় একদিন মেদিনীপুর। কিন্তু এমন বেলপাতা পাব কোথায়?'

এই ক্ষুদিরাম!

এবার চলেছেন—মেদিনাপুর নয়—সেতুবন্ধ-রামেশ্বর। চলেছেন তেমনি পায়ে হেঁটে। পদব্রজ না হলে তীর্থ কি! ক্লেশ না করলে ক্লেশমোচনের স্পর্শ পাব কি করে?

ফিরলেন পরের বছর। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাণলিঙ্গ শিব। বসালেন রঘুবীরের পাশে। হরির পাশে হর। সীতাপতির পাশে উমাপতি।

প্রায় ষোল বছর পরে ফের ছেলে হল চন্দ্রমণির। দ্বিতীয় ছেলে। ক্ষুদিরাম তার নাম রাখলেন রামেশ্বর।

রামকুমার তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, পূজো-আচ্চা করছে যজমান-বাড়িতে। লক্ষ্মীপুজোর রাত। দিন থাকতে ভুরসুবো গিয়েছে, মাঝ রাতেও ফেরবার নাম নেই। ছেলের জন্যে চন্দ্রমণি ঘর-বার করছেন। মন বড় উচাটন। এখনো ফিরছে না কেন রামকুমার?

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন চন্দ্রমণি। অনেকক্ষণ পর দেখলেন কে একজন যেন মাঠ পেরিয়ে ভুরসুবোর দিক থেকে আসছে। রামকুমারই বোধ হয়—দু' পা এগিয়ে গেলেন চন্দ্রমণি। কিন্তু, ছেলে কোথায়, এ তো একজন মেয়ে!

আশ্চর্য্য রূপ সেই মেয়ের। এক গা গয়না। এই নির্জন মধ্যরাত্রে এখানে তার কি দরকার?

'কোত্থেকে আসছ মা তুমি?' চন্দ্রমণি গায়ে পড়ে জিগগেস করলেন।

'ভুরসুবো থেকে।'

'আমার ছেলে রামকুমারের কোনো খবর জানো?'

জিগগেস করেই লজ্জিত হলেন চন্দ্রমণি। অজানা ভদ্রঘরের মেয়ে, কোনো বিশেষ কারণেই না-হয় বাইরে বেরিয়েছে—তাঁর ছেলের খবর সে পাবে কোথায়? ছেলের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন বলেই বোধ হয় তাঁর আর বোধজ্ঞান নেই।

'যে বাড়িতে তোমার ছেলে পূজো করতে গিয়েছে আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি।' মেয়েটি বললে চোখ তুলে: 'ভয় নেই এখুনি ফিরবে—'

কেমন যেন বিশ্বাস হল চন্দ্রমণির। বুকের ভার নেমে গেল।

জিগগেস করলেন, 'এত রাত্রে এত গয়না-গাটি পরে কোথায় যাচ্ছ তুমি মা?'

মেয়েটি হাসল। বললে, 'অনেক দূর।'

তোমার কানে ও কি গয়না?'

'ওর নাম কুণ্ডল—'

'মা, তোমার বয়স অল্প। এই অসময়ে এত গয়না-টয়না পরে তোমার একা-একা যাওয়া ঠিক হবে না।' চন্দ্রমণির কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ল: 'তুমি আমাদের ঘরে এস। রাতটা বিশ্রাম করে কাল ভোর হতে চলে যেও।'

'না মা, আমায় এখুনি যেতে হবে। আরেক সময় আসব তোমাদের বাড়িতে।' বলে মেয়েটি চলে গেল।

চলে গেল কিন্তু রাস্তা বা মাঠ দিয়ে নয়। ভারি আশ্চর্য তো! তাঁদের বাড়ির পাশেই নতুন

মিদার লাহাবাবুদের সার-সার ধানের মরাই। ন সেদিক পানে চলে গেল। ওদিকে পথ াথায়? বিদেশী মেয়ে পথ হারালো না কি? দ্রমণি বাইরে বেরিয়ে এলেন। এদিক-ওদিক জতে লাগলেন চঞ্চল হয়ে। কোথায় গেল ন চঞ্চলা?

এ আমি তবে কাকে দেখলাম? কোজাগরী ত্রিকে জিগগেস করলেন চন্দ্রমণি।

স্বামীকে গিয়ে তুললেন। বলো, এ আমি াকে দেখলাম? সর্বাবয়বানবদ্যা নানালঙ্কারভূষিতা। কে?

সব শুনলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বীকে দেখেছ।'

এই চন্দ্রমণি।

পিতৃদেব আর মাতৃদেবী। দুই-ই দিব্যভাবের বুক।

তিন

এমন বাপ-মা না হলে এমন ছেলে জন্মাবে ক করে?

কাত্যায়নীর বড় অসুখ আনুড়ে তার শ্বশুর-াড়িতে তাকে দেখতে গিয়েছেন ক্ষুদিরাম। মেয়ের বভাব কেমন-যেন অস্বাভাবিক মনে হল। মনে ল ভূতাবেশ হয়েছে।

চিত্ত সমাহিত করে দেবে দিব্যযোনিকে আহ্বান রলেন ক্ষুদিরাম। প্রেতযোনিকে সম্বোধন করে ললেন, 'কেন আমার মেয়েকে অকারণে কষ্ট দিচ্ছ? লে যাও বলছি।'

কাত্যায়নীর জবানিতে বললে সেই প্রেতাত্মা: লে যাব যদি আমার একটা কথা রাখো।'

'কি কথা?'

'যদি গয়া গিয়ে আমাকে পিণ্ড দিতে রাজি হও। মার বড় কষ্ট—'

ক্ষুদিরাম তিলমাত্র দ্বিধা করলেন না। বললেন, ব পিণ্ড। কিন্তু তাতেই কি তুমি উদ্ধার পাবে?'

'পাব।'

'তার প্রমাণ কি?

'তার প্রমাণ আমি এখুনি দিয়ে যাচ্ছি। যাবার ময় সামনের ঐ নিম গাছের বড় ডালটা আমি ভেঙে দেব।'

মুহূর্তে নিম গাছের বড় ডালটা ভেঙে পড়ল।

আর কাত্যায়নীর অসুখও মিলিয়ে গেল বাতাসে।

ক্ষুদিরাম গয়া রওনা হলেন। সেটা শীতকাল, ১২৪১ সাল। পৌঁছুলেন চৈত্রের সুরুতে। মধু-মাসেই পিণ্ডদান প্রশস্ত।

বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলেন ক্ষুদিরাম। রাতে বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন।

যেন তাঁর সামনে গদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব। সেবা নেব তোমার হাতে।'

ক্ষুদিরাম কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি গরিব, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'

'ভয় নেই।' বললেন গদাধর, 'যা জুটবে তাই খাওয়াবে আমাকে। আমি উপচার চাই না, ভক্তি চাই।'

এক মাস পরে বাড়ি ফিরলেন ক্ষুদিরাম। স্বপ্নের কথা পুষে রাখলেন মনে-মনে।

এদিকে চন্দ্রমণি কী দেখছেন?

দেখছেন, রাতে তাঁর বিছানায় তাঁরই পাশে কে একজন শুয়ে আছে। স্বামী বিদেশে, অথচ এ কী অভাবনীয়! তা ছাড়া, কই, মানুষ তো এত সুন্দর হয় না। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি। প্রদীপ জ্বালালেন। কই, কেউ কোথাও নেই। দরজার খিল তেমনি অটুট আছে। কৌশলে খিল খুলে কেউ ঘরে ঢুকে তেমনি কৌশলে আবার পালিয়ে গেল না কি? এত স্পষ্ট যে স্বপ্ন বলে বিশ্বাস হয় না। ভোর হতেই ধনী কামারনীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'হ্যাঁ লো, কাল রাতে কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল বলতে পারিস?'

সব কথা শুনে ধনী হেসেই অস্থির। বললে 'মর মাগী, লোকে শুনলে অপবাদ দেবে যে! বুড়ো বয়সে আর ঢলাসনি! স্বপ্ন দেখেছিস লো, স্বপ্ন দেখেছিস।'

তাই মনে-মনে মেনে নিলেন চন্দ্রমণি। স্বপ্নই হবে হয়তো। কিন্তু, আশ্চর্য, রাত কি কখনো দিনের মতো স্পষ্ট হয়?

আরেক দিন।

যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রমণি, দেখতে পেলেন মহাদেবের গা থেকে একটা

আলো বেরিয়ে এসে ঘুরতে লাগল হাওয়ার মতো। ঘুরতে-ঘুরতে ছেয়ে ফেলল চন্দ্রমণিকে, তাঁর শরীরের মধ্যে ঢুকতে লাগল প্রবল স্রোতে। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কাছেই ধনী ছিল, ধরে ফেললে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধনীকে সব বললেন চন্দ্রমণি। ধনী বললে, 'তোর বায়ুরোগ হয়েছে।'

গয়া থেকে ফিরে এসে শুনলেন সব ক্ষুদিরাম।

'আমার পেটে যেন কেউ এসেছে—এমনি মনে হচ্ছে সত্যি—' চন্দ্রমণি বললেন স্বামীকে।

'গদাধর আসছেন—'

এবারের গর্ভধারণে চন্দ্রমণির রূপ যেন আর বাঁধ মানছে না। যেন লাবণ্যবারিধি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সে-রূপ বুঝি সূর্যোদয়ের আগেকার আরক্তিম আকাশের মতো।

'বুড়ো বয়সে গর্ভ হয়ে মাগীর রূপ যেন ফেটে পড়ছে—' বলাবলি করে পড়শিনিরা। কেউ বলে, 'পেটে ওর ব্রহ্মদত্যি ঢুকেছে—বাঁচলে হয় এবার।'

নানা রকম দিব্যদর্শন হচ্ছে চন্দ্রমণির। কখনো ত্রাস কখনো উল্লাস কখনো বা ঔদাসীন্য। কখনো বলেন, আমার এ গর্ভ পতিস্পর্শে ঘটেনি; কখনো বলেন, আমার মধ্যে পুরুষোত্তম এসেছেন। কখনো বা নিতান্ত অসহায়ের মত বলেন, 'আমাকে বুঝি গোঁসাইয়ে পেল।'

গোঁসাইয়ে পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া। সুখলাল গোস্বামীর মারা যাবার পর নানা রকম দৈব উৎপাত দেখা দিয়েছিল গ্রামের মধ্যে। লোকের বিশ্বাস হয়েছিল সুখলাল গোঁসাই মরে ভূত হয়েছে, আর আছে তাদের বাড়ির সামনেকার বকুল গাছের মগ ডালে। সেই থেকে কাউকে কখনো ভাবে পেলে লোকে বলত, গোঁসাইয়ে পেয়েছে।

কিন্তু ক্ষুদিরাম তাঁর মন খাঁটি করে রেখেছেন তাঁর ঘরে পুত্ররূপে নারায়ণ আসছেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে দোর-গোড়ায় শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ শুনতে পেলেন কোথায় যেন নূপুর বাজছে। কান খাড়া করলেন, আওয়াজ তো তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে। ঘর শূন্য দেখে বন্ধ করেছি দরজা, কেউ অগোচরে ঢুকে পড়ল না কি? ঢুকে পড়ল তো নূপুর পেল কোথায়? ত্রস্ত হাতে বন্ধ দরজা খুলে ফেললেন চন্দ্রমণি। কেউ কোথাও নেই। যেমনি শূন্য ছিল তেমনি আছে। কি আশ্চর্য, চোখের মত কানও কি ভুল করবে?

স্বামীকে বললেন এই নূপুর-গুঞ্জনের কথা। ক্ষুদিরাম বললেন, 'গোকুলচন্দ্র আসছেন।'

এক দিন মনে হল চন্দনের গাঢ় গন্ধ পাচ্ছেন চ'রদিকে। ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুতের খেলা দেখছেন। বুকের উপর উঠে কে এক শিশু গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, আর পিছলে পড়ে যাচ্ছে গড়িয়ে, দু'বাহু দিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারছেন না।

রঘুবীরের ভোগ রাঁধছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ যেন প্রসব-বেদনা টের পেলেন। বললেন, 'উপায়? এখন যদি হয়, ঠাকুরের সেবা হবে কি করে?'

'যিনি আসছেন তিনি রঘুবীরের সেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসবেন না।' বললেন ক্ষুদিরাম, 'তুমি স্থির থাক। যাঁর পূজা তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।'

ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগ আর শীতল শেষ হল নির্বিঘ্নে। রাতও প্রায় যায়-যায়। ধনী এসে শুয়েছে চন্দ্রমণির কাছে। বাড়িতে থাকবার মত দু'খানি চালা ঘর, তা ছাড়া রান্না-ঘর ঠাকুর-ঘর আর ঢেঁকি-ঘর। ঢেঁকি-ঘরেই আঁতুড় পড়বে বলে ঠিক হয়েছে। ঘরের এক দিকে ধান ভানবার একটা ঢেঁকি আর ধান সেদ্ধ করবার একটা উনুন।

রাত ফুরুতে তখনো আধদণ্ড বাকি, চন্দ্রমণির ব্যথা উঠল। ধনী তাকে নিয়ে এল ঢেঁসকেলে, শুইয়ে দিলে মাটির উপর। দেখতে-দেখতে প্রসব হয়ে গেল। যা অনুমান করা গিয়েছিল, পুত্র, নরবেশে পরম পুরুষই এসেছেন। প্রতিশ্রুত প্রতিমূর্তি।

এসেছেন? দেখেছিস তুই?

হ্যাঁ লো, দেখেছি। তুই চুপ কর। ঠাণ্ডা হ। দেখবি, তুইও দেখবি। এখন তোকেই আগে দেখা দরকার।

ধনী সাহায্য করতে গেল প্রসূতিকে।

কিন্তু এ কী সর্বনাশ, ছেলে কই? কই সেই নব-কলেবর?

চকা হরিণের মত ছটফট করে উঠল ধনী। কাঁপা হাতে বাতির সলতে বাড়িয়ে দিলে। ছেলে কই? দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল না কি?

ও মা, দেখেছ? পিছল মাটিতে হড়কে-হড়কে ধানসেদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। উনুনে আগুন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদি করা।

আলগোছে ধনী ছেলেকে টেনে নিলে কোলে। ছাই-মাখা ছেলে। ভাস্বর ভস্মভূষণ।

'ও মা, কত বড় ছেলে! প্রায় ছ'মাসের ছেলের মত!' ধনী নাড়ে-চাড়ে আর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে। খালি গা, অথচ মনে হয় যেন কত মণি-রত্ন পরে আছে। দ্বিতীয়া তিথি কিন্তু মনে হয় যেন অদ্বিতীয় চাঁদ।

বাংলা ১২৪২ সালের ছয়ুই ফাল্গুন—ইংরিজি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের সতেরোই ফেব্রুয়ারি। শুক্লপক্ষ, বুধবার। ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

ছেলে. কোলে নিয়ে বসে এক দিন রোদ পোয়াচ্ছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ মনে হল কোল জুড়ে যেন তাঁর পাথর পড়ে আছে ভার যেন বইতে পারছেন না।

এ কী হলো বলো দেখি?

কী আবার হবে। বিশ্বম্ভরের ভর হয়েছে ছেলের উপর।

অসহ্য! কোল থেকে ছেলে নামিয়ে নিয়ে কুলোর উপর শুইয়ে দিলেন চন্দ্রমণি। শিশুর ভারে কুলো চড়চড় করে উঠল। কুলো ভেঙে যাবে না কি? ব্যাকুল হাতে চন্দ্রমণি ছেলেকে আবার কোলে তুলতে গেলেন। ছেলে নিশ্চল—পাষাণ। দু'হাতে এমন শক্তি নেই যে টেনে তোলেন। যিনি গিরি ধরেছিলেন তিনিই যে শুয়ে আছেন কুলোর উপর তা কে জানে। চন্দ্রমণি কাঁদতে লাগলেন।

যে যেখানে ছিল ছুটে এল।

কি হলো? হলো কি?

'ছেলেকে কোলে তুলতে পারছি না—'

'কেন?'

'নিশ্চয়ই ওই নিম গাছের ব্রহ্মদত্যি ভর করেছে বাছার উপর—'

'কি যে বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়া, গা ঝেড়ে দিচ্ছি—' ধনী কামারনী কুলোর কাছে বসে মন্ত্র পড়তে লাগল।

নিমেষে শিশু হালকা হয়ে গেল। যেমন-কে-তেমন। তেমনি নবীন ও নিরীহ।

আরো এক দিন।

সংসারের কাজে গৃহান্তরে গিয়েছেন চন্দ্রমণি। মশারি ফেলা, পাঁচ মাসের শিশু ঘুমুচ্ছে বিছানায়। ঘরে ফিরে এসে দেখেন ছেলে নেই। তার বদলে মশারি-প্রমাণ কে-এক দীর্ঘকায় মানুষ শুয়ে আছে। নবোদ্গত গাছের বদলে বিরাট বনস্পতি।

চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রমণি: 'ওগো দেখে যাও, বিছানায় ছেলে নেই—'

'কি বলছ?' ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম।

'দেখ এসে। বিছানায় বাছার বদলে কে শুয়ে আছে।'

দু'জনেই তাকালেন মশারির দিকে। কই, তাঁদের সেই শিশুই তো শান্তিতে শুয়ে আছে। হাত-পা নেড়ে খেলা করছে আপন-মনে।

এ কী খেলা! এই যে দেখলাম মহাকায় মানুষ। আবার এই দুধের ছেলে

সব শুনে গম্ভীর হলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'কাউকে কিছু বোলো না।'

ছ'মাসে পা দিল শিশু। ছেলের মুখে-ভাতের জোগাড় করতে হয় এবার। বেশি জাঁক-জমক করবার অবস্থা কই? কোনো রকমে রঘুবীরের প্রসাদী ভাত মুখে দিয়েই নিয়মরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু পাড়ার লোকেরা নাছোড়বান্দা। এমন রাজ্যেশ্বর ছেলে, ভোজ দাও।

কারবারী ধর্মদাস লাহা ক্ষুদিরামের বন্ধু। এক পাড়ার বাসিন্দে। তাঁকে গিয়ে ধরলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'বন্ধু, এখন উপায়?'

ঈশ্বরই উপায়, আবার ঈশ্বরই উপেয়। যা তাঁর কৃপা তাই তাঁর শক্তি।

ভয় কি, লাগিয়ে দাও। রঘুবীর উদ্ধার করে দেবেন।' বললেন ধর্মদাস।

ধর্মদাসই ব্যবস্থা করলেন সব। তাঁর টাকার থলের মুখ খুলে দিলেন। পাড়ার লোককে তিনিই প্ররোচনা দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামের থেকে নেমন্তন্ন আদায় করার জন্যে। আবার তিনিই সব জোটপাট করলেন। এ-পাড়া ও-পাড়া কাকে ছেড়ে কাকে বলবেন—গাঁ-কে-গাঁ ঝেঁটিয়ে আনারই আসন পড়ল। জীবের মধ্যে যে শিব আছে, নিঃস্ব-নির্ধনের মধ্যে যে নারায়ণ, সেও তো আরাধনীয়। সেও তো সেব্য-পূজ্য।

কি নাম রাখবে শিশুর?

এ আবার জিজ্ঞাসা কর কেন? গয়াধামে স্বপ্নে গদাধরকে পেলাম। এ সেই গদাধর। গয়াবিষ্ণু।

ডাক-নাম?

আদর করে গদাই বলে ডাকেন বাপ-মা। ডাকে ধনী কামারনী।

দিনে-দিনে বাড়ছে গদাধর। বড়-সড় হয়ে উঠছে। চন্দ্রমণি তাকে মাঝে-মাঝে ধুতি পরিয়ে দিচ্ছেন।

লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সাধু-সন্ন্যাসীর নানান আনাগোনা। গদাধরের মন পড়ে আছে সেই সন্নেসীদের মাঝখানে। শুধু প্রসাদের লোভে নয়, হয়তো বা আর কিছুর আকর্ষণে। হয়তো বা কোনো জ্ঞাতিত্বের প্রতিশ্রুতিতে। আত্মভোলা শিশুর মাঝে বাসা বেঁধেছিল শিশু-ভোলানাথ।

মা নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছেন গদাধরকে।

কতক্ষণ পরেই এ তার কি পরিণতি। ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছে গদাধর। এক ফালা নিয়ে দিব্যি ডোরকপনি করে পরেছে!

'ও মা এ কি? এ তুই কী হয়েছিস?'

'অতিথি হয়েছি।'

'অতিথি? সে আবার কী?'

বুঝিয়ে দিল গদাধর। লাহাবাবুদের অতিথি-শালায় যারা আসে তাদেরকে অতিথি বলে না?

তারা তো সব সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি? মার মন হু-হু করে উঠল। আস্ত কাপড় দিলাম, তা ছিঁড়ে তুই কৌপীন বানালি?

গদাধর হাসল।

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর বুঝি এইটুকু একটু খণ্ড নিয়েই খুশি।

ছোট-ছোট তিনখানি খোড়ো ঘর, তার মধ্যে একখানি আবার ঢেঁকিশাল। আশে-পাশে গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল। দেখলেই মনে হয় গরিবের সামান্য কুটির। তবু, কে জানে কেন, ছবিতে এমন একটি ভাব, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় কী যেন এখানে আছে। কত না জানি শান্তি! কত না জানি দয়া! কত না জানি আশ্রয়!

পথ দিয়ে যেতে-যেতেও দাঁড়িয়ে যায় লোকেরা। ভাবে, কেন ভাবে কে বলবে, ঐখানে গেলে যেন তৃষ্ণার জল মিলবে, মিলবে যেন সমস্ত অসুখের আরোগ্য!

ঐখানে আছে কে? ও কার বাড়ি? ও কি কোনো মুনি-ঋষির আশ্রম?

চার

লাহাবাবুদের বাড়ির সামনে ঢালাও নাটমন্দিরে পাঠশালা। পাঁচ বছরের ছেলে তখন গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢুকল এসে সে পাঠশালায়।

সকালে-বিকেলে দু'বার করে পড়া হত। সকালে দু'-তিন ঘণ্টা পড়ে স্নানাহারের ছুট, বিকেলে এসে আবার সন্ধে পর্যন্ত। ইস্কুলের আর কিছুই ভালো লাগে না গদাধরের, শুধু আর কতগুলো ছেলে এসে যে জমেছে এইটেই মস্ত মজা। খুব করে খেলা করা যাবে। যেখানে যত বেশি প্রাণ সেখানেই তত বেশি লীলা।

যদি ঐ শুভঙ্করীটা না থাকত। ও দেখলেই কেমন ধাঁধা লেগে যায় গদাধরের। কষ্টে-সৃষ্টে যোগ যদি বা হল, বিয়োগ আর কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারল না।

কি করেই বা পারবে? যোগে আছে সর্বক্ষণ তাই যোগ করায়ত্ত। কিন্তু বিয়োগ আবার কি! কোথাও লয়-খয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। এখানে পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলেও থেকে যায় পূর্ণ।

পড়া বলতে বললেই মুস্কিল। তার চেয়ে স্তোত্র-প্রণাম দাও মুখস্থ বলে দিচ্ছে। বর্ণ-পরিচয় করে পড়তে যাওয়াটাই ঠিক, কিন্তু গদাধরের উলটো—তার পড়তে-পড়তে বর্ণ-পরিচয়। অঙ্ক দিলেই আতঙ্ক। অঙ্ক ফেলে তালপাতায় ঠাকুরের নাম লেখা অনেক আরামের। যা রাম তাই নাম।

পাঠশালের ছুটির পর মধু যুগীর বাড়িতে গদাধর প্রহ্লাদ-চরিত পড়ছে। ভিড় জমেছে চার পাশে। এমন শিশুর মুখে এমন মনোহরণ পড়া কেউ আর শোনেনি কোনো দিন। কাছাকাছি আমগাছের ডালে বসে এক হনুমানও শুনছে সেই পড়া, সেই স্বর-লহরী। হঠাৎ সে হনুমান এক লাফে নেমে এল গাছ থেকে, শিশুর কাছাকাছি এসে তার পা ধরে বসে পড়ল। গদাধর বিন্দুমাত্র ভয় পেল না, বরং হনু-মানের মাথায় দিব্যি হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে।

হনুমান যেন চিনতে পেরেছে রামচন্দ্রকে। প্রণামের বিনিময়ে আশীর্বাদ নিয়ে এক লাফে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল।

তেমনি গোচারণের মাঠে গিয়ে গদাধর ব্রজের রাখাল হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে জুটছে সব সেথোরা। কেউ হচ্ছে সুবল কেউ শ্রীদাম—কেউ কেউ বা দাম-বসুদাম। আর যে গদাধর সেই তো বংশীধর। চরে-চরে কাছে আসে গোধন, আপন হাতে ঘাস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাওয়ায়। কখনো বা লাফিয়ে-লাফিয়ে দোল খায় গাছের ডালে। কখনো বা পাড়ে কাপড় ছেড়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। কোঁচড়ে করে মুড়ি খায়। খেতে-খেতে নাচে। হাসে।

এক দিন তেমনি বাঁড়ুয্যে-বাগানের মাঠে গরু চরাচ্ছে সকলে। হঠাৎ গদাধর বললে, 'আয় সবাই মিলে আজ মাথুর গান গাই। গাইবি?'

সবাই একবাক্যে রাজি।

গাছের তলায় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল।

আজ কৃষ্ণ নেই। আজ রাধিকা। আজ কৃষ্ণ-কান্ত-বিরহিণী। কৃষ্ণ দেখেছিস এত দিন, আজ দেখ রাই-কমলিনীকে।

মাথুর-বিরহের গান ধরল গদাধর। সৃষ্টির মহা-মৌনের মাঝে যে শাশ্বত কান্না প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আপন হৃদয় নিঙড়ে তা উৎসারিত করে দিল। কোথায়—কোথায় তুমি কৃষ্ণ, কোথায় হে তুমি পরমতম আকর্ষণীয়! কবে আমার এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মিলবে গিয়ে তোমার নির্বিকল্প নির্বাণহীনতায়?

গাইতে-গাইতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গদাধর। জ্ঞান-চৈতন্য রইল না। সেথোরা অস্থির হয়ে পড়ল: 'ওরে গদাই, কি হল তোর? কেন এমন করছিস? চোখ চা।' কেউ গায়ে ঠেলা দেয়, কেউ চোখে-মুখে জল ছিটোয়, কেউ বা কি করবে বুঝতে না পেরে কাঁদে।

কে একজন হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলে: 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ—'

যে নামে অজ্ঞান সেই নামেই আবার জ্ঞান। যে নামে বৈরাগ্য সেই নামেই আবার প্রেম।

প্রাণকর কৃষ্ণ নাম শুনে উঠে বসল গদাধর। কোথায় কৃষ্ণ? চার পাশে সব বালক-বন্ধুর দল। এই তো! তোরাই কৃষ্ণ, তোরাই কৃষ্ণ। সমস্ত সংসারই কৃষ্ণময়।

এই সব খেলা-ধূলোতেই গদাধরের কেরামতি। লেখাপড়ায় মন যেন থা পাতে না, আর অঙ্ক তো ডাণ্ডোশ উঁচিয়ে আছে। তার চেয়ে গাঁয়ের কুমোররা যেমন মাটির তাল ছেনে মূর্তি গড়ছে, তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও, গদাধর পয়লা নম্বরের কারিগর। যদি বলো তো পট এঁকে দিতে পারি ওস্তাদ পটুয়ার মত। বেশ, ছবি-টবি চাও না, তবে গান শুনবে? কী গান গাইব? হরিনাম ছাড়া আবার গান আছে না কি? ভক্তি ছাড়া আর কিছু আস্বাদন আছে?

পূজায় বসেছেন ক্ষুদিরাম। সামনে শান্ত-সৌম্য রঘুবীরের মূর্তি। পাশে নানান রকম উপকরণ—তার মধ্যে একগাছি ফুলের মালা। ঠাকুরকে স্নান করিয়ে রেখে চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করছেন ক্ষুদিরাম। সেই স্নাত অঙ্গের পুণ্য স্পর্শের স্বাদ কল্পনা করছেন, ধ্যানে ক্রমশই অতলায়িত হয়ে যাচ্ছেন। সাড়া নেই স্পন্দন নেই। সে এক সীমাহীন সমাধি।

গদাধরের বড় সাধ ঐ চিকণ-গাঁথন ফুলের মালাটি গলায় পরে। অমনি তুলে নিয়ে গলায় দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। নয়নরোচন রঘুবীর সাজতে হবে।

শিলামূর্তির পাশে বসে পড়ল গদাধর। চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে মাখলে সারা গায়। থালার থেকে মালা তুলে নিয়ে নিজের গলায় দুলিয়ে দিলে। বললে বাবাকে উদ্দেশ করে: 'চোখ মেল। রঘুবীরকে দেখ। দেখ কেমন সেজেছে আজ রঘুবীর—'

ধ্যান ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চোখ মেলে দেখলেন, সামনে গদাধর ব'সে।

সেই দিন কি পুত্রবন্দনা করেছিলেন ক্ষুদিরাম? শিশুপুত্রের মাঝে কি লুকিয়ে আছে বালগোপাল?

রামশীলা দেবী ক্ষুদিরামের ছোট বোন। কামারপুকুরের কাছে হিলিমপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তিনি শীতলা দেবীর ভক্ত। মাঝে-মাঝে তাঁর উপরে শীতলা দেবীর আবেশ হত। তখন তিনি একেবারে অন্য রকম হয়ে যেতেন। একদিন ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন রামশীলা। এসেই আবার অমনি শীতলা দেবীর আবেশ হয়েছে। সবাই ভয়ে তটস্থ, কি করে কি হবে কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না। কিন্তু গদাধরের একরতি ভয় নেই। খুঁটে-খুঁটে দেখছে পিসিমার ভাব, যাকে এঁরা বলছেন, ভাবান্তর। চমৎকার অবস্থা তো—যেন অন্য কোথায় দেশ বেড়াতে যাওয়া। কে যেন দিব্যি ঘাড়ে ধরে তিন ভুবন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত, কিন্তু গদাধর প্রসন্নমুখে বলছে, 'পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়—'

সেদিন কি সেই তবে প্রথম ঘাড়ে চাপল গদাধরের ?

ছ'বছরের ছেলে ধান-খেতের সরু আল ধরে-ধরে চলেছে নিরুদ্দেশের মত। কোঁচড়ে মুড়ি, তাই তুলে-তুলে চিবুচ্ছে থেকে-থেকে। হঠাৎ কী মনে হল, আকাশের দিকে তাকাল একবার গদাধর। আকাশ তো আকাশই, শুধু তাকানোর মাঝেই তাৎপর্য। গদাধর দেখল এক বিশালকায় কালো মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কি দিব্য মহিমা এই মেঘমণ্ডিত আকাশে! চোখ আর ফেরে না গদাধরের। হঠাৎ এক ঝাঁক শাদা বক সেই কালো মেঘের গা ঘেঁসে উড়ে গেল দূরান্তরে। গদাধরের সারা গায়ে শিহরণ লাগল। এই অপূর্ব, অনির্বাচ্য সৌন্দর্য কে পরিবেশন করল ? কৃষ্ণিমার সঙ্গে এই শুভ্রতার যোগাযোগ ? এই দিব্য কাব্য কার রচনা ? হঠাৎ তার প্রতি গদাধরের প্রাণ-মন উড়ে চলল পাখা মেলে। দেহ-পিঞ্জর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চোখ মেলে চেয়ে দেখল বাড়িতে শুয়ে আছে। কে তাকে কখন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে। কে জানে ?

[ক্রমশঃ।

আপনি কি জানেন ?

ক, খ, গ,

১। বাংলার নবযুগের অন্যতম পুরোহিত আক্ষেপের স্বরে বলেছিলেন,—"দেখো বেরাদার, আমি মধু ও রুটি খাচ্ছি, আর লোকে বলে আমি গোমাংস খাই।" এই উক্তি কে করেছিলেন ?

২। এক স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলেছিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, খাবার ভাবনা কি ? চার বাড়ী থেকে চার মুঠো চাল ভিক্ষে করে—সেইগুলি ফুটিয়ে খেয়ে নিলেই জীবন ধারণ হল।" কে এই মহাপুরুষ ?

৩। সুদূর সমুদ্রপার থেকে এসেছিলেন সেই মহিলা। ভারতীয় শাস্ত্রে ছিল তাঁর সবিশেষ আকর্ষণ। ভারতবর্ষের কথা উঠলেই ভাবমগ্না হয়ে মেয়েদের বলতেন,—"ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা জপ করিবে, ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা!" সেই ভারত-প্রেমিকা মহিলাটি কে ?

৪ তিনি দেখেছিলেন দেশকে শুধু নয়, বিদেশকেও। বলেছিলেন,—"আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন-রাতই কর, আর তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক।" এই নতুন বাণীর মন্ত্র কে শুনিয়েছেন ?

৫। "ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বাঙালী, আজকের দিনে তাঁকে স্মরণ করুন।

৬। ইংরেজী ভাষার সব চেয়ে বড় শব্দ কি ?

৭। পৃথিবী-বিখ্যাত এক জন সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বধির। কে সেই ব্যক্তি ?

৮। সে এক মহা দুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। কোন্ সালের ঘটনা ?

৯। ছাপাখানা এক রহস্যময় জগৎ। ছাপাখানার সৃষ্টিকর্ত্তা কে বা কারা ?

১০। ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবী। পৃথিবীর গতির বেগ কত ?

১১। এক গাধার পিঠে গেরুয়া কাপড় দেখে এক মহাজ্ঞানী সেই গাধাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। কে সেই মহাপুরুষ ?

১২। সাগর-পারের দুই বিখ্যাত কবি—এক জন অন্ধ আর অপর জন খঞ্জ। দু'জনের নাম কি ?

১৩। গণিতের সংখ্যা সর্ব্বপ্রথম কোথায় আবিষ্কৃত হয় ?

১৪। পৃথিবী-বিখ্যাত এক বৈজ্ঞানিক। শৈশবে পাঠশালার শিক্ষক তাঁকে বলেছিলেন, "ঐ ছেলেটার মাথায় গোবর ভরা, ওকে আর পাঠশালায় রেখে লাভ নেই।" সেই বৈজ্ঞানিক কে ?

১৫। "আদমসুমারী" কথাটির অর্থ কি ?

১৬। বাংলা দেশেরই এক জন চিকিৎসক। কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করে অমরতা লাভ করেছেন। সেই চিকিৎসক কে ?

১৭। সূর্য্য ও চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগে কতক্ষণ ?

১৮। "হিন্দু-মুসলমান! আমাদের বচন মানো।" এমন কথা কে বলেছিলেন ?

১৯। মোম কোথায় পাওয়া যায় ?

২০। বাংলা ভাষায় প্রথম কি বই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয় ?

[১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ঋগ্বেদ—রূপান্তর

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪।৫১।১।১১॥

উষা দেবতা, বামদেব ঋষি, ত্রিষ্টুভ্‌ ছন্দ॥

ইদমু ত্যৎপুরুতমং পুরস্তাজ্‌

জ্যোতিস্তমসো বয়ুনাবদস্থাৎ।

নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্

গাতুং কৃণবন্নুষসো জনায়॥ ১।

অস্থুরু চিত্রা উষসঃ পুরস্তান্‌

মিতা ইব স্বরবোঽধ্বরেষু।

ব্যূ ব্রজস্য তমসো দ্বারো

চ্ছন্তীরব্রঞ্ছুচয়ঃ পাবকাঃ॥ ২।

উচ্ছন্তীরদ্য চিতয়ন্ত ভোজান্‌

রাধোদেয়ায়োষসো মঘোনীঃ।

অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্ত্ব

বুধ্যমানাস্তমসো বিমধ্যে॥ ৩।

কুবিৎস দেবীঃ সনয়ো নবো বা

যামো বভূয়াদুষসো বো অদ্য।

যেনা নবগ্বে অঙ্গিরে দশগ্বে

সপ্তাস্যে রেবতী রেবদূষ॥ ৪।

যূয়ং হি দেবীর্ঋতযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ

পরিপ্রযাথ ভুবনানি সদ্যঃ।

প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং

দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চরথায় জীবম্‌॥ ৫

ক্ব স্বিদাসাং কতমা পুরাণী

যয়া বিধানা বিদধুর্ঋভূণাম্‌

শুভং যচ্ছুভ্রা উষসশ্চরন্তি

ন বি জ্ঞায়ন্তে সদৃশীরজুর্যাঃ॥ ৬

তা ঘা তা ভদ্রা উষসঃ পুরাসুর্

অভিষ্টিদ্যুম্না ঋতজাতসত্যাঃ।

যাস্বীজানঃ শশমান উক্‌থৈঃ

স্তুবঞ্ছংসন্দ্রবিণং সদ্য আপ॥ ৭।

তা আ চরন্তি সমনা পুরস্তাৎ
সমানতঃ সমনা পপ্রথানাঃ।
ঋতস্য দেবীঃ সদসো বুধানা
গবাং ন সর্গা উষসো জরন্তে ॥ ৮ ॥

তা ইন্ন্বেব সমনা সমানীর্
অমীতবর্ণা উষসশ্চরন্তি।
গূহন্তীরভ্বমসিতং রুশদ্ভিঃ
শুক্রাস্তনূভিঃ শুচয়ো রুচানাঃ ॥ ৯ ॥

রয়িং দিবো দুহিতরো বিভাতীঃ
প্রজাবন্তং যচ্ছতাস্মাসু দেবীঃ।
স্যোনাদা বঃ প্রতিবুধ্যমানাঃ
সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ১০ ॥

তন্নো দিবো দুহিতরো বিভাতীর্
উপ ব্রুব উষসো যজ্ঞকেতুঃ।
বয়ং স্যাম যশসো জনেষু
তদ্দ্যৌশ্চ ধত্তাং পৃথিবী চ দেবী ॥ ১১ ॥

এই আমাদের নয়নের সম্মুখে—
প্রাচী-উদ্ভাসিনী,—
কান্তির প্রভূতি-কামিনী
উদিত হচ্ছেন—
তমঃখণ্ডী প্রসিদ্ধা সেই জ্যোতিঃ ;—
প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করে সর্ব্বলোক।
নিশ্চয়,
এঁরাই এই আকাশদুহিতারা
এই আভামতী উষারা—
মনুষ্যকে নিত্য দেখান
চলার পথ ॥ ১ ॥

উদয়মহিমায় পূর্ব্ব দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন
বিচিত্র-দৃশ্যা এই উষারা।—
অধ্বরে অধ্বরে
যূপের যেন প্রোথিত মূর্ত্তি।
ঐ দেখ, তাঁরা—
শুচিদীপ্তা, পাবকের স্বরূপতা—
খুলে দিয়েছেন
তমঃব্রজের দুখানি দুয়ার ॥ ২ ॥

আজ এই দিনে
ঐ দেখ—তাঁরা—মঘোনী উষাদেবীরা—
ভোগীদের চেতনা দিয়ে বলছেন—
"বিলিয়ে দাও, দাও তোমাদের ঐশ্বর্য্য।
যারা বণিক্, যারা আহুতিকৃপণ,
তাদের বিরাজ করতে দাও
জাগরণহীন সুপ্তিতে
অদর্শনীয় তমসার গহনতায় ॥ ৩ ॥

লীলা-প্রকাশনী হে আমার উষা
আজ এই যজ্ঞদিনে—
কোথায় আলো দিতে চলেছ,
নূতন বা পুরাতন সেই তোমাদের রথে ?
ঐ রথেই কি, হে ধনিকারা,
ঐশ্বর্য্য-দীপ্তি দান করেছিলে
সপ্তাস্য-নবগ্ব-দশগ্ব-নামা
অঙ্গিরাদের ? ৪ ॥

অনন্ত তোমাদের দীপ্তি-ক্রীড়া।
সত্যসন্ধী অশ্বেরা সদ্য তোমাদের নিয়ে যাবে
ভুবন হতে ভুবনে।

তোমরা চলো, তোমরা চলো,
যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগিয়ে দিয়ে চলো।
যারা দ্বিপাদ্, যারা চতুষ্পাদ্
জাগিয়ে দাও সেই পথিকদের ॥ ৫ ॥

এই উষাদেবীদের মধ্যে কোথায় ছিল—সে ?
কে ছিল সেই পুরাতনী ?—
যিনি একদা নিধান করেছিলেন
ঋভুদের কর্ত্তব্য-বিধান ?
শুভ্রা উষা যেখানে চরণ রাখেন, সে স্থান শুভ।
এঁদের সদৃশী, এঁদের মত নিত্যনবা অশীর্ণা—
আছে বলে আমাদের জানা নেই ॥ ৬ ॥

আমরা জানি, আমরা জানি।
কল্যাণবর্ণিণী ছিলেন এই উষাদেবীরা—
চলার পথে পথে ছড়িয়ে পড়ত ঐশ্বর্য্য-পুষ্প।
যজ্ঞীয় সত্যে তাঁদের জন্ম,
তাঁদের সত্য—সেই শুভ্রতা ॥
উক্থ-গীতের আনন্দিত স্তবনে
শাস্ত্রাভ্যাসের স্তোত্র-প্রচুরতায়
সগু ধনলাভ করতেন
যাজ্ঞিকেরা ॥ ৭ ॥

এই উষাদেবীরাই বিচরণ করেন সর্ব্বত্র,
পূর্ব্ব হতে পশ্চিমে—সর্ব্বত্র
ছড়িয়ে যায় তাঁদের সমান মন।
দিক্ হতে দিগন্তরে,
বিস্তৃতির সৌরভে।
স্তব কর তাঁদের—
যাঁরা যাজ্ঞিকসত্যের দেবী,
স্তব কর তাঁদের—
যাঁরা জাগ্রত রাখেন আস্থান
প্রাচীন বংশের পূর্ব্ব-যজ্ঞবেদীর,
স্তব কর তাঁদের—
যাঁরা সৃষ্ট হয়েছেন
—রশ্মিসম্ভারের সমূহতা ॥ ৮ ॥

ঐ দেখ সেই উষাদেবীরা—
তাঁরা চলেছেন—আজ চলেছেন—
এক তাঁদের মন,
এক তাঁদের রূপ,
পরিমিতির বাইরে
ছড়িয়ে পড়ছে বর্ণ।
অভ্ৰ-কে (মহৎ-কে) বারংবার গ্রহণ করে,
কৃষ্ণরূপকে বারংবার গোপন করে,
তাঁরা চলেছেন—চলেছেন,—
রুশৎ-শরীরের দীপ্তিমান শুভ্রতার জ্যোতিতে
রুচির করে দিয়ে সর্ব্বস্ব ॥ ৯ ॥

দ্যুতিমতী আদিত্যদুহিতৃ,—
তোমরা আলোকের বৈশিষ্ট্যে
দাও দাও—আমাদের দাও
প্রভাবন্ত ঐশ্বর্য্য।
সুবীর্য্য—সন্তানের জন্মভূঃ হয়ে
আমরা যেন জাগরিত হই,
শয়নবেদী থেকে বারংবার উঠি ॥ ১০ ॥

সেই জন্যেই, হে আমার আলোকবিভা
আকাশদুহিতারা
তোমাদের বলি—
যজ্ঞই আমার কেতু,
সম-মানুষের মধ্যে আমরাই হব
অন্নের প্রভু, কীর্ত্তির প্রভু।
হে দেবী উষা,
এই আকাশ, এই পৃথিবী—
—তাঁদের যেন হয় এই আধানপাত্র ॥ ১১ ॥

লেখকের শারীরিক অসুস্থতার নিমিত্ত মদীয় 'মাসিক বসুমতী'র বিগত কয়েক সংখ্যায় ঋগ্বেদ—রূপান্তরের ধারাবাহিক প্রকাশে সহসা বাধার সৃষ্টি হয়। এই সংখ্যা হইতে যথারীতি প্রকাশিত হইবে, এইরূপ আশা প্রকাশ করি—স

রত্নমালা

পঞ্চানন শর্ম্মা

গন্ধ—বাস, ঘ্রাণতর্পণ, প্রণয়, সম্পর্ক।
গল্প—ইতিহাস, জনশ্রুতি, কথাবার্ত্তা, গপ্প, কথোপকথন।
গভীর—গম্ভীর, গৃহীর, অতলস্পর্শ, গহেরা, গহরা।
গম—শস্যবিশেষ, গোধূম, গোম।
গমন—যাত্রা, চলন, যাওন, সরণ, সঞ্জম।
গমনাগমন—যাতায়াত, গমাগম, যাওয়া-আসা।
গম্য—প্রাপ্য, গমনযোগ্য, আগমনীয়।
গরল—বিষ, কালকূট।
গরিমা—দর্প, অহঙ্কার, দম্ভ, গুরুতা, আত্মম্ভরিতা, গর্ব্ব।
গরিষ্ঠ—অতি শ্রেষ্ঠ, গরীয়ান্, গুরুতর।
গো—গরু, অজ্ঞান, গোরু, গাভী, ধেনু, গাঈ, সৌরভেয়ী, উস্রা, শৃঙ্গিণী, মাতা।
গরুৎ—পক্ষ, পালখ, পাখা, ডানা।
গর্গরী—ক্ষুদ্র কলসী, গাগরী, গগরী।
গর্জ্জন—কোপ, উৎকট ধ্বনি, ভর্ৎসন।
গর্জ্জিত—মেঘধ্বনি, মেঘের শব্দ।
গর্দ্দভ—খর, গন্ধ, গাধা, রাসভ, বালেয়, চক্রীবান।
গর্ভ—অন্তরাপত্য, অন্তঃপুর, শিশু।
গর্ভিণী—অন্তঃসত্ত্বা, অন্তর্ব্বত্নী, গুর্ব্বিণী।
গর্হিত—ভর্ৎসিত, অকর্ত্তব্য, নিন্দিত।
গল—কণ্ঠ, গ্রীবা, কম্বু, ঘাড়।
গহন—ক্লেশ, দুর্গম্য, নিবিড় বন।
গহনা—আভরণ, ভূষণ, অলঙ্কার, ভূষা, অলংক্রি া, মণ্ডন, বিভূষণ।
গাত্র—শরীর, কায়, দেহ, বাহ্যভাগ, গা।
গ্রাম—গাঁ, পেট, উপনগর।
গাছ—গাছী, বৃক্ষ, গাচা, তরু, মহীরুহ, শাখিন, বিটপিন্, পাদপ, অনোকহ, কুঠ, শাল, পলশিন্, দ্রু, দ্রুম, অগম, বনস্পতি, স্থাণু।
গাড়ী—যান, শকট, রথাদি।
গাঢ়—অতিশয়, দৃঢ়, শক্ত, ঘন।
গাথা—ছন্দঃ, গীত, গান, শ্লোক।
গাদা—স্তূপ, রাশি, ঠাসা, পাঁজা।
গান—গীত, গাথা, সঙ্কীর্ত্তন।
গায়ক—গাথক, গায়িয়া, গানকর্ত্তা, গাহক।
গার্হস্থ্য—গৃহস্থ ধর্ম্ম, গৃহনিবাস।
গালা—লা, লাক্ষা, লাবাতী, জৌ।
গালি—কটূক্তি, গাইল, তিরস্কার, গালাগাল।
গিধর—শৃগাল, শিবা, জম্বুক, শিয়াল।
গির—গীঃ, বাণী, বাক্য, বচন।
গুঁড়—চূর্ণ, গুণ্ডিকা, টুকি, চূর্ণিত।
গুঁড়ি—চূর্ণ, আটা, থাম, কাণ্ড।
গুচি—গুছি, গুচ্ছ, ঝাড়, স্তবক।
গুচ্ছ—গোছা, স্তবক, ঝাড়, গুৎস, হারবিশেষ, থোবা, আঁট
গুটিকা—গুলি, বটিকা, ভাঁটা, বর্ত্তুল, গুটি।
গুণ—রূপরসাদি, রজ্জু, ধনুকের ছিলা, বিনয়াদি।
গুণকথন—স্তব, প্রশংসা, কীর্ত্তিবর্ণনা।
গুণপনা—যোগ্যতা, নিপুণতা, ক্ষমতা।
গুণবাদী—যশোগায়ক, কৃতজ্ঞ, স্তাবক।
গুণবান—নিপুণ, পটু, পণ্ডিত, গুণী।
গুণী—পণ্ডিত, কৃতী, নিপুণ, যোগ্য।
গুপ্ত—রক্ষিত, নিগূঢ়, লুক্কায়িত, অপ্রকাশিত, কঠিনার্থ।
গুবাক—গুয়া, সুপারী, ফলবিশেষ।
গুরু—ভারী, শক্ত, মান্য, মন্ত্রদাতা।
গুল—অঙ্গার গুটিকা, বটিকা, সংগ্রহ।
গুল্ম—লতা, ঝাড়, সেনা, রোগবিশেষ।
গৃহ—বেশ্ম, নিকেতন, আগার, ভবন, বাটী, ঘর, আবা পতনী, নিলয়, আলয়, সদ্ম, মন্দির, সদন, গেহ, বাসস্থান
গৃহিণী—গৃহের কর্ত্রী, পত্নী, ভার্য্যা।
গৃহীত—প্রাপ্ত, লব্ধ, ধৃত, স্বীকৃত।
গোকুল—গোষ্ঠ, গরুসমূহ, বাথান।
গোচর—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ, জ্ঞাতসার।
গোঠ—সভা, গোকুল, গোষ্ঠ, বাথান।
গোত্র—কুল, আদিপুরুষ, জাতি।
গোধূলী—সূর্য্যাস্ত কাল, সন্ধ্যা, দিনান্ত।
গোপ—গোপাল, গোসংখ্য, গোধুক্, আভীর, বল্লব।
গোরস—দুগ্ধ, দুধ, পয়ঃ, ক্ষীর।
গোষ্ঠী—বংশ, সভা, কুল, পরিবার।
গোসর্গ—প্রত্যুষ, প্রাতঃ, প্রভাত, ভোর।
গৌণ—অপ্রধান, অধীনতা, বিলম্ব।
গৌরব—প্রভাব, আদর, বৃদ্ধি, গুরুতা।
গ্রন্থ—পুঁথি, পুস্তক, হস্তলিপি, বই।
গ্রন্থক—লেখক, নির্ম্মায়ক, মালার সূত্র।
গ্রন্থন—রচন, নির্ম্মাণ, সংগ্রহণ।
গ্রন্থি—সন্ধিস্থান, গিরা, অভিসন্ধি।
গ্রহ—সূর্য্যাদি নব, আদান, ধরা, বোধ।
গ্রহণ—হস্তে লওন ; অঙ্গীকরণ, ধরণ।
গ্রাস—অন্নপিণ্ড, গিলনি, কবল।
গ্রাহক—গ্রহণকারী, ক্রেতা, গ্রহীতা।
গ্রীষ্ম—উষ্ণ, গুমটকাল, উত্তাপ, উষ্মক, নিদাঘ, উষ্মোপগ উষ্মাগম, তপ।

[ক্রমশঃ।

সংঘাত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় দৃশ্য

ন্যায়রত্নের বাড়ীর দাওয়া।
সামনে গ্রাম্য-পথ চলিয়া গিয়াছে।

এক দল যুবক পথের উপর ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা অত্যন্ত উত্তেজিত। দাওয়ার উপর ন্যায়রত্ন নীরবে মাথা ঈষৎ নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যুবকেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কটূক্তি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে ন্যায়রত্নের পুত্রবধূ সতীর ভাইও রহিয়াছে।

১ম যুবক। আপনি ভণ্ড—আপনি হৃদয়হীন।

২য়। ও-সব গোঁড়া বামনামি আপনার চলবে না।

৩য়। কেন আপনি এঁর ভগ্নীকে আটকে রেখেছেন?

১ম। তাঁর বৈধব্যের জন্য আপনি দায়ী।

সতীর ভাই। প্রকৃত বিচার করতে গেলে শশীশেখরকে হত্যা করেছেন উনি। ন্যায়রত্ন! ন্যায়বিচারের চরম আদর্শ দেখিয়েছেন! একটা কচি মেয়ে বৈশাখের দুপুরে জল অভাবে বুক ফেটে মরে যাচ্ছিল তার মুখে জল দেওয়ার অপরাধে পুত্রকে বর্জ্জন ক'রে ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখালেন! শাস্ত্র! শাস্ত্র উনি ছাড়া কেউ বোঝে না! উনি যদি এই গোঁড়ামি না করতেন তবে এত বড় কাণ্ডটা ঘটে? টুকরো একখানা মেঘ—কালবোশেখীর ঝড় বইয়ে দিলে! উনি এমন জেদ না ধরলে শশীশেখর বিধবা-বিবাহের বিধান দিত না।

যুবক। বিধবা-বিবাহও অশাস্ত্রীয় নয়। বিদ্যাসাগর মশায় প্রমাণ করে গেছেন।

সতীর ভাই। শশীশেখরও প্রমাণ সংগ্রহ করেছিল, নবদ্বীপে পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছে প্রমাণ উপস্থিত করে তাঁদের অধিকাংশের মত নিয়ে এসেছিল! সে মত উনি অগ্রাহ্য করেছেন। শোনেননি পর্য্যন্ত! দ্বারকা চৌধুরীর নেশাখোর ছেলেটা ওঁর গোঁড়ামির প্রশ্রয়েই এই কাণ্ড ক'রে দল। তারও পর ন্যায়ের আর এক পরাকাষ্ঠা দেখালেন আদালতে। জজ-জুরীদের কাছে নিজেকে সত্যের দেবমূর্ত্তি প্রমাণিত করে এলেন। বলুন তো, এর পর আমার ভগ্নীকে ভাগ্নেকে কি সাহসে কোন প্রাণে ওঁর কাছে রাখি?

যুবক। না—না—না। আপনি নিয়ে যান ওদের। পাগল না কি? ওই মমতাহীন মায়াহীন এক জন আত্মসর্ব্বস্ব লোকের কাছে কখনও কি রাখা যায়!

সতীর ভাই। আমি এলাম তো আমায় বললেন, তোমার মতামত আমি জানি। তুমি কোন কালেই শাস্ত্রকে—ন্যায়কে—সমাজ-রীতিকে শ্রদ্ধা করনি। তুমি ধনলোভে কুলভঙ্গ করে বাপ-মায়ের অমতে বিবাহ করে ঘর-জামাই হয়েছিলে। আজ তুমি এসেছ ভগ্নীর দুঃখে কাতর হয়ে, তারও অর্থ আমি জানি। তোমার বিবাহ আমি অনুমোদন করিনি! আমি অনুমোদন করলে তোমার বাপ-মা মেনে নিতেন। সুতরাং আজ তোমার সঙ্গে আমার পুত্রবধূ এবং পৌত্রকে তো পাঠাতে পারব না।

যুবক। তা পারবেন না, তবে এর পর ওই ছেলেটাকেও এমনি ভাবে বলি দিতে পারবেন, তখন হতভাগিনী পুত্রবধূ স্বামি-সন্তান-শোকে পাগল হবেন; উনি ভাগ্য বিধিলিপি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ইত্যাদির দোহাই দিয়ে হাতে একটি নারকেলের মালা দিয়ে পথে বের ক'রে দিতে পারবেন নিস্পৃহ নিরাসক্তের মত। বলবেন ও সব মিথ্যা। এ সব মায়া। হে ভগবান!

সতীর ভাই। এই সব লোকেই দেশটাকে উচ্ছন্নে দিলে মশাই! আত্মসর্ব্বস্ব ... এর দল কোথাকার!

যুবকেরা। ঠিক বলেছেন ভণ্ড—বুজরুক।

সতীর ভাই। জংসনে গিয়ে যদি আপনাদের সমিতির সন্ধান না পেতাম, তবে আমাকে চোখের জল ফেলতে ফেলতেই ফিরে যেতে হত।

যুবক। আপনি আশ্চর্য্য কুটিল চরিত্রের লোক! ওঁকে ওঁর ভগ্নীর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে দেননি?

সতীর ভাই। আমায় বললেন কি জানেন? বললেন—আমার পাঠাতে ইচ্ছা নাই। তবে বউমা যদি যেতে চান, তবে আমি নিষেধ করব না। বলে উঠে বাড়ীর ভিতর গিয়ে ফিরে এসে বললেন—তিনি যাবেন না, দেখা করতেও তিনি চান না।

যুবক। তিনি যেতে চান না? আশ্চর্য্য!

সতীর ভাই। মিথ্যা কথা মশাই। মিথ্যা কথা ব'লে উনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চান—

হঠাৎ ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিলেন, মানুষের দেহে হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িলে যেমন চমকিয়া উঠে—'মিথ্যা' ভাষণের অপবাদে তিনি তেমনি ভাবেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, মাথা সোজা করিয়া তাহাদের দিকে চাহিলেন। সমস্ত দেহ কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার দিকে চাহিয়া সতীর ভাই স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই ন্যায়রত্ন একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নারায়ণ স্মরণ করিয়া আবার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন।

ন্যায়রত্ন। নারায়ণ—নারায়ণ!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল সতী, ন্যায়রত্নের বিধবা পুত্রবধূ।

সতী। বাবা!

ন্যায়রত্ন একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মুখে সকরুণ হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। এতক্ষণে তিনি কথা বলিলেন।

ন্যায়। মা।

সতী। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অপমান সহ্য করছেন বাবা?

সতীর ভাই। সতী!

সতী। (তাহার দিকে একবার চাহিয়া আবার ন্যায়রত্নের দিকে চাহিল) আমি পূজোয় বসেছিলাম। কথা আমার সবই কানে এল, কিন্তু পূজো ছেড়ে উঠতে পারলাম না। এরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে অপমান করলে, আপনি প্রতিবাদ করলেন না?

সতীর ভাই। সতী, আমি এসেছি তোকে নিতে, উনি আমাকে তোর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে দিলেন না। বাড়ীর ভিতর গিয়ে ফিরে এসে বললেন—তুই আমার সঙ্গে যেতে চাস না—

সতী। উনি মিথ্যা কথা বলেননি দাদা, আমি তাই বলেছি।

যুবক। আপনি কি ভয় পাচ্ছেন এঁর সামনে? বলুন আপনি—আপনার কোন ভয় নেই।

সতী। ভগবান আপনার কল্যাণ করবেন, আপনি অভয় দিতে চাচ্ছেন ভদ্রাতুরকে। কিন্তু আপনাদের ভুল হয়েছে। ভয় আমি পাইনি। আমার শ্বশুর—যাঁকে আপনারা এত কটূ কাটব্য করলেন—তিনি কখনও কোন দিন ভয় কাউকে দেখান না। তাঁকে আমি আমার অন্তরের কথা বলেছি—নির্ভয়ে বলেছি—উনি আমায় বার বার বলেছেন, মা, সঙ্কোচ কোরো না—ভয় কোরো না। আমি অসঙ্কোচে নির্ভয়েই বলেছি। আবারও বলেছি সকলের সামনে—এই আমার ঘর, আমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না। আমার শ্বশুরই আমার একমাত্র আশ্রয় [illegible] আমি [illegible] পারব না। শুধু তাই নয়, আমার এই দাদা, [illegible] ধনবান—তিনি এক দিন আমার স্বামীকে [illegible] পাগুরে বলে, নিজের বাপ-মাকে [illegible] দেখেননি—[illegible], পুরোহিতের কর্ম্ম করেন বলে। [illegible] এই কথাই আমি বলিনি, আমার শ্বশুর [illegible] ছিলেন, আমিই [illegible] ছিলাম—না।

যুবক: (সতীর ভাইয়ের প্রতি) [illegible] কি বলছেন উনি?

সতীর ভাই। যা বলছেন—সে আপনারাও শুনলেন, আপনাদের সঙ্গে আমিও শুনলাম। আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করবেন বৃথা কষ্ট দিয়েছি আপনাদের। আমি থাকতে পারিনি শশীশেখরের শোচনীয় পরিণামের কথা শুনে। ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু। [illegible] আচ্ছা সতী আমি চললাম।

[প্রস্থান।

যুবক। চল হে, আমাদেরও চল।

যুবক। (সতীর প্রতি) আপনি কিন্তু ভাল করলেন না। আপনার ভাইয়ের সঙ্গে গেলেই আপনার মঙ্গল হ'ত।

(সতী ম্লান হাসি হাসিল। কোন উত্তর দিল না। যুবকের দল চলিয়া গেল। ন্যায়রত্ন তখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতী এবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল—)

সতী। বাবা!

ন্যায়। মা।

সতী। আমার জন্যে আপনার এই অপমান হ'ল বাবা।

ন্যায়। না মা।

সতী। আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন বাবা?

ন্যায়। না মা। সান্ত্বনা দিতেও মিথ্যার আশ্রয় নেবার অধিকার তো মানুষের নাই। বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণের। আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি।

সতী। আপনার প্রাপ্য?

ন্যায়। হ্যাঁ মা—আমার প্রাপ্য।

সতী। কি বলছেন বাবা?

ন্যায়। যা আজ সত্য বলে মনে হচ্ছে, তাই বলছি মা। তুমি তো দেখেছ মা, আমি আজ দু'মাস পৃথিবীর সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছি। তোমার সঙ্গেও নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিনি। টোল উঠিয়ে দিয়েছি। এ সব সামান্য কথা মা, আমার চাঁদ চন্দ্রশেখরকে আমি কোলে নেবার অবকাশ পাইনি। আমি ভেবেছি মা। ভেবেছি ভুল আমার—না—ভুল শশীশেখরের?

সতী। বাবা, থাক ও-সব কথা।

ন্যায়। থাকবে? বেশ থাক। কিন্তু—কিন্তু শুনতে যে তোমাকে এক দিন হবেই মা। তোমার কাছে—চন্দ্রশেখর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত যদি এ জীবন বইতে হয়, তবে তার কাছেও এক দিন আমাকে বলতে হবে—ভুল বোধ হয় আমার।

সতী। বাবা!

ন্যায়। হ্যাঁ, মা, মনে হচ্ছে ভুল বোধ হয় আমার।

সতী। না বাবা, না।

ন্যায়। তোমার মত আমারও মন প্রথম প্রথম এমনি আকুল চীৎকার করে বলেছে—না—না—না। ভুল শশীশেখরের। তা মনে ক'রে চিন্তা শেষ ক'রে দিতে পারলে শশীশেখরের বাপের পক্ষে হ'ত সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। মনের ধর্ম্মই তাই। তাই সে নিরোধী চিন্তাকে বর্জ্জন করে, তার দিকে পিছন ফিরে বসে থাকে চিরকাল। কিন্তু মা, চিরজীবন সত্যকে যে মাথায় ক'রে এসেছে—সে তো তা করতে পারে না। শশীশেখরের মুখ যত বার মনে পড়ল, তত বার তার ঠোঁট দু'টি যেন নড়ে উঠল। সে আমাকে বার বার বলেছিল—আমি প্রমাণ দেব—আমি প্রমাণ দেব। আমি সে প্রমাণ গ্রহণ করিনি। ভেবেছি—আমি যা জেনেছি—যা বুঝেছি—এর পর আর নেই। শশীশেখরকে আমি পরিত্যাগ করলাম, তুমি শশীশেখরের সঙ্গে গেলে না, তবু শশীশেখর নিরস্ত হল না—নিজের সত্য তার ম্লান হল না। অবশেষে সে প্রাণ দিলে। যার জন্যে সে এমন ভাবে সব বলি দিলে—তার মূল্য তখনি আমার কাছে তার স্বরূপ নিয়ে দেখা দিলে। আমি ভাবিত হলাম। আজ দু' মাস আমি ভাবছি। মনে হচ্ছে—ভুল আমার। কাল পরিবর্ত্তনশীল মা। এক এক কালে মহাকাল এক এক রূপে খণ্ডকালের মহেশ্বররূপে অবতীর্ণ হন। কাল পালটেছে মা। আমি বিগত কালের মানুষ সেই কালের পূজারী, এ কালে নূতন রূপে আবির্ভূত মহাকালকে পূজা করতে আমি অস্বীকার করেছিলাম, মহাকাল আমার হাত দিয়ে আমার পুত্র বলি গ্রহণ ক'রে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। ভুল আমার—ভুল আমার।

কথা বলিতে বলিতে এক সময় ন্যায়রত্ন দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। সতী আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর সহ্য করিতে

পারিল না। দ্রুত ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। ন্যায়রত্ন একাই শেষের কথাগুলি বলিয়া গেলেন।

নিঃশব্দে বাহির হইতে রূপচাঁদ প্রবেশ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল—অপরাধীর মত। ন্যায়রত্ন মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন।

ন্যায়। বউ মা!

কেহ উত্তর দিল না। ন্যায়রত্ন চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া রূপচাঁদকে দেখিলেন।

ন্যায়। রূপচাঁদ!

রূপচাঁদ আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল।

রূপ। ঠাকুর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

ন্যায়। ক্ষমা কিসের রূপচাঁদ? কি হল।

রূপ। হয়েছে ঠাকুর, হয়েছে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি—

ন্যায়। কি, বল? তুই কি! কি করেছিস্?

রূপ। আমি। ঠাকুর, আমিই গিয়েছিলাম বউ মায়ের ভাইয়ের কাছে। আমিই তাকে বলেছিলাম—তুমি বউমাকে আটকে রেখেছ। ভেবেছিলাম ঠাকুর—বউমা—চন্দ্রশেখরও হয়তো তোমার কোপে বাঁচবে না। আমিই তাকে এনেছিলাম। আমার ভুল ভেঙেছে ঠাকুর। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

ন্যায়। তোর অপরাধ কিছু হয়নি রূপচাঁদ। তুই ঠিকই করেছিস্। ওরে আমারও যে মধ্যে মধ্যে ভয়-ভয়—।

রূপ। কি ভয় হয়, ঠাকুর?

ন্যায়। ভয় হয়, হয়তো—যদি বেশী দিন বাঁচি—তবে এই চন্দ্রশেখরের সঙ্গেও এক দিন আমার এমনি সংঘাত বাধবে। ভয় হত—।

রূপ। না—না ঠাকুর, ও-কথা তুমি বলো না। তা তুমি পারবে না। ঠাকুর, তুমি আজ দু' হাতে মুখ ঢেকেছ, ভুল তোমার—এই কথাটা একবার নয় দশ বার বিশ বার বলেছ। তা তুমি পারবে না।

ন্যায়। পারব না। তুই ঠিক বলেছিস্ রূপচাঁদ।

(অকস্মাৎ বাড়ীর ভিতরে সতীর উচ্চ তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল।)

নেপথ্যে সতী। না—না—না! সে হবে না।

নেপথ্যে শিশু-কণ্ঠ। না—না—না! আমি যাব—।

নে—সতী। না।

(ন্যায়রত্ন চকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। রূপচাঁদ দাঁড়াইয়া উঠিল।)

রূপ। এই দেখ, বউমা মারছে চাঁদুকে। চাঁদু—অ চাঁদু!

(রূপচাঁদ বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। বিপরীত দিক হইতে সমবেত কণ্ঠের গান শোনা গেল। ন্যায়রত্ন সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে রূপচাঁদ সাত-আট বৎসরের চন্দ্রশেখরকে লইয়া প্রবেশ করিল। ওদিকে শোভাযাত্রা নিকটে আসিল।

রূপ। দেখ—কি রকম সেজেছে দেখ! ছোট ছেলে জ্ঞান থাকলে এই কথা বলে?

ন্যায়। কি বলেছে? দাদু!

(ঠিক এই সময়ে শোভাযাত্রা প্রবেশ করিল)

পতাকায় লেখা 'নবযুগ' '[illegible]'। ছেলেরা গান গাহিতেছে।

'জয় জ্ঞান—জয় জ্ঞান—নব অরুণোদয়
পূর্ণ বিকাশ—হোক জ্যোতির্ময়।"

শোভাযাত্রার পুরোভাগে—সম্মুখের দল প্রবেশ করিল। তাহার পুরোভাগে নিরঞ্জন চৌধুরী। ন্যায়রত্ন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিরঞ্জন চৌধুরী আসিয়া বলিলেন—

(গান থামিল)

চৌধুরী। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি যাবেন না, তা আমি জানি। তবুও নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজ আমাদের স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। চৌধুরীদের বাগান-বাড়ীতে আমার বাবার নামে আমি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করছি। আমার বাবা—[illegible]—এর জন্য অর্থ দান করেছিলেন।

ন্যায়রত্ন। কল্যাণ হোক তোমার।

চৌধুরী। (ইঙ্গিত করিয়া) ওদের—শোভাযাত্রীদের দিকে।

ন্যায়রত্ন। একটু অপেক্ষা কর। একটু অপেক্ষা করুন।

ন্যায়রত্ন চন্দ্রশেখরকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।
শোভাযাত্রীরা গান গাহিতে লাগিল।

হে অপরাজিত বাণী—
আমরা জানি—
অপরাজেয় বাণী—অপরাজেয় সাধনা।
হে নব জাগ্রত প্রাণ
চির যৌবন তব দান—
হে মৃত্যুঞ্জয় আশা
তুচ্ছ নাশা
অন্ধকার দূর হোক অজ্ঞান হোক ক্ষয়।

গান শেষ হইবার পর ন্যায়রত্ন প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে চন্দ্রশেখর—তাহার পরনে নূতন বিদ্যার্থীর পোশাক—পরনে নূতন কাপড়—গলায় নূতন চাদর—বগলে স্লেট এবং বই। ন্যায়রত্ন প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

ন্যায়। আমার পৌত্রকে—শশীশেখরের পুত্রকে আপনাদের হাতে দিচ্ছি। ও নিজে আসতে চেয়েছে আপনাদের বিদ্যালয়ে পড়বার জন্য। ওর মা ওকে সেজেছেন। আমি জানতাম না। আমি জানতাম না। একে আপনাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে নিন। প্রণাম কর, চন্দ্রশেখর—প্রণাম কর।

(চন্দ্রশেখর প্রণাম করিল, ন্যায়রত্ন হাতজোড় করিলেন।)
যবনিকা নামিয়া আসিল।

ক্রমশঃ।

[পূর্বানুবৃত্তি]

অ, আ, ই

যাঁরা এসেছে তাদের কয়েক জনকে দেখেছে সে। তারা নতুন নয়। আরও দু'-চার বার কলকাতায় তারা এসেছে। **দেখেছে** বাঙলার মাটি। আর যারা, তারা একেবারে আনকোরা। **তারা** শুনেছে, বাঙলার মাটিতে না কি যা ফলাবে তাই ফলবে। **কখনও** চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি এত **অসংখ্য সজীব, জীবন্ত গাছ**। এত ফুল আর এত ফল। **এই গহন অরণ্যের আবেষ্টনে এমন স্বর্গপুরী**। কাঙালের ভেতরে এই শহর কলকাতা।

গাছ, শুধু গাছ। বাঙলার প্রাকৃতিক বৈভব। **কলকাতার আবেষ্টন বৃক্ষ-প্রাচীর**। **ঈশ্বরের রক্ষা-ব্যূহ**। **আম, জাম, কাঁটাল**। **তিন্তিড়ী**, কদম্ব, বাবলা, হরীতকী। বট, অশ্বত্থ, শেওড়া, শিশু, **সেগুন, শাল**। সুন্দরী, শিমুল, আমলকী। তাল, সুপুরী, নারকেল। **আর বাঁশ গাছ**। যেদিকে তাকাও সেদিকে। যেন সীমাহীন। **তাই ওদের অবাক** চোখ। বিহ্বলতার আবেশে তন্দ্রালু **দৃষ্টি**। **না-দেখা** বাঙলার এই জাগ্রত স্বপ্নে।

যারা নতুন তাদের চিনিয়ে দেয় এব [illegible] বয়সে যে **সকলের বড় সে**। বাসদেও মাহাতো। পাকা [illegible] সে **গণ্যমান্য**। **বলে**,—হুজুর, শুকদেবপ্রসাদের দুই ছে [illegible] আছে এরা। **আউর হিয়ে** ভগবান সিংকা ভাই আছে। এরা বাঙলা মুলুকে **আসিয়েছে এই** প্রথম।

বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। **নবাগতদের মুখাবয়ব** এক লক্ষ্যে **দেখে** নেয়।

শুকদেবপ্রসাদ আর ভগবান সিং। **স্মৃতির পটে** দু'জন **বৃদ্ধকে** দেখতে পায়। বহু বার দেখেছে **তাদের চণ্ডীমহলে আর** এই **কলকাতায়**। মনে হয়েছে তারা যেন **আপন জনের** মত। **আত্মীয়-স্বজন**। তাদের বুকে-পিঠে চড়েছে সে। পিতার **জীবিত** কালে যখন চণ্ডীমহলে যায় তখন **ঐ শুকদেবপ্রসাদ** আর **ভগবান** সিং মাটিতে তাকে পা দিতে দেয়নি। **হুজুরের ছেলে** দয়া **করে** এসেছেন তাদের দেশে বেড়াতে, তাই উৎসবের আয়োজন **হয়েছিল কাছারীর** প্রাঙ্গণে। ক'দিন, ক'রাত্তির। **রামলীলা, প্রহ্লাদ**-চরিত আর পুতুল নাচ। চণ্ডীস্থান মৌজার **যতেক প্রজা সপরিবারে** ভিড় **জমিয়েছিল ঐ উৎসবের আসরে**। **দেখতে এসেছিল হুজুরের ছেলেকে**। **রাজার কুমারকে**। **তাদের ভবিষ্যতের রাজাকে**।

একটু একটু মনে আছে কৃষ্ণকিশোরের। সেই **উৎসবের রাত্রি**। শত শত নর-নারীর অবিরাম কলকাকলী। **কাছারীর চত্বরে মানুষ** আর ধরে না। মেয়েছেলের দল আসছে **ইদিক-সিদিক থেকে**। **দল** বেঁধে, সারি বেঁধে। তাদের মাথায় পোড়া **মাটির কালো কলসী**। দুধ এনেছে তারা। ঘরের গাইয়ের **দুধ**। **আর এক সুরে** গাইছে ননীচোর যশোদা দুলালের **শৈশব-লীলা**। **পায়ে** তাদের গোছা-গোছা রুপোর ফাঁপা মল। চলছে **আর শব্দ হচ্ছে** ঝমাঝম্।

আসরের মধ্যিখানে জ্বলছে গোটা কয়েক রাম-মশাল। **গভীর** রাতের ঘন অন্ধকার সেই আগুনের প্রলয় নর্তনে **কম্পমান**। **মৃদঙ্গ আর** করতালির ঘন ঘন ঝঙ্কারে কত বার তার **ঘুম ভেঙে** গেছে। শুনেছে, **রামগান হচ্ছে**। সমস্বরে।

এই উৎসবের আয়োজন করেছিল **ঐ শুকদেবপ্রসাদ আর** ভগবান সিং। একটা টাটুতে চাপিয়ে তাকে ঘুরিয়েছিল **মহলের চৌহদ্দীতে**। পথের দু'পাশের ঘরের দরজায় দেখেছিল **অসংখ্য জনতার ভীড়**। **দর্শনপ্রার্থীর** দল। **নর, নারী, শিশু**।

কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করলো,—**আর এরা কারা বাসদেও? এদের কখনও** দেখেছি মনে হয় না তো।

পাশাপাশি বসেছিল তিন জন।

তাদের চোখে সরল দৃষ্টির ছায়া। মুখের ভাবে **অজ্ঞতার স্পষ্ট ইঙ্গিত**। যেন দেখে-শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়েছে। **ঘরের** দেওয়াল দেখছে। কড়িকাঠে চোখ বুলছে।

বাসদেও মাহাতো হেসে ফেললো। খুব খানিক হেসে **বললে** স্বর নামিয়ে,—ইস, চিনতেই পারলেন না তো?

হাসির রেশ টেনে বললে কৃষ্ণকিশোর,—**না, কৈ না তো!**

বাসদেও মাহাতো হাসতে হাসতে বলে,—ওরা তিন **জন** হুজুরের এই গোলামের তিন লেড়কা আছে।

কথার শেষে নিজের বুকে হাত রাখলো **বাসদেও মাহাতো। স্তব্ধ দৃষ্টিতে** তিন জনে তাকিয়ে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, **রৌদ্রদগ্ধ**। **মুখাকৃতি** অদ্ভুত এক তিন জনের। দেখলেই **অনুমান করা যায়, তিন জনেই** এক গাছের **ফুল**। **তিন জনের কপালে চন্দনের**

উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর। পশ্চিমে সিংভূম; বরাভূম, সাঁওতাল পরগণা। পূর্ব্ব দিকে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা আর চট্টগ্রাম। বাঙলা দেশ নদীর দেশ। তাই এখানে ফসল হয় প্রচুর।

শ্রোতার দল হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

হুজুর দয়া ক'রে নিজ মুখে বলছেন। তাদের কি সৌভাগ্য! বাসদেও মাহাতো ছেলেদের হয়ে শুধোয়—কিসের ফসল হয় হুজুর?

কৃষ্ণকিশোরের মন তখন ইতিহাস-ভূগোলের পৃষ্ঠায়। কিসের ফসল হয় তার সব কি মনে আছে। বাঙলার মাটি এতই উর্ব্বরা যে, যা ফলাবে তাই ফলবে। সমুদ্রের ঢেউ দেখলে চাও তো বাঙলার ক্ষেত্র কর্ষণ করো। বাঙলার মাটি চিরদিনের।

পিসীমা বলতেন প্রবাদ মত উর্ব্বরার কথা।

হেমনলিনী পোষাকে ঢাকা হয়ে থাকেন। কিশোর শিখেছে তাঁরই কাছে। শুনেছে সব বাঙলার বাঙলার ইতিবৃত্ত। শুনে-শুনে কিশোরের মনে আছে সব না হলেও কিছু কিছু। বাঙলা নদীর দেশ। তাই ঘরে ঘরে দেখো না লক্ষ্মীপূজা হয়। বছরে বছরে, মাসে মাসে, হপ্তায় হপ্তায় লক্ষ্মীর উৎসব। তাঁরই আশীর্ব্বাদী ধান বাঙলার সোনামুখী ধান। অন্নক্ষেত্র এই বাঙলা দেশ। বাঙলা অন্নপূর্ণা।

আর শুধু কি এক রকমের! রকম রকমের।

মতিচুর, দাউদখানী, কালোজিরে, মোগলাসরী, দাদখানি, কাটক, কাজলি, কালোশালি, রাঁধুনীপাগল, ক্ষীরকদম, চিনিশক্কর, পেনেটী, ভোজশালি, ধানেশালি, মানিকমুড়ি, মধুশালি, গোপালভোগ, কনকচূড়, বাদশাভোগ, রাঁধুনিপাগল, দুধসর, রামভোগ, সীতাভোগ, বেনাফুল, হাঁসরাজ, রামভোগ, পদ্মমালাশালি।

কিন্তু পিসীমা কি সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। কাছারী-বাড়ীর এই ঘরে।

কৃষ্ণকিশোর বলে—আরো হয় অনেক। পাট, সরষে, কার্পাস, মসিনা, গম, যব, মুগ, মসুর, কলাই, মটর, ছোলা, অড়হর, খেসারি, তিল, মৌরী, ধনিয়া, ইক্ষু, আলু, পলাশু, হরিদ্রা, লঙ্কা, রসুন, তিসি, তামাক, পিঁয়াজ, তরিতরকারী।

বলতে বলতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এক নিঃশ্বাসে এতগুলি নাম বলে যায় সে।

শ্রোতার দল পরস্পরের মুখের দিকে কি বলাবলি করে বিস্ময়ের সুরে। কোন কথা না বলে শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি বিনিময় করছে।

বাসদেও মাহাতো হুজুরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

অন্নদেবের নিজের মুখে যেন আসল কথা। বলতে বলতে তার চোখ দুটো যেন সত্যিই বড় হয়ে যায়। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই প্রকৃতির দান ক'টা দেশের কপালে থাকে!

বাসদেও মাহাতো সবিনয়ে বলে,—আর হুজুর, শুনেছি বাঙাল মুলুকে লোহার নানা কিছু তৈরী হয়। আমার একটা ঝাঁপি চাই হুজুর!

কথা বলতে বলতে লজ্জিত হয় বাসদেও মাহাতো। কারণ, সে যা চাইছে তা তার নিজের প্রয়োজনে নয়। তার গৃহলক্ষ্মীর আবদার হয়েছে বাংলা দেশের ঝাঁপি চাই একখানা। বাসদেও মাহাতোর স্ত্রী না কি একটু বেশী পান খায়। এই রক্তমুখী বুড়ীকে জানে কৃষ্ণকিশোর। বুড়ী ঘরের কোণে বসে থাকে, ছ্যাঁচা পানের ছিবড়ে চিবোয় আর হুঁকোয় তামাক খায়। দু'কানে তার আট দু'গুণে ষোলোটা রূপোর চুড়ী। মাথা থেকে যেন কান দু'টো খসে পড়বে মনে হয়।

কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পারে ঝাঁপি কি হবে। হাসতে হাসতে বলে,—বৌ বুঝি বলেছে বাসদেও? তাকে তুমি নিয়ে এলে না কেন?

বাসদেও মাহাতো ফোকলা মুখে হাসতে শুরু করলো। এ কথা শুনে লজ্জা পায়। বাসদেও মাহাতো ভয় না পেয়ে হাসে আর বলে,—ঠিক বলিয়েছেন হুজুর। বুড়ী তো চলতে-ফিরতে পারে না। লাঠির সাহায্যে উঠতে ভি পারে না।

কৃষ্ণকিশোর ঐ বুড়ীকে ভুলতে পারে না কোন দিন। একবার মহলে গেলে বুড়ী তাকে নেমন্তন্ন করেছিল। মাটির ঘর-দোরে পিটুলীর আলপনায় ভরে দিয়েছিল সেদিন। নিজের কোলে বসিয়ে নিজের হাতে হুজুরের ছেলেকে খাইয়েছিল ছানার মালপো, পেস্তা-বাদাম, আম আর ক্ষীরের লাড়ু। শেষে বিদায়কালে পরনের কাপড়ে তার পা মুছিয়ে নিয়ে গাঁয়ের যত বাসিন্দার মাথায় ঠেকিয়েছিল।

বাসদেও মাহাতোর বাড়ীতে সেদিন ছোটখাটো একটা মোচ্ছব হয়েছিল। কৃষ্ণকিশোরকে শুধু হাতে আসতে দেয়নি বুড়ী। উপহার দিয়েছিল প্রকাণ্ড একখানা কাঁথা। জমিতে তার কালো সুতোর নক্সা। নিজের হাতে না কি তৈরী করেছিল বুড়ী। না কি দেড় বছর লেগেছিল শুধু ঐ নক্সার কাজ করতে। অনেক মেহন্নতের বস্তুটি হাসতে হাসতে দিয়ে দিয়েছিল। এখনও সযত্নে রাখা আছে সেই কাঁথাখানা। জমির কাপড় নেহাৎ সাদা সুতোর, নয় তো কাশ্মীরী জামিয়ারও হার মেনে যায়।

কুমুদিনী বলেছেন,—তোলা থাক। তোর বৌ এসে শীতে গায়ে দেবে!

হাসতে হাসতে বললে কৃষ্ণকিশোর,—শুধু কি ঝাঁপি তৈরী। বাঙলা দেশে লোহার কত কি তৈরী হয়। ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, কাটারি, দা, খড়্গ, তরবারি, বল্লম, শড়কী, বন্দুক, কামান, গজাল, বঁটি, সাঁড়াশি কত কি। ঝাঁপি, কুরুনী, বাক্স কত কি।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওরা।

ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি কি কথা কয়। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাসদেও মাহাতো বলে,—বাস্ হুজুর, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

কৃষ্ণকিশোর কথা বলছে কিন্তু সে যেন আসলে কথা বলছে না। কথার ফাঁকে-ফাঁকে কি এক চিন্তায় কোথায় যেন চলে যাচ্ছে একেবারে। কি যেন সে ভাবছে। যার কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না এমন কিছু কি? মনে হয়, বড় বেশী চিন্তাকুল যেন সে। যেন কি এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন।

ম্যানেজার বাবু এতক্ষণে হঠাৎ দেখা দেন। ধূমকেতুর মত।

সকালে উঠে স্নান সেরে সেই যে একবার চুলে টেরী কেটেছিলেন এখনও তার এতটুকুও নড়চড় হয়নি। সোজা সিঁথির দু'পাশে ঢেউ খেলানো চুল। মাথার পেছনে চুল নেই, ক্ষুর বুলানো।

পার্কের একখানা বেঞ্চীতে বসেছিল সে চুপ-চাপ।

তার চার দিকে নানা গাছের ঝোপ। নানা ফুলের। দেখলে তাকে কে বলবে বাঙালী। মনে হবে ইউদা-কা-বাচ্ছা। কিংবা পার্শী। কিন্তু তা নয়।

তিন দিনের দেখায় ভিন্ন ভিন্ন বেশে দেখা যায়। অবাক হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর।

প্রথম দিন নাবিকদের সাদা জিনের পোষাক।

দ্বিতীয় দিন তিন টুকরোর স্যুট। আর তৃতীয় দিনে কি না ধুতি আর পিরাণ। সুঁড় আর বুট থেকে একেবারে সাপের চামড়ার লপেটা।

অবাক করলো তাকে। কৃষ্ণকিশোর বেঞ্চীতে গিয়ে বসলো তার পাশে। জিজ্ঞেস করলো—তোমার নাম কি ভাই?

লাল আলপাকার রুমালে মুখ মুছতে থাকে সে। একটু হেসে বলে,—নাম দিয়ে কাম কি ভাই?

কৃষ্ণকিশোর আশা করেনি তার মুখ থেকে হাসি আর পরিহাসের বাঙলা ভাষা বেরোবে। সেও হাসে। খুশীর মৃদু হাসি। বলে,—বল না, দরকার আছে। তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?

সে একদম বাঙলায় ধরায়!

কোন দিকে না তাকিয়ে। নির্ভাবনায়। বলে,—নিশ্চয়ই করব। যাতে এই পৃথিবীতে সকলেই তো সকলের বন্ধু। আমার নাম মাষ্টার নর্মান অরুণেন্দ্র মুখাজ্জী।

কৃষ্ণকিশোর শুনতে পায়। কিন্তু বুঝতে পারে না। বলে,—কি, কি নাম বললে?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে আবার বললে সে,—ভাল করে শুনে নাও, মাষ্টার নর্মান অরুণেন্দ্র মুখাজ্জী।

সে এতশত বুঝতে পারে না। শুধু বোঝে সে বাঙালী। বাঙলায় কথা বলতে পারে। আর তার সহজ বাঙলায় যাকে বলে নিশ্চয়ই মুখোপাধ্যায়। মুখাজ্জী যার অপভ্রংশ।

এক দিন বাড়ীতে ফিরে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠেছিল কৃষ্ণকিশোর।—মা, মা অরুণ বাঙালী। বাঙলায় কথা বলতে পারে।

এক বিন্দুও আনন্দ প্রকাশ না করে কুমুদিনী বলেছিলেন,—হোক বাঙালী! তবুও সে খৃশ্চান। বিধর্মী।

কৃষ্ণকিশোর থ' হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, মা যেন তার বিচার না করে কথা বলছেন। তাকে না জেনে বলছেন। তাকে না দেখেই। তার সম্বন্ধে কত দিন কত কথা বলবার থাকে তার। আর বলে না মাকে। ঐ এক কথা বলেন কুমুদিনী,—সে খৃশ্চান। সে বিধর্মী। তার ছায়া মাড়াবে না তুমি।

কিন্তু সত্যিই কি দেখতে সে অদ্ভুত ভাল নয়। কেমন ভাল চেহারা। কেমন দুধের মত ফর্সা রঙ। কেমন বড় বড় চোখ। কেমন কোঁকড়ানো চুল। কেমন মিষ্ট কথা। আর কেমন তার হাসি। কেমন তার বেশ-ভূষা।

নিশ্চুপ হয়ে যখন বসে থাকে কৃষ্ণকিশোর, তখনই যেন মুখখানা তার ভেসে ওঠে চোখের সমুখে। বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে ধারালো দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টিতে তার ষড়রিপুর একটিরও ছায়া নেই। আছে, অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্তি। নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্র, অরু অরু—

আরাম-কেদারা থেকে উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। তীব্র এক বিরক্তির অনুভূতিতে বড় বিশ্রী লাগছে আজকের আবহাওয়া। যত কিছুর বাধা হয়েছে ঐ পণ্ডিত মশাই। মাকে যেন পেয়ে বসেছেন। যা বলবেন তাই।

—কোথায় তুমি পড়ো? জিজ্ঞেস করেছিল কৃষ্ণকিশোর।

—হিন্দু কলেজে। তুমি?

কৃষ্ণকিশোর যেন বলতে লজ্জানুভব করে। বলে,—পণ্ডিত শিরোমণি তর্করত্নের টোলে। পটলডাঙ্গায়। ব্যাকরণ আর অলঙ্কার পড়ছি।

তার পর দেখা হয়েছে কত দিন।

কত কথা হয়েছে। দিনের পর দিন বেড়াতে এসে বসে বসে মন-জানাজানির পালা চলেছে। এ কথা থেকে সে কথায় চলে গেছে। এমন কি কুমুদিনীর অজ্ঞাতে ফিরতি পথে কৃষ্ণকিশোর তার সঙ্গে গেছে তাদের বাড়ী। রিপন ষ্ট্রীটে। এক-আধ দিন নয়। এমন অনেক দিন।

দেখেছে অরুণের বাবাকে। মিষ্টার নর্মান বিনয়েন্দ্র মুখাজ্জী। অরুণের মাকে দেখতে পায়নি। তিনি আছেন। কিন্তু কোথায় থাকেন তা কোন দিন বলেনি অরুণ। আর দেখেছে এক জনকে। ছায়াকে।

ছায়া আর অরুণ। ভাই-বোন।

কুইন এলিজাবেথের মত মুখের গড়ন। ওভ্যাল বাটের ধাঁচ। রুক্ষ সোনালী এলানো চুল। পরনে লেসের ঘাগরা। কানে আর গলায় অপেল পাথরের দুল আর মালা। একেকটা পাথর যেন একেক ফোঁটা জলবিন্দু। ছায়ার বুক জুড়ে থাকে সেই মালা। এক ঝাঁক জলের ফোঁটা। আলো-আঁধারিতে হরেক রঙের আভা দেখা দেয়। আর ঠোঁট দুটো তার ডালিমের মত রাঙা।

ছায়ার পদ্মবরণ চোখে যেন সাগর-পারের ছায়া। যেন ঠিক বাঙলা দেশের মেয়ে নয়। কোন অচিন্ দেশের মেয়ে। ছায়া তার নাম। বাপ নাম লিলি। বেথুন বিদ্যালয়ের খাতায় আছে মিস্ লিলিয়ান মুখোপাধ্যায়।

—হুজুর, বাঁদিমা বললেন আপনি স্নান সেরে নিন। বেলা প্রায় একটা বাজলো।

কথা শুনে চমক ভাঙে কৃষ্ণকিশোরের। কোথায় সে ছিল এতক্ষণ। কার ভাবনায় বিভোর। বললে,—জল দাও স্নানের ঘরে।

কলের ঘরে কল নেই। পুকুরের জলে চৌবাচ্চা ভর্ত্তি করতে হয়। তার জন্যে সময় লাগে অনেকক্ষণ। আবার বসে ঐ আরাম-কেদারায়।

দেখতে দেখতে বেলা বয়ে যায়। ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টায় ঘা পড়ে। একটা। গাছে গাছে কাকের কা-কা শুরু হয়েছে। চৈত্রের মধ্যদিনের প্রখর উত্তাপে কাকের দল তৃষায় কাতর। রৌদ্রে সূর্য্যকরোজ্জ্বল দগ্ধতা।

মা ডেকেছেন। উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর।

তার মনের মধ্যে তখন ঝড়ের তুফান উঠেছে। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ছে শিরোমণি তর্করত্নকে। কুমুদিনীকে। পিসীমা হেমনলিনীকে। আর সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে অরুণকে। আর ছায়াকে।

শিরোমণি তর্করত্নের উদ্ধত কথা। কুমুদিনীর কাতর দৃষ্টি। হেমনলিনীর সস্নেহ আদর-আপ্যায়ন। অরুণের সম্মোহনী চোখ। আর, আর ছায়া না লিলিয়ান, তার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টোকে।

এতগুলি জীবন্ত বস্তুর সংমিশ্রণে চিন্তায় তার খেই হারিয়ে যায়। ওলট-পালট হয়ে যায় সব কিছু, মনে তার রসাতল বেধে যায়।

কৃষ্ণকিশোর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এগোতে থাকে অন্দরের দিকে। মনে পড়ে ওরা হয়তো খেতে বসেছে। চণ্ডীমঙ্গলের প্রজারা।

রান্না-বাড়ীর দিকে চলে। গিয়ে দেখে কুমুদিনী স্বয়ং তাদের আহারের পর্য্যবেক্ষণ করছেন থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে। ছেলেকে দেখতে পেয়ে ফিস-ফিস ক'রে বললেন,—আর কত বেলা করবে? এধারে যে একটা বেজে গেছে। বেলা তিনপ্রহর।

রামদেও মাহাতো খেতে খেতে বলে,—হুজুর, কৃপা করকে আস্নান সেরে নিন। বেলা বহুৎ হয়েছে।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—লজ্জা ক'রে খেও না রামদেও, কে কি নেবে, তুমি তদারক করো। আমি যাচ্ছি স্নান সারতে।

ওরা লজ্জা না ক'রে পরমোল্লাসে খায়। বাঙালী রান্না।

দাদখানি চালের ভাত। সোনা মুগের ডাল। আলু-পটলের দম। বড়ি-বেগুনের ঝাল। মিষ্টি কুমড়োর ছক্কা। আলু বখরার চাটনী। মিষ্টি আর দই।

পলকের মধ্যে যেন ব্যবস্থা করছেন কুমুদিনী। ভাঁড়ার খুলেছেন আর উনুনে তুলেছেন। ভাঁড়ার না কি তাঁর কামধেনু। যখন যা চাইবে তাই পাওয়া যায়। অসময়ের যা, তাও।

তবুও চণ্ডীমঙ্গলের প্রজারা নিরামিষাশী। মাছ-মাংসের বালাই নেই। ওরা স্পর্শ করে না। ওরা যে মা চণ্ডীর স্থানের মানুষ। শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্যের শিষ্য। বীর হনুমানের ভক্ত।

অনেক দূর থেকে, স্নানের ঘর থেকে অঙ্গে বিলিতী সাবান ঘষতে ঘষতে শুনতে পায় কৃষ্ণকিশোর। ওরা সমস্বরে চিৎকার করছে—হনুমান জী কী জয়!

কৃষ্ণকিশোরের মনের মধ্যে তখনও ছায়া না লিলিয়ান তার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টো যেন কথা কইছে। কি যেন এক অব্যক্ত আবেগে সকল কিছু ছাপিয়ে মাত্র ঐ একটি বস্তুর লোভানিতে মনটা তার বারে বারে সাড়া দিচ্ছে, একটা নয়, দু'টো। ছায়ার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টো।

কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পারে ওদের আহার-পর্ব্ব চুকলো। ওরা ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করছে।

যার যা ইচ্ছা করুক। কিন্তু ঐ শিরোমণি, সে কেন এসে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে।

অরুণ বলেছিল,—আরে ছোঃ! ঐ পণ্ডিতের কাছে প'ড়ে তুমি বিশ্বজয় করতে বেরোবে? ইংরিজী না জেনে বেঁচে থাকবে এই দুনিয়ায়। আরে, আরে, ও-সব সেক্ অফ্ করে দাও এই মুহূর্ত্তে। সংস্কৃত, সে তো তোমার শেষ বয়সের। কথায় কথায় হাসতে শুরু করে অরুণ। বলে,—যখন তুমি গীতা পড়বে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে। তখন। কিন্তু ইংরিজী। I can't dream even of it! মাপ করো ভাই আমাকে।

কৃষ্ণকিশোর বলেছিল,—কিন্তু মা বলেন, বাবা না কি বলতেন, পৃথিবীর যা-কিছু সব ঐ সংস্কৃতের মধ্যেই আছে। বেদ আর বেদান্তেই সব।

আবার হেসে ফেলে অরুণ। বলে,—কিন্তু যাকে পেছনে ফেলে এসেছি তাকে যদি পেছন ফিরে আবার পাকড়াও করতে যাই, তা হলে? আমরা এগিয়ে যাব না পিছিয়ে থাকব?

আর কোন উত্তর দেয় না কৃষ্ণকিশোর। স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যেন পেছন পানে বৈদিক যুগের সেই শুচিস্নাত কালের দিকে। সেই যখন আর্য্যরা ভারতবর্ষের অধীশ্বর। যখন সেই আর্য্যরা বলছে,—ত্যাগ কর! ম্লেচ্ছদের আবাসভূমি ঐ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ।

অরুণ তার কথার জের টেনে বলে,—আরে বেরাদার, চলে এসো হিন্দু কলেজে। দেখো ডিরোজিওকে। তার পর দেখো তুমি নিজেই কি কর।

ডিরোজিও। হেনরী ডিরোজিও!

বিলিতী সাবানের সুগন্ধ। আর ঐ ছায়ার ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট দু'টো। হিন্দু কলেজ। কুমুদিনী শিরোমণি আর ঐ হেনরী ডিরোজিও।

কৃষ্ণকিশোর বিলিতী সাবান অঙ্গে ঘষতে ঘষতে ভাবে, আর ভাবে। কূল-কিনারা কৈ খুঁজে পায় না। সামনের আর পেছনের টানে একাকার চিন্তায় তার ছেদ পড়ে কখনও-সখনও। কিন্তু কৈ পরিচ্ছেদ পড়ে না!

সে ভাবছে। অন্ততঃ একবার দেখবে চোখের দেখা। অরুণকে বলবে, এক দিন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখাতে। রোমান প্যাটার্ণের আকৃতির আর অদ্ভুত প্রকৃতির ঐ সাহেবকে। সে চাক্ষুস দেখতে চায়।

তোয়ালেয় মাথা ঘষতে ঘষতে স্নান-ঘর থেকে বেরোয় কৃষ্ণকিশোর। আর নিজের মনে মনে আওড়ায়,—ডিরোজিও! হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও!*

[ক্রমশঃ।

* লেখক বলছেন, তিনি না কি এই লেখাটি লিখতে অনেক সৎ এবং অসৎ গ্রন্থের সাহায্য পাচ্ছেন। এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থকারদেরও সাহায্য পাচ্ছেন। এই সঙ্গে দু'-চারটি নামও তিনি বলে রাখছেন, নয় তো অনুসন্ধানীর দল আবার রট্ ক'রে কখন বলে বসবেন যে, লেখক না কি আত্মসাৎ করছেন।

আপাততঃ যাঁদের নাম ব্যক্ত করছেন। তাঁদের সঙ্গে আপনাদের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। না থাকে আপনাদের দুর্ভাগ্য। যথা, হুতোমপেঁচা, ভবানীচরণ, টেকচাঁদ এবং ইদানীংয়ের শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই।

পারবে। এ সব ব্যাপারে আমার ধারণার যথেষ্ট পরিচয় আছে তোমার এবং এত কথা না বললেও তুমি যে আমাকে ঠিক মতো বুঝতে পারবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমার শত্রুর অভাব নেই। মিসেস্ গড্উইনের বড্ড ভয় আমার পিছনে দাঁড়ানোর হয়ত কারুর প্রয়োজন হতে পারে। একটি বিষয়ে আমরা দ্বিমত। হয় এ কাজ সমর্থন করতে হবে আর নয় ত (এতে আমার সব চাইতে বেশী মত) ব্যাপারটাকে পুরোপুরি চেপে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বর্ত্তমানে এইটুকু অন্ততঃ আমাদের করা উচিত যে, জীবনে কলংকের ছাপ লাগবার আগেই মেয়ে দু'টিকে সংপথে ফিরিয়ে আনা। কাক পক্ষীকেও এ ঘটনা জানতে দেওয়ার চেয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা না করাকেই আমি সহস্র গুণ শ্রেয়ঃ মনে করি। এই চিঠিগুলি একমাত্র প্রমাণ আমার হাতে আছে—কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চিঠিগুলি ফেরং দেবে আমাকে।

কলংকের কথা যখন উল্লেখ করছি, তখন মেয়েদের ক্ষেত্রে এ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করছি, সে কথা বলার বোধ হয় কোন প্রয়োজন নেই। জেন শুধু অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়েছে··· সন্তানোচিত স্নেহের অভাবের পরিচয় দিয়েছে সে—যা তার কাছ থেকে পাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। মেরী ত চরম অপরাধ করেছে। ইতি

তোমার উইলিয়ম গড্উইন।

রঞ্জিত সিংহের পুত্র কেন খৃষ্টান হয়েছিলেন?

পঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত সিংহের পুত্র দলীপ সিংহের অভিভাবক স্যর জন লগিনের কাছে দলীপ সিংহের ভৃত্য লালা ভজনলাল নীচের পত্রখানি লিখেন—

ফতেগড়, ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৫১

মহাশয়,

আপনার যাইবার পর কি কারণ মহারাজা জাতিত্যাগের সঙ্কল্প করেন তাহা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। আমি যাহা জানি লিখিতেছি।

মহারাজা "ইংলিস্ ইনষ্ট্রাক্টার" হইতে পাঠ লইতে থাকেন। বইখানির শেষ দিকে খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ছিল। একবার আপনি মহারাজাকে বলেন—"এই সব আমাদের ধর্ম্মের কেতাব-পত্র, যদি পড়িতে চাও পড়, যদি না চাও পড়িও না।" কিন্তু মহারাজা আমাকে বলেন—"আমি সব জানতে চাই—আমি পড়ব।" তিনি খৃষ্টানী বইগুলো পড়ে ফেলেন। সব সময় তাঁর কাছে থাকতাম। আমাদের শূদ্রদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রশ্ন করতেন। বলতেন গঙ্গাজীতে স্নান করে কি লাভ? পাপ কাজ করে গঙ্গায় নাইলেই কি স্বর্গে চলে যাব? উত্তরে বলেছিলাম—"মহারাজ, আমাদের শাস্ত্রের এ সব ব্যবস্থা, কিন্তু স্বর্গে যাব কি নরকে যাব, তা জানি নে।" তিনি বলেছিলেন—"সবই ত আমাদের কাজের উপর নির্ভর করে।" এই ভাবে কথা হত।

বৈশাখ মাসে মহারাজা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থেরও কিছু কিছু পাঠ শুনতে শুরু করলেন। একখানি গ্রন্থ-পাঠে পণ্ডিতের মুখে শুনলেম এক রাজার কথা—যিনি অন্নগ্রহণ করবার পূর্ব্বে প্রত্যহ প্রাতে দশ হাজার গো-দান করতেন। সারা জীবন এই ভাবে করেছিলেন। কিন্তু যদি দান করা কোন গরু ফিরে আসত বা তাঁর অজ্ঞাতসারে ভৃত্যরা দানের জন্য সংগ্রহ করে আনত, তিনি তা দান করবার জন্যে নরকে গেলেন। পণ্ডিতের কথা-পাঠ শেষ হলে মহারাজের ভৃত্য জিউইনদা বলল—"প্রতিদিন অতগুলো গরু সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার।" মহারাজও বললেন—"ঠিক বলেছ, গাঁজাখুরি। এই জন্যেই ত পণ্ডিতরা যা বলেন তার অনেক কথাই আমি বিশ্বাস করিনে।" অনেক বার এমন আলাপ কথাবার্ত্তা হ'ত। দেখেছি কুসংস্কার মানতেন না, মানতেন মাত্র যুক্তি।

এখন সাহেব, আপনি ত গেলেন কলকাতা। তার কিছু দিন পর মহারাজা আমার হাতে একখানি বাইবেল দেখে বললেন—"বিক্রী করবে?" বললুম—আপনাকে বিক্রী করতে পারি? তবে বলেন ত দিতে পারি, যদি আমার সাহায্য না নিয়ে বইএর একটা অধ্যায় নিজে পড়তে পারেন। পড়লেন; আমিও বাইবেল তাঁকে দিলাম।

এর অল্প ক'দিন পর আমায় বললেন তাঁকে বাইবেল শোনাতে। তাই করলুম। প্রথম দিন সেন্ট ম্যাথুর ৬ষ্ঠ অধ্যায়, সারা হপ্তায় আরও কয়টি অধ্যায়। কখনও বাইবেল, কখনও তামাসা, কখনও "বয়েজ ওন বুক" থেকে পাঠ। তবে এ কথা ঠিক বলতে পারি যে, কোন ইংরেজ তাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি, বা তাদের কোন ধর্ম্ম-বই তাঁর কাছে পাঠ করেনি।

এই হপ্তা কেটে গেলে মহারাজ ক্যাপ্তেন ক্যাম্পবেল ও মিঃ গাইনকে জানালেন যে খৃষ্টান ধর্ম্মই সত্য, তাঁর ধর্ম্ম সত্য নয়। তাঁরা বললেন—"মহারাজ, মন যদি তোমার তাই-ই বলে, বেশ ত। আপনার সত্য ধারণা হলেই আমরা খুশী হব।"

জিজ্ঞেস করলুম—"সত্যি বিশ্বাস করেন, না তামাসা করলেন?" বললেন—"সত্যি বিশ্বাস করি, আমি খৃষ্টান হব।"

দুই-তিন দিন পর, এক রবিবার বেলা বারটায় সহরের বাড়ীতে আমি ফিরলে মহারাজ বললেন—"ভজনলাল, আমি খৃষ্টান হয়েছি।" বললুম—"কি খেলেন?" বললেন—"কিছু খাইনি, তবে মন বদলে গেছে। দেখ আজ আমি খেলতে যাইনি, খেলতে ভাল লাগছে না।"

সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তাঁর প্রিয় বাজ পাখীটিকে নিয়ে খেলতে বের হলেন। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম—"এই ত বলে গেলেন আজ আর খেলবেন না, কিন্তু বাজ পাখী নিয়ে খেলা—" বললেন—"ভুল হয়ে গেছে, দুঃখিত।"

দু'দিন পর বললেন, টমি স্কট আর রবি কারশোরের সঙ্গে বসে চা খাবেন। বললুম—"যা খুসী করুন, আখেরে যাতে ভাল হয় তাই যেন করবেন।"

বুধবার সহরে আমার কাজ ছিল। ১২টার সময় ছুটি নিলাম। সন্ধ্যায় ফিরে দেখি মহারাজের ঘরের টেবিলে বসে মহারাজ, টি স্কট, আর কারশোর। টেবিলে চায়ের পেয়ালা সাজান। মহারাজ নিজে জল গরম করছেন, আমাকে দেখতে পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "দেখে নাও নিজের হাতে চা তৈরী করছি, আমরা তিন জন একসঙ্গে বসে খাব।"

বললাম—"বেশ ত, যা খুশী করুন। তবে এক কথা বলে দিচ্ছি, ঃ লোগিন সাহেব ফিরে না আসা পর্য্যন্ত চা ত খাবেনই না, কিচ্ছু ;বেন না।" উত্তরে বললেন, "ডাঃ লোগিন আমায় এ সব করতে বেন কি না, তা তুমি বুঝি বলতে পার না!"

এই বলে চলে গেলেন। নিজের হাতে চা তৈরী করলেন। স্কট ও বি কারশোরের সঙ্গে বসে খেলেন। বেশ আনন্দ পেলেন। বে ডাঃ লোগিন এতে খুশী হবেন কি না এই তার চিন্তা রইল। যদি াপনি তাঁকে জাতি-ত্যাগ করতে অনুমতি দেন, তাহলে রাজা র খুশী হবেন এবং জাতি-ত্যাগ করে সুখী হবেন।

যত দূর আমি জানি, আপনাকে ঠিক ঠিক জানালাম।

ভবদীয় বিশ্বস্ত

জজুনলাল

অরবিন্দের খোলাচিঠি

[১৯০৯, ১লা জুলাই বিলাতে বিপ্লবী ধিংড়া গুলী করে হত্যা করলেন বাজ্জন উইলিকে। ৩১শে জুলাই বিপ্লবী অরবিন্দ, ইংরেজ তাঁকে গ্রেপ্তার করবে আশঙ্কা করে, দেশবাসীকে এই খোলা চিঠিতে তার রাজনৈতিক মত ও পথের কথা জানিয়েছিলেন]

"জনরব, কলকাতার পুলিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে আমার নির্বাসনের প্রস্তাব পেশ করেছে।···যদি আমি নির্বাসিত হই, আর নির্বাসন থেকে যদি ফিরে না আসি, তাহলে আমার দেশবাসীর কাছে নীচের লেখা প্রস্তাবগুলো আমার শেষ রাজনৈতিক উইল বলে গণ্য করা হতে পারে—

১। সম্পূর্ণ আইন মেনে চলে স্বাতন্ত্র্য ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ।
২। অধিকার খর্ব নয়, সহযোগিতা নয়।
৩। ভেদমুক্ত কংগ্রেস।
৪। বয়কট—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।
৫। বিভিন্ন প্রদেশে সংগঠন।
৬। কর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগ।

বিপিন পালের পত্র

[বিপ্লবী ধিংড়ার বিস্ফোরণ বিলাতে বিপ্লবী বিপিন পালকেও বিচলিত করেছিল। তাঁর নামের চিঠিখানি সেকালের 'কর্ম্মযোগিন্' পত্রে ১৯০৯, ৭ই আগষ্ট ছাপা হয়েছিল]

বাংলায় যে সন্ত্রাসবাদী নানা রকমের কাজ হচ্ছে তার মনস্তাত্ত্বিক হেতু ও কারণ হ'ল সরকারী দমন-নীতি। এই নীতির নিন্দা করা যদি অপরাধের হয়, তাহলে আমি অপরাধ স্বীকার করছি আর এর জন্যে আমাকে আদালতে অভিযুক্ত করতে গবর্ণমেণ্টকে বলছি। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা যদি অপরাধের হয়, তাহলে এ অপরাধও আমার স্বীকার না করে উপায় নাই। কিন্তু এটা প্রণিধানযোগ্য যে, যত দিন এই পত্রের সম্পাদনা-ভার আমার উপর ছিল, আর যদিও আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি যে, জাতীয় কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তবু এর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হয়নি।

গত ৫।৬ বৎসর আমি যা লিখেছি বা যা বলেছি তার কোন কথার অদল-বদল করবার নেই আমার, তা ভালই হোক বা খারাপই হোক। যদি আমার সে সব মত অপরাধের হয়ে থাকে তাহ'লে সে জন্যে আমাকে অভিযুক্ত করা হ'ল না কেন? যে ভাবে যে কোন কথার রাজদ্রোহকর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সেখানেও আমাকে রাজদ্রোহের জন্য কখন গ্রেপ্তার করা হয়নি।

শুনেছি, সম্প্রতি ভারতে কোন এক জজ আমার ফটো রাজদ্রোহকর বলে প্রচার নিষিদ্ধ করে রায় দিয়েছে, কিন্তু মূল মূর্ত্তিটির বিরুদ্ধে এখনও কোন রায় দেওয়া হয়নি।

আপনি কি জানেন?

শ্রীহর্ষ

১। চুম্বক সব সময় উত্তর-দক্ষিণ মুখে থাকে। ভূগোলের উত্তর-দক্ষিণ কি সেই একই দিক?

২। ভারতবর্ষের কোন্ সঙ্গীতজ্ঞ হিন্দু সম্রাটের মুদ্রায় তাঁর বীণা-বাদক মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে?

৩। বাংলা দেশের সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি ছাপ আছে কোন্ মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে?

৪। প্রকৃতির যাদুঘরে হীরে আর কয়লা তৈরী হয়। তাদের উপাদান কি পৃথক্?

৫। বাংলা সাহিত্যে উনপঞ্চাশী নামে অমর হয়ে রইলেন কে?

৬। জীবাত্মা কাকে বলে?

৭। জীব-জগতের আদিমতম প্রাণী কে?

৮। ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট হলেন মাহ্মুদ শাহ। সর্বশেষ কে?

৯। পাশা খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন পাণ্ডবেরা। প্রাচীন কোন্ ধ্বংসস্তূপে পাশা খেলার নিদর্শন পাওয়া গেছে?

১০। নাটারেদ উদ্ভূত হয়েছিল কি থেকে?

১১। বাংলা ভাষায় সনেট, কবিতার প্রবর্তন করেন মাইকেল। কোন্ বিদেশী কবির প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি?

[৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

টলাতে দ্বার ঠেলছেন। এক এক দিন রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছেন, শরীরে চোট লেগেছে—এক এক দিন পাল্কি করিয়া আসতেছেন—বেহারারা ডাকাডাকি করছে, বাবু কখনই উঠবেন না। এক এক দিন গাড়ি করিয়া আসিয়া গাড়িতে একেবারে ঢলে পড়িয়াছেন—মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিলেও নামেন না, যিনি আনতে যান তাঁকেই দুই-একটা ইংরাজী গালি খাইতে হয়।

ভবানী বাবুর এইরূপ বাড়াবাড়ি হওয়াতে পরিবারেরা প্রাণের দায়ে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবু আপন দোষ কখনও স্বীকার করেন না, সর্ব্বদাই জাপ্য করেন। পরিবারের মধ্যে যে স্নেহটুকু হইয়াছিল ক্রমে ক্রমে গেল, ঐরূপ ক্রমাগত করিতে করিতে আবার পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, তখন চাকরেরা তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। বাবু আপন স্ত্রীকে দেখিয়া অতি ক্লেশে বলিলেন—গিন্নি! আমি মরি আমাকে বাঁচাও, এ যাত্রা বুঝি রক্ষা পাইলাম না

আপন দোষে পীড়া হইলে পরিবারেরা কিছু না কিছু বিরক্ত হয়, বাবুর রোগ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীর রাগও হইল দুঃখও হইল। তাঁহাকে একটু আরাম দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—পুরুষ জাত শিকল কাটা টিয়া—কাবে না পড়লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না—তখন আর আর তোমরা-চোমরা লোক পিটান দেয়, সুতরাং স্ত্রীর মান বেড়ে উঠে—সে সময় কেবল স্ত্রীই হর্ত্তা-কর্ত্তা, নতুবা স্ত্রী পায়ের তলায় পড়ে থাকে। তুমি কেবল আপনার দোষে আবার রোগটি ডেকে আনলে, এখন আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং বাবুর মাতার নিকট হইতে সকল কথা অবগত হইয়া ঔষধাদি দিতে লাগিলেন। পরদিন তথায় আসিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া রমানাথ বাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। রমানাথ বাবু ভবানী বাবুর পিসতুতো ভাই, পূর্ব্বে একত্রে থাকিতেন, তিনি প্রথম প্রথম দুই-এক কথা টুকেছিলেন, তাহাতে ভবানী বাবু রাগ করিয়া বলেন, তুমি ভাতুড়ে বই তো নয়—ছোট মুখে বড় কথা কেন? আপনার চরকায় তেল দাও। রমানাথ বাবু সেই অবধি অভিমান করিয়া অন্য স্থানে থাকিতেন। এক্ষণে ডাকিবা মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সাহেব বাহির-বাটীর বৈঠকখানায় তাঁহাকে লইয়া স্থির হইয়া বলিলেন—ভবানীর যেরূপ পীড়া, তাহাতে মারা যাইতে পারেন, কিন্তু আমি প্রাণপণে দেখিব—যদ্যপি ভাল হন, তবে তোমাকে সর্ব্বদা তাঁহার পিছনে লেগে থাকিতে হইবে। বাঙ্গালীরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রায় মদে তাহাদের খায়, কেবল যাঁহার একিদা থাকে, তিনিই বেঁচে যান নতুবা প্রায় সকলকেই হাড়িকাঠে মাথা দিতে হয়। ভবানী বুদ্ধিমান ও ভাল মানুষ বটে, কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র একিদা নাই, হাজার বার শপথ করা আর না করা সমান কথা—প্রাতে শপথ করিবেন—রাত্রে শপথ জলাঞ্জলি দিবেন। যেমন পাগল হওয়া একটি রোগ, তেমনি মদ খাওয়াও একটি রোগ, যদি পাগল হইলে ক্রমাগত ভাবে, তবে তাহার সঙ্গে আহ্লাদ-আমোদ করিয়া তাহাকে ভাল করিতে হয়। যে মানুষ মদ খায় সে আমোদের জন্য খায়, মদ বন্ধ করিতে গেলে যাহাতে তাহার আমোদ হইয়া মদকে ভোলে, এমত তদ্বির করা উচিত, নতুবা তাহাকে কেবল টাঙ্গিয়া রাখিলে প্রকাশ্য ভাবে হউক বা গুপ্ত ভাবে হউক পুনরায় মদ ধরিবে। মদ ছাড়াইয়া প্রথমে ধর্ম্ম কথা বলিলে মাতাল মুখে হাঁ-হাঁ করিবে কিন্তু মনে মনে বলিবে, এ বেটা গেলে বাঁচি—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। মাতালকে ভাল করা ব্যস্তের কর্ম্ম নহে—এ কর্ম্মটি ধীরে-সুস্থে করিতে হয়। প্রথমে দেখিতে হইবে, যে ব্যক্তি মদ ছাড়িবে তাহার কি প্রকারে আমোদ হইতে পারে। যদ্যপি গাওনা-বাজনা করিলে মদের সোয়াদ ভুলে তবে গাওনা-বাজনাতেই ফেলিয়া দিতে হইবেক, নতুবা অন্য প্রকারে উপায় করা আবশ্যক। কোন কোন ইংরাজের এইরূপ রোগ হইলে, তাহাদের আপন আপন পরিবারের কৌশল দ্বারাই সারিয়া যায়। সন্ধ্যার পর স্ত্রী কাছে বসিয়া নানা প্রকার সং আলাপ করেন হয় তো বাদ্য বা গান শুনান তাহাতে স্বামীর মনে আমোদও হয়, এবং স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমও বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনের এরূপ গতি হইলে মদের প্রতি স্পৃহা ক্রমে ক্রমে ঘুচে যায়। কিন্তু বাঙ্গালীরা স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়াও শিখান না ও গান বাদ্যও শিখান না। ইঁহাদিগের সংস্কার আছে যে, মেয়েমানুষের গান বাদ্য শেখা বড় দোষ। এ বড় ভ্রান্তি। সং গান ও বাদ্যেতে মনে সদ্ভাব ও সুমতি জন্মে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা গানের দ্বারা সর্ব্বদা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। শুনতে পাওয়া যায়, অনেক বাবু লেখাপড়া শিখিয়া রাত্রে পরিবারের নিকট না থাকিয়া কেবল মদ খাইয়া এখানে-ওখানে হো-হো করিয়া বেড়ান—আবার জাঁকটুক করা আছে, আমরা দেশের সকল কুরীতি শোধন করিতেছি। ভবানীও তাহাদিগের মধ্যে এক জন, যদ্যাপি তিনি ভাল হন তবে তোমাকে তাঁহার উপর সর্ব্বদা নজর রাখিতে হইবেক। প্রথম প্রথম যাহাতে তাঁহার আমোদ হয় এমত করিও, পরে তাঁহার যাহাতে একিদা জন্মে এমন উপায় ক্রমে ক্রমে বলিয়া দিব। এ বিষয়ের কিছু সাধারণ নিয়ম নাই—যেমন মনের গতি দেখা যায় তেমনি করিতে হইবেক। আমার অধিক অবকাশ নাই, তুমি মনোযোগী হইয়া তাঁহাকে আমার বাটীতে সর্ব্বদা লইয়া যাইও। এক্ষণে বাটীর ভিতরে যাই চল, কাল রাত্রে বড় খারাপ দেখে গিয়াছিলাম

ডাক্তার সাহেবের কথা শেষ হইবা মাত্র বাটীর ভিতর থেকে চীৎকার শব্দে কান্না উঠিল। ডাক্তার সাহেব ও রমানাথ বাবু তাড়াতাড়ি করিয়া দেখেন, ভবানী বাবুর শ্বাস হইয়াছে—নাড়ি নাই—চক্ষু প্রায় স্থির কিন্তু পলক পড়িতেছে—জ্ঞানও একটু একটু আছে কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। মা ও স্ত্রী গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন—জ্যেষ্ঠ পুত্র চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বাতাস করিতেছেন। ছোট পুত্রের নয়ন-জলে পিতার পা ভাসিয়া যাইতেছে। ডাক্তার সাহেব হাত দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—ভবানি! তোমার আর উপায় নাই—এক্ষণে পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, আর মনে মনে বল—দয়াময়! এ নরাধমকে দয়া কর। এই কথা শুনিবামাত্র ভবানী দুই হাত জোড় করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন মুখের ভাবের দ্বারা বোধ হইল, আপন পাপ জন্য যথার্থ সন্তাপ উদয় হইল, ক্ষণেক কাল পরে চক্ষু খুলিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু না পারাতে নয়নের দুই দিক থেকে হু-হু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল ও দুই-চারি লহমার পরেই প্রাণ বিয়োগ হইল। [ক্রমশঃ

কেশবচন্দ্র ও
ভারত-সংস্কার-সভা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

১৮৬৯, ২২এ আগষ্ট কলিকাতা মেছুয়াবাজারে নবনির্ম্মিত ভারতীয় ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার অল্প দিন পরেই কেশবচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' তাঁহার বিলাত গমনের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করেন। তাঁহার মনে কিছু দিন হইতে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে একটি পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করিতেছিল। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে তিনি বিলাত-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন।

১৮৭০, ১৫ই ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তিনি বর্ষশেষে—২০এ অক্টোবর কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি স্বীয় গৃহে একটি মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করিয়া বন্ধুগণের সমক্ষে দেশবাসীর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। স্ত্রীজাতির উন্নয়ন, সুলভ সাহিত্য প্রচার, শ্রমজীবীদিগের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করিয়া, তিনি পরিকল্পনাটি অবিলম্বে কার্য্যকরী করিবার জন্য কতকগুলি নির্দ্দেশ দেন। পরবর্ত্তী ২৬এ অক্টোবর ও ১লা নবেম্বর বিষয়গুলি নিজেদের মধ্যে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া, কেশবচন্দ্র পরদিন—২রা নবেম্বর একটি সাধারণ-সভা আহ্বান করেন। সভায় এদেশবাসী ৪৭ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনই "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন" বা ভারত-সংস্কার-সভা গঠিত হয়।

ভারত-সংস্কার-সভার প্রতিষ্ঠাকাল—২রা নবেম্বর ১৮৭০, উদ্দেশ্য—ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন ("to promote the social and moral reformation of India")। সভার উদ্দেশ্য সাধনে অনুরাগী যে কেহ—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে—অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা এক টাকা (২য় বর্ষ হইতে দুই টাকা) দিয়া সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন।

ভারত-সংস্কার-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন—কেশবচন্দ্র সেন, অবৈতনিক সম্পাদক—প্রোতাপচন্দ্র মজুমদার? [illegible] (২য় বর্ষে, যুগ্ম-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন)। সভা পাঁচটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকের নাম-সহ বিভাগগুলি এই—

১। স্ত্রীশিক্ষা (Female Improvement): সম্পাদক—উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ.

২। শিক্ষা: শিল্প-বিদ্যালয় ও শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় (Education of the Working Classes and Technical Education): সম্পাদক—জয়কৃষ্ণ সেন, এম. এ. (২য় বর্ষে, অমৃতলাল বসু ও কৃষ্ণবিহারী সেন, এম. এ.)

৩। সুলভ সাহিত্য (Cheap Literature): সম্পাদক—উমানাথ গুপ্ত।

৪। সুরাপান ও মাদক নিবারণ (Temperance): সম্পাদক—যাদবচন্দ্র রায় (২য় বর্ষে, কানাইলাল পাইন)।

৫। দাতব্য (Charity): সম্পাদক—কান্তিচন্দ্র মিত্র।

আমরা ১৮৭২-৭৩ সনে মুদ্রিত ভারত-সংস্কার-সভার প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাইয়াছি। এগুলি আজিকার দিনে একান্ত দুষ্প্রাপ্য; ইহাদের সাহায্যে বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের তথ্যবহুল জীবনী লিখিতে প্রয়াস পাইবেন, এই আলোচনা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে।

১। সুলভ সাহিত্য-বিভাগ

জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ("useful information and scientific knowledge") প্রচারকল্পে স্বল্পমূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত পত্রিকা পুস্তিকাদি প্রচার এই বিভাগের কার্য্য-তালিকাভুক্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৫ই নবেম্বর ১৮৭০, মঙ্গলবার হইতে 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বাংলা সংবাদপত্র-জগতে এই পত্রিকাকে অভিনব বলিতে হইবে, কারণ, এরূপ সুলভ মূল্যের সংবাদপত্র প্রচারের কল্পনা ইতিপূর্ব্বে কাহারও মনে আর হয় নাই। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন:—

> "আমরা অদ্য নূতন সাজে সাজাইয়া এই প্রিয় সমাচার পত্রখানি অল্প পাঠকগণের হাতে অর্পণ করিলাম। আমাদের মধ্যে বিদ্বান্ এবং ধনীর সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহাদের পড়িবার শুনিবার অনেক আছে, [illegible] নানা প্রকার খবরের কাগজ আছে, এবং তাঁহাদের [illegible] সুখী হইবার উপায়ও আছে। যাঁহারা সমস্ত দিন [illegible] খাটিয়া খাটিয়া রাত

পারে, তা যে-কোনো জীব-তাত্ত্বিকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে মানুষের জীবন থেকে বাহুল্য গুলি বাদ দিতে দিতে চলো, দেখতে পাবে তার বাঁচবার জন্য—

……a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of wine, a Book of Verse—and Thou

মাত্র এই-ই যথেষ্ট। কিন্তু হিন্দুরা চ'লে এলে পাকিস্থানের এ অবস্থা নিশ্চয়ই হবে না যে সেখানে ঐ কয়টি বস্তু ও ঐ একটি ব্যক্তি আর মিলবে না। যা হোক্, এখন ওমর-খৈয়ামী কবিত্ব করবার সময় নয়। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থান থেকে যে হিন্দুরা এসেছে সেই উদ্বাস্তুদের জীবন-যাত্রার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের জীবন-যাত্রা এর চাইতে খারাপ নিশ্চয়ই হবে না। তা ছাড়া পাকিস্থান কাফেরশূন্য ক'রেছে এই মনের সুখেই তারা পাঁচ-সাত বছর নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারবে এবং একপুরুষ তারা নিশ্চয়ই টিকে থাকতে পারবে এবং তার মধ্যে পাকিস্থানীরা তাদের লোকসংখ্যা কিছুটা পুষিয়ে নেবে। আর তার মধ্যে যদি ইটালির মুসোলিনির মতো পাকিস্থানের কর্ত্তা-ব্যক্তিরা ঐ ক্ষেত্রে **produce more** ব'লে বিশেষ দৃষ্টি দেন তবে তো কথাই নেই। তবে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে বুড়িগঙ্গার তীরে তীরে, পদ্মা-মেঘনার কূলে কূলে, কুঞ্জে-কাননে, বনে-উপবনে যে কি রকম হর্ষ-কোলাহল উত্থিত হবে তাই একবার ভাবো—আনাচে-কানাচে, তাল-সুপুরির আড়ালে আড়ালে, নারিকেলকুঞ্জের আবছা আলোকে, পাট ক্ষেতের সীমানা ঘেঁসে যে কি রকম পুলক-হিল্লোল ব'য়ে যাবে তাই একবার কল্পনা-নেত্রে অবলোকন করো। সুতরাং হিন্দুরা চ'লে এলেই পূর্ব্ব-পাকিস্থান অচল হ'য়ে পড়বে এটা আশা-মায়াবিনী ছাড়া আর কিছু নয়—অর্থাৎ যাকে ইংরাজীতে বলে **wishful thinking.** না, অন্ততঃ, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের পতন দারিদ্র্যের জন্য হবে না—হ'তে পারে হুর্পিচিটির প্রভাবে অর্থাৎ প্রতিভার অভাবে, যার অভাব ইতিমধ্যেই প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে।

পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি যে পূর্ব্ব-পাকিস্থান থেকে হিন্দুরা চ'লে এলেই এ দেশে শান্তির মলয় মারুত বইতে আরম্ভ ক'রে দেবে তা নয়। কেন নয়, তা বলছি, অবহিত হ'য়ে শোনো।

তোমাকে আগে আরো একটা বলেছি এই যে, হুর্পিচিটির দিক থেকে এই মুসলিমদের ও কমিউনিষ্টদের একটা মিল আছে। কিন্তু আরো কয়েকটি বিষয়ে ঐ দু'য়ের মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে। হায়দরাবাদে রাজাকার ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে মিতালি একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র নয়। কমিউনিষ্টদের কোনো স্বদেশ নেই। আমরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা যেমন আকর্ষিত, কমিউনিষ্টরাও তেমনি একটা কেন্দ্র দ্বারা আকর্ষিত। এই কেন্দ্রটি হচ্ছে মস্কো। এদের সব কিছুই শেষ হয় গিয়ে ঐখানে। এই মুসলিমদেরও কোনো স্বদেশ নেই, এরাও কমিউনিষ্টদের মতোই একটা কেন্দ্র দ্বারা আকর্ষিত। এই কেন্দ্র হচ্ছে মক্কা। এদের সব কিছুই শেষ হয় গিয়ে ঐখানে। এদের এই কেন্দ্রের পূর্ব্ব-নাম ছিল খলিফা, খিলাফৎ। এই খিলাফতের ধ্বংসসাধন করেন আটোমান কামাল আতাতুর্ক। তবুও মুসলিম-জগতে তিনি গাজী ব'লে প্রখ্যাত। মানব-জীবনে যে নানা দিকে হাস্যরস ছড়িয়ে আছে এটা তারি একটা প্রমাণ। সে যা হোক্, কমিউনিষ্টদের অহরহ চিন্তা—**preoccupation**—যে-কোনো উপায়ে পৃথিবীতে কমিউনিজমের বিস্তার। এই মুসলিমদেরও অ চিন্তা—**preoccupation**—যে-কোনো উপায়ে পৃথিবীর স দেশে ইসলাম ধর্মের বিস্তার। কমিউনিষ্টদের জড়বাদ বিশ্ব-সভ্য পক্ষে যেমন একটা বিপদসূচক বস্তু, এই মুসলিমদের ধর্মান্ধ মানব-সভ্যতার সম্পর্কে তেমন একটা বিপদসূচক ব্যাপার। জড় মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনাকে হরণ করে, সুতরাং তার ঊর্দ্ধগতি গভীর মননকে ব্যাহত করে। ধর্মান্ধতাও মানুষের দিব্য চেতনা ধ্বংস করে, সুতরাং তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে দে গতি না হ'লে প্রগতি হয় না। কিন্তু ঐ দুই বস্তুই অর্থাৎ জড়বা ধর্মান্ধতা প্রগতির অপহারক। সুতরাং যদি বিশ্ব-মানব বা মা সভ্যতার প্রগতি ব'লে কিছু থাকে তবে ঐ দুই বস্তুর ধ্বংস অনিবা মানব-সভ্যতার দিক থেকে হিটলারের **Herrenvolk** কমিউনিষ্টদের জড়বাদ, আর এই মুসলিমদের ধর্মান্ধতা এক জা ব্যাপার। এরা প্রত্যেকেই এক একটা সংকীর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে ব —আমিই আছি আর কেউ নেই। উপনিষদের ঋষি বা গীত পুরুষোত্তমও এমন কথা বলেন না যে, আমিই আছি, আর নেই, আর কিছু নেই। বরং তাঁরা এই কথাই বলেন যে—(তে তাঁদের বাণী মানব জাতির ঔদার্য ও শালীনতাই প্রকাশ পায়— আমি আছি এবং আর সকলের মধ্যে, আর সকলের মধ্যেও আমি আছি বিশ্ব মানুষের সাম্পদ। ঈশ্বরকেও ছাড়িয়ে যায়।

সে যা হোক্, এখন, এই যে পাকিস্থানের ধর্মান্ধ মুসলিমরা-এই মুসলিমদের মধ্যে তুমি পাকিস্থানের জেনারেল আনসারদের কি হিসাব ধ'রে নিতে পারো। হায়দরাবাদের রাজাকারদেরই সমগোত্রীয় এরা—এই মুসলিমদের মনে একটা বিরাট স্বপ্ন বা জল্পনা বা প্ল্যান আছে। এই বিরাট স্বপ্নকে তুমি দিবাস্বপ্ন অর্থাৎ **day dream** ব'লে মনে করতে পারো কিন্তু এদের কাছে তা নয়। ইতিমধ্যে এ মোটা এই সম্পর্কে ইতোমধ্যেই বেশ জানতে পারেন। তার পর স্বপ্নটা এই ধর্মান্ধদের মনে কি আকার ধারণ করেছে তাও কল্পনা ক নিতে পারো। এই বিরাট প্ল্যান বা স্বপ্নটা হচ্ছে এই যে, এক দিকে ইসলামের জন্য হ'য়ে যেমন তারা অন্য এক দিকে ইরাণ, আফগানিস্থান বেলুচিস্থান, ওদিকে সমস্ত উত্তর-আফ্রিকা, ওদিকে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জয় ক'রে নিয়েছে তেমনি সারা ভারতবর্ষকে এক দিন জয় করতে হবে। সুদূর মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্য্য এত সুবৃহৎ ভূখণ্ডে একমাত্র ভারতবর্ষ কাফেরী-গর্বে ও গৌরবে উদ্ধ হ'য়ে থাকবে এটা একটা নিতান্ত বেইমানী ব্যাপার। বোধ হ কোনো এক অশুভ মুহূর্ত্তে মোহিনীপা জিন্না-টিল-আমি দখিনে পড়েছিলেন, তাই এমন একটা অশোভন ব্যাপার ঘটা পেরেছিল। কিন্তু আল্লার কৃপাতে সমস্ত পশ্চিম-ভারত আজ কাফের-শূন্য হয়েছে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানও হবার মুখে। এখন সারা ভারত ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা জয়-পতাকা উড্ডীন করাই হবে একমা কাজ।

বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব-পাকিস্থান থেকে সোয়া এক কোটি হিন্দুকে সরিয়ে আনলে এক দিকে যেমন এদের এই প্ল্যানকেই সত্য ক' তোলা হবে অন্য দিকে তেমনি এদের মনস্তত্ত্বের পিছনে অনেকখানি উর্বরতা-বর্দ্ধক সার ও উদ্দীপনা-বর্দ্ধক সুরা ঢালা হবে। অর্থা প্ল্যানটা যে ধীরে ধীরে সত্য হ'য়ে উঠছে, এর নেশা কম নয়।

...র পর সম্পূর্ণরূপে মুসলিমীকৃত পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে সেখান থেকে চিরকাল সারা ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসারের চেষ্টা চলতে থাকবে—ঠিক কমিউনিষ্টিক্ কায়দায়, অর্থাৎ কোনো উপায়ই অস্পৃশ্য ব'লে বিবেচিত হবে না। এবং তার ফলে যার প্রতিষ্ঠা হবে তার নাম শান্তি নয়। এবং পরিশেষে ভারতবর্ষকে এক মহা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হ'তে হবে যার তুলনায় আজকার দুর্ঘটনা বঙ্গোপসাগরের কাছে ডিব্বা হ্রদের তুল্য। যে ভারতবর্ষের [illegible] ইয়োরোপ আমেরিকার স্বর্ণলোভী বৈশ্যের দল ভয় করে, কেন না, তাঁরা টের পেয়েছেন যে ভারতবর্ষ তাঁদের মাসতুতো-ভাই হ'তে রাজি নয়, সেই ইয়োরোপ আমেরিকার বৈশ্যের দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, বলা বাহুল্য, পাকিস্থানের প্রতিই সহানুভূতিশীল হ'য়ে থাকবেন ঠিক আজকে যেমন আছেন। অবশ্য তাঁদের দৃষ্টি থাকবে যাতে সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে। অর্থাৎ যাতে ভারতবর্ষও [illegible] থেকে যায় এবং মুসলিমরাও জবরদস্ত হ'য়ে উঠতে না পারে। সারা এশিয়ার পক্ষে এ একটা পরম দুর্ঘটনা যে, ইয়োরোপ আমেরিকার ঐ রাজনৈতিক তত্ত্বটি পাকিস্থানের মহম্মদ আলি জিন্না থেকে [illegible] মিঞা পর্যন্ত কেউ বুঝতে চাইলেন না।

তুমি অবশ্য বলতে পারো যে, ক্ষুদ্র পাকিস্থানের সারা ভারতবর্ষকে ইসলামীকৃত করার প্রয়াসটা স্টুপিডিটির চিহ্ন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, স্টুপিডিটির সৃষ্টির আরো বহু বস্তুর মতো আপেক্ষিক ব্যাপার। আমরা যদি আজ বৃহত্তর স্টুপিডিটির পরিচয় দেই তবে পাকিস্থানের স্টুপিডিটি আর স্টুপিডিটি থাকবে না—তা হ'য়ে উঠবে প্রতিভা, দৈবী-প্রেরণা। পূর্ব-উত্তর-বঙ্গ থেকে সোয়া এক কোটি হিন্দুকে উৎপাটিত করার পরামর্শ দিয়ে আমরা আজ বৃহত্তর স্টুপিডিটির পরিচয় দিচ্ছি। এতে এই হিন্দুদের প্রতি যে একটা চরম অন্যায় অবিচার অত্যাচার করা হবে সে কথাটা আর এখানে উল্লেখ করলাম না। কিন্তু ভারতে মুসলিমরা তাদের সকল অধিকার নিয়ে নিরাপদে শান্তিতে বাস করতে পারবে অথচ পাকিস্থানে হিন্দুরা সকল অধিকার নিয়ে শান্তিতে নিরাপদে বাস করতে পারবে না—এটা মেনে নিলে নৈতিক জগতে এমন একটা আলোড়ন ওঠে সেটা সার্বিক শান্তির পক্ষে অনুকূল নয় বরং প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থাৎ actively প্রতিকূল। এখন, এই অত্যাচারের সমূলে নির্মূল করতে ভারতবর্ষ কি আজ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াবে না? তা যদি না দাঁড়ায় তবে সে কাল সম্ভাব্য কোনো বৃহত্তর দুর্ঘটনার বিরুদ্ধেই বা উঠে দাঁড়াবে কেন? আর তা যদি দাঁড়ায় তবে আজকেই বা দাঁড়াবে না কেন? পৈশাচিক কাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একটা সার্বকালিক মহা কর্তব্যও বটে, এ-বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নেই।

মনে রেখো, গত দুই শত বৎসরের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনে যত কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা হচ্ছে সারা পশ্চিম-ভারত [illegible] হওয়া। দিল্লীশ্বর [illegible] বাংলার [illegible] পারেননি। এই [illegible] চাইতে বড় দুর্ভাগ্যের [illegible] আর এক অংশে [illegible] পরামর্শ দিচ্ছেন কেউ [illegible]।

[illegible]

পুনশ্চ—[illegible] আসল [illegible] আমরা অনেকে স্পষ্ট ধরতে পারিনি [illegible], [illegible] কেউ কেউ এই প্রস্তাব করছেন যে, ভারত থেকে মুসলমানরা [illegible] পাকিস্থানের মুসলিমদের [illegible] সমাজে [illegible] ক'রে তুলুক। যারা মনে মনে পাকিস্থানের [illegible] না, যাদের হিন্দুদের প্রতি [illegible] দরদ ও মমতা রয়েছে এমন ভারতীয় মুসলিমরা পাকিস্থানে পা দিলে তাদের [illegible] যাবার ঠিক পনেরো আনা তিন পাই সম্ভাবনা। সুতরাং তাদের ওখানে যেতে বলা এক রকম [illegible] পাঠায় [illegible], [illegible] [illegible]। [illegible] না থাকলে [illegible] কেমন নিষ্ঠুর [illegible] হিন্দুদের [illegible] একটা প্রমাণ।

ক:

মহাভারতের অক্ষৌহিণী সেনা কি?

এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে একটি পত্তি হয়। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃথনা, তিন পৃথনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী, দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। এক অক্ষৌহিণীতে একবিংশতি সহস্র অষ্ট শত ও সপ্ততি-সংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, এক লক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি এবং পঞ্চষষ্টি সহস্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

গদ্য রচনা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

ছয়

মুসলমান-শাসনের পর ইংরাজের শাসন-কালে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া আনিয়াছিল, "বাঙ্গালার গীতি-কবিতা"য় এবং বাঙ্গালার গীতি-কবিতা" দ্বিতীয় কল্পে চিত্তরঞ্জন তাহা দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালা গানের ও গীতি-কবিতার ধারা যে পরিবর্ত্তিত হইয়া বহির্ম্মুখী হইয়া গেল, সে আলোচনাও তিনি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন লিখিয়াছেন :—

"বাঙ্গালা চিরদিন পূর্ব্ব দিকেই সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী-ঝলকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গালা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতরে যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল।

"ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন সে আলোক সহ্য করা যায় না, বাঙ্গালার প্রাণেও ঠিক সেইরূপ ইউরোপ হইতে যে আলোক সহসা বর্ষিত হইল, তাহা সহ্য হইল না। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।"

চিত্তরঞ্জন মনে করিতেন যে, ফেরঙ্গ-কল্পনা ও ফেরঙ্গ-ভাব আমাদের জীবনে সমাজে ও সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের অনিষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। সেই ইউরোপীয় প্রভাব হইতে আমাদের মুক্তি পাইতে হইবে এবং আমাদের জীবন সমাজ ও সাহিত্যের বহির্ম্মুখী গতিকে ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে হইবে। এই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি যে কত দূর ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার রচনায় আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ আশাবাদী। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলোক-বর্ত্তিকা তাঁহাকে পথের সন্ধান দিত। তাঁহার এতৎসম্পর্কীয় আলোচনার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

"আমার বাঙ্গালার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গালার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যামলোজ্জ্বলময়ী বনরাজিবিভূষিতা সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, মা'র বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মত্তোর্ম্মি-বিস্ফূর্জ্জিত সাগরের দিগন্ত-মুখরিত কলকলা, শিরে নগাধিরাজ ধূর্জ্জটি, সূর্য্যকিরণে ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে! মা আমার এক হাতে ধান্যশীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম, আকাশ উজ্জ্বল, তরুণ রবি হিরণ-চূর্ণ দিগ্‌বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে-পাশে ললিতকণ্ঠে পিককুল কলঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে! এ রূপের কি তুলনা আছে! সেই বাঙ্গালা মায়ের বাঙ্গালী ছেলে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, সে বাঙ্গালী যে আজিও মরে নাই, তাই সে আশার আলোয়, সেই আনন্দে, আজ চোখে জল আসে। কি কাঞ্চন-মণি ফেলিয়া, কি কাচ আজ কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়াছি; রাশি রাশি খড়ির চাপ ও ধূলায় সকল কলঙ্ক শুভ্র করিতেছি; প্রাণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভয়াবহ পরধর্ম্মের খোলস পরিয়াছি। বাঙ্গালা ভুলিয়া, বাঙ্গা ভাব ভুলিয়া, রূপ ভুলিয়া, প্রাণ ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া সে মা রূপকে দেখিতে পাই না, দেখিলেও আর চিনিতে পারি না। চো পর্দ্দা পড়িয়া গেছে, চোখ খারাপ হইয়া গেছে। আজি চো সম্মুখে ইউরোপীয় অবভাসের যবনিকা—চোখ আর সে রূপ চিনি পারে না। ইউরোপীয় ভাবের ধারায় ছাঁচে, নিজেদের না ঢালি আমরা যেন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। কল্পনা ফেরঙ্গ, ভা ফেরঙ্গ, সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গে, জীবন ও ধর্ম্মের অঙ্গে আজ ইউরোপীয় ব্যভিচারী ভাব, আমাদের জীবন, ধর্ম্ম, সাহিত্য, ও সব কল্পকলাকে মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে। আজ এই দুর্দি সূচীভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই ফেরঙ্গ-বাঙ্গালার ফেরঙ্গ-সাহি মাঝে অকস্মাৎ বিজলী-ঝলকের মত বিবর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মা শ্রীরূপ দেখিলাম; সেই পদ্মালয়া, সেই সরস্বতী, সেই অন্নপূর্ণা, সিংহবাহিনী, সেই ভীমা ভয়ঙ্করী করালবদনা করালী— দেখিলাম সেই মদনমোহন,—

'বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা।'

"সে যুগল রূপের কি তুলনা আছে! অন্দ-পাশ আন্দোলন যেন অঙ্গে বিজলী মিলাইতে চায়, মেঘ যেন বিজলীর ঝলক দিয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নব নব রূপ ফুটিয়া উঠিতে চায়, সকল রূপ নিমিষেই যুগল রূপে মিলাইয়া যায়।

'মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ
চকোর পাওল চাঁদ পাতিল পিরীতি ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ।'

"আর বাঙ্গালা কবি চণ্ডীদাস সেই রূপের পরশে মজিয়া, ভা গদগদ হইল,

'চামর ঢুলায়।'

"এই ছবি বাঙ্গালার নিজস্ব। যে মরম জানে, সে রসিক সে রসের কথাও জানে। সেই প্রাণের ধারার সঙ্গে সাধনাঙ্গের পরি পরিচয় রামপ্রসাদেরও ছিল। রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছিলেন,—

'গিরিবর আর পারি না হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে,—
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারি নে হে প্রবোধ দিতে উমারে।'

"এ সব গান বাঙ্গালার প্রাণের পঞ্জর হইতে বাহির হইয়াছে জীবনের সঙ্গে এ রসের অঙ্গাঙ্গী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

"আজ বাঙ্গালী সেই প্রাণের প্রাণকে তাহার সাহিত্যের—তাহা জীবনের সেই রূপ, যে রূপের চরণে,—

'মদন মুরছা পায়,'

সেই রূপ ভুলিয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।"

চিত্তরঞ্জন ভক্তি-রসোদ্বেল চিত্তে ভাবে গদগদ হইয়া বাঙ্গালা মায়ে রূপের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা প্রাণকে স্পর্শ করে। কবি-মানস মায়ের সে রূপ প্রতিফলিত না হইলে এমন জাগ্রত জীবন্ত চিত্র কেহ আঁকিতে পারেন না। এমনি প্রাণস্পর্শী আবেগময় কবিত্বপূ বর্ণনা তাঁহার গদ্য-রচনার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

আমাদের জীবনে সমাজে ও সাহিত্যে যে ফেরঙ্গ-ভাব ফেরঙ্গ-কল্পনা ও ফেরঙ্গ-আদর্শ প্রভাব বিস্তার করিল, ইহার জন্য চিত্তরঞ্জন দায়ী করিয়াছেন রামমোহন রায়কে। তিনি বলেন :—

"কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ-কবিতা বাঙ্গালার এবং মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্যকাল হইতে আরবী ফারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গালার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্ম-সমাজ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিকতার উপর খুব বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন। অবশ্য, এ কথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুকনা মালার ঠকঠকিতে পরিণত হইয়াছিল।"

রামমোহনের আদর্শ ও কার্য্যের এই ভাবে আরো তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন :—

"নাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না, বাঙ্গালার নিজস্ব যে বৈষ্ণব-ভাব—যাহা বাঙ্গালার প্রাণকে, ধর্ম্মকে, জাতিকে, সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গালার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাঁহার বুদ্ধির অসামান্য মল্লযুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন, এ কথা অস্বীকার করিতে পারির না। তবে এই কথা আমি বলিতে বাধ্য হইব যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গালার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না—যদি তিনি আমাদের দেশের সাধনাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজী সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া ঘরে না তুলিতেন।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিত্তরঞ্জন ছিলেন বলিষ্ঠ আশাবাদী। তাই তিনি আমাদের জীবন সমাজ ও সাহিত্যকে ফেরঙ্গ-ভাব দ্বারা প্রভাবিত দেখিলেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হন নাই। বাঙ্গালার গীতি-কবিতার (দ্বিতীয় খণ্ড) উপসংহারে তিনি শুনাইয়াছেন আমাদের আশার বাণী :—

"এই ফেরঙ্গ যুগের সঙ্গে বাঙ্গালার প্রাণের এক বিরোধ পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যুগে যুগে যে একবার করিয়া সচকিত হইয়া নিজের মূর্ত্তিকে জাগাইয়া তোলে, মুসলমান যুগেও তাহাই করিয়াছিল, আজ ফেরঙ্গ যুগেও তাহাই করিতেছে! এক দিকে মুসলমান-ফেরঙ্গ-ধারা আর অন্য দিকে বাঙ্গালার নিজের ধারা। কবে মাটি আবার সেই ধারার মূর্ত্ত পুরুষকে জনম দিবে, তাহারই আশায় বসিয়া আছি।

……"কোথায় বাঙ্গালার আত্মা জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল, এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল, আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব। আমার জীবন আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচনা করিব।"

সাত

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দুইটিতে আছে বাঙ্গলার গীতি-কবিতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। "কবিতার কথা" নামক সন্দর্ভে তিনি কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, "রূপান্তরের কথা" শীর্ষক রচনায় তিনি করিয়াছেন কলাকলা ও কলাবিদ Art ও Artist সম্পর্কে আলোচনা, আর করিয়াছেন সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের আলোচনা। 'স্বাগতম্' প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঢাকা অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। এইগুলি চিত্তরঞ্জনের উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। ইহা ভিন্ন "ডালিম" নামে ১৩২১ সনের পৌষ সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প আছে। বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যে ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ দান। চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক রচনা ও ভাষণের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিলাম না।

মানুষের জীবন কি লইয়া গঠিত, তাহা তিনি "কবিতার কথা"য় বলিয়াছেন—

"একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের প্রাণের মাঝে দুইটা ভাব সর্ব্বদাই দেখা দেয়। একটা আমাদের মাটি আঁকড়াইয়া থাকিতে বলে, আর একটা আমাদের মাটি ছাড়াইয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরে। এই সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, এই দুই লইয়াই আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি না; ছাড়িয়া দিলে, মনুষ্য-জীবন বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার অঙ্গহানি হয়।"

চিত্তরঞ্জনের মতে, এই যে অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ জীবন—"ইহাই কবিতার রাজ্য।" কবিতার রাজ্য কোথায়, তাহা তিনি উদাহরণ দিয়া আরো পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন :—

"সেদিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া গিয়াছে। এ মিলন অপরূপ, গভীর, অনন্ত! দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই ত জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই সেই মিলনভূমি অপরূপ, অনন্ত! বুঝিলাম, যাহা আত্মা, তাহাই দেহ; যাহা অনন্ত, তাহাই শান্ত; যাহা পরমার্থ, তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলন-মন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই—যাহা আছে, তাহাই জীবনের স্বরূপ! এ জীবন লইয়াই কবিতা।"

চিত্তরঞ্জন দার্শনিক কবি। হিমালয়ের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও তন্ময় হইয়াছেন! সেই দৃশ্যের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন জীবনের মহামিলন-মন্দির, আর সেইখানেই আবিষ্কৃত হইল কবিতার রাজ্য। এই রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে কবির লেখনী-মুখে অভিব্যক্ত হইবে "জীবনের কবিতা"—যাহাতে "জীবনের ধ্বনি পাওয়া যায়।" তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, "এ মিলন-মন্দির সত্য।" তাঁহার মতে "সত্যকে ছাড়িয়া দিলে কোন কবিতাই সম্ভব হয় না।"

-নার "কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদী রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।" কবিকে দিয়া কখন কবিতার সৃষ্টি হয়, সেই আলোচনাও তিনি "কবিতার কথা"য় করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"শুধু নায়ক-নায়িকার হাব-ভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্য-জীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জ্ঞানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎ লাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়-মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।"

"রূপান্তরের কথায়ও" চিত্তরঞ্জন প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন :—

"আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইন্দ্রিয়ের ডাকও সেই ভগবানের ডাক। ইন্দ্রিয়-জগতে যে প্রেমের আরম্ভ, অতীন্দ্রিয়-জগতে তাহার পরিণতি। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই এই যে, সে আঙ্গুল দিয়া অতীন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই যে অখণ্ড সত্য-রাজ্য, ইহার কোন অংশই বর্জ্জন করা যায় না,—করিলে সত্যের অঙ্গহানি হয়। এই সমগ্র সত্যটি যখন আমাদের প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তখনই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যে প্রেম, তাহার রূপান্তর ঘটে। প্রেমের যে স্বভাব, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, শুধু আমাদের চোখ খুলিয়া যায়, প্রেম আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে কবির প্রাণে এই সমগ্র অখণ্ড সত্যের প্রদীপ জ্বলিয়া না উঠে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা অসম্ভব।"

যাঁহারা মনে করেন যে,—"ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা তুচ্ছ নিম্নস্তরের কথা, কলাকলায় তাহার স্থান নাই", এবং "ইন্দ্রিয়ের বিষয় কলাকলার রাজ্যে প্রবেশ করিলে কলাকলা অপবিত্র হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে"—সেই সকল শুচিবাদীর সহিত চিত্তরঞ্জনের মতানৈক্য রহিয়াছে। তাঁহাদের যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া তিনি বলিতেছেন :—

"মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে? মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না? আজও কি চৈতন্যের দেশে এ কথা শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা সয়তানের খেলা? আমরা কি ইস্কুলী আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান মিলে না? ইন্দ্রিয় যে অতীন্দ্রিয়ের ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিলে একটা মনগড়া শুদ্ধ পবিত্র লোকের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া যেমন, শূন্য আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টাও ঠিক সেইরূপ। মিথ্যা কল্প-রাজ্যে যাহা স্থান পাইতে পারে, সত্য-রাজ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না।"

চিত্তরঞ্জন নায়ক-নায়িকার প্রেম-লীলার মধ্যেও ভাগবত-লীলার বিকাশ দেখিতে পাইতেন,—নায়ক-নায়িকার মাধুর্য্য রসের মধ্যেও তিনি দেখিতেন ভাগবত-রসের প্রবাহ। এই ভাবের অভিব্যক্তি তাঁহার "স্তব" নামক রচনার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। "স্তব" তাঁহার সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিকপত্রে প্রকাশিত একটি ছোট প্রবন্ধ। "নমস্তে নারায়ণ" বলিয়া "স্তব"এর আরম্ভ, এবং "নমস্তে নারায়ণ" বলিয়া ইহার সমাপ্তি। চিত্তরঞ্জনের স্তবে আছে :—

"নায়ক-নায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য, প্রভু ও দাসের এক দিকে স্নেহ ও অপর দিকে ভক্তি—এই লইয়াই ত সংসার, এই সব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমিই ত সকল রসকে সার্থক কর। সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি; যাহা কিছু, সব ত উপলক্ষ।

"ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছেন, এই বাৎসল্য তোমারই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে শিশুরূপী তোমাকে দেখিতে না পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনই তাঁহার প্রাণে ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনি তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনি উপভোগ করেন। নায়ক-নায়িকার যে মাধুর্য্য রস, তাহা তোমারই প্রাণে প্রবাহিত হয়; যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায়, ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনই তুমি নায়ক-নায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি-অশ্রুজলে, চুম্বনে, সকল তোমারই মাধুর্য্য রসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে; সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সকল দাস্যের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে, প্রভুরূপে না দেখা দাও, ততক্ষণ তাহারা "কই সখা, কই প্রভু" বলিয়া এই সংসার-অরণ্যে কাঁদিয়া মরিয়া বেড়ায়। তুমি তাহাদের সখ্য ও দাস্যকে সার্থক করিয়া তুল।

......"তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর,—আবার তুমিই সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর! তুমি প্রভু হইয়া দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুর প্রাণের ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া গ্রহণ কর। তুমি নায়ক-নায়িকা হইয়া প্রেম-লীলার অভিনয় কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেম-চুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

"সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী, আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপ নারায়ণ!"

[ক্রমশঃ

"সে তো সেদিনের কথা বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে।"

—রবীন্দ্রনাথ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ কথা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র

আজকের রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য, আমরা জেনেছি, রাষ্ট্রস্থ জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রাষ্ট্রকে গড়ে নিতে হয়েছে একটা শাসনযন্ত্র—যেটাকে আমরা বলেছি সরকার বা 'গভর্ণমেন্ট'। এখন এই সরকার কোন্ পথে চলবে কি রকম নীতি ও অনুশাসন মেনে সেটা ভেবে দেখতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই থাকা চাই একটা শাসনযন্ত্র। কিন্তু শাসনযন্ত্রের অস্তিত্ব বলতে আমরা স্বেচ্ছ শাসনের প্রয়োগ বুঝব না। এটা এমন ভাবে চলা চাই যাতে রাষ্ট্রের সর্ব্বমাঙ্গলিক উদ্দেশ্যটা ব্যাহত না হয়। তা যদি হয় তবে এর পবিত্রতা বলে কিছু থাকবে না, থাকবে কলুষতা। রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে, তাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানের জন্যে তাদেরই দ্বারা সংগঠিত, তখন তার পরিচালনা এমন ভাবে হওয়া চাই যাতে সেই জনসাধারণ পাবে সব চেয়ে বেশী ও বড় রকমের সুযোগ-সুবিধা উন্নতির পথে এগুতে। এ পথের পরিচয় ব্যাপকতা, সঙ্কীর্ণতা নয়। তাই রাষ্ট্রের পরিচালনযন্ত্রটা এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট হবে যাতে দেখব সেই ব্যাপকতা, সঙ্কীর্ণতা নয়। সঙ্কীর্ণতা যে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রে দেখা গেছে সেখানেই দেখেছি এসেছে স্বার্থপরতা, ক্রন্দন, হীনতা মুষ্টিমেয় ক'জনের অত্যাচার। এর ভয়াবহ পরিণতি আমরা দেখেছি রাষ্ট্রের শোচনীয় পতনে। গত মহাযুদ্ধের কঠিন পরীক্ষায় এ রকম শোচনীয় ভাবেই ভেঙ্গে গিয়েছিল ইটালীর ফাসিস্ত রাষ্ট্র, জার্ম্মাণীর নাজী রাষ্ট্র। ইউরোপের প্রাচীন দেশ নর্ম্মানদের রাষ্ট্র, আমাদের প্রাচীন সেন, পাল প্রভৃতি হিন্দুরাষ্ট্র, বাহ্‌মনী প্রভৃতি মুসলমানরাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয়েছিল অনুরূপ ভাবেই। কারণ, তাদের শাসনযন্ত্রটা চালিত হয়েছিল হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। কিন্তু আজকের রাষ্ট্র অনেকটা উন্নত, অনেকটা সংযত, অনেকটা সর্ব্বজনীন; তাই তার জনপ্রিয়তা। জনপ্রিয়তা রাষ্ট্র বিনতে পেরেছে তার শাসনতন্ত্রের সুপরিকল্পনা ও সুপরিচালনার দ্বারে। এ রকম পরিকল্পনা বা পরিচালনা সম্ভব হয় তখনই যখন তার উপরে থাকে কতকগুলো নৈতিক ও বৈধ অনুশাসন—যার থাকে একটা কর্ম্মপদ্ধতি পরিচালনা বা পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে। এই অনুশাসন ও তার কর্ম্মপদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শাসনতন্ত্র বা 'কনষ্টিটিউশন্' (Constitution) নাম পেয়েছে।

রাষ্ট্রের সরকারকে তার কাজের দিক থেকে আইন, বিচার ও কার্য্যকরী এই তিন ভাগে যে ভাগ করা হয়েছে সেই বিভাগগুলোর কার্য্য-পরিচালনার উপরই নির্ভর করছে সরকারের দক্ষতা ও সুনাম। এগুলোর কাজ কি ভাবে চললে কাজটা ঠিক হবে আর লাভ করা যাবে দক্ষতা, সেটা স্থির করার ভার রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের উপর। আমরা জেনেছি, রাষ্ট্র হচ্ছে জনগণের সংগঠিত বৃহত্তম সমিতি। যার নিয়মশৃঙ্খলা বিধি-নিষেধ মেনে চলতে প্রত্যেক সভ্যই বাধ্য। কাজেই রাষ্ট্রে আর জনসাধারণে এসে পড়েছে একটা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধটা যখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তখন তার থাকা চাই একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও আইনসঙ্গত কার্য্যপ্রণালী, যার অনুশাসন চরম ও সর্ব্বোচ্চ। এই কার্য্যপ্রণালী ও অনুশাসন নির্দ্ধারিত করবে রাষ্ট্রের সরকার, তার গঠন ও কার্য্য পরিচালনাকে। এ রকম অনুশাসনের প্রয়োগকর্ত্তা হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা (Sovereign Power of the State)। 'সভারেন পাওয়ার' যে সব নীতিগত ও রীতিগত আইনাদি উপস্থাপিত করে শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ, তাদের গঠন, ক্ষমতা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থির করবার জন্যে সেগুলোকে আমরা বলব শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক গিলখ্রাইষ্ট (Gilchrist) শাসনতন্ত্রের এ রকম একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন। হেনরী ডিসেও (Henry Dicey) এর একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কনষ্টিটিউশন্' হচ্ছে, "all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign powers in the state"। রাজনীতিজ্ঞ গেটেলও (Gettel) বলেছেন, রাষ্ট্রের মৌলিক ও মুখ্য নীতিনীতি যেগুলো রাষ্ট্রের গঠন নির্দ্ধারণ করে সেগুলোই হচ্ছে 'কনষ্টিটিউসন'। কাজেই প্রত্যেক রাষ্ট্রের থাকা চাই একটা শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক যে প্রকারেরই হোক, শাসনতন্ত্র তার একটা না থাকলে সে রাষ্ট্র অসম্পূর্ণ ও অনির্দ্দিষ্ট। কারণ শাসনতন্ত্রের অভাবে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে উচ্ছৃঙ্খল ও অরাজক। শাসনতন্ত্রই রাষ্ট্রের শান্তিকে সন্ধান দেয় শাসকের মাঝে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের। অধ্যাপক ষ্ট্রং-এর (Strong) মতে শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে "to limit arbitrarv powers, or in other words, to guarantee certain rights to at least some of the governed।"

রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সব রাষ্ট্রে গঠিত হয়নি সমান ভাবে। কোথাও হয়েছে ঐতিহাসিক পথে একটা ঐতিহ্য বজায় রেখে, কোথাও হয়েছে স্থান-কাল-পাত্রের প্রয়োজন-বোধে এক বিশেষ সময়ে। রাষ্ট্রনীতিবিদ গার্ণার (Garner) বলেছেন, 'কনষ্টিটিউসন' কথাটা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে আমদানী করা হয়েছে প্রথম সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে রাজশক্তি ও আইনশক্তির সংঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজশক্তির একটা সুনির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা ও অস্তিত্বের পরিচয় দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই তখন তাকে গঠিত হয়েছিল একটা অস্পষ্ট শাসনতন্ত্র। পরে যখন লোকের দাবী বাড়িয়ে তোলা হয়, তার এর ভিতর শুধু রাজশক্তির পরিচয় থাকল না, থাকল রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পরিচয়। তাছাড়া জনের 'ম্যাগনা কার্টা'কেও শাসনতন্ত্রের একটা প্রাথমিক রূপ বলা যেতে পারে। কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের দাবীকে রাজার মেনে নেওয়া আর তার ক্ষমতার প্রয়োগের একটা নির্দ্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত রূপ দেওয়া। ১৮৫০ সালের প্রাসিয়ার শাসনতন্ত্রও ছিল এই রকম। সেখানে রাজাকে জনগণের স্বাধিকার স্বীকার করতে হয়েছিল।' তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল 'গণতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল পথে, জনগণের দাবী মেনে নিতে'। যদিও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে আমরা দেখেছি শাসনতন্ত্রের একটা অপরিণত রূপ এবং তার আগে যে শাসনতন্ত্র বলে কিছু ছিল না এমন নয়। রাজনীতির আদি গুরু এ্যারিষ্টটল প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রের কনষ্টিটিউসন সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন, খৃষ্টপূর্ব ৬২৪ থেকে ৪০৪ পর্য্যন্ত গ্রীক রাষ্ট্রে না কি এগারটা 'কনষ্টিটিউশন' ছিল। তাঁর 'Politics'-এ তিনি তখনকার রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র কি তার একটা নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "A constitution is the organisation of offices in a state and determines what is to be

the governing body and what is the end of the community"। তখনকার রোমের রাষ্ট্রেও 'কনষ্টিটুয়েন্ট পাওয়ার' নির্দ্ধারণে এ্যারিষ্টটলের সমর্থনে "rem republicam constituere" প্রবাদ কাজ করেছিল অনেকটা। এদিকে আমাদের দেশের প্রাচীন মৌর্য্যযুগের রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পরিচয় আমরা পাই কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'। এতে কৌটিল্য স্পষ্ট একটা নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন রাজা কি করে রাজ্য শাসন করবেন, তাঁর সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ কি রকম হবে, রাজ্যের গঠন ও শাসনপ্রণালী কি রকম হবে, এ সবের। মধ্যযুগের ইংলণ্ডে ফিউডাল রাজাদের সঙ্গে নগরের, 'কর্পোরেশনের', চার্চ্চের বা প্রজাদের সম্বন্ধ স্থির করার উদ্দেশ্যে কতকগুলো সর্ত্তাবলী (charters) রচিত হয়েছিল—যেগুলো নির্দ্দেশ দিয়েছিল ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের। পরে ১৬৪৭ সালে ক্রমওয়েলের সাধারণতন্ত্রের "Agreement of the People" নামে খ্যাত সর্ত্তাবলী থেকে সূচনা পাওয়া যায় ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের। আমেরিকাতে শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক সূচনা লক্ষিত হয় ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—যখন প্রথম "American Constitution" গঠন করা হয়। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ব্রাইসের (Bryce) মতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের একটা মৌলিক পরিচয় আমরা পাই এই শাসনতন্ত্রে। আমেরিকার নীতি অনুসরণ করল ১৭৯০ সালের তার প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্রে। তখনকার জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রগুলিও এ রকম শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হয়েছিল ১৮১৪ সালে। এই ভাবে ১৮১২ সালে স্পেন, ১৮১৪ সালে নরওয়ে, ১৮৪৮এ ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ড, ১৮৬১তে অষ্ট্রীয়া ও ১৮৬৬তে সুইডেন লিখিত শাসনতন্ত্রের আশ্রয় নিল। এ ভাবে ঐতিহাসিক সমর্থনে যে সব শাসনতন্ত্র গঠিত হয়েছিল সেগুলো পরিচিত 'লিখিত শাসনতন্ত্র' (Written Constitution) নামে; কারণ এগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল একটা নির্দ্দিষ্ট 'ডকুমেণ্টের' আকারে প্রমাণ্য হিসেবে; লোকের মুখে, রাজার খেয়ালে বা শক্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল না।

অনেক রাষ্ট্রে আবার লিখিত ভাবে গঠিত কোন রকম শাসনতন্ত্র নেই। সেখানে শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে চিরাচরিত একটা রীতির সমর্থনে। দেশপ্রথা, লোকাচার, বিচারগত সিদ্ধান্ত বা কোন সামাজিক রাজনীতির প্রয়োগে ও প্রভাবে সে শাসনতন্ত্রের গঠন। তাকে সমস্ত বিশেষ একটা দলিলের আকারে কালি কলমে লিপিবদ্ধ করা হয়নি বলে তাকে বলা হয়েছে 'অলিখিত শাসনতন্ত্র' (Unwritten Constitution)। ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের (United Kingdom) শাসনতন্ত্র এর উদাহরণ। সেখানে দেশের চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতি সেখানকার শাসনতন্ত্র গঠনে বড় সমর্থন পেয়েছে, তাই 'কনভেনশন্' সেখানে অধিকার করে আছে বিশিষ্ট অংশ। ১৯১৯এর আগের সার্ভিয়ার রাষ্ট্রে ও ১৯১০এর আগের তুরস্কের রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এ রকম অলিখিত শাসনতন্ত্র। আফগানিস্থানের শাসনতন্ত্রও তাই। এ সব অলিখিত শাসনতন্ত্রকে কোন কোন রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক বলেছেন 'কনভেনশনাল' (Conventional) শাসনতন্ত্র।

শাসনতন্ত্রকে লিখিত ও অলিখিত এ দু'ভাগে যে ভাগ করা হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেটা করা হয়েছে মোটামুটি ভাবে, এদের মধ্যে পার্থক্যটা বিশেষ দৃঢ় নেই। কারণ লিখিতের মধ্যে অলিখিতের ও অলিখিতের মধ্যে লিখিতের সন্ধান আমরা পেয়েছি বড় বড় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে। ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্র 'আনরিটন্' বা অলিখি[illegible] হলেও সেখানে লিখিত শাসনতন্ত্রের রূপ আমরা খানিকটা পেয়েছি[illegible] জনের আমলের 'ম্যাগ্না কার্টা' থেকে পরবর্ত্তী যুগের 'বিল [illegible] রাইট্স্', 'রিফর্ম বিল' প্রভৃতি বিশিষ্ট বিলের অস্তিত্ব সে শাসন[illegible] বেশ স্পষ্ট। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত বড় একটা 'রিটন্' বা লি[illegible] শাসনতন্ত্রে অলিখিত অংশ অনেকটা স্থান পেয়েছে সেখান[illegible] প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনী ভোট-ব্যাপার, কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধা[illegible] প্রভৃতিতে। লিখিত শাসনতন্ত্রে সেখানে নিয়ম ছিল, কোন নাগা[illegible] একাধিক অনেক বারই প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হতে পারবে[illegible] কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন পর পর দু'বার নির্ব্বাচিত হয়ে তৃতীয় [illegible] আপত্তি জানান। তার পর থেকে নীতি দাঁড়িয়ে যায়—কোন [illegible] প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী তৃতীয় বার হতে পারবেন না।

কোন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র থাকতে পারে না চিরকাল একভা[illegible] দেশকালপাত্র অনুযায়ী তাকে পরিবর্ত্তিত করে নিতে হয়েছে রা[illegible] অবস্থা বিবেচনা ক'রে। যুগের পর যুগ এসেছে আর সঙ্গে নি[illegible] এসেছে নতুন নতুন অবস্থা—যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে প্র[illegible] প্রত্যেক রাষ্ট্র তার গঠনকে। প্রাচীন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র পরিব[illegible] হয়েছে মধ্যযুগের শাসনতন্ত্রে, মধ্যযুগেরটা আবার পরিবর্ত্তিত [illegible] পরিবর্দ্ধিত হয়েছে আধুনিক যুগে। আধুনিক শাসনতন্ত্র আ[illegible] সুযোগ দেবে ভবিষ্যতেরটার। তাই কালের ও সভ্যতার অগ্রগতি[illegible] সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলতে হয়েছে রাষ্ট্রকে। কাজেই শাসনতন্ত্র[illegible] পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজনটা বোঝা গেছে ভাল ভাবেই। প্রয়োজ[illegible] কিন্তু সব রাষ্ট্রে সমান ভাবে অনুভূত হয়নি, কোথাও হয়েছে বিশে[illegible] ভাবে, কোথাও হয়েছে সাধারণ ভাবে। যে রাষ্ট্রে প্রয়োজন[illegible] বিশেষ ভাবে বোঝা গেছে সেখানে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়ে[illegible] সৃষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট ভাবে, আর যেখানে তা হয়নি সেখানে পরিবর্ত্ত[illegible] ব্যাপারটা রয়ে গেছে একটু কষ্টসাধ্য। এ রকম ভাবে দেখা গে[illegible] দু'রকম শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের নীতির দিক থেকে—একটা নমনীয় [illegible] সহজে পরিবর্ত্তনসাধ্য যেটাকে ইংরাজিতে বলে 'ফ্লেক্সিবল কনষ্টিটিউশ[illegible] (Flexible Constitution)। আর একটা অনমনীয়, দৃঢ় [illegible] সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না, যেটাকে বলা হয় 'রিজিড' (Rigid [illegible] অধ্যাপক গার্ণার বলেছেন, 'রিজিড' ও 'ফ্লেক্সিবল' এ দু'রক[illegible] শাসনতন্ত্রের সব চেয়ে বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগ : কারণ, সাধারণ আই[illegible] প্রণয়নের নীতির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আছে অনেকটা। সাধারণ[illegible] যে রাষ্ট্রে আছে 'রিটন্ কনষ্টিটিউশন' সেখানে আছে 'রিজি[illegible] কনষ্টিটিউশন্'; আর যেখানে আছে 'আনরিটন্' সেখানে আ[illegible] 'ফ্লেক্সিবল'—যেমন যুক্তরাজ্য, ইটালী, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্[illegible] ফ্লেক্সিবল শাসনতন্ত্রের সুবিধে এই যে, রাষ্ট্রের অবস্থার পরিবর্[illegible] অনুযায়ী এটাকে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে সহজে—সাধারণ এর আইন পরিবর্ত্তিত করা হয় যে প্রণালীতে সেই প্রণালীতে। কাজে[illegible] রাষ্ট্রের জাতীয় জীবনের ঠিক প্রতিচ্ছবি এ হতে পারে জাতী[illegible] উন্নতির সঙ্গে এর সত্তা রূপান্তরিত করে। রাষ্ট্রনীতিক ম্যাকইণ্ট[illegible] (McIntosh) কথা—"Constitutions grow instead [illegible] being made" এখানে পেয়েছে যথেষ্ট সমর্থন। শাসনতন্ত্র সম্ব[illegible] প্রেসিডেণ্ট উইলসনের মন্তব্য, "its substance is the though[illegible] and habit of the nation" এখানে প্রয়োগের যোগ্য

অনমনীয় বা 'রিজিড' শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সহজে করা যায় না। 'ফ্লেক্সিবল্' শাসনতন্ত্র যেমন সাধারণ একটা আইনের মত সহজে পরিবর্ত্তন করা চলে, এর বেলায় তা চলে না মোটেই। একে পরিবর্ত্তিত করতে হলে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায় ও বিশেষ নির্দ্ধারিত এক প্রণালীর ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এ পদ্ধতিটা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে রকম, ফ্রান্সের রাষ্ট্রে সে রকম নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করতে হলে সেখানকার 'সিনেট' ও 'হাউস অফ রিপ্রেসেণ্টেটিভ' দ্বারা গঠিত আইন-সভা 'কংগ্রেসের' ডাকতে হবে যুক্ত অধিবেশন। তাতে যদি উপস্থিত সভ্যদের তিন ভাগের দু'ভাগ পক্ষে মত দেন তবেই চলবে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করা। অঙ্গ রাষ্ট্রের আইন-সভা থেকেও যদি আবেদন আসে পরিবর্ত্তন সাধনের জন্যে তখন তাদের নিয়ে বসান হবে একটা 'কনভেনশন্'—যেখানে সভ্যদের চার ভাগের তিন ভাগ সভ্যদের মতানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন চলবে। ফ্রান্সে এ নিয়মটা একটু শিথিল। সেখানে আইন-সভার দু'টো সভা 'সিনেট' ও 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ' এক যুক্তসভায় মিলিত হয়ে স্থির করবে পরিবর্ত্তন চলবে কি না। সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তন করার আর এক রকম নীতি আছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের সরাসরি মত গ্রহণ। প্রথমে আইন-সভায় সাধারণ এক খসড়া প্রস্তুত করা হবে, পরে সেটাকে প্রচার করা হবে জনসাধারণের মাঝে গণভোট নেবার জন্যে। সেই ভোটের ফলাফল বিচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ নীতি পরিচিত 'রেফারেণ্ডাম' (Referendum) নামে। সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট রাষ্ট্রেই এর ব্যবহারটা চলে ভাল ভাবে। বড় রাষ্ট্রের বেলায় এর যথেষ্ট অসুবিধে। শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন আবার অনেক সময় দেখা গেছে ক্ষেত্রবিশেষে শাসনতন্ত্র প্রয়োগে সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অবলম্বনে। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এ রকম বিচারসম্মত ব্যাখ্যা করণের (Judicial interpretation) দান আছে অনেকটা। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে মার্কিণ নীতিই এক রকম অনুসৃত হয়েছে। শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করতে হলে ভারতীয় আইন-সভার যে কোন একটা সভায় ঐ সম্বন্ধে একটা বিল উপস্থাপিত করতে হবে। তার পর প্রত্যেক সভাতে সভ্যদের তিন ভাগের দু'ভাগ সভ্যের ভোটে বিলটি পাশ হলে সেটা উপস্থিত করা হবে প্রেসিডেণ্টের সামনে তাঁর মঞ্জুর পাবার জন্যে। তাঁর মঞ্জুর পেলে তখন পরিবর্ত্তন সাধিত হবে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র গঠিত হয়নি এখনো, তাই সেটার স্বরূপ কি হবে তা জানা যাবে ভবিষ্যতে—যখন সেখানে শাসনতন্ত্র গঠিত হবে বর্ত্তমান পাক-গণপরিষদের দ্বারা।

এবার একটু ফেরা যাক বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর দিকে—তাদের শাসনতন্ত্র কি রকম জানবার জন্যে। আমরা জেনেছি, 'বৃটিশ কনষ্টিটিউশনের' প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, সেটা 'আনরিটন্' বা অলিখিত। ইংলণ্ডের ইতিহাসের গোড়ার দিক থেকেই যুগের পর যুগ ধরে সেখানকার শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছে ক্রমে-ক্রমে, হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজন-বোধে গঠিত হয়নি। তাই সেটা আখ্যা পেয়েছে 'কনভেনশানাল'। সেখানে রাজার অস্তিত্ব ও ক্ষমতা, 'পার্লামেণ্ট' ও 'ক্যাবিনেটের' মধ্যে সম্বন্ধ ও তাদের কার্য্যাবলী, মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য ও মর্য্যাদা, এ সবই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে 'কনভেনশনের' নির্দ্দেশে। এ জন্যে বিশেষ কোন 'ডকুমেণ্টের' আকারে সে শাসনতন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়নি বলে কোন রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক বলেছেন—"England has no constitution"। যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্রের আর একটা লক্ষণ হচ্ছে সেটা 'ফ্লেক্সিবল্', সাধারণ একটা আইনের মতই সেটাকে অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করা চলে। তাই সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) ও সাধারণ আইন (Ordinary Law) বলে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। কোন কোন রাজনীতিবিদ্ এ শাসনতন্ত্রকে বলেছেন মিশ্রিত শাসনতন্ত্র (mixed constitution)। কারণ এতে উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজ-সিংহাসনপ্রাপ্তির নীতিটা হচ্ছে রাজতন্ত্রের (Monarchy) চিহ্ন, আর পার্লামেণ্টের গঠন ও কার্য্যাবলী গণতান্ত্রিক ভিত্তির পরিচায়ক। তাই এ দু'য়ের মিশ্রণে চলছে এ শাসনতন্ত্র। 'বৃটিশ ক্রাউনের' অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা, 'পার্লামেণ্টের' গঠন ও কার্য্যাবলী, বিচার বিভাগের গঠন ও নিয়মাবলী—এগুলো সবই নির্দ্দিষ্ট ও নির্দ্ধারিত হচ্ছে সেখানে এ শাসনতন্ত্রের দ্বারা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যৌক্তরাষ্ট্রীক, এটাকে বলা হয় 'ফেডারেল'। প্রথমে যখন ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মাত্র তেরটা রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছিল মার্কিণ 'কনফেডারেশন' (Confederation), তখন তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল অনৈক্য ও বিরোধ। সেটাকে দূর করবার জন্যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া শহরে এক মহা সম্মেলনে রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল শাসনতন্ত্র। এ শাসনতন্ত্রই মার্কিণ শাসনতন্ত্রের গোড়াপত্তন। বর্ত্তমানে ঊনপঞ্চাশটা রাষ্ট্র নিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্র, তার শাসনতন্ত্র আরও ব্যাপক ও বৃহত্তর। এটা একটা নির্দ্দিষ্ট ডকুমেণ্টের আকারে গৃহীত, তাই এটা 'রিটন্', এটা আবার 'রিজিড'ও। একে সাধারণ ভাবে পরিবর্ত্তিত করা চলবে না, করতে হবে বিশেষ এক পদ্ধতি মেনে—যার বিষয় একটু আগে আলোচিত হয়েছে। মার্কিণ শাসনতন্ত্রে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। সেখানকার ফেডারেল কোর্টকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, আইন-সভার আইনগুলোকে বৈধ বা অবৈধ স্বীকার করবার। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক আইনই সেখানে চলছে। তাতেই দেখা যাচ্ছে, মার্কিণ শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগকে দেওয়া আছে বেশী রকম ক্ষমতা। গণতান্ত্রিক মর্য্যাদা পরিপোষণ দেবার উদ্দেশ্যে এ শাসনতন্ত্রে আর একটা বিষয় স্পষ্ট রাখা হয়েছে। সেটাকে বলা হয় দমন ও নিয়ন্ত্রণের (checks and balances) নীতি। যুক্তরাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যাতে জনসাধারণের উপর যথেচ্ছ প্রযুক্ত না হয়, যাতে তাদের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা অটুট থাকে, তার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে এ নীতির। তা ছাড়া, আইন, বিচার ও কার্য্যকরী বিভাগগুলোর ক্ষমতা পৃথক্ ও সুনির্দ্দিষ্ট রাখার জন্যে মন্টেস্কুর (Montesque) নীতি 'সেপারেশন অফ পাওয়ার্স' (Seperation of Powers) মার্কিণ শাসনতন্ত্রে যথেষ্ট প্রযুক্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় 'ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের' গঠন ও ক্ষমতা ছাড়া রাষ্ট্রগুলোরও ক্ষমতা কার্য্যাবলী ও গঠন নির্দ্ধারিত হচ্ছে এ শাসনতন্ত্রের দ্বারা।

ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের কথা আলোচনা করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৩৯—৪৫-এর মহাযুদ্ধের আগে। কারণ এ যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটা অধিকৃত আর একটা অনধিকৃত। অনধিকৃত অংশটাতে ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট

প্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের পূরো রূপটা গঠিত হয়েছিল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। এ শাসনতন্ত্রের একটা বৈচিত্র্য আছে। সেটা হচ্ছে, ১৭৮৯ থেকে ১৮৭৫ অবধি ছিয়াশী বছরের মধ্যে প্রায় বার রকমের শাসনতন্ত্র গঠিত হয়েছে সেখানে। ১৮৭৫এ পূরোপূরি একটা নির্দ্দিষ্ট শাসনতন্ত্র গঠিত হল। তাই ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্যের মত যুগের পর যুগ ধরে ঐতিহাসিক পথে গঠিত হয়নি এ। এ শাসনতন্ত্র মূলতঃ 'পার্লামেণ্টারী' ও 'রিজিড'। অবস্থাবিশেষে এটাকে সহজে পরিবর্ত্তিত করা চলে না। ফ্রান্সে প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন রাষ্ট্রের "এক্সিকিউটিভ হেড" যিনি আইন-সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত। তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্যে আছেন প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা। আইন-সভা দু'টো ভাগে বিভক্ত; একটাকে বলা হয় সিনেট (Senate) বা 'আপার হাউস' আর একটাকে বলা হয় 'চেম্বার অফ ডেপুটিজ' (Chamber of Deputies) বা 'লোয়ার হাউস'। বিচার বিভাগে এখানে একটা লক্ষ্য করার বিষয় আছে। অন্য রাষ্ট্রে যেমন সব জনসাধারণের জন্যে ব্যবস্থা আছে নিরপেক্ষ বিচারের একটা সর্ব্বোচ্চ আদালতে। ফ্রান্সে কিন্তু দু'রকম বিচারের ব্যবস্থা—সাধারণ লোকের জন্য এক রকম আর রাজপুরুষদের জন্যে আর এক রকম—যেটার আদালতকে বলা হয় 'এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ কোর্ট' (Administrative Court)

সোভিয়েট রুশিয়ার শাসনতন্ত্র বুঝতে গেলে আমাদের একটু দেখে নিতে হবে তার ইতিহাসটা। ১৯০৫ সালের বিখ্যত রুশ-বিপ্লবের পর দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসন ত্যাগের সঙ্গে সেখানে জার-রাজ্যের পতন হয় এবং একটা 'সোভিয়েট' বা শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা গঠিত একটা সভার হাতে চলে আসে ক্ষমতা লেনিনের নেতৃত্বে। সেটা ছিল ১৯১৭ সাল। তার পর বলশেভিক দল ১৯১৮ সালে 'কম্যুনিষ্ট পার্টি' নামে রাষ্ট্র পরিচালন-ভার গ্রহণ করে এবং নিখিল রুশিয়া সোভিয়েট কংগ্রেসের পঞ্চম সম্মেলনে ১৯১৮র জুলাই মাসে একটা শাসনতন্ত্র রচিত হয়। তখন থেকেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের নাম হয় ইউ. এস. এস. আর (Union of Soviet Socialist Republic)। এ শাসনতন্ত্র পরে পরিবর্ত্তিত করা হয় ১৯২৩ সালে সোভিয়েট কংগ্রেসের অষ্টম সম্মেলনে। এটাকেও আবার পরিবর্ত্তিত করা হয় ১৯৩৬ সালে যেটা 'ষ্ট্যালিন কন্‌ষ্টিটিউশন' নামে অভিহিত। এ শাসনতন্ত্র 'ফেডারেল' ও 'ইউনিটারী'। এ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া আছে 'সুপ্রীম কাউন্সিলের' 'প্রেসিডিয়াম' (Presidium) নামে একটা সভার উপর। 'প্রেসিডিয়ামে' আছেন এক জন 'চেয়ারম্যান,' এগার জন 'ভাইস চেয়ারম্যান,' এক জন সম্পাদক আর চব্বিশ জন সদস্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের মত এখানে কোন 'এক্সিকিউটিভ হেড' বা প্রেসিডেণ্ট নেই। 'প্রেসিডিয়ামই' এখানে আইন, বিচার ও কার্য্যকরী বিভাগের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চরম সভা। বর্ত্তমানে ষ্ট্যালিন হচ্ছেন এর চেয়ারম্যান।

নতুন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে ভারতীয় গণপরিষদের দ্বারা আর ঘোষিত হয়েছে, "We…in our Constituent Assembly this 26th day of November, 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution"। এ শাসনতন্ত্র সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic)। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—ভারতীয় জনসাধারণকে দেওয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, চিন্তা, ভাবপ্রকাশ ও ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা, সত্তা ও সুযোগ-সুবিধের সাম্য এবং তাদের মধ্যে গঠন করা মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব ভাব। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত হবে কতগুলো রাষ্ট্রের একটা ইউনিয়ন (Union of States)। রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝব—এত দিন যাদের বলা হত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য তাদের, এবং যে-সব রাষ্ট্র ইউনিয়নের মধ্যে ভবিষ্যতে গ্রহণ করা হবে বা অধিকার করা যাবে তাদের। শাসনতন্ত্রের ৫৩ ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যকরী ক্ষমতা (Executive Power) থাকবে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের উপর। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হবেন পাঁচ বছরের জন্যে ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় সভার ও সংগঠনকারী রাষ্ট্রগুলোর 'লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্ব্লীর নির্ব্বাচিত সদস্যদের গঠিত একটা নির্ব্বাচনী মণ্ডলীর (Electoral college) দ্বারা। প্রেসিডেণ্টের অবর্ত্তমানে তাঁর কর্ত্তব্য পালনের জন্যে আর তাঁকে সাহায্য করার জন্যে থাকবেন এক জন ভাইস প্রেসিডেণ্ট। তিনি পার্লামেণ্টের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হবেন পাঁচ বছরের জন্যে। প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকলাপে সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্যে থাকবে একটা মন্ত্রিসভা। এর মন্ত্রীরা প্রেসিডেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হবেন প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ও প্রেসিডেণ্টের যত দিন খুসী তত দিন অধিষ্ঠিত থাকবেন মন্ত্রিপদে। মন্ত্রীরা এক-এক জন এক-এক বিভাগের কর্ত্তা থাকবেন আর তাঁদের কাজের জন্যে তাঁরা দায়ী থাকবেন যুক্ত ভাবে ভারতীয় পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ দি পিপল'এর কাছে। পার্লামেণ্ট গঠিত হবে দু'টো সভা নিয়ে—আড়াই শ' জন ষ্টেটের প্রতিনিধি ও প্রেসিডেণ্টের মনোনীত সভ্য নিয়ে গঠিত উচ্চকক্ষ 'কাউন্সিল অফ ষ্টেট' (Council of States) একটা; আর ষ্টেটগুলোর জনসাধারণের নির্ব্বাচিত পাঁচ শ' প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ দি পিপল' (House of the People) একটা। এ গেল কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের কথা। সংগঠনকারী এক একটা রাষ্ট্রেও অনুরূপ ভাবে 'এক্সিকিউটিভ হেড' আছেন এক জন রাজ্যপাল বা গভর্ণর যাঁদের নীচে আছে একটা মন্ত্রিসভা। রাজ্যপালরা প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হবেন আর তাঁর খুসীমত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। রাজ্যপালকে পরামর্শ দেবার জন্যে মুখ্য মন্ত্রীর (Chief Minister) নেতৃত্বে থাকবেন এক এক জন মন্ত্রী, যাঁরা রাজ্যপালের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন। শাসনতন্ত্রের ১৬৮ ধারা অনুযায়ী বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিম-বঙ্গ প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্রে দু'টো আর অন্য রাষ্ট্রে একটা করে থাকবে আইন-সভা। যেখানে থাকবে দু'টো, সেখানে নিম্নকক্ষটার নাম হবে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লী (Legislative Assembly) আর উচ্চকক্ষটার নাম হবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল (Legislative Council)। নিম্নকক্ষের সভ্য-সংখ্যা পাঁচ শ'র বেশী হবে না, আর উচ্চটার সংখ্যা থাকবে তার এক-চতুর্থাংশের বেশী নয়। যে সব দেশীয় রাষ্ট্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে এক্সিকিউটিভ হেড থাকবেন রাজপ্রমুখ। রাজপ্রমুখ আর রাজ্যপালদের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, রাজ

রামকৃষ্ণ সঙ্গীত

[স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ কর্তৃক ১৯২৮ খ্রীঃ তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে রচিত এবং স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক ১৯৫০ খ্রীঃ সংগৃহীত

(৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা…' গানের সুরে)

সরল ভাষায় বুঝাইতে, সরল কথায় শিক্ষা দিতে
জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ আর সুধামাখা বাণী।
(এমন) কে শুনেছে, কোথায় আছে, বল দেখি শুনি ॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক' কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবল মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু।
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥ ১

কামিনী-কাঞ্চন ত্যজ, মজে কেন ভ্রমে মজ
এই কথা সার করে বলে গেছেন তিনি।
(আবার) তাঁরি নামে সংকীর্তনে মাতুক মেদিনী ॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক' কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবল মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥ ২

সাংখ্যাদি বেদ-বেদান্ত, দর্শনে যার নাইক' অন্ত
কোরাণ বাইবেল সবই মাত্র একই, ভিন্ন নয়।
কে করেছে এরূপ সর্বধর্ম-সমন্বয় ॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক' কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবল মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥ ৩

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
আশীষ দাও পরমহংস সেবক সন্তানে।
মোদের সদাই যেন থাকে মতি তোমার শ্রীচরণে ॥
কোথাও এমন জ্ঞান উপদেশ পাবে নাক' কভু।
(সে যে) দিয়ে গেছেন কেবল মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু
জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু ॥ ৪

গবর্ণর রাজ্যপালদের মত প্রেসিডেন্টের দ্বারা নিযুক্ত নন, প্রেসিডেন্টের ইচ্ছামত তাঁর কার্যকাল নয় এবং তিনি দেশশাসনভোগী নন, এক নির্দিষ্ট ভাতাভোগী। ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনস্থ এক মাত্র মহীশূর রাজ্যও অনুরূপ নিয়ে গঠিত, তার জন্য রাষ্ট্র গঠিত একটি নিয়ম। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের শিরোভাগে সর্বোচ্চ বিচারালয় থাকবে সুপ্রীম কোর্ট, আর প্রত্যেক রাষ্ট্রে থাকবে একটা ক'রে হাইকোর্ট।

এ হ'ল নতুন ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মোটামুটি পরিচয়। এতে নতুনত্ব কিছু লক্ষ্য করার নেই। কারণ এটা মূলতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ও বৃটেনের নীতিতে এক মিশ্রিত শাসনতন্ত্র। মার্কিন রাষ্ট্রের ফেডারেল চরিত্র অবলম্বনে প্রেসিডেন্ট ও রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা বিভক্ত করা হয়েছে, আবার আইন-সভার গঠন ও চরিত্র অনেকটা বৃটিশ পার্লামেন্টারী ধরণের। তা ছাড়া এতে অনেক কিছু নেয়া হয়েছে ১৯৩৫ সালের সেই ভারত শাসন আইনের বিধান একটু পরিবর্তিত আকারে। কাজেই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী শাসনতন্ত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ পাই না, সবই যেন পুরো পুরোনো মদ নতুন চকচকে বোতলে!

[ক্রমশঃ]

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বারো

বাগুলী দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য চিকিৎসক-নির্ব্বাচনের বহু প্রত্যাশিত দিনটি অবশেষে রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের সাড়া তুলিয়া দেখা দিল। কোনো বিখ্যাত মকদ্দমার নিষ্পত্তিগত রায়টি জানিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট মহল যে-ভাবে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠেন,—বাগুলী চিকিৎসালয়-সংক্রান্ত এই ব্যাপারটিও বাগুলীর অধিবাসীদের মধ্যে অনেকটা সেইরূপ আগ্রহোন্মুখ ও উত্তেজক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে গাঙ্গুলী-বাড়ীর দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত পক্ষের জিদ ও প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করিয়া প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। সুতরাং এরূপ বিশিষ্ট দুইটি পক্ষের স্নায়ু-সংগ্রামের জয়-পরাজয় জানিবার জন্য আগ্রহ পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু যে-প্রতিপক্ষটির প্রতি লোকের আস্থাপূর্ণ দৃষ্টি সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে গভীর ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, এ দিন তাঁহাকে এ-ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত দেখিয়া সংশ্লিষ্ট মহল অবাক হইয়া গেল। প্রাত্যহিক ব্যবস্থা মত চণ্ডী শ্বশুরের চরণ-বন্দনা করিতে গিয়া দেখিল, অভ্যাস মত তিনি আরাম-কেদারায় বসিয়া মুক্ত গবাক্ষ-পথে দিক্‌-চক্রবালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—সুনীল মেঘপুঞ্জ ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব গোলকটি যেখানে উঁকি-ঝুঁকি করিতেছে। গৌরবর্ণ নগ্ন দু'টি পদতলে পরিচিত হাতের স্পর্শমাত্র তিনি পাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া সহাস্যে কহিলেন: তোমার কথাই ভাবছিলাম মা, আজই যে তোমাদের একটা বৃহৎ পরীক্ষা—দেখা যাক্ কোন্ বিড়ালটির ভাগ্যে সিকেটা ছিঁড়ে পড়ে!

শ্বশুরের পদপ্রান্তে গলায় আঁচল দিয়া মাথাটি নত করিবার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া হাতের তাম্রপাত্র হইতে পঞ্চমুখী জবা ফুলটি তাঁহার ললাটে ঠেকাইয়া চণ্ডী বলিল: এই সাধারণ ব্যাপারটি নিয়ে আপনিও ভাবতে বসেছেন, বাবা?

বধূর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হরিনারায়ণ সবিস্ময়ে কহিলেন: সাধারণ! এ কথা তুমি বলছ মা? জানো, বাগুলীর সবার মুখেই আজ এইটেই সব চেয়ে বড় কথা! খবর যদি নাও তো, জানতে পারবে—কৌতূহলের তাপে রাতে অনেকের হয়ত ঘুম পর্য্যন্ত হয়নি—এই ক'টা দিনের মধ্যে কত রকমের কত গল্পই রচ

একটু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আপনি তো জানেন বাবা, পরের কথা নিয়ে গল্পের জাল বুনতে লোকের অভাব হয় না—নিষ্কর্ম্মাদের এর চেয়ে আনন্দ আর কিছুতেই নেই। কিন্তু সে গল্প আমি যেমন শুনতে চাইব না, কেউ শুনতে এলে আপনিও কানে আঙ্গুল দেবেন নিশ্চয়।

চণ্ডীর মুখে দৃষ্টি তেমনই নিবদ্ধ রাখিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন: তুমি কি তা'হলে আজকের ব্যাপারটাকে মোটেই গ্রাহ্য করতে চাইছ না? এটা কি সত্যই উপেক্ষা করবার মত ব্যাপার?

চণ্ডী কহিল: আচ্ছা বাবা, আমাদের সেরেস্তায় তো এ রকম ব্যাপার হামেশা হয়ে থাকে—এক জন চলে গেলে তার জায়গায় আর এক জন লোককে নেওয়া হয়, প্রার্থীদের মধ্যে যাঁকে পছন্দ করা হয় যোগ্যতা বিচার ক'রে, তাঁকেই বাহাল করা হোয়ে থাকে। এ নিয়ে সেরেস্তার যাই হোক, বাইরের কেউ মাথা ঘামায় না—কোন গোলও ওঠে না। তবে এ ব্যাপারেই বা এ রকম অনর্থ উৎপত্তি হয় কেন?

মৃদু হাসিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন: এই তো মা, এত বুদ্ধিমতী হোয়েও কথাটা বলতে বাধল না! সেরেস্তার কোন লোক রাখা আর এই ডাক্তার ঠিক করা—এ কি এক ধরণের কাজ বলতে চাও? এটা যে এখন দলাদলি ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে, আর সেই জন্য বাইরের লোকের কৌতূহলও এত বেড়েছে। কাজেই, সেরেস্তার লোক বেছে নেওয়ার সঙ্গে আজকের এই ডাক্তার মনোনয়ন তুলনাই হোতে পারে না। আমরা মুখ বুজিয়ে থাকলেও লোকের মুখ তো চাপা দিতে পারব না—তারা জেনেছে যে, এই ব্যাপার নিয়ে তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে তোমার জেদের লড়াই চলেছে। লোকের ধারণা কি তুমি পাল্টাতে পারবে মা?

মুখখানা গম্ভীর করিয়া চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: কিন্তু বাইরের লোকের মনে এ ধারণা কেমন করে শিকড় গেড়ে বসল বাবা? আমাদের ভিতর থেকেই যদি মিথ্যে করে জোর করে বাড়িয়ে কথাটা বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর তাই নিয়ে বাইরের লোক রূপকথা তৈরী করে আনন্দ পায়, সেখানে আমাদের উচিত হোচ্ছে যারা এ কথা বাইরে ছড়িয়েছে, তাদের সন্ধান করে শাস্তি দেওয়া, নয় ত' বাইরের কথা উঠলেই কানে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকা।

কথাটার প্রতিবাদে চণ্ডী যে এ-ভাবে গোড়া ধরিয়া টান দিয়া রটনাকারীর সন্ধান করিবার কথা বলিবে, হরিনারায়ণ তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। চণ্ডী তাহার ভাষণে রটনাকারীর নাম না বলিলেও সে যে তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে অন্ধকারে নাই, তাহার উক্তির দৃঢ়তায় হরিনারায়ণ তাহা যেমন উপলব্ধি করিলেন, পক্ষান্তরে, কর্ত্রীর উপর এ ব্যাপারটি ছাড়িয়া দিবার পর চণ্ডী যে সম্পূর্ণ ভাবে নির্লিপ্ত রহিয়াছে এবং তাহার পক্ষ হইতে কোনরূপ তদ্বির হইতেছে না, ইহাতেও তিনি নিঃসন্দেহ। সুতরাং কোন্ পক্ষের প্রবল প্রয়াসে বাহিরের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত এবং জল ঘোলা হইয়াছে, তাহাও তাঁ

স্পষ্ট যে, বোধগম্য হইবার পক্ষে কঠিন নহে। মুখখানা নত করিয়া নীরবে হরিনারায়ণ কথাগুলি ভাবিতে লাগিলেন।

চিন্তামগ্ন শ্বশুরকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী এই সময় গাঢ় স্বরে কহিল : তাই বলছিলাম বাবা, এই সাধারণ ব্যাপারটাকে এ ভাবে বাড়ানো উচিত হয়নি। আমার মনে হয়, মাও এটা বুঝেছেন। এখন কমিটীর বিচার যদি আমরা মেনে নি, এর পরও তাহলে আর কোন গোল উঠবে না। আমিও সেইটে চাই।

হরিনারায়ণ এবার সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন : কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে তো কমিটী হোতে পারে না মা। আমি যখন এর চেয়ারম্যান এবং আমার ক্ষমতা তোমাকে দিয়েছি এই মাসের জন্যে, তখন তোমাকেই আমার চেয়ারে বসে আজকের কাজ চালাতে হবে।

চণ্ডী দৃঢ় স্বরে জানাইল : না বাবা, আমাকে ও-অনুমতি দেবেন না—অন্ততঃ এই মিটিং-এ আমি আপনার দত্ত ক্ষমতা নিয়ে ও-চেয়ারে বসব না। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই নির্লিপ্ত থাকতে চাই।

হরিনারায়ণ কহিলেন, তা কি হয়? কমিটীর উপর ভার দেওয়া বলতে এই বোঝায় না যে, তুমি চেয়ারম্যানের আসনে বসবে না।

পূর্ব্ববৎ দৃঢ় স্বরেই চণ্ডী কহিল : না বাবা, কমিটীর উপরেই সমস্ত ভার আমি ছেড়ে দিয়েছি অন্ততঃ আজকের এই ব্যাপারে। কমিটীর সদস্যরাই তাঁদের ভিতর থেকে চেয়ারম্যান ঠিক করে নেবেন। আজ আমি ওর ত্রিসীমাতেও যাব না বাবা! আমার মিনতি, আপনি আমাকে এই নিয়ে আর আদেশ করবেন না।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে হরিনারায়ণ কহিলেন : [illegible] অর্থহীন সভা হবে মা। জানো, তুমি ওখানে না গেলে, [illegible] আমাকেই গিয়ে চেয়ারম্যানের আসনে বসতে হবে।

মুখখানা কঠিন করিয়া চণ্ডী কহিল, সেও হয় না বাবা।

তীক্ষ্ণ স্বরে হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হবে না কেন?

চণ্ডী ধীরে ধীরে উত্তর করিল : ভুলে যাবেন না বাবা, সমস্ত ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, এখন নিজের হাতে সেই ক্ষমতা আপনি কি করে নেবেন?

এ কথায় হরিনারায়ণের উদ্দীপ্ত মুখখানা পলকে ম্লান হইয়া গেল, তাঁহার মুখ দিয়া শুধু একটি কথা বাহির হইল : ওঃ!

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল করিয়া চণ্ডী সবিনয়ে কহিল : ব্যাপারটি আজ যে ভাবে দাঁড়িয়েছে বাবা, তাতে কমিটীর উপরেই ভারটি ছেড়ে দিয়ে আমাদের পক্ষে তফাতে থাকাই উচিত হবে। পরে সব কথা শুনলেই আপনিও এ কথার সমর্থন করবেন।

হরিনারায়ণ নীরবে বধূর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন মাত্র।

চণ্ডী পুনরায় কহিল : অনেক আগে থেকেই বাগুলীর এই দিকটার উপর কারুরই ভালো করে নজর পড়েনি বাবা। অমরনাথ বাবুর আমোলে লোকে যে সুবিধা পেয়েছে, এখন তা উপকথা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। দশ-পনেরো ক্রোশের মধ্যে আর একটা ভালো ডাক্তারখানা নেই, ডাক্তার নেই, এ সব জেনেই তিনি আর এক জন ভালো ডাক্তারকে তাঁর সহকারী করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সহকারীটি তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজে যখন কর্তা হোয়ে বসলেন, আর এক জন ভালো ডাক্তার আনা যে তাঁর কর্ত্তব্য, সেটা ভুলে গেলেন ; আর কমিটীও সে সম্বন্ধে চোখ বুজিয়ে রইলেন। তাই, বিশু ডাক্তার বিদায় হোতে এখন এমন এক জন লোকের উপর এটার ভার পড়েছে, কম্পাউণ্ডারী ছাড়া যার আর কোন যোগ্যতাই নেই—কাজেই যোগ্য ডাক্তারের অভাবে লোকের আজ অসুবিধারও শেষ নেই।

হরিনারায়ণ কহিলেন : ডাক্তারী তো বুঝি না মা, তাই এক জন পাশ-করা আর নাম-করা ডাক্তারের উপরেই সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। বিশু ডাক্তার বুঝিয়েছিল, আর এক জন ডাক্তার এনে খরচ বাড়িয়ে কাজ নেই, যে কম্পাউণ্ডারটিকে রাখা হোয়েছে—অনেক ডাক্তারের চেয়েও তার না কি দক্ষতা বেশী। আমরাও তাই বুঝেছিলাম। তার পর ইদানীং, তুমি যে ভাবে সব সন্ধান নিয়ে তলিয়ে সব দেখেছ, আমি [illegible] কমিটীর কেউই তার ধার দিয়েও যাইনি যে মা। আমাদের একটা দোষ কি জানো, যাকে বেশ মনে লাগে, তার ওপর আস্থা থাকে, বিশ্বাস করে তার উপরেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। অধিকন্তু, যে ব্যাপারগুলো নিজে ভাল বুঝি নে [illegible] আর এমনি মজা—সেই লোক পরে ভারটি পেয়েই একবারে যাচ্ছেতাই সুরু করে থাকে [illegible] এই যেমন বিশু ডাক্তার করে গেছে।

চণ্ডী কহিল : কিন্তু তার জন্যে বাবা, আপনার গরীব প্রজারাই দুঃখ পেয়েছে, বরাবর সহ্য করেছে, মুখ ফুটে বলতেও পারেনি। এই এখনকার কথাই বলছি—ক'দিন ধরে আপনারই এক জন প্রজা তার ছেলের চিকিৎসার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি হোয়ে বেড়াচ্ছে। কম্পাউণ্ডারের ওষুধে কোন ফল হয়নি, এ অঞ্চলে যে ক'জন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী আছেন—কারুর কাছেই কাকুতি-মিনতি জানাতে বাকি রাখেনি। কিন্তু সে গরীব, ভিজিট দিতে অক্ষম জেনে কেউই তার বাড়ী গিয়ে রোগীকে দেখতেও যাননি—ঐ কম্পাউণ্ডারের মতই আন্দাজে ওষুধ দিয়ে সরে পড়েছেন। আর, আমি এক জনের কথা বললাম, এমনি কত লোকই ভুগছে, আর বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাচ্ছে।

বিস্ময়ের স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন : সে কি! কেন, শশী বাবু তো এখানে রয়েছেন, এ অবস্থায় তিনি তো—

চণ্ডী কহিল : তাঁকেও বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজী হননি। বলেছেন, নির্ব্বাচনের আগে এখানকার কোন রোগীকে তিনি দেখতে পারেন না। সেবেস্তা থেকেই ভিজিট দেবার কথাও উঠেছিল ; কিন্তু রোগীর বাড়ী না কি অনেক দূরে—ঐ পাড়াগাঁয়ে, সেখানে তিনি যাবেন না। তবে এই ভরসাটুকু দিয়েছেন—আজ যদি তিনি ডাক্তারখানার ভার পান, তখন রোগীকে এখানে নিয়ে এলে তিনি তার চিকিৎসা করবেন।

গম্ভীর মুখে হরিনারায়ণ কহিলেন : [illegible] নিরপেক্ষ যে ভাবে এই শশী ডাক্তারের পক্ষে তদ্বির সুরু [illegible] মনে হোচ্ছে [illegible] এঁকেই বহাল রেখে দিকে চিঁ [illegible]।

চণ্ডী কহিল : কমিটীর সবাই কথাটা [illegible] যদি তাঁরা এঁকেই উপযুক্ত মনে করে সরকারী চিকিৎসালয়ের ভার দেন, তাই আমাদের [illegible] কিন্তু [illegible] আমরা আগেকার মত চোখ বুজিয়ে থাকব না, লোকের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে এমন আরো দু'-এক জন ডাক্তার আনাবো—গরীব রোগীদের

প্রতি যাঁরা সত্যই দরদী ; আত্মাভিমানের চেয়ে রোগীদের সারিয়ে তোলাই হবে যাঁদের কাছে বড় কথা ।

দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বধূর শেষের কয়টি কথা যেন তীক্ষ্ণ আলোক-রশ্মির একটা সূক্ষ্ম রেখাপাত করিল ! উৎসাহিত হইয়া হরিনারায়ণ সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন : বা, বা ! এর উপর আর কথা নেই মা ! তুমি যে একবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে মনে মনে একটা উপায় স্থির করে রেখেছ, তার আভাস পেয়ে আমি সত্যই আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছি। সত্যি মা, চিকিৎসা-ব্যাপারে এ অঞ্চলটা অনেক পিছিয়ে আছে, এর উপায় আমাদের করতেই হবে । কোন এক জনের উপর ভার দিয়ে এখন থেকে আর নিশ্চিন্ত থাকলে হবে না । তুমি ঠিক বলেছ মা, চার-পাঁচ জন ভালো ভালো ডাক্তার এনে তালুকের প্রজাদের সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হবে—তাহলে হাতুড়েগুলোর পাল্লায় পড়ে তারা মরতে থাকবে না, আর যাঁকেই চিকিৎসালয়ের ভার দেওয়া হবে, তাঁকেও এদিকে নজর রেখে চলতে হবে ।

চণ্ডীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, শ্বশুর সহসা এতটা উৎসাহী হইয়া উঠিলেন কেন ? যদিই শশী ডাক্তারকে কমিটী মনোনীত করিয়া ফেলেন, তাহাতে চণ্ডী যে অভিমান করিয়া তাহার অধিকার ত্যাগ করিবে না, নূতন কোন অশান্তিও দেখা দিবে না, অন্য দিক দিয়া তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া সে যে এই অপ্রীতিকর অবস্থাটা ভুলিতে চাহিবে, ইহাই হরিনারায়ণের এই আকস্মিক হর্ষের হেতু । মনে মনে হাসিয়া এক পলকে আত্মসম্বরণ করিয়া চণ্ডী কহিল : আমি এখন যাচ্ছি বাবা ।

হরিনারায়ণ বাধা দিবার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি কহিলেন : আর একটা কথা মা, গোবিন্দও কি ওখানে যাবে না ? তার অন্তত যাওয়া উচিত তো ?

শান্ত সংযত কণ্ঠে চণ্ডী কহিল : না বাবা, কমিটী নিরঙ্কুশ হয়েই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবেন, ওঁরও এই ইচ্ছা ।

এইখানেই প্রসঙ্গটির উপসংহার করিয়া চণ্ডী শ্বশুরের কক্ষ হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল । হরিনারায়ণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন ।

অন্য দিন এ সময় মাধুরী দেবী প্রায়ই নিদ্রামগ্ন থাকেন, কিন্তু আজ অতি প্রত্যুষেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন সময় স্বামীর সহিত বধূর সংলাপ তাঁহার শ্রুতিস্পর্শ করে । ফলে, তাঁহার আর শয্যাত্যাগ করা হয় নাই, সন্তর্পণে পার্শ্ববর্তী কক্ষের সংলাপের দিকে দুই কর্ণ নিবদ্ধ করিয়া একই ভাবে শয্যায় পড়িয়াছিলেন । চণ্ডীর প্রস্থানের পরেই তিনি ধীরে ধীরে স্বামীর বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, তাহাতে প্রশ্ন সূচিত হইতেছিল । এমন অসময়ে পত্নীকে দেখিয়া হরিনারায়ণ কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন : এত সকালেই আজ ঘুম ভাঙলো যে ?

সামনের কেদারাখানিতে বসিতে বসিতেই মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন : এত হাঁকাহাঁকিতেও ঘুম যদি না ভাঙে, শেষে তুমিই তো কুম্ভকর্ণের মাসী বলে খোঁটা দিতে ।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন : বটে ! কিন্তু যে স্বরে এতক্ষণ আমরা কথা বলছি, এর চেয়েও চড়া স্বরে তো বৌমার সঙ্গে কথা হয়নি, তবু তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল ? কিন্তু বৌমার কথায় তো ভুল ছিল না যে কানে ফুটবে ; বরং শুনে যদি থাক, খুসি হবারই কথা ।

মুখখানি একটু মচকাইয়া মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন : তোমার বৌমার কথায় কথা কইলেই তুমি তো ক্ষেপে ওঠ জানি । বৌমাই তোমাকে বিধান দিয়েছেন, বাইরের কথায় থাকবে না—এই কথা বলবে না, অথচ এ-ঘরে তিনি এলেই তো দেখি—কথার খই ফোটা সুরু হয়েছে, তার আর বিরাম নেই । এত বুঝদার হয়েও তখন তাঁর হুঁস থাকে না, আর তোমার কথা কি বলব বাপু, ভাবো যে বৌমা মধুবর্ষণ করছেন ।

মৃদু হাসিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন : কিন্তু আজ তিনি সত্যই মধুবর্ষণ করে গেছেন । নয় কি ?

অপ্রসন্ন ভাবেই মাধুরী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন : কি [illegible] কথাটা বলা হোচ্ছে ?

হরিনারায়ণ উত্তর করিলেন : তোমাদের অবস্থাটা [illegible] বলা হয়েছে গো ! বৌমা যে স্পষ্ট করেই বলে গেছেন, আজকের ব্যাপারে উনি একেবারে নির্লিপ্তই থাকবেন, এমন কি—তোমার শশী ডাক্তারকে বাহাল করা হোলেও ওঁর কোন আপত্তি নেই । বৌমার কথাটি শুনে সত্যিই আমার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেছে । আশ্চর্য, কথাটা শুনেও তুমি সুখী হোতে পারছ না ?

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মাধুরী দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন : না । তোমার বৌমাকে তোমার চেয়েও আমি ভাল চিনি । সব দিক দিয়ে বেয়ে-চেয়ে তিনি যখন দেখলেন, হালে পানি পাবার যো নেই—বাইরের এক অনামী ছোকরা ডাক্তারকে কেউ পছন্দ করবে না—তাঁর জেদ কিছুতেই রক্ষা হবে না, তখন তিনি কমিটীর ওপরে ভার দিয়েছেন ; কিন্তু তা বলে একেবারে হাল ছাড়েননি—আড়াল থেকে এমন করে সেটি চালাচ্ছেন [illegible] যাতে না জানতে পারে ।

স্তব্ধ ভাবেই হরিনারায়ণ পত্নীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এই অদ্ভুত কথা ভাবিতেছিলেন । এই সময় আস্তে [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন : হাতের হালটি এখন বৌমা কি [illegible] চালাচ্ছেন, সে খবর তুমি যখন জেনেছ—বলেই ফেল, আমিও শুনি ।

স্বামীর বিস্ময়াপন্ন মুখের উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন : সে কথা বৌমা তো নিজের মুখেই বলে গেছে, ভালো করে একটু ভেবে দেখলেই জানতে পারতে ।

সহজ কণ্ঠেই হরিনারায়ণ কহিলেন : নিজের অক্ষমতা মেনে স্বীকার করছি, তুমিই না হয় সেটি জানিয়ে দাও ।

অসঙ্কোচেই মাধুরী দেবী কথাটা বলিয়া ফেলিলেন । জানাইলেন যে, চণ্ডীর কথাগুলি অনুশীলন করিয়া তিনি ইহাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ডাক্তার বাগচিকে কমিটী বাহাল করিলেও তাঁহাকে না তাড়াইয়া ছাড়িবে না । বাগচি মহাশয়ের সঙ্গে আরও কতিপয় ডাক্তার রাখা এবং ডাক্তারখানার ভার বাগচির উপর দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া না থাকিবার যে প্রসঙ্গ সে তুলিয়াছে, তাহার নিগূঢ়ার্থই হইতেছে, ডাক্তার বাগচির মত সম্মানিত ব্যক্তিকে পদে পদে অপদস্থ করা এবং তাঁহার অধস্তন ডাক্তারদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া । এমন কি, কলিকাতা হইতে যে ডাক্তারটিকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহাকেও এই অজুহাতে ডাক্তারখানার

রূপে নিযুক্ত করা হইবে এবং তিনি যাহাতে ডাক্তার বাগচির উপর কর্তৃত্ব করিতেও সঙ্কুচিত না হন, সেইরূপ প্রশ্রয়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে।

পত্নীর উপলব্ধিমূলক কথাগুলি শুনিয়া হরিনারায়ণ কৌতুকহীন প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন : এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, না জানি বৌমার কি ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথাই জেনে ফেলেছ তুমি! দেখছি, তোমার সেই প্রখর বুদ্ধিও ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে গেছে। নৈলে, ডাক্তার বাগচিকে নিয়ে যে জেদের যুদ্ধ লেগেছে, তাতে জয়লাভ নিশ্চিত জেনেও তুমি খুসি নও—এর পর বৌমা কি করবেন না করবেন তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে দিয়েছ! এটা বুঝছ না যে, আজকের ব্যাপারে তুমি যদি জিতে যাও, অর্থাৎ তোমার ঐ বাগচিই যদি বাহাল হোয়ে যায়, তাহলে বৌমা সবে দাঁড়ালেও—লোকে তোমাকেই বাহোবা দেবে। তার পর ওর একবার হাতে পেলে তাকে দাবানো কি সহজ কথা বলতে চাও? ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের যে সব ক্ষমতা কমিটী থেকেই স্থির করে দেওয়া হোয়েছে, কমিটী থেকে তার অদল-বদল করাও বড় সহজ কথা নয়, যাকে বলে—দশ হাত জলে।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই হরিনারায়ণ কণ্ঠে জোর দিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সেই হাসির ফাঁকে আড় চোখে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, পত্নীর অন্তর্নিহিত সন্দিগ্ধ ও অসচ্ছন্দ ভাবটি কাটিয়া গেল কি না।

পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, বেলা ঠিক দশ ঘটিকায় বাঙ্গুলী দাতব্য চিকিৎসালয়ে কমিটীর সদস্যগণ সমবেত হইয়া পদপ্রার্থী চিকিৎসকদ্বয়ের এক জনকে মনোনীত করিবেন। প্রার্থিদ্বয়কেও নির্দ্দিষ্ট সময় বাঙ্গুলী চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ডাক্তার বাগচি বাঙ্গুলী-প্রাসাদেই অতিথিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ডাক্তার প্রতাপ রায় কলিকাতায় থাকেন, আহ্বান-পত্রের উত্তরে জানাইয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়েই তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হইবেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুবৃহৎ ঘরে কমিটীর সদস্যগণ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিযোগিদ্বয়ের জন্য দুইখানি আসন পুরোভাগে দুই দিকে রাখা হইয়াছে। ডান দিকের চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন ডাক্তার বাগচি। বাম দিকের আসনখানি ডাঃ রায়ের জন্য খালি রহিয়াছে। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

চিকিৎসালয়ের বাহিরে কৌতূহলী তরুণ দলের অপ্রতিহত গতি ক্রমশঃই জনতার আয়তন প্রসারিত করিতেছিল। চিকিৎসালয়ের দ্বারবান ছাড়াও জমিদারী সেরেস্তার এক দল পাইক শান্তিরক্ষার জন্য আহূত হইয়াছে। নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসালয়ে বাহিরের লোক-জনের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহারা সতর্কে ও সতর্ক ভাবে দ্বার রক্ষা করিতেছে। সকালের দিকে প্রত্যহই এই চিকিৎসালয়ে নানা স্থান হইতে বহু রোগীর সমাগম হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও নিষিদ্ধ সময়টি অনেকেই স্মরণ রাখিতে পারে নাই; ফলে সমাগত রোগী বা রোগীদের প্রতিনিধিস্থানীয় জনগণকেও বাহিরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নামদার খাঁ নামে এক খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধের আকুলি-ব্যাকুলি এক মর্ম্মন্তুদ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে অনেকক্ষণ হইতে। এই লোকটির একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্র আরজান খাঁর কঠিন অসুখ। কয়দিন ধরিয়াই সে গাঙ্গুলী বাবুদের তালুকের অন্তর্গত মল্লিকপুর নামক মৌজা হইতে আসা-যাওয়া করিতেছে; এই চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ-পত্রও লইয়া গিয়াছে—এ অঞ্চলের চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই কৃপা-পরবশ হইয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ-পত্র দিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। রোগীর রোগযন্ত্রণা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। খাঁ সাহেব বৃদ্ধ, জমিদার সরকারে সংসামান্য জমি-জমা রাখে, জমির আয়ে সংসার চলে না, উপযুক্ত পুত্র সূত্রধরের কাজ করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাতেই কোনরূপে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। সে পুত্র কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। জমিদার হুজুরের দাওয়াইখানায় নয়া ডাক্তার লওয়া হইবে এবং দুই জন ডাক্তারের মধ্যে এক জন ভাবী ডাক্তার আগেই আসিয়াছেন শুনিয়া সে সাহস করিয়া দেওয়ান বাবুর কাছে আগেই ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিল, তিনি যদি ঐ ডাক্তার বাবুকে দিয়া তাহার ছাবালটির জান বাঁচাইবার উপায় করিয়া দেন। সহৃদয় দেওয়ান রাধানাথ বাপুলি বেচারীর অবস্থা উপলব্ধি করিয়া প্রস্তাবটি ডাক্তার বাগচির গোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের দুর্ভাগ্যক্রমে ডাঃ বাগচি দেওয়ানজীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত রূক্ষ ভাবেই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি, সেরেস্তা হইতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবার প্রতিশ্রুতিও ডাক্তার বাগচির মনোবৃত্তিকে কোমল করিতে পারে নাই। তিনি শুধু ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া এই ভরসাই দিয়াছিলেন যে, বাঙ্গুলীর চিকিৎসালয়ের ভার যদি তিনি পান, তাহা হইলে রোগীর চিকিৎসার ভার লইতে পারেন—কিন্তু রোগীকে এখানে আনিতে হইবে। ইতিমধ্যে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠায় নিরুপায় হইয়া বৃদ্ধ পুনরায় এই দিন আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং তাহার মুখে সবিশেষ শুনিয়া কতিপয় তরুণ তাহাকে ঐ বৃদ্ধ ডাক্তারটির আশা ছাড়িয়া দিয়া অন্য উপায় দেখিতে পরামর্শ দিয়াছে। তাহারা যুক্তি দিয়াছে যে, কলিকাতা হইতে যে ডাক্তারটি এখনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, পথেই তাঁহাকে ধরিয়া তাহার অবস্থা জানাইলে হয়ত কোন কিনারা হইয়া যাইবে। এবং তাহারাও সকলে তাঁহাকে সুপারিশ করিবে।

চিকিৎসালয়ের ফটক হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা প্রাচীন নিম্ব বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া নামদার খাঁ এই বহু-প্রত্যাশিত ডাক্তারটির প্রতীক্ষার সঙ্গে সকাতরে খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল, তাঁহার দোওয়ায় ডাক্তার বাবুটি যেন তাহার প্রতি মেহেরবান হন।

দশটা বাজিতে মিনিট দশেক মাত্র বিলম্ব—এমন সময় রাজপথে প্রতীক্ষারত জনতা দেখিল, দুই ঘোড়ার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা গাড়ী দ্রুতবেগে তাহাদের অভিমুখে আসিতেছে। জনতা অধিকতর কৌতূহলী হইয়া চিকিৎসালয়ের সম্মুখবর্ত্তী পথের অনেকখানি স্থান এমন ভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল যে, গাড়ীখানি আর অগ্রসর হইবার পথ না পাইয়া নিম্ব বৃক্ষমূলে—যেখানে বসিয়া বৃদ্ধ নামদার খাঁ কাতর কণ্ঠে খোদার দোওয়া কামনা করিতেছিল—ঠিক সেইখানেই সহসা থামিয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়াছিলেন একমাত্র আরোহী—দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ গঠন এক সুশ্রী সুদর্শন তরুণ। বাঙালী ভদ্রলোকের মত সাধারণ বেশভূষা তাঁর—কাপড়-জামা পরনে, গায়ে একখানা খদ্দরের চাদর, চোখে মোটা চশমা। গাড়ী থামিতেই

জানালা দিয়া বাহিরে চাহিতেই তিনি বুঝিলেন, গন্তব্য স্থানেই আসিয়া পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রপদে সম্মুখের আসন হইতে চামড়ার ব্যাগটি লইয়া নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার আকৃতি এবং কোটের পকেটে পরিদৃশ্যমান বক্ষ-পরীক্ষা যন্ত্রটির অংশবিশেষ লক্ষ্য করিয়াই উৎসাহী তরুণদলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইনিই আজিকার বহু-প্রত্যাশিত ডাক্তার রায়।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত তরুণদের কেহ কেহ বৃদ্ধ নামদার খাঁর অন্তরে সাহস সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে এই আগন্তুক সম্বন্ধে প্ররোচিত করিয়া তুলিয়াছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ডাক্তার রায় কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় বৃদ্ধ খাঁ ঝড়ের বেগে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পদদ্বয় দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল: খোদার দোওয়ায় জনাবকে পেয়েছি—পায় ঠেলতি পারবা না—একটা যোয়ানের জান বাঁচান হুজুর!

ডাক্তার রায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; না দাঁড়াইয়া পা বাড়াইবারও তাঁহার উপায় ছিল না—বৃদ্ধ দৃঢ় বাহুবন্ধনে তাঁহার বলিষ্ঠ পদদ্বয় এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়াছে যে, পদ চালনা ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই। তিনি কিন্তু এই দৃশ্যে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা বিস্মিত হইলেন না—জনসেবার যে ব্রত তিনি নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, বিপন্ন আর্ত্তের অন্তর্বেদনা তাহার চক্ষুপ্রান্তে সুস্পষ্ট ভাবে পাঠ করিবার যে ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহাতে এই বেদনাক্লিষ্ট আতুর মানুষটির মর্ম্মন্তুদ প্রার্থনার পশ্চাতে কি ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার আভাসও বুঝিতে তিনি অভ্যস্ত থাকায়, সঙ্গে সঙ্গে নিচু হইয়া নিজের হাতে বৃদ্ধের হাতখানি ধরিয়া তুলিতে তুলিতে বলিলেন: ছি! ওঠ, ভয় কি! অসুখ-বিসুখে এত বিহ্বল হ'তে নেই—শক্ত হওয়া চাই। কার অসুখ?

কল্পনাও করে নাই বৃদ্ধ—শুধু বৃদ্ধই বা বলি কেন, সমবেত কৌতূহলী প্রাণচঞ্চল তরুণ দলও প্রত্যাশা করে নাই যে, কলিকাতার এক জন পাস-করা ডাক্তার এতটা সহানুভূতির সঙ্গে এই পল্লীগ্রামের একটা দরিদ্র চাষার সঙ্গে আলাপ করিবেন।

বৃদ্ধ বিহ্বল ভাবে ক্ষণকাল ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়াই পরক্ষণে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, সেই রোদন-রোলের ভিতর দিয়াই তাহার কণ্ঠস্বর নির্গত হইল: কি কইমু হুজুর—এক মাত্র ছাবাল—বত্রিশ বছর উমর, এক-ঘর কাচ্চা-বাচ্চা—ঐ খালি রোজগেরে—তারে যমে ধরেছে হুজুর! দশ দিন ধরে ভুগতে নেগেছে—এখন নিদেন কাল হুজুর! আর কি কইবা—

স্নিগ্ধ স্বরে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন: বাড়ী কোথায়—কাছে, না দূরে?

নত হইয়া সেলাম করিয়া বৃদ্ধ জানাইল: দূরে হুজুর, তিনখান গাঁয়ের পরে মল্লিকপুরে বাড়ী—এহন থেকে তিন ক্রোশ হবেক হুজুর!

নিকটেই ভাড়াটে গাড়ীখানা দাঁড়াইয়াছিল। হাতের ঘড়িটি একবার দেখিয়া লইয়া ডাক্তার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন: মল্লিকপুরে যেতে পারবে? যা ভাড়া চাও—পাবে।

গাড়োয়ানও ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিল এবং কলিকাতাবাসী এই ডাক্তারটির কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কথাটা শুনিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর করিল: যাবো হুজুর! ভাড়ার জন্য আটকাবে না, যা খুসি হোয়ে দেবেন, তাই নেব।

বৃদ্ধ নামদার খাঁ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যেও মনে একটা আশঙ্কা জাগ্রত হইয়া তাহাকে বিচলিত করিতেছিল, কোন ক্রমে সঙ্কোচ কাটাইয়া সে বলিয়া ফেলিল: কিন্তু হুজুর! মুই যে বড্ডো গরীব, গাড়ীভাড়া, তার উপর হুজুরের—

দৃঢ় স্বরে ডাক্তার কহিলেন: দেনেওয়ালা খোদা, তাঁরই দোয়া দিয়ে আমাকে যখন ডেকেছ, তাঁর কাছ থেকেই সব আদায় করে নেব—তোমার কোন ভাবনা নেই, কোন খরচ তোমার নেই—গাড়ীতে উঠে বস। আমি কমিটিকে একবার এখানে একটু খবর দেব।

কিন্তু খবর তাঁহাকে দিতে হইল না, বাহিরের ব্যাপারটি বিস্ময়কর কাহিনী ইতিমধ্যেই ভিতরে প্রচারিত হইয়াছিল। বিস্ময়ে কমিটির সদস্যগণ শুনিলেন যে, সাগ্রহে তাঁহারা যে ডাক্তারটির প্রতীক্ষা করিতেছেন, পথে এক রোগী তাঁহাকে পাকড়াও করিয়াছে।

কথাটি শুনিয়া ডাক্তার বাগচি বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন: ভালো-চাল দেখলে যেমন ভেড়ার মুখ চুলকোয়, কলকাতার নয়া ডাক্তারগুলো তেমনি পেসেন্ট পেলে ডিউটি ভুলে যায়।

ডাক্তার বাগচির কথাটার প্রতিবাদ করিয়া এক ছোকরা বলিয়া উঠিল: না, না, তা নয়, এই সভায় ... উনি খবর দিয়ে ... যোগ দিতে চলেছেন।

কমিটির সদস্যগণ বুঝিলেন, বাহিরে একটা কিছু ঘটিয়াছে—হয়তো ডাক্তার রায় ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারাই এবার কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ভীড় ঠেলিয়া বাহিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

গাড়ীখানা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে ডাক্তার রায়ের সহিত কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ডাক্তার বাগচির আলাপ-পরিচয় হইল। কমিটির পক্ষ হইতে কবিরাজ বৈদ্যনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে ডাক্তার রায় সবিনয়ে কহিলেন: মাপ করবেন, গাড়ী থেকে নামতেই এই বৃদ্ধটি আমাকে জানালেন, এঁর ছেলেটির অবস্থা খুব খারাপ। কাজেই এঁর সঙ্গে মল্লিকপুরে যেতে হোচ্ছে।

কবিরাজ মহাশয় সবিস্ময়ে কহিলেন: সে কি! সভাটা যে আপনার জন্যে—এখনি আপনাদের নিয়ে—

মৃদু হাসিয়া ডাক্তার রায় কহিলেন: তা জানি। কিন্তু ওর চেয়ে এই ব্যাপারটি জরুরী। মানুষ মরণাপন্ন—এ খবর পেলে, সব কাজ ফেলে সেখানেই ছোটা চাই—এই হোচ্ছে আমার গুরুর আদেশ। আপনারা সভাটা কালকের জন্যে মুলতুবী রাখবেন, না হয় সেরেই ফেলবেন। আমাকে কিন্তু মল্লিকপুরে যেতেই হবে। আচ্ছা!—নমস্কার!

আর কোন কথা শুনিবার প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াই ডাক্তার রায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং গাড়ীখানার এক পার্শ্বে বিহ্বল ভাবে দণ্ডায়মান খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধ নামদার খাঁর হাতখানা গাড়ী হইতে ঝুঁকিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকেও গাড়ীর মধ্যে আনিয়া দৃঢ় স্বরে গাড়োয়ানকে কহিলেন: হাঁকাও!

[ক্রমশঃ।

দিল্লী অনেক দূর

শ্রীবাস্তব

১৯৪৮ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস।

রাজধানী দিল্লী। বহু-যুগের পুরানো দিল্লী। সেই দিল্লী—যেখানে

'দিল্লী প্রাসাদ-কূটে,
হোথা বার বার বাদ্‌সাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।'

কিন্তু আজকার দিল্লীতে বাদশাজাদারা নেই—যাঁরা এসেছিলেন উত্তর-পশ্চিমের বন্ধুর গিরিপথ ধরে ভারতের অর্থ-সম্পদের লোভে আর সাম্রাজ্য-লালসায়। এর পর যাঁরা এলেন সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে বাণিজ্য-ডিঙা ভাসিয়ে একই মহান্ উদ্দেশ্যে, তাঁরাও অধুনা বিদায় নিয়েছেন। তাই ওদের কালো তন্দ্রা ছুটে যাবার আশঙ্কা আর নেই। এখন তন্দ্রা টুটে পণ্ডিত জওহরলালের, বিনিদ্র রজনী যাপন করেন সর্দার পেটেল। মারাঠা-শিখের অভ্যুত্থান নেই—কিন্তু আছে খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন দেশের বুকভাঙা চাপা আর্তনাদ, আছে শান্তির জনক মহাত্মা গান্ধীর বুকের রক্তে লিখা বর্ত্তমান সঙ্কটের ভূমিকা, আছে অর্থ নৈতিক বনিয়াদ গঠনের গুরুত্ব সমস্যা। দিল্লীর সেই প্রাসাদ-কূট আজও বিদ্যমান আছে। নবব্ধ আধুনিক সভ্যতার পাশ্চাত্য সম্ভারে সমৃদ্ধ নয়াদিল্লী—দিল্লীকে আয়তনে আরও বিশালতর তুলেছে। সেই রাজধানীর রাজপ্রাসাদে রাজশয্যায় শয়ন করে টুট করবার লোকেরও অভাব নেই।

এমনই কতো কথা জাগছিল মনে, যখন ষ্টেশন থেকে মোটরে চড়ে লাল কেল্লার পাশ দিয়ে পথ চলছিলাম। মাত্র কয় দিন পূর্ব্বে ওই দূরে রাজঘাটের চিতা-শয্যায় মহাত্মাজীর দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হয়েছে। সেখানকার চিতাভস্ম আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি ভারতের দিকে দিকে, নদীস্রোতের ধারায় ধারায়। মনে হল, স্বাধীনতালব্ধ ভারতের মর্ম্মস্থল এই দিল্লী সেই নিদারুণ আঘাতে না জানি কতোখানি মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। লোকের চোখে-মুখে চলা-ফেরা-বলায় তার কি করুণ চিত্রই না ফুটে উঠবে। জনকের মৃত্যুতে জাতি আজ অশৌচ ধারণ করে আছে, ধারণ করেছে শোকচিহ্ন। কিন্তু—

সেই দিল্লী। সন্ধ্যায় তেমনি তার সাজ-সজ্জা। সেই জনতার ভীড়, পথ চলা। মহামৃত্যু যেন রাজধানীর বুকে কোন চিহ্নই এঁকে যেতে পারেনি। না, পৃথিবীর এই-ই স্বভাবধর্ম্ম? শোক চিরকালই সাময়িক? অথবা বিপুল বিক্রমে ভারতের রাজধানী সেই মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রতিহত করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে?

এ, আই, সি, সি'র সদস্যরা সম্বর্দ্ধিত হয়ে গিয়ে উঠলেন 'কনষ্টিটিউসান হাউসে'। নয়াদিল্লীর প্রশস্ত রাজপথের পাশে যুদ্ধকালে বিদেশী আমেরিকান অফিসারদের বাসভবনরূপে প্রস্তুত প্রাসাদ। অধুনা নূতন নাম আর শীর্ষে উড়ছে অশোকচক্র অঙ্কিত রাষ্ট্রীয় পতাকা। বহিরাবরণে তার এইটুকুই পরিবর্ত্তন। সাজ-সজ্জা আসবাব-পত্র আছে তেমনি। পরিত্যক্ত, সম্পত্তি এসেছিল ইংরেজের হাতে, এবার আমরাই তার সর্ব্বময় অধিকারী। সেখানে সেই উর্দ্দীপরা বেয়ারা, সেই ডাইনিং হল, বিদেশী খাদ্য-পরিবেশনের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে আয়োজন, কাঁটা-চামচের টুং টাং। কক্ষে কক্ষে সাহেবদের থাকার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা। বাথরুমে গরম জলের কল্‌টি টিপে দিয়ে শাওয়ার-বাথের উষ্ণ নির্ঝর-ধারার তলে দাঁড়িয়ে মনে হয়, রাজধানীর রাজ-আতিথ্যই বটে।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সদস্যরা এবার এসেছেন শঙ্কাতুর চিত্তে, গুরুতর সমস্যার সমাধানের আশা বুকে নিয়ে। কংগ্রেস তার নূতন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন—তাতে পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। পরদেশী লোকেরা এ দেশের প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি পাঠাবেন কি করে? জাতি হিসাবে ভারতের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না, সম্পর্ক হবে আন্তর্জ্জাতিক। মনে মনে শিউরে উঠছেন পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা। দেশ-বিভাগের ন্যায় শাস্ত্র-সম্মত পরিণতি? দু দেশের লোক কি করে এক হয়ে রাজনীতি করবেন? কিন্তু এতো কালের নাড়ীর যোগ? আজ যেন চমকে উঠে দেখছেন তাঁরা দেশ-বিভাগ রাজী কি সর্ব্বনাশা ভবিষ্যৎকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন।

সুতরাং রাজধানীর রাজ-আতিথ্য, টেবিলের ডিনার আর খাটের আরাম-শয্যা পূর্ব্ববঙ্গীয়দের মনে সান্ত্বনা বা শান্তি কোনটাই জাগাতে পারল না। পরদিন প্রভাতেই তাঁরা ছুটলেন প্রাসাদ-কূটে যাঁরা সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদেরই দরবারে। মহাত্মাজীর হত্যার পর ঘাতকের খড়্গ হতে জীবনরক্ষার সতর্ক সাড়ম্বর আয়োজন প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে। বিরাট এক-একটি প্রাঙ্গণের ওধারে প্রাসাদ আর এধারে তোরণে সশস্ত্র পাহারা। প্রবেশ করতে গেলে ধন্না দিয়ে থাকতে হয়। অফিসারের হাত দিয়ে পাঠাতে হয় এত্তেলা, বহুক্ষণ পরে যদি মঞ্জুরী এসে হাজির হয় তো সৌভাগ্য। রাষ্ট্রপতি (কংগ্রেস) রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বার আপাততঃ রুদ্ধ, স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়। পণ্ডিতজী কর্ম্মব্যস্ত। সর্দারজী দর্শনার্থী-বেষ্টিত, আর লোকের স্থানাভাব। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রতিনিধিরা ধৈর্য্যশীল। 'একবারে না পারিলে দেখ আর বার।' বার বার দ্বারে করাঘাত করে ফিরতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের অবস্থাটা যে সঙ্কটজনক—'যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন, বাইরে যে তুফান।'

চলতে লাগল জল্পনা, গবেষণা। দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালীরাও এলেন বাঙালী নেতাদের কাছে দল বেঁধে—তাঁরাও পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভাবছেন। অনেকেই ভাবছেন ক্লাবে আর সরকারী দপ্তরে বসে, নেতাদের ড্রয়িংরুমের ভিড়িতে এসে। ভাবনার কারোরই অন্ত নেই, কিন্তু ওদিকে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত পূর্ব্ববঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গে হয়ত হাঙ্গামা নেই, নেই ব্যাপক প্রত্যক্ষ উৎপীড়ন, নোয়াখালির ধ্বংসলীলা অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু পথ চলতে গিয়েও এখন ভাবতে আরম্ভ করেছে, তারা কি সত্যি সত্যি বেঁচে আছে? পূর্ব্ব-পাকিস্তান রাজধানী ঢাকার জনৈক হিন্দু অধ্যাপক এক দিন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলছিলেন, "হ্যাঁ, এখন আমরা নিরাপদেই আছি। এক দিন রিক্সা চড়ে যাচ্ছিলাম, রিক্সাওয়ালা পাকিস্তান হাসিলের গল্প জুড়ে দিল। অনেক কথা বলে শেষে উপসংহার করলে, বাবু, "আপনাদের আর ভয় নেই, আপনাদের আমরাই রক্ষা করব, আপনারা যে আমাদের 'পেয়ারা' হইয়া গেছেন।" পাকিস্তানের নেতারা সভা-সমিতিতে উদার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন 'সংখ্যালঘুদের সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতেই হবে, দুর্ব্বলকে রক্ষা না করা পাপ।' হিন্দু আজ পাকিস্তানে আশ্রিত দুর্ব্বল প্রজা, মুসলমান আশ্রয়দাতা সবল ও রাজা।

২

মহাযুদ্ধেরই দান নয়াদিল্লীর কনষ্টিটিউশন ক্লাব হল। কনষ্টিটিউশন নামটি নূতন। অপরাহ্নে সেই ক্লাব-গৃহে বসল এ, আই, সি, সি'র অধিবেশন। মাঝারী রকমের পরিচ্ছন্ন হলটি। সদস্যে পূর্ণ হয়ে গেছে সারা গৃহ। দর্শকদের প্রবেশ নিষেধ। শুধু আছেন প্রেস-প্রতিনিধি আর স্বেচ্ছাসেবক দল। মঞ্চ সুসজ্জিত, তার পশ্চাদ্ভাগে উঁচুতে বিলম্বিত বৃহৎ চিত্র—মহাত্মাজীর সে চিত্র, লিখা আছে, জাতির জনক—Father of the Nation. একে একে প্রবেশ করতে লাগলেন নেতৃবৃন্দ। এলেন পণ্ডিতজী, সর্দ্দার পেটেল, ডাক্তার পট্টভি, মৌলানা আজাদ। তখনও অধিবেশন বসবার সময় হয়নি—সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসেননি। পূর্ববঙ্গীয়েরা নেতাদের কাছে ভিড় করে গিয়ে দাঁড়ালেন। সর্দ্দারজী গম্ভীর, বিষাদগম্ভ। আস্তে আস্তে কথা বলছেন। শুনলেন অনেকখানি বললেন অতি অল্প—ডাঃ ঘো গোছের দু'-একটি কথা মাত্র। পণ্ডিতজী এলেন রেগে, তোমরাই বাংলা ভাগ করেছ, পাঁচ হাজার টেলিগ্রাম আর দশ হাজার পত্র তোমরাই পাঠিয়েছিলে, তবে আজ কেন? পট্টভি পণ্ডিতজীকে দেখিয়ে বললেন, আমরা নীচের স্তরের লোক, ওই চূড়ায় যিনি বসে আছেন তাঁর মর্জ্জিতেই চলতে হয়, কি জানি চূড়া ধ্বসে পড়লে চাপা পড়ি।

বুঝা গেল, উঁরা স্থির সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন। যদিও বিভিন্ন প্রাদেশিক ক্ষুদে নেতারা বলছেন, দেশ ভাগ করেছি বলেই কংগ্রেসকে আমরা ভাগ করব? মহাত্মাজীর শেষ ইচ্ছা, কংগ্রেসকে রাজনীতি-মুক্ত লোক-সেবক সংঘে পরিণত করলেই তো দুই দেশের যোগসূত্র এমন করে ছিন্ন করার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু কংগ্রেস রাজনীতিতে এরা কারা এর এদের প্রতিপত্তিই বা কতোটুক? শুধু এই ক্ষেত্রে কেন, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নেতৃত্ব এমনই পাশে জড়িয়ে রেখেছে সবাইকে, স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত মুহূর্ত্তও বানচাল হয়ে যেতে আটকায় না। তাই পূর্ববঙ্গের ভাগ্য যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সম্মুখে, তার ললাট-লিপি পাঠ করতে কেন কষ্টই হল না।

সেই অধিবেশনে বিশেষ করে খুঁজছিলাম মহাত্মাজীর তিরোধান কি ছায়া ফেলে গেছে আমাদের জাতির প্রতিনিধিদের মুখে? কিন্তু খুঁজে পেলাম না কিছু। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম, মঞ্চের পশ্চাৎ পটে বিলম্বিত তাঁর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতিটা। আর শুনলাম সকলেরই বক্তৃতায় তাঁর দোহাই। যেন তাঁর বাণী জীবনের বেদবাণী। কিন্তু মৃত্যু-পূর্ব্বক্ষণে রচিত তাঁরই শেষ উপদেশ, কংগ্রেসকে অরাজনৈতিক লোক-সেবক সংঘে পরিণত করার প্রস্তাব ওরাই পাল্টে দিলেন সেই অধিবেশনেই। যুক্তির অন্ত নেই—মূলতঃ না কি মহাত্মাজীর নির্দ্দেশই তাঁরা পালন করছেন। বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে সোস্যালিষ্ট দল আর্ত্ত কণ্ঠে আবেদন করলেন—মহাত্মাজীর শেষ ইচ্ছাকে এমন ভাবে তাঁর চিতাভস্মের সঙ্গে মিশিয়ে দিও না। শ্রীমতী অরুণা, জয়প্রকাশ ও আরও অনেকে বিপুল করতালি-ধ্বনির মধ্যে আলোচনায় আবেগ সঞ্চারও করলেন। কিন্তু যতোগুলি হাত তাঁদের বক্তৃতায় তালি দিল ততোগুলি হাত উত্তোলিত হল না তাঁদের সমর্থনে। নেতৃত্ব মহাত্মাজীর জয়ধ্বনি করে তাঁরই ইচ্ছার সমাধি রচনা করলেন। পরদিন এই, আই, সি, সি'র সদস্যরা সকলে দলে দলে গিয়ে রাজঘাটে মহাত্মাজীর চিতাশয্যার বাঁধানো বেদীর ওপর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা-নিবেদন করলেন।

বেশ কিছু কাল আগেকার কংগ্রেস-সভার কিছুটা বিবরণী স্মৃতির পাতা থেকে আবৃত্তি করছি এই জন্যে যে, দেশ-বিভাগজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেস তথা ভারত সরকারের কর্ত্তৃপক্ষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন, তারই পূর্ব্বাপর একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাকিস্তানের মুসলমানদের মতোই তথাকার হিন্দুরা ও তাঁদের কাছে সত্যই বিদেশী, আইনতঃ বিদেশী তো বটেই, অন্তরের কাছেও তাই। তাঁরা মনে করেন এটা না-ভাগ বিপজ্জনক; তবে যদি জোর করে এসে চেপে বসে কেউ, তবে তা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তরও নেই। পশ্চিম-পাকিস্তানের হতাবশিষ্ট হিন্দুরা এক দিন এসে চেপে বসেছিল বলেই তারা বিনা স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। তবে হ্যাঁ, মহাত্মাজী যেমন তাঁর সমস্ত বক্তৃতা ও বিবৃতিতে স্বীকৃত, তেমনি পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুরা যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার করেছেন তাও স্বীকৃত হচ্ছে। নইলে আসলে মহাত্মাজী বিদেশী—পরলোকবাসী, ওরাও বিদেশী—পাকিস্তানবাসী। তাই নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির উদ্দেশ্য স্বীকৃত হচ্ছে, ঐ পাকিস্তানবাসী হিন্দুনামধারীগণ পরলোকের জন্য স্বর্গলোকের করুণা ভিক্ষা করলেও ইহলোকে সর্ব্বহারা লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, প্রহৃত এমন কি ধর্ষিত হয়েও শুধু ঢাকা ও করাচীর দিকেই করুণ-নয়নে প্রতিকার ভিক্ষা করো। সাবধান, মানবতার নামেও এদিক ওদিকে দৃষ্টি ফিরিও না।

৩

ভারতের বর্ত্তমান সরকারী রাজনীতি বুঝতে হলে পণ্ডিত জওহরলালকে বুঝতে হয়। সরকার ও জওহরলাল, কংগ্রেস ও জওহরলাল কংগ্রেস সরকারী নেতৃচক্রের বে-সরকারী লীলাক্ষেত্র, সরকার চালায় কংগ্রেসকে, কংগ্রেস সরকারকে নয়। এই জন্য আচার্য্য কৃপালনীকে সভাপতিত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল। ডাক্তার পট্টভি যা পেয়েছেন তাতেই খুশী হয়ে আছেন, মাঝে মাঝে কথা কেটুখানি ছটফট করেই শান্ত থাকেন। সর্দ্দারজীতে আর পণ্ডিতজীতে মতভেদ ঘটে, কিন্তু বয়সের চাপে সর্দ্দারজীও পণ্ডিতজীর উপর নির্ভরশীল, সুতরাং পণ্ডিতজীই সব, আর তাঁকেই বুঝা প্রয়োজন।

আদর্শের স্বপ্নবিলাসী জওহরলাল বাস্তবের বহু উর্দ্ধে। তিনি যখন মাঝে মাঝে নীচের অর্থাৎ মাটীর পৃথিবীতে সাধারণের মধ্যে নেমে আসেন, তখন অবশ্য ঝড়ের বেগে আসেন। আকাশে বিচরণশীল মেঘ মাঝে মাঝে ঝড়রূপেই পৃথিবীতে নামে। তাঁকে বিপর্য্যয় ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। জওহরলাল জাতিতে বিশ্বাসী নহেন, তিনি আন্তর্জ্জাতিকতার ভক্ত। জওহরলাল হিন্দু নহেন বোধ হয় বলেই, আন্তর্জ্জাতিকতা তা' হতে পারে না। বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁর অন্তরে। বিদেশী নরনারীর সমাবেশে তাঁকে বেশী at home মনে হয়। তাই চীনের কিম্বা জাভা-সুমাত্রা ইন্দোচীনের জন্য তাঁর মন যতোটুকু কাঁদে, পাকিস্তানের হিন্দুদের জন্য তার চেয়ে বেশী নয়। শুধু ব্যতিক্রম কাশ্মীর। হয়তো বা অন্তরের অবচেতন স্তরে কোথায় একটা দুর্ব্বলতা রয়ে গেছে।

বহু কাল পূর্ব্বের কথা। বাংলার কংগ্রেসী কোন দলে বিচারক-রূপে এসেছিলেন ওয়ার্কিং কমিটির জনৈক সদস্য। ঘরোয়া আলোচনায় তিনি জওহরলালের একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি বললেন,

পণ্ডিত যেন একটা তেজী ঘোড়া, অধৈর্য্য হয়ে ছুটে চলবার ছটফট করছে। কিন্তু বল্‌গা আছে গান্ধীজীর হাতে, তাই । পণ্ডিতজীর ইহাই ছিল স্বভাব-ধর্ম্ম। রাজনীতিক নেতৃত্বে সময়ে তা অচল। তাই পণ্ডিতজীর কোন দল ছিল না, ষ্ঠী ছিল না, না আদর্শগত না ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক। আদর্শও তাঁর স্থির নেই—থাকৃতে পারে না। দরিদ্রের, শ্রমিকের, কৃষিজীবীর বেদনায় তিনি অকপট ব্যথা অনুভব করেন, হয়তো বা চোখেও জল আসে, অথচ ভালবাসেন রাজপ্রাসাদ, ডিনার পার্টি, অর্থশালীর আড়ম্বর। বিলাত-ফেরং ছাড়া কৃতবিদ্য বিদ্বান্ লোক নেই, এমনই একটা ধারণা না কি তাঁর আছে। অভিজাত ছাড়া বুদ্ধি নেই, তাই তিনি ভাবেন। এইরূপ দ্বন্দ্ব প্রতিক্ষেত্রে—তাই তিনি আদর্শগত দলহীন। অর্থনৈতিক নানা পরিকল্পনা তিনি তৈরী করেন, আবার তা' পরিত্যাগও করেন। তাই তিনি বামপন্থী হয়েও দক্ষিণী, কম্যুনিজমের প্রশংসা করেও কম্যুনিষ্ট-বিরোধী। গান্ধী-অর্থবাদ তো তাঁর কাছে দুর্ব্বোধ্য। কারণ, তাঁর মনশ্চক্ষের সম্মুখে জ্বল-জ্বল করছে বৃটেন ও আমেরিকা। কোন প্রদেশেরও তিনি নহেন—অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমার। এই জন্য দেশেরও পুরোপুরি নহেন, দৃষ্টি তাঁর বিশ্বমুখীন। কিন্তু স্থৈর্য্যহীন অধীরতা সর্ব্বক্ষেত্রেই আছে আর আজ মহাত্মাজীও নেই। থাকৃলেও অধুনা তাঁর পক্ষে রাশ-টানা সম্ভব ছিল না।

পণ্ডিতজী গণতান্ত্রিক? গণতান্ত্রিকতার ভক্ত তিনি সত্য, কিন্তু সেখানেও তিনি ধৈর্য্যহারা। দু-একটা কাহিনী বলে তাঁর গণতান্ত্রিকতা পরখ করতে চেষ্টা করি। মীরাট কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে রচিত প্রস্তাবের আলোচনা হচ্ছে। সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী। বিহারের এক জন সদস্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। তা'তে তিনি উল্লেখ করলেন তথাকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা-দমনে পণ্ডিতজীর ভূমিকার কথা। আর রক্ষা নেই। পণ্ডিতজী ছুটে গেলেন বক্তৃতা-মঞ্চের কাছে, বক্তাকে তিনি টেনে-হিঁচ্‌ড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনবেন এমনই অবস্থা। সভাপতি হাস্‌ছেন, কোন পক্ষকেই বাধা দিচ্ছেন না। কিন্তু বক্তা বাধ্য হলেন মঞ্চ পরিত্যাগ করতে। জয়পুর কংগ্রেসে বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি ওয়ার্কিং কমিটীর দুর্নীতি-সম্পর্কিত প্রস্তাব সংশোধন করলেন। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! পণ্ডিতজী ছিলেন তখন অনুপস্থিত। আবার তাঁরই জেদে বস্‌ল অধিবেশন—যার সমাপ্তি ঘোষিত হয়ে গেছে। পণ্ডিতজী দুর্ব্বিনীত সদস্যদের ধৃষ্টতায় ছাড়লেন হুঙ্কার। সদস্যরা আত্মমর্য্যাদা বোধে একটুখানি গা-নাড়া দিয়ে উঠলেন। রক্ষাকর্ত্তারূপে এগিয়ে এলেন সর্দ্দারজী। তিনি তাঁর অভ্যস্ত দক্ষতায় শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন। এবং অবশেষে পণ্ডিতজীর জেদই বজায় রইল। পাল্‌টে গেল প্রস্তাব—সংশোধন হ'ল সংশোধিত, অসংশোধিতে পরিবর্ত্তিত।

আবার পণ্ডিত জওহরলালকে মত-পরিবর্ত্তন কিম্বা বিরোধী মতের সঙ্গে অতি-সহজে আপোষ করতেও দেখা যায়। সর্ব্বদল সম্মেলন ১৯২৮ ইংরেজিতে যে ভারতীয় গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন, তার প্রণেতা তাঁরই পিতৃ-নেতৃত্বে গঠিত 'নেহেরু কমিটী'তে তিনিই ছিলেন সম্পাদক, পিতার প্রস্তাবের প্রতিবাদ বার বার তিনি প্রকাশ্য সম্মেলনেই করেছেন, কিন্তু পদত্যাগ করেননি। কলিকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাবে অবশেষে তিনি সুভাষচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে মহাত্মাজীর কাছে নতি স্বীকার করেন। গান্ধী-আরুইন চুক্তি কালে পণ্ডিতজী প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন, সংগ্রাম-ত্যাগের দুঃখে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন—কিন্তু সেই পণ্ডিতজী! লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের সিমলা লাট-প্রাসাদের আতিথ্যে খণ্ডিত ভারতের বিকৃত রূপও তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। এমনি একটা অসামঞ্জস্য ও অস্বাভাবিকতা স্বপ্নবিলাসী পণ্ডিতজীকে ঘিরে আছে। এই সেদিনই দক্ষিণ-কলিকাতার উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে উদ্বিগ্ন পণ্ডিতজীকে আমরা দেখেছি ময়দানের সভামঞ্চে, রাজ্যপাল-প্রাসাদকক্ষে বিভিন্ন দল উপদল ও কর্ম্মিগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায়, তাঁর বক্তৃতা ও বিবৃতি আমরা শুনেছি সাগ্রহে, তাঁরই নির্দ্দেশে ওয়ার্কিং কমিটী পশ্চিম-বঙ্গ পরিষদের নব নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্তও করেছেন—তার পর? আবার পণ্ডিতজী একটা দীর্ঘ বিবৃতিই দিয়েছেন, তাতে কৃপণতা কোন কালেই নেই তাঁর, বরং সর্ব্বস্ব উজাড় করেই তিনি সর্ব্বদা কথা বলেন, কথা বলতে ভালবাসেন। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটা কি করে বানচাল হয়ে গেল? তিনিই ছিলেন সে-কমিটীর সভাপতি। সে-কমিটীরই প্রস্তুত পরিকল্পনা গ্রহণ করল এ. আই. সি. সি। কিন্তু তাঁরই প্রধান মন্ত্রিত্বে পরিচালিত সরকার তা' চাপা দিতে বাধ্য হল। কংগ্রেসীদলের সভায়ই না কি এক জন বিশিষ্ট সদস্য পণ্ডিতজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'নূতন প্রস্তাব রচনা করে সভায় নিয়ে আস্‌বার আগে কাল রাত দু'টায় পণ্ডিতজী কি মিঃ বিড়লার সঙ্গে ফোনে আলাপ করেছিলেন?'

পণ্ডিতজী নেতা ছিলেন সত্য, কিন্তু বিপ্লবের নেতা। বিপ্লবের নেতৃত্বের প্রয়োজন ঝড়ের মতো দুর্ব্বার গতিতে ছুটে-চলা, পরিণাম-চিন্তাহীন হয়ে আঘাত করার সাহস ও দৃঢ়তা আর জনতাকে নিজের ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তায় পক্ষে টেনে আনা। কি সে-বিপ্লব গঠনমূলক বিপ্লব নয়। গঠনমূলক রাজনীতিতে পণ্ডিতজীর নেতৃত্ব ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিপ্লব এক কথা আর গঠন আর-এক কথা—বিশেষতঃ বিপ্লব যেখানে আদর্শধর্ম্মী নয়, উদ্দেশ্য শুধু বিদেশী শাসনমুক্তি। পণ্ডিতজীকে অনেকে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী বলে ভেবেছে, কিন্তু কখনই কিছুতে তিনি স্থির ছিলেন না, তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, আগে ইংরেজ চলে যাক্, স্বাধীন দেশে আমরা স্থির করব—স্বরাজটা কি হবে। এক দিন বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে স্বরাজের সংজ্ঞা নিয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিরোধ বেধেছিল, অবশেষে মহাত্মাজী সংজ্ঞা দিতে বাধ্যও হয়েছিলেন, প্রথম করাচী কংগ্রেসে মৌলিক অধিকারের ভিত্তি রচিত হয়েছিল, ক্রমশঃ একটা স্পষ্ট আদর্শ মহাত্মাজী সকলের সম্মুখে তুলেও ধরে-ছিলেন, কিন্তু তা' থেকে গেল শুধু তাঁরই আদর্শ। কংগ্রেসের রাজনীতি ছুটে চলেছিল একই লক্ষ্যে বৃটিশের উচ্ছেদে—তাই সেই উচ্ছেদে শেষ পর্য্যন্ত দেশকে খণ্ডিত করতেও কংগ্রেস স্বীকৃত হয়ে গেল। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মহাত্মাজী তা'তে স্বীকৃতি দেননি, তাই তাঁর স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগষ্ট প্রতিপালিত হয়েছিল নোয়াখালিতে মৌন-অনশন-প্রায়শ্চিত্তে।

কিন্তু এ কথাও সত্য, বিপ্লব-শেষে দেশে সেই বিজয়ী নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই ভারতবর্ষে পণ্ডিতজীর নেতৃত্ব স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ। আধুনিক ভারতে চোখের সম্মুখে বর্ত্তমানে আর কোন নেতৃত্ব নেইও, যা' সে স্থান অধিকার করতে পারে। তাই আন্তর্জ্জাতিক

রাজনীতির খেলায় বার বার পরাজিত হয়েও এবং আভ্যন্তরীণ অর্থ-নীতিতে অপ্রত্যাশিত অনগ্রসর থেকেও ভারতকে এ-নেতৃত্বই আঁকড়ে থাকতে হচ্ছে।

৪

পশ্চিম-বঙ্গ ও বাঙ্গালী আজ বিপর্য্যস্ত। তাদের সঙ্কটই আজ সব চেয়ে বেশী। এমন সঙ্কট বাঙ্গালী-জীবনে অল্পই এসেছে। সে চেয়েছিল ভারতের কেন্দ্রস্থলের দিকে মুস্কিল-আসানের জন্ম। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলব, বর্ত্তমান নেতৃত্বের গতিপথ দেখেই ধারণা করা কর্ত্তব্য ছিল, সঙ্কট-ত্রাণে কতোটুকু সহায়তা আমরা পেতে পারি। প্রত্যাশা আমাদের দিক থেকে অস্বাভাবিক না-হলেও নেতৃত্বের দিক থেকে তাই। ওঁদের নীতি হল, পূর্ব্ববঙ্গ পরদেশ, বিদেশ। গ্রীসে আর পূর্ব্ববঙ্গে কোন প্রভেদ নেই ওঁদের কাছে। কর্ত্তব্য যেটুকু সেটুকু আন্তর্জাতিক, জাতিগত নয়। দুশ্চিন্তা আছে—আশ্রয়প্রার্থীর চাপে এখনকার অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা আর তথাকার দুষ্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় এখনকার শান্তি ও শৃঙ্খলার বিঘ্ন। সুতরাং নীরবে বসে থাকাও চলে না, আর উত্তেজিত উদ্বেল জনমতের চাপে সরাসরি দায়িত্ব অস্বীকারের বিপদও আছে। এ কথা চিন্তা করা ভুল, দ্বিজাতি-তত্ত্বের উদ্ভূত দাবীতে দেশ-বিভাগের দায়িত্ব স্বীকার করে ওপারের স্বজাতিদের দায়িত্ব ভারত ঘাড়ে নিয়েছিল। দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে-দায়িত্ব নেতৃত্ব ত্যাগ করে এসেছে। সেই জন্যই এগিয়ে এলেন পণ্ডিতজী, নিলেন সর্ব্ব দায়িত্ব নিজেই—কারণ উত্তেজিত জনমতকে আশ্বাস দিয়ে শান্ত রাখতে হবে আর ওপারের উপদ্রব যা'তে ক্ষান্ত হয়ে আসে, সময় নিতে হবে তার জন্যে। আজও পণ্ডিতজীই প্রধান ব্যক্তি, যিনি জনতার সমর্থন আদায় করতে পারেন। এ ম্যাজিক তাঁর অধিগত। তাই প্রস্তাবের পর প্রস্তাব গেল পাকিস্তানের কাছে, তথ্যানুসন্ধান করব আমরা একযোগে। অর্থাৎ এসো ভাই, মৃত, আহত, লুণ্ঠিত ও ধর্ষিতাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করে সংখ্যা নির্ণয় করি। আমরা সকলের কাছে বলতে পারব, দেখ, কেমন সত্য নির্দ্ধারণ করেছি। কিন্তু পাকিস্তান বাস্তববাদী. কোন নৈতিক দায়-দায়িত্বের বালাই তাদের না-থাক্‌লেও রাজনৈতিক বুদ্ধি তাদের টনটনে। সমস্ত প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করলে দৃঢ়তারই সঙ্গে। বরং এই সুযোগে মামলাটা সাজিয়ে নিলে ভাল করে। ভারতকে সমান অপরাধীর পর্য্যায়ে টেনে আনবার সুযোগ না এলে যে নেহেরু-লিয়াকত শুভ যোগাযোগের পরম লগ্ন তাদের পক্ষে আসে না। যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাদের এই নব পর্য্যায়ের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম,' তা'র অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাই তারা রইল অনমনীয়। আমরা দিনে দু'বার করে সংবাদপত্র ক্রয় করলাম আর রেডিওর পাশে গিয়ে জনতা সৃষ্টি করলাম "other methods"এর উত্তেজনায়। উচ্চকণ্ঠে বললাম, পণ্ডিতজীর শক্তি বৃদ্ধি কর, জওহরলাল জিন্দাবাদ। বন্ধ হয়ে গেল পাকিস্তানের অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশ—কি প্রয়োজন, পণ্ডিতজী যে সর্ব্ব দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন। ভাবলাম, সমগ্র ভারত বুঝি পণ্ডিতজীর কণ্ঠে ও বাহুতে এসে ভর করেছে। তাই দু'-চার কথা- বলেই কংগ্রেস-নেতারা নীরবতা অবলম্বন করলেন, কংগ্রেস সভাপতি একটি বিবৃতি দিয়েই কর্ত্তব্য শেষ করলেন। পণ্ডিতজী স্বয়ং আসছেন ক'লকাতায়—কতো আশা! হতভাগ্য পূর্ব্ববঙ্গের নর-নারী-শিশুর দল, মা ভৈঃ! দুঃখের দিন তোদের অবসান হবেই।

আশা থাক্‌লেই আশা-ভঙ্গের বেদনা জাগে হতাশা আসে। কিন্তু আশা করাই যেখানে ভুল? কেন ভুল? বিগত আড়াই বৎসরের ইতিহাস বলে ভুল। সে ইতিহাস ভারতের রাজনৈতিক ব্যর্থতার ইতিহাস। ব্যর্থতাকে অস্বীকার করলে আত্ম-প্রতারণাই করব। অনেকে বলতে পারেন এ অতি-বড়ো কথা, কিন্তু সত্য কথা। অনেকের প্রিয় না হতে পারে এ-কথা, হয়তো তা' অপ্রিয় সত্য। সার্থকতার ঢাক-ঢোল আমরা বাজাই—দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে। সর্দ্দারজীর সর্দ্দারী সেখানে দৃশ্যতঃ এনেছে সাফল্য, মূলতঃ দেশীয় রাজ্যের গণ-জাগরণই রাজাদের সর্ব্বনাশের হাত এড়াতে অর্দ্ধ-ত্যাগে বাধ্য করেছে। রাজারা অধুনা বরং মোটা বাঁধা ভাতা পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন। তথাপি সাফল্য বলতে বাধা নেই—কিন্তু আর কোথায়? অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে অগ্রগমন সম্ভব হল না। শিল্পপতিরা, ধনিকরা বাগ মানল না, এখনও তাদের লোভচক্র নিষ্পেষিত করছে দেশের জনগণকে। কোথায় রইল জাতীয়করণ আর কৃষক-মজদুররাজ? সূচনাও নেই। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রইল অর্থাভাবে। দেশে সর্ব্বত্র অসন্তোষ—তাই জনগণের মাঝে সে উদ্দীপনার অভাব যে বহু কালের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। সেই নাগরিক দায়িত্ববোধ পর্য্যন্ত জাগাতে পারল না নেতৃত্ব। মহাযুদ্ধের দান দুর্নীতির বিষ-বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠল। মহাত্মাজীর নামের দোহাই দিয়ে পশ্চিমী আদর্শে সেই আড়ম্বরপূর্ণ রাজ-আবেষ্টনী গড়ে তুলছি আমরা, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত আর রাষ্ট্র-নায়কগণের শোভাযাত্রা—জীবন-যাত্রা ব্যঙ্গ করতে লাগল তাঁকেই—যাঁকে আমরা জাতির জনক আখ্যা দিয়েছি। পণ্ডিতজীর কাশ্মীর নিয়ে ছুটে যাওয়া হল উনোর দরবারে, আজ সেখানে ভারত কুণো হয়ে পড়েছে, অথচ সেদিনে পাকিস্তানকে বিচারপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পারত ভারত। পূর্ব্ব-পাকিস্তান ঢাল-তলোয়ার-হীন নিধিরাম সর্দ্দার হয়ে বসেছিল তখন। ক্ষুদ্র পাকিস্তান আজ দম্ভভরে যুদ্ধে আহ্বান করতে সাহস করে সর্ব্বব্যাপী ব্যর্থতারই ফলে। ইংলণ্ড-আমেরিকার বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করে পণ্ডিতজী ফিরে এলেন দেশে, আমরাও আনন্দে-উল্লাসে মেতে উঠলাম, কিন্তু সত্যিকার লাভ হল কতোটুকু? ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি এক জোটে চাপের উপর চাপ দিচ্ছে ভারতকে পণ্ডিতী পররাষ্ট্র-নীতিরই জন্যে। বি, বি, সি করছে পাকিস্তানী প্রচারকার্য্য। আমরা করছি আর্ত্তনাদ, এ কি অবিচার! পাকিস্তানের দরবারে প্রতিবাদের ফাইল ভারী হয়ে উঠছে অথবা সেগুলি ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে স্থান পাচ্ছে। আমরা বিশ্বশান্তি যজ্ঞের সমিধ আহরণে ব্যস্ত—কিন্তু অশান্তির আগুন ছাই-এর চাপা ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করছে। ব্যর্থতার তালিকা ভারী আর তার নাগপাশ এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, সহজে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

কাজেই ব্যর্থ রাজনীতির কাছে প্রত্যাশা ছিল কি? পাকিস্তানের আত্ম-সম্বিত ফিরিয়ে আনা? এ প্রত্যাশা আজও দুরাশা, কালও দুরাশা। পণ্ডিতজীর other methods—অন্য পন্থা ক্রমশঃ

আত্মপ্রকাশ করছে। নেহেরু-লিয়াকত বৈঠক, মিতালী, যুক্ত-সিদ্ধান্ত other methods-এর বিকল্প নয়, অনুকল্প। তার পর আসবে তার এক প্রস্তাব—আসল প্রস্তাব, পাকিস্তানে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে, 'ইস্‌লামের সুশীতল ছায়াতলে' যে-যার ঘরে ফিরে যাও এবার। পণ্ডিতজীর রাজনীতির সাফল্য অবশ্য আছে। জনগণের উত্তেজনা আশ্বাস ও সময়ের প্রলেপে নিম্ন ডিগ্রিতে তিনি নামিয়ে দিয়েছেন। আজ 'আশু সমস্যা' আর মূল সমস্যার (Basic) বিভিন্নতার মন্ত্রে প্রথম আঘাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে দেশকে। এখনো আশা আছে দেশের লোকের, এ তো আজকার সমস্যা, সম্মুখে মহা ভবিষ্যৎ।

পণ্ডিতজী যদি সরকারী নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত না থাকতেন, তবে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতে পারতাম আমরা। বিপ্লবী নেতৃত্ব যেখানে ক্ষেত্র খুঁজে পেত। ঝড়ের বেগ উদ্দাম গতিতে ছুটে চলত। পাকিস্তানের বাধা-নিষেধ তার পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারত না। গদীরক্ষার দুশ্চিন্তা তাঁকে সশঙ্কিত করে তুলতে পারত না যে, জনগণকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে তোলা বিপজ্জনক। কতো দল যে ওঁৎ পেতে আছে? ভারতীয় ধনিকচক্র এমন ভাবে স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজে পেত না। ক্ষমতার মায়া-কাজল তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারত না, মমতাই তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠত।

সেই দুঃসাহসী পণ্ডিতজী। আমরা দেখেছি পণ্ডিতজীকে একাকী 'বেতমিজ' সশস্ত্র মুসলমান জনতার সম্মুখীন হয়ে কঠোর কণ্ঠে তাদের 'তমিজ-মাফিক' চলতে আদেশ করতে—অথচ সেই জনতা এসেছিল তাঁকেই বাধা দিতে সজ্জিত হয়ে, ধ্বনি করছিল জওহরলাল মুরদাবাদ। কিন্তু তিনি ছিলেন তখন জন-নেতা। আজ জন তাঁর চেয়ে অনেক দূরে, মাঝখানে সশস্ত্র পাহারার বিরাট ব্যবধান। আজ তিনি দিল্লীতে তক্ত-তাউশে অধিষ্ঠিত,—আর পূর্ববঙ্গের কাছে তো,—'দিল্লী অনেক দূর।'

৫

যুদ্ধ আমরা চাই না, অকপট চিত্তেই বলছি চাই না। এর পরিণতি আমরাও কল্পনা করতে পারি। কিন্তু যুদ্ধ যদি অনিবার্য্যই আসে। আসবে হয়তো কাশ্মীরকেই কেন্দ্র করে—অথবা পাকিস্তানই করবে যুদ্ধ-ঘোষণায় বাধ্য। পাকিস্তান দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু-বিদ্বেষ এবং ভারত-বিদ্বেষের ওপর। জন্ম তার এমনি বিদ্বেষের স্কন্ধে আরোহণ করে। আজো সে বেঁচে আছে একই রাজনীতির ওপর নির্ভর করে। বেঁচে থাকা তার নিজের প্রয়োজন, অন্যেরও প্রয়োজন। তাই বেঁচে থাকতে গেলে চাই তাঁর দুইটি নীতি, ভারত-বিদ্বেষ আর হিন্দু নির্য্যাতন আর বিতাড়ন। তা'ছাড়া আজ যে-ভাবে সে ব্যাপক যুদ্ধায়োজন করছে, যুদ্ধ না করলে সে নিজের আয়োজনের চাপেই মারা পড়বে। তাই যুদ্ধ তার চাই-ই। শান্তি তার স্বার্থের প্রতিকূল—তা'তে আভ্যন্তরীণ অশান্তি বাড়বে।

তবে কেন মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ দিল্লীতে এসে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন? এ যে পাকিস্তান রাজনীতির কতো বড় বিজয়! বিশ্বের কাছে আজ স্বীকৃত হল পাকিস্তানেই শুধু হিন্দু নির্য্যাতন চলেনি, ভারতেও ঠিক তেমনি মুসলিম নির্য্যাতন চলেছে। তাঁরা তাঁদের পূর্ব্ব বিবৃতিগুলি স্বীকার করিয়ে নিলেন ভারতকে দিয়ে। তার পর কয়লা চাই, পাটের বাজার চাই, অর্থনৈতিক দারুণ বিপর্য্যয় থেকে নিষ্কৃতি চাই। সহস্র সহস্র হিন্দুর প্রাণ-মূল্যে তাহা ক্রয় করা হচ্ছে। পরবর্ত্তী অধ্যায় হবে ভারতের মুসলমানদের ভারতে ফিরিয়ে দেওয়া। তাহাও সম্ভব হবে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল পাকিস্তান অর্জ্জনের জন্যে, আর সাম্প্রতিক হিন্দু নিধন ও উৎসাদনের উদ্দেশ্য হল পাকিস্তানকে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। সেবারেও জয় হয়েছিল, এবারেও পাকিস্তান বিজয়ী। চুক্তি সেই বিজয়ের প্রশস্তি-পত্র। কিন্তু বহু চুক্তিই—অনুরূপ চুক্তিই পাকিস্তান করেছে অতীতে। রাজনীতিই হচ্ছে তাই—চুক্তি চিরকালের নয়, প্রয়োজন শেষ হলে তা'ও নিঃশেষ হয়। বিনা নোটিশেই পাল্টে যায়।

আমাদের দিক থেকে চুক্তি পালিতই হবে, অতীতেও হয়েছে। জনগণকে চুক্তি পালনে সহযোগিতায় আহ্বান হাস্যকর। তাদের পালন করবার কি আছে, খুঁজে পাই না। পালনের দায়িত্ব সরকারের, ব্যবস্থা করবেন তাঁরাই। তবে জন-মনকে শান্ত করবার জন্যে আবেদন, আন্দোলন, সন্ধ্যাবক্তার আগমন পর্য্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য সব—তবে রাজনীতির দিক থেকে মূল্য আছে। নইলে, জনগণ বলতে পারে, চুক্তি আমরা করিনি, আর কখনো কোন চুক্তি ভঙ্গও করিনি। আর সহযোগিতা? শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের কথায় বলতে হয়, "Their cry for co-operation only bewilders the country, where are the operations with which to co-operate and how to co-operate?"

পশ্চিম-বঙ্গেও বাঙ্গালীর উৎকণ্ঠিত হবার কারণ বৃদ্ধিই পাচ্ছে, দূর হয়নি। লক্ষ লক্ষ বহিরাগত জনতার চাপ তার উপর—এ এক দুর্বহ চাপ। ভারত সরকারের নীতি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুকে—অবশিষ্ট হিন্দুকে স্বস্থানে রাখবার প্রয়াসে ব্যর্থ হবে। মাসের পর মাস ছুটবে অগণিত জনস্রোত। মরিয়া হয়ে ছুটবে তারা। মৃত্যু—নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড দেখেছে তারা চোখের সম্মুখে, দেখেছে শুধু সর্ব্ব সম্পদ লুণ্ঠিত হতেই নয়, নারীর সতীত্বনাশও দেখেছে নীরবে নত-নয়নে। তারা ছুটে আসবেই। তার ফল হবে ভয়াবহ। যে মূল সমস্যার দোহাই দিয়ে ভারত সরকার আজ আশু সমস্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছেন, তাই হয়ে উঠবে গুরুতর। সেদিনে আভ্যন্তরীণ কল-কোলাহলও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠবে।

কিন্তু উপায়ান্তর নেই। ভারতের রাজনীতি যে পথে চলেছে সে পথ বিপদের পথ। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তাই। দিনের পর দিন জমে উঠছে তাই ব্যর্থতা। সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করছেন দু-এক জন, কিন্তু তা' হচ্ছে অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত। ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই বিপর্য্যয়ে পূর্ণ। আচার্য্য কৃপালনী সতর্ক করে বলেছেন, সবল ও সময়োপযোগী নীতি অবলম্বন না করলে কংগ্রেসের মৃত্যু অনিবার্য্য। কংগ্রেসের মৃত্যু হোক বাধা নেই—কারণ ঐতিহাসিক বিবর্তনে রাজনৈতিক দলের মৃত্যু বা অধঃপতন ঘটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দুর্ব্বল ও ভ্রান্ত নীতির ফলে যদি দেশের মৃত্যু ঘটে?

পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুর সান্ত্বনা আছে—খণ্ডিত স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে তাদের অপমৃত্যু সে তো রাজনীতিক খাতার পাতায় লিখা হয়েই ছিল। দিল্লীর পানে চেয়ে থেকে তাদের অশ্রুপাত ব্যর্থই হতে বাধ্য—কারণ আজও দিল্লী তাদের কাছে অনেক দূর।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

(ইংল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত)

শ্রীঅমর চৌধুরী

ইংল্যাণ্ডের আকাশে যেমন অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুই-ই আছে, তার তলায় যারা বাস করে তাদের মনেও তেমনি সাদা আর কালোর মধ্যে ভেদ আছে। সেটা যদি বা এত দিন একটু ঢাকাঢাকির মধ্যে ছিল—এবারে আর তাও রইল না সেরেৎসী খামার ব্যাপার নিয়ে। বেচারাকে সাদা মেয়ে বিয়ে করার অপরাধে নির্বাসন দণ্ড লাভ করতে হল।

এই সেরেৎসী খামা হলেন আফ্রিকার বামাংগোয়াটো রাজ্যের রাজা। ইংল্যাণ্ডে পড়া-শোনা করছিলেন—সে সময় বিয়ে করেন লণ্ডনের এক টাইপিষ্ট মিস্ রুথ উইলিয়ামসকে। সেরেৎসীর রাজ্য আবার সেই কুখ্যাত দক্ষিণ-আফ্রিকা য়ুনিয়নের গা ঘেঁসে। আর যায় কোথায়? ডাঃ মালান ও তাঁর দল-বলেরা ত ক্ষেপে অস্থির। সাদায় কালোয় বিয়ে! সাদাদের অপমানের তবে আর শেষ রইল কোথায়? এক দিকে দক্ষিণ-আফ্রিকার এডিটারদের গালাগাল দিতে দিতে কষ বেয়ে ফেনা গড়াতে লাগল আর এক দিকে মালান সরকার ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিটিশ সরকারের উপর। তাঁরা বিশেষ ভাবে চেপে ধরলেন ইংরেজকে—খবরদার, ও বেটা যেন রাজ্যে ঢুকতে না পারে। কিন্তু সে অসঙ্গত অনুরোধে সায় দিতে ইংরেজদেরও একটু চক্ষুলজ্জায় বাধতে লাগল।

ওদিকে সেরেৎসীর নিজের রাজ্যেও প্রবল প্রতিবাদ উঠল এই বিয়ে নিয়ে। আর তার পাণ্ডা হচ্ছেন সেকেদী—সেরেৎসীর খুড়ো। ইনিই তখন নাবালক সেরেৎসীর হয়ে রাজ্য চালাচ্ছিলেন। সেরেৎসীকে কোন রকমে সিংহাসনে বসতে না দিলেই তাঁর স্বার্থটা সিদ্ধ হয়।

বিরুদ্ধ-মত যখন বিশেষ জোরালো হয়ে উঠল তখন সেরেৎসী ছুটলেন দেশে। সেখানে গিয়ে তিনি আহবান করলেন "কোৎলা"—আমরা যাকে বলি পঞ্চায়েৎ। সভায় সিদ্ধান্ত হল, সেরেৎসী গদিতে বসতে পারে তবে তার মেমসায়েবকে জাতি রাণী বলে গ্রহণ করবে না। পরের মাসে ফের পঞ্চায়েৎ ডাকা হল—ফের মাতব্বররা জানালেন যে তাঁদের মত বদলায়নি। যা হোক, সেরেৎসী তখন ঠিক করলেন যে, আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে পড়া-শোনা চালিয়ে যাবেন। এর পর তিনি দেশে ফিরে ১৯৪৯ সালের জুনে তৃতীয় পঞ্চায়েৎ ডাকলেন। সেখানে তিনি পরিষ্কার জানালেন যে, জাতিকে হয় তাঁদের দু'জনকে গ্রহণ করতে হবে নতুবা সেরেৎসীকে ত্যাগ করতে হবে। এদিকে তত দিনে খুড়ো মশাইএর শাসনের ঠ্যালায় প্রজাদের প্রাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে। সভায় উপস্থিত ছিল ৫০৪৩ জন—তার মধ্যে সেরেৎসীর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল ৫০০০ আর বিপক্ষে দিল সেকেদী আর তার দলের ৪২ জন। এমন কি, উপদলীয় বিবাদ ভুলে ১৪ জন উপদলপতি পর্যন্ত একবাক্যে সমর্থন করল সেরেৎসীকে। বামাংগোয়াটো জাতির ইতিহাসে এমন পরিপূর্ণ একতা এই প্রথম।

দেশে যাবার সময় সেরেৎসী স্ত্রীকে বিলেতে রেখে গিয়েছিলেন। যখন কোৎলা রুথকে রাণী বলে গ্রহণ করল তখন রুথ আফ্রিকা যাত্রা করল। দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার খবর পাঠালেন যে, রুথ তাঁদের দেশের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। হোক না সাদা মেয়ে—কিন্তু কালোর ছোঁয়া লেগে যে তার জাত গেছে। অগত্যা বেচারীকে অনেক ঘুরে স্বামীর ঘর করতে যেতে হল।

কনেকে শ্বশুরবাড়ী যদি বা গ্রহণ করল, কিন্তু জামাই নিয়ে তার বাপের বাড়ী নাজেহাল। ইংরেজ সরকার ততদিনে মালানের গুঁতোর চোটে অস্থির হয়ে উঠেছে। অথচ কোৎলার সিদ্ধান্তের পর সেরেৎসীকে তাড়াবার ভদ্রগোছের পথও সব বন্ধ। শেষকালে আর কোন পথ না পেয়ে তাঁরা নিযুক্ত করলেন এক জুডিসিয়ল কমিশন—সেরেৎসীর রাজ্যপ্রাপ্তির যুক্তিসঙ্গত বিচার করবার জন্য। যদিও ১৯৪৩ সালের বেচুয়ানাল্যাণ্ডের নেটিভ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান আইনে পরিষ্কার লিখিত আছে :—

"স্থানীয় আইন অনুযায়ী আহূত কোৎলায় জাতি ঠিক করবে কে প্রধান-পদ পাবে।" তবু যদি বা কমিশন বসল ত তার রিপোর্ট আজও হোয়াইট হলের ফাইলেই বন্দী হয়ে আছে।

এর পর কলোনিয়াল অফিসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন সার ইভলীন বেয়ারিং—বেচুয়ানাল্যাণ্ডের হাই কমিশনার। ভদ্রলোক যদিও বিটিশ অফিসার কিন্তু এঁর দপ্তর হ'ল মেফকিং-এ, মালানের রাজ্যে। কারণ ইনি আবার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থিত রাজদূতও কি না। সার ইভলীন কমনওয়েলথ রিলেশানসের মন্ত্রী মহাত্মবের কানে কী মন্ত্র দিলেন জানি না—তবে হাই কমিশনার সায়েবও চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল সেরেৎসীর লণ্ডনে হাজির হবার জন্য পত্নী সহ।

সংস্কৃত সাহিত্যে আছে মেয়েদের "অশিক্ষিত পটুত্বের" কথা। যদিও রুথ সংস্কৃত পড়েনি তবুও সে মেয়ে। কাজেই বুঝতে পারল, এ আহ্বানের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন প্যাঁচ আছে। সে লণ্ডনে আসতে অস্বীকার করল। সেরেৎসী ডিসট্রিক্ট কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি আবার ইচ্ছামত দেশে ফিরে আসতে পারবেন কি না? সাহেব কথা দিলেন সেরেৎসী তা পারবে। তখন খামা দেশ থেকে লণ্ডন রওনা হলেন।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ দিয়ে ঘেরা এরোড্রোমে এসে সেরেৎসী নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী গাড়ীতে তুলে তাঁকে নিয়ে আসা হল কলোনিয়াল অফিসে। সেখানে কলোনিয়াল সেক্রেটারী গর্ডন ওয়াকার খামাকে রাজ্য ছেড়ে দিতে বললেন এবং বিনিময়ে মোটা ঘুস দেবার প্রস্তাব করলেন। যদি সেরেৎসী রাজ্য ছেড়ে দেয় তবে বৎসরে ১১০০ পাউণ্ড ভাতা, ইংল্যাণ্ডে ভাল বাড়ী ও একটা চাকরী (!) পাবে। যখন খামা ওয়াকার সায়েবের বঁড়শী গিলল না তখন তাকে জানান হল যে, পাঁচ বছরের জন্য রাজ্য থেকে তাকে বহিষ্কৃত করা হল। সে আর দেশে ফিরে যেতে পারবে না। সেরেৎসী ত সে আজ্ঞা শুনে আকাশ থেকে পড়ল; কারণ কমিশনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকে আটকে রাখা হবে না। দেশে খুড়োর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে একটা বড় মামলা চলেছে—এক মাস পর তার শুনানীর দিন আছে। সব চেয়ে বড় কথা, আসন্নপ্রসবা স্ত্রী ছেড়ে সে যে মোটে কয়েক দিনের জন্য ইংল্যাণ্ডে এসেছে। আর এই সময় ইংরেজ তাকে কায়দা করে ডেকে এনে কয়েদ করে রাখল!

সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতায় ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণও বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠল। কাগজে-পত্রে, সভা-সমিতিতে এ নিয়ে জোর প্রতিবাদ সুরু হয়ে গেল। পার্লামেণ্টেও তুমুল বাগযুদ্ধ চলতে

তখন গর্ডন ওয়াকার এক হোয়াইট পেপার বার করলেন ও তাতে নির্ব্বাসনের তিনটে কারণ দিলেন :—

১। যে হেতু প্রথম দু'টো কোৎলা বিয়ের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল অতএব সেরেটসী সিংহাসনে বসলে অন্তর্বিবাদ গুরুতর হয়ে উঠবে।

২। জনমতের বিরুদ্ধে এ বিয়ের ফলে বোঝা যায় নির্ব্বাসিত রাজা জাতির সেবায় অমনোযোগী।

৩। মিশ্রিত-রক্ত পুত্রের সিংহাসনে উত্তরাধিকার অনিশ্চিত। পরে এ নিয়ে গোলমাল ঘটতে পারে।

পাঠক সহজেই বুঝতে পারছেন প্রতিটি অজুহাতই দুর্ব্বল। তৃতীয় কোৎলায় জাতি একবাক্যে বিদেশী পত্নী সহ খামাকে গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, সে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সেরেটসী জাতির সেন্টিমেণ্টে আঘাত দিয়েছে বলা চলবে না। তৃতীয়তঃ, সঙ্কর পুত্রের সিংহাসন লাভের প্রশ্ন উঠতে প্রায় ৫০ বছর দেরী আছে, কারণ সেই অনাগত শিশুর বাপের বয়সই মোটে ২৮ এখন। ৫০ বছর পরে কী ঘটবে তা নিয়ে বর্ত্তমানে মাথা-ঘামান হাস্যজনক। রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তন হতে পারে ইতিমধ্যে। এই সব চোখে-ধুলো-দেওয়া কারণে সাধারণ লোক মোটেই খুশী হল না। তাদের প্রতিবাদ ক্রমশঃই তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল।

সাগর পেরিয়ে নির্ব্বাসনের খবর বেচুয়ানাল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছোলে সমগ্র জাতি শোকে মুহ্যমান হয়ে গেল। স্যর ইভলীন বামাংগোয়াটোদের খবর পাঠালেন, তিনি এক মিটিং করে দণ্ডের কারণগুলো বুঝিয়ে দেবেন সবাইকে। নির্দ্দিষ্ট দিনে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কমিশনার সাহেব সভাস্থলে গিয়ে দেখলেন, কেউ নাই। বামাংগোয়াটোরা একযোগে সভা বয়কট করেছে। শূন্য আসনের মূক ভৎসনা কিছুক্ষণ সহ্য করে সাহেব বিদায় নিলেন। আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া। বামাংগোয়াটোরা জানিয়ে দিল, সেরেটসী দেশে না ফেরা পর্য্যন্ত তারা আর সরকারী খাজানা দেবে না।

স্যর ইভলীন তখন চালালেন সেই সনাতন ভেদনীতি। তিনি সেরেটসীর বদলে সিংহাসনে বসতে চায় এমন লোকের সন্ধান সুরু করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সুসভ্য চাল এই অসভ্যদের কাছে খাটল না। গদিপ্রার্থী কেউই এগিয়ে এল না। এমন কি সেই যে সেকেদী—শত্রুর সেরা জ্ঞাতিশত্রু—সে পর্য্যন্ত এখন ভাইপোর পক্ষ নিল। সেও অনুরোধ জানাল নির্ব্বাসন-আজ্ঞা রদ করবার জন্য।

ব্রিটিশ জনসাধারণও বুঝতে পারল যে, তাদের মাথা হেঁট করিয়েছে সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকার চাপে পড়ে। জনমত যখন উত্তাল হয়ে দাঁড়াল গর্ডন ওয়াকার তখন ঘোষণা করলেন পার্লামেণ্টে যে, এ বিষয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকার সঙ্গে বৃটেনের কোন পত্রাদি আদান-প্রদান 'হয়নি'। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সভাল থেকে "ডাই ট্রান্সভালার" কাগজ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গল যে, গত ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৯ সালেই মালান এই মিশ্র বিয়েতে তাঁর তীব্র অসম্মতি জানিয়ে কলোনিয়াল অফিসকে তার পাঠিয়েছেন।

যা হোক, জনমতের চাপে গর্ডন ওয়াকার তাঁর পূর্ব্বের আজ্ঞা একটু সংশোধন করতে বাধ্য হলেন এবং নূতন আদেশ দিলেন যে, নির্ব্বাসন বহাল রইল তবে কতকগুলো সর্ত্তাধীনে সেরেটসী বেচুয়ানাল্যাণ্ডে ফিরতে পারে ও স্ত্রীর প্রসবের সময় মাত্র দেশে গিয়ে তার কাছে থাকতে পারে। সে অনুসারে হৃৎরাজ্য খামা অপমানের ডালি মাথায় নিয়ে আফ্রিকাতে ফিরে গেল।

সব রঙ্গমঞ্চের মত হোয়াইট হলের রঙ্গমঞ্চেও দু'টো অংশ। প্রকাশ্যের পেছনে নেপথ্য! এই নাটকের সব অঙ্ক ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের একবার নেপথ্যে যেতে হবে। 'য়ুনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা'র গাঁ ঘেঁসে বৃটেনের তিনটি হাই কমিশনার-শাসিত প্রদেশ—সেরেটসীর রাজ্য যার অংশ সেই বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুটোল্যাণ্ড আর সোয়াজীল্যাণ্ড। ১৯১০ সাল থেকেই য়ুনিয়নের চোখ রয়েছে ওই তিনটে জায়গার উপর। সস্তায় মজুর পেতে হলে ওদেশগুলো যে তার চাই-ই। প্রথম যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা ইংরেজদের কাছে তার দাবী পেশ করে—কিছু কাল টালবাহানা করবার পর ইংরেজকে বাঁচিয়ে দিল প্রথম মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় বার ১৯৩৭এ জেনারাল হার্টজগ ফের ওগুলো চাইলেন। হস্তান্তরের সর্ত্তাদি ঠিক করতে করতেই ইংরেজ দু' বছর কাটিয়ে দিল। তার পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামানের শব্দে সে কথা চাপা পড়ে গেল।

যুদ্ধান্তে ইংরেজ খুব ভয়ে-ভয়ে ছিল্ল পাছে বোয়ারদের সেই পুরোনো দাবী আবার না কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। জন বুলের আশা ছিল, দক্ষিণ-আফ্রিকাকে তোয়াজে রাখতে পারলে হয়ত ঐ জায়গাগুলো ফিরে পাবার জন্য আর বেশী আন্দোলন হবে না। সে জন্য সে এত বড় একটা অসঙ্গত দণ্ডাজ্ঞাও সেরেটসীর উপর চাপাতে পেছপা হয়নি। কিন্তু হায়, ইংরেজের সব আশা ধূলিসাৎ করে দিয়ে ডাঃ মালান পার্লামেণ্টে আবার ওগুলোর অন্তর্ভুক্তির দাবী জানিয়ে প্রস্তাব তুলেছেন।

ঐ প্রোটেক্টোরেটগুলোর কাছাকাছি এক য়ুনিয়ন ছাড়া আর কোন বড় বাজার নাই। কাজেই ওদের অধিবাসীরা ঐ বাজারেই নিজেদের জিনিষ-পত্র বেচে অন্নসংস্থান করে। এবারে মালানের অজুহাত হচ্ছে যে, তাঁর দেশের লোকেরা না কি নিজেদের বাজারে বিদেশী মাল বিক্রি হওয়াটা পছন্দ করছে না। কাজেই ঐ তিনটে প্রোটেক্টোরেট দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেই বিদেশ "স্বদেশ" হয়ে যায়। কী সরল সমাধান—বলুন দেখি?

য়ুনিয়ন পার্লামেণ্টে ঐ প্রস্তাব উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বামাংগোয়াটোর কমিশনার জানিয়েছেন, যে হেতু সেরেটসীর রাজধানী সেরোয়েতে কোথায় একটু গণ্ডগোল হয়েছে, অতএব স্ত্রীর প্রসবের সময় ওকে দেশে গিয়ে তার পাশে থাকবার যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা এখন পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এমন কি প্রসবকালে রুথের বর্ত্তমান ভগ্নস্বাস্থ্য বিপদ ঘটবার ডাক্তারী আশঙ্কা সত্ত্বেও! অর্থাৎ কালো হাঙ্গামার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়ে যেটুকু করুণা সঞ্চারিত হয়েছিল, মালানের নূতন ধমকে সেটুকুও উবে গেল। সাধে কি নাটাল কংগ্রেসের ডাঃ নাইকার সেরেটসীকে বলেছেন, "মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী জাতিগত অহঙ্কারের নরকুণ্ড বলি।"

ব্রিটিশ সাম্রাজিক খাঁড়ার উপরে তবু এত দিন একটু ডেমোক্রেসীর চন্দন লাগান ছিল। এ বলির রক্তে সে প্রলেপটুকু মুছে গিয়ে আসল রূপটি বড় অভদ্র ভাবেই বেরিয়ে পড়েছে। এবং সে খাঁড়ার ঘা শুধু সেরেটসীর উপর পড়েনি—তা পড়েছে জগতের সমস্ত কালো লোকদের উপর। তাই এ ঘটনার গুরুত্ব আজ আমাদের বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

জাফরাণী

(খাজা আহম্মদ আব্বাসের **'Saffron Blossoms'** নামক গল্পটির অনুবাদ)

সতীন্দ্র মিত্র

এসো মুসাফির, এই ছায়াস্নিগ্ধ চীনার গাছটার তলে একটু জিরিয়ে নাও। হ্যাঁ···এইখানে আরাম ক'রে ব'সো, আমি পানি এনে দিচ্ছি।···ঐ মস্ত বড় নীল রং-এর হাওয়া-গাড়ীটা বুঝি তোমার?···টায়ার ফেটে গেছে?···তা অত ভাববার কি আছে এতে?···মোটে ত আর বিশ মাইল রাস্তা, সাঁঝ-বাতি জ্বালবার আগেই তুমি শ্রীনগরে পৌছুতে পারবে।···কি ব'লছ?···পানির দাম?···না, না, বাপজান,···এক বদনা পানি দিয়ে তার দাম নিতে পারব না। পানির দাম! হায় আল্লা!···পানি আর হাওয়া আমরা এদেশে এখনও ত বিক্রী ক'রতে আরম্ভ করিনি।

আর···দাম নিয়েই বা আমি কি ক'রব?···টাকা-পয়সার আমার আর দরকার নেই···দুনিয়াতে আপন জন ব'লতে ত আর কেউ নেই। কি ব'লছ?···একা থাকি কি না?···হাঁ, একাই ত! বেটা-বেটী কেউ নেই?···নাঃ, স্বামীও না। জেলদারের খামারে কাজ করি—ধান ভানি···ঝরণা থেকে পানি আনি···খোদা দু'বেলা দু'মুঠো জুটিয়ে দেন।···বয়স কত হ'ল জিজ্ঞেস ক'রছ?···তা এই ত পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে।···এক পা যার কবরের দিকে···তার আবার পয়সা নিয়ে কি হবে বল?···আজ যে কবর গেলে কালকে তার 'আহা' বলবার লোক নেই।···তুমি হয়ত ভাবছ···ডাইনী মাগীর মত দেখতে এ বুড়িটা···কি সব বাজে ব'কে চ'লেছে বক্ বক্ ক'রে?···কেন যে বকি···হায় আল্লা!—

কি বললে বাপজান?···মাঠে ফুটে রয়েছে ওগুলো কি ফুল?···না না, আফিমের ফুল নয়···ওগুলো জাফরাণ ফুল।···জাফরাণ ফুল অত লাল হ'ল কেন?···সত্যি, জাফরাণ ফুল অত লাল হয় না।···উজ্জ্বল বাসন্তী রং-এর পাপড়ী,—ভিতরে থাকে হলদে পরাগ।···হ্যাঁ, এখানেও ও-রকম জাফরাণ হয়···এই যেতে যেতেই দেখতে পাবে মাঠের দু'দিকে ঐ রকম রং-এর জাফরাণ ফুটে র'য়েছে।···তবে এখানে এমন খুন-খারাবী লাল হ'ল কেন?···বাপজান এ হ'ল খোদার যাদু!···ওঃ! তোমরা বুঝি আবার বিশ্বেস কর না ও-সব কথায়?···তা কেন করবে?···তোমরা একালের নওজোয়ান···তার উপর সমতল দেশের মানুষ···তোমরা ত শুনেছি, খোদাকেই উড়িয়ে দাও।···তা তাঁর আবার যাদু! হ্যাঁ···আমরা বেচারা কাশ্মীরীরা এই সব অলীক কথায় বিশ্বেস করি।

শুনবে?···কেন এখানকার মাঠে ফুটল লহুর মত লাল ঐ জাফরাণ ফুল?···কিন্তু শুনে তোমার লাভ কি?···একটু পরেই তোমার গাড়ী মেরামত হ'য়ে যাবে আর তুমি চ'লে যাবে···কাহিনীও আমার থেকে যাবে অসমাপ্ত।···এ রাস্তা দিয়ে কত গাড়ীই ত যাচ্ছে।···একটা-দু'টো নয়, শত শত।···কেউ কেউ হয়ত এক লহমার জন্যে থামে তার পর আবার ধুলো উড়িয়ে চ'লে যায়।···কিন্তু ঐ জাফরাণ ক্ষেতের ফুল এখানে এমনিই থাকবে,···যত দিন না ফসল পাকে···যত দিন না ফুল তুলবার সময় হয়।···

তার পরে, ঐ রক্ত-রাঙা পাপড়ী শুকিয়ে চালান দেওয়া হবে···যাবে দুনিয়ার দিকে দিকে।···কে জানে কোন্ বন্দ নামবে···কোন সহরে কোন খানদানী ঘরে খাবার টেবিলে বাবু পরিবেশন ক'রবে···এই জাফরাণের রং আর খুসবয় দিয়ে তৈ রকমারী খাবার! হয়ত তখন কেউ কেউ ব'লবে,—এই আজ যেম তুমি ব'লছ,—এ জাফরাণের রং এত লাল কেন? কেন যে এ লাল তা ত তারা কেউ জানবে না···কেমন ক'রেই বা জানবে দুনিয়াতে কেউ জানে না,···কেবল মাত্র জানি আমি!···

কি ভাবছ?···পাগলী বুড়ীটা বাজে বক্-বক্ ক'রছে, না? না···তা ভাবনি?···বেশ,···তবে গল্পটা সত্যিই মন দিয়ে শুনবে?···শোন।

—কেবল মাত্র এই বছরই এই জাফরাণগুলো লাল হ'য়েছে, নয় ত প্রতিবারই বাসন্তী রং-এর জাফরাণ আমাদেরও ফলে। উজ্জ্বল বাসন্তী রং-এর পাপড়ী, হলদে পরাগ,···গোটা উপত্যকা জুড়ে যখন ওগুলো ফুটে থাকে, তখন কি মনে হয় জান?···যেন বিয়ের কনে,—জাফরাণী শাল গায়ে দাঁড়িয়ে আছে।···দিকে দিকে ওর খুসবয়,—ধুলো উড়িয়ে হাওয়া-গাড়ী ছুটে যায়, ধুলোও খুসবয় হ'য়ে ওঠে জাফরাণ-ক্ষেতের উপর।

অনেক দিন আগে তার এক জন মুসাফির এখানে এসেছিল, তখন জাফরাণ ফুল সবে ফুটতে আরম্ভ ক'রেছে। মুসাফির খোসমেজাজী এক জন নওজোয়ান,—ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে জোরে জোরে শ্বাস নিতে আরম্ভ ক'রল,—যেন চুমুক দিচ্ছে ফুলের খুসবয়ে।···তার পর যেন আপন মনেই ব'লল—"আশ্চর্য্য, এখনও কেন হাসি আসছে না।"···আমি ছিলাম ক্ষেতে,—অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম—"ও আবার কি ব'লছ বাছা?···হাসি আসছে না আবার কি?" সে জবাব দিল—"জান না বুঝি, কেতাবে ধ'রে লেখা আছে জাফরাণ ক্ষেতে নিশ্বাস টানলে হাসি আসে।" তার ব'লবার ছেলেমানুষী ধরণে আমার হাসি এল। এমন সময়ে জাফরাণী সেদিক দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে ব'ললাম—"শুনছিস লা, এই মুসাফির কি ব'লছে?" তার পর মুসাফিরের কথা শুনবা মাত্র জাফরাণী একেবারে হেসে লুটিয়ে প'ড়ল। তাকে হাসতে দেখে মুসাফির প্রথমে ঘাবড়ে গেল, পরে চ'টে উঠল। তার পর যখন দেখল জাফরাণী পাগলী ঝরণার মত অজস্র হাসিতে ভেঙ্গে পড়ছে তখন সে-ও না হেসে পারল না। আর মজা দেখ,—ওদের দুজনকে বিনা কারণে হাসতে দেখে আমারও হাসি এল। তখন মুসাফির বলল—"দেখলে ত আম্মা, কেতাবে কখনও ঝুটা বাত লেখে না! এই জাফরাণ ক্ষেতে আমরা তিন জন দাঁড়িয়ে আছি আর তিন জনই হাসছি!"

ও মা দেখেছ? তোমাকে লাল পাপড়ীর কাহিনী ব'লতে গিয়ে কি সব বাজে কথা ব'লছি! ভুলো মন বাপজান, কিছুই ঠিক থাকে না! কি ব'লছ? জাফরাণী আবার কে?···জাফরাণী? ও মা, বলিনি বুঝি? কপাল আমার! জাফরাণী আমারই বেটী! ওর আসল নাম ছিল নূরান্। গাঁয়ের ছেলেরা ওর নাম দিয়েছিল জাফরাণী। জাফরাণের মত গায়ের রং ছিল কি না, তাই। সত্যিই কি সুন্দরীই না ছিল আমার বেটী। গাঁয়ের ছেলেরা ব'লত, ওর গায়ের রং জাফরাণ আর চোখ দু'টো যেন পদ্ম। কিন্তু সুন্দরী হ'লে কি হবে! স্বভাব ছিল তার বড্ড একরোখা আর দুরন্ত। হবে না কেন? একমাত্র বেটা বাপ আর ভাইয়ের 'নাই' পেয়ে পেয়ে

হ'য়ে উঠেছিল। আমি ত ভেবে সারা, অমন বেটার সাদিটা জলয় চুকে যায় কি ক'রে!

জাফরাণীকে পছন্দ ক'রল অনেকে। এমন কি গাঁয়ের ... তার বেটার সঙ্গে সাদীর কথা তুলল। জেলদারের বেটার ... এর চেয়ে আমরা চাষার ঘরে আর কি আশা ক'রতে পারি ...? ভাবলাম জাফরাণীর বরাত ভাল, আল্লা ওর প্রতি সদয় হয়েছেন। কিন্তু হায় আল্লা! কি ক'রতে কি হ'ল! হঠাৎ জাফরাণীর বাবা মারা গেলেন। নসিবের লেখন কে মুছবে বল? যা লেখা আছে তা ঘ'টবেই। তিনটি নাবালক বেটা আর জাফরাণীকে নিয়ে আমি ত এক রকম পথেই দাঁড়ালুম। মহাজনের দেনার দায়ে জমি-জমা ভিটে-মাটী সব গেল। মনে মনে ভাবলাম, বেটারাই আমার জমি-জমা আমার ভিটে-মাটী। খোদা ওদিগে বাঁচিয়ে রাখুন,—আবার সব হবে। কিন্তু জাফরাণী? তার কি হবে? বাপ-মরা অনাথা মেয়েকে আর সাদী ক'রবে কে? হ'লই বা তার গায়ের রং জাফরাণ আর চোখ দু'টো পদ্মফুল!

আমরা হ'লুম সাত-পুরুষের চাষী। কোনও বছর ফসল হয়, কখনও বা হয় না। কোনও বছর অতিবৃষ্টি—কখনও বা অনাবৃষ্টি; কখনও তুফান আসে—কখনও আবার বরফে ফসল নষ্ট করে। এমনি ক'রেই আমাদের কাটে। কোনও বছর নিজের জমিতে চাষ করি—কোনও বছর আবার পরের জমিতে ক্ষেত-মজুরী করি। কিসমতের ওঠা-নামা কে আর রুখবে?

আর বাপজান,...তার উপর মহারাজা আর তাঁর আমলাদের অত্যাচার ত লেগেই আছে! আমলারা ত আর সকলেই ভাল লোক নয়। কিন্তু কি ক'রব বল?...হাজার হ'লেও মহারাজা মহারাজাই—আর আমরা সামান্য লোক, মহারাজার বিরুদ্ধে নালিশ জানাব কার কাছে? কিন্তু আমাদের এই সব গাঁয়ে গাঁয়ে কি সব যেন ঘটতে লাগল। জান ত এটা কলিযুগ, শয়তানের কাল!

অনেক দিন আগে একবার জাফরাণীর বাপজী তখন বেঁচে ছিলেন,—আমি ধান ভানছি, এমন সময়ে আমার মেজ বেটা মুরু চেঁচাতে চেঁচাতে এল..."মা মা, শের-ই-কাশ্মীর এসেছেন আমাদের গাঁয়ে...শের-ই কাশ্মীর!" শের-ই-কাশ্মীর?...মানে কাশ্মীরের বাঘ?...ও মা, আমার কি হবে গো?...এমন কথা ত কখনও শুনিনি!...আমাদের গাঁয়ে বাঘ-ভালুকের উপদ্রব ত কখনও ছিল না!...ও মুরু...ও জাফরাণী...ও গোলাম, ঘরে আয়...শীগ্-গির ঘরে আয়!...জেলদারের ঘরে বন্দুক আছে...বাঘটাকে মেরে ফেলুক না ওরা!...

ভয়ে এক রকম দিশেহারা হ'য়ে দরজায় এসে দাঁড়ালুম।...কিছুক্ষণ পরেই দেখি গোটা গাঁয়ের লোক তুফানের মত ভেঙ্গে প'ড়েছে রাস্তায়। কাতারে কাতারে সব চ'লেছে...অত উত্তেজিত হ'য়ে ওরা সব চ'লল কোথা? বাঘটা ধরা পড়েছে বোধ হয়। নয় ত মেয়ে-ছেলেরাও খালি হাতে চ'লল কোথা?...যাই আমিও দেখে আসি।

ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখি সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সে ছবি আমি জীবনে কখনও ভুলব না।...ঐখানে ঐ—যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে না গাঁয়ের ওপাশে?...ঐখানে মক্তবের মাঠে গোটা গাঁয়ের লোক জড় হ'য়েছে।...সকলেই ব'সে প'ড়েছে মাটীতে আর তাদের সামনে একটা চৌকীর উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ক'রছে এক জন লোক। কই, বাঘও নয় সিংহও নয়, ও তো দীর্ঘকায় সুন্দর এক পুরুষ! একেই কাশ্মীরের বাঘ ব'লছে?...ও মা বাচ্চাগুলো কি রকম দুষ্টু দেখেছ?...মিছিমিছি ভয় দেখানো! এ ত বাঘ-ভালুক নয়, এমন কি মহারাজার কোনও কর্মচারীও নয়। রাজার আমলা অমন মোটা খদ্দর প'রবে কেন? দূর থেকে কি ব'লছে শোনা যায় না, প্রথমে মনে হ'ল হয়ত চা কোম্পানীর ক্যানভাসার। এক্ষুণি কলের গান বাজাবে আর বিনা পয়সায় চায়ের প্যাকেট বিলি ক'রবে।

কাছে গিয়ে শুনি, ও মা, ও যে কাশ্মীরি ভাষায় কথা ব'লছে! আর ব'লছে কি সব বিপজ্জনক কথা! এ দেশের সত্যিকারের মালিক রাজা নয়, আমরা। আমরা যারা চাষ করি, আমরা যারা অত্যাচারিত—যারা নিপীড়িত। জমিদার আর মহাজন আমাদের শোষণ ক'রে দিন দিন ফুলছে। আমাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর মুনাফা লুটছে ওরাই! ভেঙ্গে ফেলতে হবে এ সব কানুন! আমাদের এক হ'তে হবে, লড়াই করতে হবে আজাদীর জন্যে! আমাদের ছেলেদের পাঠাতে হবে ইস্কুলে কলেজে, তারাই জাতির ভবিষ্য নায়ক, তাদিগে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে। এমনি সব সর্বনেশে কথা ব'লতে লাগল লোকটা। আমি আর শুনতে পারলাম না। হায় হায়! কি সর্বনাশটাই না ঘটবে গাঁয়ে...কি সব বিপজ্জনক কথা ব'লছে লোকটা! তার উপর আবার দেখি ভীড়ের মধ্যে ব'সে আছে জাফরাণী! বিস্ময়ে তার চোখ-মুখ বিস্ফারিত, বক্তার সমস্ত জবান যেন সে গিলছে! ছুঁড়িকে এক্ষুণি টেনে নিয়ে আসতে হবে ওখান থেকে! ওর বাপকে ব'লতে হবে—বেদম মার খাওয়াতে হবে আজ, যাতে না আর হারামজাদী কখনও এই রকম জায়গায় পা দিতে পারে! চেয়ে দেখি, জাফরাণীর বাপও ব'সে আছেন সামনের সারিতে! গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে!

বুঝতেই পারছ বাপজান, গাঁয়ের অবস্থা তার পর কি রকম দাঁড়াল! পুকুরের শান্ত স্থির জলে ঢিল ফেললে যে তরঙ্গ ওঠে—গোটা পুকুরের জল তাতে নাড়া খায়, শের-ই-কাশ্মীর তাই করে গেলেন। গ্রামের শান্ত থমকানো হাওয়াতে উঠল ঘূর্ণী ঝড়। সকলেই বিরক্ত, সকলেই অসন্তুষ্ট। মহারাজা আর তাঁর আমলাদের প্রতি সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল। আমি জেনানা...ভয়ে মরি। তাদিগে বোঝাই...অমন পাগলামি করো না। তোমাদের বাপ-ঠাকুদাও এমনি করে জীবন কাটিয়ে গেছেন...তখনও এমনি রাজা আর আমলারা রাজত্ব করত। তোমরা আজ এমন কি লায়েক হয়ে উঠলে যে এ সব সহ্য করতে পারছ না? কি এমন তোমাদের হিম্মত যে দুনিয়ার খোদার কানুন পাল্টে দিতে চাও...ইনকিলাব ঘটাতে চাও! কিন্তু আমার কথা আর কে শোনে, সকলেই তখন শের-ই-কাশ্মীরের যাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন।

আমার এই একঘেয়ে কথায় বিরক্ত হচ্ছ, না বাপজান? না, বিরক্তি লাগছে না?...জাফরান ফুলের রক্ত-রঙ্গা পাপড়ীর গোপন কথা শুনতে চাও?...তাই-ই ত তোমাকে শোনাচ্ছি মুসাফির!...শের-ই-কাশ্মীরের কথা না শুনলে তুমি কেমন করে বুঝবে জাফরাণ ফুলের রক্ত-পাপড়ীর কথা?...

শের-ই-কাশ্মীর আমাদের গাঁ থেকে চলে যাবার পর শোনা গেল, রাজা তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রেছেন। শুনে ত আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

যাক, এইবার কিছুটা আশান হ'ল। গাঁয়ের লোক এবার তাঁর কথা ভুলে যাবে, আবার আগেকার মত যা আছে তাই নিয়ে খুসীমনে দিন কাটাবে। কিন্তু আমি ভুল বুঝলাম। তাঁর গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে লোকে আরও ক্ষেপে গেল। লোকটি আগের চেয়ে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। যারা তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের বিরুদ্ধে লোক উত্তেজিত হয়ে উঠল। তিক্ত কণ্ঠে তারা ব'লতে লাগল, এ রাজার সময় এবার ফুরিয়ে এসেছে।···এবার আমাদের শেষ লড়াই-এর পালা···ওদের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু-পর্দায় যাদের গলা চড়ল তারা আমারই সন্তানরা!···আবার কিছু দিন পরেই শোনা গেল, শের-ই-কাশ্মীরকে রাজা ছেড়ে দিয়েছে। যাক্···বাঁচা গেল। লোকটা জেলে থাকলে হয়ত এরা সাংঘাতিক রকমের একটা কিছু ক'রে ব'সত। আমার বেটাগুলো যা আরম্ভ ক'রেছিল! যদি জেলদারের কাছে যেত তবে কি আর রক্ষে থাকত?···

বাপ বেঁচে থাকতে তবু বেটাগুলো বাগে ছিল, তিনি মারা যাবার পর থেকে আমার ঘরকন্নায় আস্তে আস্তে ভাঙ্গন আরম্ভ হ'ল।···জমি-জিরাত আগেই গিয়েছিল···বড় বেটা গোলাম নবী ব'লল যে, সে আর পরের জমিতে মজুরী খাটবে না··· শ্রীনগর কিংবা গুলমর্গ-এ গেলে সেখানে সাহিব-লোগদের মোট বয়ে রোজ দু'-তিন টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করতে পারবে। আমি তাকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সে চ'লে গেল। যখন সে গেল তখন কি সুন্দর তার চেহারা! ইয়া চওড়া বুকের ছাতি!···গাঁয়ের সকল ছেলের মধ্যে তারই তাগত ছিল সব চেয়ে বেশী। কিন্তু ছয় মাস পরে একবার যখন সে এল,···তাকে দেখে আমার ত ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'ল। রং গেছে কালো হ'য়ে, শরীর শুকিয়ে গেছে আর চোখ দু'টো হয়েছে কোটরগত।···তার উপর কপালে দড়ি বাঁধবার দাগ কেটে বসেছে— মাল বইবার সময় মালগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয় কপালের সঙ্গে— নয়ত পড়ে যায়—তারই দাগ! যতক্ষণ সে বাড়ীতে রইল···অনবরত কাশতেই লাগল,···কাশতে কাশতে এক একবার দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি! তাকে বললাম ত সে গ্রাহ্যই করল না···বলল —ও কিছু না, ঠাণ্ডা লেগে সামান্য সর্দ্দি হয়েছে। ও যাবার সময় মেজ বেটা গুরুও ওর সঙ্গে গেল—আমার বারণ সেও শুনল না···সে আর গাঁয়ে পড়ে থাকবে না···সহরে গিয়ে রোজগার ক'রতে চায়।···

কয়েক মাস পরে জেলদার এক দিন আমাকে ডেকে ব'লল— "শুনছ গো গোলাম নবীর মা?···হুঁসিয়ার হয়ে থেকো বাছা তুমি!··· গুরু,—তোমারই মেজ বেটা, শেখ আবদুল্লার দলে যোগ দিয়েছে।··· দিনে শিকারার দাঁড় টানে আর রাতে দাঁড়ি-মাঝি আর অন্য সব মজুরদের সভায়-সভায় বক্তিমে ক'রে বেড়ান!" কাণ্ড দেখ একবার!···শের-ই-কাশ্মীরের মত আমার বেটা কি না জমায়েত-এ বক্তৃতা করে! হায় আল্লা!···শেখ আবদুল্লা যা করবে চাষার ছেলের তাই শোভা পায়? হাতীর সঙ্গে কি না ব্যাং-এর পাল্লা!

এদিকে জাফরাণীর কি হ'ল ব'লছ?···দেখ দিকিন্ কি ভুলো মন! একবারও ওর নাম করছি না বুঝি?···শোন তবে। বাড়ীতে আমরা থাকি তিন জন, আমি জাফরাণী আর ছোট বেটা গফুর। জাফরাণীর বিশ বছর বয়স হল, এখনও সাদী হয়নি, কি ক'রে হবে, হাতে আমার একটা কানাকড়িও নাই যা দিয়ে তার সাদী দেব, দু'বেলা পেট ভরানোই এক দুর্ঘট ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। শুনলাম; সাগর-পারে কোথায় খুব জোর লড়াই সুরু হয়েছে তাই এখানে আমাদের এই গাঁয়ে জিনিস-পত্রের দাম হু-হু ক'রে বেড়ে চলল। আমরা মা-বেটিতে খাটি, পানি তুলি, ধান ভানি, চরখায় পশমের সুতো কাটি। এত ক'রে তবে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে। ছোট বেটা গফুর দশ বছরের হ'ল—আমি বলি, ও এবার কাজে লাগুক। জাফরাণী কিন্তু শুনবে না, ওকে সে ইস্কুলে পড়াবে। 'পাগল হলি না কি জাফরাণী'? আমি বলি। ও কিন্তু শোনে না—। কি আর ক'রব বল, অত বড় সোমত্ত মেয়ে, মারতে তো আর পারি না! তার উপর সাদী দিতে পারছি না, নিজের মনেই চুপ ক'রে রইলাম। তবু মনে একটা খটকা রইল,—বংশে এই প্রথম ছেলে ইস্কুলে চলল—কপালে কি অঘটন না আছে কে জানে।

জাফরাণীর এদিকে বিশ্রাম নাই, ভাইটির পিছনে সে লেগে রইল, কি ক'রে তার পড়া হবে—কেমন ক'রে তাড়াতাড়ি সব শিখে নেবে এই তার চেষ্টা। ইস্কুল থেকে বাড়ী এল আবার তক্ষুণি তাকে পড়তে বসাল—পড়ুক, লিখুক, নয় অংক কষুক,— অংক ভুল হ'লে মাষ্টারের কাছে যাক,—শুধরে নিয়ে আসুক—হেন করুক তেন করুক—উপায় থাকলে গফুরের সমস্ত কেতাব জলে গুলে এক দিনে তাকে খাওয়াত।

ঘরে মিষ্টি ফলের গাছ থাকলে বাইরে থেকে দু'-একটা ঢিল এসে পড়বেই। কুড়ি-একুশ বছরের সোমত্ত মেয়ে জাফরাণী —বেহেস্তের হুর-পরী না হলেও অসামান্য সুন্দরী বলা চলে —লোকের নজর পড়ল ওর দিকে; জানই ত আজকালকার ছেলেদিকে, সহরে সিনেমা-থিয়েটার দেখে কি সব নোংরা আর জঘন্য জিনিস তারা শেখে। এক দিন কাঠ কুড়াতে গিয়ে বেটি আমার কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। মুখে কথা নাই, চোখে কেবল পানি, বিরক্ত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করাতে কেবল বলল—"মা, এবার আমার সাদীর ব্যবস্থা কর। আর কোন কথা না—কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। অনেক সাধ্য-সাধনা করবার পর যা বলল তাতে বুঝলাম, জেলদারের ছেলে আজ ওকে অসম্মান করেছে; মহব্বত জানাতে এসে বিফল হয়ে ওর হাত ধরে টেনেছে।

বল ত, এ অবস্থায় আমি কি করি! হাতে এমন কিছু নাই যাতে সাদী দেবো বেটির, গাঁয়ের অনেক ভাল মানুষকে বললাম ওর সাদীর কথা,—তবু অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশ টাকাও ত লাগবে—, গায়ে একখানা রূপার গয়নাও নাই যা বিক্রি করে কি বাঁধা দিয়ে সে টাকার জোগাড় করব।

এমন সময়ে এক জন মেহেমান এল আমাদের বাড়ীতে! লোকটাকে দেখেই মনে হ'ল কুলি,—কপালে সেই কাটা ঘায়ের মত দড়ির দাগ। বয়স যে কত ঠাহর ক'রে বলা যায় না,—চল্লিশও হ'তে পারে—আবার ষাটও হ'তে পারে। ময়লা ন্যাকড়ায় বাঁধা কতকগুলো টাকা আমার হাতে দিয়ে ব'লল,—"গোলাম নবী এগুলো আপনাকে দিতে ব'লে গিয়েছিল···জাফরাণীর সাদীর জন্যে,—" কেমন যেন থেমে থেমে আমতা আমতা ক'রে ব'লতে লাগল,— "আমি···আমি গোলাম নবীর দোস্ত···আমার নাম মাহমুদ···।"

া তাড়াতাড়ি সাগ্রহে গুণে নিলাম—সাতষট্টি টাকা দশ ···মাহ্‌মদু ব'লল আবার,—"গোলাম নবী এগুলো আপনাকে দে গিয়েছিল জাফরাণীর সাদীর জন্যে···" যাক, তবু ভাল োকে এখনও মনে আছে।···কিন্তু সে নিজে এল না ?···কেমন আছে সে ?···ভাল নাই ?···বিবর্ণ মুখে জবাব দিল মাহ্‌মদু—"আম্মাজী, তোমার গোলাম নবী আর বেঁচে নেই। র সঙ্গে রক্ত উঠতে আরম্ভ ক'রেছিল !···"

বোঝ বাপজান, আমার তখন কি অবস্থা, কে যেন আমার জটা থেঁতলে দিয়ে গেল, দশ মাস গর্ভ-যাতনার পর তিলে তিলে র রক্ত দিয়ে যাকে অত বড়টি ক'রে তুললাম সে কি না শেষকালে র মত সাহেবদের মাল ব'য়ে ব'য়ে যক্ষ্মায় ম'রল ! আমার কার অবস্থা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না বাপজান,— জাফরাণীর কি যেন হ'ল, ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে গেল একেবারে ;— তার যত যত্ন যত মনোযোগ সব গিয়ে প'ড়ল গফুরের ওপর। হাতের লেখা,—তার পড়া,—তার অঙ্ককষা—এই নিয়েই সে ্ রইল। অত্যাধিক ভাইজানকে চিঙ্গাড়ী ক'রে তুলবার মতলব। সে অমন হ'ল বুঝি না। যেন কোন রকমে ভাইয়ের পড়াটা ক'রে ফেললেই তার ছুটি, এমনি তার ভাবখানা। মাহ্‌মদুকে । প্রশ্নে উত্যক্ত ক'রে তুলল—বড় ভাই কত দিন ভুগল ?···করে ক কাশিতে খুন উঠতে আরম্ভ করল ? শেষ সময়ে চিকিৎসা ছে ? টাকার অভাব হয়নি ?···সব কুলি-খালাসীদেরই ঐ রকম অবস্থা ?···মাহ্‌মদু ব'লল—হ্যাঁ, ঐ এক রকমই। জাফরাণী ন তাকে ব'লল—তবুও তুমি সেখানে যাবে ? কেন, এখানেই ক যাও না কেন ?

কেন জানি না, আমার অনুরোধে মাহ্‌মদু আরও তিন দিন থেকে ়। যাবার দিন তাকে বললুম,—সত্যি বাছা, অত কষ্টের যখন জ, তখন নাই বা গেলে সেখানে ! সে জবাব দিল, "কি করব ন, আমি ত আর অন্য কোনও কাজ জানি না ! আর আমার । আফশোষ করবেই বা কে ? কেউ নেই আমার, মা-বাপ কেউ ।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জরু ?" সে জবাব দিল—"অনেক দিন গেই মরে গেছে !" প্রশ্ন করলাম, "আবার সাদী করনি কেন ?" বার সে হেসে উঠল। এ কয় দিন তাকে হাসতে দেখিনি কখনও ; মার কথায় তার কোটরগত চোখ দু'টো আর ভেঙ্গে-পড়া গালের ঁকড় চামড়া একসঙ্গে হেসে উঠল, ব'লল,—"কে আর আমার সঙ্গে টীর সাদী দেবে আম্মাজী !"

এর পরই আমি তার সঙ্গে জাফরাণীর সাদীর ঠিক করলাম। বলছ ? জাফরাণী মত দিল কি না ?···ও মা, সে আবার কি কথা ? দীর ব্যাপারে বেটা-বেটীর মত আবার কি ? তবু যখন তাকে ললাম যে আসছে মাসের বিশে তারিখে তার সঙ্গে মাহ্‌মদুর সাদীর কঠাক হ'য়েছে আর বিয়ের পরই মাহ্‌মদু তাকে এখান থেকে নিয়ে বে,—তখন মনে হ'ল যেন তার কাঁধ থেকে গুরু-ভার বোঝা নেমে ল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে।

জাফরাণীর সাদীর দিন এগিয়ে আসতে লাগল, আমাদের গরীবের র পণ আর কি দেব, তবু একটা পোষাক, এক জোড়া রূপোর ঝুমকো র এক জোড়া পাঁয়জোর কিনলাম তার জন্যে। সাদীর দিন মাহ্‌মদু কে নিয়ে যেতে আসবে। ভোরে তাকে ঘুম থেকে ওঠালাম,— গোসল করিয়ে তাকে কনের সাজ পরিয়ে দিলাম—গোলাপী রং-এর পিরান আর রঙ্গীন ছিটের শালোয়ার। আগেকার দিনে কাশ্মীরের মেয়েরা কেবল লম্বা পিরানই পরত, কিন্তু শের-ই-কাশ্মীর তরুণী মেয়েদের শিখিয়েছেন শালোয়ার পরতে। জাফরাণী পরে,—তার তাড়ায় আমিও পরি। নয় ত শের-ই-কাশ্মীর হয়ত চ'টে যাবেন। অবিশ্যি আমি ও-সব শের-ফের-এর পরোয়া করতুম না, তবু সব জেনানাই যখন পরছে তখন আমিই বা কত আর পুরানো আদপকে বাঁচিয়ে রাখি।

জাফরাণীর সাদীর দিনেই খবর এল যে শের-ই-কাশ্মীর গ্রেপ্তার হ'য়েছেন। রাজাকে তিনি রাজ্য থেকে তাড়াতে চান তাই। ভাবলাম, বাব্বাঃ, শেরই হও আর যাই হও,—এ আরও বড় শক্ত শের-এর পাল্লায় প'ড়েছ। কিন্তু গ্রামে উঠল প্রচণ্ড আলোড়ন। 'শের-ই-কাশ্মীর গ্রেপ্তার হ'য়েছেন', 'শের-ই-কাশ্মীর গ্রেপ্তার হ'য়েছেন', —লোকের মুখে মুখে কেবল এই এক কথা। দেখ দিকিন্ কাণ্ড ! আর কি দিন পেল না হতভাগা লোকটা। ঠিক আমার বেটীর সাদীর দিনেই গ্রেপ্তার হ'তে গেল।

রাস্তায় কিসের যেন কোলাহল উঠল। ভাবলাম, মাহ্‌মদু হয়ত জৌলুশ ক'রে সাদী ক'রতে আসছে। ছুটে গিয়ে দেখি, সে এক তাজ্জব ব্যাপার ! এক দল ছেলে একটা লাঙ্গল আঁকা লাল ঝাণ্ডা কাঁধে ক'রে চীৎকার ক'রতে ক'রতে চ'লেছে, ঘন ঘন আওয়াজ তুলছে,—"শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ !" "ডোগরা-রাজ মুর্দাবাদ !" আমার বেটা গফুর এক গাদা ইটের উপর দাঁড়িয়ে বড় বড় হরফে দেয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে লিখল,—তার পর চেঁচিয়ে প'ড়ল,—"কুইট কাশ্মীর !" "কাশ্মীর ছাড় !" দুয়ারে দাঁড়িয়ে জাফরাণী সব দেখছে। চোখে-মুখে খুসীর রোশনাই যেন নেমে এসেছে বেহেস্ত থেকে। আজকে যেন তারই জয়-জয়কার। ঘরের ভিতরে গেলাম। অকস্মাৎ ছেলেদের চীৎকার দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল ; ছুটে আবার বেরিয়ে এলাম।

এবারের দৃশ্য দেখে একেবারে পাথর ব'নে গেলাম। লরী-বোঝাই এক পাল খাকী পোষাক-পরা পুলিশ এসেছে···লরী থেকে ঝাঁপিয়ে নামছে তারা আর ছেলেগুলোকে এলো-পাথাড়ি পিটুচ্ছে ! ছুটে গেলাম, এইমাত্র গফুরকে দেখে এসেছি ওখানে, ঐ দেয়ালের গায়ে বড় বড় হরফে কি সব অলুক্ষুণে কথা যেন লিখছিল !···হায় আল্লা !···কোথায় গফুর ! মাটীতে প'ড়ে আছে এক ঝলক লহু !··· আর অনেক দূরে বাপজান আমার প'ড়ে আছে হতচেতন হ'য়ে।··· লাঠিতে মাথা ফেটে গেছে। তবু হ' এর মুঠোতে শক্ত ক'রে তখনও ধরা র'য়েছে !······

বাড়ীতে তাকে নিয়ে এলাম। তার দিদির কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলল সে। অজ্ঞান অবস্থায় একবার শুধু ঠোঁট দুটো নড়ল, জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ ক'রল,—"ডোগরা-রাজ কাশ্মীর ছাড় !" শেষ অক্ষর উচ্চারণও হ'ল না ভাল ক'রে ; মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এক ঝলক রক্ত !···ব্যস্···সব—শেষ !

এখন যখন কথাগুলো মাঝে-মাঝে মনে পড়ে, তখন মনে হয় যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি আমি !···একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনার কোনও সম্বন্ধ নাই।···তবু···তবু ভেবে দেখ একবার,···কী ভীষণ কাণ্ড !···পর্ব্বত প্রমাণ সেই শোকের বোঝা আজও আমি কেমন ক'রে ব'য়ে চ'লেছি !···

জাফরাণীর চোখে কিন্তু জল নেই একবিন্দু!···তার প্রিয়তম ভাইজান ম'ল···তবু না!···পদ্ম ফুলের মত শান্ত স্নিগ্ধ চোখ দু'টিতে যেন কিসের আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল!···দুটি চোখ ত নয় যেন দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার!···এক্ষুণি বুঝি ফুলকিতে পুড়িয়ে খাক ক'রবে সমস্ত কিছু!···

তার পর বের হ'ল এক মিছিল, গাঁয়ের সকলকে নিয়ে। মিছিলের আগে আগে চ'লল জেনানারা; আর সকলের আগে আমার জাফরাণী,—এখনও তার পরনে সেই কনের সাজ!···গোটা মিছিলটা এগিয়ে চ'লল, ঐ চষা ক্ষেত পার হয়ে ঐধারে, যেখানে তোমার হাওয়া-গাড়ী দাঁড়িয়ে,—ঠিক ঐখানে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশদের লরী; —ঐদিকে এগিয়ে চ'লল মেয়ে-মরদের মিছিল!···

খাকী-পরা কালো কালো পুলিশগুলো, কুৎসিত সব চেহারা!··· মিছিলের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধ'রল ওরা!···মিছিলের আগে আগে জেনানারা!···সবার আগে আমার জাফরাণী!···

ওরা কিন্তু এগিয়েই চ'লল!···জাফরাণীর চোখে আগুনের ঝলক; বন্দুকের অন্ধ চোখে সে ঝলক পাবে কোথায়?···বন্দুকগুলো সব ওরই দিকে উঁচিয়ে ধরা!···ডর নাই বেটীর!···এগিয়েই চ'লেছে!···

দুম্‌ দুম্‌, দুম দুম্‌,···বন্দুকের গুলী ছুটল!···একটা···দশটা··· বারটা···পনেরটা···লোকগুলো এলোপাথাড়ী ছুট দিল!···আর জাফরাণী?···এইখানে ঠিক এই মাঠে সে টলে প'ড়ল মাটীর উপর, মায়ের কোলে যেন ঢলে প'ড়ল নিদ্রা-ক্লান্ত দুষ্টু দামাল ছেলে।

ছুটে গেলাম আমি, বুক থেকে তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, যেন তৃষ্ণার্ত মাটীর পিপাসা মেটাবার জন্যেই। রক্তে ভিজে গেছে তার কনের পোষাক! ধীরে ধীরে তার মাথাটি কোলে টেনে নিলাম, আস্তে আস্তে সে চোখ বুঝল। বেটী আমার শেষ নিশ্বাস ফেলল আমারই কোলে!···যাবার আগে পর্যন্ত তার মুখে লেগেছিল মৃদু হাসিটুকু। জড়িত কণ্ঠে ব'লল···"মা···কেঁদো না···মা···দোহাই তোমার···কেঁদো না···মা,···এই ত আমার সাদী হ'ল!···" তার পর শেষ নিশ্বাস ফেলল সে এখানে,···হ্যাঁ হ্যাঁ; এইখানে,···এই জাফরাণ ক্ষেতে,—যেখানে তুমি রক্ত-রঙ্গা জাফরাণ ফুল দেখে অবাক হ'য়েছ!···

* * * *

এই ত শেষ হ'ল আমার কাহিনী বাপজান! কিন্তু তোমার আর কত দেরী? ও কি উঠছ কেন? গাড়ী মেরামত হ'য়ে গেল বুঝি?···কেমন, বলিনি আগে?···গাড়ী মেরামত হ'লেই ত তুমি চ'লে যাবে! হায় আল্লা!···কত গাড়ীই ত যাওয়া-আসা ক'রছে হরদম,···ক—ত গাড়ী! হয়ত কেউ লহমার জন্যে থামছে, আবার ধুলো উড়িয়ে চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ জাফরাণ ক্ষেতে ফুলগুলো ওখানে ঐ রকমই থাকবে,—যতক্ষণ না ফসল তুলবার সময় হয়। কে জানে কখন ঐ রক্তবিন্দুর মত পাপড়ীগুলো রোদে শুকিয়ে চালান দেওয়া হবে দুনিয়ার দিকে দিকে···কে জানে কোন বন্দরে নামবে,···কোন সহরে কোন খানদানী ঘরের খাবার টেবিলে আসবে এই জাফরাণের রং আর খোশবয় দিয়ে তৈরী খাবার!···আর তোমারই মত কেউ হয়ত অবাক হ'য়ে প্রশ্ন ক'রবে···এ জাফরাণগুলো এত লাল কেন?··· রক্তের মত লাল?···কিন্তু তারা ত কেউ জানবে না, কেন যে অত লাল! হায় আল্লা!···জানি কেবল আমি!

বাঙ্গালীর নববর্ষ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

এবার এসো না তুমি, নববর্ষ হর্ষ-মাখা মুখে চঞ্চল চরণে,
এবার রাখিনি আমি তব তরে সুখ ভ'রে বুকে প্রীতির স্মরণে;
এসেছ রক্তাক্ত পায়ে রিক্ত গায়ে তিক্ত অপমানে ক্লান্ত বেদনায়,—
বর্ষান্তে গগনপ্রান্তে সঘন আঁধার ভীতি হানে, নিরাশা ঘনায়।

তব অনুভব নাই, তুমি তাই, নূতন বৎসর, অমোঘ বিধানে
এসেছ বসন্ত শেষে মধু হেসে রূপে মনোহর ঋতু-চক্র টানে,
উৎখাত জনের ব্যথা দানব-দলিত মানবতা চূড়ান্ত গরম
তারো মাঝে তব গাথা নবীনের আগমনী কথা শোনায় নির্মম।

স্থির ভব, ওগো নব নটরাজ নাচনে মুখর বৈশাখী প্রভাত,
তোমার গৈরিক প্রান্ত পথভ্রান্ত রথের ঘর্ঘর ধ্বনি অকস্মাৎ
বঙ্গের অঙ্গনতলে দলে দলে গৃহহারা বুকে বাজে বেদনায়;
সম্বর তোমার গতি, বাঙ্গালা বসেছে মহা দুখে শব-সাধনায়।

রাত্রি অন্ধকার, ওরে, যাত্রী একা ভবসিন্ধু পারে, পদচিহ্নহীন;
পথ খোঁজা, পিঠে বোঝা, ক্লান্ত মন ভরে হাহাকারে, বিধি উদাসীন
কোথা যাবি, ওরে ভ্রান্ত, হে 'অশান্ত প্রাচীন ইহুদি, নূতন সন্ধানে'
তোমার লাগিয়া পথ জাগিয়া রয়েছে নিরবধি অনন্তের পানে।

মহাকাল যার ভাল চিরকাল রক্তিম সিন্দূরে শাশ্বত লিখনে
লেপেছে ঝঞ্ঝার সাথে ক্রুদ্ধ বাতে, বন্যায় সিন্ধুরে ডাকি' ক্ষণে ক্ষণে,
পদ্মা-মেঘনার বুকে সাগর-মোহনা তীরে তীরে অরণ্যানী তলে,—
ভগ্ন মনোরথে নগ্ন মৃত্যুপথে চলে সে কি ধীরে দূর রসাতলে?

নহে নহে! বোঝা ব'হে ভয়ে মোহে বিচ্ছিন্ন মানব সে পথ-প্রান্তে
এক কোণে দিন গোণে অসহায় ক্ষুণ্ণ অনুভব শুধু দিনান্তের
পাপক্ষয়ে পরাজয়ে হতাশার সুদীন স্বাক্ষর সর্বাঙ্গে বহিয়া
সে কি ভুলিয়াছে সব শক্তি শৌর্য্য আপনা নির্ভর অবসন্ন হিয়া?

নাই ক্ষমা; রাত্রি অমা নামে যাবে ভরিয়া আকাশ, লোলুপ শকুনি
ঘিরে ধরে চারি ধারে, মুছে দিতে চায় ইতিহাস; তারো মাঝে শুনি
মহা ভৈরবের ডাক—মুছে যাক দৈন্য দ্বিধা ভয়, সাধক বাঙ্গালী
জাগিছে শ্মশানে রাত্রি, পাবে বর, নহে সে ত নয় বিশ্বের কাঙ্গালী।

যদি তুই তটই ভাঙ্গে বন্যা-বক্ষে গড়িব আবার, ভাঙ্গা-গড়া মেলা
তারি লীলা নৃত্যে মিলা নটরাজ ছন্দে বার বার, নহি ত একেলা,—
তব শিক্ষা মহাদীক্ষা, নববর্ষ, আনিয়ো বিপদে পথের সন্ধান,
আজিকার হাহাকার অনাগত ভবিষ্যের পদে মহামূল্য দান।

আভিজাত্য

(বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

শ্রীরবীন মল্লিক

জীবনটাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবার দিকে আমার ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকেই। তাই, জীবন-রহস্য, ব্যাখ্যা ও সে রহস্য ভেদ করবার আগ্রহের তাগিদে কলেজের শেষ ধাপ উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি শুরু আমার প্রসিদ্ধ দেশভ্রমণ। এবং শেষ পর্য্যন্ত ভ্রমণটাই দাঁড়ায় আমার প্রচণ্ড নেশা।

দিন পূর্ব্বে এই ভ্রমণ ব্যপদেশে আমি যাই জাম্মাণীর [illegible] ভাগে, একটি প্রাচীন মফঃস্বল সহরে। সেখানে শুনলাম যে, সেই সহর থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে এক আছে—সেখানে না কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাপ্রলয়- এক জন যোদ্ধা, কাইজারী চালে আজও তাঁর জীবন যাপন তিনি সে যুগের কর্ণেল।

র চেয়ে বিস্ময়কর লাগলো—যখন শুনলাম দ্বিতীয় মহাপ্রলয়ের একটা ঝড়—যে ঝড় সমগ্র পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রমত্ত দানবের প্রবাহিত হ'ল—সে সম্বন্ধে সেই প্রাচীন যোদ্ধার কোনরূপ জ্ঞান পরন্তু তিনি বিশ্বাসই করতে চান না যে, জাম্মাণী নত. বিধ্বস্ত। তাঁর ধারণা, কাইজার আজও সমগ্র র শাসনের মানদণ্ড স্বহস্তে পরিচালনা করছেন।

থন মহাযুদ্ধের রীতি-নীতি, সে যুগের যুদ্ধ ও সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত জানবার আগ্রহ ছিল আমার অপরিসীম। তাই, এই লের সঙ্গে দেখা করে তাঁরই মুখে অতীত কাহিনী শোনবার ই আমি সেই দিনই রওনা হলাম সেই গণ্ডগ্রামে।

রের দিন সন্ধ্যার সময় ঝিরঝিরে তুষার বর্ষণের মধ্যে আমি সেই মে এক পান্থশালায় আতিথ্য গ্রহণ করলাম। ইচ্ছা ছিল, দিন সকালে প্রাতরাশ শেষ করে কর্ণেল রুডেনডর্ফের সঙ্গে করবো। গরম কফিটা শেষ করে আগুনের চুল্লিটার পাশে -চেয়ারে বসে সবে পাইপটা ধরাবার চেষ্টা করছি, এমন কটি জাম্মাণ যুবক এসে অভিবাদন করে আমাকে জিজ্ঞেস —মহাশয়, ক্ষমা করবেন, আপনি কি এই প্রথম আমাদের সেছেন?

আমি পাইপটা সরিয়ে নিয়ে স্মিত হাস্যে বললাম,—হ্যাঁ, ভাই, গ্রামে এই প্রথমই আসছি! আমি এক জন ভারতীয় আমার নাম নিশীথ রায়। আপনাদের গ্রামের কর্ণেল রুডেন- প্রশংসা শুনেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—তাহ'লে তো কর্ণেল সাহেব ঠিক খবরই পেয়েছেন। আমি কাছ থেকেই আসছি। তিনি আজ রাত্রে আপনাকে সান্ধ্য- যোগদান করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন,—অবশ্য আপনার পত্তি না থাকে।

—আশ্চয্য তো! তিনি আমার খবর পেলেন কি ভাবে?

—এই ছোট্ট গ্রামটিতে কোথায় কি হচ্ছে বা কে এলো-গেলো, কল খবরই তিনি রেখে থাকেন। আর নতুন কোনো লোক মে এলে—তাঁকে তাঁরই আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়—এটাই। তবে এ দুর্য্যোগের মধ্যে আপনি এসেছেন বলেই এই লার লোকেরা আপনাকে বিরক্ত করেনি। আপনি ডাক- এতক্ষণ আসা সত্ত্বেও তাঁর বাসায় গেলেন না দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এই দুর্য্যোগে যদি আপনার যেতে অসুবিধা হয় তো আমি ......

বিলক্ষণ! অসুবিধা আমার কি? এরকম এক জন মহানুভব ব্যক্তি আমার মত এক জন অচেনা-অজানা বিদেশীর জন্য অপেক্ষা করছেন আর আমি দুর্য্যোগের ভয়ে যাব না? বলেন কি, মহাশয়! আমি এখুনি যাচ্ছি, চলুন।

সেই ঝিরঝিরে তুষার-বর্ষার মধ্যেই আমি যুবকটির সঙ্গে রওনা হলাম। রাস্তায় এসে মনে হল, অসংখ্য সূচ যেন একসঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধে গেল!—প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও তুষার-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেও উষ্ম ও বাতাসের প্রলাপ শুনতে শুনতে আমি এগিয়ে চললাম।

খানিকক্ষণ যাবার পর যুবকটি একটু বিব্রত হয়ে আমাকে বললো—আপনি যদি কিছু না মনে করেন তো আপনাকে একটা অনুরোধ জানাতে চাই। মানে, এটা ঠিক আমার অনুরোধ নয়। মিসেস্ রুডেনডর্ফ ও আমাদের গ্রামের সকলেরই অনুরোধ। অনুরোধটা এমন কিছু নয়। শুধু কর্ণেল সাহেব যা বলবেন সেটা সত্যি হোক বা মিথ্যে হোক—আপনি দয়া করে তাতে সায় দিয়ে যাবেন। আর ডিনার খেতে না থাকতে বললে আপনি দয়া করে বলবেন যে, আপনার ডিনার খাওয়া হয়ে গেছে। এবং কাল সকালে এসে এখানে থাকবেন।

বিস্মিত হয়ে কিছু একটা প্রশ্ন করবার আগেই যুবকটি একটি সেকেলে ধরণের পুরানো বাড়ীর সদর-দরজায় আঘাত করলো, এবং পরমুহূর্ত্তে দরজা খুলে গেল। একটি লণ্ঠন হাতে এক জন অশীতিপর বৃদ্ধা দরজা খুলে দিয়ে আমাকে সাদরে আহ্বান জানালেন আর যুবকটিও বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত পদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এত দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল যে, মনস্থির করে কিছু ভাববার বা প্রশ্ন করবার অবসর পর্য্যন্ত আমি পেলাম না। অভিভূতের মত নীরবে বৃদ্ধার অনুসরণ করে ভিতরে গেলাম।

একটা সেকেলে ধরণের সাজানো ঘর, ঠিক সাজানো বলা চলে না, বরং বলা চলে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অতীত কালের বনিয়াদের উপর এখানে-ওখানে দু'একটা আলমারী, টেবিল, চেয়ার, সোফা ভগ্ন অবস্থায় আজও নীরব সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেখানে আমাকে বসতে বলে মিসেস্ রুডেনডর্ফ ভিতরে অদৃশ্য হলেন।

একটু পরে শুভ-সন্ধ্যা জানাতে জানাতে ঘরে প্রবেশ করলেন একটি বৃদ্ধ—কিন্তু অপরূপ সুন্দর ভদ্রলোক। পাকা আমের মত তাঁর চেহারা। তাঁর গোঁফ জোড়া কাইজারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বয়স হয়েছে প্রায় নব্বই-এর কাছাকাছি, কিন্তু বয়সের ভারে তিনি ন্যুব্জ হয়ে পড়েননি। অটল হিমালয়ের মত উন্নত দেহ এ কথাই প্রমাণ করে দেয় যে, সত্যই তিনি অভিজাত-বংশীয় এক জন যোদ্ধা!

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি! আপনি সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করে আমাকে যে সম্মান দিলেন সে জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ। কিন্তু,—

আমাকে বাধা দিয়ে কর্ণেল সাহেব বললেন, এর জন্য আপনি মোটেই কুণ্ঠিত হ'বেন না,—মিঃ……

আমার নাম—রায়, নিশীথ রায় !

—হ্যাঁ মিঃ রায়, এটা আমার বংশ-গৌরবের মর্য্যাদা ! কোনো বিদেশী বা অন্য প্রদেশের লোক আমার গ্রামে এসে আমাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেননি,—ইতিহাসে সে ধরণের ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি। জল, ঝড়, দুর্যোগ যাবতীয় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় অগ্রাহ্য করেও আমার লোক নবাগতদের আমার কাছে নিয়ে আসবেই। তাই, আপনার আসতে দেরী হ'চ্ছে দেখে আমি মূলারকে পাঠিয়েছিলাম। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো ! এম্মা, মিঃ রায় তো বেশ আরাম করে বসেছেন। তাঁর সুখ-সুবিধার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। আর আমাদের পশ্চিমের ঘরটায় তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

এম্মা অর্থাৎ মিসেস্ রুডেনডর্ফ বললেন,—তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? মিঃ রায়ের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা আমি করেছি।

—আশ্চর্য্য ! ঐ চমৎকার নীল অতলস্পর্শী চোখ দু'টায় দৃষ্টি চলে না,—এটা ভাবাই যায় না ! আমি বিস্মিত ভাবে কর্ণেল রুডেনডর্ফে'র চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি দেখে মিসেস্ রুডেনডর্ফ চুপি-চুপি আমাকে বললেন,—আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাপ্রলয়েতে তাঁর চোখ দু'টি হারিয়েছেন।

এর পর কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে কাইজারী শাসনকালীন আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি প্রভৃতির বিষয় আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করলাম। আর এই দীর্ঘ সময় মিসেস্ রুডেনডর্ফ এক পাশে বসে একটা মোজা বুনতে আর মাঝে মাঝে করুণ ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। সে দৃষ্টির অর্থ তখন বুঝিনি কিন্তু পরে বুঝেছিলাম।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর কর্ণেল সাহেব বললেন,—রাত অনেক হয়েছে বোধ হয়, এম্মা, এবার আমাদের খাবার দেবার ব্যবস্থা কর।

মিসেস্ রুডেনডর্ফ পশম ও বোনার কাঠি দু'টি টেবিলের উপর রেখে সজল চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন,—এই যে যাচ্ছি, যোশেফ !

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—আপনি ব্যস্ত হবেন না, মিসেস রুডেনডর্ফ ! আমি ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি, কর্ণেল সাহেব, সে জন্য আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ! মানে, দীর্ঘ ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আমি সরাইখানাতেই সান্ধ্য-ভোজ শেষ করি এবং কফির পেয়ালা নিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার লোক সেখানে যায়। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করার ও পরিচিত হবার উগ্র আগ্রহে আপনার নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি ! সান্ধ্য-ভোজের চেয়ে আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্যটাকেই আমি বিশেষ আকর্ষণীয় বলে মনে করেছিলাম, সে জন্য এই তুষার-ঝঞ্ঝা ও ঝড়ের মধ্যে আমার বিছানা-পত্রও আমি আনতে পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এই অমার্জ্জনীয় অপরাধ আপনি নিজগুণে ক্ষমা করবেন ! আমার কথা শেষ করে মিসেস্ রুডেনডর্ফে'র দিকে তাকাতেই দেখলাম যে, এক জোড়া সজল চোখ অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে আমার দিকে করুণ ভাবে চেয়ে রয়েছে !

কর্ণেল রুডেনডর্ফ গম্ভীর ভরাট গলায় বললেন,—আপনি সত্যই আজ আমার আভিজাত্যে আঘাত দিয়েছেন। কেন না, এ গ্রামে এসে আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ না করে পান্থশালায় উঠেছেন, এ নজির ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তবে একটা সর্ত্তে আপনাকে আমি ক্ষমা করতে পারি,—সর্ত্তটা হচ্ছে যে, কাল সকালেই আপনি বিছানা-পত্র নিয়ে এখানে চলে আসবেন আর আজ রাত্রে মহামান্য কাইজারের স্বাস্থ্য-কামনার অধিবেশনে, স্বাস্থ্য-পানের টেবিলে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হ'বে।

তাঁর আভিজাত্য-বোধকে আঘাত দিতে মন চাইল না, সে জন্য তাঁর সর্ত্ত মেনে নিলাম।

অর্থাৎ কর্ণেল সাহেবের ডিনার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল ! টেবিলে নানারূপ সুখাদ্য ও উপাদেয় খাদ্যের সুঘ্রাণে, মিথ্যা-ভাষণের জন্য বারে বারে নিজেকে অভিসম্পাত করতে লাগলাম ! সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটনের পর পান্থশালায় বিশেষ আহার হয়নি। সুতরাং, চোখের সামনে আর এক জনকে ভোজন করতে দেখে—মনে হ'ল, আমি যেন কত দিন অনাহারে রয়েছি ! ক্ষুধায় গা-হাত-পা ঝিমঝিম্ করতে লাগলো। তা ছাড়া, আর একটা কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। পান্থশালার সকলে জানে যে, আমি এখানে সান্ধ্য-ভোজে এসেছি। গভীর রাত্রে ফিরে গিয়ে কিছু আহার জোটার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ! অর্থাৎ, একটি গেঁয়ো যুবকের কথা রাখতে গিয়ে সারা রাত উপবাস দিতে হবে ! হায় রে অদৃষ্ট ! কারো পৌষ মাস—আমার সর্ব্বনাশ !

কিন্তু বিস্ময়-পর্ব্ব আমার এখানেই শেষ নয় ! কর্ণেল সাহেব খেতে খেতে গল্প করছেন। এক ফাঁকে মিসেস্ রুডেনডর্ফ আমাকে একটা কাগজ দিয়ে গেলেন, তা'তে পরিষ্কার ইংরাজিতে লেখা রয়েছে—

মহাশয়, আমার স্বামীর সম্মান রাখার ভার আপনার উপর। এই পল্লীগ্রামে ভাল পানীয়ের একান্ত অভাব, তা ছাড়া, আপনি আসবেন—সেটা আমার জানা ছিল না। ঘরে যা পানীয় আছে তা'তে দু'জনের পান করা চলে না। সুতরাং, আপনি যদি দয়া করে আজ রাত্রে মদ্যপান করার শুধু অভিনয় করেন তো আমি লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে বাঁচতে পারি। আমার অন্ধ স্বামীর মুখ চেয়ে আপনি আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন—এটাই আমার বিশ্বাস। আপনি পানীয় থেকে বঞ্চিত রয়েছেন জানতে পারলে তিনি সত্যই ভয়ানক আঘাত পাবেন ! এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আর কোনো আঘাত দিতে আমি চাই না—ক্ষমাপ্রার্থী, এম্মা রুডেনডর্ফ।

এর পর পানীয় টেবিলে—আমাকে সমানে অভিনয় ও সেই সঙ্গে অতি পুরাতন ও উপাদেয় জার্ম্মাণ মদ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করতে হ'ল। যদিও অতি পুরাতন ও দামী মদ্য সামনে থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে তার স্বাদ গ্রহণ করবার উপায় নেই, শুধু ঘ্রাণেই তৃপ্ত থাকতে হ'ল।

পরের দিন সকালে এসে প্রাতরাশ করবার ও থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, রাত প্রায় ১১টার সময় তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রজনীর অন্ধকারে পান্থশালার পথে পা বাড়ালাম।

কিন্তু আরো কিছু বিস্ময় তখনও আমার জন্য অবশিষ্ট ছিল। সরাই-এ এসে দেখি—সরাই-রক্ষক আমার খাবার নিয়ে একান্ত ভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এবং তারই মুখে শুনলাম, যুবক

মূলার সরাইওয়ালাকে আমার খাবার কথা বলে গেছিল। কিন্তু এ রহস্যের ঘন কালো যবনিকার অন্তরালে কি সত্য নিহিত রয়েছে ?

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই শুনলাম, এম্মা রুডেনডর্ফ বসবার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি উঠেছি শুনে তিনি ঘরে এসে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে কাল রাত্রের ঘটনার জন্য আমার কাছ থেকে বারে বারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, কাল সত্যি, আমার মুখরক্ষা করেছেন মিঃ রায়, আজ এসেছি ! আপনার কাছে আর একটু অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে।

আমি সহাস্যে বললাম, ও কিছু নয়, এ রকম একটা ছোট গাঁয়ে ও ধরণের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক, এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা লজ্জিত হবার কোনো কারণই নেই। তা ছাড়া আমি আপনার ছেলের মত ; অনুগ্রহ, কৃপা—এ সব কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। বরং আপনি আদেশ করুন আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি ?

—মানে আপনি কি আজই চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রের ডাক-গাড়ী ধরবার ইচ্ছে আছে। তবে শেষ পর্য্যন্ত কি হয় বলা শক্ত।

আজ রাত্রে যাব শুনে তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু, না যাবার সন্দেহের কথা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা মৃত মানুষের মত বিবর্ণ হয়ে উঠলো। আমার যাওয়া না-যাওয়ার উপর এক বিরাট রহস্য যেন আত্মগোপন করে রয়েছে। আমার উপরই যেন সব কিছু নির্ভর করছে।

বললেন,—আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি। মানে—আমার স্বামী রক্ত-চাপ রোগে ভুগছেন। অথচ তাঁর একমাত্র বিলাস—বিদেশীদের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক যুগের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা, নিজের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, বীরত্বের কাহিনী সগর্ব্বে প্রচার করা, আর এ নিয়ে কেউ অবিশ্বাস বা সন্দেহ প্রকাশ করলে রেগে উঠা ! ডাক্তারেরা বলেছেন—এই বয়সে তিনি যদি সামান্যও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তো তাঁকে বাঁচানো সত্যই কঠিন হয়ে উঠবে। সে জন্য, তিনি অতিথি-পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি কাউকে নিমন্ত্রণ করি না। ভয় হয়, পাছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লে তিনি রেগে উঠেন—যার ফলে একটা দুর্ঘটনা হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয় !

আমি শশব্যস্তে বলে উঠলাম,—আপনি সে বিষয় মোটেই ব্যস্ত হ'বেন না। খাওয়া-দাওয়ার চেয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার দিকে ঝোঁকটা আমার অনেক বেশী। সুতরাং আমার খাওয়া-দাওয়ার জন্য আপনি মোটেই ব্যস্ত হ'বেন না মিসেস্ রুডেনডর্ফ !

তিনি একটু মৌন হ'য়ে বসে রইলেন, পরে ধীরে ধীরে বললেন, —না, আমি সে কথা ভাবছি না,—আমি ভাবছি আমার স্বামীর আভিজাত্য, তাঁর লোক-খাওয়ানো স্বভাব, আর তাঁর দর্পিত মনোভাব। অর্থাৎ তিনি যদি জানতে পারেন যে, আপনি আমাদের অতিথি হননি বা আমাদের সঙ্গে আপনার আহারাদি সম্পন্ন করেননি, তবে তাঁর মর্য্যাদায় লাগবে আঘাত;—তিনি ভেঙে পড়বেন। এই শেষ জীবনে তাঁকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে উঠবে, মিঃ রায় !—কথা-শেষে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন ! উচ্ছ্বসিত আবেগে তিনি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন !

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমার ভাষা হ'য়ে গেল মূক। আমি গভীর বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে এই মহীয়সী বৃদ্ধার দিকে চেয়ে রইলাম,—তাঁকে সান্ত্বনা দিতেও গেলাম ভুলে। তার পর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, বললাম,—মিসেস্ রুডেনডর্ফ, আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন ? আমি আপনার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি। আপনি নির্ভাবনায় ফিরে যান। আমি আপনার স্বামীকে মোটেই বুঝতে দেব না যে, আমি তাঁর অতিথি নই ! খাওয়া দাওয়া থেকে আরম্ভ করে সব কিছু ব্যাপারে আমি চমৎকার অভিনয় করবার চেষ্টা করবো—তাঁকে সর্ব্ব বিষয়ে খুসী করবো।

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার হাত দু'টি ধরে আবেগময় কণ্ঠে বলে উঠলেন,—সত্যি মিঃ রায়, আপনি আমাকে মস্ত বড় দুর্ভাবনা থেকে রেহাই দিলেন। আপনার এ ঋণ আমি জীবনে কোনো দিন পরিশোধ করতে পারবো না। আমার হৃদয়ের গভীর অভিব্যক্তি ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

মিসেস্ রুডেনডর্ফ চলে যাবার পর আমি পোষাক পরিবর্ত্তন করে প্রাতরাশ শেষ করলাম এবং বেলা নয়টা নাগাদ কর্ণেল রুডেনডর্ফের বাসায় গেলাম।

কর্ণেল সাহেব আমাকে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। এ রকম অকৃত্রিম আন্তরিকতা আমার সুদীর্ঘ কাল দেশ-ভ্রমণের মধ্যে আর কোথাও পাইনি। কিন্তু মুস্কিল হ'ল প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নিক ভোজনের সময়। সকালে প্রাতরাশের সময় খুঁটিনাটি যাবতীয় ভোজ্যদ্রব্য খেতে খেতে তার গুণাগুণ ব্যাখ্যা, এ ধরণের পূর্ব্বে খেয়েছি কি না, কোথায় খেয়েছি তার ইতিহাস প্রভৃতিতে মনে হ'ল, এর চেয়ে সকালের ডাক-গাড়ীতে ফিরে গেলে ঢের ভাল করতাম। কিন্তু সব কিছু আমাকে সহ্য করতে হ'ল মিসেস্ রুডেনডর্ফের করুণ ও সজল চোখের দিকে চেয়ে ! এ ছাড়া আর উপায় কি ?

খাওয়া শেষ হলে কর্ণেল সাহেব বললেন—এম্মা, রায়কে এবার আমার চিত্রাগারে নিয়ে চল। আমার সংগ্রহ যে কত অমূল্য আর রুচিসম্মত, রায় যখন ভারতবাসী, তখন নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করবে।

কর্ণেলের কথা শেষ হলে কিন্তু এম্মার মুখ হয়ে উঠলো অন্ধকার। একটু আগে যেখানে দেখেছিলাম স্মিত হাসি ও করুণ চাহনি, সেখানে আবির্ভাব হল অমানিশার ঘোর আঁধার। মনে হ'ল, তিনি যেন কি একটা সংকট পরিহার করবার চেষ্টা করছেন। এখানটাতেই যেন তাঁর সব চেয়ে বেশী দুর্ব্বলতা ও ব্যথা। তাই তিনি ইতস্ততঃ করে বলে উঠলেন—কিন্তু গোর্শেক, এখন যদি ছবির ঘরে যাও তো তোমাদের মধ্যাহ্নিক আহারে বিলম্ব হবে না ? মিঃ রায়ের যে দেরী হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং দুপুরে খাওয়া-দাওয়া—

আমি বললাম—তাতে কি হয়েছে, না হয় একটু দেরীই হবে। তা ছাড়া কর্ণেল সাহেবের এত প্রাচীন সংগ্রহ দেখবার জন্য আমি ভয়ানক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছি। একটু দেরীতে খেলে আমার কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না মিসেস্ রুডেনডর্ফ।

শ্রীমতী রুডেনডর্ফ আমাকে চোখ টিপে নিষেধ করে বলে উঠলেন, তা হয় না—মিঃ রায়, আপনি আমাদের অতিথি, আপনার যাতে ঠিক সময় খাওয়া হয় সে বিষয়ে সচেতন হওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য। তার চেয়ে আপনি বরং আমাদের ছোট্ট গ্রামটি এখন দেখে

আসুন। এই গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, ছোট নদী, ঝর্ণা সব কিছু আপনাকে মুগ্ধ করবে। আপনি অভিভূত হয়ে উঠবেন। কথা শেষ করে তিনি আমার দিকে গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন।

কর্ণেল সাহেব বললেন, তবে তাই হোক, আপনি গ্রামটা একটু বেড়িয়ে আসুন। দেখবেন কিন্তু বেশী দেরী করবেন না যেন। তা হ'লে আমার সঞ্চয় দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

আমি তাঁদের অভিবাদন করে গ্রামটি পরিদর্শন করবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

অবশ্য বেড়িয়ে পড়বার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। এই রুডেন-ডর্ফ-দম্পতির জীবনযাত্রার পিছনে এমন একটা রহস্য আত্মগোপন করেছিল, যেটা জানবার জন্য সত্যই আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। বিশেষ করে এই চিত্র-সংগ্রহের ব্যাপারটা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দু'ঘণ্টা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও এ রহস্যের কালো জাল যবনিকার অন্তরালেই গোপন রইল!

পান্থশালা থেকে মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে ফিরে এলাম। ঘণ্টা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন শ্রীমতী রুডেনডর্ফ। এবং খুব নিম্ন কণ্ঠে গভীর অনুনয়ের সঙ্গে বললেন,—মিঃ রায়, বারে বারে আপনার প্রতি আমি ভয়ানক অবিচার ও আপনার ভালমানুষির সুযোগ গ্রহণ করছি। আশা করি, সে জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এই শেষ বারের মত আপনাকে আর একটু অনুগ্রহ করতে হবে। মনে, এটাই আমার শেষ অনুরোধ। আমার স্বামী আপনাকে সব চিত্র দেখাবেন, সেগুলি চিত্র বা সাদা কাগজ যাই হোক না কেন—আপনি দয়া করে কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করবেন না বা তাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যাখ্যায় বাধা দেবেন না। আর, দোহাই আপনার, আপনি এর কারণ জানতে চাইবেন না।—আমি আপনাকে বলতে পারবো না,—কিছুতেই বলতে পারব না, সেজন্য ক্ষমা চাইছি। অত্যন্ত ত্রস্ত ভাবে কথা শেষ করে তিনি দ্রুত ভিতরে চলে গেলেন।

আমি হতবুদ্ধির মত কয়েক মুহূর্ত্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

বসবার ঘরে কর্ণেল সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, আমার পায়ের শব্দ শুনে বলে উঠলেন,—কি রকম লোক তোমার, রায়, দেখ দিকি, কত বেলা হয়ে গেল। কখনই খাওয়া-দাওয়া শেষ করি আর কখনই বা তোমাকে আমার চিত্র-সংগ্রহ দেখাই?

আমি কুণ্ঠিত ভাবে বললাম, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে, কর্ণেল সাহেব, আপনার গ্রামের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে এমনি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে, সময় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না! আমি সে জন্য আন্তরিক দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী!

তিনি হো, হো করে হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা হাসি! বললেন—এর জন্য দুঃখিত হ'বার কি আছে! আমাদের গ্রামে যারাই আসে তারাই এ ভাবে মুগ্ধ হয়ে যায়। যাক্, আর দেরী করে লাভ নেই। কথা শেষ করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন—এম্মা, এম্মা,—আমাদের খেতে দেবার ব্যবস্থা কর।

এর পর খাবার টেবিলে সকালের অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি,—তার পর চিত্রশালায় গেলাম।

নামে চিত্রশালা বটে, কিন্তু, ছবির ছ-ও নেই! এক পাশে পার্চ্চমেণ্ট কাগজে জড়ানো অনেকগুলি, মানে, খান ৪০।৫০ বড় ছাব পড়ে রয়েছে বলে মনে হ'ল। মাঝখানে প্রকাণ্ড বড় একটা টেবিল। টেবিলের আশে-পাশে দু'-চারটে চেয়ার ছড়ানো।

একখানা চেয়ারে তিনি বসলেন আর পাশের চেয়ারে আমাকে বসতে বলে তিনি শ্রীমতীকে বললেন,—এম্মা, এবার তুমি এক একখানা ছবি আমার হাতে দাও।

শ্রীমতী এম্মার মুখ শুকিয়ে উঠলো। বলী-রেখাপূর্ণ মুখ হয়ে উঠলো বিষাদপূর্ণ! চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল মুক্তার মত টলমল করতে লাগলো। তিনি একবার আমার দিকে করুণ ভাবে চেয়ে একখানা ছবি কর্ণেলের হাতে নীরবে তুলে দিলেন। ছবিটা হাতে দেবার সময় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তাঁর হাত কেঁপে উঠলো।

ছবির উপর সস্নেহে একটু হাত বুলিয়ে কর্ণেল সাহেব বললেন,—চমৎকার ভাবে সাজিয়ে রেখেছ তো এম্মা! তবে আমার অতি প্রিয় ছবিটা যেন সব শেষকালে দিতে ভুল না হয়!

কিন্তু ছবি কোথায়? টেবিলের উপর পাতা রয়েছে প্রকাণ্ড বড একটা সাদা পার্চ্চমেণ্ট কাগজ। আর কর্ণেল সাহেব তার উপরই হাত রেখে বলে চলেছেন—সে ছবির ঐতিহাসিক মূল্য, সংগ্রহের ইতিহাস, চিত্রকরের কাহিনী, আরো অনেক কিছু।

আমি কিন্তু তখন পার্চ্চমেণ্ট ছবি দেখছি না। কর্ণেল সাহেবের ব্যাখ্যাও আমার কানে যাচ্ছে না, আমি অভিভূতের মত চেয়ে রয়েছি,—জীবন্ত ছবি শ্রীমতী রুডেনডর্ফের দিকে,—যাঁর দু'চোখে নেমেছে ঝর্ণা,—সেই ঝর্ণার জলে ফুটে উঠেছে বৃদ্ধ কর্ণেলের জীবনরক্ষার জন্য এক জন বৃদ্ধার আকুল বেদনা-বিহ্বল আলেখ্য!

এই ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চললো কর্ণেলের ছবির নামে সাদা পার্চমেণ্ট কাগজ দেখানো, তার ব্যাখ্যা আর আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা! কিন্তু বিরোধ বাধলো শেষ ছবিটি নিয়ে,—কর্ণেলের প্রাণ-প্রিয় র‍্যাফেলের আঁকা স্বর্গ ও নরকের একখানি মূল ছবি।

ছবিটি হাতে নিয়েই কর্ণেল সাহেব ফেটে পড়লেন,—এম্মা, এ কি ছবি তুমি আমাকে দিয়েছ—এটা তো আমার সংগ্রহে ছিল না?

কেঁপে উঠলেন বৃদ্ধা! বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লেন,—না, না, যোশেফ, তুমি ভুল করছ, এটাই সেই ছবি।

—কি? আমার ছবি আমি চিনি না! সুদীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে যে ছবিগুলিকে বুক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি, যার প্রতিটি রেখা আমার মুখস্ত, সেটা তুমি আমাকে নতুন করে চেনাবে? শীঘ্র বল, সে ছবি কোথায়?

—যোশেফ, যোশেফ, তুমি উত্তেজিত হয়ো না! তোমার পক্ষে উত্তেজনাটা খুবই খারাপ! সে ছবি—সে ছবি,—

—সে ছবি কি হ'য়েছে শীঘ্র বল? উত্তেজনায় কর্ণেল সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন!

—মানে, সে ছবি—ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে, উইয়ে কেটে দিয়েছিল—সে জন্য!—

—ফের মিথ্যে কথা!—কর্ণেল সাহেব ফেটে পড়লেন। কাল পর্য্যন্ত আমি সে ছবি স্পর্শ করেছি—অনুভব ক'রে দেখেছি—আজ এক দিন ও রাত্রের মধ্যে সেটা নষ্ট হয়ে গেল!—বল বল এম্মা, শীঘ্র বল, সে ছবি কোথায় রেখেছ?

কথা বলতে বলতে গভীর উত্তেজনা ও হৃদয়ভঙ্গের আবেগে

[illegible] সাহেব হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। এম্মা হাউ-মাউ করে [illegible]ঠলো!

[illegible] সাহেবকে ধরাধরি করে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে [illegible] গ্রামের ডাক্তারকে খবর দেবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

[illegible] ডাক্তারকে খবর দিয়ে ফিরে এলাম পান্থশালায়। এবং [illegible] অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হল মৃণালের সঙ্গে।

তাকে সব কিছু বলে জিজ্ঞেস করলাম—সে ছবিখানার যদি [illegible] খোঁজ করে দেন তো বোধ হয় বৃদ্ধের জীবন বাঁচতে পারে!

মৃণালের গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো। বললে, চলুন। কিন্তু যে সে [illegible] টাকার ব্যাপার!

ছবিখানা উদ্ধার করে এক টুকরো কাগজে লিখলাম, এক বিদেশী [illegible] আন্তরিকতার নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন।—সেটা পাঠিয়ে দিয়ে [illegible] সঙ্গে ফিরে এলাম পান্থশালায় এবং তাকে চেপে ধরলাম—[illegible] পরিবারের ইতিহাস বলবার জন্য।

[illegible] মৃণাল প্রথমে খানিকটা ইতস্ততঃ করলেন, বললেন—কাডেন-[illegible] অন্ধ হবার পর থেকে আরম্ভ হয়েছিল দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রচণ্ড [illegible] আর শ্রীমতীর আপ্রাণ চেষ্টা অন্ধ স্বামীকে বাঁচাবার! কিন্তু [illegible]—কাডেনডর্ফের আত্মসচেতনা, আভিজাত্য, আতিথ্য-[illegible] ও গর্বের কাছ থেকে। কাডেনডর্ফ কিছুতেই বিশ্বাস করতে [illegible] না যে, তাদের অবস্থা এক জন দীন-দুঃখীর চেয়েও খারাপ। [illegible] বিশ্বাস করতো না যে, পৃথিবীর বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। [illegible] সামান্য পেনসনের টাকায় ওদের দিন মন্দ চলতো না। অবস্থা [illegible] হ'ল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাপ্রলয়ের পর থেকে।

[illegible] পেনসন গেল বন্ধ হয়ে। জার্মানী হ'ল পর-পদানত! [illegible] কাডেনডর্ফের বনিয়াদী চাল কিন্তু এক তিলও পরিবর্তন হ'ল [illegible]। [illegible] ওদের আভিজাত্যে বাধে। কিন্তু অতিথি-[illegible] রইল ঠিক ভাবে। অন্ততঃ স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য [illegible] বজায় রাখতে হ'ল।

কাডেনডর্ফের সম্পত্তির মধ্যে ছিল ৪০।৫০খানি মহা মূল্যবান [illegible] চিত্র-সংগ্রহ। শ্রীমতী যখন আর কিছুতেই স্বামীর আভিজাত্য-[illegible] রক্ষা করতে পারলেন না, তখন তিনি আরম্ভ করলেন [illegible] সঙ্গে ছলনা। এক একখানা নকল পার্চমেণ্ট কাগজ ছবির [illegible] কাটিয়ে এনে বিক্রী করতে লাগলেন মূল চিত্র। এই ভাবে [illegible] তাঁদের বনিয়াদী চাল রক্ষা, আভিজাত্য বজায়, অতিথি-সেবা।

মুস্কিল হ'ল শেষ ছবিখানা নিয়ে। শ্রীমতীর সেটা বিক্রী করবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কারণ, সেটা ছিল তাঁর স্বামীর প্রাণপ্রিয়! কিন্তু, আপনি এসে পড়ায় স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য কাল ওটা তিনি বিক্রী করেন। কারণ, ওই টাকায় হ'বে অতিথিসেবা ও স্বামীর সম্মান-রক্ষা। কিন্তু তাড়াতাড়িতে পার্চমেণ্ট কাগজ মাপে পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে ছলনা করে যদি ছবিটা বাঁচানো যায় সে চেষ্টাও তাঁর ছিল, কিন্তু—

মৃণালের কথা শুনতে শুনতে চোখের উপর ভেসে উঠ্‌লো এক লোলচর্মা, বলীরেখাপূর্ণ বৃদ্ধার জীবন্ত আলেখ্য, যাঁর দু'চোখে নেমেছে পাহাড়ী ঝর্ণা—ঘন বর্ষায় আকুল-করা যার গতি—আর সেই ঝর্ণার জলে ফুটে উঠেছে এক অন্ধের জীবনরক্ষার জন্য আর এক রিক্ত নিঃস্ব বৃদ্ধার আকুল প্রচেষ্টা, বেদনা-বিহ্বল উতলতা।...

এমন রাত্রি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হৃদয়-দুয়ার বন্ধ করেছি কেন কর করাঘাত,
ভিতর-বাহির সমান আঁধার, ঘনায়ে আসিছে রাত।
ফিরে যাও, ফিরে যাও
দিবার যা কিছু সবই দিয়েছি,—আর কিবা তুমি চাও?

বহু দূর পথে গিয়েছিনু তাই ফিরিতে গিয়াছে বেলা
অজানা মুখের অপরিচয়ের দেখিনু বসেছে মেলা;
হাট নাই তবু হাটুরিয়া পথে, চলিতেছে বিকিকিনি
হঠাৎ থমকি দাঁড়াইতে শুনি কঙ্কন কিনিকিনি;
মুখ ফিরাইতে নজরে পড়িল একখানি রাঙা মুখ
আঁখি-পল্লবে সে কি কালো ছায়া বেদনা-সমুৎসুক;
মনে হোল যেন কত সুন্দর এমন দেখিনি আগে
অবগুণ্ঠিতা লজ্জাবতীরে আরও যেন ভাল লাগে।
এ যেন আকাশে উঠি-উঠি চাঁদ, মেঘের আড়ালে ঢাকা
জ্যোৎস্না-তরল মধুরিমা তার সকল অঙ্গে মাখা!
ধীরে কাছে এনু—দু'বাহু বাড়ায়ে যেমন ধরিনু বুকে
দেখি জীবনের অভিশাপ তা'র কালি দিয়ে আঁকা মুখে;
সুন্দর মুখে কখনও দেখিনি হেন বীভৎস ছবি
এরই স্তবগানে মুখর লেখনী? হায় অভাগা কবি!
ভুবন-ভুলানো সুন্দর মুখ, তবু কী ভয়ঙ্কর
লীলায়িত তনু দেহ, মনে হোল দুঃসহ দুস্তর।
তাই ত একেলা ফিরিলাম ঘরে ধূলায় ধূসর দেহ
পথ আগুলিয়া সম্মুখে মোর দাঁড়াল না আসি কেহ;
ভাঙা হাটে অবেলায়
ওগো পসারিণী ঘরের দুয়ারে দাঁড়ালে কী অছিলায়?

অবশ অঙ্গে ক্লান্তি নামিছে ঘুমে চোখ ঢুলে আসে
কথা কয়ো নাক'—চুপ ক'রে শুধু বসে থাকো মোর পাশে,
যদি ভাল লাগে দু'টি চোখে মোর বুলাও ও-দু'টি হাত
মোদেরে ঘিরিয়া মন্থর পায়ে নামুক গভীর রাত।
রাতের আকাশে যত তারা আছে চেয়ে থাক অনিমেষ
ঘুম যদি ভাঙে, ভাঙে নাক' যেন সুখ-স্বপ্নের রেশ
মাটির প্রদীপ নিবে যাক ধীরে ধীরে
উতলা হয়ো না, এমন রাত্রি আর আসিবে না ফিরে।

পুণ্য স্মৃতি

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার বাল্যকাল যে আবেষ্টনের মধ্যে কেটেছিল সেখানে, যে কারণেই হোক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি। ১৯০৩ সালে মফঃস্বলের কলেজ থেকে তখনকার ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় আসি। সেই সময় মোহিত সেন মহাশয়ের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তারই এক সেট এক দিন কিনে পড়তে সুরু করেছিলাম।

গ্রীক কবি হোমরের তর্জমা পড়তে কীটস যে আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করেছিলেন, তার কথা ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন।

"Then felt I like a watcher of the skies
Whena new planet swims into his kin."

কিন্তু এ তো হৃদয়-গগনে নূতন কোন ঝকমকে জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার নয়। এ যে রবি-রশ্মির দীপ্তচ্ছটায় সব গ্রহ-নক্ষত্র ম্লান হয়ে লুপ্তপ্রায় হয়ে যাবার মত। সে কী বিস্ময়, সে কী আনন্দ। ছন্দের কী ঝংকার, শব্দ-নির্বাচন ও শব্দ-যোজনার কী অনুপম কৌশল। সব মিলে আমাদের বিকাশোন্মুখ মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে, কোন স্বপ্ন-রাজ্যে নিয়ে যেত, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তার পরে চল্লিশ বছর কেটে গেছে কিন্তু মনের উপর সেই প্রথম প্রভাব এখনও অটুট আছে। এই সময় বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্লাবন এসেছিল এবং আমরা সেই যুগের তরুণবৃন্দ "বন্দে মাতরম" শব্দে গগন বিদীর্ণ করেছিলাম। আরও অনেক অকার্য্য করেছিলাম কিন্তু তখনকার পুলিশ যথেষ্ট জাগ্রত ও অবহিত ছিল না বলে আমাদের কেউ বাধা দেয়নি।

এই আন্দোলনের সম্পর্কে গুরুদেবকে প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম। আমাদের দলের কয়েক জন তাঁর গান ও বক্তৃতা শুনতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কেন জানি না, আমি সেই দলে ছিলাম না। বিশেষ চেষ্টা করে তাঁর অভিনয়ের প্রবেশ-পত্রিকাও আমি সংগ্রহ করিনি।

প্রথম পরিচয়

১৯০৬ সালের শেষে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছি। এই সময় আমরা বহরমপুরে ছিলাম। কয়েক জন বন্ধু মিলে বঙ্কিম-পাঠাগার নাম দিয়ে একটি লাইব্রেরী করেছিলাম। এখানে পাঠ ও আলোচনা এবং বাকী সময় খেলা-ধূলায় কেটে যেত। এই সময় সেখানে একটি অন্ধ গায়কের যাতায়াত ছিল। তাঁর কাছে গুরুদেবের গান শুনতাম। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো তখন জানা গেল, শান্তিনিকেতনে তাঁর গতিবিধি আছে। সেখানে দীনু বাবুর গানের আসরে তাঁর শিক্ষা। হঠাৎ স্থির করা গেল যে শান্তিনিকেতনে কবিকে দেখে আসতে হবে।

অতএব এক দিন অপরাহ্ণে আমরা তিন বন্ধু এই অন্ধকে পথ-প্রদর্শক করে রওনা হলাম। রাত্রি যাপন করেছিলাম জিয়াগঞ্জে সুরেন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে। পরের দিন আজিমগঞ্জ থেকে নলহাটিতে গাড়ী বদল করে অপরাহ্ণে বোলপুর গিয়েছিলাম।

এখন যে বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতরা থাকেন, তার দ্বিতলে তখন গুরুদেব ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতেন। আমাদের জন্য একতলার একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হল। আশ্রমের রন্ধনশালায় আমাদের আহারের ব্যবস্থাও হয়েছিল।

পরদিন সকালে গুরুদেব এসে আমাদের ভালো ঘুম হয়েছিল কি না জিজ্ঞাসা করলেন। আমার মনে পড়লো কালিদাসের বর্ণনা, অনন্ত শয্যায় শয়ান নারায়ণের—সমবেত ঋষিরা তাঁকে সুখ-নিদ্রা বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। কালিদাস তাঁদের "সৌখ্যশায়নিক" বলে অভিহিত করেছেন।

অনেক দিনের কথা, গুরুদেবের সঙ্গে যে সব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কিছুই মনে নেই। কেবল মাত্র স্মরণ হচ্ছে যে সন্ধ্যা ঘনায়মান অন্ধকারে বর্ত্তমান সিংহ-সদনের নিকটস্থ শালবীথিতে তাঁর সঙ্গে বেড়িয়েছিলাম এবং তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধের কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, বাংলা সরকারের chief secretary তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, যদি তিনি লেখনী সংযত না করেন, তবে দণ্ডবিধি আইনের বিশেষ বিধানগুলি তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বর্ত্তমান পাঠকদের অনেকেরই "অত্যুক্তি" "কণ্ঠরোধ" "রাজভক্তি" ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় নেই।

১৯০৮—১৯২৪

ইংরাজী ১৯০৮ সালে আমি সরকারী কাজে নিযুক্ত হই। কাজের চাপে ও সময়ের অভাবে সাহিত্য আলোচনার যথেষ্ট অবসর ছিল না। ফলে গীতাঞ্জলির পরবর্ত্তী যুগের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি বললেই চলে।

সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে যখন গুরুদেবের কাছে ছিলাম, তখন কথা-প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম যে আপনার লেখার যতটুকু আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি তাতেই আমার মন কাব্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ও এবারের মত আমার মনের খোরাক আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছি। এর বেশী গ্রহণ করবার সাধ্য আমার নেই। শুনে তিনি ঈষৎ হেসেছিলেন।

১৯২৪ সালে সরকারী কাজে বীরভূম জেলায় নিযুক্ত হই। আমার মধ্যে বরাবর একটা Inferiority complex আছে। সেই জন্য যে দু'বছর বীরভূমে ছিলাম, গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয়ের অনেক সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও সে সুবিধা গ্রহণ করিনি। কাজ উপলক্ষে বোলপুরে গেলে একেবারে শ্রীনিকেতনে উঠতাম এবং ৺কালীমোহন ঘোষ, ৺গৌরগোপাল ঘোষ এবং অধুনা ডাক্তার প্রেমচাঁদ লাল ইত্যাদির সঙ্গে পল্লী-সংস্কার বিষয়ে আলোচনা হত।

এক দিন আমার বন্ধু লাভপুরের জমিদার রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পত্রযোগে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার দিন স্থির করেছিলেন। কবিকে দর্শন করবার সুযোগ হবে মনে করে তাঁর সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা শান্তিনিকেতনে ছাপাখানার সামনে অপেক্ষা করছি, এমন সময় পরলোকগত এণ্ডরুজ সাহেব দ্রুতপদে এসে বললেন Gurudeb waiting for you. গুরুদেব তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাদের সংগে যখন দেখা হয় তখন শ্রীনিকেতনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রেমচাঁদ লাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নির্ম্মল-শিব বাবুর সঙ্গে আলোচনা সুরু হল জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক নিয়ে। তার পর বোলপুরের চালের কলের প্রসঙ্গ উঠেছিল। সে সময় বোধ হয় ১৪টি কল ছিল। এখন বোধ হয় ১৮টি। গ্রামে

ধান-ভানা কাজ ক্রমশঃ উঠে যাচ্ছে আর গ্রামের লোকেরা বিশেষতঃ সাঁওতাল মেয়েরা এসে কলে কাজ করছে, এই সবে গুরুদেবের মন পীড়িত হয়ে উঠেছিল। লালের দিকে চেয়ে বললেন—গ্রামে ছোট ছোট কলের প্রচলনের ব্যবস্থা কর এবং সমবায় প্রণালীতে সেই কল চালাবার ব্যবস্থা করো।

গুরুদেব ও এলমহার্স্ট

ইংরাজী ১৯৩৮ সালের শেষভাগে আমি সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে শ্রীনিকেতনে যাই। কিছু দিন পরেই গুরুদেবের পরম ভক্ত এলমহার্স্ট এসেছিলেন। সান্ধ্য-ভোজনের পর একটু বেড়াবার অভ্যাস তাঁর ছিল। তিনি প্রায় এসে আমাকে বাড়ী থেকে টেনে বার করতেন এবং নানা গল্প করতেন।

এলমহার্স্ট বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে আমেরিকান কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। যেখানে ছিলেন সেখানে ছাত্রাবাসের বাসন-পত্র পরিষ্কার করে নিজের খরচ চালাতেন। এমন সময় নিউ ইয়র্ক থেকে টেলিগ্রাফ পেলেন Can you meet me at New York ?—Rabindranath। তিনি এসে দেখা করলেন এবং গুরুদেব তাঁকে সঙ্গে করে এ দেশে এনেছিলেন, এবং তাঁর হাতেই শ্রীনিকেতনের পল্লী-সংস্কার কাজের ভার দিয়েছিলেন। কেমন করে এই অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যুবকের সন্ধান গুরুদেব পেয়েছিলেন সে কথা পরে শুনেছিলাম এণ্ড্রুজ সাহেবের নিকট।

শারীরিক বল

এলমহার্স্ট এক দিন বললেন, গুরুদেবের যখন এতো বয়স হয়নি, তখন তাঁর শরীরে যে কি অসাধারণ শক্তি ছিল তা তুমি বিশ্বাস করবে না। তাঁরা দু'জনে এক সময় পদ্মায় নৌকা করে বেড়াচ্ছিলেন। বর্ষাকালের পদ্মা পরিপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গময়। এক সময় এলমহার্স্ট গুরুদেবকে দেখতে পাননি। শোবার ঘর, বাথ-রুম, ছাদ কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবছেন। এমন সময় দেখলেন নৌকার অদূরে পদ্মার মধ্যে গুরুদেব সাঁতার দিচ্ছেন।

তাঁর জীবন-চরিত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে এই শক্তির জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আদর দিয়ে ননীর পুতুল করে তোলেননি। ভোর হতেই চাকর তাঁকে বিছানা থেকে তুলে দিতো এবং নিজে নেমে গিয়ে গায়ে ধুলো মেখে পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হত। এই সব কাহিনী তাঁর কাছে শুনেছি।

অনুলিখন

১৯৩৯এর প্রথম ভাগে গুরুদেব এসে কিছু দিন শ্রীনিকেতনে ছিলেন। এক দিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বললাম, আমাদের কিছু বলতে হবে। তিনি ধীরে ধীরে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, আমার কাছে কাগজ-পেনসিল ছিল, আমি লিখে নিয়েছিলাম। রাত্রি জেগে সবটি ভালো করে লিখলাম। কিন্তু সাহস ছিল না নিজে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। তাই পরদিন প্রাতে আমাদের সহকর্মী শিশির মিত্রের হাত দিয়ে কাগজগুলি পাঠিয়ে দিলাম। খানিক বাদেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, কেউ যখন আমার কথা লিখে নিয়ে আমাকে দেয় সংশোধন করবার জন্য তখন আমার বড় ভয় হয়। কিন্তু তোমার লেখা সংশোধন করতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। আমি বললাম দুয়েক জায়গায় ঠিক লিখে নিতে পারিনি বিপর্যয় করতে হয়েছে। আপনি বোধ হয় ধরতে পারেননি।

গুরুদেব ঈষৎ হাসলেন, বললেন, এতে অনেক মূল্যবান কথা আছে, কোনও দৈনিকে পাঠিও না, রামানন্দ বাবুর কাছে পাঠিয়ে দাও 'প্রবাসীতে' ছাপা হবে।

আমার মন ছিল, dictation নেবার দিকে, অনেক দিন সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাজেই বক্তব্য বিষয়ের মর্ম তখন গ্রহণ করতে পারিনি। পরে সেই লেখা শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও ইতিহাস নাম দিয়ে ছাপা হয়েছিল। ঐতিহাসিক তথ্য ছাড়া গ্রামের কাজের সম্বন্ধে এতে অনেক মূল্যবান কথা ছিল। 'প্রবাসী'-সম্পাদক লেখাটি পেয়ে খুব খুশী হয়ে আমাকে পত্র দিয়েছিলেন। গুরুদেবের মৃত্যুর পর Miss Marjoric Syker এটির ইংরাজী তর্জমা করেন এবং History & Ideas of Sriniketan নাম দিয়ে সেটি 'বিশ্বভারতী' প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি ডাঃ সুধীর সেন রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী-সংস্কার নামে ইংরাজীতে যে পুস্তিকা লিখেছেন তাতেও এইটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুলিখন(২)

গুরুদেব যখন দ্রুত বলতেন তখন বিশেষ অভ্যাস না থাকলে তা লিখে নেওয়া কঠিন হত। শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমার সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তাঁরা গুরুদেবের অভিভাষণ বা কথোপকথন লিখে রাখবার কোনও ব্যবস্থা করেননি। যদি করতেন তবে প্রকাশিত রচনাবলী ও চিঠিপত্র ছাড়া আর এক অভিনব সাহিত্য পাওয়া যেত।

সেবার ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবে পৌরোহিত্য করেন, সেবারও আমি কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু দুয়েকটি কথা মাত্র লিখে নিয়েছিলাম, কাজেই কিছুই দাঁড় করানো গেল না।

আর একবার আমাদের হলকর্ষণ উৎসবে তাঁর কথা লেখবার চেষ্টা করেছিলাম। পরে লেখাটি তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, এবার আমার লেখা খুব খারাপ হয়েছে, আপনাকে সংশোধন করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। যখন তাঁর কাছ থেকে লেখাটি ফেরৎ পাওয়া গেল তখন দেখলাম যে, প্রথম পাতায় কিছু অংশ রেখে বাকী কয় পাতার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত লাইন টেনে আগাগোড়াই সংশোধন করে দিয়েছেন, মার্জিনে অতি সুন্দর হাতের লেখায় একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ বেরিয়ে পড়েছে। লেখাটি 'প্রবাসী'তে হলকর্ষণ নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বেশী লোকের নজর পড়েছিল কি না জানি না, কিন্তু পৃথিবীতে জীবনের প্রথম আবির্ভাব থেকে বর্তমান মহাযুদ্ধ পর্যন্ত, 'প্রবাসী'র দুই পৃষ্ঠার মধ্যে আশ্চর্য ভাবে বর্ণনা করেছেন, যা একমাত্র গুরুদেবের পক্ষেই সম্ভব, আর তার মধ্যে গ্রথিত হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব এবং হলকর্ষণ ও বৃক্ষ-রোপণ এই দুই আশ্রমিক উৎসবের তাৎপর্য্য।

ভূতত্ত্বের বই ও "চলতি ভাষা" বনাম "কেতাবী ভাষা"

মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা বিস্তার-কার্য্যে গুরুদেবের অপরিসীম উৎসাহ ছিল। জীবনের অপরাহ্ণে তিনি ইংরাজী **Home University**র অনুরূপ নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে বাংলা বই ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা প্রাচীন হিন্দুস্থান তিনি আমূল সংশোধন করেছিলেন এবং কতক অংশ নিজেই লিখেছিলেন।

এক দিন জিওলজি (ভূতত্ত্ব) বিষয়ে বই লেখাবার কথা উঠলে আমি নিবেদন করলাম যে, আমার বন্ধু যশোরের শ্রীযুক্ত ক্ষি··· মহাশয় আজীবন এই বিদ্যার চর্চ্চা করেছেন, তাঁকে এই কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে। গুরুদেব খুব উৎসাহ প্রকাশ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।

অতএব ক্ষি···বাবুকে সংবাদ দেওয়া হল। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে দেখি, ঠিক তার আগের দিন গুরুদেব চলে গেছেন বেলঘরের প্রশান্ত মহালনবিশ মহাশয়ের বাড়ীতে। আমাদের জন্য রথী বাবুর গাড়ী প্রস্তুত ছিল। সেই সময় তাঁর একজন **dare devil** পশ্চিমা ড্রাইভার ছিল। সে আমাদের নিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যাবার সময় বেগমান যন্ত্রের কাঁটাটি একবার ৮০র অঙ্কে ছুঁইয়ে দিয়ে নিজের কেরামতি দেখিয়ে দিল।

যথা সময়ে বেলঘরের বাড়ীতে পৌছান গেলো। শুনলাম, দু'জন ইহুদী ব্যারিষ্টারের সঙ্গে গুরুদেব আলাপ করছেন প্যালেষ্টাইনের তৎকালীন পারিস্থিতির বিষয়ে। তাঁরা বিদায় নিলে আমাদের ডাক পড়লো। দু'-এক কথার পরেই কী প্রণালীতে জিওলজির বই লেখা হবে, সে বিষয়ে গুরুদেব প্রায় ১৫।২০ মিনিট নিজের মত ব্যক্ত করলেন। যে শাস্ত্র তিনি একবার পড়েছেন তার সম্বন্ধেই কী প্রগাঢ় তাঁর জ্ঞান, কী গভীর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। এক জীবনের মধ্যে মানুষ কেমন করে এতো জানতে পারে? তখন আমার মনে পড়লো, কালিদাস এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কুমারসম্ভবে—

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধীর্নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।

এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি একটু অপ্রীতিকর হয়েছিল। বেচারী ক্ষি···বাবু অনেক পরিশ্রম করে বই লিখলেন। তখন তাঁর পত্নী মৃত্যুশয্যা শয়ান। সেই অবস্থায় বই শেষ হোলো। এবং স্ত্রী-বিয়োগের কয়েক দিন পরেই পাণ্ডুলিপি ডাকযোগে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার সঙ্গে কয়েকখানি ছবি এলো। আমি তার ব্লক তৈরীর ব্যবস্থা করলাম।

পাণ্ডুলিপিটি গুরুদেবের কাছে দেওয়া হলে তিনি আমাকে ডেকে বল্লেন—এ তো ঠিক হয়নি—**style**টা বড় ভারি হয়েছে, একটু হাল্কা হওয়া উচিত ছিল। বলে তিনি নিজেই তার সংশোধনের ভার নিলেন। অনেক পরিশ্রম করে প্রথম অধ্যায়টির ভাষা পরিবর্ত্তনের কাজে খানিক অগ্রসরও হয়েছিলেন। শেষে এই কাজ যখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো, তখন আমাকে ডেকে বললেন, "এটি তোমার বন্ধুকে ফেরৎ দাও, লিখে দাও, চলতি ভাষায় সহজ করে লেখা চাই। অনেক ইতস্ততঃ করে এই আদেশ পালন করলাম। ফল যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হ'ল। বন্ধুবর অত্যন্ত রেগে চার পাতা চিঠির কাগজের প্রায় গোল ধার ভর্ত্তি করে উত্তর দিলেন যে, এ কাজ কেবল দুঃসাধ্য নয় অসাধ্য। এমন গুরু-গম্ভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে হাল্কা ভাষায় প্রকাশ করা তিনি সম্ভব ও সঙ্গত মনে করেন না। সম্ভব হলেও সে ভাষায় তাঁর এমন দখল নেই যে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পত্রের শেষে গুরুদেবের আগের দিনের গদ্য রচনা থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি দৃষ্টান্ত তুলে দিয়ে এই বলে পত্রের উপসংহার করলেন যে, এই ভাষা ত গুরুদেব নিজেই আমাদের শিখিয়েছেন, এখন আবার আমাদের অন্য বুলি বলাতে চান কেন?

[ক্রমশঃ।

"অন্যান্য সেবকদের মতো সাহিত্য-সেবক কবিদেরও খোরাকি এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মতো কিছু কিছু যশের খোরাকি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন—নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের জাপ-খোরাকি বন্দোবস্ত—তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে এক মুঠা মুড়ি-মুড়কিও দেয় না।"

—রবীন্দ্রনাথ (আত্মপরিচয় পৃঃ ২৯)

"সংসারে অনেক জিনিষ ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিষটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন ঘটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেই দিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

দক্ষিণের বিল

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

৪৬

বাড়ীর ঘাটে ধান বোঝাই কাঠামি নৌকাগুলো এসে ভিড়েছে। এক এক নায়ে এক এক রকম ধান। নামও তাদের হরেক রকম—দুধলুচি, কার্তিকদল, বাঁশফুল, গন্ধকস্তূরী। গুণও তাদের নানা রকম। সরু-মোটা-মাঝারি, কোনটা বা সুগন্ধি।

দেখতে দেখতে উঠানে এনে রাশ দিতে থাকে দিন-মজুর ও কৃষাণেরা। গ্রামের লোক একেবারে ভেঙে পড়ে। আগামী সনের জন্য আর অপেক্ষা করতে হয় না। স্তূপটা হয়েছে পাহাড়ের মত উঁচু। এপাশে কেউ খাড়া হলে ওপাশ দিয়ে বুঝি দেখা যাবে না। আমন ধান, একেবারে সোনার মত চক্‌চকে ধান। কেউ হাত ডুবিয়ে দেখে, কেউ মুঠো ভরে পরখ করে, কেউ বা দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে বিস্ময়ে। হিংসায় জ্বলতে থাকে প্রায় সকলে। তবু তারা বোসের বাড়ী ছাড়ে না। তারা ডালা কুলো এগিয়ে দেয়, নৌকা থেকে নিয়া ধান তুলে আনে, গোলা বাঁধায় সাহায্য করে—এ যেন তাদেরই ফসল, তাই এত দরদ, তাই এত অযাচিত পরিশ্রম।

গুরু আসেন, পুরুত আসেন, অন্যান্য পণ্ডিত বামুনেরাও এসে আশীর্বাদ করে, প্রশংসা করে কাঁপিয়ে তোলেন বিপ্রপদকে। মোট কথা, দেশের গণ্য ও নগণ্য কেউ আজ আর আসতে ভুল করে না।

আসে পাঁচীর মা ও অন্ধ বাজু—হিংসা নেই দ্বেষ নেই তাদের মনে পরম আনন্দ। কিন্তু তাদের লক্ষ্য করে না কেউ। পান-তামাকটা মরদ্দীদের সম্মুখেই কেবল ঘরতে থাকে।

কমলকামিনী মালাকে নিয়ে কাজে লেগে গেছেন। সরু-মোটা-মাঝারি ধান আলাদা আলাদা রাখতে হবে। অন্তত আট-দশটা রোদ খাইয়ে বীজ-ধান তুলতে হবে গোলায়। পাঁচ-মিশালি ধানগুলো আজই সিদ্ধ করা দরকার। তা না হলে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। মালা এ সব কিছু জানে না। তার কাছে সবই নতুন। সে কমলকামিনীর সাথে সাথে চলে। যা বলেন তাই করে। ক্রমে সে নিপুণ হয়ে ওঠে। কোলে-কাঁখে নেই, কাজ তার গা-হাত-পায় লাগবে কেন? দেব-সেবা, অতিথি-সংকার, সংসারের এলোমেলো রকমারী ঝঞ্ঝাট সকল দায়িত্বই সে ইতিমধ্যে মাথা পেতে নিয়েছে। হিন্দু-সংসারের বিধবা পিসী-মাসী-বোনঝিরা যা নিয়ে সকাল থেকে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে অবিবাহিতা মালাও তাই নিয়ে দিন কাটায়। ভরা যৌবন অটুট স্বাস্থ্য আর তার কোন কাজেই বা লাগবে? কাজের প্লাবনে মালা নিমজ্জিত হয়ে থাকে। বিপ্রপদ দেখেও তাকে দেখতে পান না। কমলকামিনী সোয়াস্তি বোধ করেন।

একটা লজ্জা ও গ্লানিতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েছিল মালা। যত দিন যায় ততই সে ভাব কাটতে থাকে। এ সংসারের সবাই, এমন কি, বিপ্রপদও ভাবতে থাকেন—ও বুঝি এ সংসারের এক জন যুবতী আত্মীয়া। এর বেশী যে কোনও পরিচয় বিপ্রপদও ওর কোন দিন পেয়েছেন এ কথাও মনের কোণায় স্থান পায় না—পেলেও তা শরতের লঘু মেঘের মত অদৃশ্য হয়ে থাকে। তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না।

ধান এসেছে, বিপ্রপদর আবার মান বেড়েছে। গঞ্জ থেকে নৌকাতে টিন-কাঠ আসে। পূর্বের চেয়ে আরও বড় একখানা আটচালা-মন্দির ওঠে। আবার তা জম-জম করতে থাকে লোক-সমাগমে। মজলিস চলে হরদম। ধার-কর্জ চাইতে আসে গাঁয়ের লোকে। সবাই বলে—'ধর্মের বাতি আগে জ্বলে টিপটিপিয়ে তার পর জ্বলে দপ্‌দপিয়ে—দেখতে হলে যাও বোসের বাড়ী। এর মধ্যে হয়েছিল কি, এখনই বা হয়েছে কি।

কোনও মজলিসেই বিপ্রপদ তেমন গা মাখেন না। তিনি কৃষাণদের সংগে পরামর্শ করে দু'-একটা ররিশস্য যাতে ধানের মরসুমের আগে ওঠে তার ব্যবস্থা করে তাদের পাঠিয়ে দেন বিলে। তিল এবং পাট বুনতে হবে। শস্যশালিনী মৃত্তিকার সমস্ত ঐশ্বর্য কুড়িয়ে আনার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মানের জন্য চাই পয়সা, পয়সার জন্য চাই ঐকান্তিক শ্রম। সে শ্রম সফল করার জন্য তো তাঁর রয়েছে নব-যৌবনা দক্ষিণের বিল।

এখন পর্যন্ত যেটুকু তাঁর জৌলুস তা ধানের নয়—ঋণের—সংগে সংগে এ কথাটাও যে মনে না হয় তা নয়।

•

একটা ছুটি উপলক্ষ করে অমরেশ বাড়ী আসে। বহু দিন পরে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হয়। বিপ্রপদর মনে একটা সুগভীর আনন্দ হয়। অমরেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে সগর্বে তার স্বল্প পরিসর পাঠ্য-জীবনের কাহিনী বলে যায়। নতুন নতুন বইগুলি এনে দেখায় পিতাকে। বিপ্রপদ সম্যক্‌ না বুঝলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বইগুলি খুলে দেখেন। ইংরাজী বইর ছবিগুলো দেখে ছেলের সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা জন্মে। পাছে অমরেশ পুঁথিগত কোন একটা কঠিন প্রশ্ন করে বসে, তাই তিনি তাকে নিয়ে নতুন ধানের গোলাটা দেখাতে যান। দক্ষিণের বিলের গল্প করেন। অমরেশ সত্য ঘটনার মধ্যে একটা রূপকথার গন্ধ পায়। সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে। বিপ্রপদ খোলা-মনে আজ জবাব দিয়ে যান। এর প্রত্যেকটাই বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন: এ সব ওদের জন্যই করা।

কি একটা কাজ করতে করতে মালা সম্মুখে এসে পড়ে। পিতা-পুত্রের আলাপ হঠাৎ থেমে যায়। অমরেশ বিস্মিত চোখে তাকায়।

বিপ্রপদ ভীত হয়ে পড়েন।

'বাবা, উনি কে? ঐ যে চলে গেলেন ও-ঘরে।'

মুহূর্ত মধ্যে জবাব দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোনও জবাবই বিপ্রপদর মুখে আসে না।

ভাগ্যক্রমে সেই সময় কমলকামিনী এসে পড়েন। তিনি বলেন, 'কি দেখছ বাবা? উনি এক জন বামুনের মেয়ে, বিপদে পড়ে আমাদের আশ্রয় নিয়েছেন। ও তোমাদের ছোট-মা। তোমরা ওকে ছোট-মা বলেই ডেকো।'

'ছোট-মা তো বড় সুন্দর দেখতে বাবা।'

তার পর অমরেশ বিনুর খোঁজে চলে যায়।

কমলকামিনী বলেন, 'কেমন, শুনলে তো?'

৪৭

মাঘ মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভোরের সূর্যটা একটা সিঁদুর-পিণ্ডের মত তখনও পূর্বাকাশের কুহেলি ঠেলে রোদ ছড়াতে পারেনি। কিন্তু আলো যা ছড়িয়েছে তাতেই বাড়ী-ঘর গাছ-পালা বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে। এ দেশের তুলনায় শীত পড়েছে খুবই, তবু মানুষের মনে

প্রচুর আনন্দ। এখন সকলের যথেষ্ট খাবার আছে। নতুন ধান সবে এই তো উঠল। মাছ-দুধ তরি-তরকারী পাওয়া যাচ্ছে অঢেল। লাউ দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকের মাচায় মাচায়। খেজুর-রস গুড় না আছে কোন বাড়ী! এত যে কাদা এদেশে ছিল তা পথ-ঘাটের দিকে চাইলে কেউ কি বুঝতে পারে? টন-টন করছে সব। শুধু একটু শিশিরে ভেজা—তা দেখতে লাগে বেশ, চলতে লাগে ভাল!

এক দল বৈরাগী এসেছে ভিক্ষা করতে। যে ক'টি বৈষ্ণব, সেই ক'টিই বৈষ্ণবী—হাতে তাদের একতারা। এরা এ দেশে এবার নতুন এসেছে। দলটাও বেশ ভারী। সাজ-সজ্জাও পরিপাটি। গাঁয়ের লোকের নজরে একটু নতুন ঠেকে। হয়ত এরা গান গায় ভাল নয়ত এরা এমন কিছু জানে, যা অনেকেই দেখেনি বা শোনেনি। বৈরাগীদের ঘিরে পথ দেখিয়ে আনে বোসের বাড়ী উৎসুক চঞ্চল ছেলে-মেয়ে-বুড়োর দল। বড় বাড়ী না হলে এতগুলো লোককে খুশি করবে কে? গান শোনা সোজা, গানের মাশুল দেওয়া তো সো নয়!

খড়ম পায় বিপ্রপদ বেরিয়ে আসেন, কমলকামিনী আসেন, মালাও আসে। বিনু ও অমরেশ তো আছেই। সবাই মিলে বসতে দেয় নাটমন্দিরে তোগলা-মাদুর পেতে বৈষ্ণবদের। এরা দেহতত্ত্বের গান গাইবে না। গাইবে নতুন স্বদেশী গান মুকুন্দদাসের অনুকরণে—সেই বরিশালের নামকরা মুকুন্দ দাস। ইচ্ছা হলে তারা দেহ-তত্ত্বের গানও শোনাতে পারে। জানে তারা সব রকম। ওদের মধ্যে কে এক জন জানি হাজতও খেটেছে স্বদেশী গান গেয়ে। সেই এ দলের নায়ক এবং চালকও বটে। এ সব শুনে আর কেউ দেহ-তত্ত্বের গান শুনতে চায় না।

বিপ্রপদ বললেন, 'বৈরাগী ঠাকুর, আমরাও অনেক স্বদেশী করেছি উনিশ-শো পাঁচ কি ছ' সনে—সেই বঙ্গভঙ্গের সময়। আমাদের তখন বয়স কি বিন্তু ডরাইনি কিছু! বিলিতী মাল আনতে হাটে দেইনি, বেচতে দেইনি কোনও দোকানীকে। নিজেরাও তো পরতাম না তাঁতের দেশী কাপড় ছাড়া।'···

'বাবু, আমিও যে হাজত খাটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মালীকে ক্ষুদিরামের গান শুনিয়ে। মালী বেটা ছাড়ল না, টেনে নিয়ে গেল বাগানে তার বাসার একটা কোণে। সেদিন কুঠিতে সাহেব ছিল না। গানও আরম্ভ করলাম, সে শালাও কোন দিক থেকে যেন এসে পড়ল ডালকুত্তার মত। মালী বেটোরী পালিয়ে গেল! আমি গান বন্ধ করলাম। ঠিক ভয়ে না—শোতার অভাবে।'

বিনু একেবারে এগিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। 'তার পর বৈরাগী ঠাকুর?'

কচি গলার প্রশ্ন শুনে, কচি উৎসুক চোখ জোড়ার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে বলতে থাকে বৈষ্ণব। 'তার পর বাবা, পুলিশ দিয়ে আমাকে ধরিয়ে নিয়ে যায় ডালকুত্তা সাহেব। জিজ্ঞাসা করে, কি করছিলে ওখানে—ওই বাগানে। সে বুঝতে পারেনি যে, আমি স্বদেশী গান গাইছিলাম এতক্ষণ। আমি বললাম: গান গাইছিলাম। কি যেন ভাবল আমার দিকে চেয়ে। তার পর বলল, 'একটা ড্যাম ট্রেসপাসার। একে নিয়ে যাও থানায়।' ইংরাজীগুলো আমার মনে আছে বেশ। সংগে সংগে পিঠে না পড়ে আমার মুখের ওপর পড়ল এক ঘা বেত। কেটে গেল ঠোঁটটা। এই সে চিহ্ন।···

হাজতে বসে আমি মনের আক্রোশে গান গাইতে সুরু করলাম। কনেষ্টবলেরা নিষেধ করল। এলো জেলার। তার কথাও কানে তুললাম না। আমার হাতে দিল হাত কড়ি, পায়ে শিকলী পরা[illegible]। আমার সুবিধা হলো—এখন জিঞ্জির বাজিয়ে গান ধরলাম। কয়েদী[illegible] ভিড় করে শুনতে লাগল সে গান।···যন্ত্রণা বাড়ল জেলারের। [illegible] বলত: একটা পাগলকে না ক্ষেপিয়ে খালাস দেওয়াই ভাল। [illegible] বিরুদ্ধে আর এমন কি একটা চার্জ! বাস্তবিক প্রমাণাভাবে [illegible] খালাস পেলাম ডেপুটি কোর্টে। সেই থেকেই আমি দেশে দেশে স্বদেশী গান গাইছি ঘুরে ঘুরে।'

বিপ্রপদ বলেন, 'আমরাও কম করিনি সে যুগে। আমাদের শক্তিগড়ের হাটখোলায় ছিল এক মাড়োয়ারী—বিষণ দাস। [illegible] বিলিতী ছাড়া দেশী মাল কিছুতেই বেচবে না। আমি এবং বস্তির[illegible] পঞ্চাইত পরামর্শ করে দিলাম এক দল লোক ক্ষেপিয়ে। অবশ্য [illegible] পত্তনে আমরা যদি পড়ি তবে পুলিশ এলে রক্ষা করবে কে? তাই রইলাম ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবডালে। রাত্রে আগুন দিল বিষণের ঘরের এক পাশে—সামান্য আগুন, শুধু ওকে ভয় দেখাবার জন্য। [illegible] সুড়-সুড় করে অন্য পাশ দিয়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বের হলো, ভাগ্য[illegible] খুব বাঁচাই বাঁচল বুঝি, যখন প্রাণটা তার রক্ষা পেল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে আমাদের শরণ নিল। বললাম: ভয় নেই, পুলিশ আসুক 'সব লুট হয়ে গেল যে'—যাবে কোথায়, পুলিশ আসুক, সাক্ষী [illegible] আমরা তোমার পক্ষে। পুলিশ এলো পরের দিন খবর পেয়ে[illegible] কিন্তু আমরা সাক্ষী দিলাম উল্টো। কিছু মামাল বেচে নগদ [illegible] দিলাম! লোটা-কম্বল নিয়ে দেশে ফিরে গেল বিষণ। এখন তা[illegible] কি ছেলেমানুষিই-টা না করেছি এক কালে। কিন্তু ঠাকুর ভেবে দে[illegible] স্বদেশী আমরাও কম করিনি! তার পর সেই ভিটিতে বসল [illegible] সাহা তাঁতের কাপড় নিয়ে। তখন কত স্বদেশী কথা বলেছে[illegible] এখন সেই সাহাই হয়েছে মাড়োয়ারী। গুদাম বোঝাই বিলিতী মাল, দেশী কোনও জিনিষের নাম-গন্ধ নেই। তবে দোষ করব [illegible] বিষণ? এখন ভাবলে লজ্জা হয়। তবু সে যুগে আমরা [illegible] করিনি।'

তখন আর গান আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় শেষ বেলায় খাও[illegible] দাওয়ার পর।

গান জমে খুব। ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটা আরম্ভ হতে[illegible] বিনু রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আসরের এক পাশ থেকে সে নিব[illegible] এসে বসে। সেখানে একটা মঞ্চও তৈরী হয়েছে বৈরাগী ঠাকুর[illegible] ইচ্ছা ও উপদেশ মত। ঠিক ফাঁসির মঞ্চ যেন।···

সন্ধ্যা হয় হয়—এমন সময় গান গেয়ে গেয়ে এক এক পা [illegible] ফাঁসি-কাঠের দিকে এগিয়ে আসে বৈরাগী ঠাকুর। এক-এক কলি শেষ হয় আর এক-এক ধাপ ওপরে ওঠে সে। টিনের নাটমন্দিরে শহীদ কিশোরের কণ্ঠই যেন গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে। নি[illegible] হাতে যেন ক্ষুদিরামই পরছে ফাঁসির দড়ি। তৈলাক্ত পিচ্ছিল দড়িটা দেখতে ভয় লাগে। বৈষ্ণব আর বৈষ্ণব নেই—মিশে গেছে যেন ক্ষুদিরামের আত্মার সাথে দেহের সাথে।

বিনু আর বসে থাকতে পারে না। খাড়া হয়ে ওঠে। [illegible] বুঝুক আর না-ই বুঝুক—রুদ্ধশ্বাসে গান শোনে। চেয়ে দেখে এক বাঙালী কিশোরের অভিযান।

হঠাৎ গান থেমে যায়, হুকুম হয় ফাঁসির।

মঞ্চ অন্ধকার। বৈষ্ণব নেই। শেষ হলো অভিনয়।

সাঙ্গ হয়েছে, সবাই বাড়ীর দিকে ফেরার কথাও ভুলে যায়।

এর পর অল্প কটা বছর গড়িয়ে যায় চাকার মত। বিপ্রপদ এখনও তেমন সুবিধা করতে পারেননি হালুটিতে। তবু তিনি জোঁকের মত আঁকড়ে থাকেন। ররিখন্দটা পরিপূর্ণ ভাবে জন্মান চাই। পাট-তিল-তিসি-মুগ-কলাই কিছুই বাদ থাকে না। কুমড়োর ডগা আলুর লতাও ফুঁপিয়ে উঠবে। হলুদ-মরিচ-পেঁয়াজ-রসুনে ভরে যাবে তাঁর গোলা। তিনি বালকের মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন পাকা কৃষকদের কাছে। জীবন তাঁর ফসলে ভরে তুলবেন এই তাঁর কামনা।

তাই তাঁর শক্তিগড়ের চেয়েও দক্ষিণের বিলের জন্য যেন অপার আকর্ষণ। তিনি বিভোর হয়ে থাকেন মৃত্তিকার স্বপ্নে—বিলের স্বপ্নে।

মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানে বৈষ্ণব শক্তিগড়ের ছেলে-মেয়েদের এমন মজিয়েছিল যে এখনও তারা তা ভোলেনি। বিনু তো কথায় কথায় সে গান আজো গায়। লুকিয়ে লুকিয়ে সমবয়সীদের নিয়ে আদিত্য সরকারের আম-বাগানে গিয়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসির অভিনয় করে। কিশোর বালক গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে যায় মঞ্চের দিকে—উত্তেজনায় তার সারা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে—সে হাসতে হাসতে নিজ হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে। শিউরে ওঠে বালকের দল। সময় হয় ফাঁসির।

সরে যায় পায়ের নীচের তক্তা···

অদৃশ্য হয় মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর···

হাততালি দেয় না কেউ, বরঞ্চ কয়বারও যেন তারা ভুলে যায়—যতক্ষণ না বেরিয়ে আসে বিনু।

একবার যে সাহেব সেজে ফাঁসির হুকুম দেয়, দ্বিতীয় বার সে আর কেন জানি সে ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াতে চায় না আসরে। তাই ক্রমে ক্রমে অভিনয় করা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

হঠাৎ এক দিন এ সব নজরে পড়ে বিপ্রপদর। তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়ী ফিরে এসে কমলকামিনীকে একান্তে ডেকে বলেন, ‘বিনুটা মরবে এক দিন। যম নিয়ে খেলা।’ তার পর খুলে বলেন সব।

বিনু ঘরে এলে কমলকামিনী বলেন, ‘তুই বুঝি মরতে চাস ফাঁসি আটকে গলায়। ও-খেলা খেলা নয়।’

‘বৈরাগী ঠাকুর মরেনি, তোমরা সবাই বলো ক্ষুদিরামও মরেনি—তবে আমি কেন মরব বড়মা ?’

‘ও মেজো, শোন্ শোন্ তোর বিনুর কথা।’ তার পর কমলকামিনী বলেন, ‘না, মরবে তুমি কেন বাবা ? তবে কি জানো, ও-সব খেলা ভাল নয়—হঠাৎ বিপদ হতে কতক্ষণ !’

একটি ছেলে প্রতিবাদ করে, ‘বিপদ হলেই হলো। আমরা ত ফাঁসির দড়িটা ফুলের মালা দিয়ে তৈরী করি। ক্ষুদিরাম তো ফাঁসি পরেনি গলায়—পরেছে ফুলের মালা, নইলে কি পারত হাসতে হাসতে ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে ?’

ছেলেরা এদিক ওদিক চলে যায়।

বিপ্রপদ বলেন, ‘কথাটা সত্যি না হলেও একপ্রকার সত্যি বক্তব্য।’

রাত্রে বিনু প্রশ্ন করে, ‘স্বাধীনতা মানে কি বড়মা ?’

‘কি জানি বাবা, মেজো মাকে জিজ্ঞাসা করো। আমার কাজ আছে।

‘মেজো মা, স্বাধীনতা মানে কি ?’

‘তোর তাতে দরকার ?’

‘এই যে আমার বইতে রয়েছে। বলে দাও অর্থ কি ?’

শিবপদর স্ত্রী মুস্কিলে পড়ে। তার পক্ষে কেন, বাড়ীর কোন বৌ’র পক্ষেই এ সব কঠিন কথায় জবাব দেওয়া সম্ভব না। আজকাল বিনু তার মামা-বাড়ী টাউনে থেকে এসেছে। তবেই তো তাকে এমন সব শক্ত কথা পড়তে ! সে বলে যে জ্যেঠা মশাইর কাছে যাও, তিনি বলে দেবেন।

বিনুর বিপ্রপদর কাছে যেতে হয় না। তিনি দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। স্বাধীন মানে যে পরাধীন নয়—বিজাতির অধীন নয় যে জাতি। যেমন চীন-জাপান স্বাধীন জাতি। বিশেষ্যে স্বাধীনতা।’

দুঃখিত হৃদয় বিনু বলে, ‘আমরা তো পরাধীন—আমরা ভারতবাসীরা। অথচ ওরা বাড়ীর কাছে আমাদের, স্বাধীন ; এ হলো কেন জ্যেঠা মশাই ?’

‘ইতিহাস পড়ে দেখ—ওতেই সব লেখা আছে।’

বিনু রাত জেগে ইতিহাস পড়ে। প্রথম থেকে সে শেষ পর্য্যন্ত পড়বে। আজ আর সে ঘুমাবে না। একটু একটু করে করে স্কুলে পড়া হবে সে জন্য কি বসে থাকা যায় ? তাকে ভারতের পরাধীনতার কারণ জানতে হবে। মর্ম বুঝতে হবে ইতিহাসের।

রাত্রি একটা···

পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে বিনু। অনার্য এসেছে তার উলংগ বর্বরতা নিয়ে—অসভ্য উদ্দাম।

দ্রাবিড় এসেছে তার উপল প্রস্তরের অহংকার নিয়ে—সংগে তার দেবীমূর্তি···দ্বন্দ্ব হয় স্বার্থ নিয়ে···

আসে আর্য—হিমালয়ের পাদমূলে বাঁধে বাসা···এগিয়ে চলে পাঞ্জাবে—ছড়িয়ে পড়ে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত। মূর্ত্তিপূজার সভ্যতার বিপ্লব আনে ভারতের বুকে···

পড়তে পড়তে শিউরে ওঠে বিনু। অনেক দিন পড়েছে সে ইতিহাস, দেখেছে কত বীর বিজয়ীর আলেখ্য, কিন্তু এমন করে পড়েনি, এমন করে দেখেনি কোনও দিনও এই সামান্য বইখানার পাতা উল্টে।···

রাত্রি তিনটে···

‘এখনও ঘুমাওনি বিনু ?’ মালা প্রশ্ন করে।

‘না, আমি পরীক্ষার পড়া পড়ছি ছোটমা।’

‘শরীর খারাপ হবে তোমার।’

‘হবে না ছোটমা।’

বিনু আবার মগ্ন হয়ে যায়···

কত রাজ্যের ভাংগা-গড়া উত্থান-পতন চলেছে, কত বীরের রক্তে ভেসে যাচ্ছে এ ভারতভূমি তবু চলেছে ইতিবৃত্ত এগিয়ে···

মালা চুপটি করে বিনুর পিছনে এসে দাঁড়ায়···শুনতে পায় যেন তার বুকের শব্দ···

অশোক গেল তার ঐতিহ্য ছড়িয়ে···রণজিৎ সিংহ তার বীরত্ব···আকবর গেল দীন এলাহি ধর্মের ব্যাখ্যা করে···কেউ তা

তেমন মন দিয়ে শুনল না, কিন্তু বিন্নুর বুকে রেখে গেল একটা বৃহত্তম সংকেত যেন···তার পর আসে শিবাজী···

অবশেষে ধীরে ধীরে এলো ইংরাজ···বণিকের বেশে মাণিক্য লুণ্ঠনকারী···

বন্দী হলো সিরাজ বাংলার শেষ নবাব—মৃত্যু হলো অকালে···

কেঁদে ফেলে বিন্নু···

হাতের বই মাটিতে খসে পড়ে। মালা প্রশ্ন করে, 'কি হলো বিন্নু ?'

'কিছু হয়নি ছোটমা—আমি ওদের মারব···প্রতিশোধ নেব অন্যায়ের।'

উত্তেজিত বিন্নুকে ধরে রাখে মালা।

রাত শেষ হয়ে আসে। শিয়াল ডাকে শেষ প্রহরের···

পরীক্ষা দেবে বিন্নু···

একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনে শয্যাত্যাগ করে আসেন বিপ্রপদ। প্রায় প্রত্যহ এমনি সময় তাঁর ঘুম ভাঙে। তবে আজ ভাঙল একটু আগেই।

বিন্নু কাঁদছে···মালা তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে।

উজ্জ্বল দীপালোকে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক চিত্র দেখলেন বিপ্রপদ। 'কি হয়েছে বিন্নু ? কাঁদছিস কেন ?'

বিন্নু আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।

'কি হয়েছে মালা ?'

অনেক দিন বাদে এই প্রথম সম্বোধন। মালা শিউরে ওঠে। আনন্দে নয়—ভয়ে। কণ্ঠে একটা তিক্ততা ও অবিশ্বাস বারুদের।

'কি রে, হয়েছে কি ?'

কাঁদতে কাঁদতে বিন্নু সব খুলে বলে। আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সুকুমার মুখখানা রাঙা হয়ে যায়।

বিপ্রপদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। 'চুপ করো বাবা, কেঁদো না। এই তো দুঃখী ধরিত্রীর ইতিহাস। শুধু ভারতের নয়—সারা দুনিয়ার।'

'আমরা কেন তা সইব ? জ্যেঠা মশাই ?'

একটা আতংক হয় বিপ্রপদর মনে। তাঁর সংসার, তাঁর উত্তরাধিকারী! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবেন—করবেই তো তাঁর বংশধরেরা প্রতিবাদ। তিনিই কি রেহাই দিয়েছেন ঘোষালদের? দাঁড়াননি অন্যায়ের বিরুদ্ধে? কিন্তু এ যে অগ্নিগর্ভ! আবার সংকুচিত হয়ে যায় বিপ্রপদর হৃদয়। তিনি ভাল-মন্দ কিছু বলতে পারেন না। সাহস দিতে পারেন না বিন্নুকে।

'কি, চুপ করে রইলে যে জ্যেঠা মশাই ? আমরা কি চিরদিন এমনি মুখ বুঁজে থাকব ? বলতে চাও, ভুলে যাব ইতিহাসের গ্লানি ?'

'না, না তা, ভুলবে কেন বাবা ? ভুলবে কেন ?' তিনি হাত বুলান বিন্নুর গায়।

বিন্নু শান্ত হয়।

কিন্তু বিপ্রপদ চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে পায়চারি করতে থাকেন। তখনও ঊষার আলো তার বর্ণালি আকাশের সীমান্তে পক্ষ বিস্তার করেনি। শিশির পড়ছে দু'-এক ফোঁটা করে—অন্ধকার থমকে আছে গাছপালার ফাঁকে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। একটা অব্যক্ত ব্যথায় যেন রাতের শেষ প্রহর মৌন।

তেমনি একটা অস্পষ্ট বেদনায় বিপ্রপদও ব্যাকুল। তাঁর বংশধর এই বিন্নু। কি জানি, ভবদেশ আবার কেমন হয়েছে? তিনি স্বয়ং পাকে-চক্রে আবার ঘৃতাহুতি দিলেন। এ কি ভাল হল? বিদ্রোহের লাঞ্ছনা তিনি হাড়ে-হাড়ে অনুভব করছেন। লাভ করে হবে কিন্তু সামনে কি বিপুল ক্ষতি! এখনও তিনি কোনও চোট সামলাতে পারেননি। যা দু'টো ধান পান তার চেয়ে দেনার অংক বেশী।···

কিন্তু মুখ বুঁজে মার খেলেও তো মৃত্যু অনিবার্য। তিনি ভালই করেছেন বালকের উর্বর হৃদয়ে আগুনের বীজ বুনে। কাটুক অন্ধকার।

তখনি যেন পূর্বাচলে ঊষার রক্তিমাভা দেখা যায়।

বিপ্রপদ জোড়হাতে সন্নতি জানান।

সমাপ্ত

উত্তর

১। না, সামান্য তফাৎ। ২। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। ৩। চণ্ডীমংগল। ৪। একই। ৫। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬। প্রস্তরীভূত জীব ও উদ্ভিদ দেহ। ৭। এক-কোষ বিশিষ্ট জলজ আদিম প্রাণী এ্যামিবা। ৮। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ৯। মোহান-জো-দড়ো। ১০। ঋক্ থেকে বাক্য, সাম থেকে গীত যজুঃ থেকে ভঙ্গী এবং অথর্ব বেদ থেকে রস নিয়ে। ১১। ইতালীয় কবি পেত্রার্কা।

মহামান্য আগা খাঁ

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামান্য আগা সুলতান সার মহম্মদ শা আগা খাঁ মহামতি মহম্মদ থেকে ৪৮তম পুরুষ। তাঁর যশ ঘোড়দৌড়েই নিবদ্ধ নয়। প্রায় ৫০ লক্ষ ইসমাইলী সম্প্রদায়ের মুসলমানের ধর্মগুরুরূপে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করতে পেরেছেন। এই সকল মুসলমানের প্রত্যেকেই তাদের জমির আয় থেকে তাঁকে বার্ষিক কর দিয়ে থাকে; কোন কোন ক্ষেত্রে এই করের পরিমাণ তাদের আয়ের এক-দশমাংশ।

আগা খাঁ জন্মগ্রহণ করেন ভারতের মাটিতে। পিতামহ হাসান আলি শা'র কাছ থেকেই তিনি ঐ পদবীটি লাভ করেন। পারস্যের রাজা আলি শা হাসান আলিকে 'আগা খাঁ' ব'লে ডাকতেন। ('আগা' একটি তাতার শব্দ। সাহেব শব্দটি যেমন শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়, আগা শব্দটিও সেই অর্থে ব্যবহার করা হয়। খাঁ শব্দের অর্থ রাজা বা প্রধান।)

মহামান্য আগা খাঁ এক দিকে যেমন কোরাণ ও ইসলাম ধর্মে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, অন্য দিকে তেমনি পারস্য ও ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য এবং দর্শনেও জ্ঞানার্জন করেন। পরে ইংরাজ-শিক্ষকদের হাতে পড়ে তাঁর শিক্ষার ভার। ফলে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সংযোগ-সেতু হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

যখন তাঁর বয়স মাত্র ৮ বছর, তাঁর পিতা ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেলেন। ইমামের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো তাঁর ওপর। সে ভার তিনি মাথা পেতে নিলেন।

পশ্চিম-ভারতে একবার বসন্ত দেখা দিল মহামারীরূপে। তিনি জনসাধারণের সমক্ষে নিজে টীকা নিয়ে প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন আর তাদের উৎসাহিত করেছিলেন।

আগা খাঁ এখন আর বড় একটা ভারতে আসেন না। ভারতে তাঁর দু'ইটি প্রাসাদ রয়েছে: সেখানে মালাবার হিলের ওপরে ধূসর রঙের একখানি অট্টালিকা—বিশাল তার গেটগুলো। এইটিই আগা খাঁর বোম্বাই-এর প্রাসাদ। তাঁর পুণার প্রাসাদটি বিলাতী পল্লী-ভবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাত্মা গান্ধী এখানে দু'বার অনশন করেন।

আগা খাঁর ইউরোপের জীবনটা কাটে ফ্রান্সের সেখানে কানেস অঞ্চলে। এখনকার অধিবাসীরা জানে, তিনি এক জন চৌকস লোক এবং অভিজাত শ্রেণীর হলেও সহৃদয় প্রকৃতির। তারা জানে, গলফ খেলতে তিনি ভালবাসেন আর দান করেন প্রচুর, বিশেষ ক'রে আনন্দানুষ্ঠান হ'লে তো কথাই নেই।

তাঁর শুভ্র "ইয়াকিমুর" ভবনটি 'অবশ্য-দর্শনীয়' বস্তু। তৃতীয় বেগম মাদামোজেল ইয়েভো লাবরুসীর জন্যে তিনি এখানি নির্মাণ করেন। মাদামোজেল লাবরুসা ১৯৩২ সালে 'মিস ফ্রান্স' উপাধি

মহামান্য আগা খাঁ এবং তাঁর বেগম সাহেবা

লাভ করেন। লিয়ঁ এভেন্যু ও ভিক্টোরিয়া এভেন্যুর ওপর অনেকগুলো সাইনপোষ্ট আপনাকে আগা খাঁর এই পল্লী-ভবনের সুবিশাল লোহার গেটগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে দেবে। গেটগুলো পার হ'লেই ১৩০ ফুট লম্বা মোটর যাবার রাস্তা আর সুবিস্তীর্ণ বাগান। এই রাস্তা ও বাগানের শেষপ্রান্তে তাঁর প্রাসাদ। এখানে তাঁর ১১ জন কর্মচারী। এদের মধ্যে ৪ জন বাগানের মালী। এদের সকলের কাছে তিনি "মঁসিয়ে প্রিন্স" ব'লে পরিচিত।

কানেস অঞ্চলের অধিবাসীরা বলে, সামাজিক আসরে আগা খাঁ সব থেকে চমৎকার লোক। কিন্তু ভেলভেট আর কিংখাপে ঘেরা 'ইয়াকিমুর' ভিলায় তিনি বড় একটা আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। যথেষ্ট কারণ না থাকলে তিনি বাইরের কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে কদাচিৎ উঠে আসেন।

মার্চের প্রথম দিকে 'নিউজ রিভু' পত্রিকার রিপোর্টার আসেন আগা খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। একটি স্বপ্নময় উদ্যানের মধ্যে রিপোর্টার প্রবেশ করলেন। উদ্যানের সুরুতেই দেখা যায় কৃত্রিম পাহাড়, নানা রঙা ফুল চারিদিকে ফুটেছে যথেচ্ছ ভাবে। ডজন দু'চার কমলালেবুর গাছ, একটা আঙুর গাছ আর সুপ্রশস্ত মনোহারী প্রাঙ্গণ আপনাকে মুগ্ধ করবে।

এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে রিপোর্টার লিখেছেন, "একটি হলের মধ্যে আমাকে অপেক্ষা করতে বলা হ'ল। বেগমের প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ছবি দিয়ে হলটি সাজানো। প্রিন্স-এর ভারতীয় পরিচারক এক প্রান্ত থেকে একবার উঁকি দিয়ে আমাকে দেখে নিল, তার পর একেবারে আমাকে মহামান্য আগা খাঁর সমনে এনে হাজির করলো।"

তাঁর পরনে সাদা পা-জামা, সাদা সার্ট আর হলদে রঙের পুলোভার। পা-জামাটা জানুর ঠিক নীচে পর্যন্ত নেমে এসে মোজাবিহীন লোমশ পদযুগলকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। "গলফ খেলা কিংবা অপেরা দেখা ছাড়া আমি কদাচিৎ বাইরে বেরোই", তিনি বললেন।

আগা খাঁ বাড়ীতে আহারাদি করাই পছন্দ করেন, কখন-সখন ক্যাসিনোতে গিয়ে থাকেন। প্রত্যেক দিন সকালে তাঁর ১৯৪৯ মডেলের বাদামী ক্যাডিলাক গাড়ীখানাকে বাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা যাবে। তার পর তাঁকে নিয়ে ক্যাডিলাকখানা সোজা চ'লে আসবে গলফ-মাঠে।

গলফ খেলা শেষ ক'রে আগা খাঁ ফিরে আসেন ইয়াকিমুর প্রাসাদে। খাঁটি ফরাসী খানা তাঁর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। চার জন ফরাসী পাচক তাঁর কাজ করে, এদেরই এক জন ঐ খানা তৈরী করেছে। বহু বছর আগেই ভারতীয় খাদ্যে তাঁর রুচি লোপ পেয়ে গেছে। তিনি বললেন, "একমাত্র ফরাসী খাদ্যই আমি খাই। ভারতে আমার দু'জন পাচক আছে—এক জন ভারতীয়, আর এক জন পর্তুগীজ। ওদের দু'জনকেই ফরাসী রান্নায় বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলা হয়েছে।" কিন্তু মুসলমান ব'লে তিনি মদ্যাদি বর্জন করেছেন।

লাঞ্চের পর তিনি বহুমূল্য আধুনিক আসবাবসজ্জিত অভ্যর্থনা কক্ষগুলির একটিতে আরাম-কেদারায় দু'-এক ঘণ্টা বিশ্রাম করেন।

ভারী মুখখানার ওপর হাতটা বুলিয়ে নিয়ে মহামান্য আগা খাঁ বললেন "বৃটেনে করভারই রেসকে ক্রমে উজাড়ে দিচ্ছে।"

তাঁর মতে বৃটেনের উচিত ফ্রান্সের মত ঘোড়াকে শক্তিশালী ক'রে তোলার দিকে নজর দেওয়া। এর জন্যে কোন ওষুধ-পত্তরের দরকার নেই।" তিনি জোর দিয়ে বললেন, "কেবল পেলোয়াড়দের মত মাঝে মাঝে টনিকের দরকার। ফ্রান্সে এই রকম করা হয়ে থাকে।"

মহামান্য আগা খাঁ ঘোড়দৌড়কে শিল্পবিশেষ ব'লে মনে করেন ১৯২১ সালে রেসে নামার পর থেকেই তিনি এ বিষয়ে দক্ষ। ১৯২[illegible] সালে তিনি ১৩টি রেসে জয়লাভ করেন ও ১৩,১৩৩ পাউণ্ড লা[illegible] করেন। এর সঙ্গে তুলনায় গত বৎসর ৩৯টি ক্ষেত্রে জয়মাল্য আ[illegible] তাঁর ভাগ্যে, ফলে ৬৮,৯১৬ পাউণ্ড লাভ করেন। ২৯ বছরে তাঁ[illegible] ঘোড়াগুলি ৫৯৬টি রেসে জয়লাভ করে এবং মোট ৭৯৭,৭৬[illegible] পাউণ্ড সংগ্রহ করে।

কিন্তু ঘোড়দৌড় মাঠে তাঁর খ্যাতির কারণ অন্য। রেসে জিতে টাকার অঙ্ককে ফাঁপিয়ে তোলাই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। ঘোড়া উৎপাদন বিষয়েও তিনি সবিশেষ দক্ষ। গবেষণা ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রত্যেক রেসের ঘোড়ার রক্ত ৪০৯৬[illegible] ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি রেসের ঘোড়ার ধমনীতে ১৫টি পুরু[illegible] ঘোড়া ও একটি স্ত্রী-ঘোড়ার রক্ত প্রবাহিত হওয়া চাই। তিনি এই ধারণা পোষণ করেন যে, একমাত্র এই পদ্ধতিতেই শাবকে[illegible] দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি ও ক্ষিপ্রগতি সঞ্চারিত করা সম্ভব।

বৃটেনের ঘোড়দৌড়ের প্রধান দপ্তরখানা নিউ মার্কেটের কর্তার এই রকম অনুমান করেন যে, আয়ারল্যাণ্ডে আগা খাঁ'র যে প্রজননাগারটি রয়েছে, তার মূল্য ২৫ লক্ষ পাউণ্ডের মত। প্রজনন ফি বাবদ যে বহু সহস্র পাউণ্ড নিয়মিত আয় হয়, তা উপরোক্ত অঙ্কের মধ্যে ধরা হয়নি। আগা খাঁ কর্তৃক উৎপন্ন ঘোড়াগুলি ১৯২৮ সাল থেকে ৫৭৫টি রেসে বিজয়-গৌরব লাভ করেছে এবং ৬১৬,২৯৮ পাউণ্ড অর্জন করতে পেরেছে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে এই বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও আগা খাঁ কিন্তু নিজে কদাচিত বাজী ধরেন। যদিও কখন বাজী ধরেন, নিজের ঘোড়ার ওপর ধরেন না। মাঝে মাঝে তিনি বেগমকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এই বৎসর আগা খাঁ এক জন নতুন 'ট্রেণার' পেয়েছেন। প্রবী[illegible] ফ্রাঙ্ক বাটার্স-এর জায়গায় একে নিয়োগ করা হবে। ফ্রাঙ্ক বাটার্স গত ১৮ বৎসর কাল যাবৎ আগা খাঁর ঘোড়াগুলোর তদারক করছে। ৪৫ বৎসর বয়স্ক মার্কাস মার্শ ১৯৫০ সালে ট্রেণার-এর কার্য্য সুরু করে। গত নভেম্বরে সে আগা খাঁ'র ২০টি ঘোড়ার ভার নিয়েছে। সে বলে, মহামান্য আগা ঘোড়াকে ট্রেণিং দেওয়ার কাজটা সম্পূর্ণ তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। বছরে একবার মাত্র তিনি আস্তাবলে আসেন।

তিনি ডার্বি জিতেছেন চার বার আর সেণ্ট লেজার চার বার।

আগা খাঁ'র জীবন যেন একটা রূপকথা। তাঁর অতীত জীবনের ইতিহাসে উপাখ্যান ও কিংবদন্তীর ছড়াছড়ি। অবশ্য তিনি বলেন, এর অনেকখানিই সত্যি নয়।

কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁর সারা জীবন রোমাঞ্চকর স্মৃতির কুসুমে গাঁথা মালা। তরুণ বয়সে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সংগঠক ছিলেন। 'লীগ অব নেশনস'-এ তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পরে লীগ পরিষদের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

পাঁউরুটীর জুতো-পায়ে ছেলে

[Thiophile Gautier লিখিত "L' Enfant aux souliers de pain" নামক ফরাসী গল্প]

শোন, তোমাদের একটা গল্প বলি।

জার্মাণীর বুড়ী দিদিমারা গল্পটা তাদের নাতি-নাতনীদের বলতো। জার্মাণী স্বপ্ন আর উপকথার দেশ, সেখানে রাতের জ্যোৎস্না রাইন নদীর উপরে কুয়াশার সঙ্গে মিশে কত-শত অসম্ভব স্বপ্নের সৃষ্টি করে।

এক জন স্ত্রীলোক, একলা, গ্রামের একপ্রান্তে একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করে। দীনতায় ভরা কুঁড়ে ঘর—যে সব আসবাব-পত্র না রাখলে নয়, কেবল সেই সব আসবাব ঘরের ভিতরে রয়েছে।

একটা ছত্রিওয়ালা খাট, তা' থেকে হলদে রঙের মশারি ঝুলছে। পাঁউরুটি রাখবার একটা ঝুড়ি, একটা ঢকঢকে বাদাম কাঠের বাক্স, পোকায় একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। বাক্সের গায়ে মোম দিয়ে বোজানো বিঁদগুলো, দেখলে বুঝতে পারা যায়, বাক্সটা বহু দিনের। একখানা গদি-আঁটা চেয়ার—চেয়ারটার রং যে কি রকম ছিল তা ধারণা করা যায় না। আর একটা চরকা। কাজের চাপে সেটা ঢক-ঢক করছে।

হ্যাঁ, আমি বলতে ভুলে যাচ্ছি একটা দোলনার কথা। দোলনাটা একেবারে নূতন, নানা রকম কাপড় আর নানা রঙের পালক দিয়ে সাজানো। কুঁড়ের যা কিছু ধন-সম্পত্তি যেন ঐ দোলনাটির উপর এসে জড় হয়েছে।

রাজার ছেলেও হয়তো এতো নরম বিছানায় শুতে পায় না। মায়ের ভালোবাসা নিজের সকল সুখ অবহেলা করে দৈন্যের বুকের উপর বাস করেও যে তার সন্তানের সুখের উপর লক্ষ্য রেখেছে।

প্রকৃতিও বুঝি দীনের দৈন্য সহ্য করতে পারে না, সেও ঐ কুঁড়ে ঘরের চালার জরাজীর্ণ নগ্ন রূপকে নানা রকম লতা-পাতায় আর সবুজ শেওলায় ঢেকে দিয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, চালাটি যেন একখানি সবুজ কার্পেটে ঢাকা। কতকগুলি ছোট ছোট গাছ চালার ছিদ্রগুলো বুঁজিয়ে দিয়েছে, বৃষ্টির জল আর চালার ভিতর দিয়ে দোলনায় পড়ে না। জানলার কাছে বসে পায়রাগুলো ডাকতে থাকে যতক্ষণ না শিশু ঘুমিয়ে পড়ে।

শীতের সময় পৃথিবী যখন ধূসর-ধবল রূপ ধারণ করেছিল, শিশু হাঁস সেই সময় একটা ছোট্ট পাখীকে এক টুকরো রুটি দিয়েছিল, বসন্ত কালে পাখীটা হয়তো একটি বীচি ঠোঁটে করে নিয়ে এসে দেওয়াল-গোড়ায় ফেলে গেছলো; গজিয়ে উঠেছে সেই বীজ থেকে একটি স্বর্ণযূঁই। দেওয়াল বয়ে উঠে গাছটা একটা ভাঙ্গা শার্শির ভিতর দিয়ে দোলনার উপর পর্য্যন্ত এসে দোলনার উপর যূঁই ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সকাল বেলা শিশু হাঁস, আর ঐ যূঁই ফুলগুলো একসঙ্গে চোখ খোলে আর এ ওর মুখের দিকে মিট-মিট করে চায়।

কুঁড়েটা দৈন্যে ভরা—কিন্তু বিষাদে ভরা নয়।

যুদ্ধে গিয়ে, বহু দূরদেশে হাঁসের বাবা মারা যায়, সেই থেকে হাঁসের মা বাগানে শাক-সব্জি করে, আর চরকায় সুতো কেটে কোন রকমে সংসার চালায়, কিন্তু তা বলে তোমরা মনে কোরো না যেন হাঁসের কোন অভাব ছিল।

ছেলের সুন্দর মুখ, লাল টুকটুকে ছ'টি পা, চাঁপার কলির মত ছোট ছোট হাতের আঙ্গুল দেখে মায়েরা অনেক সময় মনে করে ছেলেরা বুঝি তাদের চিরকালের; কিন্তু ভগবান তো কিছু দেন না, তিনি ধার দেন—আর সময়ে সময়ে ভুলে যাওয়া পাওনাদারের মত তিনি হঠাৎ আসেন তাঁর পাওনা আদায় করতে।

হাঁসকে জন্ম দিয়েছে বলে হাঁসের মা ভাবলে হাঁস বুঝি তারই। ভগবান সোনার তারা বসানো সুনীল আকাশের অন্তরালে থেকে সব দেখতে পান, সব শুনতে পান, মাটি ফুঁড়ে একটি ঘাস গজিয়ে উঠবার সময় যে আওয়াজটুকু হয় সেটুকুও তার কানে যায়। হাঁসের মায়ের মনের ভাবটা তিনি ভালো চোখে দেখলেন না।

তিনি দেখলেন, হাঁস ভীষণ পেটুক হয়ে উঠেছে—আর হাঁসের মা-ও তার এই পেটুকপনায় সায় দিচ্ছে। আঙ্গুর আর আপেলের পর রুটি খাওয়া দরকার, কিন্তু ছেলেটা কেবল কাঁদবে আর মাটির উপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে রুটি, যা'র অভাবে কত দীন-দরিদ্র মরে যাচ্ছে। হাঁসের মা আধ-খাওয়া রুটিগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেলে, হাঁসকে একটি বারও বলে না, "রুটি ফেলতে নেই।"

হাঁসের অসুখ করলো, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে সর্দিতে গলা বুজে গেছে, নিশ্বেসের সাঁই-সাঁই শব্দ, ভীষণ কাসি। ছেলের এমন জ্বর হলে কোন্ বাপ-মায়ের ছ'চোখ অশ্রুতে লাল না হয়ে ওঠে বলো।

এই দৃশ্য দেখে হাঁসের মায়ের বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় মুচড়ে উঠলো।

তোমরা কেউ কেউ গির্জায় গিয়ে শিশু-মাতাকে ক্রসের নীচে কালো পোষাক পরে নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ। দেখেছো তো তার বুকটা ছ্যাঁদা করা, রক্তমাখা অন্তঃকরণ, সেই বুকের ভিতরে বসানো রয়েছে সাতটি রূপোর ছুরি, এক দিকে তিনখানি, আর এক দিকে চারখানি। এ দৃশ্যের মানে কি জানো? চোখের সামনে ছেলেকে মরতে দেখলে মা'র যে কষ্ট হয়, সে কষ্টের মত কষ্ট পৃথিবীতে নেই।

তবে শিশু-মাতা জানতেন স্বর্গে তার সন্তান আবার বেঁচে উঠবে।

কিন্তু হাঁসের মা তো আর তা জানতো না!

হাঁসের জীবনের শেষ ক'দিন হাঁসের মা তার ছেলের উপর চোখ রেখে কলের মত সুতো কেটে চলেছে। চরকার ভোঁ-ভোঁ শব্দ ছেলের গলার সাঁই-সাঁই শব্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

ছেলের মরণ-শয্যার কাছে বসে মাকে এমন করে সুতো কাটতে দেখে বড় লোকেরা হয়তো বলবে, "এ আবার কী", কিন্তু তারা কেমন করে বুঝবে বলো দরিদ্রের বুকে কত বেদনা! হায়! বেদনায় কেবল শরীরই ভাঙ্গে না, মনও ভেঙ্গে পড়ে।

কেন সে এমন করে চরকায় সুতো কাটছে জানো? ছোট হাঁসের দেহ ঢাকবার চাদর চাই যে, পুরোনো কাপড়ে হাঁসের দেহ ঢাকা দেওয়া হবে। তাও কি কখনও হাঁসের মা সহ্য করতে পারে! কিন্তু তার তো পয়সা নেই, সেই জন্যে সে পাগলের মত চরকা ঘুরিয়ে চলেছে, কিন্তু চরকার সুতোর পাক বসাবার জন্যে সে আজ আর সুতো মুখের লালায় ভেজাচ্ছে না, আজ তার চোখের জলেই সুতো ভিজে উঠেছে।

ছ'দিনের দিন হাঁস মারা গেল। অনুকম্পাতেই হোক বা

ঘটনাচক্রেই হোক, হাঁসের বিছানার উপর খুঁই ফুলের মালার কুঁড়িগুলো তাদের রং হারিয়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত একে একে হাঁসের বিছানার উপর ঝরে পড়লো।

মা যখন বেশ বুঝতে পারলো চিরকালের জন্যে তার ছেলের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, যখন সে দেখলে দু'টি জীবন্ত গোলাপী অধরে মৃত্যুর রেখনী ছাপ, তখন সে হাঁসের গায়ের চাদরটা হাঁসের মুখের উপর টেনে দিল, সুতোর পুঁটলিটি হাতে তুলে নিয়ে সে চললো তাঁতির বাড়ী।

"ওগো তাঁতি," সে বললে, "এই দেখ কেমন সুন্দর সুতো এনেছি, কোথাও সরু-মোটা নেই। ঘরের ছাদের কড়িকাঠের কোণে মাকড়সাও হয়তো এত সুন্দর সুতোর জাল বুনতে পারে না। ওগো, তুমি তোমার মাকু চালিয়ে এই সুতো দিয়ে আমায় একখানা পালকের মত নরম চাদর করে দাও।"

তাঁতি তার তাঁতে বসলো, খটাখট চলতে লাগলো তার মাকু। ক্রমশঃ চাদর তৈরী হলো। রাজার রাণীরা যে কাপড়ের জামা পরে তার চেয়েও নরম সুন্দর কাপড় তৈরী হলো।

তাঁতি কাপড়খানি ভাঁজ করে হতভাগী মায়ের হাতে তুলে দিয়ে সে বললে,—কারণ মায়ের নিরাশ মাখা মুখ দেখে তাঁতি সবই বুঝেছিল—"দেখ মা, এই গেল বছর মহারাজার ছেলে মারা গেল, তার জন্যে আবলুস কাঠের বাক্স তৈরী হলো, সেই বাক্সের ভিতর তার মৃতদেহ বন্ধ করা হলো তক্তার উপর সোনার পেরেক মেরে, কিন্তু মা, তার ভাগ্যেও এত নরম গায়ের চাদর জোটেনি।

কাপড়খানি হাঁসের মা তার শীর্ণ আঙুল থেকে একটি ক্ষয়ে যাওয়া সোনার রিং খুলে নিয়ে বললে: "ওগো তাঁতি, তুমি এই আংটি নাও, এটি আমার বিয়ের আংটি, জীবনে এইটুকু সোনাই আমার সম্বল।"

তাঁতি কিন্তু আংটি নিতে চাইলো না। কিন্তু হাঁসের মা বললে, "দেখ, আমি যেখানে যাবো সেখানে তো আর সোনার আংটির কোন প্রয়োজন হবে না কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি হাঁসের ছোট ছোট দু'টি হাত আমায় মাটির নিচে টানছে।"

তার পর সে গেল ছুতোরের কাছে এবং তাকে বললে: "ওগো ছুতোর, তুমি ভালো মজবুত এমন খানিকটা এক কাঠ বেছে নাও যা পচবে না, যাতে পোকা ধরবে না, তা থেকে পাঁচখানি বড় তক্তা আর ছখানি ছোট তক্তা বার করে মৃতদেহ রাখবার একটি বাক্স করে দাও।"

ছুতোর করাত আর র‍্যাঁদা দিয়ে তক্তা করে। পাছে মায়ের বুকে আঘাত লাগে, এই ভয়ে আস্তে আস্তে পেরেক মেরে একটি বাক্স করে ফেললে। বাক্সটি তৈরী হলো। ছুতোর এত সুন্দর আর যত্ন করে বাক্স করলে যে লোকে বলবে খেলনা রাখবার বাক্স।

হাঁসের মা বাক্স দেখে বললে: "ওগো ছুতোর, তুমি আমার হাঁসের জন্যে এমন সুন্দর বাক্স করলে, পরিবর্তে কি আর আমি তোমায় দেব, এই গ্রামের প্রান্তে আমার যে কুঁড়ে আর কুঁড়ের পাশে যে বাগান রয়েছে তাই তুমি নিও। বেশী দিন তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না।"

মড়ার গায়ে ঢাকা দেবার চাদর আর বাক্সটা বগলে করে নিয়ে—এত ছোট বাক্সটি—হাঁসের মা গ্রামের পথ দিয়ে ঘরে ফিরছে। মরণ যে কি তা তো ছোট ছেলেরা জানে না, তারা বাক্স দেখে বলতে লাগলো—"দেখ দেখ, হাঁসের মা হাঁসের জন্যে খেলনা রাখবার জন্যে কি সুন্দর বাক্স নিয়ে যাচ্ছে……আমরা যদি এমনি একটা বাক্স পেতাম।"

মায়েদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তারা ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরে, তাদের মুখ বন্ধ করে: "ছি বাবা, অমন কথা কি বলতে আছে—চোখের জল ফেলতে ফেলতে যে খেলনার বাক্স নিয়ে যাওয়া হয় সে খেলনার বাক্স কি চাইতে আছে?"

হাঁসের মা বাড়ী ফিরে তার কচি হাঁসকে তুলে নিলে—কী সুন্দর তার ছেলে, কি নরম তার গা। মা শেষ বারের মত তার ছেলেকে যত্ন করে ধুইয়ে-মুছিয়ে দিলে, তাকে পরিয়ে দিলে রবিবারের পোষাক, চিরকাল স্যাঁতসেঁতে মাটির ভিতর হাঁসকে থাকতে হবে, সেই জন্যে সিল্কের জামার উপর একটা জামা পরিয়ে দিলে। এনামেলের চোখওয়ালা পুতুলটাকে সে হাঁসের পাশে শুইয়ে দিলে—এই পুতুলটাকে পাশে নিয়ে হাঁস তার খেলনায় ঘুমতো।

হাজার বার সে তার ছেলেকে চুম্বন দিয়েছে, গায়ে চাদর ঢাকা দেবার আগে শেষ বারের মত চুম্বন দিতে গিয়ে সে দেখলে, তার ছেলের পায়ে লাল জুতো জোড়াটি পরিয়ে দিতে ভুলে গেছে।

ছেলের সুন্দর লাল টুকটুকে পা দু'খানি মরণের ছোঁয়া লেগে সাদা হয়ে গেছে। হাঁস খালি পায়ে থাকবে? মা'র তা সহ্য হল না, সে জুতো জোড়া সবময় খুঁজতে লাগলো, কিন্তু সে যখন বাড়ী ছিল না, সে সময় বিছানার তলায় জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে ইঁদুরগুলো খাবার মত আর কিছু না পেয়ে জুতো জোড়াটা বসে বসে চিবিয়েছে।

হাঁসকে পরলোকে যেতে হবে খালি পায়ে—এই কথা ভেবে হতভাগী মা'র বুক বেদনায় ভরে উঠলো। বেদনায় তো হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েই ছিল, একটু ঘা লাগতেই রক্ত ঝরে পড়লো।

জুতো জোড়ার সামনে বসে সে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো; কেঁদে কেঁদে শুকনো চোখ থেকে আবার অশ্রু ঝরে পড়লো। হাঁসের জন্য সে কেমন করে এখন জুতো জোগাড় করবে, তার কুঁড়ে, তার আংটি, সে তো সব দিয়েছে। চিন্তা করতে করতে তার মাথায় একটা মতলব এলো।

কাঠের মুঠিতে তখনও একখানা রুটী রয়েছে, কারণ বেদনায় সে খাবার কথা একেবারে ভুলে গেছলো।

সে রুটীখানা ভেঙ্গে ফেললে, তার মনে পড়লো—হাঁসকে ভোলাবার জন্য এই রুটী দিয়ে হাঁসকে সে কত পায়রা, হাঁস, মুর্গি, চটি জুতো, নৌকা, জাহাজ কত কি করে দিয়েছে।

চোখের জলে রুটী ভিজিয়ে ভিজিয়ে সে রুটী দিয়ে এক জোড়া জুতো তৈরী করে তার ছেলের পায়ে পরিয়ে দিলে। এখন তার মন একটু শান্ত হলো। ছেলের গায়ে সে কাপড় ঢাকা দিয়ে মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে রাখলে। যখন সে রুটী দিয়ে জুতো তৈরী করছিল, সেই সময়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক ভিখিরী ভয়ে-ভয়ে এক টুকরো চাইলো—কিন্তু হাঁসের মা তাকে ইসারায় চলে যেতে বললে।

গির্জা থেকে লোক এসে বাক্স নিয়ে গেল। গোরস্থানের

এক গোলাপ কুঞ্জের নিচে বাক্সটি পুঁতে ফেললে। তখন সুন্দর আবহাওয়া, এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি, জমি শুকনো খটখটে। তা দেখে তবু মায়ের একটু আনন্দ হলো; সে ভাবলে, প্রথম রাত্রিটা তবু হাঁসকে গোরের তলায় কষ্ট পেতে হবে না।

সে বাড়ী ফিরে এলো, সাড়া-শব্দ নেই, হাঁসের দোলনাটি সে নিজের বিছানার পাশে রেখে সে শুয়ে পড়লো, ঘুম আসতে একটুও দেরী হলো না। ভাঙা শরীর একেবারে ভেঙে পড়লো।

ঘুমোতে ঘুমোতে সে স্বপ্ন দেখলে; অন্ততঃ তার মনে হলো সে স্বপ্ন দেখলে: হাঁস এলো—যেমন ভাবে সে তাকে পোষাক পরিয়ে বাক্সের ভিতর শুইয়ে রেখেছিল ঠিক সেই রকম পোষাক পরে। হাতে তার শোলার ঘোড়াওয়ালা পুতুল, পায়ে তার সেই পাটকটির জুতো।

তাকে দেখে মনে হলো বিমর্ষ, স্বর্গের গোলাপ তার দু'গালে ফুটে ওঠেনি এখনও, দু'গাল তার ফ্যাকাশে। তার দুই চোখের পাতায় অশ্রু-বিন্দু মুক্তোর মত টলমল করছে তার বুক ভেঙে বার হচ্ছে গভীর দীর্ঘশ্বাস!

মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল, মা জেগে উঠলো, সারা শরীর তার ঘামে ভিজে গেছে। ছেলেকে দেখে তার খুবই আনন্দ, কিন্তু দুঃখও তার হয়েছিল খুব ছেলের শুকনো মুখ দেখে, সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলে এই বলে: "স্বর্গে গিয়েও হাঁস আমায় ভুলতে পারেনি।"

পরের দিন সে আবার হাঁসকে স্বপ্ন দেখলে: হাঁসের মুখ যেন আরও শুকিয়ে গেছে, কারণ যেন মরার মত দেখাচ্ছে তার মুখ।

মা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে: "ওরে হাঁস, কেন দুঃখ করছিস স্বর্গে গিয়ে, ভাবিস্ নে, আমিও শীগ্‌গির তোর কাছে যাবো।"

তৃতীয় রাতে হাঁস আবার এলো। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—আর তার দু'চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। দু'টি হাত জোড় করে হাঁস অদৃশ্য হয়ে গেল। হাতে তার পুতুল ছিল না, কিন্তু পায়ে তার সেই পাটকটির জুতো।

মায়ের ভাবনা হলো, সে গেলো জ্ঞানী পুরুত ঠাকুরের পরামর্শ নিতে। পুরুত ঠাকুর বললেন: "আজ রাত্রে আমি জেগে থাকবো—আমি হাঁসের মূর্ত্তিকে প্রশ্ন করবো। সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে। দোষী বা নির্দোষীর মূর্ত্তির সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয় তা আমি জানি।"

হাঁস ঠিক সময়েই দেখা দিল, পুরুত তাকে জিজ্ঞেস করলে তার কিসের কষ্ট। হাঁস উত্তর দিল: "আমার এই পাটকটি জুতো-জোড়া যত কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমি ঈশ্বরের বসানো স্বর্গের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছি না। জুতো-জোড়াটা আমার পায়ে এত ভারী মনে হচ্ছে যে, দু'-তিনটের বেশী সিঁড়ি উঠতে পারছি না, সে জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি উপরে দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট দেবদূতেরা হাতে গোলাপের মালা নিয়ে আমায় ডাকছে, তাদের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে তারা আমায় কত খেলনা দেখাচ্ছে।"

এই কথা বলে হাঁসের মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন পুরুত ঠাকুর বললেন—

"তুমি একটা ভীষণ ভুল করেছ বাছা—তুমি রুটির অপমান করেছ—ভগবানের দেওয়া রুটির তুমি অপমান করেছ—ভগবানের দেহের সমতুল্য এই রুটি। গরীব ভিখারী তোমার দোরে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তুমি রুটি না দিয়ে, সেই রুটিকে নষ্ট করে জুতো তৈরী করে তোমার ছেলের জন্যে। এখন কবরের বাক্স খুলে ছেলের পা থেকে রুটির জুতো খুলে নিতে হবে, তার সেই জুতো পুড়িয়ে ফেলতে হবে আগুনে, যা সব জিনিসকে শুদ্ধ করে দেয়।"

মা আবার গেল পুরুত ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গোরস্থানে। দু'-চার কোদাল মাটি তুলতেই বাক্স বার হয়ে পড়লো। বাক্স খুলতে দেখা গেল, হাঁস শুয়ে রয়েছে যেমন ভাবে তার মা তাকে শুইয়ে রেখেছিল কিন্তু তার মুখ যেন বেদনায় ভরা।

পুরুত ঠাকুর ধীরে ধীরে মৃতের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিল এক মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জুতো-জোড়া আগুনে পুড়িয়ে ফেললে।

রাত হলো। হাঁস আবার তার মাকে দেখা দিল, মুখ তার আনন্দোৎফুল্ল, গাল দু'টি গোলাপী, সঙ্গে তার দু'জন দেবদূত, তাদের পিঠে আলোর পাখা। হাঁস বললে: "ও মা, কি আনন্দ, কি সুন্দর স্বর্গের বাগান! এখানে কেবল খেলা, ভগবান একটুও রাগ করেন না।"

পরের দিন সকালে হাঁসের মা আবার হাঁসকে দেখতে পেলে, কিন্তু পৃথিবীতে নয়, স্বর্গে। সকাল বেলা সে মারা গেল ছেলের দোলনার উপর মাথা রেখে।

অনুবাদক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

অকস্মাৎ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আমার তা কী আর, আমার তো অনেক বৈভব;
গ্রীষ্মজয়ী বর্ষা আর শরতের সোনার শৈশব

এখন আমার সঙ্গী,—বড়ো গান রবীন্দ্রনাথের,
পৌষের মাঠ আর বাঁশটি বসন্তরাতের
উত্তাপ আমার বুকে! আমার নেইক' অবসর:
প্রাণে আর প্রাণে একমনে শুনি কার স্বর:
আচমকা হাওয়ায় এই হৃদয়ের খোলা জানালায়
এক ঝাঁক তারা এসে সারা রাত কথা কয়ে যায়।

চোখ ভরে চেয়ে দেখি দেওদার তোরণের ফাঁকে
লাল পাড় শাড়ী পরে আমার অপেক্ষা করে থাকে
গাঢ় চোখে কৃষ্ণচূড়া; আমার তো নেইক' সময়:
হৃদয় ছড়িয়ে দিয়ে মনে হয় শুধু মনে হয়
একটু আকাশ আর এক ফালি মাঠের সবুজে
কী যেন, কী যেন আমি অকস্মাৎ পেয়ে গেছি খুঁজে।

মন্দের সমবিভ্যাহারে দেবদত্ত হস্তীকে ভূপাতিত করে' এবং বুদ্ধ তাকে দূরে নিক্ষেপ করেন, বুদ্ধের নিক্ষিপ্ত শর যেখানে দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিশ লী অতিক্রম করে ভূমি বিদীর্ণ করে এক উৎস সৃষ্টি করেছিল, যে উৎস পরবর্তী কালের লোকেরা পথচারীদের জন্য কূপের আকারে গঠন করেছিল—যার নাম শর-উৎস—যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করে প্রভু তাঁর সম্রাট পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন, যেখানে পঞ্চ শত রাজপুত্র সংসার ত্যাগ করেন এবং ধরণী যখন ছ'টি ভূকম্পনে কম্পমান, সেই কালে শিষ্য উপালীর নিকট যেখানে দীক্ষা লাভ করেন, বুদ্ধ-জনকের আগমন প্রতিরোধে চারিদ্বারে স্বর্গস্থ দেবসম্রাটদের প্রহরাকালে যেখানে ভগবান গৌতমদেব জন্য চতুর্বর্গ ধর্মকথা প্রচার করেন, যে ডুমুর বৃক্ষের নীচে তথাগত পূর্বমুখে উপবেশন করেছিলেন এবং তাঁর স্বসা তাঁকে উপহার প্রদান করেছিলেন যাজকের অন্তর্বাস, যেখানে রাজা বৈদুর্য শাক্যবংশের অনন্য কন্যাদের হত্যা করেছিলেন এবং যাঁরা মৃত্যুর পূর্বেই দিব্যশরীর লাভ করেছিলেন—সেই সকল স্থানেই স্তূপ নির্মিত হয়েছিল এবং সবগুলিই তখনো বিদ্যমান ছিল।

নগরের উত্তর-পূর্বে কয়েক লী দূরে সম্রাটের কৃষি-ভূমি, সেখানে রাজপুত্র বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্বক কিষাণদের চাষ করা অবলোকন করেছিলেন। সত্তরের পূর্বে পঞ্চাশ লী দূরে রাজোদ্যান লুম্বিনী। এই উদ্যানের দীঘিকায় স্নানকালে জননী উত্তর পারে গাত্রোত্থান করেন এবং বিশ পদ গমন ক'রে দুই বাহু তুলে বৃক্ষশাখা ধরেন। তার পর পূর্বমুখীন হয়ে তিনি রাজপুত্রকে ধরাতলে আনয়ন করেন। ভূপৃষ্ঠে পাদস্পর্শ করে রাজপুত্র সপ্তপদ অগ্রসর হন এবং দু'জন নাগরাজ তাঁর সর্বাঙ্গ বিধৌত করেন। সেই পবিত্র ভূমিতে একটি কূপ খনন করা হয়েছিল। সেই পবিত্র দীর্ঘিকা থেকে শ্রমণরা পানীয় জল গ্রহণ করেন।

ভগবান বুদ্ধের সহিত জড়িত চারিটি স্থান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। (১) যেখানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, (২) যেখানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন; (৩) যেখানে তিনি ধর্ম প্রচার করেন এবং বিধর্মিগণকে পরাভূত করেন এবং (৪) স্বর্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে যেখানে মাতৃসমীপে তিনি ধর্মতত্ত্ব বিবৃত করেন। এ ভিন্ন পূর্বাপর ঘটনায় যে সকল স্থান পবিত্র সেগুলিও স্মরণীয়।

কপিলবাস্তু নগর এখন জনশূন্য পরিত্যক্ত। মাত্র কয়েক ঘর বাসিন্দা নিয়মিত বাস করে। পথে শ্বেতহস্তী ও সিংহের ত্রাস। পথিকের পক্ষে অসতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বুদ্ধ-জন্মস্থানের পূর্বে পাঁচ যোজন দূরে রামগ্রাম অবস্থিত। এখানকার নৃপতি ভগবানের দেহ-শেষের এক-অষ্টমাংশ লাভ করেন এবং তার উপরেই এই চৈত্য বিহার নির্মাণ করেন। বিহারের পার্শ্বেই একটি দীর্ঘিকায় একটি দৈত্য বাস করে। সে এই বিহার পাহারা দেয় এবং অহোরাত্র পূজা-নিবেদন করে। সম্রাট অশোক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে অষ্টবিহার ধ্বংস করে তৎস্থলে চুরাশি হাজার (বুদ্ধদেহের প্রতিটি অণুর উপর একটি) নির্মাণ করার মনস্থ করেন। সাতটি বিনষ্ট করে তিনি যখন এখানে আসেন, তখন দৈত্য তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিহারের ভিতরে নিয়ে যায়। সম্রাটকে পূজা-অর্চনার খুঁটিনাটি দেখিয়ে সে বলে—চেয়েও নিষ্ঠার সঙ্গে যদি পূজা করতে পারেন, তবে এ স্মৃতিমা ধ্বংস করতে পারবেন।' সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আসতে আবার যোগ দেয়—'আমি আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না' সম্রাট অশোক উপলব্ধি করেন যে, এই পূজারতি অপার্থিব গৃহে ফিরে যান।

এই স্থান বৃক্ষলতায় পূর্ণ হওয়ায় এবং তাদের যত্ন করা বা পরিষ্কার রাখার কেউ না থাকায়, এক দল হাতী নিজে শুঁড়ের সাহায্যে জল এনে এখানে সেচন করে এবং বুদ্ধ-মন্দি পুষ্প ও স্তবস্তি নিবেদন করে। এ দেশেরই এক জন বৌদ্ধ শ্র এখানে অর্ঘ্য দান করতে এসে হস্তিযূথ দর্শন করে সন্ত্রস্ত বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন। হস্তিযূথের দ্বারা যথারীতি পূজা-নিবেদন দেখে তিনি এই চিন্তায় বিমর্ষ বোধ ক যে, এমন কোন বিহার নেই যেখান থেকে দেবতার পূজা করা যায় তখন শ্রমণ পঞ্চনির্দেশের আশ্রয় ত্যাগ করে ভিক্ষুব্রত নে ঘাস কাটা, গুল্ম পরিমার্জন করা, ভূমি সেচন করা সবই স্ব করতে থাকেন। সেখানকার রাজাকে উপরোধ করে তিনি সেখা একটি বিহার নির্মাণ করান এবং সেটি নির্মিত হলে সংঘারা স্থবির হন। এখন সেখানে একটি ভিক্ষুদের আবাস আছে এ সকল ঘটনা সাম্প্রতিক এবং তদবধি মহাযানপন্থী এক ভিক্ষু এখানে থের হয়ে থাকেন।

পূর্বে তিন যোজন দূরে সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে যুবরা সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দক ও তাঁর শ্বেতাশ্বটিকে বিদায় দিয়েছিলেন সেখানে একটি চৈত্য নির্মিত হয়েছে।

বারো যোজন পূর্ব দিকে যে বিহারটি, তারও বারো যোজ দূরে অগ্রসর হয়ে তীর্থযাত্রীরা কুশ নগরে উপনীত হলেন। নগরের উত্তর প্রান্তে, হিরণ্য নদীর দক্ষিণ তীরে দু'টি বৃক্ষের মধ্যস্থ ভূমিতে উত্তরমুখে শয়ান হয়ে লোকজ্যেষ্ঠ গৌতম পরিনির্বা লাভ করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে এইখানেই সুভদ্র শুদ্ধিলা করেছিল। বুদ্ধের পরম পরিনির্বাণের পরে সপ্ত দিবস ধরে এখানে পূজার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছিল। বজ্রপাণি তাঁর হীরক-খচিত গদা বর্জন করেছিলেন। অষ্ট রাজন বুদ্ধদেহ বণ্টন করেছিলেন এখানেই। সকল পবিত্র ভূমিতেই স্তূপ ও বিহার উঠেছে। অদ্যাবধি সবগুলিই দেখা যায়। এই নগরও লোকবিরল। যাঁরা আছেন সকলেই ভিক্ষু সম্প্রদায়ী।

বারো যোজন দক্ষিণ-পূর্বে তীর্থযাত্রীরা এলেন, যেখানে বৈশালী-প্রধানগণ ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্য-বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে বাসনায় বুদ্ধ সম্মত হননি। প্রধান শ্রেষ্ঠিগণ প্রভুসমীপ থেকে বঞ্চিত না হবার জন্য বিদায় নিতে রাজী হলেন না দেখে ভগবান তাদের ও নিজের মধ্যে এমন এক ব্যবধান সৃষ্টি করলেন যা তাঁরা অতিক্রম করতে পারলেন না। আপন ভিক্ষা-ভাণ্ড তাদের দান করে বুদ্ধ তাদের গৃহে প্রত্যাবৃত্ত করালেন। এই সকল বৃত্তান্ত উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর-স্তম্ভ এখনও বিরাজ করছে সেখানে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক :—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্ত ভাদুড়ী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বর্দ্ধমান-কাটোয়া ছোট রেল-লাইনে 'বলকাপাসী' একটি ছোট ষ্টেশন। এক বৈশাখ মাসের দিন-দুপুরে বর্দ্ধমানগামী ট্রেণের জন্য আচ্ছাদনহীন প্লাটফর্ম্মে বসিয়া আছি। কয়েক জন ছাড়া ষ্টেশনে অন্য কেহ নাই, থাকেও না।

প্রখর রৌদ্র খাঁ-খাঁ করিতেছে, জোরে হাওয়া দিতেছে; তাহাতে গ্রাফের তার ও খুঁটায় এক প্রকার ভীতিজনক তীক্ষ্ণ তীব্র ধ্বনি হচ্ছে, একটি লোক—চেহারা একটু অদ্ভুত গোছের—সেই হাওয়ার সুর মিলাইয়া "কখন কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী" গাহিতেছেন। শব্দ তাঁর গানের কি হাওয়ার বুঝিবার উপায় নাই।

লোকটি একটু অধিক মাত্রায় দীর্ঘ—মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া—মাঝে খানিকটা চুল উঁচু ও সোজা—কতকটা টিকির ধরণে। একখানা রাঙা চাদর এবং পরনে একখানা খাটো গৈরিক। কপালে সিঁদুর লেপা—গলায় ও হাতে স্ফটিকের মালা। সঙ্গে পিতলের কলসী, তাতে একগাছা ঝাঁটা ও এক পাটি চটিজুতা। কলসীর গলায় গোছা-করা কালো ও লাল সূতা।

ট্রেণ আসিতে এখনো এক ঘণ্টার উপর বিলম্ব আছে। লোকটি একটি রুগ্ন ছাগলের পিঠের ঘায়ে নানা ঔষধ দিয়া ভাল ড্রেসিং করিয়া দিয়া তিন-চারটি 'ফু' দিল এবং কিছু মন্ত্র পড়িল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছাগলটি কি আপনার ?

। না, ওটাকে ভূতে পাইয়াছিল তাই মন্ত্রৌষধি দিয়া দিলাম। ছাগলটা ঘাস খাইতে গিয়া অজ্ঞাতে এক ভূত-শিশুকে আঘাত করে, তাই সে উহাকে পাইয়াছিল।

। কেন পাইল ?

। ভূত-শিশু রোদ পোহাইতেছিল ঘাসের ডগায় বসিয়া, তাকে আঘাত—বিরক্ত করিলে রাগ হয় না ?

। তবে তো সকালে ঘাসে পা দেওয়ায় বিপদ আছে ?

। আছেই তো—হুক ওয়াৰ্ম (**Hook worm**) প্রভৃতি ভূত ছাড়া আর কি ?

। আপনি ভাল ডাক্তারী ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দিলেন কেন ? মন্ত্রবলেই তো ভূত যাইত ?

। এ সব ভৌতিক ব্যাপার বাবু, বুঝা ও বুঝানো দুই কঠিন।

। আপনি কি করেন ?

। আমি ভূতের রোজা—ডাঙ-ভূতের রোজা—অর্থাৎ ডাঙ্গার যত ভূত-তার আমি রোজা—পানি-ভূতের উপর আমার কোনো অধিকার নাই।

। যে রোগীকে ভাল করিতে পারেন তাহাকে ডাঙ-ভূতে পাইয়াছে আর যাহাকে আরোগ্য করিতে না পারেন তাহাকে পানি-ভূতে পাইয়াছে, এ বলায় বেশ সুবিধা আছে তো ?

। (ঈষৎ হাস্য করিয়া)—তা বটে, তবে আমাদিগকে যাঁহারা ডাকেন গভীর বিশ্বাসের সহিতই ডাকেন। যুক্তি-তর্কে এত ওয়াকিবহাল হইলে সাহেব ডাক্তারই ডাকিতেন।

। বেশ, কিরূপ শিক্ষা ও সাধনায় 'রোজা' হওয়া যায় ?

কতকগুলি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে—তাহা গুরুর নিকট শিখিতে হয়। তবে কোনো বিশেষ ভূতের অনুকম্পা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

ভূতের মধ্যে কি শ্রেণি-বিভাগ আছে ?

ওঝা। নিশ্চয়, বয়সেরও তারতম্য আছে—এক এক জনের বয়স পাঁচ হাজার বৎসরেরও উপরে। আমাকে যে ভূত আশ্রয় করিয়াছে বা আমি যাকে আশ্রয় করিয়াছি তাহার বয়সও ঐরূপ।

আমি। বলেন কি ! কি রকমে তা জানা যায় ?

ওঝা। আমার কাছে যিনি আসেন তাঁর বাড়ী ছিল "হরিপাদ"—যাকে আপনারা 'হারাপ্পা' বলেন—তিনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—মায় রাজসূয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত।

আমি। বাঃ রে ভূত ! তিনি হারাপ্পার কথা কিছু বলেন না কি ?

ওঝা। হাঁ, বলেন বৈ কি—সেখানে বিশাল নগর ছিল—হরি তাহাদের উপাস্য দেবতা—হেম অর্থাৎ স্বর্ণের ব্যবহার তাহারা জানিত—হীরক চিনিত। 'হাঁড়ি' যা নিত্য ব্যবহার করা হয় উহা প্রথম 'হারাপ্পায়' তৈরী হয় তা বোধ হয় জানেন না ? 'হুণ্ডির' প্রথম চলন ঐখানেই। হাতীকে তাহারাই প্রথম মানুষের কাজে লাগায়। 'হাউই' তাদেরি আবিষ্কার। ঘরকে তাহারা 'হাউস্' বলিত—ওটা ইংরাজী কথা নয়।

আমি। অবাক কাণ্ড ! এমন একটা ভূত ডাঃ সুনীতি চাটার্জ্জি পেলে যে ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পারতেন। ভূতের কি নাম আছে ?

ওঝা। হাঁ—আমার ভূতটির নাম 'টোরি'।

আমি। সেটি মেয়ে-ভূত না কি ?

ওঝা। না—সে পুরুষ।

আমি। তবে এ ধরণের নাম কেন ?

ওঝা। আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলে, হারাপ্পায় এক হোমে সে হবিঃ দিয়ে আহুতি দিতেছিলাম, তখন নহবতে 'টোরি' বাজিতেছিল। আমি আনমনা হইয়া দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মন্ত্র ভুল করিয়া 'টোরি' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলি—উহাতে প্রধান ঋত্বিক অষ্টাবক্র মুনি রুষ্ট হইয়া আমাকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজেরা যে দিন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে সেই দিন আমারও শাপমুক্তি।

আমি। বটে—সুলভ-কোপ অষ্টাবক্র মুনি তো আচ্ছা কঠিন শাপ দিয়েছেন। বেশ মহাশয়, ভূত কেন হয় ?

ওঝা। ওরা বলে কামনা পরিত্যাগ ও সংযম একমাত্র মোক্ষের উপায়। যাহারা যে কোনো একটা ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বশীভূত হয় এবং সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দোষ-গুণ তাঁহাদের মধ্যে প্রখর ভাবে থাকে। সব ইন্দ্রিয়ের সংযম ও সমতাই মোক্ষ আনয়ন করে।

আমি। এ যে ভয়ানক ভূত—খুব বড়-বড় কথা বলে দেখছি—সুদূরের সংবাদ রাখে। বেশ, ভূতের দয়া-মায়া আছে কি ?

ওঝা। যথেষ্ট—মানুষের চেয়ে বেশী—নৃশংসতাও বেশী—

আমি। আপনি কোনো কিছু বৈশিষ্ট্য তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন কি ?

ওঝা। ওদের তো সবই বৈশিষ্ট্য—বৈশিষ্ট্য লইয়াই তো ভূত হয়।

আমি। আপনার ভূতটি কিসে নিপুণ ?

ওঝা। উনি সর্ব্বগুণান্বিত, অত্যন্ত চিন্তাশীল—মনুষ্য জাতি কিরূপে সকলে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, এই বিষয়েই তিনি গবেষণা করিতেছেন। জাতির উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন। "হারাপ্পার' সাধনার পুনঃপ্রবর্ত্তন তিনি আশা করেন।

আমি। এ সব তো দার্শনিক কথা, আমাদের মত সামান্য লোকের অনধিগম্য। আপনাকে তিনি কি সাহায্য করেন ?

ওঝা। তিনি লোকের দুঃখ-যন্ত্রণা নিবারণ করিতে সতত উদ্গ্রীব। কোন লোক ভূতাবিষ্ট হইলে তাঁহাকে আহ্বান করি, তিনি প্রেতকে সরিয়া যাইতে আদেশ করেন।

কথা শেষ না হইতেই ট্রেণ আসিল, আমি গাড়ীতে উঠিলাম, রোজা কাটোয়াগামী ট্রেণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তার পর দশ-বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি সিউড়ীতে কয় দিন বেড়াইতে আসিয়াছি—হঠাৎ এক দিন শুনিলাম, নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে এক ভূতের রোজা অদ্ভুত উপায়ে এক দুঃস্থ রোগিণীকে আরোগ্য করিয়াছে—চারি দিকে লোকমুখে তাহারি কথা।

এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সেই গ্রামেই গেলাম গুণী রোজাকে দেখিবার জন্য।

গিয়া দেখিলাম, এ সেই ভদ্রলোক—যাঁকে বহু দিন আগে 'বনকাপাসী' ষ্টেশনে দেখিয়াছিলাম। চেহারার কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন এবং সাক্ষাৎ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

গ্রামের লোক তাঁহার প্রশংসায় শতমুখ। একটি বয়স্থা স্ত্রীলোককে সহসা ভূতে পায়। তাহার একমাত্র পুত্র, দরিদ্রের সংসার—অনেক রোজা দেখিল, কেহই ভূত ছাড়াইতে পারিল না—বলিল, পাহাড়ে ভূতে পাইয়াছে। এই গুণী রোজার সন্ধান পাইয়া গ্রামের কয়েকটি লোক তাঁহার নিকট গিয়া এখানে আনে—রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া তিনি একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই, কৃপা-পরবশ হইয়া ভূত ছাড়াইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, স্ত্রীলোকটির বহু কষ্টে সঞ্চিত যে পাঁচ শত টাকা চুরি গিয়াছিল এবং যাহার পর হইতেই স্ত্রীলোকটি প্রেতাবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাও ফেরৎ দেওয়াইয়াছেন। ভূতটিকে বাধ্য করিয়া সব স্বীকার করাইবার জন্য ঔষধাদি আনিতে তিনি নিজ খরচে পুনবায় বাড়ী যান এবং ঔষধাদি আনিয়া এই অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন। আমি খুব বিস্মিত হইয়া সব কাহিনী শুনিলাম।

রোজা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার সে হারাপ্পার ভূতটির কুশল তো ?

ওঝা। সেটি তো আর নাই—গত ১৫ই আগষ্ট তাহার শাপমুক্ত হইয়াছে।

আমি। অষ্টাবক্র ঋষির পাপ এত দিনে মোচন হইল—বিদায়ের সময় আপনাকে কিছু বলেন নাই ?

ওঝা। ভূতেরা সাধারণতঃ অল্পভাষী, বিশেষতঃ ঐ সব উচ্চ শ্রেণীর ভূত।

আমি। তিনি তো মুক্তি পাইলেন, আপনার নিকট এখন কোন্ ভূত আছেন ?

ওঝা। তারি এক জন সহযোগী।

আমি। এখানে রোগীকে যে ভূত পাইয়াছিল সেটি কি রকম ?

ওঝা। ওটা একটা লোভী ছিঁচকে ভূত—স্ত্রীলোকটির পাঁচশো টাকা চুরি করিয়া—তার উপর ভর করেছিল।

আমি। এ তো নূতন শুনছি—ভূতে টাকা চুরি করিয়া কি করে ?

ওঝা। ভূতে টাকা লইয়া কি করে জানেন না ? আশ্চর্য্য তো ! শুনবেন ? ওড়ায়, ওড়ায়—ভূত ছাড়া টাকা ওড়াতে কি কেউ পারে ? তাদের সাহায্য চাই—তাদের দেখিয়া ভূতাবিষ্ট হইয়া মানুষ টাকা ওড়ায়। রাজা মহারাজ ধনী রাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি কেউ বাদ যায় না। গোটা এক একটা জাতি, এক একটা জাতিসঙ্ঘ ভূতাবিষ্ট হয়।

আমি। বাঃ, এত ওদের শক্ত ? তবে টাকা ফেরৎ দেওয়াইলেন কি করিয়া ?

ওঝা। টাকা ওদের উড়তেই থাকে। উড়ে পলায় না, ইচ্ছা করিলেই ধরে নিতে পারে।

আমি। স্ত্রীলোকটি টাকা ফেরৎ পেয়েছে ?

ওঝা। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করায় সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সজল নয়নে গুণী ওঝার কৃপার কথা ও অপ্রত্যাশিত ভাবে টাকা ফেরৎ পাওয়ার কথা বলিল।

আমি। রোজা মহাশয় এরূপ, ব্যাপার তো কখনো শুনি নাই—সত্য ব্যাপারটা কি ?

ওঝা। বাবু, এ সব ভৌতিক ব্যাপার বুঝা ও বুঝানো দুই দুষ্কর।

আমি। মহাশয়, আপনি শুধু গুণী নন, প্রকৃত দানী—নমস্কার।

ওঝা। (হো-হো হাস্য করিয়া) বাবু কি বলেন—এ সব ভৌতিক ব্যাপার বুঝা এবং বুঝানো দুই-ই কঠিন।

পিকিংএর নাম বিভ্রাট

"পিকিংএর আসল চীনা নাম হ'চ্ছে "পেই চিঙ," অর্থাৎ "উত্তরের রাজধানী" জাপানীরা যখন সারা উত্তর-চীন দখল করল, তখন স্বাধীন চীনের লোকেরা "পেই চিঙ, না বলে ব'লত "পেই ফিং" অর্থাৎ "উত্তরের শান্তি।" কম্যুনিষ্টরা এসে যখন আবার পিকিংকেই রাজধানী করল তখন আবার এর নাম দেওয়া হ'ল "পেই চিঙ"। "পেই চিঙ," এই কথাটির ক্যান্টনী উচ্চারণ হ'ল "পাক কিঙ,"। এই নামই ইয়োরোপীয়দের মারফৎ "পিকিং" নামে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

মাইকেল আরজিবাশেভ

[রাশিয়ান প্রাক্‌বিপ্লবকালীন উপন্যাস। বইখানি সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের 'ইভিনিঙ্‌ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "The artistry of the novel, brutal, direct, detached, courageous, desperately poignant, is not to be disputed." অর্থাৎ, এক সময়ে ইয়োরোপের প্রত্যেকটি দেশেই এই উপন্যাসটির প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর একমাত্র ইংল্যাণ্ডেই বইখানার বিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় দশ বছরের মধ্যে। এ থেকেই বোঝা যাবে যে বইখানা ইংরাজী পাঠক-মহলেও কি রকম জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল।

বর্ত্তমান সময়ে উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই আমি মনে করি। সম্প্রতি কিছু কাল ধরে আমাদের দেশে সংস্কারমুক্তি এবং প্রাক্‌বিপ্লবকালীন মনোভাবের বিস্তৃতির পক্ষে অনেক আলোচনা চল্‌ছে। কিন্তু এই সংস্কারমুক্তি যে কতোটা সুদূরপ্রসারী এবং তীব্র হতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের আন্দোলনকারীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এই উপন্যাসের নায়ক—স্যানিন—ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য বেরিয়ে-আসা যুবক। কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সব কিছু সম্বন্ধেই তার ধারণা সংস্কারমুক্ত। অথচ সে অ্যানার্কিষ্ট বা নিহিলিষ্ট নয়, তার জীবনাদর্শ শুধুমাত্র নেতিবাচক নয়; জীবনের প্রতি তার গভীর অনুরাগ, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার আশা-ভরসা অপরিসীম। বাঁধা পথের বাঁধন মেনে অনাগত কোনো স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের রামরাজ্যের কল্পনাবিলাস তার নয়। ও বলে, "এক সোনালী দিনের স্বপ্ন আমার চোখে,—যেদিন মানুষের আনন্দ সংগ্রহের পথে থাকবে না কোনো অন্তরায়, যখন নির্ভীক্ স্বাধীন মানুষ গ্রহণ করবার উপযোগী সব আনন্দকেই করবে আয়ত্ত।" কিন্তু কি উপায়ে তা' সম্ভব হবে? সে কি স্থূল চিন্তা, স্থূল কর্ম্ম বা কোনো অজ্ঞেয়বাদের অনুশাসন গ্রহণের দ্বারা?—না। স্যানিনের উক্তি: "মানব-সভ্যতা তো বৃথাই যুগ-যুগান্তরের চক্রবালে পেরিয়ে আসেনি; অজস্র নূতন ঘটনা-সংস্থানের দ্বারা এই সভ্যতা স্থূল চিন্তা, স্থূল কর্ম্ম এবং অজ্ঞেয়বাদের সম্ভাবনা করেছে তিরোহিত।"

অনেকে বলেন, স্যানিন বইখানা অশ্লীল। আমি তা' মনে করি না। প্রচলিত সংস্কারের মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ হচ্ছে স্যানিন। যুক্তিহীন তর্ক সে করে না, অন্ধবিশ্বাসে সে পথ হারায় না। এক অতি বলিষ্ঠ মনোভাব এবং অতি বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির দ্যোতনায় এ সমুজ্জ্বল।

বর্ত্তমান কালের বুদ্ধিজীবি তরুণ-তরুণীদের পক্ষে এই বইখানার যথেষ্ট মূল্য আছে বলেই আমি মনে করি। অনুবাদক]

এক

মানুষের আর পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে চরিত্র যখন গঠিত হতে থাকে, সেই বিশেষ সময়টি, ভাডিমির স্যানিনের, বাপ-মায়ের সঙ্গে

থেকে কাটেনি। সেই সময়টিতে তাকে দেখা-শোনা করবার মতো বা সহায়তা করবার মতো কেউ ছিল না; প্রান্তরের গাছের মতোই তার ব্যক্তিত্ব নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে গড়ে উঠেছিল।

অনেক বছর সে কাটালো পারিবারিক আবেষ্টনের বাইরে। যখন সে বাড়ী ফিরে এলো, তার মা এবং বোন লিডা তাকে প্রায় চিনতেই পারেনি। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্বর বা ভঙ্গিমা হয়তো সামান্যই বদলেছিল; কিন্তু কি যেন একটা অবর্ণনীয় নতুনত্ব, কেমন যেন একটা আলগা-আলগা ভাব, তার ব্যক্তিত্ব এবং চলা-ফেরায় এক পরিণত প্রকাশ ব্যঞ্জনা দিয়েছিল। যেদিন সে বাড়ীতে ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা; এমন ভাবে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে ঘরে ঢুক্‌লো, মনে হোলো যেন মাত্র পাঁচ মিনিট আগে সে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। ঘরের মাঝখানে সে যখন এসে দাঁড়ালো, দীর্ঘকায় ঋজু শরীরে চওড়া কাঁধ মেলে দিয়ে,—প্রশান্ত মুখে ঠোঁটের কোণে যেন কী এক বিদ্রূপের হাসি টেনে,—পথশ্রমের ক্লান্তি বা পরিজনের সঙ্গে পুনর্মিলনের উচ্ছ্বাসবিহীন তার সেই মূর্তির সামনে মা ও বোনের উচ্ছ্বসিত কলরব নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

যখন সে খেতে বস্‌ল, তার বোন মুখোমুখি বসে তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। অধিকাংশ রোমান্টিক মেয়েরা যা সাধারণতঃ করে থাকে, সেও তেমনিই তার প্রবাসী ভাইয়ের প্রেমে পড়েছিল। লিডা বরাবরই ভ্লাদিমিরকে এক অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করতো—রূপকথার রাজপুত্রের মতোই। তার দাদার জীবন যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বেদনা-সুন্দর নিঃসঙ্গ একাকীত্বে এত দিন বিরাজ করছিল!

"তুমি অমন ক'রে কী দেখছ আমাকে?" মৃদু হেসে স্যানিন জিজ্ঞাসা করল।

এই মৃদু হাসি ও তীক্ষ্ণ অবলোকন তার স্বভাব। কিন্তু আশ্চর্য্য, তাতে লিডা খুসী হোলো না। লিডার মনে হোলো যেন এই প্রকাশভঙ্গি অন্তঃসারশূন্য, তার অন্তরালে নেই কোনো অতীন্দ্রিয় ঘাত-প্রতিঘাতের পরিচয়। লিডা মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। তার পর অন্যমনস্ক ভাবে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে পর, স্যানিনের মা ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, "এবার তোমার সব খবর বলো? কি করছিলে সেখানে এত দিন?"

"কি করেছি?" হাসতে হাসতে স্যানিন বললো, "খেয়েছি-দেয়েছি আর ঘুমিয়েছি: কখনো কাজকর্ম্ম করেছি; কখনো বা কিচ্ছুই করিনি।"

প্রথমে মনে হোলো, ও বুঝি নিজের কথা কিছু বলতে চায় না। কিন্তু যখন ওর মা এক-এক করে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তখন ও একটু খুশীই হয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে সুরু করলো। কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, যে কারণেই হোক, শ্রোতাদের ওপর ওর কথাবার্তার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটা সে মোটেই লক্ষ্য করছিল না। তার কথা বলবার ধরণ ও অন্যান্য ব্যবহার যতো ভদ্রই হোক না কেন, একই পরিবারের লোকদের পরস্পরের ভেতর কথাবার্ত্তা বলায় যে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়, স্যানিনের কথাবার্ত্তায় তা ছিল না। প্রদীপের আলো যেমন চার পাশের জিনিষের ওপর সমান ভাবে বিচ্ছুরিত হতে থাকে,—স্যানিনের সহৃদয়তাও তেমনি সমান ভাবে চার পাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। বস্তুবিশেষের ওপর তা পক্ষপাতিত্বহীন।

খানিকটা পরে ওরা বাগানের দিকে গেলো এবং চত্বরের সিঁড়িতে গিয়ে সবাই বস্‌লো। লিডা এক ধাপ নীচুতে বসে মনোযোগ দিয়ে দাদার কথা শুনছিল। বুকের ভিতর সে অনুভব করলো এক চাপা ঠাণ্ডা। মেয়েলী অন্তরে সে ঠিক বুঝতে পারলো, ভাইকে সে কল্পনার চোখে যে রকম দেখেছিল, বাস্তবে তার চিহ্নও নেই। তার সামনে নিজেকে কেমন একটু ব্রীড়ানতা মনে হচ্ছিল—যেমন হয়ে থাকে অপরিচিত পুরুষের সামনে। সন্ধ্যার অন্ধকার তাদের চার পাশে ঘনিয়ে আসছিল। স্যানিন একটা সিগারেট ধরিয়ে তাদের বলতে লাগলো ভাগ্য তাকে নিয়ে কি রকম ছিনিমিনি খেলেছে এত দিন! কি রকম এক-এক সময়ে সে ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়িয়েছে গৃহহীন যাযাবরের মতো। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া ও তা' সম্বতোভাবে পরিহার করা তার জীবনে কি রকম একাধিক বার ঘটেছে।

লিডা নিঃসাড়ে তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছিল। চৈত্রী সন্ধ্যার অপস্রিয়মান আলোকে ধরণী মাত্রই যে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে লিডাও তেমনই এক অনির্বচনীয় সুষমা ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

স্যানিন তার নিজের জীবনের কথা সহজেই বলছিল, লিডা তখন অনুভব করছিল—এ তার কল্পনার রাজপুত্র নয়, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সে অসম্ভব দুঃসাহসের পথে করেনি কোনো দিন অভিযান, মাটিতে এর পা, অন্য দশ জনের মতোই সাধারণ মানুষ এ। অবশ্য খানিকটা বিশেষত্ব তার ছিল বৈ কি। কিন্তু কি যে সেই বিশেষত্ব—তা' লিডা ঠিক ধরে উঠতে পারছিল। কিন্তু এটা ঠিক যে তার দাদা করেনি কোনো মহৎ ত্যাগ বা মহৎ দুঃখবরণ। মেয়েদের সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার যে যথেষ্টই হয়েছে, সে তার কথাতেই বোঝা যাচ্ছিল। অন্যান্য কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখেও লিডা মনের মধ্যে একটা বিরক্তি অনুভব করছিল, বিশেষতঃ স্যানিন যখন বললো যে এক সময়ে অভাবের জন্য নিজের ছেঁড়া প্যান্টালুন নিজের হাতে রিপু করে নিতে হয়েছিল।

"সেলাই করতেও জানো না কি?"—কিছু আশ্চর্য্য কিছু বিরক্ত ভাবে লিডা জিজ্ঞাসা করলো।

"প্রথম প্রথম জানতুম না, তবে শিখে নিয়েছিলুম।"—স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে স্যানিন জবাব দিলো; সে অনুমান করেছিলো লিডার মনের ভাব।

যেন এত দিন লিডা স্বপ্নে দেখেছে সূর্য্যালোক; ঘুম ভেঙে যেতেই যেন দেখলো মস্তর কালো আকাশ;—লিডার স্বপ্নের মায়াপুরী টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল।

তার মা-ও মনমরা হয়ে যাচ্ছিলেন। সামাজিক পদমর্য্যাদা নিয়ে স্যানিনের যেখানে দাঁড়ানো উচিত ছিল, সেটা হয়নি মনে করতেই তার মন ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বলতে সুরু করলেন যে এ ভাবে সময় কাটাতে পারে না; স্যানিনের কর্ত্তব্য হচ্ছে অতঃপর একটু বুঝে-সুঝে চলা। কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে এই উপদেশ দেওয়া

হোল,—তিনি লক্ষ্য করলেন—তা সে খেয়ালই করছে না। ফলে, অল্প-বুদ্ধিমতী মেয়েদের মতোই তিনি চটে গেলেন, বারে বারেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, ভাবলেন ছেলে তাকে অশ্রদ্ধা করছে। স্তানিন কিন্তু না হোলো আশ্চর্য্য, না হোলো বিরক্ত; হাসিভরা মুখে নীরবে বসে রইল।

তবু, যখন জিজ্ঞাসা করা হোলো, "কি করবে তা হলে এর পর?"—সে হেসে উত্তর করলো, "যা হোক একটা কিছু।"

তার প্রশান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে বলবার ভঙ্গী থেকে,—তার মা অবশ্য কিছুই বুঝলেন না,—এক অর্থপূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা প্রকাশ পেলো।

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ, তোমারই ব্যাপার, যা ভালো বোঝো ক'র। এখন আর তুমি শিশুটি নও।"—একটু বাদে বললেন, "যাও না একটু বাগানে বেড়িয়ে এসো ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়! এসো লিডা; আমাকে বাগান দেখাবে এসো।" বললো স্যানিন। "বাগানটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছি।"

স্বপ্নের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে লিডা উঠে এলো। তার পর পাশাপাশি দু'জনে সরু পথ ধরে ছায়াচ্ছন্ন বাগানের গভীর নীলে প্রবেশ করলো।

স্তানিনদের বাড়ীটা প্রধান রাস্তার ওপর ছোট শহরের এক সীমান্তে ছিল। বাগানটা গিয়ে শেষ হয়েছে নদীর তীরে। আদ্যিকালের পুরোনো নড়বড়ে বাড়ী, প্রশস্ত ছাদ, মোটা-মোটা থামওয়ালা বারান্দা। অযত্নলালিত বাগানে শ্রীহীন সৌন্দর্য্য; ধূসর মোটা একটা মেঘের চাদর যেন মাটীর ওপর ছড়ানো হয়েছে। রাত্রে মনে হোতো অশরীরী আত্মারা আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ দোতলাটা বড়-বড় হল-ঘরের সমষ্টি;—সেখানে জানালায় ঝুলছে ছেঁড়া পরদা, মেঝেতে বিছানো আছে ধুলো-ভর্ত্তি কার্পেট। বাগানের ভেতর মাত্র একটি সরু পথ, মরা ব্যাঙ ও শুকনো পাতায় আকীর্ণ। দালানের বাইরে মৌশমী ফুলের কেয়ারী করা বাগানের এক প্রান্তে গ্রীষ্মকালে টেবিল পাতা হয়,—সন্ধ্যায় চা বা নৈশ আহার্য্য পরিবেশন ও গল্প-গুজবের জন্য। বাড়ীর বিরাট শ্রীহীনতার বিরুদ্ধে এই প্রান্তটুকু যেন বিদ্রোহের প্রতীক।

বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে এলে পর যেখানে নিশব্দ গাছগুলো মৌন সাক্ষীর মতো ওদের ঘিরে দাঁড়ালো, সেখানে হঠাৎ স্তানিন সজোরে লিডার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে চাপা-গলায় বললো: "ভারী সুন্দর হয়েছ তো তুমি! যে তোমাকে প্রথম ভালো-বাসবে কি সুখীই সে হবে!"

সুগঠিত মাংসপেশীর সুদৃঢ় স্পর্শে লিডার কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। লজ্জা-জড়িত ভাবে কেঁপে উঠে স্তানিনের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে দাঁড়ালো—যেন কোনো শিকারী হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে।

এতক্ষণে ওরা নদীর কিনারায় এসে পৌঁছলো। তটরেখার সীমানায় আধো-ডোবা লতা-পাতার থেকে উঠে-আসা একটা স্যাঁত-সেতে গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। নদীর ওপারে মাঠের ওপর গোধূলির প্রথম তারাগুলি এক-এক করে দেখা দিয়েছে।

এক পাশে সরে গিয়ে স্তানিন একটা মরা ডাল তুলে নিল, দু' টুকরো করে ছুঁড়ে ফেললো জলে; আবর্ত্তের ঘূর্ণিতে আরো কয়েকটি পাতা ও বস্তু-টুকরোর সঙ্গে এই ছুঁড়ে-ফেলা মরা ডালের টুকরো দু'টি একবার চকিতে ভেসে উঠে মাথা নীচু করে যেন স্তানিনকে ডাকলো, পরক্ষণেই ঘূর্ণি আবর্ত্তে কোন্ অতলে তলিয়ে গেল দ্রুত স্রোতে।

দুই

সন্ধ্যা ছ'টা। আকাশে তখনো সূর্য্য আছে, কিন্তু বাগানে সবুজ ছায়াগুলি ক্রমশঃই দীর্ঘায়ত হয়ে আসছে। বাতাস বেশ হাল্কা এবং মৃদু উত্তাপে মন্থর। চারি দিকে একটা প্রশান্তির আবহাওয়া। ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না সবুজ পাতায় ভরা লিণ্ডেন গাছের ছায়ায় বসে জ্যাম্ বানাচ্ছিলেন; টেপারি কুল এবং চিনি জ্বাল দেওয়ার গন্ধে জায়গাটা থমথমে হয়ে আছে। সারাটা বেলাই স্তানিন ফুলের গাছগুলির গোড়া পরিষ্কার করবার কাজে ব্যস্ত ছিল—আধ-মরা কয়েকটা ফুল ধুলো-বালির হাত থেকে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করবার চেষ্টায়।

"আগাছাগুলোকে আগে তুলে ফেলো"—ওর মা বললেন। তিনি মাঝে-মাঝেই ছেলের কাজ দেখছিলেন। "গ্রুন্‌স্কাকে বরঞ্চ বলো, ও-মেয়েটাই করে দেবে সব।"

স্তানিন মুখ তুলে তাকালো। পরিশ্রমে তার মুখখানা ঘামিয়ে তাতিয়ে উঠেছিল। "কেন?"—চোখের ওপর থেকে লম্বা চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, "হোক্ না আগাছা যত খুসী পারে। সবুজ কিছু দেখলে আমার দু'চোখ জুড়িয়ে আসে।"

"আশ্চর্য্যি বাপু তুমি!"—ছেলের ছেলেমানুষিতে মা'র মন খুসী হয়ে উঠেছিল।

"আশ্চর্য্য লোক আমি না, তোমরা।"—দৃঢ়তার সঙ্গে স্তানিন বললো। তার পর ও উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে এলো এবং টেবিলের কাছে একটা বেতের চেয়ার টেনে বসলো। ওর মনটা বেশ খুসী-খুসী ছিল। দূরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সূর্য্যালোক এবং নীল আকাশ—খুসীতে যেন তার জীবন-পাত্র উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল। কোলাহল-মুখরিত মহানগরী তার কাছে কোনো দিনই আকর্ষণীয় ছিল না। এখন তার চার পাশে রয়েছে প্রসন্ন সূর্য্যালোক ও প্রশস্ত মুক্তি; আগামী দিন আনে না তার সামনে কোনো সমস্যা; যাই ঘটুক আর যাই আসুক তার জীবনে,—সহজে তা গ্রহণ করবার মতো মন তার আছে। স্তানিন সজোরে চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে দিলো, নিজের দৃঢ় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তার তার মনে এক মাধুর্য্যপূর্ণ অনুভূতির সঞ্চার করলো।

মৃদু-মন্দ হাওয়া বইছে। সমস্ত বাগানটা যেন ফেলছে নিশ্বাস। অতি ক্ষুদ্র জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে চড়ুইগুলি কিচির-মিচির করছে। মিল—ওদের ফক্স-টেরিয়ার কুকুরটা জিভ মেলে দিয়ে কান পেতে শুনছে। গাছের পাতাগুলো যেন ফিস্-ফিস্ করে কানে কানে কথা কইছে;—কাঁকরের পথের ওপর তাদের ছায়া পড়েছে নিটোল হয়ে।

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না তাঁর ছেলের নিশ্চিন্ততায় একটু উৎকণ্ঠিতই হয়েছিলেন। ছেলেকে তিনি ভালোই বাসতেন, যেমন কি না তিনি তাঁর অন্যান্য সন্তানদের প্রতি মমতা বোধ করতেন; এবং ঠিক সেই কারণেই তিনি ছেলের আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে তাকে

উন্মুখ করে ওঠাতে চাইছিলেন। পিঁপড়ের মতো তিলে তিলে অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি তাঁর সংসারের কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। অগুণতি ইটের সারি দিয়ে তাঁর সংসারের কাঠামোটি গড়া,—কোনো অনতিকুশলী গৃহশিল্পীর হাতের ছাপ-পড়া হয়তো তা'—কিন্তু তার প্রত্যেকটি ইট তাঁর দীর্ঘ জীবনের সুখ-দুঃখের আস্তর লাগানো; হতে পারে তা নিরাময় শান্তির নয়, তাতে হয়তো লেগে আছে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, বেদনা ও ভাঙ্গা মনের ব্যর্থ প্রতীক্ষার সংখ্যাতীত দাগ।

"তুমি কি মনে করো, জীবন তোমার চিরকাল এই ভাবেই কাটবে?" ফুটন্ত জ্যামের পাত্রটির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চেপে মা জিজ্ঞাসা করলেন।

"এই 'চিরকাল' বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ?"—স্যানিন উল্টো প্রশ্ন করল। তার পর প্রবল শব্দে একটা হাঁচি দিল।

ম্যারিয়া আইভানোভ্না ভাবলেন, স্যানিন তাঁকে চটাবার জন্য ইচ্ছা করেই হাঁচি দিয়েছে। যদিও ও-রকম ধারণা করাটাই অস্বাভাবিক, তবু তিনি মুখ গোম্ড়া করে রইলেন।

স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে স্যানিন বল্ল, "তোমার কাছে থাকতে কী ভালোই লাগছে!"

"হ্যাঁ, খুব খারাপ নয়।"—জবাবে মা বললেন। তাঁর গৃহস্থালীর প্রতি ছেলের দরদ দেখে তিনি মনে মনে খুসীই হলেন।

স্যানিন তাঁর দিকে একবার তাকালো, তার পর খুব চিন্তাপূর্ণ সুরে বল্লো, "যত সব আজে-বাজে ব্যাপার নিয়ে যদি আমাকে তোমরা বিরক্ত না করতে, তা হলে আরো ভালো হোত।"

কথাগুলো ও তা বলবার ধরণ এমন পরস্পরবিরোধী যে ম্যারিয়া আইভানোভ্না ধরতেই পারলেন না, স্যানিন সত্যি কি বলতে চায়?

"তোমাকে দেখছি, আর তোমার ছেলেবেলাকার কথা ভাবছি। কী অদ্ভুতই ছিলে!"—গাঢ় স্বরে বল্লেন ম্যারিয়া।

"আর এখন—?" স্যানিন ভারী ফুর্ত্তি পেয়ে বল্ল। যেন কিছু নূতন মজার কথা শুনতে পাবে।

"এখন যা' হয়েছ, এমন অদ্ভুত তুমি কোনো দিন ছিলে না।"—জ্যামের হাতা নাড়তে নাড়তে ম্যারিয়া আইভানোভ্না দৃঢ় স্বরে বললেন।

"সে তো খুবই ভালো কথা।" হাস্‌তে-হাস্‌তে স্যানিন বললো। তার পর থেমে গিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "আঃ, এই যে নোভিকফ্ এসে গেছে।"

বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক সু-আকৃতির দীর্ঘকায় যুবক। লাল সিল্কের শার্ট তার অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ঈষৎ ধূসর নীলাভ চোখ দু'টিতে কেমন যেন ভদ্রজনোচিত অলস প্রকাশ-ব্যঞ্জনা!

"তোমার যেমন কাণ্ড! মারমুখো হয়ে বসে আছ! সব সময়েই ঝগড়া!" বলার ভঙ্গি যেন জড়িমা-জড়ানো, অন্তরঙ্গতা-মাখা। "ঈশ্বরের দোহাই, কি নিয়ে কলহ বলো তো?"

"ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মা মনে করেন, আমার না কি গ্রীক্ আদর্শের আর্য্যজনোচিত চোখা নাক মানাতো ভালো; যদিও আমি যা' পেয়েছি, তাতেই আমি বেশ খুশী আছি।"—স্যানিন নিজের নাকের দিকে তাকালো, এবং হাসতে হাসতে নোভিকফের প্রশ... কোমল হাত চেপে ধরল।

নোভিকফ্ হোঃ-হোঃ ক'রে হেসে উঠল। বাগানের দিক থে... এলো একটা প্রতিধ্বনি।

"ওহোঃ, বুঝেছি ব্যাপার। ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো।"

নকল আশঙ্কার ভঙ্গিতে স্যানিন বল্লো, "কী, তুমিও?"

"তোমাকে জব্দ করা চাই তো!"

"আঃ!"—স্যানিন চেঁচিয়ে বল্লো। "দু'জনে যখন এক জ... বিরুদ্ধে সপ্তরথীর মার সুরু করলে, তখন আমার পলায়নই যুক্তি-সঙ্গত।"

"না, না, আমিই আগে যাচ্ছি।"—বললেন ম্যারিয়া আইভানোভ্না। অকস্মাৎ যেন তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তার পর তাড়াতাড়ি জ্যামের সস্‌প্যানটা তুলে নিয়ে, কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ীর ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

"সিগারেট্ আছে?"—জিজ্ঞাসা করলো স্যানিন। মা চ... যাওয়াতে সে বেশ খুশীই হোলো।

ধীরে-সুস্থে নোভিকফ্ তার সিগারেট্-কেস্ বের করলে... "মাকে এ রকম ক'রে চটিয়ে দেওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না। ... যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।"—বল্লো উপদেশের মতো ক'রে।

"কি রকম চটালাম?"

"বেশ, দেখ—"

"তুমি 'বেশ দেখ' কথাটায় কি বলতে চাও? উনিই তো সদা সর্ব্বদা আমার পেছনে লেগে আছেন! আমি তো কারো কাছে কিছু চাই না, আমাকে একলা থাকতে দিলেই তো পারে ওরা!"

দু'জনেই এর পর চুপ করে গেলো।

"ভালো কথা, ডাক্তার, চল্ছে কি রকম বলো তো!"—কুণ্ডলাকি... সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে স্যানিন জিজ্ঞাসা করলো।

"খুব খারাপ।"

"মানে?"

"সব দিক দিয়েই। এই একরত্তি শহরে সব জিনিষই এ... ঝিমিয়ে-পড়া যে আমাকে মেরে ফেল্লো। কিছু করবার নেই।"

"কিছু করবার নেই? কেন, তুমিই তো বলেছিলে নিশ্... নেবার ফুরসৎ নেই?"

"আমি তা' বলছিনা। একটা লোক অষ্টপ্রহর কেবল রোগী দে... বেড়াতে পারে না। তা' ছাড়াও জীবনের আরেকটা দিক আছে।"

"কে তোমাকে ঠেকাচ্ছে জীবনের সে দিকটা উপলব্ধি করতে?"

"এ একটা জটিল প্রশ্ন।"

"কোন্ দিক দিয়ে জটিল? বয়সে তরুণ, দেখতে শুনতে ভালো, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য,—আরো কি চাও তুমি?"

সামান্য বিদ্রূপের সুরে নোভিকফ্ বললো, "আমার ধারণায় সেটা সব নয়।"

"সত্যি?"—স্যানিন হেসে বল্ল, "আমার তো মনে হয়, ... জীবনের পক্ষে যথেষ্ট।"

"আমার পক্ষে নয়।" নোভিকফ্ও হেসেই উত্তর দিল। তা... স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য সম্পর্কে স্যানিনের মন্তব্য তার ভালোই লাগ... যদিও মেয়েদের মতোই লজ্জাও পেলো।

স্যানিন একটু চিন্তান্বিত ভাবে বল্লো, "একটা জিনিষের তোমার অভাব আছে।''

"কি সেটি ?''

"জীবন সম্পর্কে একটি সম্যক্ ধারণা। বেঁচে থাক্‌বার একঘেয়েমী তোমার পীড়াদায়ক, তবু যদি কেউ তোমাকে পরামর্শ দেয়,—সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তুমি বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ো, তুমি তা পারবে না ; তোমার ভয় করবে।"

"কি ভাবে যাবো ? ভিখারীর মতো ? হুঁ—"

"হাঁ, ভিক্ষুকের মতোও ! তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে কি হয় জানো ?—মনে হয়, ধরো কেউ এক জন যেন দেশের উন্নতি করবার জন্য এমন কি চিরটা কাল সাইবেরিয়ায় জেলে কাটাতেও রাজী। কিন্তু তাকে যদি তার বর্ত্তমান দুর্বহ জীবনের পরিবর্তন করবার জন্য কিছু একটা করতে বলা হয়, অমনি সে বলে বসবে, 'তা কি করে হবে ? রোজগারের একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে চলবে কি করে ?'—মজার নয় কি ?"

"আমি তো এর ভেতর মজার কিছু পাচ্ছি না। তুমি যা বললে, তার একটার ভেতর আছে আদর্শের ব্যাপার, আর একটায় আছে—''

"বলো—''

"ঠিক বোঝাতে পারছি না।''—নোভিকফ্ বল্লো।

শ্রাগ দিয়ে স্যানিন বল্লো, "ঠিক এই ভাবেই সত্য ব্যাপারের ধামা-চাপা দাও তুমি। আমি কখনোই বিশ্বাস করবো না যে, দেশের উন্নতি করবার ইচ্ছেটা তোমার ভাল ভাবে খেয়ে থেকে বাঁচবার ইচ্ছের চেয়ে তীব্রতর।''

"এ একটা কথার মতো কথা বটে। সম্ভবতঃ তাই।''

স্যানিন হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্ল, "থামো থামো। তোমার একটা আঙুল যদি কাটা যেতো, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি দেশের অন্য যে কোনো রাশিয়ানের আঙুল কাটার চেয়ে বেশী অনুভব করতে। তাই কি না বলো ?''

"দর্শনশাস্ত্রের সিনিসিজম্‌ও বলা চলে।" বিদ্রূপ করেই নোভিকফ্ কথাটা উচ্চারণ করলো, যদিও বোকার মতোই তা হোলো।

"সম্ভবতঃ। কিন্তু কথাটা সত্যি। যদিও এই মুহূর্ত্তেই রাশিয়া বা অন্য অনেক দেশেই সুশাসন বলে কিছুই নেই, তবু এটা তোমাকে মানতেই হবে যে এই যে তোমার মনের অস্বস্তি তা সেই সু-শাসনতন্ত্রের অভাবের জন্য নয়, সেটা হচ্ছে তোমার নিজের অ-সুখী জীবনের জন্য। তবু যদি বলো যে, না, অস্বস্তিটা দেশের বৃহত্তর অভাববোধ থেকেই হয়েছে, তবে তা মিথ্যা। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে এই যে,''—স্যানিনের চোখে দুষ্টু হাসির ঝলক খেলে গেল,—"তোমার মনের অস্বস্তি তোমার নিজের ব্যক্তিগত অভাবের জন্যও নয়, সেটা হচ্ছে লিডা এখনো তোমার প্রেমে পড়েনি,—এই জন্য। বলো, তাই কি না ?"

"কি বাজে বক্‌ছো !" পরিধানের লাল শার্টটার মতোই নোভিকফ্ লাল হয়ে উঠল। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে স্যানিন কথাটা বললো যে, নোভিকফ্, যাকে বলে—একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। সুন্দর চোখ দু'টি তার বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌ল।

"বাজে বকছি মানে ? দু'টো চোখে তো তোমার লিডা ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই দেখা দেয় না। তোমার মুখেই সে কথা বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে।"

নোভিকফ্ ভ্রূকুঞ্চিত করলো ; মানসিক উত্তেজনা দমন করবার জন্য সে তখন দ্রুত পদচারণা সুরু করে দিল। যদি স্যানিন না হয়ে অন্য কেউ এ কথা উচ্চারণ করতো, তা হলে সে অপমানিত বোধ করতো নিশ্চয়। কিন্তু স্যানিনের মুখে এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেবেলা থেকে এক-সঙ্গে স্কুল-কলেজে সে স্যানিনের সঙ্গে পড়েছে, তাকে মন্দ লোক বলে সে ভাবতেই পারে না। তাই সে বল্ল, "দেখো স্যানিন, হয় তুমি ঠাট্টা করেই বলছ, নয় তো—"

"নয় তো কি ?" স্যানিনের মুখে হাসি।

লিডার নামোচ্চারণও নোভিকফ্-এর ভালো লাগে। কিন্তু স্যানিনের কথা,—যেন তার বুকের ওপর কে এক অত্যন্ত গরম হাত রাখলো !

দু'জনেই নীরব। খানিকটা পরে স্যানিন বল্লো, "বলো, তোমার অসমাপ্ত বক্তব্য শেষ করো। আমার তেমন তাড়া নেই।"

নোভিকফ্ প্রশ্ন করলো, "শ্রীমতী লিডিয়া পেত্রোভ্‌না কোথায় ?"

"লিডা ? কোথায় আর থাক্‌বেন ? দেখো গিয়ে পার্কের রাস্তায় মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের আধুনিকা মেয়েরা তো এই সময়টাতে সেখানেই গিয়ে ভিড় জমিয়ে থাকে।"

ঈর্ষায় নোভিকফের মুখ কালো হয়ে এলো। বল্লো, "এ রকম বুদ্ধিমতী সম্ভ্রান্ত মেয়ে কি ক'রে ঐ মাথা-মোটা লোকগুলোর সঙ্গে সময় নষ্ট করতে পারে ?"

"বন্ধু, লিডা সুন্দরী এবং তরুণী, স্বাস্থ্যও তার ভালো,—যেমন তোমারও ;—তোমার চেয়েও বেশী, কেন না, তার সব কিছুতেই আগ্রহ যথেষ্ট—যা তোমার নেই। সে সব জানতে চায়, জীবন দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়।"—স্যানিন উত্তর দিলো। "ঐ যে আস্‌ছে। তুমি এক-নজর দেখে নাও, আমি যা বল্‌লাম, মাথায় ঢুক্‌বে। দেখো, বলো, লিডা সুন্দরী না ?"

লিডা ভাইয়ের চেয়ে লম্বায় একটু খাটো, কিন্তু সৌন্দর্য্য তার অনেক বেশী। কমনীয় মাধুর্য্য তার স্বাস্থ্যকে দিয়েছে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ও ব্যক্তিত্ব। তেজোদীপ্ত তার চোখের চাউনি, গলার স্বরে মধুর সংগীত-মূর্চ্ছনা। সিঁড়ি বেয়ে সে ধীর অথচ গর্ব্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো। তার পেছন পেছনে ঘোড়সওয়ারের পোষাকে দু'টি সুবেশ যুবক সামরিক কর্ম্মচারী তাঁকে অনুসরণ ক'রে প্রবেশ করলো।

"কে সুন্দরী ? আমি কি ?"—সমস্ত বাগানটিকে গলার স্বরে, সৌন্দর্য্যে ও তারুণ্যে ভরপুর ক'রে দিয়ে লিডা জিজ্ঞাসা করলো। হস্তমর্দ্দন করবার জন্য সে নোভিকফের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, নোভিকফ্‌ও তার হাত ধরলো বটে,—কিন্তু লজ্জায় আরক্তিম হয়েই। লিডা নোভিকফের এই সলজ্জ প্রেম-নিবেদনে অভ্যস্ত ছিলো বলেই এ সব নজর করেনি।

আগন্তুক কর্ম্মচারী দু'টির মধ্যে যার চেহারা সুন্দরতর, সে বললো, "শুভ সন্ধ্যা ভ্লাডিমির পেত্রোভিচ্ !"

এর নাম স্যারুডিন, ঘোড়সওয়ার রেজিমেণ্টে এক জন ক্যাপ্টেন ; লিডার অন্যতম অনুরাগী। অন্য জনের নাম লেপ্টেনাণ্ট টানারফ্, সে স্যারুডিনকে আদর্শ সৈন্য বলে মনে মনে পূজা করে, ওর প্রতিটি ভাব-ভঙ্গিকে করে অনুকরণ। সে একটু উসখুস্ করলো, কিন্তু বল্‌লো না কিছু।

"হাঁ, তোমাকেই বলছিলাম"—স্যানিন বললো তার বোনকে।

"নিশ্চয়ই আমি সুন্দরী বৈ কি! তোমাদের বলা উচিত ছিলো 'অপরূপ সুন্দরী'!" খুশী-মনে হাসতে হাসতে স্যানিনের দিকে তাকিয়ে লিডা চেয়ারে গিয়ে বসলো। দু'হাত উঁচুতে তুলে ধ'রে,—এতে তার বুকের নিটোল রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল,—সে মাথার চুল ঠিক করতে লাগলো। বোধ হয় ইচ্ছা করেই একটা চুলের কাঁটা আঙুল ফসকে তার মাটিতে পড়ে গেল।

"আন্দ্রে পাভ্লোভিচ্, দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন!"—ন্যাকামির সুরে লিডা বললো টানারফ্‌কে।

লিডার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে স্যানিন, অন্যরা শুনতে পায় এমন স্বগতোক্তি করল, "কি সুন্দর!"—লিডা সলজ্জ ভাবে ভাইয়ের দিকে তাকালো।

লিডা বলল, "এখানে আমরা যারা আছি, তারা সবাই সুন্দর।"

"কি বললেন? সুন্দর? হাঃ! হাঃ!"—উজ্জ্বল দাঁত মেলে স্যারুডিন হেসে উঠল। "যে সুকুমার দেহ-কাঠামোটি আপনার চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছে,—কেবল সেইটি ছাড়া আর সব বিষয়েই আমরা যথাসম্ভব সুন্দরই বটে!"

স্যানিন একটু আশ্চর্য্যের স্বরেই বললো, "কী বাক্‌-প্রতিভা!" তার কথায় সামান্য শ্লেষের আভাষ ছিলো।

নোভিকফ্ তার কানে কানে বললো, "বলুক না ওরা।"

লিডা স্যানিনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলো। যা'র মানে হচ্ছে, "ভেবো না এই লোকগুলোকে আমি চিনি না। তোমার চেয়ে আমি একবিন্দুও বেশী বোকা না, আর আমি বেশ জানি যে আমি কি করছি।"

স্যানিন তার দিকে চেয়ে হাসল।

ততক্ষণে চুলের কাঁটাটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে; টানারফ্ সেটি সসম্ভ্রমে টেবিলের ওপর রাখল।

"দেখুন, আমার অবস্থা কি করেছেন আন্দ্রে পাভ্লোভিচ্!"—দুষ্টুমী ও ন্যাকামী মিশ্রিত সুরে লিডা বললো। "আমার চুলগুলো এমন জড়িয়ে ফেলেছেন! এখন আমাকে ঘরের ভেতর না গেলে চল্‌বে না।"

টানারফ্ তোৎলিয়ে কি একটা বলে যেন মাফ চাইবার চেষ্টা করল।

লিডা চলে যাবার পর,—সুন্দরী তরুণীর সান্নিধ্যে পুরুষ মাত্রই যে একটা বাধা অনুভব ক'রে থাকে,—উপস্থিত সবাই তার থেকে রেহাই পেয়ে যেন হাঁপ ছাড়তে পেলো। স্যারুডিন সিগারেট ধরালো। ওর কথা বলবার সময়, মনে হোতো, যেন কথাবার্ত্তার প্রধান অংশ গ্রহণ করতেই ও অভ্যস্ত: আর যা' বলছে—তা যেন তার নিজের সত্যিকার কথা নয়।

"আমি এইমাত্র লিডিয়া পেত্রোভ্‌নাকে গভীর ভাবে গান শেখাবার জন্য বলছিলুম। ওর এমন সুন্দর গলা,—বলা বাহুল্য, ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ওঁর।"

"অতি-উজ্জ্বল জীবনাদর্শ, বলতেই হবে!"—বিমর্ষ ভাবে নোভিকফ প্রতিবাদ করলো অন্য দিকে তাকিয়ে।

"কি দোষটা এতে দেখলেন?"—ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে প্রকৃতই বিস্মিত ভাবে স্যারুডিন জিজ্ঞাসা করল।

"কেন? একটা অভিনেত্রী কী? বেশ্যা ছাড়া কিছুই—" অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে নোভিকফ ফস্ ক'রে উঠল। ঈর্ষা জ্বালিয়ে মারছিল। যে তরুণীর দেহকে সে ভালবাসে তা' যে সব লোকের সামনে প্রলোভনকর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দেখা দেবে তাদের কাম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য,—এটা ভাবতেই শরীর-মন রী-রী করে উঠল।

স্যারুডিন আনিমীলিত চক্ষুপল্লব তির্যাক্ ক'রে বললো, "কথাটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

নোভিকফের দুই চোখ-ভর্ত্তি ঘৃণা। সে স্যারুডিনকে সেই লোক ব'লে মনে করতো—যে কি না তার প্রেয়সীকে ছিনিয়ে নিতে চায়; তা'ছাড়া তার সুন্দর চাউনি তাকে করতো বিরক্ত।

পাল্টিয়ে জবাব দিল নোভিকফ্, "না, না, মোটেই বাড়াবাড়ি হয়নি। মঞ্চের ওপর অর্দ্ধ-অনাবৃতা হয়ে দাঁড়ানো, এক কোন কামপ্রবণ দৃশ্যে নিজস্ব দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে দেখানো,—বিশেষ ক'রে তাদের কাছে যারা কি না দু'-এক ঘণ্টার মধ্যে বিদায় নেবে, যেমন তারা বিদায় নিয়ে থাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে বাইজি বা ঐ শ্রেণীর মেয়েমানুষদের কাছ থেকে! অতি মনোরম জীবনাদর্শ।"

"বন্ধু", স্যানিন বললো, "প্রত্যেকটি মেয়েলোক প্রথমেই চায় তার দেহগত সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ও প্রশংসা শুনতে।"

বিরক্ত ভাবে নোভিকফ্ নিজের ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। মুখে বললো, কি রকম ছ্যাব্‌লা অভদ্র মন্তব্য!"

অভদ্রই হোক্ আর যাই হোক্, কথাটা সত্যি।" উত্তর দিল স্যানিন। স্টেজেই লিডাকে মানাবে সব চেয়ে ভালো; আমি খুশী হয়ে তাকে সেখানেই দেখতে যাবো।"

যদিও স্যানিনের এই কথাটা অন্যদের মনে একটা কৌতুহলের সৃষ্টি করল, কিন্তু তা'রা অখুশীই হোল। স্যারুডিন, যে কি না নিজেকে অন্যদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ব'লে মনে করতো, এই কলহ-মুখর মন্থর আবহাওয়াটাকে দূর করবার দায়িত্ব নিজেরই ব'লে গ্রহণ করলো। সে বললো, "বেশ, আপনি তাহ'লে এই তরুণী ভদ্রমহিলার ভবিষ্যৎ জীবন ঠিক কি রকম ছকে গড়ে ওঠা উচিত ব'লে মনে করেন? বিয়ে করাটাই কি তার পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য পড়া-শুনা করবে? অথবা, তার যা ক্ষমতা আছে তার অকস্মাৎ সমাপ্তি ঘটাবে অসময়ে? তাহ'লে সেটা হবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত অপরাধ, যে প্রকৃতি তা'কে দিয়েছে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।"

"ওঃ!" স্যানিন অবিমিশ্র বিদ্রূপ নিয়ে উচ্চারণ করলো, "এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কা'রো মাথায় এ হেন অপরাধের ধারণা ঢোকেনি!"

নোভিকফ্‌ও এই বিদ্রূপের সুরেই হেসে উঠল, কিন্তু যথেষ্ট ভদ্র ভাবেই স্যারুডিনকে প্রশ্ন করলো, "অপরাধ কিসের? এক জন সুমাতা অথবা এক জন মেয়ে-ডাক্তার হাজারটা অভিনেত্রীর চেয়ে বেশী মূল্যবান।"

টানারফ্ ঘৃণার সুরে উত্তর দিল, "মোটেই না।"

"এ আলোচনাটা কি আপনাদের কাছে তেতো লাগছে না?"—স্যানিন তাদের জিজ্ঞাসা করলো।

প্রত্যেকেই মনে মনে এই আলোচনাটারই মুণ্ডপাত করছিল

বটে, ভাবছিল কি ক'রে এই অপ্রীতিকর আলোচনার সমাপ্তি ঘটানো যায়,—কিন্তু স্যানিনের কথায় কেমন যেন আহত বোধ করলো সবাই।

অদূরে বারান্দায় লিডা এবং ম্যারিয়া আইভানোভ্‌নাকে দেখা গেলো। লিডা তার ভাইয়ের কথার শেষাংশ শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু আলোচনার বিষয়-বস্তু বা কি উদ্দেশ করে ও-কথা বলা হয়েছে, তা' সে বুঝতে পারেনি। হেসে চেঁচিয়ে বললো, "আপনারা খুব শীগ্‌গিরই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। তার চেয়ে চলুন, সবাই নদীর দিক্‌টায় যাই। এখন ওখানটা বেশ মনোরম হয়েছে।"

ওদের সামনে দিয়ে সে যখন চলে এলো, তাঁ'র সুঠাম দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঈষৎ দুলে-দুলে উঠছিল; তার চোখে একটা রহস্যঘন চাহনি,—কিছু যেন বলতে চায়, কিছু যেন প্রত্যাশা করবার ইঙ্গিত দেয়।

"খাওয়ার আগে অবধি একটু ঘুরেই এসো না।"—বললেন ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না।

"সানন্দে।"—উৎফুল্ল হয়ে উঠল স্যারুডিন। হাত বাড়িয়ে দিলো লিডার বাহু ধারণ করবার জন্ম।

যেন ঠাট্টার মতো শোনায় এরূপ ভাবে নোভিকফ্ বললো, "আশা করি, আমাকেও অনুমতি দেওয় হবে আসবার জন্ম।"—চোখ প্রায় অশ্রুভারাক্রান্ত।

ঘাড় ফিরিয়ে লিডা উত্তর করলো, "কে তোমাকে ঠেকাচ্ছে?"

"হাঁ, হাঁ, তুমিও যাও," বললো স্যানিন। "আমিও নিশ্চয়ই আসতাম যদি না লিডা দৃঢ়বিশ্বাস করতো যে, আমি তার ভাই।"

লিডা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তির হাসি হাস্‌ল।

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না সত্যিই অসন্তুষ্ট হলেন স্যানিনের কথা শুনে। "তুমি ও-রকম বোকার মত কথা বলো কেন?" বল্‌লেন, "বোধ হয় নিজেকে খুব বাহাদুর মনে করো?"

স্যানিন পাল্‌টিয়ে বল্‌লো, "সত্যিই আমি ভাবিনি কোনো দিন যে আমি খুব বাহাদুর।"

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ছেলেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। স্যানিন কখন যে ঠাট্টা করে, আর কখনই বা সহজ সুরে গভীর কথা বলে, তা তিনি ধরতেই পারতেন না। যে সামাজিক আবেষ্টনে স্যানিন জন্মেছে, শিক্ষা-দীক্ষার ফলে, তার সামাজিক মর্য্যাদা সেই আবেষ্টনেই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখুক সমাজের আর পাঁচ জনার মতো, এইটাই ছিল তাঁর কামনা। তিনি অবশ্য জানতেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার ফলে মানুষের অবচেতন গুণাবলী ভেসে ওঠে সজ্ঞান মনের ওপর তাদের, যেখানে প্রত্যেকটি ছাত্র দেখা দেয় বিপ্লবিরূপে, শাশকশ্রেণী যখন দেখা দেয় ওদের চোখে বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদিরূপে। কিন্তু যদি ছাত্র হয়ে ওঠে রক্ষণশীল, এবং শাসকশ্রেণী হয়ে ওঠে অ্যানার্কিষ্ট, তাহলে তো বিপদের কথা! স্যানিনের হয়ে ওঠা উচিত ছিল অন্য কিছু, এখন যা' হয়েছে তা নয়। বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত-মহলে স্যানিনের ব্যবহার ও কথাবার্ত্তার প্রতিক্রিয়া তিনি যা দেখছেন, তাতে তাঁকে আশংকিতা করে তুলেছে।

স্যানিনও জান্‌তো এ কথা। সে প্রথম প্রথম ভেবেছিল মাকে বোঝাবে তাঁর শ্রেণীসুলভ ভাবধারার মূল্যহীনতা। কিন্তু তা না ক'রে সে মা'র কথায় হেসে উঠত, পরে উঠে ঘরের ভেতর চলে যেত। সেখানে গিয়ে বিছানায় খানিকটা শুয়ে থাকত; চিন্তা করত। তার মনে হোত, যেন এক দল লোক এই পৃথিবীটাকে একটি মস্ত সামরিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চায়; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সেখানে স্থান নেই। এক-এক সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধেও চিন্তা করত। কিন্তু তা এতই বিশ্রী লাগত যে, শেষ অবধি ওর ঘুম পেতো, আর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হওয়া অবধি ঘুমিয়েই থাকত।

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলেন। অপসৃয়মান সন্ধ্যালোকের দিকে তাকিয়ে কি একটা অনির্দ্দিষ্ট কেঁপে উঠলেন।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—নির্ম্মলকুমার ঘোষ

উত্তর

১। রাজা রামমোহন রায়। ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ৩। ভগিনী নিবেদিতা। ৪। স্বামী বিবেকানন্দ। ৫। ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ৬। **Antidisestablishmentarianistically.** ৭। বিটোভেন। ৮। ইংরেজী ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। ৯। চীনদেশবাসী। ১০। প্রতি দিনে ১,৬০,১,৬০৪ মাইল অথবা প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল। ১১। শ্রীচৈতন্যদেব। ১২। জন মিলটন ও লর্ড বায়রণ। ১৩। ভারতবর্ষে। ভারতের কাছে আরবীয়েরা শিক্ষা করে। আরবীয়দের দ্বারা ইউরোপে প্রচারিত হয়। ১৪। এ্যাল এডিসন। ১৫। মানুষ গণনা। যার ইংরেজী অর্থ 'সেন্সাস'। ১৬। স্বর্গত সার ইউ, এন, ব্রহ্মচারী। ১৭। চন্দ্র থেকে ১'২ সেকেণ্ড। সূর্য্য থেকে ৮ মিনিট। ১৮। কবীর দাদু। ১৯। মৌচাকে। ২০। হ্যালহেড সাহেবের বাঙলা ব্যাকরণ।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
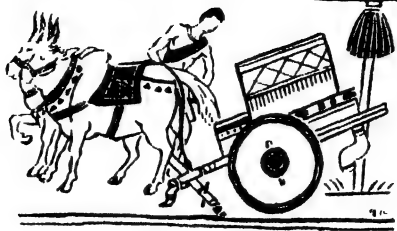
বাংলার জেলা ও গ্রামাঞ্চলের পথঘাট

৺রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে দেশে যে বিরাট নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে, তার আগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় মূলতঃ ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। যাদের কোনও অভাব ছিল না, তাদের প্রধান কাজ ছিল ধর্ম্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন এবং তাদের অর্থ প্রধানতঃ পণ্ডিতগণ ও দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণেই ব্যয়িত হত। ব্যক্তিগত সুখের জন্য তাঁরা ধন সঞ্চয় করতেন না; দান-ধ্যানে অধিক অর্থব্যয় এবং উত্তরাধিকারীদের অনুরূপ খরচের সংস্থানের জন্যই তাঁরা ধন সঞ্চয় করতেন। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁরা উদাসীন ছিলেন। এক জন সামান্য প্রজার প্রয়োজন মেটাতে যা লাগতো গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী জমিদারের ব্যক্তিগত প্রয়োজন তার চেয়ে কম ছিল। কিন্তু জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁরা হাজার হাজার টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিবেশী জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে মামলা ও বিবাদের ফলে গ্রাম্য-জীবনের শান্তি প্রায়ই নষ্ট হত। তবে এ জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা, রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটদের কুবিচারই দায়ী কিম্বা অধিবাসীদের মামলা ও মারপিট করার অস্বাভাবিক প্রীতিই এ জন্য দায়ী, তা বলা কঠিন।

জনকল্যাণমূলক কার্য্যাবলীর মধ্যে পথ এবং পুকুরই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। কেবল দান-ধ্যানের ফলেই যে এই সব হয়েছে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থও পথ-নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননে সাহায্য করেছে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি অবশ্য সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসী এবং পথিকদের পানীয় জল সরবরাহের জন্যই এগুলি খনিত হয়েছিল। এখনও অনেক বড় বড় পুকুর ও তাদের পাহাড়ের মত উঁচু পাড় দেখলে এদের পেছনে কত অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা বুঝতে পারা যায়। পথ এবং সেতু-নির্ম্মাণে দেশীয় জমিদারগণ এর চেয়েও অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করেছেন। বড় বড় ট্রাঙ্ক রোডগুলি ছাড়া জেলা ও গ্রামের মধ্যে সংযোগসাধনকারী গুরুত্বপূর্ণ পথগুলির বেশীর ভাগই দেশবাসীর দানের টাকায় তৈরী হয়েছে। এ জন্য বিভিন্ন পরিবার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। বর্দ্ধমান, নাটোর, নদীয়া, কাশিমবাজার, পাইকপাড়া ও ভূকৈলাসের রাজারা পথ-নির্ম্মাণের জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। রাজা সুকময়, পরলোকগত রাজা বৈদ্যনাথ, পরলোকগত রাজা নরসিংহ ও পরলোকগত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরিবারবর্গের দানও এ বিষয়ে কম নয়। বীরভূমের স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বসু একটি পথ তৈরী করতে দু'লাখ টাকা ব্যয় করেন। স্বর্গীয় বাবু কালীনাথ মুন্সী টাকী থেকে বারাসাত পর্য্যন্ত পথ তৈরী করেন। ঢাকার পরলোকগত রাজা কালীনারায়ণ চৌধুরী ভাওয়াল থেকে জয়দেবপুর পর্য্যন্ত পথ তৈরী করেন। রংপুরের জমিদার বাবু কৃষ্ণমোহন দাস জেলায় একটি প্রয়োজনীয় পথ-নির্ম্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মিঃ গ্লেজিয়ার রংপুর রেকর্ডসে মন্তব্য করেন, "জমিদারগণ জেলার বহু সংখ্যক পথ মেরামত করান।" ১৮২০ সালে কলিকাতার বাবু রামমোহন মল্লিক কুল্পী হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত একটি পথ-নির্ম্মাণ এবং কপিল মুনির নামে একটি মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় বহনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু মূর্ত্তি-পূজা প্রসারে সহায়তা করা হবে বলে 'সাগর দ্বীপ সমিতি' তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

রাজা পিয়ারীমোহন

নীচে হুগলী জেলার কতকগুলি প্রধান পথ ও সেতুর তালিকা দেওয়া হল। এ থেকে জমিদারদের কাজ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হবে:—

সেতু ও পথের নাম	দৈর্ঘ্য	নির্ম্মাতা
ভাস্তাড়া হইতে ত্রিবেণী	১৬ মাইল	ভাস্তাড়ার জমিদার
জনাই হইতে সরস্বতী	৮ মাইল	জনাইএর জমিদার

সেতু ও পথের নাম	দৈর্ঘ্য	নির্মাতা
জনাই হইতে কোন্নগর	৭ মাইল	জনাইএর জমিদার
বৈদ্যবাটী হইতে গোবিন্দপুর	৮ মাইল	সিঙ্গুরের জমিদারগণ
বৈদ্যবাটী হইতে ত্রিবেণী	২২ মাইল	জমিদারবৃন্দ ও এফ, এফ, কমিটি
চুঁচুড়া হইতে ধনিয়াখালি	২৫ মাইল	ঐ
হুগলী হইতে ভারবাসিনী	১২ মাইল	ঐ
পাণ্ডুয়া হইতে কালনা	১৮ মাইল	ঐ
হাওড়া হইতে জগৎবল্লভপুর	১২ মাইল	ঐ
শ্রীরামপুর হইতে শালকিয়া পর্য্যন্ত পথটি পাকা করা	১৩ মাইল	ঐ
বালী সেতু		ঐ
ধানিয়াখালি রোডে তুইটি সেতু		ঐ
নসরাই, ত্রিবেণী ও সাতগাঁয়ে তিনটি সেতু		নোয়াপাড়ার জমিদার

জমিদারবা তাঁদের জমিদারী বন্যা থেকে রক্ষার জন্যে যে সকল বাঁধ নিম্মাণ করেছেন, সেগুলিও পথের কাজ করে। বর্ত্তমানে যে কয়েকটি বাঁধ সরকারী ব্যয়ে বজায় রাখা হয়, সেগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী নেবার আগে থেকেই ছিল। এই কয়েকটি ছাড়া হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও অন্যান্য জেলায় যে অসংখ্য বাঁধ দেখতে পাওয়া যায়, তাহা স্থানীয় জমিদারগণের কৃত।

১৭৯৩ সালের ৮নং রেগুলেশনে জমিদারদের উপর তাদের জমিদারী রক্ষার জন্য বাঁধ নিম্মাণে ও তার রক্ষণাবেক্ষণের সকল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সকল বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের উপর সরকারের ভূমি-রাজস্বের নিরাপত্তা নির্ভর করলেও জমিদারগণ তাদের নিজেদের স্বার্থে সরকারী সাহায্য না নিয়ে বাঁধ নিম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রবৃত্ত হন।

ভূমি-রাজস্বের মীমাংসার পরেই পথ-ঘাটের ব্যাপারে সরকারের বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত হয়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সেনা-চলাচলের এবং সরকারের বেসামরিক কর্ম্মচারীদের সুবিধার জন্য বড় বড় ট্রাঙ্ক রোড নিম্মাণ ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। ১৮১৬ সালে ফেরীর জন্য শুল্ক বসান হয়। ১৮১৯ সালের ৬নং রেগুলেশন অনুযায়ী ঘোষণা করা হয় যে, ফেরীর শুল্ক বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা কেবল পথ, সেতু ও পয়ঃপ্রণালী নিম্মাণের জন্যই খরচ হবে। ১৮৫১ সালে সরকার ৮নং আইন দ্বারা স্থির করেন যে, সরকারী খরচায় যে সব পথ বা সেতু তৈরী করা বা সারান হবে, সে সকলের উপর সরকার শুল্ক ধার্য্য করবেন। সরকার ঘোষণা করেন, এই শুল্ক থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে, তা কেবল পথ-ঘাট নিম্মাণ ও সংস্কারের জন্য খরচ হবে। এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ, convict labour fund, জেলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি থেকে পাওয়া টাকা এবং ১৮১৩ সালের ৪নং রেগুলেশন দ্বারা নদীয়ার নদী সমূহ ও কলিকাতার খাল-সমূহের উপর ধার্য্য শুল্কের টাকা নিয়ে Amalgamated District Road Funds গঠিত হয়। District Ferry Fund Committee সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে এই অর্থ-ভাণ্ডার দীর্ঘকাল পথ ও সেতু নিম্মাণ ও সংস্কারের অর্থ জোগায়।

এখন যে সব Road Cess Committee আছে, Ferry Fund Committeeগুলিতে বেসরকারী সদস্য তাদের চেয়ে অনেক কম ছিল। জেলার কালেক্টর Ferry Fund Committeeর চেয়ারম্যান হতেন, এই কমিটি খুব জনপ্রিয় ছিল। এই কমিটি বাংলার বিভিন্ন জেলায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পথ নিম্মাণ করে। Ferry Fund Committeeগুলির জন্য সরকার যে টাকার বরাদ্দ করেন, তার পরিমাণ বর্ত্তমানের তুলনায় খুব কম ছিল। ১৮৫৭ সালে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর বাংলার বিভিন্ন Ferry Fund Committeeকে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হয়, ১৮৫৮-৫৯ সালে ৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আর Road Cess Committeeগুলি ১৮৭৮-৭৯ সালে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এবং ১৮৭৯-৮০ সালে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা খরচ করে। জেলার প্রধান সড়ক নিম্মাণে Ferry Fund Committeeগুলি জমিদারদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেত। এ ছাড়া গ্রাম্যপথগুলি নিম্মাণ ও সংস্কার জমিদার এবং প্রজারা করতেন। কোন জমিদার কোন কাজের সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন, রাজী না হলে প্রজারা চাঁদা তুলে বাকী টাকা সংগ্রহ করতেন।

জমিদার ও প্রজাদের দ্বারা কৃত গ্রাম্যপথগুলি জলনিকাশে কোন বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং ১৮৬১ ও ১৮৭১ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের কতকগুলি জেলায় সংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টিতে কতটা সাহায্য করেছিল, তা অবশ্য ভাববার কথা। সরকারী ও বেসরকারী তদন্তের পর জানা গেছে যে, ঐ সকল জেলার মধ্যে অধিক মাত্রায় ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা রোগ সৃষ্টি ও বিস্তারের প্রধান কারণ এবং রেলওয়ে বাঁধ ও বড় বড় জেলা সড়কগুলিই জলনিকাশে প্রধান প্রতিবন্ধক। গ্রামের পথগুলিকে ও দোষ দেওয়া যায়, কারণ ঐ সকল পথে জলনিকাশের জন্য কোন সংযোগ পয়ঃপ্রণালী কাটা থাকে। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে এ বিষয়ে খুব ঐক্য থাকত। কাজেই Road Cess ধার্য্যের প্রথম প্রস্তাবে জমিদার প্রজাদের তরফ থেকে প্রবল আপত্তি উঠবে, এটা বিস্ময়কর নয়। এই ব্যবস্থায় জমিদার ও প্রজাদের বিপুল অর্থব্যয় ও স্বার্থত্যাগের কথা উপেক্ষা করা হয়। এতে তারা অপমানিত বোধ করেন। কলকাতায় এর প্রতিবাদে জনসভা হয় এবং সেই সভায় বলা হয়, বাংলার অধিবাসীদের সঙ্গে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে, Road Cess ধার্য্য করা হলে তা লঙ্ঘিত হবে। কিন্তু প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্যবস্থাটি কার্য্যকরী করা হয় এবং সেই থেকে দেশের জমির সহিত সংশ্লিষ্ট সকল লোককে পথ নিম্মাণ ও সংস্কারের জন্য প্রতি বছর কর দিয়ে যেতে হচ্ছে। এই করের পরিমাণ সমগ্র রাজস্বের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগের সমান। ১৮৭৭ সাল থেকে এই টাকার সঙ্গে Public Work Cess Fund থেকে টাকা দেওয়া হতে থাকে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের শাসনাধীন বাংলার Road Cess Committeeগুলি ১৮৭৮-৭৯ সালে [illegible] লক্ষ ৬ হাজার টাকা এবং ১৮৭৯-৮০ সালে ৪০ লক্ষ [illegible] হাজার টাকা খরচ করে। প্রত্যেক বছর এই বিপুল অর্থ দেশবাসীর যে বিশেষ উপকার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, [illegible] দেশের লোক মনে করে যে, তাদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হয়েছে, তার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয়নি।

টুপ্ টুপ্ করে অবিরত ঝরে পড়ছে..

..আর তা দিয়ে
তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন
রকমের টায়ার!

জাতীয় অগ্রগতি
অব্যাহত রাখে

DX-344

Road Cess Committeeতে সাধারণতঃ কতিপয় বেসরকারী সদস্য থাকলেও একে ঠিক প্রতিনিধিস্থানীয় বলা চলে না। কয়েক জন সদস্য সম্ভবতঃ জেলার একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু অন্যান্য অংশগুলির কোনও প্রতিনিধি থাকে না। আইনে মধ্যে মধ্যে সদস্য পরিবর্তনের কথা থাকলেও অধিকাংশ জেলায় তা কার্য্যকরী হয় না। কর্মচারীদের বেতনাদি এবং জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পথ সংস্কারের খরচ বাদে কমিটীগুলির হাতে যে টাকা থাকে, তা জেলার অধিবাসীদের প্রয়োজন না জেনেই খরচ করা হয়।

মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়ার ন্যায় জেলা ছাড়া অন্যান্য অংশে পাকা রাস্তাগুলির ব্যয় বহন করতে মোটা টাকা খরচ হয়। এই সকল পথ মেরামতের জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। এতে অধিবাসীদের সকলে অবশ্য উপকৃত হয় না। কতকগুলি পথ সহরে, কতকগুলি বাজারে, তীর্থস্থানে বা রেল-ষ্টেশনে গিয়েছে বটে, কিন্তু সকল অধিবাসীর উপকারে লাগে এমন পথের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই জেলার প্রত্যেক প্রজা (জমির অধিকারী) ও রায়তের কাছ থেকে নেওয়া টাকায় গড়া রোড-ফণ্ডের টাকা উপরোক্ত প্রকার পথের জন্য খরচ করায় যে অবিচার হয়, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পথের যে ক্ষতির জন্য মেরামতের প্রয়োজন হয়, তা পথচারীদের দ্বারা হয় না, গাড়ী-ঘোড়ার জন্যই হয়। সুতরাং এই গাড়ী-ঘোড়ার উপর কর ধার্য্য করে পথ-সংস্কারের টাকা যোগাড় করাই যুক্তিসঙ্গত। অধিকাংশ পথেই গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী এত বেশী চলে যে, এ সকলের উপর সামান্য মাত্রায় রেজিষ্ট্রেশন ফি ধার্য্য করলে অনায়াসে পর্য্যাপ্ত অর্থ সংগৃহীত হতে পারে। এতে যাদের জন্য পথ, তাদের উপর থেকে ভার কমে যাবে এবং Road Cess Fundএর খরচাও অনেক কম হবে।

এখন অধিক সংখ্যক পথ নির্ম্মাণ এবং বর্ত্তমান পথ ও পয়ঃপ্রণালীগুলির সংস্কারই বাংলার গ্রামবাসীদের প্রধান দাবী। Road Cess ধার্য্যের ঠিক আগেই ভারত-সচিব বলেছিলেন, "ভারত সরকারের এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, তাঁরা বিশ্বাস ভঙ্গ করছেন না এবং এ জন্য প্রজাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার তারা যে কর দিচ্ছে, তার বদলে তারা কি উপকার পাচ্ছে?" কিন্তু এ কথা বলা সত্ত্বেও প্রত্যেক জেলায় হাজার হাজার না হলেও এমন শত শত গ্রাম আছে, যেখানে গত দশ বৎসরের মধ্যে পথ নির্ম্মাণ বা মেরামতের জন্য Road Cessএর একটি টাকাও খরচ করা হয়নি। ১৮৭৮-৭৯ সালের Bengal Administration Reportএ বলা হয়েছে, গ্রাম্য-পথের সংস্কার ও উন্নয়নের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে বটে, তবে কতকগুলি জেলায় এ জন্য জমা টাকার সবটা খরচ করা হয়নি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে, তাও পর্য্যাপ্ত নয়।" ১৮৭৯-৮০ সালের Administrationএ বলা হয়েছে বটে যে, প্রায় সকল জেলাতেই গ্রাম্য-পথের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে, তবুও ধ'রে নিতে হবে যে, এ মন্তব্য কেবল জেলার অল্প কয়েকটি গ্রাম সম্পর্কেই। উপেক্ষা করলে রোগের প্রতিকার হয় না। কয়েকটি পথের আংশিক উন্নতিতে সরকার ও জনসাধারণ যদি মনে করেন যে, অসহায় লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়েছে, তাহলে খুব ভুল করা হবে। আসল কথা এই যে, জেলার প্রধান সড়ক ও সেতুগুলি বজায় রাখতে Road Cess Fundএর টাকা এত বেশী খরচ হয়ে যায় যে, গ্রাম্য-পথের উন্নয়নের জন্য খুব কম টাকাই বরাদ্দ করা হয়। জমিদার ও রায়তদের কাছ থেকে Road Cess নেওয়ার ফলে তারা আর গ্রাম্য-পথ নির্ম্মাণ বা মেরামতের জন্য টাকা খরচ করতে চান না বা তাঁদের আর ক্ষমতাও নেই। শিক্ষা-বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির ফলে লোকে ব্যক্তিগত সুখের জন্য লালায়িত হয়েছে আর দান-ধ্যানের স্পৃহা কমে গেছে। এখন লোকে গ্রাম্য-পথের উন্নয়নের জন্য Road Cess Fundএর দিকে চেয়ে থাকে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে যে, পথ-উন্নয়নের ভার আর Road Cess Committeeর উপর রাখা উচিত নয়। লর্ড লিণ্ডহার্ষ্টের ন্যায় 'ক্ষমতার অধিকারী লোকদের কাজের প্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।' গ্রাম্য-পথের উন্নয়নের জন্য Road Cess Fundএর টাকা বণ্টনের সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করলে ভাল হয়। সরকার এরূপ নিয়ম ক'রতে পারেন যে, সকলের ব্যবহারযোগ্য পথ নির্ম্মাণ বা মেরামতের পর যে টাকা বাঁচবে, তা বিভিন্ন গ্রামকে তাদের Road Cess Fundএ দেয় টাকার অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়া হবে। এই টাকার পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি পায়, সে জন্য এই টাকা দু'-তিন বছর রিজার্ভ করে রাখা যেতে পারে। এই ভাবে Road Fundএর টাকা বণ্টনের ফলে জেলা কমিটীতে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না থাকার অভিযোগ আর থাকবে না। রেল-ষ্টেশনে যাবার পথগুলির উন্নতির জন্য জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের অনেক টাকা মঞ্জুরীর প্রস্তাব করে লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর এই সকল প্রদেশের অধিবাসীদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। গ্রাম্য-পথের প্রশ্নটির গুরুত্ব কম নয়, কারণ এতে Road Cess ধার্য্যের সময় গ্রামবাসীদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা রয়েছে এবং এর উপর সরকারের সম্মান ও সরকারের প্রতি লোকের আস্থা নির্ভর করছে।—(Selections from the writings and speeches of the Late Raja Peary Mohon Mukherjee C S I, MA, BL the book was published by his grandson Sj Tarak Nath Mukherjee BSC. MLC in 1924 from Rajendra Bhabon, Uttarpara)

—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনূদিত।

ভারতীয় রেলপথ

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় রেল লাইন সমূহে ৩৩৮খানা স্পেশাল ট্রেণ যাতায়াত করেছে। এর মধ্যে ১৬৩খানা সাধারণ দ্রব্য, ৪৫খানা খাদ্য-শস্য, ৩৬খানা ম্যাঙ্গানীজ, ৫৩খানা লবণ, ২৮খানা গোল আলু, ১৭খানা পেট্রল, ১০খানা সিমেণ্ট, ৬খানা লৌহ এবং ইস্পাত এবং ২খানা কলের লাঙল বহন করেছে। এই মাসে রেলপথে কাপড় চলাচল করেছে ১,৪৪,১১৩ গাঁট। অক্টোবর মাসে কাপড় চলাচলের পরিমাণ ছিল ১,২৩,৮১০ গাঁট।

প্রাচীন ভারতের জলযান

প্রমথনাথ শীল

ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন কাল হইতে সুসভ্য দেশ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এবং ভারতের সভ্যতা নানা দিকে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও সুবিজ্ঞ পাঠকের নিকট পরিচিত। সেই জন্য এই প্রবন্ধের অল্প সীমার মধ্যে সেগুলি লইয়া আমরা আলোচনা করিব না, শুধু তাহার সভ্যতার দোলনা—জলযান, এই বিষয় লইয়া আমরা খানিকটা পরিমাণে সুমহান্ অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। ভারতের জলযানের উন্নতির জন্য যে বাণিজ্যের প্রসার লাভ হইয়াছিল এবং এই কারণে ইহা যে সভ্যতার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও দ্বিধা নাই। আমরা বর্তমান ভারতের জীর্ণ, নিঃস্ব এবং নগ্ন রূপ দেখিতেছি, তাহা ভারতের রূপ ছিল না ···সুজলা, সুফলা এবং শস্যশ্যামলাই প্রকৃত মাতা। কিন্তু আজ তাহার বিপরীত দিক কেন, এই প্রশ্নই হয়ত সাধারণের মনে জাগিবে। প্রকৃত পক্ষে ইহার কারণ কিছুই নয়—একমাত্র পরাধীনতার হোমানলে বৈদেশিক বাণিজ্যের আহুতি দান।

ভারত কি বহু প্রাচীন কাল হইতেই জলযানের ব্যবহার জানিত, এই প্রশ্নের উত্তর এবং কতকগুলি প্রমাণ আমরা এখানে দিতে চেষ্টা করিব। পুরাণ বলিয়া থাকে যে, আমাদের এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। দ্বীপ বলিতে বুঝায় যে, যে স্থলভাগের চারি পার্শ্বে জল তাহাকে দ্বীপ বলা হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুবকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং স্বয়ম্ভুব তাঁহার সাতটি পুত্রকে এক-একটি দ্বীপের রাজা করিয়াছিলেন। একথা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সকল দ্বীপে যাইবার জন্য নিশ্চয়ই জলযানের ব্যবস্থা ছিল, তাহা না হইলে তাঁহারা কিরূপে যাইবেন? দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, যমপুরী যাইতে হইলে কথিত বৈতরণী নদী পার হইতে হয় এবং এই কারণে তখনকার দিনে নিশ্চয়ই কোনরূপ নৌকার ব্যবস্থা ছিল। "বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে" ইহাই প্রমাণ। বিমান মানেও জলযান। তার পর আমরা পড়িয়া থাকি যে, বশিষ্ঠ মুনি আমাদের বাংলা দেশের সপ্তগ্রাম হইতে নৌকাযোগে বিদেশ গিয়াছিলেন। দুর্গা পূজার সময় মহামায়া নৌকায় আগমন করিয়া থাকেন এই প্রবাদও আছে। চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি পূর্বে বিদেশে উৎকৃষ্ট নৌকায় বাণিজ্য করিতেন। বিজয়সিংহ আট শত সেনা লইয়া সিংহল জয় করিয়াছিলেন। দেশ অধিকার করিতে হইলে নৌশক্তিও যথেষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা এইখানে পাইয়া থাকি। বুদ্ধদেবের সময় ভারতীয়গণ বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং তখনকার দিনে দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস না থাকায় পোষা কাক সঙ্গে লইতেন। মাঝ-সমুদ্রে যখন দিক্‌ভ্রম হইত বা কাছাকাছি স্থল দেখিবার উদ্দেশ্যে মাস্তুলের উপর অবস্থিত কাকগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া হইত, এবং নিকটে স্থল থাকিলে সেদিকে উড়িয়া যাওয়ার ফলে নাবিকেরা জলযানের মোড় ঘুরাইত। এই সকল ঘটনাগুলি হইতেছে খৃষ্ট জন্মাইবার অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্বে। ইহার পর অর্থাৎ আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তখন তিনি পাঞ্জাব হইতে সিন্ধু নদ এবং পারস্য উপসাগর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। টলেমীর বিবরণে আলেকজাণ্ডারের অধীনে এই ব্যাপারে প্রায় দুই হাজার উৎকৃষ্ট নৌকা ছিল। ভারতের জলযানের ইতিহাস যে খুবই গৌরবময়, তাহারও সাক্ষী দেয় ভারতের কতকগুলি নৌকা-চিহ্নিত প্রাচীন মুদ্রা। নৌকা যে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রধান অঙ্গ তাহারই শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে মুদ্রায় স্থান লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ করা যায় না। ব্রতকথার মধ্য দিয়া ভারতের প্রাচীন এবং গৌরবময় জলযানের স্মৃতি জাগাইয়া দেয় আমাদের দেশের কুলবধূরা। 'সুয়া দুয়া' প্রভৃতি ব্রত আজিও অতীতের সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছে। উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রাচীন ভারতের জলযানের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহা প্রমাণ করিতেছে। তখনকার দিনে শুল্কের হার কিরূপ ছিল তাহারই কিছু বিবরণ মনু-সংহিতা হইতে দেওয়া বাহুল্য বলিয়া মনে করি। যথা—

১। রিক্ত শকটাদি পারের মাশুল ১ পণ

২। এক জন পুরুষ বহনযোগ্য ভারে $\frac{1}{2}$ পণ

৩। পশু এবং স্ত্রীলোক পার করিতে $\frac{1}{4}$ পণ

৪। ভারশূন্য মানুষ পার করিতে $\frac{1}{8}$ পণ

৫। দ্রব্যপূর্ণ যান সকল পার করিতে হইলে দ্রব্যের গুণাগুণ অনুসারে শুল্ক ঠিক করা হইত, অর্থাৎ 'what traffic can bear' এই নিয়ম চলিত ছিল।

৬। শূন্য আধার বা খালি জিনিসের জন্য সামান্য মাশুল দিতে হইত।

৭। পরিচ্ছদহীন পুরুষ যাত্রীকে অল্প শুল্ক দিতে হইত।

৮। দ্বিমাস বা তদূর্ধ্ব কালের গর্ভবতী স্ত্রী, ভিক্ষু, পরিব্রাজক, বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণগণকে পারাপার করিবার জন্য কোন শুল্ক দিতে হইত না।

৯। জলপথে দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা এবং গমনকাল বিবেচনায় পারাপার মূল্য স্থির করা হইত।

১০। নাবিকদের দোষে যাত্রীদের দ্রব্য নষ্ট হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ নাবিকেরা দিত, কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনায় নষ্ট হইলে তাহারা রেহাই পাইত। নৌ-শুল্ক নির্ধারণের রীতি দেখিলে ইহা বুঝা যায় যে, দিতে সক্ষম (ability to pay) এবং মূল্য অনুযায়ী শুল্ক বা what traffic can bear এই প্রথায় শুল্ক-নীতি চালু ছিল এবং যে রাজ্যে আধুনিক সভ্যযুগের মতন রাজকার্য পরিচালিত হইত, তাহা কত উন্নত এবং গৌরবময়, তাহার জন্য পাঠক নিশ্চয়ই গর্বিত হইবেন।

ভারতের জলযানের এই অপূর্ব গরিমা বহুকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে আকবরের রাজত্ব কালেও, এমন কি, একমাত্র সিন্ধু নদে ব্যবসার জন্য ৪০,০০০ নৌকা চলাচল করিত। পৌরাণিক যুগ হইতে বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত ভারত এই জলযানের বলে বলীয়ান হইয়া বিদেশে বাণিজ্যের দ্বারা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল, দেশের মধ্যে একাত্মবোধ আনিয়াছিল, জাতীয় শিল্প পরিপুষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু কালে সব চুরমার হইয়া যাইল!

প্রবন্ধের শেষাংশে আমরা একটা কথা বলিতে চাই···স্বাধীন ভারত অতীত ভারতকে অনুসরণ করুক। ইহার মানে এই নয় যে, স্বাধীন ভারত পুরানো গণ্ডীর স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিক। অতীতের গৌরবময় জলযানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানে তাহা চালু করুক, তাহা হইলে দেশ আবার উন্নতি করিবে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে ভারত জলের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, আজ বৈদেশিক বাণিজ্যে শতকরা মাত্র কুড়ি ভাগ তাহার অধীনে! ইহা কি বিড়ম্বনা নয়?

বিমানযাত্রীদের বিশ্রাম-ভবন

স্টেজ কোচের যুগে যে রকম পুরানো ধরণের বিশ্রাম-ভবনের ব্যবস্থা করা হত, এখন পৃথিবী জুড়ে বিমান চলাচল ব্যবস্থার প্রসার বেড়ে যাওয়ায় বিমানযাত্রীদের সুবিধা-বিধানের জন্যে সেই রকম আধুনিক ধরণের বিশ্রাম-ভবন নানা স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে। আগেকার আমলের বিশ্রামাগারের মত এই সব বিশ্রামাগারে যাত্রীদের আরাম ও বিশ্রামের জন্যে নানা রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে তফাৎ এই যে, আগেকার বিশ্রাম-ভবনগুলির মধ্যে পরস্পর ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক মাইল করে। কিন্তু এখনকার বিশ্রাম-ভবনের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে হাজার হাজার মাইল।

বি-ও-এ-সি (বৃটিশ ওভারসীজ এয়ার ওয়েজ কর্পোরেশন) পৃথিবী জুড়ে ১৭৫,০০০ মাইল বিমান-পথ খুলেছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের আরামের জন্য তাঁরা আকাশের উপরে যেমন, মাটির উপরেও তেমনই সুব্যবস্থা করেছেন। বিমান নামবার যে সব জায়গায় আগে থেকেই প্রথম শ্রেণীর হোটেল আছে, সেই সব জায়গায় সেই সব হোটেলে যাত্রীদের থাকতে দেওয়া হয়। আর যেখানে সে রকম কোন হোটেল নাই, সেই সব জায়গায় বি-ও-এ-সি কোম্পানী যাত্রীদের জন্যে বিশ্রাম-ভবনের ব্যবস্থা করেছেন।

এক ব্যক্তি সম্প্রতি বি-ও-এ-সির বিমানে কলকাতা থেকে ইউরোপে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, থামবার প্রত্যেক জায়গাতেই বিমানযাত্রীদের জন্যে "বিশ্রাম-ভবন" আছে, আর ঐ সব বিশ্রাম-ভবনে উচ্চ শ্রেণীর হোটেলের অনুরূপ সুব্যবস্থা আছে। ঐ সব বিশ্রাম-ভবনে যাত্রীরা মনোরম আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করেন ও ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করেন।

করাচীতে বিমান-ঘাঁটির পাশেই "স্পীডবার্ড হাউস" নামে এই রকম একটি বিশ্রাম-ভবন আছে। এখানে ১৪৬ জন বিমান-যাত্রী ও বৈমানিকের স্থান হতে পারে। শোবার স্বতন্ত্র ঘরগুলির ব্যবস্থা ও সাজ-সজ্জা বেশ মনোরম ও সুরুচিপূর্ণ। সব শোবার ঘরেই জলের সুব্যবস্থা আছে। তা'ছাড়া প্রত্যেক শোবার ঘরে একটি করে ঝুলান তাক, ড্রেসিং টেবিল, শয্যার পাশে [illegible] পাখা আছে। আর আছে, বরফ-দেওয়া পানীয় জল রাখবার থার্মোফ্লাস্ক। যাত্রীদের আরাম-বিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি এই সব শোবার ঘরের পরিকল্পনা করেছেন।

যে সব ঘর সকলেই ব্যবহার করেন সেগুলিতে তাপ [illegible] ব্যবস্থা আছে। অবসর-বিনোদনের জন্যে আরাম-কেদারায় সজ্জিত প্রশস্ত কক্ষ, তাস-খেলার ঘর, লেখবার ঘর এবং চিত্রশোভিত একটি মনোরম "ইনটাইম বার" আছে। একটি নাপিতের দোকান ও একটি 'সোভেনির ষ্টোর'ও এই বিশ্রাম-ভবনে আছে।

শিশু ও মা-যাত্রীদের সুবিধার জন্যে এখানে একটি [illegible] আছে এবং এখানের একটি পর্দা-দেওয়া ঘরে বিশেষ ধরণের [illegible] প্লে-পেন, বাচ্চার চেয়ার, রকিং হর্স ও নানা রকমের খেলনা আছে। শিশুরা এখানে সুশিক্ষিত নার্সদের তত্ত্বাবধানে থেকে ক্লান্তি দূর করে।

সি. ও. এ. সি'র ষ্ট্র্যাটোক্রুজার বিমানে রাতের বেলায় এক জন যাত্রী বিছানায় শুতে যাচ্ছে। বিমান চলেছে ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে।

তার পর [illegible] অগাষ্টায় "[illegible] হাউস" নামে একটি বিশ্রাম-ভবন আ[illegible] প্রাচ্য, আফ্রিকা [illegible]নের মধ্যে "সোল [illegible] বোটের" [illegible] পথে অগাষ্টা [illegible] তরণ-স্থান। ক[illegible] ও যুক্তরাজ্যের [illegible]ন্দিন সার্ভিসের [illegible] আর্গোনাট ও [illegible] বিমান যাতায়া[illegible] সেগুলি অগাষ্টায় [illegible] সেগুলি রোম [illegible] য়াত করে। যাঁ[illegible] পরিদর্শন কর[illegible] তাঁদের কায়রো[illegible] পরিবর্ত্তন করে [illegible] ধরতে হয়।

অগাষ্টায় এ[illegible] বিশ্রাম-ভবনটি আগে [illegible] ইটালীয় নে[illegible] ছিল। কি[illegible] তার মধ্যে [illegible]

the New
HINDUSTHAN
HINDUSTHAN
Rs. 9375/-
ex-plant
(excluding
local taxes
etc.) lowest
in its field.
মাঝারি আকারের মোটর গাড়ী হলে
কি হবে, বড় গাড়ীর যা সুখ-সুবিধা
সবই পাবেন—ভারতীয় আবহাওয়ার
পক্ষে একেবারে আদর্শ মোটর গাড়ী।
ASP-HM-41
HM
HINDUSTAN MOTORS
LTD
CALCUTTA

আবহাওয়ার চিহ্নমাত্র নাই। ইটালীর কারিগর ও বি-ও-এ-সি'র কর্ম্মচারীরা স্থানীয় লোকদের সাহায্যে এই ব্যারাকটিকে এখন সিসিলির আদর্শে একটি আধুনিক হোটেলে পরিণত করেছে। এখানে বেশ বড় বড় জানালাযুক্ত সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত অভ্যর্থনা-কক্ষ, খাবার-ঘর, শৌচ-কাজের ঘর প্রভৃতি আছে। এখান থেকে বন্দরের দৃশ্য বেশ ভাল ভাবেই দেখা যায়। আরও নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা এখানে আছে। সিসিলির আদর্শে খোদাই-করা নানা রকমের পাথর এবং পম্পেইর ধ্বংসস্তূপ থেকে সংগৃহীত সুন্দর পানপাত্র ও অপরাপর জিনিষ দিয়ে এই বিশ্রাম-ভবনটি সজ্জিত।

এই বিশ্রাম-ভবনে ১৬০টি কক্ষ আছে। শয্যাগুলি ফিকে লাল রং-এর মশারি দিয়ে ঢাকা। দক্ষিণ-আফ্রিকা ও বৃটেন হতে আগত ফ্লাইং বোটগুলি যখন অবতরণ করে, তখন রাত্রিকালে শতাধি[ক] খাবার-ঘরে সমবেত হতে পারে। বিভিন্ন দেশের যাত্রীরা সমবেত হয়ে যখন গল্প-গুজব করে, তখন এই ঘরটিকে ডাইনিং সেলুনের মত মনে হয়। ইটালীয় ওয়েটাররা যা[ত্রীদের] সুবিধার প্রতি সর্ব্বদাই তৎপর থাকে। স্প্যাঘেটি, জেলি, কমলা লেবু, চিয়ান্তি প্রভৃতি নানা রকম খাদ্য এই ভবনে যাত্রীদের খেতে দেওয়া হয়।

'স্পীড বার্ড' বিমান-পথের সর্ব্বত্র এই রকম বিশ্রাম-ভবন। এই বিমান পথ ভারতবর্ষকে বৃটেন, উত্তর ও দক্ষিণ-আ[মেরিকা], পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, চীন, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুক্ত [করেছে]। ১৯৪৯ সালে প্রায় দেড় লক্ষ যাত্রী [এই] সিভ বিমান-পথে ভ্রমণ করেছেন ও [এই] বিশ্রাম-ভবনে অবস্থান ও বিশ্রাম করে[ছেন]।

এখন দ্রুততর ভ্রমণ-ব্যবস্থার [ফলে প্রয়োজন] বেড়ে গেছে। সেই জন্যে এই সব [বিশ্রাম-ভবন] এখন শুধু আংশিক ভাবেই ব্য[বহার] করা হয়। এখনকার বিমানগুলিকে [অনায়াসে] "উড্ডীয়মান হোটেল" বল[তে] পারে। আকাশের উপরে [উড্ডীয়মান] সকল বিমানের মধ্যে বৈদ্যুতিক রন্ধ[নশালা] থেকে নানা রকম সুমিষ্ট খাদ্য [খেতে] দেওয়া হয়।

এই সব বিমানের মধ্যে রাত্রি [যাপন] করবার জন্যে ঘরে বেড়াবার স্থানও [আছে,] বসবার জন্যে সুকোমল আসনও আছে। যে সব ডবল-ডেক ষ্ট্রে[টোক্রুজার] আটলান্টিকের উপর দিয়ে মার্কিণ [যুক্তরাষ্ট্র] ও কানাডায় যায়, সেগুলিতে রাত্রি[র] সময়ে নিদ্রা যাবার স্থানেরও ব্যবস্থা [আছে।] নিদ্রা যাবার বার্থগুলি বড়। কোম[ল] গদি ও আবরু-রক্ষার জন্যে পর্দ্দা [আছে।] চার জন করে ষ্টুয়ার্ড যাত্রীদের সুখ-স্ব[াচ্ছন্দ্যের] প্রতি যত্নশীল থাকে। এই সব উ[ন্নত] আরামের ব্যবস্থাই যদি থাকল, তবে [আর] "ফ্লাইং হোটেল" আর থাকল না কি?

বি, ও, এ, সি'র যাত্রী—কামরায় বসে আছেন এক জন মহিলা সাংবাদিক। চলন্ত বিমান। সংবাদ লিখছেন, খুব শীঘ্র প্রেসে পাঠাতে হবে।

সাথি

"পথের সাথি নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহ নমস্কার।
বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।

ওগো নবপ্রভাতজ্যোতি, ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীগীতা দেবী

ভারতীয় দর্শন বলছে, ব্যক্তি-জীবন মহাজীবনের একটা অংশ মাত্র। বাষ্প যেমন মহাসমুদ্র থেকে উত্থিত হয়, আবার মহাসমুদ্রে লয়প্রাপ্ত হলেই হয় তার নির্ব্বাণ লাভ, ব্যক্তি-জীবনও তেমনি মহাজীবনের সংমিশ্রণেই মুক্তি পায়। বেদান্তবাদীরা বলছেন সোঽহং; অর্থাৎ 'আমিই সেই মহাশক্তি।'

অনির্দ্দেশ্যের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ...র সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম শক্তির গতি ...। এ ভাবে বিবর্ত্তনের ফলে ...এল বোধি, অহঙ্কার, মন ইত্যাদি। ...গোর অর্থাৎ সত্ত্বভাব পরিপূর্ণ ...শিত হোলো যার ভেতর—সাধারণ ...গোষ্ঠীর চিন্তাধারার সীমা অতিক্রম ...ন যারা তাঁরাই হচ্ছেন মহাপুরুষ ...দের আবির্ভাব এবং তিরোভাব ...মৃত্যু সাধারণের স্মরণীয় ঘটনা। ...নাথ এই মহাপুরুষদেরই অন্যতম।

...জাতি যত বেশী সত্যপিপাসু সেই ...র ভেতরই মহাপুরুষের সংখ্যা সব ...বেশী। এদিক দিয়ে বিচার করলে ...লার তুলনা বোধ হয় সারা ...নিয়ায় ...না। গত একশ' বছরের ভেতর ...র ইতিহাসে স্মরণীয় বাঙ্গালী মহা-...দের অভাব নেই। তার মধ্যে ...কাংশই যে কবি, দার্শনিক, চিন্তা-...ভাবুক ও প্রেমিক, তার কারণ ...ঙ্গালী জাতির প্রতিভা ও চরিত্রের ...বৈশিষ্ট্য। এই স্মরণীয় মহাপুরুষদের মধ্যে ...মাদের পূজনীয় বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্র-নাথের নাম বাংলার গৌরবাকাশে অন্যতম জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র। ...রই জন্মতিথি পালন করবার জন্য আজ এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

কাঠ-খোদাই —অনিমা মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

আমাদের নিজস্ব পরিস্থিতি, আমাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার জন্যই বছরে একবার আমরা এই স্মরণীয় মহাপুরুষদের জন্মতিথি পালন করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হই। আমাদের চলার গতির ...পথে ক্ষণিকের জন্য আমরা স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করি আমাদের জাতির গোড়ার ইতিহাস—আমাদের বর্ত্তমান পরিণতি। এই কারণেই মহাপুরুষদের জন্মতিথি যুগে যুগে সাধারণ মানবগোষ্ঠীর কাছে এত শ্রদ্ধার সংগে গৃহীত হয়ে থাকে। এ সমস্ত মহাপুরুষদের বিনাশ নেই। জাতির জীবনে, ইতিহাসের পাতায়, সামাজিক জীবনে এঁদের প্রভাব কখনই মুছে যায় না—এঁরা চিরন্তন। শাশ্বত এঁদের কীর্ত্তিমালা। এই কীর্ত্তিমালা পেছনে ফেলে মহাপুরুষরা এগিয়ে যান তাঁদের সুদূর যাত্রাপথে, সে জন্য তাঁদের নাগাল আমাদের ক্ষমতার বাইরে। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন আমাদের ভাব-জগতের বাইরে; তাঁর কীর্ত্তিসমূহ পেছনে ফেলে তিনি সেই মহাজীবনের আস্বাদ লাভের জন্য অগ্রসর হয়েছেন: সে জন্য তাঁরই ভাষায় আমরা তাঁকে বন্দনা করছি:—
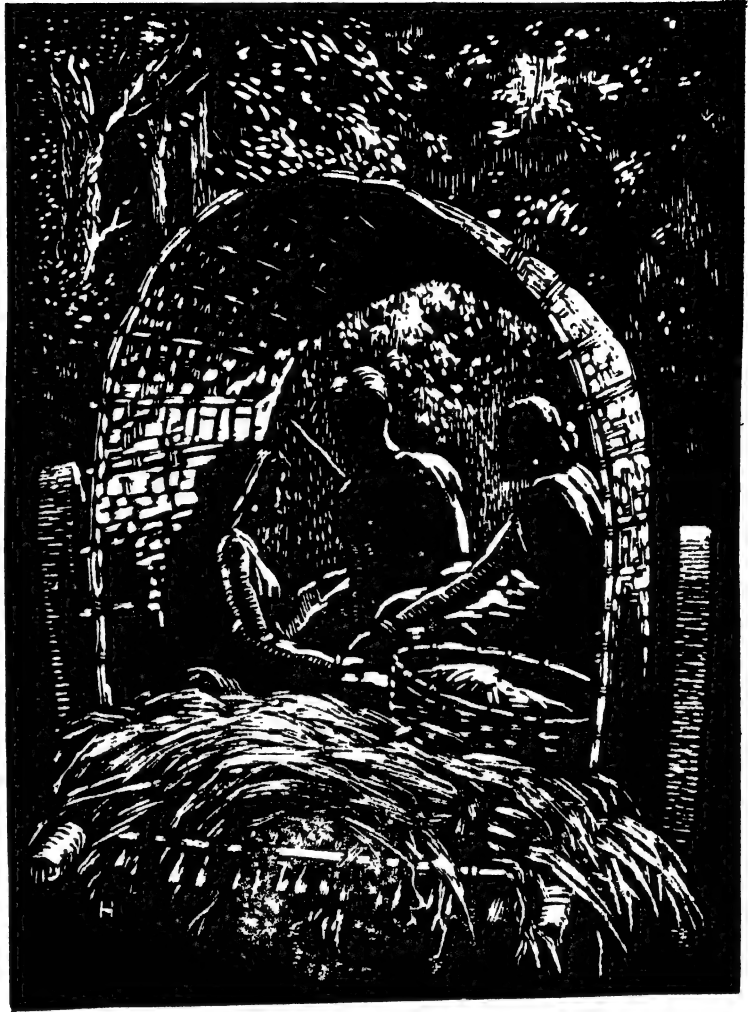
"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারংবার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।"

এই বৈশাখ মাস রবীন্দ্রনাথের জন্ম মাস। এ জন্য আমার এ শ্রদ্ধার্ঘ বিশেষ ভাবে আমাদের সেই জাতির জনকের প্রতি নিবেদন করছি। সারা জীবন ধরে তিনি যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখেছেন, সেই সুন্দর সেই আরাধ্য হচ্ছেন শান্তির দেবতা। সংগ্রামের ভেতর দিয়ে

তিনি শান্তির অমৃত এনেছেন ; প্রচণ্ড বিভীষিকার ভেতর ছড়িয়েছেন নিস্তব্ধতার অপূর্ব আস্বাদ। অব্যক্তকে রূপ দিয়েছেন বাণীতে, মনের সুপ্ত বাসনার উন্মোচন করেছেন ভাষার ভেতর দিয়ে।

ইংরেজ আমলের পর ভারতীয় সত্তা যখন ক্রমে বিলুপ্ত হচ্ছিল জগতের বুক থেকে ; সারা জগৎ যখন অনাদরে অবহেলায় ভারতকে করেছিল সমাজচ্যুত, সেই সময় ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করে ভারতকে সংস্কৃতির আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে এলেন রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। ইংরাজী ভাবের মাধ্যমে এঁরা তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সফলকামও হলেন না পূর্ণ ভাবে। ভারতের এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিণতির নিঃশেষে অবসান ঘটাবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ় পদক্ষেপে নির্ভয়ে আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করে অগ্রসর হলেন সামনের দিকে ; নিঃশঙ্ক চিত্তে সারা জগতের সামনে তুলে ধরলেন তিনি ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশের কিয়দংশ পরিচয়। কিন্তু এতে কি ভারত পেল তার পূর্ণ মর্য্যাদা ?—কবির বীণায় ধ্বনিত হোলো অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ; সে ঝঙ্কারে অপূর্ব্ব রসে বেজে উঠল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত রূপ। ভারতীয় দর্শনকে মেলে ধরবার জন্য, ভারতের শাশ্বত রূপ প্রকাশ করবার জন্য বিরাট মহাসমুদ্র সিঞ্চন করে ছোট্ট একটা ঝিনুক উপহার দিলেন তিনি পাশ্চাত্যে। জন্ম-জন্মান্তরের মানুষের প্রাণের গোপন পরিচয় বাণীর রূপ ধরে প্রকাশিত হোলো ; পথিক পথ চলতে চলতে থেমে গেল—স্তব্ধ হোলো তার চলার গতি ; নির্ব্বাক্ ভাবে স্পন্দিত চিত্তে স্তম্ভিত হয়ে পথিক অনুভব করল নতুন ভাবে তাঁর প্রাণের সুর—এ কি ! এ ভাবে কোন দিন কেউ ত শোনায়নি সেই অতি পুরাতনকে সুন্দরের মনোহর রূপে ; অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তকে কেউ পারেনি মানসীর রূপ ধরে সামনে এনে দাঁড় করাতে—বহু দিন পর দুষ্মন্ত নিজের ভুল বুঝতে পারল। অবহেলিতা, অনাদৃতা শকুন্তলাকে গ্রহণ করল সাদরে, শকুন্তলার জীবন পরিচয় হোলো দুষ্মন্তের মাথার মণি। রোমা রোঁলা, সোপেনহাওয়ারের বীণার তারে বেজে উঠল ভারতীয় দর্শনের জয়-গাথা। সোপেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন, শিল্প-বিপ্লবের ফলে বৃটেনে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার চেয়ে আরও অধিক আলোড়ন সুরু হবে—যে দিন সমগ্র জগৎ শ্রদ্ধায় মেনে নেবে ভারতীয় দর্শন। কবি নোবেল প্রাইজে অলঙ্কৃত হলেন। কিন্তু এখানেই এর পরিসমাপ্তি নয়, নতুন পথের সন্ধান দিলেন তিনি—শ্রদ্ধায় অবনত শিরে সমুদ্র-পারের ভাই-বোনেরা কবিকে আসন দিল তাদের কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু এই কি কবি-পরিচয় ?

অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বালবার জন্য মহাপুরুষেরা ধরায় অবতীর্ণ হন—মলিনকে ধুয়ে-মুছে করেন নতুনের সন্ধান ; মলিনের ধ্বংস-স্তূপের ওপর গড়ে গেলেন অ-মলিনের বিরাট সৌধ। সেই মহাপুরুষের বেশে আবির্ভূত হলেন কবি- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। জগতের কাছে ভারতের অবদান অনেক—এই সুমহান্ কঠিন কর্ত্তব্য পালনের জন্য এগিয়ে এলেন তিনি তাঁর বীণা হাতে নিয়ে ;—ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে অভিভূত বাল্মীকির মত তিনিও সৃষ্টি করলেন পুরাতনের ভেতর নতুনের আস্বাদ। ভারতে বিশেষতঃ বাংলার নিজস্ব রূপ প্রকাশ পেল তাঁর বীণা-ধ্বনিতে —যার জন্য বাংলা আজও সারা জগতের নমস্য। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী একাধিক মহাপুরুষের আবির্ভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ... উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথকে আজ আরও বিশেষ ভাবে মনে পড়ার ... জাতির ভাগ্যাকাশে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ... শক্তিশালী মন্ত্রের একাংশ নিয়েও ভারতবাসী যদি আবার ... হতে পারে তবে মেঘ যাবে সরে : মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ... যাবে সূর্য্যের ভাস্বর জ্যোতি। কবির আশীর্ব্বাদে ভারত ... আবার শক্তির প্রতীক বহন করবে ; সারা জগতের ... আবার দেখাতে সক্ষম হবে তার অতীত-ভবিষ্যতের সম্মিলিত গৌ... ইতিহাস।

জন্মতিথি পালনের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপন ... পাওয়া। মানুষ পেতে চায় একান্ত নিবিড় ভাবে তার ... নিভৃত কক্ষে। তাঁরই ভাব তাঁরই অনুভূতি দিয়ে সে আ... করে সেই মহাপুরুষের ; এ জন্যই জন্মতিথির সার্থকতা। ... সবার মাঝেই কবির স্থান ; সবাই নিজস্ব রূপ দিয়ে গঠন ... কবির কাব্যকে : ... এই পাওয়াতে ভাষায় মুখর হয়ে ওঠে ... জন্ম-জন্মান্তরের নীরব ব্যাকুলতা। যে কাব্য এভাবে সাড়া ... পেয়েছে সমস্ত মানুষের মনে, সে কাব্যই সার্থক। এ জন্যই বিশ্ব... জন্মতিথি পালনের জন্য আজ এত ব্যস্ততার আয়োজন ... ঘরে-ঘরে। কবিগুরু তাই বলেছেন, "জগতে আমরা অনেক জিনিস... চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহা... পাওয়া করে পাই ; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন ... পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই ... বহু গুণ করে পাই।"

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার চার পাশে সবাই আনন্দ... করে বলেছিল, "তোমায় আমরা পেয়েছি।" বছর ঘুরে সেই ... আবার যখন উপস্থিত হয় তখন আবার সেই একই কথা প্রতিধ্বনি... করবার, তাদের মনের একই বাসনাকে চরিতার্থ করবার ... পালন করা হয় জন্মতিথি। সেদিন তারা বলে, "তোমাকে পা... আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেন... তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনা... অধিক করে পেয়েছি।" সেই রকম ভাবে কবিকেও আমরা ... চাই একান্ত আপন করে। প্রত্যেকেই চায় নিজেকে খুঁজে ... কবির বাণীর ভেতর দিয়ে, দার্শনিক চায় দার্শনিকরূপে, বৈজ্ঞানি... চায় বৈজ্ঞানিকরূপে ; সাহিত্যিক চায় সাহিত্য-রসে আর প্রে... চায় প্রেমের মাঝে। এ সমস্ত দিকই পরিপূর্ণ হয়েছে কবির ভেত... সবার চাওয়া, সবার অদম্য স্পৃহা মেটাবার জন্য সমস্ত শক্তির সম্মি... সহায়তায় গড়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারত কেন, সারা জগ... কোন দেশের ভেতরই একই আধারে সম্পূর্ণ শক্তির এমন ... বিকাশ হয়েছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রচুর।

জর্জ্জরিত ভারতের বুভুক্ষু আত্মার ক্ষুধা মেটাবার অমৃত ... হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন বিশ্বকবি। ভাবের প্রেরণায় সম... ভেতর সৃষ্টি করলেন অমৃতত্বের ; সংগ্রামের মাঝে বিপ্লবের মা... আনলেন জেগে ওঠার প্রচণ্ড ধ্বনি। বীণার সমস্ত তারে ... সংগে যা দিলেন তিনি ; যে মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হোলো, তারই ... সুর মিলিয়ে ঘুম ভাঙ্গল অবচেতন ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী

POND'S
POND'S
POND'S
POND'S
V

কবির ভাব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হোলো সবাই। যুবশক্তিকে জানাবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন বিবেকানন্দ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", বাণীর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও তাঁর বজ্র-গম্ভীর আর্তনাদে দেশের চারি দিকে ছড়িয়ে দিলেন জেগে ওঠার সঞ্জীবনী মন্ত্র। দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হোলো দেশমাতার কঠিন আহ্বানে—বীণার তারে সেদিন যে প্রেরণার সৃষ্টি হোলো বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী তেমনটি বোধ হয় পূর্বে আর কখনও শোনেনি—

"যৌবনেরি পরশমণি করাও তবে স্পর্শ,
দীপক—তানে উঠুক ধ্বনি দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও না আতঙ্ক।"

প্রশান্তির ভেতর সুপ্ত মনের কোমল জায়গায় ঘা দিলেন তিনি করুণ প্রেমের রাগিণীর সুরে। চমকে উঠে সবাই অনুভব করল তাঁদের অন্তরের ব্যথা; সেই ব্যথা ঘোচাবার সান্ত্বনা-স্থল খুঁজে পেল আবার তাঁরই বীণার তারে। মানুষকে তিনি নির্ভয় হতে শেখালেন: হাসিমুখে জীবনের রহস্য অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। এড়িয়ে চলার জন্য তিনি গাইলেন:

"কিসের তরে অশ্রু ঝরে কিসের লাগি' দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।"

অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক মহাত্মন ব্রহ্মচারী বলেছেন রবীন্দ্র-কাব্যে যে একটা বিশ্বজনীন সাড়া আছে তার মূল সূত্র উপনিষদে। রবীন্দ্র-কাব্য গড়ে উঠেছে উপনিষদের ভিত্তিতে। এ জন্যই জগৎ-জোড়া তাঁর খ্যাতি। নিজের অন্তরে একান্ত ভাবে উপলব্ধি করে অন্তরের নিভৃত পরিচয় প্রকাশ করেছেন বাণীতে। তাঁর কাব্যে emotion passion-এর ছন্দে পাঠককে স্বপ্নাতুর করে তোলে; অসীম ভাবের মাঝে পড়ে পাঠক উপস্থিত হয় সে এক কোন স্বপ্নলোকে যেখানে সসীম আর অসীমের হয়েছে বন্ধন।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চাহে সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।"

মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি; মৃত্যু তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছে জন্মান্তরের একটা রূপ হিসাবে। জীবনের পরিপূর্ণতাই মৃত্যুর সার্থকতা, এই বাণী রূপ পেয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যে—তাই তিনি বলেছেন:

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ তুমি কও আমারে কথা।"

"রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দুঃখে সান্ত্বনা-দাতা, আনন্দে সঙ্গী, অবসাদে উৎসাহদাতা, কুসংস্কার থেকে উদ্ধারকর্তা, বুদ্ধির মুক্তিদাতা"—এ জন্যই সাধারণের এত প্রিয় তিনি।

কবি আজ অনেক দূরে তার সীমারেখা প্রসার করেছেন; নতুন রূপে নতুন ভাবে তাঁর কাব্য চিরকাল অমৃত বিতরণ করুক, সে জন্যে আমরা প্রার্থনা করি—

"নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা ভুলিয়া যাই।
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে রবে
চির জনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।"

অনিবার্য

মীরা দেবী

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কত শত লেখাই না বের হয়ে চলেছে দিনের পর দিন। তাদের কতক পড়েছি, অধিকাংশই পড়বার সময় করে উঠতে পারিনি। যাদের পড়েছি তাদেরও খবর যে একটা আগ্রহ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছি, তাও নয়। তাই যখন কর্মচঞ্চল, হাস্যোচ্ছল এই পৃথিবীর দিবালোক থেকে বিদায় নিয়ে আশ্রয় পেয়েছি নিঝুম রজনীর শান্তিময় ক্রোড়ের নিরালায়, তখন একেক সময় মনে হয়েছে আমার: কী বিচিত্র এই মানব-মনের গতি। বাসনার আমাদের সীমা নেই। কিন্তু সেই বাসনা যখন সত্যি-সত্যিই চরিতার্থ হয়, তখন তার কতটুক গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি আমরা? পথের দিকে তাকালেই দেখতে পাই রাস্তারা কোনো একদা-ধনীর দুলাল—কিংবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের—কি কোনো ভিখারীর ছেলে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছে ঢোবাবাজারে মুক্তি পাবার আকুল প্রতীক্ষায় বহু এক-আড়ত চালের অস্তিত্বের সুখ-কল্পনার পানে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ও ভাবছে: ঐ আড়তের শুদ্ধ চাল যদি ওর পাতে কোনো মতে একবার ভাত হয়ে ফুটে উঠতো শুভ্র শিউলি-দলের হাল্কা শোভায়, তাহ'লে একটা অধিক গ্রাসই যথেষ্ট হ'ত সে চালকে বে-চাল করতে ওর পক্ষে। জানি, আশা ওর অদম্য। কিন্তু আবার এও জানি, সত্যি-সত্যিই যদি ঐ চালগুলোর সব এনে ওর পাতে পরিবেশন করা হত, বড় জোর এক গ্রাস কি দু'গ্রাস—ব্যস্, তার পরেই ওকে তুলতে হত সেই খাণ্ডবদাহী আগ্নেয় ক্ষুধার পরিতৃপ্তির ঢেকুর। বাস্তবিকই আমাদের মনের অনেকখানিই জুড়ে রয়েছে একটা হ্যাংলা কুকুরের কাঙালপণা। আমরা প্রাচুর্যের মধ্যে উঠি হাঁপিয়ে। আর সামান্য, স্বল্পতা, অভাবকে নিয়ে করি কাড়াকাড়ি। নইলে একবার মনে করে দেখুন না সেই পলিত-কেশ অথবা অজাতশ্মশ্রু চার্বাক ঋষিটারই কথা—যে এক দিন—আমার কল্পনা করে নিতে একটুও চেষ্টা করতে হয় না—কত গাল খেয়েছে, নিন্দে কুড়িয়েছে—এমন কি হয়তো শারীরিক লাঞ্ছনা ভোগ করেছে এ যুগের তারাশঙ্করের মত। অথচ আমাদের বাড়ীতে দাদাদের প্রাত্যহিক আলোচনা সভায় অনেকখানা শক্তি ব্যয়িত হতে দেখছি দিনের পর দিন সেই একদা-অবজ্ঞাত, উপহসিত ঋষিটার অমূল্য জীবন এবং দুষ্প্রাপ্য 'সার্মন' আবিষ্কারের অতুল প্রচার। কথাটা উঠিয়েছিলেম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আধুনিক মনোবৃত্তির আলোচনা করতে গিয়ে। ব্যাপারটার সত্যতা আপনারা যাচাই করে দেখুন না। রবীন্দ্রনাথকে এত কাছে পেয়েছি বলে

…সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের এত সহজেই নিরসন হতে … নৈকট্যের সঙ্গে স্থায়ের চিরকালের আড়ি। রবীন্দ্র-… কতটুকু পড়ি আমরা আজ—বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত পাঠ্য-… কথা বাদ দিলে? অথচ, মনে মনে আমার খুবই হাসি … এক ভবিষ্যের কথা ভেবে, যেদিন কৌতূহলী প্রত্নতাত্ত্বি-… ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে ইম্পিরিয়াল বা ঐ রকম … রবীন্দ্রনাথ নামক সুদূর অতীতের কোনো এক … কবিতা এবং নাটকের ধ্বংসাবশেষ-পাঠোদ্ধারের … তাদের গবেষণার সামান্যতম ফলের প্রতীক্ষা করছে … লক্ষ পাঠকের জনতা। তবু উপায়ান্তর নেই! … ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টে যান একের পর এক, ভূরি … সান্ত্বনা পাবেন। ইতিহাসের গতি চক্রনেমির … পুনরাবর্তনে। তাই তো বলছিলেম: কাঙ্গালপনা … মজ্জায়। কথাটা শুনতে কটু বলেই মিথ্যে নয়।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্

(… অবলম্বনে)

অমিতা চট্টোপাধ্যায়

চ… পরিবর্তন্তে জগৎ' কথাটা বললেই অশোক তো-তো ক'রে … ওঠে।

… এ জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, কি বল? উত্তরের … অশোক বিজনের মুখের দিকে তাকায়।

… অশোকদের বাইরের ঘরে যথারীতি আড্ডায়।

… তাঁদের জন—অতীন, শঙ্কর, বরেন অবাক হয়ে … বিজনের দিকে চেয়ে থাকে।

… অভূতপূর্ব কাণ্ডটা হঠাৎ ঘটল? অতীন জিজ্ঞাসা করে।

… বলে—আরে, অবাক হবে যে, এত বড় ঘটনাটা … আমাদের সমীর যে বিয়ে করছে— বিয়ের দিন পর্যন্ত … গেছে।

… চিরকুমার থাকার অত কঠিন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে মদন … দিক থেকে ফুলশর নিক্ষেপ করলেন হে? শঙ্কর ঔৎসুক্য …

… তবে থামলেই বলি সবটা—অশোক চেয়ারের ওপর বেশ … বসে।

… এম-এস্‌সি, পাশ করে চল্লিশ বছর বয়সে বাঙালীদের পরম … ভাল কাজ হঠাৎ সমীর পেয়ে বসল। তার পর থেকে … বহু পিতা তাঁদের জুতো ক্ষয়িয়ে ফেললেন।

… বলে—এবারে বিয়ে কর সমীর। চিরটা কাল ত একলা … কাটালি—সংসারের বন্ধন বলে কিছুই ত জানলি না।

… এগার বছর বয়সের সময় সমীরের মা-বাবা এক বছর আগে … যান। তার অন্য কোন ভাই-বোনও ছিল না। এক … মামার কাছে মানুষ। স্কলারশিপ নিয়ে টিউশানী করে … শিখেছে। কাজেই বন্ধুরা যা বলত তা মোটেই মন্দ নয়, … যে কি পণ বলে—

যা যা, বকিস্ না তোরা, খাই-দাই কাঁশী বাজাই, একলা আছি, বেশ আছি। ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিয়ে মরি আর কি! বিয়ে-টিয়ে মোটেই করব না—তোদের ইচ্ছে হয় তোরা যা'টা খুসী কর গে যা।

এমনি ক'রে চাকরী পাওয়ার পরেও বছর ছ'য়েক নির্ব্বিবাদে কেটে গেল।

পূজার ১০ দিন ছুটীর সঙ্গে সমীর আরও কিছু দিন ছুটী বাড়িয়ে এক দিন তল্পী-তল্পা গুটিয়ে পশ্চিমের পথে পাড়ি দিল।

বহু জায়গা ঘুরে শেষে সমীর কাশীতে তার এক মাসীমা'র বাড়ীতে অতিথি হল। খাওয়ার সময় মাসীমা বললেন—কত দিন আর বাউণ্ডেলে হয়ে থাকবি! বিয়ে-থা কর এবারে। … পাশের বাড়ীতে একটি মেয়ে আছে, সম্বন্ধ করি। … বছর বয়েস, ম্যাট্রিক পাশ করার পরই বাপ মারা যান। আজ … বছর একটা মেয়ে-স্কুলে পড়িয়ে কোন রকমে নিজের ও মা'র পেট চালায়। বড় ভাল মেয়ে। দেখতেও যেমন সুন্দর—স্বভাবও তেমনি মধুর। এমনি ক'রে মাসীমা বোনপোটির মন ভেজাতে চান।

সমীর কোন রকম জবাব না দিয়ে খাওয়া সেরে ওপরে শুতে চলে গেল।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার আলো চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমীরের মত গদ্যময় মানুষকেও ঘরের বাইরে সামনের খোলা ছাদটুকুতে টেনে আনে। ধবধবে জ্যোৎস্নার আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে—কানের কাছে মাসীমা'র কথাগুলি ভাসতে লাগল। কতক্ষণ সে অমন ক'রে বসে থাকে টের পায় না। অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ পাশের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখে—একটা ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে—টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে একটি মেয়ে কি যেন লিখছে—পেছন থেকে শাঁখের মত শুভ্র, মসৃণ গলার কিয়দংশে এক সোনার হারটি চিক্‌চিক্ করছে।

ভাবল—এই মেয়েটি নিশ্চয়ই মাসীমার বর্ণিত সেই মেয়ে। এমন সময় নারী-কণ্ঠের ডাক শোনা যায়— সুমিত্রা, আর কতক্ষণ বসে থাকবি, এবারে শুগে যা।

ঘরে গিয়ে সমীর শুয়ে পড়ল। … ঘুমও আসে না —কি ভাবে কে জানে!…

মাসীমা, রাত্রে ভেবে দেখেছি—তোমার কথা শুনব—সকালে চা খাবার সময় সমীর মাসীমাকে জানায়।

আঃ, বাঁচালি! ভগবান তোর মঙ্গল করুন। মাসীমা পরিতৃপ্ত মুখে বোনপোটির মাথায় হাত দেন। একটি বিধবা মায়ের তুই যে কত বড় উপকার করলি সমীর! বড়মুখ ক'রেই বলতে পারি, যা'কে তোর হাতে দিচ্ছি, তা'কে নিয়ে তুই কোন দিনও অসুখী হবি না। মাসীমা তাড়াতাড়ি পাশের বাড়ীতে যান সুসংবাদ দেবার জন্য।

দিন চারেক পরেই সমীর কলকাতায় ফিরে আসে।

অঘ্রাণ মাসের এক হিমেল সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে বিনাড়ম্বরেই সুমিত্রাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে কলকাতায়।

সমীর তার নিঃসঙ্গ জীবনে সুমিত্রার মত সঙ্গী পেয়ে যেন উন্মাদ হয়ে উঠল—তা'কে নিয়ে যে কি করবে ভেবেই পায় না।

দিনের পর দিন কেটে যায়—সংসার সুশৃঙ্খলে চলে।

সমীর বলে—আচ্ছা সুমী, আমি ত ভেবেই পাই না, চারশ' টাকায় সব কিছু এমন ভাল ভাবে কর কি করে? এখন ত আমরা দু'জন

আছি—অথচ খাওয়া-পরা আমার আগের চেয়ে ভালই হয়েছে। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমার ত' কিছুতেই চলত না।

সুমিত্রা গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে জবাব দেয়—এই জন্মই লোকে বিয়ে করে।

সমীর হেসে ওঠে—আদর করে তাকে কাছে টেনে নেয়।

সুমিত্রার সিনেমা দেখার আর পাথরের গহনা কেনার অদ্ভুত বাতিক ছিল।

এত টাকা তুমি কোথায় পাও যে, এত জড়োয়া গহনা কেন? সমীর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

সুমিত্রা হাসে—আরে, এগুলোর কত দাম, সবই ত নকল!

কোন মানুষ খুব সুখে আছে—ভগবান সহ্য করতে পারেন না। এক দিন রাতের 'শো'তে সুমিত্রা তার এক পুরোন বন্ধুর সঙ্গে মেট্রোতে গিয়েছিল—ফিরল বৃষ্টিতে একেবারে চুপচুপে হয়ে।

পরদিন—রোদে ঘর ভরে গেছে—সমীর দেখে সুমিত্রা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ব্যাপার কি? রোজ ত ভোর পাঁচটাতেই ওঠে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে খুব জ্বর।

তাড়াতাড়ি এক ডাক্তার নিয়ে আসে—ডাক্তার বলেন 'নিউমোনিয়া'। সাত দিন সমীরের অক্লান্ত সেবা ও ডাক্তারদের চেষ্টা সুমিত্রাকে রাখতে পারল না।

তার মৃত্যুতে সমীর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাড়ী থেকে বেরোনো, কাজে যাওয়া ছেড়ে দিল। মাসের ১৫ দিন যেতে না যেতেই দেখল সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। কাল কি খাবে, এমন সংস্থানও নেই—চারি দিকের অগোছাল, অবন্দোবস্ত আরও বেশী করে যেন সুমিত্রাকে মনে করিয়ে দেয়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে টাকা চাইতে ইচ্ছে করল না। ভাবল—সুমিত্রার ত অনেক নকল পাথরের গয়না আছে—একটা যদি বিক্রী করে দি, ত দু'-চার টাকা পাব।

একটা মুক্তোর মালা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কোন দোকানের উদ্দেশে। কিছু দূর যেতেই একটা দোকানে লেখা আছে—'মোহনদাস কাঞ্জিলাল—জড়োয়া গহনাদি বিক্রেতা'। সেটাতেই ঢুকে পড়ে বলে—দেখুন ত এই মালাটার কত দাম হবে?

ব্যবসায়ী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে—হাজার টাকা।

দাম শুনে সমীরের মাথা ঘুরে গেল। সুমিত্রা হাজার টাকা দিয়ে মালা কিনেছে—এত টাকা পেল কোথায়? যাই হ'ক, হাজার টাকা দিয়ে সে মালাটা বিক্রী করে দিয়ে বলে—আমার কাছে আরও গয়না আছে, কাল নিয়ে আসব কি?

হাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে আসবেন—মোহনদাস জবাব দেয়।

পরদিনই সমীর দুই জোড়া কানের দুল, একটা নেকলেস ও ছ' গাছা মুক্তোর চুড়ী নিয়ে দোকানে হাজির হল।

মোহনদাস দেখেই বলে ওঠে, আরে, এ সব জিনিষ কোথায় পেলেন? আমিই ত এ-সব বিক্রী করেছি—বলে একটা খাতা টেনে বার করে। সমীর দেখে একটা পাতায় লেখা আছে—শ্রীমতী সুমিত্রা বসু—১১ নং ··· রোড। ২ জোড়া দুল ৫০০৲, ১ নেকলেস ৩০০৲, ৬ গাছা চুড়ী ১৫০০৲। জিনিষগুলো অবশ্য একসঙ্গে কেনা হয়নি, মাস ছয়েকের মধ্যে কেনা।

স্বপ্নাবিষ্টের মত সব বিক্রি করে দিয়ে বাড়ী চলে আসে সমীর।

এক চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়—সুমী—সুমী কি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? না হলে অত টাকার গহনা কেনার মত টাকা কোথায় পেয়েছে? ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে ওঠে ···

* * * *

দিন পনের পরে বন্ধুরা সমীরকে তার আফিসে বেশ ফিট্-ফাট অবস্থায় দেখতে পেল, শুনল, গ্রাম থেকে সে একটি নিরক্ষরা, কুশ্রী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে।

নূতন প্রভাত

শ্রীলীলা দাস

জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির অবসানে
ভোরের পাখীটি কহে আজ গানে গানে,
যাক ধুয়ে সব পুরোনো দিনের গ্লানি,
মুছে যাক যত কালিমার ঘন ঘোর।
নূতন আলোকে নূতন বাণী সে আনি
উঠুক ফুটিয়া নূতন দিনের ভোর॥

নূতন আলোয় কুসুম-কোরক হেসে
ছড়াক সুরভি উতলা বায়েতে মিশে
নূতন যুগের কিশোর-কিশোরী কণ্ঠে
ধ্বনিয়া উঠুক নূতন গানের সুর।
তাদের সবার জীবনের জয়গানে
আকাশ-বাতাস হোক সব ভরপুর।

মিলনের রাখী বাঁধি হাতে হাতে
চলুক সবাই মিলি এক সাথে
নয়নে নয়নে যেন জেগে ওঠে
নবারুণ-রাগে নূতন দৃষ্টি।
চলার ছন্দে সৃজিত হোক
নবীন বিশ্বে নূতন সৃষ্টি।
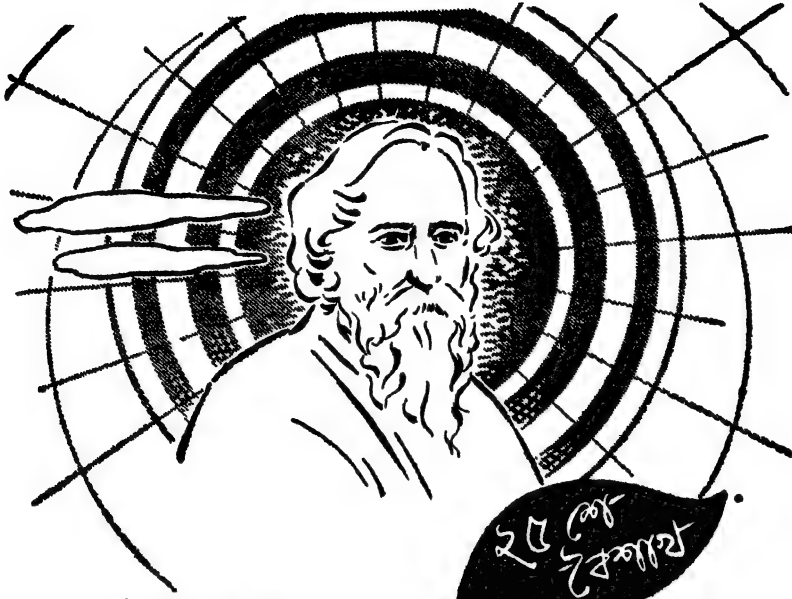
হাজারমারার বিভীষিকা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীহৃষীকেশ হালদার

ভূতের নাচ

দারোগা বাবুর নিরুদ্দেশের পর পাঁচ-ছ' দিন কেটে গেলো, তবুও তাঁর বা তাঁর সঙ্গীদের কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। সারা গ্রামখানা যেন ভয়ে আধমরা হয়ে আছে, আবার কখন কী কাণ্ড হয়! শহর থেকে যাঁরা এখানে এসেছেন, বোমার ভয়ে শহরে ফেরবার সাহস তাঁদের নেই, অথচ এখানে থাকতেও ভরসা হয় না। তাঁরা ভাবছেন অন্য কোথাও চলে যাবার কথা। কিন্তু এইটাই যাদের দেশ, এইখানেই যাদের পৈতৃক ভিটেমাটী—এখানকার মাটীই যাদের পেটের ভাত জোগায়—তারা সব ফেলে যায় কোথায়!

থানায় আর এক জন নতুন দারোগা এসেছেন। তিনি সারা দিন নিরুদ্দিষ্ট দারোগার খোঁজ করে লোক জন নিয়ে আশ-পাশের দশখানা গ্রাম চষে ফেলেন—সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই তাড়াতাড়ি থানায় ফিরে দরজা বন্ধ করেন। দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে আগেকার দারোগার মতো বেঘোরে মরতে তিনি রাজী নন—এ কথা বেশ জোর-গলাতেই সবার সামনে বলে বেড়ান। তাঁর নতুন অনুচরগুলিও ঠিক তেমনি—সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই তারা আর থানার বাইরে কেউ থাকে না। লোকে দুঃখ করে বলে: কী লোকই ছিলেন আমাদের আগেকার দারোগা বাবু। লোকের বিপদে-আপদে সবার আগে তাঁর দেখা পাওয়া যেতো। নতুন চৌকীদার দফাদারগুলোও হয়েছে তেমনি!

পুলিশের লোকের অবস্থাই যখন এই রকম, সাধারণ লোকের অবস্থা তো সহজেই অনুমান করা যায়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সব দোকান-পাটের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়—খিল পড়ে যায় প্রত্যেকটি বাড়ীর দরজায়। সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রামখানা গভীর রাতের মতো নিশুতি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। শুধু সোনারগাঁই নয়—হাজারমারার মাঠের ধার ঘেঁষে যে ক'খানা গ্রামের অবস্থান, সবগুলোর অবস্থাই সমান।

চাটুয্যে মশাই পুরী যাবার কথা বলছিলেন ক'দিন ধরেই। ভাবলাম সেই ভালো। পুরী গেলে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ শরীরটা ভালই থাকবে। ভূতের ভয়েও আর এমন করে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে না। এমন সময় এক আকস্মিক ঘটনায় পুরী যাত্রার ব্যবস্থা বন্ধ করতে বাধ্য হলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে প্রকৃতির বুকে। আমার বাসার সামনের পথে শোনা যায় বাড়ীর দিকে ব্যস্ত হয়ে ফেরা পথিকের পদধ্বনি। সবাই ব্যস্ত, সবাই সন্ত্রস্ত। প্রাণ নিয়ে কোন রকমে বাড়ী ফিরে দরজা বন্ধ করতে পারলে তবেই অন্ততঃ রাতটার মত নিশ্চিন্ত হতে পারবে সকলে। প্রত্যেকটি সন্ধ্যাই আসন্ন রাতের বিভীষিকা নিয়ে এমনি ভাবে দেখা দেয় আজকাল সোনারগাঁ আর তার আশ-পাশের গ্রামগুলোতে। কী যেন ঘটবে, কী যেন ঘটতে পারে—একান্ত অলৌকিক আর একান্ত রোমহর্ষক।

আমিও দরজাটা বন্ধ করবো ভাবছি, এমন সময় নিতান্ত পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনলাম বাইরে: মুখুজ্যে আছো?

এ যে একান্ত অসম্ভব! এ গলা আর কারো হতে পারে না—এমন অন্তরঙ্গ আর এমন মিষ্টি। কিন্তু প্রদীপ এখানে আসবে কেমন করে? সে তো এখন কলকাতায় বসে দিনকয়েকের বিশ্রাম নিচ্ছে। কলকাতা থেকে চলে আসবার সময় শুনেছিলাম, বেশ কিছুদিন বিশ্রাম না নিয়ে সে কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়বে না কিংবা কোন কাজেই হাত দেবে না।

বাইরে থেকে আবার শোনা গেলো সেই পরিচিত স্বর: মুখুজ্যে বাড়ী আছো?

ছুটে বাইরে এলাম। সত্যিই অভাবিত ব্যাপার। প্রদীপ আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। পাশে তার ও কে? ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার চন্দ্রিকা সিং না? ব্যাপার তাহলে খুব সহজ নয় দেখছি। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলাম তাদের বাড়ীর ভেতরে। প্রদীপ একটা চেয়ারের ওপর সশব্দে বসে পড়ে বললো: আমাদের দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ বোধ হয়?

—তা একটু আশ্চর্য্য হয়েছি বৈ কি! বললাম আমি: এই অজ পাড়াগাঁয়ে তোমার এমন আকস্মিক আবির্ভাব, সঙ্গে আবার মিঃ সিং। তোমরা তো বিনা কাজে এক পা-ও নড়ো না জানি। হঠাৎ যে এমন ভাবে এখানে এসে পড়বে······

—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও তার রেহাই নেই রে ভাই, বললো প্রদীপ: ধান তাকে ভানতেই হবে। ভেবেছিলাম দিন কতক বিশ্রাম করবো এবার, কিন্তু সরকারী কর্ত্তারা তা আর হতে দিলেন কই! চন্দ্রিকা সিং-এর ওপর হুকুম হলো সোনারগাঁয়ে আসবার! পুলিশের বড়কর্ত্তা আমাকেও অনুরোধ করলেন একটু সাহায্য করতে। কাজে কাজেই······

—তাহলে এখানকার ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চার দিকে বেশ

[illegible] ভুলেছে বলো! বললাম আমি: আমরা তো মনে [illegible] সোজা এখান থেকে পুরীতে পাড়ি জমাবো!

—[illegible] হয়তো দরকার হবে না, বললো প্রদীপ: ব্যাপারটা [illegible] ভাবে বলো তো শুনি। সরকারী রিপোর্টে তো শুধু [illegible] নিরুদ্দেশ আর দু'টো খুনের কথাই আছে—ব্যাপারটা [illegible] চেয়েও গুরুতর। না হলে পুলিশের কর্ত্তারা তাঁদের [illegible] কর্মচারী চন্দ্রিকা সিংকে নিশ্চয়ই এই অজ পাড়াগাঁয়ে [illegible] না কিংবা এই বেসরকারী গোয়েন্দার শরণাপন্ন হতেন না।

[illegible] সব কথা—চাটুয্যে মশাইয়ের দেখা উড়ন্ত ভূত থেকে [illegible] মণ্ডলের ছেলে দু'টোর লাশ পাওয়ার কথা, দারোগার [illegible] কথা, হাজারমারীর মাঠের আলেয়া ভূতের কথা বলে [illegible] বললাম: সরকারী কাজে এসেছো যখন, নতুন দারোগার [illegible] দেখা করবে নিশ্চয়ই।

[illegible] না. প্রদীপ ব্যস্ত হয়ে বললে: আমাদের এখানে আসার [illegible] কান হলে কাজের অসুবিধা ছাড়া আর কিছুই হবে [illegible] কেউ আমাদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে, বলবে কলকাতা [illegible] বেড়াতে এসেছি তোমার এখানে। আমরা তোমার [illegible] আর কিছু নয়।

[illegible] সিং বললেন: আমার কিন্তু মনে হয় প্রদীপ, শুভস্য [illegible] অনর্থক দেরী না করে আজই রাত্রে একবার হাজার-[illegible] হানা দেওয়া ভালো।

—আমারও আপত্তি নেই কিছু তাতে। প্রদীপ উত্তর দিলে: [illegible] আহারাদি সেরে একটু গভীর রাত্রে হলেই ভালো হয়।

[illegible] সিং একগাল হেসে বললেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়! আগে [illegible] ব্যবস্থা, তার পর দেবতা, থুড়ি অপদেবতা দর্শন! কী [illegible]?

[illegible] তার কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে অতিথি সংকারের [illegible] জন্যে উঠে পড়লাম। প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং [illegible] সম্বন্ধে বসে বসে পরামর্শ করতে লাগলো।

[illegible] করে ঘড়িতে বারোটা বাজলো। আমার চোখে বেশ [illegible] আমেজ এসেছিলো। চন্দ্রিকা সিংএর ডাকে চমকে [illegible]।

—[illegible], উঠে পড়ো। বারোটা বেজে গেছে।

[illegible] তাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে তৈরী হয়ে বললাম: চলুন, [illegible] যাত্রা করা যাক্।

—আশা করি এ যাত্রা আমাদের জয়যাত্রাই হবে। বললেন [illegible] সিং।

[illegible] যাত্রাও হতে পারে: মন্তব্য করলো প্রদীপ।

[illegible] আগে হাজারমারীর মাঠের দিকে পথ দেখিয়ে চললাম [illegible] আমার পিছনে প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং। সারা গ্রাম [illegible] কোলে ঢলে পড়েছে। চার দিক নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝির [illegible] শোনা যাচ্ছে একটানা—অবিশ্রান্ত। আমাদের পায়ের শব্দে [illegible] থেকে দু'-একটা কুকুর ডেকে উঠলো। অখণ্ড স্তব্ধতার [illegible] ডাকে চার দিক যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। [illegible] পাশে-পাশে, সামনে-পিছনে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। রাশি রাশি অন্ধকার যেন আমাদের গ্রাস করতে আসছে। চলতে চলতে আমরা গ্রামের শেষ প্রান্তে, হাজারমারীর মাঠের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

অন্ধকারে পথ, ঘাট, মাঠ সব একাকার হয়ে গেছে। ভালো করে কিছুই চোখে পড়ে না। আমাদের সঙ্গের টর্চটাও জ্বালাতে ভরসা হলো না—পাছে আমাদের অস্তিত্ব কেউ জানতে পারে! চুপি চুপি বললাম: হাজারমারীর মাঠের ধারে পৌঁছে গেছি প্রদীপ।

প্রদীপ বোধ হয় আমার কথার উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় হাজারমারীর মাঠের মধ্যে, দূরে, বহু দূরে জ্বলে উঠলো একসঙ্গে কতকগুলো আলো—লাল, নীল, হলদে। আলোগুলো এদিক-ওদিক করে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলো, তার পর সহসা আবার নিবে গেলো।

চন্দ্রিকা সিং কম্পিত স্বরে বললেন: রাম, রাম! দেখছ প্রদীপ, ভূতের প্রবাদটা একটুও মিথ্যে নয়। গাঁয়ের লোকগুলো বাজে গুজব রটায়নি।

প্রদীপ ফিস্-ফিস্ করে উত্তর দিলে: একটু আস্তে বলুন মিঃ সিং, চেঁচাবেন না। আমাদের উদ্দেশ্যটা ভুলে যাবেন না। আমরা এসেছি নিরুদ্দিষ্ট দারোগার খোঁজ করতে আর দু'-দুটো খুনের তদন্ত করতে। ভূতের রোজাগিরি করতে নয়। আপনার মত দুর্দ্ধর্ষ পুলিশ বিভাগের কর্মচারী যে এ-যুগেও ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে······আশ্চর্য্য!

—নিজের চোখ দু'টোকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না ভায়া। ওই সব লাল-নীল-হলদে আলো যদি ভূতই না হয়, তাহলে কী হতে পারে তুমিই বলো।

—হতে পারে অনেক কিছুই, এখনি ঠিক করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রদীপ দৃঢ় স্বরে বললে: তবে অমন অনেক ভূতের গলায় ফাঁসের দড়ি আমরা অনেক বার পরিয়েছি, সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন মিঃ সিং? এই নির্জ্জন মাঠে ওই সব আলোগুলো মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠার উদ্দেশ্য কী যখন জানতে পারবো, তখন তো আর এ রহস্য রহস্যই থাকবে না। এখন চলুন, মাঠের ভেতর এগিয়ে যাওয়া যাক্।

—চলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রিকা সিং বললেন: সরকারের নুণ খাই, সুতরাং নিমকহারামী করতে পারবো না। তবে সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে লড়াই করাও যা, আর ভূত-প্রেতের পেছনে ধাওয়া করাও তাই। বুড়ো বয়েসে শেষ পর্য্যন্ত বেঘোরেই প্রাণটা যাবে দেখছি!

প্রদীপ চন্দ্রিকা সিংএর কথার কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। অগত্যা আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। পাছে কোন শব্দ হয়, এই আশঙ্কায় আমরা তিন জনেই খুব পুরু রবার-সোলের জুতো পায়ে দিয়েছিলাম। তবু আমাদের প্রতি পাদক্ষেপে যে সামান্য শব্দ হচ্ছিলো তাইতেই চমকে উঠছিলাম। প্রদীপের কথা স্বতন্ত্র। তার সুদীর্ঘ গোয়েন্দা-জীবনে সে অনেক বার অনেক বিপদই হাসিমুখে বরণ করেছে! চন্দ্রিকা সিংও জাঁদরেল পুলিশ-অফিসার, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনে জমে উঠেছে। কিন্তু আমার নাগরিক জীবনে এমন নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত, এমন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াবার মতো উত্তেজনা আর কখনো আসেনি। তাই আমি বিচলিত হয়েছিলাম একটু বেশী রকমই!

চলেছি তো চলেছিই। কোথায়, কত দূরে এ যাত্রা শেষ হবে জানি না। এ যাত্রার শেষে কি পরিণাম আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে তাও জানি না। প্রদীপ নির্ব্বাক্, চন্দ্রিকা সিংও নীরব। কেবল আমাদের তিন জনের মৃদু পদধ্বনি সেই নিস্তব্ধতার বুকে ঈষৎ স্পন্দন জাগাচ্ছে।

হঠাৎ একটা শিয়াল ডেকে উঠলো—হুক্কা হুয়া হুয়া—য়া-য়া··· সঙ্গে সঙ্গে এক দল শিয়াল যেন সেই ডাককে অনুসরণ করে ডেকে উঠলো একসঙ্গে। রাত দু'প্রহর হলো এবার। আবার সব নিস্তব্ধ, সব নিঝুম।

গা ঘেঁষে কী একটা চলে গেল। চম্‌কে সরে দাঁড়ালাম প্রদীপের পাশে। প্রদীপ ফিস্‌-ফিস্ করে বললে: ও কিছু নয়, শিয়াল-কুকুর হবে বোধ হয়।

আবার যাত্রা সুরু। প্রদীপ বললে: আমরা চলেছি দক্ষিণ দিকে। আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয়, তা'হলে মাইল দু'য়েক পথ আমরা এগিয়েছি এতক্ষণে···

প্রদীপের কথা শেষ হবার আগেই মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে একটা ঝপ্‌-ঝপ্ শব্দ শুনতে পেলাম। সকলে ওপর দিকে চেয়ে দেখি, অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড বাদুড়ের মতো কী উড়ে যাচ্ছে। আকারটা তার বাদুড়ের মতো হলেও লম্বায়-চওড়ায় দু'-চারটে মানুষের সমান। তার লাল চোখ দু'টো থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে। জানোয়ারটা উড়তে উড়তে অনেক দূরে চলে গেল। চন্দ্রিকা সিং বললেন: বাব্বা:, বাঁচলাম। ওইটিই বুঝি সেই তিনি, মানে উড়ুক্কু অপদেবতা, মুখুজ্যে?

চন্দ্রিকা সিং-এর কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ চারি দিকে বহু কণ্ঠে—সরু, মিহি, ভারী নানা রকম গলায় হাসির রোল উঠলো—হো-হো, হা-হা, হি-হি, হু-হু। প্রদীপ আমাদের দু'জনের দু'টো হাত ধরে বললে: এইখানেই দাঁড়াও, ব্যাপার কী বুঝি আগে।

—আর বোঝাবুঝি! একেবারে ভূতের খপ্পরে! অস্ফুট স্বগতোক্তি করলেন চন্দ্রিকা সিং।

সহসা হাসির ধ্বনি থেমে গেলো। আমাদের আশে-পাশে জ্বলে উঠলো কতকগুলো অগ্নি-গোলক—লাল, নীল, হলদে। সেই অগ্নি-গোলকগুলো চার দিক আলো করে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলো। হতভম্ব হয়ে কতক্ষণ আমরা সেদিকে চেয়ে ছিলাম বলতে পারি না, এমন সময় আর এক ভয়াবহ কাণ্ড! খটাখট্ শব্দে চমকে উঠে দেখি কতকগুলো জীবন্ত কঙ্কাল আমাদের ঘিরে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে।

প্রদীপের রিভলভার থেকে পর পর তিনটে গুলী ছুটলো কঙ্কালগুলোকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারলো না। কঙ্কালগুলো অকস্মাৎ উচ্চ হাস্য করে এগিয়ে-আসতে লাগলো আমাদের দিকে। আমাদের তখন প্রায় হতচেতন অবস্থা। প্রদীপের দৃঢ় স্বর শুনতে পেলাম: যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিক ধরে ছোটো মুখুজ্যে, আপনিও মি: সিং—এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ দৌড়তে লাগলো, আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। আমাদের পেছনে শুনতে পেলাম কঙ্কালগুলোর খট্‌-খট্ খটাখট্ পদধ্বনি। তারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

কেমন করে যে সে রাত্রে হাজারমারীর মাঠ পার হয়ে গ্রামের মধ্যে এসে পড়েছিলাম জানি না। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটার সামনে এসে তিন জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম! আমাদের আছাড় খেয়ে পড়ার শব্দে পাশাপাশি দু'-তিনখানা বাড়ীর লোকজন আলো নিয়ে এসে আমাদের অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে, সেবা-শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। প্রদীপ, চন্দ্রিকা সিং বা আমি, কেউ-ই তাদের সত্যি কথাটা বলতে পারিনি! যা'-তা' একটা উত্তর দিয়ে তাদের প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম মাত্র!

ভূতের নাচ দেখে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়নো আর যাই হোক্ বীরত্বের পরিচয় নয়! কিন্তু মুখে না স্বীকার করি—ভূতের তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে যে বেঁচেছি, মনে মনে এ-কথা অস্বীকার করি কী করে? অথচ এত বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরও প্রদীপ প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না এখনো। নাস্তিক আর কাকে বলে!

চন্দ্রিকা সিং বলেন: হিন্দুর ছেলে, ভূত-প্রেত ঠাকুর-দেবতায় একটু বিশ্বাস রেখো হে ভায়া। শাস্ত্র কখনো মিথ্যে হবার নয়!

—শাস্ত্র মিথ্যে, এ-কথা তো আমি বলছি না মি: সিং! প্রদীপ উত্তর দেয়: তবে ভূত-প্রেত আর ঠাকুর-দেবতা দুইয়ের নাম যে রকম একসঙ্গে করে গেলেন, তাতে মনে হয় ও দুই-ই এক কথা! আমি দেবতা মানতে রাজী আছি, অপদেবতাকে নয়।

—হাজারমারীর মাঠে তবে কোন্ মহাপুরুষদের ভয়ে পালিয়ে এলে প্রদীপ? প্রশ্ন করি আমি!

প্রদীপ কোন উত্তর দেয় না, মৃদু হাসিতে প্রশ্নটাকে চাপা দেয়।

হাজারমারীর মাঠের ঘটনাটার একটা দিন পরেই প্রদীপ ক'লকাতা চলে গেল। চন্দ্রিকা সিং আমার এখানেই থেকে গেলেন। প্রদীপের হঠাৎ ক'লকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্য কী ঠিক না বুঝলেও আমার মনে হলো, সে-রাত্রের ঘটনাটার সঙ্গে এর একটা সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। চন্দ্রিকা সিং নিশ্চয়ই সব জানেন, কিন্তু তিনি মুখ খুলে বললেন না কিছুই। অতএব নীরব থাকাই সব চেয়ে ভালো পন্থা মনে করে আমিও আর কোন প্রশ্ন করলাম না। [ক্রমশ:

মুক্তোর জন্ম-ইতিহাস

শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী

মুক্তোর নাম শুনেছো তোমরা? শুনেছো অনেকেই; শুধু শোনা নয়, কেউ কেউ দেখেছোও হয়তো। আংটি, হার, ব্রোচ প্রভৃতি মেয়েদের নানা ধরণের গয়নায় মুক্তোর ব্যবহার আছে। এই যে মুক্তো—এত যার দাম—কি ভাবে তার জন্ম হয়, কোথায় পাওয়া যায় তারই ইতিহাস তোমাদের শোনাবো এখানে। লোক চক্ষুর অন্তরালে—সমুদ্রের নীচে হয় মুক্তোর জন্ম। কাজেই অনেকেই জানে না মুক্তোর জন্ম-ইতিহাস। সাগরের নীচে কি ভাবে মুক্তোর জন্ম হয় এবারে শোনো তবে সে কথা!

অতল সমুদ্রের তলে শুক্তির বুকে হয় মুক্তোর জন্ম। শুক্তি কি জানো তো? শুক্তি হচ্ছে এক রকমের ঝিনুক। ঝিনুক তোমরা অনেকেই দেখেছো। শুক্তিও অনেকটা ঐ রকমই দেখতে। তবে আকারে ঝিনুকের চাইতেও শুক্তি অনেক বড় হয়ে থাকে।

শৈশব অবস্থায় শুক্তির খোলা থাকে না। তখন এদের আকৃতি থাকে অনেকটা জেলির মতো। জলের ওপরে এরা ভেসে ভেসে বেড়াতে থাকে! তার পর যখন এরা বড় হয় তখন শুক্তির দেহের উপর একটা শক্ত আবরণ ধীরে ধীরে জন্মাতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হলে কব্জাওলা দরজার মতো দু'টো শক্ত খোলা ওদের কোমল দেহকে ঢেকে ফেলে। এই খোলার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে তখন শুক্তির দেহ। কাজেই বাইরের কোনো আঘাত এদের ক্ষতি করতে পারে না সহজে।

খোলা যখন শক্ত হয় তখন শুক্তির দেহের ওজন আগের চাইতে অনেক বেড়ে যায়। ফলে, জলের ওপর ভাসবার ক্ষমতা তখন আর এদের থাকে না। সমুদ্রের তলে ডুবে যায়। সমুদ্রের তলে থাকতে এদের অসুবিধে কিছুই হয় না; বরং লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকাটাই এরা বেশী পছন্দ করে বলে মনে হয়।

আচ্ছা, তার পর জলের তলে ডুবে গিয়ে ওরা কি করে জানো? কোনো পাথর-টাথরের পাশে আত্মগোপন করে খাদ্যের আশায় নিজেদের দেহের কব্জাওলা দরজা দেয় খুলে! জলের সঙ্গে যে সব খাদ্যদ্রব্য আসে তাই খেয়ে ওরা জীবন ধারণ করে। জলের সঙ্গে বালির কণা বা অন্য কোনো শক্ত জিনিষ অনেক সময় ওদের দেহে আটকে যায়। শুক্তিদের সব চাইতে মুস্কিলে পড়তে হয় সেই সময়। ঐ সব শক্ত জিনিষের ছোট ছোট কণা ওরা শরীর থেকে বেরও করে দিতে পারে না, আবার রাখতেও পারে না। কাজেই ওরা তখন কি করে জানো? শরীর থেকে আঠার মতো এক রকম পদার্থ বের করে ঐ সব কঠিন জিনিসের কণাগুলোকে মসৃণ করে ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করে এবং তাদের ঐ চেষ্টার ফলেই হয় মুক্তোর সৃষ্টি! বার বার শরীর থেকে আঠার মতো ঐ তরল পদার্থের স্তরের পর স্তর দিয়ে ঢেকে ফেলবার দরুণ ঐ কঠিন পদার্থের ছোট্ট কণা আকারে বড় হতে থাকে ক্রমে ক্রমে। শেষ কালে এক সময় শুক্তিরা শরীরের তরল পদার্থ বের করা বন্ধ করে দেয়। কোনো শক্ত জিনিষের কণাকে অবলম্বন করে দেহের তরল পদার্থ দিয়ে শুক্তিরা এই যে জিনিষটা তৈরী করে এটাকেই বলে মুক্তো। এই মুক্তোই হচ্ছে আসল মুক্তো।

আবার শুক্তির বুকে আর এক ভাবেও মুক্তো তৈরী করা হয়। তাকে বলা হয় নকল মুক্তো। ডুবুরীরা যখন মুক্তো তুলতে নামে জলের নীচে, তখন যে সব শুক্তির বুকে মুক্তো জন্মায়নি, তাদের কব্জাওলা দরজা খুলে ছোট ছোট জিনিষের শক্ত কণা দেহের মধ্যে ভরে দেয়। আগে যে ভাবে শুক্তিরা মুক্তো তৈরী করে বলেছি, ডুবুরীদের-দেওয়া ঐ সব জিনিষের কণাকে অবলম্বন করে শুক্তিরা মুক্তো তৈরী করে। সিংহল, জাপান প্রভৃতি নানা দেশে এ ভাবে মুক্তোর চাষ করা হয়ে থাকে।

মানুষের চোখের অন্তরালে নিজের বুকের মধ্যে সংগোপনে মুক্তো তৈরী করলেও মানুষের অত্যাচার থেকে শুক্তির কিন্তু অব্যাহতি নেই। শুক্তিদের দুর্গম বাসস্থানে মানুষ হানা দিয়ে লুঠে আনছে তাদের কতো দিনের সৃষ্টিকে।

সমুদ্রের অতল তলে মুক্তো সংগ্রহ করবার ইতিহাসও খুব চিত্তাকর্ষক। মুক্তো সংগ্রহার্থে যারা সমুদ্রের তলে নামে—তাদের মধ্যে এক দল ডুবুরী আছে যারা কোনো পোষাক পরে না। নাকে যাতে জল না ঢোকে তার জন্যে তারা নাক বন্ধ করে নেয়। তার পর শক্ত দড়ির সাহায্যে নেমে যায় সমুদ্রের নীচে। যে দড়ি দিয়ে তারা নামে তার নীচে বাঁধা থাকে খুব ভারী একটা পাথর। এই পাথরের ওপর বসে তারা সাগরের তলে নামে; কারণ, এতে তাড়াতাড়ি নামতে সুবিধে হয়। এই ধরণের ডুবুরীরা জলের নীচে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না; এক দমে বড় জোর এক থেকে দেড় মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে থাকতে পারে। সঙ্গে ছোট একটা ঝুড়িতে এরা মুক্তো জমায়। দম নেবার জন্যে মাঝে মাঝে এদের ওপরে উঠতে হয়। এই জাতীয় ডুবুরীদের বিপদের আশঙ্কাও থাকে খুব। সমুদ্রের নীচে হাঙর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের দ্বারা এরা প্রায়ই আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আর এক রকমের ডুবুরী আছে যারা সমুদ্রের নীচে নামে এক বিশেষ ধরণের তৈরী শক্ত পোষাক পরে। এদের মাথায় থাকে লোহার তৈরী শক্ত টুপী। এই টুপীর সঙ্গে থাকে একটা শক্ত মোটা নল। ওপর থেকে অনবরত হাওয়া পাম্প করে নীচে পাঠানো হয়,—যাতে ডুবুরীদের কোনো রকম শ্বাসকষ্ট না হতে পারে। এদের টুপীর সঙ্গে লাগানো থাকে শক্ত কাঁচের চশমা। কাজেই চার দিক দেখতে এদের অসুবিধে হয় না কিছুই। যতক্ষণ ইচ্ছে জলের নীচে এরা থাকতে পারে। সমুদ্রের তলে এই ধরণের ডুবুরীদের নিরাপত্তাই সব চাইতে বেশী।

সমুদ্রের রহস্যময় অতল তলে শুক্তির বুকে কি ভাবে মুক্তোর জন্ম হয়,—মানুষ কি ভাবে তা লুটে আনে, তার ইতিহাস শুনলে তো? সমুদ্রের অতল তলে, মানুষের চোখের অন্তরালে নিজের বুকের মধ্যে অতি সংগোপনে মুক্তো তৈরী করেও কিন্তু শুক্তিরা ফাঁকি দিতে পারে না মানুষকে; মানুষ ঠিক হানা দিয়ে তাদের বুক থেকে লুটে আনে তাদের সে সম্পদকে। সত্যি, মানুষ কী নিষ্ঠুর!
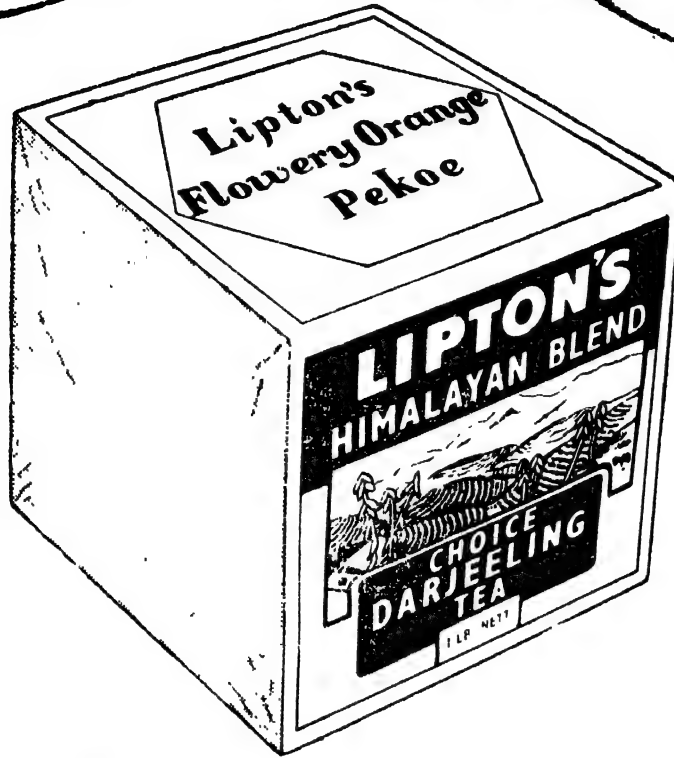
Lipton's
Flowery Orange
Pekoe
LIPTON'S
HIMALAYAN BLEND
CHOICE
DARJEELING
TEA
1 LB NETT
লিপটন
মানে
ভালো চা

LTX-180

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
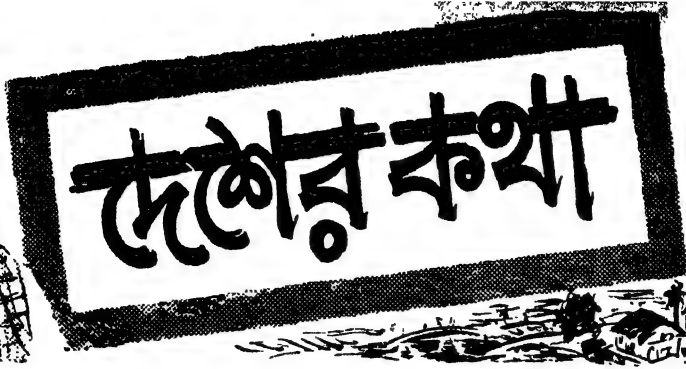
'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকায় প্রকাশ : "আমরা যত দূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, অবিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগের ফলে এবং আরও বহু কারণে কৃষি বিভাগের নৈতিক অবস্থা (morale) খুবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বিভাগের মধ্যে বহু দল-উপদলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ম্মচারিগণের দায়িত্ব বোধ, আশা, উৎসাহ প্রভৃতি খুবই হ্রাস পাইয়াছে। মাননীয় কৃষি ও খাদ্যসচিব কৃষির উন্নতিকল্পে বিশেষতঃ অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য বহু আয়াস ও পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু প্রধানতঃ যাঁহাদের সম্পূর্ণ সাহায্য, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার উপর তাঁহার আয়াস ও শ্রমের ফল নির্ভর করে তাঁহাদের বর্ত্তমান মনোভাবের উন্নতি করিতে না পারিলে তাঁহার চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বিভাগের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করিতেছি যে, ইংরাজের আমলেও বিশেষজ্ঞের কাজের পদে কখনও ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয় নাই। অর্থাৎ ডেপুটী ডিরেক্টার অফ এগ্রিকালচারের পদে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয় নাই। বহু পূর্ব্বে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার (Administration) জন্য এক জন আই, সি, এস, অধিনায়ক (Director) নিযুক্ত হইতেন; এই ব্যবস্থাও পরবর্ত্তী কালে লোপ পাইয়াছিল এবং এক জন কৃষি-বিশেষজ্ঞই অধিনায়ক নিযুক্ত হইতেন।" দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কাজেই নীতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কোন্ দিকে তাহা খুবই স্পষ্ট।

* * * *

'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় মন্তব্য : "গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এক দল নেতা কেবল মাত্র ভাব-বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়াই যে সর্ব্বনাশা মতবাদ লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার ফলে আজ তাঁহারা ভারতের কিয়দংশের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেও হিন্দু সমাজের এক বিরাট অংশকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় তাঁহারা ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরু করাচী গিয়াছিলেন কিন্তু করাচী কেন, তিনি যদি মক্কাতেও যান তাহা হইলেও পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের মনে কখনই নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়া আসিবে না। আসিবে না শুধু এই কারণেই যে, মুসলমানের উপর বিশ্বাস করিয়া কোথাও বাস করা একান্তই অসম্ভব। আজ আমাদের রাষ্ট্রনায়ক তথা ছোট-বড় অনেক নেতৃবৃন্দের মুখেই যখন নানা ভাবে এই দিল্লী-করাচী ঘটিত প্রেম-মিলনের সুমধুরবাণী উচ্চারিত হইতে দেখিতেছি, তখন সদা-সর্ব্বদাই আমাদের এই কথাই মনে হইতেছে যে এই মিলনের রজ্জুতে বাঁধা পড়িয়াছে কে? ইহাই আবার শেষে ফাঁসির দড়ি হইয়া অবশিষ্ট বাংলার কিছু অংশের গলায় চাপিয়া বসিবে না ত? নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি তথা পণ্ডিতজীর করাচী ভ্রমণের পর এই চিন্তাই আমাদিগকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।"

* * *

'দামোদরে' প্রকাশিত প্রেস-নোট : "পশ্চিমবঙ্গের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে কর্ডন ব্যবস্থা তুলিয়া দিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। লোকে যেরূপ মনে করিতেছে, ইহাতে সেরূপ কোনো সুফল পাওয়া যাইবে না। কর্ডন ব্যবস্থা তুলিয়া দিলে দেখা যাইবে, উদ্বৃত্ত অঞ্চলের চাষীরা বর্ত্তমান কালের মত গবর্ণমেণ্টকে বহুল পরিমাণে তাহাদের উদ্বৃত্ত ধান্য ও চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য না হইয়া বরং ঘাটতি অঞ্চলে বিক্রয় করিতে চাহিবে। কারণ সেখানে বিক্রয় করা অধিকতর লাভজনক। এই অবস্থায়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রেশন এলাকা সমূহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ধান্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চলের স্থানীয় বাজার দরও বৃদ্ধি পাইবে ও ঐ সকল অঞ্চলের সাধারণ ক্রেতারা ক্লেশভোগ করিবে। সংগ্রহকালীন ধান্যের দর বৃদ্ধি করিলে আপনা হইতেই উৎপন্ন ধান্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত।"

* * * *

দামোদর পত্রিকার কঠোর সত্য কথা :—"কংগ্রেসকে শ্রদ্ধার আসন হইতে নামাইয়া যাহারা লজ্জাজনক স্তরে আনিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে না—তাহাদের শাস্তি চাই। কংগ্রেস হইতে এই বিশ্বাসঘাতকদের দূর করিয়া দেওয়া হউক নতুবা কংগ্রেস এইখানেই শেষ হউক।" তাহার পর সর্দ্দারজী কয়েক ক্ষেত্রে সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদিগকে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। সেদিনও ২৩শে এপ্রিল হাজারীবাগে জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেসকর্মীদের আদর্শচ্যুতি ও ক্ষমতা-লোলুপতাকে কঠিন ভর্ৎসনা করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মিগণকে দেশ উন্নয়নের কার্য্যে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছেন। নেতৃবৃন্দ যখন বক্তৃতা করেন তখন ভাল ভাল উপদেশ-বাণী তাঁহাদের রসনা হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু তাঁহারা যদি নিজে তাহা আচরণ করিয়া জনগণকে দৃঢ় কণ্ঠে উপদেশ দিতেন তাহা হইলে তাহা দেশকে অনুপ্রাণিত করিত

[illegible] ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়াইয়া যিনি দৃঢ় কণ্ঠে এই কথা বলিতে [illegible]তেন, সেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী আজ নাই। মুখে [illegible] গান্ধীর নাম লইয়া যাহারা অপরকে কৃচ্ছ্রসাধন করিতে বলেন, [illegible] স্মরণ করা উচিত, নব্য জাপানের উত্থানের সময় তাহার [illegible] সেনানায়ক মাত্র সাধাসিধা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাজকোষ [illegible] অর্থ লইতেন। রাষ্ট্রপতি, প্রদেশপালগণ মন্ত্রিগণ ছাড়াও [illegible] দিনের পর দিন নিত্য নূতন বিভাগ, দপ্তর ও সেক্রেটারী, উপ-[illegible], প্রভৃতি দরিদ্র ভারতের রক্ত জল-করা অর্থ হইতে মোটা [illegible] গ্রহণ করিতেছে, সে বিষয় কি তাঁহাদের অজ্ঞাত? আমরা [illegible] দেখিতেছি, বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা ধনীদের অনুকূলে [illegible]। গরীব উৎপাদনকারী কৃষক-মজুর মরিতেছে, অন্য দিকে [illegible] ব্যবসায়ীরা সম্মানের সহিত স্ফীত হইতেছে।"

*　　*　　*　　*

[illegible] 'বঙ্গবাণী' বলিতেছেন: "সরকার আবার নূতন [illegible] মহকুমায় মহকুমায় এবং মিউনিসিপ্যাল সহরে পূর্ব্বের ন্যায় [illegible] কমিটী বা খাদ্য পরামর্শ সমিতি গঠন করিবার [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মহলে চিঠি-পত্র [illegible] প্রভৃতি চলিয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই মৃত ফুড কমিটী-[illegible] উঠিবে; অবশ্য তাহাদিগের ঠিক সেই পূর্ব্বের শরীর [illegible] হইতে পারে। হয়ত বা নূতন কলেবর লইয়া কিংবা [illegible] কলেবরে জোড়াতালি দিয়াও আবার নূতন রূপে দেখা দিতে [illegible] যাহা হউক, আমরা ফুড কমিটী গঠনের বিরোধী নহি। [illegible] আমরা চাই ফুড কমিটী গঠিত হইয়া তাঁহারা সরকারী কর্মচারী-[illegible] বিষয়ে সত্যকার সাহায্য করেন। তাঁহারা সরকারী [illegible] ও জনসাধারণের মধ্যে বুঝাপড়ার একটা সংযোগ-সেতু গঠন [illegible] তুলুন। তবে কথা হইতেছে, নূতন ফুড কমিটী গঠন করিবার [illegible] প্রথমেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে—পুরাতন কমিটীগুলিকেই [illegible] ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল কেন? পুরাতন ফুড কমিটীগুলি অনেক [illegible] দুর্নীতির একটা কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ফুড [illegible]লিকেই অবলম্বন করিয়া দেশের মধ্যে নানা প্রকার দলাদলি, [illegible], অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই জন্যই [illegible] সরকার নিতান্ত দুঃখের সহিত এইগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ নূতন করিয়া ফুড কমিটী গঠন করার সময় এই কথাটিই আমরা স্থানীয় এস, ডি, ও এবং মহকুমা ফুড কনট্রোলার মহাশয়কে বার বার চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।"

*　　*　　*　　*

'গণসংযোগ' পত্রিকার সত্য মন্তব্য: "সম্প্রতি কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ হওয়ায় আমরা কলিকাতা নগরবাসীরা যে, যথেষ্ট দুর্নামের ভাগী হইয়াছি ইহা বলা বাহুল্য। কারণ যাহারা এই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদেরই প্রতিনিধি। আমরাই ইহাদের কাহাকেও নির্ব্বাচন করিয়াছি, আবার কাহাকেও প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি।······আত্মবিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সব দুর্নীতির সহিত আমরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষভাবে জড়িত হইয়া, ধীরে ধীরে নিজস্বার্থে কি ভাবে দুর্নীতির নব নব পথ আবিষ্কার করিয়াছি। যেখানেই আইনসিদ্ধ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধ অসম্ভব হইয়াছে, সেইখানেই আমরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি এবং অপরকেও গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। এক দিকে আমরা সগৌরবে বলিতেছি, অর্থের দ্বারা কি না সম্ভব! এই অর্থের দ্বারাই দিনকে রাত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে······আর অপর দিকে পৃথিবীর মনুষ্য সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়ার দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছি। এক দিকে বে-আইনী বাড়ীর নক্সা পাশ করাইবার, পরিশ্রুত জলের চাপ বৃদ্ধি করাইবার ও নির্দ্ধারিত কর ফাঁকি দিবার জন্য আমরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ও অপরকে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছি। আবার পরমুহূর্ত্তেই যাহারা এই সকল কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিতেছি। চুরি করা দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া চোরকে প্রশ্রয় দিতেছি, আবার চোরের সাজার জন্য চীৎকার করিতেছি।······ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের সমাজকে সুস্থ, সবল ও আদর্শস্থানীয়রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে, প্রয়োজন "নাগরিক চেতনার" বিকাশ।······কোনোরূপ আশ্রয় না গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারি তাহা হ'লে সহজেই সমাজের দুর্নীতি দূর হইয়া সুস্থ ও সবল সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিবে।"

প্রচ্ছদপট

বসন্ত চলে গেলো। এলো নতুন বছর। বৈশাখ। কী প্রচণ্ড উত্তাপ! তাপমান-যন্ত্রে দেখা গেলো ১০৫°৩ ডিগ্রীতে উঠেছে বাঙলার আবহাওয়া। ঘাম ঝরছে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা রোজগার ক'রে খায় তাদেরই শুধু নয়, আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে চার দিক চারখানা বিজলী পাখা ঘুরিয়ে যে-সব বাঙালী শুয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটান তাঁদেরও। তাই এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আমরা সাদরে আপনাদের উপহার দিচ্ছি এক পাত্র শীতল জল আর একখানি দেশী হাত-পাখা। চিত্রটি রঞ্জিৎকুমার ঘোষ অঙ্কিত।

শ্রীকৃষ্ণ —বীরেশ্বর দাশগুপ্ত

পুরানো রাধা —পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

(বাঙলার স্থপতি)

চিত্র-পরিচিতি

এই সংখ্যার আর্ট কাগজে মুদ্রিত "অভিসারিকা" বহু বর্ণের চিত্রটি সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। চিত্রটির ভিত্তি, রঙ এবং কাঠামো নির্ম্মাণ করিয়াছেন প্রাণতোষ ঘটক। চিত্রটি প্যাস্টেল রঙে অঙ্কিত। শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রটিতে শেষ-স্পর্শ অর্থাৎ finishing touch দিয়াছেন।—স

উপুটী
রিচালন
ধিনায়

নতুন রাধা —বাসু চক্রবর্ত্তী

—[illegible]রোজকুমার ভট্টাচার্য্য **স্বামী**

—বিমল দাস **স্ত্রী**

অবগাহন

—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

—রাধাকান্ত হালদার

বাঙলার স্থপতি

রসের সন্ধানে —ব্রজগোপাল বসু

লজ্জা —বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত

গাগরী ভরণে

—পুলিন চক্রবর্ত্তী
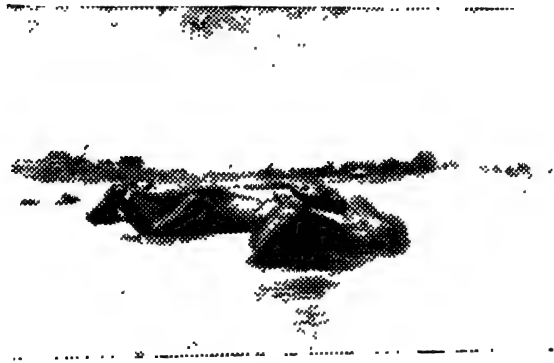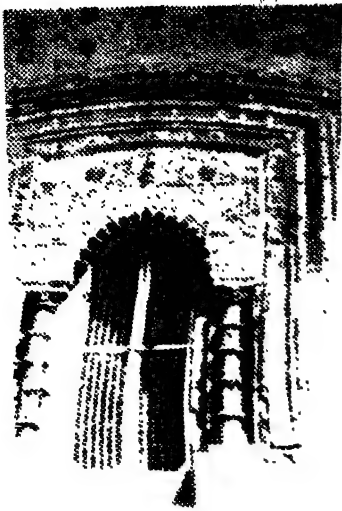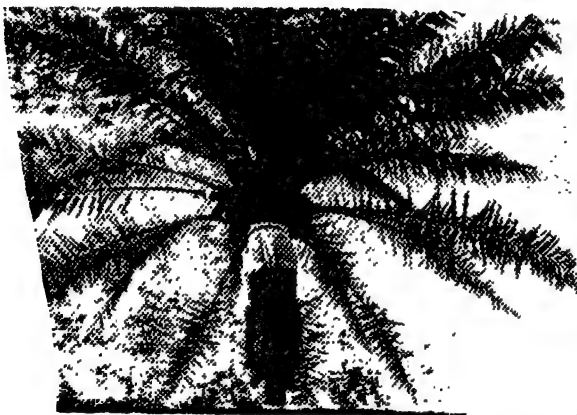
...ছে, যেন সূর্য্যের চারি ধারে গ্রহ-উপগ্রহ। কিন্তু মহাকর্ষ এবং ...তিক চুম্বক-শক্তি যে একই, তা এখন পর্যন্ত প্রমাণ করা ...। শত চেষ্টা করেও দু'টোকে এক নিয়মের সঙ্গে খাপ ...নো সম্ভব হয়নি।

...৩৩ বছর ধ'রে আইনষ্টাইন মহাকর্ষ এবং বৈদ্যুতিক চুম্বক-সমূহকে এক সূত্রে গ্রথিত করবার চেষ্টা করছেন। এখন মনে ... তিনি বোধ হয় সফলকাম হয়েছেন। বোধ হয় প্রমাণ করতে ...ছেন যে, এই দুইটি মহাশক্তি একই। একই বলা হয়ত ঠিক ... বরফ, জল এবং বাষ্প এক জিনিষ নয়, যদিও একই ... বিভিন্ন রূপ। এই এক হওয়াটাও অনেকটা সেই ...। অর্থাৎ আইনষ্টাইন হয়ত শক্তির এমন একটা মূল ... আবিষ্কার করেছেন, যাকে বলা যায় আদ্যাশক্তি, এবং তার ...সকল শক্তির কারণ ও স্বরূপও নির্ণয় করা যায়। এক ... এই ছিল আইনষ্টাইনের অন্তর: একটা লক্ষ্য। আরও ... তিনি চিন্তা করেছিলেন। কেবল মহাকর্ষ, বৈদ্যুতিক ...শক্তিই নয়, কোয়ান্টাম রহস্য এবং অণু-পরমাণু, প্রোটন, ...নের শক্তি সমূহকেও তিনি এক সূত্রে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন। ...পদার্থ যখন বিরাটাকার ধারণ করে, যেমন নক্ষত্র ও ...দের ক্ষেত্রে, তখন কাজে লাগে তাঁর আপেক্ষিক সূত্র; ...ন অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে, যেমন অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে, ... কাজে লাগে কোয়ান্টাম সূত্র। একটা বিরাটত্বের চরম, একটা ক্ষুদ্রত্বের চরম। এক ভাষায় দু'জনে কথা বলে না। ... আইনষ্টাইনের নবতম সূত্র পূর্ণ সফলতা লাভ করে, তবে ...একই ভাষায় কথা বলতে পারবে—বিরাট এবং আণবিকের ...মধ্যে ওপর সেতু গড়ে উঠবে। এখন আইনষ্টাইনের কাজ সম্পূর্ণ ... আরও কিছু দিন লাগবে বলে মনে হয়। তবে তাঁর বিশ্বাস, ...পথেই অগ্রসর হচ্ছেন!

...তই কেন্দ্রের কাছে যাওয়া যাবে ততই বৃত্তের পরিধি যাবে ... নব পরিধিস্থ বিক্ষিপ্ত ভাবধারা সমূহ ক্রমেই ঘনতর হয় ... যতই কেন্দ্রের কাছে যাবে। সব ভাবধারাই কেন্দ্রমুখী, ...দিয়ে সবই হয়ে যায় এক। তাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই ... করলেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান করায়ত্ত হয়। ...টুকু মরে ... যায়। আংশিক সত্তা ও রূপ সমূহ একটি পূর্ণ সত্তা ও ...পরিণত হয়। এই চেষ্টাই মুনি, ঋষি, সাধক, বৈজ্ঞানিকরা করে ... চিরটা কাল ধরে। আপাত রূপ ভিন্ন বলে স্বরূপ আমরা ...পারি না। কিন্তু যে স্বরূপ একবার ধরতে পেরেছে, তার ... রূপই ধরা দিয়েছে। কারণ, সকল রহস্যের সব খোল...র হাতে।

...ন্ন বিভিন্ন দ্রব্য মানুষ দেখতে পায় তার চারি দিকে। প্রথম ...দের কমিয়ে আনা হ'ল ৯২টি মৌলিক পদার্থে। তার ...দের আরও কেন্দ্রীভূত করা হল অণু-পরমাণুতে। তেমনি ...ন্ন ধরণের বলকে একীভূত করা হল বৈদ্যুতিক চুম্বক বলে। ... যত রহস্য সব কমিয়ে এনে দাঁড় করানো হয়েছে দেশ, ... পদার্থ, শক্তি ও মহাকর্ষে। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন ... করলেন যে, পদার্থ আসলে জমাট শক্তি। বাহিরের রূপ ... কিম্বা [illegible]।

শক্তি থেকে পদার্থের উৎপত্তির কথা বেদে ও পুরাণে আছে। হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎসই হল আদ্যাশক্তি। আইনষ্টাইন আরও প্রমাণ করলেন যে, দেশ আর কাল দুইটি ভিন্ন জিনিষ নয়, দুইটি মিলে একটা জিনিষ "দেশ-কাল"। একটার সঙ্গে আরেকটার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, আলাদা করা উচিত নয়।

মনে কর, একটা নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে পাঁচশ' বছর। তবে নক্ষত্রের দেশের লোক দেখছে পৃথিবীর পাঁচশ' বছর আগেকার পুরোনো ব্যাপার সমূহ। তারা হয়ত দেখছে জাহাঙ্গীরের জন্ম—সেইটাই তাদের বর্তমান, কিন্তু আমাদের ভূত। সুতরাং দেশ ও কাল পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। নবদম্পতীর মধুযামিনী ফুরিয়ে যায় যেন এক নিশ্বাসে আর ফাঁসীর আসামীর শেষ রাত্রি যেন অনন্ত, শেষ আর হতে চায় না। সময়ের ধারণা এদের কাছে ভিন্ন। আবার বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রে সময়ের ধারণা বিভিন্ন। এই ব্যাপারটাও আমাদের মনীষীদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। অর্জ্জুন জলে ডুব দিলেন—তার পর বিবাহ, ঘর-সংসার কত সব ব্যাপার ঘটে গেল কত দিন ধরে। তার পর যখন জল থেকে উঠলেন, শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, মাত্র একটা ডুব দিয়েছ আর উঠেছ। অর্জ্জুনের এবং শ্রীকৃষ্ণের সময়ের ধারণা ভিন্ন। স্বর্গের এক দিন মর্ত্তের একশ' বছরের সমান। তাই বলা হয়েছে দেশ এবং কাল ভিন্ন অথবা সম্পূর্ণ নয়, দু'টো মিলে একটা পূর্ণতা লাভ করে।

১৯১৬ সালে আইনষ্টাইন তাঁহার আপেক্ষিক সূত্রে দেখান যে, ব্রহ্মাণ্ড দেশ-কালের চতুর্মাত্রিক সমন্বয়, অর্থাৎ কোন একটা বিন্দুর কথা বলতে গেলে তিনটি দেশ-পরিচায়ক এবং একটি কাল-পরিচায়ক রাশির দরকার। এদের আলাদা করা যায় না, সব সময়েই একসঙ্গে থাকে। তার পর তিনি এই সমন্বয়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন ভর ও ভরাঙ্কের অবস্থিতির দ্বারা। এরই সাহায্যে তিনি মহাকর্ষের নতুন সূত্র আবিষ্কার করলেন। নিউটনের সূত্রে মহাকর্ষকে একটা আকর্ষণ-বল বলে ধরা হয়েছিল; আইনষ্টাইন দিলেন তার সম্পূর্ণ জ্যামিতিক ব্যাখ্যা—বল-রেখা এবং তাদের গুণাবলীর সাহায্যে। অনেকটা ম্যাক্সওয়েলের বৈদ্যুতিক চুম্বকক্ষেত্র সংক্রান্ত গঠন ও গুণাবলীর মত।

বহুদিন ধরে আইনষ্টাইন মহাকর্ষ ও বৈদ্যুতিক চুম্বকক্ষেত্রকে এক পর্য্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করে আসছিলেন। উভয়ের মধ্যে কোথাও যেন একটা মিল আছে, কিন্তু সেই মিলটা কি এবং কোথায়, তা কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না। মনে হয়, এইবার তিনি বোধ হয় সেটা ধরে ফেলেছেন। এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যকে। আইনষ্টাইনের নিজের ভাষাতেই বলি,—"বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য হল যত বেশী প্রকৃতির রহস্যকে যত কম সূত্রে সম্ভব প্রকাশ করা।" যদি আইনষ্টাইনের এই নবতম সূত্র কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে, আইনষ্টাইন বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছেন।

ফ্যাশন নয়—মরণ

যুগে যুগে ফ্যাশন বদলায়। এক সময় ঢেউ উঠেছিল ব্লীচ [illegible]। ক্রমশ [illegible] ধারে বিরাট হতে লাগল [illegible]

রক্ত কোনো নীরোগ সুস্থ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করালে, সুস্থ প্রাণীটির রক্ত রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে এবং এর ফলে সেই নীরোগ প্রাণীটির আর ধনুষ্টঙ্কার হবার আশংকা থাকে না।

তার পর ডিপ্‌থিরিয়া নিয়ে তিনি আবার গবেষণা শুরু করেন। [illegible] তিনি একটি ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত নিয়ে অপর একটি সুস্থ প্রাণীর রক্তে প্রবেশ করিয়ে দেখেন যে, দ্বিতীয় প্রাণীটি ঠিক একই ভাবে ডিপথিরিয়া প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন [illegible]। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধ Antitoxin বা প্রতিবিষ প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৯১ সালে বার্লিনে একটি শিশুর বেলায়। [illegible] তিনি যক্ষ্মা-জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে গবাদি পশুদের [illegible] প্রতিরোধ-ক্ষমতা এই ভাবে দান করতে সক্ষম হন। [illegible] এই মূল্যবান গবেষণায় গবাদি পশুর মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণে [illegible]। তাঁর বিখ্যাত Antitoxin আবিষ্কারের পর [illegible] প্রচার লাভ করে। ক্রমে এই Antitoxinই ডিপথি-[illegible] প্রতিষেধকরূপে আজও ব্যবহৃত হয়। ডিপথিরিয়া [illegible] গবেষণার ফলে [illegible] ডিপথিরিয়া সিরামের কার্য্যপ্রণালীর [illegible] সক্ষম হন।

[illegible] প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কীয় জ্ঞানের [illegible] তাঁর কাছে আজও ঋণী।

[illegible] রোগের কারণ অনুসন্ধানতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা [illegible] মূল্যবান [illegible] ১৮৯০ সালে স্থাপন করেন। তাঁর [illegible] তিনি কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন এবং সেই সঙ্গে একটি [illegible] সম্পাদনা করেন।

[illegible] গবেষণার জন্য তিনি অনেক পুরস্কার এবং বিভিন্ন [illegible] সম্মান লাভ করেন।

[illegible] সম্পর্কীয় গবেষণা ও ডিপথিরিয়া Antitoxin আবিষ্কারের জন্য [illegible] সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

[illegible] সালের [illegible] মার্চ Marburg-এ [illegible] মৃত্যু হয়।

জানেন কি ?

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

দুধ-গাছ

[illegible], [illegible] প্রভৃতি গাছের ডাল বা পাতা ভাঙলে [illegible] সাদা রঙের দুধের মত অল্প আঠাল রস বেরোয়। [illegible] রস [illegible] দুধের মত সাদা; এ ছাড়া দুধের সঙ্গে এর আর [illegible] মিল নেই। দক্ষিণ-আমেরিকায় এক রকম গাছ আছে, [illegible] শুধু দেখতেই সাদা নয়, তার আস্বাদও অবিকল গো-দুগ্ধের [illegible]। স্থানীয় লোকেরা এই গাছকে "Arbol de leche" বা [illegible] বলে।

[illegible]-আমেরিকার মরুভূমি অঞ্চলের পাহাড়ের সানুদেশেই [illegible] দুধ-গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এ গাছগুলির ডাল-পালা [illegible] এমন শুকনো যে সহসা দেখলে মরা গাছ বলেই ভ্রম হয়। [illegible] অঞ্চলে একাদিক্রমে অনেক মাস ধরে বৃষ্টি হয় না। এই সময় শুধু ডাল-পালা, কেন, এদের পাহাড়ের গায় জড়িয়ে থাকা শেকড়গুলি [illegible] একেবারে মরা বলে ভ্রম হয়। কিন্তু কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে ঐ গাছের কাণ্ড বিদ্ধ করলে সাদা দুধের মত স্বাদের [illegible] দুধের চেয়ে কিছু বেশী মিষ্টি এক রকম রস বেরোয়। আরও মজার কথা হচ্ছে,—সকালের দিকেই এই দুগ্ধবৎ উদ্ভিদ-রসটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; সূর্য্যাস্তের সময় গাছের গুঁড়ি কেটে ফেললেও দু'-চার ফোঁটার বেশী রস পাওয়া যায় না। এই কারণে আমাদের দেশে লোক যেমন সকাল বেলা গোরুর খাটালের ধারে দুধের কেঁড়ে, বালতি, ঘটি নিয়ে এসে ভিড় করে, আমেরিকান নিগ্রোরাও ঠিক তেমনি সূর্য্যোদয়ের আগে ঐ গাছের চার পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। ঠিক যখন সূর্য্য ওঠে সেই সময় তারা গাছের কাণ্ডে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে; সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত থেকে সবেগে দুধ ছুটে বেরোয়, তাদের কেউ পাত্র ভরে নিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে সেই অতি পুষ্টিকর ও উপাদেয় উদ্ভিজ-জাত দুধ পান করে, কেউ বা ছেলে-পুলের জন্যে পাত্র ভরে তা বাড়ী নিয়ে যায়।

মেধাবী সিডিস্

আধুনিক মনোবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন তাঁদের কাছে বিখ্যাত মার্কিণ-প্রতিভা ডাক্তার সিডিসের নাম সুপরিচিত। ইনি

আমেরিকার চার জন বিখ্যাত প্রতিভার অন্যতম। অন্য তিন জন প্রতিভার নাম হচ্ছে যথাক্রমে উইলিয়েম ক্লেনার [illegible] [illegible], এডোয়ার্ড হার্ডে ও জন্ ট্রাম্‌বুল্।

সিডিস্ হচ্ছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার বরিস্ সিডিসের পুত্র। ছ'মাসেরও কম বয়সে সিডিস্ সম্পূর্ণ বর্ণমালা আবৃত্তি করে যেতে পারত; দু'বছর বয়সে সে ইসপ্‌স্ ফেব্‌ল্, অ্যালিস্ ইন্ দ্য ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি বই অনায়াসেই পড়তে পারত ও বেশ লিখতেও পারত। এগারো বছর বয়সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিডিস্ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তারই অল্প কিছু কাল পরে সে "ফোর্থ ডাইমেনশান্" নিয়ে এমন বিস্তারিত ও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তাঁর ব্যাখ্যা শুনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রবীণ অধ্যাপক মণ্ডলী একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান

গ্যাব্বেটার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি

রোমের বিখ্যাত অ্যান্টনিও গ্যাব্বেটার স্মৃতিশক্তি ছিল এমন অদ্ভুত তীক্ষ্ণ যে, যে-কথা তিনি একবার শুনতেন তা আদৌ ভুলতেন না। সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনে তিনি তার প্রত্যেকটি কথা মন থেকে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারতেন। লোক-মুখে তাঁর স্মৃতিশক্তির কথা শুনে কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি তা পরীক্ষা করতে আসেন। গ্যাব্বেটাকে একটি লেখা-বক্তৃতা পড়ে শোনান হয়; শোনার পর তিনি মন থেকে সেটি লিখে কাগজখানি পরীক্ষকের হাতে দেন। তাঁরা অবাক হয়ে দেখেন তাঁদের লিখিত বক্তৃতার সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে। তার পর গ্যাব্বেটা দেখান তিনি 'বুক অব কথ' এবং ভিক্টর হিউগো ও ওসিয়ানের যে কোন বইয়ের সামনে থেকে, ও পেছন থেকে অনায়াসেই যে-কোন অংশ আবৃত্তি করে যেতে পারেন।

গাছে ওঠা মাছ

কই মাছের গাছে ওঠার গল্প এ দেশে প্রচলিত আছে। কান্‌কো বেয়ে কই মাছ গাছে ওঠে। গাছের কাণ্ড তাল গাছের 'এপড়ো-খেপড়ো' বা দাঁত-কাটা হলে কিম্বা গাছ ঝাং... াকলে তার দাঁত-কাটা গা কান্‌কো য়ে এঁরা ই কখনও ও গাছে উঠে। কিন্তু স্বচক্ষে ডায়-হারবারের এক রকম দেখেছি যারা টি কাঁ-গির-মত ছোট গাছে র ওপর লাফিয়ে বেড়ায়; টিকটিকীর মত এক গাছের বসে তাক্ করে আর-এক গাছের ডাল বা পাতার ওপরের া-মাকড় ধরেও খায়। শরৎ কালের দুপুরের উজ্জ্বল রোদে-ধারে দাঁড়িয়ে দেখলুম, এক জায়গায় ছোট-বড় বিশ-টি তেমনি মাছ লাফালাফি করে পরম উল্লাসে এ-ডাল করছে। তার মধ্যে সব চেয়ে বড়গুলি দৈর্ঘ্যে আড়াই বেশী হবে না। মাছগুলির দেহের আকার ও গায়ের নেকটা গুলে মাছের মত; তবে চোখগুলি খুব বড় ও বেরোনো আর সামনের পাখনা জোড়াটা লম্বা পায়ের গাছে লাফিয়ে উঠেই পায়ের মত পাখনা দিয়ে এরা আঁকড়ে ধরে। ছোট-ছোট কড়াইশুঁটির দানার মত চোখগুলি খুব সতর্ক ভাবে চার দিকে ঘোরায়, বিপদের সামান্য লক্ষণ ই এরা লাফিয়ে গিয়ে জলের ওপর পড়ে। ভালো করে ক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটিকে ধরতে চেষ্টা করলুম। হাত মে; চোখের পাতা পড়বার আগেই সবগুলি ঝুপ্‌ঝাপ করে জলে পড়ল। আবার দশ-পনেরো মিনিট পরে সতর্ক ভাবে র লাফিয়ে তারা ডাঙ্গায় উঠতে লাগল। অনেক কষ্টে দিয়ে একটিকে ধরে জল থেকে হাত দশেক দূরে ডাঙ্গায় ছাড়লুম। বড় বড় চোখ দু'টো পেছনে ঘুরিয়ে মাছটা র দেখলে, তার পর এক লাফেই আবার জলের ওপর পড়ল। শুধু দৃষ্টিই এদের তীক্ষ্ণ নয়; বুদ্ধিও এদের তীক্ষ্ণ।

গেছো মাছ

সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইয়ের কান

াপনারা দেখে থাকবেন, বেড়ালরা খুশী মত তাদের কান দু'টিকে নাড়াতে ও একেবারে মুড়ে ফেলতে পারে। গাধারাও কান নড়াতে পারে। কিন্তু বেড়ালের মত মুড়তে পারে না।

সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইয়ের কান দু'টি ছিল ভারি অদ্ভুত। বেড়ালের মত তিনি তাঁর কান দু'টি খুশী মত নড়াতে ও একেবারে মুড়ে ফেলতেও পারতেন। এম্‌ এচ্‌ দ্য আলমেরা চেম্বারলেঁ নাম্নী ফরাসী রাজসভার এক সভ্যা ও সম্রাজ্ঞীর সহচরীর বিবরণে দেখা যায়, মেরিয়া লুই,—প্রথম নেপোলিয়নের রাজদরবারে বসে কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করতেন। আমাত্যরা যেদিক থেকে কথা কইত তাঁর কান দু'টি সেই দিকে ঘুরত, নেপোলিয়নের কথবার্ত্তার প্রতি তাঁর কান দু'টি বেশী সচেতন থাকত। তিনি রাগ বা উত্তেজনার বশে কোন কথা বললে সাম্রাজ্ঞীর কান দু'টি একেবারে মুড়ে যেত। নেপোলিয়নেরও চোখ দু'টি থাকত তাঁর কান দু'টির দিকে নিবদ্ধ। সময় সময় রাণীর এই কানের নাচ দেখে তিনি এমন অস্বস্তি বোধ করতেন যে, তিনি রাজসভায় কাজ স্থগিত রেখে অন্তঃপুরে চলে যেতে বাধ্য হতেন।

সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুই

গাছের মত সোঁয়াপোকা

নিউজিল্যাণ্ডে এক রকম অতি বিচিত্র-দর্শন সোঁয়াপোকা দেখা যায়। মেওরীরা তাকে "পেপে য়্যাওয়েটো" বলে। জীবটির সমস্ত দেহটি দেখতে সাধারণ সোঁয়াপোকা বা শাকের পোকার মত (caterpillar), কিন্তু তার মাথার ওপর থেকে সোজা ওঠে পাঁচ-ছ' ইঞ্চি লম্বা একটি সরু লকলকে চারা কড়াইশুঁটি গাছের কাণ্ডের মত বস্তু; কাণ্ডটির মাথায় আবার থাকে কতকগুলি পাতার মত উদ্‌গত বস্তু, এমন কি সেটির রংও গাছের মত সবুজ। সমস্ত জিনিসটি অবিকল একটি কড়াইশুঁটি গাছের মত দেখায়। সোঁয়াপোকাটি যখন মাটির ওপর দিয়ে চলে যায়, তখন ঐ জৈব-গাছটিও তার সঙ্গে চলে বেড়ায়। মনে হয়, সোঁয়াপোকাটির মাথায় আঠা দিয়ে যেন একটি গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অবিকশিত বুদ্ধি

বোম ষ্টেট্ স্কুলের সুপারিন্টেনডেণ্ট চার্লস্ বার্ণস্টেইন একটি অদ্ভুত মানসিক দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত স্কুলেই বার্গি নামে একটি লোক আছে, তার বয়স তেতাল্লিশ, কিন্তু তার মনের বিকাশ চার বছরের শিশুর সমান। অনেক চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়া শেখান যায়নি। কথার মধ্যে সে যে-সব শব্দ ব্যবহার করে তার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তার কথাও শিশুর মত অত্যন্ত জড়তাপূর্ণ ও দুর্ব্বোধ্য। বার্গি দিন-পঞ্জী দেখতে জানে না, শুধু সপ্তাহ সাতটি বারের নাম সে মনে রাখতে পারে। বার্গি এখন ঐ স্কুলেই থাকে। অনেকগুলি বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকই তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কেউ-ই তার এই বিচিত্র মানসিক জড়তার কারণ নির্দ্দেশ করতে পারেননি। বার্গির দেহের বিকাশ কিন্তু ঠিক তেতাল্লিশ বছর বয়সের মানুষের মতই হয়েছে।

সুলতান মামুদের ২৪০টি স্ত্রী

সুলতান মামুদ্ যখন টার্কির সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন তার দু'শ' চল্লিশটি অতি সুরূপা স্ত্রী ছিল। হঠাৎ এক দিন তার মনে হলো, একলা মানুষের পক্ষে এত স্ত্রীকে বশে রাখা তার সম্ভব হচ্ছে না। স্ত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ জাগল। তখন একটি অতি সহজ উপায়ে সে ঐ দু'শ' চল্লিশটি স্ত্রীর হাত থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিলে। প্রত্যেকটি স্ত্রীকে একটি করে বস্তায় পূরে বস্‌পোরাসের জলে নিক্ষেপ করা হলো।

রক্তের ফোয়ারা

স্যান্ স্যালভেডোর ও গুয়েটামালার মধ্যে ভার্ডুর্ বলে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি স্বাভাবিক ফোয়ারা (fountain) আছে—তার নাম হলো 'মিনা দা সাংরে'। এটির থেকে ফোয়ারার মত এক রকম লাল রংয়ের তরল পদার্থ বার হয়। সে তরল বস্তুটির রং দেখ্‌তেই কেবল রক্তের মত লাল নয়। বার হওয়ার পর বাতাস লাগলে তা রক্তের মতই জমে যায়।

কলিকাতার সাংবাদিক সম্মেলনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীযুক্ত [illegible]

নীলকুঠির নয়না

তারানাথ রায়

ডিক ফিরিঙ্গীর খোঁজ নাই!

আবুরি নীলকুঠির ম্যানেজার—তারই খোঁজ নাই।

ফিরিঙ্গী ডিক ও-অঞ্চলের সবাইকে তলোয়ার খেলা শেখাত। গাঁয়ের লাঠিয়াল সর্দ্দাররা তাকে এমন কতকগুলো প্যাঁচ শিখিয়েছিল যে, গোরার বন্দুকের গুলীকে সে আটকে দিতে পারত অনায়াসে। তার দেশী সাকরেদ কেষ্ট বাগচি, সেও খোঁজ দিতে পারে না ডিকের।

কুঠির লাগোয়া ছিল ডিক সাহেবের বাংলো। গেল সন্ধ্যায়ও এই বাংলোর সামনে গাজনের সন্ন্যাসীরা মাথা দুলিয়ে নেচে গেছে ঢাকের বাদ্যির তালে তালে। ডিক তার বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাচনা দেখেছে। তার পর আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলোর সামনে দলে দলে লোক আসতে লাগল, কি হল জানতে। সব লণ্ড-ভণ্ড। বারান্দায় একটা গুড়গুড়ি বসে আছেন, মাথায় তাঁর কলকে নেই। মেজেয় একটা কাঁসার গ্লাস গড়াচ্ছে। সাহেবের দুই রক্ষিতা, কালা আনন্দ আর গোরা আনন্দ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মুসলমান চাকর সিরাজ, তারও পাত্তা নেই। ছেলেটা রিচ্চড না কি যেন ওর নাম, আরও গণ্ডাখানেক এ'বি-পে'বি, তাদেরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

খালি আস্তাবলে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে—আর দাঁড়িয়ে জফ্‌ফা চৌকিদার। চৌকিদার-পো বললে, হাঙ্গামা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ। দফাদার গেছে খবর দিতে, থানা-পুলিশ এসে পড়ল আর কি!

যেমন থানাদার রমন মল্লিক, তেমনি তার বরকন্দাজ জগমন্তু রায়—শুনে ভয়ে ভীড় ফাঁকা হয়ে যায়।

আঁধার ঘনিয়ে আসে। আবুরি নীলকুঠি আঁধারে সেদিন থম-থম করছিল। অন্য দিন কত কলরব কত হল্লা, নীলের বৈঠকখানায় সাত কুঠির সাহেব-মেমদের ঢলাঢলি। কালা আনন্দের যখন বয়স ছিল, আগুরি কন্যার রূপ ত কিছু মন্দ ছিল না। কিন্তু রূপে সন্ধক্কী যেদিন বের করে আনলে ব্রাহ্মণ-কন্যা রূপসীকে, তাই নিয়ে সেদিন ঝগড়া বেধেছিল যেমন কেষ্টনগর, আবুরি, বোয়ালিয়া আর বোলাডাঙ্গায় কুঠেল সাহেবদের মধ্যে, তেমনি শিকারপুর, মাগুরা, আর কাতলামারীর কুঠেলদের মধ্যেও। রূপসী সত্যি ছিল রূপসী। পঞ্চানন্দ বিশ্বাসের কেরদানীতে সেদিন কাতলামারীর খাস বিলিতি গো সাহেবের পৈঁছা পেয়ে রূপসী এক গাল হেসেছিল, সেদিন ডিক পঞ্চানন্দের পাখানা খোঁড়া করে দিয়েছিল নিজে এক লাঠির ঘায়ে। সেই থেকে পঞ্চাননের নাম হয়েছিল কাতলামারীর খোঁড়া মুন্সী। ডিক সেদিন থেকে আনন্দের উপর অনন্ত করেছিল। আনন্দ তাকে আর ডজন কাল বাচ্চার আনন্দ দিয়েছে, গুড়গুড়িতে তামাক খাবারও আনন্দ দিয়েছে। তার হাতে ও-অঞ্চলের ওস্তাদ লেঠেল—তা কিছু কম ছিল না। তার পর ভীমে সর্দ্দারের দল তাকে ওস্তাদের বোষ্টুমী বলে খাতিরও কম করে না। তাই ডিক আনন্দকে ছেড়ে দিতে পারেনি। রূপসীকেও সে ছাড়তে পারে না।

রূপসীর উপর তার কুঠির মালিক টমসনের খুবই লোভ ছিল কিন্তু রূপসীর রূপ ফিরিঙ্গী ডিককে পাগল করে ফেলেছিল। সে তার যথাসর্ব্বস্ব তার পায়ে ঢেলে বলেছিল, "রূপসি, তো[র] মা-ও বাঙ্গালী আমার মা-ও বাঙ্গালী। ও সব বিলিতি সাহে[ব] তোর ধাতে সইবে না।" সেই থেকে রূপসীর জন্যে তাকে টমসনের কুঠি ছেড়ে পৃথক্ বাংলো তৈরী করতে হয়েছিল। বাংলো[য়] এনে রূপসীকে ঢাকাই জামদানী সাড়ী আর কটকী কারিকরে[র] তৈরী গলার চিক, হাতের কাটা বাজু আর কাঁকন, কানে[র] ঝুমকো, নাকের নোলক দিয়ে সাজিয়েছিল। আনন্দ ঝগড়া করেছিল কোমর বেঁধে সাত-সকাল আর সাত-সন্ধ্যে। সেই থেকে ডিক রূপসীর নাম রেখেছিল গোরা আনন্দ। আনন্দের নাম ফিরিঙ্গীর আস্তাকুড়ে পড়ে হয়ে গেল কালা আনন্দ।

প্রতি সন্ধ্যায় ডিকের বাংলো থেকে রূপসীর গানের সুর ও-অঞ্চলটাকে মাৎ করে ফেলত। ও-অঞ্চলের বাবরীচুলো ছোঁড়ারা নানা অছিলায় আবুরি কুঠির আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করত গানের পর শিখতে—আর শিখে তারা মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছিল গাঁয়ে-গাঁয়ে।

কিন্তু আবুরি নীলকুঠির ডিক-বাংলোয় সেদিন রূপসীও নেই, তার—

"কাঁচা বয়েস দেখে
নজর দেয় ভূতে"

গানও নেই। সেও থানায় গেছে। তাকেও না কি গুম করবার চেষ্টা হয়েছিল, এ কথা বাজারে ছেলে-ছোকরাদের মুখে শোনা গেছল।

চৈৎ-সংক্রান্তির দুদিন বাকি। সন্ন্যাসীরা ব্যস্ত! চড়কতলায় কাছের ভীড়। ঢাকীরা লাফ করে বকম লাগাচ্ছে ঢাকের গায়ে। নতুন কাঠি পালিশ করা হচ্ছে। বাণেশ্বর নতুন পালকের [illegible] তৈরী করা হচ্ছে। চড়কতলায় তিন বারের বার গোবর-মাটির লেপ পড়ছে।

রূপসী আশ্বাস দিয়েছিল, সন্ন্যাসীদের এবার মোটা রকমের বকশিস ডিক দেবে। কিন্তু গাঁয়ের সন্ন্যাসীরা বুঝতেই পারছে না, কোন্ গাঁয়ের কোন্ সন্ন্যাসীরা কাল সন্ধ্যায় তার সামনে নেচে গেল। তার পর ডিকও নেই, রূপসীও নেই।

রাত ঘনিয়ে আসে। দেউড়ী থেকে যে কু'সার [illegible] কাউ চলে গেছে বরাবর বাংলোর গাড়ী-বারান্দা পর্যন্ত, [illegible] সনসনানি থেমে গেছে। এক দল শেয়াল এসে বাংলোর দিকে [illegible] সমস্বরে কি হয়েছে, প্রশ্ন করে গেল। দূরে প্যাঁচা ডাকল। [illegible] বাঁশ-ঝাড় থেকে মটমট আওয়াজ ভেসে এল।

জফ্‌ফা চৌকিদার একটু ছিলিম টেনে সবে মাত্র [illegible] বিছিয়েছে আরাম করবার জন্যে, হঠাৎ নজর পড়ল বাংলোর [illegible] একটা আলো নড়ে বেড়াচ্ছে! বল্লমটা তুলে নিল জফ্‌ফা, [illegible] এগোতে সাহস হল না। হাঁকল—কে?

জবাব নেই। আলো থামে না। এক ঘর থেকে অন্য [illegible] আবার নেই। আবার ঐ—ফুল-বাগানে।

চৌকীদার কি করে? একবার হাঁকে—"সিরাজ! সিরাজ [illegible]" সিরাজ ডিকের চাকর। সেও ত বেরিয়েছিল সাহেবের [illegible] ফিরে এল বুঝি।

একটু এগিয়ে যায়। নজরে পড়ে বারান্দায় কয়েকটি [illegible]। কারা এরা?

গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। ওরা ও কি করছে? সিন্দুকটা টেনে আনছে দেখছি। সড়কীগাছা জুৎ করে বাগিয়ে ধরে আরও আড়ালে যায়। এক দুই তিন চার—ইজাবদি মাতলা, গোদা মল্লিক, কোনাক থানার ছোট্ট দারোগা তাজু-মিঞা পর্য্যন্ত! ব্যাপারখানা কি? ওটা কে—গোমিস সাহেব না?

চৌকীদারের ভাল লাগে না। কিন্তু একা কি করবে? দৃষ্টি ওদের উপর রেখে পেছনে হটে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। ডিক-বাংলোর চার পাশের কলা-বাগানের লম্বা পাতাগুলো ইস্পাতের খড়্গের মত চক্‌চক করছে।

ফাঁকা চৌকীদার কলার ঝোপে চুপ করে বসে অপেক্ষা করে। ডাঁশগুলো বাগে পেয়ে তাকে নাজেহাল করে। অলক্ষ্যে দু'চারটে থাপড় মারতে হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখছে আলোগুলো নিবে গেছে আর জ্বলেনি।

ওরা বুঝি কলা-বাগানেই আসে। আমার বুঝি চাঁদের আলোতেই যায়। তা যাক। বাঁচ গেছে যাক। দুই ঝোপ থেকে ঝিঁঝি ঝিঁঝি ঝঙ্কারের প্রতিযোগিতা বেধেই গেছে। একটা কি-যেন কলাগাছের শুকনো বাসনাগুলো টেনে নিয়ে চলে—গো-সাপ হবে।

একটা শুয়ার-পো এসে তার বল্লমটায় নাক ঘসে চলে যায়। ডিক বাংলোর বাতী আর দেখা যায় না। সাড়াও নেই শব্দও নেই। চাঁদটা পশ্চিমেতে ঢলে পড়ছে। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে ঝাউ পথে নেমেই দেখে একটা কাল কাপড়ে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে বাংলো থেকে গাঁ করে কে যেন বেরিয়ে যায়। চৌকীদার-পো আর সইতে পারে না। হাঁক দেয়, হে রে রে রে রে... শোনা যায়, দূর থেকে তার জুড়িদার জবাব দিচ্ছে। সাহস বাড়ে। দেখে ঝাউ-পথ ধরে কাল কাপড় মুড়ি দেওয়া সেটা জোরে পা ফেলে ফেলে চলেছে আর একটু হলেই দেউড়ী পার।

ছুটতে থাকে—মুখে চৌকীদার—হু—হু—হু—র রে রে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ এক-দুই-তিন। ঐ যে কাল কাপড় মুড়ি দেওয়া লোকটা পড়ে ছটফট করছে। দুটো লাফ চৌকীদার আর পাঁচ হাত। হঠাৎ তিন দিক থেকে তিনখানা লাঠি এসে পড়ল তার মাথায়, পাঁজরে, পিঠে। ফলে চৌকীদার আর গোদা নাম করবার ফুরসৎ পেল না, ফুল বাঁশঝাড়ের পথের উপর লুটিয়ে পড়ল।

[ক্রমশঃ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রাশিয়া ও কম্যুনিজম—

রাশিয়ার সঙ্গে কোন বুঝাপড়ার চেষ্টা যে চলিতে পারে না, সে-কথা মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসন গত ২২শে এপ্রিলের (১৯৫০) বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। মার্কিণ সংবাদপত্র-সম্পাদক সমিতির বৈঠকে তিনি বলিয়াছেন যে, রাশিয়া যে-পর্য্যন্ত আক্রমণের মনোভাব পরিত্যাগ না করিতেছে সে পর্য্যন্ত রাশিয়ার সহিত কোন চুক্তি করা বা চুক্তির চেষ্টা করা চলিতে পারে না। তিনি মনে করেন যে, এই আক্রমণের মনোভাব পরিত্যক্ত হইলেই রাশিয়ার সহিত মীমাংসার একমাত্র প্রধান বাধা দূর হইবে। রাশিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাব বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহাও তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "And that world aggression includes not only military att ck, but propagard warfare and secret undermining of free countries from within." অর্থাৎ 'আক্রমণ বলিতে শুধু সামরিক আক্রমণই বুঝায় না, প্রচার-যুদ্ধ এবং স্বাধীন দেশগুলিকে ভিতর হইতে গোপনে অধীন করিবার প্রয়াসকেও বুঝায়।' মিঃ একিসন ভাল করিয়াই জানেন যে, প্রথম গুলী বর্ষণ করিয়া রাশিয়াই তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম সুরু করিবে, এমন কোন সম্ভাবনা নাই। রাশিয়ার দিক হইতে সশস্ত্র আক্রমণের আশঙ্কাও তিনি করেন না। কাজেই সশস্ত্র আক্রমণের আশঙ্কাই রাশিয়ার সহিত মীমাংসার প্রধান বাধা নহে। প্রচার-যুদ্ধের উপরেও তিনি খুব গুরুত্ব আরোপ করেন তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। তথাপি তাঁহার দৃষ্টিতে "present threat of aggression real' অর্থাৎ আক্রমণের হুমকীটা খাঁটি সত্য। কিন্তু এই আক্রমণটা কাহার আক্রমণ? কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? মিঃ একিসন বলিয়াছেন, "Russian Communism is threatening the very safety of the free world," অর্থাৎ 'রুশ কম্যুনিজম স্বাধীন পৃথিবীর নিরাপত্তাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।'

রাশিয়ার এবং কম্যুনিজম উভয়ের সম্বন্ধ যে খুব নিবিড়, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ রাশিয়া যদি কম্যুনিজম বর্জ্জন করে, তাহা হইলে সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বই আর থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া রাশিয়াই কম্যুনিজম নয়, কিম্বা পৃথিবী দখল করিবার জন্য 'কম্যুনিজম' রাশিয়ার একটা চক্রান্ত মাত্র এ কথাও সত্য নয়। বিলাতের 'The New Statesman and Nation' পত্রিকাকে শত্রুরাও কম্যুনিষ্ট বলিয়া অপবাদ দিতে পারিবে না। উক্ত পত্রিকা তাঁহার সাম্প্রতিক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: "Communism is not merely a Mascow plot, but a revolutionary movement which carries along with it the nationally oppressed and the socially under-previleged. Most of all, it appeals to coloured people who see ahead the dawn of an age in which they will be able to stand on their own feet, social equals of white man." অর্থাৎ 'কম্যুনিজম শুধু মস্কোর একটা চক্রান্ত নয়। উহা এমন একটি বিপ্লবী আন্দোলন যাহা জাতি এবং সামাজিক দিক হইতে নিপীড়িত লোকদিগকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বোপরি অশ্বেতকায় লোকদের কাছে উহা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। কারণ তাহারা সম্মুখে এমন একটা যুগ দেখিতে পাইতেছে, সে-যুগে তাহারা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে এবং সামাজিক দিক হইতে তাহারা হইবে শ্বেতকায়দের সহিত সমমর্য্যাদা সম্পন্ন।' কিন্তু মিঃ একিসনের পক্ষে এই দিক দিয়া কম্যুনিজমকে বিচার করা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ কম্যুনিজম পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিকে পর্য্যন্ত আঘাত করিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিতে কম্যুনিজমের চ্যালেঞ্জ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং যে স্বাধীন পৃথিবীতে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা টিঁকিয়া থাকিতে পারে, কম্যুনিজম সেই স্বাধীন পৃথিবীর নিরাপত্তাকে পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত। তাই মিঃ একিসন বলিয়াছেন, "But we are just as determined that Communism shall not by hook or crook or trickery undermine our country or any other free country that desires to maintain its freedom." অর্থাৎ 'কম্যুনিজম আমাদের দেশকে এবং অন্য যে দেশ তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চায় তাহাকে ছল-চাতুরী বা কৌশলে বিপন্ন করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

কিরূপে কম্যুনিজমকে প্রতিরোধ করা সম্ভব মিঃ একিসন সে-সম্বন্ধে এক ছয় দফা কর্ম্মসূচীর উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। গত ২৭শে এপ্রিল (১৯৫০) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য তিন দফা কর্ম্মসূচীর কথা বলিয়াছেন। তিনি ফেডারেল বার এসোসিয়েশনের সভায় বলিয়াছেন, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার সঠিক পথ এবং ভুল পথ দুই-ই আছে এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্ট ঠিক পথই গ্রহণ

করিয়াছেন। এই সঠিক পথ কি তাহার উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন :

(১) "আমরা আমাদের দেশরক্ষা শক্তিকে দৃঢ় করিতেছি এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যে-সকল স্বাধীন দেশ কার্য্যকরী ভাবে কম্যুনিজমের আক্রমণ নিরোধ করিতে পারে তাহাদিগকে সাহায্য দান করিতেছি।

(২) "আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এমন ভাবে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে আমাদের দেশবাসিগণ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসিগণ সকলের কাছেই গণতন্ত্রই উৎকৃষ্ট ধরণের শাসনব্যবস্থা বলিয়া প্রমাণিত হয়।

(৩) "আমাদের দেশে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ দমনের জন্য আমরা শান্ত ভাবে অথচ কার্য্যকরী ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছি। সংবাদপত্রের "হেড-লাইন" অথবা উত্তেজনা পরিহার করা হইতেছে। যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আমাদের কাম্য তাহারই গণ্ডীর মধ্যেই এই কাজ করা হইতেছে।"

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এই কর্ম্মপন্থাই সঠিক পন্থা কি না, তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু চীন সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত শ্বেতপত্র হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের উপর জোর করিয়া কম্যুনিজম চাপাইয়া দেয় নাই। বরং ১৯৪৫ সালে চিয়াং কাইশেকের সহিত রাশিয়ার যে চুক্তি হইয়াছিল, চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত রাশিয়া অক্ষরে অক্ষরে এই চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। বরং চীনের গৃহ-বিবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছে আমেরিকাই। এই হস্তক্ষেপের ফল দেখিয়া শুধু মঃ ষ্ট্যালিনই নহেন, চিয়াং কাইশেক পর্য্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। চীন কম্যুনিষ্টরা এত দ্রুত জয়লাভ করিয়াছে যে, উহা মাও সে তুং-এর কাছেও বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হইয়াছে। কেন এমন হইল? আমেরিকার সরকারী বিবরণ হইতেই জানা যায় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টকে বিলিয়ন ডলার মূল্যের যে সমরোপকরণ যোগাইয়াছিল, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই কম্যুনিষ্টদের হাতে যাইয়া পড়ে। চীনকে কম্যুনিজমের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। যে কারণে সম্ভব হয় নাই, তাহা দূর করিতে না পারিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও কম্যুনিজমকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে কি না, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে কম্যুনিজম ও রাশিয়া অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হওয়ায়, কম্যুনিজম নিরোধের জন্যই রাশিয়ার সহিত কোন মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হইয়াছে, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

বৃটেন, শ্যাম, মালয়, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া সকলেই নয়া চীনকে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চীনকে মানিয়া লইতে তো রাজী নয়ই, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও তাহাকে আসন দিতে অনিচ্ছুক। ফলে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২১টি প্রতিষ্ঠান রাশিয়া বর্জ্জন করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ ট্রিগভি লাই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এ-পর্য্যন্ত এই সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই। তিনি মস্কো পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসার কলকাঠি যে মস্কোতে নয়, ওয়াশিংটনে, এ কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এখনও যে জাতীয়তাবাদী চীনই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিতেছে, তাহা কি উদ্দেশ্যমূলক নয়? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে স্থান দিলে কম্যুনিজমেরই শক্তি বৃদ্ধি হইবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কম্যুনিজমের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি, রাশিয়ার সম্প্রসারণ, এ কথাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে কম্যুনিজমের প্রসার রোধ করিতে হইলে রাশিয়ার সম্প্রসারণও রোধ করিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে রাশিয়া এবং রাশিয়ার অনুবর্ত্তী দেশগুলিকে বাদ দিবার ইচ্ছা মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের আছে কি না, তাহা অবশ্য অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে বাদ দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ নূতন করিয়া তৈয়ার করিবার একটা আন্দোলন ইতিমধ্যেই আমেরিকায় গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাক্তন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ হারবার্ট হুভার 'New United Front against creeping Red imperialismg' গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস সম্প্রতি মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিবের রিপাবলিকান পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। এই সকল প্রচারকার্য্য যে কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে বাদ দিবার প্রাথমিক প্রয়াস, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে বাদ দিলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

মার্কিণ বিমান ও রাশিয়া—

রাশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছে যে, গত ৮ই এপ্রিল (১৯৫০) একখানা মার্কিণ বোমারু বিমান লাটভিয়ার আকাশ দিয়া উড়িয়া যাওয়ার সময় সোভিয়েট জঙ্গী বিমান-বহর উহাকে ভূতলে অবতরণের জন্য নির্দ্দেশ দিলে উক্ত মার্কিণ বিমান এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সোভিয়েট বিমানের উপর গুলী চালায়। এই অবস্থায় সোভিয়েট বিমান পাল্টা গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। অতঃপর মার্কিণ বিমানখানি সমুদ্রের দিকে চলিয়া যায় এবং উহাকে আর দেখা যায় না। তাস এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ বিমান-খানা রুশ এলাকার ২১ কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ঘটনাটি ঘটে লাটভিয়ার লিবাভা নামক স্থানে। রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ ভিসিনস্কী গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫০) মস্কোস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের হস্তে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। উল্লিখিত খবর প্রকাশিত হইবার কয়েক ঘণ্টা পরে মার্কিণ বিমান-বাহিনীর সেনানী মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ভ্যাণ্ডেনবার্গ বলেন যে, রাশিয়ার এই অভিযোগের মূলে কোন সত্য নাই। নৌযুদ্ধাধিনায়ক এডমিরাল ফরেষ্ট পি শেরম্যান বলেন যে, মার্কিণ নৌ-বাহিনীর যে বিমানখানির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তাহাতে কোন অস্ত্র ছিল না। উল্লিখিত দুই উক্তি মিলাইয়া ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে,

হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃটিশ শ্রম-মন্ত্রী মিঃ আইজাকস্ উহাকে 'সুস্পষ্ট ভাবে কম্যুনিষ্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত (clearly communist inspired) ধর্ম্মঘট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মঘটে ১৪ হাজার ৫ শত ডক-শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল এবং ১১ দিন পর ১লা মে ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের প্রেরণায় এই ধর্ম্মঘট হওয়া অবশ্য বিচিত্র কিছু নয়, কিন্তু এই ধর্ম্মঘটকে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত বলা চলে না। কিন্তু লণ্ডন ডকে ধর্ম্মঘট হওয়ার আশঙ্কা সম্পর্কে গত কয়েক মাস হইতেই 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাহার প্রতি কেহই কর্ণপাত করে নাই। আলোচ্য ধর্ম্মঘটের কারণ সম্পর্কে জটিলতা কিছুই নাই। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে যে ডক-শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয় তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবার অপরাধে তিন জন ডক-শ্রমিককে 'ট্রান্সপোর্ট এণ্ড জেনারেল ওয়ার্কস্ ইউনিয়ন' হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। তাহারই প্রতিবাদে এই ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। কিন্তু 'ট্রান্সপোর্ট এণ্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে'র বিরুদ্ধেও ডক-শ্রমিকদের যথেষ্ট অভিযোগ আছে।

উক্ত ইউনিয়নটি এত বৃহৎ এবং এত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উহার সহিত সংযুক্ত যে, ডক-শ্রমিকদের দাবী ও প্রয়োজনের প্রতি এই ইউনিয়নের উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ডক-শ্রমিকদের স্বার্থের যাহারা প্রতিনিধি নহেন তাঁহারাই ডক-শ্রমিক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কম্যুনিষ্টরা এই ধর্ম্মঘটের প্ররোচনা দিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু প্ররোচনা দিবার সুযোগ দিয়াছেন শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট এবং ট্রেড ইউনিয়ন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

বেলজিয়মের রাজা ও প্রজা—

রাজা লিওপোল্ডের বেলজিয়মের সিংহাসনে বসিবার অধিকারের প্রশ্ন গণভোট গ্রহণ করা সত্ত্বেও মীমাংসা হয় নাই। গত ১২ই মার্চ্চ (১৯৫০) এ সম্পর্কে যে গণভোট গ্রহণ করা হয় তাহাতে ২৯,৩৩,৩৮১ ভোট রাজা লিওপোল্ডের বেলজিয়মের সিংহাসনে বসিবার অনুকূলে হইয়াছে। বিরুদ্ধে হইয়াছে ২১,৫১,৮৮১ ভোট। ১,৫১,৪৭৭টি ভোট-পেপার সাদা ছিল। বেলজিয়মের জনগণের শতকরা ৫৭।৫৮ জন রাজার প্রত্যাবর্ত্তনের অনুকূলে। এই ভোট সত্ত্বেও বেলজিয়ম পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত ব্যতীত রাজা লিওপোল্ডের সিংহাসনে বসিবার উপায় নাই।

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সময় রাজা লিওপোল্ড জার্ম্মাণীর হাতে আত্মসমর্পণ করেন। জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে বেলজিয়ম পার্লামেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করেন। সুতরাং তাহাকে সিংহাসনে বসিতে হইলে পার্লামেণ্টের উক্ত নির্দ্দেশ বাতিল করা প্রয়োজন। গণভোট গৃহীত হওয়ার পর রাজা লিওপোল্ডের প্রত্যাবর্ত্তনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ধর্ম্মঘটের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। গত জুন মাসে (১৯৪৯) বেলজিয়মে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালিষ্ট পার্টি শতকরা ৪৩টি ভোট প্রাপ্ত হয়। এই দলটিই রাজা লিওপোল্ডের প্রত্যাবর্ত্তনের সমর্থক। সোস্যালিষ্ট পার্টি তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের ঘোর বিরোধী। লিবারেল দলও তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সমর্থন করে না। গণভোট সত্ত্বেও তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সমস্যার কোন সমাধান গত দেড় মাসের মধ্যেও না হওয়ায় গত ২১শে এপ্রিল বেলজিয়ম পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ৪ঠা জুন (১৯৫০) রাজা লিওপোল্ডের সিংহাসনে বসিবার প্রশ্ন লইয়াই সাধারণ নির্বাচন হইবে।

ইংরাজ মহিলা বিবাহে বিপদ—

দক্ষিণ-আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ডের বামনগোয়াটো উপজাতির ২৭ বৎসর বয়স্ক তরুণ সর্দার সেরেৎসি খামা রুথ উইলিয়মস্ নামক এক জন শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিয়া এক দিকে যেমন সর্দারের পদ হারাইতে বসিয়াছেন, তেমনি আর এক দিকে বৃটিশ জাতির বর্ণবিদ্বেষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাসুতোল্যাণ্ড, বেচুয়ানাল্যাণ্ড এবং সোয়াজিল্যাণ্ড এই তিনটি আশ্রিত রাজ্য আছে। বৃটেন এই তিনটি রাজ্য যুক্ত করিয়া অধিকার করে নাই, যদিও উহাদের শাসন-পরিচালন কার্য্য বৃটিশ ঔপনিবেশিক অফিস হইতেই নির্দ্দিষ্ট হয়। বামনগোয়াটো উপজাতির লোকেরা সেরেৎসি খামার পত্নীর গায়ের রং যাহাই হউক না কেন, তাঁহাকেই সর্দার বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছুক। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মালান সেরেৎসি খামার শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহের ধৃষ্টতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে চাপ দিয়া সেরেৎসি খামা সর্দারের পদে অভিষিক্ত হইতে পারে কি না, সে-সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করান। এই কমিশন যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রকাশ করেন নাই। তবে এ-সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্বেতপত্র হইতে জানা যায় যে, কমিশন সেরেৎসি খামাকে স্বীকার না করিবারই সুপারিশ করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেরেৎসি খামা এবং তাঁহার ইংরাজ পত্নীকে পাঁচ বৎসরের জন্য বেচুয়ানাল্যাণ্ড প্রবেশ করিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। তবে তাঁহাকে এবং তাঁহার সন্তানসম্ভবা পত্নীকে সাময়িক ভাবে স্বদেশে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। পত্নীর সহিত দেখা করিয়া আবার তিনি নির্ব্বাসিত জীবনে ফিরিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট বেচুয়ানাল্যাণ্ডকে আত্মসাৎ করিবার যে চেষ্টা করিতেছে সেরেৎসি খামার নির্ব্বাসন তাহার প্রথম সোপান মনে করিলে ভুল হইবে না; তাঁহার কাকা এবং রিজেণ্ট টিশেডি খামা এ বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদিগকে সাহায্য করিতেছেন। বৃটেনে বর্ণবিদ্বেষ নাই বলিয়া কথিত হইলেও এই ব্যাপারে উহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল।

আণবিক তথ্য ফাঁসে শাস্তি—

আণবিক তথ্য রাশিয়ার নিকট ফাঁস করিয়া দিবার অপরাধে বৈজ্ঞানিক ডাঃ ক্লাউস ফুচ বৃটিশ আদালত কর্ত্তৃক ১৪ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলেন যে, রাশিয়া যাহাতে তাড়াতাড়ি পরমাণু-বোমা তৈয়ারী করিতে পারে সেই জন্য তিনি মার্কিণ এবং বৃটিশ পরমাণু বোমার গোপন তথ্য রাশিয়াকে সরবরাহ করিয়াছেন। ডাঃ ফুচ জাতিতে জার্ম্মাণ। তাঁহার এই স্বীকার-উক্তি আর একটি স্বীকার-উক্তিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বুদাপেষ্টের ফৌজদারী আদালতে বৃটিশ ব্যবসায়ী এডগার সেণ্ডার্স বৃটিশের গুপ্তচর হিসাবে কার্য্য করার অপরাধ স্বীকার করেন।

আরব-ইহুদী সমস্যা—

মধ্য-প্রাচ্যে আরব-ইহুদী সংঘর্ষের আশঙ্কা এখনও দূর হয় নাই। [illegible] অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ [illegible]দিগকে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিতেছে বলিয়া 'বিনাই ব্রিথে'র [illegible] মি. গোল্ডম্যান অভিযোগ করিয়াছেন। আরব-ইহুদীদের [illegible] বর্তমানে যুদ্ধ-বিরতি চলিতেছে মাত্র। কিন্তু এখনও চারিটি সমস্যা সমাধান বাকী রহিয়াছে: (১) ইসরাইল রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ, (২) আরব-প্যালেষ্টাইনের কি হইবে; (৩) আরব আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যা এবং (৪) জেরুজালেমের শাসন-ব্যবস্থা। এই সকল প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধের আশঙ্কা যে থাকিবেই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও ঐক্যের অভাব আছে।

[illegible] ও লেবাননের মধ্যে বিরোধ সম্প্রতি কিছু তীব্রতা লাভ করিয়াছে। রাজা আবদুল্লা ইসরাইল রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল আপাততঃ তাহার একটা সমাধান হইয়াছে। গত ১৫শে মার্চ্চ কায়রোতে আরব লীগ কাউন্সিলের যে অধিবেশন হয়, প্রথমে জর্ডান রাজ্য এই অধিবেশন বর্জন করে। কিন্তু লীগ কাউন্সিলের ১লা তারিখের অধিবেশনে [illegible] আরব রাষ্ট্র পৃথক্ ভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি করিবে [illegible] লীগ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে, এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর জর্ডান রাষ্ট্র লীগের অধিবেশনে যোগ দেয় এবং উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করে। অনেকে মনে করেন, আরব-প্যালেষ্টাইনকে কুক্ষিগত [illegible] অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যেই জর্ডান রাষ্ট্র লীগ কাউন্সিলে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সার্থক হইবে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ-[illegible] গাজাতে একটি নিখিল আরব গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইয়াছে মিশরের উদ্যোগে। আরব লীগ উহার সমর্থক। রাজা আবদুল্লার পরিকল্পনা আরব লীগের দৃষ্টিতে বে-আইনী। কিন্তু আবার [illegible] প্যালেষ্টাইনে আরব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, উত্তপ্ত [illegible] পক্ষে [illegible] কল্পনা করা কঠিন।

[illegible] আজ শুধু জর্ডানে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি জর্ডানে [illegible] নির্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে জর্ডান পরিষদের ৪০ জন সদস্য [illegible] ২০ জনই আরব-প্যালেষ্টাইন অর্থাৎ রাজা আবদুল্লার [illegible] প্যালেষ্টাইনের অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইয়াছে। গত [illegible] এপ্রিল রাজা আবদুল্লা ঘোষণা করেন যে, তাঁহার গবর্ণমেণ্ট [illegible]প্যালেষ্টাইনকে জর্ডানের অঙ্গীভূত করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] আরব লীগ জর্ডানকে লীগ হইতে বহিষ্কৃত করিবে কি না তাহা [illegible] করা কঠিন। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যের খুবই অভাব। [illegible] লীগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জর্ডাকে জব্দ করা সম্ভব হইবে [illegible], ইহাতে ইসরাইল রাষ্ট্রের সহিত স্বাধীন ভাবে মিটমাট [illegible] তাহার সুবিধাই হইবে।

[illegible]জালেমে আন্তর্জ্জাতিক শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গত ৪ঠা [illegible] ট্রাষ্টীশিপ কাউন্সিল যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, ইসরাইল রাষ্ট্র [illegible] পছন্দ করিতেছে না। কিন্তু কয়েকটি সর্ত্তে লীগ কাউন্সিল [illegible] গ্রহণ করিতে রাজী আছে। কাজেই জেরুজালেমের সমস্যা [illegible] মিটিবে বলিয়া মনে হয় না।

পাখতুনীস্থান আন্দোলন—

ডুরাণ্ড লাইন ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী উপজাতীয় অঞ্চলে স্বাধীন পাখতুনীস্থান বা পাঠানীস্থান গঠনের আন্দোলন বেশ জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলন অবশ্য নূতন নয়। ১৯৩০ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'খোদাই-খিদমৎগার' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানীস্থান গঠনের আকাঙ্ক্ষারও উদ্ভব হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে এই আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। কিন্তু গত ২০শে অক্টোবর (১৯৪৯) পুস্তুনীস্থান জাতীয় পরিষদ গঠিত হওয়ার পর হইতে পাঠান রাষ্ট্র যে সত্যই রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই জাতীয় পরিষদে পুস্তুনীস্থান প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। যে ভাবে পাখতুনীস্থান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের কাজ অগ্রসর হইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ নির্ব্বাচন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত আফ্রিদি, শিনওয়ারী, মহম্মদ এবং বজৌরি এই চারিটি উপজাতি চারিটি আঞ্চলিক জাতীয় পরিষদ গঠন করিয়াছে। এই সকল আঞ্চলিক পরিষদ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদ নির্ব্বাচন করিবে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) পাখতুন জিরগা-ই-হিন্দের জনৈক সদস্য খান্ গাজী কাবলী নয়া দিল্লীতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মৌলানা খৈরতুল্লাকে রাষ্ট্রপতি করিয়া ওয়াজিরিস্থানের গিরা অঞ্চলে পাখতুনীস্থান গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইয়াছে।

পাঠানীস্থান গঠন আন্দোলন নূতন রূপ গ্রহণ করায় পাকিস্তান উদ্বিগ্ন না হইয়া পারে নাই। এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য পাকিস্তান বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করিতেছে। কুরাম অঞ্চলে পাকিস্তান বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে। পাক সেনাদলের সহিত পাখতুন ফৌজের সংঘর্ষও ঘটিতেছে। ইহার পরিণতি সম্বন্ধে অনুমান করা কঠিন।

হাইনান পতনের পরে—

গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৫০) চীনা জাতীয়তাবাদিগণ দাবী করেন যে, হাইনান দ্বীপে কম্যুনিষ্টদের অভিযান সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ৬ হাজার কম্যুনিষ্ট হাইনানে অবতরণ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু প্রতি-আক্রমণ করিয়া ৪ হাজার কম্যুনিষ্টকে নিহত, ৯ শত কম্যুনিষ্টকে বন্দী এবং অবশিষ্ট কম্যুনিষ্টদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহার কয়েক দিন পরেই ২৪শে এপ্রিল তারিখের সংবাদে জানা গেল, হাইনানে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে। ২৩শে এপ্রিল প্রাতে কম্যুনিষ্ট বাহিনী বিনা বাধায় হাইনান দ্বীপের রাজধানী হোইহাউতে প্রবেশ করে। অতঃপর সমগ্র হাইনান দ্বীপই কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া গিয়াছে।

হাইনানের পতন হওয়ায় ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত চীনের উপকূলে জাতীয়তাবাদীরা যে অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং কোয়াংটানে গরিলা আক্রমণের ঘাঁটির অস্তিত্বও আর রহিল না। কুয়োমিণ্টাং নূতন আদর্শ সৈন্যবাহিনী (New Model Army) গঠন করিয়াছিল। হাইনান যুদ্ধে প্রথম পরীক্ষাতেই এই

সৈন্যবাহিনী ফেল হইয়া গেল। হাইনানের গুরুত্ব হয়ত বেশী নয়। কিন্তু ফরমোসা যাহারা রক্ষা করিবে, তাহাদের এই পরাজয়ের গুরুত্বও অনস্বীকার্য্য। এখন বাকী রহিল চিয়াং কাইশেকের সর্ব্বশেষ ঘাঁটি ফরমোসা। হাইনান দ্বীপ দখল করা অপেক্ষা ফরমোসা দখল করা যে বহু গুণে কঠিন, তাহা অবশ্যই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ, চীনের মূল ভূখণ্ড এবং ফরমোসার মধ্যে যে প্রণালীটি আছে তাহা প্রস্থে প্রায় ১০০ মাইল। এই ১০০ মাইল সাগর পাড়ি দিয়া জাতীয়তাবাদী বিমান ও নৌ-বাহিনীর প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া ফরমোসা দ্বীপে অবতরণ করা খুব সহজ হইবে না। তা ছাড়া ফরমোসার অধিবাসীদের মনোভাব কম্যুনিষ্টদের প্রতি কিরূপ তাহাও অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর চীনা জাতীয়তাবাদীরা যেরূপ নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালাইয়া ফরমোসাবাসীদের বিদ্রোহ দমন করিয়াছে, তাহারা সেই অত্যাচারের কথা ভুলিয়া গিয়াছে তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক হইতেই এমন সুখে তাহারা বাস করিতেছে না যে, কম্যুনিজম প্রতিরোধের জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিবে।

ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্রোহ—

স্বাধীনতা লাভের চারি মাসের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় দুইটি বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। গত জানুয়ারী (১৯৫০) মাসে ক্যাপ্টেন ওয়েষ্টারলিংয়ের বান্দুং আক্রমণের সামরিক গুরুত্ব হয়ত খুব বেশী নয়; কিন্তু পূর্ব্ব-ইন্দোনেশিয়ার ম্যাকাসারে ক্যাপ্টেন আজিজের বিদ্রোহ খুব অর্থপূর্ণ। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা কতগুলি স্বায়ত্ত (autonomous) অঞ্চলের সৃষ্টি করিয়াছেন। হেগের গোল টেবিল বৈঠকে যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে এই সকল স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল স্বেচ্ছায় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ত্যাগের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। সংযুক্ত ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে দুর্ব্বল ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইন্দোনেশিয়াকে দুর্ব্বল করিয়া রাখাই যে এই সর্ত্তের লক্ষ্য, এইরূপ মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রীরা এই সকল স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলকে স্বাভাবিকই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়া সাতটি স্বায়ত্ত-শাসিত অঙ্গরাজ্যের বিলোপ করিয়াছেন। অবশিষ্ট রহিয়াছে মাত্র তিনটি স্বায়ত্ত-শাসিত অঙ্গরাজ্য: পূর্ব্ব-ইন্দোনেশিয়া (ম্যাকাসার), পশ্চিম-বর্ণিও এবং পূর্ব্ব-সুমাত্রা। পূর্ব্ব-ইন্দোনেশিয়াকে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিবার সপ্তাহব্যাপী প্রয়াসের পরিণাম উক্ত বিদ্রোহের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। গত ৫ই এপ্রিল (১৯৫০) এই বিদ্রোহ হয়। নয় দিন পরে ক্যাপ্টেন আজিজ আত্ম-সমর্পণ করেন এবং আলোচনার জন্য জাকার্ত্তায় আসেন। কিন্তু ম্যাকাসার সমস্যার সমাধান কি ভাবে হইয়াছে, অথবা হইয়াছে কি না, সে-সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং-ঘোষিত দক্ষিণ-মলক্কাস গণতন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইন্দোনেশিয় সরকার উহার বিরুদ্ধে অস্থায়ী অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ মালক্কাস দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ আম্বন এবং আম্বন সহর উহার রাজধানী। আম্বন দ্বীপস্থিত ইন্দোনেশীয় সৈন্যদল গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৫০) তারিখে ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

লণ্ডন ও সিডনী—

লণ্ডন ও সিডনী সম্মেলনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। ১১ই মে (১৯৫০) লণ্ডনে মিঃ একিসন, মিঃ বেভিন এবং মিঃ সুম্যানের মধ্যে যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে, সুদূর প্রাচ্য কম্যুনিজম বিরোধের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। অবশ্য জার্ম্মাণীর প্রশ্নও এই সঙ্গে আলোচিত হইবে। মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে সম্প্রতি মিঃ একিসন যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহার মূল বিষয় হইল, রাশিয়ার সহিত ঠাণ্ডা-যুদ্ধকে স্থায়ী করিয়া রাখা। এই ঠাণ্ডা-যুদ্ধকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে হইলে একটি বৃহৎ কূটনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ পরিকল্পনা গঠন করিতে হইলে রাশিয়ার সহিত ঠাণ্ডা-যুদ্ধকে স্থায়ী করিবার প্রয়োজনীয়তা বৃটেন এবং ফ্রান্সকেও স্বীকার করিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিমতের বিরুদ্ধে যাইবার ক্ষমতা যে বৃটেন ও ফ্রান্সের নাই, সে-কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই লণ্ডনের বৃহৎ ত্রয়ী সম্মেলন শেষ হইবে। কাজেই এ সম্পর্কে এখানে কোন আলোচনা করিবার স্থানাভাব।

১৫ই মে সিডনীতে যে কমনওয়েলথ সম্মেলন আরম্ভ হইবে, তাহা আসলে কলম্বো সম্মেলনেরই একটি উপশাখা মাত্র। গত জানুয়ারী মাসে কলম্বোতে যে কমনওয়েলথ সম্মেলন হয় তাহাতে এশিয়ায় কমনওয়েলথ দেশগুলির নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সম্মেলনে পররাষ্ট্র-সচিবগণ স্থির করেন যে, এই পরিকল্পনাকে বিশেষজ্ঞদের একটি পৃথক্ সম্মেলনে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। উহারই ফল সিডনী সম্মেলন। অর্থনৈতিক অস্ত্র দ্বারা এশিয়ায় কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিকল্পনা গঠনই যে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চীন যদি কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া না যাইত এবং ইন্দোচীন কম্যুনিষ্টদের হাতে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা না দিত, তাহা হইলে এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজন অনুভূত হইত কি? দারিদ্র্যই যে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রধান সমস্যা তাহা সকলেই স্বীকার করেন। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সিস বেকন বলিয়াছিলেন, "The rebellions of the belly are the worst." অর্থাৎ 'ক্ষুধাতুরদের বিদ্রোহই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক।' কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উন্নতির মনোরম চিত্র প্রদর্শন করিয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলাইতে পারা যায় না। বৈদেশিক অর্থ-সাহায্য প্রতিক্রিয়াশীল দলের হাতে পড়িলে জনগণকে যে ক্ষুধার অন্ন যোগান সম্ভব হয় না, চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মার্কিণ অর্থ-সাহায্যকে বাদ দিয়া সিডনী সম্মেলনে কোন পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব নয়। বোধ হয় এই জন্য সিডনী সম্মেলনের পূর্ব্বে লণ্ডনে বৃহৎ ত্রয়ী সম্মেলনের ব্যবস্থা।

বাংলা ছবির বাজার

প্রসাদ রায়

বাংলা চলচ্চিত্র গোড়ার দিকে নিজের শিশুত্বের দোহাই দিয়ে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে চাইত। আমরাও তার অনেক দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য ক'রেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনতুম না। কিন্তু আজ এমন দিন এসেছে, শিশু ব'লে আর তাকে ক্ষমা করা চলে না। কারণ তাকে আমরা পর্দার উপরে দেখে আসছি প্রায় তিন যুগ ধ'রে। হিসাব করলে জানা যাবে, পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের বয়স তার চেয়ে খুব বেশী নয়।

বিলাতের রবার্ট ডবলিউ. পল সাহেব সর্ব্বপ্রথমে চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য নমুনা দেখান ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে তা বিশেষ ভাবে ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ দৈর্ঘ্যে সে ছবি ছিল মাত্র চল্লিশ ফুট। ছোট ছোট ছবি তখন ছোট ছোট দৃশ্য দেখাত, গল্প বলবার শক্তি তার ছিল না। কেবল মাত্র ছবি দেখাবার জন্যে বিশেষ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনাও তখনও কারুর মাথায় আসেনি। বিলাতের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে এই ধরণের দু'-চারখানি খণ্ডচিত্র দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করত এবং চলচ্চিত্রের নাম ছিল তখন 'বায়োস্কোপ'।

দেখতে দেখতে এই ঢেউ এসে লাগল বাংলা দেশেও। ঠিক সাল-তারিখ মনে নেই, তবে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই ক্লাসিক, ষ্টার ও মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়ে নাট্যাভিনয়ের আগে বা পরে আমরা ঐ শ্রেণীর বিলাতী বায়োস্কোপের যে সব ছোট ছোট ছবি দেখেছি, তার প্রত্যেকখানিই ছিল কতকগুলি দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র। তখন আমরা ঐটুকু পেয়েই তুষ্ট ছিলুম।—ছবির গাছ-পালা বাতাসে দুলে দুলে উঠছে, ছবির সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে তটভূমির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ছবির মানুষরা রাজপথ দিয়ে আনাগোনা করছে—এমন কি ছবির কুকুর খুসি হয়ে লাঙ্গুল আন্দোলন করছে, এই দেখেই আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকত না।

ক্রমে বাড়তে লাগল ছবির আকার। সঙ্গে সঙ্গে ছবি গল্প বলতে সুরু করলে মৌন ভাষায়। সে সব গল্পের বিষয়-বস্তুও ছিল যৎসামান্য। তখনকার একখানা বিলাতী ছবির গল্প আজও আমাদের মনে আছে। এক জন পাগল গারদ ভেঙে বাইরে এল। গারদের রক্ষীরা তার পিছনে পিছনে তাড়া করলে। পাগলা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কখনো সে পাঁচিল ডিঙিয়ে কোন বাগানের ভিতর প্রবেশ করে, কখনো উঁচু জায়গা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে এবং কখনো বা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে অন্য তীরে গিয়ে ওঠে—এমনি সব কাণ্ড-কারখানা দেখতে দেখতে দর্শকদের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত পাগলকে আবার গ্রেপ্তার করলে নাছোড়বান্দা রক্ষীরা।

তার পর ছবির গল্পের ভিতরেও এল ধীরে ধীরে উচ্চতর শ্রেণীর বিষয়-বস্তু, চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা ও নাটকীয় ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা। বিখ্যাত কোন কোন নাটকও দেখলুম ছবির পর্দার উপরে। হাস্যরসাত্মক গল্পও ছবির জন্যে বিশেষ ভাবে রচিত হ'তে লাগল। আমেরিকা তখনও চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে ছবির বাজার দখল করতে পারেনি, এ বিভাগে সমধিক অগ্রসর ছিল তখন ফ্রান্সের প্যাথি সম্প্রদায় এবং আমাদের কাছে সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ফরাসী নট ম্যাক্স লিণ্ডার। এ সব হচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। এবং এই সময়েরই কিছু আগে বা পরে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্ম হয়। এই জন্যেই গোড়াতে বলেছি যে, বিলাতী ছবির চেয়ে বাংলা ছবি বয়সে বেশী ছোট নয়। তফাৎ কেবল এই, বিলাতী ছবির সূত্রপাত হয়েছে প্রথমে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও পরে বালক-ভুলানো তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে, কিন্তু বাংলা ছবি জীবন সুরু করেছে একেবারে নাটক বা নাটকীয় কাহিনী নিয়ে। বিলাতী ছবিকে জন্মগ্রহণ করবার পর যথাক্রমে বসতে, হামাগুড়ি দিতে, দাঁড়াতে ও হাঁটতে শিখতে হয়েছে, কারণ তার সামনে ছিল না কোন আদর্শ। কিন্তু বিলাতী ছবিকে আদর্শরূপে পেয়ে বাংলা ছবি একেবারে সক্ষম মানবকের মত পদচালনার শক্তি অর্জ্জন করতে পেরেছে।

কিন্তু ঐ আদর্শই এখন বাংলা ছবির পক্ষে হ'য়ে উঠেছে অভিশাপের মত। অনুকরণ কোন দিনই আদর্শকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না তো বটেই, তার কাছ পর্য্যন্ত গিয়েও পৌঁছতে পারে না। সুদীর্ঘ তিন যুগের মধ্যেও বাঙালী যে চলচ্চিত্র-জগতে অতুলনীয় বা বিশেষ রূপে স্মরণীয় কোন-কিছু দান করতে পারলে না, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, কার্য্যক্ষেত্রে তার নিজস্ব মগজ থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, দৃষ্টি তার সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হয়ে আছে বিলাতী ছবির কারখানার দিকে, সেখান থেকে পাঠ্য পুস্তকে কথিত সুবোধ বালক গোপালের মত সে যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে। বাংলা ছবির জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ম্মকর্ত্তারা ক্রমাগত অনুকরণ ও অনুকরণই ক'রে আসছেন, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার ক্ষে-

বাংলার নিজস্ব দাবেও কোন অভাবই নেই, কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসের মধ্যে বাংলার স্বকীয় বিশেষত্বের কোন পরিচয়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, বাংলা ছবির প্রয়োগকর্ত্তা ও পরিচালকরা নূতন ছবি প্রস্তুত করবার সময়ে নিজেদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে অকেজো ক'রে রেখে সর্ব্বদাই অবলম্বন করতে চান পাশ্চাত্য চিত্র-ধুরন্ধরগণকে—ডি-মিলে, লয়েড, লুবিট্‌স্ ও কাপ্রা প্রভৃতির নাম তাঁদের কাছে দেবতার নামের মত!

আমরা যদি পাশ্চাত্য ছবির আসল প্রাণ-পদার্থ খোঁজবার চেষ্টা করতুম তাহ'লে হয়তো এই বিড়ম্বনা ভোগ করতে হ'ত না। কিন্তু আমাদের নজর পড়ে শাঁস ফেলে কেবল খোসার দিকে—বিলাতী ছবির 'টেকনিক' বা যান্ত্রিক কৌশলের আড়ালে কাজ করে যেন সৃষ্টিক্ষম মস্তিষ্কের প্রভাব, সেটা থেকে যায় আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইরেই।

বাংলা ছবি যে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে অভিনন্দন লাভ করতে পারে না, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তবু উদয়শঙ্করের "কল্পনা" য়ুরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কেন? "কল্পনা"র মধ্যে ছোট-বড় দোষ-ত্রুটির অভাব নেই এবং উদয়শঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন, পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি নাবালক ছাড়া আর কিছুই ন'ন। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, এই নাবালকত্ব বা অর্বাচীনতাই হয়ে উঠেছে তার পক্ষে পরম আশীর্বাদের মত। এদেশী পাকা ও ঝুনো পরিচালকদের দলে ভিড়ে তিনি হলিউডের দরজায় গিয়ে ধর্ণা দিতে শেখেননি, তিনি দেখেছেন নিজের চোখ দিয়ে, শুনেছেন নিজের কান দিয়ে, অনুভব করেছেন নিজের প্রাণ দিয়ে। এবং সেই জন্যেই তিনি এমন একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন, অল্প-বিস্তর ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও যার মধ্যে প্রতীচ্যও লাভ ক'রেছে অভিনব উপভোগের উপাদান।

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় পরিচালকরা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, ছবির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ধর্তব্য হচ্ছে তার গল্প। ভালো গল্প ভালো ক'রে বলতে না পারলে কোন ছবিই ভালো হ'তে পারে না—তার যান্ত্রিক কৌশল হচ্ছে গৌণ ব্যাপার মাত্র। হলিউডের প্রযোজকরা এক-একটি ভালো গল্প কেনবার জন্যে বড় বড় মূল্য দিয়ে থাকেন।

কিন্তু ঐ যে বললুম, ভালো গল্প বলতে হবে ভালো ভাবেই! বাঙালী প্রয়োগ-কর্ত্তাদের হাত দরাজ না হ'লেও, ভালো গল্পের জন্যে তাঁরাও অল্প লোভ প্রকাশ করেন না; কিন্তু তাঁদের পরিচালকদের ভালো গল্প ভাল ভাবে বলবার শক্তি এত কম যে, দেখে-শুনে আমরা প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি বললেও অত্যুক্তি হবে না। বারে বারে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাবান লেখকদের প্রথম শ্রেণীর গল্প নিয়ে যে কি-রকম নিম্ন শ্রেণীর ছবি তৈরী করেছেন, এখানে তার আর হিসাব দাখিল করা বাহুল্য মাত্র, কারণ সে কথা সকলেই জানেন। এই সে দিনেই তো "চন্দ্রশেখর"কে নিয়ে একটা রীতিমত হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল!

পৃথিবীর সব দেশেই পাশ্চাত্য ছবির এত আদর কেন? তারা ভালো গল্প ভালো ক'রে গুছিয়ে বলতে পারে। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগ থেকেই তারা প্রাণপণে এই চেষ্টা ক'রে আসছে। সর্বজনখ্যাত লেখকদের সুপরিচিত আখ্যায়িকার চিত্ররূপের কথা ছেড়ে দি, বিশেষ ক'রে ছবির জন্যে রচিত গল্প বলবার সময়েও তারা এমন চেষ্টা করতে ভোলে না। এখনো মনে পড়ে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও ম্যাক্স লিণ্ডারের দ্বারা অভিনীত, অধিকাংশ চিত্রের মধ্যে যে সব গল্প থাকত, কাহিনী হিসাবেও সেগুলি সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারত।

পাশ্চাত্য ছবিতে এই গল্প বলার আর্ট ক্রমেই উচ্চস্তরে উঠছে। কিন্তু বাংলা ছবি সম্বন্ধে কোন মতেই এ কথা বলা যায় না। বরং নির্ব্বাক্ যুগে আমাদের পরিচালকরা গুছিয়ে গল্প বলবার অল্প-বিস্তর চেষ্টা করতেন, কিন্তু এখনকার অধিকাংশ পরিচালকই গল্প বলার চেয়ে বেশী ঝোঁক দেন যান্ত্রিক কৌশল এবং অন্যান্য প্রায় অবান্তর বিষয়ের দিকে। অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য ছবির মধ্যে অভিনব কোন-কিছু দেখলেই, তাঁরা গল্পকে মাটি ক'রেও ছবির মধ্যে তা সন্নিবিষ্ট করবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছেন।

কিন্তু কেবল পরিচালকদেরই বা দোষ দিই কেন, আজকাল যে সব লেখক চিত্র-কাহিনী রচনা ক'রে মাথা-মারা হয়ে পড়েছেন তাঁদেরও অনেকের হাত থেকে জোর ক'রে কলম কেড়ে নিলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হবে না। গল্প রচনার জন্যে যে সাহিত্যিক শিক্ষার দরকার, তাঁরা যে তা থেকে বঞ্চিত, তাঁদের চিত্র-কাহিনী দেখলে এ কথা বুঝতে একটুও বিলম্ব হয় না। এ সম্বন্ধে আমাদের আরো কিছু বক্তব্য আছে, ভবিষ্যতের জন্যে তা তোলা রইল।

শীস্ দিয়ে বিশ্বজয়

প্রেক্ষাগারে দর্শকের যেমন ভিড়, তেমনই ছিল গোলমাল। সকলেরই মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল। ষ্টেজে উঠলো একটি লোক, মধ্যম গড়নের, দীর্ঘায়ত দেহ। চোখে তার গাঢ় রঙের চশমা। [illegible] চালের সুর শীস্ দিয়ে দিয়ে বেড়াতে লাগলো ষ্টেজে। [illegible] সমস্ত প্রেক্ষাগার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অপরূপ মাধুর্য্য [illegible] ক'রে বেড়াতে লাগলো সেই শীস্ দেওয়া সুরের ধ্বনিতে—[illegible]নিতে।

[illegible] চশমা-পরা লোকটি আশৈশব অন্ধ। নাম তার ফ্রেড লওয়েরি। শীস্ দিয়ে সুরের ইন্দ্রজাল রচনায় তার জুড়ি সারা পৃথিবীতে নেই। বিক্রিসুরি, জগৎজোড়া খ্যাতি যাঁর—তিনি একদা এই অন্ধ লওয়েরির ছাত্র হতে চেয়েছিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে লওয়েরির সমাদর সর্বত্র। মঞ্চে, বেতারে, টেলিভিশন প্রোগ্রামে, গ্রামোফোন রেকর্ডে এই অন্ধ, চশমা-ঢাকা চোখওয়ালা লোকটির জনপ্রিয়তা অসাধারণ।

অন্ধ বালক লওয়েরিকে কয়েক মাইল দূরের এক কূয়ো থেকে জল বয়ে আনতে হতো তার দিদিমার ক্ষেতের জন্য। পথে পাখীর ডাক নকল করতো সে শীস্ দিয়ে, আর পথ চলতো। এইখানেই তার শীস্ দেওয়ার সুরু।

নৃত্য-পটীয়সী মার্গট ফন্টেন

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১ই মার্চ, ১৯৫০। কভেণ্ট গার্ডেনে 'রয়েল অপেরা হাউসে'র টুকটুকে রক্তবর্ণের পর্দাখানি স'রে গেল। মঞ্চের ওপর ছ'জন ভেরীবাদক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দর্শকদের গ্যালারীর মাঝখানে রাজকীয় আসন। এরই সামনে উচ্চশ্রেণীর নাইটদের নিদর্শন আর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক প্রোজ্জ্বল।

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট ভিনসেণ্ট অরিয়ল পরিদর্শনে আসবেন। কভেণ্ট গার্ডেনকে তাই ঢেলে সাজা হয়েছে। একমাত্র রাজকীয় দল আর তাদের অতিথিরাই প্রধান ফটক ব্যবহার করবে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্রামাগারটিকে লাল আর নীলাভ-সবুজ রেশমী কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। চারি দিকে ক্যামেশিয়ার মালার ছড়াছড়ি।

এখানেই শেষ নয়। আরও পরিবর্তন ঘটেছে,—কিন্তু সেটা মানুষের মনে। অগণিত দর্শকের মনে চলেছে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। তারা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে প্রতীক্ষা করছে। ব্যালের দলের ছেলেমেয়েরা ভীড় জমিয়েছে মঞ্চের ওপর, পরনে তাদের উপযুক্ত পোষাক।

এদেরই মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে খাটো ঘাগরাটা দু'হাতে তুলে ধ'রে মঞ্চে প্রবেশ করলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যালে নাচিয়ে মার্গট ফন্টেন। বেহালার সুরের তালে তালে তার দেহ-বল্লরী ছন্দায়িত হয়ে উঠছে।

মার্গট কঠিন ক্লাসিকাল নৃত্যে যেমন পটীয়সী, তেমনি হাস্য রসের নৃত্যেও তার তুলনা নেই।

আর্নল্ড হাসকেল ব্যালে সম্পর্কে বর্তমান যুগের এক দিক্‌পাল। তিনি মার্গটের ব্যালে নাচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকাও মার্গটের শিল্পনৈপুণ্যকে উচ্চ স্থান দেন।

মার্গটের দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, আর ওজন ১১২ পাউণ্ড। সম্পূর্ণ সুষম একটি দেহের অধিকারিণী সে—ঠিক ব্যালের উপযোগী। বঙ্কিম গ্রীবা, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ এবং মুখের গঠনে বুদ্ধদেবের ছায়া তার সর্বাঙ্গে সুষমা ঢেলে দিয়েছে।

ইংরাজ মেয়েদের মধ্যে সেই যে প্রথম ব্যালে নৃত্যশিল্পীর জীবন বেছে নিয়েছে, তা নয়। এদিক্ থেকে এলিসিয়া মারকোভার নাম করতে হয়। এর প্রকৃত নাম এলাইস মার্কস। তবে বৃটিশ ব্যালের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মার্গট ফন্টেন। বৃটিশ স্কুলেই তার শিক্ষা, সেই শিক্ষাকেই সে রূপ দিয়েছে বাস্তবে।

১৯১৯ সালের ১৮ই মে সারের রিগেট অঞ্চলে ভূমিষ্ঠ হল একটি মেয়ে। নাম তার পেগি হুথাম। পেগির বাবা ইঞ্জিনীয়ার মানুষ; কাজ করতেন বৃটিশ-আমেরিকান টোবাকো কোম্পানীতে। তার মা ধনী ব্রেজিলিয়ান বংশের মেয়ে। কফির ব্যবসায়ে এদের ভাগ্য ফিরে যায়।

শৈশবেই পেগির শিল্পি-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্যের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা গেল। তাই স্কুলের শিক্ষার প্রথম পাঠের মধ্যে নৃত্যশিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। চার বছর বয়সের সময়ে তাকে পাঠাতে হ'ল মিস্ বসুটোর লণ্ডন স্কুলে। কোর্স সমাপ্ত হ'লে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফলের জন্যে তাকে পারিতোষিক দেওয়া হল। পাঁচ বছর বয়সে সে রয়েল একাডেমী অব ড্যান্সিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল।

কিন্তু শিল্পী সে। নিজের ও-রকম বিদ্‌ঘুটে নাম তার পছন্দ হবে কেন? প্রথমে সে নাম নিল ফন্টেস। বিয়ের আগে তার মা'র ঐ নাম ছিল। কিন্তু এ নামও স্থায়ী হ'ল না। পেগি হুথাম পরিশেষে হ'ল মার্গট ফন্টেন।

মার্গট আর পরিবারের সকলে অল্প দিন আমেরিকায় বাস করে। মার্গটের বয়স যখন মাত্র আট বছর, ওরা সপরিবারে চলে আসে সাংহাই। এখানে নির্বাসিত রুশ-শিক্ষকদের মধ্যে থেকে প্রথম শ্রেণীর লোক খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। মার্গট এল জর্জ গোনচারভের কাছে। এই ছোট্ট মেয়েটির মধ্যে জর্জ ভবিষ্যৎ শিল্পীকে দেখতে পেলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, 'মার্গট যা চায়, তা যেন ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠছিল।'

চার বছর পর বোঝা গেল, ঠিক কি সে চায়। ব্যালে নৃত্যশিল্পী হওয়ার বাসনা সে প্রকাশ করলো। ওর মা মিসেস্ হুথাম ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন ইংলণ্ডে।

১৩ বছর বয়সেই মার্গট তার তরুণ মনকে বেঁধে ফেললো। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির ক'রে ফেললো। ঠিক করলো, 'স্যাডলারস্ ওয়েলস্ ব্যালে স্কুলে' যোগ দেবে এবং নিনেট্ ডু ভ্যালয়ের প্রতিভার ছায়ায় নিজেকে একটা প্রকৃত শক্তিরূপে গড়ে তুলবে। ভ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক দিকে যেমন সহজ, সরল অন্য দিকে তেমনি অনন্য ও অপরিবর্তনীয়। ভ্যালয় চেয়েছিল এমন একটি দল গড়ে তুলতে, যেখানে কারোও মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না আর দলটি হবে খাঁটি বৃটিশ।

১৯৩৫ সালে মিস্ ডু ভ্যালয় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'ল। তার দলের শিল্পী মারকোভা নিজের দল গড়বার অভিপ্রায়ে স্যাডলারস্ ওয়েলস্ ছেড়ে চলে গেল। মিস্ ভ্যালয় পড়লো সমস্যায়। ওয়েলসের জন্য আর এক জন নতুন শিল্পী নেওয়া হবে, না পুরানোদের দিয়েই চালিয়ে নেওয়া হবে? কিন্তু পুরানোদের দিয়ে চালাতে গেলে একটা বড় রকমের ঝুঁকি নিতে হয়, কারণ সে ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহ শূন্য থেকে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিনের কথা মার্গটের আজও স্মরণ রয়েছে: "মাদাম ভ্যালয় আমার মা'র সঙ্গে কথা বলছিলেন বললেন, 'বছর খানেকের জন্য ক্লাসিকাল ব্যালে বাদ দিয়ে রাখবো মনে করছি। পরের বছরে মার্গটকে নামাবো 'গিসেল' বইতে।' শুনে আমি তো ভয়ে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলাম।"

ল্যাম্বার্ট-এস্টনের ব্যালে 'রিও গ্র্যাণ্ডে'তে মার্গটকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হ'ল। মার্গটের বয়স তখন ষোলো। মারকোভার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর মধ্যে এ নৃত্যটি পড়ে না; কাজেই এতে সাফল্য অর্জন করতে মার্গটকে বেশী বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু 'সোয়ান লেক' নৃত্যেও মার্গটের সাফল্য লক্ষ্য করবার বিষয়। কারণ, এই নৃত্যটিতে মারকোভা ছিল অতুলনীয়া। অথচ ফন্টেনও এতে সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

মার্গট ফন্টেন বরাবরই পরিপূর্ণতা অর্জনের পক্ষপাতী। সে প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করতো আর নাচতো, নাচতো আর অনুশীলন করতো। সন্ধ্যা ৭টায় হয়তো তার অনুষ্ঠান সুরু হওয়ার কথা; অন্ততঃ দু'ঘণ্টা আগেই সে থিয়েটারে হাজির হয়। তার পর পৃথিগন্ধময়, অপরিচ্ছন্ন সাজ-ঘরে ধীরে-সুস্থে, সযত্নে সাজ-গোজ করে। অপেরা শিল্পী ও ব্যালে-শিল্পীদের জন্যে এই একই সাজ-ঘর। 'স্লিপিং বিউটীর' প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর আগে সে সমগ্র তৃতীয় অঙ্কটি রবার্ট হেলপম্যানের সঙ্গে দ্বৈত রিহার্শাল দিয়ে নেয়।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত এগারো বৎসরে মা ফণ্টেন ধাপে ধাপে বেড়ে উঠতে লাগলো। যুদ্ধকালে তাল রেখে চলা [illegible]ন হয়ে পড়লো। হল্যাণ্ড থেকে তাদের দলকে যখন স'রে পড়তে [illegible], সেও তখন দলের সঙ্গেই ছিল। ছোট্ট সবুজ রঙের কচ্ছপের [illegible]রের যে ব্রোচটা সে-সময় সে পরতো, আজও সেটা তার কাছে [illegible]ছে।

[illegible] দল যখন কভেণ্ট গার্ডেনে এল, তখন মঞ্চে ফণ্টেনের জুড়ি [illegible] ভার।

১৯৪৬ সালের কথা।

[illegible]রিচালক এস্টন তাঁর পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ব্যালে 'সিণ্ডেরেলা' প্রদর্শনের [illegible]জন করছেন। মার্গট ফণ্টেন ছ'মাস ধরে এর জন্যে ঐকান্তিকভাবে [illegible] নিয়ে তৈরী হ'ল। কিন্তু সে জানতে পারলো না যে, ঈশ্বর [illegible] অধ্যবসায় দেখে অলক্ষ্যে ব'সে হাসছেন। অক্টোবর [illegible] গিয়ে তার পায়ে আঘাত লাগলো। 'সিণ্ডেরেলা'র [illegible] অবতীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য তার আর হ'ল না। [illegible] পরিশ্রম তার ব্যর্থ হয়ে গেল। তার জায়গায় নেওয়া হ'ল ময়রা শিয়ারারকে। প্লাষ্টার-করা পা নিয়ে মার্গট ফণ্টেন গেল প্যারিসে।

সেখানে কি ঘটলো জানা যায় না। বিয়ে করার মত অবসরই [illegible], সেই মেয়ে কি শেষে প্রেমে পড়লো? যা হোক কিছু একটা ঘটেছিল বৈ কি, কারণ তার মধ্যে পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। ১৯৪৭ [illegible] ফেব্রুয়ারীতে সে যখন কভেণ্ট গার্ডেনে ফিরে এল, [illegible], চমক লাগানো নৃত্যকলা, করুণ আবেদন সকলকে মুগ্ধ করলো।

[illegible] তার বিষয়ে যা-ই ভাবুক না কেন, মিস্ ফণ্টেন তাতে [illegible] না। সাধারণের মধ্যে তার গুণানুধ্যায়ীর সংখ্যা এত [illegible] যে, তাদের সকলের প্রতি মনোযোগ দিতে হ'লে এক জন [illegible] রাখার প্রয়োজন।

[illegible] হয়ে পড়েছে, এ কথাটা সে স্বীকার ক'রে নিতে চায় [illegible] সে চাল চলনে শিল্পীর মত আদব-কায়দাও অভ্যাস [illegible]। সে বলে, "আমাদের দলে যে কেউ আদব-কায়দা দেখাতে যা[illegible] তাকে তামাসা করবে। ফলে তাকে তা ছাড়তে [illegible]।" [illegible]রিচালক এস্টন এই অ-থিয়েটারী আচরণের একটা সঙ্গত [illegible] দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "ব্যালের দলের প্রধানার [illegible] 'নাক' নেই, তখন অপরে সে চেষ্টা করলে বিসদৃশ দেখাবে [illegible]।"

মঞ্চের বাইরে একটি বিষয়ে ফণ্টেন অমিতব্যয়ী। সুন্দর, দামী পোষাক পরতে সে ভালবাসে। এতে তাকে দেখায়ও চমৎকার। কুড়ি বছর বয়সেই সব প্রথম "Who's Who" পুস্তকে তার নাম ওঠে। তাতে লেখা ছিল "ছোট ছোট স্তন্যপায়ী জন্তু" তার প্রমোদ সহচর। অবশ্য এখনও সে বিড়াল ভালবাসে। কিন্তু এখনকার "Who's Who" পুস্তকে তার নামের পাশে প্রমোদ-তালিকার ঘর শূন্য।

মিস্ ফণ্টেন সুবিধা পেলেই অভিনয় দেখতে যায় এবং অবসর পেলেই ফরাসী উপন্যাস পাঠ করে।

কখনও সে তার পরিবারবর্গের সঙ্গে থাকে ইলিং-এ, কখনও থাকে লণ্ডনের ব্লুমসবেরী ওয়ের একটা ফ্ল্যাটে। এ বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ সে গোপন রাখতে চায়। এমন কি এই ব'লে সে গর্ববোধ করে যে, সেখানে কোন সাংবাদিকও কখনও তার নাগাল পায়নি। আত্ম প্রচারকে সে ঘৃণা করে আর এই মনোভাব তার অদম্য—অনড়। নৃত্যশিল্পিরূপে তার সৃষ্টিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে সে প্রস্তুত, কিন্তু নিজের সম্পর্কে আলোচনা সে আদৌ পছন্দ করে না। অবিবেচকের মত কোন প্রশ্ন ক'রে বসলে তার টানা-টানা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বহু জনের আড়ালে নিজেকে একান্তে সরিয়ে রাখতেই সে পছন্দ করে। তার এই সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকার মনোভাবের জন্যে এক দিকে যেমন তাকে ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি অজ্ঞাতসারে তার পুরস্কারও লাভ হচ্ছে। ক্ষতি এইটুকু যে, লোকে তাকে ভুল বুঝছে আর তার সম্পর্কে নানা রকম গাল-গল্প প্রচার হচ্ছে। লাভ এই যে, তাকে নিয়ে উপাখ্যানের সৃষ্টি হচ্ছে। মোনা লিসার মত সেও প্রহেলিকায় পরিণত হচ্ছে।

কিন্তু কারোও কারোও কাছে মার্গট ফণ্টেন আদৌ প্রহেলিকা নয়। কভেণ্ট গার্ডেনের পরিচালক ডেভিড ওয়েবষ্টার বলেন: "যে অর্থে পাভ্‌লোভাকে 'প্রহেলিকা' বলা হয়, মার্গট ফণ্টেনকে সেই অর্থে প্রহেলিকা বা শিল্পী বলা যায় না। চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গেও তাকে তুলনা করা যায় না। তার হাসির ধরণ বা চুলের রঙের জন্যেই যে তার অনুগামী দলের সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। তার দেহে এমন কিছু কুহক মাখানো নেই যে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে।

"তার বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্যালে নৃত্যে তার তুলনা নেই এবং শুধু মাত্র এই কারণেই তার অনুগামী দলের সৃষ্টি। ব্যালে নৃত্যে তার সমকক্ষ আর কেউ হ'তে পেরেছে কি না সন্দেহ।"

[illegible]গের হাওয়া কথাটি অস্বীকারের উপায় নেই। এক যুগের পর [illegible] যুগ আসবেই। বসন্তের দখিণা সমীরণের পর যেমন কাল-বোশেখী। নির্মল আকাশের বুকে হঠাৎ আবার কালো ছায়া পড়ে। এই চিরন্তন প্রথাকে কে আর করে অস্বীকার [illegible] যুগের হাওয়ায় কালে-কালে সমাজের নানা পরিবর্তন—মনুষ্য জগতের এই তো রীতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধোত্তর, রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রোত্তর, কংগ্রেসের পর কংগ্রেসোত্তর—এ তো আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। একের পর এক! একের কোন আধিপত্য নেই।

কিন্তু এক হাওয়া যদি চিরকাল বইতে থাকে? আলো না

এসে যদি চির-অন্ধকার থাকতো ! মৃত্যু না হয়ে মানুষ যদি বেঁচে থাকে চিরকাল ! কামিনীর যৌবন যদি হয় অটুট, অক্ষয় ! গান যদি শুধু অন্তরায় গাওয়া হয় ! কলকাতা বেতার-কেন্দ্র যদি বিশ্রাম গ্রহণ না করতেন ! আর বাঙলা দেশে অবিরাম যদি এই খদ্দরধারীদের তাণ্ডব-লীলা চলতে থাকে !

তেমনি ঠিক যুগে-যুগে বছরে-বছরে মাসে-মাসে দিনের পর দিন যদি সেই মিসরকুমারী, ইন্দিরা, আনন্দমঠ, আলমগীর, চাঁদ সদাগর, প্রফুল্ল, স্বামী আর বামুনের মেয়েকে দেখতে হয় ? মঞ্চ কিংবা পর্দা যেখানেই যান না কেন, দেখবেন সেই আপনার ছেলেবেলার দেখা সেই মামুলী অভিনয়-কলা। আশ্চর্য ! একটু বদল নেই ?

আমাদের শুধু দুঃখ হয় তাদের জন্যে যারা গলা ফাটিয়ে শুধু চিৎকারই করছেন যে, এটা একাল। এটা সেকাল নয়। সেকালের ইতি হয়েছে অনেক আগে। আমরা কিন্তু তার কিছু নজীর দেখতে পাচ্ছি নে এই পোড়া চোখে। পুনশ্চ, সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি সেই সেকালকে ধরে টানাটানি। সর্বত্র শুনছি ঐ একই গরুর হাম্বা-হাম্বা রব।

এবং সত্যি কথা বলতে কি গোয়াল-ঘরও আলাদা নয়। আর সেই জন্যেই কি সবই ঐ এক গোয়ালের গরু ! কিন্তু একটি মাত্র চারণ-স্থান—বাঙলার এই কলা-ক্ষেত্র !

* * * *

অসিত আর অসিতার শেষ পর্যন্ত মিলন হল। অর্থাৎ অসিতবরণ আর অসিতা বসুতে এক হলেন পরস্পরে। আর তাই বা হবে না কেন ? দু'জনের কাঁচা বয়েস, দু'জনেই উঠতি। এ মিলনের বা... ঘর হল নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও। পুরোহিতের কাজ করছেন ... থিয়েটার্সের সেই আদি ও অকৃত্রিম শিল্প-নির্দেশক সৌরেন সে... সানাই বাজাবেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মিলনের রচয়িতা আমরা নয়, দক্ষিণ কলিকাতার কবিতা-ভবন অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী প্রতিভা বসু। হাসি, পরিহাস আর সঙ্গীত-ম... এই কাহিনীর নামকরণও হয়েছে বড় মিঠে—রূপকথা।

নিউ থিয়েটার্সের এই "রূপকথা" হবে দ্বিভাষী। বাঙলা ও হিন্দী। দুঃখের বিষয়, 'রূপকথা' নেহাৎ শিশুদের দেখবার নয় ... হয়তো আর ব'লে দিতে হবে না।

* * * *

প্রথমবার কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ফেরারী ফৌজে এসেই ক্ষান্ত না... কালো-ছায়ার পর কুয়াশায় শেষ নয় তাঁর যাত্রা। এখন ... কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ের তদারকে ব্যস্ত। কাজও প্রা... শেষাশেষির দিকে। ট্রেণ ছাড়তে আর বড় বেশী দেরী নেই। বিজ্ঞাপনের হুইসিল্ বাজলেই দেখবেন ট্রেণ চলতে শুরু হয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে প্রধান হলেন ধীরাজ, জহর, বিকাশ, কবিতা ও শোভা সেন।

এই রেলপথের আসল কণ্ট্রাক্টর হলেন এম, পি, প্রডাকসন্‌। আমরা শুধু সিগনালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ... হয়ে আছে, আপ, হ'লেই সপরিবারে দেখতে যাবো এক দিন, আমাদের এই জাতীয় রেলপথ।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসবে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনা... [illegible] ভাষণ দান করিতেছেন। (ছবির পাশে) বসুমতীর অন্যতর একজিকিউটর শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সাহিত্য-বিবেক

[সম্প্রতি সাহিত্যের বাজারে এমন কোন ভাল বইয়ের দেখা না পেয়ে বাঙলার নব্য লেখক সম্প্রদায়কে একটি পুরানো রচনা আমরা উপহার দিলাম। এই সংখ্যার সাহিত্য পরিচয়ে তাই আর কোন বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ পাচ্ছে না।]

অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথমতঃ, "ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য-বাক্য" অর্থাৎ মনোগত ভাব প্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য; দ্বিতীয়, "উদ্দেশ্য-বাক্য" অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের উদ্দেশে প্রোক্ত বাক্য, এবং যে যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য সকলের সুশৃঙ্খলার প্রয়োগ বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে তাহার নাম "সাহিত্য", অর্থাৎ বাক্য বিষয়ক হিতকারি শাস্ত্র। রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য পরম্পরা কথিত সেই বাক্যকে সাহিত্য শব্দে বিধান করা যায়, পরন্তু, বোধ হয় সে কেবল তৎকাব্যের উৎকর্ষজ্ঞাপনার্থে ঘটিয়া থাকিবেক।

ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য-বাক্য সম্বন্ধে কোন নিয়মের আবশ্যক নাই, কারণ যদ্যপি বিশৃঙ্খলতায় বাক্য উচ্চারণ করিলেও আপনার বাক্য আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, এবং তাহা হইলেই বাক্য-তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইল, অন্যের তাহা বুঝিবার প্রয়োজন না থাকায় তদ্বিষয়ের নিয়ম করণে ফলাভাব।

উদ্দেশ্য-বাক্য এক ব্যক্তি স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় অপরকে ব্যক্ত করে। ঐ বাক্যের পরস্পর ঐক্য ও মাধুর্য্যাদি গুণ থাকিলে যে অভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করা যায় তৎসিদ্ধির সুলভতা হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন, এবং ঐ নিয়ম সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। বাক্যের পরস্পর অর্থ সম্পাদন ব্যাকরণ শাস্ত্রে নিষ্পন্ন হয়; এবং আশু বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয় এবং বাক্যের প্রয়োজ্যতা ও অপ্রয়োজ্যতা বিষয়ে বক্তা আপনিই বিহিত বিবেচনা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নিয়মান্তরের আবশ্যক করে না। যথা ক্রোধ-প্রকাশ-করণ-সময়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি হইতে ক্রোধ জ্ঞাপক বাক্যই নির্গত হয়, করুণা বাক্যের স্ফূর্ত্তি কদাচ হয় না, তথা অন্যান্য ভাব প্রকাশ-করণ-সময়েও তত্তদ্ভাবানুরূপ বাক্যেরই সম্ভাবনা। পরন্তু এই স্বাভাবিক রীতি কেবল মনোগত ভাব প্রকাশ সম্বন্ধেই ফলবতী হয়; রসোদ্দীপন বিষয়ে পরম্পরা পরীক্ষায় যে সকল নিয়ম উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে, তাহারই অনুশীলন করা আবশ্যক। বিশেষতঃ কাব্যাদি রচনা সময়ে, যখন অন্তঃকরণে যে সকল রস প্রবলীভূত থাকে তাহারই বর্ণনা করিতে হয়, তখন তদুদ্বোধক বিষয়ক নিয়ম জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে, আর ঐ উদ্দেশ্যে কেবল নিয়মেরই আবশ্যক এমত নহে, কিন্তু নিয়ম করিবার হেতু এবং ঐ রসের প্রকৃত
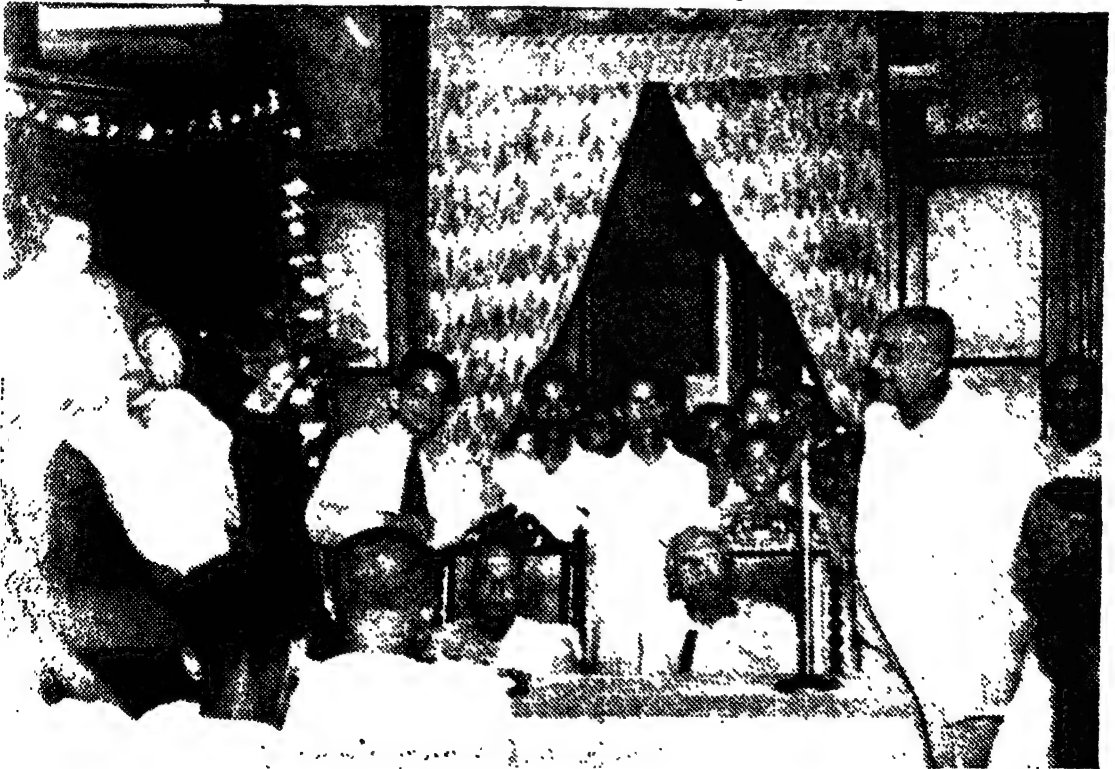
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম সুহৃৎ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির এস্টেটের একজিকিউটর বোর্ডের সভাপতি শ্রীভবতোষ ঘটক মহাশয় বক্তৃতা দিতেছেন। (উপবিষ্ট) শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকালিদাস নাগ প্রভৃতি।

তত্ত্ব অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য, নচেৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অভিপ্রায় ভিন্ন কেহ বাক্য উচ্চারণ করেন না। সেই অভিপ্রায় ভেদে উদ্দেশ্য বাক্য তিন প্রকার হইয়া থাকে; যথা, ১। বুদ্ধ্যুদ্দীপক, অর্থাৎ যে বাক্যে তর্ক করা যায় বা অজ্ঞানী ব্যক্তির মনে জ্ঞানালোক প্রদান করা যায়; ২। রসোদ্দীপক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শ্রোতার মনে করুণাদি রসের উদ্দীপন হয়, এবং ৩। মনোব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ যে বাক্য দ্বারা শ্রোতার মনকে এক পথ হইতে অন্য পথে আনয়ন করা যায়, যথা, ক্রোধীকে স্নিগ্ধ বাক্যে শান্ত করা ইত্যাদি। ঐ অভিপ্রায় ভেদে বাক্য রচনার পদ্ধতি বিভিন্না হইয়া থাকে, এবং তাহার অন্যথা করিলে ফলের হানি হয়। যে পদ্ধতিতে রসোদ্দীপক বাক্য রচনা করা যায়, তদনুসারে বুদ্ধ্যুদ্দীপক প্রস্তাব লিখিলে কদাপি তুল্য ফল সম্ভবে না। রসোদ্দীপক রচনায় যমক, অনুপ্রাস, রূপকাদি নানাবিধ অলঙ্কারের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। বুদ্ধ্যুদ্দীপক বাক্যে তাহার প্রয়োগে আপাততঃ ভ্রমের সম্ভাবনা, প্রকৃত প্রস্তাবের কোন উপকারই হয় না; বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রের উপদেশ সময়ে অলঙ্কার নিতান্ত নিষিদ্ধ। ২, ৩, ৫, ৭ ও ৯-য়ে ২৬ সংখ্যা হয়, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে দুই এবং তিনে পাঁচ, পাঁচ এবং পাঁচে দশ, এবং দশ ও সাতে সতর, এবং সতের ও নয়ে ২৬, এই প্রকার বলিলেই বক্তার অভিপ্রায় সর্ব্বতোভাবে সুব্যক্ত হয়; তদন্যথায় যমক অনুপ্রাস বা রূপকে কদাপি সুলভে ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্র এবং উপদেশ বিষয়ক রচনায় অলঙ্কার পরিহরণ পূর্ব্বক যাহাতে অভিপ্রায়ের স্পষ্টতা বোধগম্য হয় তাহাই কর্ত্তব্য। পরন্তু এ কথা বলায় আমাদিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে অন্যত্র অভিপ্রায় স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত সর্ব্বত্রই স্পষ্টতার আবশ্যক। রচনা সম্বন্ধে ইহা এক অত্যুৎকৃষ্ট গুণরূপে গণ্য। এই গুণবিরহে কোন রচনাই সমাদরণীয় হইতে পারে না, এবং এই গুণ-প্রাপ্তির নিমিত্তে লেখক মাত্রেরই নিয়ত চেষ্টা করাই বিধেয়। আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের এই মাত্র তাৎপর্য্য যে অঙ্কশাস্ত্রে অলঙ্কার নিরপেক্ষ শুদ্ধ স্পষ্ট বাক্যেরই অত্যন্তাবশ্যক। এতদ্রূপ স্পষ্টতা বিচারালয় সম্পর্কীয় কাগজ-পত্রেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। তথায় অলঙ্কার সার্থক হয় না, প্রত্যুত তাহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এতদ্বিষয়ে মিতাক্ষরাকার লেখেন "[আবেদন পত্র] নিরূপ, সার্থ, বিরুদ্ধার্থক, অধিক শব্দান্বিত না হইয়া স্বল্পাক্ষর স্বল্প অথচ কোমল শব্দে বহু মর্ম্মাবধারক হইবেক"; এবং ইদানীন্তন বিচারালয়ের কর্ম্ম-চারীরা এতদ্রূপ আবেদনপত্র রচনায় সম্যগ্‌রূপে অপটু হওয়াতেই অধুনা আবেদন পত্রৈক-পার্শ্বে সংক্ষেপে তমর্ম্ম লিখনের প্রথা হইয়াছে। অপর অঙ্কশাস্ত্র ও বিধিনিরূপক বাক্য ব্যতীত অন্য প্রকার বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় সাবধানে বিবেচনা পূর্ব্বক উপমাদি সামান্যালঙ্কার ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই, পরন্তু রূপকাদি প্রদীপ্ত অলঙ্কার কদাপি প্রয়োগ যোগ্য হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার রচনার নাম রসোদ্দীপক। ইহার অভিপ্রায় শ্রোতার মনোমধ্যে করুণাদি রসের উদ্দীপন করত আনন্দ প্রদান করা। এবং তদর্থে কোন রসাত্মক বাক্যকে উপযুক্ত অলঙ্কারে ভূষিত করি[illegible] মনের সহিত সন্দর্শন করাইতে হয়। এতদ্রূপ রচনার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থ[illegible] কবিতা। তাহাতে অলঙ্কার মাত্রেরই প্রচুররূপে ব্যবহার আছে। ফলতঃ কবিতা ও রসাত্মক গল্পই অলঙ্কারের উপযুক্তাধার; অপি[illegible] মনোব্যাবর্ত্তক বাক্যেও অলঙ্কারে নিষিদ্ধ নহে।

যে বাক্যে কোন ব্যক্তির মনকে এক পন্থা হইতে ফিরাইয়া অন্য পথে আনয়ন করা যায় তাহারনাম "মনোব্যাবর্ত্তক বাক্য"; এ[illegible] জনসমাজে বক্তৃতাই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। ইহা পূর্ব্বোক্ত রচনা[illegible] অপেক্ষা কঠিন। পূর্ব্বোক্ত রচনাদ্বয়ে এক এক মাত্র অভিপ্রায়। বুদ্ধ্যুদ্দীপক বাক্যে ন্যায় ও স্পষ্টতা রক্ষা করিলেই ইষ্টাপত্তি হয়, [illegible] রসোদ্দীপক বাক্যে মনের সন্তোষই উদ্দেশ্য, ও তাহা জন্মানই মুখ্য কল্প। মনোব্যাবর্ত্তক বাক্যের অভিপ্রায় দুই: প্রথমতঃ, কোন পদার্থকে সপ্রমাণ করা, এবং দ্বিতীয়, তদ্বিষয়ে শ্রোতার মনকে রত করা। সুতরাং ইহাতে ন্যায় ও স্পষ্টতা ও রসোদ্দীপন—এতৎ সকলের ঐক্য ভিন্ন কদাপি ইষ্ট সিদ্ধি সম্ভবে না, এবং যে সকল বক্তৃতায় এই সকল গুণের উত্তম সম্মিলন হয় তাহাই অত্যন্ত সমাদরণীয়া ও ফলবতী হইয়া থাকে।

যে প্রকার অভিপ্রায় ভেদে রচনার বৈবিধ্য নিরূপিত হইল, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যাদি ভেদেও রচনা ত্রিবিধ হইয়া থাকে, যথা, সাধারণী, বৃত্তগন্ধিনী ও উৎকলিকা। পরন্তু এতদ্বিষয়ে এক্ষণে আমাদিগের মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্তি নাই। আদৌ রচনার অঙ্গ সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ বিচার্য্য, পরে অলঙ্কারের লক্ষণ করা কর্ত্তব্য, [illegible] এই উভয়ের বিশেষ বোধ হইলে রচনা-প্রণালীর বিচার অনায়াসেই সাধ্য হইবেক।

পদ, পদাংশ, বাক্য, অর্থ, এবং রস, এই পঞ্চ রচনার অঙ্গ, অলঙ্কার অলঙ্কার মাত্র, এবং ইহাদিগের প্রত্যেকেতে দোষের সম্ভাবনা আছে। সাহিত্য-শাস্ত্রজ্ঞেরা পদগত দোষকে চতুর্দ্দশ প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন; তদ্যথা ১। শ্রুতিকটু, অর্থাৎ শ্রবণে কটু; ২। অশ্লীলতা, অর্থাৎ ব্যাকরণ অশুদ্ধ পদের প্রয়োগ; ৩। চ্যুতসংস্কৃতিত্ব, অর্থাৎ ব্যাকরণ অশুদ্ধ পদের প্রয়োগ; [illegible] অপ্রযুক্ততা, অর্থাৎ যে পদ শুদ্ধ হইলেও সাহিত্যিকেরা ব্যবহার করেন না তাহার প্রয়োগ; ৫। গ্রাম্যত্ব, অর্থাৎ গ্রাম্য বাক্যের প্রয়োগ; ৬। অপ্রতীতত্ব, অর্থাৎ যে পদের কোন এক মাত্র শাস্ত্রে ব্যবহার আছে তাহার প্রয়োগ; ৭। সন্দিগ্ধতা, অর্থাৎ যে পদের প্রয়োগে দুই অর্থের সন্দেহ জন্মে; ৮। নিহতার্থতা, অর্থাৎ লক্ষণা দ্বারা অপ্রসিদ্ধ অর্থ নিষ্পাদ্য পদ; ৯। নিরর্থকতা, অর্থাৎ যে বাক্যের প্রয়োজন নাই কেবল পাদ-পূরণের নিমিত্তে তাহার প্রয়োগ; ১০। নেয়ার্থতা, অর্থাৎ যে পদের যে অর্থ তদ্ভিন্ন অন্য অর্থে বা গৌণার্থে পদ প্রয়োগ; ১১। অবাচকতা, অর্থাৎ যে অর্থের নিমিত্ত পদ প্রয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা তদর্থের বোধ হয় না এমত পদের প্রয়োগ; ১২। [illegible] অর্থাৎ অত্যন্ত বুদ্ধি শ্রম দ্বারা যে শব্দার্থের বোধ হয় তাহার প্রয়োগ; ১৩। বিরুদ্ধমতিকারিতা, অর্থাৎ একার্থে প্রযুক্ত [illegible] বিরুদ্ধরূপ অর্থের বোধক-বাক্যের প্রয়োগ; ১৪। অসমর্থতা, অর্থাৎ যে পদে লেখকের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে না তাহার প্রয়োগ।

—[বিবিধার্থ-সংগ্রহ ১২৫৮ সন]

নব বৎসর

সমস্যা-কণ্টকিত ১৩৫৬ সাল শেষ হইল। কিন্তু কোন সমস্যারই শেষ হইল না গত এক বৎসরে। নূতন বৎসর ১৩৫৭ সাল আসিল দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়া। সঙ্গে আনে কোন আশার বাণী। যেদিকে তাকাই, শুধু গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকার। প্রতিকূল শক্তি তিগ্ম বিভীষিকার আকারে আমাদের যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমাদের শাসকবর্গ যে ভাবে জাতীয় জীবন-তরণীর হাল ধরিয়াছেন, সর্ব্বদাই ভয় হয়, এই বুঝি অতলে তলাইয়া যাইবে। ক্রমাগত সমস্যারূপী তরঙ্গাঘাতে তরণী টলমল করিতেছে। মাঝ-সমুদ্রে ভাসিতেছি, কূল নজরে পড়ে না। আমাদের কর্ত্তারা ভারতে লৌকিক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন, ভারতে সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের লৌকিকত্বের সুযোগে ভারতে যে রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ চলিতেছে, তাহার বহু পরিচয় ১৩৫৬ সালের শেষ ভাগে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শাসকবর্গের তবু চক্ষু ফুটে নাই। যাহারা তাঁহাদের প্রধান এবং প্রকৃত সহায়ক, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিই তাঁহাদের অবিশ্বাস ও দমন-নীতি। আর যাহারা ক্রমাগত বঞ্চনা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের জন্য কেবল তোষণ-নীতি।

অর্থনৈতিক দুর্গতি গত বৎসরের প্রথম হইতেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। তাহার কোন সমাধানই হয় নাই, অধিকন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের আগমনে সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের ধন-প্রাণ, মান-মর্য্যাদা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কি ভীষণ ভাবে বিপন্ন, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ৮ই এপ্রিল তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর মনে এই চুক্তি কোন আশা বা উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে নাই। বাস্তুহারাদের তো কথাই নাই। বৃটিশ রাজত্বে এক জন মিস্ এলিসের অপহরণে উত্তর-সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম আকাশ কি ভাবে ধোঁয়াতে-সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আর আজ আমাদের শত শত মাতা, ভগিনী ও কন্যার লজ্জা কাহারও বুকে কি বাজিল না ?—বাস্তুহারাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। নেতাদের আছে কি না, জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে, এ লজ্জা আমাদের সকলের। শত চুক্তিতেও এ লজ্জা ঢাকা পড়িবে না। ভারতবাসীর ক্লীবত্ব জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের একমাত্র আশা, যদি ভগবান অবতাররূপে প্রকট হ'ন।

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার শুভাশীষধারা আমাদের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-অনুগ্রাহক সকলের উপরই বর্ষিত হয়।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি

দিল্লী চুক্তি সম্পাদন করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে এ কথা প্রত্যক্ষ ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু নিপীড়ন সম্পর্কে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, পূর্ব্ববঙ্গের সহিত সমান অপরাধে অপরাধী। ইহা যে সত্য নহে, তাহা পণ্ডিত নেহরু ভাল করিয়াই জানেন। এই চুক্তি দ্বারা তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ললাটে মিথ্যা অপরাধের পঙ্ক-তিলক পরাইয়া দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সমস্যাকে অত্যন্ত নগণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। যদিও এই চুক্তিতে দেশবাসীর সমর্থন ছিল না, তথাপি ইহাকে কার্য্যকরী করিতে তিনি দেশবাসীর সহযোগিতা অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই দাবীর আহ্বান এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, এই চুক্তি কার্য্যকরী করা সম্পর্কে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর মনে উহা একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে।

কম্যুনিষ্টদের প্রতি শত বিরাগ সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহরু দিল্লী চুক্তি কার্য্যকরী করিবার জন্য কম্যুনিষ্টদের সহযোগিতাও আহ্বান করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি নিজেও এই চুক্তির সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান। অথচ আগে থাকিতেই পাকিস্তান সংখ্যালঘু চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সার্টিফিকেট তিনি দিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের পক্ষে ইহা কিরূপ সৌভাগ্য সূচনা করিবে, তাহা এখন বলা সম্ভব নহে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারে। পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা পড়িয়া মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে তাঁহার দুর্ভাবনা কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হওয়ার পর ভাবনার আর কিছুই থাকিবে না, ইহাই বোধ হয় তাঁহার ধারণা। কিন্তু এই কমিশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এক জন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক জন সদস্য থাকিবেন। এক জন প্রাদেশিক মন্ত্রী হইবেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান। তিনি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকই হইবেন, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি ? এই অবস্থায় কমিশনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য যে সব বিষয়েই চিরকাল সংখ্যালঘু হইয়া থাকিবেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে ? এই কমিশনের নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব শক্তি নাই। সকল সদস্য একমত হইয়া সুপারিশ করিলেও গভর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য থাকিবেন না। চুক্তি কার্য্যে পরিণত করার এই সকল অসুবিধা এবং উহা সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের দুর্ভাবনার জন্য পণ্ডিত নেহরু মোটেই

ভাবেন না। তাঁহার ভাবনা শুধু ভারতে এই চুক্তি কার্য্যকরী করিবার দুরূহ ব্যাপার লইয়া। অতীতের অভিজ্ঞতাকে যিনি জলাঞ্জলি দিতে পারেন, এই চুক্তি পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান করিবে, এইরূপ বিশ্বাস শুধু তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি পশ্চিমবঙ্গে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সর্দ্দার প্যাটেলকেও কলিকাতায় আসিতে হওয়ায় বিশ্ববাসীর মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবে যে, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে এই চুক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে হইতেছে। ইহা ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। এই চুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গকেও পূর্ব্ববঙ্গের সহিত সমান অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যে বিশেষ কিছুই হয় নাই, তাহা সর্দ্দার প্যাটেলও জানেন। যে দু'চারটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই পঞ্চম বাহিনী পাকিস্তানী পঞ্চমবাহিনীর কার্য্য। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে এই চুক্তি সম্পর্কে করণীয় খুব কমই আছে। [illegible] দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে "চুক্তির সাফল্যের লক্ষণ কি" এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ইহার লক্ষণ দুইটি। একটি শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান এবং অন্যটি উদ্বাস্তুদের আগমন বন্ধ হওয়া। পশ্চিমবঙ্গে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের কঠোর ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে কি? প্রায় মাসাবধি কাল হইল চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও প্রতিদিন এক পশ্চিমবঙ্গেই ১৭।১৮ হাজার করিয়া উদ্বাস্তু আসিতেছে। আসামের কথা না হয় বাদই দিলাম। উদ্বাস্তু আগমন কত দিনে বন্ধ হইবে, তাহা আমরা অনুমান করিতে চেষ্টা করিব না। কিন্তু আগত উদ্বাস্তুদের অবিলম্বে পাকিস্তানে ফিরিবার জন্য চাপ দেওয়া আমরা অসঙ্গত মনে করি।

পাকিস্তান যে এই চুক্তি আন্তরিকতার সহিত কার্য্যে পরিণত করিবে, ভারতবাসীর পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তদুপরি এই [illegible] ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসরের প্রয়োজন নাই। [illegible] এই চুক্তির সাফল্যের সহিত কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ [illegible] বিশেষ [illegible], কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্ব তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। [illegible] তাঁহারা চুক্তির যে সকল সর্ত্ত পাকিস্তানের [illegible], [illegible] ভারতবাসীকে কার্য্যে পরিণত করিয়া চুক্তিকে [illegible] করিবার জোর তাগিদ দিতেছেন। কিন্তু তাহা [illegible] করিবার সার্থকতা কি? ভারতীয় সংবাদপত্র সম্মেলনের [illegible] শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "আপনারা [illegible] সংবাদ ছাপিবেন না, যাহাতে দিল্লী চুক্তির সাফল্য [illegible]। [illegible] সত্য ও নির্ভুল সংবাদ ছাপিতে কোন [illegible]।" কিন্তু কোন সংবাদ সত্য ও নির্ভুল কি না, তাহা [illegible] কে? পাকিস্তান?

[illegible] নেহরুর আগ্রহাতিশয্যেই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত [illegible]। কাজেই এই চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া তাঁহার [illegible] ধারণা জন্মিয়াছে। সেই জন্যই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন [illegible] চুক্তির ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছু দিন [illegible] পার্লামেণ্টে তিনি বলিয়াছেন যে, যেখানে দৈনিক [illegible] করিয়া উদ্বাস্তু আসিতেছিল, চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় সেখানে মাত্র ৭।৮ হাজার করিয়া উদ্বাস্তু আসিতেছে। অথচ এখনও এক পশ্চিমবঙ্গেই দৈনিক ১৪।১৫ হাজার করিয়া উদ্বাস্তু আসিতেছে। এই অসত্য ভাষণেই কি চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে? এ অবস্থায় ইহাই বা কি করিয়া স্বীকার করা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে নিরাপদ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে? তথাপি বিশ্ববাসীদের চুক্তির সাফল্যের প্রমাণ দিবার জন্য এখনই উদ্বাস্তুদের পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইবার জন্য যে প্রচার-কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে আমরা শঙ্কিত না হইয়া পারিতেছি না।

উদ্বাস্তুদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শুধু সাহায্য দিলেই চলিবে না, পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। উদ্বাস্তুদের আগমন বন্ধ অথবা প্রত্যাবর্ত্তন কোনটাই জোর করিয়া কথা বাঞ্ছনীয় নয়। অবস্থা নিরাপদ হইলে কেহই বাস্তুত্যাগ করে না। এখন প্রত্যাবর্ত্তনের কথা তুলিলে সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তোলা হয় মাত্র। লাভ কিছু হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গে যাহাই ঘটিতে থাকুক না কেন, পণ্ডিতজী ভারতবাসীদের শান্ত থাকিয়া সত্য-প্রেম-অহিংসার পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার জবাবে আমরা কৃপালনীজী কি বলিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিব। তিনি বলিয়াছেন, "যাঁহারা স্বগৃহে সুখ শান্তিপূর্ণ নীড়ে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৎ পথ অনুসরণ করা সহজ। কিন্তু যাঁহাদের গৃহ-সম্পদ গিয়াছে, মান-ইজ্জত গিয়াছে, মাতা-ভগিনী, স্ত্রী-কন্যা গিয়াছে, তাঁহাদের কাছে এই মহৎ বাণী শুনাইতে যাওয়া কাটা ঘায়ে নুণের ছিটের সমান। এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকাই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল।"

তেলে-জলে মিশ খায় না। বিরোধের সাময়িক সমাধান হয়ত চুক্তিতে হইতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়ী শান্তি ইহার দ্বারা সম্ভব নহে। পণ্ডিতজী নিজেও এ কথা স্বীকার করিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—"চুক্তি-কার্য্য অপর পক্ষ কর্ত্তৃক কত দূর পালিত হইবে জানি না, তবে বর্ত্তমান অবস্থায় বিরোধের সমাপ্তি ঘটাইতে ইহা ছাড়া অন্য পথ খুঁজিয়া পাই নাই।" সাময়িক ভাবেও চুক্তি প্রতিপালিত হইবে কি না, এ প্রশ্নের জবাবও তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেন নাই। কেন দেন নাই, তাহার কারণও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

পাট-চুক্তি

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে যেমন সংখ্যালঘু নিপীড়ন সম্পর্কে ভারতকেও পাকিস্তানের সহিত সমান অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তেমনই পাট সংক্রান্ত চুক্তিতেও পাকিস্তানের বুদ্ধি-চাতুর্য্যের নিকট ভারতের পরাজয় হইয়াছে। পাটের দাম বাজারদর অপেক্ষা অধিক ধার্য্য করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারত যে ৫ লক্ষ গাঁইট পাট পাকিস্তানের নিকট ক্রয় করিয়াছে এবং দাম পর্য্যন্ত দিয়াছে, সেই পাট এখনও ভারত পায় নাই, এই প্রসঙ্গে সে কথাও উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় মুদ্রার নিম্নলিখিত হারে পাট ক্রয়ের চুক্তি করা হইয়াছে : (১) জুট কাটিং প্রতি মণ ২৮৲ টাকা, (২) হাবিজাবী প্রতি মণ ৩০৲ টাকা এবং (৩) ক্রস্ বাটন প্রতি মণ ৩৪৲ টাকা।

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ মিঃ সি এস রঙ্গস্বামী বলিয়াছেন, হ্রাস-মূল্য ত্রাসের পূর্ব্বে ক্রীত প্রায় পাঁচ লক্ষ গাঁইট পাট পাকিস্তান আটক রাখিয়াছে। ঐ পাট কলিকাতায় পূর্ব্বেকার মূল্যে প্রদান করা না হইলে পাকিস্তান হইতে আর পাট ক্রয় করা উচিত হইবে না।

চন্দননগর

দীর্ঘ আড়াই শত বৎসর পরে চন্দননগরে ফরাসী কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। গণভোটে চন্দননগরের অধিবাসীরা একবাক্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবার পরও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তারা বৃথা কালক্ষেপ করিবার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছাড়িতে চান নাই। শেষ অবধি এই কূটনৈতিক প্যাঁচ কষিয়া যে বিশেষ সুবিধা হয় নাই এবং আইনতঃ না হইলেও কার্যতঃ ভারতের অন্যতম বিদেশী শাসনের ঘাঁটা হইতে বিদেশী কর্ত্তৃত্ব লোপ পাইয়াছে, ইহাতে দেশবাসী মাত্রেই আজ আনন্দিত। কিন্তু যতটা আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, বাঙ্গালা দেশের লোক ততটা আনন্দিত হইতে পারে নাই। চন্দননগরের শতকরা ১০০ জন স্থায়ী অধিবাসীই বাঙ্গালী, অথচ এই স্থানটিকে প্রাণ ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম-বাঙ্গালার হাতে তুলিয়া দিতে পারেন নাই। ইহার কোন কারণও সরকার খুলিয়া এ পর্য্যন্ত দেখান নাই। ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত যুক্ত করিবার ব্যবস্থা তাঁহাদেরই করা। যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির সহিত ভাষাগত দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিকে জুড়িয়া দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি হয় নাই। বাঙ্গালার দাবী উপেক্ষা করিয়া সরাইকেল্লাকে এক রকম জোর-জবরদস্তি করিয়া বিহারের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোচবিহারের মত বাঙ্গালী-প্রধান দেশীয় রাজ্যকেও দিল্লীর বড়কর্ত্তারা সহজে বাঙ্গালার হাতে তুলিয়া দিতে রাজী হন নাই। বাঙ্গালা দেশে প্রবল আন্দোলন না উঠিলে কোচবিহারের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াইত বলা কঠিন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরাকে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী জানাইয়া বাঙ্গালীর গলা ধরিয়া যাইবার উপক্রম হইলেও এখনও সেই দাবীর প্রতি কর্ণপাত করিবার এতটুকু লক্ষণও কেন্দ্রীয় সরকার দেখান নাই। ইহার একমাত্র কারণ হইল, বাঙ্গালার প্রতি সহানুভূতি ও দরদের অভাব। বিহারের বাঙ্গালা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলি, আসামের কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চল, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা—বাঙ্গালার সহিত যুক্ত করিলে বর্ত্তমান সঙ্কটের কালে বাঙ্গালার যে প্রভূত উপকার হয়, নেতারা সে কথা ভাল করিয়াই জানেন। এই সকল অঞ্চল বাঙ্গালাকে প্রত্যর্পণ করিলে কাহারও প্রতি কোন অবিচার হইবে না, বরং বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত দাবীই পূরণ হইবে,—ইহাও তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই। তবু এই সামান্য ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতেও এ পর্য্যন্ত তাঁহারা পারিলেন না। নানা কারণে বাঙ্গালীর মন আজ তিক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কেন্দ্রের নিকট হইতে বাঙ্গালা যে সুবিচার পায় নাই—এ ধারণা আগের চেয়ে হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, বরং ইদানীং বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার উপর আর নূতন করিয়া ঘৃতাহুতি দিয়া লাভ কি?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন

৫ই মে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রেসিডেন্টের নিকট তাঁহার নিজের এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন এবং প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহরুকে পুনরায় প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন ও নব মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পরামর্শ দিতে বলেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় সদস্য নিয়োগ করিয়াছেন :—

মন্ত্রিসভার সদস্য :—সর্দ্দার বল্লভভাই ঝাবেরভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ জন মাথাই, শ্রীজগজীবন রাম, জনাব রফি আহমেদ কিদোয়াই, শ্রীমতী অমৃত কাউর, ডাঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, শ্রীনরহর বিষ্ণু গ্যাডগিল, শ্রীনরসিংহ গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতব, শ্রীকানাইলাল মানেকলাল মুন্সী।

সহকারী মন্ত্রী :—শ্রীযোগেন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীমোহনলাল সাক্সেনা, শ্রীকস্তুরীরঙ্গ শান্তনম, শ্রীরঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর, শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ।

মন্ত্রিমণ্ডলীর দপ্তর হইতে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীখুরসেদ লাল ও ডাঃ বি ভি কেশকারকে ডেপুটী মন্ত্রী নিয়োগ করিয়াছেন।

ডাঃ জন মাথাই আর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধক্রমে তিনি এই মাস পর্য্যন্ত মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে সম্মত হইয়াছেন। এই মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের কারণ শিল্প-সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বাণিজ্য-সচিব শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর পদত্যাগ। নূতন দুই জন মন্ত্রীর মধ্যে কাহাকে কোন দপ্তর দেওয়া হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

রাজাজীকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ

শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ এবং তাঁহার মন্ত্রিসভায় যোগদানের সম্ভাবনা দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেলকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ করিয়া কেন একটি খারাপ নজির সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া অনেকেই হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান যাহাতে পুনরায় শাসনকার্য্যে যোগদান না করেন, সেই উদ্দেশ্যেই রাজাজীকে এক হাজার টাকা পেন্সন দিবার সিদ্ধান্ত হয়। গণপরিষদে নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কালে সমালোচক ও শাসন পরিচালকগণ সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রের কোন প্রধানের পুনরায় শাসন-কার্য্যে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার সমর্থনে বলা হয় যে, অবসর গ্রহণের পর রাষ্ট্রের প্রধানকে শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিলে তিনি স্বভাবতঃই ক্ষমতাধিষ্ঠিত দলের সুনজরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন। অতএব রাষ্ট্রের প্রথম ও একমাত্র অবসরপ্রাপ্ত প্রধান রাজাজীকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ করা অনুচিত। আশা করা যাইতেছে যে, রাজাজী মন্ত্রিসভায় যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়া রাষ্ট্রের প্রধানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীমোহন কর
কলিকাতা ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত

গার্বা নৃত্য

—অনিমা মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

(এই চিত্রখানি 'একাডেমী অব ফাইন আর্ট' প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

২৯শ বর্ষ, ১ম খণ্ড :
জ্যৈষ্ঠ : ১৩৫৭ ২য় সংখ্যা

কথামৃত

নিত্যজীব কখনও সংসারে মেশে না। হোমা পাখী শূন্যেতেই থাকে, শূন্যেতেই ডিম পাড়ে, ডিম পড়তে পড়তে শূন্যেতেই ফুটে, যেমন ছানা হল—অমনি তার পাখা বেরোয়, সে আর নিচেয় পড়ে না, চোঁ-চাঁ উপরে উঠে যায়। নিত্যজীবকে নিত্যসিদ্ধও বলে।

নিত্যসিদ্ধের বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 'ক' দেখেই কান্না—অমনি কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। কিন্তু জীবের সর্ব্বদাই সংশয় বুদ্ধি, তাদের সহজে বিশ্বাস হয় না।

নিত্যসিদ্ধ মৌমাছির ন্যায়—কেবল মধুপান করে—হরিরস পানে বিভোর থাকে, বিষয়-রসের ধারেও যায় না।

যখন অবতার আসেন, নিত্যসিদ্ধ জীব তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসে। জমিদার নায়েবের দ্বারায় তালুক শাসন করেন; অবতার,—নিত্যসিদ্ধের দ্বারায় সংসারী লোকদের শিক্ষা দেন।

দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে যে ব্যক্তি ঈশ্বরলাভ করবার জন্য চেষ্টা না করে, তার বৃথাই জন্ম।

ঈশ্বর লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তবে নিষ্কাম কর্ম্ম ঈশ্বর লাভের একটি উপায় মাত্র। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—অবস্তু।

একের পিঠে পর পর শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু এক পুঁছে ফেল্লে শূন্যের কোনওই মূল্য নাই ; সেইরূপ ঈশ্বরকে প্রথমে লাভ করে অপরাপর কাজ কর, সে সমস্ত সার্থক হবে, যদি তাঁকে ছেড়ে দাও, তাহলে সকলই অনর্থক।

মানুষের মন চতুর্দ্দিকে নানা বিষয়ে ছড়িয়ে আছে, তা'থেকে কুড়িয়ে এনে পরমাত্মাতে মন স্থির করার নাম যোগ।

ঠিক দুপুরে ঘড়ির ছোট কাঁটা ও বড় কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়,—ঠিক যোগ হলে সেইরূপ অবস্থা হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এক হয়ে যায়।

ঠিক ধ্যান যে হচ্চে, তার লক্ষণ এই যে, মাথায় পাখী বসবে, জড় মনে ক'রে।

যখন ঈশ্বরের নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, আর অশ্রুপাত হয়, তখন জেনো যে, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম আর করতে হবে না। তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে, কর্ম্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল নাম বা ওঁকার জপলেই হল।

ব্রাহ্মণ-ভোজনে প্রথমে খুব হৈ-চৈ। যখন সকলে পাতা সুমুখে করে বসলো, তখন অনেকটা হৈ-চৈ কম্‌লো, কেবল 'লুচি আন্' 'লুচি আন্' শব্দ হতে থাকে। যখন খেতে আরম্ভ করে, তখন বার আনা শব্দ কমে যায়। যখন দই আসে—তখন সুপ্‌সাপ্‌,—শব্দ নাই বল্লেই হয়। খাবার পর নিদ্রা, তখন সব চুপ্‌।

হাটের দূর থেকে হৈ-হৈ শব্দ শোনা যায়। যখন হাটের ভিতর যাবে, তখন শুনবে, আলু দাও, বেগুন দাও, চা'ল দাও। যার যা দরকার নিচ্ছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যারা তর্ক করে, তারা অনেক বাইরে আছে, তাঁর কাছ থেকে দূরে আছে। যারা তাঁর ভিতরে প্রবেশ করেচে, তারা স্পষ্ট সব বুঝতে পারে, আর তর্ক করে না।

মৌমাছি যতক্ষণ মধু পায় না, ততক্ষণ গুন-গুন করে, মধু পেলে আর গুন-গুন শব্দ করে না। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম্ম লয়ে গোলমাল করে, ততক্ষণ সে ধর্ম্মের আস্বাদ পায় নাই, আস্বাদ পেলে চুপ করে যায়।

যে পুকুরে সামান্য জল, সে জল আস্তে আস্তে হাতে তুলে খেতে হয়, নাড়তে নাই,—নাড়লে ভিতর থেকে ময়লা উঠে জল ঘোলা করে ফেলবে। সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র মনে, বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারায় ধীরে ধীরে ঈশ্বর-পথে এগুতে হয়, কতকগুলো শাস্ত্র-বিচার ও তর্ক তুলে মনকে গুলিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

এক ঘটি জল খেলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার কি দরকার। আধ বোতল মদ খেলে মানুষ বেহুঁস হয়ে গড়াগড়ি দেয়, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ জেনে কি লাভ। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান বিচার করে কি হবে, কি বুঝবে। তাঁর কতটুকু ইয়ত্তা করবে! ভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারা তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, প্রাণ ভরপুর হয়ে যাবে।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[বাঙলা আর বাঙালী। বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান—পাশাপাশি বসবাস করতে পারে কি না তাই নিয়ে কর্ত্তাব্যক্তিদের চিন্তার আর অবধি নেই। বাঙলা আর বাঙালীর রক্ষাকর্ত্তা বাঙালী নয়—বিলকুল অবাঙালী। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদের মত। তাদের ডাইনীর দৃষ্টি এই বাঙলা দেশের 'পরে। বুদ্ধিজীবি বাঙালীর কপালে শ্রমজীবিদের কর্ত্তৃত্ব! কিন্তু লক্ষ্মীর দেশ এই বাঙলা। মিথ্যা নয়, সত্যি ঘটনা। আজ বাঙলা দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন মুষ্টিমেয়-স্বার্থান্ধ নেতারা—হিন্দু আর মুসলমানকে পৃথক্ করতে চাইছেন আন্সার আর সেবা দলের সাহায্যে। আমরা মাননীয় বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, খাজা নাজীমুদ্দিন, নুরুল আমিন এবং অন্যান্য নেতাদের এই রচনাটি তাঁদের অবসর সময়ে প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এবং সেই সঙ্গে যাঁরা সত্যিকার বাঙালী তাঁদেরকেও। বিশেষতঃ মেয়েদের।]

বন্দে মাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হয়ে মা পূর্ব্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে-ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

এমন সময় মর্ত্ত্যে কলির উদয় হল। লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা, তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন, হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়তে হল। তখন বাংলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী, বাংলায় অনাচার ঘটেছে, আমি বাংলা ছেড়ে চললেম। রাজা কেঁদে বললেন—না মা, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, যাতে বাংলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি করছি। রাজা ঘুম ভেঙ্গে দরবারে বসলেন। দরবারে বসে পশ্চিম দেশে কনোজে লোক পাঠালেন, কনোজ থেকে পাঁচ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ জন সজ্জন কায়স্থ এলেন। রাজা তাদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাংলা দেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলে-মেয়ে বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখা দেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বসলেন। ধনে-ধানে দেশ পূর্ণ হল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা, তিনি আবার চঞ্চল হলেন। বাংলার ধন দেখে ধান দেখে মোছলমান বাংলায় এলেন। তখন বাংলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাংলার রাজা হলেন। হিঁদুর জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট হতে লাগল। হিঁদুর ঠাকুর ভেঙ্গে মোছলমান মস্‌জিদ তুলতে লাগলেন। অনেক হিঁদু মোছলমান হল। হিঁদু-মোছলমানে এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস করে মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন, হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়তে হল। তখন বাংলাতে গৌড়ের পাঠান বাদশা রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল হোসেন শা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেমনি, হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল, আমি বাংলা ছেড়ে চললেম। পাঠান রাজা কেঁদে বললেন—মা, তুমি যেতে পাবে না, আমি হিঁদু মোছলমান সমান দেখব, তাদের ভাই-ভাই এক ঠাঁই করব, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বললেন—আচ্ছা, তাই হবে, আমি এখন থাকব, দিল্লীতে মোগল বাদশা হবেন। দিল্লীর বাদশা বাংলায় রাজা হবেন, সেই রাজা হিঁদু মোছলমান সমান দেখবে, তখন হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙ্গে দরবারে বসলেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য করে রাজমন্ত্রী করলেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নী দিতে লাগল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হলেন। তিনি যবন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদশা বাংলার রাজা হলেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগলেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বসলেন। ধনে-ধানে দেশ পূর্ণ হল।

এইরূপে বহু দিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা, তিনি আবার চঞ্চলা হলেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলমগির। তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাৎ করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাত সমুদ্র পার হয়ে খৃষ্টান ইংরেজ সদাগর বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর করে নিজের রাজ্য মধ্যে জায়গা দিয়ে ছিলেন। বাংলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হল। লক্ষ্মী

তখন আলমগিরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাংলার দেওয়ান করে দিলেন। বাদশার দশা দেখে বাদশাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে তারাই হল বাংলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হয়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হল, কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাংলা দেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চলল। সাগরের জাত কি না, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত্ত। তারা চোর-ডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগল, আবার নিজের দেশ হতে খেলনা এনে, পুতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন, তখন মানুষের বুদ্ধি লোপ হয়। বাংলার লোকের বুদ্ধি লোপ হল। বুড়ো মানুষে শিশু সাজল, ইংরাজের দেওয়া খেলনা পুতুল নিয়ে ছেলে-খেলা করতে লাগল। সদাগর রাজা কাচ এনে দিলেন। বাংলার প্রজা কাঞ্চন বদলে সেই কাচ নিতে লাগল। দেশের জিনিষে লোকের মন উঠে না। ঝুটো মণির রং দেখে দেশের সাচ্চা মণিকে অনাদর করতে লাগল। রাজা হাততালি দিতে লাগলেন, দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বলতে লাগল। লক্ষ্মী বললেন—আর না, আমি বাংলার লক্ষ্মী, বাংলার লোকের এই দশা, আমার আর বাংলায় থাকা চললো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠল। তখন সাত কোটি বাঙ্গালী কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চললেন বলে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হলেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল, সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগির বাদশার তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগিরের নাতি ঠাওরাত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছে, থাক এদের দু'-দল করে দিচ্ছি, এক দিকে থাক মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই এক-ঠাঁই থেকে বড় বিরক্ত করছে, এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করে দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই বলে তিনি বাঙ্গালীকে দু'-দল করে দিলেন, এক দিকে গেল হিঁদু, এক দিকে গেল মোছলমান। পূবে উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে দক্ষিণে থাকল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী, আর আমার নিতান্তই বাংলায় থাকা চলল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হল, তখন আর আমার বাংলায় থাকা চলল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণ পক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দ্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাংলা দু'-ভাগ হবে, দু'-ভাগ দেখে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙ্গালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল—মা, তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, বিদেশী রাজা আমাদের সুখ-দুঃখ বোঝেন না, তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করতে লাগলেন, আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না, মা, তুমি কৃপা কর, আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব। আর পুতুল-খেলা করব না, মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাংলার লক্ষ্মী বাঙ্গালীকে দয়া করলেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা-কালী শব বেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্য্যোগ। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হু-হু করে হ[illegible] পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়ল। মা, আমাদের রক্ষা কর; বাংলার লক্ষ্মী যেন বাংলা ছেড়ে ন[illegible] আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলব না। [illegible] দিয়ে কাচ নেবো না; ঘরের জিনিষ থাকতে পরের জিনি[illegible] না। মায়ের মন্দির হতে মা বলে উঠলেন—জয় হউক, জ[illegible] ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন, বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকবেন, প্রতিজ্ঞা ভুলো না, ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না, পরে[illegible] ভিক্ষা চেয়ো না, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না, তোমাদের "[illegible] এক ভগবান, এক জাতি এক প্রাণ" হোক্, লক্ষ্মী তোমাদে[illegible] হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূজা নিয়ে বাংলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাংলা ছাড়ছিলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় অচলা হলেন। বাংলার হাট-মাঠ-[illegible] বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে ল[illegible] ফলে-ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোয়াল-ভরা গরু, [illegible] হাসি হল।

বাংলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। [illegible] সে দিন উনুন জ্বলল না। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই কে[illegible] করলে। হাতে হাতে হলদে সূতোর রাখী বাঁধলে। [illegible] বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনলে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে[illegible] লক্ষ্মী অচলা হন।

বচ্ছর-বচ্ছর ঐ দিনে বাঙ্গালীর মেয়েরা এই ব্রত [illegible] বাঙ্গালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বলবে না। হাতে হাতে হলদ[illegible] রাখী বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্র[illegible] বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা[illegible] ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকবেন

সবাই বল—

আমরা	ভাই ভাই	একঠাঁই।
	ভেদ নাই	ভেদ নাই
	ভাই ভাই	একঠাঁই।
	ভেদ নাই	ভেদ নাই।
	ভাই ভাই	একঠাঁই।
	ভেদ নাই	ভেদ নাই।

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না [illegible] থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না [illegible] দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না [illegible] অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। [illegible] আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাই [illegible] পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অ[illegible] ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।

বাংলার মাটি	বাংলার জল
বাংলার হাওয়া	বাংলার ফল

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্ ।

বাংলার ঘর, বাংলার মাঠ,
বাংলার বন, বাংলার হাট,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান্ ।

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্ ।

বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই-বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্ ।

বন্দে মাতরম ।

অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন । সে দিন অরন্ধন । দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না । ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্ব্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে ।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন । বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দূর লইবেন । হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন । কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন । প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রা-রঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন । রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে । তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন । সংবৎসর কাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবেন । সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন ।

(১৩১৩ সালে প্রকাশিত)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মনীষা, সদ্গুণরাশি, শুদ্ধ চরিত্র ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য হেতু তিনি শিক্ষিত সমাজে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর নামে পরিচিত ছিলেন । বশ্রন গোত্রীয়, জিঝোতীয়, ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার পিতা ছিলেন । ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬৩ খৃঃ) ।

প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়া তিনি কান্দি ইংরেজী স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় ।

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতে আরম্ভ করেন । এখানে তিনি পিতৃব্যের নিকট অবস্থান করিতেন । প্রথমাবধি তিনি অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন । এফ-এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পঁচিশ টাকা বৃত্তি ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন । প্রেসিডেন্সী কলেজেই তিনি বি-এ পড়েন । এই সময় হইতে বিজ্ঞানের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ আসিয়া পড়ে । ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি চল্লিশ টাকা বৃত্তি পান ।

তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানের এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক শত টাকার পুস্তক ও স্বর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন । পর-বৎসর পদার্থবিদ্যায় ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ বৃত্তির অধিকারী হন ।

রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মজীবন ছিল শিক্ষা বিভাগে এবং শিক্ষকের কার্যে, মাত্র বিজ্ঞানের বা রসায়নের পরীক্ষার গৃহেই তিনি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেন না ; পরন্তু সভ্য মানবসমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্মকথা বলিবার নানা ভাবে নানা চেষ্টা তিনি করিয়াছেন । জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি মিশর, হিব্রু, গ্রীক ও রোমক ইতিহাসের আলোচনা করিয়া ভারতের সভ্যতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতে বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ।

বাল্যকাল হইতে ইতিহাসে তাঁহার প্রবল অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত । প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি গ্রীন, হিউম্, গীবন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন । আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ।

দর্শন ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের অতীব প্রিয় ব্যাখ্যান বস্তু । সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সেবা তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞান-স্পৃহাকে তৃপ্ত করিতে পারিত না । সাংখ্যদর্শনের কাছে জার্মান দর্শনের ঋণ কতটা, রামেন্দ্রসুন্দর এ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন । ক্রমে তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের আলোচনা করেন । তাঁহার একটি দার্শনিক প্রবন্ধ পরলোকগত অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়া জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে সে দেশের দার্শনিক মহলে সাড়া পড়িয়া যায় । কিন্তু ৫৫ বৎসর বয়সে তাহার অকাল মৃত্যুতে এই শ্রেণীর আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই ।

তিনি নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন । সাহিত্য সম্বন্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন । প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন তাহার ঋত্বিক্ ও আচার্য । তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে 'প্রকৃতি,' 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা' ও 'চরিতকথা'য় তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন ।

বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের সেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত । সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান তাঁহাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিয়াছিল । পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ম্যাক্সওয়েল্ বা কেল্‌ভিনের ন্যায় খ্যাতিলাভ করিতেন । সম্প্রতি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পাঁচ

গদাধরের মোটে সাত বছর বয়েস, ক্ষুদিরাম মারা গেলেন।

গিয়েছিলেন ভাগ্নে রামচাঁদের বাড়িতে, ছিলিমপুরে। মহাপূজার কাছাকাছি। কিন্তু মনে সুখ নেই। মনে সুখ নেই কেন না সঙ্গে গদাধর নেই। ইচ্ছে ছিল সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু ছেলেকে দূরে পাঠিয়ে চন্দ্রমণিই বা কি করে থাকবে? ও যে কটাক্ষে স্থিতি আবার কটাক্ষেই প্রলয়!

ছিলিমপুরে এসে দিন কয়েক পরেই অসুখে পড়লেন ক্ষুদিরাম। বাড়াবাড়ি অসুখ, তবু পুজোর আনন্দ ম্লান হতে দেবেন না। ষষ্ঠী গেল সপ্তমী গেল অষ্টমী গেল—নবমী বুঝি আর যায় না! কাতর চোখে তাকালেন একবার প্রতিমার আয়ত চোখের কোমল করুণার দিকে। নবমীও কেটে গেল। দশমী? দশমীর সন্ধ্যায় প্রতিমা-বিসর্জনের পর রামচাঁদ দেখলেন ক্ষুদিরাম তখনো বেঁচে আছেন কিন্তু সময় বড় সংক্ষিপ্ত। চোখের দৃষ্টি যেন প্রতিমারই পথ ধরেছে।

ডাকলেন: 'মামা!'

সাড়া নেই, শব্দ নেই। ক্ষুদিরাম নির্বাক্‌।

সে কি? মৃত্যুকালে নাম করবেন না? জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাবে? নামবে বিস্মৃতির বিভ্রান্তি? এতদিনের অভ্যাস-যোগ আজ কোনো কাজে আসবে না?

সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জপ-যজ্ঞ। তাই, ঠাকুর বললেন, রাত-দিন জপ করবি। তা হলেই অভ্যাসবশে মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা আসবে। মৃত্যুকালে যা ভাববি তাই হবি। ভরত রাজা হরিণ-হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছলি। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। মৃত্যুকালে যদি হরিনাম করতে পারিস তা হলেই সন্ধান পাবি ঈশ্বরের।

'মামা, রঘুবীরকে ভুলে গেলেন?' রামচাঁদের চোখ জলে ভরে এল: 'এত যার নাম করতে সে আপনাকে আজ পরিত্যাগ করল?'

'কে? রামচাঁদ?' আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকালেন ক্ষুদিরাম: 'বিসর্জন হয়ে গেছে? আমাকে একবার তবে বসিয়ে দাও ধরাধরি করে।'

বসিয়ে দেওয়া হল। শুয়ে শুয়ে নাম করব না পূজার ভঙ্গিতে বসে নাম করব।

সে নাম কি ভুলে যেতে পারি? সে আমার কণ্ঠের মধ্যে স্বর, মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতি, রক্তের মধ্যে চেতনা। সে আমার নিশ্বাসবায়ু। আমার নিস্তার-নৌকা।

জ্ঞানে গাঢ়, গম্ভীর সে স্বর—ক্ষুদিরাম রঘুবীরের নাম করলেন তিন বার। নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলেন স্বধামে।

ভূতির খালের শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে গদাধর। বাবা নেই, কোথায় গেলেন, মনটা কেমন উড়ু-উড়ু ফাঁকা-ফাঁকা—কোনো কিছুতে মন বসে না। মা'র কাছাকাছিই মন ঘুরঘুর করে—এটা-ওটা আবদার করতে সাধ হয়। কিন্তু অভাবের জন্যে মা যদি সে-আবদার রাখতে না পারেন, তা হলে তো বাবার জন্যে শোক আরো উথলে উঠবে। সুতরাং চুপ করে রইল গদাধর। কোথায় গেলে অভাব থাকবে না সংসারে, শূন্যতার ভার উড়ে যাবে মেঘের মত, অন্তরের অন্ধকারে তারই ঠিকানা খুঁজতে লাগল।

এবারে পৈতে দিতে হয়। সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। দাদারা কোমর বেঁধেছেন।

পৈতে তো হল, কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে? গদাধর গোঁ ধরল, ধনি কামারণী ছাড়া আর কারু হাতে ভিক্ষে নেব না।

সে কি কথা? ধনি ছোট জাতের মেয়ে, ব্রাহ্মণ-কন্যা নয়। সে কি করে ভিক্ষে দেবে? কুল-প্রথা লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে।

কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত? প্রাণ চাইছে ধনিকে মা বলব, যে ধনি কোলে করে আমাকে মুক্ত করেছে মা'র জঠর থেকে—সেই মা-নামের কাছে কোনো বিধি-নিষেধ মানব না। তোমরা তোমাদের বামুনাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকব। এই দরজায় খিল দিলাম।

কত জনের কত কাকুতি-মিনতি, তবু দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিপ্লবী গদাধর।

শেষ কালে রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনি কামারণীই ভিক্ষে দেবে। খোল্ দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, তবু তোকে উপোসী দেখতে পারব না।'

প্রসন্ন সূর্যের মত দরজা খুলে দিল গদাধর।

ধনি কামারণী ভিক্ষে দিল। কড়ে রাঁড়ি, নিঃসন্তান, কিন্তু মহা ভাগ্যবতী। ত্রিভুবনে যিনি ভিক্ষে দিয়ে বেড়ান তাঁকেই কি না সে ভিক্ষে দিলে!

আমুড়ে বিশালাক্ষী বা বিষলক্ষ্মীর থান। কামারপুকুর থেকে মাইল দুই দূরে আমুড়। মাঝখানে খোলা মাঠ। ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে প্রসন্ন পূজায় চলেছে। সঙ্গে গ্রামের আরো অনেক মেয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে গদাধর এসে বললে, 'আমিও যাব।' তুই যাবি কি রে! এতটা মাঠ-ভাঙা পথ হাঁটবি কি করে? কিন্তু গদাধরের মুখের দিকে চেয়ে মুখের কথা মুখের মধ্যেই আটকে রইল। মন্দ কি, যাক না সঙ্গে! ফেরবার সময় যদি ক্ষিদে পায়, সঙ্গে দেবীর প্রসাদ থাকবে, দুধ থাকবে, তাই খাবে আর কি! তা ছাড়া, মিষ্টি গলায় খাসা গান গাইতে পারে ছেলেটা, বললে দু'-চারটে গানই বা কোন না গাইবে! নে, চল, গান গাইতে হবে কিন্তু।

'সত্যি, গদাইয়ের গান শুনে অবধি আর কারু গান কানে লাগে না।' বললেন প্রসন্ন। 'গদাই কান খারাপ করে দিয়েছে।'

ফাঁকা মাঠের মধ্যে গদাধর খোলা গলায় গান ধরলে। দেবী বিশালাক্ষীর মহিমা-কীর্তনের গান। গান গাইতে-গাইতে হঠাৎ থেমে গেল গদাধর। মেয়ের দল তাকিয়ে দেখল—এ কি ব্যাপার! গদাধরের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, তার শরীর আড়ষ্ট অসাড়, দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দের মত। কি, কি হল তোর?-কে কার প্রশ্নের জবাব দেয়? গদাধরের জ্ঞান নেই। ও মা, এখন কি হবে? মেয়ের দল ভয়ে বিশীর্ণ হয়ে গেল। রোদে নিশ্চয়ই ভিরমি গিয়েছে ছেলে, খুব করে জলধারানি দে। হাওয়া কর, হাত বুলিয়ে দে সারা গায়ে।

কিন্তু গদাধরের সাড়া নেই, সঙ্কেত নেই।

'গদাধর—গদাই!' ব্যাকুল কণ্ঠে কত ডাক, কত কাতরতা! কি করে মা'র কোলে ফিরিয়ে দেব এই ছেলেকে!

হঠাৎ প্রসন্নর মনে ডাক দিয়ে উঠল—যে বিশালাক্ষীকে দেখতে চলেছি সেই আগ বাড়িয়ে আসেনি তো পথ দেখাতে?

'ওলো, দেবীর ভর হয়নি তো?' প্রসন্ন অধীর হয়ে উঠল: 'মিছিমিছি তবে গদাইকে ডেকে কী হবে? বিশালাক্ষীকে ডাক। যিনি এসেছেন আগ বাড়িয়ে। আধার পেয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আনন্দে।'

সবাই দেবী-স্তব সুরু করলে। গদাধরের কর্ণমূলে রাখলে দেবী-নাম।

গদাধরের মুখে হাসি ফুটল। সংজ্ঞার লাবণ্য তরল হয়ে এল সর্বাঙ্গে। কেউ আর তাকে গদাই বলছে না, সবাই মা বলে ডাকছে। নৈবেদ্যের ডালি কি হবে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে? ওলো, গদাইকেই সবাই খেতে দে এখানে। সব তবে মাকেই খেতে দেওয়া হবে।

এই গদাধরের দ্বিতীয় ভাবাবেশ।

কালো মেঘের কোলে সিতপক্ষ বক-বলাকার যে রূপ বিশালাক্ষীরও সেই রূপ। দুইয়ের একই উল্লাস, একই তাৎপর্য। একই দিব্য কাব্যের দু'টি শ্লোক।

কামারপুকুরের পাইনদের অবস্থা বেশ শাঁসালো। শিবরাত্রির সময় তাদের বাড়িতে যাত্রা হবে। পালা-ও শিবদুর্গা নিয়ে। ধুমুল পড়েছে, কিন্তু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। অসুখ করেছে না কি, আসতে পারবে না। আর যে কেউ সাজবে তেমন লোক নেই। সুতরাং যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? এদিকে, যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি-জাগরণ কি করে হয়? সবাই ধরে পড়ল অধিকারীকে। অধিকারী বললে, আপনারা এক জন শিব জোগাড় করুন, বাকিটা আমি চালিয়ে নিতে পারব।

একবাক্যে সবাই বলে উঠল—গদাধরকে শিব

বাজালে কেমন হয় ? চমৎকার হয়। বয়েস অল্প হোক, শিবের গান জানে সে অনেক। তাই দিয়ে সে চালিয়ে নিতে পারবে। তার পর শিবের পোষাকে তাকে যা মানাবে, আর দেখতে হবে না।

কী যে ঠিক দাঁড়াবে বুঝতে পাচ্ছে না গদাধর। তবু সকলের ধরাধরিতে সে রাজি হয়ে গেল।

আসরে এসে দাঁড়াল সে শিবের মূর্তিতে। একেবারে সেই স্বভাবস্বচ্ছধবল সচ্চিদানন্দ শিব! মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিঙা, অন্য হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে অনন্ত নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শেখরে খেলা করছে সুধা-ময়ূখ শশধর। পদপাতে ধৈর্য্য, অবস্থিতিতে শান্তি। চোখে সেই অনিমেষ দৃষ্টি যা তৃতীয় নয়নের দীপ্ততা। যেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব নেমে এসেছেন নরদেহে। সেই তপযোগগম্য শূলপাণি বিশ্বনাথ। যিনি প্রচণ্ড-তাণ্ডব অথচ প্রাণপালক।

অভাবনীয়-আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চার দিকে। মেয়েরা যারা আসরে ছিল, হঠাৎ উলু দিয়ে উঠল, কেউ-কেউ বা শাঁখ বাজালে। হরিধ্বনি করে উঠল পুরুষেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি সুরু করলেন।

'মাইরি, কি সুন্দর মানিয়েছে গদাইকে!'

'শিবের পার্ট যে এত ভালো উতরোবে কেউ ভাবিনি।'

'ওকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা দল করতে হবে দেখছি—'

এমনি বলাবলি করছিল পাড়া-বেপাড়ার ছোকরারা। কিন্তু, ও কি, গদাধর কিছু বলছে না কেন, নড়ছে না কেন? শুধু চেহারা দেখিয়েই কি পার্ট হয়? বলতে-কইতে চলতে-ফিরতে হয় যে। ও কি? দেখছিস? গদাধর কাঁদছে। শিব আবার কাঁদল কখন?

কেউ কেউ ছুটে গেল গদাধরের কাছে। গদাধরের জ্ঞান নেই। গদাধর তৎস্বরূপ!

জল দাও। হাওয়া করো। শিবের ভর হয়েছে, কানে শিবমন্ত্র দাও।

'ছোঁড়াটা রসভঙ্গ করলে মাইরি। এমন পালাটা শুনতে দিলে না।' আপশোষ করলে কেউ-কেউ।

যাত্রা ভেঙে গেল। কাঁধে করে গদাধরকে কারা বাড়ি পৌছে দিলে। গদাধর তখনো সংজ্ঞাহীন। তখনো শিবময়।

সারা রাত বাড়িতে কান্নাকাটি—গদাধরের জ্ঞা[ন] হচ্ছে না। কাকে বলে জ্ঞান, আর কাকেই ব[া] অজ্ঞান। কে বা জাগ্রত, কে বা সুষুপ্ত!

সকালে চোখ মেলল গদাধর। আকাশে চো[খ] মেলল দিনমণি।

ছয়

এই আমাদের গদাধর। দু'টি আয়ত-উজ্জ্ব[ল] চোখ—যে চোখে শান্তি আর সরলতা—মাথাভ[রা] এলোমেলো চুল—যে-চুলে আনন্দময় ঔদাসীন্য মুখে অমিয় মধুর হাসি, যে হাসিতে অহেতুক করুণা। কণ্ঠস্বরে অমৃতনির্ঝর প্রসন্নতা, যে প্রসা[দে] অশেষ আশ্বাস। যে দেখে সেই তাকে ভালোবাসে যে একবার চোখ রাখে সেই আর চোখ ফেরা না। যদি ভালো কিছু আহার্য পায় ইচ্ছে ক[রে] গদাধরকে খাওয়াই। ইচ্ছে করে তার একটু ক[থা] শুনি। যেখানে সে গিয়েছে সেখানে গিয়ে বসি।

এদিকে লেখাপড়ায় এক ফোঁটা মন নে[ই] গদাধরের। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত পড়তে দা[ও] মন মাতিয়ে পড়বে সে অনর্গল। ধ্রুব-প্রহ্লাদে[র] কথা শুনতে চাও, সবাইকে সে ব্যাকুল করে ছাড়বে মামুলি পাঠশালায় যেতে তার মন ওঠে না। ত[ার] চেয়ে মাঠে-মাঠে তাকে মুক্ত হাওয়ার মত ছু[টে] বেড়াতে দাও, সে মহা খুশি। যা কিছু সুন্দ[র] তারই উপর তার মনের টান। মনে হয় কি ক[রে] এই সুন্দরকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ ক[রা] যায়। গদাধর তাই কাদা নিয়ে মূর্তি গড়ে, গ[লা] ছেড়ে গান গায়, দু' হাত তুলে নাচে। শিল্পে, সঙ্গী[তে] আর নৃত্যে সে সে-এক অনির্বচনীয়কে উদ্ঘাটিত কর[তে] চায়. আর যা সে কথা বলে তাই সাহি[ত্য] সাহিত্যের সারবিন্দু। 'আমাকে রসে-বশে রা[খিস] মা, আমাকে শুকনো সন্নেসী করিস নে।' [এ] প্রার্থনাই এক দিন করেছিল গদাধর। আমাকে '[রসে] দিস' কিন্তু সেই সঙ্গে 'বশে' রাখিস। আমা[কে] উচ্ছ্বাস দে, সঙ্গে-সঙ্গে সংযমও দে। ভাবের স[ঙ্গে] সঙ্গে রূপকেও বিকশিত কর্। আমি তোর [রূপ] হব। তুই যদি মা আদি দেবী, আমিও তোর অ[াদি] কবি। কত আর মূর্তি গড়ব, মা, আমি নি[জে] এখন নিজেকেই মূর্তি বানাই!

প্রায়ই আজকাল ভাবসমাধি হয় গদাধরে[র] হরিবাসরে শিবের গাজনে মনসা-ভাসানে কো[থাও]

একটু দেব-দেবীর নাম-গান হলেই হয়! শুনতে-শুনতে গদাধর একেবারে বিহ্বল-তন্ময়। সেই তন্ময়তা একটু গাঢ় হলেই ভাবসমাধি। চন্দ্রমণি আগে-আগে ভয় পেতেন, ছেলেকে বুঝি দানোতে পেয়েছে। এখন দেখেন নিজের ভাবে যেমন ডুবে যায় তেমনি আবার নিজের ভাবে উঠে আসে। রোগের চিহ্ন নেই শরীরে। দর্পণের আভা যেন তার সারা গায়ে চমক দিচ্ছে। সেই দর্পণে যেন দেখা যাচ্ছে আরেক মূর্তি—আরেক দেহ! চিন্ময় মূর্তি, চিন্ময় দেহ।

কিন্তু দাদারা ধরে নিয়েছেন বায়ুরোগ হয়েছে। তাই তার উপর আর পড়া-শোনার তাড়া নেই, যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও। তবু গদাধরের পাঠশালাতে একবার যাওয়া চাই। সংসার চলে না দেখে রামকুমার কলকাতায় গেলেন, সেখানে গিয়ে টোল খুললেন—গদাধরের তখন বারো-তেরো বছর বয়েস, তখনো সে পাঠশালায় যাচ্ছে। পড়তে নয়, ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে, দল বাঁধতে। যারা প'ড়ে জ্ঞানী-গুণী হবে তাদেরকে চিনে রাখতে। যতই কেন না আড্ডা দিক রঘুবীরের পূজা ঠিক সেরে রাখে, মা'র ঘরকন্নার কাজে জোগান দেয়। রামেশ্বরের উপর সংসারের ভার, কিন্তু সেও রঘুবীরের উপর বরাত দিয়ে বসে আছে চুপ করে। মনে-মনে বিশ্বাস, গদাইয়ের যখন এত তুকতাক, তখন একটা কিছু হবেই। যিনি চিন্তামণি তিনিই যখন নিশ্চিন্ত, তখন চিন্তা করে লাভ কি!

বাড়িতে কাজ-ছুট বসে আছে গদাধর—গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে তার বড় বনিবনা। দুপুর বেলা সবাই জোট বেঁধে চন্দ্রমণির কাছে আসে, আর গদাধরকে হরিনাম গাইতে ফরমাস করে। কিংবা কোনো দিন বায়না ধরে, ধর্মের কোনো উপাখ্যান বলো। এর চেয়ে আর মনোগত বিষয় কী আছে গদাধরের! গদাধর তখুনি তৈরি। 'মা গো, তুমিও বসে যাও—' 'না রে, বাবা, আমার হাতের কাজ এখনো শেষ হয়নি।' 'সে কি কথা, আমরা আপনার কাজ সেরে দিচ্ছি।' সমাগত মেয়েরা চন্দ্রমণির হাতের কাজ চটপট সেরে দিলে। চন্দ্রমণি বসলেন স্থির হয়ে। গদাধর গান ধরলে, কোনো দিন বা পাঠ। গাঁয়ে যত ভাগবত পাঠ বা গান-কীর্তন হয়, সব শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে গদাধরের। তার পর যা কখনো সে শোনেনি সে সব কথাও তার মুখে এসে জোটে। মেয়েরা তন্ময় হয়ে শোনে। সময়ের হুঁস থাকে না। বিকেলে যে আরেক কিস্তি কাজ আছে বাড়িতে তা ভুল হয়ে যায়। গদাধরের সঙ্গে-সঙ্গে তারাও নাম করে।

নাম কি কম? যা নাম তাই তো রাম। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে সোনাদানা দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন তখন হল না। কিন্তু রুক্মিণী যখন এক দিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন তখন ঠিক ওজন হল। নামের এমনি গুণ। তবে নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। যে প্রিয় তাকে শুধু নাম ধরে ডাকলেই চলে না, তার সঙ্গে চাই একটু প্রেম। যদি নাম করতে-করতে দিন-দিন অনুরাগ বাড়ে, আর অনুরাগের সঙ্গে আনন্দ, তা হলে আর ভয় নেই। বিকার কাটবেই কাটবে। তার পরেই তিনি আকারিত হবেন।

ধর্মদাসের মেয়ে প্রসন্ন গদাধরকে ভাবে গোপাল। আর, মেয়েদের মতন এমন হাব-ভাব করে গদাধর, আর-আর মেয়েরা তাকে বলে রাধারাণী।

সীতানাথ পাইনের প্রকাণ্ড সংসার। আট ছেলে সাত মেয়ে। তা ছাড়া জ্ঞাতি-গুষ্টিও অনেক। তার ঘরে রোজ দশটা শিলে বাটনা বাটা হয়। এত লোকের জায়গা কার আঙিনায় হবে? তাই গদাধরকে ডেকে নিত সীতানাথ। বলত, আমার বাড়িতে কীর্তন করবে এসো। সীতানাথের বাড়ির মেয়ে-বউরা ঘোরতর পর্দানশিন, সূর্যের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি হয় না। তারা কি করে তবে এই স্বরতরঙ্গ শোনে! কি করে দেখে সেই অনিন্দ্যসুন্দরকে? তারা চন্দ্রমণির সামনে পর্যন্ত বেরোয় না—অথচ গদাধরকে তাদের সংকোচ নেই। গদাধর যেন তাদের অন্তরের মানুষ। ইহকাল-পরকাল সকল কালের চেনা লোক।

কিন্তু দুর্গাদাস পাইনের এটুকুতেও আপত্তি। দুর্গাদাস এই বেনে-পাড়ারই লোক, সীতানাথের প্রতিবেশী। এত বড় ছেলে কেন বাড়ির ভিতরে এসে মেয়েদের সঙ্গে বসে গান করবে এতে তার প্রবল আপত্তি। হোক হরিনাম, হোক গদাধর হীরের টুকরো ছেলে, তবু সমাজ-সংসারে মেয়েদের সম্ভ্রমরক্ষার যে নিয়ম তা মানতে হবে বৈ কি। আমার সংসারে মেয়েদের এমন বেচাল নেই—এমন

টিটকো লোক কেউ ঢুকতে পারে না আমার বাড়িতে। খুব বরফট্টাই করতে লাগল দুর্গাদাস। কই একটা কাক পক্ষী গিয়ে তার বাড়ির ভিতরের খবর জেনে আসুক তো, দেখে আসুক তো তার মেয়েদের মুখ! আটঘাট বাঁধতে জানা চাই, বুঝলে? হরিনামের পথে ধুলোট হতে দিতে নেই।

সন্ধ্যের দিকে বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সামনে এমনি তম্বি করছেন দুর্গাদাস। এমনি সময় ঘরের দরজায় একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। বেশভূষা দেখেই চিনতে পারলেন দুর্গাদাস। তাঁতিদের কারু মেয়ে হয়তো। পরনে হাতে-বোনা মোটা ময়লা শাড়ি, হাতে রূপোর ভারি পৈঁছা, কাঁখে চুবড়ি—তাতে কয়েক লাছি সুতো।

"কোত্থেকে আসছ?" দুর্গাদাস প্রশ্ন করলেন।

'হাট থেকে।' লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখে ঘোমটা টানল মেয়ে।

'কি হয়েছে? চাও কি?'

সংক্ষেপে মেয়েটি যা বললে তাতে বিশেষ বিচলিত হবার কিছু নেই। পাশের গাঁয়ে মেয়েটির বাড়ি, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাটে গিয়েছিল সুতো বেচতে। হাটের পর বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটি দেখলে সঙ্গিনীরা তাকে ফেলেই চলে গিয়েছে। এখন এই ভর-সন্ধ্যের সময় একা-একা বাড়ি ফিরতে তার ভয় করছে। যদি আজকের রাতের মত একটু আশ্রয় পায় তো বেঁচে যায়।

'বেশ তো, ভেতরে যাও, মেয়েদের গিয়ে বলো, থেকে যাবে খন রাতটা। এ আর বেশি কথা কি।' দুর্গাদাস উদারতায় প্রসারিত হলেন।

শরণাগতা প্রণাম করল দুর্গাদাসকে। অন্তঃপুরে গিয়ে বললে সব মেয়েদের। আগন্তুকাকে ঘিরে ধরল সবাই। অল্প বয়স, মিষ্টি কথা, আতান্তরে পড়েছে, সবাই সহানুভূতিতে নরম হল। বললে, থাকবে বৈ কি, একশো বার থাকবে, তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও। কি যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে মেয়েটির। যে তাকে দেখে তারই মনে মমতা লেগে থাকে। থাকবার জায়গা ঠিক হল এক ধারে, মুড়ি-মুড়কি দিয়ে দিব্যি জলযোগ করলে। তন্ন-তন্ন করে দেখে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল মেয়েটি, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলে, ভাব করলে, জেনে নিলে সুখ-দুঃখের ইতিহাস। যেন কি জাদু জানে, এক মুহূর্তে অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠল।

অন্ধকারে রামেশ্বর চলেছে হনহন করে।

এ কি, কোথায় চলেছেন এত রাতে?

সীতানাথের বাড়িতে।

সেখানে কি?

গদাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত রাত হ'ল, এখনো তার ফেরবার নাম নেই। মা ঘর-বার করছেন। কোথাও মূর্চ্ছো গেল কি না কে জানে।

ঐ সীতানাথের বাড়িতেই আছে ঠিক। সারা দিন-রাত ঐখানেই পাঠ-কীর্তন করে। ঐখানে গিয়েই হাঁক দেন।

না, সীতানাথের বাড়িতে যায়নি আজ গদাধর। রামেশ্বর চোখে অন্ধকার দেখল। রাত করে কোথায় এখন তাকে খুঁজবে ভেবে পেল না। পাইন-পাড়ার ঘরে-ঘরে অসহায়ের মত সে হাঁক দিয়ে ফিরতে লাগল—গদাই, গদাই,—গদাই আছিস্?

তাঁতি-মেয়ে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েদের সঙ্গে খোস-গল্প করছে, এমন সময় শুনতে পেল, কে উঁচু গলায় হাঁক পাড়ছে বাইরে থেকে। কার নাম ধরে ডাকছে? কান খাড়া করল তাঁতিনী। লাফিয়ে উঠল 'যাচ্ছি গো দাদা—এই যে আমি এইখানে।' বলে সেই তাঁতিনী এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির মেয়েরা সব বললে গিয়ে দুর্গাদাসকে। দুর্গাদাস চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, 'প্রভু আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন।'

তাই ঠাকুর বলেছেন উত্তর কালে: "আপনাকে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি-রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেক দিন মেয়েদের মত কাপড়-গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলুম। আবার ঐ ভাবেই আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রাখতে পারতুম? দু'জনেই মা'র সখী। আমি আপনাকে শুধু পুরুষ বলতে পারি কই। এক দিন আমার ভাবাবস্থায় পরিবার জিগগেস্ করলে: আমি তোমার কে? আমি বললুম: আনন্দময়ী।"

সাত

গ্রামে কিছুই হচ্ছে না গদাধরের। তাই তাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন রামকুমার।

কিন্তু গদাধরের মন গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘুরঘুর করে। কত চেনা মুখ, কত মন-কাড়া ভালোবাসা। এই ইট-কাঠের জটিলতার মধ্যে পাওয়া যাবে কি সেই সরল মমতা? সেই নিঃসঙ্গ থাকার শান্তি?

নির্জনে না হলে ভক্তি লাভ হবে কি করে? তাকে ভাববো কোথায়? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। একেক বার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, সাফ হল কেমন। তা কাঁড়বার সময় যদি পাঁচ বার ডাকে, ভাল কাঁড়া কেমন করে হবে?

কত জনাকেই মনে পড়ে। মনে পড়ে বৃন্দার মাকে। বৃন্দার মা জেতে বামুন, গদাইকে নিজ হাতে হামেসা রান্না করে খাওয়ায়। কিন্তু খেতির মা জেতে ছুতোর, ইচ্ছে থাকলেও ঘরে ডেকে এনে খাওয়াতে পারে না। মনটা কেবল আঁটুবাঁটু করে। মনের কথা মুখে ফোটে না। ধনি কামারণীর বোন শঙ্করী কাছে-পিঠেই থাকে। তাকে এক দিন জিগগেস করলে গদাধর: 'আচ্ছা বলতে পারো, খেতির মা আমাকে কি বলতে চাইছে, অথচ যেন বলতে পাচ্ছে না?'

শঙ্করী তো থ! মনের কথাও জানতে পেরেছ তা হলে? বেশ, তবে বলো, কি খাবে, আমি নিয়ে আসছি।

খাবো তো, এখানে এই পথের মাঝখানে খাব না কি? তার ঘরে যাব, ঘরে গিয়ে মেঝের উপর আসন পেড়ে বসে খাব। যা সে নিজের হাতে রেঁধে দেবে—সমস্ত। তার মনের সাধ পূর্ণ করব ষোল আনা।

তাই গেল ঠিক ছুতোর-বাড়ি। খেতির মা'র হাতের রান্না খেল সে তৃপ্তি করে।

খেতির বাপ কিন্তু স্ত্রীর অনাচার সহ্য করতে পারল না। অনাচার বৈ কি। ছোট জাতের মেয়ে, উচ্চবর্ণের জাত মেরে দিলি? দেবতা খেতে চাইবে বলে তুই তার অন্ন জোগাবি? রাগে দিশেহারা হয়ে গেল খেতির বাপ। পায়ের খড়ম তুলে শক্ত কয়েক ঘা বসিয়ে দিল স্ত্রীর পিঠের উপর।

খেতির মা টলল না একচুল। বললে, 'যতই কেন না মারো আর ধরো, আমার আর কিছুতেই দুঃখ নেই। ঠাকুরের প্রসাদ খেয়েছি আমি।'

আর মনে পড়ে চিনু শাঁখারিকে।

বয়েস হয়েছে, ছোট দোকান, কষ্টে দিন গুজরায়। কিন্তু গদাধর যখনই দোকানে এসে বসে, মনে হয় কোথাও যেন আর কষ্ট নেই। রাত যতই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরন্তন সুপ্রভাত। যাই একটু বাড়তি রোজগার হয় তাই দিয়ে মিষ্টি কিনে গদাধরকে খাওয়ায়। গদাধর খায় আর চিনু দেখে। ওদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সেদিকে খেয়াল নেই। গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছে চিনু। তার নাম যখন চিনু তখন সেই তো প্রথমে চিনতে পারবে।

এক দিন হলো কি, চিনু ফুল তুলে পরিপাটি করে মালা গাঁথলে। কোঁচড়ে করে লুকিয়ে মিষ্টি কিনে আনলে বাজার থেকে। গদাধরকে বললে, 'চলো।'

'কোথায়?'

'মাঠে। যেখানে কেউ কোথাও নেই। যেখানে কেবল তুমি আর আমি।'

চিনিবাস গদাধরকে নিয়ে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টির গোচরে নেই কোথাও জনমানুষ। উপরে আকাশ-ভরা শান্তির নীলিমা। মালা-মিষ্টি পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে রইল চিনিবাস। সামনে গদাধর। কৃষ্ণকিশোর।

'এ কি চিনিবাসদা, এ কি করছ? তার চেয়ে মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে দাও।'

'দিচ্ছি গো দিচ্ছি—'

আগে মালা দিলে গলায়। কৃষ্ণের গলায় অতসী ফুলের মালা। পরে হাতে করে খাওয়াতে লাগল গদাধরকে। ব্রজের ননীগোপালকে।

জলে চোখ ভেসে যাচ্ছে চিনিবাসের। মিষ্টিভরা হাত কখনো পড়ছে গিয়ে গদাধরের নাকে, কখনো চোখে, কখনো কপালে। গদাধর হাসছে আর খাচ্ছে।

খাওয়ানোর পর আবার স্তব করতে বসল চিনিবাস। বললে, 'বুড়ো হয়েছি, বাঁচব না বেশি দিন। মর্তধামে তোমার কত লীলা-খেলা হবে, কিছুই দেখতে পাব না। তবু আজ যে আমাকে একটু চিনতে দিলে দয়া করে, তাই আমার পারের কড়ি হয়ে রইল।'

মস্ত অসুরের মত স্বাস্থ্য ছিল চিনিবাসের। দু'-হাতে তুলে গদাধরকে কাঁধে চড়িয়ে বীরবিক্রমে

নৃত্য করত। বলত, 'তুমি আমাকে দাদা বলো—চিনিবাস দাদা। আমি যদি তোমার দাদা হই, তবে আমি তো বলরাম।' বলে আবার নৃত্য।

তুমি সমুদ্র আর আমি সামান্য শঙ্খকার।

একবার, মনে পড়ে, চিনু শাঁখারির পায়ে পড়েছিল গদাধর। শুধু চিনুর নয় আর-আর সমবয়সীদেরও। কি খেয়াল হল, সবাইর পায়ে ধরে-ধরে গদাধর মিনতি করতে লাগল, 'ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল—'

সকলে তো অবাক। যত ছোটজাতের লোক, নুয়ে পড়ে সকলের পায়ে ধরা!

আসল কথা বুঝেছিল চিনিবাস। বলেছিল, 'তোমার এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান দেখছিস। জাত-বেজাত স্তর-পঙ্‌ক্তি দেখছিস না। প্রথম যখন ঝড় ওঠে তখন আম-গাছ তেঁতুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম এটা তেঁতুল—চেনা যায় না।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগে মান-অপমান থাকে না। ছায়া-কায়া থাকে না। সব তুমি-ময়।

মরে যাবে চিনিবাস—এই তার দুঃখ। বয়সে সে জীর্ণ হয়ে এসেছে। মরে গেলে দেখতে পাবে না এই নিত্যলীলা।

রাবণ-বধের পর রাম-লক্ষ্মণ যখন লঙ্কার প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলেন, দেখলেন, রাবণের বুড়ি মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ বিদ্রূপ করে উঠলেন—যার ছেলে-নাতি-পুতি সব গেল, বংশে যার বাতি দেবার কেউ নেই, তার কি না নিজের প্রাণের উপর এত টান! নিকষাকে রাম কাছে ডাকিয়ে আনলেন, জিগগেস করলেন, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কিসের ভয়? নিকষা বললে, আমার আর কিছু ভয় নেই, ভয়, যদি মরে গিয়ে তোমার এত লীলা না আর দেখতে পাই। বেঁচে ছিলাম বলেই তো দেখলাম তোমাকে। তাই এখনো বাঁচবার সাধ যেতে চায় না।

কিন্তু কলকাতায় এসে গদাধরের কি চুপচাপ করে বসে থাকলে চলবে? কত সাধ করে তাকে নিয়ে এসেছেন রামকুমার। অক্ষয়কে জন্ম দিয়েই রামকুমারের স্ত্রী মারা গেল আঁতুড়ে—সেই থেকেই সংসারে অনটন। ছেলে গর্ভে আসতেই কেমন হয়ে গিয়েছিল বৌদি, কাঁধে অলক্ষ্মী চেপেছিল। সংসারে নিয়ম ছিল, যে-ছেলের এখনো পৈতে হয়নি সে ছেলে কিংবা রুগী ছাড়া আর কেউ রঘুবীরের পুজো আগে জলস্পর্শ করতে পারবে না। রামকুমারের সেই নিয়ম অমান্য করতে লাগল। বাধার উত্ত করতেলাগল অবাধ্যতা। রামকুমার বুঝলেন, স্ত্রীর মৃ ঘনিয়ে এসেছে, আর সেই সঙ্গে বা অমঙ্গলের দিন

হলও তাই। স্ত্রী চলে গেল। সংসারে ে কঠিন দুর্ভাগ্য।

গদাধরের পরে আরেকটি বোন ছিল, সর্বমঙ্গল গৌরহাটির রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বি দিলে, যখন আট পেরিয়ে নয়ে পড়েছে। অ রামসদয়ের বোনের সঙ্গে বিয়ে দিলে রামেশ্বরে রামেশ্বর গৃহস্থালি দেখুক, তুই, গদাধর, কলকা চল্। ওখানে টোল খুলেছি, একটা কিছু হি তোর হবেই। অন্ততঃ শান্তি-স্বস্ত্যয়নটাও তো শিখ কলকাতায় অনেক বড় লোকের বাসা, যদি মা হতে পারিস, টাকার জন্যে ভাবতে হবে ন সংসার স্বচ্ছন্দ হবে।

টাকা? টাকা দিয়ে আমার কী হবে? অ তো অবিদ্যার সংসার করতে আসিনি। আমি ঐশ্বর্যভোগ চাই, না, দেহের সুখ চাই? না, 'লোকমান্য'?

আর, তুমিই বা অত ভাবছ কেন? যে ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জু দেবেন। যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পা যে সদ্‌ব্রাহ্মণ, যার কোনো কামনা নেই, হা বাড়ি থেকে হলেও তার সিধে আসে। যে আসে তেমনি যায়। এই যদৃচ্ছা লাভই ভা সাঁকোর তলা দিয়েই জল বেরিয়ে যায় সহ সঞ্চয় করে কি হবে? কত কষ্ট করে মৌমাছি চ তৈরি করে, কে আরেক জন এসে ভেঙে দিয়ে যা উপার্জন করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য? নর পেয়েছি, ঈশ্বর দর্শন করব না?

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি প্রায়ই আ দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরের বিছানা ময়লা দেখে তার বড় ক্ষো বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা লি দিচ্ছি—তা দিয়ে তোমার সেবা হবে।'

যেই এ কথা শোনা ঠাকুর অমনি অজ্ঞান হ পড়লেন। কে যেন মাথায় লাঠি মারলে।

জ্ঞান হবার পর বললেন বিমর্ষ কণ্ঠে : 'অমন কথা মুখে এনো না। অমন কথা যদি আর বলো, তোমার এখানে এসে তবে কাজ নেই।'

'কেন, কি হল ?'

'তুমি জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই—কাছেও রাখবার জো নেই।'

লক্ষ্মীনারায়ণও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বেদান্ত-বাদী। তর্কপটু।

'তা হলে এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে ?' লক্ষ্মীনারায়ণ হাসল : 'তবে তো জ্ঞান হয়নি আপনার !'

'না বাপু, অত দূর হয়নি এখনো।'

যারা-যারা কাছে বসে ছিল, হেসে উঠল।

তবু লক্ষ্মীনারায়ণ দমবে না। সে ধরল হৃদয়কে। হৃদয় মানে হৃদয়রামকে, ঠাকুর যাকে ডাকতেন হৃদে বলে। ক্ষুদিরামের বোন রামশীলার মেয়ে হেমাঙ্গিনী। তারই ছেলে এই হৃদয়।

হৃদয়কে দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ গছাতে চাইল টাকা। বললে, 'আমি হৃদয়কে দিচ্ছি।'

'তা হলে আমাকেই বলতে হবে, একে দে, ওকে দে। না দিলে রাগ হবে মনে-মনে, অভিমান হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আরশির কাছে জিনিস রাখতে নেই। জিনিস থাকলেই প্রতিবিম্ব হবে না। বুঝলে, ও সব হবে না এখানে—'

যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।

গদাধর কি রাজার বেটা নয় ?

বাবাকে মনে পড়ে গদাধরের। স্নান করবার সময় জলে দাঁড়িয়ে "রক্তবর্ণং চতুর্মুখং" বলে ধ্যান করতেন, আর তাঁর চোখ জলে ভেসে যেত। খড়ম পায়ে দিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, গাঁয়ের দোকানিরা দাঁড়িয়ে পড়ত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন উনি স্নান করতেন তখন আর কেউ সাহস করে নাইতে যেত না। খোঁজ নিত—তিনি কি স্নান করে গেছেন ? রঘুবীর, রঘুবীর বলতেন আর তাঁর মুখ লাল হয়ে যেত।

সেই বাপের ছেলে গদাধর।

শুধু এইটুকুই তার পরিচয় ? কে বলে ! সে জগৎপিতার ছেলে।

সে পড়া-শোনা জানে না। শাস্ত্র-সংহিতা সে কিছু ছোঁয়নি। সে হয় তো পুরো 'বাবা' বলে ডাকতে পারে না, উচ্চারণ জানে না সবটার, সে হয়তো আধো-আধো ভাষায় শুধু 'মা' বলে। বাপের টান কি শুধু 'বাবা' বলা ছেলের উপর বেশি হবে, 'মা' বলা ছেলের চেয়ে ? না, বাবা বলবেন, এ আমার কচি ছেলে, বাবা ঠিক বলতে না পারলেও ডাকছে ঠিক আকুল হয়ে, অতএব একেই আগে কোলে নিই হাত বাড়িয়ে ?

কিন্তু সেই যে বাবা স্বপ্ন দেখলেন গয়াধামে গিয়ে, রঘুবীর বলছেন তোমার ঘরে আমি ছেলে হয়ে জন্মাব, তার কি হবে ? তবে, আসলে, তার কি কেউ পিতা নেই ? সে তবে কে ?

এই আত্মদর্শনই তো ঈশ্বরদর্শন।

আট

রানি রাসমণি কাশী যাবেন। কৈবর্তের মেয়ে, কিন্তু আসলে অষ্ট সখীর এক সখী।

কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। কিন্তু মন রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে। চার কন্যার মা। আর, তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাস। আমাদের সেজ বাবু।

বিয়ের অল্প কাল পরেই মারা যায় করুণাময়ী। রাসমণি চতুর্থ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে মথুরামোহনের বিয়ে দেন। কিন্তু নাম তার সেই সেজ বাবুই থেকে গেল।

স্বামী রাজচন্দ্র তখন গত হয়েছেন। বাড়ির পাশেই গোরা সৈন্যদের ব্যারাক। এক দিন মাতাল হয়ে এক দল সৈন্য ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। আত্মীয়-পুরুষেরা কেউ বাড়িতে নেই, রুখতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছে দারোয়ানেরা। সৈন্যরা বাড়ি লুঠ করতে সুরু করেছে। এখন কি করেন রাসমণি ? রাসমণি অস্ত্র ধরলেন। ছিলেন লক্ষ্মী, হয়ে দাঁড়ালেন রুদ্রচণ্ডী চামুণ্ডা।

রাজেন্দ্রাণী রাসমণি। রাজেন্দ্রাণী হয়েও অন্তরে ভিখারিণী। তেজস্বিনী হয়েও মমতার গঙ্গা-মৃত্তিকা। সংসারে কিছুই চান না, শুধু সেই মহা যোগেশ্বরী মহাডামরী সাট্টহাসা মহাকালীর রাঙা পা দু'খানি কামনা করেন। সেরেস্তায় যে শিলমোহর চলতি, তাতে তাঁর নাম লেখা—"কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" ঐশ্বর্যের শয়নে শুয়েছেন, কিন্তু উপাধান হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসঙ্গ।

বারো শো পঞ্চান্ন সাল। রানি কাশী যাবেন মনস্থ করেছেন। দর্শন করবেন অন্নপূর্ণাকে, মহা-ভিক্ষুক বিশ্বনাথকে। অঢেল টাকা এ জন্যে আলাদা করা আছে। অজস্র হাতেই তা ব্যয় করবেন। ঘাটে বাঁধা হয়েছে নৌকো, সারি-সারি প্রায় একশোখানি। থরে-থরে সম্ভার সাজানো হয়েছে। কত দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন। সবাই বিশ্রাম করছে নৌকোতে। শুধু এক জন জেগে আছে। সে স্বয়ং কুবের। রানির কোষাগারের দ্বারপাল।

রাত। নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রানি ঘুমিয়ে পড়েছেন উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন, স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর্। আমাকে অন্নভোগ দে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্। আর কাশী যেতে হবে না। স্বয়ং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

প্রথমে ভেবেছিলেন গঙ্গার পশ্চিম কূলে বালি-উত্তরপাড়ায় জমি নেবেন। কথায় আছে, গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অঞ্চলের জমিদারদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আজগুবি। টাকার লোভে জমি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জমিতে পরের টাকায় যে ঘাট তৈরি হবে সে ঘাট দিয়ে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে যাবেন না। না যাবেন তো না যাবেন—এমন কথা বলতে পারলেন না রাসমণি। তিনি পূর্ব কূলে উপস্থিত হলেন।

পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বর। এক লপ্তে ষাট বিঘে জমি কিনলেন রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেস্টি নামে এক সাহেব, আর বাকি অংশে মুসলমানদের কবরখানা আর গাজী পীরের থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্রমতে অমন জমিই শক্তিসাধনার অনুকূল। তাই সন্দেহ কি, ঐ পূর্ব কূল দেবীই নির্বাচিত করেছেন পূর্ব থেকে।

নয় লাখ টাকায় মন্দির আর মূর্তি তৈরি হল। নবরত্নবিশিষ্ট কালী-মন্দির, উত্তরে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর দক্ষিণে নাটমণ্ডপ। মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে আরো তিন সার দালান—সব মিলে অতিকায় দেবায়তন। সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় দশ বছর।

এই দশ বছর—উদ্যোগ থেকে উদযাপন পর্যন্ত—রাসমণি ব্রতধারিণী হয়ে ছিলেন, ছিলেন কঠোর নিয়মে-সংযমে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছেন, হবিষ্যান্ন খেয়েছেন, শুয়েছেন শুকনো মেঝের উপর। আর জপ করেছেন অবিশ্রান্ত। কিসের জন্যে এত অনুষ্ঠান? এই দেহ-মনকে যদি তাঁর উপযুক্ত বাহন করতে না পারি, তবে দেবী শুনবেন কেন আবাহন? হয় আসবেন না, নয় তো এসে ফিরে যাবেন।

তৈরি হল মন্দির। তৈরি হল দেবীমূর্তি। পণ্ডিতেরা পাঁজি দেখতে লাগলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিন কবে ঠিক করা যায়।

মূর্তি ছিল বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে। দেখা গেল, মূর্তি ঘামছে।

রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। ক্লান্ত-কাতর কণ্ঠে ভবতারিণী বলছেন, 'আমাকে আর কত দিন কষ্ট দিবি এমনি বন্ধ করে রেখে। শিগগির আমাকে মুক্তি দে—'

রানি অধীর হয়ে উঠলেন। আর দেরি করা যায় না। আসন্ন যে কোনো শুভদিনেই প্রতিষ্ঠিত করতে হয় দেবীকে।

স্নানযাত্রার দিনই নিকটতম শুভদিন। কিন্তু এ দেবী শক্তিস্বরূপিণী—একে বিষ্ণু-পর্বাহে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি করে? হোক বিষ্ণু-পর্বাহ, তবু আর অপেক্ষা করা যায় না—মা আকুল হয়ে উঠেছেন। যা শক্তি তাই মাধুরী—তাই "পরমাসি মায়া"। যিনি কালী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই লজ্জা। যিনি মুণ্ডমালিনী তিনিই পদ্মালয়া। সর্বার্থসাধিকা।

বারো শো বাষট্টি সালের বারোই জ্যৈষ্ঠ স্নান যাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। দেবী ভবতারিণী পাষাণময়ী অথচ করুণাদ্রবা। মৃত্যুবর্জিতা শিব-সুন্দরী। ত্রিনয়নী, তেজোরূপোজ্জ্বলা। পুরাতনী, পরমার্থা। কাললোকবাসিনী কালী কপালিনী।

রূপার সহস্রদল পদ্ম, তার উপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত শিব শুয়ে আছেন। তাঁরই হৃদয়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছেন ভবতারিণী। পরনে লাল বেনারসি, মাথায় মুকুট, গলায় সোনার মুণ্ডমালা। নানা অলঙ্কারে ঝলমল করছেন সর্বাঙ্গে। কটিতটে সারে-সারে খণ্ডিত নরকর। দেবী চতুর্ভুজা—দুই

বাম করে নৃমুণ্ড আর অসি, আর দক্ষিণ ছুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা।

দেবী দক্ষিণাস্যা।

এততেও যেন সম্পূর্ণ হল না। সোয়া হু'লাখ টাকায় দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগণা কিনলেন। মার সেবায় দান করলেন শালবাড়ি। তবুও হল না পুরোপুরি। মা অন্নভোগ চেয়েছেন, তার ব্যবস্থা কি?

পণ্ডিতেরা বললেন, তার বিধি নেই।

মাকে চাট্টি খেতে দেব ভক্তি করে, তার বিধি নেই?

না, নেই। তুমি রানি হলে কি হবে, তুমি শূদ্রাণী। শূদ্রাণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার।

ব্যথায় চমকে উঠলেন রাসমণি। এ কিছুতেই হতে পারে না। বিধিতে আর ভক্তিতে এত প্রভেদ কি করে সম্ভব? নিচু ঘরে জন্মেছি বলে কি আমি মা'র সন্তান নই? মা কি নিচু হয়ে অন্ন খান না?

না। প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করবেন রাসমণি। এ বিধি নয়, বিধি-বিড়ম্বনা। এ কিছুতেই মানতে পারব না। অভুক্ত থাকতে দেব না মাকে। তাঁর নিত্য ভোগের ব্যবস্থা করব।

সাবধান! অমন যদি কিছু করো, ব্রাহ্মণেরা মন্দিরে এসে প্রসাদ নেবে না। তোমার দেবালয় অনাশ্রিত হবে।

তবে উপায়? রাণী দিকে-দিকে লোক পাঠালেন। টোলে বা চতুষ্পাঠীতে, কোথাও কেউ কোনো ব্যবস্থা দিতে পারে কি না। সবাই এক বাক্যে বললে, কৈবর্তের মেয়ে দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকারী নয়।

রাণী আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এতে কাঁদবার কি আছে? এত বড় একটা কীর্তি স্থাপন করলে, দেশে-দেশে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ল—এ কি কম কথা? কী হবে অন্নভোগে? অন্নপূর্ণার কি অন্নের অভাব আছে সংসারে?

তবু মেয়ের সংসারে মা এলে কি মেয়ে তাঁকে উপবাসী রাখে? আমি নাম-কাম চাই না। আমি চাই ভক্তি। আমি চাই সন্তোষ। মাকে অন্নভোগ দিতে না পেলে আমার সন্তোষ নেই।

আবার কাঁদতে বসলেন রাসমণি।

হঠাৎ রামকুমারের টোল থেকে নতুন বিধান এসে পৌঁছুল। প্রতিষ্ঠার আগে রানি যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে অন্নভোগ চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে মন্দিরে ব্রাহ্মণদের প্রসাদ নিতে কোনো বাধা নেই।

অন্ধকারে রাসমণি দেখতে পেলেন মা'র আনন্দ চক্ষু। অভয় চক্ষু।

কিন্তু এ ব্যবস্থা পণ্ডিতদের মনঃপূত হল না। তবু, উপায় কি। স্বয়ং রামকুমার ভট্টাচার্য এ-পাঁতি দিয়েছেন, এ কে খণ্ডায়? সাধ্য নেই কেউ এ নিয়ে বিতণ্ডা করে।

রাসমণি ঠিক করলেন তাঁর গুরুর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পূজক-পুরোহিত কে হবে? গুরুবংশের কেউ পূজা-অর্চনা করে এ রানির অভিপ্রেত নয়। তারা সবাই অশাস্ত্রজ্ঞ, আচার-সর্বস্ব। তাদেরকে ডাকতে তাই তাঁর মন উঠল না। তবে কাকে ডাকেন? যাকেই ডাকেন সেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বলে পাঠায়, পুজো করা দূরস্থান, যে দেবতাকে শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত করবে তার পায়ের গোড়ায় মাথা পর্যন্ত নোয়াব না। পারব না ব্রাত্য হতে।

এখন তবে কি করা যায়। এই মহা দুস্তরে পথ কোথায়?

শেষ পর্যন্ত রানি রামকুমারকেই লিখলেন উদ্ধার করতে। রামকুমার বললেন, 'পূজকের অভাবে মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন, বেশ, আমিই পূজক হব।'

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন গদাধর এসেছে কালীবাড়িতে। বিরাট উৎসব। যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ পাঠ—কত কি হচ্ছে চার পাশে। কত দিক থেকে কত লোক এসেছে, সংখ্যায় লেখা-জোখা হয় না। সদাব্রত অন্নসত্র বসে গেছে। আহূত-অনাহূতের ভেদ নেই—শুধু দাও আর খাও, নাও আর ধরো। চলেছে চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র ঢালাঢালি।

গদাধরের মনে হল ভগবতী যেন কৈলাস শূন্য করে চলে এসেছেন মন্দিরে। কিংবা গোটা রজতগিরিই যেন রানি রাসমণি তুলে এনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়ে দিয়েছেন।

এত আয়োজন এত অজস্রতা, তবু গদাধর মন্দিরের অন্নভোগের অংশ নিল না। বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেল, আর তাই খেয়ে কাটাল সমস্ত দিন। বেলা পড়লে হেঁটে চলে গেল ঝামাপুকুর।

'কিছু খেলি নে কেন রে গদাই?' জিগগেস করেছিলেন রামকুমার।

'কৈবর্তের অন্ন খেতে পারি না দাদা।'

গদাধর এখন বড় হয়েছে, পণ্ডিত হয়েছে। ভাবলেন রামকুমার। নইলে ছেলেবেলায় ধনি কামারণীর হাতে কি করে সে ভিক্ষে নিয়েছিল?

পরদিন সকালে উঠেও গদাধর দেখলে দাদা ফেরেননি। তার মানে কি? দাদা কি কায়েমী হয়ে থেকে যাবেন না কি মন্দিরে? এ কি অভাবনীয়?

একের পর এক সাত-সাত দিন কেটে গেল, তবু দাদার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করা যায় না, গদাধর চলল দক্ষিণেশ্বর।

'এ কি, বাড়ি যাবেন না?'

'না রে—ভাবছি, জীবনের ক'টা দিন এখানেই কাটিয়ে দেব।'

গদাধর অবাক হয়ে রইল। বললে, 'তবে কি—'

'হ্যাঁ, মন্দিরের পূজার ভার নিয়েছি। টোল এবার তুলে দেব। তুইও চলে আয় আমার সঙ্গে।'

প্রবল আপত্তি তুলল গদাধর। তা কি করে হতে পারে? বাবা কোনো দিন শূদ্রযাজী হননি, তাঁর ছেলে হয়ে কোন্ যুক্তিতে তাঁর প্রথার প্রতিকূলতা করবেন? ও সব ছাড়ুন।

রামকুমার অনেক বোঝালেন। অনেক তর্ক কাঁদলেন। গদাধর নির্বিচল। নিষ্ঠায় নিয়তস্থিত।

তা হলে ধর্মপত্র করা যাক। বললেন রামকুমার। যা ধর্মপত্র তাই দৈবাদেশ।

একটা ঘটিতে কতগুলি কাগজের টুকরো। তাতে কোনোটায় 'হাঁ' বা কোনোটায় 'না' লেখা। অনপেক্ষ কোনো শিশুকে ডেকে আনো, সে যে কোনো একটা টুকরো তুলুক হাতে করে। সেই টুকরোতে যদি 'হাঁ' থাকে, তবে করো; আর যদি 'না' থাকে, তবে কোরো না। জানবে তাই তোমার দেবতার ইঙ্গিত।

ধর্মপত্রে হাঁ উঠল। তার মানে রামকুমার করুক যেমন করছে পূজকের কাজ।

এখন গদাধরের কাজ কী? ঝামাপুকুরের টোল তো পটল তুলল, সে খায় কি, থাকে কোথায়?

রামকুমার বললেন, 'মন্দিরের প্রসাদ খাবি নে?'

'না'।

'কেন গঙ্গাজলে রান্না, মাকে নিবেদন করা, খেতে দোষ কি?'

'আমি স্বপাকে খাই।'

'বেশ তো, তবে সিধা নিয়ে যা না গঙ্গাপারে, নিজের হাতে রান্না করে খা গে। গঙ্গাকূলে সবই পবিত্র—এ তো মানতেই হবে।'

গঙ্গার নাম শুনে গদাধর গলে গেল। সকল-কলুষভঙ্গা গঙ্গা। "তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।" সেই ভবভয়দ্রাবিনী ভাগীরথী। তাকে গদাধর ফেরায় কি করে?

তবে তাই। গদাধর থাকবে দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাবে। গঙ্গাজলের রান্না।

কেন, কেন এই নিষ্ঠার কাঠিন্য?

ঠাকুর বললেন, পায়ে একটি কাঁটা ফুটলে আরেকটি কাঁটা জোগাড় করে পায়ের কাঁটাটি বের করতে হয়। তার পরই ফেলে দিতে হয় দু'টো কাঁটাই। তেমনি অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্যে জ্ঞান কাঁটা জোগাড় করো। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দু'টো কাঁটাই ফেলে দাও। তখন বিজ্ঞান অবস্থা। ত্রিগুণাতীত অবস্থা।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

নিষ্ঠা না থাকলে সত্যে পৌঁছুবে কি করে? নিয়মে না থাকলে কি করে হবে নিয়মাতীত? আগে শাসন চাই, শম-দম-সাধন চাই, তবে তো নির্বাণে পৌঁছুবে। আগে কঠিন হও, তবে তো সরল হবে। আগে ডুব দিতে শিখবে তবেই তো খুঁজে পাবে গভীরতা।

চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে চলেছে। শঙ্করাচার্যকে সে ছুঁয়ে দিলে। 'আমায় ছুঁলি?' শঙ্করাচার্য চমকে উঠলেন। চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁইনি, তুমিও আমাকে ছোঁওনি। শুদ্ধ আত্মা যে নির্লিপ্ত।

এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর ভাব। সে কখনো বালক, কখনো জড়, কখনো উন্মাদ, কখনো পিশাচ। সে

তখন নিয়মাতীত। তার সর্বত্র ব্রহ্মময়। তার লজ্জা ঘৃণা ভয় ভাবনা নেই—কোনো গুণেরই আঁট নেই। সে কখনো বা জড়ের মত চুপ করে বসে থাকে। কখনো হাসে কখনো কাঁদে। এই বাবুর মত সাজে-গোজে, খানিক পরে আবার বগলের নিচে কাপড়ের পুঁটলি পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ডোবার জল আর গঙ্গাজল সমান দেখে।

এই যে নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা—এতে আসতে হলে কত নিষ্ঠা-নিয়ম কত শাসন-বন্ধন দরকার তার কি ঠিক আছে?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরে এক পাগল এসে উপস্থিত। এক হাতে একটা কঞ্চি, অন্য হাতে একটা ভাঁড়, পায়ে ছেঁড়া জুতো। গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেল। তার পরে মন্দিরে গিয়ে স্তব করতে বসল। গমগমে শব্দে কেঁপে-কেঁপে উঠল মন্দির। ভাত জোটেনি, অতিথিশালার পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল ভাত। পথের কুকুরের মত। এমন কি পথের কুকুরদের সরিয়ে-সরিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে। হলধারী ছুটে এল মন্দির থেকে। লোকটার পিছু-পিছু ধাওয়া করলে। বললে, তুমি কে?

পাগল বললে, 'চুপ। কাউকে বলিসনি। আমি পূর্ণজ্ঞানী।'

পূর্ণজ্ঞানী?

'হাঁ, তোকে বলে যাই। যেদিন এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখনই বুঝবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।' বলেই পাগল চলে গেল কোন দিকে।

ঠাকুর সব শুনলেন। ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন হৃদয়কে। মাকে বললেন, 'মা, আমারো কি তবে এমনি হবে?'

ভয় কি। মা'র মুখে সেই অভয়ঙ্কর প্রসন্নতা। চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ চলে গেলে জাহাজের আর কী থাকে? তার কলকব্জা ইস্ক্রুপ-বলটু লোহা-লক্কড় সব আলাদা হয়ে খুলে যায়। তেমনি তোর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখন তুই আর তুই থাকবি না। তুই তো কাঠ নস যে পোড়ালে ছাই থাকবি। তুই কর্পূর, পোড়ালে তোর কিছুই বাকি থাকবে না। শেষ বিচারের পর তোর সমাধি হয়ে যাবে। নুণের পুতুল হয়ে নামবি তুই লবণের সমুদ্রে।

তোর ভয় কি। তোর তো আমিই আছি। মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী মা। [ক্রমশঃ

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটান যায় কি? নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ আরভিং ল্যাং মুইর বলেন, [illegible] যা[illegible]।

[illegible]র্কিণ আবহাওয়া প্রতিষ্ঠানের কর্তা ডাঃ এফ, ডব্লিউ, [illegible] বলেন, মানুষের দ্বারা বৃষ্টিপাতের কোন পরীক্ষাই [illegible]নক হয়নি, এমনও হতে পারে যে, কৃত্রিম উপায়ে যা করান [illegible], তা স্বাভাবিক ভাবেই হতো।

[illegible] নিয়ে বহু বিতর্ক সত্ত্বেও কৃত্রিম উপায়ে বারিপাত ঘটান হচ্ছে। [illegible]রিপাতের প্রধান উপায় বিমানের সাহায্যে মেঘের মধ্যে শুষ্ক [illegible] টুকরো ছড়িয়ে দেওয়া।

[illegible]গুরাসে জো সিলভারথোর্ণ ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর জন্য শতাধিক বার বিমান ও বরফের টুকরোর সাহায্যে প্রচুর [illegible]পাত করিয়েছেন।

[illegible]রিউবায় কৃষি-বিশেষজ্ঞ হার্ম্মান কোহেন কয়েক বছর ধরে মধ্য[illegible]য় দু'লক্ষ একর জমি কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের দ্বারা চাষ করছেন। [illegible]নি বলেন যে, তিনি খুব ভাল ফল পেয়েছেন।

[illegible]রোগ নদীর ওরেগন উপত্যকায় বৈমানিক ব্র্যাণ্ড ও কুসার [illegible] ফলচাষীদের জন্য মেঘের মধ্যে বরফের টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে [illegible] ফসগুলিকে শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন।

কালিফোর্ণিয়ায় কালিফোর্ণিয়া ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানী ১৯৫৭ সাল থেকে ওয়েলস্ উপত্যকায় জল-তাড়িত বিদ্যুতের কারখানার জন্য জলের বিজার্ভার পূর্ণ করার জন্য কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত করাচ্ছেন। কোম্পানীর রিপোর্ট এই যে, এতে বৃষ্টিপাত শতকরা ১২ থেকে ১৪ ভাগ বেড়ে গেছে।

হাওয়াইএ লুনা লিওপোল্ড ও মরিস হলষ্টেড আতার চাষের জন্য মেঘের মধ্যে বরফের টুকরো ও জল চালিয়ে বৃষ্টির সৃষ্টি করেন।

কিন্তু এই সব ব্যাপারে আবহাওয়া প্রতিষ্ঠানের (Weathe[r] Bureau) অভিমত বেশ স্পষ্ট নয়। ডাঃ রিসেলডার্ফার বলেন, আপনা থেকে বৃষ্টি যে হ'ত না, তার কোন প্রমাণ নেই কিন্তু তিনি এমন কথাও বলেন না যে, বৃষ্টি হয়ত এমনি হ'ত। ডাঃ রিসেলডার্ফার আরও বলেন যে, আবহাওয়া প্রতিষ্ঠান একবার কালিফোর্ণিয়ায় এবং আর একবার আলাবামায় কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির জন্য পরীক্ষা-কার্য্য চালান, কিন্তু ফল সে-রকম উল্লেখ-যোগ্য হয়নি—অর্থাৎ দেখা যায় যে, কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য যে ব্যয় হয়, তাতে পোষায় না। আবার নতুন করে চেষ্টা করা হচ্ছে। এবার ফ্লোরিডায় পরীক্ষা-কার্য্য চালান হবে।

ডাঃ ল্যাং মুইর বলেন যে, সঠিক পন্থা অনুসরণ করলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হবেই। ১৯৪৯ সালের ২১শে জুলাই নিউ মেক্সিকোতে এক বারের প্রচেষ্টায় ৩২ হাজার কোটি গ্যালন বৃষ্টিপাত হয়।
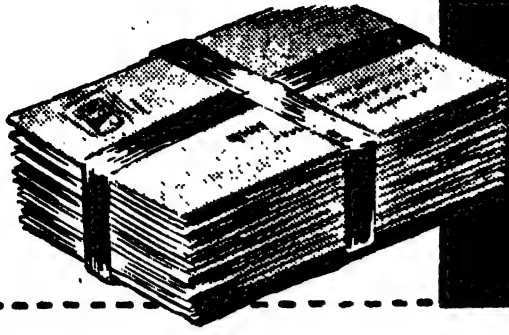
[দা' ঠাকুরের নাম শুনেছেন ? মুদ্রাকর, প্রকাশক, সম্পাদক আর স্বত্বাধিকারী একসঙ্গে—সেই দা' ঠাকুর। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সেই বিখ্যাত দা' ঠাকুর। কথক দা' ঠাকুর—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

কেদার বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে প্রথম দেখা হল তাঁরা দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরে—কেদারনাথের কলকাতায় শেষ জন্মতিথি উৎসবের দিনে। অমল মিত্র *এই আলাপের যোগসূত্র। পূর্ণিয়ায় ফিরে গিয়েই এই চিঠি লিখলেন কেদারনাথ।]

১

Purnia.

এক দিন পরে date আর দিলাম না।

কল্যাণীয় ও প্রিয় অমল,

আমার শরীর আর ভাল থাকবার কথা নয়, তাই পত্র লেখা হয়নি ভাই। যখন যা আপনি ঘটে যায় এখন তাই করি। এই ক'দিন পূর্ব্বে তোমার কথা ও তোমার দৌলতে মুর্শিদাবাদের যে আনন্দময় দাদাকে পেয়েছিলুম, তাঁর কথা অনেকক্ষণ আমার মনকে অধিকার করেছিল। তাঁর "জগদ্দল" আর "Bombay" ভুলিনি। তাঁর গুণ বুঝবে কে, সে অমৃত বোস নেই, ও সব অমূল্য জিনিসও বিরল। তাঁকে আমার ৵বিজয়ার বিশেষ অভিবাদন ও নমস্কার জানিও।

এখন অকেজো বা নিষ্কর্ম্মা হয়েছি প'ড়ে থাকি, কেউ নিচ্ছেও না। বস্তুশূন্য খোলটা কেউ চায় না, মাল খোঁজে। তা ফুরিয়ে গেছে।

প্রিয় নির্ম্মল, লব, উর্ম্মিলাকে আমার শুভাশীষ জানিও। আশা করি, তারা সব কুশলে ও সুস্বাস্থ্যে আছে। আর কি সকলকে দেখার আনন্দ এ জীবনে পাব? তোমাকে ভালবাসাই জানালুম আর তোমার উন্নতির প্রার্থনাই করলুম।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুঃ—পত্রাদি লিখলে Addressটি লিখতে ভুলো না ভাই। মাথায় আর কিছু নেই,—ভুলে গিয়েছি।

দাদামশাই।

[রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কেদারনাথ কলকাতায় এসেছিলেন। সে সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত-গ্রন্থ "রবিচ্ছায়া" প্রকাশক সাহিত্য-রসিক ৵যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এক চায়ের আসরে কেদারনাথকে সম্বর্দ্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করেন। যোগেন্দ্রনারায়ণের আকস্মিক বিয়োগে এই ব্যাপার স্থগিত থাকে। পত্রখানি তাঁর পুত্র অমল মিত্রকে কেদারনাথ লিখেছিলেন মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে।]

২

Purnia, Bhatta,
4, 2, 32.

প্রিয় অমল,

এইমাত্র তোমাদের পত্র পেলুম, যে পত্র কেহ প্রার্থনা করে না, যা কেবল পীড়াই দেয়, যে কেবল ব্যথারই বাহন।

আমি এ কথা বলবার স্পর্দ্ধা রাখি না যে, তোমার পূজ্য পিতার আকস্মিক দেহত্যাগ আমাকে তোমাদের চেয়ে বেশী বেদনা দিয়েছে। তবে, আমার এ-বলাটা অসত্য হবে না যে, তিনি আমাকে তাঁর বন্ধুত্বের প্রিয় আস্বাদে বঞ্চিত করে চলে গেছেন। মাত্র কয়েক দিনে যে এক জন লোক,—বাক্য, ব্যবহার, কার্য্যে, ঔদার্য্যে আর এক জনকে অভিন্নের আসন দিতে পারেন এবং তার প্রিয়চিকীর্ষু হ'য়ে পড়েন, এ নিতান্ত বিরল হ'লেও, আমি তাঁর সেই ভালোবাসা উপভোগ করবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। তাঁর এই মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সেই সহৃদয় সহাস্য মূর্ত্তি স্মরণ করে আমি আজ যে অভাব অনুভব করছি, সেটা কঠিন আঘাতেরই নামান্তর।

সেই নির্ম্মম বারের সন্ধ্যায় তিনি আমাকে খুঁজেছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি ঠিক সেই দিনই "ছায়ার" বৈঠকে অনুপস্থিত। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস!

পরে শুনেছি, আমাকে পার্টি দিবার জন্য তিনি যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছিলেন। বিলম্ব হচ্ছে বলে অপরেশ বাবুকে তিরস্কার করেছিলেন। এই অতিষ্ঠ হবার কারণ আজ আমার কাছে সুস্পষ্ট দুরন্ত নিয়তির অলক্ষ্য ইঙ্গিত তাঁকে চঞ্চল করছিল।

শেষ স্থির হয়, শনিবার পার্টি হবে। নিজে তিনি স্বেচ্ছায় মা[illegible] ও cake-এর ভার নিয়েছিলেন। প্রস্তাব ও উৎসাহ দুই ছি[illegible] তাঁরই। সম্ভবতঃ সেই সংস্রবেই আমাকে খুঁজেছিলেন। কা[illegible] পূর্ব্বে আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই জানানো হয় নাই।

আজ আমি শ্রদ্ধানত অন্তরে সেই আমার ভাগ্যলব্ধ প্রিয় বন্[illegible] ঊর্দ্ধগত আত্মাকে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞ চিত্তে জানাচ্ছি,—তাঁর সেই আন[illegible] আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। আমার অন্তর প[illegible] প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধায় তার প্রাপ্তি স্বীকার করছে। তাঁর অন্তর যা[illegible] ইচ্ছা করেছিল, আমি তা পাবার অধিক পেয়েছি, তাঁর মালা আম[illegible] কণ্ঠেই রইল। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

অমল, এ জগতে অনেক ব্যথাই বহন করবার জন্য আমা[illegible] প্রস্তুত থাকতে হয়। তোমাদের বেদনার মধ্যে একটা গৌরবোজ্জ্[illegible] স্মৃতির প্রলেপ আছে। তোমরা আদর্শ পিতা পেয়েছিলে—কীর্ত্তিমা[illegible] সপুরুষ, সন্তানবৎসল। যা করবার ছিল তিনি তা সবই করে গেছেন

এখন তাঁর অভাবটাই মাত্র তোমাদের কষ্টের কারণ হয়েছে। কিন্তু অমল,—মরজগতে যে বস্তুর "নাম-রূপ" আছে, তা চিরস্থায়ী হয় না। এ সত্য চির-স্বীকৃত।

যে যায় গো পরপারে,—
কে তায় ফিরাতে পারে
বাড়ে শুধু হাহাকারে
হৃদয়-ক্ষত।

দুঃখ পুষে তাঁর আত্মাকে দুঃখ দিও না। প্রার্থনা করি, তোমরা সেই কর্তব্যপরায়ণ পিতার যোগ্য সন্তান হও। তার মধ্যেই তাঁর পূজা।

এখন আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ভালোবাসা গ্রহণ কর। সুখী হও।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[১৯৪২ সালে পূর্ণিয়াতে কেদারনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান হয়। তার পর এই চিঠি লিখেছেন]

৩

পূর্ণিয়া
২০শে মার্চ, ১৯৪২

কল্যাণীয়েষু—

প্রিয় অমল, তুমি খুসি হবে তা জানি। দূরে দূরে থাকলেও তুমি যে আমার আপন এক জন। লেখার অনেক কিছু ছিল, বয়স বাধা দিলে। কতটুকু লিখে এত অধিক পাওয়াটার "প্রফিটিয়ারিং"-এর অপবাদ হয়, তাই ও-সব কথা কোনো দিনই মনকে কলুষিত করেনি ভাই। এ কাজের মধ্যে তোমাদের সকলের ভালোবাসার পরিচয়ই আমি পেয়েছি। সেই আমার পাথেয় হবে।

তোমরা আনন্দে থাকো, সুখী হও, এই কামনাই করি। যে দুর্যোগ এসেছে তাও কেটে যাবে। দুর্ব্বল মনটাই তা নিয়ে বিচলিত থাকে মাত্র।

আজ আর লেখা গেল না। মনটা হঠাৎ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীঠোফেনের চিঠি

[১৮১২ সালের জুলাই মাসে ভাইমার থেকে বীঠোফেন কবিগুরু গ্যেটেকে এই চিঠিখানি লেখেন। তাঁর প্রণয়িনী বেত্তিনার মারফৎ কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। কবি গ্যেটে, বীঠোফেনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বেত্তিনাকে বলেছিলেন : কাব্যলোকের ওপারে সুরলোক, বীঠোফেন সেখানে একক এবং অদ্বিতীয়।]

হে কবি,

আপনার চিঠিখানি বার বার পড়েছি। আপনি বেত্তিনার কাছে আমার প্রশংসা করে যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে আপনার হৃদয়ের ঔদার্য্যের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কাব্যলক্ষ্মীর একনিষ্ঠ সেবায় আপনার মহৎ জীবন উৎসর্গীকৃত—জার্মাণীর আপনি গৌরব এবং গর্ব্ব। কিন্তু ভাবী কালের ইউরোপে যে-দু'টি নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, তার একটি হলো সেক্সপীয়র, অপরটি হলো গ্যেটে। কারণ আপনাদের দুই জনের দুর্লভ শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে চিন্তার এমন সম্পদ আছে যা শাশ্বত এবং সুন্দর। আমি সুরলোকের পূজারী, আমার সৃষ্টির পরিধি সংকীর্ণ নয়, তবে আমার শ্রোতার সংখ্যা সত্যিই বিরল। আমার শিল্প-সৃষ্টির আবেদন কেবল মাত্র তাঁদের কাছেই যাঁরা সংগীতের ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করতে চান সত্য এবং সুন্দরকে। উদ্দীপ্ত বুদ্ধি দিয়ে নয়, সৌন্দর্য্য-পিপাসু হৃদয় দিয়ে যে জিনিস অনুভব করতে হয়, তা কোনও দিনই জনসাধারণের আসর জমাতে পারে না। রাজসভার জাঁকজমক ও অভিনন্দন সে শুধু কবির জন্যেই, বীঠোফেনের সেখানে স্থান কোথায়? আপনি তাই ভাইমারের রাজকবি, আমি নিতান্তই এক জন সামান্য সুরস্রষ্টা! বাইরের পৃথিবীর কোলাহল আমার কাছে নীরব—নিষ্প্রাণ। জনসংঘের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন আমার কানে এসে পৌঁছয় না। বধিরতা তাই আমার কাছে শাপে বর। আমি বধির বলেই অন্তরলোকের দরজা আমার কাছে উন্মুক্ত—সেখানে আমার অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীকে আমি ঘৃণা করি না। এইখানেই বীঠোফেনকে সবাই ভুল বুঝেছে—এই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখ। একমাত্র বেত্তিনা আমার এই দুঃখের কথা জানে।

আমি আমার নব সৃষ্টির রূপকে সংগীতে প্রতিষ্ঠা দিতে পারবো কি না জানি না, তবে আমি সাহস দিয়ে গেলাম, নতুন সুরকারদের উৎসাহ দিয়ে গেলাম। ইউরোপে সংগীতে একটা নতুন রূপের প্রবর্ত্তন আমি করেছি কি না, ভাবী কাল তার বিচার করবে। সুরের প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আমি তার পূজা করেছি—নিভৃতে, রাজসভায় নয়—এই আমার সান্ত্বনা। আমি আমার রূপের জগৎ সৃষ্টি করেছি বহু ও বিচিত্র সুরের ভেতর দিয়ে। সেই রূপের লীলায় ঢেলে দিয়েছি আমার আনন্দ—এই আমার জীবনের পুরস্কার। রাজসভার বরমাল্য আপনিই গ্রহণ করুন। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ
বীঠোফেন।

কলিকাতা-প্রবাসী জনৈকা বিদেশিনীর চিঠি

[ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজত্বকালে মিসেস্ ফে নাম্নী জনৈকা ইংরাজ মহিলা এ দেশে আসেন ভাগ্যান্বেষণে। মিসেস্ ফের স্বামী মিঃ এ্যান্টান ফে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করতেন। কিন্তু ভদ্রলোক কেবল মাত্র অসচ্চরিত্র ও অসাধুই ছিলেন না, নিজের দুর্ব্বুদ্ধি-পরিচালিত হয়ে তৎকালীন কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন তিনি এবং শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রস্থান করেন। এর পরই সুরু হয় স্বামি-পরিত্যক্তা মিসেস্ ফের বেঁচে থাকার জন্য রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে অবিরাম লড়াইয়ের পালা এবং অশেষ দুঃখ ও নির্য্যাতন ভোগ করে ভারতের মাটিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন তিনি। মিসেস্ ফে ইংলণ্ডে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে লেখা নানা চিঠিতে তৎকালীন কলিকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বহু কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেগুলির ঐতিহাসিক মর্য্যাদা অসামান্য। বর্ত্তমান চিঠিতে কলিকাতার বাজার-দর, বাড়ী-ভাড়া, ও সামাজিক জীবনের একাংশের একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়।]

কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট

প্রিয় বন্ধুবৃন্দ,

গতকাল যে অমূল্য চিঠির তাড়াটি পেয়েছি তার জন্য সহস্র ধন্যবাদ। "লণ্ডনের চিঠি"র আনন্দ-ধ্বনি শুনে আমি যে কি আগ্রহ নিয়ে প্রসাধন-কক্ষ থেকে ছুটে এসেছিলাম আর মিঃ ফে এসেছিলেন স্টাডি থেকে তা' তোমাদের ধারণাতেই আসবে না। কিন্তু সে-আগ্রহ মুহূর্তের জন্য নিরাশায় মুশড়ে পড়ল; কারণ এই প্রিয় সম্পদটি স্পর্শ করতে না করতেই এমন একটা মূর্চ্ছার ভাব হোল যে বহুক্ষণ সে মোহ ভাঙ্গতে পারিনি। এই বহু প্রোথিত আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করতে কিছুতেই দিইনি মিঃ ফে'কে। এ রকম ধন পেলে কে না কৃপণ হবে বল দেখি—যতক্ষণ না নিজে সবটা গোগ্রাসে গিলেছি এক টুকরোও বেহাত হতে দিইনি। প্রিয়জন-সঙ্গ হতে যারা বহু দিন বঞ্চিত, একমাত্র তারাই পিপাসার্ত হৃদয়ের অধীর আগ্রহ ও তৃষিত স্নেহের মর্ম জানে।

শেভালিয়র দ্য সেণ্ট লুবিন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে এবং মক্কা পর্যন্ত পথের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত তোমাদের হস্তগত হয়েছে জেনে খুশী হলাম। স্নেহময়ী মায়ের শঙ্কা ও ভ্রান্তির আশ্রয়-স্থল সেই মরুভূমি যে আমরা অতিক্রম করে এসেছি এ কথা জেনে তাঁর মন এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু হায়! আরো যে ভয়াবহ দুঃখভোগের অনেক বাকি ছিল তা যদি তিনি জানতেন! ভগবানকে ধন্যবাদ, মেঘ কেটে গেছে। মনকে না বিচলিত করে তা নিয়ে আলোচনা অবশ্য পরিত্যজ্য।

আমাদের বাড়ীটি ভাবী আরামদায়ক। কিন্তু এক দল চোরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইংলণ্ডে চাকর-বাকররা অসাধু হলে শাস্তি দি, তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দি বাড়ী থেকে এবং তাদের পরিণাম দেখে অন্যেরা সাবধান হয়—অন্ততঃ সে রকম আশা করা যেতে পারে। কিন্তু এই হতভাগারা একেবারে লজ্জা-সরম-বিবর্জিত। এদের কীর্তি-কলাপের দু'একটা নমুনা দিচ্ছি—তাহলেই বুঝতে পারবে কেমন ঈর্ষান্বিত পরিবেশে অধিষ্ঠিত আমরা। আমার খানসামা এক গ্যালন দুধ আর তেরটা ডিম কিনে এনেছিল কিন্তু তাতে তৈরী হয়েছে—তাও কোন মতে—মাত্র দেড় পিণ্ট কাষ্টার্ড। লোকটা এমন নাক-কান-কাটা ঠগ যে আমি এ কিছুতেই বরদাস্ত করব না বলায় সে চাকুরীতে ইস্তাফা দেওয়ার নোটিশ দিল। আমি তখন আর একটিকে বহাল করে তাকে বললাম—"দেখ বাপু, আমার বাড়ীতে যা-যা ঢুকবে তার বাজার দাম আমি যাচাই করে দেখছি—কোন প্রকার চুরী-টুরী চলবে না এখানে। রোজ সকালে তাদের ঠিক-ঠিক হিসেব চাই।" এ কথা শুনে সে কি বললে জান? সে দ্বিগুণ মাইনে চাইলে। বুঝতেই পারছ, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি এবং সেই সঙ্গে প্রথমটিকেও ক্ষমা করেছি অবিশ্যি যতক্ষণ না সে আমার পায়ে পড়ে সেলাম করেছে অর্থাৎ ডান হাত আমার পায়ের উপর রেখেছে। আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত এ নিদর্শন। (হায়! একটু সাধারণ সাধুতার যদি মুখ দেখতে পেতাম!) জানি, লোকটা একের নম্বর জুয়াচোর—আর সবাই তো তাই—তবে আমার যা' পরিচয় পেয়েছে তাতে এখন থেকে জুয়াচুরী ব্যবসায়ে একটু সংযম অনুসরণ করবে আশা করি। প্রথম প্রথম সে জন-প্রতি রোজ বার আউন্স মাখন খরচা হয় বলত, কিন্তু এখন বলে মাত্র চার আউন্স লাগে! লোকগুলো বোধ হয় জানতে পেরেছে যে আমি তাদের সম্বন্ধে লিখি-টিখি—তাই আর একটি ঘটনা আমাকে উপহার দিয়ে বাধিত করেছে। মনে হচ্ছে বাজার-সরকারটি পালিয়েছে। তারা বলে, গরীব চাকর-বাকরদের আমার বাড়ীতে খেটে কোনই লাভ হয় না। অন্য লোকের বাড়ীতে খাটলে মাইনে ছাড়াও দৈনিক অন্ততঃ এক টাকা রোজগার হয়। আর এখানে দু'-এক আনা বেশী নিয়েছ কি তা কেড়ে নেওয়া হবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ কি ভয়ংকর জীব আমি। এত ঘনিষ্ঠতার জন্য নিশ্চয়ই তুমি সাধুবাদ দেবে না আমায়—এ আমি হলফ করে বলতে পারি। দেখছি, বাজার-সরকার না রেখে আমি তাদের উপর টেক্কা দিতেও জানি। খানসামারাই তো এ কাজ করতে পারে! তোমরাই বিচার কর, একটু বুঝে-সুঝে চলার তাগিদে এই সমস্ত বিশ্বগ্রাসী লোকগুলোকে কি আমি ভাতে মেরেছি। দু'-চার আনা হাতসাফাই করতে এরা নানা ফন্দি ফিকির অনুসরণ করবেই করবে। এ রকম ভাবে ক্ষতি পোহাতে হয়নি এমন কেউ থেকে থাকে তো আশ্চর্যের কথা! অথচ আইনসম্মত ভাবে শতকরা বার পার্সেণ্ট সুদ নেওয়া চলে (যথেষ্ট, তোমার বলবে), কিন্তু মাত্র এক দিনের জন্য সামান্যতম অর্থ লেন-দেনের জন্য দোকানীরা কুড়ি পার্সেণ্ট দেয়। তাহলে কড়িতে হিসেব করলে কত দাঁড়াবে বিচার করে দেখ ৫১২০ কড়িতে হয় এক টাকা। মুচ্ছুদ্দিদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই যে নিষেধ আইন তার জন্য হাজার রকমের জাল-জুয়াচুরী সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ এদের বাদ দিয়ে লেন-দেন অসম্ভব, অথচ যা-কিছু ঘরে ঢোকাবে তা থেকেই উপসত্ব নেবে।

এবার এখানকার জীবনযাত্রা নির্বাহ ও আমার সংসার খরচার একটু আভাস দিচ্ছি। বাড়ী-ভাড়া মাসিক দু'শো টাকা—কারণ বাড়ীটা আমাদের সহরের কোন সমাদৃত স্থানে নয়। তা'হলে গুণাগার দিতে হোত তিনশো কি চারশো টাকা। আরো [illegible] বাড়ী খুঁজছি। ইংল্যাণ্ডে থাকতে প্রায়ই শুনতাম বাংলার [illegible] হাওয়ায় খিদে মরে যায়, কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমি তার কোনই প্রমাণ পাইনি। বরং এত প্র[illegible] পরিমাণ খাদ্য উদরসাৎ করতে দেখিনি কোথাও। এই গরমের মধ্যেও আমরা বেলা দু'টোতে খাই। এই সময় মিঃ ফে ডিনার জন্য বাজ পাখীর মতই তাকাতে থাকেন। এখনও পর্যন্ত যা শরীর সম্পূর্ণ সারেনি তবুও আমিও দু'টো দাঁতে কাটি। [illegible] তোমাদের ভোজ্য দ্রব্যের ও জিনিষ-পত্রের সাধারণ দামের একটা তালিকা দিচ্ছি। স্যুপ, রোষ্ট-করা মুরগী, তরকারি, ভাত, মাটন, ভেড়ার ছানার মাংস এক কোয়ার্টার, রাইস পুডিং, টক, চীজ, [illegible] মাখন, রুটি ও মেডিইরা (মদ)। মদের দাম বেশী কিন্তু খা[বার] জিনিষ খুব সস্তা। একটা গোটা ভেড়ার দাম দু'টাকা—[illegible] মেষ-শাবক এক টাকা, ছ'টা ভাল মুরগী বা হাঁস এক টাকা, দু'টো পায়রা ঐ—বার পাউণ্ড রুটিও ঐ—দু' পাউণ্ড [illegible] ঐ—বাছুরের অস্থিসন্ধি একটা এক টাকা—ভাল চীজ দু'মাস [আগে] প্রতি পাউণ্ড তিন বা চার টাকায় অতি চড়া দামে বিক্রী হয়েছে কিন্তু এখন দেড় টাকায় পাওয়া যায়। ইংলিশ ক্ল্যারেট এখন [illegible] টাকায় দু'ডজন হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। এই হোল মূল্য-তালিকা

এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, প্রতিদিন খাওয়ার টেবিলে এর অনেক কিছুই আমরা চোখে দেখতে পাই না—তবে কালেভদ্রে হলেও মাঝে মাঝে এ সবের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হতে হয়। আকণ্ঠ ঋণজালে জড়িয়ে না পড়তে হলে খুব সতর্ক হওয়া চাই। এখানে ঋণ পাওয়ার সুবিধা কল্পনার অতীত। ইউরোপের দোকানদাররা জিনিষপত্তর ঘরে পাঠিয়ে দিতে সদাই উদ্‌গ্রীব আর বেনিয়ারা এখানে কাজ গোছাতে এত ওস্তাদ যে, একে অন্যের চেয়ে কম হাঁকতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এক জন হয়ত বললে—'আমারটা নিন, আমি পাঁচ হাজার টাকা ধারে দিচ্ছি।' আর এক জন অমনি সাত হাজারে উঠবে—তৃতীয় জন হয়ত উঠবে দশ হাজারে। কোম্পানীর কেরাণীরা, বিশেষ করে নিজেদের বিলাসিতা চরিতার্থের রসদ সহজেই পায়। এ রকম দৃষ্টান্ত একটুও অসাধারণ নয় যে, কোম্পানীর কেরাণীরা এখানে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই কোর্সে চার জন ছুঁড়ি নিয়ে উড়ছেন। যৌবনের অপরিণামদর্শিতার কথা বাদ দিলেও অনেকেই যে অনতিবিলম্বে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তা'তে বিস্ময়ের কি আছে? কয়েক জনের কথা আমি শুনেছি যারা দু'-তিন বছরের মধ্যেই এমন জড়িয়ে পড়েছে যে উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত। এখানে টাকায় বার পার্সেণ্ট সুদ—বেনিয়ারা ধার দেওয়ার আগে বণ্ড লিখিয়ে নিতে ভোলে না। বছরের শেষে হিসেব-নিকেশ হয়—সুদের টাকা আসলে যোগ হয়—কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রভু অচিরেই দেখেন তাঁর ঋণের অঙ্ক দ্বিগুণে উঠেছে—মুক্তির উপায় থাকলেও এ নিয়ে অনুযোগ করার ভরসা পান না। কিন্তু হায়, মুক্তির পথ চিররুদ্ধ।

আগেই জানান উচিত ছিল যে, মি. কে ১৬ই জুন সুপ্রীম কোর্টে এ্যাডভোকেট হিসেবে যোগ দেওয়ার অনুমতি পেয়েছেন—কয়েকটি মামলাতে সওয়াল করেছেন এবং বেশ সন্তোষের সহিত বেরিয়ে এসেছেন। কাজেই এখন অতি ব্যস্ত তিনি। এখানে প্রত্যেকেই তাঁকে উৎসাহ দিতে ইচ্ছুক এবং তিনি যদি নিজের ভাল বুঝে চলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দিন ভাল ভাবেই কাটবে, প্রতিবেশীদের মত আমরাও আমাদের মোহরের অংশ পাবই। খুব মামলা আসে তাই আমি চাই। ইংলণ্ডের চেয়ে এখানে মামলার ফী খুব বেশী। তোমরা হয়ত বলবে, তাই তো হওয়া উচিত—আমিও এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে একমত।

কয়েক সপ্তাহ আগে স্যার রবার্ট চেম্বার্স একটি দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন (ঘোড়া ক্ষেপে যাওয়ায় গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে চোট খেয়েছিলেন) যার জন্য বাড়ীতে অনেক দিন বন্দী হয়ে থেকে হয়েছে—এখন তিনি আরোগ্যের পথে। এই কারণেও বটে মিঃ কে এক জন বন্ধুর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ... বটে, বড়ই বিরক্তিতে আছি। সেই থেকে আমার দয়ালু সহধর্মিণীরও দেখা পাই নে। স্বামীকে ছেড়ে কদাচিৎ তিনি বাইরেও বের হন এবং যেদিনই সম্ভব হবে, আমরা ডীনারে মিলিত হব। তাঁরা পশ্চিমে গেছেন এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফিরছেন না। ইতি

তোমাদের

মিসেস্ কে।

স্ত্রীকে লেখা ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেলের পত্র

[জীবনের অধিক যে প্রিয়, সেই প্রিয়ার বিরহে কাতর পুরুষের একখানি লিপি। মেরিয়ান অর্থাৎ মিসেস্ হেষ্টিংস স্বামীর আগেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছিলেন, আর মিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারতে অবস্থানের কাল নানা অনিবার্য কারণে আরো কয়েক মাস বিলম্বিত হয়েছিল। এই সময় হেষ্টিংসের লেখা পত্রগুলি প্রিয়বিচ্ছেদ বেদনায় রঞ্জে যেমন রঙীন তেমন হৃদয়স্পর্শী।]

কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৪

প্রিয় মেরিয়ান,

আমার শরীর সামান্য খারাপ হয়েছিল। কথাটা জানিয়ে রাখলাম, না হলে কোন বিপ্রমুখাৎ পল্লবিত হয়ে অতি ভয়াবহ রূপ নিয়ে পৌঁছবে তোমার কাছে। ৯ই তারিখ সকাল বেলা কেমন একটা শারীরিক দৌর্বল্য নিয়ে ঘুম ভাঙল। গলার গ্লাণ্ডগুলো স্ফীতোদর—তার সাথে সামান্য অবসাদ জড়িমা ও জ্বরের তাপ। এর জন্য অবশ্য সবার সঙ্গে বসে প্রাতরাশ খেতে কোন অসুবিধা হয়নি এবং বেলা একটা অবধি কাজ করেছি। তার পর শুতে গেছি এবং সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা অনেকটা সুস্থ করে নিয়েছি দেহটাকে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না উঠলেও এখন বেশ ভাল। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তোমার ছবির ধ্যান করেছি, আর আমার ও আমার মেরিয়ানের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সে কথা ভেবে বড়ই দুঃখ পেয়েছি। মেরিয়ান তো জানে না, আমি ভাল কিংবা মন্দ আছি; অথবা আমার রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ধৈর্যের আবার একটা কঠোর পরীক্ষা হোত অথবা ঘুম ভেঙ্গে দেখতাম, আমাকে সান্ত্বনা দিতে তার মহিমাময়ী মূর্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই সব চিন্তার সময় কত বার করে ফিরে দেখতাম সেই দিকে, যেখানে চিত্রাংকনটি আগে ছিল যখন আমার পীড়া ছিল গুরুতর।······কিন্তু আমার নয়ন যুগল সে প্রোষিত মূর্তি দেখতে পায়নি এবং কল্পনাতেও মাত্র তার ক্ষীণ আভাষ পেয়েছি। আমার মেরিয়ান এখন আমার কাছ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে এবং হয়ত আমার নিকটে তার উপস্থিতির চেয়ে তার কাছে আমার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। মনের সকল ভাবনাগুলির আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই নে, কিন্তু এ কথা তোমায় স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিতে চাই যে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে তোমার বিরহ আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তোমার অভাব প্রতিমুহূর্তে বোধ করছি। জানি না, তোমার ভাগ্যে কি আছে বা কি ঘটে গেছে।

আগের চিঠিতে জানিয়েছি কি—ভাগলপুরে হতভাগ্য ক্লেভল্যাণ্ডের একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণে বোর্ড সম্মতি দিয়েছে? সেই সমাধি-স্তম্ভের প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ করার জন্য আমি যে লেখার প্রস্তাব করেছি তার প্রতিলিপি পাঠালাম। অবশ্য সহকর্মীরা যদি অনুমোদন করেন—তাদের এখনও দেখানো হয়নি।

তিন দিন আগে বোসরাগামী নেপচুন স্লুপে ছোট্ট একখানা চিঠি পাঠিয়েছি তোমায়। বোসরাতে নেপচুন থেকে একখানা সরকারী প্যাকেট নামান হবে—তাতেই আছে চিঠিখানা। মেজর স্কটের ঠিকানায় লেখা। সে জলপথে লণ্ডনে তোমার কাছে পৌঁছে দেবে চিঠিখানা। সামান্যই সন্দেশ আছে তাতে—তবুও সুযোগ পেলেই

আমি চিঠি লিখি, নইলে যদি আমার চিঠি যথাস্থানে না পৌছায় বা পৌছতে দেরী হয়।

প্রিয় বন্ধু স্যার উইলিয়ম জোনসের একটা পার্শী কবিতা পাঠালাম। তোমার ও মিসেস্ মোটের বেশ কাজে লাগবে। কবিতাটিতে উৎকৃষ্ট কবিত্বের স্পর্শ আছে কিন্তু প্রকৃতির নামগন্ধ নেই। তোমার অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি কিন্তু তার কোনটিই গোলাপ জলের বোতল বলে ভুল হয়নি।

আমার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা জ্ঞাপনের জন্য মিঃ ডভটনের নির্দেশ মত শেষ সময় পর্যন্ত অসমাপ্ত রেখেছিলাম চিঠিখানা। এখন বেলা সোয়া একটা—কিন্তু একবার ক্ষণেকের জন্যও একটুও বেদনার অনুভূতি হয়নি—যদিও খুব—খুবই সামান্য দুর্বলতা এখনও আছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেণ্ট হেলেনা জাহাজে চিঠি পাঠাতে তোমায় অনুরোধ করা হয়নি। যত দিন না আমিও লণ্ডনে পৌছচ্ছি, তত দিন যতগুলি জাহাজ এই দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে তার প্রত্যেকটিতে মিঃ কর্ণনাইলের কেয়ারে একখানা চিঠি পাঠান চাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চের শেষ নাগাদ আশা করতে পার, আমি চিঠিগুলি গ্রহণ করতে সেখানে পৌছতে পারি। জাহাজ কবে ছাড়বে মেজর স্কট জানাবে তোমায়। তোমার সম্বন্ধে সাম্প্রতিক খবর দেওয়ার এই উপায় এবং খবর আমার চাই-ই। বিদায় প্রিয়ে। ইতি তোমার

ও. হে.

● শিল্পী জোফানী মিসেস্ হেষ্টিংসের একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেছিলেন। মিসেস্ হেষ্টিংস যখন বিলেতে, তখন রোগক্লান্ত হেষ্টিংসের শয্যার সম্মুখে ছবিখানা টাঙানো থাকত। যন্ত্রণা-কাতর হেষ্টিংস এই ছবি দেখে দূর সমুদ্রপারে প্রিয়ার বিরহের কথা ভুলতে চেষ্টা করতেন।

● স্যার উইলিয়ম জোনস এক জন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও ভাষা-বিদ্। ইম্পের বিলাত প্রত্যাগমনের পর তিনিই প্রধান বিচারক হয়ে কলিকাতায় আসেন। স্যার জোনস বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির এক জন প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয়দের প্রতি তিনি অতি শ্রদ্ধান্বিত ভাব পোষণ করতেন।

● সেণ্ট হেলেনা'র গভর্ণর কর্ণনাইল হেষ্টিংসের এক জন পুরোনো বন্ধু। অতি অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন তিনি।

● বিয়ের আগে মিসেস্ মোটের নাম ছিল মিস্ মেরী টাউচেট। তিনি পিটার টাউচেটের বোন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ মোট নামক বেনারসের এক জন হীরক-ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিস্ টাউচেটের বিয়ে হয়। মোট-দম্পতী হুগলীতে থাকতেন। মিঃ ও মিসেস্ হেষ্টিংস প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। মিসেস্ মোট অতি মনোরমা মহিলা ছিলেন।

উৎসর্গ-পত্র

[পত্র কত প্রকার? ডাকঘর মারফৎ পত্রের আদান-প্রদান না ক'রেও লেখা যায় এক রকমের চিঠি। লেখক আর গ্রন্থকারকে লিখতে হয়—উৎসর্গ-পত্র। একটি বিখ্যাত উৎসর্গ-পত্র এই সংখ্যায় প্রকাশ পাচ্ছে। মাইকেলের বীরাঙ্গনাকাব্যের উৎসর্গ-পত্র]

শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যের উৎসর্গ-পত্র বা মঙ্গলাচরণ

বঙ্গকুলচূড়

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া

কাব্যকার ইহা

উক্ত মহানুভবের নিকট

যথোচিত সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল।

ইতি—

১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

মেঘনাদবধ কাব্যের উৎসর্গ-পত্র বা মঙ্গলাচরণ

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য, আপনি শৈশব কালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ-ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং স্বদেশীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে[illegible] বোধ হয়, এ অভিনব কাব্য-কুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার ন[illegible]। তবুও আমি আপনার উদারতা ও আমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপা[illegible] করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে[illegible]। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার ক[illegible] তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ম[illegible] আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কো[illegible] সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসর-কালেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়া[illegible] বীর-কেশরী মেঘনাদ, সুর-সুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিত-ম[illegible] মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি

কলিকাতা
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল } দাস শ্রীমাইকেল মধুসূদন দ[illegible]

রত্নমালা

পঞ্চানন শর্ম্মা

ঘটক—মধ্যস্থ, মিলনিয়া, যোজক।
ঘটনা—যোজনা, দৈব বিষয়।
ঘটা—জনতা, সমূহ, সভা, আড়ম্বর।
ঘটিকা—দণ্ড, দণ্ডধর, গুল্‌ফ।
ঘটিত—সংশ্লিষ্ট, সংযুক্ত, সংলগ্ন, সংঘটিত।
ঘট্ট—ঘাট, অবগাহন স্থান।
ঘড়ী—ঘণ্টা, সময়-নিশ্চায়ক যন্ত্র।
ঘন—মেঘ, গাঢ়, নিবিড়, অবিরল।
ঘন ঘন—অনবরত, শীঘ্র, দ্রুত।
ঘনিষ্ঠ—আসন্ন, নিকটোপস্থিত, আত্মীয়।
ঘর—গৃহ, বসতিস্থান, বাটী, নিকেতন।
ঘরণী—স্ত্রী, কলত্র। (গৃহিণী দেখ)
ঘরুয়া—গৃহজাত, গৃহনির্ম্মিত, ঘরাও।
ঘর্ম্ম—স্বেদ, ঘাম, লোমকূপ-নিঃসৃত জল।
ঘর্ষণ—দ্বষণ, মার্জ্জন, ডলন, মর্দ্দন, ঘষাঘষি।
ঘা—ক্ষত, আঘাত, চোট, ঘটিল, ঘাত।
ঘাইট—অপরাধ, দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা।
ঘাঁটি—চোরা-পথ, থানা, ওৎ।
ঘাঘরা—ঘুঙ্গুর, রাঙ্গাতুষ।
ঘাতক—মারক, হন্তা, বধকারী, বধী।
ঘি—ঘৃত, ঘী, আজ্য, হবিঃ, সর্পিঃ, দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়ঃ, অগ্নি-সংস্কৃত নবনীত।
ঘুণ্টী—কিঙ্কিনী, ঘণ্টিকা, পুঁট্যা।
ঘুম—নিদ্রা, তন্দ্রা, ঝিমনী, ঢুলন, নিদ্‌।
ঘুষ—মুষ্টি, মুষ্ট্যাঘাত, উৎকোচ।
ঘুষণ—কীলন, জপন, প্রচারণ, উল্লেখন।
ঘূর্ণ—পাক, শিরঃকম্প, চাকভ্রমী।
ঘূর্ণি—বিবর্ত্ত, ফেরা, চক্রগতি।
ঘৃণা—অত্যন্ত অশ্রদ্ধা, মন্দবাস, অনিচ্ছা।
ঘেরা—মণ্ডল, আড়াল, বেড়া, আবৃত।
ঘোটক—তুরগ, হয়, সৈন্ধব, গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ-অশ্ব, তুরঙ্গম, বাজি, বাহ, অর্ব্ব, ঘোড়া।
ঘোপ—ঝোপ, ঝোড়, ঝাড়, গুল্ম।
ঘোমটা—অবগুণ্ঠিকা, মুখাচ্ছাদন।
ঘোর—তমস, অন্ধকার, আতঙ্ক, ভয়ানক।
ঘোষণা—প্রকাশ, প্রচার, প্রচারণা।
ঘ্রাণ—আঘ্রাণ, বাস, গন্ধগ্রহণ।
ঘ্রাণেন্দ্রিয়—নাসিকা, নাক, নাসা।
[illegible]—ক্রয়-বিক্রয় স্থান, চতুঃশালামধ্যস্থান।
[illegible]—বাদ্যবিশেষ, ঢাকা, চাতুরী।
[illegible]পাণি—বিষ্ণুর এক নাম।
[illegible]—বিষ্ণুর এক নাম। সম্রাট, কুম্ভকার, কলু।
[illegible]—নেত্র, দৃক্‌, দৃষ্টি, দর্শন, অম্বক, গো, ঈক্ষণ, নয়ন, অক্ষি, লোচন, আঁখি, চোখ।

চঞ্চল—অস্থির, চপল, অস্থায়ী, কম্পমান।
চড়—চাপড়, চপেট, করাঘাত, করতল, চাপট, থাবড়া।
চণ্ডী—চণ্ডিকা, দুর্গার এক নাম।
চতুরানন—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিধাতা।
চতুরালি—চাতুর্য্য, চতুরতা, ধূর্ত্ততা।
চতুষ্পাঠী—টোল, চৌবাড়া।
চত্বর—আঙ্গিনা, উঠান, যাগস্থান।
চন্দন—গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রশ্রী।
চন্দ্র—হিমাংশু, কুমুদবান্ধব, বিধু, সুধাংশু, ওষধীশ, নিশাপতি, অব্জ, জৈবাত্রিক, সোম, গ্লৌ, মৃগাঙ্ক, কলানিধি, দ্বিজরাজ, নক্ষত্রেশ, ক্ষপাকর, চন্দ্রমা, চাঁদ, ইন্দু, শশধর।
চন্দ্রচূড়—চন্দ্রশেখর (শিবের এক নাম)।
চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া, চাঁদনী, ছত্রী।
চপলা—লক্ষ্মী, বিদ্যুৎ, চঞ্চলা।
চম্পট—প্রস্থান, পলায়ন, লুকান।
চরণ—পাদ, পা, পদ।
চরণামৃত—চরণোদক, পাদপ্রক্ষালিত জল।
চরম—অন্তিম, শেষ, অন্ত, পশ্চিম, সর্ব্বশেষ।
চরিত—কৃত, ব্যবহৃত, চলিত, চরিত্র, স্বভাব।
চর্ম্ম—ছাল, ত্বক্‌, চামড়া, ঢাল।
চর্য্য—ব্যবহার্য্য, আচরণীয়, সাধ্য।
চা—স্পৃহা, বাঞ্ছা, ইচ্ছা, গাছবিশেষ।
চাউল—তণ্ডুল, ধান্য, চাল।
চাকা—চক্র, নেমি, মণ্ডল, মৌচাক।
চাক্ষুষ—প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ, ব্যক্ত।
চাতুরী—চাতুর্য্য, শঠতা, ছলনা, মায়া।
চাপল্য—চপলতা, অধীরতা, চাঞ্চল্য।
চারি—চতুর, চতুষ্টয়, চার।
চারণ—নর্ত্তক, ভণ্ড, শাস্ত্রপাঠক।
চারু—সুন্দর, মনোহর, সুদৃশ্য।
চালি—রীতি, ব্যবহার, ধারা, দ্রুতগতি।
চাষ—কৃষিকর্ম্ম, হলযোজন, হলকর্ষণ।
চিকণ—চিক্কণ, সূক্ষ্ম, সরু, স্নিগ্ধ, তেলা, পিছল, তৈলাক্ত চারু।
চিকিৎসক—বৈদ্য, ব্যাধির প্রতিকারক।
চিকুর—কেশ, চুল, কচ, কুন্তল।
চিঠি—পত্র, টীপ, লিপি, চিরকুট।
চিৎ—চিত্ত, বুদ্ধি, মন, জ্ঞান, অন্তঃকরণ, হৃদয়।
চিত্র—ছবি, অদ্ভুত, বিস্ময়, নানারঙ্গী।
চিত্রকার—চিত্রকর, ছবিকর, পটুয়া।
চিত্রগুপ্ত—যম, যমের অমাত্য, ধর্ম্মরাজ, পিতৃপতি, সমবর্ত্তীন্‌, পরেতরাজ, কৃতান্ত, যমুনাভ্রাতৃ, শমন, যমরাজ, কাল, দণ্ডধর, শ্রাদ্ধদেব, বৈবস্বত, অন্তক।

[ক্রমশঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অ, আ, ই

টম ছিল কোথায়।

ছুটতে ছুটতে এসে পায়ের কাছে মুখ নামালো। আবদারের আতিশয্যে লেজ দুলিয়ে সামনের পা দু'টো ধরলো তুলে। লালায়িত জিব বের করে কেমন একটা ঘড়-ঘড় শব্দ করলো গলায়। তার পায়ের চতুর্দ্দিকে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলো। গলার কণ্ঠীতে ঝুমঝুমি। বাজলো তার চাঞ্চল্যে।

আর কোথায় ছিল বিনোদা। কোন্ ঘরের ভেতরে। বেরিয়ে এলো হঠাৎ। বললে,—কি ম্লেচ্ছ কাণ্ড! বাপের বয়সে দেখিনি বাবা! কুকুরের সঙ্গে মাখামাখি? জাত-জন্ম কিছু আর রইলো না। বিদেয় কর, এক্ষুণি বিদেয় কর! চান ক'রে বেরিয়েই কুকুর?

কৃষ্ণকিশোর হেসে ফেললো তার ধরণ-করণ দেখে। বিনোদা রাগ করলে মজা পায় সে। তাকে চটিয়ে দেয় যখন-তখন। পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। ক্রোধের মাত্রা তার যত বাড়ে, তত বেশী হাসি পায় কৃষ্ণকিশোরের। হাসতে হাসতে বললে,—তোমার আবার জাত আছে না কি?

খ্যাঁক ক'রে উঠলো যেন বিনোদা। বললে,—না, তা থাকবে কেন! যত জাত আছে তোমার। আমার সাতপুরুষে কখনও কুকুরকে মাথায় তোলে না। ছুঁলে পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে হয়। জানো?

কৃষ্ণকিশোর চাপা হাসির সঙ্গে বলে,—কিন্তু কুকুরও ভগবানের সৃষ্টি। কেমন প্রভুভক্ত জাত। কত কাজে লাগে।

তেলে-বেগুনে যেন জ্বলে উঠলো বিনোদা। বললে,—থাক্, ঢের হয়েছে! তোমাকে আর ভগোবানের ছিষ্টি দেখতে হবে না? তোমার আবার ভগোবান! এখন চান হয়েছে তো যাও না, গিয়ে খেতে বস'গে যাও না। বেলা যে দু'টো!

এবার পরিহাস নয়। সহানুভূতির সুরে বললে সে,—বিনোদা, তোমার খাওয়া হয়েছে?

বিনোদার কণ্ঠস্বরে কোন পরিবর্ত্তন নেই। বলে,—আজ্ঞে না। আগে আপনি অনুগ্রহ ক'রে খেতে যান। খেয়ে মাকে খেতে দিন। তার পর দাসী-বাঁদীরা সব খেতে বসবে তো। ইস্ দরদ কত! খাওয়া হয়েছে কি না আবার জিগ্‌গেস করা হচ্ছে!

রান্না-বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় সে। বিনোদার সব কথা হয়তো কানে যায় না তার। আপন মনে বলতে থাকে বিনোদা একা দাঁড়িয়ে। বলে,—ছিষ্টিছাড়া ছেলে বাবা! দেখিনি কখনও এমন। সময়ে চান করবে না, সময়ে খাবে না—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড। আর তেমনি কি মা হয়েছেন? কোথায় শাসন করবে তা নয়, আদরে আদরে গোল্লায় পাঠাচ্ছে ছেলেকে। ক'দিন আবার পাঠশালায় যাওয়া নেই, পড়াশুনোর বালাই নেই! গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ছেলে। ধন্যি ছেলে বাবা। কি হবে কে জানে!

হাতে কাজ না থাকলে খাস-কামরায় চলে যান কুমুদিনী।

সেখানে গেলেই যেন একটু শান্তি। আর কোথাও নয়। এত বড় চার-মহলা বাড়ী কেন, এই পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গেলে কুমুদিনী সকল জ্বালা জুড়াতে পাবেন। কোথাও নয়, আর কোথাও নয়। ছেলেকে ঠাকুরঝি হেমনলিনী'র হেফাজতে রেখে একে একে ভারতের প্রায় সকল তীর্থের ধূলি মেখে এসেছেন মাথায়। শ্রীচরণ দর্শন ক'রে এসেছেন। কষ্টসাধ্য এই যাত্রায় এতটুকুও ক্লেশ প্রকাশ করেননি। শরীর ভেঙ্গে পড়ে... তবুও নয়। এত ঘুরেছেন, এত দেখেছেন। কিন্তু মন ... বাঁধা পড়লো না কোন দেবতার দুয়োরে। পাদস্পর্শ করে... আর বলেছেন—স্থান দাও তোমার চরণে। আমি ... পারছি না।

নিরুত্তর দেবতার দল চোখ চেয়ে দেখেছেন মাত্র। আহ্বা... সাড়া পাওয়া যায়নি।

কুমুদিনী মনে মনে সর্ব্বক্ষণ চলে যেতে চান। কিন্তু পারেন ...

তিনি চলে গেছেন। তার পর এক মুহূর্ত্ত শরীরে প্রাণ থা... কুমুদিনীও চলে যেতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন,—একলা ... দেবো না। কিছুতেই নয়। তোমরা আয়োজন কর। সতীদা...

সতীদাহ! মৃতদেহ তখনও বাড়ীর বাইরে যায়নি। ... পায়ে মাথা রেখে কথাগুলি বলেছিলেন কুমুদিনী। আত্মীয়-স্ব... আর আমলারা শিউরে উঠেছিল এমন কথা শুনে। কারণ কুমু... কথা বলেন না, পণ করেন। তাই ভয়ে সব আঁৎকে ওঠে সে...

সতীদাহ ! শেষে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেন,—নাবালক সন্তান বর্ত্তমানে এই অনুষ্ঠান অকর্ত্তব্য। মহাপাপ !

তাই ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারেননি কুমুদিনী। সঙ্গ হারিয়েছেন তাঁর। তিনি চলে যাওয়ার পর ঠাঁই নিয়েছেন ঐ খাস-কামরায়। কৃষ্ণচরণের স্মৃতি-মন্দিরে। আলমারীতে বই, দেরাজে পোষাক, পালঙ্কে শয্যা—যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। আর রয়েছে কৃষ্ণচরণের নিত্য-ব্যবহার্য্য কয়েকটি দ্রব্য—ট্যাঁকঘড়ি, নবরত্নের আঙটি, মসলা খাওয়ার ডিবে, চশমা, কলম, জল খাওয়ার গেলাস, ওষুধ খাওয়ার গল আর তালতলার পাদুকা এক জোড়া।

একখানা মাদুরের 'পরে ব'সে ব'সে নিঃশব্দে পড়ছিলেন কুমুদিনী। কাশীরাম দাসের মহাভারত। কখন এসেছেন কে জানে। অবসর পেলেই চলে আসেন এই ঘরে। কখনও বা আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। বসে থাকেন যেন কি এক ডাকের প্রতীক্ষায়। ডাক আসবে তাঁর। তাঁর ডাক আসবে।

—কুমুদিনী, কুমুদিনী !

কেউ ডাকে না তবুও কাণে যেন ডাক শোনেন। কা'কেও দেখতে পান না। এত বড় চার-মহলা বাড়ীর কোথাও কেউ নেই। কোথা থেকে ডাকছেন। কোথায় তিনি।

সেই সেখানেই চলে যেতে চান কুমুদিনী। কিশোর এখন বড় হয়েছে, আর কোন বাধা নেই। কিন্তু সত্যিকার ডাক না এলে কোথায় যাবেন। তাইতো ঐ ছবি দেখে প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বলেন,—আমাকে নাও। আমি আর পারছি না।

শিল্পীর সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়।

শুধুই ছবি। শুধু পটে লিখা। কৃষ্ণচরণ শুধু তাকিয়ে থাকেন—কথা বলেন না। চক্ষে তাঁর আহ্বানের ইঙ্গিত। কাছে যাও, কথা নেই। ঈশ্বরের সৃষ্টি কৃষ্ণচরণ আজ স্বর্গত। শিল্প তাঁকে ধ'রে রাখলো মানুষের চোখে। দান করলো অমৃতত্ব।

কুমুদিনী অবসর পেলেই তাই চলে আসেন এ ঘরে। তিনি নেই, তার ছায়া আছে। যেদিকে তাকাও তাঁর স্মৃতির চিহ্ন। যেন এখনি আসবেন ব'লে চলে গেছেন। আর ব'সে আছেন কুমুদিনী। অবিরাম প্রতীক্ষায়।

—ছেলে না হয় খেতে বসলো এতক্ষণে। এবার তোমার খাওন হবে শুনি ? কোথা থেকে বিনোদা এসে হাজির হল। কথা বলে তিরস্কারের সুরে। বললে,—বলি, বাড়ীতে আজ আর লোকজনের পেটে ভাত পড়বে না তোমাদের জন্যে ?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন কুমুদিনী। বই রেখে উঠে পড়লেন তখনি। বললেন,—কিশোর খেতে বসেছে ? ডাকিসনি আমাকে ? আহা বাছা যে—

বিনোদা বললে,—তোমার বাছা খাচ্ছে। তুমি এখন খাবে কিনা দেখিন।

তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ত্রস্তপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কুমুদিনী। চললেন রান্না-বাড়ী।

খেতে বসেছে, আহারে মন নেই।

দূরে থেকে দেখেই বুঝলেন কুমুদিনী ছেলে তাঁর বসে আছে ভাতের গ্রাস হাতে তুলে। দাঁতে কাটছে না। পাতের ভাত যেমনকার তেমনি। বুঝলেন তার মন ঠিক নেই। চঞ্চল। ভাবলেন, সে হয়তো তার লেখাপড়ার বিষয় নিয়ে ভাবছে। বলেছে তো, ভেবে বলবে দু'-চার দিন পরে।

—কিছু খাচ্ছ না কেন ? কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন কুমুদিনী।

কি ভাবতে ভাবতে হেসে ফেললো সে। হঠাৎ। খুশীর সুরে বললে,—খাচ্ছি তো। তুমি কোথায় ছিলে ?

খেতে শুরু করে কৃষ্ণকিশোর। কুমুদিনী বসেন এক পাশে। মাছি তাড়াতে হাতে হাত-পাখা। বলেন, এটা খাও সেটা খাও। সে খায় আর থেকে থেকে হাসে এক্কেকবার। নিজের মনেই।

কুমুদিনী বলেন,—হাসছিস্ কেন রে ? কি হল আবার ?

কৃষ্ণকিশোর হাসি চাপতে চেষ্টা করে। কথা ঘোরায়। হাসছে কেন তা বলে না। বলে,—তোমার বিনোদা বলছে যে টুনকে বিদেয় ক'রে দিতে। বল ত' তুমি ?

কুমুদিনী একটু হাসেন। বলেন,—আমার নাটমন্দিরে তোমার কুকুর না উঠলেই হল। তা তুমি যা খুশী কর। দুঃখ আর শোকের প্রবাহে তাঁর এই হাসি এখনও মুখ থেকে মিলিয়ে যায়নি। নীরব সলজ্জ হাসি। বললেন,—তোমার খাওয়ায় মন নেই। ব'স, পিসীমা মোয়া পাঠিয়েছেন তোমার জন্যে। জয়নগরের মোয়া। আর তোমার মহল থেকে ঐ দই এসেছে। মোয়া আর দই মেখে খাও, বেশ ভাল লাগবে।

কুমুদিনী উঠে পড়লেন। মোয়া আনতে। আর কিছু নেবে কি না, আর কিছু দেবে কি না তাই জানতে রান্না-ঘরের দুয়োরে দাঁড়িয়েছিল ব্রাহ্মণী। কুমুদিনী বললেন,—একখানা রেকাবী পাতের কাছে বসিয়ে দাও তো ব্রাহ্মণী।

জমিদারী কায়দা, সবেতেই দেরী। সবেতেই গড়িমসি। ঘুমুতেও যেমন, ঘুম ভাঙতেও তেমন। স্নান করতে যেমন, খেতেও তেমন। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। একবার এটা, একবার সেটা। খাচ্ছে না তো ঠোকরাচ্ছে যেন। চাকছে। শুধু ঐ সাজিয়ে দেওয়াই সার। ভাতের চূড়া ভাঙে না কোন দিন। এতগুলো ব্যঞ্জনের বাটি একটাও কি শূন্য হয়। একটা বাটা মাছও সম্পূর্ণ খেতে পারে না। একটা কচি রুইয়ের মাথা, তাও নয়। কাঁটা, কাঁটা লাগে গলায়।

হেলতে দুলতে হাঁফাতে হাঁফাতে বিনোদা এসে দাঁড়ায়। মুখ খিঁচিয়ে বলে,—তোমার যে খাওয়া আর হয় না দেখছি ! মা বুঝি আজ আর খাবে-দাবে না ? উদিগে যে হু'টো, সে খেয়াল আছে ?

কুমুদিনী মোয়া দিয়ে আবার বসেন হাত-পাখা নিয়ে। বলেন,—তুই খায় তো বিনো !

কৃষ্ণকিশোর লজ্জা পায় এ কথায়। বলে,—ব্রাহ্মণী, মাকে ভাত দাও না। আমি কি খেতে বারণ করেছি ?

বিনোদা বলে,—হ্যাঁ, এবার ঐ আঁশের মধ্যিখানে মাকে ভাত দেবে !

সত্যিই কুমুদিনীর আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট। লুকিয়ে লুকিয়ে। বৈধব্যের অপরাধে নিরামিষ ভোজন। হবিষ্যান্ন। শূদ্রের চক্ষের অন্তরালে। ঐ নিরামিষ রান্না-ঘরের ভেতরে। এক পাশে। খাওয়া-দাওয়ার পরেই কেমন যেন আলস্য ধরে। কেমন যেন

মন্ত্রে-চড়তে ইচ্ছা হয় না। চক্ষে জড়তা। সদরের দিকে এগোয় সে ভাজা মসলা চিবোতে চিবোতে। সেই হলঘরের দিকে বৈঠকখানার ঘর। স্নানের পরেই ভাত খেয়েছে আর খেয়েছে সিদ্ধি—সমান্য মাদকতার আমেজ শরীরে। যেন অবসন্নতা।

হল্‌ঘরের ফরাসে দাঁড়িয়ে ঝাড়ের আলো দুলিয়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়লো একটা তাকিয়ায় মাথা রেখে। ঘরের বাইরের দালানে একটা উজবুক হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলো। হুজুর এসে পড়েছেন, সে বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ দেখতে পেয়েই হাত চালাতে শুরু করলো। ঘরের ভেতরে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দের সঙ্গে শালুর ঝালর দেওয়া টানা-পাখা চলতে শুরু হ'ল। এক জন তাঁবেদার পিচকারী হাতে জল ছিটিয়ে দিয়ে গেল দরজায় দরজায়। খসখসের হিমকণাবাহী স্নিগ্ধ সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দ্দিকে। আর সে ঐ ঝাড়ের হরেক রকম আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। কাচের মালার আবেষ্টনে পঁচিশ বাতির ঝাড়—পঁচিশটা ফুটন্ত শ্বেতপদ্ম। এক বৃন্তে ঝুলছে। আলো জ্বলছে আর কত রকমের রঙ দেখা যাচ্ছে। লাল, হলদে, নীল, বেগুনী, সোনালী, রূপালী। মুহুর্মুহুঃ রঙ বদলাচ্ছে। এক রঙ থেকে অনেক রঙে। রাশি রাশি পলকি হীরেয় যেন তৈরী ঐ আলো। বেলোয়ারি গেলাসের আলো।

তবুও এখন বাতি জ্বলছে না। দিনের বেলা।

কিন্তু বেলা-শেষের দেরী কত আর? তার মানে রোদ্দুর পড়তে আর কতক্ষণ। ভয় তো তার সূর্য্যের প্রখর বহ্নিতাপকে নয়, ভয় মাকে। কুমুদিনীকে। নয় তো সে কি আর বসে থাকতো এতক্ষণ। কখন বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু একবার বেরোতে হলে কত কিছুর দরকার হয়। প্রথমেই হয় কুমুদিনীর মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হওয়ার। তার পর দাও কোথায় যাওয়া হচ্ছে তার হাজারো কৈফিয়ৎ। তার পর কত কি।

কিন্তু সূর্য্যাস্তের সময় বেরোতে পারো। সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা চাই। কুমুদিনী নিষেধ করবেন না। দিন-রাত্তির ঘরে বসে থাক্‌, তাও তাঁর পছন্দ নয়। সকাল-সন্ধ্যা হাওয়া খেতে যাও, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। পারো তো বেড়িয়ে এসো না পায়ে হেঁটে। গড়ের মাঠে। পরিশ্রম হবে, স্বাস্থ্যোন্নতি হবে।

কিন্তু বসন্ত কালের বিকেল। চৈত্র-গোধূলির দিন। দক্ষিণা বাতাস আর কোকিলের কুহু-কুহু। স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ। কচি সবুজ পাতার বাহার। নানান ফুলের মিলন। কে যাবে মাঠে বেড়াতে। ঘাম ঝরাতে।

ঘড়ি-ঘরের নিশানা। তিনটে বাজলো। বেলা তিনটে। একটা আনন্দের ক্ষণ-অনুভূতির আস্বাদ পায় যেন সে। অন্ততঃ ভাবতেও ভাল লাগে আজ কোথায় যাবে সে। আজ বিকেলে। যাবে ঐ অরুণেন্দ্র, অরুণ, অরুদের বাড়ী। বিপন ষ্ট্রীটে।

খাস-খানসামাকে ডাকলো কৃষ্ণকিশোর। সদাক্ষণ কাছাকাছি থাকে সে, কখন কি প্রয়োজন হয় হুজুরের। কৃষ্ণকিশোর ডাকলো,—এই অনামুখো। শুনে যা।

অনামুখো আদরের ডাক। খুব যখন খুশী থাকে তখন এই নামে ডাকে। আসল নাম অনন্ত, অনন্তরাম। বর্দ্ধমানের মানুষ।

অনন্ত ঘরে ঢুকেই বলে,—আচ্ছা, তোর কি আক্কেল হবেনি কখনও? মানা করি নাই যে অনামুখো কথাটা আর ক'স নে কারও সমক্ষে?

সে তখন উঠে বসে পড়েছে। হাসতে হাসতে বলছে,—অনন্তদা, তুমি রাগ কর? আর কক্ষনও বলব না।

অনন্তরাম বলে,—তা রাগ করব না। কথাটি কি এমন মিষ্টি যে শুনে পুলক হবে আমার! জানিস্‌ কিশোর, তোর বাবা বলতেন, অনন্ত, তুমি আমার ছেলে। তুই তখন কোথায়? কার ঘরে বুড়ো হয়ে বসে আছিস। তা এখন ডাকছিস কেন তাই বল্‌ কেনে।

কৃষ্ণকিশোর বলে—আমার ঘরে যা। দেরাজ খুলে কোঁচানো কাপড়, ফতুয়া, আসমানী অর্গাণ্ডির পিরান আর ভেলভেটের জুতোটা নিয়ে আয়। আয়না-চিরুণীও চাই। আর একটু আতর আনবি—খস-খস। আমি বেরুবো এখুনি।

অনন্তরাম বললে,—বাইরে যা চড়চড়ে রোদ, একটু পরে যাস্‌খন। কোথায় যাবি পুড়তে?

কৃষ্ণকিশোর তখন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলছে—যা না তুই, নিয়ে আয় না। তোর যেতে-আসতে রোদ পড়ে যাবে।

—বৌমা যদি শুধোয়, কোথায় চললি তুই? কি বলব? অনন্তরাম নিজেকে বাঁচাবার জন্যে জিজ্ঞেস ক'রে নেয় কথাটা।

চোখ বন্ধ ক'রে খানিক ভাবে কৃষ্ণকিশোর। বলে—বলবি, গড়ের মাঠে যাবে। বেড়াতে যাবে। কিছু বলবে না মা।

—সত্যি কথা? জিজ্ঞেস করলো অনন্তরাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি কথা। যা না তুই, নিয়ে আয় না। কথার শেষে হেসে ফেললো কৃষ্ণকিশোর। অনন্তরামও হাসলো সেই সঙ্গে। হাসতে হাসতে খসখস সরিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অনন্তরাম গোপ: রাঢ়ী শ্রেণী গয়লা। বর্দ্ধমানের মানুষ। যশোহর জেলায় হাজরাপুর মোতালকে নীলের কুঠীতে অনন্তরাম কাজ করেছে এক কালে। নীল বানরের দল যখন কয়েদ রেখে কিছু করতে পারছে না, তখন হাত তুললে লোকের গায়ে। শঙ্কর মাছের চাবুক চালাতে শুরু করলে ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে খুশী। লাথি মারলে কত লোকের পেটে, পিলে ফেটে মরে গেল কেউ কেউ। অনন্তরাম কয়েদ ছিল সাত দিন। একবিন্দু জল পর্য্যন্ত খেতে দেয়নি, আলোর মুখ দেখতে দেয়নি। অন্ধ-ঘর। শেষে খালাস পেয়ে এক দলের সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে পালিয়ে আসে। এসে কিছু দিন পরেই কাজ নেয় কৃষ্ণচরণের কাছে। তাঁর পায়ে মাথা রেখে বলে—হুজুর, আমি আপনার দাস।

সে আজ অনেক কাল আগের কথা। সেই থেকেই দাসত্ব করছে অনন্তরাম। দেশে যায় না কখনও। কুল-শীলের প্রশ্ন উঠলে বলেছে,—'ছিল আমার সবই। বাপ-মা ছিল, নয় তো এলাম কেমনে? ঘর-বাড়ী সব ছিল।' সে যখন হাজরাপুরে তখন এক বন্যা এসেছিলো দামোদরে। তাতেই সব ভেসে গিয়েছিল। বাপ, মা, এক ভাই, দু'টো বোন আর তাদের ঘর-বাড়ী ঐ দামোদরের গর্ভে ভবলীলা সংবরণ করেছে। দু'জোড়া বলদ আর ছ'টা গাই। অনন্তরাম চিরটা কাল তাই কৃষ্ণচরণের পদ-সেবা ক'রেই কাটাতে চেয়েছে। কিন্তু মধ্যে থেকে তিনি চলে গেছেন। অনন্তরাম কত রাতে স্বপ্ন দেখে, কর্ত্তা যেন তাকে ডাকছেন। বলছেন, অনন্ত তামাক দাও। অনন্ত, পায়ে একবার হাত দাও। অনন্ত, অনন্ত, অনন্ত!

অনন্তরাম কৃষ্ণচরণের পা টিপতো শুধু। ফাই-ফরমাস খাটতো। তামাক সেজে দিতো। কর্ত্তা পান খেতেন আর অনন্তরাম ডিবে ধ'রে থাকতো। পিকদানি।

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও!

কৃষ্ণকিশোর ফরাসের ওপর দাঁড়িয়ে ভাবছিল যে, আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। অরুণকে বলবে,—কাল চল দেখিয়ে আনবে তাঁকে। আমি তাঁকে দেখতে চাই। আমি ভর্ত্তি হবো তাঁর স্কুলে। পড়বো, ইংরেজী পড়বো। রাজার ভাষা শিখবো। রাজভাষা। অরুণেন্দ্র মুখে মুখে কত গল্প বলেছে তাঁর সম্বন্ধে। যত বলেছে ততই সে আকৃষ্ট হয়েছে। ততই সে মন থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সেই মানুষটিকে। বাঙালীর বন্ধু সেই ফিরিঙ্গি সাহেবকে।

অরুণেন্দ্র বলেছে,—যেদিন খুশী চল। As you like it. আমি তাঁকে দেখবো, আলাপ করিয়ে দেবো। দেখবে কত তিনি ভালবাসেন, How much he loves the students! দেখলে তুমি অবাক হবে যাবে। তাঁর ব্যবহারে you will be charmed. তার ওপর সব চেয়ে বড় কথা the man is a poet.

কবি। জাত-কবি। স্বভাবকবি ডিরোজিও। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। জনৈক ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস ডিরোজিওর সন্তান। ১৮০৯ সালের ১০ই এপ্রিল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কবি, দার্শনিক, নিরীশ্বরবাদী, সাংবাদিক, শিক্ষক ডিরোজিও।

অনন্তরাম ঘরে ঢুকলো খসখস সরিয়ে। তার দু'হাতে সাজ-সরঞ্জাম। কৃষ্ণকিশোর বললে,—অনন্তদা, মা কিছু বললেন!

—হ্যাঁ, বললেন বৈ কি। বললেন, কোথায় আবার! আমি বললাম, গড়ের মাঠ। ঠিক বলি নাই?

সহাস্যে সম্মতি জানালো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—অনন্তদা, আমি পড়ছি, তুমি যাও। আবদুলকে বল গাড়ীতে ঘোড়া জুতবে।

সে পোষাক বদলায়। চুল ফেরায়। কানে আতরের তুলো গুঁজে দেয়। তার পর ভেলভেটের জুতো পায়ে দিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসে। জুড়ি ঘোড়া পা ঠুকে ছুটতে থাকে ঠগবগিয়ে। তীরের বেগে। সওয়ার জানতে পারে না কোথা দিয়ে সময় চলে যায়। পথটা যে পথ তাও শেষ হতে চললো প্রায়। সে ভাবছে খুব যা হোক অবাক করবে অরুণকে। একেবারে না বলে-কয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির। একবার সে শুধু জানিয়ে দেয় তার গন্তব্য। বলে,—আবদুল, সেই অরুণ বাবুর বাড়ীতে যাবো।

হাওয়ার বেগে চলেছে আবদুলের গাড়ী। সে শুধু ঘোড়ার কানের পাশে চাবুক পাক খাওয়াচ্ছে। পথের লোকজন আগেভাগে সরে যাচ্ছে দু'পাশের বাড়ীর নীচে; দোকান-ঘরের দরজায়। আর থেকে থেকে পায়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে আবদুল। সাবধানী ধ্বনি—ঢং ঢং ঢং।

আজকে যা হয় একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

একে একে দিন চলে যাচ্ছে। সময় চলে যাচ্ছে। ক'দিন বই নিয়ে পড়তেই বসেনি সে। ছুটি ভোগ করছে মনের আনন্দে। পড়াশুনায় মন নেই, কারণ, তার পাঠ্য পুস্তকে কোন রসের খোরাক নেই যে—নীরস বিষয়। ব্যাকরণ আর অলঙ্কার। অং বং সং, নরঃ, নরৌ, নরাঃ তদ্ধিত প্রত্যয়, করণে তৃতীয়া, ভাবে সপ্তমী আর অলঙ্কারের এটা সেটা মাত্রা—কাঁহাতক পড়তে পারে মানুষ! পড়ছে তো পড়ছেই। শেষ হবে না কোন দিন?

কিন্তু তার বয়সের আর আর ছেলেরা শিখছে কত কি। কত দেশ-বিদেশের কথা, কত কাহিনী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাদের চোখের সামনে। সে শুধু ব্যাকরণ অলঙ্কারের গণ্ডীতে বাস করছে! তারা সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে, আর সে কি না পুরানো সেকেলে পুকুরের তীরে শুধু দাঁড়িয়ে রইলো। কূপমণ্ডুক হয়ে রইলো।

ইদিকে সাহেব-সুবোর বাস। ফিরিঙ্গিপাড়া।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোলাহল নেই, কলরব নেই। শান্তির নীড় একেকটি। হোয়াইট হার্ট কটেজ, গ্রীন ভ্যালি, দি রিট্রিট, সুইট হোম, তার পরেই নর্থ্যাপ লজ্। একতলা বাড়ী, সাহেবী কায়দায় তৈরী। বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী-বারান্দা ঝুলছে। বারান্দার নীচে থামের গায়ে মাধবী লতার বেষ্টন। সিঁড়িতে কাঠের সবুজ রঙের টবে রকম-বেরকমের পামের সারি। আর ফার্ণ নানা জাতীয়।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে কাকেও দেখতে পায় না কৃষ্ণকিশোর। কেউ কোথাও নেই। ড্রইং-রুমে শূন্য সোফা। দেওয়ালে দা ভিঞ্চির আঁকা যীশুর শেষ-ভোজনের ছবি। মেরীর কোলে নবজাতক যীশুর ছবি—সেই সঙ্গে কি একটা ক্যারলের স্বরলিপি একসঙ্গে পাশাপাশি বাঁধানো। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি। আর একখানা ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবের ছবি।

ভেতর থেকে, অনেক ভেতর থেকে মৃদু-মন্দ টুং-টাং শব্দ ভেসে আসছে। ক্ষীণ তরঙ্গায়িত ঝঙ্কার। চারি দিক নিস্তব্ধ তাই শোনা যায়, নয় তো এ সুর দূরের মানুষের কানে পৌছবে না। এক কৃষক বালিকার আক্ষেপের সুর। ভেড়ার পাল নিয়ে সে মাঠের দিকে গেছে। কথা ছিল দয়িতের দেখা দেওয়ার, কথা কওয়ার। কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সে পুরুষ আজও আসেনি। আসতে পারেনি। কৃষক-বালিকা প্রতীক্ষা-কাতর কণ্ঠে শেষে গান গাইতে শুরু করে। কান্নার সুরে। পুরুষ চলে গেছে ভিন্ দেশে—অভাবী, তাই ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে।

কৃষ্ণকিশোর মুগ্ধ হয়ে যায় এই ধীর যন্ত্র-সঙ্গীতে। পিয়ানো বাজায় কে ভেতরে, অনেক ভেতরে। কি এমন ব্যাথা যে তার এই কান্নার বাজনা বাজাতে হবে। একটা বাচ্ছা খানসামা এসে দাঁড়ায় তার পাশে। সে বলে,—সাহেব কোথায়?

খানসামা শুধোয়,—কোন্ সাহেব? বড় না ছোট?

অর্থাৎ পিতা না পুত্র। সে বললে,—ছোট সাহেব?

খানসামা তৎক্ষণাৎ বলে,—কোঠিমে হায় নেই। কালেজ গিয়া।

ইতিমধ্যে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন বিনয়েন্দ্র, অরুণের বাবা। এক হাতে তাঁর ধূম্রমান পাইপ আর অন্য হাতে তর্জনীর দ্বারা পৃষ্ঠা-চিহ্নিত কি একখানা বই। সোনার জলের নাম দেখা যায় দূর থেকে। মরক্কো বাঁধাই। তাঁর পরনে পাৎলা কাপড়ের আলগা পায়জামা আর সূতীর লঙ্-কোট। রেশমী দড়িতে কোমর-বাঁধা। প্রথমে চিনতে পারেননি। কাছে এসেই চিনতে পারেন। বলেন,—আরে তুমি এসেছো, কিন্তু তোমার Friend এখনও যে ফেরেনি! Sit down my boy. সে এখনই আসবে।

কথার মাঝে হাতের বই একটা তেপায়ার 'পরে রাখলেন। নিজে বসলেন একটা সোফায়। সে বসলো আরেকটায়।

বিনয়েন্দ্র অভিজ্ঞ মানুষ, দেখলেই বোঝা যায়। মুখে তাঁর বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি এখনও। ফর্সা রঙ আর ফ্রেঞ্চ-কাট শ্মশ্রুতে মনে হয় তিনি এ দেশের মানুষ নন। চুলে সামান্য পাক ধরলেও সাত ফিট লম্বা লোকটির শরীরে বার্দ্ধক্যের ছায়া বড় সামান্য। কপালের রেখা কয়েকটি স্পষ্ট। মাথার কেশ পেছন দিকে তোলা। চোখে প্যাঁস্নে।

বিনয়েন্দ্র জানতেন কৃষ্ণকিশোরের পূর্ব্বপুরুষকে। আলাপ ছিল না, তবুও পরিচয় জানতেন। জানতেন যে, বাঙালী ব্রাহ্মণ-পরিবারের মধ্যে তাঁরা কলকাতার অন্যতম সম্মানী ব্যক্তি। যশ, খ্যাতি এবং অর্থের প্রাচুর্য্যে তাঁরা স্বনামধন্য। বললেন,—তুমি কি ঠিক করলে? কি পড়তে চাও, ইংরেজী না সংস্কৃত?

কিছু কিছু জানতেন বিনয়েন্দ্র। জানতেন যে, কৃষ্ণকিশোর সম্প্রতি ইংরেজীর দিকে ঝুঁকেছে। তাঁর ছেলের কাছে এমন ইচ্ছা না কি প্রকাশ করেছে। সে বললে,—এখনও কিছু ঠিক হয়নি। অরুণ আমাকে বলেছে যে ডিরোজিওকে দেখাবে। তাঁর কাছে যদি পড়তে পাই তো হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হব।

—ডিরোজিওকে দেখাবে! বিনয়েন্দ্রের কপালের বলিরেখা কুঁচকে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। বললেন,—ডিরোজিওকে দেখাবে! What do you mean by it? ডিরোজিওকে সে কোথা থেকে দেখাবে? How fun! He is dead now, বহু কাল হল তিনি L rd God-এর কাছে চলে গেছেন।

কথাগুলি শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ে সে। বিস্ময়ে হতবাক্। এত দিনের সকল আশা আর স্বপ্ন ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নিজের বিদ্যাধারায় এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যার আশায় সে একটা আমূল পরিবর্ত্তন করতে চেয়েছে, সেই মহাজন আর ইহলোকে নেই? সে বলে,—তবে অরুণ যে বললে, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে।

তার কথার মাঝেই হাসতে শুরু করলেন বিনয়েন্দ্র। দাঁতে পাইপ কামড়ে হাসতে হাসতে বললেন,—Oh, God! তুমি বুঝি জানো না? অরুণের কথায় মেতে উঠেছো! তুমি জানো না অরুণের মস্তিষ্ক সামান্য একটু বিকৃত, A bit cracked?

আরও বিস্মিত হয় কৃষ্ণকিশোর। তার মনে হয় অরুণেন্দ্র নয়, যিনি এখানে ব'সে কথা বলছেন আর হাসছেন তিনিই বোধ হয় উন্মাদ। নয় তো এমন ধরণের কথা কেন? সে বললে,—না, আমি জানতাম না তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, Lord God তাকে সব কিছু দিয়েছেন। কিন্তু একটি জিনিস যা না থাকলে মানুষকে মানুষ বলা যায় না, শুধু সেইটি থেকে অরুণকে বঞ্চিত করেছেন। সেটি হচ্ছে Rationality. বিচার-বুদ্ধি। তুমি বুঝি জানতে না? হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হলেন বিনয়েন্দ্র। মুখে পাইপ তুললেন। ধোঁয়া ছাড়লেন এক মুখ।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না, আমি জানি না।

—তবে বলি শোন'। আমার ফাদার ছিলেন ডিরোজিওর এক জন প্রিয়তম ছাত্র। তোমাদের কালীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জ্জীদের সহপাঠী ছিলেন। বিনয়েন্দ্র বলতে থাকেন চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁতে পাইপ কামড়ে,—ডিরোজিওর বাসায় যাওয়া-আসা করতেন আমার ফাদার। ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েসনের এক জন নামজাদা বক্তা ছিলেন তিনি। ডিরোজিওর কাছেই লক্, রীড, ষ্টুয়ার্ট আর ব্রাউনের মতামত জেনেছিলেন। 'এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল' আর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কাগজে রীতিমত লিখতেন নানা বিষয়ে। সেই ডিরোজিও, He died in 1831...

কিন্তু ডিরোজিও কোথায়?

অরুণেন্দ্র কেন মিথ্যা আশার ছলনায় তাকে বিভ্রান্ত করেছে। অরুণেন্দ্র, অরুণ, অরুর মস্তিষ্ক বিকৃত! সে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি কোথায় সে বসে আছে। চোখের সামনে দেখতে পায় না কোন কিছু। এটা কি তাদের বাড়ী, গড়ের মাঠ, রাস্তা, না অরুণদের বাসা? এটা কোথায়। ভেতর থেকে, অনেক ভেতর থেকে সেই মৃদু-মন্দ যন্ত্র-সঙ্গীতের ক্ষীণ শব্দ—তাতেই সে আত্মস্থ হয়। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

বিনয়েন্দ্র লক্ষ্য ক'রে দেখছিলেন প্যাঁসনের ভেতর থেকে।

দেখছিলেন কৃষ্ণকিশোরের জামার চারটে বোতাম। হাতের আঙটি। দেখছেন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে। হঠাৎ বললেন,—তোমার ঐ বোতামগুলো কি বস্তু হে? Diamond?

প্রশ্ন শুনে লজ্জিত হয় সে। সলজ্জায় বলে,—না না, ডায়মণ্ড নয়। আলেকজান্দ্রিয়া। বাবা ইটালী থেকে আনিয়েছিলেন কাকার জন্যে। কাকা তো মারা গেলেন ঘোড়া থেকে প'ড়ে। আমি পেয়েছি এখন।

তার কথায় কান নেই, বিনয়েন্দ্র তখন উঠে পড়েছেন সোফা থেকে। পাইপ কামড়াতে কামড়াতে একটা কাচের আলমারীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কি যেন খুঁজতে থাকেন। বুক-কেশে বিলেতী বাঁধাই এক সেটের সব বই। ইংরেজী কেতাব। লণ্ডনে ছাপা। কি বই? এত চমৎকার সুদৃশ্য এক ধরণের এতগুলো বই। সোনালী নক্সা আর নাম বন্ধনীতে। সে তো আর ইংরেজী পড়তে পারে না। বিনয়েন্দ্র হাতের পাইপ তেপায়ার 'পরে ঠকাস ক'রে নামিয়ে রাখলেন। পেয়ে গেছেন তিনি। যে খণ্ড তার প্রয়োজন বইয়ে চোখ রেখে সেখান থেকেই বললেন চাপা গলায়,—Riding তোমার কাকার মৃত্যুসংবাদ জানি আমি। Most tragic and full of deep sentimental pathos.

কথাগুলো শুনে সে সত্যিই চমকে উঠেছিল। এত গম্ভীর স্বর। সে আর কি তখন সেখানে আছে। বিভ্রান্তি আর দূরের যন্ত্রসঙ্গীত, বিস্ময় আর ঐ ঠুং-ঠাং ধ্বনি। সে তখন ভাবে একবার যদি দেখা পাওয়া যায় এই সময়ে। মাত্র একবার। সে ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট আর অপেল পাথরের মালা—একবার যদি ঐ পর্দ্দা সরিয়ে দেখা দেয়। আসে সেই রকম হাসতে হাসতে মুক্তোর মত দাঁতের সারি দেখিয়ে।

বিনয়েন্দ্র এক পলকে দেখে নিলেন বইয়ের একটি পাতা খুলে। কিন্তু কি বই? কি দেখবার প্রয়োজন হ'ল। শব্দকোষ—ইংরেজী শব্দকোষ। বৃটেনের এনসাইক্লোপেডিয়া মন্থন ক'রে দেখলেন কি বস্তু ঐ আলেকজান্দ্রিয়া। দেখলেন এক প্রকার রত্ন, [illegible]

ক্ষণে দ্যুতি বদল হয় যার। আর অন্ধকারে যার ভিন্ন ভিন্ন রঙ। একেক বেলায় একেক রকম। আলেকজান্ড্রিয়া! এখন ঠিক তীরে মনে হচ্ছে, রাতে মনে হবে নীলা বুঝি। সন্ধ্যায় হয়তো চুণীর আকার ধারণ করলো। আলেকজান্ড্রিয়া, এক পলকে দেখে নিলেন বিনয়েন্দ্র। সোফায় এসে বসলেন পুনরায়। প্যাসনের কালো সুতো নিয়ে খেলা করতে করতে বললেন,—যে কথা বলছিলাম তোমাকে। আমার ফাদার মারা যাওয়ার কিছু কাল পরেই আমি স্বপ্ন দেখলাম এক রাত্রে, Really I dreamt, আমি দেখলাম, আমার ফাদার এসে বলছেন আমাকে। Truly speaking বলছেন যে, I am comming back. আমি আবার আসবো তোমার কাছে। তোমার সন্তান হবো আমি। My child। My father will be my child. Strange। But not a fiction। Truth।

বিনয়েন্দ্র বোধ করি কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠেন। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন। তাঁর মাথা আর হাত দু'খানা ঠক-ঠক করে কাঁপে। সোফায় মাথা এলিয়ে দেন। আবার নিশ্বাস টেনে নিয়ে বলতে শুরু করেন,—যে womanকে আমি আমার স্ত্রীর মত, like my own wife মনে করতাম, তার গর্ভে আমার সন্তান হ'ল। ঐ তোমার ঐ friend অরুণেন্দ্র আর ঐ তোমার ছায়া my little Lily.

তোমার ছায়া! মনে মনে একবার চমকে উঠলো সে। অনেকটা স্বস্থ হ'ল যেন। অরুণদের বংশ-কাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পেলে কিছু কিছু যেন বুঝতে পারে সে—বুঝতে পারে এরা ঠিক সাধারণ নয়, খানিক অসাধারণ, অস্বাভাবিক। সে শুনতে থাকে গভীর মনোযোগ সহকারে। বিনয়েন্দ্র বলতে থাকেন,—সেই অরুণ, আমার ফাদার। ঠিক তাঁর মত character, gesture, posture সব তাঁর মত! তা' অরুণ যে তোমার ছিরোজিওকে নিয়ে হঠাৎ এমন খামখেয়ালী কথা বলবে, তা'তে I am not at all surprised. বলতে পারে সে। তার প্রকৃতি অদ্ভুত, সে মানুষও নয়, অমানুষও নয়। তুমি বোঝ না কেন, কলেজে prize পেলে, আর সেগুলো কি না যারা prize পেলে না তাদের হাতে তুলে দিয়ে এলো! কিন্তু এ-ও তুমি জানবে, বাড়ীতে not a line তাকে আমি পড়তে দেখি না। খানিক থেমে বললেন,—ও এখনই ঐ রকম।

কথার শেষে তাঁর মুখে কাতরতার চিহ্ন দেখা গেল। ক্ষোভের, আর হতাশার। মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা ঝড়ের তুফান। দমকা হাওয়ায় অদল-বদল হয়ে গেল সব। কৃষ্ণকিশোর বসে থাকে পাষাণের মত। শোনে মন দিয়ে।

—কিন্তু এতক্ষণ সে তো এসে পড়ে কলেজ থেকে। কেন আজ এলো না? হঠাৎ স্বগত করলেন বিনয়েন্দ্র। উঠে পড়লেন সোফা থেকে। বেরিয়ে গাড়ী-বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরে এখন নীরবতা। কৃষ্ণকিশোর কান পেতে শুনলো সেই শব্দ। আর আসছে না সেই ঠুং ঠাং আওয়াজ। থেমে গেছে। রেশ যেন কানে লেগে রয়েছে তার।

তারও দেখা না-দেখার স্বপ্ন তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে মাত্র একটি কথা শুনে। অরুণের মস্তিষ্ক বিকৃত! অরুণ—

বাইরে বিকেল। বৎসরান্তের সময়। বসন্তের দক্ষিণা বাতাস। স্বচ্ছ আকাশ। সামনের লনে চেরীর ঝরা-পাতা খড়খড় করছে। চৈত্র-গোধূলি। আলো-অন্ধকার। পথে দেখা যায় লোক-চলাচল। সাহেব-সুবোরা সব সপরিবারে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে। মায় বাড়ীর কুকুরটি পর্য্যন্ত সঙ্গে নিতে ভোলেনি। খানসামা আর আয়ারা চলেছে। খানসামাদের হাতে কুকুর আর পাখী আর আয়াদের হাতে মনিবদের খোকা-খুকুরা। কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল চলে যাবে, না থাকবে। বড় বিশ্রী লাগছে এই অস্বাভাবিক আবহাওয়া। কিন্তু এক জন, সে তো বিশ্রী নয়। সুশ্রী। সে ভাবছিল চলে যাবে, না বসে থাকবে।

বিনয়েন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। চোখের প্যাসনে খুলে ফেলেছেন। ঝুলছে বুকের কাছে। কৃষ্ণকিশোরের অত্যন্ত কাছে এসে তার দু'টি গালে হাত বুলিয়ে বললেন,—তোমাকে আমি কি offer করতে পারি? কি খাবে বল'। A cup of tea? দু'টুকরো পাঁউরুটি?

সে লজ্জা পায়। কিছু বলে না। তাকিয়ে থাকে নির্ণিমেষ নয়নে। সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে মুখে। কিছু বলে না, শুধু হাসে। বিনয়েন্দ্র টেপায়া থেকে রেখে-দেওয়া বইখানা তুলে নিতে নিতে বললেন,—তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমি এবার কাজে যাই। My little Lily, তাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে খাওয়াবে, বসে বসে গল্প করবে তোমার সঙ্গে, তোমার friend যতক্ষণ না আসে।

হ্যাঁ, না, কিছুই বলে না সে। তিনি কাজে যাবেন এই কথাটি শুনেই যেন ব্যস্ত হয় একটু। বলে,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখন কি কাজ করবেন?

নেহাৎ আবদারের মত শোনায় তার কথা। বিনয়েন্দ্র যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েন। হাসতে হাসতে বলেন,—কাজ? Official work. তুমি জানো না I suppose, আমি সরকারী Translator. অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে অনুবাদক। সেই কাজের কিছু কিছু বাড়ীতে বসে করতে হয়।

বিনয়েন্দ্র মসীজীবি। তাই চোখের দৃষ্টি নেই। কর্ম্ম-জীবনে শুধু অনুবাদের কাজেই লেগে রয়েছেন, কলম চালিয়েছেন। মৌলিক লেখা হ'ল না, শুধু ইংরেজী থেকে বাঙলা আর বাঙলা থেকে ইংরেজী। সরকারের আইন-কানুন, সাধারণের আবেদন-নিবেদন আর দলিল-দস্তাবেজের তর্জ্জমা ক'রে এতগুলো দিন তাঁর কেটে গেছে। পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছেন বিপণ ষ্ট্রীটের এই বাড়ীখানা। আর কিছু নয়। নির্দ্ধারিত হারে মাইনে পেয়েছেন আর দিন কাটিয়েছেন মনের সুখে। শারীরিক কায়ক্লেশ নেই, তাই এই বয়সেও কাজ করছেন, নয় তো কবে ইস্তফা দিয়ে দিতেন কাজে। বিনয়েন্দ্র মসীজীবি,—মৌলিক লেখায় হাত দিলেন না কখনও। সাহিত্যাকাশে স্থান না পেয়ে অন্তরালে থেকে পুষ্ট করছেন বাঙলা ভাষা। কত ইংরেজী কথার বাঙলা করছেন। কত বাঙলা কথার ইংরেজী ভাষান্তর!

সে আসছে?

সে আসবে। বিনয়েন্দ্র চলে গেছেন ভেতরে। যাওয়ার সময় ঘরের মধ্যেকার টেবিল থেকে নিয়ে গেছেন দোয়াত আর কলম।

ভুলে গেছলেন। ফিরে এসে নিয়ে গেলেন শিসের দোয়াত আর চিলের পালকের কলম। বিনয়েন্দ্র মসীজীবি। সে চেয়ে থাকে তাঁর যাওয়ার পথে। কারও আসার আশায়! নিজেকে যেন অসহায় মনে হচ্ছে তার। কেমন যেন নিরাশার অসহায়তা। কেমন যেন নিঃসঙ্গ। অরুণেন্দ্র, যার আকৃতি আর প্রকৃতি দুই-ই সে মন থেকে ভালবাসলো, সে কি না বিকৃত মস্তিষ্ক? দেখতে পাওয়ার যে উগ্র আশা নিয়ে কৃষ্ণকিশোর বেরিয়েছে বাড়ী থেকে, এখন আর ততটা যেন নেই। কি হবে দেখে। বড় বিশ্রী লাগছে এই পরিস্থিতি। কেমন যেন অসাধারণ, কেমন অস্বাভাবিক। সে নিঝুম হয়ে ব'সে থাকে।

বাচ্ছা খানসামাটা আড়ষ্ট হয়ে দেখা দেয় আবার। হাতে তার আখরোট কাঠের ট্রে। তাতে এক পেয়ালা চা আর সেঁকা পাঁউরুটি। মধ্যেকার টেবিলের 'পরে নামিয়ে রাখে। চলে যায় যন্ত্রচালিতের মত।

সে আসে। খানিক পরে।

ছায়া, লিলি না লিলিয়ান! সেই মুক্তো-ঝরা দাঁত আর ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট, লেসের জামা রঙের ঘাগরা আর সেই রঙীন পাথরের মালা-পরা মেয়েটার দেখা পাওয়া যায়। হঠাৎ যেন চন্দ্রোদয় হ'ল কৃষ্ণাকাশে। ঘর এখন প্রায় অন্ধকার। বাইরে প্রথম সন্ধ্যার আলো-আঁধারি। বসন্তের সমীরণ। কাছাকাছি কোথায় কোন্ চার্চের ঘড়িতে বাদ্য-ধ্বনি হচ্ছে। ঘণ্টা-ধ্বনি। উপাসনার সময় সমাগত। ঘড়িতে তাই বাজনা শুরু হয়েছে বুঝি। কেমন মন-মাতানো কান-ভাঙ্গানো সুর—যেন ডাকছে। এসো, উপাসনায় মন দাও। বল,—**The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.**

লজ্জার বালাই ছিল না কোন দিন।

আজ কেন যেন লজ্জার আভায় কৃষ্ণকিশোরের চোখে-মুখে। কান দু'টো রাঙা হয়ে উঠলো। চোখ তুলে প্রাণ ভ'রে দেখতে পর্য্যন্ত পারলো না। চোখ তুলতে, কথা বলতে কেমন যেন জড়তা।

সেই নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বললে ছায়া,—কৈ, আপনি খাচ্ছেন না? কথার শেষে বসলো একটা সোফায়। তার এক পাশে।

সে বললে,—আমি তো চা খাই না। আপনার বাবা বললেন তাই খাচ্ছি।

চায়ের পেয়ালায় হাত দেয় সে। ছায়া তার কথায় হাসতে শুরু করে। বলে,—চা খান না আপনি? কেন? আবার তার হাসি। চোখ বন্ধ ক'রে নিঃশব্দ হাসি। উর্দ্ধাঙ্গ কাঁপিয়ে।

এক ফালি পাঁউরুটি আর আধ পেয়ালা চা কোন রকমে গলাধঃকরণ করলো সে। পকেট থেকে আলপাকার রুমাল বের করে হাত-মুখ মুছে বললে,—অরুণ এলে বলবেন আমি এসেছিলাম। অনেকক্ষণ বসেছি তার জন্যে। বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়লো সে সোফা ছেড়ে।

হাসি বন্ধ ক'রে বললে ছায়া,—এ কি, চলে যাচ্ছেন? দাদা এখুনি যে আসবে। অন্য দিন এসে পড়ে অনেক আগে। আজ কেন আসছে না!

ছায়ার বড় বড় চোখে ব্যাকুলতা। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ ব্যস্ততা। কথা বলতে বলতে এবং বলার পরেও ছায়া চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। অপলক নেত্রে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। প্রায় অন্ধকার ঘরের ভেতর সে শুনতে পাচ্ছে ছায়ার নিশ্বাসের শব্দ। একেবারে পাশেই সে বসেছিল। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। চোখে কি এক আবেদনের ভাষা। যেন আত্মসমর্পণের। ছায়া আবার বললে,—চ'লে যাবেন এক্ষুণি?

ঘরে আর কেউ নেই। শুধু সে আর সে। ছায়া আর সে। এত পাশাপাশি এত কাছাকাছি পেয়েও তার যেন তাকাতে লজ্জা। কান দু'টো কেমন যেন রাঙা হয়ে উঠেছে। ছায়ার কথার উত্তরে সে শুধু বললে,—হাঁ। আজকে যাই।

ছায়া বললে,—কি এসেন্স মেখেছেন?

এতক্ষণে সে একটু হাসলো। বললে,—এসেন্স নয় আতর। খসখস।

—**How sweet**, কি মিষ্টি গন্ধ! ছায়া স্বগতঃ করলো।

মনে মনে ক্ষণিকের জন্য অত্যন্ত খুশী হল সে। গন্ধটা যে তার মিষ্টি লেগেছে সেই জন্যে। কি মনে ক'রে কান থেকে আতরের তুলো বের করলে। বললে—এই নিন।

হাত পাতলো ছায়া। গ্রহীতা যেমন হাত পেতে দান গ্রহণ করে সেই ভাবে হাত মেলে ধরলো ছায়া। ডিমের মত ফর্সা দু'খানা হাত। চাঁপার কলির মত আঙুল। আতর পেয়ে ক্ষান্ত হয় না। ছায়া কেমন যেন বলে ফেললে মুখ ফসকে। বললে—আর ঐ রুমালখানা?

কৃষ্ণকিশোর অবাক হয় না শুধু। হতভম্ব হয়ে পড়ে যেন। এ কি রকম কথা। এমন অপ্রাসঙ্গিক। কেমন অপ্রত্যাশিত। সে হাতের রুমাল এগিয়ে দেয়। বলে—রুমালখানা? কেন?

ছায়া লজ্জায় যেন মরে যায়। মাথা নত করে। বলে—আমার চাই রুমালখানা।

কেন তার কি কোন উত্তর হয়। ছায়া চায়। হাত পাতে। কে চায় এমন? রুমাল আর আতর সমেত হাত দু'টো মুখের 'পরে চেপে ধরলো ছায়া। ধরে রইলো অনেকক্ষণ। কে জানে, কি বলতে চাইলো।

—আজকে যাই। কেমন? কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। লন পেরিয়ে গাড়ীতে উঠেই বলে—আবদুল, চল, বাড়ী চল।

ছায়া শুধু একা বসে থাকে সেই প্রায় অন্ধকার নির্জন ঘরে। চেতনাহীন জড়ের মত বসে থাকে। রুমালখানায় মুখ মোছে। হাতে জড়ায়। চেপে চেপে ধরে মুঠোর ভেতর। লাল আলপাকার রুমাল। কৃষ্ণকিশোরের ব্যবহৃত। আর তাই জন্যেই তো চেয়েছে ছায়া তা কি বুঝেছে সে। ঐ কিশোর?

ফটকে গাড়ী ঢুকতেই দূর থেকে দেখতে পায় সে নাটমন্দিরে লোকে লোকারণ্য। আশ্চর্য্য হয়ে যায় যেন। কেন ঐ জন-দর্শনপ্রার্থী? না তো, কোন দিন আসে না এত লোক। এক দিন নয়। নাট-মন্দিরের কড়িতে সারি সারি রঙীন আলো। কুল-উৎসব-অনুষ্ঠান ব্যতীত ঐ আলো জ্বলে না। রঙীন কাচের ঝাড়-লণ্ঠন!

ম্যানেজার গাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ায়। সে নামতেই তাকে লে,—বাসদেও মাহাতোর ছেলেরা নামগান করবে। তাই আয়োজন করেছি নাট-মন্দিরে। পাড়া-প্রতিবেশী জনা কয়েককে আসতে বলেছি গান শুনতে।

সে কিছু বলে না। জনতার কারণ জেনে নিশ্চিন্ত হয় যেন। নাট মন্দিরে গিয়ে দেখতে পায় গালচে পাতা হয়েছে। লোকজন বসেছে। বাসদেও মাহাতোর তিন ছেলে পাশাপাশি বসেছে। এক জনের হাতে করতাল। এক জনের সামনে একটা হারমনিয়াম। রাজছে। আরেক জন তবলায় চাটি মারছে। সুর বাঁধছে।

এক দিকে পুরুষ, আরেক দিকে নারী।

এক দিক উন্মুক্ত, আরেক দিকে চিকের আড়াল। লোকজন আসতে শুরু হয়েছে। হাওয়ায় খবর ছড়িয়েছে। নাট-মন্দিরে আজ গাওনা হবে বাবুদের বাড়ীতে। কৃষ্ণকিশোরকে দেখে লোকজন চুপ করে খানিক। খোদ্‌কর্ত্তা এসেছেন তাই। ম্যানেজারকে বললে কৃষ্ণকিশোর,—মা কোথায়? মা জানেন?

—হ্যাঁ, তাঁর অনুমতি পেয়ে তবেই এই আয়োজন করেছি। হাতে হাত কচলাতে কচলাতে বললে ম্যানেজার। বললে,—হুজুর, কে এক জন এসেছেন। অনেকক্ষণ বসে আছেন আপনার জন্যে। নাট মন্দিরে বসতে অনুরোধ করলাম। তা বললেন যে, না আমি এখানে বসলে আপনাদের মন্দির অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই ঐ দালানে বসে আছেন একা একা।

কে বলুন তো? ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর।

পাশানে। কাছারীর দালানে চুপ-চাপ বসেছিল সে। দূর থেকে খুঁজে লক্ষ্য করছিলো এদের আদব-কায়দা। কৃষ্ণকিশোর দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারে আগন্তুক কে। মূর্ত্তিমান অরুণেন্দ্র, অরুণ, অরু! মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল আনন্দ নিবে যায় তার মনে। অরুণেন্দ্র বিকৃত-মস্তিষ্ক? সে এসেছে। আর সে গেছে তাদের বাড়ী। সে বুঝতে পারে তার ব্যর্থ প্রতীক্ষার কারণ।

ম্যানেজার পাশেই ছিল। যুক্ত-করে। সে বললে,—মা জানেন কে এসেছে?

আজ্ঞে না। সংবাদ যায় নাই তাঁর কাছে। ম্যানেজার ... আর বলে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি যাচ্ছি, আপনি ওকে আমার পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিন। মা যেন না জানতে পান, দেখবেন। মা খুঁজলে বলবেন, পৌঁছে এসে পড়ার ঘরে আছি। আসরে আসছি এখুনি।

ম্যানেজার অরুণকে ডাকতে যায়। আর সে যায় তার পড়ার ঘরে। ... হয়ে যাওয়া রুমাল আর সেই হাত দু'খানা বার বার মনে পড়ে কৃষ্ণকিশোরের। আর সেই মুক্তোঝরা হাসি। আর সেই চোখের রহস্যময় চাউনি। পড়ার ঘরের দিকে ধীরে ধীরে এগোয় সে। ম্যানেজার অরুণকে ডেকে আনতে যায়। আর আসরে তখন সবে মাত্র সুর ধরে বাসদেও মাহাতোর তিন ছেলে। নামগান শুরু হওয়ার আগে বন্দনা-গীত ধরেছে তারা। তারপরেই গান আরম্ভ হবে। রঘুপতি রাঘবো রাজা রাম। রাম। রাম, রাম। আকাশে দেখা যায় মেঘের মালায় দু'-চারটে তারা ঝুলছে। চাঁদ উঠবে খানিক পরে।

[ক্রমশঃ।

মদ খাওয়া বড় দায়

জাত থাকার কি উপায়

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

নেসাতেই সর্ব্বনাশ

জয়হরি বাবুর যশোহরে আদি বাস। পিতার লোকান্তর হইলে অর্থ অন্বেষণার্থ কলিকাতায় আগমন করিলেন। যাত্রাকালীন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সকলেই বলিল—জয়হরি! তুমি বালক, কলিকাতা বড় সিট্‌কেল জায়গা—যদি কাহারও কুহকে পড়, একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাবে; তাহা অপেক্ষা পৈতৃক ভিটেতে বসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য কর অনায়াসে দশ টাকা উপায় করিতে পারিবে। জয়হরির কিঞ্চিৎ ইংরাজী পাঠ হইয়াছিল—ইংরাজী রকম সকমই ভাল লাগিত—গ্রামস্থ লোক নিকটে আসিলে বিরক্ত বোধ হইত। তিনি কাহারো পরামর্শ না শুনিয়া পরিবার লইয়া শোভাবাজারে আসিয়া বাসা করিয়া থাকিলেন। কলিকাতায় কাহারো নিকট পরিচিত নহেন—সহায় সম্পত্তিও নাই—কর্ম্ম-কাজের যোগাযোগ কি প্রকারে হইবে ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে দুই-এক জন গালগল্পে উমেদারি গোচের লোক বাসায় আসিতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগের সঙ্গে কেবল বাজে কথারই আলাপ হয়—কলিকাতায় শ্রীশ্রী৺পূজার সময় কোন্ বাটীতে কি কি তামাসা হয়—কোন্ বাবুর কত বিষয়—কোন্ বাবুর কোন্ কোন্ সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়—কাহার কেমন মেজাজ—কে কত আহার করে—কে কেমন শৌখিন—কে বা অনুগত প্রতিপালক—কে কোন্ কোন্ নেসার ভক্ত—কাহার কত ব্যয়—কাহার কোন্ কোন্ স্থানে বাগান—কে বা বেরাল আমুদে—কে বা জঙ্গুলে ভদ্র—কে বা পাঁতুড়ে আহ্লাদে, এ সব কথারই উলট-পালট হয়, আর শতরঞ্চ ও পাশাতেই দিন ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্রমে দুই-তিন মাস গত হইল। জয়হরি দেখিলেন, আপনার কার্য্যের সেতুবন্ধন কিছুই হইতেছে না—নিরর্থক সময় ক্ষেপণ ও সঞ্চিত ধনের বিনাশ হইতেছে। বিস্তর তদ্বিরে সদর দেওয়ানির এক জন জজের উপর একখানি সুপারিস চিঠি বাহির করিলেন—চিঠি পাইবা মাত্র তাঁহার বোধ হইল, এত দিনের পর বুঝি গ্রহবৈগুণ্য কাটিয়া গেল, ইষ্ট সিদ্ধির মুখকমল দেখিতে পাইব। পরিবারের অনুরোধে শুভ দিন দেখাইয়া ভাল কাবা ও বাঁধা পাগড়ি পরিয়া একখান কেরায়া গাড়ি আনাইয়া গমন করিলেন। সাহেবকে কি বলিবেন গাড়িতে বসিয়া জড়ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন; সাহেব এক জন ভারি লোক, তাহাকে দেখিয়া পাছে থতিয়ে যাই ও এক বল্‌তে আর এক বলি—এ চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির হইল। ইতিমধ্যে সাহেবের বাটীর নিকট গাড়ি পৌঁছিল, আর্দ্দালিরা দূর থেকে হাঁক দিয়া বলিল, গাড়ি তফাৎ রাখ্। পরে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বাবুর নাম ধাম ও অভিপ্রায় সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। জয়হরি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি কি তোমাদের নিকট চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি—এত পেড়াপিড়ির আবশ্যক কি? সাহেবের নামে এক চিঠি আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেও। এই কথা শুনিবা মাত্র এক জন চোপদার চোখ লাল করিয়া গোঁপ ...

করিতে করিতে বলিল—তেরি বাত্‌সে চিঠি দেওঙ্গে ? হামলোক বুজসমজকে কাম করেঙ্গে। জয়হরি স্বকার্য্যার্থ বাগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—বাবু মিছামিছি তকরার কেন কর, তোমরা যা পেয়ে থাক তাই পাবে। এই কথায় যেন জোঁকের মুখে লুণ পড়িল। তৎক্ষণাৎ আর্দ্দালিরা সুড়্‌-সুড় করিয়া সাহেবের নিকট গিয়া চিঠি দিল। সাহেব কুকুর লইয়া খেলা করিতেছিলেন, চিঠি পড়িয়া বাবুকে নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। যাইবার সময় জয়হরির পা কাঁপিতে লাগিল, বহু কষ্টে সাহস অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন, এমত সময় চোপদারেরা চীৎকার করিয়া বলিল—বাবু, জুতি খোল্‌কে যাও। জয়হরিকে তাহাই করিতে হইল। পরে সাহেবের নিকট গিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে, সাহেব নাকের উপর আই-গ্লাস দিয়া চোখ ঘুরাইয়া জয়হরির পেনটুলেন কাবা ও বাঁধা পাগড়ি দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—টোম কিয়া মাংতা—টোম কিয়া মাংতা—টোমলোক থোড়া আংরেজি পড় করকে বহুত টেড়ি হোনে চাতা—বাপ্‌-দাদাকা পোবাখ কাহে নেহি পেন্‌তা ? জয়হরি একেবারে কাষ্ঠ—মুখ দিয়া বাক্য সরে না। সাহেব আবার বলিতেছেন—ওয়েল ! টোম কিয়া মাংতা ? জয়হরি ইংরাজীতে উত্তর করিতে যান ইতিমধ্যে সাহেব ভূমিতে পদাঘাত করতঃ ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—হিন্দি বাত কহ—বাঙ্গালিকা লেড়্‌কা হিন্দি নেহি জান্তা ? জয়হরির হিন্দি শিক্ষা ছিল না—সতিসি রকম হিন্দি যাহা জানিতেন তাহাই জোটপাট করিয়া বলিলেন—খোদাবন্দ, আমি বেকার, কুচ কম্মকাজ মেলে। সাহেব উত্তর করিলেন, হামারি পাস কাম পৈদা হোতা নেহি, টোম কাহে দেক করতা হৈয়, এই বলিয়া বারাণ্ডা থেকে কামরার ভিতর গমন করিলেন। জয়হরি ছল-ছল চক্ষে আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠিলেন। নৈরাশ্যের বেদনায় মন বিচলিত হইতে লাগিল। বাটী আসিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরব ভাবে থাকিলেন। রজনী হইলে নিদ্রাদেবীর আহ্বানার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাবনাকে দেখিয়া নিদ্রা নিদ্রিত ভাবেই থাকিল, একবারও তাঁহার দিকে গেল না। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল—কাকগুলা কা-কা করিতেছে, এমত সময় বাহির-বাটীর দ্বার ঠেলিবার শব্দ শ্রুত হইল। জয়হরি ধড়মড়িয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন—সাহেবের চারি জন চোপদার উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি ? তাহারা বলিল, আর খবর কি—মোদের বক্‌সিস্‌ দেও, সাহেব তোমাকে বড় পেয়ার করেছে, মালুম হয় জল্‌দি একটা ভারি কাম দেবে। জয়হরি মনে মনে বলিলেন—কি আপদ ! মরার উপর খাঁড়ার ঘা, কিন্তু এ বেটারা নেকড়ার আগুন—পুন্‌কে শত্রু—ভাল না করুক, মন্দ করিতে পারে, এ জন্যে চটান ভাল নয়। এই বিবেচনা করিয়া প্রত্যেককে এক এক টাকা দিলেন। চোপদারদের বড় পেট, অল্পে মনে উঠে না, টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বকিতে লাগিল, পরে বিস্তর সাধ্য-সাধনায় বিদায় হইল।

অনন্তর অন্যান্য চেষ্টা ও সুপারিস অনেক হইল, কিন্তু কিছুই সফল হইল না, কোন কোন সাহেব দেখাই করে না—কেহ বলে, তুমি স্কুল-বয়, আমি প্রবীণ লোক চাই—কেহ বলে, তোমার কেতাবি বিদ্যা, কর্ম্ম-কাজ কি জান ?—কেহ দুই-এক দিন কর্ম্ম করাইয়া অযোগ্যতা দেখিয়া জবাব দেয়। জয়হরি পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়া হেদো পুষ্করিণীর তীরে আস্তে আস্তে পাইচারি করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি প্রাচীন তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আলাপ করণার্থে নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিলেন, জয়হরি তাঁহাকে আড়চোখে দেখিয়া একটু দ্রুত চল্‌তে লাগলেন, প্রাচীন ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ইংরাজী চলন চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎ থেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কে গা ? শিষ্টাচার রক্ষার্থ জয়হরি অনিচ্ছায় ফিরিয়া পরিচয় দিলেন। সেই প্রাচীন ব্যক্তি বড় আলাপী—কথার মিষ্টতা দ্বারা অনুসন্ধানের কুরুণী চালাইয়া বাবুতে যে পদার্থ আছে মনে মনে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলেন—মহাশয় মহা কুলোদ্ভব—ইংরাজীও ভাল শিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু বৈষয়িক উপদেশ অথবা ভারি মুরুব্বি অথবা টাকার জোর কিম্বা দৈব সুযোগ ব্যতিরেকে বিষয়-কর্ম্ম হওয়া ভার—কর্ম্ম-কার্য্যের যোগ্যতা থাকিলে লোককে প্রায় বসিয়া থাকিতে হয় না, অনেকে ডাকিয়া কর্ম্ম-কায দেয়। বিদ্যাশিক্ষার সময় ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহঙ্কার হয়, কেবল ইংরাজী চলন ইংরাজী কথোপকথন ও ইংরাজী ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীনের এই সকল কথায় জয়হরি ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—কি, আমার কর্ম্ম-কাযের যোগ্যতা নাই ? আমি কোন্‌ কর্ম্ম না পারি ? বাবুর এই কথায় প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—মহাশয় যে পল্লীতে থাকেন, সেখানে কতকগুলা কুলোক আছে, তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দিবেন না। জয়হরি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এমন লোক কেহ নাই যে আমাকে খারাব করে, বরং মন্দ লোক আমার কাছে এলে ভাল হয়ে যায়। ও কথা যাউক, একট্রা বরাৎ আছে আমাকে শীঘ্র বাসায় যাইতে হইল, এই বলিয়া জয়হরি মস-মস করিয়া চলিয়া গেলেন—প্রাচীন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পথিমধ্যে এক নব বাবুর সহিত জয়হরির সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র কাছে গিয়া হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন—ভাই হে ! আজ এক ঘোর যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলাম—হেদোর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, কোথ্‌থেকে এক বুড়া গায়ে পড়ে আলাপ করে, কাছে আসিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল—বেটা যেন ভীষ্মদেব ! যাহা হউক, আজ অবধি আর হেদো ধারে বেড়াতে আস্‌ব না। নব বাবু বলিলেন, হেদোয় বেড়াবে না কেন ? চল না দু'জনে গিয়া সে বেটাকে লঙ্গে দি ? তাতে কাজ নাই—দূর কর ! আবার কি ফৌজদারি বাধ্‌বে—এই বলিয়া দুজনে লর্ড বায়রণের কবিতা আওড়াতে আওড়াতে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

বারম্বার নৈরাশ্য হইতে থাকিলে ধীরতা বিরহে মন একেবারে দমে যায় তখন বিরক্ততার অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে— কাহারো নিকট যেতে অথবা কাহারো সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না। আর নৈরাশ্যের দুঃখ মোচন অথবা বিপদ সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করা বিশেষ ধর্ম্ম উপদেশ ব্যতীত হয় না—কিন্তু জয়হরির ঐরূপ উপদেশ ছিল না—তিনি বিষয় করণার্থ অবিশ্রান্ত যত্ন করিতে ছিলেন, পরে ক্রমাগত নিষ্ফল হওয়াতে অত্যন্ত মনমরা হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা গালে হাত দিয়া ভাবেন ও এক কথা জিজ্ঞাসিলে আর এক কথার উত্তর দেন। বাটীর ভিতর আহার করিতে গেলে ভাতে হাত দিয়াই দুগ্ধের বাটিকে ডালের বাটি বলিয়া পাতে ঢালেন—পরিবারেরা দেখিয়া-শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইত ও পরস্পর বলাবলি

২৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রিয়ালিজম্

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ দেশে কতগুলি জনপ্রবাদকে আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। এগুলি যে ঠিক কখন ঘটে এবং কখন রটে তাহা ধরা কঠিন ; সাধারণতঃ রটনার প্রাবল্যই আমাদের দৃষ্টি ঘটনার সম্ভাবনার দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এ জিনিসটি দেখা গিয়াছে যে এই জাতীয় জনপ্রবাদ কখনই একেবারে মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠে না, পাহাড়ের স্তূপীকৃত কালো মাটির ফাটলে ফাটলে সোনার রেখার মতন সত্যের সোনালি মিশ্রণে তাহারা বহুমূল্য লাভ করে।

আমাদের বর্তমান কালের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কতগুলি জনপ্রবাদ প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, ইহাদের ভিতরে একটি প্রধান হইল, সাহিত্যের আধুনিক যুগটা হইল 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর যুগ। কথাটাকে প্রথমে কিছু দিন বিজ্ঞজনোচিত অবজ্ঞায় কোণঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা গিয়াছে, অজ্ঞজনোচিত উপহাসও এ কম লাভ করে নাই ; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রটনাটা যখন দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তখন পিছনকার ঘটনার কথাও আবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে।

প্রথমেই ভাবিতে হইবে 'আধুনিক যুগ'টার কথা। আমাদের মনের ভিতরে সাধারণ ভাবে 'আধুনিক যুগ' সম্বন্ধে যে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে তাহা একটি সন-তারিখের চৌহদ্দিযুক্ত বিশেষ রঙে রঞ্জিত কালখণ্ড বিশেষ। আপাততঃ ইহার এক সীমানায় দাঁড়াইয়া আছে ১৩২৭ সাল, তর্ক অপর সীমানার বিস্তৃতি সম্বন্ধে। উগ্রবাদীরা হয়ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথি হইতে আর পশ্চাৎপদ হইতে চাহিবেন না, কাহারও ঝোঁক হয়ত জন্মক্ষণের পুণ্যলগ্নের প্রতি ; কেহ হয়ত পিছাইয়া যাইবেন মধু-বঙ্কিমের আবির্ভাব কালে, কাহারও বিস্তৃতি রামমোহনের রাজত্ব, সাবধানী বলিবেন, সন্ধানী দীপবর্তিকা লইয়া সুড়ঙ্গপথে চলিয়া যাওয়া যাক ভারতচন্দ্রেরই মাঙ্গলিক কাব্যে। এই সীমানা-সমিতির সুপারিশ গৃহীত হইলেই, দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে, এই সীমানাটি আবার যথার্থ রিয়ালিজ্‌ম্-এর সীমানা কি না।

আমার মনে হয়, আধুনিকতা সম্বন্ধে আমাদের উপরি-উক্ত ধারণাটি ভুল, এবং 'রিয়ালিজম্'-এর যথার্থ স্বরূপটি বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদের এই আধুনিকতার ধারণাটি বদলাইয়া লইতে হইবে। আমাদের বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন, জীবনের বিভিন্ন বয়স ভেদে শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা রহিয়াছে, যেমন, বাল্য-লীলা, কৈশোর-লীলা, প্রৌঢ়-লীলা প্রভৃতি ; কিন্তু এই সব লীলারই আবার একটা নিত্যত্ব রহিয়াছে। 'বাল্য' একটি স্বরূপযুক্ত নিত্যতত্ত্ব। ঠিক সেই ভাবেই বলিতে পারি, একটা জাতির সমগ্র জীবন জুড়িয়া মহাকালের যে বিভিন্ন লীলা—তাহার প্রত্যেকটিরই আবার একটি নিত্যত্ব রহিয়াছে। এদিক হইতে দেখিলে, আধুনিকতারও একটা নিত্য-স্বরূপতা আছে। কালপরিবর্তনের ভিতর দিয়া বিস্তীর্ণ সমাজ-জীবনে আসে নানা রকম পরিবর্তন। সমাজ-জীবনের এই পরিবর্তন জাতীয় জীবনে জাগাইয়া তোলে কতগুলি বিশেষ বিশেষ রুচি-প্রবণতা ; এই রুচি-প্রবণতাযুক্ত যে বিশেষ যুগধর্ম, সে অতীত ধর্ম হইতে স্বভাবতঃই খানিক পৃথক। এই যুগধর্মের পার্থক্যের চেতনাটাই বার বার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়া দেখা দেয় 'আধুনিকতা'র রূপ লইয়া।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'আধুনিকতা' কথাটার কোন নিরপেক্ষ মান বা মূল্য নাই, ইহার ধর্ম এবং মূল্য সবটাই আপেক্ষিক। আমরা যে অর্থে ১৯৫০ সালটিকে আধুনিক যুগ আখ্যা প্রদান করিয়া তাহাকে যে বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করিতে উৎসুক, বৈদিক যুগের অগ্নি-প্রদক্ষিণকারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিবলবসন কোন উগ্রযুগচেতনাসম্পন্ন মানুষ যদি সেই যুগটিকেই এই জাতীয় আখ্যা এবং মর্যাদা দান করিতে উৎসুক হইতেন তাহাতেও আপত্তি করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অতীত যুগের অপেক্ষায় তাঁহার যুগটিই তাঁহার নিকটে আধুনিক ছিল। তফাৎ শুধু হয়ত এইটুকু, তখনকার জীবনের গতিতে একটা আপেক্ষিক মন্থরতা ছিল, সুতরাং পরিবর্তনের প্রকার এবং পরিমাণ এবং তাহার ফলে পূর্ব যুগের সহিত পার্থক্যও হয়ত এ কালের অনুপাতে অনেক কম ছিল। আমাদের কালে জীবনের যে গতি তাহার ভিতরে শুধু প্রাথমিক গতিই (initial velocity) বড় কথা নয়, নিরন্তর বর্ধমানতা (acceleration) এই প্রাথমিক গতির সহিত যুক্ত হইয়া বেগ এবং আবর্ত সবই অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া দিয়াছে : ফলে অল্প কালের ব্যবধানও পার্থক্যের চেতনাকে তীব্র করিয়া দিতেছে।

আধুনিকতার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম সে সম্বন্ধে হয়ত বিতর্কের অবকাশ কম : কিন্তু এই আধুনিকতার আপেক্ষিকতাকে অবলম্বন করিয়াই আমি আর একটি কথা বলিতে চাই, তাহাই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমার মনে হয়, সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকতা কথাটার যেমন কোন নিরপেক্ষ অর্থ নাই, রিয়ালিজ্‌ম্ বা বাস্তববাদ কথাটারও তেমনই কোন নিরপেক্ষ অর্থ নাই : ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, রিয়ালিজ্‌ম বলিয়া আমরা সাহিত্যে এবং শিল্পে যে কথাটা বলি তাহাও সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের একটা যুগোচিত আপেক্ষিত ধর্ম। বৈদিক যুগটাই বৈদিক যুগের মানুষের নিকট যেমন আধুনিক কাল ছিল, তেমনই, আমার বিশ্বাস, বৈদিক-সাহিত্যও তৎকালীন মানুষের নিকট 'রিয়াল' ছিল। ত্রেতা যুগে বৈদিক সাহিত্যের এই 'রিয়ালিজম্' অনেকখানি ঘুচিয়া গিয়াছিল, বাল্মীকি-কৃত রামায়ণই বোধ হয় তখন ছিল 'রিয়াল'। কালিদাসের কাব্য-ধর্ম সম্বন্ধে আমরা আজ যত উচ্ছ্বাস প্রাবল্য দর্শাই না কেন, তাঁহার সাহিত্যকে রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে এখন আমরা কেহই রাজি হইব না : কিন্তু আমার মনে এ সংশয় আছে, আমি যদি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার এক জন বিদগ্ধ সদস্য হইতাম কালিদাসের সাহিত্যই আমার নিকট 'রিয়াল' বলিয়া মনে হইত। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা সশ্রদ্ধ ভাবেই রোমান্টিকতা মিশ্রিত আইডিয়ালিষ্ট বলিয়া দূর হইতে নমস্কার করিতে শিখিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার নিজের যুগের পাঠকগণের নিকটে তিনি যে উগ্র রিয়ালিষ্ট বলিয়া নিন্দার্হ হইয়াছেন তাহারও প্রমাণ আছে। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও শরৎচন্দ্র উগ্র বাস্তব-পন্থী বলিয়া অভ্যর্থনা ও ভর্ৎসনা উভয়ই লাভ করিয়াছেন, এখন আবার বোধ হয় আমরা জোল বদলাইয়াছি। এখন আবার দেখিতেছি, এ যুগে যাহা কিছু লিখিত,

হইতেছে মোটের মাথায় তাহা সবই 'রিয়াল' বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, অথবা 'রিয়াল' বলিয়া ধাঁ-ধাঁ লাগাইতেছে ; এবং মোটের মাথায় যুগটাকে আমরা রিয়ালিজম্-এর যুগ বলিয়াই অভিহিত করিতেছি। এই ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে রিয়ালিজম্-এর সংজ্ঞা দাঁড়ায় কি ? কবির বা শিল্পীর যুগানুগত্য-হেতু তাঁহার রচিত সাহিত্য বা শিল্পের তৎতৎকালে একটা সহজ-গ্রাহ্যত্ব। এই সহজ-গ্রাহ্যত্বের পিছনে যুগ-মনের একটা 'সায়' দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, সাহিত্য বা শিল্পের যে বিশেষ ধর্ম এই যুগ-মনের 'সায়'টি আদায় করিতে পারে সব চেয়ে বেশী তাহাই সাহিত্য বা শিল্পকে 'রিয়ালিষ্টিক্' রূপ দান করে। কথাটা হয়ত অনেকখানি আমাদের প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হইল ; সুতরাং ইহার যথার্থ্য যাচাই করিয়া দেখিতে হইলে 'রিয়ালিজম্' বিষয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন।

আমাদের প্রচলিত মতে রিয়ালিজ্‌ম্ কাহাকে বলি ? কথাটা যত স্পষ্ট করিয়া আমরা বলি, তত স্পষ্ট করিয়া বোধ হয় ভাবিও না, জানিও না। এ সম্বন্ধে চলতি কথা যাহা দু'-একটা আছে, আসলে তাহা অচল। 'বস্তু বা ঘটনা যেমন ঠিক তেমনই তাহার রূপ দিব'—প্রভৃতি জাতীয় কথা অর্থহীন ; কারণ, প্রথমতঃ, এই 'যেমন' এবং 'তেমন' কথা দুইটিরই কোন স্পষ্ট অর্থ নাই ; দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যদি কোন অর্থ নির্দিষ্ট করিয়াও লওয়া যায়, তবে 'যেমন'-এর ঠিক 'তেমন'এর সহিত হুবহু যোগ ঘটান কাহারও পক্ষে আদৌ সম্ভব কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় বর্তমান। এই প্রসঙ্গে 'যথাস্থিতবাদ' কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, কোন বস্তু বা ঘটনার মানুষের মনোনিরপেক্ষ কোন যথাস্থিত রূপ আদৌ আছে কি না, থাকিলে মানুষের মনের পক্ষে এই জাতীয় কোন যথাস্থিত রূপ গ্রহণ করা সম্ভব কি না। শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ত এই একটা রফায় উপস্থিত হই যে, বস্তু বা ঘটনার একেবারে যথাস্থিত কোন রূপ নাই, বা থাকিলেও কোন জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রেই সেই বিশুদ্ধ যথাস্থিত সত্যের রূপায়ণ সম্ভব নহে বটে ; কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে গৃহীতা মনের প্রাধান্য বেশী না বস্তু বা ঘটনার স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বাহিরের রূপ-গুণেরই প্রাধান্য বেশী, ইহা লইয়াই রিয়ালিজম্-এর বিচার।

আসলে রিয়ালিজম্ কথাটাকে আমরা একটা স্পষ্ট ইতি বাচক রূপ অপেক্ষা নেতি বাচক রূপে হয়ত বুঝি ভাল। এই নেতি বাচক রূপে রিয়ালিজ্‌ম্ হইল রোম্যাণ্টিকবাদের বিরোধী ধর্ম এবং ভাববাদ বা আদর্শবাদেরও বিরোধী ধর্ম। প্রথমে রোম্যাণ্টিকবাদের কথাই আলোচনা করা যাক্। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রোম্যাণ্টিকবাদ এবং রিয়ালিজ্‌ম্ শিল্পিমনের দুইটি পরস্পরবিরোধী ধর্মপ্রসূত। একজাতীয় শিল্পীর সহজাত মনোধর্মই এইরূপ যে, তাঁহারা কোন বস্তু বা ঘটনার বাহিরের রূপটিতেই আকৃষ্ট হন বেশী ; রূপায়ণের ক্ষেত্রেও সেই দিকটাই প্রধান হইয়া ওঠে। আর এক জাতীয় শিল্পীর সহজাত মনোধর্ম তাহাকে স্বভাবতঃই বহির্বিমুখ করিয়া তোলে, তিনি বাহিরের বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ফিরিয়া আসেন তাঁহার অন্তর্জগতে—আন্তর অনুভূতির ক্ষেত্রে। মোটের উপরে মনোধর্মের এই বহির্মুখিতাই রিয়ালিজম্-এর প্রবর্তক ; বহির্বিমুখ অন্তর্মুখিতাই দান করে রোম্যাণ্টিকবাদের প্রবর্তনা। সূর্যরশ্মি যেমন চতুষ্পার্শ্বস্থ শূন্যপরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া সপ্তবর্ণের বৈচিত্র্য লাভ করে, এই এক মনোধর্মই সেইরূপ শিল্পের বিস্তীর্ণ পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র ধর্ম গ্রহণ করে।

সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে—বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সকল কথাকে আমার মনে হইয়াছে ইতিহাসনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্ব মাত্র। এই বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবলম্বনে কতগুলি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছান খুব সহজ ; কিন্তু মাঝখান হইতে মুস্কিল বাধায় আসিয়া ইতিহাস ; সে তাহার প্রচণ্ড আলোড়নে—নিরন্তর ঘূর্ণ্যাবর্তে বিশুদ্ধ তত্ত্বের ভিতরে খানিকটা কাদা-মাটির সংযোগ ঘটাইয়া সব জিনিসটাকে ঘোলাটে করিয়া দিয়া যায়। আধুনিক যুগটা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম, আধুনিক যুগ লইয়াই কথা বলি। আধুনিক যুগটা রিয়ালিজ্‌ম্-এর যুগ বলিয়া একটা সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে ; এই স্বীকৃতি আবার সব চেয়ে বেশী উপন্যাস-ছোট গল্পের ক্ষেত্রে। এ যুগের কথা-সাহিত্যকে তাই একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। এ যুগের কথা-সাহিত্যিকগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন, এরূপ এক জন কোন লেখকের নাম করা শক্ত ; তথাপি জনপ্রিয়তার দিক হইতে বিচার করিয়া আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উল্লেখ করিতেছি। লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের ধর্ম কি ? তাঁহার লেখার ভিতরে বাঙলা দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের এমন নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়, এই অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানব-জীবনের সহিত তাঁহার হৃদয়ের এমন গভীর সংযোগের পরিচয় ছড়াইয়া আছে তাঁহার সকল লেখার ভিতরে যে, তিনি রিয়ালিষ্ট লেখক নন এমন অপবাদ তাঁহাকে কিছুতেই দিতে ইচ্ছা হয় না। বাঙলা-দেশের সাধারণ পাঠক সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে এই রিয়ালিষ্ট বলিয়া স্বীকৃতিও দুর্লভ নয়। কিন্তু পাঠক হিসাবে তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়া মনে যে ফলশ্রুতি লাভ করিয়াছি তাহার একটা মিশ্রধর্ম সর্বদা লক্ষ্য করিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে নিজের অনুভূতিকে যখন নিজেই নানা ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, তখন নিজের মনের মধ্যেই অনেক সংশয় উপলব্ধি করিয়াছি।

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস পাঠ করিয়া এই প্রশ্ন মনে আসিয়াছে যে, নাগরিক জীবনে নিরন্তর সংগ্রামলিপ্ত মধ্যবিত্ত আমাদের [illegible] কথিত শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের কাছে এই সব সাহিত্যের [illegible] আবেদন, বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ জনসমাজে তাহার [illegible] আবেদন আছে কি না। আমাদের নিকটে এই সাহিত্যের ভাল লাগা তাহার ভিতরে মনে হয় অনেক কারণ যুক্ত [illegible] রহিয়াছে। এখানে বাঙলা দেশের একটা বিশেষ অঞ্চলের প্র[illegible] ও জীবনের একটা নিখুঁত ছবি পাইয়াছি, অবজ্ঞাত সাঁ[illegible] হাড়ী, বাগ্‌দী, বাউরী জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি পা[illegible] ক্ষয়িষ্ণু পরগাছা মধ্যবিত্ত জীবনের ক্রম-অন্তর্ধানের ছবি [illegible] সমাজ-জীবনের আবির্ভাবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছি : আমা[illegible] ভাল লাগার ভিতরে এ উপাদানগুলির প্রভাব যথেষ্ট। [illegible] ইহাই কি সমস্ত ? এই ভাল লাগার ভিতরে অনেকখানি [illegible] প্রভাব বিস্তার করিয়াছে একটা স্বপ্নের ব্যবধান, পরিচয়-অপা[illegible] আলো-আঁধারি রহস্য—সংগ্রামক্ষত নাগরিক জীবনের শ্রান্তি ও [illegible] হইতে মুক্তি ও বিশ্রান্তির আনন্দ। নাগরিক জীবনের অনেক হইতে হাজা-মজা নদীর বাঁকে ঘনবিন্যস্ত শালবন বাঁশবনের আ[illegible]

ভাঙা মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনির নীচে কতগুলি জীবনধারা দেখিতেছি—সে ধারা উৎসহীন নদীর মতন খর তাপে চট্ করিয়া শুকাইয়া যায়—বর্ষার বানের মতন আচমকা দুর্বার হইয়া ওঠে। তাহারই আশে-পাশে আস্তে আস্তে খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবন—আগাছায়-ভরা কত কালের পুরানো ভাঙা-চুরা পোড়ো বাড়ির মতন। এখান হইতে জাগিয়া উঠিতেছে একটা জ্ঞাত-অজ্ঞাত আদিম জীবনের গন্ধ—তাহার খানিকটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাই—অনেকখানি পাই না। এই পাওয়া-না-পাওয়ায় বোঝা-না-বোঝায় মিলিয়া-মিশিয়া সব জিনিসটাই কেমন একটা অজ্ঞাত রহস্যে মণ্ডিত হইয়া ওঠে। তবে কি লেখক রোম্যাণ্টিক?

শুধু রোম্যাণ্টিকতা নয়, এখানে একটা মুক্তির—একটা বিশ্রান্তির আনন্দও রহিয়াছে—গাল্‌সিবার্দ ভাষায় যাহাকে বলা যাইতে পারে 'পলায়নী বৃত্তি'। যে একটা আদিমতাগন্ধী সহজ সরল মন্থর জীবনে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাই তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যে সে সাময়িক ভাবে আমাকে আমার অস্বস্তিকর বর্তমান জীবনের পরিবেশ হইতে অনেক দূরে টানিয়া লয়। এই দূরত্বের ব্যবধান-রহস্য—এই মুক্তি বা বিশ্রান্তির আনন্দকেই আমি অযথা বড় করিয়া দেখাইতে চাহিতেছি না; কিন্তু আমাদের সমগ্র 'ভাল লাগা'র ভিতরে এই সকল উপাদানের স্থানও একান্ত অবজ্ঞেয় নয়। এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে, তারাশঙ্করের সৃষ্ট সাহিত্যের এই রোম্যাণ্টিক রূপটা আমার পাঠক-চিত্তের বিকারজনিত কি না, এ বিষয়ে নিজে অভ্রান্ত বিচারক নই; কিন্তু যতখানি বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব তাহা দ্বারা এই প্রত্যয় লাভ হইয়াছে, এ ধর্ম শুধুমাত্র আমার পাঠক-চিত্তগত নহে, ইহা বস্তুগতও বটে।

এখানে তাহা হইলে দেখিতেছি, রিয়ালিজ্‌ম্ এবং রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ শত্রুরাত্মা, অহি-নকুলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ত নহে, বরঞ্চ উভয় উভয়ের পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছে। শুধু এইটুকুই নয়; আরও লক্ষ্য করিবার বস্তু রহিয়াছে। পূর্বে তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যে যে সকল উপাদানের উল্লেখ করিলাম তাহার অনেক উপাদান রোম্যাণ্টিক্, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার কিছু কিছু উপন্যাসের ভিতরে যে ভাবে রোম্যাণ্টিক্ বলি বা রবীন্দ্রনাথকে যে ভাবে রোম্যাণ্টিক বলি, তারাশঙ্করকে ঠিক সেই ভাবে রোম্যাণ্টিক্ বলিতে ইচ্ছা হয় না। বরঞ্চ এই সকল রোম্যাণ্টিক উপাদান সত্ত্বে সাধারণ পাঠক-সমাজে তারাশঙ্করকে রিয়ালিষ্টিক্ লেখক বলিয়া গ্রহণ করিবার ঝোঁক বেশী, আর আমি প্রারম্ভেই বলিয়াছি, সাধারণ পাঠক-সমাজের এই ঝোঁক একেবারে অবজ্ঞেয় নয়, আমার বিশ্বাস, ইহার পশ্চাতে একটা গভীর কারণ নিহিত থাকে।

তারাশঙ্করকে এই ভাবে রিয়ালিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবার ঝোঁক ... আমার মনে হয়, তাহার কারণ, লেখকের সহজ এবং অকৃত্রিম ...—এবং তজ্জনিত তাঁহার সাহিত্যের সহজ ও সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব। ... যুগধর্মকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন; যুগের রোমাণ্টিকতা তাহা বৃহত্তর সমাজ-চৈতন্যের নিকট সহজ-গ্রাহ্য সানন্দ-গ্রাহ্য; তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক মনের একটা সাধারণ ... রহিয়াছে, মোটামুটি ভাবে সে বর্তমান-জীবনের সহিত একটা সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিয়াছে—এই জন্যেই যুগের পক্ষে সে 'রিয়াল্'—সে সত্য। সমাজের নিম্নস্তরের অখ্যাত অবজ্ঞাত এবং শোষিত জীবন সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য—একটা গভীর সহানুভূতি, তাহাকে জানিবার বুঝিবার—আত্মস্থ করিয়া লইবার একটা প্রবৃত্তি আমাদের যুগেরই ধর্ম; তাহাদের জীবনেরও যে মূল্য আছে—মহিমা আছে—মানুষের অধিকারে তাহারাও যে বঞ্চিত হইবার নয়—সমাজ-জীবনের অন্তস্তলে নানা দুর্বার শক্তির আলোড়নের আঘাতে-প্রত্যাঘাতে তাহাদের জীবনেও যে নূতন দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে—সেই সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে একটা নূতনতর সমাজ-জীবনের আবির্ভাবের ইঙ্গিত জাগিয়া উঠিতেছে—এই সকল জিনিসের সহিত বর্তমান যুগে আমরা আমাদের হৃদয়ের একটা গভীর যোগ অনুভব করি; আর এই সকলের বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ তাহার সহিতও আমরা অনুভব করি হৃদয়ের যোগ; সে তাই মারাত্মক ভাবে আধুনিক রিয়ালিজ্‌ম্-এর বিরোধী রূপে দেখা দেয় না, সে দেখা দেয় 'রিয়ালিজ্‌ম্'-এর অঙ্গীভূত রূপে। এ কথা শুধু তারাশঙ্করের কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, কম-বেশী এ যুগের অনেক কথা সাহিত্যিকগণের রচনা সম্বন্ধেই সত্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা,' 'পদ্মা নদীর মাঝি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর ভাবে এই এক কথাই প্রযোজ্য মনে হয়। রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ যুগোপযোগী হইলে সেও কত সহজ এবং সানন্দ-গ্রাহ্য হইয়া রিয়ালিজ্‌ম্-এর রূপ ধারণ করিতে পারে সেই কথাটিই এ-সব স্থলে লক্ষ্যণীয়।

শুধু কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, এ যুগের কবিতার ক্ষেত্রেও এই কথাটা আমার সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের উল্লেখ করিতেছি। করিতেছি এই জন্য যে, যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িলে মনে হয়, তাঁহার কবিতার একটা স্পষ্ট সুর আছে, সে সুরটিকে আমি শুধু দুঃখবাদের সুর বলিব না, সেখানে আছে একটি রোম্যাণ্টিকতা-বিরোধী সুর। রোম্যাণ্টিক্ কল্পনাবিলাস এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এত দিন ধরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি যে বহু বিচিত্র মন-ভুলান ভাবের সৌধ, তিনি তাহার ভিত্তি-ভূমিতে অনেক স্থানে বলিষ্ঠ আঘাত করিয়া তাহাকে নাড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই রোম্যাণ্টিক্ ভাবানুভাব বিরোধিতা এ যুগে আমাদের ভালই লাগিয়াছে। কিন্তু একটু দীর্ঘ হইলেও তাঁহার রচিত 'বেদিনী' কবিতাটি নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।—

> ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
> ওঠ রে বেদিনী মোট বেঁধে নিই তুলিতে হইবে ডেরা।
> দখিণার লোভে খোলা মাঠে তুই বসালি তাঁবুর খোঁটা,
> ভাঙা ফাটা ফুটো তৈজস গুটো, সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।
> ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী, দখিন হাওয়া এ নয়,
> ঈশাণ কোণের কন্টার কণায় বিষের নিশ্বাস বয়।
> ওই আসে সেই ঝড়,—
> ওঠ রে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে বেদিয়ার হাত ধর।
> কি হ'ল বেদিনী তোর?
> উড়ো মেঘে রাখি' নিশ্চল আঁখি কোন্ বেদনায় ভোর?

এবার সহসা উঠাইতে বাসা কেমন করে কি মন ?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে ক্লান্ত কি এ জীবন ?
বেদিয়ার বালা সাধিয়া দিলি যে বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস্ তুই এদের বংশে নাই যে ঘরের জ্বালা।
বেদের ধারা ত বুঝিস্ বেদিনী,—যে ঘর বাঁধে সে দিনে
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি
এত কাল পরে হ'লি তুই আজ সেই ঘরে অনুরাগী ?

বেলায় বেলায় পথের খেলায় বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের প'রে পথের কুকুরও নহে কভু উদাসীন।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে, মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী, ভরা বুকে বুক চাপি।
তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি সাথে শত তালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কাল ভুজঙ্গী চির সাথী শির'পর।
এ সবে কি রুচি নাই ?
ঘরের মায়ায় ঝড়ের আকাশে নয়ন মেলিলি তাই ?

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর চুলে বাঁধিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি বনে বনে হাতে ছাগলের দাঁড়,
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্ ফুলে ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপান হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘোরের ঘরণী রে তুই ঘাঘরায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদের ভক্ত—বিস্ময় সবে মানে,
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায় মোহিনী মন্ত্র জানে।

শোন রে বেদিনী শোন্

সুরু হ'ল ওই অদূর আঁধারে গুরু গুরু গর্জ্জন !
ঘরের মায়া সে থাকে ত এখনও কেটে দে তাঁবুর রসি,
না হয় কাটাব এ কালরাত্রি খোলা মাঠে খাড়া বসি'।
আকাশ জুড়িয়া কোন সাপুড়িয়া বাজায়ে চলেছে তুরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ, নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রসির ফাঁসে ওই তাখ ঘন ঘন পড়ে টান।

কেন উদাসীন আনমনা হেন বেদিনী, বেদের মেয়ে ?
দূরের বাঁশীর সুরে তুইও কি রে উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে ?

* * *

অকালে এল এ কালবৈশাখী কাছে আয় কাছে আয়,
যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী যা ছিল তাও যে যায়।
ছুটে যায় খুঁটো, উড়ে ছেঁড়া তাঁবু, টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কাণা-ভাঙা হাঁড়ি, দূরে দূরে গড়াগড়ি।
অকালের এই কালবৈশাখী ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে বেদিনী রে হাত ধর।
ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—ভয় নাই ভয় নাই,
এ মাঠ ছাড়িয়া চল রে বেদিনী আর কোন মাঠে যাই।
হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে আঁধারে আঁধারে চল—
আকাশে খেলায় নয়া নয়া সাপ পায়ের সাপুড়ে দল।

কি ভাবিস্ মিছে, আয় পিছে পিছে যা হবার তাই হোক্—
বেদে-বেদেনীরা ভয় পায় যদি—হাসিবে গাঁয়ের লোক। (সায়ম্)

এটা কি-জাতীয় কবিতা ? 'উত্তররাম-চরিতে' যেমন দেখিতে পাই, বাল্মীকির আশ্রমে একটা নূতন জন্তুর আবির্ভাব দেখিয়া লব-কুশ জীববিদ্যা-শাস্ত্রের লক্ষণ মিলাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—'অশ্বোহয়ম্ অশ্বোহয়ম্,' তেমনই আমাদের কাব্যবিদ্যা শাস্ত্রের লক্ষণ মিলাইয়া আমাদেরও বলিতে হয়, ইহা রোম্যাণ্টিক কবিতা। কিন্তু মজা এই, এত রোম্যাণ্টিক ধর্মোপেত হইয়াও ইহা আমাদের নিকট রোম্যাণ্টিক বলিয়া ধিক্কৃত ত নয়ই, বরং অভ্যর্থিত। ইহার কারণ, এখানকার সকল রোম্যাণ্টিক ধর্ম যুগধর্মের সহিত একটা আশ্চর্য সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছে ; ফলে খুব অবহিত হইয়া বিচার করিতে না বসিলে মোটের উপরে সব কবিতাটাকে রোম্যাণ্টিক বলিয়া সহসা গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা হয় না। বেদে-বেদেনীর অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত জীবনকেও আগাইয়া আসিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিবার একটা আকুল আগ্রহ দেখা দিয়াছে আমাদের ভিতরে ; তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বেদে-বেদিনীর বাস্তব জীবনের সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা, সব জুড়িয়া তাই জাগে যেন একটা রিয়ালিজম্-এর আমেজ। কল্পনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতে থাকে অজ্ঞাত জীবনের লীলা-চাঞ্চল্য—তাহার জটিল রহস্যময় পরিবেশ—অসীম অনিশ্চয়তা—অব্যবস্থিততা—আদিমতা—রিক্ততা ও রুক্ষতার মাঝখানে প্রেম-বৈচিত্র্যের বিস্ময় মহিমা ! কিন্তু যুগানুগত্যের ফলে সে মনে কোন বেসুরা আঘাত তোলে না ; বৃহত্তর জীবনের পারিপার্শ্বিকতার সহিত অন্তরঙ্গ যোগে সেও সানন্দ-গ্রাহ্য—এইখানেই তাহাতে রিয়ালিজম্-এর আমেজ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রোম্যাণ্টিসিজম্-এর বিরুদ্ধে বর্তমান কালে আমাদের মনে যে বিরূপতা উহা নিছক রোম্যাণ্টিসিজম্-এর বিরুদ্ধে নয়, যে রোম্যাণ্টিসিজম্ যুগ-মনের সহিত সুর রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না অভিযোগটা তাহার বিরুদ্ধে। এই যুগ-মনের সহিত অমিলটাই তাহা হইলে দেখিতেছি সকল বিরোধ অপ্রীতির মূলীভূত কারণ। রাজপুত্র-রাজকন্যাকে লইয়া সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে যে প্রেমের কল্পনা-বিলাস—যে নিদ্রিত স্বপ্নপুরী—সেই পুষ্পপেলব সজ্জা, স্বর্ণাভ বিহ্বলতা—তার ভিতরে সোনার কাঠি রূপার কাঠির স্পর্শজনিত ঘুম ও জাগরণ—যত সুন্দর ভাষা ও ছন্দে যত বিচিত্র করিয়াই তাহাকে লেখা যাক্ সে আর আজকের দিনের মনে সায় পাইবে না—যেখানে সে তাহার সেই সানন্দ-গ্রাহ্যত্ব হারাইয়া ফেলিল সেইখানেই সে ধিক্কৃত। কিন্তু সেই যে সাতসমুদ্র তেরনদী পারের স্বপ্নপুরীর প্রেম সে ত মানুষের জীবনে মরিবার নহে—সে যুগে রূপান্তর লাভ করিতেছে এবং আমার সন্দেহ, আজ সে ঐ বেদে-বেদেনীর ভিতরেই অনেকখানি আত্মগোপন করিয়া আছে। আমাদের মনোবৃত্তি এক দিন আমাদের ঘরের প্রেমকে সাতসমুদ্র তেরনদী পারের স্বপ্নপুরীতে নির্বাসিত করিয়া একটা গোপন তৃপ্তিলাভ করিত ছিল, সেই মনোবৃত্তির যুগানুগ সূক্ষ্ম রূপান্তরই কি আজ আমাদের প্রেমকে কালবৈশাখীর অখ্যাত অজ্ঞাত ঘাটে-মাঠে সরাইয়া দিয়া, বনে বাদাড়ে—বিরল বসতি পাহাড়ি মহুয়া বনে—অথবা মর্ত্যলোক হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন পদ্মার চরের আগাছার আড়ালে জলে ভেজা খড়ের ঘ[illegible]

ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া বিচিত্র রহস্যের সন্ধান করিতেছে? 'তেপান্তরের মাঠ' আজ ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছে কি?

কিছু দিন পূর্বে এক জন উগ্র আধুনিকতা-পন্থী এবং বাস্তববাদী কবি-লেখকের সঙ্গে কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন, সব সময় তাঁহার কবিতার স্ফূর্তি হয় না, তাহার একটা অনুকূল আবহাওয়ার প্রয়োজন। মনে করা যাক্, কলিকাতা শহরের একটি ঘিঞ্জি গলিতে অন্ধ গলি—তাহার ভিতরে একটি ছ্যাতলা-পড়া ফাটা দেয়ালের পোড়ো বাড়ির ভিতরে একটি প্রেস—পায়ে ঠেলা একটা অতি পুরাতন যন্ত্রে ঘড়ড়্-ঘড়ড়্ শব্দে দেওয়াল কাঁপাইয়া রাজচক্ষুর অন্তরালে ছাপা হইতেছে নিষিদ্ধ পুস্তিকা—প্রতি মুহূর্তে রাজপুরুষের শুধু আগমন নয়, দস্তুর মত আবির্ভাবের আশঙ্কা—ঠিক যেন একটা 'পতিত পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্'-এর ভাব! ইহার ভিতরে কেরোসিনের ডিবি জ্বালাইয়া একটা হাত-ভাঙা বা খোঁড়া চেয়ারে বসিয়া চারি দিকের বদ্ধ হাওয়া ও সোঁদা গন্ধের ভিতরে কলম ধরিতে পারিলেই তাঁহার কবি-মন জাগ্রত হইয়া যথার্থ সক্রিয় হইয়া ওঠে। তাঁহার সাধনার কৃচ্ছ্রতার প্রতি সকল শ্রদ্ধা-সহানুভূতি সত্ত্বেও আমার মনে একটা কথা উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল, সম্প্রদায় বিচারে তিনিও এক জন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' না কি?

রিয়ালিজ্ম্-এর প্রসঙ্গে এতক্ষণ রোম্যান্টিকতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলাম; এইবারে আদর্শবাদের কথা আলোচনা করা যাক্। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের রিয়ালিজ্ম্-এর ধারণার সহিত যুক্ত হইয়াছিল একটা পরম আসক্তির ভিতরে পরম নিরাসক্তির প্রশ্ন। বাহিরের জগৎটা—জীবনটার প্রতি একটা গভীর আকর্ষণ, অথচ তাহাকে গ্রহণ এবং প্রকাশের ভিতরে নিজেকে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া রাখা। এই জাতীয় রিয়ালিজ্ম্-এর বিরুদ্ধে এত দিন আমাদের যেটা তর্ক ছিল, সেটা সামাজিক জীব মানুষের চিত্তধর্মের পক্ষে ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এখন প্রশ্ন শুধু সম্ভাব্যতার নহে, সম্ভব হইলেও এখন প্রশ্ন যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার ঔচিত্য সম্বন্ধে। অথবা বলা যাইতে পারে, নিরাসক্তির প্রশ্নটাকে আজ-কাল আমরা অস্বীকার করি না, অস্বীকার করি তাহার প্রাচীন ব্যাখ্যাটাকে। নিরাসক্তির অর্থ 'শুধু অকারণ পুলকে' দেখার আনন্দে দেখা এবং প্রকাশের আনন্দে প্রকাশ নয়; আসক্তির অর্থ বৃহত্তর সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ আসক্তিকে সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত বৃহৎ আসক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত করিয়া দেওয়া। সাহিত্য বা শিল্প-ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার আধুনিক যুগে ইহাই গূঢ় তাৎপর্য। ব্যক্তি-চেতনা সেখানে লুপ্ত হয় নাই, সমাজ-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া অসীম বিস্তারের ভিতরে প্রায় নিরুপাধিক হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর সমাজবোধের উপরেই যেখানে রিয়ালিজম্-এর প্রতিষ্ঠা, সেখানে আদর্শনিষ্ঠার সহিত রিয়ালিজ্ম্-এর কোন বিরোধের প্রশ্ন উঠিতে পারে না; বরঞ্চ গভীর আদর্শনিষ্ঠাই সেখানে রিয়ালিজম্-এর প্রাণ। আদর্শবাদের সঙ্গে যেখানে রিয়ালিজম্-এর বিরোধ, সেখানে বুঝিতে হইবে, আদর্শ সেখানে সত্য-জীবনেরই নহে। সমাজ-জীবন হইতে আমরা যেখানে 'যোগভ্রষ্ট' আসলে আমরা সেখানে আদর্শভ্রষ্ট; সেই ভ্রষ্ট আদর্শকেই সাহিত্য ও সাধারণ শিল্পের মারফতে আমরা যদি সমাজ-জীবনের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাই, সেখানেই আসে বিরোধিতা; এই বিরোধিতাকেই আমরা ভুল করিয়া বলি, সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজ্ম্-এর সহিত আইডিয়ালিজ্ম্-এর বিরোধিতা। আসল জিনিসটা তাহা হইলে মোটামুটি গিয়া দাঁড়ায় এই, কোন একটি বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের সত্য আদর্শ লইয়া এবং সর্বতোভাবে সেই আদর্শ প্রচার করিতে, সেই আদর্শে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে যে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি তাহাই রিয়ালিষ্টিক্; আর যে সাহিত্য বা শিল্প যুগবিরোধী, অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের সত্য-জীবনের পরিপন্থী, তাহাই তথা-কথিত আইডিয়ালিজম্ বলিয়া ধিক্কৃত।

কথাটা একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আলোচনা করা যাক্। কথাশিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র একান্ত ভাবেই পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, এমন একটা কথার 'বহুল প্রচার' বাঙলা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়ান রহিয়াছে। কথাটাকে প্রচলিত ভাষায় রূপ দিতে গেলে বলিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র খানিকটা ছিলেন রোম্যান্টিক, আর অনেক অংশেই ছিলেন অসহ্য ভাবে আইডিয়ালিষ্ট; অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রে এই উভয়বিধ রাহুর কোনটারই কোনও স্পর্শ ঘটে নাই, তিনি তাই শুভ্র সমুজ্জ্বল অকলঙ্ক রিয়ালিষ্ট। আসলে কিন্তু কথাগুলি সর্বৈব মিথ্যা। শরৎচন্দ্র রোম্যান্টিক্ ছিলেন না এ কথাও সত্য নয়, আইডিয়ালিষ্ট ছিলেন না এ কথাও সত্য নয়। তবে এই জনশ্রুতিগুলির পিছনকার সত্য কি? সত্য এই, বঙ্কিমী ঢঙের রোম্যান্সটাও আজকাল আর তেমন ভাল লাগে না, তাঁহার আইডিয়াগুলিও এখন আর তেমন ভাল লাগে না; অপর পক্ষে শরৎচন্দ্রের রোম্যান্সটাও একটু বেশী ধাতসহ, আইডিয়াগুলির সঙ্গেও মনের সায় মেলে অনেক বেশী; ইহারই গলিতার্থে গিয়া সংক্ষেপে দাঁড়াইল, এক জন অসহ্য আইডিয়ালিষ্ট, অপর জন অসম্ভব রকমে রিয়ালিষ্ট। জীবনের রোমান্সকে শরৎচন্দ্র জীবনের আরও অনেক কাছে আনিয়া দিলেন,—শরৎ-সাহিত্যে তাই জীবনের রোমান্স আর বাস্তবতা পরস্পরে সর্বদাই পরস্পরের অনুপূরক হইয়া উঠিয়াছে। আর আইডিয়ালিষ্ট শরৎচন্দ্র আমার মতে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী। 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী এবং 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মীকে লইয়া আদর্শনিষ্ঠার যাহা বাড়াবাড়ি হইয়াছে সূর্যমুখী, ভ্রমর প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া আদর্শ-নিষ্ঠার বাড়াবাড়ি তাহা অপেক্ষা অনেক কম বলিয়া মনে হইয়াছে।

আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তিনিই ছিলেন যথার্থ রিয়ালিষ্ট। তাঁহার রোমান্স ধর্মের ভিতরে ছিল যুগানুকূলতা; আর তৎকালীন সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করিতেছিল যে শক্তিসমূহ তিনি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন; সেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অন্তঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয়-জীবনের আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার অকৃত্রিম সাধনা করিয়াছেন তিনি তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া। তিনি জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই আদর্শের প্রতি তাঁহার অটল নিষ্ঠা ছিল; কল্যাণময় সেই আদর্শে তিনি যে জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাই ত যথার্থ রিয়ালিষ্ট শিল্পীর কাজ। তাঁহার সাহিত্য যথাসম্ভব সব দিক হইতে যুগ-জীবনের সত্যকে বহন করিয়া আনিতেছিল, এই যুগ-জীবনের সত্যকে বহন করিয়া আনারই অর্থ হইল রিয়ালিজ্ম্।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের যে জীবন পঞ্চাশ বৎসর পরেও সে ঠিক তেমন ভাবেই অচল হইয়া থাকে নাই, থাকা উচিতও হইত না। নূতন সমাজ-জীবনের প্রবাহ নূতন নূতন সত্যকে—নূতন নূতন সমাজাদর্শকে বহন করিয়া আনিয়াছে; সেই নূতন সত্যের বাণী বহন করিয়াই শরৎ-সাহিত্য এক দিন রিয়াল্ হইয়া উঠিয়াছিল। জীবন-যাত্রার পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গেই আদর্শও বদলায়; সেই আদর্শের যে যুগোচিত পরিবর্তন তাহারই আমরা নাম দিয়াছি রিয়ালিষ্ট শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহের সুর।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজ-বিদ্রোহী; ইহাকে মিথ্যা ভাষণ না বলিলেও বলিব অসতর্ক ভাষণ। সমাজ-বিদ্রোহী শিল্পী কখনও রিয়ালিষ্ট হইতে পারেন না। বিদ্রোহ আসলে সমাজের সেই অংশটার বিরুদ্ধে, যে জীবনের পক্ষে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, অথচ জীবনকে সে তাহার কবলমুক্ত করিতে চাহিতেছে না। শরৎচন্দ্র সমাজকে যথার্থ কোন দিন ভাঙতে চাহেন নাই; যে নূতন সত্যকে সমাজ-জীবন বহন করিয়া আনিয়াছে—যাহার সন্ধান তাঁহার সূক্ষ্ম তীব্র সংবেদনশীল হৃদয়ের কাছেই ধরা পড়িয়াছে, তখন পর্যন্ত জনসাধারণের নিকটে গ্রাহ্য হইবার মতন রূপ পরিগ্রহ করে নাই—সেই সত্যের উপরে সমাজ-জীবনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। একটা বৃহৎ জাতির জীবনে প্রবাহের ঘূর্ণ্যাবর্তে কি সত্যের সঞ্চারণ হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন্ সত্যের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা প্রথমে আসিয়া সংবেদনের স্পন্দন তোলে যথার্থ শিল্পিচিত্তে, গণচেতনা হয়ত তখনও উদ্বুদ্ধ হয় না, অথবা জনগণ অস্পষ্ট অন্তর্বেদনাকে নিজেরাই তত্ক্ষণে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় যখন ঘটে একজন যথার্থ শিল্পীর আবির্ভাব, তখন সেই আবির্ভাব স্বভাবতঃই বহন করে একটা বিদ্রোহের সুর। সেই বিদ্রোহের সুরের ভিতরেই আছে রিয়ালিজ্‌ম্-এর পদধ্বনি।

হালে কিন্তু আবার শরৎচন্দ্রও ঠিক হালে পানি পাইতেছেন না। সমাজ-জীবনের আরও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রিয়ালিজম্‌ও কিন্তু একটু একটু করিয়া উবিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য হইয়া দেখা দিতেছে তাঁহার রোমান্সধর্ম এবং আদর্শবাদিতা। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের লেখক-ধর্মের সহিত আমাদের মনোধর্মের যে সাম্যটা, তাহাতেও ক্রমে ভাঁটা পড়িতেছে।

রিয়ালিজ্‌ম্-এর যে ধর্মের কথা পূর্বে আলোচনা করিলাম, তাহাই একটি স্পষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে আমাদের প্রগতিবাদী শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে। প্রগতিবাদী কথাটা অবশ্য আমাদের সাহিত্যে অতি শিথিল-প্রযুক্ত, সুতরাং শুধু 'দ্ব্যর্থক' নয়, 'বহ্বর্থক'। আমাদের দেশে কথাটার একটা মোটামুটি পারিভাষিক অর্থ আছে; সেই পারিভাষিক অর্থে প্রগতি-সাহিত্য বা প্রগতি-শিল্প অর্থ গণ-সাহিত্য বা গণ-শিল্প। জানি, রেহাই পাইবার উপায় নাই, খরতর প্রশ্নবাণ উদ্যত হইয়া আছে। বাঙলা দেশে গণ-সাহিত্য কথাটার অর্থ কি? ইহা কি গণের জন্য রচিত সাহিত্য, না গণকর্তৃক রচিত সাহিত্য, না গণ অবলম্বনে রচিত সাহিত্য? এ ক্ষেত্রে তর্কের অবকাশ প্রচুর; কিন্তু সেই পথ অবলম্বন না করিয়া সহজ সিদ্ধান্তের পথ গ্রহণ করিতেছি। সহজ সিদ্ধান্ত মতে গণ-সাহিত্যের সংজ্ঞা আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই, এখানে সাহিত্যিক এবং সাধারণ শিল্পীর মনে জনগণের পরম কল্যাণের একটি জীবনাদর্শ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এই জীবনাদর্শে অটল বিশ্বাস লইয়া সাহিত্য এবং সাধারণ শিল্পের মারফতে জনগণকে এই জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার ব্রত যাঁরা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই গণ-সাহিত্যিক বা গণ-শিল্পী। এই আদর্শটিকে হয়ত একটু উগ্ররূপে দেখিতে পাইতেছি আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে, সেই জন্য আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, জিনিষটা আর কিছুই নয়, সাহিত্যের শাশ্বত ধর্মের উপরে একটা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উগ্রচেতনার প্রতিক্রিয়া। খাঁটি গণ-সাহিত্যিক বা গণ-শিল্পীর পক্ষে কিন্তু এই আদর্শ শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শ নয়—সমগ্র-জীবনাদর্শ। সাহিত্য বা শিল্পের কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিছক রাজনৈতিক আদর্শ বলিয়া আজিকার দিনে কোন জিনিষ হইতে পারে না; রাজনীতি সমগ্র জীবন-নীতিরই একটি বিশেষ দিক্ মাত্র।

কিন্তু আদর্শ যাহাই হোক্, এ ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে বা শিল্পে খাঁটি উপাদানের অপ্রাচুর্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার কারণ এই, প্রগতিবাদী লেখক ও শিল্পি-গোষ্ঠীর ভিতরে যে পরম কল্যাণের আদর্শটি প্রচারিত আছে, তাহাকে একটা বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বানের মুখেই যেন আমরা অনেকখানি কুড়াইয়া পাইয়াছি, সেই বানের জল ঘাটের পুকুরে এবং চার দিকের খানা-ডোবায় এখন পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। প্রগতিবাদিগণের এই কল্যাণের পরমাদর্শটি হইল মুখ্যতঃ মার্ক্‌স্-প্রদর্শিত আদর্শ, পরে অবশ্য লেনিন্ এবং ষ্ট্যালিন্ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এবং আচরিত হইয়া সে ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। এই যে মার্ক্‌স্-পন্থা ইহাকে শুধু মাত্র একটি রাজনৈতিক পন্থা মনে করিলে ভুল হইবে, ইহা একটি বিশিষ্ট জীবন-পন্থা। কিন্তু আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই, রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহাকে হয়ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ইহাকে গভীর করিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ঠিক গ্রহণ করিতে পারিয়াছি বলা যায় না, অধিকন্তু গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনের একটা ঝোঁক আসিয়াছে। এই যে রাজনৈতিক-বোধ এবং জীবন-বোধের বিরোধ তাহার ফল সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রেও বেশ সহজবোধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই সাহিত্য এবং শিল্পের আদর্শ সম্বন্ধে সভা-সমিতিতে আমরা গাল ভরিয়া কথা বলি, সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাণ ভরিয়া তাহা করি না। অর্থাৎ কথা বলিলে বলিতে হয়, আমরা নিজেরা হয়ত মার্ক্‌স্-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, 'অন্তর্যামী'কে এখনও দীক্ষিত করিতে পারি নাই।

ফলে, এখন পর্যন্ত মার্ক্‌স্‌বাদে প্রতিষ্ঠিত রিয়ালিষ্টিক সাহিত্য বা শিল্প আমাদের দেশে খুব বেশী গড়িয়া ওঠে নাই। কিন্তু গড়িয়া উঠুক আর বেশী গড়িয়া উঠুক, মার্ক্‌স্‌বাদে প্রতিষ্ঠিত রিয়ালিজ্‌ম্ কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই মতে সাহিত্য বা সাধারণ শিল্প সৃষ্ট হইবে জীবন লইয়া; কোন ব্যক্তি-জীবন নহে,—সমাজ-জীবন লইয়া; কারণ ব্যক্তি-জীবনের সমাজ-নিরপেক্ষ কোন স্ব-তন্ত্র বা স্ব-ধর্ম নাই; উভয়ে জড়িত একান্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে। এই সমাজ-জীবন লইয়া সাহিত্য রচনা করিতে হইলে প্রথমে বুঝিতে হইবে, চারি পাশের এই সমাজ-জীবন কি ভাবে রচিত হইতেছে। শিল্পীর পক্ষে এই 'বোঝা' জিনিসটির অর্থ হইল সহজাত অসীম ...

দের ভিতর দিয়া প্রবহমান সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে ল্পের সূক্ষ্ম গভীর সংবেদনশীল চিত্তে অনুভব করা। এই সমাজ-জীবনকে নিরন্তর গড়িয়া-পিটিয়া একটি বিশেষ রূপ এবং ধর্ম দান করিতেছে গুলি অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই শক্তি সৃষ্ট কতগুলি পারিপার্শ্বিক হেতু-প্রত্যয়ের সমাবেশে, মার্কস্-এর মতে হার ভিতরে মুখ্য হইল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতি। সাহিত্যিক এবং সাধারণ শিল্পীর কাজ শুধুমাত্র কল্পনা-বিলাস নহে; তাহার কাজ একটি সমাজ-জীবনের আবর্তের ভিতরে প্রাচীন ধারার কি শক্তি কাজ করিতেছে, সেই প্রাচীন ধারার উপরে বিভিন্ন বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার সমাবেশে নিরন্তর কি নব নব শক্তির সারণ হইতেছে,—ইতিহাস-উৎসারিত এই সকল শক্তির দুর্বার গতি সমাজ-জীবনকে কোন্ পরিণতির দিকে টানিয়া লইতেছে; তার এই সঙ্গেই মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বজীবনের এত দিনকার ইতিহাসের আবর্তন এবং তজ্জনিত সমাজ-বিবর্তন কোন্ মঙ্গলময় আদর্শের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। নব নব সৃষ্ট সমাজ-শক্তিগুলির ক্রিয়াভিমুখিতাকে এই সর্বজনীন মঙ্গলের যে আদর্শ, তাহার দিকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া একাভিমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এ কাজ সমাজের কোন বিশেষ স্তরের বা বিশেষ বিভাগীয় লোকের নয়, এই কাজ মাঠের চাষীর, কলের মজুরের, পদস্থ রাষ্ট্রসেবকের—যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গীনধারী প্রতিটি সৈন্যের এবং তাহারই সঙ্গে ঠিক সমভাবে লেখনী-ধারী প্রতিটি লেখকের—তুলিকাধারী প্রতিটি শিল্পীর। সুতরাং সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে রিয়ালিজ্‌ম্-এর তাৎপর্য হইল, সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রিয়মাণ সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির যথার্থ পরিচয় চিত্ত-সংবেদনের ভিতর দিয়া গ্রহণ করা এবং সমস্ত প্রতিভার প্রয়োগে তাহাদিগকে সর্বজনীন পরমাদর্শের অনুকূল করিয়া তোলা। ইহাই চরম যুগানুবর্তিতা—ইহাই রিয়ালিজ্‌ম্-এর পরম আদর্শ।

এইখানেই একটি নূতন সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। দেখা যাইতেছে, একটা চরম 'অনুবর্তিতা'ই তাহা হইলে রিয়ালিজ্‌ম্-এর মূল কথা; আর প্রগতিবাদীদের মতে এই রিয়ালিজ্‌ম্-ই হইল সকল শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণ। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সমাজ-জীবন-প্রবাহের একটা চরম অনুবর্তিতাই গিয়া দাঁড়ায় শিল্প ও সাহিত্যের প্রাণস্বরূপে। কিন্তু এত দিন আমরা জানিতাম, মুক্তি—স্বাধীনতাই শিল্পের প্রাণ। আমরা জানিতাম, শিল্প ও সাহিত্য শিল্পী ও লেখকের স্বচ্ছন্দ আনন্দ-লীলারই অবাধ রূপায়ণ; শিল্পের কারখানায় শিল্পী নিঃসঙ্গ ও একক।

মার্কস্-পন্থিগণের মতে শিল্পের ক্ষেত্রে এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের ধারণাটাই একান্ত স্ববিরোধী। এই স্ববিরোধের অর্থ এই যে, এই স্ববিরোধের ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্রেই ইহা কোন দিন সম্ভব হইয়া ওঠে নাই; ইতিহাসের ক্ষেত্রে এত দিন এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের সম্ভাবনা এবং সংঘটনাই বেশী দেখা গিয়াছে; কিন্তু যুগে যুগে তাহাকে আমরা যতই রঙীন জমকালো করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি, সেখানে যে শিল্পের আদর্শচ্যুতি ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। জাতীয় সাহিত্য এবং শিল্প যতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহাকে নিপুণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, সেই সার্থকতার মূলে রহিয়াছে সাহিত্যিক বা শিল্পীর নিজের অজ্ঞাতেই সহজ শিল্পধর্মের প্রবর্তনাতেই অনেকখানি যুগ-জীবনের প্রতি অনুবর্তিতা; সেই কারণেই সে হইয়াছে সেই যুগের পক্ষে সহজ ও সানন্দ-গ্রাহ্য।

প্রগতিবাদিগণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই মুক্তি বা স্বাধীনতার পরিপন্থী নহেন; তাঁহাদের পরিপন্থিতা এই মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে আমাদের শিল্পবোধ বা শিল্পশক্তিই একটা গূঢ় সামাজিক বোধ-প্রসূত। শিল্পের মূল কথা প্রকাশ। সমাজবোধ ব্যতীত কখনও প্রকাশের তাগিদ আসে না। আদিযুগ হইতে বিভিন্ন শিল্পের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলেই এই সত্যটি ধরা পড়িবে। আজ আত্ম-প্রকাশের সকল তাৎপর্যকে যেখানে আত্ম-রতির ভিতরেই আমরা নিবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছি সেখানে সে পরিচয় দিতেছে আমাদের বিকাশের নয়, বিকারের; কারণ এই আত্ম-রতির বাসনা এবং তৎ-প্রণোদিত অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের মহিমা-কীর্তন আমাদিগকে আমাদের মূল অর্ধ—আমাদের সমাজ-সত্তা হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিতেছে। তাহা হইলে শিল্পের ক্ষেত্রে আসল মুক্তি কি? সমাজ-প্রবাহের অনুবর্তিতাই বন্ধন নয়, অন্ধ অনুবর্তিতাই হইল বন্ধন। যাঁহারা সমাজ-জীবনকে ঠিক জানেন না—তাহার গতি-প্রকৃতির সহিত কোনও পরিচয়ও নাই, অন্তরের যোগও নাই,—অথচ দুর্বার সমাজ-স্রোত অন্ধ নিয়তির মতন তাঁহাদিগকে সকল সচেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেগে টানিয়া লইতেছে—অসহায় ক্রীড়নকের মতন পরিবর্তনের প্রতিটি বাত্যাবিক্ষোভের দ্বারা দোলাইয়া মারিতেছে—শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহারাই যথার্থ বদ্ধ—পরাধীন। মুক্তি সমাজ-জীবনের প্রতি সচেতন অনুবর্তিতায়। সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি-লীলার প্রতিটি স্পন্দনকে যে নিজের অন্তরে ধারণ করিতে পারিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে অনুভব করিতে পারিয়াছে নিজের জীবন-ধারার সঙ্গে সেই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অখণ্ড যোগ—সে বুঝিতে পারিয়াছে, এই মোলাটে জটিল প্রবাহের ভিতরে কোথায় তাহার স্থান—কি তাহার শক্তি—সেই শক্তি লইয়া কি তাহার করণীয়। সমস্ত জিনিস জানিয়া-বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সানন্দে শিল্প-সৃষ্টির ভিতর দিয়াই বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে যে যোগ তাহাই হইল শিল্পীর স্বচ্ছন্দ-বিহার—ইহাই স্বাধীনতা—ইহাই মুক্তি। শিল্পীর সমগ্র জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় সত্য—ইহাই রিয়াল—ইহারই অনুবর্তনায় রচিত যে শিল্প তাহাই বহন করে রিয়ালিজ্‌ম্।

রিয়ালিজ্‌ম্ কথাটিকে নানা দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। কিছু কিছু মতবাদকে অনেকে হয়ত নিছক 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া বর্জনের সদুপদেশ দিবেন। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রের সকল সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিয়াও সকল আলোচনার ভিতরে একটা জিনিস প্রধান হইয়া উঠিতেছে, তাহা এই যে, রিয়ালিজম্-এর গোড়ার কথা যুগ-সত্য। ইংরেজি রিয়াল্ কথাটার বাঙলা 'বাস্তব' অর্থ অতিমাত্রায় স্থূল, 'রিয়াল্' কথাটার আসল অর্থ সত্য। যাহা সমগ্র যুগ-জীবনের সহিত গভীর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বৃহত্তর যুগ-মানসে 'সত্য'রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই রিয়াল্,—সে নিখুঁত বর্ণনাই হোক্—রঙীন কল্পনাই হোক্—বা গভীর আদর্শনিষ্ঠাই হোক। পাশ্চাত্য জগতে আজকাল এই অর্থে আর একটি কথার ব্যবহার দেখিতেছি, তাহা 'সিগনিফিক্যাণ্ট' (significant)। সব দিক হইতে যে শিল্প-রচনা যুগ-জীবনের পক্ষে সার্থক তাহাই রিয়ালিষ্টিক। রিয়ালিজ্‌ম্-এর তাই আমি অর্থ করিতে চাই—যুগ-সত্যবাদ।

কেশবচন্দ্র ও
ভারত-সংস্কার-সভা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

গত বারে আমরা ভারত-সংস্কার-সভার মাত্র দুইটি বিভাগের কথা বলিয়াছি; এবার বাকী তিনটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ

স্বদেশীয় নারীগণের বিদ্যোন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই এই বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে-কয়টি উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা—বালিকা-বিদ্যালয়, বয়স্থা-বিদ্যালয় ও শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন; মহিলাদের উপযোগী পুস্তক-পত্রিকা প্রকাশ এবং আলোচনা-সভার সূচনা।

এদেশে বহু বঙ্গনারী আছেন, যাঁহারা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যৎসামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া, বাল্যবিবাহের চাপে অন্তঃপুর-প্রাচীরমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিদ্যানুশীলনে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইচ্ছা সত্ত্বেও জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারেন না। এক দল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারিলে, এই শ্রেণীর অন্তঃপুরিকাগণ সানন্দে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন,—এ কথা ভারত-সংস্কার-সভা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভদ্র গৃহের বয়স্থা ছাত্রীগণকে শিক্ষাদান এবং তাঁহাদেরই মধ্য হইতে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতকরণ, এই উভয় লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সভা ১৮৭১, ১লা ফেব্রুয়ারি একটি "শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়" (Female Normal and Adult School) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমাবস্থায় অল্প দিনের জন্য ছাত্রীগণের বিদ্যালয়ে গমনাগমনের ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা ছিল; কেহ কেহ আবার নিজ ব্যয়েই বিদ্যালয়ে আসিতেন।

ছাত্রী: চৌদ্দটি ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়টির সূচনা হয়। ১৮৭১, ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ হয়; তন্মধ্যে কুমারী ৪, বিবাহিতা ১৭ ও বিধবা ৩ জন; সকলেই সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা। ১৮৭২, ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ৩০।

বালিকা-শ্রেণী: নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রীরা যাহাতে শিক্ষাদান-কার্য্য অভ্যাস করিতে পারেন, প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে ১৮৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যালয়টিতে একটি ক্ষুদ্র বালিকা-শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

১৮৭৩ সনের ১লা মে হইতে ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সহিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় (দ্রঃ—'বামাবোধিনী,' বৈশাখ ১২৮০)। গোড়াতেই এই বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ২৫।৩০ জন; অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ-ঘরের কন্যা।

পাঠ্য-তালিকা: আমরা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্য-তালিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

১ম শ্রেণী—M'Culloch's Course of Reading; The Landmarks of Ancient History; English Grammar. মেঘনাদবধ কাব্য, নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, ভূগোল, গণিত ও মনোবিজ্ঞান।

২য় শ্রেণী—Rudiments of Knowledge. রচনাবলী, মেঘনাদবধ কাব্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও গণিত।

৩য় শ্রেণী—চারুপাঠ ৩য় ভাগ, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ, ভূগোল, গণিত, First Book of Reading.

৪র্থ শ্রেণী—আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ, পদ্যপাঠ ১ম ভাগ, ভূগোল, বস্তুবিচার, গণিত, First Book of Reading.

৫ম শ্রেণী—চরিতাবলী, গণিত, First Book of Reading.

১৮৭৩ সনে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা হয়। "ভারত-সংস্কার-সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে (Music) সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে।" ('বামাবোধিনী পত্রিকা', চৈত্র ১২৭৯)

শিক্ষক: সভার প্রথম বার্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায়, প্রথম চারি মাস দত্ত-গৃহিণী ছাত্রীগণকে ইংরেজী ও সূচিশিল্প শিক্ষা দেন; তাহার পর মিস্ নিকোলসন্ প্রায় বর্ষশেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অপটু স্বাস্থ্যের জন্য বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতি দিন বিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগে শিক্ষকতা করিতেন; তাঁহার কার্য্যভার বৃদ্ধি পাইলে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য জুন (১৮৭১) মাস হইতে পণ্ডিত অঘোরনাথ গুপ্ত নিযুক্ত হন। "ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন" ('বামাবোধিনী,' ফাল্গুন ১২৭৭)।

সভার দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ, বর্ষারম্ভ হইতে শিবনাথ শাস্ত্রী, এম. এ. * ও গৌরগোবিন্দ রায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। মিস্ অ্যানেট্ এক্রয়েড (পরে বেভারিজ-পত্নী) জুন মাসে বিলাত হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিবেন—এইরূপ স্থির ছিল, কিন্তু শেষে তিনি অস্বীকার করায় অস্থায়ী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিসেস্ উইকন্স ঐ পদে স্থায়ী হন; তাঁহার সহকারিণী নিযুক্ত হন—মিস্ মুখার্জ্জী।

সরকারী সাহায্য: যে সময়ে ভারত-সংস্কার-সভা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সূচনা করেন, তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে বেথুন-বালিকা বিদ্যালয়ের সহিত একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল; উহার সাফল্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া ১৮৭২, ৩১এ জানুয়ারির পর সরকার উহা বন্ধ করিয়া দিবার নির্দ্দেশ দেন, এবং জনশিক্ষা-বিভাগের অধিকর্ত্তাকে জানান যে, বয়স্থা ছাত্রীগণের—বিশেষতঃ যে-শ্রেণী ছাত্রী কালক্রমে শিক্ষয়িত্রীর ব্রত গ্রহণ করিবে তাহাদের, সুষ্ঠু [illegible] শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত যে-কোন বে-সরকারী বিদ্যালয় আবেদন

---

* "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম এ ভারত-সংস্কার-সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞানবিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন ছাত্রীগণ তাহা লিখিয়া লইয়া পুস্তকাকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে [দ্রঃ ১২৮০—১২৮২] প্রকাশিত হইল।"—'বামাবোধিনী পত্রিকা,' কার্ত্তিক ১২৮২, পৃঃ ২১৭।

করিলে সরকারী সাহায্য লাভ করিতে পারিবে। কেশবচন্দ্র তাঁহার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করিলে, সরকার পরবর্ত্তী জুলাই মাস হইতে বার্ষিক দুই সহস্র টাকা সাহায্য দানে সম্মত হন, তবে কেশবচন্দ্রকেও সমপরিমাণ অর্থ বিদ্যালয়টির জন্য ব্যয় করিতে হইবে, এই সর্ত্ত থাকে।

এই সময়ে "শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে"র এই বিজ্ঞাপনটি 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় (অগ্রহায়ণ ১২৭৯, মলাট ৩য় পৃঃ) মুদ্রিত হয়:—

"ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২০০০ টাকা সাহায্য দানে স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহার সকল বিষয়ের নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা ইহার ছাত্রী হইতে অভিলাষ করেন, সত্বর আমার নিকট আবেদন করিবেন।

ভারত সংস্কার সভার অধীনে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা প্রণালী সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্র হইতে অন্যূন ১২টি ছাত্রী পাইলে আমরা এ বিষয়ের নিয়মাদি নিদ্ধারণ করিয়া প্রচার করিব।—শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক।"

স্থান-পরিবর্ত্তন: শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়টি প্রথমে পটলডাঙ্গায় অবস্থিত ছিল। ১৮৭২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে উহা কলিকাতার সাত মাইল উত্তরে বেলঘরিয়ার একটি সুরম্য উদ্যানে স্থানান্তরিত হয়। এখানে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ভারত-আশ্রমে'র অধ্যক্ষগণের সহায়তায় ছাত্রীগণ নীতিশিক্ষা ও সংদৃষ্টান্ত লাভের সুবিধা পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে বিদ্যালয়টি মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছি উদ্যানে স্থান লাভ করে। এই স্থানও কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী হওয়ায় অনেক ছাত্রীর অসুবিধা হইতেছিল। এই কারণে বিদ্যালয়টি শেষে কলেজ স্কোয়ারে স্থাপিত হয়।

বামাহিতৈষিণী সভা: ১৮৭১, ১৪ই এপ্রিল এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র (বৈশাখ ১২৭৮) নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে সভার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে:—

"ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের উৎসাহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা। বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুই বার হইবে। সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্যশ্রেণীমধ্যে গণ্য। সভাস্থলে স্ত্রীজাতির হিতজনক রচনা পাঠ, বক্তৃতা ও কথোপকথন হইবে। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন ভদ্র হিন্দুমহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের পত্নী বিবি ফিয়ার দর্শক হইয়া আইসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রথমতঃ বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন···কুমারী পিগট, ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ ও বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং উকীল বাবু দুর্গামোহন দাসের পত্নীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন।"

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী (পরে বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী) বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদক ছিলেন।

১২৭৮ সালের ১৭ই বৈশাখ মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছীর উদ্যানে কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে বামাহিতৈষিণী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক রাধারাণী লাহিড়ীর বার্ষিক বিবরণ প্রকাশ:—

"স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির নিমিত্ত ভক্তিভাজন বামাহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং স্ত্রীনর্ম্মাল ও বয়স্থা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহা স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে এই সভার তাবৎ কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সমস্ত ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে ইহাতে তাঁহাদিগকে কোন কোন অংশে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। এই সভার স্থাপন অবধি এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশব বাবু ইহার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতেছেন। নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রীগণ লইয়াই প্রথমতঃ সভা সংগঠিত হয়, তাঁহারাই ইহার সভ্যশ্রেণীরূপে পরিগণিত হয়েন। ১৩।১৪ জন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ২৪।২৫ জনে পরিণত হইয়াছে। সভাপতি এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় বলিয়াছেন নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত হইল।

১ প্রকৃত শিক্ষা, ২ প্রকৃত স্বাধীনতা, ৩ স্ত্রীলোকদিগের নিরুদ্যম ও উৎসাহহীনতা, ৪ লজ্জা, ৫ বিনয়, ৬ অভ্যর্থনা, ৭ সভ্যতা, ৮ পরিচ্ছদ, ৯ নম্রতা, ১০ অহঙ্কার, ১১ ক্রোধ, ১২ গৃহকার্য্য, ১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, ১৪ হিংসা, ১৫ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া।" ('বামাবোধিনী পত্রিকা,' বৈশাখ ১২৭৯)

বামাবোধিনী পত্রিকা: ১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে মহিলাদের উপযোগী এই মাসিক পত্রিকাখানি জন্মলাভ করে। নবম বর্ষে ইহা আলোচ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে আসে। এই নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (ভাদ্র ১২৭৮) লেখেন:—

"বামাবোধিনীর নবম বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্য-প্রণালী সুন্দরতর রূপে চলিবার জন্য একটি নূতন ব্যবস্থা হইল ইহাতে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। বামাবোধিনী বামাবোধিনী-সভার পত্রিকা এবং এত কাল সেই সভার সভ্যগণ দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইত। সভ্যগণ কার্য্যানুরোধে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়াতে যখন যিনি অবসর পাইতেন পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য করিতেন। এরূপ নিয়মে কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে চলে না বলিয়া বর্ত্তমান ভাদ্র মাস হইতে ইহার সম্পাদকীয় ভার ভারত সংস্কার সভার বামাকুলোন্নতি-সাধক (Female Improvement) বিভাগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পত্রিকার স্বত্ব যেমন বামাবোধিনী সভার ছিল সেইরূপ থাকিবে। ইহার লিখনাদি কার্য্য কেবল ভারত সংস্কার সভার উক্ত বিভাগ হইতে সম্পন্ন হইবে। এই স্থলে বক্তব্য, বামাবোধিনী সভার যেরূপ উদ্দেশ্য, এই বিভাগেরও সেইরূপ উদ্দেশ্য। বামাবোধিনী সভা যেমন কোন সম্প্রদায়ের অনুগত না হইয়া উদার ও স্বাধীনভাবে স্ত্রীজাতির হিতকর প্রস্তাব সকলের আলোচনা করিতেন এবং বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান

ও নীতিশিক্ষা দিতেন, এ বিভাগও সেইরূপ করিবেন। বস্তুতঃ নূতন ব্যবস্থা হইল বলিয়া বামাবোধিনীর মূল মত ও ভাবের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ করিবার কারণ নাই।"

এই সময়ে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র গ্রাহক-সংখ্যা ছিল—৪০০। কিন্তু বৎসর কালের মধ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০ হইয়াছিল; ইহাতে সুন্দর সুন্দর কাঠখোদাই চিত্র (১ খানি ত্রিবর্ণ চিত্রও আছে) দেওয়ায় গ্রাহকগণের নিকট বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সময়ে সময়ে মহিলাদের যে সকল গদ্য-পদ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার উৎকৃষ্টগুলি একত্র করিয়া 'বামা রচনাবলী' নামে ১৮৭২ সনে প্রচারিত হয় পুস্তকখানি বামাগণের মানসিক উন্নতির পরিচায়ক।

শিক্ষা-বিভাগ

শিক্ষা-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল—শ্রমজীবী শ্রেণীকে ইংরেজী ও বাংলা, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিল্প শিক্ষা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭০, ২৮এ নবেম্বর তারিখে কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাটীতে সভা করিয়া দুইটি বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙালী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজ ফিয়ার সাহেব সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যালয় দুইটি—একটি নৈশ, একটি প্রাতঃকালীন—প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কার্য্যালয়ে অবস্থিত ছিল; ১৮৭১, ১লা সেপ্টেম্বর হইতে উহা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সম্মুখস্থ ৫৩ নং কলেজ স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হয়।

শ্রমজীবীদিগের বিদ্যালয়: "ইহাতে কারিকর দোকানদার চাকর প্রভৃতি যে সকল লোকের সমস্ত দিন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় এবং পড়িবার অবকাশ নাই, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে। এমন লোক আমাদের দেশে অনেক আছে। ইহারা গরিব, সুতরাং ইহাদের শিক্ষার জন্য কাহাকেও বড় চেষ্টা করিতে দেখা যায় না। ইহাদের নিজেদেরও তেমন যত্ন নাই। সমস্ত দিন খাটিয়া রাত্রিতে আলস্য হয়, কেহ বা ইয়ারের দলে মিলিয়া মদ গাঁজা খায় ও জঘন্য আহ্লাদ করিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করে। এমন লোক যাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয় এজন্য আমরা খুব অনুরোধ করিতেছি। সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা বৈ ত নহে। একটু পরিশ্রম করিলে অনেক উপকার হইবে। ঐ বিদ্যালয়ে অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রভৃতি নানা বিষয়ে সহজ ভাষায় উপদেশ দেওয়া হইবে, এবং যাহাতে সাধারণের মনোনীত হয় এমন উপায় করা যাইবে। ভাল ভাল ছবি, বই, মানচিত্র, এবং শিক্ষার অন্য অন্য সামগ্রী সেখানে রাখা হইবে, ইচ্ছা হইলে তথায় যাইয়া সন্ধ্যার সময় সকলে উহা দেখিতে পারেন।" ('সুলভ সমাচার,' ৪র্থ সংখ্যা, ২২ অগ্রহায়ণ ১২৭৭)

এই নৈশ বিদ্যালয়ে প্রথম সপ্তাহে তিন দিন—সোম, বুধ ও শনিবার এবং ১৮৭১ সনের এপ্রিল মাস হইতে প্রতি দিন (রবিবার ও ছুটি ছাড়া) অপরাহ্ন ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা এইরূপ ছিল:—

১ম শ্রেণী—Azimgurh Reader, Third Book of Reading, Geography of Asia, History of India, Charupat 1, Arithmetic as far as Addition of Fractions.

২য় শ্রেণী—Second Book of Reading, History and Geography (oral lessons), Charupat 1.

৩য় শ্রেণী—কবিতাবলী, বোধোদয়, শিশুশিক্ষা ২য় ভাগ, অঙ্ক—গুণ পর্য্যন্ত।

প্রথম বর্ষে বিদ্যালয়ের ঊর্দ্ধতম ছাত্র-সংখ্যা ছিল—৮১; দ্বিতীয় বর্ষে—৬৫।

শিল্প বিদ্যালয়: "ইহার কার্য্য প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমাধা হইবে। ইহাতে ছুতরের কার্য্য, সেলাই, ছবি আঁকা, ঘড়ি মেরামত, এবং ছাপাকার্য্য নিয়মিতরূপে শেখান হইবে। যাঁহারা কেরাণীগিরি করিয়া দশ বার টাকার জন্য সমস্ত মাস পরিশ্রম করেন এবং অধীনতার যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাঁহারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিবেন। ভদ্র লোকেরা এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কেবল যে তাঁহাদের নিজের উপকার হইবে তাহা নহে, ঐ সকল ব্যবসায়েরও উন্নতি হইবে। তাঁহারা ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের নূতন ও ভাল প্রণালীতে ছুতরি, সেলাই প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারিবেন। ইহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?" ('সুলভ সমাচার,' ৪র্থ সংখ্যা)

শিল্প বিদ্যালয় প্রথমে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল,—ছুতরের কাজ, সেলাই, ঘড়ি-মেরামত, ছাপা, লিথোগ্রাফি ও এনগ্রেভিং। সপ্তাহের প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে এক এক বিভাগের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রগণের মাসিক দেয় ছিল মাত্র ।০ আনা। কিন্তু এতগুলি বিভাগের কাজ সন্তোষজনক ভাবে পরিচালন করা সহজসাধ্য নহে। এই কারণে কিছু দিন পরে শেষোক্ত তিনটি বিভাগ বর্জ্জিত হয়, এগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রও আকৃষ্ট হয় নাই। সঙ্কীর্ণ সময়ে শিক্ষাদান-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে না দেখিয়া বর্ষ (১৮৭০) শেষার্দ্ধে অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্তের আয়োজন করা হয়, ১লা জুলাই হইতে সেলাই-বিভাগ ও ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ঘড়ি মেরামত বিভাগ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খোলা থাকিত। কিছু দিন পরে এই ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়; ১৮৭১, ১লা আগষ্ট 'সুলভ সমাচারে' এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়:—

"ভারত-সংস্কার-সভার শিক্ষা বিভাগে লোককে কোন ব্যবসায় ও শিল্পকার্য্যে নিপুণ করিবার উদ্দেশ্যে মৃজাপুর ১৩ নং বাটীতে ঘড়ির, দরজির ও ছুতর মিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা স্বতন্ত্র নিয়মে চলিতেছে। ছুতরের কাজ প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এবং দরজির কাজ প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। যাঁহারা এই দুই কাজ শিখিতে চান তাঁহারা বিনা বেতনে শিখিতে পারেন। কিন্তু ঘড়ির কর্ম্ম শিখিতে চাহিলে মাসে আট আনা বেতন দিতে হইবে। ইহার শিক্ষা প্রাতে রবিবারে দুইটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।"

বিদ্যালয়ের আয় হইতে ইহার ব্যয়সঙ্কুলান সম্ভব ছিল না। কারণে ছাত্র ও শিক্ষকগণ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ও ফরমাস মত দ্রব্যাদি তৈয়ার করাইয়া সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা দ্বা-

দিকে যেমন শিক্ষাদান-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিত, অপর দিকে নষ্ট আবার আয়ের পথও প্রশস্ত হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, শিল্প বিদ্যালয়টি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে [illegible] নাই। ভারত-সংস্কার সভার দ্বিতীয় বার্ষিক (১৮৭২) বিবরণে [illegible]শ :—

"The Committee regret the absence of sustained interest in the manual arts and of an appreciation of their utility among those for whom the School was intended, and the consequent falling off in the number of pupils. The only Department which continues to draw pupils and is in an efficient working condition is the Clock and Watch Repairing Department. The Carpentry class has been retained simply as a source of income to meet the expenses of the School."

দ্বিতীয় বর্ষে (১৮৭২) ভারত-সংস্কার-সভার শিক্ষা বিভাগের [illegible] আরও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী [illegible], উচ্চতর শ্রেণীর জন্যও আর একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ভার [illegible] গ্রহণ করেন ; উহা—

ব্যালকাটা স্কুল : ১৮৬২, ১লা মার্চ প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের [illegible] এবটি প্রাচীন গৃহে 'ক্যালকাটা কলেজ' নামে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ সালের জুলাই মাসে ইহা ভারত-[illegible] পরিচালনাধীন হয়। প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে [illegible] দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণে এইরূপ বলা হইয়াছে—"The only distinguishing features of the institution which deserve notice, are the comparatively moderate rates of schooling fees and the especial importance attached to moral discipline and instruction in physical sciences." ১৮৭২ সনের ৩১এ ডিসেম্বর [illegible] শিক্ষায়তনের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৩২৮। প্রথম বর্ষেই [illegible] হইতে পারিয়াছিল ; ইহা স্কুলটির জনপ্রিয়তার পরিচয় [illegible]।

দাতব্য-বিভাগ

[illegible] ছাত্রবর্গকে বেতন ও পুস্তক দানে বিদ্যাশিক্ষায় সহায়তা [illegible] পরিবারকে আর্থিক সাহায্য, বিধবা পিতৃহীন ও দুঃস্থ [illegible]বারকে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দান, অনাথ আতুরকে [illegible] বিতরণ—এই বিভাগের কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত ছিল।

[illegible] সনের জুলাই মাসে বেহালা ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে যে [illegible] ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়, তাহার [illegible] সভার দাতব্য-বিভাগ উদাসীন ছিলেন না। এই [illegible] বহু রোগী আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি [illegible]। যাঁহারা সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, [illegible] মধ্যে মেডিক্যাল কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রাক্তন [illegible] পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় চারি মাসব্যাপী সেবাকার্য্যে ভারত-সংস্কার-সভার ১২৪১৵৹ ব্যয় হইয়াছিল। [illegible] বাহাদুর একাই [illegible] সভাকে [illegible] ছিলেন। সভা তাঁহাকে 'অনারারি মেম্বর' নির্বাচিত করিয়া সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করেন নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে (১৮৭১—৭২) দাতব্য-বিভাগ দরিদ্র ও অসহায় জনকে যথাক্রমে ৫০০৲ ও ৪৭৪৲ অর্থ সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। সাহায্যলাভকারীদের সংখ্যা এইরূপ :—

	মাসিক দান		সাময়িক দান	
	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ
ছাত্র	১৩	১৫	২২	—
বিধবা	৬	৬	৩	—
দুঃস্থ পরিবার	৮	১০	৬২	—
অন্ধ	৭	৮	৬	—

বিবিধ

ভারত-সংস্কার-সভার পাঁচটি বিভাগের কর্ম্মসূচীর উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া পতিতাদের আশ্রম, অশ্লীল চিত্রাদি বিক্রয় ও জুয়াখেলা নিবারণ, মদ্যবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর একটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ; উহা—

হিন্দু বালিকাগণের বিবাহযোগ্য বয়স : বাল্যবিবাহ-রূপ কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইলে অগ্রে হিন্দু বালিকাদের বিবাহযোগ্য বয়স নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন—এই উদ্দেশ্যে সভার সভাপতিরূপে কেশবচন্দ্র ১৮৭১, ১লা এপ্রিল খ্যাতনামা হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ চিকিৎসকগণের অভিমত জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ বিশেষ বিবেচনা সহকারে যে বয়সের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

	বিবাহের সর্ব্বনিম্ন বয়স	বিবাহযোগ্য বয়স
ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী …	১৬	২১
" জে. ফেরার …	১৬	১৮ বা ২০
" জে. ইউয়ার্ট …	১৬	১৮ বা ১৯
" চন্দ্রকুমার দে …	১৪	—
" নর্ম্মান চীভার্স …	১৬	১৮
" টি. ই. চার্লস্ …	১৪	—
" মহেন্দ্রলাল সরকার …	১৬	—
" তমিজ খাঁ বাহাদুর …	১৬	—
" ডি. বি. স্মিথ …	১৬	১৮ বা ১৯
বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু …	১৫	১৮
আত্মারাম পাণ্ডুরং (বোম্বাই) …	২০	—
ডাঃ এ. জি. হোয়াইট (বোম্বাই) …	১৫-১৬	১৮

এই প্রসঙ্গে ভারত-সংস্কার সভা দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

"The Committee rejoice to find that the medical opinions elicited in the preceding year regarding the marriageable age of native girls have not been without their effect on

public opinion. In compliance with the wishes of a large body of Brahmos and other educated natives, the Legislature passed an *Act, on the* 19th *of* March 1872, to provide a form of marriage for dissenters, under which girls cannot marry unless they have completed the age of fourteen. Such legislative restriction on the marriageable age of girls cannot but produce most salutary effects."

উপসংহার

ভারত-সংস্কার-সভা কোনরূপ ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয় নাই; অসাম্প্রদায়িক ভাবে দেশের শুভোন্নতি সাধনই উহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কেশবচন্দ্র এই কর্ম্মে প্রেরণা লাভ করেন—বিলাত ভ্রমণ হইতে; তথায় জনসেবাকল্পে সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারত-সংস্কার-সভা অন্ততঃ দশ বৎসর জীবিত থাকিয়া সাধ্যমত জনকল্যাণ সাধন করিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা—কেশবচন্দ্রের জীবনের একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

নিজের আঁকা নিজের ছবি —সুভো ঠাকুর অঙ্কিত
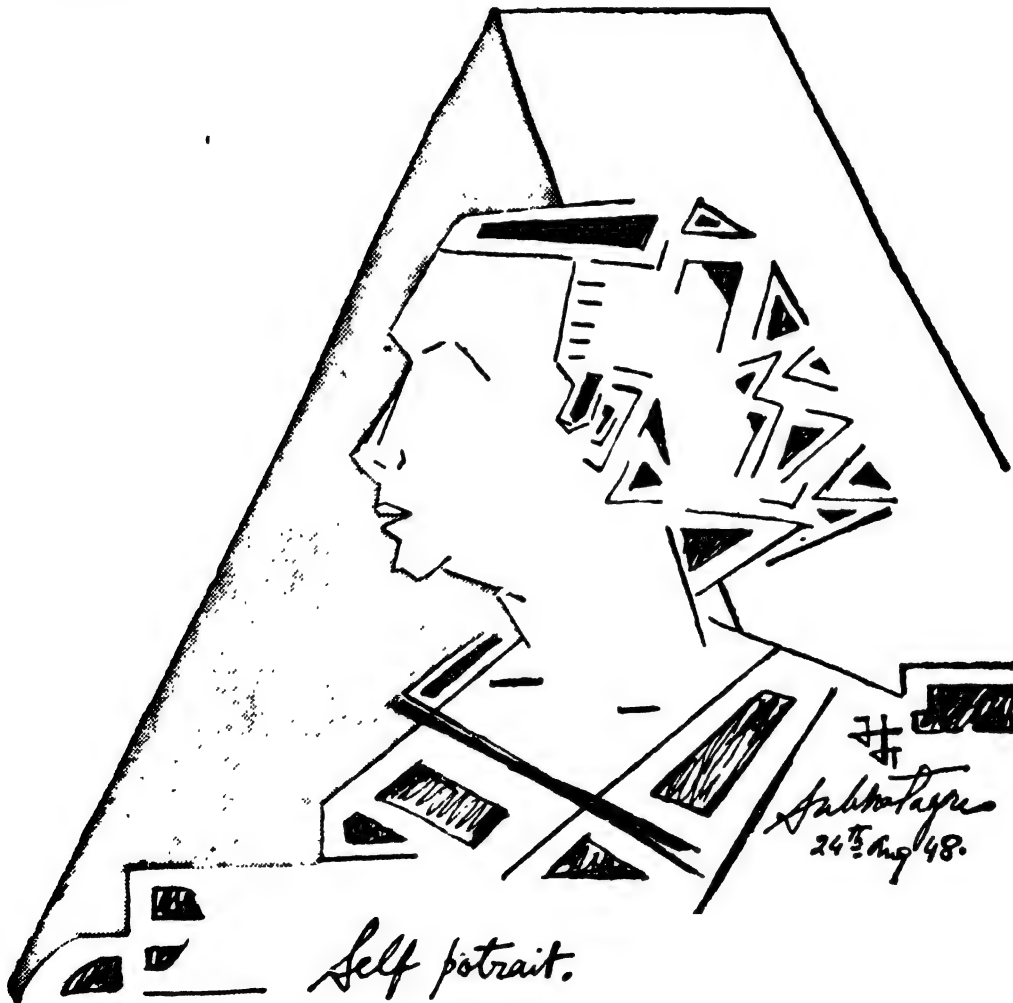
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গদ্য রচনা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রেমের সাধক, রসের পিয়াসী, রূপের পূজারী এবং সুন্দরের উপাসক। তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে। তাঁহার মতে "রস বিচারের বিষয় নহে, অনুভূতির বস্তু।" "সকল কলাকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কলাকলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনই সার্থক হইতে পারে না।" রস-সাধন না হইলে রস-সৃষ্টিও বিড়ম্বনা।" এই উদ্ধৃতিগুলি দিলাম "রূপান্তরের কথা" হইতে। রূপান্তরের কথায় তিনি আমাদের ইহাও শুনাইয়াছেন,—

"যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহাই যে অনন্ত, স্বাধীন। যাহা স্বাধীন, তাহাকে তোমার মাপের রশি দিয়া বাঁধিতে পারিবে না; যাহা অনন্ত, তাহাকে তোমার মাপকাঠি দিয়া পরিমাণ করিতে পারিবে না।

"তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম—অখণ্ড অনন্ত প্রেম। ভাব যেমন আপনার ভাবে গলিয়া আকারের ছাঁচে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, তেমনি জীবনকে সেই প্রেমে ঢালিয়া দিলে তবেই জীবনের সত্য রূপটি ধরা দেয়।"

এই প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তিনি দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়া এক ভক্তের হৃদয় লইয়া। তিনি বলিয়াছেন :—

"জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে তবে তাহা প্রেম, প্রেমে এই মূর্তি-স্রোতের জন্ম, প্রেমেই এই প্রাণ-স্রোতের চঞ্চলতা। সারা বিশ্ব এই প্রাণ-স্রোতে মূর্তির পর মূর্তি, রূপের পর রূপ এই লীলা-চঞ্চল ... অবিরাম প্রাণ-স্রোতে টলমল করিতেছে। সেই ... মূরতি-স্রোতের সঙ্গে প্রাণের নিঃসঙ্গ পরিচয়-লাভই ... দিক। রূপের ভিতর দিয়া প্রাণের এই লীলামূর্তির ... যখন ধ্যানগত হয়, তখন সেই মূর্তির সহিত অহৈতুকী পরিচয় ... সেই নিজের মাধুরী সেই মূর্তি-স্রোতের ভিতর আস্বাদন হয়। ... সত্য রূপান্তর।"

সুন্দরের উপাসক চিত্তরঞ্জনের মতে,—"সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কলাকলার সৃষ্টি।" এই সুন্দর যে কি, তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন তিনি এই ভাবে :—

"... বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত' জড় নয়, জড়তা আমার মনের মধ্যে, তাই ... ধামের রূপ-মাধুর্য্যের ভিতর সুন্দরকে ব্যভিচারী দোষে দুষ্ট ... বলি। অঙ্গসমূহের যখন অঙ্গাঙ্গি ভাবে যাহার যথাযোগ্য ... রূপসৃষ্টি হয়, আর, সেই রূপের ভিতর তাহার আত্মার মধুর ... জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। তাই সুন্দরের জন্য প্রাণ ... ব্যাকুল হয়। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের প্রাণের ... তেমনই স্বাভাবিক ভাবের মিলন হওয়া চাই। যখন মনকে ... মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তখনই সুন্দর, সুন্দর হয়। এই ... প্রকাশ করিবার জন্যই কলাকলার সৃষ্টি। মানব অন্তঃ- ... ভিতর যে ভাবরাশি ঘুমাইয়া থাকে, মানুষের মনে যে গভীর ... গুলি লুকাইয়া আপনি খেলা করে, তাহার প্রাণের ভিতরে ... সঙ্কল্প-বিকল্প, যত দ্বন্দ্ব, যত দ্বৈতের জঞ্জাল, দৈন্য-বিরোধ, যত ... সোহাগের মাধুর্য্য, তাহার বেদনা, তাহার যাতনা, তাহার ... অনুরাগ, তাহার ভাব-অভাব, মহাভাব এই সব দিয়া আমাদের ... জীবনের যে অনুভূতি, জীবনচক্রের এই মহা পরিধির ভিতরে মানুষ যেমন করিয়া বাঁচে, যেমন করিয়া মরে,—এই জাগ্রত ভাবের রূপ ধরিয়া সৃষ্টি করাই কলাকলার উদ্দেশ্য। আর সেই রূপের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দ-ঘন-চিন্ময় কেমন প্রতিরূপ হইয়া ভাঙ্গা-গড়ার লীলা লীলায়িত ভাবে আমাদের প্রাণ-মন-দেহ দিয়া সাধন করিতেছেন, তাহারই প্রকাশ করা, সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া তোলাই কলাবিদের প্রাণের সৃষ্টি-কাহিনী।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্র উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র তাঁহার রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধুর সহিত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারাবন্দী ছিলেন। কারাবাস কালে দেশবন্ধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে কয়েক মাস শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। কারাগারে দেখিয়াছি, রোগশয্যায় তাঁহার সেবা-যত্নের যাবতীয় কাজ সুভাষচন্দ্র নিজ হস্তে করিতেন। গুরু-শিষ্য উভয়ে একই ঘরে থাকিতেন। দেশবন্ধুর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাইবার বেশী সুযোগ সুভাষচন্দ্র তৎকালে কারাগৃহেই পাইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি লিখিয়াছেন :—

"ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজ কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে, নিজে ভাষা করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

নয়

চিত্তরঞ্জনের ছোট গল্প রচনায়ও যে সুন্দর হাত ছিল, তাঁহার "ডালিম" গল্পটি পড়িলেই বুঝা যায়। বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যে ইহাই তাঁহার একমাত্র দান। একটি পতিতা নারীর কাহিনী লইয়া গল্পটি রচিত। গল্প লেখার কলা-কৌশল যা' আর্ট তাঁহার আয়ত্ত ছিল— ভাষার ত' কথাই নাই। কিরূপ অসহায় হইয়া এক অসহনীয় অবস্থায় পড়িয়া বাঙ্গালী ভদ্র-গৃহস্থের এক তরুণীকে স্বামীর বাড়ির হইতে হইয়াছিল এবং পরে পতিতা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহারই করুণ বেদনা-ভরা কাহিনী তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের "মালঞ্চ" কাব্যের "বারবিলাসিনী" কবিতা

পাঠ করিলে যেমন সেই বারবনিতার প্রতি সমবেদনা জাগে, তেমনই এই গল্পটি পাঠ করিলেও পতিতা নারী ডালিমের ব্যর্থ ও ব্যথিত জীবনের কথা ভাবিয়া প্রাণ বেদনায় ভরিয়া উঠে।

চিত্তরঞ্জনের লেখার আর একটা বিশেষত্ব এই যে, তিনি অল্প কথায় বেশী ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। "বঙ্কিম-প্রতিভা" শীর্ষক ছোট একটি প্রবন্ধ হইতে ইহার পরিচয় দিতেছি। প্রবন্ধটির আরম্ভে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই বঙ্কিম-প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়া গেছে। তিনি বলিয়াছেন :—

"বঙ্কিমচন্দ্র শুধু এক জন ব্যক্তি নহেন—যদিও তিনি খুব ব্যক্তিত্ব-শালী পুরুষই ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই-ই।

......"বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর Europeএর সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম-সাহিত্য—আত্মস্থ, সমাহিত, তেজঃপূর্ণ অথচ প্রশান্ত ও গভীর। ইহা সমুদ্রবিশেষ।"

এইরূপ চিত্তরঞ্জনের "স্বাগতম্" শীর্ষক সন্দর্ভটির আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, "স্বাগতম্" বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ঢাকা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। চিত্তরঞ্জনের গদ্য রচনার মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। গোটা প্রবন্ধটিকে এক খণ্ড সাহিত্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে ঢাকা নগরী, বিক্রমপুর ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা আছে, ঐতিহাসিক বিবরণ আছে, লুপ্ত গৌরব ও গর্ব্বের কাহিনী আছে; কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিজস্ব রচনা-রীতি ও প্রকাশভঙ্গী সে আবেগময় প্রাণস্পর্শী মধুর ভাষা রচনার সর্ব্বত্র কোথাও নষ্ট করে নাই। "স্বাগতম" হইতে নিম্নে উদ্ধৃতি দিতেছি।

আজ সংক্রান্তির ক্লান্তিপাত পড়িয়াছে, বর্ষ ওই চলিয়া যায়, 'নূতন' তাহার বালোজ্জ্বল বিভায় মহিমময় হইয়া আমাদের ঘরে অতিথি হইতে আসিয়াছে, আজ সেই কবেকার গৌড়ের আঙ্গিনায় সেই পুরাতন আবার নূতন হইয়া আসিয়াছে। তাই আজ বলিতেছি, হে আমার পুরাতন, হে আমার নূতন, স্বগৃহে স্বাগতম! এই গৃহের বক্ষে পিতৃ-পিতামহের পদারবিন্দের রেণুকণা আছে, এই ধূলি মস্তকে গ্রহণ কর, এই আয়ুষ্মান্ বায়ুতে তাঁহাদের নিশ্বাসের গন্ধ আছে, প্রাণ ভরিয়া মাখিয়া লও, এই পদ্মা-গঙ্গার জলধারায় তাঁহাদের তর্পণ হইয়াছে, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন, আজি আমরা তাঁহাদের স্মৃতির স্মরণে ধন্য হইব।

"কত দিনের এ দেশ! কত সভ্যতার কাহিনী এই ধূলিতে তাহার চরণ-চিহ্ন রাখিয়া গেছে, কত দান-সাগর এই পদ্মা-সাগরের তীরে তীরে ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ছড়াইয়া গেছে, কে আজি তাহার সে স্মৃতির ধ্যান করে। কিন্তু স্মৃতি আত্মস্থ হইতে শিখায়, প্রতি ব্যষ্টিতে চৈতন্যের আভাস জাগাইয়া দেয়, তাই স্মরণ পুণ্যকথা। সেই পুণ্যকথার শ্রবণে মনুষ্য-জন্ম ধন্য হয়, তাই আজ মাতৃ-মন্দিরে সেই পুণ্যকাহিনী শুনিতে আমরা মিলিত হইয়াছি। মাতৃরূপা এই শ্যামলা জননীকে বার বার নমস্কার করি।

"আপনারা আজ যে গৃহের আঙ্গিনায় সবে সমবেত হইয়াছেন, কত ইতিহাস তাহার আছে। কত আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কত ঘোর অমানিশার কাহিনী, তাহার অঙ্গে সঙ্গে জড়াইয়া আছে। দুর্দ্দাম দুর্ব্বার পদ্মার ভাঙ্গন, কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত ভাঙ্গিয়াছে। পদ্মার ভাঙ্গন ও গড়ন আজিও থামে নাই; কিন্তু যে ইতিহাস সে একবার গড়িয়াছে, সেই পৃষ্ঠা সে নিজেই আবার ধুইয়া-মুছিয়া ফেলিয়াছে। আপনারা আজ যেখানে আসিয়াছেন, অশ্রান্ত-বারি-বিস্তার পদ্মা আপনাদের বুকে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু পদ্মার সে গৌরবের দিন নাই, হে অতিথি! হে নারায়ণ! সে—

* * * * জলপাত্র, দিব্যাসন,
সুবঙ্গ-কম্বল, বহু প্রকার বসন,
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে—

তাহা আর নাই।

"কাল আমাদের ভাগ্যহীন করিয়াছে। চিরদিনই কিন্তু আমরা এমন ছিলাম না। ইতিহাস আলোচনার অবসর এখন নয়। আর আমি ইতিহাস-ব্যবসায়ীও নহি। আমি সেই পরশমণির খোঁজেই ছুটিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রাণ-ধর্ম্মের আমি কাঙ্গাল। ইতিহাস সেই প্রাণধর্ম্মেই ভিত্তি করে, সেই প্রাণধর্ম্মের ইতিহাসেই জাতির প্রাণের সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। দেশমাতৃকার ক্রোড়ে সন্তান চিরদিনই সেই প্রাণের স্নেহরসে জীবিত থাকে। সেই প্রাণধর্ম্মের পরিচয় মা'র আশীর্ব্বাদে প্রাণের অনুভূতিতেই আসে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে সে সুর ধ্বনিয়া উঠে, সন্তান মা'র স্নেহের সত্য পরিচয় লাভ করে। সেই প্রাণধর্ম্মের দিক হইতেই এই ডাক আমার আসিয়াছে: মা আমাকেও ডাকিয়াছেন, আপনাদের সেবার জন্য; মা আপনাদের ডাকিয়াছেন মিলিবার জন্য। প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাবে ভাবে। এ এক বিশাল প্রাণযজ্ঞ, যে যজ্ঞের হবিঃ প্রাণ, যে যজ্ঞের চরু জীবন, যে যজ্ঞের কামনায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা হয়, যে যজ্ঞের হোম-ধূমের মাঝে সাহিত্যের মিলন-বাণী ও মন্ত্র ধ্বনিত হয়, জানি আপনারা তাহাতে হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিতে পান, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে হে আমার পুরাতন! হে আমার নূতন অতিথি! ব্রীহি, যব, ধান্য সকলি প্রস্তুত, আপনারা যজ্ঞে ব্রত হউন।"

তার পর চিত্তরঞ্জন ঢাকা নগরীর সংক্ষিপ্ত প্রাচীন ইতিহাস এবং সম্রাট বল্লাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী দুর্গামূর্ত্তির পুরাবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাতন গৌড়-বঙ্গের কেন্দ্র ঢাকা বিক্রমপুরের লুপ্ত গৌরবের বিবরণ দিয়াছেন। "পদ্মা-মেখলা এই চিরশ্যামা এক দিন কি মহিমময় কোটি-সূর্য্য-কিরণ-ভাতিতে দীপ্তিময়ী ছিল।"—আর, "মগধের করদ হইবার পূর্ব্বে গাঙ্গেয়গণের বিপুল বলশালী রণ-কুঞ্জর-সজ্জিত অক্ষৌহিণী বাহিনী-শোভিত এই দেশের প্রাসাদ-শিখরে গগনস্পর্শী স্বাধীনতার ধ্বজা স্বর্গাকিরণে ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিত।"—সুদূর অতীতের সেই বিস্মৃতপ্রায় গৌরব-কাহিনী আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সেই গৌরব-যুগের অবসান কি করিয়া হইল, আর কি করিয়াই বা "গৌড়ের স্বাধীনতা গঙ্গার জলে ভাসিয়া গেল,"—সেই কাহিনী তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন। উত্তর কালের ভারত-বরেণ্য দেশ-নায়ক চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালা মায়ের সুধী সন্তানগণের সমাবেশে সেদিন পরাধীন জীবনের জ্বালা অনুভব করিয়া বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন :—"সেই স্বপনের দেশ কোথায় গেল? সুখের সে স্মৃতি আছে, আর কিছু নাই।" তার পর বলিতেছেন :—

"আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান—গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ! প্রেতের মত আমরা কয়টি আছি। তবু এই আমাদের ভিটা!

তৈল বিনা সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারি না, দেউলে দেবসেবা হয় না! কীর্ত্তিনাশা ভাঙ্গে গড়ে, দুর্দ্দমা মাতঙ্গিনী একবার করিয়া কাঁদে, আর বার গরজি আস্ফালন করিয়া হাসিয়া উঠে। পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়েও জল নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়-বঙ্গ এক দিন প্রয়াগ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত, যে কেন্দ্র হইতে এক দিন বঙ্গ জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এই সেই ভূমি। এই ভূমিতেই সেই সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের আশিষমন্ত্র ও শান্তিবারিতে শুষ্ক গজারী বৃক্ষ নব মুঞ্জরায় মুঞ্জরিত হইয়াছিল, এ সেই দেশ। সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে যে বাণিজ্য লক্ষ্মী অর্ণবপোত বোঝাই করিয়া ধন আনিত, সে ধনেশ্বরী আজ নাই। শতাব্দীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘান্ধকারে সে সব কোথায় মিলাইয়া গেল। তাই আজ মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য নিজ গৃহে পরান্নভোজী, নিজ গ্রামে চির-পরবাসী, জীবন-মরণের সন্ধির মধ্যে না-বাঁচা না-মরা হইয়াছি। কি দিয়া আপনাদের অভ্যর্থনা করিব। [illegible] সে কণ্ঠ আমার নাই, তাহা হইলে আজ শুনাইতাম—এই অরণ্যানীমুখরিত বনভূম শ্যাম-তমাল-দ্রুম-সুশোভিত দেশের রূপের কথা. শুনাইতাম—এই অতল তলে কি সৌভাগ্য ও বৈভব নিমজ্জিত; শুনাইতাম—যদি আমার এই প্রিয় সুহৃৎ গোবিন্দ দাসের মত আমার কণ্ঠ থাকিত, তবে "আদিশূরের যজ্ঞভূমি"—বল্লালের আস্তাবলে পরিণত যে দেশের 'পথের ধূলি'—সে দেশের বিগত সমৃদ্ধির কথা ও কাহিনী আপনাদের শুনাইতাম; আর শুনাইতাম—জঙ্গলের কুহেলিকাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারে, অতল নদী তলে ও ভূগর্ভে মহা সমাধিতে লীন কি কীর্ত্তি, কি বিজয়-কাহিনী! কি দারুণ [illegible] পরিহাস, কি করুণ কাহিনী এই কীর্ত্তিনাশার! আর [illegible]—সেই দানসাগরের কথা, কামরূপ-কলিঙ্গ-কাশী-বিজয়ীর [illegible] অপনয়ন করিলাম। গাইতাম,—হরিশ্চন্দ্রের কথা, [illegible] সেই প্রাণ-মনবিমোহনকারী মধুর কাহিনী; চাঁদ [illegible] বীর্য্যগাথা। এ সেই সোনার দেশ, এই দেশে [illegible] আসিয়াছেন। হে বাঙ্গালার সন্তান, আজ সে প্রয়াগ [illegible] বিস্তৃত সে সাম্রাজ্য নাই, সে গৌরবের স্মৃতি আছে: সেই [illegible] আজ আমাদের পুণ্যকথা, তাঁহাদের সেই পুণ্য-কাহিনী আজ [illegible] আমাদের আত্মস্থ করিয়া দেয়, যদি সেই অসীম জলরাশির [illegible] কেমন করিয়া, আবার পাল তুলিয়া, জীবন-যাত্রার যাত্রা-গান [illegible] পারি।"

ইহার পরও বিগত গৌরবের আরো চিত্তাকর্ষক বর্ণনা রহিয়াছে। [illegible] মুসলমান প্রসঙ্গেরও সুষ্ঠু আলোচনা তিনি করিয়াছেন। সেই [illegible] অবতারণা করিয়াছেন এই ভাবে,—"এই বঙ্গে শুধু আজ [illegible] একলা নই, আমাদের আর এক ভাইরা এখানে আছেন। [illegible] গৌরবের কথা আছে, তাঁহাদেরও দুঃখের কাহিনী আছে।" [illegible] শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া,—"একই জমির পাশে পাশে [illegible] ফসলে হিন্দু মুসলমান, আপনাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাইতেছে। [illegible] মর্য্যাদা আমরা যেন কখন লঙ্ঘন না করি।" অতঃপর [illegible] অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন রামপালের প্রতি। [illegible] কণ্ঠে কহিতেছেন:—

"হে অতিথি! ওই সেই রামপাল, ওই সেই প্রাচীন যজ্ঞবেদী আপনাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, সে ত মূক নয়, যজ্ঞের মন্ত্রের প্রতিধ্বনি এখনও তাহার প্রাণের তারে রনন্-রন্ করিয়া বাজিতেছে। ওই সেই ভস্মসুপ্ত অগ্নি, বুঝি বা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আছে অতিথি, আছে! যে বেদধ্বনি এই যজ্ঞভূমে উঠিয়াছিল, যে ধ্বনি অরণ্যানী শুনিয়াছে, যে ধ্বনি পদ্মার এক দিন ঘোর করিয়া ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও আছে; আকাশে-বাতাসে এখনও তাহার সুর বাজিতেছে। এই সেই প্রাচীন হব্যভস্ম মাটী বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। সেই ভস্ম আজি আপনাদের ললাটদেশ শোভিত করুক। এ ভূমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছে। হে ঋত্বিক্! আবার তারস্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করুন, অগ্নি জ্বলিয়া উঠুক, দেখিবেন,—এই এত কালের সহিষ্ণু মাটী শতধা দীর্ণ হইয়া, জ্বলিত-জ্বলন মহান্ ধূর্জ্জটিকে জটাজাল-ললাট দীপিয়া তুলিয়াছে। যিনি সহস্র বৎসরের বাঙ্গালার মৃত সতীকে স্কন্ধে করিয়া প্রলয়কালের তাণ্ডব-নর্ত্তনে সব হিংসা, ঈর্ষা, জড়তা, পরানুকরণের মতিচ্ছন্ন অহঙ্কার জ্বালাইয়া, সেই সৃষ্টিপারাবারের এপারে আনিয়া দিবেন—সংহারের পর আবার নীহারিকায় নূতন বাঙ্গালার সৃষ্টি হইবে। বাহান্ন পীঠের মত সারা ভারতে আবার পীঠস্থানে মন্দির উঠিবে। হে তপোনিষ্ঠ সত্যসন্ধ সাহিত্যের ঋষিগণ, জীবনে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে একাত্ম হইয়া সেই মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি আসুন; স্বাহা স্বধা দ্বিবিধ অগ্নিই জ্বলিয়াছে! পূর্ববঙ্গের শ্মশানে বল্লালের ভিটায় সেই শব-সাধনায় অগ্রসর হউন। তাই বাঙ্গালীরা আপনাদের ডাকিয়াছে। এই শ্মশানে মড়ার হাড়ে ফুলের মালা পরিয়া, কি ভুলে ভুলিয়া আছি, সেই ভুল একবার ভাঙ্গিয়া দিউন।"

চিত্তরঞ্জন এই অনবদ্য প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছেন এই ভাবে:—

"হে আমার মা আনন্দময়ী বাঙ্গালার সন্তানগণ, আজ গঙ্গা-পদ্মা-করতোয়া-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-নদ-নদী-বিধৌত সেই প্রাচীন গৌড়-বঙ্গের অতীত সমৃদ্ধির স্বপ্নময় পুরীতে মা আমাদের ডাকিয়াছেন, তাই আজ আমরা মা'র কথা কহিবার জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরম্,'—সুজলা সুফলা নদীবহুলা এই আমার মাতৃভূমিকে বার বার বন্দনা করি! জননী আমাদের যে বাণী দিয়াছেন, মাতৃকণ্ঠের সেই গীতবাণ—সেই মা মা ধ্বনি, পবনে গগনে ধ্বনিত হইয়া পদ্মার পারে পারে যেন সেই বাণী ছুটিতে থাকে, মাও যেন প্রাণ-মন ভরিয়া সন্তানের এ বাণী শুনিয়া আকুল হন।"

আর পরিসমাপ্তি করিয়াছেন এই বলিয়া:—

"হে সাগ্নিক! আসুন, তবে সমস্বরে মা'কে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি পদ্মার ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন, তিনি শুনিতে পাইবেন। মা'র ভাষা দিয়াই মা'কে ডাকি, আসুন! মা ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মাবতী-তীরে মাতৃপূজা করিব। আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্ত-চরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবিঃ দান করিব। আর গললগ্নী-কৃতবাসে বলিব,—জননি, জাগৃহি।"

(মাইকেল আরৎজিবাষেভ)

তিন

ওরা যখন বেড়িয়ে ফিরে এলো, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাগানের পাত্‌লা কালো আবরণের ওপার থেকেই ওদের হাসি ও মেজাজী গলার শব্দ খানিক সময় থেকে পাওয়া যাচ্ছিল। লিডার গায়ে যেন নদীর গন্ধ, তারুণ্যের সঙ্গে মিশে এক অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল।

"খেতে দাও, মা, খেতে দাও।" লিডা মা'কে টান্‌তে টান্‌তে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল ; বলল, "ইতিমধ্যে ভিক্টর সার্জেভিশ্‌ আমাদের গান শোনাবেন।"

ম্যারিয়া আইভানোভ্‌না রাতের খাবার গুছিয়ে নেবার জন্য বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, এমন সুন্দরী হাস্যমুখী মেয়ে তাঁর, নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ কখনোই এর দুঃখের হবে না।

স্যারুডিন এবং টানারফ, বস্‌বার ঘরে পিয়ানোর কাছে গেলো ; লিডা বারান্দায় একটা দোল্‌না-চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল। নোভিকফ, অস্থির ভাবে পায়চারী করতে করতে এক-একবার লিডার মুখের দিকে, একবার তা'র সুপুষ্ট স্তনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে। লিডার ওদিকে নজরই ছিল না। সে চোখ বুজে জীবনের প্রথম আত্মপ্রেম-সুধা পান করছে।

নোভিকফের মনে সেই প্রাচীন দ্বন্দ্ব ; সে লিডাকে ভালোবাসত, কিন্তু লিডার তা'র প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে সে মোটেই নিশ্চিন্ত নয়। এক-এক সময়ে মনে হোত, হয়তো লিডা তাকে ভালবাসে, আবার হয়তো মনে হোত, না। যখন মনে হোত, হ্যাঁ লিডা ওাকে ভালবাসে, তখনই মনে মনে সে লিডার সুকোমল দেহবল্লরী দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, স্বপ্ন দেখত। কিন্তু এ কামজ, অশ্লীল,—এ'টা ভাবতে নিজের ওপর ধিক্কার অনুতপ্ত হয়ে ভাবত, সে যেন লিডার উপযোগী নয়।

সে ঠিক করলো, আজই লিডার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করবে। হ্যাঁ, আজই। এ ভাবে সে আর নিজেকে দগ্ধে পারে না। কিন্তু যদি লিডা প্রত্যাখ্যান করে ?

সে ভাবতেই পারে না, এই প্রত্যাখ্যানের পর সে কি ক

না, আজই……

ওর মাথায় তখন আগুন ছুটছে। কপালে সারি সারি হৃৎপিণ্ডের শব্দ পরিষ্কার শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

"আঃ, ওরকম খট্‌-খট্‌ ক'রে আওয়াজ কোরো না।" মেলে লিডা নোভিকফকে জুতোর আওয়াজ করতে বারণ "কেউ কিছু শুন্‌তে পাচ্ছে না।"

মাত্র তখনই নোভিকফ জান্‌তে পারলো যে, ভেতরে গান গাইছে—

"এক দিন তোমা ভালবেসেছিনু
তুমি কি গো পারো ভুলিতে
দেখো চেয়ে প্রেম-হোমানলশিখা
আজো আছে হৃদে জ্বলিতে।"

নিতান্ত মন্দ গায় না স্যারুডিন ; অশিক্ষিতপটু গাইয়েরা যেমন গলার ওপর দিয়েই কায়দা দেখাবার চেষ্টা ক'রে থাকে, স্যারুডিনও তেমনি। নোভিকফ ওর গানে এমন কিছু আকর্ষণীয় পেলো না।

"ওটা কি গান? ওর নিজেরই তৈরী না কি?"—নোভিকফ বক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"না! দয়া করে ব্যাঘাত কোরো না, বোসো!"—তীব্র সুরে লিডা বললো। "গান যদি না ভালো লাগে, বাইরে চাঁদ দেখো গে যাও।"

সেই সময়টিতে, পূর্ণিমার চাঁদ কালো গাছের ডাল-পালা ছাড়িয়ে উঠছিল। আবছা পাণ্ডুর আলো বারান্দার ঠাণ্ডা পাথরের ওপর, লিডার পোষাকে, শান্তশ্রী মুখের ওপর এসে পড়ছিল। বাগানের ছায়া ক্রমশঃ ঘনতর হয়ে আসছে। নিবিড় বনানীর আবছায়া।

নোভিকফ সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "চাঁদের চেয়ে তোমাকেই আমি বেশি পছন্দ করি।" (মনে মনে বলল, 'একটা অপোগণ্ডের মতো মন্তব্য করলাম।')

লিডা হো-হো ক'রে উঠল। "কি রকম কুমড়োপানা বর্ণনা।"

"কি করে আমার মনের কথা তোমাকে জানাব, বুঝতে পারছি না"—নীরস মুখে বললো নোভিকফ।

"বেশ, চুপ করে বসে শোনো তা'হলে।"—কমনীয় ভাবে গ্রীবা তুলে লিডা বলল তাকে।

> "ভুলে গেছ আজি,
> জানি আমি জানি,
> মোরে নাহি তব স্মরণে।
> কেন তবে তব বিবচিত ব্যথা
> অশ্রু-বিহ্বল নয়নে!"

... কপালী সুর বাগানের সবুজ পেরিয়ে উধাও হয়ে যায়। ... আরো চলকে ওঠে। ছায়া হয় আরো সুনিবিড়। ... পার হয়ে স্যানিন একটি লিনডেন গাছের ছায়ায় ...। সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেল। অকস্মাৎ ... আলো, নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকার, তার ওপর পিয়ানোর ... মিলিয়ে একটা ঐকতান মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে যেন। ... চাইলো না ঐ সুন্দর পরিবেশকে কোনো সামান্য উপায়েও ...।

"লিডা পেত্রোভনা!"—যেন এই মুহূর্ত কিছুতেই অতিক্রান্ত ... চায় না নোভিকফ।

... লিডা বললো, "কি, বলো?" বনের ওপর যেখানে নীল কপালী চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে, সে দিকে তাকিয়ে।

"অনেক—অনেক দিন অপেক্ষা করেছি,—মানে, তোমাকে কিছু চাই।"—কোনো রকমে থতমত খেয়ে বলে ফেললো ...।

স্যানিন কান পেতে শুনতে লাগল, কি বলে ওরা।

"কি নিয়ে?"—আনমনা লিডা জিজ্ঞাসা করলো।

স্যারুডিনের আগের গানটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবার আর ... গান সুরু করলো।

নোভিকফ বুঝছে, সে ক্রমশঃই লাল হয়ে উঠছে, এবার পাণ্ডুর হবার পালা। বোধ হয় ও এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

"আমি—দেখ—লিডিয়া পেত্রোভনা—তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?"

থেমে, তোৎলিয়ে যখন কোনো রকমে নোভিকফ কথা কয়টা শেষ করলো, তার মনে হোলো, আরো ভালো ক'রে গুছিয়ে প্রস্তাবটা করা যেতো। কথা শেষ হবার আগেই সে বেশ বুঝতে পারছিল, তা'র ভাগ্যে আছে "না"। একটা আহাম্মুকী কিছু ঘটবে এই মুহূর্ত্তে এ যেন সে দিব্য দেখতে পাচ্ছে।

যন্ত্রোচ্চারিতবৎ লিডা বললো, "কাকে বিয়ে?—" তার পর অকস্মাৎ আরক্তিম হয়ে উঠে সে যেন কিছু বলতে চাইলো। কেমন একটা দুর্দমনীয় লজ্জা এবং সঙ্কোচ তা'কে করে তুলল বিমূঢ়। জ্যোৎস্নালোকে তখন তা'র সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত।

"আমি—আমি তোমাকে ভালোবাসি!"—জানালো নোভিকফ।

চাঁদের আর আলো নেই; তরুণী রাত্রির বাতাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল; ধরণী যেন পায়ের নীচে দ্বিধা হয়ে যাচ্ছে।

"আমি জানি না কি ক'রে গুছিয়ে কথা বলতে হয়;—তা যাই হোক্ গে, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি!"

('খুব ভালোবাসি' মানে? যেন আইস্-ক্রীম আর কি!—নিজের মনেই বললো নোভিকফ।)

কোথা থেকে একটা পাতা খ'সে উড়ে এসে পড়ল লিডার হাতে; সেইটাকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে লিডা ভাবলো কী? এইমাত্র যা' শুনলো, তা' তাকে নিঃসংশয়ে অভিভূত করেছে, প্রস্তাবের অসমীচীনতা ও আকস্মিকতার জন্যই। নোভিকফ,—যাকে সে শিশুকাল থেকেই দেখে-দেখে অভ্যস্তা হয়ে গিয়েছিল, যাকে সে নিকট-আত্মীয়ের মতোই মনে ক'রে এসেছে, তা'র মুখে এই প্রস্তাব!

"আমি সত্যিই বুঝছি না কি বল্লে! আমি কখনোই ভাবিনি!"

নোভিকফের বুকের ভেতর কি হাতুড়ীর ঘা' হচ্ছে? এখনই কি হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি বন্ধ হয়ে যাবে? অসম্ভব রকম পাণ্ডুর হয়ে সে উঠে দাঁড়ালো, হ্যাটটা তুলে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলো।

"তুমি কি চলে যাচ্ছ?—বিদায়!"—অস্বস্তিকর হাসি টেনে এনে হাত বাড়িয়ে দিল লিডা।

তুলে নিল হাত নিজের মুঠোয়, কিন্তু নোভিকফ তা' স্পর্শ করলো না অধর দিয়ে। ছেড়ে দিল হাত। টুপিটা মাথায় না দিয়েই সে আর একটি বাক্য উচ্চারণ না ক'রে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে।

গাছের ছায়ায়, অন্যের অলক্ষিতে, দু'হাতে মাথা চেপে ধ'রে সে বলে উঠল, "হে ভগবান্! শেষটায় এই দিলে আমায়? কী করব? নিজেকে গুলী করবো?—না, না, সেটা একটা নিছক বোকামী!—আঁা, গুলী করবো নিজেকে?"

এলোমেলো উন্মত্ত চিন্তার দ্রুত স্রোত বয়ে গেল তা'র মস্তিষ্কে।

স্যানিন গোড়ায় ভেবেছিল ওকে ডাকা যাক্; তা' না ক'রে সে একটু হাসল। এটা তা'র কাছে অদ্ভুত লাগছিল যে নোভিকফের মতো একটা সুস্থ সবল লোক নিজের চুল টেনে ছিঁড়বে, মেয়েছেলের মতো কাঁদবে,—কেন না যে মেয়ের দেহ কামনা সে করেছিল সে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। এ রকম একটা লোককে লিডা পাত্তা দেয়নি বলে সে একটু খুসীই হোল মনে-মনে।

কয়েকটা মুহূর্ত লিডা একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্যানিনের কৌতূহলী দৃষ্টি তা'র প্রস্তরমূর্তিবৎ শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইল। স্যারুডিন এতক্ষণে ড্রয়িং-রুমের আলো থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো। লিডার দিকে এগিয়ে গিয়ে সে নীরবে আলগোছে ওর কটিবেষ্টন ক'রে ধরল।

কানের কাছে মুখ রেখে ফিস্‌ফিস্ ক'রে স্যারুডিন বললো, "এত মনমরা হয়ে কেন?"—লিডার কানের লতি একটা সে তা'র ঠোঁটে স্পর্শ করলো। অন্যান্য বারের মতোই লিডা তা'র সর্বাঙ্গে একটা কম্পন অনুভব করল। সে বেশ জানত, আভিজাত্যে, শিকার, কালচারে লিডা নিজে তার অনেক ওপরের স্তরের,—তা'কে স্যারুডিন কখনোই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। তবু এই ওর দু'বাহুর মাঝে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ওর সাবলীল স্পর্শ পেতে বেশ ভালোই লাগছিল। যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বরের পাশে এসে ও দাঁড়িয়েছে, ইচ্ছা করলেই নিজেকে সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।

অর্ধোচ্চারণে শুধু বললো, "আমাদের দেখে ফেলতে পারে।"

যদিও ওর আলিঙ্গনের প্রত্যুত্তর সে দিচ্ছিল না, তবু তো নিজেকে ওর বাহুমুক্ত ক'রে নিল না! স্যারুডিন কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় প্রত্যুত্তরে ক্রমশঃই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

কানে কানে বললো, "একটি কথা দাও।"—দৃঢ় বাহুপাশে সে তাকে পিশে ফেলতে চায়। "আসবে?"

লিডা কাঁপছে। এ প্রশ্ন তা'র কাছে প্রথম নয়; প্রতিবারই এই কাঁপুনি এসেই তো আর তাকে মত দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

"কেন?"—লিডা জিজ্ঞাসা করলো! আকাশের চাঁদের দিকে তা'র চোখ।

"কেন?—তোমাকে কাছে পেতে চাই, তোমাকে দেখতে চাই, কথা বলতে চাই। আ., এ একটা কষ্ট! হাঁ, লিডা, তুমি আমার কষ্ট দিচ্ছ! বলো, আসবে?"

এ কথা বলে, আর দৃঢ়তর ভাবে ওকে দু'হাতে বুকের ওপর চেপে ধরে। চার পাশের বস্তুময় পৃথিবী আর নেই,—সব নাচছে; আকাশে চাঁদ নেই, সে খ'সে পড়েছে বাগানের লন্-এর সীমায় ঝোপ-ঝাড়ের ডগায়। অদ্ভুত ভাবে পরিচিত বাগানটা এক নতুন বস্তুহীন দৃশ্য নিয়ে তার চার পাশে ঘনিয়ে এসেছে। মাথা ঘুরছে। অতি কষ্টে লিডা নিজেকে স্যারুডিনের বাহুমুক্ত করে দাঁড়ালো।

অস্পষ্ট ভাবে জবাব দিল, "হাঁ, যাবো।"—ওর অধরোষ্ঠ শুকনো, নির্জীব।

অনাগত এক অপরিচিত বেদনা, অথচ পুলক-জাগানো মাদকতা-মাখা,—এমনি এক চেতনা নিয়ে লিডা ঘরের ভেতর কোনো রকমে চলে এলো।

স্যারুডিন তখনো বারান্দায়। অর্ধনীমিল চোখ;—ভাবছিল তা'র ভাগ্যের কথা। কোনো দিন নারী-হৃদয় বিজয়ে সে পরাঙ্মুখ হয়নি; কিন্তু এবারকার—? আগতপ্রায় সময়টি কল্পনা ক'রে সে প্রবল কামপ্রবণতা অনুভব করলো শরীরে। সমর্পণের চরম মুহূর্তে লিডার কামোত্তেজিতা হাব-ভাব সে স্বপ্নের মতো দেখতে পেলো!

প্রথম প্রথম যখন লিডাকে সে প্রণয়-নিবেদন করেছিল, প্রথম যখন লিডা তা'র বাহুবন্ধনে এসেছে, সে দেখেছে লিডার চোখে এক কালো আগুনের শিখা, জ্বালাময়ী, অন্তঃপ্রবাহী;—... চোখের দিকে তাকাতে সাহস হোতো না।—যেন সেখানে কী ... ঘৃণা তা'র জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে। তা'র অভিজ্ঞতায় যে-... মেয়েরা এসেছে, তা'দের তুলনায় একে দেখা চলে না। এক-এক সময় মনে হোতো, ওকে নিয়ে লিডা যেন খেলা করছে। কিন্তু আজকের এই বাক্‌দানের পর, সে তার জয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হোলো। এই গর্বোদ্ধতা, অপাপবিদ্ধা, মার্জিতরুচি মেয়েটা তা'র কাছে আত্মসমর্পণ করবে—যেমন করেছে অন্যেরা!—ওকে নিয়ে তখন যে-রকম খুসী ব্যবহার করবে। সর্ব-আবরণহীনা লিডা, বিস্রস্তবেশা, আলুলায়িতকেশা, আনীমিলনয়না, কামাতুরা,... কামসম্ভোগ পরিবেশের মধ্যমণি! পরিষ্কার সে দেখল—লিডার দেহদানের সেই চরম প্রতিচ্ছবি। শারীরিক স্থৈর্যে এই কল্পনা-ছবি দেখা যায় না; সে সিগারেট ধরাতে গেল, হাত কাঁপছে। সে ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল।

স্যানিন ওদের কথাবার্তা কিছুই শোনেনি; দেখেছে সব, অনুমানও করেছে সব। ওকে অনুসরণ ক'রে সেও ভেতরে গেল।

মনে তা'র কি ঈর্ষার আভাস?

"ওর মতো পশুগুলোরই কি কপাল সব সময়ে ভালো?" —সে ভাবল নিজের মনে। "কি মানে এর? লিডা আর ও?"

খাবার সময় হঠাৎ ম্যারিয়া আইভানোভ্‌নার মেজাজটা কড়া হয়ে উঠল। সেই জন্য টেবিলে আলাপ জমল না। তা' ছাড়া লিডা কারো দিকে না তাকিয়েই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছিল। স্যারুডিনই যা-কিছু গোলযোগ তুলে রেখেছিল। স্যানিন হাই তুলল বার কয়েক, প্রচুর ক্লান্তি পেলো, এবং মনে হোলো এখন ঘুমুতে যাবে। কিন্তু যখন খাওয়া শেষ হোলো, সে বললো স্যারুডিনকে ব্যারাক অবধি পৌঁছে দেবে। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি, চাঁদ মাথার ওপরে। প্রায় নীরবে ওরা ব্যারাক অবধি ... পৌঁছালো। সারা রাস্তাটা স্যানিন স্যারুডিনের দিকে ... তাকাতে ভাবছিল, ওকে ঠিক মুখের ওপর একটা চড় মারলে ... হবে কি না।

"হুঁ—ঠিক।"—হঠাৎ সে সুরু করলো। ততক্ষণে ... স্যারুডিনের কোয়ার্টারের প্রায় কাছে এসে পৌঁছেছে। "... পৃথিবীতে কতো অজস্র রকমের বদ্‌মাসই যে আছে!"

চোখ উঁচু ক'রে স্যারুডিন জিজ্ঞাসা করলো, "কথাটার মানে ...?"

"ঠিক তাই, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলতেই হয় ... বদ্‌মাসগুলোই সব চেয়ে আকর্ষণীয়।"

"আপনি নিশ্চয়ই তা' মনে করেন না!"—স্যারুডিন হে... বলল।

"নিশ্চয়ই তাই। পৃথিবীতে সংলোকের চেয়ে বিরক্তিকর কিছু নেই। সংলোক মানে কি? সততা এবং পুণ্যের ... ও কার্য্যক্রম আমাদের প্রত্যেকেরই কাছে এত পুরোনো ... হয়ে গেছে যে, ওর ভেতর আর কোনো নূতনত্ব ... এই সব মান্ধাতার আমলের বস্তা-পচা নীতির ... মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যায় নষ্ট হয়ে, জীবন হয়ে ওঠে ... ও পুণ্যের ছকে-বাঁধা অসহ্য রকমের সীমাবদ্ধ। তুমি ...

না', 'মিথ্যা কথা বোলো না', 'ঠকিয়ো না', 'ব্যভিচার কোরো না।' মজার কথা এই যে, এইগুলো প্রায়শঃই এক জনের মধ্যেই বর্তমান দেখতে পাওয়া যায়! প্রত্যেকেই চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, ঠকায় এবং ব্যভিচার করে,— অর্থাৎ করে তা' যতোটা পারে।"

"সবাই না।"—মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করলো স্যাক্সডিন।

"হাঁ, হাঁ; সব্বাই! যে কোনো এক জন মানুষের জীবন পরীক্ষা করে দেখুন, দেখবেন তার পাপাবলী। বিশ্বাসঘাতকতাই ধরুন না কেন। 'সিজারের জিনিষ সিজারকে দিয়ে আমরা যখন শুতে যাই, অথবা খেতে বসি, তখন আমরা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বসি না?"

কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়েই স্যাক্সডিন প্রশ্ন করলো, "কি বললেন আপনি?"

"হাঁ, আমরা তাই করি। আমরা ট্যাক্স দিয়ে থাকি; প্রয়োজনের সময় সৈন্যদলে নাম লেখাই; তা'র মানে এই যে, আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষতি করে থাকি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে,—যা আমরা মনে-প্রাণে ঘৃণা করি! আমরা নিশ্চিন্তে শুয়ে নিদ্রা যাই, যখন কি না আমাদের ছুটে যাওয়া উচিত তাদের কাছে, যারা আমাদেরই আদর্শের জন্য নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করছে সেই মুহূর্তে। আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আমরা খাই, অন্য অনেকে অনাহারে মরে। যদি আমরা প্রকৃতই সৎলোক হতাম, তাহলে তাদেরই সুখ-সুবিধার জন্য আত্মোৎসর্গ করতাম। উদাহরণ আরো দেওয়া যেতে পারে,— খুব সরল কথা! কিন্তু একটা বদমাস, সত্যিকারের এক জন বদমাস,—একেবারেই আলাদা ধাতুর তৈরী! তার বর্ণনার প্রথমেই বলা যায় যে, সে এক জন অতিবিশ্বস্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ।"

"সাধারণ?"

"নিশ্চয়ই, সে সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিক মানুষ যা' করে, সে তাই করে। এমন কিছু হয়তো সে দেখলো—যা' তা'র নিজস্ব নয়, অথচ তা' ভালো লেগেছে; সে কি করবে?—নিয়ে নেবে। ... একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক, যে কি না তাকে আত্মদান করবে ... বা কৌশলে তাকে আত্মসাৎ করবার পন্থা বের করলো। ... তা'র তৃপ্তিসাধন করবার প্রবৃত্তি,—এইটেই তো মানুষকে ... জানোয়ারদের থেকে ঊর্ধ্বে রেখেছে। জানোয়ারেরা যতোই ... হয়, ততই তার মনে এই প্রবৃত্তি লোপ পেতে ... সে শুধু নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই ঘুরে বেড়ায়। এ ... আমরা সকলেই একমত যে, মানুষ দুঃখভোগ করবার জন্য ...নি।

... কথা সত্যি।"

"... তো! উপভোগ করাটাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। ... হচ্ছে এই উপভোগ করবারই নামান্তর। স্বর্গ একটা রূপক, ...—এটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়।"

... থেমে সে আবার সুরু করলো, "এই উপভোগ ... পরিতৃপ্তি প্রকৃতির অনভিপ্রেত নয়। আমরা ... স্বর্গ সম্পর্কে অল্প-বিস্তর কামনা করে থাকি। আমি তাদেরই সত্যিকার মানুষ বলে মনে করি যারা তাদের মনের কামনা গোপন করে না,—অর্থাৎ যাদের সামাজিক ভাবে বদ্মাস বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে—এই যেমন আপনি।"

স্যাক্সডিন অবাক্ হয়ে তা'র দিকে তাকালো।

"হাঁ, আপনি"—বলে চললো স্যানিন ওর চমকানোর দিকে একটুও নজর না দিয়ে। "পৃথিবীতে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, অন্ততঃ আপনি তাই মনে করেন। বলুন, আপনার চেয়ে আরো ভালো লোকের দেখা পেয়েছেন?"

একটু থম্‌কে স্যাক্সডিন বল্‌লো, "হাঁ, অনেক।" সে স্যানিনের কথার ভাবার্থ অনুমানই করতে পারেনি। বুঝে উঠতে পারলো না, রাগ করবে, না খুসী হবে।

"বেশ, তাদের নাম বলুন।"—স্যানিন বল্‌লো।

স্যাক্সডিন নিজের কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"এই তো, পারলেন না বলতে!"—ফুর্তিভরে স্যানিন বল্‌লো। "আপনিই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক, আমিও তাই: তবু দেখুন, আমাদের দু'জনের কেউই চুরী করতে, মিথ্যা কথা বলতে পশ্চাৎপদ নই, এমন কি ব্যভিচার করতেও,—হাঁ, ব্যভিচার করতেও।"

"কি মৌলিক লোকটা!"—বিড়-বিড় করে স্যাক্সডিন কথা কয়টা উচ্চারণ করলো, তার পর আবার কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

সামান্য বিরক্ত হয়ে স্যানিন শুধোলো, "আপনি তাই মনে করেন না কি?—আমি করি না! হাঁ, যা বলছিলাম,—বদ্‌মাসরাই সব চেয়ে ভালো এবং আকর্ষণীয় লোক, কারণ মানুষের নীচতা যে কত দূর যেতে পারে তা'র কোনো সীমা নির্দ্দেশ এঁরা করেন না। আমি সব সময়েই এক জন বদ্‌মাসের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করতে আগ্রহান্বিত।"

এই বলেই সে স্যাক্সডিনের হাত চেপে ধরল এবং ওর মুখের দিকে চোখ রেখে প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিল। তার পর অকস্মাৎ "গুড্, বাই, গুড্, নাইট্—বিদায়!" বলে ফিরে চললো।

কয়েক মুহূর্ত স্যাক্সডিন একই জায়গায় স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে স্যানিনের অপস্রিয়মান দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর কথাগুলো কি ভাবে গ্রহণ করবে সে বুঝতে পারলো না,—এমন এলোমেলো এবং কটু সেগুলো। লিডার কথা মনে পড়ল; ওর ঠোঁটের কোণে এলো হাসি। যাই হোক্, স্যানিন তো লিডারই ভাই!—ও যা' বলছে তা নিশ্চয়ই ঠিক বলেছে। কি রকম একটা ভ্রাতৃত্ববোধ ওর মনে এলো স্যানিনের প্রতি।

"ভারী মজার মানুষ!"—সে ভাবল। তার পর গেট খুলে নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে গিয়ে স্যানিন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতে তুলে নিল 'জরথুষ্ট্রের বাণী' নামক দর্শনের বই—যেখানা সে পেয়েছিল লিডার বইয়ের টেবিলে। কিন্তু কয়েক পাতা পড়বার পরই এমন বিরক্ত হোল,—কল্পিত অবান্তর ভাবকাহিনী পড়ে—যে, সে থুঃ-থুঃ করে থুতু ছড়িয়ে বইটা ছুঁড়ে ফেলল এক দিকে, তার পর ঘুমিয়ে পড়ল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

পশ্চিম-বাংলার ধর্ম্মঠাকুর

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম-বাংলার একটি লৌকিক দেবতা সম্পর্কে এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সকলে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। দেবতাটির নাম ধর্ম্মঠাকুর। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে আলোচনার উদ্বোধন করেন—তিনি নানা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ধর্ম্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ এবং তাহার পূজা বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্বশেষ রূপ। অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া এই মতই সকলে নির্ব্বিবাদে মানিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে এই বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংশয়-প্রকাশকারীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি দল—এক দলের বিশ্বাস, ধর্ম্মঠাকুর সূর্য্য দেবতা ও অপর দলের বিশ্বাস ইনি কোন অনার্য্য সংস্কৃতি হইতে আগত কূর্ম্ম দেবতা; ধর্ম্মঠাকুরকে এখন আর বুদ্ধ বলিয়া দাবী করিতে বড় শুনা যায় না।

কিছু কাল পূর্ব্বে ঢাকা প্রত্নাগারের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত [illegible] গ্রাম হইতে দুই কচ্ছপের খোল আবিষ্কার করেন—তাহাতে দুইটি লিপি উৎকীর্ণ ছিল। এই লিপি দুইটির পাঠোদ্ধার প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় 'প্রবাসী'তে (ভাদ্র, ১৩৫৬) এক প্রবন্ধ লিখিয়া পশ্চিম-বাংলার পূজিত ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্ম্ম বা কচ্ছপের অভিন্নত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। পর অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে আমি তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের পরিকল্পনা যে অনার্য্য সূর্য্যোপাসনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার পক্ষ-মত সমর্থন করিয়া ডক্টর সরকার মহাশয় পরের মাসেই একটি জবাব দিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিষয়ক সিদ্ধান্ত তাঁহার নিজের নহে, পরের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তাহাতে তিনি একটি নূতন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এখানে তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা পশ্চিম-বঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই, ইহাই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্ব এবং উত্তর-বাংলাতেও ধর্ম্মঠাকুর পূজার প্রচলন ছিল; ডক্টর সরকার মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়া তাহার অনুকূলে দুইটি যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 'পূর্ব্ব ও উত্তর-বাংলার 'পাটঠাকুর পূজা' ও দ্বিতীয়তঃ, 'ময়নামতী যোগীর ভবনে ধর্ম্মঠাকুরের পাট'। বিষয় দুইটির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। 'রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে'র সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায় ডক্টর সরকারও বিশ্বাস করেন যে, 'পূর্ব্ব ও উত্তর-বাংলার পাটঠাকুর পূজার সহিত পশ্চিম-বাংলার ধর্ম্মঠাকুর পূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ধর্ম্মঠাকুর পূজার বিশিষ্ট কোন আচারের সঙ্গে পাটঠাকুর পূজার কোন আচারেরই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব এই অনুমানের যে কি ভিত্তি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাঁহারাও এই বিষয়ে কিছুই প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। পাটঠাকুর পূজা মূলতঃ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অতি ব্যাপক লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান। যত দূর জানিতে পারা যায় তাহাতে দেখা যায় যে, ইহা বাংলা দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের দ্রাবিড় ও অষ্ট্রীক ভাষাভাষী জাতির মধ্যে আজিও প্রচলিত আছে। বাংলা দেশে যে অঞ্চলে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত, সেই অঞ্চলে ধর্ম্মপূজা দ্বারা ও যে অঞ্চলে ধর্ম্মপূজা অজ্ঞাত, সেই অঞ্চলে লৌকিক শৈবধর্ম্ম দ্বারা ইহা প্রভাবিত হইয়াছে। বাংলার বহির্ভাগে ইহার আদিম রূপের এখনও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতির মধ্যে পাট, পাটঠাকুর বা পাটরাজা গ্রামের অধিপতি উপদেবতা বলিয়া পূজিত হয় (S. C Ray, Oraon Religion and Custom পৃ, ৪৫—৪৭)। উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী খড়িয়া উপজাতির মধ্যে পাট বা পাটঠাকুর বলিতে পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতা উপদেবতাকে বুঝায়। ময়ূরভঞ্জের সমতল ভূমির অধিবাসী খড়িয়াগণ পাটঠাকুরের পরিবর্ত্তে কখনও কখনও পাটঠাকুরাণী কথাটি ব্যবহার করে (S. C. Ray, The Kharias, পৃঃ ৩১০)। ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য খড়িয়াদিগের মধ্যে তিনটি দেবতা প্রধান—ধর্ম্ম, পাট ও বাসুকি (Ray, ঐ, পৃ ৩১১); [illegible] বাসুকি বলিতে তাহারা বসুমতী বা ধরিত্রীকে বুঝায়। [illegible] বসুমতী বা [illegible]। তার পরে পাটঠাকুর বা পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা উপদেবতা (Hill-spirits)। উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ভূইঞা উপজাতির উপদেবতা পাটঠাকুর [illegible] বা পাহাড় দেবীর অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কল্পিত হয়। [illegible] তাহার পূজা হয়, ইহাকে পাটপূজা বলে (Ray, The Hill Bhuiyas of Orissa, পৃ ২২৮—২১৬)। প্রায় ৮০ [illegible] কর্ণেল ড্যাল্টন্ যখন ছোটনাগপুর উপজাতীয় অঞ্চলের জাতিতত্ত্ব [illegible] বিবরণ প্রকাশ করেন, তখনও এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের [illegible] উপদেবতা মাত্রেই পাট নামে অভিহিত হইতে [illegible] (Descriptive Ethnology of Bengal, পৃ ১৩২)। [illegible] হিন্দু-প্রভাবের ফলে ইহা এখন প্রায় সর্ব্বত্রই পাটঠাকুর বা [illegible] ঠাকুরাণী নামে অভিহিত হইতেছে। উড়িষ্যার কোন [illegible] এই দেবতার নাম পাট মহাপ্রভু। [illegible] বাহুল্য, পুরীর [illegible] জগন্নাথের প্রভাব বশতঃই এখানে পাটঠাকুর পাট মহাপ্রভু [illegible] পরিচিত হইয়াছেন। [illegible] আশ্বিন মাসের দশহরা দিনে [illegible] কোরাপুট জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী [illegible] অঞ্চলের উপজাতি জয়পুর মহারাজ [illegible] একটি খাঁড়া [illegible] থাকে, ইহার নাম পাটখণ্ডা (খাঁড়া) মহাপ্রভু (Verrier E[illegible] Bondo Highlander, পৃঃ ১৭২)। উড়িষ্যার সীমা [illegible] করিয়া মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় সেখানেও পাটঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। (W. Cr[illegible] The Popular Religion and Folklore [illegible] Northern India, পৃঃ ১৬৮)। পাট শব্দের অর্থ [illegible] প্রধান; দেবতার আসন বা কোন প্রধান দেবতা [illegible] শব্দটি উপজাতি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। (Ray, The Bhuiyas of Orissa, পৃঃ ১১০)। ইহা হইতেই দেখা [illegible] বাংলার নিম্নজাতির মধ্যে যে পাটঠাকুরের পূজা প্রচলিত [illegible] তাহা কোন প্রতিবেশী আদিম সমাজ হইতে আসিয়াছে, [illegible] হইতেই এই দেশে বর্ত্তমান ছিল। ইহা এক স্বতন্ত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইহার মধ্যে কূর্ম্ম মূর্ত্তির কোন স্থান নাই; বিভিন্ন অঞ্চলে স্বভাবতঃই ইহা পরবর্ত্তী কালে স্থানীয় ধর্ম্ম [illegible] প্রভাবিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী হিন্দু-প্রভাব বশতঃই পূর্ব্ব[illegible]

ধর্ম্মরত্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাকে ভট্টশালীকৃত পাঠের বিরোধিতা হয়, তাহা অবশ্যই আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তবে ভট্টশালী মহাশয় যে ইহাকে অভিচার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। ডক্টর সরকারের আর একটি কথা সম্বন্ধে আমার কিছু নিবেদন করিবার আছে। 'ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার করিয়া পরে বুদ্ধকে নমস্কার করার দৃষ্টান্ত ত বাংলা দেশে দুর্লভ নহে। জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দে'র দশাবতার স্তোত্রই যে ইহার জলন্ত প্রমাণ! মহাযান বৌদ্ধগণ বহু হিন্দু দেবদেবীকে নিজেদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন, হিন্দুগণও বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা দেশে কোন দিনই ত ব্যাপক ভাবে ধর্ম্মগত গোঁড়ামির কোন স্থান ছিল না। অতএব ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ কোন বৌদ্ধ এখানে কোন হিন্দুর বিরুদ্ধে অভিচার প্রয়োগ করিলেও ইহার সঙ্গে এ দেশে ব্যাপক সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

ডক্টর সরকার মহাশয় ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে কূর্ম্মের অভিন্নত্ব প্রমাণ করিবার সহায়করূপে 'ধর্ম্মপূজাবিধানে'র যে শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্ব্বাচীনত্ব কি তাঁহার মত অভিজ্ঞ ঐতিহাসিককেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? শ্লোকের প্রথম পদে 'উলূকঃ বাহনঃ ধর্ম্ম' বলিয়াই উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় পদে 'ইদানীং কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে তু' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উলূক বাহন ধর্ম্মের সঙ্গে 'ইদানীং' কেন যে কূর্ম্মের সম্পর্ক কোন কোন স্থলে কল্পনা করা হয়, তাহা ত আমার আলোচনায় আমি নিজেই নিবেদন করিয়াছিলাম। অতএব ইহা দ্বারা ডক্টর সরকারের বক্তব্য বিষয় কোনরূপেই সমর্থিত হয় না। 'কূর্ম্ম সূর্য্য দেবতার প্রতীক' বলিয়া কেহ দাবী করিয়াছেন, কিংবা তজ্জন্য কোন যুক্তি কিংবা প্রমাণ দেখান নাই। ভারতীয় পৌরাণিক কিংবা লৌকিক সাহিত্যে এমন কোন প্রমাণ আছে বলিয়াও শুনা যায় না। একমাত্র 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র কশ্যপ (কচ্ছপ নহে) ঋষির সঙ্গে সূর্য্যের 'উপমা' দ্বারাই কি তাহা নিশ্চিত প্রমাণিত হইতে পারে? তেজস্বিতার জন্য সূর্য্যের সঙ্গে উপমা দেওয়ার রীতি ত অনেক সংস্কৃত। ধর্ম্মঠাকুর কূর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া যাঁহার মতের উপর ডক্টর সরকার নির্ভর করিতেছেন তিনিই যে আবার বলিয়াছেন, 'ধর্ম্মশিলা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ' (রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলের ভূমিকা ১০/০) এবং ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'মোটামুটি কচ্ছপ আকার' অর্থাৎ তাঁহার আশানুরূপ 'সুনির্ম্মিত কূর্ম্মমূর্ত্তি' নহে, এই সম্বন্ধে ডক্টর সরকার কিছুই বলেন নাই। 'ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ' শিলাকে কচ্ছপাকার বলিয়া দাবী করা সমীচীন হয় কি না, তাহা কচ্ছপ-পালক বাঙ্গালী মাত্রই বিচার করিতে পারিবেন।

আমি বলিয়াছি, ধর্ম্মঠাকুরের 'সুনির্ম্মিত' কূর্ম্মমূর্ত্তির পরিকল্পনা ধর্ম্মপূজার প্রচলিত সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, এই অবস্থায় 'Chiselled stone image of Dharma' যে কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! ডক্টর সরকার অপরের যে অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রকার মূর্ত্তি কোথায়, কোন মন্দিরে, কত কাল ধরিয়া কাহা কর্ত্তৃক পূজিত হয়, সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নাই। এই অবস্থায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও উপায় নাই। তবে ইহা যে কত অসম্ভব তাহা নিম্নোল্লিখিত সুপরিচিত ধর্ম্মশিলাগুলির উৎপত্তিমূলক কিংবদন্তী হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বীরভূম জেলার শিউড়ী সহরের মালীপাড়া অঞ্চলে এক ধর্ম্মশিলা আছেন। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মালাকার জাতীয় পূজারী (দেয়াশী)-র নিকট নিম্নলিখিত কাহিনী অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। পল্লীর রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময় এক ঠিকাদার মাটির নীচ হইতে একটি পাথর বাহির করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। সেই রাত্রেই ঠিকাদারের মুখে রক্ত উঠে; স্বপ্নে ধর্ম্মঠাকুর আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বলেন, আমি যে জায়গায় ছিলাম সেই জায়গায় রাখিয়া দাও, নতুবা তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। ঠিকাদার পরদিন তাহাই করে, এবং সেই জায়গায় রাস্তাটি একটু সরাইয়া নেয়। তদবধি সেই শিলারূপী ধর্ম্মঠাকুর সেই স্থানেই পূজিত হইতেছেন, মূল প্রস্তররূপী মূর্ত্তি মাটিতে প্রোথিত আছেন, অন্য একটি প্রস্তর সেই স্থলে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পূজিত হইতেছে।

বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় একটি প্রাচীন গ্রাম। 'দেশাবলি-বিবৃতি'তে বালিয়াতোটিক নামে ইহার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরের কায়স্থ রাজমন্ত্রী রাজীব এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এখনও এখানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। এখানে একটি প্রাচীন ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির আছে। ধর্ম্মশিলার উৎপত্তির বিবরণ এই: গ্রামের এক বেণে প্রস্তররূপী এই দেবতাকে পথে কুড়াইয়া পায়। সে ইহা জিনিস ওজন করিবার কাজে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে কিন্তু অল্প দিনেই দেখিতে পায়, পাথরটি কখনও আধ সের, কখনও এক সের, কখনও এক ছটাক ওজন হয়। সে ইহার রহস্য বুঝিতে পারে না। এক দিন স্বপ্নাদেশ হয় যে তিনি ধর্ম্মঠাকুর, তাঁহাকে যেন নিয়মিত পূজা করা হয়। তদবধি তিনি পূজিত হইতেছেন। প্রথমে বৃক্ষতলে পূজিত হইতেন, পরে তাঁহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া কোন ভক্ত বর্ত্তমান মন্দির গড়িয়া দিয়াছেন, এই মন্দির শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

বর্দ্ধমান জেলার খুদকুড়ি গ্রামের ধর্ম্মশিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়: একদিন বাড়ীর কোন মহিলা ঘাটে চাউল ধুইতে যায়। পুকুরের জলে চাউল ধুইবার সময় হাতে একটি পাথর ঠেকিল। তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। পুনরায় তাহা হাতে লাগিল, এই বারও তাহা ছুঁড়িয়া ফেলা হইল, যত বারই ইহা ছুঁড়িয়া ফেলা হয় তত বারই ইহা আসিয়া হাতে ঠেকিতে লাগিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া পাথরটি হাতে করিয়া বাড়ী লইয়া আসা হইল, কিন্তু তাহা আঙ্গিনার মধ্যে এক জায়গায় ফেলিয়া রাখা হইল। রাত্রে গৃহস্থের উপর স্বপ্নাদেশ হইল যে, তিনি ধর্ম্মঠাকুর, তাঁহার যেন নিয়মিত পূজা করা হয়। তদবধি সেই শিলারূপী ধর্ম্মঠাকুরের পূজা চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মশিলার উৎপত্তির অনুরূপ বিবরণ বাঁকুড়া জেলায়ও শুনিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশিলার উৎপত্তিমূলক এই কিংবদন্তীগুলি হইতেই তাঁহার 'সুনির্ম্মিত' কূর্ম্মমূর্ত্তির অস্তিত্ব যে কত অসম্ভব তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দুই বন্ধু

গী দ্যে মোঁপাসাঁ

অবরুদ্ধ প্যারী, হতাশ্বাস, মুমূর্ষুর মত যেন শেষ বারের মত ধুঁকছে। ছাদে ছাদে পাখীদের আসরগুলো ভেঙ্গে গেছে, একটা কেবল এদিক-ওদিকে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়ায়, নর্দ্দমা থেকে ইঁদুরগুলো পালিয়েছে। জীবন্ত প্রাণী আর কিছু অবশিষ্ট নেই, সব পোচে গেছে।

জানুয়ারীর এক সুন্দর সকাল। বাইরের বুলেভারের পাশ দিয়ে ম্লান মুখে হেঁটে বেড়াচ্ছিল মঁসিয়ে মরিসট, খালি পেট, হাত দু'খানা ঢোকান মিলিটারী প্যান্টের পকেটে। যুদ্ধের আগে তার পেশা ছিল ঘড়ি তৈরী করা, অবস্থাও বেশ ভালই ছিল সে সময়। চলতে চলতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল, চোখে পড়ল একটি পরিচিত চেনা মুখ মঁসিয়ে সভেজ,—মাছ ধরতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল।

লড়াই সুরু হওয়ার আগের দিন পর্য্যন্ত মরিসটের অভ্যেস ছিল রবিবার খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়া—হাতে একটা লাঠি আর পিঠের ওপর একটা টিনের বাক্স নিয়ে। আর্জেনতাইল থেকে একটা ট্রেন ধরে নামতো গিয়ে কলম্বেস-এ; সেখান থেকে হাঁটতে হ'ত মারাঁতে পর্য্যন্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে এক সময় সে গিয়ে পৌঁছত তার সেই স্বপ্নের দেশে। আর সেখানে গিয়েই লেগে যেত মাছ ধরতে—চলত মাছ ধরা সেই রাত পর্য্যন্ত। সেখানে প্রতি রবিবারই দেখা হ'ত এই মঃ সভেজের সঙ্গে—ছোটখাট গোলগাল হাসিখুসী মানুষটি, রু নোত্র ডাম দি লোরেটের ছোট একটি দোকানের দোকানের মালিক, মাছ ধরার নামে পাগল বিল্কুল ঠিক তারই মত।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আদ্ধেকটা দিন তাদের কাটত পাশাপাশি বসে, হাতে থাকত ছিপ, পা ঝুলত নদীর ওপর—ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে দাঁড়াল তারা। কোন কোন দিন দু'জনে মিলে গল্প করত, কোন দিন হয়ত বা একটি কথাও বলত না কেউ। কিন্তু কথার কোনই প্রয়োজন হ'ত না, কথা ছাড়াই ওরা দু'জনে দু'জনের মন বুঝত পরিষ্কার ভাবে—ওদের পছন্দ-অপছন্দগুলো পর্য্যন্ত ছিল দু'জনেরই একই রকম!

বসন্তের সকালে বেলা দশটা নাগাদ, শান্ত নিস্তরঙ্গ নদীর ওপরে নতুন প্রভাতী সূর্য্যের আলো-মাখান একটা পাতলা পর্দ্দা পড়ত, আর তার তাপটা দুই বন্ধুর পিঠের দিকটায় একটা গরম গরম ভাব যখন এনে দিত তাদের মনে—মরিসট হয়ত পাশ ফিরে সঙ্গীর দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বললে হয়ত একবার, "একেই কোন হয় স্বর্গীয় সুখ, তাই না?" মঃ সভেজ হয়ত জবাব দিলে, "আঃ, এর চেয়ে আর কিছু হতে পারে না।" ব্যস্ ঐটুকুই, কিন্তু ঐ যথেষ্ট!

শরতের শেষ বেলায় অস্তগামী সূর্য্যের লাল আভা গলে গলে চারদিক ছড়িয়ে পড়ে, রক্ত-রাঙা আকাশ আর সোনালী মেঘগুলো নদীর জলে ছায়া ফেলে থিরথির করে কাঁপছে সারা নদীটায়, নানা রঙে মিলে রামধনু আঁকা দিগন্ত জ্বলছে, আমাদের এই বন্ধুও যেন আগুনের মত লাল রংয়ে স্নান করে উঠেছে, আশে-পাশের গাছগুলো যারাই অল্প শীতের আমেজে পাতা ঝরাতে আর কাঁপতে সুরু করেছিল, এখন সেগুলো ঝলমল করছে ঘন সোনালী রংয়ে—মঃ সভেজ হাসিমুখে মরিসটের দিকে তাকিয়ে বলত, "আঃ, কি চমৎকার!" আর মরিসট ফাৎনা থেকে চোখ না তুলেই খুশীর স্বরে জবাব দিত, "সহরের চেয়ে অনেক ভাল, না?"

পরস্পরের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এবার দুই বন্ধু অনেকক্ষণ ধরে করমর্দ্দন করলে—দু'জনেরই মন আলোড়িত, কত দিন পরে দেখা হ'ল, কিন্তু কি রকম ভয়ঙ্কর নতুন পরিবেশে! মঃ সভেজ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিড়-বিড় করে বললে, "কি চমৎকার অবস্থা!" মরিসট মুখ কাল করে প্রতিধ্বনি করলে, "আর আবহাওয়াটাই বা কি বিশ্রী! এই বছরে আজকের দিনটাই প্রথম একটু ভাল দিন।"

সত্যিই সেদিন আকাশটা নীল, চারি দিক আলোয় আলোময়।

দু'জনে পাশাপাশি চলতে লাগল, চিন্তাগ্রস্ত, বিষণ্ণ। মরিসট নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে আপন মনে বললে, "আর মাছ ধরা? কি চমৎকার দিনগুলোই না আমরা কাটিয়েছি!"

"হাঃ!" মঃ সভেজ বলে আস্তে আস্তে, "সে রকম মাছ ধরতে আবার আমরা যাব কবে?"

পাশেই একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকল দু'বন্ধু, এক গ্লাস মদ নিয়ে ভাগাভাগি করে খেয়ে আবার বেরিয়ে এল রাস্তায়, আস্তে আস্তে পায়চারি করতে লাগল ফুটপাথ ধরে।

হঠাৎ থেমে গেল মরিসট। আরেক গ্লাস? "বেশ ত।" জবাব দেয় সভেজ। আরেকটা মদের দোকানে গিয়ে ঢোকে দু'জনে। যখন বেরিয়ে এল, তখন দু'জনেরই মাথা বেশ হাল্কা! খালি পেটে কড়া মদের ফল হবে কি। দিনটাও বেশ ঝরঝরে, ঝিরঝিরে এক দমকা হাওয়া যেন তাদের মুখে-চোখে মিষ্টি হাত বুলিয়ে দিল।

কড়া পানীয়টা মঃ সভেজের মাথাতেই বেশী কাজ করছিল, তার পর আবহাওয়াটা রাকাটুকু পরিয়ে দিল—সে হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা, ধর—আমরা যদি যাই?"

"কি বলতে চাও তুমি?"

"এই মাছ ধরা……"

"কোথায়?"

"কেন, আমাদের সেই জায়গায়? কলম্বেসের কাছেই একটা ফরাসী ঘাঁটি আছে। কর্ণেল দুমলিনকে আমি চিনি—তিনি নিশ্চয় যেতে দেবেন আমাদের।"

মরিসটের গলা কাঁপতে লাগল গভীর আগ্রহে, "ঠিক আছে, আমি খুব রাজী।" তক্ষুণি বিদায় নিয়ে যে যার মাছ-ধরার সাজ-সরঞ্জাম আনতে চলে গেল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দেখা গেল দুই বন্ধুকে বড় রাস্তা ধরে চলতে। একটু পরেই কর্ণেল দুমলিনের বাংলোতে পৌঁছে গেল ওরা—দুই বন্ধুর অদ্ভুত খেয়ালে খুব মজা পেয়ে কর্ণেল হাসি-তামাসা করে ছুটী দিয়ে দিলেন ওদের। ছাড়পত্র হাতে নিয়ে তক্ষুণি রওনা হয়ে পড়ল দু'বন্ধুতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ঘাঁটি পেরিয়ে গেল, পরিত্যক্ত কলম্বেস গ্রামটা ছাড়িয়ে চেনা আঙ্গুর ক্ষেতটার পাশে পৌঁছে গেল—ঐ ক্ষেতই গিয়ে শেষ হয়েছে সীন নদীর পাশে।

বেলা তখন প্রায় এগারটা।

সামনের উঁচু জায়গার দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মঃ সভেজ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট গলায় শুধু একবার বললে, "প্রুসিয়ানগুলো আছে ওখানে!" নির্জন পরিত্যক্ত গ্রামটার দিকে তাকিয়ে দুই বন্ধুই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

প্রুসিয়ান! এ পর্য্যন্ত ওরা চোখে দেখেনি একটাও, কিন্তু অনুভব করেছে তাদের অবিরাম দিবা-রাত্রি, প্যারীর চারি দিকে; ওরা ফ্রান্সে ধ্বংস এনেছে, এনেছে দুর্ভিক্ষ, হত্যা, লুঠ—অদৃশ্য ওদের হাত কিন্তু অমোঘ।

ঘৃণা আর তাকেও ছাপিয়ে একটা আতঙ্ক—ওদের দু'জনেরই যেন সংস্কার হয়ে গেছে এই বিজয়ী জাতটার বিরুদ্ধে সেই থেকে।

মরিসটের কথা জড়িয়ে আসে, "কিন্তু ধর—যদি কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাদের?"

মঃ সভেজ গম্ভীর গলায় জবাব দেন, "কিছু ভাজা মাছ উপহার দিয়ে দেব তাহ'লে।"

দুই বন্ধুতে আঙুর ক্ষেতে নেমে পড়ে—চোখ-কানগুলোকে সজাগ রেখে চারি দিকে লক্ষ্য করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে গোয়—বিন্দু মাত্র সন্দেহে ঝোপের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে।

এখনও এক টুকরো খালি জমি আছে—পার হয়ে যেতে পৌঁছতে হবে নদীর পারে। দুই বন্ধুতে দৌড়ে সেটুকু পার হয়ে এক ঝাড় ওমিয়াবের আড়ালে শুয়ে পড়ল লম্বা হ'য়ে। মরিসট মাটিতে কান লাগিয়ে রইল, কোথাও কোন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। না, চারি দিক নিস্তব্ধ। ওরা একা, একেবারেই একা!

আবার সাহস ফিরে এল—মাছ ধরতে লেগে গেল দুই বন্ধু।

ঠিক সামনেই নির্জন দ্বীপ মারান্তি—দূরের তীরভূমি থেকে আড়াল করে রেখেছে ওদের। দ্বীপের রেস্তোঁরাটা বন্ধ দেখে মনে হয়, যেন কয়েক বছর ধরে পড়ে আছে অমনি পরিত্যক্ত।

মঃ সভেজ প্রথমে মাছের চার ফেললো, তার পর মরিসট। এর পর শুধু তারা আর মাছ'''। প্রতি মিনিটে তারা একবার করে ছিপ তুলছে আর প্রতিবারই তাতে বিঁধে ছটফট করতে করতে উঠে আসছে একটা করে ছোট রুপোলী মাছ! সত্যি অদ্ভুত ব্যাপারই বলতে হয়।

পিঠের দিকটায় সূর্য্যের আলোয় অল্প-অল্প গরম সেঁকছে। দুই বন্ধু জগৎ-সংসার ভুলে গেল, মনে কোন চিন্তা নেই, কানে কোন শব্দ আসছে না—তারা মাছ ধরছে!

কিন্তু হঠাৎ চারি দিকে একটা দুম্-দুম আওয়াজ করে আশে-পাশের সমস্ত জমি থরথর করে কেঁপে উঠল। আবার বোমা পড়তে সুরু হয়েছে।

মরিসট ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দূরে নদীর তীরে দেখা যাচ্ছে মণ্ট ভেলেরিয়ানের উঁচু চুড়ো, তার ওপরে খানিকটা জায়গা সাদা—যেন নীচ থেকে ফুঁ দিয়ে এক গাল ছাই উড়িয়ে দিয়েছে কেউ। একটু পরেই দুর্গের মাথা থেকে আবার ধোঁয়া বেরুল গল্-গল্ করে—তার পরেই শোনা গেল আকাশ-ফাটা গর্জ্জন।

মঃ সভেজ কাঁধ ঝাঁকুনী দিল, "ঐ আবার সুরু হ'ল।"

মরিসট আগ্রহ ভরে হাতের চারের দিকে লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ একটা তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষে মনটা ভরে গেল তার—কতগুলো পাগল নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাচ্ছে যেন! গর্জ্জন করে উঠল সে, "মূর্খ কতগুলো, মূর্খ ই বলি আমি ওদের, খুনোখুনি করে মরছে সব।"

"জানোয়ারের চেয়েও অধম," বললে মঃ সভেজ।

মরিসট একটা মাছ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সে যোগ দিল, "আর এই রকমই চলবে চিরদিন, আমার মনে হয়, অন্ততঃ পক্ষে আমাদের গবর্ণমেণ্টগুলো যত দিন আছে।"

মঃ সভেজ বাধা দিল, "রিপাবলিক কখনোই যুদ্ধ ঘোষণা করত না—হাঁ—"

তার কথাকে লুফে নিয়ে মরিসট বলে উঠল, "ব্যাপার হচ্ছে, রাজতন্ত্রে তোমাকে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়, আর রিপাবলিকে লড়তে হয় নিজেদের মধ্যেই, এই তফাৎ আর কি।"

ওদিকে মণ্ট ভ্যালেরিয়ান গর্জ্জন করেই চলল—তার গোলার ঘায়ে তাদের মত ভেঙ্গে পড়তে লাগল ফ্রান্সের ঘর-বাড়ী, ধ্বংস হয়ে গেল কত মানুষের জীবন, কত স্বপ্ন অস্পষ্ট হয়ে গেল, স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল কত হাজার ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা—কত স্ত্রী-কন্যা-মায়ের মনে যে দাগ কাটল, তার দাগ আর এ জীবনে মিলাবে না।

"এই ত জীবন," আস্তে আস্তে বললে সভেজ।

"জীবন? বলি বরং একে মৃত্যু বলি।" জবাব দিল মরিসট, তার পরেই কি ভেবে হেসে উঠল।

হঠাৎ সভয়ে লাফিয়ে উঠল দু'জনেই, নিশ্চয় তাদের পেছনে আসছে কেউ। পেছনে তাকাতে একটু ঘোরাতেই দেখা গেল, প্রায় তাদের ঘাড়ের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে চার জন লোক—দাড়ির জঙ্গলে মুখ প্রায় ঢাকা, গায়ে লম্বা পোষাক, মাথায় লম্বা টুপি, হাতে বন্দুক বাগিয়ে দুই বন্ধুর দিকে তাক-করা।

হাত থেকে ছিপ দুটো খসে পড়ল তাদের, নদীর ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেল কোথায়।

প্রুসিয়ানরা দুই বন্ধুকে বেশ করে কসে বেঁধে নৌকোর পাটাতনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল—নৌকো ভেসে চলল সামনের দ্বীপ লক্ষ্য করে।

যে বাড়ীটাকে ওরা এতক্ষণ পরিত্যক্ত বলে ভাবছিল, তার আড়ালে দেখা গেল অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি জন জার্ম্মাণ সেনা।

লোমশ দৈত্যের মত দেখতে এক জন জার্ম্মাণ অফিসার একটা চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে পোর্সিলিনের পাইপ টানছিল। চমৎকার ফরাসীতে সে জিজ্ঞাসা করল, "তার পর, মশাই, মাছ-টাছ পেলেন কেমন?"

একটা সৈন্য মাছ শুদ্ধ জালটা সাবধানে নিয়ে এসে অফিসারের পায়ের সামনে সে মেলে ধরল সেটা।

অফিসার হাসল, "ওঃ, তা মন্দ নয় দেখছি। কিন্তু আমার তাতে কোন বড় মাছ পড়েছে মনে হচ্ছে যেন। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথা শুনুন। আপনারা দু'জনে গুপ্তচর, আমাদের ওপর নজর রাখতে এখানে এসেছেন—এই আমার ধারণা। ধরা পড়েছেন, শুধু গুলী করে মারাটা বাকী। আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য মাছ-ধরার ভাণ করছিলেন আপনারা—ধরা পড়েছেন, তাতে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য বোধ হয় আপনাদের আর কিছু নেই, এই হচ্ছে যুদ্ধ। কিন্তু'''কথা হচ্ছে, আপনারা ত ঘাঁটি পার হয়ে এসেছেন, ফিরে যাবার সঙ্কেত শব্দও নিশ্চয় জেনে এসেছেন তা। সেটা কি বলে দিন—এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের!

কঠিন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই বন্ধু, পাশাপাশি কেবল হাত দু'টো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। অফিসার বলে চলল, "কেউ কখনো জানতেও পারবে না; ঠিক হয়ে যাবে! নিশ্চিন্ত মনে যে যার বাড়ীতে চ'লে যেতে পারবেন। কিন্তু অস্বীকার করলে মৃত্যু—তৎক্ষণাৎ মৃত্যু! বেছে নিন!"

বন্দীরা অনড়, মুখে একটিও কথা নেই। প্রুসিয়ানটা আগের মত নিরুদ্বেগ গলায় আবার বললে সামনের নদীর দিকে হাত দেখিয়ে, "ভাবুন! ঐ নদীর তলায় চলে যাবেন আপনারা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। পাঁচ মিনিট! আপনাদের পরিবার আছে নিশ্চয়, তাই না?"

মঁ ভ্যালেরিয়ান ভঙ্কার ছেড়েই চলেছে। মৎস্য-শিকারী দুই [illegible] দাঁড়িয়ে আছে।

প্রুসিয়ান কি যেন একটা হুকুম দিলে নিজের ভাষায়। [illegible] নিজের চেয়ারটা বন্দীদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা [illegible] সরালে। বার জন লোক এগিয়ে এল, কুড়ি পা দূরে [illegible] বন্দুক তৈরী করতে লাগল।

"[illegible] একটি মিনিট সময় দিচ্ছি।" অফিসার বলল।

[illegible] করে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে সে ফরাসী বন্দীদের [illegible] গেল। মরিসোটের হাত ধরে ঘরের এক কোণে টেনে নিয়ে [illegible] করে বললে, "শীগ্‌গির, সঙ্কেত শব্দটা! তোমার বন্ধুও [illegible] পারবে না। দেখাবে ঠিক যেন আমি দয়া করে ছেড়ে [illegible] তোমাদের।" মরিসো কোন জবাব দিল না।

[illegible] প্রুসিয়ানটা মঃ সভেজকেও এক পাশে সরিয়ে নিয়ে ঐ [illegible] বললে।

[illegible] কাছ থেকেও কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। [illegible] পাশাপাশি দাঁড়াল। অফিসার একটা হুকুম দিল, [illegible] তুলে নিশানা করল।

[illegible] মুহূর্তে মরিসোর চোখে পড়ল সামান্য কয়েক পা দূরে [illegible] রূপোলী মাছ-ভর্তি জালটা। সোনালী সূর্য্যের আলো [illegible] মাছের স্তূপটার ওপর—মাছগুলো এখনও সজীব। [illegible] সাহস নষ্ট হয়ে গেল, শত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ দু'টি তার [illegible]। "বিদায়, মঃ সভেজ"—কোন মতে অস্পষ্ট গলায় [illegible]

[illegible] জবাব দিল, "বিদায় মঃ মরিসো।" তারা পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরল, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সারা শরীরে একটা কাঁপুনী ধরেছে তাদের, কিছুতেই থামাতে পারছে না।

"গুলী কর," চীৎকার করে হুকুম দিল অফিসার। একসঙ্গে বারটা বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল

মঃ সভেজের নিষ্প্রাণ দেহটা সামনের দিকে লুটিয়ে পড়ল এক টুকরো কাঠের মত। মরিসোর লম্বা দেহটা থর-থর করে কেঁপে উঠে চার পাশে একবার ঘুরপাক খেয়ে বন্ধুর মৃতদেহের ওপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে গেল—মুখটা আকাশের দিকে চিৎ করা, বুকের কাছে জামাটা ছেঁড়া; রক্ত ঝরছে সারা পোষাক বেয়ে।

আর একটা হুকুম দিল জার্ম্মাণ। লোকগুলো চলে গেল। ফিরে এল হাতে দড়ি আর পাথর নিয়ে—মৃতদেহ দু'টির পায়ের সঙ্গে বেঁধে টেনে নিয়ে গেল নদীর ধারে। মঁট ভ্যালেরিয়ান এক মুহূর্ত্তের জন্যও থামল না, সারা চূড়াটাই এখন ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।

দু'টো সৈন্য মরিসোর দেহটা মাথা আর পা ধরে তুলে নিল, আর দু'জন নিল সভেজকে। দেহ দু'টোকে জোরে বার কয়েক সামনে-পিছনে দুলিয়ে জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল—জলের ওপর দু'টো চক্র এঁকে সোজা নেমে গেল জলের নীচে, পাথরের ভারে পা দু'টোই সব চেয়ে আগে।

নদীর জল উছলে উঠলো, চার পাশে খানিকটা বুদ্‌বুদ্ কেটে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল আবার। কেবল ছোট ছোট ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউ কূলের দিকে ছুটে বেড়াতে লাগল।

কয়েক ফোঁটা রক্তও ভেসে এল ঢেউয়ের মাথায়।

অফিসার এবার বলল আগের মতই নিরুদ্বেগ সহজ গলায়, "এবারে মাছগুলোর পালা!" বলে পেছন ফিরে সোজা চলে গেল বাড়ীটার দিকে।

কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সে—ঘাসের ওপর জাল-ভর্ত্তি ঝকঝকে মাছগুলোর দিকে চোখ পড়েছে! একটু হেসে ডাকল, "উইলহেলম!"

সাদা এপ্রন গায়ে এক জন সৈন্য দৌড়ে সামনে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

আমাদের দুই বন্ধুর শেষ চিহ্ন মাছগুলোকে তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে প্রুসিয়ান হুকুম দিল, "এগুলো তাজা থাকতে থাকতেই ভেজে ফেল শীগ্‌গির। চমৎকার মাছগুলো!"

চেয়ারে ফিরে গিয়ে আবার পাইপ নিয়ে বসল সে।

অনুবাদিকা—শ্রীসাবিত্রী ঘোষাল।

"হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজাসকল হিন্দু রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দুরাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

পুণ্যস্মৃতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

এণ্ড্রুজ সাহেব ও গুরুদেবের ছবি

এণ্ড্রুজ সাহেব কিছু দিন শ্রীনিকেতনে ছিলেন। বোধ হয় রথীন বাবুর মেয়ে পুপুর তখন বিয়ে, তাঁদের সব বাড়ী আত্মীয়-স্বজন ও নিমন্ত্রিতে ভরে গিয়েছিল। এণ্ড্রুজ চাইতেন একটু নির্জন নিরিবিলি স্থান, তাই আমার বাড়ীর সামনের বাড়ীতে তিনি ডেরা নিয়েছিলেন।

তাঁকে দেখা-শোনার জন্যে গুরুদেবের একটি পুরানো মুসলমান পরিচারক—মোবারক নিযুক্ত ছিল। সেই সময় কলকাতার মিউনিসিপ্যাল গেজেটে গুরুদেবের একটি চমৎকার (ব্লক) ছবি বেরিয়েছিল। আমি ছবিটি কেটে নিয়ে শিল্প-ভবনের ছুতারের কারখানায় ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম। তখন সবে গ্রামে আমাদের কাজ সবে সুরু হয়েছে। আমার ইচ্ছা যে পল্লী-সমিতির অফিসে ছবিটি টাঙ্গিয়ে দেবো। সন্তোষ পাল তখন ছিল কারখানার অধ্যক্ষ। সে নিজে যত্ন করে এমন সুন্দর পালিশ-করা ফ্রেমে ছবিটি বাঁধিয়ে দিল যে ছবির সৌন্দর্য্য অনেক গুণ বেড়ে গেলো। আমি নিয়ে এণ্ড্রুজকে দেখালাম। তিনি শত-মুখে তার প্রশংসা করে বললেন, "আমারও একটি ঐরকম ছবি চাই।" আমি বললাম, "আচ্ছা, অফিসে আর এক কপি গেজেট আছে তার ছবিটি নিয়ে আপনাকে বাঁধিয়ে দেবো।" তিনি বললেন, "দেখো কিন্তু বাঁধানো যেন ঠিক এই ছবিটির মতোই হয়, কেন না এই ফ্রেমটি একেবারে নিখুঁত, for this frame is perfect."
আমি দেখলাম সর্বনাশ, এ যে দেখছি এণ্ড্রুজের মত সর্বত্যাগী নির্লোভ লোকের মনেও লোভের উদয় হয়েছে ; কাজ নেই, আবার একটি ফ্রেম তৈরী হলে যদি ভালোই হোক্ দোষ উনি বার করবেন এবং যে ছবিটি তাঁকে দেওয়া হয়নি তার জন্য শোক প্রকাশ করবেন। অতএব বললাম, "কাজ নেই, এটিই আপনাকে দিলাম, আমি আর একটি করিয়ে নেব।"

পল্লী-সমিতির ভাঙ্গা ঘরে গুরুদেবের ছবি টাঙ্গিয়ে দিতে কয়েক দিন দেরী হয়ে গেলো। পরের দিন সকালে এণ্ড্রুজের প্রাতরাশের সময় যেমন তাঁর বারান্দায় গিয়েছি অমনি তিনি অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, "জানো, আজ সকালে কী হয়েছে ? আমার খাবার টেবিলের ওপর গুরুদেবের ছবিটি ছিল। মোবারক আমার খাবার নিয়ে যেমন এসেছে অমনি ছবির দিকে নজর পড়তেই অবাক হয়ে দাঁড়ালো, তার পর ধীরে ধীরে পরম ভক্তি ভরে একটি সেলাম করলে।"

শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু

সুভাষ বাবু তখন কলকাতা সহরে মহাজাতি সদনের গোড়া-পত্তনের ব্যবস্থা করছেন। সেই অনুষ্ঠানে গুরুদেব পৌরোহিত্য করবেন অঙ্গীকার করেছেন এবং অভিভাষণ রচনা করছেন। এমন সময় আমি এক দিন অপরাহ্ণে গুরুদেবের কাছে গিয়ে দেখি তাঁর সঙ্গে এণ্ড্রুজ সাহেবের রীতিমত ঝগড়া ! সুভাষ বাবুর প্রতি গুরুদেবের একটা স্নেহের ভাব ছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত হিসা[illegible] এণ্ড্রুজ সুভাষ বাবুর মতকে শ্রদ্ধা করতেন না। যত [illegible] বুঝলুম ব্যাপারটা এই রকম :—গুরুদেবের খসড়ায় সুভা[illegible] বাবুর প্রশংসাসূচক এমন কোনও উক্তি ছিল যা এণ্ড্রুজ সা[illegible] একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেননি এবং সেই সব অংশ [illegible] দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলেন। গুরুদেব সস্নেহ হাস্য সহকা[illegible] তাঁকে নিরস্ত করতে চান। এণ্ড্রুজ অত্যন্ত বিচলিত। [illegible] গুরুদেবের মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও ঈষৎ হাস্যময়। ঠিক যেন ছোট [illegible] কোনও আবদার করছে এবং বয়স্ক ব্যক্তি তাকে ভুলিয়ে দেবার [illegible] করছেন। এবং তার কথায় কৌতুক অনুভব করছেন।

এমন সময় বারান্দায় আমাকে দেখে গুরুদেব এণ্ড্রুজ সাহে[illegible] বলে উঠলেন, "ওই দেখো, সুকুমার তোমায় ডাকছে, তোমার সঙ্গে ওর বিশেষ দরকার আছে।" বলা বাহুল্য, আমার এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে কোনও দরকার ছিল না। সময়-অসময়ে সুবিধে হলেই [illegible] গুরুদেবকে দর্শন করতে ও প্রণাম করতে তাঁর কাছে যেতাম [illegible] তাই গিয়েছিলাম। এই ঘটনার কেমন উপসংহার হল মনে নেই।

এণ্ড্রুজ সাহেব (নং ২)

আর এক দিন অপরাহ্ণে গুরুদেবের কাছে বসে আছি। [illegible] বড় চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসে আছেন। সামনের [illegible] পা তুলে দিয়েছেন। কোলের উপর কয়েকটি ইংরাজি [illegible] সেই দিনের ডাকে এসেছে, তখনও মোড়ক খোলা হয়নি। [illegible] ঝড়ের মত এণ্ড্রুজ প্রবেশ করলেন, কোথায় যেন যাবার জন্য [illegible] হয়ে এসেছেন গুরুদেবের কাছে বিদায় নিতে। তিনি ব[illegible] "গুরুদেব, পথে পড়বার জন্য কিছু বই দিতে পারেন [illegible]" গুরুদেব জানলা দিয়ে দূর-দিগন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "[illegible] আমার কাছে কোথায় ?"

এণ্ড্রুজ আর অকারণ বাক্যব্যয় না করে গুরুদেবের [illegible] উপর থেকে কয়েকটি পত্রিকা তুলে নিয়ে "আসি আসি" বলে [illegible] চলে গেলেন। ঈষৎ কৌতুকের স্নিগ্ধ হাস্যে গুরুদেবের মুখ [illegible] হয়ে উঠলো।

সংস্কৃত উচ্চারণ

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ বিশুদ্ধতার দিকে গুরুদেবের [illegible] ছিল। নিজের উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল এবং অপরের উচ্চা[illegible] থাকলে তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। [illegible] শ্রীনিকেতনে কোন উৎসব হলে মন্ত্রের উচ্চারণ যাতে [illegible] তার ব্যবস্থা করতে হত। সাধারণতঃ ক্ষিতিমোহন বাবু[illegible] উৎসবে মন্ত্র পাঠ করতেন, কিন্তু কোনও কারণে তিনি [illegible] না অপারগ হলে দ্বিবেদীজীকে বলে রাখা হত।

বাঁকুড়ায় যে ঘটনা হয়েছিল 'প্রবাসী'র পাঠকবর্গ [illegible] কি না জানি না। ১৯৪০ সালে গুরুদেব বাঁকুড়া [illegible] সেখানে বন্দে মাতরম্ গান করা হয়েছিল। তখন [illegible] গানের রেকর্ড থেকেই গাওয়া হয়েছিল, তাতে স[illegible] হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের প্রভেদ বজায় ছিল না। গুরুদেবের [illegible] ধীর-স্থির "অপামিবাধার মন্তু ও রঙ্গম্" কিন্তু এই [illegible] ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এবং তাঁর অভিভাষণে তিনি এমন তীব্র [illegible] করেছিলেন যে সেই অভিভাষণ ছাপবার সময় সম্পাদক

...তে কৈফিয়ৎ দিলেন যে, সভার উদ্যোক্তাগণকে এর জন্য দায়ী ... পারে না। কারণ প্রচলিত বহু-বিজ্ঞাপিত রেকর্ড ... গান হয়েছিল। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি। ... ফিরে আসার কয়েক দিন পরে আমি তাঁর কাছে গেছি। ... সংগে গুরুদেবের বিশেষ পরিচিত এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ... ছিলেন। তিনি নিজের কর্মস্থানে ফিরে যাচ্ছেন, তাই ... যাবার পথে গুরুদেবের কাছে বিদায় নিতে গেলেন। ... সে কথা তাঁকে বললাম, কিন্তু তিনি সে কথা যেন ... না। আমাকে দেখে বাঁকুড়ার ঘটনা মনে জেগে ... কারণ আমার বাড়ীও বাঁকুড়াতে। অতএব 'প্রবাসী'তে ... প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সব বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক ... এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের গানটিকে যে ভাবে গাওয়া ... অনুকৃতি করেও আমাদের শোনালেন। সংস্কৃত ... মহর্ষির গভীর অনুরাগ, উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রতি ... এবং নিজের পরিবারভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ... নিযুক্ত করার কথা, সম্বর্দ্ধনা সভায় যা বলেছিলেন ... কাছে বললেন। এতেই বুঝা যায়, সেদিনকার ... গুরুদেবের মন কত দূর বিচলিত ও ব্যথিত হয়েছিল।

তালের রস

... অসংখ্য তাল গাছ। কিন্তু স্বাভাবিক আলস্য বশতঃ ... লোকেরা তালের গুড় প্রস্তুত করে না। সহর-বাজারের ... কোথাও তাল গাছ কাটে, কিন্তু সে রস থেকে তাড়ি ...

... সেবার ২৪ পরগণা থেকে এক জন শিউলি আনিয়ে ... পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে তালের গুড় প্রস্তুত করে ... দেখেছিলাম। গুড় কিছু প্রস্তুত হলে, কিছু গুড় নিয়ে ... গেলাম। তখন তাল গাছের কথা সুরু হল। তিনি ... করলেন, তালের রস খেয়েছ? উত্তর দিলাম, খাইনি। ... বেশ ভালো জিনিষ, মিষ্টিকা খেজুর রসের মতো। শরীর ... আমার জীবনের অধিকাংশ বাংলার পল্লীতেই কেটেছে। ... কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি বলে যে গর্ব ছিল, ... কথায় তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

... শিউলীর সংগে পরামর্শ করে গুরুদেবের জন্য সদ্য-সংগৃহীত ... ব্যবস্থা করা গেল। এই ব্যবস্থা করতে কয়েক দিন ... গেল। ইতিমধ্যে তিনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ... বাবুর কাছে গেলাম, তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ ... দিলেন। তার পর গুরুদেবকে গিয়ে বললাম যে, ... থেকে তাঁর জন্য তালের রস পাঠানো হবে। শুনে কী তাঁর ... সুরেন্দ্র কর কাছেই ছিলেন, তাঁকে ডেকে বললেন, সুরেন, সুকুমার কাল থেকে আমায় তালের রস পাঠিয়ে দেবে। ... জেলার প্রবল পরাক্রান্ত কালেক্টর মিঃ স আমার ... ছিলেন। আমরা দু'জনে খুব ভোরে উঠে নিজের হাতে ... পরিষ্কার করে তালের রস ভর্তি করে মুখে শীল করে ... আগে রস পাঠিয়ে দিতাম, যেন প্রাতরাশের সময় পৌঁছায়। ... ব্যবস্থা বেশী দিন চলেনি, বোধ হয় চিকিৎসকেরা আপত্তি ... ছিলেন।

ভালো জিনিষ পেলে তাঁর বালকসুলভ আনন্দের সহজ অভিব্যক্তি দেখেছি, কিন্তু তাই বলে সেই সব জিনিষে কোনও আসক্তি তাঁর ছিল না। তা যদি থাকতো তবে তার সংগ্রহের ব্যবস্থাও হোতো। এই কথা আমার মনে বদ্ধমূল হয় গুরুদেবের ক্রীম খাওয়া দেখে। পূর্বে বলেছি যে, কিছু দিন তিনি শ্রীনিকেতনে ছিলেন। আমি অনেক দিন থেকে অনিদ্রা রোগে ভুগছি, একটু রাত থাকতেই ঘুম ভাঙে। কিন্তু গুরুদেব এতই সকালে উঠতেন যে, আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হতে প্রায়ই তাঁর প্রাতরাশ শেষ হয়ে যেত। টেবিলের উপরে অবশিষ্ট জিনিষ ন্যাপকিন দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, আমাকে বলতেন, তুমি খাও।

প্রাতঃকালে তিনি কফি খেতেন। আমি এক দিন শ্রীনিকেতনের গোশালা থেকে টাটকা ক্রীম পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কফির সংগে ক্রীম পেয়ে কী তাঁর আনন্দ! পাত্রের প্রায় সমস্ত ক্রীমটুকুই ঢেলে নিয়ে দু'বার করে কফি পান করলেন। আমার জন্যে একটু রেখে বললেন, তুমি ক্রীম দিয়ে কফি খেয়ে দেখ, কত ভালো লাগবে, জেনিস সত্যের প্রাণবিজ্ঞানীক লোকেরা খায়।

ভালো লাগে, সেই ভালো লাগার আনন্দ প্রকাশ করতে বিন্দু মাত্রও সংকোচ নেই, কিন্তু আসক্তিও নেই। এমন কথা বলেননি শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে এতো দুধ হয়, Alfa Laval যন্ত্র রয়েছে, আমার কফির জন্য রোজই কেন ক্রীম হয় না। বৈরাগ্যকে বরাবর নিন্দা করে এসেছেন। ভালো জিনিষকে ভালো বলবার সাহস তাঁর ছিল, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সুখকর কোনও পদার্থে আসক্তি তাঁর ছিল না, তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

আমাদের ওখানে গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম পড়ত। যতই গরম হোক, গুরুদেব কখনও অনাবৃত দেহে বা পাতলা জামা পরে থাকতেন না। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে তাঁকে সর্বদা "প্রচুররূপে আবৃত"ই দেখেছি। শ্রীনিকেতনে যে কয়েক দিন ছিলেন, দিনে পাখা চলার ব্যবস্থা ছিল না। আলোর জন্য সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ইঞ্জিন চলত। মাত্র দুই-তিন দিন রাত্রে খুব বেশী গরম পড়াতে সমস্ত রাত ইঞ্জিন চালিয়েছিলাম মনে আছে।

আর এক দিন গ্রীষ্মকালে আন্দাজ ১০টার সময় উত্তরায়ণে গুরুদেবের সংগে আমরা কয়েক জন আলাপ করছিলাম। ঘরে পাখা ছিল কিন্তু চলছিল না, এমন সময় কৃষ্ণ কৃপালনি ঘরে প্রবেশ করলেন। একটু পরে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাখাটি কি চালিয়ে দেব? গুরুদেব তাঁর দিকে তাকালেন, সে দৃষ্টিতে বিরক্তির ঈষৎ আভাস ছিল, বললেন, কী দরকার পাখার? দেশে এত লোক আছে, তাদের ত বিনা পাখাতেই চলে, আমার কি পাখা নইলে চলবে না? কৃষ্ণ বেচারী ত রীতিমত অপ্রস্তুত।

চিত্রাঙ্কন

আমি যত দিন শ্রীনিকেতনে ছিলাম, তত দিন গুরুদেবের ছবি আঁকা খুব উৎসাহের সংগে চলছিল। একবার বোধ হয় ইংরাজী ১৯৩১ সালে পূজার ছুটীতে শান্তিনিকেতন প্রায় খালি হয়ে গেছে, বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে নন্দলাল বাবু আর কৃষ্ণ ছিলেন। আমি প্রায় বিকালে কৃষ্ণের বাড়ীতে আসতাম। কিছু পরেই গাড়ী করে এসে গুরুদেব নামতেন, সংগে থাকত সেদিনকার আঁকা এক বা ততোধিক ছবি। নন্দলাল বাবু হয়ত আগেই এসে উপস্থিত...

থাকতেন, নয় ত তাঁর ডাক পড়তো। নন্দ বাবুকে ছবিগুলি জিম্মা করে দিতেন, সামান্য কিছু আলোচনাও হত।

শ্রীনিকেতনে যে কয় দিন ছিলেন, তখন দিনের অনেকটা সময় চিত্রাঙ্কনে কেটে যেত। দিনের আলো ম্লান হয়ে এলে আঁকা বন্ধ হত, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম ছড়িয়ে থাকতো। সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী বাণী চন্দ নয়ত দৌহিত্রী নন্দিতা এসে সেগুলি গুছিয়ে রাখতেন।

স্মরণশক্তি

গুরুদেবের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। অনেক বার তার প্রমাণ পেয়েছি। এক দিন তিনি বাইরে বসে আছেন। তখন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। শান্তিনিকেতনে তখন প্রচুর জনসমাগম হত। যত দিন চিকিৎসকের নিষেধ জারী হয়নি, তত দিন সকলেই এসে সময়-অসময় বিচার না করেই তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে যেতো এবং প্রয়োজন মত তাঁর সংগে কথা বলত।

এক দিন একজন দক্ষিণ দেশীয় যুবক ঢিলে পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে এসে উপস্থিত। কবির দৃষ্টির ক্ষীণতার কথা বোধ হয় তিনি শুনেছিলেন। গুরুদেবের মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে ইংরাজীতে বললেন, আমায় চিনতে পারছেন গুরুদেব? সংগে সংগেই উত্তর হোল, "Don't I? তোমাকে যখন শেষ দেখেছি তখন তুমি লণ্ডন সহরের সংবাদপত্র সম্পর্কিত কোনও কাজ করছিলে।"

পরে শুনলাম, ইনি লঙ্কার অধিবাসী, বিশেষ নামজাদা কেউ নন।

লেখার তর্জমা

আমার এক বন্ধু শ্রীযুত অমল মুখোপাধ্যায় ইংরাজী রচনায় বিশেষ পারদর্শী। আমার পিতৃব্য ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগে পরামর্শ করা গেল যে, গুরুদেবের লেখা কিছু তাঁকে দিয়ে তর্জমা করে ছাপাতে হবে। আমি প্রবন্ধ খুঁজে ঠিক করছি, এমন সময় আমার এক সহকর্মী "কালান্তর" প্রবন্ধের কথা বললেন। আমি এটি আগে পড়িনি। পড়ে চমৎকৃত হয়ে গেলাম এবং ঐ প্রবন্ধ-সম্বলিত একটি বই আমার বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলাম। যথাসময়ে তর্জমা আমার কাছে এলো। রথী বাবুর কাছে এই প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বললেন, এ তর্জমা তো ছাপা হতে পারে না, সুরেন দাদা (৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এর তর্জমা অনেক আগেই করেছেন। আমার মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এত কষ্টের তর্জমা যদি কোন কাজে না লাগে তবে অন্য তর্জমার জন্য অনুরোধ করা দূরে থাকুক, বন্ধুর কাছে আমার মুখ দেখানোই দুষ্কর হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম, গুরুদেবের কাছে কথাটা পেড়েই দেখা যাক্ না। তিনি আমার বন্ধুর তর্জমা পড়ে পরদিন বললেন—তোমার বন্ধু তো বেশ ভালো ইংরাজি লেখে হে। সুরেনের চেয়ে এর তর্জমাটি ভালোই লাগলো—দু'বার ছাপা হলে দোষ কী?

তার পর আর আমাকে পায় কে? তর্জমাটি গুরুদেবের অনুমতি সহ 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদকের কাছে পাঠানো হল এবং Other Times নাম দিয়ে ছাপান হয়ে গেল।

এর আগে কয়েকটি তর্জমা আমার বন্ধু করে দিয়েছিলেন; শেষে তিনি "ব্যাধি ও প্রতিকার" ধরলেন এবং প্রথম অংশের তর্জমা যখন রামানন্দ বাবুর হস্তগত হল, তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে এই তর্জমা ছাপা সমীচীন হবে না, এই অভিমত তিনি প্রকাশ করলেন। আমার মনে হয়, এতে আমার বন্ধুর উৎসাহ ভঙ্গ হয়ে গেলো, তিনি আর কোন নতুন কাজে হাত দেননি।

আমার মত ইংরাজী অনভিজ্ঞের একটি তর্জমাও গুরুদেব পছন্দ করে ছাপাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিছু দিন থেকে ছেলেবেলায় পড়া "মুক্ত পাখীর প্রতি" কবিতাটি মনে হচ্ছিল, আর তার দু'একটা লাইনের তর্জমা মনে মনে করেছিলাম। এক দিন টাইপ রাইটার নিয়ে বসে সবটাই লিখে ফেললাম। তর্জমা শেষ হলেও সেটা নিয়ে কি করব, তা চিন্তা করিনি। এমন সময় কৃষ্ণ কৃপালনী আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁকে বললাম আমার তর্জমাটি দেখতে।

পরদিনই ইংরাজীর অধ্যক্ষ শ্রীমান্ ক্ষিতীশ রায়ের পত্র এলো। গুরুদেবের আপনার তর্জমাটি বড়ই ভালো লেগেছে। তিনি [illegible] সংশোধন করে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি'তে ছাপাবার অনুমতি দিয়েছেন। এর মধ্যে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা। আমি প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন—ওহে, আমি এত কবিতা লিখেছি, তার মধ্যে এইটি তোমার মনে থাকলো কেমন করে?

আমি বললাম, মোহিত সেনের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে [illegible] পরই কবিতাটি আমাকে খুব impress করেছিল। কিন্তু গুরুদেব, এর তাৎপর্য কি? কী মনে করে আপনি এটি লিখেছিলেন? তিনি বললেন, জানো কি, আমি এটা জগদীশের কথা [illegible] লিখেছিলাম। আমার একটু খটকা লাগলো, আমি বললাম, গুরুদেব, যদি একশো বছর ধরে এই এক প্রশ্ন নিয়ে ভাবতাম, তবুও মীমাংসা কিছুতেই আমার মনে আসতো না।

এর কিছু দিন পরে তর্জমাটি শ্রীনিকেতনে আমার দেখা [illegible] করে কলকাতায় এসেছি। পূজা আসন্ন, গুরুদেব কালিম্পং [illegible] বলে কলকাতায় এসেছেন। সন্ধ্যার গুমোট গরমে ফুটপাথে [illegible] করছি। এমন সময় একটি খোলা মটর এসে পড়লো [illegible] জ্যোৎস্নায় ও কার মাথার টাক চিকমিক করছে? [illegible] না কি? সত্যই সুধাকান্ত, সঙ্গে 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে'র [illegible] সম্পাদক, পূজার সংখ্যায় গুরুদেবের একটি ইংরাজী লেখা [illegible] ভারি অস্থির করেছিল। কিন্তু তাঁর মন ও শরীর ভালো [illegible] তাই আদেশ করেছেন "সুকুমারের ঐ তর্জমাটিই ছাপিয়ে [illegible]" সম্পাদক মহাশয় বললেন, এখনই চাই। অধিকাংশ [illegible] ছাপা হয়ে গেছে, কেবল গোড়ার একটি পাতা খালি [illegible] হয়েছে গুরুদেবের লেখার জন্য। সর্বনাশ, সে তো শ্রীনি[illegible] দু'দিনের কমে আনা যায় না। অবশেষে স্থির হল, [illegible] যা মনে আছে সেই রকম তর্জমাই করে দেব।

পরদিন কিশোরীমোহন সাঁতরার কাছ থেকে এক খা[illegible] সংগ্রহ করে আমি তর্জমা করে দিলাম এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট[illegible]' ছাপা হল, কিন্তু গুরুদেব যে দু'-এক জায়গায় সংশোধন করে[illegible] তা আর করা সম্ভব হয়নি।

[ক্রমশঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ কথা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রের নাগরিকতা ও আইন-শৃঙ্খলা

রাষ্ট্র সব চেয়ে বড় জন-সংগঠন। তার উদ্দেশ্য যখন জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান, তখন এই জনগণই যে রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই রাষ্ট্রের দিকে আমাদের যেমন লক্ষ্য, তার গঠনতন্ত্র বা শাসনতন্ত্র বিচার করতে রাষ্ট্রস্থ জনগণের দিকেও তেমনি আমাদের থাকা উচিত সমান লক্ষ্য। তাদের অনুমতিতেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, তাদের সমর্থনেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। জনসংখ্যা বা 'পপুলেশন' সে জন্যে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড। এ দণ্ড ভাঙ্গলে রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়বে, এ দণ্ড প্রবল থাকলে ওটা হয়ে থাকবে শক্তিশালী। তবে এই মেরুদণ্ড ঠিক থাকল কি না তা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। সে আলোচনার খাতিরে রাষ্ট্রের দিকটা ছেড়ে আমাদের এবারে আসতে হবে রাষ্ট্রসংগঠনকারী জনগণের দিকে।

আধুনিক রাষ্ট্র যেমন খুব বড় ও ব্যাপক, প্রাচীন রাষ্ট্র সে রকম ছিল না। আয়তন তার ছিল খুবই অল্প। এক একটা ছোট নগর বা 'ক্যাণ্টনের' সীমাতেই তার আয়তনের বন্ধন। সে রকম ক্ষুদ্রের মাঝে অল্প জনসংখ্যাই ছিল ছোট রাষ্ট্রটির সংগঠক ও পরিচালক। সে রাষ্ট্রের এক একটি জনকে বলা হ'ত নাগরিক বা ইংরিজিতে 'সিটিজেন' (Citizen); কারণ, এ রকম ছোট নগরই তখন ছিল একটা রাষ্ট্র বা নগর-রাষ্ট্র, যার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রাচীন গ্রীস ও এথেন্স রাষ্ট্রে। সে রকম নগর-রাষ্ট্রে নাগরিকতা বলতে বিশেষ কটা গুণাবলীর কথা বোঝাত। নগরবাসী মাত্রই যে নাগরিক আখ্যা পাবার যোগ্য তা নয়, রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে তাকে করণীয়, বর্জনীয় ও পালনীয় কতগুলো নৈতিক ও বৈধ বিধি-ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হতে হত। এ হওয়াটা একটা বিশেষ গুণ, আর এ গুণে যারা হত গুণী তারাই প্রকৃত নাগরিক বলে পরিচিত হবার যোগ্য হত। এই গুণাবলীর অধিকারী হওয়াটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাম পেয়েছে নাগরিকতা বা 'সিটিজেনশিপ' (citizenship)। রাষ্ট্র ক্রমে বড় হয়ে উঠেছে আর সেই সঙ্গে বেশী করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাগরিকতা-লাভের প্রয়োজনীয়তা। তাই আজকের বড় রাষ্ট্রে নাগরিকতার প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে বেশী করে।

সাধারণ জ্ঞানে এক জন নাগরিক বলতে আমরা বুঝব, যে নগরে বাস করে তাকেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞানে কিন্তু শুধু ওটুকু বুঝলেই চলবে না। নাগরিক বলতে এখানে বুঝতে হবে তাকেই যে রাষ্ট্রের শাসন ও পরিচালন ব্যাপারে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একটা অংশ পেয়ে থাকবে। অংশটা অবশ্য প্রত্যক্ষ পাওয়া যেত প্রাচীন রাষ্ট্রে, আজকের রাষ্ট্রে পরোক্ষেই পেতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুমোদনে নাগরিক বলতে আমরা যাকে বুঝব, তা এ্যারিষ্টটল বেশ স্পষ্ট বলেছেন। নাগরিক বলতে তিনি তাকেই বুঝেছেন, "who has a share in the government of the state and entitled to enjoy its honours।" কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" জানা যায়, মৌর্য্যরাষ্ট্রে নাগরিক বলতে রাষ্ট্রের শাসনের মাপকাঠিতে মাপা বিশেষ রাষ্ট্রীয় গুণসম্পন্ন নাগরিককেই বোঝাত। ফা-হিয়েন, হিউ এন সাঙ প্রমুখ প্রাচীন বিদেশী পর্য্যটকও তখনকার ভারতীয় রাষ্ট্রে নাগরিকদের বিষয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মহাভারতীয় যুগেও কৌরব ও পাণ্ডব-রাষ্ট্রের নাগরিকতার এই রকম একটা পরিচয় আমরা পাই বিচক্ষণ বিদুরের বিবরণে। প্রাচীন বাংলার হিন্দুরাষ্ট্রে প্রায় সে রকম ভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব ছিল সীমাবদ্ধ। বাকি নগরবাসীদের দাস, সেবক, ভৃত্য, এই সব আখ্যা দেওয়া হত। মধ্যযুগের ইংলণ্ডে নাগরিকতা পাওয়া একটা বিশেষ দলগত অধিকার হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছিল। তখন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নাগরিক তাদেরই বলা হ'ত, যারা সাধারণের একটু উপরে থেকে বিশেষ রাষ্ট্রীক অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিল ফিউডাল নবিলিটি (Feudal nobility) শ্রেণীভুক্ত হয়ে। বাকি জনসাধারণকে ঠিক নাগরিক বলা হত না। তারা ছিল 'সার্ফ' 'ভিলেন' ইত্যাদি। কিন্তু মধ্য-যুগের এ নীতি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল আজকের যুগের নীতির কাছে। আজকের রাষ্ট্রে, বিশেষ ক'রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বিশেষ কোন শ্রেণীগত অধিকারেই বদ্ধ যায়নি। রাষ্ট্রস্থ সকলেই—নগরবাসী লোক আর গ্রামবাসীই লোক—পাবে নাগরিকতার অধিকার। তাই নাগরিকের সংজ্ঞা হচ্ছে, "citizens are memb.rs of the political comunity to which they belong." রাজনীতিবিদ্ ভ্যাটেল (Vattel) বলেছেন, নাগরিক হচ্ছে তারা, যারা রাষ্ট্রের "civil ociety"র সভ্য, আর যারা "bound to this society by certain duties, subjected to its authority and equal participation in its advantages." আমাদের শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মতে নাগরিক রাষ্ট্রের সে রকম এক জন সভ্য, যার চেষ্টা সর্ব্বদাই থাকবে সক্রিয় স্বীয় মানবতার উন্নয়নের দ্বারা রাষ্ট্রের ও জাতের সর্ব্বোচ্চ নৈতিক উন্নতি সাধনের দিকে।

রাষ্ট্রের অধিবাসী সভ্যরাই সাধারণতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু অধিবাসী মাত্রই কি রাষ্ট্রের সভ্য? আজকের বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো প্রায় সকলেই পরস্পরের সঙ্গে কোন না কোন যোগসূত্রে আবদ্ধ। তাই একটা রাষ্ট্রে বৈদেশিককে স্থান দেবার ব্যবস্থা রাখতে হয়, ব্যবস্থা করতে হয় পররাষ্ট্রিক সম্বন্ধ স্থাপনের ও দূতাবাস পরিচালনার। বৈদেশিকরা আবার কাজের খাতিরে বসিয়েছে এক রকম স্থায়ী বসবাস। কাজেই তাদের আর তাদের বংশধরদের রাষ্ট্রের নাগরিকতার অধিকার দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। তাই নাগরিকতা তাদের দেবার জন্যে রাষ্ট্রকে উদ্ভাবন করতে হয়েছে কতগুলো নীতির। এ নীতি প্রধানতঃ দু'টো—একটা হচ্ছে জন্ম-বিচারে, আর একটা হচ্ছে বৈদেশিককে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অনুমোদনে নাগরিকতা দানের বিশেষ ব্যবস্থার বিবেচনায়। এটাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ন্যাচারালাইজেশন্ (Naturalisation)। প্রথমটার বেলায় আবার দেখা যায় দু'রকম নীতির প্রয়োগ। প্রাচীন গ্রীক ও এথেন্স রাষ্ট্রের নীতি ছিল, পুত্র যেখানেই জন্ম নিক না কেন, তার পিতা বা মাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সেই রাষ্ট্রের নাগরিক সে হবে। এ নিয়মের নাম 'জাস স্যাঙ্গিনিস' (Jus Sanguinis)। এটা এখন প্রবর্ত্তিত আছে ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি কতগুলো রাষ্ট্রে। ইংলণ্ডের যুক্তরাজ্য প্রমুখ বড় বড় রাষ্ট্রে আবার নিয়মটা একটু

অন্য রকম। এখানে নীতি হচ্ছে, পুত্র যে রাষ্ট্রের ভূমিতে জন্ম নেবে, সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতা সে পাবে, তার পিতা-মাতা যেখানেই জন্ম নিক না কেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ নিয়মটার নাম হচ্ছে 'জাস সোলি' বা 'জাস লোসি' (Jus Soli বা Jus Loci)। রাণী এ্যানের আমল থেকে ইংলণ্ডে নিয়মটার প্রয়োগ অনেকটা উদার করে নেয়া হয়েছে। তাই ইংলণ্ডের ভূমি ছাড়াও বিদেশে যদি কোন ইংরেজ-পুত্র জন্মায়, তবে সে পুত্র ইংলণ্ডের নাগরিকতা পাবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দু'রকম নীতির প্রয়োগ আছে। ১৮৫৫ সালের এক আইন অনুসারে সেখানে আগেকার 'জাস সোলি' নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'জাস স্যাঙ্গিনিস' নীতি। ১৯০৭ সালের আর এক আইন অনুসারে সেখানে স্থির হয় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানকে অধিকার দেওয়া হবে, অপর রাষ্ট্রে থাকা কালে সে মার্কিণ রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করবে কি না স্থির করতে। ভারতের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের নতুন শাসনতন্ত্রের ৮ নং ধারা অনুসারে এ নীতির অনুকরণে স্থির হয়, কোন ব্যক্তি ভারত-ভূমির বাইরে থাকলেও যদি সে বা তার পিতা বা মাতা ভারতে জন্ম নিয়ে থাকে, তবে সে পাবে ভারতের নাগরিকতা। অবশ্য সে ক্ষেত্রে তাকে আগে আবেদন জানাতে হবে সেখানকার 'কনসুলার' প্রতিনিধির (Consular representative) কাছে। তা ছাড়া ভারতের নীতি হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি—সে, তার পিতা বা মাতা—ভারত-ভূমিতে জন্ম নিলেই ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হবে। ভারতের বাইরে থাকলেও নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পাঁচ বছরের মধ্যে যদি ভারতে সে বাস ক'রে থাকে তবে ভারতীয় নাগরিকতাই সে পাবে। এ ভাবে জন্ম-বিচারে নাগরিকতা দানের নীতিটা প্রযুজ্য দেশী ও বিদেশী উভয় অধিবাসীদের পক্ষেই। কোন বৈদেশিককে নাগরিকতা দেবার আর একটা প্রধান উপায় হচ্ছে 'ন্যাচারালাইজেশন'। এ ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে বৈদেশিককে আইনের বলে নাগরিকত্ব বা 'সিটিজেনসিপ' দেওয়া। কাজটা সাধারণতঃ রাষ্ট্রের বিচারালয়গুলোর দ্বারাই হয়ে থাকে। বৈদেশিককে 'ন্যাচারালাইজড' নাগরিকতার 'সার্টিফিকেট' দিতে গেলে তাকে আগে মেনে নিতে হবে কতগুলো সর্ত। এ রকম সর্ত মেনে নেবার নীতিটা আবার সব এক রকম নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রে কাউকে 'ন্যাচারালাইজড' নাগরিকতা দিতে হলে দেখে নিতে হবে সে কমপক্ষে পাঁচ বছর রাষ্ট্রে বাস করছে কি না। যদি করে, তবেই তাকে দেওয়া হবে সে রকম নাগরিকতা। ফ্রান্সে বসবাসের কালটা ধরা হয়েছে দশ বছর। সুইজারল্যাণ্ডে এটা আবার মাত্র দু'বছর। আবেদনকারী মাত্রেই যে 'ন্যাচারালাইজেশন' পাবে তা নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চীন, জাপান ও কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদের সাধারণতঃ নাগরিকতা অস্বীকার করা হয়। ইউরোপের কোন কোন রাষ্ট্রে ইহুদীদের এ বিষয়ে করা হয়েছে বঞ্চিত। মার্কিণ রাষ্ট্রে 'ন্যাচারালাইজড' নাগরিকদের 'প্রেসিডেণ্ট' বা 'ভাইস-প্রেসিডেণ্টে'র পদপ্রার্থী হবার অধিকার দেওয়া হয় না। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পাকিস্তান থেকে আগত ব্যক্তিদের ভারতীয় নাগরিকতা দেওয়া হবে, যদি তারা ১৯৪৮এর উনিশে জুলাই-এ বা তার আগে ভারতে এসে থাকে। ১৯৪৭ এর পয়লা মের পর যারা ভারত ছেড়ে [illegible] তাদের দেওয়া হবে না ভারতীয় নাগরিকতা। তা ছাড়া যারা স্বেচ্ছায় অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করবে, তাদের ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে না।

১৯৫১ সালের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্যে উপযুক্ত ভোটদাতা নির্দ্ধারণ করতে আমাদের রাষ্ট্রে নাগরিকতা পাবার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা আরও স্পষ্ট ভাবে স্থির করা হয়েছে সম্প্রতি একটা আইনে। এ আইনটা হচ্ছে 'রিপ্রেসেণ্টেশন্ অফ পিপল্‌স্ এ্যাক্ট' (Representation of Peoples Act)। এতে বলা হয়েছে, সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি যার ভারতস্থ কোন এলাকায় বসবাস স্থির আছে, আর যার স্বীয় কোন বাড়ী আছে বা ছিল, সেই পাবে নাগরিক হিসেবে নির্ব্বাচনে ভোট দেবার অধিকার। ১৯৪৭এর পয়লা এপ্রিল থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ পর্য্যন্ত একশ' আশী দিন যারা ভারতের নাগরিক হিসেবে বাস করবে, তারাই ভোটাধিকার পাবে। পাকিস্তান থেকে আগত ব্যক্তিদের বেলায় এ বিষয়ে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—যারা নতুন শাসনতন্ত্র প্রযুজ্য হবার সময় অর্থাৎ পঁচিশে জানুয়ারী, ১৯৫০, ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণ্য ছিল, যারা ভারতীয় এলাকায় জন্ম-বিচারে নাগরিকতা লাভ করেছিল, আর যারা কমপক্ষে পাঁচ বছর ভারতীয় এলাকায় বসবাস করেছে। এই সব নাগরিকদের উক্ত আইন অনুসারে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াটা একেবারে সহজ ব্যাপার নয়। আর সহজ নয় বলেই নাগরিকের নাগরিকত্ব তার কাছ থেকে দাবী করছে বিশেষ একটা দায়িত্ব-জ্ঞান। এ দায়িত্ব-জ্ঞান যে নাগরিকের মনে সজাগ হবে, সেই বুঝতে পারবে, রাষ্ট্রে তার অস্তিত্বের আর সত্তার মানে। এটা বুঝতে পারলেই রাষ্ট্রের প্রতি তার কতগুলো করণীয় কর্ত্তব্য, পালনীয় দায়িত্ব, আচরণীয় নির্দ্দেশ তার কাছে সমীচীন বলে অনুভূত হবে। তখন রাষ্ট্রের পক্ষেও তার কাছ থেকে কিছুটা কাজ বা সাহায্য দাবী করা অযৌক্তিক নয়। এ রকম কাজকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হয়েছে 'ডিউটিজ' (Duties)। প্রত্যেক নাগরিককে সৎপথে চলতে হলে আর সুনাগরিক আখ্যা পেতে হলে আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত কতগুলো কর্ত্তব্য তাকে মেনে চলতে হবে রাষ্ট্রের বা অন্য নাগরিকের সঙ্গে। ভদ্র, সভ্য ও শিষ্ট আচরণ হচ্ছে নাগরিকের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রের নির্দ্ধারিত আইনাদি পালন পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য; তার পর আসছে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা, আনুগত্য ও আনুরক্তি, তার পর রাষ্ট্রের কার্য্যাদি করণ। পরিশেষে আসছে রাষ্ট্রে, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, ভোটদানের কর্ত্তব্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শক্তি জনগণের শক্তির উপর; জনগণের শক্তির পরিচয় আবার রাষ্ট্রের শক্তিতে; আর এ শক্তি প্রযুক্ত হবে ভোটের মাধ্যমে। তাই সুচিন্তিত ও উপযুক্ত ভোটদানের কর্ত্তব্য সব চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ ও সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। এ ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি যেমন নাগরিকদের কতগুলো কর্ত্তব্যে [illegible] হয়েছে, আর সে কর্ত্তব্য রাষ্ট্র যখন তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে আইনের সাহায্য নিয়ে, তখন তাকেও নাগরিকদের দিতে হয়েছে কতগুলো অধিকার ও স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে গণের শিক্ষা ও দক্ষতায়

...নোন্নয়ন করতে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে নাগরিকদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের লক্ষ্যটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকা চাই সর্বাগ্রে। তাই নাগরিক যাতে সে লক্ষ্যপথে এগুতে পারে তার জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদের দেবে কতগুলো নাগরিক অধিকার—যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হয় 'রাইট্‌স্' (Rights)। রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক লাস্কি (Laski) এর একটা সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best"। এ অধিকার দু'রকম—রাষ্ট্রীক (political) ও অরাষ্ট্রীক (civil)। প্রথমটা হচ্ছে রাষ্ট্রে বসবাস করার অধিকার, [illegible] কালে স্বদেশে বা বিদেশে রাষ্ট্রের সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ পাবার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ভোটদানের অধিকার প্রভৃতি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও চিন্তা, কার্য্য ও বাক্‌-স্বাধীনতার অধিকার। ব্যক্তিগত ভাবপ্রকাশ ও স্বাধীন চিন্তার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককেই দেওয়া আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের এ স্বাধীনতা অস্বীকার করে সে রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্র স্বাধীন চিন্তার অভাবে নতুন ভাবধারার অভাবে উন্নত হতে পারে না মোটেই, পিছিয়ে থাকে অনেকটা। লাস্কি বলেছেন, সে রকম রাষ্ট্র যে কেবল "gains nothing from a refusal to entertain the possibility that a new idea may be true"। তাই উন্নতিকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'প্রেস'-স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করে রাখতে হয়েছে। অনেক দিন আগে বৃটিশ সরকারের প্রেস রেগুলেশন এ্যাক্টের (Press Regulation Act) প্রতিবাদে রাজা রামমোহন বলেছিলেন, যেখানে প্রেসের কোন স্বাধীনতা নেই এবং ফলতঃ জনগণের অভিযোগাদি রাষ্ট্রের অগোচরে আর অন্তর্নিহিত থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে রাষ্ট্রের ইতিহাসে সংঘটিত হয়ে গেছে [illegible] কতগুলো বিপ্লব। তাই এ রকম বিপদকে এড়িয়ে চলার [illegible] আজ দেখা যাচ্ছে অধিকতর প্রেস-স্বাধীনতার দাবী [illegible] সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই। অরাষ্ট্রীক অধিকারগুলোর মধ্যে প্রধান [illegible] রাষ্ট্রের মধ্যে সুবিধে মত বসবাসের অধিকার, সমিতি ও সঙ্ঘ-[গঠ]নের অধিকার, এবং ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস পোষণের অধিকার। [এ]ভাবে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ পরস্পর কতগুলো কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও [অধিকারের] যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী [করে] এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতির পথে।

নাগরিকদের যে সব স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া আছে, সেগুলো [যাতে] সদুদ্দেশ্যে ও সংপথে ব্যবহৃত ও চালিত হয় তা দেখবে রাষ্ট্র। [এক]জন রাজনৈতিক আইনজ্ঞ ঠিকই বলেছেন, "Law permits [ever]y one to say, write and publish what he [pl]eases, but if he makes a bad use of this liberty [h]e must be punished"। আর যখনই এই শাস্তির কথা [এল] তখনই শাস্তি দেবার যে শক্তি সেটার খোঁজ পড়ে। সেটা আর [কিছু]ই নয়, রাষ্ট্রের আইন মানেই যে রাষ্ট্রীক কর্তৃত্বের ক্ষমতা তা নয় যদিও এটাকে রাজনীতিজ্ঞ অষ্টিন বলেছেন, রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ আদেশ (Supreme Command of the sovereign)। এটা হচ্ছে আসলে, যেমন উইলসন বলেছেন, 'রাষ্ট্রের সভ্যগণের সুচিন্তা ও সুঅভ্যাসের সুপ্রতিষ্ঠিত সেই অংশটা যেটা কতগুলো একক নিয়মাবলীর আকারে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট একটা অনুমোদন পায় রাষ্ট্রের সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায়।' কাজেই দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণের জন্যেই আইন তাদের সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করতে। তাই আইন এলেই, তাদেরই দ্বারা তাদের স্বাধীনতা ও অধিকারগুলোকে তাদেরই স্বার্থে সংপথে চালিত করতে। সে জন্যেই "Law is the real guardian of liberry"। গেটেলের কথায় বলা যায়, আইন সকলের আদেশ সকলকে দোষমুক্ত করে সংশোধিত করে নিতে। তাই এটা "command of an authorised public organ active within the sphere of its legal competence"। এ হিসাবে রাষ্ট্রের আইন রাষ্ট্রের সকলের, সকলের জন্য। তাই 'আইনের চোখে সবাই সমান'। এ উক্তির দাম আছে এখানে। কিন্তু এ নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রে। সেখানে আইনের চোখে সবাই সমান নয়। আইনের কাছে রাজপুরুষরা সেখানে এক রকম, আর সাধারণ লোক অন্য রকম। দোষ করলে রাজপুরুষদের বিচার হবে সাধারণের থেকে অনেকটা তফাতে সম্পূর্ণ পৃথক আইনে ও পৃথক বিচারালয়ে। এ নীতিকে বলা হয় 'Droit Administratif'। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে কিন্তু রাজপুরুষ বা সাধারণ লোকে এ রকম কোন প্রভেদ নেই, তাই নেই সেখানে পৃথক আইনের ব্যবস্থা। আইনের কাছে সেখানে সকলেই সমান। এ রকম নীতিকে বলা হয় "Rule of Law"। ভারতীয় নতুন রাষ্ট্রে এ নীতি মানা হয়েছে। আগেকার ভারতে ইংরেজের আমলেও আগে আইনের চোখে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টি ছিল। তাই হিন্দু ও মুসলমানদের জন্যে ব্যবস্থা ছিল পৃথক ভাবে আইন প্রণয়নের। ইংরেজরা ভারত নিয়ে নিলেও সে নীতির পরিবর্তন করেনি। প্রথম দিকে অবশ্য তারা 'ইংলিশ ল' (English Law) প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনমতের চাপে তাদের এ নীতি ত্যাগ করতে হয়েছিল। ১৭৮০ সালে ডিক্লারেটরী এ্যাক্ট (Declaratory Act) নামে একটা আইন পাশ ক'রে স্থির করে যে, হিন্দুদের বিচার হবে হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী হিন্দুধর্ম্মের সমর্থনে 'হিন্দু ল' (Hindu Law) এর বিচার, আর মুসলমানদের বিচার হবে ইসলাম ধর্ম্ম অনুযায়ী কোরাণের অনুমোদনে 'মহামেডান ল' (Mahomedan Law) এর বিচারে। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় বিচারের সুবিধে দেখে হিন্দু ও মহামেডান ল'তে আনতে হয়েছে খানিকটা পরিবর্তন। আজকের নতুন ভারতীয় রাষ্ট্রের আইনেও আগের নীতিই রাখা হয়েছে। তাই হিন্দু ল-এর পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে আম্বেদকরের 'হিন্দু কোড বিল' উত্থাপনে।

[ক্রমশঃ ।

বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ

শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতার এক সরু অপ্রশস্ত গলিতে (ঝামাপুকুর, ১৩ নং গুরুপ্রসন্ন চৌধুরী লেন) একটি ছোট বাটীর বাহিরে একটি পুরাতন তক্তপোষের উপর মাদুরে উপবিষ্ট 'শ্রীম' শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত, বয়স ২৫।২৬ শ্মশ্রু-গুম্ফপূর্ণ সরল গম্ভীর মূর্ত্তি, পরনে আধ ময়লা সরু লাল ধুতি—Collegeএ lecture দিবার জন্য 'Smile's Self Help' পুস্তক পাঠে মগ্ন। অন্দরে যাইবার দরজা বন্ধ। প্রাতঃকাল]

শ্রীম। [পুস্তক পাঠ করিতে করিতে নোট করিতেছেন। পরে উদাস ভাবে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া, বইটি রাখিয়া একখানি খাতা বা ডাইরি বাহির করিলেন (যাহাতে পরমহংসদেবের কথা নোট করিয়াছেন) ও কিছু লিখিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিলেন] ঠাকুরের এই কথাটি কাল লেখা হয়নি। কত অমূল্য কথাই অনর্গল বলে যান। দেবী ভারতী যেন ওঁর কণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। নিত্য নূতন কথা। বেশ উপমাও দেন। যেমন উনি (ঠাকুর) সহাস্যে বোললেন—ও দেশে (কামারপুকুরে ওঁর জন্মভূমিতে) যখন ধান মাপা হয় তখন এক জন 'রামে রাম' বলে মাপে আর এক জন পেছন থেকে ধানের রাস ঠেলে দেয়। তিনিও মা কালীকে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি মুখ্যু মানুষ, শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছুই বুঝি না, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।' তাই মাও ধানের রাস এগিয়ে দেন। (একটু থেমে) সত্যি, যার মা আছেন তার আবার ভাবনা কি? কত বড় বড় পণ্ডিত ওঁর সাথে তর্ক করতে এসে 'থ' হয়ে যান।

[এই সময় একটি অন্ধ ভিখারী ছোট একটি বালকের সাথে গান করিতে করিতে গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্রীম ব্যগ্র ভাবে গানটি শুনিতে লাগিলেন।—গানটি আবেগপূর্ণ রামপ্রসাদী সুর—"মা আমায় ঘুরাবি কত?" গায়ক ঐ বাড়ীর দিকে আসিলে তিনি উহাদের ভিতরে ডাকিলেন এবং সাদরে তক্তপোসের উপরে বসিতে বলিলেন]

শ্রীম। (সহাস্যে গায়ককে) তোমার গলার সুরটি শুনে বেশ বোঝা যায় তুমি একটি ভক্ত লোক। আর একবার শোন না।

গায়ক। (কৃতজ্ঞতা ভাবে) আজ্ঞে মশাই, আপনাদের নিজগুণেই ঐ কথাই বোলছেন। (বালককে যোগ দিতে বলিয়া গায়ক পুনরায় ঐ গানটি গাহিতেছে)।

[অন্দরের দরজা খুলিয়া তাঁর দুইটি বালক ও বড় কন্যা (যিনি ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছেন) বাহিরে আসিয়া গান শুনিতেছে। দ্বারের নিকট লাল পাড় শাড়ীপরনে তাঁর স্ত্রীও শুনিতেছেন। সদর দরজায় সব বালক- বালিকাগণ আসিয়াছে। গানটি বেশ জমিয়াছে। বয়স্কের ভারী গলা এবং বালকের চড়া গলার সুর শ্রোতাদের মনে-প্রাণে আনন্দের বান ডাকিয়েছে। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ তথায় আসিতে শ্রীম তাহাকে সাদরে নিকটে বসাইলেন। গায়ক গাহিতেছে—

"ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা (ও মা, মা গো)
পাক দিতেছ অবিরত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি
দেখি তোমার ঐ অভয় পদ।"

ইতিমধ্যে শ্রীসুবোধ (শ্রীখোকা মহারাজ, ঠনঠনিয়া কালীমাতা স্থাপয়িতা স্বর্গীয় শঙ্কর ঘোষের বংশধর ও বালক ছাত্র বাবুরা (ঠাকুরের লীলা-সহচর শ্রীপ্রেমানন্দ মহারাজ) আসিলে শ্রী: উহাদের নিকটে বসাইয়া পুনরায় গানটি গাহিতে অনুরোধ করিলেন—"এঁরাও যখন এসেছেন তখন এই গানটি আর একবার গাইতে হবে।" গায়ক গাহিল, শ্রীমও মৃদু স্বরে যোগ দিলেন ও নরেন্দ্রনাথকে যোগ দিতে ইঙ্গিত করিলেন। গানটি শেষ হলো, শ্রীম সহাস্যে গায়ককে বলিলেন, "বাঃ, আজ বেশ আনন্দ হলো!" সকলেই তৃপ্ত। কন্যাকে চাল আনিতে বলায় সে বাড়ী হইতে একটি রেকাবীতে চাল ও আলু আনিল। তিনি বলিলেন—"ইনি দিয়ে আর একবার ঐ রকম আনতে হবে। এরা যে দুজন।" বালিকা পুনরায় বাড়ী হইতে চাল আলু আনিয়া ঢালিয়া দিলো।]

গায়ক। (কৃতার্থ ভাবে) আর অনুমতি হলে আমরা উঠি।

[গায়কের ঝুলিতে চারটি পয়সা দিয়া শ্রীম বলিলেন, আবার যখন এদিকে আসা হবে তখন যেন এখানে আসতে ভুল না হয়।]

গায়ক। আজ্ঞে, আমি অন্ধ, চোখে দেখতে পাই না (বালককে) ছাখ, এই বাবু মশায়ের বাড়ী ভাল করে চিনে রাখ। মাঝে মাঝে এখানে আসতেই হবে। আজকের মত প্রণাম নিন।

[প্রস্থান

শ্রীম। (নরেন্দ্রকে) আজ কেমন আনন্দ হলো?

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) Le grande, চমৎকার! ঠিক যেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের ব্যাপার! ছোট Pocket edition (সকলের হাস্য)।

[এই সময়ে জনৈক উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা... গলদেশে ... পৈতা, কাঁধে উড়ানী, কপালের উপর চন্দন কৌটা, মুখে পান, হাতে শালু ঢাকা বাক্সের মধ্যে ৺শীতলা ... লইয়া ঐ ভাবে নিকট আসিল ও বালকদের কপালে ... করিয়া চন্দনের টিপ দিল ও একটি ফুল দিতে ব্যস্ত হই... (সকলের উচ্চহাস্য)]

নরেন্দ্র। আবার যে এক নূতন candidate আমদানী ... (পরে বালকদের) তোমরা ফুলগুলি ফেরৎ দাও, ওর অন্য ... লাগবে। (পরে পূজারীকে) 'তু খসি পড়। (হাস্য)

উঃ ব্রা। (বাগত ভাবে) এমতি কথা কইবো না, মুশাই। শীতলা বড্ড জাগতা অছি। ওঁর কোপে পড়লে সর্ব্বনাশ হবো। (চন্দনের টিপ শ্রীমকে দিয়া নরেন্দ্রের নিকট ... করিলে)

(বাধা দিয়া) ঐ বড় বাবুকে দিলেই সব হবে। মু নবো না। (হাস্য)।

...শ্রা। (কুপিত স্বরে) এ কিমতি কহুছন্তি। কলিতে সব ভাবতা ঘুমছি—এই মা মোর জাগিছি। এ বাড়ীতে সব ভাল ... 'মাব দয়া' হব না। এ ঠাঁই মোর অন্ন অছি।

... যখন ধর্ম্মের নাম নিয়ে এসেছে তখন চারিটি পয়সা দিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

পয়সা পাইয়া সে আশীর্ব্বাদ করিয়া "মা ভাল কর' বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল। (সঙ্গে সঙ্গে বালকেরাও)।

... No good to encourage helplessness. ধর্ম্মের নামে কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। কুসংস্কার superstition like imperialism dies hard. সাম্রাজ্য ... নীতি-নীতি মরেও মরে না। Beggar's law হওয়া ... । ঐ জোয়ান বয়স গতর খাটাতে চায় না। Societyকে সমাজকে সংসারকে যে কিছুই দেয় না বরং একটা useless burden। এই অকেজো বোঝাগুলো দুষ্ট ব্রণের মত কষ্ট ... । তেলক-কাটা ছাপ-মারাদের তেল-চকচকে গা ও মস্ত ... কেবল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গে। Must lift these rotten stuff. এদের জাগাতে হবে, তুলতে হবে। সমাজের কোন অঙ্গ—পঙ্গু রাখা কখনও চলে না।

... কথাটা সত্যি বটে। তবে ধর্ম্মের ভাণ করতে করতে এক দিন ওর আসল ধর্ম্মের দিকে নজর পড়তে পারে! ঠাকুরের গল্পটা মনে আছে ত? একটা চোর ধরা পড়বার ভয়ে সাধু ... গাছতলায় চোখ বুজিয়ে বসত। কত লোক তাকে ভক্তি ... টাকা-পয়সা-খাবার দিত। এক দিন গভীর রাত্রিরে সেই ... ভাবলে, নকলে যখন এত, তখন আসলে না জানি ... । সে তখন চুরি করা ছেড়ে দিয়ে প্রকৃত সাধুর মত বাস ... থাকে। ঠাকুরের কথা, কাটবার যো নেই। ওর একটা ... ভেতর কত গভীর অর্থ!

... ঠিক কথা। That thief was shocked into moral life. হঠাৎ ওর জ্ঞান-নেত্রটা খুলে গেল।

(যুবাদ্বয়কে সস্নেহে) তোমরা যে আজ সকাল বেলাই এলে?

... । আজ্ঞে, পরীক্ষা নিকট। তাই একবার মা কালীকে প্রণাম করে প্রসাদী ফুল নিয়ে এলাম।

... । (উচ্চ হাস্যে) পরীক্ষা বা বিপদের সময়েই লোকেদের ভক্তি-... গণগণ করে জ্বলে ওঠে, আর বিপদ কেটে গেলেই খপ, ... নিবে যায়! ঘুষ দিয়ে কাঁও মারা যায় কি? সারা বছরটা ... দিয়ে কেউ প্রণাম করে পাশ করতে পারে? 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—Redemption of the ego by the self.

... ওটা বীর সাধকের কথা।

... নিজের পায়ে ভর দিয়ে নিজেকেই দাঁড়াতে হবে। দালাল ... নিয়ে, ঘুষ না দিয়েও স্বর্গের সোনার চাবিকাটি মিলতে পারে। Life must assert itself.

... (শান্ত ভাবে) Moral life বা নৈতিক জীবন গড়তে হলে ভক্তিভাব থাকাই ভাল। গোড়া থেকেই যদি ছেলেদের মধ্যে ভাল সংস্কার জন্মায় তাহ'লে পরে ভাল ফল হয়। Youth is the seed-time of life (যৌবনই জীবনের বীজ বপন কাল)। (পরে যুবাদ্বয়কে) দেখি মায়ের নির্ম্মাল্য, (মস্তকে স্পর্শ করিয়া ফেরৎ দিবার কালে)—তোমাদের আর দেরী করা ঠিক নয়।

[যুবাদ্বয়ের প্রণামান্তে প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আপনাকেও তো উঠতে হবে। আমরা এসে আপনার কাজের সময় নষ্ট করলাম।

শ্রীম। আমাদের কাজের কোন ক্ষতি হয়নি বরং কত আনন্দ হোল। তাই বাইবেলে আছে—"Man liveth not on bread alone"—এ-রাজ্যের কৈন্তে কৈরে নিয়ে মত্ত থাকলে ও-রাজ্যের আসল খবর কিছুই জানা যায় না। ঠাকুরেরও কথায় আছে—"ইঁদুরগুলো দু'টো খই-মুড়কি খেয়েই সারা রাত কাটালে, নীচে মুদির যে সব মাল আছে তা আদৌ টের পেলে না"।

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) বাঃ, বেশ কথা। Paying too much f r the tin whistle—ছেলেটা টিনের বাঁশী পেতেই পাগল! The hectic life is not the be-all and end-all. কর্ম্ম-চঞ্চল জীবনই সারবস্তু নয়! ব্রহ্ম ও মায়ার খেলা বোঝা শক্ত। (স্বগতঃ) দক্ষিণেশ্বরের ঐ পাগল বামুনটার কাছে যতই যাচ্ছি ততই মজছি। সবার মাথা জোর করে হেঁট করে দেয়। Magnatic personality বটে! কথার মধ্যেও একটা force (শক্তি) আছে।

শ্রীম। ঐ তো revelation! আত্মদর্শনের পর সত্য লাভ—যাকে বলে revealed truth, আর বই পড়ে জ্ঞান লাভ—যাকে বলে acquired knowledge—এ দু'য়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ! তাই পণ্ডিতরা ওখানে তর্ক করতে এসে চুপ। Fools cause to scoff but began to pray!

নরেন্দ্র। হ্যাঁ, a God intoxicated man—সদাই ঈশা-প্রেমে বিভোর। Carlyle এই typeকেই বলেছেন—'Representative man'। Super man—অতিমানব। Faultless saviour.

শ্রীম। এতে সন্দেহ আছে? সামান্য উদ্দীপনাতেই সমাধি। বিশেষতঃ তোমাকে কাছে পেলে বা তোমার মধুর গলা শুনলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না। অথচ সকলেই মনে করে যে তিনি তাকে খুব ভালবাসেন। একেই বলে বহুবল্লভতা।

নরেন্দ্র। Not a tinge of selfishness in the devine love—ওর স্বার্থে ভরা ভালবাসা নয়, আমি নিজের মুক্তির জন্য এতটুকু কাতর নই। I am out and out a democrat wild a fanatical longing for true freedom—আমি মনে-প্রাণে মুক্তি-পাগল! নিজে মুক্ত হয়ে অপরকে মুক্তির পথ দেখান কি বড় নয়?

শ্রীম। তাই তো তিনি তোমাকে এক দিন বলেন, চিনি হওয়ার চেয়ে কি চিনি খাওয়া ভাল নয়? বট গাছে কত প্রাণী আশ্রয় পায়? তিনি অন্তর্যামী—সবার মনের খবর জানেন। তোমার দ্বারা জগতের অনেক মঙ্গল কাজ করাবেন।

নরেন্দ্র। কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে?—**A very burning desire to solve the mystery**! দিন কতক তপস্যা করতে চাই। কিন্তু মা'র শুকনো মুখ দেখে সব গুলিয়ে যায়। তাই মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, সদাই দাবানলের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

শ্রীম। দ্যাখ, ভাল কথা মনে পড়ল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তোমার কথা বলেছি। হয়ত ওখানে একটা মাষ্টারী হতে পারে। তুমি যদি রাজি থাক, আজ স্কুলে একবার যেও না—**introduce** করে পাকা কথা ঠিক করা যাবে। আসছো তো? আর একটু দাঁড়াও, সামান্য মিষ্টিমুখ করে যাবে।

নরেন্দ্র। এতক্ষণ ধরে যে মিষ্টি খাওয়ালেন তাতেও আপনার সং মিটলো না? দোকানের মিষ্টি কি এ সবের চেয়েও বেশী মিষ্টি না কি? আর আপনাকে দেরী করান উচিত নয়। (সহাস্যে) —আপনি একটি কম্বনাশা। যেমন গুরু তেমনি চ্যালা। সংসার-ফংসার অতলে তলিয়ে যায়। পালাই।

[প্রস্থান।

শ্রীম। তুমি যে সত্যের ও সুন্দরের চির পূজারী, তাই অসত্যের ও অসুন্দরের চির বিরোধী।

[ক্রমশঃ

বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান জগতে সংবাদপত্রের স্থান অতি উচ্চে। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রের প্রভাব অতুলনীয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংবাদপত্র বহু বড়-বড় রাজা ও রাজনৈতিক নেতার উত্থান ও পতন ঘটিয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্রকে বহু আপদ-বিপদ থেকে যথাসময়ে সতর্ক করে দিয়ে রক্ষা করেছে। তাই আজ দেখতে পাই, সকল দেশেই যত দিন যাচ্ছে ততই সংবাদপত্রের প্রভাব বাড়ছে ও সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রচারও বাড়ছে। ডাল-ভাতের মত সংবাদপত্র না হলে যেন আর আজকাল কারও দিন কাটে না। সকাল বেলার চায়ের সঙ্গে সবারই দুই-একখানা করে খবরের কাগজ চাই-ই।

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ট্রিগভি লাই বিভিন্ন দেশে খবর কাগজের প্রচার-সংখ্যা ও খবরের কাগজ ছাপার কাগজ খরচের পরিমাণ সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রকাশ কোরেছেন। তাঁর রিপোর্টে দেখা যায়,—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ৬ কোটি দৈনিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। হিসেব কোরে দেখা গেছে, আমেরিকায় সংবাদ-পত্র মুদ্রণের জন্য প্রতি বৎসর কাগজ খরচ হয় মাথা-পিছু ৩১ কিলোগ্রাম।

সংবাদপত্র ও সংবাদ আদান-প্রদানের স্বাধীনতা সম্বন্ধে রাষ্ট্রসংঘের যে সাব-কমিটী গঠন করা হয়, সেই কমিটীর কাছে বিভিন্ন দেশ সংবাদ-পত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি পেশ করে। তারই ভিত্তিতে ট্রিগভি লাই-এর রিপোর্ট রচিত।

সোভিয়েট রুশিয়ায় দৈনিক ৩ কোটি ১০ লক্ষ খবরের কাগজ প্রচারিত হয়। মাথা-পিছু সেখানে কি পরিমাণ সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য কাগজ খরচ হয় তা জানা যায়নি। বৃটেন ও রুশিয়ায় সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা কিছু বেশী।

বৃটেনে আজকাল মাথা-পিছু বছরে ৭'১ কিলোগ্রাম সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য কাগজ খরচ হয় বলে জানা গেছে। ১৯৩৯ সালে মাথা-পিছু ২৬ কিলোগ্রাম কাগজ খরচ হ'ত। যুদ্ধের কনট্রোলের ফলে কাগজের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে কিলোগ্রাম। তবে লোক-সংখ্যার অনুপাতে ইউরোপের এখনও বৃটেনে সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী।

রিপোর্টে এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যের যে হিসেব দেওয়া তাতে দেখা যায়, জাপানেই মাথা-পিছু এই কাগজের খরচ সব বেশী। জাপানে ১৯৩৯ সালে মাথা-পিছু কাগজ খরচ হ'ত ৬ কিলোগ্রাম। ১৯৪৮ সালে এর পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাথা-পিছু ১'৫ কিলোগ্রামে।

ফিলিপাইন ও মালয়ে সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য কাগজ ও মাথা-পিছু '১ কিলোগ্রাম।

আর আমাদের ভারতবর্ষে মাথা-পিছু খরচ হয় [illegible] কিলোগ্রাম। চীন ও ব্রহ্মদেশের অবস্থাও ভারতেরই এই দুইটি দেশেও মাথা-পিছু '১ কিলোগ্রাম সংবাদপত্র জন্য কাগজ খরচ হয়।

দক্ষিণ-আমেরিকায় উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনায় মুদ্রণের জন্য কাগজ খরচ হয় মাথা-পিছু প্রায় ৮ কিলোগ্রাম থেকে জানা গেছে যে, আর্জেন্টিনায় প্রতি হাজার লোক ২১৫খানি করিয়া দৈনিক সংবাদপত্র ছাপানো হয়। ছাপা হয় প্রতি হাজারে ১৭৪খানা।

লেডী রম্

পুলকেশ দে সরকার

না-পড়া মাসিকখানা নিয়ে আলস্য ভাঙলে যতখানি ভাল দেখায়। সে ভাবে যে ভঙ্গীতেই হোক্ না কেন, দেয়ালের আয়নায় নিজের রূপ-ভঙ্গিমা দেখে দেখে লেডী রমলার আশ আর মেটে না। খুব ভালো পটুয়াকে দিয়ে আঁকানো আর তেমনি পটু ক্যামেরা-ম্যানকে দিয়ে তোলা গোটা কয়েক বড় বড় ফোটো টাঙানো আছে এ-ঘরে ও-ঘরে এবং এ-বাড়ীর যেখানে যেখানে বিচরণ করেন লেডী রম্। বন্ধু-বান্ধবকে টেনে নিয়ে দেখান ছবিগুলো, বার বার তাদের মত জিজ্ঞাসা করেন আর ভবিষ্যতে আবার কি ভঙ্গীতে ছবি তুলবেন ভাবতে থাকেন। লেডী রম্ নিজের রূপের মাঝখানে জাগেন, নিজের রূপের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েন। ৪৫ বছরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা লেডী রম্। প্রসাধনে প্রসাধনে ঘর্ষণোজ্জ্বল ৪৫ বছরের পরিমিত চর্বি-পরিপুষ্ট স্বাস্থ্যশ্রী লেডী রম্।

তির্যক গতিতে রঙিন শার্শির ভেতর দিয়ে সূর্যের স্পেকট্রাম এসে সদ্য সুপ্তোত্থিত লেডী রমলার উন্মীলিত চোখে পড়তেই আজ এই ১৩ই তারিখে অকস্মাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের গ্লানিতে শেষ সুপ্তির জড়তাও সম্পূর্ণ কেটে গেল। ঝটকা মেরে উঠলেন লেডী রম্, দেয়ালের আয়নাগুলোতে অপরূপ ভঙ্গী প্রতিফলিত হল যেন, নিজের রূপ-ছায়ার দিকে তাকাতে তাকাতেই খাটের ডান বাজুতে বৈদ্যুতিক কল টিপ্‌লেন, বি ট্রিটের পশ্চিম দরজার শীর্ষে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল, আর ঘণ্টি কির্‌-কির্‌ করে বেজে উঠল। ঐ বুক-কাঁপানো শব্দ এতটুকুও শোনা যায় না বি ট্রিটের ভেতরটায়। কিন্তু দুয়ারে দাসী সুশীলা প্রস্তুত, বুক-কাঁপানো কির্‌কিরানি থামতেই ভারী দরজাটা খুলে ঢোকে এই ঘরে······

দেয়ালের আয়নার দিকে তাকিয়েই বলেন, সুশীলা শীগ্‌গির খুলে দে তো আমার পুতুলের ঘরটা। ইস্, কদ্দিন হয়ে গেল যাইনি পুতুলের ঘরে, কোনও এমনি হয়েছিস্······

সঙ্গে সঙ্গে চাবির গোছাটা নিয়ে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়ায় মূক সুশীলা, কর্ত্রীর মনের কথা মনে করিয়ে দিলে বা না দিলে দোষের পার্থক্য ওজন করতে পারল না কিছুতেই বারো বছরের পুরানো ঝি সুশীলা। মনের কথা টেনে বলা চলে কর্ত্রীর?—না, না-বলাটাই শোভন? এ কথাটা একবারও কি মনে করিয়ে দিতে নেই যে, আর, তোর এ সব কথায় মাথা ঘামাবার দরকারটা কি, এ দু'য়ের পার্থক্য আজও বুঝতে পারেনি সুশীলা—কৃত্রিম প্রচেষ্টায় স্বভাব-মুখর মূক সুশীলা।

চাবির গোছাটা নিয়ে সুশীলা পৌঁছোয় পুতুলের ঘরের কাছে, চপল গতিতে তালা খুলে ফেলে, আর প্রায়-বিস্রস্ত বসনে আসেন লেডী রম্, তর, সয় না লেডী রমলার, কি একটা অন্যায় অনুভূতি জেগেছে ওঁর মনে। তালা-খোলা দরজাটা আধ-ভেজানো থাকতেই দড়াম্ করে ভেতরে ঢুকলেন, পুট্ করে আলো জ্বাললেন, জানালাগুলো সুশীলাকে খুলে দিতে বললেন, হুতাশে ছুটে গেলেন তাকের কাছে, তেমনি উদ্দামতার সঙ্গে তাক থেকে নামালেন এক পুতুল,

রঙিন শার্শির ভেতর দিয়ে তির্যক গতিতে সূর্যের স্পেকট্রাম এসে পড়েছে লেডী রম্ ওরফে লেডী রমলার চোখে। লেডী ... এই ঘরটায় শোন, এই পূবের ঘরটায়, একেবারে পূব কোণে, ... দালানের পূর্বাস্ত। ঘরটা একেবারে ছোটো নয়। মুসল- ... তাড়া-খেয়ে-আসা পাঁচটা উদ্বাস্তু-পরিবার পঁচিশটা ছোট-বড় ... নিয়ে বসতি বাঁধতে পারে। একটু ঘিঞ্জি হবে, কিন্তু কাঁকা ... মুসলমানের তাড়ার ভয় নেই।

... ঘরে জানালা একটাও নেই। মেঝে থেকে ছাদ অবধি ... কবাটগুলো আলো-হাওয়া আগমন-নির্গমনের অবকাশ আছে ... সব ক'টাই দরজার সংজ্ঞায় পড়ে। এমন আর্টটা দৈত্যের ... দেড়া আর মাগোয়াড়ীর মতো স্থূলকায় অবকাশ আছে এই ... কিন্তু বাইরের আকাশ আর ভেতরের আকাশের মাঝে ... রচনা করেছে নানা বর্ণাঙ্কন-বিচিত্র শার্শি। পুলিতে টানা ... রঙের পর্দা। আছে ঝুলানো দরজাগুলোর মাথায় মাথায়, ... বাইরে বাইরে গোলাকৃতি দু'খানা ভেনেস্তা চেয়ারে ... বিচ্ছিন্ন বারান্দা।

... পরিবারের ঘিঞ্জি হয়ে পুনর্বসতি হতে পারে পূব কোণে ... মাত্র একটি সোফা, স্প্রিংয়ের প্যাঁচে ওঠা-নামা করতে ... বাবারের নরম চাকায় পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ করতে ... পারে এতে দু'-দু'টো মানুষ অনায়াসে বসতে, শুতে এবং ...

... ঘরে লেডী রম শোন্ একা এবং এর পশ্চিম দরজার ... আছে বি টি ট্রি, যার সোজা বাংলা হচ্ছে সংসারের হট্টগোল ... লেডী রম্ পালান, পঁয়তাল্লিশ বছরের লেডী রম্ ... পালান, বছরে দু'শো দিনই পালান এবং লিফ্‌টে-ওঠা তেতলায় ... স্বামী স্যার বি আর মহাপাত্রের পশ্চিম দিক্‌কার ঘরের ... যোগাযোগ রাখেন—এক্সটেন্সান থ্রি। আর এ ঘরে ... লেডী রম্—যে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মসৃণ আয়না, ... পরিব্যাপ্ত, চোখ বুজলেও লেডী রম্ অনুভব করতে পারেন ... করে শুয়ে আছেন এবং তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে, ... মতো অন্তর্ভেদী মুখস্থ দৃষ্টি। একটু চোখ খুললেই ... রশ্মির সুতীক্ষ্ণ রেখা রেটিনায় প্রতিফলিত হয় আর ... চিত্তে সেই ছবি ছাপা হয়ে যায়। পলকে পলকে ... চলচ্চিত্র দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে লেডী রমলার ...

... ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে লেডী রমলার নিজেকে। ... সাজানো-গোছানো সব-কিছুই কেমন শিল্পশ্রী-মণ্ডিত, কেমন ... শুকনো অলকদাম, পাকা চর্বিতে ফাঁপানো মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল ... সামীপ্য-প্রার্থী কৃষ্ণকলি ভ্রূযুগল, আভিজাত্য স্পর্ধোদ্ধত ... বোঁচা নাক, সিগারেটের ধোঁয়ায় লাঞ্ছিত কালো পুরু ঠোঁট, ... দু'টি নিষ্কলঙ্ক কপোল, স্বল্প দৃশ্যমান সামান্য ভেজো লোমে ... ভর্তি থুৎনি। এর পর নেমেছে গ্রীবা, এসে থেমেছে ... স্কন্ধে, যে স্কন্ধে কখনও কোন ভার নিতে বা বইতে হয়নি। ... যৌবন গিয়েছে রমলার কিন্তু স্বাস্থ্য আছে, নিটোল স্বাস্থ্য, ... না থাকলেও মেদাধিক্য আছে যে স্বাস্থ্যে। সোজা ... দেখা যায় লেডী রমলার সুপুষ্ট দেহ, নানা ভঙ্গীতে শায়িতা। ... শুলেও মন্দ দেখায় না, ঠিক ততখানিই ভাল দেখায় চিৎ ... সব শরীরটা টান-টান করে শুলে অথবা আধ-শোয়া অবস্থায়

কালপ্রবাহের কোন বিস্মৃত মুহূর্তে তাঁর তাকে-তোলা পুতুল, পরম আদরে ঝাড়তে লাগলেন ধুলো-নিরোধী ঘষে নিধূল পুতুলের অঙ্গগুলি, তার পর তেমনি আবেগের সঙ্গে একে জড়িয়ে ধরে বললেন, ইস্, তোরা কি রে, একবারও কি মনে করিয়ে দিতে নেই রে, কত দিন কেটে গেল আমার পুতুলমণির অনাদরে। তোদের কাউকে আর রাখব না কাজে।

গাটাপার্চারের রঙিন পুতুলের ফোলা-ফোলা গালে লেডী রমলা চুমো খেলেন। নিউ মার্কেটে স্বামী আর মহাপাত্রের সঙ্গে কেনা গাটাপার্চারের রঙিন পুতুল, গ্ল্যাকসোর বিজ্ঞাপনের মতো ড্যাবা-ড্যাবা হাত-পা আর চকচকে ন্যাড়া মাথার এত বড় পুতুল, প্রাণ থাকলে কমসেকম দেড় বছর বয়স হ'ত। প্রাণ না থাক্, তুই বাক্স দরজি দিয়ে তৈরী নানা ঢঙের জামা—মায় হাওয়াইয়ান সার্ট আছে। আছে শান্তিপুরী কাপড়। এক পাশে কাঠের ঘোড়া, আর এক পাশে মোটর গাড়ী, আরও কত কি খেলার সামগ্রী। প্রাণ না থাক্, তাতে লেডী রমলার কথা বলতে বাধে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর সঙ্গে বুলবুলির মতো কথা বলে যেতে পারেন লেডী রম্‌, এই মূক সুবোধ বাধ্য ছেলেটিকে বড় ভাল লাগে লেডী রমলার, যা ইচ্ছা তাই চরিতার্থ করতে পারেন, নির্বিকার পুতুল। তবু লেডী রম্ বলেন, তুমি যে কিছু বলছ না খোকন, বলতে চাও না বুঝি, বলতে ভাল লাগে না বুঝি, শরীর খারাপ? তবে এসো, একটু ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেয়ে এসো। ও মা! এই রোদে ঘোড়ায় চড়ে যাবেই বা কোথায়। নাও, মোটর চড়ো, নাঃ, এবার খোকনকে একটা নিউ মডেল কিনে দিতেই হবে। আজই।

অনর্গল বলে যেতে পারেন লেডী রম্। সত্যি, কত কথা আছে এই পৃথিবীতে। বল তো খোকন, আজ জল হবে কি না, না, ঝড় হবে। যাই হোক্, বলেই গান ধরেন, ফিরব নাকো আর, মোদের যাত্রা হ'ল সুরু······

গাইতে একটু একটু পারেন লেডী রম্। আর মহাপাত্রের স্ত্রী হবার পর একবার তদ্বির-তদারক করে একটা গান রেকর্ড করার আয়োজনও হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি একটা যান্ত্রিক গোলমালে আর তোলা হয়নি। অভিমানবশে লেডী রম আর রেকর্ড তো করানই নি, বাড়ীর রেকর্ডগুলো ভেঙেছেন, নূতন রেকর্ডও কেনেননি। নিউ মার্কেটে স্বামীর সঙ্গে কেনা গাটাপার্চারের খোকনকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে কোম্পানীকে জব্দ করাবেন ভেবেছিলেন লেডী রম্, কিন্তু খোকার মৌনভঙ্গ হয় না কিছুতেই।

নির্ধূল অঙ্গের ধুল ঝেড়ে পুতুলের অঙ্গ থেকে এত দিনকার বাসি কাপড় নিলেন ছাড়িয়ে, তার পর ন্যাড়া মাথায় দিলেন সামান্য একটু বাথগেটের তেল, তার পর নিয়ে বসালেন ছোট্ট টাবটায় আর ঠিক মাথার ওপরকার ছোট্ট ঝরণা-টাপকল দিলেন ছেড়ে, লাক্স গুলে সাবান দিলেন গায়ে, তার পর নিয়ে এলেন আদর করে টাবের বাইরে, শুকনো তোয়ালেয় নিজ্জলা করে মুছলেন। নিজের গায়ে হাই ব্লাড-প্রেসারের গরম দিয়ে বুঝলেন, খোকনের গরম সহ্য হচ্ছে না, নাই বা জামা গায় দিলে এখন খোকন, যা গরম। একটা বরং ইজের পর। ন্যাংটো থাকতে নেই, লোকে নিন্দে করে। ব্যস্, এবার পাখার নীচে এই চেয়ারটায় বাবু হয়ে বসো। বাঃ, সুন্দর, সোনা!

সুশীলাকে ব'লে ড্রাইভারকে দিয়ে আনালেন সেন মহাশয়ের সন্দেশ। লুচি ভেজে দেব দু'খানা? না, এই থাক, বরং এক ক[illegible] দুধ খাও। অনেকটা বেলা গড়িয়ে গেছে, দুপুরের ভাত খা[illegible] কখন?

অনেক যত্নে ছোট্ট বিছানা করলেন খোকনের; দু'দিকে [illegible] পাশ-বালিশ। খোকনের আবার পাশ-বালিশ চাই, এমনি [illegible] অভ্যেস। পড়েও তো যেতে পারে। আজ কি খুব মশা? [illegible] মশারিটা চাঁদোয়া করে তোলা।

কলের পাখায় কুলোয় না যেন খোকার। হাঁটু গেড়ে খস্‌[illegible] পাখা নিয়ে বসেন লেডী রমলা। খুব কি ক্ষিদে পেয়েছে খোক[illegible] অত হাভাতেপনা করো না খোকা। এই তো খেলে, এক্ষুণি [illegible] অসুখ করবে যে। সুশীলা গেছে খাবার জোগাড়ে। সুশী[illegible] ডাকলেন। বৈদ্যুতিক জগতে দূরের লোকেরও বাঁচে [illegible] দেরী হয় না। সুশীলা তো কি। সঙ্গে সঙ্গে সুশীলা এসে হা[illegible] সঙ্গে সঙ্গে লেডী রম্ তিরস্কার করে উঠলেন। হ্যা রে, তোদের [illegible] আক্কেল নেই রে! সেই সাত-সকালে খেয়েছে খোকন দু'টি [illegible] টুক্ সন্দেশ আর এক কাপ দুধ। কতক্ষণ থাকে? বলি, [illegible] তোদের এ জন্মে হবে না?

পরিষ্কার করে মুখ মুছিয়ে দিলেন খোকনের, ভেজা গামছা [illegible] আর একবার মুছে দিলেন গাটাপার্চারের রঙিন পুতুলের [illegible] অঙ্গ। তার পর আদর করে শুইয়ে দিলেন। হাওয়া [illegible] খস্‌খসের পাখায়। আওড়ালেন ঘুম-পাড়ানিয়া গান। [illegible] পড়ল বুঝি খোকন। তার পর খুট ক'রে দরজার বাইরে [illegible] বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে। সুশীলাকে আদেশ দিলেন [illegible] পরিষ্কার করে গাটাপার্চারের পুতুলটাকে তাকে তুলে রাখতে।

দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর বৈকালিক প্রথম জাগরণে [illegible] ডাকলেন সুশীলাকে। জানতে চাইলেন, রমেনকে আনতে [illegible] গেছে কি না। রমেন। লেডী রমলার শিল্পী। লেডী রমল[illegible] রকমের তেলে-আঁকা ছবি এঁকেই শৈল্পিক কৃতিত্ব, রেখায় রেখা[illegible] তোলে যে লেডী রমলার অপার সৌন্দর্য। রমেনের হাতে [illegible] খেলে রঙ, অদ্ভুত চলে তুলি, অদ্ভুত তরল ভাইঙ্গিমা। ক'দিনের উপবেশনেই আঁকতে পারে যে লেডী রমলার কন্দর্প [illegible] মাংসের সঙ্কল্প। এমনি মুগ্ধ হয়ে গেছে লেডীর দেহ[illegible] রমেনের। খানিকটা স্নেহ, কিছু মমতা এবং অনেকখানি [illegible] সঞ্চার হয়েছে এই একবার করে আঁকা দেহ সম্পর্কে, দে[illegible] লাগে রেখাগুলি, অনেক দিনকার লালন-করা তুলিতে বুলা[illegible] লেডী রমলার দেহ-রেখা। শিল্পীর মতো অষ্টকোণা পাঁচ[illegible] পরে রমেন, আর কেমন ঘোলা-ঘোলা দৃষ্টিতে তাকায়, [illegible] রঙে তুলি ছোপায়, তার পর মারে ক্যান্‌ভাসে টান, তুল[illegible] টানে টানে ফুটে ওঠে রেখা, লেডী রমলার দেহ-রেখা। তার [illegible] দিন জ্বল-জ্বল করে ওঠে রূপ আর রমেনের হাতে রূপা! মতোই চীনাংশুক আর মুগার জামা ছাড়া গায় দেয় না রমে[illegible] তাঁতের কাপড় ছাড়া পরে না শিল্পী রমেন, পায়ে দেয় না [illegible] ছাড়া কোন জুতো।

শিল্পী রমেন সাহা। বৈঠকখানা রোডের এক হাতা[illegible] ঘরের বাড়ী, ভাড়াটে বাড়ী। বিয়ে-করা স্ত্রী, দু'টি [illegible] দু'খানা ঘরের একখানা ঘরে শিল্প, অপর ঘরে সংসার। বা[illegible]

মিষ্টি সুগন্ধ সারা ঘরটায়। পরম আদরে মুছে দিলেন চোয়াল-ভাঙা শিল্পী রমেনের মুখখানি লেডী রম্ নিজ হাতে। নিয়ে এলেন পাউডারের পাফ্, ঝুরঝুরে পাউডারে আচ্ছন্ন করে দিলেন শিল্পী রমেনের চোয়াল-ভাঙা মুখখানি, অভিভূত, মোহাবিষ্ট হ'য়ে গেল রমেন লেডী রমলার পরিচর্য্যায়। শিল্পীর মনে শত শত বুদ্বুদ উদ্ভূত হ'য়ে মহা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে লাগল মগজে। লেডী রমলার অতি-সামীপ্যের ঘ্রাণ এসে বার বার তরঙ্গ তোলে নাসারন্ধ্রে, পাৎলা চিরুণী নিয়ে আসেন লেডী রম্, আলগোছে উল্টে-পাল্টে সিঁথি কেটে দেন শিল্পী রমেনের কাঁচা-পাকা কেশারণ্যে, সাপের বাঁশী শুনে শিল্পী রমেনের চিত্ত ফণার মতো দুলতে থাকে। পাঁসনে চশমার নীচে ঘোলাটে চোখে তাকায় শিল্পী রমেন, লেডী রমলার চর্বির ঠাসায় টানা-চামের সুগোল বাহুতে ভাড়াটে রমেনের কর্কশ পাণির স্পর্শ পড়ে।

তুমি হাত দেখতে জান, রমেন? পাঙা কষ্‌তে? পার না বুঝি? পারবে কি, যে রোগা তুমি! বোসো, তোমার খাবার আনি। কি খাবে? সন্দেশ? নোন্‌তা তুমি ভালবাস না, ভালবাসা উচিতও নয়, তোমার দরকার প্রোটিন।

হাল্কা টিপয়টা নিয়ে এলেন রমেনের সোফার কাছে; নিজে বয়ে নিয়ে এলেন লেডী রম্ বাড়ীতে পাঁচটা ঝি আর সাতটা চাকর থাকা সত্ত্বও। ছোট্ট কাচের আলমারী থেকে বের করে আনেন সেন মশাইর সন্দেশ, একটা বড় ডিসে গুছিয়ে দিয়ে রেফ্রিজারেটর থেকে এক গ্লাস জল নামিয়ে আনেন। নাও, খাও। ব'লে খানিকটা কাছেই হাঁটু গেড়ে বসেন। মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা থাকা সত্ত্বেও হাতের চন্দন পাখাটা নাড়তে-নাড়তে বলেন, আবার কবে আস্‌বে বলো। আস্‌ছে শুক্রবার, না, রোববার? রোববার? মঙ্গলবার এলেও পার। মঙ্গলবার আস্‌বে তো? কখন আস্‌বে? না, সকালে নয়। দুপুরে আস্‌বে? রাপস্, দুপুরে যা রোদ। তুমি বিকেলেই এসো। সন্ধ্যা হলে আরো ভাল। ধর ছ'টা। না পার, সাড়ে ছ'টা। ঠিক সাড়ে ছ'টা। আমি ঘড়ি ধরে থাকব। ঠিক সাড়ে ছ'টা। মনে থাকবে তো, না, ভুলে যাবে? শিল্পীর মন! না, মনে রাখতেই হবে। ঠিক এসো কিন্তু সাড়ে ছ'টা।

লিফট্ পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন লেডী রম্! ভুলবে না তো কিছুতেই রমেন? সেদিন থেকেই নূতন সীটিং সুরু হবে। তোমা[র] আসা চাই-ই রমেন, ভুলবে না কোন মতেই, বুঝলে, তোমায় সেদি[ন] চাই। বিচ্ছেদের বেদনা আর অভ্যর্থনার আবেগ অঝোরে ঝরে[ছে] লাগ্‌ল লেডী রমলার কণ্ঠাবেদনে। শিল্পী রমেনের ভাবপ্রবণতায় ... এই ভাবটাই বুদ্বুদ কাটতে লাগল যে, মঙ্গলবার সকালে নয়, দুপুরে নয়, সন্ধ্যা ছ'টায় নয়, ঠিক ঠিক সাড়ে ছ'টায় তার আসাই চাই লেডী রমলার "বিট্রিটে", নইলে, কে জানে, লেডী রমলা মা—রা যা-বে-ন

মঙ্গলবার অনেক দিন পর গড়িয়ে গড়িয়ে এল, একান্ত কূর্ম্মগতিতে আবির্ভূত হ'ল শিল্পী রমেনের ভাড়াটে ঘরে। শিল্পী শৈল্পিক দৃষ্টি ও নৈপুণ্যে দেহ ও পরিবেশ মার্জনা করল সারা দিন। উবুড়-করা জাপানী টাইমপিসটা অনেক বার তুলে তুলে সময়ের টুকরো টুকরো-টুকরো সময় দেখল—উবুড়-করা জাপানী টাইমপিস, তিন ... টুকরো-টুকরো সময় পরিমাপের পর যার আর দাঁড়িয়ে টিক্-টিক্ করার শক্তি নেই চতুর্থ বছরে। বার বার মাথার ওপর ... উর্দ্ধদৃষ্টি শিল্পী রমেন নিরীক্ষণ করছে সময়ের ছোট-ছোট পদক্ষেপ আর জিন্-কষা সবল ঘোড়ার মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—... শিল্পী রমেন ক্রমশই।

সোয়া ছ'টায় পদাতিকের মতো ঘরের বাইরে প্রথম পদক্ষেপ করল শিল্পী রমেন। আজ আর গাড়ী আস্‌বে না, আজ আক[স্মিক] আহ্বান নয়, আজ আগে থেকে ব'লে-কয়ে রাখা সম্মিলনের ... আজ দায়িত্ব শিল্পী রমেনের ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গাটি[তে] পৌঁছোবার। পদাতিকের মতো পা বাড়ালো রমেন। পদাতিকের মতো চল্‌ল রমেন, আর ঘোড়-সওয়ারের মতো ... বাসে। বাস এসে থাম্‌ল মস্ত বাড়ীর কয়েক গজ দূরে, নাম্‌ল চট্ ক'রে লেডী রমলার শিল্পী রমেন, বাসের গতি লেগেছে রমেনের ... সঞ্চালিত হয়েছে তার চলনে। শিল্পী রমেনের গতি সবে ... থেমেছে গেটের কাছে, এমন সময় গেট গেল তড়িৎ গতিতে দু' ফাঁক হয়ে, আর তেম্‌নি তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে এল ঝক্‌ঝকে একটা ... ভারী গাড়ী, তড়িৎ গতিতেই তা বাঁক নিয়ে রাস্তায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট[ল]। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো গাড়ীর ভেতরে দৃষ্টিপাত হল রমেনের, ... হয়নি রমেনের কিছুতেই।

শিল্পী রমেনের উবুড়-করা জাপানী টাইমপিসে এখন ক'টা?

আমাদের উপেন

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইল স্বদেশী বস্ত্র স্বদেশী লবণ স্বদেশী চিনির ব্যবহারের ব্যবস্থা লইয়া। ব্রিটিশ বেনিয়াদের পকেটে হাত না দিলে তাদের ধ্বংস হইবার অন্য কোন পন্থা নাই ভাবিয়া এই ব্যবস্থা গৃহীত হইল। ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি তখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকের স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক মহাশয়কে মুখপাত্র করিয়া ৺সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল—রবীন্দ্রনাথের 'রাখীবন্ধন'—ও ... অনুশীলন সমিতি ও পূর্ব্ববঙ্গে ৺পুলিন দাসের অনুশীলন সমিতি ... 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দে মাতরম্', 'নবশক্তি' প্রভৃতি সংবাদপত্র মারফৎ অগ্নিময়ী ভাষায় যুবক-হৃদয়ে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ... সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সমিতি স্থাপন।

বারীন্দ্র ছিলেন গুপ্ত সমিতির অন্যতম নেতা, সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসকর হেমচন্দ্র কানাই প্রভৃতি সহকর্ম্মীরা মিলিত হইয়া ... কেমন করিয়া ব্রিটিশ-সিংহের নখ-দন্ত ভাঙ্গিয়া দিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা।

কিন্তু যাঁহারা এ গুপ্ত সমিতি করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গুপ্ত সমিতির যোগ্য গোপনে কার্য্য করার, বিশেষ চলা-ফেরার কোনই চেষ্টা ছিল না। আমি এক দিন উপেনকে বলিলাম—"শুনছি, পুলিশ গোয়েন্দারা তোদের পেছু-পেছু চলছে, বাগানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখছে।" হেসে উত্তরে বললে—"কাছে এলেই নাক কামড়ে দেব।" এই রকম হাল্কা রকম ভাব নিয়ে তারা নেমেছিল এত বড় কাজে। তার [illegible] হল, ধরা পড়ার পর গড়-গড় করে সব বড়দের স্বীকারোক্তিতে। স্বীকারোক্তির কোনই প্রয়োজন ছিল না। তারা মনে করলে, "আমরা যা করতে চেয়েছিলাম যা করা হল না, তা পরে যারা আসবে তারা সার্থক করে তুলবে, তাই জানিয়ে যাই।" সেটা না করিলেও [illegible] প্রচারের করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল—তারা সহজেই করিত, [illegible] যখন বান ডাকে তখন তার গতি কেহই থামাতে পারে না—[illegible] সব ভাসাইয়া লইয়া যায়।

উপেন আর বারীনকে মিছরি বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার [illegible] আমায় বলিয়াছিল যে, আপাততঃ কিছু টাকা একটা [illegible] জন্য চাই—শতখানেক বা দুই শত। আমি তাহাকে পর-[illegible] সন্ধ্যার পর আমার বাড়ীতে আসিতে বলি ও সে তাহা লইয়া [illegible] আমি পরীক্ষার বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত মনে [illegible] নাই, কারণ আমার ভার ছিল মাত্র টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া।

কিছু দিন পরে আবার আমায় বলিল যে, তিন শত টাকা চাই [illegible] মধ্যে। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হবে—আবার [illegible] না কি।—হাসিয়া বলিল—না, এবার ভাল রকম পরীক্ষা—[illegible]পুরে। আমি মিছরি বাবুর নিকট হইতে তিন শত টাকা [illegible] 'নবশক্তি' আফিসে বেলা ৩।৪টার মধ্যে দিয়া আসি। সেখানে [illegible] বারীন উভয়ে অপেক্ষা করিতেছিল।

তাহার পর একেবারে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের ও প্রফুল্ল চাকীর [illegible] নিক্ষেপ—কিংসফোর্ডের গাড়ী ভাবিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হইল—[illegible] বশতঃ কেনেডি সাহেবের কন্যা ও স্ত্রী সেই গাড়ীতে ছিলেন, [illegible] হত হইলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িল পুষা ষ্টেশনে, প্রফুল্ল [illegible] ষ্টেশনে ধরা না দিয়া নিজেকেই হত্যা করিল—ইচ্ছা করিলে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেইখানেই হত্যা করিতে পারিত—কিন্তু [illegible] বলিয়াই তাহাকে হত্যা করে নাই। পরে অবশ্য নন্দলালকে [illegible] হত্যা করা হয়, এবং সে কার্য্যটি একা যতীন্দ্রনাথ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে মাণিকতলার বাগান ঘিরিয়া পুলিশ সেখানকার সকল [illegible] ধরিয়া ফেলিল। ঠিক তার পূর্ব্ব-রাত্রে উপেনের ও [illegible] উত্তরপাড়ায় আসার কথা—তারা আসিল না—পরদিন [illegible] মাণিকতলার লীলাখেলার অবসান। বহু আড্ডা হইতে [illegible] দলের প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। সবাই [illegible] করিয়া উঠিল। বাকী রহিল বাগানের বাহিরে মাত্র ৩।৪ [illegible] তাহার মধ্যে চন্দননগরের শ্রীচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল রায় এবং [illegible] নিজে। আর ছিল পুরাতন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাঘা যতীন [illegible] অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। উহারা তখনও প্রকাশ্য [illegible] করেন নাই। গোঁদলপাড়ায় ছিল নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, যার [illegible] উপেনের একেবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চন্দননগরের অধ্যাপক [illegible] রায়কেও ঐ দলের সঙ্গে গ্রেপ্তার করে।

এক বৎসর ধরিয়া আলিপুর বোমার মামলা চলিল। তখন আমরা ঐ মামলার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলাম। মধ্যে মধ্যে যাইয়া কোর্টে যখন তাহারা বিচারের পর গাড়ীতে উঠিত, তখন চোখে-চোখে দেখা হইত। এক দিন উপেন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দেয়। হাইকোর্টের রায়,—ফাঁসী না হইয়া দ্বীপান্তর ও জেল হইল, শুধু কানাইলালের ও সত্যেন্দ্রের ফাঁসি হইল নরেন গোস্বামীকে জেলে হত্যা করার অভিযোগে। অরবিন্দ বেকসুর খালাস হইলেন।

এই হত্যা-চেষ্টার পূর্বে উপেন ও দু'-চার জন শ্রীচন্দ্রকে বলিয়া দেন, জেল হইতে পলায়নের পর গোপনে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে। অরবিন্দ নিষেধ করেন। পরে কানাইয়ের নিজের জিদে নরেন গোস্বামীকে হত্যার জন্য রিভলভার দিবার প্রস্তাব করে। মতিলাল ও শ্রীচন্দ্র জানিত। শ্রীচন্দ্র দিয়া আসে। দ্বিতীয়টি কে দিয়াছিল, আমার জানা নাই, জানিতে চেষ্টা করি নাই। তাহাদের বিপ্লবী-জীবনের প্রথমাঙ্কের যবনিকার এইখানেই পতন হইল। তাহার পর হইতে যে ব্যবস্থা হয় তাহার সহিত ঐ দলের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, উহাদের অসমাপ্ত কার্য্য ব্যর্থ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই। আবার যাত্রা সুরু হইল তাহাদের।

আমরা চন্দননগরে মতিলালের বাগান-বাড়ীতে চুঁচুড়া ষ্টেশনের কাছে পুনরায় গোপনে মিলিত হই। শ্রীচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল, আমি আর সখারাম গণেশ দেউস্করের ভাগিনেয় প্রবারকর।

পুনরায় আমরা গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া চন্দননগরকে কেন্দ্র করিয়াই আরম্ভ করিলাম। আমার উপর ভার রহিল অর্থ ও সাধ্যমত অস্ত্র সংগ্রহের। সমিতি গঠনের ভার রহিল শ্রীচন্দ্রের উপর এবং বোমা রিভলভার রাখা ও প্রস্তুত এবং সরবরাহ-ভার রহিল মতিলাল রায়ের উপর। প্রবারকর রহিল মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগের জন্য।

উপেনরা আন্দামান হইতে পত্রাদি আমার কাছে পাঠাইত। বৎসরে এক বার জনৈক ব্যক্তি সে সকল পত্র লইয়া আসিত। বোধ হয় ডাক্তারের আত্মীয়। আমি তাহার মারফৎ কিছু কিছু অর্থ পাঠাইতাম। শেষ পত্রে লিখিল যে, লোক মারফৎ না পাঠাইয়া ডিকশনারির মলাটের ভিতরে নোট পাঠাইয়া দিলে টাকা পাওয়া যায়। একবার পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু তাহা তাহারা পায় নাই। জানি না, কে তাহা আত্মসাৎ করে। ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ চলিয়া গেলেন পণ্ডিচেরী। ১৯১৪ সালে যুদ্ধারম্ভ হইল, তখন জার্ম্মাণীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র আনাইবার ব্যবস্থা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হয়। ধরা না দিয়া আমরা জন আট-দশ অজ্ঞাতবাসে চলিয়া যাই। সকলের নামে হুলিয়া বাহির হয়, কাহাকেও বৃটিশ পুলিশ ধরিতে পারে না। মতিলাল ও প্রবর্ত্তক সংঘ আমার প্রথম ও অন্যতম আশ্রয়। নরেন বাঁড়ুয্যে গোঁদলপাড়ায় আমার অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করে এবং সেই সময়ে সে আমাকে উপেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র—তখন একমাত্র পুত্র ন্যাপাকে দেখায়—সেই বাড়ীর প্রাচীরে প্রাচীরে, গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন সে শিশু—তাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিতে পারিনি। যুদ্ধে বিজয়ের ফলে আন্দামানের রাজনৈতিক কয়েদীদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তার পর আমি ১৯২১, অক্টোবরে আবার বন্ধু উপেনের সঙ্গে মিলিত হই।

গ্রাম্য ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমান শাখা

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি স্তরে যে অসামঞ্জস্যের দর্শন মেলে তাহার ছোঁয়াচ ব্যাঙ্কগুলিতে লাগিয়াছে। গুটিকতক মধ্যম আকারের শ্রমশিল্প গঠন করিতে গিয়া আমরা ধ্বংস করিয়াছি অসংখ্য দেশীয় কুটির-শিল্প। যান-বাহনের উন্নতি-কল্পে সেতু বাঁধিয়া আমরা রেলপথ উন্মুক্ত করিয়াছি, ফলে মজাইয়াছি বেগবতী নদীগুলি। উর্বর শস্যশ্যামল ক্ষেত্রগুলি পরিণত হইয়াছে অনুর্বর মরুভূমিতে। সহরে বন্দরে বাণিজ্যকেন্দ্রে এক দিকে যেমন আমরা অত্যধিক ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করিয়াছি, অন্য দিকে অকাতরে অবহেলা করিয়াছি ভারতের অগণিত গ্রামাঞ্চল।

ইংরাজদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব প্রথায় আধুনিক যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন এ দেশে ইংরেজ সম্প্রদায়ই করেন। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এক দিন উন্নত ধরণের ছিল; এ স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার ধৃষ্টতা আজ আর আমাদের দেখান উচিত নয়। এক দিন হয়তো আমাদের সব কিছুই ছিল, কিন্তু বর্তমানে যখন তাহার ক্ষীণ চিহ্নও নাই, তখন সে অতীত ঐশ্বর্য্য আমাদের গৌরব বৃদ্ধি না করিয়া অপমানের বোঝাই বাড়াইয়া তোলে। আমরা যে কতো অকর্ম্মণ্য এ শুধু তাহারই পরিচয় দেয়। আমাদের জগৎশেঠ আজ শুধু ইতিহাসের প্রাণহীন পৃষ্ঠায় বিরাজ করিতেছে, বর্তমানের বাস্তব জীবনে তাহার কোন প্রভাব আজ আর লক্ষ্য করা যায় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পর ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়-বাণিজ্যে অধিকতর সুবিধার জন্য কোম্পানী কর্মকর্তাগণ নিজেদের দেশীয় প্রথায় এ দেশে যৌথ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন কোম্পানীর প্রধানতম কাজ ছিল বিনিময়-কার্য্য; সুতরাং তখনকার দিনে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি বিনিময়-কার্য্য ছাড়া দেশীয় শিল্পগঠনমূলক কোন প্রকার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করিত না। … কালে যদিও ভারতীয় নেতৃত্বাধীনে দু'-একটি সুদৃঢ় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপিত হইল তথাপি তাহারাও ইংরেজী প্রতিষ্ঠানগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গতানুগতিক পদ্ধতিতে … সহরে-বন্দরে শাখা স্থাপন করিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকা … সাজাইয়া, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার নীচে আরাম কেদারায় বসিয়া অসংখ্য পেয়াদা-চাপরাসি পরিবেষ্টিত হইয়া অল্প পরিশ্রমে যৎসামান্য মুনাফা অর্জন করিয়া পরম … বোধ করিতে লাগিল। দেশের প্রকৃত প্রয়োজন, উৎপাদন ও বণ্টন, শিল্প গঠন ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধনে … ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মনিয়োগ করিল না। দেশের … সাধারণ যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির … প্রতিষ্ঠানগুলির আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে … যাহাতে তাহারা তাহাদের কর্মজীবনে পূর্ণ মাত্রায় … নানাবিধ আধুনিক সুবিধাগুলির সুযোগ গ্রহণ করিতে … তাহার কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল না। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে সহর ও গ্রামের মধ্যে কোন যোগসূত্র স্থাপিত … না। ফলে ভারতের শতকরা ৭৫ ভাগ অধিবাসী পল্লী … বাস করিয়া ব্যাঙ্কের সেবা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইল।
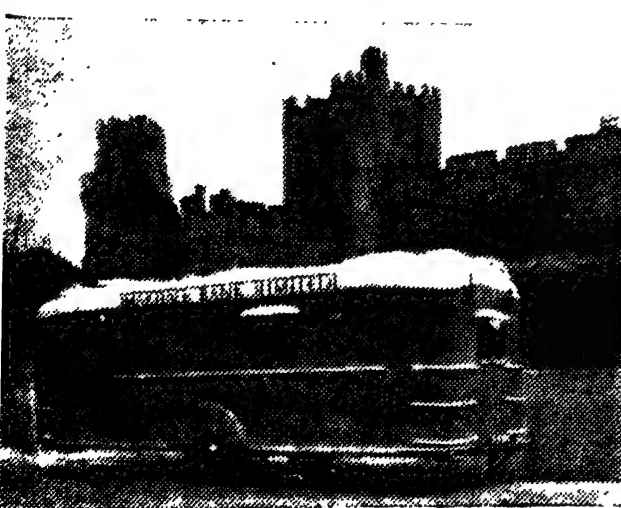
মার্টিনস্ ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমান শাখা

স্বাধীনতা লাভ করিয়া দেশের শাসন-ভার যখন দেশবাসী আপন হস্তে গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের চেতনা হইল, কি করে আধুনিক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধাগুলি গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত করা যায়। মাননীয় অর্থ-সচিবের ...রের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, ভারত সরকার গ্রাম্য ব্যাঙ্কের ...কল্পে স্যার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে প্রাক্তন ...র্থ-সচিব সি. এইচ. ভাবা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ লইয়া একটি ...দ গঠন করিয়াছেন। এই পরিষদ আগামী ১৯৫০ ...র ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গ্রাম্য ব্যাঙ্কের উন্নয়ন ...কল্পনা সরকারের নিকট পেশ করিবেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ...র্দ্ধ আধা-সরকারী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও বে-সরকারী ...র ব্যাঙ্ক ছাড়া বিভিন্ন স্থানে অন্য কোন যৌথ ব্যাঙ্ক-...ষ্ঠান কোনরূপ শাখা-প্রশাখা স্থাপন করে নাই। ফলে ...ঙ্ক-ব্যবসায় আশানুরূপ প্রসারতা লাভ করিতে পারে ...অব্যবহিত যুদ্ধ-পূর্ব্বের হিসাবে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড ও ...তি পাঁচ বর্গ মাইলের ভিতর একটি করিয়া শাখা ছিল। আর ৩৯০০ ব্যক্তির মাথা-পিছু একটি ...ব্যাঙ্কের আফিস ছিল। সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে ছিল ...বর্গ-মাইল ও ১,৭৬,০০০ ব্যক্তির মাথা পিছু মাত্র একটি ...শাখা। অথচ ইংলণ্ড আয়তনে কত ক্ষুদ্র : মাত্র ৯৪০২৭৯ ...অবিভক্ত ভারতের ১৬ ভাগের এক ভাগেরও কম।

যুদ্ধ শেষেও আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসারতা তেমন ...বৃদ্ধি পায় নাই। বর্ত্তমান বছরের গত আগষ্ট মাসের ...দেখা যায়, গোটা ভারতবর্ষে সিডিউল্ড ব্যাঙ্কের শাখা-...র মোট সংখ্যা ছিল ৩৫৬০টি। আর ইংলণ্ডে কেবল মাত্র ...ব্যাঙ্কের নিজস্ব ও তাহার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখার ...দাঁড়াইয়াছে বর্ত্তমানে ২৪৫০এর উপর। মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ...ব্যাঙ্কের অথবা লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের শাখাগুলি যোগ করিলে ...তুলনায় ভারতের সমুদয় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা ...নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে।

...যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন ...র জন্য যাহাতে উৎসাহিত হইতে পারে তাহার নিমিত্ত ...কমিটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, সরকারী ...কাজকর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান-...মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় কি না। বর্ত্তমানে যে স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কোন শাখা-প্রশাখা নাই, সকল স্থানে সরকারের তেজারতী কারবার ট্রেজারী ...ট্রেজারীগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে। কমিটি আলোচনা দেখিবেন, এই সকল স্থানে সরকারী তেজারতী কারবার ...ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদান করা যায় কি না। উহা যদি না হয়, তাহা হইলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করা উচিত কি না—ইহাও কমিটির ...হইবে।

...র্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে অনুগমন ...য়ে আমাদের দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি এ যাবৎ ...ষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। ট্রেজারীর কাজকর্ম্মে

লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমান শাখা

প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে দেশের সেবায় প্রলুব্ধ করা যাইবে কি না, তাহাতে সরকারের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। জনসাধারণও এ বিষয়ে সমপরিমাণে সন্দিহান। কিন্তু যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ইদানিং বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ অধিবাসীরা কৃষিজীবী। এক কাল ছিল তাহারা ঋণগ্রস্ত। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের প্রসারতার একাবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, অল্প সুদে চাষীদের ঋণ দান করিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা; মহাজনের কবল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করা। কিন্তু আজ খাদ্যদ্রব্যের তুলনামূলক অপেক্ষাকৃত মূল্যবৃদ্ধির ফলে সহরবাসী মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের তুলনায় গ্রাম্য চাষীর অবস্থা অনেকাংশে ভাল। তাহারা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়াও আজকাল দু'-একটা পয়সা সঞ্চয় করিতেছে। ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য পাইলে

মার্টিনস্ ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমান শাখার অভ্যন্তর

তাহাদের সঞ্চয়-বৃত্তিগুলি আরও পুষ্টি লাভ করিবে। এই কথাগুলি সম্যক্‌ বিবেচনা করিলে যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামাঞ্চলে তাহাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে কেন যে নারাজ হইবে, তাহা বোঝা কঠিন। যৌথ ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলির ইহাও ভাবা উচিত যে, দেশীয় অর্থ নৈতিক কাঠামোতে তাহারা কেবল মুনাফা আহরণকারী যন্ত্র নয়। জন-সেবার তাহারা অন্যতম অঙ্গ। আর সেই সেবা গ্রহণ করিতে গিয়া যদি বা অল্প-বিস্তর আর্থিক কৃচ্ছ্রসাধন অপরিহার্য হইয়া উঠে দেশের বৃহত্তর উন্নতিকল্পে, সেই স্বার্থত্যাগ কি তাহাদের করা উচিত নয়?

গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের কি করিয়া প্রসারণ সম্ভবপর করান যায়, তাহার জন্য কমিটি জনমত আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ বলা যায় যে, যে সমস্ত ট্রেজারী, সাব-ট্রেজারীতে সরকারী তেজারতী কারবার হইয়া থাকে সেই সকল ট্রেজারী ও সাব-ট্রেজারীর অফিসে এক-একটি করিয়া যৌথ ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করা যায়। সরকারী তহবিল ও ব্যাঙ্কের সাধারণ আমানতী টাকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরকার গ্রহণ করিবেন। ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় দপ্তর সরকার বিনা ব্যয়ে সরবরাহ করিবেন। বাড়ীভাড়া বাবদ ব্যাঙ্ককে কোন খরচ বহিতে হইবে না। শুধু মাত্র এক জন প্রধান কর্মকর্তা আর দুই তিন জন কেরাণী লইয়াই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক শাখা বিস্তার করা সম্ভব হইবে। প্রয়োজন বোধে কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে ভারতীয় ট্রেজারীগুলিকে ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন সিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বাঁটোয়ারা করিতে হইবে। যেমন বাংলার ট্রেজারীর কাজ-কর্মগুলি বাংলায় সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সমানভাবে বিলি করিতে হইবে। মাদ্রাজের সরকারী তেজারতী কাজ মাদ্রাজ কর্তৃত্বাধীন ব্যাঙ্কগুলি গ্রহণ করিবে। তেমনি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশের সরকারী ট্রেজারীর কাজ-কর্ম স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি লাভ করিবার সুযোগ পাইবে। যেখানে তেমন ব্যবস্থা সম্ভব নয়, সে সকল স্থানের দায়িত্ব ভারতের প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক, যথা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বিবেচনা করা যাইতে পারে রেল-ষ্টেশনগুলির কথা। যে সকল স্থানে ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী নাই সেখানে রেল-ষ্টেশন থাকিলে সেই সকল ষ্টেশনে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কের প্রসারকল্পে এই ব্যবস্থায় ব্যয়বহুল হইবে না। ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বা বাড়ীভাড়া বাবদ এ ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোন খরচ বহন করিতে হইবে না।

তৃতীয়তঃ, বিবেচনা করা যাইতে পারে ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্কের সার্থকতা। ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্কের সূচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ইংলণ্ডে দেখা দেয়। যুদ্ধের সমসাময়িক কালে ইংলণ্ডে এমন কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রধান সহর, বন্দর, রাস্তা-ঘাট ছিল না, যেখানে ব্যাঙ্কের কোন না কোন শাখা না ছিল। ইহা ছাড়া, ক্রয়ডন, হিথরো প্রভৃতি বিমান-ঘাঁটিতে; কুইন মেরী, এলিজাবেথ, মারেটোনিয়া প্রমুখ বড় বড় জলযানে বৃটিশ ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওয়া যাইত। তার পর মেলায়, প্রদর্শনীতে, গো-মহিষ বিক্রয় হাট-বাজারে, কৃষি প্রদর্শনীতে বিলাতি ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাময়িক শাখা স্থাপন করিয়া প্রদর্শনীতে যোগদানকারীদের টাকা-পয়সা লেন-দেন কার্য্যে সাহায্য করিত। ব্যাঙ্কের বিনিময়-কার্য্য গ্রামাঞ্চলেও যাহাতে সব সময় চালু থাকিতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইল শকট-চালিত ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা। যে সকল নির্জ্জন পল্লীতে অর্থ বিনিময়ের কোন সুবিধাই ছিল না, এমন সব স্থানেও এখন হইতে চলন্ত ব্যাঙ্ক-শাখাগুলি নিয়মিত হাজিরা দিতে লাগিল। পল্লীবাসীরা বিনা আয়াসে সহরে ব্যাঙ্কের সুবিধা গ্রামে বসিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত লুইস দ্বীপে আজও কোন [illegible] নাই, তথাপি "নর্থ অফ স্কটল্যাণ্ড" ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমান শাখার [illegible] হইতে এই দ্বীপবাসীরা বঞ্চিত হয় নাই।

ভারতবর্ষে নগরের সংখ্যা ইংলণ্ডের তুলনায় নিতান্ত অল্প। এই কারণে আমাদের দেশে ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা আরও [illegible] বলিয়া মনে হয়। সহরতলীর যে সকল স্থানে ব্যাঙ্কের [illegible] শাখার কোন প্রয়োজন না থাকে, সেই সকল কেন্দ্রে এই [illegible] ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্ক-শাখা খুবই কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে [illegible] আশা করা যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই [illegible] ব্যাঙ্ক প্রতিদিন ৩০ হইতে ৭০ মাইল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ [illegible] পারে। আর এমন একটি চলন্ত ব্যাঙ্ক-শাখা প্রস্তুত করিতে ১৭৫০ পাউণ্ড বা ২৩,০০০ হাজার টাকার উপর ব্যয় হয় [illegible] অথচ ইহাতে একটি ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক-দপ্তরের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রই থাকিবে। প্রধান কর্মচারীর অফিস, ব্যাঙ্কের [illegible], কেরাণীর টেবিল-চেয়ার, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক পাখা, আলো [illegible] সকল প্রকার জিনিসই মানানসই ভাবে চলন্ত গাড়ীতে সাজান থাকে।

উপরোক্ত তিনটি পন্থার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবটি [illegible] করা তেমন কষ্টসাধ্য হইবে না। সরকারী তেজারতী [illegible] কিছু পরিমাণে অতিরিক্ত মুনাফা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি [illegible] করিতে পারিবে। তার পর সরকারী সান্নিধ্য লাভ করি[illegible] ব্যাঙ্কগুলির উপর জনসাধারণের আস্থা আরও বাড়িয়া [illegible]

তৃতীয় পর্য্যায়ে আলোচিত ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্কের প্রস্তাবনা [illegible] আড়ম্বরকারী মনোবৃত্তির পরিপন্থী হইতে পারে, কিন্তু [illegible] দিক্‌ দিয়া ইহা যেমন অভিনব তেমন তাৎপর্য্যপূর্ণ। [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলির যে সকল বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে আমাদের [illegible] পড়ে, তাহা অতি পুরাতন ধরনের ও বৈচিত্র্যবিহীন। [illegible] মূলধন, কত আমানত, কোথায় কোথায় তাহার কত শাখা আছে আর তাহার কর্মকর্তা কাহারা—ইত্যাদি ধরণের মামুলি খবর জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য প্রকাশ করা হয়। সাধারণ [illegible] ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রকার [illegible] বিবরণী পাঠ করে না। বিজ্ঞাপনের মারফৎ শিল্পের [illegible] যাহা ইংলণ্ড বা যুক্তরাষ্ট্রে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, [illegible] দেশে তাহা বিরল। ভ্রাম্যমান ব্যাঙ্কের দ্বারা জন-মনের [illegible] প্রভাব বিস্তার করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। [illegible] ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয়ে অগ্রসর না [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষামূলক ভাবে আগ্রহশীল যৌথ ব্যাঙ্ক-গুলিকে দু'-একখানা চলন্ত ব্যাঙ্ক-যান উপঢৌকন দিতে [illegible] যে খরচে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, [illegible] নিমিত্ত করদাতারা গররাজী হইবেন না—আর এ [illegible] সরকারী অর্থের কিছু অপচয়ও ঘটে, সে ক্ষতিও দেশবাসী স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না।

পাত্রে অর্দ্ধসিদ্ধ মৃগ-মাংস, বন্য ফল ও মধু স্তরে স্তরে সজ্জিত। প্রত্যেকের কটিতে লৌহ ও প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র। উহাদের সমবেত কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন এখানে হইতেও শুনা যায়।

আমি রঙ্গণের পথ চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছি। না—ঐ দূরে তাহাকে দেখা যাইতেছে, সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। রঙ্গণ বিংশবর্ষীয় অপার প্রাণশক্তিতে উচ্ছল বলিষ্ঠ যুবক, পৌরুষের তেজোদীপ্ত দেহের সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্যে সে ছিল আমার নিকট অপরূপ। রঙ্গা আমার আবাল্য প্রিয় সঙ্গী। সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিকটে আসিয়া তাহার আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—মহুয়া, জানিস্ ত, একটা বন্য বরাহ আসিয়া বড়ই উৎপাত করিতেছে? তাহাকে শীকার করিয়া আনিবার ভার আজ আমার উপর পড়িয়াছে। পিতা তোকে ডাকিয়াছেন—শীঘ্র চল, এখনি—সে আমার হস্ত আকর্ষণ করিল।

আমি উৎসাহে করতালি দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, বেশ হইয়াছে, এইবার শবরের দর্প চূর্ণ হইবে। বলা বাহুল্য, শবর আমাদের দলের একটি গর্ব্বিত যুবক—অত্যন্ত অশিষ্ট। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রঙ্গণকে পরাস্ত করা অবধি উহার দম্ভের সীমা নাই। রঙ্গার প্রতি ও রঙ্গাকে ভালবাসি বলিয়া আমার উপরও তাহার ও তাহার অনুচর সঙ্গীদিগের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অত্যাচারের সীমা ছিল না। তবে পিতা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া আমাকে সে কিঞ্চিৎ ভয় পাইত। এইবার দেখিব তাহার দম্ভ কোথায় থাকে?

দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইতেই পিতা ডাকিলেন—মৌয়া, এতক্ষণ কোথায় পলাইয়া ছিলি—এদিকে শোন্। আমি লঘুপদে সেই রুক্ষ পর্ব্বত সদৃশ বিশাল বপু পুরুষটির পদতলে বসিয়া পড়িলাম। পিতার জানু ধরিয়া তাঁহার মুখের পানে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিতেই পিতা সস্নেহে আমার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন—শোন মহুয়া, দক্ষিণ দেশের বন্য সম্প্রদায়ের সহিত শীঘ্রই আমাদের যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে তোর বিবাহ দিয়া যাইতে চাই। কাহাকে তোর পছন্দ হয় বল ত?……আমি নির্লজ্জ ভাবে রঙ্গণের দিকে চাহিয়া পিতার দিকে মুখ ফিরাইতেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—কহিলেন, আমি জানি মৌয়া, রঙ্গণকে তুই ভালবাসিস্। বেশ, তাহাই হইবে। বরাহ শীকারের ভার রঙ্গণকে দিয়াছি, যদি সফল হয়, তবে সে তোকে পাইবে। আগামী কল্য এইখানে প্রজ্বলিত অগ্নি ও সমবেত সকলের সম্মুখে রঙ্গণ তোর ললাটে ও সীমন্তে মৃত বরাহের রক্ত দ্বারা তিলক আঁকিয়া দিবে।

আমি আনন্দে পিতার জানুতে মুখ লুকাইলাম। পরে চোখ তুলিয়া রঙ্গণের দিকে চাহিয়া দেখি, রঙ্গার সহাস্য মুখমণ্ডল কৌতুক ও অনাবিল সারল্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমবেত সকলে নানারূপ মন্তব্যের গুঞ্জন তুলিল—কিন্তু সাহস করিয়া আপত্তি বা অনুমোদন কিছুই করিল না। কিছুক্ষণ পর শবরের পিতা বৃদ্ধ মল্ল তাহার ক্ষীণ-দেহ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—সর্দ্দার, শবরের শক্তি পরীক্ষা ত ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে—তাহাতেই কি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় নাই? বল-বীর্য্যে রঙ্গণ ত শবরের নিকট বালক মাত্র! মহুয়াকে শবরও ভালবাসে—তাহা ছাড়া মহুয়ার যোগ্য সঙ্গী আরও দুই চারি জন নাই কি?

পিতা কহিলেন—আছে, তাহা জানি। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে—প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে যখন অধিকারের সীমানা লইয়া আমাদের যুদ্ধ বাধে…তখন শত্রুপক্ষীয় দুইটি মাতৃ-পিতৃহীন বালক ও শিশুকে আমি অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম…তাহারাই ঐ রঙ্গণ ও মহুয়া। উহাদের সুশ্রী গাত্রবর্ণ, সুগঠিত দীর্ঘকায় ও সুন্দর মুখশ্রী দেখিলেই বুঝিবে। আমার ইচ্ছা, উহাদের বিবাহ দেই। কারণ উহারা পরস্পরকে ভালবাসে। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে উহাদের মিলন ঘটাইব। তবে রঙ্গা যদি বীর্য্য-পরীক্ষায় অপারগ হয় তবে শবরের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। রঙ্গণ, তোমা[illegible] অস্ত্র প্রস্তুত রাখিও…আগামী কল্য চাঁদ উঠিলে শীকারে যাত্রা করিবে…দিনে বরাহটার দেখা পাওয়া বা উহাকে আয়ত্তে আনা কষ্ট সাধ্য হইবে।…কেহ আর কোন কথা কহিল না। আমি ইতিমধ্যে শবরের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া তাহার অপদার্থতার সম্পর্কে এক[illegible] বিদ্রূপের ইঙ্গিত করিলাম…শবরের চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল[illegible] পরক্ষণেই আনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল…আমি গ্রাহ্য করিলাম না। বরাহ-শীকারে কেবল শক্তিরই প্রয়োজন হয় না…যে বুদ্ধি ও চতুরতার প্রয়োজন, স্থূলবুদ্ধি শবরের তাহা কতটুকু?…রঙ্গণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—সর্দ্দারের জয় হউক। আগামী কল্য রাত্রিতে দুর্দ্দান্ত বরাহটাকে শীকার করিয়া আনিয়া এইখানে উপস্থিত হইব—নচেৎ জীবিত ফিরিয়া আসিব না…ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।…

…উত্তেজনা, আনন্দ ও গর্ব্বের অনুভূতিতে তাহার নীল চোখ দুইটি উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। রঙ্গা দ্রুত চলিয়া গেল…আমি তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম।

* * * *

পরদিন ক্রীড়া-সঙ্গীদিগকে এড়াইয়া সেই নির্ঝরিণী-তীরে [illegible] আসিয়া উৎসুক নেত্রে রঙ্গার প্রতীক্ষা করিতেছি। বরাহ-শীকারে আমিও যাইব, ইহাই আমার অভিসন্ধি। প্রবল উৎসাহে [illegible] মারাত্মক অস্ত্রটির অগ্রভাগে লৌহ শলাকার তীক্ষ্নতা পরীক্ষা করি[illegible] —এমন সময় রঙ্গা পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া আমার চোখ টিপি[illegible] ধরিল। আমি হাসিয়া ক্রীড়াচ্ছলে কহিলাম……কে—শবর কি? অথবা হয়ত পিয়ালী…তাও নয়? তবে বুঝি টিয়া…?

থাক্, তোমাকে আর ছলনা করিতে হইবে না…চাহিয়া তোমার জন্য কি উপহার আনিয়াছি……

তাহার হাত ছাড়াইয়া চাহিয়া দেখি…রঙ্গণের কণ্ঠদেশ [illegible] দোদুল্যমান বিরাট এক কৃষ্ণসর্প……আমি চমকিত হইয়া [illegible] করিয়া দূরে সরিয়া গেলাম…। রঙ্গা উচ্ছ্বসিত হাস্যে ভাঙ্গিয়া [illegible] কহিল……তোমার বান্ধবী পিয়ালীদিগকে বড়ই ভীত [illegible] তুলিয়াছিল…এক আঘাতেই উহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছি… ভয় নাই…বলিয়া সে অবহেলায় মৃত সর্পটাকে দূরে নিক্ষেপ করিল……বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে…এস, কিছুক্ষণ এইখানে [illegible] করা যাক্…

আমরা দুই জনেই প্রচুর হাসিতে হাসিতে শ্যামল দূর্ব্বাদলে[illegible] আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর আমি রঙ্গার হাত দু[illegible] ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিলাম……রঙ্গণ, জান কি…কেন [illegible] আসিয়া তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি?

……সে ত আজ নূতন কথা নয়! আর এক দিন পর

…মারই হইবে…তখন……আমি ত্রস্তে তাহার ওষ্ঠযুগল হস্ত দ্বারা …বৃত করিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিলাম……সে কথা পরে হইবে… …আপাততঃ বরাহ-শীকারে আমিও যাইতেছি…বুঝিলে?……

রঙ্গণ কৌতুক ভরে হাসিয়া উঠিল……বরাহ-শীকার খুব সহজ …র নয় মৌয়া, তবে যদি আমার রক্ষাকর্ত্রী হইয়া যাইতে …ল……।

আমি গম্ভীর হইতে চেষ্টা করিয়া কহিলাম…কে বলিতে পারে? …এ কথা নিশ্চয়, আমি যাইব-ই। আমাকে বাধা দিতে …না।

রঙ্গণও ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে কহিল……বাধা দিব না…কিন্তু ভয় হয় …মহাশয়ের দেখা পাইলে তুমিই হয়ত ভয়ে পলাইয়া আসিবে …আমরা তাহার বিশ্রাম-সুখে ব্যাঘাত ঘটাইতে যাইতেছি, সে …বল রাখিও মহুয়া……বলিয়া সগর্ব্বে হাসিয়া উঠিল। আমি …করিতে যাইতেছি…রঙ্গা আমার হাত ধরিয়া উঠাইয়া …দেরী নয়—ঐ দেখ চাঁদ উঠিয়াছে…এবার যাত্রা করা …বলিয়া তাহার বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়ে আমাকে পার্শ্বে টানিয়া …মিও পরম নির্ভরতায় তাহার পাশে-পাশে চলিতে ……

……কিন্তু আমাদের পথ আগলিয়া ও কে? নিকটে গিয়া …—শাখাচ্ছাদিত পর্ব্বত-গাত্রে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ভীমমূর্ত্তি ………

…সে উদ্ধত ভঙ্গীতে আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। …দেখিতে পাইয়াই শিশু স্বরে বলিয়া উঠিল……এখানেও …?

…অগ্রসর হইয়া মেঘ-গর্জ্জনের মত গম্ভীর অথচ সংযত স্বরে …তোমার কি? পথ ছাড়……

…চক্ষু ক্রূর বিদ্বেষের অগ্নিতে জ্বলিতেছিল। ক্রুদ্ধ …নাগ নিশ্বাস ফেলিয়া দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া চাপা-স্বরে …মাবিদার ভার আমি লইব…তুমি উহাতে হাত দিতে …না…সদ্দারের প্রিয় পাত্র হইবার আশা ছাড়িয়া দাও… …সাবধান করিয়া দিতেছি……বলিয়া সে রঙ্গণের বাহু …বলিয়া ধরিল। ক্রুদ্ধ রঙ্গা এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া …কহিল…তুমি দূর হও…আমাকে বাধা দিতে আসিও না… …না।

…ভাল হইবে না, তাহা তুমি শীঘ্রই দেখিবে…বলিয়া …অগ্রসর হইয়া আসিতেই আমি বলপ্রয়োগে রঙ্গাকে সরাইয়া …মধ্যস্থলে দাঁড়াইলাম…কহিলাম…শবর, তোমার …লঙ্ঘন করিয়াছ…আমাদের পথ ছাড়িয়া দাও…নতুবা …কে বলিয়া তোমার বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করিব।…

…শাস্তি' সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া এবং সেখানে …আমার উপস্থিতি তাহাকে কিঞ্চিৎ বিব্রত ও ভীত …লিয়াছিল হয়ত…সুতরাং অনিচ্ছার সহিত সরিয়া গিয়া …আচ্ছা, ইহারও প্রতিফল পাইবে। কিন্তু মনে রাখিও… …দেখা হইবে…বলিয়া অতর্কিতে রঙ্গণকে এক প্রবল ধাক্কা …উর্দ্ধশ্বাসে বনপথে পর্ব্বতের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া …। রঙ্গণের সুগৌর মুখমণ্ডল অপমানে ও ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু আসন্ন গুরু কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া আপনাকে সংযত করিয়া লইল। শবরের অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকাইয়া কহিল…শীঘ্রই শবরের আস্ফালন শূন্যে মিলাইয়া যাইবে…উহার অনেক অন্যায় সহ্য করিয়াছি—কিন্তু আর নয়।

আমি তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম—ঐ দেখ, আকাশের কত উচ্চে চাঁদ…কি সুন্দর…নয় কি?…

সত্যই কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই না আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল! দূরে পর্ব্বতশ্রেণী, চতুষ্পার্শ্বের নিবিড় অরণ্য ও অরণ্য-শীর্ষে স্তিমিত আলোক ও ছায়ার কি বিস্ময়কর ও অনির্ব্বচনীয় রহস্যের কুহেলিকা! রঙ্গণের বিচলিত মন শান্ত হইয়াছে। এই অপার্থিব সৌন্দর্য্যরস আস্বাদনে ও প্রিয় সঙ্গ-সুখে আবিষ্ট হইয়া আমরা পথ চলিতেছি…। অরণ্য ভেদ করিয়া…পর্ব্বত-গাত্র বাহিয়া পশুর মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইলাম।…দূর হইতে মধ্যে মধ্যে অরণ্য পশুর মৃদু গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। দুর্দ্দান্ত মানবের বুদ্ধি-কৌশলে ও শক্তিতে পরাজিত হইয়া তাহারা সুদূরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে…এ বুঝি সেই অপমানের ব্যর্থ ক্রুদ্ধ-হুঙ্কার…! ক্রমশঃ অরণ্য নিবিড় হইয়া আসিতেছে, চারি দিক তমিস্রাবৃত…রঙ্গার চোখ দুইটি অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিতেছে। আমরা শ্বাসরোধ করিয়া লঘুপদে চলিয়াছি। সহসা এক স্থানে আসিয়া সে কান পাতিয়া কি শুনিল…পরক্ষণেই আমাকে বাম হস্তে পশ্চাদ্দিকে ঠেলিয়া দিয়া উদ্যত অস্ত্র হস্তে তীব্রগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল।… মুহূর্ত্ত মাত্র আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। তার পর আমিও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। অজ্ঞাত পরিচিত পথে চলিতে বিন্দুমাত্রও ক্লেশ হইতেছিল না…কিন্তু কোথায় রঙ্গা? আমি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিলাম…অরণ্য বিরল হইয়া আসিতেছে…কতক্ষণ চলিয়াছি

…কাহার ভাল হইবে না—তাহা তুমি শীঘ্রই দেখিবে…

আমি না···সহসা নিকটেই একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শুনা গেল। যেন [illegible] ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিয়াছে। স্তিমিত চন্দ্রালোকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া দেখি···কিয়দ্দূরে রঙ্গা ভূপতিত···তাহার বক্ষের উপর ক্রুদ্ধ আহত জন্তুটা নিদারুণ জিঘাংসা লইয়া আক্রমণোদ্যত। রঙ্গার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত···আহত হইয়াও সে হস্তের শাণিত অস্ত্রটা প্রাণপণ শক্তিতে বরাহটার বক্ষে বিদ্ধ করাইয়া দিতেছে। শিহরিয়া দুই চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিলাম। একটা আর্ত্ত চীৎকার আমার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল···নিমেষের জন্য···পর-মুহূর্ত্তেই কটি হইতে অস্ত্র উন্মোচন করিয়া জন্তুটার পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। মুমূর্ষু পশু শেষ গর্জ্জন করিয়া ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল···আর উঠিল না। রঙ্গাকে তুলিতে গিয়া দেখি, সে অচেতন···মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত··· দেখিলে চেনা যায় না। অসহনীয় দুঃখে আমার সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রী আলোড়িত হইয়া যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বক্ষ ঠেলিয়া একটা আকুল ক্রন্দন বাহির হইয়া আসিল···নিমেষে আপনাকে সংযত করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া নিকটস্থ নির্ঝরিণীর জল আনিয়া তাহার ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়া দিলাম। বনমধ্যে ছুটিয়া গিয়া পরিচিত গুল্ম, পত্র ও উদ্ভিদের মূল লইয়া আসিয়া দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া ক্ষত-স্থানে উহার নির্য্যাস ঢালিয়া দিলাম। বক্ষে হাত দিয়া দেখি, নিশ্বাস অতি ক্ষীণ···নিদারুণ ভীতি ও মানসিক উত্তেজনা আমাকে শিথিল করিতেছে। রঙ্গা কি বাঁচিবে না? রঙ্গা আমার পার্শ্বে না থাকিলে আমার জীবনের মূল্য কোথায়? তাহার বক্ষে হাত দিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ধীরে ধীরে ডাকিলাম, রঙ্গা, একবার চাহিয়া দেখ···আমার দিকে একবার চোখ মেলিয়া তাকাও রঙ্গা। কিন্তু রঙ্গা চাহিল না···স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলাম···চারিদিক যেন শূন্য মনে হইল···পরে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম···

কিছুক্ষণ পর একটা চাপা মৃদু হাসির শব্দে চমকিয়া চাহিতেই দেখি···পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শবর পৈশাচিক হাসি হাসিতেছে। তাহার পৃষ্ঠে মৃত বরাহটা রজ্জু ও গুল্মে আবদ্ধ। সে আমার হস্ত মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিল, আর বসিয়া থাকিয়া কি হইবে—[illegible] মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই···মৃত বরাহটি আমি সর্দ্দারের জন্য [illegible] লইয়া যাইতেছি। যাইবে ত চল···

···অসহ্য ঘৃণা ও ক্রোধে হাত ছাড়াইয়া লইয়া আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম···মিথ্যাবাদী নির্লজ্জ···তুমি [illegible] সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। প্রভাতের আলো দেখা দিলে আমি উহাকে পিতার নিকট লইয়া যাইব···মৃত বরাহটা তুমি লইয়া যাইতে পারিবে না···আমি কিছুতেই দিব না···বলিয়া চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

নির্লজ্জ শবর বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া বলিল···[illegible] আমি শীকার করিয়াছি···আগামী প্রভাতে সর্দ্দারের আদেশে [illegible] আমারই হইবে মহুয়া···বৃথা আস্ফালন করিয়া আর লাভ কি? যাক্ আমি চলিলাম···সর্দ্দারকে সংবাদটা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে··· শবর উচ্চৈঃস্বরে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার [illegible] আমার পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া আমি কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। পরক্ষণেই রঙ্গার পার্শ্ব হইতে তীক্ষ্ণধার [illegible] অস্ত্র তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিলাম। [illegible] দেখি, লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। নিদারুণ যন্ত্রণায় শবর আর্ত্তনাদ [illegible] করিয়া দাঁড়াইল···তার পরই মরণোন্মুখ অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া যাইতে যাইতেও ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করিয়া কহিল···[illegible] বলিয়া হস্তের মারাত্মক অস্ত্রটি আমার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।···আমিও রঙ্গার [illegible] পড়িয়া গেলাম······একটা প্রলয়ের [illegible]···একটা [illegible] অন্ধকার···আমার সমস্ত সত্তাকে বিলুপ্ত করিয়া দিল।

* * * *

সহস্র বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া [illegible] ক্লান্ত চাঁদ অস্ত গিয়াছে···কৃষ্ণপক্ষের আকাশ [illegible] আবৃত···!

শাশ্বতী

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

আমার কবিতা-মুকুরে পড়ে কি তোমার অরূপ ছায়া?
তোমার মনের পিয়াসী মরাল মেলি কল্পনা-ডানা
আমার মানস-সরোবর-তীরে আজো করে আনাগোনা?
অবচেতনায় জাগে মুছে যায় ক্ষণে ক্ষণে তব কায়া।

জীবনের পথে স্বপন জড়ানো তুমি যে সোনালি ফুল।
ফুটে ঝরে গেছো কোন্ আষাঢ়ের সঘন অন্ধকারে;
আজো সে সুবাস ভেসে আসে তব রিক্ত ধরণী-দ্বারে।
কভু চেতনায়, বেদনায় হিয়া বিচ্ছেদ সমাকুল।

চোখ মিলে চাই সমুখে পিছনে, কিছুই যায় না দেখা!
তবুও তোমার চরণ ছোঁয়ায় স্বপ্ন-সরণি বাহে।
নবোঢার মত চোখে চোখে রাখ আজো নব অনুরাগে।
নয়নে তোমার না জানি কত না প্রণয়ের ভাষা লেখা।

তুমি আর আমি, হাসি, কথা, গান, কিছুই মিথ্যা নয়।
স্মরণের তীরে চিরদিন জানি মরণের পরাজয়।

থেকে বিদ্যালয়ে যাবার এবং বিদ্যালয় থেকে বাড়ী আসার পথটুকু চেনাই তার ভূগোল-বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের সর্ব্বপ্রথম বিষয়। তার পর শিশু তার ক্লাশ-ঘর, ক্লাশ-ঘরের চারি পাশের ঘরগুলি, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বসবার ঘর, বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকের কিছুটা অংশ তন্ন তন্ন করে দেখবে। তার উৎসুক মন বেশ তাড়াতাড়ি এ-সবের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। এবার হবে তার ভূগোলের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সঙ্গে পরিচয়।

ভূগোল-শিক্ষা বিবিধ উপায়ে শিশুর পক্ষে খুব আনন্দদায়ক হতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত। ভূগোল-শিক্ষা দেবার সময় শিশুর ক্লাশঘরে নানা কথা-বার্ত্তা, চিত্তাকর্ষক গল্প-গুজব, সুন্দর এবং ছোট্ট ছোট্ট কবিতা, কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা ও কাহিনী, রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-বৃত্তান্তাদির অবতারণা করতে হবে। ভূগোল শিখতে শিখতে শিশুর হাতের কাজও শেখা হবে; যেমন, পাহাড় থেকে নদী নেমে আসছে, নদীতে নৌকো ভাসছে, সূর্য্যোদয় হয়েছে, সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট নদী বয়ে চলেছে ইত্যাদি ছবি আঁকবে; রঙীন্ চা-খড়ি দিয়ে বোর্ডে অথবা তুলি ধরে খাতার পাতায় রঙ দিতে শিখবে। শিশুর ভূগোল-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে থাকবে এমন সব বিচিত্র কাহিনী যা তার উৎসুক মনকে আনন্দ দান করতে পারবে, যা একান্ত চমকপ্রদ অথচ চির সত্য। শিশুর ভূগোল-শিক্ষায় অমূলক ও অসত্য কথা বা কাহিনীর স্থান হবে না। কবিতা, গল্প, কথা-বার্ত্তা এবং ছবির সাহায্যে বিভিন্ন দেশের লোকের জীবনযাত্রার বিষয়ে শিশু ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে আলোচনা এবং শিশুর পক্ষে ঐগুলি অভিনয় করে দেখানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই সত্যিকারের ভূগোলের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটবে। হাতের কাজে এবং অভিনয়ে প্রত্যেক শিশু অংশ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় লোকের চমকপ্রদ কাহিনী শুনতে শিশুর খুবই ভাল লাগবে। কিন্তু হাতের কাজ দিয়ে এবং অভিনয় করে তাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখানোর কাজটা তার কাছে আরও উপভোগ্য হবে। যেমন, রেড্-ইণ্ডিয়ান, এস্কিমো এবং আরব-বেদুইনরা কি করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেটি বোঝাবার জন্যে শিশুরা Sand-table অথবা একটি বড় বাক্সের আলগা ঢাকনীর ওপর ছোট্ট ছোট্ট কাঠের টুক্‌রো, দেশলাই, তুলো, কার্ডবোর্ড, সাদা ও রঙীন্ কাচ, বালি, সবুজ ও শুক্‌নো ছোট্ট ছোট্ট তৃণ, সাদা ও রঙীন্ চা-খড়ি, এক টুক্‌রো চামড়া, আঠা ইত্যাদির সাহায্যে কয়েকটি দৃশ্য রচনা করবে এবং উল্লিখিত জাতিদের জীবন-ধারণের পদ্ধতি খুব সরল ও সাধারণ ভাবে অভিনয় করে দেখাবে। এ ধরণের কাজের মধ্য দিয়েই শিশু-মনের সৃজন-শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

বিদ্যালয়ে আসার পূর্ব্বেও শিশু আপন স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভূগোলের অতি প্রাথমিক ও যৎসামান্য জ্ঞান নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে আয়ত্ত করে। বিদ্যালয় থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছবার কয়েকটি রাস্তা খুঁজে বার করতে করতেই শিশুর দিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকে। শিশু যখন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়, বিচিত্র রঙের ভাসমান মেঘগুলিকে লক্ষ্য করে, চাঁদের ভিতর বুড়ী বসে চরখায় সুতো কাটছে—এই দৃশ্য তার শোবার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখে, সমুদ্রের পার থেকে ঝিনুক এবং পাহাড়ের পাদদেশ থেকে নানা [illegible] কোনটি [illegible] হয় তার হাতে-কলমে ভূগোল-শিক্ষা। এমন কি, যখন শিশু ওপর, নীচ, ডান বাঁ দিকের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শেখে, তখনি তার আয়ত্ত হয়ে [illegible] প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রাথমিক জ্ঞান। যে সকল শিশু বিদ্যা[illegible] নতুন ভর্ত্তি হয়েছে, তাদের মধ্যে সকলেরই যে ভূগোলের এই স[illegible] প্রাথমিক জ্ঞান হয়েছে তা নয়, তবে শিশুর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ক্লা[illegible] ঘরেই যদি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে বড় বড় নক্সা, রঙীন্ [illegible] এবং রকমারি খেল্‌নার সাহায্যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তবে এ[illegible] জ্ঞান অর্জ্জন করা প্রত্যেক শিশুর পক্ষেই সহজ হবে এবং ভূগো[illegible] শিক্ষার সময় শিশুদের আনন্দবর্দ্ধন করতে পারলেই ভূগোল-বিজ্ঞা[illegible] প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়তে থাকবে। যে সকল শিশুরা বিদ্যা[illegible] আসবার আগেই ভূগোলের কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, [illegible] বিদ্যালয়ে এসে গল্প ক'রে অন্য শিশুদের,—যারা এ বিষয়ে [illegible] কিছু শেখেনি—প্রাথমিক ভূগোল-বিজ্ঞান শিখিয়ে দেবে। শি[illegible] এ কাজেও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর যথেষ্ট সহায়তা ও প্রেরণা থাকা [illegible]। শিশু-বক্তার মুখ থেকে গল্প অথবা কথা শুনতে শিশু-শ্রোতাদের [illegible] লাগবে।

শিশুর বাড়ীই হোল তার ভূগোল-বিজ্ঞানের প্রধান [illegible] মন্দির। এই পরীক্ষা-গৃহেই তার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিশেষ [illegible] পায়। এটি আশানুযায়ী সম্ভব হয় শিক্ষিত পরিবারের [illegible] গৃহে। যে কয়টি সরঞ্জাম এই গবেষণাগারের ব্যবহারে [illegible] তা হোল শিশু-শিক্ষার বিষয় সম্পর্কিত ও উজ্জ্বল রঙে [illegible] চিত্র, বড় বড় নক্সা, ব্লাক্‌বোর্ড, সাদা ও রঙীন্ চা-খড়ি, [illegible] ও ছবির বই, কার্ডবোর্ড, ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রো, ছোট্ট [illegible], scale, রেল-গাড়ী, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, মোটর, নদী, নৌকা প্রভৃতি কাঠের খেলনা, কাগজের বাক্স, দড়ি অথবা সুতো, পিরিষ, canvasএর টুকরো, তুলো এবং কাগজ। এই সব [illegible] নাড়া-চাড়া করতে করতেই শিশুর পর্য্যবেক্ষণশক্তি আরও [illegible] হবে। শিশুকে দামী জামা-কাপড় পরিয়ে এবং ভাল ভাল [illegible] রাখলেই তাকে উপযুক্ত ভাবে প্রতিপালন করা হয় না। [illegible] মনের খোরাক যোগাবারও যথেষ্ট আয়োজন করতে [illegible]। শিশুর পোষাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করে [illegible] মনোরঞ্জনার্থে এবং তার কর্ম্মপ্রবণতাকে উৎসাহ দেবার জন্য [illegible] ঘরের মধ্যে উল্লিখিত সরঞ্জামগুলির আয়োজন করতে হবে। [illegible] সাহায্যেই সে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় করে থাকে। গৃহ-শিক্ষক [illegible] বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশুর পরীক্ষাগারে সহকারীর কাজ [illegible] জন্যে নিযুক্ত, আসল গবেষক সে নিজেই।

ভূগোলের প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পর শিশু স্বতঃপ্র[illegible] হয়ে যে সকল প্রশ্ন করে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর উচিত শুধু [illegible] প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, শিশুকে সম্ভাব্য প্রশ্নের আভাস দে[illegible] তার জিজ্ঞাসু-বৃত্তিকে উৎসাহিত করা। শিশুর পূর্ব্ব-জ্ঞান [illegible] ভিত্তি করে তাঁরা তার ভূগোলশিক্ষার বিষয়-বস্তুকে বাড়ি[illegible] ক্রমে প্রসারিত করে যাবেন। ঘরকে বাসস্বরূপ গণ্য ক[illegible] তার মধ্যে দিয়ে বিরাট্ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ করানোই শিক্ষক-শি[illegible] প্রধান উদ্দেশ্য হবে। তাঁরা জানেন যে, শিশুর স্বভাব-সুলভ [illegible] ও কর্ম্মপ্রবণতাকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়াই হোল শি[illegible] দিবার প্রকৃষ্ট উপায়। শিশুরা নকলপ্রিয়। সুতরাং [illegible]

…রবে, তা হাতে করে দেখাবার সুযোগ পায়, সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর যথেষ্ট তৎপর হওয়া উচিত। বাড়ীতে বুদ্ধিমান শিশু যা করতে ভালবাসে, বিদ্যালয়েও সে তাই করবে; যেমন, অভিনয় করা, গল্প বলা, ছবি দেখা এবং নিজেদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করা ও দেখানো ইত্যাদি।

শিশুর বিদ্যালয় ও তার পরিবেশকে আদর্শ গৃহের অনুরূপ করে … হবে। যে সকল আদর্শ পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োজ্যেষ্ঠারা …দের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলা-মেশা করেন, সমবয়স্ক এবং …ভূতি-সম্পন্ন বন্ধু-বান্ধবের মত গল্প-গুজব করেন, শিশুদের খেলা, … এবং বেড়ানোর কাজে সাথী হন, তারা অনর্গল যে সকল প্রশ্ন … ধৈর্য সহকারে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দেন, তাদের প্রচুর …না ও বই উপহার দেন, সে সকল পরিবারের শিশুরা ছোট …তেই আত্মপ্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করে থাকে। শিশু-বিদ্যালয়ের … উচিত, বিদ্যালয়ের মধ্যে এবং চতুষ্পার্শ্বে এমন একটি … সৃজন করা যেখানে শিশু তার খেলার উপযুক্ত … পারে। শিশুকে শিক্ষাদানের কাজে অনুকূল পরিবেশ সৃজনের … আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পেতে পারি।

শিশু-বিদ্যালয়ে গল্প বলা এবং ছবি দেখানোর ওপর সর্ব্বাধিক … করতে হবে। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, পৃথিবীর আকার, … এবং গতি প্রভৃতি সুবিন্যস্ত পাঠ শিশুকে শিক্ষা দেওয়া …। বিজ্ঞানের নির্ভুল তত্ত্ব শিশুকে শেখানো যায় না। … বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধি এবং ধারণ করবার শক্তি নাই। … এবং তন্ময় হয়ে থাকাই শিশুর বয়োধর্ম। কল্পনার … সৃষ্টি করা তার স্বভাবের কাজ। এই স্বভাব-ধর্ম এবং বয়োধর্মের ব্যতিক্রম করে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

… ভূগোল শিশু শুনে শুনে শিখবে, তার মধ্যে থাকবে—(ক) … বাড়ীর ভিতরের এবং আশে-পাশের ভূগোল, (খ) আঞ্চলিক … এবং সমস্ত জগতের ভূগোল। শিশু-বিদ্যালয়ে যে প্রকৃতি … শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে, সেটিই হোল শিশুকে স্থানীয় … শিক্ষা দিবার প্রথম আয়োজন। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ … বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া এবং পরিবেশের মধ্যে বিশিষ্ট … কি ভাবে গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে যখন শিশু গল্প শোনে, … অভিনয় করে দেখায়, তখনি সে আঞ্চলিক ভূগোলের জ্ঞান … থাকে। যে সকল জাতির বিষয়ে শিশু গল্প শোনে, … পৃথিবীর কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করে, সেইটি যখন শিশু … মানচিত্রে দেখাতে শেখে, তখনি তার জাগতিক … সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

… বিদ্যালয়ের ভূগোল-বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর একটি … হোল, এমন সব বিষয়-বস্তু বেছে নেওয়া, যা হবে … পক্ষে একান্ত চিত্তাকর্ষক এবং যেগুলিকে অবলম্বন করে … আগ্রহের সহিত জাগতিক ভূগোল-বিজ্ঞানের দিকে …। প্রকৃত ভূগোল-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রথম প্রচেষ্টা- … চিত্তাকর্ষক বিষয়-বস্তুগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। শিশুকে প্রকৃত … জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করাবার সময় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর … প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হবে,—(১) শিশুর ঠিক চারি পার্শ্বে যে … ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় রয়েছে তাদের প্রতি, মানুষের জীবন ও স্বভাবের প্রতি শিশুর কৌতূহল জন্মানো, (২) শিশু যেন বিভিন্ন আবহাওয়া এবং অবস্থার গঠিত বিভিন্ন জাতীয় মানুষের স্বভাবের তুলনা করে, সে বিষয়ে তাদের প্রণোদিত করা।

শিশুর ভূগোল-শিক্ষার প্রারম্ভের উপর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন; তাঁদের সত্য সাধনার ওপর শিশুর ভূগোল-শিক্ষার বনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা তাকে দৃঢ় করে তুলবেন।

জীবন-বীমা কেন করব ?

শ্রীমতী বিজলী রায়

আজকাল মেয়েরা অনেক রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও, বীমা সম্বন্ধে আলোচনাটা বিশেষ শোনা যায় না। বীমার কথা হলেই "জীবন-বীমা কেন করব" এ কথা শিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে আগেই বলে থাকেন। অনেকেই বলেন, "কী দরকার করার, সংসার চালিয়ে, আমার টাকাই বাঁচে না, প্রিমিয়াম দেব কোত্থেকে, আমি মরে গেলে টাকাটা পাওয়া যাবে, তা নয়ত সেই ২০।২৫ বছরের কথা"—এই রকম নানা অজুহাত দেখিয়ে বীমার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চান।

এঁরা একটু বদি তলিয়ে ইনসিওরেন্স কেন করা উচিত, এ-সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করেন, তা'হলে দেখবেন যে, বীমার মত উপকারী বন্ধু আর নেই। এই বন্ধুর উপকারিতা সহজ ভাষায় প্রাঞ্জল ক'রে বুঝিয়ে দেবার মত সদালাপী, মিষ্টভাষী, অধ্যবসায়ী ও শিক্ষিত কর্ম্মী ইনসিওরেন্সে দরকার হয়। তা না হলে নিছক নিজের দরকারে জবরদস্ত কান-ঝালাপালা-করা যে সকল কর্ম্মী আছেন, তাঁদের দেখলে দূর থেকে লোকে পালায়।

সঞ্চয় করাটা মানুষের জন্মগত অভ্যাস। কেন জমায় ? যদি ভবিষ্যতে দুর্দ্দিন আসে, তখন এই দুর্দিনে জমানটাই তাকে সাহায্য করবে। সংসার খরচের পর হাতে কিছু বাঁচলে অনেক গৃহিণী বন্ধ ফুটো বাক্সে ফেলে কিংবা ঠাকুর-ঘরে মাটীর ঘড়ায় ফেলে ফেলে জমা করেন—তাঁদের অভিলাষ, এইরূপ ভাবে জমান পয়সাটা তীর্থযাত্রার সহায়তা করুক বা হঠাৎ কোন বিশেষ প্রয়োজনে লাগুক। ইনসিওর একটা প্রয়োজনের বন্ধ বাক্স বটে। অনেকে বলেন, ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে সুবিধা এই যে, যখন মন করা যায় তখন তোলা যায়। তা অবশ্য যায়, এবং টাকা জমা দিলে ব্যাঙ্কে টাকা জমে বটে। ইনসিওরে এটা হয় না বটে, তবে দরকার পড়লে পলিসির উপর ধার নেওয়া যায়। যে সংসারে সমান আয়, সমান ব্যয়, কিংবা আয়ের চাইতে ব্যয় বেশী, সেখানে একটা বীমা-পত্র খোলা ভিন্ন টাকা বাঁচানর আর কোন উপায়ই নেই। বীমা শুধু আমাদের উপকারই নয়, এক দিক দিয়ে তারা সমাজ সেবা করে, সমাজের হিতৈষিণা করে।

জীবন-বীমা সম্বন্ধে মেয়েদের সম্যক্ সচেতন হওয়া উচিত। এই সচেতনা তাঁকে দেশসেবার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অনেক অভাবগ্রস্ত মেয়ে এই বীমা-প্রসারের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করছেন।

মৃত্যুটাকে কেউ কোন দিন "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান" করে নিতে পারেননি, কিন্তু স্থিরচিত্তে যদি খানিকটা শ্মশান-বৈরাগ্যের

অহিতও ভাবা যায় যে, মৃত্যুটাই সত্য, যখন নিষ্ঠুর ভাবে এর রূপ প্রকটিত হয়, তখন এ আঘাতে প্রথমে আমরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। কিন্তু তার পর 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' উপস্থিত হয়। এই দেশেই যেখানে উপার্জ্জনশীল একটা লোকের উপর নির্ভর ক'রে দশটা প্রাণী প্রতিপালিত হয়—এখানকার কথাই বলছি। এ ছাড়া ছেলে-মেয়ের শিক্ষা, বিবাহ, এ সব সমস্যাও বীমার দ্বারাই মিটতে পারে।

শত দুঃখে পড়লেও ভবিষ্যতে এই জীবন-বীমার দ্বারাই যত দূর দুঃখ লাঘব হয়, তার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

খুব সামান্য কথায় বীমার কথা আলোচনা ক'রে এখানে শেষ করলাম। আশা করি, আমাদের অঙ্গন-প্রাঙ্গণে বীমা-বিষয়ক তথ্য-পূর্ণ আরও আলোচনা অন্য বোনেরা আনয়ন করবেন। আমি কেবল একটু মুখবন্ধ করে রাখলাম।

ভেজাল তেল, বেরিবেরি ও পা ফুলা

সুধারাণী দেবী

খাওয়ার জিনিসে ভেজালের দরুণ—বিশেষ করে শিয়ালকাঁটা তেল মেশানো সরিষা তেল খাওয়ায় বেরিবেরি বা পা-ফুলা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। শুষ্ক, পুরাতন ও পচা খাদ্য ব্যবহারও শোথ রোগের একটা হেতু। অসুখ আরো ব্যাপক আকারে প্রকাশ পাওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। নানা কারণেই বেশীর ভাগ লোককে আজকাল অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে হচ্ছে। এ একটা ভাববার কথা। বেরিবেরিতে হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল ও পঙ্গু করে দেয়। চিরকাল ভাঙ্গা শরীর নিয়ে জীবনযাত্রা যে কি কষ্টকর, তাহা না লিখলেও চলে।

বাজারে খাঁটি জিনিসেরও একান্ত অভাব সকলে। তাতে শুধু বেরিবেরি কেন, বহু রোগ আক্রমণ করতে পারে। কেহ কেহ উপায় নেই ভেবে, কেহ বা গতানুগতিক অভ্যাস ছাড়তে পারে না বলে, আবার অনেকে অজ্ঞতার জন্যও এই সব জিনিস ব্যবহার করেন।

ঘর-গৃহস্থালী মেয়েদেরই করতে হয়। কি করলে এই রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এবং রান্না-বান্নার কী পরিবর্ত্তন সাধন করা উচিত—তাই আলোচনা করা দরকার।

বাঙ্গালী রান্নার প্রধান উপকরণ সরিষা তেল। অথচ, সেই তেলে ভেজালের দরুণেই পা-ফুলা ও পারস্থলীর নানা গোলমাল উপসর্গ দেখা দিয়েছে। চিরকালের রুচি এর পরিবর্ত্তনে বাধা।

এখন কথা হচ্ছে, সরিষার তেল একেবারেই বাদ দিতে হবে। তার বদলে বাদাম তেল, বনস্পতি, কৌটার মাখম নিরামিষ রান্নায়, এবং টাটকা চর্ব্বি আমিষ রান্নায় চালু করতে হবে। অবশ্য মনে রাখা উচিত যাতে করে তেল ছাড়া রান্না হতে পারে অথবা যৎসামান্য তেলে মুখরোচক রান্না করা যেতে পারে, তার দিকেই দৃষ্টি থাকবে।

টাটকা শাক-সব্জি ভাল করে ধুয়ে অল্প জলে লবণ মিষ্টি পরিমাণ মত দিয়ে সামান্য সিদ্ধ করে জল শুকিয়ে ভাজাভাজি করলে তেল ছাড়াও খেতে বেশ লাগে।

সব জিনিস ভাপে রান্না করা প্রয়োজন, নতুবা খাদ্যপ্রাণ বাষ্প হয়ে উবে যায়। তরকারি সিদ্ধ খাওয়া ভাল। কিন্তু একঘেয়েমি খাওয়া নষ্ট করবার জন্য রুচির ব্যবস্থা হতে পারে, যদি ভাপে সিদ্ধ তরকারির সাথে সরিষা বাটা, ক্ষেত্রবিশেষে পোস্ত বাটা, নারিকেল বাটা, অথবা পাকা মিষ্টি কুমড়োর বিচি বাটা দিয়ে নেড়ে-চেড়ে অল্প আঁচে তাতিয়ে নেওয়া যায়।

পাঁচমিশালি তরকারির ঝোল,—তরকারি সব সমান আকারে কেটে ধুয়ে, কড়াইয়ে সামান্য তেল তাতিয়ে কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে তাতে তরকারি সব ছেড়ে সামান্য জলের ছিটে দিয়ে ঢেকে-ঢেকে সাঁতলিয়ে নিতে হবে। একটি পাত্রে ধনে, হলুদ, লঙ্কা [illegible] জলে গুলে তরকারিতে ঢেলে লবণ, কাঁচা লঙ্কা দিতে হবে। ডাল[illegible] বড়ি থাকলে দেওয়া চলে। মাছের ঝোলের মত ঝোল থাকলে নামাতে হয়।

শরীরে খাদ্যপ্রাণ—'বি' ঘাটতি হলেই বেরিবেরি হতে দেখা যায়। যে কোন শোথ রোগে খাদ্যপ্রাণ—'বি' ব্যবহারে উপকার দর্শে।

এই খাদ্যপ্রাণটি ঢেঁকিছাঁটা চাউল, আটা, লাল গুড়, [illegible] শাকসব্জি, ডিমেতে, নানা রকম ফল, দুধ ও ডিমে বিভিন্ন পরিমাণে আছে। অঙ্কুরিত ছোলায় পরিমাণ বেশী।

কলিকাতা সহরে ঢেঁকিছাঁটা চাউল যোগাড় করা [illegible] ফেন না ফেলে ভাত রান্না করা উচিত, কারণ, ফেনের সঙ্গে [illegible] সারাংশ সব বেরিয়ে যায়। প্রথম রান্না করতে কষ্ট হলেও [illegible] হয়ে গেলে অসুবিধে বোধ হবে না।

চাউলের কুঁড়ো, পুনর্ণবা-শাক, মানকচু, [illegible] শাক ও [illegible] ছোলা কেবল খাদ্য পথ্য হিসেবে ব্যবহার করলেও শোথ [illegible] জন্য ঔষধের প্রয়োজন বড় একটা হয় না।

বাস্তব

দীপ্তি বসু

দ্রুতপদে ফিরে চলেছে সুপ্রিয়। অনেক দেরী হয়ে গেছে [illegible] বিকেল পাঁচটায় বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, আর [illegible] রাত সাড়ে দশটার কাছাকাছি। বন্ধু অবনীশের বাড়ী [illegible] নিমন্ত্রণ ছিল। অবনীশের বাবার গান-বাজনার খুব শখ [illegible] শিখেছেনও কিছু-কিছু। কোথাও গান কিংবা বাজনা [illegible] সুযোগ পেলে সে সুযোগের অসদ্ব্যবহার করেন না। আবার [illegible] থাকলে, পাঁচ জনকে ডেকে শোনাবার জন্যেও ব্যস্ত হন [illegible] অনেক চেষ্টা করে আজ পাঞ্জাবের বিখ্যাত সুবোধ বাজ[illegible] সিংকে বাড়ীতে এনেছেন। আর সেই উপলক্ষে বেশ [illegible] দলকেই জানিয়েছেন আমন্ত্রণ। পুত্রের বন্ধুদের তরফে পড়েছি[illegible]

সত্যই চমৎকার বাজান ভদ্রলোক। সুরের মূর্চ্ছনা [illegible] ঘরটাকে একেবারে নিস্তব্ধ করে ফেলেছিলেন। বাসন্তী [illegible] অর্থাৎ এই সরস্বতী পূজার দিনটি এদের কাছে একটা [illegible] উৎসবের রূপ ধরেই দেখা দেয়। দেবী সরস্বতী কেবল [illegible] নন, বীণাপাণিও—সব রকম কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী [illegible] দেবীর প্রসাদী সিঁদুরে তিলক করে বৎসরেক ধরে [illegible] শিখেছেন তাই দিয়েই প্রাণঢালা অর্ঘ্য সাজিয়ে [illegible] পায়ে অঞ্জলি দেন—অমন আকুল-করা বাজনা শুনে [illegible] বার বার এই কথাটাই মনে পড়েছিল সুপ্রিয়ের। [illegible] স্তরে স্তরে স্তরে কেঁপে কেঁপে মানবের অন্তরাত্মায় [illegible] ধরে ভেসে চলেছে সুর লহরী। মনপ্রাণ এক নিমেষে [illegible] বিশুদ্ধ তান-লয় আর আন্তরিকতায় পূর্ণ হয়ে আত্মপ্র[illegible] করে

ঐ সুর, সে সুর একেবারে অন্তরে এসেই ঘা দেয়; নিতান্ত অরসিককেও করে তোলে রসগ্রাহী। মনে হয় শ্রুতি আজ সার্থক। শুধু তাই না, স্মৃতির দুয়ারেও সে রেখে যায় চিরস্থায়ী পদচিহ্ন। সমঝদার না হয়েও সুরের শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছিল সুপ্রিয় অবনীশের বাবাকে।

কিন্তু···বড় দেরী হয়ে গেছে। রাণী গলির মধ্যে দিয়ে গেলে অনেক শীগ্‌গির পৌছান যায়। সেই দিকে পা চালিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মা হয়ত বসে রয়েছেন, রাত্রির গভীরতা হয়ত ভাবছেন সুপ্রিয়র শরীরে রয়েছে বনেদী মুখুয্যে-বংশের রক্ত—যে রক্ত প্রতি পুরুষে তার উত্তরাধিকারের দাবী জানিয়ে এসেছে। কথাটা মনে পড়তেই গতি শ্লথ হয়ে আসে···এ গলিটা দিয়ে যাওয়া···ঠিক হবে? সহরের নাম-করা গলি এটা; সব-রকম বার-বিলাসিনীদের বাস। যাবার সময় অবশ্য এই পথেই গিয়েছিল। কিন্তু তখন ছিল পরিষ্কার দিনের আলো, কোন কুৎসা, কোন কলুষ যার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতে পারে না।···ঘরের খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে চোখ পড়েছিল একটা স্ত্রীলোকের ওপর। তখন সে প্রসাধনে ব্যস্ত। অত কালো আর কুরূপ মেয়েছেলে সুপ্রিয় আর কখনো দেখেনি। যে ঘরে সূর্য্যের প্রবেশের অধিকার নেই, সে ঘরের অন্ধকার পটভূমিকায় তাকে যেন আরও ভয়াবহ লেগেছিল। অবনীশদের ওখানে গিয়েও বেশ কিছুক্ষণ ভুলতে পারেনি মেয়েটার কথা। তার পর কুমার সিংজীর বাজনা সুরের মায়া-জাল সৃষ্টি করে এমন্‌ এক কল্পলোকে নিয়ে গেছল, যেখানে বাস্তবের একটুকু কুশ্রীতা মনের গহিন কোণে ভুলেও উঁকি মারে না। কিন্তু এখন ঘুর-পথে চলতে গেলেও ত প্রায় মিনিট দশেক দেরী হয়ে যাবে। মা অবশ্য কোন প্রশ্নই করবেন না; অথচ তাঁর নির্ব্বাক্‌ ব্যথা-ভরা দৃষ্টি যে অনেক কথাই বলে যাবে, এ কথাও সে জানে। একটু ইতস্ততঃ করে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে আবার ঐদিকেই পা চালিয়ে দেয়। কোন দিকে না তাকিয়ে চোখ-কান বুজে বেরিয়ে গেলেই হবে।

"বলি ওহে বিঁধু, মুখটা তুলে একবার তাকাও না গো···"

চমকে মাথা তোলে সুপ্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়!

সেই মেয়েটা!

গলির দু'পাশে যে দু'টো 'বাই-লেন' বেরিয়েছে, তারই বাঁ দিকেরটায় ঢোকার মুখে একটা পানের দোকানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে! সারা অঙ্গে গিল্‌টির চকমকে গয়না! অন্ধকারের মধ্যে সেগুলো যেন বড় বেশী উজ্জ্বল।

ঘৃণায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলার বেগ বাড়িয়ে দেয় সুপ্রিয়। গলিটা শেষ হলে বাঁচে! কিন্তু এদের এখনও চেনেনি সে। সূর্য্যাস্তের পর যারা এ গলিতে আসে, তাদের সহজে ছেড়ে দিতে পারে না এরা। তারাই এদের জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, তারাই এদের লক্ষ্মী।

স্ত্রীলোকটা সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে···"আহা আমায় না হয় নাই পছন্দ করলে···আরও অন্য আছে। এদের মধ্যেই একটাকে চয়িস্‌ কর না বন্ধু···কই, ইদিকে এগিয়ে আয় না লো পদ্মশ্রী···।"

পদ্মশ্রী!

থমকে দাঁড়িয়ে যায় সুপ্রিয়।

এ গলির পক্ষে একান্ত অপরিচিত একান্ত অনুপযুক্ত নাম কৌতূহলী মনের সঙ্গে চোখ আপনি গিয়ে পড়ে উদ্দিষ্টার ওপর।

পরিপূর্ণ গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি।

পদ্মশ্রীই বটে!

পূরন্ত ঢলঢলে মুখখানির ওপর ভয়-ত্রস্ত ভাসা-ভাসা দু'টি চোখ, ছোট্ট টিকলো নাক আর ঠিক তার নীচেই ডান দিক ঘেঁসে ওষ্ঠের ওপরে কালো একটা আঁচিল। ভয়ে উত্তেজনায় টুকটুকে ঠোঁ দু'টো থর-থর করে কাঁপছে। যেন ভ্রমরের ভার সহ্য করতে না পেরে পদ্মের দু'টো পাপড়ি কেঁপে-কেঁপে নিষ্ফল প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

এক নিমেষেই বোঝা যায় যে এ পথের নতুন পথিক। দুনিয়ার ছাল-চালের বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ। স্ফুটনোন্মুখ কুসুমেই কীট দংশন করেছে; প্রস্ফুটিত হবার অবসরও দেয়নি।

করুণায় ভরে ওঠে সারা মন; জানতে ইচ্ছে যায় কোন দুরদৃষ্ট তাঁকে এখানে এনে ফেলেছে, কে আছে তার, কোথায় ঘর···

সহসা তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্রূপে সচেতন হয়ে ওঠে: "কি গো, চোখ দিয়েই সব মধুটুকু চুষে নেবে না কি? অতই যদি তেষ্টা তাহলে সুড়-সুড় করে ঘরে গিয়েই ঢোক না চাঁদ।"

মুহূর্ত্তে কি যেন হয়ে যায়···

মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়···"আচ্ছা, তাই চল।"

"এই ত লক্ষ্মী ছেলের মত কথা···যা লো পদি, বরাত ভালো। 'বেশ থাপসুরৎ নাগ······"

স্ত্রীলোকটার বাক্যস্রোত মাঝপথেই থেমে যায়। হৈ-চৈ ক'রে কতকগুলো মাতাল এসে পড়ে। বেপরোয়া মাল টেনে স্বভাবতঃ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সব ক'জন। এখানকার নিত্য অতিথি, সে হিসেবেও কিছুটা বেপরোয়া। দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সুপ্রিয়।

এক জন স্ত্রীলোকের কদাকার কুৎসিত মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরে হঠাৎ হেঁড়ে-গলায় গান ধরে: "বঁধু কি আর বলিব আমি, জনমে জনমে মরণে মরণে প্রাণনাথ হোয়ো তু-উ-উ-মি ই: ই: :: "

জোরের সঙ্গে কয়েক পা হঠে গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে স্ত্রীলোকটা বলে: "আঃ, কি হচ্ছে শ্যাম বাবু, আবার মাতাল হয়ে এসেছ? আজ ত খুব টেনেছ, বলি, পকেটেও মাল-টাল আছে ত, না একেবারে গড়ের মাঠ। তা যদি হয়, তবে সরে পড় বাপু, নইলে বাড়ীওয়ালী হল্লা না করে ঘরে ঢোক।"

আবার এক চোট চীৎকার করে ওঠে মাতালগুলো। ··· শীষ দেয়, এক জন কবিতা আওড়ায়, আবার এদের মধ্যেই এক জন এসে বাঁ হাতে মেয়েছেলেটার গলা জড়িয়ে ধরে ডান হাতের খালি বোতল তার মুখের কাছে এনে কাঁদ-কাঁদ গলায় সুরু করে "পিয়ারী, ভাই, কালকের সেই আঙ্গুরটা আজও আমার জন্যে ···ত···আহা, বড় সুন্দর কাশ্মীরি আঙ্গুর ভাই-ই, বড় টুকটুকে······

"না হে রসিক মশাই, না; কাশ্মীরি আঙ্গুরের কাশ্মীরি ··· জুটেছে··· এই ত, সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে···নতুন কি না, তোমাদের দেখে ভেবড়ে গেছে। তা' তুমি যাও বন্ধু, নিজের ··· যাও। কেউ তোমায় জ্বালাতন করবে না। তুমিই আগে এসেছ···"

কোন জবাব না দিয়ে তীক্ষ্ণ অন্ধকারের মধ্যেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাতালের মুখ দেখার চেষ্টা করে সুপ্রিয়। মাতালটা তার পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারাটা···গলার স্বরটা যেন···

মাতাল তখন বলে চলেছে…"হ্যাঃ, যাও বললেই যাও…কেনো রূপেয়া দিয়া…হাম বিশ গুণ দেবে…চাল্লিশ গুণ দেবে…পচাশ গুণ দেবে…লেকিন আঙ্গুর হামার চাই-ই…"

"আঃ, কি কর রমেশ বাবু…।"

বেত্রাহতের মত চমকে ওঠে সুপ্রিয়। তার পরই পেছন ফিরে কোনো দিকে না তাকিয়ে এক রকম ছুটেই পালিয়ে যায়…পেছন থেকে নারী ও পুরুষ-কণ্ঠের মিশ্রিত হাসি শোনা যায় হোঃ-হোঃ হাঃ হা. হিঃ-হিঃ!

পরিষ্কার ভাবে রমেশ বাবুর স্বর ভেসে আসে: যেদ্দাও শালেকো…মেরা আঙ্গুর…।

কোনো রকমে বাড়ী পৌছেই স্নানের ঘরে ঢুকে যায় সুপ্রিয়; নাক-মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে। প্রকৃতিস্থ হতে কিছুটা সময় লাগে। তার পর অনুসন্ধানে জানে সন্দেহ সত্য। প্রাত্যহিক নিয়মেই পিসী গৃহে অনুপস্থিত।

প্রকৃতির সংকট

অশোকা মুখোপাধ্যায়

শ্যাম সুন্দর সবুজ বনভূমি। দখিণ-সায়রের সমীরণ নিয়তই তাকে চুমু দিয়ে আদর করছে। বাতাস ভরে উঠেছে বনফুলের গন্ধে।

ধারালো কুঠার দিয়ে বন কেটে তৈরী হলো নগর-ফ্যাক্টরী-বস্তী। সভ্যতার প্রয়োজনে—বাস্তবতার তাগিদে।

বনানীর বুক চিরে চলে গেল লাল সুরকী-বাঁধানো রাস্তাটা। প্রকৃতির বুকে আঁকা সভ্যতার রক্তাক্ত পদ-লেখা।

সৌম্য ধ্যান-গম্ভীর উত্তুঙ্গ গিরি-শিখর দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে অতন্দ্র প্রহরায়। এলো ডিনামাইট। পাহাড় ধ্বসিয়ে সেখানে রেল-লাইন বসানো হলো। ইঞ্জিনের সুতীক্ষ্ণ বাঁশী আগেকার নিস্তব্ধতাকে উপহাস করতে করতে চলে যায়।

শহর থেকে অনেক দূরে। পাহাড়ের নীচে মহুয়া গাছের ছায়ায় ছবির মতো সুন্দর সাঁওতাল-পল্লী। তন্দ্রালস নিস্তব্ধ দুপুরে সাঁওতাল ছেলে গাছের তলায় বসে এক মনে বাঁশী বাজিয়ে চলে। …তার প্রেমিকার খোঁপায় গুঁজে দেয় বড় এক থোকা কৃষ্ণচূড়া; তারপর খানিকক্ষণ দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পর হঠাৎ লুটোপুটি খায়।

…মাটীন দুর্বাসার দৃষ্টি পড়ে এদের ওপর।

…ইঞ্জিনীয়ার, কণ্ট্রাক্টর, লোক-লস্কর, যন্ত্রপাতি; মাপ-জোখ হয়। কিছু টাকা নিয়ে সাঁওতালদের গ্রাম ছেড়ে দিতে হয়। …সেখানে ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা; দুপুর বেলা শোনা যাবে—…কারখানার বাঁশী।

নদীর বুকে জেগেছে ছোট একটা চর। সোনার বালুচরে সূর্য-কিরণ চিক্-চিক্ করে। শুভ্র কাশবন হাওয়ায় এদিক-ওদিক দুইয়ে পড়ে। মাছরাংগাটা একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে পরম গম্ভীর দার্শনিকের মতো। কোথা থেকে এক দল হাঁস এসে নামলো চরটির ওপর।

হুড়ুম—হুড়ুম! গোটা কয়েক হাঁস ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে লুটিয়ে পড়লো। নিহত সঙ্গীদের দিকে একবার তাকিয়ে আর্তনাদ করতে করতে হংস-বলাকা উধাও হলো দিগন্তের বুকে। মাছরাংগাটাও যেন ইতিমধ্যে কোথায় সরে পড়েছে।

ক্রমে ট্রাক্টর এনে জমি খোঁড়া হলো। সেদিনকার সান্ধ্য আসরে রেডিও ঘোষণা করলো—"কতো অল্প খরচে সয়াবীন উৎপন্ন করা যায় সে বিষয়ে সরকার বাহাদুর '—' চরে গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণা বাবদ ব্যয় মঞ্জুর হয়েছে দু'লক্ষ একুশ হাজার তিনশো টাকা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

গিরি-গৃহত্যাগিনী অভিসারিকা ঝর্ণা চলেছে বয়ে। বিপুল তার জলোচ্ছ্বাস, উদ্দাম তার জীবনী-শক্তি, অদম্য তার বেগের আবেগ। দু'পাশে ফুটে উঠেছে ভায়োলেট ফরগেট-মি-নট, রডোডেনড্রনের গুচ্ছ। বসেছে আরো কতো নাম-না-জানা রঙীন ফুলের মেলা।

বৈজ্ঞানিক দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন—"এ কি বিরাট অপচয়!"

তার পর? তার পর নদীর বুকে তৈরী হলো বাঁধ; তৈরী হলো জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা। ঝর্ণার কলতান ছাপিয়ে সেখানে এখন দিবারাত্র শোনা যায় ঘর-ঘর শব্দ।

* * *

সভ্যতা আর প্রকৃতি। মানুষের পৃথিবীতে একসঙ্গে এদের দু'জনের স্থান বোধ হয় হবে না।

'I wish no one had ever learned how to make Guns'

শ্রীমতী অমিয়া দেবী

১৯৪৮ সাল, ৩০শে জানুয়ারী—শ্রীমতী Pearl S. Buck বলেছেন—"আমেরিকার সুদূর পল্লীগ্রামে শোক-বার্তা নিয়ে এল নিদারুণ সংবাদ—গান্ধীজী নেই—শুধু যে নেই তা নয়, তাঁকে হত্যা করেছে, তাঁরই স্বদেশবাসী, তাঁরই স্বধর্মাবলম্বী নিষ্ঠুর ভাবে, বন্দুকের গুলীতে। আমরা স্তম্ভিত হতবাক্—সহসা আমার দশ বছরের ছোট ছেলেটি আকুল ভাবে কেঁদে বলে উঠল, 'মা, লোকে কেন বন্দুক তৈরী করতে শিখেছিল, I wish no one had ever learned how to make guns.'

বাস্তবিক আজ মনে হয়, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে তার বিজয় অভিযান সুরু করেছিল অতি অশুভ মুহূর্তে। তার বিদ্যা তার নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা তাকে এ কোন্ অকল্যাণের পথে নিয়ে চলেছে! হায় মানুষ, এ কি সর্ব্বনাশা শিক্ষা তোমার?

সুদূর আদিম যুগে শিশু-মানব যখন পৃথিবীতে এল, তখন সে প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক মাত্র—দুর্ব্বল, অসহায়। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, ভীষণ গিরি-গুহায় তার দিন কাটে অজানার বিস্ময়ে, অনিশ্চিতের আশঙ্কায়, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। তার পর কবে কোন্ ক্ষণে মানুষ আবিষ্কার করল রহস্যময়ী প্রকৃতির জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি। সেই মুহূর্ত্তে তার আত্ম-চেতনা উদ্বুদ্ধ হল, দূর হল তার ভয়, তার অন্তরে জাগ্রত হল জয়ের অভিলাষ। সেই জয়ের নেশা মানুষকে করালো অসাধ্য সাধন, তার অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি প্রকাশ করল অজানাকে নানা স্থানে নানা রূপে। ধর্ম্মে,

দেবতা প্রসন্ন হলেন তাঁর সন্তানের স্তুতিতে; বললেন, "সফলকাম হও, সিদ্ধিলাভ হোক তোমার।"

সিদ্ধিলাভ যতই হয়, জয়ের নেশা তার বেড়েই চলে। অবশেষে এক দিন গর্ব্বান্ধ মানব তার বিজয়-রথ নিয়ে হানা দেয় দেবতার প্রাসাদে। হেঁকে বলে, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, যেই হও, তোমাকে আমি ভয় করি না, আমি মানুষ, সমগ্র দুনিয়া আমার করতলগত এবং দুনিয়ার বাইরে যদি কিছু থাকে, তাও। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে দেবতার অভিশাপ লাগল বুঝি দেবদ্রোহী মানবের উচ্ছৃঙ্খল দর্পে। জিগীষার ছদ্মবেশে মানুষের হৃদয় অধিকার করল দুর্ব্বার লিপ্সা। সেই লোভের বিজয়-পতাকা শিরে নিয়ে মানুষ ছুটল দেশ-দেশান্তরে, শক্তি-সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে বহু হল শক্তির অপচয়ে। ভাইয়ে-ভাইয়ে লাগল হানাহানি, সুরু হল হিংসার বীভৎস লীলা। হিংসার অস্ত্র বেড়েই চলল, বেড়েই চলল মানুষে মানুষে নিষ্ঠুর তাণ্ডব সংগ্রাম। দুর্ব্বলের রক্তে পৃথিবী হল কলুষিত, পীড়িতের আর্ত্তনাদে মুখরিত, হিংসার দানবিকতায় জর্জ্জরিত। স্বর্গে দেবতার আসন বুঝি টলল। পৃথিবীতে নেমে এল ভগবানের দূত শান্তির বার্ত্তা নিয়ে। যুগে যুগে মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করল নিষ্ঠুর উপহাসে, নির্ব্বোধ অবিশ্বাসে। পাশবিকতা উঠল চরমে। সর্ব্বংসহা জননী বসুমতীও কাতরা হলেন। "ক্ষমাহীন, দয়াহীন এ সংসারে পাপের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, ভগবান ত্রাণ কর।" ভগবান বিচলিত হলেন। পৃথিবীতে নেমে এলেন মহামানব—

"নিরঞ্জন প্রশান্ত মূরতি
দৃষ্টি হ'তে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর পরে
করুণার সুধা-হাস্য-জ্যোতি"

হাতে তাঁর প্রেমের দীপ, কণ্ঠে তাঁর অভয় বাণী—মানুষকে ডেকে বললেন, "ভাই সব, হিংসায় জয় করা যায় না, জয় করা যায় প্রেমে। জয় যদি করতে চাও হে রিপু-তাড়িত লোভোন্মত্ত মানব—জয় কর আগে নিজেকে, জয় কর তোমার দুরন্ত লালসাকে, জয় কর তোমার দুর্ব্বার হিংসা-প্রবৃত্তিকে, তবেই জয় হবে তোমার।" মানুষ হেসে উঠল অবিশ্বাসের হাসি। কেউ বলল পাগল, কেউ বলল প্রতারক, কেউ বা জানাল প্রণতি, আবার কেউ বা দেখাল ভয়। প্রেমের প্রদীপ হাতে এগিয়ে চললেন দেবদূত 'হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত'। তিনি ত কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন না, তাঁর কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই, কিছু হারাবারও আশঙ্কা নেই। তিনি এসেছেন শুধু দিতে, নিরাশ জনকে আশার বাণী শোনাতে, আর অন্ধকারের মাঝে আলো দেখাতে।

অন্যায় লোভান্ধ অহঙ্কারী মানুষ, শেষে এ কী করল, এ কী করল সে! ঈর্ষা-বিক্ষুব্ধ রাত্রে প্রেমের পথে যার যে দীপ জ্বলে উঠেছিল, সে দীপ সে নিজের হাতে নিবিয়ে দিল নিষ্ঠুর আঘাতে। আকাশ-বাতাস কেঁদে উঠল করুণ হতাশায়—স্বয়ং ভগবানও কেঁদে উঠলেন, তাঁর সেই ক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল নিষ্পাপ শিশুর আকুল চীৎকারে 'I wlsh no one how ever learned how to make guns.'

আমার ছোট কুটীরখানি

শ্রীমতী পুষ্পবালা দে

আমার ছোট এ কুটীরখানি ছোট নদীর তীরে,
বিশাল মাঠের নিস্তব্ধতা আছে চার দিক ঘিরে।
ও-পাড়ের ঐ পাতার ফাঁকে আসে নবীন হাওয়া,
নূতন জিনিষ লয়ে সাথে পুরাতে মোর চাওয়া।

পিছনের ঐ গ্রাম হতে আসে আর এক বাতাস,
শঠতা আর প্রবঞ্চনায় ঘেরা তার চারি পাশ,
এমনি ক'রে হাওয়া দু'টি মেশে আসি অহর্নিশি,
দিবানিশি তাদের কথাই ভাবি আমি বসি বসি।

ছিলাম আমি এক দিন (ঐ) গ্রামের এক গ্রামবাসী,
এখন কিন্তু একাই ত থাকতে বড় ভালবাসি।
নূতন হাওয়ার পরশ লাগল আমার গায়ে,
নূতনের আশায় যে মন চলল সেদিক পানে।

ভুলে গেছি মা-বাপের মুখ কত কালের কথা,
প্রাণে কিন্তু লাগল যখন পাই যে বড় ব্যথা।
ঐ নিষ্ঠুর ভগবান যখন তাদের নিল কেড়ে,
তাই নিয়ে আমি বইছু সদা দাবিদাকে ঘিরে।

এখন আমি বেশ সুখেতেই আছি নদীর ধারে,
কষ্ট বড় হউক না কেন থাকব ধৈর্য্য ধরে।
গ্রামের ঐ কঠিন হাওয়া সইল না মোর প্রাণে,
তাইতে ছুটে চলে এলাম এ হেন বিজন স্থানে।

গ্রামবাসীর সেই নিষ্ঠুরতা মানুষে দেয় কষ্ট,
মানুষ কিন্তু বেঁচেই মরে থাকে সদাই নিশ্চেষ্ট।
মানুষে মানুষে বিবাদ করা, এ প্রাণে দেয় ব্যথা,
তাই ত আমি ছুটে এলাম, বাঁধলাম বাসা হেথা।

ভগবান তাই আমার ডাকে দিলেন এবে সাড়া,
কারা হ'তে মুক্তি দিলেন, আনলেন সুখের ধারা।
একা আমি বেশ ভালই আছি ছোট নদীর ধারে,
আমার ছোট কুটীরখানি ছোট নদীর তীরে।

বেতারের আসর—
কি শহরে, কি পাড়াগাঁয়ে

শহরে কি পাড়াগাঁয়ে যেখানেই থাকুন, বিজলী পান আর না-ই পান, শুধু একটি ব্যাটারী সেট আর 'এভারেডী' রেডিও ব্যাটারী হলেই স্বচ্ছন্দে বেতারের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

একটি 'এভারেডী' ড্রাই ব্যাটারী থাকলে বিজলী যোগাযোগ ছাড়াই নির্ঝঞ্ঝাটে মাসের পর মাস বেতার শোনা চলবে। সুদীর্ঘ ৬০ বৎসরেরও বেশীকালের সাধনা ও অভিজ্ঞতায় তৈরী এই ব্যাটারী — এ অনেক বেশী টেকে, এর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা চলে, আর তাই এর নাম ছড়িয়ে আছে দেশে দেশে।

EVEREADY
TRADE-MARK

রেডিও ব্যাটারী

ন্যাশনাল কার্বন কর্তৃক প্রস্তুত

ছোটদের আসর

হাজারমারীর বিভীষিকা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহৃষীকেশ হালদার

রোজার ঘরে ভূতের বোঝা

প্রদীপ কলকাতায় ফিরে যাবার দু'-তিন দিনের মধ্যেই আর একটা নতুন ব্যাপার ঘটলো। এত দিন যারা ভূতের ভয়ে কোন রকমে প্রাণ হাতে করে সোনারগাঁ আর হাজারমারীর মাঠের আশ-পাশের গ্রামগুলোতে দিন কাটাচ্ছিলো, এবার তারা সবাই পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দূরে কোথাও পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সেদিন রাত্রে হাজারমারীর মাঠে আমরা যে জীবন্ত কঙ্কালের নাচ দেখেছিলাম, এখন তারা না কি গ্রামের মধ্যে গভীর রাত্রে হানা দিচ্ছে। মাঝ রাত্রে হঠাৎ তাদের বিকট হাসির ধ্বনি, পথে-প্রান্তরে উল্লাসভরা নাচ গ্রামের লোককে এমন সন্ত্রস্ত করে তুলেছে যে, আর একটা রাত্রিও তারা এখানে নিজেদের নিরাপদ মনে করছে না।

চাটুয্যে মশাইকে দেখিনি ক'দিন। তিনি বোধ হয় অন্যত্র চলে গেছেন কিংবা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার ভরসা হয়নি তাঁর। এই সব গণ্ডগোলের মধ্যে থাকবার ইচ্ছা আমারও ছিল না, চন্দ্রিকা সিং এখানে উপস্থিত না থাকলে বা প্রদীপের যে-কোন মুহূর্ত্তে আবার ফিরে আসবার সম্ভাবনা না থাকলে আমিও চলে যেতাম অন্য কোথাও। কিন্তু প্রদীপ যখন আমার এখানে থেকেই তার কাজ সুরু করেছে, তখন আমার চলে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অগত্যা গ্রামশুদ্ধ সকলে গ্রাম ছাড়বার তোড়জোড় করলেও আমি নিশ্চেষ্ট ভাবেই বসে রইলাম।

প্রদীপ যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিলো, তেমনি হঠাৎই আবার ফিরে এলো সেদিন সকালে। সঙ্গে তার এক জন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী চাকর, মাথায় তার প্রকাণ্ড একটা মোট। হিন্দুস্থানী চাকরটাকে দেখে আর কেউ না চিনুক, আমি আর চন্দ্রিকা সিং ঠিক চিনেছিলাম। বদ্‌রিয়া-বেশে যে প্রদীপের সঙ্গে সামান্য হিন্দুস্থানীর মতো মোট বয়ে নিয়ে এলো, সে অন্য কেউ নয়—স্বয়ং প্রদীপের সহকারী আর বন্ধু অধীপ। ধোঁয়া দেখলেই যেমন আগুনের অস্তিত্ব বোঝা যায়, তেমনি কোন তদন্তে প্রদীপকে দেখলেই বোঝা যায় অধীপও এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নেই নিশ্চয়ই।

অধীপের অপরূপ ছদ্মবেশ আর তার মাথার প্রকাণ্ড বোঝা দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম: ব্যাপার কী প্রদীপ? অধীপের

—চুপ! প্রদীপ হেসে বললে: ও দু'টো নামই এখন [illegible] যাও কিছু দিনের জন্যে। আমি এখন প্রদীপ রায় নই, রাজীব শর্ম্মা—ভূতের রোজা, প্রেত-তাত্ত্বিক যা খুশী বলতে পারো। [illegible] ধরা আর ভূত তাড়ানোই আমার পেশা। অধীপ বলে [illegible] কেউ নেই—ও হচ্ছে বদ্‌রিয়া, আমার হিন্দুস্থানী চাকর। আর, [illegible] চন্দ্রিকা সিং নন—জনার্দ্দন বাবু, নিছক কৌতূহলের বশে [illegible] দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে এসেছেন। বুঝলে?

—বুঝলাম। কিন্তু লোকে যদি আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কী জিজ্ঞাসা করে······

—তাদের বলবে, তুমিই আমাকে আনিয়েছো। প্রদীপ [illegible] দিলে: এখানে ভৌতিক উপদ্রবের বাড়াবাড়ি হওয়ায় তোমা[র] কাছ থেকে খবর পেয়েই আমরা এসেছি। দেখা যাক, [illegible] সরষে-পড়ায় ভূত ধরা পড়ে কি না!

—তা' মতলবটা মন্দ নয় ভায়া, চন্দ্রিকা সিং বললেন: [illegible] সে রাত্রে ভূতুড়ে কাণ্ডের যে নমুনা দেখেছি, তাতে বিশেষ [illegible] ভরসা হয় না। শেষে রোজার ঘাড়েই না ভূত চাপে।

—দেখা যাক! প্রদীপ বললো: এখন প্রধান কাজ [illegible] গ্রামের লোকগুলো যাতে গ্রাম ছেড়ে না পালায় তার ব্যবস্থা [illegible]। লোক-জন তাড়ানোই যে ওদের প্রধান উদ্দেশ্য, তাতে আর [illegible] সন্দেহই নেই। নইলে গ্রামের মধ্যেও অপদেবতার দল হানা [illegible] না। ভূত তাড়াতে রোজা এসেছে শুনলে তবু যদি গ্রামের [illegible] একটু ভরসা পায়। বদ্‌রিয়া······

—হুজুর! আভূমি নত হয়ে সেলাম করে ভৃত্যবেশী [অধীপ] জবাব দিলে।

—কলকাতা থেকে যে হ্যাণ্ডবিলগুলো ছাপিয়ে এনেছি, [illegible] মধ্যে ঝটপট সেগুলো বিলি করে দাও—যাতে করে সকলে [illegible] আসার খবরটা আজকের মধ্যেই জানতে পারে।

অধীপ তাড়াতাড়ি মোটটা খুলে এক তাড়া হ্যাণ্ডবিল [illegible] গেলো। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে একখানা হ্যাণ্ডবিল [illegible] পড়তে লাগলাম:—

প্রেত-তাত্ত্বিক রাজীব শর্ম্মা

সোনারগাঁয়ে এবং তার আশে-পাশে ভূতের উপদ্রবের [illegible] প্রেত-তাত্ত্বিক রাজীব শর্ম্মা এসেছেন ভূত ধরতে আর [illegible]। হাজারমারীর মাঠের সব ভূত তিনি তাড়াবেন বলে প্রতিজ্ঞা [illegible]। বর্ত্তমানে তিনি জগদীশ আচার্য্যের বাড়ীতে মুখুজ্যে মশাই[এর] [illegible] যখন ইচ্ছা [illegible]

প্রয়োগ করতে পারেন। প্রেত-তাত্ত্বিক রাজীব শর্ম্মা কলকাতার বিখ্যাত রোজা, সুতরাং তাঁর বিশেষ পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজনই নেই।

হ্যাণ্ডবিলটা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই তাহলে প্রদীপ ভূত রোজা সাজছে। কিন্তু তার মতলবটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করাও নিষ্ফল। কারণ, বহু বছর থেকেই দেখে আসছি, সে কী মতলবে কোন্ কাজ করে সে কথা আগে কাউকেই জানায় না। কাজ শেষ হয়ে গেলে অবশ্য সে গোপন করে না কোন কিছুই। মন্ত্রগুপ্তি গোয়েন্দাগিরির প্রধান লক্ষণ।

হ্যাণ্ডবিল বিলি করা সেরে ঘণ্টা তিনেক পরেই ফিরে এলো প্রদীপ। তখন বেলা দুপুর হয়ে গেছে—বাইরের কাঠ-ফাটা রোদের তাপে প্রদীপের অবস্থা শোচনীয়। সকলে আহারাদি সেরে দুপুরটা একটু বিশ্রাম নেওয়া গেলো। বৈকালে আর এক নতুন পর্ব। হ্যাণ্ডবিল পড়ে দলে দলে লোক প্রদীপকে দেখতে এলো। ভূত তাড়াতে রোজা এসেছে জেনে অনেকেই একটু আশ্বস্ত হয়েছে—বিশেষ করে অশিক্ষিত চাষী-মজুরের দল। তারা একবার রাজীব শর্ম্মার দর্শন চায়। প্রদীপ ততক্ষণে নিজের ভোল পালটে ফেলেছে। পরনে তার গরদের ধুতি, গায়ে গরদের বেনিয়ান আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্তচন্দনের তিলক এঁকে আর খড়ম পায়ে খট্‌খট্ শব্দে এসে সে বার-বাড়ীতে একটা ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে বসলো। ডান হাতে তার একটা হাড়ের মত কী দেখলাম। এ সব সে কলকাতা থেকে জোগাড় করে এনেছে।

প্রদীপের পেছনে ঠিক ভক্ত গরুড়ের মতো রহস্যাবেশী অধীপ জোড়হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। চন্দ্রিকা সিং প্রদীপের একটু তফাতে একখানা মাদুরের ওপর বসে পড়লেন।

গ্রামের সাধারণ চাষীরা অত্যন্ত সরল। তারা সহজেই সব কিছু বিশ্বাস করে। শহরের লোকের মতো এদের মন এখনো সন্দেহাকুল হয়নি। তারা রাজীব শর্ম্মাকে গ্রামে ভূতের উপদ্রব সম্বন্ধে অনেক কথাই নিবেদন করলে। তাদের সকলেরই একান্ত অনুরোধ শর্ম্মা মশাই ভূতগুলোকে তাড়িয়ে তাদের বাঁচান, নইলে সকলকেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।

প্রদীপ সকলের কথাই একে একে হাসিমুখে শুনলে। তার পর সকলকে ভূত তাড়াবার আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলে। কেবল দু'জন জোয়ান চাষী রয়ে গেলো শেষ পর্য্যন্ত। প্রদীপ তাদের জিজ্ঞাসা করলে, কী বলতে চায় তারা।

রামহরি আর হরিচরণ জানালে, তারাই এ গাঁয়ের মাতব্বর চাষী। অনেক জমি-জমা তাদের। ভূতের উপদ্রবে গ্রাম ছাড়তে হলে তাদের ক্ষতি হবে সব চেয়ে বেশী। সুতরাং প্রাণ যায় সেও ভালো, তবু গ্রাম ছাড়তে তারা পারবে না। রাজীব শর্ম্মাকে ভূত তাড়াতে সবরকমে সাহায্য করতে তারা রাজী।

—কাল একবার দিনের বেলা হাজারমারীর মাঠে ভূতের আস্তানা দেখতে যাবো মনে করছি। প্রদীপ তাদের জিজ্ঞাসা করলে: তোমরা যাবে আমার সঙ্গে?

—আজ্ঞে, মরেছি না মরতে আছি। মানুষ দু'বার মরে না। হরিচরণ উত্তর দিলে: আপনার সঙ্গে যেতে আমরা দু'জন রাজী।

—বেশ, কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। প্রদীপ তাদের বললে: সেই সময় যা হয় ঠিক করা যাবে। আমি রাজীব শর্ম্মা, অনেক শহরে ভূত তাড়িয়েছি, এ তো পাড়াগেঁয়ে ভূত। খালি দু'মুঠো সরষে-পড়া···! ব্যস্···

প্রদীপকে ভক্তিভরে প্রণাম করে হরিচরণ আর রামহরি চলে গেলো। এখানকার নতুন দারোগাও এসেছিলেন রাজীব শর্ম্মাকে দেখতে। তিনি এতক্ষণ চুপ করে এক ধারে বসে বসে প্রদীপের সঙ্গে অন্য সকলের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। রামহরি আর হরিচরণ চলে যেতেই তিনি প্রদীপকে বললেন: তাহলে কাল দুপুরে আপনারা হাজারমারীর মাঠে যাচ্ছেন শর্ম্মা মশাই?

—ইচ্ছা তো আছে, প্রদীপ দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে: এখন সবই শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

—কিন্তু ভগবানের ও-রকম ইচ্ছা না হলেই বোধ হয় ভালো হয় শর্ম্মা মশাই। নইলে ওই মাঠেই আপনাদের লাশগুলো হয়তো পড়ে থাকবে। দারোগা বাবু বললেন: শহর থেকে এসে কেন এই অজ পাড়াগাঁয়ের একটা মাঠে পড়ে প্রাণটা দেবেন শুধু শুধু ভূতের হাতে। আর সে কী একটা-আধটা ভূত মশাই, পালে পালে ভূত—দলে দলে ভূত···! বাপস্···

দারোগা বাবু যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। প্রদীপ তাঁর কথার ভঙ্গী দেখে হাসতে হাসতে বললো: তাহলে তো ভূতের সঙ্গে রীতিমতো বোঝা-পড়া না করে এখান থেকে এক পা'ও নড়ছি না দারোগা বাবু। কারণ ভূতের সংখ্যা যত বাড়ে, আমার উৎসাহও তত বাড়ে।

—যা বোঝেন করুন তবে! দারোগা বাবু মুখ ভার করে যাবার জন্যে উঠে পড়ে বললেন: আমি সৎপরামর্শই দিলাম। এখন আপনার বিবেচনায় যা হয় তাই করবেন।

দারোগার গমন-পথের দিকে চেয়ে প্রদীপ নিজের মনেই বলে উঠলো: আশ্চর্য্য! লোকটা যেন আমায় সাবধান করবার ছলে শাসিয়ে গেলো। আমাকে সাহায্য করা দূরের কথা, যাতে আমি হাজারমারীর মাঠের দিকে না যাই, সেইটাই ওর বিশেষ চেষ্টা।

—এর চেয়েও আশ্চর্য্য কথা তোমায় শোনাতে পারি প্রদীপ। চন্দ্রিকা সিং বললেন: লোকটা মোটেই আসল দারোগা নয়, জাল দারোগা।

অর্থাৎ···বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

—অর্থাৎ ইনি তিনি নন। এখানে আসবার আগে এখানকার দারোগা নিখোঁজ হওয়ার পর কে এখানের থানার চার্জ্জে নতুন এসেছেন সে কথা জেনেই এসেছিলাম। জীবনময় ঘোষ হচ্ছে তাঁর নাম, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, লম্বা দোহারা চেহারা। কয়েক বার জরুরী দরকারে কলকাতার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে তাঁকে যেতে হয়েছিলো, সুতরাং তাঁকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। বর্ত্তমানে এ জেলার সদরে তিনি ছিলেন; কাজের লোক বলে দারোগা বাবুর নিখোঁজের পর কর্ত্তৃপক্ষ জীবনময়কেই এ থানায় বদলী করেছেন। অথচ যে লোকটা আমাদের সঙ্গে কথা বলে গেল, আমি হলপ করে বলতে পারি, সে জীবনময় নয়। শুধু তাই নয় চেহারা আর বয়েসেও আকাশ-পাতাল তফাৎ।

—কিন্তু এখানকার দারোগা বাবু নিখোঁজ হওয়ার পর উনিই তো!

থানার চার্জে আছেন। বললাম আমি: উনি যদি জাল দারোগা হন, আসল জীবনময় গেলেন কোথায়?

—আসল জীবনময় হয়তো দলবলশুদ্ধ বিপদে পড়েছেন। প্রদীপ বললে: হয়তো তিনি বন্দী হয়ে আছেন, নয়তো মারা পড়েছেন শত্রুদের হাতে। এখানকার দারোগা থানার কয়েক জন কর্মচারী সঙ্গে নিয়ে হাজারমারীর মাঠে গিয়ে আর ফিরে আসেননি, স্বতরাং সদর থেকে শুধু জীবনময় নয়, আরো কয়েক জন কর্মচারীকেও এখানে পাঠাতে হ'য়েছিলো। দারোগা যখন জাল, তখন থানা-শুদ্ধ সবাই জাল লোক—আসল নয় কেউ-ই।

বিস্মিত ভাবে আমি প্রশ্ন করলাম, তাহ'লে তুমি বলতে চাও প্রদীপ, সদর থেকে যে ক'জন কর্মচারী আসছিলো তারা কেউই এসে পৌছয়নি? সবাই বিপদে পড়েছে?

—নিশ্চয়। প্রদীপ দৃঢ় কণ্ঠে বললে: দুই আর দুইয়ে যোগ করলে চিরকালই চার হয়—তিনও নয়, পাঁচও নয়। মি: সিং-এর কথামত জীবনময় যদি জাল হয়, তাহ'লে সবাই জাল। নইলে সদরের অন্যান্য লোকেরা, যারা জীবনময়ের সঙ্গে আসছিলো, তারা নকল জীবনময়কে চিনতে পারতো।

—তাহ'লে তো এখনি সদরে খবর পাঠিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করা উচিত। চন্দ্রিকা সিং বললেন: আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয়।

—ধীরে মি. সিং, ধীরে! অত ব্যস্ত হবেন না। প্রদীপ বললো: তাড়াতাড়ি করতে গেলে সব কাজ পণ্ড হবে। ভুলে যাবেন না যে, আমরা এসেছি নিরুদ্দিষ্ট দারোগার খোঁজ করতে আর দু'টো খুনের তদন্ত করতে। তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে বিষম ভুতুড়ে রহস্য—যার মর্ম ভেদ করতে আমরা এখনো পারিনি। মাঝখানে রহস্য হয়ে উঠলো আরো জটিল। আসল জীবনময় তার লোক জন নিয়ে উধাও—দারোগা সেজে বসে আছে এক নকল জীবনময়, আর থানা দখল করে বসে আছে তার লোক-জন। এখনি ওদের আমরা গ্রেপ্তার করতে পারি সত্যি; কিন্তু তাতে কী হারানো লোক-জনের সন্ধান মিলবে, না ভৌতিক রহস্যের সমাধান হবে? বরং তাতে আসল অপরাধীরা আরো সাবধান হবে। আমার মনে হয়, নকল দারোগা আসল অপরাধীদের হাতের পুতুল। তাকে তারা যেমন ভাবে চালাচ্ছে, সে তেমনি ভাবে চলছে। এই সব ব্যাপারের পেছনে একটা ভয়ানক রহস্যজনক কিছু আত্মগোপন করে আছে নিশ্চয়ই।

—কিন্তু এত দিন ধরে এক জন নকল দারোগা কি করে ধরা না পড়ে কাজ চালাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম আমি: সদরের পুলিশ কী এতটুকু সন্দেহ পর্য্যন্ত করেনি?

—সেটা বিশেষ আশ্চর্য্য নয় মুখুজ্যে, বললেন চন্দ্রিকা সিং: কারণ এই দূর পল্লীগ্রামের থানার সঙ্গে সদরের যোগাযোগ অধিকাংশ সময়েই রক্ষা করা হয় রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে। জীবনময়ের হাতের লেখা আর সই জাল করা কোন পাকা জালিয়াতের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। আর পুলিশের কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোক ওদের দলে থাকলে তো সোনায় একেবারে সোহাগা! কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জানো মুখুজ্যে? যারা এক দল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সরকারী কর্মচারীকে এমন করে গুম করে রাখার মত দুষ্কর্ম করতে পারে, তাদের আর একটা দিনের জন্যেও সমাজের বুকে অবাধে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে দেওয়া উচিত নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যেমন করে হোক ওদের ষড়যন্ত্র চূর্ণ করবো। তাতে আমার নিজের জীবন গেলেও কোন দুঃখ নেই।

—এত দিনে একটা সূত্র যখন পেয়েছি তখন আশা করি, অচির ভবিষ্যতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। প্রদীপ চন্দ্রিকা সিং-এর কথার জবাবে বললে: এখন আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে হাজারমারীর মাঠটাকে দিনের আলোয় ভালো করে দেখা। হয়তো আসল রহস্যের কোন সূত্র মিলেও যেতে পারে।

সেই দিনই রাত্রে!······

গল্প-গুজবে রাতটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিলো। আহারাদি সেরে যখন শুতে গেলাম তখন রাত প্রায় বারোটা। বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমে চোখ দেন জড়িয়ে এলো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ঘুম ভাঙলো প্রদীপের ডাকাডাকিতে।

চোখ রগড়ে উঠে বসলাম। দেখি চন্দ্রিকা সিং গম্ভীর মুখে তাঁর জুতোর ফিতে আঁটছেন। প্রদীপ রীতিমত আঁটসাঁট করে কাপড় পরেছে—জামার হাতাটা গুটানো। অদীপ তার রিভলভারটা বার করলো চামড়ার খাপ থেকে। তিন জনেরই যেন যুদ্ধযাত্রার মতো মুখের ভাব। ব্যাপার কী?

প্রদীপকে প্রশ্ন করতে হলো না। সে নিজেই বললে: ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মুখুজ্যে। বোধ হয় আজ রাত্রেই ওরা আমাদের শেষ করতে চায়, যাতে কাল দিনের বেলা আমরা হাজারমারীর মাঠে উপস্থিত হয়ে কোন তদন্ত করতে না পারি। এ রকমটা যে ঘটবে, সেটা চন্দ্রিকা সিং আগেই আন্দাজ করেছিলেন। কাজেই আমরা সকলেই ঘুমোলেও তিনি জেগে ছাদের ওপর পায়চারী করছিলেন। একটু আগে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, তাল গাছের মতো লম্বা-লম্বা কতকগুলো কঙ্কাল এই দিকে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এসে তিনি আমাকে জাগিয়ে তোলেন। তখনি তাঁর সঙ্গে আমি ছাদে উঠে গিয়ে এই একই দৃশ্য দেখতে পাই। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না থাকায় আমাদের সেই কঙ্কালগুলোকে দেখতে কোন অসুবিধে হয়নি। এতক্ষণে তারা হয়তো আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে!

খবরটা শুনে আমার মনের অবস্থা যা হলো, তা আর যাই হোক প্রকাশ করবার মতো নয়। চন্দ্রিকা সিং, প্রদীপ বা অদীপের কথা বলতে পারি না—কিন্তু আমি পুলিশ অফিসারও নই, শখের গোয়েন্দাও নই। নিতান্তই গোবেচারী সাধারণ লোক মাত্র। চন্দ্রিকা সিং-এর নামে শহরের নামকরা গুণ্ডা-বদমায়েসরা ভয় পেত। বহু বার জীবন বিপন্ন করে, অনেক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সাধারণ কর্মচারী থেকে তিনি ধাপে-ধাপে এত বড় সম্মান লাভ করেছেন। নিজের জীবনকে কর্ত্তব্যের কাছে তিনি তুচ্ছ বলেই মনে করেন। প্রদীপ আর অদীপও শখ করে, ইচ্ছে করেই গোয়েন্দাগিরির অসমসাহসিক পথ বেছে নিয়েছে। ওদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমি যে তাল গাছের মতো লম্বা-লম্বা কঙ্কালের আমার বাড়ীর দিকে আসার সংবাদে খুসী হতে পারিনি, এ কথা বলাই বাহুল্য। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম—কী করতে চাও তাহলে তোমরা?

—সম্মুখ-যুদ্ধ নয় নিশ্চয়ই। প্রদীপ বললো: ওরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তা ছাড়া বন্দুকের গুলীতে ওদের যে কিছুই করতে পারা যাবে না, তার প্রমাণ আমরা সে-রাত্রে হাজারমারীর মাঠে পেয়েছি। সুতরাং কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু দেখে যাও।

প্রদীপ, চন্দ্রিকা সিং আর অদীপ ছাদে উঠে গেলো। আমিও পেছন পেছন উঠে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার সংজ্ঞা প্রায় লোপ পাবার মতো হলো। আমাদের বাড়ীর পেছন দিকের বাগানে একসার লম্বা-লম্বা কঙ্কাল মূর্ত্তি লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

হঠাং দুম-দুম্ করে ভীষণ কতকগুলো শব্দ হলো। সে শব্দে আমাদের ছাদ শুদ্ধ কেঁপে কেঁপে উঠলো। আবার, আবার……।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, চন্দ্রিকা সিং আর প্রদীপ কতকগুলো কাচের বলের মতো কী নিয়ে একটার পর একটা বাগানের দিকে ছুঁড়ছেন। আর তারই ফলে মাটী কাঁপিয়ে ওই ভীষণ শব্দ হচ্ছে।

বিস্ফোরণের ফল হলো ভারী অদ্ভুত রকমের। ঝুপ-ঝুপ করে কঙ্কালগুলো পড়ে গেলো মাটীর ওপর—বোধ হয় ভূমিকম্পের মতো মাটি কেঁপে ওঠার ফলেই। তার পরই আশ্চর্য্য···কঙ্কালগুলো উঠে দৌড়ে পালালো! এবার আর তারা তাল গাছের মতো নয়, ঠিক মানুষের মতোই লম্বা। আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে প্রদীপ বললে: ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে? না? কিন্তু আশ্চর্য্যের কিছুই নেই বন্ধু। তুমি যদি বাগানে যাও, দেখতে পাবে কতকগুলো লম্বা বাঁশ পড়ে আছে ওখানে। ওরা রণপা চড়ে এসেছিলো। এই রকম রণপা চড়ে ডাকাতি পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কিছু কাল আগে পর্য্যন্ত হামেশাই হতো। দু'টো বাঁশের ওপর পা রেখে চলার কায়দা ও-অঞ্চলের ডাকাতরা ভালো করেই জানে সেই আদিযুগ থেকে। এতে সুবিধা অনেক। রাতারাতি কোথাও হানা দিয়ে মাইলের পর মাইল দূরে অনায়াসে সরে পড়া যায়।

—কিন্তু আমরা তো স্বচক্ষেই দেখলাম, যারা এসেছিলো তারা মানুষ নয়—কতকগুলো কঙ্কাল। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললাম আমি: কঙ্কাল কী রণপা চড়ে?

—চড়ে কি না নিজেই তো দেখলে! মৃদু হেসে বললো প্রদীপ।

—তোমার কথার ধরণে মনে হয়, তুমি ভূতের অস্তিত্বে এখনো বিশ্বাসী নও। বললাম আমি: তুমি কী নিজের চোখকেও বিশ্বাস কর না প্রদীপ?

—চোখও অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে মুখুজ্যে। উত্তর দিলো প্রদীপ: চোখে আমরা যা দেখি তার সবটাই কী ঠিক? তাহলে তো মানুষের রজ্জুতে সর্পভ্রম হতো না। যাক্, রাত আর খুব বেশী নেই। ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো। কাল আবার তোকে হাজারমারীর মাঠে একটু হানা দিতে হবে। আমরা ততক্ষণ বাগানে পড়ে ফেলে যাওয়া ভূতের বোঝা রণপাগুলোকে সরিয়ে রাখি—যাতে লোকের চোখে না পড়ে।

[ক্রমশঃ।

এক থেকে বহু

নন্দিতা মজুমদার

আমাদের উপনিষদে আছে, এক বললেন, বহু হব। বিজ্ঞানেও আছে এমনি কথা, একের বহু হবার কথা। এককোষী দেহী প্রাণী থেকে বহুকোষী দেহী প্রাণী সৃষ্টির আশ্চর্য এই ইতিহাস। ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে, এক ঘটনা থেকে পরবর্তী পরিবর্তনে বয়ে চলেছে সমস্ত সৃষ্টির ধারা। ধারাবাহিক এই পরিবর্তনের মাঝখানে মাঝে-মাঝেই এমন পরিবর্তন এসেছে এত আশ্চর্য ভাবে যে চমক লেগে যায়। বিরাট সেই পরিবর্তনকে আমরা মনে ভাবি আকস্মিক বলে, কিন্তু এত আকস্মিকতা নেই ইতিহাসে। সত্য কথা বলতে হলে বলতে হয়, ক্রমাগত প্রয়াসের পর অনেক অনেক চেষ্টায় যখন ফল দেখা দেয়, দীর্ঘ প্রয়াসলব্ধ সেই ফলকে মনে হয় আশ্চর্য বলে।

এমনি করেই এক দিন অকস্মাৎ দু'টি এককোষী প্রাণীর জোড় বেঁধে গেল কি শুভক্ষণে। শুভক্ষণে বললুম কেন না, এই জোড়বাঁধা দ্বিকোষী প্রাণীই পৃথিবীতে বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাবের প্রথম ইংগিত বয়ে নিয়ে এলো। এ খবর এত বড় খবর যে, সহজেই ঘটেছে বলে মনে মেনে নিতে পারি নে। মনে হয়, অকস্মাৎ চমক দিয়ে ঘটে গেল কি এক শুভক্ষণে। এক শুভ মুহূর্তে অকস্মাৎ এগিয়ে এসেছিল দূর আকাশচারী এক নক্ষত্র আমাদের একান্ত আপন নক্ষত্র সূর্যের কাছে, তারি ফলে দেখা দিল সূর্যের গ্রহ-উপগ্রহ, এই আমাদের পৃথিবী; আর এক শুভ মুহূর্তে অকস্মাৎ প্রথম প্রাণী দেখা দিল জলে, চঞ্চল করে তুলল জলরাশির তীররেখাকে; আবার আর এক শুভক্ষণে অকস্মাৎ কি করে জোড় বেঁধে গেল এই দু'টি এককোষী প্রাণীর। আলাদা করে খাবার সংগ্রহ করছিল এই দু'টি প্রাণী, চলছিল ফিরছিল, আলাদা আলাদা করে টুকরো করছিল নিজেকে, তারাই হঠাৎ রফা করে নিল নিজেদের দু'জনের মধ্যে। এই ঘটনাটি কি করে এত বড় হতে পারে, এমন কথা মনে হতে পারে তোমাদের। এ কাহিনী যদি না ঘটত, পৃথিবীর ইতিহাস হোত অন্যতর। বৈচিত্র্যহীন হোত পৃথিবী, আর সেই বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীতে পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে খেয়ে খেয়ে বংশ বাড়িয়ে চলত অসংখ্য অগণ্য এককোষী প্রাণী। পঞ্চাশ কোটি বছর ধরেই তার একটি মাত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ কোষটি দিয়েই সমস্ত কর্মসম্পাদন করত, অর্থাৎ খেত, বাড়ত, টুকরো করত নিজেকে। তাহলে দেখা দিত না বনভূমি গহন অরণ্য, ঋজুদেহ বনস্পতি, মালতী লতা যেত না লতিয়ে, ফুটন্ত চামেলি গন্ধে উদাস করে দিত না রাত্রির আকাশকে। মাছ খেলে বেড়াত না জলে, পাখীর কূজন যেত না শোনা, হিংস্র-শ্বাপদ-গর্জনে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত না অরণ্যভূমি। সব চেয়ে বড়ো কথা, মননশীল মেধাবী মানুষের দেখা কোনখানে মিলত না।

বিবর্তনের ইতিহাসে জীবনের মূল কথায় রয়েছে রাসায়নিক উপাদান। আমরা দেখেছি, কোষের মধ্যেকার জেলির মতো হড়হড়ে থলথলে অংশ প্রোটোপ্ল্যাজম অন্য কিছুই নয়, ফ্যাট, প্রোটিন, ষ্টার্চ ইত্যাদির রাসায়নিক সংমিশ্রণ। শেষ পর্যন্ত তাকেও বিশ্লেষ করলে দেখতে পাব তারা কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন

পরমাণুর সমষ্টি। জীবনের মূল কথায় রাসায়নিক উপাদান আছে বলেই শেষ কথাতেও সে কথাই নেই! রূপ-বৈচিত্র্যের জন্য, প্রকাশ-বৈচিত্র্যের জন্য অন্য কথাও আছে। প্রাণের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কি অস্থিরতাই না চলেছে পৃথিবীর, বারে বারে ভেঙেছে, গড়েছে, এক রূপ বদলে চলে এসেছে আর এক রূপে। প্রাণের দেখা মিলল, কিছু দিন ধরে সেই কাজই চলল পৃথিবীর। চুপ করে বসে শান্ত লক্ষ্মীটির মতো অনেক দিন ধরেই এককোষী প্রাণী সৃষ্টি করেছে পৃথিবী। এমনি করে গড়নের কৌশলটি আয়ত্ত হয়ে গেল। তার প্রোটীন, ফ্যাট্, ষ্টার্চ নিয়ে গঠনের কাজ করতে করতে নির্মাণ-কৌশলে যেই পাকাপাকি দখল হয়ে গেল, আবার দেখা দিল চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতাই এককোষী প্রাণীদের ভিতরে ভিতরে নাড়া দিয়ে তাদের নতুন করে তোলার দুঃসাধ্য আবেগ এনে দিল।

প্রথম প্রাণী সৃষ্টির পরেকার শান্ত যুগে আদি প্রাণী ছিল জলে বিচরণশীল। জৈবধর্মী সমস্ত প্রাণীকে অজৈব পদার্থ থেকে কি কি লক্ষণ দিয়ে বেছে নিতে পারা যায়, এ কথা তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনের মননশীল, সৃজনধর্মী মানুষের সংগে অজৈবের যে বিপুল ব্যবধান, বিপুল সেই ব্যবধান ছিল না প্রথম প্রাণীর সংগে। তা সত্ত্বেও সমস্ত অতীত আর সমস্ত বর্তমানের প্রাণীর মধ্যে সংগতি রয়েছে। তাদের ক্ষমতা রয়েছে বৃদ্ধির; সমস্ত প্রাণীই বৃদ্ধির জন্য আহার্য গ্রহণ করে, খাবার সংগ্রহের জন্য চলে ফেরে, সে চলা-ফেরা হতে পারে হয়তো বা দ্রুতগতি, হতে পারে ঈষৎ সঞ্চরণশীলতাও, মাটির ভিতর শিকড় চালিয়ে দেওয়া, হাওয়ায় ঢুলিয়ে দেওয়া শাখাও এই গতিশীলতা। আর এক কথা, বংশবৃদ্ধি। জীবন মাত্রেই বংশবৃদ্ধি করে, আদি প্রাণীর মতো নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করেই হোক্, উদ্ভিদের মতো বীজ রেখে, কিংবা অণ্ড বা পূর্ণ সন্তান রেখেই হোক্। পুষ্টি আর বৃদ্ধি, গতিশীলতা আর বিভাজন ছাড়াও অন্য কথা আছে। চিরকালের জন্যে পৃথিবীতে দখলী স্বত্ব সাব্যস্ত করতে পারে না কোনো জীবিত। বৃদ্ধির পথে সীমারেখা টানাই আছে, কিছু দূরের পরে চলতে চলতে শুনতে হয় তাকে,—বাস্ করো। এই 'বাস্ করা,' বাড়ার সংগে এই থামাটা আছে মিলিয়ে। একেই বলি মৃত্যু।

জীবিতের জীবনযাত্রায় মৃত্যুর কথা ভালো করে বুঝে নিলে বুঝতে পারব, অকস্মাৎ কি কারণে দু'টি এককোষী প্রাণীর মধ্যে জোড় বেঁধে গেল। আসল কথা, অকস্মাৎ নয়, অনিবার্য ভাবেই। আদি সহজতম প্রাণী, না পুরুষ, না নারী, বংশবৃদ্ধিকল্পে দ্বিখণ্ডিত করে দিত নিজেকে, সেই দ্বিখণ্ডিত দু'টি আবার দ্বিখণ্ডিত করে দিত নিজেদের, এমনি করে বেড়ে চলত খণ্ডের পরে খণ্ড, খণ্ডিতাংশ। উপনিবেশ গড়ে উঠত। তার পরে এক দিন ক্লান্তি নেমে আসত উপনিবেশের 'পরে, বিভাজন-ক্ষমতা থেমে যেত অকস্মাৎ। এক থেকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত হওয়া এককোষী প্রাণীর উপনিবেশে মৃত্যুর ঝড় বয়ে যেত। এই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কি উপায়ে? কি কাজ করলে এমন করে সমস্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে যাবে না?

আশ্চর্য ঘটনা ঘটল দু'টি এককোষী প্রাণীর মিলনে। রক্ষা করে বাঁচবার কাজটুকুকে ভাগ করে নিল তারা। এত দিন আলাদা ভাবে নিজেরা যে খুঁজে মরেছে খাবার, খেয়েছে, সঞ্চয় রেখেছে দেহে, বিভাজন করেছে পৃথক, এখন একটি সেল নিল খাবার সঞ্চয়ের ভার আর একটি সংগ্রহের। পূর্বতন জীবনযা... বিসর্জন দিয়ে বহুতর এককোষী প্রাণীর মধ্যে এরা দুঃসাধ্য ... করল, এগিয়ে গেল বহু দূর। এ কেমন জানো, যেন ... পরবার প্রয়োজন বলে একা এক-একটি মানুষ চাষ করছে; ... চরকায় কাটছে সুতো, তাঁতে কাপড় বুনছে, হঠাৎ ... হবে বলে কাজ ভাগ হয়ে গেল, সুতো তৈরির কাজ যার, কা... বুনবার কাজ তার নয়। এমনি করে বিশেষ এক-একটা কা... ভার নিয়ে কাজ করতে করতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে, নৈপুণ্য ... কর্মক্ষমতা বাড়ে। দ্বিকোষী প্রাণীই বহু এককোষী প্রাণীর ম... নতুন আশ্চর্য সম্ভাবনা নিয়ে এলো বলেই গেল এগিয়ে। দ্বিকো... তত্ত্ব আবিষ্কার হলে বহুকোষীও হ'তে লাগল। দু'টি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি করে এক-এককোষী প্রাণী মিলে মিশে কাজ ভা... করে কাজ করতে করতে একটি হয়ে উঠ্‌তে লাগল। আট-কো... দশ-কোষী, শত-সহস্র-কোষী প্রাণী দেখা দিতে লাগল। ইতিমধ্যে নাড়া দিয়ে সব চেয়ে বড়ো কথাটার কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে, ... জন্য এত প্রয়াস। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই সুরু ... দিয়েছে জীবন, নিজেদের ভাগ না করে দু'জনে মিলে সন্তান সৃষ্টি করে। এই সন্তান আদি বিভাজনের মতো নয়। ... প্রাণী থেকে টুকরো টুকরো হওয়া প্রাণীর উপনিবেশ ন... মৃত্যুর ঝড়ে অকস্মাৎ যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। এরা নতুন, মৃত্যুর পূর্বে এরাই আবার রেখে যেতে লাগল নবীনকে, এমনি ... এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের মধ্য দিয়ে জীবনকে ... যেতে লাগ্‌ল. দিনের পর দিন ধরে মালা গাঁথা হোল নবী... মৃত্যু পুরাতনকে যেই খসিয়ে দেয়, নবীন এসে বলে—আমি আ...।

মৃত্যুর সংগে বাজি রেখে লড়তে লড়তে, ভাগ করে ... মিলে মিশে কাজ করতে করতে বহুকোষী জীবের থেকে ... কোটি কোটি-কোষ-সমন্বিত প্রাণীর উদ্ভব হতে লাগল। ... উঠ্‌ল রক্ত, মাংস, চর্ম, অস্থি-মজ্জা, নানা দেহ-উপাদে... দিতে লাগল। চোখ দিয়ে দেখা হোলো, কান দিয়ে শো... দাঁত দিয়ে চিবোনো। সমস্ত ছোট-খাট কাজের জন্যেও ... আলাদা অংগ-প্রত্যংগ দেখা দিল। আর সমস্ত কোষগুলির ... যোগাযোগ সাধনের জন্য আবির্ভূত হোলো নার্ভ বা স্নায়ু... মস্তিষ্ক এলো সমস্ত পরিচালন-কর্মে;

জীবনের মূলে ছিল রাসায়নিক তত্ত্বের আয়োজন। রূপ... আর প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূলে শুধু সেইটুকুতেই কাজ চল্‌ল না। ... প্রয়োজন হোলো মিলে মিশে সমস্ত শ্রমকে ভাগ করে ... শ্রমবিভাগ আর সহযোগিতার সংঘাতেই নতুন নতুন রূ... হোলো।

আদিতম প্রাণী তার সহজতম কাজগুলি একাই ... বটে, সহযোগিতা করেনি। একা অধীশ্বর হয়েছিল বলেই ... একাকী ঘুরেছে ফিরেছে, একাকী করেছে বিভাজন। সংখ্যাবৃদ্ধিতেও শুভ ফল দেখা যায়নি। দ্বিকোষী জীব... বয়ে নিয়ে এল সহযোগিতাকে। শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, ... জীব-বিজ্ঞানের কথা। শুধু মাত্র 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'... 'সমষ্টিগত সমন্বয়ই' সব চেয়ে বড় কথা জীব-বিজ্ঞানের। ... নয়., কো-অপারেশন্; প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতাই

মর্মকথা। বহুকে পিছনে ফেলে একা এগিয়ে যাওয়া নয়, বহুকে মিলিয়ে নিয়েই সম্মুখে এগিয়ে চলা।

চাঁদ বনাম চাঁদা

অমর সরকার

"মামা, তোমার—" ভাগ্নী অমিতা বিজয়া দশমীর ছ'দিন বাদে এসে ঢোকে আমার বাইরের ঘরে। ওর মায়ের মা, আমারও মা; কাজেই আমি নিশ্চিত ভাবে ওর মামা।

তাই পূজনীয় গুরুজন হিসেবে ওর কাছ থেকে একটা পাওনা প্রণাম পাওয়া আর আমার দিক থেকে আশীর্বাদ করার আশায় খুশী হ'য়ে উঠি।

কিন্তু আমাকে একেবারে নিরাশ ক'রে ঘাড় উঁচু ক'রে ব'লতে থাকে অমি, "তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা হবে কবে শুনি?"

অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকি ওর রেগে-যাওয়া লাল মুখের দিকে; কেন্ন্ ভয়ও পাই লালমুখো সার্জেন্টগুলোর চেহারা মনে ক'রে। আমার 'মন' জ্ঞানের অভাব আছে স্বীকার করি; কিন্তু তা ব'লে [illegible] জ্ঞান?

"আমি যে কেপ্পণ তা জানি, কিন্তু তা ব'লে এত দূর 'ক্রটতা'?"

আমার দুর্ব্বলতায় ঘা মেরে, ইংরাজী-বাংলায় জগা-খিচুড়ী ভাষায় আমাকে 'ক্রুট' বলে ঘোষণা ক'রে আমারই ভাগ্নী!

"কি, নিজের দোষ খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি?" হুমকি শুনি, "আচ্ছা, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি।" কোমরে আঁচলখানা ভাল ক'রে জড়িয়ে নেয়।

'মারবে না কি?' ভয়ে সন্ত্রস্ত হই খানিকটা।

মারে না মেরে আমার ওপর কথার মার-প্যাঁচ চালায় অমি, "এই কাল যে বিজয়ার পর্ব্ব চলছিল সেটা জানতে না তুমি?"

ঘাড় নেড়ে জানাই, "জানতাম।"

"জানতে! তবে শেলী, মিলি, বেবী ওরা যে কাল এসেছিলো তোমার কাছে, সেটা দেখনি?"

আমার বান্ধবীদের যে দেখেছিলাম সেটাও জানাই ঘাড়ের মাধ্যমে।

"তবে?" এবার প্রায় মারমুখো হ'য়ে ওঠে অমি, দারোগারা যেমন মারমুখো হয় চোরের কাছ থেকে জোর ক'রে খবর আদায় করার পর; "তবে ওদের এক প্লেট ক'রে খাবার দাওনি কেন?"

এতক্ষণে কথা জোগায় আমার মুখে, "খাবার কি ওরা খেতে এসেছিল? ওরা খেতে এসেছিলো আমাকে! চাঁদা চায় চাঁদা;— [illegible] টাকা চাঁদা দিতে হবে ওদের ক্লাবের জন্য।"

"ওদের নয় আমাদের।" গম্ভীর মুখে আমার ভুলটা শুধরে দেয় অমি;

"তা ওদের বলো আর তোমাদের বলো, আমার তো নয়?" এবার বেপরোয়া হ'য়ে উঠি আমি, "চাঁদা ক'রে চাঁটি দিয়ে যাও [illegible], কিন্তু চাঁদা? কভি নেই দেগা!"

রাগের চোটে আমার মুখ থেকে খাঁটী রাষ্ট্রভাষা বের হ'য়ে [illegible] শুধু আমার কেন, রাগলে অনেকেরই বেরোয়।

"আচ্ছা মামা; এ সব ভাল কাজে তোমরা যদি 'ইন্‌স্প্রেরণা' না দাও, তবে ভাল কাজ হয় কি করে?" গলার তরল শব্দগুলো বরফের মতন ঠাণ্ডা ক'রে আমাকে শোনায় অমি।

ওর ঠাণ্ডায় আমার রাগের বাষ্প জল হ'য়ে যায়। তাই ধীরে ওকে বুঝিয়ে যাই, "দেখো, আকাশে চাঁদ উঠলে তোমরা যখন বলো 'আয়, আয় চাঁদা মামা', তখন সেটা শুনতে খুব ভাল লাগে স্বীকার করি। কিন্তু তা ব'লে তোমরা যখন ক্লাবের জন্য 'দাও, দাও চাঁদা, মামা' বলো, সেটা কি আমার শুনতে ভাল লাগবে?"

"যেতে দাও ও-সব কথা।" এক মুহূর্ত্তে অমিতার ভাব বদলে যায়; ঝট ক'রে প্রণাম সেরে ফেলে।

আমার আর আশীর্ব্বাদ করার ফাঁকও থাকে না। গলার মধ্যে আশীর্ব্বাদ সেরে বলি, "হ্যাঁ রে অমি, দিদি কেমন আছে?"

"ভালই।" আমার ঘরোয়া আলাপের জের খতম ক'রে বলে অমি, "আমি আজ এখানেই থাকবো।"

"থাকবি মানে? নিশ্চয় থাকবি।" নিজের ত্রুটি ঢাকবার জন্য আমি ঢাক পেটাতেও নারাজ নই, "আর তুই যেতে চাইলেই বা যেতে দিচ্ছে কে? চল, বাড়ীর ভেতরে চল।" মামা-ভাগ্নীতে বাড়ীর ভেতরে চলি।

সন্ধ্যা বেলায় বারান্দায় ইজি-চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখছিলাম আর দেখছিলাম সামনের টিপয়ের ওপর রাখা চায়ের শূন্য কাপটাকে।

তলানিটুকু নিঃশেষ ক'রে, আরেক কাপ পেলে কেমন হয় ভাবছি; এমন সময় অমি এসে দাঁড়ায় আমার পাশে।

"মামা", বলে অমি, "তুমি যদি এখনই চাঁদ সম্বন্ধে একখানা কবিতা লিখে দিতে পারো, তবেই বুঝবো তোমার কবিত্বশক্তি; আর এক কাপ চা-ও পেতে পারো তবে!"

আমার কবিত্ব-শক্তির নাস্তিককে অস্তিত্ব জানাবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠি আমি; বিশেষ ক'রে এ অবস্থায় এক কাপ চা-ও নেহাৎ কম নয়।

"দেরাজ থেকে আমার খাতা আর কলমটা আন্ দেখি।" চাবিটা ফেলে দিই ওর হাতে।

একটু বাদেই খাতা, কলম, চা এসে যায়; আর আসে আমার কবিতা :—

ওগো চাঁদ,
তুমি মিছেই পাতো ফাঁদ
সুরু হ'লে রাহুর দশা,
ক'সের কবে খাও গো শশা?
নাই বা যদি খেলে, তবে
শশধর সে নামটি হবে
মিছেই পিছে বসা।
'চাঁদা মামা, চাঁদা মামা';
চাঁদার শোকেই কাঁদে রামা;
অনেক কষ্টে পার পেয়েছি,
ভাগ্নী দেছে ক্ষমা।
বুঝলে চাঁদা মামা?
কাব্য ক'রে লিখলো এত
'রাম মনোহর মামা।'

"কই রে অমি, কোথায় গেলি?" লেখা শেষ করে ডাক দিই, "তোর কবিতা হোয়ে গেছে।"

"যাই মামা।" ঘরের ভেতর থেকে ওর উত্তর পাই।

বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। কবিতাখানা তুলে দিই ওর হাতে।

"চমৎকার হয়েছে।" পড়া শেষ করে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে অমি।

নিজের কবিত্ব-শক্তির গর্বে আমার বুক—দশ হাত না হোক—দু' ইঞ্চি যে ফুলে ওঠে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

"আচ্ছা মামা, এখন চলি।" লণ্ঠন হাতে হরিয়া এসে গেছে ততক্ষণে।

"আজ রাত্তিরটা থেকেই যা না?" নিজের প্রশংসা আরও খানিকটা শোনবার ইচ্ছে ছিলো।

"দেখছো হরিয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে মা।" বলতে থাকে অমি; চলতে চলতে বলে, "আবার আসছি কয়েক দিন পরে। আর দেখো, দুঃখু-টুঃখু ক'রো না।" চলে যায় ওরা। ওর সব কথাই বুঝলাম; কিন্তু ওই যে শেষ কথাটা 'দুঃখু-টুঃখু ক'রো না', তার অর্থটা একেবারেই বোধগম্য হ'লো না।

অর্থ বোধগম্য হ'লো পরদিন সকালে, যখন বাজার করার অর্থের জন্য দেরাজটা খুললাম।

দশ টাকার নোটের বাণ্ডিলখানা বেশ পাতলা হ'য়ে গেছে, আর তার পাশেই পড়ে আছে একখানা রসিদ;—'শ্রীযুত রামমনোহর মজুমদার...মহাশয়ের নিকট হইতে...১০০৲ (এক শত টাকা) ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল।

কুমারী অমিতা রায়,
সেক্রেটারী; 'কুমারী ক্লাব।'

উঃ! এই জন্য চাঁদের কবিতা লেখানোর জন্য চাবি হাতিয়ে ছিল আমার কাছ থেকে! গা জ্বালা ক'রতে সুরু করে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত।

অমিতাকে হাতের কাছে না পেয়ে কবিতাটাকেই ছিঁড়ে ফেলি টুকরো-টুকরো করে।

লিঙ্কনের গল্প

সুখেন্দু দত্ত

তোমাদের সবারই তো নিশ্চয়ই বন্ধুদের কাছ থেকে বা লাইব্রেরী থেকে বই ধার করে পড়ার নেশাটা আছে ষোল আনা। বন্ধুদের কারো কাছে কোন ভাল বইয়ের খোঁজটা একবার পেলে সেটা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাকে আর রেহাই দাও না। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, বইখানা ধার করে আনার জন্য তোমার যতটা আগ্রহ, বই ধার দিতে বইয়ের মালিকেরও ঠিক ততটাই অনিচ্ছা। এর কারণটাও অবশ্য খুব অন্যায় কিছু নয়। আজকাল প্রায় সবার মধ্যেই পরের বই এনে হারানো, অযত্নে বই নষ্ট করা, পড়ে ফেরৎ না দেওয়া বা ইচ্ছে ক'রেই ফেরৎ দিতে ভুলে যাওয়া—এই সব দোষগুলো দেখা যায় বড় বেশী রকম। আর শুধু তোমরাই নও, বড়দের মধ্যেও এই বদভ্যাসগুলো আছে খুবই। এর পরও কিন্তু বইয়ের মালিক বই ধার না দিলে তোমরা দুঃখিত হও, অথচ নিজেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথাটা বোধ হয় একবার চিন্তা করেও দেখ না।

এই বই ধার করে পড়ার ব্যাপার নিয়েই তোমাদের এক সত্যিকারের গল্প শোনাচ্ছি। মানব-দরদী, আব্রাহাম লিঙ্কনের ছোটবেলাকার ঘটনা এটা। মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যাদের অন্যের কাছ থেকে বই ধার করে পড়ার নেশা আছে, তাদের উদ্দেশে বিশেষ করে বলা হচ্ছে গল্পখানা।

গরীব চাষীর ঘরের ছেলে ছিলেন লিঙ্কন। ছোটবেলায় পাঠশালার পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সামান্য কিছু লেখা-পড়া শিখেছিলেন তিনি, এর বেশী কিছু পড়াবার ক্ষমতা আর ছিল না তার গরীব বাপের।

ছোট্ট লিঙ্কনের কিন্তু ছিল অদম্য জ্ঞান-পিপাসা। যার কাছ থেকে যে বই তিনি পেতেন, তাই পড়তেন মনযোগ দিয়ে। জীবনী পড়ার দিকে ছিল তার বিষম ঝোঁক।

একবার এক প্রতিবেশীর কাছে একখানা ওয়াশিংটনের জীবনীর খোঁজ পেলেন তিনি এবং অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে বইখানা যোগাড়ও করলেন! অপরের বইকেও নিজের বইয়ের মতই যত্নে রাখা ছিল লিঙ্কনের অভ্যাস, এই নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ সুনামও ছিল তাঁর! আর সেই জন্যই তাঁর পক্ষে বইখানা ধার পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বই নিয়ে মহা আনন্দে লিঙ্কন বাড়ী ফিরলেন, ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। সেই রাত্রেই তিনি বইখানা নিয়ে পড়তে বসে গেলেন এবং অনেকটা পড়েও ফেললেন। কয়েক দিন পর বইখানা পড়া যখন তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখনই ঘটল এক কাণ্ড।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই খুব ঝড়-বৃষ্টি হ'চ্ছিল। রাত্রি বেলা পড়ার পর বইখানা সযত্নে এক জায়গায় রেখে দিয়ে লিঙ্কন ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে অনেক রাত্রে বাতাসের গতি গেল বদলে। ফলে, বৃষ্টির জলের ঝাপ্‌টা লেগে বইখানা গেল একদম ভিজে।

সকালবেলা উঠেই বইয়ের অবস্থা দেখে লিঙ্কনের তো চক্ষুস্থির। সেটা তখন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, মলাটটারও দফা গয়া! তার পর পরের বইয়ের এই অবস্থা দেখে নিদারুণ দুঃখে লিঙ্কন তো [illegible] ফেললেন। বইখানা নিয়ে অনেক কায়দা করলেন লিঙ্কন। [illegible] দিলেন, আগুনে শুকিয়ে নিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেটা আর [illegible] মত হল না। এদিকে আর একটা নতুন বই যে কিনে এনে [illegible] সে-ক্ষমতাও ছিল না। মায়ের সংগে পরামর্শ করে শেষ পর্য্যন্ত বইয়ের দাম মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন এক অভিনব উপায়ে।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা ঝড়-বৃষ্টি থামলে লিঙ্কন বইখানা [illegible] হাজির হলেন তাঁর প্রতিবেশীর বাড়ী। বইয়ের হাল দে[illegible] তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। বেশ দু'-চারটা গরম গরম কথা [illegible] দিলেন তিনি লিঙ্কনকে। লিঙ্কন অবশ্য তার অনিচ্ছাকৃত [illegible] কথা বলে সবিনয়ে জানালেন যে, তিনি বইয়ের দাম মিটি[illegible] প্রস্তুত আছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ভদ্রলো[illegible] বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতে লাগলেন। "অসাবধানতা," বইয়ের জন্য কি দরদ" ইত্যাদি শুনতে শুনতে লিঙ্কনের ম[illegible] লাগল, এর চেয়ে ভদ্রলোক তাকে চাবুক মারছেন না কেন?

বইয়ের মালিক লিঙ্কনদের আর্থিক অবস্থার কথা জানতে[illegible] তার দাম মিটিয়ে দেওয়ার কথায় কানও দেননি প্রথমে। লিঙ্কন যখন বললেন যে, তিনি বইয়ের নগদ দাম দিতে পার[illegible] তাঁর বাড়ীতে মজুর খেটে বইয়ের দাম শোধ করবেন, তখন

লোকের মেজাজটা ঠাণ্ডা হল। তিনি দেখলেন, ব্যবস্থাটা তাঁর পক্ষে মন্দ নয়, বরং ভালই। ক্ষেতের ফসল কাটার জন্য সে-সময় সত্যিই তিনি এক জন লোক খুঁজছিলেন। তাঁর নিজেরও সময় ছিল না, এদিকে ফসল কাটার সময়ও যাচ্ছিল চলে। লিঙ্কনের প্রস্তাবে চট করেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। ঠিক হল যে, কাজ করে বইয়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে লিঙ্কন বইখানা কিনে নেবেন। বইখানা এখন মালিকের কাছেই থাক।

নিরুপায় লিঙ্কনকে বাগে পেয়ে প্রতিবেশীটি কিন্তু বেজায় খাটিয়ে নিলেন তাকে, সমস্ত জমির ফসলই তাকে দিয়ে কাটান হল। লিঙ্কন কিন্তু এতেও বিশেষ দুঃখিত হলেন না, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সব কাজই তিনি শেষ করলেন। একটা ব্যবস্থা যে করা গিয়েছিল বইটার জন্য, এতেই তিনি ছিলেন খুশী।

কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরার দিন লিঙ্কনের আনন্দ আর ধরে না। তাঁর হাতে রয়েছে তখন জর্জ ওয়াশিংটনের সেই জীবনীখানা। এবার কিন্তু বইয়ের মালিক আব্রাহাম লিঙ্কন নিজেই। বইয়ের মলাটটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, জলে ভেজার পর পাতাগুলোও ঠিক ছিল না, কিন্তু তবু তো নিজের বই।

বই হাতে সগর্বে লিঙ্কন বাড়ী ফিরলেন।

অধ্যবসায়

চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছি-ছি-ছি, সত্যি, কী লজ্জার কথা!

ইংরিজীতে ফার্ষ্ট হয় ছেলেটা, কিন্তু নিজের মাতৃভাষা বাংলাতেই একেবারে আনাড়ি! মাষ্টার মশাই ক্লাশে লিখতে দিলেন সেদিন বাংলা রচনা। 'গরু' সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে হবে।··· সেই ছেলেটিকেও লিখতে হবে।

ক্লাশ শুদ্ধ সবাই লিখছে। চুপচাপ,—শুধু খস্‌খস্ করে কলম চলছে সবার।···তার পর যাদের লেখা হয়ে গেল তারা একের পর এক খাতা দেখাতে লাগলো। সেই ছেলেটিও দেখালো,—সেই ইংরিজীতে ফার্ষ্ট বয়।

তার খাতা দেখতে গিয়ে মাষ্টার মশাই'র ভ্রূ গেল কুঁচকে। এ কী, এ সব কী লেখা? তখন সবাই ঝুঁকে পড়লো সেই খাতাটার ওপর সকৌতূহলে; আর তার পরেই একে একে বলতে সুরু করলো, 'ঃ, এ সব কী বানান লিখেছে!'

লজ্জায় মিয়মাণ ছেলেটির কানের গোড়া লাল টক্‌টকে হয়ে উঠলো, মুখ হয়ে উঠলো রাঙা, সহপাঠীদের ঠাট্টা-মিশ্রিত বাক্যবাণে মাথা গুঁজে বসে রইলো সে।

পরের দিনেও সে ক্লাশে ঢুক্‌তেই সবাই ঠাট্টা করতে শুরু করলো। এমনি ঠাট্টা ওর কাছে ক্রমেই হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। ছেলেটা ভাবলো, এর প্রতীকার করতেই হবে।···সত্যিই তো, বাঙালীর ছেলে হয়ে বাংলা জানে না, এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কী হতে পারে।··· 'যে ক'রে হোক্ চিনতেই হবে মাতৃভাষা'—এই রকম প্রতিজ্ঞা করে সেই দিন থেকে ছেলেটি বসলো বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার সে শুধু পড়লোই না, তার প্রতিভা-দীপ্ত মগজে ঢুকিয়ে নিলো সে সব। তার পর ছেলেটা বাংলা সাহিত্য নিয়ে নাড়া-চাড়া করে বেশ কিছুটা জ্ঞান লাভ করলো অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই।

বাৎসরিক পরীক্ষা এসে গ্যাছে; দেখতে দেখতে তাও শেষ হয়ে গেলো।···এলো প্রোমোশনের দিন।

···ক্লাশের সবাই ঠিক জানে, সেই ছেলেটা নিশ্চয়ই বাংলায় পাশ করতে পারবে না,—যা বিদ্যে বাংলায়।

কিন্তু—

সবাই অবাক হয়ে দেখলো, সেই বাংলায় মূর্খ ছেলেটিই হয়েছে বাংলায় প্রথম! আশ্চর্য!

কে এই মেধাবী ছেলেটি জানো? এমন যার অধ্যবসায়, এমন যার মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা,—সে আমাদেরই বাংলা মায়ের সন্তান বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

সকাল বেলার মিষ্টি রোদে—

প্রভাকর মাঝি

সকাল বেলার মিষ্টি রোদে ঝরছে কাঁচা সোনা,
জানলা দিয়ে ঝিলিকটুকু করছে আনাগোনা।
আদ্যি কালের থুপুরে ঐ বৃদ্ধ বটের শিরে,
একশো পাখী ঐক্যতানে জাগায় ধরণীরে।
নরম কচি দূর্বো-ঘাসে আলোর ঝিকিমিকি,
তোমার মনে আমার মনে স্বপন দিলো লিখি।
ফুরফুরিয়ে ভোরাই হাওয়া ইতস্ততঃ বুলে,
কাঁপন লাগায় খোকনমণির কোঁকড়া-কালো চুলে।

দোল দিয়ে যায় আচম্বিতে কলকে ফুলের গাছে,
সেই দোলনের ছোঁয়াচ পেয়ে শালিখ-শিশু নাচে।
ঝুমকো লতার আগুন জুড়ে কিসের শিহরণ,
বুনো ছেলের বাঁশীর সুরে চমকে উঠে বন।
গাঁয়ের শেষে ঝিরঝিরে সেই ছোট্ট নদীর জল,
অরুণ-রাগে উজল হয়ে বইছে ছলোচ্ছল।
সকাল বেলায় মিষ্টি রোদের পরশখানি লেগে,
মনের কোণে সুপ্ত শিশু উঠলো আমার জেগে।

ইচ্ছে করে একঘেয়ে সব কাজ-কর্ম্ম ফেলে,
মেঘের মতো যাই উড়ে যাই পাখনা দু'টি মেলে।
বকুল-ঝরা পথের মাঝে ভাবনা যাবো রাখি,
আবির-গুঁড়া রোদটুকু নিই অঙ্গে আমার মাখি।

বৌদ্ধ ভারত সন্ধানে

ফা-হিয়ান

পূর্বে পাঁচ যোজন গিয়ে যাত্রীরা পৌঁছলেন বৈশালী নগরীতে। রাজধানীর উত্তরে এক বৃহৎ অরণ্য। এখানে দ্বিমহল এক মন্দিরে ভগবান বাস করেছিলেন। আনন্দের দেহাবশেষের অর্দ্ধের উপর নির্মিত এক স্তূপ আছে এখানে। ভগবানের উদ্দেশ্যে রচিত আম্রপালিকার চৈত্য। নগরীর দক্ষিণে রাজপথের পশ্চিম প্রান্তে যে উদ্যান-ভবন নিবেদন করেছিল সে তা আজও দেখা যায়। মহাপরিনির্বাণের আসন্ন কালে ভগবান যখন সশিষ্য নগরীর পশ্চিম দ্বারপথে নিক্রান্ত হচ্ছিলেন, দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বলেছিলেন—'এই নগরীতেই আমার শেষ পদার্পণ'। পরবর্তী কালে সেখানেও মন্দির রচিত হয়েছে।

তিন লী উত্তর-পশ্চিমে একটি চৈত্য আছে, সেটি অস্ত্রবর্জন নামে পরিচিত। উত্তর গাঙ্গেয় দেশে এক রাজার উপপত্নী এক অপরিণত ভ্রূণ প্রসব করে। অশুভ লক্ষণ ঘোষণা করে রাজমহিষী ঈর্ষ্যাপরবশে সেই ভ্রূণ দারুপেটিকায় বন্ধ করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। অনেক দক্ষিণে আর এক নৃপতি গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে সেই ভাসমান পেটিকা উদ্ধার করেন এবং উন্মোচন করে দেখেন যে তন্মধ্যে এক সহস্র সুঠাম সুদর্শন শিশু। নৃপতি তাদের গ্রহণ করে আপন পুত্রের মত পালন করেন। সহস্র পুত্র যখন তারুণ্য প্রাপ্ত হোল, তাদের বীর্যবত্তায় সম্রাটের শত্রু সকল বিপর্যস্ত হয়ে শরণপ্রার্থী হোতে লাগল। কিছু কাল পরে সেই সহস্র বীর যুবক তাদের প্রকৃত পিতার রাজ্য আক্রমণ করল যখন, তখন তিনি চিন্তায় বিমর্ষ হলেন। উপপত্নীর জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন তিনি—ঐ দেশের নৃপতির অতুলনীয় সহস্র বীর যোদ্ধা পুত্র যখন এ রাজ্য আক্রমণ করেছে তখন বিমর্ষতার অপরাধ কি?' উপপত্নী বললেন—'দুঃখ করবেন না প্রভু। নগরীর পূর্ব দ্বারে এক সুউচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করুন। শত্রু যখন নগরীর উপান্তে এসে পড়বে, আমাকে সেই মঞ্চোপরি প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। আমি শত্রু-সৈন্যকে প্রতিহত করব।' সত্য সত্যই শত্রু যখন সমীপবর্তী হোল, নারী সেই মঞ্চে দণ্ডায়মানা হয়ে প্রশ্ন করল—'আমার আপন সন্তান তোমরা, কেন মাতৃ-বিদ্রোহে ব্রতী হয়েছ?' প্রশ্ন হোল—'জননী বলে দাবী করছ কে তুমি নারী?' নারী বললেন—'বিশ্বাস যদি না হয়, তবে ওষ্ঠ উন্মুক্ত করে তোমরা আমার দিকে চাও।' সহস্র যোদ্ধা সেইরূপ করলে, নারী আপন দুই স্তন থেকে সহস্র ধারায় সুধা বর্ষণ করলেন তাদের মুখে। বিশ্বাসে নত হয়ে যোদ্ধৃগণ অস্ত্রত্যাগ করল। এই লোকোত্তর ঘটনায় অভিভূত হ'য়ে দুই নৃপতি তপশ্চর্য্যার দ্বারা অর্হত্ব লাভ করলেন। তাঁদের নামযুক্ত স্তূপ আজও বিদ্যমান। লোকজ্যেষ্ঠ প্রভু গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে শিষ্যবর্গকে সেই স্থান নির্দ্দেশ করে বলেছিলেন—'আমারও প্রাক্কালে এখন অস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়েছিল বীরগণ।' তথাগতের মুখেই জনগণ সেই পবিত্র কাহিনী জ্ঞাত হয়! সেই সহস্র বীর যুবক প্রাক্তন যুগের সহস্র বুদ্ধ। সেই স্তূপের পার্শ্বে দাঁড়িয়েই আমার নির্বাণ ঘটবে।' আর তখন শিষ্যের এমন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছিল, প্রভুকে মর্ত্যভূমে অবস্থান করার প্রার্থনা জানায়নি আনন্দ।

পূর্বে তিন চার-লী দূরে আর একটি স্তূপ আছে। পরিনির্বাণের শত বর্ষ পরে বৈশালীর কয়েক জন ভিক্ষু দশটি বিষয়ে বিচ্যুত হলে এই আবেদন করেন যে, তাদের আচরণ ভগবানের বাণীর ব্যতিক্রম নয়। সাত শত বিহারের অর্হৎমণ্ডলী যে স্থানে মিলিত হয়ে বিনয় ও অভিধর্মের সূত্রগুলি পুংখানুপুংখরূপে অনুধাবন করেন সেখানে এই স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল!

চার যোজন পূর্বে পঞ্চ নদীর সঙ্গম। আনন্দ যখন মগধ [illegible] বৈশালীর পথে যাত্রা করেন নির্বাণের আকাঙ্খা নিয়ে, দেবগণের নির্দেশে নৃপতি অজাতশত্রু রাজরথে সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন। বৈশালীর শ্রেষ্ঠিগণও আনন্দ সন্দর্শনে এসে নদীর অপর তীরে সমবেত হন। নদীগর্ভের মধ্যপথে দাঁড়িয়ে আনন্দ চিন্তা করলেন, যদি অগ্রসর হই, রাজা অজাতশত্রু আমার প্রতি অপ্রেমী হবেন। যদি প্রত্যাবৃত্ত হই বৈশালীর নাগরিকগণ মর্মাহত হবেন। চিন্তা করে সেই নদী মধ্যে তিনি সমাধিমগ্ন হলেন এবং নির্বাণ লাভ করলেন। বৈশালীর নৃপতি এবং রাজা অজাতশত্রু শিষ্য আনন্দের মরদেহের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করলেন প্রত্যেকে এবং আপন আপন দেশে স্তূপ নির্মাণ করলেন।

নদী অতিক্রম করে দক্ষিণে এক যোজন দূরে মগধ দেশে পাটলি-পুত্র নগরী, সেখানে সম্রাট অশোক প্রজাপালন করতেন। সেই প্রাসাদের অপূর্ব অপার্থিব কারুকার্য্যখচিত শিলা গঠিত প্রাচীর তোরণ সকলই যক্ষগণ কর্তৃক উৎকীর্ণ ও স্থাপিত। সম্রাটের কনিষ্ঠ ভাই অর্হত্ব লাভ করে গৃধ্রকূট পর্বতে নির্জন তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। সম্রাট তাঁকে রাজপ্রাসাদে বাস করে ধর্ম্মের পালনের অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সম্রাট তাকে মিনতি করেন—'যদি তুমি প্রত্যাগমনে সম্মত হও, আমি নগরীর অভ্যন্তরে তোমার জন্য পর্বত-গৃহ নির্মাণ [illegible] সম্রাট যক্ষগণকে এক ভোজে আমন্ত্রণ করে জানান যেন প্রত্যেকে আপন আসন আনেন। পরদিন যক্ষগণ প্রত্যেকে শিলাখণ্ড সহ উপস্থিত হন। ভোজ অন্তে সম্রাট তাদের দিয়ে একটি গিরি [illegible] সেই গিরির পাদদেশে ত্রিশ ফুট দীর্ঘ, বিশ ফুট প্রস্থ এবং [illegible] ফুট উচ্চ এক প্রস্তর-কক্ষ নির্মাণ করান।

সেই নগরীতে রৈবত নামে সর্ববিদ্যা-পারঙ্গম এক [illegible] কুলজাত জ্ঞানী বাস করতেন। নিভৃত পবিত্র ছিল তাঁর [illegible] দেশের নরপতি কখনো তাঁর সম্মুখে আসন গ্রহণ করতে [illegible] গভীর শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে নৃপতি যদি কদাচ তার পাণিগ্রহণ [illegible] বিদায় জানাবার পর ব্রাহ্মণ হস্ত প্রক্ষালন করে শুচি [illegible] পঞ্চাশোর্ধ এই জ্ঞানী সকলের শ্রদ্ধার্হ মানুষ ছিলেন [illegible] স্বয়ং তথাগতের বাণী প্রচারিত করতেন বলে বিধর্মী [illegible] বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের উপর নিগ্রহনে সাহসী হতেন না।

অশোক-স্তূপের পার্শ্ববর্তী মহাযান ও হীনযান [illegible] বিহারে প্রায় ছয়-সাত শত ভিক্ষু শ্রমণ বাস করেন। এই [illegible] দু'টি যথাযোগ্য স্থানে অপূর্ব মহিমায় দণ্ডায়মান আছে। [illegible] দিগ্‌দেশ হতে শ্রমণ ও ছাত্রগণ এই বিহার দু'টিতে জ্ঞানার্জনের [illegible]

মহাযান বিহারে মঞ্জুশ্রী নামে এক মহাস্থবির বাস করেন—জনগণ ও ভিক্ষুগণ যাঁকে পরম শ্রদ্ধা করেন।

মধ্যভারতের সর্বাপেক্ষা ঋদ্ধিশালিনী এই দেশে জনগণও পদপ্রাণ। করুণা ও প্রেম বিতরণ করে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে। চান্দ্রমাসের অষ্টম দিবসে প্রতি বৎসর হয় বিগ্রহ-শোভাযাত্রা। নির্মিত পঞ্চতলবিশিষ্ট চারি-চক্র যানটি মন্দিরের অনুকৃতি। নানা বর্ণ-রঞ্জিত কাশ্মীরী শ্বেত চাঁদোয়ায় আচ্ছাদিত যানে সিংহের আকার শোভা মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকারে মণ্ডিত দেবমূর্তিগুলি আসীন থাকে। চতুষ্কোণে প্রতিষ্ঠিত থাকে বোধিসত্ত্ব সঙ্গে আসীন বুদ্ধ। এরূপ যানের সংখ্যা হয় কুড়িটি অবধি। গৃহী-সন্ন্যাসী নির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে যোগদান করেন, সঙ্গীত আলাপন দ্বারা দেবগণের পূজারতি করেন। ব্রাহ্মণগণ স্বাগত করেন বৌদ্ধগণকে। দুই অহোরাত্রি ধরে চলে এই উৎসব। দীপ জ্বলে, সঙ্গীত চলে, ধূপ-সুবাসাদি সহ পূজারতির বিরাম থাকে না। সারা জাতি এ উৎসবে যোগদান করে।

পাটলিপুত্র নগরীতে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। দীন অনাথ আতুর অথব সেই সকল প্রতিষ্ঠানে ভেষজ্ঞগণ দ্বারা পরিচর্যা পথ্য ও ঔষধ গ্রহণ করে। নিরাময় হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

সপ্ত মন্দির ধূলিসাৎ করে মহারাজ অশোক যে বিরাট চৈত্য নির্মাণ করেন, সেটি এখান হতে দক্ষিণে তিন লী। ভগবানের পদচিহ্নের উপর উত্তরমুখী একটি মন্দির আছে এরই সম্মুখ ভাগে।

এই বিহারের দক্ষিণে চতুর্দশ ফুট প্রশস্ত শিলাস্তম্ভের গাত্রে এই লিপি উৎকীর্ণ আছে। পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের বৌদ্ধভক্তগণের চরণে নিবেদন করে সম্রাট অশোক এই চৈত্য-বিহার ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করেন। জীবনে তিন বার তিনি এরূপ করেছিলেন।

এখান হতে উত্তরে চার শত পদ দূরে নিলি নগরী অশোক প্রতিষ্ঠিত। নগরীর কেন্দ্রে ত্রিশ ফুট উচ্চ এক সিংহশীর্ষ শিলা-স্তম্ভ। তাতে প্রতিষ্ঠার বর্ষ, মাস ও দিন লিখিত আছে।

পূর্ব দিকে নয় যোজন দূরে পর্বতশীর্ষে দক্ষিণমুখী প্রস্তর কক্ষে ইন্দ্রের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে বুদ্ধ দেবভোগ্য গীতবাদ্য শুনেছিলেন। স্বর্গাধিপতির উত্থাপিত যে বিয়াল্লিশটি প্রশ্নের উত্তর ভগবান প্রস্তর-গাত্রে অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত করেছিলেন, সে লিপি আজও বর্তমান। দক্ষিণ-পশ্চিমে এক যোজন দূরে নালন্দা। সারিপুত্র এখানেই জন্মলাভ করেন ও নির্বাণ প্রাপ্ত হন। নালন্দার স্তূপ আজও বর্তমান।

এক যোজন পশ্চিমে দুই বিহার-লাঞ্ছিত মহারাজ অজাতশত্রুর নবনগর রাজগৃহ। ভগবানের দেহশেষের উপর নির্মিত স্তূপ আছে এখানে। নগরের দক্ষিণে চার লী দূরে পঞ্চগিরিবেষ্টিত উপত্যকা মহারাজ বিম্বিসারের প্রাচীন রাজধানী। অনেক স্থান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যেখানে প্রভু বুদ্ধের প্রথম পঞ্চ শিষ্যের অন্যতম অশ্বজিতের সঙ্গে দর্শন ঘটে সারিপুত্র ও মোগ্‌গলানের। সন্ন্যাসী শ্রীগুপ্ত অগ্নিগহ্বর রচনা করে বিষমিশ্রিত খাদ্য দান ক'রে যেখানে ভগবানকে বিপর্যস্ত করবার চেষ্টা করেছিল। ভগবানকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে, শত্রু যেখানে আসবপানে মত্ত হস্তীকে প্রেরণ করেন।

বিম্বিসার ও আম্রদারিকার পুত্র যেখানে জননীর নিবেদিত কানন, ভূমিতে মন্দির নির্মাণ ক'রে ভগবান ও তাঁর দ্বাদশ শত পঞ্চাশ জন শিষ্যকে পূজার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। সে নগরী এখন জনবিরল ও পরিত্যক্ত।

উপত্যকা প্রদেশে প্রবেশ করে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পর্বতকে বেষ্টন দিয়ে পনেরো লী অধিরোহণ করে যাত্রী দল পৌঁছলেন গৃধ্রকূট-পর্বতে। শীর্ষদেশে তিন লী দূরে একটি গুহাকন্দরে ভগবান ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এরই ত্রিশ পাদ ঈশানে আর একটি গুহায় আনন্দও ধ্যানস্থ ছিলেন যখন মার গৃধ্ররূপ ধারণ করে আতঙ্কিত করতে চেয়েছিল আনন্দকে। ভগবান ঋদ্ধিবলে গিরি বিদীর্ণ করে প্রসারিত করে আনন্দের স্কন্ধ স্পর্শ করেছিলেন ভয়-বিদূরণের জন্য। সেই পক্ষীর পলায়ন-পথ এবং গিরি-গহ্বর অদ্যাপি বিদ্যমান। গৃধ্রকূট পর্বতের নামের সঙ্গে এই ঘটনা জড়িত।

এই গুহা সম্মুখে চারি বুদ্ধ বসেছিলেন। কয়েক শত অর্হৎ যেখানে ধ্যানাসীন ছিলেন, সে সকল গুহাও দর্শনীয়। যেখানে ভগবান পূর্ব-পশ্চিমে পাদচারণ কালে পর্বত-ফাটল হতে নিক্ষিপ্ত দুরাত্মা দেবদত্তের প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে আঘাত পেয়েছিলেন, সে গিরিগহ্বরও দেখা যায়। যে ভবনকক্ষে বুদ্ধ ধর্মবাণী প্রচার করেছিলেন, তার ভিত্তি-প্রাচীরগুলি ভিন্ন আর সবই ভূমিসাৎ হয়েছে।

পঞ্চ পর্বতমালার উত্তুঙ্গ এই পর্বতটি মনোরম। নবনগরে ধূপ দীপ ও কুসুমাদি ক্রয় করে ফা হিয়ান এই পর্বতে আরোহণ করে অর্ঘ্য নিবেদন করেন ও নিশি ভোর অবধি দীপ জ্বালিয়ে রাখেন। অধীর অশ্রুবেগ সংবরণ করে ফা হিয়ান আপন মনেই চিন্তা করেছিলেন,—এখানে ভগবান বাস করেছিলেন। শীর সূরঙ্গম সূত্র এখানেই তিনি প্রচারিত করেন। কত কাল পরে এ পবিত্র ভূমিতে এসে আমি কেবল তা দর্শন করেই কৃতার্থ হতে পারলাম।

প্রাচীন নগরীর উত্তরে তিন শত পাদ দূরে রাজবর্ত্মের পশ্চিম পাড়ে কানন-ঘেরা মন্দিরে উপনীত হন যাত্রীরা। এরই কিছু দূরে মশান।

দক্ষিণান্ত পর্বতের তিন শত পাদ পশ্চিমে পিপুল গুহায় আহারান্তে ভগবান ধ্যানমগ্ন হতেন।

অল্প দূরেই শতপর্ণ প্রস্তর-কক্ষে বুদ্ধের নির্বাণান্তে পাঁচ শ' অর্হৎ মিলিত হয়ে সূত্র গ্রথিত করেন। সূত্রগুলি রচনার পর তিনটি মনোহর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণেরটি মোগ্‌গলানের জন্য, বামে সারিপুত্রের জন্য। পঞ্চ শত অর্হতের মধ্যে এক জন ছিলেন অনুপস্থিত, কিন্তু কশ্যপ উপস্থিত হয়ে যখন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন, তখন দেখা গেল, আনন্দ দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করছেন, প্রবেশ করতে পারছেন না। সেই স্থানে নির্মিত স্তূপ এখনো বর্তমান।

চারি যোজন পশ্চিমে গয়া। প্রাচীরের অভ্যন্তরে নগরীটি পরিত্যক্ত। দক্ষিণে বিশ লী দূরে সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে ছ'বৎসর ভগবান দুষ্কর সাধনায় ব্রতী ছিলেন। সেটি গভীর জঙ্গলাকীর্ণ।

তিন লী পশ্চিমে সেই জলাশয়, যেখানে অবগাহনের জন্য নেমেছিলেন বুদ্ধ এবং এক জন দেব বৃক্ষশাখা নত করে দিয়েছিলেন, যার সাহায্যে বুদ্ধ জল হতে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেন।

এরই দু' লী উত্তরে সেই স্থান, যেখানে বুদ্ধকে এক নারী দুগ্ধ পায়সান্ন নিবেদন করেছিল। পূর্বমুখী উপবেশন ক'রে যে বৃক্ষতলে বুদ্ধ তা পান করেছিলেন, সেই প্রস্তর ও বৃক্ষ দেখা যায়। প্রস্তরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছ' ফুট এবং উচ্চতায় চু'ফুটের উর্দ্ধে। মধ্য-ভারতের আবহাওয়া এমন স্নিগ্ধ-মধুর যে, এখানে বৃক্ষাদি দশ সহস্র বৎসও অবধি জীবিত থাকে।

উত্তর-পূর্বে অর্দ্ধ যোজন দূরে সেই গুহা, যেখানে পদ্মাসনে বসে বোধিসত্ত্ব পশ্চিমমুখী হয়ে ভেবেছিলেন—'যদি আমি বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারি, তবে এখনই তার কোন ঐশী লক্ষণ দেখতে পাব।' তৎক্ষণাৎ গিরিগাত্রে বুদ্ধের ছায়ামূর্তি ফুটে ওঠে। তিন ফুট উচ্চ সে ছায়ামূর্তি এখনো দেখা যায়। সেই সময় আকাশ-মর্ত্য কম্পিত হয়, স্বর্গের দেবগণ ঘোষিত করেন, 'বুদ্ধত্ব লাভের এই ভূমি নয়। অর্দ্ধ যোজন দক্ষিণ-পশ্চিম দূরে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে অতীতে বোধি লাভ করেছে নরগণ, ভবিষ্যতেও করবে।' এ দৈববাণীর শেষে দেবগণ গীতযোগে বোধিসত্ত্বকে সেই পূত বোধিদ্রুমতলে নিয়ন্ত্রিত করেন। বৃক্ষতলের ত্রিশ পাদ দূরে এক দেবতা তাঁকে কুশ অর্পণ করেন। পনের পদ অগ্রসর হওয়ার পর পাচ শত হরিৎ বর্ণের পাখী তাঁকে তিন বার প্রদক্ষিণ করে। বোধিদ্রুমতলে উপনীত হয়ে বোধিসত্ত্ব ভূমিতে কুশ স্থাপন ক'রে পূর্বমুখে আসন নিলেন। তখন দানবরাজ মার তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য তিনটি সুন্দরী কন্যাকে পাঠায়। তারা এলো উত্তর থেকে আর স্বয়ং মার এলো দক্ষিণ থেকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে পেষণ করতেই সেই নারকীয় বিপুরা বিপর্যস্ত হয়ে পলায়ন করল এবং কন্যা তিন জন বৃদ্ধা রমণীতে রূপান্তরিত হলো।

এ সকল স্থানেই স্তূপ রচিত হয়েছে পরবর্তী যুগে। পৃথিবীর বন্ধন মুক্ত হয়ে যেখানে ভগবান বোধিদ্রুমকে ধ্যান করেছিলেন; বোধিদ্রুমতলে যেখানে পূর্ব-পশ্চিমে পাদচারণা করেছিলেন সাত সপ্ত দিবস। সপ্ত মণিঘটিত কক্ষ নির্মাণ ক'রে দেবগণ যেখানে বুদ্ধকে পূজারতি করেছিলেন সপ্ত অহোরাত্র। সপ্ত দিবস যেখানে দেহকুণ্ডলীর মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিল যেখানে দৃষ্টিহীন যক্ষ। চতুষ্কোণ শিলার উপর পূর্বমুখী আসীন বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়ে দেবগণ যেখানে তাঁর নিকট ধর্মবাণী শুনতে চেয়েছিলেন। স্বর্গের চারি জন দেবরাজ যেখানে তাঁদের ভিক্ষাপাত্র নিবেদন করেন বুদ্ধকে। সিদ্ধান্ন ও মধু দান করেছিল যেখানে পঞ্চ শত শ্রেষ্ঠী। যেখানে তিনি কশ্যপ ও শিষ্যবর্গকে এক সহস্র মুক্ত আত্মায় পরিণত করেছিলেন।

যেখানে তথাগত বোধিত্ব লাভ করেন, সেখানে তিনটি সংঘারাম বর্তমান। প্রত্যেকটিতেই এক-এক জন স্থবির আছেন। স্থানীয় গৃহীরা নিত্য তাঁদের অন্ন দেন পর্যাপ্ত পরিমাণে। ভগবান বুদ্ধ যতদিন মর্ত্যলোকে ছিলেন, এই সকল শ্রমণ ও ভিক্ষুরা আসন, উপবেশন ও উত্থানে যে সকল নিয়ম নিরন্তর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন, অদ্যাবধি তা শিথিল হয়নি।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শ্রীজয়ন্তকুমার সেনগুপ্ত

মুহূর্ত

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও মেয়ের কাছে
কোনও ফুলের কাছে
হৃদয় কি কোন দিন খুলে ধরেছিলে ?
আকাশ উজাড়-করা নক্ষত্র-মেলায়
সে সব মুহূর্তগুলি জিজ্ঞাসু দু'চোখ নিয়ে ফিরে ফিরে আসে।
সলজ্জ হাসির আলো আরক্তিম কপোলে পড়েছে
অসহ্য খুসির স্রোতে ঝলমল করেছে কি প্রাণ ?
হাতখানি হাতে রেখে অনেক কথার বেলা
কথা আসে নাই···
তন্দ্রাতুর চোখে কেঁপে স্বপ্নাকুল আচ্ছন্ন কামনা
অধরে অস্ফুট হয়ে আর এক অধরে মিশে গেছে ?

তারা তো মুহূর্ত নয়,
হীরা মণি মুক্তা তারা পান্না জহরৎ,
অনুভূতি-বিজড়িত সে সব মুহূর্তগুলি
সযত্নে লালন করো মমতায় প্রেমে, শাবকের ন্যায়,
কৃপণের সম্পদের মত
তারা থাকে কবরিত দিবসের রুচ সূর্যালোকে।
এই হাহাকারময় হাওয়া
এই ঝোড়ো মেঘ, ছিন্নমূল সহস্র সংসারপুঞ্জ,
কান্নার আড়ালে ঢাকা বালকের শবের পশ্চাতে,
নিত্তহীন রুচ জ্বালা মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত মাটিতে,
সে সব মুহূর্তগুলি সমাধিস্থ থাকে ;

স্বেদাক্ত ললাটে আর ফাল্গুনের শুভাশীষ নেই।
মুহূর্তেরা মাঝে মাঝে ফিরে আসে তবু
রূপময় পাখীর মতন,
আকাশ উজাড়-করা নক্ষত্র-মেলায়
নিশির ডাকের মত তবু তারা ডাক দিয়ে যায়

মালয়

ললিত হাজরা

"প্রায় ১২০ বৎসর বৃটিশ শাসনের পরে এশিয়ার জনসাধারণ বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে এত উদাসীন যে বৃটিশ শাসন আরও কিছু দিন বজায় থাকুক—এ মতে সায় দিতে তারা ... মতেই রাজী নয়। এবং এ কথা যদি সত্য হয় যে, বৃটিশ শাসন ... জনসাধারণের মনের মধ্যে শিকড় গাড়তে সক্ষম হয় নাই— ... কথাও অনস্বীকার্য যে, যে-কয়েক হাজার বৃটন মালয় থেকে ... জীবিকা অর্জন করেন তাঁরা মালয়কে স্বদেশ বলে গ্রহণ করতে ... নাই ও মালয়ের অধিবাসীদের সাথে নিজেদের পুরা মাত্রায় ... ক'রে নেয়েছেন।"—(The Time—Feb 18, 1942)

আজও কি এই অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছে? ১৯৫০ সালের ... বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিছু শিক্ষা লাভ করেছে? অতলান্তিক ... বলা হয়েছিল—"এই সনদে যাঁরা সহি করছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ... লোকের স্বাধীন ভাবে গভর্ণমেণ্ট গঠন করা আর ... গভর্ণমেণ্টের কাঠামো যাই হোক না কেন—সে অধিকার মেনে ...।" পরে সম্মিলিত জাতিসংঘের নীতি হিসাবে এই ঘোষণা ... । যাই হোক, তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ... অতলান্তিক সনদের এই ঘোষণার অপব্যাখ্যা ক'রে ঘোষণা ...: "নাৎসী আক্রমণে বিধ্বস্ত ইওরোপের ব্যাপারে এই ঘোষণা প্রযুক্ত হবে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য ... সম্পর্কে এ ঘোষণা প্রযোজ্য নয়। ১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী ... প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চার্চিলের অপব্যাখ্যার প্রতিবাদ ক'রে ...: "শুধু অতলান্তিকের উপকূলের দেশ সমূহের জন্যে নয়— ... সম্পর্কেই এই ঘোষণা প্রযোজ্য।" প্রেসিডেণ্ট ...—চার্চিল স্বদেশবাসী কর্তৃক গভর্ণমেণ্ট হইতে ... । কিন্তু তাঁদের উত্তরাধিকারীরা আজ চার্চিলের ঘোষণাই ... লেগেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ... কথাই ধরা যাক। এখানে অতলান্তিক সনদের ... কি প্রযুক্ত হ'য়েছে?—না বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ... কি?

... যুদ্ধের সময়েই অন্যান্য উপনিবেশের মত বৃটিশের এই ... আভ্যন্তরীণ অবস্থা তীব্র আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় ... পরে উপনিবেশ সমূহের সমাজ-ব্যবস্থায় যে তীব্র সংকট ... তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে উপনিবেশ সমূহের জন- ... মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতায়। উপনিবেশ সমূহের জনগণের ... সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদীর প্রাণকেন্দ্র পশ্চাৎ দিক হতে ... উঠেছে। উপনিবেশের মুক্তিকামী জনগণ সাম্রাজ্য- ... শাসনে আর অবরুদ্ধ থাকতে চায় না আর সাম্রাজ্যবাদের ... তার অচল কায়দায় আর শাসন চালাতে পারছে না। ... মুক্তি-সংগ্রাম কঠোর হস্তে দমন করার জন্যে সাম্রাজ্য- ... তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করেছে, কিন্তু ... মুক্তিকামী জঙ্গী জনগণের দুর্বার প্রতিরোধের ... দিনের পর দিন পরাজিত হচ্ছে।—(A. A. Zhdanov—International Situationp", 11)। এই অভিযোগ যে ... সত্য তার প্রমাণ আমরা পাই মালয়ে, ফিলিপাইনে, দক্ষিণ ...। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বদেশে যতই সংকট ঘনিয়ে উঠছে ... এরা মরীয়া হয়ে উঠছে।

এই সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন যুদ্ধের শেষে এক নয়া কূটনীতির আশ্রয় নিল। তার উপনিবেশ সমূহে যে জাতীয় আন্দোলন চলে আসছিল তার উপর-তলার বুর্জোয়া নেতাদের সাথে একটা আপোষ-রফা করে তথাকথিত "স্বাধীনতা" দান করে। এ ধরণের স্বাধীনতা দেওয়ার সোজা অর্থ হলো—উপর-তলার বুর্জোয়ারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে একাত্ম হয়ে দেশের গণ-আন্দোলন নির্মম ভাবে দলন করবে। ফলে বৈষয়িক স্বার্থ যেমন অক্ষুণ্ণ থাকবে তেমনি যুদ্ধের সময়ে এরা গণশক্তির বিরুদ্ধে দেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ব্যবহার করতে দেবে। আর একটি কূটনীতির প্রয়োগ দেখা যায়। "যে সব উপনিবেশে পূর্বোক্ত পন্থা অনুসরণ করার মত সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিকাশ হয় নাই—যেখানে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মত বিশ্বাসী বুর্জোয়া-শ্রেণী গড়ে উঠে নাই এবং যেখানকার বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় রাখা একান্ত দরকার, সেখানে বলপূর্বক সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে বিরাট সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে গণ-আন্দোলন দমন করার জন্যে।"—(R- Palme Dutt—"Britain's Crisis of Empire"—"page 73)। এই শেষোক্ত কূটনীতির প্রয়োগ-ক্ষেত্র হলো মালয়। যুদ্ধের পরে মালয়ের উপরে যে শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদ তার নিলর্জ্জ ভণ্ডামী গোপন রাখে নাই। এর মধ্যে আছে সাম্রাজ্যবাদী একনায়কত্বের পূর্ণ প্রকাশ। কোন কিছু গোপন রাখে নাই সাম্রাজ্যবাদী। নামে মাত্র যে নির্বাচনের ব্যবস্থা এতে আছে তাতে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সিঙ্গাপুরেই নির্বাচন হবে। সিঙ্গাপুরের বাহিরে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থাই তারা করে নাই। জাতীয়তাবাদের দোহাই পেড়ে ও মালয়ের মুক্তিকামী সংগ্রামী জনসাধারণকে "দস্যু" বলে প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে—বৃটেন সেখানে প্রতিষ্ঠা করতে চায় গণতন্ত্র আর বিপথগামী দস্যুরা তথায় কায়েম করতে চায় গণতন্ত্র-বিরোধী দস্যু-রাজত্ব। মালয়ে বৃটিশ স্বার্থ বজায় রাখা যে একমাত্র উদ্দেশ্য, সে কথা আজ চাপা দেওয়া যায় না। রবার ট্রেড এসোসিয়েশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওয়াণ্টার ফ্লেচার এম, পি, প্রকাশ্যেই বলে ফেলেছেন মালয়ে বৃটিশ স্বার্থের কথা। ১৯৪৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ পত্রিকা 'দি টাইমস্' পত্রিকায় মালয়ের মুক্তিকামী জনগণের বিরুদ্ধে বৃটেনের নির্মম লড়াইএর যুক্তি সমর্থন করে তিনি লিখলেন: মালয় হলো বৃটেনের ডলার রোজগারের প্রধান উৎস (chief dollar-earning source)।

সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সর্বাগ্রে মালয়কে হাতে রাখতে হবে। মালয় হস্তচ্যুত হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বড় রকমের কোন যুদ্ধ চালান অসম্ভব হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হাড়ে-হাড়ে এ কথা বুঝেছে। বর্তমানে হল্যাণ্ড, ফরাসী, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন

উপনিবেশে যে সংগ্রাম চলছে, তার দমনের জন্যে মালয়কে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। তাই মালয়ের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বৈষয়িক ও সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়ে মালয় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কত প্রয়োজন তা' দেখা গেল।

মালয়ের অধিবাসীরা আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত কেন ব্যর্থ ক'রে দেবার জন্যে বিরাট আন্দোলন চালিয়েছে, তার পটভূমিকায় আলোচনা করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ সমূহে যে সব নীতি অনুসৃত হয় তার মধ্যে তিনটি নীতি প্রধান। এই তিন নীতি হলো—(১) সাম্রাজ্যবাদের বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থে উপনিবেশের আর্থিক শোষণ—জন-বলকে নামে মাত্র মজুরীতে শিল্পে খাটিয়ে বিরাট মুনাফা লুণ্ঠন; (২) উপনিবেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিকে নিজেদের তাঁবেদারে রাখা আর উপনিবেশকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে রাখা; এবং (৩) সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ পূরা মাত্রায় অক্ষুন্ন রাখার উপযোগী শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখা। সাম্রাজ্যবাদের এই তিন নীতি মালয়ে কিরূপে প্রযুক্ত হয়েছে, আমাদের তাই আলোচনা করতে হবে।

মালয়ের আয়তন প্রায় ৫১ হাজার বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটি। এদের মধ্যে চীনাদের সংখ্যাই অধিক। ১৯৪৭ সালে যে আদম সুমারীর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তা'তে দেখা যায়—২৬ লক্ষ ৮ হাজার ৩ শত ১৫ জন চীনা, ২৫ লক্ষ ১১ হাজার ৭ শত ৭৭ জন মালয়ী, আর ৬ লক্ষ ৫ হাজার ২ শত ৫০ জন ভারতীয় মালয়ে আছে। মোট জনসংখ্যার ৪৫.৩% জন হল চীনা আর ৪৩.৩% জন মালয়ী।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, নারিকেল, চা, তামাক, কর্পূর, সাগু প্রভৃতি, আর খনিজ দ্রব্যের মধ্যে টিন প্রধান। পৃথিবীর অর্ধেক রবার এখানে উৎপন্ন হয়। এই রবার ও টিন সাম্রাজ্যবাদীদের অতি লোভনীয় বস্তু। বৃটিশ একচেটিয়া পুঁজিবাদীরা এখানে এসে টিনের খনি অধিকার করে এবং রবারের বাগিচা তৈয়ারীর জন্য মূল্যবান আবাদী জমি জোর ক'রে কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ভারতবর্ষে নীল চাষের জন্যে নীলকুঠির সাহেবরা যে নির্মম অত্যাচার বাংলার কৃষকদের উপর চালিয়েছিল, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। চাষীদের জমি কেড়ে নিয়ে রবার-ব্যবসায়ীরা এদের নিঃস্ব ক'রে দেয়। ক্রমে ক্রমে পুঁজিবাদের বিকাশের পর এখানে একচেটিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। টিনের বেলায় এই একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। বৃটিশ টিন ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন (The British Tin Investment Corporation) আর লণ্ডন টিন করপোরেশন (London Tin Corporation) এই দুই বৃটিশ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান মালয়ের টিন-শিল্পকে করতলগত ক'রে রেখেছে। এক মাত্র রবার ব্যবসায়েই বৃটিশ পুঁজিবাদীরা নিয়োগ করেছে ২০ কোটি পাউণ্ড। শ্রমিকদের নামে মাত্র একটা মজুরী দিয়ে তারা রবার চাষে নিযুক্ত করেছে। উপনিবেশে কাঁচা মাল ও শ্রমের মূল্য অতিশয় সস্তা। কারণ হল এই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের প্রয়োজনের বাইরে কোন শ্রমশিল্প গড়ে উঠতে দেয় না। একচেটিয়া ব্যবসায়ের পূর্ণ অধিকার নিজেদের হাতে [illegible] নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা এরা নিজ স্বার্থে প্রয়োগ করে। সুতরাং নতুন শিল্প গড়ে ওঠা দুঃসাধ্য। ফলে উপনিবেশের শ্রমিক [illegible] এখানে সস্তায় শ্রম বিক্রয় করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। [illegible] প্রচুর। ১৯৪৮ সালে মালয়ের কামুনটিন টিন ড্রেজিং কোম্পানী (Kamuntin Tin Dredging Company) ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা ঐ বৎসরে বর্ধিত হারে আরও ২ লক্ষ পাউণ্ড [illegible] করেছেন। মালয়ে লুটের পরিমাণ আরও অধিক হারে [illegible] করার জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৩৬—১৯৫৩ সাল পর্যন্ত যে হিসাব বের হয়েছে, আর ১৯৫২-৫৩ সালে লুণ্ঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার একটা তালিকা পাওয়া গেছে। বৃটিশ লেবার গভর্ণমেণ্ট মার্শাল-প্লানের কর্তাদের [illegible] এক চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা পেশ করেছেন। ১৯৪৮ সালের [illegible] মাসে এই পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, [illegible] পুনর্গঠনের জন্যে উপনিবেশ সমূহের বর্ধিত হারে দানের জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ উপনিবেশের [illegible] জনসাধারণকে হত্যা ক'রে তাদেরই অস্থি দিয়ে চূণ তৈরী ক'রে সাম্রাজ্যবাদের নতুন ঘরের ভিত্তি গাঁথতে হবে। মালয়কে [illegible] শোষণ করা হবে, তার যে হিসাব ঐ চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে তার তালিকা উদ্ধৃত করা হল। এই [illegible] হতে বোঝা যাবে যে, মালয়কে দুর্দশার কোন্ স্তরে বৃটিশ [illegible] বাদীরা নিয়ে চলেছে।

	১৯৩৬,	১৯৪৬,	১৯৫২-৫৩ (পূর্বাভাব)	১৯৪৬ সালের উৎপাদনের [illegible] পরিকল্পিত [illegible] হারে উৎপাদনের [illegible]
	(এক হাজার মিট্রিক টন হিসাবে)			
টিন···	৭৮	২৭.৫	১৪.৫	[illegible]
রবার···	৪০০	৪৩৫	৮৩০	[illegible]

এই শোষণের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য খাড়াপ [illegible] পড়েছে আর নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধুঁকছে। অথচ [illegible] কোন ব্যবস্থাই নাই। ১০ হাজার লোকের জন্য [illegible] এক জন চিকিৎসক। মৃত্যু-সংখ্যাও যথেষ্ট। একমাত্র [illegible] লণ্ডনের মৃত্যু-সংখ্যার ৪ গুণেরও অধিক। শিক্ষার [illegible] মালয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। শতকরা ৭০ জন নি[illegible] ৬ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন শিশু প্রাথমিক শিক্ষা [illegible]

দ্বিতীয় নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, মালয় হলো সা[illegible] পূর্ণ স্থান। চীন, জাপান আর অষ্ট্রেলিয়া হতে ভারত[illegible] ও আফ্রিকা যাবার জলপথে সংকীর্ণ মালাক্কা প্রণালীর [illegible] বলে সিঙ্গাপুরের সামরিক গুরুত্ব বেশী। এখানে [illegible] সাম্রাজ্যবাদের নৌ-ঘাঁটি ও বিমান-ঘাঁটি। উপনিবেশে [illegible] জন্যে আধিপত্য কায়েম করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে [illegible] আজ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক শিবির হলো [illegible] পরিচালিত গণতন্ত্র-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শিবির, আর [illegible] হলো সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিচালিত ফাসিস্ত ও সাম্রাজ্য[illegible]বোধী

শিবির। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের উদ্দেশ্য হলো সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি করা, নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিকল্পনা করা, সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রের বিরোধিতা করা এবং নিজেদের অধীনস্থ প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যে তথায় সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র-বিরোধী ফ্যাসিস্ত শাসন কায়েম করার জন্যে [illegible] প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর হাতে মেকী আজাদী দান করা [illegible] নিজেদের অধীনস্থ সরকারের অধীনে দেশদ্রোহিতা করার পুরস্কার-স্বরূপ মোটা বেতনের চাকুরী দেওয়া। মালয়ে এই নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। তৃতীয় নীতি সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে আমরা এর প্রমাণ পাবো।

সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় নীতি হলো উপনিবেশে এমন শাসনতন্ত্র চালু রাখা যার সাহায্যে তার যাবতীয় স্বার্থ পূরা মাত্রায় অক্ষুন্ন থাকতে পারে। মালয়ে এই ধরণের শাসনতন্ত্র চালু রাখা হয়েছে কি না আমাদের দেখতে হবে। আমরা আগেই বলেছি যে, মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রের ভাণ পর্য্যন্ত করে নাই! মালয়ে চালু করা হয়েছে "Colonial Dictatorship"। ১৯৪৮ সালে মালয়ে [illegible] শাসনতন্ত্র ঘোষিত হয়। এর পাশাপাশি সৃষ্ট হয়েছে একটা "লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিল"। এই কাউন্সিল ৭৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হয়েছেন কত জন? এক জনও না! ১৪ জন সরকারী, ১১ জন [illegible] সুলতানদের কর্ত্তৃক আর বাকী ৫০ জন সাম্রাজ্যবাদের [illegible] হাই কমিশনার কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য দ্বারা "কাউন্সিল" [illegible] প্রকৃত প্রস্তাবে হাই কমিশনারই হলেন মালয়ের [illegible]। তাঁরই নির্দেশ পালন করার জন্য ৭৫ জন সদস্য [illegible] সদা-সর্ব্বদা তৈরী হয়ে আছে। সুতরাং মালয়ের গণতন্ত্র [illegible] বোঝায় এর পরেও কি তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে?

[illegible] কর্ত্তৃক মালয় অধিকৃত হবার পর মালয়ের জনসাধারণ [illegible] উপলব্ধি করলো যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ করার [illegible] অত্যাচার চালানোর শক্তি যতখানি তীব্র—ফ্যাসিবাদের [illegible] জনসাধারণকে রক্ষা করার কোন শক্তিই তার [illegible] বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামরিক শক্তির অক্ষমতার রহস্য [illegible] হয়ে গেল। উপনিবেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে স্বদেশ থেকে [illegible] হলো ইওরোপের হিটলার অধিকৃত জাতিগুলিকে উদ্ধার [illegible] জন্য। জাপানী আক্রমণের মুখে সাম্রাজ্যবাদী শাসক কর্ত্তৃক [illegible] অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণ কম্যুনিষ্ট [illegible] নেতৃত্বে জাপ-আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাবার [illegible] শক্তিশালী জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলল। শুধু জাপানী শাসন থেকে নয়—যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ [illegible] মুক্তি পাবার জন্যে এই সব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন স্বাধীনতার লড়াই চালিয়েছিল। যুদ্ধের শেষে বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-[illegible] পুনরায় তাদের উপরে চেপে বসতে না পারে তার জন্যে [illegible] সংগ্রাম চালিয়ে আসছে।"—(R. Palme Dutt—[illegible]ain's Crisis of Empire" p. 33)। মালয়ে এর ব্যতিক্রম [illegible]। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাপানী বাহিনী কর্ত্তৃক মালয় থেকে [illegible] বিতাড়িত হবার পর মালয়ের কম্যুনিষ্ট বাহিনী—জাপ-বিরোধী এক [illegible] গণবাহিনী (Malayan People's Anti-Japanese Army) গঠিত করে। এই গণবাহিনী জাপ ফাসিস্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে জাপ ফাসিস্তদের বিপন্ন ক'রে তুলেছিল। জাপানীরা তখন গণফৌজকে বলত "দস্যু-বাহিনী"। আজকের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদের বলছে "দস্যু-বাহিনী"। জাপ ফাসিস্ত আর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সৌসাদৃশ্য কি চমৎকার! আজ যাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ "ডাকাত" বলছে তাদেরই জাপ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এক দিন প্রয়োজন হয়েছিল। সেদিন বৃটিশ সরকার এদের পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়েছিল এবং এই গণ-বাহিনীর নেতাদের সামরিক উপাধিতে ভূষিত ক'রে লণ্ডনের বিজয় উৎসবে (Victory March) যোগদান করাবার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার প্রশংসা করা হয়েছিল। জাপানী সামরিক শক্তির পরাজয়ের পর এই "দস্যু-বাহিনী"ই কয়েক সপ্তাহ ধরে মালয়ের শৃংখলা বজায় রেখেছিল। তার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এসে এদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এরা কি সত্যিই দস্যুর দল? ডাকাতি করাই কি এদের পেশা? এদের "আন্দোলন জাতীয় মুক্তি অথবা স্বতঃস্ফূর্ত নয়?"—(The Statesman—১১।৫।৫০ তারিখের প্রধান সম্পাদকীয়) আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলোর মধ্যে নাম-করা ঐ-চারখানা—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জয়ঢাক কাঁধে নিয়ে চীৎকার করছে যে, মালয়ের আন্দোলন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নয়। এ হ'লো দস্যুদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে লুণ্ঠন করার ষড়যন্ত্র। এখন দেখা যাক, কাদের নিয়ে এই "দস্যু-বাহিনী" গঠিত হয়েছে। দি লীগ অব ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ (The League of Democratic Youth), মালয় ইয়ুথ লীগ (The Malayan Youth League), আর প্যান-মালয় ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নকে (The Pan-Malayan Federation of Trade Unions) (পাঁচ লক্ষ সদস্য লইয়া এই ইউনিয়ন গঠিত) সংঘবদ্ধ করিয়া মালয়ের কম্যুনিষ্ট পার্টি মালয়ের গণ-বাহিনী গঠন করে। এই রাজনৈতিক দলগুলির সদস্যগণ কি "দস্যু"? হ্যাঁ, এরা সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের ত্রাস। সম্প্রতি এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক লড়াই বলে চালাবার অপচেষ্টাই চলেছে। বলা হচ্ছে যে, মালয়ের এই আন্দোলন কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় চীনাদের আন্দোলন—এদের সাথে মালয়ী অথবা ভারতীয়দের কোন সম্পর্ক নাই। ইতিপূর্বে মালয়ের জনসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার পুনরুক্তি না ক'রে বলা যাবে—এই প্রচার একেবারে দুরভিসন্ধিমূলক। চীনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় স্বভাবতঃই তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অধিক সংখ্যায় যোগদান করেছে। তা'ছাড়া চীনারাই অধিকাংশই শ্রমিক। মালয়ের মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকেরা করছেন। জাপ-ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মালয়ের শ্রমিক যেমন নেতৃত্ব করেছে তেমনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব করছে। মালয়ীরা অধিকাংশই কৃষক। কৃষকেরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। ফলে কৃষকেরা শ্রমিকদের আশ্রয় ও খাদ্য প্রদান করছে। গেরিলা বাহিনীতে শতকরা ২৫ জন মালয়ী যোগদান করেছে। এ কথা মালয়ে বৃটিশ গোয়েন্দা-বাহিনীই স্বীকার করেছে।—'Sunday Times'—May 15, 1949)। অস্ত্র রাখার জন্যে যে ব্যক্তিকে

[illegible]য়ে প্রথম ফাঁসী দেওয়া হয় সে ব্যক্তি হলেন মালয়ী। আরও [illegible] করার বিষয় হলো—মালয়ীদের সতর্ক ক'রে যে প্রচার-পুস্তিকা বিমান থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয় তার মধ্যে নিহত বিদ্রোহীদের যে চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল সে বিদ্রোহীরা হলেন মালয়ী। আর যারা বিদ্রোহে যোগদান করবে তাদেরও এই দশা হবে—এই বলে যে শাসানী দেওয়া হয়েছিল সেটাও মালয়ী ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল কিন্তু চীনা ভাষায় নয়।

১৯৪৮ সালের জুন মাস। মালয়ের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় যুগ আরম্ভ হলো। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশানুসারে বৃটেনের শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদ পর থেকেই মালয়ের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের টুঁটি টিপে মারার ষড়যন্ত্র করছিল। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে বৃটেন যখন দেখল যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করতে বেগ পেতে হবে না—তখন তা'রা কাজে হাত দিল। জুন মাসেই সর্বাগ্রে আন্দোলনের নেতাদের ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংস্থার উপর হামলা সুরু করল। লণ্ডন থেকে নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ গোটা দেশের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান, প্যান-মালয়ান ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্, লীগ অব ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ, দি এসোসিয়েশন অব এক্স-সার্ভিসমেন্ (Association of Ex-servicemen), জাপ-বিরোধী জনফৌজ, দি লীগ অব ইয়ুথ ফর ষ্ট্রাগল ফর দি ন্যাশন্যাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অব মালয় (The League of Youth for Struggle for the National Independence of Malay), মালয় কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি যাবতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করল আর হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার ক'রে ফেলল।

২২শে জুন রবার উৎপাদনের চারটি প্রধান অঞ্চলে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করা হলো। ২৪শে জুন তারিখে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র সিঙ্গাপুরেও অবরোধ অবস্থা ঘোষিত হলো। সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় গোটা দেশে আগুন জ্বলে উঠল। পুলিশ জনতার উপর গুলী চালায়। ফলে গেরিলা বাহিনী সশস্ত্র প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গোটা দেশে গেরিলা বাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠল। অত্যাচার চালিয়ে গণ-আন্দোলন দমন করা ত দূরের কথা, আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান আড্ডা কুয়ালালামপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ইংল্যাণ্ড, নিকট-প্রাচ্য, মাল্টা, সিংহল ও হংকং থেকে আকাশ-পথে ও জলপথে হাজার হাজার সৈন্য পাঠান হতে লাগল এবং গেরিলাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হলো। ব্যাপক ভাবে গেরিলাদের উপরে বিমান আক্রমণ সুরু হলো। সিংহল থেকে আরম্ভ ক'রে সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুর—সর্বদাই বোমারু বিমানের চলাচল আরম্ভ হয়ে গেল। হংকং থেকে বৃটিশ দূর-প্রাচ্যের স্কোয়াড্রোনের (British Far East Squadron) ঘাঁটি সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত হলো। গুর্খা ও দিয়াক (Dyak) ভাড়াটে সৈন্যদের কথা ছেড়ে দিলে কাতারে কাতারে বৃটিশ সৈন্য, কামান, ট্যাংক, স্পিটফায়ার ও [illegible]টাস্ (ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক-নির্মিত হয়েছিল) মালয়ের গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে মালয়ে জাহাজ বোঝাই পাঠান হলো।"—(R. Palme Dutt—"Britain's Crisis of Empire"—p. 95)।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি মালয়ের সর্বত্র বৃটিশ বাহিনীর [illegible] মালয়ে গেরিলা বাহিনীর রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেল। মধ্য[illegible], বালিতো অঞ্চল, সেলাংগোর, পেরাক্ ও নেগ্রী-সেমবিলানে [illegible] যুদ্ধ হয়ে গেল। সিঙ্গাপুরের সন্নিকট জোহোর রাজ্যে [illegible] নিযুক্ত শ্রমিকেরা সংগ্রাম সমর্থন ক'রে ধর্মঘট আরম্ভ ক'রে দি[illegible]।

আগষ্টের ৬ তারিখ। সিঙ্গাপুরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৃটিশ [illegible] ও বেসামরিক কর্তাদের এক গোপন বৈঠক বসল। [illegible] উদ্দেশ্য ছিল—মালয়ের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করা। বোর্ণিওর আদিবাসী, দিয়াকরা [illegible] আশ্রয় নিয়েছিল। লণ্ডন থেকে শ্রমিক সরকার [illegible] জানিয়ে দিল যে, অনতিবিলম্বে জংগলের উপর পুরা দমে [illegible] বর্ষণ কর—জংগলে আগুন লাগিয়ে দাও। যে সব গেরিলা [illegible] হলো বৃটিশ শাসক দলে দলে প্রকাশ্য তাদের রাস্তায় গুলী ক'রে [illegible] করতে লাগল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরিয়ে [illegible] জন্যে বৃটিশ শাসক মালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তদের আর [illegible] বিরুদ্ধে মুসলমানদের লাগিয়ে দেবার জন্যে মালয়ের কা[illegible] নিয়োগ করল।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এক [illegible] বের করল। তা'তে বলা হলো—মালয়ের ৫ হাজার [illegible] বিরুদ্ধে ৫০ হাজার শক্তিশালী বৃটিশ সেনা সংগ্রামে নিযুক্ত [illegible] আন্দোলন দমন করা ত দূরের কথা, বহু ক্ষেত্রে উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে সেনারা গেরিলাদের হাতে বেদম প্রহার খেয়ে [illegible] করতে বাধ্য হলো।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। লর্ড সভায় রক্ষণশীল [illegible] লর্ড স্যাণ্ডফোর্ড (Lord Sandford) বললেন: "মালয়ে [illegible] অবস্থা চলছে তা বোঝা দুঃসাধ্য। একটা কথা পরিষ্কা[illegible] উঠেছে যে, আমরা মালয়ের যুদ্ধে জিততে পারছি না।" [illegible] সাল হতে আজ পর্য্যন্ত মালয় যুদ্ধে মোট খরচ হয়েছে [illegible] পাউণ্ড। এত খরচ ক'রে আকাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে [illegible] সাম্রাজ্যবাদ অতিমাত্রায় রেগে উঠল। আরও [illegible] চালাতে লেগে গেল। নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর নির্মম [illegible] আরম্ভ করে দিল—গ্রামের পর গ্রামে আগুন ধরিয়ে [illegible] অত্যাচারের দৃশ্য বর্ণনা করে লণ্ডনের 'অবজার্ভার' [illegible] সিঙ্গাপুরস্থিত সংবাদদাতা লিখলেন: "There was no whinning or begging. They were given a few minutes to collect what they could.…The [illegible] burst into a slow explosion of flame, [illegible] family stood and watched ankle-deep in all [illegible] had. That happened five times. Once [illegible] started to scream. Others just stood, [illegible] faces marble-cold. At the end of the [illegible] old woman waited at the door of he[illegible]. Her son crouched outside, his legs and ar[illegible] chicken limbs, approaching the slow en[illegible] consumption. Inside was a climax [illegible] poverty."—(Observer—Sept 19, 1948)। [illegible]

হাজার হতাহত হয়েছে, ২০ হাজারেরও অধিক লোককে বন্দিশালায় পুরে রেখেছে। ৫ হাজার গেরিলা-বাহিনীর বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য লড়ছে। কিন্তু গেরিলাদের দমন করা সহজসাধ্য হয়ে উঠল না। ১১।৫।৫০ তারিখে 'ষ্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকা "মালয় রহস্য" এক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, মালয়ের গেরিলা-বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত ১ লক্ষ সৈন্য পুলিশকে গ্রাহ্য করে না।" এই একই প্রবন্ধে বলা হয়েছে: "Malay's terrorists are a graver menace than ever."

ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা মালয়কে স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছেন, তাঁরাও স্বদেশের মুক্তি কামনায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্যান্-মালয়ান্ ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস্-এর সভাপতি গণপতি ভারতীয়। ১৯৪৯ সালের মে মাসে তার ফাঁসী হয় এবং তাঁর পরবর্তী ঐ ট্রেড ইউনিয়নের ভারতীয় সভাপতি বীরসেনানকেও গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। আরও শত শত ভারতীয় মালয়ের বন্দিশালায় পচে মরছে তার আর ইয়ত্তা নাই। এ সব দিক দিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় যে, মালয়ের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কোন ক্রমেই মুষ্টিমেয় চীনা সম্প্রদায়ের আন্দোলন নয়।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এখন আর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। আন্দোলনের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছে। দু'বৎসর পূর্বে যখন সশস্ত্র সংগ্রাম বেধে উঠেছিল তখন বৃটেনের লেবার-নেতারা সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে, দু' মাসের মধ্যে এই বিদ্রোহ সমূলে ধ্বংস করা হ'বে। এই দম্ভোক্তির মূল্য মালয়ের সংগ্রামী মানুষেরা কিছুতেই দেয় নাই। দু' বৎসরের যুদ্ধের ফলাফলের খতিয়ান দিয়ে মালয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র 'ষ্ট্রেট্স্ টাইমস্' লিখেছে যে, গোড়ার দিকে বিদ্রোহ দমনে যতখানি সাফল্য লাভ করা গিয়েছিল—তার তুলনায় বর্তমানে কিছুই হচ্ছে না। উপনিবেশ-সচিব মিঃ গ্রিফিথস্ (Mr. Griffiths) স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, চলতি বৎসরে গেরিলা-বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আক্রমণের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা সপ্তাহে গড়পরতায় ২০ থেকে ৫০ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মালয়ের বিদ্রোহ আজ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র লণ্ডনের 'টাইমস্'—১৯৪৯ সালের মার্চ—"Far Eastern Front" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছেন: "The revolutionary movements in Eastern Asia as a whole ranging from North China down to Indonesia and northword again to Malaya and the Burmese hills—are changing the world strategic and political map. The destinies of nearly a thousand million people are being shaped. With Communists either in the leadership or striving towards it, the challenge to Western security is at least as great as if Africa were in ferment." মহাচীনে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর সাফল্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শোষিত জনগণের আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে সিডনীতে যে সম্মেলন হয়ে গেল তার কাহিনী পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং তার পুনরুল্লেখ ক'রে প্রবন্ধের আর কলেবর বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়। মালয়ের পরিস্থিতি যে আজ অতীব শোচনীয় সে কথা অনস্বীকার্য। মালয় হস্তচ্যুত হলে বৃটেনের শক্তি আরও ক্ষীণ হ'য়ে উঠবে। শুধু তাই নয়—"…Malaya is the bulwark of British Imperialism in Asia and the rear of the American basis in the Paciific and outh-Eastern Asia,…" ("Sovietland"—Vol. III No. 10, at May 25, 1950—page 23). লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকাও বলেছে: "Eastern Asia is a main base of Western Europe." সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্ট শ্রমিক দলের সমাজতন্ত্রী (!) সদস্য লর্ড পেথিক লরেন্স বলেছেন: "বৃটেন যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে মুনাফার ক্ষেত্ররূপে বজায় রাখতে চায় এবং কম্যুনিজম রোধে তাকে সক্ষম রাখতে চায় তবে কিছু কিছু সম্পদ তাদের হাতে রাখার ব্যাপারে নেতিবাচক নীতি অবলম্বন না করাই বৃটেনের উচিত। এই সমাজতন্ত্রী নিষ্ঠাবান কথায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিজম্ রোধের নামে কেবল যে বৃটেনের মুনাফার ঘাঁটি সুদৃঢ় করা হচ্ছে, তাই নয়—একই প্রকার স্বার্থ আর যে সমস্ত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলোর রয়েছে, তাদেরও মুনাফা-মৃগয়ার ক্ষেত্র নিরুপদ্রব করার চেষ্টা চলছে। মোটের উপর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা যে গণতন্ত্র রক্ষা—মালয়ের জনসাধারণের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা বলছেন, আসলে সেটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া কিছুই নয়। এর পিছনে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের গভীর ষড়যন্ত্র আছে। বৃটিশ ও পশ্চিম-ইউরোপের এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের যে শোষণ-নীতি রূপ পাবে তার পরিণাম ভয়াবহ। এ সম্পর্কে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভবপর নয়।

তবে এ কথা ঠিক যে, মালয়ের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ উড্রো ওয়াট্ সম্প্রতি মালয় সফর শেষ ক'রে তথাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন: "বৃটেন কমনওয়েলথ থেকে মালয়কে হারাতে বসেছে, কারণ যুদ্ধোত্তর প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে শাসন-কার্য্য চালাতে সে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।"—(পি-টি-আই, রয়টার, ২৪।৫।৫০)। বোধ হয়, এই জন্যই যুদ্ধ-সচিব মিঃ ষ্ট্র্যাচী ও উপনিবেশ-সচিব মিঃ গ্রিফিথস্ উভয়েই স্বচক্ষে মালয়ের পরিস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়েছেন।

—আগামী সংখ্যায়—

ভারতে প্রাচ্য গবেষণা

শ্রীসুশীলকুমার দে

হাইড্রোজেন বোমা কি পৃথিবী ধ্বংস করবে ?

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হাইড্রোজেন আণবিক বোমা তৈরীর আদেশ দিয়েছেন। বেসরকারী ভাবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, এক থেকে তিন বছরের মধ্যেই এই ভীষণ সমরাস্ত্র পরীক্ষার উপযোগী হবে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এই বোমা কার্য্যকরী হবে না বলেই তাঁরা আশা করেন ; কিন্তু এই বোমা যে কার্য্যকরী হতে পারে, এই আশঙ্কাও তাঁদের আছে।

যে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম বোমা হিরোশিমা ও নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন করেছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'আণবিক বোমা'। কিন্তু যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে, আণবিক বোমা সেই ভীষণ বোমার পলতের কাজ করবে। এ থেকেই বোঝা যায়, হাইড্রোজেন বোমার শক্তি কত ভীষণ ! এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী উত্তাপ সৃষ্টি হবে এবং তাতে এক ধরণের আণবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে যা পৃথিবীতে নতুন। 'Fusion' প্রক্রিয়া এই বোমাকে আণবিক বোমার অপেক্ষা আট থেকে হাজার গুণ অধিক শক্তিশালী করবে।

ইউরেনিয়াম fission আবিষ্কারের আগেই পদার্থবিদ্‌রা বুঝতে পেরেছিলেন যে, হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা যায়। 'Fusion'এর ধরণের আণবিক প্রতিক্রিয়া সূর্য্য ও তারকার শক্তি (energy) সরবরাহ করে। এই ভীষণ বোমার প্রতিক্রিয়াকে শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগান অসম্ভব বলে মনে হয়। ইউরেনিয়াম 'fission'এর দ্বারা নির্গত শক্তিকে অসম্ভব রকম গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন 'fusion'এর ফল ঠিক উল্টো। এ কেবল সামরিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যাবে। এর একমাত্র কাজ ধ্বংস সাধন, অন্য কোন কাজ এ থেকে পাওয়া যাবে না।

হাইড্রোজেন বোমা যে কতখানি ধ্বংস করতে পারে, তা সহজেই হিসাব করা যায়। সাধারণ লোকে শুনলে বিস্মিত হবেন যে, বোমার ধ্বংসের যতটা ক্ষমতা থাকে, তার চেয়ে ধ্বংস-ক্ষমতা আর একটু বাড়াতে গেলে তার শক্তির মাত্রা খুব বাড়ান দরকার। অতি সাধারণ "কিউব রুট" ফরমূলা দিয়ে বোমার শক্তি আট গুণ বাড়ালে এর ধ্বংসের এলাকা দ্বিগুণ বাড়বে। হাজার গুণ শক্তি বাড়ালে ধ্বংসের এলাকা দশ গুণ বাড়বে। প্রকৃত বিস্ফোরণ হলে যে ধ্বংসাত্মক অনুষ্ঠান হবে, তার তুলনায় এই হিসেব অবশ্য খুবই কম।

দু'হাজার ফুট উঁচুতে যদি আণবিক বোমা ফাটান যায়, তাহলে তার চার দিকে আধ মাইল জায়গা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে এবং এক মাইলের মধ্যবর্ত্তী এলাকার ক্ষতি হবে খুব ভীষণ রকমের। আণবিক বোমার চেয়ে আট থেকে হাজার গুণ অধিক শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা দুই থেকে দশ গুণ অধিক দূর থেকে একই কাজ করবে।

আণবিক বোমার চেয়ে আট গুণ অধিক শক্তিশালী একটি হাইড্রোজেন ... র বিস্ফোরণে ... মাইল পরিধির ... অগ্নি-গোলক সৃষ্টি ... সূর্য্যের ঠিক ক্ষুদ্রাকার ... আকার ন্যায় হবে এবং ... যার। এর কেন্দ্র থেকে ... স্ফো-রক পদার্থ, ... তাপ ও মারাত্মক ... "Radio-active" ... নাই হবে। যেখানে ... প্রথম হবে, ঠিক ... এক মাইলের ... ব্যাসের সকল লোক ... হবে। আর বিস্ফোরণের ... তাপ ... Radioa... ... এর
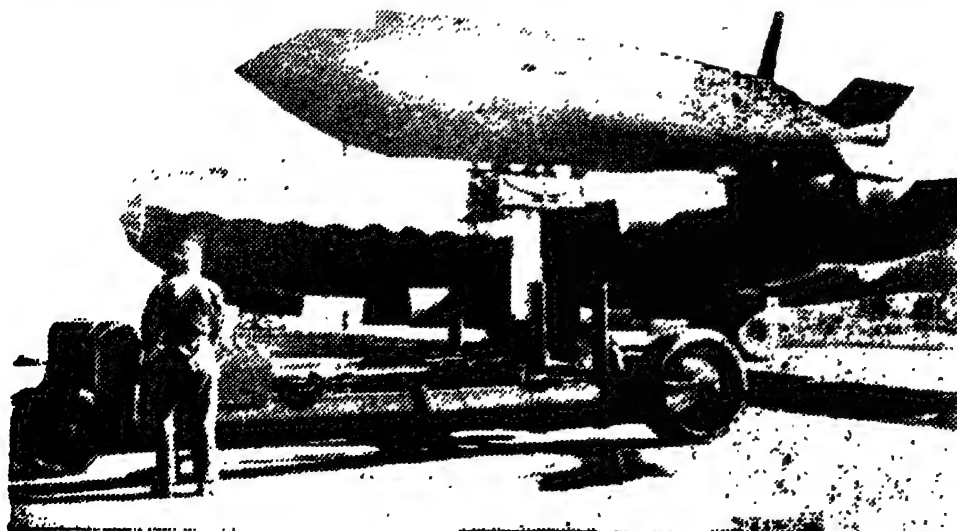
অধিক লোক নিহত হবে। অধিকাংশ বাড়ীই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। যদি কোন বাড়ী ধ্বংস না হয়, তবে তা আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হবে। গৃহ-পতনের ফলে ও বোমা থেকে নির্গত উত্তাপে এক থেকে দু'মাইল এলাকার মধ্যে ... লোকের প্রাণহানি হবে। ইস্পাতের বাড়ীগুলি দুমড়ে তাল-পাকিয়ে যাবে আর ইটের বাড়ীগুলি চূর্ণ হবে। দু'মাইলের অধিক দূরের লোকদের শরীর পুড়ে যাবে, কিন্তু তা মারাত্মক হবে না। চার মাইলের অধিক দূরে আঘাত সামান্য রকমের হবে।

হাইড্রোজেন বোমার শক্তি যদি আণবিক বোমার চেয়ে হাজার গুণ বাড়ান যায়, তাহলে পাঁচ মাইলের মধ্যবর্ত্তী স্থান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। দশ মাইলের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় ভীষণ রকমের প্রাণহানি ও ক্ষতি হবে এবং আরও অধিক দূরের লোক-জন আহত হবে।

লেঃ জেনারেল লেসলী আর গ্রোভস হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, নিউ ইয়র্কের মত বড় সহরকে ধ্বংস করতে যেখানে সাতটি আণবিক বোমার দরকার, সেখানে একটি মাত্র মাঝারি আকারের হাইড্রোজেন বোমা নিমেষের মধ্যে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। শত্রুর হাতে যদি হাইড্রোজেন বোমা থাকে, তবে নিউ ইয়র্ক ও আমেরিকার অন্যান্য বড় সহর তার লক্ষ্যবস্তু না হয়ে পারবে না। পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রুশিয়ায় মাত্র দু'টি প্রকৃত বড় সহর আছে—মস্কো ও লেনিনগ্রাড।

আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার কার্য্যকরী শক্তি

বোমার শ্রেণী	সম্পূর্ণ ধ্বংসের এলাকা (প্রায় সব লোক নিহত ও গৃহাদি বিধ্বস্ত)	ভীষণ ক্ষতির এলাকা (বহু লোকের প্রাণহানি ও গৃহাদির ভীষণ ক্ষতি)
আণবিক বোমা	½ মাইল	১ মাইল
ব্যাসার্দ্ধ এলাকা	¾ বর্গ-মাইল	৩ বর্গ-মাইল
হাইড্রোজেন বোমা		
৮ গুণ অধিক শক্তি-শালী ব্যাসার্দ্ধ এলাকা	১ মাইল ৩ বর্গ-মাইল	২ মাইল ১২ বর্গ-মাইল
হাইড্রোজেন বোমা		
হাজার গুণ অধিক শক্তিশালী ব্যাসার্দ্ধ এলাকা	৫ মাইল ৭৫ বর্গ-মাইল	১০ মাইল ৩০০ বর্গ-মাইল

হাইড্রোজেন বোমা যদি ঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর না প'ড়ে তার কাছাকাছিও পড়ে, তাহলেও লক্ষ্যবস্তুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

হাইড্রোজেন বোমার অসীম শক্তির গোপন কথা এর সীমাহীন ...। এমন কি, সমগ্র একখানি জাহাজকে ভিতরে উপকরণ ... হাইড্রোজেন বোমায় পরিণত করা যেতে পারে। বিমানে যে ... হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে যেতে পারে, তার ওজনের সীমা ২১ টন। ... একটি বোমার ছবি দেওয়া হ'ল, যদিও এটা হাইড্রোজেন বোমা নয়, সাধারণ বিস্ফোরক দিয়েই এ বোমা তৈরী, তবে এর ওজন ... টন এবং আমেরিকায় তৈরী।

হাইড্রোজেন বোমার ডিজাইন সাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কেবল রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় বিষয়ের ভার যাঁদের ওপর তাঁরাই জানেন। কাজেই এই বোমার আকারের বর্ণনা কাল্পনিকই হবে। বিমান-বাহিত হাইড্রোজেন বোমার এইরূপ একটা কাল্পনিক আকার জানা গেছে :

আকার—২৬ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৪½ ফুট ব্যাস এবং ২১টন ওজন।

বিশেষ যান্ত্রিক সাজ-সজ্জা—বোমার পতনের গতি হ্রাসের জন্য বিরাট আকারের একটি প্যারাস্যুট। এতে বৈমানিক-চালিত বোমাবর্ষী বিমান বিস্ফোরণের এলাকা পার হবার সময় পাবে।

নিক্ষেপের কৌশল—একটি কিউজ বা ব্যারোমিটার সমন্বিত সুইচ আপনা আপনি মাটির ওপরে একটা নির্দ্দিষ্ট উচ্চ স্থানে (শূন্যে) পলতেটিকে কার্য্যকরী করবে।

পলতে—মূলতঃ একটি আণবিক বোমা।

বিস্ফোরক চার্জ—হাইড্রোজেন (কিছু প্রতিক্রিয়ার জন্য লিথিয়াম৬) এ জন্য তিন শ্রেণীর হাইড্রোজেন বা যে কোন একটির কোন কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড।

হাইড্রোজেনের সম্ভাব্য বিভিন্ন শ্রেণী—নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বাষ্প :

প্রোটিয়াম (সাধারণ হাইড্রোজেন) Mass 1, common দস্তার উপর অম্লজানের ক্রিয়া ও অন্যান্য বহু উপায়ে প্রাপ্তব্য।

ডিউটেরিয়াম (ভারি হাইড্রোজেন)। Mass, 2, দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জল থেকে প্রাপ্তব্য।

ট্রিটিয়াম (অতিরিক্ত ভারি হাইড্রোজেন)। Mass 3: একান্ত দুষ্প্রাপ্য। Radioactive, আধা জীবন, ১২ বছর। চিকাগোর আর্গোন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে লিথিয়াম থেকে তৈরী। হাইড্রোজেন বোমায় ব্যবহারের পক্ষে এই উপকরণ বিশেষ উপযোগী।

হাইড্রোজেন বোমার আর একটি উপকরণ হচ্ছে ইউরেনিয়াম হাইড্রাইড।

হাইড্রোজেন বোমা কি পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে? বৈজ্ঞানিকদের অভিমত এই যে, হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পর একটি মাত্র স্ফুরণে পৃথিবী ধ্বংস হবে না, তবে সুদূরপ্রসারী পরিণাম অসম্ভব নয়।

অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন বলেন, হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুতকারকরা যদি তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে সমর্থ হন, অর্থাৎ আবহাওয়াকে বিষাক্ত Radioactive করতে পারেন, তবে পৃথিবীতে জীবনের স্পন্দন থেমে যাবে।

আণবিক বোমার মত তবে তার চেয়ে অনেক বড় আকারে হাইড্রোজেন বোমা থেকে নিউট্রন নির্গত হয়ে বাতাস, জল ও মাটির একটা অংশকে দীর্ঘকালস্থায়ী Radioactive পদার্থে পরিণত করবে। যদি যথেষ্ট সংখ্যক হাইড্রোজেন বোমা সমগ্র আবহাওয়াকে বিপজ্জনক ভাবে সংক্রামিত করতে পারে, তাহলে পৃথিবীর সকল প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এক আউন্স ওজনের রেডিও

একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান মাত্র এক আউন্স ওজনের একটি রেডিও সেট প্রস্তুত করেছেন। এই রেডিও বিমানে ব্যবহার করা হবে। দু'বছর পরীক্ষার পর এই রেডিও সেট উদ্ভাবন করা হয়েছে।

আধুনিক বেকারী

আগামী জুন মাসে টরন্টোতে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা হবে, তাতে রুটি প্রস্তুত করার দু'টি আধুনিকতম যন্ত্র প্রদর্শিত হবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে ছয় থেকে আট মিনিটের মধ্যে ময়দা মাখা হয়ে যাবে।

কাপড়-জামা সামলান্

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটর চালিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পথের মাঝখানে মোটরের কল গেল বিগড়ে। গাড়ীটি এমন বিকল হল যে, তার তলায় ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে তবে কল সারতে হবে। অথচ আপনার গায়ে পরিষ্কার ধব্‌ধবে জামা-কাপড়। উপায়? উপায় আছে। এর জন্য আপনাকে তোয়ালে কিম্বা গামছা পরে কেলেঙ্কারী করতে হবে না। মোটর নিয়ে বেরুবার সময় এক খণ্ড রবার ক্লথ বা অয়েল ক্লথ বা ঐ ধরণের অন্য কোন জিনিষ নিয়ে বেরুবেন। সেটা গাড়ীর তলায় বিছিয়ে দিয়ে তার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে মনের আনন্দে গাড়ী সারুন। চাই কি একটু ঘুমিয়েও নিতে পারেন।

নিউট্রন্

সাধনা মিত্র

বিশ্ব-জগতে আমরা যে সমস্ত জিনিষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকি, তাদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পদার্থ ও শক্তি। দু'টোর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে যে, প্রথমটার ওজন আছে, দ্বিতীয়টার তা নেই।

যে কোন পদার্থকে আমরা যদি ভাঙতে আরম্ভ করি তো ভাঙতে ভাঙতে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছবো, যখন সেটাকে আর ভাঙ্গা চলবে না, মানে, ভাঙলে আর সেই পদার্থের গুণ অবশিষ্ট থাকবে না। এই যে অবস্থা—পদার্থের সব চেয়ে ছোট সমগুণ বিশিষ্ট অংশ, একে বলা হয় "অণু" বা "মলিকিউল"। এই অণুকে আরো ভেঙে পরমাণু বা অ্যাটমে পরিণত করা যায় বটে, তবে ঐ পদার্থের গুণ যে অ্যাটম হারিয়ে ফেলে, তা আগেই বলেছি। পরমাণুকে বিশ্লেষণ করে এর গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছে, তা হচ্ছে এই—দু'টো অংশে বিভক্ত পরমাণু—ধনাত্মক নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াস্কে ঘিরে অনেকগুলো ইলেক্‌ট্রোন্।

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে, যে-কোনো প্রসারিত গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চার করলে ক্যাথোড হতে কণিকা-স্রোত বেরিয়ে আসে—এই স্রোতের নাম দেওয়া হয়েছে "ক্যাথোড রে"। এই কণিকাগুলো একক ঋণাত্মক তড়িৎ শক্তি (৪·৭৭৪৯ × ১০-১০ স্থৈতিক বিদ্যুৎ একক) বহন করে আর সব চেয়ে হালকা গ্যাস্ হাইড্রোজেনের একটা পরমাণুর ১৮৩৩ ভাগ আয়তনসম্পন্ন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমাদের জানা সব চেয়ে হালকা জিনিষ পরমাণুর চেয়ে অনেক অনেক বেশী হালকা এগুলো, আর এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে ইলেক্‌ট্রোন্। যে-কোনো বস্তু হতেই এদের পাওয়া চলে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, জাগতিক যাবতীয় পদার্থের সাধারণ উপাদান এই ইলেক্‌ট্রোন। যেহেতু, পদার্থেরা সাধারণ ভাবে তড়িৎনিরপেক্ষ, সেই হেতু এই ... একটা ... এবং সেটি

হচ্ছে প্রোটন্। প্রোটন্‌কে বলা হয় ধনাত্মক শক্তি-বিশিষ্ট হাইড্রোজেন্ পরমাণু। তাহলে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু সম-আয়তনবিশিষ্ট প্রোটন্ একক ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তি বহন করে। আর ইলেক্‌ট্রোনের আয়তন হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় নগণ্য এবং একক ঋণাত্মক তড়িৎ-শক্তি বহন করে। প্রোটন্‌টা আবার দু'টো অন্য এককে বিভক্ত—নিউট্রন্ আর পজিট্রোন্। নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ—একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় সমান আয়তন-বিশিষ্ট। পজিট্রোনের আয়তন ইলেক্‌ট্রোনের সমান—একক ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তি বহনকারী। পরমাণুর সংগঠনী উপাদান দু'টোর মধ্যে একটা যে ইলেক্‌ট্রোন তা বলেছি এবং ইলেক্‌ট্রোন্ জিনিষটি সম্বন্ধে ধারণাও একটু হয়েছে আমাদের। আরেকটা অংশ নিউক্লিয়াস্। নিউক্লিয়াস্‌টা বিশেষ কিছুই নয়—প্রোটন্ আর ইলেক্‌ট্রোনে গঠিত বস্তু একটি। পরমাণুর ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করে এটা।

একটা পরমাণুর গঠন-রীতি বা বৈশিষ্ট্য যে ঠিক কি, তা বোঝার জন্যই একটু আলোচনা হোল এতক্ষণ। এবার অ্যাটমের অন্তর্গত প্রোটনের অন্তর্ভুক্ত নিউট্রনের আবিষ্কার কি করে হোল, সেই বিষয়ে দেখা যাক্।

উনিশশো উনিশ সালে রাদারফোড নাইট্রোজেন্ গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করে নাইট্রোজেন্ নিউক্লিয়াস্ বিশ্লিষ্ট করা সম্বন্ধীয় অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তার পর ১৯২১ সালে রাদারফোড আর গাড্‌উইক্ একযোগে উন্নততর যন্ত্রাদি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে, পিরিয়ডিক্ টেবিলে বোরোন্ থেকে পটাশিয়াম্ পর্য্যন্ত যতগুলো মৌলিক পদার্থ আছে, সমস্তগুলো হতে প্রোটন্ বেরিয়ে আসে উপরোক্ত উপায়ে। অবশ্য কার্বন্ আর অক্সিজেনকে আমরা নিশ্চয়ই বাদ দেবো। এর পর আসে উনিশশো ত্রিশ সালে 'বেথি' এবং 'বেকার'-কৃত পরীক্ষার কথা। এঁরা দেখেছিলেন যে, কোনো হালকা মৌলিক পদার্থ যেমন বেরিলিয়াম—যখন আলফা কণিকা দ্বারা চূর্ণীকৃত হয়, তখন পোলোনিয়াম হতে গামা রশ্মির মতো বিকিরণ প্রক্ষিপ্ত হয়। ১৯৩১ সালে কুরী-জোলিয়ট এবং ১৯৩২ সালে ওয়েবষ্টার দেখালেন যে, এই নতুন বিকীর্ণ শক্তির ভেদনক্ষম ক্ষমতা—স্বাভাবিক রেডিও ক্রিয়াশীল ধাতু হতে উৎপন্ন গামা রশ্মির ভেদনক্ষম শক্তির চেয়ে যথেষ্ট বেশী। এঁরা আরো দেখিয়েছেন যে, এই বিকীর্ণ শক্তি, হাইড্রোজেন, কার্বন, আর্গন্ আর বাতাস থেকে বেশ গণ্য গতিসমেত প্রোটন্ উচ্ছেদ করতে পারার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন। পরীক্ষিত ... কারণ যে শুদ্ধ মাত্র বিকিরণ—চ্যাড্‌উইক্ তা স্বীকার ... তাঁর মতানুসারে তথাকথিত নতুন বিকীর্ণ শক্তি একক সমআয়তনসম্পন্ন কণিকা সমূহের দ্বারা সৃষ্ট।

এক লক্ষ আল্‌ফা-কণিকার ক্রিয়াতে বেরিলিয়াম ... নিউট্রন দেয়—অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায় লিথিয়াম, ফ্লোরিন, নিয়ন্, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম আর ফস্‌ফরাস ... তালিকাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নিউট্রন সেই মৌলিক ... হতেই পাওয়া যায় যাদের পরমাণবিক আয়তন, সংখ্যার (Atomic number) থেকে দ্বিগুণ ... প্রত্যেকটি বিষয়েই বিশিষ্ট শক্তি, নতুন নিউট্রন দেয়। যেমন বেরিলিয়াম্, কার্ব্বন দেয়, বোরোন-

আর ফ্লোরিন দেয় নিয়ন্। কতকগুলো নিউক্লিয়াস্ আবার আইসোটোপ, মানে বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনসম্পন্ন একই মৌলিক পদার্থ, কিন্তু প্রতিটি অবস্থাতেই পরমাণবিক সংখ্যা সব সময়ে একই। কাজে কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে, আলফা-কণিকাগুলো দু'রকম উপায়ে বিশ্লেষণ সংঘটিত করে : ১। প্রোটন্ ত্যাগ করে দিয়ে ; কখনও বা ২। নিউট্রনের উচ্ছেদ সাধন ক'রে।

১। উনিশশো বত্রিশ সালে ককৃফট্ আর ওয়ালটন্—খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন (Righ velocity) প্রোটন্-স্রোত তৈরীর একটা নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করা হোল, আর ৬০০,০০০ ভোল্ট্ বৈদ্যুতিক গতিতে প্রোটন্ নামতে দেখা গেল। এই তীব্র গতিসম্পন্ন প্রোটনদের দিয়ে লিথিয়াম্, বোরোন্ আর ফ্লোরিন, খুব চমৎকার ভাবে বিশ্লিষ্ট হোল। প্রোটনের পরে আলফা-কণিকাগুলো উদ্গীর্ণ হোল এবং সেগুলিকে বেধে নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হোল নিউক্লিয়াস্।

২। অন্য দিক দিয়েও নিউট্রনের আবিষ্কারটা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। যেহেতু নিউট্রনের নিজের কোনো তড়িৎশক্তি-বহনকারী ক্ষমতা নেই, সেই হেতু কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে অতি সামান্য ভাবে আয়নিত হয় এটা। একটা যথোপযুক্ত নিউক্লিয়াসের সঙ্গে কোনো নিউট্রনের সংঘর্ষ হলে সেই সংঘাতটা স্থিতিস্থাপক হতেও পারে বা না-ও হতে পারে। দ্বিতীয় রকমের সংঘাতে নিউক্লিয়াসের মৌলিক অংশ সমূহ বিশ্লেষণ সংঘটনকারী। নিউট্রনের গতি প্রথম পরীক্ষা করে দেখানো হোল মোম কিংবা জলের মধ্য দিয়ে নিউট্রনকে অতিক্রম করিয়ে, যাতে স্থিতিস্থাপক সংঘাত প্রচুর পরিমাণে সম্ভব হতে পারে। নাইট্রোজেন, বোরোন্ আর লিথিয়ামই প্রধান, যাদের নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিলো, যদিও সোডিয়াম, নিয়ন্ আর আয়োডিনও পরীক্ষাকালে বেশ সন্তোষজনক ফল উদ্ভূত করেছিলো।

নিউট্রন্ সংশ্লেষণ দ্বারা সুবিধা পেয়েছে কৃত্রিম বেতার-ক্রিয়াশীলতা (artificial radioactivity) আর ট্রান্স্-ইউরেনিক মৌলিক পদার্থ সমূহ।

নিউট্রন, মেসোট্রোন্, ডিউট্রন্ প্রভৃতি কণিকাগুলোর আবিষ্কার খুব পুরোনো নয় এবং সেই হেতু এগুলো সম্বন্ধীয় জ্ঞানও এখনো খুব সীমাবেখার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ।

সার রোনাল্ড রস

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

আজো জগতের বিভিন্ন দেশে লাখো-লাখো লোকের মৃত্যু হয় একমাত্র ম্যালেরিয়ায়। ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে গ্রামের লোকদের নিত্যসঙ্গী। কত লোক দেখি এ দেশে শুধু ম্যালেরিয়ার খবর কেউ রাখে না, আর সেই সঙ্গে দেখি আমাদের দেশের লোকেদের উদাসীনতা। আবার যখন বিদেশের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাই তখন দেখি ও-দেশে লোকেরা উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল করে ফেলেছে ওদের দেশে।

আজ থেকে বেশ কয়েক যুগ আগে বিজ্ঞান-জগতে এমন এক জন বিদেশী মনীষী জন্মেছিলেন, আমাদেরই দেশে যিনি এই ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণা করে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়ে যা আবিষ্কার করে গেছেন, সারা জগৎ তাঁর সে আবিষ্কারের কাছে আজো মাথা নত ক'রে শ্রদ্ধায়।

বৃটিশ জেনারাল সার সি, সি, জি, রসের পুত্র সেই মনীষী সার রোনাল্ড রস ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে জন্মগ্রহণ করেন ভারতের অন্তর্গত আলমোড়ায়। শৈশবে প্রাথমিক বিদ্যা সমাপ্ত করার পর তিনি লণ্ডনের St, Bertholomew's Hospital Medical School-এ চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৯১ সালে ভারতে I, M, S হয়ে কাজে যোগদান ক'রে ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত কাজ করেন।

এই সময় ম্যালেরিয়া ব্যাপক ভাবে দেশে দেশে দেখা দেয় এবং সেই জন্যে তিনি ম্যালেরিয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। ম্যালেরিয়া সম্পর্কে তিনিই প্রথম গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৫ সালে আবিষ্কার করেন যে, মশাই ম্যালেরিয়া ব্যাধি ছড়ায়। তাঁর আগে শুধু জানা ছিল যে, মানুষের লাল রক্ত-কণিকায় ম্যালেরিয়া পরজীবী থাকার জন্যেই ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয় ; কিন্তু মশা কি ভাবে ম্যালেরিয়া ছড়ায় সেটা জানা ছিল না। কয়েক বছর গভীর গবেষণার পর তিনি অ্যানোফেলিস মশার পাকস্থলীতে ম্যালেরিয়া পরজীবী দেখতে পান। ক্রমে ক্রমে তিনি লক্ষ্য করেন যে, মশার লালাগ্রন্থিতে পরজীবী থাকে এবং দংশনের সময় এই জীবাণুপূর্ণ লালা নির্গত হয়ে রক্তে প্রবেশ করার ফলে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। এর পর তিনি মশার জটিল জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে আরো গভীর গবেষণা করার সময় মশার রক্তে জীব শাবক দেখতে পান এবং সেই সঙ্গে মশা কেমন করে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয় তাও অনুসন্ধানের ফলে জানতে সক্ষম হন। তাঁর এই গভীর অনুসন্ধানের ফলে মশার জটিল জীবন-বৃত্তান্ত আমাদের জ্ঞানগোচর হয়।

১৮৯৯ সালে অবসর গ্রহণের পর লিভারপুল স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পরিচালক সার আলফ্রেড জোন্স্ তাঁকে পশ্চিম-আফ্রিকায় আফ্রিকান জ্বর সম্পর্কে গবেষণার জন্যে পাঠান। এখানেও তিনি গবেষণার ফলে লক্ষ্য করেন যে, আফ্রিকান জ্বরের মূল কারণ মশা।

১৯০২ সালে সার আলফ্রেড জোন্সের পর তাঁর পদপূরণে তিনি লিভারপুলে নিমন্ত্রিত হন এবং ১৯২৩ সালে তিনি Royal Institute ও Hospital for Zropical disease-এর পরিচালক নিযুক্ত হন।

তিনি যে কয়টি তাঁর গবেষণা-সম্পর্কিত পুস্তক রচনা করেন তার মধ্যে Instruction for the Prevention of Malaria (১৯০০) Report of the Malaria Expedition (১৯০০), First Progress Report of the Campaign aginst Mouitoes in Siera Leone (১৯০১) Mosquito Brigades and how to organise them (১৯০২) ও The prevention of Malariaগুলিই প্রধান।

রস Royal Society ও Royal Society of Surgeon-এর সভ্য ছিলেন এবং Royal Society তাঁকে সম্মানজনক

[illegible]বে ভূষিত করেন। এ ছাড়া, ১৯১১ সালে ও ১৯১৪ সালে [illegible]ক্রমে তিনি K C B ও K C M G উপাধি পান। [illegible]১১ সালে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন "মশা কি ভাবে মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করায় এবং কি ভাবে ম্যালেরিয়া এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়ায় এবং এই মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গবেষণার জন্য ১৯০২ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

তিনি যে শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন তা নয়। তিনি এক জন সুলেখক।

১৯৩২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

আহার-তত্ত্ব

আপনি খেতে চাইলেন শ্লাইস করা মাংস আর পোটাটো-চিপ্‌স্‌। এইটাই আপনার প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে আপনাকে দেওয়া হল কড্‌ মাছের কাট্‌লেট। এই মাছ থেকে আপনার পুষ্টি হয়ত সমানই হ'বে। কিন্তু আপনার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হল না। আপনি চাইলেন এক, পেলেন আর এক। মনের এইটুকু অতৃপ্তিই আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।

মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে Lord Horder জিনিসটি সংক্ষেপে অথচ সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আহার্য্যবস্তুপূর্ণ প্লেটের দিকে তাকিয়ে মনে যদি স্ফূর্ত্তির উদ্রেক না হয়, তাহলে পাকস্থলীতে তার প্রতিক্রিয়া হবে প্রতিকূল। ফলে, ঐ খাদ্যবস্তু পুষ্টিকর হওয়া সত্ত্বেও পরিপাক ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা আসবে।

'বৃটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসন কমিটি' পুষ্টি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন। লর্ড হোর্ডার এই রিপোর্ট কার্য্যকরী করা বিষয়ে এসোসিয়েসনের লণ্ডন হেডকোয়ার্টার্সের প্রাসাদোপম অট্টালিকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি কমিটির চেয়ারম্যান।

রিপোর্টে বলা হয়েছে: "পাঁচ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুরা প্রয়োজনাতিরিক্ত 'ক্যালরি' পায়; পাঁচ থেকে দশ বৎসর বয়স্ক শিশুরা একমাত্র রেশন থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু পায়। কিন্তু যুবক-যুবতী, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, অন্তঃস্বত্তা স্ত্রীলোক এবং দৈহিক পরিশ্রমকারীর পক্ষে আরও অধিক পরিমাণ 'ক্যালরির' প্রয়োজন। এরা যদি গড়পড়তা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য না পায়, বা প্রচুর পরিমাণ আলু খাদ্যরূপে না পায়, তাহলে এরা অপুষ্টিজনিত বিপদের সম্মুখীন হবে।"

কমিটি মনে করেন, "পুষ্টির একটা বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে। এর গুরুত্ব সমধিক। বর্ত্তমান খাদ্যসম্ভার নীতিগত ভাবে হয়ত পর্য্যাপ্ত। কিন্তু মানুষের বিশেষ বিশেষ খাদ্য-রুচি ও প্রবৃত্তি থাকে এবং এরই ফলে উপরোক্ত খাদ্যসম্ভারও অপর্য্যাপ্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

"অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে খাদ্যদ্রব্যে অভ্যস্ত কোন জাতি কি বর্ত্তমান বৃটিশ-খাদ্যকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না? কিন্তু বৃটিশ জনসাধারণ হয়ত এর মধ্যে সমৃদ্ধিকর কিছু পাবে না।"

কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন যে, একঘেয়ে খাদ্য 'গ্যাসট্রিক আলসার' বা অন্য কোন পাকস্থলীর পীড়ার কারণ নয়। অনেকে মনে করেন যে, স্নায়বিক উত্তেজনাই এর কারণ। যুদ্ধের [illegible] আমেরিকায় বিবিধ রকমের খাদ্য খাওয়া হত, কিন্তু [illegible] গ্যাসট্রিক আলসার বর্ত্তমানে মার্কিণ ব্যবসায়ীদের একচে[illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তারেরা স্বীকার করেন যে, প্রচুর স্নেহজাতীয় খাদ্য [illegible] যারা অভ্যস্ত, ঐ বস্তুটির অভাবে তাদের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। অধিক পরিমাণে রুটি ও আলু খেয়ে এর পূরণ করা যেতে পারে, কিন্তু স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রকৃত মূল্য এতে পাওয়া যাবে না।

যে আহার্য্য-বস্তুর দর্শন মাত্রেই আপনার বিরক্তি [illegible] হয়েছে, তা আপনার পুরোপুরি ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে সক্ষম [illegible] সুতরাং শরীরে গৃহীত ক্যালরির মাত্রাও হ্রাস পাবে।

কমিটির রিপোর্টে রেশনিং ব্যবস্থাকে অত্যন্ত ক্ষতিকা[illegible] হয়েছে। কমিটি সুপারিশ করেছেন যে, "শুধু এই দেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে [illegible] গ্রহণ করতে হবে। তাহলে খাদ্য ক্রয় সম্পর্কে যত বিধি [illegible] নিষেধের অবসান করা সম্ভব হবে এবং সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর [illegible] পুষ্টির হানি আর হবে না।"

একঘেয়ে খাদ্যবস্তু গ্রহণে পরিপাক-ক্রিয়ার ওপর [illegible] প্রতিক্রিয়া যে দেখা দেয়ই, উপরন্তু বহু লোকের নৈতিক [illegible] অবনতি ঘটে।

দেখা যায়, বহু গৃহকর্ত্রী তাঁদের স্বামি-পুত্রকে খাইয়ে [illegible] নিজেদের বরাদ্দের যথাযোগ্য অংশটুকুও পান না। [illegible] অল্প আহারে তাঁদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

বাইরের লোককে খাইয়ে-দাইয়ে গৃহকর্ত্রীরা স্বাভাবিক একটা [illegible] লাভ করেন। সেদিকে এঁদের একটা বিশেষ প্রবণতা রয়েছে। [illegible] এই ঘাটতির দিনে সে গুড়েও বালি। ফলে গৃহকর্ত্রী[illegible] ইচ্ছায় বাধা পড়ায় তাঁদের অসন্তোষ ও অতৃপ্তির মাত্রা বেড়ে [illegible]।

কমিটির রিপোর্টে এদিকটারও সুন্দর আলোচনা করা [illegible]। রেস্তোরাঁতে বসিয়ে আপ্যায়িত করতে পারে, এমন লোকে[illegible] অল্প। আর তাছাড়া বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে নি[illegible] আপ্যায়িত করার মধ্যে যতটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, রেস্তোরাঁ[illegible] গ্রহণ করে তা পাওয়া সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত ছোট-খাটো [illegible] রেস্তোরাঁতে তো খাওয়ার আনন্দই আর নেই। এই [illegible] রেস্তোরাঁগুলি প্রায়ই অপরিচ্ছন্ন।

সরকারী খাদ্য-দপ্তরের কার্য্যাবলীর বিন্দুমাত্র নিন্দা [illegible] কমিটি মনে করেন যে, গত কয়েক বৎসরে মানুষের [illegible] ও প্রবৃত্তিতে কোন রকম মৌলিক পরিবর্ত্তন হয়েছে কি না, [illegible] বিশেষ প্রয়োজন। আর যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে [illegible] হবে যে, বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে আবার সে[illegible] রুচিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হ'বে কি না।

বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বেশ ক্ষতি[illegible] দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের শ্রমিকরা [illegible] রকমফের খাদ্য গ্রহণেই অভ্যস্ত ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী[illegible] বস্তুতে পরিবর্ত্তন ঘটায় তাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়ে[illegible]।

আশা করা যায়, নতুন খাদ্য-সচিব মিঃ মরিস [illegible] মেডিকেল এসোসিয়েসনের মন্তব্যগুলি বিবেচনা করবেন।

ছবির পেছনে সব সময়ে নাম ধাম ঠিকানা লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এ ধরণের প্রচুর ছবি আমাদের হাতে জমে আছে। নামহীন ছবির কোন মূল্য নেই আমাদের কাছে—তা সে যতই ভাল হোক না কেন।

আদ্যাপীঠ কালী-মন্দির

—অমরনাথ মিত্র

—সুব্রত রায়

ছবির সঙ্গে যথাযোগ্য ডাকটিকিট না থাকলে ছবি ফেরৎ দেওয়া হয় না।

শ নিষেধ (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর) —গৌরীশঙ্কর প্রসাদ

নৃত্যমান নারী

—বর্ণি২ রায়চৌধুরী

ছবি পাঠাবার সময় একটি কথা স্মরণ রাখবেন—
Enlarged ছবি পাঠালে আমাদের সুবিধা
হয়। অন্তত: পোষ্ট কার্ডের আকার। নয়তো
৬″×৮″ আকার।

কুমোরের চাকা

—অজিত ঘোষ

একক

—হেমন্তকুমার

সাঁতারু কুকুর

—কে, কে, গঙ্গোপাধ্যায়

মা ও ছেলে

, আর, সেনগুপ্ত

ঋগ্বেদ—রূপান্তর

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৫।৮৩।১—১০॥

পর্জন্য দেবতা, ভৌম আত্রি ঋষি ১,৫,৮,১০,: ত্রিষ্টুভ., ২,৩,৪ জগতী ৯, অনুষ্টুভ।

অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ
স্তুহি পর্জন্যং নমসা বিবাস।
কনিক্রদদ্-বৃষভো জীরদানূ
রেতো দধাত্যোষধীষু গর্ভম্ ॥ ১ ।

বি বৃক্ষান্ হন্ত্যুত হন্তি রক্ষসো
বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবতো—
যৎ পর্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ২ ।

রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্
আবির্দূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ-সিংহস্য স্তনথা উদীরতে
পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্য ৭

প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুৎ
উদোষধীর্জিহতে পিন্বতে স্বঃ
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে
যৎ-পর্জন্যঃ পৃথিবীং রেতসাবতি ॥ ৪

যস্য ব্রতে পৃথিবী নন্নমীতি
যস্য ব্রতে শফবজ্জর্ভুরীতি
যস্য ব্রত ওষধীর্বিশ্বরূপাঃ
স নঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ ॥ ৫ ।

দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং
প্র পিন্বত বৃষ্ণো অশ্বস্য ধারাঃ—
অর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহি
অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ ॥ ৬ ।

অভি ক্রন্দ স্তনয় গর্ভমা ধা—

উদন্বতা পরি দীয়া রথেন

দৃতিং সু কর্ষ বিষিতং ন্যঞ্চং

সমা ভবন্তূদ্বতো নিপাদাঃ ॥ ৭ ॥

মহান্তং কোশমুদচা নি ষিঞ্চ

স্যন্দন্তাং কুল্যা বিষিতাঃ পুরস্তাৎ ।

ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী ব্যুন্ধি

সুপ্রপাণং ভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

যৎ পর্জন্য কনিক্রদৎ

স্তনয়ন্ হংসি দুষ্কৃতঃ

প্রতীদং বিশ্বং মোদতে

যৎ কিং চ পৃথিব্যামধি ॥ ৯ ॥

অবর্ষীর্বর্ষমুদু ষূ গৃভায়া—

কর্ধন্বান্যত্যেতবা উ । ✽

অজীজন ওষধীর্ভোজনায় কম

উত প্রজাভ্যো ঽবিদো মনীষাম্

হে কবি, তুমি চলো—
বাণীসহচর হয়ে তুমি চলো—
বীর্যাদৃপ্ত পর্জন্যের সকাশে।
তাঁর স্তব কর, প্রার্থনা কর
পরিচরণ কর হবি-লক্ষণ অন্নে।
(ইনিই সেই পর্জন্য—
যিনি আদি-অন্ত বৈপরীত্যের তর্পয়িতা—
যিনি পরম-জেতা, যিনি জনয়িতা—
যিনি প্রার্জয়িতা,
রসের বিপুল দাতা।

Ref, যাস্কের নিরুক্ত

ইনিই সেই বর্ষণ-বৃষভ
যিনি ক্ষিপ্রদান এবং গর্জনগরিমায়
ওষধির গর্ভে গর্ভে
আহিত করেন রেতঃ ॥ ১ ॥

বিহনন করেন বৃক্ষগ্রাম
বিহনন করেন রাক্ষস
বিশ্বভূতের ইনিই ভীতি
মহান্ এঁর বধ।
বর্ষণের বিশাল স্তননে,
যখন হনন হয় দুষ্কৃতির
তখন, যারা পাপহীন
তারাও দূরে সরে যায়—শঙ্কায় ॥ ২ ॥

রথী যেমন ক্ষিপ্ত করে অশ্বদের
—কশাঘাতে
তেমনি এই পর্জন্য
ক্ষিপ্র-প্রেরণ করেন
ধারাবর্ষী তাঁর মেঘদূত।

দূর থেকে শোনা যায়
সেই সিংহনাদী মেঘ-গর্জন
যখন—
পর্জন্য আবৃত করে দেন সমস্ত অন্তরীক্ষ
বর্ষণোন্মুখ মেঘে ॥ ৩ ॥
ওঠে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা,
দিকে দিকে ছোটে বিদ্যুৎ,
আর—
ওষধিতে ওষধিতে খেলে যায়
উদ্গমন-লীলা—,
বর্ষাক্ষরা হয় অন্তরীক্ষ।
জগদ্ধিতায় সমর্থা হয়ে ওঠে ভূমি,
আহা,—যখন দেব পর্জন্য
পৃথিবীকে অভিগমন করেন
রেতসের প্রাবল্যে ॥ ৪ ॥

যাঁর ব্রতে বারংবার নত হন পৃথিবী,
যাঁর ব্রতে পূর্ত্তি পায় পদ-চারী
যাঁর ব্রতে ওষধি ধারণ করে—
—রূপের বিশ্বতা
হে পর্জন্য,—সেই তুমি দান করো আমাদের
তোমার সেই মহৎ সুখ ॥ ৫ ॥

হে মরুৎ,
বারংবার দাও
—দাও আমাদের
তোমার সেই দিব্য-দেশের বৃষ্টি
ঝরাও তোমার দিক্-ব্যাপিনী মেঘের ধারা।
গর্জমান মেঘের সঙ্গে তুমি এস
এস আমার দেশে,
সেচন-রিক্ত হোক, হে পর্জন্য
তোমার অম্ভোরাশি।
তুমি আমাদের
প্রাণ-সঞ্চারী পিতা ॥ ৬ ।

পৃথিবীর লিপ্সায়
নামুক্ তোমার হুঙ্কার
নামুক্ তোমার প্রীত-গর্জন
আধান কর গর্ভ।
বিহার করো দিকে দিকে
—সলিলবাহী রথে
তোমার ঘন-নিবদ্ধ দৃতি
অধোমুখে মুক্ত করে দাও।
উন্নত এবং অবনত
সব সমান হয়ে যাক্ ॥ ৭ ।
হে পর্জন্য,
অধোমুখে ঢেলে দাও তোমার
বিশাল জলকোশ ;
পূর্ব্বমুখে বহে যাক্ পূর্ণা নদীর প্রবাহ
ক্লিন্ন হোক্ আকাশ এবং পৃথিবী
তোমার ঘর্ষণ-মুক্ত বারি-ঘৃতে
স্বস্তি হোক্ গোধনের
শোভন জলাশয়ের কৃপায় ॥ ৮ ।
বিপুল ভৈরবে
বজ্র নির্ঘোষে
যখন হনন কর দুষ্কৃত
তখন প্রসন্নতায় মত্ত হয় বিশ্ব—
মত্ত হয়ে ওঠে পৃথিবীর যা-কিছু বাহির ॥ ৯ ।
এবার তোমার শেষ হয়েছে বর্ষণ
তুমি ক্ষান্ত হও, শান্ত হও।
জলসিক্ত হয়েছে মরুভূমি
চলার পথ করেছ সুগম।
জীবনের জন্য, ভোগের জন্য
ওষধির গর্ভে গর্ভে
সঞ্চার করেছ জন্ম।
এবং হে পর্জন্য, তুমি—
প্রজাদের কাছ থেকে অন্ত লাভ করে
স্তোত্র-সঙ্গীত ॥ ১০ ।

BENGALI

কেশের শ্রী রূপপ্রসাধনের প্রধান অঙ্গ

তাই কেশপরিচর্য্যার নব নব ধারা ও উপাদান সৃষ্টিতে কোন দিন মানুষ ক্লান্তি বোধ করে নি।

গত সত্তর বছর ধরে সারা ভারতে নানা রুচির নানা ধারার কেশপরিচর্য্যায় তৃপ্তি দিয়ে জবাকুসুম আজ অর্জ্জন করছে মহাকালের জয়তিলক।

আমাদের দেশে ধূলাবালির প্রাচুর্য্যের জন্য চুলের গোড়ায় ময়লা জমে। প্রখর আবহাওয়ায় মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি সহজেই তপ্ত হয়। এ কারণেই চুলের স্বাভাবিক শ্রী ও পুষ্টি নষ্ট হয়।

আয়ুর্বেদীয় জবাকুসুম এমন ভেষজ উপাদানের সুমিশ্রণে প্রস্তুত যে অতি সহজেই সব ময়লা পরিষ্কার করে দিয়ে গোড়াগুলিকে শক্ত ও পুষ্ট করে তোলে। এর স্নিগ্ধ স্পর্শে মস্তিষ্ক শীতল হয়।

জবাকুসুম নিত্যব্যবহার করলে সুগন্ধে মন ভরে উঠবে, গুচ্ছে গুচ্ছে জেগে উঠবে বনানীর অপরূপ চিকণ শ্রী, চেহারায় ফুটে উঠবে ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা।

সত্তর বছরের সুনামে সমৃদ্ধ

জবাকুসুম

কেশের শ্রী ফুটিয়ে তোলে-মস্তিষ্ক শীতল রাখে

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস-কালিকাতা
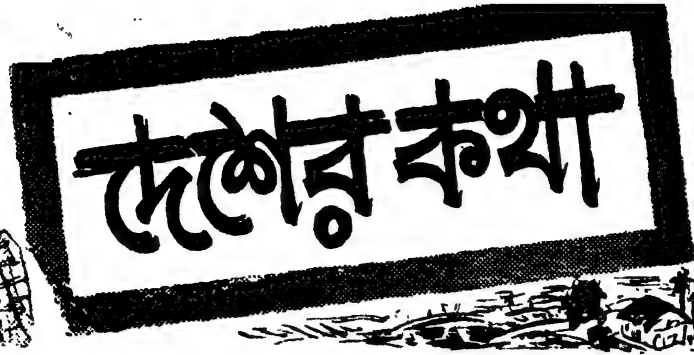
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'নীহার' প্রকাশ করিতেছেন : "পশ্চিম-বঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু শরণার্থীদের পুনর্ব্বসতির জন্য মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, হাওড়া, গড়িয়া, জলপাইগুড়ী, শিলিগুড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষি জমি, বসতি ভূমি ও নির্ম্মিত বাসগৃহাদি প্রদানের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, বহু ক্ষেত্রে বর্ত্তমান তাহার কার্য্যারম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই পরিকল্পনাগুলিকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা :—(১) জমি উন্নয়ন আইন অনুযায়ী জমি দখল এবং জমির উন্নতি বিধানের পর উহা শরণার্থী পরিবারকে বণ্টন, (২) খাসমহালের অন্তর্ভুক্ত জমি উন্নয়ন ও উহা উদ্বাস্তু-পরিবারদের মধ্যে বণ্টন, (৩) জমিদারের সহিত যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া অথবা সমবায় সমিতি মারফৎ জমি দখলে সাহায্য করা। উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী এ পর্য্যন্ত উক্ত সমূহ স্থলে যে বণ্টন-কার্য্য চলিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উন্নয়ন আইনানুসারে ১৬৩৫ প্লট কৃষি জমি, ৮২৫৭ প্লট গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী ভূমি বণ্টন করা হইয়াছে। খাসমহালের অন্তর্গত ২০৮০ একর জমি শরণার্থী-পরিবারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অথবা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২১,৪০০ প্লট কৃষি জমি এবং ৪৫০ প্লট গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী ভূমি বণ্টন করা হইয়াছে। এইরূপে মোট ২৪,১৪৫ একর জমি উদ্বাস্তু-পরিবারদের দেওয়া হইয়াছে। জমি উন্নয়ন আইনানুসারে ১১,২১২ একর জমি দখল করা হইয়াছে। উহার উন্নতি বিধান কার্য্য শেষ হইলে ৩০১০ প্লট কৃষি জমি এবং ৩০৩১ প্লট গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী জমি পাওয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্য মেদিনীপুর জেলায় ১০০ এবং ১০০০ প্লট জমি গৃহীত ও ১২০টি গৃহ নির্ম্মিত ও বণ্টন করা হইয়াছে। এ ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষাধিক বাস্তুহারার বসবাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত সমূহ স্থলে ১২০০০ কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছেন।"

*　　*　　*　　*

'মুক্তি' বলিতেছেন : "গান্ধী-ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ কম। তাহাদের নিকট এ বিষয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই যাওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্যবসায়ী শিল্পপতি ও পুঁজিপতির অর্থের পরিমাণই যদি অধিক না হয় তবে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা হইবে। গান্ধী-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা দেখিয়াছি যে, ডিষ্ট্রিক্ট সাপ্লাই অফিসার, এস ডি, ও প্রভৃতি যাহাদের সহিত লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদের বাধ্য-বাধকতা আছে তাহারাই বহু ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তি অর্থ দান করিয়াছে তাহারা এস, ডি, ও, ডি, এস, ... কবিবার চেষ্টায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সুবিধা পাইবার আশায় জোর করিয়া বা চাপ দিয়া আদায় করিবার যে সমস্ত ... ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহারও ব... দেশময় ছড়াইয়া আছে।"

*　　*　　*　　*

'সাধারণতন্ত্রী'র মন্তব্য : "এত কাল পরে ভারত সরকার ... করেছেন, আগামী গ্রীষ্মে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ... শাসন-ক্ষমতা পাবার পর দীর্ঘ চার বছর কাটিয়ে অবশেষে এই ... মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—'তা হোলে কি নির্বাচনের পথ ... করবার জন্যই, নির্বাচন-যুদ্ধে জয়যুক্ত হবার জন্যই কংগ্রেসে ... শাসনদণ্ডের সাহায্যে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে দলন করতে ... সময় নিলেন ? বহু মাস যাবৎই তো দেখছি, ভারতের বৃহত্তর ... দল কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী, হাজার হাজার নরনারী ... বন্দী অথচ এঁদের বিরুদ্ধে কি যে অভিযোগ তা দেশবাসী ... আদালতে বিচারপ্রার্থী হবার সুযোগ থেকেও এঁরা ... সরকার এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন সেই সরকার ... শাস্তি দিয়েছেন। ন্যায়ানুমোদিত বিচার বিভাগ ... তাঁদের হাতে এঁদের বিচারের ভার দেওয়া হয়নি। ... এমন কি উচ্চ আদালত কর্ত্তৃক কোন কোন ব্যক্তিকে ... আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের গ্রেপ্তার করে আটক ... এঁদের মুক্তির জন্য দেশবাসীও বহু আন্দোলন করেছে, ... তাতে কর্ণপাত করেননি। এ সব দেখে কি মনে হয় না ... কার্য্যের পিছনে শাসনকারী নেতাদের নিশ্চয়ই কোন ... তারপর, সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ... সমান অধিকার ও সুযোগ পাবে না। দিনের পর দিন ... চলেছে তা থেকেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। স্বাধীন ... মত প্রকাশ কর, স্বাধীন ভাবে যদি সমালোচনা কর, ... কাকেও ভোট দিতে যাও, অমনি তুরেক রকম নিরাপত্তা ... যে-কোন একটির সাহায্যে তোমার হাতে শেকল ... হবে।'

*　　*　　*

'আসানসোল-হিতৈষী' কথায় :—"২৫শে ... জন্মোৎসব অনুষ্ঠান আমাদের একটি জাতীয় ...

—সাহিত্যিক পর্ব্বদিন হিসাবেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। উপলক্ষে এই যে সাহিত্য সভার আয়োজন হয়, বারোয়ারী পূজার অনুকরণেই হইয়া থাকে—সেখানে সাহিত্য হইয়া "জলসা" অর্থাৎ নাচ, গান, আবৃত্তিই (এই আবৃত্তিও পর্য্যায়ে পৌঁছায়) প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। এই সভায় যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারাও যে সাহিত্য ঐরূপ হাল্কা নাচ-গানের অনুরাগী বেশী এ কথাও অস্বীকার না। কাজেই এইরূপ সভায় যে দুই-একটি সারবান পাঠ হয়, তাহা পাঠকের আত্মতৃপ্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। আজ ধর্ম্ম গিয়াছে, আত্ম-সম্মান নাই, মস্তিষ্ক শূন্য, চেতনা অনুভূতিহীন, তাই এই সব সভায় কোনও সুফল করে না। আমরা যা পাইতে পারি এই অনুষ্ঠানে সেই পরম কিছুই লাভ হয় না। দেশ মরিতে বসিয়াছে—তবু নাই, আর তাহার উপলক্ষেরও অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথ , তাঁহার নামটি ত আছে? সেই নামটাকেই লইয়া এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা ও আমোদ-প্রমোদ মত্ত কাজে ।"

* * * *

মেদিনীপুর হিতৈষী'র আক্ষেপ: "দিকে দিকে কলেরা, বসন্ত, অতিসার! জ্বর ও নিউমোনিয়ার আধিক্য সারা বঙ্গ সহরে সহর নালা-নর্দ্দমা ও পাইখানার দুর্গন্ধে জন- যমাগারে পরিণত! দয়াহীনতায় মানুষ পশুাধম হয়! -মারা ভেজাল চালাইতে লোকে আদৌ দ্বিধাবোধ করে পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে সহরে নানা রোগের আকর ন্যায় দেখা দেয়। মেদিনীপুরে কলেরার পর বসন্ত -লাভ করিতেছে! সহরের বায়ু নানা দুর্গন্ধ পদার্থ হইয়া উঠিতেছে! মশায় মেদিনীপুরে দিবসেও বসা সিক্ত জল-হাওয়ার বিষে! ট্যাক্স আদায় অব্যাহতই যে জন্য ট্যাক্স, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন চিহ্নই তাহার করে না—সুতরাং মৃত্যু হইতেও তাহাদের অব্যাহতি ছাড়িয়া পলাইলেই যেন ছাড়িয়া বাঁচে! থাকিলে মানুষ যে পিশাচ হয়, তাহা না বলিলেও চলে। প্রতি রাস্তায়, অলিতে-গলিতে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত শিক্ষিতগণ কেন নীরবে এ যন্ত্রণা সহ্য করেন? কোন ব্যবস্থা নাই?"

* * *

লিখিয়াছেন: "পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের সদর দপ্তর রাইটার্স টাপিওকা হইতে প্রস্তুত নানা প্রকারের খাদ্যদ্রব্য করা হইয়াছে। ট্যাপিওকা ত্রিবাঙ্কুরের অন্যতম প্রধান খাদ্য। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের কৃষি- শ্রেণী কথা প্রসঙ্গে ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশের বলেন যে, সেই সময়ে ত্রিবাঙ্কুরেও দুর্ভিক্ষ হাজার হাজার লোক এই ট্যাপিওকা আহার করেন। খাদ্য হিসাবে দেখা গিয়াছে ট্যাপিওকা বেশি খাদ্যপ্রাণ-সমন্বিত। বাংলা দেশে ইহার প্রচলন আজও না হইলেও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সেন এই বলিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, এক দিন না এক দিন ইহা বাঙালীর প্রিয়খাদ্য হইয়া উঠিবে। খাদ্য সম্বন্ধে বাঙালীর অভ্যাস যেরূপ অদ্ভুত তাহাতে এই আশা কোন দিন পূর্ণ হইবে কি না বলিতে পারি না। অবশ্য উপায়ান্তর না দেখিয়া খাদ্যের ব্যাপারে অনেক কিছু অসুবিধাই বাঙালীকে সহ্য করিতে হইতেছে, কিন্তু তথাপি রন্ধনের প্রণালী পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গ অধিবাসীদের এই জন্য অনেক ক্ষতি হইতেছে। বহু রন্ধনীয় উপকরণের মধ্যে ভেজাল আছে জানা সত্ত্বেও মুখরোচক আস্বাদের লোভে আমরা পুরাতন রন্ধনের প্রণালী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। এই রন্ধনের প্রণালী এবং বিশেষ বিশেষ অপ্রয়োজনীয় রন্ধন দ্রব্যের প্রতি আসক্তি ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে না পারিলে আরো কতো দুর্ভোগ ভাগ্যে আছে তাহা বলা শক্ত।"

* * *

দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে 'ত্রিস্রোতা'র মন্তব্য: "স্থানীয় বাজারে খাদ্য-দ্রব্যের অগ্নিমূল্য চলিয়াছে। মাছ তরি-তরকারী ইত্যাদি পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী অথবা দূরবর্ত্তী বহু জেলা হইতে এখানে চালান হইয়া আসিত। এখন লোক আসিতেছে অথচ খাদ্যদ্রব্য আসিতেছে না। যাহারা রেলযোগে মাল আমদানী করিতেছে, বিক্রয়ের সময় বিমানের মাশুল আদায় করিতেও তাহারা ইতস্ততঃ করিতেছে না। অবশ্য বিমানযোগে যে মাল আসিতেছে না তাহা নহে। পান হইতে আরম্ভ করিয়া মাটির হাড়ি-পাতিলও বিমানে চড়িয়া এখানে আসিতেছে। সুতরাং এই মেহনতের মাশুল, বিমান কোম্পানীর মালের ভাড়া, ব্যবসায়ীর লাভের পরিমাণ সকল মিলাইয়া দ্রব্যের যে মূল্য দাঁড়ায় তাহা অগ্নিমূল্য না হইয়া আর উপায় কি? এই মূল্যের জন্য সাধারণ লোক নিত্য প্রয়োজনীয় বহু খাদ্যই বর্জ্জন করিয়াছে কিম্বা প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবহার কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষ নিরুপায়। কারণ আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু দ্রব্যমূল্যের কোন সীমারেখা নাই। আজ যাহা এক আনায় বাজারে বিক্রয় হইতেছে কালই তাহা এক টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। ইহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। বাজার হইতে জিনিষ একবার কয়েক দিনের জন্য সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই হয়। তার পর ধাপে ধাপে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জিনিসের দর বাড়িতে থাকে। এমন জিনিষ এই ভাবে অদৃশ্য করা হয় যাহা না কিনিয়া মানুষের উপায় নাই অর্থাৎ যাহা মানুষের নিত্য প্রয়োজনে লাগে।"

* * *

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কারণ 'নির্ণয়'-এর মতে: "বাংলার দুই জন মন্ত্রীর পদত্যাগের পরও কেন যে তিনি পুনরায় বাংলা দেশ হইতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাবে নিজের কথাই বলিয়াছেন যে, কর্ত্তব্যবোধের অনুরোধে জাতির অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে মঙ্গলের আশা লইয়াই তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত বিশ্বাস বৃথাই নিজেকে বাস্তববাদী বলিয়া অভিহিত করেন নাই। তাঁহার বিবৃতির মধ্যে এই বাস্তবতার সুর সমধিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দিল্লী চুক্তির

...য এমন কয়েকটি অংশের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা অত্যন্ত ...ৎপর্য্যমূলক এবং ভবিষ্যতের বহু সমস্যা সমাধানের পক্ষে ...হায়ক। এক স্বাধীন দেশের এক জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অপর এক ...ধীন দেশে কাজ করিবেন—ইহা শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে আজও ...র্লভ। দিল্লী চুক্তিতে ইহাও সম্ভব হইয়াছে।"

* * * *

'গণ-সমাজ'-এ প্রকাশ: "খাগড়া ডাকঘরের কাজের চাপ বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ডাক-বিভাগ নিজেদের বেলা ঘড়ি ঘণ্টা ধরিয়া চলে, আর জনসাধারণের বৃথা সময় নষ্টের কারণ দূর করিবার চেষ্টা করে না। আমরা শুনিয়াছি যে, খাগড়ার জনসাধারণের পক্ষ হইতে খাগড়া ডাকঘরে লোক দিয়া জনসাধারণের কষ্ট লাঘব করার জন্য এক আবেদন কলিকাতার বড় কর্ত্তাকে পাঠান হইয়াছে এবং সেখান হইতে প্রস্তাব বিবেচনাধীন রহিয়া খবর আসিয়াছে। আরও শুনিলাম, স্থানীয় ডাক-বিভাগের কর্ত্তা ও উপকর্ত্তার দল লোক বাড়াইবার বিরোধিতা করিতেছেন। কারণ, আরও কেরাণী বাড়াইলে খাগড়া ডাকঘরের গ্রেড্ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোষ্ট-মাষ্টারেরও বেতন বাড়াইতে হইবে। আমাদের প্রস্তাব, ডাকঘরের লোক বাড়াইয়া জনসাধারণের অসুবিধা দূর করা হউক এবং যে সমস্ত উপকর্ত্তার—পোষ্ট-মাষ্টারের বেতন বৃদ্ধির জন্য শিরঃপীড়া হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে আরো উচ্চপদ দেওয়া হউক। কারণ, তাঁহারাই ডাক-বিভাগের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী।"

* * * *

'বঙ্গবাণীর' মতে: "ইংরাজী আমলে শ্বেত প্রভুদের গাত্রচর্ম্মের কৌলীন্য বজায় রাখিবার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ "ইউরোপীয়ান" ও "ইণ্ডিয়ান" নামে দুইটি পৃথক্ ইন্‌ষ্টিটিউটের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রেলের সকল বড় বড় কেন্দ্রেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল এবং দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, আজও চলিতেছে। ইণ্ডিয়ান এই কথাটির মধ্যে যে একটু অবজ্ঞা-মিশ্রিত হীনতার ভাবও জড়িত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালে তথাকথিত টম, হ্যারি, জন প্রভৃতি আংলো-ইণ্ডিয়ান ট্যাঁসের দলও "ইউরোপীয়ান" ইন্‌ষ্টিটিউটের মেম্বার হইয়া ভরিয়া যাইতেছিল। তাঁহারা নিজেদের "ইণ্ডিয়ান" বলিতে নারাজ ছিলেন। স্বাধীন ভারতে "ইণ্ডিয়ান" মার্কা দিয়া কোন প্রতিষ্ঠানকে পৃথক করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা আছে কি? উহা কি জাতীয়তাবোধের মর্য্যাদা-হানিকর ও জাতির পক্ষে চরম লজ্জাজনক নহে? ভারতে আজ সকলেই "ইণ্ডিয়ান"; যাহারা ইণ্ডিয়ান নহে তাহারা বিদেশীয় বা foreigner. ভারতীয়ের কোন অধিকার তাহাদিগের নাই। তথাকথিত টম, হ্যারি, জনের দলও আজ "ইণ্ডিয়ান"। সুতরাং "ইণ্ডিয়ান" ইন্‌ষ্টিটিউট নামে বর্ত্তমানে কোন প্রতিষ্ঠান থাকা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, বিসদৃশ ও জাতীয় মর্য্যাদার ক্ষতিকর।"

* * * *

'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রিকায় উদ্বাস্তু সমস্যার বিষয়ে মন্তব্য করা [illegible]

সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য নানা দিকে নানারূপ চে... করিতেছেন; এবং অজস্র অর্থও ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক রকম সমালোচনা করেন। এই সকল সমালোচকদের মধ্যে কেহ কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা প্র... করিয়াছেন কি না এবং উহা আমাদের প্রধান মন্ত্রীর নিকট ...শ করিয়াছেন কি না জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে, আমরা সমালোচনা করিতে যেমন পটু, আসল কাজের বেলায় ঠিক তেমনি পশ্চাদ্‌পদ। কাঁচড়াপাড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনের উদ্বাস্তুগণের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা আমরা শুনিয়াছি; তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা আমরা দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কৃষকশ্রেণীভুক্ত অনেকের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছে। সাধারণতঃ তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা পাইলে কৃষিকার্য্য করিতে এখনি প্রস্তুত আছেন। পশ্চিম-বঙ্গে চাষের উপযুক্ত অনাবাদী জমির পরিমাণ কম নহে; প্রত্যেক গ্রামেই কিছু না কিছু পরিমাণ এইরূপ অনাবাদী জমি আছে। কোন্ কোন্ গ্রামে কি কি কারণে কি পরিমাণ অনাবাদী জমি আছে এবং উহাদের মালিকগণের নাম-ঠিকানা সহ কোন বিবরণ বা তালিকা সরকার কর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে কি না জানি না। যদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মালিকগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ গড়ে ৩০।৪০ জন কৃষক-পরিবারকে পুনঃস্থাপিত করা যাইতে পারে; আমাদের নিজের এলাকার অবস্থা ও কথা সম্মুখে রাখিয়াই এই কথা লিখিতেছি। এই ব্যবস্থায় গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও উন্নতি হইবে; এবং খাদ্য উৎপাদনও বাড়িবে। উদ্বাস্তুগণকে জমি বিলি সম্বন্ধে হয়ত আইনতঃ অনেক বাধা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের সময় জমি সংগ্রহ ব্যাপারে কোন বাধাই বাধা বলিয়া গণ্য হয় নাই। উদ্বাস্তুগণের সমস্যা অপেক্ষা যুদ্ধ সমস্যা বেশী না হইলেও কম নহে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নূতন জরুরী আইন জারি করিয়া বাধা হয়ত দূর করা যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক জমির মালিকগণের সহিত আপোষেও বন্দোবস্ত করা অসম্ভব নয়।"

* * * *

'প্রদীপে' প্রকাশ: পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এক ...নাটে সরকারী ডাক্তারদের ফিসের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দি...ন। যাতায়াতের ব্যয় উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা রোগীকে বহন ...রিতে হইবে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি সার্জ্জন ও অনুরূপ ম... সার্জ্জনগণ রোগীর বাড়ীতে ২৪৲ এবং চেম্বারে ১৬৲। ...স্থলে ও কলিকাতায়:—সিভিল সার্জ্জনগণ ৮৲, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জ... ৪৲ সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনগণ ২৲। রাত্রিতে ৮টা হইতে ...টার মধ্যে ফিসের হার উহার ডবল হইবে। সরকারী ডাক্তারগণ তাঁহাদের হাসপাতালে কর্ত্তব্যের সময় ছাড়া অন্য সময়ে চেম্বারে অথবা রোগীর বাড়ীতে গিয়া রোগী দেখার জন্য বাহিরের রোগীদের নিকট হইতে উপরোক্ত হারের অতিরিক্ত ফিস লইতে পারিবেন না। ...কারী ডাক্তারদের বাহিরের রোগীদিগকে হাসপাতাল হইতে ...মূল্যে ঔষধপত্র ইত্যাদি দেওয়া হইবে না। রোগীরা স্বেচ্ছায় দিলেও সরকারী ডাক্তারগণ নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত ফি... হইতে পারিবেন না।"

নীলকুঠির ময়না

তারানাথ রায়

দুই

চোটটা লেগেছিল বেশী মাথায়। ভোরের হাওয়া জাফ্‌ফা চৌকীদারের মুখে, কপালে হাত বুলিয়ে যায়। চোখ মেলে দেখে, বল্লমটা হাতেই আছে। দু'গজ দূরে পড়ে কাল কাপড়টার সেই-এক-জন—এতক্ষণে হয়ত প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

উঠতে চেষ্টা করে। কাঁধটা ফুলে গেছে। পিঠটাও টন-টন ... দুষমন!

ওঠে। এক পা দু'পা এগিয়ে দু'হাত দিয়ে সামনের কাপড়টা ... দেখতে চায়। বেচারা যেই হোক গুলীতে ত ঘায়েল হয়েছে— ...নিবার গুলী! সামনে সয়তান, পেছনে সয়তান। সহানুভূতি ... উপর। ধীরে ধীরে মোটা কাপড়টার একধার উঠিয়ে দেখতে চায়।

... কি! কেউ নেই ত! গেল কোথায়?

...গুলীতে ঘায়েল মানুষটা বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল?

জাফ্‌ফা চোখ কচলায়, মাথা চুলকোয়। চুলকোতে গিয়ে দেখে ... একেবারে ছোঁয়া যায় না। কিন্তু ভাবে—গেল কোথায়?

একবার ফিরে ডিক সাহেবের বাংলোর দিকে তাকায়। এক ... দু'পা করে ফিরে গিয়ে দাওয়ায় বসে।

ক্রমে রোদ ওঠে। রাতের কথা নিয়ে জাফ্‌ফা সাত-পাঁচ ভাবে। ... পেল্লায় বড় সিন্দুকটা হিঁচড়ে নিয়ে গেছে মেঝের বুকে আঁচড় ... সামনের বাগিচার মেহেদি বেড়া আর ফুল-বাগিচার যুঁই ঝাপটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ভারী সিন্দুকটাকে টেনে নিয়ে গেছে। ... দেখেছে, ইজারদি মাতলা, খোদা মল্লিক, কোলগঞ্জ থানার ছোট দারোগা তাজু মিঞা—আর গোমিশ—হাঁ, নিশ্চয় গোমিশ সাহেব।...

কামিলারা কুঠিতে আসতে সুরু করেছে। রতন আর দুর্গী কুঠিতে ... কুটতে চলেছে। দোলাই-গায়ে দুর্গীর ছাওয়ালটা কুনকী ভরা ... চিবুতে চিবুতে চলেছে। জাফ্‌ফা হাতছানি দিয়ে ডাকে।

... এসে চার দিকটা একবার ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে।

—কি বলছ?

—পথেই ত রায় মশায়ের বাড়ী, একটু বলে যা না, ডিক ... বাংলায় তড়িঘড়ি চলে আসে।

... ভয় পায়। থানাদারের বরকন্দাজ জগমন্ত রায়ের নাম শুনে ... গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বলে—দেরী হয়ে যাবে, কুঠিতে ... হাজির যেতে হবে।

চৌকীদার বিড়-বিড় করে। ওদের গালাগালি দেয়। ওরা ...য়। যেতে যেতে ভয়ে ভয়ে ফিরে ফিরে তাকায়। দু'জনা খুব ... কি সব বলতে বলতে ছুটে চলে। ছেলেটা তেমনি মুড়ি ... চিবুতে দৌড়াতে দৌড়াতে পিছু নেয়।

চৌকীদার বসে থাকে, আর থানাদারের মুণ্ডপাত করে। উঠে ... কুঠির দিকে যায়।

...ঠির কাজ সে দিনও বন্ধ। নীলের ভাটগুলোর নিচে আগুন ... ঢেঁকিশালার ঢেঁকিগুলো সুরকির গেরুয়া মেখে চুপটি ... আছে।

...র জনের সঙ্গে দেখা হয়। চাপা-গলায় তারা ডিক ... খোঁজ পাওয়া গেল কি না জিজ্ঞেস করে। চৌকীদার মাথা ... কুঠির মালখানার দিকটায় একটা কি গোল হয়েছে। ... মালখানা, দোরে দোরে বরকন্দাজ লাঠী হাতে পাহারা ... তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দফাদারের কাছে ...

আনিয়েছিল। এত হাতিয়ার যে মাল-গুদামে ধরেনি, অনেক শড়কি, অনেক লাঠী দশ গাঁয়ের মুসলমান পাড়ায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। গেল জুম্মা বারে জাফ্‌ফা খোদা থানায় একটা চাপা আলোচনাও শুনেছে যে, আংরেজদের সঙ্গে কি একটা বুঝা-পড়া হবে। খোদা থানায় এক ফকীর তাদের বলেছিল, মক্কা সরিফ থেকে হুকুম নিয়ে এসেছে বাদুড়ের পীর, তাঁর ফাতোয়া—কর্জ দিয়ে সুদ নেবে না, মহরমে ডঙ্কা পিটবে না, কাছা দিয়ে কাপড় পরবে না; আর দাড়ী রাখা ফরজ। জাফ্‌ফাকেও দাড়ী রাখতে হয়েছিল। বেহেস্তের লোভ যে তার ছিল না তা নয়, কিন্তু এ কথা সে বুঝেই উঠতে পারেনি আংরেজের কামান-বন্দুকের সঙ্গে লাঠী আর শড়কি নিয়ে কি করে বাদুড়ের পীর লড়বে। আর সাহেব সুমুদ্দিরা না হয় সয়তান হল, হিন্দু-কত্তাবাবুরা, যাদের খেয়ে পরে চোদ্দ পুরুষ বাঁচল, তারা কি করে হ'ল দুষমন!

পিঠটা বড্ড টনটন্ করছে। কেটে বুঝি গেছে। মাথাটাও ঝিমঝিম করছে।

ঐ ত নবাই শেখ, তার ফুফাত ভাই। জাফ্‌ফা তাকে ডাকে। বলে, দেখ্‌ ত ভাই, শালারা পিঠের কি হাল করেছে। নবাই বলে, ঘরে যা ভাই। এখানে দাঁড়াস্‌ নে, মালখানার হাল দেখ্‌ছিস্‌ নে—পরশু রাতে কোন মতে বেঁচেছে, কিন্তু কাল রাতে যা ছিল সন্ন্যেসীর দল সব এসে ফাঁক করে নিয়ে গেছে। কেশবপুরে খবর দিতে যাচ্ছি, তুই ভাই ঘরে যা।

সত্যি সে আর চলতে পারে না। টলতে টলতে এগিয়ে চলে বল্লমটাতে ভর করে। পিঠের টাটানি জান কাবেজ করে ফেলছে। ক্ষিদেয় আঁতগুলোকে কামড়াচ্ছে। জাফ্‌ফা এক পা দু'পা করে ঘর চলে। সাত বিঘের মাঠ পেরোলেই জোড়া তাল গাছওয়ালা তার বাড়ী—সিকি দণ্ডও লাগে না যেতে।

ঘরে ঢুকেই জাফ্‌ফা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। চৌকীদারকে ঘরে ফিরতে দেখে ঘুঁটে দিতে দিতে বৌ ছুটে এসে চোখ দুটো ডাগর করে কাঁথা মুড়ি দেওয়া মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে। বলে—শুলে যে!

—চোট!

চোট! ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ফতিমা কাঁথা তুলে চোট দেখে। আর কপালে করাঘাত করে ডুকরে কেঁদে পাড়া মাৎ করে। কাঁদতে কাঁদতেই এক নিমিষে চুণ আর হলুদ বেঁটে এনে মাথায় পিঠে আর কাঁধে দিয়ে কাছে বসে অনিশ্চিত আঘাতকারীদের পুরুষান্ত করে। জাফ্‌কা বলে, চুপ, চুপ।

বলি, চুপ, কেন? শুনি! পৈ-পৈ সে চৌকীদারকে বারণ করেছে, তুই বাপু চৌকীদারী করে কোন মতে দিন গুজরান করিস্‌, তোর অত-শতে কাজ কি? বলে কি না, বাদশাহী ফিরে আসুচে! আসুচে ত তোর কি? তোর ভাঙ্গা চালার উপর কি পাকা বাড়ী হবে, না, শানকি সোনা-রূপোর হবে! বাবুদের বাড়ী ধান ভেনে যে ক্ষুদকুঁড়ো পাই, তারও পথ বন্ধ হবে আর কি।

কোন চুলোয় গিয়েছিল ? চৌকীদার তেমনি কাঁথা মুড়ি দিয়ে চুপটি করে পড়ে থাকে। বৌ তেমনি বকে যায়। হঠাৎ মনে পড়ে, মিনসের কাল চোপর দিন-রাত পেটে দানা পড়েনি।

বলে—ওগো শুনচ !

রা কাড়ে না। গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিতে গিয়ে দেখে গা পুড়ে যাচ্ছে। বলে—পানি !

লোটা ভরে জল এনে যত্ন করে খাওয়ায়। হঠাৎ—পেছনে কে এসে দাঁড়ায়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাল কাপড়ে ঢাকা দু'টো চোখ !

নজর পড়তেই ভয়ে বৌ সোয়ামীর দিকে সরে যায়। ফিস-ফিস করে চৌকীদারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—নয়না !

নীলকুঠির নয়না ! সাঁজ-সকালেই ত তাকে দেখতে পাওয়া যায়—এখানে ওখানে সেখানে। কোন কোন দিন দূরে ঐ ঠগবগের মাঠের ভাঙ্গা কালী-মন্দিরে মাথা কোটে আর ডুকরে ডুকরে কাঁদে। জ্বরে গা হা-হা করছে। চৌকীদার অতিকষ্টে কাঁথা সরিয়ে চোখ খোলে—চোখ দু'টো কপালে উঠে যায়, কপাল থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। আতঙ্কে ঠোঁট দু'টো খুলে যায়। শ্বাস ঘন হয়ে আসে। গলা থেকে একটা চীৎকার বেরোতে চায়, বেরোয় না।

কাল মূর্ত্তিটা ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চায়। কয় জন পালোয়ান গোছের লোক ঘরে ঢোকে। একটির পর একটি, তার পর একটি। তারা চৌকীদারকে কাঁথা সমেত কাঁধে ফেলে বেরিয়ে চলে যায়। বৌ সোয়ামীর কাঁথাটা চেপে ধরতে চেষ্টা করে ; কিন্তু ওদের হ্যাচকা টানে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। লোটার কাণাটা লেগে কপাল যায় কেটে। মুখ যখন তোলে তখন দেখে—কেউ নেই ! কাঁথা নেই, চৌকীদার নেই। কাল মূর্ত্তিটা শুধু সামনে দাঁড়িয়ে। কাল টানা-টানা চোখ দু'টি তার দিকে খালি চেয়ে থাকে। তার পর তার হাত দু'খানি ধরে আদর করে। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত সে তার পেছন পেছন চলে যায়।

তিন

দিন-কাল তখন ভাল ছিল না। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে জনসাধারণ তখন ক্ষেপে উঠেছিল।

বাংলার হিন্দু জমিদারদের উচ্ছেদ করবার জন্যেই নীলকররা সেদিন ষড়যন্ত্র করেছিল। নীলের সাহেবরা এক একটি করে জমিদারীর পত্তনী বা ইজারা নিচ্ছিল। দেশের জমিদার ও প্রজায় যে সম্পর্ক ছিল, তা ক্রমে লোপ পাচ্ছিল, মাটির সঙ্গে মা-বোনের ইজ্জত পর্য্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে বাংলার চাষী জনসাধারণকে সেদিন বাস্তহারা "বুনা" কুলী সাজতে হয়েছিল। হিন্দু জমিদাররা ক্রমে বুঝতে পারছিলেন, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাদের নেতৃত্ব লোপ করে হিন্দুর সংস্কৃতি ও গ্রাম্য সমাজতন্ত্র ভেঙ্গে দেবার জন্যে পাদরীদের সহায়তা করছে প্ল্যাণ্টাররা।

দুই পুরুষ প্রজার উপর যে অত্যাচার চলছিল, তা আর সইতে পারছিল না—যেমন রায়তরা, তেমনি জমিদাররাও। কাজেই প্রজা-বিদ্রোহ সেদিন আসন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই ফিরিঙ্গী সয়তানদের সায়েস্তা করবার জন্যে রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী বাবুদের মত কালীনাথ বাবুকেও নীলকুঠির পত্তন করতে হয়েছিল। চার মাইল দূরে টমসনের কুঠি। টমসন নদীয়ার পাঁচ পাঁচটা কুঠির মালিক। মালিক বুড়ো টমসন থাকে কলকাতায়। তার ছেলে ছোট টমসন কেশবপুরের কুঠি। জন এণ্ড রবার্ট ওয়াটসন তার মালিক, তারাও থাকে কলকাতায়। কালীনাথ বাবু এদের কাউকেই গ্রাহ্য করেন না।

স্বর্গীয় পিতামহ ও পিতা ঠাকুর তাঁকে তাঁদের পা ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, নীলা ফিরিঙ্গীদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে দেশময় যদি আগুন জ্বালাতে হয় তাও তাকে করতে হবে। তাঁরা বলে ছিলেন—ওরা আমাদের মা-বোনের ইজ্জৎ নষ্ট করছে, আমাদের ঘর ভেঙ্গেছে, জমি লুঠছে, আমাদের শিল্প ও সমাজ নষ্ট করতে বসেছে—বেঁচে থেকে যে তাঁরা এ সবের শোধ নিতে পারলেন না, কালীনাথ যেন এ কথা না ভুলে যান।

কালীনাথ ভোলেননি সেকথা। বিশ্বনাথ বাবু, তাঁর সহযোগ মঘা, কৃষ্ণ সর্দ্দার, নরদা সন্ন্যাসীকে নিয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে যেমন অভিযান চালিয়েছিলেন, তেমন অত্যাচারিত দরিদ্র জনসাধারণের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবার ভারও গ্রহণ করেছিলেন। পিতা ঠাকুরের মুখে শুনেছিলেন, ইনডিগো কনসার্ণের ফ্যাডি সাহেবের বাংলো সেদিন বিশ্বনাথ বাবু রায়তদের নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন, ফ্যাডি সেদিন রাতের অন্ধকারে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে পুকুরে আত্মগোপন করেছিল। অনুচর রায়তরা সাহেবকে ধরে নিয়ে এসে কেটে ফেলবার জন্য তলোয়ার ওঠাতেই বিশ্বনাথ বাবু তাকে রক্ষা করেছিলেন। ডিক সাহেবের মতন ফ্যাডিও সেদিন শপথ করেছিল রায়তদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। কথা সাহেব রাখেনি ! কথা কখনও রাখে না ধলো বাঁদররা। নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সেদিন দলে গোরা পল্টন পাঠিয়ে রায়তদের উপর অত্যাচার করেছিল।

ঠগবগের খালের মাঠে এখনও না কি ওদের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াত। বাঁশবেড়ে নীলকুঠির দক্ষিণে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে সে অশ্বত্থ গাছ আজও দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছেই এক দিন ধলো বাঁদররা বিশ্বনাথ বাবু আর তাঁর বারো সাকরেদকে ফাঁসী দিয়ে মেরেছিল।

মরার আগে কালীনাথের পিতা ঠাকুরের হাত ধরে বিশ্বনাথ শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন—প্রতিশোধ নিয়ো ফ্যাডির।

ইংরেজ যখন রাজ্য হাতে নিয়েছিল, নীলকর রায়তদের হাতে মাথা কাটতে সুরু করেছিল। পিতাঠাকুর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পেরে কালীনাথকে বলেছিল, বিশ্বনাথের প্রেতাত্মাকে তুষ্ট করো কালীনাথ !

কালীনাথ তাই নীলকুঠির পত্তন করেছিলেন। ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্যই নয়। তার নীলকুঠি ছিল ও অঞ্চলের ক্ষিপ্ত সর্দ্দারদের ঘাঁটি।

কিন্তু উল্টো আপদ এসে জুটেছিল। মুসলমান রায়তরা এতদিন তাঁর কথা মেনে চলছিল। আজ তারা সাহেবদের দলে হয়ে দাঁড়ালেও, হিন্দুদেরও দুশমন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীয়া জেলা তখন তিতুর দলে। তারা ফিরিঙ্গীদের বিরোধী হয়ে প্রতি গ্রামে হিন্দুদেরই প্রথমে মুসলমান করবার জন্তে উঠে পড়ে লেগেছে। সেদিন খবর এসেছে, তিতু বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানিয়ে দিয়ে জাহির করেছে সে হিন্দুস্থানের বাদশা। সে টাকী আর ডাঙ্গার জমিদারদের কাছে খাজনার দাবী করেছিল। গোবরডাঙ্গার মুখুটি বাবুরা শত-শত হাবসীদের এনে তিতুকে সায়েস্তা করেছিলেন। কালীনাথেরও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়েছিল, হাবসী ম্যাজোচদের কুঠির চার দিকে বসাবেন। কিন্তু কেষ্ট বাগদী বলেছিল, ঠগব

মাঠে বিশ্বনাথ আর তার বারো সাকরেদ আজও আছে কর্তা বাবু, ফাঁসী-ফাবসিতে কাজ নেই। হাঁদি থানার দাবোগা রমন মল্লিকও বলছিল, আপনি আর কেষ্ট বাবুর দল হাতে থাকলে ইণ্ডিগো আর তিতুর নীল আর লাল বক্তে সে ঠংগবগের মাঠে নীল ঘাস গজাবে আর মাথাভাঙ্গার জল রাঙিয়ে দিতে পারবে।

ষড়যন্ত্র পোক্ত করে তুলেছিলেন কালীনাথ। জোয়ান ফিরিঙ্গী ডিক যে ফরাজীদের দলে, এ কথা তিনি জানতেন। ডিকও তা জানত। ডিকের মুনিব কৃষ্ণনগর, বোয়ালিয়া, আবুরি, বোলাভাঙ্গা প্রভৃতির নীলকুঠির মালিক টমসনের পুত্রের সঙ্গে কেশবপুরের নীলকুঠির ম্যানেজার জেমসের দাঙ্গা লেগেই থাকত। আবার শিকারপুর কাগলমাটীর প্রভৃতির কুঠির মালিক ওয়াটসনদের সঙ্গেও নীলের জমি নিয়ে টমসনের নিত্য বিরোধ ছিল। তিতুর দলের ফরাজি মুসলমান রায়তরাই ছিল কুঠিয়ালদের ভরসা। আগে আংরেজের সহায্য হিন্দু কাফেরদের মোছলমান বানিয়ে পুরান ও নয়া মুসলমান নিয়ে ওরা আংরেজকে দরিয়ায় ডুবিয়ে মারবে, এই ছিল মিরু মীরের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। প্রকাশ্যে ভাব করতে হয়েছিল, বাংলামাটীর গ সাহেবের সঙ্গে, আর গোপনে কেশবপুরের ছোট টমসনের আর বড় টমসনের আবুরি কুঠির ম্যানেজার ডিকের সঙ্গে। খান সাহেব গং এক কালে ডিকের সঙ্গেই ছোট টমসনের কাছে চাকরী করত, আর সেই সময় দুই সয়তান ফরাজীদের সঙ্গে মিশে হিন্দুর গলা টিপে মারত, তাদের মা-বোনদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সতীত্ব নষ্ট করে তাদের পেশাকর বানাত। কেষ্ট বাগচী তাই বলেছিল—রায় মশাই, হুকুম দিন, কালা যবন তিতু আর ধলা যবন ঐ খাব ডিককে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেই। কালীনাথ বাবু ধৈর্য্য ধরতে বলেছিলেন।

কালীনাথ এক দিন ছোট টমসনকে আপনার কুঠিতে সাদরে নিমন্ত্রণ করে বুঝিয়েছিলেন, তিতুর দল কি ভয়ানক আয়োজন করছে ইংরেজ মারবার জন্যে। বলেছিলেন, ডিক ফিরিঙ্গীকে সরাতে না পারলে এ অঞ্চলটাতে কুঠির কাজ অচল হয়ে পড়বে। টমসন একমত হয়ে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখেছিল—"ডিক তার ছেড়ে সশস্ত্র বহু লোক জন সংগ্রহ করছে ও ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট ডিককে তিনশ' টাকার মুচলেকা বদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ডিককে ফরাজীরা খেপিয়ে তুলেছিল—নিত্য মদ আর নিত্য লুঠে-আনা হিন্দু নারী দিয়ে। ম্যাজিষ্ট্রেট তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করেছিলেন।

তবু ডিককে সায়েস্তা করা যায়নি। তলোয়ারবাজ ও পাকা লাঠিয়াল ডিক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এঁটে উঠতে কেউ পারেনি। এক বার অবশ্য তার মুনিব টমসনের হুকুম পেয়ে গোমস্তা রাধামোহন সরকার ডিককে ধরে নিয়ে গেল, ডিক সেদিন আর টমসনকে কথা দিয়ে এসেছিল, তাঁর ছেলের সঙ্গে আর হাঙ্গামা করবে না।

হাঙ্গামা বাধিয়েছিলেন কালীনাথ।

তাঁরই প্রজা নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের বিধবা বিলাসী। বিলাসী বলেছে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। তার শিশু গোপাল। পা ছুঁয়ে বালক বলেছে—প্রতিশোধ নেবে।

সেদিন দোকড়ি পরামাণিকের হাতে বিলাসী চিঠি দিয়েছিল কালীনাথকে—

"আমি যে ভুলতে পারি না কর্তা আমার গোপালকে, তাকে বলো, প্রতিশোধ নেবার দিন দূরে নয়। নরকেই যখন ডুবছি, তখন আশীর্ব্বাদ করো কর্তা, এদের ঝাড়ে-বংশে নির্ম্মূল না করে যেন গলায় দড়ি না দেই। গোপাল—আমার গোপালকে তুমি চোখে-চোখে রেখো, অভাগিনীর এই প্রার্থনা।"

দোকড়ির মুখে কালীনাথ বিলাসীকে সব আশ্বাসই দিয়েছিলেন, আর ঠংগবগের শ্মশান-কালীর নির্মাল্য পাঠিয়েছিলেন কেষ্ট পুরুতের হাতে স্নানের ঘাটে।

[ক্রমশঃ।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়

[২৮৭ পৃষ্ঠার পর]

বাবুর রকম-সকম ভাল নয়। জয়হরি এইরূপে কালযাপন করেন। নিকটে উমেদারি রকমের যে দুই-চারি জন আসিত, তাহাদের মধ্যে ফলহরি শর্ম্মা তাঁহাকে নৈরাশ্যযুক্ত দেখিয়া এক দিন বলিলেন—বাবু! আপনাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখি—এটা ভাল নয়। মনটিকে খুসি না রাখলে শরীরটি খারাব হয়ে যাবে আর মনটিকে আমোদ-প্রমোদ করিতেই আসা—কয়লার নৌকা ডুবাইয়া থাকার তাৎপর্য্য কি? যদি কোন কারণ বশত: মন খারাব থাকে আমি শুধরাইয়া দিতে পারি—আমার নিকট ভাল ঔষধ আছে। এই কথাগুলি জয়হরির হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি বলিলেন—বাঃ! ভাল বলছ—একটু সরে এস—আমার দুই-এক কালেজি বন্ধু বলে, একটু নেসা করলে মনের দব্‌কা ভাব ছুটে যায়, তাহাতে একটু নেসা আরম্ভ করেছি, কিন্তু পরিবারের জন্যে ঐ কর্ম্মটি ষোল আনা রকমে হইতেছে না—ইহাদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিতে চাই, ইহারা কোনক্রমেই যাইতে চান না। ফলহরি বলিলেন—থাকুক না কেন্—প্যাঁচ কি? তোমাকে এমন এক স্থানে লইয়া যাইতে পারি যে সেখানকার লোকদিগকে দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। আহ্লাদিয়া লোকদের নিকট থাকিলেই আহ্লাদ হয়। কোথায়—কোথায়—কে—কে—বল দেখি, বলিয়া জয়হরি ঘেঁসে বসিয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ফলহরি বলিল, হাতে পাঞ্জি মঙ্গলবার কেন? যদি তিনটা বাজিয়া থাকে তবে একখানা চাদর কাঁধে ফেলে উঠ। উন্মত্ততার লোভে উন্মত্ততার আবির্ভাব হইল—জয়হরি তাড়াতাড়ি চাদর ভুলে একখান পাইডওয়ালা ধুতি কোঁচা করিয়া হন্-হন করিয়া চলিলেন। ফলহরি ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন—ও কি? ঠিকে ভুল না কি! রাম! একখানা চাদরই লও।

[ক্রমশঃ।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষ
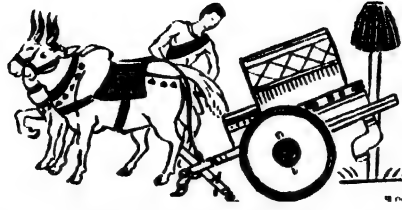
ভারতের বাণিজ্য-পথ—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় (১)

সুধাংশু ঘোষ

[প্রাচীন সভ্যতার শিশুকালেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। ব্যাপক বাণিজ্যিক লেন-দেন চালাবার জন্যে বন্ধুর পার্বত্য পথ ডিঙিয়ে, বিস্তৃত মরু-প্রান্তর পাড়ি দিয়ে সুদীর্ঘ স্থলপথে পণ্য বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো দূর-দেশে। এই পণ্যের প্রধান বাহন ছিলো উটের দল। প্রচুর পণ্য নিয়ে তারা দীর্ঘ পদবিক্ষেপে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিতো। জলপথেও বাণিজ্যিক লেন-দেন ব্যাপক ভাবে চলতো। পণ্য বোঝাই করে অগুন্তি বাণিজ্য-তরী পাল তুলে দিতো উত্তাল সমুদ্রে।

অতীত ভারতের বাণিজ্য-পথের বর্ণনা পুঁথিপত্রে মেলে। ভারতের এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা খুব সামান্যই জানতেন। ইহুদীদের ধারণায় ইউফ্রেতিস নদী এবং তার পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলগুলিই ছিলো পৃথিবীর প্রত্যন্ত।

ভারবাহী উটের দল চলতো যে সুদীর্ঘ স্থলপথগুলি দিয়ে 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' তার উল্লেখ আছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে এই সব পথে প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মূল্যবান পণ্য বয়ে আনা হতো। এই পণ্যের মধ্যে ভারতেরও যে একটি বিরাট অংশ ছিলো তা অনস্বীকার্য। ইজেকিয়েলের ২৭শ পরিচ্ছেদ বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যতম প্রাচীন ইতিহাস। ডাঃ ভিনসেন্টের অভিমত অনুযায়ী ইজেকিয়েলে বর্ণিত পণ্যগুলি ভারতেরই সম্পদ। এই পণ্য আসতো হেরান, কানে ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরবর্তী অন্যান্য নগরগুলি থেকে। কিন্তু ইউফ্রেতিসের তীরবর্তী কোনো নগরে এই পণ্য প্রস্তুত হতো না; পূর্ব-এশিয়ার আরো দূরবর্তী দেশগুলিতে এগুলি উৎপন্ন। মূল্যবান বস্ত্রই ছিলো এই পণ্যের মধ্যে প্রধান। দেদান ও ইডুমিয়ার পথে আরবের মধ্য দিয়ে এই পণ্য বয়ে আনা হতো। সুতরাং ডাঃ ভিনসেন্টের অভিমত মেনে নিতে কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন হয় না। 'পামীরের ধ্বংসস্তূপ' বইয়ের লেখক বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে সিরিয়ার জৌলুস বর্ণনা করেছেন। পূর্ব-ভারতীয় বাণিজ্যই এই নগরীর সমৃদ্ধির উৎস। সলোমনের সময় থেকে এই লেন-দেন চলে আসছিলো বলে কল্পনা করা হয়েছে।

এই প্রাচীন কালে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ ছিলো না। তাই এই সময়কার 'বাণিজ্য-তরীকে' 'বাণিজ্যিক নৌবহর' বলাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত। বিপদ আজো আছে, কিন্তু তখন বিপদ লুকিয়ে থাকতো সব মোড়ে, সব কোণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্তের মূল্য দিয়ে বাণিজ্য-তরী বোঝাই করতে হতো।

ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যের গতি-প্রগতির বিশ্লেষণ করতে হ... যে সব দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তাদে... উঠতি-পড়তির হিসেব কিছু করা দরকার। তাই এই অনুচ্ছেদগুলি... অতীত ভারতের বাণিজ্যের পটভূমিতে কোন্ পথে লেন-দেন চল... তারই কিছু ইঙ্গিত মিলবে।]

আলেকজাণ্ডারের আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে তাঁর ভারত সাম্রা... স্থাপনের এবং ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা... স্বপ্ন সার্থক রূপ পেলো না। তিন শতাব্দী ধরে মিশরীয় ... আরবরা আলেকজান্দ্রিয়া ও আরও কয়েকটি বন্দরের মাধ্যমে লো... সাগর, নীল নদ ও ভূমধ্য সাগরের জলপথে ভারতের সঙ্গে বাণি... সম্বন্ধ রক্ষা করে। লেগাসের পুত্র টোলেমী ছিলেন আলেকজা... ভারত অভিযানের অন্যতম বিশিষ্ট নায়ক। আলেকজা... মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে মিশর তাঁর ভা... জোটে এবং অতঃপর তিনি তাঁর পুরোনো লীলাক্ষেত্র ভা... দিকে দৃষ্টি দেন। মিশর ও আরবের বাণিজ্যিক লেন-দেনের ব্যা... তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশর প্রাচ্যের প্রধান বা... পথ হয়ে দাঁড়ায়। আরো দু'টি পথ অবশ্য ছিলো যার মধ্য... লেন-দেন কিছুটা চলতো। একটি পথ ছিলো পারস্য ও আ... উত্তরাঞ্চল দিয়ে সিরিয়ার নগরগুলি পর্যন্ত। এই স্থলপথ ... অত্যন্ত বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল। এ-পথের অনেক জায়গায় ভা... যাত্রীদের মরুভূমি পাড়ি দিতে হতো। কিন্তু এই পথ ... প্রাচীন বাণিজ্য-পথগুলির অন্যতম। এই বিপদসঙ্কুল পথের ... মাত্র বিশ্রাম-স্থল ছিলো পামীর। পাম গাছের প্রাচুর্য এই ... দিয়েছিলো এই নগরকে। এই বাণিজ্য-পথটির জন্যে ... এতো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলো যে, এই নগর রোমেরও ... উদ্রেক করে। এই হিংসার আগুনে যুদ্ধ বেধে ওঠে। পা... রাণী জেনোবিয়া বন্দী হন, পামীর নগরী ধ্বংস হয় আর ম... পেরিয়ে, বন্ধুর বিপদসঙ্কুল চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে আত্রাহাময়... থেকে যে বাণিজ্য-পথ গড়ে উঠেছিলো তা ধ্বংস হয়। কঠোর প... ভারবাহী উটের দল ছিলো এই বাণিজ্য-পথের দুর্জয় মুসাফি...

ভারতের পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে পর্তুগীজদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই সব এলাকার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্য-পথ ও বিশেষ করে পণ্য-বহন পদ্ধতি বর্ণনা করতে ভারতের তীরভূমিতে ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলিতে পর্তুগীজ-শক্তির জোয়ার-ভাটার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রাচ্যের নৃপতিদের শাসন-ব্যবস্থায় যে সব গলদ ছিলো, তার সবটুকু সুযোগ গ্রহণ করে পর্তুগীজরা। জলদস্যুদের অত্যাচারে সমুদ্র-পথে বাণিজ্য-তরীতে পণ্য-বহন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তারা তীরভূমির বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিও লুঠ করতে শুরু করে। এদের মধ্যে সাহসে রক্তলোলুপতায় পর্তুগীজ জলদস্যুরা ছিলো অদ্বিতীয়। ভারতের পর্তুগীজ এলাকার কর্তৃপক্ষের সাহায্যের জন্য তাদের পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু ক্রমে তারা আনুগত্য জলাঞ্জলি দিয়ে হিংস্র দস্যুবৃত্তিকে একমাত্র পেশা করে নেয়। ফ্রান্সিস জেভিয়ারের নেতৃত্বে গোয়ায় ইনকুইজিশনের প্রতিষ্ঠা মানুষের ইতিহাসে এক অন্ধকারময় অধ্যায়। প্রাচ্যে পর্তুগীজদের বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ তাদের ধর্ম। গোয়ায় ইনকুইজিশনের অবর্ণনীয় হত্যালীলা ভারতের জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের চোখে পর্তুগীজদের মুখ মসীলিপ্ত হয়। এই রক্তের নদীতে পর্তুগীজদের বাণিজ্যের স্বপ্ন ডুবে যায়। তাদের থেকে আরো দূরদর্শী এবং কিছু পরিমাণে নরমপন্থী ওলন্দাজরা হস্তগত করে প্রাচ্যের বাণিজ্যের বল্গা। পরিপন্থী পরিবেশ ছাড়াও পর্তুগীজদের ভাগ্যে ছিলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের অনেক পণ্যবাহ বাণিজ্যতরী ধ্বংস হয়। ওলন্দাজরা সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে ভারতের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। ইংরেজরা অনুসরণ করে ওলন্দাজদের। কিন্তু এই সময়ে প্রাচ্যের সম্পদ শোষণে ওলন্দাজরা সফল হয় অনেক বেশী। কারণ প্রথম জেমস স্পেনের ফিলিপকে খুশী করতেই ব্যস্ত ছিলেন। ওলন্দাজরা ফিলিপের তোয়াক্কা না রেখে প্রাচ্যের সম্পদ লুণ্ঠনে সব শক্তি নিয়োগ করে। সিংহলে মশলার বাণিজ্য তাদের আওতায় আসে, চীনের সঙ্গে যে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তারা তাকে জোরদার করে দেয়। গোয়া, দিউ, ম্যাকাও এখনো পর্তুগীজদের দখলে রয়েছে, কিন্তু তাদের বাণিজ্যের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।

প্রাক-এলিজাবেথীয় যুগের ইংলণ্ড ভারতীয় পণ্য কিনতো ভেনিসীয়দের কাছ থেকে। ডাঃ কুক টেচর ও অন্যান্য লেখকরা এই বাণিজ্যকে লাভজনক বলেননি। ইংলণ্ডের পক্ষে এই মুনাফাহীন বাণিজ্য বেশী দিন চালান সম্ভব ছিলো না। ১৫১৮ সালে ইংলণ্ডের কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভেনিসের মারফৎ বাণিজ্য চালাবার অসারতা বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা বিবেচনার প্রস্তাব তাঁরা এলিজাবেথের দরবারে পেশ করেন। এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। তখন থেকে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে এক নতুন বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তুরস্কের মধ্য দিয়ে ভারতের পণ্য বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ইংলণ্ডে। লণ্ডন, সাউদাম্পটন ও ব্রিষ্টল থেকে নিয়মিত বিরাট বাণিজ্য-তরী সমূহ রোডস, সাইপ্রাস ও সিরিয়ার লেইকটের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকে। এই সময়ে ম্যাঞ্চেষ্টার কয়েক প্রকারের পশমী বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত হয়ে পড়ে। ষোল শতকের শেষে ক্যাভেণ্ডিশের প্রচেষ্টা এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ড্রেকের গোয়া অভিযান লণ্ডনের বণিকদের উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। ১৬০১ সালে ক্যাপ্টেন ল্যাঙ্কাষ্টারের অধিনায়কত্বে প্রথম বৃটিশ নৌবহর ভারতে পাঠানো হয়। এর পরেই ১৬০৫ সালে বৃটেনের সুপরিচিত অভিযান সাফল্য অর্জন করে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পর্তুগীজরা বৃটিশ নৌবহর ধ্বংসের আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে বৃটেনের এই অভিযান পরিণতি লাভ করে।

একটি নতুন সেতু

কলকাতা থেকে ৩৭ মাইল দূরে গাইঘাটায় কলিকাতা-বনগাঁ রোডে যমুনা নদীর উপর ১৮০ ফুট লম্বা একটি রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে।

এই নদীর উপর একটি জীর্ণ ভাসমান সেতু আছে। এই সেতুর উপর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় মাল নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বহু দুর্ঘটনা ঘটে এবং কখনও কখনও প্রাণহানি পর্যন্ত হয়ে থাকে। গত যুদ্ধের সময় সৈন্য বিভাগ নদীর উপর একটি হ্যামিল্টন সেতু নির্মাণ করেন, কিন্তু যুদ্ধের পর তা খুলে নেওয়া হয়। কিন্তু যানবাহন চলাচলের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। বঙ্গ-বিভাগের পর কলিকাতা ও বনগাঁর সংযোগ সাধনকারী এই রাস্তাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ জন্য নদীর উপর একটি স্থায়ী ও মজবুত সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার [illegible] টাকা ব্যয়ে একটি রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের সেতু নির্মাণ [illegible] করেন।

প্রায় ২০০০ ফুট নতুন রাস্তা নির্মাণ দ্বারা সেতুর প্রবেশ-পথের উন্নয়নের জন্য নতুন সেতুর স্থানটি একটু পশ্চিম দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেতুর মধ্যে গাড়ী চলাচলের জন্য ২২ ফুট চওড়া [illegible] রাস্তা এবং লোক চলাচলের জন্য এই রাস্তার দু'দিকে ৩ ফুট [illegible] ফুটপাথ থাকবে।

লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে

[১৫৫০—১৮৪৫]

স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাই ভারতের ধর্ম্ম—ব্যক্তিতে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। এরই জন্য এখানকার লৌকিক ও সামাজিক জীবনে বারো-য়ারী ব্যবস্থা কোন দিনই হয়নি। কারণ, দেহ-সুখ ও অর্থ-সমৃদ্ধি ভারতের কাছে তুচ্ছ ও পরোক্ষ, তাই যেটুকু না করলে দেহ ও সমাজ বাঁচে না, তাই ছিল তার লৌকিক ব্যবস্থা।

যে দেশের সম্পদ স্বভাব-স্বচ্ছন্দ সে দেশের "অন্ন-বহু-কুর্বীত" নীতি অনুসারে অন্ন বহু হয়েছিল রাষ্ট্রের ব্যক্তিদেরই জন্য, যাতে অনায়াসে তারা আধ্যাত্মিকতার দিকে নজর দিতে পারে। সম্পদের আভ্যন্তরীণ আদান-প্রদান, যা না করলে নয়, তাই-ই করা হয়েছিল। যাদের দর্শন ও বিজ্ঞান-সমৃদ্ধি বিশ্বের চোখে ধাঁধা লাগাত, যাদের স্থপতি আজও বিশ্বের বিস্ময়, দু'-চারটে চমকপ্রদ পথ-ঘাট রচনা করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। তবু করেনি তারা।
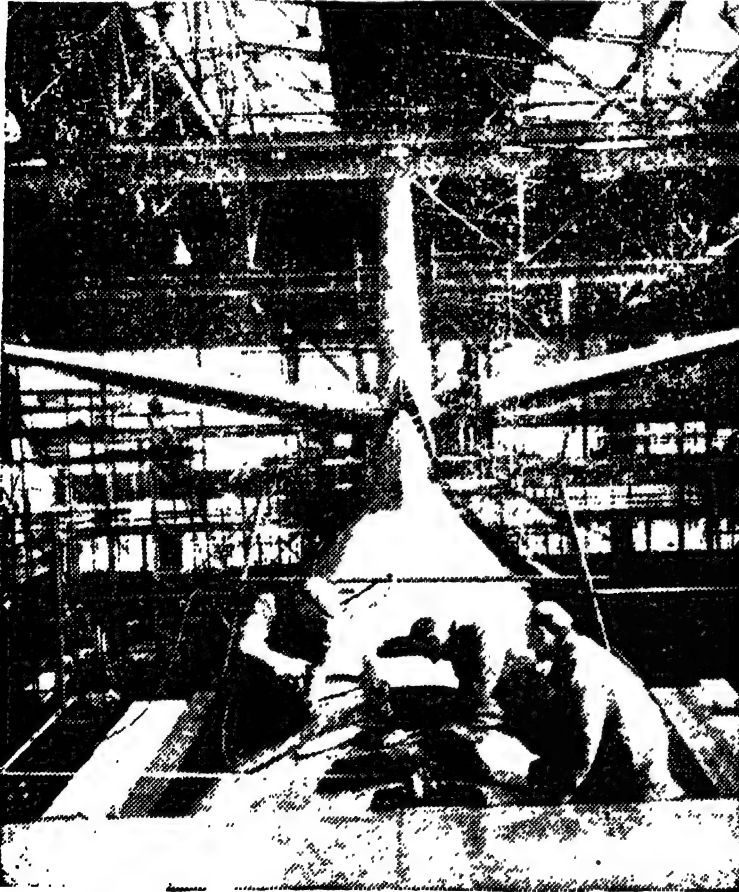
বৃটেনে অতিকায় বিমান নির্ম্মাণ। এই বিমানের ওজন ১৪০ টন, দৈর্ঘ্য ১৪৮ ফুট ও উচ্চতা ৫৫ ফুট ৯ ইঞ্চ। এতে ৩৫০০ অশ্ব-শক্তির ১০খানি এঞ্জিন থাকে এবং এর গতি হবে ঘণ্টায় ৩৮০ মাইল। এই বিমানে ১০৫ জন যাত্রী ৭০ টন মাল নিয়ে যেতে পারবে। কয়েক জন যাত্রীর শয়নের ব্যবস্থাও থাকবে। ছবিতে শ্রমিকদের নির্ম্মাণ

করেছিল কিন্তু তারা যাদের কাছে ভারত ছিল লুণ্ঠন-স্থল। লুণ্ঠন ও লুণ্ঠিত রাষ্ট্রকে তাঁবে রাখতে তাদের রচনা করতে হয়েছিল 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' অশোকের ধর্ম্ম-প্রচারবর্ত্মকে নতুন আকার দিয়ে।

কিন্তু নদীমাতৃক দেশের প্রকৃত পথ ছিল নদীপথ। নদীপথের যান-বাহনই তাই উৎকর্ষ হয়েছিল সেকালে। এই পথেই ... বাণিজ্য-পণ্যের আদান-প্রদান করত, এবং এই পথ বয়েই ... করে বাংলার ধনপতি সওদাগররা সিংহল, বালি, সুমাত্রা প্রভৃতি ... গিয়ে যেমন মূল্যে বেচে গজদন্ত কিনত, তেমনি পুরস্কার দিয়ে ... ভারতের সংস্কৃতি।

এ চলেছিল ঢের দিন।

ভারতের সম্পদের কথা লুব্ধ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ... কানে গিয়ে যখন পৌঁছেছিল, তখন দলে দলে শ্বেত-বণিকরা ... এসেছিল হিন্দুর সম্পদ ভিক্ষা করতে ..., লুণ্ঠন করতে। সুযোগ-সন্ধান ... ভারতের মুসলমানবাদশাহীর পতন ... হিন্দুর এই সম্পদ ওদের দেশে নিয়ে ... পথ ছিল তখন দুর্গম। ... মধ্যযুগে মালপত্র বয়ে নিয়ে যেত ... বলদ-উটের পিঠে, শকটে, সিন্ধু নদের ... পথে ভারতের 'সপ্তসিন্ধু মধুকরে', ... থেকে অক্সাস নদীর ভাটি-পথে, ... সাগর দিয়ে ভল্গা নদীতে। ভল্গা ... ইউক্সাইন (Euxine)। ... দাগরী কারবারান এসে পৌঁছলে ... নোপল। মুসলমানরা মাল ... জাহাজ ... তাদের নিজদেশে নিয়ে ...

ইটালীর সওদাগরদের পথ ছিল ... হিন্দুস্থান থেকে মাল নিয়ে পারস্য ... ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রাস নদীপথে ... বগদাদে। তারপর পামিরা মরু ... হয়ে ভূমধ্য সাগরের বন্দরগুলোতে ...

দুই পথই ছিল দুর্গম ও ... মুসলমানদের সঙ্গে খৃষ্টানদের লড়াই ... এই সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার পথ ... হয়ে যায়। ঠিক এই সময় আ... উত্তমাশা অন্তরীপ ঘিরে ভারতের পথ। ... বাণিজ্য-পথ একেবারে পাল্টে ... থেকে। ফলে ইটালীর ভারত-বা... হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যে ... নগরী শ্মশান হ'ল, সাম্রাজ্যও হাওয়া ... গেল। ভারতের সম্পদ নিয়ে সৃষ্টি ... যেমন রোম সাম্রাজ্য, ভারতের সম্... রণের নতুন পথ থেকে সৃষ্টি হ'... সাম্রাজ্য।

বালেশ্বর থেকে সমুদ্রের তীর ধরে গঙ্গার মোহনা দিয়ে এই খৃষ্টান পাদরীকে দেশের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়েছিল নৌ-পথে। তিনি লেখেছিলেন—"For the first twenty (league) we passed through vast forests, then was revealed a fairly well populated country. Europeans of different nationalities have fitted up various spots proper to receive ships."

কুলপীতে জাহাজ নোঙ্গর করত। প্রধানতঃ ফরাসী ও ইংরেজী জাহাজ এখানে থামত। ওলন্দাজ জাহাজ আরও উজিয়ে ফলতা পর্য্যন্ত যেত।

পাদরীরা আরমানী জাহাজে কিছু দূর গিয়ে বজরায় উঠেছিলেন। এই বজরার বর্ণনায় বলা হয়েছে—"That is a bark of this country which, according to its size, requires from six to forty rowers, with one or two cabins on the stern."

চন্দননগর থেকে চট্টগ্রাম ছিল ৮ দিনের নৌকা-পথ। এই ৮ দিন প্রত্যহ ১৮ ঘণ্টা বাইতে হ'ত। নদীর জলে ২০ ফুট লম্বা কুমীর আর নদীর তীরে মস্ত মস্ত বাঘ, যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকো থেকে মানুষ ধরে নিয়ে যেত। আর ছিল ডাকাতের দল, তাদের পানসী অবিরাম নদীপথে হানা দিত। ("Robbers, who incessantly wander about in those parts on board panceaux, that is small boats which travel like a dart."

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ছিল পাঁচ দিনের নৌকা-পথ। ঢাকার কথা—"The convenience of the rivers provides this town with a great trade. The muslins which are spun with yarn and silk are much prized in Europe."

ঢাকা থেকে নৌকায় যাওয়া হ'ত তিন হপ্তায় রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি থেকে ১৫ দিনে যাওয়া যেত চীনের ইউনন প্রদেশে। বিদেশীদের চীনে যাওয়া শক্ত ব্যাপার ছিল। ব্রহ্মপুত্রের প্রখর স্রোতে রাঙ্গামাটি যাওয়া এত শক্ত ছিল যে, বাঙ্গলায় তখন এই মর্ম্মে একটা চলতি কথাও ছিল যে, দু'জন রাঙ্গামাটি গেলে এক জনকে আর ফিরে আসতে হ'ত না।

স্থলপথে এই সময় বালেশ্বর থেকে কটক যেতে ৪০ ঘণ্টা (১৭৭৮) আর কটক থেকে কলিকাতা আসতে লাগত ১৫ দিন। এই ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন ছিল—"They said that one hundred horse was absolutely necessary as the road was not without danger. It was held impossible to make a journey without tents, for the Bearers, Servants and coolies, as we should be three and four days without meeting with a village." (Letter from Alex. Elliot—1778,) কটক থেকে নাগপুর যেতে লাগত—'Less than five weeks.'

বালেশ্বর থেকে হুগলী বন্দর পর্য্যন্ত জাহাজ যাওয়া-আসার জন্য ব্যবস্থা ছিল নিয়মিত পাইলট বোটের। পাইলটরা ফরাসী ও ইংরেজ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী হলেও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে বেশ সম্পত্তি করে ফেলেছিল।

পলাশীর তামাসার সময়, সেকালের দরবারী ষড়যন্ত্র আর রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরও অর্দ্ধ শতাব্দী এই বাণিজ্য-পথ, আর সেই পথের কণ্টক নিয়েই নয়া-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাকামীদের তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

পলাশী যুদ্ধের ৭ বছর পরে, অর্থাৎ ছলে বলে কৌশলে বাংলার নৌপথ আর হাট-গঞ্জগুলোতে একাধিকার স্থাপনের পর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নৌবহরের লেফটন্যাণ্ট টমাস ওয়াগহর্ণ নিজ-খরচে সুয়েজের পথে ৫০ দিনে বোম্বাই থেকে জাহাজে লণ্ডনে নিয়ে গেছলেন (৩১ অক্টোবর, ১৮৪৫)। এই পথে চলার নাম হয়েছিল "ওভার ল্যাণ্ড জার্নি"। জাহাজ গিয়ে দাঁড়াত সুয়েজে, সেখান থেকে দুই বা চার ঘোড়ায় টানা ভ্যানে করে আলেকজান্দ্রিয়ায়, আর সেখানে থেকে জাহাজে ভূমধ্য সাগর দিয়ে ইউরোপের নানা স্থানে। এই অসমসাহসিক উদ্যমের সুযোগ নিয়েছিলেন M de Lessep সুয়েজ খাল কেটে বৃটেনের কুমীরকে পার করে ভারতে আনবার ব্যবস্থা করে এই ফরাসী প্রবঞ্চক ভারতের পরাধীনতা কায়েম করবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঠিক এই সময়েই ইংরেজরা ভারতের আভ্যন্তরীণ লুণ্ঠনের পরিধি করবার জন্যে রেলপথের রচনার পরিকল্পনায় ভারতবাসীকে ঠাট্টা করে বলেছিল—"The arrogant self assertion of the whiteman, which the Hindoo Priesthood could contradict or explain away. There were no means of contradicting or explaining away the railway cars which travelled without horse or bullocks, at the rate of thirty miles an hour, or the electric wires, which in a few minutes carried a message across the breadth of a whole province...."

"That the fire carriage or the iron road was a heavy blow...The lightning post, which sent invisible letters through the air and brought back answers from incredible distances, in less time than an ordinary messenger could bring from the next street, was a still greater marvel and a still greater disturbance."

কিন্তু এ লৌহবর্ম্মের জাল-বন্ধন আর ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ করা অভিন্ন হয়ে পড়েছিল। রেলপথ ভারতের আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির জন্য হয় নাই, হয়েছিল সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনেরই জন্য। সে লুণ্ঠনে ও শোষণে "India bled white."

ফরাসী পর্যটক আর্ণেষ্ট পিরিউ ভারতে ইংরেজের নীতির যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার কতকটা উল্লেখ করে প্রবন্ধের উপসংহার করব। পিরিউ বলেছিলেন—

exploitationএর চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইংরেজী মূলধন চারি দিক হইতে আসিয়া পড়িল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাইবার সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল এবং এই সময়েই রেলপথের সূত্রপাত হইল।···সর্ব্ব প্রথমে, কতকগুলি রেলপথ স্থাপনের ভার (বাণিজ্য ও সামরিক সুবিধার জন্য) কোন কোন অসরকারী কোম্পানীর হস্তে অর্পিত হয়; উহা সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং সরকারই উহার প্রতিভূ থাকিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। সরকার প্রতিভূ না হইলে মূলধন আইসে না। কিন্তু শীঘ্র বুঝা গেল, এইরূপ প্রতিভূ-পদ্ধতিতে সরকারের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। সরকার, সুদের জন্য দায়ী, এই মনে করিয়া কোম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকে ও কোন প্রকার অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড লরেন্স সরকারী ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে কতকগুলি রেলপথ স্থাপন করিয়া লাভের উদ্দেশে উহা চালাইতে লাগিলেন। এই অতীব প্রয়োজন ও অপরিহার্য্য রেল-জাল, [illegible] মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইহার দরুন সরকারী রাজস্বের উপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়িল।···

রেল হইতে যে লাভ হয় তাহার প্রায় অধিকাংশই ইংরাজ ধনপতিদিগের হস্তে যায়। রেল সংক্রান্ত সমস্ত উপকরণগুলি ইংরাজের খনি হইতে উৎপন্ন এবং তাহাদের কামার-কারখানা হইতেই সে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আইসে। এঞ্জিন, গাড়ী, রেল, লোহার কড়ি—সমস্তই ইংলণ্ড হইতে আইসে এবং ইংরাজ কলমিস্ত্রীর দ্বারাই যথাস্থানে স্থাপিত হয়। রেলের এই সব কারকর্ম্ম ইংরাজ জাত-ভাইদিগের জন্যই রক্ষিত।···রেলপথ স্থাপনের সূত্রপাত হইতেই যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদের কথা ধরা যাউক। কর্ম্মকর্ত্তা ইংরাজেরা মোটা মোটা বেতন ভোগ করে, সরকারী রাজস্বের যে এইরূপ অপব্যয় হয় তাহা লজ্জার হিসাবে গোঁজামিল দিয়া কোন প্রকারে ঢাকিয়া লইতে হয়।···

"সরকারী তহবিল হইতেই, প্রজাবর্গের অর্থ হইতেই গোড়ায় রেল স্থাপনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার, রেল-কার্য্যের লভ্যাংশ ও প্রতিভূ স্বীকৃত সুদ, এই উভয়ের মধ্যে হিসাব করিয়া যে ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে, সেই ক্ষতির অঙ্ক ও সেই প্রাথমিক ব্যয়ের হিসাবে সংযোজিত হইয়াছে। আর এক কথা, শুধু দেশীয় মালের ভাড়ার দ্বারা ও দেশীয় আরোহীদিগের টিকিট মূল্যের দ্বারাই রেলের লভ্য পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে দুই দিক দিয়া দেশীয়দিগের অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তাহার পরিবর্ত্তে উহারা পায় কি? ভারত কেবল খরচই করে, পায় না কিছুই?"

"সার জেনীফটন তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে অবস্থার বিশ্লেষণ করে নব্য ভারতকে জানিয়েছিলেন—'ভারত যেমন গরীব, তাতে এই ব্যয়সাধ্য রেলপথ ও খাল ব্যবস্থার ব্যয় নির্ব্বাহ করতে পারে না, তাই তাকে ইংলণ্ডের কাছে টাকা ধার করতে হয়। এই ঋণ ক্রমে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে। 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুযোগ দানের জন্য ইংরেজ রেলপথের রচনা করেনি।" যদি ভেবে দেখা যায়—ভারতে পণ্য বহনের যে সব প্রাচীন পন্থা ছিল, রেলওয়ে প্রবর্ত্তনে সেগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে মাত্র নয়, ভারতের জলপথগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে ইংরেজ ভারতের যুগ-যুগের শিল্প-কেন্দ্রগুলোকে গলা টিপে মেরেছে, কৃত্রিম পথ তাড়াতাড়ি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না করবার জন্য দেশে স্থায়ী মন্দাভাব কায়েম করে দিয়েছে'।

আর্ণেষ্ট পিরিট্ তাই সেদিন বলেছিলেন—"যদি কল্পনা কর এই প্রত্যেক রেল লাইনরূপ শোষণ-চোঙের মুখ প্রত্যেক স্বর্ণখনির মধ্যে প্রত্যেক আমের ঘরে বসান হইয়াছে তাহা হইলে কতকটা অনুমান করিতে পারিবে এই অতি প্রশংসিত লৌহযান হইতে ভারতের কিরূপ লাভ হইতেছে।—(পিরিটের বিবরণের অনুবাদক ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১২ সাল)

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে গতির ইতিহাস

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

কয়েক সপ্তাহ আগে আমেরিকার নৌবাহিনীর এক তরুণ বৈমানিক বিমান নিয়ে অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতার পাল্লা দিয়েছিল। সে পাল্লায় হার মানলেও, প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ বিশাল। কেন না, আজ মানুষের হাতে গতিশীল যন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে, যার গতি পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে তুলনীয়।

অতীত কালে মহাকাব্যের যুগে আকাশচারী রথে দেবকুল ও কখনো মর্ত্ত্যবাসিগণ অবাধে ভ্রমণ করতেন। তখন জল-স্থল-ব্যোমে মানুষের পর্য্যটন ছিল অবাধ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু, মহাকাব্যের কাল কবেই কেটে গেছে। আমরা তার কাহিনী মাত্র শুনেছি, কিন্তু নৈসর্গিক জগতে সেই সব মানুষদের অভিযান প্রত্যক্ষ করতে পারলাম না।

[illegible]শ শতাব্দীর প্রথম দশকে যাঁরা লোকান্তরিত হয়েছেন, অন্ততঃ তাঁদের চেয়ে আমরা ভাগ্যবান। আমরা ত দেখলাম, আকাশ-পথে চলেছে মানুষের হাতে তৈরী কলের জাহাজ। ব্যোম থেকে ব্যোমে বিপুল ডানা মেলে দেওয়া কলের পাখী তার গর্ভে মনুষ্য-ভার আর বস্তু-ভার বহন করে উড়ে চলেছে। পৃথিবীর দূরত্ব কমিয়ে দিয়ে জগৎটাকে ছোট করে এনেছে। এত ছোট, যেন বিপুলা পৃথিবী মুঠোর মধ্যে ধরতে পারি ইচ্ছে করলে। পারি দুই বিস্তৃত বাহুমূলের পরিধির মধ্যে তাকে কল্পনা করতে। এ কথা ভাবলেও আনন্দ লাগে।

গত পঞ্চাশ বছরে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সময় ও দূরত্বের উপর আমরা যতখানি প্রভুত্ব অর্জ্জন করেছি, জানিত কালের ইতিহাসে তার সমকক্ষ উদাহরণ নেই।

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছুটত। পিছনে উড়ত অশ্বারোহীর বসনাঞ্চল। ঘোড়ার মুখে ফেনার বাশ। খুরের আঘাতে ধূলিময় পৃথিবী ক্ষত-বিক্ষত হত। লঘু পাখীর মত ছুটে চলত স্থলের বাহন।

খরতর নদীতে জোয়ার-ভাঁটায় পতপত করে পাল কাঁপিয়ে বয়ে যেত ডিঙি নৌকা। দূর-পাল্লা সমুদ্রে ভেসে চলত ময়ূরপঙ্খী জাহাজ। দেশে-বিদেশে চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য করে লক্ষ্মী আহরণ

করত। তার দাঁড় টেনে, পালের উপর পাল চাপিয়ে, বায়ুর জোরে মানুষ তার জল-পথের গতি বাড়াবার চেষ্টা করত।

সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রায় উনিশ'শ দশ সাল অবধি মানুষের হাতে জল-স্থলে গতির বেগ বৃদ্ধি পায়নি। রেখাচিত্রে এই গতিবেগ অঙ্কের সঙ্গে সমান্তরালেই চলে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ সেই রেখা তীক্ষ্ণ কোণে ঊর্দ্ধমুখী হোল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে।

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মাপকাঠি হোল গতি। কেন না, গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে বৈজ্ঞানিক-জগতেই অচিন্তনীয় বিপ্লব দেখা দিয়েছে তা নয়, বস্তুতঃ সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা হয়েছে। বিজ্ঞানের যতগুলি সুফল আমরা পেয়েছি, তার মূলে এই গতি। জলে নয়—স্থলে নয়—যুগপৎ জল-স্থল-অন্তরীক্ষে। গতির উপর মানুষ যতখানি প্রভুত্ব করেছে, ততখানি বিজয়ী হয়েছে সে নিজের পারিপার্শ্বিকতার উপর। আর ততখানিই তার প্রতিভার অবদান।

গত পঞ্চাশ বছরে মানুষের প্রতিভার যতখানি বিকাশ হয়েছে ও সাধনার সাফল্যের পরিচয় মিলেছে, গত কোন শতাব্দীতেই তা সম্ভবপর হয়নি।

আর সেই অভাবনীয় কৃতিত্বের মূল কথা শক্তি। মাটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে-থাকা প্রাচীন যুগের বনস্পতিদের দেহাবশেষ যে কয়লা, তার আশ্চর্য শক্তির কথা ভুললে চলবে না। কেন না, পৃথিবীর যান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করেছে কয়লা—তাকে বলিষ্ঠ করেছে, বলতে গেলে নিজের কাঁধে ভর করেই তাকে মহান ভবিষ্যতের কোঠায় পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু কয়লা বিংশ শতাব্দীর ধাবমান অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা রাখতে পারেনি। আর মানুষের হাতে শক্তি উৎপাদনের অন্য উপায় না এলে এ বৈপ্লবিক উন্নতি থমকে থেমে যেত অর্দ্ধপথে। গতিবেগ বাড়ত না। আমরা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অসাধ্য সাধন করতে পারতাম না। মহাকাব্য যুগের স্বপ্নলোক কি তার সম্পূর্ণ ছবি স্বচক্ষে দেখে যেতে পারতাম না।

পেট্রোল আর জল। মাটির নীচে বিপুল মৃত্তিকা-স্তরের সরোবরে যে তরল শক্তি উৎস, তাকে মাটির উপরে মানুষের তৈরী বিপুলায়তন ট্যাঙ্কে আনতে না পারলে আমরা দম হারিয়ে ফেলতাম। আর আমাদের চিরকেলে জানা নিত্যসঙ্গী—জল। তাকেও ঠিক মত খাটিয়ে নিতে না পারলে আমরা কিছুই না করতাম।

পেট্রোল আর পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্য দিয়ে আমরা বড় জোর আঁধার ঘরের আলো জ্বালিয়েছি। জলকে দিয়ে বড় জোর চাকা ঘুরিয়ে ছোট কাজ করিয়ে নিয়েছি। কিন্তু পেট্রোল দিয়ে যতক্ষণ মোটরের ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিতে না পেরেছি, আর জল পরিচালনা করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা পাকা করতে পেরেছি, ততদিন আমরা পিছিয়ে ছিলাম। সত্যি পিছিয়ে ছিলাম। কেন না, কাউকে দিয়ে পুরো কাজ না করিয়ে নিতে পারলে আমাদের পুরো লোকসান।

আর এই নূতন শক্তি উৎপাদন সম্ভবপর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিপ্লবের উদ্যোগ-পর্ব শেষ হল। তার পর তার যান্ত্রিক উন্নতি। ইঞ্জিনে জুড়ে দাও—ঘরে পাঠাও বিদ্যুৎ সরবরাহ। যান্ত্রিক উন্নতির পথে মানুষের হাতের নৈপুণ্যের ভার দাও যন্ত্রকে। নূতন পদ্ধতিতে, দ্রুততর গতিতে, পৃথিবীব্যাপী উন্নতির ঢেউ তুলিয়ে দাও।

গত পঞ্চাশ বছরে আমরা দুর্গমকে জয় করেছি, অজ্ঞাতকে অবাধে অতিক্রম করেছি। নৈসর্গিক বাধাকে স্মিত হাস্যে অবহেলা করেছি।

আরো দ্রুত—আরো দ্রুত—আরো দ্রুত। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে। প্রথম দেশটি মাইল ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম, ঘণ্টায় দশ মাইল করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে নতুন ইঞ্জিন ঘণ্টায় চব্বিশ মাইল গতির তাক লাগিয়ে দিয়েছিল লোককে। আরো পঁচিশ বছর পরে সেই ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে তেত্রিশ সেকেণ্ডে এক মাইলের রেকর্ড স্থাপনা করা হয়েছিল। তার পর বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাড়তে বাড়তে আমরা গিয়ে পৌঁছেছিলাম ঘণ্টায় ১২০ মাইল।

কিন্তু পার্থিব সব গতিবেগ তুচ্ছ করে দিল আকাশচারী যন্ত্র। ১৮৮ মাইল ঘণ্টা থেকে সুরু করে ১৯০১ সালে আমেরিকার জেট প্লেনের এরোপ্লেন কয়েক মিনিটের জন্য ঘণ্টায় হাজার মাইল অবধি গতিবেগ দেখিয়েছে। অর্থাৎ শব্দ-তরঙ্গের গতিকেও সে ছাড়িয়ে গেছে।

এখনও মানুষের হাতে নিরবধি কালের আশীর্ব্বাদ আছে। আর আছে বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত—সংখ্যাতীত গতির পরিমাপ। বিংশ শতাব্দী কালগর্ভে বিলীন হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা গতির জগতে একটা যুগান্তকারী কিছু করতে পারব, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে মানুষের বিজয় অভিযানের এই নূতন পর্ব্ব সবে তো সুরু।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-বন্দর সম্প্রসারণ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অসামরিক কার্য্যে বিমানের ব্যবহার দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে। উহার জন্য ব্যাপক ভাবে বিমান-বন্দর নির্ম্মাণ এবং বিমান-বন্দরের উন্নয়নকার্য্যে হাত দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে এই কার্য সম্পূর্ণ হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমান অসামরিক বিমান-বন্দরের সংখ্যা প্রায় ৫১০০। আরও ২৭১৪টি নূতন বিমান-বন্দর নির্মাণ করা হইবে, উহার মধ্যে ২১১টি নির্ম্মাণ করা হইবে জল-বিমানের জন্য এবং ৩০৩টি নির্ম্মাণ করা হইবে হেলিকপ্টারের জন্য। ২১৮৩টি বিমান-বন্দরের সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধন হইবে। উহার হেলিপোর্টের (হেলিকপ্টারের জন্য ব্যবহৃত বিমান-বন্দর) সংখ্যা ...।

এই কার্যের জন্য ব্যয় হইবে ১,১১৪,৯০০,০০০ ... উহার ৪৫ শতাংশ প্রদান করিবেন মার্কিণ সরকার। ... প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব এলাকায় বিমান-বন্দর সম্প্রসারণের কার্যে ... হইয়াছেন তাহারা প্রদান করিবেন অবশিষ্ট ৫৫ শতাংশ। যে ... বিমান-বন্দর অবস্থিত সেই অঞ্চলের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ... বিমান-বন্দরগুলি নির্মিত বা সম্প্রসারিত হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

করগেটের ছাদওয়ালা বিরাট একটি বিল্ডিং আর সেখান থেকে সুরু হয়েছে একটি মাত্র রেল লাইন, আর সেটা চলে গেছে অনেক দূর পর্য্যন্ত। এই লাইনের দু'পাশে দু'টি প্লাটফর্ম। দেখলেই মনে হবে ঠিক যেন একটি রেল-ষ্টেশন। সত্যিই এটা এক সময় রেল-ষ্টেশনই ছিল, কিন্তু এখন হয়েছে মালগাড়ীর সাইডিং বা বাব নম্বর প্লাটফর্ম।

আমরা প্রাচীন হাওড়া ষ্টেশনের কথা বলছি। এই হাওড়া ষ্টেশনের সঙ্গে এখনকার হাওড়া ষ্টেশনের কত প্রভেদ! এখন এগারটি প্লাটফর্ম, অসংখ্য লাইন, বিল্ডিং, শেড, দোকান, রেস্তোঁরা প্রভৃতিতে হাওড়া ষ্টেশনটি সজ্জিত। এক সময় যে জায়গাটি পোড়ো ছিল, সেই জায়গায় এখন প্রতিদিন এক শত ষাটখানি ট্রেণ আসে এবং যাত্রা করে। আর শুধু যাত্রীদের কাছ থেকেই ভাড়া ও লগেজ বাবদ প্রত্যহ এক লাখ টাকা আয় হয়।

পাঁচ হাজারের অধিক লোক হাওড়া ষ্টেশনে কাজ করে। তার মধ্যে গাড়ী চালানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীর সংখ্যা এগার শ' আর কুলীর সংখ্যা চোদ্দ শ'। বাকী লোক অন্যান্য নানা রকম কাজ করে। এই সব কর্ম্মীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রেতারাই সকলের চেয়ে বেশী কর্ম্মব্যস্ত থাকে বলে মনে হয়। টিকিট বিক্রেতাদের তিনটে করে শিফট হয়, প্রত্যেক শিফটে কাজের সময় পূরো ছ' ঘণ্টা। লোক্যাল ট্রেণের এক-এক জন টিকিট বিক্রেতা রোজ দু' হাজার থেকে চার হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করে। উচ্চ শ্রেণীর টিকিট বিক্রেতাদের কাজ কম, আয় বেশী। এদের দু'টি শিফটে কাজ করতে হয়।

ভোর সাড়ে চারটের সময় হাওড়া ষ্টেশনের কাজ আরম্ভ হয়, আর রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত কাজ চলে। এর মধ্যে ট্রেণ যাতায়াত শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধের আগে নিয়ম ছিল, রাত্রি সাড়ে দশটার পর কেউ ষ্টেশনের মধ্যে থাকতে পাবে না, সকল দিকের বড় গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হত। যুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে এই নিয়ম উঠে যায় এবং আজ পর্য্যন্ত আর বলবৎ হয়নি। এখন আবার এর একটি বাধার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে উদ্বাস্তু সমস্যা। ষ্টেশনের মধ্যে দেখা যাবে, এখানে-ওখানে এক-একটি জোট রয়েছে। এদের জিজ্ঞেস করলেই তারা যাত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দেবে। কিন্তু আসলে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে গৃহহারা উদ্বাস্তু। ষ্টেশন-কর্তৃপক্ষ এদের প্রতি সদয় মনোভাব দেখিয়ে থাকেন।

হাওড়া ষ্টেশনে এমন অনেক কর্ম্মী আছে যারা রেলের কর্ম্মচারী নয়। যেমন ষ্টলওয়ালা, ভেণ্ডার, ভোজনালয়ের কণ্ট্রাক্টর প্রভৃতি। এদের মধ্যে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রতিদিন গড়ে দেড় শত লোককে বসন্তের টিকা এবং এক শত পঁচাত্তর জনকে কলেরার টিকা দিয়ে থাকেন। জনসাধারণ এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকেন। ষ্টেশনে একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জও আছে।

ষ্টেশনের আয়তন যতটা সম্ভব বাড়ান হয়েছে এবং আরও বাড়ান যায় কি না, তা ভেবে দেখা হচ্ছে।
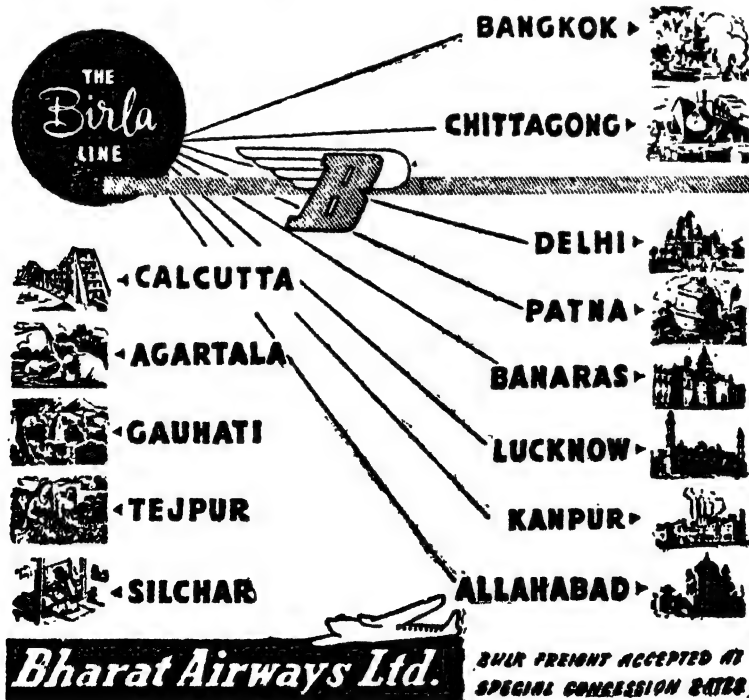
জিজ্ঞাসা

[বড় গল্প]

সুলেখা দাশগুপ্তা

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। অফিস-কোয়াটারের বিরাট সৌধগুলি হইতে সবে মাত্র কর্ম্ম-ক্লান্ত লোক দু'-চার জন করিয়া বাহির হইয়া দ্রুত-গতিতে ছুটিয়াছে ট্রাম-বাসের উদ্দেশ্যে। কেউ বা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দ্রুত কলম চালাইতেছে হাতের অসমাপ্ত কাজের উপর—কেউ বা মুহূর্ত্ত বিশ্রামে সোজা হইয়া বসিয়া টান করিয়া লইতেছে পিঠের শিরদাঁড়া।

বীণাও সমস্ত দিনের বৃথা ইনটারভিউ দেওয়ার ক্লান্তি ও অবসাদ কাটিয়ে একটা অফিস-কামরার ভিতর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে তার বান্ধবী ইন্দ্রাণীর অফিসে আসিয়া বসিয়াছিল, মুখ্যতঃ বিশ্রামের উদ্দেশ্য লইয়াই—তার পর মনে এ ইচ্ছাও ছিল, যদি কিছু একটা চাকরীর ব্যবস্থা ইন্দ্রাণীর দ্বারা করিয়া লওয়া সম্ভব হয়। নইলে দিন যে আর চলে না। ভাবের বিভাগের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে যে প্রাণ-দানের জন্যে ছুটে এসেছিল—সে দু'য়েরই বিসর্জ্জনের বাজনা যে কানের কাছে ভাল ভাবেই বাজছে—তাতে সন্দেহ নেই!

বীণাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে, "তুই বড় বেশী ভাবছিস্—দেখিস, ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। কালকের ইন্টারভিউটা দিয়ে আয়—যদি না-ই হয়, তখন আমার অফিসেই চেষ্টা করব।" তার পর হাতের ব্যাগটি খুলিয়া ভিতর হইতে ছোট্ট আয়না চিরুণী ও পাউডার পফটি বাহির করিয়া, বীণার সম্মুখ ঠেলিয়া দিতে দিতে বলে, "সারা দিন পথে পথে চেহারাখানার অবস্থা যা হয়েছে—চুলগুলো ও মুখটা একটু পরিষ্কার করে নে।—আচ্ছা, বি-এটা পাশ করেছিলি তো?"

বীণা বান্ধবীর আয়নায় চেহারাখানা দেখিয়া ভাবে—ভাগ্যিস ইন্দ্রাণী চেহারাটা পালটাইয়া লইবার এ সুব্যবস্থাটুক করিয়া দিল, নইলে যে সত্যি পাগলের মতই দেখাইতেছিল। চুলে চিরুণী চালাইতে চালাইতে জবাব করে, "না।"

"না!" একটু সময় ভাবিয়া লইয়া বলে, "আচ্ছা, সে জন্য আটকাবে না—আজ নয় কাল কিছু একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারব বলেই তো আশা করি।"

"আজ নয় কাল! কাল হলে আজ খাব কি?" বীণা হাসির আবরণে আড়াল করিতে চায় কথার করুণ ভাবটাকে।

বিস্মিত ইন্দ্রাণী যেন একটু চমকাইয়া যায়। বলে, "কেন, এত খারাপ কি তোদের অবস্থা ছিল না বীণা? তোর দাদা?"......উত্তরের আশায় তাকাইয়া থাকে বীণার দিকে। কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায় [illegible]

[illegible] বেশ-বাসটা মোটামুটি ঠিক করিয়া প্রসাধন দ্রব্যগুলি ইন্দ্রাণীর দিকে সরাইয়া দিতে দিতে বলে, "যে মেয়েটির প্রেমে দাদা পড়েছিলেন—হঠাৎ সে কি না বিয়ে করে বসল গাড়ী-বাড়ীওলা একজনকে—তার পর বিবাগী হয়ে যাওয়া ছাড়া তিনি হয়ত [illegible] পেলেন না। এই আর কি।"

[illegible] হাসি পায় এই ভাবিয়া—যে মেয়ে নিতান্ত অবহেলায় [illegible]িয়া গেল, তাহার জন্য কি না বিধবা মা ভাই বোনকে [illegible] মুখে ঠেলিয়া দিয়া বিবাগী হইয়া যাওয়া! [illegible] পরিচয়!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "আজ উঠি ভাই।" কথার শেষে [illegible] করিয়া কিছু একটা বলিবার জন্য ঠোঁট দু'টি ঈষৎ [illegible]—বাহির হইতে দ্রুত পায় অগ্রসর হইয়া আসা জুতার [illegible]

কায়দা দুরস্ত যুবকটি ঘরে ঢুকিয়াই ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাইয়া তাড়া দেয়—"চলো, চলো। বড্ড দেরী হয়ে গেল কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে।" হাতের কব্জি ঘুরাইয়া সময়টা দেখিয়া লইয়া বলে, "ওঃ, সাড়ে চারটে! আধ ঘণ্টার ভেতর চায়ের পর্ব্বটি সেরে নিতে হবে। ছ'টায় শো আরম্ভ। উঠে পড়ো—উঠে পড়ো।"

ইন্দ্রাণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বীণার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়। "আমার বান্ধবী বীণা! আর উনি হলেন—উনি হলেন আমাদের অফিসের ম—স্ত বড় এক জন অফিসার—" বলিয়া ইন্দ্রাণী অহেতুকই হাসি হাসে।

নমস্কারের আদান-প্রদান হয়।

তিন জনই বাহির হইয়া আসে। ইন্দ্রাণী বলে, "তোর কালকের 'ইন্টারভিউটা' সেরে সোজা আমার এখানেই চলে আসবি। তার পর যা হয় পরামর্শ করে দেখা যাবে।"

যুবকটি যাইয়া দরজা খুলিয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দাঁড়ায়, ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিতে নিজেও উঠিয়া বসে—গাড়ী ছাড়িয়া দেয়।

"চমৎকার দেখতে তো মেয়েটি। চাকরীর চেষ্টায় এসেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, পারেন না একটা ব্যবস্থা করতে? বড্ড অসুবিধেয় পড়েছে।"

চিন্তিত মুখে রমেশ যেন মনে মনে একবার খোঁজ করিয়া দেখে কিছু একটা করিয়া দেওয়া যায় কি না। তার পর মাথা নাড়িয়া বলে, "উপস্থিত যে অসম্ভবই ঠেকছে!"

ইন্দ্রাণী একটু হতাশ হয়। সে যে বীণাকে আশা দিয়াছে!

ইন্দ্রাণীরা চলিয়া গেলে বীণা ধীর পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইল একটা ষ্ট্যাণ্ডের কাছে। সমস্ত চেহারায় তার ক্লান্তির ছাপ। হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বীণা দেখিতে পায়, সেখানে ব্যস্ত মেঘের আনা-গোনা কখন যেন সুরু হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ দিক হইতে এক বিরাট কালো মেঘের চাপ আকাশের উপর ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে, ঝড়-বৃষ্টি আসিল বলিয়া। লোকজন ব্যস্ত ভাবে যে যার গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। বাস-ট্রামগুলিতে তিল ধারণের স্থান নাই—অবশ্য বাসে-ট্রামে না উঠিতে পারার সমস্যা তাহার স্থানাভাবটাই নয়। আসিবার সময় ট্রাম ভাড়া দিয়া অবশিষ্ট দু'টি পয়সায় সে পান খাইয়াছে। এবং সমস্ত দিনে এই হইয়াছে তাহার আহার্য্যগ্রহণ। কিছু ধার চাহিতে গিয়াও থামিয়া যাইতে হইয়াছে ইন্দ্রাণীর অফিসার বন্ধুটির আগমনে।...এখন সে কি করিবে। বালিগঞ্জের শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বাসায় যাওয়া—সে যে একান্তই অসম্ভব! তাহার উপর অনাহারে গিয়েছে সমস্তটা দিন। কালকের রাত্রির খাওয়াকেই কি আর খাওয়া বলা চলে—আধ পাউণ্ডের ছোট্ট রুটিখানা দুই ভাই-বোনের দুর্দ্দান্ত ক্ষুধার পক্ষে কিছুই নয়, দু'পয়সার চিনির সঙ্গে সেইটুকু খাইয়া জল খাইয়াছে।

ঝড়-বৃষ্টি আসিয়া পড়িল বলিয়া। বাতাসের হাত হইতে রুক্ষ [illegible] এলোমেলো [illegible]

তাকায়—রাস্তা যে প্রায় জনমানবশূন্য হইতে চলিল। একটা চল্‌তি বাসের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়াও সে থামিয়া পড়ে—নাঃ, বাসের কণ্ডাক্টারগুলো বড় হুঁসিয়ার। এক দিন পয়সা ফেলিয়া আসিবার অজুহাতে—অবাক হইবার ভাণে টিকিট কাটিবার বিপদটা এড়াইয়াছিল, কিন্তু নামিয়া যাইবার সময় কণ্ডাক্টারের সেই টেরছা দৃষ্টি ও 'ডাকু জেনানা হ্যায়' মন্তব্যটা কানে বাজিয়া আছে—ও পথ আর নয়। তবে কোন্ পথ? হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া বীণা ভাবে—যতটুকু পথ আগাইয়া যাওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি যোগ দিয়া সমস্যা আরও গুরুতর করিয়া তোলে। একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বীণা আশ্রয়ের আশায় ইতস্ততঃ তাকাইতেছে, ঠিক এমনি সময় একখানা গাড়ী আসিয়া আকস্মিক ভাবে সশব্দে ব্রেক কষিয়া দাঁড়াইল তাহারই সম্মুখে। বীণা প্রায় চমকাইয়া উঠিয়া দু'পা পিছাইয়া দাঁড়ায়।

এক জন লোক নামিয়া ভিতরের ষ্টিয়ারিংধারী ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলে, "একটু দাঁড়া, এক্ষুণি জিনিষ কটা পাঠিয়ে দিলাম বলে। বাসায় পৌঁছে দিয়ে বলে যাস্—আমার ফিরতে একটু দেরীই হবে।" চলিয়া যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত ভাবে বলে, "আমার নতুন বাসার 'লোকালিটিটা' মনে আছে তো? একেবারে বালিগঞ্জের শেষ মাথায়—তের নম্বর বাড়ী বুঝলি?"

"রাস্তাটার নামটা যেন কি বলেছিলি?" ভিতরে উপবিষ্ট লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

রাস্তাটার নামটা বলিতে বলিতে—মাথা নিচু করিয়া বৃষ্টির জল হইতে বাঁচিতে দৌড়াইয়া গিয়া ভদ্রলোকটি উঠেন উল্টো দিককার একটা দোকানে।

ভদ্রলোকটি রাস্তার যে নাম বলিয়া গেলেন বীণার বাসাও যে ঠিক সেই রাস্তার উপরই! গাড়ীখানা তো তাহা হইলে তাহার বাসার কাছেই যাইতেছে! সে যেন ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না—আহা, যদি তাহাকে তুলিয়া লইত! গাড়ীখানার দিকে চোখ পড়িতেই দেখিতে পায় উপবিষ্ট লোকটি স্থিরদৃষ্টিতে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। বীণা অস্বস্তি বোধ করে—কি ভাবিতেছে তাহাকে লোকটি—ট্রামে-বাসে উঠিতেছে না—আশ্রয়ের জন্য দৌড়াইল না—কেন একটি গাছের আশ্রয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া! হাঁটিতে আরম্ভ করিবে না কি সে? নাঃ, এত বৃষ্টিতে হাঁটা অসম্ভব। এদিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘন হইয়া রাত্রি হইতে চলিল যে! বীণা এদিক্-ওদিক্ তাকায়—ভাবে: অনুরোধ জানাইবে না কি লোকটিকে?…একটা কুলী দৌড়াইয়া কতকগুলো প্যাকেট লইয়া আসিলে ভদ্রলোকটি হাত বাড়াইয়া সব তুলিয়া লইলেন।…বন্ধুর জিনিষের জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, কাজ হইয়া গিয়াছে এবার চলিয়া যাইবে—বাড়ী পৌঁছানোর শেষ আশাটুকুও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে মিলাইবে! সে কি তবে রাস্তায় থাকিবে? গুণ্ডার হাতে পড়িবে! পথচারী যাহাকে ডাকিয়া সাহায্য চাহিবে সে যদি ভাল লোক না হয়…আর সময় নাই—গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়া হইয়া গিয়াছে—আবার সে চোখ তুলিয়া তাকায় আবার—স্থিরদৃষ্টিতে তাকান লোকটির চোখে জন্য তাহার অজ্ঞাতেই ঠোঁটটি ঈষৎ নড়িয়া উঠে।—লোকটি হঠাৎ দরজা খুলিয়া আহ্বান জানায়, "ভিতরে আসুন, একেবারে ভিজে গেলেন যে!"

বীণা যেন মাত্র এ আহ্বানটুকুরই অপেক্ষায় ছিল—[illegible] ভাবে গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তার পর কৃতজ্ঞতার [illegible] হাসিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলে, "যে রাস্তায় আপনার গাড়ী [illegible] ঠিক সেই রাস্তার উপরই আমার বাসা। আপনার কিছু অসুবিধে হবে না পৌঁছে দিতে—"

লোকটি কিন্তু স্বল্প হাসির সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে থামিতে [illegible] বলে, "বুঝেছি।"

বাসার ঠিকানা না বলিতেই বুঝিয়া গেলো! বীণা [illegible] ও হাসির ভঙ্গিতে অস্বস্তি বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। সে ভিজা শাড়ী ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া—হাত দু'টি [illegible] উপর রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। বৃষ্টি-বাতাসের [illegible] না ভয়েই কে জানে—শরীর তার বার দুই শিহরিয়া ওঠে।

"শীত করছে বুঝি?"

লোকটির প্রশ্নে চমকাইয়া উঠে বীণা। বলে, "না।" [illegible] এই সামান্য শিহরিয়া উঠাটাও এর দৃষ্টি এড়াইতেছে না। [illegible] অনুভূতি তাহার সম্পর্কে এতটা তীক্ষ্ণ হইয়া আছে! কিন্তু [illegible] উদ্দেশ্য কি এর ভাল নয়?…আর ভাল হোক, মন্দ হোক, [illegible] ভয় পাইবার কি থাকিতে পারে! বীণা নিজেকে প্রবোধ [illegible] "না সে ভয় পায় না—যেই গাড়ী তাহাদের বাসায় [illegible] অমনি সে ধন্যবাদ জানাইয়া নামিয়া পড়িবে—[illegible] জিনিষ [illegible] —বন্ধুপত্নীকে খবর বলিতে গাড়ী তো সেখানে যাইতেছেই।

গাড়ী সন্ধ্যা ও মেঘে আচ্ছন্ন বর্ষণ-সিক্ত নির্জন পথের [illegible] উপর পূর্ণগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে বৃষ্টিরও বিরাম নাই। [illegible] গাড়ী থামিবার শব্দে চমকাইয়া তাকাইয়া দেখে—তার [illegible] নিতান্ত অপরিচিত [illegible] এ তো তাহাদের বাড়ী নয়! [illegible] লোকটি দরজা খুলিয়া নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। বীণার কণ্ঠ [illegible] তীক্ষ্ণ আর্ত-স্বর বাহির হইয়া আসে—"এ কোথায় আপনি [illegible] নিয়ে এলেন?"

"চিৎকার-টিৎকার করো না। নেবে এসো বলছি।" [illegible] সূচক গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

"না, আমি এখানে নাবব না—কিছুতেই না"—[illegible] কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

গাড়ীর হাতলে হাত রাখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া লোকটি—এ অভিনয় দেখিতেছি—এখনও [illegible] রাখিতেছে। এ সব সস্তা ভড়ং—সে কি ডাকিয়া আ[illegible] নিজেই ত সাধিয়া আসিয়াছে। গাছের নীচে বৃষ্টিতে ভিজিতে [illegible] ইসারা…কি হয় এ সবের অর্থ? এগুলো দাম বাড়ানো[illegible] গানা ভাণ; বেশ ত দেওয়া যাইবে উচ্চমূল্যই। [illegible] ততোধিক গম্ভীর করিয়া বলে, "বলছি নেবে এসো। চাকরের কাছে আমায় অপমান করো না। বেশ তো [illegible] নেবে ঘরে বসে একটু অপেক্ষা করো—আমার কাজ সেরে [illegible] দিয়ে আসব তোমায়।"

[illegible]

"কাল রাতে দিদি কখন এসেছিল মা ? 'অনেকক্ষণ মা'র সঙ্গে জাগিয়া থাকিয়া শেষে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মা'র জবাব শুনিবার জন্ম প্রশ্নকর্তার চাইতেও উৎকর্ণ হইয়া ওঠে বীণা।

মা বলেন, "তা রাত অনেকই হবে। ঘড়ি তো নেই, সময় বলব কি করে ? ঝড়-বৃষ্টির জন্য আটকা পড়ে গিয়েছিল বন্ধুর বাড়ী, তারাই শেষে গাড়ী দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।"

বীণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—লোকটা তবে সে রাত্রিতে মাকে ইহাই বুঝাইয়াছিল! নিশ্চয়ই বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছিল—মা বিশ্বাস করিয়াছেন। করিবেনই তো—এ ছাড়া আর কিছু যে সম্ভব, এমন কথা সে নিজেই কোন্ আর ভাবিতে পারিত—না কেউ পারে!

মা'র জবাব শুনিয়া রতন উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, "বন্ধুর বাড়ী ছিল দিদি ? নিশ্চয়ই খুব খাইয়ে দিয়েছে দিদিকে—না, মা ?"

"কি জানি, সে কথা তো কিছু বলেনি বীণা।" অনাহারক্লিষ্ট পুত্রের লোভাতুর প্রশ্নে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে যেন নিজে নিজেই বলেন, "অন্ন নেই ; বস্ত্র নেই—এ কেমন স্বাধীনতা এলো !"

কিশোর রতন পত্রিকার সস্তা বুলি আওড়ায়, "শিশু-রাষ্ট্র যে মা।"

ছোট সংসারটির তিনটি প্রাণীই জাগিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু কিছুই কাহারও করিবার নাই। ভাইটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার সামর্থ নাই—নাই সামর্থ বই কিনিবার, নাই তাই তাহার পড়িবার—স্কুলে যাইবার তাড়া।

ভাঁড়ার শূন্য—নাই তাই মায়ের কর্মব্যস্ততা। বীণারও করিবার কিছুই নাই, নাই পড়া, নাই চাকরী—সমস্ত সংসারটি যেন কিছু করিবার অভাবে হাত পা ছড়াইয়া অলস হইয়া ঝিমাইতেছে। বীণা উঠিয়া একটি চেয়ারে শরীর এলাইয়া বসিয়া ভাবে—এক কিছুই করিবার থাকে না যাহাদের অনেক আছে, আর কিছুই করিবার থাকে না যাহাদের কিছুই নাই! বীণা আড়মোড়া দিয়া সোজা হইয়া বসে, ভাবে কিছু টাকার ব্যবস্থা না করিলেই যে নয়। হাঁটা-পথে যাইয়া ধার চাওয়া যায় এমন একটা ঠিকানা বাহির করিতে সে তাহার হাতব্যাগটা টানিয়া লয়—ছোট নোটবইখানার জন্য। ব্যাগ খুলিয়া স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হইয়া যায়—ব্যাগে যে অনেক টাকা! তাড়াতাড়ি 'ক্যাসনার' টানিয়া ব্যাগটার মুখ সে বন্ধ করিয়া ফেলে—যেন কাহারও দেখিয়া ফেলিবার ভয়ে ও আতঙ্কে।...বুকের অসহ্য ধক্‌ধকানিটা না থামিলে কিছুই ভাবিয়া সে স্থির করিতে পারিবে না। বুকটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়—না হইলে যেন হৃৎপিণ্ডটা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে। এত বড় নোটের তাড়া যে বীণা জীবনেও একসঙ্গে দেখে নাই—কি করিবে এখন সে এ টাকা দিয়া ? লোকটার মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে ? পাইবে কোথায় ? ঘৃণ্য টাকা ঘৃণার সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলিবে ? দিবে পোড়াইয়া ?—কি লাভ হইবে ? দান করিবে পথের ভিক্ষুককে ?... তাহারা তো পথের ভিক্ষুকের চাইতেও অসহায় ?

"দিদি—"

বীণা রতনের ডাকে চমকাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

"কাল রাতে বন্ধুর বাসায় খেয়ে এসেছিলে ? ইন্দ্রাণীদির বাসায়

বীণা স্থিরদৃষ্টিতে রতনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে—খা... অভাবে এতটুকু ছেলে খাবারের কথা শুনিয়াই খুসী হইতে চায়,—... করিতে চায় অতৃপ্ত খাওয়ার সাধ! বীণা বলে, "আমি কি খেয়ে... শুনে তোর তো কোন লাভ হবে না তোর কি খেতে ইচ্ছে যায় ব...?"

রতন নীরবে অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

বীণার এত করুণ মনে হয় রতনের মুখের এই হাসি—... দেখিতে পায় অসংখ্য ছেলের মুখের প্রতিবিম্ব রতনের মুখের হাসি... যাহারা জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য খাদ্যটুকুও না ... তরুণ মনের সজীব রঙীন আশা-আকাঙ্ক্ষার অকাল-সমাপ্তি... টানিয়া দিয়া ত্যাগ করে শেষ নিশ্বাস!—বুকটা তাহার ... মাথিয়া ওঠে..., না, রতনকে সে এ পথে ঠেলিয়া দিতে পারিবে না। খাদ্য দিয়া শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিবে সুস্থ, সবল যুবক—... পথে নয়—দিবে বাঁচিবার পথে অগ্রসর করিয়া।...ব্যাগটা সে ... আনে—দশ টাকার একখানা নোট রতনের হাতে দিতে দিতে ... "একটা কাজ হয়ে গেছে রে রতন, যা তোর খুসীমত খাবার ... আন—দেখি কত খেতে পারিস্ তুই। যা চট্ করে।"

কাজ হওয়া এবং অগ্রিম পাওয়ার সংবাদে মা আনন্দে ... হইয়া ওঠেন। "সত্যি! এতক্ষণ বলিস্‌নি বীণা। তা ক... দিয়েছে অগ্রিম ? শ'খানেক হবে!" সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন ... মন বলিয়াই বুঝি উঁকিটুকুও মারে না—তিনি যেন আনন্দে ... মানুষ হইয়া ওঠেন। আব্দারের সুরে বলেন, "আর ... আমি সেদ্ধ চাল খাব না, বীণা। রান্নাটাও করব ভিন্ন ... যা করেছি—অনুপায় হয়েই করেছি, ভগবান তা বুঝবেন।"

"তা ভগবান বুঝবেন—অন্ততঃ বুঝতে কষ্ট হওয়া ... আর হলেই বা আমরা ছাড়ব কেন ? জেনে-শুনে নিজের হাতে ... সব করাচ্ছেন—পুণ্যটা সুদ-শুদ্ধ আদায় করে তবে ছা... তিনি জবাব চাইবার আগে আমরাই জানতে চাইব—কেন ... পাপের পথে ঠেলে—কেনই-বা বাধ্য করেন পাপের অন্ন খেতে"

"ছিঃ, বীণা ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে নেই"

"কেন নেই মা ? তিনি বুঝি ঠাট্টা-তামাসা করতেই ভাল... শুনতে নয় ?" শ্রদ্ধাহীন তিক্ততার সঙ্গে কথা কয়টি ... সরিয়া গেল মা'র কাছ হইতে। নিজের জীবন দিয়া সে ... উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি সে শুনিতে ...।

ইন্দ্রাণীর ঐকান্তিক চেষ্টায় কিছু দিনের মধ্যেই ... কর্মে বহাল হইয়া অভাবের দুঃখ-দুর্ভাবনা হইতে বীণা মু... ফেলে। সে দিনের ঘটনা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার মত কখন... হঠাৎ উঁকি মারিয়া—আতঙ্কিত ধমকে তাহাকে জাগাইয়া দি... ছাড়া আর বেশী কিছু উৎপাত করে না। যে ঘটনার সাক্ষী ... নিজে—সে ঘটনা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা এমন কি তার ...

আলো-আঁধার, জল-ঝড়-বন্যা, আগ্নেয়গিরির ... প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়া, ভ্রূক্ষেপহীন চিরে... সময় চলে তার নির্দিষ্ট গতি-পথে—ঘটনার আকস্মিকতা ... জন্যও তাহাকে স্তব্ধ নিশ্চল করিয়া দাঁড় করাইতে পা... তাই চলার চুল-চেরা হিসাব তার ত্রুটিহীন—তার সেই চলার নিজস্ব পদ্ধতিতে সময়—এক-একটি ঋতু পার হইয়া গিয়া...

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

লণ্ডনে ত্রয়ী সম্মেলন—

গত মে মাসে লণ্ডনে যে তিনটি সম্মেলন হইয়া গেল, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রথম সম্মেলন হইল মিঃ বেভিন ও মি. একিসনের দ্বৈত সম্মেলন। ৯ই মে এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং প্রকৃত পক্ষে উহাকে মিঃ বেভিন, মিঃ একিসন এবং মিঃ সুম্যানের বৃহৎ ত্রয়ী সম্মেলনের উদ্যোগ পর্ব বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। মিঃ বেভিনের সহিত আলোচনা করিবার পূর্বেই মিঃ একিসন ওয়াশিংটন হইতে সোজা প্যারীতে যান এবং মঃ সুম্যানের সহিত আলোচনা করেন। এই একিসন-সুম্যান আলোচনাও উল্লিখিত ত্রয়ী সম্মেলনের উদ্যোগ-পর্বের একটি অংশ মাত্র। মিঃ একিসন ৭ই মে প্যারীতে পৌছেন এবং মার্কিন সরকারী কর্মচারীদের সহিত আলোচনা করেন এবং ৮ই মে মঃ সুম্যানের সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। অতঃপর ৯ই এবং ১০ই মে লণ্ডনে বেভিন-একিসন আলোচনা হওয়ার পর ১১ই মে হইতে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং সম্মেলন শেষ হয় ১৩ই মে। ১৫ই মে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী বারোটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিবদের যে সম্মেলন আরম্ভ হয় তাহা ১৮ই মে শেষ হয়। এই সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে যে পটভূমিকায় এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গত কয়েক মাস যাবৎ মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসন তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় যাহাকে 'situations of strength' অর্থাৎ 'শক্তির অবস্থা' সম্বন্ধে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা আসলে রাশিয়া ও কমিউনিজমের আক্রমণাত্মক নীতির চাপে উদ্ভূত গুরুতর অবস্থায় উহার প্রতিকারের প্রকৃত পন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়া তাহার আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তন না করিলে রাশিয়ার সহিত মীমাংসার জন্য কোন আলোচনাই চলিতে পারে না। কিন্তু কি করা কর্ত্তব্য, ইহাই প্রধান প্রশ্ন।

রাশিয়ার সহিত ঠাণ্ডা যুদ্ধে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ আরও চালাইয়া যাইতে হইলে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। নতুবা ঠাণ্ডা যুদ্ধে হারিয়া যাইবার আশঙ্কা উপেক্ষা করা চলিতেছে না। পরমাণু বোমা এখন আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়। মার্শাল পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের জুন মাসে শেষ হইবে, কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুই উন্নতি হয় নাই। জার্ম্মাণীর সমস্যাও কম উদ্বেগ-জনক নহে। পশ্চিম-জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণীকে চিরকাল বিভক্ত রাখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জার্ম্মাণী দখলকার রাষ্ট্রগুলির তাঁবেদার হইয়া চিরকাল থাকিবে, ইহা আশা করাও অসম্ভব। সুতরাং কিছুদিন পূর্বেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের উপর যতখানি নির্ভর করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল, বর্তমানে তাহাও আর সম্ভব নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধকে আমেরিকার তথা পশ্চিমী শক্তিবর্গের অনুকূলে তীব্রতর করিবার জন্য মিঃ একিসন এবং রাষ্ট্রবিভাগ কোন পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন কি না মিঃ একিসন লণ্ডনে যাওয়ার সময় তাহা কিছুই জানা যায় নাই। কাজেই তিনি কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া যাইতেছেন, ইহা অনুমান করিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু পরে ওয়াশিংটনের সংবাদে জানা যায়, লণ্ডন সম্মেলনের জন্য মিঃ একিসন বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলেন। মিঃ একিসন এবং মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগের পরিকল্পনা-গঠন দপ্তর পৃথিবীব্যাপী কম্যুনিজম নিরোধের জন্য যে পরিকল্পনা-গঠন করেন, তাহা অবশ্য অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। তথাপি যে-নীতির ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে, তাহার কিছুটা আভাষ পাওয়া কঠিন হয় নাই। সে-টুকু আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে লণ্ডনের বৃহৎ ত্রয়ী পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সহজ হইবে।

আমরা 'situations of strength'-এর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই 'situation of strength' সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা-ই প্রথম নীতি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সোভিয়েট-বিরোধী শক্তিবর্গের দেশরক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, প্রয়োজন হইলে যে-কোন মুহূর্ত্তে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালানো সম্ভব হইবে। দ্বিতীয় নীতি হইল এই যে, এই 'situations of strength' একমাত্র আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলির সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলাই সম্ভবপর এবং এই সহযোগিতায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণী পরিপূর্ণ ভাবে যোগদান করিবে। এই দুইটি নীতি কি ভাবে প্রয়োগ করা হইবে, বৃহৎ ত্রয়ী পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব-ত্রয়ের প্রথম দিনের আলোচনা সম্বন্ধে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে, "It is recognized that in the present world situation

the preservation of peace requires renewed effort of co-operation in all fields, particularly in building up of an effective defence through the North Atlantic Treaty and the strengthening of economic foundations of the Western Powers to support these efforts." অর্থাৎ 'ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় শান্তিরক্ষা করিতে হইলে সমস্ত ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির মারফৎ কার্য্যকরী রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করিবার জন্য নূতন উদ্যমে চেষ্টা করিতে হইবে।' ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, এ পর্য্যন্ত সামরিক উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য চেষ্টা যে-পরিমাণে করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিবার এবং এই চেষ্টা শুধু ইউরোপে নিবদ্ধ না রাখিয়া পৃথিবীব্যাপী করিবার সিদ্ধান্তই এই সম্মেলনে করা হইয়াছে। রক্ষা-ব্যবস্থাকে অধিকতর ব্যাপক ও সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্তের মধ্যে মিঃ একিসনের মৌলিকত্ব কতটুকু আছে, তাহা অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যে রাশিয়ার পরমাণু বোমার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রহিয়াছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। পরমাণু বোমা ছাড়াই রাশিয়ার সামরিক শক্তি এরূপ যে, সমগ্র ইউরোপ দখল করা তাহার পক্ষে কঠিন কিছুই নয়। বস্তুতঃ, লণ্ডনে আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত শক্তিবর্গের বৈঠক চলিবার সময়েই পশ্চিম-জার্ম্মাণী হইতে আলেকজাণ্ডার ক্লিফোর্ড 'ডেইলী মেইল' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "রুশরা যদি আগামী কল্য অভিযান আরম্ভ করে, তাহা হইলে এক মাসের মধ্যেই তাহারা ইংলিশ চ্যানেলের তীরে এবং পিরানিজ পর্ব্বতমালার নিকটে উপস্থিত হইবে। এই হিসাব সম্পর্কে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের মধ্যে সামান্য মতভেদ যে হইতে পারে না তাহা নয়। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিবেন, এমন কাহাকেও আপনারা পাইবেন না। পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা বাস্তব অবস্থার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রবর্গের সামরিক শক্তি একত্রিত করিলেও লাল ফৌজ উহা অপেক্ষা বহু গুণে শক্তিশালী। অতি সহজেই উহারা জয়লাভ করিবে।" সুতরাং পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ রক্ষা-ব্যবস্থা এবং উহার ভিত্তি অর্থনৈতিক শক্তি সুদৃঢ় করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জার্ম্মাণীর নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে এবং ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর কয়লা ও ইস্পাত-শিল্পের সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মঃ সুম্যানের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। ১৩ই মে তারিখের অধিবেশনে পররাষ্ট্র-সচিবত্রয় জার্ম্মাণী সম্পর্কে একটি সুদূর-প্রসারী ঘোষণা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ অ্যাডেনওয়ারের নিকট প্রেরণ করিতে সিদ্ধান্ত করেন। ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রতিরোধকল্পে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের তিন দিনব্যাপী আলোচনার পর এই ঘোষণাটি রচিত হয়। ১৪ই মে রাত্রে উক্ত ঘোষণা প্রচারিত হয়। বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয় জার্ম্মাণী সম্পর্কে যে-ঘোষণা [illegible] তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই দেখা যায় না। ইহাতে এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণী যত অ[illegible] পরিমাণে সম্ভব সার্ব্বভৌমত্ব লাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়, ইহাই বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের অভিপ্রায়। ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী দখলে রাখা সংক্রান্ত বিধি-বিধানের পরিবর্ত্তন [illegible] উদ্দেশ্যে এক দল সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে। ঘোষণায় ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রাশিয়া যে-পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে অন্যান্য জার্ম্মাণদের সহিত যোগদান [illegible] গণতান্ত্রিক এবং ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করিতে দিতে অস্বীকার করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর সহিত শান্তি-চুক্তি করা [illegible] হইবে না। সর্ব্বশেষে স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া জার্ম্মাণীর বিভাগ রহিত করিবার জন্য রাশিয়াকে অনুরোধ করা হইয়াছে। [illegible] লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয় জার্ম্মাণীর [illegible] নির্দ্ধারণের জন্য পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে নিযুক্ত দখলকার রাষ্ট্রত্রয়ের [illegible] জন হাই-কমিশনার এবং রাশিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণীর জনগণের অভিপ্রায় জানিবার [illegible] চেষ্টা বা ব্যবস্থা করেন নাই। আজকাল আমরা সর্ব্বদাই গণ[illegible] কথা শুনিতে পাই। কিন্তু তিনটি বৃহৎ পশ্চিমা [illegible] পশ্চিম-জার্ম্মাণীর উপর যে-ভবিষ্যৎ চাপাইয়া দিলেন, [illegible] জার্ম্মাণীর জনগণের অভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন কেন, ইহা কি সত্যই বিস্ময়ের বিষয় নহে? [illegible] গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির কিরূপ [illegible] হইতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। জার্ম্মাণীর জন[illegible] অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যে-ভবিষ্যৎই নির্দ্ধারণ করা হউক তাহা [illegible] মণ্ডিত হইবে এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রতি জার্ম্মাণীর [illegible] বর্দ্ধিত হইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী [illegible] জন্য স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন হইতে দিতে রাশিয়ার নিক[illegible] পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়কে যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহাতে [illegible] গণতন্ত্রী সাজিবারই শুধু চেষ্টা করেন নাই, জার্ম্মাণী বিভক্ত [illegible] দায়িত্বও রাশিয়ার ঘাড়েই চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। [illegible] যে দুইটি পৃথক্ রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কি [illegible] যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সেরই নহে? জার্ম্মাণী বিভক্ত হওয়া[illegible] রাশিয়ার দায়িত্বও যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও উহা[illegible] মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত সমান দায়ী।

ত্রয়ী-সম্মেলন একটি সাধারণ ইস্তাহার প্রকাশ করি[illegible] ইহাতে রাশিয়ার নাম উল্লেখ করা না হইলেও যে-ভাবে বর্ণনা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, রাশিয়াকেই তাঁহারা একমাত্র যুদ্ধ আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের জন্য রাশিয়ার সহিত কোন নূতন আলোচনা না করিতেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার ফ্রণ্ট সম্বন্ধে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে ঐ ফ্রণ্টে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালাইতে তাঁহারা একমত হইয়াছেন। কয়েকটি দেশ নূতন স্বাধীনতা লাভ করায় উহার আলোকে [illegible] এশিয়ার পরিস্থিতি এবং অগ্রসরমান কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ [illegible] যে-অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বিশেষ ভাবে বিবেচনা কথা এবং ঐ সকল নূতন গবর্ণমেণ্টকে উৎসাহ দান এবং সমর্থন সিদ্ধান্তের কথাও ইস্তাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইস্তাহারে

[illegible] হইয়াছে যে, ঐ অঞ্চলকে তাঁহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে [illegible] বলিয়া মনে করেন এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য ঐ অঞ্চলের সমস্ত গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অধিকতর শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ঠাণ্ডা যুদ্ধ কি ভাবে পরিচালিত হইবে, উল্লিখিত [illegible] হইতে কিছুই বুঝা যায় না। তবে ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নকে যেমন আটলাণ্টিক চুক্তির সামরিক ছাঁচে ঢালিয়া সাজিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জন্যও একটা বিরাট সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তবে বন্দুক-কামানের উপরে কিছু ভাত [illegible] ব্যবস্থাও যে হয় নাই তাহাও নয়।

[illegible]-সম্মেলনে ব্যাপক এবং বিপুল সামরিক প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত [illegible] হইয়াছে। শুধু ইউরোপেই নয় এশিয়াতেও। কিন্তু কি উপায়ে [illegible] সামরিক প্রস্তুতি করা হইবে তাহাই প্রশ্ন। আটলাণ্টিক [illegible] বারোটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনেও যে-কোন [illegible] আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার উপযোগী করিয়া আধুনিক [illegible] সহ একটি সুদৃঢ় দেশরক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প গৃহীত [illegible]। সম্মেলনে আটলাণ্টিক চুক্তি-পরিষদের একটি উচ্চ ক্ষমতা-[illegible] গঠনেরও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই সংস্থার প্রধান দপ্তর স্থাপিত হইবে লণ্ডনে। এ সম্পর্কে যে ঘোষণা প্রকাশ [illegible] তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চুক্তির রাজনৈতিক দিক [illegible] করিবার জন্য আটলাণ্টিক চুক্তি-পরিষদের বৈঠক যেরূপ [illegible] হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, চুক্তির [illegible] দিক বিবেচনা করিয়া একটি দেশরক্ষা পরিকল্পনা রচিত [illegible] এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিরূপ সৈন্যবল প্রয়োজন [illegible] স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে [illegible] সাধারণ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক দায়িত্ব বণ্টন এবং প্রয়ো-[illegible] সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই উচ্চ ক্ষমতা-বিশিষ্ট [illegible] বা Super Atlantic Union আটলাণ্টিক চুক্তির [illegible] প্রত্যেক দেশকে তাহার সুনির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া [illegible] সাধারণ রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য তাহারা যাহা করিবে তাহার [illegible] বিধানের ব্যবস্থাও করা হইবে। কিন্তু আসল সমস্যা [illegible] অর্থনৈতিক সমস্যা। আধুনিক সামরিক প্রস্তুতি যে কিরূপ [illegible] তাহা সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অস্ত্রশস্ত্র না হয় [illegible]রাষ্ট্রই সরবরাহ করিবে, তথাপি পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-[illegible] গড়িয়া তুলিতে হইবে রাডার স্ক্রীন (radar sereen), [illegible] সংখ্যায় বিমান-বিধ্বংসী কামান (anti caircraft [illegible] স্থাপন করিতে হইবে যে, যেন বিমান-বিধ্বংসী কামানের [illegible] সৃষ্টি করা হইয়াছে। তা ছাড়া গাইডেড্ মিসিল [illegible] ঘাঁটিও তৈয়ার করিতে হইবে। এইগুলি বড় কম [illegible] ব্যাপার নয়। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র পরিচালনায় সৈন্য-[illegible] শিক্ষিত করিয়া তোলাও বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। [illegible]ইউরোপের দেশগুলি এই বিপুল ব্যয় সঙ্কুলান করিবে কিরূপে? [illegible] দেশগুলি মার্শাল সাহায্য পাইয়াই জনসাধারণের [illegible] মানের উন্নতি করিতে পারে নাই। মার্শাল সাহায্য [illegible] এবং [illegible]

দুর্গতি আরও বাড়িবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি করিয়াই এই বিরাট রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। মাখনের পরিবর্ত্তে বন্দুকই পাইবে প্রাধান্য। অবশ্য ১৯৫২ সালের পরে কি করা হইবে তাহার আয়োজন এখন হইতেই আরম্ভ হইবে। পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাইলে দেশরক্ষা ব্যয় সঙ্কুলান এবং জনগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মান বর্দ্ধিত করা সম্ভব হইবে কিরূপে তাহা অনুমান করা কঠিন।

আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলি, গ্রীস, তুরস্ক, পারস্য ফিলিপাইন, কোরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াকে সামরিক সাহায্য দিবার উদ্দেশ্যে ১২২,২৫,০০,০০০ ডলার মঞ্জুর করিবার জন্য মার্কিন কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহা যে ঠাণ্ডা যুদ্ধকে তীব্রতর করিবার ব্যবস্থা মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন সামরিক সাহায্য দিবে, তেমনি রাশিয়াও যদি অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশেই গৃহযুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিবে। কিন্তু শান্তির সময় এইরূপ বিরাট সামরিক প্রস্তুতি এবং ব্যাপক ভাবে অস্ত্র সাহায্য দান কি সত্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? সাধারণ মানুষ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবে তাহাও বিবেচনার বিষয়। সিনেটর টাফ্ট এইরূপ ব্যবস্থাকে আক্রমণাত্মক কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গত ২৯শে মে (১৯৫০) তিনি বলিয়াছেন, "If we go out to put modern invasion airplanes in every country surrounding Russia then we have become an agressor." অর্থাৎ 'রাশিয়ার চারি দিকে যে-সকল দেশ আছে তাহাদের প্রত্যেককেই আমরা যদি অভিযান চালাইবার উপযোগী বিমান প্রদান করি তাহা হইলেই আমরা আক্রমণকারী হইলাম।' সেনেটর টাফ্ট মিঃ একিসন অপেক্ষা কম রুশ-বিরোধী নয়। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলি না বিলাইয়া আমেরিকাতেই মজুত করিয়া রাখিবার তিনি পক্ষপাতী। কারণ-স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, "রাশিয়া যদি ঘোষণা করে যে অমুক দিন সে পরমাণু বোমা বর্ষণ করিবে, তাহা হইলে বেলজিয়ম এবং হল্যাণ্ড আমাদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে বলিয়া কি আপনারা মনে করেন?" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়া পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলিকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করার অর্থ যুদ্ধকে অধিকতর সম্ভাব্য করিয়া তোলা। তাঁহার এই মন্তব্য যে খুবই সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুম্যান পরিকল্পনা—

গত ৯ই মে (১৯৫০) ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব মঃ সুম্যান এক উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্ত্তৃত্বাধীনে জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সের কয়লা এবং ইস্পাত-শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই সুম্যান-পরিকল্পনা নামে খ্যাত। বেলজিয়ম, লাক্সেমবুর্গ এবং অন্য যে-দেশ এই পরিকল্পনায় যোগদান করিতে চায় তাহাকেও ইহাতে গ্রহণ করা হইবে। পেট্রোল এবং পরমাণু শক্তির মত কয়লা ও ইস্পাতও অর্থনৈতিক ও শিল্পনৈতিক ব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ, কাজেই সামরিক শক্তিও বটে। শুধু শান্তির সময়েই নয়, যুদ্ধের সময়েও [illegible]

নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সুম্যান-পরিকল্পনার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহাই প্রধান প্রশ্ন। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বিরোধের যে বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে এই পরিকল্পনার দ্বারা তাহা যেমন দূরীভূত হইবে, তেমনি পশ্চিম-ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও ঐক্যবদ্ধ করিবার পথ প্রশস্ত হইবে। পশ্চিম-ইউরোপে শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য জার্ম্মাণীর কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু জার্ম্মাণীর এই দুইটি শিল্পকে অবাধে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়ার বিপদও উপেক্ষার বিষয় নয়। এই জন্যই পশ্চিম-জার্ম্মাণীর দখলকার শক্তিত্রয় গত ১৭ই মে (১৯৫০) জার্ম্মাণীতে ক্রুপ, কোয়েকুয়ের এবং ফ্লিকের ন্যায় বৃহৎ কারখানা যাহাতে গড়িয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। উল্লিখিত কারখানাগুলি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট কারখানা তৈয়ার করা হইবে। ত্রয়ী-সম্মেলনের ঘোষণা হইতে বুঝা যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে ধীরে ধীরে সার্ব্বভৌমত্ব দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহার শিল্পনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা হইবে ফ্রান্সের সহযোগিতায়। একই উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃত্ব-শক্তির অধীনে জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সের কয়লা ও ইস্পাত শিল্পকে যদি ঐক্যবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে জার্ম্মাণ-শিল্পের সমস্ত সুবিধাই পাওয়া যাইবে, অথচ জার্ম্মাণীর শিল্পোন্নতি হইতে উদ্ভূত বিপদ নিবারণ করাও সম্ভব হইবে। এইখানেই সুম্যান-পরিকল্পনার সার্থকতা।

পশ্চিম-জার্ম্মাণী ইউরোপীয় কাউন্সিলে যোগদান করিতে রাজী হইবে কি না তাহা এখনই অনুমান করা কঠিন। গত ১০ই মে (১৯৫০) পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ একিসন অবশ্য বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশগুলি যদি শান্তিরক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে কতক পরিমাণে জাতীয় স্বার্থ অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি সুম্যান-পরিকল্পনাও সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম-জার্ম্মাণী জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট কর্তৃত্ব-শক্তির হাতে শিল্প সংক্রান্ত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা তুলিয়া দিতে রাজী হইবে কি? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপ উপেক্ষা করাও যে সম্ভব নয়, সে কথাও অবশ্যই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বৃটেনও এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা বৈঠকে যোগদান করিতে রাজী হয় নাই।

মিঃ লাইয়ের প্রয়াস—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারল মিঃ ট্রিগভি লাই শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দশ দফা-সমন্বিত এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রত্যেক সদস্যের নিকট এই পরিকল্পনা একটি স্মারকলিপি সহ প্রেরণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন আলোচনা আমরা করিব না। তবে শুধু এইটুকু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে-সমস্যা লইয়া তিনি মস্কো পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন সেই চীনের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত সমস্যাটি কোন আকারেই এই পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই। শান্তি-প্রতিষ্ঠার পথে বহু অন্তরায়ই আছে। কিন্তু চীনের প্রতিনিধিত্ব সমস্যাই বর্ত্তমানে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া [illegible] তিনি বলিয়াছেন, "সেক্রেটারী-জেনারল হিসাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে এবং যাহাতে চিরস্থায়ী শান্তি দেখা দেয় তাহার জন্য জগৎকে নূতন পথের সন্ধান দিতে হইবে।" বৃহৎ ত্রয়ী পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরেও তাঁহার [illegible] আশাবাদ একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহার চেষ্টার পরিণাম সম্বন্ধে অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া [illegible] লাভ আছে কি?

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্লী এবং [illegible] প্রেসিডেন্ট অরিয়লের সহিত আলোচনার পর মিঃ লাই মস্কো যান। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন আশা বা আশ্বাস পাইয়া তিনি মঃ ষ্ট্যালিনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন কি না, তাহা [illegible] জানা যায় না। কিন্তু মস্কো আলোচনা সম্পর্কে মিঃ লাই বলিয়াছেন যে, মস্কোতে মঃ ষ্ট্যালিন এবং অন্যান্য রুশ-নেতাদের সহিত [illegible] যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ নিরাশ হইবার কারণ থাকিলে তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ একিসনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে কি আশ্বাস তিনি পাইয়াছেন? প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং মিঃ একিসন তাঁহাকে এইটুকু আশ্বাস মাত্র দিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখিবার জন্য আমেরিকা ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না। এই আশ্বাস আসলে নেতিবোধক আশ্বাস ছাড়া [illegible] কিছুই নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দলে [illegible] যে, কুয়োমিন্টান চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইতে অপসারিত করিবার কোন প্রস্তাবই গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। [illegible] মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনই [illegible] না। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের যে-অধিবেশন হইবে, তাহার পরবর্ত্তী অধিবেশনের বিষয়-সূচীতে মিঃ লাইয়ের [illegible] পরিকল্পনাটি অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কিন্তু আগামী সেপ্টেম্বর অধিবেশনেও কুয়োমিন্টাং চীনকে অপসারিত করা সম্ভব না [illegible] রাশিয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ত্যাগ সম্পূর্ণ হইবে।

তুরস্কে সাধারণ নির্ব্বাচন—

গত ১৪ই মে (১৯৫০) তুরস্কে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া [illegible] তাহাতে 'পিপলস্ রিপাবলিকান পার্টি' বিপুলভাবে হারিয়া [illegible] এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে ডেমোক্রাট [illegible] ২৭ বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছেদে এবং নিরঙ্কুশ ভাবে তুরস্কের শাসন-পরিচালনের পর এই প্রথম রিপাবলিকান পার্টির পরাজয় হইল [illegible] অপেক্ষাকৃত নূতন দল ডেমোক্রাট দলের নিকট। ডেমোক্রাট [illegible] ৪৩৪টি, পিপলস রিপাবলিকান পার্টি ৫২টি এবং ন্যাশনাল [illegible] মাত্র ১টি আসন দখল করিয়াছে। তুরস্কের পার্লামেন্ট অর্থাৎ ন্যাশনেল এসেম্বলীর সদস্য-সংখ্যা ইতিপূর্ব্বে ছিল ৪৬৫ [illegible] বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে উহা বর্দ্ধিত করিয়া ৪৮৭ জন করা [illegible] বিগত পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের সদস্য-সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিত [illegible] পিপলস্ রিপাবলিকান পার্টি—৪০২, ডেমোক্রাট দল—৩২, ন্যা[illegible]

আধুনিক তুরস্কের স্রষ্টা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৩ সালে পিপলস্ রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন। ১৯৩৮ সালের ১০ই নবেম্বর কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হইলে জেনারেল ইসমেৎ ইনোনু তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। জেনারেল ইনোনু ছিলেন কামাল আতাতুর্কের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ। কিন্তু কামাল আতাতুর্ক যে গণতান্ত্রিক প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার সমস্তই পরিত্যক্ত হয়। প্রেসিডেণ্ট স্বৈরতান্ত্রিক নায়কের মতই দেশ শাসন করিতেন। তাঁহার ক্ষমতার ভিত্তিভূমি ছিল আনাতোলীয় অভিজাত সম্প্রদায় এবং সৈন্যবাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে নূতন রাজনৈতিক দল ডেমোক্রাট পার্টি গঠিত হয়।

বর্ত্তমান নূতন নির্ব্বাচনের পর ডেমোক্রাট দলের নেতা সেলাল বয়ার দেশের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন মিঃ আদ্নান মেনদেরেস। ডেমোক্রাট দল জয়লাভ করায় তুরস্কের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতখানি প্রসারিত হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু পররাষ্ট্র-নীতির যে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গত ২৯শে মে (১৯৫০) জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে নূতন প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, "বৃটেন এবং ফ্রান্সের সহিত প্রগাঢ় মৈত্রী এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিবিড়তম সহযোগিতাই হইবে নূতন গবর্ণমেণ্টের নীতি।"

তরুণ জার্ম্মাণদের শান্তি অভিযান—

পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর পাঁচ লক্ষ তরুণের যে শান্তি অভিযানের সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মনে আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা গত ২৮শে মে (১৯৫০) নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এই অভিযান উপলক্ষে পশ্চিম-বার্লিনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল [illegible], মার্কিণ এবং ফরাসী পুলিশ ও সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়াই [illegible] কিন্তু কোন অঘটনই ঘটে নাই। পাঁচ লক্ষ তরুণ জার্ম্মাণ যুবক যুবতী বৃষ্টির মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বার্লিনের সমগ্র সীমারেখা বরাবর [illegible] মাইল পথ কুচকাওয়াজ করিয়া অতিক্রম করে। ইহাতে [illegible] ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া[illegible] পশ্চিম-বার্লিন হইতে শোভাযাত্রাকারীদের উপরে একটি [illegible] নিক্ষিপ্ত হয় এবং উহা ফাটিয়া শোভাযাত্রাকারীদের মাথায় [illegible] কতকগুলি মুদ্রিত ইস্তাহার। ঐ সকল ইস্তাহারে রাশিয়ার [illegible] সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার সাবধান-বাণী মুদ্রিত ছিল। [illegible] অতিক্রম করিবার সময় শোভাযাত্রাকারীরা শান্তির [illegible] শত শত পায়রা ছাড়িয়া দেয়। ঐগুলি আকাশে চক্রাকারে [illegible] প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া উড়িয়া [illegible]।

[illegible]-প্রাচ্য—

[illegible] মে মাসে (১৯৫০) মধ্য-প্রাচ্য সম্পর্কে দুইটি ঘোষণা প্রচার [illegible] গত ১৯শে মে মার্কিণ ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে [illegible] ঘোষণায় গ্রীস, তুরস্ক এবং পারস্যের স্বাধীনতা এবং [illegible] সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। কূটনৈতিক [illegible] ধারণা যে, রাশিয়া যাহাতে মধ্য-প্রাচ্যে নূতন কোন চাপ [illegible] অগ্রসর না হয়, সেই উদ্দেশ্যে রাশিয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই এই ঘোষণার উদ্দেশ্য। গ্রীস, তুরস্ক এবং পারস্য যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন দেশ তাহা সকলেরই জানা কথা।

অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় সম্পর্কে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের যে ঘোষণা গত ২৫শে মে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে ইজরাইল এবং আরব রাষ্ট্রগুলিকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা সীমান্ত অথবা যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করিবার আয়োজন করিলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিতরে এবং বাহিরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ওয়াশিংটন হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডন সম্মেলনের সময় বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স এই বিষয়ে একমত হন যে, আক্রমণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না, এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি না দিলে ইজরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলির নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা হইবে না। খুব ভাল নীতি সন্দেহ নাই। পাকিস্তান আমেরিকায় অস্ত্র-শস্ত্র কিনিয়া আরব দেশগুলিতে পাঠাইতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এইরূপে অপরের মারফৎ যদি অস্ত্র ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে অস্ত্র বিক্রয় সম্বন্ধে উল্লিখিত চুক্তির কোন সার্থকতা থাকিবে না।

আরব লীগের রাজনৈতিক কমিটিতে মিশর আরব লীগ হইতে জর্ডনের বহিষ্কার দাবী করিয়াছে। মিশরের এই দাবী সৌদী আরব, লেবানন ও সিরিয়ার সমর্থন লাভ করিয়াছে। কেবল ইরাক ও ইয়েমেন নিজ নিজ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সময় চাহিয়াছে। মিশরের প্রস্তাবের পরিণাম কি হইবে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

জাপানে কমুনিষ্ট উচ্ছেদ—

জাপান হইতে কমুনিষ্ট উচ্ছেদের অভিযান সুরু হইয়াছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার জাপানের প্রধান মন্ত্রীকে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যকে আইনের আশ্রয়-বঞ্চিত ঘোষণা করিতে এক নির্দ্দেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী সাঙ্গো নোসাকা এবং কুইচি তোকুদা এই দুই জন কম্যুনিষ্ট নেতা সহ মোট ২৪ জন নেতাকে আইনের আশ্রয়-বঞ্চিত (Outlawed) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। জেনারেল ম্যাক আর্থারের পত্রে জাপানের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এই যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি আইনানুমোদিত কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং আইন-শৃঙ্খলা উপেক্ষা করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ বিবৃতি এবং অন্যায় কার্য্যকলাপ দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এবং বলপূর্ব্বক আইনানুমোদিত গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। অভিযোগের এই বিবরণ হইতে হঠাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রকৃত কারণ অনুমান করা কঠিন।

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির আলোচনায় রাশিয়া যোগদান করিবে, এরূপ ভরসা দেখা যাইতেছে না। ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতাও বাড়িয়া উঠিতেছে। যত দিন যুদ্ধাশঙ্কা থাকিবে, তত দিন আমেরিকা জাপান হইতে দখলকার সৈন্য সরাইয়া লইবে, এরূপ সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। জাপান আমেরিকার সামরিক সরবরাহের ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। এদিকে কমিনফর্ম কর্তৃপক্ষ সাঙ্গো নোসাকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, তিনি দলের নীতি ভঙ্গ করিতেছেন। কাজেই তাঁহার স্থলে যোশিরো শিগাকে পার্টির নেতা নিয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে ব্যাপক

ভাবে ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় কম্যুনিষ্ট উচ্ছেদের অভিযান সুরু করা হইয়াছে।

ডাঃ হো-চি-মীনের অপসারণ—

ডাঃ হো-চি-মীন সম্পর্কে যে ক্ষুদ্র একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই সংবাদে প্রকাশ, তাঁহাকে ইন্দোচীন কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারীর পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইন্দোচীনে যে-জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান সুরু হইয়াছে, তাহাতে কম্যুনিষ্ট পার্টি সংখ্যালঘু। কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাব যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য ডাঃ হো-চি-মীনকে অপসারিত করা হইয়াছে। এই সংবাদ হইতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ডাঃ হো-চি-মীনের দল রাশিয়া দ্বারা প্রভাবিত নহে। ডাঃ হো-চি-মীনের অপসারণ গ্রীসের কম্যুনিষ্ট নেতা জেনারেল মারকোসের অপসারণের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়।

সিডনী সম্মেলন—

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধের উপায় নির্দ্ধারণ ও গ্রহণের জন্য গত মে (১৯৫০) সিডনীতে যে কমনওয়েলথ সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার ফলাফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গত জানুয়ারী (১৯৫০) মাসে কলম্বো সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ কার্য্যকরী করিবার জন্য একটি 'Commonwealth Consultative Council' গঠিত হয়, তাহারই অধিবেশন হয় সিডনীতে। বৃটেন, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড এবং কানাডার প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৫ই মে এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং সম্মেলন শেষ হয় ১৯শে মে তারিখে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য দানের প্রশ্ন লইয়া প্রতিনিধিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। অতঃপর তৃতীয় দিবসে এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহকে কারিগরী সাহায্য দানের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির জন্য ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং ব্যয় করা হউক বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া যে প্রস্তাব করে, তৎসম্পর্কে মোটামুটি ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ইহাতেই সম্মেলনের ফাঁড়া কাটে নাই। বৃটেন এই প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সময় চায়। ফলে অসমাপ্ত অবস্থায় সম্মেলন শেষ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে বৃটেন অষ্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবে রাজী হয় এবং পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে বৃটেনের প্রস্তাবে অষ্ট্রেলিয়াকে রাজী হইতে হয়।

বৃটেন স্বল্পমেয়াদী সাহায্য দান প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিয়াছিল। অবশেষে স্থির হয় যে, আগষ্ট মাসে লণ্ডন-বৈঠকে এ-সম্পর্কে আলোচনা হইবে। এই ভাবে বিরোধের মীমাংসা করা সম্পর্কে আপোষ হইয়াছে। লণ্ডন-বৈঠকের পরিণাম কি হইবে, তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সাহায্য দান ব্যবস্থায় যে বিলম্ব ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং সাহায্য পর্য্যাপ্ত কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। কম্যুনিষ্ট-আক্রমগ্রস্ত দেশগুলির শাসন পরিচালন-ব্যবস্থাও এরূপ যে, এই অর্থের সদ্‌ হইয়া জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট দূর হওয়ার ভরসা করাও কঠিন।

বাগুইও সম্মেলন—

ফিলিপাইনের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী বাগুইওতে এশিয়ার সা অ-কম্যুনিষ্ট দেশের সম্মেলন গত ২৬শে মে (১৯৫০) আরম্ভ হই ৩০শে মে শেষ হইয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, থাইল্যা অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন এই সাতটি দে প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। উদ্বাস্তু কুয়োমি গবর্ণমেণ্টকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয় নাই, যদিও জেনা চিয়াং কাইশেক প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্লক গঠন করিবার এক জন প্রধান উৎসাহী ছিলেন। কম্যুনিষ্ট ব্লক অসন্তুষ্ট হয় কিছু করা এই সম্মেলন সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। বক্তৃতাদি কম্যুনিষ্টদের নিকট হইতে বিপদের আশঙ্কার কথাও স্পষ্ট করিয়া হয় নাই। আবার পশ্চিমী শক্তিবর্গ অসন্তুষ্ট হইতে পারে কিছু বলিতেও প্রতিনিধিগণ বিরত ছিলেন।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, স্বা রক্ষা, ন্যায়সঙ্গত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের সক্রিয় ও শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার উপায় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সম্মেল আলোচনা করা হইবে। বস্তুতঃ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তা এই উদ্দেশ্যকেই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই এই সম্মেলন বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ছাড়া আর কিছুই না। সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম মিঃ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট জেনা রমুলো বলিয়াছেন যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের দেশ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার নীতি সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার করিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে হয় নাই। জেনারেল রমুলোর উপরেই সংযোগ-সমন্বয় দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। বাগুইও সম্মেলনে কোনরূপ মৈত্রী স্থাপন করা হয় নাই। বস্তুতঃ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য দান করিবার মত সামর্থ্যও এই দেশগুলির নাই। উপস্থিত হইলে এই দেশগুলি কি ভাবে পরস্পর সহযোগি তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জনগণের অর্থনৈতিক সাধনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে! কিন্তু ফিলিপা জনগণেরই অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাহা আর্থিক শোচনীয় অবস্থার সুযোগে ফিলিপাইনে বিদ্রোহ যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়। মার্কিণ দ্বারা বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইলেও রোগের মূল কারণ দূরীভূত হইবে না। ফিলিপাইন তাহার অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন করিবে, এরূপ আশা করাও কঠিন।

——আগামী সংখ্যা থেকে——

নূতন ধারাবাহিক উপন্যাস

অন্তরা

পুস্তকে রোগ-বীজাণু

বহু লোকের হাতাহাতির দায়ে পড়ে বই-এর পাতায় পাতায় রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকে। লণ্ডনস্থ [illegible] প্রেসের' মতে—সেইসেতে আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে [illegible] নষ্ট হয়ে যায়। সম্প্রতি তাঁরা এসম্পর্কে আরও একটা [illegible] করেছেন। হাসপাতালে রোগীদের পড়বার জন্য আজকাল [illegible] বই সরবরাহের একটা ব্যবস্থা আছে। 'মেডিকাল প্রেস' [illegible] যে, এই শ্রেণীর বই-এ 'রোগ-জীবাণু' সহজে অনুপ্রবেশ করে [illegible] তা থেকে স্বভাবতঃই রোগ ছড়িয়ে পড়বারও কারণ হয়। [illegible] বই-এর পাতার ন্যায় রুমাল প্রভৃতিতেও 'রোগ-জীবাণু' [illegible] থাকতে পারে। তবে সর্দিকাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়াবার [illegible] অপেক্ষা বই-এর জীবাণু অধিকতর শক্তিশালী। এর একটি কারণ হলো—রুমাল প্রভৃতি জিনিস ধোপাখানায় সাধারণতঃ সিদ্ধ [illegible] দেওয়া চলে এবং তাতে জীবাণু আর বাঁচতে থাকতে পারে না। কিন্তু বই-এর জীবাণু মুক্ত করবার জন্য যে কোন পদ্ধতিই [illegible]—তাতে বই বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

[illegible] সালে লণ্ডনে জনস্বাস্থ্য বিভাগ লাইব্রেরী বা সাধারণ [illegible] সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়ন করেন। সেই [illegible] কোন বিশেষ রোগে যদি লাইব্রেরীর বই-এ হাত [illegible], তবে সেই বই লাইব্রেরী ফেরত নেবার পূর্বে জীবাণু [illegible] হবে। জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় এক জন মুখপাত্র সেদিন [illegible] জীবাণু মুক্ত করবার একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে—[illegible] নামক এক প্রকার গ্যাসের সামনে খুলে ধরল। [illegible] পাতায় আবদ্ধ জীবাণু নিশ্চিত ভাবে মরে যায় [illegible] বই-এর কোন ক্ষতিও হয় না। তিনি আরও [illegible] বা ইনফ্লুয়েঞ্জা এমন ধরণের কোন রোগ নহে, [illegible] যদি কোন বইয়ে হাত দেয়, তবে তা জীবাণু [illegible] প্রয়োজন পড়ে।

[illegible] পাঠাগার বা লাইব্রেরীর অধিকাংশগুলোতেই বই-এর [illegible] দেখা যায়। সেখানে রক্ষিত জীর্ণ শীর্ণ বই-এর [illegible] হয়, সেগুলো যেন কত দিনের পরিত্যক্ত—ডাষ্টবিন [illegible] থেকে যেন ওদের করা হয়েছে উদ্ধার। বস্তুতঃ এই [illegible] স্পর্শ করা মাত্র—পাতা কয়টি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে [illegible] পড়বার সময় এরূপ বোধ হয়, বুঝি বা—নাক- [illegible] আসছে। লণ্ডনে এ সব বিষয় প্রতিকারের জন্য [illegible] প্রচলিত আছে। সেখানকার সাধারণ পাঠাগারের [illegible] বলেছেন—বই ফেরত আসা মাত্র ওদের জীবাণু মুক্ত করার অবশ্য কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, তবে বইগুলো পড়বার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে দেখলেই সেগুলো বাইরে পড়তে দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে তৎস্থলে নতুন বই-এর আমদানি করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৭ সি, গোখেল রোড, ১৩ নং ফ্ল্যাট, কলিকাতা—২০। মূল্য চার টাকা।

তিনি এসেছিলেন। সেই রাম আর সেই কৃষ্ণ। যখন ভারতের ধর্মে গ্লানি মিশেছে, যখন সাধুদের পরিত্রাণের আর কোন পথ নেই, ঠিক সেই সময়ে তাঁর আবির্ভাব। যুগে যুগে এসেছেন তিনি—কথা দিয়ে গেছেন, আবার আসবো। আবার তিনি এসেছেন। সেই রাম আর সেই কৃষ্ণ। আমরা হীন, আমরা দীন, আমরা মূর্খ—তাই চিনতে পারিনি তাঁকে—সেই রাম আর সেই কৃষ্ণকে। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি? ডিঙ্গেয় জাহাজ সমুদ্রের কি কিনারা করবে! তিনি কিন্তু মানুষকে আশ্রয় দিলেন, জীব আর শিবের মধ্যে কোন তফাৎ দেখলেন না। বললেন,—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। দেখবি আয়। সাধুফকির সবাই আয়। আস্তিক আয়, নাস্তিক আয়। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে টিলার উপরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন। কেউ এলো না। বললেন,—কারেই বা বলবো, কে-ই বা বুঝবে।

তখন আমরা অনেকটা নীচে নেমে গেছি। ভারতীয় মহাজাতি বেদ, বলে স্বীকার করেছে, মায়াময় জীবন ও জগৎ-সংসার বর্জনের আদর্শ। কেবল শুধু মোগল পাঠান ইংরেজের হাতে রাজনৈতিক অধীনতা নয়, তার সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনেও ঘনিয়ে উঠেছে চরম অধঃপতন। আর বাঙলা দেশে তখন নষ্টতন্ত্রের ভয়ঙ্কর প্রভাব। বর্তমান তমসাচ্ছন্ন বাঙালী সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত উঠতে চায়, তার পরে নয়। তিনি বললেন, সিদ্ধাই হোসনি। আরও উপরে উঠে যা। বললেন,—তাঁকে বললাম, মা আমাকে সিদ্ধাই করিসনি।

সেই রাম আর সেই কৃষ্ণ এসেছিলেন এই বাঙলা দেশে। দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারে, এক পুরোহিতের বংশে। যে রাম আর যে কৃষ্ণ, সেই এযুগের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—আধুনিক ভারতে আদি পুরুষ—নবীন ভারতের প্রধান পুরোহিত। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। লেখাপড়া নেই, অথচ সর্বশাস্ত্রে সমান দখল। আমাদের মত গুহাবাসী জীবদের চোখে আলো ছড়িয়েছেন কথায় কথায়। বদ্ধ জীবদের কানে মন্ত্র দিয়েছেন। বলেছেন,—সংসারে থেকেই হবে। কাশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখান থেকেই হবে। শুধু ডাকলেই হবে। শুধু ডাক। নির্লিপ্ততার পথে জীবনকে

সর্ব্বব্যাপক ভাবে গ্রহণ করতে হবে আর নিত্য চলতে হবে। আর শুধু ডাকতে হবে।

সংসার-অরণ্যে পথের সন্ধান ক'রে কাঁদে কে? চোখের জলে ভিজে উঠছে কার নিশীথ রাত? সেই তাঁদের হাতে লেখক নিবেদন করেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-কথা। তাঁর কথা। তাই বড় বড় অক্ষরে একেক পরিচ্ছেদের একেক শিরোনামা। সে যে আসে, আসে, আসে—: দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠ; রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান; দিব্য উন্মাদনা; তার খবর নাই; রামলালা লাভ; সিদ্ধির চরম শীর্ষে; যত মত তত পথের অনুভূতি; সিদ্ধি ও সিদ্ধাই; তীর্থপথে নতুন ঠাকুর দর্শন; নতুন দেশে মাটির দেশে ফিরে আসা; মনের মানুষের সন্ধান: তোমা পাখির দলের সঙ্গে মিলন; লীলাসঙ্গীদের জীবনে নিজেকে দান, সিংহ-শিশুর জাগরণ; যাদুকরের বাজল ভেরী: শেষ দান; অফুরাণের জয়যাত্রা। তিনি চলে গেলেন। তাঁর কথা, তাঁর লীলার কথা, তাঁর জীবনের কথা, তাঁর মনের কথা, রইলো শুধু, সব জগতের কানে।···রামকৃষ্ণ-কথামৃত। তিরোধানের পরে আমরা জানলাম যাকে আমরা হারিয়েছি। তিনি জীব না শিব, কে তিনি?

তাঁর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। যাঁরা তাঁর দর্শনে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের অনেকে বলেছেন তাঁর কথা। পার্ষদরা বলেছেন। শ্রীশ্রীমা বলেছেন। বোঁমা বৌঁলাও বলেছেন। তিনিও বলেছেন তাঁর নিজের কথা। মাষ্টার মশাই ডায়েরী লিখেছেন—কথামৃত।

তাঁর কথা যত হয় ততই মঙ্গল। তাঁর কথাই শেষ কথা কি না। বিচার-বিতর্কের অবকাশ নেই, শুধু বিশ্বাসের কথা। কথামৃত। এই গ্রন্থের লেখক স্বনামধন্য সাহিত্যিক, স্বকীয় ভাষার জোরে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। লেখক তাঁর লীলা-কথা বড় মিষ্টি সুরে গেয়েছেন। লেখকের লেখনী ধন্য। ছাপা, বাঁধাই আর ছবি সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। তবুও বইখানি আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছলে এই ঘোর অমানিশায় কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁর আশার আলো। লেখকের নিবেদন,—"মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র ক'রেও আধুনিক ভাবনে জাগবে তেমনি নব জীবনের প্রেরণা।" আহা, তাই যেন জাগে।

নবযুগের মহাপুরুষ:—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা। দাম—ছ' টাকা।

নাস্তিকতার দুর্য্যোগে ধর্ম্ম-জীবনের যখন নাভিশ্বাস ওঠে, তখন ঈশ্বরপ্রেরিত কোন-না-কোন কর্ণধার আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময় ধ্রুবতারার মতো দিশারী হয়ে। 'সম্ভবামি যুগে যুগে': শ্রীচৈতন্যদেব হতে সেই একই অলৌকিক মহাসত্যের পুনরাবৃত্তির রূপায়ণ তাই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' 'করুণা ধারায়' তাঁরা ভগ্নপ্রায় সমাজের শুষ্ক স্নায়ু সঞ্জীবিত করবার জন্য নর-জীবনের দেহধারীর দুঃখ বরণ করেন। যে 'Heavenly hermony' হতে আরম্ভ হয়েছে 'Frame of universe', হয়েছে সৃষ্টির সুরু, যোগীপুরুষেরা জীবাত্মার সঙ্গে ভেদাভেদশূন্য সেই বিশ্বলীলার ঐক্যসূত্র [illegible] করেছেন এই যোগ-সাধনায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা আরও জাগতিক, আরো মানবিক মাধ্যমে; সেই অর্থে [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনার ষোল জন উত্তরাধিকারী সন্ন্যাসী শিষ্য এবং স্বামীজীর ছয় জন শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আরো [illegible] জন গৃহী শিষ্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত আলোচ্য বইটি [illegible] সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। বিচিত্র শক্তির, বিভিন্ন স্বার্থের [illegible] ধর্ম্মমতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ছিলেন সমন্বয়বাদী শক্তি। তাঁর শিষ্যদের জীবনেও সে-সাধনা মূর্ত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের সারগর্ভ [illegible] সূত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ তাঁর শিষ্যেরা। ঠাকুরের জীবনের [illegible] ঘটনা যদি সাধারণ মানুষের কাছে অসম্ভব প্রতীয়মান হয় বা [illegible] ঠেকে, তবে তাঁর শিষ্যবর্গের জীবনী অবগত হলে বিভ্রান্তি [illegible] হবে। তিনি ছিলেন বহুমুখী জীবন্ত প্রতিভা; সেই প্রতিভার [illegible] শাখায় বিভিন্ন শিষ্যের জীবনে পল্লবিত ও ফলভারাবনত। [illegible] ধরণের উক্তি মনীষী রোমাঁ রোঁলার কণ্ঠ হতেও নিঃসৃত হয়েছে—"সৌরকরের প্রাখর্য্য বুঝিতে হইলে যেমন সৌরকরতপ্ত [illegible] স্পর্শ করিতে হয়," ঠাকুরের শিষ্যদের জীবনী অধ্যয়ন ক'রে [illegible] দিব্য জীবনের তেজের অনুভূতি লাভ হয় যেন।

এই কয়জন মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করে দেখা যায় [illegible] জীবনের কোন ঘটনায়, কোন আচরণে যেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই [illegible] সংহতি, দৃঢ়তা, অনমনীয় গতিবেগ প্রতিফলিত।

মানুষের অন্তরে জীবন-কথার প্রভাব প্রবল; উপদেশ [illegible] [illegible] উদাহরণের মূল্য হয়তো অনেক বেশী। তাই [illegible] সমাজের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই গ্রন্থটির প্রচার কাম্য [illegible] এবং যুক্তিযুক্ত ভাবেই তা বাঞ্ছনীয়। যেমন 'চৈতন্য [illegible]' 'চৈতন্যভাগবত' দ্বারা চৈতন্যদেবের জীবনী সারা বাংলায় [illegible] হয়েছে, তেমনি আধুনিক যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের [illegible] পুণ্য-কথা অজানা থাকলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। [illegible] উচ্ছ্বসিত [illegible] বিচারমনন ভাবাদর্শ [illegible] স্বামী [illegible] 'নবযুগের মহাপুরুষ' একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য অর্জন [illegible] প্রতিকূল স্থান, কাল, অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে [illegible] প্রতিটি [illegible] বিকাশ লাভ করেছে, তারই কাহিনী [illegible] করলে মানসিক, আধ্যাত্মিক অনেক উপকরণ আমরা [illegible] পাবো। [illegible] সমস্ত রচনাগুলি মনোজ্ঞ গল্পের [illegible] বিবরণে পূর্ণ করে এক-এক জনের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা [illegible] যা আবার মনের সহজ ভক্তি ও শ্রদ্ধা দাবী করে। বইটির [illegible] সুন্দর চিত্র দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের। ঠাকুরের শিষ্য, [illegible] দেবের গৃহী শিষ্যদের অন্যতম 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা [illegible] উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামের কোন উল্লেখ [illegible] আমরা কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত না হয়ে আর পারলাম না।

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (তৃতীয় সংস্করণ)—[illegible] দেবী। প্রকাশক অভিযান পাবলিশিং হাউস [illegible] ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর যে ইতিহাস [illegible] নবজাগরণের ইতিবৃত্ত, তার মধ্যে যে একটি মানুষ [illegible] প্রতিভা ও শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। [illegible] কোন দেশের ইতিহাসে এমন সামগ্রিক ভাবে দান [illegible]

[illegible] জন মানুষ। আর আমাদের এই পরম গৌরব যে, [illegible] কালে তাঁর সঙ্গে পৃথিবীতে বেঁচেছি, তাঁর বিরাট [illegible] অনস্বীকার্য ঐশ্বর্যের অধিকার ভোগ করেছি, তাঁর পরম [illegible] নিজেদের চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত করে মনুষ্য- [illegible] যোগ্যতা অর্জন করবার চেষ্টা করেছি।

[illegible] দান তিনি রেখে গেলেন তাঁর লোকোত্তর জীবনে, তা শুধু [illegible] নয়, আগামী সর্বকালের মনুষ্য-সমাজ তার [illegible] ভোগ করে [illegible] হবে। আগামী সমাজ তাঁর লেখনার ভিতর দিয়ে [illegible] জানবে। আপন জীবনের [illegible] প্রত্যেকটি উজ্জ্বল [illegible] তিনি যে আনন্দঘন অপার মহিমাকে প্রত্যক্ষ করলেন, তার [illegible] তাদের থাকবে না। সেইখানেই আমরা রবীন্দ্র- [illegible] আগামী সর্বকালের মানুষের কাছে জিতে গেলাম।

[illegible] ক্ষতি যাঁকে স্পর্শ করল না, সেই মানুষকে আমাদের [illegible]-মন্দিরে চিরজাগ্রত চিন্ময় দেবতা করে রাখতে পারলে [illegible] আমাদের সার্থকতা। রচনার মধ্যে তাঁর যে অপার [illegible] মহাকালের চক্র-ঘর্ঘরধ্বনিকে ছাপিয়ে বাজতে থাকবেই, তাঁর যে অনুভূতি [illegible] সুদূর কালেও মানুষের সুপ্ত চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁর বেগবান অন্যায়-বৈরিতা সকল কলুষের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে শাণিত অস্ত্রের মত কার্যকরী করে তুলবে। কিন্তু [illegible], যেখানে তিনি মহাপুরুষ হলেও আমাদের মর্ত্যলোকের [illegible], সেখানে তাঁর প্রতি মুহূর্তের বাঁচার মধ্যে বড়দের [illegible] উঠেছিল তাঁর মানুষীয়ানা, যে প্রত্যয়, মহিমতা ও [illegible] স্বতঃস্ফুরিত তাঁর দৈনন্দিন জীবনে, তার অগাধ [illegible] [illegible] আশ্চর্য আনন্দ হয় মনে।

[illegible] রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে বারে বারে এই কথাই মনের [illegible] করেছে। আমরা কতটুকু জানতে পারলাম। যাঁরা [illegible] যেতে পেরেছেন, পেয়েছেন নিত্য সাহচর্যের আনন্দ, [illegible] যারা তাঁর অতি-সান্নিধ্য উপলব্ধি করবার সুযোগ [illegible], তাদের সংখ্যাই যে অনেক। তাদের কাছে মংপুতে [illegible] কাহিনী মাত্র নয়। মহামানব রবীন্দ্রনাথকে এবং [illegible] স্রষ্টা-মানসকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করার জন্য স্রষ্টার [illegible] প্রকাশ-ব্যঞ্জনাকে প্রথম জানার প্রয়োজন হয়ই। [illegible] প্রয়োজনকে অপ্রত্যাশিতরূপে পূরণ করেছে এই অমূল্য গ্রন্থ। [illegible] নিজের জীবন-কথা ভিন্ন আর অন্য কোন গ্রন্থেই [illegible] নিবিড় পরিচিতি নেই। জীবনের শেষ কিছু দিন [illegible] মংপুতে গিয়ে থেকেছিলেন। সেই সময়কার [illegible] প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি, সন্ধ্যায় কবিতা-সভা [illegible] চিত্রের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ছবি ফুটেছে কবির।

[illegible] বা সাহিত্য সৃষ্টি কোনটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল [illegible] পেলেই আমি তাঁর মুখের কথাগুলি লিখে রাখতাম [illegible] মধ্যে মনে মনে আবৃত্তি করে মনে রাখতাম, সে কেবল আমার নিজের আনন্দের জন্যেই। লিখেছেন লেখিকা তাঁর গ্রন্থের নিবেদনে। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনা-মাধুর্যে এখানি অনায়াসেই সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সামান্য [illegible] যা নিছক নীরস ডায়েরী মাত্র হতে পারত, তা অনির্বচনীয় রস-মাধুর্যে একটি ছন্দময়ী প্রাণময়ী আনন্দ-[illegible] হয়ে উঠেছে। আর পাতার পর পাতা পড়তে পড়তে আমরা সেই আনন্দ-ধারায় অবগাহন করে শুচিস্নাত বোধ করি। লেখিকার [illegible] কম নয়।

কবি নিজেও দুঃখ করে বলেছেন, তাঁর জীবনের কতো সম্পদশালী মুহূর্ত এমনিই চলে গেছে, তার স্বাক্ষর মাত্র থাকলেও ভালো হতো। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে কোথায়? তার আফশোস করেও লাভ নেই। তবু মংপুতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সে দুঃখ কিছুটা মোচন করল।

শেষে ধন্যবাদ লেখিকাকে এই জন্য যে, যাঁর গৃহস্থালীতে এই উজ্জ্বল ছবি মুহূর্তে মুহূর্তে রেখাঙ্কিত হয়ে স্বর্গ সুষমায় মহিমা লাভ করেছে [illegible], তারই অনুভূতির প্রেক্ষিতে এই কীর্তি-প্রবাহ বহমান হয়েছে [illegible], তবু তিনি স্পষ্টতঃ এই বইতে অন্তরালবর্তিনী হয়ে আছেন।

তৃতীয় সংস্করণে পদার্পণ করে গ্রন্থখানি প্রমাণ করল যে, বাংলার সাহিত্য-রসিক সমাজের স্বীকৃতি সে পেয়েছে। অমলস্থ মুদ্রণ পারিপাট্য ও ছবিগুলির জন্য প্রকাশকরা পাঠকের ধন্যবাদার্হ।

অসীমের অন্বেষণ—বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ শ্রীঅভয়পদ রায় বিদ্যারত্ন, কবিরঞ্জন প্রণীত ও ১২৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার সহজ সুখবোধ্য বাংলা ভাষায় জ্ঞানমার্গের জটিল তত্ত্ব ও সরল যৌগিক প্রক্রিয়াসমূহ চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অধুনা যোগধর্ম সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তাহাতে পাঠককে ঐ পথে চলিবার প্রেরণা অল্পই দেয়; বৃথা পাণ্ডিত্য কিম্বা অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের ভাবে জর্জ্জরিত লেখনী পাঠককে ধর্মপথে প্রবর্ত্তিত বা তাহার জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া যেরূপ সহজ সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাবে অসীমের অন্বেষণের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই মনে সেই পথে চলিবার আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবে জাগিয়া উঠিবে। পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে অনেক সময় এই নশ্বর জগতের স্বার্থ দ্বন্দ্বের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় এবং চিদানন্দের অনুভূতি আসে। যোগাভ্যাসে কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং অভ্যস্ত, সেই জন্য ঐ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে। তিনি যে যে-সত্য স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই মানবের মানসিক জরা দূর করিবার জন্য এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সহজ সরল একটি ধর্মপ্রাণ আন্তরিকতাপূর্ণ সাধক-হৃদয়ের চিত্তাকর্ষক প্রতিচ্ছবি। এই পুস্তকের বহুল প্রচার জগতের প্রভূত কল্যাণ করিবে।

-প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আমাদের অতীত এবং বর্ত্তমানের নিয়মিত বিজ্ঞাপনদাতাদের একটি সংমিশ্রিত চিত্র মুদ্রিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণের বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে দেখিতে [illegible]

দুর্গত বাংলা রঙ্গালয়

প্রসাদ রায়

নাট্যজগতে বাঙ্গালীরা না কি নামজাদা। ভারতবর্ষে নটচর্য্যায় আমরা না কি অদ্বিতীয়। বাংলার নাট্য-সাহিত্যও না কি অসাধারণ। কিন্তু আজ এ-সব প্রশস্তি শুনেও মনে স্বস্তি পাই না কেন ?

উত্তর ও মধ্য-ভারতের অধিকাংশ বিখ্যাত দেশেই ভ্রমণ করবার সুযোগ পেয়েছি। যেখানে সেখানে রঙ্গালয় দেখেছি, তার নাট্যকলার আদর্শ এতটা খর্ব্ব যে, প্রায় ছেলেখেলার সামিল ব'লে মনে হয়। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কিন্তু গুজরাটি, মারাঠী ও মাদ্রাজী প্রভৃতি বন্ধুদের স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে শুনেছি, বাঙালীদের তুলনায় এ বিভাগে তাঁরা যথেষ্ট পিছিয়ে আছেন। তাঁদের দেশে ভালো নাচ আছে, কিন্তু ভালো অভিনয় নেই।

কিন্তু এ-সব দেখে-শুনেও আজ কিন্তু মনে জাগে না গর্ব্বের ভাব। সন্দেহ হয়, আমরা বাস করছি নির্বোধের স্বর্গে। ভারতের আর সব দেশ নাট্যাভিনয়ে বাংলার চেয়ে দরিদ্র, এইটুকুই কি আমাদের শ্রেষ্ঠতার মস্ত বড় নজির ব'লে ধ'রে নিতে হবে ? বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ডকেও বৃক্ষের পদমর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু সে জন্যে সান্ত্বনা লাভ করবার কারণ দেখি না।

যখন এ দেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন নব্য বাংলার যে-সব গুণী ব্যক্তি নাট্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা আসন পেতেন বিদগ্ধ-সভার মধ্যেই। কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট), কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কৃতী ব্যক্তিরা তখন সাগ্রহে অভিনয়-অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদির বর্ণনা থেকে জানা যায়, তখন উচ্চশ্রেণীর নাটকের অভাব থাকলেও অভিনয় হ'ত না নিম্নশ্রেণীর। সহজ জ্ঞান ব্যবহার করলে বোঝা যায়, তখনকার অভিনেতারা ছিলেন সত্য সত্যই গুণী ব্যক্তি। কারণ পরে এই সৌখীন সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র ও মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গালয়ের অসাধারণ শিল্পীরা।

তার পর সাধারণ রঙ্গালয় বিশেষ ভাবে গিরিশ-যুগের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম বারো [illegible]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভা [illegible] বিকসিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের [illegible] "সৎনাম", "বলিদান", "সিরাজউদ্দৌলা", "মীরকাসিম", "[illegible]" "শাস্তি কি শান্তি", "শঙ্করাচার্য্য", "রাজা অশোক", "[illegible]" "গৃহলক্ষ্মী" প্রভৃতি; ক্ষীরোদপ্রসাদের "[illegible]", "প্রতা[illegible]" "রঙ্গাবতী", "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত", "[illegible]", "[illegible]" "রাজা অশোক" প্রভৃতি; এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "রাণা [illegible]" "দুর্গাদাস", "নূরজাহান", "মেবারপতন", "সাজাহান", "চন্দ্র[illegible]" "পরপারে" প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক এই সময়ের মধ্যেই [illegible] সেই সঙ্গে প্রহসনে ও গীতিনাট্যে চলছে অমৃতলাল বসু [illegible] মিত্রের কলম। এবং গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও [illegible] কয়েকখানি গীতিনাট্য বা হাস্যনাট্য রচনা করেন। [illegible] আরো কেউ কেউ নাটক লিখে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন।

তার পর রঙ্গমঞ্চের উপরে তখন দেখা দিচ্ছেন [illegible] অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, উপেন্দ্রনা[illegible] পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও নীলমাধব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শীর্ষস্থানী[illegible] অভিনেতার সঙ্গে দানী বাবু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, তারক [illegible] থাকো বাবু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হাড়ু বাবু ও [illegible] প্রভৃতি নবীন শিল্পীরা। একাধারে নৃত্যবিদ ও [illegible] নাম কিনেছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাপু বাবু ও নৃপে[illegible] প্রভৃতি। প্রধান অভিনেত্রী ছিলেন তিনকড়ি, [illegible] সুশীলাবালা। গানে পুরুষদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও অঘোর পাঠক এবং নারীদের মধ্যে [illegible] ও নরীসুন্দরী সব চেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। [illegible] তিনকড়িও ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারিণী।

আর একটি উল্লেখ্য কথা হচ্ছে, ঐ দ্বাদশবর্ষব্যাপী [illegible] মধ্যেই দানী বাবুর প্রতিভা যথার্থরূপে বিকসিত হয়ে [illegible] গিয়ে উঠেছিল। তার পরেও তিনি বহু কাল অভিনয় [illegible] বটে, কিন্তু কোন নূতন ভূমিকাতেই আর তেমন [illegible] দেখাতে পারেননি। এর কারণ মনে হয়, তাঁর পিতা [illegible] গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমন।

তার পরেই আসে বাংলা রঙ্গালয়ে এক বিষম অরাজক যুগ। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল মৃত, প্রাচীন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও [illegible]

নাট্যকারের দেখা নেই। গিরিশ-যুগের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয় মারা পড়েছেন, নয় মঞ্চ ছেড়ে স'রে পড়েছেন, যে দু'চার জন এখনো পাদপ্রদীপের মায়া কাটাতে পারেননি, তাঁরাও নতুন কিছু দেখাবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে ক্ষেত্র হয় সীমাবদ্ধ—শক্তি থাকলেও বহু ভূমিকাই তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না। গিরিশচন্দ্রের তিরোধান ও শিশিরকুমারের আবির্ভাবের মধ্যে আছে প্রায় এক যুগের ব্যবধান। এ সময়টাকে বাংলা রঙ্গালয়ের অন্ধ-যুগ ব'লে গণ্য করা চলে। এর মধ্যে এক জন মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর নূতন নাট্যকারেরও খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং এক জন মাত্র উল্লেখযোগ্য নূতন অভিনেতা নাট্য-জগতে প্রবেশ করেননি। নগণ্য শ্রেণীর নাটকের জঘন্য অভিনয় বাংলা নাট্য-জগৎকে ক'রে তুলেছিল ভয়াবহ।

তার পরেই আবার নব যুগের মহা সমারোহ। এলেন শিশিরকুমার; এলেন নরেশচন্দ্র, রাধিকানন্দ, নির্মলেন্দু; এলেন অহীন্দ্র, তিনকড়ি ও দুর্গাদাস প্রভৃতি। অভিনয়ের মরা গাঙে যেন বান ডেকে গেল। নূতন রকম অভিনয়-ভঙ্গি, নূতন রকম প্রয়োগনৈপুণ্য, নূতন রকম আলোকপাত-কৌশল। রঙ্গমঞ্চে গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর অভাব পূর্ণ হ'ল না বটে, কিন্তু অভিনয়ের সাধারণ আদর্শ উঠল উচ্চতর শ্রেণীতে। দর্শক ও অভিনেতাদের রুচিও হ'ল উন্নত, এমন কি গিরিশ-যুগের চেয়েও।

কিন্তু নাট্যকারও দেখা দিলেন। কিন্তু তথাকথিত অন্ধ-যুগের নাট্যকাররা যেমন তাঁদের কাছে দাঁড়াতে পারেন না, তাঁরাও তেমনি দাঁড়াতে পারেন না গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। তাঁদের কারুর কারুর ভঙ্গি, আখ্যানবস্তু ও চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে পাওয়া যায় উৎকট বিলিতী গন্ধ। এই জন্যে নব যুগে আর পুরাতন অভিনয়-ধারা না থাকলেও, সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে আছে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত কয়েকখানি নাটকই।

নব-যুগের আরম্ভটা হয়েছিল বিশেষ আশাপ্রদ। অভিনয় উঠেছিল যথার্থরূপেই উচ্চশ্রেণীতে। গিরিশ-যুগেও একখানি নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা এতটা যত্নের সঙ্গে অভিনীত হ'ত না। অনেক সময়েই চেরাগের তলাতেই থাকত অন্ধকার। তখনকার দিনে এক-এক জন বিশেষ অভিনেতা দর্শক আকর্ষণ করতেন ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারাই। যেমন "সাজাহান" ও "চন্দ্রগুপ্ত" জমিয়ে তুলতেন দানী বাবু একাই। কিন্তু ঐ দু'খানি নাটক সমগ্র ভাবে সুঅভিনীত হয়েছে নব যুগেই। প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিক্ দিয়ে নব যুগ যে গত যুগের উপর নিশ্চিতরূপেই টেক্কা মেরেছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এবং আগেই বলেছি, নবযুগের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিলেন গিরিশোত্তর যুগের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী কয়েক জন নূতন নাট্যকার। সুতরাং আরম্ভ দেখে আশা হয়েছিল বৈ কি! দুঃখের কথা এই যে, "প্রারম্ভঃ সদৃশোদয়ঃ"—যেমন আরম্ভ তেমনি তার সমাপ্তি হয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি।

নব যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয়ের আদর্শকে উন্নীত ক'রে নব যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। যাত্রারম্ভে যে সব নূতন অভিনেতা দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাধিকানন্দ, দুর্গাদাস ও নির্ম্মলেন্দু স্বর্গত, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী নাট্যজগতের বাইরে এবং শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র ও অহীন্দ্র চৌধুরী আজ বর্ত্তমান থাকলেও বৃদ্ধ। হয়তো ওঁদের দান করবার শক্তি আরো কিছু অবশিষ্ট আছে, তবে ওঁদের উপরে আর বেশী নির্ভর না করাই উচিত। অথচ ওঁদের বাদ দিয়ে যাঁদের উপরে নির্ভর করব, তাঁদের কারুকেই যে দেখতে পাচ্ছি না! অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পূর্ববর্ণিত অন্ধ-যুগের মতই! শক্তিশালী তরুণ অভিনেতার একান্ত অভাব। কয়েক বৎসর আগে শচীন্দ্রনাথের "সিরাজদ্দৌলা" যখন খোলা হয়, তখন নাম ভূমিকার উপযোগী অভিনয় করতে পারেন, এমন কোন নবীন অভিনেতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই সেদিন পর্য্যন্ত আঠারো বৎসরের বালকের ভূমিকায় বাধ্য হয়ে অভিনয় করতে হয়েছিল বৃদ্ধ নির্ম্মলেন্দুকে। সে অভিনয় জনপ্রিয় হয়েছিল বটে, কিন্তু আঠারো বছরের তরুণের ভূমিকার উপযোগী হয়নি, হ'তে পারেও না। ভাগ্যে সিরাজদ্দৌলার বয়সোচিত তারুণ্য নাট্যকারের দ্বারাও উপেক্ষিত হয়েছে, নইলে ঐ ভূমিকাটি গ্রহণ ক'রে নির্ম্মলেন্দুকে হাস্যাস্পদ হ'তে হ'ত নিশ্চয়ই।

তার পর বর্ত্তমান কালের নাট্যকারদের দেখুন। গোড়ার দিকে তাঁদের ভিতরে যেটুকু সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, আজ আর তা নেই। তাঁদের শক্তি পুরোপুরি বিকসিত হবার আগেই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে,—হয়তো এর চেয়ে বেশী কিছু দান করবার পুঁজি তাঁদের ছিল না। কেউ কেউ তো এরই মধ্যে একেবারেই রিক্ত হয়ে লেখনী তুলে রেখেছেন কলমদানে। গিরিশোত্তর যুগে ছিলেন তবু অমৃতলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং সকলেই জানেন, শেষোক্ত লেখকের কয়েকখানি নাটক পেয়ে নব যুগের ভাণ্ডার কতখানি ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ঐ প্রাচীনদের অভাব পূরণ করতে পারেন, এমন এক জনও নবীন (এবং প্রবীণ) লেখক নেই।

এই তো ব্যাপার! তবে নাট্য-জগতে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে, এমন অশোভন দর্পের সার্থকতা কোথায়? দর্পণে মুখ দেখলেই খর্ব্ব হবে এ দর্প।

নব যুগ এসেছে, নব যুগ চলে গিয়েছে—কিন্তু আমাদের হাতে দিয়ে গিয়েছে কি? অভিনয়ের নূতন ধারা এবং অল্প-বিস্তর প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং তিন-চার জন চলনসই নাট্যকার—ব্যাস্, আর কিছুই নয়। ভালো ক'রে খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, নব যুগের উন্নতি হচ্ছে আংশিক উন্নতি মাত্র। গিরিশ-যুগের নাট্য-পরিচালকরা এখনকার চেয়ে ঢের বেশী খোরাক পরিবেশন ক'রে রসিকদের চিত্ত-ক্ষুধা নিবারণ করতেন। নব যুগের স্বেচ্ছাকৃত অবহেলার ফলে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমাদের নাট্য-জগতের বহু স্মরণীয় সম্পদ।

প্রথমতঃ, গীতিনাট্যের কথাই ধরুন। প্রতীচ্যের প্রতি দেশেই সাধারণ নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে গীতিনাট্যাভিনয়েরও নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকে। এ দেশেও গিরিশ-যুগে মাঝে মাঝে নিছক অপেরা মঞ্চস্থ করা হয়েছে। আর গীতিবহুল ছোট ছোট বা মাঝারি আকারের নাটিকা পালা খোলা হ'ত তো যখন-তখন। ও-সব পালার শক্তি ও গুরুত্ব একবার তা ভালো ক'রেই বোঝা গিয়েছিল। অধিকাংশ এলেন 'কোহিনূর' থিয়েটারে। সকলেই ভাবলে, মিনার্ভা থিয়েটার এইবারে বুঝি কাণা হ'য়ে গেল। 'কোহিনূরে'র নাট্যকার ছিলেন অদ্বিতীয় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ। কিন্তু 'মিনার্ভা' একান্ত ভাবে নির্ভর করলে গীতিনাট্য-লেখক অতুলকৃষ্ণ মিত্রের উপরে। এবং তাঁর সাহায্যেই সে 'কোহিনূরে'র সঙ্গে সমান ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে গেল ও অর্থের দিক দিয়ে অর্জ্জন করলে অধিকতর সফলতা। এই শ্রেণীর গীতি-নাটকের জান যে কত, 'আবুহোসেন', 'আলাদিন', 'আলিবাবা' ও 'যাদুকরী' প্রভৃতি পালার জনপ্রিয়তা দেখলে তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ ঝুড়ি ঝুড়ি গীতি-নাটিকা রেখে গিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালেরও একাধিক গীতি-নাটিকা আছে এবং এ-বিভাগে আরো আছে রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনেকেরই রচনা। কিন্তু আমাদের বহু-প্রশংসিত নব যুগ গীতি-নাট্যকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না—অথচ বাঙালী জাতি চিরকালই গানের ভক্ত ব'লে বিখ্যাত। আগে অনেক বড় বড় ও ভারি ভারি নাটকেরও অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ঐ সঙ্গীতই। এখন নাটকে দু'-একটি গান ব্যবহৃত হয় বড় জোর গৌণ ভাবেই! নব যুগের লেখকরা একখানি মাত্র উল্লেখযোগ্য গীতি-নাটিকা লিখতে পারেননি। লিখবেন কি, তাঁদের অধিকাংশই গান রচনা করতেই পারেন না!

নব যুগের অধিকাংশ রঙ্গালয়েই আর নিয়মিত ভাবে বেতন-ভোগী সঙ্গীতাচার্য্য ও নৃত্যাচার্য্য নেই। সুশীলাবালা, নরীসুন্দরী ও নীহার বালার মত গায়িকা-নটী নেই। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত সুগায়কেরও একান্ত অভাব। কুসুমকুমারী, চারুশীলা, নীরদাসুন্দরী ও নীহারবালার মত নর্ত্তকী এখন দুর্লভ। ভাবগতিক দেখলে সন্দেহ হয়, আমাদের আধুনিক থিয়েটারওয়ালারা যেন রঙ্গালয় থেকে নৃত্যগীত বিভাগটি একেবারে তুলে দিতে পারলেই আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

সেকালের রঙ্গালয়ে আর একটি পরম উপভোগ্য বস্তু ছিল, হাস্যনাট্য বা প্রহসন। গিরিশ-যুগের প্রধান নাট্যকারদের [illegible] রচনা আছে অসংখ্য। সাধারণ রঙ্গালয় জন্মলাভ করবার আগেই মাইকেল ও দীনবন্ধু প্রভৃতি প্রহসন বা হাস্যনাট্য রচনা করে গিয়েছেন! প্রধানতঃ প্রহসনের দৌলতেই অমৃতলাল [illegible] নাট্য-জগতে অমর হয়ে আছেন। কিন্তু নব যুগের লেখকরা এ শ্রেণীর রচনায় হাত দিতে চান না। যেন তাঁদের বিশ্বাস, দর্শকরা এখন একেবারে হাসি ভুলে প্যাঁচার মত গোমড়া মুখে ব'সে [illegible] তাঁদের বাক্য-বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনতেই ভালবাসে!

নব যুগের রঙ্গালয়, নব যুগের রঙ্গালয়! বড় জোর-গলায় [illegible] তার নাম উচ্চারণ করি। হয়তো কোন কোন দিকে [illegible] পদ অগ্রসর হ'তে পেরেছে, কিন্তু পশ্চাৎপদও হয়েছে নানা [illegible]। নেই তার প্রথম শ্রেণীর নাটক, গীতি-নাটিকা ও হাস্যনাট্য! [illegible] শিশিরকুমার ও অহীন্দ্র অবসর গ্রহণ করলে পর তার [illegible] আসরও রক্ষা করবে কে?

আমাদের সামনে আবার এগিয়ে আসছে অন্ধযুগ। [illegible] থেকেই বলতে সুরু করেছে—"কোথায় আলো, কোথা [illegible]

'রিভারের' কাজ শেষ হয়ে গেল ব্যারাকপুরে। কোম্পানী তলপি-তলপা গুটিয়ে কলকাতা ত্যাগ করলেন সদলবলে। শোনা গেল, কলকাতায় যাঁরা ষ্টুডিওর সঙ্গে জড়িত তাঁরা না কি উক্ত কোম্পানীর কাজের আদব-কায়দা দেখে বিস্ময়ে অধোবদন হয়েছেন। লজ্জায় ম্রিয়মাণ। রিভার ছবির পটভূমিকা ভারতবর্ষ। যে লেখিকার রচনা, তিনি বহু কাল ভারতবর্ষে কালাতিপাত করেছেন। পরিচালনা করেছেন পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পী রেণোয়ার পুত্র। শোনা গেল, সব সমেত কোম্পানী ব্যয় করেছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা। 'রিভার' প্রথমে মুক্তিলাভ করবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। অতঃপর পৃথিবীর অন্যত্র প্রদর্শিত হবে। সব চেয়ে আনন্দের কথা হল, রিভারের পরিচালক মিঃ রেণোয়া বাঙালী বিশেষজ্ঞদের খুঁজে বের করেছেন এবং কাজে লাগিয়েছেন রিভারের কাজে। সেটিং-এর জিনিষ-পত্তর তৈরী করিয়েছেন কলকাতার কারিগরদের দিয়ে। দৃশ্যপটের কয়েকটি চিত্রাঙ্কন করেছেন শিল্পী গোপাল ঘোষ। স্থির-চিত্রের অনেক ছবি তুলেছেন ছায়াচিত্রী সুনীল জানা। আমরা রিভার দেখি আর না দেখি, বাঙালী-ছায়াচিত্র ব্যবসায়ীরা যেন দয়া ক'রে একবার অন্ততঃ দেখে আসেন। দেখে আসেন কোথা থেকে কি হয়েছে। অবশ্য দেখে যে তাঁরা বুঝতে পারবেন না তা আমরা না দেখেই বলতে পারি। কারণ টেক্‌নিক্ কখনও দেখে বোঝা যায় না যতক্ষণ না হাতে-নাতে খাটতে হচ্ছে।

* * * *

যারা উকিল, তাদের কাজ হল কে চুরি করলো, কে সিঁদ কাটলো, কে নারীহরণ করলো, কে জমি বেদখল করলো তার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ওকালতি করা। উকিলদের কাজই হল এই। কিন্তু উকিল যদি চুরি করে? এবং পাকা ঝানু উকিল? কাকে ডাকা হবে ওকালতি করতে? যে চুরি রাতারাতি পুকুর চুরির মত চুরি তার শাস্তি দেবে কে? এই তো চাই, আবার দেখাতে হবে, জিনিষ ... দাও ইত্যাদি ইত্যাদি মন্তব্যকে বাংলা আর ইংরেজী ... মারফৎ ছড়িয়ে আর ফটোগ্রাফিক হাড়ের খেলা দেখিয়ে যে বাজার গরম করলেন উকিল নরেশ মিত্র—তার সাফল্যের প্রধান কর্ত্তা ... তার নাম পর্য্যন্ত কোথাও করলেন না কেন? নাট্যকার ... চৌধুরী আজ পরলোকগত, নয় তো তিনিই আজ দাবী ... কঙ্কালের রচনাকার হিসাবে নিজেকে। Man wars with the dead—নরেশচন্দ্র শিক্ষাগুরু হয়েও এ কথাটা যদি ... না হলে আমরা নাচার!

* * * *

শিশিরকুমার ভাদুড়ী শান্তিপ্রিয় মানুষ। পড়াশুনা, ওল্টাটন ... থেকে থেকে সেক্সপীয়র, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ থেকে ... এই তিনি অবসর সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু আমাদের ... তো তা বোঝে না। দেখতে যায়, দেখা করতে যায় ...দের সঙ্গে। তিনি মুখে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে বিরক্ত হন। দেখা করলে এবং দেখা না করলেও বিপদ। শিশিরকুমার সাঁওতাল পরগণার দেওঘরে একটি বাসা তৈরী ... কলকাতায় অভিনয় করেন এবং সপ্তাহের বাকী ক'টা দিন সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসেন। অন্য দেশ হলে সরকার থেকে এই দেখা করতে চাওয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতো—কিন্তু এ দেশে কি তা কখনও সম্ভব? এই দ্বিখণ্ডিত পোড়া বাংলা দেশে!

* * * *

যুগ-দেবতা চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে কালিদাসের প্রযোজনায় কালিদাস প্রডাকসন্স-এর পক্ষ থেকে। কালিকায় এই নাটকের অভিনয় দেখে আমরা একদা প্রচুর সাধুবাদ জানিয়েছি, আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা এখনও সে-কথা ভুলে যাননি। রঙ্গমঞ্চে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের অনেকেই আছেন এই যুগ-দেবতায়—যথা নবীন অভিনেতা গুরুদাস, সুদর্শন নীতিশ মুখোপাধ্যায় এবং আধুনিক বাঙলা ছায়াচিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনা দেবী। মঞ্চ এবং পর্দ্দা এক জাতীয়বস্তু নয়; এ এক বস্তু আর সে আর এক বস্তু—এ কথা বোধ করি স্বীকার করতে কেউই কুণ্ঠিত হবেন না। তাই বলছিলাম, নাটকে যে যুগ-দেবতাকে দেখেছি এ যে সেই যুগ-দেবতা হবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। কায়ায় আর ছায়ায় অনেক পার্থক্য, সে আর কে না জানে? তবুও বড় বড় সমালোচকরা বলেন, পরিচালকের হাতের গুণে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। যদি পরিচালক হতে পারেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং সত্যিকার পরিচালক তবেই, নয় তো নয়।

গত কয়েক বছর যাবৎ কয়েকটি বাংলা ছবি, তারা যে কত খারাপ হতে পারে তার প্রমাণ আপ্রাণ-চেষ্টা ক'রে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য বাঙলার ছায়া-জগতকে। দেখেতো বাঙালীর মত অন্ধ দর্শকও উঠে পালিয়ে যেতে পথ পায়নি। তাই বলছিলাম, পরিচালকের হাতের গুণে হতে পারে না এমন কোন অসম্ভব ব্যাপারই নেই। পরিচালক যখন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য তখন এ আবার কোন্ যুগের দেবতাকে দেখতে হবে তা একমাত্র দেবতারাই বলতে পারেন। কুতো মনুষ্যাঃ?

* * * *

বড় মানুষের জীবনী চিত্রে দেখাতে অনেকেই তৎপর হয়েছেন আজকাল। অত্যন্ত সুখের খবর বলতে হবে, কারণ এত দিন বাংলা ছবিতে যে-সব বড় মানুষদের দেখতে দেখতে আমরা পেকে উঠলাম তাঁদের অধিকাংশই ছবি বিশ্বাস অভিনীত সেই সব বড় মানুষ—যাঁদের রায় বাহাদুর কিছু একটা না কিছু হতেই হবে—যাঁদের একটি মাত্র কন্যা কিংবা একটি মাত্র পুত্র থাকবে—এবং যাঁদের হাতে থাকবে টেলিফোন, অন্তত গোটা পাঁচেক মিল্ আর লাখ লাখ টাকা। এই ধরণের বড় মানুষ এ্যাদ্দিন ধ'রে দেখছি আমরা—দেখে দেখে প্রায় বুড়ো হতে চলেছি। কিন্তু সম্প্রতি একটা ঢেউ এসেছে, যাঁরা সত্যিকার বড় মানুষ তাঁদের দেখাতে হবে। যেমন পরমহংসদেব, বিদ্যাসাগর, মাইকেল দত্ত, নেতাজীর জীবনীতে তাঁরা এখন হাত দিয়েছেন। লোকের চোখেও ধাঁধা লাগছে। আরে! এরা তো কেউ রায় বাহাদুর নয়? ছবি বিশ্বাস নয়!

এম, পি প্রডাকসন্স কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় বিদ্যাসাগর দেখাবেন বাঙলা দেশকে। কাছে পেয়েও যাঁকে আমরা দেখিনি

পাইনি, 'বগুরে কৈ' আখ্যা দিয়ে হাসাহাসি ক'রেছি, সেই বিদ্যাসাগরকে দেখতে পাবো আমরা—এ তো মহা আনন্দের কথা। পাহাড়ীদা'র সঙ্গে দেখা হ'ল এক দিন। জিজ্ঞেস করলাম, 'মাসিক বসুমতী'র প্রচ্ছদে কয়েক মাস আগে বিদ্যাসাগরের একখানি দুষ্প্রাপ্য ছবি ছাপা হয় দেখেছিলেন? মুক্তোর মত দাঁতগুলো বের ক'রে সহাস্যে বললেন,—হ্যাঁ, তাঁর সব রকমের ছবিই পরিচালক যোগাড় করেছেন।" কাগজে দেখলাম বিদ্যাসাগর-বেশে পাহাড়ী সান্যালকে। আসল ছবি দেখে তার পর বলবো কেমন লাগল।

* * * *

অগ্রদূতের পর পঞ্চভূত।

এঁরাও কয়েক জন গুণী একত্রিত হয়ে নিজেদের নাম লুকিয়ে ছবির কাজে অগ্রসর হলেন না কি? সাহিত্য থেকে সিনেমায় ছড়ালো ছদ্মনামের মিষ্টিসিস্‌ম? পঞ্চভূত স্রেফ মুখোস প'রে বাজারে আত্মপ্রকাশ করছেন। অভিনয় করছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই বিকাশ রায় আর নবেশ মিত্তিরের আবিষ্কার কঙ্কালের মলয়া সরকার। কাহিনী লিখেছেন কে এক জন অলকা মুখোপাধ্যায়। কে এক জন বলতে মনে আমাদের পড়ছে এ অলকা কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের আমাদের সেই প্রভাত না? প্রভাত মুখুজ্জ্যে?

* * * *

পরিচালক আবার বিদ্রোহী হয় কখনও শুনেছেন? আমরা শুনেছি। মনোরঞ্জন ভট্টাচায্যি বলেছেন, হেমেন গুপ্ত যেমন বিদ্রোহী মনোভাবসম্পন্ন পরিচালক ঠিক সেই রকম কাহিনীই বেছে নিয়েছেন তাঁর ছবির জন্য।

হেমেন গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে হাত দিয়েছেন। বিদ্রোহীরা সাধারণতঃ পুরানোকে ভেঙে তচনচ ক'রে নতুন ইমারতের গঠন ক'রে থাকে দেখা যায়। বিদ্রোহী কখনও পেছনে ফেলে-আসা কোন ...র পানে ফিরে তাকায় না। বিদ্রোহী হ'ল নতুনের পথ-প্রদর্শক।

আনন্দমঠ আমরা বহু বার দেখেছি মঞ্চ এবং পর্দায়। বিদ্রোহী যখন, তখন হেমেন গুপ্ত কেন তবে একেবারে হালের বিপ্লবে হাত দিলেন না? বাঙালী মধ্যবিত্তের অন্তর্বিপ্লবে? যে ... আগুন জ্বললে আর চট ক'রে নিবতে চায় না, সেই বিপ্লবে হাত দিলে কি তাঁর হাত পুড়ে যেতো? '৪২ তো অহিংস (!) বিপ্লব —ইট-পাটকেল আর লাইন, তার কেটে দেওয়ার সেই চিরকালীন বিপ্লবের প্রথম ধাপের কাহিনী।

হেমেন গুপ্ত এগিয়ে যেতে যেতে বুঝি পেছিয়ে গেলেন। কংগ্রেসের মধু ঘোষকে ডাকলেন তাঁর ছবিতে পুরোহিত ... অন্ততঃ মহরতের দিনে। সেন্সর বোর্ডের ভয়ে কি না কে ... আনন্দমঠে নেপালী ফৌজ আর পুলিশ সুপারকে দেখাবার ... অবকাশ নেই এই যা রক্ষা। নয় তো সুরেন ঘোষ খুশী হ'লে সুরেন চাটুজ্জ্যেকে খুশী করবার প্রয়োজন হত হেমেন গুপ্ত ... —তা আমরা একান্ত অন্তরালে থেকেও হলপ ক'রে বলতে পারি।

* * * *

প্রিয় বান্ধবীর পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জ্ঞাত আছি। তাঁর সাহিত্য-প্রীতি, শিল্পদৃষ্টি ও ছায়াছবি সম্বন্ধে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সত্যিই তৃপ্তি দান ক'রেছে একাধিক ছবি মারফৎ। সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে ন্যাশনাল ফিল্মস্ লিমিটেডের প্রথম কথাচিত্র 'সহযা...' ...র মহরৎ হয়ে গেছে। পরিচালনা করছেন সৌমেন মুখোপাধ্যায়। ... একখানি সুদৃশ্য বাঙলা ছবি দেখবার সুযোগ আবার আমরা পাব এমন আশা সহজেই করতে পারি। সৌমেন মুখোপাধ্যায় ... সাহিত্যিক শ্রীসৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র।

* * * *

আমাকে একবার আমার এক ভূতপূর্ব্ব বাঙালী ... কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'লরেল হার্ডি লোকটা কে?' ... বলেছিলাম,—'তারা তো এক জন লোক নয়, লরেল ... হার্ডি দু'জন। একসঙ্গে অভিনয় করেন।' সেই লরেন ... হার্ডি ভারতবর্ষে আসছেন নতুন ছবির কাজে। ইনফরমেশন ... এর অধিনায়ক বিখ্যাত মিঃ এজরা মীর এই ছবি প্রযোজনা ...ন। নবদ্বীপ হালদার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশু বোস, আর জহর ...র ন্যক্কারজনক ভাঁড়ামো দেখতে দেখতে যাঁদের চোখ খা... তাঁরা এ সংবাদে অতীব খুশী হবেন তা সহজেই অনুমেয়। ... সব গোপাল ভাঁড়গুলি বাঙলা ছবির রুচিকে কত নীচে নামাতে পেরেছে সে-সম্বন্ধেও কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন। মুখখানাকে বিকৃত করলেই যদি হাস্য-রসিক অভিনেতা হওয়া যায় তা হ'লে বেবুন আর সিম্পাঞ্জীদের কি আর খাঁচায় ... হত? জু গার্ডেনে না রেখে তাদের সানন্দে ঐ লরেল ... কাজে লাগিয়ে দেওয়া হত। তার কারণ নবদ্বীপ, জহর ... কাজে লাগতেও তারা লজ্জা বোধ করতো। কারণ ... মুখবিকৃতি না কি অনেক বেশী স্বাভাবিক এদের তুলনায়?

পাক-ভারত চুক্তির ব্যর্থতা

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিয়মিত ভাবে হিন্দু বিতাড়নে এখন পর্য্যন্ত পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষ এবং সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের সুনির্দ্ধারিত নীতি রহিয়াছে। নারীহরণ, ধর্ষণ, ধর্ম্মান্তরকরণ, ডাকাতি ইত্যাদি অত্যাচার হিন্দুদের উপর পূর্ব্বের মতই চলিতেছে এবং উহাতে সরকারী কর্ম্মচারীরা একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের রক্ষার এ-যাবৎ কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, উপরন্তু যে সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়াইতে হইবে, তাহাই ভূতে পাওয়া।

পূর্ব্ববঙ্গের ১০টি জেলায় গত এক মাসের মধ্যে ৫০২টি অত্যাচার-মূলক ঘটনার খবর পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের লৌহ যবনিকা ভেদ করিয়া শতকরা দশ ভাগ সংবাদও পাওয়া যায় না। সুতরাং অত্যাচারের প্রকৃত পরিমাণ এবং গুরুত্ব কতটা, বলা কঠিন। যেটুকু খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—নরহত্যা ১৩, ডাকাতি ১৩৭, দস্যুতা ১০১, চুরি ১৫, বলপূর্ব্বক অর্থ আদায় ১২৭, অগ্নিসংযোগ ১৮, নারীহরণ ১২, নারীদের শ্লীলতাহানি ৬, অনধিকার প্রবেশ ১৭, মারপিট ২২, তহরাণি ১৩, ভুলক্রমে আটক ১, হিন্দু-মন্দির অপবিত্রকরণ ৪,—মোট ৫০২। একটি বালিকা অত্যধিক অত্যাচারের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আত্মরক্ষার সকল ব্যবস্থায় বঞ্চিত হইয়া হিন্দুদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং নিজেদের ধন, মান, প্রাণ, বিশেষ ভাবে নারীর মর্য্যাদা লইয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতে তাঁহারা আর প্রস্তুত নহেন।

আর যে দুইটি কারণ বাস্তুত্যাগ অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক। মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রবল ভাবে আর্থিক বর্জ্জন সুরু করিয়াছে। হিন্দুদের পক্ষে সেখানে উপার্জ্জন করাও দুরূহ এবং প্রকৃত মূল্য দিয়া কোন জিনিস কেনাও অসম্ভব। ফলে উপায়ান্তর না পাইয়া তাঁহারা বাস্তুত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের শতকরা নব্বইটি শিক্ষায়তন হিন্দুদের চেষ্টা ও অর্থে প্রতিষ্ঠিত। এখন সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে মুসলমানদের দ্বারা। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতকে বর্জ্জন করিয়া উর্দ্দু ও আরবী চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে পূর্ণোদ্যমে। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ধ্বংসোন্মুখ।

সংবাদে প্রকাশ যে, পাকিস্তানী কর্ত্তারা হিন্দুদের স্পষ্টই বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতে হইলে হয় তাঁহাদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা ক্রীতদাসের মত থাকিতে হইবে। পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, হিন্দুরা সেখানে সমান নাগরিক অধিকার পাইতে পারে না।

পাক-ভারত চুক্তির ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতি ও শুভেচ্ছার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথা। ভারত সর্ত্তাবলী নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেছে, কিন্তু পাকিস্তান এখন পর্য্যন্ত কোনরূপ আন্তরিকতার পরিচয় দেয় নাই। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান আমেরিকায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইহার পরিপন্থী। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানে বর্ত্তমানে যে ৬ কোটি মুসলমান রহিয়াছেন শুধু তাঁহাদেরই নয়, বর্ত্তমান ভারতে যে ৪ কোটি মুসলমান রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও মুক্তির উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তিনি দুই জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিতে পারে সেই জন্য পাকিস্তানের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন। এই অজুহাতে তিনি আমেরিকার নিকট হইতে রণসম্ভার সংগ্রহ করেন। এই স্থানে মার্কিণের পাকিস্তান-প্রীতি উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কাশ্মীর সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে পাকিস্তানের প্রাপ্য। ভারত বলপূর্ব্বক কাশ্মীর দখল করিয়াছে। পাকিস্তানই যে অপরাধী, ইহা প্রমাণিত হইবার পরও এই মিথ্যা উক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। সর্ব্বোপরি পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের হত্যা ও নির্য্যাতনের সকল অভিযোগই তিনি মিথ্যা বলিয়া স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিয়াছেন। ভারত সরকার ইহার কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। এই নীরবতা যে আত্মঘাতী, তাহা বলা বাহুল্য। মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের মতে তিনি পাক-ভারত চুক্তি এবং পরে বাণিজ্য-চুক্তি দ্বারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব অন্ততঃ সাময়িক ভাবে টিকাইয়া রাখা ও আসন্ন বিপর্যায় হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাঁহার দেশবাসীকে প্রস্তুত হইবার সময় দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কূটনীতির চরম সাফল্য। এই চুক্তি না হইলে পাকিস্তানের অবস্থা এতদিনে শোচনীয় হইয়া উঠিত। ইহা পাকিস্তানের নিকট ভারতের চরম এবং কূটনীতির পরাজয়। যাহাই হউক, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী যখন এই সুরে কথা বলিতেছেন এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী যখন কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছেন না, তখন পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের মনে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে আস্থা জাগিতে পারে না। এক কথায় পাকিস্তান যত দিন মুসলিম রাষ্ট্র থাকিবে, তত দিন পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের থাকা শত চুক্তি সত্ত্বেও অসম্ভব।

—

অর্থ-সচিব জন মাথাই-এর পদত্যাগ

৩১শে মে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব জন মাথাই পদত্যাগ করিয়াছেন। কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া ডাঃ মাথাই পণ্ডিত নেহরুর সহিত মতভেদের কথাটুকু উল্লেখ করিয়াই চুপ করিয়া গিয়াছিলেন এবং ভারতের আসন্ন আর্থিক সঙ্কটের ইঙ্গিত করার বেশী অগ্রসর হন নাই। ডাঃ মাথাই-এর পদত্যাগের একটা কৈফিয়ৎ দিবার জন্য ত্রিবান্দ্রমে বক্তৃতায় পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—"প্ল্যানিং কমিশন সংক্রান্ত বিষয় লইয়া মতভেদের ফলেই প্রধানতঃ ডাঃ মাথাই মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় লইয়াছেন। তবে প্ল্যানিং-এর মূল নীতি সম্বন্ধে কোন বিরোধ হয় নাই,—প্ল্যানিং কমিশনের এখন প্রয়োজন আছে কি না, তাহা লইয়াই মতভেদ ঘটিয়াছিল।" প্রত্যুত্তরে ডাঃ মাথাই যে সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়,—মতবিরোধ শুধু এই বিষয়টি লইয়াই হইয়াছে, এমন নয়—মতবিরোধের আরো দুইটি কারণ রহিয়াছে—একটি সরকারী খরচ কমানো এবং দ্বিতীয়টি বহু-বিঘোষিত পাক-ভারত চুক্তি।

ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন, প্ল্যানিং কমিশন নিয়োগ বিষয়ে মতভেদ তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম মূল কারণ এবং কেন তিনি পণ্ডিতজীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় একটি নূতন প্ল্যানিং কমিশন নিয়োগের কোন প্রয়োজনই নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তরের শেলফে বর্ত্তমানে ৩০০০ কোটি টাকার নানাবিধ পরিকল্পনা মজুত রহিয়াছে—টাকাকড়ি, কারিগর এবং অন্যান্য উপাদানের অভাবে এগুলি কাজে পরিণত করা যায় নাই। এই অবস্থায় আবার নূতন কতকগুলি পরিকল্পনা তৈয়ারী করিয়া কি সুফল ফলিবে? বস্তুতঃ পক্ষে এ প্রশ্ন দেশের অতি-বুদ্ধিমান নেতৃবৃন্দ [illegible] সকলের মনেই বহু দিন হইতে জাগিয়াছে। প্ল্যানিং কমিশন নিয়োগ করা যে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে—এই [illegible] প্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, দেশে যখন [illegible] অভাব, দেশ যখন পশ্চাৎপদ, তখন পরিকল্পনা মাফিক [illegible] না হইলে চলে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ যুক্তি অর্থহীন। পরিকল্পনা করিয়া অগ্রসর হওয়া ভাল কি মন্দ, সে প্রশ্ন এখানে উঠে না—যে পরিকল্পনাগুলি রহিয়াছে সেগুলি কাজে পরিণত না করিয়াই নূতন কমিশন বসাইবার ছেলেখেলার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ উঠিয়াছে। [illegible] সুভাষচন্দ্র এবং পণ্ডিত নেহরুর উদ্যোগে কংগ্রেস একদা যে [illegible] প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্টগুলি [illegible] রহিয়াছে এবং ঐগুলিকে সহজেই কাজে লাগানো চলিত। [illegible] কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সমান বেতন দিয়া কতকগুলি লোক [illegible] না, ইহাই যা অসুবিধা। ডাঃ মাথাই শুধু প্ল্যানিং [illegible] নিয়োগেরই যে বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাহা নয়—[illegible] কাজ চালাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধেও তিনি একমত হইতে [illegible] নাই। এক জন সরকারী কর্ম্মচারীকে ডেপুটি চেয়ারম্যান [illegible] পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে যে ভাবে কমিশনের কাজ চালাইবার ব্যবস্থা [illegible] তাহাতে কমিশন কার্য্যতঃ পাল্টা মন্ত্রিসভায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। কমিশন শুধু প্ল্যানিং-এর ব্যাপারেই মাথা ঘামান না—[illegible] অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধেও মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—আগে শুধু মন্ত্রিসভার সদস্যদের সহিত আলোচনা করিয়া কোন বিষয়ে মতৈক্য স্থাপন করিতে হইত। এখন কমিশনের সদস্যদের সঙ্গেও আপোষ-রফা করিতে হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত গোঁজামিল দিতে দিতে গোড়াকার প্রস্তাব বা নীতিকে আর চিনিবার জো থাকে না।

সরকারী ব্যয়-সঙ্কোচের সিদ্ধান্তকে জলাঞ্জলি দিবার যে দৃষ্টান্ত ডাঃ মাথাই দিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইবারই কথা। সরকারী ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য স্থির হইয়াছিল যে, ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির অনুমোদন ভিন্ন নূতন কোন ব্যয় বরাদ্দ গৃহীত হইবে না। ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন, এই মূল নীতি অগ্রাহ্য করিবার ঝোঁক বিভিন্ন মন্ত্রি-দপ্তরে প্রবল এবং প্রধান মন্ত্রী নিয়ন্ত্রিত দপ্তরগুলিই এই নীতি অমান্য করার অপরাধে সব চেয়ে বেশী অপরাধী। ইংলণ্ডে ভারতীয় হাই কমিশনারকে আয়ার্ল্যাণ্ডে ভারতীয় দূত নিয়োগ করার পর ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া, পণ্ডিত নেহরুর হস্তক্ষেপের ফলে, যে ভাবে ঐ দূতাবাস পুষিবার খরচ বৃদ্ধি করার কথা ডাঃ মাথাই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই ভারত সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। ভারত-সরকারের রাজ্যশাসন যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে দেশের স্বার্থরক্ষা করিয়া অর্থ-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব বুঝিয়াই ডাঃ মাথাই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সর্ব্বোপরি ডাঃ মাথাই উল্লেখ করিয়াছেন, পাক-ভারত চুক্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর সহিত তাঁহার মতভেদের কথা। চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হইয়াছে তখন তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও ডাঃ মাথাই বলিয়াছেন, মন্ত্রিসভার মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রতিক চুক্তিকে গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদেরই এক জন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং ক্ষিতীশচন্দ্র যখন মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন কোন কোন স্বার্থদুষ্ট মহল হইতে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল—তাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়াই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সত্য শেষ পর্য্যন্ত চাপিয়া রাখা যায় নাই। পণ্ডিত নেহরুর পাকিস্তান-তোষণ নীতি শুধু দুই জন বাঙ্গালী মন্ত্রীই বরদাস্ত করিতে পারেন নাই এমন নয়, ডাঃ মাথাই-এরও হজম হয় নাই। তিনি তাই সংযত কণ্ঠে বলিয়াছেন—"তোষণ-নীতির ছদ্মবেশে গুরুতর জাতীয় স্বার্থও যাহাতে বিসর্জ্জন দেওয়া না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার। একটি মহান্ আদর্শের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের অছিস্বরূপ এবং যথেষ্ট চিন্তা না করিয়া, যথেষ্ট কারণ না দেখাইয়া এই জনসাধারণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।" ইহা শুধু গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে সতর্ক-বাণী নয়—জনসাধারণের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের আহ্বানও বটে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সঙ্কট এই সত্যটা আজ যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার পার্ষদগণ নিজেরাই শুধু যে বিপর্যয়ের দিকে চলিয়াছেন তাহা নয়—দেশকেও সেই পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সে অধিকার দেশবাসী তাঁহাদের কি দিয়াছে? ১লা জুন তিনি ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের সদস্য পদেও ইস্তফা দিয়াছেন। ডাঃ জন মাথাই-এর শূন্য স্থানে শ্রীসি, ডি, দেশমুখকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীমোহনলাল সাক্সেনার পদত্যাগ

৩১মে ভারত সরকারের পুনর্ব্বসতি মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সাক্সেনা পদত্যাগ করিয়াছেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে, কার্য্যভার গ্রহণের সময় তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহা তিনি পালন করিতে পারেন নাই। উদ্বাস্তদের সমস্যার মূলে আঘাত করিতে তিনি অক্ষম হইয়াছেন। পুনর্ব্বসতি বিভাগের কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—"আমি দায়িত্বে থাকা কালে পুনর্ব্বসতির দিকে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি দিয়াছি। কিন্তু বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা অনেক। তৎসত্ত্বেও পুনর্ব্বসতির কার্য্য চলিয়াছে, তবে তাহা আশানুরূপ নহে। শ্রীমোহনলাল সাক্সেনার পদে শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

শোক-সংবাদ

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী ২২শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে পরলোক গমন করেন। ডাঃ নিয়োগী এক জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি রাজসাহী কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যথাক্রমে ১৪ ও ১৩ বৎসর কার্য্য করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি পাটনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন বিভাগের সভাপতি ছিলেন। তিনি বিধবা পত্নী, তিন পুত্র এবং এক জন বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

গত ২০শে বৈশাখ জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চারুচন্দ্র মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর। তিনি ছিলেন স্বর্গত বীরচন্দ্র মিত্রের পুত্র ও বিখ্যাত কর্ম্মী স্বর্গত রামগোপাল ঘোষের দৌহিত্র।

বিগত ১২৭৪ সালে নৈহাটীর বিখ্যাত মিত্র-বংশে শ্রীযুক্ত মিত্রের জন্ম হয়। মেট্রোপলিটান স্কুল হইতে বৃত্তিসহ এনট্রান্স পাশ করিয়া ঐ কলেজ হইতেই বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি আইন পড়িতে সুরু করেন। এটর্ণী পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকটীশ, সুরু করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ পসার করেন। সততার জন্য তাঁহার বিশেষ নাম ছিল।

স্বর্গত রামগোপাল ঘোষের দৌহিত্র হিসাবে বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর ইত্যাদি মনীষীদের সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যানুরাগ ছিল। উত্তর-কালে 'মাসিক বসুমতী'তে তাঁহার অতি সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ পুস্তক 'নারী পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়। পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'কল্যাণ' ঐ পুস্তক হিন্দিতে ধারা-

বাহিক ভাবে বাহির করেন। ইহা ছাড়া দর্শনশাস্ত্রে ও ভৌতিক বিজ্ঞানে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সুরু হইতে তিনি উহার এক জন অক্লান্ত কর্ম্মী। কয়েক বৎসর তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি হন। শ্রীযুক্ত মিত্র ইদানীং ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তক লিখিতেছিলেন। ইহাতেই তাঁহার শরীর খারাপ হয়।

তিনি তাঁহার পত্নী, এক জন বিধবা পুত্রবধূ ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ১৩১১ সালে শিবপুর নৌ-দুর্ঘটনায় মারা যান।

যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত নন্দীগ্রামের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের প্রথমা কন্যা কুমারী রেণুকা ঘোষ (বাণু) উনত্রিশ দিন টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া গত ১৭ই বৈশাখ রবিবার পিতার কলিকাতাস্থ বাসভবনে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ

করিয়াছে। নম্র ও প্রীতি-পূর্ণ ব্যবহারের জন্য কুমারী রেণুকা তাহার আত্মীয়-স্বজন ও অনাত্মীয় পরিচিতদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। এত অল্প বয়সে তাহার যে ঐকান্তিক সাহিত্যানুরাগ ও শিল্প-নীতি ছিল তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এই আকস্মিক মৃত্যুর বেদনা তাহার প্রিয়জনদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গতা কুমারী রেণুকার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-পরিজনদের আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

মহাদেবের বিষপান
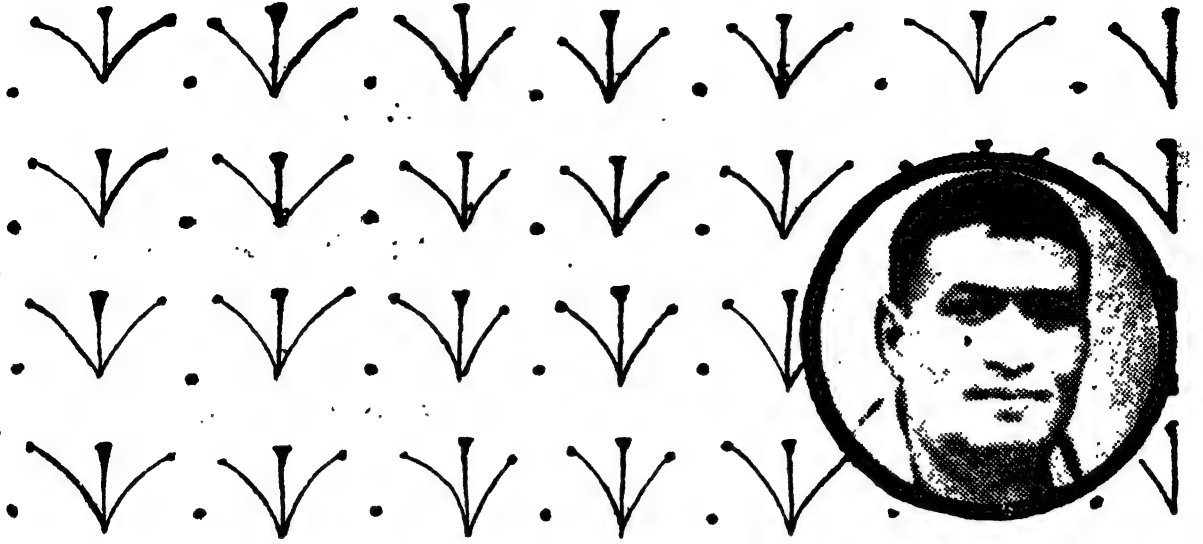
২৯শ বর্ষ, আষাঢ় ঃ ১৩৫৭]   সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত   [১ম খণ্ড ঃ ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বইতে থাকে। তার কাছে সব স্বপ্নবৎ। সে সর্ব্বদা স্ব স্ব রূপে থাকে। ভক্তের ভিতর একটানা নয়, জোয়ার-ভাঁটা হয় ;—হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে—কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে ; যেমন জলের ভিতর বরফ 'টাপুর টুপুর' 'টাপুর টুপুর' করে।

শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—এই বোধের দিকে সর্ব্বদা মন যায়। বিষ্ণু অংশে জন্মালে ভক্ত হয়। সে যদি হাজার জ্ঞান বিচার করে, তবু তার প্রেমভক্তি হু-হু করে বেড়ে যায়।

জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের ঈশ্বর রসময়।

দু'জন লোক বাগান বেড়াতে গেছে। এক জন—যার বেশী বিষয়-বুদ্ধি, সে কত আম গাছ আছে, কত আম হয়েছে, বাগানের দাম কত, এই হিসাব করতে লাগলো। আর এক জন মালিকের সঙ্গে ভাব কোরে একটি একটি আম পাড়তে লাগলো, আর খেতে লাগলো। যারা জ্ঞানী, তারা শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্ক মীমাংসা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ; ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব ক'রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করে।

ভক্ত, ভগবান ও ভাগবত,—তিনিই এক জিনিষ।

ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত আর উত্তম ভক্ত।

অধম ভক্ত বলে—ঐ ঈশ্বর। অর্থাৎ সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা।

মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্য্যামী, তিনি হৃদয়মধ্যে আছেন। অর্থাৎ সে, হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পায়।

উত্তম ভক্ত দেখে, তিনিই—এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন। সে দেখে, ঈশ্বর অধো ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ।

ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

চক্‌মকি পাথর হাজার বছর জলের ভিতর পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না। তুলে লোহার ঘা মারবা মাত্রই আগুন বেরোয়। ঠিক ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত, সংসারে থাকলেও তার বিশ্বাস ভক্তি নষ্ট হয় না, ভগবৎকথা হইলেই সে উন্মত্ত হয়।

ভক্তের বালকের স্বভাব। বালক টাকা-কড়ি ফেলে দিয়ে পুতুল নেয়। বিশ্বাসী ভক্ত সংসারের ধন, মান, যশ ইত্যাদি ফেলে দিয়ে ঈশ্বরকে নেয়।

ভিজে দেশেলাই হাজার ঘসলেও জলে না, কেবল ধোঁয়া উঠে। কিন্তু শুক্‌নো দেশেলাই ঘসবা মাত্রই দপ্‌ করে জলে উঠে, ভক্ত শুকনো দেশেলাই—হরিকথা হবা মাত্রই তার প্রেমাগ্নি জলে ওঠে, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত মানুষের প্রাণ ভিজে দেশেলাই—হাজার ঈশ্বর-প্রসঙ্গেও উষ্ণ হয় না।

পতঙ্গ আলো দেখলে—সব ফেলে উড়ে তার উপরে গিয়ে পড়ে, পিপড়ে গুড়ে প্রাণ দেয়, তবু ফেরে না, ভক্তও সেইরূপ সব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে ছুটে যায়।

যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও, ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন। ঠিক যে রাজার বেটা, সে মাসহারা পায়। যার কোনও কামনা নাই—যে টাকা-কড়ি চায় না, তার টাকা আপনি আসে।

যে ভগবানের ভক্ত, তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালার 'নাই'। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্ব্বিকার—যেমন তেমনি। যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও তবে সব সহ্য করতে হবে।

মেয়েরা রাত্রে স্বামীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে, তা কারো কাছে বলে না, কিন্তু এক-বয়সীদের কাছে সমুদায় বলে ও আনন্দ পায়; ভক্তও সেইরূপ অপর ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা বলতে সুখ পায় কিন্তু বাইরের লোকের কাছে কোন কথা বলতে চায় না।

একা গাঁজা খেয়ে গাঁজাখোরের সুখ না—সঙ্গী চায়; ভক্তও সেইরূপ একা-একা তত আনন্দ পায় না, অপর ভক্ত-সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নয়

'এ ছেলেটি কে?' খানিকটা তন্ময়ের মতই জিগ্‌গেস করলেন মথুর বাবু।

উদারদর্শন, নবীন ব্রহ্মচারী। কুমার কোমল। এ কে? একে কি আগে কোথাও দেখেছি? কোথায় দেখব? কত দিন আগে?

কিছুতেই মনে করতে পারছেন না মথুর বাবু। তবে কি পূর্বজন্মে দেখেছি? কিংবা, জন্ম-মৃত্যুর পরপারে?

'কে এই ছেলেটি?'

না, স্বগতোক্তি নয়, প্রশ্ন করছেন রামকুমারকে।

'আমার ভাই।' স্নিগ্ধ-বিনয়ে বললেন রামকুমার।

কিন্তু মথুরামোহনের কে? কেউ যদি না-ই হবে তবে তার দিকে মন ছুটে চলেছে কেন?

'এখানে, এই মন্দিরে, কাজ করবে?'

'দেখব জিগ্‌গেস করে।'

বললেন বটে রামকুমার, কিন্তু জিগ্‌গেস করতে সাহস পেলেন না। তিনি জানেন তো তাঁর ভাইকে। দক্ষিণা নিয়ে ঠাকুর-পুজো করবার সে ছেলে নয়।

এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়রাম এসে হাজির।

'এ কি, তুই এখানে কোত্থেকে?' অবাক হলেন রামকুমার।'

'বর্ধমানে গিয়েছিলাম চাকরির সন্ধানে। চাকরির নামে লবডঙ্কা। শুনলাম মামারা এখন মস্ত হয়েছেন, রানি রাসমণির কালীমন্দিরে আছেন পূজুরী হয়ে। ভাবলাম যদি তাঁদের ধরলে একটা হিল্লে হয়।'

ষোল বছরের বলবান ছেলে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ...য়। সুপুরুষ। সদানন্দ।

'ওরে, হৃদে এসেছিস্?' আনন্দে ছুটে এল গদাধর। যদিও বছর চারেকের ছোট, সম্পর্কে ভাগ্নে, ... একেবারে নিকটতম বন্ধু। ছেলেবেলার খেলুড়েদের এক জন। সহজ স্নেহে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। বললে, 'তুই কী মনে ক'রে?'

হৃদয় কিছু বলল না, চুপ করে রইল। কিন্তু অন্তরে বসে অন্তরবাসিনী বললেন, 'তোরই জন্যে হৃদয়কে পাঠিয়ে দিলাম তোর কাছে। ও না হলে তোকে দেখবে-শুনবে কে? সামলাবে কে? সাধনায় বসে যখন সব ভুলে যাবি তখন তোর শরীর কে বাচিয়ে রাখবে? তুই যদি শিব ও তোর নন্দী। তুই যদি রাম ও তোর লক্ষ্মণ।

গাছের যেমন ছায়া, গদাধরের তেমনি হৃদে।

দুটিতে কাছছাড়া নেই। সর্বক্ষণ সমভাব। শুধু খাবার সময় আলাদা। হৃদয় মন্দিরে প্রসাদ নেয়, গদাধর গঙ্গাতীরে রান্না করে।

সেজ বাবুকে এড়িয়ে চলে গদাধর। কালী-ঘরে কোনো একটা চাকরিতে তাকে ঢুকিয়ে দেবেন তাঁর মনের কথা চোখের ভাষায় যেন ধরা পড়েছে। চাকরি-বাকরির মধ্যে আমি নেই, ধরা-বাঁধার মানুষ নই আমি। তার চেয়ে নিজের মনে শিব গড়ি, পুজো করি নিজের মনে। সেই আমার ভালো। আমার ধ্যানের আরাম।

এমনি মূর্তি গড়ছে গদাধর। মূর্তি গ'ড়ে পুজোয় বসেছে এক দিন। পুজোয় বসে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই সুযোগে চুপিসারে কখন কাছে এসে পড়েছেন সেজ বাবু। তন্ময় হয়ে দেখছেন সেই শিবমূর্তি। তার গঠনলাবণ্য। শুধু ভাস্কর্য নয়, ভাস্কর্যের চেয়েও যা বড় জিনিস তাই যেন ফুটে উঠেছে সর্বাঙ্গে। তা ভক্তি। তা মনোমাধুরী। হাতের পেলবতায় গলে-গলে পড়ছে যেন অন্তরের অনুরাগ।

'এ মূর্তি কে করেছে?'

'গদাধর।' হৃদয় কাছাকাছিই ছিল, বললে।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন মথুর বাবু। বললেন, 'পুজো হয়ে গেলে আমাকে দেবে এই মূর্তি ?'

আপত্তি কি! চক্ষের নিমেষে এমনি কত-শত মূর্তি গড়তে পারবে গদাধর। হৃদয় সম্মতি দিল।

মূর্তি হাতে পেয়ে আরো ব্যাকুল হলেন মথুর বাবু। যার চকিত কল্পনার এই রূপ, তার অতলতল ধ্যানের না-জানি কেমন চেহারা! ডেকে পাঠালেন রামকুমারকে। গদাধরকে রাজি করান, তাকে কাজ নেন মন্দিরে। অসম্ভব—মুখ গম্ভীর করলেন রামকুমার। গদাধরের চাকরিতে রুচি নেই।

জেদ চাপল মথুর বাবুর। যে করেই হোক গদাধরকে কালীর কোলের কাছে টেনে আনতেই হবে।

'বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

গদাধর চেয়ে দেখল, সেজ বাবুর চাকর।

আর পালাবার জো নেই। সেজ বাবু একেবারে চোখের উপর দাঁড়িয়ে।

'ডাকছেন, যাও না!' হৃদয় তাড়া দিল: 'এত ভয় কিসের ?'

'গেলেই বলবে, এখানে থাকো, চাকরি করো। ও আমি পারব না।'

'দোষ কি! করলেই বা চাকরি! লোক কত সৎ আর মহৎ। এমন লোকের আশ্রয়ে চাকরি করা তো সুখের কথা।'

'তুই কত বুঝিস্! চাকরি নিলেই চিরকাল বাঁধা পড়ে যেতে হবে। আমার তা পোষাবে না। তা ছাড়া—' গলা নামাল গদাধর: 'তাছাড়া কালী পুজোর ভার নেওয়া চারটিখানি কথা নয়। দেবীর গায়ের অত গয়নার কে ভার নেবে ?

'আমি নেব।'

'তুই নিবি? সত্যি বলছিস্?'

'চাকরি খুঁজতে এসেছি আমি এখানে। আমার একটা কিছু জুটে গেলেই হল।'

'তবে যাই, বলি গে সেজ বাবুকে।'

হাতে চাঁদ পেলেন মথুর বাবু। গদাধরকে বললেন, 'তুমি মাকে রোজ সাজাবে, মার 'বেশকারী' হলে তুমি।' আর, হৃদয়কে বললেন, 'তুমি হলে ওর সাগরেদ।'

এ সময় একটা কাণ্ড ঘটল।

রোজ সকালে রাধারাণী আর কৃষ্ণকে মন্দিরের সিংহাসনে এনে বসান আর বিকেল হলে নিয়ে যান শয়নঘরে। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। দুপুরে ভোগ-রাগ অনেক হয়ে গিয়েছে এখন বিরামপর্ব। কক্ষান্তরে রাধারাণীকে আগে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন, এখন গোবিন্দকে নিয়ে চলেছেন ক্ষেত্রনাথ। হঠাৎ পড়ে গেলেন পা পিছলে। নিজে সামলেছেন কিন্তু বিগ্রহের একটি পা গিয়েছে ভেঙে।

তুমুল সোরগোল উঠল মন্দিরে। এ কি! অঘটন! এ কি অশুভ সূচনা!

ক্ষেত্রনাথকে বরখাস্ত করে দেওয়া হ'ল সরাসরি। কিন্তু তাতে কী হবে? বিগ্রহ তো তাতে অভঙ্গ হয়ে উঠবে না!

তা উঠবে না, কিন্তু এখন উপায় কী বলো। রানি রাসমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। মথুর বাবুকে বললেন, সভা বসাও, ডাকাও পণ্ডিতদের, বিধি নাও।

বসল পণ্ডিতসভা। সব ন্যায়চঞ্চু তর্কচূড়ামণির দল। অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে আর সংস্কৃত আওড়ে তাঁরা পাঁতি দিলেন—ভাঙা বিগ্রহকে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে, আর তার জায়গায় বসাতে হবে নতুন দেবমূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেবমূর্তির ফরমায়েস গেল।

কিন্তু রানির মনে সুখ নেই। অন্তরের অন্ধকারে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন গোবিন্দকে, তুমি কি আমার কাছে শুধু পাথর না তামা-পেতল যে, তোমাকে জলে ফেলে দেব? তার চেয়ে তুমি আমাকে চোখের জলে ফেলে রাখো।

মথুর বুঝলেন রানির অস্থিরতা। বললেন, 'গদাধরকে গিয়ে জিগ্‌গেস করি।'

মনে হল যেন কোথাও একটা সহজ সমাধান আছে। যিনি সরলের মধ্যে সরল তিনিই তরল করে দেবেন।

গদাধরকে বললেন সব মথুর বাবু। এখন তুমি কী বলো। তোমার মন কী বলে।

'যেমন পণ্ডিত তেমনি তাদের পাঁতি।' বলে উঠল গদাধর: 'রানির জামাইরা যদি আজ ঠ্যাং ভাঙত তবে রানি কী করতেন? গঙ্গায় জামাইকে ফেলে দিতেন আর তার জায়গায় বসাতেন এনে নতুন জামাই ?'

সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

করাতেন। চিকিৎসা করিয়ে ভাল করে তুলতেন। এখানেও সে-ব্যবস্থা করলেই হয়।'

সবাই বাক্যহীন।

'হ্যাঁ গো, ভাঙা পা জোড়া দেয়ার কথা বলছি। ভাঙা পা জুড়ে দিলেই ঠাকুর আবার আস্ত-সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার চলবে তাঁর সেবা-পূজা।'

একেবারে সোজাসুজি অন্তরের কথা। মন যেমনটি চায় তেমনি। যা মন থেকে আসে বিবেক থেকে আসে তাই ঈশ্বর থেকে আসে। যেখানে সরল-স্বচ্ছ সেখানেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব।

এমন যে সহজ মীমাংসা হতে পারে—শুনে পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে গেল। অনেক শাস্ত্র পেড়ে আপত্তি তুললে, কিন্তু মনের কাছে আবার শাস্ত্র কি! মনের জোরের কাছে কার জোর খাটবে!

রানির বুক ভরে গেল আনন্দে। দুচোখে ধারা নেমে এল। কত সহজের মধ্যে তুমি আছ। কত সহজের মধ্যেই ধরা দিলে! মনে-মনে বললেন গোবিন্দকে।

গদাধরকে বললেন, 'তুমিই তবে ভাঙা পা জুড়ে দাও। তুমি ওস্তাদ কারিকর, তুমিই বৈদ্যনাথ।'

ভাঙা পা জুড়ে দিল গদাধর। একেবারে নিখুঁত করে দিল। কারুর সাধ্যি নেই চোখে দেখে বার করে দেয় জোড়ার দাগ। কারুর সাধ্যি নেই বার করে দেয় এই জাদুকরের জারিজুরি।

ফরমায়েসি মূর্তি এসে পৌঁছুল। মথুর বাবু বললেন, 'দেখ তো, ও আগের মতন হল কি না।'

চোখ মেলে নয়, চোখ বুজে দেখল গদাধর। দেখল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে। না, তেমনটি হয়নি। তেমনটি আর হয় না।

দরকার নেই নতুন বিগ্রহে। পুরোনো বিগ্রহই ভালো। কত প্রীতি-ভক্তির কোমলতা তার গায়ে মাখা। কত অশ্রুতে তাকে স্নান করানো। কত প্রার্থনায় তার ঘুম ভাঙানো। তাকে কি আর বিদায় দেওয়া চলে? না কি বিদায় দিলেই তার দায় যাবে?

কিন্তু যাই বলো খুঁতে হয়ে রইল যে। অঙ্গহীন বিগ্রহে কি পূজা সিদ্ধ হয়?

খুব হয়। প্রিয়জন যদি খুঁতে হয় তবে সেই খুঁতের জন্যেই প্রিয়তর।

গদাধর বেড়াতে এসেছে। সেখানে ডাকসাইটে জমিদার জয়নারায়ণ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় রানি রাসমণির কালী-বাড়ির কথা উঠল। রাধাগোবিন্দের কথা।

'হাঁ হে মশাই, ওখানকার গোবিন্দ কি ভাঙা?'

'তোমার বুদ্ধি কি গো!' গদাধর হেসে উঠল: 'যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার তিনি কি কখনো ভাঙা হন?'

জয়নারায়ণ চুপ।

ভাবাবস্থায় পড়ে গিয়ে ঠাকুরের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেল।

'হাত ভাঙলো কেন জানিস?' ভক্তদের সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

কে কি বলবে! ঠাকুরের হাত ভেঙে গিয়েছে এ একটা দৈব-বিপাক ছাড়া আর কি। কিন্তু ঠাকুর বললেন, 'হাত ভাঙলো—সব অহঙ্কার নির্মূল করবার জন্যে। এখন আর এই খোলের ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি তিনি রয়েছেন।'

রানি রাসমণি খুঁজতে গিয়ে দেখলেন ভাঙা বিগ্রহের মধ্যেই গোবিন্দ রয়েছেন। জ্ঞানে যিনি সত্তায় যিনি প্রাপ্তিতে যিনি তিনিই গোবিন্দ।

দশ

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গদাধর এ বার পূজারী হল। আর হৃদয় হল কালীর সাজনদার।

কিন্তু এ কেমনতরো পূজা! সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে চক্ষের পলকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানবিলীন হয়ে বসে থাকা। মূর্তিকে প্রতীক না ভেবে প্রাণধারী বলে ব্যবহার করা। এমন পূজা দেখেননি কোনো দিন মথুর বাবু।

এমন তন্ময়, পূজা দেখবার জন্যে কারা ভিড় করেছে তাদের দিকে লক্ষ্য নেই। সে তো অল্প কথা, স্বয়ং মথুর বাবুকে পর্যন্ত দেখছে না।

দেখছে, মন্ত্র বলবার সময় মন্ত্রের উজ্জ্বল বর্ণ কি করে তার দেহের সঙ্গে মিশে-মিশে যাচ্ছে। কি করে সর্পিণী কুণ্ডলিনী সুষুম্না দিয়ে সহস্রারে উঠছে ধীরে-ধীরে। শরীরের যে-যে অংশ ত্যাগ করে যাচ্ছে তাই অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আর যে-যে অংশ ভেদ করে যাচ্ছে তাতে ফুটে উঠছে বিকচ পদ্ম। পূজায়

বহ্নিপ্রাকার তৈরী হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে। তন্মনস্ক হয়ে মন্ত্র পড়ছে আর সমস্ত শরীর হয়ে উঠছে জ্বলিত-তেজস্বান্।

যে দেখছে সেও তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ধ্যানের অবস্থা কি রকম জানো? মন হবে ঠিক তেলের ধারার মত। এক ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। পাখি মারবার জন্যে ব্যাধ তাগ করছে। সামনে দিয়ে বর চলে গেল মিছিল করে কত গাড়ি-ঘোড়া কত বাজনা কত হট্টগোল। ব্যাধের হুঁস নেই। জানতেও পেল না বর গেল চতুর্দোলায়।

বুঝলে, স্পর্শবোধ পর্যন্ত থাকে না। গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে যাবে, সাপও বুঝতে পারবে না কিসের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। মনের বা'র-বাড়িতে কপাট দিয়ে বোসো। কপাটের বাইরে পড়ে থাকবে তোমার রূপ-রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শ—তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ উপচার। বন্ধ ঘরে তুমি আর তোমার মন। প্রতীক্ষা আর অন্ধকার। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। বারুদ আর বহ্নিকণা।

প্রথম-প্রথম সব ভোগের থালা আসবে ভারে-ভারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রবঞ্চনা। বিচলিত হবি না, তলিয়ে যাবি, তলিয়ে যাবি। অন্ধকার থেকে চলে আসবি শুভ্রতায়। দেখবি, আর ওরা আসবে না। আর কার কাছে আসবে?

'ধ্যান করতে-করতে প্রথম-প্রথম আমার কি দর্শন হতো জানিস?' বললেন এক দিন ঠাকুর 'স্পষ্ট দেখলুম, সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল-দোশালা, এক থালা সন্দেশ, ছুটো মেয়ে আর তাদের ফাঁদী নথ। মনকে শুধোলুম, মন তুই কি চাস, কোন্‌টা চাস? মন বললে, কোনটাই চাই না! ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কিছুই চাইবার নেই।'

রামকুমার খুশি। মন্দিরে এবার মন দিয়েছে গদাধর। কিন্তু যার জন্যে পূজো সেই রোজগার হচ্ছে কই? ফিরছে কই সংসারের অবস্থা? চাকরি করতে বসে টাকার প্রতি টান না হলে চলবে কেন? টাকা ছাড়া উপায়ান্তর কি?'

'আচ্ছা, এটা তোমার কী মনে হয় বলতে পারো?' ঠাকুর জিগগেস করলেন ডাক্তারকে,—নাম ভগবান রুদ্র। 'টাকা ছুঁলেই হাত আমার বেঁকে-বেঁকে যায়। নিশ্বাস পড়ে না।'

বলেন কি। ডাক্তার একটা টাকা বের করে ঠাকুরের হাতে রাখলেন। কি আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে ঠাকুরের হাত বেঁকে গেল, রুদ্ধ হয়ে গেল নিশ্বাস।

তা ছাড়া—চিন্তিত মনে ভাবছেন রামকুমার—ছেলেটার কেমন উদাস-উদাস ভাব। পঞ্চবটীর জঙ্গলে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে একলা। কখনো বা সকাল-সন্ধ্যায় গঙ্গার পার ধরে দীর্ঘ পথ হেঁটে বেড়ায় আপন-মনে। কারুর সঙ্গে মেশে না, হাসে না, কি চায় কি ভাবে, কে জানে।

বাড়িতে মার জন্যে মন কেমন করছে হয়তো।

এক দিন ডেকে প্রশ্ন করলেন। 'মার জন্যে মন কেমন করছে রে গদাই? বাড়ি যাবি?'

'মার জন্যে?' কি বলবে ঠিক করতে পারল না গদাধর। বললে 'না, বাড়ি যাব কেন?'

তবে এমনি ঘুরে বেড়াস কেন বনে-বাদাড়ে? কেন নির্জনে গিয়ে বসে থাকিস? কী হয়েছে?

নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় কই। সোনা গলিয়ে গয়না গড়াব, তা যদি গলাবার সময় পাঁচ বার ডাকে, তা হলে গয়না গড়াবো কি দিয়ে? ধ্যান করবো মনে বনে কোণে। ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভালো।

হয়তো এ মেজাজ চলে যাবে গদাধরের। এ একটা ক্ষণিক ঔদাস্য ছাড়া কিছু নয়। তেমনি ভাবলেন রামকুমার। কালীকে বললেন, মা, গদাধরকে সুমতি দাও।

শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে রামকুমারের। চলে যাবার আগে ছেলেটাকে মানুষ করে দিতে হয়। যাতে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে। যাতে দুপয়সা ঘরে এনে খাবার জোগাড় করতে পারে সংসারের। অন্তত তাঁর চাকরিটা সে ধরতে পারে সহজে।

তাই ভেবে গদাধরকে তিনি চণ্ডীপাঠ শেখাতে লাগলেন। শেখাতে লাগলেন কালীপুজোর বিধি-নিয়ম। বিস্তীর্ণ অনুশাসনের রীতি-নীতি।

কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না নিয়ে পুজো করা যাবে না কালীকে। দীক্ষা নেব তো শক্তিসাধক কোথায়? আছে—বৈঠকখানার কেনারাম ভট্চাজ। দক্ষিণেশ্বরে আসে-যায়, রামকুমারের জানা-শোনা। এক জন নামজাদা তান্ত্রিক। গদাধরের পছন্দ হল। বললে, এঁকেই তবে গুরু করি।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিল গদাধর। যেই তার কানে মন্ত্র পড়ল চীৎকার করে উঠল গদাধর, ডুবে গেল গভীর সমাধিতে। গুরু তো হতবুদ্ধি। তাঁর নিজের মন্ত্রের এত শক্তি তা তাঁর নিজেরই অজানা।

'এক কাজ কর এখন থেকে।' বললেন রামকুমার: 'তুই কালীঘরে আয়, আমি রাধা-গোবিন্দের ভার নিই।'

মথুর বাবুও পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন।

'আমি শাস্ত্রের কি জানি? না জানি তন্ত্রমন্ত্র না জানি আইনকানুন। কোথায় কি ত্রুটি করে ফেলব তার ঠিক নেই।'

'তোমাকে মানতে হবে না শাস্ত্র। দরকার নেই জেনে।' বললেন মথুর বাবু: 'তোমার ভক্তি আর আন্তরিকতাই শাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। ভক্তিভরে যাই তুমি দেবে দেবীকে তাই তিনি গ্রহণ করবেন।'

বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল গদাধরের। এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও—মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর। বড়লোক নয় শুধু, বড় মানুষ। মা মথুর বাবুকে জুটিয়ে দিলেন।

'মাকে বললুম, মা, এ দেহরক্ষা কেমন করে হবে? সাধুভক্ত নিয়েই বা কেমন করে থাকব? একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। মা সেজ বাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। চোদ্দ বছর ধরে সেবা করলে সেজ বাবু।'

রামকুমার বললেন, এবার একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। হৃদয় এল রামকুমারের জায়গায়। ছুটি পেল রামকুমার। বাড়ি যাবার আগে মুলাজোড় গিয়েছিল কি কাজে, সেখানেই চোখ বুজলে।

বাবার স্থলে দাদা—দাদার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। তখন তাকে ঈশ্বরতৃষ্ণা পেয়ে বসেছে। পেয়ে বসেছে মৃত্যুর রহস্য ছেদন করবার আকুলতা। তাই দাদার জন্যে শোক মিশে গেল ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়। যদি ঈশ্বর বুঝি তা হলে [illegible] কেও বুঝব। থাকেন যদি ঈশ্বর, তাহলে আর [illegible] নেই।

ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। সমাধি ভাঙবার পর এক জন প্রশ্ন করলে, এখন কী দেখছ? ঠাকুর বললেন, তখন যা দেখেছি, এখনো তাই। দেখছি, জগৎ যেন তাঁতে জ'রে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ, তিনিই সর্বময়। যা কিছু হয়েছে, তিনিই হয়েছেন। কিছু নেবার কিছু ফেলবার এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

মা যেন আলো করে বসে আছেন।

মার পূজার ভার নিয়েছে গদাধর। ভার নিয়েই নিজেকে ঢেলে দিয়েছে, বিকিয়ে দিয়েছে। মার কোলে চড়ে বসেছে। নিজে মার হাত ধরেনি—বলছে, তুই আমার হাত ধরে নিয়ে চল। আমি যদি তোর হাত ধরি, পড়ে যেতে পারি হাত ফসকে। কিন্তু তুই যদি একবার আমার হাত ধরিস আমার আর ভয় নেই।

ভগবানকে কে জানবে? জানবার চেষ্টাও করি না। আমি মাকে জানি, তাই মা বলে ডাকি। যা ভালো বুঝবেন, করবেন। বেড়াল-ছানার মত হেঁসেলে রাখলে তিনিই রাখবেন, আবার বাবুদের বিছানায় এনে শোয়ালে তিনিই শোয়াবেন। আমি কেন বলতে যাব? ইচ্ছা হয় জানাবেন না-হয় নাই জানাবেন। মা হয়ে বুঝবেন না তিনি সন্তানের ব্যাকুলতা?

ছোট ছেলে, মার ঐশ্বর্যের সে কী বোঝে? তার মা আছে এই তার পরম ঐশ্বর্য।

মা গো, তুই যেন তিন-ভুবন আলো করে বসেছিস।

মার মূর্তি রোজ ফুলে আর চন্দনে সাজায় গদাধর। মূর্তির গায়ে হাত লাগে আর চমকে-চমকে ওঠে। মনে হয় এ যেন নিশ্চল পাষাণ নয়, প্রাণময়ী জননী। পাথরে শৈত্য নেই, এ যেন প্রফুল্ল প্রাণতাপ। যেন এখুনি চোখের পালক নড়ে উঠবে, কথা কয়ে উঠবেন, হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন কোলের কাছে।

কই, অনুভবে-অনুমানে নয়, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হবি কবে?

রাতে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, তখন শয্যা ছেড়ে একা-একা বেরিয়ে পড়ে গদাধর। সকাল হলে ফেরে। দু চোখ ফোলা, জবাফুলের মত লাল। যেন সমস্ত রাত নির্জনে বসে সে কেঁদেছে, দু চোখের পাতা মুহূর্তের জন্যেও এক করেনি। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদের মত চেহারা।

'কোথায় যাও রোজ রাত্তিরে?' হৃদয় ধরে পড়ল এক দিন।

'ঘুম আসে না। তাই ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াই।' পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল গদাধর।

'ঘুম আসে না মানে? না ঘুমুলে শরীর যে ভেঙে পড়বে একেবারে।'

শুষ্ক-শুভ্র চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর: 'ঘুম না এলে আমি করব কি!'

তখনকার মত চেপে গেল হৃদয়। নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। হৃদয় ঘুঘু ছেলে, ঠিক বার করে ফেলবে।

অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী বা আমলকী আর অশোক এই পাঁচ বৃক্ষের সমাহারের নাম পঞ্চবটী। তখন পঞ্চবটীর চার পাশে ঘোর জঙ্গল, ঘোরালো অন্ধকার। দিনের বেলায়ও ওদিকে মাড়াতে গা ছমছম করে। একে গোরস্থান তাই অন্ধকারের জড়িপটিতে গাছপালার গোলকধাঁধা—রাত্রে সেখানে ভূত-প্রেতের মাতামাতি চলে। কারুর সাহস নেই ওদিকে পা বাড়ায়।

যেমন-কে-তেমন রাত নিবিড় হয়ে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে গদাধর। পিছু-পিছু হৃদয়ও বেরিয়ে পড়েছে সন্তর্পণে। দেখি কি করে। কোথায় যায়।

কি সর্বনাশ! সেই সর্বগ্রাসী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গদাধর।

মা গো, মন্দির এখন বন্ধ, কিন্তু তোর এই আকাশ-ভুবন-জোড়া চিরসুন্দরের মন্দিরে তো দরজা পড়ে না। আমি চুপি-চুপি চলে এসেছি তোর কোলের কাছে। এই অন্ধকারে তোর হাতের স্পর্শ, এই স্তব্ধতায় তোর নিশ্বাস, এই প্রতীক্ষায় তোর পদধ্বনি। আমাকে দেখা দে।

বাইরে হৃদয় দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। হাঁক-ডাক দিলে শুনতে পাবে না গদাধর, হয়ত গ্রাহ্যও করবে না। তবে কি উপায়ে তাকে নিরস্ত করা যায়। টেনে আনা যায় ঐ জঙ্গল থেকে। শেষ কালে সর্পাঘাতে মারা যাবে বুঝি।

একের পর এক ঢিল ছুঁড়তে লাগল হৃদয়। ভূতের আস্তানা, নিশ্চয় ভূতেই ঢেলা মারছে। যদি হুঁস হয়, যদি বা একটু ভয় পায়!

কা কস্য পরিবেদনা! একটি পাতারও চাঞ্চল্য নেই। যেমন নিরেট স্তব্ধতা তেমনি নীরন্ধ্র অন্ধকার। ভয় পেয়ে হৃদয়ই পিছু হটল। ফিরে এল বিছানায়। ঘুমুতে পারল না।

পরদিন ফাঁকায় পেয়ে পাকড়াল গদাধরকে। বললে, 'রাত্রে জঙ্গলে ঢুকে কর কী?'

'ধ্যান করি।'

'ধ্যান কর? কার?'

'আমার মার। মার মন্দির বন্ধ হয় না দিনে-রাত্রে।'

'কিন্তু, জঙ্গলে কেন?'

'নির্জন না হলে ধ্যান করবার জোর আসে না মনের মধ্যে। ঐ আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করি। আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করলে কামনা সিদ্ধ হয়।'

'তোমার আবার কামনা কী?'

'একমাত্র কামনা—মাকে দেখব, মাকে পাব, মা'তে মিশে থাকব।'

কিন্তু এ সব কাজ ঠিক হচ্ছে না। মন্দিরে সেবা-পূজার পরিশ্রমেই তুমি যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছ। তার উপর আহারে তোমার রুচি নেই, দেহের কোনো আরাম নেই। শেষ কালে রাতের ঘুমটুকুও যদি বিসর্জন দাও তুমি পাগল হয়ে যাবে। এ সব ছাড়ো।

মাকে তো তাই বলি—আমাকে পাগল করে দে। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞান-বিচারে।'

কিন্তু জায়গাটা তুমি ভালো বাছোনি। ওখানে ভূতের আড্ডা। রাতদিন দাপাদাপি করে। লোফা-লুফি করে ঢিল নিয়ে। টের পাও না?

গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে গেলেও টের পাই না।

ঢিল ছুঁড়ে নিরস্ত করা গেল না গদাধরকে। একদিন শেষ কালে সাহস সঞ্চয় করল হৃদয়। মামার ভাগ্নে সে—কিসের ভয়? গভীর রাত্রে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে বনের মধ্যে। চলে এল আমলকী গাছের কাছাকাছি।

কিন্তু গাছের তলায় সে কী দেখছে? সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল হৃদয়। মামা সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছে না কি?

দেখছে নিরবকাশ নগ্ন হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে গদাধর। নিবাত দীপশিখার মত নিষ্কম্প। গিরিশৃঙ্গের মত সমাহিত।

ধ্যান করবে তো করো, কিন্তু এ কী পাগলামি! শুধু পরনের ধুতিই ত্যাগ করেনি, গলার পৈতে পর্যন্ত খুলে রেখেছে।

হৃদয়ের সহ্য হল না। এগিয়ে এসে ধমকে উঠল: ...কি হচ্ছে? পৈতে-কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ ...য়ে বসেছ যে?'

...ও, তুই! হৃদে: এ সব ফেলে দিয়েছি কেন ...গেস করছিস? এরা হচ্ছে ছেলের মুখে চুষি-...ঠির মত। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে মা ...সে না। যখন চুষি ফেলে চীৎকার করে তখন ...ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আসে। অহং-এর ...র র-ঙং আমি মুছে ফেলে দিয়েছি, অন্তরের ...ণো বসে ডাকছি মাকে চেঁচিয়ে। মা, ভাতের ...ড়ি নামিয়ে ছুটে আয় আমাকে কোলে নিতে।'

...উত্তর মনের মত হল না হৃদয়ের। যত খুশি ...কো, কিন্তু দিগ্বসন হবার কী হয়েছে!

'তুই কী জানিস!' ঝলসে উঠল গদাধর: 'অষ্ট ...শে বদ্ধ হয়ে আছে মানুষ। ঘৃণা লজ্জা ভয় ...শীল মান জাতি আর অভিমান—এই অষ্ট পাশ। ...কে ডাকতে হলে পাশমুক্ত হয়ে ডাকতে হয়। ...-এর আঁশটি থাকলেও তিনি আসেন না। তাই ...সব খুলে রেখেছি। ধ্যানের পর ফিরব যখন ...বার অজ্ঞানের মেলায় তখন আবার ও-সব পরে ...ব

...পীদের বস্ত্রহরণ হয়েছিল জানিস্? তার ...নে কি? তার মানে আর কিছুই নয়—গোপীদের ব...পাশই গিয়েছিল, শুধু লজ্জা বাকি ছিল। তাই ...নি ও-পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন।

...পরিধেয় আর পৈতে—এ দুটো উপাধি ছাড়া ...ছু নয়। অভিমানের চিহ্ন। আমি বামুন, জাতে-...ত্রে সকলের চেয়ে বড়, এই অহংকার। এই ...হংকার বর্জন না করলে দীনতা আসে না। দীনতা ...এলে সরলতা আসে না। আমার মার আরেক ...ম সরলতা।

'আমি কী? আমি কি বস্ত্র না উপবীত? ... কি হাড় না মাংস? রক্ত না নাড়ীভুঁড়ি? ...ম্মা। খুঁজে কী পাচ্ছ দেখতে? দেখছ, আমি ... শুধু তিনি। আমার কিছুই উপাধি নেই, শুধু ...ঐশ্বর্য।

...মচন্দ্রকে বললেন হনুমান, 'রাম, কখনো ভাবি ...পূর্ণ, আমি অংশ। কখনো ভাবি তুমি সেব্য, ...সেবক। কখনো ভাবি তুমি প্রভু, আমি ...স। কিন্তু, রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিও যা আমিও তাই। তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

যা সোঽহং তাই তত্ত্বমসি।

হৃদয় মামাকে বকতে এসেছিল, সব অন্য রকম হয়ে গেল। বললে, 'অহংকার যায় কই? এই যায় আবার এই আসে।'

তাই তো বলি, আমি যখন যাবে না, তখন যাক শালা দাস আমি হয়ে। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমি ঈশ্বরের ছেলে এ অহংকার ভালো।

হাজার বিচার করো, আমি যায় না, চায় না যেতে। ভাবো একবার, চার দিকে অনন্ত জল, উপরে-নিচে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে জলে জলময়। সেই জলের মধ্যে একটি কুম্ভ আছে। কুম্ভের বাইরে যেমন জল তেমনি ভিতরেও জল। জলে জল। তবু কুম্ভটি তো তখনো আছে। ঐটি হচ্ছে আমিরূপী কুম্ভ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে ততক্ষণ আমি-তুমি আছে। তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি আকাশ আমি পৃথিবী।

'কিন্তু কুম্ভ যখন থাকবে না? ভেঙে যাবে?'

গদাধর আবার ধ্যানস্থ হল।

তখন রাম আর হনুমান এক। তখন সে এক অন্য কথা। তখনকার কথা তখন।

এগারো

'মা গো, তুই কই? আমাকে কৃপা কর। আমাকে দেখা দে। রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি নে? আমি কি দোষ করেছি জানিয়ে যা। এত কান্নায়ও কি সব দোষ ধুয়ে গেল না? আমি ধন জন ভোগ বিভব কিছুই চাই না মা। শুধু তোকে চাই। তুই দয়া কর্। দেখা দে।'

চোখের জলে বুক ভেসে যায় গদাধরের। অশ্রুভরা গলাতেই ফের গান ধরে:

আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যবে মুণ্ডমালা কোথা পেলি।

পরের দিন আবার কান্না: 'মা গো, আরেক দিন চলে গেল। বৃথাই গেল। তুই এলি না। এই তো সামান্য আয়ু, তার মধ্যে আরো এক দিন নিয়ে নিলি মা। আমার কান্না কি তুই শুনিস্ না?

আমার কান্নায় কি জোর নেই? আমি কি পারছি না কাঁদতে?'

নুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে মুখ ঘষে গদাধর! বলে: 'মা তুই কোথায়? তুই কি সত্যি আছিস? না, সব মায়া, মিথ্যা, সব মনের ভুল? যদি তুই আছিস, তোর জন্যে যখন এত আলো এত অন্ধকার, তখন তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন? রামপ্রসাদ তো তোকে দেখেছে। তোকে তবে ছলনা বলি কি করে? তুই আয়। দেখা দে। চোখের সামনে দাঁড়া।'

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে গদাধর। চুল ছিঁড়ছে। মাটিতে মুখ ঘষছে। চোখের জলে কাদা করে ফেলছে।

'আহা, ছোকরার মা মরেছে বুঝি।' পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে পড়ে কৌতূহলে।

'কিসে ম'ল? কবে? মাকে খুব ভালোবাসত, তাই না?'

চার পাশে ভিড়, তবু গদাধরের লজ্জা নেই, লৌকিকতা নেই। এক বিন্দু বিরতি নেই কান্নার।

'এক-এক করে দিন চলে যাচ্ছে মা। এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। আর দেরি সহ্য হচ্ছে না! নরজন্ম যে ফুরিয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রে বলে, তুই-ই সত্য, তুই-ই একমাত্র অধিগম্য। শাস্ত্র কি সব গাঁজাখুরি? তুই কি ভাঁওতা? সমস্ত একটা ভেল্কিবাজি? সমস্ত জগতের কি কেউ জননী নেই? যদি থাকে তবে সে কি আমারো জননী নয়?'

যন্ত্রণায় ছটফট করছে গদাধর। মনে হচ্ছে এক ঘরে আছে একতাল সোনা, অন্য ঘরে ঢুকেছে এক চোর। মাঝখানে শুধু একটা পাৎলা যবনিকা। সোনা নেবার জন্যে চোর কি পাগল হয়ে ফিরবে না? চাইবে না সে পর্দাটা দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলতে? টুকরো-টুকরো করে ফেলতে?'

গুরু নেই, সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ কেউ নেই যে, রীতি-নীতি বা পদ্ধতি-প্রকরণ শেখায়। এমন কেউ স্বজন-বন্ধু নেই যে অভিজ্ঞতার কথা বলে। শাস্ত্রপুঁথি তো চিরকালের জন্যে শিকেয় তোলা। কোনোই সহায়-সম্বল নেই গদাধরের। শুধু আছে উত্তুঙ্গ বিশ্বাস আর উদ্দাম ব্যাকুলতা।

পূজোয় নিয়ম মত আর বসতে পারে না গদাধর। কেমন যেন জো হয়ে গিয়েছে। মূর্তির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কখনো-কখনো, ঘুমের মধ্যে শিশু যেমন কাঁদে তেমনি করে কেঁদে ওঠে। পূজো করতে করতে হঠাৎ কখনো ফুল নিয়ে নিজের মাথার উপর রাখে আর পূজা ভুলে ডুবে যায় সমাধিতে। ফুল দিয়ে দেবীকে সাজাচ্ছে তো সাজাচ্ছেই, শেষ আর হচ্ছে না। আরতি করছে তো করছেই, দীপ থেকে ঘণ্টায়, আবার ঘণ্টা থেকে দীপেই ফিরে আসছে। দেরি করছে, প্রতীক্ষা করছে। এই বুঝি মা জেগে উঠবেন।

'আমার কথা তুই কেন শুনছিস না মা? আমি তোর অযোগ্য ছেলে বলে কি তোর স্নেহেরও অযোগ্য? আমি বেদ-বেদান্ত কিছু জানি না বলে কি তোর স্নেহও জানব না?'

সবাই বিদ্রূপ করছে। বলছে, আহা মরি কী পূজোই না হচ্ছে!

গদাধরের ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকের মুখের দিকে সে চাইবে না। সে চেয়ে আছে মার মুখের দিকে। ঘুম নেই। খাবার গলছে না গলা দিয়ে। সমস্ত মুখ আর বুক লাল।

তবু, কোথায় মা! কোথায় জগদীশ্বরী!

যেমন করে ভেজা গামছা নিংড়োয় তেমনি করে কে বুকের মধ্যিখানটা নিংড়োচ্ছে গদাধরের। মনে ভয় ঢুকেছে, হয়তো ইহজীবনে মার দর্শনলাভ হবেই না। মা থাকতেও মাকে যদি না পাই তবে কী হবে বেঁচে থেকে? জীবনের আর তবে মূল্য কি!

হঠাৎ কালী-ঘরে যে খাঁড়া ঝুলছিল তার উপরে নজর পড়ল। গদাধর শিশুর মতন ছুটে গিয়ে পেড়ে আনলে সেই খড়্গ। এই মুহূর্তেই জীবনের সে অবসান করে দেবে। আত্ম-রক্তপাতে জননীর নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবে।

গলায় আঘাত করতে যাচ্ছে, অমনি সামনে মা এসে দাঁড়ালেন।

মা! তুই মা? তুই এলি এত দিনে!

মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল গদাধর।

"দেখলুম—কী দেখলুম—যেন ঘর-বাড়ি ছাদ দেয়াল জানলা-দরজা আড়াল-আবডাল সব এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল, মিশে গেল। কোথাও কিছু নেই। শুধু এক সীমাহীন উজ্জ্বল সমুদ্র। চৈতন্য-সমুদ্র। যেদিকে তাকাই, দেখি তার জ্বলন্ত ঢেউ আমাকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে।

…ত্রিক থেকে ছুটে আসছে। চোখের পলকে …কে আচ্ছাদন করে ফেলল, ভেঙে গুঁড়িয়ে …য়ে দিল একাকার করে। কোথায় নিশ্চিহ্ন …লিয়ে গেলুম।”

…ঐ কি তোমার মা? ঐ তোমার মাতৃরূপ। …তন্যময়ী জ্যোতি? তোমার মা হাসে না, …বলে না, খায় না, হাঁটে না?

কি জানি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আমাকে ডুবিয়ে …গেল অতলে। আমি আনন্দে ‘মা’ ‘মা’ বলে …লুম। মনে হল ও তো ঢেউ নয়, মা-ই …টেনে নিলেন কোলের মধ্যে।

…আর বরফ, বরফ আর জল। যাই জল …, যাই বরফ তাই জল।

…নে গোপনে বসে কাঁদতে লাগল গদাধর: …তুই যে কেমন তাই আমাকে দেখিয়ে দে। …কার কি নিরাকার বুঝতে পারি না। তুই … ব্রহ্ম তা তুই-ই জানিস। তুই যা হ, … কৃপা কর, দেখা দে।’

…আবার বলতে লাগল আকুল হয়ে: ‘ভক্তের … একবার ব্যক্তি হয়ে দেখা দে মা! একবার … ওঠ। তার পর যখন জ্ঞানসূর্য উদয় হবে …য় বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি … যাবি। আমি তোর মা-রূপটি ভালোবাসি। আমায় তুই মা হয়েই দেখা দে। আমি তোর সন্তান, আমার সন্তানভাব।’

একবার দেখে কি তৃপ্তি আছে গদাধরের? সে বহুবার, অনন্ত বার দেখতে চায়। মায়ে পূর্ণ হয়ে থাকতে চায়, লীন হয়ে থাকতে চায়। যা পূর্ণ তাই লীন। চাই সেই অবিরাম যোগ। অবিচ্ছিন্ন আনন্দ।

লোক দাঁড়িয়ে থাকে চার দিকে, কত কি মন্তব্য করে, গদাধর কান পাতে না, চোখে দেখে না। মনে হয় সব পটে-আঁকা ছায়ামূর্তি। অবস্তু, অসত্য। মনে হয় সংসারে শুধু মা আর মা'র জন্যে এই কাতর কাকুতি ছাড়া আর কিছু নেই। তাই কে কি বলবে বা ভাববে কিছু আসে-যায় না গদাধরের। শুধু আসে-যায় মা কবে আবার দেখা দেবেন, কবে থাকবেন চিরস্থাতি হয়ে!

একমাত্র হৃদয়ের দুশ্চিন্তা। এ যে কঠিন রোগ হয়ে পড়ল মামার! কাজের বার হয়ে পড়ল ক্রমে-ক্রমে। সাধনা করতে বসে স্নায়ুবিকার হল! চিকিৎসা করতে হয়। ভূকৈলাসের রাজার যে কবরেজ ছিল, নামজাদা বদ্যি, তাকে খবর পাঠাল। কবরেজ এসে নাড়ী টিপলে। ওষুধ দিলে। এ রোগের ওষুধ নেই। এ রোগের ওষুধ মাতৃদর্শন। মাতৃস্পর্শন!

হৃদয় ভাবলে, কামারপুকুরে খবর পাঠাই। মার ছেলে ফিরে যাক মার কাছে। [ক্রমশঃ

স্মরণ

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

নব জীবনের যৌবন-অঙ্গনে
মোর জীবনের সঙ্গিনী এল যবে
প্রকাশ-ইচ্ছু আত্মা ভুবনে ভুবনে
বুঝিল নিজেরে পূর্ণতা পেল কবে।

…সেছিলে প্রিয়া নব সৃষ্টির দানে
…-জাগরণ-জীবন-প্রাতের গানে
… গেয়েছিলে নব ছন্দের তানে
…সন্ত-সাঁঝে পরম উন্মেষনে,
আঁধার-আলোর যুগান্ত বিপ্লবে॥
…গান আমার জীবনের বীণাটিতে
… নব সুরে জীবনের রাগিণীতে
যে জাগায় আজো তোমার
দেখার লেখা।

যে মূর্তি জাগে হৃদয়ের মাঝটিতে
প্রান্তিক-পথে শেষের সীমানাটিতে
শত জনমের মাঝে
নিসঙ্গ একা।
ওপারের আলো-লিপি যে সঙ্গে আনে
স্তব্ধ প্রহরে চরম শেষের গানে
চির-বিরহের পরম ব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাণে তোমারি সৌরভে
অবিনশ্বর মিলনের উৎসবে॥

বয়স তখন কত ? চব্বিশ পঁচিশ। তখনও তো বৌঠান্ কটাক্ষ হান্‌ছেন কবির লেখা সম্বন্ধে—ঠিক বিহারীলালের মত হচ্ছে না লেখা।

কিন্তু কবি-কণ্ঠের গান শুনে বৌঠান্ বাক্যব্যয় করতে পারেননি এমন কি তাঁর ছেলেবেলায়। সেই সুরশিল্পীর প্রথম সঙ্গীতগ্রন্থ "রবিচ্ছায়া" প্রথম প্রকাশের কাহিনী বড় কৌতূহলোদ্দীপক। এই লেখায় "রবিচ্ছায়া" সম্বন্ধে সবিশেষ আলোকপাত রয়েছে।]

ইং ১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথ

"র বি চ্ছা য়া"

শ্রীকালিদাস নাগ

রবি ঠাকুর কবি হবেন কি না, কোনও কালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারবেন কি না—এ নিয়ে তাঁর বৌঠাকুরাণীর হাটে যখন তর্ক চলত তখন কিন্তু রবি গাইয়ে হবেন একথা কেউ অবিশ্বাস করেননি। ছন্দ-সরস্বতীর পূজার প্রথম ফুলগুলি বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে, শুধু একটি কবিতার গল্পরূপ কবি নিজেই রেখে গেছেন তাঁর "ছেলেবেলা"তে : "মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউ-এ পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না…" কবির বয়স হয়ত তখন বছর দশেক অর্থাৎ ১৮৭০-৭১; তার আগেই তাঁর পিতৃদেব মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের শিশুকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে বাঙলার "বুলবুল" বলে তাঁকে আদর করতেন; পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ শিশু রবির গান শুনে নেচে উঠতেন 'ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাঁশরী'। নাম-ভাঁড়ান সুরকার ভানুসিংহের পদাবলী তখনই যেন সুরু হয়ে গেছে। হারমোনিয়মের কলটেপা সুরের গোলামি করতে হয়নি, কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করেছেন কত নাম-হারা গাইয়ের কাছে, বিখ্যাত রূপদী বিষ্ণু চক্রবর্তী ও সুররসিক যদু ভট্ট প্রভৃতির কাছে শিক্ষা চলেছে, তার উপর রবীন্দ্রনাথের দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলি আমন্ত্রণ করেছেন বাঙলা ভাষায়।

কিন্তু তান-কর্তবের রাজ্য ছেড়ে সুরশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যেদিন বাল্মীকির মতই আপন প্রাণের আবেগে প্রথম গেয়ে উঠেছিলেন, তার সন তারিখ জানা নেই। শুধু তেমনি একটি তারিখ-হারান গানের আলাপ তিনি রেখে গেছেন 'ছেলেবেলায়' (৭০ পাতা); জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দননগরের গঙ্গা-তীরে—

প্রথম সংস্করণ রবিচ্ছায়ার গ্রন্থ-পরিচয় পত্র

নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ওপারে বনের মাথায়। অনেকবার এই রকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি—সেদিন তা হোলো না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে : 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'। নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে, রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা বাদল-দিন আজো রয়ে গেছে আমার বর্ষা-গানের সিন্ধুকটাতে…বৌঠাকরুণ ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে, ভালো লাগল বলেননি—চুপ করে শুন্‌লেন; তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো।

অর্থাৎ ১৮৭৭-৭৮ সালের ব… বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন প্রথম পর্যায় সুরু … গেছে, ভারতী পুরো দমে চলছে। … বোধিনী পত্রিকায় ১২ বছরের বালক

…ন্দ্রনাথের কাঁচা লেখা "অভিলাষ" ও "নদী" কবিতা ছাড়া …এক কাঁচা-পাকা লেখা তাঁর 'ভারতী' 'জ্ঞানাঙ্কুর' ইত্যাদি …পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিছু তার 'শৈশব সঙ্গীত'ও "অচলিত" …তে স্থানও পেয়েছে। ১৮৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রের সরোজিনী …টকে 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—এবং সঞ্জীবনী সভার জন্য …'একসূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন' ও 'তোমারি তরে মা সঁপিনু …' গানগুলিও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন জানি। কিন্তু তাঁর অচলিত-… নিয়ে আলোচনা প্রায় সুরু হয়নি বললেই চলে! শ্রীশান্তিদেব … তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গ্রন্থে অনেক কিছু সংগ্রহ করতে চেষ্টা …েছেন : কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণেও উল্লেখ নেই একটি গীতি-…গ্রন্থের যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কম নয়। এর নাম "রবিচ্ছায়া"; …নামকরণ করেছিলেন স্বরকার রবীন্দ্রনাথ নিজেই, তার প্রমাণ …িতেই আছে; অথচ 'রবিচ্ছায়া' আজও কাব্যে উপেক্ষিতা হয়ে …ে কেন?

…ার গানের ইতিহাসটা চাপা পড়ে গেল, কারণ ১৮৭৮-৮০ …ের …ক্ষর রবীন্দ্রনাথ বিলাতে কাটালেন। বিলাত যাত্রার ঠিক … …: ১৮৭৮ (এপ্রেল-সেপ্টেম্বর) আমেদাবাদে মেজ দাদা …েন্দ্রনাথের বাসায় আরো গান লিখে স্বাধীন … …র দিয়েছেন যথা, 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন …জোছনায়' (রবিচ্ছায়ার প্রথম গান: মিশ্র আড়া-…ক' 'বলি ও আমার গোলাপ বালা', 'শুন …নলিনী খোলো গো আঁখি', 'আঁধার শাখা উজল …' ইত্যাদি।

১৮৮০ সালের শেষে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরেই …সঙ্গীত ও ভাব' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন, জ্যোতিরিন্দ্র-…নাথের 'মানময়ী' নাটকে অংশ গ্রহণ করেন ও শেষ …টি …না করে দেন: 'আয় তবে সহচরী।' তারো … …দের বাড়ীতে "বিবাহোৎসব" "বসন্তোৎসব" …(স্বর্ণকুমারী দেবীর) প্রভৃতি গীতি-নাটকের মধ্যে …নাথ আরো গান কিছু দিয়েছেন কি না তার …নির্ণয় করা শক্ত, কারণ পালাগুলিই লুপ্ত হয়েছে। … …অমূল্য সংকেত রয়ে গেছে 'রবিচ্ছায়া'র …

কিন্তু এ বইখানি বহু কাল ছাপা হয়নি সুতরাং …। ১৮৮১তে "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও ১৮৮২তে …"মৃগয়া" রচনা ও অভিনয়াদি হয়েছে। তার …রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে গানও করেছেন অভিনয়ও …: সাক্ষ্য দেবার মানুষ আজ কেউ বেঁচে না … কবির নিজের মুখে শুনেছি যে কি বিরাট …হয়েছিল। আর সব চেয়ে বড় সাক্ষী হয়ে … …অমর বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বাল্মীকি-প্রতিভা …লেখে 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর আনন্দের স্বাক্ষর রেখে …হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়ে'র সমালোচনা … …

…৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী মৃণালিনী … …। প্রায় এক বছর পরে—২০শে ডিসেম্বর

১৮৮৪—অধুনা বিস্মৃত-প্রায় অথচ আদিম রবিভক্ত শ্রীযোগেন্দ্র-নারায়ণ মিত্র ২নং বেনেটোলা লেন থেকে চিঠি লিখছেন :—
"রবিবাবু!···ছায়া-আলোক ভাল শুনায় না···ছায়া মানে হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বুঝাইতে পারে, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের ছায়া না বুঝাইতেও পারে, ঐ এক কথার মধ্যে আলোক-আঁধার দুই থাকিতে পারে। যে নামটি ভাল বোধ হয় এই লোকের নিকট অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন···"

সেই চিঠিরই কোণে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :—

"আলোছায়া" বল্লে কেমন হয়? আর রবিচ্ছায়া যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে—যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য, আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই।"

সুর-লোকের প্রথম কবি-নন্দিনী "রবিচ্ছায়ার" জন্মকথা ও নামকরণ যে চিঠিখানিতে আছে সেটি দেখবার সৌভাগ্য হল যোগেন্দ্র-নারায়ণের উপযুক্ত পুত্র বন্ধুবর অমল মিত্রের সৌজন্যে। তিনি বহু যত্নে সেকালের দলিল-পত্র রক্ষা করেছেন ও কবিভক্তদের দেখবার সুযোগ দেন বলেই 'বারোয়ারী' রবীন্দ্র-সঙ্গীত মহলের একটা

আলোছায়া' বল্লে কেমন হয়? আর 'রবিচ্ছায়া' যদি বলেন সে আপনাদের অনুগ্রহ। নামকরণের ভার আপনার উপরে — যখন আপনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন তখন তার গোত্র ও নাম আপনারি দাতব্য। আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই।
—রবিবাবু,
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোধ হয়, আবার 'ছায়া-আলোক' ভাল শুনায় না, কি করিব? অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিন। 'ছায়া' মানে হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বুঝাইতে পারে, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের ছায়া না বুঝাইতেও পারে, ঐ এক কথার মধ্যে আলোক আঁধার দুই থাকিতে পারে। যে নামটি ভাল বোধ হয় এই লোকের নিকট অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন। নামটি একটু poetic হওয়া আবশ্যক।

২০ সেপ্টেম্বর ৮৪
২নং বেনেটোলা লেন
কলেজ স্কোয়ার
শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

রবিচ্ছায়ার নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনারায়ণের পত্র-বিনিময়। লক্ষ্য করবার বিষয় কবিগুরুর লেখায় শুদ্ধ ও চলিত ভাষার গোলমাল।..

পড়া দরজা একটু খুলতে চেষ্টা করছি। প্রথমেই দুষ্প্রাপ্য "রবিচ্ছায়া" থেকে রচয়িতার নিবেদন এবং প্রকাশকের বক্তব্যটি পাঠকদের উপহার দিতে চাই :—

'রবিচ্ছায়া' রচয়িতার নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত অধিকাংশ গান সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত্ত-স্থায়ী সুখদুঃখের সহিত দুইদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল—সেই সকল শুষ্কপত্র চারিদিক হইতে জড় করিয়া বইয়ের পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়িভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোন আনন্দ নাই।

আমার এইরূপ মনের ভাব। এইজন্য এ গানগুলি আজ সাত-আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি নিজে হইলে হয়ত ছাপাইতাম না। কিন্তু প্রকাশক মহাশয় যখন ছাপাইতেছেন, তখন আর আমার তাহাতে আপত্তি কিছু নাই। আমার পক্ষে সে ত সুখেরই বিষয়। এখন প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে পাঠকদের বোঝাপড়া।

অনেক কারণে গান ছাপান নিষ্ফল বোধ হয়। সুর সঙ্গে না থাকিলে গানের কথাগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তা ছাড়া গানের কবিতা সকল সময়ে পাঠ্য হয় না, কারণ সুরে ও কথায় মিলিয়া তবে গানের কবিতা গঠিত হয়। এইজন্য সুর ছাড়া গান, ছাপার অক্ষরে পড়িতে, অনেক স্থলে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার বিস্তর উদাহরণ আছে, পাঠক মহাশয়ের গোচরার্থে নিবেদন করিলাম ইতি।

পুনশ্চ—অনেকগুলি গানে রাগরাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসানো হয় নাই। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে সে অভাব পূরণ করিয়া লইতে পারেন।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা—পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি। এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরের সঙ্গে বসানো হয়।

ভানুসিংহের সমস্ত গান এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইল না। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা হইতে গুটিকয়েক গান উদ্ধৃত হইল।

স্বাঃ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের বক্তব্য

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রতি বর্ষেই তাঁহার অনেকগুলি করিয়া নূতন সঙ্গীত বাহির হইতেছে। বিধাতা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, প্রকাশ দিয়াছেন, তিনি বিধাতার দানের ... পাঠকমাত্রেই তাঁহার কবিতার সহিত সুপরিচিত। নূতন করি আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তাঁহার কবিতাগুলি সরল, সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী, তাঁহার সঙ্গীতগুলি ততোধিক সরল সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি তান লয় স্বরযোগে যখন গীত হয়, তখন মনে হয় বুঝি স্বর্গ হইতে সে সকল সঙ্গীত আকাশ ভাসাইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতলে এ সংসার-দাবদাহে দগ্ধ মানবমণ্ডলীকে শান্তি দিবার জন্যই নামিয়া আসিতেছে। এ ঘোর সংসার-কাননে 'তমস-ঘন-ঘোরা-গহন-রজনীর' নাম শুনিয়া কোন পান্থ-হৃদয় না ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত হয়? বা সেই 'জীবনের ধ্রুবতারা'র উদ্দেশ্য পাইয়াই বা কোন অনুতপ্ত হৃদয় না আশ্বাস লাভ করে? বাস্তবিক সে সঙ্গীত শ্রবণে প্রাণ ইহলোকের অতীত হইয়া যায়, পাঠ করিলে অসাড় প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া ওঠে, ঘোর সংসার-মুগ্ধ প্রাণও ক্ষণকালের জন্য উদাসভাব ধারণ করে। তাঁহার স্বভাব-সঙ্গীত প্রকৃতিকে নব ভাবে সাজাইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করে। প্রকৃতি যেন কোমল জ্যোৎস্নায় স্নাত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চক্ষের সম্মুখে আগমন করে। তাঁহার প্রণয়-সঙ্গীতগুলি সুমধুরভাবে হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে, প্রাণে বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করে।

এই সঙ্গীতগুলি এত দিন রচয়িতার উদাসীনতা বশতঃ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কখনও আলোক দেখিত কি না জানি না। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার গুণে মানবহৃদয়ের কোমল ভাবগুলি সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়, সেগুলির আদর আমাদের দেশে ক্রমেই বাড়িতেছে ইহা অতি আনন্দের বিষয়। কিন্তু তবু গুরুজনের নিকট গান করিতে অনেকেই সংকোচ বোধ করেন, তাহার কারণ সচরাচর দুইটি,—সামাজিক শিক্ষার অভাব,—আর ভাল গানের অভাব, শেষোক্ত কারণটি কতক পরিমাণে দূরীকরণ করা এই পুস্তকের একটি উদ্দেশ্য। সাধারণে এই সঙ্গীতগুলি গান করিয়া ও পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, তাই সযতনে তাহা সংগ্রহ করিয়া এই "রবিচ্ছায়া" প্রকাশ করিলাম; ১২৯১ সনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া হইল।

সিটি কলেজ, বৈশাখ ১২৯২

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

রবিচ্ছায়ার প্রকাশক
৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

যোগেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের এক বয়সী (১৮৬১ সালে জন্ম)। রবি যখন বিলাত থেকে ফিরে (১৮৮০) ... প্রেরণায় বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল মৃগয়া প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা-প্রযোজনায় ... ভানুসিংহ (১৮৮৪) প্রকাশে মেতে আছে, তখন যোগেন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে ... ছাড়তে বাধ্য হয়ে সিটি কলেজে চাকরি নিয়েছেন। খাঁটি আদর্শবাদী এই যুবকটি আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা স্নেহ করতেন। আদি ... সমাজের সম্পাদকত্ব (১৮৮৪) গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন উচ্চা...

…ঙ্গীত রচনা করছেন, তেমনই অন্য দিকে জাতীয় মহাসভার জন্ম-…র (১৮৮৫) শুভ শঙ্খধ্বনি করছেন রবিচ্ছায়ার জাতীয় …তে। "এ কি অন্ধকার এ ভারত ভূমি"—গানটিতে জুড়েছিলেন …তী' রাগিণী—আমাদের নব জীবন-প্রভাতের যেন সূচনায়। …সমঝদার যোগেন্দ্রনারায়ণ ভাগ্যবান সাথিরূপে রবীন্দ্রনাথের কত …ও শুনেছেন আর মনে মনে গেঁথে তুলেছেন মেঘরাগ-নন্দিতা …চ্ছায়া" :—

"ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা! জলদে
গাও রে শত অশনি মহা নিনাদে,
ভীষণ প্রলয় সঙ্গীতে
জাগাও জাগাও জাগাও রে—এ ভারতে।"

…র পাশেই 'জয়-জয়ন্তী' রাগিণীতে কবির রচনা—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরসিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"

… গানটি কবির ১৭ বছরে বিলাত-যাত্রার পূর্বেই 'ভারতী'তে … হয় এবং রবিচ্ছায়ার "জাতীয় সঙ্গীত" অংশে গৌরবের আসন …। কলকাতার দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৮৮৬) অধিবেশনে রাম-… 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি কবি নিজে …নিয়েছিলেন; যেমন ১৩০৩ সালের কংগ্রেসে (১৮৯৬) …ম্' গানটি দেশ রাগিণীতে কবি গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ …ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও যে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি, সেকালের …র গান শুনে স্বীকার করে গেছেন।

… জাতীয় সঙ্গীতের রীতি, সুর ও সংখ্যা বেড়ে চলেছে … যুগ থেকে। তার মধ্যে আরো পাই ১৭টি "ব্রহ্ম-সঙ্গীত" … রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের যুগ, তথা নিধু বাবু, জ্যোতির্মোহন …, বিষ্ণু চক্রবর্তী ও বহু ভাটের সুর-প্রবাহের ছন্দ-বৈচিত্র্য ও …ক্রম রবীন্দ্রনাথই আমাদের দিয়ে গেছেন। রামমোহনের … শুরু করে ১২৮৯ (১৮৮২) পর্যন্ত বিষ্ণু আদি … …য়ক হিসাবে কত ভজন ও সাধন-সঙ্গীত রচনা করেছেন, … ও শুনিয়ে শান্তি দিয়েছেন—তারও কিছু পরিচয় রবীন্দ্র-…পে পাই। উচ্চাঙ্গের মার্গ সঙ্গীত যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভিত্তি, … প্রমাণ কবির ব্রহ্ম-সঙ্গীতের পর্বে পর্বে আছে।

…য় বিভাগে দেখি রবিচ্ছায়ায় প্রকাশক ১১৬টি গান …শ করেছেন;—এগুলিকে পরে "বিবিধ সঙ্গীত" বলা হয়েছে …—১১৬ মধ্যে)। প্রায় প্রত্যেক গানের মাথায় রাগ ও তালের … সেকালে কবি নিজেই দিয়েছেন। হয়ত ঘটনাচক্রে এই বর্গের …ন: "নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়"—"মিশ্র" রাগিণীর … সগৌরবে ধরে আছে! পূর্ব ও পশ্চিম যেমন রবীন্দ্রনাথের … শুধু মিশেছে নয় সার্থক সমন্বয় পেয়েছে, তেমনি Rob. rt …wingএর Abt Voglerএর মত তিনি তাঁর শাশ্বত সুর-সৌধ …য়েছেন কত বিচিত্র উপাদানে, সেটি বুঝতে হলে রবিচ্ছায়ার …৮৮৫) প্রথম সুর-সঞ্চয়ন থেকেই আমাদের পাঠ নিতে …র কিছু আগে তিনি প্রকাশ করেছেন 'ভানুসিংহ' পদাবলী …শব সঙ্গীতে"র জুড়িদার। তাঁর কাব্য-সন্তানদের নামকরণেও দেখি বীণাপাণির ঝঙ্কার: 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২) 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) ইত্যাদির সঙ্গে তাল রেখে 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) 'মায়ার খেলা' (গীতিনাট্য, ১৮৮৮)। রবীন্দ্র কাব্যের আলোচনায় নেমে বহু লেখক তাঁর ভাব, ভাষা, প্রভাবাদির আলোচনা করেছেন, কিন্তু সুর ও তালকানা হয়ে যে রবীন্দ্র-রচনার মর্ম্মস্থলে পৌঁছন যায় না, আজও অনেকের সেদিকে হুঁশ নেই! এই হুঁশ হয়ত ফিরে আসবে যদি "রবিচ্ছায়া" প্রভৃতি গানের বইএর পাশাপাশি রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা যায়। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-ভবন ও গীতি-বিতান প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করা উচিত: তবেই রবীন্দ্র পাঠ-চক্রগুলি জীবন্ত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

'রবিচ্ছায়া'র রচয়িতা হিসাবে ২২ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ সহজ বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, অনেকগুলি গান তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরে বাঁধা, আবার অনেকগুলিতে তিনি নিজেই সুর বসিয়েছেন। যে সব গানে রা…গিণীর নাম লেখা নেই সেগুলিতে সুরের অভাব পূরণ করে নেবার অধিকার তিনি দিয়েছেন সঙ্গীতজ্ঞদের হাতে। এই অধিকার দানের তাৎপর্য্য কবির জীবদ্দশায় হয়ত স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু ভাবী কালে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের উত্তরোত্তর বিকাশ যখন এ দেশে হবে তখন হয়ত বোঝা যাবে। 'জনগণমন' প্রভৃতি গান নিয়ে আলাপ-প্রলাপে হয়ত তার পূর্ব্বাভাষ আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্র সুর-ভারতীর ও Tagore Auditorium গড়ে তোলার দায়িত্ব ও অধিকার দেশবাসীকে অনেক বার স্মরণ করিয়েছি: কিন্তু হাততালি কিছু পেলেও সাধারণের কাছ থেকে আসল সাড়া আজও পাইনি। হয়ত অপেক্ষা করতে হবে, হয়ত বা Danielouর মত, পাশ্চাত্য সুর-রসিকদের তাগিদে ও সাহচর্যে আমাদের স্বপ্ন এক দিন সত্য রূপ পাবে।

ভবিষ্যতের আলোচনা স্থগিত রেখে এ প্রবন্ধে শুধু স্মরণ করাতে চাই যে, রবিচ্ছায়ার ছাপা আদিম গানগুলি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলাপের খুব সার্থকতা আছে এবং আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান বাকি আছে ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের উদ্দেশে, যিনি কবির শৈশব সঙ্গীতের যুগ থেকে স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত কত বিচিত্র সুরের ঐক্যতান শুনেছেন ও আমাদের শোনাতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসরের বিরাট সম্বর্দ্ধনা দেখে ও কবির প্রীতি-আলিঙ্গন লাভ করে কল্যাণমিত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করেন (১৪ জানুয়ারী ১৯৩২)। তাঁর ছবি হয়ত বাঙ্গালী দেখেনি। এ যুগের আর দু'জন কবি-বন্ধুর নামও আজ স্মরণ করাতে চাই—বহু ভাষাবিৎ কবি প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বাড়ীর লোক না হয়েও তাঁরা কত বড় অন্তরঙ্গ ছিলেন সেটা কবিগুরুর মুখে শুনেছি। কিন্তু এক জন সুর-রসিকের নামটা তাঁর কাছ থেকে যাচাই করে নিতে পারিনি, শুধু তাঁর গদ্য নক্সার (pen picture) একটু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করে শেষ করব।

বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় বার বন্ধ হয়ে গেল ১২৮৯ সালে (ইং ১৮৮২) তখন বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশ করলেন (শ্রাবণ ১২৯১) এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছাপতে সুরু করলেন 'নবজীবন', যার মধ্যে বঙ্কিম দিয়েছেন তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব

[৩৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ঋগ্বেদ—রূপান্তর

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৬।৫৪।১—১০॥

পূষণ দেবতা, ভরদ্বাজ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ।

স পূষন্বিদুষা নয়
যো অঞ্জসানুশাসতি
য এবেদমিতি ব্রবৎ ।১।

সমু পূষ্ণা গমেমহি
যো গৃহাঁ অভিশাসতি
ইম এবেতি চ ব্রবৎ । ২ ।

পূষ্ণশ্চক্রং ন রিষ্যতি
ন কোশোঽব পদ্যতে
নো অস্য ব্যথতে পবিঃ । ৩ ।

যো অস্মৈ হবিষাবিধন্
ন তং পূষাপি মৃষ্যতে
প্রথমো বিন্দতে বসু । ৪ ।

পূষা গা অন্বেতু নঃ
পূষা রক্ষত্বর্বতঃ ।
[illegible] । ৫ ।

পূষন্ননু প্র গা ইহি
যজমানস্য সুন্বতঃ
অস্মাকং স্তুবতামুত । ৬ ।

মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্
মাকীং সং শারি কেবটে
অথারিষ্টাভিরা গহি । ৭ ।

শৃণ্বন্তং পূষণং বয়ম্
ইর্যমনষ্টবেদসম্ ।
ঈশানং রায় ঈমহে । ৮

পূষস্তব ব্রতে বয়ং
ন রিষ্যেম কদাচন ।
স্তোতারস্ত ইহ স্মসি । ৯

পরি পূষা পরস্তাদ্
হস্তং দধাতু দক্ষিণম্ ।
পুনর্নো নষ্টমাজতু । ১০ ।

পূষণ—
যিনি জানেন,—
তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটিয়ে দাও ;
যিনি ঋজুপথে আমাদের অনুশাসন দেন—
তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটিয়ে দাও ;
যিনি বলেন—"এই এখানে রয়েছে,"—
তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটিয়ে দাও ॥ ১ ।

দেব পূষণের অনুগ্রহে—
আমরা মিলিত হব তাঁর সঙ্গে
যিনি অভিশাসন করেন—"এই সেই গৃহ,"
যিনি বলেন—"তারা এই" ॥ ২ ॥

বিনাশ নেই দেব পূষণের চক্রের
[illegible] নেই তাঁর চক্রের কোশের,
কুণ্ঠা-কণ্টকিত হয় না—
চক্রের ধারা— ॥ ৩ ।

[illegible] মানব ঘৃতের আহুতি দিয়ে
পরিচরণ করে পূষণের
[illegible] মানব কখনও ভ্রষ্ট হয় না—
পূষণের স্মৃতি থেকে।
[illegible] মানব সর্ব্ব-প্রথমেই
লাভ করে—বসু ॥ ৪ ।

[illegible]গমন করুন আমাদের গোধন

[illegible] করুন আমাদের অশ্ব-সঞ্চয় ;
[illegible]ভোগ করতে দিন মানবকে
[illegible]দের অন্নের সংগ্রহ।
—এই আমাদের আশা ॥ ৫ ।

হে পূষণ,
সোম-সবন-কারী যজমানদের
স্তোত্রগান-কারী অস্মদীয়ের
গোধন তুমি রক্ষা কোরো।
তাদের অনুগামী হও। ৬।

হে পূষণ,
তুমি প্রতিবেধ কোরো, দেখো,—।
আমাদের গোধন যেন নষ্ট না হয়
হিংসার প্রকোপে না পড়ে
কূপ-পাতনের আঘাত না পায়।
অহিংসিত গোধন লয়ে,
হে পূষণ,
সায়ংকালে তুমি ফিরে এস ॥ ৭ ।

স্তোত্রশ্রবণে প্রীত হয়েছেন কি
দারিদ্র্য-প্রেষী এই দেবতা, পূষা ?
উদ্ধরণ করবেন কি নষ্ট ধন ?
আমরা জানি তাঁর ঐশ্বর্য্যের অবিনাশিত্ব।
তিনি ঈশান।
আমরা তাঁর কাছে
প্রার্থনা করি সার্থকতা ॥ ৮।

হে পূষণ,
তোমার ব্রতকর্ম্মের সম্পাদনায়
আমরা যেন হিংসিত না হই—
—কদাচিৎ।
ইহস্থানে আমরাই তোমার স্তোতা ॥ ৯।

দূরদেশগত গোধনকে
বিনষ্টি হতে যেন নিবারণ করেন পূষা—
তাঁর দক্ষিণ হস্তের প্রসারে।
যা হারিয়ে গেছে
পুনর্বার যেন আমরা তা ফিরে পাই ॥ ১০ ।
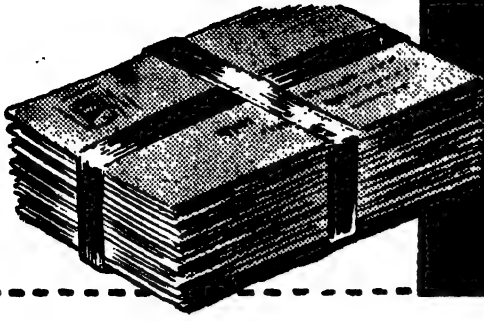
নন্দকুমারের পত্র

[নিম্নলিখিত বাংলা পত্রখানি মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার পুত্র গুরুদাসের নিকট লিখিয়াছিলেন। জগৎচন্দ্র নন্দকুমারের জামাতা। হেষ্টিংস গুরুদাসকে বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা বেতনে দেওয়ানী পদ দেন ইহাতে জগৎচন্দ্র ঈর্ষান্বিত হন]

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণম্

প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদ শিবঞ্চ বিশেষঃ—

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক। অত্র কুশল পরন্ত শ্রীযুক্ত মিস্তর মেদনটিন সাহেব ১ই পৌষ সোমবার দুই প্রহর দিবসকালে এখান হইতে রাহি হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারিবে। তুমি কোন বিষয় অসন্তোষ করিবে না। নামে ওয়াজীবন আরজ লিখাইয়া শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের মিস্তর মিদনটিন সাহেব দিয়া দস্তগত করিয়া লইয়াছি। শ্রীযুক্ত লালা সুবংস রায় অল্প দিবসের মধ্যেই যাইবেন ইহার মারফৎ পাঠাইব। ইহা তোমাকে দিবেন তাহার এক পরামর্শ ঠাওরাইছি মজকুরের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া তাহার মত কার্য্য করিবে। যে যে বিপক্ষতা করিতেছে তাহারা পোশমান হবেক দাস্তমানের দফা এবং আর আর সবিশেষ সকল পশ্চাৎ লিখিব, তাহাতে ওয়াকিফ হইবে। লালা সুবংস রায়কে বিস্তারিত কহিলাম ইহার স্থানে জ্ঞাত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিবে। শ্রীযুক্ত রায় জগৎচন্দ্র যদি তোমার বিগন লোকের সহিত মিলিয়া তোমার জুববীতে কমর বান্ধিয়া থাকেন তবে তিঁহ আপনার অবিবেচনাতে আপনি ফলে পঁহুছিবেন। মিস্তর মেদনটিন সাহেবের সহিত সুন্দররূপে মিলিবা তাহা হইতে কুসুর জাবেক না। সমাচার এখানে হামেষ লিখিবে। কিমধিকং ইতি—১৩ই পৌষ, শুক্রবার।

সমাচার পত্রার্থ জ্ঞাত হইবে কোন বিষএ ভাবিত না হবে শ্রীশ্রী৺ মঙ্গল করিবেন আর ২ বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত লালা সুবংস রায় পশ্চাৎ যাইতেছেন তাহার প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইবা।"

রাণী ভবানীর চিঠি

শ্রীশ্রীরামঃ

তরফ সাহানগর আমলে পরগণে ধাত্তা মতালকে চাকলে বাদসাহি তালুক হরিপ্রসাদ রায়ের প্রজা কর্ম্মচারী হাল সাহানা কোটাল প্রতী লিখনং কার্য্যঞ্চাগে। তরফ মজকুর তালুকদার হরিপ্রসাদ রায় মজকুর শ্রীযুক্ত রাজা গুরুদাস গৌড়পৎ বাহাদুরের স্থানে বাটা ও [illegible] ছিল অতএব লিখি তোমরা গৌড়পৎ বাহাদুরের তালুকদার মস্তকীম জানিয়া ইহার নিকট রুজু হইয়া আবাদবশতঃ মালগুজারী আদায় সরবরাহ করহ কোন বাবদে পোশাদা না রাখীবা ইতি সন ১১১১ তারিখ ৭ই শ্রাবণ।

শ্রীমহারানী ভবানী দেব্যা।

বুলাকীদাসের চিঠি

[বুলাকীদাস মুর্শিদাবাদের এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৭৫৮, জুন মাসে মহারাজ নন্দকুমার বুলাকীদাসের নিকট ৪৮০২১ টাকা মূল্যে বিক্রয়ার্থ এক ছড়া মুক্তার মালা, একখানা কণ্ঠা, একটি শিরপেঁচ, দুইটি হীরা ও দুইটি মাণিকের আংটি গচ্ছিত রাখেন। বুলাকী এই টাকা দিতে না পারায় নীচের পত্রখানি মহারাজকে লিখিয়া দেন]

আমি বুলাকীদাস

এক ছড়া মুক্তার হার, একখানি কণ্ঠা, একটি শিরপেঁচ, চারিটি আংটী, দুইটি হিরার, দুইটি মাণিকের রঘুনাথ রায় জীউ মহারাজা নন্দকুমার বাহাদুরের পক্ষ হইয়া ১১৬৫ সালের আষাঢ় মাসে আমার মুর্শিদাবাদের কুঠিতে বিক্রয়ের জন্য গচ্ছিত রাখেন। নবাব মীর মহম্মদ কাশীম খাঁর সৈন্যের পরাজয়ের পর উপরোক্ত মহারাজ পূর্ব্ব কথিত গচ্ছিত জহরত আমার নিকট দাওয়া করেন, আমার অবস্থা ভাল না হওয়াতে জহরত ফিরাইয়া বা তাহার মূল্য দিতে অক্ষম হই। আমি অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে, কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা, যাহা আমার কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য আছে, সেই টাকা প্রাপ্ত হইলেই আটচল্লিশ হাজার একুশ সিক্কা টাকা জহরতের মূল্য আমার কাছে পাওনা আছে, সেই টাকার সহিত টাকা প্রতি চারি আনা সুদ দিব। এ বিষয়ে আমি মহারাজের নিকট কোন ওজর আপত্তি করিব না। ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র লিখিত হইল।

আলাব—বুলাকীদাস

সাক্ষী—মহাতাব রায়

সাক্ষী—শীলাবত বুলাকীদাসের উকীল

সাক্ষী—আবদেও কমল মহম্মদ।

পুণা কংগ্রেসের সময়ে

[১৮৯৫ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর, শুক্রবার পুণায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১১শ তম অধিবেশন হয়। এ অধিবেশন হইতে বাংলায় ফিরিয়া জনৈক কংগ্রেস প্রতিনিধি 'হিতৈষী' পত্রে নিম্নলিখিত বাংলা পত্র প্রকাশ করেন।]

সম্পাদক মহাশয়—

...পুণ্য কংগ্রেস নাটক অতি দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছে। ...সেব 'প্যাণ্টোমাইম' বা প্রহসন এবার বড়ই বাহার দিয়াছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাগম হইয়াছিল যথেষ্ট। ডাক্তার বন্দরকরই ইহার মধ্যে বাহবা পাইবার যোগ্য। তিনি বলেন— এ দেশের রমণীগণ নিরক্ষর, মূর্খ। ইহারা না পারে ইংরাজীতে কথা কহিতে, না পারে পর-পুরুষের কাঁধে ভর দিয়া হাওয়া খাইতে, না পারে নাচিতে, না পারে পিয়ানো বাজাইতে—এক কথায় ইহারা ...অসভ্য ও মূর্খ; অতএব ইহাদের দ্বারা দেশের, যথা দশের কি উন্নতি সাধিত হয়—না ভবিষ্য বংশধরগণের নিকট কোনরূপ ...কর যাইতে পারে? বোর্ডিং হাউসে বাধিয়া ট্রেনিং ...পরিয়া ইহাদের শীঘ্রই সায়েস্তা কর, তবেই ত দেশের উন্নতি।

তুমি ডাক্তার বন্দরকর—বেশ বলিয়াছ। তোমার অদ্ভুত বুদ্ধির ...ই ইহা বলিয়াছ। শুনিয়াছি তুমি না কি খুব বিদ্বান—তোমার বিদ্যার কূল-কিনারা নাই। চতুর্বেদ, ষড়দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ এ ...বিদ্যায় তুমি দিগ্‌গজ পণ্ডিত—এক কথায় তুমি মা সরস্বতীর ..., কিন্তু তাই বলিয়া, বল দেখি হিন্দু সমাজ কেন তোমার ...কবিবে? ···আর্য্য রমণীর যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, গৃহে তাহা অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে, হইতেছেও তাহাই। ইতি-...এই খোল বঙ্গেই সংস্কার, বেহদ্দ স্ত্রীশিক্ষার ঢেউ উঠিয়াছিল, না ...গুজুগে মাতিয়া অনেকেই সেই সকল সংস্কারের পক্ষপাতী ...য়াছিলেন—ঋষিতুল্য মনস্বী স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরও কালবশে উহাতে ...য়াছিলেন। বঙ্গদেশের সে স্রোত আর নাই—কারণ প্রত্যেক ...শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বিশ্বাস, ফলমূলাহারী ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত ...উৎকৃষ্ট নিয়ম আর হইতে পারে না।

...মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এখন সংস্কারের পুরা ধূম। সংস্কার কালে ...দেশের আশা ত্যাগ করতঃ পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরোপকূলে ...গাড়িয়াছেন। সুতরাং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের লোক ...। ইহাতে আমি বিস্মিত হয় নাই, বাঙ্গালীর ন্যায় ...চক্ষু ফুটিবে, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালারও আর দু'-চারিটি ..., তাহা কিন্তু সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ। তাহাদের ...বড় বিলম্ব নাই। বোম্বাই কিন্তু বাঙ্গালাকে পরাস্ত ... প্রথমতঃ, রুক্মাবাই সতীত্বের তেজে স্বামীত্যাগ করিয়া ...। দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিতা রমা বাইয়ের 'সারদা সদন' ...স্তম্ভ। শুনিয়াছি, পণ্ডিতা রমা বাইয়ের ইউরোপের ...তীর্থ, বিলাত, মার্কিণ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন ...নের পবিত্র জলেও না কি অবগাহন করিয়া 'আত্মা' ...ছেন। দেশে আসিয়া স্বজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের দুঃখে ...বিদীর্ণ হইল; তাই 'সারদা সদন' খুলিয়া ১২।১৩টি ...প্রেম ত্যাগ করাইয়া খৃষ্টপ্রেমে মজাইলেন। ...দূর করিবার জন্য পণ্ডিতা খুব চেষ্টিতা। এদিকে ...বন্দরকর প্রমুখ প্রধান পাণ্ডাগণ কিন্তু ও উপায়ে নিবারণ করিতে নারাজ। 'সারদা সদনের' যুবতীদিগকে ...করাইয়া নিজেদের মতে আনিতে বিশেষ চেষ্টিতা ...। উঁহারা বলেন, বিধবার বিবাহ দিব—কিন্তু বীত ভজাইয়া নহে। নিরাকার ব্রহ্মের সাহায্যে ভ্রাতা-ভগিনীর পবিত্র মিলন করাইব কেন?······

'হিতৈষী',—৮ই মাঘ, ১৩০২ সাল।

রাজা সপ্তম এডোওয়ার্ডের পত্র

[স্বর্গীয় রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে, তিনি রাজনীতি এবং শাসন-সংস্কার প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া কখনও মাথা ঘামাইতেন না। দিন-রাত আমোদ-আহ্লাদেই তাঁহার সময় কাটিত। কিন্তু এ ধারণা যে কত ভুল, তাহা নিম্নের পত্রখানি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। লর্ড মিণ্টো যখন বড়লাট এবং ভারতে রাজপ্রতিনিধি, সেই সময় এই পত্রখানি রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁহাকে লিখেন। ভারত এবং ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কত মহান্ এবং প্রীতিপূর্ণ ছিল, তাহাও এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্রমিক দল ছাড়া ইংলণ্ডের অন্য দলীয় নেতাদের মনোভাব এখনো রাজা এডোয়ার্ডের মতামত অনুসরণ করিতেছে।]

(ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখিত)

প্রিয় মিণ্টো,

গত ৪ঠা তারিখের যে পত্রে তুমি ভারতীয় এক জন নেটিভকে ভাইসরয়ের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নিযুক্ত করার পক্ষে কারণ এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে।

এ-বিষয়ে তোমার মতামত অতি স্পষ্ট এবং তীব্র। তোমার মতামতের পক্ষে প্রদর্শিত কারণগুলিও যুক্তিপুষ্ট এবং সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের সহিত এক। এ বিষয়ে আমি তোমার এবং সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের বিরুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু নেটিভকে ভাইসরয়ের এক্‌সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ করার বিষয়ে আমার মতামত তোমাদের সহিত এক নয়। আমার মতামত হয়ত পুরাতনপন্থী, কিন্তু ইহাতে আমার বিশ্বাস আছে। ভারত হইতে সদ্য-প্রত্যাগত আমার পুত্রও আমার মতামত সমর্থন করেন।

ভারতের বর্ত্তমান অশান্তিকর অবস্থায় এবং নেটিভগণ এখন যে প্রকার নানা ষড়যন্ত্রাদি কার্য্যে লিপ্ত আছে, তাহাতে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আলোচনাদিতে কোনো নেটিভের যোগদান বিপজ্জনক বলিয়া আমি মনে করি। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে যে সকল গুরুতর বিষয়ে আলোচনা হইবে, তাহাতে কোনো নেটিভের যোগদান করা আমি অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়ও বলিয়া মনে করি। ইহার আর একটি দিক আছে। তুমি এক জন হিন্দুকে তোমার কাউন্সিলে গ্রহণ করিলে, একজন মুসলমানকেও কেন লইবে না? মুসলমানরাও নিশ্চয় এ-দাবী করিবে। যে-যুক্তি এবং উদ্দেশ্যে তুমি একজন নেটিভকে তোমার কাউন্সিলে লইতে চাহিতেছ, তাহা যদি সার্থক না হয়, তখন তোমার পক্ষে ভবিষ্যতে ভাইসরয়ের কাউন্সিল নেটিভ-সদস্যমুক্ত করা আর সম্ভব হইবে না। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ভাইসরয় এবং তাঁহার শ্বেতাঙ্গ সদস্যবৃন্দ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে কোনো আপত্তি করেন না, কিন্তু মানে-সম্মানে এবং পদ-মর্য্যাদায় হীনতর কোনো নেটিভ ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইলে তাঁহারাও প্রবল আপত্তি করিবেন। নেটিভ সদস্য যতই চতুর এবং তাঁহাকে তুমি এবং তোমার কাউন্সিল যতই রাজভক্ত বলিয়া মনে কর না কেন, তোমরা এ-বিষয়ে কখনো নিশ্চিন্ত হইতে পার না ...

এই নেটিভ সদস্য যে-কোনো সময়ে ভাইসরয়ের কাউনসিলের গোপন আলোচনা এবং অন্যান্য তথ্যাদি, যাহা কখনো কাউনসিলের বাহিরে যাওয়া উচিত নহে, নিজের দেশবাসীদের জানাইয়া দিতে পারেন। এই হিসাবে নেটিভ সদস্য বিপজ্জনক হইবেন।

যাহা হউক, আমার গভর্ণমেণ্ট ভাইসরয়ের কাউনসিলে নেটিভ সদস্য নিয়োগ সম্পর্কে আমাকে অত্যন্ত চাপ দেওয়ায় এবং পীড়াপীড়ি করায়, এ-বিষয়ে আমি আমার অনিচ্ছাকৃত সম্মতি সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে জ্ঞাপন করিয়াছি। সম্মতি দান কালে আমি ইহাও স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া রাখিতেছি যে—এ বিষয়ে আমার নিজস্ব বিরুদ্ধ মত লিখিত থাকিবে। তোমাদের সহিত একমত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

আশা করি, তোমরা যে গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছ, ভবিষ্যতে তাহার জন্য তোমাদের কখনো যেন অনুতাপ করিতে না হয়। ইতি

তোমাদের বিশ্বস্ত এডোয়ার্ড, আর অ্যাণ্ড আই।

এরিক গিলের চিঠি

[প্রখ্যাত শিল্পী এরিক গিলের লেখা এই পত্রে বিদেশী এক স্থপতির আশা-আকাংখার পরিচয় পেয়ে আমাদের হৃদয় পুলকিত হয়। শিল্পের পরম তীর্থপথে ভারতবর্ষের গুহা-শিল্পগুলি যে সর্বযুগের শিল্পীর দিক নির্দেশের মশাল তা স্বীকার করে আর এক জন বিখ্যাত শিল্পীকে লেখা এই পত্রখানি ইউরোপের বিদগ্ধ আত্মার বোধের পরিচায়ক।]

(উইলিয়ম রথেনষ্টাইনকে লেখা)

প্রিয় সুহৃদ, ১৯১১

এ সংবাদে প্রগাঢ় আনন্দিত হয়েছি যে, আপনি সুস্থ আছেন এবং ও-দেশের সন্ধ্যার দুঃসহ নির্জনতা (কেন, ওখানে কি সন্ধ্যাসঙ্গিনী পাওয়া যায় না ?) সত্ত্বেও প্রফুল্লতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন। ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহই সর্বোত্তম আর্টের দেশ। এ দেশে সম্প্রতি পৃথিবীর বিচিত্রতা নামে একখানি পাক্ষিক সংকলন বেরোচ্ছে (সাত পেন্সের পত্রিকা কেমন তা আন্দাজ করতে পারেন) এবং তার চেয়ে আশ্চর্যের এই, সেই সংকলনে ভারতবর্ষের স্থাপত্যের অনেকগুলি ফটোগ্রাফই ছাপা হয়েছে। আপনি স্বচক্ষে যা দেখে বেড়াচ্ছেন, এখানে তার সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমরাও পাচ্ছি। এপষ্টাইন (তিনি এখন এখানে পাথর কুঁদে এক বিরাট মূর্তি নির্মাণে ব্যস্ত আছেন) ও আমি দু'জনেই আপনার সঙ্গে একমত যে, এলিফাণ্টা, ইলোরা ও অজন্তার পথই স্বর্গের চরমতম পথ। বাস্তবিক আশ্চর্য সুন্দর সেগুলি! এ ভিন্ন গোয়ালিয়ারের চিত্র-নিদর্শনও আমরা কিছু দেখলাম। আশা করি, এক দিন আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে দেশে গিয়ে আমরাও সেগুলি প্রত্যক্ষ করতে পারব। এপষ্টাইন প্রস্তর খোদাই কাজে চমৎকার শিল্পদক্ষতা অর্জন করেছেন। দু'-এক সপ্তাহ আগে মিসেস্ রথেনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার প্রদর্শনীর জন্য মূর্তিটি ব্যবহার করার অনুমতি চেয়ে পেয়েছি। এখন আপনার মত পেলেই আমি কৃতার্থ হব। জনের প্রদর্শনী যে ভাবে সাফল্য অর্জন করেছে, তার জন্য অতিরিক্ত এক সপ্তাহ সেটি সাধারণের জন্য খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমার প্রদর্শনীর, [illegible] ছবির প্রায়

মধ্য-রাত্রে নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে হঠাৎ পাশের ঘর থেকে [illegible] চীৎকার শুনে জন জেগে ওঠে। সেই অর্ধ জাগরিত অবস্থায় [illegible] গিয়ে জন দেখে বাড়ীর দাসী মেয়েটি আলো জ্বেলে ম্যাণ্টেল [illegible] সময় কি ভাবে আগুন লাগিয়ে ফেলেছে কাপড়ে। অগাষ্টাস মে[illegible] আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কোন প্রকারে আগুন নিবিয়ে ফেলে ব[illegible] নিজে ভীষণ ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়। এখন সারা শরীরে ব্যাণ্ডেজ [illegible] সে পড়ে আছে বিছানায়। অন্য লোকে বলে বটে, মেয়েটি[illegible] আলিঙ্গনাবস্থাতেই কি ভাবে আগুন লেগে যায় (অর্থাৎ ধ[illegible] সময় কি ভাবে বাতিটা উল্টে পড়ে আগুন লাগে) কিন্তু [illegible] লোক কত কী-ই না বলে থাকে। ইতি

এরিক গি[illegible]

ছোট বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লেখা গল্পদাদুর চিঠি

[এলিসের মজার কাহিনী পড়েনি যারা, সত্যই তারা [illegible] এলিস ছেলে-বুড়ো সবারই মিতা। এমন কি এলিস য[illegible] এলিস যখন পরের দুঃখে কাঁদে, তখন তার অনুভূতির ভা[illegible] জন্য আমাদের কোনই চেষ্টা করতে হয় না। এলিস[illegible] কর্তা সেই লিউইস ক্যারলের এই পত্রখানিতে এমন [illegible] স্নিগ্ধতা জড়িয়ে আছে, যা স্বতঃই মনে আনন্দ সঞ্চারিত ক[illegible]

নীচের এই চিঠিখানি আমেরিকার একটি সংবে[illegible] ছেলেমেয়েদের চিঠির উত্তরে লেখা।]

প্রিয় বন্ধুরা,

তোমাদের চিঠি পাওয়া সত্যিই ভারী আনন্দের, [illegible] উত্তর দেওয়ার আগে ছোট্ট দু'টো অনুরোধ জানাতে চাই [illegible] প্রথমতঃ, দেশময় ছড়িয়ে দিয়ো না যে আমি তোমাদে[illegible] লিখেছি। তাহলে যারা এলিস পড়েছে আমেরিকার [illegible] ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকেই বন্যার ধারার মত [illegible] সুরু করবে চিঠির পর চিঠি এবং প্রত্যেকেই উত্তরের [illegible] চেয়ে বসে থাকবে। জীবনের শেষ দিনগুলো শুধু চিঠি লি[illegible] দেওয়ার বাসনা নেই আমার। আমার সুখ্যাতি [illegible] না, এই হোল দ্বিতীয় অনুরোধ। ছোটদের বই [illegible] যদি আমার কিছু থেকে থাকে, তার সব কৃতিত্বটুকুই আ[illegible] নিজেকে আমি শুধু প্রতিভূ মনে করি, ব্যাস! [illegible] তোমাদের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলে—"ছোটদের [illegible] খরচ করো", তাহলে এতে কি তোমরা নিজেদের খুব [illegible] বলে মনে করবে? তাছাড়া প্রশংসা কারুর প[illegible] শুভ হোল প্রীতি ভালবাসা। দুনিয়াটা যদি শু[illegible] ভরা থাকত কত না মঙ্গলময় হোত? তোমরা [illegible] ভালবাস এটা আমি পছন্দ করি। ছোটরা অ[illegible] আমার বইয়ের জন্য ভালবাসে এ চিন্তায় আনন্দ [illegible] আমার বইগুলোর প্রশংসা কর, সে আমার পছন্দ [illegible] জাতীয় বইগুলো সম্বন্ধে আমার কি ধারণা সেই কথাই [illegible] অনেকগুলো বই আমি সস্তা কাগজে ছাপিয়ে সাধারণ [illegible] আরোগ্য-নিকেতনে উপহার দিয়েছি গরীব রুগ্ন শিশুদের [illegible] গোটা সহরশুদ্ধ লোক আমার পিছু-পিছু বলতে বলে[illegible]

... ঘণ্টার হাত থেকে বাঁচাতে পারার চিন্তা আমার কাছে বেশী ... । তোমাদেরও নিশ্চয় তাই মত।

এই হাসপাতালগুলোতে নানা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। আমি ... দেওয়ার জন্ত ছাপান চিঠি পাঠিয়েছিলাম—তার সঙ্গে হাসপাতালের একটি তালিকাও ছিল। আমার তালিকায় কোন হাসপাতালের নাম যদি বা বাদ পড়ে থাকে তা জানানোর আবেদন করেছিলাম। এক জন ম্যানেজার সেই আবেদন-পত্র পেয়ে লিখেছিলেন—তিনি একটি জায়গার কথা জানেন যেখান কয়েকটি ... শিশু থাকে, কিন্তু তাঁর ভয়, আমি হয়ত কোন বই সেখানে ... রাজী হব না। কিন্তু কেন? ভাবতে পার—"কারণ, তারা ... শিশু বলে।" আমি অবশ্য লিখে জানিয়েছি তাদেরও দেব ... খানা বই। আচ্ছা, বল তো দেখি অন্তান্ত শিশুদের মত ... ছোট ইহুদী বন্ধুরাই বা কেন, এলিস এ্যাডভেঞ্চার পড়তে পা... না? এক জন লেডী সুপিরিয়র আবার এক কপি এলিস ... লিখেছেন—বই নেবার আগে পড়ে দেখতে চান কেমন ... বই। তাঁর শিশুরা আবার রোমান ক্যাথলিক কি না। কী ধরণের ... আহরণ করবে শিশুরা সেটা আগে সাবধানে বিচার করে ... হবে তো! আমি লিখে দিয়েছি—"যদি চান, নিশ্চয়ই আগে ... পাবেন। কিন্তু এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি যে, ... ধর্মতত্ত্বের নাম-গন্ধ মাত্র নেই। বস্তুতঃ এতে শিক্ষা-... কিছু আপদ নেই-ই।" চিঠি পেয়ে লিখেছেন তিনি—খুব ... । এবার বই নিতে আর কোন বাধা নেই।

..., এই ভাবে চললে দেখছি তোমাদের চিঠির আর উত্তর ... হবে না। **Snark** কথাটার অর্থ কি জানতে চেয়েছ? ..., কোন অর্থই বোঝাতে চাইনি আমি। কথার দ্বারা ... যা বোঝাতে চাই তার চেয়ে ঢের বেশী তারা অর্থদ্যোতক। ... বোঝাতে চান তার চেয়ে ঢের বেশী অর্থপূর্ণ তাঁর বই। ... সব ভাল ভাল কথা লেখা আছে সেগুলিই বইয়ের মর্ম-... গ্রহণ করতে আমি ভালবাসি। সব চেয়ে খাঁটি কথা ... এক জন মহিলা—"বই আর কিছু নয়, সুখের পিছনে ... এক রূপক কাহিনী।"...

...দের আমি চিঠি লিখছি, অর্থাৎ তোমাদের নাম-ধাম-বয়স ... সঠিক জ্ঞান দান করে বাধিত করবে কি আমায়? এর ... মনে হচ্ছে আমরা সবাই বন্ধু। নাম-ধাম-পরিচয়ের জন্য ... জোর দিতে পারতাম কিন্তু তাহলে তোমরাও তো পাল্টা ... নাম-ধাম-পরিচয় দাবী করে বসতে পার? কিন্তু আমি তা ... কাউকে—(কারণ, ব্যক্তিগত ভাবে আমি অপরি-... থাকতে চাই। অপরিচিত লোক মুখ দেখে আমায় ... এ অসহ্য)—কাজেই তোমাদের নাম-ধাম চাইতে ভরসা না।

...মি হরেক রকম খেলা-ধূলা আবিষ্কার করতে ভালবাসি। ...h Mosch খেলার নিয়ম-কানুন পাঠালাম এই সঙ্গে। ... সুবিধে এই যে, একাই খেলা যায়—দোকলার প্রয়োজন ...। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খেলা যায়—বেলুনে, ডাইভিং বেলে ... খেলতে পার—যে কোন জায়গায় খেলা যায়। ইতি

তোমাদের প্রিয়বন্ধু লুইস ক্যারল।

স্যামুয়েল জনসনের পত্র

[অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে স্যামুয়েল জনসন এক বিখ্যাত নাম। মানুষটি প্রতিভাবান্ ছিলেন নিঃসন্দেহ, কি... রাজসম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে না পেরে গভীর ক্ষুব্ধতায় তাঁর দি... কাটত। মনের সেই অপরিসীম একাকীত্বের মধ্যে তার সঙ্গিনী ... প্রীতিদায়িনী নারী ছিলেন মিসেস থ্রেল। জনসনের সঙ্গে যখন তাঁ... পরিচয় ঘটে, তখন মেয়েটির বয়স চব্বিশ, জনসনের পঞ্চান্ন। ... বৎসর নিত্য নিয়মিত স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, প্রেরণা ও আশ্বা... দিয়ে থ্রেল জনসনের প্রতিভাকে কেবল বাঁচিয়েই রাখেননি, তাঁ... নূতন নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির খাতে প্রবাহিত করিয়েছিলেন। বারো... সন্তানের জননী হবার পর থ্রেলের স্বামী-বিয়োগ ঘটে। তখন জনস... সত্তর পেরিয়েছেন। এই সময় আচম্বিতে এক দুর্ঘটনা ঘটল। থ্রে... বিয়ে করে বসলেন এক ইতালীয় লেখককে। জনসন যখন বিবাহে... লিপি পেলেন, তখন তার মনে যে ভাবের সঞ্চার হয়েছিল, নীচের ক্ষু... চিঠিখানিতে তা পরিস্ফুট হয়েছে। সে চিঠির প্রতিটি লাইনের গভী... অর্থ বিশদ করে বোঝান হয়ত নিষ্প্রয়োজন।]

আপনার পত্রের যথার্থ অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে থাকি তবে বলব যে, আপনার এই বিবাহে শালীনতা নেই। যদি বিব... কার্য ইতিমধ্যেই সমাধা না হয়ে থাকে, তবে আমরা একবার পরস্পর... সঙ্গে বোঝাবুঝি করতে পারি। আপন পুত্র-কন্যাদের এবং ধর্ম... মতকে যদি পরিত্যাগ করে থাকেন, তবে ঈশ্বর আপনার অমার্জ... অপরাধ ক্ষমা করুন। নিজের খ্যাতি ও স্বদেশের প্রীতি ত্যাগ কর... দুর্বুদ্ধি যদি ঘটে থাকে, তবে সে অপচেষ্টার এই যেন শেষ হয়।

যদি বিবাহ না হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর একটি বার আ... আপনার সাক্ষাৎকামী; এত বর্ষ ধরে আপনাকে ভালবেসেছে, ... করেছে, যার চোখে পৃথিবীর প্রথম নারী আপনিই, আর একটি ... আপনার দর্শন কামনা করছে সে।

চিরকাল ছিলাম, আজও আপনার প্রীতিকামী আছি। ইতি

স্যামুয়েল জনসন।

হুইটম্যানকে লেখা এমার্সনের চিঠি

['লীভস অফ গ্রাস' কবিতা-গ্রন্থ সমসাময়িক ইংরেজী সাহি... যে চাঞ্চল্য এনেছিল, তা ধারণাতীত? বস্তুতঃ চুরানব্বই পাতা... কবিতা-সমষ্টি যখন ১৮৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন পাঠ... সমালোচক সেদিকে দৃষ্টিপাত করেনি। প্রচলিত কাব্য টেক... ও চিন্তাধারার ব্যতিক্রম ঘটায় রক্ষণশীল ইংরেজ-মানস তা গ্রহণ ক... সানন্দে। কিন্তু পণ্ডিত এমার্সন যখন এই কবিকে সম্বর্ধনা জা... নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে পত্র লেখেন, তখন সকলের দৃষ্টি পড়ে ... দিকে। আসলে এমার্সন যত দিন না দেখিয়েছেন তত দিন হুইট... কাব্য-খ্যাতি পাননি। কিন্তু তার পর-পরই হুইটম্যান সমাদে... পেতে সুরু করেন এবং অত প্রচুর সুখ্যাতি ও কটু নিন্দা আর ... কবি পাননি আপন যুগে। শোনা যায়, এমার্সনও শেষ পর্যন্ত এই অকুণ্ঠ প্রশংসার ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। কিন্তু পৃ... কাব্য-সাহিত্যে হুইটম্যান তাঁর একখানি কাব্য-গ্রন্থেই অমরত্ব ...।]

হুইটম্যান,

আপনার "লিভস অফ গ্রাসের" অনবদ্য দান আমার দৃষ্টি ...নি। এমন রস-মধুর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ বিশ্ব-সাহিত্যে ইতিপূর্বে ...া নিবেদন করেনি আমেরিকা। আপনার কাব্য পাঠে প্রভূত ...দ লাভ করেছি, বস্তুতঃ শক্তির পরিচয় লাভ করলে হৃদয় ...আপ্লুত হয়ই। আমাদের পাশ্চাত্য দেশে সাম্প্রতিক সাহিত্যে ...ম্ন শ্রেণীর চিন্তাশীলতা ও অকুশল আঙ্গিকের প্রখরতা লক্ষ্য ...ই তাতে হতাশ হবার কারণ ঘটেছে। আপনার বলিষ্ঠ মুক্ত ...শীলতায় আমি মুগ্ধ। সত্যই আমি আনন্দিত। আপনার ...ীতে অসামান্য সামগ্রী অসামান্য ভাবেই ফুটে উঠেছে। আপনার ...র আঙ্গিকের সাহসিকতা কেবল প্রীত করেই না, আমাদের মহত্তর ...াকে প্রণোদিত করে।

আপনার বিরাট ভবিষ্যতকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। ...নার রচনার সূর্যকরোজ্জ্বলতা বাস্তব না মায়া, এ সন্দেহ আমার ...র হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম, তার মধ্যে ভ্রান্তির অবকাশ নেই। ...লখা যেমন উদ্দীপক তেমনি সুদৃঢ়।

গত রাত্রে পত্রিকা বিজ্ঞাপনে দেখার আগে আমি কল্পনাই করতে ...রিনি যে, ঐ নামে কোন ব্যক্তি সত্যি বর্তমান আছেন এবং ...র ডাকঘর মারফৎ পাওয়া যাবে।

আপনি আমার হিতৈষী। ইচ্ছা হচ্ছে এখানকার কাজ ফেলে ...ার নিউইয়র্কে উপস্থিত হয়ে আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন ...আসি। ইতি

এমার্সন।

সুরশিল্পী সুবার্টের পত্র

আপন নির্মম দারিদ্র্য অবহেলা করে যে মানুষটি তাঁর স্বল্পায়ু ...কে গীতলক্ষ্মীর চরণে নিবেদন করে সার্থক হয়েছিলেন, সেই ...ট জন্মেছিলেন ভিয়েনা নগরীতে ১৭৯৭ সালে। একত্রিশ বছর ...তাঁর লোকান্তর ঘটে।

বাপ ছিলেন চোদ্দটি সন্তান-সন্ততির পিতা, দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার। ...বয়স থেকেই সুবার্ট সুকণ্ঠ বলে পরিচিত হন। ষোল বছর ... লেখেন তাঁর প্রথম সিম্ফনী। উনিশ বছর বয়সে তাঁর স্বরচিত ...র মধ্যে পাঁচটি সিম্ফনী, আড়াইশ' গান। কাগজ কেনার ... ছিল না যে প্রতিভাশালী গীতিকারের, তিনি দু'দিনে পনেরোটি ... গান রচনা করেছিলেন। হোটেলের রসিদের পিছনে তাঁর ... গান—'হার্ক, হার্ক দি লার্ক'। সেই দিনই লিখেছিলেন 'হু সিলভিয়া'।

এই খরস্রোতা সঙ্গীতধারার সঙ্গে সঙ্গেই সুবার্ট চালিয়েছিলেন জীবিকার জন্য চাকরীর দরখাস্ত। কেবল গীতিকার হিসেবেই ...র্গান ও ভায়োলিনেও তাঁর হাত ছিল মধুর। পিতার স্কুলের ...তম এই সুরশিল্পী কিন্তু কোন গানের চাকুরী সংগ্রহ করতে ...েনি।

এই সময় সুবার্ট জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। বদ্ধ পরিবেশ, নীরস জীবন আর নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্য এই তিনটির সঙ্গে লড়াই করতে তাঁর প্রাণশক্তি ক্ষয়িত হতে আরম্ভ করে। প্রতিভার দাম তো দূরের কথা, এমন কি রাজকীয় কোন সহানুভূতির অভাবে তিনি বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন প্রাণে-প্রাণে। তাঁর চারি পাশে ভিড় করে এই সময় এক দল গুণী, যারা নিজেদের সুবার্ট-পন্থী বলে পরিচয় দিতে গর্বিত বোধ করত।

একুশ বছর বয়সে এক অভিজাত পরিবারে সঙ্গীত-শিক্ষকের চাকুরী তাঁর জোটে, কিন্তু সেখানে তিনি যে ব্যবহার পেলেন তা অকথ্য। শরীরের মনের তাঁর কোথাও খোরাক মিলল না বটে, কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি সৃষ্টি করতে লাগলেন অবিরত। এই সময় এক বন্ধুকে সুবার্ট চিঠিতে লিখেছিলেন—"পৃথিবীর সব থেকে হতভাগ্য দুর্দশাগ্রস্ত হলাম আমি।"

এর কিছু দিন পরে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে এই গুণী শিল্পী মারা যান।]

(সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিসকে লেখা সুবার্টের পত্র)

মহামহিম সম্রাট—

পরম আনুগত্যের সহিত আমি আপনার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি, কৃপা করিয়া অভাজনকে আপনার দরবারের সহ-সঙ্গীতজ্ঞের শূন্য পদটি দিয়া বাধিত করিবেন। এতৎসহ আমার গুণপণা দাখিল করিতেছি।

১। আবেদনকারীর জন্ম ভিয়েনায়, পিতা স্কুল-মাষ্টার, বয়স উনত্রিশ বৎসর।

২। ইম্পিরিয়াল ও রয়েল কলেজ স্কুলে পাঁচ বছর গায়কের কাজ করিয়াছে।

৩। আবেদনকারী কোর্টের প্রধান সঙ্গীতজ্ঞের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া ঐ পদের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

৪। আবেদনকারীর নাম গীতকার হিসাবে কেবল ভিয়েনায় নয়, পরন্তু সমগ্র জার্মাণীতে বিদিত।

৫। আবেদনকারীর রচিত পাঁচটি ভজন ভিয়েনা নগরীর বিভিন্ন গীর্জায় গীত হইয়াছে।

৬। বর্তমানে কর্মহীন বিধায় আবেদনকারীর ঐকান্তিক কামনা যে, ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কিঞ্চিৎ জীবিকার সংস্থান পাইলে সে আপন সঙ্গীত আদর্শের সিদ্ধির জন্য যথোচিত প্রেরণা লাভ করিবে।

যদি মহামহিম কৃপা করিয়া ঐ পদে আমাকে নিযুক্ত করেন, তবে অভাজন আপনার পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য কোন চেষ্টারই কার্পণ্য করিবে না। ইতি

সুবার্ট

[এ পত্র সম্রাট স্বীকার করেননি—চাকুরী দেওয়া দূরের কথা। ১৮২৭ সালে বীটোভেনের মৃত্যু-শোভাযাত্রায় সুবার্ট এক জন মশালবাহী ছিলেন। তারই পর বৎসর ১৯শে নভেম্বর বীটোভেনের সমাধির পাশে এই তরুণ সুরশিল্পীও মৃত্তিকা আশ্রয় গ্রহণ করেন।]

"রঞ্জন"

"হ্যাঁ কলকাতা থেকে নৈনিতাল।"

না কি মস্কো থেকে পিটার্সবার্গ ?

সহযাত্রিণীর প্রশ্নের অচিন্তিত উত্তর সন্দেহ জাগল মালতীর মনে। শুধু মালতীর নয়, সহযাত্রিণীরও। কেমন যেন অস্বাভাবিক। যাত্রা করেছে বটে, চলন্ত গাড়িতে বসে আছে, কিন্তু তবু মনটি যেন সঙ্গে আনতে ভুল হয়ে গেছে। প্রথমে প্রশ্ন কানেই তোলেনি। শুনতেই পায়নি। কিন্তু সহযাত্রিণীর সময় ছিল না মালতীর আনমনা মন নিয়ে গবেষণা করবার। বরং বলা চলে প্রচুর সময় ছিল, কেন না তিনি নিজে আগে নামবেন না। তাই জেরা স্থগিত রেখে তিনি তাঁর পাঠ্য-রচনায় মনোনিবেশ করলেন।

মালতীও একা থাকবার জন্যে আসন ছেড়ে গাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মুখ বাইরে বাড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করল অদৃশ্য অন্ধকারে। অল্পই দেখা যায়, সব কিছুই অস্পষ্ট। গাছ-পালা, পথ-ঘাট, টেলিগ্রাফের পোষ্ট—সব কিছু তাদের স্বাধীন ও পৃথক সত্তা হারিয়ে মালতীর স্থিরদৃষ্টি থেকে অস্থির বেগে দ্রুত ধাবমান। এখানে ছিল গাছ, ওখানে পোষ্ট—মুহূর্তে দুই এক হোলো। পরস্পরের কোনোটাই নেই! যেন কোন অদৃশ্য অগ্রগামী আক্রমণকারীর ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান হয়েছে ভীত, পরাজিত বৃক্ষবাহিনী। একটা গাছের উপর আরেকটা গাছ লাফিয়ে পড়ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ছুটে পালাচ্ছে প্রাণভয়ে। সেখানে অস্থিরতার মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু মালতী।

আপন স্থিরতার কথা মনে হতেই একটা হাসির গল্প মনে পড়ল মালতীর। ছেলেবেলায় শুনেছিল বাবার কাছে। (এইবার তার মনে পড়ল যে সে বাবার কাছে যাচ্ছে। এতক্ষণ শুধু মনে ছিল কোথা থেকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তা ভাববার সময়ই হয়নি।) গল্পটা এক স্নেহশীলা সৈনিক-মাতার। সেই গর্বিতা রমণী তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে অগ্রসরমান সেনাবাহিনী নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁর পুত্রও পা ফেলে চলছিল সেই বাহিনীর সঙ্গে, কিন্তু পদক্ষেপে সাম্য ছিল না। বিরক্ত হয়ে তিনি তখন প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখো একবার! আমার টোনি ঠিক তালে পা ফেলে, কিন্তু আর বাকি দু'হাজার আনাড়ী চলেছে একেবারে আউট অব ষ্টেপ!" তাঁর সাধের টোনির যে সামান্যতম প্রমাদ ঘটতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা ...য়ণার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পায়নি।

আলোচ্য মুহূর্তে মালতীর মনে তার নিজের জন্যে স্নেহের ... ছিল না। তাই সে নিজে স্থির এবং চার দিকের সব-কিছু ... এমন তৃপ্তিময়ী চিন্তা থেকে প্রবোধ পেল না। স্বীকার ...র উপায় রইল না যে সে নিজেই অস্থির, সে নিজেই ...মানা। প্রকৃতি দৃঢ়মূল। ছিন্নমূল সে নিজে।

...বিশ ঘণ্টা আগেকার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার দৃশ্য মালতীর চোখের সামনে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মসীকৃষ্ণ পরিপ্রেক্ষিতে অসহ্য বিভীষিকায় রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মালতী ভয়ে চোখ মুদল। স্মৃতি প্রতিচ্ছবি হোলো স্পষ্টতর!

বাড়ি ফিরেছিল স্বপ্নাবেশে। কিছুই নয়। হৃদয়ের সুর দি... নামটুকু ডাকা, অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা। কি... তাইতেই,—প্রাণের গভীর ক্ষুধা, পেয়েছিল শেষ সুধা। শে... বটে! বাড়িতে পা দিতে-না-দিতেই দেখা হোলো সুবর্ণর সঙ্গে... স্বপ্ন চূর্ণ হোলো প্রথম প্রশ্নাঘাতে, "এত দেরী যে তোর?"

চমক ভাঙলে মালতী বলল, "আরে দাদা যে! এত রাত্তিরে?"

"ও, রাত যে গভীর হয়েছে তা খেয়াল আছে। তবু ভালো!"

মালতী ক্ষীণ হাসির ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, "একটু বসো তুমি... আমি এখনি ভিজে কাপড়টা বদলে আসছি!"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মালতী শিউরে উঠল। সমস্ত শরী... বেয়ে জল ঝরছে। চুল একেবারে চুপচুপে, শুকোতে তি... নিরবচ্ছিন্ন গ্রীষ্মও যথেষ্ট হবে কি না সন্দেহ। কোথায় গিয়েছিল সে... সত্যি কি সে এমন সব-কিছু বিস্মৃত হয়ে পার্কের কাদায় বসেছি... ঘণ্টার পর ঘণ্টা? একবারও মনে হয়নি অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তনে... কথা? একবারও না! মনে হলে এক মুহূর্ত সে সেখানে হ... থাকতে পারত না। কী আবেশে সে এমন অসম্ভব কাণ্ড করে এলে... আয়নায় আপন কুঞ্চিতভ্রূ আনন দেখে সচকিত হোলো। পর-মুহূ... তিরস্কারের কথা বিস্মৃত হয়ে এলায়িত কেশ ডান হাত দিয়ে এ... সরিয়ে আয়নার একেবারে কাছে এসে ছায়া-সখীর কানে কানে ব... "আবেশ নয়, দেবেশ।"

পাশের ঘর থেকে কঠোর আহ্বান এলো, "মালতি!"

"এই যে!" ছুটে এলো মালতী। একটু শীত লাগছি... আঁচলটা দিয়ে সব অঙ্গ আবৃত করে তার উপর চুল ছড়িয়ে দি... মালতী এসে বসল ইতস্তত সঞ্চরমান দাদার সামনে একটা উঁ... গদিওয়ালা মোড়ার উপর। তাঁর গতি থেকে মতির একটা হ... পাওয়া শক্ত ছিল না। অজানা ভয়ে মালতীর বুক কেঁপে উঠ... চুপ করে রইল।

সুবর্ণ এমনিতেই কথা-শিল্পী নয়। এখন ক্রোধে তার সাধ... অসংস্কৃত ভাষাও অন্তর্হিত হোলো। আর কিছু ভেবে না পে... একেবারে নগ্ন একটা ফ্যাক্ট বিবৃত করল, "আজ কাকাবাবুর চি... পেয়েছি।"

"আমিও দিন তিনেক আগে পেয়েছি।" মালতী আর কি... বলতে সাহস পেল না। সুবর্ণ মৌন ধারণ করে রইল।

মালতী তার বাবার মেয়ে। মা'র চেয়ে বাবার সঙ্গেই মিল বেশি। শুধু চেহারায় নয়, স্বভাবেও। সেও বাবার সব চেয়ে প্রিয়। সুবর্ণর নৈঃশব্দ্যে তাই মালতীর মন মারাত্মক আশংকায় ভরে উঠল। তবে কি বাবার কিছু হয়েছে? অসুখ করেছে?

আশংকাগুলি মুখে প্রকাশ করতে বাধল। ভয় পেল। আর ধৈর্য ধারণ না করতে পেরে জিজ্ঞাসা করল, "বলো দাদা, বাবা কি লিখেছে? অমন চুপ করে থেকে এদিক-ওদিক হাঁটছ কেন?"

সুবর্ণর ভ্রমণ তবু ক্ষান্ত হোলো না। মুখ দিয়েও একাধিক বর্ণবিশিষ্ট দু'-চারটে শব্দ ব্যতীত আর কোনো কথা বেরুল না। মালতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বলো, বাবার কি কিছু হয়েছে?"

এবারে সুবর্ণ সুরু করল, "না, কিছু হয়নি। কিন্তু ভাবছি সব কথা জানতে পেলে কী হবে।"

যাক। অন্তত একটা দিকে আশ্বস্ত হওয়া গেল। মালতীর বুঝতে বাকি রইল না সুবর্ণর ইঙ্গিত। তবু ধরা দিল না। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "কোন কথা?"

সুবর্ণ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "কোন কথা? নিজে জানো না?"

"না।" মালতী দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল।

"এত রাত্তিরে তুই কোত্থেকে এলি?"

"সিনেমা।" মালতীর মিথ্যা বলতে এতটুকু বাধল না। মনে মনে বলল, মিথ্যাবাদীর কাছে মিথ্যা ভাষণে অপরাধ নেই।

অপরাধ হয়তো নেই। কিন্তু বিপদ আছে। সুবর্ণ তার অসমান, মলিন দন্তপাটি বিকশিত করে তার জীবনের বৃহত্তম রসিকতা পরিবেশন করল, "তাই বুঝি? তাইতো! সিনেমা তো অন্ধকারেই হয়। সাধারণত ঘরে হয়। আজকাল অবিশ্যি পার্কেও হয়তো হয়। হবেও বা। কী জানি! তবে সে সিনেমার দর্শক তো ছিলুম আমি, আর তুমি তো ছিলে নায়িকা!"

সুবর্ণর কুৎসিত হাস্যে মালতীর ঘরটি লজ্জিত হোলো। মালতী বিরক্ত হোলো। ভয় তখন তার গেছে। সতেজে বলে উঠল, "দাদা, উপরে ওঁরা ঘুমিয়ে আছেন।" অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ী।

সুবর্ণ একবার নৈনিতালের বাঙালী ক্লাবের বার্ষিক সম্মিলনীতে "রত্নশক্তি" নাটকে মৃগাঙ্কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সর্বসম্মতিক্রমে ওইটেই হয়েছিল তার অভিনেতা-জীবনের পঞ্চমাংক। মঞ্চ থেকে যাঁরা তাকে বিতাড়িত করেছিলেন, তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে, ওই বিতাড়নে তাঁরা ওর অভিনয়-অদক্ষতাকে বিশ্বময় দিয়েছে তারে তারে।

কঠোর নাটকীয় ভঙ্গীতে সুবর্ণ বলল, "কই, উপরে যাঁরা আছেন তাঁদের কথা তো আগে মনে মনে হয়নি। এমন কি কারো বা নৈনিতালে যাঁরা আছেন তাঁদের কথাও তো একবার স্মরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না? হা—হা—হা—"

দৃপ্ত কণ্ঠে সুবর্ণর উপভোগে বাধা দিয়ে মালতী বলল, "দাদা, আমি কাল সন্ধ্যায় নৈনিতাল যাচ্ছি। আর তোমার সঙ্গে কোনো আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নে। এবার তোমার যাওয়া উচিত। আমার ঘুম পেয়েছে।"

"কাকা বাবুর যে ঘুম হচ্ছে না এই খবরটাই তোমাকে জানাতে এসেছিলুম। এবং—"

"এবং এ বাসায় নেই। কাল আমি যাচ্ছি।"

সুবর্ণ মালতীর বাধা উপেক্ষা করে বলল, "এবং পরে যখন সব কথা জানতে পারবেন, তখন যে তাঁর আরো ঘুম হবে না সেই কথাই ভাবছি।"

সুবর্ণর ঔদ্ধত্যে মালতী বিস্মিত হয়ে গেল। আহত হোলো ওর এই দুঃসাহসের উৎসের কথা মনে করে। ক্রোধে, অপমানে মালতী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সুবর্ণ আজ সুযোগ পেয়েছে, তা তার দুর্বল, ঘৃণ্যচিত্ত হেলায় হারাবে না, মালতীর এ কথাটা বুঝতে দেরী হোলো না।

অথচ এই সুবর্ণ হচ্ছে সেন-পরিবারের কলঙ্ক। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে বড়ো হয়েছে পিতৃব্যের, অর্থাৎ মালতীর বাবার অনুগ্রহে। এই কথাটাই সুবর্ণ এক দিন জানাতে গিয়েছিল সমারোহ করে, বলেছিল, "কাকা, আমি তো তোমারই দয়ায় মানুষ হয়েছি।" সেন সাহেব তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিয়েছিলেন, "দ্যাট্‌স এ ম্যাটার অব ওপীনিয়ন। তার চেয়ে বলো, বড়ো হয়েছ। ও তো প্রকৃতির কীর্তি, মানুষকে কেন মিছে দোষ দেয়া?" বলা বাহুল্য, রসিকতাটার সঠিক মর্ম সুবর্ণর মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। কিন্তু যাক সে কথা।

নৈনিতালে কর্মহীন সুবর্ণর নানা কীর্তি ক্রমেই তার কাকার পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর হতে থাকল। শেষে নিরুপায় হয়ে তিনি ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, যদি এখানে ছোটো-খাটো কোনো একটা কাজ জোগাড় করতে পারে। গোলদীঘির কাছে বাসস্থান হোলো, কিন্তু লালদীঘির পারে অনেক পরিভ্রমণ করেও এ অকর্মণ্যের কর্মসংস্থান হোলো না। কিন্তু নৈনিতাল থেকে মণিঅর্ডার এসেছে পরিমিত হলেও নিয়মিত। মাসিক ঘাটতি পূরণ করেছে মালতী। তাই দিয়ে চলেছে সুবর্ণর ধূমপান আর তার বদলে সে হয়েছিল মালতীর বাজার-সরকার। এটা-ওটা কিনে দিয়েছে, যখন যা মালতীর প্রয়োজন।

সেই সুবর্ণর আজ এত সাহস। আর তারই ভয়ে মালতীকে একটু আগে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে। যদিও কিছুটা অনির্দিষ্ট ও সাধারণ ভাবে।

কিন্তু বিশেষের সবিশেষ পরিচয় দেবার লোভ সুবর্ণ সম্বরণ করতে পারল না। দুর্বলের হাতে বল এলে, অক্ষমের হাতে ক্ষমতা এলে, নীচের হাতে শক্তি এলে, তার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। বহু দিন তার মালতীর কাছে অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হয়েছে। আজ সুযোগ পেয়েছে ঋণ শোধ করবার, অর্থাৎ প্রতিশোধ নেবার। সুবর্ণ ইতিপূর্বে তার ব্যর্থ নাট্য-প্রতিভার বীর রসের অংশটার পরিচয় দিয়েছে। এবারে করুণ রসের পালা। গভীর অবমাননার অভিনয় করে নতমস্তক নাড়তে নাড়তে বলল, "ছি, ছি, তুই এমন করবি এ কথা ভাবতেও পারিনি! প্রথমে তো আমি বিশ্বাসই করিনি। আমাকে যখন ওরা এসে বলল যে তুই কার সঙ্গে ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে গাছের তলায় বসে আছিস, আমি বললুম, খবরদার, আমার বোনকে নিয়ে এ সব কথা আমি সহ্য করবার পাত্র নই।" এইখানে এসে সুবর্ণ তার নিজের নীচ রুচি অনুযায়ী একটা সস্তা রসিকতার লোভ দমন করতে না পেরে হঠাৎ গম্ভীর স্বর পরিহার করে স্নেহের ভঙ্গিতে বলল, "পাত্রটি কে জানতে পাই কি?"

"দাদা, তোমাকে যেতে বলছি।"

"কে ওই লোকটা ?"

"দেবেশের এমন অবজ্ঞাপূর্ণ বর্ণনায় মালতীর নিজের গায়ে যেন লাগতে লাগল। ছি, ছি, এমন স্বর্গীয় অনুভূতিকে একেবারে নরকের কুৎসিত কাদায় না টেনে এনে এদের শান্তি নেই। ক্ষোভে, দুঃখে মালতীর গা পর্যন্ত রী-রী করতে লাগল। বলল, "তোমার যা বলবার বলে যেতে পারো। তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না। কিছু বলব না।"

"বলবার মুখ থাকলে তবে তো বলবি! আমারই কি আর মুখ দেখাবার উপায় রেখেছিস্ ?"

"সে জন্যে ভাবনা কেন দাদা ? এমন কারো কথা তো জানি নে যে তোমার মুখ না দেখতে পেলে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবে।"

স্বর্ণ আঘাত হেনেছিল। প্রতিঘাতে মুহূর্তের জন্যে মুষড়ে পড়ল। পরক্ষণেই বলল, "ছি, ছি, শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্যে না হয় শ্রদ্ধা নেই, মা-বাবার জন্যেও না হয় চিন্তা নেই, রুনুর প্রতিও যেন কোনো দায়িত্ব বা বিশ্বস্ততা নেই। কিন্তু নীতি বলে কি কিছু নেই সমাজ বলে নেই কিছু সমাজ বলে ?"

হায় রে, মালতীর অতি দুঃখেও হাসি পেল, শেষে স্বর্ণ হোলো নীতির প্রহরী ? যে স্বর্ণ অনৃত ভাষণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ? সমাজপতি হোলো স্বর্ণ ? যে স্বর্ণ জগতের ক্ষুদ্রতম কর্মের জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে অক্ষম বলে পরিগণিত ও প্রত্যাখ্যাত ? শিক্ষা যার ন্যূনতম, রুচি যার নিম্নতম ? আর ওরই অনুশাসন মেনে চলতে হবে মালতীদের ?

মালতী জানতো স্বর্ণ তার কি কি ভয়ানক ক্ষতি করতে পারে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে জানিয়ে প্রলয় বাধাতে পারে। মা-বাবাকে জানিয়ে তাঁদের অসহনীয় অপমানের ও বেদনার ব্যবস্থা করতে পারে। রুনুকে জানিয়ে নির্বোধকে উত্তেজিত করতে পারে। সর্বোপরি, দেবেশকে অপমান করতে পারে। এই বিভীষিকাময়ী সম্ভাবনাগুলি, বিশেষ করে দেবেশের অসম্মানের কথা চিন্তা করে মালতী তার ক্রোধের উপযুক্ত প্রকাশ করতে সাহস পেল না। সমস্ত ঘৃণ্য আলোচনাটা শেষ করবার একটা উপায় চিন্তা করতে থাকল। এদিকে স্বর্ণর গর্জন তখন ক্রমবর্ধমান।

গোলমাল শুনে দোতলায় স্বল্পনিদ্রারোগী শ্বশুর জেগে উঠলেন। তিনি নেমে আসবার আগে মালতী তার সব সাহস, সব অহঙ্কার জলাঞ্জলি দিয়ে স্বর্ণর হাত ধরে বলল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, যা বলবে, তাই করব। যা চাইবে, তাই দেব। ওঁকে কিছু বোলো না যেন।"

শ্বশুরের আগমনে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সুবোধ বালকের মতো নম্রশিরে দাঁড়াল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এত রাতে ?"

মিথ্যা উদ্ভাবনে স্বর্ণর পারদর্শিতা পরাজিত হবার নয়। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বলল, "আজ বিকেলে কাকা বাবুর চিঠি পেয়েছি কি না। তাই ওকে বলতে এসেছিলুম যে, কাকীমার শরীর তেমন ভালো নেই, তাই মালতীকে এখন নৈনিতালে যেতে বারণ করেছেন।"

"তা রাত হয়েছে। এখন বরং বাড়ি যাও।" বৃদ্ধ আর কোনো প্রশ্ন না করে উপরে ফিরে গেলেন। মালতী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শ্বশুরের চটির শব্দ মিলিয়ে যেতেই স্বর্ণ তার সত্যকার রূপ প্রকাশ করে, ময়লা দাঁতগুলি বের করে, হেসে বলল, "কি রকম বাঁচিয়ে দিলুম! অ্যাঁ ?"

মালতী বলল, "ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদের কথা নয়। হাজার হোক, বোন তো। তোর কলঙ্ক কি আমারই গৌরবের হোতো ? যাই করে থাকিস্, তার জন্যে কি লোক হাসাবো ? একটু কাছে এসে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, "তা দেখ মালতী, আমার আজ পঞ্চাশটা টাকার বিশেষ প্রয়োজন। আজই চাই। তাই তো এতক্ষণ তোর জন্যে এ-পাড়ায় রয়েছি। পারবি দিতে ?"

মালতী অনায়াসে টাকাটা দিতে পারতো। কিন্তু একটু ইতস্তত করল। সেটা ভুল বুঝে স্বর্ণ বলল, "সত্যি, পার্কে-টার্কে ও-রকম আর যাসনি। যাক গে যাক, যা হয়েছে। আমি কাকা বাবুকে আর কিছু লিখব না, দে টাকাটা।"

মালতী দিল। স্বর্ণও নিমেষে অন্তর্হিত হোলো।

মালতী হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছিল না। তার ওই অপরূপ সন্ধ্যাটির মূল্য কি মাত্র পঞ্চাশ টাকা ? না কি সমাজের অন্ধতার অভিনয়ের মূল্য পঞ্চাশ টাকা ? হাসতে হাসতে মনে মনে বলল, স্বর্ণ, সমাজ তোমার মূল্য পঞ্চাশ টাকা বলেও মনে করে না। সমাজের মূল্য আমি আজ পঞ্চাশ টাকা বলে স্থির করলেম। অর্থনীতিতে একেই তো বলে ইনফ্লেশন।

আর সমাজনীতি ? এই তো পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি, আর কোনো দোষ নেই। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি অবিচার করিনি, মা-বাবার অপমান করিনি, রুনুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, সমাজের ধ্বংস সাধন করিনি। কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। সমাজ অটুট, নীতি অক্ষত—কেন না কেউ জানল না। নগদ মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

কথাটা মনে করে আবার মালতী ট্রেনের মধ্যে একটু বুঝি শব্দ করেই হেসে উঠল। হাসতেই সচেতন হয়ে পিছন ফিরে সহযাত্রিণীর দিকে তাকিয়ে দেখল বেচারী নিজেই অত্যন্ত উন্মনা হয়ে গাড়ির বাইরে অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে উল্টো দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

মালতীর নিজের চিন্তা ফিরে এলো। কলকাতা থেকে নৈনিতাল, না কি মস্কো থেকে পিটার্সবার্গ ?

তার সমস্যাটা এমন বিদেশী, বিজাতীয় রূপ নিয়েছিল বিশেষ একটি কারণে। গত কয়েক দিন থেকেই মালতী সব ভুলে ছিল, মনে ছিল শুধু দেবেশের কথা। প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে চোখে ভেসেছে দেবেশের ছবি, কানে বেজেছে দেবেশের স্বর। বে-আইনী ওই অপ্রতিরোধ্য, অনির্বচনীয় অনুভূতিটা সকল বাধা, সকল বুদ্ধির বেড়া ডিঙিয়ে নির্ভয়ে বিচরণ করেছে মালতীর আচ্ছন্ন মনের বিস্তীর্ণ আঙিনায়। সেই সঙ্গে অলক্ষ্যে প্রসারিত হয়েছে মালতীর সংকীর্ণ জগৎ, বিস্তার লাভ করেছে তার গৃহবধূর ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব। রিহ্বল দেবেশের সান্নিধ্যে নিজেকে আর সেবাদাসী বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছে সম্রাজ্ঞী। সেই সঙ্গে আত্মীয়তা হয়েছে বহু ঐতিহাসিক বিজয়িনীর সঙ্গে, বহু ঔপন্যাসিক নায়িকার সঙ্গে। কালের সীমানা ঘুচেছে, দেশের সীমান্ত হয়েছে নিশ্চিহ্ন। জর্মান অ্যানা আজ হয়েছে মালতীর বোন, ফরাসী মাদাম বোভারি হয়েছে মালতীর

... অ্যানা কারেনিনা হয়েছে মালতীর সহগামিনী। শেষোক্তার চিন্তারই মালতীর মনে সন্দেহ জেগেছিল তার গন্তব্য স্থল নিয়ে। ... সকলের কল্পিত সান্নিধ্যে মালতীর অন্তত তখনকার মতো নিজেকে একেবারে একা মনে হোলো না।

সহযাত্রিণী ইতিমধ্যে দরজা থেকে সরে এসে শয়নের উদ্যোগ করছিলেন। এবারে আলো নেবাবার অনুমতি চাইলেন মালতীর কাছে। সম্মতি পেলে শুয়ে পড়লেন নিঃশব্দে। মালতীও তার বার্থে শুয়ে পড়ল।

ছোটো একটি কুপে। দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। কারো চোখেই ঘুম ছিল না। গাড়ি এদিকে এক জনকে নিয়ে যাচ্ছিল তার আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের কাছে, আরো কাছে। আর মালতীকে নিয়ে যাচ্ছিল দেবেশ থেকে দূরে, আরো দূরে।

সহযাত্রিণী নিদ্রার চেষ্টা স্থগিত রেখে সসংকোচে জিজ্ঞাসা করল, "ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

মালতী বলল, "না তো!"

"আচ্ছা, আপনি কখনো দেরাদুনে গেছেন?"

"অনেক বার। আমরা ওখানে দু'বছর ছিলেম। বাবা ওখানে পোস্টেড ছিলেন।"

"ও!" আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না সহযাত্রিণী।

এবারে মালতীই প্রশ্ন করল, "আপনি বুঝি দুনে যাচ্ছেন?"

একটু ইতস্তত করে সহযাত্রিণী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। আগে কখনো যাইনি। তাই একটু যেন ভয় করছে। সমীর অবিশ্যি স্টেশনে আসবে।"

কথাটা বলেই মনে হোলো, "ও তো! সমীর যে কে তাই তো বলিনি আপনাকে।"

"আপনার নিজের নামও বলেননি কিন্তু। আমার নাম মালতী।"

"তাই তো! আমার নাম শীলা। আর সমীর হচ্ছে—" শীলা এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল। অপরিচিতা সহযাত্রিণীর কাছে সব কথা বলা কি ঠিক হবে? উনিই বা শুনতে চাইবেন কেন? কিন্তু শীলা এতক্ষণ চুপ করে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল, সব কিছু সকলের কাছে গোপন রেখে এখন প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরিচিতদের বলবার উপায় নেই, অপরিচিতদেরও বলতে মানা, তবে শীলা বলবে কাকে? শীলা দুঃসাহসিকা, কিন্তু সে দুঃসাহস নাবালিকার হঠকারিতা। তাই তার এখন সাহস সঞ্চয় করবারও প্রয়োজন ছিল। লজ্জা কাটিয়ে বলল, "আচ্ছা, সত্যি বলুন, আপনার ঘুম পায়নি?"

"একটুও না। বাড়িতেই আমি দেরিতে ঘুমোই। তা ছাড়া গাড়িতে আমার ঘুম হয় না।"

"তা হোলে আপনাকে বলি সমীর কে।"

"বলুন না, এত ভূমিকা কেন?"

"বলুন নয়, বলো। আমি কাউকে আপনি বলতে পারি না বেশিক্ষণ। তোমাকে বলব মালতীদি।" এই বলে শীলা নিজের বেঞ্চি ছেড়ে মালতীর মাথার কাছে এসে বসল। ছোটো বোনের মতো যত্ন করে মালতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, ... সহানুভূতির প্রত্যাশায়। মালতীর ... এমন অন্তরঙ্গতায় একটু বিব্রতই হোতো। কিন্তু তারও এমন এক সস্নেহ স্পর্শের প্রয়োজন ছিল। স্বর্ণের বিশ্রী রূঢ়তা মন থেকে মুছে গেছে, কিন্তু তার ক্ষতিসাধ্যতার সম্ভাবনাটা একেবারে সরে যায়নি। মালতী শীলার হাতের চুড়িগুলি নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, "বলো না কি বলবে। আমাকে লজ্জা কিসের?"

শীলাকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না। সেই সুযোগে শুরু করল, "আচ্ছা, আমি এত দূরে একা একা যাচ্ছি, এ কথা শুনে আপনি একটুও অবাক হননি?"

"আমিও তো একা যাচ্ছি।" একটু থেমে যোগ করল, "তবে আমি অবিশ্যি তোমার মত শিশু নই।"

শীলা সত্যি শিশু। তাই শিশুরই মতো উত্তর দিল, "বাঃ, আমি বুঝি শিশু? কবে আমার সতেরো বছর হয়ে গেছে!"

"আমি সতেরো ছিলেম দশ বছর আগে।"

"মাত্র তো দশ বছরের বড়ো। ও একটা বড়োই নয়!"

"আর তুমি বুঝি সতেরোয় বুড়ী?"

"না, বুড়ী নয়। তবে শিশু বললে আমার ভালো লাগে না। সমীরও আমাকে কেবলি শিশু মনে করে। আমি যেন কিছুই বুঝি নে।"

"ওটা বাজে কথা। যার বুদ্ধি আছে সে সতেরোয় বোঝে। আর যার বোঝবার ক্ষমতা নেই সে সত্তরেও বোঝে না। বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা হয়, সেটাকে বুদ্ধি ভেবে বোকারা সান্ত্বনা লাভ করে। তাছাড়া," মালতী দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করে বলল, "আমার তো সতেরোয় একটা গোটা সংসারের ভার বুঝে নিতে হয়েছিল, শুধু নিজের নয়।"

মালতীর স্বরের সামান্য কারুণ্যটুকু শীলার ভালো লাগল। মালতীকে সত্যি দিদি বলে মনে হোলো। বলল, "আমিও তো তাই বলি। আচ্ছা মালতীদি, পশু-পাখি সকলের অধিকার আছে নিজের রুচি অনুযায়ী সাথী নির্বাচন করবার। নেই শুধু মানুষের, বিশেষ করে আমাদের। তোমার কি মনে হয়?"

"আমার কিছু মনে হয় না ভাই। তোমার কী মনে হয় তাই বলো। তবে, মানুষের রীতির বিচার কি পক্ষ-পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করতে হয়? তা হোলে যে মানুষেরই অপমান করা হয়। তবে পশুদের চাইতে মানুষের যদি বেশি বিচারশক্তি আছে বলে মনে করি, তবে তার নির্বাচন তো আরো ভালো হওয়াই উচিত। তাই নয়?"

পশু-পাখির যুক্তিটা শীলা শুনেছিল সমীরের কাছে। ... এমন সহজ খণ্ডন শীলার ভালো লাগল না। কিন্তু সিদ্ধান্তের ঐক্য ... হোলো। বলল, "আমিও তো তাই বলছিলুম সেদিন। মা ... মা কিছুতেই মানবে না। তাই তো আমার চলে আসতে হোলো এমন করে।"

মালতী এবার অ্যানা এমার ভূমিকা পরিহার করে শীলার আসনে নিজেকে কল্পনা করল। আহা, তার যদি থাকত শীলার মুক্তি!

শীলা বলল, "জানো মালতীদি, একেবারে ঠিক ... তবে আমাদেরও কিছু দিনের জন্যে নৈনিতাল যাবার কথা আছে। তখন

...র সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। দেখবে, ওর মতো ছেলে ...এর আগে আর দেখোনি।"

বাকিটুকু মালতী যোগ করল সস্নেহ হাস্যে, "তার পরেও দেখব না তাই না?" সত্যি, একটি মানুষের মধ্যে আরেকটি মানুষ কেমন ...কিছু আবিষ্কার করে। তার বড়ো আর কেউ নেই, তার বাইরে ...কিছু নেই। মনে মনে বলল, দেবেশ অবিশ্যি সত্যি একান্ত ...তে অসামান্য। শুধু মাত্র মালতীর চোখে নয়। আনন্দে চোখ ...মালতী।

শীলা ভাবছিল সমীরের কথা, ঠিক তেমনি গভীরতার সঙ্গে। ..., "জানো মালতীদি, সমীর সব ঠিক করে রেখেছে।"

সব বুঝেও মালতী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, "কি ঠিক করে রেখেছে?"

"...রে, হাসির কথা হোলো বুঝি? তুমি জানো না, মা এখন ...কি রকম কাঁদছে, বাবা কি রকম রাগ করেছে।" মা'র ... কথা মনে করে শীলারও চোখ সজল হয়ে উঠল। পূর্বেকার আনন্দোচ্ছ্বাস তখন আর নেই। অসহায়ের মতো বলল, "আচ্ছা, মালতীদি, তুমি হলে কী করতে?"

মালতী শীলার প্রশ্ন এড়াবার জন্যে পরিহাস করে বলল, "আমি ...কে দেখিইনি এখনো।"

শীলা তাড়াতাড়ি শুধরে বলল, "না, না, সে কথা বলিনি। আমি ...ছি ... কি, আমি যেমন সমীরকে ভালোবাসি তেমনি তুমি যদি ...কে ভালোবাসতে তাহোলে তুমিও কি আমারই মতো চলে ...না? না এসে কি পারতে?"

মালতী আবার উত্তর এড়ালো। বলল, "না এসে যদি নাই ... তাহোলে না এসে উপায় থাকতো কোথায়?"

"না মালতীদি, তুমি ভালো করে বলছ না। কথা এড়িয়ে ...।"

"...সত্যি এড়িয়ে যাচ্ছি শীলা। কিন্তু কাজ এড়াব না।"

কথাটা বলেই মালতীর খেয়াল হোলো, বড়ো বেশি বলা হয়ে গেল বোধ হয়। তার কারণ ছিল। গাড়িতে ওঠা অবধি মালতি ...মনে গত দেড় মাসের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করছিল। স্মৃতি অবগাহনে যে প্রগাঢ় আনন্দ ছিল, তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ দুশ্চিন্তা। কী একটা মুহূর্তে দেখা হয়ে গেল দেবেশের সঙ্গে তার সেই মুহূর্তে অবলুপ্ত হয়ে গেল তার সকল শুভবুদ্ধি, সবল সমাজ-চেতনা, সমস্ত বিচক্ষণতা! নিজেকে নিবেদন করে দিল এমন একটা অনুভূতির পায়ে যা শুধু অবোধ্য নয় অদম্য। গত দশ বছর তার জীবনে আনন্দের লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু এখনকার মতো এমন অসহ্য অস্থিরতাও ছিল না কখনো। বর্তমানের যে শিহরণ, সে কি সুখের না ভয়ের? গত কালের যে স্থিরতা, সে কি মৃতের না স্থিতের? কিন্তু থাক গত কালের কথা। আগামী কাল সে কী করবে? কোনটাকে বেছে নেবে? সর্বক্ষণ এই প্রশ্নগুলি মালতীর মনে আকীর্ণ হয়ে ছিল। শীলার সব কথা তাই সে বোধ হয় শুনতেও পায়নি। তাই হঠাৎ অমিমান কর্তব্যপরায়ণতা প্রকাশের মধ্যে নিজেরই সন্ধান করেছে, মালতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে: কাজ এড়াব না।

শীলা ঠিক বুঝতে পারেনি। মালতী তাই তাড়াতাড়ি অন্য ব্যাখ্যা করে বলল, "শীলা, তোমার কথা সব বুঝেছি বোন। আজ এখন শুয়ে পড়ো। কাল সকালে বলব আমার যা বলবার। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে, হোক ট্রেণের পরিচয়, যাকে মালতীদি ডেকেছ তার যতটুকু সাহায্য করবার তা সে সানন্দে করবে তোমার জন্যে। যাও, ঘুমিয়ে পড়ো।"

শীলার ভরসা পেল। উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর সে একা নয়, আর তার ভয় নেই।

মালতী পাশ ফিরে শুয়ে চিন্তার ঝুলি খুলল, সাপুড়ে যেমন খোলে পোষ-না-মানা সাপের ঝাঁপি।

[ক্রমশঃ।

"রবিচ্ছায়া"

[৩২৭ পৃষ্ঠার পর]

... রবীন্দ্রনাথ তাঁর (হয়ত প্রথম) ছোট গল্পের খসড়া ...কথা' (১৮৮৪)। তার মধ্যে একটি বেনামী লেখা ...চার গান' বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ রাধাকান্ত ...ও বিদ্যাসাগর থেকে সুরু করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ...মোহন ঠাকুর পর্য্যন্ত কেউ বাদ যাননি লেখকের ...থেকে। তেমনি আর একটি সার্থক বেনামী রচনা: ...লি"। কেশব সেন থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...নেতাদের আমরা মাথা ঘুরিয়েছি, হাততালি দিয়ে— ...করে লেখক ২৩ বছরের তরুণ নেতা রবীন্দ্র ...নিখুঁৎ ছবিখানি এঁকেছেন: "সেই অমল কোমল কমলশোভা-সমন্বিত মুখশ্রী, সেই উজ্জ্বল ভাসা-ভাসা ভ্রমর-ভয়-স্পন্দিত পদ্মপলাশলোচন, সেই চামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছ গুচ্ছ স্বভাববেণী-বিনায়িত চিকুর-ঝলঝল মুখমণ্ডল, সেই মৃদুহাস্যে আনন্দে মাখান হাসিখুসি ভরা অধরপ্রান্ত, সেই সংচিন্তার প্রসর কেন্দ্র সুন্দর শুভ্র পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল—ভরসার সম্বল…"

এ ভাষা ও পদবিন্যাস কার? হয়ত সঠিক ভাবে আমরা জানিব না; কিন্তু এটি যে গভীর ভবিষ্যবাণী, সে বিষয়ে আজ কারো সন্দেহ নেই।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অ, আ, ই

সন্ধ্যের অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে অনেকেই এসে উপস্থিত হলেন। কেউ গা-ঢাকা দিয়ে, কেউ বুক ফুলিয়ে, আবার কেউ বা একেবারে বেহেড় অবস্থায় টলতে টলতে। যাঁরা আহূত তাঁরা সসম্মানে আসন গ্রহণ ক'রেছেন আসরের যত্র-তত্র। আসছেন, ম্যানেজার বাবুর নমস্কারের ফেরতাই দিয়ে ব'সে পড়ছেন যে যেখানে ফাঁক পাচ্ছেন। এদের কেউ মোচে পাক দিচ্ছেন, কেউ আপনার পরনের বেনিয়ানখানার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছেন, কেউ ব'সে ব'সে পান চিবোচ্ছেন আর হাসছেন ম্যাড়ার মত। আবার কেউ বা তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হ'ল না মনে ক'রে ম্যানেজার বাবুর প্রতি কটাক্ষ হানছেন। কেউ হাতের আঙটি দেখাচ্ছেন। কেউ নিজের লাঠি। হাতীর দাঁতের, মোষের শিঙের, রূপোর। কেউ আবার সবান্ধবে না এসে আর পারেননি। তেনাদের সঙ্গে দু'-চার ইয়ার বন্ধু আর দিলের দোস্তরাও এয়েছেন।

হুজুগে বাঙ্গাল। ঢাকে কাঠি পড়তে না পড়তেই। যেমন শুনেছে তেমনি। একেই কলকাতার শহর। যেমন কেজোদের ভিড় তেমনি ঠিক অকেজোরাও কমতি নয় এখানে। শুনেছে, গাওনা হবে, আসর হয়েছে। বাতাসে খবর ছড়িয়ে গেছে।

ম্যানেজার বাবু একটা কাণ্ডই বাধিয়ে ব'সে আছেন।

চিকের আড়ালে বেনারসীর নানান জলুস। সাদা থান। ফিস-ফিস কথা আর শিশুর ক্রন্দন। আসরে গান হচ্ছে তাই শুনবে, না দেখবে পরস্পরকে। এ দেখবে ওর শাড়ীর বাহার, ও দেখবে এর গয়না। তন্ন তন্ন ক'রে। বয়স্থারা ধমকানি দেয়, সামলায় চটুলার দলকে। তারা ছ'মাসে ন'মাসে আজ একত্র হয়ে হাসে খিলখিলিয়ে। ঢ'লে পড়ে এ ওর গায়ে।

অনাহূতের দল দূর থেকে দেখেই তৃপ্তি পায়। দেখে জন-সমাগম, দেখে কড়িতে ধুচুনী লণ্ঠনের রঙীন সারি। আসরের মধ্যিখানে রূপোর আতর-দান, পান-দান আর গোলাপ-পাশ। তারা দূর থেকে দেখে রূপোর চিকন। ফটকের দারপালের চোখ এড়িয়ে কে যাবে সেখানে। গলায় ধাক্কা খেতে। ছক্কড় মহল তাই শেষ পর্য্যন্ত আর থাকতে না পেরে মুখ ছোটাতে শুরু ক'রেছে। হিংসা আর অপমানের জ্বালায়। পরশ্রীকাতরতায়।

এখানে এত ব্যাপার, আর ভেতরে কি। অন্দরে তখন কুমুদিনী ব্যস্ত হয়ে ডাক পাঠাচ্ছেন। দাসীর পর দাসী এসে সদরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। কোথায় সেই গোদ কর্ত্তা। কোথায় ম্যানেজার বাবু। কোথায় কে।

ভুল হয়ে গেছে। চরম ভুল। যার আর কোন শোধন নেই। প্রতিকারও নেই। কুমুদিনীর কানে গেছে বড় বাড়ীতে না কি কোন সংবাদ দেওয়া হয়নি। ভুল হয়ে গেছে। পরম ভুল। যার আর ক্ষমা নেই। সময়ও আর নেই যে, গিয়ে বলে আসবে। এখন বলতে গেলে হয়তো আসবেও না কেউ, পরন্তু নতুন কথার সৃষ্টি হবে।

গানের সুর আর করতালের ঝঙ্কার তখন সপ্তমে উঠেছে। বন্দনার পর মূল কথার গান ধরেছে বাসদেও মাহাতোর পুত্রদ্বয়। ভিন্‌দেশী ভাষা, ভিন্‌দেশী ধ্বনি। বড় অদ্ভুত শোনায় যেন শ্রোতাদের কানে। অশ্রুতপূর্ব্ব।

প্যালার থালায় টাকা পড়ে ঠং-ঠং। যে যেমন মানুষ সে তেমন দেয়। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির হেতুতে দু'-এক বৃদ্ধের ভাবান্তর হতে দেখা যায়। গোলাপ-পাশ হাতে নিয়ে ম্যানেজার বাবু অতিথিদের মাথায় গোলাপ-জলের ছিটে দিতে থাকেন।

কিন্তু মালিক কৈ? যার প্রজা সেই রাজার সাক্ষাৎ নেই। হোতা নেই অনুষ্ঠানে।

কৃষ্ণকিশোর পড়ার ঘরে। দু'খানা কেদারায় সামনা-সামনি বসেছে দু'জনে। অরুণেন্দ্র বলছে,—**I am hungry.** ভারি বড় ক্ষুধার্ত্ত। সেই সকালে খেয়ে কলেজ গেছি, কলেজ থেকে সোজা **I have come to you.** তোমার কাছে এসেছি। **I am too hungry now.**

কেদারা থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লো কৃষ্ণকিশোর। বললো,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কি খাবে বল?

পাজামার পাশ-পকেট থেকে বার্ডসাইয়ের প্যাকেট বের করলো অরুণেন্দ্র। ঠোঁটের কোণে একটা ধ'রে চকমকি ঘষতে ঘষতে বললো,—কিছু না থাকে **a glass of water only.** এক গেলাস জল খাওয়াও। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আজ তো কি যেন এক **ceremony** দেখতে পেলাম। **What's the matter?**

কৃষ্ণকিশোর বলে,—ও কিছু নয়। আমাদের প্রজারা এসেছে। গাইছে। অপেক্ষা কর, আমি বলে আসি।

কিন্তু বলবে কাকে। আহার্য্যের অভাব নেই। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। কিন্তু বললে তো আর রেহাই নেই। কার কে খাবে শতেক কৈফিয়ৎ দাও। কুমুদিনীর যদি কানে যায় সেই খৃষ্টান ছেলেটা এসেছে তাঁর ভিটের ভেতর, তা হলে কি আর রক্ষা আছে না কি। কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করে অরুণেন্দ্রর মুখখানা। যেন বিবর্ণ। ক্লান্তির ছায়া নেমেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা। চোখ দু'টো যেন রক্তহীন। পাংশু। মাথার রুক্ষ কেশ। কৃষ্ণকিশোর বললে,—অপেক্ষা কর, আমি বলে আসি।

পড়ার ঘরের বাইরে দরজার পাশেই বসেছিল অনন্তরাম। ... দু'-চারখানা কাপড় চুনোট করছিল এই অবসরে। মাংসভাজার জরদ পাড়, ঢাকাই আর কালো ভেলভেট পাড়ের ধুতি। হাতের চুরি পাশে রেখে জিজ্ঞেস করলো অনন্তরাম,—কি, কি চাই ... কাকে কি বলতে হবে বল না, আমি ব'লে আসছি।

... মতন বললে কৃষ্ণকিশোর,—অনন্তদা, এক জনের মত জলখাবার চাই। মায়ের কাছ থেকে কি ব'লে চাইবে? বল'না ... অরুণ এসেছে। রসাতল কাণ্ড করবেন মা। বলবে—

কি বলবে তা আর বলতে পারে না সে। হাসতে হাসতে অনন্তরাম বললে,—বলব'খন যে, বেড়িয়ে ছেলের ক্ষিদে লেগেছে। কিছু খাবার দাও তোমার ছেলেকে।

—তাই বলবে? বলে কৃষ্ণকিশোর।—তা আমি জানি না। তুমি ... দেরী ক'র না।

হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠে পড়লো অনন্তরাম। কৃষ্ণকিশোর ঢুকলো পড়ার ঘরে। দেখলো অরুণেন্দ্র বাড়সাই খেতে খেতে গুনগুন্ সুরে গান ধরেছে। কি এক ইংরেজী গান। পা দু'টোকে তুলে দিয়েছে টেবিলের 'পরে।

ওদিকে তখন জমে উঠেছে আসর।

... থেকে গানের সুর শোনা যাচ্ছে। তবলার বোল্। ... শুধু মানুষের কালো মাথা। আর সারি সারি ... লণ্ঠন। সন্ধ্যার এলোমেলো বাতাসে দুলছে এদিক সেদিক। ... থেকে মনে হচ্ছে সাগরের বুকে বুঝি বা বিরাট এক ... দুলছে। আলোকোজ্জ্বল। অন্দরের সেই তিন তলার ... জানলার পাখীর ফাঁক থেকে নিঃশব্দে দেখছেন কুমুদিনী। ... তাঁর নাট-মন্দির দুলছে। লণ্ঠনের রঙীন আলো-ছায়ায়। ... তাঁর অশান্তির বিষাদে ভারাক্রান্ত। কর্ত্তব্যে অবহেলা হয়ে ... কত যে কথা উঠবে এই সামান্য ত্রুটিতে! বড় বাড়ীতে ... খবর দেওয়া হয়নি, অথচ প্রতিবেশীদের ঢাক পিটিয়ে ... হল। ভুল হয়ে গেছে, পরম এবং চরম ভুল! দাসীর ... সী এসে খোঁজ করছে সদরে। কোথায় কৃষ্ণকিশোর। ... ম্যানেজার বাবু। কোথায় কে।

... কেন এসেছি বলতে পারো? কথা বলতে বলতে সোজা ... বসলো অরুণেন্দ্র। বার্ডসাইয়ের শেষাংশ জুতোর তলায় চেপে ... বললে,—কেন এসেছি Cant you guess?

অপ্রতিভ হয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর,—এসেছো বেশ তো। কেন তা জানি না। আমিও তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে চলে এসেছি।

ঘরের দেওয়ালে ছিল একটা দেওয়ালগিরি। কম্পমান শিখা। অরুণেন্দ্রর মুখে দেখা যায় ক্ষুধার ক্লান্তি। চোখের দৃষ্টিতে যেন তৃষ্ণার ব্যাকুলতা। অনন্তরাম আসে খাবারের রেকাবী হাতে। আরেক হাতে জলের পাত্র। রেকাবীতে ক্ষীরের মোহনপুরী, নারকেল নাড়ু, পেস্তার বরফী আর ঝুরি-ভাজা। অনন্তরাম টেবিলের 'পরে নামিয়ে দিয়ে বলে,—মা যে কখন থেকে তোমাকে ডাকাডাকি করছেন! বড় বাড়ীর লোকজনাদের না কি বলতে ভুল হয়ে গেছে।

—তাই না কি? বললে কৃষ্ণকিশোর।—মা কোথায় অনন্তদা'?

—কোথায় আবার অন্দরে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে অনন্তরাম।—দেখলাম তেনার মুখখানা যেন রাগে ভারী হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণকিশোরের বুক দুরু-দুরু করে। ভয় আর আশঙ্কায়। অরুণ তাদের ভিটের ভেতরে এসেছে, মা কি জানতে পেরেছেন! কিন্তু বাড়ীতে যদি কেউ আসে তাকে কি মুখের ওপর বলে দেওয়া যায় যে এসো না, চলে যাও। অনুরোধের অপেক্ষা করে না অরুণেন্দ্র। রেকাবী তুলে খেতে শুরু করে। লজ্জা, সঙ্কোচের বালাই নেই। ক্ষুধার্ত্তের আহার। জঠরানলের জ্বালায়। রেকাবী নিঃশেষ হতে বড় বেশী সময় লাগে না। গেলাসের জল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললে অরুণেন্দ্র,—আমি এসে তোমাকে আটকে রেখেছি। কিন্তু কেন এসেছি তা বোধ হয় জানো না?

তার মাথায় তখন দুশ্চিন্তা। কুমুদিনী ডাকতে পাঠিয়েছেন, নাট-মন্দিরে আসর আর অরুণেন্দ্র বাড়ীর ভেতরে এসেছে। অনেক সমস্যার তোলপাড়। কৃষ্ণকিশোর বললে,—তুমি আমাকে যে সব কথা বলেছো তার একটাও সত্যি নয়। কোথায় ডিরোজিও?

হাসতে থাকে অরুণেন্দ্র। বলে,—তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে না। আমি তাঁকে দেখতে পাই কলেজে। শুনতে পাই He is delivering speech on the subject of classical English literature.

—তাই না কি? কৃষ্ণকিশোরের কথায় কৌতূহল।—এই রাতের বেলায় তুমি যাবে এতটা রাস্তা? ভয় করবে না?

—ভয়। হেসে ফেললো অরুণেন্দ্র।—ভয় আবার কাকে? গান গাইতে গাইতে চলে যাবো। ভয় আবার কি? I am not afraid of anyone in this world of the almighty.

কৃষ্ণকিশোর বলে,—চৌরঙ্গীতে যে ইংরেজ দস্যুরা আছে। তারা যদি······

—Let them be, তাতে আমার ভয় কি! অরুণেন্দ্রর মুখাকৃতিতে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। সে যেন অজাতশত্রু। তার কথাগুলি শুনতে যেন মজা লাগে কৃষ্ণকিশোরের। বলে,—কেন এসেছো বললে না?

চেয়ার থেকে উঠে পড়লো অরুণেন্দ্র। পাজামার পকেট থেকে ফস করে বের করলো কি একখানা বই। বললে,—আমি তোমাকে পড়াবো। তুমি ইংরিজী পড়তে চাও, I will teach yo

English. Have this book with you. Please try to read the alphabets.

বইখানা হাতে নেয় কৃষ্ণকিশোর। উলটে-পালটে দেখে। রেখে দেয় টেবিলের দেরাজে। দেখবে সে, পরে দেখবে। নীল রঙের মলাট। ইংরেজী ভাষার প্রথম ভাগ। প্যারীচরণ সরকারের ফার্ষ্ট বুক! অরুণেন্দ্র আরেকটা বার্ডসাই ধরায়। দরজার কাছে গিয়ে বলে,—কাল বিকেলে তুমি এসো আমাদের বাড়ীতে। আমি তোমাকে ইংরিজী পড়াবো। Now I am going. রাস্তাটা আমাকে একটু বাৎলে দাও। কোন্ দিকে তোমাদের ফটক?

বাইরে তখন আর অন্ধকার নেই। আকাশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পূর্ণাকার চাঁদ। সুধা বিকিরণ করছেন। গ'লে পড়ছে জ্যোৎস্না। নীল আকাশের এখানে সেখানে ভাসমান মেঘের জটলা। ভেসে যাচ্ছে দূর-দূরান্তরে। লুকোচুরি খেলছেন চন্দ্ররাজ। পৃথিবীর সঙ্গে।

ফার্ষ্ট বুক। সেই জাম রঙের লেসের ঘাঘরা। ডালিমের মত রাঙা ঠোঁট। অপেল পাথরের মালা। বেহাত হয়ে যাওয়া রুমাল। কুমুদিনীর ডাক। নাট-মন্দিরে আসর। আর এই বিচিত্র জীব অরুণেন্দ্র। তার মনে যেন এক ঝড়ের দোলা লেগেছে। দক্ষিণের সমীরণ? না, এলোমেলো বাতাস। দিগ্‌ভ্রান্ত।

কি গান! এত মিষ্টি! এত তার আকর্ষণ! বন্ধুকে বিদায় দিয়ে আসে সে। এতক্ষণে গানের সুর কানের ভিতর দিয়া মরমে গিয়ে পশেছে। শুনতে পেয়েছে সত্যিই গান গাইছে কারা। ভজন গান। দোঁহা। শ্রীতুলসীদাসের।

—মা যে ডেকেছেন। পেছন থেকে বললে অনন্তরাম।

—মা আসরে আসেনি? জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরামের কথায় যেন দুঃখের কাতরতা। বলে,—না, আসবেও না। কর্ত্তা যাওয়ার পর থেকে কি আর মুখ দেখিয়েছে কারও সমক্ষে? দেখো না, তুমি যদি ধরে—করে আনতে পারো। দিন নেই রাত নেই ঐ একখানা ঘরের ভেতরে মুখ লুকিয়ে বসে আছে! তোমাকে কিন্তুক ডেকেছেন বহুক্ষণ হল।

কৃষ্ণকিশোর পা চালায় দ্রুত।

অন্দরের মাঝ-পথে দেখতে পায় কুমুদিনীকে। মা! ডাকের সাড়া না পেয়ে নিজেই তিনি ব্যস্ত হয়ে আসছিলেন সদরের মুখে। ছেলেকে দেখতে পেয়েই বললেন,—এতক্ষণে তোমার দয়া হল বুঝি? ম্যানেজার যে বাড়ীতে এই কাণ্ড করেছে তা বড় বাড়ীতে একবার খবরটা পাঠালে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো! কত কথা উঠবে এই নিয়ে। তুমি ছিলে কোথায়?

মুখ দিয়ে যেন কথা বেরোয় না। মিথ্যা কথা জলের মত কি আর সহজে বলা যায়? সে বললে,—টোলের একটি ছেলে এসেছিল। এই মাত্র গেল। কুমুদিনী তার কথা শেষ হতে না হতেই বললেন,—তুমি যাও না একবার বড় বাড়ীতে। যদি কেউ আসেন দেখো না একবার! সঙ্গে অনন্তকে নিয়ে যাও। ঘরে ঘরে গিয়ে বলে আসবে। বলবে, মা বললেন আপনারা গান শুনতে আসুন। যে আসে আসবে, না আসে না আসবে। আমাদের দিক থেকে—

কৃষ্ণকিশোর ভেবেছিল মা [illegible] ফেলেছেন। দেখতো যে, না, তেমন কিছু নয়। খুশী হয়ে বললে,—বেশ তা, এক্ষুণি আমি যাচ্ছি।

কুমুদিনী বললেন,—দেখো, কোন ঘরে বলতে যেন ভুল না হয়। আগে বটঠাকুমার ঘরে যাবে। তাঁকে বলবে। তার পর আর আর সকলকে বলবে। জ্যাঠা মশাইদের বলবে, বৌদিদের, দাদাদের আর মেয়েরা যদি কেউ থাকে তাদেরও বলবে। কিন্তু দেরী করলে আর যাওয়া না যাওয়া দুই-ই সমান। শেষে ওরা বলবেন যে, আসর যখন শেষ হতে চললো তখন বলতে এসেছে!

বড় বাড়ী।

হ্যাঁ, ঐ বাড়ীই আসল বাড়ী কি না! মূল। কাণ্ড। ঐ বাড়ী থেকেই বেরিয়েছে যত শাখা আর প্রশাখা। প্রথমে ছিল একতা। তার পর ষড়রিপুর তাড়নায় বেধেছিল দ্বন্দ্ব। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে হয়েছিল ভাগাভাগি। যার ভাগে যেমন প'ড়েছে সে তেমনি পেয়েছে। ঐ বটঠাকুমা'র ভাগ্যে ঐ বড় বাড়ী পড়েছে। তিনি এখনও কাণ্ড আগলে ব'সে আছেন তাঁর বংশধরদের নিয়ে। বয়স তাঁর প্রায় নয়ের কোঠায়। নবাবী আমলের শেষ ভাগে মাত্র সাত বৎসর বয়সে এসেছিলেন ঐ বাস্তুভিটায়।

তার পর?

তার পর কত কি। সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার জোয়ার-ভাঁটায় কত কি ঘটে গেছে। কত কে জন্মেছে—আর চলে গেছে কত কে। কত কি দেখেছেন তিনি। ঐ ফুলকুমারী। এক দিন ঐ ফুল রঙে রসে আর গন্ধে ছিল সজীব, জীবন্ত। এখনও [illegible] আছে, তবে সেই রঙ রস আর গন্ধ যেন উবে গেছে। ফুলকুমারী আজ ম্লান কুসুম। লোল-চর্ম্মের বৃদ্ধা। খেলো হুকোর ভক্ত এখনও। তামাকের।

বেশী দূরে নয়। বড় বাড়ী কাছেই। ফটক থেকে রাস্তায় পা দিতেই অনাহূতের দল মন্তব্য শুরু করলো। দ্বারোয়ান তাদের প্রবেশ করতে দেয়নি। বাধা দিয়েছে। এক পাল অপোগণ্ড। আকৃতি এবং প্রকৃতি দুই-ই তাদের সমানে। চাল চুলো নেই নিজেদের। মুখের আক-ঢাক নেই।

এক জন বললে,—আমাদের খোদ কর্ত্তা-শালা আসছে। যক্ষের ধন নীলমণি। শালার ঘরের শালা!

আরেক জন তালিম দেয়,—আমরা কি এমন দোষ করলাম বাবা? গাড়ী-বাড়ী নেই ব'লে কি বাবা গান শুনতেও জানি না!

অপর এক জন ভুল শুধরে দেয় দ্বিতীয় বক্তার। বলে, না, গাড়ী-বাড়ী না থাকলে কি পাত্তা পাওয়া যায় কখনও? না না, যায় না, যায় না।

অনন্তরাম সঙ্গে ছিল। বললে,—ও-সব কথায় তোমার কান দিয়ে কাজ নাই। বলতে দাও না, কত লোকে এমন [illegible] কথা বলে।

কৃষ্ণকিশোর চলতে চলতে বলে,—কিন্তু আমার বাবাকে গাল দিচ্ছে?

অনন্তরাম খেঁকিয়ে ওঠে যেন। বলে,—বলতে দাও না তুমি। এরা কি মানুষ? শালারা সব শুয়োরের বাচ্চা!

আকাশে চাঁদ। চতুর্দ্দিক্ আলোয় আলোকময়। জ্যোৎস্না-...পথ। বড় বাড়ী। ঐ তো দেখা যাচ্ছে বড় বাড়ীর সীমানা। ... কুঠি নয়, বাড়ীও নয়—সুবৃহৎ প্রাসাদ। সাত মহলা। মূল। ...

বড় বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই দু'পাশে বৈঠকখানা। সন্ধ্যার ...জ বাবুরা বন্ধুদের নিয়ে সব তাস-দাবা খেলছেন। হৈ-হৈ আর ...। তুরুপ আর কিস্তী-মাতের জয়ধ্বনি। ভৃত্য সমভিব্যাহারে ...কিশোরকে দেখেই বাবুরা খেলা থামিয়ে মুখ ফেরালেন তার ...। সবার বড় যিনি, তিনি বললেন,—কি খবর কিশোরচাঁদ?

কৃষ্ণকিশোর ভয়েই জড়-সড়। আমতা আমতা ক'রে বললে,—...দের নাট-মন্দিরে নাম-গান হচ্ছে। মা বললেন আপনাদের ...।

খেলা তখন সবে মাত্র জমেছে। ইয়ার-বন্ধু আর মোসাহেবদের ...এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা নিরাশ হয়ে পড়লো।

...বড় যিনি তিনিই বললেন,—আমাদের আর কেন? যাও তুমি অন্দরে যাও, দেখো না মেয়েরা যদি কেউ যেতে চান। আমরা ...টের জোড়জোড় ক'রে খেলতে বসেছি।

অনন্তরামকে সদরে রেখে অন্দরের দরজা পেরিয়ে ভেতরে যেতেই অন্ধকারে কে যেন তার একটা হাত চেপে ধরলো। ফিস-ফিস করে বললো,—তুই আর আসিস্ না কেন রে কিশোর?

...বুঝতে পারে প্রশ্নকারী কে। বলে,—কমল দিদি?

—হ্যাঁ রে, চিনতে পারলি না? তুই কেন এয়েছিস?

—আমাদের নাট-মন্দিরে যে নাম-গান হচ্ছে। তোমাদের ...এসেছি। তুমিও চল না।

—তাই না কি? আমাকে একলা যে যেতে দেবে না। সবাই যদি যায়, তা হলে যেতে পারি।

—সবাইকেই বলতে পাঠিয়েছেন মা। যার ইচ্ছা হবে সেই ...। তুমিও চল।

—ঐ তো বললাম, সবাই যদি যায়। তোকে কত দিন দেখিনি ...।

... কথার কোন উত্তর দেয় না। কি বলবে, মা ... আসতে দেয় না? কমল দিদি, কমল, কমলমণি। ...পরশ আর গায়ের গন্ধেই কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পেরেছে, এ আর ...—সেই কমল দিদি। কি একটা এসেন্সের সুমিষ্ট গন্ধ, ...দের কাছে এলেই সেই গন্ধ পাওয়া দায়। কমল দিদির ...জড়িয়ে আছে সেই মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ।

তুমি জানলে কি ক'রে যে আমি এসেছি? জিজ্ঞেস করলো ...।

...থেকে কথা ভেসে আসে।—দেখলাম যে ওপরের ...তুই ইদিকে আসছিস। কথার শেষে একখানা ... দু'খানা হাত ধরে একেবারে বুকের ভেতরে তাকে যেন কমলমণি। দুই গালে হঠাৎ চুমু খেতে শুরু করে দেয় তার। ...তে পারিস না তুই? যখন খুশী চলে আসবি।

...সবে সে, মা বড় একটা আসতে দেয় না। সব কথা কি আর সব সময়ে সকলকে বলা যায়। বলে,—কমল দিদি, তোমার কি জ্বর হয়েছে? তোমার গা এত গরম কেন?

কমলমণির কণ্ঠে যেন বিস্ময়। নিজের বাহু থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে যেতে বললে,—জ্বর! কৈ না তো। তা হবে। তুই যা ভেতরে যা। আমি চললাম। ঐ কে আসছে বুঝি।

অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে যায় কমলমণি। ঢুকে পড়ে কোন্ এক ঘরে। কমলমণি বাড়ীর ছোট কর্ত্তার মেয়ে। কৃষ্ণকিশোরের বোন হয় সম্পর্কে। সে বটঠাকুমা'র ঘরের দিকে চলতে শুরু করে। এদিকটায় আর তেমন অন্ধকার নেই। লম্বা বারান্দার কড়িতে একটা বেল-লণ্ঠন টিম-টিম ক'রে জ্বলছে।

বটঠাকুমা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন,—এসো ভাই, এসো। এমন সময়ে হঠাৎ কি খবর? হাতের হুঁকো সরিয়ে রাখলেন ফুলকুমারী।

কেন যে সে এসেছে সে কথা শুনে তিনি তাঁর বৌ-ঝিকে বললেন একবার ঘুরে আসতে। তাঁরা সব অন্য বাড়ীর মেয়ে। মুখ বেঁকিয়ে বললেন কেউ কেউ,—এত রাত্তিরে কি আর যাওয়া যায়। জানে, এখন বললে কেউ তো আর যাবে না, তাই গিন্নী ছেলেকে পাঠিয়েছেন। আমাদের এখন কত কাজ!

তাঁদের কথায় কেমন যেন অপমান বোধ করলো কৃষ্ণকিশোর। বটঠাকুমাকে প্রণাম ক'রে তরতরিয়ে চলে এলো ভেতর থেকে বাইরে। তার পর সদর থেকে একেবারে রাস্তায়।

অনন্তরাম দাঁড়িয়েছিল প্রতীক্ষায়। তাকে দেখেই বললে,—কি, কেউ আসবে না তো?

—হ্যাঁ। বললে কৃষ্ণকিশোর।

—জানতাম। আগেই আন্দাজ ক'রেছি। ত্রিশটা বছর তো কাটলো এ-বাড়ীতে। সেই কুড়িতে ঢুকেছি, আর আজ পঞ্চাশের ধাক্কা। কথাগুলি যেন স্বগত করে অনন্তরাম। বলে,—চল, যাওয়া যাক্। তা না এসে এক রকম ভালই ক'রেছে। এলে এখুনি আর দেখতে হ'ত না। কার সম্মানের হানি হল তাই দেখতে দেখতেই প্রাণ বেরিয়ে যেতো তোমার মায়ের। চল, চল, যাওয়া যাক।

তাদের ফটকের সামনে তখনও জটলা। সেই তারা—যারা আসরে স্থান পায়নি। মন্তব্য করছে। টীকা আর টিপ্পনি। দ্বারপাল ফটক বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। যেন পশুশালায় পশু। আর নাট-মন্দিরে তখন সুর সপ্তমে চড়েছে। দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে সেই গানের সুর। কথা শোনা যাচ্ছে না।

কৃষ্ণকিশোর মায়ের কাছে যায়। বলে,—বড় বাড়ীর কেউ আসবেন না।

কুমুদিনী বললেন,—না আসে আমি আর কি করতে পারি। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন ক'রেছি। তা তুমি এবার যাও, আসরে গিয়ে বস। কত গণ্যমান্য লোক এসেছেন। তাঁদের আদর আপ্যায়িত কর।

কৃষ্ণকিশোর অনুনয়ের স্বরে বলে,—তুমিও চল। চিকের ভেতরে বসে গান শুনবে।

সে কি কথা! সেখানে পাড়া-প্রতিবেশী কত মেয়ে-বৌ এসেছে। সেখানে যাবেন কুমুদিনী। গান শুনতে। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই বাড়ীর লোক ব্যতীত আর কোন অপর জন কুমুদিনীর মুখ দেখতে পেয়েছে? না, তা হয় না। কুমুদিনী বললেন,—না বাবা, লক্ষ্মীটি, আমি আর যাবো না। তুমি যাও তাড়াতাড়ি। আর তোমার ম্যানেজারকে বল, কেউ যেন প্রসাদ না খেয়ে চলে না যান।

অগত্যা সে একাই আসে। কুমুদিনী আসেন না। ম্যানেজার বাবু এসে কানে কানে বলেন,—ব্রাহ্মণ গাঁবা—তাঁরা ঐ ওদিকে সব রয়েছেন। আপনি গিয়ে তাঁদের প্রণাম করুন।

আসর তখন গম-গম করছে। কাকেও প্রণাম, কাকেও নমস্কার আর কাকেও শুধু মুখের হাসি দেখিয়ে আপ্যায়িত করে কৃষ্ণকিশোর। ক্ষণিকের জন্য শ্রোতাদের চোখ গায়কদের দিক থেকে তার দিকে ফেরে। মালিক, তাই ফিরে ফিরে দেখে সকলে। প্যালার থালাটা দেখতে পাওয়া যায় প্রায় পরিপূর্ণ। টাকা আনা আর পয়সা। যে যেমন মানুষ সে তেমন দিয়েছে। কৃষ্ণকিশোর আসরের মধ্যিখানে বসে। গায়কদের পুরোভাগে। গান চলে দ্রুত লয়ে।

বড় ক্লান্ত মনে হয় যেন এতক্ষণে। ঘোরাঘুরি আর টানা-পোড়েনে কেমন যেন কাহিল মনে হয় নিজেকে। এত লোকের মাঝে এসে কিছু বা লজ্জা আর সঙ্কোচ। চুপ-চাপ বসে থাকে সে।

রাত কত? গান শেষ হতেই বা দেরী কত আর। ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টার ঘা পড়তে শুরু হয়। একটা···দুটো···পাঁচটা···সাতটা··· ন'টা বাজলো। বাসদেও মাহাতো পাশেই ছিল। বললে সে,—কখন শেষ হবে বাসদেও?

—হয়ে এসেছে হুজুর। শ্রীরামচন্দ্র এখন হরধনু ভঙ্গ করবেন আর সীতা মায়ীকে সাদি করবেন। সেখানেই শেষ হবে গান। বললে বাসদেও মাহাতো।

ফার্ষ্ট বুক। ফার্ষ্ট বুক দেখতে হবে যে। ইংরেজী ভাষার প্রথম ভাগ। অরুণেন্দ্র দিয়ে গেল। বললো, অক্ষরগুলো চিনতে চেষ্টা কর। অরুণেন্দ্র পড়াবে তাকে ইংরেজী। ঐ বিকৃত মস্তিষ্কের অরুণেন্দ্র।

ঐ মেয়েটা কে। চিকের আড়াল থেকে দেখছে আর হাসছে মিটি-মিটি। চেনা-চেনা যেন মুখটি তার। কে? আইভিলতা। কৃষ্ণকিশোরের সন্দেহ হয় মনে। আইভিলতা আসবে এই আসরে। হবেও বা। লক্ষ্য ক'রে দেখে, হ্যাঁ, আর কেউ নয়। ঐ আইভিলতা।

এত দিন দূর থেকে দেখেছে। দূরের ঐ বাতায়ন-পথে। এই প্রথম দেখলো এত কাছের থেকে। দেখলো, সাজিয়ে আইভিলতাকে দেখতে প্রতিমার মত। আর কত গয়না পরেছে। চুণী-পান্নার গয়না। লণ্ঠনের আলো-ছায়ায় দেখায় বড় অদ্ভুত। ঠিক যেন কোন এক মহারাণীর মত।

মিটি-মিটি হাসে আইভিলতা। সে হাসে না, সে শুধু তাকায়। হাসলে কে কি মনে করবে যদি কেউ দেখতে পায়। মনে মনে সে গৌরব বোধ করে। তাদের বাড়ীতে এসেছে গান শুনতে ঐ আইভিলতা!

কিন্তু শেষ হতে কত দেরী আর? ম্যানেজার বাবু নিজে প্রসাদ বিতরণ করছেন। পাতা ভাঙতে দেরী নেই বেশী। মিষ্টি আর জল। আর ফলের মধ্যে পেয়ারা, শশা, শাঁকালু।

গান শেষ হতেই যে যার ঘরে ফিরে যায়। একে একে সকলে চলে যায়। কৃষ্ণকিশোর বসে থাকে বিহ্বলের মত। আইভিলতাও চলে যাচ্ছে। সে উঠলো, দেখলো, আর হাসলো। তার পর খিড়কির দরজা দিয়ে চলে গেল একেবারে। ছেলের যখন চেতনা ফিরলো তখন দেখে যে নাট-মন্দিরের অতিথিদের কেউ নেই আর।

এখন আকাশের মধ্যিখানে চন্দ্ররাজ। স্বচ্ছ জোৎস্নার প্রবাহ। মেঘের জটলায় ঢাকা পড়ছে চন্দ্রসভা।

ফার্ষ্ট বুক! আর এখন অন্য কিছু নয়। নয় অন্য কোনো। আহার সেরে সোজা শয্যায়। তার পর একা একা প্রথম ভাগের পড়া। ইংরেজী ভাষার প্রথম ভাগ। সে মায়ের কাছে যায় আহার সারতে।

পড়ার ঘরের দেরাজ থেকে বের করে নেয় সেই বইখানা—ফার্ষ্ট বুক! ফার্ষ্ট বুক! ফার্ষ্ট বুক!

[ক্রমশঃ

-প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে উড়িষ্যার কোণারক মন্দিরস্থিত সূর্য্য মূর্ত্তির একাংশ মুদ্রিত হইল। —জে, আর সেনগুপ্ত গৃহীত

ভারতে প্রাচ্য গবেষণা

শ্রীসুশীলকুমার দে

[১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে সাধারণ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ সুশীলকুমার দে'র অভিভাষণ হইতে অনূদিত]

এদেশে প্রাচ্য গবেষণার পথে বাধা অনেক। বিভিন্ন শ্রেণীর গবেষণার সংযোগ-সাধন ও উৎসাহী কর্ম্মীদের সাহায্য দেবার জন্য এখনো পর্য্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হয়নি। এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ একটি পরিকল্পনা ছিল বটে, কিন্তু তা কখনো কার্য্যকরী আকার ধারণ করেনি। এই সম্মেলন ভারতের সকল প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর কেন্দ্রীয় অধিবেশন হলেও সরাসরি উপরোক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা এর পক্ষে সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালনা ও প্রচেষ্টা আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, একথা সত্য, কিন্তু এই সব ছোট-খাট ও বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা দ্বারা যে বৃহত্তর জাতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রাচ্য বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষায় সাহায্যের উপযোগী গ্রন্থাগার এদেশে অতি অল্পই আছে। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু সংখ্যক মূল্যবান পুঁথি আছে একথা সত্য, কিন্তু সবগুলি সকলের অধিগম্য নয়। তাছাড়া ঐ সকল পুঁথি দেখবার জন্য সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা ক'জন পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব? অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে গবেষণার কাজ খুব কষ্টের এবং ব্যয়সাধ্য। সামান্য একটি কাজকে সফল করে তুলতে অসাধারণ ধৈর্য্যের দরকার। গবেষণার জন্য ভাল কর্ম্মী পাওয়া যায় না, তার কারণ তাদের উৎসাহ দেবার মত পর্য্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার মত আধুনিক পন্থায় গবেষণা শিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও এদেশে নেই।

১৯২৫ সালে নিখিল-ভারত প্রাচ্য সম্মেলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা ঘোষণা করেন যে, এদেশে প্রাচ্য গবেষণার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। আজও একথা বলা চলে। কিন্তু নানা অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও ভারতে গবেষণার কাজ মন্থর গতিতে হলেও নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া পুণা, কলিকাতা, বরোদা, এলাহাবাদ, বারাণসী, লাহোর, মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবান্দ্রম, হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্য কেন্দ্র থেকে বহু সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সংস্কৃতের জন্য ষোলটি গ্রন্থ-প্রকাশের কেন্দ্র এবং [illegible] আরবী ও পার্শীর জন্য আটটি কেন্দ্র আছে। [illegible] দেশের পক্ষে ইহা আদৌ পর্য্যাপ্ত নয়। যাহা [illegible] তা ঠিক পথেই হয়েছে। তবে এখনও অনেক কিছু [illegible] আছে। ডাঃ বেলভালকর বারাণসীতে তাঁর সভাপতির [illegible] কাজের উচ্চ মান বজায় রাখা সম্বন্ধে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ [illegible] করেছেন। তবে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রত্যক্ষ বিকাশ [illegible] এবং কঠিন ও জটিল সমস্যা সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা [illegible] সন্দেহ নেই। গবেষণার ক্ষেত্র অনন্ত এবং উৎসাহী [illegible] সংখ্যা নগণ্য হলেও ফল আদৌ নৈরাশ্যজনক নয়। এটা [illegible] কথা নয়। ডাঃ এফ. ডব্লিউ. টমাসের ন্যায় [illegible] পণ্ডিতও ১৯৩৭ সালে তাঁর ত্রিবান্দ্রম অভিভাষণে ভারতীয় [illegible] উচ্চ মান স্বীকার করেছেন।

তা বলে এই সম্মেলনকে প্রাচ্য গবেষণার 'ক্লিয়ারিং হাউস' মনে করলে ভুল হবে। প্রাচ্য বিষয়ে গবেষণা এর প্রধান কাজ হ'লেও দু'বছর অন্তর একবার তিন দিনের অধিবেশনে সন্তোষজনক কার্য্যতালিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমার মতে এইরূপ সম্মেলনের প্রধান মূল্য এই যে, এতে একই প্রকার গবেষণায় রত পণ্ডিতমণ্ডলী পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পান। লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষা এতে উপকার বেশী হয়। অবশ্য আমাদের আশু কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রাচ্য বিদ্যালাভে উৎসাহ দান। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? পণ্ডিতবিশেষের চিত্তবৃত্তির সন্তোষ ও জাতীয় গর্ব্ব-প্রকাশ ছাড়া কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই? ঐ উদ্দেশ্য সাধনেরও দরকার আছে, কিন্তু এই সম্মেলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত, ভারতের অতীত চিন্তাধারার একটা ব্যাপক চিত্রের ধারাবাহিক পুনর্গঠন দ্বারা ভারতের উন্নতি সাধনের জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টা ও চিন্তার ঐক্য সম্পাদন। আমার বিশ্বাস, এই উদ্দেশ্য সাধনে আমরা অনেকটা সফল হয়েছি। কতিপয় বিরাট পণ্ডিত ও পৃষ্ঠপোষকের অনুপ্রেরণায় এই সম্মেলন আজ ভারতীয় সংস্কৃতির সজীব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আমাদের এই ঐতিহ্যের ধারকের কাজ করতে হবে।

ভারত প্রাচ্যবিদ্যাবিদের কাজ সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক দেরী আছে। আপনারা সকলেই জানেন যে, প্রাচ্যবিদ্যার প্রত্যেক বিভাগে এখনও অনেক কাজ ও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ছোট-খাট সমস্যাগুলির সমাধান পণ্ডিত-বিশেষের একক প্রচেষ্টার দ্বারা হতে পারে বটে। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কানে নাগপুর সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বহু পণ্ডিতের সম্মিলিত চেষ্টায় সম্ভব অনেক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কার্য্যকরী করার সুযোগ না থাকলে কেবল বিষয়ের উল্লেখ করে কোন লাভ নেই। সুতরাং আমি সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকবো। কিন্তু এই সম্পর্কে আমি প্রাচ্য গবেষণা সম্বন্ধে কতকগুলি ত্রুটির উল্লেখ করতে চাই।

প্রকৃত ভাল কাজ করতে হ'লে চাই অসীম ধৈর্য্য ও শ্রম, নির্ভুলতা এবং সর্ব্বোপরি তথ্যনিষ্ঠা ও সুসঙ্গত বিচারবুদ্ধি। ভারতীয় পণ্ডিতগণের যে এই সকল গুণ নেই, একথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি বলি যে, আমরা প্রায়ই এই সকল প্রয়োজন মেটাতে পারি না, তাহ'লে কেউ যেন ভুল বুঝবেন না। কুসংস্কার আমাদের সমালোচনার মনোভাবকে আচ্ছন্ন করে দেয় এবং পরম্পরাগত গোঁড়ামি আমাদের সত্যানুসন্ধানে ব্যাঘাত ঘটায়। আমাদের দার্শনিক প্রকৃতি আমাদের প্রায়ই প্রকৃত ঘটনাকে উপেক্ষা করতে এবং অবাস্তব বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত করে। আমরা প্রায়ই তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হই না, এবং এ কথা ভুলে যাই যে, দ্রুত সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার মনোভাব পণ্ডিতদের পক্ষে মারাত্মক। স্বাভাবিকই [illegible] এ মাত্রা, বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা [illegible]

মৌলিকতা, কার্য্যের মান এবং স্থায়ী ফল উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতীয় পণ্ডিতগণ অল্প কয়েক জন বাদে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের তুলনায় অনেক নীচে, একথা ভাবতে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত যে আন্তর্জাতিক মান অর্জ্জন করেছে, প্রাচ্য গবেষণার ক্ষেত্রে এখনো তা অর্জ্জন করতে পারেনি।

আমাদের পণ্ডিতের উচ্চ ঐতিহ্য আছে। কিন্তু আমাদের যা আছে এবং আমরা যা অর্জ্জন করেছি, তাই নিয়ে যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি এবং আর কিছু জানতে না চাই, তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ এক দিকে আধুনিক পন্থাকে [illegible] হেয় মনে করা হয়, তেমনি অন্য দিকে পুরাতন পন্থাকেও তদ্রূপ হেয় চক্ষে দেখা হয়। পুরাতন পন্থা আমাদের নিজস্ব হলেও আধুনিক পন্থাকে উপেক্ষা করা যায় না। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক এবং উভয়ের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত বিরোধিতা নেই। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা যেমন অতি আধুনিকতাও তদ্রূপ অনিষ্টকর। পুরাতন পন্থার আর কোন প্রয়োজন নেই, একথা মনে করা ভুল। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান এই পন্থার দ্বারা সম্ভব এবং এই অগাধ প্রাচীন পাণ্ডিত্য নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু উন্নতি করতে হলে আমাদের চার দিকে ও সামনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। যে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ বিদেশের সব কিছুকে উপেক্ষা বা নিন্দা করে, তার চেয়ে অধিক ছেলে-মানুষী, মিথ্যা বা ক্ষতিকারক আর কিছু নেই। পরীক্ষা না করে বৈদেশিক পাণ্ডিত্যের মূল্য স্বীকার না করলে আমরা পিছিয়ে পড়বো এবং এতে আমাদের দুর্ব্বলতাই প্রমাণ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সকলেরই অধিকার আছে। বৈদেশিক পণ্ডিতের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ একথা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু তাহ'লেও তাদের কাছ থেকে আমাদের যা জানবার আছে তা জানতে হবে এবং আমাদের ধারণার সংশোধন করতে হবে। প্রাচীন কালে কিন্তু এরূপ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, তখন ভারত যতটা দিত ততটা আবার গ্রহণ করতো। জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে গ্রীকদের প্রাধান্যের উল্লেখ করে গর্গ বলেছেন—

> ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্
> শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
> ঋষিবত্তেপি পূজ্যন্তে কিং
> পুনর্দৈববিদ্দ্বিজঃ।

অর্থাৎ "যবনরা বাস্তবিকই ম্লেচ্ছ, কিন্তু এই বিজ্ঞান তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। *জ্যোতিষশাস্ত্রে* ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাক এই যবনরাও ঋষির মত সম্মানিত হয়।"

এগুলি কেবল বড় বড় কথা নয়। পাণ্ডিত্যে আমাদের সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের জাগ্রত হয়ে বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। এক দিকে আমাদের ভ্রান্ত রক্ষণশীলতা, অন্য দিকে চরম পন্থা ত্যাগ করতে হবে। এর কোনটাই সত্যানুসন্ধানের মনোভাব নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যা করে গেছেন সে জন্য আমরা অবশ্যই গর্ব্ব করতে পারি। কিন্তু এই প্রশ্ন আজ আমাদের নিজেদের করতে হবে যে, পূর্ব্বপুরুষগণের অর্জ্জিত অমূল্য [illegible] আমাদের

যুগে কি করেছি। এমন এক দিন ছিল যখন বৈদেশিক পণ্ডিতরা পরিব্রাজকরূপে ভারতে জ্ঞানার্জ্জন করতে আসতেন, সেই খ্যাতি আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে। আপনারা সকলেই জানেন যে, গত শতাব্দীতে এদেশে প্রাচ্য-বিদ্যা অনুশীলন কমে যায়। এক সময় প্রাচ্য-বিদ্যানুশীলনকে পুনরুজ্জীবিত করার কৃতিত্ব য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের প্রাপ্য ছিল। আজ যদি য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রাচ্য-বিদ্যা বিষয়ে পাণ্ডিত্যের গতি স্তিমিত হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ভারতে আমাদের পক্ষে সেই গতিকে ভারতীয় পন্থায় চালিত করার চেষ্টা করা কি বাঞ্ছনীয় নয়? কন্দর, মন্দির ও মসজিদের দেশেই প্রাচ্যবিদ্যার স্থায়ী আবাস হওয়া উচিত, এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করার ভার সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই।

এই সম্পর্কে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রাচীন বিদ্যা অনুশীলনের প্রতি ব্যাপক উপেক্ষা থেকে এই প্রশ্নের উৎপত্তি। আপনাদের গত অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ আর. সি মজুমদার এই প্রশ্নের উল্লেখ ক'রে প্রতিকার ব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করেন যে, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রাচ্য বিষয়গুলিকে উচ্চতর স্থান দেওয়া উচিত। তিনি ঠিকই বলেছেন; কিন্তু প্রশ্নটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে প্রাচীন বিষয়ের অধিক সংযোজনা অপেক্ষা গভীর। প্রকৃতপক্ষে ইহা আমাদের শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজাবার প্রশ্ন। সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করার স্থান এটা নয়, কিন্তু এই সম্মেলন প্রাচ্যশিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহশীল বলে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

ইহা সুবিদিত যে, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীকে স্বীকার করা হয়, কিন্তু তাদের আগেকার সম্মান আর নেই, এবং গভীর ভাবে ও ঐকান্তিকার সহিত এ সব বিষয় পাঠ করা হয় না। এই উপেক্ষার একটি কারণ এই হতে পারে যে, আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি আনুষঙ্গিক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে; কেবল বিদ্যাভ্যাস দ্বারা এই সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য যে উপেক্ষিত হবে, এ আর বেশী কথা কি! সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার চাপে প্রাচীন বিদ্যালোচনার অবনতি ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আধুনিক মানুষ প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জ্জনে অধিকতর মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। তার মতে আধুনিক জীবনের পক্ষে অতীত কালের শিক্ষার কোন মূল্য নেই এবং এই ধারণা তাকে অতীত যুগের শিক্ষার প্রতি উদাসীন করে তুলেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রার কথা ভাবলে এই অভিমতের সপক্ষে বলবার অনেক কিছু পাওয়া যাবে। ভারতে যা হচ্ছে, তা প্রাচীন শিক্ষার বিশ্বব্যাপী অবনতির একটা দিক্ মাত্র। কিন্তু সম্ভবতঃ এটাই একমাত্র কৈফিয়ৎ নয়। গত শতাব্দীতে যখন প্রাচ্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে সরকারী নীতি নির্দ্ধারিত হয়, তখনই আসল ক্ষতি আরম্ভ হয়। ১৮৩[illegible] সালের বিখ্যাত মেকলে মিনিটে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। এতে কেবল শিক্ষার বাহন ও কথা বলবার ভাষাই নির্দ্ধারিত হয়নি, এতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এবং অতীতের সম্পর্ক ত্যাগ করে কেবল [illegible]

বর্তমান নিয়ে থাকার শুধু সুযোগ করে দেওয়া হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইটি সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের পরিবর্তে কেবল মাত্র ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে জোর করে পাশ্চাত্য-করণের নীতি অবলম্বন করা হয়। এতে প্রাচ্য সংস্কৃতির ভিত্তি কেঁপে ওঠে এবং প্রাচ্য শিক্ষাকে ক্রমশ: অবজ্ঞাত স্থানে ঠেলে দেওয়া হয়। একথা সত্য যে, মেকলের 'মিনিট' লেখার ১৮ বছর আগে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত দাবী উত্থিত হয়। এই দাবীর ফলে ১৮১৭ সালে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক বিখ্যাত হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। মেকলে এই দাবী সঠিক ভাবে উপলব্ধি ক'রে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার ভুল হয়েছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ ও প্রাচ্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করায়। তিনি ঘোষণা করেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার চেয়ে বেশী। তাঁর এই মনোভাব সঙ্কীর্ণ। এদেশে সংস্কৃত ও আরবীর যে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি লাভের বিশেষ দাবী আছে, তা তিনি উপলব্ধি করেননি।

কিন্তু গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী প্রত্যক্ষ হয় যে, মেকলের ন্যায় অধৈর্য্য বিদেশী ত' দূরের কথা, শিক্ষিত ভারতীয়গণ পর্য্যন্ত অনুরূপ চিন্তা করিতে পারেননি। এমন কি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত রাজা রামমোহন রায় পর্য্যন্ত ঘোষণা করেন যে, সংস্কৃত শিক্ষার কেবল প্রাচীন কুসংস্কার ও অচল ভাবধারা প্রচারিত হবে। নূতন শিক্ষার প্রবল প্রতাপে একথা কেউ ভেবে দেখবার অবসর পাননি যে, ভারতে প্রাচীন শিক্ষার একটা বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য আছে, এবং এই শিক্ষা বাদ দিলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি একপেশে ও অপর্যাপ্ত রয়ে যাবে। তৎকালীন প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা করতে গিয়ে ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের উৎকর্ষের উল্লেখ করে দুর্বল যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। কারণ, এই যুক্তি মেনে নিলেও এটা প্রমাণ করা খুব সহজ ছিল যে, য়ুরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনে উৎকর্ষের অভাব নেই। কাজেই প্রাচ্য পণ্ডিতগণের যুক্তি কোন কাজে আসেনি। তৎকালে প্রাচ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার যথাযথ আবিষ্কার এবং প্রাচ্যবিদ্যার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি। ইতিহাস, ধর্ম, নীতি ও সমাজের ক্ষেত্রে, অথবা সাহিত্য ও ভাবাগত সমস্যার [illegible] প্রাচ্য বিদ্যার সাংস্কৃতিক, মানবীয় এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যের উপর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে জোর দিতে পারার সময় তখনো আসেনি। প্রাচ্যবিদ্যা যে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, [illegible] জীবন-যাত্রা ও চিন্তাধারা, আমাদের আচার-ব্যবহার [illegible] উপলব্ধির, এবং বস্তুতঃ আত্মোপলব্ধির চাবীস্বরূপ, একথা [illegible] বোঝেনি এবং এখনো কেউ ঠিক বোঝে না। এই [illegible] আমরা আমাদের প্রাচীন শিক্ষার প্রতি সুবিচার করতে [illegible] এর ফলে প্রাচ্যবিদ্যা আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনায় [illegible] স্থান পায়নি। ফলে শিক্ষার পরিকল্পনাগুলি প্রথম থেকেই [illegible] প্রকৃতিতে বৈদেশিক হয়ে পড়ে।

[illegible] শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আমাদের অত্যধিক [illegible] ফলে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, এই মনোভাব জাতীয় [illegible] জাতীয় জীবনের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা যে প্রেরণা এনে দিয়েছিলো, তখন যে তার দরকার ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষা যে আমাদের [illegible] উপকার সাধন করেছে, তা অস্বীকার করা সঙ্গত হবে না। [illegible] শিক্ষা না পেলে আমরা প্রগতিশীল বিশ্বে অচল হয়ে পড়তাম। কিন্তু গত শতাব্দীতে অবিচারিতার সহিত যে শিক্ষানীতি অবলম্বন করা হয়, তাতে প্রাচীন শিক্ষাকে পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনীতিক প্রয়োজনের সহিত অথবা নূতন শিক্ষাকে জাতীয় মনোভাব ও দৃষ্টির সহিত খাপ খাওয়াবার কোন চেষ্টা করা হয়নি।

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্ভবতঃ মানসিক স্থৈর্য্য অর্জ্জন করেছি এবং বিদেশী সভ্যতার প্রাধান্যে আমাদের বিশ্বাস কমে গেছে। কিন্তু আমাদের একদর্শী-মূলক মনোভাবের সংশোধনের চিন্তা করবার সময় পেয়েছি কি? কমিটী ও কমিশন গঠন করা সত্বেও আমরা প্রকৃতপক্ষে জাতির মঙ্গলের দিক থেকে সমগ্র ভাবে সমস্যাটি বিবেচনা করেছি কিংবা না আমরা যথেচ্ছ ভাবে প্রাচীন নীতিরই অনুসরণ করেছি? জাতীয় মনোভাব ও সংস্কৃতিতে যা গভীর ভাবে শিকড় গেড়েছে তাকে বাদ দিয়ে, কোন জাতীয় শিক্ষা-নীতিই যে সম্পূর্ণরূপে সফল হতে পারে না, একথা কি আমরা এখনও সম্পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেছি? একটা জাতি যে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গিয়ে আদিম জীবনযাত্রা প্রণালীতে ফিরে যেতে পারে, একথা বলা হচ্ছে না। আমরা আধুনিক ভারতে বিশ্বাস করি; কিন্তু যতই আমরা মনে করি না কেন যে, আমরা প্রাচীন ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছি এবং আধুনিক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে যতই চেষ্টা করি না কেন, আমরা আমাদের বহু কালের সংস্কার ত্যাগ করতে পারি না। অধ্যাপক এফ. ডব্লিউ টমাস ১৮৯১ সালে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেখেন। কিন্তু তিনি ১৯৩৭ সালে সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: "মানবতার দিক থেকে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে ভারতে সংস্কৃতের প্রয়োজন খুব বেশী। ইংরেজীর সাহায্যে বড় বড় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আধুনিক ও আন্তর্জ্জাতিক জীবন নির্ব্বাহ করা সম্ভব। কিন্তু দেশের মাটিতে এর শেকড় নেই এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে এর সম্বন্ধ সহানুভূতিসূচক নয়, বরং বিরক্তিকর।"

এখন অধিকতর গঠনমূলক একটি যুগ আরম্ভ হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। নূতন সংস্কৃতির উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের কোন অন্ধ বিশ্বাস নেই এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা যে সংস্কৃতি পেয়েছি, তাকে আমরা মূল্যবান বলে মনে করি। আমাদের শিক্ষা-নীতিতে এই দু'টি সংস্কৃতির মিলন ঘটাবার সময় কি আসেনি? কেবল আমাদের পাঠ্য-তালিকায় অধিক মাত্রায় প্রাচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি দ্বারা ইহা করা যাবে না, শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতির সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা দরকার। জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে নূতন ও প্রাচীন শিক্ষাকে সম্মান ও গুরুত্ব প্রদানের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন সরকারী নীতির প্রবর্তন করা দরকার।

আপনাদের মুখপাত্র হিসেবে আমি রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পাচ্ছি না। এই কমিশন সমস্যাটি উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে পারেননি। ইংলণ্ডেও প্রাচীন শিক্ষার অনুরূপ অবনতি ঘটেছে। সমগ্র শিক্ষা-নীতিতে 'ক্ল্যাসিক্স'এর উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণের জন্য লয়েড কর্তৃক ১৯১১ সালে একটি

কমিটি গঠন করেন। আধুনিক ভাষা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থান নির্ণয়ের জন্যও অনুরূপ কমিটী গঠিত হয়। সমস্যাটি একটু আলাদা হলেও এই সকল কমিটীর রিপোর্ট ভারতের সমস্যায় অধিকতর জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই সকল কমিটী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "আমাদের শিক্ষা থেকে যদি 'ক্ল্যাসিক্যাল' শিক্ষা বাদ দেওয়া হয় অথবা এই বিষয়ের শিক্ষা যদি ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তবে তাতে জাতির মহা অনিষ্ট হবে বলে সকলে মনে করবেন।" ভারতে জাতীয় শিক্ষার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করবেন, এটা আশ্চর্য্যের বিষয়। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ইংরেজীর সঙ্গে গ্রীক ও লাটিনের যে সম্বন্ধ, আধুনিক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত আরবী ও পার্শীর সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ। ইংলণ্ডে যাকে জাতীয় ক্ষতি বলে মনে করা হয়, ভারতে তার উপর গুরুত্ব না দেওয়া বিস্ময়ের বিষয়। আমরা আমাদের জাতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের কথা বলি, কিন্তু তাকে রক্ষা করিবার কথা চিন্তা করি না।

এই সম্মেলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর একটি বিষয় বলবার আছে। ত্রিশ বছর আগে যখন এই সম্মেলনের সৃষ্টি হয়, তখন আমরা ঠিক করেছিলাম যে, এর কাজ কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু এখন অবস্থা অন্যরূপ হয়েছে। ভারতীয় বিষয়গুলি আজ আর ভৌগোলিক সীমা মানতে চায় না। আমরা আর বহির্ভারতীয় সম্প্রসারণ বা প্রাক্‌ভারতীয় প্রভাব অস্বীকার করতে পারি না। মেসোপোটেমীয়, ইরাণীয়, গ্রীক, ইসলামীয়, তুর্ক-মোঙ্গল এবং সম্ভবতঃ ক্রীট ও মিশরীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সংস্কৃত ও সাংস্কৃতিক ভাষা সমূহ প্রাচীন হলেও আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইসলামীয় সংস্কৃতিরও প্রতিনিধি। কার্য্যকরী প্রেরণার জন্য আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা দরকার।

দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার বক্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখন বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করা কেবল পালি ও সংস্কৃত জানা পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ এই গবেষণা করতে হলে তিব্বতী, চীনা এবং অন্যান্য ভাষাও জানা দরকার। তাছাড়া ভারতের বাইরে অবস্থিত বৌদ্ধ দেশগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করাও দরকার। প্রাকৃত সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। মধ্য-এশিয়ার খোরোষ্ঠি পুঁথিগুলি এক প্রকার প্রাকৃতে লেখা। এই জ্ঞান আমাদের ভারতের বাহিরে নিয়ে যায়। বৈদিক গবেষণাতেও আবেস্তি ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। মোহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক কিছু জানা গেছে। প্রাচীন এসিরিয়া, সুমার, এলাম ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে গবেষণার কোনও ব্যবস্থা ভারতে এখনো হয়নি। এই সকল দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হলে ভারতে সমধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে এই সব বিষয়ে গবেষণার উপযুক্ত সুযোগও পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

যুদ্ধোত্তর ভারতে এশিয়ার দেশগুলির সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং যাতায়াতের সুবিধাও বেড়েছে। এখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ নতুন করে স্থাপন করা উচিত। এই সম্মেলন তা করতে পারে। আমি প্রস্তাব করছি যে, এই সকল দেশ থেকে প্রতিনিধি আহ্বান করে এই সম্মেলনকে প্রাচ্য শিক্ষার নিখিল-এশিয়া সম্মেলনে পরিণত করা হোক অবশ্য আমি এর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে বলছি না। উপযুক্তরূপ সাড়া পাওয়া গেলে অন্যান্য দেশের আমন্ত্রণ অনুসারে এই সম্মেলন ভারতের বাহিরে বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে পারে। স্বাধীন ভারত আজ এশিয়ার একটা বড় রাষ্ট্র হতে চলেছে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ বিচ্ছেদ নয়। আমরা রাজনীতিক নই, কিন্তু আমরা মনে করি ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া উচিত এবং ভারত যেন প্রাচীন সংস্কৃতির নিখিল-এশিয়া প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষার বাঁধন বিশ্বজনীন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের একত্র সম্মেলন শুভেচ্ছা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঐক্য সাধনে সহায়তা করবে। এশিয়ার দেশগুলিকে পরস্পরকে বুঝতে হবে এবং এইরূপ একটা সম্মেলন সেই বোঝা-পড়ার উত্তম স্থান। পরিকল্পনাটি বিরাট হলেও আমি আমাদের নতুন সরকারের সহানুভূতি অর্জ্জন করে এশিয়ার প্রাচ্য পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপক সৌভ্রাত্র সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করবার আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি।

আজ পৃথিবীতে প্রাচ্য পণ্ডিতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার আছে। বর্ত্তমান অন্ধকারের যুগে বস্তুবাদ আধ্যাত্মিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই বস্তুবাদ মানুষকে যন্ত্র ও পশুশক্তির আরাধনায় নিযুক্ত করেছে। এমতাবস্থায় নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অতীতের প্রতি আগ্রহ-সৃষ্টির দ্বারা মানসিক স্থৈর্য্য ও অনুভূতি ফিরিয়ে আনতে প্রাচ্যবিদ্‌গণের সম্মেলন বিশেষ সাহায্য করবে। বর্ত্তমান বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষের দিনে একমাত্র শান্তির স্থান হবে এই সম্মেলন। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হিন্দুরা শান্তির জন্য যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে লোকে শান্তি ও শুভেচ্ছার সন্ধান পাবে। বৈদিক মন্ত্রটি এই—

"যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং
সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ"।

অর্থাৎ এখানে যাহা কিছু ভীষণ, যাহা কিছু ক্রূর, যাহা কিছু অমঙ্গল, তাহার শান্তি হোক, তাহা কল্যাণে পরিণত হোক, সব কিছু আমাদের মঙ্গল বিধায়ক হোক।"

—হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনূদিত।

নগরবাসী

(পূর্বানুবৃত্তি)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

না, সোহাগ-আদরের ভণ্ডামি-ভরা স্বামীর প্রভুত্ব ঢের পর্য তার বিশ বছরের আনুগত্য ঘুচে যাবার একমাত্র বা আসল কার নয়। সত্য কথা বলতে কি, তাদের বিশ বছরের সাধারণ সম্পর্কে বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেনি, সুশীলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয় তার আসল উদ্দেশ্য ছিল না! ওই একপেশে কৃত্রিম স্বাধীনত সে চায়নি। সারা দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে নিজের স্বাধীন অর্জনের জন্য লড়ায়ে অংশ নেবার যে অধিকার দেশের মেয়ে-পুরু ছোট-বড় উঁচু-নীচু প্রত্যেকটি মানুষের আছে, নিজের সে অধিকারটুকু সে খাটাতে চেয়েছিল।

সুশীলের সঙ্গে তার লড়াইটাও আসলে তাই।

সুশীল স্বামী আর সে দাসী বলে নয়, দাম্পত্য জীবনে তাদ অনেক মিথ্যা আর অনেক ফাঁকি ছিল বলে নয়,—এখানে এ শুধু এই দিকটাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি, অসহ্য হয়ে ওঠেনি এখানে এসে জীবনের আরও একটা সত্যও বড় হয়ে উঠেছে ত কাছে, দেশের ও দশের মুক্তির জন্য যার যেটুকু সাধ্য না কর সে মানুষ থাকে না, পশু হয়ে যায়। প্রকারান্তরে পোষা পশু মতই মেনে নেওয়া হয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর প্রভুত্ব, যার যেটু লড়াই সেটুকু যদি সে না করে!

সুশীল তাকে এই লড়াইটুকু করতে দিতে চায়নি, স্বাধীনত সংগ্রামে সামান্য অংশটুকু না নিলে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকে যখন জেনে গেছে, তখন সুশীল তার এই অংশ নেবার জন্য অধিকার মানতে চায়নি!

এটাই তার ঘৃণা ও বিক্ষোভকে প্রচণ্ড করে তুলেছে। এ একটি দিকে স্বামিত্বের জোরে তাকে আটকাতে চেয়ে সব দি দিয়ে স্বামিত্বকে সুশীল তার কাছে অসহনীয় করে তুলেছে। কই ভয়ানক রকম মতবিরোধ আর প্রচণ্ড কলহ আগে কি তাদ আর হয়নি? কিন্তু অল্পেই মিটে গেছে সে-সব ঝগড়া! কা কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার লড়াই, আর সে লড়াই নিজের অংশটুকু গ্রহণ করে মনুষ্যত্ব বজায় রাখার প্রশ্ন উঁকি মারেনি তাদের কলহে, চরম বিচ্ছেদ ঘটে যাবার মত আপো হীনতার চরম পর্য্যায়ে উঠে যায়নি তাদের ঘরোয়া যুদ্ধ।

মণির মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছিল, সে লক্ষ্য কর ছেলে-মেয়েরাও বেশ ঘাবড়ে গেছে। ছেলে-মেয়েদের ম্লান বি মুখ আর স্তিমিত নিস্তেজ ভাবটাই তাকে পীড়ন করছিল সব বেশী।

সুশীলের সঙ্গে তার সংঘাতের আসল মর্ম বুঝতে পেরে তার ম ফিরে আসে, মুখের কালো ছায়া মিলিয়ে যায়। নিজের ভুল- আর দুর্ব্বলতার হিসাব-নিকাশটাও এবার সে করতে পারে। : চেয়ে বড় দোষ তার হয়েছে—কাণ্ডজ্ঞান হারাণো। এটা নিছ তাদের দাম্পত্য কলহ নয়, আদর্শের লড়াইও বটে, অথচ ক্রোধ ঘৃণায় দিশে হারিয়ে সুশীলকে সে শুধু আঘাতই করেছে, দূরে ঠে দিয়েছে। আদর্শকে তুলে ধরেনি, বাঁধবার চেষ্টা করেনি,—পা

কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা! এ কেমন মুক্তি ক্রীতদাসীর?

দু'দিন যেতে না যেতে সে টের পেতে থাকে, অত সহজ নয় স্বাধীনতা লাভ, অত সস্তা নয় মুক্তি। সব বজায় রইল, আইন-কানুন, নিয়ম-রীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, অবস্থা বদল হ'ল না দশ জনের, এক জন শুধু তার নিজের স্বামীটার সঙ্গে ঘরোয়া খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করে মুক্ত স্বাধীন নতুন জীবন আরম্ভে এনে ফেলল—এটা ছেলেমানুষী চিন্তা।

গোকুল যেমন বলে, বিদেশী বড়লাট দেশে ফিরে গেছে বলেই কি স্বাধীন হয়ে গেছে দেশটা? আর কিছু না পাল্টালেও? কৃত্রিম দেশ বিভাগ থেকে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলেও? আরেকটা সর্ব্বনাশা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র বিষবৃক্ষের চারার মত গজিয়ে উঠতে সুরু করলেও?

নিজের এত কালের আটঘাট-বাঁধা সাজানো-গোছানো অভ্যস্ত জীবন ওলোট-পালোট করে দিয়েছে—একটা আদর্শের জন্য! সুখের সংসারের ভিত্তিটাই ভেঙ্গে ফেলেছে। সব দিক দিয়ে জীবন এবার নতুন করে গড়তে হবে, এখন সুরু হল অনেক দিকে অনেক রকমের নতুন সংগ্রাম। এ জন্য দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, অতীত জীবনের মোহে কাবু থাকার অবস্থায়, মণির কিছু কিছু আফশোষ জাগে বৈ কি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। সাধারণ মানুষের ও রকম হয়েই থাকে। মণির এই আফশোষের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই এই জন্য যে নত হয়ে আপোষের চিন্তা তাতে কিছুমাত্র প্রশ্রয় পায় না।

মুখোমুখি লড়াইটা চরমে উঠেছিল, সুশীল চলে যাবার পর ধীর-স্থির ভাবে সব কিছু পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয় স্তরে নেমে আসে আবেগ উত্তেজনা, সমস্তটুকু মনের জোর প্রয়োগ করে জয়লাভের পর জয়টা কি ও কেমন হয়েছে, হিসাব না করে উপায় থাকে না।

সুশীলকে এত তীব্র ভাবে উগ্র ভাবে ঘৃণা করা কি করে তার পক্ষে সম্ভব হল? বিশ বছর যার সোহাগে-আদরে খুসী থেকে হাসিমুখে ঘর-সংসার করেছে, মা হয়েছে সন্তানের?

এখানে এসে মুক্ত স্বাধীন বৃহত্তর মহত্তর জীবনের স্বাদ পেয়ে টের পেয়ে গিয়েছে বলে যে খুসী থেকে হাসিমুখে করে এলেও আসলে সে দাসীত্বই করে এসেছে, সোহাগ-আদরটা ছিল তাকে ভুলিয়ে রাখার বখশিস? অর্থাৎ সোজা কথায় সে কি তার স্বামীকে ঘৃণা ও বর্জন করেছে শুধু এই জন্য যে আরও লাখ লাখ স্বামি-স্ত্রীর মত তাদেরও সম্পর্ক ছিল আদর-সোহাগের প্রলেপ মাখানো প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক? কোটি কোটি স্ত্রী যে সম্পর্ক মেনে চলেছে আজো, এখানে এসে সে এমনি এক মহামানবীতে পরিণত হয়ে গেছে যে, সে সম্পর্কটা তার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হল না?

সুশীল যেদিন চলে যায় সমস্ত রাত্রি এই চিন্তাই মণিকে [illegible] করে রেখেছিল।

তার পর দু'-চার দিনের মধ্যে সে যখন টের পেতে আরম্ভ করে ব্যক্তিগত ঘরোয়া যুদ্ধে এত বড় জয়লাভ করেও সে জগৎটাকে [illegible] বদলাতে পারেনি, তার সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জলাঞ্জলি [illegible] মত ত্যাগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি, শুধু নিজের মানুষ হিসাবে বাঁচার প্রয়োজনেই দাঁতে দাঁত লাগিয়ে [illegible] হয়ে এই জয়লাভ করা তার দরকার ছিল, তখন ধীরে আসল কথাটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

...তে চায়নি। সে চেষ্টা করলে চোরা-কারবারী বন্ধুর উস্কানিতেও ...লা হয়তো এতটা বিগড়ে যেত না।

...শীল আদালতে নালিশ করার পর এই কথাটা আরও বেশী ... তার মনে হয়েছে। সুশীল এ ভাবে সোজাসুজি মামলা করতে ... প্রতিহিংসার জ্বালায়, এ যেন বিশ্বাস করা যায় না।

প্রণব বলে, পিছনে তো আছে আরেক জন, তাকে ভুলো না। ...য় পেয়েছি, যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে দাদা যতীনের কারবারে ...লেছে। জমিটা বেচেছে, আপিস থেকে যতটা পারে লোন ...য়েছে—

আমার তোলা গয়নাগুলিও নিয়ে গেছে। লাখপতি হবার এ ...ত কেন ঘাড়ে চাপল ঠাকুরপো?

লাখপতি ভূত ঘাড়ে চেপেছে যে! ছেলেবেলা দেখেছি, ওই ...কটি সত্যিকারের বন্ধু ছিল। বন্ধু ঠিক নয়, নেতা। যতীন যা ...লে, যতীন যা করায়, তাই সই। এত কাল পরে আবার তার ...াল্লায় পড়েছে। অনেক সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল তো, সেগুলি ...টেনি। যতীন আজ ভরসা দিয়েছে স্বপ্ন সফল করে দেবে, জীবনটা ...র্থক করে দেবে। দশ কাঠা জমি দিয়ে কি হবে, একতলা ... দোতলা একটা ইটের কুড়ে তৈরী করার বেশী যদি সাধ্য না হয়? ...নের মত পাঁচ-সাতটা প্রকাণ্ড বাড়ী ছাড়া বেঁচে সুখ কি?

মণি অধীর হয়ে বলে, তা তো বুঝলাম ঠাকুরপো, হাড়ে-নাড়ে ...লাম। অত ব্যাখ্যা কোরো না। কিন্তু বড়লোক বন্ধু বড়লোক ...রে দেবে বলে সংসার—ছেলে-মেয়ে ভেসে যায়?

ভেসে গেল কোথায়? তাহলে কি নালিশ করে?

মণির যেন চমক ভাঙ্গে। তাই বটে, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ...লে-মেয়ের অভিভাবকত্ব, পৈত্রিক বাড়ীর অংশ,—এ সবই তো ...শীলের নালিশ। মণি সুশীলকে জানে, আইন-আদালত-পুলিশের ...হায্যে স্ত্রী-পুত্র আর সুখী দাম্পত্য জীবন পাওয়া যায়, এটা বিশ্বাস ...রার মত ছেলেমানুষ সুশীল নয়। কোন কোন দিকে বুদ্ধি তার ...ই কম হোক। এ শুধু একটা চাল, বাঁকা ভাবে চাপ দেওয়া— ...াপোষের জন্য। আদালতের সমনটা আসলে সুশীলের বাঁকা ...ঘোষণা,—এখনো মিটমাট করো, আমায় মেনে নাও, নইলে আদালতে ...প্রকাশ্য ভাবে কুৎসিত অপমান মানতে হবে, খবরের কাগজে কেচ্ছা ...য় হবে।

কিন্তু সুশীলের কি মান-অপমান জ্ঞান নেই? সে কি জানে ...য় তার স্ত্রী-পুত্রের অপমানে, পিতৃপুরুষ আত্মীয়স্বজন-ভাইদের ...অপমানে তার নিজেরও অপমান?

প্রশ্ন শুনে প্রণব মুখ বাঁকায়। বলে, তাই তো শুধু দাবীর নালিশ ...করেছে। একটা আমগাছ নিয়ে এ রকম মামলা করা চলে। ...তোমার আমার অপমান গায়ে লাগবে বলেই নিজের মান বাঁচিয়ে ...নালিশ করেছে। নইলে—নইলে?

প্রণবের মুখ দেখে মণির ভয় করে!

—নইলে নালিশটা যত দূর পারে বীভৎস, কুৎসিত করে তুলত। ...নিজের লজ্জা-অপমান গ্রাহ্য করত না, আমাদের অপদস্থ করতে পারলেই ...হল। আমাদের সঙ্গে তোমার খারাপ সম্পর্ক, তোমাদের আটকে রেখে ...জোর-দখল করছি, তোমাকে দিয়ে আমাকে দিয়ে ... করছি—

ছি! ছি!

কেন মণি বৌদি? মূর্চ্ছা যেতে বসলে কেন? খবরের কাগজে কি এ রকম মামলার বিবরণ পড় না? আজকের কয়েকটা কাগজেই আছে—নামকরা কাগজ, অনেক বিক্রী। একটার প্রথম পাতায় চার-পাঁচ কলম জুড়ে স্বাধীনতা আসছে, তার পাশে দু'কলম জুড়ে মামলার খবর। এক জন শিক্ষিত পদস্থ লোক তার স্ত্রী আর শ্বশুর শালাদের নামে—

থাক, আর শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে ছাড়ছে কে মণি বৌদি? দাদা যে পথ ধরেছে সেটা বড় পিছল। আজ এইটুকু পেরেছে, দু'দিন পরে চরম নালিশের সমন আসবে না—এটা ধরে নিও না।

মণির মুখ দেখে প্রণব ভরসা দিয়ে বলে, তবে পথটা পিছল বলে সবাই যে গড়িয়ে যায়, তা নয়। মানুষ তো—সামলে চলার ঝোঁকটাই স্বাভাবিক। আমি শুধু বললাম যে অসম্ভব নয়, এইমাত্র। কাজেই ভড়কে যেও না।

মণির কথা শুনে বোঝা যায় ভরসা তার দরকার ছিল না। সে মাথা নেড়ে বলে, না ঠাকুরপো, আমি বিশ্বাস করি না। অতটা নামা তোমার দাদার পক্ষে অসম্ভব।

তুমি কেবল দাদাকে দেখছ। আমি দেখছি পিছনে দাদার বন্ধুটিকে। মণির চেয়েও সাংঘাতিক ভূত ঘাড়ে চেপেছে, এ সব নালিশ-টালিশ সব তার বুদ্ধি-পরামর্শ।

এ আরেকটা দিক্, মণির কাছে যার তাৎপর্য্য ঠিক মত ধরা পড়েনি। যার কথায় তাদের বরবাদ করে নিয়ে যথাসর্বস্ব চোরা-কারবারে ঢালতে পেরেছে, সুশীল যে তার কতখানি বশম্বদ সেটা ক্রমে ক্রমে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

এ কথাও তার মনে হয় যে, শুধু ওই লোকটার জন্য সুশীল এ ভাবে বিগড়ে গেছে। ওর সংস্পর্শে না এলে সুশীল হয়তো তাদের পথেই ঝুঁকত, অন্য দিকে যেত তার মনের গতি!

মণি প্রশ্ন করে, আমরা এবার কি করব?

প্রণব বলে, সব দাবী-দাওয়া মেনে নেব। বলব যে নালিশ মিছে, তার কোন অধিকার কেউ অস্বীকার করেনি। তিনি আসুন, স্ত্রী-পুত্রের অভিভাবক হোন, বাড়ীর অংশ দখল করুন।

শেষকালে হার মানব!

হার মানবে? হার কিসের?

আমায় তো কান ধরে টেনে নিয়ে যাবে?

প্রণব হাসে, যার যাবার ইচ্ছা নেই, কেউ তাকে কান ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারে? যে পথে চলতে চায় না, সে পথে চালাতে পারে? সৈন্য-পুলিশের সাঁড়াশি দিয়ে কান টানলেও কানটা হয় তো ছিঁড়ে যায়, প্রাণটা হয় তো বেরিয়ে যায়, কিন্তু মানুষটা নড়ে না মণি বৌদি!

কিন্তু আমি যে দাবী মেনে নিচ্ছি—

কি দাবী মেনে নিচ্ছ? কান ধরে টানলেই সঙ্গে যাবার দাবী? যা হুকুম করবে তাই তুমি করে যাবে, এই দাবী? যন্ত্রের মত ... কয়ার স্বভাবটা ছাড়ো তো মণি বৌদি! নইলে এ রকম সস্তা ... ভড়কেই যাবে, শুধু কিছু করতে পারবে না।

প্রণব একটু থামে, শান্ত স্পষ্ট কথাগুলিতে জোর দিয়ে বলে, ... নাবীর সমন এসেছে, তার একটাও তুমি অস্বীকার করনি। এ সব নিয়ে তোমাদের ঝগড়া নয়। আইন-সঙ্গত কেন, তুমি সমাজ-সঙ্গত স্ত্রী, এই সোজা সত্যটা কেন অস্বীকার করতে যাবে? নাবালক ছেলে-মেয়ের অভিভাবকত্ব তার বাপের, এটাই বা মানবে না কেন? স্ত্রী বলেই স্বামীর হুকুমে তুমি গলায় দড়ি দেবে কি দেবে না, সে হল আলাদা কথা। বাপ চুরি করতে বললে নাবালক ছেলে-মেয়ে চুরি করবে কি করবে না, সেটা আলাদা কথা। আইন-আদালতের সাধ্য আছে এখানে নাক গলায়?

কিন্তু—

তোমার কিন্তু বুঝেছি। স্বামীর অবাধ্য হলে স্বামী বড় জোর ভাত-কাপড় দেওয়া বন্ধ করবে—ওটাই তো আসল সম্পর্ক। ছেলে-মেয়ে অবাধ্য হলে বড় জোর তাদের ত্যাজ্য করবে—খেতে-পরতে দেবে না, সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব দেবে না।

এবার ব্যাপার বুঝে মণি কথা বলার বদলে কৌটো খুলে একটা পান মুখে দেয়। বাসি পান, কালকের সাজা। আদালতের মারফৎ স্বামীর সমন পাবার পর পান খেতেও তার সাধ যায়নি!

গোকুল এসে জুটেছিল, এতক্ষণ একটি কথা কয়নি। বলতে হলে গোকুলও কি কম কথা কয়! অথচ চুপ করে থাকার অসাধ্য সাধনাও এই বয়সে সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে।

এতক্ষণে গোকুল বলে, আমায় একটা পান দিন। সর্দ্দি-জ্বরে মুখটা বিশ্রী লাগছে।

ওমা, সর্দ্দি-জ্বর না কি তোমার? ঠাণ্ডা লাগিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

ঠাণ্ডা লাগাইনি। কড়া জোলাপ খেয়ে শোব, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

কল্পনা কি ছিল, আর আজ মেয়ের কি পাত্র পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে, পার্থক্যটা বাস্তবতার কঠোর স্পষ্টতা নিয়ে মনে ভেসে আসে মণির। রূপসী মেয়ে ছিল, কুরূপা বিক্ষতা হয়ে গেছে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ের বাজারে তার দাম গেছে কমে, শূন্যের কাছে। নতুন জীবন গড়ার কাজে রত এই সুস্থ সমর্থ বুদ্ধিমান প্রতিভাবান তরুণ মনুষ্যত্বের মূল্যকে সে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই মেয়ের।

নগদ টাকা গয়না-গাঁটি দান-সামগ্রী সমেত সুন্দরী মেয়েটিকে ভাল একটি ছেলের হাতে সঁপে দেবার দুশ্চিন্তায় কত কাতর ছিল সে আর সুশীল! মেয়ের আজ রূপ নেই, চাকুরে বাপও নেই!

সুশীল চলে যাবার পর একটা আতঙ্ক জেগেছিল মণির,— ... হয়তো পিছিয়ে যাবে! তার মনে সত্যই একটু খটকা ... যে, মেয়েটা কুৎসিত হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে ভালবাসা বোধ ... -বয়সী ছেলেটার প্রথম প্রেমের মহৎ ঝোঁক। কিন্তু কুৎসিত ... উপর মেয়েটার দীনহীনা হওয়ার চোট কি সইবে এ প্রেমের!

... দিন গোকুলের রকম-সকম দেখে মণি লজ্জার সঙ্গে নিজের ... স্বীকার করেছে যে, সারা জীবন ক্ষুদ্রতা আর হীনতাকে বড় ... দেখে দেখে তার নজরটা ছোট হয়ে গেছে, চিনেও সে মানুষ ... দিশা করে!

... ভাগ হয়ে যাবে, দেশের দু'টো টুকরোর প্রত্যক্ষ শাসনের ... পাবে কংগ্রেস ও লীগের প্রধানেরা। সময় ঘনিয়ে এসেছে।

জল্পনা-কল্পনা আর পরিকল্পনার জোয়ার এসেছিল—প্রায় তা ... পরিণত হয়েছে। আশা-হতাশা আনন্দ-বেদনা প্রীতিবোধ ... লোভ ক্রোধ ঘৃণার পাশাপাশি মেশামেশি কী উলঙ্গ উত্তাল রূপ ...

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঝিমিয়ে গিয়ে রূপ নিয়েছে ওলট-পালটের ...

সে কি ওলোট-পালাট! ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়ে ... মারাত্মক বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে। অশান্তি উদ্বেগ ঝঞ্ঝাট ... প্রাণশক্তির ক্ষয় ও সম্পদের লোকসান—এ সবের সীমা-পরিসীমা থাকছে না।

বিশেষতঃ যাদের ছড়ানো স্বাভাবিক জীবন কৃত্রিম স্থানে ও স্থা... ভাগ হয়ে যেতে বসেছে। প্রাথমিক গুরুত্ব সরকারী কর্ম্মচারীদের উচ্চপদস্থদের—স্থান বা স্তান বেছে নেওয়া। সরকার সবার উপ... সরকারী চাকরদের সমস্যাকে তাই প্রথম সরকারী স্বীকৃতি।

মুখ ম্লান হয়ে গেছে স্তান ও স্থানের হিন্দু ও মুসলমানের। মারাত্মক আত্ম-হননের মধ্যে জন্মেছে স্থান ও স্তান, কে জানে ... ভাগাভাগিতেই তার ইতি কি না?

সহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা ঘর-বাড়ী ফেলে পালিয়েছি... ভারাক্রান্ত বুক ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক প্রাণে নিয়ে ... ধীরে তাদের ফিরে যাবার প্রক্রিয়া সুরু হয়েছে। বস্তিবাসী অনে... ফিরে যাবার বালাই নেই, ঘর পুড়ে গেছে কিম্বা যথাসর্ব্বস্ব ... হয়েছে। অনেকে ফিরে যাবার উপায় থাকলেও যেতে চায় ... অন্য ব্যবস্থা করেছে বা করছে। অথবা করার কথা ভাবছে।

এ পাড়ার বস্তির পোড়া ঘরগুলি তেমনি পড়ে আছে, ... পোড়া বাঁশ আর দরজার কাঠ কিছু সাফ হয়েছে হাতে-হাতে। নানীর মরণ থেকে যে হাঙ্গামার সুরু, তার ধাক্কায় এ ছোট ব... মানুষগুলি কাছের বড় বস্তিতে চলে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে তা... দু'-চার জনের চেনা-মুখ এ পাড়ার পথেও দেখা যায়।

পার্ক সার্কাস থেকে উৎখাত উষার নিরীহ গোবেচারী স্বামী কণ্ঠে বাড়ী ফিরে যাবার কথা বলে। নিজেদের বাড়ী, কত করে কত কষ্টে তৈরী করা বাড়ী!

উষা বলে, না বাবা, আমার কাজ নেই নিজের বাড়ীতে গি... ও-বাড়ী তুমি বেচে দাও।

এখানে, মানে কলকাতায় আর ভয় কি আছে? কলকাতা হিন্দুস্থানে হল?

ও-সব বুঝি নে আমি! আমি যাব না।

উষার একটা অন্ধ বিদ্বেষ আর আতঙ্ক জন্মে গেছে সাধারণ ... দিষ্ট এক দল মানুষের বিরুদ্ধে, যারা তার কাছে মুসলমান। উ... বসতে সে মুসলমানদের গাল দেয়। রক্ত-মাংসের জীবন্ত মুসল... দেখে কিন্তু সে এতটুকু ঘৃণা রাগ বা ভয় অনুভব করে না। ... কাসেমেরা প্রণবদের কাছে আসা-যাওয়া করে, দরকার হলে ... দরজা খুলে তাদের ছাতে নিয়ে যায়, চা খেতে দেয়—কথা শোনে। মনসুর আর রশোনার সঙ্গে তার গলায়-গলায় ... হয়েছে। ওরা ধৈর্য্য ধরে তার একঘেয়ে সুখ-দুঃখের কাহিনী ... বলে, বাড়ীর লোকের চেয়ে ওদের কাছে নিজের কথা বলতে সে বেশী ভালবাসে। বলতে বলতে মুসলমানদের গাল দিয়েও ফ...

মনসুর মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। রশোনা মৃদু হেসে ... আমরাও কিন্তু মুসলমান!

উষা তাড়াতাড়ি বলে, না না, ছি ! আপনাদের কিছু বলিনি !

মনসুর বলে, সেটা না বলতেই বুঝেছি। কাদের বলছেন জানেন না, তারা শুধু মুসলমান। মুসলমান হয়েও তারা যে [illegible] ধরে সাধারণ গরীব মুসলমানের ঘাড় ভাঙছে, মুসলমানেরাই সেটা টের পেতে আরম্ভ করেছে, আপনার দোষ কি।

কেবল নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতেই নয়, ছাতে নানা [illegible] নিয়ে সকলের আলোচনা শুনতে শুনতেও গরম হয়ে গাল বসে, মনসুর রশোনা কাল্লু কাসেমদের সামনেই।

প্রণব-গোকুলদের খোঁচা দিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে উষা বলে, [illegible]রা বিপ্লবী না হাতি ! ওদের জিততে দিলে, তোমরা আর বলো না।

প্রণব বলে, কাদের জিততে দিলাম ?

কাদের আবার, যাদের জন্য আমার আজ এই দশা ! নিজের বাড়ী থাকতে চোরের মত এখানে পালিয়ে রয়েছি। বলতে বলতে গরম হয়ে উষা অভিশাপ দেয় !

তার গোবেচারী স্বামী বিব্রত হয়ে বলে, আহা, চুপ কর না !

মনসুর নির্ব্বিকার হয়ে থাকে, রশোনার মুখখানা একটু ম্লান হয়।

প্রণব সোজাসুজি বলে, এরাও মুসলমান কিন্তু উষা।

উষা তাড়াতাড়ি বলে, না না, ছি ছি ! ওদের কিছু বলিনি !

মনসুর বলে, আপনার বলতে হবে না, সেটা জানি ! কাদের দিচ্ছেন আপনি জানেন না, তারা শুধু মুসলমান। আপনার দোষ নেই, বেশীর ভাগ মুসলমানেরাই জানে না মুসলমান হয়ে কারা তাদের ঘাড় ভাঙছে, হিন্দু-রাজত্বের ভয় দেখিয়ে বৃটিশ-রাজত্বের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছে।

রশোনা সখেদে বলে, সত্যি, ভাবলেও বুক জ্বলে যায়। রাজনীতি না বুঝুক, এই সোজা কথাটা সাধারণ মানুষ বোঝে না ? হিন্দু-মুসলমানে লড়তে হয়, ভিন্ন রাষ্ট্র দরকার হয়, পরেই নয় লড়ব, বৃটিশরাজ ঘাড়ে চেপে আছে, ওটাকে আগে খতম করি !

গোকুল মৃদু হেসে বলে, সাধারণ মানুষকে অত বোকা ভেবো না ছোট মাসী। সোজা কথা যদি না বুঝত, সহজে ভোলানো যেত, দেশটা ভাগ করার দরকার হ'ত না। বৃটিশরাজকে খতম করেছে জেনেছে বলেই ঘর-ভাগাভাগির লড়াইটা তারা ঘটতে দিয়েছে। এই তো মোক্ষম চাল বৃটিশের। বৃটিশরাজ ঘোষণা করেছে, আর আমি খতম হয়েছি, তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে এ দেশ ছেড়ে এখন পালাতে পারলে বাঁচি—কিন্তু যাবার আগে এসো তোমাদের ঘরের বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই। দু'শো বছরের বাপ আমি, দু'শো বছর ধরে কত কষ্টে কত যত্নে লালন-পালন করে তোমাদের সাবালক করলাম, আমি চলে গেলে তোমরা মারামারি করে মরবে, সমুদ্র-পারে গিয়েও সেটা কি করে সইব বল ?

মণি মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গোকুলের ঘৃণায় বিকৃত মুখের দিকে। [illegible] হতে চলেও ক্রমে ক্রমে সে প্রায় ভক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে গোকুলের।

গোকুল তপ্ত নিশ্বাস ফেলে। আবার বলে, সত্যি সত্যি এবার লজ্জা পেয়ে যাচ্ছি বিশ্বাস জন্মাতে না পারলে কংগ্রেস-লীগ

সরস্বতীও বৈঠকে এসে বসে। তার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঘটনাচক্রে এমন যোগাযোগ হওয়াও অসম্ভব নয় যে, পনেরই আগস্ট স্বাধীনতার জন্মের সঙ্গে তার সন্তানও জন্ম নিয়ে বসবে। মাঝখানে কাবু হয়ে পড়েছিল, আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, একটা অদ্ভুত বেপরোয়া সাহস এসেছে তার।

হাসপাতালে মরলে গিরীন স্বর্গে যেত, মরেনি বলে হাসপাতাল থেকে সোজা জেলে গেছে—স্বাধীনতাদাতা বৃটিশরাজের বে-আইনী বিনা বিচারে আটক আইনে। খবর শুনে দেহের জড়তা আর অস্বস্তিবোধ কাটিয়ে উঠে মরিয়া হয়ে গেছে সরস্বতী। ডাক্তারের প্রত্যেকটি নির্দেশ ভঙ্গ করছে। তাকে বিয়োতে তার মা মরে গিয়েছিল। কিন্তু তার ঠাকুরমা না কি দশ মাস পর্য্যন্ত মস্ত সংসারের হাঁড়ি ঠেলত, প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়ে বলত, মা গো, গেলাম !—বলে উঠানে তৈরী অস্থায়ী আঁতুড়ঘরে গিয়ে দু'দণ্ডে বিনা কষ্টে মা হত ! সরস্বতীও তাই ঠিক করেছে এই অন্যায় অনিয়মের জগতে একটা নিয়ম অন্ততঃ মানবে—মা হওয়া সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার ! এতটুকু কাবু হলে চলবে না।

সরস্বতী বলে, যাই হোক, এবার তো শান্ত হয়েছে দেশটা ? ভাল হোক, মন্দ হোক, একটা মীমাংসা হয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে রোজ মারামারির চেয়ে ভাগাভাগি হওয়া ভাল। ভাব হতে আর তো বাধা রইল না, এবার নিশ্চিন্ত মনে যাচাই করা যাবে, কেমন স্বাধীনতা পাওয়া গেছে।

প্রণব একটু হাসে, মনসুরের মুখেও মৃদু হাসি ফোটে। রশোনা দ্বিধার সঙ্গে বলে, কে জানে মিটমাট হল কি না !

গোকুল বলে, কি করে মিটমাট হয় ? ভাগাভাগিতে যার স্বার্থ, সেই হল ভাগ-বাটোয়ারা মিটমাটের মধ্যস্থ, কত বিষয়ে কত মামলা বাধার রাস্তা খোলা রয়েছে জানো ? সত্যি যদি বৃটিশ চলে যেত, এত কাল ধরে বৃটিশ যে জোড়াতাড়া তৈরী করে গেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে সত্যি যদি হিন্দু-মুসলমান নিজেরা মারামারি করে অর্দ্ধেক সাবাড় হয়ে গিয়েও নিজেরা একটা মিটমাট করত, তাহলে বরং একটা স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব ছিল। বৃটিশ করাচ্ছে মারামারি, বৃটিশ করে দিচ্ছে ভাগাভাগি মিটমাট, সে কি হিন্দু-মুসলমানে মিল হবার জন্য ? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাতে রাষ্ট্রগত যুদ্ধে দাঁড়ায় তার ভিৎ গাঁথা হচ্ছে।

যুদ্ধ বাধতে পারে ?

প্রভুদের প্রয়োজন থাকলে বাধাবার চেষ্টা হবে। তবে, দেশের লোকের সায় না থাকলে তো আর যুদ্ধ হয় না। ক'দিন আর লাগবে এ স্বাধীনতা তিতো হতে, দেশের লোকের চোখ খুলতে ? যাদের গর্জ্জনে বৃটিশ পিছু হটেছে, আবার তাদের গর্জ্জন শোনা যাবে হিন্দুস্থানে, পাকিস্তানে—সত্যিকারের স্বাধীনতা চাই, সাধারণের গণতন্ত্র চাই।

প্রণব মৃদু স্বরে বলে, অনেক কালের পরাধীনতা গোকুল, দৃষ্টি বাঁকা হয়ে আছে অনেক ভাবে। হাজার বছরের কুয়াশায় দেশে চারি দিক ঝাপসা হয়ে আছে। চোখ খুললেই কি শত্রু-মিত্র চেনা যায়, সত্য চোখে পড়ে ? অত সোজা করে দিও না ব্যাপারটা !

গোকুল একটু লজ্জিত হয়ে বলে, না, সোজা করিনি। আমি কি জানি, না, ঠিক বুঝতে পেরে গেছি কি ভাবে অধিকার কি হবে !

... মোটামুটি বা ঘটবেই সে কথা বলছি। চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমানকে তো চিরকাল বিদেশী আর স্বদেশী দালালরা শোষণ করতে পারবে না।

প্রণব হাসিমুখেই বলে, চিরকাল মানে জানো তো? দু'শো চারশো বছর না হয় ধরলাম না, দশ-বিশ বছর তো ধরতে পারি? এতেই তুমি খুশী যে আরও দশ-বিশ বছর চললেও তার বেশী তো চলবে না?

গোকুল জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় না। আজ সাধারণ লোকের মধ্যে যে চেতনা এসেছে, ষড়যন্ত্র ভাঁওতা সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারলেই—

প্রণব বলে, এইখানেই তুমি সোজা করে দিচ্ছ ব্যাপারটা। সাধারণ লোকের চেতনা আজ ষড়যন্ত্র ভাঁওতা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার বেশী রকম প্রতিকূল। দেশ যারা ভাগ করেছে, এখনকার মত তারাই দখল করে বসেছে চেতনা। স্বাধীনতা নিয়েই সবাই মশগুল, চিন্তিত। তা ছাড়া, এ চেতনা বহু কালের জঞ্জালে আবিল হয়ে আছে। প্রাণ দিয়েও ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করে এ চেতনাকে আরও সচেতন করার সাধ্য তোমার-আমার নেই। অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে এবার ষড়যন্ত্রের মুখোস খুলে দিতে হবে, এক হয়ে যেতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তারা এবার নিজেরাই হিসাব-নিকাশ নিয়ে বসবে কি পেলাম আর কি পেলাম না—নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচাই করবে। সঙ্কট বাড়বে, বঞ্চিত হতে হতে লোভ বাড়বে। এর সঙ্গে যদি চলে চেতনাকে সাফ করা, দেশ-বিদেশে ছড়ানো বজ্জাতির আসল চেহারা চিনে চিনে নেওয়া, তবে হয়তো বছরও ঘুরবে না, চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমান গর্জ্জন করে উঠবে। নইলে সব ভেস্তে দেবে বজ্জাতেরা। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার রাজপথ তো আছেই, আরও কত অন্ধকার অলিতে-গলিতে ঠেলে দিয়ে চেপে পিষে ঠেকিয়ে রাখবে দেশটার সভ্য স্বাধীন জগতে মাথা তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াবার সাধ।

গোকুল সতেজে বলে, এ সব তোমার বাজে আতঙ্ক! শ্রমিক জেগেছে, চাষী জেগেছে, মধ্যবিত্ত জেগেছে—কারও সাধ্য আছে এবার তাদের ঠেকিয়ে রাখে? আজ সাহস করে ডাক দিলে তারা সাম্রাজ্যবাদের, ধনতন্ত্রের বনিয়াদ ছারখার করে দেবে।

প্রণব ধীর কণ্ঠে বলে, তা দেবে। কিন্তু শুধু ডাক দিলেই দেবে? এতখানি প্রস্তুত আর সচেতন হয়ে আছে তোমার দেশের মানুষ?

গোকুল সতেজে বলে, আছে। চরম বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়ে ...

... চিন্তিত ভাবে তাকায় গোকুলের দিকে, উপস্থিত সকলের ... সে লক্ষ্য করছিল প্রথম থেকেই। গোকুলের কথা ... তে আবেগের তাপে যেন স্ফুরিত হচ্ছিল সকলের মুখ-... র মত দু'-এক জন ছাড়া। তার কথা শুনতে শুনতে ... গিয়েছিল মুখগুলি, গোকুলের সতেজ উগ্র প্রতিবাদে ... ার কেটে গেছে মুখগুলি থেকে।

... বাঁকিয়ে বলে, তোমাদের সঙ্গে পারি না সত্যি। কি ... াম, কি নিয়ে তোমরা মেতে গেলে। ধন্যি বাবা ...! এমনিতেই কি পাঞ্জাবী ভিজে গেছে? কথা হচ্ছে মুসলমানদের বজ্জাতির, তোমাদের সুরু হল স্বাধীনতা, বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদ, হাতি-ঘোড়া! ধন্যি তোমাদের!

উষারা পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে ফিরে যায় স্বাধীনতা দিবসের দিন তিনেক আগে।

তার নিরীহ গোবেচারী স্বামী তাকে এক দিন বলে, তোমার যেতে হবে না ও-বাড়ীতে। বাড়ীটা বেচেই দেব আমি। শুধু একবার বেড়িয়ে আসি চল, দেখে আসি বাড়ীটা কেমন আছে।

এমন ভাবে সে বলে যেন ইট-সুরকির বাড়ী নয়, জীবন্ত কোন রুগ্ন পরমাত্মীয় কেমন আছে একবার দেখে আসার কথা বলছে।

তবু উষা বলে, ওরে বাপ রে!

কিন্তু সে যায়। গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করে তারই বাড়ীর আশে-পাশে মহা সমারোহে স্বাধীনতা দিবসকে বরণ করার আয়োজন চলছে। স্বাধীনতা দিবস বলে নয়, দুর্গাপূজা হোলির মত উৎসবের আয়োজন।

পরদিন উষা মালপত্র এবং স্বামী পুত্র নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যায়।

তারা যায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে, সন্ধ্যার পর প্রণব বাড়ী ফিরে মণিকে বলে, মণি বৌদি, কাল একবার যাবে তোমাদের বাড়ীটা দেখে আসতে?

মণি উষা নয়। সে ধীর কিন্তু উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে বলে, ব্যাপার কি ঠাকুরপো?

ব্যাপার কিছু নয়। বাড়ীটা একবার দেখে আসব।

মণি শান্ত কিন্তু কড়া সুরে বলে, ব্যাপার কি ঠাকুরপো?

প্রণব একটু ভেবে বলে, তবে তোমায় খুলেই বলি। সকালে বলব ভেবেছিলাম।

খুলেই বল।

বন্ধুটি দাদাকে পথে বসিয়েছে।

মানে?

লাখপতি হবার লোভে যথাসর্বস্ব বন্ধুর চোরা-কারবারে ঢেলেছিল। বাড়ীটা পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে টাকা তুলেছিল। কাল যতীন ওকে দরোয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে।

মণি চুপ করে থাকে। সুধীন ও আশা এসে দাঁড়াতে প্রণব তাদের বলে, তোরা একটু ঘুরে আয় তো গিয়ে, আমরা একটা পরামর্শ করে নি।

মণি বলে, ওরা থাক।

প্রণব ঘামে-ভেজা গেঞ্জি-পাঞ্জাবী ছাড়ে। গামছা টেনে নিয়ে গা মোছে। শুধু তাকে নয়, সুধীন আশার সামনেও সব কথা খুলে বলবে কি না চিন্তা করার অজুহাত বলে এটা মণি নীরবে সহ্য করে যায়। সুধীন আশাদের প্রসব করার আগে তার যে রকম উদ্বেগ ব্যাকুলতায় ভারাক্রান্ত ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা এসেছিল, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার খবর শোনার প্রস্তুতি হিসাবে তার প্রায় সেই রকম ধীরতা স্থিরতা এসেছে এখন।

হোগলার চালার নীচে শুধু তারে ঝোলানো বালবটা জ্বলছে। প্রণবের এটা আস্তানা, এত সে খাটে অথচ তার এই আস্তানায় এলোমেলো ভাবে স্তূপাকার বই, লেখা ও সাদা কাগজগুলি চাপা ...

[illegible] কাজে লাগানো হয়েছে একখানা বই। কে জানে কি করে দিতেও লেখাপড়ারও সময় করে নেয় অফুরন্ত কাজের মধ্যে।

গামছাটা কোমরে বেঁধে প্রণব বলে, যতীনের সঙ্গে আজ দাদার মারামারি হয়ে গেছে। যতীন পুলিশে দিয়েছিল, সুকুমার বাবু জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। তার কাছে শুনলাম।

খুন করতে গিয়েছিল, না?

মণির প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য্য হয়ে প্রণব বলে, কি করে জানলে?

মণি বলে, এ তো জানা কথা। বন্ধুর হাতের পুতুল ছিল, বন্ধু ঘাড় ভেঙ্গে ডুবিয়ে দিয়েছে, আপন জনের সঙ্গে পর্য্যন্ত ছাড়াছাড়ি করিয়েছে। প্রথম ঝোঁকটাই হবে বন্ধুকে খুন করা।

একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে মণির। জামিনের কথা বললে, [illegible] বেঁচেছি। খুন করলে তো জামিন দেয় না।

খুন করলে অসুখী হতে?

হতাম। একটা জানোয়ারকে মেরে দশ-বিশ বছর জেল খাটবে?

ঠিক বলেছ। তার চেয়ে বরং যাতে সব চোরা-কারবারীর ফাঁসির ব্যবস্থা হয় সে জন্য জীবন উৎসর্গ করা ভাল। তবে ভেবো না, যতীনের অবস্থাও দাদার মতই হবে। বেশী দেরী নেই।

কি করে?

দাদাকে যেমন যতীন পার্টনার করেছিল, যতীনও তেমনি জীবনলাল মাড়োয়ারীর পার্টনার। লাখোপতি হাত মিলিয়েছে কোটিপতির সঙ্গে, পুঁটি মাছ-খেকো রুই মাছ গেছে রাঘব বোয়ালের কাছে। কি হবে তা তো জানা কথাই, স্বাধীনতাটা একবার আস[illegible] দাও।

মণি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। দ্বিধার সঙ্গে বলে, দেখা ক[illegible] না কি?

—করেছি। ভালই আছে। তোমরাও চল না কাল সকালে?

প্রণবের প্রথম কথাটা মণি ভুলে গিয়েছিল। প্রণব বাড়ী [illegible] তাকে প্রথমে শুধু পরদিন সকালে তাদের ফেলে পালিয়ে [illegible] বাড়ীটা দেখে আসার কথা বলেছিল। এতক্ষণে মণি যোগা[illegible] খুঁজে পায়।

তাই সকালে ও-বাড়ীটা দেখে আসার কথা বলছিলে? কিন্তু যেখানে থাকে সেখানে না গিয়ে খালি বাড়ীতে গেল কেন?

তা তো জানি না।

মণি আর্ত্তনাদের সুরে বলে, ঠাকুরপো! শীগ্‌গির একটা ট্যাক্সি ডাকো। এত বোকা তুমি?

প্রণবও চমকে উঠে বলে, সত্যি তো!

মণি অধীর হয়ে বলে, ট্যাক্সি ডেকে আনো একটা।

সুধীন বলে, চলো না বেরিয়ে পড়ি, রাস্তায় ট্যাক্সি নিয়ে নেব। গিয়ে ডেকে আনতে দেরী হবে।

চার জনে তারা দ্রুত পদে রাস্তায় নেমে যায়। সরস্বতী প্রশ্ন করে, কিন্তু চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেবার সময়ও তাদের নেই। সরস্বতী ও গোকুল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তার পর গোকুল ব্যাপার জানতে দ্রুতপদে এগিয়ে তাদের সঙ্গ নেয়।

সমাপ্ত

স্বপ্ন-প্রসবিনী

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঞ্জ পুঞ্জ কালো কালো ধোঁয়ার আড়ালে
অস্পষ্ট নগরী,
সেখানে বেদনা বহু
পরিমিত অক্ষরের পরিচিত বহু কলবর
জ্বালামুখী রৌদ্রস্নাত যন্ত্রণা অগাধ।

সে যন্ত্রণা সয়ে সয়ে তবু প্রতিদিন
অপার ক্লান্তির কাদা মেখে
অপরূপ অনিমেষ আকাশের নক্ষত্রের দিকে
সে নগরী ফিরে ফিরে আসে,
নগরীর সমস্ত পিপাসা
সে নক্ষত্র মিটাতে পারে কি?

এ নগরী পৃথিবীর নয়,
সে নক্ষত্র আকাশের নয়।
আমারি হৃদয় সে যে নগরীর জটিলতা নিয়ে
নগরীর রুক্ষতায় গড়া।
বহু রাজপথ গলি, ব্যর্থতা অনেক,
জটিলতা অনেক সেখানে।

নক্ষত্রের মতন সুদূর
চোখে নিয়ে অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা
হৃদয়কে ভ্রান্তি দিতে
হৃদয়কে মোহ দিতে
তবুও সেখানে আছ তুমি,
তোমার চোখের শিখা
এত ধোঁয়া এত কুয়াশাকে
কখনো কি পার হয়? তুমি জান নাক'!
তবু তুমি আছ সারা রাত
দূরযাত্রা দ্বীপের মতন স্বপ্ন-প্রসবিনী,
এ নগরী এ হৃদয় গতিহারা জাহাজের মৃত্যু
চিরকাল স্তব্ধ হয়ে আছে
জলধর সমুদ্রের মাঝে।

মাইকেল আরৎজিবাশেভ

চার

কর্ণেল নিকোলাই ইগারোভিচ, স্বোয়ারোগীস্, ঐ ছোট শহরটির অন্যতম অধিবাসী। তিনি তাঁর ছেলের—মস্কো ...কনিকের ছাত্র—ফিরে আসবার জন্য রেল-ষ্টেশনে রেল-গাড়ীর ...য় ছিলেন।

পুলিশের নজরবন্দী ছিল ছেলেটি, তাকে সম্প্রতি মস্কো থেকে ...ত করা হয়েছে; সন্দেহ করা হয়েছিল, হয়তো বিপ্লবীদের ... তার সংযোগ ছিল। ইউরাই স্বোয়ারোগীস্ তার ধরা পড়া, ...স জেল খাটা এবং মস্কো থেকে বিতাড়ন,—সব খবরই আগে ...টীতে লিখে জানিয়েছিল; সুতরাং তাঁরা তার প্রত্যাবর্তন ... প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। যদিও নিকোলাই ইগারোভিচ, ...ারটাকে একটা বালকোচিত প্রহসন ব'লে মনে করেছিলেন, ... প্রিয় ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যাকুলও হচ্ছিলেন কম নয়। ...কে অবদমিত ক'রে তিনি ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন। ...টো দিন ইউরাই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ ক'রে আসছিল, ...র নোংরা আবহাওয়ায় থেকে তার নিদ্রা ভাগ্যে জোটেনি। ...ারেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পিতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী ...াকে (ডাক নাম লালিয়া) কোনো রকমে দু'-একটা কথা ... বাড়ী ফিরে সটান শুয়ে পড়ে ঘুম লাগালো।

... তার ঘুম ভাঙল, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পাশের ঘরে ... যাচ্ছে ছুরী-কাঁটার টুংটাং আওয়াজ; আর পাওয়া যাচ্ছে লালিয়ার মিষ্টি সু-উচ্চ হাসির শব্দ। তারই সঙ্গে আসছে আর একটি পুরুষ-কণ্ঠের আওয়াজ, সেটিও তার বেশ ভালোই লাগল। তন্দ্রাঘোরে মনে হয়েছিল, ও আওয়াজ যেন রেল-গাড়ীর পাশের কামরা থেকে আসছে। পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙল। চার পাশে নিজের বাড়ীর পরিবেশ দেখে তার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

একবার মনে হোলো, বাড়ীতে সে মোটেই না ফিরলে পারতো। তাকে যেখানে খুসী থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাহলে সে নিজের বাড়ীই বেছে নিল কেন? এর উত্তর সে দিতে পারলো না। বেঁচে থাকবার জন্য তাকে কোনো কাজ করতে হোত না; পৈতৃক অবস্থা তার ভালোই, তা' ছাড়া তার বাবা তার জন্য আলাদা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। যদিও এ চিন্তাটা তার কাছে লজ্জাজনক। এবার তার মনে হোল, বাড়ী এসে ভালো করেনি। বাপ-মা তার কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবেন না। এত দিন ধরে যে সময়টা কাটল, যে টাকাটা ব্যয় হোল তার পড়াশুনার জন্য, সবই অপব্যয় হয়ে গেল। ফলে, বাবার সঙ্গে সরল হৃদয়ে মুখোমুখী কথা কইবার সুযোগও গেল নষ্ট হয়ে চিরতরে। এই ছোট শহরে সে অবিলম্বেই হাঁফিয়ে উঠবে। যে দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদ তার জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে, তা' এই মফঃস্বল শহরের কুনো বাসিন্দারা কোনো কালেই সম্যক্ প্রণিধান করতে পারবে না।

ইউরাই উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে

দাঁড়িয়ে দিল। ছোট একটি বাগান,—মৌসুমী ফুলের কেয়ারী-করা লতা-পাতার বাহারে ঝলমল করছে; তার পরে দেয়ালের ও-পাশে বড়ো বাগান—যা এই শহরের অনেকের বাড়ীরই পেছনে রয়েছে। ডাল-পালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নদীর জল, সন্ধ্যালোকে ঝলমল্ করছে। সুন্দর প্রশান্ত সন্ধ্যা। ইউরাই মনের ভিতর কি রকম একটা বিরসতা অনুভব করলো। বড়ো বড়ো শহরেই সে চিরকাল থেকে এসেছে, তবু তার মনে হোতো, বোধ হয় এই রকম গ্রাম্যতা-জড়ানো ছোট শহরই তার লাগে ভালো; যদিও প্রকৃতি তাকে কোনো দিন দেয়নি প্রেরণা, দিয়েছে একটা স্বপ্নালু অস্বাভাবিক পরিবেশের অনুভূতি মাত্র।

"আহা! ঘুম ভেঙেছে শেষ অবধি!"—লালিয়া ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সহাস্যে বললো।

অনিশ্চিত অবস্থা এবং আসন্ন সন্ধ্যার ভারে নুয়ে-পড়া মন নিয়ে বোনের আনন্দিত কলরব সহজ সুরে নিতে পারলো না ইউরাই। সে ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, "তোমার এতো উল্লাসের কারণ কি?"

যেন একটা কি মজার প্রশ্নই না করা হয়েছে, তাই লালিয়া আবার হেসে উঠলো। বললো, "আহা, কি প্রশ্নই করলেন! আমি কি আর সারা দিন মুখ-গোমড়া ক'রে থাকি না! ও-রকম থাকবার আমার সময়ও নেই।"

তার পর নিজেরই কথায় নিজে উৎসাহিত হয়ে গম্ভীর ভাবে বললো, "আমরা এ রকম সময় জন্মেছি যে, আমাদের পক্ষে মুখ-গোমড়া হওয়াটাই অপরাধ,—পাপ। শ্রমিকদের আমি লেখা-পড়া শেখাই; তার পর আছে লাইব্রেরী; তুমি যখন ছিলে না এখানে, তখন আমরা একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলেছি। তাতে আমার অনেক সময় যায়। বেশ চলছে ওটা।"

অন্য সময় হলে সংবাদটা ইউরাই-এর পক্ষে মনোরম লাগত। কিন্তু এখন যেন সব-কিছুই অবান্তর বলে মনে হচ্ছে। লালিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, সে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠেছে—ভাইয়ের কাছে প্রশংসা শুনবারই আশায়। শেষ অবধি ইউরাই বলল—"হুঁ, তাই না কি?"

"এত সব কাজ ক'রে, তুমি কি মনে করো, আমি মুখ-গোমড়া হয়ে থাকতে পারি?"—লালিয়া প্রসন্ন মনে বললো।

"কি জানি কেন, সব-কিছুই আমাকে পীড়া দিচ্ছে!"—নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললো ইউরাই। লালিয়া, মনে হোল, কথাটায় আঘাত পেলো।

"আহা, কী কথাই বললেন! বড়ো জোর দু'ঘণ্টা তো হোল বাড়ীতে এসেছ, ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে! আর বলছো কি না, তোমার এরি মধ্যে বিশ্রী লাগছে!"

"আমার দোষ নয়, এটা আমার দুর্ভাগ্য।"—কথাটা বলে ফেলে ইউরাই ভাবলো—বিশ্রী লাগাটা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ, খুসী হওয়াটা নয়।

"তোমার দুর্ভাগ্য! হাঃ হাঃ!"—লালিয়া যেন উৎসাহিত হয়ে ইউরাই-এর পিঠ চাপড়ে দিল।

ইউরাই বকতে পারেনি এরি মধ্যে লালিয়ার আনন্দোজ্জ্বল কেটে গিয়েছিল। লালিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললো, "আমি কখনোই খুসী হতে পারি না।"

যেন ভারী একটা মজার কথা শুনেছে,—এমনি ভাবখানা লালিয়ার; সে আবার হি-হি করে হেসে উঠল। বললো, "বেশ বেশ! হে অন্ধকারের হাঁড়িমুখো বাদ্‌শা, তুমি যদি খুসী না হও, না হও। যাক্ গে সে কথা। এবার এসো তো, তোমাকে একটি সুন্দর ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এসো!"

হাসিমুখে সে দাদার হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চললো।

"দাঁড়াও! কে এই সুন্দর ভদ্রলোকটি?"

"আমার বন্ধু!"—বললো লালিয়া। ওর মুখ আনন্দে আর লজ্জায় অপরূপ হয়ে উঠলো। বাবা ও বোনের চিঠিতে ইউরাই আগেই জেনেছিল যে, এক জন তরুণ ডাক্তার সম্প্রতি লালিয়াকে প্রেম-নিবেদন করছে, কিন্তু তা যে বাক্‌দানের অন্তরঙ্গতায় গিয়ে পৌঁছেছে, এ খবরটা তার জানা ছিল না।

"সত্যি?"—আশ্চর্য্য হয়ে ইউরাই বল্‌লো। এটা তার কাছে অদ্ভুত লাগছিল যে লালিয়া—সবে মাত্র যে জীবনের বসন্ত-স্পর্শ পেয়েছে, এই চটুল হাস্যময়ী ছোট্ট মেয়েটি ইতিমধ্যেই প্রেমিকা হয়ে উঠেছে, আর দু'দিন পরেই দাঁড়াবে বধূবেশে! ইউরাই লালিয়াকে জড়িয়ে ধরলো, এবং খাবার-ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়ালো রোদে-ঝল্‌সানো তামাটে চেহারার একটি সুকান্তি যুবা,—ঠিক যেন রাশিয়ানদের মতো দেখতে নয়,—নাম তার নিকোলাই ইগোরোভিচ। বল্‌লো, "আলাপ করিয়ে দাও।"

সকৌতুকে লালিয়া পরিচয় করিয়ে দিল, আনাতোল পাভলোভিচ রিয়াজানজেফ।"

"আপনার বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্দ কামনা করি।"—ঠাট্টার সুরে ইউরাই বোনের কথায় কথা যোগ দিয়ে দিল।

সত্যিকারের বন্ধুত্বাভিলাষী মন নিয়ে দু'জন হ্যাণ্ডশেক করলো।

মনে মনে ভাবলো রিয়াজানজেফ, "এই ওর দাদা!"—লালিয়ার মতো তো দেখতে নয়। লালিয়া বেঁটে সুন্দরী হাস্যমুখী। কিন্তু ইউরাই যেন লম্বাটে, রোগা এবং ময়লা রং-এর, কিছুটা গম্ভীর। তাহ'লেও দু'জনকেই দেখতে ভালো এবং গড়নও দু'জনেরও ভালো।

ইউরাই ভাবলো, "এই সেই যুবক, যে কি না নূতন সময়ের সকাল বেলায় সৌন্দর্য্য দেখেছে আমার লালিয়ার ভেতর, আবিষ্কার করেছে এক নারী—যাকে ও ভালোবেসেছে! মেয়েকে যেমন আমি ভালোবাসি, ও-ও তেমনি ভালোবেসেছে আমার বোনকে!"—কি জানি কেন, ওর মনটা কি এক ব্যর্থতায় বেদনান্বিত হয়ে উঠলো; ভয় পেলো, পাছে ওরা ওর মনের ভাব বুঝে ফেলে।

"আপনি লালিয়াকে ভালোবাসেন? সত্যি সত্যি? ও-রকম ভালো নিষ্পাপ মেয়েকে শেষ অবধি ঠকাবেন না যেন! বড় দুঃখের কথা হবে তা হলে।"—ইউরাই প্রশ্ন করতে চাইল।

আনাতোল্‌ও মনে মনে উত্তর দিলো, "হাঁ, সত্যিই ওকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। ও-রকম মেয়েকে কে-ই বা ভালোবাসবে না বলুন? কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েটি! টোল-খাওয়া গালের হাসি দেখেছেন ওর?"

অন্ত কথা : "অনেক দিনের জন্যই কি আপনাকে বিতাড়িত করেছে ?"

"পাঁচ বছরের জন্যে।"—ইউরাই-এর উত্তর।

নিকোলাই ইগারোভিচ—অর্থাৎ ইউরাই-এর বাবা—কাছাকাছি পায়চারী করছিলেন। ছেলের উত্তর শুনে একবার থমকে দাঁড়িয়ে শুনলেন, তার পরই আবার অভ্যস্ত সেনাপতির মতো পায়চারী করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, তাঁর ছেলেকে পুলিশ মস্কো থেকে বিতাড়িত করেছে ; কিন্তু সঠিক জানতেন না—কেন এবং কত দিনের জন্য। অর্ধোচ্চারণ করলেন, "এ সব আহাম্মুকীর মানে কি ?"

লালিয়া বাবার ভাবগতিক জানতো। আশংকিতা হোল, একটা অনর্থ ঘটে বুঝি ! সে তাই কথাবার্ত্তার গতি অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করলো। ভাবলো, "কি বোকা আমি ! আনাতোলকে কিছু বলা হয়নি।"

আনাতোলও জানতো না ইউরাই-এর বিতাড়নের কারণ। লালিয়া যখন তাকে আর এক কাপ চা খেতে অনুরোধ করলো, সে ইউরাইকে জিজ্ঞাসা করলো, "এখন কি করবেন ঠিক করেছেন ?"

নিকোলাই ইগারোভিচ তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। ইউরাই একটু বিরক্তির সুরেই বললো, "কিছুই না।"

"কিছুই না—মানে ?"—হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে নিকোলাই জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর গলার স্বর যদিও নীচুই ছিল, কিন্তু তাতে তাঁর অন্তরের উষ্মা প্রকাশ পেতে বাধা পেলো না। "কি ক'রে বললে এ কথা ? যেন চিরকাল তুমি আমার গলগ্রহ হয়ে থাকবে ! কেন ভাবছো না যে আমার বয়স হ'চ্ছে,—তোমার এখন নিজের অন্নসংস্থানের চেষ্টা করা উচিত ? আমি বলবো না কিছু। যা' খুসী তোমার করো। কিন্তু, তোমার নিজেরও কি বিবেক-বুদ্ধি নেই ?"

ইউরাই বাবার কথার প্রতিবাদ খুঁজে পেলো না ; ফলে মনে মনে সে আরো চটে উঠলো।

খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো ইউরাই, "না, কিছু নেই। আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?"

নিকোলাই ইগারোভিচ পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। আবার সুরু করলেন পায়চারী। ছেলে ফিরে আসবার প্রথম দিনেই তার সঙ্গে ঝগড়া-কেলেঙ্কারী না করবার মতো তাঁর মনের [illegible] ছিল। ইউরাই যেন কোন্দল করবার জন্য রুখে [illegible]। লালিয়া কেঁদে ফেলবার উপক্রম করলো। আনাতোল [illegible] গুরুত্ব বুঝে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লো।

[illegible]কর আবহাওয়ায় সন্ধ্যাটা কাটলো। সেকেলে মনোভাব- [illegible] বাবাকে সে ক্ষমা করতে পারলো না ; ওঁরা কি বুঝবেন [illegible] যুগকে ? আনাতোলের কথাবার্ত্তা তার কানে ঢুকছিল না।

[illegible] আহারের আগে এলো নোভিকফ, আইভানফ, ও সেমেনফ।

সেমেনফ, নিজে ছাত্র, প্রাইভেট টুইশানী করে জীবিকার্জন [illegible] ব্যায়াম আছে ওর। আইভানফ, স্থানীয় কোনো [illegible] করে। ইউরাই-এর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পেয়ে ওরা [illegible] ওকে অভিনন্দন জানাতে। নোভিকফ, স্যানিনদের বাড়ীতে [illegible] অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে এবং লিডার সঙ্গে [illegible] দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াতে বেশ মনমরা হয়েছিল। লিডা ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করে নিজে বড়ো কুণ্ঠাবোধ করতো, এবং নোভিকফ তা অনুভব করে একটু একটু আশান্বিত হতে সুরু করেছে।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসবার মুখে নোভিকফ প্রস্তাব করলো, "কি বলেন আপনারা,—এক দিন পুরোনো মঠে চড়ুইভাতি করলে কেমন হয় ?"

জায়গাটা নদীর পারে, একটা পাহাড়ের ওপর, বেড়াতে যাবার ও চড়ুইভাতি করবার পক্ষে বিখ্যাত।

এ সব ব্যাপারে লালিয়ার উৎসাহের অভাব নেই। সে আনন্দে প্রায় নেচে উঠে বললো, "খুব ভালো কথা ! খুব ভালো প্রস্তাব ! কিন্তু কবে যাবেন ?"

"কালকেই চলুন না কেন !"—নোভিকফ বললো।

প্রস্তাবটায় আনাতোলও আকৃষ্ট হয়েছিল ; বললো, "আর কাকে কাকে বলা যায় ?"—বনের ভেতর বনদেবীর মতো নিভৃতে লালিয়াকে সে পাবে এই সম্ভাবনায় সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

"ভেবে দেখা যাক্।...আমরা তো ছ'জন আছি।...আচ্ছা, শাফ্‌রফ্‌কে বললে কেমন হয় ?"

ইউরাই জিজ্ঞাসা করলো, "কে সে ?"

"একটি ছাত্র।"

"বেশ কথা।—আর, লুডমিলা নিকোলাই এড্‌না [illegible] কার্সাভিনা এবং ওলগা আইভানোভ্‌নাকে।"

"কারা তারা ?"—আবার জিজ্ঞাসা করলো ইউরাই।

লালিয়া হেসে বললো, "দেখতে পাবে।" দুষ্টুমী তার চোখে-মুখে।

"আহা—" ইউরাই বললো, "যা দেখবো, তা তো দেখবই।"

একটু থেমে, নোভিকফ বললো, "স্যানিনদেরও ডাকা যেতে পারে।"

"ওঃ, নিশ্চয়ই লিডাকে ডাকবো।"—লিডা যে তার বিশেষ প্রিয় সে জন্য নয়, কিন্তু ও জানতো লিডার প্রতি নোভিকফের মনোভাব। সেই জন্যই বললো, "কারণ, লিডা এলে নোভিকফ খুসীই হবে।"

আইভানফ একটু ঝাঁঝালো ভাবেই বললো, "তাহলে তো আমাদের অফিসারদেরও ডাকতে হয় !"

"তাতে দোষ কি ? তাই করা যাক্। যত বেশি লোক হবে, মজাটাও তো তাতে বেশিই হবে !"

চাঁদের আলোয়, সদর দরজার বাইরে ওরা তখন দাঁড়িয়ে।

"কি সুন্দর রাত !"—লালিয়া বললো। অজান্তেই ও তার প্রেমাস্পদের দিকে সরে দাঁড়ালো। এমন সুন্দর রাতটায় ও আনাতোলকে ছেড়ে দিতে চাইছিল না।

"হাঁ, সত্যিই বড়ো সুন্দর চাঁদনী রাত !" বললো আনাতোল। এই সহজ সাধারণ ক'টা কথা, কিন্তু লালিয়ার কানে তা মধুবর্ষণ করলো।

সুর কেটে দিয়ে আইভানফ তার হেঁড়ে-গলায় বলে উঠলো "থাকো তুমি তোমার চাঁদিনী রাত নিয়ে, আমি চললুম ঘুমুতে যা ঘুম পেয়েছে !"—বলেই সে সোজা এগিয়ে চললো দু'হাত নেড়ে—যেন শামুক তার দাঁড়া নাড়া দিয়ে চলেছে।

নোভিকফ এবং সেমেনফও তাকে অনুসরণ

আনাতোল্ লালিয়ার কাছে বারে বারে বিদায় নিয়েও যেতে চাইছে না। কিন্তু শেষ অবধি বিদায় তো দিতেই হয়! দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে লালিয়া বললো, "এখন আমাদের সবাইকেই বিদায় নিতে হবে।" ওর নিজের সুকুমার সৌন্দর্য্য, আকাশের চাঁদের আলো, আর হাল্কা হাওয়া,—এই সব মিলে যে একটা মধুর পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করেছে,—এর মাঝখানে আনাতোলকে বিদায় দিতে ওর মন চাইছিল না।

ইউরাই ভাবছিল, বাবা বোধ হয় জেগে আছেন। বাড়ীর ভেতরে ফিরলেই তাঁর সঙ্গে একটা তিক্ত আলোচনা অনিবার্য্য হয়ে উঠবে নিশ্চয়।

"না।"—নদীর দিকে,—যেখান থেকে একটা নীলাভ বাষ্পের আবরণী গড়ে উঠে আকাশের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে,—সেদিকে তাকিয়ে ইউরাই বল্‌ল, "না, এখনই ঘুমুতে যাবো না। একটু বেড়িয়ে আসি।"

"যা খুশী—" বল্‌লো লালিয়া তার সুমিষ্ট কলকণ্ঠে। তার পর সে তাকালো চাঁদের দিকে, ঠোঁটের কোণে তার হাসির আভাস। একবার সে আদুরে বেড়ালের মতো একটা হাই তুল্‌ল, তার পর বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

ইউরাই আরো খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে রইল, দূরের বাড়ী-ঘর আর গাছপালা মিলিয়ে যেখানে একটা অস্পষ্ট বস্তুপুঞ্জ রচনা করেছে—সেদিকে তাকালো; তার পর সেমেনফ, যে পথ দিয়ে এগিয়ে গেছে সেদিকে রওনা হোল।

সেমেনফ, বেশী দূর যেতে পারেনি; চল্‌বার সময় থেমে থেমে কুঁজো হয়ে ওকে বারে বারে কাশ্‌তে হয়েছে? চাঁদের আলোয় ওর পেছনে ওর ছায়াটা দীর্ঘায়ত হয়ে রয়েছে। ইউরাই শীগ্‌গিরই ওকে ধরে ফেল্‌ল। ওর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলো ইউরাই। খাবার সময় সেমেনফ, হাসি-খুশী মেজাজী অবস্থায় ছিল, কিন্তু এখন ওকে দেখাচ্ছে বিষণ্ণ আত্মমগ্ন; ওর কাশির আওয়াজ ইউরাই-এর কাছে আশংকাজনক মনে হোল।

"আরে, আপনি যে!"—ইউরাইকে দেখ্‌তে পেয়ে সেমেনফ, বল্‌লো।

"আমার ঘুম পায়নি। আপনি যদি মনে না করেন কিছু তাহলে আপনার সঙ্গে চলি।"

"বেশ বেশ।"—সেমেনফ, বল্‌লো বটে, কিন্তু তাতে আগ্রহ প্রকাশ পেল না।

"আপনার ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে না?"—ইউরাই জিজ্ঞাসা করলো। ওর কাশিটা ইউরাই-এর কেমন যেন ভালো লাগছিল না।

বিরক্তির সুরে সেমেনফ, জবাব দিলো, "আমার সব সময়েই ঠাণ্ডা লাগে!"

ইউরাই মনে বেদনা বোধ করলো; বোধ হয় সেমেনফের দুর্ব্বল জায়গায় সে আঘাত করেছে। কথাবার্ত্তার গতি ঘুরিয়ে নেবার জন্য বল্‌ল, "আপনি কি অনেক দিন হোল ইউনিভার্সিটি ছেড়েছেন?"

খানিকটা দেরী করে সেমেনফ, জবাব দিল, "অনেক দিন।"

ইউরাই তখন সুরু করলো বল্‌তে ইউনিভার্সিটিতে বর্ত্তমানে কি নিয়ে আলোচনা চলছে, ছাত্ররা কোন বিষয়কে এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান মনে করছে। গোড়াতে সে সাধারণ ভাবেই বল্‌ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠে নি[illegible] বিশ্বাস এবং বক্তব্য বল্‌তে লাগল।

সেমেনফ, কিছু না বলে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল।

শেষটায় ইউরাই বল্‌তে লাগল, জনসাধারণের ভেতর [illegible] প্রচারের ব্যর্থপ্রয়াসের কাহিনী, এবং এ জন্য জনসাধারণকেই সে দোষী সাব্যস্ত করলো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ইউরাই [illegible] ব্যাপারটা খুব গভীর ভাবেই অনুভব করে।

জিজ্ঞাসা করলো, "বেবল্-এর শেষ বক্তৃতাটা আপনি পড়েছেন?"

"হাঁ।"—উত্তর দিল সেমেনফ,।

"আপনার কি মত?"

হঠাৎ সেমেনফ, চটে গিয়ে হাতের বাঁকানো লাঠিটা তুলে ধরলো। ছায়া দেখে মনে হতে পারতো যেন কোনো এক নিশাচর কালো পাখী তার ডানা বিস্তার করেছে।

চেঁচিয়ে বললো, "কি আমার মত?···আমি বলছি যে আমি শীগ্‌গিরই মারা যাচ্ছি।"

আবার সে তার হাতের লাঠিটা তুলে ধরলো, আবার তার ছায়া তার অনুকরণ করলো। এবার সেমেনফ,ও তা' লক্ষ্য করলো।

বললো, "দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক আমার পেছনেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে আমাকে লক্ষ্য করছে!···আমার কাছে বেবেল্-এর মূল্য কি? শুধু বক্-বক্ করতেই জানে! ওর পরে আর এক আহাম্মকও ওরই মতো বক্-বক্ করবে! আমার কাছে সব সমান! আমি যদি আজ মারা না যাই, কাল মারা যাবো।"

ইউরাই কোনো কথা বললো না। ওর চিন্তাধারা বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল।

সেমেনফ, বলে চললো, "ধরুন আপনার কথা। আপনার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা কি ভাবছে বা বেবেল কি বললো,—এ সবের মূল্য খুব বেশি। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনিও যদি নিশ্চিত বুঝতে পারতেন—যেমন আমি বুঝছি যে আপনি শীগ্‌গির মারা যাবেন, তা হলে বেবেল্ বা নীট্‌শে বা টলষ্টয়, বা ঐ রকম আর কেউ,—এদের কোনো মূল্যই আপনার কাছে থাকতো না।"

সেমেনফ, চুপ করলো। আকাশে চাঁদ তখনও উজ্জ্বল, সেমেনফ,-এর ছায়াটাও তেমনি পরিষ্কার তার পেছনে ছড়িয়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ সেমেনফ, আবার বলতে সুরু করলো, "আমার [illegible] দফা শেষ হয়ে গেছে! আপনি যদি জানতেন মৃত্যুকে আমি কি রকম ভয় করি!···বিশেষতঃ এমন সুন্দর নরম রাতে···" [illegible] আলোয় ওর কুৎসিত মুখটা ভয়াবহ হয়ে উঠল। "সবই [illegible] থাকবে, বেঁচে থাকবে, শুধু আমাকেই চলে যেতে হবে···আপনার [illegible] এই বহু-উচ্চারিত কথাটার কোনো দাম নেই হয়তো।···আমি [illegible] আমার মনের ভেতরকার সত্য কথাটা, কোনো উপন্যাস থেকে [illegible] করা মুখস্থ কথা নয়। আমি সত্যিই মরে যাবো।"—[illegible] সেমেনফ,-এর দম আটকে আসছে।

ও বলে চললো, "আমি প্রায়ই ভাবি, শীগ্‌গিরই তো মরে যাবো! ঠাণ্ডা মাটির ভেতর আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক এক ক'রে [illegible] পচে যাবে, আর সেই মাটির ওপর, আমার কবরের পাশ দিয়ে [illegible] বেঁচে

[illegible] সমারোহ, জীবনের মিছিল, মৃতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। [illegible] টলষ্টয় বা ও-রকম আরো হাজার বুকনিবাজের মূল্য কি [illegible] কাছে?"—এই শেষ কথা কয়টা সে হঠাৎ যেন জ্বলে উঠে [illegible]।

[illegible]রাই-এর বলবার কিছু ছিল না। বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে [illegible]প [illegible] রইলো।

[illegible]নিশ্বাস ফেলে সেমেনফ্ বললো, "গুড নাইট্—শুভরাত্রি। আমি এবার ভেতরে যাবো।"

[illegible] কাছে বিদায় নিয়ে ইউরাই ফিরে চললো। আধ ঘণ্টা আগেও জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবীর দৃশ্যপট, তারা-ধোয়া আকাশ, রূপালী [illegible] গাছগুলি, মায়া-ভরা ছায়া,···ওর কাছে ভালো লেগেছিল; এই সামান্য সময়ের ব্যবধানেই তা হয়ে উঠল নিরর্থক, প্রাণহীন, বীভৎস, প্রেতায়িত।

বাড়ী ফিরে গিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করল নিজের শোবার ঘরে, খুলে দিল জানলা বাগানের দিক্কার। জীবনে এই প্রথম ইউরাই উপলব্ধি করল যে এত দিন ধরে যে চিন্তা, যে বস্তু-সমষ্টি ওকে আবিষ্ট করে রেখেছিল, সত্যিই তার হয়তো কোনও দাম নেই। ভাবলো, যদি কোন দিন সেমেনফ্-এর মতোই তারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে, হয়তো সেদিন তার মনে···মানুষের উপকার করবার, জনগণকে অধিকতর সুখী করবার জন্য তার প্রয়াসের ব্যর্থতার জন্য—কোনো দুঃখই, কোন অনুতাপই দেখা দেবে না। সব চেয়ে যে বোধটা তার বড়ো হয়ে উঠবে সেদিন তা হবে তার নিশ্চিত মৃত্যুর বোধ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্ষমতালোপের বোধ, জীবনের যাবতীয় উপভোগ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হওয়ার নিশ্চয়তা-বোধ।

নিজেই লজ্জিত হোল নিজের এ রকম চিন্তাপ্রবাহ দেখে। মনে মনে এই রকম ভাববার কারণ মীমাংসা করতে চাইল।

"জীবন হচ্ছে একটা সংঘাত।"

"সম্ভবত, কিন্তু কার সঙ্গে? কিসের জন্য?—সে কি সম্পূর্ণই [illegible]তার জন্যই নয়?—সে কি নিজের জন্য সূর্য্যালোকে স্থান [illegible] জন্যই?"

[illegible] অন্তরে যেন আর এক জন কেউ কথাটা বললো। [illegible] চেষ্টা করলো কথাটা মস্তিষ্কে না নিতে। কিন্তু ঘুরে-ফিরে বারে [illegible] চিন্তাটা তাকে বিব্রত করে তুলল। নিশীথ প্রহরের নিঃসঙ্গে [illegible] চোখ ফেটে লোনা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

পাঁচ

[illegible] নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে লিডা তার ভাইকে সেটি দেখালো। [illegible] স্যানিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না। মনে মনে কতকটা [illegible]ত্যাশা করেছিল। চাঁদের আলোয় নদীর ওপরে সে [illegible] স্যারুডিনের দিকে আকৃষ্ট হবে, এবং সেই সন্ধ্যা বেলার [illegible] আবার ফিরে আসবে। কিন্তু ও জান্‌ত যে স্যানিন [illegible] মনে-প্রাণে ঘৃণা করে তবে সে হচ্ছে স্যারুডিন।

[illegible] স্যানিন এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

[illegible] সকাল সেদিন; আকাশ মেঘহীন নির্মল, উজ্জ্বল [illegible]কে ঝলমল্ করছে।

"অনেক মেয়ে আসবে, তাদের মধ্যে দু'-এক জনকে তোমার ভালোও লাগতে পারে।"—বললো লিডা, খানিকটা যন্ত্রচালিতবৎ।

"আঃ! তাই না কি? খুব ভালো।" স্যানিন বললো। "আকাশও বেশ পরিষ্কার। চলো, যাওয়াই যাক্।"

নির্দিষ্ট সময়টিতে স্যারুডিন এবং টানারফ ওদের পল্টনের একটা বড়ো ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হোল।

"লিডিয়া পেট্রোভ্না, আমরা আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।" চালিয়াৎ চৌকশ মূর্ত্তি নিয়ে স্যারুডিন চেঁচিয়ে ডাক দিল লিডাকে।

লিডা একটি পাৎলা ফুরফুরে পোষাক প'রে ছুটতে ছুটতে নেমে এলো। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্যারুডিনের দু'হাত ধরলো, কিন্তু ওর চোখের ওপর চোখ পড়তেই আরক্তিম হয়ে উঠলো, সরিয়ে নিলো হাত;—জান্‌তো স্যারুডিনের ঐ দৃষ্টির মানে কি।

ওরা বেরিয়ে পড়লো। শহর ছাড়াবার মুখেই ধরে ফেললো আর একটা গাড়ী, সেটায় ছিল লালিয়া, ইউরাই, রিয়াজানৎজেফ, নোভিকফ, আইভানফ্ ও সেমেনফ্।

সারাটা রাস্তা হৈ-চৈ ক'রে এসে ওরা গাছে-ঢাকা পাহাড়টার কাছে থামলো। চূড়ার কাছেই সেই পুরানো মঠটা। দূরের থেকে দেখলে বিরাট বিরাট গাছগুলোর ঘনসন্নিবিষ্ট ডাল-পাতাকে কোমল পশমের মতো মনে হয়। একটি ছোট নদী পাহাড়টার তলা দিয়ে বয়ে চলেছে।

গাড়ী ভালো করে থামবার আগেই ওরা সব লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নাম্‌লো। আগে থেকেই একটি ছাত্র ও দু'টি মেয়ে এসে চা তৈরী সুরু করেছিল। লালিয়া তাদের সঙ্গে স্যানিন ও ইউরাইকে আলাপ করিয়ে দিলো। লিডার হঠাৎ মনে পড়লো, ইউরাই ও স্যানিনের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় নেই। তাই সে ওদের পারস্পরিক আলাপ করিয়ে দিল। করমর্দ্দনের সময়ে স্যানিনের মুখ প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; খুব ভালো লাগছে তার। নূতন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়,—ভারী ভালো লাগছে। কিন্তু ইউরাই-এর মন অন্য ধাতুতে তৈরী। তার ভালো লাগবার মতো লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে অতি সামান্য; অপরিচিতকে আহ্বান ক'রে নেবার মতো মন তার নয়। আইভানফ্ স্যানিনকে বিশেষ চিনত না, কিন্তু ওর সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে, তাতেই তার ভাল লেগেছিল। সে সোজা গিয়ে স্যানিনের সঙ্গে অন্তরঙ্গের মতো আলাপ জমিয়ে দিল।

লালিয়া চেঁচিয়ে বলল সবাইকে, "আশা করি, প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের বাধা কাটিয়ে উঠে এবার আমরা মন খুলে আনন্দ করতে পারবো।"

গোড়ায় যা বাধো-বাধো লাগছিল, তা অচিরেই উৎরে ওঠা গেলো যখন সবাই খেতে বস্‌লো। কিছু পানীয়ের ব্যবস্থাও ছিল। সুতরাং আমোদ পূরোপূরি হয়ে উঠতে সময় নিল না। প্রায় সবাই হৈ-হল্লা, দৌড়-ঝাঁপ সুরু ক'রে দিল।

"যদি সবাই এ রকম প্রাণ খুলে দৌড়-ঝাঁপ করতে পারতো, তাহলে শতকরা নব্বুইটি রোগ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হোত।"—রিয়াজানৎজেফ, হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললো।

"পাপও যেতো।"—লালিয়া বলে উঠলো।

আইভানফ বললো, "পাপের কথা যদি বলেন, তাহলে বলবো

ও ওটা যথেষ্ট পরিমাণেই বরাবর থাকবে।" যদিও কথাটায় এমন কিছু বুদ্ধিমত্তার ব্যাপার ছিল না, কিন্তু উপস্থিত সকলেই হো-হো করে হেসে উঠলো।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে; নদীর জলে গলিত সোনার আভা, তরুশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের বর্ণাঢ্য সমারোহ।

লিডা চেঁচিয়ে বল্ল সবাইকে, "নৌকোয় চলো এবার।"—স্কার্টের প্রান্ত হাতে তুলে ধ'রে সে দৌড়ল জলের দিকে। "কে আগে গিয়ে পৌঁছুবে—দেখি।" বল্লো সে।

দু'-এক জন তার সঙ্গে দৌড়ল, বাকী সবাই ধীরে-সুস্থে হেঁটেই গিয়ে নৌকায় উঠলো।

"ইউরাই নিকোলাইভেভিচ, আপনি চুপ ক'রে রয়েছেন কেন?"—মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে লিডা জিজ্ঞাসা করলো।

'আমার কিছু বলবার নেই—" ইউরাই একটু হেসে উত্তর দিল।

"হতেই পারে না!"—ঠোঁট ফুলিয়ে, মাথা পেছনে হেলিয়ে লিডা বল্ল। ওর ধারণা যে পুরুষ মাত্রই ওর দিকে আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে না।

সেমেনফ কথায় যোগ দিয়ে বললো, "ইউরাই বাজে কথা বলবার লোক নয়। উনি চান…"

"খুব একটা গুরু-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা, কেমন তাই তো?"—লিডা বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

স্যাকডিন তীরের দিকে দেখিয়ে বল্লো, "ঐ একটা গভীর বিষয় এগিয়ে আসছে।"

নদীর পারটা সেখানটায় খাড়া হয়ে উঠেছে, বুড়ো একটা ওক গাছের লতানো শিকড়গুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সরু রাস্তার মতো, দু' পাশের উঁচু পাড়, শ্যাওলা ও বুনো লতা-পাতার আড়ালে প্রায় লুকিয়ে আছে।

শাফরফ প্রশ্ন করলো, "কি ওটা?"—ও এদিককার খবর বিশেষ কিছু জানত না।

আইভানফ উত্তর দিল, "একটা গুহা।"

"কি ধরণের গুহা?"

"খোদা জানেন! কেউ কেউ বলে, এককালে না কি কা'রা ওখানে বসে মুদ্রা জাল করবার কাজ করতো, পরে সবাই ধরা পড়ে। লাইনটা বড্ডো গোলমেলে, তাই নয় কি?"—আইভানফ মন্তব্য করল।

নোভিকফ ফোড়ন কাটল, "বোধ হয় তুমিও ও-রকম একটা ব্যবসা ফাঁদবার মতলবে আছ? কি বলো? আনি-দু'-আনি এই সব বানাবে!"

"আনি-দু'আনি? ছোঃ! মোহর, বন্ধু, মোহর!"

"হুঁ—" স্যাকডিন বিড়-বিড় করে কি বল্লো। আইভানফের ফাজলেমিটা তার বোধগম্য হোল না।

একটু পরেই আইভানফ বল্লো, "ব্যাটাদের সবাই ধরা পড়ল। গুহার মুখও দেওয়া হোল বুজিয়ে, কালক্রমে গর্ত্তের খানিকটা ধ্বসেও পড়ল। কেউ আর যায় না ওর ভেতর আজ-কাল। ছেলেবেলায় দু'-একবার আমিও গিয়েছি ভিতরে। ভারী মজা লাগে!"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে!"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লিডা। "ভিক্টর সার্গেজেভিচ, আপনি যাবেন ভেতরে? আপনি তো খুব সাহসী!"

খানিকটা হকচকিয়ে স্যাকডিন জিজ্ঞাসা করল, "কেন?"

হঠাৎ ইউরাই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমি যাবো।" সঙ্গে একটু লজ্জিতও হোল এই ভেবে যে, ওর আকস্মিক সাহস দেখানোর ব্যাপারটা কারো কাছে যদি ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে ওঠে।

আইভানফ ওকে সাহস দেবার জন্যই বলল, "ভারী সুন্দর জায়গা ভেতরটা!"

"তুমিও যাচ্ছো তো?"—নোভিকফ ওকে জিজ্ঞাসা করল।

"না, আমি এখানেই দাঁড়াই!"

এ কথা শুনে সবাই হেসে উঠল।

নৌকাটাকে পারের কাছে নিয়ে আসা হোল; গুহার আশে-পাশে থেকে একটা ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া ওদের দিকে বয়ে এলো।

"ভগবানের দোহাই, ইউরাই, এ রকম ছেলেমানুষী করতে যেও না।"—ওকে নিরস্ত করবার জন্য লালিয়া বলে উঠল। "সত্যিই এ তোমার ছেলেমানুষী!"

"ছেলেমানুষী? সত্যিই তো!"—হেসে ইউরাই ওর কথায় সায় দিয়ে বলল, "সেমেনফ, মোমবাতীটা এগিয়ে দাও না!"

"কোথায় রেখেছ?"

"ঐ যে তোমার পেছনে খাবারের বাক্সটার ভেতরে আছে।"

সেমেনফ ধীরে-সুস্থে মোমবাতীটা বের করে দিল।

"সত্যিই যাচ্ছেন না কি?"—আশ্চর্য্য রকমের সুগঠিতা একটি লম্বাটে ধরণের মেয়ে জিজ্ঞাসা করল। লালিয়া ওকে সীনা বলে ডাকে, ওর পদবী হচ্ছে কার্সাভিনা।

"হ্যাঁ, যাচ্ছিই তো! কেন, কি হয়েছে?"—পাল্টে বলল ইউরাই। অবশ্য ওরও যে মন একটু উসখুস করছিল না, তা বলা চলে না। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সময়ও এ রকম বাহাদুরী ওকে করতে হয়েছে। যে কারণেই হোক, ওর কাছে ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছিল না।

গুহায় ঢুকবার মুখটা যেমন সেঁৎসেতে তেমনি অন্ধকার। স্যানিন মুখ বাড়িয়ে খানিকটা দেখল, "ব্রর্‌র্‌"—বলে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করল অপ্রসন্ন মনে। ওর ভাল লাগছিল না যে, পাঁচ জনে দেখবে বলেই ইউরাই ঐ গর্ত্তটার ভেতর ঢুকবে। নাঃ, কোনো মানে হয় না। ওদিকে অতি আত্মসচেতন ইউরাই ধীরে-সুস্থে বাতীটা জ্বাললো, মনে ভাবল একবার, বাহাদুরীটা কি খুব বোকামীর পরিচায়ক হচ্ছে? কিন্তু দর্শকবৃন্দের মনে ও চোখে নিঃসন্দেহই একটা প্রশংসমান হাব-ভাব প্রকাশ পেলো; বিশেষতঃ মেয়েদের ভেতর প্রশংসাটা প্রায় আতঙ্কেরই কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। ইউরাই বাতীটা ভালো করে জ্বলে উঠবার জন্য একটু অপেক্ষা করল, তার পর ধীরে ধীরে গুহায় প্রবেশ করল। অকস্মাৎ পুরো জনতাটি চমকে উঠল এই ভেবে যে, সত্যিই যদি কোনো বিপদ ঘটে! অথচ চোখ তাদের অজ্ঞাতের অন্ধকারকে যেন ভেদ করতে চায়!

রিয়াজানৎজেফ চেঁচিয়ে সাবধান ক'রে দিল, "নেকড়ে বাঘ থাকতে পারে, লক্ষ্য করবেন।"

ভেতর থেকে অস্পষ্ট উত্তর এলো, "দেখা যাবে; রিভলবার আছে সঙ্গে।"

ইউরাই সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে অগ্রসর হোল। গুহার দেয়াল

ছাদ কেমন যেন ভিজে-ভিজে অসমতল নীচু। পায়ের কাছে পা ও লক্ষ্য করে চলতে হয়, এরি মধ্যে দু'বার হোঁচট খেতে হোল। একবার ভাবল, ফিরে যাওয়াই ভালো, কিংবা কিছুটা এখন চুপচাপ বসে থাকলেই হয়; বাইরে ওরা ভাববে—শেষ অবধিই নিচ্ছিল।

হঠাৎ মনে হোলো, পেছনে কার লঘু পা ফেলার শব্দ, কাদা-মাটির ওপর দিয়ে কে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বাতীটা সে উঁচু করে ধরল।

"সীনাইডা কার্সাভিনা!"—আশ্চর্য্য হয়ে ও বলে উঠল।

"স্বয়ং সশরীরে।"—সীনা কলকণ্ঠে জবাব দিল। এই সুন্দরী হাসি-খুসী মেয়েটি তার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে, এই ভেবে ইউরাই ভারী আনন্দিত বোধ করল; ওর মুখে-চোখে হাসি উপচিয়ে উঠল।

একটু ব্রীড়ানত ভাবে সীনা বলল, "চলুন, এগিয়ে যাই।"

বাধ্য ছেলের মতো ইউরাই ওর কথা শুনল। আর কোনো ভয়ের ছায়া নেই তার মনে। আলো তুলে ধরে পথ দেখছে—ঠিক নিজের যতোটা, তার চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে সহযাত্রিণীর জন্য।

"নাঃ, এমন কিছু দেখবার নেই ভেতরে!" চার দিকে মাটি, মাটি, কেবল মাটি, যেন কবরের ভেতর। ইউরাই-এর ভালো লাগছিল না।

"না, বেশ লাগছে! ফিস্‌ফিস্ করে বলল সীনা! ঘাড় বাঁকিয়ে বলবার সময় ওর চোখ বাতীর আলোয় জ্বল-জ্বল্ করে উঠল। কিন্তু লক্ষ্য করল ইউরাই, সীনা একেবারে যে ভয় পায়নি, তা নয়; শারীরিক ভরসা পাবার জন্য সীনা প্রায় ওর গা ঘেঁসেই চল্‌ছে। কী রকম একটা করুণা বোধ করল মেয়েটার জন্য।

সীনা বলে চলেছে, "মনে হচ্ছে যেন আমাদের জীয়ন্তে কবর দেওয়া হয়েছে। চেঁচালেও কেউ শুন্‌তে পাবে না।"

"নিশ্চয়ই না।" বললো ইউরাই।

দপ্ করে একটা চিন্তা ওর মাথা সরিয়ে দিল। এই সুন্দরী মেয়েটি, কি রকম নরম,…ওর মুঠোর মধ্যে এখন। কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না, শুনতেও পাবে না।…ইউরাই-এর কাছে চিন্তাটা ঘৃণ্য বোধ হোল। তাড়াতাড়ি এ রকম একটা কুচিন্তাকে তাড়াবার জন্যই ও বলল, "বেশ, চেষ্টা করেই দেখা যাক্ না!"

ওর গলা কাঁপছে। সীনা কি ওর মনের বাসনা কিছু বুঝতে পেরেছে?

"কি চেষ্টা করবেন?"—সীনা প্রশ্ন করল।

রিভলবার বের ক'রে ইউরাই বল্‌ল, "ধরুন, আমি যদি গুলী ছুঁড়ি?"

"আমরা কি তা হ'লে মাটি-চাপা প'ড়ে যাবো?"

"তা বল্‌তে পারি না"—যদিও ইউরাই নিশ্চিত ছিল যে রিভলবারের গুলীতে এমন কিছু আর গুহার ছাদটা ধ্বসে পড়বে না। বল্‌ল, "ভয় পাচ্ছেন না কি?"

"না, না, আপনি গুলী ছুঁড়ুন।"

ইউরাই ছুঁড়ল গুলী; আগুন ঝলসে উঠল, এক ঘর ধোঁয়া ওদের ফেল্‌ল ঢেকে। আওয়াজের প্রতিধ্বনি গেলো মিলিয়ে।

"বাস্! হয়েছে।" ইউরাই বলল।

"চলুন ফেরা যাক।"

ফিরে চল্‌ল ওরা। সীনা আগে, ইউরাই বাতি হাতে করে পেছন পেছন চল্‌ল। চোখ তুলে তাকালেই দেখছে সীনার পরিপূর্ণ ভরাট নিতম্ব পা-ফেলার তালে তালে দুলে উঠছে। আবার সেই নারী-দেহের জন্য আসঙ্গ-লিপ্সার কামনা। অসম্ভব এ চিন্তাকে মন থেকে তাড়ানো।

গলার স্বর যেন ভেঙে গেছে। তবু অনেক চেষ্টা করেই ইউরাই বলল, "আমি বলি কি, শুনুন, সীনা কার্সাভিনা, আমি আপনাকে মনস্তত্বের দিক দিয়ে একটা প্রশ্ন করবো। এই যে আমার সঙ্গে একলা গর্ত্তের ভেতর এলেন, আপনার ভয় করল না? আপনিই তো বল্‌ছিলেন, 'যদি চেঁচাই তা হলেও কেউ শুন্‌তে পাবে না!'… আপনি তো আমাকে একটুও চেনেন না!"

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল সীনা। ভাগ্য ভালো, অন্ধকারে ইউরাই ওকে দেখল না। একটু থেমে আস্তে আস্তে বল্‌ল, "আমি জানতাম, আপনাকে বিশ্বাস করা যায়।"

শুধু করুণা নয়, দয়া বোধ করল ইউরাই। কামনার আগুন যেমন অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছিল, তেমনি অকস্মাৎ নিবে গেল।

অনাড়ম্বর সরল উত্তর,—ইউরাই-এর অন্তর স্পর্শ করল।

নিজের উত্তরে নিজেই খুসী হয়ে উঠল সীনা; ইউরাই যে নীরবে তা শুন্‌ল,—এ তো ওর সমর্থনই প্রকাশ করে!

গুহার দ্বারপথে এসে ইউরাই আরও প্রসন্ন মনে দৃষ্টি-বিনিময় করল।

সীনা ভাবল মনে মনে: ইউরাই-এর ও-ধরণের প্রশ্নে তো ও অপমান বোধ করতে পারতো। কিন্তু কৈ? সে রকম তো নয়ই, বরং ভালোই লেগেছিল ওর মুখে ঐ প্রশ্ন শুনে। কেন?

জবাব পেল না নিজের কাছে। [ক্রমশঃ।
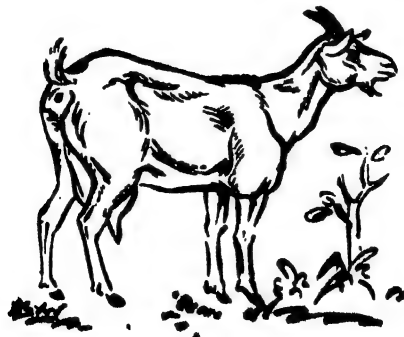
বদলে-পাওয়া ছেলে

লুইগি পিরান্‌দেলো

সারা রাত ধরে দূর থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছটফট করে যখন ঘুম এল তখনও আমার মাথায় ঘুরছে—আওয়াজটা মানুষের না কোনো জানোয়ার-টানোয়ারের!

পরদিন সকালে পাড়ার মেয়েদের মুখে শোনা গেল, এক জন নতুন পোয়াতি রাত-ভোর কান্নাকাটি করেছে—ও ছিল তারই শব্দ। মেয়েটির নাম সারালোঙ্গো, তার তিন মাসের শিশুটা খোয়া গিয়েছে,—বেচারা তখন ঘুমিয়ে, কিছু টের পায়নি, তার জায়গায় কাদের একটা শিশুকে রেখে গিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলে চুরি গিয়েছে! কে চুরি করবে!"

"কেন, ঐ ওরা!"

"ওরা কারা?"

পাড়ার মেয়েরা তখন ব্যাখ্যা করল: এক জাতের পেত্নী আছে; তারা রাতের বেলা ডাইনীদের মত হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়, সারালোঙ্গোর ছেলেটাকে তারাই নিয়ে গিয়েছে।

"তোমরা বলতে চাও, ছেলের মা-ও এ কথায় বিশ্বাস করে!"

আমার বলার ভাবে ওরা ধরে ফেলেছিল, আমি এ সব আজগুবিতে মোটেই বিশ্বাস করি না; যারা বিশ্বাস করে তাদের সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞাও হয়তো ফুটে উঠেছিল আমার কথায়। মেয়েগুলো এমনিই তো ভয়ে দুঃখে বেশ একটু উত্তেজিত হয়েছিল; আমার কথায় একেবারে চটে উঠল। আমার তো রীতিমত ভয় হয়ে গিয়েছিল, পড়ে বুঝি আমার উপর ঝাঁপিয়ে। রাগের মাথায় বেশ গলা চড়িয়ে তারা আমায় জানিয়ে দিল, গোঙানি শোনা মাত্র তারা বিছানা ছেড়ে দৌড়েছিল—কাপড়-চোপড় যা পরণে ছিল তাই পরেই—সারালোঙ্গোর বাড়ী গিয়ে তারা দেখেছে—স্বচক্ষে দেখেছে—বদলে রেখে-যাওয়া ছেলেটা ইটের খালি মেঝেতে পড়ে রয়েছে, বিছানার পায়ের দিকটায়। সবাই জানে, সারালোঙ্গোর ছেলের রঙ ছিল দুধের মত সাদা, সোনালি রঙের চুল, শিশু যিশুর মত ফুটফুটে সুন্দর, আর এ ছেলেটা! এটা তো রীতিমত ময়লা, ঐ এক রকম কটা রঙ, কুচ্ছিৎ,—বাঁদরের চেয়েও কুচ্ছিৎ। তারা যখন লোঙ্গোর বাড়ীতে পৌঁছায়, দুঃখের প্রথম বেগে মা-টা তখনও নিজের চুল ছিঁড়ছে। সব কথা ওরা তার নিজের মুখ থেকে শুনেছে: ছেলের কান্নার মত একটা আওয়াজে কি করে তার ঘুম ভাঙল, পাশে ছেলে আছে কি না দেখবার জন্যে কি ভাবে সে হাত বাড়াল। দেখল, ছেলে নাই। ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পিদিম জ্বেলে সে দেখল, কোথায় তার নিজের ছেলে, তার বদলে ঐ হতকুচ্ছিৎ ছেলেটা মাটিতে পড়ে আছে। তা দেখে তার মনে এমনি ঘা পেল, তার মন এমনি বিষিয়ে উঠল যে, ওটাকে মাটী থেকে তুলে নিতে পর্যন্ত পারল না। মেয়েগুলো বললে, লোঙ্গোর ছেলে তো নেহাৎ কচি, এখনও কাপড়-জড়ানো অবস্থায়; অতটুকু ছেলে অত দূর গড়িয়ে যেতে পারে! না হয় ধরেই নেওয়া গেল, মা ঘুমিয়ে ছিল, ছেলেটা কখন বিছানা থেকে পড়ে গিয়েছে জানতে পারেনি কিন্তু অত দূর গড়ায় কি করে? তা ছাড়া, এই ছেলেটাকে পাওয়া গিয়েছে বিছানার মাথার দিকে পা-করা; ওর ছেলেই যদি বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে থাকে তার পা তো হত অন্য দিকে।

কোনো সন্দেহ নাই, ঐ ওরাই সে রাত্রে লোঙ্গোর বাড়ী [illegible] ছেলে বদল করে গিয়েছে; লোঙ্গোর সোনার খোকার জায়গায় [illegible]টা কুচ্ছিৎ ছেলে ছেড়ে গিয়ে শয়তানি করেছে। হতভাগী মা[illegible] উপর এমন অনেক শয়তানি ওরা করে: দোলনায় ছেলে শোয়া[illegible] ছিল, দেখা গেল আর এক ঘরে চেয়ারে পড়ে কাঁদছে! আজ ছে[illegible] কোনো খুঁৎ নাই কাল সকালে হয়তো দেখা গেল, তার ছোট্ট [illegible] পা-দু'খানি গিয়েছে বেঁকে, কি চোখ টেরা হয়ে গিয়েছে!

মেয়েদের এক জন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "বিশ্বাস হচ্ছে না আমা[illegible] কথায়—তবে দেখ, এই দেখ…।" কোলের ছোট মেয়েটার মাথা[illegible] খপ্‌ করে ঘুরিয়ে সে দেখাল, ঘাড়ের উপর একগোছা জট-পাকা[illegible]না চুল। ও চুলের গোছাটা কোনো ক্রমেই কাটা যাবে না, জট খোলা[illegible] মানা। জটা কেটে ফেললে বা খুলে দিলেই শিশুর মৃত্যু অনিবার্য। মেয়ের মা আমায় লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল, "জানো এটা [illegible] ঐ ওরা এসে বেণী পাকিয়ে গিয়েছিল! আমাদের দুধের বাছাদের মাথা নিয়ে রাত্তিরে ওরা এই সব অনাছিষ্টি খেলা করে।"

এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার পর নিশ্চিত জানলাম, [illegible] অভাগীদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, তাদের বিশ্বাস [illegible] ভুল, অমূলক। বেচারা শিশুটার কি দশা হবে ভেবে মনটা [illegible] হয়ে গেল; হয়তো এদের কুসংস্কারের বেদীমূলে বলি পড়বে [illegible]। ব্যাপারটা আসলে যে কি, সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সংশয়ই [illegible] না—রাত্রে ছেলেটাকে রোগে ধরেছে। খুব সম্ভব শৈশব-[illegible] দরুণ শরীরে খিঁচুনি ধরাতে ওটা বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়েছি[illegible]

জিজ্ঞেস করলাম, "ছেলের মা এখন কি করবে?"

"সে তো পাগলের মত হা-হুতাশ করছে; ঘর-বাড়ী [illegible] হারাণো ছেলেকে খুঁজতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে গিয়েছিল, [illegible] করে আটকানো হয়েছে।"

"তাহলে ছেলেটার কি হবে?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

ওরা উত্তর দিল, "মা তো ওর দিকে চাইবেই না, [illegible] কোনো কথা কানে তুলবে না।"

কচি ছেলেটা পাছে না খেয়ে মারা যায় এই ভয়ে ঐ [illegible] এক জন এক টুকরো রুটি আর খানিকটা চিনি এক ফালি [illegible] বেঁধে, জলে ভিজিয়ে, ন্যাকড়ার এক দিক পাকিয়ে স্তনের [illegible] মত করে ছেলেটাকে চুষতে দিয়েছে। মেয়েরা আমাকে আশ্বাস [illegible] হতকুচ্ছিৎ বাচ্চাটার উপর তাদের যত বিতৃষ্ণাই জন্মে থাক, [illegible] পালা করে সেটাকে দেখবে। মা তো দেখতে চায় না, [illegible] ক'দিন যে দেখবে এ আশা করা মিথ্যে, সুতরাং তারা দেখবে [illegible]

আমার ভয় ছিল, মা-টা হয়তো ছেলেটাকে শেষ [illegible] না খাইয়ে মেরে ফেলবে। পুলিশে খবর দেওয়া ঠিক হবে [illegible] না ভাবছিলাম। এমন সময় জানা গেল, লোঙ্গোদের [illegible] ঐ দিনই সন্ধেবেলা ভান্না ঝোমো বলে এক জনের কা[illegible] পরামর্শ করতে গিয়েছিল, কি করবে। এই ভান্নার [illegible] পিশাচসিদ্ধি আছে; ডাইনীদের সঙ্গে তার রীতিমত [illegible] চলে। লোকে বলে, ঝোড়ো রাত্তিরে ডাইনীরা আশপাশের [illegible] ভান্নাকে তাদের সঙ্গে চক্করে বেরুতে ডাকে। ভান্নার দেহটা [illegible] বসে থাকে আর তার প্রাণ ডাইনীদের সঙ্গে উড়ে বেড়ায়,— [illegible] যায় কে জানে। অনেকেই এ কথা জানে, তারা শুনেছে [illegible] বাড়ীর ছাদ থেকে একটা ধীর করুণ ডাক ওঠে:

মাসী ভান্না……মাসী ভান্না

[illegible]-বিহ্বলা মা-টা ভান্নার কাছে গিয়েছিল সে কি বলে শুনতে। [illegible] অবিশ্যি ঝেড়ে জবাব দিয়েছিল, হারাণো ছেলের কোনো [illegible] সে জানে না। সেটা স্বাভাবিক। পরে মেয়েটা অনেক [illegible]-মিনতি করার পর বলেছে, "কারুর কানে না যায় এ কথা— [illegible] দেখেছি তোমার ছেলেটাকে।"

"দেখেছ—কোথায়? কোথায়?"

[illegible] তাতে জানিয়েছে, সে দেখেছে বটে, কিন্তু কোথায় তা বলতে [illegible] না। তবে মায়ের কোনো ভাবনার কারণ নাই, ছেলে যেখানেই [illegible] আছে, সুখে আছে। তার বদলে যে ছেলেটা রেখে গিয়েছে [illegible] মা যত দিন যত্ন-আত্তি করবে তত দিন তার নিজের ছেলের [illegible] কষ্ট হবে না—সুখে থাকবে সে। ভান্না না কি বার বার করে [illegible] দিয়েছে, বদলে-পাওয়া ছেলেটাকে মা যত বেশী ভালবাসা [illegible] নিজের ছেলেও তত ভাল থাকবে—ঐ ওপারে।

[illegible] গল্প শুনে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম, মনে মনে ডাইনী [illegible] বুদ্ধির অনেক তারিফ করলাম। করুণা আর ক্রুরতার কি [illegible] মিশ্রণ। মা-টাকে সে শাস্তি দিল তার কুসংস্কারের জন্যে, [illegible] উপর চাপিয়ে দিল মনের বিতৃষ্ণা জয় ক'রে হারাণো সন্তানের [illegible] যে স্নেহ তারই খাতিরে বদলে-পাওয়া ছেলেটাকে স্তন দিয়ে [illegible] ববার গুরু দায়ভার। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে আশাও [illegible] দিন তার ছেলে তার কোলে ফিরে আসতেও পারে; [illegible] দিল, ছেলে তার ভালই আছে। মা তাকে দেখতে [illegible] না বটে কিন্তু ভান্না ঠিকই পাবে: তার কাছ থেকেই মা [illegible] খবরাখবর পাবে।

নিছক ন্যায়বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ভান্না এ সমস্ত বলেছিল, এ [illegible] বাড়াবাড়ি হবে। ডাইনী সে, কাজ দিয়ে তার প্রণামী [illegible] করবে, এ তো স্বাভাবিক। সারালোঙ্গোর কাছ থেকে রোজই [illegible] কিছু আদায় করত। মাঝে মাঝে বলত, ছেলেকে দেখেছে [illegible] বলত, না, দেখা হয় নাই। স্বার্থের বশে করুক যে-পথ [illegible] করেছিল তাতে তার বিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

[illegible] চলছিল। এক দিন লোঙ্গোর স্বামী তার জাহাজের সঙ্গে [illegible] থেকে ফিরে এল। স্বামীটি জাহাজী, বছরের বেশীর ভাগ [illegible], বাড়ীর উপর বড় টান নাই। এবার বাড়ী এসে সে [illegible] শুকিয়ে গিয়েছে—তার যেন মাথার ঠিক নাই; ছেলেটাও [illegible] কঙ্কালসার, দেখে চেনা যায় না। কি হয়েছিল জানতে চাইলে [illegible] বলল, অসুখ। স্বামী এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেনি। [illegible] চলে যাওয়ার পর লোঙ্গোর দুঃখ বাড়ল। এবার সে [illegible] অসুখে পড়ল—দ্বিতীয় বার গর্ভ হওয়ার দরুণ। দ্বিতীয় [illegible] প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীর প্রায়ই ভেঙ্গে পড়ে। [illegible] দরুণ লোঙ্গো আর নিত্যি-দিন ডাইনী বুড়ীর বাড়ী যেতে [illegible] না। এখন সে শুধু বদলে-পাওয়া ছেলেটাকে যথাসাধ্য যত্ন [illegible] আশা, এতেই তার নিজের হারাণো ছেলের কল্যাণ [illegible] দুশ্চিন্তার দরুণ এমনি তার স্তনে দুধ ছিল কম, তাও [illegible] আসে; এখন তা একেবারেই শুকিয়ে গেল। যে ভাবতে [illegible] পাগল হয়ে উঠত, এই বদলে-পাওয়া ছেলেটার চেহারা [illegible] দিন যা হচ্ছে, যদি তার নিজের ছেলেটারও ঐ দশা [illegible]! কি অন্যায়! সে তো ছেলে-বদল হওয়া চায়নি! তার উপর এ বোঝা চাপানো হয়েছে! এ ছেলেটার ঘাড়ে একটুও জোর নাই, কাঁপা মাথাটা নড়বড় করে; লিকলিকে পা দু'টোর উপর ভর দিয়ে কোনো দিন দাঁড়াবে এ ভরসা কম।

ইতিমধ্যে তিউনিস্ থেকে স্বামীর চিঠি এল, জাহাজে যাবার সময় সে তার সঙ্গী জাহাজীদের কাছে তার ছেলে-বদল হওয়ার গল্প শুনেছে, ডাইনীরা না কি তার ছেলে বদলে দিয়েছে। সেই শুধু এ গল্প আগে শোনেনি। তার সন্দেহ, আসল ব্যাপার হচ্ছে, তার নিজের ছেলেটা মারা গিয়েছে আর সারালোঙ্গো ওখানকার অনাথাশ্রম থেকে একটা ছেলে এনে পালছে। স্বামী লিখেছে, তার বাড়ীতে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল বাচ্চার স্থান হবে না, তাকে যেন অবিলম্বে ফেরৎ দিয়ে আসা হয়।

পরের বার স্বামী যখন তিউনিস্ থেকে ফিরল, বৌ অনেক কাকুতি-বিনতি করতে সে অভাগা শিশুটাকে বাড়ীতে বরদাস্ত করতে রাজী হল বটে কিন্তু তার প্রতি তার কোনো প্রকার মমতা জন্মাল না। বৌ তার সাধ্য মত ছেলেটার যত্ন-আত্তি করত, যাতে তার নিজের ছেলের কোনো অমঙ্গল না হয়।

ছেলেটার দশা আরও বিগড়াল যখন দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হল। স্বভাবতঃই লোঙ্গো আর আগের মত অত বেশী প্রথম সন্তানের কথা ভাবত না। ফলে, ঐ কাদা-কাবা ছেলেটার যত্ন নেওয়াও তার কমে গেল। দুর্ব্যবহার অবশ্য করত না সে,—অবহেলা করত। সকালে তাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে রাস্তার দিকের দরজাটার পাশে একটা বর্ষাতি-চটের দোলনায় বসিয়ে দিত সে—সামনে একটা মাচায় একটু করে রুটি কি একখণ্ড পিঠে ফেলে রাখত। ব্যস্, সারা দিনের মত ছেলের কাজ শেষ।

অভাগা ছেলেটা সারা দিন ঐখানে পড়ে থাকত—ময়লার মধ্যে; এক ঝাঁক মাছি তাকে উত্যক্ত করত। পা পঙ্গু, মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ দোলে, চুলে ধূলো-মাটী। রাস্তার ছোঁড়ারা তার মুখের উপর বালি ছুঁড়ে মজা দেখে। ওর মুখে কোনো অভিযোগ নাই, হাত দিয়ে যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করে সে।

পাড়ার সবাই তাকে ডাকে ডাইনীদের ছেলে ব'লে। ছোট ছেলেদের কেউ কাছে এসে কিছু জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে চেয়ে থাকে, কি জবাব দেবে হয়তো ভেবে পায় না। সম্ভবতঃ কিছুই বোঝে না। একমাত্র সাড়া দেয় একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে। ও-রকম হাসি শুধু রুগ্ন শিশুদের মুখেই দেখা যায়। মুচকি হাসি—মুখের চোখের কোণগুলোতে একটু রেখা টেনেই যা মিলিয়ে যায়।

লোঙ্গো নব জাতককে কোলে নিয়ে দরজার কাছে আসে—দিব্যি নধরকান্তি শিশু, লালচে মুখখানা। আগেকার ছেলেটার মতই তার নিটোল স্বাস্থ্য। অভাগা বদলে-পাওয়া ছেলেটার দিকে করুণ চোখে চেয়ে থাকে—আহা, বেচারার এ পরিবারে আর জায়গা নাই। লোঙ্গো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে:—"এ কী পরীক্ষা আমাদের!"

প্রথম সন্তানের কথা মনে পড়ে এখনও সে মাঝে-মাঝে কাঁদে। ভান্না ক্লোমোর কাছে সে আর লোক পাঠায় না—ডাইনী বুড়ী নিজেই যেচে আসে। হারানো ছেলেটা এখন বেশ বড়-সড় স্বাস্থ্যবান্ হয়েছে, সুখেই আছে—এই সুসংবাদ নিয়ে আসার জন্যে যা-হোক্ কিছু প্রণামী আদায় করে।

অনুবাদক—শুভেন্দু ঘোষ

পুণ্যস্মৃতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

[রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ইনস্পেক্টার জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশানের কার্য্যে ইস্তফা দিয়া যখন শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ভার লইয়াছিলেন, তখন তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা পুষ্পদেবীর সৌজন্যে রচনাটি প্রকাশিত হইতেছে]

শ্রমশীলতা

কী অসাধারণ পরিশ্রম তিনি করতেন, কী অফুরন্ত উৎসাহ ছিল সব কাজে তা ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমরা বাল্যকাল থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর রাখি। কিন্তু কলিকাতা মুনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় তাঁর জীবনের বৃত্তান্ত পড়বার পূর্বে, আমাদের মনেও ধারণা জন্মেনি যে এত কাজ তিনি করেছেন। এ সব ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে যা এখনও হিসাবের মধ্যে আসেনি। যেমন বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাঁদের লেখা চিঠি-পত্র।

কত লোক কত কাজে এবং কত অকাজে এবং কখনও কখনও কেবল মাত্র অহেতুক কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছে। যত দিন সামর্থ্য ছিল অর্থাৎ জীবনের শেষ ভাগে, চিকিৎসকদের হাতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করবার পূর্বে পর্য্যন্ত তিনি কারুকে ফিরিয়ে দেননি। এবং যারাই কথা বলতে চেয়েছে তাদের সংগেই কথা বলেছেন। নিরর্থক ভদ্রতা রক্ষার আলাপ নয়, তাঁর মনোবৃত্তি সর্ব্বদাই সজাগ, প্রতি কথাই তাঁর ব্যক্তিত্বে ও বিশেষত্বে প্রাণবন্ত।

একবার পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনে আগন্তুকের অসম্ভব ভীড় হয়েছে, মন্দিরে উপাসনা ও অন্যান্য কাজে গুরুদেবের রুগ্ন শরীর পরিশ্রান্ত। তার উপর কত লোকের সংগে কত কথা বলতে হয়েছে। বিশ্রামের একান্ত অভাব, এমন সময় তৃতীয় দিন প্রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শহীদুল্লাহ, এসে উপস্থিত। তিনি সেই দিন বিকেল ৫টার গাড়ীতে ফিরে যাবেন, তার পূর্বে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করা চাই। এই প্রস্তাব নিয়ে অত্যন্ত দ্বিধার সংগে সুধাকান্তের কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা অপরাহ্ণ চারটের সময় গুরুদেবের নিকট গেলাম। পথে শহীদুল্লাহ, সাহেবকে ভালো করে তালিম দেওয়া হল যে, কেবল মাত্র কুশল প্রশ্ন করেই চলে আসবেন কোন প্রকার আলোচনা বা তর্কের বিষয় ভুলেও যেন উত্থাপন না করেন।

কিন্তু কার কথা কে শোনে? দু'মিনিটের মধ্যেই ভাষা-তত্বের দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা সুরু হল এবং আধ ঘণ্টার উর্দ্ধকাল যে সব কথা হয়েছিল তার অধিকাংশই সাধারণের দুর্বোধ্য।

কিন্তু এই এক দিন নয়। দিনের পর দিন দেখেছি কী কঠোর পরিশ্রম তিনি করতেন এবং যতটুকু বিশ্রাম করতেন তাতে মানসিক ও শারীরিক শ্রান্তির পূরণ কেমন করে হত তা আমার বুদ্ধির অতীত। দিবানিদ্রা করতে কখনই দেখিনি, কঠিন রোগে শয্যাশায়ী না হলে দিনের মধ্যে শয়ন করেননি। কিন্তু এই সময় যে কেবল ছবি আঁকতেন বা গান বা কবিতা লিখতেন তা নয়, শ্রীনিকেতনের তেতলায় দেখেছি ছাপাখানার প্রুফ নিজের হাতে সংশোধন করেছেন অথবা প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বইখানি পরিবর্তন করবার জন্য লাইব্রেরী থেকে মোটা মোটা বই আনিয়ে পড়তেন।

শান্তিনিকেতনের উৎসবের দর্শকদের ধারণাই হতে পারেনি যে অভিনয় ও নৃত্য-গীতাদির অন্তরালে গুরুদেবের কত চিন্তা ও কত পরিশ্রম ছিল।

আমি শ্রীনিকেতনে যাবার কিছু দিন পরেই রথী বাবুর পঞ্চাশ জন্মদিন উপলক্ষে তাসের দেশ অভিনীত হয়, সন্ধ্যার পরেই গুরুদেব রাত্রির আহার শেষ করতেন। আহারের অব্যবহিত পরেই মুহূর্ত মাত্র বিশ্রাম না করেই তাঁর ঠেলা-চেয়ারে বসে উত্তরায়ণের নিম্নতলস্থ হল-ঘরে এসে উপস্থিত। তার পরে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁর পরিচালনায় অভিনয়ের আখড়াই চলত। অভিনয় ও সঙ্গীতের প্রতি কথাটি যতক্ষণ নির্দোষ না হত ততক্ষণ তিনি বার বার সংশোধন করে দিতেন। দিনের পর দিন এই রকম চলছে, আমরা পেছনের বেঞ্চে বসে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দেখতাম।

তার সংগে সংগে বইখানির পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনও চলছে। আমি প্রথম প্রথম একটি ছাপার বই নিয়ে গেছি, যে সব স্থলে পরিবর্তন হচ্ছে তা পেনসিলে নোট করছি। ৺কালীমোহনের পুত্র শান্তিদেব রাজপুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, বক্তব্য কথা মুখস্থ হয়নি বলে গুরুদেব তাঁকে ভর্ৎসনা করছেন কিন্তু পরিবর্তন এত বেশী ও ঘন ঘন হতে লাগলো যে আমি আর লিখে নেবার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।

এদিকে নূতন নূতন গানের সংযোজনা চলছে—এক জন মণিপুরী নর্ত্তক এসেছেন—তার জন্য এলো

ওগো মনোরমা

আমি যদি আজ করি অপরাধ

করিও ক্ষমা—

তার পর এলো আবার এক জন জাপানী নর্ত্তক—। নূতন গান রচনা হল তার জন্য।

শিক্ষাদান কার্য্য

গুরুদেব যখন শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপন করলেন তখন শিক্ষাব্রত গ্রহণ করলেন। মামুলি স্কুল-কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেননি এ কথাও যেমন বহু বার বলেছেন তেমনি নিজের শিক্ষা পদ্ধতির কথাও বলেছেন। অনেক লোকের কাছেই তাঁর অধ্যাপনার অদ্ভুত দক্ষতার কথা শুনেছি। তার মধ্যে ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও এণ্ড্রুজ সাহেবের নাম করা যেতে পারে।

তাঁর শেষ-জীবনে কয়েক দিন তাঁর ক্লাশে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এক দিন হঠাৎ খবর এলো, গুরুদেব এম-এ পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে অনার্স ক্লাশ নেবেন। যাবার [illegible] ইচ্ছা সত্বেও প্রথম দিন যেতে পারিনি কোনো ব্যক্তিগত [illegible] তার জন্যে পরে তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। ক্লাশে [illegible] ভীড় হত, কিন্তু একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিতেন কে কে এসে[illegible]

একবার আমার শ্রীনিকেতন থেকে পৌছুতে দেরী [illegible] ক্লাশ তখন শুরু হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম তাঁর নূতন [illegible] দোতলার ঘরে ক্লাশ হত। পরে বেশী লোকের সমাগম হ[illegible]

... বাড়ীর একতলার বারান্দায় ক্লাশ বসতো। সেদিন এইখানেই ... হচ্ছিল। সেই সময় গিয়ে পড়লে সৌজন্যের অভাব হবে মনে ... আমি আর গেলাম না। সামনে অনিল চন্দের খোলা বারান্দায় ...টি বেতের চেয়ার অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য সাজানো থাকতো। তারই একটিতে বসে ক্লাশ শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করলাম।

...খান থেকে গুরুদেবের আসন প্রায় ২৫০।৩০০ হাত দূরে। কিন্তু তিনি এতো জোরে বলছিলেন যে তাঁর বক্তব্য প্রায় সমস্ত আমি ... পেয়েছিলাম।

আমি ভাবলাম মিনিট পনের-কুড়ি আগে আরম্ভ হয়েছে, তখন ... আর কতই বা দেরী হবে। কিন্তু সেদিন পাঠ চললো তো চললোই। শেষ হলে দেখা গেল যে, এক ঘণ্টা পনর মিনিট সময় লেগেছে।

এই বাংলার ক্লাসের সঙ্গে আমার একটি বিপদের স্মৃতি জড়িত আছে। ক্লাশে যেতাম কাগজ-পেনসিল নিয়ে, যত দূর সম্ভব বক্তৃতার নোট করতাম। বাড়ীতে ফিরে এসে একটি খাতায় ভালো করে লিখতাম। লেখা হলে সুধাকান্তর মারফৎ বইটি গুরুদেবের কাছে পাঠানো হত। গুরুদেব আমার লেখা সংশোধন করে দিতেন। এই রকম দু'বার হয়েছিল। তৃতীয় বার খাতা পাঠানোর পরেই গুরুদেব ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেই অসুখ তাঁর শেষ অসুখ।

আমি আর খাতার খোঁজ করিনি, কারণ সে সময় সুধাকান্তকে কিছু বলা অসঙ্গত। গুরুদেবের দেহান্তের কিছু দিন পরে খাতার খোঁজ করেছিলাম। সুধাকান্ত বললেন, গুরুদেবের ঘরে অন্যান্য কাগজপত্রের সংগে ছিল, কিন্তু তার বিশেষ অনুসন্ধান করেও খুঁজে পাইনি। আমি খাতাটির আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার পর ...ন বছর কেটে গেল। ১৯৪৪ সালের মে মাসে এক দিন বোলপুর গেছি। সকাল বেলা বোলপুরের ডাক-বাংলোয় বসে চা খাচ্ছি। এমন সময় ঝড়ের মত সুধাকান্তের প্রবেশ। তার হাতে আমার সেই হারানো খাতা।

অপরিমেয় স্নেহ

আমার শ্রীনিকেতন থেকে কলকাতায় আসার দিন স্থির ...। এমন সময় শুনলাম, তার ঠিক আগের দিন সদলবলে ... কলকাতা আসবেন। আমি যাত্রার দিন বদলে ষ্টেশনে ... গুরুদেবের গাড়ীর কাছে দাঁড়াতেই বললেন, কী সাহেব-... যাচ্ছ? আমি চাকরীর আমলের প্যান্ট বা হাফ প্যান্ট ... তিনি রহস্য করে আমায় সাহেব বলতেন।

... দিলাম, কাল কলকাতা যাব ভেবেছিলুম কিন্তু ... সবাই আজ যাচ্ছেন বলে আজই যাচ্ছি। কর্তব্যো ... গুরুদেব ফার্ষ্ট ক্লাসে বসলেন। আমাদের ইণ্টার ... বেশ ভারি হয়েছিল। বর্দ্ধমান আমাদের ... নির্দ্দিষ্ট স্থান, সেখানে গাড়ী দাঁড়াতেই রাণী চন্দ চায়ের ... এবং আলুকে বললেন গুরুদেবের কামরা থেকে ... বাটি আনতে।

... ওরফে সচ্চিদানন্দ রায়, অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের ... অবিবাহিত সদাপ্রফুল্ল ও ভবঘুরে। ঐ সময় তিনি ... দেখা-শোনার কাছে নিযুক্ত ছিলেন]

খানিক পরে আলু ফিরে এসে রাণীর কানে কানে কি যেন বললেন এবং রাণী খাবারওয়ালাকে ডেকে প্রচুর পরিমাণে সিঙ্গাড়া-কচুরী কিনলেন। পরে বোধ হয় কয়েক ঠোঙ্গা সাড়ে বত্রিশ ভাজা কিনে আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

গাড়ী যথাসময়ে হাবড়াতে পৌঁছুল। গুরুদেবকে চাকা দেওয়া চেয়ারে বসিয়ে গাড়ীতে তুলে দেয়ার পর আলু এসে প্রকাণ্ড টিফিন ক্যারিয়ারটি আমার গাড়ীতে তুলে দিয়ে বললেন, "গুরুদেব বলে দিলেন যে, সুকুমার যাচ্ছে বাড়ীতে খবর না দিয়েই, এত রাত্রে ওর খাবার হয়তো থাকবে না। আমার এই খাবার ওকেই দিও।"

বেশী রাত হয়নি। সুতরাং বাড়ীতে যে খাবার ছিল না তা নয়। কিন্তু সেই প্রসাদ যে কী পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমি ও ছেলেরা খেয়েছিলুম তা জীবন থাকতে ভুলবো না।

তিরস্কার

গুরুদেবের শরীর তখন রীতিমত অসুস্থ। শান্তিনিকেতনের চিকিৎসক শচীন বাবু ছাড়া তাঁর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা থাকবার জন্যে এক জন নিজস্ব ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছে। অভ্যাগতদের সংগে সাক্ষাৎ নিষেধ।

এমন সময় ৺স্যার ডেনিয়েল হেমিলটনের গোসবা প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক জন কর্ম্মী এলেন শ্রীনিকেতনে। যাবার দিনে তাঁরা আমাকে ধরলেন গুরুদেবের দর্শন লাভের জন্য। আমি বললাম অসম্ভব, চিকিৎসকদের নিষেধ আছে। বাইরের লোক এলে কথাবার্ত্তায় তাঁর উত্তেজনা হয়। তাঁরা একেবারে নাছোড়বান্দা। অতএব তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সকাল বেলা উত্তরায়ণের সামনের খোলা বারান্দায় উপস্থিত হলাম। সংবাদ পাঠানো গেল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তার বাবু এসে বললেন—গুরুদেব আপনাকে ডাকছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এঁদের নিয়ে যাবো?' 'না, আপনি একলাই আসুন।'

ভিতরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বড় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে গুরুদেব বসে আছেন। ইনজেকসান-জনিত ব্যথায় নুণের পুঁটলী গরম করে সেঁক দিচ্ছেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। সম্ভবত শ্রীমতী রাণী মহলানবীশও ছিলেন।

আমি পায়ের ধুলো নিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, "দেখো, তোমার মধ্যে একটি European strain আছে। তুমি নিজেকে বিন্দুমাত্র spare কর না, অপরের কর্ত্তব্যের ত্রুটিও মার্জ্জনা করতে পার না, আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমার কাছে আমাকে কখনও কাজ করতে হয়নি"—এই ভাবে দু'-তিন মিনিট বলেছিলেন। আমি তো একেবারে অপ্রস্তুত। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই ভাবে আমাকে তিরস্কার করবার কারণ সেই সময় ঘটেছিল কী না, তা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। তবে এ কথা নিশ্চিত জানি যে, আমার সহকর্ম্মীদের তরফ থেকে আমার বিরুদ্ধে নালিশ হয়েছে একাধিক বার। শুনেছি যে, এতে গুরুদেব মাঝে মাঝে বিচলিত হয়েছিলেন। এক দিন পরলোকগত আলুকে বলেছিলেন, "ওরে আমার শ্রীনিকেতনে এক জন হিটলার এসেছে।" আলুর কাছে এই কথা শোনা। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমাকে কিছুই বলেননি।

এ্যাডাল্ট এডুকেশান

ইংরাজী ১৯৩৮ সালে আমরা কয়েক জন বন্ধু বঙ্গীয় শিক্ষা সমিতির বেঙ্গল এ্যাডাল্ট এডুকেশান এ্যাসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করবার অনুরোধ নিয়ে আমরা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সেই সময় এবং পরে দু'য়েক বার এই বিষয়ে তাঁর সংগে আলোচনা হয়েছিল, প্রতিবারেই তিনি এক কথাই বলেছেন, বর্ণমালার ভিতর দিয়ে কেতাবী শিক্ষার বিস্তারের উপর তিনি কখনই ঝোঁক দেননি। যাত্রা-গান ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক প্রণালীর দ্বারা দেশের জ্ঞানের ভাণ্ডার জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করাই যে জনশিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ, প্রতিবার এই কথাই বলেছেন। "শিক্ষার বিস্তার" প্রবন্ধেও এই কথাই বলেছেন।

চীনা ভাষা

চীন জাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। শান্তিনিকেতনে চীন-ভবন প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ। চীনের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। এ কথা ভালো করে বলেছিলেন শ্রীযুত তাই, চি, তাও যখন শান্তিনিকেতনে আমরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করেছিলাম। সংবাদপত্রে তাঁর সেই উক্তি সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়নি। এক দিন অপর আলোচনার মধ্যে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "সুকুমার, তুমি চীনে ভাষা শেখো।" আমার হাসি পেয়ে গেল, বৈকুণ্ঠের খাতায় চীনা জুতাওয়ালার হিসেবের কথা মনে পড়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "চীনে ভাষা শিখতে যাব কেন গুরুদেব?"

তিনি বললেন, "ওদের ফিলজফি খুব ভালো।"

উপসংহার

এই সামান্য ক'টি বৃত্তান্তে আমার মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে নিজের মধ্যে যে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছি, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না।

গুরুদেবের কথা লিখবার প্রধান বাধা এই যে, তিনি যে কথাই বলতেন তাতে কথার ভাবের বা Idiom-এর এমন একটা বিশেষত্ব থাকতো যে, সেই সময় সংগে সংগে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে না রাখলে পরে আর স্মরণ-পথ দিয়ে তার পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব।

যাঁরা গুরুদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেননি, কেবল মাত্র তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচয় লাভ করেছেন, তাঁদের ধারণা, আমার কাহিনী পাঠে যদি কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হয়, তবে আমার আনন্দের বিষয় হবে।

সমাপ্ত

—গোপাল ঘোষ অঙ্কিত

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তেরো

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর কমিটীর সদস্যগণ ভিতরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও পুনরায় বৈঠকের শোভাবর্দ্ধনে যেন কুণ্ঠিত হইতে-ছিলেন। অগত্যা চত্বরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ডাঃ বাগচিই প্রথমে সঙ্কোচটুকু কাটাই-বার উদ্দেশ্যে কহিলেন : উনি তো কমিটীকে উপেক্ষা করেই চলে গেলেন !

কথাটা কাহারও কাহারও অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিয়া বুঝি খচ্-খচ্ করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণে রাধানাথ বাপুলীর তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের কথাগুলিও সেখানে যেন প্রলেপের কাজ করিল। তিনি কহিলেন : কিন্তু ওঁর কথাগুলিও গ্রাহ্য করবার মত—উনি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়েই যেন ত্রুটিটা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন।

অন্যতম সদস্য ভুবন দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন : তা'হলে আমরা এখন কি করব বলুন ?

বাপুলী কহিলেন : সে আপনারা স্থির করুন।

অপর এক সদস্য কৈলাস চক্রবর্ত্তী কহিলেন : তা'হলে এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চলুন বসা যাক ; তার পর—

বাপুলী কহিলেন : কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

সবিস্ময়ে সদস্যগণ বাপুলীর দিকে চাহিলেন ; সদস্য যত্ন ঘোষাল বিস্মিত স্বরে বলিয়া ফেলিলেন : সে কি ! আপনি—

বাপুলী কহিলেন : ঐ ডাক্তারটি যেমন বলে গেলেন, এখানে বৈঠক রেখে মরণোন্মুখ রোগীটিকে দেখা তাঁর আগের কাজ, আমারও তেমনি বলতে হচ্ছে—ঐ ডাক্তারটি অপরিচিত স্থানে রোগী দেখতে গিয়ে যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সে ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে আগে, আর সেইটিই আমার মস্ত কাজ।

কথাগুলি দৃঢ় স্বরে বলিয়া এবং কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বাপুলী চলিয়া গেলেন। সকলেই স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়ে একটি কথাও বাহির হইল না। কিন্তু এই স্তব্ধতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—ভাঙ্গিয়া গেল নিবারণের আকস্মিক আগমনে। দ্বারদেশ হইতেই সে কহিল : পাগলের মত পাগলকে ছুটতে দিন, কিন্তু আপনারা তো পাগল হননি ! রয়েছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ; আপনাদের কাজ আপনারা—

কমিটীর সদস্য না হইয়াও এই মনোনয়ন ব্যাপারটির সহিত নিবারণ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট, ইহা কমিটীর সভ্যগণ গূঢ় ভাবে জ্ঞাত ছিলেন ; তাহার এই উদ্ধত নির্দ্দেশ এখানে প্রত্যেকের চিত্ত বুঝি নাড়িয়া দিল ; এমন কি, যে বৈদ্যনাথ কবিরাজ তাহার প্রতি বিশেষ প্রীতিমান ছিলেন, তিনিই সর্ব্বাগ্রে কথাটা তাহাকে শেষ করিবার অবসর না দিয়াই প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন : আমাদের কাজ আমরাই ভালো বুঝিছি—তোমার উপদেশের অপেক্ষা রাখি না। ডাক্তার রায় ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এ ব্যাপারটা মুলতুবি থাকবে। আজকের ম্যাজেণ্ডায় এই কথাই আমরা লিখব।

নিবারণ তথাপি যুক্তি দেখাইয়া কবিরাজ মহাশয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্ব উক্তিতেই দৃঢ় থাকিয়া কহিলেন : এ জবাব নয়। তোমাদের এত দিনের চাল এই ডাক্তার এক তুড়িতে বেচাল করে দিয়েছেন—হাওয়া এখন তাঁরই দিকে।

•

অল্পক্ষণের মধ্যে কথাটা বাপুলীর সর্ব্বত্র লোকমুখে প্রচারিত হইয়া এই অজ্ঞাত অপরিচিত ডাক্তারটিকে বিখ্যাত করিয়া তুলিল।

হরিনারায়ণের সহিত চণ্ডীর কথোপকথনের মধ্যে মাধুরী দেবী যদিও রোগীর প্রসঙ্গটি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে এ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে, ধারণাও করেন নাই। এখন উপলব্ধি করিলেন যে, ডাক্তার বাগচি ইচ্ছাপূর্ব্বক কি ভাবে নিজেই নিজের শুভাদৃষ্টের দ্বারটি তাঁহার প্রতিযোগীর জন্য খুলিয়া রাখিয়াছিলেন ! নিবারণ যখন শশী ডাক্তারকে লইয়া ম্লান মুখে কমিটীর পক্ষপাতিতার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট নালিশ করিতে আসিল, মাধুরী দেবী তখন জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে ভাগ্যান্বেষী এই কৃপাভাজনটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : নিজের দোষ-ত্রুটি সব চাপা দিয়ে কমিটীর উপরে মিছিমিছি দোষ চাপাতে এসেছেন আপনি ! যেখানে আপনাকে বসাবার জন্যে আমি এত চেষ্টা করছি, সেখানে যে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল—বাপুলী মশাই আপনাকে ভিজিট দিয়ে সে রোগী দেখতে পাঠাবার কথা পর্য্যন্ত বলেছিলেন—আমাকে সে কথা জানানোও দরকার মনে করেননি ! এই সহজ-বুদ্ধিটুকুও আপনার নেই—কাজ আদায় করবার সময় কাউকে চটাতে নেই, সকলের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়। ভোট নেবার সময় বড় বড় মানী লোকেরা কি ভাবে মনের আসল ভাব চেপে রেখে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ভোটারদেরও বাহ্যিক ভাবে তোয়াজ করে থাকে, সে কি আপনি জানেন না ?

শশী ডাক্তার বলিলেন : বাপুলীর সঙ্গে গোড়া থেকেই আমার বনি-বনাও হয়নি, বিরোধী জেনেই ওঁর সে প্রস্তাবটা আমি অগ্রাহ্য করেছিলাম।

মাধুরী দেবী কহিলেন : আপনি বুদ্ধিমান হোলে ওঁর প্রস্তাব কিছুতেই অগ্রাহ্য করতেন না ; অন্তত আমাকেও জানাতেন।

মৃণালিনী এই সময় কহিল : দাদা বলছিল, ব্যাপারটা না কি সাজানো। ডাক্তার দাদুকে জব্দ করবার জন্যেই ভুয়ো রোগী খাড়া করে ওরা—

মাধুরী দেবী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন : থামো, তোমার দাদা এমন অনেক কথা শোনে যা ঠিক নয়, আর নিজে যা বলে,

তা নিছক মিথ্যে। এ সব কথা তুলে নিজেদের আর খাঁটো কোরো না। যদি কথাটা সত্যিই হয়, তা'হলেও বলবো যে, কোন কিছু নিয়ে নতুন বৌ-এর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে যাওয়াই ঝকমারি—সব দিক দিয়েই তোমাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করবার অস্ত্র সে চালাতে জানে।

সেই দিনই মাধুরী দেবী নিবারণকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন: আমি নিষেধ করছি নিবারণ, যদি এখনো নিজের মান-ইজ্জত রাখতে চাও, প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কোন দিন বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে না।

মুখখানা রক্তবর্ণ করিয়া নিবারণ উত্তর করিল: কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ মা—আমিও নিবারণ, কারুর বারণ মেনে চলবার শিক্ষা এখনো পাইনি। ছোট-ঘরের ঐ মেয়েটাকে লোকে যত বড়ই ভাবুক না কেন, আমার ধারণা তাতে টলবে না মা, আমার চোখে ও বরাবরই ছোটই থাকবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন: তোমার বুদ্ধি আর চোখের দৃষ্টি থাকলে এ নিয়ে আর বড়াই করতে না নিবারণ। মুখের কথায় কাউকে ছোট করা যায় না, নিজেকে তুমি নিজেই কত ছোট করেছ, সেটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এখনো মিছে আস্ফালন করছ।

নিবারণের ঔদ্ধত্য তথাপি প্রশমিত হইল না; মায়ের কথায় ক্ষণিকের জন্য তাহার মুখখানা কালো হইয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া রুক্ষ ম্লান মুখখানাকে আরক্ত করিয়া সে উত্তর দিল: দুনিয়া-শুদ্ধ লোক আমাকে ছোট ভাবলেও আমি কিন্তু নিজেকে ছোট ভাবি নে। গরীবের মেয়ে এ-বাড়ীতে এসে অবধি সব দিক দিয়েই আমাকে ছোট করবার চেষ্টা করেছে, তার কাছে আমি গাধা, আমাদের আভিজাত্য অসার, তার পর আমার মাতামহকে উদ্দেশ করে যে-সব কথা বলেছে—সে অপমান তোমরা ভুললেও, আমি সহ্য করব না। আর তুমি কি চাও—আমি ছোট হোয়ে বেঁচে থাকি? তাহ'লে কেন আমাকে সব দিক দিয়ে বড়ো হবার আবেষ্টন দিয়ে গড়ে তুলেছিলে? এখন তার প্রত্যেকটি জোর করে গা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাকে শিষ্ট শান্ত সহজ হোতে বলছ কোন মুখে? বাঙলীর গদীর ছবি আমার চোখের ওপর তুলে ধরেছিল কে? কার কাছে ভরসা পেয়ে, আশ্বাস পেয়ে, সাহস পেয়ে আমি নিজেকে বড় ভেবেছিলুম? সেই ভাবেই আমি তৈরী হয়েছি; সেই ভাবধারা ফল্গুর মত আমার বুকের মধ্যে চাপা রয়েছে—যে দিন বন্যার মত ফুটে বেরুবে, তুমি কি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে?

মাধুরী দেবী অপলক দৃষ্টিতে উত্তেজিত পুত্রের মুখপানে তাকাইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে এই মর্ম্মভেদ কথাগুলি শুনিতেছিলেন, শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতেছিল, মাতৃত্বের কঠিন আবরণ মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া অতি সতর্ক ভাবে একমুখী স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে যে পুত্রপ্রীতি তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামীর দৃষ্টিতে তাহা উদ্‌ঘাটিত হইলেও মাতৃত্বের অকাট্য যুক্তির মায়াজালে সে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করা যত সহজ হইয়াছিল, আজ মর্ম্মাহত পুত্রের উত্তেজিত কণ্ঠের জিজ্ঞাসার আঘাতে সে যুক্তিজাল বুঝি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, তাহাকে ঠেকাইবার মত ভাবাও তাঁহার কণ্ঠে নাই। ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে নীরব থাকিবার পর জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন: তোমার কাছ থেকে এ প্রশ্ন যে কোন দিন আসবে, আমি তা ভাবতেও পারিনি; তাই এর জবাব আমি এখনি দিতে পারব না; তা ছাড়া বুঝছি—এর জবাবও বুঝি নেই। সংসারে চিরদিনই মায়েরা এমনি অসহায় বাবা! সন্তানের স্বার্থের দিকেই শুধু মায়ের দৃষ্টি একমুখী হোয়ে একই ভাবে পড়লে, বুঝি এক দিন এমনি করেই তাকে অনুতাপ করতে হয়! আজ আমি এ বাড়ীর সবার কাছেই অপরাধী। যুক্তি দিয়ে আর সকলের মুখ বন্ধ করলেও, তোমার মুখ আমি বন্ধ করতে পারব না বাবা! তোমার মনের জ্বালা আমি বুঝতে পারছি, আর এর জন্যে আমিই যে সব চেয়ে বেশী দায়ী, সেটি বুঝে তোমাকে বলছি—যে অন্যায় করেছি, তার জন্যে যদি কোন খেসারত দিতে হয় আমাকে, আর তুমি তাই নিয়ে অভাগিনী মাকে ক্ষমা করতে পারো—আমাকে জানিও। সেইটিই হবে আমার প্রায়শ্চিত্ত।

কথাগুলি শেষ হইতেই অঞ্চলে মুখ চাপিয়া মাধুরী দেবী তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে একরূপ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন—তাঁহার অন্তরে তখন যে ঝড় বহিতেছিল, নিজেকে সামলাইয়া পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার মত অবস্থা তাঁহার মত দৃঢ়চিত্ত নারীর পক্ষেও তখন সম্ভব ছিল না।

আর নিবারণ—নিচের ঠোঁটটি উপরের বলিষ্ঠ দন্তপাটি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজনার এক বিশেষ মুহূর্ত্তে মায়ের কণ্ঠোচ্চারিত কথাগুলির নির্গলিতার্থ বাহির করিতে নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল।

চৌদ্দ

পূর্ণ একটি সপ্তাহ পরে—অষ্টম দিনে ডাক্তার রায় বাগুলীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে এই নবাগত ডাক্তারটি মল্লিকপুর নামক দূরবর্ত্তী দরিদ্র পল্লীতে যাত্রা করিয়াছিলেন, বাগুলীর সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসিবর্গ তাহার পরিণতি জানিবার জন্য কেহই কৌতূহলী না হইয়া পারেন নাই। অথচ, অন্য সময় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী উক্ত পল্লীর কোন অখ্যাত ও দরিদ্র অধিবাসী গৃহের এই শ্রেণীর কোন ব্যাধি ইহাদিগকে কোন দিন আকৃষ্ট করিয়াছে, এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঘটনাচক্রে এইরূপ সামান্য ঘটনাও ব্যাপক ভাবে অসাধারণ হইয়া উঠে।

সেদিন ছ্যাকরা গাড়ীতে ডাক্তার রায়ের মল্লিকপুর যাত্রার খানিক পরেই রাধানাথ বাগুলীও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও খাদ্যাদি লইয়া মল্লিকপুরে রওয়ানা হন। কতিপয় উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক সহ রাজেনও তাঁহার সহযাত্রী হয়। এই যাত্রার পশ্চাতে বধূরাণী চণ্ডীর সুচিন্তিত নির্দ্দেশ সাধারণের অজ্ঞাত থাকিলেও অভিযাত্রীদের অন্তরে রীতিমত প্রেরণা দেয়। মল্লিকপুর গ্রামখানির অধিকাংশ অধিবাসী নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান, ইহাদের এক অংশের উপজীবিকা কৃষিকার্য্য, কিয়দংশ রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর ও দর্জ্জির কাজে অভ্যস্ত। তরুণ ও প্রবীণ দল সাধারণতঃ এই জাতীয় সম্প্রদায় রূপেই পরিচিত। কতক হাঁস, মুরগী, ছাগল, গাভী, মাছধরা জাল এবং ডিম-মুরগাদি বাঙলীর ন্যায় সমৃদ্ধ অঞ্চলে

দোকান দিয়া উপস্বত্ব ভোগ করে। কয়েক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থের নিদর্শনও পাওয়া যায়—ব্যবসায় সম্পর্কে তাহারা যে বিত্তবান হইয়াছে, সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘন সন্নিবদ্ধ মৃন্ময় কুটীরশ্রেণীর মাঝে মাঝে নির্মিত কোন কোন ইষ্টকালয় তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। কেহ অর্থভাগ্য লাভ করিয়া দালান-কোঠা তুলিলেও, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া তাহাদের যে ভাগ্যোদয় ঘটে নাই—যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়াছে, বাসভূমির পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ও নিরক্ষর প্রতিবাসীদের দুরবস্থা যেন চোখে অঙ্গুলি দিয়াই প্রদর্শন করিতেছে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটির এক পার্শ্বে একটি দীর্ঘ ঝিলকে পরিবেষ্টন করিয়া নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী ও ধীবরদের পল্লীগুলি তাহাদের বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের নানা নিদর্শন দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে।

পল্লীবাসীদের মধ্যেও অসুখ-বিসুখ লাগিয়াই থাকে; এ ক্ষেত্রে ইহারা সাধারণতঃ টোটকা, হাতুড়ে ডাক্তার এবং রোজার দ্বারস্থ হইয়া মুস্কিল আসান করিতে চাহে। রোগ যেখানে দুর্বোধ্য ও দুর্নিবার হইয়া উঠে, তখনই ডাক্তারী দাওয়াইখানায় ধর্ণা দিয়া থাকে। সদর মহকুমার পরেই বাগুলী সর্ব্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চল এবং এখানকার রাজা বাবুদের দাতব্য দাওয়াইখানার খ্যাতি আট-দশ ক্রোশব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। বাগুলী ব্যতীত আর কোথাও কোন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দাদের পক্ষে উক্ত চিকিৎসালয়টির উপযোগিতা কতখানি—দীর্ঘপথযাত্রায় গাড়ীতে বসিয়া ডাক্তার রায় তাঁহার সহযাত্রীর নিকট হইতেই সে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে রোগীর সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বেই অঞ্চলবাসীদের অসহায় অবস্থা ও সহনশীল প্রকৃতির সুস্পষ্ট আভাসও পাইয়াছিলেন।

এ পর্যন্ত ডাক্তার তাঁহার সহযাত্রী নামদার খাঁকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই যে, পুত্রটি কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যে অপরিচিত গ্রামাঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া তিনি চলিয়াছেন, রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল অধিবাসী তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইতেছে, সেই পল্লী ও পল্লীবাসী সম্পর্কে তাঁহার সাগ্রহ প্রশ্ন বৃদ্ধ খাঁকে পর্য্যন্ত অবাক করিয়া দিয়াছে। সে ভাবিয়া পায় না, কলকাতার এ হেন পাস-করা ডাক্তার বাবু এমন করিয়া গাঁয়ের কথা, গাঁয়ের মানুষের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

তাহার পর এই দরিদ্র গৃহস্বামীটি মানী ডাক্তার বাবুকে বাড়ীতে আনিয়া কোথায় বসাইবে, কি করিয়া খাতির করিবে, তাহার তদ্বির করিতে যখন পাগলের মত হইয়াছে—পাড়ার সম্পন্ন বাসিন্দা বসির মিঞার বাড়ী হইতে একখানা খুরসী চেয়ার আনিবার জন্য হাঁক-ডাক সুরু করিয়া দিয়াছে, সেই ডাক্তার বাবুই তাহাকে থামাইয়া সর্ব্বাগ্রে বাড়ীর উঠান ও ঘরের সামনের মাটির দাওয়াটি পরিষ্কার করিবার কাজে যেই লাগাইয়া দিলেন, সে তখন নিজেই বুঝি লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সত্যই, কি হাল করিয়া রাখিয়াছে ইহারা উঠান ও দাওয়াটির—শিশুদের সদ্য-ত্যক্ত মল, মুরগীর ছাল, ডিমের খোলা, উচ্ছিষ্টাদি, ছিন্ন মলিন কাপড়-চোপড়—এমনই কত কদর্য্য দুর্গন্ধযুক্ত বিশ্রী বস্তু চারি দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দুই নাতীকে লইয়া বৃদ্ধ খাঁ আবর্জনাগুলি সরাইবার সময় বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল—উঠানের এক পার্শ্বে যে সুপুষ্ট লাউ গাছটির পল্লবিত শাখা গৃহের চালাগুলি ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং চালার নীচে বাঁশের মাচাটিও আবৃত করিয়া বহু ফল প্রসব করিয়াছে, সেগুলি দেখিয়া ডাক্তার বাবুর কি আনন্দ! মাচার নিম্নে দোদুল্যমান লাউগুলি লইয়া বালকের মত তাঁহার কি হাস্যোল্লাস!

অল্পক্ষণ পরেই পরিচ্ছন্ন দাওয়ার উপর বাড়ীতে বয়ন করা একখণ্ড নূতন মাদুর বিছাইয়া দিল নামদার খাঁ ডাক্তারকে বসাইবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ডাক্তার তাঁহার ব্যাগটি গাড়ী হইতে আনাইয়া সেই মাদুরের উপর রাখিয়া বলিলেন: আগে রোগী দেখবো, সেইখানেই বসা যাবে।

দাওয়ার সামনের গৃহে রোগী থাকে। ছোট একটি দরজা, মাটির ঘর। এক পার্শ্বে একখানি তক্তপোষের উপর মলিন শয্যা, শয্যার আস্তরণ, বালিসের ওয়াড় এত ময়লা যে, বিশ্রী রঙ ধরিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। গৃহ মধ্যে বায়ু-চলাচলের কোন পথ নাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষগুলি অতি সন্তর্পণে রুদ্ধ। মলিন শয্যায় পূর্ণবয়স্ক এক যুবা অতি কষ্টে অস্পষ্ট আর্ত্ত স্বরে বক্ষ-যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে।

ডাক্তার প্রথমেই ঘরের জানালাগুলি মুক্ত করিয়া দিলেন। গৃহটিও পরিচ্ছন্ন ছিল না—এলোমেলো ভাবে ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি মেঝের উপর ছড়াইয়াছিল। সেগুলি সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া ঘরখানির কিছুটা পরিচ্ছন্নতা আনিয়া ডাক্তার রোগীকে লইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাপুলী আসিয়া প'ড়িলেন তাঁহার সহায়ক দল ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমস্ত লইয়া। তৎপূর্ব্বেই ডাক্তার সর্ব্ববিধ পরীক্ষার পর রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ব্যাগটি প্রয়োজনীয় দুর্ল্লভ ঔষধপত্র ও আধুনিক ইনজেক্সনের দ্রব্যজাতে পূর্ণ ক্ষুদ্র একটি ডিস্‌পেন্সারী-স্বরূপ। প্রতিষেধক লোসনের গন্ধে গৃহ ভরিয়া গিয়াছে—রোগীর বুকে-পীঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়াছে; একটি ইনজেক্‌সনও দিয়াছেন। ডাক্তারের ব্যবস্থায় ঘরের শ্রীও পাল্টাইয়া গিয়াছে।

বাপুলী আসিয়াই ছ্যাকরা গাড়ীর গাড়োয়ানকে ভাড়া ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। জমিদার-বাড়ীর বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারীদের খাদ্যাদি আসিয়াছিল। ইতিমধ্যেই পল্লীর সম্পন্ন গৃহস্থ বসির মিঞা আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে, তাহার বাড়ীর বৈঠকখানায় ডাক্তার বাবুর বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। ডাক্তারের মুখে বাপুলী শুনিলেন, রোগী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, অবস্থা খুবই খারাপ, তবে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইলে হয়তো রক্ষা পাইতে পারে। শুশ্রূষাকারীদিগকে পাইয়া—বিশেষত, সেবাকার্য্যে হাতে-কলমে রাজেনের শিক্ষাপটুতা দেখিয়া ডাক্তার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাপুলী কহিলেন: বধূরাণী বলেছেন, রোগীকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। আপনার যা যা প্রয়োজন, জানাবা মাত্রই সে সব উপস্থিত করা হবে। যদি বাগুলীতে কোন জিনিস না পাওয়া যায়, সদর থেকেই আনিয়ে দেওয়া যাবে।

ডাক্তার কহিলেন: কলেরা, নিউমোনিয়া, এপোপ্লেক্সি, মেনেনজাইটিস প্রভৃতি রোগের যা-কিছু জরুরী ঔষধপত্র আমায়

ব্যাগেই থাকে, আর এই ব্যাগ আমার সকল সময়ের সাথী। ওষুধের জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হোতে হবে না। তবে, আমার কি ধারণা জানেন—রোগীর সঙ্গে বাড়ীর লোকজনের নিরাপত্তাও দেখা চাই। এদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন, খাবার সংস্থান নেই। রোগীর খাদ্য-পথ্যের সঙ্গে ওদেরও খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করুন। আর একটি কথা, রোগীর পরিষ্কার বিছানাপত্র, তাছাড়া পরবার কাপড়-জামাও চাই।

বাপুলী কহিলেন: আপনার কথাতেই বুঝতে পারছি, আপনি যখন এসেছেন, রোগী বাঁচবেই; আর তাকে বাঁচাবার জন্যে তার পরিজনদের দুঃখ-কষ্টের অবসান যে করতেই হবে, এ কথা বৌরাণীও বলে দিয়েছেন। আমিও তৈরী হয়েই এসেছি। খান কয়েক ধোপ-দুরস্ত মোটা চাদর আমাদের সঙ্গেই এসেছে, উপস্থিত এতেই কাজ চলুক; তার পর আর সব জিনিস যা যা প্রয়োজন হবে, আজই আনাবার ব্যবস্থা করে দেব।

অতঃপর ডাক্তারের সম্মুখেই গৃহস্বামী নামদার খাঁকে ডাকিয়া আনিয়া বাপুলী তাহার হাতে এক শত টাকা দিয়া কহিলেন: বাগুলীর সেরেস্তা থেকে এই টাকা তোমাকে দেওয়া হোচ্ছে, তুমি ভেবো না যে, খয়রাৎ করে সেরেস্তা বাহাদুরী জানাচ্ছে। তোমরা হোচ্ছ প্রজা—সন্তানের মত, তোমাদের আপদে-বিপদে জমিদার-সরকার তোমাদের সাহায্য করতে বাধ্য, আর এতে তোমাদের দাবীও আছে। এই টাকায় সংসারের অভাব মিটিয়ে ফেল; সংসারে শান্তি ও সুসার না এলে রোগীর মনে শান্তি আসবে না—সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হোয়েছে।

বৃদ্ধের দুই চক্ষু ছাঁপাইয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়াছে; আনন্দে, ভাবের প্রাচুর্য্যে, কৃতজ্ঞতায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ! ডাক্তার জানাইলেন: রোগীর যে রকম অবস্থা, তা'তে এখানে থেকেই আমাকে ওর চিকিৎসা করতে হবে।

বাপুলী কহিলেন: আপনার ইচ্ছার উপর আমাদের কোন কথা নেই। আপনি যদি এখানে থাকতে চান, কোন অসুবিধা যা'তে আপনার না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। আমার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও আপনার সঙ্গেই এখানে থাকবেন। আমি আবার আপনাকে আমাদের বৌরাণীর পক্ষ থেকে সবিনয়ে বলছি ডাক্তার বাবু, এই রোগীকে সারিয়ে তোলার জন্যে আপনি যে-কোন ব্যবস্থা করতে বলবেন, তার কোন ত্রুটি হবে না।

প্রফুল্ল মুখে ডাক্তার কহিলেন: আপনাদের বৌরাণীর সম্বন্ধে আমি যে সব কথা শুনেছিলাম, এখন ভাবছি, সেগুলির কোনটি অতিরঞ্জিত নয়। বাঙলা দেশের এমনি ষ্টেটের সংস্রবেই আমি কাজ করতে চেয়েছিলাম ঠিক এই ভাবেই মফঃস্বলের বাসিন্দাদের চিকিৎসা করবার আগ্রহে। আমি যদি কিছু দিন এখানে থাকি, পল্লী অঞ্চলের এ অবস্থার প্রতীকার করাই হবে আমার প্রধান কাজ। আর এতে যে আপনাদের পরিপূর্ণ উৎসাহ পাব, তার নমুনা তো আপনি হাতে-কলমেই দেখিয়ে দিলেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন দেখি—তিন-চার ক্রোশ জুড়ে যে সব গ্রাম, হাজার হাজার লোকের বসতি, সেখানে এক জন ডাক্তার নেই!

বাপুলী কহিলেন: আপনি এখানে এসেই যে উদারতা দেখিয়েছেন ডাক্তার বাবু, তাতে সমস্ত অঞ্চলটার মধ্যেই একটা সাড়া পড়ে গেছে, সবাই ধন্য ধন্য করছে আপনার নামে।

কুণ্ঠিত ভাবে ডাক্তার কহিলেন: এখন রোগীকে যদি চাঙ্গা করে তুলতে পারি, তবেই আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ইহার পর ডাক্তারের সহিত শুশ্রূষাকারীদের অবস্থিতি ও আহারাদির যাবতীয় সুব্যবস্থা করিয়া বাপুলী মহাশয় বাগুলীতে ফিরিয়া যান। সাত দিনব্যাপী চিকিৎসার পর রোগীকে রোগমুক্ত ও পথ্য দান করিয়া অষ্টম দিনে বাপুলী মহাশয়ের [illegible] তত্ত্বাবধানে ডাক্তার রায় সহকর্ম্মীদের সহিত বাগুলী-[illegible] প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সেই দিনই অপরাহ্ণে পাঠাগারের উদ্যোগে বাগুলীর অধিবাসীরা ডাক্তার রায়কে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। ডাক্তার রায় এই সব বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া প্রথমে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠাগারের সম্পাদকরূপে রঞ্জন যখন ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিল, তখন তাঁহার পক্ষে আর আপত্তি করা সম্ভবপর হইল না। মল্লিকপুরে রোগীর পরিচর্য্যা ব্যাপারে এই উৎসাহী ছেলেটির প্রতি বিশেষ ভাবেই তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

মল্লিকপুরের এক দরিদ্র রোগীর প্রতি বাগুলীর জমিদার সরকারের অত্যধিক বদান্যতা এবং সেই সম্পর্কে নবাগত এই ডাক্তারটিকে বিপুল ভাবে মর্য্যাদা দানের ব্যাপার নিবারণ এবং ডাক্তার বাগচী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ভাবিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন। এই সূত্রে এমন সংবাদও তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল যে, পরবর্ত্তী মনোনয়নের দিবস বাগুলীর মহোৎসাহী তরুণ সমাজ না কি ডাক্তার রায়কে মনোনীত করিবার জন্য কমিটীর সদস্যগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেন এবং সেই সঙ্গে কালো নিশান লইয়া এক দল লোক মিছিল করিয়া বাহির হইবে—তাহাদের নিশানের বুকে লেখা থাকিবে—'ডাক্তার বাগচী, ফিরিয়া যাও।' কথাটা মাধুরী দেবী কোন সূত্রে জানিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাক্তার বাগচীকে গোপনে আহ্বান করিয়া নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিদায় লইতে অনুরোধ জানান। সেই সঙ্গে যে অর্থ তিনি [illegible] স্বরূপ ডাক্তার বাগচীর হাতে তুলিয়া দেন, তাহার প্রাচুর্য্যে [illegible] সকল ক্ষোভের অবসান ঘটে। ফলে, ডাক্তার রায়ের [illegible] আসরেই রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, ধূমকেতুর মত যে বৃদ্ধ ডাক্তারটি বাগুলীর আকাশের একাংশ আবৃত করিয়াছিল, তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন। এই শুভ সংবাদটি শুনিয়া বাগুলীর সর্ব্বসাধারণ যে আশ্বস্ত ও পরিতুষ্ট হইলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

পনেরো

চিকিৎসক মনোনয়নের দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হরিনারায়ণ সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন। খবর পাইবা মাত্র গোবিন্দ চণ্ডী কর্ত্তার শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, মাধুরী ও মৃণালিনী মাথার দিকে দুইখানি কেদারায় পাশাপাশি বসিয়া রোগীর দিকে চাহিয়া আছেন।

চণ্ডী তাড়াতাড়ি শ্বশুরের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার অবসন্ন পদদ্বয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। ক্ষীণ কণ্ঠে হরিনারায়ণ কহিলেন: বৌমা বুঝি?

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল : মাথায় কি কষ্ট হোচ্ছে বাবা ?

মৃদু স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন : হ্যাঁ—মা।

গোবিন্দ মাধুরীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : ডাক্তারকে খবর দেওয়া হোয়েছে, মা ?

মাধুরী দেবী কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ তিক্ত করিয়া উত্তর করিলেন : না। বললেন—বৌমা ওঁর চিকিৎসা করবেন, তাঁর ওষুধ ছাড়া আর কোনো ডাক্তারের ওষুধ খাবেন না। বাগুলী মশাইকেও পাওয়া গেল না—তিনি নতুন ডাক্তারকে তোয়াজ করতে মল্লিকপুরে গেছেন।

গোবিন্দ কহিল : ডাক্তার বাগচি মশাই তো বাড়ীতেই রয়েছেন, তাঁকে একবার ডাকলে—

গোবিন্দের কথায় বাধা দিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন : যদি তাঁর ওষুধই না খাবেন, ডেকে আনা মানে তাঁকে অপমান করা। বৌমা তো এসেছেন, উনিই—

বলিতে বলিতে বৌমার দিকে সহসা মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই তাঁহার মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল। স্তব্ধবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, ইতিমধ্যেই বৌমা অঞ্চল হইতে রূপার একটি ক্ষুদ্র কৌটা খুলিয়া তন্মধ্যে রক্ষিত চূর্ণ পদার্থ কয়েক টুকরা কাগজে ভরিতেছেন। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, চণ্ডী শ্বশুরের জন্য ঔষধ লইয়াই আসিয়াছেন।

অনতিবিলম্বে একটি পুরিয়া লইয়া চণ্ডী শ্বশুরের শিয়রের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল : ওষুধটা খেয়ে ফেলুন বাবা, মাথার যন্ত্রণা এখনি কমে যাবে।

অবোধ সরল শিশুর মত হরিনারায়ণ মুখব্যাদান করিতেই চণ্ডী চূর্ণ পদার্থ টুকু মুখবিবরে ঢালিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ পার্শ্বের টিপয় হইতে জলপাত্রটি মুখে ধরিল। এক চুমুক জলপান করিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন : আমি জানতুম মা, খবর পেয়েই তুমি একবারে তৈরী হয়ে আসবে।

চণ্ডী মুখখানা একটু কঠিন করিয়া কহিল : এ কথা বলবার কোনো দরকার ছিল না বাবা! আপনি তো জানেন, আর ডাক্তাররা একবাক্যে আপনাকে বলেছেন, যখনই এই ভাবে অসুস্থ হবেন, তখনই শুয়ে পড়বেন, আর মুখখানি বুজিয়ে ফেলবেন—একটি কথাও বলবেন না। তবে ?

হরিনারায়ণ কি বলিতে যাইতেছিলেন, চণ্ডী তৎক্ষণাৎ ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল : আবার কথা বলতে চাইছেন বাবা ? তা'হলে আমরা উঠে যাবো। কথা আপনি কিছুতেই বলতে পারবেন না ; চুপ করে শুয়ে মুখখানি বুজিয়ে খালি আমাদের কথা শুনুন।

হরিনারায়ণ ইহার পর সত্যই নীরব হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়িলেন। চণ্ডী শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল : ঘুমটাই হোল আসল ওষুধ, মা! যে অস্থির মানুষ, কিছুতেই মুখ বুজিয়ে থাকতে চান না। ঘুমিয়ে যখন পড়েছেন, আর ভয় নেই।

[illegible] গভীর নিদ্রান্তে হরিনারায়ণ সেদিন সুস্থ হইয়া উঠায়, [illegible] অল্পের উপর দিয়াই চলিয়া যায়। কিন্তু চণ্ডীর কঠোর শাসনে পরদিনও তাঁহাকে শয্যাশায়ী অবস্থায় নীরবে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতে হইল।

তৃতীয় দিনে তিনি পূর্ববৎ আরাম-কেদারায় বসিয়া এবং চণ্ডীর সহিত কথা কহিয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। কথা-প্রসঙ্গে ডাঃ রায় এবং মল্লিকপুরের সেই মুসলমান রোগীটির কথা উঠিতেই চণ্ডী কহিল : কাকা বাবু সেদিককার ব্যবস্থা সব করে এসেছেন। আর ঈশ্বর যা করেন, সে যে মঙ্গলের জন্যেই—এই ব্যাপারে সেটাও বেশ বোঝা গেছে।

হরিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন : কি ভেবে কথাটা বলছ তুমি ?

চণ্ডী কহিল : একটা দরিদ্র প্রজার জন্যেও আপনার দরদ যে কতখানি, সেটা আপনার তালুকের সবাই জানতে পারল। এর পর ও অঞ্চলের লোকেরাও বুঝতে পারবে যে, ঝাড়-ফুঁকে বা হাতুড়ে রোজার ওষুধে রোগ সারে না। এখন থেকে সবাই ডাক্তারখানার ওষুধ খেতে চাইবে ভালো হবার জন্যে।

হরিনারায়ণ কহিলেন : অবিশ্যি যদি এই রোগীটা না টেঁসে যায়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বৌমা, তুমি যেন মনে ঠিক দিয়ে রেখেছ—রোগী বেঁচে উঠবেই।

চণ্ডী কহিল : এ রোগে যদি থামা দেওয়া যায়, তার পর রোগ আর না বেড়ে ওঠে, তা'হলে আর ভাবনা নেই। খবর পেয়েছি, সেই লক্ষণই দেখা গেছে।

হরিনারায়ণ কহিলেন : আমি ভাবছি মা, ঐ রোগীটার শুভাদৃষ্টের কথা! খুব সাধারণ আর অখ্যাত হোয়েও আজ তার এমনি সৌভাগ্য যে, বাগুলীতে এমন লোক নেই যে তার জন্যে না ভাবছে! তুমিও মা ঐ লোকটার জন্যে—

গাঢ় স্বরে চণ্ডী কহিল : বাবা, যেদিন আপনার তালুকের প্রত্যেক প্রজাটির জন্যে আমাদের মনে এমনি দরদ আসবে সেই দিন বুঝবো, প্রজাপালনের যে ভার আমাদের হাতে এসে পড়েছে, সত্যিই সে সার্থক হোয়েছে।

হরিনারায়ণ কহিলেন : এই সঙ্গে আমিও স্থির বুঝিছি মা, মানুষ যা ভাবে, যদি সে ভাবনার সঙ্গে নিষ্ঠা থাকে, অন্তরের যোগ থাকে, তাহলে তা পূর্ণ হবেই। তার সাক্ষী এই দেখ মা মা, কমিটীর ওপরে সব ভার ছেড়ে দিয়ে তুমি তো নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘরে বসেছিলে মা, কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য, ভগবান নিজেই তোমার ইচ্ছাটি পূরণ করে দিলেন। এর-পর ঐ ডাক্তারকে নেওয়া হবে না—এ কথা বলবার সাহস আর কেউ পাবে ?

কক্ষ মধ্যে সে সময় মাধুরী দেবী উপস্থিত ছিলেন, তিনি মুখখানি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইলেন। চণ্ডীও শ্বশুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আস্তে আস্তে নীরবে উঠিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরে ডাক্তার মনোনয়নের পাট চুকিয়া গেলে, মাধুরী দেবী সহসা হরিনারায়ণকে কহিলেন : তোমার কাছে একটা ভিক্ষা আছে।

স্থিরদৃষ্টি পত্নীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন : কোন দিন তো তোমার মুখে এ কথা শুনিনি ? কি ব্যাপার বল তো ?

মাধুরী দেবী কহিলেন : আমার জীবনে এর আগে এমন দুর্দ্দিনও বুঝি কোন দিন আসেনি, সেই জন্যেই এটা চাইতে হোচ্ছে।

মৃদু স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন : বল।

মাধুরী দেবী কহিলেন : শুনেছিলাম, বছর সাতেক আগে আমার নামে তুমি সরস্বতী পরগণাটি কিনেছিলে ?

হরিনারায়ণ কহিলেন : কুণ্ঠিত হোয়ে কথাটা বলছ কেন

পরগণাটা শুধু যে তোমার নামে কেনাই হোয়েছে তা নয়, ওর টাকাও তোমার নামে আলাদা জমা হোচ্ছে।

বিস্ময়ের সুরে মাধুরী দেবী কহিয়া উঠিলেন : বলো কি ?

হরিনারায়ণ উত্তর করিলেন : তালুকটা কেনার কথা তোমাকে যখন বলি, তোমার কাছ থেকে কোন সাড়াই পাইনি। ব্যাপারটা তুচ্ছ ভেবেই তুমি হয়তো চুপ করেছিলে। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য ভুলিনি। বছর সালিয়ানা ওর আয়ের সব টাকাই তোমার হিসাবে জমা করবার হুকুম দিই।

মাধুরী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন : সে কত হবে ?

হরিনারায়ণ কহিলেন ; সঠিক বলতে হোলে হিসাব তলব করতে হয়, আন্দাজ মত বলতে পারি—গেল সাত সনে বছরে গড়পড়তা বিশ হাজার ধরলে এক লাখ চল্লিশ হাজার হয়। এ টাকা সব তোমার।

মাধুরী : এ টাকা আমি ইচ্ছা করলেই পেতে পারি ?

হরিনারায়ণ : তোমার টাকা তুমি পাবে—এতে জিজ্ঞাসার কি আছে ?

মাধুরী : তা'হলে আমার নামের ঐ তালুক দান-বিক্রী করবার অধিকারও আমার আছে ?

হরিনারায়ণ : জমিদারের মেয়ে আর জমিদার-বংশের গৃহিণী হোয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। ও-তালুক তোমার, তুমিই ওর মালিক। কিন্তু এত কাল পরে আজ হঠাৎ এ কথা কেন ?

মাধুরী দেবী কহিলেন : সেই কথাই এখন তোমাকে বলব। আমার বুকের মধ্যে যে ঝড় বইছে, সেটা থামাবার জন্যে ঐ তালুক আর আমার নামে সঞ্চিত সমস্ত টাকা আমি আজ আহুতি দেব।

সভয়ে ও সবিস্ময়ে হরিনারায়ণ পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন : কি ব্যাপার আমাকে জানাও তো—কিছু লুকিও না, সব বলো।

গাঢ় স্বরে মাধুরী দেবী কহিলেন : তাই বলছি। তুমি শোনো—মনে আছে, মাস কয়েক আগে হঠাৎ এক দিন বৌমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে গিয়ে নিজেই হেরে যাই, তার পর পরাজয়ের সেই জ্বালা ভোলবার জন্যে আমার কাছে এসেছিলে আর একটা বোঝা-পড়ার মতলব নিয়ে ?

স্নিগ্ধ স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন : মনে আছে বৈ কি, তবে, তুমিও তোমার মাতৃত্বের দিক দিয়ে নজির দেখিয়ে যে জবাব দিয়েছিলে, আমাকেও বোঝা-পড়া করতে এসে শেষে হার স্বীকার করে লজ্জায় সরে যেতে হয়েছিল। কিন্তু আজ সে পুরানো কথা কেন ?

বিজলী বিকাশের মত মুখের কোণে হাসির একটু তীক্ষ্ণ রেখা প্রকাশ করিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন : পুরানো কথাই অনেক সময় কঠিন সমস্যার সমাধান করে দেয় যে! সেই পুরানো কথাই আজ আমার বুকে কাঁটার মত ফুটে এমনি যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে যে, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি নে তার জ্বালা!

হরিনারায়ণ বাবু এতক্ষণ আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া কথা কহিতেছিলেন, এক্ষণে সন্তর্পণে সোজা হইয়া বসিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে কহিলেন : তোমার মুখ দেখেই তার আভাস পাচ্ছি। কি হোয়েছে আমাকে বল—কি সে যন্ত্রণা, কে দিয়েছে, কার জন্যে—

আর্ত্ত স্বরে মাধুরী দেবী কহিলেন : বলছি, সেই কথাই বলছি, সে আর কেউ নয়, আমার ছেলে, আমার—নিবারণ।

মুখখানা কঠিন করিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া হরিনারায়ণ কহিলেন : নিবারণ ?

ভগ্ন স্বরে মাধুরী দেবী উত্তর করিলেন : হাঁ। সেই পুরানো কথা ধরে সেও আমার কাছে এসেছিল বোঝা-পড়া করতে, কিন্তু আমি তাকে বোঝাতে পারিনি, পুত্রস্নেহ দিয়ে স্বার্থের যে কল্পনা ভাবি করেছিলুম, তার ভার সইবার শক্তি যখন হারিয়ে ফেলেছি, কি জবাব তাকে দিতে পারি বল ? নিবারণের কাছে আমি হেরে গেছি, তার ব্যথায় সান্ত্বনা দেবার আমার কিছু নেই, সেই জন্যেই আমি ভেবেছি—

গম্ভীর মুখে হরিনারায়ণ কহিলেন : এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, কেন তুমি ভিক্ষা চাইছিলে! কিন্তু বলতে পারো—তোমার নামের পরগণা, সঞ্চিত টাকা নিবারণকে দান করলেই কি তুমি শান্তি পাবে ? এতেই তার সঙ্গে তোমার বোঝা-পড়া শেষ হয়ে গেল! আর সেও কি তোমাকে মুক্তি দেবে ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মাধুরী দেবী কহিলেন : তা আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি এইটুকু জানি, আশার যে ছবি এঁকেছি তার মনে শিশুকাল থেকে ফুটিয়ে দিয়েছি, তাতে নিজের চেষ্টা করে কিছুতেই সে বাঁচতে পারবে না ; তার চেয়ে ঐ সম্পত্তিকে সম্বল করে সে নিজের ভবিষ্যতকে গড়ে তুলুক। আমি শুধু বলতে চাই—মা হোয়ে যে অন্যায় আমি করেছি, এই হোক তারই প্রায়শ্চিত্ত, আমার ভুলের মণ্ডল।

ধীর স্বরে হরিনারায়ণ কহিলেন : বেশ, এতে যদি তুমি সান্ত্বনা পাও, আমি তাতে সুখীই হব। আমি আবার বলছি তোমার নামের ঐ তালুক আর টাকার মালিক তুমি—নির্ভয়ে তুমি যদি নিবারণকে দিতে চাও, তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই।

[ক্রমশঃ]

জিজ্ঞাসা

(বড় গল্প)

সুলেখা দাশগুপ্তা

"এ কথাটাই আমার জিজ্ঞাস্য—চাকরী তুমি কেন করছ?—এ তোমায় ছাড়তেই হবে। কি প্রয়োজন তোমার ঘড়ি-ধরা দশটা-পাঁচটায়?"

"এক কথা নিয়ে বার বার বিরক্ত করা ভাল লাগে না। অনেক বার তো বলেছি—অপ্রয়োজন বোধে ছাড়তে হলে তোমারও অনেক কিছুই ছাড়া উচিত। তুমি যেদিন ছাড়বে তোমার অপ্রয়োজনীয় সব অভ্যাস—আমিও ছাড়ব সেদিন আমার অপ্রয়োজনীয় চাকরী—তার আগে নয়।"

"দু'টো এক কথা হলো?" শিবনাথ যেন খেঁকাইয়া ওঠে।

নির্ব্বিকার নিরীহ মুখ-ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী জবাব করে "না, এক কথা তো হলোই না—চাকরী-অভ্যাস আর বদ-অভ্যাস যে একই কথা নয় এ তো জানা কথা। তবু তোমার মন্দ অভ্যাস ছাড়াতে আমার না হয় একটা ভাল অভ্যাসই ছাড়তে হলো। তা আমার কথায় রাজী হলে আজকেই আমি কাজে জবাব দিয়ে আসতে পারি।" জিজ্ঞাসু কৌতুকোজ্জ্বল চোখে ইন্দ্রাণী শিবনাথের দিকে তাকায়।

"যত উদ্ভট বুদ্ধি মাথায় আসে তোমার! আমার মদ ছাড়ার সঙ্গে তোমার চাকরী ছাড়া! এ কি একটা কথা!"

"তবে তুমি মদ ছাড়, আমার কাজটি থাক। ওঃ, তাও যে ঠিক কথা হলো না! তবে আমি কাজ ছেড়ে ঘরে বসি, সন্ধ্যার প্রতীক্ষা আমার ঘড়ির প্রতিটি বিন্দুতে ধীর-মন্থর পা ফেলে ফেলে গড়িয়ে যাক্ মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত! তুমি মদ খাও, রাত্রে খেয়াল-খুশী মত ফেরো না ফেরো, যা মন চায় তাই কর কেমন? এবার বোধ হয় কথাগুলো খুব ভাল যুক্তিসঙ্গত কথার মত ঠেকছে?"

শিবনাথ গলার স্বরে বিদ্রূপ মাখাইয়া বলে, "না, খুব ভাল ঠেক্‌ছে না—আমার জন্ম প্রতীক্ষায় বসে থাকবে এ কি হতে পারে! তোমার প্রতীক্ষায়ই বসে থাকে কত কত লোক!"

"তাদের ভেতর তুমি নেই নিশ্চয়ই? যার স্বামী কি স্ত্রীর প্রতীক্ষা কোন দিনই করলো না, সে স্ত্রীকে অন্ত পথ দেখতে হয় বৈ কি—অন্তত দেখা উচিত।" ইন্দ্রাণী চলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলে, "প্রতীক্ষা যত দিন তুমি না করছ আমার প্রতীক্ষাও তুমি পাচ্ছ না। কিন্তু আর নয়, এই অর্থশূন্য কথার কিচিমিচি না করাই ভাল।"—ইন্দ্রাণী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

শিবনাথ ইন্দ্রাণীর নিষ্ক্রমণের দিকে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে একটি কৌচে বসিয়া পড়িয়া গুম হইয়া শুনিতে থাকে ইন্দ্রাণীর কণ্ঠের ভাসিয়া-আসা গানের পর গান। শিবনাথ উঠিয়া হাত দু'টা পেছনে রাখিয়া ঘরময় অস্থির পায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে থাকে।

"আকাশ-বাতাস কেমন করে জানলো,
কাহার গলে দিলেম তুলে আমার বরমাল্য—"

—গান করিতে করিতে বারান্দায় গিয়া ইন্দ্রাণী রেলিঙে ঝুঁকিয়া বাবুর্চিখানার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ে—"বাবুর্চি, খানা লে আও।"

দুই

হল-ঘরে পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া রিডের উপর টুং-টাং করিয়া চলিয়াছে ইন্দ্রাণী। উদ্দেশ্যবিহীন টেপা হইলেও সুর আছে। দূরে থাকিলে সুর শোন, সামনে থাকিলে আঙুলের [illegible] ভঙ্গি দেখ—দু'টাই সমান উপভোগ্য। আঙুল তাহার [illegible] জাল বুনিয়া চলিলেও মন চলিয়াছে চিন্তার জাল বুনিয়া। [illegible] হয়ত পিয়ানোর উপর আঙুল টিপিয়া ভাবিবার মতই [illegible]—অর্থাৎ তেমন কিছুই নয়।

অনেক আছে ইন্দ্রাণীর—নাই তাই তার সাংসারিক প্রয়োজনের [illegible] কর্ম্মব্যস্ততা। বিরাট বাড়ী তার বিরাটত্বের গাম্ভীর্য্য, মূল্যবান আসবাবের প্রাচুর্য্য ও বাবুর্চি-খানসামার দলটি সমভিব্যাহারে আভিজাত্যের গৌরব লইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। অন্দর-মহলের মস্ত মূল্যবান পরদা হইতে গেটে দণ্ডায়মান তকমা-আঁটা দারোয়ান—সবাই নীরব আভিজাত্যের ঘোষণা করিতেছে—'আমরা বিশেষ কেউ—[illegible]!' পঞ্চাশ জনের আরাম ও সুখ-সচ্ছন্দ-বাসের আয়োজনে [illegible] কিন্তু দু'টি ব্যক্তি—ইন্দ্রাণী ও তাহার স্বামী শিবনাথ।

ইন্দ্রাণীর এই বাজনা অনেকক্ষণ ধরিয়াই শিবনাথকে ত্যক্ত করিতেছিল—সে উঠিয়া আসিয়া ইন্দ্রাণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে, "কখন হতে বসে বসে কি টুং-টাং করছ? ভাল লাগে না। উঠে এসো, কথা আছে।"

"টুং-টাং নয়, টুং-টা।" ইন্দ্রাণী উঠিতে উঠিতে বলে, "কিন্তু [illegible]-ভঙ্গিতে যে পর্য্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে কথা শুনতে ডাকছ, তাতে কথা শুনবার আগ্রহ আমার চলে যাচ্ছে কিন্তু!"

"আমার কথা শুনবার আগ্রহ কখনই বা তোমার থাকে? [illegible] পিয়ানো, বই নয়ত বাইরে—এ তিন নিয়েই তো তোমার জীবন—সেখানে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির স্থান কোথায়?"

"আর তোমার জীবন কি কি নিয়ে? আমার জীবন সম্বন্ধে যখন [illegible]টা পরিচ্ছন্ন ধারণা, নিজেরটা সম্বন্ধেও তা আছে নিশ্চয়ই?"

"আমারটা তুমিই বল—আমি বল্‌লে হয়ত বিশ্বাস করতে [illegible] না।"

"তোমারটা আমি স্ত্রী হয়েও জানি না। জানি না তার কারণ—[illegible] তোমার নিপুণ কর্ম্মকুশলতার গুণে, কিছু বা আমার [illegible] লুকানো কর্ম্ম-তালিকার খবর সংগ্রহের প্রতি বিতৃষ্ণার [illegible]। তোমার চোখের তেরছা বাঁকা দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার পিছু [illegible] চেষ্টা করে, আর আমি যখন তাকাই—তাকাই পূরো [illegible]। মানুষের মনুষ্যত্বে আমি বিশ্বাস রাখি।"

"খালি বড় বড় কথার প্যাঁচ সর্ব্বদা অত্যন্ত বিরক্তিকর—" শিবনাথের মুখ বিরক্তিতে যেন বিষাইয়া ওঠে। বলে, "কিন্তু [illegible] দৃষ্টিতে তাকানোর সময়ের অভাবে তাকানোই যে আর হয়ে [illegible] না!"

"[illegible] তাই, কিন্তু যে কথা বলতে ডেকেছিলে তাই বল। [illegible] বিষয়-বস্তুটা পাল্‌টিয়ে নেওয়া যাক্।"

"আমি যে কথা বলতে ডাকছি তাও 'ঝগড়াই'—এই তোমার [illegible]?"

"স্থির না হলেও একেবারে অ-স্থিরও নয়। সর্ব্বদাই যা হয়ে [illegible] সেটাই তো মনে আসা সম্ভব। তা কি বলবে চট্‌পট্ [illegible]—" চোখ তুলিয়া দেয়াল-ঘড়িটা দেখিয়া লইয়া বলে, "স্নান-খাওয়া সব পড়ে—অফিসের সময় যে প্রায় হয়ে এলো।"

খাবার টেবিলে আবার দু'জনের সাক্ষাৎ হইলে শিবনাথ বলে, "আকাশ-বাতাসেরও জানবার কথা নয়—এমনি ভাবেই একেবারে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছ কার গলে?"

প্রথমটায় ইন্দ্রাণীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে তার বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শিবনাথের দিকে তাকায়। কিন্তু হঠাৎ অর্থটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে, "সত্যি, এ ভাবে এক জনের গলায় মালা পরিয়ে দিলে মন্দ হয় না কিন্তু! গভীর রাত্রিতে একান্ত কাছে গিয়ে পরিয়ে দেওয়া মালার খবর দু'জনার বাইরে আকাশ-বাতাস-মানুষ কেউই যখন জানছে না—এমন একটা নিতান্তই দু'জনার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকাও উচিত নয়। আবার সে হাসিয়া উঠিয়া বলে, "বাস্তব পথে হদিশ না পেয়ে শেষে বুঝি গানের পথে পা বাড়িয়েছ? এ পথে সত্য না মিললেও জ্বলবার ও জ্বালাবার বিষয়-বস্তুর অভাব হবে না।" তার পর একটু সময় নীরব থাকিয়া বলে, "কেন জ্বলছ নিজে—কেনই বা জ্বালাচ্ছ আমাকে? এসো, তুমি শোন আমার কথা—আমি শুনি তোমার। এক তরফা শোনা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—এ জানা তোমার হয়ে গিয়ে থাকবে।" আবার শেষে চোখ তুলিয়া শিবনাথের বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দ্রাণী হাতের কাঁটা-চামচ রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলে, "কিছুই না দিয়ে সব পাওয়ার অভ্যাস তোমাদের মজ্জা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে—লজ্জাহীন চাওয়ারও তাই তোমাদের শেষ নাই। দাও—নেও, নয় ত পাওয়ার ঘর শূন্যই রইল।"

"আমি অপরের ঘর তা দিয়ে ভরিয়ে তুলি।" ভ্রু কুঁচকাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া শিবনাথ বলে।

"নিজের ঘরে যা এলো না, কার ঘরে তা গেল সে দিকে নজর না দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ তো নিশ্চয়ই—রুচির পরিচয়ও বটে" এবার উত্তেজিতা ইন্দ্রাণী সশব্দে চেয়ার পেছনে ঠেলিয়া খাওয়ার প্লেট ঠেলিয়া উঠিয়া পড়ে।

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে শিবনাথের আবার দেখা হয় সিঁড়ির গোড়ায়। সাক্ষাৎটা যেন হঠাৎই হইয়া গিয়াছে—শিবনাথ সে ভাবটাই দেখায়, কিন্তু ইন্দ্রাণী বুঝিতে পারে কিছু বলিবার জন্যই শিবনাথের এ ছল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা। তাহার দুঃখ হয়, শিবনাথ না ছাড়িবে নিজের পথ—না হইবে নিজে সুখী, না পাইতে দিবে তাহাকে সুখ।

ইন্দ্রাণী কাছে আসিতেই কেসের উপর সিগারেটটা ঠুকিতে ঠুকিতে শিবনাথ বলে, "কখন বাড়ী ফিরছ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"বাঃ, নিশ্চয়ই পার—তা তুমি কখন ফিরছ?"

শিবনাথের ভ্রূ আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিতে চায়, "আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?"

"স্বামি-স্ত্রী। এত দিনে ছাই তাও জান না, তাই তো সমস্যা?" ইন্দ্রাণী নকল গাম্ভীর্য্যে বলে।

শিবনাথের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু গম্ভীর থাকিয়াই সে বলে, "আমার সঙ্গে তো তোমার কথা চলতে পারে না; অফিসের পর আমি ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ী আসি যে!"

"আমিও যে তাই আসি। কি হবে একা-একা বসে থেকে।"

"কোথায় যাও?"

"তুমি কোথায় যাও?"—[illegible] ইন্দ্রাণী অপেক্ষা করে না। বলে, "দেখ, এ সব কথা-কাটাকাটিতে অনর্থক সময় নষ্ট। আসল কথা, তুমি কোথায় যাও না-জানা পর্য্যন্ত আমারটাও তোমার জানা হবে না, তুমি ক'টায় ফিরছ না বললে আমিও বলতে রাজী নই। তুমি কখন ফিরছ জানলে তার আগে নিশ্চয়ই আসব।"

"আমি যদি রাত দু'টো-তিনটায় ফিরি?" গম্ভীর স্বরে শিবনাথ বলে।

"তা আমারও একটা-দু'টো হতে পারে বৈ কি।"

নিরুপায় শিবনাথ দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরে, তার পর যেন ইন্দ্রাণীকে বাজাইয়া দেখিবার জন্যই বলে, "পাঁচটায় আসব আমি, আসবে তুমি চারটায়?"

"আসব।" ঘড়ি দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলে, "ওঃ, আর সময় নাই; চলি।" দ্রুত পায়ে ইন্দ্রাণী তর-তর করিয়া সিঁড়ি নামিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। শিবনাথকে ভাল করিবার সব চেষ্টা যখন সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রাণীর ব্যর্থতায় দাঁড়াইল, তখন হইতে ধীরে ধীরে ব্যবধান বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ আজ এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

ইন্দ্রাণীর গাড়ীর শব্দ দূরে মিলাইয়া গেলেও শিবনাথ তেমনি নিশ্চল হইয়াই দাঁড়াইয়া থাকে। স্ত্রী এমন ভাবে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইবে—এ কি সে কল্পনা করিতেও পারিয়াছে? গাড়ী, বাড়ী, জড়োয়ার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ-বিস্ময়ে মজিয়া থাকিবে—কর্ত্তৃত্ব করিবে সর্ব্ব বিষয়ে শুধু তাহাকে বাদ দিয়া,—কিন্তু সব কিছুই যেন উল্টা হইয়া গেল। তাহার সব কর্ত্তৃত্ব শুধু শিবনাথকে [illegible] শিবনাথের খুসী মত চলা দূরের কথা, নিজের অজ্ঞাতে শিবনাথই যেন বাধ্য হইয়া চলিয়াছে ইন্দ্রাণীর ইচ্ছা মত। কেমন করিয়া এই দুর্দ্ধর্ষ মেয়েকে সায়েস্তা করা যায়, শিবনাথ ভাবিয়া পায় না।

অফিসের ঘড়িতে চারিটা না বাজিতেই ইন্দ্রাণীর ব্যস্ততা দেখিয়া বীণা জিজ্ঞাসা করে, "এত তাড়া? আজ কোথায় যাওয়া হচ্ছে—ছবি দেখতে?"

"না ভাই, আজ যাওয়া হচ্ছে বাড়ী।"

"হঠাৎ আজ বাড়ী ফিরবার এত তাড়া কেন? কেউ আসবে না কি?"

"হাঁ, স্বামী।" ইন্দ্রাণী অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলে।

"স্বামী!" বীণার এই সীমাহীন বিস্ময়ের নামই বুঝি আকাশ হইতে পড়া—"তোমার বিয়ে হয়েছে না কি? স্বামী থাকেন কোথায়?"

"থাকেন এখানেই"—বলিয়া হাত দিয়া মাথার [illegible] ফাঁপানো চুলের গুচ্ছ ফাঁক করিয়া সিঁদুরচিহ্নটুকু দেখাইয়া বলে, "এর চাইতে বেশী স্বামী-থাকার বিজ্ঞাপন নিয়ে আজকালকার মেয়েরা চলা পছন্দ করে না। সর্ব্বাঙ্গ চিহ্নিত হয়ে দৃষ্টি [illegible] নিষেধের নিশানা আঁটায় চাইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাই [illegible]দের পছন্দ—বুঝলে?"

বীণা হাসিয়া বলে, "তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু [illegible] ছাড়ার অনেক দিন বাদেই যদিও তোর সঙ্গে আবার এই [illegible]— "কিন্তু তাও তো দেখা হয়েছে মাস পাঁচ-ছয় হবে? বলেছি [illegible] এক

ব্যালোক আত্মীয়ের বাড়ী থাকিস্। যেতে চাইলে এড়িয়ে গেছিস, কিন্তু কেন?" বীণার বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চায় না।

খোঁপায় কাঁটাগুলি ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে দিতে ইন্দ্রাণী বলে, "বাড়ী নিয়ে যাওয়া এড়ানোর কারণ বিয়ে ব্যাপারটা তাহলে আর লুকানো সম্ভব ছিল না। আর তা জানা মানেই আমার চাল-চলন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠা। তার পর আরম্ভ করবি, উচিত-অনুচিত-বোধের উপদেশ। রমেশ বাবুর সঙ্গে ভাব জমছে ভেবে তুই নির্বাক্ আছিস, আমাকেও বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করছিস্। কিন্তু আজ কেন যে হঠাৎ সব বলে ফেলতে ইচ্ছে গেল বুঝে পাচ্ছি না।"

"হ্যাঁ, আমি তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু এখন কি ভাবব বুঝে উঠতে পারছি না?"

"তোমার 'বুঝে উঠায়' সাহায্য আর এক দিন আমিই করব—আজ নয়।"

বীণা তার আগের কথার রেশ ধরিয়াই কিন্তু বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া ওঠে, "কি এর অর্থ? রমেশ বাবুকে নিয়ে কি তুই তবে খেলা করছিস?"

"খেলাই! হয়ত তাই। কিন্তু সত্যিকারের জীবনসঙ্গী পাওয়ার চাইতে একটুও কম কঠিন নয় বীণা মনের মত খেলার সাথী পাওয়া। খেলার আনন্দও তুচ্ছ নয়, সে আনন্দ দিতে পারাতেও কৃতিত্ব আছে বৈকি। এ শুধু সময় কাটান—ভাল আমার কাউকেই লাগে না।" কথার শেষে ভাল না-লাগার ভঙ্গিতে চেয়ার পেছনে ঠেলিয়া ইন্দ্রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমার বিয়ের গল্প আর এক দিন বলব—স্বাস্থ্যসম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের সুন্দর চেহারা মুগ্ধ করেছিল—তার উপর পেছনে ছিল ঐশ্বর্য্যের ছটা। কিন্তু যখন বোঝা গেল রূপ আর রূপার বাইরে আর কোন ঐশ্বর্য্যের গৌরব এঁর নেই—যা আমার ভাল লাগাকে স্থায়ী ভালবাসায় নিয়ে দাঁড় করাতে পারে, তখন এ বোঝা-বুঝি অর্থহীন—বিয়ে হয়ে গেছে। তবে ভদ্রলোকের প্রশংসাটা করি—এটা না থাকলে আমায় ঘরে রাখতেন কেন? কি বলিস্?" ইন্দ্রাণী বেশ একটু শব্দ করিয়াই হাসিয়া ওঠে। তার পর বলে, "এটা জেনে রাখবি বীণা, ভাল ছেলেরা আনন্দহীন জীবন নিয়ে পড়ে মন্দ মেয়েদের ফাঁদে—করে মন্দ মেয়ে বিয়ে, আর মন্দ ছেলেরা জানে—কাদের নিয়ে খেলা করে চলে যেতে হয় আর কাকে হয় ঘরে আনতে। কিন্তু আর নয় আর এক দিন চেষ্টা করা যাবে বাকীটার। আজ পাঁচটায় ছবি যাওয়া চাই।"

ইন্দ্রাণী বীণার কাছে বিদায় লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসে। ইন্দ্রাণীর অপস্রিয়মান গাড়ীর দিকে তাকাইয়া বীণা ভাবে, আধুনিকা নারী আখ্যায় আখ্যায়িত করার মত মেয়েই বুঝি ইন্দ্রাণী! কিন্তু তার যে কিছু বলবার ছিল ইন্দ্রাণীকে।

রমেশ ব্যস্ত ভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "ইন্দ্রাণী কোথায়?"

"তিনি চলে গেছেন।" বীণা রমেশের দিকে তাকাইয়া ভাবে, ইনি এও জানে কি না ইন্দ্রাণী বিবাহিতা!

"বাড়ী চলে গেছেন! আমার সঙ্গে যে কথা ছিল ছবি দেখতে যাবার!" কাঁধ দু'টা ঝাঁকাইয়া রমেশ একটা চলতি অঙ্গভঙ্গি করিয়া চিন্তিত মুখে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলে, "দু'খানা টিকিট কেটে ফেলেছি...কি করি—আপনি যাবেন? ছোট ছবি তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। একেবারে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব আমি—যাবেন?"

"ধন্যবাদ, আমার শরীরটা একেবারেই ভাল নয়—" ভদ্রতাসূচক হাসি হাসিয়া বীণা অসমাপ্ত আপত্তিতে কথা শেষ করে। আবার সেই কাঁধ ঝাঁকান ভঙ্গি করিয়া, হাত উল্টাইয়া রমেশ চলিয়া গেল। রমেশের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সেও বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হয়। শরীরটা তার কিছু দিন হইল ভাল যাইতেছে না—অফিস না করিলেই নয়, তাই আসা। ভীড়ের চাপ হইতে গাড়ীতে যাইতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু সেদিনের ঐ গাড়ী-ঘটিত ঘটনার পর হইতে তাহায় যেন গাড়ী-আতঙ্ক রোগে পাইয়া বসিয়াছে—গাড়ীর পাদানীতে দাঁড়াইয়া ভিতরে পা গলাইবার আগে গোটা শরীরটা একবার তার শিতরিয়া কাঁটা দিয়া উঠিবেই—হোক না তা ইন্দ্রাণীর গাড়ী, থাক না ইন্দ্রাণী সঙ্গে।...বীণা ট্রামের পথে পা বাড়াইল। প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তার অসুস্থতার শ্রান্তিতে ও চিন্তার গুরুভারে ভারাক্রান্ত।

ইন্দ্রাণী বাড়ী পৌঁছাইয়া সিঁড়ির কাছে থামিয়া হাতের ঘড়িটা একবার দেখিয়া লইল—ঠিক আছে। মূল্যবান কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি তর-তর করিয়া পার হইয়া উঠিয়া গেল উপরে—হাতের ব্যাগটা বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাইরের শাড়ী-কাপড় পালটায় আর তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে গুন্-গুন্ করিয়া চলে—,

"আজ কোন কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবদ্ধ-গ্রন্থ-গীত—এসো তুমি প্রিয়ে..."

স্নানের ঘরে যাইয়া বাথ-সল্টমিশ্রিত ঈষৎ-সবুজাভ জলে গা ডুবাইয়া স্নান শেষ করিয়া প্রবেশ করে পাশের কাপড় ছাড়িবার ঘরে। ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া সযত্নে পরিপাটীরূপে প্রসাধন শেষ করে। পরে ধীর-মন্থর অলস গতিতে আবেগ-ভরা কণ্ঠে—

"আজন্ম সাধন ধন সুন্দরী আমার,
কবিতা কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে বসো—"

আবৃত্তি করিতে করিতে বারান্দা পার হইয়া বসিবার ঘরের দিকে রওনা হয়।

—"ওমা তুমি এখানে বসে? কখন এলে?" ঘরে ঢুকিয়া আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত শিবনাথকে দেখিয়া সত্যি ইন্দ্রাণী ভীষণ চমকাইয়া ওঠে। শিবনাথ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকাইয়া আছে দেখিয়া ইন্দ্রাণীর মনে হয়—সন্দিগ্ধচিত্ততা, অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে সে দৃষ্টি যেন আজ দার্শনিকের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ! কাছে আসিয়া বলে, "কথা তো এ রকম ছিল না? প্রথমে আমার আসাটা হতে দিলে না কেন?"

"না হয় আগে আমিই এলাম!"

ইন্দ্রাণী ছেলেমানুষের মত মাথা দোলাইয়া বলে, "প্রথম দিনের বউনিটা এ রকম হতে না দিলেই ভাল হত—তুমি এসে বসে থাকবে, শেষে আমি আসব!"

শিবনাথ ইন্দ্রাণীর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসে—"আগে-এসে

বসে আছি বলেই না তোমার মিষ্টি আবৃত্তি শুনতে পেলাম? তুমি তো অরসিক ভেবে আমায় দূরেই ঠেলে রাখ। ভাল জিনিষ আমারও ভাল লাগে বুঝলে?"

গান ও কবিতা ইন্দ্রাণীর নেশা। সময় অসময় নাই, যখন যেটার ঝোঁক চাপে করিয়া যায় একের পর এক কিন্তু শিবনাথের কিছু মাত্রও ভাল লাগিবার তথ্যটা এত দিন তার অজানাই ছিল—লেও কোন দিন ভাবে কিংবা ভাষায় শিবনাথ বুঝায় নাই তার এই ভাল লাগিবার সংবাদ। কিন্তু সে জন্য আজিকার এই ভাল লাগাটা হয়ত মিথ্যা নয়—হয়ত তার মনের ভাল লাগিবার অনুভূতির স্পর্শের মত শিবনাথের মনেও তেমনি কোন অনুভূতির স্পর্শ লাগিয়াছে, না হইলে তাহার প্রতীক্ষায় শিবনাথের এই বসিয়া থাকা—এ কি সম্ভাব্য ঘটনা!

পরের দিন অফিসে যাইয়া ইন্দ্রাণী যেন তেমন করিয়া কাজে মনঃসংযোগ করিয়া উঠিতে পারে না। মনটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া যাইয়া উপস্থিত হইতে চায় কেবলই বালকের সন্ধ্যাটিতে। বেশ কাটিয়াছে সন্ধ্যাটি! শিবনাথকে যে সে ভালবাসে—এতে যেন মনের ভিতরটা তাহার পড়া হইয়া যায়। ভাল না বাসিলে কি এক জনের সঙ্গ ও সাহচর্যে মন এমন ভাল লাগিবার আবেশে কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে! স্বামীর স্বাভাবিক সহৃদয় মাধুর্য-পূর্ণ ব্যবহারটুকুর জন্যও নারীর মন কি কাঙ্গাল হইয়া থাকে না!··· হাতের কাজ রাখিয়া সে চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া বসিয়াছে এমন সময়ে বীণা আসিয়া ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে এমনই ভাবে ইন্দ্রাণীর পাশের চেয়ারটায় বসিল, যেন শরীরের গুরুভার টানিয়া চলিতে সে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। চেয়ারে বসিয়া সে টেবিলের উপর মাথা রাখিল।

ইন্দ্রাণী উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলে, "কি হয়েছে রে বীণা? অসুস্থ বোধ করছিস্? শুবি?"

বীণা হাত তুলিয়া ব্যস্ত হইতে নিষেধ করে।

ইন্দ্রাণী বসিয়া থাকে বীণার সুস্থ হইয়া উঠিবার অপেক্ষায়, "তোর শরীরটা কিছু দিন হতেই খারাপ যাচ্ছে—এ আমি লক্ষ্য করছি। শরীর নিয়ে অবহেলা ভাল নয়। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থা কর বীণা!"

বীণা মুখ তুলিয়া মলিন হাসিয়া বলে, "আমার ব্যবস্থা দেওয়া ডাক্তারের হাতের বাইরে।"

—"এ কথার অর্থ।" ইন্দ্রাণী বিস্মিত ও আতঙ্কিত হইয়া ওঠে। থাইসিস্ নয় ত!

—"এ কথার অর্থ বুঝিয়ে বলার স্থান এটা নয়। আমি আজ ছুটির ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি, তুইও যদি তাই নিস্ তো চল এক জায়গায় বসে চা খেতে খেতে বলি।"

ইন্দ্রাণী সম্মত হইয়া উঠিয়া গেল ছুটি লইয়া আসিতে। দুই বন্ধু ছুটি লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এমন সময় রমেশ আসিয়া সঙ্গ লইয়া বলে, "বেরুচ্ছ তোমরা? কালও যে এসে ঘুরে গেছি!"

—"আজও তাই যেতে হবে। দরকার আছে।" ইন্দ্রাণী চলিতে চলিতেই বলে।

কথাগুলার জন্য তত নয়, ইন্দ্রাণীর কণ্ঠের নির্লিপ্ত ও অবহেলা-জনিত সুরের আভাযে প্রথমটায় হকচকাইয়া যাইবার পর রমেশ সচেতন হইয়া বলে, "এত দরকার দু'দিনের ভেতর যোগাড় করলে কোথা হতে? তা বেশ! কিন্তু জবাবটা ইচ্ছে করলে ভাল করে দেওয়া চলত নিশ্চয়ই। না, সে ইচ্ছেটাও নেই?"

—"না, নেই।"

—"ভাল করে কথা বলবার যখন সময়ের অভাব, তখন—তখন—" রমেশ যেন কথা যোগাইয়া উঠিতে পারে না।

ইন্দ্রাণী অবহেলা ভরে রমেশকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে থাকে। তার গতির সঙ্গে সমতা রাখিয়া অগ্রসর হইতে হাঁপাইয়া উঠে বীণা।

পাংশুমুখে অবাক চোখ মেলিয়া রমেশ তাকাইয়া থাকে ইন্দ্রাণীর নিক্রমণের দিকে। ইন্দ্রাণীকে কোন সময়ই সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, আজও পারিল না। দুর্ব্যবহার ইন্দ্রাণী বড় কাহার সঙ্গে করে না, তাহার সঙ্গেও করে নাই। তার বেশী কিছু কি ইন্দ্রাণীর ব্যবহারে সে কোন দিন পাইয়াছে? না। তবু সিনেমা বা চায়ের আহ্বানে কোন দিন সে বড় আপত্তি জানায় নাই! বাল্যকালের পরিচয়-সূত্র টানিয়া বাহির করিয়া সে 'তুমি' বলিয়াছিল। ইন্দ্রাণী আপত্তি করে নাই—করে নাই নিশ্চয়ই কিছু আসিয়া-যায় না বলিয়া। মুখের উপর রূঢ় হইয়া নিষেধ করিবার সঙ্কোচও হয়ত ছিল। ভাবের গভীরতার 'তুমি' সম্বোধন এ নয়। কিন্তু কিছু দিন হইল ভিতরটা তাহার অগ্রসর হইবার দুর্দমনীয় আবেগে দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল···বুঝিতে পারিয়াই কি ইন্দ্রাণী আজ তাহাকে আঘাত হানিয়া দূরে সরাইয়া দিল? পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখটা মুছিয়া লইয়া রমেশ সিগারেট ধরায়; ভাবে, অন্ধের মত পথ চলিলে যেমন আছাড় খাওয়া অনিবার্য, তেমনি আঘাত পাওয়া অনিবার্য নারীর চরিত্র না বুঝিয়া অগ্রসর হইলে।

নারী-মন তুচ্ছ জিনিষও অবহেলা ভরে ফেলিয়া আসিতে পারে না। তাই বুঝি দু'টি নারী-মনই আঘাত দিয়া ফেলিয়া আসিবার বেদনায় কিছু ম্লান হইয়া পথ চলে। চৌরঙ্গীর একটা রেস্তোরার কেবিনে যাইয়া দু'জনে বসে। বয় আসিয়া ফরমাস লইয়া চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী বীণাকে বলে, "এবার বল্ তোর কথা।"

বীণার লজ্জা-সঙ্কোচ ও উত্তেজনার জড়িত কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করিয়া কথা বলিতে সময় লাগে। হোক ইন্দ্রাণী তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু! তবু বলিবার আগে কণ্ঠস্বরের চাইতেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে বুকের অসহ্য স্পন্দনটা। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া বুকের অসহ্য দাপাদাপিটাকে সামলাইয়া উঠিতে সময় দিয়া বলে, "তুই ছাড়া এ বিপদে পথ দেখাবার—সাহায্য করবার আমার আর কেউ নেই ভাই—" কিন্তু কণ্ঠস্বরকে ভারমুক্ত করিয়া সহজ করা ইচ্ছা করিলেই যায় না। এই ভিতরের চাপা কান্নায় কণ্ঠস্বর ...নায় বিকৃত। ঠেলিয়া-ওঠা কান্নার চাপে ভগ্ন কণ্ঠ ও কম্পিত ওষ্ঠ অসমর্থ হইয়া পড়ে কথা লইয়া অগ্রসর হইতে।

ইন্দ্রাণী ভাবিয়া পায় না—এমন কি কথা হইতে পারে, যে কথা বলিতে একটা মেয়ে এতটা পীড়া অনুভব করিতেছে?

নিজেকে শান্ত করিয়া বীণা রুমাল দিয়া চোখ-মুখ মুছিয়া স্থির

... ভূমিকাহীন সংক্ষিপ্ত কথায় তার বক্তব্য শেষ করে, "ভেরী সুন ... শাল বি এ মাদার!"

ইন্দ্রাণী আতঙ্কিত আর্তনাদে অস্ফুট শব্দ করিয়া ওঠে, বলে কি বীণা! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীণার দিকে তাকাইয়া দেখে। কয়েকটি বিশেষ রেখার সাহায্যে শিল্পী যেমন সন্তান-সম্ভাবনাময়ী নারী-রূপ ফুটাইয়া তোলে, তেমনি প্রতিটি বিশেষ রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে বীণার দেহে সন্তান-ধারণের সঙ্কেত। এ না বোঝার কারণ—বীণার শারীরিক গঠনে অবস্থানুরূপ বিশিষ্ট পরিবর্তনটা এমন ভাবে মানাইয়া গিয়াছে, যাকে কোন অপরিণীতা সম্বন্ধে না বলিয়া দিলে এ লক্ষ্যে পড়িবার কথা নয়। ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে ইন্দ্রাণী সময় নেয়।

বয় আসিয়া সার্ভ করিয়া চলিয়া যায়।

চায়ের ট্রে টানিয়া লইয়া চা করিতে করিতে ইন্দ্রাণী চিন্তা করিয়া চলে—কি ভাবে কোন কথা দিয়া প্রসঙ্গটা আরম্ভ করা যায়। বীণার পেয়ালা আগাইয়া দিয়া নিজেরটা টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। বীণা ইন্দ্রাণীর এই নিশ্চেষ্ট ভাবে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। চোখ তুলিয়া ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার সাহসও সে সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না। কে জানে, ও-মুখে যদি ঘৃণার—বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়া থাকে? আবার আরম্ভ হইয়া যায় তার বুকের অসহ্য তোলপাড়টা।

—"অপরাধী বুঝি সময় বুঝে পালিয়েছে?" ইন্দ্রাণী চায়ের পেয়ালা টানিয়া লইয়া চুমুক দিতে দিতে বলে।

—"হ্যাঁ, সে অনেক কথা। সে ইতিবৃত্ত তোকে পরে এক দিন বলব। আজ বড় বেশী অসুস্থ বোধ করছি।" তার চোখ-মুখ-শরীর এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছিল। শ্রান্তি, ক্লান্তি, ভয়, ভাবনা ও অসুস্থতা যেন মুখে ছাপ মারিয়া বসিয়াছে।

—"আচ্ছা, ও-সব ইতিবৃত্ত শুনবার জন্য আমি ব্যস্ত নই। কিন্তু আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। ভাবতে—ব্যবস্থা করতে তো সময়ের দরকার!" তার পর বীণার দিকে তাকাইয়া একটু দ্বিধা ভরে জিজ্ঞাসা করে, "কত দিন?" কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে কণ্ঠস্বর যেন সঙ্কোচে জড়াইয়া আসিতে চায়।

"... মাস।" বলিয়া কথাটার গ্লানি কাটাইয়া লইতেই যেন বীণা একটু থামিয়া বলে, "এত দিন না বলার কারণ প্রথম বুঝতে পারিনি। ... হয়েছি ভয়ে দিশেহারা হয়ে। কার কাছে যাব, কে দেবে ... কে দেবে বল—কেই বা করবে সাহায্য! সামনে ভাগ্যে যে ... ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করে আছে, কি করে তার কবল ... পাব—মনে করতে গেলেই ভয়ে-ভাবনায় হাত-পা ... আসে। তোর কাছে বলি-বলি করেও বলে উঠতে ... কি ভাববি, কি ভাবে কথাটা নিবি, আমায় বিশ্বাস করবি ... কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। দ্বিধায় সঙ্কোচে কেবলি ... গেছি। কিন্তু এখন আর না বলে উপায় দেখছি না ... থামিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলে, "তুই ... ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই বাতলে দিতে পারবি। আর ... শরীরে দুর্ভাবনার বোঝা সহ্য হয় না। এবার আমি নিশ্চিন্ত..." মুখে নিশ্চিন্ততার কথা বলিলেও চেহারায় কিন্তু সে ... অবস্থায় রাখিতে পারে না। নীরব কান্নায় সর্বাঙ্গ তার কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

ইন্দ্রাণী ভাবিয়া পায় না—কি সান্ত্বনা সে দিতে পারে, কোন্ নির্ভাবনার বাণী শুনাইয়া পারে অশ্রু মুছাইতে! তার স্বেদ-সিক্ত রমণীয় পাতলা হাতখানা টানিয়া নিজের হাতে লইয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে।

বীণাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া ইন্দ্রাণী বাড়ী আসিয়া নীচের হল-ঘরটাতে বীণার চিন্তা লইয়া বসিল। লঘুপদে তর-তর করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া যাওয়া যেন আজ আর সম্ভব নয়। বিরাট হল-ঘরটা সৌন্দর্যে চাকচিক্যে মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত। ভোর হইতে সমস্ত দিনই চলে ঝাড়ন হাতে ঝাড়-পোঁছ ও ব্রাসো ঘসা। একাধিক ব্যক্তির সচেষ্ট প্রচেষ্টায় গৃহসজ্জার দ্রব্যসম্ভারের নতুনত্বের ঔজ্জ্বল্য প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়, ম্লান হইতে পারে না। ইন্দ্রাণী একটা কোচে খানিকক্ষণ বসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। না, এত বড় ঘরে এত দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে বসিয়া গুছাইয়া চিন্তা করা সম্ভব নয়। সে যাইয়া বসিবে তার শোবার ঘরের সঙ্গে একান্ত নিজস্ব ঘরে—যে ঘরে প্রবেশ করিতে শিবনাথও জানান দিতে হয়। তার ঐ ছোট ঘরখানা মনকে বিক্ষিপ্ত করে না, সন্নিবিষ্ট করে। সে তার ঘরের উদ্দেশে রওনা হইতে যাইবে, বেয়ারা আসিয়া হাতে দেয় একখানা চিঠি। চিঠিতে শিবনাথ জানাইয়াছে তাঁহার ফিরিতে আজ দেরী হইবে। বিশেষ কাজে এক জায়গায় যাইতে হইতেছে। ইন্দ্রাণীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে, "সেক্রেটারী বাবু হ্যায়?"

"হ্যাঁ, মেমসাব।"

"বোলাও।" কোন দিনও সেক্রেটারীকে ডাকিয়া সে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই। করে নাই এই কারণে যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি রুচিবিরুদ্ধ অতি নোংরা কাজ মনে হয় তার। কিন্তু মনটা তার আজ এমনিতেই চিন্তায় জড়ানো। আর শিবনাথের গতকল্যকার ব্যবহারে মনটা বুঝি আশান্বিত হইয়া রহিয়াছিল। একটির বেশী দু'টি দিন শিবনাথ স্ত্রীকে দিতে পারিল না! দপ্ করিয়া মাথাটা তার জ্বলিয়া ওঠে। সেক্রেটারী অজিত আসিয়া দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করে, "সাহেব কখন ফিরবেন এবং কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

অজিত বলে, "না।"

"বলতে পারবেন না? কেন আপনি আজ অফিসে যাননি?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"তবে কেন বলতে পারছেন না?" ইন্দ্রাণীর স্বরের রূঢ়তা চাপা থাকে না।

অজিত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিছু দিন হয় সে শিবনাথের কাছে চাকুরী লইয়াছে! এর ভিতর গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার হইয়াছে নিতান্তই কম। আর হইলেও কথাবার্তা নাই বলিলেই চলে।

অজিতের এই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা দেখিয়া তার রাগ বাড়িয়া যায় অস্বস্তি হয়। নিজেকে সংযত করিয়া ইন্দ্রাণী বলে, "জানেন না, না, বলবেন না?"

অজিত নিরুপায় বিপন্ন মুখভঙ্গীতে ইন্দ্রাণীর প্রতি তাকাইয়া চোখ নামাইয়া নেয়।

"তবে জানেন, কিন্তু বলবেন না। এই তো? বেশ দরকার

নেই বলবার।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, "বলতে মানা আছে বুঝি?"

"আপনি কোন দিনও ডেকে জিজ্ঞাসা করেন না। তাই মানা করবার প্রশ্ন শিবনাথ বাবুর মনেও আসেনি। কিন্তু আপনাকে চিঠিতে যখন লেখেননি, তখন নিশ্চয়ই বলতে চান না···।"

"তাই আপনিও বলবেন না?

ইন্দ্রাণীর অত্যধিক গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অজিত এবার স্পষ্ট করিয়াই বলে, "দেখুন, কারো কোন একটা কথা, যা তার অপরকে জানাবার ইচ্ছা নেই তা আমি জেনেছি বলেই বলে দিতে পারব না। আবার জানি না এমন মিথ্যে কথাও মুখ দিয়ে বের হবে না। তাই আমাকে ক্ষমা করবেন।" হাত জোড় করিয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইন্দ্রাণী লোকটির কথাগুলাতে আশ্চর্য্য হয়। বলে, "আচ্ছা, যান।"

অজিত নমস্কার করিয়া চলিয়া যায়।

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ লোকটার দিকে তাকাইয়া ভাল করি। কথা বলাও প্রয়োজন মনে করে নাই। এইবার তাকাইল। পরিধানে দামী সুট। শিবনাথেরই দেওয়া হইবে। কিন্তু পোষাকের উচ্চমূল্য অনুযায়ী যত্ন, পরিশ্রমের ও পরিপাট্যের মূল্য দিয়া যে এ ব্যক্তি পোষাক পরিধান করে নাই তা একবার দেখিলেই বোঝা যায়। অজ্ঞতা না অবহেলা-জনিত এ ত্রুটি! অজিতের অপস্রিয়মান দেহের দিকে তাকাইয়া সে ভাবে, কত স্বল্প কথায় স্পষ্ট বক্তব্যে সসম্মানে প্রভুপত্নীকে বলিয়া গেল, প্রতারণা করা বা মিথ্যা বলা তার আসে না!

ইন্দ্রাণী উপরে তার পড়িবার ঘরে গিয়া আরাম-কেদারায় গা এলাইয়া দিয়া বসিল। শিবনাথের প্রতি একটা দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব আসিয়া মন জুড়িয়া বসে। কিন্তু তার এই অভ্যস্ত সমস্যাকে সরাইয়া সে ভাবিতে বসে, বীণার এ অবস্থায় সে কি করিতে পারে। এটা ঠিক, বীণার জন্য যা করার তাহাকেই করিতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে—কি উপায়ে? সত্যি কি বোকা মেয়েই না বীণাটা! ছিঃ, এমন ভুলও করিতে হয়! আচ্ছা, লোকটা কে? এ ভাবে একটা ভাল মেয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া পলাইল? পুরুষ জাতটার উপর তার ঘৃণা আসিয়া যায়। ঠিক হইয়াছে রমেশকে অপমান করিয়া।···আচ্ছা, বীণার কাছে লোকটা কে, জানিয়া লইয়া খোঁজ করিয়া দেখিবে না কি? কি লাভ হইবে? সমস্যা সমাধানের কি কোন সুব্যবস্থা হইবে তাহাতে? জোর করিয়া বীণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করাইবে? মনে হইতেই তার ঘৃণা হয়। না, বীণাও এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চায় না। তাহা হইলে সে সেই সাহায্যই চাহিত। না, অবান্তর পথে চিন্তা করিয়া লাভ নাই। যদিও আশ্বিনের ঠাণ্ডার আমেজ, খোলা জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া সুস্থ অবস্থায় একটু শীত ভাবেরই উদ্রেক করিয়া দেয়, তবুও ইন্দ্রাণী উঠিয়া যাইয়া পাখাটা ছাড়িয়া দিয়া আসিয়া বসে। 'কথার পৃষ্ঠে ভাল বা তীক্ষ্ণ কথা বলিয়া ধাঁধাঁ লাগাইয়া চমৎকৃত করিতে আর কত বুদ্ধির দরকার হয়? পথ-হারাকে পথ দেখাইবার বুদ্ধি আছে তোমার? আছে দুঃসময়ে ধৈর্য্য ধরিবার সাহস? তবে তো বুদ্ধি আছে বলিয়া মানিব।'···ইন্দ্রাণী নিজের বুদ্ধিকে আঘাত হানিয়া যেন কাজ আদায় করিতে চায়।

বীণাকে কোথাও পাঠাইয়া দিলে কেমন হয়? কিন্তু কে দেখা-শোনা করিবে? টাকায় কি না হয়? আচ্ছা, সে যদি এখানেই কোন লেডী ডাক্তারের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া লয়? বেশ, ব্যবস্থা ক... কিন্তু শিশুর কি করিবে? যে উপায় প্রথমেই আসিয়া মনে উঁকি দেয়, ভাবিতেও সে শিহরিয়া ওঠে। তীব্র প্রতিবাদে মন তার পিছাইয়া আসে। না, না, এ সে হইতে দিতে পারে না। আচ্ছা, সে যদি আনিয়া তার কাছে রাখে? সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু শিবনাথকে রাজী করান যাইবে না। ঘৃণ্য সন্তানে তার বড় ঘৃণা। তবে কি করা যায়? মনে মনে কত ব্যবস্থা করিল আবার পাল্টাইল তার বুঝি ইয়ত্তা নাই। গান ভুলিল, ভুলিল সময়ে অসময়ের কবিতা আবৃত্তি। দু'টি দিন কাটিয়া গেল তার নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার—অস্থিরতার ভিতর। এ অস্থিরতা তার স্থির হইল তৃতীয় দিন বীণার চিঠি পাইয়া। চিঠি অফিসের দারোয়ান আসিয়া হাতে দিয়া গেল। এই দু'দিন সে অফিসে যায় নাই। কেন যায় নাই তা সে নিজেও জানে না। হয়ত ব্যবস্থা একটা কিছু ভাবিয়া স্থির না করিয়া বীণার ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির কাছে দাঁড়াইবার অনিচ্ছা। চিঠি পড়িতে পড়িতে ইন্দ্রাণীর দু'চোখ জ্বলিয়া ওঠে। হয়ত পুরুষের নৃশংসতার পরিমাণ দেখিয়া। চিঠি হাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দোতলার খোলা জানালা পার হইয়া দৃষ্টি গিয়া তার স্থির হইয়া থাকে কেয়ারী করা লাল মসৃণ পথের উপর দণ্ডায়মান শিবনাথের গাড়ীর উপর। শিবনাথ বাহির হইয়া যাইতেছে। এ দু'দিন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কথা নাই বলিলেই চলে। শিবনাথকে পথে দেখা যাইতেই ইন্দ্রাণী একটু সরিয়া দাঁড়ায়। শিবনাথকে লইয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে আবার যাইয়া তার দৃষ্টি গাড়ীর পেছনে নিবদ্ধ হয়। সে স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে! গাড়ীখানা অদৃশ্য হইয়া গেলে ধীর পদক্ষেপে স্নানের ঘরে যাইয়া ধারা-স্নানে মাথা পাতিয়া বসে।

পরের দিন হইতে হঠাৎ ইন্দ্রাণী ভারি অসুস্থ হইয়া পড়ে। দিন যায়, অসুস্থতা বাড়ে বই কমে না। মাথা-ঘোরা গা-বমি-বমি লাগিয়াই আছে। মাঝে মাঝে স্নানের ঘরে যাইয়া বমি করিয়াও আসে। খাওয়া প্রায় বন্ধ। নিৰ্জ্জীব হইয়া সে বিছানায় পড়িয়া থাকে। শিবনাথ চিন্তিত হইয়া ওঠে। ডাক্তার ...ক, প্রেস্‌ক্রিপসন হয়, গাড়ী ছোটে, ঔষুধ আসে; রোগিণীর রোগ কিন্তু বাড়ে বই কমে না। শিবনাথ ভীত হইয়া ওঠে। চিন্তিত মনে পায়চারী করিতে করিতে আসিয়া বলে, "এক জন লেডী ...কে দেখালে বোধ হয় এত দিন ভাল ছিল।" উত্তরের জন্য ...পেক্ষা করে না। পাশের ঘরে যাইয়া ফোন তুলিয়া লইয়া 'কল' দেয়। লেডী ডাক্তার আসিলে নার্স দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেই ইন্দ্রাণী উঠিয়া বসে। বলে, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। লেডী ডাক্তারটি বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া ইন্দ্রাণীর প্রতি চায়। কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া যেন কত কি ভাবিতে থাকে! তার পর মাথা নাড়িয়া দারুণ আপত্তি জানাইতেই ইন্দ্রাণী বালিশের তলা হইতে কি যেন বাহির করিয়া তার হাতে গুঁজিয়া দেয়। গুঁজিয়া দেওয়া বস্তুর অঙ্ক দেখিয়া এবং তার কোনও বিপদে পড়িবার আশঙ্কা নাই স্পষ্ট বুঝিয়া লইয়া লেডী ডাক্তার বাহির হইয়া অপেক্ষারত শিবনাথকে জানাইল ইন্দ্রাণী সন্তানসম্ভবা। শিব...থের

[illegible] মুখের প্রতি তাকাইয়া আবার বলে, 'স্বাস্থ্য ভাল আর [illegible] কোন উপসর্গ ছিল না বলে আপনারা দু'জনেই বুঝতে [illegible]নি। ছেলে না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর আর বিশেষ ভাল [illegible] না। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই।'

শিবনাথ সংবাদটাতে যেমনি বিস্মিত হইয়াছিল, তেমনি আ[illegible]ন্দতও হইয়া ওঠে। তার চাল-চলনের পদ্ধতি দেখিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, স্ত্রীকে সে ভালবাসে না। কিন্তু সত্যি তা নয়। ইন্দ্রাণীর প্রতি ভালবাসা তার আন্তরিক। কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস। বদ্ অভ্যাসগুলি শিকড় গাড়িয়া এমনি স্বভাবে পরিণত হইয়া [illegible] যে, সন্ধ্যা না হইতেই প্রতিটি রক্তবিন্দু হইতে শিরা উপশিরা পর্য্যন্ত তাদের সমস্ত রকম চাহিদা লইয়া আসিয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। সেই দুর্দ্দান্ত চাহিদাকে হার মানাইবে সে শক্তি [illegible] কোথায়? সমস্ত শক্তিতে একটি দিন নিজেকে বাঁধিয়া রাখিলে দ্বিতীয় দিন পরাজয় হয় তার অনিবার্য্য। নিজের স্বভাবের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে সে যেমনি অক্ষম, তেমনি অক্ষম ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যুঝিতে। চারিত্রিক দুর্ব্বলতায় দুর্ব্বল মানুষের স্বাভাবিক সন্দিগ্ধচিত্ততাও তার স্বভাবে বর্ত্তমান। তাই পীড়ন সে শুধু করেই না, অহেতুক ভোগও করিয়া থাকে। প্রাণ-প্রাচুর্য্যে উচ্ছল ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধে মনে তার একটা ভয়ও যেন বাসা বাঁধিয়া আছে। আজ তাই এই খবরে সে অত্যধিক খুসী হইয়া উঠে। ভাবে, এবার ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে ভাবনা ঘুচিবে।

কিছু দিন বাদে এক দিন ইন্দ্রাণী জানায়, সে তার মা'র কাছে যাইতে চায়। এ অবস্থায় মেয়ের মা'র কাছে যাইবার ইচ্ছায় আপত্তি জানান যুক্তিসঙ্গত নয়। তবু শিবনাথের মন চায় না। সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা তো সে এখানেই করিয়া দিতে পারে। কিন্তু খুব সহজে না হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রাণীর একান্ত ইচ্ছার কাছে শিবনাথের হার মানিতেই হয়।

[ক্রমশঃ
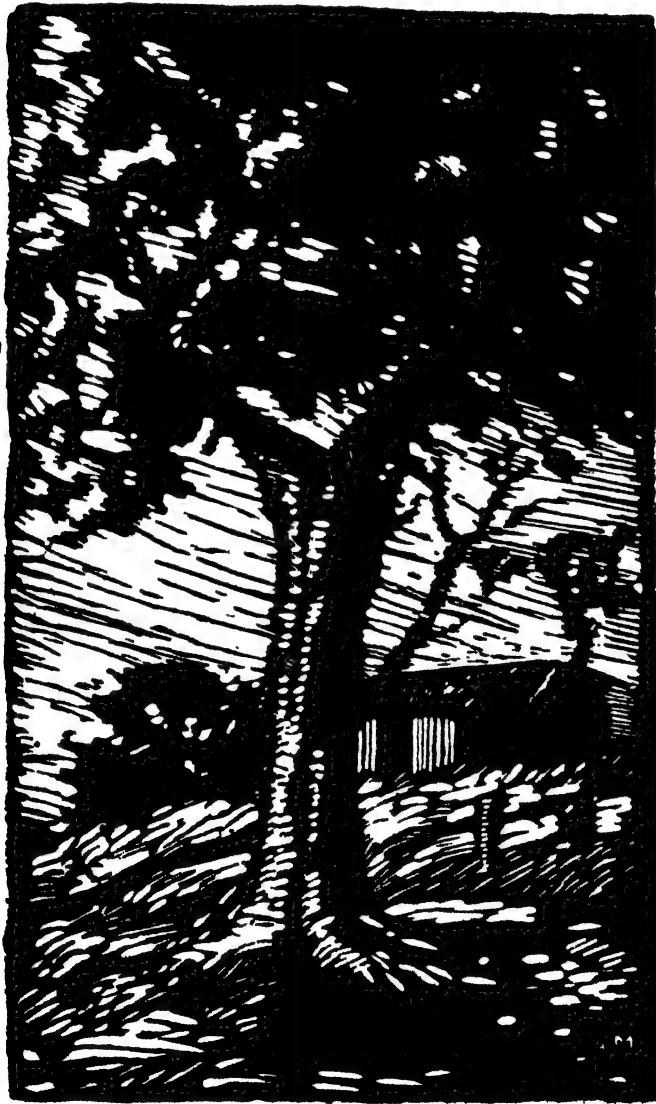
ছোট গল্প, উপন্যাস ও "একটি ছোট গল্প"

শ্রীআশীষ গুপ্ত

গল্প ও উপন্যাসের প্রভেদ নির্ণয় করতে হ'লে যে কথাটা প্রথমেই বলা প্রয়োজন, তা হল এই যে, এদের পার্থক্য মূলতঃ ধর্ম্মগত,—আকারগত নয়। অবশ্য এই ধর্ম্মবিচারের প্রসঙ্গে আকারের প্রশ্ন কিছুটা এসে পড়ে,—কিন্তু সেটা হল গৌণ।

গল্প-রচনায় কিছু চিরাচরিত নিয়ম আছে—তাকে প্রথা বলি, তাকে আঙ্গিক বলি, তাকে অন্য কিছু গালভরা নাম দিই অথবা একেবারে কোন কিছু নাম না দিই, তবুও তা আছে। কিন্তু সেটা বহিরঙ্গ মাত্র। তার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা একেবারে অপরিহার্য্য নয়। যা অপরিহার্য্য তা হচ্ছে গল্পের প্রয়োগ-কৌশল। এই প্রয়োগ-কৌশলের ক্ষেত্রে—দুর্ভাগ্যক্রমে অথবা সৌভাগ্যক্রমে—কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। "দুর্ভাগ্যক্রমে" বলছি এই জন্য যে, সেরকম কোন নিয়ম থাকলে মাষ্টার রেখে গল্প লেখা শিখতে পারতাম এবং "সৌভাগ্যক্রমে" বলছি এই কারণে যে, শাল্পিক প্রতিভার বৈচিত্র্য, কথা-সাহিত্যের বিচ্ছুরিত দীপ্তি কেবল মাত্র সম্ভব হয়েছে ক্ষেত্রভেদে প্রয়োগ-পদ্ধতির বৈসাদৃশ্যের জন্য।

কিন্তু তাহলে কি "ছোট গল্প" কাকে বলে তার কোন সংজ্ঞা নেই? তার কোন মোটামুটি পরিচয় নেই?—নিশ্চয়ই আছে। সে সংজ্ঞা, সে পরিচয়ও আমরা স্থির করেছি রসের ক্ষেত্রে ছোট গল্পের সার্থকতা থেকে। অর্থাৎ আগে আমরা করেছি ভাষার সৃষ্টি, তার পর গড়েছি ব্যাকরণ। আগে রচনা করা হয়েছে ছোট গল্প, তাতে পেয়েছি আনন্দ,—তার পর সেই কাহিনীকে বিশ্লেষণ করেছি, বুঝবার চেষ্টা করেছি এই আনন্দের হেতুটা কি, এই মনোহারিত্বের উৎস কোথায়, এই রচনার সংগঠন-পদ্ধতি কি? এমনই উপায়ে দেশ-বিদেশের কথা-সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষাকে অবলম্বন করে ছোট গল্পকে আমরা একটা নিয়মের ছাঁচে ফেলবার চেষ্টা করেছি। সেইটেই হচ্ছে আমাদের ছোট গল্পের সংজ্ঞা, সেইটেই হচ্ছে আমাদের ছোট গল্প বিচারের সাধারণ মানদণ্ড।

"সাধারণ" কথাটি ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করেছি। কারণ, বিশ্বসাহিত্যে এমন গল্পও আমাদের চোখে পড়েছে, যা গল্পরচনার বহু পরীক্ষিত কোন নিয়ম না মেনেও সার্থক রচনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা হল ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। ব্যতিক্রমের দ্বারা নিয়মের যাথার্থ্য স্বীকৃত হয় মাত্র, নিয়মকে তা উড়িয়ে দেয় না। এইখানে এক জন বিখ্যাত ইংরেজ লেখককে অনুসরণ করে বলি, ক্রিকেট খেলার কতগুলি বিশেষ পদ্ধতি আছে, সে সব পদ্ধতি বহু বার বহু ক্ষেত্রে অনুসরণ করে দেখা গিয়েছে যে, তাতে সত্যিই খেলা ভালো হয়। কিন্তু হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এক জন বিচিত্র প্রতিভাশালী ইংরেজ খেলোয়াড়—যিনি উইকেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে একেবারে পিঠ কুঁজো করে, ব্যাট বাঁকা করে টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করতে সুরু করে দিলেন। অর্থাৎ ক্রিকেট খেলার কোন প্রচলিত ষ্টাইলই তিনি মানলেন না এবং অন্য খেলোয়াড় যে ক্ষেত্রে এই রকম করে খেলবার চেষ্টা করলে হাসপাতালে স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন, সে স্থলে তিনি আসন পেলেন উৎসাহী ভক্তবৃন্দের স্কন্ধে। এ ক্ষেত্রে উক্ত খেলোয়াড় ক্রিকেট খেলার প্রচলিত কৌশলগুলিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত করে কাজে লাগিয়েছেন মাত্র। কিন্তু তবুও তা ব্যতিক্রম। মোট কথা, সব জিনিসই একটা বিশেষ অবস্থা পর্য্যন্ত ধরা-বাঁধা নিয়মের সাহায্যে শিক্ষা করা যায়। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তি হয় সেই নিয়মগুলিকে নিজস্ব কৃতিত্বের দ্বারা উজ্জ্বল করেন, অথবা সেই নিয়ম সমূহেরই সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা ভাস্বর হয়ে ওঠেন। এই উক্তি ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও নির্ভুল ভাবে প্রযোজ্য।

ছোট গল্প ও উপন্যাসের পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য আমরা একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। পিরামিড কাকে বলে তা আমরা সকলেই জানি। এই পিরামিডকে যদি উল্টো করে তার সূচ্যগ্র শীর্ষবিন্দুর উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকে ছোট গল্পের রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এবং প্রচলিত পিরামিডকে যদি তার পার্শ্বদেশস্থ যে কোন একটি ত্রিভুজের সমগ্র ক্ষেত্রের উপরে সংস্থাপিত করা হয়, তাহলে তুলনার প্রশ্ন ওঠে উপন্যাসের গঠন-বিন্যাসের সঙ্গে। এবার এই পিরামিড-প্রসঙ্গ আর একটু বিশদ করে বলবার চেষ্টা করা যাক।

ছোট গল্প ও উপন্যাসের প্রধান পার্থক্য হল এই যে, ছোট গল্প একটি মাত্র লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু উপন্যাসে বহুদৃষ্টি [illegible] সম্ভব হয় না। ছোট গল্প একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিন্দুর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু উপন্যাস নির্ভরশীল একটি সমগ্র ক্ষেত্রের উপরে। ছোট গল্প জীবনের একটি মাত্র বিশেষ ঘটনাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, কিন্তু উপন্যাসের অবলম্বন এক হয় সমগ্র জীবন, না হয়তো জীবনের একটা সুবৃহৎ অংশ। উপন্যাসকে যদি তৈলচিত্র বা Canvas Oil Painting বলি, তাহলে ছোট গল্পকে বলব Miniature Portrait।

উপন্যাসে একটি মূল কাহিনী থাকে; কিন্তু সেই মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করে একাধিক অন্য কাহিনী স্বচ্ছন্দে চিত্রিত হতে পারে। যদিও সে ক্ষেত্রে একটা কথা আছে। ওই সব উপকাহিনীকে মূল কাহিনীর সমান্তরাল হলে চলবে না, তাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রধান কাহিনীর সঙ্গে মিশে যেতে হবে। অর্থাৎ উপন্যাস মানে কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি নয় এবং ছোট গল্প বলতে সংক্ষিপ্ত উপন্যাস নিশ্চয়ই বুঝায় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ছোট গল্প ও উপন্যাসের পার্থক্য আয়তনগত নয়, প্রকারগত।* বস্তুতঃ, ছোট গল্পের কোন ধরা-বাঁধা মাপ নেই। ৫০০ শব্দেও উৎকৃষ্ট ছোট গল্প হতে পারে (The Parable of th Prodigal Son—St. Luke) আবার ১৫,০০০ শব্দবিশিষ্ট উচ্চশ্রেণীর ছোট গল্পও [illegible]। ইংরেজী সাহিত্যের যে বিখ্যাত ছোট গল্পটি পৃথিবীর [illegible] গল্প বলে অদ্যাবধি পরিচিত (A Turn of the Screw by Henry James), তার শব্দ-সংখ্যা তো "মাত্র" ৪[illegible] ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে, সাধারণ ছোট গল্পের সর্ব্বোচ্চ যা আয়তন (শব্দ-সংখ্যা ৪০০০—৬০০০), তার চেয়ে অনেক

*ছোট মাপের কোন কোন উপন্যাসের সংবাদও আমরা [illegible]। দৃষ্টান্তস্বরূপ Zona Gale রচিত The Biography of

...এর (শব্দ সংখ্যা ১৮০০ মাত্র) উল্লেখ করা যেতে পারে। ... আমরা মনে রাখি যে, এর আয়তন সাধারণ সংবাদপত্রের দুই ... অনেক কম, তাহলে সহজেই এর পরিসরগত ক্ষুদ্রতা ... করা যাবে। কিন্তু সমালোচকদের মতে এর চেহারা ... গল্পের হলেও বিষয়-বস্তুর বিন্যাস অনুসারে এটি একটি উপন্যাস।

গল্প ও উপন্যাসের পর্য্যায় নির্ণয় সম্পর্কে সময়ে সময়ে কিরূপ ... মতভেদের সৃষ্টি হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সমারসেট মমের The Letter নামক বিখ্যাত রচনাটির কথা পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করতে বলি। এই রচনাটির পর্য্যায় নিরূপণ সম্পর্কে সাহিত্যের জহুরীদের মধ্যে সবিশেষ মতভেদ আছে। এবং উভয় পক্ষের নিজ নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূলেই জোরাল যুক্তি বর্ত্তমান। এক দল সমালোচক যেমন প্রবল আগ্রহে এই রচনাটিকে স্থান দান করেছেন উল্লেখযোগ্য গল্প-সংগ্রহে, অন্য দলীয় পণ্ডিতবর্গ তেমনই সম-উৎসাহে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই কাহিনীকে উপন্যাস গ্রন্থমালায়। অর্থাৎ এটি গল্প কি উপন্যাস শেষ পর্য্যন্ত তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এ রকম গোলযোগ সাধারণতঃ হয় না (এবং মমের এই রচনার ক্ষেত্রেও হওয়া উচিত ছিল না)। গল্প ও উপন্যাসের মধ্যবর্ত্তী পার্থক্য ক্ষীণ হতে পারে, সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু সে পার্থক্য সুস্পষ্ট, সে পার্থক্য তীক্ষ্ণ। তাকে সচরাচর ভুল করবার উপায় নেই। সেই জন্যই কোন রচনার শ্রেণী নিরূপণ সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ অসুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু ছোট গল্পের পরিসর সম্পর্কে যা বলছিলাম তার থেকে একটু দূরে সরে এসেছি। নির্দ্দিষ্ট শব্দ-সংখ্যার উপর, পৃষ্ঠা-সংখ্যার ... উপর ছোট গল্পের সংজ্ঞা নির্ভরশীল নয়। সুতরাং, ছোট গল্প রচনায় আমাদের ঝোঁক হচ্ছে মর্ম্মের দিকে, আয়তনের ... নয়। ছোট গল্প বিচারের সময় আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে ... একটি মাত্র সুর বর্ণনা করার জন্য একটি মাত্র পরিণতির দিকে ... যাওয়ার জন্য যে বাক্যব্যয় করা হয়েছে, তা একেবারে ... কি না। যদি দেখা যায়, অল্পতম শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ... চরিত্রসৃষ্টির সাহায্যে গল্পের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিণতির ... কাহিনীকে প্রবাহিত করা সম্ভব হয়েছে, তাহলে শব্দ-সংখ্যা ... কম যা-ই হক না কেন, ছোট গল্প হিসাবে ওই রচনা ... রচনা হয়েছে, তা আমাদের স্বীকার করতে হবে।

... যদিও একটি মাত্র সুরের বিশ্লেষণ করতে হয় বলে, ... পরিমাপে উপন্যাসের চাইতে সাধারণতঃ ছোটই হয়। ... তবে সেই "ছোট হওয়া" যে ঠিক কতটা ছোট, ... নিশ্চয়ই কোন অনুশাসন নেই। কিন্তু বাক্‌সংযম ... সব চেয়ে বড় কথা। গল্পের effect-এর জন্য ... আবশ্যক, তদতিরিক্ত বাগ্‌বিস্তারের ক্ষেত্র ছোট গল্পে ... climax-এ পৌঁছোবার জন্য অবশ্য ছোটখাট ঘটনা ... যেতে পারে, কিন্তু সে সকল ঘটনা এমনই সুনির্ব্বাচিত ... যে, তাদের সাহায্যে যেন কাহিনীর চরম পরিণতি আরও ... নিকটতর হয়ে আসে। অর্থাৎ ছোট গল্পের প্রতিটি ঘটনা, এমন কি প্রতিটি বাক্যকে অবধি করে তুলতে হবে এই climax অথবা চরম পরিণতির অধীন।

কাহিনীর এই যে শীর্ষবিন্দু অথবা climax, এর পরে আর ছোট গল্পকে সাধারণতঃ টেনে নিয়ে যাওয়া চলে না। সেই জন্যই ছোট গল্পের climax আসে ছোট গল্পের শেষে। এমন যদি কখনও হয় যে, বিচার করে দেখা গেল গল্পের যেখানে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে, তৎপূর্ব্বেই কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সে গল্পকে নিশ্চয়ই আদর্শ ছোট গল্প বলা চলে না। কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে,—দৃষ্টান্তস্বরূপ "ও হেনরি" রচিত দু'টি বিখ্যাত গল্পের নাম করব। এই রচনা দু'টিতে আঙ্গিকের দিক থেকে মারাত্মক ত্রুটি থাকলেও (সমাপ্তির পরেও বিস্তৃতি) পাকা হাতের গুণে এবং অনির্ব্বচনীয় মাত্রাবোধের দৌলতে উভয় কাহিনীই অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। আমি "ও হেনরি"র "দ্য গিফ্‌ট্ অভ দ্য মেজাই" এবং "ভ্যানিটি অ্যাণ্ড সাম সেবল্‌স্"এর কথা বলছি। উভয় ক্ষেত্রেই climax এর পরেও গল্পকে টানতে হয়েছে বলে, সেখানে গল্পের গতিকে দ্রুততর করার প্রয়োজন হয়েছে ; অর্থাৎ চরম পরিণতির পরেও কাহিনীকে প্রলম্বিত করা হচ্ছে বটে, কিন্তু ওই অতিরিক্ত অংশটুকুকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তও করা হয়েছে। এই ধরণের দৃষ্টান্ত শুধু যে বিদেশী সাহিত্যেই মেলে তা নয়, বাংলা সাহিত্যের ওস্তাদ লিখিয়েদের রচনাতেও এরূপ উদাহরণ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, climax-এর পর denouement সৃষ্টি করতে হলে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

কাহিনী সংগঠন ও তার পরিণতি সম্পর্কে আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে যা লিখেছি তা যথাযথ অনুসরণ করে থাকলে, পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা গল্প-সাহিত্য রচনায় অদীক্ষিত, তাঁরা যখন শুনবেন যে, সকল গল্পই পিছন দিক থেকে লেখা হয়, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই চমকে উঠবেন না। অবশ্য "পিছন দিক থেকে লেখা হয়" কথার মানে এ নয় যে, এটা উর্দ্দুর মত বইয়ের শেষ দিক থেকে সুরু করা হয় এবং বাঁ দিক থেকে পাতা উল্টিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করতে হয়। আমার এ উক্তির অর্থ এই যে, গল্পের পরিণতিই গল্পের প্রাণ-সম্পুট, অতএব এক হয় কাহিনীর সমাপ্তি কি হবে সর্ব্বাগ্রে তা নির্দ্ধারণ করে নিয়ে গোড়ার দিকের ঘটনা সমাবেশ স্থির করতে হয়, অথবা যে ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হতে পরিণতি নির্দ্দিষ্ট না করে কাহিনী রচনা সুরু করা হয় এবং লিখতে লিখতে শেষ অবধি একটা পরিণতি দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে এই অ-পূর্ব্বচিন্তিত পরিণতির পক্ষে পূর্ব্ব-সন্নিবিষ্ট ঘটনাসমূহ প্রকৃতই আবশ্যক কি না, এবং আবশ্যক না হলে ওই সকল ঘটনাকে পরিবর্জন, পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক গল্পের climax সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষে কেমন করে সাহায্য করা যায়, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে ওই সকল পরিণতিপূর্ব্ব ঘটনাবলীর পুনর্লিখন আবশ্যক হয়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, গল্প রচনার শেষটাই হল গোড়ার কথা।

ছোট গল্পের প্লট অথবা কাহিনীর কাঠামো নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহিত্য-বোধের প্রয়োজন। এইখানে আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার—গল্পের প্লট এবং থীম (theme) এক জিনিস নয়, যাই হোক, কাঠামো নির্দ্ধারণ ভালো হলে গল্প লেখা সহজসাধ্য হয়।

অর্থাৎ কাঠামো যদি সবল হয়, তাহলে দক্ষ লেখক সুবিন্যস্ত ও নিপুণ রচনাশৈলীর সাহায্যে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য পরিবেশন করতে পারেন অপেক্ষিক অনায়াসে। পক্ষান্তরে দুর্বল প্লট নিয়ে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে উন্নততর প্রয়োগ-কৌশল ও রচনা-রীতির উপর লেখককে নির্ভর করতে হয়।

গল্পের প্লট ঘটনাবহুল হতে পারে। অথবা প্রধানতঃ চরিত্র-চিত্রণ, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, কিংবা পরিবেশ কিংবা atmosphere-এর উপর নির্ভরশীল হতে পারে। আজকাল কারও কারও মুখে এ কথা শোনা যায়, কাহিনীর মধ্যে গল্পাংশ বেশী থাকলে সে কাহিনী না কি ভারী হয়ে ওঠে। এটা ঠিক মানবার মত যুক্তি নয়। গল্প-সাহিত্যের দু'টো কর্তব্য আছে। এক হচ্ছে, জীবনকে প্রতিবিম্বিত করা এবং তার সঙ্গে হয়তো সুকৌশলে কিছু লোক-শিক্ষার অথবা প্রচার-কার্য্যের বন্দোবস্ত করা, আর নয় তো মানুষকে আনন্দ দান করা। তথাকথিত intellectual অথবা highbrow কাহিনী প্রথম পর্য্যায়ে পড়ে; কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের বেশীর ভাগ গল্প এবং বেশীর ভাগ শ্রেষ্ঠ গল্পই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর প্রধান আশ্রয় রচনা-রীতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ঘটনা-বিন্যাস। কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে মতভেদ এবং পথভেদ থাকলেও উদ্দেশ্যভেদ থাকা নিশ্চয়ই উচিত নয়। সেই উদ্দেশ্য হল পাঠককে গল্প শোনানো। গল্প-লেখক যদি "গল্প"ই না বলতে জানেন, তাহলে "মানময়ী গার্লস্ স্কুল"-এর ভাষায় বলা যেতে পারে যে, সত্যিই তাঁর চাকরি থাকবে না!

কাহিনীতে যদি "গল্প" থাকে এবং রচনা-রীতি যদি উন্নত হয়, তাহলে যে কেন আদর্শ ছোট গল্প পাব না, সে কথা বুঝতে পারা শক্ত। মোটের উপর যেদিক থেকেই বিচার করি না কেন, প্রয়োগ-কৌশল ও রচনা-পদ্ধতি হল সব কিছুর ঊর্দ্ধে। প্রাচীনপন্থীদের অনুসরণ করে সাহিত্যকে বদধর্মী বলি, অথবা আধুনিকপন্থীদের মতানুযায়ী তাকে গতিধর্মী বলেই মেনে নিই,—কাহিনীকেই সাহিত্যে প্রধান স্থান দিই, কিংবা জীবনের সত্য অথবা কাল্পনিক সমস্যাকে,—আনন্দকে উচ্চাসনে সংস্থাপিত করি, অথবা প্রচার-কার্য্যকে,—যা-ই কেন না করি, লিখতে জানাই একমাত্র জানা এবং সহস্র নিয়ম-কানুন ও উপদেশের চাইতেও বড় জিনিস হল একটি চিত্তহারী কাহিনীর সৃষ্টি করতে পারা।

সাহিত্যের রীতি-প্রকৃতি বলতে ঠিক কি বোঝায়, যুগে যুগে সাহিত্যের রূপান্তর কেমন করে ঘটে, কালভেদে ও শিক্ষাভেদে মানুষের রুচিভেদের উদ্‌ঘাটিত স্বরূপ কি, সাময়িক সাহিত্য ও নিত্যকালের সাহিত্যের মূল্য-বিচার ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা এ প্রবন্ধের পরিকল্পিত বিষয়-বস্তু নয়, অতএব বর্ত্তমান আলোচনায় ওই সকলের উল্লেখ অবান্তর। কিন্তু সমজাতীয় একটি চিন্তাধারা সম্পর্কে সামান্য একটু ইঙ্গিতের এ স্থলে প্রয়োজন আছে।

পরিবর্ত্তিত পরিবেশে পরিবর্ত্তিত সাহিত্যের প্রয়োজন, তাতে সন্দেহ নেই,—যুগে যুগে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার অভ্যাস যে বদলে যায়, শিক্ষা যে বদলে যায়, সাহিত্য-উপভোগের মন ও রীতি যে বদলে যায় এটাও ঠিক; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহিত্যের একটি চিরন্তন নিয়ম আছে,—তা অপরিবর্ত্তনীয়, তা অচঞ্চল। সেটা হল এই যে বাস্তব কাহিনীর বর্ণনা গল্প নয়, জীবনে যা ঘটে তা "সাহিত্য-কাহিনী" নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবন জোলো, পানসে—তাকে আমরা সাহিত্যের "বাস্তব জগৎ"এ উন্নীত না করতে পারলে তা কোন দিনই [illegible] সাহিত্য হবে না। সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে জীবনের সত্যের পার্থক্য আছে—বিশাল পার্থক্য। কোন এক বিরাট পুরুষেরও জীবনের একটি দিনের খুঁটিনাটির বর্ণনা দিতে গেলে দেখা যাবে যে তা [illegible] তুচ্ছ, কত সামান্য—সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হিসাবে তা [illegible] অকিঞ্চিৎকর!

সাহিত্যে যে বাস্তবতার সৃষ্টি করা হয় তার জন্য পশ্চাৎপট [illegible] করতে হয়। এমন ভাবে সে পশ্চাৎপট তৈরী করতে হয় যে [illegible] সামনে ওই কাহিনীকে আমাদের নিজ নিজ জীবনের সত্য কাহিনী বলে মনে হবে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের বহু অসম্ভব ঘটনাও আমরা সাহিত্যে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে, সে সকল ঘটনাকে [illegible] করে নিতে সম্মত আছি; কিন্তু সর্ত্ত হচ্ছে এই যে, তার জন্য [illegible] পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, সেই কাহিনীকে এমন ভাবে ধাপে [illegible] অগ্রসর হতে হবে যে আমাদের মনে হবে, এর এই [illegible] অপ্রতিরোধ্য, এর এই পরিণতি অনিবার্য্য।

আমার পরিকল্পিত "ক্ষুদ্র" প্রবন্ধ বৃহৎ হয়ে উঠেছে, [illegible] এবার থেমে যাওয়া উচিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গত আশ্বিন [illegible] "মাসিক বসুমতী"তে (শারদীয়া বসুমতী—১৩৫৬) প্রকাশিত [illegible] উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "বেচুলাল" রচনাটি নিয়ে [illegible] আলোচনা করতে চাই। সদ্য প্রকাশিত এই রচনাটিকে [illegible] করলে আমার এই প্রবন্ধান্তর্গত উক্তির সপক্ষে উদাহরণ [illegible] অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

আমার মতে "বেচুলাল" একটি সার্থক ছোট গল্প। [illegible] ছোট গল্পে প্রধানতঃ যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন "বেচুলালে" তার প্রায় সবগুলিই আছে।

"বেচুলাল" কাহিনীর কেন্দ্র একটি; সেটি হল [illegible] বালকের পশুপ্রীতি, যে পশুপ্রীতির জন্য প্রয়োজন হলে [illegible] পর্য্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এই পশুপ্রীতির কেন্দ্র [illegible] তাকে যে ওই গ্রাম্য বালক মুখেই শুধু "ভাই" বলে [illegible] যার জন্য সে প্রকৃত সহোদরেরই ন্যায় যে কোন [illegible] করতে পশ্চাৎপদ হয় না। এই রচনার ওই একটি মাত্র [illegible] বিষয়কেই স্ফুটতর করবার উদ্দেশ্যে অতিশয় সংক্ষেপে [illegible] অল্পসংখ্যক চরিত্রের সহায়তায় কয়েকটি সংলাপ ও ঘটনার [illegible] করা হয়েছে মাত্র। অতএব প্রাথমিক পর্য্যায়-নি[illegible] "বেচুলাল"কে আমরা ছোট গল্পের শ্রেণীতে ফেলব [illegible] অর্থাৎ ছোট উপন্যাস নিশ্চয়ই বলব না।

প্রতিপাদ্য বিষয় স্থির হয়ে যাবার পর বিচার করে [illegible] অভিজ্ঞ লেখক কি উপায়ে কাহিনীকে সেই পরিণতির [illegible] করে নিয়ে যাচ্ছেন।

উমানাথ পণ্ডিত লোক, চরিত্রবান্ লোক এবং [illegible] বটেই। সহৃদয়তার কথা বলছি এই জন্য যে, বিনোদের [illegible] প্রাথমিক কথাবার্ত্তার সময় তাঁর হৃদয়বত্তার আমরা [illegible] পেয়েছি এবং পরিচয় পেয়েছি তাঁর কৌতুকবোধের [illegible] বিনোদের পশুপ্রীতি কেবল যদি অনুকূল পবনে পাল তুলে [illegible] করে ভেসে বেড়ায় তাহলে তাকে গল্পের বিষয়-বস্তু করে [illegible]

...তএব ঝড়-ঝাপটার মধ্যে তার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। ... নাটকীয় ভাষায় যাকে বলে ঘাত-প্রতিঘাত, প্রয়োজন ... ঘাত-প্রতিঘাতের। উমানাথকে অবলম্বন করে এল ... ঘাত এবং বিনোদের পশুপ্রীতির অগ্নিপরীক্ষা। "বেচুলাল" ...র নায়ক বিনোদ, উপনায়ক বেচুলাল, প্রধান চরিত্র উমানাথ ... অপ্রধান চরিত্র বিপিন ও ভুবনেশ্বরী।

এমন যে চরিত্রবান্, হৃদয়বান্, সুপণ্ডিত উমানাথ—তাঁকেও ... বিদ্বেষপরায়ণ ও হিংস্র করে তুলল বিনোদের অতীব শ্রদ্ধাহীন ... তার একটি কুৎসিত উক্তি এবং তরল হাসির বিদ্রূপ। বিনোদ-... "মাষ্টরি চাঁদ" উক্তিটি রুচিবিগর্হিত, এটা আমাদের কানে লাগে, প্রথম শ্রবণে এই উক্তিটিকে সহ্য করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়, কিন্তু এই উক্তিটি ব্যবহারিক নীতির দিক থেকে আপত্তিকর হলেও সাহিত্য-নীতির বিচারে নিখুঁত। এই কথাটিকে কুৎসিত না করলে উমানাথের হীনতাবোধকে অত প্রবল করে দেখানো সম্ভবপর হত না। আমরা এ কথা স্বচ্ছন্দেই মনে করে নিতে পারি যে, যখনই উমানাথের মনে পড়ত তাঁর নাকের সামনে হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করে বিনোদের "মাষ্টরি চাঁদ" বলা, তখনই তিনি আর আত্মসংবরণ করতে পারতেন না এবং বিনোদের বেচুলালকে যেমন করে তোক কেটে-কুটে খেয়ে, অথবা পাঁচ জনকে খাইয়ে বিনোদকে জব্দ করবার স্পৃহা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অদম্য হয়ে উঠত।

বেচুলালকে হস্তগত করবার জন্য উমানাথ কৌশল অবলম্বন করেন,—নোংরা কৌশল। একটি অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য মানুষকে—... ভক্তিপরায়ণ মানুষকে—প্যাঁচে ফেলবার জন্য তার অনিচ্ছা সত্ত্বে তার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে, তাকে দেব-রোষের ভয় দেখিয়ে, ... কল্যাণের কথা উত্থাপন করে, তাকে নিজের জুতোর ... করবার শাসানি শুনিয়ে, অবশেষে একান্ত আপত্তিকর ... "পাঁঠা আমার"—এই অমার্জনীয় মিথ্যাভাষণের আশ্রয় ... বেচুলালকে হস্তগত করার, তথা বিনোদকে আঘাত ... বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলেন না। উমানাথের এবম্বিধ আচরণের ... তাঁর সেই হীনতাবোধের প্রাবল্য উপলব্ধি করা যেতে ...

"...লাল" গল্পের দ্বিতীয় উপচ্ছেদে (sub-chapterএ) ... আঙ্গিকটি গড়ন কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হয়েছে বলে আমার ... জমিদার-গৃহ এবং মৃত জমিদার-সম্পর্কিত বর্ণনায় ... ঔপন্যাসিক ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। এর কারণ, মনে হয়, উপেন্দ্রনাথ মুখ্যত ঔপন্যাসিক,—ছোট গল্প রচনার ...নি সাফল্য অর্জন করলেও তাঁর প্রধান কৃতিত্ব উপন্যাসের ... যাই হোক, গল্পের এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে নিপুণ ...সামলে নিয়েছেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তার পর কাহিনী ... গতিতে তার নিশ্চিত পরিণতির দিকে।

... রাত্রে রাজির আকস্মিক আবির্ভাব ছোট গল্প ও ...র পার্থক্য নির্ণয়ের পক্ষে ভারী চমৎকার একটি ইঙ্গিত। ... রাজিকে এর পূর্ব্বেই কাহিনীতে নিয়ে আসার ... হত। সে ক্ষেত্রে বিনোদ, দুর্‌গো ও রাজিকে কেন্দ্র করে ... eternal triangleএর মান-অভিমান, জয়-...লীলা-বিলাস। কিন্তু "বেচুলাল"এ ও-সব শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, একেবারে মারাত্মক। রাজির আকস্মিক আবির্ভাবই এখানে সুপ্রযুক্ত,—তার সম্বন্ধে বাকী যেটুকু জানবার কথা, তা গল্পের শেষাংশে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাঁঠা পৌঁছে দিয়েই বিপিন চলে গিয়েছিল। "ওস্তাদ লোক, সময় বুঝে সট্‌কে পড়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে—" জনতার অন্তর্বর্তী একটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন! কিন্তু বিপিন "ওস্তাদ" লোকও নয়, ছেলেকেও সে পাঠিয়ে দেয়নি। সে ছিল সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু মানুষ—সত্য পালনই তার সঙ্কল্প ছিল,—সে সত্য পালন তার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হলেও সে তা থেকে পরিভ্রষ্ট হয়নি। ছেলের একান্ত প্রিয় ছাগ-শিশুর বলিদান চোখের উপর দেখা নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য ছিল না। সে দৃশ্য তার নিজের সন্তানেরই পরম বেদনার দৃশ্য। জীবন-নীতি অথবা সাহিত্য-নীতি, কোন দিক দিয়েই বিপিনের আর অতিরিক্ত উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। অতএব তাকে ঠিক যথা সময়েই কাহিনী হতে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

বিনোদের ক্রোধ, ঘৃণা ও বেদনা সম্যক্ প্রকাশের উদ্দেশ্যে উপেন্দ্রনাথ যে বিনোদের মুখে ভাষা গুঁজে দেননি, এমন কি ভুবনেশ্বরীর মুখ থেকে বেচুলালের মুক্তির আদেশ শোনার পরেও সে যে কৃতজ্ঞতায় ভেঙ্গে না পড়ে শুধু কেবল সংক্ষিপ্ততম বাক্যে প্রশ্ন করেছিল, "নিয়ে যাই?"—এতে যে সংযম প্রকাশ পেয়েছে তা শুধু বিনোদের দুঃখ, বেদনা, ঘৃণা, ক্রোধ এবং কৃতজ্ঞতাকেই আমাদের কাছে স্ফুটতর করেনি, ছোট গল্পের ক্ষেত্রে যে বাক্-সংযমের কথা আমি ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেছে। গল্প এখানেই শেষ হতে পারত, কারণ কাহিনীর পরিণতিতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম; কিন্তু রাজির পরিচয় কিছুটা দেওয়া প্রয়োজন, সেই জন্য পরিণতির পরেও কাহিনীকে কিয়দ্দূর প্রলম্বিত করা আবশ্যক হয়েছে এবং রাজি ও বিনোদকে আশ্রয় করে সম্পূর্ণ অন্য একটি গল্প, একটি প্রেম-কাহিনী গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অনভিজ্ঞ লেখকের হাতে গল্পের এই অতিরিক্ত অংশ অথবা দেনুমাঁ (denouement) মূল কাহিনীর পক্ষে ক্ষতিকর হত। কিন্তু "বেচুলাল"এর কৃতী লেখক তাঁর পাকা হাতের মুনশীয়ানার এই পরিসমাপ্তিকে সহজ, স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় করে তুলতে পেরেছেন। বিনোদের মুখ দিয়ে তিনি স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন যে, রাজি যে বিনোদের বেচুলালকে বাঁচাবার উপলক্ষ হয়েছে, সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ-পরিশোধের অন্যতম উপায়স্বরূপ বিনোদ বড় লোকের মেয়ে দুর্গাকে এবং তার যৌতুককে তুচ্ছ করে রাজিকেই বিয়ে করবে স্থির করেছে। অবশ্য বেচুলালের প্রাণরক্ষার সঙ্গে এই ঘটনাকে জুড়ে দিলেও কৌতূহলী পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, শুধু কি কৃতজ্ঞতা? শুধুই কি ঋণ-পরিশোধ? এর মধ্যে অন্তর-ঘটিত আর কিছু কি ছিল না?—কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে সে প্রশ্ন অনাবশ্যক। যাই হোক, রাজিকে আমাদের কাছে পরিচিত করতে গিয়ে "বেচুলাল" কাহিনীর শেষাংশে উপেন্দ্রনাথ যে ঘটনার অবতারণ করেছেন, তাকেও তিনি climaxএর অঙ্গীভূত করতে পেরেছেন। গল্পের কাঠামো, সংলাপ, চরিত্রাঙ্কন, পরিণতি-সৃষ্টি প্রভৃতি সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে "বেচুলাল" যে একটি উচ্চ শ্রেণীর ছোট গল্প, তাতে সংশয় নেই।

মদ খাওয়া বড় দায়

জাত থাকার কি উপায়

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড—পেটটি একটি ঢাকাই জালা—নাকটি চেপ্‌টা—চোক ছুটি লঙ্গের তালা—হাঁ-টি বোড়া সাপের মত—দন্তগুলি মিসি ও পানের ছুবের তবকে চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে—গোঁপ জোড়াটি খ্যাঙ্গরার মুড়া, ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিন-চারিটা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নান-আহার করেন, পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদায় রজনী সজনী সজনী বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখীসংবাদ বিরহ লাহড় খেউড় টপ্পা নক্তা জঙ্গলা গজল্ ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন। আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডক্কেশ্বর—সে ব্যক্তির গুণের মধ্যে নাকটি বড় টেঁকাল, হাসিতে আরম্ভ করিলে হাহা হাহাতে গগনমণ্ডল ফাটিয়ে দেয়। তাহার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী গৌরবর্ণা কি শ্যামবর্ণা কিছুই জানিত না। যে সকল লোক ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত হয়, তাহারা প্রায় বিষয়কর্ম্ম একেবারে ভুলে যায়। এ বিষয়ে ডক্কেশ্বর অসাধারণ ছিলেন। ধড়াস করিয়া যেমন কামান পড়িত, অমনি গঙ্গায় পড়িয়া দাঁ করিয়া একটা ডুব দিয়া পান চিবুতে চিবুতে সম্মুখে দুই খান দফ্‌তর সাজাইয়া কিস্তির কর্ম্ম করিতে বসিতেন—দুই-তিন ঘণ্টা যাবতীয় বরবলিয়া ও জালাসাচ লোক অথবা মাগি ও কুঁজড়া বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন, পরে নানা প্রকার গলতি কর্ম্মের বেনাকারি ও তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায় আসিতেন। আড্ডায় পা দিবা মাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিতেন। তিনি যাহা উপায় করিতেন তাহাতেই আড্ডার খরচ চলিত—আগড়ভম স্থূলত্ব প্রযুক্ত নিজে অচল ও অর্থাভাবে দক্ষিণ হস্তের দফায় প্রায় অচল হইয়াছিলেন, সুতরাং ডক্কেশ্বর তাঁহার চক্ষুস্বরূপ হইলেন। যদিও তাঁহার চর্ম্ম-চক্ষু সর্ব্বদাই প্রায় মুদিত থাকিত, তথাচ মনচক্ষু ডক্কেশ্বরের আগমনের আশায় পথ চাহিয়া থাকিত। ডক্কেশ্বর কখন ডঙ্ক না ধরে তাহার এই বিশেষ চেষ্টা ছিল। পক্ষির দলের আর আর পক্ষীরাই সর্ব্বদাই ডানা ধরিত। চরস গাঁজা গুলি ছর্‌রা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" মধুর চেষ্টা করিত। কিন্তু বহুমূল্য সুধা কোথা হইতে আসবে? সুতরাং যেনো রকমেই পিপাসা নিবৃত্তি করিতে হইত—প্রথম তিলকাঞ্চনী রকম আরম্ভ করিয়া বেগুনি ফুলুরি চাউলভাজা ছোলাভাজা দ্বারা ক্রমে ক্রমে দান-সাগরি গোচ হইত। সন্ধ্যার সময় পক্ষী সকল বোধ করিত, তাহারা যোগবলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূন্যমার্গে উড়িতেছে—সপ্ত-লোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—সশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক এক জন পড়িতে পড়িতে উঠিয়া বলিত—আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই। অমনি আর এক জন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত—না বাবা কর কি, একটু থাম এই বলনটা বাদে যেও। পক্ষীদিগের গান সকল অতি বিচিত্র, সকলে মিলে সর্ব্বদা এই গান গাইত—"বড় ধরেছে—ফু ফু রামশালিকে, ফু, ফু ফু গঙ্গাফড়িং"। পক্ষিরাজ আগড়ভোম মন্ত্রী ডক্কেশ্বর ও অন্যান্য দ্বিজ লইয়া আহ্লাদে [illegible] আছেন—গৃহ ধূমময়, এক এক বার টানের চোটে বাড়ী আলোকময় হইতেছে, খক্‌খক্‌ কাসির শব্দ উঠিতেছে, এমত সময়ে ফলা [illegible] জয়হরিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ডক্কেশ্বর অমনি তিড়িং ক[illegible] লাফিয়া উঠিয়া বলিল—আরে বেটা ফলা! তোর চুলের টিকি দে[illegible] পাই নে কেন রে? তোবেটাকে আজ জবাই করবো। ফলা[illegible] বলিল, ফলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায় না—ফলা একটা হলকে বা[illegible] করিয়া আনিয়াছে, এখন তোমরা একে চালাও, কিন্তু বাবা একটু থেমে যুক্ত অক্ষর করিও যেন আর্কফলার ভয়ে কেঁসে যায় [illegible] শনিবারের মড়া দোসর চায়, ও আপন দল বাড়াইতে কে না ইচ্ছা করে? পক্ষীরা জয়হরিকে লইয়া তাহার হস্তে নাড়া বাঁধিয়া ওস্তাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে টান-টোন ধরণ-ধারণ কাটা-ছেঁড়া ঢালা-সাজা এক মাত্রা দুই মাত্রা শিখাইয়া অবশেষে পূর্ণ মাত্রা ধারণ করাইল। তখন মাথায় পাগড়ি ও হইয়া তাহার একটু গুমর বাড়িয়া উঠিল এবং এই বোধ হইল, এত দিনের পরে আমি এক জন হইলাম, কিন্তু দলস্থ কয়েক জন প্রাচীন পক্ষী তাঁহাকে অর্দ্ধরথি বলিয়া গণ্য করিত—সময়ে সময়ে তাহারা বলিত, তুমি কিছু দিন কপচাও [illegible] তোমার টান দোরস্ত হয় নাই। কি লেখা-পড়া—কি খেলা-ধূলা—কি নেসা—কি অঘোরপান্থি—কি দুষ্কর্ম্মে, সকলেতেই মান-অপমান বোধ হয়। আমি সর্ব্বোপরি হইব, এ ইচ্ছা প্রায় সকলেরই হয়। এই কারণে জয়হরি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে টানিতে আরম্ভ করিলেন, এক এক টানে কলিকা পটাস্ পটাস্ করিয়া ফাটিতে লাগিল, তখন পক্ষীরা বলিল, হাঁ বাবা, এত দিনের পর তুমি এক জন কৃষ্ণবিষ্ণু হইলে। পক্ষিদলভুক্ত হইয়া অবধি জয়হরি দিবা-রাত্রি আড্ডায় পড়িয়া থাকিতেন—পরিবারের কিছুমাত্র তত্ত্ব-তাবাস লইতেন না—আপন বিষয়-আশয়ের দেখা-শুনা ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়া গিয়াছিল—কেবল অহরহ নেসা করিয়া ভোঁ হইয়া থাকিতেন। জয়হরি কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিলে যে পরিষ্কার বুদ্ধি ও দৃঢ়রূপে অভীষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণের ক্ষমতা হয় এমত নহে, তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ ও অভ্যাসের আবশ্যক। সংসারে নৈরাশ্য বিষাদ সন্তাপ বিয়োগ ইত্যাদি নানা উৎপাত [illegible] সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি তত্তৎ অবস্থায় সুস্থির হইয়া মনঃসংযম করিতে আরো রত হন। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই যে, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যাহা প্রেরিত, তাহাই মঙ্গলজনক। কেবল সুখ ও সম্পদে মনের সংযম কখনই হইতে পারে না বরং [illegible] হইয়া ওঠে। মধ্যে মধ্যে বিপদ হইলে মন অধর্ম্মে বিরত [illegible] রত হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এতদবস্থায় এই সকল সংস্কা[illegible] সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাধ্যানুসারে যত্ন করেন—কর্ম্মের [illegible] ঈশ্বরের হাত, এ জন্য নিরাশ বা নিরুদ্যম হওয়া অনুচিত, [illegible] চলেন। জয়হরির দুর্ব্বল মন, সুতরাং যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত [illegible] তাহা সফল না হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া না ডুবাইয়া [illegible] এইরূপ বারম্বার হওয়াতে তাঁহার উৎসাহ একেবারে গিয়াছি[illegible] এমত ক্ষমতা ছিল না যে অন্যান্য সদুপায় দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর [illegible] এই কারণেই একেবারে নেসার দাস হইয়া পড়িলেন।

বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায় বড় প্রপণ্ড। তাহারা সর্ব্বদা [illegible] ও আমোদ লইয়াই থাকে, আজ মানুষকে পাগল করিয়া ছেড়ে দে[illegible]

[illegible]রামের আকার-প্রকার ও স্বভাব দেখিয়া তাহারা তাহাকে ঘেঁটু [illegible] চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিন এক জন ঘটককে [illegible] তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। ঘটক আসিয়া বলিল, [illegible] মহাশয়! বারাকপুরের বলরাম বাবুর একটি অবিবাহিত কন্যা [illegible]—বাবুর বিষয়-আশয় বিলক্ষণ, আপনি সুপাত্র, এ জন্য [illegible] কন্যা দান করিয়া তিনি আপন পত্নীকে লইয়া কাশী গমন [illegible]। তাঁহার বিষয়-আশয় সকলই আপনাকে দেখিতে হইবেক।

[illegible] বাল্যকালাবধি নেসাখোর ও কুকর্ম্মে রত, এমন হতভাগাকে [illegible] দিবে? কিন্তু তিনি ঐ সংবাদ শুনিবা মাত্র একেবারে [illegible] উঠিলেন, ঘটককে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিয়া বলিলেন, [illegible] আমার অমত নাই, মেয়েটি দেখতে কেমন? ঘটক বলিল, [illegible] কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না—সেটি স্বর্গের অপ্সরী কি বিদ্যাধরী [illegible] কিছু বলিতে পারি না। পক্ষিরাজ আহ্লাদে আপন ওষ্ঠ [illegible] করিয়া অন্যান্য দ্বিজোপরি দৃষ্টিপাত করত বলিলেন—তবে [illegible] মহাশয়, আমার এক কলম লেখা লইয়া যাউন ও পত্রের দিন [illegible] করুন। ঘটক বলিল, মহাশয় গুণের সাগর, আপনার বিয়ে [illegible] এমত কাহার সাধ্য? আমি একেবারেই লগ্নপত্র করিব। [illegible] হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল, ঘটক মহাশয়! এমনি আর [illegible] সম্বন্ধ আমার জন্য করিবেন। জয়হরি বলিল, এমন বরকম [illegible] পাইলে আমিও আর একটি বিয়ে করিতে পারি। [illegible], পক্ষীরা ঘটককে গুড়ের গাছ পাইয়া বলিল, কুলাচার্য্য [illegible]! আমাদিগেরও এই প্রকারে একটা একটা যোড়া গাঁথা [illegible] দিবেন। ঘটক বলিলেন, আপনারা সকলেই সুপাত্র ও [illegible], বিয়ের ভাবনা কি? কিন্তু একটু স্থির হইতে হইবে, [illegible] একটি মেয়ে উপস্থিত—সেটি কুন্তী অথবা দ্রৌপদী হইলেও [illegible] মানস সম্পন্ন হইতে পারিবে না। আগড়ভম বলিলেন, [illegible]—ও মেয়েটি আমি একলা বিয়ে করব, ইহাদিগের জন্য [illegible] অন্যান্য সম্বন্ধ দেখুন। পরে ঘটক উঠিয়া বলিলেন, এক্ষণে [illegible]—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব কিন্তু ভবিতব্যই মূল, [illegible] যাহা নির্বন্ধন করিয়াছেন তাহাই ঘটিবে।

[illegible] পক্ষিরাজ ডাকযোগে এক পত্র পাইয়া আহ্লাদে মগ্ন [illegible] পত্র শ্রীমতী ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। যে প্রকার কাদম্বিনী [illegible] আপন গলিত অঞ্জনে প্রেমার্দ্র চিত্তে লিখিয়াছিলেন সেই [illegible] লিপি বিরচিত। ভুবনময়ী লিখিতেছেন—হে আগড়ভম! [illegible] যৌবন গুণ ঐশ্বর্য্য জগতে বিদিত—কোন্ অঙ্গনা তাহা [illegible] মোহিত না হয়? আমার বাল্যাবস্থায় পতিবিয়োগ [illegible] শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান মুখ্য কল্প, কিন্তু [illegible] বিধবা-বিবাহের নিষেধ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য দেবল ও পরাশরের [illegible] পুনর্ব্বার পতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুকালাবধি সুপাত্র [illegible]—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত তত্ত্ব করিতে [illegible], কিন্তু আপনার তুল্য সুপাত্র চক্ষেও দেখি নাই, কাণেও [illegible] পড়ি নাই, ধ্যানেও পাই নাই—তোমা ভিন্ন [illegible] মালা প্রদান করিতে পারি? আমার অসংখ্য ধন [illegible] অমুকের কন্যা, কেবল মাতা বর্ত্তমান, আমার বিষয়- [illegible] করিবার কর্ত্তা নাই, এক দিবস নন্দনবাগানের টোলের [illegible] আসিলে সাক্ষাতে সকল কথা বলিব, নতুবা প্রত্যুত্তর পাইলে আমার সহচরী রত্নমালাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। পক্ষিরাজ উক্ত লিপি পড়িয়া লোভ ভরে ও উদ্বাহ বাসনায় ডগমগ হইয়া বিরল স্থানে গিয়া বসিলেন, এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন—আমার কি এত রূপ—এত গুণ—তবে তো আমি আত্মবিস্মৃত—তবে তো আমি অঞ্জনাপুত্র, কি আশ্চর্য্য! বিধবা-বিবাহে কি দোষ?—এখন কি করি?—কোন্ মেয়েটিকে বিয়ে করি? একটা কি ডঙ্কাকে দিব? না—ও কি আমার কুলের পুরুত? আমি দুটো মেয়েকেই বিয়ে করে সব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং-ডেং করিয়া চলে যাব। যাহা হউক, শেষ দশাটায় কপালে খুব সুখ ছিল—এক পক্ষ বারাকপুরে থাকিব—এক পক্ষ নন্দনবাগানে থাকিব—ঐ দুই স্থান আমার বৈকুণ্ঠধাম হইবে। যদিও দুই পক্ষে দুই স্থানে বাস করিব, কিন্তু কোন পক্ষেই আমার অমাবস্যা হইবে না—আমার দুই পক্ষেই শুক্লপক্ষ—বার মাস বসন্ত—সদাই সুখের ভ্রমর গুন-গুন রব করিবে—কোকিল কুহু কুহু করিবে—মলয় পবন সুমধুর বহিবে—ফুলেল আতর ও গোলাপের ছড়াছড়ি হইবে—দিন-রাত্রিতে হাজার হাজার পান মারিব, ছেলেরা বাবা বাবা করিয়া বুকের উপর ঝাঁপিয়া উঠিবে—এখন বিয়ে দুটো হলে হয়। এই সময়ে "ওমা সিংহ দিয়া অম্বর কামড়ানী—উদ্ধফোস ধরণী" এই গান পক্ষিরা চীৎকার করিয়া ধরিল, এদিকে ডুক্কেশ্বর দৌড় পক্ষিরাজের নিকট আসিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল—কি বাবা, আজ যে তোমাকে পরমহংস দেখছি? পক্ষিরাজের চটক ভাঙ্গিয়া, চল চল বলিতে বলিতে চিঠিখানি বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিলেন। ও কি আমাকে দেখাও বলিয়া ডুক্ক ঝুঁকে পড়িল, পক্ষিরাজ বালিশের উপর একেবারে শুয়ে পড়িলেন—সাক্ষাৎ সুমেরু পর্ব্বত—কাহার সাধ্য তাহাকে নাড়ে।

পরদিবস ঘটক উপস্থিত হইলে পক্ষিরাজ প্রাণপণে আপন শরীরকে নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু স্বীয় ভর সাম্‌লাতে না পারাতে একেবারে হুমড়িয়া পড়িয়া গেলেন। ওগো বর পড়িল—বর পড়িল পড়িল—এই বলিয়া সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল। পক্ষিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশার্থ কোঁচার কাপড় দিয়া গোঁপ, ভুরু, নাক ও মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। ঘটক বলিল, আগামী মাসের পোনেরই উত্তম দিন অতএব ঐ দিবসে একেবারে লগ্নপত্র হইবে—আমার আজ অনেক বরাৎ আছে এক্ষণে উঠিলাম, আর আর পক্ষীরা বলিল, মহাশয়! এঁর তো হল, আমাদের বিষয় ভুলবেন না। ঘটক বলিল, আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, এমন চাঁদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিব?

ঘটক গমন করিলে পক্ষিরাজ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতেছেন—বারাকপুরেণী তো আমার হলেন, এখন নন্দনবাগানীকে কেমন করে পাই। যে পর্য্যন্ত চক্ষু-কর্ণের বিবাদ না ঘুচিয়া যায় সে পর্য্যন্ত সাতিশয় অস্থির হইতেছি। হায়! আমার চিত্ররেখা নাই, কে তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া দেখায়? বারাকপুরে এক্ষণে যাইতে পারি না, নন্দনবাগানে আজ সন্ধ্যার অগ্রে যাইব।

প্রবৃত্তিই মন আর আশা সবলবং হইলে কি না হইতে পারে? পক্ষিরাজের মন ব্যাকুল—কেবল সূর্য্য অবলোকন করিতেছেন, বেলা কতক্ষণে অবসান হয়, এক-এক বার ইচ্ছা হয় রাবণের ন্যায় দিবাকরকে অস্ত যাইতে আজ্ঞা দেন। অন্যান্য পক্ষীরা ধূমবৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু

তিনি অতি নরম ভাবে এক এক টান মারিতেছেন ও পাছে চক্ষের ভাবে মনের ভাব প্রকাশ হয় এ জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন, অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রাণ ঠাণ্ডা প্রকরণে কিছুই আদর করিতেছেন না। ক্ষণেক কাল পর দ্বিজ সকল নানা প্রকার মাদকতায় মত্ত হইয়া ডানা ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পক্ষিরাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া চাদরখানা মস্তকে উষ্ণীষ করিয়া বাঁধিয়া একটু আতর লেপন করিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে নন্দনবাগানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ হইতেছিল, পক্ষিরাজের মনে উদয় হইল, যেন ভুবনময়ী ঐ—জানালায় বসিয়া বদনের বসন খুলিয়া সুধাংশু তুল্য হাস্য করিতেছেন। টোলের প্রান্তভাগে এক জন শাঁখা হাতে ছিপি করা কাপড় পরা প্রাচীনা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, সে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, সেনজ মহাশয়! এত বিলম্ব কেন? আমার নাম রত্নমালা। পক্ষিরাজ থর-থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, আমার ভুবনময়ী তো ভাল আছেন? রত্নমালা বলিল, ভাল আর কই? তোমাকে দেখলেই ভাল হবেন। অমনি পক্ষিরাজ সজল নয়নে বলিলেন, ভুবনময়ীকে গিয়া বল তাঁহার চিহ্নিত দাস আসিয়া চাতকের ন্যায় চাহিয়া আছে, সন্দর্শন-বারি প্রদান পূর্ব্বক কিঙ্করের তাপিত মনকে শীতল করুন—ওগো রত্নমালা! যদি এ সম্বন্ধ নির্বন্ধ হয় তবে তোমাকে রত্নমালা দিব। সহচরী বলিল, আপনি স্থির হইয়া ঐ জানালার নীচে বসুন, আমি সেই স্থির বিদ্যুল্লতাকে আনিয়া দেখাই। এই বলিয়া রত্নমালা প্রস্থান করিল। এদিকে পক্ষিরাজ শয্যাকণ্টকির ন্যায় অস্থির চিত্তে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা গত হইল, কাহারো দেখা নাই—যাবতীয় অপরিষ্কার স্থানের মশা ও ডাঁশ গাত্রে বসিতেছে—তিনি দুই হাত দিয়া গা ও পিঠ চাপড়াইতেছেন। কাহার উচ্চ-বাচ্য নাই—কেবল শৃগাল ও কুকুরগুলা এক এক বার ডাকিতেছে ও নিকটস্থ কলুর ঘানি ক্যাঁ-ক্যাঁ করিয়া শব্দায়মান হইতেছে। পক্ষিরাজের মন সাতিশয় বিচলিত হওয়াতে গানা বাগে "কেন আমারে বারে বারে বল তুমি তাঁর" এই উচ্চ বিলাপ গান করিতে আরম্ভ করিলেন, ইতাবসরে জানালার উপর দিয়া টিকাগোলা আলকাতরা কালি চুণ তাঁহার মস্তকে ছর-ছর করিয়া পড়িল। পক্ষিরাজ অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া এ কি এ কি বলিয়া উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গেল ও গা-মাথা আলকাতরায় চট-চট করিতে লাগিল। মত্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না, পক্ষিরাজের বিবেচনা হইল, উপস্থিত কর্ম্ম শবসাধনের ন্যায়, প্রথমে ভয় প্রদর্শন চরমে ইষ্ট লাভ হয়। যে-প কর্ম্মে যে যে মহাত্মা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার অগ্রে সুখ হইয়াছে? ফরহদ শিরির জন্য কি না করিয়াছিল? লৈলার জন্য মজনুর জ্ঞান ছিল না—পাখীর মাথায় বাসা করিয়া ডিম পাড়িয়া ছানা করিয়াছিল—তথাপি তাহার চেতনা হয় নাই। স্বয়ং মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করিয়া কুচনি পাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে মনকে সান্ত্বনা দিতেছেন, ইতিমধ্যে এক ধামা শিমুল তুলা ও চাউলের কুঁড়া মাথায় গায়ে পড়িয়া আলকাতরার সহিত একেবারে লিপ্ত হইয়া গেল, তখন আগড়ভম ভোম হইয়া স্বীয় শরীর ও জানালার প্রতি এক এক বার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এক প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল দূর থেকে খিল-খিল হাসির শব্দ হইতেছিল। পক্ষিরাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া রত্নমালা—রত্নমালা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। নিকটে বাঞ্ছারমা নামে এক মাগী কেসোরুগী থাকিত, তাহার একটু তন্দ্রা হইতেছিল, পক্ষিরাজের [illegible] গলার শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে সে বিরক্ত হইয়া বলিল—[illegible] তুই বেটা কে রে! এখানে রত্নমালা কোথায়? আমার [illegible] কেন গোল কচ্ছিস? মরতে কি আর জায়গা পাস্ নে? [illegible] নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, এদিকে ডঙ্কেশ্বর হা-হা করিয়া [illegible] হাসিতে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কৌতুক ভাবে বলিল—[illegible] বরের শয্যা না কি—বিয়ে হল কি? বাবা! ভাল [illegible] খাচ্ছ—তোমার পেটে এত বিদ্যা? বালিশের নীচে চিঠি [illegible] হয়েছে। পক্ষিরাজ অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া ডঙ্কেশ্বরের হাত [illegible] অধোবদনে নিজালয়ে চলিলেন। রাস্তার দোধারি লোক [illegible] লাগিল, আরে ভাই দেখ্ সে আয়। একটা ধূম্রলোচন ও চিমাই [illegible] চলে যাচ্ছে। ডঙ্কেশ্বর পক্ষিরাজের দুর্গতিতে মনে মনে [illegible] মৌখিক ভাবে বলিলেন—সেনজ! বড় উদ্বিগ্ন হইও না—[illegible] কার্য্যসিদ্ধি—ভুবনময়ী তোমার মন বুঝে দেখছেন—[illegible] তাঁহার লিপি তাহাতে এক বার আঁখির মিলন হইলেই [illegible] লৌহ ও চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় একেবারে লেগে যাবে—এই [illegible] "কলা বউকে ঝালা দিও না, গণেশের মা" এই গান গাইতে [illegible] চলিতেছেন। পরদিন বৈকালে ঘটক আসিয়া উপস্থিত, [illegible] পক্ষিরাজ কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি মস্তকে [illegible] করত কহিলেন, মহাশয়! কল্য কি পত্র হবে? ঘটক [illegible] বিকৃত করিয়া বলিলেন, বাবু, একটা গোলযোগ হইয়াছে—[illegible] শুনা যাইতেছে, আপনি ধন লোভে আসক্ত হইয়া এক জন [illegible] বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা হইলে আমি এ [illegible] দিব না—এ পর্য্যন্ত এ কথা বলরাম বাবুর কর্ণগোচর [illegible] পক্ষিরাজ জড়সড় হইয়া জিব কাটিয়া বলিলেন—মহাশয়, [illegible] বিশ্বাসযোগ্য? ভদ্রলোকের এ সব কর্ম্ম কখনই হইতে [illegible] আমার কুলশীল তো আপনি সকলই অবগত আছেন—[illegible] সেনের পৌত্র—আর অধিক কি বলিব? ঘটক বলিলেন, [illegible] কিন্তু জানি কি? তুমি সুপুরুষ—জোরকপালে, ধনের [illegible] দেখে পাছে তোমার ধাঁদা লেগে যায়—সে যাহা হউক, [illegible] গায়ে কি? কই কি—কই কি—বলিয়া পক্ষিরাজ তুলাগুলা [illegible] ফেলিতেছেন ও ভাবিতেছেন, কি বলি। সকলে [illegible] না ও মিথ্যা সাজানা বড় জুয়ারি, এ দিকে ডঙ্কেশ্বর হা-হা [illegible] করিতেছে—পক্ষিরাজ তাঁহার ঘরের ঢেঁকি কুমীরের হা [illegible] হইয়া বদন ও নয়নভঙ্গিতে নিবারণ করত বলিলেন—[illegible] কাল বাত্রে একটা বাতশ্লেষ্মা বেদনা হইয়াছিল, এবং [illegible] দেওয়াতে অনেক বিশেষ হইয়াছে। ঘটক বলিলেন, [illegible] প্রবল হইলে তাহার ঔষধ এই—এক্ষণে বাগবাজ [illegible] কল্য কল্যাণ হইবে। ঘটককে উঠিতে দেখিয়া [illegible] পক্ষীরা বলিল, মহাশয়! আমাদিগের বিদায় [illegible] আমরা আপনার গলার দড়ি। ঘটক প্রত্যুত্তর ক[illegible] দড়ি হইলে আমাকে দরায় কলসি হস্ত করিতে হই[illegible] বাবা একটু স্থির হউন—বিবাহের শিলাবৃষ্টি করিব—[illegible] দেখিলে বোধ হয় আকাশে আর নক্ষত্র নাই, এমন স[illegible]

[illegible] কত লোকে পায় ধরিয়া মেয়ে দিতে পারিলে বাপের সঙ্গে [illegible] যাবে।

[illegible]রাজ ভাবি সুখে মন মগ্ন করিয়া একলা বসিয়া আছেন, [illegible] সময়ে একখান পত্র আসিয়া উপস্থিত—লিপির শিরোনামা [illegible] মাত্র তিনি কম্পিত হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক চারি দিকে দৃষ্টিপাত করত মস্তক নত করিয়া বক্ষের নিকট লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন। [illegible] ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। তিনি লিখিতেছেন—"তব দর্শনার্থ [illegible] রাত্রি জানালার নিকট বসিয়া অতি অসুখে কালক্ষেপ করিয়া [illegible] হইয়া আছি। রত্নমালাকে তোমের নিকট পাঠাইয়াছিলাম [illegible] কিছুই সমাচার পাই না, তত্র অবশ্য অবশ্য আসিবে—অনেক কথা আছে।" দুই-তিন বার পত্র পড়িয়া পক্ষিরাজের মনে হইল [illegible]রাজ হইয়া তখনি গমন করেন, কিন্তু সে সময় ঐ বিষয়টি গোপন [illegible]বার জন্য স্বীয় মন ও পদদ্বয়কে অনেক কাল বন্ধন করিয়া রাখিতে হইল। যদিও দুই পা শরীরের ভরে চলৎ-শক্তি রহিত হইল, তথাচ মন কোন প্রকারে প্রবোধ মানিল না—তপ্ত তাওয়ার খইয়ের ন্যায় [illegible] করিয়া ফুটিতে লাগিল ও সর্ব্বদাই এই বোধ হইতে লাগিল, [illegible] নন্দনবাগান ঐ—গগনমণ্ডলে নবাভ্র বেষ্টিত শশধর ঐ প্রকাশ হইতেছে—ঐ রত্নমালা দাঁড়াইয়া সুমধুর বাণী বলিতেছে—ঐ ভুবনময়ী [illegible] হইয়া হাস্যান্বিত বদন বিকশিত করিতেছেন। এক এক বার মনে হইতেছে—এ বন্ধন হইলে বারাকপুরের নিবন্ধন পাছে ফেঁসে যায় [illegible] লোভের প্রাবল্য হেতু বুদ্ধি অস্থির হইতেছে, কোন্ দিক অবলম্বন [illegible] কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইতেছে না। বিধবা-বিবাহ করিয়া কি প্রকারে পরিপাক পাইবে এ ভয় এক এক বার হইতেছে, অমনি [illegible] উপস্থিত হইতেছে যে, অর্দ্ধ বার করিলেই সব দোষ ঢেকে [illegible]।

[illegible] না হইতে হইতে পক্ষিরাজ নন্দনবাগানে যাইয়া উপস্থিত। [illegible]কে দেখিয়া সজল নয়নে স্বীয় দুর্গতি ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা [illegible], তুমি কেন ফিরে আইলে না? সহচরী আ মরি আহা আহা [illegible]—আমার মুখে ছাই, সে কথা আর কি বলিব! পথে [illegible] আমার পেটের পীড়া হইয়াছিল, সে জন্য ফিরে আসিতে [illegible] নাই—সে যাহা হউক, আজি পাট জমিয়ে দিব—আমি আগু [illegible], তুমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। এই বলিয়া রত্নমালা [illegible] ন্যায় চলিল। যদিও কাবধ্বজ রথ ও কুলা সঙ্গে ছিল না, [illegible] তাহার গা দেখিলে বোধ হইত বিশ্ব গাইতে উদ্যত হইয়াছে। [illegible] হৃষ্টচিত্তে থপ থপ করিয়া ধাবমান হইয়াছেন। ক্ষণেক [illegible] একটা ভগ্ন বাড়ীতে পৌছিলেন, সেখানে জনমানবের শব্দ [illegible], কেবল কতকগুলা গোলা ও গেরওবাজ পায়রা বক বকম বকম [illegible] ভঙ্গ করিতেছে ও রাশি রাশি আরসুলা দ্বিজত্ব অহঙ্কারে [illegible]তেছে। একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর লইয়া সহচরী [illegible] বলিল—তুমি এইখানে একটু বইস, আমি সমাচার দি। [illegible] করযোড় করিয়া বলিলেন—অগো! একটু শীঘ্র আইস—[illegible] যেন ধড়ফড়াতে হয় না। সহচরী বলিল, আমি এলুম বলে [illegible] স্থির হও। পক্ষিরাজ আষাঢ়ীয় বেলার ন্যায় আশা প্রাপ্ত [illegible] সুখের ডাঁশা অবলম্বনে কেশ ভুরু মোচ সুচারু করতঃ [illegible] শরীরের লাবণ্য এক এক বার কটাক্ষ করিতেছেন ও নিজ [illegible] জন্য হাস্যবদনে ক্রীড়া করিতেছেন, আর এক এক বার চঞ্চল হইয়া কলেবর ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক উঁকি মারিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, একবার দেখা হইলেই বলিব "দেহি পদপল্লব-মুদারং।" কই রত্নমালা—কোথায় গেল, এখনও যে দেখা নাই। এই বলিতে বলিতে রত্নমালা একখানা নাবিনের রং করা কাপড় হস্তে করিয়া অতিশয় দ্রুত ভাবে উগ্রচণ্ডীর স্বরূপ আসিয়া বলিল—অগো সেনজ! বড় বিপদ—ভুবনময়ীর মামা কেমন করে এ কথা শুনিয়া একটা মস্ত ঠেঙ্গা হাতে করিয়া আসিয়া বড় ধুম করিতেছে, তোমাকে দেখতে পেলে একবার হাড় চূর্ণ করিয়া দেবে। এখন যদি বাঁচিতে চাও তো এই কাপড়খানা পরিয়া মেয়েমানুষের বেশে খিড়কি দ্বার দিয়া পলাও। ইহা শুনিয়া পক্ষিরাজের হরিষে বিষাদ হইয়া যেন দুর্য্যোধনের ন্যায় মৃতবৎ হইলেন। পরে আস্তে আস্তে উঠিয়া সহচরীর আনীত শাড়ী পরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইলেন। রত্ন-মালা আপন হাত হইতে দুই গাছা পিতলের মর্দ্দানা তাঁহার হাতে পরাইয়া অঞ্চল ও মাথার কাপড় ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। খিড়কি দ্বারের আয়তন অল্প, এ কারণ নির্গত হইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—বিস্তর কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া আস্তাগুড় ও কাঁটা বন দিয়া যাইতে যাইতে পক্ষিরাজের মনে হইল, মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাঁটা বন দিয়া গমন করা ততোধিক ক্লেশ। কিঞ্চিৎ কাল পরে, সদর রাস্তার উপর আসিলে রত্নমালাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ রূপসী কে গো? সহচরী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল, ইনি আমার ব্যান। বেস বেস!—জুতা পরা কেন? এরা রাঢদেশের মেয়ে, জুতা পরিয়া থাকে। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে ঘটক সম্মুখে আসিয়া পক্ষিরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অমনি পক্ষিরাজ জুতা জোড়া রাস্তায় ত্যাগ করিয়া ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া ল্যাগব্যাগ ল্যাগব্যাগ করিতে করিতে নিকটস্থ একটা মুদির দোকানে প্রবেশ করিলেন। মুদি কাজলা চাউলের ভাত ও পায়রাচাঁদা মাছের চড়চড়ি দিয়া আহার করিতেছিল, হঠাৎ অদ্ভুত আকার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কে গো তুমি—কে গো তুমি? পক্ষিরাজ হাত ও চক্ষের ভঙ্গি দ্বারা তাহাকে চুপ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু বস্ত্র অতি ফিন্‌ফিনে ও নিকটে প্রদীপ জ্বলিতেছিল এ জন্য গোঁপ একেবারে দেদীপ্যমান হইল। যদিও তিনি গোঁপের উপর হাত রাখিয়া ভূরি ভূরি ও ভূয় ভূয় সঙ্কেত করিলেন, কিন্তু মুদি বলিল—তোমাকে দেখে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি দোকান থেকে বাহির না হইলে আমি এখনি চৌকিদারকে ডাকিব। এদিকে বাগ-বাজারের নব্য দল মশাল জ্বালাইয়া নিশান তুলিয়া ঢোল বাজাইতে বাজাইতে "বৌ আস্তে গেছে তারা ঘরে নাই গো" এই গান গাইতে গাইতে দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত—পক্ষিরাজ দেখিলেন বিপদ সমূহ—ঘটক মহাশয় চাপা-হাসি বদনে গলা খাঁকরি দিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেনজ মহাশয়, ব্যাপারটা কি? ওদিক থেকে ডক্কেশ্বর সকল পক্ষীকে লইয়া হা-হা হা-হা হাস্য করিতে করিতে বলিল, এ কি মহাদেবের মোহিনী বেশ না কি? বাবু, ডুবে খুব জল খেলে, এখন যাদের মড়া তাদের কাছে এস, এই বলিয়া পক্ষিরাজের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎ থেকে হুওর গর্‌রা—হাততালির চোট—ঢোলের চাটি ও গানের গলাবাজিতে চতুর্দ্দিক কম্পমান হইতে লাগিল। ঘটক দৌড়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে লগ্নপত্র কি কাল হবে? ডক্কেশ্বর বলিলেন, একেবারে

হসন্তের পত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১২ই মে, ১৯৫০

একদা একটা গল্প শুনেছিলাম। কোথায় এবং কার কাছে সেটা অবান্তর অর্থাৎ মনে নেই। সাধারণতঃ ঠাকুমা-দিদিমারা স্নেহশীলাই হ'য়ে থাকেন—একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই। নাতি-নাতনীদের আদর-আবদার ইত্যাদি ঠাকুমা-দিদিমাদের কাছেই হ'য়ে থাকে বেশি—আন্তরিক, অব্যাহত ও অপ্রতিহত। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। পদ্মবনে অহিব ন্যায়, মৃগযূথে নেকড়ের ন্যায়, দেশভক্তের দলে রাজসাক্ষীর ন্যায় কচিৎ-কদাচিৎ এমন দু'-একটি ঠাকুমা-দিদিমা দেখা যায় যাঁদের গতি-প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন ধরণের। এমনি এক দিদিমার দু'টি নাতি ছিল পাঁচ ও চার বছর বয়েসের। নাতি দু'টিকে এই দিদিমাটি রাখতেন একেবারে কড়া শাসনে—এদিকে যেতে ক্যাট্‌-ক্যাট্‌, ওদিকে যেতে ক্যাচ্‌-ক্যাচ্‌, উঠতে-বসতে খেতে-শুতে বেচারীদের আর কিছুই যেন ভব্য মতো হ'য়ে ওঠে না সেই দিদিমাটির ফৈজৎ ছাড়া। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে শিশু দু'টি আর দুষ্টুমি তো দুষ্টুমি, একটু খেলা-ধূলো করবারও সুযোগ ও সাহস পেতো না—থাকতো অতি শান্ত-শিষ্ট ও সুশীল হ'য়ে। দিদিমা যখন বাইরে যেতেন তখন দেয়ালে একটি চোখ এঁকে রেখে যেতেন, নাতি দু'টিকে ব'লে যেতেন,—এই রইলো আমার চোখ, খবরদার কোনো গোলমাল বা দুষ্টুমি ক'রো না, করলে মজাটা টের পাবে আমি ফিরে এলে। দিদিমার অনুপস্থিতিতেও ওই চোখের দিকে তাকিয়ে শিশু দু'টি শিশুসুলভ কিছু করতেই আর সাহস পেতো না—না একটু খেলা-ধূলো, না একটু নড়ন-চড়ন, না একটু উচ্চ গলায় অহৈতুকী হর্ষধ্বনি। এটা বোধ হয় দিদিমার সম্পর্কে নাতি দু'টির **fear complex** অর্থাৎ তাদের অবচেতন মনে ভীতি-বিহ্বলতা কায়েমী হ'য়ে যাওয়া ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমার মনে হয়, ঠিক ঐ রকম পাকিস্থানের জন্মের পর ডেম্‌ ব্রিটানিয়া (Dame Britannia) চ'লে যাবার সময় পাকিস্থানের বর্ডার-দেয়ালে নয়া দিল্লীর দিকে তাক ক'রে তাঁর এক চোখ এঁকে রেখে গেছেন। এবং এই চোখ দেখেই যেন স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিমণ্ডল অর্থাৎ নেহরু ও প্যাটেল দিদিমার ঐ নাতি দু'টির মতোই সন্ত্রস্ত ও [illegible] অর্থাৎ হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্‌ হয়ে আছেন। [illegible] পাকিস্থান ও ভারত সম্পর্কিত ব্যাপারের আর কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নে।

একবার মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখো, প্যাটেল-নেহরু নিতান্ত বাজে মার্কা বোকা লোক নন। কেউ বলতে পারবে না যে, তাঁদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই বা তাঁরা সাহসী নন। নেহরুর বোধ আর প্যাটেলের প্ল্যান একত্র হ'য়ে বহুবিধ মুস্কিলের অবসান ঘটাতে পারে, এমন মনে করলে অন্যায় হয় না। স্বাধীনতা লাভের পর প্যাটেল স্বরাষ্ট্র-সচিবরূপে এক বছর দেড় বছরের মধ্যে যে-ভাবে সারা ভারতবর্ষকে (অবশ্য পাকিস্থানকে বাদ দিয়ে, এবং এতে পাকিস্থানীদের শেষাশেষি লাভ হ'ল, না লোকসান, সেটা ভবিতব্যতাই বলতে পারে) এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন তাতে তাঁকে বাহবা দেওয়া চলে। নেহরু পররাষ্ট্র-সচিবরূপে সম্পর্কিত ব্যাপারে উত্তাল তরঙ্গমালার উপর দিয়ে যে-ভাবে [illegible] ভারত-রাষ্ট্র নৌকার হাল ধ'রে চলেছেন তার মধ্যে ভীতি-[illegible] কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু পাকিস্থানের সামনে এসে নেহরু-প্যাটেল যেন দু'জনে গলা-জড়াজড়ি করে অসহায় ভাবে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। নেহরু-প্যাটেলের মিলিত প্রাণ ও মস্তিষ্ক পাকিস্থান সম্পর্কে যা করেছে, তা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর [illegible] করা হবে না। কিন্তু কেন? পাকিস্থানের দেয়ালে [illegible] ব্রিটানিয়ার ঐ চোখ। ঐ চোখের উপর চোখ [illegible] বুদ্ধি যেন গিয়েছে ভেসে, সাহস যেন গিয়েছে তলিয়ে—[illegible] যেন হয়েছেন আড়ষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ, হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্‌। [illegible] আর কোনো ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই নে।

অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন যে, পাকিস্থান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র-সচিব ও পররাষ্ট্র-সচিবের মুস্কিল হয়েছে এই যে, ও-রাষ্ট্র [illegible] না ঘাট্‌কা। অর্থাৎ পাকিস্থান পুরোপুরি ভাবে স্বরাষ্ট্রের [illegible] পড়ে না, আবার অন্য দিকে পুরোপুরি ভাবে পররাষ্ট্রের [illegible] না। মানুষের সম্পর্কে কিছু করা যায়, দেবতার সম্পর্কে [illegible] করা যায়। কিন্তু ত্রিশঙ্কুর সম্বন্ধে বোকা ব'নে থাকতে [illegible] তাই নেহরু ও প্যাটেল ওই ব্যাপারে কায়দা পাচ্ছেন না। [illegible] রস আছে এবং সেদিক থেকে বেশ উপভোগ্য। কিন্তু [illegible] প্রামাণ্য নয়, এবং এঁদের অর্থাৎ নেহরু-প্যাটেলের [illegible] বিচারে মার্জনার যুক্তি নয়।

আমি পশ্চিম-পাঞ্জাবের কাণ্ডের কথা ধরছি নে, [illegible] ছিল একটা প্রকৃত মাৎস্যন্যায়ের কাল। কিন্তু [illegible]

কলসী কাঁধে থকে ও সুঁদরি কাষ্ঠের সহিত হবে। পক্ষিরাজ বাটীর নেকড়া-নেকটি হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে পারিয়া ভদ্রকে ফিরিয়া বলিলেন—বিটুলে বামুন, তোর এই কথা—র রে বেটা, তোর মাথা ভাঙব—তুই জানিস নে আমি লাউসেনের পৌত্র। ভদ্র বলিলেন—আরে বেটা তুই যা—আমিও কুমড়ো শর্মার দৌহিত্র।

প্রায় সকলে মনে মনে বোধ করে, আমি বড় বুদ্ধিমান। নির্বুদ্ধিতা প্রচার হইলে অহঙ্কারের খর্বতা হয়, তাহাতে মহা অসুখ হইয়া থাকে। পক্ষিরাজ কিছু দিন ম্লান ভাবে থাকিলেন, পরে তাঁহার ও দলস্থ সকলের অতিশয় অনাটন হওয়াতে পাতের মাল কিনিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপ দশ দিন করিতে করিতে এক দিন ধৃত হইয়া বিচারান্তে সকলের সাজা হুকুম হইল। তৎকালীন আদালত হইতে তাঁহারা জেলে যান তৎকালীন যে প্রাচীন [illegible] অহহরির জেলোতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি রাস্তা [illegible] যাইতেছিলেন—জয়হরিকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া [illegible] পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু এ কি? তখন জয়হরি [illegible] হইয়াছে, আপন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। প্রাচীন [illegible] বাবা! এক্ষণে উপায় নাই, লোকে সঙ্গ অথবা [illegible] যায়, এটি সদা সর্ব্বদা স্মরণ না থাকিলে ভাবি [illegible] এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, [illegible] হইয়া সাধুসঙ্গ করিও এবং মনে রাখিও যে কুসঙ্গ [illegible] সর্ব্বনাশ।

থেকে হিন্দু শিখ উৎসাদিত হ'তে আরম্ভ হ'ল সেই মুহূর্ত থেকে পাকিস্থানের সত্তা আইন অনুসারে, নৈতিক হিসেবে, সভ্যতার কষ্টিপাথরের পরখে নস্যাৎ হ'য়ে গেছে। সেই মুহূর্ত হ'তে ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে, ভারত রাষ্ট্রের প্রতি হর্ম্যচূড় থেকে ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল যে, পাকিস্থানের গঠন ও অস্তিত্ব আর গ্রাহ্য নয়—ভারত-খণ্ডন আর স্বীকার্য্য নয়, কেন না পাকিস্থান ওর মূল তত্ত্বেই আঘাত হেনেছে। ইতিমধ্যে অনুমান করা যায়, ভারত রাষ্ট্রের "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান"-ওয়ালাদের বহু মুসলমান পাকিস্থানটা কি চিজ তা কতকটা মালুম করতে পেরেছিলেন। এবং হয়তো ত্রিখণ্ডিত ভারত আবার অখণ্ডিত হ'লে এঁদের অনেকে মনে মনে খুশিই হতেন। কিন্তু সে যা হোক্, ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে ও-সব কিছুই ঘোষিত হ'ল না—এমন কি গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে ও-সম্বন্ধে একটু কানাকানির পর্য্যন্ত আভাস পাওয়া গেল না। একটা চরম তাৎপর্য্যপূর্ণ দুর্ঘটনায় ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধাররা রইলেন নিস্পন্দ নিশ্চল নির্বাক্! যেন কোন্ অদৃশ্য এক শক্তির দেবতা এই কর্ণধারদের কর্ণ ধারণ ক'রে আছেন। কিন্তু কেন এই অবিশ্বাস্য সংস্থিতি? কেন পার্লেমেন্ট এমন বিভ্রান্ত-বুদ্ধি? কেন এখনো আমাদের ধারণা, অখণ্ড ভারতের কথা বলা আইন-বিগর্হিত, শর্ত্তবিরোধী কাজ? পাকিস্থানের দেয়ালে প্রস্থান-কালীন ডেম বৃটানিয়ার ঐ চোখ। আর কিছু নয়, "দিদিমণি যেন জানতে না পারে।" পাছে দিদিমণি জানতে পারে [illegible]। এই ভয় যেন নেহরু-প্যাটেলকে কাবু ক'রে রেখেছিল [illegible] হয় আজো রেখেছে।

তুমি অবশ্য বলতে পারো, হম চু থেকে ঐ কথা ঘোষণা করলেই [illegible] কি স্বর্গলাভ হ'ত? কোনো স্বর্গলাভ হ'ত না নিশ্চয়। কিন্তু পাকিস্থানের কর্মসূচীর ওর পরের দফায় হাত দেবার পক্ষে [illegible] মস্ত বড় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হ'ত। তা ছাড়া ঐ ঘোষণা [illegible] একেবারে [illegible]—অর্থাৎ যা করলে [illegible] নেই, কিন্তু না করলে প্রমাণিত হয় যে, [illegible] নিতান্ত আনাড়ি—কঠিনের কাজ করবার মতোও যোগ্যতা [illegible] যখন থেকে বোঝা গেল যে, ভারত খণ্ডিত ক'রে [illegible], তখন থেকে অখণ্ড ভারতের চিন্তা-বীজ যত উপায়ে সম্ভব [illegible] আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হ'য়ে পড়েছে একটা [illegible]। ভারত গভর্ণমেণ্টের ঐ ঘোষণা ঐ কাজেও [illegible] মস্ত বড় সাহায্য—ওটাই হ'ত অখণ্ড ভারতের এক [illegible] পরিকল্পনা। আর এখন তো অখণ্ড ভারতের কথা [illegible] কাছে হ'য়ে উঠেছে পাগলা মেহের কাছে [illegible] তুল্য। এঁদের সাম্প্রতিক কথাবার্ত্তা শুনে তাই [illegible]।

[illegible] ভদ্রলোক other methods অর্থাৎ অন্য পন্থার কথা [illegible] তার সুবোধ ও সহজ অর্থ হয় এই যে, পাকিস্থানী [illegible] সঙ্গে বাতচিৎ ক'রে যদি মহব্বৎ কায়েম না হয়, তবে অন্য [illegible] অবলম্বন করতে হবে। অমনি পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী [illegible] আলি খাঁ তাঁর অসহায় নবনীত-কোমল বাহু দুটি ডেম্ [illegible] বৃটানিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আকুল অন্তরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন—দিদি! ঐ যে নেহেরু দাদা "অন্য পন্থা"র কথা বলছে। ঐ অন্য পন্থা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। এর পূর্বে আমরা ফিরোজ খাঁ নুন-প্রমুখ পাকিস্থানের একাধিক হোমরা নেতাদের মুখে তাঁদের কটি-বিলম্বিত তরবারির ঝনৎকার শুনেছি। কিন্তু বোধ হয় পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থানী শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে বেশি ওয়াকিফহাল। তাই নেহরুর মুখে যুদ্ধের একটু আনুমানিক ইঙ্গিতের কথা শুনেই তাঁর হৃদ্‌স্পন্দনটা হৃদ্‌কম্পনে পরিণত হয়ে গেল। পাকিস্থানী নেতাদের পক্ষে এই ধরণের হৃদ্‌কম্পন একটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যাপার—একেবারে যেন সারসা-প্যারিলা। সুতরাং ঐ হৃদ্‌কম্পন তাঁদের বক্ষে সম্ভব ঘটাতে দেওয়া উচিত ছিল একটা মহা কর্ত্তব্য বোধে—বিশ্ব-মানবের কল্যাণ উদ্দেশ্যে। কিন্তু জহরলাল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, বললেন—তাঁর গলার স্বরটাও যেন তৃতীয় সপ্তকের নি থেকে প্রথম সপ্তকের সা-তে এসে নেমেছে—বললেন—আরে না না লিয়াকৎ ভাই! আমি অন্য পন্থা বলতে যুদ্ধ বোঝাইনি—অন্য পন্থা মানে অন্য কোনো পন্থা মাত্র। আসলে আমার মন-প্রাণ-চিত্তে, অস্থি-মাংস-মজ্জায়, খেয়াল-খোয়াব-খতিয়ানে যুদ্ধের "য" পর্য্যন্ত কোথাও নেই! সচ্, বাৎ। এখন, লিয়াকৎ আলির আর্ত্তনাদে জহরলালের দিক থেকে কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না, কারণও ছিল না। যে-কোনো দেশে অনুরূপ ক্ষেত্রে যে-কোনো প্রধান মন্ত্রী চুপ ক'রে থাকতেন। লিয়াকৎ আলির কথায় মনোযোগই করতেন না—ignore করতেন। কিন্তু জহরলাল তা পারলেন না। কেন? পাকিস্তানের দেয়ালে আঁকা ডেম ব্রিটানিয়ার সেই চোখ। যেন সেই মস্তিষ্ক অহেতুকী ভয়।

এ এক মহা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার—এক মহা অদ্ভুত ব্যাপার বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। ভারত রাষ্ট্র পাকিস্থানের তুলনায় একটা তুচ্ছ রাষ্ট্র নয়। স্বাধীন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে কানাকানি হ'তে লাগলো—কোথাও ঈর্ষাক্ষুব্ধ কণ্ঠে, কোথাও মৈত্রী পুলকিত স্বরে—যে, ভারত রাষ্ট্র সারা এশিয়ার নেতৃত্ব করবে, ভারত মহাসাগরের তরঙ্গমালার খবরদারি করবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুরুব্বিগিরি করবে। কিন্তু একেবারে বাড়ির কাছে এক মহা অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল, যে-অগ্নিকাণ্ড ভারতবাসীর হাত-পা ঝলসে দিয়ে গেল, নয় দিল্লীর কর্ণধারদের নাক-কান পুড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু কোথা থেকেও উঠলো না একটা টুঁ, না একটু টাঁ। নেতারা যেন সব জড়ভরত হ'য়ে গেলেন। যেন ডেম্ ব্রিটানিয়ার সেই চোখ এঁদের মুহ্যমান ক'রে রাখলো! কি জানি একটু উঁ আঁ করলে যদি সত্য ভঙ্গের দায়ে পড়তে হয়!

কিন্তু পাকিস্থানী কাণ্ডকারখানা এবং তাতে ভারতীয় কর্ত্তাদের ভাব দেখেই যে কেবল ভ্যাবাচ্যাকা খেতে হয় তাই নয়, খাস ভারত রাষ্ট্রের দু'-একটি ব্যাপার দেখেও কম ভ্যাবাচ্যাকা খেতে হয় না। এই ধরো না, দিল্লীর কর্ত্তারা একটা ফরমুলা বাতলিয়েছেন এই যে, যদি দুই ষ্টেট্ বা দুই প্রদেশের মধ্যে মতান্তর বা কোনো গোলমাল উপস্থিত হয়, তবে সেই দুই ষ্টেট্ বা প্রদেশের মধ্যে বুঝাপড়া হ'য়ে ব্যাপারটার মীমাংসা করতে হবে—তা ছাড়া মীমাংসা করা চলবে না। ফরমুলাটা বেশ খানিকটা অদ্ভুত ধরণের। কেন—তা বলছি।

মনুষ্য-সমাজে যখনই যেখানে কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হয় তখনই তার মানেই হচ্ছে এই যে, কেউ এক জন বা বহুজন কোনো সত্যচ্যুত হয়েছে অর্থাৎ কোন অন্যায় করেছে। আমরা

অবশ্য কথায় ব'লে থাকি যে, এক হাতে তালি বাজে না। কথাটা বাস্তব হিসেবে অর্থাৎ technically সত্য। কিন্তু ঐ কথা বলে সাধারণতঃ আমরা যে ইঙ্গিত করি, যেখানেই হাতাহাতি হয় সেখানেই দু'দলেরই দোষ থাকে এ-কথা সত্য না। আসলে যেখানেই দু'পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় সেখানেই, অন্ততঃ শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে, নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এক পক্ষ দোষী, আর এক পক্ষ নির্যাতিত। অর্থাৎ এক পক্ষ আক্রমণকারী আর এক পক্ষ আত্মরক্ষাপ্রয়াসী। এখন, প্রত্যেক রাজ-সরকারের কর্তব্য, এবং সর্বপ্রথম কর্তব্য—যে-কর্তব্যের উপর সমাজ-শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ ভিত্তিটাই দাঁড়িয়ে আছে—হচ্ছে ঐ আক্রমণকারীকে ব্যাহত করা এবং আত্মরক্ষাপ্রয়াসীকে সমর্থন করা। এমন ক্ষেত্রে রাজ-সরকার যদি বলেন, আমি দর্শক মাত্র, তোমরা নিজেরাই বোঝাপড়া করো, তবে তাঁর সর্বপ্রাথমিক কর্তব্যের হানি ঘটে। চোর ও গৃহস্থের মধ্যে যখন বচসা, তখন রাজ-সরকার যদি বলেন, দু'য়ের মধ্যে বোঝাপড়া হ'য়ে চোর যদি বাসন ফেরত দিতে রাজি হয়, তবেই গৃহস্থ তার জিনিসপত্র ফিরে পাবেন, নইলে নয়—তবে ব্যাপারটা রীতিমত গোল আনা হাস্যরসাত্মক হয়ে ওঠে। নব দিল্লীর নব্য কর্তাদের যে-ফরমূলার উল্লেখ করেছি সেটিও এই রকমের হাস্যরসাত্মক ব্যাপার। কিন্তু আজ দেশের নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে, অশ্রু প্রবাহের মধ্যে কিছু হাস্যরস পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই যে নেহেরু-মন্ত্রিসভা ঐ ফরমূলার জন্ম দিয়েছিলেন, তা মনে হয় না। আসলে ঐ ফরমূলার হাস্যরসটা যে তাঁদের চোখে পড়েছে, তা বোধ হয় না।

এখন তত্ত্ব থেকে তথ্যে আসা যাক, অর্থাৎ ফরমূলা থেকে তার প্রয়োগ-ক্ষেত্রে নামা যাক। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের একটা কর্মসূচী আছে কংগ্রেসের। এই কর্মসূচীটা হঠাৎ আকস্মিকভাবে এসে উদয় হয়নি—ওটা কংগ্রেসীদের বহু দিনের আকিঞ্চন। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট যে জগাখিচুড়ি ক'রে প্রদেশ গঠন করেছিল কংগ্রেসের এই কর্মসূচীটা বুদ্ধিমানের তরফ থেকে তারি প্রতিবাদ। ঐ রকম জগাখিচুড়ি প্রদেশ গঠনের অর্থ হ'তে পারে এই যে, মানুষের মাতৃভাষাটা একটা নিতান্ত বাহুল্য বিলাসিতা। সুতরাং বিশেষ একটা ভাষার মানব-সমষ্টিকে বিশেষ একটা সীমার মাঝে স্থান দান ক'রে তাদের স্পষ্ট ক'রে তোলার কোনো মানে নেই। বলা বাহুল্য, কথাটা অবশ্য সত্য নয়, আসলে কথাটা ঘোরতর মিথ্যা, একটা বড়ো অকল্যাণকর মিথ্যা। মানুষের আত্মা ও মাতৃভাষার মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ আছে যেটা একেবারে তত্ত্বগত—fundamental। এর একটা ছাড়া আর একটার সুষ্ঠু বিকাশ হ'তে পারে না। আবার এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—inter-dependant। আত্মা ভাষাকে গ'ড়ে তোলে, আবার ভাষা আত্মাকে শক্তিশালী করে, ঐশ্বর্যশালী করে। একটা মানুষের স্বাধীনতার একটা প্রধান তাৎপর্য তার মাতৃভাষার স্বরাজ্য। তার ঘরে-বাইরে, স্কুল-কলেজে, আইন-আদালতে, সভা-সমিতিতে, তার জলসায়-বৈঠকে-আড্ডায় মাতৃভাষার স্বরাট্ত্ব—সে-সব জগতে তার মাতৃভাষা থাকবে রাজরাজেশ্বরীরূপে স্বর্ণসিংহাসনে। আন্তঃপ্রাদেশিক লেন-দেনের জন্য, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বাতচিৎ করার জন্য তাকে একটা ভাষা যদি শিখতে হয় তবে সেটা হবে প্রয়োজনের ভাষা, পুলকের ভাষা নয়। সুতরাং তার স্থান তার কাছে চব্বিশ [illegible] থাকবে দ্বিতীয় স্তরে। সে-ভাষায় সে তার ইষ্টদেবতার কাছে ভক্তি-অর্ঘ্য দেবে না, প্রণয়িনীর কাছেও প্রেম-নিবেদন করবে না। মানুষের প্রাকৃত জীবন ছাড়িয়ে অর্থাৎ তার আহার, নিদ্রা, মৈথুনকে অতিক্রম ক'রে যা-কিছু অভিব্যক্তি সত্যে-সৌন্দর্যে-কল্যাণে তা সুষ্ঠু ভাবে হ'তে পারে মাতৃভাষাতে। [illegible] জাতিকে কোনো রকম রক্তপাত না ক'রে নিঃশব্দে [illegible] চাইলে সাংঘাতিক ভাবে জখম করা যায় তার মাতৃভাষাকে আঘাত ক'রে। বাহির থেকে কোনো রকম রক্তপাত [illegible] যাবে না, শারীরিক অস্থি-শৃঙ্খলার কোনো রকম ব্যত্যয় [illegible] না, দেহের একটি অণুকেও স্থানভ্রষ্ট দেখা যাবে না, কিন্তু জাতি ঠিক মরণের পথে এগিয়ে যাবে যদি তার মাতৃভাষার মৃত্যু [illegible] যায়। সুতরাং কংগ্রেসী নেতারা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ [illegible] কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষাভাষীদের [illegible] পরিচ্ছিন্ন মূর্তি দান করবার প্রস্তাব ক'রে একটা মহা [illegible] পরিচয় দিয়েছিলেন। তা ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে একটা মহা চমকপ্রদ সত্য চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে নানা বিচিত্রতার সমন্বয়—নানা সুর, নানা বর্ণ, নানা ধর্ম নিয়ে, কলহ নয়, একটা বিরাট সামঞ্জস্যময় জীবন—ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর [illegible] কোলাহল নয়, একটা অপূর্ব ঐকতান সঙ্গীত, এই চমকপ্রদ [illegible] সঙ্গে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কর্মসূচীটাও চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে যায়। অনেকে অবশ্য আজ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্য সম্বন্ধে ভীষণ ভাবে সচেতন হয়েছেন এবং উতলা হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু ঐক্য আসবে বৃহত্তর স্বার্থের তাগিদে, বুদ্ধিমানের [illegible] বোধের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রসাদে। অর্থাৎ ঐক্য [illegible] বুদ্ধিলীপ্ত মানুষদের, দৃক-তাড়িত মেষদের নয়। মাতৃভাষা[illegible]—regional languageগুলিকে—বধ করতে চাইছেন এবং [illegible] মতলব আঁটলে গোড়াতেই ঐক্যের বদলে উঠবে বাধা [illegible] এবং তা থেকে জন্ম নেবে অনৈক্য। মাতৃভাষার [illegible] অকল্যাণ ঘটবে তা পূর্বেই বলেছি।

কিন্তু কোথায় যেন হয় একটি রসিক পুরুষ [illegible] রসিকতার সৃষ্টি করবার প্রাণপণ প্রয়াস করছেন। তাই [illegible] যখন ভারতবর্ষের শাসন-গদি পেলেন তখন দেখা গেল, ভাষার [illegible] প্রদেশ গঠনের কর্মসূচীটাও অনেকখানি নীরস হয়ে উঠে [illegible] অজুহাত নানা বাধা-বিঘ্নের কথা ব'লে এই ব্যাপারে তাঁরা [illegible] করতে লাগলেন। কোনো কোনো কংগ্রেসী নেতার ঐ [illegible] দিকে তাকিয়ে প্রায় চোখই ট্যারা হ'য়ে যাবার জোগাড় হ'ল। [illegible] এত দিন তামিলদের সঙ্গে (এবং মালয়ালী ও কানাড়ি[illegible]) এক-প্রদেশস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের বহু দিনের কামনা [illegible] একটা নিজস্ব প্রদেশ গঠিত হয়। এ নিয়ে বহু বাক্বিতণ্ডা [illegible] অবশেষে রঙ্গমঞ্চে ধর-কমিটির আবির্ভাব। বশংবদ ধর-[illegible] গবেষণানন্তর কংগ্রেসী রাজ-সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে [illegible] ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন এখন অত্যন্ত অসমীচীন [illegible] কিন্তু কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান পাণ্ডা এবং তখনকার কংগ্রেসের সভাপতি অন্ধ্র-দেশীয় পাট্টাভি সীতারামাইয়া এতে গেলেন ক্ষেপে—[illegible] এক জন ভদ্র ব্যক্তির ভদ্র ভাবে যতটা ক্ষেপে যাওয়া সম্ভব। [illegible] উঁচু

[illegible] কংগ্রেস পাণ্ডারা প্রমাদ গণলেন। তখন নেহেরু ও প্যাটেল [illegible] এসে বললেন—আচ্ছা বাপু, হোক্ হোক্ তোমার অন্ধ্র প্রদেশ। [illegible] ব্যাপারটা তামিলদের সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে ক'রো। তামিলরা [illegible] এতে রাজি হয় তবেই অন্ধ্র প্রদেশ হ'তে পারবে, নইলে নয়। [illegible] অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! এক অপূর্ব সত্য ও ন্যায়ের বিচার! [illegible] সংখ্যা কত, তা আমি সঠিক জানি নে—বোধ হয় দুই কোটির [illegible] হবে। দুই কোটি এক ভাষাভাষীর প্রদেশ গঠন নির্ভর করবে [illegible] এক ভাষাভাষী জন-সমষ্টির উপরে। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড! [illegible]-তত্ত্বে জাল-জুয়াচুরি খুন-খারাবির সম্পর্কে একটা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—who benifits? অর্থাৎ ঘটনাটাতে কে লাভবান হচ্ছে। তামিলরা যদি অন্ধ্রদের প্রদেশ গঠনে রাজি না হয়, [illegible] মানেই হবে এই যে, ঐ প্রদেশ গঠনে তাদের স্বার্থের হানি ঘটবে। আমি পূর্বেই চোর ও গৃহস্থের উল্লেখ করেছি। এই ব্যাপারে চোর হচ্ছেন তামিলরা আর গৃহস্থ হচ্ছেন অন্ধ্ররা। [illegible], কংগ্রেসী রাজ-সরকারের নির্দেশে গৃহস্থ অন্ধ্রদের অধিকার লাভ ঘটতে পারে মাত্র চোর তামিলদের সম্মতিতে। এমন [illegible] পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত আর কোথাও কেউ দেখাতে পারেননি —যেমন দেখালেন আজ আজীবন সত্যব্রতী অহিংসপন্থী মহাত্মা গান্ধীর এই প্রিয় শিষ্যবৃন্দ। এর পর রামধুন ভজনটা ভক্তিভরে গাইলেই ব্যাপারটা একেবারে চৌকশ হ'য়ে ওঠে!

বঙ্গ ও বিহারের মধ্যেও একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি অতি সহজ সরল প্রশ্ন—এর মধ্যে কোনো জটিলতা কিছু নেই, কোনো mystic কিছু নেই, আইন-তত্ত্বের মাথা-ঘামানোর কিছু নেই। যেমন কোনো কোনো ব্যক্তির কাণ্ড প্রতি একটু কিছু অন্যায় [illegible] না পারলে ভাত হজম হয় না, তেমনি বৃটিশরা যখন ১৯০৫ [illegible] বিভক্ত বাংলাকে বহুর ছন্দপাত পরে আবার যুক্ত [illegible], [illegible] যেন ঠিক তাঁদের চপ-কাটলেট্ হজমের সাহায্যের [illegible] বাংলার কিছু কিছু টুকরো এক দিকে বিহারের মধ্যে [illegible] [illegible] ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেদের পাকস্থলীর স্বাস্থ্য [illegible] তার ব্যবস্থা করলেন। কংগ্রেসীরা চিরকাল এই [illegible] প্রতিবাদ ক'রে এসেছেন, এমন কি বিহারের নেতারাও [illegible] স্বরে আপনাদের গলার স্বর মিলিয়েছেন দ্বিধাহীন [illegible] স্বাধীন হওয়া মাত্রই যে, এই অন্যায়কে সংগ্রামে [illegible] দেশ থেকে বের ক'রে দিতে হবে এমন কথা [illegible] নেতারা কখনো দীপক রাগে, কখনো কিঁকিট-খাম্বাজ, [illegible] মিশ্র কানেড়ায় সুর ক'রে বহু বছর ধ'রে আমাদের শুনিয়ে [illegible]। কিন্তু যেমনি কংগ্রেসী নেতারা এসে দিল্লীর মসনদে [illegible] অমনি "বদলে গেল মতটা"। তখন এক নতুন [illegible] হ'ল যে, বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে একটা বোঝা-[illegible]—বিহারীরা যদি সম্মত হয় তবেই বাংলার নিজস্ব [illegible]-বঙ্গ ফিরে পাবে, নইলে নয়। এখন গোয়েন্দা-[illegible] প্রথম প্রশ্নের কথা—who benifits? পশ্চিম-বঙ্গ [illegible] ফিরে না পেলে কে বা কারা লাভবান হয়? [illegible]। সুতরাং এক্ষেত্রে চোর হচ্ছেন বিহারীরা [illegible] হচ্ছে পশ্চিম-বঙ্গ। এখন এই চোর বিহারীরা [illegible] সম্মত হয় তবেই গৃহস্থ পশ্চিম-বঙ্গ আপন জিনিস ফিরে পাবে, নইলে নয়! সত্য-তত্ত্ব ও ন্যায়-ধর্মের এ-এক অদ্ভুত নিদর্শন! এবং মহাত্মা গান্ধীর সত্যসন্ধ শিষ্যবৃন্দ ক্ষমতা হাতে পেয়েই তাই প্রকট করেছেন। এখন আমাদের উচ্চ কণ্ঠে, প্রাণপণে গলার রগ ফুলিয়ে বলতেই হয় সত্য ও ন্যায় জিন্দাবাদ। নেহরু-মন্ত্রিসভা ও সত্য ন্যায় ধর্ম ইত্যাদি একেবারে সম অর্থবাচক হয়ে গেল। আমাদের সবারই ধারণা ছিল, একটা দেশের গভর্ণমেণ্টের কাজ হচ্ছে ন্যায়কে রক্ষা করা, অন্যায়কে ব্যাহত করা এবং কোথাও অন্যায় ঘটলে তার প্রতিবিধান করা ও অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু আজকার কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট বলছেন, চোরের মর্জির উপরেই ন্যায়ের বিধানটা ন্যস্ত করতে হবে। "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিতপাবন সীতা রাম!"

কংগ্রেসী কর্তারা দেশের শাসন-ভার হাতে পাবার পর থেকেই কিন্তু চোর বিহারীরা মাল যাতে বেমালুম সরিয়ে ফেলতে পারেন তার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগে গিয়েছেন। এবং এ-কাজে বিহারের রামা-শ্যামারাই যে কেবল হাত লাগিয়েছেন তাই নয়—তা হ'লে এর অশোভনতাটা এমন ভাবে চোখে খোঁচা মারতো না—রাজেন্দ্রপ্রসাদ সচ্চিদানন্দ সিংহের (May his soul rest in peace) মতো বিহারী নেতারাও এ-ব্যাপারে কম উৎসাহিত হয়ে ওঠেননি। এই ব্যাপারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও বিহার-মন্ত্রিসভার কোনো কোনো সভ্যের ব্যবহার দেখে মনে হয় না যে, তাঁরা কোনো দিন মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ছিলেন, বরং মনে হয় যে, তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা হয়েছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্লাইভ এবং হেষ্টিংসের অধীনে। এই বিহারীদের মধ্যে এবং পূর্ব-পাকিস্থানের আনসারদের মধ্যে নৈতিক কোনো পার্থক্য নেই। এখন, রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো লোকেরও যখন পশ্চিম-বঙ্গকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবার কৌশলে কোনো রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ দেখা যায় না, তখন বুঝতে হবে যে আমরা একটা ভীষণ রকম অবনত অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। স্বয়ং রাজেন্দ্রপ্রসাদেরই যখন এই অবস্থা তখন বালোবাজারী গোণ্ডরি-রামদের জিন্দাবাদ ক'রে কোন্ সুরাহা হবার সম্ভাবনা? যা হোক, এখন, বিহারের অন্তর্গত পশ্চিম-বঙ্গের ন্যায্য প্রাপ্য অঞ্চলগুলি পরিণামে বিহারকেই দিতে হবে নেহরু-ক্যাবিনেটের কর্মসূচীর এটা একটা "dark secret" কি না, এমন প্রশ্ন আজ স্বভাবতই মনে উদয় হয়।

পূর্ব-পাকিস্থানের উদ্বাস্তু কয়েক সহস্র বাঙালী বিহারে আশ্রয় পেয়েছেন। সহজ বুদ্ধিতে, সুবিচারী বুদ্ধিতে, দরদী বুদ্ধিতে বোঝা যায়, এই উদ্বাস্তুদের পশ্চিম-বঙ্গের পশ্চিম সীমানার কাছ ঘেঁসে বিহারের বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে স্থান ক'রে দিলে এঁরা আপন প্রদেশের কাছ ঘেঁসে স্বজাতিদের মধ্যে থাকতে পারতেন এবং তাতে বাস্তুত্যাগের দুঃখ-ক্ষোভ ইত্যাদির অন্ততঃ কিছু এঁদের লাঘব হ'তে পারতো। কিন্তু এই সহজ সহৃদয় কাজটি কংগ্রেসী কর্তাদের দ্বারা হয়ে ওঠেনি। তার কারণ কি? কারণ এই যে, বাঙালী উদ্বাস্তুরা বিহারের বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থান পেলে সে-অঞ্চলে পশ্চিম-বঙ্গের দাবী আরো পাকা ও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে? অপর পক্ষে এই উদ্বাস্তুদের বিহারের ভিতরের দিকে স্থান দান করলে সীমান্তের বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে বিহার গভর্ণমেণ্ট দাবী করতে পারবেন কতকটা ন্যায়ের সঙ্গে? এই সব কূটনীতির কথা ভাবলে বেশ বোঝা যায়, এ-দেশে মহাত্মা গান্ধীর দেখা রামরাজ্যের স্বপ্নটা কি রকম!

শনৈঃ শনৈঃ রূপায়িত হয়ে উঠছে। আশ্চর্য নয় তাই নেহরু উপহাসের সুরে বলে ফেলেছিলেন—"that Ramrajya business."

উপরে তামিল ও অন্ধ্র এবং বাঙালী ও বিহারী-সম্পর্কিত এ-দু'টি ব্যাপার আলোচিত হয়েছে, এ-সম্বন্ধে আর একটি জিনিস সহজেই মনে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আমি গোয়েন্দা-তন্ত্রের প্রথম প্রশ্ন—who benifits? অর্থাৎ কে লাভবান হয়? এ-প্রশ্নের কথা আগেই উল্লেখ করিছি। অন্ধ্ররা তাঁদের আপন পৃথক্ প্রদেশ না পেলে লাভবান হন কে বা কাঁরা? লাভবান হয় তামিল নাড়ু। আর তামিল নাড়ু হচ্ছে রাজাগোপালাচারীর আপন প্রদেশ। আর রাজাগোপালাচারী হচ্ছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের এক মস্ত বড় চাঁই, নেহরু-প্যাটেলের অন্তরঙ্গ, কংগ্রেসী কেন্দ্রের এক জন মহা মাতব্বর ব্যক্তি। পশ্চিম-বঙ্গ তার পশ্চিমের দিককার বিহারের অন্তর্গত বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ফিরে না পেলে লাভবান হন কে বা কাঁরা? লাভবান হয় বিহার আর বিহার হচ্ছে রাজেন্দ্রপ্রসাদের আপন প্রদেশ। এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ হচ্ছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্য এক জন মস্ত বড় চাঁই, নেহরু-প্যাটেলের অন্তরঙ্গ, কংগ্রেসী কেন্দ্রের অন্য এক জন মহামাতব্বর ব্যক্তি। সত্যিই ব্যাপারটা মনে অদ্ভুত ভাবে আঘাত করে। মনে হয়, এটা কি কাকতালীয়বৎ মাত্র? কিম্বা এর পিছনে কংগ্রেসী ভ্রাতৃসঙ্ঘের অবচেতন মনের আছে একটা খেল? হাঁ, কংগ্রেসী ভ্রাতৃসঙ্ঘেই বটে—সব ব্যাপারটা হ'য়ে উঠেছে যেন কংগ্রেসী নেতাদের একটা ঘরোয়া ব্যাপার, যেমন শুনি চীনদেশে হয়ে উঠেছিল সুঙ-পরিবারের একটা পারিবারিক ব্যাপার। এই ঘরোয়া ব্যাপারে সত্য ন্যায় নীতির কোনো বাধা-বিঘ্ন নেই, কংগ্রেসী বড় বড় নেতারা আপন আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা যিনি যে-টুকু আপন কোলে ঝোল টেনে নিতে পারেন। ভাগ্যক্রমে অন্ধ্রদের ছিলেন পাট্টাভি সীতারামাইয়া, রাজাগোপালাচারীর দরের না হলেও, কংগ্রেস ভ্রাতৃসঙ্ঘের এক জন প্রথম লাইনেরই বলতে হবে, তার উপর তখন তিনি ছিলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। সুতরাং তিনি তেড়ে-মেড়ে গিয়ে নেহরু-প্যাটেলের কাছ থেকে অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের সম্মতি আদায় ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু কর্ণাট কেরালার ভাগ্যে শিকা ছেঁড়েনি, কেন না তাদের কংগ্রেসী তেমন কোনো মাতব্বর ব্যক্তি নেই যিনি নেহরু-প্যাটেলের মহড়া নিতে পারেন। পশ্চিম-বঙ্গেও এমন কেউ নেই যিনি দিল্লীর কংগ্রেসী ভ্রাতৃসঙ্ঘের ঘরোয়া বৈঠকে রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেন। সুতরাং রামধুন গাইতে গাইতে মানভূম ধলভূম ইত্যাদি অঞ্চলগুলি বিহারে বেমালুম চিরস্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারে। মহা সৌভাগ্যের কথা যে কুচবিহার রাজ্যটি বিহার সীমান্তে ছিল না, ছিল আসাম সীমান্তে। এবং আরো সৌভাগ্যের কথা যে আসামে রাজাগোপালাচারী বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের দরের ও স্তরের কংগ্রেসী কেন্দ্রের কোন সভ্য নেই।

এই তো ব্যাপার—অর্থাৎ অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ লোকদের চোখে যেমন লাগে; এবং এর উপর শীর্ষদেশে আছেন জহরলাল স্বয়ং। সুতরাং জহরলালের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা এ-ক্ষেত্রে নিতান্ত অবান্তর হবে না।

গান্ধী ও জহরলাল—শিক্ষক ও ছাত্র, গুরু ও শিষ্য। এক জন পিতৃতুল্য, অন্য জন পুত্রস্থানীয়। সুতরাং এক জন আরেক জনের উত্তরাধিকারী। দু'জনেরই শিক্ষা সমাপ্ত বিলেতে—এবং দু'জনই ছিলেন আইনজীবী। কিন্তু এক জনের জীবন গ'ড়ে উঠেছে একটা সাত্ত্বিকী আবহাওয়ায়, আর এক জনের জীবন রূপ নিয়েছে একটা রাজসিক পরিবেশে। এঁদের প্রথম জন ছিলেন পরাধীন ভারতের জনগণের অবিসম্বাদিত নেতা, আর দ্বিতীয় জন আজ অবিসম্বাদিত ভাবে জনতার দুলাল, স্বাধীন ভারতের শাসন-পরিষদের প্রধান।

কিন্তু কলিকালটা একটা অদ্ভুত কাল। এ-কালে অনেক অদ্ভুত রকমের ব্যাপার ঘ'টে থাকে। যেন কতকটা ফটোগ্রাফের লেন্স—বাইরের যা-কিছু সব উলটো ভাবে গিয়ে পড়ে। গান্ধীর মুখে অবিরাম ডেমোক্রাসির কথা শোনা যেতো, জহরলালের মুখেও ঐ ডেমোক্র্যাসির তত্ত্ব, ওর নানা ব্যাখ্যা ইত্যাদি শোনা যায়। অথচ ঐ দুই ব্যক্তির জীবপুরুষই অবিসম্বাদিত ভাবে একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ ডিক্টেটারের। তবে দু'জনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। গান্ধী পরমতসহিষ্ণু—সাত্ত্বিকী বুদ্ধির গুণ। আর জহরলাল পরমত-অসহিষ্ণু—রাজসিক স্বভাবের দোষ। গান্ধীজী অপরের মতামত শোনেন, শুনতে চান—সে-সব মতামত নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আলোচনা করেন, খেলা করেন—বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে—এবং তার পর নিজের মন মত ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ ক'রে যান। ডেমোক্র্যাসিটা বোধ হয় কোনো এক কোণে লোকে ঝুলতে থাকে। জহরলাল পরমত শোনা বা তা নিয়ে আলোচনা করা সময়ের অপব্যয় মাত্র মনে করেন—বড় জোর মনে করেন একটা অপ্রতিরোধ্য ঘটনা evil বলে। আপনার মনের নিজের ভঙ্গিটি ছাড়া অন্য ভঙ্গি, অন্য মত, অন্য পথ তাঁর কাছে মহা অসোয়াস্তির ব্যাপার। সে সবকে তিনি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চান আপনার মানসিক নিরাপত্তার জন্য। এর উপর জহরলালের মধ্যে আছে একটা প্রচ্ছন্ন spoilt child। কিন্তু spoilt child-এর ভূমিকা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে বেশ মানিয়ে যায়—বৃহত্তর দেশের ভূমিকায় তা যেমন চোখকে ক্লিষ্ট করে, তেমনি মনকে করে [illegible]

গান্ধীজীর জীবপুরুষ মূলগত ভাবে একনায়কতান্ত্রিক [illegible] সুভাষচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের [illegible] নির্বাচিত হ'লে তিনি কিছুতেই সুভাষকে ক্ষমা করতে পারেননি। গান্ধীজীর আত্মা গণতান্ত্রিক হ'লে তাঁর এই পরাজয় তিনি [illegible] গ্রহণ করতে পারতেন এবং তা হ'লে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারতেন। আর তাহ'লে হয়তো ভারতের পরবর্তী [illegible] অন্যরূপ হ'তো এবং আজ আমরা সম্ভবতঃ ভারত খণ্ডিত [illegible] না। কেন না, সুভাষচন্দ্রের এমন সব আইডিয়া ছিল যা [illegible] থেকে ভিন্ন এবং রাজাগোপালাচারীর মন্ত্র থেকে অন্য। কিন্তু [illegible] ঘটবার সম্ভাবনাই দাঁড়ালো না এবং তার একমাত্র কারণ [illegible] গান্ধীজীর জীবপুরুষ একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ ডিক্টেটারের।

গান্ধীজী ও জহরলালের মধ্যে আর একটা মহা পার্থক্য [illegible] যে-পার্থক্যটা ভারতবর্ষের পক্ষে হয়েছে মারাত্মক ব্যাপার। [illegible] হচ্ছেন দুঃখের দিনের বন্ধু, আর জহরলাল হচ্ছেন [illegible] সুহৃদ, সৌভাগ্যের দিনের অলঙ্কার। তাই বোধ হয়, [illegible] স্বাধীনতা নিকটে আসার সাথে সাথে রঙ্গমঞ্চ থেকে গান্ধী [illegible] ক্রমে দূরে স'রে গিয়েছেন আর জহরলাল পাদপ্রদীপের দিকে [illegible] এসেছেন। কিন্তু ট্র্যাজেডিটা হ'ল এই যে, স্বাধীন ভারতের [illegible] মন্ত্রী হলেন জহরলাল, কিন্তু সেই স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে [illegible]

বর্ণে হ'য়ে গেল না, সেখানে নেমে এলো অমাবস্যার অন্ধকার। কারো প্রতিভা খোলে সুখের দিনের সোনালী স্পর্শে, আবার কারো প্রতিভা খেলে দুঃখের দিনের অন্ধ পরিবেশে! কারো হাতে ভালো উৎরায় বিয়োগান্ত নাটক, আর কারো হাতে মিলনান্ত। অবশ্য সব্যসাচীও কেউ কেউ থাকতে পারেন। কিন্তু জহরলালের প্রতিভা সে গোত্রের নয়।

আমরা জানি, এক এক প্রতিভার বিকাশের জন্য এক একটি পৃথক পরিবেশের প্রয়োজন। গান্ধীর প্রতিভার স্ফূর্তির জন্য দরকার একটা দুঃখের পটভূমিকা আর জহরলালের প্রতিভার জন্য দরকার একটা সৌভাগ্য-সম্পদের প্রতিবেশ। নোয়াখালির মনুষ্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল অমাবস্যার বিভীষিকার মধ্যে গান্ধীজীর প্রকৃত স্থান, নব দিল্লীর আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে এশিয়ার সর্বজাতির মিলিত বৈঠকের সভাপতির মাঝে জহরলালের প্রকৃত আসন। গান্ধীজীর কর্ম-সাধনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠে উদ্বাস্তুদের শিবিরে, নোয়াখালির নর-খাদকদের শোণিত-লোলুপতার মাঝে, ভাঙ্গীদের বস্তি-জীবনের দুঃখ-দুর্দশার সান্নিধ্যে—আর জহরলালের প্রতিভা-পুষ্প স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বর্ণে গন্ধে সম্পদে সুষমায় প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে দিল্লীর রাষ্ট্রপালের প্রাসাদে, ইংলণ্ডের বাকিংহাম প্যালেসে, আমেরিকার হোয়াইট হাউসে এবং এই আনুষঙ্গিক পরিবেশে। নোয়াখালির বিষাদের মধ্যে জহরলাল যান দু'দিনের অতিথিরূপে, উদ্বাস্তুদের শিবিরে গিয়ে তাঁকে করতে হয় দৃপ্ত কর্তব্যের অভিনয়—এ-সবের সঙ্গে কদাপি তাঁর আত্মার সহজ যোগ স্থাপিত হয় না। তাঁর মন প্রাণ চিত্ত পড়ে থাকে সেখানে বৃহত্তর জগতের রোশনাই, সারা পৃথিবীর লোকের হাততালি, নিখিল জাতি-সঙ্ঘের বন্দনা-গান! ঠিক এই কারণে জহরলালের অবচেতন মনে একটা প্রবণতা আছে সেই রকম ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দিকে, অভিনন্দিত করার দিকে, prefer করার দিকে যে-রকম ক্ষেত্রে তাঁর অন্তরাত্মা স্ফূর্ত হ'তে পারে, তিনি shine করতে পারেন এবং এই কারণেই গোলমেলে ব্যাপারে, দুঃখের ব্যাপারে প্রাণ দিয়ে তিনি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ নিবিষ্ট করতে পারেন না—ইচ্ছে থাকলেও পারেন না। কেন না মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে সবার উপরে—এতে ধনী-নির্ধন নেই, সুখী-দুঃখী নেই, প্রধান অপ্রধান নেই—সব ক্ষেত্রেই ওটা সত্য। এই প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যাবার কথা জহরলালের সাধ্যের মধ্যে নেই। তাই ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাসের পটভূমিকায় প্রধান মন্ত্রী জহরলালের ঐ প্রকৃতি দাঁড়াচ্ছে একটা মস্ত বেকায়দার ব্যাপার। এখন যদি তাঁর জায়গায় এমন এক জন প্রধান মন্ত্রী থাকতেন, যিনি বক্তৃতায় নয়, কাজে যাঁর কর্মপ্রবণতা অদম্য, যিনি দুঃখের দিনের বন্ধু, যিনি ব্যাপারের বিঘ্নসঙ্কুল সমস্যার সমাধানে যাঁর আত্মার আনন্দ ও যাঁর চিত্তের প্রসাদ, যাঁর প্রতিভা খোলে ও খেলে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির নিরসন করার কাজে, তবে আজ ভারত ও পাকিস্তানের ইতিহাস অন্য রূপ নিত, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। নাচনেওয়ালা যিনি গানের নয়, যিনি নাচেন তাঁর।

সম্প্রতি জহরলাল-লিয়াকৎ আলির মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা শেষাশেষি কি রকম দাঁড়াবে তা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে নির্বিঘ্নে বলতে পারি যে, যত দিন না দুই দেশের আত্মায় জোড়া না লাগছে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানেরা নিজেদের ভারতবাসী ব'লে না ভাবছেন এবং ভারতে আসমুদ্র হিমাচল হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীশ্চান প্রভৃতি মিলে একজাতীয়তার পথে হাত-ধরাধরি ক'রে না চলছেন, তত দিন আসল বস্তুটি পাওয়া যাবে না। সুতরাং গোলমাল ঘটার সম্ভাবনা থাকবেই। ভারত খণ্ডিত হয়েছে ইতিহাস ও ভূগোলের উপর একটা চরম গুণ্ডামি। ভারতবর্ষ বহু গুণ্ডামিকে কাটিয়ে উঠেছে কেবল তাই নয়, সে সব থেকে কি একটা কায়দায় শক্তি ও সম্পদ অর্জন করেছে। বর্তমান গুণ্ডামিকেও সে কাটিয়ে উঠবে—উঠতে বাধ্য ইতিহাসের তাগিদে, ভূগোলের আহ্বানে। অসত্য যা তা টেকে না। মহাত্মাজীর চরকা খদ্দর টেকেনি, কায়েদ-এ-আজমের দ্বিজাতি-তত্ত্বও টিকবে না—ও দু'টোরই স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য নেই। এখন একমাত্র প্রশ্নটা হচ্ছে, এই দেশ-কাল-পাত্রের অনিবার্য সত্যটার আবির্ভাব হবে ভদ্র ভাবে কিম্বা বহু অভদ্র অসভ্য বর্বর কীর্তিকলাপের পর। বলা বাহুল্য, এটা নির্ভর করবে পাকিস্তানী নেতাদের সুবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধির উপর।

* * * *

অশান্ত, অনেকের অনেক রকম সাধ থাকে। সম্প্রতি আমার মনেও একটি সাধ জেগেছে। এই সাধটির কথা শুনলে তুমি নিশ্চয়ই হো-হো ক'রে হেসে উঠবে। তবুও বলছি। আমি প্রধান মন্ত্রী জহরলালকে এক দিন ধুতি প'রে পালিয়ামেন্ট-গৃহে উপস্থিত হতে এবং বক্তৃতা দিতে দেখতে চাই, অবশ্য ফটোতে। কেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে যত রকমের পোষাক আছে, তার মধ্যে সবার চাইতে দেখতে কুৎসিত জহরলাল যা পরেন সেই চুড়িদার পাজামা। আর অনুমান করি, ও পাজামা পরতে গলদঘর্ম, খুলতে জান হয়রাণ। আর্য অনার্য শক হূন গ্রীক মোগল পাঠান কার আমলে এই পাজামার আবির্ভাব ঘটেছিল তা জানি নে, তবে জানি যে, এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হওয়া যায় না। কিন্তু এই পাজামাকে জহরলাল যেমন ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন তাতে মনে হয় যে, রাজা-গোপালাচারী ধুতি পরে বড়লাটগিরি না করলে এবং প্যাটেল ধুতি পরেই মন্ত্রিত্বের আসনে না থাকলে হয়তো এতদিন ধুতি পরে বড়লাট-প্রাসাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'য়ে যেতো। যা হোক, একে তো ঐ কুৎসিত পাজামা, তার উপর আছে আবার হাঁটুর নিচে ঝুলে-পড়া শেরওয়ানি। বোতামের সংখ্যা গুণে দেখলে বোঝা যায়, এও পরতে গলদঘর্ম, খুলতে জান হয়রাণ। চলতে-ফিরতে উঠতে-বসতেও যে এটা খুব আরাম-দায়ক তা মনে করা চলে না। তা ছাড়া দিল্লীর মতো জায়গায়, যেখানে গরম থাকে বছরে আট মাস এবং যে-গরমের মাপটা বোধ হয় ১১৫ ডিগ্রি ফারেনহিটের নিচে কখনো নামে না, সেখানে এই পোষাক যে কি রকম আরামদায়ক, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এই পোষাকের কর্মদক্ষতা অর্থাৎ efficiencyর কথাও বলা চলে না। কেন না দিল্লীর মতো গ্রীষ্মমণ্ডলে এই রকমের আপাদ-কণ্ঠ সেঁটে থাকা পোষাকে যে দক্ষতা বাড়ে সেটা হচ্ছে আইসক্রীম অভ্যন্তরস্থ করবার। অপর পক্ষে ঐ গরমের মধ্যে খোলা-খালা ঢিলে-ঢালা ঝলমলে-ঝিল্‌মিলে ধুতির কথা একবার স্মরণ করো। মনে করতেই যেন অঙ্গ জুড়িয়ে যায়। ধুতির সৌন্দর্যের কথা এখানে আমি তুলছি নে। কিন্তু সারা পৃথিবীতে সবার চাইতে সভ্য পোষাক হচ্ছে ধুতি। কেন না আমার বিশ্বাস, সারা পৃথিবীর পোষাকগুলির মধ্যে ঐ ধুতিই হচ্ছে একমাত্র পোষাক যা প্রকাশ করে—আমি গুণ্ডামি করার জন্যে প্রস্তুত নই। ইতি

হরেন্দ্র

বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সাহিত্যিক

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

একটি যুগকে অথবা একাধিক যুগকে আশ্রয় করিয়া কোনও জাতি গড়িয়া উঠে না—অথবা সেই যুগের সূচনা ও সমাপ্তিতেও কোনও জাতির জীবন সীমাবদ্ধ নহে। "অখণ্ড মহাকালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া তাহারই এক অংশকে অতীত বলি, এক অংশকে বর্ত্তমান বলি, আর এক অংশকে ভবিষ্যৎ বলি। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে। ইতিহাস সেই যোগসূত্রের সন্ধান প্রদান করে।" ইতিহাস সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যাহা বলিয়াছিলেন—সংস্কৃতি সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা বলা চলে। জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকলার আদর্শ-অনুশীলনে যেমন তাহার ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে —তেমনি এ সকলের সমন্বয়ে ও সামঞ্জস্যে গড়িয়া উঠে জাতির সংস্কৃতি। ইংরাজের culture বা জার্ম্মাণের kultur বলিতে আমরা যাহা বুঝি—বাঙালীর সংস্কৃতি বলিতে তাহা অপেক্ষা আমরা অনেকখানি বেশী বুঝি এবং কেমন করিয়া বুঝি, জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি—তাহা শুধু গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধের মধ্য দিয়া নহে, বাংলা ভাষায় লিখিত অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত গ্রন্থেই আমাদের সংস্কৃতির আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের পরিচয় লাভ করি। গত যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগে এবং বর্ত্তমান যুগ হইতে ভবিষ্যৎ যুগে সে সংস্কৃতির যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে।

সাহিত্যই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং সাহিত্যিকগণই সেই সংস্কৃতির আসল প্রচারক। কাজেই সংস্কৃতির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের পরিচয় দেওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। "সমাজ-স্থিতির জন্য, জাতীয় অভ্যুদয়ের জন্য" সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের সহিত সংস্কৃতির প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। "উচ্চ আদর্শ—উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা অপেক্ষা দৃষ্টান্তের দ্বারা অধিক দ্রুতবেগে জনসমাজের অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারা যায়।" সাহিত্য তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন এবং সেই সাহিত্যকে যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের আন্তরিকতায়, মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর নিষ্ঠায় ধারণ করেন, যুগে যুগে লোকে লোকে বহন করিয়া লইয়া চলেন, সেই সাহিত্যিকগণের মতি-গতি ও স্বভাব-ধর্ম্মের আলোচনা যে কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি।

সাহিত্য সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠে এবং গ্রন্থাকারে জনসমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে। সাময়িক পত্রিকার স্বল্প আয়তনে আমরা কবিতা, গল্প, ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস, নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রভৃতি পাঠ করিবার সুযোগ পাই—পাঠক-মনে তাহার প্রভাবও সেই জন্য স্বল্পকালব্যাপী। গ্রন্থাকারে পাই একই সাহিত্যিকের সৃজনশীলতা, আদর্শবাদ ও আঙ্গিকের একটি পরিপূর্ণ পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের একটা স্থায়ী প্রভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে কোনও একটি সাহিত্যিক বিশেষের পরিচয় পাইলেও সমষ্টিগত ভাবে আমাদের সাহিত্য সমাজের [illegible] পাইতে হইলে আমাদিগকে সাহিত্য পরিষদ এবং সাহিত্য সম্মি[illegible] আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু সে পথে আজ অনেক অন্তরায় আসি[illegible]।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজ

বর্ত্তমানে বাংলার সাময়িক সাহিত্যে ভাঁটা পড়িয়াছে [illegible] যাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন তাঁহারা এ কথা শুনিয়া নি[illegible] আশ্বস্ত হইবেন যে, সাময়িক পত্রে একদা যে জোয়ার দেখা দি[illegible] এখন তাহা হটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশ্বস্ত হইবেন [illegible] এই জন্য যে, ব্যাঙের ছাতার মত সাময়িক পত্র আমাদের [illegible] গজাইতে আরম্ভ করিয়া অবধি "আধুনিকতার" দোহাই দি[illegible] অদ্ভুত সাহিত্যের সৃষ্টি হইল, তাহাতে সত্যকার সাহিত্যিক [illegible] প্রকৃতি শোচনীয় ভাবে ব্যাহত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট লেখার [illegible] অভাব এবং তাহাই একমাত্র কারণ না হইলেও অনেক কাগজ [illegible] প্রায় বিজ্ঞাপনশূন্য এবং অনেকের হিসাবের খাতায় জমার [illegible] কেবল শূন্য অঙ্কই পড়িতেছে। চেষ্টার অবধি নাই কিন্তু বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দ্বিপ্রাহরিক 'চেষ্টা' তাহাতে মিটে না। বিজ্ঞাপনদাতা[illegible] হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন—কেনা-বেচা বন্ধ—তাই বিজ্ঞাপন [illegible] করিয়া যদি বা কিছুটা সামলানো যায়। কাগজের গ্রাহক সং[illegible] ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে,—সাহিত্যে পাঠকের চাহিদা কম [illegible] সাময়িক সাহিত্যের উৎকর্ষ দেখা যাইতেছে না। কবিতা, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হইতেছে [illegible] কোনও রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার নাই। [illegible] কদাচ কখনও চোখে পড়ে, যাহা নিজে পড়িয়া অপরকে [illegible] জন্য উৎসাহিত বোধ করা যায়। এ জন্য অবশ্য বর্ত্তমান [illegible] পারিপার্শ্বিক অবস্থাই বহুলাংশে দায়ী। কিন্তু ইহাও স্বীকা[illegible] যায় না যে, লেখকের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা [illegible] বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণে। তবুও [illegible] 'ক্যারাভ্যান' সমানে চলিয়াছে। সাহিত্যিকরাও সমানে [illegible] চলিয়াছেন—কিন্তু অধিকাংশ লেখার মধ্যে গতি নাই, [illegible] নাই, এবং পাঠকের স্মৃতিপটে ছায়াপাত করিবার ম[illegible] শক্তিও নাই। মানুষ যেমন আজ সকল প্রকার রিক্ত[illegible] কোনও প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, আমাদের [illegible] তেমনি কালির আঁচড় ও অক্ষরের আশ্রয়ে যেন তেন [illegible] প্রাণরক্ষা করিয়া চলিতেছে। অথচ আমাদেরই জীবনে [illegible] রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া সেদিনও সাহিত্যের মহা[illegible] মাতিয়াছি; সেখানে আনন্দের ভোজসভার পংক্তি-ভোজন [illegible] আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সাহিত্য সমাজ বলিয়া সেদিন [illegible] সমাজটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার ভিত্তিমূলে [illegible] ফাটল ধরিয়াছে—যে সমাজের রূপে বর্ণাঢ্য ছিল—গুণে র[illegible] ও রস-গ্রহণের পারস্পরিক আগ্রহের আতিশয্য ছিল—প্রা[illegible] প্রেরণা ছিল, সাধনা ছিল; ছিল বলিয়াই আমরা সিদ্ধি[illegible] অনেক দূর অবধি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু আজ সে

...জের বিকৃত অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া নিজেদেরই লজ্জা হয়—... অনুভব করি। বাহিরে তাই সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ... মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন আজ তাই অতিমাত্রায় লৌকিক ... দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যিক সাহিত্যিককে চাহে না, কবি ... পরিহার করিয়া চলে, আজকাল সাহিত্যের মজলিস বা ... বসে সাহিত্য আলোচনার জন্য নহে, অনুপস্থিত সাহিত্যিকের ...বাদে আত্মশ্লাঘকারী জুগুপ্সার প্রশ্রয় দানের জন্য। সাহিত্য ...জের এমন শোচনীয় অধঃপতন পূর্ব্বে কোনও দিন ঘটে নাই—সাহিত্যিকগণেরও এমন মানসিক অবনতি ইতিপূর্ব্বে কোনও দিন দেখা যায় নাই। আজ সঙ্গতিসম্পন্ন সাহিত্যিক দরিদ্র সাহিত্যিককে ...পার চক্ষে দেখেন—পরস্পরের মধ্যে যে স্বাভাবিক হৃদ্যতা ও ...ছিল তাহা আজ প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু ...ভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, সাহিত্যিকগণ তাহা অনুভব করিবার ... আজ হারাইয়াছেন; অনুভব করিতে পারিলে তাঁহারা ... হয়তো অধোবদন হইতেন। এ ভাবে মানুষ বাঁচে না, সাহিত্যও বাঁচিতে পারে না; মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অপ...র অকাল মৃত্যু হইলে দেশও বাঁচিতে পারে না। শিক্ষা, ...স্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি লইয়াই দেশ বাঁচিয়া থাকে—...গতির পথে তাহার অবদান ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাহার ...ন্যের চিহ্ন রাখিয়া যায়। কিন্তু এখন কি হইতেছে? আমরা কি সত্যকার সাহিত্য রচনা করিতে পারিতেছি? কোথাও কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার আভাসও পাওয়া যাইতেছে? আমাদের সাহিত্যিক-সুলভ মনোবৃত্তি ও অনুভূতি আজ আমাদের আছে কি? কোনও কবির রসোত্তীর্ণ কবিতা অপর এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ... অপরকে পড়িয়া শুনান কি? ভাল গল্প, চিন্তাশীল প্রবন্ধ, ... আলোচনা আমাদের মধ্যে কয় জন নিয়মিত ভাবে ... করেন এবং পাঠ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্বের সংবাদ কয় জন ... কাছে সপ্রশংস চিত্তে বহন করিয়া লইয়া যান? ...পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা হইতে সাহিত্যিকগোষ্ঠী ... উঠে, যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকিলে ব্যক্তির উৎসাহে ...িত হইয়া আগেকার দিনের মত সাহিত্য সম্মিলনের ...নের জন্য সচেষ্ট হইতে পারেন, তাহা আজ আমাদের মধ্যে ... আছে? একদা ভাল লিখিয়া সুনাম হইয়াছে—এখন ... লেখা আসে না—অতএব শুধু নামের খাতিরে সাধারণ্যে ... হইতে চাহেন না এমন সংস্কৃতিসম্পন্ন ভদ্র মনোভাব ... মধ্যে কয় জনের আছে? নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে ... জন আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের রচনার নিরপেক্ষ সমালোচনা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন? সাহিত্যিক হইয়া ...কে হীন ও অপদার্থ প্রতিপন্ন করিবার দুরভিসন্ধি হইতে ... জন আজ মুক্ত? আজ আমাদের সাহিত্যিক সমাজ ... মানসিক দুর্গতির পথে নামিতে বসিয়াছে, সে সম্বন্ধে ... জন উপলব্ধি করি? আমাদের অবস্থা আজ এই প্রকার ... হইয়াছে বলিয়াই আমাদের অর্থাৎ সাহিত্যিকদের মধ্যে ... মেলা-মেশা ও ওঠা-বসা করা দরকার। সাহিত্যিকদের ...মধ্যে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় তখনই, যখন তাঁহারা চিন্তা করেন, পাঠ করেন অথবা গভীর মনোনিবেশ সহকারে সাহিত্য রচনা করেন। ইহা যেমন সাহিত্যিকদের জীবনের একটি দিক, অপর দিক হইতেছে পরস্পরের মধ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা, নিজের নিজের রচনা পাঠ করিয়া অপরকে শুনান এবং সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামতের দ্বারা নিজের রচনার উৎকর্ষ সাধন করা অথবা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। এই কাজ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভা ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারে, তেমনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করিয়া তাহার দূর-প্রসারী প্রয়োজনকেও সার্থক করিয়া তোলা যায়।

সাহিত্যিক ও সাহিত্য পরিষদ

আমাদের কৈশোর ও যৌবনে কয়েকটি সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতে দেখিয়াছি। তখনকার দিনে বাংলা দেশের সাহিত্যিকগণ সাহিত্য পরিষদকে পরিচালিত করিতেন এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের রাজা-মহারাজা ও জমিদারগণ। তাঁহারা প্রতি বৎসর সাহিত্য সম্মিলনের আহ্বান করিয়া সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরিচয় ও মিলনের সুযোগ ঘটাইয়া দিতেন। আজ আমাদের দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও শ্রমিক আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া আপন আপন দল গঠনের উদ্যোগ দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেরূপ কোনও উদ্যোগ আমাদের সাহিত্যিক-সমাজে দেখা যায় না। সাহিত্যে সহস্র দল আছে কিন্তু সাহিত্য সমাজের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রতীক স্বরূপ আমরা একটি সাহিত্য-শতদলেরও সৃষ্টি করিতে পারি নাই। আজ দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে দেশের বিত্তশালীদের যোগাযোগ নাই বলিলেই হয় এবং সাহিত্যিক সাধারণের এমন কি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বহু সাহিত্যিকেরও কোনও সম্পর্ক নাই। কেহ কেহ অনুযোগ করিয়া থাকেন যে, কয়েক জন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক অথবা সাংবাদিক মিলিয়া কায়েমী স্বত্বে আজ সাহিত্য পরিষদের মালিক হইয়া বসিয়া আছেন। ইহার জন্য কিন্তু আমরা শুধু তাঁহাদিগকেই দোষ দিই না বরং প্রশংসাই করি, কেন না রাজনীতি ক্ষেত্রের দলাদলি ও অসূয়া অপেক্ষা অধিকতর অবাঞ্ছিত হিংসার দ্বারা সঙ্কুচিত ও দলগত প্রাধান্যে সীমাবদ্ধ সাহিত্য ক্ষেত্র বর্জ্জন করিয়া সাহিত্যিকগণ যদি নিজেদের শৈথিল্য, উপেক্ষা বা অভিমানবশে আজ সাহিত্য পরিষদকে দূরে রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তবুও যে কয় জন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু আজ সময় ও মেহনত দিয়া সাহিত্য পরিষদকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আজ প্রশংসাই করিব। শুধু তাঁহাদের কাছে আমাদের এইটুকু জিজ্ঞাসা করিবার আছে যে, তাঁহারা সাহিত্যিক হইয়াও সাহিত্যিকদের সাহিত্য পরিষদে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন না কেন? বৎসরে অন্ততঃ একটি দিনও কেন তাঁহারা "অ-সভ্য" সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করিয়া এমন একটি উৎসবের আয়োজন করেন না, যেখানে ভাবের আদান-প্রদান ও সম্প্রীতি সম্পাদনের ভোজ-সভায় এক পংক্তিতে বসিয়া বাংলা দেশের সাহিত্যিকগণ আমন্ত্রকদের আন্তরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ হইয়া অ-সভ্যও সভ্য শ্রেণীতে নাম লিখাইবার জন্য আগ্রহশীল হন? পদাধিকারের কায়েমী স্বার্থে সর্ব্বদা সজাগ প্রহরা দিয়া তাঁহারা সাহিত্য পরিষদকে আজ এমন একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করিয়াছেন, যাহা সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উদ্রেক

করিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়া আছে—যাঁহারা এই অভিমত পোষণ করেন তাঁহারা সাহিত্য পরিষদের কল্যাণকামী বলিয়াই তাঁহাদের এই অভিমত পরিবর্ত্তন করিবার দায়িত্ব পরিষদ কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। বাংলা দেশের আপামর সাহিত্যিক-গণকে সাহিত্য পরিষদের অঙ্গনে আহ্বান করিয়া আনিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ যে তাঁহাদেরই ইহা আমরাও অনুভব করি। প্রথমতঃ ছোট ছোট সাহিত্য সভার আহ্বান করিয়া [illegible] পথে কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর তাঁহারা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাহিত্য সম্মিলনের আহ্বান করিতে পারেন। বাংলা দেশের সাহিত্য সমাজের বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা দূর করিয়া নূতন ভাবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করার আজ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ এবং সাধারণ ভাবে সাহিত্যিকগণ এই আশু প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হইবেন কি ?

সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন

সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রথম চেষ্টার ফলে স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আহ্বানে এই প্রকার সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল কাশিমবাজারে; রবীন্দ্রনাথ সেই সম্মিলনের মূল সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন স্বয়ং কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এবং তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হইয়াছিলেন যুবক মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র (বর্ত্তমান কাশিমবাজারের মহারাজা)। সেকালে বাংলা দেশের রাজা-মহারাজা-প্রমুখ জমিদারবর্গ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। এখন আর সেদিন নাই—দেশীয় জমিদারদের সে অবস্থাও নাই।

সাহিত্য-জগতে ১৩১৪ সালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন। ১৭ই কার্ত্তিক, রবিবার তারিখে এই সম্মিলন প্রভূত অর্থব্যয়ে কাশিমবাজার রাজবাটীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠানে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহারাজের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। মহারাজের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও রামেন্দ্রসুন্দরের চেষ্টাতেই তিনি এই সম্মিলনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে তাঁহার পীড়িতা কন্যাকে লইয়া শিলাইদহের কাছারী-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। কন্যার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় সম্মিলনে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন কি না, এই আশঙ্কাতে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিলেন :

"আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আপনিই ধ্রুবতারা। আপনাকে ছাড়িয়া সাহিত্য সম্মিলন হইতে পারে কি না সন্দেহ। আপনি যদি ঐ সময় আসিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়।" (৭ই আশ্বিন, ১৩১৪)

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের কন্যা সুস্থ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ সময় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য সম্মিলন প্রসঙ্গে কবিগুরুর বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া তাঁহার [illegible] নিশ্চিত সম্মতি লাভ করিলেন সেই দিনই তিনি কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

এই প্রথম সম্মিলনের পূর্ণ বিবরণ "সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস" নামক পুস্তিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের পক্ষে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

কাশিমবাজার রাজবাটীতে এই সম্মিলনের সহিত "সঙ্গীত সম্মিলন"এরও অধিবেশন হয়। এক দিকে সাহিত্য সম্মিলনে [illegible] শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ উপস্থিত, অন্য দিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-[illegible] সঙ্গীত সম্মিলনে সমাগত—সে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের [illegible]। এইরূপ যুক্ত অধিবেশন শুধু বাংলায় কেন, ভারতবর্ষেও কখনও হয় নাই।

এই প্রকার সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করিবার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের [illegible] আলোচনা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা অধিবেশনে [illegible] বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের অভিভাষণে সে আলোচনার আভাস পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিলে রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের উক্ত আলোচনায় আমাদের বক্তব্যও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। উক্ত অভিভাষণে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বলিতেছেন :—

"নয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকপদ গ্রহণের পর এক দিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিত্য পরিষদের [illegible] বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে কাঁধ [illegible] নামাইয়া পরিষদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা এবং অন্যের উপদেশ-গ্রহণ [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া যখনই রবীন্দ্রনাথের নিকট গিয়াছি, তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া [illegible]। সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্য পরিষদের [illegible] বাংলাদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য [illegible] সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত দেশ [illegible] সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের [illegible] মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন [illegible] না করিয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে [illegible] করিলে কার্য্যটির সূচনা হইতে পারে। বিলাতের British Association for the Advancement of Science যেমন [illegible] ভিন্ন ভিন্ন নগরে উপস্থিত হইয়া নূতন জ্ঞানের আহরণ ও [illegible] প্রচার করিয়া থাকেন, সাহিত্য পরিষদও সেই পথে [illegible] পারেন। British Association কেবল বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। বাংলাদেশে ঐরূপ বিজ্ঞান-সভা গঠিত [illegible] এখন সময় হয় নাই। সাহিত্য পরিষদকে সাহিত্যের [illegible] বিভাগের কাজ করিতে হইবে। আজ যদি আমি স্বীকার করি [illegible] রবীন্দ্রনাথের এক একটা কথা এক এক সময়ে মন্ত্রের ন্যায় আমার [illegible]

হইয়াছে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে নিতান্ত ক্ষীণজীবি ভাবিয়া ক্ষমা করিবেন না। এই প্রস্তাবটিও তদবধি আমার মোহ জন্মাইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লোকবল এবং ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই শক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই ব্যাপক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিন্তা বহু রাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ১৩১২ সালের শেষ ভাগে হঠাৎ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সূচনা হয়। রঙ্গপুর হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী এবং বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রায় একই সঙ্গে বাংলার সাহিত্যসেবকগণকে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। বরিশালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু বরিশালের সাহিত্য সম্মিলন সেই বৎসর বরিশালে আহূত রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনের পুচ্ছ আশ্রয় করিতে যাওয়ায় সম্মিলন চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পর বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় সাহিত্য সম্মিলনের আহ্বানও দৈবক্রমে নিষ্ফল হয়। তার পরবৎসর কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের আহ্বানে সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ঘটে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের সেই প্রথম বৎসর বিজ্ঞান আলোচনার বিশেষ কোন সুবিধাই ঘটে নাই। পরবৎসর রাজসাহী হইতে নিমন্ত্রণ আইসে। সেখানকার অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সম্মিলন কোন্ পথে চালিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। সাহিত্যের নানা বিভাগের সম্যক্ আলোচনার জন্য সাহিত্য সম্মিলনকে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান এই তিন শাখায় আপাততঃ বিভাগ করা যাইতে পারে, এই অভিপ্রায় আমি জানাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, বৃটিশ এসোসিয়েসনের আদর্শ আমার মনে জাগিতেছিল।"

সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন

রামেন্দ্রসুন্দরের এই অভিভাষণ হইতে জানা যায় যে, রাজসাহীর সাহিত্য সম্মিলনকে শশধর বাবু যেরূপে প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পরিণত করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে রামেন্দ্রসুন্দর কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। "সেবার সভাপতি ছিলেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কতকটা সেই কারণে এবং কতকটা শশধর বাবুর সূত্র-চালনায় রাজসাহীর সাহিত্য সম্মিলনে বৈজ্ঞানিকের এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রাধান্য হইয়াছিল।" পরবৎসর ভাগলপুরে এবং তৎপরবৎসর ময়মনসিংহে বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ জটলার অবসর পান নাই। তবে ময়মনসিংহে স্বয়ং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণটাই "বৈজ্ঞানিকের অভিভাষণ।"

পরবৎসর ভাগলপুরের সাহিত্য সম্মিলনকে বিভিন্ন শাখায় বিভাগের প্রস্তাব যথারীতি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তখন উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। পরবৎসর হুগলীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লইয়া অনেক জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কতকটা বিদ্রোহী হইয়া ছিলেন। শশধর বাবু এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক লেখকদিগের একটি স্বতন্ত্র অধিবেশন হইয়াছিল এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরবৎসর চট্টগ্রামে রামেন্দ্রসুন্দর উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু যে কয় জন বিজ্ঞান-সেবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে কতকটা স্বাতন্ত্র্যপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মিলনের এই বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন কলিকাতায় হইয়াছিল এবং সেবারে সাহিত্য সম্মিলনকে বিভক্ত করিবার কল্পনা হইয়াছিল এবং রামেন্দ্রসুন্দরের উপর বিজ্ঞানসভার "নকিবি ভার" অর্পিত হইয়াছিল।

সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" হইতে জানিতে পারা যায় যে, "অধিবেশনের অধিবাস বাসরে" সমিতির নামকরণ লইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে অল্প-বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ হইয়া অবশেষে সকলের "ঐক্যমতে" ইহার নাম "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন" নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য স্বীকৃত হয় **"ভাষা-সংস্কার, ইতিহাস-সংকলন, ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ, দর্শন-বিজ্ঞানাদি বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন ও সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠা।"** নিয়মাবলীর মধ্যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য অংশ ছিল **"উচ্চ-নীচ সকল সাহিত্যসেবীর ইহাতে সমানাধিকার। বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তৎস্থানীয় সমর্থ সাহিত্যানুরাগীর আনুকূল্যে ইহার অধিবেশন হইবে।"**

"অধ্যক্ষ সভা ও সদস্যগণের সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। যে প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ, প্রবল উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে মহারাজ সম্মিলনের উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা অতি বিরল।" এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে;—

"বঙ্গ-সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করা এবং স্বদেশের কল্যাণ সাধন করা এক কথা, বরং বলিতে পারি ইহাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধন চেষ্টার প্রথম চেষ্টা—মূল চেষ্টা; ইহার তুলনায় অন্যান্য চেষ্টা সাধুবাদ লাভ করিতে পারে না। ইহাকে কেবল কল্যাণ সাধন চেষ্টা বলিয়াই নিরস্ত হইতে পারি না। ইহা পুণ্য—ইহাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। মহারাজ বাহাদুর এই পুণ্যের অনুষ্ঠানে যেরূপ অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া অভ্যাগতগণের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—তিনি শ্রেষ্ঠ পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, কারণ কবি বলিয়াছেন :—

"সন্ধ্যাভ্র-বিভ্রম-নিভা বিভবা ভবেঽস্মিন্
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দু-চলস্বভাবাঃ।
নূনং নৃণামিহ পরত্র চ বন্ধুরেকো
নোচেৎ স্বদেশহিতসাধনতোঽস্তি পুণ্যম্।"

সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশন

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষণ হইতে সম্মিলনের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারিলাম। এই সম্মিলনের স্মৃতি এখনও লেখকের মনে জাগ্রত আছে। সে বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি—এই সম্মিলনে স্বেচ্ছাসেবক হইবার সৌভাগ্য হইল। ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

সম্মিলনের সভাপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে সভায় উপস্থিত। বেদী-মণ্ডপের সম্মুখেই আমার উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ ছিল। সেদিন বাংলা দেশের খ্যাতনামা রাজা-মহারাজা-জমিদার, সুধীবৃন্দ ও বহু সাহিত্যিকদের দর্শন লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রৌঢ়ত্ব ও জীর্ণ স্বাস্থ্যের দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহার অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিয়াই থামিয়া গেলেন, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবিষ্ট মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তখন দাঁড়াইয়া প্রস্তাব করিলেন—"আমাদের সুবক্তা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণটি পাঠ করিলে আমরা সকলেই সুখী হইব।" সমবেত সভাসীন সাহিত্যিক ও দর্শকবৃন্দ ঘন ঘন করতালির দ্বারা মহারাজের এ প্রস্তাব সমর্থন করিলে রবীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিভাষণটি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করিলেন। সভার প্রারম্ভে দেখিলাম, সাত-সাত জন রাজা-মহারাজা ও একাধিক সাহিত্যিক নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয়কে আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন;—বহুসংখ্যক সভ্যের সমর্থনে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সভাপতির আসনে বসাইয়া দিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ; মাল্যভূষিত করিলেন—নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ। অধিবেশন শেষ হইলে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সেই সভায় সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাঁহার আপার সারকুলার রোডের বাটীতে পরদিন সান্ধ্য-ভোজনের জন্য করজোড়ে আমন্ত্রণ জানাইলেন। সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা, প্রীতি ও বন্ধুত্বের পরিচয়—আলিঙ্গন ও রহস্যালাপের মধ্যে ভাবী কালের বাংলা সাহিত্য সমাজের যে কল্পনা সেদিন আমার সেই কৈশোরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে জাগিয়াছিল ক্ষুদ্রায়তনে বিভিন্ন পরিবেশে সে কল্পনার বাস্তব রূপ একালেও যে কদাচ কখনও চোখে পড়ে নাই এমন কথা বলিতে পারি না, তবে আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সাহিত্য সম্মিলনের কল্পনা ও সম্ভাবনা কোথায় যেন মিলাইয়া গেল; কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের তুল্য অথবা তাহার অক্ষম অনুকরণেও বাংলা দেশের কোথাও কোনও অধিবেশন হইতে দেখিলাম না। কেহ তাহার জন্য চেষ্টাও করিলেন না।

সাম্প্রতিক সাহিত্যিক সমাজ

তাহার প্রধান কারণ মনে হয়, সাহিত্য-সেবা ও সাধনা আজিকার দিনে আমাদের এই বর্ত্তমান পরিবেশে, এই পরিবর্ত্তিত জীবনে অন্যান্য বিষয়ের মতই "পোষাকী" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমরা বক্তৃতা-মঞ্চে আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব প্রচারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠি অথচ আমাদের সাধারণ আচার-ব্যবহার সৌজন্য ও ভব্যতা যে আজ একান্তই "পোষাকী" হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। সাহিত্যের প্রতি আমাদের আন্তরিক আকর্ষণ ও নিষ্ঠা যে আজ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে ইহার নানাবিধ সাম্প্রতিক কারণ দেখাইয়া অম্লান বদনে আমরা বলিয়া থাকি যে "ইহা ত হইবেই" "ইহাই ত স্বাভাবিক" "ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের অবস্থার ইহা প্রতিক্রিয়া মাত্র কাজেই ইহাতে দুঃখ পাইবার কিছু নাই, বেদনাবোধ করিবার হেতুও নাই।" ব্যাপারটা এইরূপ যে, এই নিস্পৃহতা বা নির্লিপ্ততা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের কোনও চেষ্টারও যেন প্রয়োজন নাই। ইহা যে শুধু সাহিত্যিক-জীবনের দুর্গতি তাহাই নহে, ইহা সমগ্র জাতিরই ক্লৈব্য। ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা পাইতেই হইবে। কি করিয়া রক্ষা পাওয়া যায় তাহার উপায় আমাদিগকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অথচ কৈ, তাহার কোনও চেষ্টাই ত দেখা যায় না। অথচ একদা বাঙালী তাহার সাহিত্য লইয়া এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিল যে উহাকে আমরা বহু দিন পরে বাংলা সাহিত্যের এক নব অভ্যুদয়ের সূচনা ভাবিয়া উল্লসিত ও উৎসাহিত হইয়াছি, মনে মনে গর্ব্বও অনুভব করিয়াছি।

সেকালের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী

সেদিন বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালগণ তাঁহাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া সাহিত্যের সাধনা করিয়াছেন, একাগ্র নিষ্ঠা ও অচলা শ্রদ্ধার দ্বারা, উদার মনোভাব ও প্রশস্ত শুভবুদ্ধির দ্বারা সমবেত প্র[illegible] সাহিত্য-সাধনার পথ হইতে সমস্ত কণ্টক নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রাণপণে নিজের বলিতে সব কিছু ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত [illegible] ছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, জাতির জীবনে সাহিত্যের অপ্র[illegible] ও অপরিহার্য্য প্রভাবের কথা, সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষের জন্য সাহিত্য সম্মিলনের অনিবার্য্য প্রয়োজন ও সার্থকতার কথা। তাই সেদিন সাহিত্য সম্মিলনকে তাঁহারা সাহিত্য-জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়রূপে স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু বৎসরের পর বৎসর সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন সম্পন্ন করিয়া আমাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ কালের জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন।

এই "সাহিত্য সম্মিলন"এর উদ্যোগ-পর্ব্বে যাঁহারা অগ্রণী হইয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "সাহিত্য সম্মিলন" সম্বন্ধে [illegible] তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এই যে, যত দিন আমরা আমাদের নিজস্ব ভাব-রাজ্যের প্রজা ছিলাম তত দিন ঘরে [illegible] জাতিকুলমান বজায় রাখিয়া বাহিরের প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া বলা যাইত যে "কাশীতীর্থে আমার কাজ কি—"শ্যামাপদ-কোকনদে" "আমার তীর্থ রাশি রাশি"। সেখানেই আমার অজস্র পুণ্য লাভ হইবে। কিন্তু যখন বাহিরের নানা ভাব ও মননশীলতা আ[illegible] অনুশীলনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিতে আরম্ভ হইল, তখন একবার তাই তিনি বলিতেছেন, "ঘরের দিকে তাকাইবার [illegible] হইল আত্মান্বেষণের প্রয়োজন আছে। নিজের সব থাকিতেও অনেক কিছু নাই ইহা ভাবিয়া কাঁদিলাম—কাঁদিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। তাই আকাশগঙ্গা ভাবতরঙ্গিণী ভাবামন্দাকিনীর প্রবাহে অবগাহন স্নান করিবার সাধ হইল। যে ভাষার অন্তরে ভাবের ঠাকুর লুকান আছে, যে ভাষার কূল[illegible] বেলাভূমির স্তরে স্তরে যুগ-যুগান্তরের ভাব ও গৌরব গাথা [illegible] আছে, যে ভাষার স্নেহশীকরসম্পৃক্ত শীতল বেলাঞ্চলের [illegible] বঙ্গীয় মানবতার নিদর্শন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যে ভাষা [illegible] ভাগীরথীর ন্যায় আমার সর্ব্বস্ব সর্ব্বাবলম্বন ইহ-পরকাল; প[illegible], স্নিগ্ধতা, কোমলতা যাহাতে নিত্য বিদ্যমান, জনমে-মরণে [illegible] যৌবনে যাহার তীরে যাইয়া আমি শান্ত ও মুগ্ধ হই। [illegible]

[illegible] পিতৃগণের তর্পণ করিয়া আমি সুখী হই—বাঙ্গালীর সেই [illegible] রাজার ধন মাণিক' ভাষাতটিনীর তরলতরঙ্গে ডুব দিবার [illegible] যোগকাল উপস্থিত হইল। তখন হাসিয়া বলিলাম—

"ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

[illegible] "সাহিত্য সম্মেলন।" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গভীর [illegible]পূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী কথা কয়টির পর "সাহিত্য সম্মিলন" কি তাহা [illegible] বুঝাইতে হইবে না।

[illegible] "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন" প্রচেষ্টার মধ্যে খানিকটা [illegible]ক্তিগত দলাদলি ও রেষারেষির ভাব দেখা দিয়াছিল। তাহার ইঙ্গিত [illegible] পাঁচকড়ি বাবু বলিতেছেন—"উহাকে এই ভাবে বুঝি বলিয়াই [illegible] ব্যক্তিগত দলাদলি রেষারেষির দিকে দৃষ্টিপাত করি না; [illegible] দ্বন্দ্বে দৃক্‌পাত করি না। নিজের ভাবে বিভোর হইয়া [illegible] ত্রিবেণী-সঙ্গমে শুভক্ষণে যাইয়া ডুব দিই। একবার [illegible] দাও—'শ্যামা জননী' বলিয়া একবার ডুব দাও—সতী-অঙ্গ-[illegible] বাহান্নপীঠে বিভূষিতা সুজলা, শ্যামলা, গিরিমেখলা জন্মভূমিকে স্মরণ [illegible] একবার ডুব দাও। দেখিবে, ফল ফলিবেই।"

[illegible] উদ্বুদ্ধ হইয়াই লেখক চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে [illegible] সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি বুঝিলেন, বাংলা সা[illegible] হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে, সাহিত্যের সেই মহাতীর্থে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া স্নান করিয়াছে। মায়ের ভাষায় [illegible] ছেলেই সমান ও সমভাবে অধিকারী। তিনি বলিতেছেন, "[illegible] দুই ভাই, আমাদের মাকে যে নয়নে, যে ভাবে দেখিব, [illegible] আর সেই ভাবে আর [illegible] কেহ দেখিতে পারিবে না। [illegible]সিদ্ধি সাহিত্য সম্মিলন। ইহাই আমার স্মৃতি, আমার [illegible], আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ম্ম;—আমার সমাজ ও সাহিত্য।"

সাহিত্য-সাধনার পথে

[illegible] দিনে সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা কয় জন সাহিত্যের [illegible] ও সার্থকতা এমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করি; কয় জনই বা জাতির জীবনে সাহিত্যকে তাহার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি? সাহিত্য-সেবাকে স্বার্থ-নিরপেক্ষ ভাবে কয় জন আমরা আমাদের অন্তরের একান্ত নিষ্ঠায় পবিত্র সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? আজ আমাদের আত্মচেষ্টায় অবিশ্বাস, আত্মসামর্থ্যে কুণ্ঠা, আত্মগৌরবে অনাসক্তি আসিয়াছে—তাই আজ আমরা ভাঙ্গিতে পারি, গড়িতে পারি না, সমালোচনা করিতে পারি, কিন্তু সংস্কার করিতে জানি না, প্রাচীনকে অকর্ম্মণ্য ও নবীনকে অর্ব্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিই। আমরা যুগে পরিবর্ত্তন চাহি কিন্তু উত্থান-পতনের আবর্ত্তন বা সঙ্কট হইতে অভ্যুদয়ের স্বাভাবিক বিবর্ত্তন দেখিলে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের জাতির ইতিহাস তাহা নহে, আমাদের আদর্শও প্রকৃতপক্ষে ইহার বিরোধী। তবে কি আমাদের কোন আশা নাই? আশা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, "সংসারে কেবল পরাজয় নাই—জয়-পরাজয়ও আছে; কেবল পতন নাই, উত্থান-পতন আছে; কেবল মন্দ নাই, ভাল-মন্দ আছে। আছে বলিয়াই আশা আছে; যে পরাজিত, তাহার আবার জয়লাভে আশা আছে; যে পতিত তাহার আবার উত্থিত হইবার আশা আছে—যে মন্দ তাহার আবার ভাল হইবার আশা আছে।"

আজ আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাইতে হইলে, সাহিত্য-সমাজকে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় ঘটাইতে হইলে সমগ্র বাঙ্গালী সাহিত্যিককে এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। উদার দৃষ্টি ও সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারা "সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে, সমস্ত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের অপরিহার্য্য অসামঞ্জস্যের মধ্যে এক বিচিত্র সামঞ্জস্যের পরিচয় প্রদান" করিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপনের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে এ কাজ কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই কার্য্যসাধনের "মূলমন্ত্র একতা, তাহার মূলমন্ত্র স্বার্থত্যাগ—তাহার মূলমন্ত্র অকৃত্রিম অনাবিল স্বদেশপ্রীতি।" সাহিত্য সম্মিলনের বিরাট ক্ষেত্রে, বিপুল সম্ভাবনায় আস্থা রাখিয়া আমরা কি আবার বাংলা দেশে একটি আদর্শ সাহিত্য-সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারিব না?

হাজারমারীর বিভীষিকা

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

শ্রীহৃষীকেশ হালদার

হাজারমারীর মাঠে

পরদিন সকাল হতে না হতেই গ্রামশুদ্ধ লোক এসে জড়ো হলো আমাদের বাড়ীর সামনে। গত রাত্রে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দে সকলেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো; কিন্তু কেউ ভয়ে ঘর ছেড়ে বার হয়নি। আজ সকালে সকলেই খবর নিতে এসেছে আমাদের।

প্রেততাত্ত্বিক রাজীব শর্ম্মা ওরফে প্রদীপ সকলকেই হাসিমুখে জানালে, গত রাত্রে যে শব্দ শোনা গেছে তা বিশেষ কিছুই নয়—এ অঞ্চলের ভূতগুলোকে তিনি একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন যে স্বয়ং রাজীব শর্ম্মা এসেছেন তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। এ অঞ্চলে তাদের রাজত্ব আর বেশী দিন চলবে না।

তার এ উত্তরে দু'-চার জন অজ্ঞ চাষী খুসীই হলো, দু'-চার জন নানা রকম সন্দেহ করলে। কিন্তু সকলে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর দেখা দিলেন থানার নকল দারোগা বাবু। আমরা যে তাঁর স্বরূপ বুঝতে পেরেছি, এ সন্দেহ তখনো তাঁর মনে জাগেনি। তিনি মুখখানাকে অসম্ভব রকম গম্ভীর করে প্রশ্ন করলেন: কাল গভীর রাত্রে আপনাদের বাগানে কিসের শব্দ শোনা গেছলো শর্ম্মা মশাই?

—আজ্ঞে, সরষে পড়ার! হাসতে হাসতে বললো প্রদীপ: ভূত তাড়াতে ওর মতো ওস্তাদ জিনিষ আর নেই মশাই!

—ঠাট্টা রাখুন! আরো গম্ভীর স্বরে বললেন দারোগা বাবু: শব্দটা ভয়ানক রকমের বিস্ফোরক কিছুর। এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে থানায় পর্য্যন্ত সে শব্দ শোনা গেছে। থানা শুদ্ধ সকলে সে শব্দে জেগে উঠেছি আমরা। আমি চাসা-ভূষো নই যে, যা হয় একটা কিছু বুঝিয়ে দেবেন। ওটা নিশ্চয়ই কোন বিস্ফোরণের শব্দ।

—হয়তো তাই! রহস্যময় স্বরে বললো রাজীব শর্ম্মা: হয়তো ওটা কোন বিস্ফোরকেরই শব্দ!

—কিন্তু ভূতের রোজা কি বিস্ফোরক নিয়ে নাড়া-চাড়া করে? কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন দারোগা বাবু।

—করে বই কি মশাই, মানুষে কত কি করে। আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন চন্দ্রিকা সিং: এই দেখুন না কেন, আমি জনার্দ্দন সিং কোথায় কলকাতায় বসে বসে দু'দণ্ড আরাম করবো—তা নয়, এলাম রাজীব শর্ম্মার পেছন পেছন ভূত দেখতে। আর থানার দারোগা আপনি, চোর-ডাকাত ধরাই আপনার পেশা, তার বদলে এসেছেন ভূতের রোজার পেছনে তাড়া দিতে।

দারোগা বাবুর গম্ভীর মুখ ক্রমশঃ আরো গম্ভীর হচ্ছিলো চন্দ্রিকা সিং-এর টিটকিরীতে—এবার, তাঁর মুখে ফুটে উঠলো স্পষ্ট রাগের লক্ষণ। তিনি ধমক দিয়ে বলে উঠলেন: বাজে কথা রাখুন, আপনারা সত্যি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিশেষ করে কালকের রাত্রের ঐ বিস্ফোরণের শব্দ! এখানের ভৌতিক কাণ্ডগুলোর পেছনে, আমার আগে যিনি দারোগা ছিলেন তাঁর দলবল শুদ্ধ নিরুদ্দেশের ব্যাপারে, এমন কি আগের দু'টো খুনের সঙ্গেও যে আপনাদের সম্বন্ধ নেই, তা কে বলবে? যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে আপনারা নিরপরাধ, ততক্ষণ আমাকে আমার কর্ত্তব্য করতেই হবে। আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করলাম। হ্যাঁ, রাজীব শর্ম্মা, তাঁর চাকর, জনার্দ্দন বাবু আর মুখুজ্যে মশাই—সবাইকেই গ্রেপ্তার করলাম। এখন ভালোয় ভালোয় থানায় যাবেন, না অন্য ব্যবস্থা করতে হবে?

সর্ব্বনাশ! লোকটা বলে কী? চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। ওর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। থানা দখল করে দারোগা সেজে যখন বসে আছে, তখন আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে নিশ্চয়ই। আমরা স্বেচ্ছায় না গেলে, ওর লোক-জন—যারা নকল চৌকীদার দফাদার ইত্যাদি সেজে বসে আছে, তারা জোর করেই টেনে নিয়ে যাবে আমাদের। গ্রামের লোকে বাধা তো দেবেই না, বরং ওদের আসল পুলিশ ভেবে সাহায্যই করবে। আমাদের এ ভাবে বন্দী করতে পারলে লাভ ওদের অনেক! অনায়াসেই ওরা ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে—কেউ বাধা দেবে না। বড়-কর্ত্তারা তো প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং-এর ওপর নির্ভর করে বসে আছেন, তাঁরা কি আর আমাদের এ দুর্গতির কথা জানতে পারবেন? আসল পুলিশের লোক হলে অবশ্য ভয়ের কিছুই ছিলো না, তারা প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং-এর সত্যিকারের পরিচয় পেলে ছেড়ে দিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও দেরী করতো না। কিন্তু এরা আমাদের আসল পরিচয় পেলে বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা বেশী। এমন কি প্রথম দিনই চন্দ্রিকা সিং তো তখনি গ্রেপ্তার করতে বলেছিলেন ঐ নকল জীবনময়কে। তখন যদি প্রদীপ বারণ না করতো, তাহলে এ বিপদ ঘটতো না নিশ্চয়ই।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে দারোগা বাবু অত্যন্ত ভারী গলায় বললেন: কি মশাই, সবাই একসঙ্গে চুপ করে গেলেন যে! বি-

ভালো ছেলের মতো শান্ত ভাবে আমার সঙ্গে থানায় যাবেন, না লোক-জন ডাকতে হবে ?

এর চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না, উত্তর একটা দিতেই হয়। প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং-এর মধ্যে চোখে চোখে কি ইসারা হয়ে গেলো। চন্দ্রিকা সিংই দারোগার কথার জবাব দিলেন ; কথায় নয়, কাজে। শিকারী বাঘের মতো তিনি হঠাৎ লাফিয়ে পড়লেন নকল দারোগার ঘাড়ের ওপরে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ কোথা থেকে একজোড়া হাতকড়া বার করে এঁটে দিলে তার হাতে। নকল দারোগা একটু তর্জ্জন-গর্জ্জন করলো অবশ্য ; কিন্তু প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং তাকে ভালো করে বেঁধে একটা ঘরের মধ্যে পূরে যখন বাইরে থেকে শেকল তুলে চাবী বন্ধ করে দিলে, তখন সে ভয়ে চুপ করে গেলো।

চন্দ্রিকা সিং মন্তব্য করলেন : অপরাধীরা কোথাও না কোথাও তাদের কাজে এমন সামান্য একটা ভুল করে বসে, যার জন্যে পরে তাদের আপশোষ করতেই হয়। এটা আমি বরাবরই দেখে আসছি। এই নকল জীবনময় একটা আস্ত শয়তান। তার মতলবটাতেও সে বেশ বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে। যদি সে একবার আমাদের থানা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারতো, তাহলে সেখান থেকে আমাদের অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা বা মেরে ফেলা মোটেই শক্ত হতো না। কিন্তু সে একটু ভুল করেছিলো আমাদের একলা গ্রেপ্তার করতে এসে। বোধ হয় তার ধারণা ছিলো, আমরা পুলিশের ভয়ে সুড়-সুড় করে ওর সঙ্গে যাবো। যদিই না যাই, পরে লোক-জন ডেকে আনলেও চলবে। কিন্তু এই সামান্য ভুলটুকুর জন্যেই ওর অত বড় শয়তানী মতলবটা ফেঁসে গেলো।

—আপাততঃ ফেঁসে গেলো বটে, কিন্তু ওকে নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি করবেন ঠিক করেছেন ? বললাম আমি : ওকে এখানে এ ভাবে বন্দী করে বেশীক্ষণ রাখা যুক্তিযুক্ত হবে বলে তো মনে হয় না। কারণ, ওর দল-বল থানা থেকে এসে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে, সেই সঙ্গে আমাদেরও ধরে নিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

—তা পারে। তবে বেশীক্ষণ ওকে এখানে রাখা হবে না। বললেন চন্দ্রিকা সিং : আমরা হাজারমারীর মাঠ থেকে ফিরে এসেই ওকে সদরে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ষ্টেশন থেকে একটা তার করবো। সন্ধ্যার মধ্যেই সদলে ওরা গ্রেপ্তার হবে।

—কিন্তু তার ফলে কি আসল জীবনময়, তাঁর আগের নিরুদ্দিষ্ট দারোগা বা তাঁদের লোক-জনদের উদ্ধারের কোন সুবিধা হবে ? প্রশ্ন করলাম আমি।

—তা ঠিক বলতে পারি না। উত্তর দিলেন চন্দ্রিকা সিং : বরং এর ফলে আসল অপরাধীরা আরো সাবধান হবে বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু এ ছাড়া আপাততঃ আর কোন উপায় তো দেখছি না।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা ছ'জন—প্রদীপ, অধীপ, চন্দ্রিকা সিং, আমি, হরিচরণ আর রামহরি—হাজারমারীর মাঠের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রদীপ এবার কলকাতা থেকে আসবার সময় মোটর-সাইকেল নিয়ে এসেছিলো। সে দু'টো এত দিন ছিলো ষ্টেশন-মাষ্টারের কোয়ার্টারে। সকালে কুলী মারফৎ সে দু'টো আনিয়ে নিয়েছিলো প্রদীপ। এখন তাতে চড়েই যাত্রা হলো সুরু।

চন্দ্রিকা সিং যে মোটর-সাইকেলটা চালাচ্ছিলেন, তাতে ছিলো অধীপ আর রামহরি। প্রদীপের গাড়ীটায় হরিচরণ আর আমি ছিলাম যাত্রী। উঁচু-নীচু গেঁয়ো পথ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটলো গাড়ী দু'খানা। তার বিষম ঝাঁকানিতে সারা শরীর যেন ব্যথা হয়ে যেতে লাগলো। গ্রাম্য পথে সশব্দে এই আধুনিক যান দু'টির যাত্রা দেখতে পথের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভীড় করতে লাগলো।

হাজারমারীর মাঠের ধারে মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম। গাড়ী দু'টো থামিয়ে প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং নেমে পড়লেন। সামনে ধূ-ধূ করছে বিরাট হাজারমারীর মাঠ। এই মাঠেই এক দিন হাজার হাজার লোকের অপমৃত্যু দেখেছে ঠগী আর ঠ্যাঙ্গাড়ের হাতে। এই মাঠেই নানা রকম প্রবাদের কেন্দ্র হয়ে এত দিন ভীতির স্থল হয়ে আছে এ অঞ্চলের লোকদের। বর্ত্তমান রহস্যময় ঘটনাগুলোও ঘটছে একে কেন্দ্র করেই। এই সে রাত্রেও আমরা জীবন্ত কঙ্কালের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কোন রকমে এখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু সে ছিলো গভীর রাত্রি—এখন দিনের আলোয় সে সব বিভীষিকার কথা নিজের মনেই ভাবতেও হাসি পায়—বিশ্বাস হয় না যেন।

প্রদীপ চন্দ্রিকা সিং-এর সঙ্গে আসন্ন অভিযান সম্বন্ধে পরামর্শ করতে লাগলো। আমরা চেয়ে রইলাম সামনের জনহীন রহস্যময় হাজারমারীর মাঠের দিকে। চন্দ্রিকা সিং বললেন, সে রাত্রে যেদিক থেকে আমরা পালিয়ে এসেছিলাম, সেই দিকেই যাত্রা সুরু করা হোক। প্রদীপও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। সুতরাং আবার গাড়ী চলতে সুরু করলো।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সে রাত্রে যতটুকু এসেছিলাম তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী দূরে এসে পড়লাম। প্রদীপ বললো, আমরা প্রায় পনের মাইল এসে পড়েছি। এতক্ষণ হাজারমারীর অনুর্ব্বর রুক্ষ মাঠটাই শুধু চোখে পড়ছিলো, কোথাও এতটুকু গাছপালা কিংবা আগাছা পর্য্যন্ত নেই। বাংলা দেশের কোথাও জমি যে এমন মরুভূমির মতো শূন্য হতে পারে, এর আগে তা কল্পনাও করতে পারিনি। এবার ক্রমে ক্রমে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হতে লাগলো। আমাদের আশে-পাশে কতকগুলো ইতস্ততঃ ইটের পাঁজা, ঘর-বাড়ীর ভগ্ন স্তূপ দেখা যেতে লাগলো। বোধ হয় এখানে আগে সমৃদ্ধ জনপদ ছিলো। ঠগী আর ঠ্যাঙ্গাড়েদের অত্যাচারে কিংবা কোন দৈব-দুর্ব্বিপাকে বা রোগে মহামারীতে সব শূন্য হয়ে গেছে। এধারে-ওধারে কতকগুলো বট-অশ্বত্থ আর বুনো গাছের জঙ্গল। দু'-একটা বড় বড় পুকুর প্রায় শুকনো অবস্থায়, নয়তো পচা জল আর কচুরী-পানা নিয়ে আজো অতীতের সাক্ষী দিচ্ছে।

প্রদীপ হরিচরণকে প্রশ্ন করলো ; তোমরা এই সব বাড়ী-ঘরের কোন খবরই বোধ হয় জানো না হরিচরণ ?

—না ঠাকুর মশাই ! হরিচরণ উত্তর দিলে। তার তখনো ধারণা, প্রদীপ ভূতের রোজা রাজীব শর্ম্মা ! সে বললে : আমরা ভয়ে কখনো মাঠের ধারে-কাছে আসতাম না—আর এ তো মাঝ-মধ্যিখানে। তবে বুড়োদের কাছে গল্প শুনেছি যে, এই মাঠের

মাঝামাঝি কোথাও ঠ্যাঙ্গাড়ে আর ঠগীদের আড্ডা ছিলো। লুঠের পয়সায় তারা তোষা-বাগাখানা বানিয়ে দিব্যি আরামে এখানে বাস করতো। ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে তাদের যখন ধরে ধরে ফাঁসী দেওয়া হয়, দ্বীপান্তর পাঠানো হয়, তখন তাদের গ্রাম খালি হয়ে যায়। এই সব ভাঙ্গা বাড়ী বোধ হয় তাদেরই। আমরা এ কথাও শুনেছি যে, এখনো এ সব জায়গায় তাদের বহু ধনরত্ন লুকানো আছে।

—হুঁ! চন্দ্রিকা সিং ও-পাশ থেকে বললেন: ভূতগুলো বোধ হয় সেই সব ধনরত্নের লোভেই এখানে আড্ডা করেছে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়লেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপও। সামনেই একটা বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ী আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে—তার দু'পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাবলা গাছের জঙ্গল।

চন্দ্রিকা সিং বললেন: আর তো এখান দিয়ে গাড়ী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া চলবে না প্রদীপ। অনেকটা ঘুরে না গেলে আর উপায় নেই।

—আপাততঃ আর এগিয়ে যাবার কোনো দরকারও আমি দেখছি না মিঃ সিং। প্রদীপ বললো: এই বাড়ীটার সামনের রাস্তাটা দেখছেন। রীতিমত লোক-চলাচল না থাকলে রাস্তার অবস্থা এ রকম হয় না। তাছাড়া বাইরে থেকে বাড়ীটা যতই ভাঙ্গা-চোরা চূণ-বালি-খসা মনে হোক, ওর ভেতরে মানুষ বাস করে নিশ্চয়ই—নইলে ওই ভাঙা দরজাটার সামনে বাড়ীতে ঢোকবার রাস্তাটা অত পরিষ্কার থাকতো না। আমার মনে হয়, আসল রহস্যের সূত্র মিলবে এখানেই। এই বাড়ীটায় কোন্ মহাপ্রভুরা বাস করেন, সেইটাই এখন খোঁজ নেওয়া দরকার।

প্রদীপের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ গুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। একটা বন্দুকের গুলী ঠিক হরিচরণের পাশ দিয়ে চলে গেলো। হরিচরণ একটা অস্ফুট শব্দ করে বসে পড়লো।

তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে টেনে তুলে প্রদীপ তাকে গাড়ীতে বসিয়ে দিলে। গুলীটা একেবারে ব্যর্থ যায়নি, হরিচরণের কাঁধের ওপর তার সামান্য একটু স্পর্শ রেখে গেছে। অল্প রক্তও পড়ছে সেখান থেকে। যদিও মারাত্মক রকমের নয়, তবুও একটু প্রাথমিক চিকিৎসার দরকার। কিন্তু কিছু ভাববার বা করবার আগেই আরো কয়েকটা গুলী ছুটে এলো আমাদের দিকে। শত্রুর সংখ্যা সম্বন্ধে কিছুই জানা না থাকায় পাল্টা আক্রমণ করতে চন্দ্রিকা সিং একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। এমন সময় প্রদীপ গুরুগম্ভীর স্বরে বললে: মুখুজ্যে, তুমি হরিচরণের ক্ষতটা রুমাল দিয়ে বেঁধে দাও। দরকার হলে ফার্ষ্ট-এডের কিছু কিছু সরঞ্জামও গাড়ীর মধ্যে পাবে। আমি একবার দেখি ওদের দৌড় কত দূর।

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম হরিচরণকে নিয়ে। প্রদীপ ঘুরে দাঁড়ালো বাব্‌লা-বনটার দিকে। ওই বনের আড়াল থেকেই আমাদের দিকে গুলী ছোড়া হচ্ছিলো। কিছুক্ষণ ধরে উভয় পক্ষের গুলীর আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। আমাদের বিপক্ষের সুবিধা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী—কারণ তারা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গুলীবর্ষণ করে চলেছে, আর আমরা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে। তবুও যে আমাদের মধ্যে আর কেউ আহত হলো না, সেটা বোধ হয় নেহাৎ ভাগ্যের জোরে কিংবা শত্রুপক্ষের লক্ষ্য স্থির ছিলো না [illegible]। প্রদীপের মতে আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম একটি মাত্র কারণে। [illegible] আড়াল থেকে সম্ভবতঃ দু'টো দূর-পাল্লার বন্দুক ছুড়ে আমাদের [illegible] করবার চেষ্টা চলছিলো, আর দু'জন লোকই ছিলো গুলী [illegible] রীতিমতো অনভ্যস্ত।

যাই হোক, কিছুক্ষণ পরে অপর পক্ষের বন্দুক একেবারে নস্তব্ধ হয়ে গেলো। গুলী ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক বা [illegible] কোন কারণেই হোক, ওরা আর সাড়া-শব্দ করলো না। তার [illegible] শোনা গেলো কতকগুলো দ্রুত পদধ্বনি। বোধ হয় ওরা পালিয়ে যাচ্ছে আরো গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

ওদের পদধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর কয়েক মিনিট [illegible] কাটলো। তার পর প্রদীপ এগিয়ে চললো সেই জঙ্গলের দিকে, যেখান থেকে এতক্ষণ গুলীবর্ষণ করা হচ্ছিলো আমাদের লক্ষ্য করে। চন্দ্রিকা সিং তার অনুসরণ করলেন। [illegible] ক্ষতস্থানটায় ততক্ষণে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হয়ে [illegible] রামহরিকে হরিচরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে [illegible] আর প্রদীপও ওদের পিছন পিছন জঙ্গলের দিকে চললাম। [illegible] খুব সুবিবেচনার হয়নি অবশ্য, কারণ ঘন জঙ্গলের [illegible] শত্রুপক্ষের কারো লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়—[illegible] থেকে গুলী করে আমাদের সকলকে না হোক, দু'-এক জনকে আহত বা নিহত করাও অন্ততঃ তাদের পক্ষে [illegible] শক্ত কাজ নয়। কিন্তু প্রদীপ কখনো সামনে বিপদ দেখে পিছু [illegible] আর তার সঙ্গে থাকলে অন্যের পক্ষেও তাকে [illegible] মুখে রেখে নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়া সম্ভব নয়। [illegible] আমরাও অনুসরণ করলাম তাকে।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল। গাছগুলো এত ঘন যে সেই [illegible] আলোও তার মধ্যে পৌঁছতে পারেনি। চার দিকে [illegible] বিভীষিকা। প্রদীপের জামার পকেটগুলো যেন [illegible] তার মধ্যে সব সময় থাকতো এমন সব জিনিস, যার [illegible] আমরা খুঁজে পেতাম না। ছুরি, কাঁচি, স্ক্রু-ড্রাইভার—[illegible] কি জিনিস ছিলো তার নিত্যসঙ্গী। তার পকেট [illegible] জোড়া নকল দাড়ী-গোঁফ পর্য্যন্ত পাওয়া যেতো। [illegible] গোয়েন্দাগিরির অপরিহার্য্য উপকরণ। অন্ধকারের মধ্যে [illegible] কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, তখন সে-ই নিজের পকেট থেকে বার করলো একটা ছোট টর্চ্চ। টর্চ্চটা ছোট [illegible] খুব কম ছিলো না। তারই আলোয় আমরা আশ-পাশটা ভালো করে দেখে নিলাম। চার দিকে শুধু ঘন [illegible] গাছ—[illegible] আশে-পাশে জন-মানবের চিহ্ন নেই।

হঠাৎ প্রদীপ নীচু হয়ে সাদা মতো একটা কি [illegible] জিনিষটা আর কিছুই নয়—একখানা ছোট খুব [illegible] ভিজিটিং কার্ড। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে—এই [illegible] জায়গায় এমন একটি বস্তুর অবস্থান কেমন করে সম্ভব [illegible] বুঝতে পারলাম না। প্রদীপ বললে: আমাদের [illegible] করেছিলো, তাদেরই কারোর অসাবধানতায় জিনিষ [illegible] এখানে। নইলে এখানে এ জিনিষ অন্য কোন [illegible] সম্ভাবনা নেই।

কার্ডটায় একটা নাম-ঠিকানা লেখা—জহর সান্যাল, বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার,…নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। ঠিকানাটা দেখে নিয়েই প্রদীপ বললো : আপাততঃ এইখানেই আমাদের এখানের কাজ শেষ। চলো, ফেরা যাক্।

জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমরা মোটর সাইকেলের কাছে ফিরে এলাম। সেখানে এসে দেখি আর এক বিপত্তি। হরিচরণ মূর্চ্ছা গেছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রামহরি ঠক্-ঠক করে কাঁপছে। তারও প্রায় মূর্চ্ছা যাবার মতো অবস্থা। ব্যাপার কী? রামহরিকে প্রশ্ন করে জানা গেলো—সামনের ওই ভাঙা বাড়ীটার জানলায় তারা একটা বীভৎস মুখ দেখতে পেয়েছে। মুখটা যে মানুষের নয়, তাতে তাদের কোন সন্দেহই নেই।

চন্দ্রিকা সিং উত্তেজিত ভাবে বললেন : বাড়ীটায় একবার খানা-তল্লাসী করলে হয় না প্রদীপ? যত কিছু রহস্যের মূল যে ওইখানেই পাওয়া যাবে, এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

—আমিও। চন্দ্রিকা সিংকে সমর্থন করে অধীপ বললে : ভূত-প্রেত কিংবা মানুষ যাই হোক, এই দিন-দুপুরে তাদের কোন চালাকীই খাটবে না।

প্রদীপ কিন্তু চন্দ্রিকা সিং বা অধীপের প্রস্তাব সমর্থন করলে না। মৃদু হেসে সে বললে : শত্রুর বল কতখানি না জেনে অনিশ্চিতের উদ্দেশে অভিযান করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় মিঃ সিং। সাহসিকতার অর্থ যেখানে গোঁয়ারতুমি, পরাজয়ই সেখানে নিশ্চিত পরিণাম। আমার মনে হয়, আমরা যাতে বাড়ীটার ভেতরে যেতে উৎসুক হই, সেই জন্যেই জানলা দিয়ে ওরা দেখা দিয়ে ওদের ওখানে অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিয়েছে। এখনকার মত ফিরে যাওয়াই আমাদের পক্ষে উচিত হবে।

আমিও সেই অভিমতই প্রকাশ করলাম। কিন্তু চন্দ্রিকা সিং বললেন, এর ফলে অপরাধীরা সরে পড়বার সুযোগ পাবে। অতঃপর তাদের হাতে পাওয়া আমাদের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

প্রদীপ বললে : আপনার যুক্তিটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়, তবু আমি ফিরে যেতে বলছি মিঃ সিং। ওরা যে উদ্দেশ্যে এই তেপান্তর মাঠে আড্ডা করেছে, সে উদ্দেশ্য যতক্ষণ না সফল হবে ততক্ষণ ওরা এ জায়গা ছাড়বে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং এখানে পরে প্রস্তুত হয়ে এলেও চলবে। বিশেষ করে, আমাদের এখনি কলকাতায় যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বস্ত্র-ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার জহর সান্যাল নামক ভদ্রলোকটির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ-পরিচয় করতে হবে। [illegible] নকল দারোগা জীবনময়েরও একটা গতি করা দরকার।

প্রদীপের পরামর্শ সকলেরই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। আবার [illegible] সাইকেলে আরোহণ করলাম। নির্জীব যান গতি [illegible] চললো গ্রামের দিকে। [ক্রমশঃ।

একটি সাহসী শিশু

শ্রী অরুণকুমার ঘোষ

সুদূর স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য অঞ্চল। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি গম্ভীর থমথমে আকাশের দিকে স্তব্ধ ভাবে মৌনী ঋষির [illegible] হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশের কোণ ঘিরে ঘিরে এগিয়ে আসছে জলভরা কালো কালো [illegible] মেঘগুলো মাঝে মাঝে যেন গুমরে গুমরে উঠছে। পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে সেই শব্দ। ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব সুরু হবে শীগ্‌গিরই। আসন্ন ঝটিকার সঙ্কেত পেয়ে পাহাড়ের গাছ-পালাগুলি যেন ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দূরে জাগছে ক্ষ্যাপা ঝড়ের কোলাহল। দূর দিগন্তের অরণ্যানী যেন মত্ত ঝড়ের স্পর্শ পেয়ে ছোট শিশুর মতই আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। গাছ-পালাগুলি আহ্লাদে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ের উপরে। এগিয়ে আসছে ঝড়……প্রকৃতি জেগে উঠছে ভৈরবী বেশে। আকাশের বুকে কালো মেঘের মধ্য থেকে ঘন ঘন গর্জ্জে উঠছে অদেখা দৈত্যের দল। মেঘের বুকে বুকে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে তাদের শাণিত তরবারি। কড়্-কড়্—কড়াৎ! বিকট শব্দে একটা বাজ পড়লো কোথায়।

পাহাড়ের উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটি শিশু—তিন বছর বয়স। চারি দিকের এই আসন্ন প্রলয়ের মধ্যে সে একটুও ভয় পাচ্ছে না। বরং সে যেন প্রকৃতির এই ভৈরবী বেশের মধ্যে পেয়েছে এক ভয়াল সৌন্দর্য্যের সন্ধান। আকাশের বিদ্যুৎ-ঝিলিকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে আনন্দে হাততালি দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠছে, “বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর! (Bonny, Bonny!)”

শিশুটিকে এখানে একাই ফেলে তার পরিচারিকা কোথায় যেন চলে গিয়েছে। সে খবর জানতে পেরে তার উদ্বেগাকুল আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে এলো সেই পাহাড়ের উপরে। শিশুর বিপদাশঙ্কায় তারা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা যখন শিশুটিকে দেখতে পেলো তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। চারি দিক থেকে এগিয়ে আসছে প্রলয় ঝঞ্ঝা। সেই ভয়াল পরিবেশের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শিশু আনন্দে উল্লসিত হয়ে হাততালি দিচ্ছে। ছোট্ট শিশুর এই বিচিত্র সাহস আর সৌন্দর্য্যবোধ আশ্চর্য্য নয় কি?

এই সাহসী শিশুটি কে জান? ইনি বিখ্যাত স্কচ সাহিত্যিক স্যার ওয়াল্টার স্কট। স্কট খোঁড়া হলেও ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ ছিলেন। ইনি অসাধারণ সাহসী ও প্রচণ্ড বলশালী ছিলেন। এঁরই অমর লেখনীর মুখে সৃষ্টি হয়েছিল ‘আইভ্যানহো’, ‘লে অব্ দি লাষ্ট মিন্‌স্ট্রেল’, ‘কোয়েণ্টিন ডারওয়ার্ড’, ‘দি ব্রাইড অব্ ল্যামারমুর’ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি—যা আজ পর্য্যন্ত সাহিত্য-জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাল্যকাল থেকেই এঁর পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল এবং সেই জন্যই এঁর অধিকাংশ রচনাতেই আমরা প্রাচীন গ্রেট বৃটেনের সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাই।

মহা দুষ্টু ছেলে

শ্রীনীলিমা মুখোপাধ্যায়

মহা দুষ্টু ছেলে, কারুর বাগানের ফল একবার চোখে পড়লে আর তা গাছে থাকত না। ঝড়-বৃষ্টি হলেও সে-কাজে বাধ পড়ত না। দুষ্টু ছেলেটি সবরকম খেলাতেই পারদর্শী। লাট্টু খেলায় অব্যর্থ ছিল লক্ষ্য। কি বোঁ-বোঁ করে ঘুরত লাট্টু! ঘুড়ি প্যাঁচ মেরে কাটা বা লটকে আনা, সুতায় মানজা দেওয়া ইত্যাদিতে জুড়িদার কেউ ছিল না। রোজই খেলা শেষে দেখা যেত দু'পকেট ভর্ত্তি লাট্টু আর মার্ব্বেল। বাড়ী নিয়ে যেত না, ছোটদের মাঝেই বিলিয়ে দিয়ে

বাড়ী ফিরত। মাছ ধরতে খুব ভালবাসত, পটুও হয়েছিল। এ ছাড়াও নানা রকমের সখ বা খেয়াল ছিল ; এই যেমন,—নানা বিচিত্র রংয়ের ফড়িং জ্যান্ত ধরেই একটা ছোট্ট কাঠের বাক্সে ভরে রেখে রোজ তা পরিষ্কার করা, রুচি অনুযায়ী খাবার দেওয়া সবই নিয়মিত করা হত। বাগানের সখ ছিল খুব। ছোট্ট একটুখানি জায়গাতে কাশ ফুলের চারা লাগান, রোজ তত্ত্বাবধান করা, মেপে দেখা গাছ বড় হ'ল কি না ইত্যাদি আর গাছে কুঁড়ি এলে সে কি আনন্দ! বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটি গর্ত্ত করে তাকে পুকুর করা হত, সেখানে দেখা যেত কাগজের নকল হাঁস, পদ্ম, শালুক, ইত্যাদি। কিন্তু এত দুষ্টুমি সবই হ'ত অভিভাবকদের লুকিয়ে। তাঁরা ছিলেন এ সব কাজের দারুণ বিরোধী। দুষ্টু ছেলেটি তাই বলে কখনও শাস্তি পেত না। কি করে দেবেন? সবই যে লুকিয়ে করা হত, ঠিক কেউ ধরতেই পারতেন না। ভাবছ মহা দুষ্টু ছেলেটি লেখাপড়ায় একদম ফাঁকিবাজ—মোটেই না, বরাবর ক্লাসের প্রথম স্থানটি দুষ্টুটির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। হাতের লেখা খুব চমৎকার, ছবি আঁকাতে হাত ছিল। দুষ্টু ছেলেটি যেমনি অসীম দুঃসাহসী তেমনি জেদী। দুষ্টু ছেলেটির নাম কি জান? ন্যাড়া। এই ন্যাড়াই আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুকের আত্মকাহিনী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

আমি মূক, তবে বধির নয়, সব কথা বুঝি, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না, তাই আমার এত কষ্ট।

আজ চার মাস হল এ-বাড়ীতে আছি, দিনগুলো কাটছে মন্দ না। এত দিনে আমি বেশ একটু বড়ও হয়েছি, সবার মনোভাবই বুঝতে পারি। বাড়ীর কর্ত্তা যখন সুট পরে গটগট করে অফিস থেকে ফিরেন, আমার মনে হয়, আমি একটু কাছে গিয়ে বসি, আদর করি। কিন্তু কর্ত্তার ভাব-স্বভাবে মনে হয়, উনি আমাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। গিন্নীমা খুব ভালও বাসেন না, বা অনাদরও করেন না, ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দুধ-রুটি এ সব খেতে দেন, তবে তার কোলে উঠতে গেলে তাড়িয়ে দেন। বাড়ীতে চারটি ছেলে-মেয়ে আছে। তারা সবাই আমাকে ভালবাসে। তার মধ্যে লাল্লু বলে যে ছেলেটি আছে সেই আমাকে বেশী ভালবাসে, তার বাবা-মা'র বকুনি-খাওয়া সত্ত্বেও সে চুপি-চুপি এসে আমাকে কোলে তুলে নেয়, তার খাবার থেকে খাবার দেয়, আমাকে আদর করে, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে মারেও। এটা শিখেছে সে তাদের রান্নার ঠাকুরের কাছ থেকে। লোকটা আমাকে ভালও বাসে আবার তাড়নাও করে। লাল্লু ছোট কি না, তাই তার ও-অভ্যেসটা দেখে দেখে শিখে নিয়েছে। এক দিন দুপুরে আমি বাংলো ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিলাম, এক সাথী পেয়ে আড্ডা জমালাম। তার পর কি একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে গেল, দু'জনে খুব মারামারি করলাম, বয়সে আমি ছোট, হেরে গেলাম, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। হয়রাণ হয়ে বাংলোয় এসে বসে আছি, মনটাও খারাপ, এমন সময় ছোট খোকা আর লাল্লু বড় [illegible] আর সইতে না পেরে দিলাম লাল্লুর হাতে এক কামড়, কামড়টা যে এত গুরুতর হবে বুঝতে পারিনি; ছেলেরা চীৎকার করে উঠল। গিন্নীমা গোলমাল শুনে [illegible] এসে দেখেন লাল্লুর হাত থেকে রক্ত ঝরছে, শুনলেন আমি না কি তাকে কামড়ে দিয়েছি। রাগে গিন্নীমা অস্থির হয়ে হাতে [illegible] বেত নিয়ে আমাকে বললেন, "হতভাগা, তুই আমার ছোট [illegible] এমন করে কামড়েছিস, তোকে বের করে দেব",—এই বলে [illegible] করে দু'-চার ঘা দিলেন। আমি ভয়ে কোণায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম, বুঝতে পারলাম যে খুব দোষ করেছি, মনে যে একটু অনুতাপও না হ'ল তা নয়, কারণ লাল্লু আমাকে বড় ভালবাসে, তবে [illegible] দোষ ছিল বই কি, আমি মন-খারাপ করে বসে আছি, সে আমাকে মারল কেন? যা হোক, কর্ত্তা তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনতে লোক পাঠালেন, ডাক্তার এসে হাতে ওষুধ বেঁধে দিলেন, দু'-তিন দিন [illegible] সেরে যাবে বললেন।

পরদিন ভোরে আমি আর তাদের ঘরে যাইনি। আমার একটা অভ্যেস ছিল, ভোরে গিন্নী মা দরজা খুলে দিলেই ঘরে ছুটে [illegible]। ছেলেদের খোঁচা দিয়ে তুলতাম, বিশেষতঃ ছোট খোকার [illegible] ধরে টানা আমার এক কাজ ছিল। কিন্তু আজ ভয়ে [illegible] পারলাম না, মনটা বড় খারাপ লাগছিল। ভোরে গোয়ালা [illegible] গিন্নীমা তাকে ডেকে বললেন,—"নিরাশ্রয় দেখে এটাকে স্থান দিয়েছিলাম, কিন্তু এমন শয়তান আমার লাল্লুকে কামড়ে দিয়েছে, [illegible] তুই নিয়ে যা, আমি একে চাইনে।" কি করব, নিরুপায় [illegible] গোয়ালার সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলাম। কেউ আমাকে [illegible] দেখাল না। বাড়ীতে নিয়ে গোয়ালা আমাকে এক [illegible] দিল। আমার চেয়ে ছোট-বড় অনেক সাথীই ছিল, কিন্তু [illegible] আমার মন খুলে মিশতে ইচ্ছে হল না। গোয়ালা [illegible] বলল, তুমি এখানে থাক, তোমার কোন কষ্ট হবে না। [illegible] বেড়াও, আমার বাড়ীতে প্রচুর দুধ আছে, কোন অসুবিধা [illegible] শুধু দুষ্টুমি করো না। আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম, কিন্তু [illegible] ভাব-স্বভাব দেখে গোয়ালার সন্দেহ হল, সে আমাকে [illegible] রাখল। দুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। [illegible] আমি উপোস রইলাম, সন্ধ্যে বেলা শুধু একটু দুধ খেলাম। [illegible] দিতে যখন গোয়ালার ছোট মেয়ে ঘরে ঢুকল, আমি [illegible] হঠাৎ এক দৌড় লাগালাম, দৌড় দৌড়, এক দৌড়ে [illegible] বাড়ী এসে হাঁফাতে লাগলাম। গিন্নীমা'র ভয়ে আমি [illegible] রইলাম। লাল্লু তার আঘাতের কথা ভুলে গিয়ে [illegible] ধরল, আমার মন আনন্দে ভরে গেল। গিন্নীমা [illegible] দিকে কাতর নয়নে চাইলাম। আমার চোখের দিকে [illegible] হল, তিনি বললেন, "কি রে, আবার পালিয়ে এসেছিস [illegible] আর যদি কখনও দেখি ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া [illegible] মারামারি করেছিস, তবে একেবারে জন্মের মত বি[illegible] কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করলাম, গিন্নীমা তাহলে [illegible] আবার খাই-দাই-বেড়াই, শিশুদের আদর-দৌরাত্ম্য ভা[illegible]

ঠাকুর লোকটি এমনি মন্দ নয় তার চা [illegible] দেয়, তার মাছ ডিম থেকে মাছ ডিম ভেঙ্গে দেয়, তার [illegible] ভালই, তবে একটি বড় দোষ, আমি যে ছোট [illegible] খেয়াল থাকে না, আমি একটু অবাধ্য হলেই শপাং-শপাং [illegible]

থাকে, কি করব, ভাষায় ব্যথা প্রকাশ করতে পারি না, চীৎকার করে একটু কেঁদে চুপ করে থাকি। আমাকে মারলে গিন্নীমা খুব রাগ করে তাই আজকাল আর বড় মারে না। আমাকে তার ঘরেই থাকতে দেওয়া হয়েছে, তাই রোজ রাতে ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে শুতে যাই। তার সিনেমা দেখবার বড় সখ। বাড়ীর লোকদের খাওয়া-দাওয়ার পর নিজে খেয়ে আমাকে খাইয়ে প্রায়ই সে চুপচাপ চলে যায় সিনেমা দেখতে। আমাকে খাবার দেয় আমি খেয়ে-দেয়ে একাই শুতে যাই। প্রথম প্রথম সে চলে যাওয়ায় আপত্তি করতাম, তা ও যখন শুনে না, তখন তার উপায় না দেখে একাই থাকি।

এক দিন ঠাকুর তাড়াহুড়া করে আমাকে খাবার না দিয়ে রাতে সিনেমা দেখতে চলে গেল। আমি বাইরে ছিলাম, এসে দেখি আমার খাবার নেই। আমি খিদেয় ধীরে ধীরে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু গিন্নীমা সব দরজা বন্ধ করে চলে গেছেন, ছেলে-মেয়েরা ত শুয়ে আছে, কেউ আমার কান্না শুনতে পেল না। শেষ কালে আর থাকতে না পেরে গিন্নীমার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম। গিন্নীমা চমকে উঠে বললেন, "কি রে, তুই এমন করে কাঁদছিস কেন? ঠাকুর তোকে খাবার দেয়নি?" আমি শুধু কাঁদতে লাগলাম, তখন তিনি উঠে দরজা খুলে আমাকে খেতে দিলেন, তার পর বললেন, "যা, ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক।" আমার পেটটা ত ঠাণ্ডা হল, কিন্তু ঘুমুতে গিয়ে দেখি, হা ভগবান! দরজা বন্ধ, চার দিকে খোলা বড় বড় মাঠ, এক বিরাট বাংলো, নিস্তব্ধ অন্ধকার, তার মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে, ভয়ে আমার গাটা ছমছম করে উঠল, নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। কি করব, ভয়ে ভয়ে আবার গিন্নীমা'র জানলার কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলাম। তিনি বললেন, "কি জ্বালা, তোর জন্যে আর শান্তি নেই" —বলে দরজা খুলে দেখেন, ঠাকুর ঘরে নেই, দরজা বন্ধ। তখন তিনি দরজা খুলে দিলেন, আমি ধীরে ধীরে গিয়ে কোন রকমে শুয়ে রইলাম।

পরদিন গিন্নীমা ঠাকুরকে খুব বকলেন। কেন সে আমাকে খাবার না দিয়ে একা চলে গেল। ঠাকুর বকুনি খেয়ে আমার উপর খুব রাগ করল, তার পর চুপি-চুপি বলল, "দেখ, তোর শাস্তি কি হয়, তুই আমকে শুধু শুধু বকুনি খাইয়েছিস।"—এই বলে আমাকে গোয়ালার হাতে সঁপে দিল। যমদূতের মত গোয়ালা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। গিন্নীমায়েরা কেউ বাড়ীতেও ছিলেন না। তাঁরা কেউ জানতেও পারলেন না যে আমাকে এরা গুম করে রাখতে নিয়ে যাচ্ছে।

বিকেলে আমার খোঁজ হল, ছেলেরা চার দিক খুঁজে হয়রান, তখন গিন্নীমা ঠাকুরকে তলব করলেন। ঠাকুর তখন বললে, সে গোয়ালার কাছে আমাকে দিয়ে দিয়েছে। এবার কর্ত্তা গিন্নীমা সবাই চটে গেলেন, বললেন পুলিশে খবর দেবেন। পুলিশের নামে ভয় পেয়ে গোয়ালা আমাকে ছেড়ে দিলে। যাবার আগে আমিও একটু সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নিলাম। গোয়ালার একটা লাল ধবধবে সুন্দর বেড়াল ছিল। দুধ খাইয়ে খাইয়ে গোয়ালা এটিকে নাদুস-নুদুস করে তুলেছে, আমি তার সেই সাধের বিড়াল টাকে কেটে দিয়ে বাংলোয় ছুটে এলাম। আমাকে দেখে ছেলেদের কি আনন্দ! লালু, খুকী, ছোট খোকা—এরা আমার গলা জড়িয়ে ধরে কি আদর করতে লাগল! কর্ত্তা ও গিন্নীমাও আমাকে খুব স্নেহ দেখাতে লাগলেন, তখন থেকে আমার কদর বেড়ে গেল। আমি শান্তিতেই আছি। এই আমার সংক্ষিপ্ত আত্মকাহিনী। আমার নাম ছোট্টু। বয়স চার মাস। জাতে সারমেয়।

মহাজিজ্ঞাসা

রুদ্রাণীশংকর ঘোষ

নূতন এসেছে ওই
দিঙ্‌মণ্ডল সেই জড়সড়
নব আলোড়ন কই!

কই সে চেতনা নূতন প্রেরণা
নব নব উচ্ছ্বাস;
শুধু শোনে সেই দীর্ঘ বিষম
রিক্তের নিশ্বাস।
শুধু আঁখিজল আজি সম্বল
রক্তের নদী-নালা;

নির্ধন লাগি শুধু জাগি
ধনীর বিচারশালা।
ধনী তোষামোদ আমোদ-প্রমোদ
আর দীন-আঁখিজলে;
বাবুভায়া সব করে কলরব
বসিয়া প্রাসাদ-'হলে'।

ছি-ছি-ছিঃ এরি লাগি কি
শহীদ দিয়েছে প্রাণ?
এরি লাগি তারা চাহিল কি সবে
পুরাতন অবসান?

অঞ্জন ও প্রাঞ্জন

সৌন্দর্য্য

সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে ? অবয়বের গঠন কিরূপ হইলে তাহাকে সুন্দর বলিতে পারা যায় তাহার কিছু নির্দ্ধারিত নিয়ম আছে কি ? অয়ি সুন্দরি ! তুমি যে সম্মুখে দর্পণ রক্ষা করত, স্বীয় জলদ-পটল-বিনিন্দিত চিকুরদাম বেণী আকারে নিবদ্ধ করিতেছ ও স্বীয় সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিম্ব সন্দর্শনে তোমার অধরোষ্ঠ যে ঈষৎ হাস্য প্রসব করিতেছে—তুমিই কি যথার্থ সুন্দরী ? হে বরাননে ! তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠের মনোহারিত্ব দর্পণপটে দেখিতে দেখিতে মনে মনে সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইতেছ, তুমিই কি যথার্থ সুন্দরী ? হে নবীনা ! চঞ্চলচিত্ত নায়ক "বিদ্যুদ্দাম"-নিঃসারিণী নেত্রযুগলের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে মৃতপ্রায় হইতেছে বলিয়া তুমি ভাবিতেছ যে, জগতে তুমি অদ্বিতীয়া সুন্দরী ? অয়ি লাবণ্যময়ি ! বিচেতন ও সংজ্ঞাশূন্য ভাবে প্রেমিক যুবক তোমার বদনের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য একমনে নিরীক্ষণ করিতেছে বলিয়া কি তুমি ভাবিতেছ যে, জগতে তোমার ন্যায় সুন্দরী আর নাই ? আর দুর্গেশনন্দিনীর বিমলে ! শৈলেশ্বর-মন্দিরে যুবরাজ জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে বলিয়া স্বীয় বরবপু অমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিলে, কিন্তু কেন তুমি দর্পণে স্বীয় রূপের ছায়া দেখিয়া অধরপ্রান্তে ঈষৎ গর্ব্বের হাসি ভাসাইয়া দিলে ? ভাবিলে কি জগতে তোমার ন্যায় রূপসী আর নাই ? সুন্দরীগণ যদি তোমরা এইরূপ বিশ্বাস মনে স্থান দিয়া থাক, তবে তাহা ত্যাগ কর, তোমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। তাই বলিয়া তোমাদের সৌন্দর্য্যের অপ্রশংসা বা তোমাদিগকে কুৎসিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রবিধ।

সৌন্দর্য্য লইয়া জগতে কতই প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সৌন্দর্য্যের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া দেবদ্বেষী অমৃতলাভে বঞ্চিত হইল। এই সৌন্দর্য্য হেতু সুন্দ-উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় অকালে জীবলীলা শেষ করিল। এই সৌন্দর্য্যই রোমসাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ। ইহাই ক্লিওপেট্রার নাম অনন্ত কাল স্থায়ী করিবার হেতু। এই সৌন্দর্য্যই জাহাঙ্গীরের জীবনের অনপনেয় কলঙ্কের নিদান। ইহাই নূরজাহানের নাম ইতিহাস-প্রথিত করিবার মূল। এই সৌন্দর্য্যই কাব্য-নাটকাদির জীবন। সেক্সপীয়র ও কালিদাস প্রভৃতি কবিকুল-সবিতাগণের অমৃতময় নাটক সকলের মূলে সৌন্দর্য্যই কারণস্বরূপ নিহিত। এই সৌন্দর্য্য হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষের উৎপত্তি। ফলতঃ জনসমাজের অর্দ্ধাধিক আমোদ সৌন্দর্য্য দ্বারা পরিচালিত। অধিকাংশ কার্য্যেরই মূলে সৌন্দর্য্য সংস্থিত।

সৌন্দর্য্যের ন্যায় সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বদা দৃষ্ট, নিরন্তর নির্ব্বাচিত বিষয় আর কিছুই নাই। তথাপি এ সৌন্দর্য্য যে কি, তাহা বলিয়া উঠা ভার। কাহাকে সৌন্দর্য্য বলে তাহা নির্ব্বাচন করা অসাধ্য। ঐ রমণীর লোচনের তারাদ্বয় নিবিড় কৃষ্ণ, অতএব উনি সুন্দরী ; বাঁড়ুয্যেদের বড় বৌয়ের নাকটি যেন বাটালী-কাটা, সুতরাং তিনি সুন্দরী ; ওপাড়ার হালদারদের মেজ মেয়ের রংটি যেন কাঁচা হলুদ বা দুধে-আলতা, অতএব তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রতি সন্দেহ করা অবিধি। ইত্যাদি প্রকার সৌন্দর্য্যের বিচার ও তাহার বাদানুবাদ সততই জনসমাজে শ্রবণ করা যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রং, নাক, চোক, মুখ ভাল হইলেই কি তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতি আর সন্দেহ করিবার উপায় নাই ? ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, দেহগত বা বস্তুগত কতকগুলি দ্রব্যের কোন কোন অংশবিশেষ এরূপ সুন্দররূপে বিন্যস্ত থাকে যে, তাহা দর্শন মাত্র দর্শকের একটা অভূতপূর্ব্ব অপরিজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যেন স্বেচ্ছায় স্বয়ং বাজিয়া উঠে, তিনি যেন সুখী হন। সেই মনোহর অপূর্ব্ব বিন্যাসই সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অনেক বিখ্যাত দার্শনিক এ সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক করিয়াছেন। অঙ্গ সমুদায়ের সুচারু বিন্যাসের সমষ্টি যে সৌন্দর্য্য, এ বিষয়ে তাঁহাদের সকলের ঐক্যমত নাই। সে যাহাই হউক, সৌন্দর্য্যের প্রধান ও বিশেষ কারণ যে স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে অধিকাংশেরই মতের একতা দৃষ্ট হয়। সেই কারণটি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। বিন্যাস বিষয় সর্ব্বথা প্রশংসনীয় হইলেও তদভাবে যে সকলই তুচ্ছ ও অতি সামান্যরূপে প্রতীত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যে যাহাকে ভালবাসে তাহার দেহে সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমষ্টি ও তাহার অন্তরে সমস্ত গুণের ভাণ্ডার দেখিতে পায়। ইহা নূতন কথা নহে। মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় এই ঐশী আকর্ষণটি মানব-সমাজের দৃঢ় বন্ধন। প্রণয়ের চক্ষে দোষ বিচার নাই ইহা সাধারণ কথা। এই জন্য গ্রীসীয়েরা আপনাদের প্রণয়-দেবতা কিউপিদকে অন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা সকলেই স্ব স্ব পত্নীর সৌন্দর্য্য ক্লিওপেট্রা ও মেহেরউন্নিসা অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি এই প্রণয়ই তাহার মূল কারণ। এই জন্য যুবক বা বৃদ্ধ স্ত্রীর অপ্রশংসা শুনিলে দুঃখ ভার করেন, এই জন্যই নবীনা স্বীয় পিতৃসম বয়স্ক স্বামীকেও সাধ করিয়া সিমলার কালপেড়ে ধূতি পরাইয়া সুখী হন। তোমাকে আমি অযথা ভালবাসি বলিয়া তোমার দেহে অযথা রূপের, অন্তরে অযথা গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই সত্য, কিন্তু জগৎ তো আমার চক্ষে দেখে না। জগতের চক্ষে এই অযথা সৌন্দর্য্যের অবশ্যই অন্যরূপ বিচার হইবে। সুতরাং আমি তোমাকে পরম সুন্দর বলিলেও অন্যে হয়তো তাহার বিপরীত বলিবে। তোমাকে আমি ভালবাসি বলিয়াই তোমার শরীরে এত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই, কিন্তু তোমাকে আমি যত ভালবাসি এত আর জগতে আর কেহ বাসে না, এই জন্যই হে নবীনা রূপসীগণ ও নবীন ভাবুককুল, তোমরা আপন রূপে আপনিই মোহিত হও। কিন্তু জানিও, জগৎ হয়তো তোমাকে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাদৃশ প্রশংসা দিতে প্রস্তুত নহে। তোমাকে আমি ভালবাসি বলিয়া তোমার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, অন্যে তাদৃশ ভালবাসে না বলিয়া তাদৃশ সৌন্দর্য্যের সত্তা অনুভব করে না। এই জন্যই জগন্মধ্যে সৌন্দর্য্যের রুচি সম্বন্ধে ভয়ানক অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। "দেশভেদে, জাতিভেদে, মনুষ্যভেদে, সৌন্দর্য্যের রুচি ভিন্নবিধ। জগতস্থ বিভিন্ন জাতি সমূহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য প্রচলিত। কোন জাতি হয়তো তুষার-ধবলাঙ্গী, তাম্রকেশী, বিড়ালাক্ষীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। কোন জাতি হয় ক্ষুদ্র পদশালিনী, নখরকুলিশ-প্রহারিণী, সর্পপ-সম-লোচনী বোধার গৌরব করেন। অপর কোন জাতি হয়তো কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলচপ্পা, স্থূলাধরসম্পন্না অঙ্গনার লাবণ্য অর্চনা করেন। কোন জাতি বা স্বর্ণবর্ণা, স্থিরনয়না, কুঞ্চিতকেশী রমণীর রূপে মুগ্ধ হন। কোন জাতি বা চঞ্চললোচনা, দ্রুত সজোর-পদ-বিক্ষেপিণী, শুকপক্ষীতুল্য নাসা-ধারিণী কামিনীর দেহে সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে কুত্রাপি একতা দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জগৎ দারুণ বৈষম্যপূর্ণ।" নিম্নলিখিত বাক্যে অবিকল এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে—

"Where one sees beauty another perceives none, nay, recognises, it may be, hedious deformity. A Chinese lover would see no attractions in a belle of London, or Paris, and a Bond Street exquisite would discover nothing but deformity in the Venus of Hotentots."†

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আশ্চর্য্য বৈষম্যের হেতু নিরাকরণার্থ চেষ্টা পাইয়াছেন। বিবিধ পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বিবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি আন্তরিক আকর্ষণ চাই তাহাকে প্রণয় বল বা যা ইচ্ছা হয় বল, ইহার একমাত্র কারণ। আমরা আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি, এ সত্যে দ্বিমত নাই। এই জন্যই আমরা আপনার রূপ ভাল, কথা ভাল, বিদ্যা ভাল, চলা ভাল, বসা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। আপনাকে ছাড়িয়া দিলে যে ব্যক্তি আমাদের অবিচলিত প্রেমের আস্পদ, আন্তরিক আকর্ষণের মূল, যথার্থ প্রীতির নিকেতন, তাহারই প্রেমময় মূর্ত্তি মনে পড়ে। তাহাকে নিখুঁত, তাহার সকল কাজ অনির্ব্বচনীয় সুন্দর বলিয়া বিবেচনা হয়। তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিবেচনা করিলে স্বদেশ, স্বজাতি, প্রভৃতি আমাদের লক্ষ্যস্থল হয়। যে কারণে লাপলাণ্ডবাসী অনবরত রাত্রির ঘোর তমসে আবৃত থাকিয়া এবং অনবরত দিবাকরের খরতার উত্তাপ ভোগ করিয়া, অসহ্য শীতে ও সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত হইয়াও স্বদেশের গুণ, শোভা, সৌন্দর্য্য ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না, যে কারণে আফ্রিকাবাসী দুরন্ত অগ্নিবৎ শোণিত-বিশোষক উত্তাপে সমস্ত দিন বরাহ ও বন্য পশু বধ করত আম মাংসে উদর পূর্ণ করিয়া কথঞ্চিৎরূপে কাল যাপন করিয়াও কোনক্রমে ভ্রমেও স্বদেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে, সেই কারণ আর সৌন্দর্য্য-বোধ বিধায়ক কারণ প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন। উভয়ই একরূপ মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। একমাত্র চিত্তের আকর্ষণই এই বিসম্বাদী ঘটনা-নিচয়ের অকাট্য কারণ। এই চিত্তের আকর্ষণ বা চিত্তোচ্ছ্বাস (emotion of the mind) কেবল মাত্র যে প্রণয়ের জন্য উদ্ভূত হয় তাহা নহে। লালসা, বিকার প্রভৃতি কতকগুলি মনোবৃত্ত এবম্বিধ সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের বিশিষ্ট কারণ। কিন্তু ঐ সকল মনোবৃত্তি চিত্তের আকর্ষণ বা উচ্ছ্বাস (emotion) বা প্রণয়ের প্রশাখা মাত্র, অতএব বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র আমাদের চিত্তই পরকীয় মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করায়। মূর্ত্তিতে, ছবিতে, প্রণয়াস্পদের বদনে, কিছুতে সৌন্দর্য্য নাই। সৌন্দর্য্য অপরের মনে। ডাক্তার ব্রাউন এই মতের পক্ষপাতী। তিনি এই কথা বলিয়া পরে অনেক কুটিল তর্কের আবির্ভাব করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সে-সকল দার্শনিক তর্করাশিতে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। লর্ড জেফ্রি এতদপেক্ষা বিশদরূপে সে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। লোক-প্রথিত কুৎসিতা কুব্জাকে কৃষ্ণ যে সুন্দরীরূপে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে। যেরূপে বা যে কারণেই হউক, কুব্জার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ জন্মিয়াছিল।

তুমি লুৎফউন্নিসা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বুঝিয়াছ কি সৌন্দর্য্য কিছুই নহে, কেবল দর্শকের মনের উচ্ছ্বাস মাত্র। ঐ উচ্ছ্বাস বা আকর্ষণ ছিন্ন হইলে বিদ্যাধরীর রূপও তুচ্ছ হইয়া পড়ে। এ কথা যদি কোন রমণী বুঝিয়া থাকে তবে লুৎফউন্নিসা তুমি এক দিন তাহা বুঝিয়াছিলে তাহা সন্দেহ নাই। জামাইবারিকের কামিনী, তুমি সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে স্ফীতা হইয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু দুই দিন পরে বুঝিবে যে, তোমার ও সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। তুমি সুন্দরী হইলেও তোমার স্বামীর চক্ষে তুমি অতি অপদার্থ। কারণ তোমাতে তাহার চিত্ত নাই। যাহাতে তাহার চিত্ত অধিকার করিতে পার তাহার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তোমার রূপ বাড়িবে। অতএব তুমি দর্পণ ফেলিয়া দিয়া স্বামীর চরণ ধরিয়া আরাধনা কর।

হে কুটিল কটাক্ষবর্ষিণী কামিনীগণ! হে মুকুর-হস্ত সুন্দরী! হে সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব-গর্ব্বিতা রমণীগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমাদের রূপের বড়াই ত্যাগ কর। তোমাদের শরীরে একবিন্দুও রূপ নাই।

...মি তোমাদের নিন্দনীয় বা কুৎসিতা বলিতেছি না। হইতে পারে—তোমার লোচন যুগল পটল-চেরা, বা ইন্দীবরতুল্য বা পদ্ম-পলাশবৎ। তোমার নাসিকা তিল ফুল অপেক্ষাও উত্তম, তোমার ... পয়োধর দাড়িম্ব অপেক্ষা আশ্চর্য্য, তোমার বাহুদ্বয় মৃণাল অপেক্ষাও সুকুমার, তোমার অঙ্গুলিনিচয় চম্পক কুসুম সদৃশ, তোমার উরু যুগল রামরম্ভা অপেক্ষাও ভয়ানক, তোমার বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার ন্যায়। সংক্ষেপতঃ তোমার শরীর মহান্ অশ্বত্থ গাছ হইতে অতি ক্ষুদ্র ঘাস পর্য্যন্ত যাবতীয় বন-জঙ্গলের আদর্শস্থল, ইহা আমি স্বীকার করিলাম। বিনা ওজরে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, তোমার দেহস্থিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস অতি মনোরম, কিন্তু মন না থাকিলে তুমি কোন কাজের? তোমার ও রূপরাশি ছাব নাক ফুঁড়িয়া তাহাতে দেড় মণ নথ ঝুলাও, কান ফুঁড়িয়া তাহাতে রাজ্য সমেত বোঝা দোলাও, তঃখ রাখ কেন, সোনার পাথর গলায় বাঁধিয়া বাসনা-স্রোতে সাঁতার খেল, দিনে-দুপুরে পুরুষ মহাজনের মন চুরি করিয়া স্বয়ংই তার বাঞ্ছা স্বরূপ অগ্রে পায়ে রূপার বেড়ী দিয়া আনন্দের কয়েদী হইয়া বসিয়া থাক। আর যা খুসী হয় তা কর, কিন্তু এ নিশ্চয় জানিবে যে, তাতে রূপ বাড়িবে না বরং কমিবে। তোমরা বাহির সাজাইতে চেষ্টা করিও না, তাহাতে কেবল হিতে বিপরীত ঘটিবে। সবিদ্র শিশু তোমাদের এ বেশ দেখিতে পাইলে, কোন নূতন জীব দেখিলাম ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে, আর জগদ্বিখ্যাত ভীরু বাঙ্গালী পুরুষ তোমাদের এই রণরঙ্গিনী বেশ দেখিয়া বিশেষ শুধু মুখ নাড়া নয়, উপরন্তু নথ নাড়ার ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিবে। তাই বলি, তোমরা বাহির সাজাইতে চেষ্টা করিও না। নাক কোঁড়া-ফুঁড়িতে আর বাক্স নাই, যাহাতে আত্মার উন্নতি হয় অন্তর সঙ্কীভূত হয়, তাহার উপায় বিধান কর—তোমার রূপরাশির কখন ধ্বংস হইবে না, তোমার পার্থিব কায় স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে, প্রেমিকের চক্ষে তোমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় বলিয়া বোধ হইবে। প্রেমিকের মনের মত তোমার রূপ। অতএব গুণের প্রলোভনে প্রেমিকের চিত্তকে ভুলাইয়া রাখ, তাহা হইলে তোমার রূপ বাড়িবে। হে ললনা বাঙ্গালিনি! তুমি আর কষ্ট করিয়া স্বীয় সুকোমল ... মাখাইও না, আর সোপ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দেহ ক... করিও না, তাহাতে তোমার রূপ বাড়িবে না, রূপ বাড়েও না ...। যে তোমাকে সুরূপা বলিয়া জানে সেই প্রেমিকের ... তোমার ব্যবহারে, তোমার গুণে আনন্দিত থাকে ... চেষ্টা কর—তোমার রূপরাশি কখন ভাঙ্গিবে না। হে ...! তুমি মান করিয়া করিয়া নায়ককে পায়ে ধরিয়া ...ছে, সাধাও—কিন্তু কেন তুমি তাহাকে প্রকারান্তরে ... যে, ভুবনে আর তোমার ন্যায় সুন্দরী নাই? যদি তুমি ... বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার নিতান্ত ভ্রম ...। এখনও সে বিশ্বাস ত্যাগ কর। বঙ্গদর্শন—১২৮২।

শিশু মনস্তত্ত্বের ভূমিকা

প্রতিমা দাশগুপ্তা

মানুষের সাথে প্রাণিজগতের তফাৎ এই যে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকে বিচার করবার ক্ষমতা রাখে। এই বিচার-ক্ষমতার নানা পথে নানা ভাবে বিকাশ ঘটছে কাল হতে কালে। যে কোনও ঘটনা ঘটলে মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগবার অবকাশ আছে। কেন? মানুষ বুদ্ধিশীল বলেই এ প্রশ্নের একটা উত্তর তার দরকার, যদিও কেউ যুক্তিসঙ্গত উত্তর খোঁজেন, কেউ প্রচলিত ধারণা বা সংস্কারকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। মানুষের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা যত বাড়ছে ততই সে সংস্কারে সন্তুষ্ট না থেকে যুক্তি খুঁজছে। সাধারণ জ্ঞানের সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তফাৎ এই যে, বিজ্ঞান সাধারণ জ্ঞানকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে তবে গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি বিশেষ ধারা আছে। বিজ্ঞান কোন জ্ঞানকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে না যতক্ষণ তা পর্য্যবেক্ষণ আর পরীক্ষায় প্রমাণিত না হয়। আর এই প্রমাণ করবার উপায় হল ঘটনাগুলোকে কার্য্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত করা।

আদিম মানুষ অতিপ্রাকৃত কারণ দিয়ে প্রাকৃত ঘটনার ব্যাখ্যা করত। ক্রমশঃ সমাজ-বিকাশের সাথে সাথে জ্ঞানের বিকাশ হল আর মানুষ মান্ত্রিক, দেবদেবী, ভূতপ্রেত কিংবা ভাবাবেগ দিয়ে ব্যাখ্যা না করে একটা ঘটনাকে অন্য ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে শিখল। যদিও আজও অনেক মানুষ আদিম পন্থাকেই আঁকড়ে আছেন, তবু এ কথা বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ নানা বিষয়ে বিস্তৃত হয়েছে। আজ জল-বাতাস থেকে আরম্ভ করে মানুষের দেহ আর ভূমির গঠনতত্ত্ব পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের জ্ঞানকে বিজ্ঞান কঠিন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর এই জ্ঞানের বলে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকেও ভেঙ্গে গড়ে নূতন করে সৃষ্টি করছে।

কিন্তু এই জ্ঞানের বিকাশের পথটি সরল রেখার মত সোজা নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যতই বাড়ুক না কেন, সাধারণ মানুষ প্রচলিত সংস্কারকে, তা যতই যুক্তিহীন হোক না কেন, নির্বিচারে আজও গ্রহণ করে। উপরন্তু কতগুলো বিষয়ে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সহজে পথ করে নিলেও এমন কতগুলো বিষয় আছে, যেখানে বিজ্ঞান সহজে পাত্তা পায় না। মানুষের নিজের মন আর ব্যক্তিত্ব হল এমন বিষয়। আশ্চর্য্য এই, যে মানুষ বুদ্ধিবলে পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলোকে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা ভাবে করায়ত্ত করেছে, সেই মানুষেরই নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান এত অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হল ভাবাবেগহীন, বুদ্ধিপ্রধান, অব্যৈক্তিক (impersonal), কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই সত্যকে যথার্থরূপে ধরা যায়, এর ব্যতিক্রম ঘটলে মানুষের মনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয় বা সংস্কার দ্বারা সত্য বঞ্চিত হয়ে ওঠে। নিজের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে মানুষ ভাবতে সুরু করেছে এই সেদিন। অগ্রগামী দেশগুলোতে যদিও আজ মানুষের মন আর ব্যক্তিত্বকেও জ্ঞানের বিষয় করা হয়েছে, আমাদের দেশে এখনও আমরা হয় কোনও ধারণা ছাড়াই কিংবা গতানুগতিক সংস্কার (কুসংস্কারও বলতে পারেন) দ্বারাই চালিত হই। এটা একটা মস্ত ভুল, মানুষের জ্ঞান যেখানে বৈজ্ঞানিক পথে হাঁটতে সুরু করেছে সেখানে চিন্তাশূন্য, গোলমেলে গতানুগতিক ভাবধারায় চালিত হবার চেষ্টা অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে ক্রমোন্নতির পথ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

মানুষকে বুঝতে হলে শিশুকে বুঝতে হবে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, শিশুই মানুষের রূপ। প্রত্যেক মানুষই এক দিন শিশু থাকে, ধাপে-ধাপে যেমন তার দৈহিক বিকাশ ঘটে, তেমনি

তার মানসিক বিকাশও ঘটে। অপরিণত দেহ-মন নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে; আর এই কাজটি সুরু হয় জন্মের সুরু থেকে। শিশুও যে এক জন মনসম্পন্ন ব্যক্তি, তা যতই অপরিণত হোক না কেন, এটা যেন কি রকম আমাদের মাথাতেই আসে না। মনে হয়, অনেকে শিশুকে ক্ষুধা-তৃষ্ণাসম্পন্ন একটা দৈহিক যন্ত্রবিশেষ মনে করেন। শিশুর দেহ-মনের বিকাশ নানা অনুকূল অবস্থায় ঘটে, তা না পেলে সুস্থ দেহ বা মানসিকতার অভাব ঘটবে। আজকাল আমরা অনেকে এটা কম-বেশী পরিমাণে জানি যে, যথেষ্ট আর পুষ্টিকর খাবার না পেলে দৈহিক বিকাশ যথোপযুক্ত হয় না। আনন্দের কথা, অনেক বাবা-মা এদিকে সাধ্যানুযায়ী দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করছেন। ঠিক তেমনি পুষ্টিকর আর যথেষ্ট মনের খোরাকও দরকার, যার অভাবে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হবে। এটা এখনও সাধারণের জ্ঞানের বিষয় হয়নি, যদিও পরবর্তী জীবনে সুখ, শান্তি এবং পরিপূর্ণতা লাভে দৈহিক স্বাস্থ্যের চেয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের অবদান কম নয়। বাস্তবিক পক্ষে, দেহ এবং মনের স্বাস্থ্য পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, যেহেতু দেহ এবং মন নিয়েই সম্পূর্ণ ব্যক্তি।

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি। ধরুন, কোনও শিশু দিন-রাত কাঁদে, তাকে কিছুতে থামানো যায় না; কোন দু'-তিন বছরের শিশু খেলা-ধূলা করতে ভালবাসে না, গম্ভীর হয়ে বসে থাকে, কেউ মা ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি ধরলে ভয়ে কুঁকড়ে যায়, তাহলে তাদের ব্যক্তিত্বকে স্বাস্থ্যকর বলবেন, না অস্বাস্থ্যকর বলবেন। মনে হতে পারে, শিশুর আবার ব্যক্তিত্ব কি। হ্যাঁ, শিশুরও ব্যক্তিত্ব আছে। ব্যক্তিত্ব হল পরিবর্তনশীল, ক্রমবর্দ্ধমান কতগুলো দৈহিক এবং মানসিক প্রক্রিয়ার একটা বিশেষ সংগঠন, যা অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের সাথে পারিপার্শ্বিকতার সংযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিশেষ সংগঠন কথাটা মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পর হতে ভিন্ন, ঠিক একই মানুষ দু'জন দেখতে পাওয়া যায় না। সব মানুষের মধ্যেই কতগুলো মৌলিক প্রবৃত্তি কিংবা প্রয়োজন-বোধ আছে, সে হিসাবে তারা এক। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ কতগুলো দৈহিক এবং হয়ত মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, যেগুলো মৌলিক প্রয়োজন-বোধগুলোর সাথে মিলিত হয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আওতায় একটা বিশেষ ধারায় গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ ধারাটি কাজেই শুধু জন্মগত কিংবা অবস্থাগত না হয়ে দু'য়ের একটি অপূর্ব সংমিশ্রণ। এ সংগঠন আবার পরিবর্তনশীল, ক্রমবর্দ্ধমান, ফলে এই পরিবর্তন আর বৃদ্ধিকে যথোপযুক্ত পথে চালিত করার প্রয়োজন খুব বেশী। এক জন লোক হাসিখুসী, কর্মঠ স্বাস্থ্যবান, আর এক জন রোগা পিটখিটে, কেউ অসম্ভব রকম আত্মপরায়ণ, কেউ নিজের সাথে পরিবার এবং সমাজের আর পাঁচ জনের সংযোগ অনেক বেশী মাত্রায় অনুভব করেন। কেউ আত্মনির্ভর, কেউ পর-নির্ভর। কেউ অতি অল্পেই ঘাবড়ে যান, কেউ সহজে বিচলিত হন না। এ জাতীয় নানা প্রকার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ অহরহ আমাদের চোখে পড়ছে, কেন এ রকম ঘটে এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং এ কারণটা মানুষের বেড়ে ওঠার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে। জন্মগত কতগুলো প্রবৃত্তি, প্রেরণা আর প্রয়োজনের সমষ্টি যে শিশু, সে বেড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে নানা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে। এই বেড়ে ওঠার ইতিহাসটি আমাদের বুঝতে হবে, এও বুঝতে হবে, এ কাজটি সুরু হয় জন্মমুহূর্ত থেকে। তার দৈহিক বৃদ্ধি সুরু হয় আরও আগে, মাতৃগর্ভে তার অবস্থানের সাথে-সাথেই। শিশুকে বোঝবার প্রয়োজনীয়তা যদি আমরা স্বীকার করি তবে যেদিকে আমাদের খুব বেশী দৃষ্টি দিতে হবে তা হচ্ছে বৃদ্ধি, দৈহিক এবং মানসিক। সদ্যজাত শিশুর দৈহিক প্রকাশ ক্ষমতা এবং ব্যবহার এক বছরের শিশুর চেয়ে ভিন্ন, ঠিক তেমনি এক বছরের শিশুর চেয়ে দু'বছরের শিশুর দৈহিক প্রক্রিয়া এবং ব্যবহার জটিলতর। এই ক্রমোন্নতিকে যথোপযুক্ত করতে হলে শিশুর দেহ-মনকে বাড়বার সুযোগ দিতে হবে ও শিশুর ব্যবহারগুলোকে শুধুই দৈহিক প্রক্রিয়া না ভেবে মানসিক প্রক্রিয়া বলেও ভাবতে হবে।

এখানে একটা প্রশ্ন আছে। মানুষের ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে কি, জন্মগত (heridity) বা অবস্থাগত (invironnoment) কারণ এ নিয়ে বহু মতবিরোধ আছে। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষের গুণাবলীকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জন্মগত মনে করতাম, এই জন্মগত কারণই মানুষের সাথে মানুষের প্রভেদ সৃষ্টি করছে। কেউ জন্মায় বড় হয়ে, কেউ ছোট হয়ে, কেউ ভাল হয়ে, কেউ মন্দ হয়ে। সোজা কথায় গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না। একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, পিতৃপুরুষদের রক্তের মধ্যে [illegible] বা দোষ বইছে, সেই বংশগত গুণাবলী নিয়েই জন্ম [illegible] রক্তের মধ্য দিয়ে কিন্তু কোনও গুণ সঞ্চালিত হয় না, [illegible] (germ eall) মধ্য দিয়ে যা পিতা-মাতার সম্মিলিত [illegible] এবং যার মধ্যে পিতামাতার এবং পিতৃপুরুষদের কোন [illegible] বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। যে বৈশিষ্ট্যগুলো এ ভাবে [illegible] সঞ্চালিত হয় সে সম্বন্ধে বহু মতবিরোধিতা আছে। কেউ বলেন, এগুলো সম্পূর্ণ ভাবে দৈহিক। মানুষ তার দৈহিক [illegible] গঠন আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাবলী, স্নায়ুমণ্ডলী, মস্তিষ্ক, [illegible] দৈহিক (স্নায়বিক এবং মাস্তিষ্ক) সংগঠন যে জন্মগত [illegible] এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার। যেমন কাল চোখ [illegible] মেয়ে কাল চোখ পায়। অনেকে বলেন, এ ছাড়া [illegible] এবং বুদ্ধিও লোকে জন্মগত ভাবে পায়। অনেকের মতে [illegible] ভাবেই জন্মগত আবার কারু কারু মতে এগুলোর [illegible] জন্মগত। প্রথমোক্ত দলের মতে শিক্ষার দ্বারা মানুষকে [illegible] গড়ে তোলা যায়। অনুকূল আবহাওয়ার এবং যথো[illegible] ব্যবস্থার দ্বারা কারুকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা লেখক [illegible] অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়োক্ত দলের কারু কারু মতে [illegible] খুব কম। প্রত্যেক মানুষ যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে [illegible] সীমারেখার মধ্যেই শিক্ষার কারিকুরী চলে, যে [illegible] ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে তাকে কিছুতেই অন্য রকম [illegible] সম্ভব নয়।

মানুষ সম্বন্ধে আজকের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের [illegible] মতবাদকেই চরম বলা যায়। চরিত্রের কতগুলো বৈশি[illegible] যে জন্মগত ভাবে মানুষ পেতে পারে তা অস্বীকার [illegible] যেমন ধরুন, সঙ্গীতে কেউ জন্মগত ভাবেই একটা [illegible] নিয়ে জন্মায়, কিংবা খুব বড় একজন বৈজ্ঞানিক [illegible]
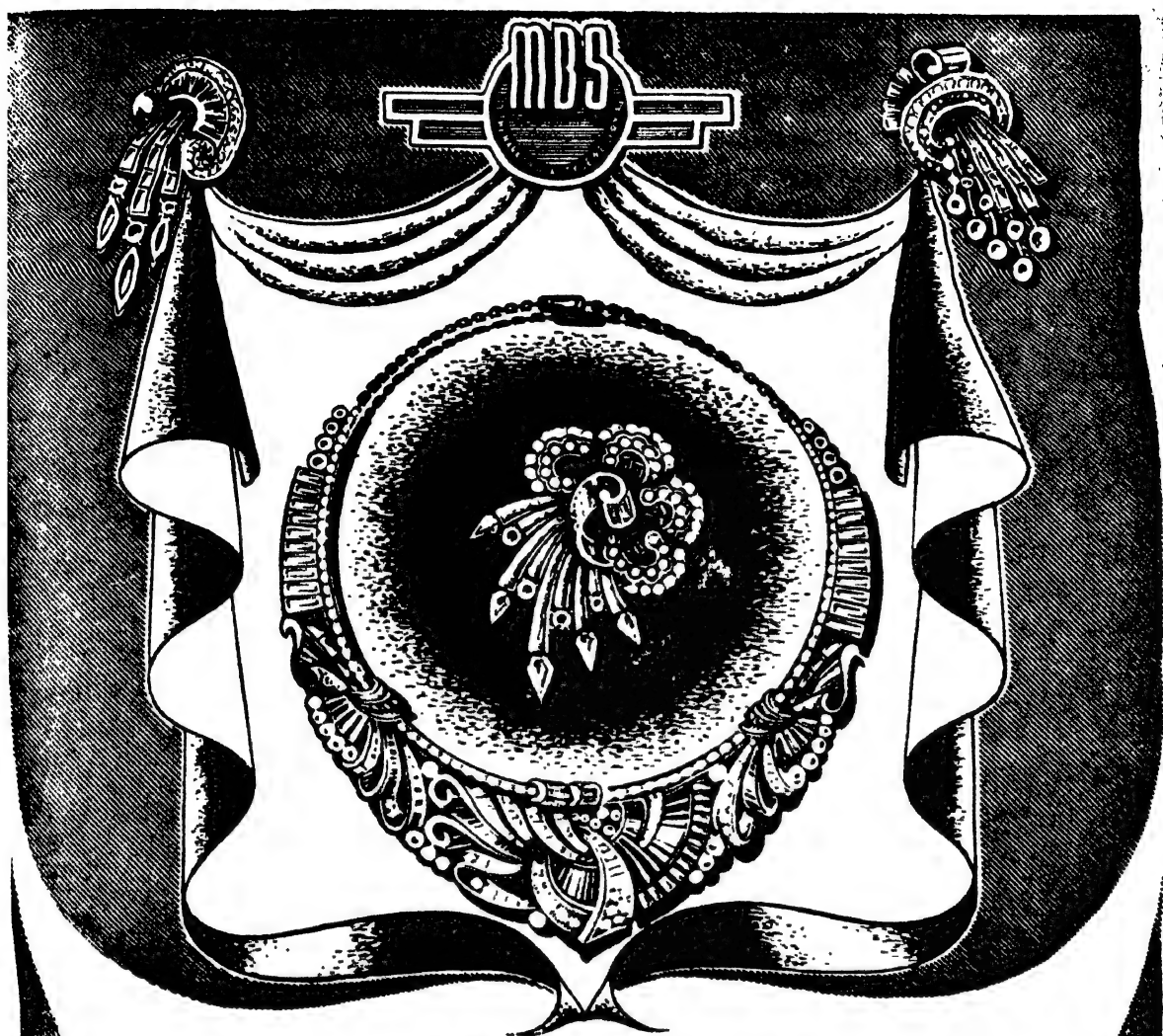
MBS

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রতিভা শুধুই শিক্ষাগত নয়। কিন্তু আবার এ-ও তেমনি সত্য যে, সে রকম জন্মগত প্রতিভা ছাড়াও শিক্ষার দ্বারা সঙ্গীতকে কেউ অনেকটা আয়ত্ত করতে পাবেন, কিংবা বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেন। যে গুণগুলো বংশগত হলে পারিপার্শ্বিক সহায়তার উপব কম নির্ভর করে (একেবারেই নির্ভর করে না তা নয়, অনেক প্রতিভা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় নষ্ট হয়ে যায়) সেগুলোই বংশগত না হলেও চেষ্টা এবং যত্নকৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অনেকটা আয়ত্তাধীনে আসে। কাজেই বংশগত গুণাবলী যদি আমরা অস্বীকার না-ও করি তবু বংশগত এবং অবস্থাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা সীমারেখা টানা অসম্ভব। অন্তত সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এ কথা খাটে। যে ছেলে শিক্ষার অভাবে কিংবা কুশিক্ষায় অপরাধপ্রবণ হয় সেই ছেলেই শিক্ষার বলে হয়ত এক জন ডাক্তার হয়ে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজে আসতে পারে। কারণ অপরাধপ্রবণতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি হিসাবে তার যে মৌলিক প্রয়োজন মিটছিল সেটা সামাজিক ভাবে মিটবার সুযোগ পাবে।

সোজা কথায় শিশু যখন জন্মায় সে অত্যন্ত গঠনক্ষম থাকে, দৈহিক এবং মানসিক উভয়তই। তার ফলে সুগঠিত হবার সুযোগ দিলে, সুযোগের অভাবে যা ঘটবে তার চেয়ে বহু গুণে ভাল ফল পাওয়া যাবে, আজকের বিজ্ঞান এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে। এমন কি বংশগত গুণাবলী পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যও সুযোগের প্রয়োজন। ধরুন, রাম খুব বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু পিতা-মাতার অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্যের চাপে পড়ে সে বুদ্ধির বিকাশ হয়নি। সে কারখানার এক জন সামান্য শ্রমিক ছাড়া আর কিছু হয়নি, শ্যামের বুদ্ধি রামের চেয়ে বংশগত ভাবে অনেক কম, কিন্তু তাকে সুশিক্ষা দেওয়ায় তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। পারিপার্শ্বিক সহায়তায় ব্যবসায় নেমে সে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই বাস্তব জীবনে শ্যামের বুদ্ধি রামের চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশিত হয়েছে যদিও জন্মগত ভাবে তা রামের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। অতএব রাম এবং শ্যাম উভয়ই যদি সমান শিক্ষার সুযোগ না পায় এবং একই পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে বড় না হয়ে ওঠে তবে কার বুদ্ধির প্রকাশ কতটা অবস্থাগত এবং কতটা জন্মগত তা বিচার করবার আমাদের কোনও উপায় নাই। মানুষ যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় সেগুলো অচল এবং নানা ভাবে প্রকাশক্ষম, কোনও অনড়, ছাঁচে-গড়া কিছু নয়, কাজেই একই পারিবারের দু'টি ছেলে পরস্পরের অনুরূপ হলেও পরস্পর হতে ভিন্ন। মানুষের শিক্ষা-ক্ষমতা এত বেশী যে তার নানা ভাবে গড়ে ওঠবার অসংখ্য সম্ভাবনা আছে। কাজেই 'যার যা হবার তা হবেই' এ জাতীয় মতবাদ কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। শুধু তাই নয়, মানুষের নানা জাতীয় সুযোগ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে অবস্থাগত শিক্ষা যখন পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ করে তখনই সে শিক্ষা সম্পূর্ণ, সে শিক্ষাকে হতে হবে পরীক্ষামূলক, বহুধা বিস্তৃত।

এখন দেখা যাক, শিশু যখন জন্মায় তখন কি তার রূপ। জন্ম-মুহূর্তে তাকে কতগুলো প্রবৃত্তি এবং জন্মগত দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বলা যেতে পারে এবং ব্যক্তিত্বের এই হল আদিম উৎস। এ প্রবৃত্তিগুলো যদিও সকলের মধ্যেই আছে, তারা অচল, অনড় নয়, তারা বাড়ে, বদলায় (সম্পূর্ণ না হলেও রূপ পরিবর্তন করে), বিকৃত হয়। তারা সাদা কথায় জলের মত তরল, বরফের মত কঠিন নয়। জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন রূপ ধারণ করে, প্রবৃত্তিও তেমনি নানা ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা রাখে। অনেক জন্মগত বৈশিষ্ট্য জন্মকালে অপ্রকাশিত থাকে, ধীরে ধীরে স্বভাবতই তাদের প্রকাশ, বিকাশ, এবং পরিণতি লাভ হয় (maturation) এ হল শিক্ষা-নিরপেক্ষ, কিন্তু এ স্বভাবজাত বৃদ্ধির সাথে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে থাকে (learning), কাজেই কোন বৃদ্ধি স্বভাবজাত এবং কোন বৃদ্ধি শিক্ষাজাত তা বলা কঠিন। ঠিক কি যে 'দত্ত' (given) আর কি যে 'গৃহীত' (acquired) তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব, যদিও 'দত্ত' কিছু যে আছে তা অনস্বীকার্য। তাকে আমরা মোটামুটি জীবনাবেগ কিংবা উত্তেজনাক্ষম জীবিত পদার্থ বলতে পারি। এই জীবনাবেগ শিশুর নানা কার্য্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং মূলতঃ এ হল সাধারণ অনুভব-ক্ষমতা, প্রেরণা (যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা) আর প্রবৃত্তি বা মৌলিক প্রয়োজন। এদের পরিপূর্তির সহায়ক হল শিশুর দেহ, জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা।

তোমার পথে

প্রসূতি দেবী

জীবন-পথে চলিতে যবে বাহির হ'নু আমি
বুঝিনি মোর সুরুর আগে পড়িতে হবে থামি।
সুখের প্রাতে দুখের রাতে সাথী যে কয় জনা
কখন তারা হয়েছে হারা থেমেছে আনাগোনা।

তুলেছি তাল বেজেছে বীণ গেয়েছি কত গান
ভরেনি হৃদি আঘাতে নিতি ভাঙ্গিয়া গেছে প্রাণ।
বেসেছি ভাল বেসেছে ভাল নিয়েছি কত আর
দিয়েছি কম, পেয়েছি বেশী, মেনেছি কত হার।

এসেছে কত গিয়েছে কত গভীর ছোঁয়া দিয়ে
বুকের মাঝে সে সুর বাজে অসহ ব্যথা নিয়ে।
মনের বনে গহন-কোণে রক্ত-রঙ্গিন খেলা
খেলেছে যারা আপনহারা চোখের জল ফেলা।

গোপন রাতে আপন-হাতে মুছিতে হবে তারে
অধর-কোণে হাসির সনে নয়ন-জলে ভরে।
আজিকে যারে চাহিছে তারে কালিকে যাবে ভুলে
গভীর প্রেমে ক্ষণেক নেমে মন যে ওঠে দুলে।

মিথ্যা কথা ভোলার ব্যথা মনে রাখার চেয়ে
কঠিন বেশী, যেমন তরী উলোট স্রোতে বেয়ে।
চলিতে হলে নদীর তালে তরণী যাবে ঘুরে
তেমনি মনে নীরব রণে মরিতে হবে ফিরে।

তোমার পথে আমার রথে চালাব আমি প্রিয়
নীরবে মোর বাঁধন-ডোর খুলিয়া তুমি দিও।

সেই কথাটি

শ্রীবাসবী বসু

নিতুই কেন সাঁঝের বেলায় পিদিমটি যাই জ্বেলে—
সেই কথাটি সেদিন তুমি জানতে চেয়েছিলে,
সামনে তোমার সেই কথাটি জানাতে পাই লাজ
তাই লেখনীর গোপন পাতায় জানিয়ে দিলেম আজ।
ম্লান আলোতে মুখটি তোমার দেখতে যদি পাই
সেই আশাতে নিত্য আমি পিদিম জ্বেলে যাই।
নিত্য যখন প্রভাত বেলায় আলোয় আকাশ ভরা
তোমার কাছে যাবার আমার কিসের এত ত্বরা
অরুণ আলোয় সজল কুসুম যেমন ঝলমলে
তেমনি তোমার নয়ন ত্ব'টি আমায় কী যে বলে
আজকে আমি জানিয়ে গেলেম সকল লজ্জা টুটে
বারে বারে সেই চাহনিই দেখতে আসি ছুটে।
নিত্য যখন পাখীরা সব মিষ্ট মধুর বোলে
এই ধরণীর হৃদয়খানি মধুর কোরে তোলে
কোন্ মধু তায় মধুর করে সেই কথাটি জানি
তার মাঝে যে লুকিয়ে আছে তোমারই গানখানি
তাই তো তোমার মধুর বাণী শুনতে বারে বারে
লুকিয়ে আসি গভীর রাতের গহন অন্ধকারে।
এই জীবনের মাঝখানে মোর নিত্য সকাল-সাঁঝে
কোন মাধুরী মিশিয়ে দেছ দিনের সকল কাজে
কিসের লাগি হৃদয় আমার তোমারই গান গাহে
ব্যাকুল হিয়া প্রতীক্ষিয়া তোমারই পথ চাহে ?
সেই কথাটি জানাতে আজ এলেম অভিলাসে
ধন্য আজি পূর্ণ হৃদয় তোমায় ভালবেসে।

পরিবর্তন

পুষ্প দেবী

লোকে হাসতো, বলতো, মা গো, বুড়ো বয়সে কী সাজের ঘটা ? আরসীতে কি নিজের মুখ দেখতে পায় না ? কিন্তু কেউ খবর রাখতো না তাদের মনের। বিশ বছরের সুঠাম সুন্দর তরুণ যেদিন বার বছরের কিশোরী মেয়েকে ঘরে এনেছিল তার পর প্রতি দিনে দিনে যে পরিবর্তন তাদের দেহে এসেছে, তা তাদের মনের মধ্যে পৌঁছয়নি। বাস্তবের র[illegible] তাদের মুখের উপর গাঢ় ছায়া ফেলতে পারেনি, মন তাদের সেই সবুজ র[illegible]য়েই ভরপুর ছিল। এই অপরাধটুকু সংসার ক্ষমা করতে চায় না।

অমর গিছলো পাটনায় বন্ধুর বাড়ী। পারুল সেখানকার মেয়ে। তাকে দেখে অমরের বড্ড ভালো লেগেছিল। কিন্তু সে তো আজকের যুগ নয় ? অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্কোচে অমর সে কথা দিদিমাকে দিয়ে মাকে জানালো। স্নেহময় পিতা নিজে গিয়ে মেয়ে আশীর্বাদ করে এলেন। কামনালব্ধ ধন পেয়ে অমরের আনন্দের সীমা রইলো না। পারুলেরও এই নতুন কিশোরী জীবনে প্রবল প্রেমের আকর্ষণ গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই মুগ্ধ তরুণ ভক্তের কাছে সেও নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। ত্ব'জনেরই তখন কিশোর বয়স। দেহের আকর্ষণ কারুরই মনে প্রভাব ফেলেনি। অতি সুন্দর পবিত্র কু[illegible] মতই ত্ব'জনের জীবন ফুঠে উঠলো। ত্ব'জনের দেহের ও মন[illegible] সব কিছু নতুন সবই সাথীর হাতে প্রথম তুলে দিয়ে তাদের প্রা[illegible] সে কী পরিতৃপ্তি !

ভোর বেলা শাশুড়ী মায়ের পূজার ফুল তুলতে যেতো পার[illegible]। পড়ার ঘর থেকে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এসে অমর হত তার স[illegible]। লাল পাড় গরদের সাড়ী-পরা সদ্যস্নাতা পারুল তখন যেন বড় [illegible] হয়ে উঠেছে। জুতো পরে বাসী কাপড়ে তাকে তখন ছোঁবার উপায় নেই। উঁচু গাছের ফুল ডাল শুদ্ধ নুইয়ে দেওয়া বা শিউলী গাছের ডাল ধরে ঝাঁকি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো সাহচর্য্যের উপা[illegible] নেই তখন। তবুও কি ত্বর্নিবার আকর্ষণ ! বিকেলে ত্ব'জনে ত্ব'দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে একত্র হবার যে কি গভীর আনন্দ ছিল, তা আজকালকার অবাধ মিলনের দিনে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বন-জঙ্গল পেরিয়ে নিভৃত পুকুর-পাড়ে বসে অমর বাজাতো বাঁশী আর তারি কোলে মাথা রেখে তন্ময় হয়ে পারুল নির্ণিমেষে সেই প্রিয় মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। হয়তো এক-এক দিন সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত, বাড়ীতে খোঁজ পড়তো পারুলের। গৃহকর্ত্তা হরনাথ বাবু বলতেন, দেখো তো অমর পড়ার ঘরে আছে কি না ? দেখা যেত, সেখানেও এক জন নিখোঁজ। নীরব স্নেহময় হাস্যে বৃদ্ধের মু[illegible] ভরে উঠতো। গৃহিণীর গুরু-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলতেন, এক দিন বিপদ বাধাবে ত্ব টোতে দেখছি। সাপ-খোপ কিছুরই ভয় নেই ওদের।

আর এক দিন এমনি রাত হওয়ায় কর্ত্তার আদেশে দরোয়ান গেট বন্ধ করে দিয়েছিল পারুলের তো ভয়ে কান্না পাবার জোগাড়। কিন্তু অমর একটুও দমেনি। নিজে পাচীলের ওপর উঠে অবলীলা-ক্রমে পারুলকে ভেতরে নাবিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তাতেও বিপদ কাটেনি। বাড়ীর দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ, শেষে বামুন ক[illegible] রান্না-ঘরের দরজা খুলে তাদের বাড়ীর ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সকালে উঠে আর কারুর দিকে মুখ তুলে চাই[illegible] পারে না পারুল। আর একবার বাপের বাড়ী থেকে পারুলে[illegible] ফিরতে ত্ব'-চার দিন দেরী হয়েছিল। হঠাৎ পারুলের বাবার কাছে তা[illegible] নামে এক টেলিগ্রাফ হাজির।—'পারুলকে শীঘ্র পাঠাও।' নানা বিপদের আশঙ্কায় মহা বিব্রত হয়ে ভদ্রলোক মেয়ে নিয়ে [illegible]। পরে ত্বই বৈবাহিকে দেখা হতে প্রকাশ পেল ঘটনা। টে[illegible] কথা হরনাথ বাবু বিন্দু-বিসর্গ জানেন না। উচ্চ হাস্যে [illegible] মুখরিত করে তিনি বললেন, এ সব অমরের কাণ্ড। এবা[illegible] বাড়ী ফিরতে পারুলের ঠাকুরদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রশ্ন করলেন, বা[illegible] কি বল তো ? পারুলের বাবার সে এক সমস্যা। শেষে [illegible] পারুলের ঠাকুর্দা পারুলকে চিঠি লেখেন, 'দিদি, টেলি[illegible] করিয়াছিল।'

তাস দাবা পাশা বন্ধু-বান্ধব পান-সিগারেট কোন প্র[illegible] অমরের ছিল না। গভীর যত্নে এই সব রকম সংস্রব থে[illegible] হরনাথ বাবু সরিয়ে মানুষ করেছিলেন। লেখাপড়া, বই, [illegible] বাঁশী বাজান—এ ছাড়া বাইরের জগতে তার শুধু ছিল বাবা [illegible] অমর ভয় করতো না, সম্ভ্রম করতো আর ভালোবাসত প্রা[illegible] তার এই সঙ্গিসাথীহীন জীবনে প্রথম মাধুর্য্য এনে দিয়েছি[illegible]।

[illegible] পেয়েই অমরের জীবন পরিপূর্ণতায় ভরে উঠেছিল। পারুলই [illegible] জীবনে গভীর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক মুহূর্ত পারুল না [illegible] চলতো না।

[illegible] এক দিনকার কথা মনে পড়ে। কি জানি কি কারণে পারুল [illegible] শাশুড়ী মায়ের কাছে শুয়েছিল। অমরের তখন মাথার ওপর [illegible] পরীক্ষা। পড়া শেষ হতে সে ঘরে এসে দেখলো পারুল নেই, ঘরের কোণে ছিল অর্গানটা, কিছু করতে না পেরে সেইটেই বেতালা বেসুরো ভাবে বাজিয়ে চললো। ঘণ্টা খানেক বাদে মা পারুলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পারুলের পরনে ছিল লাল টুকটুকে শাড়ী, লজ্জায় তারও চেয়ে লাল হয়ে পারুল বলেছিল, কি কাণ্ড তোমার পাগলের মত? অমর বলেছিল জানো তো পাগল করো কেন?

অমরের চিঠি সাধারণ টিকিটে যেত না। মস্ত খামে করে অনেক টিকিট দেওয়া সে চিঠি লজ্জায় মাথা হেঁট করে পারুল নিতো, কিন্তু গভীর আনন্দে বুক তার উচ্ছলিত হয়ে উঠতো। বাপের বাড়ীতে যেটুকু সময় থাকতো চিঠি লিখতেই কেটে যেত। এ নিয়ে সেখানে সমবয়সী মহলে কম কথা শুনতে হয়নি পারুলকে। এই সংসার-অনভিজ্ঞ দুই কিশোর-কিশোরীকে যাঁরা একত্র করে দিয়েছিলেন, সেই দুই বৈবাহিকের স্নেহের প্রশ্রয়ে তারা নির্বিবাদে বেড়ে চলেছিল। বাপের সঙ্গে কোথাও বিদেশে যেতে গেলে পারুল নিঃসঙ্কোচে বাবাকে বলতো, ওখান থেকে যে এক দিনে চিঠি যাবে না বাবা? বাবা অনেক হাঙ্গাম করে যথাসময়ে চিঠি পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে তবে মেয়েকে নিয়ে যেতে রাজী হতেন। আবার অমরও যখন ক্লাস কামাই করে পারুলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, হরনাথ বাবু হেসে বলতেন, কি হে অমর, তোমাদের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে তো দেখছি বেজায় ছুটি। এই [illegible]বুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধের অজানা কিছুই ছিল না। অমর বিব্রত হয়ে [illegible] দাঁড়িয়ে থাকতো।

[illegible] কোথাও নেমন্তন্ন হলে পারুল শরণ নিতো শ্বশুরের। বলতো, আমি যাব না বাবা, অনেক রাত হয়ে যাবে, ভীষণ ঘুম পায় আমার। কর্তা গৃহিণীর কাছ থেকে বধূর ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিতেন। [illegible] না পড়ায় ক্ষতি হবে বলে। আর একবার গৃহিণীর [illegible] বিয়েতে তিনি একটু জোর করেই পারুলকে নিয়ে [illegible] সত্যি তাঁরও তো সখ-সাধ আছে, অমন সুন্দর বউ কেউ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে অমর গিয়ে হাজির, বাবা পারুলকে পাঠিয়ে [illegible]। যখন তারা দু'জন ফিরলো, হরনাথ বাবুর তখন [illegible]। গয়নার রাশ খুলে ফেলে বাঁচলো পারুল, কিন্তু ময়ূর-[illegible] বেনারসীটা অমর কিছুতে ছাড়তে দেয়নি, সারা রাত ধরে [illegible] অমরের আশ আর মেটে না।

[illegible] বড্ড লোভ ছিল পারুলের আলতা-পরা পায়ের ওপর। [illegible] সাজ-গোজের ওপর অমরের অত লক্ষ্য ছিল না। [illegible] বিষয়ে তত সচেতন ছিল না। কিন্তু আলতা না পরলেই [illegible] পড়তো। বহু দিন রাতে নিজ হাতে করে আলতা [illegible] সে। অমর যখন কলেজ থেকে ফিরতো, শত কাজ [illegible] গিয়ে জানলায় দাঁড়াতো। দেখতে পেলে দু'জনের মুখ [illegible] সার্থকতার আনন্দে। পারুলের বিয়ের পর কি এক কারণে [illegible] কয়েক দিন পেছিয়ে গেছলো। গলির দিকে জানলায় বসে পারুল আনমনে [illegible], হঠাৎ দেখে রাস্তা থেকে অমর নির্ণিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে আছে। তার স্বল্প জীবনে ঠিক এ ধরণের দৃষ্টি আর দেখেনি পারুল, তাকে যে কারুর এত ভালো লাগতে পারে এ কথা সেদিন সে প্রথম জেনেছিল। যে ঘরে সে থাকতো তার দরজায় পুরু কাপড়ের পরদা দেওয়া। সামনের ঘরে চায়ের আসর বসতো। মেঝেতে আসনে বসে শাশুড়ী মা [illegible] করতেন। অমর আসতো চা খেতে, তার সুন্দর ফরসা হাতে হলদে সূতোয় দূর্ব্বো-বাঁধা, প্রিয় পরিচিত হাতটি পরদার তলা দিয়ে দেখে দেখে পারুলের যেন আশ মিটতো না।

সেবার দেওঘরে এক দিন বেড়াতে গিয়ে কি এক লতানে ফুল তুলে অমর সাজিয়েছিল পারুলকে, তার পর বাড়ীতে ফিরতে সে কি বকুনি খেলো দু'জনে, সত্যি সত্যি বৌ-মানুষকে কি অমনি করে ফুলের গয়না পরে আসতে আছে রাস্তা দিয়ে? তাদের জীবনে যা-কিছু রোমান্স যা-কিছু আনন্দ তা শুধু দু'জনকে নিয়েই। সে আনন্দের পরিপূর্ণতার জন্যে গয়না কাপড় মোটর সিনেমা কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। কখনো বা পারুল পড়তো কবিতা, অমর মুগ্ধ হয়ে শুনতো। কি কবিতা কার কবিতা সবই সেখানে ছিল অবান্তর, একমাত্র দ্রষ্টব্য ছিল পাঠিকা। এমনি আনন্দের মধ্যে তারা চলেছিল। সংসারে দুঃখ ছিল না তা নয়। কিন্তু তাদের যুগল প্রাণের সরসতা সেটা হাসিমুখে সয়ে যাবার শক্তি তাদের দিয়েছিল।

তার পর দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সংসারে কত কি পরিবর্ত্তন এলো গেলো, কিন্তু তাদের মনে আজো সেই রং অটুট। বাড়ীতে জামাই এসেছে, রঙ্গীন কাপড় পরতে কুণ্ঠা হয় পারুলের, কিন্তু অমর বুঝতে চায় না। বলে, কি যে বিধবাদের মত কাপড় পর তুমি, দেখলে মনে হয় আমি বুঝি মরে গেছি। মনে মনে শিউরে উঠে পারুল বলে, যা-তা বোলো না, রঙ্গীন কাপড়ই পরব আমি। বাড়ীতে ও পাড়ায় কানাঘুষোর সীমা থাকে না—মা গো, জমাই-এর সামনে কি সাজের ঘটা! এক দিন কি একজিবিসান দেখতে গিয়ে লাল টুকটুকে একটা গালার কানের গয়না নিয়ে এল অমর। এক্ষুণি পরা চাই—দেখে দেখে অমরের আশ যেন মেটে না।

পারুলের মুখের চামড়া কুঁচকে এসেছে, সামনের চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু কিছুই কি অমর দেখতে পায় না? পারুল কুণ্ঠিত হয় কিন্তু এই উদ্দাম পাগলকে বাধা দিতে পারে না। মনে মনে ভাবে, বাইরের লোকে কি ভাববে বলে ওকে কষ্ট দেব আমি?

কোথাও নেমন্তন্ন যেতে হলে পাঁচ বার পারুলকে সাড়ী বদলাতে হবে—অমরের কি সে ঝোঁক? সেই জামদানী সাড়ীটা পরো না? না, সেই কালো জংলা বেনারসীটা। হাসে নাতি-নাতনী হাসে বৌ-মেয়ে। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যায় পারুল। বড় নাতনী স্কুলে পড়ছে, সে একটা কমলা রংএর জর্জ্জেট পরে দাঁড়ায় নাতনীর পাশে জংলা সাড়ী পরে যেতে ভীষণ লজ্জা করে পারুলের। কিন্তু মুখখানা ধরে অমর যখন বলে, এ ভুবন-ভোলা রূপ। পারুল অমরের মুখ চেপে ধরে বলে, কি যে বলো তার মাত্রা থাকে না। বুড়ী হচ্ছি তাও কি দেখতে পাও না? শেষে রফা হয়, অমর বলবে না। আমার ভুবনভরা রূপ বলবো তাতে তো আপত্তি নেই। মায়ের সাজে মায়েরা কুণ্ঠিত হয়। পাড়ায় পাঁচ জনের কাছে নাতনী নানা কথা শোনে। এক দিন নাতনী রমা এসে বললো, [illegible]

আছে, সামনের বাড়ীর ছায়া বললো তোর দিদি তো সাজবুড়ী—দাঁত পড়ে গাল তুবড়ে গেছে তবু কি সাজের ঘটা! অমর বোধ হয় শুনতেই পেলো না কথাটা। অন্যমনস্ক ভাবে শুধু হুঁ বললো। পারুল শুনলো কথাটা—কিন্তু অমর যে কিছুতে বুঝতেই চায় না, বলে, কে কোথা কি বলেছে বলে তুমি আমার আনন্দে বাদ সাধবে?

পারুলের মনে একটা দুর্ব্বল জায়গা ছিল—সে অমরের স্বাস্থ্য। ছোট বেলায় নিমোনিয়া হয়েছিল তার, অনেক কষ্টে তা থেকে বাঁচলেও কঙ্কাল রোগ তার কিছু রেখে যেতে ছাড়েনি। ফলে হার্ট ড্যামেজ হয়ে গেল বরাবরের মত। ভালো স্কলার হয়েও তাই অমর সরকারী চাকরী পেলো না। একটা সামান্য চাকরীতে নিযুক্ত হল অতি অল্প বেতনেই। প্রিয়তম স্বামীর প্রতি অদৃষ্টের এই নিদারুণ পরিহাস পারুলের বুকে গভীর হয়েই বেজেছিল। অসুস্থ স্বামী ট্রামে-বাসে করে কি কষ্টে যে উপার্জ্জন করে আনেন, সে কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলতে পারতো না। সেই পয়সায় বিলাসিতা করা সম্ভব নয় কিন্তু অমর তা বুঝতো না, বলতো আমারও তো সাধ হয়? স্নো-পাউডার সেন্ট-ক্রীম এ সবের প্রয়োজন তার ছিল না। পা দু'টি আলতায় টুকটুকে, কপালে সিঁদূরের টীপ আর হাতে রঙ্গীন কাচের চুড়ী আর রঙ্গীন সাড়ী পারুলের পরনে—এইটুকু মাত্র ছিল তার সাধ।

ডাক্তাররা বারে বারে বলতো, অমরের স্বাস্থ্য মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়; হৃৎযন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল, যে-কোন সময়ে তা বিকল হতে পারে। তারো চেয়ে দুর্ব্বল ছিল অমরের মন। সহজেই বড় বেশী আঘাত পেতো সে। এই আপনভোলা মানুষটিকে নিয়ে পারুলের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। স্বার্থপর সংসারে জাল-চাতুরীর অভাব ছিল না, যে যেভাবে পারতো অমরকে ঠকিয়ে নিতো, ঘরের কোণে পারুল জ্বলে মরতো সেই দাহে। সংসারের শত অভাবের মধ্যে পারুল অমরের ঔষধ ও আহারের বিন্দুমাত্র অভাব সইতে পারত না, সে জন্য পরিশ্রমের তার অন্ত ছিল না। কিন্তু দেবে কি? অদৃষ্টের পরিহাসে সব কিছু ভালো জিনিষেই তো অমর বঞ্চিত। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ দৈহিক সম্বন্ধ তাদের বহু দিনই শেষ হয়ে গিছলো, কিন্তু অন্তরের গভীর প্রেম তাতে আরো সুগভীরই হয়েছিল—এক বিন্দু কমেনি।

অমরের মনে হত, সেই তরুণী পারুলের চেয়ে এ পারুল যেন আরো সুন্দর, এ যেন ভোগবতী পার হয়ে অমরাবতীতে পৌঁছেছে, এ মহিমান্বিতা সৌন্দর্য্যের যেন তুলনা হয় না। আর পারুলের মনে হত, এমনটি আর দেখিনি ত কভু আমার যেমন আছে। তার চোখে অমরের সেই প্রথম দিনের দেখা অতুল রূপ চিরদিন অটুট ছিল। সেই পাটনায় হলদে জিনের কোট আর কালো পাড় ধুতি-পরা ফর্সা ছেলেটি—টকটক করছে রং, কালো কোঁকড়া চুল আর বিস্ময়-বিমুগ্ধ দু'টি চোখ, তাতে স্নেহ ও ভালোবাসা যেন ঝরে পড়ছে।

পারুলের সখ ছিল গাছের, কলকাতায় স্থানের দুর্লভতা তাকে আটকাতে পারেনি। টবে গামলায় নানা রকম ফুলগাছে তার ছাদ-বারান্দা ভর্ত্তি ছিল। যতক্ষণ অমর বাড়ীতে থাকতো সেই পারুলের হাতে তৈরী কুঞ্জবনে ইজি-চেয়ারে বসে বইএর মধ্যে ডুবে থাকতো, সে বই ও পারুল ছাড়া আর কিছু সম্বন্ধেই সে সচেতন ছিল না।

সংসারে এমন ঘটনাও হয় যা কেউ কখনো ভাবেনি। পারুল মারা গেল, অমর প্রথমে যেন অবাক হয়ে গেলো। তার পর আস্তে আস্তে উঠে এসে দাঁড়ালো পারুলের শিয়রে। পারুলকে খাট শুদ্ধ নিয়ে এসেছে বারান্দায়। আজ পারুলের সাজে কারুর কুণ্ঠা নেই। বিয়ের লাল টুকটুকে জংলা বেনারসী তার পরনে। মাথায় লাল টকটকে সিঁদুর। সে সিঁদূরের আভায় পারুলের টকটকে ফরসা রং আরো যেন সুন্দর লাগছে। কপালে তাঁর চন্দন আঁকা, কাঁধের ওপর সেই পরিচিত নীল তিলটি। হাতের দিকে চেয়ে অমর চমকে উঠলো। কই হাতে তো সেই সবুজ মীনে-করা রুলি নেই যা সখ করে পারুল গড়িয়েছিল। শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের টানা খুলে অমর এক রাশ কাচের চুড়ী নিয়ে এল। যা সখ করে মাঝে মাঝে কিনে আনতো অমর, কিন্তু লজ্জায় দিনের বেলা পারুল তা পরতো না, রাত্রে পরে আবার খুলে রাখতো। আজ দিনের আলোয় বহু পরিচিত বন্ধু-আত্মীয়ের সামনে অমর তা পারুলের হাতে পরিয়ে দিলো। কেউ হাসলো না, কেউ বিদ্রূপ করলো না। কালো শিংএর একটা আংটি অমর মুলোজোড়ের মেলা থেকে এনেছিল, পারুলের জন্যে সেটি পরিয়ে দিলো। তার পর নিজের কোঁচা দিয়ে তার পা দু'টি মুছিয়ে আলতা পরিয়ে দিলো। বারে বারে মনে পড়লো, এই পায়ে হাত দেওয়া নিয়ে কত মান-অভিমান হয়ে গেছে। পারুল বলতো, এ কি কাণ্ড তোমার? তুমি গুরুজন পায়ে হাত দেবে আর আমি নরকে পড়ে মরি? অমর বলতো, আর স্বামীর মনে কষ্ট দিলেই বুঝি অক্ষয় স্বর্গ? প্রত্যেক বারই হার মানতে হয়েছে পারুলকে। আলতা পরানো শেষ হলে বরাবর পারুল অমরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত। আর মনে মনে বলতো, ঠাকুর, আমার এ জায়গা তুমি অক্ষয় রেখো। আজ আলতা পরানোয় কেউ বাধা দিলো না। কেউ উঠে প্রণাম করলো না। শুধু পারুলেরই পোঁতা শিউলী গাছ থেকে কয়েকটা ফোটা ফুল ঝরে পড়লো তার মাথায়। অন্যমনস্ক অমর বার কয়েক হাত বুলালো পারুলের শুভ্র ললাটে। পারুলের ঠোঁটের কোণে আজো তেমনি দুষ্টু হাসি। সুন্দর মুখে মৃত্যু বিন্দুমাত্র কালিমা আঁকতে পারেনি। অমর অবাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো, যেদিন প্রথম পারুলকে এই সাড়ী পরিয়ে এ বাড়ীতে এনেছিল সেদিনের চেয়ে আজকের পারুল এক ফোঁটা কম সুন্দর নয়। দিনে দিনে পারুলের রূপ যেন বেড়েই চলেছিল।

সেদিনের পারুলের দিকে চেয়ে দেখতে তার অধিকার ছিল না, কি লজ্জা কি কুণ্ঠা যেন কি একটা মস্ত অপরাধ করছে। আজ সহানুভূতিতে সকলের হৃদয় ভরা, আজ পারুলের সাজাও যেমন সহজ তেমনি সকলের সামনে প্রাণ ভরে পারুলকে দেখা যায়, কোন অপরাধ হয় না, চিরদিনের মত হারানর পূর্ব্বে বুঝি এই অবাধ স্বাধীনতা। স্থির হয়ে অমর দেখলো রাশি রাশি ফুলের গয়নায় পারুলকে সবাই সাজিয়ে দিলো—অমরের মনে পড়লো সেই অনেক দিন আগের কথা। সেদিন ফুলের গয়না পরিয়ে রাস্তা দিয়ে আনায় টিটকিরি খেতে হয়েছিল। আজ এ সাজে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে দুঃখ আর কিছু দোষ নেই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ কথা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫
রাজনৈতিক দল

রাষ্ট্রসংগঠনের গোড়ার দিকে মানুষ যখন প্রথম একত্র হয়ে দলবদ্ধ ভাবে বাস করবার শক্তি ও সামর্থ্য কাজে লাগাতে পেরেছিল, তখন সেটুকুতেই সে ছিল যথেষ্ট তৃপ্ত। তাই নিজেকে চেনবার বা জানবার কোন রকম স্পৃহা তখন জাগেনি তার মধ্যে। কিন্তু আর দশ জনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সে যে রাষ্ট্র সংগঠিত করল, তারই অনুবর্ত্তী হয়ে তাকে চলতে হল উন্নতির পথে একটা সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে; তখন সত্যিই সে উন্নতির পথে চলতে পারছে কি না সে রকম উদ্দেশ্য নিয়ে, তা ভেবে দেখার ক্ষমতাটুকু সে পেল আপনা থেকেই সঙ্ঘবদ্ধতার গুণে। এটা পাওয়ার পরই সহজ হয়ে পড়ল তার কাছে তার পরিবেশটা চিনে নেওয়া, যে পরিবেশটা প্রধানতঃ রাজনৈতিক। এটুকু চিনতে যেখন সে পারল, তখন সে অনেকটা পথ এগিয়ে এল রাষ্ট্রে তার অস্তিত্বের সত্তা আর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে। এটা বোঝা মানেই রাষ্ট্রিক চেতনা (Political consciousness) লাভ করা। আগেকার দিনে 'রাজা' নামধারী কোন এক হোমরা-চোমরা লোকের হাতে যখন ছিল রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব, তখন এ রকম চেতনা জাগলেও সক্রিয় হতে পারেনি। ক্রমে রাজার হাত থেকে যখন নানা কারণে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল জনগণের হাতে, তখন থেকে এ চেতনা জনগণকে সুযোগ দিল রাষ্ট্র-ব্যাপারে খানিকটা জ্ঞানী করবার। এ জ্ঞানটা পাওয়ার পর অনেকেই চাইল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সচেতন থাকতে। সচেতন থাকতে হলেই দরকার হয়ে পড়ল তাদের বিশেষ কোন বিষয়ে মতামত পোষণ করার। শুধু পোষণ করায় আবার কোন সার্থকতা থাকে না যদি না তাকে ব্যক্ত করা যায়। তাই কোন এক জন, যে একটু বেশী ক'রে সচেতন হতে পেরেছে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আর পোষণ করতে পেরেছে খানিকটা স্পষ্ট মতবাদ, সেই এগিয়ে এসেছে তার মতটাকে ব্যক্ত করতে পাঁচ জনের মাঝে। পাঁচের মধ্যে হয়ত দু'-তিন জন তার মত সমর্থন ক'রে তার পাশে এসে দাঁড়াল আর বাকিরা করল তার বিরোধিতা আর চেষ্টা করল বিপরীত মত গঠন করতে। এ ভাবে একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় নিয়ে দেখা দিল মতের ভাগাভাগি। বিষয়টি যদি হয় খব গুরুত্বপূর্ণ তবে মতদ্বৈধ হবে জোরাল, আর দু'দিকে বিপরীত মতাবলম্বী লোকের ভিড় জমতে থাকবে বেশী ক'রে। এই ভাবে সৃষ্ট হল একটা বিরোধিতা গোটাকে সক্রিয় করে তুলতে জেগে উঠল দু'দিকে দু'টো জনসমষ্টি যাকে বলা যেতে পারে 'দল' বা ইংরিজিতে 'পার্টি' (Party)।

রাজনীতি নিয়ে যে সব দল গড়ে উঠেছে সেগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর সে দলের দলাদলি আজকের রাষ্ট্রে, বিশেষ ক'রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যথেষ্ট কাজ করেছে গণকে ক'রে রাখতে সজাগ ও স[illegible]। সাধারণ ভাবে দলাদলি বলতে আমরা যা বুঝি তার থেকে এর পার্থক্য অনেক বেশী। কারণ, সাধারণ ঝগড়া নিয়ে যে দলাদলি আমরা দেখি সচরাচর, তার গণ্ডী খুব ছোট ও উদ্দেশ্য সংকীর্ণ। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলির গণ্ডী অনেক বড় ও উদ্দেশ্য মহৎ, আর এর উৎপত্তি অনেক কিছু নিয়ে—ধর্ম্ম, রাষ্ট্রতন্ত্রের গঠন, জাতীয়তা, শ্রেণিগত স্বার্থ ইত্যাদি। কিন্তু যা নিয়েই দলগুলোর উৎপত্তি হক সকলেরই লক্ষ্য থাকে এক; সকলেই চায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার ক'রে গঠন করতে ভাল রাষ্ট্র (Good State)—যেখানে তারা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করার পাবে যথেষ্ট সুযোগ।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রগুলোতে সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রযুজ্য হচ্ছে যেখানে থেকে, সেখানে সে রকম ক্ষমতা কোন এক জনের একার বুদ্ধিপ্রসূত সম্পূর্ণ নয়; সুপরিকল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত ক'টা বুদ্ধিমান মাথার সুচিন্তিত মতবাদ সেটা। এ মতবাদ যখন একটা বিশিষ্ট 'বাদ' (ism) পর্য্যায়ভুক্ত হতে পেরেছে আর হয়ে দাঁড়িয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে বাদ-বিসম্বাদ রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে, তখন রাজনীতিকে বাধ্য করেছে একে একটা বিশিষ্ট আসন দিতে। তাই এ রকম বাদ-বিসম্বাদ বা দলাদলি রাজনীতি ক্ষেত্রে স্থাপন করতে পেরেছে একটা বিশেষ প্রথা। রাজনীতিতে দলপ্রথা (Pary System) তাই আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নিয়ে আছে একটা বড় অংশ, যাকে বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করতে হচ্ছে রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিকদের রাষ্ট্রের কাজে লাগাতে, কূটনৈতিকদের রাষ্ট্রনীতি সমালোচনা করতে, রাজনীতিবিদদের তর্কের জাল বুনতে, আর রাজনীতির ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতে। এখন প্রশ্ন উঠছে, রাজনীতিতে দলপ্রথা যখন এতটা দরকারী, তখন একটা রাজনৈতিক দল বলতে আমরা ঠিক কোনটাকে বুঝব? এর একটা উপযুক্ত সংজ্ঞা পেতে হলে আমাদের পাশ্চাত্যদেশীয় রাজনীতিবিদদের শরণাপন্ন হতে হবে। কারণ, আমাদের দেশের রাজনীতির ইতিহাস তো সন্ধান দেয় রাজতন্ত্রেরই বেশী। কিন্তু গণতন্ত্রেই যে দল বা 'পার্টি'র জন্ম। তাই ওদের দিকেই এখন ফেরা যাক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্যে স্বেচ্ছায় যোগদানকারী সভ্যদের নিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত শক্তিপ্রয়োগে যে একটা দল গঠিত হয় তাকে আমরা বলব 'রাজনৈতিক দল' (Political Party)। রাজনীতিজ্ঞ গেটেল (Gettel) বলেছেন, রাজনৈতিক দল হচ্ছে জন কয়েকের সমষ্টি, সুগঠিত হ'ক বা না হ'ক, যার প্রধান লক্ষ্য ভোটের জোরে নিজেদের হাতে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করা। সে জন্যে কখন রাজনীতির নামে, কখন জাতীয়তাবাদের নামে, কোন ক্ষেত্রে ধর্ম্মের নামে, কোন সময় শ্রেণিগত স্বার্থের নামে বা রাষ্ট্র সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হয় একটা রাজনৈতিক দলের। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে প্রধান দু'টো 'পার্টি' ছিল—'ক্যাথলিক্‌স্' (Catholics) ও প্রোটেষ্ট্যান্টস্' (Protestants) ধর্ম্মের নামে। সেদিনকার আস্ত ভারতেও ধর্ম্মের ভিত্তিতে ছিল 'হিন্দু মহাসভা' ও 'মুসলীম লীগ'। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে আবার দল গড়ে উঠেছিল রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব নিয়ে। গত শতাব্দীতে সেখানে দেখা গেছিল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে 'রিপাবলিকান' (Republican), 'মনার্কিষ্ট' (Monarchist) প্রভৃতি দল। আজকের বিংশ শতাব্দীর দুনিয়াতে দেখি শ্রেণিগত বৈষম্য নিয়ে বড় বড় দলের অস্তিত্ব, যাদের পরিচয় 'ক্যাপিট্যালিষ্ট' (Capitalist), 'প্রোলেটারিয়েট' (Proletariat) ইত্যাদি। এই সব দলগুলো কার্য্যতঃ রাজনৈতিক হলেও এদের মূলে যে গলদটা নিয়ে দলাদলি, সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক। কারণ অর্থনৈতিক অবস্থার স্বচ্ছলতায় যখনই টান ধরেছে, তখনই

মানুষ উঠেছে ক্ষেপে আর সৃষ্টি করেছে বিক্ষোভ দলগত ভাবে। এই বিক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্র যখন রাষ্ট্র, তখন সে রাষ্ট্রেই এ বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে আগে ইংলণ্ডে যেমন অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ও রক্ষণ-নীতি (Protection) সেখানে 'লিবারাল' (Liberal) ও 'কনসারভেটিভ' (Conservative) পার্টিগুলোর গঠন অনেকটা নির্দ্ধারিত করেছিল, সে রকম আজও দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থাই 'ক্যাপিট্যালিষ্ট', 'লেবার' বা 'কম্যুনিষ্ট' পার্টিগুলোকে করছে শক্তিশালী। এখনকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন রাজার হাত থেকে নেমে এসেছে জনগণের হাতে, তখন সেটার কারণ যে মূলতঃ অর্থনৈতিক অবস্থা তা সহজেই বিবেচ্য। কারণ আগে বড় বড় পার্টিগুলো যেগুলোই এক রকম ছিল রাষ্ট্রনিয়ন্তা, সেগুলো গঠিত হ'ত প্রধানতঃ অবস্থাপন্ন বিশিষ্ট সভ্যদের নিয়ে। দরিদ্রের স্থান সেখানে ছিল না বললেই হয়। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে অর্থনৈতিক অবস্থার চাপেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যের ফাঁকটা প্রকাণ্ড করে তুলেছে। ধনী ও দরিদ্রের কলহ ও দলাদলি আজ তাই সব চেয়ে বড় দলাদলি রাজনীতি ক্ষেত্রে যার ফল, কোন ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ বলেন, "has been to accentuate class sentiment."

এখন দেখা যাক রাজনীতি ক্ষেত্রে দলগুলো কি কাজ করে থাকে। আজকের রাজনীতি প্রধানতঃ দলীয় রাজনীতি। কাজেই দলের কাজ ও তার গুরুত্ব এত বেশী যে, দল ছাড়া কাজ চলতে পারে না বললেই হয়। এ কথার তাৎপর্য্য বেশী ক'রে বোঝা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানেই 'পার্টির' জন্ম ও কর্ম্ম দলপ্রথাকে জাগ্রত রাখতে। কারণ, গণতন্ত্রেই সম্ভব—জনের রাষ্ট্রকে জনপ্রিয় ক'রে 'পপুলার গভর্ণমেন্ট' স্থাপন করা। এটা সম্ভব হয় সেখানে এক-একটা জনপ্রিয় দলের কাজে। তাছাড়া গণতন্ত্রই একমাত্র নীতি যেটাতে গণের মতামতকে দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত মর্য্যাদা। তাই যেখানে আছে এ নীতি, সেখানে আছে রাজনীতি নিয়ে দলাদলি আর শক্তিশালী দল। দলের দিক থেকেও তাই গণতন্ত্রকে ঠিক গণের তন্ত্র ক'রে তুলতে সচেষ্ট থাকতে হয়। তার জন্তে দরকার জনমত সৃষ্টি করা। এটাই রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। দল সব সময়েই চায় বেশী লোক দলে টেনে দলকে ভারী ক'রে রাখতে। এটা করতে হলে জনগণকে দলের মতে করতে হবে বিশ্বস্ত, তাদের মতামতকে আনতে হবে দলের মতামতে। তাই বিশেষ এক রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে জনমত গঠন করা দলের বড় কাজ। এ কাজ করতে হলে তাকে চালাতে হয় প্রচুর প্রচার 'যেন তেন প্রকারেণ' লোককে বিশ্বস্ত ক'রে তার সমর্থক করতে। এতে সাধারণ লোকও কম উপকৃত হয় না। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নিয়ে যখন বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে চলে মত-যুদ্ধ, তখন তাদের প্রচারের আধিক্যে শহরবাসী থেকে গ্রামবাসী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই সে বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই নেহেরু সরকারের নীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ওঠে, 'ইন্দো-পাক চুক্তি নিয়ে বাক্‌যুদ্ধ চলে, 'পোষ্ট-গ্রাজুয়েট' বিভাগের রাজনীতির 'সেমিনার' থেকে সুরু ক'রে গ্রামের ছোট্ট হাটে আলুওয়ালা পটলওয়ালাদের অদ্ভুত আলোচনার মধ্যেও। ভোটের সময় বিভিন্ন দলগুলোকে নিয়ে টানাটানি চলে কলেজ-স্কুলের ক্লাশে, ধনীর 'প্যার্লারে', ছেলে-মেয়েদের ক্লাব-ঘরে, চায়ের দোকানে, 'ডিস্পেন্সারীতে, সাঁকোর আড্ডায়, গাঁয়ের মোড়লের মজলিসে। দলের আর একটা বড় কাজ হোচ্ছে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা দলের হয়ে শাসন-কার্য্য চালাবার ক্ষমতা জয় করতে। সুতরাং ভোটাধিকার এ বিষয়ে দলের প্রধান কাজ। যেখানে আছে প্রতিনিধিত্বমূলক (Representative) সরকার, সেখানে উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাবার দায়িত্ব দলগুলোর এবং তার জন্তে ভোট সংগ্রহের যা-কিছু কাজ সবই করতে হয় তাদের। এর জন্তে দরকার হয় ব্যাপক প্রচারকার্য্য চালাতে সভা-সমিতি, বক্তৃতা, পুস্তিকা, খবরের কাগজ প্রভৃতির সাহচর্য্য নিয়ে। এ সব কাজ কৃতকার্য্যতার সঙ্গে করতে গিয়ে অনেক দলকে দেখা গেছে নিয়মিত দপ্তর স্থাপন ও পরিচালনা করতে বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগ ক'রে। এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বেশ কিছু তিক্ততা, আর নষ্ট হয়েছে দলের পবিত্রতা যার দরুণ সে পরিচয় পেয়েছে 'পার্টি ব্যুরোক্রেসী' (Party Bureaucracy) বলে।

একটা রাজনৈতিক দলের খ্যাতি ও কৃতকার্য্যতা যেমন নির্ভর করছে সুদক্ষ গঠন ও পরিচালন ব্যবস্থার উপর, তেমন সে ব্যবস্থা আবার নির্ভর করছে দলের এক জন নেতার উপর। কাজেই দলের যিনি নেতা হবেন তাঁর দক্ষতা ও ক্ষমতা যে সকলের চেয়ে অনেকটা বেশী তা সহজেই অনুমেয়। দলকে সুপথে চালিত ক'রে রাখতে গুরু-দায়িত্ব তাঁরই। সভ্যদের এক পথে চালিত ক'রে যথাযথ কার্য্যভার অর্পণ সুচিন্তিত ভাবে করতে হবে তাঁকেই। সব কিছু স্বার্থ ও আলস্য ত্যাগ ক'রে দলের স্বার্থকে বড় ক'রে সব রকম বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে দলকে লক্ষ্যে চালিত করার যে বড় দায়িত্ব, তা রয়েছে সুদক্ষ নেতার উপর। দলের সম্পদে বিপদে নেতার নেতৃত্বই অগ্রগণ্য। তাই দলের নেতা হতে গেলে বিশেষ কতগুলো গুণে তাঁকে হতে হবে গুণবান। তীক্ষবুদ্ধি তার থাকা চাই-ই, তাছাড়া উপস্থিত-বুদ্ধি, বিচার-দক্ষতা, কর্ম্ম-নৈপুণ্য, পরিশ্রম, নির্ভীকতা, ধৈর্য্য, সংযম, এগুলোকে যদি তিনি আয়ত্বে আনতে পারেন-তবেই তাঁর নেতৃত্ব হবে আদর্শস্থানীয়। আর এই সব গুণগুলোর অধিকারী হয়েছিলেন বলেই আমেরিকার ওয়াশিংটন গ্রেট বৃটেনের লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান, রুশিয়ার লেনিন ইটালীর মুসোলিনী, জার্ম্মাণীর হিটলার, তুরস্কের কামাল ভারতের সুভাষ, পাকিস্তানের জিন্না বিশ্ববরেণ্য ও চিরস্মরণীয়।

আমরা জানলুম গণতন্ত্রেই প্রধানতঃ 'পার্টির' জন্ম ও কর্ম্ম। তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে দলপ্রথা কি রকম ভাবে কাজ ক'রে আসছে তার পরিচয়টাও নিতে হবে আমাদের। প্রথমেই দেখা যাক বৃটেনে রাষ্ট্রের দিকে। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বৃটেনে দু'টো পার্টিরই অস্তিত্ব ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে এ দু'টো ছিল 'ক্যাভ লিয়ার্স' (Csvaliers) যারা ছিল রাজার সমর্থক, আর 'রাউণ্ড হেড্‌স্' (Roundheads) যারা সমর্থন করত 'পার্লামেন্ট' পরে এদের নাম বদলে গিয়ে হয় 'টোরী' (Tory) ও 'হুইগ' (Whig)। তার পর এরা আবার ডিস্‌রেলি (Disraeli) গ্ল্যাডষ্টোনের (Gladstone) নেতৃত্বে নামান্তরিত হয় 'কনসারভেটিভ' (Conservative) ও 'লিবারাল' (Liberal) নামে ১৯১৪ পর্য্যন্ত এ দু'টোর মধ্যেই চলে পাল্লাপাল্লী। মহাযুদ্ধের কিন্তু এদের মধ্যে ধরল ভাঙন, আর এদের সরিয়ে দিয়ে জোর উঠ

'লেবার' (Labour) দল। ১৯২৪ সালে ভোট-যুদ্ধে জয়লাভ করে এরা 'গভর্ণমেণ্ট' হাতে নেয়। কিন্তু সামান্য ক'মাসের মধ্যেই 'হাউস অব কমন্সের' আস্থা হারিয়ে পরাজিত হল আর তার জায়গায় এসে দাঁড়াল 'কনসারভেটিভ' যার আয়ু ছিল ১৯২৯ পর্য্যন্ত। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন-যুদ্ধে 'লেবার' দল জয়লাভ করলেও বিরোধী দলের সামনে প্রবল থাকতে পারল না। ফলে ১৯৩৫এর সাধারণ নির্ব্বাচনে বলডুইনের (Baldwin) নেতৃত্বে 'কনসারভেটিভ'ই আবার গভর্ণমেণ্ট হাতে পেল। বছর দুই পরে তিনি পদত্যাগ করায় চেম্বারলেন (Chamberlain) এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। চেম্বারলেনের পর আসেন চার্চ্চিল (Churchill)। কিন্তু গত মহাযুদ্ধে তাঁর সরকারের নীতির অনেক গলদই ধরা পড়েছিল 'লেবার পার্টি'র বিরুদ্ধ প্রচারে। কাজেই পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনে এ জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে পরাজিত হয় ও এ্যাটলীর (Attlee) প্রধান মন্ত্রিত্বে 'লেবার' দল আবার শাসন-ক্ষমতা হাতে পায়। বিগত ভোট-যুদ্ধেও 'লেবার' দল তাঁরই নেতৃত্বে জয়লাভ করেছে। বর্ত্তমানে কিন্তু এর শক্তি অনেকটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। লেবার পার্টিতেও আবার আছেন এমন ক'জন যাঁরা বামপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা চান গণতন্ত্র সরিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে সমাজতন্ত্র।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দলপ্রথা বৃটেনের চেয়ে বেশী সুগঠিত ও সুপরিচালিত। তাই সে দেশে দলগুলোর সংখ্যাধিক্য দেখা যায়নি। দলাদলির তিক্ততা ও জটিলতাও সেখানে নেই সে রকম। সেখানে আছে প্রধানতঃ দু'টো দল—'ডেমক্র্যাটিক' (Democratic) ও রিপাব্লিকান (Republican)। এদের নির্দ্দিষ্ট কোন নীতি নেই, দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় হাল-চাল বুঝে সুবিধে মত কোন নীতি অবলম্বন করে এরা নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ও বিজয়ী হলে শাসন-ক্ষমতা হাতে পায়। তাই বিগত ভোটযুদ্ধে ট্রুম্যান (Truman) ও ডিউইর (Dewy) প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপাততঃ দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছিল নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা। নির্দ্দিষ্ট নীতির অভাবে সেখানে দু'টো দলেই রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দু'রকম মনোভাবাপন্ন সভ্য দেখা যায়। গত মহাযুদ্ধের পর সেখানে 'সোস্যালিষ্ট' (Socialist) দল বলে আর একটা দল আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করছে। 'কম্যুনিষ্ট পার্টি'ও সেখানে একটা ভিত্তি পাবার জন্যে সচেষ্ট। কিন্তু এটা এখন একেবারেই নগণ্য।

ফ্রান্সের দল-প্রথার বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। সেটা হচ্ছে এখানে বহু দলের অস্তিত্ব। বৃটেন ও আমেরিকায় যেমন আমরা দেখেছি দু'টো বা তিনটে দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুগঠন ও সুপরিচালনার পথে শাসন-ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যে, এখানে কিন্তু সে রকম গঠন ও পরিচালনার বালাই নেই। সবই যেন কোন রকমে একটা দল গঠন ক'রে যা হোক্ ক'রে 'গভর্ণমেণ্ট' হাতে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা। তাই এখানে মন্ত্রিসভার ঘন ঘন ভাঙ্গন যেন স্বাভাবিক ঘটনা। মন্ত্রিসভা বসে খুব ঘটা ক'রে সব দলগুলোকে নিয়ে গড়া 'কোয়েলিশন' (Coalition) আকারে। কিন্তু দলগুলোর মধ্যে কোনটাই এমন দক্ষ বা শক্তিশালী নয় যে, অপর দলগুলোকে দমনে এনে মন্ত্রিসভা স্থায়ী করতে পারে। ফলে সভা বসলেই বাধে সংঘাত, দেখা দেয় হাতাহাতি, মারামারি—সভ্যদের মন অসন্তুষ্ট। তাই মন্ত্রিসভা ভাঙে, দল-বদল হয়, আবার গড়ে, আবার ভাঙে। এমন ভাবে মন্ত্রিসভার অস্থায়িত্ব (instability of ministries) ফ্রান্সের রাজনীতিকে দিয়েছে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য। এখানে প্রধান প্রধান দলগুলোর মধ্যে এক দিকে আছে ১৯০৩ সালে গঠিত Republican Democratic Federation, যেটা প্রকৃতপক্ষে একটা রক্ষণশীল দল, আর অন্য দিকে আছে অনেকগুলো বামপন্থীর আকারে—Radicaux-Socialistes, Republicains Socialistes, Socialistes, Communistes Socialistes, Communistes ইত্যাদি।

এ পর্য্যন্ত আমরা পেলুম শুধু বহু দলের পরিচয়। কিন্তু রুশিয়া, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রমুখ মহাদেশীয় ইউরোপের ক'টা বড় বড় রাষ্ট্রে আমরা দেখেছি একদলীয় প্রথার অস্তিত্ব। বহুদলীয় নীতি সেখানে পেয়েছে যথেষ্ট নিন্দা ও প্রতিবাদ। এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিই এগিয়ে এসেছে। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেক দল থেকে 'পার্টি গভর্ণমেণ্ট' কৃতকার্য্য হতে পারেনি। বিভিন্ন দলগুলোর বিভিন্ন রকমের মতবাদের বাক্‌যুদ্ধে জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে ঠিক পথে চলতে পারেনি, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তাই জনমত সেখানে রয়ে গেছে অপরিপক্ক। সমালোচক হলকম্বের (Holcombe) মতে সেখানে নেই কোন রকম "efficient system for the expression of public opinion when the variety of opinion and intensity of conviction are great." জনমতের পঙ্গুতার জন্যে সেখানে নেই শৃঙ্খলা, একতা। কাজেই বড় কাজে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টই হয়েছে। অধ্যাপক রামসে মূরও (Ramsay Muir) তাঁদের বহুদলপ্রথার কুফলটা লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, "it has disturbed the working of our system of government." ১৯১৯ সালের আগে যে ইটালীতে ছিল চার-পাঁচটা দলের উপরে সোস্যালিষ্ট পার্টির রাজত্ব, সেখানে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে দাঁড়াল এসে ফাসিস্ত দল গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত। জার্ম্মাণীতেও ১৯১৯এর উইমার শাসনতন্ত্রের (Weimer Constitution) ফলে সেখানে ছিল একাধিক 'পার্টি'। তাই ১৯১৯ থেকে '৩৩ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর আইন-সভা রীচষ্ট্যাগে (Reichstag) প্রায় এক ডজন পার্টির স্থান ছিল। কিন্তু তারা টিকতে পারেনি বেশী দিন। ১৯৩৩এর সাধারণ নির্ব্বাচনে 'ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট' (National Socialist) বা যেটা সহজ ক'রে 'নাজি পার্টি' বলেই পরিচিত সেটা প্রতিদ্বন্দ্বী 'কম্যুনিষ্ট' ও 'সোস্যাল ডেমক্র্যাট' (Social Democrat) দল দু'টোকে পরাজিত ক'রে প্রতিষ্ঠা করল একাধিপত্য। রুশিয়াতে 'বুর্জ্জোয়া' দলগুলোর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই লেনিন (Lenin) 'বলশেভিক' (Bolshevik) দলের নেতা হয়ে ক্ষমতা জয় করেন এবং পরে ১৯১৮ সালে এ দলের নাম রাখেন 'কম্যুনিষ্ট পার্টি' (Communist Party)—যার শক্তি এখন পশ্চিমী দলগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পূর্ণ ক্ষমতা ও সাহস রাখছে।

আমাদের ভারতে দল-প্রথার একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে রাজনৈতিক দলগুলো গড়ে উঠেছে বিচিত্র পরিবেশের ভিতর দিয়ে। কারণ দলগুলোর গঠন ও কার্য্যকালে ভারত ছিল বৃটিশ শক্তির অধীনে। তাই এখানে স্বাধীন ভাবে কোন দল গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে অনেক কিছু গলদ জাতির উন্নতির পথে বাধা
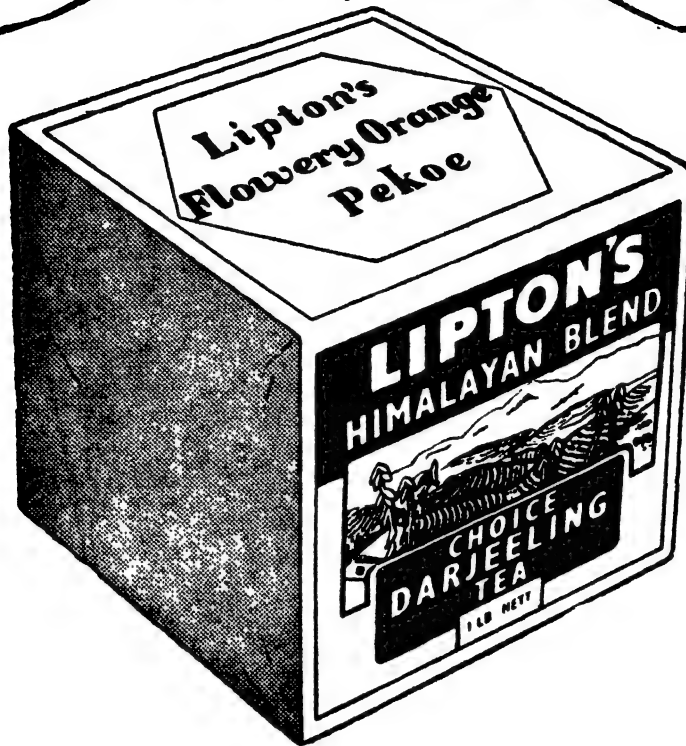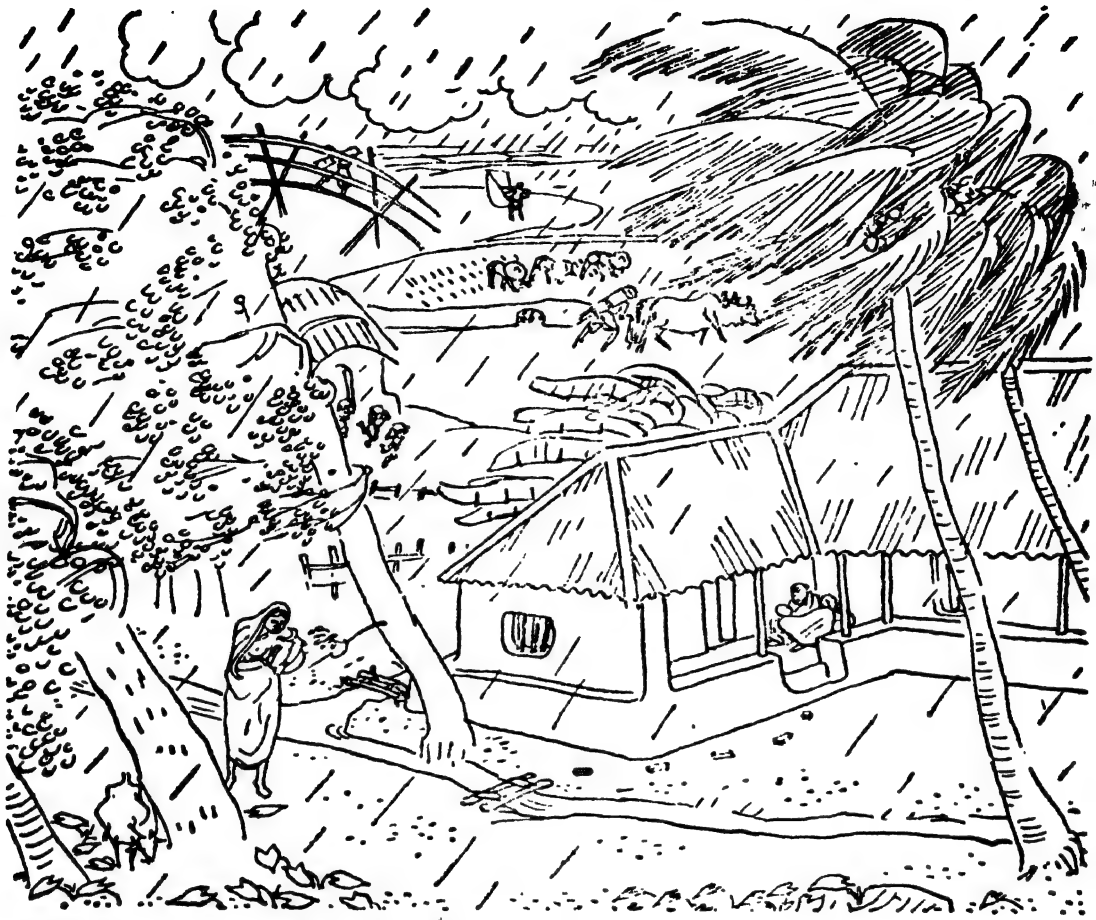
সুমিত্রার আত্মহত্যা

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মহত্যা করতে স্থির করেছে সুমিত্রা।

সংসারের জ্বালা আর তার সহ্য হয় না।

বাবার কাছে বা দাদার ওখানে গিয়ে সাময়িক ভাবে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে সত্য, কিন্তু ফেলে-রেখে যাওয়া সংসার এমনি দুর্নিবার বেগে তাকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করতে থাকে যে, আবার এক দিন তাকে ফিরে আসতেই হয় এবং সংসারের জঠরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে অক্টোপাশের মত এই হিংস্র সংসার একাধিক বাহু বিস্তার করে মরণ-আলিঙ্গনে তাকে বেঁধে ফেলে। অভিমন্যুর মত সে বেরিয়ে আসবার পথ পায় না খুঁজে। কাজে কাজেই এই জ্বালাভরা সংসার থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেয়াই স্থির করছে সে।

সংসারের নির্ভুল সংজ্ঞা কি, কী তার এমন জ্বালা, সত্যিই সে জ্বালার দাহ তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে কি না, তীব্রতা তার অন্ততঃ কিছুটা কমিয়ে দেবার কোনো পন্থা আছে কি না, এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বেশ খানিকটা আচমকা ও অপ্রত্যাশিত হয়েছে কি না, যুক্তিবাদীদের এই সব নীরস প্রশ্নের জবাব দেয়া নিরর্থক মনে করে সে। তার মতে নীরস দার্শনিক বুলিতে কোনো বর্ষণমন্দ্রিতমুখর সন্ধ্যায় পোর্টিকোতে চায়ের আসর সরস ও প্রাণবন্ত করে তোলা যেতে পারে মাত্র। সংসারের ঘানির গতিবেগ একটুকুও কমবে না তাতে। তাই তার সংকল্পে অটল সুমিত্রা। দ্বিধা ও বিলম্বের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কেন করবে না সে! জীবনের কোন্ আশা তার পূর্ণ হয়েছে?···আশুতোস কলেজের সকালের ক্লাশে যাবার জন্য যখন সে বেণী দুলিয়ে আঁচল উড়িয়ে উঠে পড়তো প্রায়-চলন্ত ট্রামে, লেডিজ সীট খালি না থাকলে খালি করে দেবার জন্য অসাবধান ও অন্যমনস্ককে জানাতো সপ্রতিভ অনুরোধ পাতলা ঠোঁট দু'টির ফাঁকে ছিটকে-ওঠা টুকরো হাসি চেপে রেখে, তার পর খাতা আর বই দু'খানা আলগোছে কোলের ওপর শুইয়ে রেখে যখন সে বাইরে চেয়ে থাকতো অপস্রিয়মান রাজপথের পানে, স্বপ্ন দেখতো তখন সে কোন্ স্বপনপুরীর আধেক-দেখা রাজকুমারের!······ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে সে অতলান্ত পাড়ি দিয়ে, হিমালয় ডিঙ্গিয়ে, তেপান্তরের ধূ-ধূ মাঠ পেরিয়ে। কোমরে তার বাঁকা তলওয়ার, মাথার পাগড়ীতে তার কবুতরের সাদা পালক। এমনি এক দিন কলেজ যাবার পথে সুমিত্রার কণ্ঠে পরিয়ে দেবে সে কুরুবকের মালা, সহস্র বিস্ফারিত চক্ষুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সুমিত্রাকে তুলে নেবে সে ঘোড়ার 'পরে, তার পর ছুটবে পক্ষিরাজ খুরের ঘায়ে-ঘায়ে পথের ধুলা উড়িয়ে, আকাশের মেঘ খান্-খান্ করে দিয়ে প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে ঝড় বইয়ে দিয়ে কোন্ অমরাবতীর পানে!···স্বপ্ন দেখতো সুমিত্রা, বেদুঈন তার প্রিয়, যাযাবরের টুনকো সংসার তাদের, আজ শহরের উপকণ্ঠে, কাল আবার গ্রামের প্রান্তে। প্রিয় তার অসভ্য বর্ব্বর, কোমরে ছুরি-ঝোলানো বেপরোয়া পুরুষ, মাংসপেশীর উৎকট প্রকাশে জিঘাংসাপরায়ণ মনোবৃত্তির উগ্র পরিচয়! কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা যখন আকাশে ছড়িয়ে দেবে তার, শিশিরসিক্ত রুক্ষ চুলের বিপুল সম্ভার নেকড়ে বাঘের মত ঘুরে বেড়াবে খাদ [illegible] পরিবেষ্টিত।

কিন্তু হায়, এমনি রোমাঞ্চকর [illegible] বেলোয়ারী কাচের প্রাসাদ তার ঝন্-ঝন্ করে ভেঙে [illegible] দিয়ে এল অজিত তার অতি বাস্তব বিচার-বিবেচনা নিয়ে, স্থূল, নীরস ও ক্লান্তিকর ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট মন নিয়ে।

ভোরের টুকরো আলো খোলা বাতায়নে মশারির মধ্যে এসে পড়তে-না-পড়তেই অজিতের ঘুম ভেঙে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এল আর-একটি কর্ম্মময় দিবস। যে অর্ডারগুলো সেদিন সরবরাহ করতে হবে, তার পূর্ণ তালিকাটি মানসচক্ষে ভেসে ওঠে অজিতের···অন্ততঃ সন্ধ্যার মধ্যে অতীন বাবুকে আজ না দিলেই নয়। তার মেয়ের আজ বিয়ে। কিন্তু কাল সন্ধ্যা বেলাতেও ড্রেসিং টেবিলের ভার্ণিশটা ভালো করে শুকোয়নি দেখে এসেছে সে। রসিক ঐ রকমই, বরাবর শ্লো। গ্রাহকদের কাছে কথা রাখতে পারলে যে দু'টাকা দামও চড়িয়ে দেয়া যায়, এই সহজ সত্য কথাটি আট বছরেও ঐ চট্টগ্রামী মগজে ঢুকলো না। প্রত্যেকটা কাজের জন্য নির্দ্ধারিত দিনের বেশী লাগলে যে উৎপাদনের খরচও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় এবং কাজে কাজেই লাভের অঙ্কও কমে আসে, এ কথা সে-ই বোঝে, যে সামান্য পুঁজি নিয়ে ভেনেস্তা চেয়ারের দোকান খুলে আজ পুঁজিপতি হয়ে উঠতে পেরেছে। রসিককে ধমকে দিতে হবে আর একবার আর অতীন বাবুকে গ্যারান্টি দিয়ে আসতে হবে যে বিয়ের সভা-মণ্ডপে আসবাবপূর্ণ লরীখানা যথাসময়ে পৌঁছুবেই। সভা-মণ্ডপের অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ভার্ণিশটা একটু বেশী ঝক্‌ঝক্ করবে বৈ কি।···মনে হতেই হাসি পায় অজিতের।

তার পর সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টার বিমল বাবুর খাটখানা আজ দেবার কথা। দাম শোধ করবেন মাসিক কিস্তিতে। যে বিল দেয়া হবে, তার ওপর যথেচ্ছ কলম চালাবার অধিকারও তাঁর। অনিচ্ছা যতই থাক, আপত্তি জানাবার উপায় নেই। কারণ রেশন যা পাওয়া যায় আইনতঃ, সপ্তাহ তাতে চলে না বলেই তাগাদা নিতে হয় খান কয়েক "ভুতো" কার্ডের আর সে কার্ডগুলো তত দিন জীবন্ত থাকবে, যত দিন এই মহাপ্রভুদের বদন থাকবে হাস্যময়!···

চায়ের জন্য মিছে চাকরের আগমন প্রত্যাশায় বসে না থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে অজিত। পাশে একবারটি তাকিয়ে দেখে না এক রাশ চুলের মত বিস্রস্ত পোষাকে বিছানায় এলিয়ে রয়েছে যৌবনোচ্ছ্বসিতা সুমিত্রা ঘুমের ভাণ করে।

ভোরের নরম হাওয়া প্রিয়ের আলতো আলিঙ্গনের মত [illegible] গোছে অধর পরশের মত রক্তকণিকাগুলিকে খানিকটা দোলা দিয়ে যায়। তন্দ্রাজড়িত ভারী চোখের পাতা দু'টি টেনে খুলতে কষ্ট হয় সুমিত্রার। এমনি অসতর্ক, উচ্ছৃঙ্খল ও এলোমেলো হয়ে শয্যাপ্রান্ত আঁকড়ে পড়ে থাকতে ভারী রোমান্টিক মনে হয় তার। [illegible] করে রূপ দেখার আকর্ষণ যার নেই, তারই পাশে ঘন থেকে ঘন [illegible] হয়ে উঠে চোখ মিটমিট করে বৃথাই খুঁজে মরে সুমিত্রা তার স্বপ্নলোকের তেপান্তরের রাজকুমারের মুখের আদল!······

প্রকাণ্ড আসবাবের দোকান অজিতের। খাট, আলমারী, কুশন, দেরাজ, ড্রেসিং টেবিল, টিপয় ও চেয়ারে ভর্ত্তি। বেশ জেঁকে বসেছে অজিত। সকাল বেলা চা খেয়েই সে দোকানে এসে বসে। তার পর

ন'টায় সে [illegible] খাবার খেয়ে আসে, কোন দিন বেরিয়ে [illegible] দোকানেই দিয়ে যায় চাকর। দোকানের নাম-ডাক তার খুব। অজস্র আসবাবের দোকান পথে-ঘাটে, এমন কি অলিতে-গলিতে থাকলেও অজিতের নিত্য-নতুন ডিজাইন ও ফিনিশ একেবারে না কি অভিনব! ল্যাজারাসের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে।

রাত্রিতে অজিত খেতে আসে। খেয়ে-দেয়ে যখন সে বিছানায় একটুখানি দেয় গা এলিয়ে, ঠিক তখনই খোঁজ পড়ে সুমিত্রার। এবং তা প্রায়ই প্রতিদিন, বারো মাস, জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত। অজিতের পায়ে ধীরে ধীরে হাত না বুলিয়ে দিলে ঘুম আসে না আজন্ম। তাই সহস্র কাজ থাকলেও সুমিত্রাকে আসতে হয়। এমন [illegible] খোকাকে ঝিয়ের হাতে দিয়েও।

হাত বুলিয়ে দেয় সে পায়ের পাশে বসে আর অজিত নিমীলিত চক্ষে পড়ে থাকে এবং বাধা না পেলে দশ মিনিটের মধ্যেই শোনা যায় তার নাসিকার বিশ্রী গর্জ্জন।

ভালো লাগে না সুমিত্রার। অলস স্তব্ধ দুপুরে ঝি-চাকররা প্রায়ই ব্যস্ত থাকে বিশ্রামের আয়োজনে, দোলনায় দোল খেতে-খেতে খোকা ঘুমোয়, এমনি নিশ্চিন্ত একটি অবকাশে অতখানি ভালো-মানুষী ভালো লাগে না সুমিত্রার। দলিত হবার লোলুপ কামনা বৃথাই তার শিরার মধ্য দিয়ে শির্-শির্ করে বয়ে চলে!

এক সময় হয়তো সঙ্কুচিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করে: চিত্রালয়তে একখানা চমৎকার ছবি এসেছে। যাবে দেখতে?

নিমীলিত চক্ষেই পালটা প্রশ্ন করে অজিত: চমৎকার কি করে জানলে?

যারা দেখেছে, তারাই বলে।

অজিত বিজ্ঞতা প্রকাশ করে: ও-বলার কোনো মানে নেই। হিন্দী ছবি মানেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিমাবহুল নৃত্য-গীত কিংবা আজগুবি একটা কাহিনী। দর্শকদের রুচি এমনই বিকৃত হয়েছে যে, এই [illegible] তারা চমৎকার আখ্যা দেয়। অথচ—এবার বক্তৃতা সুরু করে অজিত: এই শিল্পের মারফৎ দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের [illegible] সাধন করা যায়, তা যদি একবার—

[illegible] যায় সুমিত্রার! জ্বালা চেপে রেখে শান্ত কণ্ঠে প্রথম প্রশ্নের [illegible] উচ্চারণ করে: খুব বিশ্রী একটা ছবি এসেছে চিত্রালয়ে [illegible] যাবে দেখতে?

[illegible] করে যায়। তার পর প্রশ্ন করে: পরিচালক কে? [illegible] কিংবা শান্তারাম—কী নাম যেন বলেছিল ঠাকুরপো। যাবে?

[illegible] ইচ্ছে করছেই, আরও বিশেষ করে তুমি যখন বলছো, কিন্তু— [illegible] বাসুর কুশন ক'খানা কাল সকালে ডেলিভারী না দিলেই [illegible] পরশু তাঁর মেয়ের জন্মদিন। ঘোষাল মশাই না কি সদলে [illegible] চলে যাচ্ছেন, তাঁর জিনিষগুলো তিন দিনের মধ্যে দিতেই [illegible] রতন বাবু একখানা নয়া ডিজাইনের টিপয় চান। [illegible] ডিজাইন, যা ফ্যাসানের রাজত্বে একেবারে যুগান্তর [illegible]। ক'দিন ধরে সেই ডিজাইনটাই মাথায় জট পাকাচ্ছে [illegible] পর রসিক মিস্ত্রির বিরুদ্ধে পর-পর নালিশ আসছে [illegible] চাটগাঁয়ের মগ, সব পারে। সেটা তদন্ত করতে হবে। [illegible] ভার্ণিশ কিনে রাখবো আজই। বাজার দুম্ করে চড়ে যাচ্ছে। ওদিকে বর্ম্মা থেকে সংবাদ এসেছে টিক উডের জাহাজখানা না কি কোনও বিশেষ কারণে আরও পনেরো দিন পরে ছাড়বে। কি মুশকিল বল তো? এদিকে [illegible] ইনস্যুরেন্সের সমস্ত ফার্নিচার সাপ্লাই করবো বলে অর্ডার বুক করে বসে আছি! তার পর তিন মাসের সেল-ট্যাক্স্ বাকি পড়ে রয়েছে। কী যে করেন সারা-দিন এ্যাকাউনটেণ্ট বাবু। ভাবছি—

আর সহ্য হয় না সুমিত্রার, বলে: ভাবো, ভাবো, খুব ভাল করে ভাবো। ভেবে ভেবে সারা জীবন কাটিয়ে দাও। তোমার ভাবা শেষ হলে আমায় সংবাদ পাঠিও।

বেরিয়ে যায় সুমিত্রা। মাথাটা ঝিম-ঝিম করে তার। এক ঝলক রক্ত মাথায় ছিটকে উঠে শিরার মধ্যে দিয়ে টন্-টন্ করে ছুটে চলে। পরের ড্রয়িং রুম সাজাবার অথবা মেয়ের বিয়েতে উপহার দেবার জন্য নিত্য-নতুন অর্ডার সংগ্রহ ও নিখুঁত ভাবে তা সরবরাহ করে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়াতেই মত্ত অজিত, সিনেমায় যাবার রোমান্সের মর্ম্ম সে কী বুঝবে?

কী রঙীন কল্পনাই না আজো মাঝে মাঝে সুমিত্রার বুক দুলিয়ে দেয়···রক্ত-রাঙা আটোসাঁটো চোলি পরে আকাশ রংয়ের ক্রেপের আঁচল দুলিয়ে ষ্টুডিবেকার থেকে নামবে সুমিত্রা প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখে অগণিত কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে। প্ল্যাষ্টিকের সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগটি আলগোছে চেপে ধরবে সে দু'টি আঙুলের ফাঁকে। তখন নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়ে গেছে, ইণ্ডিয়ান নিউজ রিভিউ অথবা ওয়াল্ট্ ডিস্নের মিকি মাউস্ সুরু হয়ে গেছে। অজিতকে পাশে নিয়ে সুমিত্রা প্রবেশ করতেই এগিয়ে আসবে একজন টর্চ্চ হাতে করে। তার পর মেঝের 'পরে আলো ফেলে-ফেলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সবাই তখন বসে গেছে, দুই সারি আসনের মাঝখান দিয়ে পুরুষদের হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু ঠেকিয়ে সুগন্ধি বিতরণ করতে করতে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার সময় সে মিহি গলায় প্রায় কানে-কানে বলার মতো করে বলবে: এক্স্কিউজ মী প্লিজ!···তার পর পাশা-পাশি ঘেঁসাঘেঁসি বসবে তারা হাতে হাত রেখে। প্রাণবন্ত করে তুলবে প্রেক্ষাগৃহের রোমাণ্টিক মুহূর্ত্তগুলি!

ফেনিয়ে একেবারে উদ্বেগ হয়ে ওঠে সুমিত্রার অন্তর, কিন্তু টিক্ উডের পালিশে আদৌ পারে না তা দাগ কাটতে।··· খেয়ালী বেহিসাবী কুমারী-মন এখনও টগবগ করে ফুটছে সুমিত্রার বুকের মধ্যে। কিছুই স্থির না করে অকস্মাৎ বেরিয়ে পড়তে চায় তার মন। এক দিকে যাবে মনে করে পা বাড়িয়ে দিতে চায় অপর দিকে! সেদিকে পৌঁছুবার পূর্ব্বেই সে আবার অকস্মাৎ ফিরে আসতে চায় যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিল সেখানে নয়, যেদিকের কথা কল্পনাও করেনি সে কোন দিন, সেই দিকে। এখনও মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তার নিজেকে টুকরো টুকরো করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে এ্যাডভেঞ্চার করতে।—কিন্তু পাকা ব্যবসায়ী স্বামীর অতি-বাস্তব হিসাব-নিকাশের ছক-কাটা গণ্ডীর মধ্যে বন্দিনী হয়ে সারা জীবন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ভোর হতেই সংসারের ঘানিতে গলা বাড়িয়ে দিতে হয় তাকে। বেড টি-এর মতো খোকার ভোর হতেই চাই অন্ততঃ এক গাল স্তনদুগ্ধ। তার পর ঘানি চালাতে চালাতে সারা দিন এবং রাত্রেরও অনেকটা অবধি তার পরিচর্য্যা করতে হয়।

ঝি-চাকর থাকলেই কি আর ওদের উপর সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়? হয়তো ওরা সময় বেঁধে খাওয়াবেই না, দুধ ভালো করে গরম জল দিয়ে ধোওয়া বাটিতে ছেঁকেই নেবে না কিংবা হয়তো মাইপোষের ভেতর শুকিয়ে থাকবে আগের দিনের দুধ। কিংবা ঝিনুক দিয়ে খাওয়াতে বসলেও গলার নীচে তোয়ালেখানা এমনি অসতর্ক ভাবে জড়িয়ে নেবে যে, মুখ থেকে উছলে-ওঠা দুধ গাল বেয়ে হয়তো কানেই ঢুকে পড়বে, তার পর কান পাকবে, পুঁজ হবে, জ্বর হবে—উঃ, আর ভাবতেই পারে না সুমিত্রা।

কিন্তু অতিমাত্রায় নীতিবাগীশ স্বামীর সঙ্গে নীরস ও শুষ্ক জীবন কাটাবার জন্ত এবং তাঁর প্রদত্ত সন্তানের পরিচর্য্যা করবার জন্তই কি এমনি লোভনীয় স্বাস্থ্য ও অচঞ্চল যৌবন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে সুমিত্রা? মাঝে মাঝে এমনি মারাত্মক একটা প্রশ্নই সে নিজকে করে বসে।

কৃপণ বলে না সে অজিতকে, কিন্তু হিসাব তার অত্যন্ত প্রখর এবং প্রতি পদে। যে সময়টুকু বাড়ীতে থাকে সে, তার মধ্যেই আলনায় কাপড় গোছানো থেকে সুরু করে কোন্ ব্যঞ্জনে তৈলাধিক্য হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা করবে সে। সমালোচনার ভাষায় শ্লেষের আঁচ পেলেই সুমিত্রা তার যোগ্য জবাব না দিয়ে পারে না। তার পর জবাব ও প্রতিজবাবে কটু হয়ে উঠবে আবহাওয়া এবং হয়তো সাতটি দিন থাকবে এই উত্তাপের ঝাঁজ! এমনি কার ভালো লাগে? কে সইতে পারে এমনি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর?

কাজে কাজেই সংসারের জ্বালা আর সইতে না পেরে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে চিরদিনের মত মুক্তি নেবার পথ বেছে নিয়েছে সে! আত্মহত্যা করবে সুমিত্রা এবং তা আজই, এই রাত্রেই।

বারোটা বাজতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সুমিত্রা। যথারীতি অজিতের নাক ডাকছে কর্কশ স্বরে। ঘুমিয়ে পড়লে কি হবে, একখানা হাত খোকা তার ব্লাউজের মধ্যে চালিয়ে দিয়েচে। হাতখানা সন্তর্পণে বার করবার সময় ভারী কচি ঠেকলো তা, প্রজাপতির পালকের মতই নরম তুলতুলে!···সুমিত্রা খাট থেকে নামলো, সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। ঠাকুরপোর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় রুদ্ধ দ্বারে একবারটি কান রাখলো, নাঃ, ঘুমুচ্ছে বেচারা। ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস্ ভাগ্যিস আজ আর তাকে পেয়ে বসেনি। অন্ধকার বারান্দায় খোকার দোলনা নিশ্চল হয়ে ঝুলছে। টিপয়টার ওপর দাঁড়িয়ে সে সাবধানে দড়িটা খুলে সংগ্রহ করলো। বেশ মোটা আর বেশ শক্ত!

যে দড়িতে সন্তান দোল্ খেয়ে-খেয়ে ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়েছে এত কাল, সেই দড়িতেই আজ ঝুলবে তার মা, কণ্ঠরোধ হয়ে আত্মহত্যা করবে সুমিত্রার মুখর যৌবন, তার রঙীন্ কল্পনা, তেইশটি বসন্ত দিয়ে তিল-তিল করে গড়ে তোলা তার মোমের মত দেহ!···দোলনাটি মেঝেয় নামিয়ে রেখে সুমিত্রা অগ্রসর হলো লাইব্রেরী ঘরের দিকে। দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে সে একশো ওয়াটের বাল্‌ব্‌টি খচ্ করে জ্বালিয়ে দিল।

চারি দিকে চেয়ার ছড়ানো, মাঝখানে একখানা গোল টেবিল, তারই তৈরী কাপড় দিয়ে ঢাকা। কোণে কোণে ফুটে রয়েছে রজনীগন্ধা মাধবী; আলমারী ভরা অজস্র বই থরে থরে সাজানো। বই কিনে পড়া একটা বাতিক ছিল সুমিত্রার। এই নিয়ে কি অজিতের সঙ্গে কম হয়েছে! বই না কিনে কোনো লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে পড়লেই তো হয়, অজিত এমনি মন্তব্য অহরহঃ করতো এবং তার ফলেই জেদ চেপে গিয়েছিল সুমিত্রার। ঠাকুরপোর সঙ্গে গিয়ে অজস্র বই কিনে নিয়ে আসতো সে, আর তার বিল হাতে পেয়ে অজিতের হিসাবী মগজে খানিকক্ষণ জ্বালা করতো প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে।

থাক্, ভালোই হয়েছে। এতগুলো বইয়ের গ্রন্থকার আজ সাক্ষী থাকবেন সুমিত্রার আত্মহত্যার। এ যে তার সখ নয়, মুহূর্ত্তের খেয়াল নয়, এডগার ওয়ালেস কি তা বুঝবেন না, বুঝবেন না ন্যুট হামসুন কিংবা আনাতোল ফ্রাঁ? এই সাজানো সংসারের আবেষ্টনী ছেড়ে, স্বামী পুত্র ছেড়ে কেন সে নিতে চায় চিরবিদায়, গল্‌স্‌ওয়ার্দী বা গোর্কির দরদী চিত্তে এই প্রশ্নটা কি চিরন্তন হয়ে জেগে থাকবে না? মোপাসাঁ, টুর্গেনিভ, শেখভ—এঁদের ছোট ছোট গল্পের ক্ষুদ্র তরঙ্গশীর্ষে তার তৃষাতুর যৌবনের এক ঝলক রক্ত কি নেচে উঠবে না? আগামী কাল এই কক্ষের মেঝে পুলিশের বুটের ঘায়ে যখন সচকিত হয়ে উঠবে, কাচের অন্তরালে পাশাপাশি বসে টলষ্টয়, বার্ণার্ড শ, ওয়েল্‌স্, ষ্টিভেনশনের মুখে কি তখন অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠবে না?

কোথায় যেন ঢং করে একটা বাজলো। চমকে উঠলো সুমিত্রা। এই ঘরের দেয়াল-ঘড়িটাতেও একটা বেজেছে। কিন্তু বাজবার শব্দ হয় না, যন্ত্র বিগড়ে গেছে। অজস্র বার সারাতে বলা হয়েছে, অজস্র বার অজিত তা ভুলে গেছে। কিন্তু টিকটিক শব্দ··· যেন জীবন্ত ধরণীর বুকের ধ্বকধ্বকানির মত শোনা যাচ্ছে।

একেবারে তুহিন-শীতল নিস্তব্ধতার মাঝে বিদায় নিতে চায় সে। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি, ভোরের ট্রেণে সে দাদার কাছে গেছে হাওয়া পরিবর্ত্তনে—এমনি ভাবে সে চলে যেতে চায়। সংসারের ঘানি প্রত্যহের মত ঘুরুক ঘড়-ঘড় করে, অজিতের দোকানের হোক উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, রতন বাবুর নয়া ডিজাইনের টিপয় ··· আসুক আসবাবের বাজারে, জয়শ্রী ইনস্যুরেন্স একখানা প্রকাণ্ড সার্টিফিকেট দিন অজিতকে, কারুর প্রতি অণুমাত্র অসন্তুষ্টিও মনে ··· চায় না সুমিত্রা বিদায়ের এই শেষ রাত্রিতে।······

সত্যিই ঠাকুরপো খুব ভালবাসতো তাকে। একা··· সে ছিল সুমিত্রার সঙ্গী, ভাই ও বন্ধু। মনের অনেক কথাই ··· অসঙ্কোচে বলে ফেলতো তাকে। সুমিত্রা নিশ্চয় জানে কাল ··· ছেলেটি ছোট ছেলের মত হাউ-মাউ করে কেঁদে কেঁদে জ্ঞান হা··· ফেলবে। কিন্তু বিদায় চেয়ে নেয়াও তো সম্ভব নয়।······

সুমিত্রা একটুখানি চিন্তিত হয়ে পড়ে। একখা··· চিঠি লিখে রেখে যাবে ঠাকুরপোকে সান্ত্বনা দিয়ে?···পরমুহূর্তে··· হাসি পায় তার। সমগ্র দুনিয়াই আজ যার কাছে ব্যর্থ নি··· হয়ে গেল, তার আবার পিছনের টান কিসের? কার জন্ত তার ···

একখানা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আর একখানা··· পা ছড়িয়ে দিল সুমিত্রা। ভারী গরম বোধ হচ্ছে। পাখাটা ··· দিলেই হয়। কিন্তু কাজ কি? কাজ কি আর অজিতের ··· ইলেকট্রিক বিলের অঙ্ক বাড়িয়ে? বিশেষ করে ঐ পাখার ··· সঙ্গেই যে দড়িটা বাঁধতে হবে। তার দেরীই-বা আর কী?··· সুমিত্রা ঘড়ি

দিকে চাইলো। দু'টো পার হয়ে গেছে ঘণ্টার কাঁটা কখন্ নিঃশব্দে। টের পায়নি সে। সময় এত তাড়াতাড়ি যায় ?

টেবিলের ওপর একখানা চেয়ারে উঠে দাঁড়ালো সে। তার পর হাত বাড়িয়ে পাখার রডে দড়িটা শক্ত করে বাঁধতে গিয়ে একেবারে অকস্মাৎ, আচম্কা, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে কয়েক বছরের পুরাতন স্মৃতি-সাগর উদ্বেলিত হয়ে উঠে মনে পড়ে গেল তার অভিলাষের কথা।

সেই অভিলাষ, তার কুমারী-জীবনের প্রথম পুরুষ ?···দীর্ঘদেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সেই বুকে আছাড় খেয়ে মরতে ইচ্ছে করতো সুমিত্রার। দাদার বন্ধু, তাই সুমিত্রাদের বাড়ীতে তার যাতায়াত ছিল অবাধিত। প্রথম পরিচয়ের পর কেমন করে অভিলাষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে গেল সে, তার পর কী করে সেই অন্তরঙ্গতা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠলো, আজ আর তার খুঁটিনাটি ইতিহাস মনে পড়ে না সুমিত্রার। শুধু মনে আছে এমনি এক দিন দাদার শোবার ঘরের পাখাটা বিগড়ে যাওয়ায় এমনি টেবিলের ওপর একখানা চেয়ার তুলে তার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল অভিলাষ অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের মতো হাতে নিয়ে একটি স্ক্রু ড্রাইভার আর চেয়ারখানা শক্ত করে ধরে রেখেছিল সুমিত্রা।

মুচকি হেসে সে বলেছিল : দেখবেন মিস্ত্রি সাহেব, অত নড়া-চড়া করলে ধরে রাখতে পারবো না আমি।

মিস্ত্রি! তুমি আমায় মিস্ত্রি বলে গাল দিচ্ছ সু ?—জিজ্ঞেস করেছিল সে।

সুমিত্রা জবাব দিয়েছিল ; আচ্ছা, আচ্ছা, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব। কিন্তু ঐ দু' মণ বপুর ভার হাল্কা চেয়ারখানা যে সইতে পারবে না, তাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে নড়া-চড়া একটু কম করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অভিলাষ বলেছিল হেসে : আর পড়লে তো তোমার ঘাড়েই পড়বো। মাথা ফেটে যাবার বা পা ভেঙে যাবার আর ভয় থাকবে না। দু' মণের চাপে এই চেয়ারখানার মতো তুমিও চ্যাপ্টা হয়ে যেতে পার।

বলে সে মিছেমিছি চেয়ারখানা ঠক ঠক করে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

দুষ্টু, অভিলাষ! এমনি করে সুমিত্রাকে ভয় দেখাবার জন্য কত বার সে ছাদের কার্নিশের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দোতলার সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপর দিয়ে সড়-সড় করে নেমে এসেছে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে। সুমিত্রার বুক দুলে উঠতো, চোখের কোণে জল ফুটে উঠতো।···ডানপিটে! যেমন ছিল বিরাট শরীর, তেমনি ছিল অদম্য সাহস! পাড়ার ছেলেরা তাকে গুরুদেব বলে ডাকতো। সেবার বালক সমিতির বার্ষিক উৎসবে একটা মোটা এক পাত লোহার পাত সে অক্লেশে হাতের সঙ্গে দড়ির মত জড়িয়ে দিলো, বাম্পার ঠেলে রেখেই একটা মোটর গাড়ী থামিয়ে রাখলে। মনে পড়ে সুমিত্রার সে দিনের কথা!···স্যাণ্ডো গেঞ্জি-ভর্তি তার সোনা আর রূপোর মেডেল চক-চক করছিল, দর্শকেরা চারি দিকে ঘন ঘন করতালি দিয়ে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে তুলেছেল, যার মধ্যেই ঘটে গিয়েছিল সেদিন সুমিত্রার হাত থেকে প্রকাণ্ড পেনডেন্টখানা খুলে নিয়ে ঐ তারাগুলির মাঝে চাঁদের মত এঁটে দেয় তার একটি হেয়ার-পিন্ দিয়ে ঐ স্যাণ্ডো গেঞ্জিতে এবং স্বেদসিক্ত ঐ সুবিশাল বক্ষে—

ব্যস্, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হলো। অকস্মাৎ চেয়ারখানা স্লিপ করতেই অভিলাষ হুড়মুড় করে একেবারে সুমিত্রার গায়ের ওপর পড়ে গেল।

ব্যথার চাইতে সুমিত্রা লজ্জাই পেল বেশী। কারণ ঠিক সময়টিতে বিপদ বুঝে কৌশলী স্মার্ট অভিলাষ এমনি ভাবে লাফ দিয়েছে যে, সুমিত্রার একেবারে গা ঘেঁসে মেঝেতে বসে পড়লো সে।

গা ঘেঁসে নয়, বুক ঘেঁসে!···স্পষ্ট মনে পড়ে সুমিত্রার সেই অভিলাষ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার জন্য বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে তাকে বলে গিয়েছিল : মিস্ত্রি এবার সত্যিই ইঞ্জিনীয়ার হতে চললো সু। এবার আর তোমায় চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের পাশে পাশেই থাকতে হবে। সেটা ভুলো না। চাকরি আজই দিয়ে রাখলাম প্রাইভেট সেক্রেটারী এ্যাণ্ড পার্টনার—

পার্টনার! পার্টনার কিসের ?

আমার জীবনের।—বলেই গট্-গট্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়েছিল অভিলাষ।

দূরে কার বাড়ীতে ঢং-ঢং করে তিনটে বেজে গেল।

নাঃ, আর দেরী করা যায় না। সাড়ে তিনটে বাজলেই আবার খোকা হয়তো জেগে উঠে অন্ধকারে হাতড়াবে। মাতৃস্তন পাবে না। একটু হরলিক্স্ তৈরী করে রেখে এলে ঠিক হতো। অজিত মাইপোষটা পারতো ওর মুখে পুরে দিতে।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালো। চারি দিকে আর একবার চাইলো। সংসার-ঘানির দাপটে সে অনেক দিন লাইব্রেরীতে আসতে পারেনি। আলমারীগুলো আদৌ ঝাড়া হয় না, কাচে ময়লা এত জমেছে যে, বইগুলোর নামই পড়া যায় না, চেয়ারগুলো সব ইতস্ততঃ ছড়ানো, মেঝেতে টুকরো কাগজ-এনভেলপ গড়াগড়ি যাচ্ছে।···কেন, তা হবে না। চাকর তো আর বাড়ীর জন্য নয়, দোকানের জন্য। খাবার পৌঁছুবে, চিঠি বিলি করবে আবার বসিকের ওপর নজর রাখতে হবে পাছে সে ভার্ণিশের সঙ্গে কেরোসিন তেল মিশিয়ে দেয়! নেহাৎ আজ সুমিত্রার জীবনের শেষ রাত্রি, নইলে কালই সে চাকর শ্রীমানকে বুঝিয়ে দিত যে, সে বাড়ীর জন্য নিযুক্ত, দোকানের জন্য নয়।···আর বলবেই-বা কাকে! এই তো খোকার কতগুলো জামা এখানে জড়ো করে ফেলে রাখা হয়েছে। কাল সকালে ঝিকে দেয়া হয়েছিল সাবান দেবার জন্য। সাবান দিয়ে ধুয়ে শ্রীমতী বৃষ্টি হচ্ছিল বলে মেলে দিতে না পেরে সেই যে কাল এখানে রেখেছিলেন, ব্যস্, আজও তা পড়ে রয়েছে সেই ভাবেই। কিছু বলা যাবে না, তাহলেই অজিত এসে ওকালতী করবে : গরীব মানুষ, খাবে কি, না-হয় একটা ভুলই করে ফেলেছে ইত্যাদি।

অথচ, কেমন করে এই অন্ধ পুরুষকে বোঝাবে সুমিত্রা যে, যার যা কাজ, সে তা না করলে তাকে ভুল হয়েছে বলে সর্ব্বদাই তুচ্ছ করা যায় না। এই তো সব জামাগুলোই ভিজে রয়েছে এখানে। সকালে দুধ খাওয়াবার পর জামা পরাবার সময় এইগুলোই কি পরাতে

হবে? আজকাল চারি দিকে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছে, ব্যস্, খালি গায়ে রেখে খোকার হোক্ তাই। তার পর ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ-পত্র, ইনজেক্‌শন-মিকশ্চার চলুক খোকাকে ভালো করবার জন্য।

কিন্তু ভালো যদি না হয়?···

কথাটা আচম্‌কা মনে পড়ে গেল সুমিত্রার। ডাক্তার এলেই কি রোগ ধরা পড়ে? ওষুধ দিলেই কি অসুখ সেরে যায়?···যদি ধরা না পড়ে? যদি না সারে?

উঃ, আর ভাবতে পারে না সে!

আবার সে টেবিলে উঠলো, চেয়ারখানায় উঠলো, দড়ির ফাঁস খুলে নিয়ে নীচে নেমে এল। তার পর এ ধারের আর আলমারীর দু'টো আংটার সঙ্গে দড়িটা টাঙ্গিয়ে নিয়ে তার ওপর মেলে দিল খোকার প্রত্যেকটি জামা পরিপাটি করে।

তার পর পূর্ণ বেগে খুলে দিল সে মাথার ওপরকার ··· ··· পাখা।

তার পর একখানা হাতল-ওয়ালা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আর একখানায় পা তুলে দিল।

আঃ, হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা!

আমাদের উপেন

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯০৫ সালের আগষ্ট ৭ তারিখে টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভের প্রথম বিরাট সভা আহূত হয়। ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র অরবিন্দর মেসো মহাশয় 'সঞ্জীবনী' সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। তিনি ৺সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্ম্মী। অরবিন্দ সেই সময় পশ্চাতে থাকিয়া ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রকে মুখপাত্র করিয়া স্বদেশী গ্রহণ বিদেশী বর্জ্জন, জাতীয় শিক্ষার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধের জন্য। পূর্ব্বের আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। এই উপায়ে দেশে নূতন ভাবের বন্যা আসিয়া পড়িল এবং সুরেন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে দেশে সেই ভাবের বন্যা বহাইয়া দিলেন। বাংলার আবাল-বৃদ্ধবনিতা সে আন্দোলনে সহায়তা করিল। যাহারা নিতান্ত হতভাগ্য—নিতান্ত বৃটিশের করুণার উপর নির্ভর করিত, তাহারা ভীত-ত্রস্ত হইয়া প্রকাশ্যে যোগদান করিতে পারিত না। অক্টোবর মাসে বঙ্গভঙ্গ গেজেট করা হইল। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাঁর রাখী-বন্ধনের বিখ্যাত সঙ্গীতটি জাতিকে দান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবিরা গানে-কাব্যে-সাহিত্যে দেশকে মুখর করিয়া তুলিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রদেশপাল হইলেন সার ব্যামফাইলড ফুলার। তিনি মুসলমানদের সুয়োরাণী করিয়া বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিলেন। ঢাকার নবাবকে হাত করিয়া মুসলমানদের বঙ্গবিভাগ লইতে স্বীকার করাইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তখন জাতীয়তাবাদী মুসলমান কম ছিলেন না, তাঁহারা এই স্বদেশী আন্দোলনকে সহায়তা দানে কুণ্ঠিত হন নাই।

ইতিমধ্যে 'বন্দে মাতরম্' দৈনিক সংবাদ পত্রের আবির্ভাব হইল। বাংলায় 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি' প্রকাশিত হইল। 'বন্দে মাতরমে' উপেন্দ্রনাথকে অরবিন্দ নিজে আমন্ত্রণ করিয়া সাদরে সম্পাদকীয় দলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। যে প্রবন্ধটির জন্য অরবিন্দ আসামী হইলেন, যে মকর্দ্দমায় ৺বিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া করিলেন কারাবরণ, যেদিন বালক সুশীল পুলিশকে মারিয়া বেত খাইল, সেই লেখাটি না কি উপেন্দ্রনাথের দ্বারাই রচিত ছিল। অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। তার পর উপেন্দ্রনাথ 'যুগান্তরে' যোগদান করেন।

যখন 'বন্দে মাতরমে' উপেন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় কার্য্য করিতেন সেই সময়ে ৩০শে আশ্বিনের আহূত সভায় যোগদান করা সম্বন্ধে আমি 'বন্দে মাতরমে' একখানি পত্র লিখি। সেখানি ছাপা হইবার পর উপেন্দ্রনাথ আমায় তাঁহার সহিত যোগদান করিতে বলেন।

আমি তখন ৺সুরেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ··· ··· এ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি করিয়া "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" বলিয়া দ্বারে দ্বারে কাপড় বিক্রয় করি—অনুশীলন সমিতির মত field and academy করি আমার গ্রামে। ৺সুরেন্দ্রনাথ আমাকে গ্রামের মধ্যে নুণ চিনি কাপড়ের স্বদেশী প্রচার করিতে পরামর্শ ও আদেশ দেন। আমি সেই আন্দোলনের মধ্যে ৺রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ···ন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহকর্ম্মী হিসাবে কার্য্য করিবার সুযোগ পাই। স্বদেশী আন্দোলনের তখন ঘোর ঘটা। সে সব ঘটনার নানা পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আর নাই লিখিলাম। প্রথম 'যুগান্তরের' নির্য্যাতনের বলি হইলেন আমাদের ডাঃ ভূপেন্দ্র··· ··· অনায়াসে সে মুক্তি পাইতে পারিত কিন্তু সে মুক্তি পা··· ··· লাঞ্ছনার কারণ হইত বলিয়া সে আত্মবলি দিল। ··· কিংসফোর্ড সম্বন্ধে যে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল— ··· ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় ও মুদ্রাকরকে আসামী ··· ··· উপাধ্যায় মহাশয় কলা দেখাইয়া হাসপাতালে মারা গেলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "যাহা বুঝিয়াছি তাহা করিয়াছি, ইংরাজের সাধ্য নাই যে তাহাকে সাজা দেয়।" যেমন কথা তেমনি ··· করিয়া গেলেন। 'যুগান্তর' দিনের পর দিন অগ্নিময় ··· যুবকদের হৃদয়ে ভারতের দাসত্বের গ্লানির তীব্রতা জাগাইতে··· ক্রমশঃ আইনের চাপ পড়িতে লাগিল—'যুগান্তরে'র যাহা ··· সব বাজেয়াপ্ত হইল। 'যুগান্তর' বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তখন ··· আমার বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী, অন্নদা কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতি ··· আমি

...নে গোপনে 'যুগান্তর' প্রকাশ করিয়া দেয়ালের গায়ে ও স্থানে স্থানে ছড়াইয়া দিতাম।

উপেন আমায় তাহার দলভুক্ত করিয়া অরবিন্দের সহিত পরিচিত করিয়া দিল—তার পূর্ব্বে বারীনদা'র সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিল—আমার উপর ভার ছিল—বিপ্লবের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। সেই সংগ্রহার্থে আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের লাগাইলাম এবং প্রথমে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিছরি বাবুকে এই দলে দীক্ষিত করিলাম। তার মত স্বদেশপ্রেমী ও তেজস্বী ধনী পুত্র অল্পই জন্মায়। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমাদের নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। নিজের অর্থ দিবার সাধ্য তখন ছিল না—নিজে সংগ্রহ করিয়া আবশ্যক মত অর্থ লাগাইতেন। তিনি নিজের বিলাস-ব্যসন সব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় অর্থ ও সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রথম উপেন আমার নিকট বলে যে, ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে দলবৃদ্ধি করিতে হইবে—এখন তাহা করিতে হইলে বিলম্ব হইয়া যাইবে। যখন যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারা যায় ততটুকুতেই সামলাইতে হইবে, কারণ ডাকাতি করিয়া স্থানে স্থানে ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রথম যে টাকা সংগ্রহ করিলাম নিজের বাটী হইতে করিলাম। দ্বিতীয় যে টাকা প্রয়োজন হইল—মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে মারিতে লোক পাঠাইবার জন্য। ইতিপূর্ব্বে মিছরি বাবুর সহিত বারীন্দ্র ও উপেনের আলাপ-পরিচয় করিয়া দেওয়ায় মিছরি বাবুর উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরে উত্তরপাড়া সভায় অরবিন্দকে আনিবার পর তার উৎসাহ সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি অরবিন্দের অনুগত হইলেন—আমারও খুব সুবিধা হইল।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মজঃফরপুরে চলিয়া গেল। তাহাদের খরচের জন্য আমি মিছরি বাবুর নিকট হইতে মাত্র ৩০০৲ টাকা লইয়া 'নবশক্তি' অফিসে উপেনের ও বারীনের হাতে দিয়া আসি। সেখানে যাহারা বাস করিত তাহারা সত্যই সন্ন্যাসীর মতই বাস করিত যদি ও ...িক ধারণ করে নাই। তাহাদের না ছিল আহারের যোগাড়, না ছিল বস্ত্রের যোগাড়, না ছিল শয্যার যোগাড়। তাহারা ছেঁড়া ... শুইয়া ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিত। সেই কর্ম্মযোগীদের সাথে আমার জীবন ধন্য হইয়াছিল এবং উপেন সেই যোগাযোগ ঘটাইয়া ...ন বলিয়া তাঁহাকে আমি রাজনৈতিক গুরু বলিতাম।

প্রথম দীক্ষা লইলাম—৺সুরেন্দ্রনাথের কাছে, দ্বিতীয় দীক্ষা লইলাম শ্রীঅরবিন্দের কাছে। এই দীক্ষার যোগাযোগ ঘটায় বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ।

মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের ফলে কিংসফোর্ড মরিল না—মরিল কেনেডির কন্যা এবং তাঁর পত্নী। দেশময় একটা হুলস্থুল হাওয়া বহিল—তার পর ক্ষুদিরাম ধরা পড়িল। তার ফাঁসি হইল। সে হাসিতে হাসিতে ফাঁসিকাঠে ঝুলিল দেখিয়া ব্রিটিশ-শক্তি শিহরিয়া উঠিল। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সি, আই, ডি ইনস্পেক্টর প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিল, প্রফুল্ল ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সেই স্থানেই হত্যা করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া নিজেকেই মারিল। কিংসফোর্ড উদ্দেশ্য হইয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

মাণিকতলা, 'নবশক্তি' অফিস এবং অন্যান্য আড্ডা হইতে দলভুক্ত যুবকদের ও শ্রীঅরবিন্দকে ধরিয়া লইয়া গেল, বোমা রিভলভার সহ সব ধরা পড়িল। আলিপুরের বোমার মকদ্দমা চলিল। তখন সেই মকদ্দমার খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া 'সঞ্জীবনী' অফিসে জমা হইতে লাগিল। নরেন গোস্বামী সরকার পক্ষের সাক্ষ্য হইয়া সত্যে মিথ্যাতে বহু নাম করিয়া দিতে লাগিল। কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু তাহাকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিল। বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র ঘোষ চন্দননগর হইতে রিভলবার যোগাড় করিয়া দিয়া আসিল। নরেন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল—দেশ শান্তির নিশ্বাস ছাড়িল। কানাই হাসিতে হাসিতে ফাঁসি গলায় পরিল। সত্যেন দত্তকে কোথা হইতে রিভলবার যোগাড় হইল জানিবার জন্য বহু প্রকার ক্লেশ দিতে দিতে না কি ফাঁসির পূর্ব্বেই তার মৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং সেই মৃত ব্যক্তিরই ফাঁসি হইল। কানাই দত্তের শবদেহের শোভা-যাত্রা ও সম্মান দেখিয়া ব্রিটিশ-শক্তি কম্পিত হইল এবং সত্যেনের শবদেহ জেলের ভিতরেই ভস্মীভূত করিল।

বিচারের ফলে যাহা ঘটিল তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা—নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি তার পর হইতে সর্ব্বদাই দিন গণিতাম কবে আমার ডাক আসিবে। কেন ধরা পড়িলাম না—সে কথা এর পরের প্রবন্ধে লিখিব। উপেনের সঙ্গে আমার পোর্টব্লেয়ার হইতে পত্রের আদান প্রদান মধ্যে মধ্যে চলিত।

[ক্রমশঃ]

অবকাশ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরের সুবিস্তীর্ণ শূন্যতার পানে আঁখি মেলি'
বিরলে ভাবিছ বসি' এ-জীবন শুধু অর্থহীন ;
মিলালো আলোর শিখা, আঁধারের বাজিছে কিঙ্কিণ,
কাজল নয়ন ভরি' ঘনাইল অশ্রুর কুহেলি।

... করিল হিয়া সৌরভের সমারোহে বেলি,
... উঠিল কোনো অনাহত সুরে মন-বীণ ;
... আবার মনে পিছনের গত সেই দিন,
... চুমিলে এই কবিতাটি দীর্ঘশ্বাস ফেলি'।

বুঝিলে—কী আশা মোর পায় নাই ভাষা খুঁজে তার,
গুমরিয়া মরে খালি কবিতার অক্ষরে অক্ষরে ;
নয়নে ও নভে কেন অফুরান শ্রাবণ-আসার,
কাহার স্বপন ভাসে বিরহীর আতুর অন্তরে।

লুকায়ে লিখেছি সেই যতোটুকু ছেঁড়া ইতিহাস,
ভরিয়া তুলিল তব আজিকার একা অবকাশ।

টীকা কি সত্যই বসন্ত-প্রতিষেধক ?

আরতি রায়

সম্প্রতি টীকা-বিরোধী সংঘের সম্পাদিকা মিস্ লেক সাংবাদিকদের কাছে বসন্ত রোগ প্রশমনের জন্ম টীকা দেওয়ার প্রচলিত অভ্যাসের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি দিয়েছেন। সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো সহরে বসন্ত রোগের কিছু প্রকোপ হয়েছিল। মিস্ লেক জানান : এই উপলক্ষে যাঁরা টীকাদান প্রথার সমর্থক, তাঁরা আবার খুব জোরগলায় টীকা দেওয়ার স্বপক্ষে প্রচার আরম্ভ করেছেন। প্রকাশ যে, মাসা আলি নামক এক এশিয়াবাসী স্কটল্যাণ্ডে নবাগত নাবিকেরই প্রথম বসন্ত রোগ হয় এবং তার থেকেই অন্যত্র সংক্রামিত হয়। এই লোকটি কিন্তু দস্তুরমত টীকা নিয়েছিল, এবং চিকিৎসকেরা তা জানতেন বলেই তাঁরা প্রথম থেকে বসন্ত রোগ সন্দেহ করেননি—টীকার প্রতি তাঁদের এমনই গভীর বিশ্বাস! প্রথমেই যদি বসন্ত রোগ ধরা পড়তো, তাহলে রোগীকে আলাদা করে দিলেই অন্যত্র তার ছোঁয়াচ লাগত না।

মিস্ লেক স্পষ্টই বলেছেন যে, যদি বসন্তের বীজাণুকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আপনার শরীরে না থাকে তাহলে টীকা নিন আর না নিন—রোগ-বীজ আপনার দেহে সংক্রামিত হলে আপনার বসন্ত হবেই—আর আপনার মৃত্যু-সম্ভাবনাও থাকবে।

গ্লাসগোতে বসন্তের প্রকোপ সম্পর্কে ঐ সহরের জন-স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাঃ ষ্টুয়ার্ট লেডল বলেছেন যে, যদি এই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করবার কোনও সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তিনি সর্ব্বসাধারণকে টীকা দেওয়ার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করবেন। এই প্রসঙ্গে মিস্ লেক বলেন, এতে জনসাধারণের প্রচুর ক্ষতি হবে। অনেককে হয়তো সপ্তাহ কাল শয্যাশায়ী হয়ে কাটাতে হবে—তাদের কাজ-কর্ম্ম ফেলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যারা টীকা নেবে, তাদের শরীরে এর এমন প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে, যাতে তারা হয়তো সারা জীবন কষ্ট পাবে। মিস্ লেকের মতে বসন্ত রোগ প্রসারের বিরুদ্ধে একমাত্র ব্যবস্থা যা অবলম্বন করা যেতে পারে, তা হল, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা।

জ্যাকব হেনড্রিক ভ্যাণ্ট হফ্

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

যে বিখ্যাত মনীষী রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান তাঁর নাম ভ্যাণ্ট হফ্। কোনো এক সাধারণ চিকিৎসকের পুত্র ভ্যাণ্ট এবং ১৮৫২ সালের ৩০শে আগষ্ট রটারডাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি Delft Polytechni[illegible] অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং যৌবনে Leyden, Bonn, Pari[illegible] Utrecht প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবার সুযোগ [illegible] এবং ক্রমে ১৮৭৪ সালে শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় Utrecht [illegible] ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত হন। ডাচ্ ভাষায় এই সময় [illegible] ষ্ট্রাক্চারাল্ ফরমূলা ইন স্পেস্ (structural formula in space) সম্পর্কিত বই প্রকাশিত হয় এবং পরে ঐ বই [illegible] ভাষায় অনূদিত হয়। এর পর ১৮৭৬ সালে Utrecht Veterinary College-এ তিনি পদার্থ বিদ্যার প্রফেসর নিযুক্ত হন। [illegible] বছর খানেক পরে আমস্টারডাম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার [illegible] পান। এই সময় তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর ছিল।

রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর ষ্ট্রাক্চারাল্ ফরমূলা সম্পর্কিত [illegible] গবেষণার জন্যে তাঁকে ষ্টিরিও কেমিষ্ট্রী বা বিন্যাস রসায়নের [illegible] বলা হয়। এর পর তিনি সংগঠনাত্মক সংকেত অর্থাৎ structural formula সম্পর্কিত গবেষণা থেকে সরে গিয়ে রাসায়নিক [illegible] বিজ্ঞান বা chemical dynamics সম্পর্কে গবেষণা সুরু [illegible] এবং ১৮৮৪ সালে এই গবেষণার ফলাফল একটি পুস্ত[illegible] লিপিবদ্ধ করেন। এই গবেষণার ফলে রাসায়নিক [illegible] এবং ইকুইলিব্রিয়াম্ অফ্ হোমোজিনাস অ্যাণ্ড হেট[illegible] সিসটেম (equilibrium of homogenous and h[illegible]ogenous system) সংক্রান্ত গবেষণা অনেকখানি [illegible] এর পর তিনি রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে [illegible] তাপগতিবিজ্ঞানের সূত্রগুলি (laws of thermodyna[illegible]) ব্যবহার করে অনেক মূল্যবান সমাধান করতে সক্ষম [illegible] ছাড়া ভ্যাণ্ট হফ্ অভিসরণ চাপের (osmatic pre[illegible]) সূত্রগুলির সত্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং [illegible] পরীক্ষা আরহিনিয়াস নামক আর এক নোবেল বিজ্ঞানীর the[illegible] of dissociation বা ব্যবচ্ছেদ মতবাদ সূত্র গঠনে যথে[illegible] করেন।

ভ্যাণ্ট হফ্ সারা জীবন ধরে গবেষণা ক'রে যে সব মূল্[illegible] আবিষ্কার করেন, তা তিনি ১৯০১ সালে পুস্তকাকারে প্রক[illegible] এবং এই সূত্রগুলির বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা উপল[illegible] তাঁকেই প্রথম নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এই পুরস্কার পাবার বহু আগে ১৮৯০ সালে [illegible] পদার্থের দ্রবণের (solid solution) বৈজ্ঞানিক স[illegible] করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি আমস্টারডাম্ থেকে বার্লি[illegible] বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানজনক অবৈতনিক প্রফেসর নিযু[illegible]

এই সময় তিনি আরো গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হন এবং মাঝে তাঁর গবেষণা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। বিভিন্ন ভাষায় গুলি অনূদিত হয়।

১৯১১ সালে ৩রা মার্চ এই বিরাট প্রতিভার মৃত্যু হয়।

পেনিসিলিন

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য

ব্যাঙের ছাতা দেখেছ ত? এই ত বর্ষা আসছে, চারি দিক ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকবে, আর তা থেকে দেখা দেবে ছোট ছোট সাদা সাদা ছাতা, আবার কোথাও সবুজ শ্যাওলা। ভিজে গেল, ঘরে ফেলে রাখলে, রোদ্দুর নেই কি করবে। ক'দিন দেখা গেল সাদা সাদা বা সবুজ সবুজ কি দেখা যাচ্ছে? মা "ওরে জুতোগুলো একটু রোদে বার কর, ছাতা ধরে গেল যে!" ভিজে এক কোণে পড়ে আছে, গজাল তার থেকে ছোট ছোট কাঠ পচে গেল ভিজে ভিজে, তাতেও দেখা গেল ছাতা এই শ্যাওলা ছাতা আর ব্যাঙের ছাতা এ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই নয় কি? এই ধরণের জিনিষগুলি যে ভয়ানক একটা দরকারী কাজে লাগতে পারে এ আমরা স্বপ্নেও পারি না, বরং ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত জিনিষ বলেই জানি, যে একেবারেই মিথ্যে কথা তা নয়, আবার সব ব্যাঙের বিষাক্ত নয় এ কথাও ঠিক। বাজারে ব্যাঙের ছাতা মাঝে কিনতেও পাওয়া যায়, সেগুলো মাংসের মত করে রান্না করে বেশ লাগে। ক'দিন আগেকার কাগজে দেখেছ তো ব্যাঙের খেতে গিয়ে কি বিপত্তিই ঘটে- কাজেই ব্যাঙের ছাতা কোন্‌টা কোন্‌টা ভাল আমাদের চেনা তাই আমরা বলবো ও-সবের না খাওয়াই ভাল। কিন্তু পশ্চিমে ব্যাঙের ছাতা আর শ্যাওলা কত আশ্চর্য্য রকম ওষুধ আবিষ্কার তোমরা বলবে—'ধ্যাৎ, তাও হয় না কি?' আচ্ছা, আগে শোন, তার পর মতামত কোরো। অবশ্য ঠিক যে ব্যাঙের বা শ্যাওলা থেকে ওষুধটা তৈরী তা নয়। এই ধরণের জিনিষগুলিকে বিজ্ঞানে বলে Fungus আর us জাতীয় জিনিষ থেকে জগতের মহা উপকারী ওষুধ আবিষ্কৃত তার একটার কথা তোমাদের ছি।

১৯২৯এর কথা। Alexander ing বলে এক জন ইংরেজ বৈজ্ঞা- রোগ-বীজাণু নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি কতকগুলি ষ্ট্যাফিলোকক্কাসের বীজাণু বাতাসবিহীন কাচের পাত্রে রেখে তা'তে বিশেষ ধরণের খাদ্যবস্তু দিয়ে বীজাণুগুলি কয়েক গুণ বেড়ে যাবার ব্যবস্থা করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ এক দিন তিনি আবিষ্কার কোরলেন, ঐ বাতাসহীন পাত্রে সবুজ শ্যাওলা জমেছে কি জমেছে। বৈজ্ঞানিক তিনি—কাজেই অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক, ফলে আশ্চর্য্য হয়ে আবিষ্কার করলেন যে, ঐ সবুজ শ্যাওলা ধরণের জিনিসগুলি যেখানে জন্মেছে তার আশে-পাশে ষ্ট্যাফিলোকক্কাস বীজাণু কেবল যে বাড়েনি তা নয়, এর ছোঁয়াচ লেগে বীজাণুগুলি এক দম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি উঠে-পড়ে লেগে গেলেন এই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন জিনিষটির খবরাখবর জানতে। শেষ কালে জানা গেল, এটা যাকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে বলে Penicillium natateum অর্থাৎ এক রকমের মোল্ড বা শ্যাওলা, এর বীজ বাতাসেও থাকতে পারে আর উপযুক্ত খাদ্য ও আবহাওয়া পেলে যেখানে-সেখানে জন্মাতেও পারে। Fleming এর গবেষণার পাত্রেও কোন রকমে বাতাসের সঙ্গে ২।৪টি বীজ ঢুকে গিয়ে বেশ ভাল খাদ্য আর থাকবার জায়গা পেয়ে বেড়ে গিয়েছিল। এই মোল্ড থেকে সব চেয়ে দরকারী জিনিষ যা আবিষ্কার হোল সেটা হচ্ছে এই যে, এর নিজের কোন বীজাণুধ্বংসী গুণ নেই; এই শ্যাওলাগুলি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক রকম রস বেরোয় সেটাই কতকগুলি রোগ-বীজাণু ধ্বংস করে। Fleming এই মোল্ডগুলো নিয়ে দ্রাবক রসে ডুবিয়ে আবার পরীক্ষা সুরু করলেন। এই রকম পরীক্ষার নাম calture করা। দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় অর্থাৎ subcalture করতে গিয়ে Fleming একে ৮০০ গুণ তরল করে দিলেন এবং দেখলেন, এই তরল পদার্থের তখন পর্য্যন্ত কতকগুলি রোগ-বীজাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে। Fleming এই
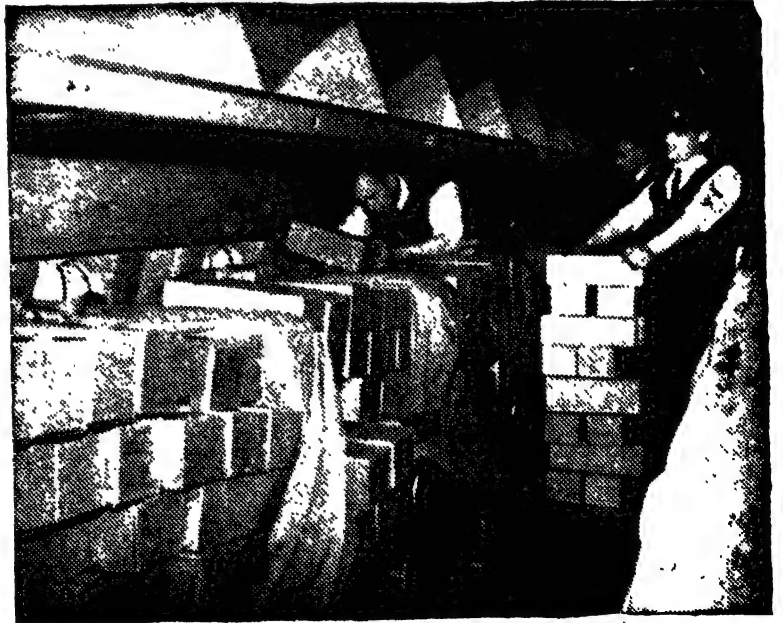
বিমানের ভিতরে পেনিসিলিন

তরল পদার্থের নাম দিলেন Penicillin ; আসলে ঐ তরল পদার্থটাই Penicillin নয়, মোল্ড থেকে যে রস বেরোয় বলেছি তাকেই বলে Penicillin—প্রথম আবিষ্কার এইখানেই শেষ হোল।

তিন বছর পরে আবার সেই তরল পদার্থ নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা কি করে Penicillinটুকু বার করে আনা যায়, জারক রস ভিন্ন গ্লুকোজ বা লবণ জাতীয় জিনিষে এটা উৎপন্ন হ'তে পারে কি না ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ডাক্তারদের উৎসাহ দেখা গেল না, কারণ তখন সালফনোমাইড পাউডারেরই বহুল প্রচার ছিল, আর তা ছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য বলে কিছু দিনের জন্যে চাপা পড়ে গেল।

৮ বছর পরে ১৯৪০-এ এক দল বৈজ্ঞানিকের এক অভিমত প্রকাশিত হ'ল। তাতে প্রয়োজনীয় অংশটুকু বের করে আনবার পদ্ধতি এবং বেশ কিছু দিন এই মহা মূল্যবান জিনিষটি রাখবার উপায়ও বলা হ'ল। যাই হোক, এত সব করার পরও দেখা গেল, খাঁটি পেনিসিলিন যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা একটা গিনিপিগের উপর পরীক্ষা চালাতে যতটা পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার হয় তার মধ্যে মাত্র শতকরা এক ভাগ থাকে। ঐ বৈজ্ঞানিকের দল ষ্ট্যাফিলোকক্কাস্, ষ্ট্রেপটোকক্কাস্ ক্লস্ট্রিডিয়াম বীজাণুর ওপর Penicillinএর আশ্চর্য্য রকম প্রভাব দেখতে পেলেন।

এত দিন পর্য্যন্ত কেবল জন্তুদের ওপরই পরীক্ষা চালান হচ্ছিল। ১৯৪১ সালে প্রথম মানুষের ওপর Penicillinএর প্রয়োগ করা হ'ল, তাতে রোগী আশ্চর্য্য রকম সাফল্য দেখালেও কয়েকটা উপসর্গ থেকে গেল, যেমন ধর বমি-বমি ভাব, মাথা-ঘোরা ইত্যাদি। আবার অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা এর কারণ বার করবার চেষ্টা হ'ল এবং দেখা গেল, যে সব উপসর্গ থেকে যাচ্ছে সেটা Penicillinএর সঙ্গের বাড়তি কিছুর প্রতিক্রিয়া, কাজেই ঐ বাড়তি দূর করবার প্রক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের ভীষণতম আলোড়নের জন্যে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকেরা নিরিবিলি কাজ করতে চলে গেলেন আমেরিকায়। সেখানকার বৈজ্ঞানিকরা খুব উৎসাহের সঙ্গেই এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ফলে আজ তোমরা পাচ্ছ Penicillin Injection, মলম, লজেন্স ইত্যাদি কত রকমের জিনিষ। হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি, Penicillin আবিষ্কৃত হবার পর এর ব্যবহার ছিল কেবল মাত্র বাহ্যিক প্রয়োগ, পরে Injection ইত্যাদি হয়েছে।

এই শ্যাওলা জাতীয় জিনিষ থেকে ওষুধটির আবিষ্কারের ফলে পচা পুরোনো ঘা থেকে সুরু করে ডিপথিরিয়া, মেনিনজাইটিস, ষ্ট্রেপটোকক্কাস আক্রমণ, সাধারণ ঘা ইত্যাদি আশ্চর্য্যজনকভাবে সেরে যাচ্ছে। Typhoid, পেটের অসুখ ইত্যাদিতে এর কোন কাজ হয় না, কিন্তু সেপ্‌টিক সংক্রান্ত রোগে Penicillinএর প্রয়োগ প্রায় অব্যর্থ বলা যায়। যে সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা পেনিসিলিনের উৎপত্তি ও তাকে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হয়, সেটা দু'-চার কথায় বোঝান মুস্কিল ; তবে মোটামুটি যে প্রক্রিয়া আজকাল ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা ব্যবহার করছে, সেটা হচ্ছে, বীজাণুশূন্য বড় বড় কাচের পাত্রে গমের খোসা বীজাণুশূন্য জল দিয়ে মেখে রেখে রাখা হচ্ছে, ক'দিন বাদেই সবুজ সবুজ শ্যাওলার মত গজাচ্ছে। এগুলো তাই দিয়ে বড় বড় ফ্যাক্টরীতে তখন মহা উৎসাহে নানা রকম cultureএর ভিতর দিয়ে Penicillin বার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ফ্রান্সে কৃত্রিম উপায়ে Penicillin তৈরী করবার কারখানা হয়েছে। আমাদের দেশেও পুণার কাছে Penicillin তৈরী করবার জন্যে কারখানা তৈরী হচ্ছে।

পেনিসিলিন বিমানপোত থেকে মোটরে উঠছে

ইলেক্‌ট্রণ মাইক্রস্‌কোপ

শ্রীদিলীপ ঘোষ

চক্ষু আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান হলেও প্রয়োজনের তুলনায় এর সামর্থ কিন্তু যথেষ্ট নয়। [illegible] নিয়মে এর দৃষ্টি-ক্ষমতা যতটুকুর [illegible] সীমাবদ্ধ, তার বাইরেও অনেক [illegible] কিছু রয়ে গিয়েছে, যার পরিচয় [illegible] লুকানোই ছিল। লুকানো থাক [illegible] যদি মানুষের কৌতূহল রূপকথার [illegible] না-শোনা রাজপুত্রের মত সেই [illegible] জগতের রহস্য-বৈচিত্র্য জানবার [illegible] কৌতূহলী না হতো। এ জগতের [illegible] অনেকখানি,—মানুষের দৃশ্য-জগতের [illegible] সীমান্তে এদের সুরু। মহাশূন্যের [illegible] গ্রহ উপগ্রহের বিচরণ-স্থান, আর [illegible] বিপরীত দিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র [illegible] জীবাণুদের সাম্রাজ্য ;—এ দু'য়ের [illegible] খানিই কিন্তু আজকের জানার [illegible] মধ্যে এসে গেছে।

মানুষের এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের [illegible] ক্ষমতা মোটেই যদৃচ্ছ-প্রসারী নয় [illegible] [illegible] আমস্‌টারডাম থেকে পাওয়ার [illegible] সম্মানজনক অবৈতনিক কোন বস্তু [illegible]

কাছে আনা যায়, ততই তার আকৃতি ইত্যাদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা সত্যি, কিন্তু এই দূরত্ব কমতে কমতে যখন দশ বারো ইঞ্চির কাছাকাছি এসে পৌঁছয়, তখনই সেটা আবার ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে থাকে। চোখের সামনে যে লেন্সটি আছে, সেটা এত কাছের জিনিষকে ফোকাস না-করতে পারার জন্যেই অসুবিধে। পরিষ্কার-ভাবে কোন জিনিষ দেখতে পাওয়ার এই যে দূরত্ব, ইংরেজীতে তাকে বলে Least Distance of Distinct Vision.

চোখের দ্বিতীয় অক্ষমতা হচ্ছে এর পর্দা বা Retinaর সংগঠক কোষগুলির দরুণ। কোন বস্তু বা তার গায়ের দুইটি সংলগ্ন বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব যদি এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগের (ইঞ্চি) চেয়েও কম হয়, তবে তাদের প্রতিবিম্ব চোখের সেলগুলোকে আলাদা কোনও সাড়া জাগাতে পারে না। ফলে, বস্তুতঃ পৃথক্‌ হলেও একই বিন্দু বলে প্রতীত হয়।

চোখের এই অক্ষমতা সেদিনই অনেকটা দূর হল, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যেদিন কাচ ঘষে ঘষে প্রথম লেন্স বা পরকলা বানাতে সক্ষম হলেন হল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক লিউয়েন হোক্‌। ক্ষুদ্র বস্তুকেও কুড়ি গুণ বর্ধিত আকারে দেখানো এই লেন্সের বৈশিষ্ট, তাই যে বিন্দুদের ব্যবধান দু'শো মিলিমিটারের কাছাকাছি, খালি চোখে তাদের দেখা না গেলেও এই লেন্সের সাহায্যে তা মনে হবে ... মিলিমিটার। ফলে, সেই ক্ষুদ্র বস্তু, যার স্বরূপ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না এতক্ষণ, তা অনেক সরল ও সুপরিস্ফুট হয়ে এল আমাদের চোখের কাছে। এই হ'ল সাধারণ বীক্ষণ যন্ত্র বা আতস কাচের কথা।

এর চেয়েও বেশী বিবর্ধন (Magnification) প্রয়োজন হলে আমাদের ব্যবহার করতে হবে একাধিক লেন্স দিয়ে প্রস্তুত যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এতে সোজাসুজি দ্রষ্টব্য বস্তুর দিকে না তাকিয়ে প্রথমে একটা লেন্সের সাহায্যে তার আকৃতি বিবর্ধিত করা হয়, সেই বিবর্ধিত আকৃতিকে এবার দ্বিতীয় লেন্সের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতি লেন্সের বিবর্ধন ক্ষমতা যদি হয় সাধারণ আতস কাচের দশ গুণ, তবে এ ক্ষেত্রে মোট একশো গুণ বিবর্ধন পাওয়া গেল।

... গুণ বিবর্ধিত ক'রে দৃশ্যাতীত জীবাণু-রাজ্যের অনেক ... বিচিত্র এই যৌগিক অণুবীক্ষণের সাহায্যে সুপরিস্ফুট হয়ে ... নানা প্রকার ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতিকে জানতে পারা গেল, ... গেল তাদের ধ্বংসমূলক ক্রিয়াকলাপ। কিন্তু তাতেই তো সব কিছু প্রয়োজন মিটল না। শুধু জানলেই হবে না, তাদের পুংখানুপুংখরূপে (details) চিনিতেও পারা চাই। তাদের চেয়েও যারা ক্ষুদ্রতর অন্যান্য জীবাণু ভাইরাস ইত্যাদি, তাদেরও ধরতে পারা চাই দৃষ্টিসীমার মধ্যে। তার জন্যে প্রয়োজন আরও বেশী বিবর্ধনের।

অনেকে ভাবলেন, দু'টো লেন্সের সাহায্যে যদি একশো গুণ বৃদ্ধি সম্ভব হয়, তিনটে লেন্সের সাহায্যে হবে আরও বেশী, চারটের সাহায্যে আরও। সে চেষ্টাও চলল। লেন্সের নানা প্রকার উন্নতি করা হ'ল। কিন্তু আপত্তি এল আলোর তরফ থেকে। সাধারণ আলো আর মানুষের জন্যে অত খাটতে রাজী হ'ল না। প্রথম অসুবিধে, অনেকগুলো লেন্স পর পর সাজিয়ে অনেক বেশী বিবর্ধন করা যাবে, কিন্তু যত বেশী বিবর্ধন হচ্ছে, একই পরিমাণ আলো,—যেটুকু ওই লেন্সের গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসছে,—সেটুকুই তত বেশী বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। ফলে হচ্ছে কি, প্রতিফলিত দৃশ্যটা তত কম পরিমাণে আলোকিত হচ্ছে। এ ছাড়া, কাচের তৈরী লেন্স যত নিখুঁতই হোক্‌ না কেন, পুরোপুরি স্বচ্ছ মোটেই নয়। তাই তাদের সংখ্যা যত বাড়ানো হয়, প্রত্যেকেই আলো নিয়ে কিছু কিছু 'স্মাগ্‌লিং' করায় সবাই মিলে আলোর পরিমাণ আরও কিছু কমিয়ে দেয়।

এই অনতিক্রম্য বাধা ছাড়াও আলোর শক্তিহীনতা আরেক মুশকিল। আলোর চরিত্র অনুধাবন ক'রে জানা গেছে, আলো প্রধানতঃ তরঙ্গধর্মী। এই তরঙ্গময় আলোকরশ্মি কোন পদার্থের ওপর পড়লে অস্বচ্ছ অংশে তা আটকে যায়, কিন্তু স্বচ্ছ অংশের ভেতর দিয়ে তার গতি অবাধ। এই ভাবে অপর পার্শ্বে সেই বস্তুর ছায়া পড়ে। কিন্তু যদি দু'টি অসচ্ছ অংশের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ক্ষুদ্রতম আলো-তরঙ্গের চেয়েও ছোট হয়, তাহ'লে তার ভেতর দিয়ে যাবার সময় ধাক্কা লেগে তরঙ্গের সমস্তটাই চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদের আর কোন ছায়াই পড়ে না। এই কারণেই পাঁচ হাজার মিলি-মিটারের চেয়ে ছোট কোন বস্তুকে আর আলোর সাহায্যে দেখা যায় না।

এইবার ইলেকট্রণ এগিয়ে এল মানুষের সেবায়। নেগেটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন এই সব ইলেকট্রণ-কণিকাগুলির ব্যাস প্রায় এক মিলি-মিটারের কুড়ি হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। সব চেয়ে বড় কথা, এই ইলেকট্রন গতিসম্পন্ন হ'লেই আলোর মত তরঙ্গধর্মী হয়ে যায়, আর এর দৈর্ঘ্য হয় আলোর চেয়ে অনেক—অনেক

ছোট। তার ছোটার বেগ যতই বাড়তে থাকে, ততই কমতে থাকে এই তরংগ-দৈর্ঘ্য। এখন এই ইলেকট্রণ-তরংগকে যদি আলোর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়, তাহলে যেটুকু ব্যবধানের ভেতর দিয়ে আলো যেতেই পারে না, তার মধ্যে দিয়েও অনায়াসে চলে যাবে এই ক্ষুদ্রতর ইলেকট্রন-তরংগ বস্তুটির বিশদ ছায়া বহন ক'রে।

এই আশা নিয়ে কাজ করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। প্রথমেই প্রয়োজন এই রশ্মিকে ফোকাসিত (Focussed) করবার লেন্স। কিন্তু কাচের লেন্সে তা অসম্ভব, কারণ এই ইলেকট্রন কাচকে ভেদ ক'রে যেতে পারে না। সে কাজ সম্ভব কেবল চৌম্বক লেন্সে। উপযুক্ত বিদ্যুৎ চালিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ইলেকট্রন-রশ্মিকে প্রয়োজন মত ফোকাসিত করা গেছে।

পূর্বেই বলেছি, ইলেকট্রন-তরংগের দৈর্ঘ্য ততই কম হবে, যত তার গতিবেগ বাড়ানো যাবে। কিন্তু কি ভাবে?

একটি টাংস্টেন ধাতুর তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তার গাত্রদেশ থেকে অজস্র ইলেকট্রন নির্গত হতে আরম্ভ করে। সামনে রাখা হয় পজিটিভ শক্তিবিশিষ্ট একটি প্লেট। এই প্লেটের বিদ্যুৎ হয় খুব শক্তিশালী (high voltage)। ফলে নেগেটিভ তড়িংযুক্ত ইলেকট্রনগুলি ভীষণ দ্রুতগতিতে সেদিকে আকৃষ্ট হয়। প্লেটের মধ্যস্থলে আছে একটি ছিদ্র। তার মধ্য দিয়ে এই দ্রুতগতি ইলেকট্রনের একটি রশ্মি বেরিয়ে যায়। প্লেটটি ষাট হাজার ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন হলে এই ইলেকট্রনের গতি হয় সেকেণ্ডে প্রায় ষাট মাইল। মাইক্রস্কোপের এই অংশকে বলা হয় Electron Gun.

মধ্যস্থলে ছিদ্রবিশিষ্ট একটি নেগেটিভ ও আরেকটি পজিটিভ বিদ্যুৎ-সম্পন্ন প্লেট ইলেকট্রনের পথে রেখেও ইলেকট্রন-রশ্মিকে ফোকাসিত করা যায়। প্লেট দুইটির কেন্দ্রস্থ পথ দিয়ে যাবার সময়ে ইলেকট্রন প্রথমে উপরের নেগেটিভ প্লেটের পরিধির প্রভাবে সমান ভাবে বিকর্ষিত হয় এবং নীচের পজিটিভ প্লেট এদের সমান ভাবে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ সোটা সরল গতিতে নেমে যায়। কিন্তু যে সব ইলেকট্রন কেন্দ্রের পথ থেকে ছিদ্রের পরিধির দিকে নিকটবর্তী থাকে, তারা প্রথম নেগেটিভ প্লেটের প্রভাবে পুনরায় প্রায় কেন্দ্রবর্তী হয়ে আসে। ফলে হয় কি, কাচের লেন্স যেমন আলোক-রশ্মিকে একটি বিন্দুতে ফোকাসিত ক[রে] তেমনি ভাবে এই ইলেকট্রন-রশ্মিতে ফোকাসিত হয়।

কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রস্তুত গোলাকার পোলবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চুম্বক সাহায্যে আরও আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। তড়িংযুক্ত ইলেকট্রন কণিকা এই চুম্বক ক্ষেত্রে পড়লে সবেগে আবর্তিত হয়ে একটি বিন্দুতে ফোকাসিত হয়।

উৎস-নির্গত ইলেকট্রন-রশ্মিকে তার পর চৌম্বক লেন্সের সাহায্যে প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে ফোকাসিত করা হয়। লেন্সের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎশক্তি কমিয়ে বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দু'টি লেন্স,—একটি objective, অপরটি eye piece, একটি condenser-লেন্স, ইলেকট্রন-গান—এদের সমন্বয়ে এই ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ তৈরী হয়েছে, যার বিবর্ধন-ক্ষমতা কুড়ি হাজার থেকে প্রায় এক লক্ষ গুণ।

অবশ্য এই মাইক্রস্কোপ ব্যবহারে অনেক অসুবিধে এসে দি[য়েছে]। প্রথম অসুবিধে, ইলেকট্রনের গমনের জন্যে চাই সম্পূর্ণ [বায়ুশূন্য] একটি রাস্তা। কারণ সামান্য পরিমাণেও বাতাস থাকলে ইলেকট্রন-রশ্মির গতি তাতেই থেমে যাবে। এ কারণে সমস্ত যন্ত্রটি সব সময় বায়ুশূন্য করে রাখতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মাইক্রস্কোপে দে[খবার]

জন্যে নমুনা প্রস্তুত করার হাংগামা। দ্রষ্টব্য নমুনার ক্ষীণতা হ[বে] অন্ততঃ এক মিলিমিটারের পাঁচ হাজারের এক ভাগ। অসুবিধে, এই রশ্মি-তরংগ চোখের স্নায়ুতে কোন [সাড়া] জাগাতে পারে না। তার প্রতিবিম্ব দেখবার জন্যে চাই একটি প্রতিপ্রভ (fluorescent) পর্দা। ইলেকট্রন পর্দার ওপর এসে পড়লে তাতে তার ছবি ফুটে ওঠে, আমরা তা দেখতে পাই। সব চেয়ে প্রধান অসুবিধে, আয়তন এবং বিরাটত্বর মূল্যের পরিমাণ। উচ্চতায় মা[নুষের মত] এই যন্ত্রের চেহারাও যেমন, দামও তেমনি কয়েক লক্ষ [টাকার] কাছাকাছি। আর খোরাকও সেই রকম। প্রতিবার ব্যবহার [আগে] খুব জোরাল পাম্পের সাহায্যে যন্ত্রের ভেতরের সমস্ত [বাতাস বের করে] দেওয়া, প্রচুর হাই ভোল্টসম্পন্ন বিদ্যুৎ চালানো, তার খেয়ে গবেষকের প্রাণনাশের আশংকা,—সব-কিছু মি[লিয়ে] দিতে হয় কম নয়।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"সমস্ত চাকুরীতে উদ্বাস্তু যুবকদের আবেদন অগ্রগণ্য বিবেচনা করার সরকারী সিদ্ধান্তে পশ্চিম-বঙ্গের যুবকবৃন্দের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গবাসী কোন যুবক সরকারী চাকুরী পাইতেছে না। অবাঙ্গালী শিল্পপতিবৃন্দও বাঙ্গালী যুবকদের গ্রহণ করিতে নারাজ। অন্যান্য সকল স্থানেও পশ্চিম-বঙ্গের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ উপেক্ষিত। ফলে শত শত শিক্ষিত যুবক বেকার অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। কোন স্থানেই তাহাদের আবেদন বিবেচনা করা হয় না। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ চাকুরী-সংস্থান বোর্ড হইতে উদ্বাস্তু যুবকদের জন্যই সর্বাগ্রে সুপারিশ করা হয়। যে সমস্ত যুবক সরকারী চাকুরীতে বা অন্যান্য স্থানে নিয়োজিত আছেন, উপযুক্ত হইলেও তাহাদের ডিঙ্গাইয়া অন্যান্যদের প্রোমোশন দেওয়া হয়। পশ্চিম-বঙ্গের স্বার্থ দেখিবার জন্য আজ আর কেহই নাই। সর্বত্রই তাহারা উপেক্ষিত। উদ্বাস্তু যুবকদের প্রতি সকলেই সহানুভূতিশীল। কিন্তু এইরূপে পশ্চিম-বঙ্গের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সকলেই হতাশ হইতেছেন এবং অসন্তোষের চাপা বহ্নি ধূমায়িত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই ধূমায়িত বহ্নি তীব্র অনলে পরিণত হইবে। সকলেই লোক-সংখ্যার ভিত্তিতে চাকুরীর হার নির্ণয়ের পক্ষপাতী। কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। অবিলম্বে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা আর এক প্রাদেশিকতার সম্মুখীন হইতে হইবে।"—অজয়।

*　　*　　*　　*

'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় 'খাদ্য-উৎপাদন' পত্রে বলিতেছেন: "কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি কৃষি-সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করি। তার একটির প্রাঙ্গণের দেওয়ালে হিন্দীতে এই কথাই বড় বড় অক্ষরে লিখিত ছিল: "হরা পেড় কাটনা অওর আপ্না পেট কাটনা এক হ্যয়" অর্থাৎ "সবুজ গাছ কাটা আর নিজের পেটে ছুরি বসানো এক কথা।" এ কথা সত্য। বহু দিন আগে বাংলার জমি কেন অনুর্ব্বর হচ্ছে এবং বাংলার গোধন কেন অবনতির পথে চলেছে এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে Birdwood বলেছিলেন যে, জ্বালানী কাঠ, কাঠের তক্তা ও শিল্পের কাঠ সংগ্রহের লোভে বাংলার বন-সম্পদ্ উজাড় করায়, ভূমি রসহীন এবং সারবিহীন হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে কৃষি বা গোচারণ এই দুইয়ের জন্যই গাছের পাতা ও ছোট ডালপালা পচিয়া যে সার হয়—যাকে ইংরাজীতে compost বলে তাতে উহার সঙ্গে গোবরও থাকে—তার উপর জমির উর্ব্বরতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। অন্য দিকে ... গৃহস্থালীতে সকল কাজই গাছের উপর নির্ভর, কুটীর নির্মাণ ... ফলাহার পর্য্যন্ত সব কাজেই। সুতরাং আমাদের সাধারণ ... গাছের প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার চেষ্টা বাহুল্য মাত্র। অথচ দেশে গাছ কাটা চতুর্দ্দিকে হয়, গাছের চারা বা বীজ বপন অতি অল্পই দেখা যায়। এই বিষয়ে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ...ন্দ্রনাথ বৃক্ষরোপণ উৎসব আরম্ভ করেন। তার বহু দিন পরে দেশের স্বাধীন সরকারও সে দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন এটা আনন্দের কথা। কিন্তু এই আনন্দ-উৎসবের সাময়িক আনন্দ হওয়া উচিত নয়। এর স্থায়ী ফল যাতে হয় সে দিকে সকলের দৃষ্টি আসা উচিত। বৃক্ষরোপণের সময় আছে, আবার সব রকম মাটিতে সকল প্রকার গাছ বাড়ে না, ফল-ফুল দেয় না। কোন্ গাছ কি রকম মাটিতে কোন্ ঋতুতে বসানো উচিত সেটা জ্ঞানী ও গুণী লোকের কথা মত প্রচার হওয়া উচিত। আশা করি, এদিকেও দৃষ্টি দেবার সময় সরকারের হইবে।"

*　　*　　*　　*

কংগ্রেস পরিত্যাগ কালে শ্রীযুক্ত দাশরথি তা মহাশয়ের ...

"সবিনয় নিবেদন,

প্রিয় বন্ধু, আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ... আজ হইতে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতেছি। কংগ্রেস আদর্শ... হইয়া জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বর্ত্তমানে ধ... ...লিত প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। মহাত্মা গা... ...বিত থাকিলে উহার সংস্কারের আশা থাকিত, কিন্তু বর্ত্তমা... ...গ্রেস-চালকদের মতি-গতি ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার ... বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইহার আর সংস্কার হইবে না। সে জন্য ... ২... বৎসর পরে কংগ্রেসের প্রতি আস্থাহীন হইয়া কংগ্রেসের স... সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছি।

আমি বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পা... ...পদও ত্যাগ করিতেছি।

বিনী...

শ্রীদাশ...থি...

*　　*　　*　　*

'আর্য্য' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির সংবাদ:—"ব... ৫ই জুলাই; নিখিল ভারত কংগ্রেস হইতে কংগ্রেস-কর্মীদের ত্যাগের

...ড়িক পড়িয়াছে। বহু কংগ্রেসকর্মীর উক্তিতে প্রকাশ, ... অধিবেশনের সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস ...দত্যাগ করিবেন। সংবাদদাতার মতে বর্ত্তমানে যাঁহারা ... ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত। ...নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিবাদী এবং অন্য দল সুবিধাবাদী। ... দল কংগ্রেসের যে দল বর্ত্তমানে মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিচালক ... সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন। ... বলেন—তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, ... আরও এক দল কংগ্রেসকর্মী শীঘ্রই কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত ... করিবেন। কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত সরকারী শাসন-ব্যবস্থায় ... সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারাই এই দলে আছেন। কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত ... করিবার পর ইঁহারা জুলাই মাসের শেষ ভাগে বর্দ্ধমানে এক সম্মেলন আহ্বান করিবেন।

* * * *

"...ভাগ্যের দেশে সব কিছুই যেন কেবল সুদূর অতলতার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া থাকে। চঞ্চলা লক্ষ্মীর পাদস্পর্শ দূরে সরিয়া যায়, সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠে শুধু অপরিসীম শূন্যতা। অভাব ... কেবল অপ্রতুলতা, কোথায় পাকে-চক্রে কোথায় যেন ... বাধিয়া যায়, কিছুতেই সুরাহা হয় না কোন দিকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি বাজেট সেই পুরান কথাই নূতন করিয়া ... করাইয়া দিয়া গেল সকলকে। আয়-ব্যয়ের সকল ... ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬,৬৩,০০০ ... অবশ্য সরকারী তত্ত্বাবধানে বোর্ড অব একাউন্টস কর্ত্তৃক ... বাজেট প্রকাশের সম্ভাবনা এখনও রহিয়াছে। ঘাটতি ... বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহা নানা খাতে লক্ষ লক্ষ ... হিসাব দেখাইয়া জটিলতা তরল করিয়াছেন, কিন্তু ... শিক্ষাদান কার্য্যে প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে কতটুকু ... তাহা বলিতে পারেন নাই। পাগার কথাও নয়, ... মতোই স্বচ্ছ এবং প্রত্যক্ষ, বরং তিনি প্রায় সোজাসুজি ... উল্লেখ করিয়াছেন।"—স্বস্তিকা।

* * * *

...ঙ্গে 'নব সঙ্ঘে'র মন্তব্য :—"পূর্ব্ব-পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু ... চিরদিন সংখ্যাগুরু ইসলাম সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া ... সে কর্ত্তৃত্ব করার অধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় সংখ্যালঘু ... মনে যে অবসাদ আসিয়াছে, তাহা না হয় সহিয়া ... অসম্মত নহেন। কিন্তু হিন্দু নারীর প্রতি পাশবিক ... ক্রমেই আমাদের অশ্রাব্য হয় এবং হিন্দু জাতির ... ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু জাতি বলে, ঐশ্বর্য্যে পূর্ব্ববঙ্গের ... অধিকার করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিন্দু জাতির ধন-সম্পদ সহজেই হস্তগত করিয়া লইবে, ... চুক্তিতেও সংবরণ করা সম্ভব যখন নহে, তখন ... ও আভিজাত্যে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল ... পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে চাহিবেন না, ইহা দিবালোকের ... মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও পূর্ব্ববঙ্গে বাস করা অসম্ভব ... পশ্চিমবঙ্গে যখন আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, তখন সহায়-সম্পদহীন প্রায় ১ কোটি হিন্দু কি ভরসায় পূর্ব্ববঙ্গে থাকিতে চাহিবে? ইহাদের মধ্যেও আত্মসংস্কৃতির দায়ে কতক লোক ভারতে চলিয়া আসিতেছেন। অবশিষ্ট লোক সর্ব্বহারা হইয়া মুসলমান রাজ্যে আজ ক্রীতদাসের ন্যায় বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। কাল তাহারাই কালাপাহাড়ীর বেশে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হইবে, ইহা দুর্ব্বোধ্য কিছু নহে। অতএব দিল্লীর সর্ত্ত পূর্ব্ববঙ্গে কার্য্যকরী কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা আমাদের নিকট দুর্জ্ঞেয় হইয়াই রহিল। চুক্তির সফলতায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় স্বস্তি পাইত কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা এক প্রকার দুঃস্বপ্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

* * * *

"ভারতীয় শিল্প ও সরবরাহ সচিব তুলা চাষ সম্বন্ধে সবিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যথোপযুক্ত তুলা উৎপাদন না করিলে ভারতীয় বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না, এবং ইহার মূল্যও ঠিক থাকিবে না। এ সম্বন্ধে পশ্চিম-বাংলার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। প্রাদেশিক সরকার তুলা চাষ বিষয়ে মনোযোগী হইলে পশ্চিম-বঙ্গেও নিতান্ত কম পরিমাণে তুলা পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা তুলা উৎপাদন বিষয়ে বিখ্যাত ছিল। কুচবিহার, জলপাইগুড়ী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়ও তুলা হইতে পারে। আমরা আশা করি, প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন। জনগণও সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া এ বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হউন।"—সত্যাগ্রহ পত্রিকা।

* * * *

"বর্ষা আসায় সাধারণ ভাবে সর্ব্বত্র চাউলের অভাব দেখা দিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলা হইতে বে-আইনী ভাবে প্রত্যহ শত শত মণ চাউল বাহিরে যাইতেছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানা গেল যে, বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতাগামী একটি ট্রেণ বর্দ্ধমানের কয়েকটি ষ্টেশন পর হইতে ছোট ছোট পুটলী ও রেশন-থলিতে করিয়া বহু লোক চাউল লইয়া ট্রেণে উঠিল। উক্ত ট্রেণে বহু সংখ্যক পুলিশ ও রেলওয়ে কর্ম্মচারী ট্রেণের প্রায় প্রত্যেক কামরায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ঐ বে-আইনী চাউল রপ্তানিকারিগণকে ট্রেণ হইতে নামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং সামান্য দুই-এক জনকে নামাইতে সক্ষম হইলেন। কার্য্যতঃ দেখা গেল, শতকরা ৯৯ জনই যথারীতি গন্তব্য স্থলে চাউল লইয়া যাইতে সমর্থ হইল। ইহাই যদি অবস্থা হয়, তবে সরকারী ব্যয়ে এই বিপুল সংখ্যক কর্ম্মচারীকে চোরা-কারবার দমনের অভিনয়ে নিযুক্ত রাখার সার্থকতা কি?—দৃষ্টি।

* * * *

"শ্রীযতীন্দ্রকুমার দেব ও তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা বকুল গুণ্ডার দলকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন। ঘটনার বিবরণে দেখা যায়, যতীন্দ্র বাবু এক উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসারদাচরণ দেবের বাড়ীর বাঁশ কাটিয়া লইয়া যাইবার সময় মুসলমানদের বাধা দেন। ফলে কলহ বাধে। যতীন বাবু প্রহৃত হন, কিন্তু পলায়ন না করিয়া মুসলমান যুবকদ্বয়কে তিনি আক্রমণ করিলে তাহারাই

পলায়ন করে। অতঃপর ঐ দুই যুবকের পিতার নেতৃত্বে বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত ত্রিশ জন মুসলমান সারদা বাবুর বাড়ী আক্রমণ করে। যতীন বাবু বলিদানের খড়্গ লইয়া আততায়ীদের সম্মুখীন হন এবং গুরুতর আঘাতে আক্রমণকারীদের দুই জনকে নিহত করেন। তখন অন্যান্যরা পলায়ন করে। অতঃপর প্রায় তিন শত মুসলমানের এক জনতা লাঠি, বর্শা, ড্যাঠা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ পুনরায় সারদা বাবুর বাড়ী আক্রমণ করে। যতীন বাবু, তাঁহার মাতা, জ্ঞাতি ভ্রাতা বকুল ও সারদা বাবুর মাতা একটি গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। জনতা যখন দরজা ভাঙ্গিতেছিল, যতীন বাবু তখন জনৈক আততায়ীর হাত কাটিয়া দেন। কিন্তু এইরূপ চেষ্টাতে বিরাট জনতাকে বেশীক্ষণ প্রতিরোধ করা যায় না। যতীন বাবু ও বকুল জনতার হাতে নিহত হন। যতীন বাবুর মাতা ও সারদা বাবুর মাতা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। পাকিস্তানের বিগত হাঙ্গামার সময় হইতে হিন্দুদের পলায়নের কাহিনী অনেক শুনা গিয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রতিরোধের সংবাদ খুব বেশী পাওয়া যায় নাই।—জনশক্তি।

* * * *

"প্রায় তিন বৎসর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে। এই সময় মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বরাজ অর্জ্জনে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে দেশকে যে অনেক দূর আগাইয়া লইতে পারা যাইত, এ কথা অস্বীকার করিলে আত্মপ্রবঞ্চনাই করা হয়। অধিকাংশই তাহা করেন নাই। রাজশক্তির সহিত সহযোগিতার নামে কর্তৃত্বের প্রলোভনে জনতার উপর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অনেকেই হারাইতে হইয়াছে। জনগণ আর বুঝিতে পারিল না যে, কংগ্রেস জনসেবা করিতে চায়। জনসেবার পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রে স্বার্থপরতার নগ্ন চিত্র জনপ্রিয়তার হানি ঘটাইল। যে সকল ত্যাগধন্য নেতাদের ইঙ্গিতে অসংখ্য নরনারী এক দিন অসঙ্কোচে ... করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ স্বদলপোষণ জন্য ... হৃদয় হইতে তাঁহাদের আসন টলাইয়া দিয়াছে।

"কংগ্রেসের ব্যর্থতা দেশ মধ্যে শুধু যে হতাশা আনিতেছে তাহা নহে, নানা প্রতিক্রিয়াপন্থীর স্বমত বিস্তারেরও পূর্ণ সুযোগ জুটিয়া যাইতেছে। ফলে বিভ্রান্ত জনসাধারণ নানা মতবাদের ... বুদ্ধিতে সমধিক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। বহু কাল ... কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার অবশ্য দায়িত্ব ... অনুযোগ, অভিযোগ ও হা-হুতাশ করিয়াই জাতির মূল্যবান ... নষ্ট হইতেছে। এ সময় কংগ্রেসের দরদী বন্ধুগণের বিষয়টি ... বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। দেশের এই সঙ্কটময় ... করিলে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা পায়—সর্বপ্রকার ... ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের সহিত সেই ... একান্ত কর্তব্য। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের ... বিলম্ব করা উচিত নহে।"—পল্লীবাসী।

কলিকাতায় সাংবাদিক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং বাংলা দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ। পণ্ডিত নেহেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) **: নীহাররঞ্জন রায়। প্রকাশক : বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, কলিকাতা।** প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৬। মূল্য ২৫৲ টাকা।

অনেক দিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ ক'রে বলে গিয়েছিলেন : "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" কথাটা ঠিক। পণ্ডিতরা সব লিখে গেছেন রাজরাজড়াদের রোমাঞ্চকর জীবনী, কোনটা তার বংশতালিকা ... জন্মবিত, কোনটা বা গোয়েন্দা-কাহিনীর ... কল্পনা। রাজানুগ্রহজীবী পণ্ডিতেরা রাজা আর রাষ্ট্র ছাড়া ... আর কিছুই বিবেচনার যোগ্য ব'লে মনে করতেন না। ইতিহাসের অনেক পণ্ডিতের এই ধরণের সচেতন কেনা ... মনোভাব আজও আছে এবং তাঁরা ঘটনা ও তথ্য ... ক'রে, নিজেদের অভিসন্ধি অনুযায়ী তাকে ব্যাখ্যা ও ... ক'রে, ইতিহাসের এমন একটা লোকবর্জ্জিত সমাজসম্পর্কশূন্য কুৎসিত ... মূর্তি প্রকাশ করেন, যা পাঠ ক'রে ছেলেমেয়েরা ... এবং দেশকালপাত্র ও সমাজ সম্বন্ধে কোন কাণ্ডজ্ঞানই ... হয় না। আধুনিক যুগে ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গী ... গেছে এবং ইতিহাস যে ক্যাটালগ, বা ক্রনিকেল নয়, '... বিজ্ঞান' মাত্র, তা অনেকেই স্বীকার করেন। তবু ... চলবে না যে, আজও "টয়েনবি"র (Toynbee) মতো "চক্র... বর্তনবাদীরা" কেবল ভাষার চমকে এবং বাচনভঙ্গীর কৌশ... ইতিহাসের পণ্ডিত-মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন।

... যে সমাজের পরিবর্তনশীল ইতিহাস, লোকসমষ্টির ইতিহা... সমাজবিজ্ঞানী ঐতিহাসিকরা স্বীকার করলেও, আজও সেই ... ধারণা, সেই অচল দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পণ্ডিতের মধ্যেই বদ্ধমূল ...। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় বাঙলার ঐতিহাসিকদের মধ্যে ... তিন জরাজীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করতে পেরেছেন এবং আধু... বিজ্ঞানীর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাঙলার ইতিহাস আলো... ছেন, এইটাই একটা "যুগান্তকারী" ঘটনা হিসেবে উল্লে... কতটা তিনি এ কাজে সার্থক হয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন ... এখনই উপস্থিত হওয়া হঠকারিতার নামান্তর মাত্র ... নিশ্চয়ই তাঁর আছে, তিনিও সে সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু ... কে আছেন পৃথিবীতে জানি না, যিনি নির্ভুল লেখা ... গেছেন। নীহার বাবু যে "বাঙলার ইতিহাস" না লি... "...লীর ইতিহাস" লিখেছেন, এইটাই একটা অসাধারণ দুঃসাহ...। "দুঃসাহসই" বলছি এই জন্যে যে, আমাদের দেশের ... পণ্ডিতের কাছে আজও নীহার বাবুর পথ "নিষিদ্ধ" পথ এবং তাঁর "ইতিহাসের যুক্তি" কান দিয়ে শোনাও তাঁরা 'পাপ' ব'লে মনে করেন। নীহার বাবু বলেছেন : "বস্তুত, সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস। প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই এই গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বলিয়া ইহার নামকরণ করিয়াছি বাঙালীর ইতিহাস। রাজা ও রাষ্ট্র এই সমাজবিন্যাসে যতটুকু স্থান অধিকার করে ততটুকুই আমি ইহাদের আলোচনা করিয়াছি। এই সমাজবিন্যাসের বস্তুগত ভিত্তি, সমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণী, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহাদের স্থান, তাহাদের দায় ও অধিকার, বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ, সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি, ইত্যাদি সমস্তই প্রাচীন বাংলার সমাজবিন্যাসের, তথা জনসাধারণের ইতিহাসের আলোচনার বিষয়।" এই 'যুক্তি' অনেক পণ্ডিতের কাছে "বিদ্রোহীর" যুক্তি ব'লে মনে হবে। তাই তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" লেখার প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাকে ('বাঙলার' নয়) আমি 'দুঃসাহসিক' বলেছি। দুঃসাহসই যে "প্রতিভার" প্রথম ও প্রধান লক্ষণ, এ কথাও ঠিক। সেই "প্রতিভার" স্বাক্ষর নীহার বাবুর "বাঙালীর ইতিহাসের" মধ্যে যে সুস্পষ্ট ভাবে রয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে নীহার বাবু প্রথমে বাঙালীর নরবংশের কথা এবং ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণের উৎপত্তির কথা আলোচনা করেছেন। তার পর বাঙলা দেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রাকৃতিক ধন-সম্পদের কথা বলেছেন। এর পরে ভূমিবিন্যাস, বর্ণবিন্যাস, শ্রেণীবিন্যাস, গ্রাম ও নগরবিন্যাস, রাষ্ট্রবিন্যাস ইত্যাদি আলোচনা ক'রে তিনি "রাজবৃত্তের" কথা বলেছেন, রাজা এবং রাজবংশের স্থূল ও বিস্তৃত বিবরণ হিসেবে নয়, সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন রাজপক্ষ ও রাষ্ট্রীয়শক্তির সম্বন্ধের দিক থেকে। শেষ কালে বাঙালীর মানস-সংস্কৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বাঙালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, বসন-ব্যসন, দৈনন্দিন জীবন, উৎসব-পার্বণ ইত্যাদির কথা বলেছেন। এক কথায় বলা যায়, এত সব জ্ঞাতব্য কথা একখানা বইয়ের মধ্যে এর আগে কেউ বলেননি, এমন কি বারো জন বাঙালী পণ্ডিতের লেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলার ইংরেজী ইতিহাসেও না। বাঙলা বা ইংরেজী ভাষায় আজ পর্যন্ত যতগুলি বাঙলার ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার মধ্যে তথ্যনিষ্ঠায়, বিষয়বৈচিত্র্যে এবং নূতন সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে "বাঙালীর ইতিহাস" নিঃসন্দেহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে সমাদৃত হবে। প্রত্যেক বাঙালীর, একবার নয় অনেক বার, এই বই পড়া উচিত বলে আমরা মনে

করি। গ্রন্থের আকার বিরাট হলেও এবং বিষয়বস্তু তথ্যবহুল ইতিহাস হলেও, নীহার বাবুর ভাষার চমৎকার প্রসাদগুণে আদ্যোপান্ত পড়তে পাঠকের আগ্রহ বজায় থাকে, কোথাও নীরস মনে হয় না।

এইবার বইয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলব। তথ্যের দিক দিয়ে ত্রুটি বিচার করা এত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবিন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি বলা যায় যে, নীহার বাবুর "ইতিহাসের যুক্তি" পরবর্তী অধ্যায়গুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মনে হয় যেন লিখতে লিখতে তিনি ক্রণিকেলারদের নীরেট তথ্যানুসন্ধানের দিকেই ঝুঁকেছিলেন বেশী এবং দৃষ্টি বা সূত্রটি সম্বন্ধে সব সময় সচেতন ছিলেন না। ইতিহাসের যোগসূত্রটি অনেক জায়গায় ছিন্ন হয়েছে ব'লে মনে হয়, বিশেষ ক'রে "সমাজবিন্যাস" ও "সংস্কৃতির" আলোচনা প্রসঙ্গে। তথ্যের সঙ্কলন ও সমাবেশটাই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের কাছে যথেষ্ট নয়, তথ্যের বিচার ও বিশ্লেষণ, বর্জ্জন ও নির্ব্বাচন এবং সবার উপরে তার "synthesis" ও "integration"-ই হ'ল বড় কথা। এই সমীকরণের অভাব পাঠককে অনেক সময় তথ্যের গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়, কোন দিক্‌-নির্ণয়ে সাহায্য করে না। তা যদি না করে তাহ'লে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা অর্থহীন হয়ে যায়। এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে হঠাৎ-কুড়িয়ে-পাওয়া কোন ঘটনা বা তথ্যের জোরে নীহার বাবু "ইতিহাসের ধারা" বা সর্ব্ববাদিসম্মত ইতিহাসের "প্যাটার্ণ" পুনর্বিচার করার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন ব'লে মনে হয়। এ ঝোঁক ক্রণিকেলারদের আসতে পারে, বৈজ্ঞানিকের আসা উচিত নয়। এ-বইয়ের নিশ্চয়ই নূতন সংস্করণ হবে এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণও একটা হওয়া উচিত। তখন গ্রন্থকার এই দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং এ বিষয়ে চিন্তা করবেন নিশ্চয়ই। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমার কোন কথাই শেষ কথা নয়। সত্যসন্ধী ঐতিহাসিকের কাছে শেষ কথা কিছু নাই।" আমরাও তাই মনে করি এবং বিশ্বাস করি, তিনি নিজেই এই সব আলোচনার ভিতর দিয়ে আরও অনেক স্থায়ী ও নির্ভুল সত্যে ধীরে ধীরে পৌছবেন। তাতে "বাঙালীর ইতিহাস" লেখকের যে অতুলনীয় কৃতিত্ব ও গৌরব তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না।

হিন্দুসমাজের গড়ন: নির্মলকুমার বসু। লোক-শিক্ষা গ্রন্থমালা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকেও একখানি 'ইতিহাস' বলা যেতে পারে। তবে এ ইতিহাস অন্য জাতের ইতিহাস, নীহার বাবুর ইতিহাসের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। নির্ম্মল বাবু এক জন খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ্‌, তাঁর দৃষ্টি ও বিচার-পদ্ধতি নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টি। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন, "নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে যেরূপে দেখিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" আমাদের দেশে নৃতত্ত্ববিদ্‌ এমনিতেই কম, তার উপর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আলোচনা করার ক্ষমতাও সকলের নেই। যে দু'-এক জনের আছে, তাঁরা আবার নিজেদের পাণ্ডিত্যকে সকলের বোধগম্য করে সরস ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। নির্ম্মল বাবু যে শুধু নৃবিদ্যা ও প্রত্নবিদ্যায় পারদর্শী তা নয়, লেখক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত এবং ভাষাও তাঁর স[illegible]ও সরল। সুতরাং নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে [illegible] করার যোগ্য ব্যক্তি তাঁর মতো আর কেউ আমাদের বাঙলা দেশে আছেন কি না সন্দেহ। নৃতাত্ত্বিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই স[illegible] মূল্যবান এবং সে অভিজ্ঞতাও নির্ম্মল বাবুর মতো বোধ হ[illegible] কারও নেই।

প্রথমে নির্ম্মল বাবু অরণ্যবাসী কয়েকটি জাতির বৃত্তান্ত [illegible] করেছেন, তার মধ্যে জুয়াঙ্গ ও মুণ্ডাদের কথাই প্রধান। [illegible] সব জাতির আর্থনীতিক জীবন, পূজা পার্ব্বণ লোকোৎসব, আচা[illegible] অনুষ্ঠান অর্থাৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা [illegible] ক'রে, তিনি ভারতবর্ষের আর্য্য-সংস্কৃতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক[illegible]। কি ভাবে আর্য্য ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে ছোটনা[illegible] অরণ্যবাসী জাতিগুলির মধ্যে, সে-সম্বন্ধেও তাঁর আলোচনা ই[illegible]সের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এক কথায়, নৃতত্ত্ববিদ্‌রা [illegible] যাকে "acculturation" বলেন, বিভিন্ন বাইরের সংস্কৃ[illegible] প্রভাবে ও সংস্পর্শে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই সমন্বয়-ধারার ইতিহাসই [illegible] প্রধান আলোচ্য বিষয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জুয়াঙ্গ জাতির বুঢামবু[illegible] বুঢামবুঢী পূজার কথা। জুয়াঙ্গ পল্লীতে এই পূজার অনুষ্ঠা[illegible] স্নান ও উপবাস, ধূনা জ্বালার ব্যবস্থা, হলুদ আলোচাল প্রভৃতির ব্যবহার, লক্ষ্মীদেবতা, ঋষিপত্নী প্রভৃতির নামগ্রহণ ব্রাহ্মণ্য-স[illegible] প্রভাবের পরিচয় দেয়। আবার এরই মধ্যে পুরোহিত-শ্রেণীর অভাব, বিশিষ্ট মন্ত্রের অভাব, মোরগ বলি দেওয়া, বুঢামবুঢা প্রভৃতি [illegible] পূজা লৌকিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য দেয়। পাল[illegible] ঢেঙ্কানালে জুয়াঙ্গদের জীবিকা অর্জ্জনের পদ্ধতি পর্য্যালোচনা [illegible] তাদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য এবং ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের কোল অথবা মু[illegible] জাতি হয়ত কোন কালে ফল-মূল আহরণ ও বন্য জন্তু শীকার [illegible] জীবন ধারণ করত, কারণ এক সময় সমগ্র ছোটনাগপুর গভী[illegible] আচ্ছাদিত ছিল। তার পর ধীরে ধীরে কৃষির-চাষ ও লা[illegible] শিখে গ্রামের পত্তন করেছে। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ-শা[illegible] সমাজে শ্রমবিভাগ দ্বারা জীবনের মান যে ভাবে উন্নত করা যায়, [illegible] দেখে মুণ্ডারাও কিছু কিছু তার অনুকরণ করতে থাকে। মুণ্ডা [illegible] বুনে চরকার সাহায্যে সূতো কাটতে শিখল, তেলের [illegible] কলুর মতো ঘানি ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। কিন্তু [illegible] কলুর সামাজিক স্তর অনেক নীচুতে ব'লে, জাত খোয়া[illegible] ঘানিতে বলদ না যুতে মুণ্ডা-গৃহিণীরা স্বয়ং ঘানি ঠেলে [illegible] লাগল। অর্থাৎ হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতের নিবিড় স[illegible] যে উৎপাদন-ব্যবস্থা রচিত হয়েছিল, মুণ্ডা জাতি মোটামুটি [illegible] ক'রে নিল এবং সেই সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে[illegible] দেখা যায়, মুণ্ডা-সমাজেও তেমনি ছোট-বড়োর ভেদাভেদ দে[illegible]

"একালচারেশনের" এই রকম কয়েকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত [illegible] বাবু তাঁর বইয়ের মধ্যে দিয়েছেন। ছোটনাগপুরে ব্রাহ্ম[illegible] বিস্তার সম্বন্ধে তিনি আরও বিস্তৃত ভাবে একটি [illegible] আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের আর্য্য সমাজে[illegible] আর্য্য-সংস্কৃতির প্রকৃতি, ভারতের বর্ণ-ব্যবস্থার প্রাচীন ইতি[illegible] বিষয়ে আলোচনায় মধ্যেও নির্ম্মল বাবু নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টি [illegible] নূতন

…কসম্পাত করেছেন যথেষ্ট। ভারতের প্রাচীন অর্থনৈতিক সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। …কের ধারণা আছে, এমন কি এক শ্রেণীর দিগ্‌গজ …শাসিকের পর্য্যন্ত, যে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো …তন্ত্রের অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন …ত্বর আদর্শ ছিল "সাম্য"। এর চেয়ে মিথ্যে ও ভুল ধারণা …কিছুই হতে পারে না। ব্রাহ্মণরা স্বেচ্ছায় মধ্যে মধ্যে …দ্রব্রত গ্রহণ করতেন ব'লে, অথবা ধনীরা মন্দির পথ-ঘাট …করতেন ব'লে যে ধন-বণ্টনের সমতা বজায় থাকত তা …কোন সঙ্গত কারণ নেই। এ যুগের বিড়লারাও যথেষ্ট …মন্দির নির্মাণ করেছেন। ডালমিয়াও গরুর জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন। নির্ম্মল বাবু ঠিকই বলেছেন: "নিজের …র মালিক মানুষ নিজেই ছিল, তদুপরি ধনোৎপাদনের সরঞ্জামের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বও স্বীকৃত হইত। সেগুলিকে রাষ্ট্রের …জনের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা, অথবা সকলের মধ্যে আর্থিক …রের সমতা সম্পাদনের আদর্শ প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল না। অতএব হিন্দুসমাজ সংগঠনের ব্যাপারে সাম্যবাদের আদর্শ বর্তমান ছিল, একপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।" এর পরেই …বলেছেন: "রাজনৈতিক-গগনে শাসকের পর শাসকের উদয় হইয়াছে, দেশে বিদ্রোহ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বারংবার দেখা দিয়াছে, তবু জীবনের ভারকেন্দ্র গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতি ও সমাজ-নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মানুষ গ্রামের শাসন এবং লৌকিক বা জাতিগত আইনের শৃঙ্খলার জোরে এই সকল আগন্তুক …কে বার বার উপেক্ষা করিয়া জীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত …রাছে।" এ কথাটা ঠিক, কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু …বাবুর সিদ্ধান্ত: "এই শক্তি ছিল বলিয়া অন্তরের বহুবিধ দু… সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া ভারতের …আজও জীবন্ত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে…"—নিশ্চয়ই ঠিক …ভারতের আত্মনির্ভর গ্রাম্য-সমাজ তার প্রাণশক্তি বহু যুগ …হয়ে ফেলেছে। তার ফলে কূপমণ্ডুকতা ভারতের জাতীয় …শুষে ফেলে তাকে কঙ্কালসার করেছে। সমাজের মধ্যে …প্রাণ ব'লে কিছু নেই, আছে কেবল শাস্ত্রের নামে কতকগুলি বিধি-নিষেধের বন্ধন, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের চর্চ্চা, প্রাণের …বদলে মৃতপ্রায়ের সর্ব্বগ্রাসী জড়তা, আর গতিশীলতার …শীলতা। এর মধ্যে ভারতের নবজন্ম লাভের সম্ভাবনা …আমরা মনে করি না।

…খণ্ড বিক্ষিপ্ত আলোচনা বইখানির আর একটি ত্রুটি ব'লে …। বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে যোগসূত্রের অভাব রয়েছে …তথ্য ও যুক্তি একটা অখণ্ড পরিণতি লাভ করেনি। …সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন করার ফলেই এই …ঘটেছে। অথচ নির্ম্মল বাবু এই বিষয়ে একখানি ভাল …অনেক সম্পূর্ণ ক'রে লিখতে স্বচ্ছন্দেই পারেন। তাঁর …বিষয়ে আর কারও যোগ্যতা আছে কি না সন্দেহ। আশা …ভারতীয় সংস্কৃতির এই সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ধারা সম্বন্ধে তিনি …প্রামাণ্য পরিপূর্ণ গ্রন্থ ভবিষ্যতে লিখবেন এবং বাঙলায় …ভাবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবেন।

ভারতদর্শনসার: শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা চার আনা।

সংস্কৃতে একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে:

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তৎ গ্রহীতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।"

অর্থাৎ "শাস্ত্র অনন্ত এবং জানিবার বিষয়ও বহু; সময় কম অথচ বাধা অনেক; কাজেই, হাঁস যেমন জল থেকে দুধটুকু টেনে নেয় তেমনি আমাদেরও সারটুকু শুধু গ্রহণ করতে হবে।" ভারতীয় দর্শনের বিপুল সাহিত্য, তার সার সংগ্রহের বেশী আধুনিক কালের মানুষের পক্ষে আর কিছু সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এখানে সেই সার সংকলনেরই চেষ্টা করেছেন। এ কাজে তিনিই যে প্রথম হাত দিয়েছেন তা নয়। অনেক কাল আগে সংস্কৃত কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাধবাচার্য্যের "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মাধবাচার্য্য এই গ্রন্থে সংক্ষেপে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত, রামানুজ, পূর্ণপ্রজ্ঞ, নকুলীশপাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর, উলুক্য (বৈশেষিক), অক্ষপাদ (ন্যায়), জৈমিনি (মীমাংসা), পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল এই পনেরটি দর্শনের সারসংগ্রহ করেছেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন তাঁর বাঙলা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: "বিশ্ববিখ্যাত, অসামান্য ধীসম্পন্ন, বিবিধ বিদ্যাসমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৎকালে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, তৎকালে তিনি আমাকে ঐ পঞ্চদশ দর্শন ও শাঙ্কর দর্শনের স্থূল মর্ম্ম সকল বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কহেন।…তাঁহার প্রবর্ত্তনানুসারে আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমাকে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে হয়, এবং অবশিষ্ট সময় বাটীতে বিদেশীয় ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে হয়, সুতরাং আমার অধিক অবকাশ না থাকাতে মদীয় ছাত্র শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে কিয়দংশ লিখিতে ভার অর্পণ করি।" আজও যদি এই বইখানি পুনর্মুদ্রিত হয় তাহলে বাঙালী পাঠকের অনেক উপকার হতে পারে। উমেশ বাবুর বইখানি এর চেয়ে একটু সহজ সরল করে লেখা এবং দর্শন-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক পটভূমির কথা উল্লেখ করে আরও সরস করা।

গ্রন্থকার "নাস্তিক" ও "আস্তিক" মোটামুটি এই দুই ভাগে দর্শনকে ভাগ করেছেন। নাস্তিক দর্শনের মধ্যে চার্বাক দর্শন, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। আস্তিক দর্শনের মধ্যে অধুনা প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন—মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক। প্রারম্ভে আলোচনার পটভূমিতে ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে লেখক বলেছেন: "প্রাচীন উপনিষদগুলি ভারতের দার্শনিক সাহিত্যের প্রথম স্তর। সুতরাং খৃষ্টের ৬০০।৭০০ বৎসর আগে ভারতে দর্শনের আবির্ভাব হয়, ইহা প্রতিবাদের ভয় না করিয়াই বলা চলে।" লেখক আরও বলেছেন: "দর্শনের আবির্ভাবের পক্ষে অনুকূল একটা প্রতিবেশ না থাকিলে দর্শনের জন্ম হয় না, এ কথা আমরা বলিয়াছি। এই প্রতিবেশের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজও পরিগণিত হয়। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে ভারতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা যাহা ছিল তাহাও দর্শনের অনুকূলই

ছিল। দর্শনের অর্থ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা। এই প্রশ্ন সকলের মনেই জাগে না এবং সব সময়ও ওঠে না।" এ সব কথা একেবারেই অবান্তর ও অর্থহীন বলা চলে। গ্রন্থকার অবশ্য প্রতিবাদের ভয় না করেই খৃষ্টপূর্ব ৬০০০-১০০ বৎসরকেই ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব কাল বলেছেন, কিন্তু এই ধরণের ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন উক্তির প্রতিবাদ না ক'রে উপায় নেই। বেদের কি কোন দর্শন নেই? ঋগ্বেদের রচনা-কাল কবে? আরও ছয়-সাতশ' বছর আগে নয় কি? তাছাড়া, উমেশ বাবুর মতে দর্শনের অর্থ যদি কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়, তাহলে সে-প্রশ্ন এবং সে-চেষ্টা তো নিয়ানদার্থাল মানুষের মনেও জেগেছিল এবং সে তো হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। সকলের মনে এই প্রশ্ন জাগে না, এত বড় ঐতিহাসিক সত্য লেখক কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? আমাদের মনে এবং প্রাচীন ভারতবাসীর মনে যে-সব প্রশ্ন জাগে বা জেগেছিল, তা হাজার হাজার বছর আগে প্রত্যেক আদিম মানব জাতির মধ্যেও জেগেছিল এবং তারা উত্তর দেবারও চেষ্টা করেছিল। তাই থেকেই মানুষের মধ্যে "ধর্মের" উৎপত্তি হয়েছে এবং "দর্শনেরও"। এ কথা প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানীই আজকাল স্বীকার করেন। আদিম মানব জাতির চিন্তার ধারা যে "pre-logical" নয়, তাও সমাজ-বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। তাদের যুক্তিবিন্যাস আর আধুনিক মানুষের যুক্তিবিন্যাস প্রায় একই। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনার অবতারণা না ক'রে লেখক সোজাসুজি শাস্ত্রীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করলেই ভাল করতেন। এ বিষয়ে আলোচনা করতে হ'লে তাঁকে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সেই পরিচয়ের কোন প্রমাণ যখন তিনি আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে দেননি, তখন উৎপত্তি, ইতিহাস, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি বড় বড় বিষয়ের অবতারণা ক'রে তিনি বইখানির মূল্য অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া, মূল দার্শনিক মতগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাঁর ভালই হয়েছে, এবং আশা করি, সকলে তা প'ড়ে বুঝতেও পারবেন। শুধু এইটুকু থাকলে, অর্থাৎ গ্রন্থের মধ্যে "আলোচনার পটভূমি" ও "উপসংহার" বাদ দিলে বইটির যথার্থ মূল্য বাড়বে ব'লে আমাদের মনে হয়।

বাগর্থ: শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। প্রকাশক: কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

ইংরেজীতে যাকে "Semantics" বা Rhematology" বলে, লেখক তারই বাঙলা পরিভাষা "বাগর্থবিজ্ঞান" করেছেন। Semantics-এর অর্থ হ'চ্ছে "the science of meaning"। বাঙলায় "শব্দার্থ" শব্দের বহুল প্রচলন আছে, কিন্তু "বাগর্থ" শব্দের তেমন ব্যবহার নেই। গ্রীক ভাষার "Rhema" শব্দের অর্থ "উক্ত" অর্থাৎ "যা বলা হয়েছে" এবং "Semaino" শব্দের অর্থ "সূচিত করা। গ্রন্থকারের মতে এই দু'টি শব্দেরই অর্থ "বাগর্থ" শব্দের মধ্যে অনেকটা প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য বইয়ের ভূমিকাতে বলেছেন: "ইংরেজীতে Semantics শব্দের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে বাগর্থবিজ্ঞান শব্দটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছে—ইহার গঠনে কালিদাসের যুক্ত বাগর্থ এই সুন্দর সমস্ত পদটির অতি সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে।"

অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের আলোচ্য বইখানি কত[illegible]গুলি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলিতে বাঙলা ভাষার কতকগুলি [illegible] আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে 'বাগর্থবিজ্ঞানে'র মূল সূ[illegible]গুলি সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য ক'রে, উপযোগী বাঙলা উ[illegible] দিয়ে বিশদ ক'রে লেখা হয়েছে। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন, তখন বাঙলা বানানের সংস্কারে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। সেই সময় গ্রন্থকার তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য ক'রে বানান সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। এ বইয়ের "[illegible]লিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান" প্রবন্ধটি সেই-গবেষণারই ফল। বানান নিয়ে আধুনিক বাঙলা ভাষায় যে ভীষণ অরাজকতা চলেছে তার রীতিমত "ষ্ট্যাটিটিক্স" নিয়ে লেখক অকাট্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ভাষার রাজ্যে এই "মাৎস্যন্যায়" অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, নাহ'লে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। লেখক দেখিয়েছেন যে, সামান্য "ক'রছে" ও "চ'লছে" এই দু'টির চব্বিশটি ক'রে বানান বাঙলায় প্রচলিত। যেমন—

করছি	কোবছি	ক'রছি
কর্‌ছি	কোর্‌ছি	ক'র্‌ছি
কচ্ছি	কোচ্ছি	ক'চ্ছি
কর্চ্ছি	কোর্চ্ছি	ক'র্চ্ছি

এই ত গেল বারটি। আবার 'ছ'-এর স্থলে 'চ' লিখলে আরও বারোটি। লেখক বলেছেন: "'doing' কথাটা লিখিতে কাহাকেও ভাবিতে হয় না, 'i' লিখিব কি 'e' লিখিব। i-এর উপর বিন্দুটা দিতে ভুলিয়া গেলেও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। ইংরাজী যিনি কিছু মাত্র জানেন তিনিও ইহা বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু 'করছি'র চতুর্বিংশতি রূপের কোন্‌টি লিখিব ইহা ভাবিতে কিছু সময় দিতেই হয়।" বানান সম্বন্ধে পূর্বে পণ্ডিত মহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে, কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা [illegible] সেদিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয়নি, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার [illegible]কের তলায় বানান সমস্যা চাপা প'ড়ে গেছে। কিন্তু, লেখক ঠিকই বলেছেন যে, লেখ্য ভাষা সাধুই হোক আর চলিতই হোক তার বানানের একটা শৃঙ্খলা বজায় রাখা একান্ত দরকার।

বইয়ের এই দু'টি প্রবন্ধ ছাড়া "বাঙ্গালা ভাষায় [illegible] শব্দ", "মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ প্রণালী", "স[illegible]বতীয় লিপি" প্রবন্ধ তিনটি তথ্যবহুল এবং শিক্ষাপ্রদ। "[illegible]তত্ত্ব" রচনাটি আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। ভাষাতত্ত্ব সাধারণ[illegible]ত্যন্ত নীরস বিষয় ব'লে লোকের একটা ধারণা আছে। সে[illegible]কের অপরাধ নয়, লেখকের অক্ষমতা। তত্ত্বকথা মাত্রই নী[illegible] কিন্তু লেখকের ভাষা ও বাচনভঙ্গীর প্রসাদগুণে নীরস তত্ত্বকথা[illegible]মত সরস হয়ে ওঠে। বিজন বাবুর ভাষা ভাল, লেখার ভঙ্গীটি[illegible]দার। তাঁর হাতে নীরস নীরেট ভাষাতত্ত্বের সরস আলোচনা যে [illegible]ত্যর স্তরে উন্নীত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। [illegible]তই ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বইয়ের অত্যন্ত অভাব বাঙলা ভাষায়। [illegible]খ্যা রামেন্দ্রসুন্দরের "শব্দকথা", রবীন্দ্রনাথের "শব্দতত্ত্ব" এবং [illegible]কুমার

সম্প্রতি "ভাষার ইতিবৃত্ত" এ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইগুলি শুধু এ দেশের নয়, পৃথিবীর ভাষা-সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে বলা চলে। এই কয়েক জন বাঙালী পণ্ডিত ও লেখকের মধ্যে বিজন বাবু তাঁর যথাযোগ্য স্থান করে নেবেন আমরা বিশ্বাস করি। তাঁর 'বাগর্থ' পণ্ডিত-মহলে এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কৌতূহলী ছাত্র-মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করবে।

পেঙ্গুইন আর ক্যাঙ্গারু

১৯৩৭ সালে মাত্র একশ' পাউণ্ড মূলধন নিয়ে বিলাতের আর্থার লেন সুবিখ্যাত পেঙ্গুইন পুস্তকাবলী প্রকাশিত করতে সুরু করেন। ইংরাজী-জানা পাঠক মাত্রেরই নিকট কাগজের মলাট-ওয়ালা এই সস্তা পুস্তক সিরিজটি অতি সুপরিচিত। লেন যখন প্রথম এই ব্যবসায় নামেন, তখন বাজারে তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না, এমন কি গিল্ড পুস্তকমালা প্রকাশিত হওয়ার পরেও তা পেঙ্গুইন গ্রন্থাবলীকে বাজার থেকে হটাতে পারেনি।

কিন্তু সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের বইয়ের বাজারে পেঙ্গুইন কোম্পানীর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়েছে। আমেরিকান পুস্তক-প্রকাশক রবার্ট ডি-গ্রাফ, লণ্ডনের এসেক্স ষ্ট্রীটে তাঁর সুবিখ্যাত 'পকেট-বুক' গ্রন্থমালা-প্রকাশনের জন্য একটি কার্য্যালয় স্থাপন করেছেন। ইংল্যাণ্ডে পেঙ্গুইন গ্রন্থমালা যা, আমেরিকায় 'পকেটবুক' গ্রন্থমালাও তাই। রবার্ট ডি-গ্রাফ, ১৯৩৯ সালে আমেরিকাতে এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি যে কেবল বইয়ের দোকান সাজিয়ে বই বিক্রী করেছেন তা নয়—রাস্তার ফুটপাথে, ঔষধের দোকানে, রেল-ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে সর্ব্বত্র তাঁর পকেট-বুক গ্রন্থমালার প্রসার। এক বিষয়ে তিনি মিঃ লেনের মত ভাগ্যবান নন। ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁকে গোড়া থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন কি, বৃটিশ পেঙ্গুইন পুস্তকাবলীর আমেরিকান সংস্করণগুলিও "পকেট বুক" গ্রন্থমালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছে।

বিলেতে প্রকাশিতব্য তাঁর সঙ্কলিত পুস্তকমালার মলাটে তিনি ট্রেড মার্ক হিসাবে ক্যাঙ্গারুর চিত্র ব্যবহার করবেন। এই ছবির নীচে লেখা থাকবে "Gertrude, the Kangaroo."

সম্প্রতি তিনি বিলাতের খ্যাতনামা লেখক, সমালোচক ও প্রকাশকবর্গকে এক পার্টিতে আপ্যায়িত করেছেন। সেই সম্মিলনীতে তিনি সত্যি সত্যি 'ওয়ালী' নামে একটি জীবন্ত ক্যাঙ্গারুকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে উপস্থিত করেছিলেন।

মিঃ ডি-গ্রাফ-এর এই সাম্প্রতিক ব্যবসায় প্রচেষ্টার মূলধন ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। প্রয়োজন হলে এর বেশীও তিনি খরচ করতে প্রস্তুত। সর্ব্ব প্রথমে তিনি কোনানডয়েল, ডরোথী উইপ্ল, কেন প্রভৃতি লেখকদের রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করবেন বলে মনস্থ করেছেন। পরে অবশ্য অন্যান্য নূতন পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছাও তাঁর আছে। তাঁর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে সস্তা পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে পেঙ্গুইন কোম্পানীর একচেটিয়া রাজত্ব আর থাকবে না বলে মনে হয়।

কলিকাতায় সাংবাদিক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহিত পশ্চিম-বঙ্গের লৌহ-ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের একজিকিউটিব বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত ভবতোষ ঘটক মহাশয় ব্যবসায় সংক্রান্ত আলাপ করিতেছেন

তারানাথ রায়

চার

গুপ্তচররা খবর বয়ে নিয়ে গেছল বাঁশবেড়ের আমবাগানে তীতু মীরের বাঁশের কেল্লায়। তারা 'বাদশা' তিতুকে জানিয়ে দিল, হাঁদু রায় মশায় ফিরিঙ্গীদের আশ্রয় দিচ্ছে। স্থির হয়ে গেল, ও অঞ্চলের হিন্দুদের বিলকুল হয় মোছলমান করতে হবে, না হয় কেটে ফেলতে হবে—আর তাদের বৌ-ঝিদের তার মুরিদদের বখশিস দিতে হবে।

বাঁশের কেল্লা সেদিন হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। দলে দলে ফরাজী মুসলমান চব্বিশ পরগণার সীমান্ত অতিক্রম করে নদীয়ার গাঁয়ে গাঁয়ে এসে ভীড় করেছিল। আর তার হয়ে পদ্মা-তীরের গাঁগুলোতে আগুন জ্বালাবার ভার নিয়েছিল ফিরিঙ্গী ডিক।

বিলাসী ডিকের সব সংবাদ রায় মশাইকে জানিয়েছিল। প্রমাদ গণে টমসন আর ওয়াটসনদের কুঠিয়ালরা সদরে খবর দিয়েছিল সাহায্যের জন্যে। সদরের কর্ত্তারা কর্ত্তৃপক্ষকে জানালে কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজের এই নতুন বিপদের প্রতিকারের জন্যে যেমন ফৌজের ব্যবস্থা করেছিল, তেমনি সেকালের প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ রবার্ট রীড্‌কেও প্রস্তুত হতে বলেছিল।

টমসনদের কুঠীতে যেমন ওয়াটসনদের কুঠীতে তেমনি বহু অস্ত্র-শস্ত্র ও লাঠিয়াল আমদানি করা হয়েছিল। কালীনাথের দল ঠগবগের শ্মশান-কালীর নির্মাল্য মাথায় করে মা-বোনদের রক্ষা করবার শপথ গ্রহণ করেছিল।

১৮৩০, ৭ই এপ্রিল। কাল-বোশেখীর ঝড় নেমেছে সন্ধ্যা বেলা। কালো কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃত করে এক মূর্ত্তি সেই ঝড়ের মধ্যে সাতখুনের মাঠ পেরিয়ে চলেছে। মাঠ থেকে দেখা যাচ্ছে, বনের ঘন ছায়ার ভেতর থেকে একটা উঁচু ইমারতের চূড়া। মাঠ পার না হতেই বৃষ্টি নামল। মূর্ত্তি তবু এগিয়ে চলে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। কালো মূর্ত্তি সামনেই দেখে রণ-পায়ের উপর দাঁড়িয়ে বিরাট দৈত্য।

প্রথমে একটু থমকে যায়। তার পর ব্যস্ত হয়ে কালো কাপড়ের ভেতর থেকে বের করে চকচকে ছোট্ট একটা ত্রিশূল।

দৈত্য জিজ্ঞেস করে—নয়না?

মূর্ত্তি বলে—চল!

দৈত্য নেমে নয়নাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে কাঁধে ফেলে নেয়, তার পর রণ-পায়ে উঠে ছুটে চলে বনের দিকে!

দুর্ভেদ্য বন!

অন্ধকার ও দুর্ভেদ্য কাঁটা বেতের ঝোপ প্রতি পদে বাধা দেয়।

রণ-পা সন্তর্পণে এগিয়ে চলে।

বনের মাঝখানে পুরোনো এক ইমারত। ইমারতের গা থেকে চূণ-বালি খসে পড়েছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। অন্ধকারে মনে হচ্ছে একটা বিরাট রাক্ষস তার সাত চোখ দিয়ে কট-মট করে দেখে নিচ্ছে চার দিকটা।

[illegible] এক জন মশালচি দাঁড়িয়ে ছিল। রণ-পা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কি ... তাই সে মাথা ঝুঁকিয়ে পথ ছেড়ে দিল।

সামনে চলে দৈত্য, পেছনে নয়না। ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে ... গিয়ে নয়নারও গা একটু ছম্‌ছম্ করে।

ওপরে মস্ত হলঘর। চার কোণে চার মশাল লাল ধোঁ... আলো দিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মাঝখানটায় এক ফরাস পাতা। তার উপর বসে রায় মশাই। রায় মশাই বেশ বুড়ো হয়েছেন কিন্তু চোখ দু'টো তখনও জ্বলছে। অঙ্গে অঙ্গে শক্তির পরিচয়। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে এক কালকেলো জোয়ান মস্ত এক ...পাখা দিয়ে হাওয়া করে যাচ্ছে।

রায় মশায়ের সামনে এসে বিলাসী কালো কাপড়খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সযত্নে উঠিয়ে রায় মশাই বললেন—"ওঠ্, বিলাসী।"

পেছনের যুবককে দেখিয়ে বললেন—"এই তোর গোপাল। গোপ্‌লা, এই — এই তোর মা জগদম্বা, প্রণাম কর।"

মা ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার গোপালকে জড়িয়ে ধরে তার গালে, মুখে, মাথায়, চোখে চুমু খেয়ে খেয়ে অস্থির করে তোলে। কখন বুকে জড়িয়ে ধরে, কখন ঘাড়ের উপর তার মাথাখানি রেখে চোখ বুঁজে কি যেন আরাম অনুভব করে।

কর্ত্তা ডাকেন—বিলাসী!

আবেগ-সংযত করে স্থির হয়ে বসে বিলাসী।

—খবর!

—ওরা হাজার হাজার ফরাজী মুসলমান এনে এদিকটা ভর্ত্তি করে ফেলেছে। ডিক ফিরিঙ্গী আমদানী করেছে গাড়ী গাড়ী লাঠি, সড়কি আর বন্দুক।

রায় মশাই ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন। কথা বলেন না। একবার হাঁকলেন—বাগচি!

কেষ্ট বাগচি। চুলে পাক ধরলেও ও-অঞ্চলের ... জোয়ান। নাম শুনলে সাহেবরাও ভয় পায়।

—বিলাসী বলছে, তীতু যবন হাজার হাজার ফরাজী ... আর গাড়ী গাড়ী হাতিয়ার।

কেষ্ট—হাতিয়ার আমাদের যথেষ্ট নেই কর্ত্তা।

—বাগচি, ওদের সব হাতিয়ার হাত করতে ... বিলাসী তুই ফিরে যা, ডিক কাল আমাদের কুঠী আক্র... খবর পেয়েছি। আমাদের লাঠিয়ালরা সন্ন্যেসী সেজে তো... নাচতে যাবে। হাতিয়ার আটক করা চাই-ই চাই, ... গোপাল—তোর গোপালও যাবে নাচতে, কেমন রে গোপ...

গোপাল মৃদু মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

গোপালের মুখে তেমনি করে চুমু দিয়ে অস্থির ... জননী বিলাসী বুক-ভরা আশা আর আনন্দ নিয়ে ফিরে যেতে ...

কর্ত্তা বলেন—ফরাজীরা বলছে, হিন্দুর বৌ-ঝি... ওদের এখানে সরাবার ব্যবস্থা করেছি। ... করেছি। তুই আর বাংলা ছাড়িস নে বিলাসী। ভয় না...

আবার কালো কাপড়খানা সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ... হয়ে কর্ত্তা মশাইকে প্রণাম করে। হাত তুলে ঠগব... শ্মশান-কালীর উদ্দেশে প্রণাম ক'রে মনে মনে বলে—মা গো, ...বাসনা পূর্ণ কর, বুকের টাটকা রক্ত দিয়ে খুসী করব মা।

... ওকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

... মশাই বসে আকাশ-পাতাল ভাবেন। ঝড় তখন ... চার দিক থেকে ঝিঁঝিঁরা থেমে থেমে ডাকছে। ... শকুনি-ছানার কান্না ভেসে আসছে। রায় মশাই ... কি।

... জন এসে বললে—এবার আনব কর্তা!

—আন।

... আলি। পীর আলি বলেই ও-অঞ্চলের সকলে তাকে ... নামটা কিন্তু পেরে এলা। ওর বাপ ছিল ফরাসী, ... ডিকের বাপ ছিল ইংরেজ, তাই ডিক তার শত্রু। ... ইংরেজের সঙ্গে ফরাসীদের দারুণ শত্রুতা।

পীর আলি এসে শপথ করল যিশুর নামে—ডিককে সে ... দেবে। বলে গেল—হিন্দুরা তার দোস্ত। পীর আলি ... সংবাদও দিয়ে গেল যে, সদর থেকে পুলিশের এক বড় গোয়েন্দা ... আসছেন।

কর্তা বললেন—আর গোমেশ? গোমেশ ফিরিঙ্গী কথা রাখবে ... না রাগে, বাপ-বেটা কাউকেই আস্ত রাখব না বলে দিও।

পীর আলি বলে—জোসেফ আর তার ছেলে এডোয়ার্ডের সঙ্গে ... ভাল ব্যবহার করছে না, ওদের নিশ্চয় হাত করা যাবে।

—আর গং সাহেব?

—ইয়ং? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ও ডিককে ক্ষমা করবে না। ... সিষ্টার ডিককে পেয়ার করে, মিঃ ইয়ং এ বরদাস্ত কর... না কিছুতেই।

ডিক আর ফরাজীরা ঢের হাতিয়ার আর লাঠিয়াল এনেছে। ... যেন তৈরী থাকে পীর আলি, তোমার গং সাহেবকেও ... বলো।

... হয়ে পেরে এলা বিদায় যখন নিল, তখন পূব দিকের ... একটু আলো ফুটছে।

... সেই গভীর বন ভেদ করে শত শত নর-নারীর আর্তনাদ ... লাগল। রায় মশাই ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠে ... কাছে গেলেন। দেখলেন চার দিকে আগুন দিয়েছে।

... লা, মানুকে, বাগচি। সবাই ত্রস্ত ভাবে এসে দাঁড়াল!

... আগুন দিয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে! মা কাঁদছে, কচিদের ... শোনা যাচ্ছে। চল চল, ছুটে চল।

... উলট-পালট হয়ে গেল। হাজার রণ-পা, হাজার সড়কিদার বন ভেঙ্গে বেড়িয়ে পড়ল। বেশী দূর ... না, সাত খুনের মাঠে ফরাজীরা লুঠের মাল আর ...দের এনে জমায়েৎ করছিল, রায় মশায়ের দল ওদের ... করল অতর্কিতে।

পাঁচ

... যখন শেষ রাত্রিতে ফিরে এলো ডিক-বাংলায়, তখন ... ওঠেনি। মুসলমানপাড়ায় দু'-একটি মোরগ ডেকে ...। বোষ্টমপাড়ার গোঁসাইএর খঞ্জনী শোনা যাচ্ছিল।

... গোমেশ বাংলোর পেছনের দিকটায় তার ছেলে ... নিয়ে থাকত। সে ঘরে আলো জ্বলছে দেখে মনে হ'ল, ...। একটু গলার আওয়াজ দিল বিলাসী। জোশেফ, আঙিনায় এসে দাঁড়াতেই কালো কাপড়খানা তার হাতে দিয়ে ইসারা করে ঘরে যেতে বলল। কাপড়খানা নিয়ে জোশেফ সরে গেল।

ওপরে গিয়ে কালা আনন্দের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ও আর তার ছেলেপুলেরা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

আপনার ঘর খুলল বিলাসী। গুন-গুন করে গাইতে লাগল। মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল গোপালের মুখখানি মনে পড়ে যেতেই। তার গোপাল! তারই গোপাল! বাপের মতনই গ্যাঁট্টা-গোট্টা হয়েছে। কি মিষ্টি যাদুর মুখখানা! কাঁধে যখন মাথাটা রাখল, মনে হ'ল, পৃথিবী আর নেই—আছে মা আর ছেলে—ছেলে আর মা। রায় মশাই—ও মানুষ না দেবতা—গোপাল যখন তাঁরই সেবা করছে, তখন সেও ধন্য, বিলাসীও ধন্য।

হঠাৎ নজর পড়ল দোরের কাছে। এক টুকরো কাগজ। তুলে নিয়ে জানালার কাছে এল। আবছা আলোয় বুঝা গেল না। কাগজখানা নিয়ে ছুটে গেল গোমেশের ঘরে। গোমেশ আলোর কাছে নিয়ে পড়ে তার বিলাসীর দিকে চায়। বিলাসী জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে ওর দিকে চায়।

—মরিয়ম!

—মরিয়ম? গং সাহেবের মরিয়ম?

—হাঁ, মরিয়ম।

—কাকে লিখেছে?

—তোমাকে।

—আমাকে?

—হাঁ। লিখেছে—ডিককে সে ছাড়তে পারবে না। ডিককে নিয়ে সে দেশ ছেড়ে পালাবে, তুমি যেন বাধা দিও না।···

বিলাসী খালি ক্রুর এক অট্টহাসি হেসে উঠল। হেসে বললে—ডিক বুঝি ওর কাছেই রাত কাটাচ্ছে আজ?

—সম্ভবতঃ।

—আর কি লিখেছে?

—বুঝবে না সব ছাই-পাঁশ···

গোমেশ মনে করল, এ চিঠিখানা ডিক শয়তানকে ঘায়েল করতে কাজে লাগবে। চিঠিখানা সে ভাঁজ করে তার জামার ভেতরের পকেটে রেখে দিতে দিতে বলল—কাজে লাগবে আনন্দ, কাজে লাগবে। ডিক আজও হয়ত ফিরছে না।

—কেন?

—চল না দেখবে।

গোমেশ আলো হাতে এগিয়ে চলে। বিলাসী পেছনে পেছনে চলে। মস্ত এক চাবী ঘুরিয়ে আবুরি বাজারের লাগোয়া এক মালগুদামের পেছনের দরজা খুলে সে বিলাসীকে দেখায় ভেতরটা।

বিলাসী দেখে—গুদামে নতুন নতুন সব হাতিয়ারে ভর্তি। অবাক হয়ে গোমেশের মুখের দিকে তাকায়।

—সব আমারই হেফাজতে। বাজারের ঐ যে সব চালা দেখছ, ওগুলোতে প্রায় হাজার ফরাজী লাঠিয়াল আর সড়কিদার অপেক্ষা করছে। ডিক কাল একবার হঠাৎ এসে আমায় এ সব লুকিয়ে রাখতে বলে গেছে, আর বলে গেছে কলাবাগানে বসে পাহারা দিতে।

—তাই বুঝি ঘরে বসে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পাহারা দিচ্ছ?

—আজ কি একটা যেন হবে, ডিক বড় ব্যস্ত, ওপর পর্যন্ত

উঠল না, আবার বেরিয়ে গেল। মদ টেনেছে খুব। চোখ টকটকে লাল।

বিলাসী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাজারের চালাগুলোর দিকে। রায় মশায়ের কথাগুলো তার মনে পড়ে যায়। কিন্তু তার গোপাল আছে। ভয় সে আদপেই করে না। রায় মশাই আছেন, গোপাল আছে, আর আছে ঠগবগের শ্মশানকালী। দু'হাত তুলে শ্মশানকালীর উদ্দেশে প্রণাম করে। আর একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বাজারের চালাগুলোর দিকে।

—মরিয়ম কি লিখেছে বললে গোমেশ ?

—ডিককে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে···

—হুঁ !

গুদামের বড় চাবীটা এক রকম কেড়েই নেয় গোমেশের হাত থেকে। তার পর গুদাম বন্ধ করে উঠে চলে যায় তার ঘরে। গোমেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে দেখে, বাধা দিতে পারে না।

ডিক সেদিন দুপুরেও ফিরল না। আবুরি বাজার নিত্য যেমন বসে তেমনি বসেছিল। নিত্য যেমন কেনা-বেচা হয়, নিত্য যেমন হট্টগোল হয় তেমনি হয়েছিল। কুঠীর কাজ নিত্য যেমন চলে তেমনি চলেছিল। গোমেশ একবার এসে চাবী চাইতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে গেছল। কালা আনন্দ নিত্য যেমন গেঁয়ো ভাষায় চাকর দু'টোকে শাপান্ত করে তেমনি সেদিনও করেছিল। তার কালো ফিরিঙ্গী বাচ্চাগুলো নিত্য যেমন কুঠীর হাড়ি-বাগদী ছেলে-গুলোর সঙ্গে ডাংগুলি খেলে বেড়ায় সেদিন তেমনি বেড়িয়েছিল। কিন্তু বিলাসীর উনুন সেদিন আর জ্বলেনি। চাকর তাগিদ দিতে এসে তার মুখ দেখেই ফিরে গেছল।

বিলাসী সারা দিন ধরে এ-বাক্স খোলে, ও-বাক্স খোলে। তার গয়না, তার সাড়ীগুলো বের করে স্তূপ করে—গয়নাগুলোর মধ্যে তার বিয়ের নোয়া, সিঁদুরের কৌটা তখনও সে যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছিল। নোয়াটা কপালে ঠেকিয়ে সিঁদুর-কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে নোয়ায় একটু দিয়ে দু'টো আঁচলে বেঁধে রাখে, যেন অমূল্য রত্ন।

বেলা পড়ে আসে। বাংলোর গাছে গাছে আঁধার এসে বাসা বাঁধে। ময়না দীঘির অশথ গাছটায় যত রাজ্যের কাক ফিরে লুটোপুটি করতে থাকে। বিলাসী স্পষ্ট দেখতে পায় ঐ অশথ-তলায় কে এসে ঘোড়া থেকে নামে। গোপাল ? হাঁ, তারই মতনই ত বাবরী-ছাঁট চুল। মাথার কি সুন্দর ঝাঁকুনী দিয়ে বাবরীগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। বাপেরই ত ব্যাটা !

ইচ্ছে হ'ল দৌড়ে যায়। গেল না। কেবল জানালা থেকে দেখে। ও ঘোড়া থেকে নেমে পায়চারী করে। তার পর একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে ঘোড়া বেঁধে ফিরে আসে। একবার চায় বাংলোর দিকে। বিলাসী আঁচল নেড়ে ইসারা করতে চেষ্টা করে। হাবা ছেলে দেখতেই পায় না। দু'-এক পা এগিয়ে আসে, আবার ফিরে যায়। অত বড় অশথ গাছে কেমন তড়-তড় করে ওঠে বাচ্চা কাঠবিড়ালীর মত ! তার পর আর দেখা যায় না।

সন্ধ্যা পড়ে আসে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। কুঠীর কাজ শেষ হয়। কমিলায়া হট্টগোল করতে করতে যে যার ঘরে ফিরে। মাঠ দিয়ে দলে দলে গরু খেদিয়ে নিয়ে রাখাল ছেলেরাও ফিরে।

ডিক যখন ফিরে তখন বেশ রাত্তিরই হয়েছে। বিলাসী ও[illegible] গলা ছেড়ে ভাটিয়াল ধরেছে—

সই সই রে,
শুনে যা মোর
মন-চরকার গুনগুনি !

ডিক ফিরে সরাসর উপরে উঠে যায়। গায়ে রক্ত ; পো[illegible]ক ছেঁড়া। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো ধূলোময়। মন চঞ্চল।

গোরা আনন্দ, গান থামিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে চা[illegible]। ডিক টলতে টলতে এসে খাটে শুয়ে পড়ে বলে—সরাব দে, গোরা।

ফিরিঙ্গীটার সামনে সরাবের বোতল এগিয়ে দিয়ে [illegible]

—কোথায় গেছলি ? এ কি হাল ?

ডিক সরাব খায় খালি, বলে—খেতে দে !

—ব্যাপার কি বল্‌।

—লড়াই ! মোল্লি পাড়ার কুঠী খতম !

—মিছে কথা ? মরিয়মের কাছে ছিলি বুঝি !

—ড্যাম মরিয়ম ! ওর ইয়ং আর স্যাটান-কালীর লেঠেল ঠেঙিয়ে ফিরছি, বিশ-পঁচিশ খুন—আর কত্তো ঘায়েল।

—বিশ-পঁচিশ খুন ? বলিস কি ?

বিলাসীর চিবুক ধরে বলে—হাঁ, হাঁ রে মনুয়া, বিশ-পঁচিশ। দে, খেতে দে !

চাকরদের ডাকে। জানালার কাছে গিয়ে বিলাসী একবার একদৃষ্টে অশথ গাছটার দিকে চেয়ে কি দেখে।

ডিক বলে—কি দেখছিস্‌ ? আগুন ? সে এ গাঁয়ে নয় রে। কেলো শালার সাত এক দম গাঁ ছাই—আর চোদ্দ খাপসুরাং···

—কি বললি ? চোদ্দ কি ?

—মাল্‌ ! মাল্‌ ! লোপাট্‌ !

—লোপাট ?

বিলাসীর চোখে আগুন জ্বলে, মুখে কিছু বলে না। কিন্তু অশথ গাছও ত এগিয়ে আসে না।

চাকর খানা দিয়ে যায় উপরেই। বিলাসী ভ্রূক্ষেপও ক[illegible] না। ডিক নিজেই উঠে ডাকে—কালা—কালা ! কালা আনন্দ [illegible] কালো রূপ নিয়ে উঠে আসে উপরে।

—কী রে মুখপোড়া !

মাথা ধুইয়ে দিতে বলে। পোষাক পালটে দিতে বলে। [illegible] একবার বিলাসীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বিড়বি[illegible] কার যেন মুণ্ড চিবিয়ে খায়। তার পর দুম-দুম করে নে[illegible] কোলের বাচ্চাটাকে অকারণ ঠেঙাতে থাকে। ছেলেটির [illegible] রাগিণীতে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা মুখর হয়ে ওঠে।

খানা-পিনা সেরে একটু সুস্থ হয়ে ডিক সেজে-গুজে বাংলো[illegible] বারান্দায় নেমে গিয়ে আর একবার 'বয়'দের ডাকে। সাড়া [illegible] গেল না। ছেলে রিচার্ডকে ডেকে এক ছিলিম তামাক [illegible] বলে। কালা তার কালো শিশু-পার্ষদ নিয়ে বিলাসীর বিরু[illegible] দিনের জমান নালিশ নিবেদন করতে এসে দাওয়ায় বসবার উ[illegible] করছে, এমন সময়···

• এমন সময় চার দিক থেকে হারে রে রে রে রে ! [illegible] চার দিক ঘিরে ফেলে শত শত লাঠিয়াল আর সড়[illegible]

... গবগ করে চার ঘোড়সোয়ার এসে নামে ঠিক বারান্দার ...।

...লাসী উপর থেকে দেখে—তার গোপালচাঁদ নামল, হাতে ... লাঠি! নামল পীর আলি—হাতে কিরিচ। নামল বাগচি ... হাতে চকচকে ফলা। আর কালো ঘোড়ার উপরে কাতলা-মা... গং সাহেব—হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। শুনতে পেল—গং-এর ক... চীৎকার—পাকড়ো শালেকো! হামারা হুকুম—পাকড়ো!

...কের আর্তনাদ আর গোপালের অট্টহাসি শুনতে বিলাসীকে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যেতে হ'ল।

ছয়

...লাসী নেমে এসে দেখে শ'-দেড়শ' চড়ুকে সন্ন্যেসী লাঠি-শোটা নিয়ে ...ল্লা করছে। গং সাহেব ঘোড়ায় চড়ে হাতের তলোয়ার আস্ফালন করে বলছে—'বাঁধ, শালাকে!'

...ড়াটা গড়াচ্ছে। কালার দশ বছরের বাঁদর রিচার্ড কলকী হাতে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। তার গোপালই এসে ...কোমরে গামছাখানা খুলে কসে বাঁধছে ডিকের মুখ। একটা ...টি মাচুর কচি মুখের উপর বসিয়ে দেয় ডিক। বাঘের ...ও নাকটা ফাটিয়ে দিয়ে টুঁটি ধরে চেপে আচ্ছা করে। কালা ...লিয়েছিল, কে এক জন ওর চুল ধরে টেনে এনে ফেলে দেয় ...র ঘোড়ার পায়ের তলায়। বিলাসী গিয়ে গোপালের হাতখানা চেপে ধরে বলে, "ছাড়্।" গোপাল মা'র মুখের দিকে তাকায়। হাত তার শিথিল হয়ে আসে অমনি। বিলাসী ওর মুখের দিকে কেমন করে তাকিয়ে একটু হাসে, তার পর চেঁচিয়ে কোম্পানীর দোহাই দেয়।

গোরা আনন্দকে দেখে গং ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। খানাখা পৈছা-গাছ ...য়েছিল হারামজাদীকে। সে তার কুঠীতে যেতে চায়নি মাঝ-খান থেকে পেঁচো মুহুরীর পা খোঁড়া করে দিয়েছিল ডিক শয়তান। সে কথা মনে হতেই গং সাহেব চিৎকার করে বলে, "সড়কী—সড়কী।" কে একটা সড়কী দিল তার হাতে। ঘোড়ার পিঠে ... মারল ছুড়ে বিলাসীকে। বিলাসী চীৎকার করে পড়ে ... গোপাল ছুটে গিয়ে ধরল মাকে!

... ...র করছে। চড়ুকে সন্ন্যেসীরা ঘর-দোর ভেঙ্গে বাংলো লুটছে। ...লের রাঙা আলোতে আলোতে আলোময় হয়ে গেছে চার ... বাজারের লোকেরা আতঙ্কে কেবল কোম্পানী বাহাদুর... দিচ্ছে।

... না। এরই মধ্যে ডিককে বেঁধে কয়েক জন কাঁধে উঠিয়ে ... গং, পীর আলি, বাগচি এরা ঘোড়ায় চড়ে বাংলো থেকে ... ডিককে নিয়ে। চড়কে সন্ন্যেসীরা লুঠের মাল নিয়ে ... করতে করতে চলে গেল।

...চ্চা ভূত-বাঁদরগুলো ত্রাহি স্বরে চেঁচাতে লেগেছে। কালা... আধখানা মনসা গাছে উড়ছে। গোরা পড়ে আছে উপুড় ... সড়কীটা বেশ বিঁধেছে কাঁধটায়। বাছা গোপাল পাশে বসে ... ও মা! মা গো!"

... মুখখানি উঠিয়ে কি যেন খোঁজে গোপালের মুখে আর ... চোখে। ... কণ্ঠে ডাকে—"বাবা!"

—খুব লেগেছে মা?

—না রে পাগল!

—তবে ওঠ!

বিলাসী বলে—না রে! মা! এই যে চাবী। মালখানায় বোঝাই হাতিয়ার। নে, দেরী করিস্ নে হতভাগা ছেলে।···আবার বসে রইলি?···যা, শীগ্‌গির যা।

বাইরে এসে তার ঘোড়াটাকে খোঁজে গোপালচাঁদ। কোথাও নেই। কোত্থেকে গোমেশ? একটু আড়াল দিতে চায়। গোমেশ বলে—তোর ঘোড়া ডিকের আস্তাবলে বেঁধে রেখেছি! চল্।

দুই জনে মালখানার দিকে যায়। দরজা খুলে দেখে—ওঃ বাবা!

আস্তাবলে ঘোড়াটা দানা খাচ্ছিল—গোপাল তাকে খুলে নিয়ে লাফ দিয়ে চড়ে লাগালো পেটে দু' গোড়ালীর গুঁতো।

যখন ফিরে এল তখন বিলাসী উঠে বসেছে। আঁচল দিয়ে রক্ত মুছছে। একবার যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলছে—বাবা রে! গোপাল কাছে যেতে চায়। ইসারা করে বিলাসী সরে যেতে বলে। বাগচিকে নিয়ে আর লেঠেলদের নিয়ে ওরা মালখানাগুলো নিঃশেষ করে লোটে, তার পর কুঠীর গরুর গাড়ীগুলোতে অস্ত্রগুলো বোঝাই করে ওরা চলতে থাকে কাতলামারীর দিকে।

বিলাসী আবার উঠে বসে। বাংলোর চার দিকে চায়। বাইরে অন্ধকার। ওদের দু'-একটা মশাল তখনও দাঁড়িয়ে জ্বলছে বাংলোর আঙ্গিনায়। বিলাসী দেখে চার দিকে লণ্ডভণ্ড। কাঁধটায় বড্ড ব্যথা করছে। কাছে একটা লোটা পড়েছিল। হাতে তুলে দেখল, জল। ঢক্‌ঢক্ করে খেল। আঁচল ভিজিয়ে কাঁধে চেপে ধরল। বাগ মানে না রক্ত। আঁচল ভিজে যায়। মনে মনে বলে—"যা, বেরিয়ে যা পাপের রক্ত!"

মনে পড়ে—তার গোপাল! কেমন করে বাঘের মত শয়তান ফিরিঙ্গীটার টুঁটি চেপে ধরেছিল! ধরবে না, ওর সোনা মুখে লোহার মুঠি দিয়ে মারলে, ও ধরবে না? বেশ করেছে—বাপের বেটা!

এতক্ষণ হয়ত হাতিয়ারগুলো নিয়ে মাঝ-পথে। রায় মশাই এবার নিশ্চয় খুশী হবেন। তাঁর শ্মশানকালীর বিল্বপত্র ফাল হয়ে নিশ্চয় সয়তানদের বুক ফাঁক করে দেবে।

হঠাৎ কানে যায়, বাজারে হঠাৎ কলরব বেড়ে উঠল। মেয়েরা চেঁচাচ্ছে। কচিদেরও কান্নার আওয়াজ। আওয়াজ ক্রমে কাছে আসে।

বিলাসী আবার উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। দেখতে দেখতে এক দল ফবাজ্ঞী বাংলোতে ঢুকে পড়ে। কালার ঝাঁজালো গলা। রিচার্ড খালি কোম্পানীর দোহাই দিচ্ছে। কে জিজ্ঞেস করে—"মরে গেছে?" কালা বলে—'গং সড়কী মেরেছে নিজে।'

কালা এসে বুকে হাত দেয় বিলাসীর। বলে—"নিশ্বেস বইছে এখনও।" দাঁতে হাত দিয়ে বলে—"দাঁতি লেগে আছে।" কাঁধটা দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে ডাকে—"গোরা—গোরা, বিলিসী!" বিলাসী শুনতে পায়। রা কাড়ে না। সবাই ধরাধরি করে ওকে উঠিয়ে কেশব নগরে ডিকের মুনিব টমসনের খোদ কুঠীর দিকে নিয়ে যায়।

সাত

ডিকের উপরিওয়ালা কুঠিয়াল মিষ্টার জেমস্ টমসন। কেশব নগর কুঠী তাঁর খোদ তত্ত্বাবধানে চলত। জেমসের পিতা এ জিলেজায় ছিলেন টমসনদের সব কুঠীর মালিক। কলকাতাতেই

থাকতেন প্রধানতঃ। সম্প্রতি মোল্লাহাটি কুঠীর ম্যানেজার ডেভিস দু'শ' লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা নিয়ে তিতু মীরকে আক্রমণ করে হেরে গিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, আর মুসলমানরা ইংরেজের বংশ নির্ব্বংশ করবার জন্যে নদীয়ার নীলকুঠীগুলোতে হানা দেবার আয়োজন করেছে, এই সংবাদ পেয়ে বুড়ো টমসন কেশব নগরে এসেছেন তাঁর বন্ধু কলকাতার নামজাদা ডিটেক্‌টিভ রবার্ট রীডকে সঙ্গে নিয়ে।

রাত তখন প্রায় তিন প্রহর। কেশব নগর নিস্তব্ধ। কঠিয়াল সাহেবের মস্ত বাড়ীটা নিশুতি। দেউড়ীতে দু'জন বরকন্দাজই থাকত। দিন-সময় দেখে খাড়া পাহারা চতুর্গুণ হয়েছে। হাতে তাদের সঙ্গীন-চাপান বন্দুক। একটা কামানও দেউড়ীর ঠিক সামনে উবু হয়ে মুখ তুলে বসে আছে।

হঠাৎ কলরব করতে করতে একটা ডুলিতে বিলাসীকে চড়িয়ে লোকগুলো এগিয়ে আসতে লাগল। পাহারাওয়ালারা দেউড়ীর সামনে এসে ভীড় করল, লোকজন বেশী দেখে বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—হুকুমদার!

কলরবে বড় সাহেব জেগে উঠে গাড়ীবারান্দায় এসে দাঁড়ান। দেখেন, মশাল জ্বালিয়ে এক দল লোক হল্লা করতে করতে এগিয়ে আস্‌ছে। বন্ধু রীড্‌ তার ঘরে হয়ত ঘুমুচ্ছেন। ছুটে গিয়ে তাঁর দোরে আঘাত করে ডাকে—রীড্‌! রীড!

বুড়ো টমসন ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওদিকে হল্লা এগিয়ে আসে। উপায়? আবার দোরে জোরে জোরে ঘা দিতে থাকেন। তবু সাড়া নেই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বৃদ্ধ ঘরে ফিরে তার পিস্তলটা নিয়ে এসে গাড়ী-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। দেখেন, পাহারাওলারা হল্লাকে থামিয়েছে দেউড়ীতে। এক জন চৌকীদার ছুটে আস্‌ছে বাগিচা পেরিয়ে কুঠীর দিকে। বুড়ো উপর থেকে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—কি হয়েছে?

সেলাম বাজিয়ে জানায়—"জখমি জেনানা আর ফরাজী লাঠিয়াল!"

ফরাজী লাঠিয়ালের কথা শুনে টমসন জখমি জেনানার কথা আমলেই আনলেন না। হুকুম দিল—"হটা দেও!"

কুঠীর লেঠেলরা বেরিয়ে এল। চৌকিদার আর লাঠিয়ালরা মিলে ফরাজীদের আক্রমণ করে জখম করতে লাগল। তারা যে যার ইচ্ছা মত পালাল। ডুলি রইল পড়ে দেউড়ীর বাইরে। ডুলির ঢাকনির কাপড় সরিয়ে বিলাসী দেখল কেউ কোথাও নেই, সে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল, আর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঝোপ-ঝাড়ে আত্মরক্ষা করে চলতে লাগল। কোন্ দিকে চলেছে, অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারল না।

কাঁধটা বড় টাটাচ্ছে। রক্ত তখনও গা বয়ে ঝরছে। একটা জায়গায় মাটি মনে হ'ল নরম নরম, ভেজা-ভেজা। দূরে যেন বিল। মাটির গন্ধ ভেসে আস্‌ছে, আর ঠাণ্ডা হাওয়া। নরম নরম ঘাসে পা ডুবে যেতে লাগল, ভাবল, এগুনো ত আর চলে না।

দাঁড়াল। আকাশের দিকে চাইল। ধ্রুবতারা দেখে উত্তর দিকটা ঠিক করল। পূব দিকের চিকনায়ের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না, একটু যেন ওদিকে মেঘ জমেছে, ঝলকে ঝলকে বিদ্যুতের মলিন চমকানি দেখা যাচ্ছে।

ফেরাই স্থির করল। পা ওঠে না। কী করে। সাত দিন খায়নি। রক্তও পড়েছে ঢের। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। মনে পড়ে, খানিকটা ঘাস চিবিয়ে জখমটাকে চেপে ধরলে রক্ত বন্ধ হতে পারে। তাই করল। আঁচল দিয়ে বাঁধতে গিয়ে হাতে ঠেকল তার নোয়া আর সিঁদুর-কৌটোয়!

নোয়া মাথায় ঠেকায়। মনে পড়ে যায়, স্বামী গোপাল ভট্টচাজের কথা। তাঁর স্বামীর মত স্বামী! সয়তানরা তাকে ধরে পার করে দিল কালাপানিতে। বাছা গোপালের চাঁদ মুখখানি বুকে জড়িয়ে সে তবু ভুলেছিল। কিন্তু তার বয়েসটা সেধেছিল বাদ। দু'টো ভাতের ভিখারী হয়ে বামুন ঘরের রূপসী সে দাসী বৃত্তি করতে গেছল, সেই দাসীবৃত্তিই কাল হয়েছিল। মুহূর্ত্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই বুড়ো টমসনের ব্যাটাই তাকে বিবি হবার লোভ দেখিয়েছিল। তার পর হল সে লুঠের মাল।

গোপাল ভট্টচাজ কালাপানি থেকে ফিরেছিল বলে সে শুনেছিল। দেখবার কত না ইচ্ছে তার হয়েছিল, কিন্তু সয়তানরা তাকে ছেড়ে দেয়নি, আর তাদের টাকা খেয়ে গাঁয়ের টিকিবাজরাও নানা কথা রটিয়েছিল।

স্বামী হয়ত তার কেলেঙ্কারীর কথা শুনেছিল। শুনে হয়ত আত্মহত্যাই করেছিল—কে জানে? হয়ত বা বিবাগী হয়ে বেরিয়েই গেছল—তাও হতে পারে। এই গেল বারে ছুঁচো টমসন—কাপুরুষ টমসন যখন জাত তুলে গাল দিয়েছিল, তখন বিলাসী তার মুখে সত্যিকার লাথী মেরে বেরিয়ে এসেছিল ডিকের সাহায্যে। ডিক তাকে কত লোভ দেখিয়েছে, কত গয়না দিয়েছে, কত শাড়ী দিয়েছে। কিন্তু হাদা মাতালটা যেমন দাঙ্গা করতে মজবুত, তেমন মেয়েমানুষের মন বুঝতে মজবুত মোটেই ছিল না। টমসন আর ডিক একই রক্তের সাদা বাঁদর। রায়তদের যেমন তারা দাদনের লোভ দেখিয়ে শেষে যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করে, দেশের মেয়েমানুষদেরও তেমনি টাকার লোভ দেখিয়ে ওরা জাত কুলমান হরণ করে থাকে।

বিলাসী ঘাস ছেঁড়ে, ঘাস চিবোয়, কাঁধে লাগায় [illegible] ভাবে। বিলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ক্লান্ত আর অবসন্ন দেহ [illegible] হয়ে আসে। কখন যে ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না।

ঘুম যখন ভাঙ্গে, তখন দেখে দিন হয়ে গেছে। [illegible] রগড়ে দেখে মাথা অনেকটা পাতলা বোধ হচ্ছে। কাঁধের [illegible] আছে খুবই, কিন্তু মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। কেশব [illegible] কুঠীর পথ আর সে ধরল না। ভিন্ন পথে আবুরি কুঠীতে [illegible] বললে উঠ্‌ল। হঠাৎ মনে হ'ল, ডিকের গোড়া আনন্দ [illegible] দুপুরে পথে দেখে যদি নতুন হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়! কিন্তু [illegible] করা যাবে!

বার বার মনে পড়ে যায় গোপালের মুখখানা। [illegible] বার বুঁকে পড়ে ডেকেছিল—"মা, ও মা!" সে ডাক তার কানে [illegible] ভাসছে [illegible]। বিলাসী মনে মনে ধ্যান করে তার গোপালের [illegible] ফিরিয়ে ফিরিয়ে নাড়ে-চাড়ে তার নোয়া আর [illegible] কৌটো [illegible] আর মাঠের আল ধরে ধরে চলে। সাত পোয়া [illegible] কথা নয় ত!
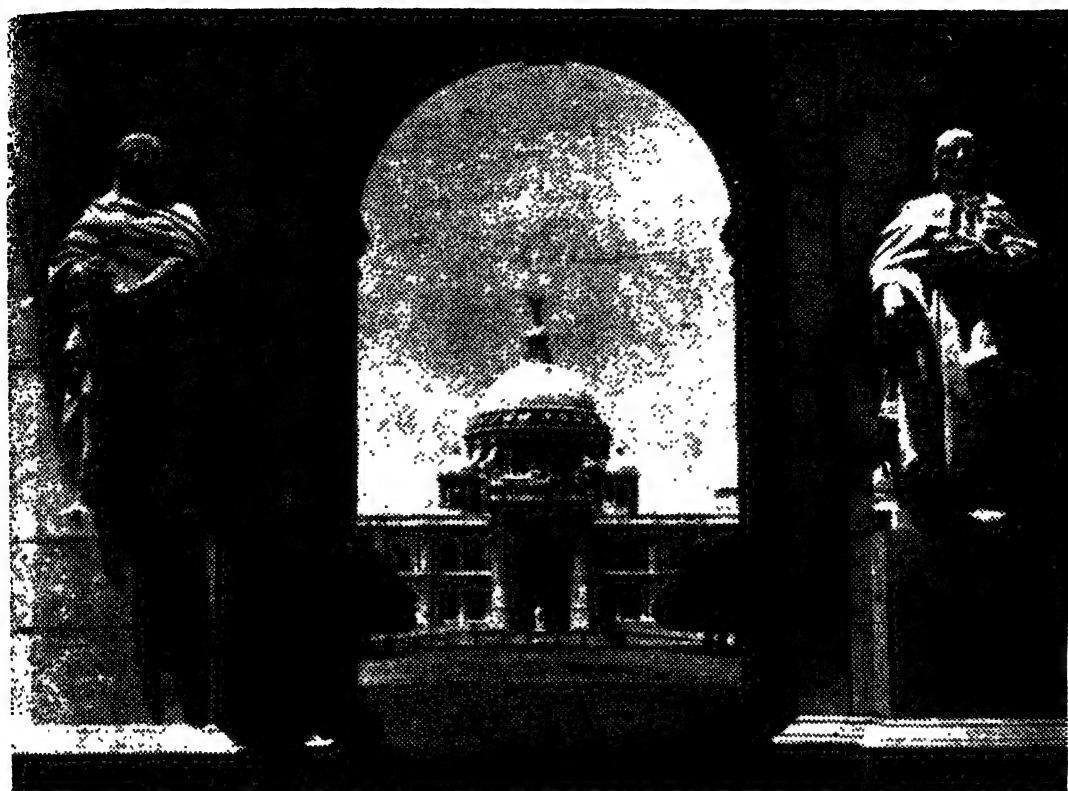
মানুষের সৃষ্টি (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল) —গণেশচন্দ্র দাস

রত্নাকরের সৃষ্টি
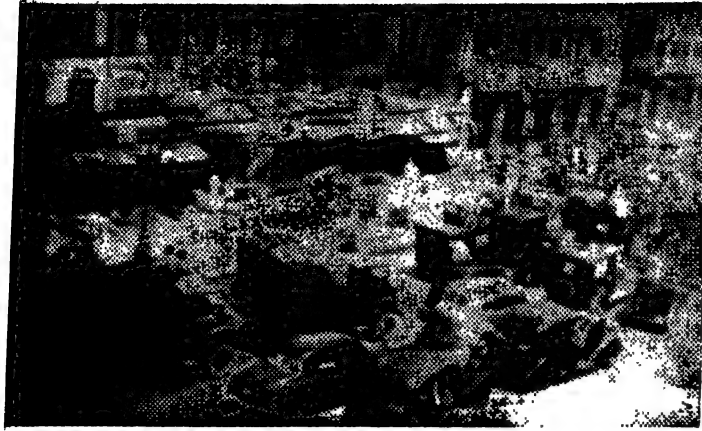
—রণজিৎকুমার ঘোষ

—ইন্দিরা দেবী

—শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

শ হ র ক ল কা তা

—বাদলকুমার দে

—গোপালচন্দ্র ...ষাল

মালিনী —সরোজ মুখোপাধ্যায়

—শ্রীকান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তা ব্যক্তি —সুধীরেন্দ্র সান্যাল

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
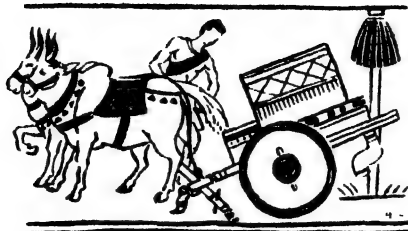
ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থা

শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাজপথ

আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থার সম্যক্ উন্নতি না হইলে কোন দেশেই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না এবং সেই কারণেই পরিবহন-ব্যবস্থাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। যে দেশের পরিবহন-ব্যবস্থা যে পরিমাণে উন্নত ও সুপরিকল্পিত, সেই দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদও সেই পরিমাণে সুদৃঢ় ও সবল হইয়া থাকে। পরিবহন-ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির জন্যই বর্ত্তমান যুগের শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

প্রাচীন কালে প্রধানতঃ স্থলপথে ও সম্ভাব্য স্থলে জলপথে পরিবহন-কার্য্য সম্পন্ন হইত, কিন্তু আধুনিক যুগে ইহা ব্যতীত বিমান-পথেও পরিবহন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থলপথে পরিবহন-ব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত—রাস্তা ও রেলপথ। দ্রুত পরিবহন-কার্য্যে রেলপথ অধিকতর সুবিধাজনক হইলেও জাতীয় জীবনে রাস্তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অন্য দুইটি পথ অপেক্ষা যে কোন ক্রমে কম নহে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। শিরা ও ধমনী প্রবাহিত রক্ত যেমন মনুষ্য-দেহকে সরস ও সজীব রাখে, রাস্তাও সেইরূপ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, কৃষি অঞ্চল ও সহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া উহাদিগকে সতেজ ও কর্ম্মচঞ্চল রাখে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ এবং অধিবাসীদিগের শতকরা প্রায় ৯০ জন গ্রামে বাস করে। যে সকল শিল্প ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই এই সকল গ্রাম হইতে বহু দূরে অবস্থিত। রেলপথের বিস্তার দ্বারা এই গ্রামগুলিকে শিল্পাঞ্চল এবং সহরের সহিত সংযুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিভিন্ন স্থানে সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য রাস্তাই যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে না।

প্রাচীন কালে ভারতে উৎকৃষ্ট পাকা রাস্তার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হয় নাই, কারণ তৎকালে প্রত্যেক গ্রাম প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল। সম্রাট অশোক কিম্বা শের সাহের সময়ে যে দুই-একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ সামরিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে ভারতের সহরগুলি যে পরিমাণে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, গ্রামগুলি সেই পরিমাণে শ্রীহীন হইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতের সর্ব্বত্র রাস্তার বিস্তার [illegible] ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে গ্রামগুলি পরস্পরের সহিত এবং নিকটবর্ত্তী সহরের সহিত যুক্ত হইতে পারে। বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে সকল রাস্তা আছে, তাহার প্রায় সমস্তই কাঁচা এবং বর্ষাকালে ইহাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় যে, ইহাদের সাহায্যে গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অন্যত্র প্রেরণ করা দুঃসাধ্য এবং কোন কোন স্থলে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গ্রামের চাষী উৎপন্ন শস্যাদির বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে বঞ্চিত হয়, সহর হইতেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সময় [illegible] গ্রামে পৌঁছিতে পারে না। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে উৎকৃষ্ট রাস্তার অভাবে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্থায়িভাবে বসবাস করিবার ও প্রয়োজন হইলে গ্রামে যাইবার কোন উৎসাহ অনুভব করেন না এবং ইহার ফলে প্রতি বৎসর বহু লোক বিনা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মৃত্যু বরণ করে। এতদ্ভিন্ন [illegible] অনেক জনবহুল গ্রাম আছে, যেখানে উপযুক্ত রাস্তার [illegible] উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। এমন কি, [illegible] পর্য্যন্ত তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। নিরক্ষরতা ইহার পরিণাম। উপযুক্ত রাস্তা থাকিলে এই সমস্ত অভাব দূর [illegible] পারে, পরন্তু বিভিন্ন স্থানে পণ্য দ্রব্যাদির অবাধ চলাচলের [illegible] পারস্পরিক শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান সহজ হয় [illegible] ফলে গ্রামবাসীর আর্থিক ও মানসিক উন্নতিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি [illegible]

ভারতবর্ষ ব্যতীত সভ্য জগতের সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট রাস্তার [illegible] প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি হইয়াছে। ফ্রান্সে এবং [illegible] আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যার হিসাবে উৎকৃষ্ট [illegible] দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৩৪ এবং ২,৫০০ মাইল, কিন্তু তদনুপাতে এ দেশে রাস্তার দৈর্ঘ্য মাত্র ৮১ মাইল। নিম্নে পৃথিবীর [illegible] প্রধান শিল্পোন্নত দেশের রাস্তার দৈর্ঘ্যের সহিত ভারতের [illegible] দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক সমালোচনা প্রদত্ত হইল :—
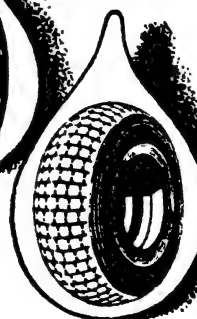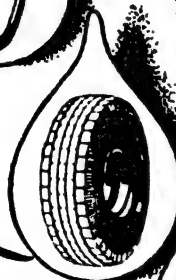
(১) দেশের নাম মোট আয়তন রাস্তার দৈর্ঘ্য

দেশের নাম	মোট আয়তন	রাস্তার দৈর্ঘ্য
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৩,০২৬,০০০ বর্গমাইল	৩,৫০০,০০০ মাই
ভারতবর্ষ	১,৫৭৫,০০০ "	৩৫০,০০০ "
ফ্রান্স	২১২,০০০ "	৩১০,০০০ "
গ্রেট বৃটেন	৮১,০০০ "	২০০,০০০ "

(২)

দেশের নাম	রাস্তার দৈর্ঘ্য (প্রতি ১লক্ষ জনসংখ্যা হিসাবে)	রাস্তার দৈর্ঘ্য (প্রতি বর্গ-মাইল হিসাবে)
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২,৫০০ মাইল	১°০৩ মাইল
ফ্রান্স	১৩৪ "	১°৮৪ "
গ্রেটব্রিটেন	৩১২ "	২°০২ "
ভারতবর্ষ	৮১ "	০°২২ "

ভারতে বর্ত্তমান চারিটি প্রধান রাজপথ আছে। ইহাদের একটি (Grand Trunk Road) কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লী হইয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অপর তিনটি রাজপথ (১) কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, (২) মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই ও (৩) বোম্বাই হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই চারিটি পথের মোট দৈর্ঘ্য ৫০০০ মাইল এবং ইহাদের সাহায্যে প্রধান প্রধান জনাকীর্ণ সহর, শিল্পকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সেতু, সমতা, পর্য্যাপ্ত প্রশস্ততা, পেট্রোল ঘাঁটি, মোটর মেরামতের কারখানা, মোটর গাড়ী রাখিবার স্থান (Garage) প্রভৃতির অভাবে ইহাদিগকে সম্পূর্ণ আধুনিক এবং সম্বৎসরব্যাপী চলাচলের উপযোগী বলা যায় না। নিম্নে যুদ্ধপূর্ব্ব ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার রাস্তার বিবরণ দেওয়া হইল :—

রাস্তার দৈর্ঘ্য (৩১. ৩. ৩১)

পাকা রাস্তা—	৬৩,৭০৬ মাইল
কাঁচা রাস্তা—	২,২০,৪৫৫ "
মোট রাস্তা—	২,৮৪,১৬১ মাইল
সরকারী রাস্তা (P.W.D)—	৩৯,৩১৪ মাইল
স্থানীয় রাস্তা (Local bodies)—	২,৪৪,৭৬৭ "
মোট রাস্তা—	২,৮৪,১৬১ মাইল।

ইহার সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের রাস্তা যোগ করিলে অবিভক্ত ভারতে পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৭৪,০০০ মাইল এবং কাঁচা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ২,৭৬,০০০ মাইল হইবে। এই সকল কাঁচা রাস্তার যদিও কতকগুলি বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী, তথাপি ভারতের বিশাল আয়তনের এবং জনসংখ্যার তুলনায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাস্তার পরিমাণ যে অত্যন্ত শোচনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী বহু পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথাসম্ভব স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত পরিবহন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহার জন্য মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী পর্য্যাপ্ত সংখ্যক উৎকৃষ্ট রাস্তা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক; কারণ, দেশের দূরতম অঞ্চলে রেলপথের বিস্তার সাধন অসম্ভবপর বলিয়া এবং একমাত্র মোটর গাড়ী দ্বারাই দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের উৎপন্ন [illegible] বিক্রয়-কেন্দ্রে এবং রেল-ষ্টেশনে শীঘ্র প্রেরণ করা সম্ভব হয়। [illegible] যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য মোটর গাড়ীর বহুল প্রচলন এবং চলাচলের উপযোগীয় উৎকৃষ্ট রাস্তার প্রয়োজনীয়তা কোন ক্রমে [illegible] করা যায় না।

রাস্তার মাধ্যমে মোটরে পরিবহন-কার্য্য দ্রুততর, উৎকৃষ্ট এবং অধিকতর স্থায়ী ভাবে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কোন পন্থা [illegible] রাস্তার উন্নতি বিধান করা সম্ভব এবং এই সকলের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থাদি কি ভাবে সংগৃহীত হইতে পারে তাহার উপায় নির্ণয় করিবার জন্য ১৯২৭ সালে শ্রীএম, আর, জয়কারের সভাপতিত্বে [illegible] কমিটি (Road Development Committee) [illegible] হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯২৯ সালে গভর্ণমেণ্ট পেট্রোলের আমদানি এবং আবগারী (excise) শুল্ক গ্যালন প্রতি [illegible] আনা হইতে ছয় আনা ধার্য্য করেন এবং এই বর্দ্ধিত শুল্ক হইতে প্রাপ্ত আয় যাহাতে কেবল মাত্র রাস্তার উন্নয়ন-কার্য্যে ব্যয়িত হয় [illegible] রোড ফণ্ড (road fund) নামে একটি নূতন বিভাগ স্থাপন হয়। এই বিভাগের হিসাব হইতে জানা যায় যে, এই আয়ের পরিমাণ বাৎসরিক ১০ কোটি টাকা, কিন্তু মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তার রক্ষা ও মেরামতের ব্যয় আয়ের তুলনায় অতি সামান্য। নিম্নোক্ত ব্যয়ের হিসাব হইতে ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

১৯৩০—৩১	=	৮ কোটি	১৫ লক্ষ টাকা
১৯৩১—৩২	=	৬ "	৩৪ "
১৯৩২—৩৩	=	৫ "	৩৫ "
১৯৩৩—৩৪	=	৫ "	১ "

১৯৩৮—৩৯ সালে মোটরে পরিবহনের আয় ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, কিন্তু রাস্তার রক্ষা ও মেরামতের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে [illegible] প্রয়োজনে মোটর গাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। [illegible] যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করায় এবং ভারত প্রাচ্য [illegible] যুদ্ধ পরিচালনার প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ায় মোটর [illegible] সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তৎসঙ্গে মোটর গাড়ী চলাচলের উপযোগী রাস্তার দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার [illegible] ফলে ১৯৪৪—৪৫ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির [illegible] আয়ের পরিমাণ ১১ কোটি টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১০ [illegible] অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। যুদ্ধ অবসানে সামরিক প্রয়োজনে [illegible] বহু মোটর গাড়ী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারতে মোটর গাড়ীর সঠিক [illegible] জানা যায় নাই সত্য, কিন্তু সম্বৎসর ব্যবহারোপযোগী অনুমান [illegible] ৮০ হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তায় ব্যক্তিগত এবং সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত মোটর গাড়ীর সংখ্যা যদি ২½ হইতে ৫ লক্ষ [illegible] ধরিয়াও লওয়া যায় তাহা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক নহে। [illegible] স্বরূপ বলা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি চারি জনের মধ্যে [illegible] জন, কানাডার প্রতি ৮ জনে এক জন এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে [illegible] ১৮ জনের মধ্যে এক জন মোটর গাড়ী ব্যবহার করে; [illegible] ভারতে প্রতি ২০১৭ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র মোটর গাড়ী ব্যবহার [illegible] করে।

রাস্তার নির্ম্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত সম্পূর্ণ প্রাদেশিক [illegible] ব্যাপার।

...ঃ দুই ভাগে বিভক্ত ; যথা—(১) প্রাদেশিক রাস্তা—পি, ডব্লিউ, ডি,র অধীন ; এবং (২) স্থানীয় রাস্তা ...dies)—ইহা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটির ...টিশ-শাসিত ভারতে ১১৭৪ সালে ২৪৫,৯৩৫ মাইল ... ১৭৮,২৩৩ মাইল স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ (local bodies) ; ...৬৯ মাইল প্রাদেশিক সরকার (P. W. D.) ; ...৪৩৩ মাইল মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ... দেশীয় রাজ্য সহ অবিভক্ত ভারতে বিভিন্ন মিউনিসি... কর্ত্তৃত্বাধীন রাস্তা ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাস্তার ... ছিল ৯৮,২৪০ মাইল এবং ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ...রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২০৪,৯০২ মাইল। ইহাদের ...৩৯০ মাইল রাস্তা মোটর গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত ...গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত উপরোক্ত পরিমাণ রাস্তার ...৭৪ মাইল সম্বৎসরব্যাপী এবং অবশিষ্ট ১৫,৩১৬ মাইল ... ঋতুতে ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল।

... মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে রাস্তা নির্ম্মাণ ও তাহার উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য "Reconstruction Committee of Council on Planning" নামক একটি কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটি যে সকল সুপারিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

... উন্নতির জন্য রেলপথ ও রাস্তার মধ্যে সহযোগিতা থাকা আবশ্যক এবং এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে একটি কেন্দ্রীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি স্থাপন করিতে হইবে।
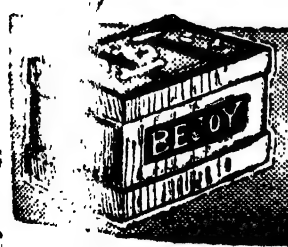
(২) সকল শ্রেণীর রাস্তার উন্নয়ন-কার্য্য সমভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য রাস্তাগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য ; যথা (ক) কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারী পথ (National highways), (খ) প্রাদেশিক বা দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত পথ, (গ) জেলা—মহকুমার অভ্যন্তরস্থ পথ, এবং (ঘ) পল্লীর পথ।

(৩) কেন্দ্রীয় রাজপথ প্রাদেশিক রাজধানীগুলিকে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহের সহিত সংযুক্ত করিবে। এই রাজপথগুলির উপর দিয়া চলাচল ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় রাস্তা নির্ম্মাণ সমিতির (Central Road Board) মাধ্যমে ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং রাস্তাগুলির সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবে।

(৪) অন্যান্য তিন শ্রেণীর রাস্তার উন্নয়ন-কার্য্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে। এই রাস্তাগুলি বিভিন্ন গ্রামগুলিকে ব্যবসায়-কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিবে। এই সকল রাস্তায় বড় বড় সেতু নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিবে।

(৫) উৎকৃষ্ট ধরণের রাস্তার মাধ্যমে পরিবহন-ব্যবস্থার অসঙ্গত প্রতিযোগিতা এবং পণ্য-চলাচলে অসম্ভব চাপ (overcrowding)
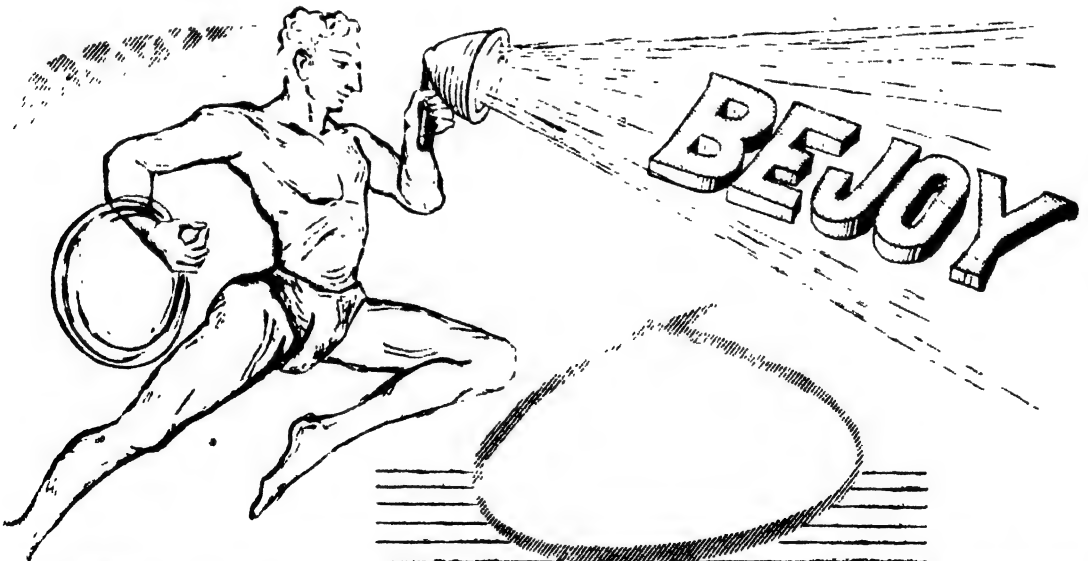
[illegible] করিবার জন্ত গ্রামের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) মোটর গাড়ীর কর-ভার (Motor Vehicle Tax) সর্ব্বক্ষেত্রে সমান (uniform) হইবে এবং রবারের চক্রযুক্ত যানের যাহাতে বহুল প্রচলন হয়, তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(৭) রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া ইহার সহিত মোটর পথের সহযোগশীল সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

(৮) রাস্তার সংস্কার, সংরক্ষণ এবং নিৰ্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দেশের অভ্যন্তরেই প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৯৪৩ সালে নাগপুরে প্রাদেশিক সরকারগুলির ও দেশীয় রাজ্যগুলির ইঞ্জিনীয়ারদিগের যে বৈঠক হয়, তাহাতে তৎকালীন রাস্তাগুলির উন্নতি বিধান করা এবং অধিকন্তু ১ লক্ষ মাইল নূতন রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তাঁহারা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই উদ্দেশ্য সফল হইলে নিৰ্ম্মাণ ও মেরামতের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াও রাস্তা হইতে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইবে। নাগপুর বৈঠকের পরিকল্পনায় ইহা অনুমান করা হইয়াছিল যে, পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৯০ হাজার মাইলকে বর্দ্ধিত করিয়া ১ লক্ষ ৪৭ হাজার মাইলে এবং ১ লক্ষ ৬৩ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তাকে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার মাইলে পরিণত করিতে আনুমানিক ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতা বশতঃ এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করা অদ্যাপি সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে, আগামী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই খাতে বার্ষিক ২৩½ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দ করা সম্ভব হইবে না। ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের অন্তর্গত দেশগুলিতে রাস্তা হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে সরকার শতকরা ৯ ভাগ এই খাতে ব্যয় করে, কিন্তু ভারতে এই আয়ের শতকরা ৩ ভাগ মাত্র ব্যয়িত হয়। ইহার কারণ কি, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। ১৯৩৯ সালে ভারতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১,৪৪,০০০ ছিল এবং ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি ১,৭৯,০০০এ পরিণত হয়। মোটর গাড়ীর উপর প্রবর্ত্তিত বিভিন্ন প্রকারের কর হইতে ১৯৪৮ সালে যে আয় হয়, তাহার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮ কোটি টাকা, কিন্তু রাস্তার মেরামত ও অন্যান্য খরচের মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ১৪ কোটি টাকা। সুতরাং নূতন নূতন রাস্তা নিৰ্ম্মাণ, উন্নতি ও মেরামতের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যের কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে যখন রাস্তা হইতে প্রভূত আয় তদ্দেশীয় গভর্ণমেন্টের সবিশেষ লাভজনক হইয়াছে, তখন ভারতের পক্ষে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে বৎসরে রাস্তা নিৰ্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য ব্যয়িত প্রতি ১০০ টাকা হইতে ২৭৭ টাকা আয় হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, তৎকালে ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর গাড়ীর সংখ্যা ছিল ২,৬৬,৪২৯ এবং প্রতি মোটর গাড়ী হইতে নানাবিধ কর বাবদ বৎসরে প্রায় ১ হাজার টাকা আয় হয়; সুতরাং ১৯৪৯—৫০ সালে রাস্তা হইতে ন্যূন পক্ষে ২৬,৬৪,২৯,০০০ টাকা আয় হইবার আশা আছে। সুতরাং রেলপথের ন্যায় রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করি[illegible] ইহা হইতে কেবল মাত্র মোটর গাড়ী দ্বারা রাজস্ব হিসাবে ৭½ কোটি টাকা আয় হইবে।

এতাদৃশ সন্তোষজনক আয় হইলেও ভারত সরকার [illegible]াপি রাস্তার প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দেন নাই। ভারতে [illegible] কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি [illegible] করিতে হইলে সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মোটর [illegible] উপযোগী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বহু নূতন রাস্তার নিৰ্ম্মা[illegible] আবশ্যক এবং এই উদ্দেশ্যে আয়ের শতকরা মাত্র ৩ [illegible] যে নিতান্ত নগণ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সরকা[illegible] পক্ষ হইতে হয়ত এ কথা বলা হইবে যে, বর্ত্তমানে রাস্তা হইতে [illegible] হয়, প্রয়োজনীয় সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা নূতন রাস্তা নিৰ্ম্মাণের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভবপর নহে। [illegible] কথা সত্য যে, বর্ত্তমানে মাত্র মোটর গাড়ী ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় [illegible] উপর ধার্য্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর হইতেই যাহা কিছু অর্থাগম [illegible] গ্রাম্য অঞ্চলের গরু বা মহিষের শকট বা রাস্তায় চলাচলকারী [illegible] কোন যান হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কর আদায় করা [illegible] দেশীয় রাজ্যগুলি বাদ দিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি-রাজস্ব [illegible] বাৎসরিক ২৫ কোটি আয় হয়, এবং যদি পথকর বা "রোড সেস" বাবদ টাকা প্রতি দুই আনা ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে [illegible]রিক প্রায় তিন কোটি টাকা অধিক আয় হইতে পারে। নাগপুর [illegible] ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাম্য রাস্তাগুলির উন্নয়ন এবং সম্বৎসর [illegible]পযোগী করিতে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া [illegible] করা হইয়াছিল। সুতরাং 'রোড সেস' হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করিতে ১৫।২০ বৎসর সময় লাগিতে পারে। অধিকন্তু রাস্তার উন্নতি হইলে তৎসন্নিকটস্থ ভূমির মূল্যও যথাসম্ভব বৃদ্ধি পায় এবং ইহা দ্বারাও গভর্ণমেন্টের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অন্যান্য প্রগ[illegible] দেশে উৎকৃষ্ট রাস্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন তদ্দেশীয় [illegible]র্ণমেন্ট নিঃসন্দেহ হইয়া তাহার সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় [illegible] বিভিন্ন পন্থা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন ভার[illegible]র্ণমেন্ট কেন যে সে বিষয়ে অসমর্থ হইবে তাহা বুঝা যায় না।

ভারত বিভাগের পর পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, পশ্চিম-বঙ্গ ও আসা[illegible] প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা [illegible] তিনটি প্রদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নূতন নূতন রাস্তার নিৰ্ম্মাণ, [illegible] রাস্তাগুলির সংস্কার এবং চতুর্দ্দিকে বহু রাস্তা[illegible] বর্ত্তমান কালে অধিকতর প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে [illegible] সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা আশু কর্ত্তব্য, এ কথা সক[illegible] করিবেন এবং অযথা বিলম্বের জন্য এই তিনটি প্রদেশের—ভারতের—নিরাপত্তা যে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে [illegible] চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই একমত হইবেন। দেশরক্ষা [illegible] অর্থ বরাদ্দ করা আছে তাহা হইতেও অন্ততঃ এই তিন[illegible] রাস্তা নিৰ্ম্মাণের ব্যয়-ভার বহন করা উচিত। রাস্তা সম্বন্ধে [illegible] যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় আছেন এ কথা অবশ্য বলা চলে না। [illegible] প্রদেশে ১০ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৮০৩ মাইল [illegible] এবং ৬২টি সেতু নিৰ্ম্মাণের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্[illegible]

...। ইতিমধ্যে ২১টি রাস্তা, একটি বৃহৎ ... ও তিনটি পদব্রজে চলাচলোপযোগী সেতুর ... কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ... রাস্তা ও কতকগুলি সেতু নির্ম্মাণের প্র...জনীয় জরীপ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এ... আরও ২১৮টি রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১টি রাস্তার নির্ম্মাণ-কার্য্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের ছয়টি প্রধান রাজপথের নির্ম্মাণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যয়-ভার বহন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। জমি দখল করিয়া এই কেন্দ্রীয় রাজপথগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু কিছু কাল পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে একমাত্র দক্ষিণ-ভারতের রাস্তার উন্নয়নকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং এ বিষয়ে মাদ্রাজ সরকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রদেশের মধ্যে ১৭,৮৬১ মাইল রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য পঞ্চবিংশতি বার্ষিক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজ সরকার ১৯৪৭ সাল হইতেই এই পরিকল্পনা যাহাতে অতি দ্রুত কার্য্যকরী হয় তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পার্শ্বে এই পরিকল্পনার একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

মাদ্রাজ সরকার রাস্তার উন্নয়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করিয়া প্রদেশের অভ্য... গুরুত্বপূর্ণ প্রধান রাস্তা এবং ১৫ হাজার মাইল অন্যান্য শ্রেণীর রাস্তার কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্-ব্যতীত নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় রাজপথগুলিরও উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ভার মাদ্রাজ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, যথা :—

১। মাদ্রাজ—কলিকাতা।
২। ভিজাগাপটম্—রায়পুর।
৩। বেজওয়াদা—হায়দ্রাবাদ—পুণা।
৪। মাদ্রাজ—বোম্বাই।
৫। মাদ্রাজ—ডিণ্ডিগুল।
৬। কাশী হইতে বাঙ্গালোরের মধ্য দিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ।
৭। মাদুরা—রামেশ্বরম।
৮। সালেম—কোচিন।
এবং ৯। রাণীপেট—কৃষ্ণগিরি।

রাস্তার শ্রেণী বিভাগ	বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য (মাইল)	প্রস্তাবিত অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য (মাইল)	মোট দৈর্ঘ্য (মাইল)	আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকা)
(১) জাতীয় বা কেন্দ্রীয় রাজপথ— ইহার অন্তর্গত প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি প্রদেশের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া বিভিন্ন বন্দর, প্রাদেশিক ও বড় বড় দেশীয় রাজ্যের রাজধানীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন করিবে। অধিকন্তু দেশরক্ষার জন্য এই সকল পথ সমর-বিভাগের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে	২,০৩১	২১	২,০৬০	৮.৫০
(২) প্রাদেশিক রাজপথ— জাতীয় রাজপথ এবং জিলার গুরুত্বপূর্ণ সহর সমূহের সহিত সংযোগ-সাধনকারী অন্যান্য প্রধান প্রধান রাস্তা ইহার অন্তর্গত	৩,০৬১	১৯	৩,০৮৮	৬.৫৫
(৩) জিলাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন রাস্তা— প্রত্যেক সহর হইতে উৎপাদন অঞ্চলের এবং ঘন বসতিপূর্ণ গ্রামের সহিত সংযোগকারী রাস্তা ইহার অন্তর্গত	২৩,০২৩	৫,০১৫	৮২,০৩৮	৩৯.৩০
(৪) গ্রাম্য রাস্তা (লোকাল বোর্ডের অধীনে)— পাঁচ শতের অধিক লোকবিশিষ্ট গ্রামগুলির সহিত নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামগুলির যোগাযোগ স্থাপনকারী রাস্তা। এই রাস্তাগুলি সম্ভব হইলে নিকটবর্ত্তী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা, রেলপথ অথবা নদী-ঘাটের সহিত মিলিত হইবে	৮,৮২২	১২,৮০৬	২১,৬২৮	১৩.২৫
মোট—	৩৬,৯৫৩	১৭,৮৬১	৫৪,৮১৪	৬৭.৬০

নাগপুর পরিকল্পনায় প্রত্যেক প্রদেশের জন্য সমশ্রেণীর রাস্তার একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য্য করা হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে যে এই পরিকল্পনা আশাতীত সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে।

(১) নাগপুর পরিকল্পনায় জাতীয় ও প্রাদেশিক রাজপথের এবং গুরুত্বপূর্ণ জিলা-পথের দৈর্ঘ্য ২১,৬০০ মাইল ধার্য্য করা হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে এই শ্রেণীর রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য বর্ত্তমানে ২১,২০০ মাইল। এতদ্ব্যতীত এই প্রকার রাজপথকে আরও ১৫০ মাইল বর্দ্ধিত করিবার পরিকল্পনা আছে এবং ইহা সম্পূর্ণ হইলে এই প্রদেশে নাগপুর পরিকল্পনা

অপেক্ষা এই শ্রেণীর রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল অধিক বৃদ্ধি পাইবে।

(২) অন্যান্য প্রদেশে সমতল পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ১০,০০০ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এই প্রদেশের বর্ত্তমান পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ২৫,০০০ মাইল।

(৩) নাগপুর পরিকল্পনায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীন রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ২৫,২০০ মাইল হওয়া উচিত বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই প্রদেশে এই জাতীয় রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ১৬,০০০ মাইল। পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও ১৭,০০০ মাইল রাস্তার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে এই জাতীয় রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হইবে ৩৩,০০০ মাইল অর্থাৎ নির্দ্ধারিত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা এই শ্রেণীর রাস্তার দৈর্ঘ্য ৮,০০০ মাইল অধিক হইবে।

(৪) এই সকল রাস্তা ব্যতীত মাদ্রাজ কর্পোরেশন, প্রাদেশিক মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আরও ২,০০০ মাইল দীর্ঘ পথ রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে বিহার প্রদেশে রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩১,৪১৬ মাইল। রাস্তার জন্য বিহার গভর্ণমেণ্ট তিন বৎসরের মধ্যে ১৮ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই তিন ব[illegible]রের মধ্যে ৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,১৭৫ মাইল প্রা[illegible]শিক রাজপথ, ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭২৬ মাইল সহরের বড় রাস্তা এবং ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১৮ মাইল গ্রাম[illegible] রাস্তা নির্ম্মাণ করাই বিহার গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক যে রাজপথের কথাই বিবেচনা করা হউক না কেন, ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য যে [illegible] নগণ্য এবং অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা অস্বীকার [illegible] যায় না। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে অধিকাংশ রাস্তাই ধূলায় [illegible]পূর্ণ, এবং ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী লৌহচক্রবিশিষ্ট গরু এবং মহিষের গাড়ী, নিরেট রবারের চক্রযুক্ত গুরুভার বহনকারী মোটর যান এবং সর্ব্বোপরি ডিষ্ট্রিক্ট এবং লোকাল বোর্ডের ঔদাসীন্য। যত দিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় রাস্তা সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতের রাস্তার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতির আশা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রকৃতই রাস্তার উন্নতি করিতে ইচ্ছুক হন তবে নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইলে সন্তোষজনক ফল লাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

(১) প্রথমেই একটি শক্তিশালী এবং স্বাধীন সত্তাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় রাস্তা নির্ম্মাণ সমিতি (Central Road Board) স্থাপন করা আবশ্যক। যাবতীয় রাস্তার নির্ম্মাণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যাপারে এই সমিতির মতামত এবং পরিকল্পনা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়া যাহাতে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় তৎপ্রতি য[illegible] হইতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, ভারতে [illegible]নে রাস্তা সম্বন্ধে শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ইঞ্জি[illegible]নিয়ারদিগের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। [illegible] ভারতীয় রাস্তার সমস্যা সমা[illegible] করিতে হইলে কেবল মাত্র এই কার্য্যের [illegible] বহু ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিতে [illegible] তাঁহারা পূর্ত্ত-কার্য্য, সেচ-কার্য্য, দৈন[illegible] হিসাব প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্য [illegible] নিষ্কৃতি পাইয়া কেবল মাত্র রাস্তা নির্ম্মা[illegible] তাহার উন্নয়নের প্রতি একাগ্র ভা[illegible] মনোযোগী হইতে পারেন। এরূপ [illegible] তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত শক্তি এই [illegible] কাজেই নিয়োগ করিতে পারিবেন। [illegible] এই শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারের অভাব [illegible] বিদেশ হইতে সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ আ[illegible] করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে [illegible] এবং ভবিষ্যতের জন্য এই স[illegible] বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ভারতীয়দিগকে শি[illegible] করিতে হইবে।

ইচ্ছামত্যায়ী মোটর এবং বিমান হিসাবে ব্যবহার করা চলবে

তৃতীয়তঃ, রাস্তায় চলাচল এবং লৌহ চক্রযানের সমস্যা বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সর্ক্তএ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। বর্ত্তমান রাস্তাগুলির দ্রুত পথে লৌহচক্রযুক্ত গো-শকট প্রধান বাধা, তাহাতে কোন নাই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্যাদির পরিবহনের জন্য গো-মহিষাদি বাহিত শকট আপাততঃ বর্জ্জন না করিয়াও যদি লৌহচক্রের পরিবর্ত্তে রবারের টায়ার ও টিউবযুক্ত চক্রের প্রচলন করা যায় তাহা হইলে কেবল মাত্র যে রাস্তার দ্রুত ক্ষয় নিবারিত তাহা নহে, পরন্তু পুনঃ পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হ্রাস বৎসরে কোটি কোটি টাকার অপচয় নিবারিত হইবে। রবার-চক্রের প্রবর্ত্তনে শকটের মালিকেরাও আর্থিক লাভবান হইবে।

এতদ্ভিন্ন আর্থিক সাহায্য সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিতে হইবে। রাস্তার মাধ্যমে পরিবহন-ব্যবস্থা হইতে অর্থাৎ মোটর যান, পেট্রোল প্রভৃতির আমদানি ও অন্যান্য নানাবিধ শুল্ক হইতে গভর্ণমেণ্টের যে আয় হয় তাহা রাস্তা নির্ম্মাণ ও উন্নয়নের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। আয়ের স্বল্পতা প্রকৃত বাধা বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কি প্রকারে এই আয় পরিকল্পনানুযায়ী রাস্তার দ্রুত বিস্তার ও উন্নতির জন্য এবং সুষ্ঠু ভাবে ব্যয় করা যায় তাহার সঠিক উপায় নির্ণয় করাই সমস্যা।

সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজপথগুলির বিস্তার ও উন্নতি সাধন যেমন প্রয়োজন, গ্রাম্য রাস্তা সম্বন্ধে আশু কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিয়া ইহার দ্রুত বিস্তার ও উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করা সেইরূপ আবশ্যক। বর্ষাকালে গ্রাম্য রাস্তার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ ধারণা করিতে পারিবে না। বর্ষাকালে গ্রাম্য রাস্তাগুলি এরূপ কর্দ্দমাক্ত হয় যে, তাহার উপর দিয়া মাল-বোঝাই গরু ও মহিষের গাড়ী চলাচল করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, গাড়ী ...কে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাদায় আবদ্ধ গাড়ীর ...মুক্ত করিতে হয়। রাস্তার অবস্থা অনুকূল না থাকায়, গো-ম... বাহিত গাড়ীগুলি অসমতল এবং আঁকা-বাঁকা পথের উপর ...বেশি মাল লইয়া চলিতে পারে না। কিন্তু রাস্তার অবস্থা ... হইলে এই সকল পশু-বাহিত যান বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক ... বহন করিতে পারিবে, গো-মহিষাদির স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, ... বাহিত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামবাসীদের আর্থিক ... ও মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাইবে।

... অসঙ্গতি হেতু গ্রাম্য রাস্তার উন্নয়ন বর্ত্তমানে সময়সাপেক্ষ হইতে ... গ্রামবাসীরা অপরের সাহায্যের প্রত্যাশায় অপেক্ষা না করিয়া ... রাস্তার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে অবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতে ... নিজ গৃহ অথবা গ্রাম্য মন্দিরের প্রতি তাহাদের যে মমত্ববো... আছে সেই মমত্ববোধে যদি তাহারা গ্রাম্য রাস্তাকে নিজের ... বলিয়া অনুভব করিতে পারে তাহা হইলেই ইহার সুফল পাওয়া যাইতে পারে। বর্ষার পূর্ব্বে গ্রামবাসিগণ উদ্যোগী ... যদি কয়েক ঝুড়ি মাটি দ্বারা রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি পূর্ণ করেন এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ নালা পরিষ্কার করিয়া রাখেন তাহা হইলে বর্ষার জলে ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। ইহাতে প্রতি বৎসর মেরামতের ব্যয়ও হ্রাস পায় এবং রাস্তাগুলিও চলাচলের উপযোগী থাকে। এই প্রকার স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তি গ্রামবাসীদের মনে সঞ্চারিত করিতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে: "রাস্তা তোমাদের নিজস্ব সম্পত্তি, ইহার রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার তোমরা স্বহস্তে গ্রহণ কর"—এই বাণী প্রচার করিয়া গ্রাম্য রাস্তার প্রতি মমত্ববোধ তাহাদের মনে বদ্ধমূল করাই সামগ্রিক ভাবে এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম্য রাস্তা উন্নয়ন সমিতি (Village Road Committee) স্থাপন করা আবশ্যক।

ভারতে রাস্তার উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে আমাদিগকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে; যথা—বৃষ্টি-বহুল আবহাওয়া, অশিক্ষিত শ্রমিক, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব, অসাধু এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন কনট্রাক্টর এবং সর্ব্বোপরি সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা। কিন্তু ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে আমাদিগকে এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে।

ছোটদের মোটর গাড়ী

ছেলেকে মোটর চালান শেখাবার জন্য আমেরিকার ওকলা প্রদেশের টিকাগো নামক স্থানের মিঃ এল, এস, রবিনস এই গাড়ী তৈরী করেছেন। প্রমাণ গাড়ীর মত এর সবই আছে তবে সবই ক্ষুদ্রাকারের। এতে দেড় অশ্ব-শক্তির একটি এঞ্জিন লাগান আছে
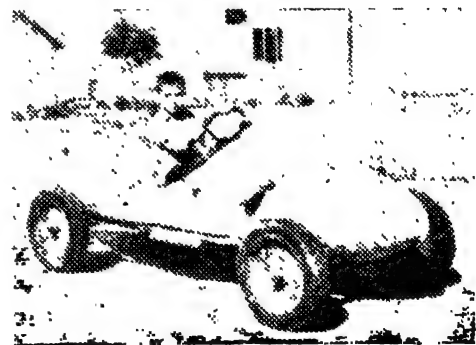
ছোটদের মোটর গাড়ী

আর এর সর্ব্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৫ মাইল। চালকদের মোটর চালান শেখার পক্ষে খুব উপযোগী। কিন্তু এই গাড়ী চালানোর জন্য আলাদা পথ তৈরী করা দরকার, নইলে যে পথ দিয়ে বালকরা এই গাড়ী চালাবে, সেই পথ দিয়ে চলা নিরাপদ নয়।

'ব্যালে' বা নৃত্যনাট্য

প্রসাদ রায়

দেশে এখন যখন-তখন নৃত্যনাট্যের আয়োজন হয়। ভারতবর্ষে নৃত্যনাট্য অবশ্য নতুন জিনিষ নয়। প্রাচীন কালেও এখানে নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হ'ত। কিন্তু আজকাল নৃত্যনাট্য বলতে আমরা বুঝি 'ব্যালে' (ballet)। ওটি হচ্ছে ফরাসী শব্দ, এখন ইংরেজী ভাষাতেও গৃহীত হয়েছে। ঐ ব্যালে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা আছে ব'লে মনে হয় না।

নৃত্য এবং নৃত্যনাট্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই : নৃত্যের জন্ম মানুষ যখন সভ্য হয়নি সেই আদিম কালে। কিন্তু মানুষ নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা করেছে সভ্য হবার পরেই। খুব সম্ভব প্রাগৈতিহাসিক যুগেও নৃত্যনাট্যের প্রচলন ছিল।

আবার নৃত্যনাট্য এবং ব্যালের মধ্যেও পার্থক্য বড় অল্প নয়। প্রথমে নৃত্যনাট্যের অর্থের কথাই ধরুন। নৃত্যনাট্য কি? যে নাচের সাহায্যে একটি গল্প বলবার চেষ্টা করা হয়। এক জন মাত্র নর্তকও এমন গল্প বলতে পারেন। কিন্তু ব্যালের মধ্যে এক জন মাত্র নর্তক থাকে না। ব্যালে হচ্ছে কয়েক জন নর্তকের নৃত্য।

ভারতবর্ষে নানা দেশে এমন সব নৃত্যনাট্যের চলন আছে, যার জন্যে ভূমিকা গ্রহণ করে বহু নর্তক। যেমন 'কথাকলি', 'মণিপুরী' ও সেরাইকেলার 'ছউ' প্রভৃতি নৃত্য। এই সব নাচে নর্তকরা বিশেষ বিশেষ মুদ্রা বা ভঙ্গি বা অঙ্গ-কিছুর সাহায্যে এক-একটি গল্প বলবার চেষ্টা করেন, সেগুলিকে আমরা নৃত্যনাট্য বলতে পারি, কিন্তু ব্যালে বলতে পারি না। কেন পারি না, পরে তা স্পষ্ট ক'রে বলবার চেষ্টা করব।

অতঃপর ব্যালের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে রাখি। য়ুরোপীয় ব্যালের পূর্ব্ব-রূপ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু রেনেসাঁসের যুগে ব্যালে ছিল রাজপ্রাসাদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এবং ইতালীর নিজস্ব সম্পত্তি। রাজা-রাজড়াদের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ব্যালের নর্তকরা নৃত্যাভিনয়ে যোগদান করত। তখন এর মধ্যে (ভারতের 'কথাকলি' ও 'ছউ' নাচের মত) নারীর স্থান ছিল না।

ইতালীতে ক্রমে অপেরা এসে ব্যালের স্থান গ্রহণ করে এবং ব্যালে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে ফরাসী দেশে। তখন ফ্রান্সের রাজা ও অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিরাও এই শ্রেণীর নৃত্যে যোগ দিয়ে অবসর রঞ্জন করতেন। ব্যালের বিষয়-বস্তু সাধারণত নেওয়া হ'ত পৌরাণিক আখ্যায়িকা থেকে। লুলি (১৬৩৩—৮৭ খৃঃ) নামে এক ভদ্র- [illegible] দিতে সুরু করেন এবং তিনিই প্রথমে কমেডি ও ট্রাজেডি—দুই রকম নৃত্যনা[illegible] রচনা করেন। ক্রমে ব্যালের ভিতর থেকে পুরুষ-নর্তকরা একেবা[illegible] স'রে দাঁড়ান এবং এটি হয়ে ওঠে এক রকম নারীদে[illegible] নৃত্য। ইংলণ্ডে ব্যালের আবির্ভাব হয় অষ্টাদশ শতাব্দী[illegible] এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে তার জনপ্রিয়তা ওঠে চরমে।

কিন্তু তার পরই ব্যালের অবনতি আরম্ভ হয়। যে-সব [illegible] নর্তকীদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ব্যালের আদর্শকে উচ্চতম স্তরে উন্নী[illegible] করেছিল, তাঁদের মৃত্যু হয় একে একে। কিন্তু তাঁদের অভাব পূরণ করতে পারে এমন সব শিল্পী আর আত্মপ্রকাশ করলেন না। পুরুষ-নর্তক হ'ল দুর্লভ এবং যে-সব নর্তকী ব্যালেকে অবলম্বন করলে তাদের চরিত্রই কেবল সন্দেহজনক নয়, শিল্পী হিসাবেও তারা রীতিমত নিম্ন শ্রেণীর। ব্যালের দর্শকের দলও [illegible] ক'রে তুলতে লাগল যত সব বখাটে ও বিলাসী যুবক। তার পর পঙ্ক-শয্যা থেকে ব্যালেকে আবার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন রুশ দেশের নৃত্য-শিল্পীরা। আধুনিক ব্যালে বলতে এক রকম রুশীয় ব্যালে বুঝায়, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। [illegible] য়ুরোপ-আমেরিকার সব দেশই গ্রহণ করেছে রুশীয় ব্যালেরই আদর্শ।

ফ্রান্স থেকেই ব্যালে যায় রুশিয়ায়। সামাজিক [illegible] ব্যবহারে, সাহিত্যে ও শিল্পে পশ্চাৎপদ রুশিয়াকে দক্ষিণ[illegible] আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলবার জন্যে পিটার দি গ্রেট [illegible] চেষ্টা করে গিয়েছেন। ব্যালের দিকেও তিনি দৃষ্টিপাত [illegible] ভোলেননি। তাঁর পর সম্রাজ্ঞী আন, এলিজাবেথ ও ক্যাথা[illegible] গ্রেট এবং অন্যান্য সম্রাটরাও ব্যালের উন্নতির জন্যে যথেষ্ট [illegible] করে গিয়েছেন। আধুনিক যুগে রুশদের এই শ্রেণীর নৃত্যে যাঁরা [illegible] ক'রে তুলেছেন, তাঁরা সকলেই বিদেশী। মোরিয়াস পেতিপা [illegible] ফরাসী, গস্টেভ জোহানসেন দিনেমার এবং এন্‌রিকো শেচেটি [illegible] প্রথম যুগেও ব্যালের আর্টে রুশদের পোক্ত ক'রে তোল[illegible] জন্য নৃত্যাচার্য্য আনানো হ'ত ফরাসী প্রভৃতি দেশ থেকেই। [illegible] কিন্তু রুশ নৃত্য-প্রতিভারই প্রভাব পড়েছে প্রতীচ্যের অন্যান্য দেশে [illegible] পরে। আগে যে ছিল ছাত্র, এখন সে হয়েছে শিক্ষক।

এটা সম্ভবপর হয়েছে তিন ব্যক্তির শক্তি ও ব্যক্তিত্বে[illegible] প্রথম হচ্ছেন নর্তক, চিত্রকর ও সঙ্গীতবিদ্ মাইকেল [illegible] দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম আলেকজাণ্ডার বিনোয়িজ, তিনি [illegible] কেবল চিত্রকর নন, ললিতকলা ও সাহিত্যের প্রত্যেক বিভা[illegible] তাঁর [illegible] দর্পণে। তৃতীয়, কিন্তু খ্যাতির দিক দিয়ে প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন

...লোভিচ ডায়াঘিলেফ। তিনি চিত্রকরও নন, সঙ্গীতবিদও ন... ...ও নন; কিন্তু এমনই ছিল তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ যে, ... আধুনিক রুশীয় ব্যালে একটা নির্দ্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ রূপ ... ছিল তাঁরই পরিকল্পনার মধ্যে।

...ঘিলেফের জন্ম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ... যৌবন থেকেই সাহিত্য ও চারুকলার অনুরাগী। তাঁর ...কটি ... হচ্ছে, আর্টের প্রধান কর্ত্তব্য আনন্দ দান করা এবং তার ...কমাত্র সহায়, সৌন্দর্য্য। আর্টের অস্তিত্ব কেবল আর্টের জন্যেই, শিক্ষা দেওয়া তার ব্রত নয়।

এই সময়ে মস্কো সহরে এক জন ধনী কারখানাওয়ালা ছিলেন, তাঁর নাম ম্যামনটভ। তাঁর নাট্যানুরাগও ছিল যথেষ্ট। প্রথম প্রথম তিনি সৌখীন নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন, তার পর স্থাপন করেন একটি সাধারণ রঙ্গালয়। সেখানে প্রধানত গীতিনাট্যেরই অভিনয় হ'ত। কিন্তু সে রঙ্গালয় অভিনয় ও শ্রেষ্ঠ নট-নটীর জন্যে বিখ্যাত ছিল না, তার প্রধান আকর্ষণ ছিল সপটু পটুয়াদের আঁকা দৃশ্যপটের সৌন্দর্য্য। তখন পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের মধ্যে সমস্ত প্রশস্তি লাভ করতেন অভিনেতারাই, কিন্তু ম্যামনটভই প্রথমে দেখিয়ে দেন, দৃশ্যপট ও তার শিল্পীরাও কতটা উচ্চ প্রশংসার অধিকারী হ'তে পারে। কেবল তাই নয়, রুশীয় সঙ্গীতের জন্যও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন।

ম্যামনটভ একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন তার নাম 'কলাজগৎ' (Mir Iskustvo) ডায়াঘিলেফ পান তার সম্পাদকের পদ। চিত্রকর বিনোয়িস্, বাক্স্‌ট, কোরোভিন, সাইমভ ও সেরভ প্রভৃতিও সেই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে এই দলে এসে যোগ দেন গোবিক (বাংলার চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকা রাণীর শ্বশুর), গণ্ট,চারোভা ও লারিয়োনোভ প্রভৃতি চিত্রকররা। রুশীয় চিত্রকলা তখন বস্তুতন্ত্র হয়ে উঠেছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যেই 'কলা-জগতে'র আত্মপ্রকাশ। তার মূলমন্ত্র ছিল—"বিষয়বস্তু সংগ্রহ কর অতীত যুগে ফিরে গিয়ে।" এই দলের শিল্পীরা পরে রুশীয় ব্যালের সাহায্য নেন নিজেদের তুলির লিখনের সঙ্গে জনসাধারণকে সুপরিচিত করবার জন্যেই।

রুশ-সম্রাটদের নিজস্ব নৃত্য-বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর ধ'রে শিক্ষাগ্রহণ ক'রে নর্ত্তক ও নর্ত্তকীরা তাদের কলা-কুশলতা প্রকাশ করত রাজকীয় রঙ্গালয়েই। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে রুশ রঙ্গালয়ে নূতন এক পরিবর্ত্তনের ধারা এসেছিল বটে, কিন্তু রুশীয় ব্যালের অবস্থা ছিল বদ্ধ জলাশয়ের মত। রুশিয়ায় উচ্চশ্রেণীর নর্ত্তক-নর্ত্তকীর অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্যের মানরক্ষা ক'রে চলতেন।

ডায়াঘিলেফের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল এই দিকে। পুরাতন ব্যালের মধ্যে কি উপায়ে নূতন জীবন সঞ্চার করা যায়, তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি রুশীয় চিত্র, সঙ্গীত ও অপেরাকে রুশিয়ার বাইরে পরিচিত করবার জন্যে প্যারিসে গিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন এবং যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করত তাঁর সে সব প্রচেষ্টা। কিন্তু কেবল তাই নিয়েই তিনি তুষ্ট হ'তে

পারতেন না, কারণ তিনি চাইতেন একাধিক আর্টের সমন্বয় সাধন ক'রে ব্যালের মধ্যে অভিনব রূপদান করতে।

কিছু কাল ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টার পর ডায়াঘিলেফ উপলব্ধি করতে পারলেন, রুশিয়ায় ব'সে কিছুতেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, এখানে ব্যালের অঙ্গ থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যের শৃঙ্খল খোলা অসম্ভব। তখন তিনি নর্ত্তক ফকিন এবং চিত্রকর বিয়োনিজ বাকৃস্টএর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, এক দল রুশীয় নর্ত্তক-নর্ত্তকী নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে প্যারিসে গিয়ে ব্যালের এই নূতন রূপ সকলকে দেখিয়ে আসবেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ("Ballet" গ্রন্থ-প্রণেতা আর্নল্ড Haskell সাহেবের মতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থ "দি রাসিয়ান থিয়েটারে"র মতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) ডায়াঘিলেফের আশার স্বপন সফল হ'ল। সাহিত্য ও চারুকলার পীঠস্থান প্যারিস নগর তাঁর দ্বারা পরিচালিত রুশীয় ব্যালে দর্শন ক'রে তারস্বরে দান করলে অপূর্ব্ব অভিনন্দন। সে কি অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, কি অভাবিত নূতনত্ব, কি অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য!

এই নৃত্যানুষ্ঠানে দৃশ্যপট ও সাজ-পোষাক পরিকল্পনা করেছিলেন বিয়োনিজ, বাকস্ট ও রোরিক্ প্রভৃতি চিত্রশিল্পীরা, নৃত্য-পরিকল্পনা করেছিলেন ফোকিন এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন ষ্ট্রাভিন্স্কি প্রভৃতি। নৃত্যের ভার ছিল যাঁদের উপরে, তাঁরা সকলেই ছিলেন রুশিয়ার রাজকীয় নৃত্য-সম্প্রদায়ের শিল্পী, ছুটি নিয়ে ডায়াঘিলেফের সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশের বাইরে এত দিন যাঁরা ছিলেন অপরিচিত, প্যারিসে আত্মপ্রকাশ ক'রেই তাঁরা শুনতে পেলেন য়ুরোপের দেশে দেশে উঠেছে তাঁদের নামে জয়গান! ফোকিন, নিজিনস্কি, আনা পাবলোভা, টামারা কার্সাভিনা প্রভৃতি আবির্ভাবেই নিজেদের জন্যে করলেন অমরত্বের সোপান রচনা।

এখন ডায়াঘিলেফের এই নূতন রুশীয় ব্যালের বিশেষত্ব দেখা যাক্। ব্যালে এত দিন ছিল নৃত্যপ্রধান। তার সঙ্গে সঙ্গীত ও দৃশ্যপট থাকত বটে, কিন্তু মুখ্য ভাবে নয়, গৌণ ভাবে। নূতন রুশীয় ব্যালে একের প্রাধান্য দেখালে না, সমভাবেই দেখালে ত্রয়ীর প্রাধান্য—নৃত্য-পরিকল্পক, দৃশ্যপট-শিল্পী ও সঙ্গীত-পরিচালক।

এই নূতন ব্যালে বা নৃত্যনাট্য রচনা করতে বসে আগে সঙ্গীত-পরিচালক ও নৃত্য-পরিকল্পক পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজেদের কাজ শেষ করেন, তার পর চিত্রশিল্পী এসে সাজ-সজ্জার ভার নেন। চিত্রকর শেষের দিকে কাজে হাত দেন বটে, কিন্তু তিনি গোড়া থেকেই সঙ্গে থাকেন প্রধান অংশীদাররূপে। এই জন্যেই ডায়াঘিলেফের রুশীয় ব্যালে কেবল নৃত্য-পরিকল্পক ও নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের নাম নয়, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকর ও সঙ্গীতবিদ্‌দের নামও বিখ্যাত ক'রে তুলেছে।

লিয়ন বাকস্ট হচ্ছেন রুশীয় ব্যালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু তিনি আধুনিক যুগের প্রথম শ্রেণীর যে কোন চিত্রশিল্পীর সঙ্গে একাসনে বসতে পারেন। রঙ্গালয়কেই নিজের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র রূপে নির্ব্বাচিত ক'রে তিনি প্রমাণিত ক'রে গিয়েছেন, রঙ্গমঞ্চের উপরেও উচ্চ শ্রেণীর চারুকলার কার্য্যকারিতা কতখানি! তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত ও চিত্রিত অধিকাংশ দৃশ্যপট "ডেকোরেটিভ আর্ট" বা প্রসাধন-শিল্পের জন্যে অমর হয়ে আছে। কেবল দৃশ্যপট নয়, তাঁর পরিকল্পিত সাজ-পোষাক দেখেও সকলে চমৎকৃত হয়েছে।

কলকাতায় যখন রুশীয় ব্যালে নিয়ে আনা পাবলোভা আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আমি কয়েক বার এই বিশেষ শ্রেণীর নৃত্যাভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। অনেক দিনের কথা, কিন্তু সে সময়ে আমার মনের উপরে পড়েছিল যে নব নব বিস্ময়ের ছাপ, আজও তা লুপ্ত হয়নি। ... নৃত্য নিয়ে সুদীর্ঘ কাল ... আসছি এবং ভারতীয় নৃত্যনাট্যের সঙ্গেও অপরিচিত ছিলুম না। কিন্তু রুশীয় ব্যালে দেখতে গিয়ে যা দেখলুম এবং শুনলুম ... কার চলতি নৃত্যনাট্যের ... অনেক কিছুই মেলে ... দক্ষিণ প্রদেশের "কথাকলি" ... সেরাইকেলার "ছৌ" ... কথা। ও-দু'টি নাচে ... দেখতে যাই এবং দেখি ... কেবল নৃত্যই, ওদের সঙ্গীত যা থাকে তা কিছুমাত্র ... যোগ্য নয় এবং ওদের ... না দৃশ্যপটের নাম-গন্ধও ... রুশীয় ব্যালের আসরে ... একসঙ্গে সমান ভাবেই ... পেলুম

লণ্ডনে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের দর্শক লর্ড এবং লেডী মাউণ্টব্যাটেন মিঃ সরকারের সঙ্গে আলাপ করছেন।
শ্রী ... মাসিক বসুমতীর জন্য প্রেরিত।

... চিত্রকলা এবং সঙ্গীতকলা! যখনই নির্দ্দিষ্ট সময় আসছে, প্রত্যেক কলা আপন আপন ভূমিকায় কাজ ক'রে যাচ্ছে—নৃত্য, কখনো চিত্র, কখনো সঙ্গীত। এবং এই জন্যেই ... রুশীয় ব্যালের নাচও ভুলিনি, পটও ভুলিনি, সঙ্গীতও ...। য়ুরোপ-আমেরিকার আধুনিক ব্যালে ডায়াঘিলেফের রুশীয় ... আদর্শেই গঠিত হয়।

পাশ্চাত্য ব্যালে বলতে ভারতে চলতি নৃত্যনাট্য বুঝায় না বটে, কিন্তু আমাদের আধুনিক নৃত্যনাট্যের উপরে ঐ ব্যালের প্রভাব দেখা যায়—কোথাও অল্প, কোথাও বিস্তর। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এর মূলে আছেন উদয়শঙ্কর। আনা পাবলোভার নৃত্য-সম্প্রদায়ে তিনি বহু কাল নর্ত্তকরূপে কাজ করেছিলেন। সুতরাং তিনি যে রুশীয় ব্যালের প্রত্যেকটি বিশেষত্বের সঙ্গে সুপরিচিত, এটুকু অনুমান করা যায় অনায়াসেই। ভারতে ফিরে এসে পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে খাটাতে তিনি বিলম্ব করেননি।

ভারতীয় নৃত্য কিছু কিছু সঙ্গীতের সাহায্য নেয় মাত্র, কিন্তু সঙ্গীতকে কোথাও নিজের সমকক্ষ বা প্রধান অংশীদার ব'লে স্বীকার করে না। উদয়শঙ্করই হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় নৃত্য-শিল্পী, যিনি নাচের সঙ্গে সমান ভাবে করেছিলেন সঙ্গীতের মিলন-সাধন। এখন তাঁর প্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ করছেন আরো অনেকেই। অধিকাংশ স্থলেই উদয়শঙ্কর দৃশ্যপট ব্যবহার করেননি, নিজে চিত্রকর হ'লেও। কিন্তু "লেবর ও মেসিন" এবং "কল্পনা" চিত্রের কোন কোন নাচে যখনই তিনি দৃশ্যপটের সাহায্য নিয়েছেন, তখনই রুশীয় ব্যালের সঙ্গে তাঁর রচিত নৃত্য-নাট্যের ব্যবধান আরো অনেকখানি ক'মে এসেছে।

কিন্তু এবারে আমেরিকা যাবার আগে উদয়শঙ্কর যে নূতন সম্প্রদায় নিয়ে কলকাতায় দেখা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষ্য করলুম। সঙ্গীতকে তিনি অবহেলা করেননি বটে, কিন্তু তার প্রাধান্য বেশ খানিকটা কমিয়ে এনেছেন. নৃত্যের ভাব ... জন্যে সঙ্গীতের যতটুকু সাহায্যের দরকার, খুব ... কেবল ততটুকুই গ্রহণ করেছেন। এ জন্যে একখানি ... প্রধান সমালোচকের দ্বারা তিনি নিন্দিতও হয়েছেন।

... আমি তাঁকে সমর্থন করি। নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্র—প্রত্যেক ... হচ্ছে স্বাধীন কলা। প্রত্যেক কলার নিজস্ব ক্ষেত্রে গিয়ে ... বা প্রাধান্য ক্ষুন্ন না ক'রেই তাকে উপভোগ করা ... ডায়াঘিলেফের পরিকল্পিত রুশীয় ব্যালে হচ্ছে এক বিশেষ ..., বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তার সৃষ্টি। ও-রকম ...কের, চিত্রকরের ও সঙ্গীতবিদের বাহাদুরি, ভারতীয় ... পায় ব'লে মনে হয় না।

...লেফের রুশীয় ব্যালে আর নেই। কিন্তু ব্যালের ... পুনরুদ্ধার করেছেন তিনিই। এখন ইংলণ্ডে এর ... কথা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। ঐটুকু তো দেশ। ...লেই ভয় হয় সমুদ্রে প'ড়ে যাব, কিন্তু অমন দেশেও ... হাজার বালক-বালিকা ব্যালে বা নৃত্যনাট্যের ... ভাবে নাচ অভ্যাস করে। ওখানকার এক জন ...শিক্ষয়িত্রী হচ্ছেন নিনেট ডি ভ্যালোয়স্, আগে তিনি ... ডায়াঘিলেফের সম্প্রদায়ের শিল্পী।

সিনেমার চিঠি

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মৈত্র

'প্রিয়তমা।'

'বিশ বছর আগে' 'কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে' 'শহর থেকে দূরে' 'অঞ্জন গড়ে' 'দেবদাস'-এর 'দিদি'র বাড়ী গিয়েছিলাম। 'পথের সাথী' হয়েছিল 'জিপসী মেয়ে'। তার সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর', 'রামপ্রসাদ', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'বিষ্ণুপ্রিয়া,' 'কৃষ্ণসখা সুদামা,' 'ধাত্রী দেবতা', 'ধাত্রী-পান্না'র 'মহাদান' ও 'ভক্তপ্রহ্লাদ' প্রভৃতি মনীষিদের সম্বন্ধে আলোচনাও হোল ঢের।

'উল্টো রথের' দিন 'মাতৃহারা' 'ভাইবোন' 'চন্দ্রশেখর' আর 'নন্দিতা'র সাথে 'পরিচয়' হ'ল। 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এ তারা পেয়েছে 'মহা সম্পদ' কিন্তু 'আভিজাত্যে'র অহঙ্কার তাদের নেই। 'জজ সাহেবের নাতনি' 'বন্দিতা'র সাথে 'মাইকেল মধুসূদন'এর 'সমাধিতে' গিয়েছিলাম। 'কবি' 'বিদ্যাপতি'র 'দক্ষযজ্ঞে' 'সতী-সীমন্তিনী'র 'শাপমুক্তি'র কাহিনী বড়ই চমৎকার লেগেছিল। 'নৌকাডুবি'র ফলে 'বামুনের মেয়ে' 'শকুন্তলা' আর 'একই গ্রামের ছেলে' 'গোরা'র যা অবস্থা হয়েছিল—'ডাক্তার' আর 'নার্স' 'সি সি'র অক্লান্ত চেষ্টায় 'মন্ত্রশক্তি'র মত তারা উঠল সেরে। এই তো গেল 'পথহারার' কাহিনী'।

'দুই পুরুষ' ধরে 'রায়-চৌধুরী'দের মধ্যে যে 'গরমিল' চলে আসছিল, 'বিদুষী ভার্য্যা' 'বড়বৌ' সেই 'বিষবৃক্ষ' সমূলে উৎপাটন করেছেন। 'প্রতিশোধ' নেবার জন্য 'কাশীনাথ'-এর 'পরিণীতা' 'উর্ব্বশী' 'আলেয়া'র ইসারায় এক দিন 'রাত্রি'তে 'অপরাধ'এর বোঝা মাথায় নিয়ে 'দিগ্‌ভ্রান্ত'র মত হলো 'নিরুদ্দেশ'। সেই 'মাতৃস্নেহ' 'বঞ্চিতা' 'স্বয়ংসিদ্ধা' 'সাধারণ মেয়ে' 'পর বাড়ী'তে খুলেছিল 'সন্দীপন পাঠশালা'। 'সন্ধ্যা বেলার রূপকথা'র মত এ সব 'অভিনয় নয়'। মন 'মানে না মানা', তবু শুধু 'অভিমান' করে 'দিনের পর দিন' রয়েছিল সে একা।

'তার পর?'

'মুক্ত পৃথিবী'তে 'জাগ্রত ভারত' হোল 'অগ্রদূত।' 'মন্ত্রমুগ্ধের' মত 'দেশের ডাক'-এ 'পথের দাবী' নিয়ে 'সংগ্রামের' 'সংকল্পে' 'বন্যার পথে' করলাম 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।' কিন্তু 'সহসা' 'যোগাযোগ' ছিন্ন হওয়ায় ইহাই হইল আমাদের 'মহাকাল'। 'বিদ্রোহী'র 'অভিযোগ'এ 'উদয়ের পথে'র এই 'তরুণ' 'অভিযাত্রী'র দল '১০১ ধারায়' হলো 'বন্দী' আর তুমি হ'লে 'বন্দিনি'। 'যার যেথা ঘর' তারা গেল সে'থা। রইলাম শুধু 'তুমি আর আমি'। আমাদের সামনের 'কালো ছায়া' সরিয়ে 'জীবন-সঙ্গিনী' হ'য়ে তুমি 'পথ বেঁধে দিলে।' তুমি পেলে 'মুক্তি' আর আমি 'সাক্ষীগোপাল' হ'য়ে রইলাম 'বন্দী'। বন্দিদশায় বাংলার 'ভাবী কাল' ভাবতে ভাবতে একটি 'কঙ্কাল' হ'য়ে পড়েছি। কিন্তু কই তোমাকে তো 'ভুলি নাই'! আমার 'বামের সুমতি' দিও। দেখো, ওই এক দিন এই বাংলার 'মাটীর ঘরে' হাসি ফুটিয়ে তুলবে। তোমার 'শাঁখা-সিঁদুর' বজায় থাকিলেই 'শেষ রক্ষা' হয়। 'এই তো জীবন' আমাদের। ইতি—

তোমারই

'চণ্ডীদাস'

ভানুমতীর খেলা

ভারতীয় যাদুবিদ্যার কদর আজকের নয়। চৌষট্টি কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা হিসাবে ভারতীয় ভোজবাজী দেশ-বিদেশের ভোজের আসরে সম্মান লাভ ক'রে আসছে বহু কাল আগে থেকে। আমাদের দেশের সকল খেলোয়াড় একেবারে বিশ্ব-পরিচিত না হলেও সামান্য গ্রাম্য বাজীকরদের হাতের যা গুণ তাতে বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের কারণ আছে যথেষ্ট। বিশ্বের প্রখ্যাতনামা যাদুকরদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত অনেক কিছু জানা আছে আমাদের গ্রাম্য বাজীকরদের। কেবল মাত্র দরিদ্র বাঙলার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শিল্পকলাটি আজ অনাদৃত। বাজীকরের জাতও তাই এখন লুপ্তপ্রায়।

তবুও ভারতবর্ষের তুলনায় বাঙলায় এই শিল্পটির চর্চা আজও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি। গণপতি আর রাজা বোসের নাম যেমন পৃথিবীর যাদুবিদ্যা-মহলে একদা সাড়া তুলেছিল তেমনি ঠিক বন্ধুবর পি. সি. সরকারের নামও ইদানীং ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। সাগর-পারের জনসাধারণ সরকারের খেলা দেখে সবিস্ময়ে স্বীকার করেছে তাঁর বৈশিষ্ট্য। এমন কতকগুলি অভিনব খেলা তিনি দেখিয়েছেন, যেগুলি না কি পৃথিবীর অন্য কোন যাদুকর এখন পর্য্যন্ত রপ্ত করতেই পারেননি।

বাঙলা দেশে চ্যাং, কাটার এবং আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী খেলোয়াড় তাঁদের খেলা দেখিয়ে গেছেন। সম্প্রতি গোগিয়া পাশা মিশর থেকে এসেছেন খেলা দেখাতে। দেখলাম কোন নতুনত্ব নেই বললেই হয় তাঁর খেলায়। গোগিয়া পাশার খেলায় পৃথিবীর অন্য দেশের চোখ কপালে উঠলেও বাঙালীর চোখে তাঁর কসরতের মূল্য আদপেই অধিক নয়। অত্যন্ত নগণ্য। বাঙলার গ্রামের বাজীকরদের বোধ করি আরও অনেক বেশী খেলা জানা আছে, গোগিয়া যাদের কাছে খেলার পুতুল বলেই মনে হয়।

বাঙলার গৌরব এই যাদুবিদ্যার প্রতি অদূর ভবিষ্যতে যদি আমাদের সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হয়, তা হলে হয়তো এক দিন দেখা যাবে, বাঙলার অন্যান্য সম্পদের মত এই যাদুবিদ্যাও এক দিন (ম্যাজিকের মতই) লোপ পেয়ে গেছে বাঙালীর মন থেকে। তখন দেখা যাবে, আমাদের জাতীয় খেলা ভুলে গিয়ে আমরা দেখতে ছুটছি ঐ গোগিয়ার বৈচিত্র্যহীন পাশা খেলা।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক-সঙ্ঘের পুনর্জীবন লাভ

চোখের সমুখে কত ব্যাপার ঘটে যায়, তবুও নিস্ক্রিয় থাকে বাঙালী। কত স্বার্থপর তার স্বার্থসিদ্ধি করছে, কত ন্যায়ের পথে কত অন্যায়ের জয়যাত্রা, কত অজ্ঞ ও অক্ষম কেমন মুখোস প'রে সর্ব্বজ্ঞের ভাণ করছে, কত দোষী স্রেফ ভাঁওতার জোরে নির্দ্দোষ প্রমাণ হ'তে তৎপর হচ্ছে—বাঙালীর মুখে তার প্রতিবাদ নেই। বাঙলার ছায়া-ছবির বাজারেও এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ষ্টুডিওর ঘরে-বাইরে, সেন্সরের ভেতরে আর চলচ্চিত্রের সাংবাদিকতায় এমন পাঁয়তারা কিয়ে রেষারেষি করতে বহু দিন দেখা যায়নি। 'যে দিকে ফিরাই আঁখি তোমার করুণা-রাশি দেখিতে পাই।' দেখতে পাই, আমাদের ষ্টুডিওর ঘরে-বাইরের অধিকাংশ ছবি বাজারে চলে মাত্র হপ্তা দেড়েক, দেখতে পাই সেন্সরের কবল থেকে ৪২-[illegible] মত ডকুমেণ্টারী ছবিও দেখতে পায় না বাঙালী, দেখি বাঙলা চলচ্চিত্রের সাংবাদিকদের কেমন অজ্ঞতা আর অশিক্ষার দৌড়। হাতে গোণা যায় এমন দু'-চার জন ব্যতীত প্রায় সকলেই দেখি বহু কষ্টে বলতে পারেন মাত্র দু'টি কথা, ছবি ভাল। ছবি ভাল নয়।

সম্প্রতি দীর্ঘকাল নিস্ক্রিয় থাকার পর বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এসোসিয়েসন তাঁদের অস্তিত্ব পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতার সমস্ত চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, সঙ্ঘকে টোটকা-টুটকি খাইয়ে পুনর্জ্জীবিত করা। এই সঙ্ঘটি, অনেকেই হয়তো জানেন যে, আন্তর্জ্জাতিক স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বাঙলা দেশের নানা দুর্বিপাকের মধ্যে প'ড়ে সঙ্ঘ গত কয়েক বছর নিস্ক্রিয় থাকে।

বাঙালীর চলচ্চিত্র সাংবাদিক-সঙ্ঘ যদি কোন রকমে আবার জীইয়ে উঠতে পারে তা হলে আশার কথা, সন্দেহ নেই। এবং বেঁচে উঠলে সঙ্ঘ প্রথমে এ ক্ষেত্রে কে সাংবাদিক আর কে নয়, প্রথমেই যেন তার একটা বিভাগ কষে ফেলেন। করলে দেখবেন, ভাল আর ভাল নয় বলেই শেষ হবে না আমাদের সমালোচনা। আমাদের সমালোচনায় তখন থাকবে সত্যিকার দোষ-গুণের বিচার। আমাদের বাঙালী চলচ্চিত্র-সাংবাদিকরা তখন দেখবেন Movie ছবি সম্বন্ধে কথা বলছেন, ভুল ক'রে Still photoর কথা বলছেন না।

কুলহারা মধ্যবিত্ত

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ। সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার কি রহস্যময় জীবন! লুকোচুরি আর মুখরক্ষার কি কষ্টকর প্রয়াস। অভাব অনটনের সঙ্গে ক্ষমাহীন সামাজিকতা। বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রাণ তাতেই আজ ওষ্ঠাগত। এদের দিকে কারা তাকাবে? দেশ-প্রীতি, ক্ল্যাসিক-প্রীতি আর প্রেম-প্রীতি বাদ দিয়ে এখনও যে ক[illegible]ক জন কাহিনীকার ছবির পটভূমিকা নির্ব্বাচন করছেন বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য।

এদের মধ্যে নিতাই ভট্টাচার্য্য অন্যতম। গত কয়েক বছরের মধ্যে যে ক'খানা ছবির কাহিনী তিনি রচনা করেছেন তার অধিকাংশই মধ্যবিত্তের কাহিনী। তবুও কোথাও যেন [illegible]কার বাঙালীর জাতীয় জীবনের কোন ছায়া দেখতে পাওয়া [illegible] না অনেক ছবিতেই। কোথায় যেন মনে হয় অভাব রয়েছে [illegible] মধ্যবিত্তের আসল পরিচয়। এম, জি, পিকচার্স [illegible] পক্ষ থেকে সুদক্ষ পরিচালক মানু সেনের পরিচালনায় নিতাই [illegible] 'কুলহারা' ছবির কাজ প্রায় শেষ। ভূমিকায় অবতীর্ণ [illegible] জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, পদ্মা, [illegible] আর রেণুকা। নির্ব্বাচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রতিভা সম্বন্ধে [illegible] কোন সন্দেহ নেই। আমাদের সন্দেহ 'কুলহারা'র কা[illegible]। নিতাই বাবু কি একটু দুষ্টি ফেলাবেন?

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'

জ্যোতির্ম্ময় রায় যেমন সাহিত্য থেকে প্রায় বিদায় গ্রহণ করতে ... তেমন ছবির বাজার থেকে নয়। 'উদয়ের পথে'র পর ... ' ও 'দিনের পর দিন' শেষ ক'রে আবার যে নতুন ছবি ... কাজে তিনি হাত দেবেন, আমরা তেমন আশা করিনি। ... রাধামোহন, নিবেদিতা দাস আর মণীন্দ্র ও মৃণাল রায় ... সঙ্গে নিয়ে তিনি এখন 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'র চিত্র রচনায় ... সুর-সংযোজনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সেই team ... সেই তাঁরাই খেলবেন—যাঁরা 'উদয়ের পথে' একদা সুকৌশলে ... এবং বাঙালীর চিত্ত জয় করেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময় তাঁর ... দৃষ্টিকোণে' যদি আরেক team-work না দেখাতে পারেন, তাহলে 'উদয়ের পথে'র লেখক পুনরায় 'যা তা' সাহিত্যে যে আবার ... করবেন—আমাদের এমন আশা করা কি তেমন কিছু অন্যায় হবে!

কথাটা হল এই, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' ছবি শুধু যদি শ্রুতিপথের জন্য হয় ... একমাত্র আকর্ষণ হবে হেমন্তের গান। কারণ মিষ্টি কথার ... অধিক আকৃষ্ট হয় সঙ্গীতে। আবার চোখে দেখাতে হলে শুধু ... কথা বললেই রেহাই নেই। তখন চোখ দেখলেও কান শুনে না। করতে হবে কি, না, একটি team-work দেখাতে হবে ... জ্যোতির্ম্ময় 'উদয়ের পথে' যেমন দেখিয়েছেন।

স্রেফ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

... দেশের বাজার যদি কেউ ঠিক ঠিক চিনতে পেরে থাকে ... দিন পরে এই সেদিন বাজারে এসে এই প্রথম ... সরোজ মুখুজ্জ্যে। স্রেফ প্রাপ্তবয়স্কদের দেখবার জন্যে ... এমন জিনিষ তিনি ছাড়তে শুরু করেছেন যে, শেষ ... না দেখে যেন থাকতে পারা যায় না। সরোজের ছবিতে ... থাক আর না থাক কিছুটা entertainment ... এমন কথা সে-সে বলতে পারে না। খানিকটা ... লুকিয়ে ফেলতে চায় সরোজ তাদের দলে নয়। ... পর 'অপবাদ' ছেড়েছেন বোম্বাই সুলোচনা ...

... বস্তুটা আমাদের সমাজের বড় লজ্জারজনক প্রবৃত্তি। ... বিনামূল্যে বিতরণ ক'রে অপবাদ ছড়ানোর অপচেষ্টা ... সাহিত্যেও, ছবিতে সরোজের এই সর্ব্বপ্রথম ... সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু ... 'অপবাদ' বহু চক্ষুষ্মান্ দর্শককেও আকৃষ্ট করতে ... এমন কিছু জাতের ছবি না হলেও একটা রাতের আনন্দ ... শনের পক্ষে 'অপবাদ' সার্থক বলতে হবে। যদি নিশান ... ক।

সাবুর আরণ্য চিত্র

বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা সাবু যে এশিয়ান, এ কথা সে কত দূরে গিয়েও এখনও পর্য্যন্ত ভুলতে পারলো না। শুধু তাই নয়, সাবু কে ভারতীয় এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। সাবু তাঁর প্রযোজক এবং অন্যান্য টেক্‌নিকাল্ উপদেষ্টাদের নিয়ে আগষ্টের প্রথমেই সিঙ্গাপুরে পৌঁছবেন। ছবিখানির পটভূমিকা হবে জঙ্গলাকীর্ণ মালয়, যেখানে এখন গেরিলা যুদ্ধের সংগ্রাম চ'লেছে। আর এই সংগ্রামের জন্যই না কি ছবি মালয়ে না তুলে সিঙ্গাপুরে তুলতে হচ্ছে।

দু'টি হস্তি-শাবক "এলিফ্যাণ্ট বয়" সাবুর এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করবে। আর তা ছাড়া থাকবে ময়ূর, অজগর সাপ, ভাল্লুক আর উল্লুক। আমাদের দেশে এত বন-জঙ্গল থাকতেও এখনও পর্য্যন্ত সত্যিকার আরণ্য-চিত্র কেউ দেখাতে পারলেন না। এত জন্তু-জানোয়ার থাকা সত্ত্বেও। স্রেফ উল্লুক ভাল্লুকের অভিনয় দেখিয়ে সাবু ছবি তৈরী করবেন। আর আমরা কি না এত সুদক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী পেয়েও অধুনা একখানা পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরী করতে পারি না? আশ্চর্য্য!

১০৯ ধারা

রাধা ফিল্মসের সংবাদ। ১০৯ ধারা। শীঘ্র কলকাতা এবং তার আশ-পাশের মফঃস্বলে মুক্তিলাভ করবে। পরিচালনা অপূর্ব্ব-কুমার মিত্র। কাহিনী রচনা করেছেন রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকায় আছেন মলিনা, স্মৃতিরেখা, পদ্মা, রেবা, শিশুবালা, বিপিন গুপ্ত, তুলসী, আশু, নৃপতি, অমর প্রভৃতি।

দুঃখের খবর

'আনন্দবাজারে'র খবর: "ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ভ্রাম্যমান চিত্র প্রদর্শন সংস্থার সংখ্যা ১২৮; যার মধ্যে মাদ্রাজের সংখ্যাই হচ্ছে ৬২৫ আর পশ্চিম-বাঙলায় মাত্র ৬টি।"—এত দুঃখের খবরও 'আনন্দবাজারে' থাকে!

ভ্রম সংশোধন

পশুতে কখনও ভুল করে না। ভুল করে মানুষেই। কয়েক সংখ্যা আগে শ্রীতুলসীদাসের কাহিনীকারের নাম হিসাবে অভ্যাসবশতঃ বিনয় চাটুজ্জ্যে মশায়ের নাম আমরা ভুল বশতঃ লিখেছি, তাতে কেউ কেউ আমাদের উকিলের চিঠি দিতে উপদেশ দিয়েছেন বিনয় বাবুকে। আমরা এ কথা নিশ্চিত জানি, বিনয় বাবু যদি ঠিক সেই ধরণের মানুষ হতেন তা হলে কবে কোন কালে এই সব উপদেষ্টাদেরই উকিলের চিঠি নয়, মোক্তারের চিঠি দিয়ে ফেলতেন এঁদের এত দিনের সচল ও মহামূল্য উপদেশের দক্ষিণা হিসাবে। আর তখন দেখতে পাওয়া যেতো, পৃথিবীর সব-কিছু জেনে-শুনেও অজের মত ব্যা-ব্যা নয়, বাবা, বাবা বাবা করতে হচ্ছে কাকেও কাকেও। কেলো, Et tu brute?—প্র

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধি

... মাস পর্য্যন্ত ৩০ বছরের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের সমৃদ্ধি হচ্ছে: ষ্টুডিও সংখ্যা—৬০, লেবরেটরী—৩৭, চিত্রগ্রহণ ... , প্রযোজক—৪৬০, পরিবেশক—১০০, স্থায়ী সিনেমা—২০৩৭, ভ্রাম্যমান বা অস্থায়ী সিনেমা—১২৮, চিত্র নির্ম্মাণে ... মূলধন—১৫ কোটি টাকা, পরিবেশনে নিয়োজিত—৩ কোটি, প্রদর্শনে নিয়োজিত—২৫ কোটি, বছরে প্রদত্ত ...—সওয়া ৪ কোটি, সরকারকে প্রদত্ত অন্যান্য কর—সাড়ে ৪ কোটি, কর্ম্মি-সংখ্যা—সওয়া লক্ষ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

গৃহযুদ্ধে কোরিয়া—

গত ২৫শে জুন (১৯৫০) রবিবার প্রত্যুষে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আকস্মিক বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, তেমনি এই যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। কোরিয়া যুদ্ধের যেরূপ দ্রুত পট-পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে বিশেষ করিয়া ঠাণ্ডা যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশনের বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করিলে এই যুদ্ধের প্রকৃত পটভূমিকার পরিচয় পাওয়া কঠিন হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হয় না। দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়াস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করিয়াছেন যে, উত্তর কোরিয়ার সশস্ত্র বাহিনী বিনা উত্তেজনায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার পক্ষের কথা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং-গিয়াং-এর বেতারে যুদ্ধ ঘোষণার কথা অস্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু এই যুদ্ধারম্ভের জন্য দায়ী করা হইয়াছে দক্ষিণ কোরিয়াকেই। দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত বরাবর তিন স্থানে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করায় উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুতরাং কে প্রথম আক্রমণ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ কথা নয়। বস্তুতঃ পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন যুদ্ধেরই প্রথম আক্রমণকারী কে, তাহা কোন দিনই নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ কোরিয়ার গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও এই প্রার্থনা পূরণে বিলম্ব করে নাই। কোরিয়া সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করে নাই, ইহা সকলেরই জানা কথা।

কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দিনই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারীকে অনুরোধ করে এবং ঐ দিনই রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ কোরিয়া অভিযানকে আক্রমণাত্মক কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির এবং উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখায় [illegible] করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৫শে জুন তারিখেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে উচ্চতন সামরিক ও কূটনৈতিক কর্ম্মচারিগণ মিলিত হইয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে দ্রুত অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত করেন এবং ঐ দিনই জাপান হইতে দক্ষিণ কোরিয়াকে দ্রুত সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র সাহায্য দিবার জন্য জেনারেল ম্যাকআর্থার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হন। ২৭শে জুন তারিখে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ সেনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়করূপে মার্কিণ বিমান ও নৌবাহিনীর প্রতি কোরিয়ার যুদ্ধে যোগদানের জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করেন। ফরমোসার উপর কোন আক্রমণ হইলে উহা রোধ করিবার জন্য সপ্তম মার্কিণ নৌবহরকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় এবং ফিলিপাইন ও ইন্দোচীনে সাহায্য প্রেরণ ত্বরান্বিত করিবার জন্য তিনি আদেশ জারী করেন। ঐ দিনই নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদিগকে অনুরোধ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩০শে জুন তারিখে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান নৌবহরের সাহায্যে কোরিয়ার সমগ্র উপকূল ভাগ অবরোধ করিতে এবং মার্কিণ স্থলবাহিনীকে কোরিয়ার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করেন। বস্তুতঃ কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত দ্রুততার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক শক্তি [illegible] দুর্ব্বলতা বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কি রণকৌশল, কি [illegible] রণসজ্জা, কি নৈতিক সাহস ও দৃঢ়তা, সব দিক দিয়াই উত্তর কো[illegible] সৈন্য বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। ২৫শে জুন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার অভিযা[illegible] [illegible]রম্ভ হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় রাজধানী সিউলের পতন হয় [illegible]শে জুন তারিখে। ১লা জুলাইয়ের মধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া [illegible] [illegible]হিনীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। দক্ষিণ কোরিয়ার [illegible] [illegible]নীকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার রক্ষা[illegible] প্রতি আক্রমণের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিণ [illegible]রাষ্ট্র। অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির স[illegible] বৃটিশ কমনওয়েলথের কয়েকটি দেশের কিছু কিছু বাহি[illegible] [illegible]যোগদান করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকা যদি যুদ্ধে না না[illegible] তাহা হইলে এত দিন উত্তর কোরিয়া সমগ্র দক্ষিণ কো[illegible] দখল করিয়া ফেলিত। দক্ষিণ কোরিয়ার হইয়া মার্কিণ [illegible]ষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় কোরিয়ার [illegible] তৃতী-

বিশ্ব...ম পরিণত হওয়ার আশঙ্কা অনেকেই উপেক্ষার বিষয় বলিয়া ... ন না। কিন্তু হঠাৎ কোরিয়ায় এই সংগ্রাম আরম্ভ হইল কেন কোরিয়া বিভাগের পটভূমিকাতেই তাহার কারণের সন্ধান করিতে হইবে। উভয় কোরিয়ার সীমান্তে প্রায়ই হাঙ্গামা ঘটিবার ... বহু বার পাওয়া গিয়াছে। এই সীমান্তের হাঙ্গামাই প্রকৃত আক্রমণে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা কোন সময়েই উপেক্ষার বিষয় ছিল না। এই আশঙ্কাই কোরিয়ার যুদ্ধের মধ্যে সত্যে পরিণত হইয়াছে।

কোরিয়া বিভাগের পটভূমি—

কোরিয়াবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোরিয়াকে বিভক্ত করিয়া উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পৃথক্ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কাহিনী কাহারও অজানা নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে। জাপানী শাসনের ৪০ বৎসর ধরিয়াই কোরিয়াবাসীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কোন সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাহারা জাপানেরই মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে কোরিয়া শত্রুদেশ ছিল না। জাপানের পতনের পর কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে, এইরূপ আশা করাই ছিল স্বাভাবিক। বস্তুতঃ ১৯৪৩ সালের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলনে যথাকালে (in due course) কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্তই করা হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে ১লা ডিসেম্বর (১৯৪০) বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন কোরিয়া সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘোষণা করে: "The aforesaid three Great Powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent." অর্থাৎ উল্লিখিত বৃহৎ শক্তিত্রয় কোরিয়ার জনগণের অধীনতা সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং যথাকালে কোরিয়ার মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ ... তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। ১৯৪৫ সালের ... মাসে অনুষ্ঠিত পটস্ডাম (Pots...) সম্মেলনে জাপানের আত্ম-সমর্পণ ... নির্দ্ধারিত হয় এবং ২৬শে জুলাই ... কোরিয়াকে স্বাধীনতা দান সংক্রান্ত ... সম্মেলনের ঘোষণাকে পুনরায় স্বীকার ... লওয়া হয়। এই সম্মেলনে জাপান ... জয়ের তিন মাসের মধ্যে জাপানের ... যুদ্ধে যোগদান করিতে রাশিয়া ... হয়। এই সময় বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ... রাশিয়ার সামরিক প্রধান কর্তাদের ... (... of staff) মধ্যে আলোচনায় ... হয় যে, কোরিয়ায় মার্কিণ বাহিনী ... সৈনীর অভিযানের মধ্যবর্তী সীমানা ... অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখা। অর্থাৎ রাশিয়া উত্তর দিক হইতে কোরিয়ায় জাপানীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখা পর্য্যন্ত আসিয়া থামিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি দক্ষিণ দিকে কোরিয়ায় জাপানীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া আসিয়া থামিবে অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখায়। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই কোরিয়া বিভাগের বীজ উপ্ত হইয়াছে এবং কোরিয়ার বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধের মূল কারণও নিহিত রহিয়াছে এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই।

১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই সময় ইহাও ঘোষণা করে যে, সে পটসডাম ঘোষণা সমর্থন করে। পটসডাম চুক্তি বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী কোরিয়ার উত্তরাঞ্চল হইতে জাপানীদিগকে উৎখাত করিয়া অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখায় আসিয়া থামে। দক্ষিণ দিকে মার্কিণ সৈন্যও আসিয়া থামে অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখায়। এই ভাবে কার্য্যতঃ কোরিয়া বিভক্ত হইয়া পড়িল। উত্তর কোরিয়া রহিল রাশিয়ার দখলে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলে রহিল দক্ষিণ কোরিয়া। অতঃপর ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কো সম্মেলনে কোরিয়া সম্পর্কে যে চুক্তি হয়, তাহাতে কোরিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার এবং দীর্ঘকাল জাপানের অধীনে থাকার কুফল দূর করিবার জন্য একটি অস্থায়ী গণতান্ত্রিক কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। মস্কো সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, কোরিয়ার জন্য চারি শক্তির পাঁচ বৎসরের ট্রাষ্টিশিপ গঠনের উদ্দেশ্যে একটি জয়েণ্ট কমিশন গঠন করা হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্র কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করা অপেক্ষা বিভক্ত রাখার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং উহার পরিণতি-স্বরূপ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান পররাষ্ট্রীক অর্থ নৈতিক বিলে স্বাক্ষর করিতেছেন—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ম্মকর্তারা

উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পৃথক্ পৃথক্ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়া কার্য্যতঃ কোরিয়া বিভাগ সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

উত্তর কোরিয়ায় রাশিয়ার অনুপ্রেরণায় ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি অস্থায়ী জনগণের কমিটি (Provisional People's Committee) গঠিত হয়। অবশ্য এই কমিটিতে কম্যুনিষ্টদেরই ছিল প্রাধান্য। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে শ্রমিক দল তথা কম্যুনিষ্ট দল ডেমোক্রেটিক দল, চণ্ডো-কিয়ো দল (Chondo-kyo Party) প্রভৃতি মিলিয়া New People's Front বা জনগণের নয়া ফ্রণ্ট গঠন করে। নির্ব্বাচনের ফলে শ্রমিক দলের ৮৯ জন, ডেমোক্রেটিক দলের ২৯ জন, চণ্ডো-কিয়ো দলের ২৯ জন এবং স্বতন্ত্র ৯০ জন, মোট ২৩৭ জন সদস্য লইয়া উত্তর কোরিয়ার National Assembly বা জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়াতেও অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যবস্থা পরিষদ গঠনের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচন হয় ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসেই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন দক্ষিণ কোরিয়া দখল করে, তখন সেখানে People's Republic Party নামে একটি দল ছিল। এই দলটি ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এই দলটিকে স্বীকার করে নাই। দক্ষিণ কোরিয়ার এই নির্ব্বাচনকে সত্যই নির্ব্বাচন বলা যায় কি না, তাহাতে কেহ সন্দেহ করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে না। অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যবস্থা পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য নির্ব্বাচিত হয় এবং অর্দ্ধেক সদস্যকে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মনোনীত করেন। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ায় যে সকল দলের উদ্ভব হয় তন্মধ্যে কোরিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টিই প্রধান। ডাঃ সিঙ্গম্যান রী এই দলের নেতা। এই ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া কোরিয়ার নিজ নিজ এলাকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হওয়ার দাবী করিলেও অখণ্ড কোরিয়ার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা ক্রমেই আলেয়ার মত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশ্য অখণ্ড কোরিয়া গঠনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া একটি যুক্ত (joint) কমিশন গঠন করিয়াছিল। ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে এই কমিশনের অধিবেশনও আরম্ভ হয়; কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' শব্দের সংজ্ঞা লইয়া মতভেদ হওয়ার ফলেই এই কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ইহার পরেও অখণ্ড কোরিয়া গঠনের জন্য রাশিয়ার দিক হইতে চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই।

যুক্ত কমিশনের বৈঠক আহ্বান করিবার জন্য ১৯৪৭ সালের ২০শে মে রাশিয়া পুনরায় এক প্রস্তাব করে এবং যুক্ত কমিশনের বৈঠক আহ্বান সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত দাবীই রাশিয়া স্বীকার করিয়া লয়। অতঃপর অস্থায়ী কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠনের ভিত্তি সম্পর্কে রুশ-মার্কিণ যুক্ত কমিশন একমত হইলেও উহার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোরিয়া সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উপস্থিত করা হয় ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং অস্থায়ী কোরিয়া কমিশন গঠনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই নবেম্বর। রাশিয়া এই প্রস্তাবের সহিত সহযোগিতা করে নাই। ইহাতে রাশিয়া অখণ্ড কোরিয়া গঠনের এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে কোরিয়ার সাধারণ নির্ব্বাচন রাশিয়ার দাবী ছিল, কোরিয়া হইতে রুশ ও মার্কিণ সৈন্য [illegible] সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়া আ[illegible]। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে রাজী হইতে পারে নাই। [illegible] মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা, মার্কিণ সৈন্য অপসারিত হইলে [illegible] জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরাই [illegible] পন্থায় জয়লাভ করিবে। ফলে কোরিয়ায় সাধারণ নি[র্ব্বা]চন তত্ত্বাবধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কোরিয়া কমিশন গঠ[ন] করা সত্ত্বেও অখণ্ড কোরিয়া গঠন করা সম্ভব হইল না। [দ]ক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিণ সৈন্যের উপস্থিতির জন্যই রাশিয়া [কোরি]য়া কমিশনকে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করিতে দেয় নাই। [কো]রিয়া কমিশনের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্ব্বাচন হইয়াছে [illegible] দক্ষিণ কোরিয়ায় খাঁটি কোরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, এ কথা [স্বী]কার করা কঠিন।

১৯৪৮ সালের ১০ই মে দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। কোরিয়া কমিশন এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে সার্টিফিকেট দেন তাহাতে এই নির্ব্বাচনকে 'a valid expression of the free will of the electorate in this part of Korea which were acceptable to the Commission' বলিয়া অভিহিত করেন। অর্থাৎ এই নির্ব্বাচনে দক্ষিণ কোরিয়ার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর স্বাধীন ইচ্ছার ন্যায়সঙ্গত প্রকাশ হইয়াছে এবং কমিশন [উহা]কে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ কোরিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-পদপ্রার্থী হইলে ১৯৪৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] পরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়। সোভিয়েট ডেলিগেট [illegible] উহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, কোরিয়া কমিশনের ৯ জন [সদস্যে]র মধ্যে মাত্র ৪ জন সদস্য এই নির্ব্বাচন অনুমোদন [illegible]। ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, এল সালভাডোর, ফ্রান্স, [ফি]লিপাইন, সিরিয়া ও ইউক্রেনকে লইয়া এই কমিশন গঠিত হয়। [illegible] এই কমিশন বয়কট করে। কানাডার প্রতিনিধি এই [illegible] 'unwise and unconstitutional' (অবিবেচনা[প্রসূত ও] নিয়মতন্ত্র-বিরোধী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। [ক]মিশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান মিঃ কে, পি, এস, মেনন এই নির্ব্বা[চন] সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "I seriously doubt whether the government to be created as a result of the election will be genuinely national ; I seriously doubt [whe]ther the election will lead to the unification of [Ko]rea." অর্থাৎ 'এই নির্ব্বাচনের ফলে যে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে [তাহা খাঁ]টি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হইবে কি না সে সম্বন্ধে আমার [গুরুতর] সন্দেহ আছে। এই নির্ব্বাচনের ফলে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠ[ন হইবে কিনা সে সম্ব]ন্ধেও আমি সন্দিহান।'

কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ ও নিরাপত্তা পরিষদ—

নিরাপত্তা পরিষদ যে অত্যন্ত অশোভন দ্রুততার সহিত [কো]রিয়া সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা ক[রিবার পূ]র্ব্বে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সন[দের বি]ধান ভঙ্গ করা হইয়াছে কি না, তাহাই প্রথমে আলোচনা করা [প্রয়ো]জন। [illegible] কি কি করিতে পারেন, তাহা সনদের [illegible] হইতে

৩২ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ৪২নং ধারায়। কিন্তু সনদের ২৭(৩) ধারায় বলা হইয়াছে, "Decision of the Security Council on all matters other than procedure shall be made by an affirmative vote of seven members including the concurring votes of the permanent members." অর্থাৎ 'কার্য্যবিধি সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্ত সমস্ত বিষয়েই সাতটি ভোট দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং এই সাতটি ভোটের মধ্যে স্থায়ী সদস্যদের সকলেরই ভোট দেওয়া আবশ্যক।' নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে রাশিয়া অনুপস্থিত থাকায় সনদের ২৭(৩) ধারা ভঙ্গ করা হইয়াছে। রাশিয়ার এই অনুপস্থিতির জন্য দায়িত্ব কাহার, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে। চীনের জনগণের পক্ষে কোন কথা বলিবার বা কাজ করিবার কোন অধিকারই উদ্বাস্তু কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের নাই। অথচ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রভাবের দ্বারা এই কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। উহারই প্রতিবাদে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতেছে না। রাশিয়া স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বে-আইনী হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদের কতিপয় সদস্য যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অনুগত এবং তাহারা যে তাহার পক্ষেই ভোট দিবে এ-সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন সন্দেহ ছিল না। এই জন্যই নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের পূর্ব্বেই আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করে। নিরাপত্তা পরিষদের যে-সকল সদস্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়াছেন, তাঁহারা কার্য্যতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকেই বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান্ নীতি বলিয়া প্রচার করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। নিরাপত্তা পরিষদে যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত না হইত, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দানে বিরত থাকিত কি না, এই প্রশ্নও উপেক্ষার বিষয় নয়। ভারত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুমোদন করায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আরও একটা মস্ত সুবিধা হইয়াছে। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপ এশিয়ার একটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পশ্চিমী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বলিয়াই গণ্য হইত যদি ভারত এই প্রস্তাব অনুমোদন না করিত। নিরাপত্তা পরিষদ যুগোশ্লাভিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, উত্তর কোরিয়াকে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে সুযোগ দেওয়া হইল না। উত্তর কোরিয়ার গবর্ণমেণ্টকে নিরাপত্তা পরিষদ আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া মানিতে রাজী না হওয়া সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ কে আক্রমণকারী, তাহা স্থির করিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এবং কোন প্রমাণ না পাইয়াই নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করেন এবং তাহার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া হইতে সরাইয়া লইবার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু কাশ্মীরের বেলায় আমরা দেখিয়াছি উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় নাই এবং কাশ্মীর হইতে সৈন্য সরাইয়া লইবারও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিতেও তাঁহাদের বাধে নাই।

উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে। জেনারেল ম্যাকআর্থার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে সমর-অধিনায়ক-রূপে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালন করিতেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নাম ও পতাকার অপব্যবহার ইহা অপেক্ষা আর কিছু হইতে পারে না। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পোষাক পরিয়া অগ্রসর হইতে দিয়া নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেই মরণাঘাত হানিয়াছেন।

কোরিয়া ও আমেরিকা—

উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ বিমান ও নৌবহর দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে নিয়োগ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়ায় এবং অতঃপর মার্কিণ স্থলবাহিনীও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করায় দক্ষিণ কোরিয়া যে মার্কিণ উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি ইহাকে পুলিশী কর্ম্মতৎপরতা (Police action) বলিয়া অভিহিত করায় এই ধারণাই আরও সুদৃঢ় হইয়াছে মাত্র। কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস দক্ষিণ কোরিয়া পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে (১৯শে জুন ১৯৫০) তিনি বলিয়াছিলেন, "South Korea will never be alone as long as it continued to play a worthy part in the fight for human freedom." অর্থাৎ 'দক্ষিণ কোরিয়া যে-পর্য্যন্ত মানুষের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া একাকী থাকিবে না।' মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম বলিতে তিনি যে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বুঝাইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু আমেরিকাবাসীর দৃষ্টিতে মার্কিণ মূলধন রক্ষার সংগ্রামই যে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জনসন জাপান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন, "America must do—and I am sure, will do—all things necessary in the Far East for the security of the United States and peace in the world." অর্থাৎ 'পৃথিবীর শান্তি এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সুদূর প্রাচ্যে যাহা কিছু করিবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহা করিবেই।' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা, পৃথিবীর শান্তি এবং কম্যুনিজম নিরোধের নাম করিয়া আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যে তাহার সাম্রাজ্য বহাল রাখিতে এবং আরও প্রসারিত করিতে [illegible]। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান শুধু কোরিয়ার যুদ্ধেই নামেন নাই, [illegible]

প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিবেন। ইন্দোচীনের বাও দাই ...কেও সাহায্য দিবেন।

...পানকে ঘাঁটি করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সহিত ...রিতেছে। কিন্তু এই যুদ্ধে জাপানকে ঘাঁটি করিবার অধিকার ... আছে কি না, সে কথা কেহই বিবেচনা করে নাই। ... জাতিপুঞ্জ কি উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ম জা...নকে ঘাঁটি করিবার আদেশ দিতে পারেন?

দক্ষিণ কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ কি... আই সেক বেতার-যোগে কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ... ভেদ করিয়াছেন, তাহা সত্যই চমকপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশে প্রেসিডেণ্ট সিঙ্গম্যান রী উত্তর কোরিয়াকে আ...ণ করিয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট ... যদি বিব্রত করিয়া না তুলিত তাহা হইলে গত বৎসর (১৯...) জুলাই মাসেই দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করিত। এই আক্রমণ আরম্ভ করিবার তারিখ ধার্য্য হই...ল ১৯৪৯ সালের ১৫ই জুলাই। মিঃ কিম আই সেক বলি...ছেন, এই অভিযানের জন্য আয়োজনে তিনিও প্রত্যক্ষ অং... করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, মার্কিণ বিমান ও নৌ...বহর এবং জাপান হইতে স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনীর সাহায্য পা... যাইবে এই ভরসাতেই সিঙ্গম্যান রী ২৫শে জুন তারিখে উত্... কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

... কোরিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য উত্তর কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট এ... প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় ... আক্রমণের আয়োজনকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই উত্তর কোরি... আপোষ-আলোচনা করিবার ভান করিতেছিল, তাহা হই... কোরিয়ার সমরায়োজনের কথা দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জানিত না তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। দক্ষি... কোরিয়াস্থিত আমেরিকার রাষ্ট্রদূতাবাসের কর্ত্তারা এবং মার্কিণ সামরিক মিশন উত্তর কোরিয়ার সমরায়োজনের কথা জানিতেন ... গবর্ণমেণ্টের সহিত এ-সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি... আলোচনার ফলাফল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জানানও হইয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রী গবর্ণমেণ্টকে এই আশ্বাসও দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বাধি... জাপানস্থিত বিমান ও নৌবহর দ্বারা দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করা ...। বস্তুতঃ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সাহায্য দানের প্রাথমিক পরি... পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছিল এবং ঐ পরিকল্পনা জেনারেল ম্যাক-আর্থ... নিকট পাঠাইয়া এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, আদেশ পাও... এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য তিনি যেন প্রস্তু... থাকেন। কাজেই নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মার্কিণ ...রাষ্ট্র কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করা সম্ভব ... কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাধিলে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করি... সিদ্ধান্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আগেই করিয়া রাখিয়াছিল।

দক্ষি... ও উত্তর কোরিয়া—

... হইতে রীতিমত প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রারম্ভেই দক্ষিণ ...রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটিল কেন, এই প্রশ্নও উপেক্ষার বিষয় নয়। রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিয়াছে এবং সামরিক সাহায্যও দিয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও নিশ্চেষ্ট ছিল না। মার্কিণ সামরিক মিশন দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যদিগকে যুদ্ধ শিখাইয়াছে। আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়াছে ১০ কোটি ডলার। তথাপি উত্তর কোরিয়ার আক্রমণের সম্মুখে মার্কিণ সামরিক মিশন কর্ত্তৃক শিক্ষিত, মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী বিপর্য্যস্ত হইল কেন? এণ্ড্রুরথকে কিম কু বলিয়াছিলেন, "one of the reasons I do not want to see a civil war is because I am sure the North Korean is stronger." অর্থাৎ যে-সকল কারণে আমি গৃহযুদ্ধ চাই না তন্মধ্যে একটি কারণ এই যে, উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী যে অধিকতর শক্তিশালী, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।' তাঁহার উক্তি যে কিরূপ সত্য তাহা নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। উত্তর কোরিয়ার শক্তির উৎস কোথায়? দক্ষিণ কোরিয়ারই বা দুর্ব্বলতার কারণ কি?

এণ্ড্রুরথ কম্যুনিষ্ট তো নহেনই, বামপন্থীও নহেন। তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উৎপাদন-ব্যবস্থার পুনর্গঠনে উত্তর কোরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। উহার কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ১৯৪৪ সালের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, উত্তর কোরিয়া প্রথমেই ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে মন দেয়। বড় বড় জমিদারীগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া সমস্ত জমি সাত লক্ষ কৃষক-পরিবারের মধ্যে

বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাপানী আমলে ইহাদের অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর। ভূমি-ব্যবস্থার এই আমূল সংস্কারের ফলে অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই উত্তর কোরিয়া ছাড়িয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় আশ্রয় লইয়াছে বটে, কিন্তু খাদ্যসম্পর্কে উত্তর কোরিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়া জাপানী জমিদারদের জমিদারীর বিলোপ করিয়াছে বটে, কিন্তু জমিদার-প্রীতির জন্য জমিদারী বিলোপের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে দক্ষিণ কোরিয়াই ছিল কোরিয়ার শস্যাগার। আজ আর তাহার সে গৌরব নাই। কোরিয়ার উত্তর অঞ্চল পূর্ব্ব হইতেই শিল্পপ্রধান। উত্তর কোরিয়া গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় শিল্পোন্নয়ন কার্য্য কৃষি-উন্নয়ন অপেক্ষাও অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। উত্তর কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও সুদৃঢ়। উত্তর কোরিয়া হইতে দশলক্ষেরও অধিক লোক দক্ষিণ কোরিয়ায় চলিয়া গিয়াছে। সে তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়া হইতে অল্পসংখ্যক লোকই উত্তর কোরিয়ায় গিয়াছে। কিন্তু উত্তর কোরিয়া হইতে যাহারা দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়াছে, তাহারা জমিদার, ব্যবসায়ী এবং দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবী। দক্ষিণ কোরিয়া হইতে বামপন্থী শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা উত্তর কোরিয়ায় গিয়াছে। এই ভাবে উত্তর কোরিয়ায় গঠিত হইয়াছে সুদৃঢ় সামরিক শক্তির ভিত্তি।

উত্তর কোরিয়ার সৈন্যরা যে উৎকৃষ্ট সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহা মিঃ পিটার ক্যালিস্‌চারের (Mr. Peter Kalischer) উক্তি হইতেই বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "American military advisers who trained the South Korean Army woefully underestimated both equipment and training of enemy." অর্থাৎ 'দক্ষিণ কোরিয়া সেনাবাহিনীর মার্কিণ সামরিক উপদেষ্টাগণ শত্রুপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত ভুল ধারণা করিয়াছিলেন।' উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদিগকে তিনি 'bold and tenacious'—সাহসী এবং সহনশীল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উত্তর কোরিয়ার পদাতিক সৈন্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "The fighting calibre of this infantry is good." অর্থাৎ 'এই পদাতিক সেনাবাহিনীর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ভাল।' জনৈক মার্কিণ সৈনিক তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "We shoot them down and they just keep coming without bothering to duck." অর্থাৎ 'আমরা তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিতেছি, কিন্তু তাহারা উহাকে একটুকুও আমল না দিয়া অগ্রসর হইতেই থাকে।' কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যরা এইরূপ সাহস, দৃঢ়তা ও যুদ্ধক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। তাহাদের মনোবলেরও যে অভাব, তাহাও বুঝা যায়।

দক্ষিণ কোরিয়ার রী গবর্ণমেণ্ট জনপ্রিয় নহেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিতে এই গবর্ণমেণ্ট শুধু দমননীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনৈক ব্যক্তি মিঃ এণ্ড্রুথকে বলিয়াছিলেন যে, "পুলিশের অত্যাচার জাপানী আমল অপেক্ষাও বেশী। যাহাকে তাহারা পছন্দ করে না, তাহাকেই তাহারা কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া জেলে পুরিয়া থা‌ক। জাপ-শাসনের আমলে পুলিশের সংখ্যা যাহা ছিল, রী গবর্ণমেণ্টের আমলে তাহা অনেক বেশী বাড়িয়াছে। বন্দীর সংখ্যাও জাপ-শাসনের সময় অপেক্ষা বহু গুণে বেশী। খুশী মত যে-কোন লোককে গ্রেফতার করা হয় এবং হেবিয়াস কর্পাস বলিয়া কোন কিছু দক্ষিণ কোরিয়ায় নাই। কম্যুনিষ্ট সন্দেহে প্রায় ২ হাজার শিক্ষকের চাকুরী গিয়াছে। পুলিশের নিপীড়ন সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কিছু বলিবার উপায় নাই। পুলিশের নিপীড়নকে সংবাদপত্রে 'severly examined' বা 'severe examinition' বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিপীড়ন এড়াইবার

জাপান-জয়ী জেনারেল ডগলাস ম্যাকার্থার

জন্য অনেকে বহু নির্দোষ লোককে জড়িত করিয়াও স্বীকারোক্তি করিতে দ্বিধা করে না। পুলিশই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেক কৃত্রিম বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের তিন জন নেতাকে উত্তর কোরিয়ার সহিত সংযোগ স্থাপনের অপরাধে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। যে-লোকটির সহিত তাঁহারা আলাপ করিয়াছিলেন সে নিজেকে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয়। পরে বুঝিতে পারা যায় লোকটি এজেণ্ট প্রোভোকেটর। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিয়া ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার পক্ষে ৮৮টি এবং বিপক্ষে ১৫টি ভোট হয়। যাঁহারা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কম্যুনিষ্ট বলিয়া গণ্য করা হইবে বলিয়া ভয় দেখানো হইয়াছিল। মিঃ এণ্ড্রুথ গত অক্টোবর মাসে (১৯৪৯) লিখিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী তিন মাসে ৩০ জন সাংবাদিক এবং জাতীয় পরিষদের সহকারী সভাপতি সহ ৩০ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইরূপ দমননীতি সুদৃঢ় সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি হইতে পারে না। ইহার উপর জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি তো আছেই। দমননীতি এবং আর্থিক দুর্গতি জনগণ রী গবর্ণমেণ্টের প্রধান দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। যুদ্ধের গতি দেখিয়া মনে হয়, উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিতেছে।

পাক-ভারত চুক্তির জের

৯ই আষাঢ় পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় আসিয়া বলিলেন যে, চুক্তির ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষ জনক হইয়াছে। যদি এই উক্তির উদ্দেশ্য এই হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এই চুক্তি ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের ইহাতে সম্পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। কিন্তু এখানে চুক্তির পূর্ব্বেও সংখ্যালঘুরা নিরাপদে ও নির্ভয়ে বাস করিতেছিলেন। দিল্লী চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের ধন-প্রাণ মান-মর্য্যাদা নিরাপদ করা। সেই উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। তিনি সে বিষয়ে কোন খোঁজ-খবর না লইয়াই, কলিকাতায় পৌছিয়াই বলিয়া উঠিলেন যে, চুক্তির ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষ জনক হইয়াছে। জনসাধারণের বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইবার কথা বই কি!

দিল্লী চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর হইতে অর্থাৎ ৯ই এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক মাস একুশ দিনে মোট ১১৩২টি হিন্দু নির্য্যাতনের ঘটনা পূর্ব্ববঙ্গে ঘটিয়াছে। যে খবর আমরা পাকিস্তানী লৌহ যবনিকা ভেদ করিয়া পাই, তাহা শতকরা দশ ভাগেরও কম। এই সংখ্যার মধ্যে নারীহরণ ও ধর্ষণ ৪৬টি, নরহত্যা ৪৫টি এবং ডাকাতি ৩৩৯। পণ্ডিত নেহরু এইগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। যেন-তেন-প্রকারে তিনি চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ করিতে উদ্গ্রীব।

"চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তবে কেন আপনারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিতেছেন"—এই কথার উত্তরে এক জন উদ্বাস্তু বলেন—"মশায়, সখ করিয়া কি পথের ভিখারী হইতে আসিয়াছি? দেশে সর্ব্বত্র চুরি, ডাকাতি দাঙ্গা ও রাহাজানি বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুপাড়ায় হইতেছে। থানায় খবর দিলে প্রতীকার হয় না। উল্টে আনসার বাহিনী আসিয়া শাসায় বা মার-ধর করে। আর তাহাদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হইবে বলিয়া দাবী করে।" আর এক জন উদ্বাস্তু বলেন,—"যেখানে রাত্রে বয়স্থা কন্যাকে আত্মীয়দের বাড়ী পাঠাইয়া ভোরে ফিরাইয়া আনিতে হয়, সেখানে অবস্থা ভাল বলিয়া বক্তৃতা দেওয়া চলে। 'পাকিস্তানের অবস্থা ভাল,—সেখানে আপনারা ফিরিয়া যান' ইত্যাদি সদুপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে স্ত্রী-কন্যা সহ পাকিস্তানের কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়া কিছু কাল বাস করিয়া আসুন, তার পর কিরূপ বক্তৃতা দেন দেখা যাইবে।" নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে আশান্বিত হইয়া জনৈক উদ্বাস্তু দেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। বেণীপুর (পাকিস্তান সীমানা) পুলিশ-ফাঁড়িতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া সমুদায় অর্থ সেখানকার পুলিশ নায়েক ছিনাইয়া লয়। অশ্লীল গালাগালি দিয়া থানার লোকেরা বলে যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের কোন স্থান নাই। তোমরা পাকিস্তানে প্রবেশ করিলে বাঁধিয়া চালান দিব।

চুক্তির পরও পূর্ব্ববঙ্গে নারী-ধর্ষণ পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। বরিশালের কনকদিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেডিক্যাল অফিসারের অষ্টাদশবর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা সতীরাণীকে ১৬ই এপ্রিল রাত্রে দুর্বৃত্তেরা বলপূর্ব্বক লইয়া যায়।

২৯শে এপ্রিল কুমারখালির জনৈক মজুমদারের বিংশবর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা দেবীরাণী কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়। এই ব্যাপারে স্থানীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডেরও সভাপতি। তিনিই এই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে চান।

১৫ই মে ঝিকরগাছা থানার বোধখানা গ্রাম হইতে একটি ১৫ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বালিকাকে অপহরণ করা হয়। পরে এক জঙ্গলে তাহাকে পাওয়া যায়। বালিকাটি এক জন অপরাধীকে চিনিতে পারে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইলে আসামী বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই।

২৫শে মে রাত্রে ফরিদপুর জেলার কাগদিয়া গ্রামে স্থানীয় মুসলমানরা জনৈকা হিন্দু বিধবাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এক জন মুসলমানের সহিত নিকা বিবাহ দেওয়া হয়।

৮ই জুন ধনগ্রামের কেদার দাসের বাড়ীতে কতিপয় মুসলমান হানা দেয় এবং ১৩ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। উক্ত তারিখে ধানকুরিয়া-নিবাসী জনৈক গাঙ্গুলীর অবিবাহিতা কন্যাকে কতিপয় মুসলমান ছিনাইয়া লইয়া যায়।

১০ই জুন রাজসাহীর অন্তর্গত তাহার এক হিন্দু-বাড়ীতে মুসলমানরা হানা দেয় এবং গৃহস্বামীর পত্নীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটিকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হয়। একই তারিখে ফরিদপুর গোয়ালন্দ ঘাটের জনৈক চৌধুরীর লীলা নাম্নী ৯ বৎসরের একটি বালিকাকে ৪ জন মুসলমান অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

১১ই জুন গাটিহাটার দুই জন হিন্দুনারীকে হরণ করা হয়। উক্ত তারিখে পশ্চিম-বঙ্গে আগমনের সময় এক হিন্দু-পরিবারের উপর মুসলমানরা আক্রমণ করে। তাঁহাকে ও তাঁহার একটি কন্যাকে হত্যা করিয়া অপর একটি কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। একই তারিখে কয়েক জন মুসলমান ময়মনসিং-এর অন্তর্গত এক গ্রামে এক হিন্দু-পরিবার গৃহে হানা দেয় এবং গৃহস্বামীর যুবতী পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার উপর পাশবিক

অত্যাচার করে। পরদিন তাঁহাকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

পাবনা জেলা হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক অত্যাচারিত বহুসংখ্যক হিন্দুনারী পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। পাশবিক অত্যাচার করার পর দুর্বৃত্তগণ মহিলাদের বিভিন্ন রাস্তার পার্শ্বে ফেলিয়া যায়।

দিনাজপুর গ্রামে সশস্ত্র মুসলমান জনতা কর্তৃক হিন্দু-গৃহ আক্রান্ত হয়। মুসলমানগণ বাড়ীতে ঢুকিয়া তিন জনকে প্রথমে রাম-দা দিয়া কাটিয়া ফেলে। পরে এক জন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেটে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসব হইয়া যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়।

ছয়না গ্রামের চাটুজ্জেদের বাড়ীতে দুর্বৃত্তগণ হানা দিয়া হুমকি দেয় যে, বাড়ীর কন্যাদের মুসলমানদিগের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। বাড়ীর লোকজন ইহাতে অসম্মতি জানাইলে দুর্বৃত্তরা হামলা চালায় এবং জিনিষ-পত্র লুঠ করিয়া লইয়া যায়।

১৮ই মে বরিশালের মোড়াকাঠি গ্রামে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মুসলমান দুর্বৃত্তগণ জনৈক চন্দের গৃহে দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং উক্ত চন্দের মস্তকে রাম-দা দিয়া আঘাত করে। ফলে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। প্রকাশ, ইত্যবসরে দুর্বৃত্তরা পর-পর তাঁহার স্ত্রীর উপর পাশবিক ও নৃশংস অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটি পর-দিবস অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মারা যান। থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই।

১৬ই জুন পাবনা জেলার বেরা গ্রামে রাত্রি ১২টার সময় ৫ জন মুসলমান দুর্বৃত্ত স্থানীয় এক হিন্দু ডাক্তারকে রোগী দেখিবার অছিলায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া আটক করে। পরে আরও তিন জন মুসলমান তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলে যে, ডাক্তার বাবু অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত চলিয়া আসেন। দুর্বৃত্তগণ তাঁহাদের উভয়কে একত্র রাখিয়া বলেন যে, তাহাদের এক জনের সহিত তাঁহাদের ১৭ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। মৃত্যু-ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের সম্মতিদানে বাধ্য করে। পরদিবস বিবাহ হইয়া যায়। তাহার পরের দিন মেয়েটি তলপেটে ভীষণ যাতনা অনুভব করাতে তাহার পিতা (ডাক্তার বাবু) আসিয়া তাহাকে এক ডোজ বিষ খাওয়াইয়া দেন। ফলে তাহার মৃত্যু হয়। বাড়ী ফিরিয়া ডাক্তার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

হাজিপুর গ্রামের জনৈক মণ্ডল বাস্তভিটা ছাড়িয়া স্ত্রী ও কন্যা সহ কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন। ষ্টীমার-ষ্টেশনে যাইবার পথে মুসলমান গুণ্ডার দল উক্ত মণ্ডলকে নিহত করে এবং স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া উধাও হয়।

এইরূপ খবর অনেক আছে, অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। চুক্তি যে কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছে, এই সকল ঘটনা হইতেই তাহা বুঝা যায়। দিল্লী চুক্তি না হইলে এক আঘাতেই হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত; চুক্তির ফলে ধীরে ধীরে জ্বলিয়া-পুড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইতেছে। এই যা পার্থক্য! ইউনাইটেড প্রেসের [illegible] বর্ণনায় বলিয়াছেন,—অপরাধের সংখ্যা সেখানে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সংখ্যালঘুদের নারীরা অপহৃতা ধর্ষিতা হইতেছে; তাহাদের [illegible] ডাকাতি, খুন, জখম লুঠ-পাট হইতেছে; বিনা বাধায় গাছের [illegible], পুকুরের মাছ চুরি চলিয়াছে। অল্পসংখ্যক হিন্দু এখনও পূর্ব্ব-পাকিস্তানে আছে, তাহাদের তাড়াইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট। 'পূর্ব্ববঙ্গ যে [illegible] মুসলমানদের জন্য' এই ইসলামী প্রচার-কার্য্যে মোল্লা ও মৌলবীদের কোন বিরাম নাই। হিন্দু-মেয়েরা পথে-ঘাটে বাহির হইতে পারে না। এমন কি, ছোট ছোট মেয়েরা স্কুলে পর্য্যন্ত যাইতে পারে না।

এইবার বাণিজ্য-চুক্তির কথা আলোচনা করা যাক। [illegible] চুক্তি ইহার অন্যতম। এই চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল যে, পাকিস্তান ১,৪০০,০০০ মণ পাট ভারতে রপ্তানী করিবে; কিন্তু পাকিস্তান সে কথা রাখে নাই। ৩১শে মে পর্য্যন্ত মাত্র ৫০০,০০০ মণ পাট রপ্তানী করা হইয়াছিল। কেবল পাট নহে, পাকিস্তান হইতে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের রপ্তানী স্থগিত হইয়াছে। এমন কি মাছ, তরি-তরকারী পর্য্যন্ত আসিতেছে না। অথচ ভারত হইতে পাকিস্তানে পণ্য রপ্তানীর কোন বাধা নাই।

বাস্তত্যাগীর আগমনও কমে নাই; গড়ে এখনও প্রতিদিন ছয় হাজার বাস্তত্যাগী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে যে-সকল বাস্তহারা চুক্তির ভরসায় সাহস সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারাও আবার ফিরিয়া আসিতেছে। হিন্দু-বাস্তহারাদের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে পরিত্যক্ত বাস্তবাটী এবং ক্ষেতী জমি ও [illegible] স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে পুনর্দখল পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

এই সকল ঘটনাবলী হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে জিত হইয়াছে মিঃ লিয়াকৎ আলির কূটবুদ্ধির এবং লাভ হইয়াছে পাকিস্তানের। পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক ভাঙ্গনের মুখে মিঃ লিয়াকৎ আলি এই চুক্তির [illegible] লইবার অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ সফরে নিজেদের কাজ গুছাইতে গমন করিলেন। মার্কিণ রাষ্ট্র এবং কানাডা হইতে কি পরিমাণ অস্ত্র আমদানী পাকিস্তান করিতেছে, ভাগ্যক্রমে তাহা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জগদ্বাসী জানিতে পারিল। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া পাক-প্রধান মন্ত্রী যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, কাশ্মীর না পাইলে চুক্তি পাকিস্তানের কাছে মূল্যহীন। কাশ্মীর পাইবার জন্য এবং তাহার [illegible] জন্যই এই চুক্তি।

পাকিস্তান কর্তাদের মতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দ্দশা [illegible] করা এই চুক্তির উদ্দেশ্য নয়। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে [illegible] মনে হয়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ঠিকই বলিয়াছেন,—"[illegible] রাষ্ট্রের ইসলামী নীতি ধ্বংস করিতে হইবে কিংবা সরকারী [illegible] ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সমেত লোক ও সম্পত্তি বিনিময় করিতে [illegible]। এই দুইটি ব্যবস্থাই যদি ব্যর্থ হয়, তবে এক কোটি কুড়ি [illegible] হিন্দুর জীবনরক্ষার্থে ভারত সরকারের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ [illegible] ভীত হওয়া উচিত নয়।"

উদ্বাস্তুদের উপর গুলীবর্ষণ

১ই আষাঢ় শনিবার রাত্রে পুলিশ দুই বার কুপার [illegible] উদ্বাস্তুদের উপর এবং ১০ই আষাঢ় রবিবার প্রাতে এক বার [illegible]

...র একটি গ্রামে গুলীবর্ষণ করে। শনিবার রাত্রে কুপার ... জনৈক উদ্বাস্তু রমণী কল হইতে জল আনিতে গেলে দুই জন ... তাহার সহিত অসদ্ব্যবহার করে। ইহার প্রতিবিধানের ... পরে এক দল উদ্বাস্তু রেল-কর্ম্মচারীদের বাসা আক্রমণ ... পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলীবর্ষণ করে। ... কেহ আহত হয় নাই। রবিবার প্রাতে এক গ্রামের ... পাশের গ্রাম আক্রমণ করিতে গেলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে।

পশ্চিম-বঙ্গে খাদ্য-সঙ্কট

পশ্চিম-বঙ্গে বিরাট খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। কেন্দ্র হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না, কারণ ভারতেও রহিয়াছে ভীষণ খাদ্য-সঙ্কট। বহু দিন ধরিয়াই শুনা যাইতেছে যে, খাদ্য-শস্য বিষয়ে ... সম্পূর্ণ হইবে। অধিবাসীরা না খাইয়া মরিবার পর ... সমস্যা আপনা হইতেই দূর হইয়া যাইবে।

পশ্চিম-বঙ্গের এই খাদ্য-সঙ্কটের কারণ প্রধানতঃ চারিটি ; (১) ... একর ধান-জমির ৪ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপাদন ; (২) মুসলমান বাস্তুত্যাগী কর্ত্তৃক ৩'৫৬ লক্ষ একর জমি পরিত্যাগ ; (৩) ...বঙ্গ হইতে ত্রিশ লক্ষাধিক আশ্রয়প্রার্থীর আগমন ; (৪) অতিবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট

... আষাঢ় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক বিশেষ অধিবেশনে ডাঃ মেঘনাদ সাহা ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট উপস্থাপিত ... বাজেটে ২২ লক্ষ ১৫ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা ঘাটতি ... হইয়াছে। সাধারণ ফি আদায় খাতে ধরা হইয়াছে ৪১,... টাকা এবং ব্যয় ৪১,০০,... টাকা, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ৬,... টাকা। পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাদান তহবিলে ১৮.৯২,৪১২ ... পড়িবে। উক্ত তহবিলে আয় ধরা হইয়াছে ১১,... টাকা এবং ব্যয় ৩০,৩৪,৯৬৫ টাকা।

... প্রভৃতি কালে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেন ... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাটতি চলিতে থাকায় এবং ঘাটতি ... পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় যথোচিত আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা ... আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থার তদারক প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ৩ জন সদস্য লইয়া একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন ... নীয়। সদস্যগণ সেনেটের সদস্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিবেন না। এই ... বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া আর্থিক পরিচালনা ব্যবস্থার তদারক করিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া ... টি গঠিত হইয়াছে :—(১) স্যর জে সি ঘোষ, ডিরেক্টর টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, হিজলী ; (২) এস কে মুখার্জ্জী, পশ্চিম সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা অথবা কে কে হাজরা, আই-সি-এস ; (৩) এক জন অবসরপ্রাপ্ত একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল। ... ব্যক্তি বেতনপ্রাপ্ত ফিনিন্সিয়াল এডমিনিষ্ট্রেটর হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

পশ্চিম-বঙ্গের উপর প্রতিক্রিয়া

পশ্চিম-বঙ্গে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। চাকরীপ্রার্থীরা জানান যে, প্রত্যেক সরকারী এবং বেসরকারী অফিসে উদ্বাস্তুদের সুযোগ দিতে গিয়া পশ্চিম-বঙ্গের যুবকেরা চাকরী পাইতেছেন না। ব্যবসা এবং লাইসেন্স ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা। এমন কি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জেও পশ্চিম-বঙ্গের যুবকদের দাবী কোণঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে। উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার দাখিল। এখানকার লোকেরা বহু দিন এক বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, কিন্তু এখন অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রেশন বরাদ্দ ক্রমেই কমিয়া চলিয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এক অসহনীয় অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া অতি ভয়ানক হইতে পারে। অবিলম্বে পশ্চিম-বঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাবধান হওয়া এবং এই অবস্থাকে উন্নততর করিবার চেষ্টা করা উচিত।

যতীন্দ্রকুমার দেবের আত্মাহুতি

"অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহে"—উভয়েই অপরাধী। কংগ্রেসের অপরাধে ভারত বিভক্ত হইয়াছে এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা। পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে হিন্দু নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেও হিন্দু নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। সেখানকার সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুদের অমানুষিক অত্যাচার আজ সর্ব্বজনবিদিত। কংগ্রেস সরকার তাহাদের রক্ষা করেন নাই অথবা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ফল একই হইয়াছে। তাহারা ধনে-প্রাণে মরিতে বসিয়াছে। ধর্ম্ম, মান, ইজ্জৎ ধূলিসাৎ হইতেছে। সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুরা কোন দিনই কিছু করিতে পারে না, যদি তাহারা সরকারী সাহায্য না পায়। পাকিস্তান সরকার সে সাহায্য তো দেনই নাই, বরং সংখ্যাগুরুদের অত্যাচারের সাহায্য করিয়াছেন। ফলে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা নীরবে শত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। কিন্তু ইহাও পাপ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও। ন্যায়ের বর্ম্ম-পরিহিত ব্যক্তি নীরবে অন্যায় সহ্য করিতে পারে না। সে প্রতিবাদ করিবেই। এমন কি নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখেই। এই ধরণের লোক ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রকুমার দেব। শ্রীহট্ট জেলার বাজনগর থানার একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসারদাচরণ দেবের বাটী হইতে দুই জন মুসলমান যুবক জোর করিয়া বাঁশ কাটিয়া লইয়া যাইতেছিল। যতীন বাবু তাহাতে বাধা দেন। মারপিটের ফলে যুবকদ্বয় আহত হইয়া চলিয়া যায়। পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ত্রিশ জন মুসলমান আসিয়া যতীন বাবুকে আক্রমণ করে। যতীন বাবু একা তাহাদের মহড়া লইয়া ভাগাইয়া দেন। অতঃপর তিন শত অস্ত্রধারী মুসলমান আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি তাহাতেও ভীত না হইয়া একা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন। তখন দু'-এক জন যুবক সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে। এই অসমান যুদ্ধের ফলে যতীন বাবু নিহত হন। এক জনের বিরুদ্ধে তিন শত লোকের যুদ্ধ কাপুরুষতা, মনুষ্যত্বহীন বর্ব্বরতা। কিন্তু ইহা ছাড়া আমরা পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগুরুদের নিকট কি আশা করিতে পারি ?

যতীন বাবুর মৃত্যু বীরের মৃত্যু। কিন্তু ভারতের দিক দিয়া ইহা অতি লজ্জার মৃত্যু। ভারত সরকারের অক্ষমতাই এই বীরের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সংখ্যাবলে বলীয়ান্ গুরু সম্প্রদায় বেপরোয়া। সরকারী সাহায্য তাহাদের দিকে। এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নিজের সম্মান নিজের হাতেই রক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর ঘরে ঘরে যদি আজ যতীন বাবুর অভ্যুদয় হয় তবেই সমস্যার সমাধান হইবে, হিন্দুরা পূর্ণ এবং সম্মানজনক নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারিবে। ভারত সরকারের নিকট হইতে প্রতিকারের আশায় হাত-পা গুটাইয়া থাকিলে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

শ্রীহেমন্তকুমার বসুর কংগ্রেস ত্যাগ

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের সম্পাদক শ্রীহেমন্তকুমার বসু এম-এল-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "কংগ্রেসের ভিতর হতেই আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, জনসাধারণের সহিত কংগ্রেস-নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহা দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন-তখন যে কৃষক-মজুর-প্রজারাজের আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণ মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য করা হয়।" নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, "এই ব্যাপারেও নেহরু সরকার ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে আমি উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। মার্কিণ এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের ইঙ্গিতে পণ্ডিত নেহরু ভারত-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান অনুন্নত ও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র। এই গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছে। আজ বৃটিশ চলিয়া যাইবার পর তাহারা আমাদের ঘরের কাছে একটি পৃথক্ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে—যাহাতে বৃটিশ সরকারের ইচ্ছানুযায়ী আমাদের অস্তিত্বের মূলে আঘাত করা সম্ভব হয় এবং বৃটেনের খুশীমত আমাদের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ তোষণ-নীতি শেষ পর্য্যন্ত কাশ্মীর বিভাগে পর্য্যবসিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার বিবৃতিতে ভারত কর্ত্তৃক কোরিয়া সম্পর্কে উনোর প্রস্তাব সমর্থনেরও প্রতিবাদ করেন। উপসংহারে তিনি বলেন যে, "অতঃপর নেতাজীর আদর্শ ও কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইবে।" শ্রীযুক্ত বসু পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের সম্পাদক পদেও ইস্তফা দিয়াছেন।

শুভ-বিবাহ

সম্প্রতি লালগোলা রাজ-পরিবার দুইটি বিবাহে লালগোলাধিপতি রাজা রাও শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছেন। লালগোলা রাজ-পরিবার উত্তর প্রদেশাগত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। গত ২৪শে মাঘ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ [illegible] প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রে [illegible] হিত দিয়াছেন, এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার বীরেন্দ্রনারা[illegible] [illegible] সহিত নদীয়ার মহারাজা ৺ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের দৌহিত্রী এবং [illegible] রাজবাটীর ৺কুমার রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা [illegible] শ্রীমতী প্রণতি দেবীর সহিত গত ৭ই বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া দিনে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা নবদম্পতীর অক্ষয় মিলন কামনা করি।

লালগোলাধিপতির পুত্র এবং পুত্রবধূ

পরলোকে কৃষ্ণলাল বাগচী

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ সাল (ইং ৩রা জুন ১৯৫০) শনিবার প্রাতে কৃষ্ণলাল বাগচী মহাশয় তাঁহার ৭ নং চৌরঙ্গী টেরেসের ভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি [illegible] ১২৮২ সালে [illegible] বিখ্যাত বাগচী-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অতিশয় মেধাবী ও পরি-শ্রমী ছিলেন। [illegible] কলেজ হইতে [illegible] পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্র[illegible] কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠা[illegible] সামান্য পদে নিয়োজিত হ[illegible] ডিপার্টমেণ্টে অ[illegible] পদে উন্নীত হইয়া চা[illegible] অবসর গ্রহণ করেন। [illegible] খেলাধূলায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং বিখ্যাত [illegible] ক্লাব-সংগঠনে তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। শ্রীরামপুরের [illegible] গোস্বামীর কনিষ্ঠা কন্যা ও স্বর্গীয় রাজা কিশোরীলাল গো[illegible] পৌত্রী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণলাল বা[illegible] নীরব কর্ম্মী ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

দি গ্লোব নার্শারী

প্রদর্শণী গৃহ-কলেজষ্ট্রীট মার্কেট (টাওয়ার ব্লক)

—গ্লোব নার্শরীর উৎকৃষ্ট বীজ—

—সবে মাত্র আমদানী হইয়াছে—

নাম	আউন্স
বাঁধাকপি	
গ্লোব গ্লোরী	২॥০
মাউণ্টেন হেড	২॥০
নারিকেলি	২॥০
ফুলকপি	
স্নোবল লেট্	৯৲
স্নোবল আর্লি	৯৲
গ্লোব বেটার	৪৲
প্রাইজকুইন	৩৲
ওয়ালচিরাণ	৩৲
কাশীর জলদি ও নাবি	২৲
ওলকপি	
লাল ও সাদা	১॥০
বীট	
লাল গোল	১॥০
ইজিপসিয়ান	১॥০
ইক্লিপস	১॥০
গাজর	
৯ং অরেঞ্জ	১৵০
অক্সহার্ট	১৵০
রাক্কুসে	১৵০
শালগম	
সাদা	১৲
লাল	১৲
রাক্কুসে	১৲
লেটুস	
বিগবোষ্টন	১॥৵০
টমথাম্ব	১॥৵০
বারমেসে	১॥৵০
লঙ্কা	
চাইনিজ জায়েণ্ট	২৲
পাটনাই	॥০
সূর্য্যমণি	২৲
কামরাঙ্গা	১৲

নাম	আউন্স
মুলা	
বোম্বাই ১নং (সের ১২৲)	॥০
কাঁথির (সের ১০৲)	॥০
লাল লম্বা, সাদা লম্বা	॥০
লাল গোল	১৲
চাইনিজ রোজ	৸০
রাক্কুসে (জাপানি)	১॥০
নেপালের	॥০
রামজিৎ	॥০
মগরী	॥০
বেগুন	
মুক্তকেশী	১৲
কুলি	১৲
বারমেসে	১৲
মাকড়া	১৲
রামনগর	২৲
/৬ সেরা	৩৲
ব্ল্যাক [illegible]উটী	২৲
পেঁয়াজ	
রাক্কুসে	১॥০
আলিরেড	১॥০
বোম্বাই (সের ২০৲)	৸০
পাটনাই (সের ২০৲)	৸০
মটর	
ওলন্দা (সের ৩৲)	৵০
দার্জ্জিলিং („ ৩৲)	৵০
আমেরিকান („ ৩৲)	৵০
বীন ফ্রেঞ্চ	
লাল (সের ৩৲)	৵০
সাদা („ ৩৲)	৵০
হলদে („ ৩৲)	৵০
সয়াবীন	
পুষ্টিকর (সের ৩৲)	৵০

নাম	আউন্স
টম্যাটো এক্সিলেণ্ট	২৸০
ঐ ম্যাচলেশ	৸৵০
ঐ লার্জ্জরেড	৸৵০
ঐ পারফেকসন	২৸০
খরমুজা লক্ষ্ণৌ	॥০
ঐ রাক্কুসে	১॥০
ঐ সর্দ্দা	১॥০
খেঁড়ো বীরভূমের	১৲
তামাক হিংলী	১৲
ঐ মতিহারী	১৲
ঐ আমেরিকান	২৲
তরমুজ রাক্কুসে	১৲
ঐ আইসক্রিম	১৲
ঐ গোয়ালন্দ	॥০
ঐ ভাগলপুর	॥০
পামকিন রাক্কুসে	১॥০
ঐ ক্রুকনেক	১৲
ঐ ম্যামথ কিং	১॥০
রাই চাইনিজ	॥০
পেঁপে রাঁচি	৪৲
ঐ লঙ্কাদ্বীপ	৪৲
ঐ সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্গালোর	৪৲
ঐ বোম্বাই	১৲
ঐ আফ্রিকান ওয়াণ্ডার	৮৲
স্কোয়াস রাক্কুসে	২৲
ঐ ম্যারো	১৲
ঐ বুস	২৲
সিলেরী সাদা, লাল	১।০
সীম আলতাপাটী	॥০
ঐ সবুজ	।০
ঐ সাদা	॥০
ঐ হাতিকান	॥০

নাম	আউন্স
উচ্ছে	॥০
করলা দেশী বড়	১৲
কাঁকুড়	।০
কাঁকড়ি	২
কুমড় মিষ্টি	।০
খেঁড়ে	১৲
গুড়মি (কাচরা)	।০
চিচিঙ্গা	১॥০
চালকুমড়া	।০
ঝিঙ্গা পালা	।০
টেঁপারী	২৲
টেঁড়স	।৵০
ধুন্দুল	॥০
ফুটি	।০
বরবটি	।০
লাউ লম্বা	॥০
লাউ গোল	॥০
শশা পালা	১
ঐ ভুঁয়ে	১
ঐ আমেরিকান	২
শাঁক আলু	॥০
শাক পালম সের ৩ ।	৵০
ঐ ঝাড় পালম	৵০
ঐ টক পালম	১৲
ঐ কাটোয়ার ডাঁটা	১৲
ঐ চাঁপানটে	৸০
ঐ পদ্মনটে	॥০
ঐ লাল শাক	॥০
ঐ কনকানটে	॥০
ঐ পুঁইশাক	॥০
দূর্ব্বা ঘাস	পাউণ্ড ৫॥০
বেড়ার বীজ	পাউণ্ড ৩৲

আলু ও দটল মূলের জন্য আবেদন করুন।

☞ মরশুমী ফুলবীজ ১২ রকম ১২ প্যাকেট—৫৲ টাকা মাত্র।

গ্রাম-যমুনা

৯শ বর্ষ, শ্রাবণ ঃ ১৩৫৭]   সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত   [১ম খণ্ড ঃ ৪র্থ সংখ্যা

ক থা মৃ ত

মানুষ আপনাকে চিন্‌তে পারলে, অন্যকে এবং ঈশ্বরকেও চিন্‌তে পারে।

'আমি' বলে কোনও জিনিস নাই। প্যাজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে প্যাজ বলে আর কোনও জিনিস থাকে না, সেইরূপ "আমি কে" বিচার করে দেখলে, আমি খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষে যা থাকে, তা ঈশ্বর। আমিত্ব দূর হলে ভগবান দেখা দেন।

আমি দু'রকম। এক "কাঁচা আমি" আর এক "পাকা আমি"। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে, আমার স্ত্রী—এই সব কাঁচা আমি। আর, সবই ভগবানের—'আমি তাঁর দাস'—'আমি তাঁর সন্তান' অথবা 'আমি নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ'—এইরূপ যে জ্ঞান, তার নাম "পাকা আমি।"

অভিমান রাবিশের ঢিপি। তার উপর কোনও ফসল হয় না, অহংকারী লোক ধ্যান, জপ ক'রে কোনও ফল পায় না। জ্ঞান-কোদালের দ্বারা রাবিশ সরিয়ে ফেলে, তার পর সাধন ভজন করলে ঈশ্বর দর্শন ঘটে।

অহঙ্কার তমঃগুণ, অজ্ঞান থেকে হয়। অহঙ্কার আড়াল করে আছে বলেই ঈশ্বর দর্শন বা আত্ম-দর্শন ঘটে না।

অহঙ্কার করা ভাল নয়। আমি করছি, আমি কর্ত্তা—এটি অজ্ঞান থেকে হয়, আর ঈশ্বরই কর্ত্তা, তিনিই সব করছেন, আমি—যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী—এ সব জ্ঞান থেকে হয়। যার এইরূপ জ্ঞান হয়েছে তার সংসার-যন্ত্রণা ঘুচে যায়—মুক্তি হয়,—আর ঘুরে-ফিরে কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার—এ রকম সব লোকের জ্ঞান হয় না। এদের যদি বলো যে, অমুক যায়গায় এক জন সাধু আছেন, দেখতে যাবে ?—নানা

ওজর করে বলবে—"যাবার সময় নাই"—আর মনে মনে ভাববে, আমি এত বড় লোকটা—আমি যাবো!

আবার 'বজ্জাৎ আমি' আছে। যদি চোরে তার দশ টাকা চুরি করে, তবে প্রথমে সেই টাকা কেড়ে নেয়, তার পর চোরকে খুব মারে, তাতেও ছাড়ে না, তার পর পাহারাওয়ালা ডেকে তাকে পুলিশে দেয় ও মেয়াদ খাটায়। তখনও 'বজ্জাৎ আমি' বলে, 'বেটা জানে না—আমার দশ টাকা নিয়েছে, এত বড় স্পর্দ্ধা।

আমি আমি করলে যে দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুরের হাম-হা হাম-হা (হাম্-হ্যায়—আমি আমি) করে—কিন্তু তার দুর্গতি দেখ। রোদ নাই—বৃষ্টি নাই, সকাল-সন্ধ্যা লাঙ্গোল টানছে। হয়ত কসাইয়ের হাতে প্রাণ যাবে, মাংসটা লোকে খাবে, চামড়ায় জুতো হয়ে—লোকের পায়ের নীচে থাকবে। নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তাঁত তৈয়ার হবে। ধুনরী যখন সেই তাঁতে ঘা মেরে তুলো ধোনে, তখন "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু" (আমি না, আমি না, তুমি তুমি) বলবে। এই "তুঁহু তুঁহু" বললে, তবেই নিস্তার।

হাজার বিচার করো, আমি যায় না। তাই, তোমার আমার পক্ষে, 'ভক্ত আমি', 'দাস আমি', 'সন্তান আমি'—এ সব 'আমি' ভাল। এ অভিমানে দোষ হয় না।

'আমি দাস, তুমি প্রভু' 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান' এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর-লাভ হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ। দাসভাব সাধকের পক্ষে খুব ভাল।

ঈশ্বরলাভ না হলে, অহঙ্কার যায় না! যদি কারু অভিমান গিয়ে থাকে, তবে তাঁর ঈশ্বরলাভ হয়েছে,—বুঝতে হবে।

ঈশ্বরলাভের পর যে আমি বা অভিমান থাকে, সে আমির দ্বারা কারু অনিষ্ট হয় না। পরশ-মণি ছোঁয়ার পর তলোয়ার সোনা হয়ে যায়—তলোয়ারের আকার থাকে, কিন্তু তাতে আর হিংসা করা চলে না। সেরূপ লোকের ঈশ্বরীয় কথাই ভাল লাগে, তাই নিয়েই থাকে। অন্য আর কিছু ভাল লাগে না—করে না।

দড়ি পুড়ে গেলে তার আকারটা থাকে, কিন্তু সে দড়িতে আর বাঁধনের কাজ চলে না।

পাঁটা,—কাটা হয়ে যাওয়ার পরেও সেটা খানিকক্ষণ ধড়ফড় করে, অহঙ্কার সেইরূপ। জীবন্মুক্ত পুরুষের অহঙ্কার যা থাকে—সে জীবনশূন্য। তাঁরা কোঁস করতে পারেন কিন্তু কখনও কামড়ান না।

স্বপ্নে ভয় দেখে, জেগে ওঠার পরও বুক দুড়দুড় করতে থাকে, অভিমানও সেই রকম; তাড়িয়ে দিয়েছ তবুও কোথা থেকে এসে পড়ে।

নারকেল গাছের বেল্লো (পাতা) খসে পড়ে গেলেও একটা দাগ থাকে, সেইরূপ অভিমানহীন ব্যক্তির যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে অভিমানের বা কাম-ক্রোধের রেখা মাত্র দেখা যায়, কিন্তু তাতে কারু অনিষ্ট হয় না।

দুই-একটি লোকের সমাধি হয়ে অহং যায় বটে, কিন্তু প্রায় সকলের যায় না। হাজার বিচার করো, তবু ফিরে-ঘুরে এসে উপস্থিত হয়। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল সকালে দেখ, আবার তার কেঁকড়ি বেরিয়েছে।

জীবের আমিত্ব নাশ হলে শিবত্ব হয়। এই শিব, শব হলে তবে মা আনন্দময়ী তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করেন।

যে "আমি"তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি'ই খারাপ। এ 'আমি' মাঝখানে আছে বলে, জীব ও আত্মায় প্রভেদ হয়েছে। জলের উপরে যদি একটা লাঠি ধরো, জল দু'ভাগ দেখায় কিন্তু একই জল। জীবের অহংই এই লাঠি—অহং আছে বলে জীব আত্মা দু'টি দেখায়। অহং না থাকলে, ব্রহ্মজ্ঞান হলে, জীব ও আত্মা এক হয়ে যায়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বারো

শুধু একবার দেখা দিয়েই পালিয়ে গেলে চলবে। চোখের সামনে দাঁড়াতে হবে স্থির হয়ে। একটু হাত বাড়িয়ে দিলি, বা দু'টি চোখ নাচালি, ছুটে পালিয়ে গেলি চুল এলিয়ে, তাতে হবে না। স্থ হয়ে সর্বসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে হবে। উঠতে-তে চলতে-ফিরতে থাকতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে। য়ে-পায়ে, চোখে-চোখে, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে। থিবীকে ঘিরে যেমন বাতাসের প্রাণস্পর্শ তেমনি মাকে ঘিরে তোর অচঞ্চল অঞ্চল।

'মন রে, ঐ ভাখ।'

কি দেখব?

ভৈরবকে ভাখ, মা'র নাটমন্দিরের ছাদের ালসেয় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। অমনি নিশ্চল ভাবশূন্য হয়ে বসবি, চোখ রাখবি মা'র পদ্মপদের পরে। শরীরে ঝড় বয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে সব াদ-দেয়াল। তুই নড়বি না। তুই নড়বি কেন? ার নাড়ীর টান সে নড়ুক।

আমার কি হচ্ছে, কিছুই বুঝছি না। কিংবা ছুই হচ্ছে না মাথামুণ্ডু। মন রে, মাকে তাই ই বল কেঁদে-কেঁদে। বল, আমাকে শিখিয়ে দে া, কি করে তোকে দেখতে পাব। আমি একেবারে রেট. আমি না জানি তন্ত্রমন্ত্র, না জানি যাগযজ্ঞ, ই না দিলে কে বলে দেবে? তুই-ই বল, ই ছাড়া আমার কি আর কেউ আছে?

মন রে কথা বলতে বলে দিয়ে চোখ বুজল দাধর। ধ্যানে নিশ্চিহ্নচেতন হয়ে গেল। মনে ল কে যেন শরীরের হাড়ে-হাড়ে জোড় খাইয়ে ল দিচ্ছে। একটু যে নড়বে-চড়বে, বা াসন বদলাবে তার সাধ্য নেই। আবার যতক্ষণ গ্রন্থি খুলে দিচ্ছে ততক্ষণ এমনি স্থাণু হয়ে সে থাকে জড়পুত্তলির মত।

মন রে বসে থাক। ভালোই তো, থাক বসে। যে তোকে বসিয়ে রেখেছে, সে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে দেখি।

কি দেখছিস্?

জ্যোতিবিন্দু দেখছি।

সর্ষেফুল দেখছিস। তার মানে কিছুই দেখছিস না।

না। এখন আর বিন্দু নেই। পুঞ্জ-পুঞ্জ হয়ে উঠেছে।

তার পর?

গলানো রূপোর স্রোত চলেছে পৃথিবীতে। সব কিছু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

উঠেছে? তবে ধৈর্য ধর্। এবার দেখা দেবেন জ্যোতির্ময়ী। জগদ্ভাসিনী।

ঘরে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে গদাধর। সমাধি হয়েছে। সম্যক্ প্রকারে ধারণ করার ভাবই তো সমাধি। মা আগে আংশিক ছিলেন, কখনো প্রসারিত একখানি হাত, কখনো স্থির স্থিত দু'টি পা, কখনো বা হাসির ঝিলিক দেওয়া একটি ক্ষণচকিত চাহনি—এখন মা সম্যক্‌সম্পূর্ণ হয়ে উঠছেন। সমগ্র. সর্বাঙ্গসম্পন্ন। অষ্টৈশ্বর্যে সৌষ্ঠবান্বিত।

ঝম্‌ঝম্ শব্দে পাঁয়জোর বাজিয়ে কে উঠছে রে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে? গভীর রাতে নির্জন মন্দিরের চাতালে কে এমন ছুটোছুটি করছে? ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে এল গদাধর। দেখল, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, মা মহামায়া মুক্তকেশে মন্দিরের দোতলার বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রলয়-ঘনঘটা ঘোররূপা প্রচণ্ডা। দিগ্‌বস্ত্রা নবনীল-ঘনশ্যামা। পূবে একবার কলকাতার দিকে তাকাচ্ছেন, আরেক বার তাকাচ্ছেন গঙ্গার দিকে, পশ্চিমে। সর্ববর্ণময়ী, পরব্রহ্মস্বরূপিণী।

মা আমার কালো কেন বলতে পারিস? যার আদিও নেই অন্তও নেই তাকে তুই কোন রং দিয়ে বোঝাবি? যার কোনো রংই নেই, সে কালো ছাড়া আর কি?

মা আমার উলঙ্গিনী কেন? মা যে অদ্বিতীয়া। যেখানে দ্বিতীয় বলে কেউ নেই, সেখানে আবরণের কথা ওঠে না! যে অন্তহীন তাকে তুই আবরণ দিয়ে ঢাকবি কি করে?

মন্দিরে ঢুকল গদাধর। মন্দিরে মূর্তি নেই, তার বদলে সশরীরে মা আছেন বসে। গদাধর তাঁর নাকের নিচে হাত রাখল, হাতে স্পষ্ট নিশ্বাসের স্পর্শ। মন্দিরে ভোগ সাজিয়ে রেখেছে, দেখল, গায়ের রঙে ঘর আলো করে মা খেতে বসেছেন। এক-এক দিন মন্ত্র বলবার পর্যন্ত ফুরসৎ দেন না, নৈবেদ্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে বসেন।

'দাঁড়া, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস।' চেঁচিয়ে উঠল গদাধর।

হৃদয় ছুটে এল। দেখল, জবা-বেলপাতা নিবেদন করবার আগেই মামা নৈবেদ্যের থালা নিবেদন করছে মাকে।

'এ কি মামা, এ কি করছ?'

'কি করব! রাক্ষুসির যে তর সইছে না। খিদের জ্বালায় নোলা সকসক করছে।'

শুধু তাই নয়। নৈবেদ্যের থালা থেকে এক গ্রাস ভাত নিয়ে মামা সিংহাসনে উঠে মা'র মুখে ঠেকিয়ে বলছে, 'খা, খা, বেশ করে খা—'

হঠাৎ সুর বদলে বলছে, 'কি, আমাকে খেতে হবে? আমি না খেলে খাবি নে? বেশ, খাচ্ছি—' বলে গ্রাসের খানিকটা নিজের মুখের মধ্যে পূরে দিলে। পরে উচ্ছিষ্টাংশ মা'র মুখে দিয়ে বললে, 'নে, এবার খা। আমি তো খেলাম—'

হৃদয় স্তম্ভিত। নিঃসন্দেহ, বদ্ধ পাগল হয়েছে মামা। ফুল-বেলপাতা মায়ের পায়ে না দিয়ে নিজের পায়ে রাখছে। মাকে পূজা না করে নিজেকে পূজা করছে। সর্বনাশ! সেজবাবু দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এক ধমকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবেন। হৃদয়েরও অন্ন উঠবে সঙ্গে-সঙ্গে।

শুধু পাগল নয়, কাঁধে ভূত চেপেছে মামার। নইলে দেবতাকে নিয়ে এ কী সুরু করেছে ছেলে-খেলা! মা'র চিবুক ধরে আদর করছে, কথা কইছে, ঠাট্টা-তামাসা করছে। মা যেন সসম্ভ্রম দূরত্বের জিনিস নয়, একেবারে কোলে চড়ে [illegible]বার জিনিস। যেন অনম্য-প্রণম্য নয়, আদর-ভালোবাসার কাঙাল। যেন বিধির বাঁধনে দরকার নেই, যেন গুটি-গুটি পায়ে আর এগুতে হবে না ভয়ে-ভয়ে, মাকে সিংহাসনে বসিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুটোতে হবে না আর চৌকাঠের বাইরে। সটান সিংহাসনে উঠে তার কোলে চড়ে বসতে হবে। সেই মা—যে ত্রিজগৎপ্রসবিনী—সেই মা'র কোলে কোলের শিশু হয়ে চড়ে বসব। আমি উঠবন্দী রায়ত না হয়ে ক্ষেমংকরীর খাস তালুকের প্রজা হব। এই যে মা'র কোলে চেপে বসেছি—এ হচ্ছে "ক্ষেমার খাসে আছি বসে, আমার মহালে নাই শুখা-হাজা"। যিনি জগৎরঙ্গিণী তাঁর সঙ্গে ঘরের ভাষায় রঙ্গ-রহস্য করব। মা যে আমার সহজ মানুষ। সহজ না হলে সহজ মানুষকে চিনব কি করে?

গদাধরের মুখ-চোখ লাল। যেন মদ খেয়েছে আকণ্ঠ। টলে-টলে নাচছে আর গান গাইছে: 'সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে। আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥' সরাসরি গান শোনাচ্ছে মাকে। মার হাত ধরে নেচে বেড়াচ্ছে:

"আর ভুলালে ভুলব না গো,
ভয়ে হেলব না গো দুলব না গো—
প্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি
ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥"

রাত্রে ঘুম নেই। ভাবের ঘোরে কার সঙ্গে কথা কয়। কখনো বা গান শোনায়।

'ঘুমুবে না মামা?'

দুই চোখে ধারা, গান ধরে গদাধর:

"ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।
যে দেশে রজনী নাই,
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি"

কোনো দিন বা মন্দিরে মাকে [illegible] হঠাৎ সেই শূন্যরূপাকে উদ্দেশ করে [illegible]

গদাধর: 'আমাকে তোর কাছে শুতে বলছিস? আচ্ছা, শুচ্ছি তোর বুকের কাছে।' মা'র সর্ব অঙ্গে বাৎসল্য, দুই চোখে স্নেহসিঞ্চিত লাবণী। হাত-পা গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে মার রুপোর খাটে শুয়ে পড়ল গদাধর। নীল-নিবিড় মেঘমণ্ডলের কোলে ক্ষীণ শশিকলা।

ভোগ নিবেদন করছে, কালীঘরে এক বেড়াল এসে উপস্থিত। ঘুরছে আর মিউ-মিউ করছে। ওমা, মা এসেছিস? খাবি মা? খা। ভোগের অন্ন বেড়ালকে খাওয়াতে বসল গদাধর।

গণেশ একবার মেরেছিল একটা বেড়ালকে। ভগবতী বললেন, তুই আমাকে মেরেছিস। আমার সর্ব অঙ্গে যন্ত্রণা। সে কি কথা? গণেশ তো হতবুদ্ধি। মাকে সে মারবে? এই দ্যাখ, তোর মারের দাগ আমার গায়ে ফুটে রয়েছে। লজ্জায়, অনুশোচনায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল গণেশ। যা মার্জারী তাই ভগবতী।

রাত্রিতে তো মন্দিরে আলো জ্বালে। মা যদি আসেন, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে দেয়ালে তাঁর ছায়া পড়ে না কেন? ভাবে হৃদয়। মাকে দেখার পুণ্য করিনি কিন্তু দেয়ালে তাঁর ছায়া দেখতে দোষ কি!

দিব্য অঙ্গের ছায়া থাকবে কি? সে অচক্ষু হয়েও দেখে অকর্ণ হয়েও শোনে। অস্পর্শ হয়েও কোলে নেয়।

বিশুদ্ধ পাগলামো। তাই বলে হেসে উড়িয়ে ... চলে না এ কেলেঙ্কার। দেব-দেবী নিয়ে এই ... ছেলেমানসি। আগে নিজের পায়ে ঠেকিয়ে ... মায়ের পায়ে ফুল দেওয়া। আগে নিজে খেয়ে ... এঁটো খাওয়ানো। খাটের উপর মা'র ... শুয়ে পড়া। মা'র চিবুক ধরে ফষ্টি-নষ্টি ... অসম্ভব এই অনার্যতা। একটা বিহিত ... হয়। জানাতে হয় সেজ বাবুকে।

কালীঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়ায় এসে সব ... আমলারা। খাজাঞ্চি আর গোমস্তা, ... আর আটপ্রহরী। কি-রকম যেন আবিষ্টের ... চেয়ে থাকে। গদাধরের ধরণ-ধারণ সব ... সন্দেহ নেই, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। যা ... করছে যেন অকপটে করছে। বিশ্বাস বেশি ... এত সাহস। আর ঐ যে উন্মনা ভাব ... ঠিক উন্মাদের ভাব নয়।

সবাই শাসন-বারণ করতে এসেছিল। মুখ... করতে পেল না। দপ্তরে ফিরে পরামর্শে বসল—কি করা। আর কি করা। জানবাজারে খোদ মালিকের দরবারে দরখাস্ত দিতে হয়। যাই বলো, না হচ্ছে বিধিমত পূজা, না হচ্ছে ভোগরাগ। অশাস্ত্রীয় অকাণ্ডের জন্যে শেষকালে না কোনো অঘটন ঘটে!

মথুর বাবু লিখে পাঠালেন, দাঁড়াও, আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।

এবার তল্পি বাঁধো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। অনাচারের দণ্ড নাও।

কাউকে কিছু না বলে পূজোর মধ্যে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন মথুর বাবু। সটান ঢুকে পড়লেন কালীঘরে। ঢুকে যা দেখলেন, তা নরদেহে দেখবেন বলে কল্পনা করেননি। গদাধর তনুমনোময় হয়ে পূজা করছে। কোনো দিকে লক্ষ্য নেই, লজ্জা নেই। যে মথুর বাবুর নিশ্বাসের আভাসে আর সবাই শশব্যস্ত, সে মন্দিরে এল বা চলে গেল, ভ্রূক্ষেপ করে না গদাধর। তার সমস্ত নিবেশ-নিক্ষেপ মা'র উপরে। কখনো কাঁদছে আকুল হয়ে, কখনো বা চেঁচিয়ে উঠছে আনন্দে। তন্ময় হয়ে গান গাইছে কখনো, কখনো বা ধ্যানে নিঃসংজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে। মা'র সঙ্গে কথা কইছে নির্ভয়ে। অভিমান করছে, আবদারে ছেলের মত আখখুটেপনা করছে।

এ কি দেখছেন মথুর বাবু!

তাঁর দুই হাতে কি কোনো শাসনের উদ্যত্তি ছিল? হঠাৎ সেই দুই হাত তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ হল কেন?

ঘুমঘোর ভাঙবে এবার মা'র। পাষাণী এবার প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। আর ভাবনা নেই। মিলেছে ওস্তাদ বাজীকর। ঘুম-ভাঙানে বাঁশিওয়ালা।

যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন চুপি-চুপি। জানবাজার থেকে ফরমান পাঠালেন, গদাধরকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। যেমন তার খুশি তেমনি ভাবেই পূজো করুক মাকে।

সীমা ছেড়ে চলে এসেছে সে অসীমায়। মাটির উপরকার বাঁধা-ধরা লাইন-ফেলা রাস্তা ছেড়ে সে চলে এসেছে আকাশের অনাবৃতিতে। ক্রিয়াকর্মের শাস্ত্র থেকে সর্বার্পণের অশাসনে। বৈধীভক্তি থেকে পরমপ্রেমরূপা ভক্তিতে। শুধু সন্তরণে নয়, নিমজ্জনে।

বিষয়বিষয়ে অবিবেকীর যেমন আগ্রহ সেই অনুরক্তিরীশ্বরে।" সর্ববন্ধনবিমোচনে।

'মা-মা যে করো, মাকে দেখতে পাও তুমি?' নরেন্দ্রনাথ জিগগেস করল ঠাকুরকে। জিজ্ঞাসার যেন বা একটু অবিশ্বাসের রহস্য।

'দেখতে পাই কি রে! মা'র সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মা'র পাশটিতে শুয়ে ঘুমুই—'

নরেন্দ্রের স্বরে তখনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ: 'ঈশ্বরকে দেখা যায় কখনো? কোথায় সে?'

নিচে, উপরে, পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে—এবেদং সর্বমিতি। ভিতরে, বাইরে—বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত তিনি। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং। দেখবি বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখবি। তোর এমন চক্ষু, তুই দেখবি নে?

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে আস্তানা গেড়েছে। হচ্ছে নগদ-বিদায়ের সাধু। তার মানে, ধর্ম-কর্ম করে কিন্তু সব সময়েই প্রত্যাশা করে কিছু ফল-কলা। যদি কিছু পার্থিব উপকার না হয় তবে কি হবে এ-সব জপতপে? সব খাটনিরই টাকা আছে আর এর বেলায়ই শুধু লবডঙ্কা। যদি জপতপ করে কিছু সিদ্ধাই হয় তবে হয়তো সংসারের অবস্থাটা ফেরানো চলে। মনে-মনে এই কামনা নিয়েই বসেছে পূজার্চনায়।

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি।' ঠাকুর সাবধান করে দিতেন ভক্তদের, 'ওর কথা শুনিস নে তোরা কেউ।'

কিন্তু হাজরার কথা নরেনের মন্দ লাগে না। এই লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার কথা। যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে স্পর্শসহ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুনো। ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবেরও হিসেব নেওয়া। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্দেহ তো থাকবেই। হাজরার কথা তাই একেবারে ফেলনা নয়।

'যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়—এ গানটা গা তো রে, নরেন।' ঠাকুর ফরমাস করলেন।

নরেন গান ধরল। তাকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যা কিছু তুই দেখছিস তোর চোখের সামনে সব তিনি। গাছ পাখি মানুষ পশু, সব। আকাশ মাটি বাতাস আগুন জড় চেতন—সমস্ত। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বাতীতও। স্বয়ংপ্রকাশ।

কে ঈশ্বর?

কে ঈশ্বর! অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু আর বৃহতের শেষ সীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব আর তার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা—ঈশ্বর।

সহজ করে বলুন।

সহজ করে বলব! ঈশ্বর কে তাই জানতে চেয়েছিস? সহজ করেই বলি। "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুই-ই সেই। হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

তবু সংশয় যায় না নরেনের।

সংশয় থাকলেই মীমাংসা। নির্ণয় তো সংশয়-সাপেক্ষ। সংশয় আছে বলেই সংসারবিচার আত্মবিচার। থাক, থাক তুই সংশয়ে।

নরেন বারান্দায় এসে বসল হাজরার কাছে। তামাক সাজছে হাজরা। হুঁকোটা বাড়িয়ে দিলে নরেনের হাতে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নরেন বললে, 'বলে কি অসম্ভব কথা! এ কখনো হতে পারে?'

'কি বলে?' হাজরা কটাক্ষ করল।

'বলে কি না, ঘটি বাটি থালা গ্লাস সব কিছু ঈশ্বর। যা কিছু দেখছি চোখ মেলে তাই না কি তাই। এমন কি আপনি আমি—আমরাও না কি—'

হাসির রোল তুলল হাজরা। পাগল আর কাকে বলে! সে ব্যঙ্গের হাসিতে নরেনও যোগ দিলে।

ঘরের মধ্যে ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্যদশা। সে সব্যঙ্গ হাসির শব্দ তাঁর কানে এল। তিনি নিমেষে বালকের মতন হয়ে গেলেন। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

'কি বলছিস রে নরেন?' হাসতে-হাসতে কাছে এসে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন ঠাকুর। ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর নরেন? নরেনের কি হল?

কি যে হল কে বলবে। চোখের সমুখ থেকে একটা পর্দা উঠে গেল। যেন চেতনান্তর নিমগ্ন দুই চোখ বুজে গিয়ে জেগে উঠল ললাটে তৃতীয় নয়ন। চেয়ে দেখল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ধূলিকণা থেকে আকাশ-বি...

সূর্য পর্যন্ত সব কিছু ঈশ্বর। এ কি, চোখে ঘোর লাগল না কি? চোখ বুজল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন। বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ দরজা চৌকাঠ সব প্রাণময়। খেতে বসল, মনে হল, থালা-বাটি ভাত-ডাল সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন। যিনি পরিবেশন করছেন আর যে খাচ্ছে দুই-ই তিনি।

ভাতের থালার সামনে নিস্পন্দের মত বসে রইল নরেন।

'কি রে, বসে আছিস কেন? খা।' মা মনে করিয়ে দিলেন।

খেতে সুরু করল নরেন। কিন্তু যে খাচ্ছে সে কে! যাকে খাচ্ছে তাই বা কি!

ভোর হল তবুও ঘোর গেল না। কলেজে চলেছে, রাস্তায় বেরিয়েও সেই বিচিত্র অনুভূতি। সর্বানন্দপ্রদাতা ঈশ্বর সমস্ত কিছুর মধ্যে জাগ্রত হয়ে আছেন। প্রায় গায়ের উপর গাড়ি এসে পড়ছে, তবু সরবার প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় গাড়িও যা সেও তাই। দুই-ই ঈশ্বরপূর্ণ। বিকেলে হেদোর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকছে নরেন: বল্, তুই কে? তুই কি ঈশ্বর?

কোথাও কি রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই? জাগরণে যে আছে সে কি স্বপ্নেও আছে? সুষুপ্তিতেও কি সেই? আর সব কিছুর অন্তরালেও কি সেই এক অখণ্ডস্বরূপ?

সব সেই এক। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্যক্‌গতি হয়ে এঁকে-বেঁকে চললেও সাপ। নিত্যেও যিনি লীলায়ও তিনি। সব একাকার।

শুধু ঈশ্বর দেখছি এ হলেই চলবে না। তাঁকে ধরে আনতে হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। রাজাকে তো অনেকেই দেখে পথে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বাড়িতে এনে খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে দু'-এক জন।

নরেন আকুল হয়ে উঠল। আমি কি পথে দাঁড়িয়ে রাজা দেখব? আমি কি তাকে টেনে আনতে পারব না ঘরের মধ্যে?

ভেবো

গদাধরের সমস্ত শরীরে ভীষণ জ্বালা। প্রায় ছ'মাস ধরে ভুগছে।

নানান ধরনের কবরেজি তৈল এনে দিলে ... গায়ে-মাথায় মাখিয়ে দিলে। কিছুতেই কিছু হল ...

পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছে গদাধর, ... তার শরীর থেকে কে এক জন বেরিয়ে এল। ... কালো, চোখ দু'টো লাল, ভয় পাওয়াবার ... চেহারা। নেশাখোরের মত টলে-টলে পড়... আরো এক জন বেরিয়ে এল পিছু-পিছু। প... গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, প্রশান্ত মূর্ত্তি। সেই ঘোর... কদাকারকে সে আক্রমণ করলে, নিপাত কর... পাপ-পুরুষ ভস্ম হয়ে গেল।

মথুরের কাছে রানি শুনলেন সব কাণ্ড-কারখা... ঠিক করলেন এক দিন গদাধরকে দেখে আস... নিজের চোখে।

তাই এসেছেন। গঙ্গায় স্নান করে ঢুকেছে... মন্দিরে। মা'র মূর্ত্তির কাছে বসেছেন শান্ত হ... গদাধরের গান বড় ভালো লাগে। তাই বলল... একটা গান ধরো।

গান ধরল গদাধর। রানি ধ্যানে চোখ বুজলে...

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, গদাধর রানির গা... এক চড় বসিয়ে দিল। ধমকে উঠল, 'এখা... ঐ চিন্তা?'

রানি হকচকিয়ে উঠলেন। এষ্টেট নিয়ে এক... কঠিন মামলা চলছে, তারই কথা ভাবছিলেন ধ্যা... বসে। কিন্তু তাই বলে সামান্য এক জন মন্দিরে... পুরোত তাঁর গায়ে হাত তুলবে না কি?

মন্দিরের খাজাঞ্চি-গোমস্তারা উৎসুক হ... উঠল। এবার নির্ঘাৎ বরখাস্ত হবেন বাছাধন...

কথাটা মথুর বাবুর কানে তুললে। বির... হলেন অত্যন্ত। এ কি অশোভন ব্যবহার!

হৃদয় ছুটে এল মামার কাছে। ভীত ক... বললে, 'এ তুমি কি করেছ!'

গদাধরের মুখে নির্মল প্রশান্তি। 'আমি ত... কি জানি! মা বললেন, এখানে এসেও ও বিষ... সম্পত্তি ভাবছে, এক ঘা বসিয়ে দে পিঠের উপর... তাই বসিয়ে দিলাম। মা'র কথা অমান্য ক... কি করে?'

মথুর বাবুকে ডেকে পাঠালেন রাসমনি। বললে... 'ঠিকই করেছে গদাধর। ওর হাত দিয়ে মা আমায়... শাসন করেছেন।'

সত্যি?

'হ্যাঁ, আর সেই আঘাতে হৃদয় আলো করে রয়েছেন।'

ভক্তি-ভাবের পাঁচটি প্রদীপ। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। পঞ্চ ভাবেই সাধনা করছে গদাধর।

শান্ত হচ্ছে ঐকাত্মজ্ঞান। নির্গুণ সাধন। স্বস্থ, নির্লিপ্ত, ব্রহ্মনিষ্পন্ন হয়ে বসে থাকো। আরগুলো সগুণাত্মক, রাগরঞ্জিত। দাস্য হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব। সখ্য হচ্ছে বাসুদেবের প্রতি অর্জুনের। বাৎসল্য হচ্ছে গোপালের প্রতি যশোদার। আর মধুর হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীর।

যার তেমন ভাব সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত নিজে মাংস খায়, তাই ভাবে মাও পাঁঠা খাবে —তাই বলিদান দেয়। রজোগুণীর বিস্তারে-বিলাসে বিশ্বাস, তাই সে নানান ব্যঞ্জনে ভোগ সাজায়। সত্ত্বগুণীর জাঁক নেই জৌলুস নেই। তার পুজো কাকে জানতেও পারে না। ফুল নেই তো বেলপাতায় আর গঙ্গাজলে পুজো করে। শীতল দেয় দু'টি মুড়কি কি বাতাসা দিয়ে।

আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। যে শুধু নাম করে। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁকে পুজো করা।

শান্ত হচ্ছে ঋষিদের ভাব। স্বানন্দভাবে পরিতুষ্ট। ভিক্ষান্নমাত্রে খুশি, ছেঁড়া কাঁথাই যেন ইন্দ্রের ঐশ্বর্য। শুধু মূল তরুতে আশ্রয়। শুধু আদি নিয়ে আছে, অন্ত-মধ্যের ধার ধারে না। "অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ"—সেই যোগীর ভাব।

আর দাস্য হচ্ছে বলবানের ভাব। রামের কাজ করছে হনুমান, শত সিংহের শক্তি তার শরীরে। কে অত বাছ বিচার করে, গোটা গন্ধমাদনই নিয়ে এল। দ্বারকায় এসে হনুমান বললে, আমি সীতারাম দেখব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এখানে সীতা পাবে কোথায়? তা জানি না। তুমি যখন আছ তখন সীতাকেও চাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বোস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষে নেই।' সীতার পাতাল-প্রবেশের সময় এমন অবস্থা, রামকেই প্রায় মারতে যায়।

ধনমান দেহসুখ কিছুই চায় না, শুধু ঈশ্বরকে চায়। স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, মন্দোদরী অনেক রকম ফল দেখিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে যদি অস্ত্রটা ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান কি ভোলবার ছেলে? বললে, আমার শ্রীরামই কল্পতরু, আমার কি ফলের অভাব?

লঙ্কাজয়ের পরে অযোধ্যায় ফিরেছেন রাম-সীতা। কত মিলন-উৎসব, কত আনন্দ-কোলাহল, পরিত্যক্তের মত এক কোণে পড়ে আছেন কৈকেয়ী। কই কই আমার কৈকেয়ী-মা কই? হনুমান এসে তাকে সংবর্ধনা করলে। ভাগ্যিস তুমি রামকে পাঠিয়েছিলে! বনের মানুষ হয়ে তাই মনের মানুষকে পেলাম।

ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসেব থাকে না। এক জন এসে হনুমানকে জিগগেস করলে, আজ কোন্ তিথি? হনুমান বললে, কে তোমার বার-তিথির খোঁজ রাখে! রাম ছাড়া আর কিছু জানি না।

আর সখ্যভাব কেমন জানো? এই—এসো ভাই এসো, কাছে এসে বোসো। অনেক দূর থেকে এলে বুঝি, বোসো, পাখার হাওয়া খাও। হাত-মুখ ধোও, খাও পেট ভরে। গল্প করো।

বাৎসল্য ভাবে যশোদা ননী হাতে করে বেড়াতেন কখন গোপাল খেতে চাইবে। বলতেন, আমি না দেখলে গোপালকে দেখবে কে? তার অসুখ করবে। উদ্ধব বললে, 'মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎচিন্তামণি।' যশোদা বললেন, 'ওরে তোদের চিন্তামণিকে চিনি না, আমার গোপাল কেমন আছে তাই বল।' কার কি জানি না, আমার গোপাল।

আর মধুর ভাব শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। মেঘ কি ময়ূরকণ্ঠ দেখছেন আর কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছেন। চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে চলেছেন, শুনলেন এ গাঁয়ের মাটিতে খোল হয়। যেমনি শোনা অমনি ভাবাবেশ। এ ভাব মহাভাব।

কি নিষ্ঠা গোপিনীদের! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে তো সভায় ঢুকল। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? দ্বারী নিয়ে গেল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ পাগড়ি মাথায় দিয়ে বসে আছে। গোপিনীরা মুখ নামিয়ে রইল—এ আবার কে! এর সঙ্গে কথা কয়ে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব? চল

য... আমাদের সেই পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃ... কোথায়? আমরা তাকে চাই।

দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসত এক পাগলি। কি ন... কোথায় থাকে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরকে শু... গান শোনাবে। বাধা দিলে বড় জ্বালাতন ক...। ভক্তরা তাই ত্রস্ত থাকে সব সময়।

এক দিন কাছে এসে কান্না শুরু করল। সে কি কান্না! ঠাকুর জিগগেস করলেন, কাঁদছিস কেন?

পাগলি বললে, 'মাথা ধরেছে।' এই ওজুহাতে কাছটিতে বসে রইল।

আরেক দিন, ঠাকুর খেতে বসেছেন, কোত্থেকে হঠাৎ পাগলি এসে হাজির। বললে, 'দয়া করলেন না? মনে ঠেললেন কেন?'

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোর কি ভাব?'

পাগলি বললে, 'মধুর ভাব।'

'ওরে, আমার যে সন্তান ভাব। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়।'

'তা আমি জানি না। সে খবরে আমার কাজ নেই।'

গিরীশ ঘোষ শুনছিলেন ঠাকুরের মুখে। বললেন, 'পাগলি ধন্য, কৃতার্থজন্ম। পাগলই হোক আর মারই খাক ভক্তদের হাতে, সর্বক্ষণ তো আপনাকেই চিন্তা করছে। আপনাকে চিন্তা ক'রে—আমিই বা কি ছিলাম আর কি হলাম।'

গদাধরের এখন দাস্য ভাব। হনুমানের ভাব। রঘুবী... সেবক মহাবীর।

... তো যাবে না সহজে। তাই বলি, থাক, দাস-... হয়ে থাক। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি ... আমি সেবক। তুমি রাজাধিরাজ আমি অকি...।

হনুমানের ধ্যানে ডুবে গিয়ে হনুমানের মতই হয়ে গেল গদাধর। পরনের কাপড়টা কোমরে বেঁধেছে আর ...নের দিকে লেজ দিয়েছে ঝুলিয়ে। হাঁটে না, ...য়ে-লাফিয়ে চলে। বেশির ভাগ সময়ই গাছে ... বসে থাকে। খোসা না ছাড়িয়ে না কোনো ...-আস্ত ফল খায়। আর আওয়াজ করে, রঘুবীর ...বীর।

হনু...র সাধনায় মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগটা এক ইঞ্চি বে... বেড়েছিল গদাধরের। সে ভাব চলে যাবার পর আ... স্বাভাবিক হয়ে যায়।

পঞ্চবটীতে শূন্যমনে চুপচাপ বসে আছে গদাধর। হঠাৎ জায়গাটা আলো হয়ে গেল। চেয়ে দেখল এক অপূর্বসুন্দরী নারী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরূপ লাবণ্য, বেদনা করুণা ক্ষমা ও ধৃতির স্নিগ্ধতা। কে তুমি? উত্তর দিক হতে গদাধরের দিকে এগিয়ে আসছে দক্ষিণে। চোখে সেই প্রসন্ন দাক্ষিণ্য। কে তুমি?

সহসা কোত্থেকে এক হনুমান উপ করে লাফিয়ে পড়ল সেখানে।

চিনতে আর দেরি হল না। রামময়জীবিতা সীতা-দেবী এসেছেন।

'মা' 'মা' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে গদাধর, অমনি সেই মূর্তি তার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গদাধর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পঞ্চবটীর কাছেই হাঁসপুকুর। সে পুকুর ঝালাতে গিয়ে বাড়তি মাটি ফেলা হয়েছে এই পঞ্চবটীর গর্তে। ফলে আমলকী গাছটা আর রইল না। মারা পড়ল।

ওরে হৃদে, আমার বসবার জায়গার একটা বন্দোবস্ত কর।

গদাধর নিজেই অশ্বত্থের চারা লাগাল। হৃদয় নিয়ে এল বট অশোক বেল আর আমলকী। তুলসী আর অপরাজিতার চারা পুঁতে জায়গাটা ঘিরে দিলে। ক'দিনেই ঘন ঝোপ হয়ে উঠল। ভিতরে ধ্যানে বসলে কেউ দেখতে পায় না বাইরে থেকে।

ওরে হৃদে, ছাগলে-গরুতে ঝোপঝাড় সব খেয়ে ফেললে যে। নতুন লাগানো গাছের চারাতেও দাঁত বসিয়েছে। ওরে, কাঠ-বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া লাগা—

কাঠ-বাঁশ কই? হৃদয় ফাঁপরে পড়ল। দড়ি-পেরেক কই?

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না।

প্রবল জোয়ারের জলে গঙ্গার এ-পারে ঠিক মন্দিরের ঘাটের সামনে এক বোঝা কাঠ-বাঁশ আর দড়ি-পেরেক ভেসে এসেছে।

যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।

তবে, যদি মুখে রাম নাম বলতে-বলতে হাত দিয়ে কের কাপড় সামলাস, তাহলে হবে না। জানিস নে গল্পটা?

চার দিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

বুড়ি গয়লানির নদী পার হয়ে দুধ যোগাতে যেতে হয়। সেদিন দুর্যোগে পারাপারের নৌকা পেল না। রাম-নামের কথা মনে পড়ল। ভাবলে, রাম-নামে ভবসমুদ্র পার হয়, আর আমি এই ছোট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। রাম-নাম করতে-করতে নদী পার হয়ে গেল বুড়ি। যে বাড়িতে দুধ দেয় সে এক পণ্ডিত। সে তো অবাক, এ দুর্যোগে বুড়ি নদী পার হল কি করে? কেন বাবা ঠাকুর, রাম-রাম করে পার হয়ে এলুম। ওপারে কি কাজ ছিল পণ্ডিতের। বললে, বলিস কি রে? আমিও অমনি রাম-রাম করে পার হতে পারব? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। দু'জন এল নদীর ধারে। বুড়ি রাম-রাম করে পার হতে লাগল। পণ্ডিতও রাম-রাম করে এগুতে লাগল, কিন্তু জলে নেমেই কাপড় গুটিয়ে নিলে। বুড়ি বললে, ঠাকুর, রাম-রামও করবে আবার কাপড়ও সামলাবে—তা হবে না। পণ্ডিত পড়ে রইল পিছনে। দিব্যি পার হয়ে গেল বুড়ি।

যদি ধরবি তো এমনি আঁকড়ে ধরবি। বিশ্বাস চাই। সরল বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস।

হাজরা টিপ্পনি কাটল: অন্ধ বিশ্বাস?

নিশ্চয়ই। বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চোখ কি? ছিদ্র কি! হয় বল, বিশ্বাস; নয় বল, জ্ঞান। জ্ঞান দুরূহ, বিশ্বাস সোজা। মার কাছে কেঁদে-কেদে বল, মা, আমাকে ভক্তি দে, বিশ্বাস দে।

চৌদ্দ

দিনে-দিনে পাগলামি বেড়েই চলেছে গদাধরের।

মথুর বাবু পর্যন্ত বিচলিত হলেন। নিশ্চয়ই কিছু স্নায়ুবিকার ঘটেছে। কলকাতার সেরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে ডেকে আনালেন।

কা কস্য পরিদেবনা। গঙ্গাপ্রসাদ বিফল হল।

তবু গঙ্গাপ্রসাদকে ধন্বন্তরি বলেই মানতেন ঠাকুর। ঈশ্বরের বিভূতি না থাকলে কি অত বড় চিকিৎসক হয়? যেখানেই গুণের বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। সেখানেই নত হবি।

গঙ্গাপ্রসাদ বললে, আপনি রাতে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি ও সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

ধন্বন্তরিতে যখন কিছু হল না তখন নিজেই নিজেকে সামলে চলুন। আইন-কানুনের মধ্যে নিয়ে আসুন নিজেকে। ছাড়ুন এ সব খেয়ালিপনা।

'ঈশ্বর যে ঈশ্বর—সে পর্যন্ত তার নিজের আইন মেনে চলে।' বললেন মথুর বাবু। 'নিজের নিয়মকে লঙ্ঘন করার তাঁর ক্ষমতা নেই।'

গদাধর থমকে গেল। সে কি কথা? যে আইন তৈরি করেছে সে ইচ্ছে করলে তা রদ-বদল করতে পারে না? সে কি স্বাধীন নয়?

কি করে হবে? নিজে নিয়ম করে নিজেই আবার তা ভাঙলে নিজের কাছে কি জবাবদিহি দেবেন?

বা, সব তাঁর খেলা যে। ভাঙা-গড়ার খেলা। তাঁর কাছে আবার নিয়ম কি! তিনি সমস্ত নিয়মের বাইরে।

কিছুতেই মানলেন না মথুর বাবু। বললেন, 'লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, শাদা ফুল হয় না। কই ফটক দেখি তো শাদা ফুল।'

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে হতে পারে না এটুকু! অখিল লোকনাথের হাত-পা কি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা? তিনি কি খর্ব না পঙ্গু?

পরদিন সকালে মন্দিরের বাগানে লাল জবাফুলের গাছে এ কী দেখছে গদাধর! একই ডালে দু'টো ফেঁকড়িতে দু'টি ফুল রয়েছে ফুটে—একটি টুকটুকে লাল, আরেকটি ধবধবে শাদা।

উল্লাসে অধীর হয়ে গদাধর ডালটা ভেঙে ফেলল হাত বাড়িয়ে। চলল মথুরের কাছে। এই দেখ। ঈশ্বর কি অল্প না অক্ষম না আবদ্ধ? কৃপানিধি কি কখনো কৃপণ হতে পারেন?

মথুর বাবু হার স্বীকার করলেন।

চেয়ে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে তাঁর গুরু দাঁড়িয়ে। যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান তিনিও গুরু। যিনি অন্ধকার দেশে আলোর সংবাদ নিয়ে আসেন তিনিও।

যদি তাপ বা আলো চাও, উদ্দীপিত আলোর আশ্রয় নিতেই হবে। যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে সেই গুরু। গদাধর প্রজ্বলিত [illegible]।

কিন্তু, যাই বলো, একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

শরীর ভেঙে পড়ছে গদাধরের, এর কারণ হয়তো ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। নিবৃত্তির কাঠিন্য থেকে যদি ক্ষণিক

... পায় তাহলে হয়তো সে একটু স্বস্থ-সুস্থ হতে ...। কিন্তু সরাসরি প্রস্তাব করতে গেলে মুখের ... প্রত্যাখ্যান করে দেবে গদাধর। এ একেবারে ... লোকের মত স্পষ্ট। তাই গোপনে ফাঁদ পেতে ... বাঁধতে চাইলেন মথুর বাবু।

শহর থেকে দু'টি পতিতা মেয়ে নিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন চুপি-চুপি।

গদাধর মুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল: 'মা, মা এসেছিস?' বলেই তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

ওরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে!

আরো এক দিন চেষ্টা করলেন মথুর বাবু। গদাধরকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গেলেন। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে থামলেন এক বাড়ির কাছে। দোতলায় অনেকগুলি সাজগোজ-করা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঘরে তাদের মাঝখানে গদাধরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন মথুর বাবু। পালিয়ে গেলেন মানে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আর গদাধর?

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—" সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই তিনি, জগজ্জননী।

গদাধর মাতৃস্তব সুরু করল। শিশুর মত হয়ে গেল ... লোপ পেল বাহ্যসংজ্ঞা।

কোলাহল সুরু করল মেয়েগুলো। কান্নার কোলাহল। আত্ম-তিরস্কার। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল: আমাদের ক্ষমা করে ... আমরা অভাজন, অকিঞ্চন—

গদাধরের মুখে শুধু মাতৃনাম। মা-ই সব হয়েছেন। রাজেশ্বরী হয়েছেন আবার পণ্যাঙ্গনাও হয়েছেন।

... গোল শুনে উঁকি মারলেন মথুর বাবু! দেখলেন ... শম-দম শৌচ-মৌনের সৌম্য প্রতিমূর্তি গদাধর ... সেদিন তিনি যা একবার দেখেছিলেন, তাই ... স্পর্শহীন প্রজ্বলিত বহ্নি।

... দল মথুর বাবুর উপর ঝাঁজিয়ে উঠল: 'আপনি ... বাবাকে এইখানে নিয়ে এসেছেন, এই আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে? আপনার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলেন মথুর বাবু। গুরুপ্রাপ্তির গরিমায় ... লাল হয়ে উঠলেন।

পানিহাটিতে ফি-বছর মহোৎসব হয়। বাইশ বছর বয়েস, সেখানে গিয়েছে গদাধর। সেখানে সেখানে বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা। বৈষ্ণবচরণ যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক। ঠাকুরবাটিতে বসে আছে গদাধর, বৈষ্ণবচরণ তাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। চিনে নিলেন এক নিমেষে। অলোক-সুন্দর দিব্যপুরুষ।

পাঁচটা টাকা হঠাৎ দিতে চাইলেন গদাধরকে। কি করে আনন্দ জানাবেন যেন বুঝতে পারছেন না। বললেন, 'আম কিনে খাও।'

না, না, টাকা দিয়ে কি হবে? আম না খেলে কি হয়!

বৈষ্ণবচরণ ছাড়বার পাত্র নন। হৃদয়কে গছালেন। আম কেনালেন। বললেন, ভোগ হবে।

তার পর গদাধরকে মাঝখানে বসিয়ে কীর্তন সুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সমাধি হয়ে গেল গদাধরের।

সমাধিভঙ্গের পর ভোগের দ্রব্য খেতে দেওয়া হল তাকে। আশ্চর্য, গলা দিয়ে কিছুই গলে না।

এক হাতে মাটি আরেক হাতে কটা টাকা নিয়ে গঙ্গাতীরে বসেছে গদাধর। মনে-মনে ওজন নেবার চেষ্টা করছে, কোন্‌টা ভারী। কোন্‌টার বেশি দাম! টাকা না মাটি, মাটি না টাকা! বিচার করতে-করতে উন্মেষ হল মনের মধ্যে, দুই-ই তুল্যমূল্য, দুই-ই সমান অসার। মাটি আর টাকা দুই-ই একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলল গঙ্গায়। নিঃশেষে নির্মুক্ত হয়ে গেল।

তাঁকে যদি একবার পাই তবে সব কিছুই পেয়ে যাব।

'সব কিছুই পেয়ে যাব।' বললেন ঠাকুর: 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হল মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন! লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন! অমনি বললুম, মা, তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না। তোমাকে পেলেই সব কিছু পেয়ে যাব।'

ভবনাথ চাটুজ্জে কাছেই বসে ছিল। হাসতে-হাসতে বললে, 'এ পাটোয়ারি।'

'হ্যাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারি।' ঠাকুরও হাসলেন। ঈশ্বরানন্দ পেলে কোথায় বা বিষয়ানন্দ, কোথায়

স্বা রমণানন্দ! বললেন, 'ভক্তের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান দেখা দিলেন। বললেন, বর নাও। ভক্ত বললে, বর দিন যেন সোনার থালে বসে নাতির সঙ্গে ভাত খাই। প্যাটোয়ার ভক্ত—এক বরে অনেকগুলি মেরে দিলে। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল—আয়ুও পেল মন্দ নয়।'

তাই তেমন জিনিস সন্ধান করো যা চরম যা চূড়ান্ত, যার আর পরতর নেই

নারাণ বড়-ঘরের ছেলে। অল্প বয়স, ছাত্র, কিন্তু ভগবানে অর্পিত চিত্ত। দক্ষিণেশ্বরে লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে। দক্ষিণেশ্বরে আসে বলে অভিভাবকেরা মারে। তবু না এসে পারে না। ঠাকুরের কোলের কাছটিতে তার স্থান।

'মাষ্টার', মহেন্দ্র গুপ্তকে জিগগেস করলেন ঠাকুর: 'একটি টাকা দেবে?'

'কাকে?'

'নারাণকে। দেবে? না কালীকে বলব?'

'আজ্ঞে বেশ তো, দেব।'

'ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে তাদের দেওয়া ভালো। তাহলে টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?'

অধরচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—মাইনে তিনশো টাকা। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে—মাইনে হাজার টাকা। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করছে যাতে চাকরিটি হয়। সই-সুপারিশ জোগাড় করেছে অনেক।

তবু যেন এগোয় না। প্রতাপ হাজরা এসে বললে ঠাকুরকে, 'অধরের কাজটি হবে, তুমি মাকে একটু বলো।'

অধরও বললে, 'একবারটি বলুন।'

ঠাকুর রাখলেন ওদের অনুরোধ। মাকে একটি বার, একটুখানি বললেন। বললেন, 'মা, অধর তোমার কাছে আনাগোনা করছে, যদি হয় তো হোক না।' বলেই সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বললেন, 'কী হীনবুদ্ধি মা! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

টাকা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল গদাধর। "সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন" হয়ে গেল। আরো কত অভিমান না জানি আছে! কাঙালীরা খেয়ে গেছে, মাথায় করে তাদের পাত ফেলে নিজে ঝাটা ধরে জায়গা পরিষ্কার করে দিলে। মেথরের কাজ করতে লাগল স্বচ্ছন্দে। শুধু তাই? কাঙালীদের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ করলে প্রসাদ জ্ঞানে। শুধু তাই! জিভ দিয়ে চন্দন আর বিষ্ঠা স্পর্শ করলে! সর্বত্র ব্রহ্মাস্বাদ।

ভবাবেশে সর্বদা বিভোর গদাধর। পূজা সেবার রীতিনীতি দূর স্থান, কালাকালই ঠিক থাকছে না। পূজা না করেই ভোগ দিয়ে দিলে। পূজার ফুল-চন্দন দিয়ে নিজেকেই সাজিয়ে রাখলে। বেলা বয়ে যাচ্ছে, হয়তো ধ্যানই ভাঙল না।

ক্রমে ক্রমে কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের। আসন্নপ্রসবা গর্ভিনীর মত।

এক দিন ভাবাবেশে গদাধর বলে উঠল মথুর বাবুকে: 'আজ থেকে হৃদে পূজো করবে।'

মথুর বাবুর কাছে দৈবাদেশের মত শোনাল। হৃদয় বসল পূজার আসনে।

গদাধরের ছুটি। ছুটি মানে মা'র জন্যে ছুটোছুটি। মা'র জন্যে কান্না।

মাকে দেখতে যদি কখনো একটু দেরি হয় আথাল-পাথাল করে গদাধর। আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। কোথায় পড়ল, আগুনে না জলে, তার জ্ঞান নেই। দম আটকে-আটকে আসে, কাটা ছাগলের মত ছটফট করে। সমস্ত গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, ভ্রূক্ষেপ করে না। মাটিতে মুখ ঘষতে-ঘষতে কাঁদে আর চেঁচায়: মা, মা গো—

পথ-চলতি লোক বলে, 'আহা শূলব্যথা উঠেছে বুঝি—'

———আগামী সংখ্যায়———

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

শ্রীকালিদাস নাগ

হরি ওঁ

৭।৪৯।১।১,।৪

অপ দেবতা, বসিষ্ঠ ঋষি, ত্রিষ্টুভ্-ছন্দ

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ
পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ।
ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ
তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ১।

যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি
খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্
তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ২।

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে
সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্
মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্
তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ৩।

যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো—
বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্
তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ৪।

অন্তরীক্ষের মাধ্যমিক স্থান হতে—
বহমান হয়ে ছুটে আসছেন
সমুদ্র-জ্যেষ্ঠা অপ্‌দেবীরা।
অবিচ্ছিন্ন তাঁদের গতিরাগ
তাঁরা চলেছেন—
তাঁরা চলেছেন।
নিখিলের মধ্যে প্রথমক্ষণেই হয়,
—তাঁদের নিঃশেষ প্রবেশ
আবার পরক্ষণেই আসে
—মুক্তির স্ফূর্তি।
তাঁরা বহে যান, বহে যান—
বারংবার পূত করে দিয়ে বিশ্ব।
একদা—
বর্ষণবৃষভ ইন্দ্র,
এঁদেরই জন্যে খনন করে দিয়েছিলেন পথ-রেখা
—বজ্রের সৌভাগ্যে।
আহা, সেই প্রসিদ্ধা অপ্‌দেবীরা
আমাদের রক্ষা করুন
ইহস্থানে, এই প্রদেশে,
আমাদের রক্ষা করুন;
—অবন্তু। ১।

দিব্যলোক থেকে ঐ যাঁরা ছুটে চলেছেন
—আপ:
অথবা ঐ যাঁদের
নদীরূপের বিভিন্নতায়
নিত্য ঝরে পড়ছে আনন্দ
যাঁদের সুখ-প্রবাহ ছুটে চলেছে
খনিত্র দীর্ণ-পথে,—
অথবা ঐ যাঁরা
চলন-পথে
স্বজন্মা হন প্রতিক্ষণ
ঐ যাঁরা—
শুচিশুদ্ধা অগ্নিময়ীরা
সার্থক হন সমুদ্রের সহমিলনে
আহা, সেই প্রসিদ্ধা অপ্‌দেবীরা
আমাদের রক্ষা করুন
ইহস্থানে, এই প্রদেশে,
আমাদের রক্ষা করুন ;
—অবন্তু ॥ ২ ॥
এই দেবীদের জ্যোতির্ময় মধ্যমলোকে
যখনই হয় রাজা বরুণের
—সুখপ্রবেশ
তখনি তিনি অবদর্শন করেন
জাতমাত্রের সত্য,
জাতমাত্রের অনৃত।
চ্যুত হয়ে পড়ে যায় মধু।
আহা, সেই প্রসিদ্ধা শুচিশুদ্ধা
অগ্নিময়ী অপ্‌দেবীরা
আমাদের রক্ষা করুন
ইহস্থানে, এই প্রদেশে,
আমাদের রক্ষা করুন ;
—অবন্তু ॥ ৩ ॥
অন্নের বিপুল মাদকতায়
যাঁদের মধ্যে বিরাজ করছেন রাজা বরুণ
বিরাজ করছেন সোম
এবং বিশ্বদেবেরা
বৈশ্বানর অগ্নি যাঁদের মধ্যে করেছেন
সমাহিত নিবেশ
আহা, সেই প্রসিদ্ধা অপ্‌দেবীরা
আমাদের রক্ষা করুন
ইহস্থানে, এই প্রদেশে,
আমাদের রক্ষা করুন ;
—অবন্তু ॥ ৪ ॥

'বাল্মীকি'

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

জন্মশিখা আমি।
প্রৌঢ়গুরু হে বাল্মীকি,
অগ্নিতে তোমার মিশে আছে অগ্নি মোর।
সন্তানের সীমা লভেছে নিঃসীম রূপ।
গন্ধধূপ-কাব্য—
জ্বলে অক্ষরের গৃহে।
পুরাতন জম্বুদ্বীপে প্রথম ভারতী,
আজি আমি কাব্যযজ্ঞে তোমার অতিথি।
শ্লোকের শোকের ছন্দ শুনিতেছি কানে ;
ও-পারের সুর বাজে
এ-পারের গানে।
আর্য্য-কবি, বর্ষ-অশ্ব পঞ্চ-সাহস্রিক
পাঠাবে কি মানদীপ্তি বঙ্গের সংসারে ?
পরাবে কি অগ্নিটিপ ভারত-লক্ষ্মীরে ?,
জ্ঞানমুগ্ধ করো সবে—
সংজাতীয় প্রেমে।
স্বাধীন-ভারতে আজি পুষ্প-সঞ্চয়ন
কাব্যযজ্ঞঋষি তুমি, রচ রামায়ণ ॥ ১ ॥

রাম-গান এস রামায়ণ।
স্থান লও
হৃদয়েতে অনুষ্টুভী শ্লোকে।
বঙ্গ-রঙ্গ
এস হনুমান্—পৃথ্বীর শক্তির মূর্ত্তি।
দাঁড়াও ক্ষণেক ঋষি আর্য-কুলপতি।
শুভ্রতার আশীর্ব্বাদ লভিয়াছি আমি,
দাঁড়াও প্রণাম করি।
হিংসা অনার্য্যের

আর রক্তবর্বরতা বিশ্ব করে গ্রাস ;
অণুধ্বংসী হয়ে গেল সংসার তোমার।
শুনিতেছি বসি লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের
নর-বানরের—
সঙ্কেত-সঙ্গীতখানি,
ক্রোধের ঘোষণা। কাল-মেঘে তূর্ণ বাজে
মৃদঙ্গ মোহের, কামের মন্দিরা-ধ্বনি।
তার মাঝে হে বাল্মীকি, প্রশ্ন করি আমি
কে তোমারে শেখাল এ রাম-গান-খানি। ২।

অন্ন দাও, ওগো কবি।
আশ্রমে তোমার
আসিয়াছি আজি। অক্ষরের ভাষা-সত্রে
লব দু'টি কাব্যের কণিকা। ভিক্ষা-স্নিগ্ধ
হবে বঙ্গদেশ।
বঙ্কিম-চন্দ্রতা নাই,
রবি নাই গগনেতে, মধুসূদনের
মেঘনাদী নাই পাঠ, বিদ্যার সাগর
আজি বিন্দু-শোধ।
তাই ঋভু, লবণিত
অশ্রু নিয়ে এসেছি আশ্রমে।
—অন্ন দাও।
রামগান জ্যোতিঃস্নান করাও আমারে
বর্ণহীন অবসান অপূর্ব্ব সাহিত্যে।
জানি বন্ধু, সুধা কভু হয় নাকো ম্লান।
কালস্রোত—দর্শনের অলীক ইঙ্গিত।
এক দিন বেজেছিল, আজো ঘড়ি বাজে
গান শুনি, অন্ন চাই—
বাল্মীকিয়ী লাজে। ৩।

হে বাল্মীকি রত্নাকর, অস্থির আহ্বান
এক দিন শুনেছিলে তুমি।
কেঁপে গেল
কলেবর, শিহরিল শিরা। অরণ্যের
ঋক্ষঋষি, সংগ্রথিলে কাব্যমধু তুমি।
নব কাব্য-সংসারেতে পাঠালে শ্রীরামে।
...ম-জ্ঞানী বশিষ্ঠেরে ব্রহ্মালিঙ্গী তুমি
...দ-মুক্ত করে দিলে, আনিলে বাসরে।
...ন্ত্র হতে কর্ণে এল মন্ত্র-আসঞ্জনী।
...রতের বুকে এল রামায়ণ-গান।
...খ-পূর্ণ নব এক ভাষা-সুন্দরতা!

...ক্তের অক্ষরে লিখা তব আর্ঘদান
... গৃহ গায়। চাষী গায়, ঋষি গায়।

শুধু তারা চেনে নাকো দরিদ্র ব্রাহ্মণে,
মৃত ক্রৌঞ্চ রচে শ্লোক ভাবার প্রাঙ্গণে। ৪।

এক দিন রন্ধ্র হতে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের
এসেছিল দু'টি ক্রৌঞ্চ মিলনের সুখে
জানে নাই তারা—
নিষাদের বাণ-বেঁধা—
একটি মৃত্যুর বিন্দু—রচিবে সহসা
অভিনব বিরহের রক্তশোধ গাথা।
বিরহের পদ্মদল উঠিবে ফুটিয়া
অশ্রুর সায়রে।
জনস্থান শূন্য হবে,
কাঁদিবে চকিতা সীতা অশোক-অরণ্যে
স্বর্ণ-সীতা সঙ্গে লয়ে যাপিবে যামিনী
চক্রবর্ত্তী নৃপ এক সিংহাসন ভুলি।

একটি মৃত্যুর বিন্দু, কবির প্রাণেতে
গড়ে গেল সিন্ধু অমৃতের। মৃত্যু ধন্য!
প্রাণ যেথা প্রকাশের পায় অবসর
আলোর বলাকা ওড়ে ভারত-ভাস্বর। ৫।

বাক্যহীন তুমি এস, এস মোর প্রিয়
অঙ্গ হতে খুলে লও মোর উত্তরীয়।
সুন্দরিত আমি।
চক্ষে মোর হে বাল্মীকি
রাখো আঁখি।
সৌন্দর্য্যের পরিচ্ছন্ন লোকে
তোমারে পাঠানু মম প্রণাম-ভারতী।
দিব্য রথে কবি-রথী তুমি।
আনো রথ
ভারতের দুর্গতির পথে ; আনো অশ্ব
বহাও গোমতী। দুগ্ধপায়ী সন্তানেরা
হোক্ বিশ্বজীবি।
কে রুধিবে মধুরথ,
হিরণ্ময়-গতি ?
চমকে কাব্যের বন্যা,—
বসুধারা ঝরে যায়, কাব্য সুর শুনি ;
ভাবে ও ভাবায় ঘটে অপূর্ব্ব প্রণয়।

আজি ক্রুদ্ধ দিগন্তের আরক্ত সন্ধ্যায়
দেখা হল তব সাথে নব্য কবিতায়। ৬।

রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রতিক শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

১

সাহিত্য বা সাধারণ শিল্প সম্বন্ধে আমরা যখন আলোচনা করিতে বসি, তখন একটা কথা আমরা অনেক সময়ে খুব বড়-গলায়ই বলিয়া থাকি তাহা হইল এই যে, 'সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা হয়, ইহা হয় না, বা ইহা হওয়া উচিত, ইহা অনুচিত' ইত্যাদি। ইহার ভিতরে প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, সাহিত্যালোচনায় বা শিল্পালোচনায় আমরা সাহিত্য বা সাধারণ শিল্পের একটা স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র 'ক্ষেত্র' নির্দিষ্ট করিয়া লই এবং আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, এই সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্র আমাদের জীবনের ক্ষেত্র হইতে একেবারে না হইলেও অনেকখানি পৃথক্। জীবনের ক্ষেত্র এবং শিল্পের ক্ষেত্রের এই পার্থক্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই কীর্তিত হইয়া আসিতেছে; এ-কথা যে বলা হয় শিল্পীর আত্মরক্ষার তাগিদেই এমন নয়, ইহার ভিতরে হয়ত আছে শিল্পিমনের একটি প্রচ্ছন্ন আত্মতোষণ, যাহাকে ঠিক অবিমিশ্র নিন্দার্হ বলিয়া অভিহিত করা চলে না।

কথাটি বহু-প্রচলিত হইলেও প্রমাদ-গর্ভ; সুতরাং ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন আছে। জীবনের ক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রকে আমরা যখন পৃথক্ বলি, তখন 'জীবনের ক্ষেত্র' বলিতে আমরা কি বুঝি? সেখানে জীবনের ক্ষেত্র বলিতে যদি আমাদের দৈনন্দিন একান্ত ব্যাবহারিক বা লৌকিক জীবনের কথাই আমরা মনে করি তবে সমস্যা অনেক সহজ হইয়া যায়; কারণ শিল্পি-জীবন এবং শিল্প-ধর্ম লৌকিক জীবন এবং লৌকিক ধর্ম হইতে যে অনেকখানি পৃথক্ এ বিষয়ে মতদ্বৈধ কম। কিন্তু আসলে আমাদের এইখানেই থামা উচিত হইলেও এইখানেই আমরা থামি না; স্পষ্ট ভাবে হৌক বা অস্পষ্ট ভাবে হৌক আমাদের শিল্পবোধকে আমাদের অন্যান্য সকল বোধ হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ করিয়া একটা বিশেষ শিল্পদর্শন দাঁড় করাইবার ঝোঁক আমাদের আছে। বিপদাশঙ্কা এই পথে।

শিল্প-দর্শন যদি সমগ্র জীবন-দর্শন হইতে উদ্ভূত না হয়, তবে সেখানে শিল্প-দর্শনের শেষ পরিণতির আশঙ্কা একটা বিশুদ্ধ আকৃতিগত নিয়মতান্ত্রিকতায় (formalism)। প্রত্যেক যুগেই দেখা যায়, শিল্প প্রথমে জীবনের সঙ্গেই গভীরভাবে যুক্ত থাকে; জীবন হইতে একটু একটু করিয়া সে যত দূরে সরিতে থাকে ততই তাহার ভিতরে আসিতে থাকে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রাধান্য; এই নিয়মতান্ত্রিকতার প্রাধান্যই শিল্পকে শেষ পর্যন্ত অর্থহীন করিয়া তোলে। ফলে শিল্পের আদর্শ বা ধর্ম লইয়া আমাদের যে মতানৈক্য তাহা বহু সময়েই দেখা দেয় একটা বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক তর্কের রূপে। এই জাতীয় নৈয়ায়িক তর্কের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে যত ইচ্ছা শাণিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা সত্য লাভের আশা খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

যথার্থ কোন শিল্পীর পক্ষে তাঁহার জীবন-দর্শন এবং শিল্প-দর্শনের উভয়ে কোনও পার্থক্য বা সীমারেখা থাকিতে পারে না; উভয়ে এক এবং অভিন্ন; জীবনের কতগুলি গভীর অনুভূতি ও অনুভূতিলব্ধ বিশ্বাসই এই সকল 'দর্শনে'র গোড়ার কথা। এ সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে রবীন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেই। রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্য-কবিতা, নাটক-উপন্যাস, রচনা-প্রবন্ধ প্রভৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, সাধারণ শিল্প—বিশেষ করিয়া সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কতগুলি বিশেষ বিশ্বাস এবং আদর্শ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সকল লেখার ভিতর দিয়া যেমন এই ভাবে একটি শিল্প-দর্শন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই তাঁহার সকল লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে একটি জীবন-দর্শন। এই কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে এক এবং অভিন্ন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শন সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার জীবন-দর্শনেরই অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে; অথবা বলা যাইতে পারে, উভয়েরই উৎস-মূল এক এবং অভিন্ন।

বর্তমান কালে রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শের সহিত আমাদের অনেকেরই বনিবনা হইতেছে না। যাঁহারা 'রবীন্দ্রোত্তর'-যুগচিহ্নিত হইবার দুর্নিবার লালসায় রবীন্দ্রোত্তর হইবার আপ্রাণ কসরৎ করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও বলিতে হয়, মতের পার্থক্য অনেকখানি ঘটিয়াছে। এই মতের পার্থক্যটা বুঝাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে রোম্যাণ্টিক, পলাতকা, সমাজচ্যুত কল্পনাবিলাসী, বুর্জোয়া প্রভৃতি আখ্যাগুলিকে যেভাবে কটুঝাঁঝ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগের চেষ্টা হয় তাহা যে খুব ব্যাখ্যাসহ তাহা নয়; কিন্তু ঝাঁঝের কথা বাদ দিলে কাজের কথাও কিছু-কিছু আসিয়া পড়ে, তাহাই এখানে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শের সহিত বর্তমান কালের শিল্পাদর্শের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহার পরিমাণ, প্রকৃতি এবং কারণ সম্বন্ধে ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে; কারণ আমার মতে বাঙালীর সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই জিনিসটির একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে শিল্পবোধ তাহার দোষ-গুণ আর যাহাই থাকুক, শিল্প-ন্যায়ের নিয়মতান্ত্রিকতা দ্বারা তাহা আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত ছিল না; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শুধু মাত্র নিয়মতান্ত্রিক তর্ক বা প্রতিবাদে কোন লাভ হইবে না। এই শিল্পাদর্শের পার্থক্যের পশ্চাতে আছে একটা বিরাট পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনটিকে আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

বর্তমান কালে এই রবীন্দ্র-শিল্পাদর্শ-বিরোধী শিল্পী এবং সাহিত্যিকগণ কাহারা? সংক্ষেপে ইঁহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে প্রগতিবাদী বলিয়া। অন্যত্রও বলা হইয়াছে, [illegible] সাহিত্য ও সাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রগতিবাদের একটি পারি[illegible]ষিক অর্থ আছে; অর্থটিকে সম্পূর্ণ পারিভাষিক না বলিয়া একটি যোগারূঢ় অর্থ বলা যাইতে পারে। এই প্রগতিবাদী শি[illegible] এবং সাহিত্যিকগণ হইলেন মোটামুটি ভাবে মার্ক্সপন্থী শি[illegible] এবং লেখকগণ। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শনের সহিত এই প্রগতিবা[illegible]শিল্পী ও লেখকগণের শিল্প-দর্শনের যে পার্থক্য, আসলে তাহা দুইটি [illegible] বিরোধী জীবন-দর্শনেরই মৌলিক পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের [illegible]র্শন যেমন প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জীবন-দর্শনের উপরে, প্রগতিবাদী [illegible]র্শন তেমনই প্রতিষ্ঠিত মার্ক্স দর্শনের উপরে। রবীন্দ্র-শিল্প-দর্শন [illegible] তাঁহার জীবনদর্শনেরই প্রয়োগ মাত্র; প্রগতিবাদী শি[illegible]নও তেমনই মার্ক্স দর্শনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট প্রয়ো[illegible]ত্র। মৌলিক পার্থক্য যাহা তাহা সবই জীবন-দর্শনের, সেই কথাটা [illegible]

...র শিল্প-দর্শনের কতগুলি প্রধান ধারা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

বলিয়াছি, রবীন্দ্র-শিল্প-দর্শনের সহিত যে আধুনিক শিল্প-...বোধ, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার ...শেষ মূল্য রহিয়াছে। সে বিশেষত্বটি এই, আমার মনে হয় ... ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে একটি বিশেষ ... প্রাচীন কাল হইতে বঙ্কিম গতিতে আবর্তিত হইয়া ...রবীন্দ্রনাথ সেই ধারার শেষ মনীষী এবং কবি। অবশ্য ... শেষ কি না এ কথা জোর করিয়া বলা দুঃসাহসের কাজ; ... হয়ত এমন বিশ্বাস আছে, আমরা আমাদের চারি দিকে ... যে সব বিরোধী মতের প্রচার ও প্রসার দেখিতে পাইতেছি, ... সাময়িক বিপর্যয়েরই ফল, এই বিপর্যয়কে এড়াইয়া ... আবার প্রকৃতিস্থ এবং আত্মস্থ হইতে পারিব। ...ভবিষ্যৎ গতি এবং পরিণতি সম্বন্ধে বিতর্কে লাভ নাই। ... দেখিতে পাইতেছি তাহা এই, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ... সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় এই ধারাটির ধারক আর ... তেমন দেখা যাইতেছে না,—বিরোধের আঘাতটাকেই ... হইতেছে। এই যে ভারতীয় ধারার কথা উল্লেখ ...তাহার বৈশিষ্ট্য কি? ইহার বৈশিষ্ট্য হইল অধ্যাত্মবাদ। ...রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মূলে; আমার বিশ্বাস, ...রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শনেরও মূলে। মার্ক্সবাদের ... এই অধ্যাত্মবাদের বিরোধিতায়, তাহার প্রতিষ্ঠা-ভূমি ... মার্ক্সপন্থীয় শিল্প-দর্শনের মূলেও তাই রহিয়াছে একটা ... জড়বাদ। রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ এবং আধুনিক ... ভিতরে যেখানে যেটুকু বিরোধ, ভাল করিয়া খুঁজিয়া ... পাইব, সকল বিরোধের মূলে রহিয়াছে ঐ অধ্যাত্মবাদ ... বিরোধ। অধ্যাত্মবাদী বলিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে ... প্রগতিবিরোধী 'সনাতনী' বলিতে পারি না। ... সত্যকে তিনি কোন 'বাদে'র কোঠায় না ফেলিয়া ... শ্রদ্ধা করিয়াছেন এবং নিজের মতন করিয়া গ্রহণ ...মান রাশিয়ার বহু ব্যবস্থার প্রতি তিনি কিরূপ ... তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি'তে তাহার প্রমাণ আছে। ...স্থার পশ্চাতে এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড অমিল ...টার মতন বিঁধিত এবং তাহাই তাঁহার চিত্তকে ...করিয়া রাখিত। এই সংশয়ের একটি সুন্দর ইঙ্গিত ... 'কালের যাত্রা'র 'অন্তর্গত 'রথের রশি' কাব্য-...

...কালের রথের রশিটা অনড় হইয়া পড়িয়া আছে ... আর পুরোহিতের মন্ত্রতন্ত্রে পড়ে না, পণ্ডিতের নড়ে না; ভক্তিমতী মেয়েরা আসিয়া সব দড়ি-... হইয়া গড় করিল, তাহার ভোগ চড়াইল, তাহাতে ...জল ঢালিল, পঞ্চগব্য পঞ্চ-প্রদীপ কিছুই বাকি ... রাজা আসিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁহার সকল ... তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। পরে আসিল ... দল, রথের রশি নড়িয়া উঠিল তাহাদের ...নে। কিন্তু এই নব-জাগ্রত শূদ্রশক্তিকে ...ই অভ্যর্থনা জানান, ইহার সম্বন্ধে একটা প্রবল শঙ্কা তাঁহার মনে ছিল! পুরোহিত যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে?

তাহার জবাবে কবি বলিয়াছিলেন,—

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙ্গল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

এইখানেই কবি রবীন্দ্রনাথেরও একটা মৌলিক সংশয়। নবজাগ্রত শ্রমিকশক্তি যদি অধ্যাত্ম বিশ্বাসকে একেবারে হারাইয়া ফেলে তবে সেই বলরামের চেলাদের আত্মঘাতী মদমত্ততায় কল্যাণের অপমৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। আমার বিশ্বাস, উপরের কথাটির ভিতরে ধ্বনিত হইয়াছে কবি রবীন্দ্রনাথের একটি মূল সুর। এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, অথবা বলা যায়, এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাস কি করিয়া রবীন্দ্রনাথের সকল শিল্প-বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হইয়া রহিয়াছে, কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহারই আলোচনা করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের ভিতরে 'অন্তর্যামী' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 'চিত্রা' কাব্যের 'অন্তর্যামী' কবিতাটির ভিতরে এই অন্তর্যামীর পরিচয় প্রকৃষ্ট হইয়া উঠিলেও বিভিন্ন যুগের কাব্যগ্রন্থে এই অন্তর্যামীর পরিচয় নানা ভাবে ছড়াইয়া আছে। কবির এই 'অন্তর্যামী' কে? 'অন্তর্যামী' কবিতাটির ভিতরে এই অন্তর্যামীর পরিচয় তিনটি স্তরে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রথম স্তরের অন্তর্যামী রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের অন্তর্যামী; দ্বিতীয় স্তরে দেখিলাম, যিনি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী তিনিই আরও গভীর এবং ব্যাপক রূপ লইয়া দেখা দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পুরুষীয় সত্তার অন্তর্যামিরূপে। তৃতীয় স্তরে দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিপুরুষের যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখা দিলেন বিশ্বজীবনের অন্তর্নিহিত সত্যরূপে।

প্রথম স্তরে কবির যে অন্তর্যামীর সন্ধান পাইলাম তাহাতে দেখিতে পাইলাম, কবি তাঁহার সকল শিল্পসৃষ্টির ভিতরেই এই একটা সত্য অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহার কোন সৃষ্টিই তাঁহার ভাসমান সচেতন আমিটির দ্বারা সৃষ্ট নয়; নিজের লৌকিক ব্যক্তি-সত্তার পশ্চাতে তিনি সর্বদা অনুভব করিয়াছেন চেতনলোকের অন্তরালবর্তী আর একটি অসীম কৌতুকময়ী গভীর সত্তাকে, যাহার হাতে কবি ক্রীড়নক বা যন্ত্রের মত পরিচালিত বা ধ্বনিত হইয়াছেন। এই অনুভূতিটির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের কোন বৈশিষ্ট্য নাই; জগতের সকল যুগের সকল বড় কবি বা শিল্পীই এই সত্যটিকে অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহাদের যাহা কিছু সৃষ্টি তাহা তাঁহাদের লৌকিক 'আমি'র সচেতন সৃষ্টি নয়; শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা শুধু নয়, শিল্পসৃষ্টির প্রকাশ-ক্রিয়াও সম্পাদিত হয় শিল্পীর অচেতনে; অচেতনে সমাহিত কবি বা শিল্পীর এই বৃহত্তর সত্তা ও শক্তির নিকটে অনেক কবি বা শিল্পীই আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন।

আজকালকার দিনে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এই অন্তর্যামীর ব্যাখ্যা অতি সহজ। আধুনিক মনোবিকলন শুধু আমাদের শিল্প-সৃষ্টির পশ্চাতে কেন, প্রায় সকল সৃষ্টির পশ্চাতেই এক অদৃশ্য শক্তি বা অন্তর্যামীর আবিষ্কার করিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় বাসনা-লোকের ভিতরেও এই অন্তর্যামীর অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই অন্তর্যামীতে যে বিশ্বাস এখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত মার্ক্সপন্থিগণেরও সাধারণ ঐকমত্য রহিয়াছে। কিন্তু মতান্তর হইতেছে এই অন্তর্যামীর স্বরূপ লইয়া। মনোবিকলনবাদিগণ এই অন্তর্যামীকে অবচেতন এবং অতিচেতনে বিরাজিত আমাদের চেতনের নিয়ামক দ্বৈতসত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। মার্ক্সপন্থিগণ ইহাকে আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন, আমাদের ব্যক্তি-পুরুষের অন্তরালবর্তী ব্যক্তি-পুরুষের নিয়ামক এই গভীর সত্তা হইল আমাদের সমাজ-সত্তা। এই বৃহৎ সমাজ-সত্তার ভিতরে শুধু একটি ব্যক্তির মগ্নচৈতন্য বা অতিচৈতন্য লুকাইয়া নাই,—ইহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে একটি বৃহৎ জাতির সকল মগ্নচৈতন্য, অতিচৈতন্য, একটি জাতির বাসনা-সংস্কার—ঐতিহ্য-সংস্কৃতি যাহা কিছু সব। একটি ব্যক্তিমনের অন্তরালে যেমন বহু দিক হইতে আসিয়া বহু অদৃশ্য শক্তি কাজ করিতে থাকে, একটি সমাজ-জীবনের অন্তস্তলেও ঠিক সেইরূপ পুরাতন এবং নূতন বহুবিধ শক্তি কাজ করিতে থাকে। এই বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে যে একটি বৃহৎমূল শক্তি গড়িয়া ওঠে, তাহাই হয় সেই সমাজ-জীবনের নিয়ামক। ব্যক্তি-জীবন এই বৃহৎ সমাজ-জীবনের হাতে অনেকখানি ক্রীড়নক বা যন্ত্রের মত চালিত হয়। শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রে প্রতিফলিত হয় এই বৃহৎ সমাজ-সত্তা। এ দিক হইতে তাই প্রতিভার লক্ষণ করা যাইতে পারে ব্যক্তি-জীবনের কেন্দ্রে সমাজ-সত্তার অবাধিত এবং সুষ্ঠু প্রতিফলন-যোগ্যতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার নিজের কিছুই নয়; তাঁহার গর্ব এই যে, নিজেকে এমন ভাবে সর্বদার জন্য প্রস্তুত রাখিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার কৌতুকময়ী অন্তর্যামী নিজের স্বচ্ছন্দ লীলায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-কেন্দ্রের ভিতর দিয়া অবাধিত প্রকাশলাভ করিতে পারিতেছে। পুরাতন এবং নবীন বহু শক্তির সমবায়ে সমাজ-জীবনের ভিতরেও আসে এই জাতীয় একটা বিচিত্র এবং স্বচ্ছন্দ প্রকাশ-লীলার আবেগ। সেই আবেগই সমাজ-জীবন হইতে কেন্দ্রীভূত হয় একটি ব্যক্তি-জীবনে; তাহাতেই—

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-কথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা।
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

ব্যক্তি-সত্তার ভিতর দিয়া এই যে সমাজ-সত্তার অবাধিত প্রকাশ ইহাই শিল্পের স্বতঃস্ফূর্তত্বের তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথ অন্তর্যামীর পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন-জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে-ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।

এই 'নবীন প্রতিমা' বিশ্বজনের বস্তু। যাহা ছিল 'আপনার কথা' এবং 'ঘরের কাহিনী' তাহাই যখন শিল্পরূপ ধারণ করিল তখন তাহা বিশ্বজনের কথা। মার্ক্সপন্থিগণও তাহাই বলিবেন,—"That which comes from the pen of the writer ceases to be his private possession the moment it is published. The ideas and views put forword in his works no longer depend on his will, but are completely determind by the objective conditions and the inter-relations of classes." (Lenin on Art and Literature, ১৪৪ পৃ:)। যাহা লেখকের লেখনী মুখে বাহির হইয়া আসে তাহা প্রকাশিত হইবা মাত্র আর লেখকের নিজস্ব বস্তু থাকে না। তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশিত চিন্তা ও মত আর তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় কতগুলি বাস্তব হেতু-প্রত্যয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা। মোটের উপরে দেখিতেছি, এই অন্তর্যামীর ক্রমাভিব্যক্তি তাহা হইলে শিল্প-চেতনার অপরিহিত একটা দ্বৈতবোধের ভিতর দিয়া; এই দ্বৈতবোধের এক দিকে রহিয়াছে ব্যক্তি—অপর দিকে রহিয়াছে বৃহৎ সমাজ। বিচিত্র শক্তিতে এই সমাজ-সত্তাই শিল্পীর অন্তর্যামিরূপে তাঁহার ব্যক্তিসত্তার চারি পাশে একটি বৃহত্তর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া শিল্পীকে ঘিরিয়া থাকে।

মার্ক্সবাদিগণ একান্ত ভাবেই অনাধ্যাত্মবাদী; তাঁহাদের নিকট তাই পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে মনুষ্য-সমাজ; শিল্পের সকল উৎসারণ এবং প্রসারণ তাই এই চরম লক্ষ্য মনুষ্য-সমাজ [illegible] করিয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহজাত অধ্যাত্মবোধ এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে অন্য দিকে অনেক দূরে টানিয়া লইয়াছে। তাঁহার কাব্যে [illegible] যে অনন্ত রহস্যময়ী অদৃশ্য শক্তিকে তিনি বরাবর গভীর [illegible] করিয়াছেন সে যে মনুষ্য-সমাজের অন্তর্নিহিত কতগুলি [illegible] আবর্তনে সৃষ্ট জড় শক্তি বিশেষ—সেই শক্তির প্রধা[illegible] মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত শ্রেণি-সংগ্রাম [illegible] সুরে সুর-বাঁধা রবীন্দ্রনাথ এ-কথা কিছুতেই শ্রদ্ধেয় [illegible] করিতে পারেন নাই! তাঁহার মনে যে এ জাতীয় [illegible] হইয়াছিল, তার পরে তিনি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া সেদিক [illegible] ফিরাইয়া লইয়াছিলেন তাহা নহে, সহজাত [illegible] তার মন চলিয়াছে অন্য পথে। তাই দেখিতে পাই [illegible] কবিতাটির দ্বিতীয় স্তরে তিনি এই একটি রহস্যময়ী [illegible] তাঁহার সমগ্র জীবনের সমগ্র কর্মের পশ্চাতেই অদৃশ্য [illegible] এই অদৃশ্য শক্তি শুধু চৈত্তিক সত্যরূপে শুধু তাঁহার [illegible] অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই দেখা দিল না, দেখা দিল [illegible]

অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ; সুতরাং এই কাব্যের অন্তর্যামী
...জ ভাবেই তাঁহার জীবন-দেবতার সহিত অভিন্ন হইয়া
... আর এই যে ব্যক্তি-জীবন সে ত বিশ্ব-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন
...তরাং এই অনন্ত-রহস্যময়ী শক্তি শুধু কাব্যজীবনকে নহে,
...-জীবনকে নহে, সমগ্র বিশ্ব-জীবনেরই অন্তরালে অবস্থান
... বিশ্ব-জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ; ইহা বিশ্বের অন্তর্যামী।
...শ্বের অন্তর্যামী রবীন্দ্রনাথের নিকটে একটি গভীর অধ্যাত্ম সত্য।
... দেখিতে পাই, অন্তর্যামী কবিতার শেষ অংশে কবি যেখানে
...র্যামীর বর্ণনা করিয়াছেন—

শূন্য গগন নীল নির্মল,
নাহি রবিশশী গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাই কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা।
অচল আলোকে রয়েছে দাঁড়ায়ে,
কিরণ-বসন অঙ্গে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তল-ভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।

তখন এই 'অন্তর্যামী'র স্বরূপ বুঝিতে আর কোন কষ্ট হয় না। ইহাকে বেশ মিলাইয়া লইতে পারি উপনিষদের সেই 'অন্তর্যামী'র সহিত—যাঁহার সম্বন্ধে অনেক বলার পরে সর্বশেষে বলা হইয়াছে—"যঃ সর্বতত্ত্বে তিষ্ঠন্ সর্বতত্ত্বস্যান্তরঃ, যং সর্বতত্ত্বং ন বেদ, যস্য সর্বতত্ত্বং শরীরং যঃ সর্বতত্ত্বং যময়তি স আত্মা অন্তর্যামী।" যিনি সর্বতত্ত্বে বর্তমান থাকিয়া সর্বতত্ত্বের অন্তরস্বরূপ, যাঁহাকে সর্বতত্ত্ব জানে না, সর্ব... যাঁহার শরীর, যিনি সর্বতত্ত্বের নিয়ামক সেই আত্মাই অন্তর্যামী। এই ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের শিল্প... ভিতরকার অন্তর্যামীর ধারণা।

...নাথের আর একটি বিশেষ কাব্য-ভাবধারা লইয়া আলোচনা করা ...। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা রহিয়াছে যেখানে তিনি নানা... নিজের ব্যক্তি-সত্তার সঙ্কীর্ণ পরিধিকে কেবলই অতিক্রম ক... আত্ম-প্রসারের ভিতরে আনন্দের সন্ধান করিয়াছেন। ক... মনোভাবটির স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত তাঁ... নিরন্তর তাদাত্ম্যবোধে। এই তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা ... আত্ম-অতিক্রমের প্রবণতা, ইহা রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধকেও ... করিয়াছে। এই আত্মাতিক্রান্তি (self transcendence) রবীন্দ্রনাথের শিল্পানন্দকে একটা অতীন্দ্রিয়তা দান কা... রবীন্দ্রনাথের শিল্পায়নের ভিতরে অনেক স্থানে একটা ...লোকোত্তরণ রহিয়াছে ; ইহা তাঁহার সহজাত আত্মাতিক্রমপরিণতি।

মূলধর্ম সাধারণীকৃতির ভিতরেই শিল্পীর আত্মাতিক্রম এবং ... আত্মপ্রসার রহিয়াছে, কিন্তু আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের শিল্প... যে আত্মাতিক্রম এবং আত্ম-প্রসারের কথা বলিতেছি, তাহা ... সাধারণীকৃতির আত্মাতিক্রম এবং আত্ম-প্রসার হইতে পৃ...

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় আত্মাতিক্রমের প্রবণতা লিরিক্ কবিতার ক্ষেত্রে। লিরিক্ কবিতার ক্ষেত্রে আসল বিভাবাদি কবি নিজেই ; সুতরাং সেক্ষেত্রে সাধারণীকৃত হ'ন কবি নিজেই—তাঁহার সকল চিন্তা ও বিচিত্র আনন্দানুভূতি লইয়া বিশ্বমানবের সহিত নিগূঢ় যোগে। কিন্তু অনেক লিরিক্ কবিতার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের আর এক ধরণের আত্মাতিক্রান্তি আছে—যেখানে তিনি সমগ্র জীব-জগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ—জলে স্থলে প্রতিটি অণু-পরমাণুর সহিত নিজেকে যুক্ত এবং প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এই জাতীয় আত্মাতিক্রম এবং আত্ম-প্রসারণ তাঁহার এই জাতীয় লিরিক্ কবিতার কাব্য-রসকে একটি বিশিষ্ট গুণ-সমন্বিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই বিশিষ্টতার ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে একটা মিষ্টিক্ অতীন্দ্রিয়তা।

কবির এই জাতীয় আত্মাতিক্রমের সহিত কাব্যফলশ্রুতির অতীন্দ্রিয়তার কোন নিত্যসম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিযোগ নাই, অধ্যাত্মবাদের সহিত ত নয়ই। একান্ত অনাধ্যাত্মবাদীর পক্ষেও এই জাতীয় একটা ভাবাবেগ-জনিত আত্মাতিক্রম অতি সহজ ভাবেই দেখা দিতে পারে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির ভিতরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মূল অধ্যাত্মবাদ এ সকল ক্ষেত্রেও তাঁহার শিল্প-দর্শন এবং রস-সৃষ্টির নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছে। জড়বাদীর দৃষ্টিতে কবির এই আত্মাতিক্রম স্পৃহাকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে আলোচনার সুবিধার জন্য এই আত্মাতিক্রমের ভিতরে কতগুলি স্তরভেদ করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম স্তরে দেখি প্রাণি-জগতের সহিত কবির একাত্মতার আগ্রহ। ইহার কারণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, মানুষ মননশীল প্রাণী ; এই মননশীলতা এক-দিকে তাহার বর, অন্য দিকে তাহার অভিশাপ। চিত্তবৃত্তির স্থূল-সূক্ষ্ম, চপল-গভীর সর্বপ্রকার কম্প্র-গতিতে আমরা সর্বদা নানাখানা হইয়া আছি ; মননের তীব্রতা বুদ্ধির রূপ পরিগ্রহ করিয়া শাসক এবং শোষকরূপে অন্তহীন উপদ্রবের সৃষ্টি করিতেছে। এই উপদ্রব আমাদের অনুভূতিকে সর্বদা খণ্ডিত এবং সীমিত করিয়া দিতেছে। অনুভূতির আরও গভীরতা এবং ব্যাপ্তির জন্য তাই আমরা আমাদের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা করি এমন একটি সত্তা, মন যেখানে একটি একান্ত অনভ্যর্থিত শয়তানের মতন তাহার নিরন্তর তীব্র বৃত্তি-চাঞ্চল্যের দ্বারা শুধু উৎপাত সৃষ্টি করিতেছে না। প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রহিয়াছে অথচ মনের অনভিপ্রেত দৌরাত্ম্য নাই—এই জাতীয় অখণ্ডিত জীবনের আনন্দানুভূতির আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে মনুষ্য-উপাধি ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর প্রাণি-জগতের সহিত অন্বয়যোগে যুক্ত করিয়া দিতে চাহে। জীবন-লীলার ক্ষেত্রে ইহা যেন একটি বিশেষ জাতি (specis) হইতে সাধারণ জাতিতে (genus) গমন ; 'বিশেষ'-এর সকল বৈশিষ্ট্যই জীবন-রসের পরিচ্ছেদক ; এই পরিচ্ছেদ অপসারণেই জীবন-রসের অনাবিল এবং অবাধিত অনুভূতি। এই জন্যই—

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে,—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্য-মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে

বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা,
হিংসা তীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা—"

তাহার স্বাদ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও কখনো কবির নিকট দুর্নিবার হইয়া ওঠে। গান হিসাবে মানুষের গান অপেক্ষা পাখীর গানকে কবি অনেক স্থানে অধিক বরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; তাহার কারণ গানের ভিতর দিয়া জীবন-রসধারার যে অনাবিল স্বতঃ-উৎসারণ, পাখীর গানে তাহা কথা ও রাগ-রাগিণীর বন্ধনে শতধা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহুধা পারমিতত্ব লাভ করে নাই। তাই 'কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে' তেমন একটি সুর লাভ করা কবির নিকটে একটি প্রার্থিততম বস্তু ছিল।

কিন্তু পশুপাখীও চেতন প্রাণী ; কবি ইহারই পরের স্তরে তাই আর একটি বিশুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের সন্ধান করিয়াছেন তৃণ-তরু-লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্-জগতের ভিতর দিয়া। এখানেই যেন প্রাণের আদিম ধারার অনাবিল প্রবাহ। কবির এই ভাবটি একটি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাঁহার 'পঞ্চভূতে'র 'মন' শীর্ষক লেখাটির ভিতর দিয়া। সেখানে তিনি বলিয়াছেন,—'কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতা গাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে ঐ সরস-শ্যামল দারু-জীবনের মধ্যে কী বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়! তবে চিন্তায় উহার সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে।" এই লেখাটিরই অন্যত্র দেখিতে পাই,—"যদি কোনো প্রবল সয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাটির নিচে প্রবেশ করিয়া শত লক্ষ আঁকা-বাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র, সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না।······

"তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া অরণ্যের ভাষাহীন মর্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ নিবৃত্তি করিবার জন্য এই অনন্ত প্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রকাণ্ড নীলাম্বু-রাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, এখানে কবি যে 'আবশ্যকে'র কথা বলিলেন তাহাকে কোন আধ্যাত্মিক 'আবশ্যক' না বলিয়া একটি বিশুদ্ধ মানসিক আবশ্যকরূপেই গণ্য করা যাইতে পারে। এই আবশ্যকের মাত্রা মনের ভিতরে যতই বাড়িয়া যায় ততই জীবনযাত্রার একটা পশ্চাদাবর্তন (Regressive process) বা প্রত্যাবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া হইল নিজের পরিচয়-পরিধিরূপ 'বিশেষ জাতি' (Specis)গুলিকে ক্রমে অতিক্রমণ এবং ক্রমবিস্তীর্ণ 'সামান্য জাতি'র সহিত অন্বয়যোগে নিজের ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমগভীরীকৃত সত্তানন্দকে অনুভব করা। কবি তাই শুধু উদ্ভিদ্-জগতের ভিতরে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াই থামেন নাই—দূরে—অতিদূরে সমস্ত দেশকাল অতিক্রম করিয়া অন্ধকার রহস্যের গুহাহিত সৃষ্টির প্রথম উৎস-মূলে চলিয়া গি[য়া]ছেন, সেখানকার প্রতিটি অণু-পরমাণুর প্রথম অস্তিত্ব ও প্রথম স্প[ন্দ]নের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। [সেখ]ানে চেতন-অচেতনের কোন প্রশ্নই নাই—সেখানে একটা সর্বব্যাপী [বি]শুদ্ধ সত্তা মাত্রের ভিতরে একটা বিশুদ্ধ স্পন্দনের অনুভব। এই [বিশ্ব]ব্যাপী আত্মবিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষা কবিকে বার বার সমস্ত দেহমন [অনু]ভূতি লইয়া বিরাট্ বসুন্ধরার সহিত সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইবার আকা[ঙ্ক্ষা] দান করিয়াছে। বিরাট বসুন্ধরায় অন্তর্লীন হইয়া আছে অ[ন]ন্ত ও আনন্দের অনন্ত সম্ভাবনা ; সেই সম্ভাবনার অংশীদার হইবা[র] জন্যই বসুন্ধরার নিকট ব্যাকুল আবেদন,—

ওগো মা মৃণ্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে ; উত্তরে দক্ষিণে,
পূরবে পশ্চিমে ; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণশীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নবপুষ্পদল
করি পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণলেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্-দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয় প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে
নিঃশব্দে নিভৃতে।" (বসুন্ধরা, সো[নার তরী])

জড়বাদীর দৃষ্টিতে ইহাই হইল কবির ভাবাবেশে লো[কো]-(poetic transport) তাৎপর্য। কবি সেখানে বলিতে[ছেন]—

তাই আজি কোনো দিন—শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র 'পরে,
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহা ব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।

সেখানকার আসল সত্য হইল, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে নিরন্তর ... রূপে বাড়াইয়া তোলা মনটা লইয়া কবি এই একটি বেদনা ... করিয়াছেন যে, শরৎ-প্রাতের সোনার আলো শিশির-ভেজা ... কলের পাতাগুলির প্রাণ-প্রবাহে যে আনন্দ শিহরণ জাগাইয়া ... একটি মানুষের দেহমনে, সে তাহা পারে না ; এই বেদনা ও ... প্রতিক্রিয়া কবিমনকে আস্তে আস্তে চেতনার এমন একটি অস্পষ্ট স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যেখানে বিশ্ব-জীবনের সহিত ... গাহনের ফলে তাঁহার দেহ-প্রাণ-মন জুড়িয়া তিনি মাত্র ... অনুভূতি বা স্পন্দন লাভ করিতেছেন যতটুকু অনুভূতি ... স্পন্দন লাভ ঘটে নারিকেল পত্রগুলির শরতের আলো ... স্পর্শলাভে! ব্যক্তি-মন হইতে মানব-মন, মানব-মন ... জীব-প্রবৃত্তিতে, জীব-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভিদ-প্রাণস্পন্দনে—সেখান হইতে আস্তে আস্তে একটি বিলীয়মান-নাম-রূপ ... ভিতরে ক্রমাবগাহন—ইহাই শিল্পীর লোকোত্তরণ ... জাতীয় লোকোত্তরণ বহুবার ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে। ... ভাবাবেশে তিনি বলিয়াছেন—

> ফিরিয়া এসেছি যেন আদিজন্মস্থলে
> বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে
> পশুপাখিপতঙ্গম সকলের সাথে
> ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
> পূর্ব জন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে
> আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
> জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
> আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ। (মধ্যাহ্ন, চৈতালি)

রবীন্দ্রনাথ নিজেই দু'-এক স্থলে তাঁহার এই উত্তরণ-মনোভাবটির স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্গত দু'-একখানি চিঠিতে—

"... সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, ... উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, ... আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ ... যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত ... দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল ... নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে প'ড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-... আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি ... অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে ... থাকত তাই যেন মনে পড়ে। আমার এই যে ... যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত সূর্যসনাথা ... ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর ... এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ... হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে ... গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ...।"

... হয়ত বলিবেন, কবির এই যে আত্মাবগাহনের ... মানুষের সহজাত প্রকৃতি (Instinct) ও বুদ্ধির চিরন্তন ... এখানে বুদ্ধির অভাব-জনিত একান্ত একটা বিমূঢ়তা। মাত্র ... এখানে আছে প্রবৃত্তি-রাজ্যের নিকট যুক্তিরাজ্যের স্বেচ্ছায় ... সমর্পণ। দ্বিধাহীন চেতন-লোকে অনুপাধিক প্রবৃত্তির এই দৃঢ় এবং গভীর আলোড়নই তথাকথিত সকল স্বর্গীয় উত্তরণের মূল কথা।

জড়বাদী দৃষ্টিতেও এই আত্মাতিক্রম-জনিত উত্তরণের ভিতরে একটা মিষ্টিসিজ্‌ম্ স্বীকার করা যাইতে পারে, যদি বিশ্বব্যাপী একটা অন্বয়বোধকেই মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর মূল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শুধু ত অন্বয়বোধ হইলেই হইবে না ; সে বোধ বুদ্ধি-জনিত হইতে পারিবে না। তবে ইহাকে গ্রহণ করা হয় কিসের দ্বারা? এইখানেই 'অতিমনে'র আবির্ভাবের সম্ভাবনা ; মনের ক্রিয়া, বুদ্ধি যাহাকে লাভ করিতে পারে না, অতিমনের ক্রিয়া বোধি তাহাকে সহজলভ্য করিতে পারে। বিরুদ্ধবাদিগণের হয়ত সংশয় দেখা দিবে এইখানেই! যে বোধ মনের অতীত, তাহার ভিতরে বড় হইয়া ওঠে হয়ত প্রাণময়কোষ ও অন্নময়কোষের স্পন্দন। মনোময়কোষের এই আত্ম-সংহরণ এবং প্রাণময় ও অন্নময়কোষের এই স্পন্দনের ভিতরে অবগাহনই কি অতিমনের আবির্ভাব-রহস্য? কাব্য-ভাবাবেশে লোকোত্তরণ কি এই মনলোক হইতে প্রাণলোক এবং অন্নলোকে প্রত্যাগমন?

রবীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শন তথা জীবন-দর্শন এই সংশয়ের একান্ত পরিপন্থী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' (মানসী) 'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী), 'বসুন্ধরা' (সোনার তরী) প্রভৃতির কবিতার ভিতরে যে বিশ্বাত্মবোধ দেখা দিয়াছে, তাহাকে কোন অধ্যাত্মবোধ বা বিশ্বাসের সহিত যুক্ত না করিয়াও গ্রহণ করিতে খুব বেশী অসুবিধা হয় না ; কিন্তু অসুবিধা মনে না হইলেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মূল অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের সহিত যুক্ত করিয়া না লইলে এই সকল কবিতার ভিতরকার বিশ্বাত্মবোধ একটা উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবি-কল্পনামাত্রে পর্যবসিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ভাবের এবং এই সুরের আরও অনেক কবিতা রহিয়াছে ; এইগুলিকে সমগ্র ভাবে বিচার করিতে হইলে এবং এই কবিতার অন্তর্নিবিষ্ট রস সম্যক্ আস্বাদন করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের মূল অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এই জাতীয় কবিতার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের যে মিষ্টিসিজ্‌ম্ রহিয়াছে, তাহার পটভূমিকায় রহিয়াছে উপনিষদের অন্বয়-বাদ। সকল পশু-পাখী, জীব-জন্তু, তৃণ-তরুলতা, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যাহা কিছু সকলের সহিত এই যে নিগূঢ় ঐকাত্ম্যের অনুভূতি ইহার পশ্চাতে আর একটি গভীরতর বিশ্বাস ব্যঞ্জিত হইয়াছে—বিশ্বে যাহা কিছু সব একটি সৃজনী-শক্তির একটি প্রাণ-শক্তির লীলা।

> এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
> যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
> সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে,
> সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
> নাচিছে ভুবনে ; সেই প্রাণ চুপে চুপে
> বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
> লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
> বিকাশে পল্লবে পুষ্পে,—বরষে বরষে
> বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
> দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়। (নৈবেদ্য)

বিশ্বব্যাপী এই যে এক প্রাণের তরঙ্গ, ইহাই তৃণ-তরু-লতাকে সর্বদা

করিয়া রাখিয়াছে প্রিয়তম। তৃণ-তরু-লতারও তাই বাণী ছিল, সে ছিল প্রাণের বাণী, তাহাকে শুনিতেও হয় তাই কানে নয়, প্রাণে। ইহাদের ভাষা হইতেছে 'জীব-জগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে।' কবি 'বনবাণী'র ভূমিকায় তাই বলিয়াছেন,—"ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হ'লে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।' 'পত্রপুটে' কবি বলিয়াছেন, এক 'আদিত্যবর্ণ' মহান্ পুরুষের আবির্ভাব সবিতার ভিতর দিয়া, আর সবিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> আমার অন্তরতম সত্য
> আদিযুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
> তোমার বিরাটে ছিল বিলীন
> সেই সত্য তোমারই। (১০ সংখ্যা)

ইহা অপেক্ষা অনেক স্পষ্ট করিয়াও রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন; 'জীবনদেবতা'র সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—"তিনি যে কেবল আমার ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেইজন্য এত বড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" (আত্ম-পরিচয়, ১)

বিশ্বজগতের সহিত এই নিবিড় অধ্যাত্মযোগের প্রমাণ রবীন্দ্র-কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই; তাঁহার প্রাচুর্য সুবিদিত। এই অধ্যাত্ম অন্বয়যোগই রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর গোড়ার কথা। কিন্তু কথা উঠিবে, ইহা ত রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর পরিচয়; ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ বা তাঁহার সৃষ্ট রসের সহিত সম্পর্ক কি? আমি প্রারম্ভেই বলিয়াছি, মূলতঃ জীবনবোধ আর শিল্পবোধে কোন পার্থক্য নাই, উভয়ের ভিতরে আছে অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক। সুতরাং জীবনবোধের এই বৈশিষ্ট্য শিল্প-বোধেরও নিয়ামক হয়। শিল্পরসকে আমরা যদি একটা অলৌকিক হ্লাদগোচরতা বলিয়া বর্ণনা করি, তবে নিজের আসল প্রকৃতিতে সে এক এবং অখণ্ড। আমাদের বিশেষ বিশেষ চিন্তা-ভাবনা, রুচি-প্রবণতা, জ্ঞান-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াই আমাদের এক শিল্পানন্দও বহুবৈচিত্র্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ চিন্তা-ভাবনা, রুচি-প্রবণতা, জ্ঞান-বিশ্বাসও তাঁহার সৃষ্ট শিল্পরসকে বিশেষ কতগুলি প্রকৃতি দান করিয়াছে। অধ্যাত্মবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মিষ্টিক মনোধর্ম ও তাই তাঁহার সৃষ্ট শিল্পরসকে বহু স্থলে অধ্যাত্মগন্ধি করিয়া তুলিয়াছে। এই অধ্যাত্মগন্ধিত্বকে আমি কোন লঘু অর্থে গ্রহণ করিতেছি না; পুষ্পের সহিত গন্ধের যেমন সমবায়-সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় লিরিক্ কবিতার ক্ষেত্রেও শিল্পরসের সহিত আধ্যাত্মিকতার সেই জাতীয় একটা সমবায় সম্বন্ধ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে সকল কবিতা ও গান স্পষ্টতঃই আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমি এ-কথা বলিতেছি না, আমি এ-কথা বলিতেছি যেখানে আধুনিক সংশয় এবং জড়ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে এবং যে কবিতার ভিতরে সাধর্ম্য এবং বৈপরীত্যের তুলনায় আধুনিক শিল্প-বোধের সহিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের পার্থক্যটাকে স্পষ্ট করিয়া ধরা যায়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

পারিবারিক জীবনে গীতার আদর্শ

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু

কোন এক তরুণী ভদ্র-মহিলার সহিত হিন্দু-পরিবারে যে সকল অবাঞ্ছিত মনান্তরের দরুণ শান্তি ও ঐক্য বিঘ্নিত হয় ... আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম ... স্বাধিকার-বোধই অনর্থের মূল এবং ভগবদ্গীতোক্ত ত্যাগধর্ম্মের ...শীলন করিলে সংশ্লিষ্ট সকলেরই বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। ...স্থের দৈনন্দিন ব্যাপারে এরূপ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণায় ... ভদ্র-মহিলাটি একটু হতভম্ব হইয়া আমার বক্তব্যের আরও ... ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আমাদের ...য়ের মধ্যে এক ভাবোদ্দীপক আলোচনার সূত্রপাত হয়। সেই ...লোচনার বিষয়বস্তু সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য হইবে এবং আমার ...কালীন মতামত বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষক হইবে এই ...বণার বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমার যুক্তিগুলি সন্নিবেশ ...রিতে সাহসী হইলাম।

মনুষ্য মাত্রেরই স্বাধিকার-বোধ অত্যন্ত প্রবল। ইহা ...ল ক্ষেত্রে দোষাবহ নহে, বস্তুতঃ সময় সময় ইহার মহত্ত্বপূর্ণ ...ভাবে মানুষ স্বার্থগন্ধহীন ঐকান্তিক অনুরাগে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ...বারে নিজেকে উৎসর্গ করে। এই প্রকার আত্মত্যাগ সচরাচর ...ষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু ইহার মূলে থাকে স্বাধিকার-বোধ। ... প্রসঙ্গে পুত্রের উপর মাতার অধিকার-বোধের কথাই আমার ...শেষ করিয়া মনে হইতেছে। প্রত্যেক হিন্দু-মাতাই সাধারণতঃ ...ন করিয়া থাকেন যে, তিনি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং ...পূর্ণ মাতৃস্নেহ লইয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, অতএব তিনি ...স্তানের নিকট হইতে তুল্য স্নেহলাভের অধিকারী। তিনি দাবী ...রেন যে, পুত্রের ধন, সম্পদ্, গৃহ, সংসার সকলেরই তিনি অংশীদার। ...ক্ষে তিনি পুত্রের গৃহকে তাঁহার নিজের গৃহ বলিয়াই গণ্য ...রেন ... স্বীয় অধিকারবলেই তিনি তথায় বাস করিতে পারেন, ...হাই ...হার ধারণা। অধিকার বলিতে সত্য সত্যই যাহা বুঝায় তিনি ...পুত্রের উপর দাবী করিয়া থাকেন। এবং ইহার সমর্থনও ... ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তার পর আসেন পুত্রবধূ। ...বার তাঁহার স্বামীর ভালবাসার উপর প্রায় ষোল আনা ...স্বত্বের তুল্য দখলী-স্বত্ব দাবী করিয়া থাকেন। তাঁহার ... যে, আইনতঃ ধর্ম্মতঃ, এবং সনাতন রীতি অনুসারে ...মীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। তিনি ও তাঁহার স্বামী এই দুই জনকে ...তাহার জগৎ। স্বামীর ঘরই তাঁহার ঘর, স্বামীর সম্পদই ...দ। পক্ষান্তরে তাঁহার শাশুড়ী পুত্রের মাধ্যমে পৌত্র...বই দখলী-স্বত্ব দাবী করেন। ফলে, মাতা ও পুত্রবধূর ...ধের পরস্পর সংঘর্ষ ঘটে, এবং তাহা হইতেই হিন্দু ...বিবাদ, ঈর্ষা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। শুধু মাতা কেন, ... ও ভগিনীর বেলাও এ কথা বলা চলে। পুত্রের ...পূর্বে, পিতা এবং ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে ভগিনী বা অন্য ...কেই আপনাপন সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে নিজ নিজ অধিকার ... থাকেন। ভ্রাতা, ভগিনী অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের ...র কর্ত্তব্য কি, তাহার নির্দ্দেশ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে। কিন্তু পরিবারে বধূ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন অধিকারের সংঘাত উপস্থিত হয়। স্বভাবতঃই বধূ চাহেন সর্ব্বময় কর্ত্রীত্ব এবং এই কারণেই তিনি অন্য সকলকেই স্বামীর ভালবাসা বা শ্রদ্ধার অংশীদার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহেন। তিনি হয়ত নিজের উদারতা ও স্নেহশীলতায় এক জন আদর্শ পুত্রবধূ অথবা ভ্রাতৃবধূ হইতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল গুণের পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহাকে আপন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে দিতে হইবে। তাঁহাকে এড়াইয়া তাঁহার স্বামীর ভালবাসার উপর পূর্ব্বেকার কোন দাবী ঘটাইতে গেলে তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং তাহাতে গৃহের শান্তি নষ্ট হয়। স্বামীর ভালবাসার উপর নিজের কর্ত্রীত্ব-বহির্ভূত কোন প্রকারের দাবীই তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সমগ্র ভারতে শাশুড়ীর সহিত পুত্রবধূর, ভ্রাতৃজায়ার সহিত ননদের অথবা অন্যান্য আত্মীয়ের অসম্প্রীতির যে সকল কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ স্বামীর মাতা-পিতা কিংবা অন্যান্য স্বজনবর্গের উল্লিখিত অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা হইতেই উদ্ভূত।

আমার মতে এই সকল সংঘর্ষের সম্ভাব্যতা দূরীকরণের একমাত্র উপায় উক্ত অধিকার-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ভাবে বিসর্জ্জন করা—কোন ব্যক্তি বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার উপর মাতা-পিতা অথবা অন্যান্য আত্মীয়ের স্বাধিকারের যাবতীয় দাবী ত্যাগ করা। প্রত্যেক নারীই বিবাহের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সচেতন। ইহা প্রকৃতই তাহার জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। তিনি যেন এক দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হন এবং এক সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রদেশে। নিজের মাতা-পিতার তত্ত্বাবধান ও আশ্রয়ে থাকিয়া হয়ত যে গৃহে ২০ বৎসরের অধিক কাল বাস করিয়াছেন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া এমন এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন, যাহার সহিত রক্তের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও বন্ধন হয় তদপেক্ষা দৃঢ়তর। তাহার এই দুঃসাহসিক অভিযানের কি পরিণতি ঘটিবে তাহা প্রথমে অজানাই থাকে। কিন্তু কালক্রমে দুইটি সম্মিলিত জীবন হইতে অপরাপর জীবন সৃষ্ট হইলে উভয়ের সুখ-দুঃখ একীভূত হইয়া যায় এবং দুইটি পৃথক সত্তা যেন কোন আধ্যাত্মিক যাদুবলে একই সত্তা হইয়া পড়ে। সুখময় বিবাহ বলিতে ইহাই বুঝায়।

প্রত্যেক রমণীরই বিবাহিতা কোন মহিলার অনুকূলে স্বীয় স্নেহ ও ভালবাসার অধিকার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য বলিয়াই আমি মনে করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে না এবং মাতার স্বাধিকার-বোধ পুত্রের বিবাহের পরেও সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। এ ক্ষেত্রে ত্যাগই একমাত্র পথ। কোন ব্যক্তির বিবাহ হইবা মাত্রই তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ঐ ব্যক্তির স্নেহ বা মমতার উপর নিজেদের সকল দাবী নববধূর অনুকূলে পরিত্যাগ করা এবং নববধূকেই তাহার স্বামীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সম্পূর্ণ অবিভক্ত ভাবে ভোগ করিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। স্নেহপ্রকাশ কিংবা অন্য কোন দাবী উত্থাপন করিয়া ইহার ব্যাঘাত ঘটিতে দেওয়া উচিত নহে। আমার এই অভিমত [illegible]

পারে, কিন্তু ইহা মোটেই বিস্ময়কর নয়। শাশুড়ীর মনে করা ভুল যে, তিনি এক জন পুত্রবধূকে ঘরে আনিয়াছেন। তাঁহাকে পুত্রবধূ মনে না করিয়া নিজের কন্যারূপে বরণ করাই সঙ্গত। ননদের পক্ষেও নববধূকে ভাজ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে সহোদরা ভগিনী মনে করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার মনোভাব অকৃত্রিম হইলে পুত্র অথবা ভ্রাতার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধন দৃঢ়তর হইবে, অবশ্য তাহা ভিন্ন প্রণালীতে। পুত্র তখন জামাতার স্থান অধিকার করিবে এবং ভ্রাতা ভগিনীপতির পর্য্যায়ে আসিবে। স্বভাবতঃই এই সকল নূতন সম্বন্ধ হইতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ফল দেখা দিবে। জামাতা অতিশয় স্নেহ, মমতা ও আদরের পাত্র। তাহার প্রতি নানাবিধ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, অথচ কোন দাবী-দাওয়ার প্রশ্ন নাই। যদি পুত্রকে জামাতা অর্থাৎ কন্যাস্থানীয়া পুত্রবধূর স্বামী বলিয়া মনে করা যায় তবে ফল হইবে এই যে, তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রকার যত্ন ও মমতা সত্ত্বেও তাহার উপর অধিকারের দাবী আপনা-আপনি কমিয়া আসিবে। পিতা তখন পুত্রের গৃহে যাইবেন কোন স্বত্বের বলে নয়—উহাকে আপন কন্যার গৃহ মনে করিয়া পুত্রের সম্মানিত অতিথিরূপে। ভগিনীও তেমনি ঐ গৃহকে আপনার ভ্রাতার গৃহ মনে না করিয়া তাহার ভগিনীর গৃহ ভাবিয়াই তথায় যাইবে। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, এই প্রকার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিলে কল্পনাতীত ও অবর্ণনীয় সম্প্রীতির উদয় হইয়া থাকে। পুত্রবধূর প্রতি কন্যার মত আচরণ করিলে তাঁহার নিকট হইতেও অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাওয়া যাইবে। তিনি নিজেও শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি পরম ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিবেনই, পরন্তু তাঁহার স্বামীকেও অনুরূপ আচরণ করিতে প্রণোদিত করিবেন। কোন তরুণী হিন্দু-ভার্য্যা ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব হইতে মুক্ত হইয়া যে মুহূর্ত্তে নিজেকে স্বামীর ঘর-সংসারের অবিসংবাদিত ও স্বীকৃত মালিক বলিয়া বোধ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তিনি স্বতঃই তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী এবং তাহার স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত এমন ব্যবহার করিবেন, যাহা এ জগতে একমাত্র হিন্দুনারীর পক্ষেই সম্ভব। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতেই আমি এ কথা বলিতেছি। আমার জীবনে আমি যে সমস্ত নারীর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আমার আপন জননীকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে করি এবং তিনি এই নীতিই পালন করিতেন। দত্তক-সূত্রে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি সেই ভ্রাতার স্ত্রীকে আপন ভগিনীর ন্যায় দেখিতেন এবং ভ্রাতাকে নবলব্ধা ভগিনীর স্বামী জ্ঞানেই স্নেহ করিতেন। সেই ভগিনী (অর্থাৎ আমার মাতুলানী) তাঁহার নিজের পুত্র ও আমার মধ্যে কোনরূপ বিভেদ করিতেন না। আমরা বাস করিতাম গ্রামাঞ্চলে, আর তিনি থাকিতেন লাহোর সহরে। তাঁহার অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হইলেও তিনি আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পীড়াপীড়ি করেন এবং তাঁহার অত্যন্ত অসুবিধা সত্ত্বেও আমাকে প্রায় ৫ বৎসর তাঁহার নিকট রাখেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়াই আমি আমার কলেজের পাঠ সমাপ্ত করি। আমার বিবাহ হইলে আমার মাতা আমার স্ত্রীর প্রতি পুত্রবধূর ন্যায় ব্যবহার না করিয়া তাঁহাকে নিজের কন্যার মতই দেখিতেন। মা'র কাছে আমার অপেক্ষা আমার স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই অগ্রগণ্য ছিল। তিনি বহু কাল আমার ও আমার স্ত্রীর সহিত একত্রে বাস করিয়াছিলেন এবং আমাদের গৃহেই দেহরক্ষা করেন। আমরা যদিও তাঁহাকে গৃহের কর্ত্রী এবং আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া অভিহিত করিতাম, তথাপি তিনি সর্ব্বদা এই ভাব প্রকাশ করিতেন যে, ইহা তাঁহার নবলব্ধ কন্যার গৃহ এবং উহাতে তিনি এক জন অতিথি মাত্র। ফলে আমাদের পরিবারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল।

মাতা-পিতার স্নেহলাভের যে কি উদগ্র বুভুক্ষা নারীর অন্তরে নিহিত থাকে, তাহা অনেক সময় উপলব্ধি হয় না। ঘটনা-পরম্পরায় আমি অদ্ভুত ভাবে ইহার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি। বহু কন্যা আমার উপর তাঁহাদের স্নেহ বর্ষণ করিয়াছেন এবং বৃদ্ধ বয়সে ইঁহারাই আমার সুখের অন্যতম উপাদান। বর্ত্তমানে আমি মনে করি, আমার অনেকানেক পালিতা কন্যা আছেন। ইঁহারা সকলেই আপনাপন গৃহের কর্ত্রী এবং বহু সন্তানের জননী। এক মাত্র উপায়েই এই ধরণের আত্মীয়তা স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। কোন তরুণীকে তাঁহার স্বামীর সমক্ষে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছি—তিনি কি হইতে চান—আমার কন্যা না পুত্রবধূ। এই প্রশ্নের সকল ক্ষেত্রেই একই উত্তর পাইয়াছি—"কন্যা" এবং 'তথাস্তু' বা তাহাই হউক বলিয়া উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সম্প্রতি এই জাতীয় মনোভাব সম্পর্কে এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি। আমার এক শ্রদ্ধেয়া মহিলা-বন্ধুর সহিত রাজ্যপাল-ভবনে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, যে কয় দিন তিনি আমার এবং আমার পরিজনবর্গের সহিত ছিলেন তাহা তাঁহার পরম আনন্দেই কাটিয়াছে। কিন্তু এই ভাবে বারংবার আমার কাছে আসিয়া অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে কত দূর সমীচীন হইবে তাহা বুঝিতেছেন না। আমি উচ্চ হাস্য করিয়া উত্তর দিলাম যে, আমি তাঁহাকে কন্যা অথবা পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলে সমস্যাটির সহজেই সমাধান হইয়া যায়—এই সম্বন্ধ দুইটির মধ্যে যে-কোনটি তিনি বাছিয়া লইতে পারেন। তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াই উত্তর দিলেন—কন্যা সেটাই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, মাতা-পিতার স্নেহের জন্য প্রত্যেক নারীর আকাঙ্ক্ষা কত দূর প্রবল। অতএব পূর্ব্বোক্ত মতে শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রবধূকে ... রূপে বরণ না করিয়া যদি প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্ত্তে এক তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন এবং পুত্রকে তাহাদের কন্যার স্বামী বলিয়া গণ্য করিতে সমর্থ হন, তবেই পরিবারে অভাবনীয় সুখ-শান্তির উদ্ভব হইবে এবং ভালবাসার যাদুকরী প্রভাব পরিস্ফুট হইবে।*

---

* মূল ইংরাজি প্রবন্ধটি এলাহাবাদ হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রদত্ত হইয়াছে। মূল প্রবন্ধ অথবা তাহার কোন অনুবাদের আংশিক বা সামগ্রিক পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
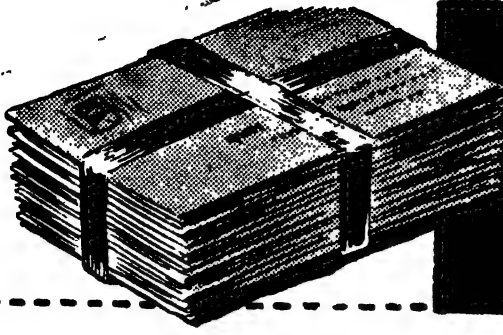
অভিনন্দন-পত্র

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গীয় [illegible] পরিষৎ মন্দিরে ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ সালে সার গুরুদাস [illegible]পাধ্যায় মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ [illegible] জন্ম আহ্বান করা হয়। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন।]

[illegible]হার গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, যাঁহার প্রভায় আজ [illegible] প্রভান্বিত, যাঁহার রচনা অবলম্বনে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য [illegible] সাহিত্য মধ্যে উন্নত আসন অধিকার করিয়াছে, তাঁহার [illegible] ভারতবর্ষে আনন্দের স্রোত বহিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য [illegible] মুখপত্রস্বরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সেই আনন্দে [illegible]করণে যোগ দিতেছেন!"

[illegible] প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

[illegible] মত প্রাচীন লোকের পক্ষে আনন্দ প্রকাশের ভার পাওয়ায় [illegible] আনন্দ হয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে শুধু [illegible] সম্মানিত হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার কর্ম্মভূমিও সম্মান [illegible] হইয়াছে। বর্ত্তমান স্থলে আনন্দের কারণ কি, তাহা দেখা [illegible]

[illegible] মূল্য প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। যে [illegible] মূল্য এত অধিক, তাহা আর্থিক হিসাবে বিশেষ আনন্দের [illegible]। কোনও দুঃস্থ সাহিত্যিক এই পুরস্কার পাইলে তাঁহার [illegible] আনন্দ হইত, কিন্তু দ্বারকানাথের (যিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ [illegible] ছিলেন) পৌত্রের পক্ষে এই আর্থিক আনন্দ [illegible]।

[illegible] নব্য সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক এই পুরস্কার পাইলে [illegible] সমাজে বিশেষ সম্মানভাজন হইতেন ও উচ্চাসন পাইতেন [illegible] পক্ষে অন্ত ভাবে সহজ হইত না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে [illegible] পারে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ঃক্রম [illegible] কলিকাতা টাউনহলে দেশের লোকের নিকট যে মান [illegible] পাইয়াছেন, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে কখনও [illegible] বিরুদ্ধ-মত বাদ দিলেও এই দেশেই আমরা তাঁহাকে [illegible] দিয়াছি তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

[illegible] মতে আমাদের আজিকার আনন্দ প্রকাশের দুইটী [illegible]।

প্রথম পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্য পাশ্চাত্য জগতের চক্ষে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। অবশ্য বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন গৌরব বড় কম নয়, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নব্য সাহিত্যিকবর্গ যাহা দিয়াছেন, তাহারও মূল্য বড কম নয়; কিন্তু তাহা হইলেও প্রথম যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ, এম-এ প্রভৃতি পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হয়, তখন কেহ বলিয়াছিলেন যে, বি-এ, এম-এ পড়িবার মত এমন কি বই বাঙ্গালা ভাষায় আছে যে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য ইউনিভারসিটিতে পড়াইতে চাহিব? অবশ্য তাঁহারা ইহার ঠিক জবাব পাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার প্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্যের পাশ্চাত্য জগতে পরিচয় হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে, কালে এক জন বড়লোক হইবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই একটি কবিতায় বলিয়াছিলাম। সেই কবিতা আমি আর একবার বলিয়াছি; আজও তাহা বলিতেছি। ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় শুনিয়া সেই কবিতাটি রচনা করি। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করিয়াছিলেন।

> ওঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেক না আর,
> অজ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
> উঠিছে নবীন কবি, নব জগতের ছবি
> নব "বাল্মীকি-প্রতিভা" দেখাইতে পুনর্ব্বার।
> হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখ তৃষ্ণা যাবে দূরে,
> ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
> মণিময় ধূলিরাশি, খোঁজ যাহা দিবানিশি,
> ও-ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে হবে না আর।

এইবার আনন্দ প্রকাশের দ্বিতীয় বিশেষ কারণের কথা বলিব। এক জন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন—

> **The West is West, The East is East;**
> **And never shall the twain meet.**

এই কবিতা লেখকও এক সময়ে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। আজ Kipling দেখুন যে, তাঁহার জোড়া পূর্ব্ব দেশে আছে এবং তিনি তাঁহার সহিত সমাসনে বসিতে অধিকারী। তিনি যে কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন Never shall the twain meet, আজ তাহা ব্যর্থ হইল।

এই স্থানে পুরস্কার-দাতাগণের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাঁহারা অনুবাদের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিন্মাত্র দেখিয়াই পুরস্কার

...। সবটা পেলে না জানি কি হইত! আর এক কথা ...দের পক্ষে বলা যায় যে, তাঁহারা একটু দেখিয়াই সমস্তটা বুঝিতে ...য়াছেন। ইহাতে পুরস্কারদাতাগণের গুণপনার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রত্যেক কবির কাব্য-জীবন সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়,—উদয়, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ কাল। ইংলণ্ডের এক জন বড় কবি মিল্টন সম্বন্ধে অনেকে এইরূপই বলেন। তাঁহারা বলেন এই যে মিল্টন Paradise Lost কাব্যে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, Paradise Regained কাব্যে তাহা পাওয়া যায় না।

আকাশের রবির, উদয়, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ আছে। বঙ্গাকাশের রবির উদয় ও মধ্যাহ্ন হইয়াছে, কিন্তু অপরাহ্ণ হইবে না, ইহা আমি জোরের সহিত বলিতে পারি। আমার এই উক্তির বিশেষ কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে—"তুমি কোন গান গাও হে গুণী", যে গান শুনলে মানুষ আর চাহিবেও না, ফিরিবেও না। তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া গান রচনা করিতেছেন, সেই জন্যই তাঁহার গানের অপরাহ্ণ কাল আসিতে পারে না। এই কবিত্ব-প্রভা পূর্ণানন্দে গিয়া পঁহুছিয়াছে। পূর্ণানন্দের অপরাহ্ণ কাল হইতে পারে না।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের পত্র

[স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থ পাঠের পর আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই পত্র দেন।]

গুরুদাস বাবু,

তোমার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থের প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা হৃদয়ঙ্গম করা হইয়াছে। আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, বাঙ্গালা ভাষাতে এরূপ উচ্চদরের গ্রন্থ অদ্যাপি আর হয় নাই। আদ্যোপান্ত অতি মহার্ঘ অতি গুরুতর বিজ্ঞতা (wisdom)তে পরিপূর্ণ। এত বিজ্ঞতার কথা একাধারে সমাহৃত করিতে যে কি পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাক্যাতীত। সেই সঙ্গে আবার দেখিতেছি যে, রচনার পারিপাট্য ভাবের গভীরতা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। একটি নূতন শব্দ সৃষ্টি করা হয় নাই অথচ দুরূহ ও দুরবগাহ সমস্ত তত্ত্বই বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। কোনও পাঠকের এরূপ বলিবার অধিকার নাই যে, ভাষার অব্যক্ততা বশতঃ বুঝিতে পারিলাম না। তবে ভাবের দুরূহতা নিবন্ধন যদি কেহ কোন অংশ বুঝিতে না পারেন তাহা স্বতন্ত্র কথা। আমি দেখিতেছি, তোমার গ্রন্থখানি আমাদিগের স্বদেশের ও স্বভাবের একটি গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে এবং বাঙ্গালা শাস্ত্র মধ্যে আপাততঃ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। নিজে লিখিতে অনেক সময় কষ্ট বোধ হয় এই নিমিত্ত কিয়দংশ পরের দ্বারা লেখাইয়া লইলাম ইহা দ্রষ্টব্য। ইতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র

[বাঙ্গালা দেশের মুকুটমণি, বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বাবুর আদর্শের সর্ব্বথা অনুবর্ত্তন করেন নাই। আচারে ও স্বভাবে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। কিন্তু তথাপিও বঙ্কিমচন্দ্রের যে কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল স্যর গুরুদাসের প্রতি, তাহা তাঁহার একখানি চিঠি হইতে বুঝিতে পারা যা...। চিঠিখানি এই :—]

নমস্কার পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন।—

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে ... বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে ... আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ, মুখে ... তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখি... বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া ... এবং আমার মৃত্যুর পর ঐরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রা... জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ, উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে, "আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মান ও সম্মানিত হইয়াছে।" ... এ কথা বলিলে, তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয়, তখন একখানি ইংরেজি সম্বাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন যে, ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episodeগুলির সহিত তুলনীয়, এবং আর এক জন ইংরেজ সমালোচক সূর্য্যমুখীর চরিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী-চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি ১১ পৌষ, ১৩০০।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

[স্যর গুরুদাসের 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' গ্রন্থ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্র দেন।]

ওঁ

শান্তি নিকেতন
বোলপুর।

বহুমানভাজনেষু

সবিনয় প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার প্রেরিত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থখানি ...তকল্য আমার হস্তগত হইয়াছে। কালই আমি পাঠ আরম্ভ ...য়াছি। দ্রুতবেগে পড়িয়া ফেলিবার মত জিনিষ ইহা নহে ... কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভাষা ও যুক্তি-বিন্যাস যত ... পর্য্যন্ত সহজ হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে। এরূপ ভাষা ...বাংলা রচনার নিবিড়তা এবং যুক্তি-বিচারের বিশদ ...রলতা আপনার মত পাকা হাতে ছাড়া হইবার জো ছিল না ...ইহার মধ্যে আপনি যে সকল তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া... ...গার সমস্তই গ্রহণ করিতে না পারিলেও শ্রদ্ধার সহিত এব... ...ক্যের সহিত পাঠ করিতেছি। সুচিন্তিত শ্রেণীবদ্ধ আকারে ... মনন-সাধ্য বিষয়কে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে পরিব্যক্ত কর... ...কাশ করা বাংলা ভাষায় ইহার পূর্ব্বে আর দেখি নাই। আশা ... ...ষ্টি

আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরো অনেক লেখক এই মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিবে। নতুবা বাংলা ...ইতে চিন্তা প্রণালীর আলস্য এবং রচনা প্রণালীর শৈথিল্য দূর হইবে না। এ সম্বন্ধে আমার মত অভাজন বিস্তর ...য়াছে কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ভার বিধাতা আপনাদের হাতে ...ন ইহা দেখিয়াই আজ আমি আনন্দ বোধ করিতেছি। ... প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

স্নেহপ্রার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার গুরুদাসের পত্র

[১৩২৫ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণের "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকায় ... ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র খ্যাতনামা ৺মুকুন্দদেব ...পাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত স্যার গুরুদাসের নিম্নোদ্‌ধৃত পত্রখানি ...শিত হইয়াছিল।]

২রা ফাল্গুন, ১৩২২

...বরেষু—

আপনার সযত্ন প্রদত্ত আপনার পিতৃদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী ও ...ত "সদালাপ" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ...দের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আপনার 'সদালাপ' অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহা কেবল বালক ও ... নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরও শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

...নার পিতৃদেবের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়া ... পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার প্রথম দর্শন হইতেই তাঁহাকে এক জন ... পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ ... ক্রমে তাঁহাকে যতই ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতে লাগিলাম এবং ... লেখা পড়িতে লাগিলাম ততই সেই ভক্তি প্রগাঢ়তর হইতে ... বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক হইয়া যেদিন ... যাত্রা করি, সেই দিন ভূদেব বাবুর সঙ্গে হাবড়া ষ্টেশনে প্রথম ... দেখিলাম, তিনি এক জন সুদীর্ঘকায় বিশাল ললাট শুভ্রবর্ণ ... পুরুষ। তাঁহার অন্তরের উদারতা ও প্রখর বুদ্ধি যেন ...কান্তিতে বিকাশ পাইতেছিল। আমরা যে গাড়িতে ... সেই গাড়িতে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড সাহেবও ... এবং তিনিই আমাকে ভূদেব বাবুর নিকট পরিচিত করিয়া ... তাহাতে ভূদেব বাবু এতই অমায়িকতা ও স্নেহের সহিত ... আলাপ করিলেন যে, বোধ হইল যেন আমার সঙ্গে ... কালের পরিচয় ছিল। হ্যাণ্ড সাহেব নিজের একখানি ... তাহাকে দেওয়াতে তিনি বলিলেন :—"It is a good ... but I like the original better than ...."

... সঙ্গে হ্যাণ্ড সাহেবের ও আমার নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা ...। সে কথাগুলি সকল মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ ... যে তাঁহার কথাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল। এইরূপে ... যাওয়ার পর তিনি হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। ... গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ... সকল কথার আলোচনা আছে তন্মধ্যে কতকগুলি কথা লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু যতই সময় যাইবে ততই তাঁহার অধিকাংশ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে, এবং সমাজ সংস্কারকেরা তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদপত্র ও সরকারী শাসন

[ভারতে সংবাদপত্রের উপর ক্রমশঃ কি ভাবে সরকারী শাসন কঠোর হইতে কঠোরতর হয়, তাহার ক্রমিক ইতিহাসের কথা বর্ত্তমানে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। নিম্নলিখিত পত্রগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের সামান্য পরিচয় মাত্র দান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। খুব সম্ভবত ১৭৯৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর হইতে সংবাদপত্রের উপর সেন্সারসিপ আরম্ভ হয়। চারি বৎসর পরে ২৯এ জুন, ১৭৯৯ সালে মান্দ্রাজ সরকারের তৎকালীন সেক্রেটারী মিঃ ওয়েব (Mr. Webbe) মান্দ্রাজের 'কুরিয়ার' এবং 'মান্দ্রাজ গেজেটের' সম্পাদকদের নিকট নিম্নলিখিত পত্র (হুকুমনামা) প্রেরণ করেন।]

মহাশয়,

"সকাউন্‌সিল গভর্ণর জেনারেল নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, এই প্রদেশের (মান্দ্রাজ) সকল সংবাদপত্রকে, সংবাদপত্রে যাবতীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সরকারের সেক্রেটারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। সেক্রেটারীর অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো কিছুই প্রকাশ করা চলিবে না। অতএব, আমি আপনাদের, নির্দ্দেশ অনুযায়ী জানাইতেছি যে, প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আপনারা সকল বিষয়বস্তু আমার আপিসে প্রেরণ করিবেন। বলা বাহুল্য, আপনার পত্রিকার প্রথম প্রকাশ কালে এই ব্যবস্থা মতই সংবাদ মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইত।"

এই সময় হইতে সংবাদপত্র ডাক-বিভাগ হইতে যে সকল সুবিধা পাইত, তাহাও ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়।

বাঙলা সরকারের ইস্তাহার

[এই সময় কলিকাতার সংবাদ এবং সাময়িক পত্রগুলিতে সরকার-স্বার্থবিরোধী নানা প্রকার মন্তব্য এবং সংবাদ প্রকাশের আধিক্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এই সকল পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিক কয়েক জন শ্বেতাঙ্গও ছিলেন। পত্রিকাগুলিতে যাহা প্রকাশ হইত, তাহা সরকারবিরোধী হইলে সত্য এবং যথাযথ, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিতেন না। এইকালে সংবাদপত্রে মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের নাম মুদ্রিত করা সম্পর্কে কড়াকড়ি না থাকাতে, প্রকাশক এবং মুদ্রাকরকে আইনের কবলে ফেলা সম্ভব হইত না। সংবাদপত্রে সরকার-স্বার্থবিরোধী মন্তব্য, সংবাদ প্রভৃতির প্রচার দমনার্থে, বাঙ্গলা সরকার হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি : India Gazette, Hur Kuru, Mirror, Calcutta Gazette, Morning Post, Orphan Press, Telegraph and Star নামক পত্রিকাগুলির মালিকদের নিকট ১৮১১ সালের ৫ই জানুয়ারী লিখিত হয়।]

মহাশয়,

সকাউন্‌সিল গভর্ণর জেনারেলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমি আপনাদের নিকট নিম্নলিখিত আদেশ জ্ঞাপন করিতেছি।

কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর, এই প্রদেশের এবং প্রদেশের শাসনাধীন অন্যান্য স্থানের সকল ছাপাখানার মালিকদের, তাঁহাদের ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত সর্ব্বপ্রকার পত্র, পুস্তক, বিজ্ঞাপনাদি এবং অন্যান্য সকল প্রকার মুদ্রিত কাগজেই মুদ্রাকরের নাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই আদেশের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম কিংবা অবহেলা ঘটিলে, সরকারের পক্ষে তাহা পরম অসন্তোষের কারণ বলিয়া গৃহীত হইবে। ইতি

এ ট্রটার

অস্থায়ী সেক্রেটারী।

[মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার পূর্ব্বেই ছাপাখানা দমন কঠোরতর করা হয়। এই প্রদেশে সরকারের পূর্ব্ব-আদেশ এবং অনুমোদন ব্যতিরেকে পুস্তক, পত্রাদি সব-কিছুর প্রকাশ এবং মুদ্রণ বিশেষ আদেশ-বলে রোধ করা হয়।

জারিনার চিঠি

[এই পত্রের ছত্রে ছত্রে আসন্ন ঝঞ্ঝার গর্জ্জন-ধ্বনি—যে ঝড়ের ঝাপটায় রাশিয়ার রাজশক্তি সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল চিরদিনের জন্য।

যে সময়ে রাণী এই পত্র লিখেছিলেন তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সমরাঙ্গনে জার আপন সেনাপতি ও রাজপুরুষদের সঙ্গে হেড কোয়ার্টার্সে ব্যাপৃত। রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হতে পারে এ সম্ভাবনার গুঞ্জন উঠেছে তখন, যদিও প্রিয় সুহৃদ রাসপুটিনের সঙ্গে লালসামত্ত রাণী সে সম্ভাবনার কথা তুচ্ছই করে দিয়েছেন স্বামীর কাছে লেখা পত্রে। আগামী তিন মাসের মধ্যেই যে রাজছত্র ধূলায় লুণ্ঠিত হবে তা কি ভাবতে পেরেছিলেন রাজমহিষী? তখনো রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য এক কোটি পাউণ্ডের জমিদারী, প্রায় দু' কোটি পাউণ্ডের হীরা-জহরৎ আর মাসিক বরাদ্দ দু' লক্ষ পাউণ্ড।

ট্রটস্কি লিখেছিলেন—'রাশিয়ার অভিজাত সমাজ চাইছিল জার ও তার অমাত্যবর্গকে সরিয়ে আসন্ন বিপ্লবকে এড়িয়ে যাবার জন্য।···কিন্তু মনে-প্রাণে কামনা করলেও তা করার মনোবল ছিল না তাদের। আর শাসকগোষ্ঠী নিজেদের মুনাফা, অসাধুতা আর কাপুরুষতায় হয়ে উঠেছিল দোর্দণ্ড স্বেচ্ছাচারী। তারাও চাইছিল রাসপুটিনের প্রভাবমুক্ত রাজ-পরিবার। কিন্তু সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর কথা এই রকমই গ্রহণ করতে হবে আমাদের?'

মন্ত্রী বদলের আওয়াজের প্রত্যুত্তরে জারিনা স্বামীকে রাসপুটিনের মন্ত্রপূত একটি আপেল পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, সেইটি আহার করে মনে শক্তি বাড়িয়ে তুলতে।

'পায়ের নীচে দলিত করো তাদের'—রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী পত্রে লিখেছিলেন সম্রাটকে।

রাজ-পরিবারের কারাবাসের সময় একটি কালো বাক্সে এই পত্রখানি উদ্ধার করে বিপ্লবীরা।]

৪ঠা, ডিসেম্বর, ১৯১৬

প্রাণের প্রিয়তম—

বিদায় হৃদয়বল্লভ!

যে দুর্দ্দৈবের ভিতরে আমরা কালাতিপাত করছি ও সংগ্রাম [illegible] পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় এখন সুদিন ফিরছে, অধিকতর [illegible] ফলে এবং আমাদের প্রিয় সুহৃদের প্রার্থনা ও সহায়তায় আমরা শীঘ্রই বিপন্মুক্ত হব। রাশিয়া এবং সম্রাটের রাজ্যকাল অধিকতর গৌরবমণ্ডিত হবে এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী। সম্রাট তাঁর মনোবল অক্ষুণ্ন রাখুন। কোন বাক্যে বা পত্রে যেন সে [illegible] ক্ষুণ্ন না হয়। সে সকল ক্ষণস্থায়ী আবর্জনা যত শীঘ্র মন থেকে সরে যায় ততই মঙ্গল।

আপনি যে প্রভু এবং প্রভুর আদেশ অমোঘ, এ শিক্ষা ওদের দিন! করুণা ও সহনশীলতার দিন গত—এখন হতে সম্রাটের শক্তি ও ইচ্ছাই হবে কার্য্যকরী। সম্রাটের আদেশ নতশিরে মান্য করতে হবে ওদের—কাজ করতে হবে আপনার নির্দ্দেশানুসারে আনুগত্যের সঙ্গে। আনুগত্য কথার অর্থ বিস্মৃত হয়েছে ওরা—আপনার ক্ষমাপরায়ণতা ও দয়ালুতায় ওরা নষ্ট হয়ে গেছে।

লোকে কেন আমায় ঘৃণা করে জানেন? কারণ, তারা জানে যে আমার ইচ্ছাশক্তি প্রবল! যে পথ ঠিক বলে আমি মনে করি, (এবং যে কাজে আমি গ্রেগরীর আশীর্ব্বাদ পাই) সে পথ থেকে আমি কিছুতেই ভ্রষ্ট হই না। তারা তা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সে হোল দুষ্ট-প্রকৃতির লোকেরা।

ঘণ্টা ও বিগ্রহ আমায় উপহার দিয়ে ফিলিপস যা বলেছিলেন, তা স্মরণ করুন সম্রাট। আপনি করুণাময়, সরল বিশ্বাসী ও সজ্জন, আমাকেই আপনার ঘণ্টা হতে হবে। যারা মন্দ উদ্দেশ্যে আসবে তারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে না এবং আমিই আপনাকে সতর্ক করে দেব। যারা আমায় ভয় করে, তারা আমার চোখের দিকে তাকাতে পারে না, যাদের মনে দুরভিসন্ধি তারা আমায় পছন্দ করে না। অরলভ উইটি, কাকোট জেভ, ট্রেপভ, সাবারোভ, কাউফম্যান, সোফিয়া, আইভানোভনা, মেরী, সান্দ্রা আপ্রেলস্কি প্রভৃতির কথাই ধরুন। কিন্তু সরল-প্রাণ জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনী আমায় ভালবাসে। আপনার প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাবান। যে লোক আপনাকে অথবা আমাকে উদ্ধত পত্র লিখতে সাহস করে, তাকে শাস্তি দিন।

এনিয়া আমায় বালোস্কোভ সম্বন্ধে বলেছিল, লোকটাকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। আপনার প্রতীক্ষায় নিদারুণ [illegible] কষ্টভোগ করছিলাম অথচ আপনি কেন এলেন অনেক [illegible] তা আমি বুঝেছিলাম। প্রিয়তম আমার, ফ্রেডরিককে [illegible]—উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে অনাহূত ভাবে পত্র লেখার দুঃ[illegible] জন্য সেন তাকে কঠিন ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়। এ [illegible] তার প্রথম নয়, পূর্ব্বেও এমন ঘটনা ঘটেছে। পত্রখানি ছিঁ[illegible] ফেলবেন এবং তাকে শাস্তি দেবেন।

এখন আর আমরা অসম্মান সহ্য করব না। এখন [illegible] প্রয়োজন দৃঢ়তার। ট্রেপভের পুত্রকে আপনার এডিসি করেছেন, [illegible] পাভের সঙ্গে কাজ করতে তাকে বাধ্য করাবেন। সে তা[illegible] ভক্ততা প্রকাশের সুযোগ পাবে। গুর্কোকে রাজনীতি থেকে [illegible] থাকার উপদেশ দিতে বিস্মৃত হবেন না। ঐ ভাবেই নি[illegible] না ও এলেকসিয়েভ নষ্ট হয়েছে। ঈশ্বর অনুগ্রহ করলেন [illegible] সম্রাট এলেকসিয়েভের হাত হতে নিষ্কৃতি পেলেন। আপনার [illegible] সামরিক আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে দুষ্ট লোকের কথায় ও পত্রে আপ[illegible] কখি

পথ ধরেছিল সে। এখন তাকে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছে এক বুড়ো আইভোনোভের কাছে তার স্বীকারোক্তিই তার প্রমাণ। কিছুই রাহুমুক্ত হবে শীঘ্রই। আবহাওয়াও নির্ম্মল হচ্ছে, শুভ সূচনা।

ঈশ্বরের অতি নিকট একটি ধার্মিক প্রাণ আপনার জন্য নিয়ত প্রার্থনা জানাচ্ছেন। যে শক্তি, বিশ্বাস ও আশা একান্ত প্রয়োজন তা দান করেছেন তিনিই আমাদের। আমার পরম স্থৈর্যকে লোকে উপলব্ধি করতে পারে না বলেই আপনাকে আতংকিত ও ধৈর্যহারা করার অপচেষ্টা করছে। শীঘ্রই তারা শ্রান্ত হয়ে পড়বে।

দয়িতহীন রাত্রি কেমন কাটাব ভাবতে পারি না। আপনাকে মধ্যে জাপটে নিয়ে আত্মার সমস্ত প্রেম, প্রার্থনা ও আপনাকে ভালবাসার সঙ্গে ঢেলে দিতে পারলে তবে যেন শান্তি পাই। সম্রাট, স্বামী আমার, কি অনির্বচনীয় ভালবাসাই আমি পেলাম! আমার জীবন-সূর্য, হৃদয়ের সব প্রেম আপনাকে নিবেদন করছি।

আমার দেহমন আপনারই সান্নিধ্যে থাকে, আমার প্রার্থনা আপনাকেই ঘিরে। ঈশ্বর ও জননী মেরী আপনাকে সদা রক্ষা করবেন। ইতি একান্ত আপনারই।

[রাণী ভিক্টোরিয়ার নাতনী জারিনার হাতের ক্রীড়নক ছিলেন জার—যেমন ছিল রুশ-সম্রাজ্ঞী রাসপুটিনের। এই চিঠির ন' দিন পরে আবার জার পত্র পান স্ত্রীর। তাতেও কঠিন হবার উপদেশ— 'আবহাওয়া পরিষ্কার হচ্ছে, সম্রাটের গৌরবোজ্জ্বল রাজ্যকালের শুভ লগ্ন সমাসন্ন হওয়ার নিশ্চিত প্রেরণা।'

কিন্তু তিন দিন পরে রাসপুটিনকে হত্যা করা হয় এক ঘরোয়া ভোজসভায় আর রুশ বিপ্লবে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও রাজবংশের অন্যান্য সকলেরও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়।]

এপষ্টিনের নারী-মূর্ত্তি

পৃথিবী বিখ্যাত ভাস্কর এপষ্টিনের নাম আজ কে না জানে? আধুনিক শিল্প-জগতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জোরে যে-সব শিল্পী পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বীকৃতি লাভ করলেন এপষ্টিন তাদের অগ্রগণ্য। নীচে আমরা এপষ্টিনের নারী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের একটি চিত্র-পরিচয় দিলাম।

"রঞ্জন"

দুই
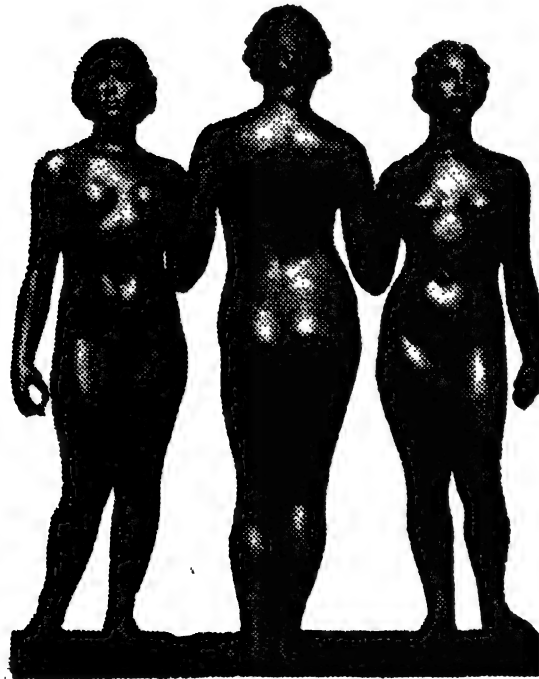
ঘর সাজাতে মালতীর অসামান্য নৈপুণ্য। প্রায় প্রতিভা বলা বলে। এ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় কখনোই মেলেনি তার শ্বশুরবাড়িতে—ওটাকে বাড়ি বলেই মনে হয়নি কখনো, মনে হয়েছে জেলখানা। কিন্তু নৈনিতালের বাড়িতে প্রতিটি ঘরের প্রতিটি ইঞ্চিতে সে প্রতিভার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আজো বর্তমান, যদিও গত দশ বছরে সে কত দিনই বা ওখানে থেকেছে? বোনেরা দিদির সাজানোর মূল পরিকল্পনা আজো অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তবু, যদি কখনো কোনো ফুলদানি বা ফোটোগ্রাফ, অর্গ্যানের উপর থেকে টেবিলে গেছে, বা টেবিল থেকে অর্গ্যানে, সেন সাহেব তৎক্ষণাৎ সেটিকে স্বহস্তে পূর্বাসনে পুনরধিষ্ঠিত করেছেন। ছোটো মেয়েরা পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলে শিরসঞ্চালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেছেন, "না, মালতী যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি থাক। বদল করতে হয়তো ও-ই এসে করবে।"

চলন্ত গাড়ির অন্ধকার কামরায় শুয়ে নানা কথা ভাবতে শুরু করে মালতী দেখলে, মনটা তার নিতান্তই অগোছালো। তার ঘরের ঠিক বিপরীত। যেখানে যে জিনিসটি থাকবার কথা সেটি সেখানে ছাড়া আর সব জায়গায় আছে। সব কিছুই এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। স্তূপীকৃত কতগুলি অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আবর্জনা যেন। কিছু তার ভাঙাচোরা, বাকিটায় জোড়াতালি। এই বৃহৎ অব্যবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে মালতীর পক্ষে অশ্রুরোধ করা দুঃসাধ্য হোলো। দৃষ্টি তাতে ঝাপসা হোলো, মনের অগুছিত দৃশ্যটা আরো মর্মান্তিক মনে হোলো।

দেবেশ পারে পরিষ্কার করে ভাবতে। এমন সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা মালতী এর আগে কারো মধ্যে দেখেনি। চিন্তাই শুধু সুনিয়ন্ত্রিত নয়, তার প্রকাশও। বিশেষ করে ইংরেজিতে। বাঙলায় বড়ো সংস্কৃতবহুল ওর ভাষা। প্রিসীসনের জন্যেই তেমন ভাষার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ফলে অনেক সময় সাধারণ কথাবার্তাও ওর মুখে সযত্নরচিত প্রবন্ধের মতো শোনায়, ডিডাকটিভ লজিকের একটা সিলোজিজম যেন। কিন্তু প্রকাশ যদি বা মাঝে-মাঝে কাঠখোট্টা, চিন্তার কাঠামোতে কোথাও নেই ফাঁক। যুক্তিগুলি এক, দুই, তিন, সব নম্বর দিয়ে সাজানো। বীমা কোম্পানীর ডোসিয়ে যেন, কিম্বা লাইব্রেরির ডকেট।

মালতী তেমনি করে ভাবতে চেষ্টা করল। এক, দেবেশ···

আর আলাদা হতে পারল না। তার কাছে নিয়ন্ত্রিত চিন্তার পাঠ নিতে গিয়েছিল, সেই দাঁড়াল পথ রোধ করে! এক, দেবেশ।

এক তো। কিন্তু একা যে নয়। দেবেশও নয়, মালতী নিজেও নয়। এইখানেই তো সব বিপদের সুরু, সব আনন্দের শেষ। তা নইলে পার্শ্ববর্তী শীলার মতো মালতীও তো পারতো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একটি লোকের সঙ্গ নিতে। ভয় থাকতো না, ভাবনা থাকতো না। চরম ঝাঁপ দিয়ে শিশুর মতো ঘুমুতে পারতো নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে।

কিন্তু, সত্যি পারতো কি মালতী?

মালতীর সন্দেহ হোলো। মালতীর বিপদই এই। সংশয় বরাবরই ছিল। দেবেশকে জেনে আরো বেড়েছে। সংশয়, কেবল সংশয়। নিশ্চিত বলে সংসারে যেন কিছু নেই, ধ্রুব নয় যেন ধরার ধারা। তা নইলে মালতী কেন পারলে না পিতৃকুল পরিত্যাগ করে শ্বশুরকুলে স্বামিনী হতে? কেন সে হতে গেল এক জায়গায় পরবাসিনী, আর আরেক জায়গা থেকে নির্বাসিতা? সংশয়, দ্বিমানস। শাশুড়ীর পাশে বসে মনে হয়েছে (স্বামীর পাশে বসবার সময় সে পেল কোথায়?) অতীতকে কি অস্বীকার করছি না? আর, বাবার কোলে বসে মনে হয়েছে, ভবিষ্যৎ, আমার ভবিষ্যৎ, তার কী হবে?

তাই আমার অতীতও গেল, ভবিষ্যৎও গেল। নিজকে পর করেছি কর্তব্যের প্রেরণায়। এদিকে পর পরই রয়ে গেল, কেন না কর্তব্য সেখানে পর্যাপ্ত প্রেরণা নয়।

ঠিক এমনি সন্ধিক্ষণে এলো দেবেশ। আমার অতীতের সঙ্গে তার সামান্যতম যোগাযোগ নেই। নেই তার মধ্যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। শুধু আছে মূর্ত, মুখর বর্তমান। কিন্তু বর্তমান যে অতীতের সন্তান, ভবিষ্যতের জনক। এ দু'য়ের মাঝে যে আমি, অর্থাৎ মালতী গুপ্তা, তার কী হবে? হাত বাড়িয়েছি এক দিকে, কিন্তু পা বাড়াবো কোন দিকে?

মালতী উঠে বসল। টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলি একটার সঙ্গে আরেকটা তার দিয়ে বাঁধা, নিবিড় তাদের যোগাযোগ। একের বার্তা মুহূর্তে অন্যের কাছে পৌছায়, সে তা বোঝে, এবং ... তা প্রেরণ করে দেয় পরবর্তী পোষ্টের কাছে। মালতীর ... দিকে তাকিয়ে থেকে মনে হোলো সে যেন এমন একটা টেলিগ্রাফের পোষ্ট যার সঙ্গে আগেকার পোষ্টের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ আছে ... পরেরটার সঙ্গে তার ছিঁড়ে গেছে। আগেকার সব কথা ... স্মরণে আসছে, কিন্তু ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত মিলছে না ... মনে হোলো সে যেন এমন একটা ঘর যার দক্ষিণ খোলা ... উত্তর বন্ধ। তাই দক্ষিণ থেকে দখিণার বাণী এলে ... রুদ্ধ বলে ঘরখানি হাওয়াহীন। মালতীর সত্যি নিশ্বাস ... হয়ে এলো। সে আবার উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ... দিকে তাকাল। মুক্ত হাওয়ার রূঢ় স্পর্শটি বড়ো ভালো লাগল ...

এমনি মুক্তির আস্বাদ এনেছিল দেবেশ। কিন্তু এই ... হাওয়ায় মতো সে তো পালিয়ে গেল না। পালিয়ে গেলে বুঝি ... মালতী। তাই তো পালাতে হোলো তার নিজেরই। কিন্তু ...

…হাত থেকে? দেবেশের? সে যে ধরে রাখতে চেয়েছিল তার …মাত্র প্রমাণ নেই। তবে? তবু কেন মালতীকে পালাতেই …? পালিয়ে এসেও কেন এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হচ্ছে না …য়ন সম্পূর্ণ হয়েছে? যে, আর ভয়-ভাবনা নেই?

…রণটা মালতী স্পষ্ট বুঝতে পারলে না। কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে …মনে হোলো যে পলায়ন দেবেশের কবল থেকে নয়। পলায়ন …নিজেরই একটি অংশ থেকে, যে-অংশ দিয়ে সে দেবেশকে কল্পনা …তাকে ভালোবেসেছিল। দেবেশ বস্তুত কে বা কী সে প্রশ্ন …সঙ্গা। মালতী যাকে ভালোবেসেছে তার সঙ্গে দেবেশের সাদৃশ্যই …সামান্য, কিন্তু সেটাও অপ্রাসঙ্গিক। তার সমস্ত হৃদয়ের …বাসনা দিয়ে যে-দেবেশকে সে নির্মাণ—হ্যাঁ নির্মাণ—করেছে, …মালতীস্বাধীন অন্য এক পৃথক্ ব্যক্তি নয়; সে মালতীর …মালতী তার অংশ। এর হাত থেকে কোথায় পালাবে মালতী? কি যে পালিয়ে যাবে সে মালতী থাকবে?

…পলায়মানা মালতী পলায়নের অসার্থকতা উপলব্ধি করে …আশার কাছে হার মানল। মালতী আবার এসে বেঞ্চিতে বসল। …ক্লান্তিতে একটু পরে শুয়ে পড়ল মালতী। কিন্তু নিদ্রা …নির্বাসিতা।

যে-দেবেশকে মালতী ভালোবাসে সে-দেবেশ যদি অর্ধেক কল্পনা …থাকে, তাহোলে যে-মালতী দেবেশকে ভালোবাসে সেও কি …র্ধেক কল্পনা নয়? এই প্রশ্নটার মধ্যে মালতী তার সমস্যার …আংশিক উত্তরের ইঙ্গিত পেল। মনে হোলো, ক'জন জানে …মালতীর কথা? সে নিজে জানে, দেবেশও হয়তো জানে না। …কেউ তো নিশ্চয়ই নয়। আর সবাই জানে মানবী মালতীকে, …অর্ধেককেই তারা পূরো বলো মানে। অপরার্ধের অস্তিত্ব …তারা অজ্ঞান, তাই সেই অর্ধের অন্তর্ধানের কথাও কেউ …না, এক মালতী ছাড়া। বাইরে থেকে তার মৃত্যু হলেও …স্মৃতির মণিকোঠায় সে রইবে অম্লান, অক্ষয়। তবে কি, …—আজ রাত্রে মালতী হত্যা করবে সেই অলীক মালতীকে?

…হোক, তবে তাই হোক। মালতী তার চরিত্রের সকল …প্রবল বিরোধিতা করে এই সংকল্পই গ্রহণ করল। দেবেশ …বায়ুপথে বায়ু-তরঙ্গের রূপ ধরে। মালতী মনে মনে …দেবেশ আবার অরূপ হয়ে মিশে গেল হাওয়ার সঙ্গে। …সে নেই। মালতী ছিল না, মাঝে একটা সংক্ষিপ্ত মাসের জন্যে ছিল, আবার এখন থেকে দীর্ঘ একটা না-থাকার পালা। সয়ে যাবে, সইতেই হবে, মালতী দৃঢ়মুষ্টিতে জানালাটা ধরে দাঁড়াল। অস্থিরকে স্থির হতে হবে, উড়ন্তকে মাটি আঁকড়ে থাকতে হবে। উড়তে লাগল শুধু মালতীর দুরন্ত চুলগুলি।

মন তবু সংস্কৃত শব্দরূপের মতো, বীজগণিতের সূত্রের মতো, কেবলই আওড়াতে থাকল: সে ছিল, সে নেই। আমি ছিলেম না, আমি ছিলেম, আমি নেই।

একটা সুইচ যেন! টিপলে আলো, তুলে দিলে অন্ধকার। মালতী আলোর জ্বালা সহ্য করতে পারছিল না। শান্ত অন্ধকারকে অন্তত তখনকার মতো ভালো লাগল।

সুইচের কথায় মনে পড়ল মালতীর। অনেক বার সে তার রেডিয়োর সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু তবু চারি দিকের বাড়িগুলি থেকে স্পষ্ট শোনা গেছে রেডিয়োর গান বা বক্তৃতা। সুইচ বন্ধ করেও নিষ্কৃতি পায়নি। মালতীর আরো মনে হোলো, রেডিয়ো বন্ধ করলেও রেডিয়োর অনুষ্ঠান তো বন্ধ হয়ে যায় না। মালতী না শুনলেও অনুষ্ঠান চলতে থাকে অব্যাহত।

সুইচ টিপে সে দেবেশকে সরিয়ে দিয়েছে, তবু যেন চতুর্দিকে সে অদৃশ্য ভাবে বিচরণ করছে। মালতী চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিল। সে দেখছে না, শুনছে না। তবু কি দেবেশ ঠিক আগেরই মতো বলে চলেছে? যেন কোনো পরিবর্তন হয়নি? যেন মালতী রেডিও বন্ধ করেনি?

ভালো লাগল না ভাবতে এমন সম্ভাবনাটা।

মালতীর পলায়নে পৃথিবীর কোনো কোণে, এমন কি দেবেশের মনে, কোথাও এতটুকু পরিবর্তন হবে না? কোথাও হবে না সামান্যতম ব্যতিক্রম? যে যেমন ছিল, যা যেমন ছিল, সবাই, সব কিছু ঠিক আগেরই মতো চলতে থাকবে?

এমনি ব্যবস্থা মালতী নিজের জন্যে বেছে নিয়েছিল মুহূর্ত কাল পূর্বে। কিন্তু বাকি পৃথিবীও যে তেমনি নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হবে, এমন কথা মালতীর কাছে অসহ্য মনে হোলো। তার কেবলই মনে হতে থাকল, দেবেশ এখন কী করছে? আজ বুধবার, অনেক রাত পর্যন্ত ওর ট্রান্সমিশন্ ডিউটি। বড়ো ব্যস্ত। মরবার সময় নেই। কিন্তু তারও মধ্যে, একটু, একবার, একটা খণ্ডিত মুহূর্তের জন্যেও কি দেবেশের মনে হচ্ছে না মালতীর কথা? শুধু একটি বার?

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অ, আ, ই

জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী।
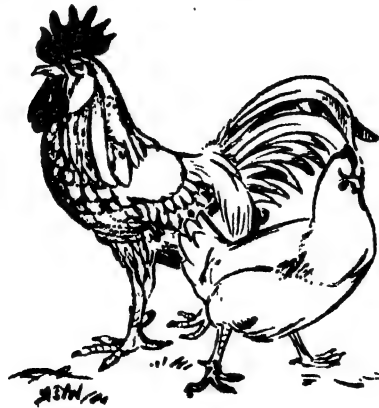
ভস্ম বর্ষণ হচ্ছে না কি। এমন স্বর্ণাভ চন্দ্রিমা ছড়াছড়ি দিকে দিকে। নীল আকাশে তুষার-শুভ্র মেঘ, বৈরাগীর মত ভেসে চলেছে বাতাসের বেগে। পৃথিবীর কত কাছাকাছি নেমে এসেছে। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় পূর্ণ গোলাকার ঐ স্বর্ণপিণ্ড? যাওয়া যায় সেখানে। চাঁদের দেশে? না। কেউ এখনও যেতে পারেনি সেখানে। চন্দ্রলোকে। কিন্তু কে আছে ঐ চাঁদের রাজত্বে। পিশীমা বলেছেন, আছে। আছে এক জন। শনের মত চুল, কোটরগত চোখ, লোলচর্ম্মা এক বৃদ্ধা। কাজকর্ম্ম নেই, কি করবে। বসে ব'সে তাই পেঁজা তুলোয় সুতো কাটে। চরকা ঘোরায় আর সুতো কাটে!

ঘরের ভেতর লণ্ঠনের স্বল্প আলো। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঝলক এসে লজ্জিত করে যেন ঐ আলোর শিখাকে। রাশি রাশি জ্যোৎস্না। কোথা দিয়ে রাত্রি চলে যেতে থাকে। প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত দেখতে-দেখতেই তন্দ্রা নামে চোখে। পড়া হয় না, শুধু দেখা হয় মাত্র। কেমন সব জন্তু-জানোয়ার আর পাখীর ছবি। মুরগী, রাজহাঁস, ময়ূর, সিংহ, বাঘ, গোখরো সাপ। কি আছে এই বইয়ে যে, নিজের মা থাকতে অপরের মাতৃবন্দনা। সমগ্র ইউরোপের সর্ব্বজনীন এই একটি মাত্র ভাষা—এ্যাংলোস্যাক্সন্ আর ব্রিটেনের মাতৃভাষা। কুইনের ব্রিটানিয়ার প্রথম সোপান। প্রথম ভাগ, ফার্ষ্ট বুক!

অনুগত প্রজার রাজভক্তির কি এই প্রকৃষ্ট পরিচয়! দেশের ঠাকুর ফেলি বিদেশের—। কিন্তু অক্ষরের অঙ্গে আর পরিচয় হয় না। ছবি দেখতে দেখতেই চোখে তন্দ্রা নামে। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন বাইরে প্রখর রৌদ্র। বেলা অনেক।

স্বপ্নমুখর রাত। এলোমেলো, সামঞ্জস্যহীন স্বপ্ন। যেন গান চলেছে। গান গাইছে বাসদেও মাহাতোর ছেলেরা। লাল আলপাকার সেই রুমালখানা এলো কোথা থেকে? ম্যানেজার বাবু ব্যস্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করছেন। অরুণেন্দ্র বলছে,—'আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত। জল দাও, খাবার দাও।' নাট-মন্দিরে লোকজনের হৈ-হৈ। চিকের আড়ালে চুণী-পান্নার গয়না-পরা একটা মেয়ে, হাসছে. মিটিমিটি। কুমুদিনী ডাকতে পাঠিয়েছেন অন্দর থেকে। আদি-অন্তহীন একেক ঘটনার ছিন্ন স্বপ্নজাল। টাটকা স্মৃতির স্বপ্নিল রোমন্থন। রাত ফুরিয়ে কখন দিনমণির আবির্ভাব হয়েছে। সেই সঙ্গে পাখীর কল-কাকলী।

একটা চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে যেন কোথা থেকে। কে এমন অসময়ে কাঁদে। এমন ইনিয়ে বিনিয়ে, মেয়েলী কণ্ঠে! শোনা যায় কান্নার সঙ্গে টুকরো কথা। সকাতর আত্ম-বিলাপ।

স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন। এখনও কি ঘুমিয়ে আছে না কি? কৈ, না তো! ঐ তো চোখের সমুখে শুভ্র আকাশ—হলুদ রঙের কাঁচা সূর্য্যালোক। দূরে, আকাশের বহু দূরে চিল পাক খাচ্ছে ডানা ছড়িয়ে। রাস্তায় শুরু হয়েছে মানুষের কলরোল।

আর বাড়ীতে এই চাপা কান্না।

কিন্তু কাঁদে কে? এক অজানা দুর্ঘটনার আতঙ্কে উঠে চলো কৃষ্ণকিশোর। ঘরের বাইরে দালানে আসতেই দেখে কে এক জন গুণ্ঠনবতী। বসে বসে কাঁদছেন। কুমুদিনী তাঁর কাছে বসে প্রবোধ-বাক্য শোনাচ্ছেন। দুঃখ ভুলতে বলছেন।

কাছে আসতেই দেখতে পায়। চিনতে পারে এ যে পিশীমা। জহর আর পান্নার মা। কুমুদিনীর ঠাকুরঝি, হেমনলিনী কখন এলেন তিনি?

—পিশীমা! সরাসরি ডেকে ফেললো সে। মুখ দিয়ে যেন বেরিয়ে গেলো কথাটা।—পিশীমা! তুমি কাঁদছ?

হেমনলিনীর মুখে আঁচল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিনি কাঁদছেন। বললেন,—হ্যাঁ বাবা।

—কাঁদছ কেন পিশীমা? সে যেন আর থাকতে পারে না। ব্যগ্র মনে জিজ্ঞেস করে।—তুমি কাঁদছ কেন?

লজ্জিত হন কুমুদিনী। ছেলের প্রশ্নে বিরূপ হন মনে মনে। ইসারায় নিষেধ করেন। মুখে তো কিছু বলতে পারেন না—একবার শুধু চোখ বড় করেন। বলেন,—মনে কষ্ট পেয়েছেন তাই কাঁদছেন। তুমি যাও, মুখে-চোখে জল দাও। বেলা অনেক হয়ে গেছে।

হেমনলিনী যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। গুণ্ঠন সরিয়ে মুখ তুলে তাকান। শিউরে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর তাঁর মুখাকৃতি দেখে। ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। কান্নার একটা আবেগ সামলে হেমনলিনীই

না বৌঠান, ওকে লুকিয়ে কোন লাভ নেই। ওরা জানুক, যে দরকার। মানুষ চিনবে না বৌঠান?

শেষে অঝোরে কেঁদে ফেললেন। দু'চোখের কোণ থেকে ধারা। ফর্সা মুখখানা তাঁর রাঙা হয়ে গেছে।

দেখে কিছুই অনুমানে বোঝা যায় না। বুঝতে গিয়ে আর অন্ত থাকে না। হেমনলিনীর মুখখানা দেখে তারও জল আসে। হেমনলিনী বললেন,—দেখো বাবা, তোমার কাণ্ড দেখো। কাল রাত্তিতে ফিরে এসে আমাকে মেরেছেন। কত মানা ক'রেছি, শোনেননি। লাথি জুতো মেরেছেন। খানিক থেমে আবার বলেন,—তাই লুকিয়ে চলে এসেছি তোমাদের বাড়ী। আর তো আস্থানা নেই, তাই তোমার মায়ের কাছে এসেছি।

মুখে নয়। হাত দু'খানাও আঘাতের চিহ্নে পরিপূর্ণ। কালসিটে। সে দেখে আর তার চোখ ছলছল করে। মেরেছে। পিশীমার গায়ে হাত তুলতে পারে এমন কেউ নিয়ায়?

গৃহিণী সেই গৃহস্বামী যদি হাত চালায় তাতে আর কার আপত্তি! যার স্ত্রী সেই পুরুষ যদি হয় অবুঝ! শিবচন্দ্র দাম্ভিক, বড় একরোখা। কিন্তু মেজাজও তাঁর তেমনি বিয়া। নেশার বশবর্ত্তী হয়ে যা করেন তা কি আর পরক্ষণে রাত্তিরে যা করেন সকালে?

হেমনলিনীকে ভুল বুঝেছেন শিবচন্দ্র বাবু। এমন এক সহধর্ম্মিণী পেয়েও তাঁর মূল্য বুঝলেন না। উনুনের ধারে সংসার করবেন দিনের পর দিন, হেমনলিনী ঠিক সেই প্রকৃতির না। তাঁর অসামান্য রূপের না হয় কদর না করলে, কিন্তু তাঁর গুণপনার কি কোন আদর নেই। শিবচন্দ্র বাবু যাতে সংসারের হন তার জন্য কি কম ক'রেছেন হেমনলিনী? লুকিয়ে ক'রেছেন, গান শিখেছেন। অন্য কোন নর্ত্তকীর দ্বারে এমন কি তাই নাচতেও শিখেছিলেন। নিজের হাতে তুলে ধরেছেন স্বামীর মুখে। কিন্তু কিছুই ফল শিবচন্দ্র বাবুর মন বাঁধা পড়েনি কোন মতেই। মুক্ত আসমানে উড়ে গেছেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

নী কিছুই করতে পারেননি। পাখী কখন ফিরে আশায় মুহূর্ত্ত গুণেছেন গহন রাতে। একা একা। মন্দিরে এসে প্রতীক্ষিতাকে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে জুতো আর ন। হেমনলিনী করজোড়ে অনুনয় ক'রেছেন,—ওগো আমি যে তোমার হেম। আমাকে তুমি মারছো এমনি

র উন্মত্তে কোন তফাৎ নেই। শিবচন্দ্রের মত্ত অবস্থা। বোতল হুইস্কির নেশা। চতুর্গুণ শক্তিতে আক্রমণ বাধা দিতে গিয়ে হেমনলিনী লুটিয়ে পড়েছেন ভূমিতে। লাথি চালিয়েছেন সর্ব্বাঙ্গে।

আমাকে তুমি মারছো এমনি ক'রে? বলতে বলতে ফেলেছেন আঘাতের ব্যথায়। অশ্রু আর রক্তপাত। পরণের কাপড়খানা ভিজে গেছে রক্তধারায়।

তার পর রাত শেষ হ'তেই লুকিয়ে পালকীতে উঠে চলে এসেছেন পিত্রালয়ে। কুমুদিনীর কাছে। হঠাৎ আবার কথা বললেন হেমনলিনী,—বৌঠান, আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পাবো? খেয়ে তা হলে জ্বালা জুড়োই। আর তো ভাই পারি না সহ্য করতে।

—ছিঃ, এমন কথা মুখে এনো না। কি করবে বল! কুমুদিনী বলতে বলতে নিজেও যে না কাঁদেন তেমন নয়। তাঁর চোখেও জল। তবে রুদ্ধ অশ্রু। চোখ দু'টো শুধু চিক-চিক করে। বলেন,—আর কাঁদে না ভাই। বাড়ীতে আবার মহলের প্রজারা এসেছে।

প্রজারা তখন প্রাতঃস্নান সেরে নাট-মন্দিরে বসে পড়েছে সারি সারি। কপালে তাদের শ্বেতচন্দনের লেপন। কোরাসের সুরে মন্ত্র বলছে। ধীর-গম্ভীর সকলের কণ্ঠস্বর। নাগরী ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ। সছন্দ।

তারা এসেছে যাযাবর পাখীর মত। প্রতি বছরেই আসে একবার একেক দল। আসে বাকী খাজনা দিতে আর ফসলের বীজ কিনতে। ভুট্টা, মরাই, অরহড়, সর্ষে আর ধুঁধুলের বীজ। পাইকারী দরে কিনবে। নিয়ে যাবে আর ছড়িয়ে দেবে মাঠে। এক দিন দেখতে দেখতে মাটি চিরে অঙ্কুরোদ্গম হবে। সেই লাঙল-চষা কালো মাটি হঠাৎ এক দিন সবুজের আবরণে ঢাকা পড়ে যাবে। তার পর মাঠ থেকে যাবে ব্যবসাদারের হাতে। চলবে টাকা-পয়সার খেলা; লাভ-লোকসানের কথাবার্ত্তা। বীজ থেকে ফসলই শুধু হবে না, হবে শ'য়ে শ'য়ে টাকা। তারা এসেছে চলে যেতে। কাজ সেরেই চলে যাবে।

ব্যাপারটা যাতে লঘু হয়ে যায় সেই আশায় অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেন কুমুদিনী। ছেলেকে বলেন,—তুমি কি মনে করেছো পড়াশুনোর বালাই একেবারে চুকিয়ে দেবে? কি ঠিক করলে কি?

কুমুদিনীর স্বর ঝাঁজালো। কথায় যেন রুক্ষতা। ক্রোধের আভাষ। বললেন,—যাও না, পড়ার ঘরে একবার যাও না। সময় কি এমনি ক'রেই হেলায় হারায়? এমন সকালটা নষ্ট করবে?

সে প্রথমে বিস্মিত হয় মায়ের কথার ধারায়। কুমুদিনীর চোখে চোখ পড়তেই দেখে তিনি ভ্রূ কুঁচকে ইশারায় চলে যেতে বলেছেন এখান থেকে। আঁচল-চাপা হেমনলিনীর চোখ দেখতে পায় না সেই ইঙ্গিত। নীরব নির্দ্দেশ।

কৃষ্ণকিশোর সবিস্ময়ে চলেই যায় সেখান থেকে। বোঝে না এত-শত. বোঝে শুধু পিশী, তার পিশীমা'র গায়ে হাত পড়েছে। তাঁর মত মানুষের শরীরে প্রহারের চিহ্ন! কি পাশবিকতা!

সময় কি হেলায় হারায়। কুমুদিনীর এই কথাটিই যেন তার চেতনাকে সব চেয়ে বেশী আঘাত করলো। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং। সময় এবং প্রবাহ চির বহমান—কারও অপেক্ষায় থাকে না।

পেছনে ছিল অনন্তরাম। কৃষ্ণকিশোর বলে,—অনন্তদা, বিছানায় একখানা বই ফেলে এসেছি। লুকিয়ে নিয়ে এসো। মা যেন দেখতে না পায়।

বই বিছানায়? ক্ষণিকের জন্য কৌতূহল জাগে অনন্তরামের মনে। এ ছেলে তো সে ছেলে নয়। না ঘুমিয়ে পড়বে। বই হবে তার শয্যাসঙ্গী। তবে কি বই যে, এমন লুকোচুরির পাঠ? তবে হয়তো কোন অশ্লীল রসোপন্যাস। এরই মধ্যে এতটা পাক ধরলো ছেলের মনে। গেল কি উচ্ছন্নয়?

ঘরে এসে বইখানাকে উলটে-পালটে দেখলো অনন্তরাম। দেখলো ভাষা বাঙলা নয়। সেই নীলকর সাহেবদের যে ভাষা সেই ভাষার বই। ম্লেচ্ছ ভাষার। অনন্তরাম হেসে ফেললো আপন মনে। বুঝলো এ সেই ফিরিঙ্গী ছোঁড়াটার কাণ্ড। ম্লেচ্ছদের দলে নাম লিখিয়ে নেওয়ার ওষুধ খাওয়াতে চাইছে। ল্যাজকাটা শেয়াল চাইছে অন্যের লেজ কাটতে। হেসে ফেললো অনন্তরাম। এমন অনেক দেখেছে সে। বহুত-বহুত। যখন নীলের চাষে কাজ ক'রেছে, দেখেছে অজ্ঞ, নিরক্ষর, সরল-প্রাণ গ্রামীণদের ধ'রে ধ'রে কানে খৃষ্টমন্ত্র শুনিয়েছে পাদরীরা। মন্দির আর মসজিদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। গির্জা তৈরী হয়েছে এখানে-সেখানে। শাসনের পীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে দলে দলে গ্রাম্য বাঙালী বুকে ঝুলিয়েছে যীশুর ক্রুশ। অনন্তরামের মনটা এক অনাগত আশঙ্কায় যেন ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

কিশোরের বাপকে মনে পড়ে যায়। প্রভু কৃষ্ণচরণকে; তাঁর নিষ্ঠা আর ধর্মকর্মকে; তাঁর পাণ্ডিত্য আর বিনম্রতা। এ অঘটন ঘটলে তাঁর আত্মা অস্থির হবে; তিনি শান্তি পাবেন না। অনন্তরামের ইচ্ছা হয় বইখানাকে এখনই ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে উনুনে দিয়ে আসে। কিন্তু বই কি এই একখানা? একটা গেলে আরেকটা আসবে না?

কৃষ্ণচরণ দাতাকর্ণ ছিলেন। পাঠশালা স্থাপন আর বিদ্যোৎসাহীদেরই দান ক'রেছেন অজস্র অর্থ। ভগ্ন মন্দির সংস্কার করাতেন। শূন্য মন্দিরে বসাতেন বিগ্রহ। কসাইদের হাত থেকে টাকার বিনিময়ে উদ্ধার করতেন অসংখ্য গাভী—বিলিয়ে দিতেন তাদের, যারা গো-পালনের যোগ্য। ধর্মে কারও হাত পড়লে কড়া চিঠি দিতেন তৎকালীন রাজ্যপাল—গভর্ণরকে। বাঙলার গভর্ণরকে। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান আর ত্রি-সন্ধ্যায় আহ্নিকের ব্রত পালন করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। স্বর্গতঃ মাতৃদেবীর পদরজ মুখে দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করতেন। আর তাঁর ছেলে—

একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অনন্তরামের বুকের অন্তস্তল থেকে। গৌরবময় অতীতের একেক ছবি দেখতে পায় যেন। সেই সব হারানো দিনের টুকরো-টুকরো ছবি।

অবসর পেলেই কৃষ্ণচরণ চলে যেতেন গায়ে উত্তরীয় চাপিয়ে। জুড়ী হাঁকাতেন স্বয়ং। কুমুদিনী বুঝতে পারতেন, কর্তা চলেছেন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে। মহারাজা নবকৃষ্ণের রাজবাড়ে। সেখানে আছেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। বাঙলা দেশে বিদ্যাশিক্ষা প্রচারের প্রধান পুরোহিত। মুকুটমণি। কৃষ্ণচরণ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, সেই কায়স্থ-কুলশিরোভূষণের পাদস্পর্শ করতেন। রাজা ধর্মপ্রবণ, ঘোর আপত্তি জানাতেন। বলতেন,—ভায়া, শেষে কি মহাপাতকী করবে?

কৃষ্ণচরণ সশ্রদ্ধায় উত্তর দিতেন,—বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে। আপনি পূজনীয় ব্যক্তি, আপনি যে শব্দকল্পদ্রুম রচনা ক'রেছেন।

রাজা হাসতেন বিনয়ের হাসি। তার পর দু'জনে চলতো শাস্ত্রীয় বিদ্যার আলোচনা। তর্ক-বিতর্ক। বাদানুবাদ।

অনন্তরাম পড়ার ঘরে আসতেই স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর,—অনন্তদা, পিশীমার কি হয়েছে বল তো?

বইখানা সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললো অনন্তরাম,—কি আর হবে? যা হয় তাই হয়েছে।

—কি হয়েছে? তার কথায় সাগ্রহ কৌতূহল।

অনন্তরাম।—হবে আর কি, তোমার গুণধর পিশে মশাই এসে ঠেঙ্গিয়েছেন। আহা, এমন লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীকে কেউ মারে! তোমার পিশীর মত মেয়ে আর আছে না কি [illegible] এ তল্লাটে?

—পিশে মশায়ের কি অন্যায় বল তো? ছিঃ! কৃষ্ণকিশোরের কথায় সহানুভূতির সুর।

অনন্তরাম।—অন্যায়! এক-আধ বোতল পান করলে কি আর তিনি মানুষ থাকতে পারেন! অমানুষ হয়ে যান। নেশা হয়, উত্তেজনা হয়। তাই মারা-ধরা করেন।

কৃষ্ণকিশোর বলে—কেন?

অনন্তরাম কি ভাবতে থাকে যেন। ক্ষীণ হাসির সঙ্গে হঠাৎ বলে,—কেন? জানিস, রাধিকা চোখে কাজল পরেছিলেন। অনুরাগের কাজল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ। তখন যেদিকে তাকান সেদিকেই দেখেন অনুরাগ। মাতালও তাই নিজে পঙ্ক-কুণ্ডে থেকে চতুর্দ্দিকে পাঁক দেখতে পায়। নিজে দোষ ক'রে অপরের দোষ দেখে। তোর পিশে দোষ দেখেছেন, তোর পিশী না কি তাঁকে অবহেলা ক'রেছে [illegible]তেই রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে হাত-পা চালিয়েছেন।

—অনুরাগ কি অনন্তদা? কেমন যেন অস্বাভাবিক [illegible] সঙ্গে কথাটা বলে ফেললে কৃষ্ণকিশোর।

অনন্তরাম হাসলো একটু। খুশীর হাসি নয়। [illegible] দেখে হাসলো। চুপি-চুপি বললে,—অনুরাগ? কেন, [illegible] প্রতি হয়েছে না কি?

—যাঃ। বল' না তুমি। বিরক্তির সঙ্গে বলে সে।

কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকে অনন্তরাম। তার [illegible],—মুখ হাত ধুয়েছো?

কৃষ্ণকিশোর।—হ্যাঁ।

অনন্তরাম।—তা হলে জল-খাবার এনে দিই [illegible] খেয়ে একটু পড়তে ব'স না কেন। মা এত ক'রে বললেন।

কৃষ্ণকিশোর।—বল' না ছাই।

অনন্তরাম আবার নীরব থাকে। কিছু বলে না। খানিক তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে,—ঐ দেখো না কেনে অ[illegible] কাকে বলে। আমি যাই তোমার খাবার আনি গে।

হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অনন্তরাম। অট্টহাসি হাসতে হাসতে।

কে? কৃষ্ণকিশোর জানলার বাইরে দেখলো। [illegible] এক গৃহের প্রায় শিখর-দেশের বাতায়ন-পথে দাঁড়িয়ে কে [illegible]জন। এলায়িত উড়ন্ত কেশরাশি, আর বন্য বয়েসী [illegible] শাড়ী। কে

সেই আইভিকন্তা। আজ আর চোখ তার ইদিকে নয়। ...কাশ পানে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। কেন?

...নেজার বাবু ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতে এক তাড়া চাবি। —একবার যদি এসে দাঁড়াতেন। ছোট বাবুর বাজনার ঘর ...গুলি তুলে রাখতে হবে। অনেক মূল্যবান সামগ্রী আছে। চাকর-বাকর কে কোথা থেকে কিছু একটা—

...সে বইয়ের পাতা খুলে ব'সেছে। পড়তে সুরু করেছে, ...কৌমুদীর আত্মনেপদী রূপ। তে, আতে, অন্তে—সে, ...এ, বহে, মহে। লট, লোট, লঙ, বিধিলিঙ্, ইত্যাদি। ...মুখ তুলে বললে,—এখন নয়। একটু অপেক্ষা করুন। ...আজ্ঞে! বলতে বলতে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে ...ম্যানেজার বাবু। যেন কত অপ্রস্তুত হয়ে প'ড়েছেন।

ছোট বাবু। কৃষ্ণকান্ত।

...নের অনুজ! বয়সে অনেক তফাৎ দু'জনে। দাদা আর ...বড় ভাই ছোট ভাইকে কখনও বুঝতে দেননি যে, সে ...তার মুখে হাসি না দেখলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলতেন। ...ভাইকে পালন করেছিলেন নিজের সন্তানের মত। আর ...ছিলেন দুর্দান্ত, যাকে বলে গিয়ে দামাল। দোর্দণ্ড ...বেড়াতেন ঘোড়ার পিঠে চেপে কলকাতার শহরে। সেই ...থেকে প'ড়েই তাঁর জীবনাবসান হয়। সেই ঘোড়াই হয়ে ...কাল। বুকের পাঁজর একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল। ...কোন মতেই ভাইয়ের জীবন রক্ষা করতে পারলেন না। ...কৃষ্ণকান্ত চ'লে গেছেন।

...কান্তর দুই রূপ ছিল।

...এ-পিঠ আর ও-পিঠ। আলো আর অন্ধকারের মত। ...অমাবস্যা। সারা দিন হাতে থাকতো ঘোড়ার বল্গা ...হাতে তুলে নিতেন একটি "তত" যন্ত্র। রুদ্রবীণা। দিনে ...নিতে বাড়ী মাথায় ক'রে তুলতেন। আর রাতের ...শোনাতেন নানা ঝঙ্কারে—রুদ্রবীণা।

...ঘরে শুধু বাজনা।

...তেলানো। মাটিতে বসানো। আনলায় ঝোলানো। ...যন্ত্র আর মধ্যে মধ্যে মাথা সমেত বাঘের ছাল। দেওয়াল ...এসে হাঁ ক'রে রয়েছে। চিরকাল ঐ হাঁ ক'রেই রয়েছে। ...বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহের নাস্তিক বাতিক ছিল কৃষ্ণকান্তর। ...পেয়েছেন, এনে সাজিয়ে রেখেছেন। "তত, শুষির, আনদ্ধ ...বাদিত্রের সভা বসিয়ে গেছেন যেন। সভার মধ্যিখানে ...কার্পেট একখানা। ঘন লাল রঙ। ভেলভেটের। ...তাকিয়া আছে। নেই শুধু সভাপতি।

...মাহাতোর ছেলেরা কাল গান গেয়েছিল। তাই ...বাজনার ঘরের তালায় হাত পড়ে। বেরিয়েছিল ...এক জোড়া তবলা আর করতালি। তাদের যথাস্থানে ...নির্দিষ্ট জায়গায়। যেখানে যেমনটি ছিল। ম্যানেজার। ...গেছিলেন। দেখেছিলেন মনিবের উপস্থিতি, মজুর কয়জন ...হয়ে যায় [illegible]।

মূল্যবান সামগ্রীর মধ্যে ঘরে আছে চারটি ধাতব মূর্ত্তি। নিরেট রূপোর। পোষা ভেড়া হাতে পরীদের মূর্ত্তি। ডানা-কাটা প্রায় উলঙ্গ পরী। ঘরের চার কোণের তেকোণা ব্র্যাকেটে দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে হাতীর দাঁতের নারীমূর্ত্তি। বাজারে পাওয়া যায় না, অর্ডারী মাল। চার রকমের নারীমূর্ত্তি—পদ্মিনী, চিত্রিণী শঙ্খিনী আর হস্তিনী।

ছোট বাবুর চাকর ছিল রঞ্জন। হাতে তৈরী চাকর। সেই রঞ্জনের হেফাজতে থাকতো ঐ বাজনার ঘর। কৃষ্ণকান্তর ঐ বাদ্য-মন্দির।

মনিব চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনও বিদায় নিয়েছে। চিরকালের মত দেশে চলে গেছে। আর আসেনি। ছোট কর্ত্তা তাকে নিজে পড়াতেন। রঞ্জন না কি ইংরেজীও পড়তে পারতো। কৃষ্ণকান্ত বলতেন,—পারিস তো ম্লেচ্ছ ভাষা শিখে ফ্যাল্। তাদেরই রাজত্ব হয়েছে এখন। কদর হবে দেখবি।

বাজনার ঘর খোলা হবে।

কাকা বাবুর বাদ্য-মন্দির। আবছা-আবছা মনে পড়ে কৃষ্ণকিশোরের। মনে পড়ে সেই অদ্ভুত মানুষটিকে। পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। মাথায় বাবরি চুল। আজানুলম্বিত বাহু। সুবিশাল চক্ষু। গৌর বর্ণ। মনে পড়ে যখন কাকা বাবু সারা বাড়ীতে ঘোরাফেরা করতেন তখন ঠিক ইঁদুরের মত তাঁর একটি হাত ধরে ঝুলতো কৃষ্ণকিশোর। সস্নেহে তাকে হাতে নিয়ে কৃষ্ণকান্ত ঘরে বেড়াতেন বাড়ীময়। কারণে-অকারণে চিৎকার ক'রে ডাকতেন যখন-তখন,—বৌঠান, বৌঠান, বৌঠান।

হাসিভরা মুখে কুমুদিনী এসে দাঁড়াতেন। বলতেন,—ডাকছো ঠাকুরপো? তা কি আস্তে ডাকতে নেই? কি বলছো, কি?

কৃষ্ণকান্ত হাসি চেপে বলতেন,—হ্যাঁ, ডাকছি। ডেকে ডেকে তো সাড়াই পাই না। গলা ভেঙ্গে যায়। বলছিলাম, আজ কি বার বল তো?

কুমুদিনী এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেন না। হাসতে হাসতে চলে যেতেন। বলতেন,—পাঁজীতে দেখো না ভাই। আমার অত-শত মনে থাকে না।

কৃষ্ণকান্ত চাপা হাসির সঙ্গে বলতেন,—তবে কি মনে থাকে আমার দাদাটিকে? কুমুদিনী সে কথারও কোন উত্তর দিতেন না। হাসতেন শুধু। হাসতে হাসতে কোন এক ঘরে ঢুকে পড়তেন। তামাসার মাত্রা যাতে আর না বেড়ে যায় সেই জন্যে।

ব্যাকরণ-কৌমুদী। পাণিনির অনুসরণে রচিত।

বর্ণ-বিভাগ, সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব বিধান, শব্দরূপ, বিভক্তির আকৃতি, ধাতুরূপ, কৃৎ প্রকরণ, বিভক্তি নির্ণয়, কারক, তদ্ধিত, স্ত্রীপ্রত্যয় আর বহুবিধ সমাসের বর্ণনা। এক নাগাড়ে দিনের পর দিন পড়তে পড়তে এদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে বললেই হয়। তবুও পড়তে হয়, অভ্যাস রাখতে হয়। অনভ্যাসে ভ্রান্তি আসতে পারে, স্মৃতি-বিভ্রান্তি।

কিন্তু ঐ শিরোমণি পণ্ডিত।

চতুষ্পাঠীতে গিয়ে নিয়ম মত পড়তে তার আপত্তি নেই। [illegible]

[illegible]বার। 'রাজা-রাজড়াদের একযজ্ঞের দান-দক্ষিণার লম্বা ফর্দে শিরোমণি তর্করত্নের নাম প্রায় শীর্ষদেশেই থাকে। শিরোমণি, হয়তো কেন, সত্যি সত্যিই শিক্ষাদানের রীতি সম্বন্ধে অদ্ভুত যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু—কিন্তু শুধু যদি পঠন-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, পণ্ডিত মশায়ের সাগ্রহ কৌতূহল! শিরোমণি পাঠশালার হাটে বাড়ীর খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। কারণে, অকারণে কথা বলেন বাড়ীর কথায়। স্থাবর আর অস্থাবর সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের কথায়। কেমন যেন অস্বাভাবিক কৌতূহল। শিরোমণির কথায় কোথায় যেন লোভের আভাষ।

লোভের আরেক নাম কাম।

আকাঙ্ক্ষা। পরদ্রব্যাভিলাষ। লিপ্সা। কৃষ্ণকিশোর নিজের চোখে দেখেছে শিরোমণির চোখে লোভাতুর কুটিল হাসি। মুখে যেন হিংসার। তার মনে পড়ে যায় কোথায় যেন শুনেছে কার কাছে। না, ঐ পণ্ডিত মশায়ের মুখেই শুনেছে। দেখেছে, সেই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতে করতে পণ্ডিত মশায়ের মুখাকৃতিতে এসেছে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। মনের আয়নায় হয়তো নিজের মুখখানাই দেখতে পেয়েছেন। শ্লোকটা হচ্ছে—'পরবিত্তাধিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে। অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।'

অর্থাৎ, অন্যের বিত্তের আধিক্য দেখিয়া যাহার হৃদয়ে লোভ ও অভিলাষ জন্মায় না, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিকীর্ত্তিত হয়। কিন্তু শিরোমণি তর্করত্ন—

কিন্তু ঐ মেয়েটা কেন এমন আকাশ পানে তাকিয়ে আছে। কেন দেখছে না রোজকার মত। কেন হাসছে না। কেন?

—এই দেখো কেনে, আবার বুঝি এক ফ্যাসাদ বাদিয়ে বসলো! দরজার বাইরে বসেছিল অনন্তরাম, ফটকে যেন কাকে দেখেই কথাগুলো স্বগত করলে। অনন্তরাম বসেছিল ছেলেকে জল-খাবার খাইয়ে। বসে বসে পড়ছিল সেও। তেল-চিটচিটে কি একখানা খাস্তা কাগজের পাতলা বই। বোধ হয় ঢপ-কীর্ত্তনের বটতলা সংস্করণ। কিংবা হয়তো পেমটা-সঙ্গীতের কোন এক সংগ্রহ।

—কে অনন্তদা? কে আবার ফ্যাসাদ করলে? ঘর থেকে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর। সে জানে অনন্তরাম শুধু শুধু কথা কইবে না।

অনন্তরাম।—কে আবার? তোমার পিশে আসছেন। টলছেন না এই যা রক্ষে। সঙ্গে আবার তেনার গুণধর ব্যাটা দু'টিও এয়েছেন দেখছি।

কৃষ্ণকিশোর ভয়ে ভয়ে বলে,—তুমি ব'সে থেকো না অনন্তদা। মাকে গিয়ে খবর দাও, শীগ্গির যাও।

পিশে মশাই। শিবচন্দ্র বাবু।

দিনমানে যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকেন ততক্ষণই তিনি মানুষ। এমন মানুষ যে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। মিষ্ট কথা, অমায়িক ব্যবহার, হাসি-ভরা মুখ—শিবচন্দ্র বাবুর না কি শত্রু নেই এ দুনিয়ায়। শুধু টাকা দেখিয়ে নয়, মিষ্টি কথায় তিনি বশ করেছেন যে গেছে তাঁর কাছে। যে গেছে সে আর ফিরতে চায়নি। ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যা [illegible] পরে কেউ কোথায় খুঁজে পাবে না। হদিস পাওয়া যাবে সেই শিমলের কাছাকাছি এক বাড়ীতে। শিবচন্দ্র বাবু তখন—

—পড়া হচ্ছে না কি। বাঃ রে বাহা রে, কেমন হীরের [illegible] ছেলে তাই তোরা ছাখ্। পড়ার ঘরের দরজায় এসে [illegible] হাজির হলেন। ভাঙ্গা গলায় বললেন কথাগুলি। তাঁর [illegible] তাঁর দুই ছেলে। জহর আর পান্না। তাদেরই দেখতে [illegible] হীরের টুকুরোকে। তারা দেখতে দেখতে পরস্পরের মুখ চাওয়া [illegible] করতে লাগলো।

বই সরিয়ে সে উঠে এসে শিবচন্দ্রের গ্লেজড্ কীডের চকচকে [illegible] ধুলো খানিকটা নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালে। শিবচন্দ্র [illegible] উঠলেন। বললেন,—থাক্, থাক্, হয়েছে, হয়েছে। [illegible] কোথায় বাবা?

—মা অন্দরে আছেন। আপনি চলুন না। জহর [illegible] না তোরা, মায়ের কাছে যা না। কৃষ্ণকিশোর এই [illegible] বলে অভ্যাসের রীতিতে। তাঁরা এলেই বলতে হয় এমন [illegible]। এত দিন পর্য্যন্ত এই একই ধারায় কথা বলে এসেছে [illegible] তাঁদের নিজেদের মধ্যে যদি কোন রকম কিছু একটা [illegible] গোপন ছায়া পড়ে থাকে, তাতে তার যে কি কর্ত্তব্য, [illegible] তখনও পর্য্যন্ত তো পাওয়া যায়নি কুমুদিনীর কাছ থেকে [illegible] অবস্থায় তিনি যা বলবেন সে তাই করবে। যেমন বলবেন [illegible]।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় ঢং-ঢং শব্দে অনেকগুলো বাজলো না [illegible] বেলা হল? কলকাতার শহরে এই সময়টা আলো দেখে [illegible] আন্দাজ হয় না। কটা? ন'টা, দশটা, না এগারোটা? [illegible] আগে আগে যান। পেছনে যায় তারা তিন জন। সে [illegible] জহর আর পান্নার মুখ দু'টো গম্ভীর। পিশে যাতে শুনতে না [illegible] কৃষ্ণকিশোর ফিস-ফিস ক'রে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে রে [illegible]

জহর আর পান্না প্রায় একসঙ্গে নিজেদের তর্জ্জনী মুখে [illegible] ইঙ্গিত করলে তার অর্থ, চুপ করো। কি হয়েছে, এখন [illegible] সে কথা বলা যায় না।

অন্দরের দরজা পেরিয়েই শিবচন্দ্র ভাঙ্গা গলায় [illegible]— বৌঠান, বৌঠান কোথায় গেলে গো?

কিছুই যেন হয়নি। কুমুদিনী হাসতে হাসতে এসে [illegible]। বললেন,—কি হুকুম, বলুন।

শিবচন্দ্র প্রথমেই পায়ের জুতো খুলে সাষ্টাঙ্গে [illegible] প্রণাম করলেন কুমুদিনীর পায়ে। ভক্তিসহকারে।

কুমুদিনী পেছনে সরে যেতে যেতে বললেন,—ছি, ছি [illegible] বলুন তো। মনে হচ্ছে, খুব একটা দরকার পড়েছে। [illegible] হঠাৎ এমন আসা হয় না তো!

শিবচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন,—আজকের প্রণাম [illegible] অকারণে নয়। যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ বলছি।

পেছনে তারা তিন জন জড়ভরতের মত দাঁড়িয়েছি[illegible] কথা থামিয়ে হঠাৎ তাদের এক ধমক দিয়ে বললেন শিবচন্দ্র বাবু,[illegible] না তোরা, সদরে খেলগে যা না দু'দণ্ড।

তারা তিন [illegible] পেয়ে

ভাই, জানো তো একটু কারণ-টারণ পান করি। সেই কাল রাতের বেলায় এক অঘটন ঘটিয়ে বসে আছি। বৌঠান, কি হতে পারে। এখন সকল অপরাধ মার্জ্জনা [illegible] ঘরের লক্ষ্মীটিকে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

[illegible]নীর মুখ সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টি স্থির। [illegible] স্বরে বলেন,—লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে আছে? আপনার [illegible] আর যাবে না। আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘরেই [illegible]। তাকে আমরা যেতে দেবো না।

[illegible]চন্দ্র বাবু যুক্তকরে বললেন,—মার্জ্জনা চেয়েছি বৌঠান। [illegible] পায়ে পড়বো? বল তো—

[illegible] ফেললেন কুমুদিনী। বললেন,—যেতে দিতে পারি [illegible]।

—[illegible]? সে সর্ত্ত আমি নিশ্চয়ই পালন করবো। শিবচন্দ্র [illegible] তখনও দম্ভ। অব্যাহতি পাওয়ার দ্রুত সিদ্ধান্ত। [illegible] পালন করবো।

[illegible]নীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। বললেন,— [illegible] আপনি তাকে মেরেছেন বলুন তো! সে যে কি জিনিষ [illegible] আপনি জানেন না? আপনি কত অনিয়ম করেন, সব [illegible] হাসি-মুখে।

—[illegible] বৌঠান, তা তো আমি অস্বীকার করি না। তুমি এখন [illegible] বল না। শিবচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়েন কথা বলতে বলতে।

—[illegible] সর্ত্ত হচ্ছে: আপনাকে কথা দিতে হবে আমার কাছে [illegible] দিন আর আমার ঠাকুরঝির গায়ে হাত তুলবেন না। [illegible] সর্ত্ত হ'ল, হেমনলিনীর পা[illegible] ধ'রে আপনাকে বলতে [illegible] পাওয়ার কথা। কুমুদিনী কথার শেষে হাসলেন। [illegible] হাসি।

—[illegible] আর এমন বেশী কথা কি? শিবচন্দ্র বললেন,— [illegible]ঠান, নিশ্চয়ই। তুমি যা বলবে তাই করবো আমি। [illegible], আমি কখনও কথার খেলাফ করি না। কোথায় [illegible] কোথায়?

—[illegible] শ্বশুরের ঘরের মাটিতে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে সে। যান [illegible] যান। কি করেছেন কি? প্রতিমার গায়ে পা [illegible] এক্ষুণি গিয়ে তাকে— আর বললেন না কুমুদিনী। [illegible] সেখান থেকে অন্তর্দ্ধান। একেবারে কোথায় অদৃশ্য হবে [illegible] বললেন,—আর তাও, হেম তো এখন যেতে পারবে [illegible] তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছি। আপনি [illegible] কাছে, গিয়ে— আর বলেন না কুমুদিনী।

[illegible] সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে চলেন। শ্বশুরের ঘরে? [illegible] তার ঘর। কৃষ্ণকিশোরের কর্ত্তা-দাদুর ঘর।

[illegible] সঙ্গে নিয়ে বাইরে আসতেই দূরে ফটকের কাছে [illegible]নের আবির্ভাব! ভাবলো, ব্যাপার কি? পেয়ে বসলো [illegible] আসছে হন্ত-দন্ত হয়ে। ঝড়ো কাকের মত চেহারা। নর্থ্যান [illegible]অরুণ। অঙ্ক। হঠাৎ এ সময়ে কেন? কলেজের [illegible] খেয়ালীর আবার কি খেয়াল হ'ল কে জানে। জহর [illegible] সঙ্গেই বললে,—কে রে কিশোর? সায়েব বুঝি?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ। তবে বাঙলাও একটু-আধটু বলতে পারে।

—সে কি রে? সায়েব? আমরা তা হলে মামীর কাছে পালাই। জহর পান্না প্রায় একসঙ্গেই কথাগুলি বললে। সত্যিই তারা সেখানে আর না দাঁড়িয়ে অন্দরের দিকে পিছু হাঁটে। সাহেবের ভয়ে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—মাকে যেন বলিসনি। সায়েবটা পাগল। ভিক্ষে নিতে এসেছে। এক্ষুণি চলে যাবে আবার।

জহর বললে,—তা না হয় বলবো না। তুইও পালিয়ে আয় না। যদি কামড়ে দেয়?

সে হাসতে হাসতে বলে,—ব্যাচারী পাগল। পয়সা নিয়েই চ'লে যাবে। আহা, খেতে পায় না।

পান্না বললে,—একে সায়েব। তার ওপর পাগল। আমি ভাই নেই।

তারা সত্যি সত্যিই আর সেখানে থাকে না। মামীর আঁচলের তলায় গিয়েই লুকোয় হয়তো।

—কি খবর? এমন কলেজের টাইমে যে? সাগ্রহে বললে কৃষ্ণকিশোর।

একেবারে কাছাকাছি এসে অরুণেন্দ্র ধীর-গম্ভীর স্বরে বললে,—

I come not, friends, to steal away your hearts:
I am an orator, as Brutus is.
.........I only speak right on.

কৃষ্ণকিশোর অবাক হয়। তার কথা শুনে। কি বলছে অরুণেন্দ্র। এমন গ্রীক ভাষায়? সে বললে,—আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

অরুণেন্দ্রর মূর্ত্তি কেমন আজ ছন্নছাড়া। মুখে যেন কেমন বিষণ্ণতার কালো ছায়া। কথায় বুঝি অসংলগ্নতা। আবার অরুণেন্দ্র বললে,—**If you have tears prepare to shed them now.** চোখে যদি জল থাকে অশ্রুপাতের জন্য প্রস্তুত হও।

বড় বিশ্রী লাগে তার এই হেঁয়ালীপনা। সে বললে,—কেন? কেন? কেন?

অরুণেন্দ্র আরেক দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,—আমার বোন বোধ হয় আর বাঁচবে না। খুব অসুখ তার। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে এসেছি তোমার কাছে সাহায্য চাইতে। **She is lying unconscious. My beloved playmate Lilian is senseless now.**

সাহায্য? ভিক্ষা?

কৃষ্ণকিশোর ভাবলো, তবে কি তার তামাসার কথা এমন প্রকট ভাবে সত্যি হয়ে উঠলো। অরুণেন্দ্র বললে,—আমার বাবা, ঐ নর্থ্যান বিনয়েন্দ্র লোকটা একটা পাষণ্ড। লিলিয়ান **is so ill,** তাই বললাম, টাকা দাও **let me call for a doctor.** তা বললে, আমার **income fixed,** আমার কাছে টাকা কৈ? তাই এসেছি তোমার কাছে। **Kindly lend me at least twenty rupees,** কুড়ি রুপেয়া।

সড়ক —সুখেন্দুবিকাশ দাস

সমুদ্রসৈকতে নোণা মাছ ধরা —জে, আর, সেনগুপ্ত

...দানে বোমা বিস্ফোরণ —কাঞ্চন মুখার্জী
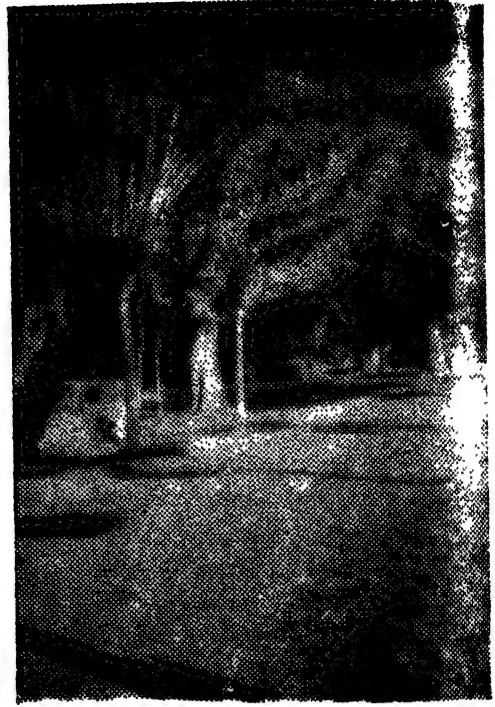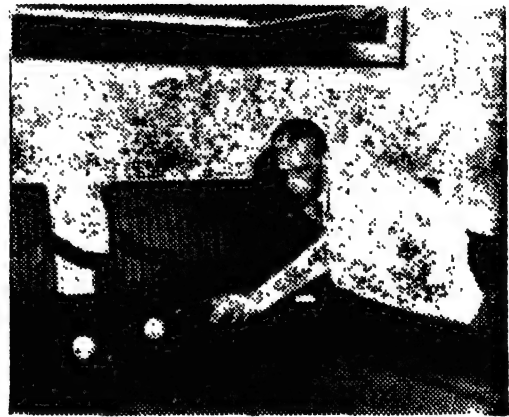
একটি অরাজনৈতিক কামান —এফ. ই. পামার

আমাদের প্রথম সংবাদ চিত্র প্রদর্শনী

ব..ার কলকাতায় মেঘ করলে না কি রাস্তায় জল মে..ায়। পথে-ঘাটে চলতে ফিরতে বিরক্ত হতে ..., ...ও ইলিশ মাছের চড়া দর সত্বেও মাছ কিনতে ..মন ..াবুরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, তেমনি আরও অনেক আকর্ষণীয় বিষয় দেখতে আরও অনেককে দেখা যায় জল-বৃষ্টি উপেক্ষা করেও বেরিয়ে পড়ছেন। কেন? কিসের এত আকর্ষণ যদি বলেন, তা হলে বলব এবার বর্ষায় কলকাতায় মাছের তেমন আমদানী হচ্ছে

কলকাতায় এবার সর্ব্বপ্রথম আমদানী হয়েছে একটি প্রদর্শনীর—যার নামকরণ হয়েছিল "প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েসন" বা "সংবাদ-চিত্র প্রদর্শনী"।

প্রদর্শনী অর্থে যদি মেলা বোঝায়, তা হলে স্বদেশী মেলার যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত মেলাই মেলা এই কলকাতা শহরের বুকে দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু সংবাদালোক চিত্রের প্রদর্শনী না কি এর আগে কখনও আর দেখা যায়নি। সে যুগে মেলা দেখানোর উদ্যোগে লাগতেন দেশের স্বরাজনৈতিকরা নয়, তখন ঝুটো রাজনৈতিকের স্থান ছিল মেলার বাইরে। মেলা দেখিয়ে যাতে দেশ আর দশের খানিকটা চোখ ফোটে, তাই এ কাজে তৎকালীন বিচক্ষণ ও শিক্ষিত সমাজ-সেবকদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তার প্রমাণ বাঙালীর জাতীয় গৌরব সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক "স্বদেশী মেলা"।

মেলাই কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাঙলা দেশের পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থাপকদের ধন্যবাদ দিই—তাঁদের পত্র-পত্রিকার Public-এর সেবা কার্য্যে। এ বিষয়ে আজও তাঁরা দেশের সেবায় সম্মুখীন। বাঙলা দেশে নেতার অভাব, তাই বাঙালী পত্র-পত্রিকার মুখাপেক্ষী। কাগজ প'ড়ে তাদের দিন কাটে, কাগজে দিক-নির্দ্দেশের সন্ধান খোঁজে, কাগজে দেখতে চায় কি সত্যি আর কি মিথ্যা। কাগজ না থাকলে আজ বাঙলা হয়তো অন্ধকারে হারিয়ে যেতো। তাই কাগজের কারবারীদের দিই অসংখ্য ধন্যবাদ।

কিন্তু শুধু কাগজের দিন বোধ হয় অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু কাগজ চলে না, কাগজে ছবি না থাকলে সে কাগজ বাজারে চলে না। আর কাগজে তো আপনার আমার ছবি ছাপলে কাগজ চলবে না, সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে দস্তুরমত চিত্র ছাপতে হবে—যাকে বাঙলায় বলে সংবাদ-চিত্র। তার কারণ কাগজে এমন সব চটকদার সংবাদ মাঝে-মিশেলে ছাপা হয় যার সঙ্গে ছবি না থাকলে পাঠক-পাঠিকার চক্ষু না কি সার্থক হয় না।

কাগজে দস্তুরমত ছবি ছাপতে শিখেছি আমরা সম্প্রতি। ছবি ছাপার টেকনিকাল দিকে অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল—অধুনা আমাদের কেউ কেউ সে বাধা অতিক্রম করে রীতিমত ছবি ছাপছেন তাঁদের আপন আপন মুখপত্রিকায়। সত্যি কথা বলতে কি, এই সংবাদচিত্র প্রকাশের রেষারেষি এত দূর এগিয়েছে, যার ফলে আমাদের দেশে আজ সংবাদ-চিত্রশিল্পীদের সংখ্যাও প্রতিদিন বর্দ্ধিত হচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে দেখছি বহু বাঙালী শিল্পীও অগ্রসর হচ্ছেন। সম্প্রতি কলকাতা শহরে সংবাদচিত্রের যে প্রদর্শনী হ'ল, তাতে দেখবার অনেক কিছু ছিল। অসংখ্য আলোকচিত্রী যোগদান করেছিলেন। ছিল ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের উপস্থিত বুদ্ধি, তৎপরতা আর দক্ষতার পরিচয়।

চিত্র-সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য চিত্রে সংবাদ পরিবেশন করা। শিল্পী আর সাহিত্যিকে যেমন তফাৎ, চিত্র-সাংবাদিক আর সাধারণ আলোকচিত্রীতে তেমনি পার্থক্য। এই প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে আমরা এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। ক্ষিপ্রতার পরিচয় হিসাবে আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের "ময়দানে বোমা বিস্ফোরণ", সুযোগ-সন্ধানী হিসাবে আমরা তারিফ করছি পান্না-এর "একটি অরাজনৈতিক কামান" এবং শিল্পদৃষ্টির প্রশংসা করছি সুশীল জানার "বিহ্বল মাতৃমুখ" আর ব্যানার্জ্জীর "ভারতীয় অলঙ্কার" ছবি দেখে। এবং আরও অনেককে তাঁদের বিভিন্ন ছবির জন্য।

জাতির ইতিহাস ছবিতে দেখিয়ে দেশের চোখ ফোটানো যায় অতি সহজেই। আমাদের চোখ ফোটাতে যাঁরা এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঠিক এই ধরণের সুনিয়মের চিত্র-প্রদর্শনী বড় একটা দেখবার সৌভাগ্য হয় না। দেখে সত্যিই আমাদের চক্ষু সার্থক হয়েছে।—প্র

যখন আমি তাঁকে শেষ দেখি —কি. এল. সিংহ

জন্ম : বংশ-পরিচয়

... জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে এক ...গ্রান্ত বৈদ্য-বংশে ১৮৬৫ সনের ২৬এ জুলাই (১২৭২, ...) বুধবার রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ... তখন কাটোয়ার মুনসেফ।

...কান্তের সাহিত্য-সাধনায় পারিবারিক প্রভাব নিতান্ত ...। পিতা গুরুপ্রসাদ সঙ্গীতজ্ঞ ও সুকবি ছিলেন। ... রচিত তাঁহার কীর্ত্তন-সমষ্টি 'পদচিন্তামণিমালা' ১২৮৩ ...দ্রিত হয়।* সুগায়ক পিতার সান্নিধ্যে থাকিয়া পুত্রও ...ঙ্গীত অভ্যাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্ত ...চারি বৎসর বয়সে সাধক রামপ্রসাদের গানগুলি সুর করিয়া ... শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মনোমোহিনী দেবীও এক ...বতী মহিলা। কাব্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি ...ল হইতেই পুত্রের হৃদয়ে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার ...রিয়াছিলেন। এই পরিবারের অম্বুজাসুন্দরীও (রজনীকান্তের ...ন কন্যা) উত্তরকালে কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শিক্ষা

রজনীকান্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েন নাই। তাঁহার প্রাথমিক ...ন শিক্ষা হয় রাজসাহীতে। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ রাজসাহীর খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। রজনীকান্ত কোন দিনই ...টি" ছিলেন না; প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ...বলিয়া পরীক্ষার কাছাকাছি সময়ে মনোযোগ সহকারে দিন-পড়িয়া সকল পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। নিজেই বলিয়াছেন,—

"বাবা, হারমোনিয়ম, তাস, ফুটবল—এই নিয়ে ...টিয়েছি। যেবার বি-এ- পাস হলাম, সে-বার বাটীতে ব'সে ...কয়ে হিন্দু হোষ্টেলেরই ৮০।৮২খানা পোষ্টকার্ড পাই—যে ...মন পাস।...আমি যদি পড়তাম, তবে আমি স্পর্দ্ধা ক'রে ...তে পারি যে, কেউ আমার সঙ্গে compete কত্তে পারত ...। আমি গান গেয়ে হেসে নেচে পাস হয়েছি। I was ...ever a book-worm, for I was blessed with ...ery brilliant parts." ("হাসপাতালের রোজনামচা": ...ন পণ্ডিত-প্রণীত 'কান্তকবি রজনীকান্ত')

...বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে রজনীকান্ত ... কান্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার আভাস দিতেছি :—

...	... এন্ট্রান্স,	৩য় বিভাগ	... কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুল (বয়স ১৭ বৎসর)
...	... এফ, এ,	২য় বিভাগ	... রাজসাহী কলেজ
...	... বি, এ,		... সিটি কলেজ
...	... বি, এল,	২য় বিভাগ	... সিটি কলেজ

---

* ...দ শেষ বয়সে 'অজয়া বিহার' নামে একখানি গীতি-... করিয়াছিলেন। ইহাতে দক্ষপ্রজাপতি-গৃহে সতীর ...যজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ঘটনা ছয়টি কাননে ...ইয়া ...।—জগদীশর রায় : "একখানি অপ্রকাশিত কাব্য"—..., শ্রা... ১৩১৮।

রজনীকান্ত সেন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহ

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অল্প দিন পরেই—১২৯০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রজনীকান্তের বিবাহ হয়। পাত্রী—স্কুল-বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর, ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ মহকুমার বেউথা গ্রাম-নিবাসী তারকনাথ সেনের কন্যা, উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তিধারিণী হিরণ্ময়ী দেবী।

ওকালতি ও সাহিত্য-সাধনা

রজনীকান্ত যখন সিটি কলেজে বি- এ- পড়িতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই পরলোকগমন করেন (ফাল্গুন ১২৯২)। সমৃদ্ধ সেন-পরিবারের অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া আসিতে লাগিল। সংসারের অবস্থা বুঝিয়া রজনীকান্ত বি- এল- পরীক্ষা দিয়া স্বাধীন ভাবে ওকালতি সুরু করিলেন, কিছু দিন নাটোর ও নওগাঁয় অস্থায়ী ভাবে মুন্সেফের কাজও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সাহিত্যগতপ্রাণ; ওকালতিতে তাঁহার তেমন প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে পারে নাই। রজনীকান্ত একখানি পত্রে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে লিখিয়াছিলেন :—

> "কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

আইন-ব্যবসায় সম্বন্ধে তিনি তাঁহার হাসপাতালের রোজনামচার এক স্থলে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "সংপথে থেকে ওকালতি করা বড় কঠিন হয়েছে। টাকার লোভ এতো হবে যে, সত্যাসত্য বিচার-ক্ষমতা blunt হবে heart callous হবে, তখন টাকা হ'তে পারে, অর্থ হবে, তবে তার পায়ে পরমার্থ টি রেখে হবে। ইতি মে মতিঃ।"

রজনীকান্ত রাজসাহীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। শৈশব হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যপ্রতিভা প্রকৃতপক্ষে রাজসাহীতেই বিকাশ লাভ করে। এই রাজসাহীতে অবস্থান কালেই তিনি স্বনামধন্য সাহিত্যিক ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। অক্ষয়কুমারের ভবনে প্রায়ই গানের আসর বসিত; সে আসর মাতিয়া উঠিত সুকণ্ঠ রজনীকান্তের স্বরচিত গানে। এইখানেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; দ্বিজেন্দ্র-লালের কণ্ঠে হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত হাসির গান রচনায় প্রবৃত্ত হন।

স্থানীয় সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে রজনীকান্তকেই গান রচনা করিয়া দিতে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই গান গাহিয়া সমবেত জনের মনোরঞ্জন করিতে হইত। এক কথায় রজনীকান্ত বিনা রাজসাহীর কোন আনন্দোৎসবই যেন জমাট বাঁধিত না। তিনি কিরূপ ক্ষিপ্রতার

কিরূপ গান রচনা করিতে পারিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জলধর সেন লিখিয়াছেন :—

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্ত যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি ত অবাক্। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্ব্বজন-পরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।"

১৩০৪ সালে রাজসাহী হইতে 'উৎসাহ' নামে যে মাসিক-পত্রখানি প্রকাশিত হয়, অক্ষয়কুমার ও রজনীকান্ত তাহার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; উভয়েরই বহু রচনা 'উৎসাহে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে।

বাণী-সাধনায় সবিশেষ উৎসাহী রজনীকান্ত কিন্তু মোটেই কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন না। অক্ষয়কুমারের নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বাণী' ১৩০৯ সালে মুদ্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার "কান্তকবির স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

"...কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনা-প্রতিভা-বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সঙ্গীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে, অন্তকে শুনাইবার পূর্ব্বে আমাকে শুনান হইয়াছে; মজলিসে সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে।...তথাপি সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সরলতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনা-প্রতিভা ছিল, কিন্তু আত্মপ্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের একটি জ্ঞাতব্য কথা।...

সে-বার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্ত একখানি ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে তীর হইতে রজনী ডাকিলেন,—'দাদা! ঠাঁই আছে?'

তাঁহার স্বভাব এইরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্প কাল পূর্ব্বে 'সোনার তরী' বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই উপর ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; হয়ত আর্শা ছিল, আমি বলিয়া উঠিব—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী,
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি!'

আমি বলিলাম,—'ভয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে ..., আমি ধানের ব্যবসায় করি না।' এইরূপে দুই জনে ক...কাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বোল... যাইবার সময়ে, রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিক... উৎসাহ পাইয়াও, রজনীকান্তের ইতস্ততঃ দূর হইল না। ...কাতায় ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্ত বলিল,—'সমাজপতি থা...তে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না।'

মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালো...র ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল, তাহার এইরূপ অ... পরিচয় পাইয়া, প্রিয়বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতি... জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া, নূতন কবির পরি... না দিয়া, গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল ...টিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যা... সঙ্গীত-সুধাপানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না; সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ...ার পর আলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের পরে রজনীর সঙ্গীত যখন দশজনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গিয়া আমার ইতস্ততের আ... হইল।

আমার ইতস্ততের যথেষ্ট কারণ ছিল। আমাকে পুস্তকে ও পুস্তকে মুদ্রিতব্য প্রত্যেক সঙ্গীতের নামকরণ ক... হইবে, গানগুলির শ্রেণী-বিভাগ করিয়া, কোন্ পর্য্যায়ে কোন্ শ্রেণী স্থান পাইবে, তাহাও স্থির করিয়া দিতে হইবে, এবং গ্রন্থে... ভূমিকাও লিখিতে হইবে,—এই সকল সর্ত্তে রজনীকান্ত গ্র... প্রকাশের অনুমতি দিয়া, আমাকে বিপন্ন করিয়া তুলি...ছিলেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি ..., ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। তবে আমার পক্ষে দুই...কটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাম হইল—'বাণী'। স...তগুলিরও একরূপ নামকরণ হইয়া গেল। শ্রেণী-বিভাগ... হইল,—তাহারও নামকরণ হইল আলাপে, বিলাপে, ...লাপে।... রজনীকান্তের "আলাপ"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমা... ধারণা;—তাহা অনাবিল, তাহা মধুময়, তাহা ভা... ভক্তিতে রচনা-লালিত্যে অনুপম।" ('মানসী', কার্ত্তিক ১৩...

'বাণী'র তিন বৎসর পরে রজনীকান্তের দ্বিতীয় ... 'কল্যাণী' (ভাদ্র ১৩১২) মুদ্রিত হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া দেশে ...ন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ উঠিয়াছে। প্রতিবাদ-সভা... ...দেশী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া গেল। ...ই সময়ে রজনীকান্ত দেশাত্মবোধমূলক গান রচনায় মাতিয়া উঠি... ইহার একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই ;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

তাঁহার হাসপাতালের রোজনামচায় লিখিয়াছেন :—
দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই ছেলেরা আমাকে আগে করে procession বের ক'রে গাইতে গাইতে গেল, সেদিনের কথা মনে করে আমার জল আসে।"

এই অপূর্ব্ব গানখানি 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র মুগ্ধ করিয়াছিল ; তিনি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন যোগ্য :—

"কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড' নামক প্রাণপূর্ণ স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক পর্য্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল- প্রাতঃসূর্য্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির আছে,—নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশী-যুগের সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন সৌভাগ্য ও সফলতার এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করি।"

আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালী রজনীকান্তকে আরও ভাল —তাঁহার নাম ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িল।

মৃত্যু

ভাগ্যে যখন যশ ও গৌরবের দিন আসিল, ঠিক নিয়তি বাদ সাধিলেন। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্য তায় আনা হইল। গলদেশে অস্ত্রোপচারও হইল, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছিন্নকণ্ঠ বাক্‌শক্তি- শেষ দিনগুলি বেদনায় করুণ। দারুণ রোগ-যন্ত্রণার কবি এক দিনের তরেও বিচলিত হন নাই ; তিনি লিখিয়াছেন :—

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব্ব করিতে চুর ;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকামতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর,
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে,
গর্ব্ব করিতে চুর।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

২৮এ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ অনন্তপথের যাত্রীকে মেডিকেল কলেজের কটেজ-গৃহে দেখিতে গিয়াছিলেন। কবিগুরুর দর্শন লাভ করিয়া রোগ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট রজনীকান্ত আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া গিয়া ১৬ই আষাঢ় তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

"—এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?"

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ

বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য!

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেই দিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

আপনি যে গানটি ["আমায়, সকল রকমে…] পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" ('কান্তকবি রজনীকান্ত,' পৃঃ ২৩৪-৩৬)

১৩১৭ সালের ২৮এ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০) রজনীকান্তের জীবন-দীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

"যে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করা মানবশক্তির পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত কঠিন, তাহার প্রাচুর্য্য তাঁহাকে যতই ঘিরিয়া বসিয়াছে, তিনি তাহার মধ্যে ততই শ্রীভগবানের প্রেমলীলার অনুভূতিতে তাঁহার উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন;—কদাপি তাঁহার দয়ার বিধানে সন্দিহান হইয়া, 'হা ভগবন্ কি করিলে' বলিয়া আর্ত্তনাদ করেন নাই। ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি; ইহাতেই তাঁহার সিদ্ধি।

তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।

কবির প্রথম জীবনের এই আকুল প্রার্থনা, শেষ-জীবনে পূর্ণ হইয়াছিল অভ্যর্থনায়।…রাজসাহীতে সম্মিলিত বঙ্গসাহিত্য-সুহৃদ্বর্গের কান্তকবি যে স্বাগত-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আনন্দোচ্ছ্বাস যেমন সমাগত বিদ্বজ্জনকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল, বিদায়-গীতিটি সেইরূপ সকলকেই বিষাদমগ্ন করিয়া, বিদায় দান করিয়াছিল। কান্তকবির জীবনগীতিও সেইরূপ। তাহা আরম্ভে আমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল, অবসান সময়ে সেইরূপ অবসন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে! তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া, আমরা এখন তাঁহার মতই কাঁদিতেছি—

সুখের হাট কি ভেঙ্গে দিলে!
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে রইল গাঁথা,
ভাঙ্গা বীণায় কি সুর দিলে!*

গ্রন্থাবলী

রজনীকান্তের পুস্তক-সংখ্যা মোট ৮খানি; ইহার [illegible]খানি তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। এগুলির একটি কাল[illegible]ক্রমিক তালিকা দিতেছি; বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **বাণী** (কাব্য)। (২৪-৮-১৯০২)। পৃ. ৮[illegible]

ইহার ভূমিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন:—"[illegible] বাণী গদ্যে, কাহার পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত-পদাবলী কেবল সঙ্গীত।" ১৯০৬ সনের মা[illegible] মাসে প্রকাশিত ২য় সংস্করণটি পরিবর্দ্ধিত।

২। **কল্যাণী** (কাব্য)। ভাদ্র ১৩১২ (ইং ১৯[illegible])।

৩। **অমৃত** (নীতি-কবিতা)। বৈশাখ ১৩১৭ ([illegible] ১৯১০)। [illegible]

দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়কে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্রে কবি লিখিয়াছেন:—

নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া? আর কেবা পারে?
কি দিব, কাঙ্গাল আমি? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মালা, বহু কষ্ট করি;
ধর দীন-উপহার; এই মোর শেষ;
কুমার! করুণানিধে? দে'খো, র'ল দেশ।

[মৃত্যুর পরে]

৪। **আনন্দময়ী** (আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত) ১[illegible] সাল (৫-১০-১৯১০)। পৃ. ৮৬। সারদাচরণ মিত্র-লিখিত ভূ[illegible] সহ।

"ভগবান্‌কে কন্যারূপে আর কোনও জাতি ভজন [illegible]নি। যশোদার গোপাল, আর মেনকার উমা ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত। সেই বাৎসল্য ভাবটা পরিস্ফুট ক'রে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। প্রেমই নানা আকারে প্রে[illegible] বলে। বাৎসল্য একটা আকার, যে বাৎসল্যে জগৎ চলছে, শু[illegible] দাম্পত্য প্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ কর্‌তো, মানে সৃষ্টি হ'[illegible], কিন্তু বাৎসল্য না থাকলে সৃজন পর্য্যন্তই থাকতো—পালন আর [illegible] না, একেবারেই সংহার এসে উপস্থিত হ'তো। সৃষ্টি, স্থিতি, [illegible] এই তিনটি অবস্থার (stage) মধ্যে স্থিতিটাই বাৎসল্য [illegible] ভাবটা মনে ক'রে বই আরম্ভ করেছি, এই ভাব দিয়ে [illegible] শেষ কর্‌বো।"—হাসপাতালের রোজনামচা।

* অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: "কান্তকবি রজনীকান্ত" 'শিশির,' ১৩ পৌষ, ১৩৩০।

৫। **বিশ্রাম** (কাব্য)। (১০-১০-১৯১০)। পৃ. ৮৭।
৬। **অভয়া** (কাব্য)। ১৩১৭ সাল (৫-১১-১৯১০)। পৃ. ১০১।
৭। **সদ্ভাব-কুসুম** (নীতি-কবিতা)। ইং ১৯১৩ (৩১এ মে)। পৃ. ৪৭।
৮। **শেষ দান** (কাব্য)। ১৩৩৪ সাল (সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১১৩।

"কবির অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রচনার সঙ্কলন।"

রজনীকান্ত ও বাংলা-সাহিত্য

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে-রজনীকান্তকে বাংলা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে মৃত্যুশয্যায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, বাংলার গীতিকাব্যে তাঁহার যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভগবদ্‌ভক্তির এমন সহজ অনাবিল প্রকাশ ইদানীং কালে আর দেখা যায় নাই। রজনীকান্তের ভগবদ্‌-নির্ভরশীলতার গান এক সময়ে সারা বাংলা দেশকে মাতাইয়া দিয়াছিল। এইগুলি এবং অন্যান্য ভাবের কয়েকটি গানের মধ্য দিয়াই রজনীকান্ত চিরজীবী থাকিবেন। প্রবন্ধ-মধ্যে দু'টি গান উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও কয়েকটি গান নিম্নে সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়া আমরা রজনীকান্ত-প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

'বাণী' :

মা

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে!
কক্ষণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে।
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর;
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম!
অচলা মতি পদে মাগি রে!

মিশ্র ইমন্—তেওরা

মোহ

(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়
অন্ধকারচিরমরণসিন্ধু-নীরে,—
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়;
(কত) জ্ঞান, বুদ্ধি বল, স্নেহ, করুণা, দেহ,
স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধু, গেহ,
নিষ্কলঙ্ক মন, মধুময় পরিজন,
পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায়।
(মম) সুপ্তহৃদয় করি' নয়ন-নিমীলন,
না করিল তব করুণা-অনুশীলন;
মোহ ঘিরিল মোরে, রহি' চির-ঘুম-ঘোরে,
ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে, হায়!
(এস) দীনদয়াময়ি! রক্ষ রক্ষ, লহ
কোলে; ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ;
দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়।

নিপট কপট তুঁহু শ্যাম—সুর

আমরা

আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট;
তবু, আজ সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ!
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে প'র্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেণ্ডার চাই নে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা, রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে?
হারাস্ নে ভাই রে আর এমন সুদিন;
মায়ের পায়ের কাছে এসে যোটো।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে,
কিন্‌বো না ঠুনকো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে;
থাক্‌লে, গরীব হ'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।

মিশ্র বারোঁয়া—কাওয়ালী

'কল্যাণী' :

পাতকী

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয়?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয়?
করিতে এ ধূলাখেলা, অবসান হ'ল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়ে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখন আমি, ডাকি নি, হৃদয়-স্বামি!
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?

মিশ্র বেহাগ—খং

মাইকেল আরজিবাবেভ

ছয়

ইউরাই এবং সীনা গুহার ভেতরে চলে যাবার পর আর সবাই খানিকটা সময় গুহার মুখে দাঁড়িয়ে রইল. কেউ কেউ ওদের দু'জনকে নিয়ে দু'-একটা সস্তা রসিকতা করল ; তার পর প্রায় সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাটা ছেলেরা কেউ কেউ সিগারেট ধরালো। লিডা দু'হাত কোমরে রেখে কি একটা গান গুন-গুন করে গাইতে সুরু করল ; ওর চল্‌বার ভঙ্গি দেখে মনে হোতে পারত, বুঝি বা নাচবার আয়োজন করছে। লালিয়া সেখান সেখান থেকে দু'-একটা বুনো ফুল তুলে আনাতোল্‌-এর দিকে ছুঁড়ে মারছিল,—ওদের দুজনেরই চোখে যেন পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার অঞ্জন মাখানো।

আইভানফ, জিজ্ঞাসা করল স্যানিনকে, "কিছু মাল-টাল খেলে কেমন হয় ?"

"ঠিক মনের মতো কথাটা বলা হোল"—উত্তর দিল স্যানিন।

নৌকায় উঠে এসে ওরা গোটা কয়েক বীয়ারের বোতল খুলে বস্‌ল।

লালিয়া পার থেকে এক মুঠো ঘাস ওদের দিকে ছুঁড়ে বল্‌ল, "বিশ্রী মাতলামো !"

স্যানিন বলে চলল, "আমি অনেক বার ভাবতে চেষ্টা করেছি, মানুষ কেন মদ পছন্দ করে না। আমার তো মনে হয়, মাতালরাই সব চেয়ে বেশি ক'রে জীবন উপভোগ করতে পারে।"

…ইচ্ছে হোল গান করল। নাচতে ইচ্ছে করলে নাচল। ফূর্তি করতে বা উপভোগ করতে তার লজ্জা হয় না।"

রিয়াজান্‌জেফ. বল্‌ল, "তা বটে ; মারামারি করতে ইচ্ছা করলে তাও পারে।"

স্যানিন উত্তর করল, "তা' বটে ; তবে যারা তা' করে, মদ খেতে জানে না।"

নোভিকফ. ওকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কখনো মদ খা… পর মারামারি করতে ইচ্ছে হয়েছে ?"

"না।" বল্‌ল স্যানিন। "আমি যখন মদ খাই না, … মারামারি করতে তৈরী থাকি। খেলে পর, যত দূর সম্ভব ভদ্রস্থ … বার চেষ্টা করি,—কারণ জীবনের নীচতা-হীনতার ঊর্দ্ধে তখন আ…

রিয়াজানজেফ, বল্‌ল, "সবাই তা' পারে না।"

"তারা অনুকম্পার পাত্র।"—স্যানিন বল্‌ল। "তা' … অন্যেরা কি করে বা পছন্দ করে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার … আমার নেই।"

নোভিকফ, বল্‌ল, "তা' বলা চলে না।"

"কেন ? সত্যি কথাই তো বলছি !'

"আহা, কি সত্যই প্রকাশ করলেন !" মাথা ঝাঁকুনি দি… লালিয়া অপ্রসন্ন মুখে বল্‌ল।

স্যানিনের হয়ে আইভানফ জবাব দিল, "এর চেয়ে সত্যভা… আমার অজ্ঞাত।"

লিডা এতক্ষণ গলা ছেড়ে গান গাইছিল, হঠাৎ থেমে গেল ; বল চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্‌ল, "কৈ, ওরা তো ...ছে না।"

"আরে, তাড়া-হুড়ো করবার কি আছে। তাড়া-হুড়ো ক'রে ... করা নিতান্ত বোকামী!"—আইভানফ জবাব দিল।

"আমার মনে হয়, ওরা বেশ মজা লুঠছে!—কোমর দুলিয়ে ...া বল্‌ল।

হঠাৎ গুহার ভেতর থেকে গুলীর আওয়াজ আস্‌তেই সবাই ...র্ণ হয়ে সেদিকে তাকালো। "গুলীর আওয়াজ!"—বল্‌ল ...কফ।

"এর মানে কী?—লালিয়া দস্তর মতো ভয় পেয়ে আনাতোলের ...কের কাছে এগিয়ে গেলো। আনাতোল ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌ল, "...য় পাবার কিছু নেই। যদি নেকড়েই হয়, তাতেই বা কি! এ সময়টায় ওদের তেজ থাকে না, আর তা'ছাড়া দু'জন লোককে এক-সঙ্গে আক্রমণ ওরা করবে না।"

"মুখ্যামি!"—শাফরফ, মন্তব্য করলো। সেও এই ছেলেমানুষী ক'রে ইউরাই-এর গুহার ভেতরে ঢোকা পছন্দ করেনি।

লিডা হঠাৎ বলে উঠল, "আসছে। ঘাবড়িও না।"

...দের পায়ের শব্দ শোনা গেল ; খানিকটা পরে সীনা ও ইউরাই বেরিয়ে এলো।

ইউরাই বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল ; সবার দিকে তাকিয়ে ...ন যেন একটা অবাস্তব হাসি হাসল। ওর এবং সীনার সর্বাঙ্গে, পোষাকে হলদে মাটির গুঁড়ো।

আলস্যজড়িত কণ্ঠে সেমেনফ, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে ...লো, "তার পর?"

ইউরাই হাত কচলাতে কচলাতে বল্‌লো, "ভেতরটা বেশ মজার। ...য় গুহাটা বেশি দূর অবধি যায়নি।..."

সীনা বললো, "গুলীর আওয়াজ পেয়েছিলেন?"

আইভানফ, চেঁচিয়ে বললো, "বন্ধুগণ, আমরা সব বীয়ার খেয়ে ...ছি, এক ফোঁটাও পড়ে নেই। এখন আমাদের সখের প্রাণ ... মাঠ! চলো হে, যাওয়া যাক্‌!"

নৌকা ছেড়ে দিল। অদ্ভুত, নিস্তব্ধ, অপার্থিব সন্ধ্যা। ...শে আর নদীর জলে অজস্র তারা ফুটে উঠল। দুই সীমা-...র প্রান্ত ছুঁয়ে নৌকা চলেছে! তীরের বন, গাছ, ঝোপ-...কী রকম যেন আশ্চর্য লাগছে! অনেক দূরে—দেখতে ... যাচ্ছে না—একটা পাখী ডেকে গেল। পাখী তো নয়!—...ন্দের ঝরণা! স্বপ্নিল পরিবেশ! সীনা কার্সাভিনা চুল ঠিক ...নিয়ে একটা রাশিয়ান পরিচিত লোকপ্রিয় গান সুরু করলো। ...কিছু আশ্চর্য্য রকমের গাইয়ে সে নয়, তবু যেন এই ঘনায়মান ...র, তারা-ভরা আকাশের নীচে, বন আর লতা-গুল্মের ফ্রেমে ...া নদীর বুকে, অদ্ভুত আশ্চর্য্য লাগল তার স্বর সবাইর কাছে। ...ন থাম্‌বার সঙ্গে সঙ্গে করতালির ঐক্যতান পড়লো! কেউ ... "বাঃ!" আইভানফ, বল্‌লো, "বেশ মিষ্টি!" স্যানিন বল্‌লো, ...ার!"

...নু, আরেকটা গাও না!" লালিয়া উপরোধ করলো। "না ...আমার নিজের একটা কবিতা আবৃত্তি করো।"

"আপনি কবিও না কি?" আইভানফ, বল্‌লো। "ভগবান্‌ কতো ভাবেই না তাঁর দয়া প্রকাশ করেন!"

"কেন, সেটা কি খুব মারাত্মক ব্যাপার?"—খানিকটা থতোমতো খেয়ে সীনা বল্‌লো।

"না, ও তো খুব ভালো কথা!"—স্যানিন উত্তর দিল।

আইভানফ, বল্‌লো, "দেখতে যদি সুন্দরী হয়, আর তা'র যদি যৌবন থাকে, তাহলে মেয়েরা কবিতা নিয়ে কি করবে? বলো তো আমাকে!"

"যাক্‌ গে, ওদের কথায় কান দিও না। সীনু, লক্ষ্মীটি, একটা আবৃত্তি করো!"—ভারী খুসীমুখে নরম স্বরে বললো লালিয়া।

সীনা একটু হাস্‌লো। আত্মসচেতন হয়ে দূরে তাকালো। তার পর সুললিত পরিষ্কার গলায় নীচের লাইন ক'টা আবৃত্তি করলো:—

> "হে আমার ঐকান্তিক প্রেমিক সুজন,—
> তোমারে ক'ব না কভু—কহিব না—
> জ্বালাময়ী অন্তরের প্রেমের কাহিনী!
> রুদ্ধ করি' দুই আঁখি—হৃদয়ের এই দু'টি দ্বার—
> লুকায়ে রাখিব মোর হৃদয়ের বাণী।
> তপস্যার দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার পরে
> দেখা দেয় অকস্মাৎ এক একবার—
> নীলাকাশে শান্ত রাত, সোনালী তারারা,
> —কানে কানে কথা কয় স্বপ্নিল বনানী,
> —পাতার মর্ম্মরে বাজে হৃদয়ের বীণ,
> —আলো-ঝরা তারাগুলি চোখে ফেলে ছায়া।
> এরা জানে মোর কথা, তাই এরা মূক হ'য়ে রয়,
> প্রকাশ করে না তারা রূঢ়ালোকে
> প্রেম-ভীরু রমণী-হৃদয়।"

আবার সেই উচ্ছ্বাস, করতালির ঐক্যতান। কবিতাটা যে খুব ভালো হয়েছে তা নয়, কিন্তু বক্তব্য বিষয়টা প্রত্যেকেরই অন্তর স্পর্শ করছে, তাই এ উচ্ছ্বাস। ওদের সবারই এখনকার বয়সটা এমন যে, ভালোবাসার গভীর অনুভূতি,—তা আনন্দেরই হোক্‌ আর বেদনারই হোক্‌,—ওরা পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

গভীর উত্তেজনায় আইভানফ, হাত-পা ছুঁড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললো, "হে চন্দ্র-সূর্য্য! হে অন্ধকার রাত! হে মায়াবী চোখ সীনা, একবার বলো,—সেই ভাগ্যবান পুরুষ আর কেউ নয়—আমি—"

"নিশ্চিন্ত থাকো হে," বল্‌লো সেমেনফ,. "সে আর যেই হোক্‌, তুমি নও!"

বিলাপের সুরে আইভানফ, বল্‌লো, "হায়, দগ্ধ-ভাল আমার—"

ওর কথায় সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

সীনা ইউরাইকে জিজ্ঞাসা করলো, "আমার কবিতাটা কি খারাপ লাগ্‌লো শুন্‌তে?"

ইউরাই কবিতাটাতে এমন কিছু বিশেষত্ব পায়নি। এ ধরণের হাজারো কবিতা সে দেখেছে, ঐ সস্তা প্রেমোচ্ছাস। কিন্তু সীনার কালো চোখের দিকে তাকিয়ে সে সত্যি কথাটি বলতেই পারলো না। ওকে খুসী করবার জন্য বললো, "চমৎকার লাগ্‌লো আমার।"

...খুশী হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য হোল এই ভেবে যে এ রকম ... ওর নিজের কাছে এত ভালো লাগলো।
...সবাই মিলে সীনা-আবকতায় মেতে উঠল।
...তার ভালো লাগছিল না সীনাকে নিয়ে সবার এতোটা বাড়াবাড়ি। সে বলে উঠলো, "এবার ফিরতে হবে না?" মনে ...র প্রত্যয় ছিল, সব দিক দিয়েই সে সীনার থেকে শ্রেষ্ঠতর,—বুদ্ধিতে, সৌন্দর্য্যে,...
...নিন যখন ওকে বললো গান গাইতে, ও স্রেফ জবাব দিল, "আমার গলা ভালো নেই।"

সাত

দিন তিনেক পরে, সন্ধ্যা বেলা, লিডা বাড়ী ফিরলো তারাক্রান্ত ... অপরিসীম একটা ক্লান্তি বয়ে। নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রে ...নীচু ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ বুঝতে পারলো, ...ক্লডিনের সঙ্গে সে বড্ড বেশি মাখামাখি ক'রে ফেলেছে। সেই ...ক্লডিন,—যে কি না সব দিক দিয়েই ওর অনেক নীচুতে,—ক্রমে ...সে তা'রই মুঠোর মধ্যে গিয়ে ও পড়েছে। আজকে স্যাক্লডিনের সামান্যতম অঙ্গুলি-হেলনে লিডাকে উঠতে-বসতে হয়। আগের মতো আর লিডা ওকে নাচাতে পারে না; আজকে ক্রীতদাসীর মতোই তাকে স্যাক্লডিনের অভিরুচি মাফিকই যে-কোনো ব্যবহার সইতে হয়।

কি ক'রে, কবে থেকে যে তার এই ক্রমাবনতি সুরু হোল, তা' ওর মনে পড়ছে না। বরাবরই তো সে স্যাক্লডিনকে নিয়ে যথেচ্ছাচার করেছে,—ওর প্রেম-নিবেদন মঞ্জুর করেছে; বেশ লাগত মধুর উত্তেজনাময় অনুভূতিগুলি। তার পর এক দিন এমন একটা মুহূর্ত্ত এলো যেদিন ওর সমস্ত শরীরে যেন আগুন লেগে গেলো, মাথার ভেতরে-বাইরে সবটা হয়ে উঠল ঘোলাটে, অস্পষ্ট; সেদিন তো নিজেই প্রাণপণে ঝাঁপ দিয়েছিল—যেন একটা কালো অতলস্পর্শী অজানা গহ্বরে! পায়ের নীচের থেকে সেদিন মাটি গিয়েছিল স'রে, নিজের শরীরের কোনো প্রত্যঙ্গের উপরই রইল না কোনো এক্তিয়ার, সমস্ত সত্তা দিয়ে সেদিন অনুভব করেছিল শুধু দু'টি দুঃসাহসী জ্বালাময়ী চোখ—চুম্বকের মতো যা' তাকে সেদিন অন্ধকার গহ্বরের পথে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ণ অস্তিত্ব ঘিরে সেদিন সে পেয়েছিল জীবনের চরম আকুতি; উদগ্র কাম-পিপাসার পাত্র হয়ে উঠে নিজেকে এগিয়ে দিয়েছিল পরম উৎসর্গের বেদীতে। আজকে ওর জীবনে ঘিরে এসেছে ক্লান্তি, হতাশা, অপমান; তবুও কি মনের গোপনে কামনা জাগছে না—আর একবার, মাত্র একবার সেই নিজেকে নিঃস্ব ক'রে সমর্পণ করবার—সেই জ্বালাময়ী অনুভূতি পাবার জন্য? ও কথা ভাবতেই ওর সারা শরীরটা কেঁপে উঠ্‌লো। দু' হাতের আঁজলায় মুখ লুকোলো। টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে জানালা খুলে দিল। তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাঁদের দিকে। বড়ো অসহায়, বিষণ্ণ বোধ করলো নিজেকে। ক্ষণিকের ভুলে—একটা দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে একে—একটা খেলো বাজে লোকের কাছে নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিল!

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইল, "বেশ করেছি, তা'তে ক্ষা'র কি?"

জানালার কাছ থেকে স'রে এসে সে পোষাক-পরিচ্ছদ ... লাগল। মনে মনে বললো, "মোটমাট একবারই তো বাঁচবো ... যত দিন আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হচ্ছে, 'অপেক্ষা করতে হবে'! ... কি উপকারটা হবে তাতে আমার?...কী হবে ভেবে?..."

মনে ভাবলো, বেশ হয়েছে। আকাশের পাখীর মতো ... জীবন এবার তার, যা' খুসী, যে রকম মন চায়, নিজেকে উপভোগ করতে পারবে। আরাম, সুখ, ভোগ,...একটা গানের ... গাইল, "আমার খুসী, আমি বাসবো ভালো, খুসী হই, ভালো-বাসবো না।"

নিজের গলার স্বর কানে যেতে ভাবলো, তার গলা সীনা কার্সাভিনার চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের বেশি ভালো। বললো মনে মনে, "আমার খুসী, আমি উচ্ছন্ন যাবো।" দু'হাত সজোরে আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিতে ওর স্তনযুগ নড়ে উঠল।

"এখনো ঘুমুওনি লিডা?" —জানালার ওপাশ থেকে স্যানিনের গলা শোনা গেল।

আতঙ্কে লিডা প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। একটা শাল নিশবরণ বুকে কাঁধে জড়িয়ে ও জানালার কাছে এগিয়ে গেল।

"কী ভয়ই পাইয়েছিলে তুমি!"—ও বললো।

স্যানিন এগিয়ে এসে জানালার আলসের ওপর কনুই ... রাখল। ওর চোখ উজ্জ্বল, মুখে হাসি।

"ওটার কোনো দরকার ছিল না!"

লিডা বুঝতে পারলো না স্যানিন কি ইঙ্গিত করছে।

"শালটা না থাকলেই তোমাকে আরো সুন্দর দেখাতো!"—চাপা গলায় স্যানিন বললো।

অবাক হয়ে লিডা ওর দিকে তাকালো; শালটাকে আরো ... ক'রে জড়িয়ে নিল।

স্যানিন হেসে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে লিডাও জানালার গরাদের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

"কী সুন্দর তুমি!"—স্যানিন বললো।

স্যানিন কি ওর মনের কথা টের পেয়েছে? সমস্ত শরীর ... যেন অনুভব করলো স্যানিনের দৃষ্টি। ঠিক ঐ দৃষ্টিই তো ... সে অভ্যস্ত হয়েছে প্রত্যেক পুরুষের চোখে। কিন্তু স্যানিন ... তাদেরই মতো? তার নিজের ভাই! একটা নোংরা সরীসৃপ ... ওর শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুখে বললো, "হাঁ, ... জানি।"

ও যখন জানালায় ঝুঁকে কথা বলছিল, শাল ও সেমিজ ... সরে গিয়েছিল, চাঁদের আলো এসে পড়ছিল ওর বুকে; ... সেদিকে চোখ রেখে বললো, "মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে তৃপ্তিলাভের পথে চীনের প্রাচীরের মতো দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়।"—ওর গলা কাঁপ... লিডা দস্তুর মতো ভয় পেলো।

"কি বলতে চাও তুমি?"—অর্ধোচ্চারণে লিডা জিজ্ঞাসা করে ... জিজ্ঞাসা করলো বটে, কিন্তু ও বেশ জানে—কি বলতে ... স্যানিন। একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে—এই মুহূর্ত্তেই যা' ... ভাবতে চাইছে না। মাথার ভেতরে কি রকম গরম উঠেছে। চোখ বুজে সে অনুভব করলো স্যানিনের ... নিশ্বাস—যেন ওর গাল পুড়ে যাচ্ছে।

... বলতে চাই ?···এই বলতে চাই।"—ধরা-গলায় স্তানিন ...।

... একটা বিদ্যুৎবাহী চাবুক এসে লাগলো লিডার গায়ে। ... পিছিয়ে সরে গেল ও, নিজের অজ্ঞাতেই টেবিলের ওপর ঝুঁকে ... দিয়ে নিবিয়ে দিল বাতিটা। বললো, "শুতে যাচ্ছি এবার।" ... কাচের শার্সিটা দিল বন্ধ ক'রে।

বাইরের চাঁদের আলোয় স্তানিনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কি রকম একটা নীলাভ মূর্ত্তি। শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে, মুখে লেগে আছে পরিচিত হাসি।

লিডা গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়; সর্ব্বশরীর ভয়ে ও কি-এক উত্তেজনায় কাঁপছে, ধারাবাহিক কিছু ভাবতে পারছে না। বাইরে স্তানিনের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো; পায়ের শব্দের তালে তালে ওর হৃৎপিণ্ডের এ কি দোলানী ?

সেদিন অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না লিডার চোখে। "আমি কি পাগল হয়ে যাবো ? কী একটা কথার কথা বললো, আর তাই আমাকে তোলপাড় করছে!···আমি কি সত্যিই উচ্ছন্নে গিয়েছি ?"—বললো নিজের কাছে নিজে। চোখ ফেটে এলো জল; ভাবলে, এ রকম ঘটতে পেরেছে, কেন না ওর নিষ্কলুষ কুমারীত্ব আর অবশিষ্ট নাই। কেন সে স্যারুডিনের কাছে আত্মদান করেছিল ?—তাই না আজ ভাইয়েরও চোখে দেখলো অবমাননাকর লালসাময় দৃষ্টি।

"কেন ওরা আমাকে অপমান করবে ? কে দিয়েছে তাদের এ অধিকার ? কোনো দিন পাবো না পরিত্রাণের কোনো সুযোগ ? নিষ্কলুষ সুন্দর ভবিষ্যৎ ?"

যৌবনের বেদনার প্রচ্ছন্নে যে আশীর্ব্বাণী লুকিয়ে থাকে, লিডা ... আছে ভবিষ্যৎ, দাবী তার সুপ্রতিষ্ঠিত। যতো দিন যৌবন-... রবে তার অস্তিত্বে,—পৃথিবীর সব কিছু আনন্দ, সুখ, সৌন্দর্য্য, ... পাবার অধিকার আছে। এই শরীর, সুন্দর, নরম, মোহময় ... নিজের শরীর নিয়ে যা' খুসী সে করতে পারে।

কিন্তু এ যুক্তি, অজস্র পরস্পরবিরোধী এলোমেলো চিন্তার মাঝে ... হারিয়ে ফেললো।

আট

... দিন হোল ইউরাই ছবি আঁকা সুরু করেছে। এক কালে ... বাসনা ছিল আর্টিষ্ট হবে; কিন্তু সময়, সুযোগ ও খরচা ... সামর্থ্যের অভাবে সে বাসনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। এখন ... শিল্পচর্চ্চা ওর, তা হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং খেয়াল চরিতার্থ করা ... বলা বাহুল্য, সত্যিকার শিল্পীদের যে কঠোর অধ্যবসায়, ... দীর্ঘকাল ধ'রে শিক্ষানবীশির সময় পেরিয়ে আসতে হয়, তা' ... না। সুতরাং ওর সৃষ্টিও হোত তেমনিই—অশিক্ষিত ... সৃষ্টি।

... দিন ওর অন্তরে এলো দারুণ শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা; তুলি, রং, ক্যানভাস্ নিয়ে বসলো। "জীবন"—এই নামের অভিধানে ... বিরাট অচিন্ত্যপূর্ব্ব শিল্প-সৃষ্টি করবে, এই রকমটা ... কল্পনা। ঘণ্টা কয়েক খেটে খুটে যা তৈরী করলো, তাকে সে নিজেই স্বীকার করলো—আর যা' পরিচয় দেয়া যাক, "জীবন" বলা যেতে পারে না; বরঞ্চ বলা যেতে পারে—"মৃত্যু"। ... অকৃতকার্য্যতা ও অক্ষমতার উপর এলো দারুণ অবজ্ঞা, ছুরী ... নিয়ে সে ক্যানভাস থেকে চেঁছে তেল-রঙের প্রলেপ তুলে ফেলতে লাগলো।

ইউরাই-এর এই শিল্প-ব্যস্ততার মধ্যে প্রবেশ করলো নোভিকফ্। লিডার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, এবং বিশেষতঃ এখানে-সেখানে লিডা স্যারুডিনের কেলেঙ্কারীর উপাখ্যান শুনে শুনে ও একদম মুষড়ে গিয়েছিল। ব্যর্থ-প্রেমের বোঝা বয়ে সে এসে ইউরাই-এর ঘরে ঢুকলো।

নিজের জীবনের ওপর নোভিকফ্-এর ধিক্কার জন্মে গিয়েছিল। মনে মনে এক রকম স্থির ক'রে ফেলেছিল, এ ধিকৃত জীবন অতঃপর অপরের আনন্দের জন্য,—প্রায় সেবাব্রতের মতোই—উৎসর্গ করবে। একবার ভেবেছিল, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সেন্ট্ পিটার্সবার্গে যাবে, গিয়ে গুপ্তবিপ্লবী দলের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে তুলে 'দুর্গা' ব'লে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অবশ্য এ আদর্শটাই ওর সব চেয়ে ভালো লাগলো; কিন্তু···

অকস্মাৎ সব কিছুই যেন ওর কাছে অসার ও বিস্বাদ বলে মনে হলো। এতক্ষণ ধরে সে ইউরাই-এর পাশে এসে বসে আছে, ইউরাই কিন্তু একটা কথা বলেনি; এমন কি, প্রাথমিক ভদ্রতা-বিনিময় অবধি নয়। রং তুলে ফেলে এতক্ষণে সে নূতন রেখায় নূতন রঙের প্রলেপ দিচ্ছে। একবার তুলি ও প্যালেট হাতে নিয়ে ক্যানভাসটার থেকে দূরে সরে গিয়ে সে ঘাড় কাৎ করে নিজের স্বর্গ-সৃষ্টির দিকে তাকালো; বোধ হয় এবার ওর মনঃপূত হয়েছে ছবিটা। নাঃ, নিশ্চয়ই বেশ হয়ে উঠছে!

নোভিকভফ্-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কেমন লাগছে ?"

কিন্তু ও যদি ভালো না বলে, তা'হলে···ইউরাই প্রায় ম'রে যাচ্ছিল।

"বাঃ, ভা···রী সুন্দর হয়েছে!"—নোভিকফ্ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললো।

"তার পর,···খবর কি বলো।"

"আমি তোমার প্রবন্ধটি পড়েছি 'ক্রা' পত্রিকায়। খুব গরম লেখা হয়েছে।"—নোভিকফ্ বললো।

"গোল্লায় যাক্ ওটা ?" রেগে গিয়ে ইউরাই বললো। সেমেনফ্-এর কথা মনে পড়লো। "কী এমন কাজ হবে এতে ? ফাঁসি, ডাকাতি, খুন-জখম, কিছুই এতে বন্ধ হবে না। বড়ো জোর দু'-পাঁচটি আহাম্মক প্রবন্ধটা পড়বে! প্রবন্ধ লিখে দেশোদ্ধার হবে! মিছিমিছি দেয়ালে মাথা ঠুকে লাভ কি ?"

চোখের সামনে ওর ভেসে উঠল ওর বিপ্লবী জীবনের প্রথম দিককার ছবি। গোপন বৈঠক, প্রোপাগাণ্ডা, বিপদ, ব্যর্থতা, নিজের অপরিসীম কর্ম্মদ্যোতনা এবং জনসাধারণের কৈবল্য। পায়চারি সুরু করলো ইউরাই।

নোভিকফ্ বললো, "তাহলে কোনেই মানে হয় না কিছু করার ?"

"না!"—ইউরাই ... ওপর নিজের ব্যর্থতার জগদ্দল ভার অনুভব করলো। ...এর সত্যিকার প্রয়োজন যে কিসে,

তাই আমরা জানি না, অথচ নয়া রাষ্ট্রতন্ত্র, বিপ্লব,—এই নিয়ে হৈ-চৈ করছি। হয়তো যে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বাস্তবে সফল করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, তা' থেকেই আসতে পারে মানুষের ধ্বংসের সম্ভাবনা। আবার তখন সুরু করতে হবে গোড়া থেকে আমূল ক'রে গড়ে তোলার কাজ। আর যদি আমি আমার স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা না ঘামাই? তা' হলে? কি লাভ এই পরিশ্রম ক'রে? বড়ো জোর, চেষ্টা-চরিত্র করলে খানিকটা নাম-ডাক হবে আমার, চার পাশের স্তাবকমণ্ডলীর অভিনন্দনে নেশা হবে বেশ। তার পর? বেঁচে থাকা—যত দিন না কবরে যাচ্ছি। তার পর? আর যে যশের মুকুট মাথায় প'রে থাকবো—তা' ক্রমশঃ আমার মাথার খুলিকে চেপে ধরতে থাকবে—যতক্ষণ না তা' বিঁধিয়ে উঠছে।"

"নিজের কথাই বলে চলেছে।"—বিড়-বিড় ক'রে নোভিকফ্ উচ্চারণ করলো।

ইউরাই তা' শুনতে পায়নি। নিজের কথা নিজের বেশ লাগছিল ওর। যেন ইতিহাসের পাতা থেকে কোনো নামজাদা ব্যক্তি স্বগতোক্তি করছে! ও বলে চললো, "আমি যদি জানতে পারতাম যে আমার মৃত্যুতে পৃথিবী রক্ষা পাবে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত কষ্টকর ভাবেও মরতে রাজী হতাম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার চেষ্টায় ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হবে। সুতরাং, দিনের পর দিন ধ'রে আমাকে অবধারিত পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।"

ও বুঝতে পারছিল না যে, ওর বক্তৃতায় ক্রমশঃই ধারাবাহিকতার অভাব ঘটছিল। আবোল-তাবোল বুকনি সহ্য করতে না পেরে নোভিকফ্ ও ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আসল কথা কি—" ইউরাই ওর বক্তৃতা শেষ করলো,—"আমি অবধারিত পরিণতিকে ভয় করি। যদিও জানি মৃত্যু স্বাভাবিক, আমি কোনো রকমেই পারবো না তাকে এড়াতে, তবু মৃত্যুর চিন্তা মনে এলেই ভয়ানক বীভৎস লাগে!"

"মৃত্যু হচ্ছে শারীরবৃত্ত-সংক্রান্ত একটা প্রয়োজনীয় ঘটনা।"

"খোদা হাফিজ্! আমাদের মৃত্যুটা অন্য কারো প্রয়োজনে এলো কি না এলো, তাতে আমাদের কী?"

"কেন, এই যে বললে অপরের জন্য কষ্টকর মৃত্যুও বরণ করতে পারো!"

"আহা, সেটা অন্য কথা।"—অবশ্য ইউরাই-এর কথায় জোর ছিল না।

"নিজেই নিজের কথা ভাঙ্‌ছ-গড়্‌ছ।"—পিঠ চাপড়ানোর মতো ক'রে নোভিকফ্ বললো।

"না, আমি কখনোই নিজের কথা উল্‌টোই না। স্বেচ্ছায় যদি মৃত্যুবরণ করি—"

বাধা দিয়ে নোভিকফ্ বললো, "পুরোনো কাসুন্দি। তোমাদের প্রত্যেকেই চাও তুবড়ীর খেলা, হাততালি, বাহাদুরী। এ আর কিছুই নয়, শুধু স্বার্থপ্রাধান্যবোধ!"

"যদি তাই হয়, তাতেই বা কি?—"

দু'জনেই বুঝতে পারলো, এতক্ষণ ধরে ওরা যা' বলেছে, তার কোনো মাথা-মুণ্ড হয় না। এ তর্কের কোনো মানে নেই।

নয়

ইউরাইদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ইউরাই ও নোভিকফ্ গেল পার্কের রাস্তায়। সেখানে স্যানিন ওদের সঙ্গে জুটলো। স্যানিনের হাব-ভাব ইউরাই পছন্দ করে না, তাই ও চুপ ক'রে রইল। দু'পাশে, কাছে দূরে যেখানে সামান্য পরিচিতও কাউকে দেখা গেলো, স্যানিন তাদের দিকে তাকিয়ে হেসে আপ্যায়িত না করে ছাড়লো না।

খানিকটা পরে আইভানফ্‌কে দেখতে পেয়ে স্যানিন এদের ছেড়ে ওর সঙ্গে গিয়ে জুটল।

"কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"—নোভিকফ্ প্রশ্ন করলো।

পকেট থেকে ভডকার একটা বোতল বের করে আইভানফ্ বললো, "বন্ধুকে একটু আনন্দ দিতে।"

স্যানিন হেসে উঠল।

ইউরাই-এর নিকট এই ভডকা এবং হাসি অত্যন্ত কুৎসিত ও স্থূল ব্যাপার বলে মনে হোল। সে বিরক্তি ভরে অন্য দিকে তাকালো

"নোভিকফ্, তুমিও এসো না!"—আইভানফ্ ওকেও ডাকলো।

"একটি রোগী আছে, দেখতে যেতে হবে।"

"আহা, সে তোমার সাহায্য ব্যতিরেকেই মরতে পারবে।...নাই যদি আসো, কি করা যাবে! তোমার সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা ওটা পরিষ্কার খালাস করতে পারবো।"—স্যানিনের চোখে দুষ্ট হাসি।

"অল রাইট্! চলো আমিও আস্‌ছি।"—নোভিকফ্ ওদের সঙ্গেই চললো।

কিছুটা পথ যাবার পর ইউরাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল সীনা কার্সাভিনা এবং ইস্কুল-মাষ্টারণী ডুবোভার সঙ্গে; ওরা একটা বেঞ্চিতে বসেছিল।

ওদের দেখতে পেয়ে ইউরাই জিজ্ঞাসা করলো, "...কোথায় ছিলেন?"

"লাইব্রেরীতে।"

ইউরাই সীনার পাশেই বস্‌তে চাইছিল, কিন্তু লজ্জায় পারলো না, ও গিয়ে ডুবোভার ও-পাশেই বসলো।

"এ রকম মনমরা দেখাচ্ছে কেন আপনাকে? কিছুই করবার নেই বোধ হয় আপনার?"—ডুবোভার প্রশ্ন।

"আপনার কি অনেক কাজ?"

"যাই হোক্, মুখ বেজার ক'রে থাকবার মতো সময় আর নেই।"

ইউরাই উত্তরে বললো, "জীবনে হাসি কাকে বলে ভুলে গিয়েছি।"

এমন একটা তীব্রতা কথা কয়টিতে প্রকাশ পেলো যে ওরা আর কোনো কথাই বলতে পারলো না।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ইউরাই নিজেই বললো, "একটি বন্ধু ... যে, আমার জীবন থেকে না কি অনেক তথ্য ও আদর্শ পাওয়া ...।"—যদিও কেউ তা বলেনি।

সতর্ক ভাবে সীনা প্রশ্ন করলো, "কি রকম?"

"এই যেমন, কি ক'রে বেঁচে না থাকা যায়।"

...আ:, বলুন না আমাদের। হয়তো আদর্শের খানিকটা আমাদের ...বে লাগতে পারে।—ডুবোভা বললো।

...উরাই তখন সুরু করলো নিজের জীবনের কথা বলতে। ... ভাবে বলে চল্‌লো, শুনলে মনে হোতে পারত যে, ও যেন এক ...ধ গুণসমন্বিত মহা শক্তিবান পুরুষ, যে নারী ওকে দেখেছে— ...দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ওকে চিন্‌ল না ওর বিপ্লবী দলের সভ্যরা, ...ল পরিবেশ ওকে আষ্টে-পৃষ্টে বাধা দিচ্ছে নিজেকে প্রকট করতে। ...দ ইত্যাদি—

...র বল্‌বার ভঙ্গি, গলার স্বর, মেয়ে দু'টিকে অভিভূত করে ... ওরা ওর কথা সম্পূর্ণই বিশ্বাস করলো।

'আচ্ছা, আপনার মনে কি কখনো আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা ...নি ?"

...কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন ?"

"না, এই এমনি···"

...নিয়ে ওরা আর কোনো কথা তুলল না।

সীনা সাগ্রহে প্রশ্ন করলো, "আপনি তো পার্টির কর্মি... আছেন, তাই না ?"

যেন স্বীকার করতে বিশেষ ইচ্ছা নেই, এমনি ভাবে ইউরা... বল্‌ল, "হ্যাঁ।"

ওরা যখন বাড়ী ফিরবার পথে পা বাড়ালো, ইউরাই ও... পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো। ওর মনের অন্ধকার তত... কেটে গিয়েছে।

ইউরাই বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর, সীনা বললো, "কী মি... আর ভালো মানুষ ও !"

ধমকে বললো ডুবোভা, "দেখিস যেন প্রেমে পড়িস্ না শেষটায়।"

"কী যে বলছিস্ !—সীনা হেসে উঠল। কিন্তু মনের পর... কি তার পড়লো না একটা অজানা আতঙ্কের ছায়া ?

সেই রাতে ইউরাই স্বপ্ন দেখল, অনেক নরম স্বপ্ন। হাল্কা, রেশমের মতো নরম আর হাল্কা, উচ্ছ্রিত-যৌবনা অনেক সুন্দরী মেয়ের স্বপ্ন। [ক্রমশঃ

অনুবাদক—নির্ম্মলকুমার ঘোষ।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

[আমাদের এই সংখ্যায় আমরা ...: কালিদাস নাগ লিখিত ...' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। রবীন্দ্রনাথের ...সঙ্কলিতা "রবিচ্ছায়া"র প্রকাশক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ ... জীবনী সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাহা সংক্ষেপে ... পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে প্রকাশ করলাম।]

...নারায়ণ মিত্র নদীয়া জেলার চাকদহে জয়কৃষ্ণপুর (অধুনা ... নামে পরিচিত) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারই ...বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্রের নামেই গ্রামখানির নাম হয় ...। যোগেন্দ্রনারায়ণের পিতা স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন মিত্র খুব ... থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার নীলকুঠীর দেওয়ান হয়ে প্রচুর ... করেন। পিতার কর্মস্থল আখ্‌রিগঞ্জে ১৮৭১ ... এপ্রিল সোমবার যোগেন্দ্রনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪ ... বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রেন্স পরীক্ষায় ... পর যোগেন্দ্রনারায়ণ হুগলী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে ...রেন। ১৮৯১ সালে সরকারী চাকুরীতে যোগদান ... তিনি কিছু দিন সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সিটি ... দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ...ঙ্গে তাঁহার আন্তরিক সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। এই ...সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন ...সমাজের সংস্পর্শে এসে যুবক যোগেন্দ্রনারায়ণ তদানীন্তন ... কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিদ্বয় বোম্বাইয়ের এন, জি, ... আনন্দমোহন বসু এবং ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ...তাহার সংস্কৃতিসম্পন্ন ও অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট করেন এবং তাঁহাদের স্নেহলাভে ধন্য হন। সরকারী চাকুরীতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং সামান্য চাকুরী থেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদ লাভ করেন। পরে বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা, স্বাধীনচেতা ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। মধুর ও উদার স্বভাবের জন্য তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। প্রকৃত সাহিত্য-রসিক যোগেন্দ্রনারায়ণ দ্বিজেন্দ্রলালের "ইভ্‌নিং ক্লাবের" এক জন বিশিষ্ট ও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে (কংগ্রেসেরও জন্মের পূর্ব্বে) স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় যোগেন্দ্রনারায়ণ "আমরা কেন অস্ত্র পাইব না ?" নামক প্রবন্ধে ভারতবাসীর অস্ত্রশিক্ষার দাবী করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা আমাদের দৈনিক পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করেছি। ঐ সময়েই তিনি "রবিচ্ছায়া" প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ওটেন ঘটনার পর সরকার যুবক সুভাষচন্দ্রের বিলাত যাবার ছাড়পত্র দিতে আপত্তি করেন, তখন যোগেন্দ্রনারায়ণের নির্ভীক এবং আপ্রাণ চেষ্টার ফলে সুভাষচন্দ্র ছাড়পত্র পেতে সক্ষম হন। ১৮৮৯ সালে তিনি চন্দননগরের বিখ্যাত পালিত-পরিবারের সায়দাবিহ্বর পালিতের কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজিনীকে বিবাহ করেন। ১৯১৭ সালে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৯৩২ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করেন।

মদ খাওয়া বড় দায়

জাত থাকার কি উপায়

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

জাতি মারিবার মন্ত্রণা

কলিকাতায় শনিবারকে কোন কোন বাবু মধুর শনিবার ও কোন কোন বাবু সোণার শনিবার বলিয়া থাকেন, কারণ শনিবার রাত্রে নানাপ্রকার আয়েস মজা ও চোহেল হয়। গত শনিবারে ভবশঙ্কর বাবু কুঠির কর্ম্ম আস্তে ব্যস্তে শেষ করিয়া নিজ বাটীর বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাবুর পারিষদগণ প্রেমচাঁদ দত্ত, দিগাম্বর বাচস্পতি ও হলধর গোস্বামী উপস্থিত হইলেন।

ভবশঙ্কর। (তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবোলার নল ভড়র ভড়র টানিতেছিলেন, পারিষদদিগকে দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন)—এত বিলম্ব কেন? অদ্য শনিবার—তোমরা কি ঘুমিয়াছিলে?—অবে বলা—বলা—বলা—!

বলরাম চাকর। এজ্ঞে—এজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। আরে বেটা—। পাঁচ ডাকের পর আজ্ঞে—নীচে গিয়া দেখ দেখি হানপে আসিয়াছে কি না? আর চার পাঁচ বোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শীঘ্র আন।

বলরাম। হানিপ ঝুড়ি ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মোশাই কাল বলেছিলি যে হানিপ দাড়ি কামায়ে মালা পরে এসবে—সে সব করেছে—এজ তাকে গোঁসাই গোবিন্দের মত দেখাচ্চে।

ভবশঙ্কর। তবে তাকে আস্তে আস্তে আসিতে বল, আর তুই বোতল টোতলগুলা এনে দিয়া দোয়ার ভেজাইয়া দাঁড়া। যে আসিবে তাকে বল্‌বি আমার বড় মাথা ধরেছে—বুঝলি?

বলরাম। এজ্ঞে।

হানিপ টিপি টিপি বৈঠকখানার ভিতর যাইয়া নানাবিধ মাংসের কাবাব ব্যঞ্জন ও পোলাও ও রুটি উপস্থিত করিয়া দিল, এবং চতুর্দ্দিকে ছুরি কাঁটা ও কাঁচের বাসন ও গ্লাস সাজান হইল।

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! আসুন, ঠাকুরদিগের ভোগ দেওয়া যাউক।

বাচস্পতি। ওহে ভাই! একবার কোশা কুশীটা নেড়ে এলে ভাল হয় না? আমি এ সকল কিছুই মানি না, কিন্তু কি করি—যেখানে যেমন—সেখানে তেমন।

গোস্বামী। আমিও কোশা কুশী গঙ্গায় টেনে ফেলেছি, কিন্তু স্থান বিশেষে বুঝে চলি। খড়দহ প্রভৃতি স্থানে গেলে তিলক করি ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আবার তেমন তেমন জায়গায় গিয়া রক্তচন্দনের কোঁটা করি ও দুর্গা দুর্গা জপি, কোন কোন স্থানে নাস্তিকতা প্রকাশ করি। আমি সকলকে তুষ্ট রাখি—আমার কুহক কেহই বুঝিতে পারে না।

প্রেমচাঁদ। এই তো বটে—বুদ্ধিমান পুরুষ আর কাহাকে বলে? কিন্তু এক্ষণে তো কেহ নাই, তবে সাঙ্গ সন্ধ্যা করিবার আবশ্যক কি?

ভবশঙ্কর। প্রথমে বরফ দিয়া কিছু কিছু পাকা মাল খাও।

পরে প্রত্যেকে তিন চারি গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি। ওহে ভাই সকল—যে শীতল দ্রব্য পান করিলাম ইহা ভুলিবার নয়। চিনির পানা মিছরির পানার মুখে [illegible]টা মারি। এ সামিগ্রী পেটে গেলে পুত্রশোক নিবারণ হয়।

বলরাম। মোশাই পূজরি বামুন এসেনি—মা ঠাকরুণ [illegible] সে বাচ্‌স্পতি গিয়া ঠাকুরের আরুতি করুক।

বাচস্পতি। সর্ব্বনাশ! ব্রাণ্ডি আমার মাথায় উঠিয়া[illegible]—আমি দাঁড়াইতে পারি না। তুই বল্‌গে যা—আমি সা[illegible] সন্ধ্যা করিতেছি, সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, মিঠাই ওয়ালার দোকানে এক জন ব্রাহ্মণ আছে, তাকে লয়ে কর্ম্ম শেষ করিয়া দি[illegible]।

ভবশঙ্কর। রাম—বাঁচলুম! কৌশলে বাচস্পতি [illegible] বৃহস্পতি!

বাচস্পতি। এক্ষণে সকলে মন দিয়া আমার একটা কথা শুন, হরিনাথ দত্ত ইংরাজদিগের সহিত প্রকাশ্যরূপে খানা খান, বাইবেল পড়েন, ক্রিশ্চিয়েন কি না তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু আচার ব্যবহার সাহেবদিগের ন্যায়। তাঁহার ভগিনীর বিবাহে যে যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাবুর দলে রাখা উচিত হয় না।

অন্য দুই জন পারিষদ। তার সন্দেহ কি? হরিনাথ দত্ত বেটা কি হিন্দু? আরে বেটা অখাদ্য খাবি ঘরে বসে খা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার কর—ইংরাজদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যরূপে আহার করিয়া জাতি মজাইবার কি আবশ্যক? সে [illegible] যেমন ধাষ্টেমো করে তেমনি তাহার সমুচিত দণ্ড করা কর্ত্তব্য, [illegible] নিমন্ত্রণে যে যে ব্যক্তি গিয়াছিল তাহাদিগকে দল হইতে দূর করা উচিত।

ভবশঙ্কর। কিন্তু হরিনাথ দত্ত দেনা পাওনায় ও [illegible] ব্যবহারে অতি ভদ্র।

বাচস্পতি। আরে সে বেটার আদৌ হিন্দুয়ানিই নাই, ভদ্রতা কি প্রকারে হইবে?

ভবশঙ্কর। তবে আমি কালই দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ত্বরায় বৈঠক করিব।

বাচস্পতি। অবশ্য—অবশ্য, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্ব্বদাই করিতে হইবেক। আপনকার পিতৃ পিতামহ [illegible] ছিলেন। তাঁহাদিগের দেবালয় দ্বাদশ মন্দির অতিথিশালা ঘাট ও অন্যান্য সৎ কর্ম্মদ্বারা আপনার বংশ ধন্য হইয়াছে। [illegible] যাহাতে ভ্রষ্ট হয় এ মত করিবেন না। উদ্‌যোগী হউন [illegible] পাপের দণ্ড করুন।

ভবশঙ্কর। আমি অবশ্য যত্নবান হইব—এক্ষণে [illegible] একটু একটু কুক্কুটের মাংস আহার কর—তোমাদের যে কিছু খা[illegible] হইল না?

বাচস্পতি। কুক্কুটের মাংস অতি উপাদেয়, মনু বি[illegible] বলে বনকুক্কুট আমাদিগের খাদ্য। পূর্ব্বে ঋষিরা গোমেধ [illegible] তন—বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইত। যদ্যপি [illegible] কালে চতুষ্পদ পশু আমাদিগের উদরস্থ হইত, তবেব দ্বিপদ [illegible] এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে?

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! একটু পায়ের ধুলা [illegible]—তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি।

…স্বামী। আমি আর একটু মদ পান করিব ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং …ন করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছে …শানুপে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। সে দিবস …নের হোটেলে যে মাংস খাইয়াছিলাম, সে বড় উপাদেয়।

প্রেমচাঁদ। তবে তুমিও প্রকাশ্যরূপে আহার কর না কি ?

গোস্বামী। হাঁ বাবা, আমি কি কাঁচা ছেলে। মুখে চক্ষে … মুড়ি দিয়া এমন এমন কম্ম শেষ করিয়া আসিয়াছি যে কাক … টের পায় নাই।

প্রেমচাঁদ। তবে ভাল—দেখ যেন ধরা পড়ে মজো না— …র বাবু বৈঠক করিলে হরিনাথ দত্ত বেটাকে মনের … জব্দ করিব। আমি স্বয়ং গিয়া বক্তৃতা করিয়া ঐ …বে বাটীতে যে যে গিয়াছিল তাহাদিগের সকলের জাতি …িবব। আমার গলাটা শুকিয়ে উঠিতেছে আর একটু মদ …, খাই। আজ রাত্রে আমার বাটী যাওয়া হইবেক না। … কাপড় মুড়িয়া গলির ভিতর দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছি …ই জানি। এখানে মুড়ি শুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া …িকব—তাহার পর দেখিব হিন্দুয়ানি থাকে কি না—বাচস্পতি … কালেতে সব ধর্ম্ম নষ্ট হইল। হায়, হায়, হায়!— …শাং রাখিবার স্থান নাই!

বাচস্পতি। কেন হে বাপু ব্যাপারটা কি ? বাটী যাইবে … কেন ? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে না কি ?

প্রেমচাঁদ। না মহাশয়—বাজারের মহাজনের নিকট হইতে … লইয়া ব্যবসা করিয়াছিলাম, টাকা হাতে আছে কিন্তু … না। বিষয় আশয় যাহা করিয়াছি তাহাতে পুরুষানুক্রমে …য়ের উপর পা দিয়া দোল দুর্গোৎসব করিয়া সুখে কাল কাটাইব। … বিষয় বিনামি করিয়াছি কাহাকেও এক পয়সা দিব না, … আমার নামে গেরেপ্তারি হইয়াছে, কি জানি ধরা পড়িলে … হইবে।

…স্পতি। তা বটে তো—এ বাটী সে বাটী এক—স্বচ্ছন্দে …নি কি ? আর কিছু কাল লুকিয়া থাকিলে গেরেপ্তারি … যাবে। তার পর খুব বড়মানুষি করিয়া সব বেটাকে … বলা দেও। হাতে টাকা থাকিলে সকলকে পাবে।— …পুরুষো দাসঃ"—পুরুষ অর্থের দাস!

…স্বামী! ওরে বলা! আর একটা বোতল খোল—আমার … শুকিয়ে উঠিতেছে।

…বার্ত্তা কহিতে কহিতে চারি জনায় ক্রমে ক্রমে এত মত্ত …িলেন যে সকলেই বেহুঁস ও ভোঁ হইলেন। বাচস্পতি …হইতে দুই তিনখানা টাকা লইয়া বাতাসা বোধে কচ্‌মচ্‌ …খাইতে খাইতে বলিলেন, হায়! কলিতে হিন্দুয়ানির সঙ্গে … নিষ্ঠাও গেল।

…দ। দেখো, বৈঠকটা যেন রবিবারে হয়, তা না হইলে …া ভার।

…পতি। তুমি না থাকিলে বক্তৃতা কে করে? তোমার …শল বক্তা কে আছে? বাবা হিন্দুয়ানি যেন যায় না— …াস ত্যাগানন্তর) "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানি"—

…দ। মহাশয়, উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমার প্রাণ দিয়া হিন্দুয়ানিকে বজায় করিব, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে হরিনাথ দত্তের মাথাটা কেটে আনি।

ভবশঙ্কর। গোঁসাই মামা—ভাই একটা যাত্রার গান গাও না। এই বলিয়া প্রেমচাঁদের পিট ঢিপঢিপ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন।

বাচস্পতি। শাস্ত্রব্যবসায়ী হওয়া বড় দায়—অশুদ্ধ শুনিলেই শুদ্ধ করিতে হয়। গোঁসাই মামা বলিয়া কি ভাই বলে? বলিতে হয়—গোঁসাই বাবা ভাই একটা গান গাও না।

গোস্বামী। আমাকে মামাই বল—বাবাই বল—দাদাই বল, আর কোন মিষ্ট কুটম্বিতার কথা বলিয়া সম্বোধন কর, আমি সেই গোঁসাই। আমার জ্ঞান টনটনে—আমি গাই—শুন। এই বলিয়া বাগীশ্বরী রাগিণীতে গম্ভীর স্বরে এক খেয়াল ধরিলেন—মেঁ—য়ে—য়ে—য়ে—য়ে—লা—লা—লা—লা—গি—গি —গি—গি—

বাচস্পতি। আরে বাবু, এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফার্শি পড়িতে হয়। সাদা সিদে রকম মজাদারি একটা আড়খেমটা যাত্রার গান গাও।

গোস্বামী। যাত্রার গান আরম্ভ করিবা মাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া ধিং ধিং করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু নেসার জোরে পা নেটিয়া পড়িল, এজন্য টুপভুজঙ্গ হইয়া পরস্পরের ঘাড়ের উপর পা, পায়ের উপর ঘাড় দিয়া চালচিত্রের পুত্তলিকার ন্যায় ধড়াস ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেলেন ও শিয়াল ডাক কুকুর ডাক বিড়াল ডাক ডাকিতে লাগিলেন। বলরাম এ সকল দেখিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করণানন্তর দোয়ারে চাবি দিয়া ভোজন করিতে গেল। বাটীর দরওয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, ভাই পেটের জ্বালায় চাকরি করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু এ ভণ্ড ব্যাল্লিক বেটার হাত হইতে কবে মুক্ত হইব!

জাতিরক্ষার্থ সভা

গত রবিবার ভবশঙ্কর বাবুর ভবনে জাতিরক্ষার্থ এক মহা সভা হয়। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। যে ঘরে বৈঠক হয়, সে ইংরাজী রকম সাজান অর্থাৎ তথায় মেজ, চৌকি, কৌচ ইত্যাদি সকল ছিল।

রামভট্ট দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—আহা কি অপূর্ব্ব সভা হইয়াছে। এ সভা রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার ন্যায়—কলিকাতার পুলস্ত অঙ্গিরা গৌতম ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্য ও ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলেরই সমাগম হইয়াছে, আর ভবশঙ্কর বাবুর ভবন কৈলাসধাম তুল্য দৃষ্ট হইতেছে।

ভবশঙ্কর। রাজীব—রাজীব—রাজীব!

সভার দশ পোনের জন। অহে রাজীবকে ডাক—রাজীবকে ডাক—কর্ত্তা ডাকিতেছেন।

রাজীব। আজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। সভার জন্য সকল চিঠি বাঁটা হইয়াছে ?

রাজীব। আজ্ঞে হাঁ—বাঁটা হইয়াছে।

ভবশঙ্কর। কেমন উমাশঙ্কর বাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার একটা দেওয়ানি মোকদ্দমা পড়িয়াছে। তিনি দিন রাত সাক্ষিদিগকে তালিম দিতেছেন—তাঁহার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই।

ভবশঙ্কর। কালীশঙ্কর বাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। তিনি দেনা উড়াইবার জন্য চন্দননগরে পটাকশন লইয়া ইনসালবেন্টের কাগজ তৈয়ার করিতেছেন, আর অদ্য তাঁহার বাটীতে একটা মোয়াফেল হইবে তাহাতেই ব্যস্ত আছেন।

ভবশঙ্কর। তারিণীশঙ্কর বাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। আজ্ঞে, তাহার বাগানে অদ্য রাত্রে খ্যামটার নাচ হইবে এজন্য ছেলে-পুলে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাগানে গিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। রামশঙ্কর বাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। তিনি মদনমোহন সিংহের কিছু জমি কাড়িয়া লইয়াছেন এজন্য চারেক্টের মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন—অদ্য প্রাতে দারোগার নিকট তদ্বির করিতে গেলেন।

ভবশঙ্কর। হরিশঙ্কর বাবু কি বলিলেন ?

রাজীব। (কাণে কাণে) তাঁহার বাটীতে সাহেব সুভোদিগের একটা খানা আছে, আর তিনি নেসা করিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। শিবশঙ্কর বাবুর সহিত কি দেখা হইয়াছিল ?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার মত উল্‌টা—তিনি বলেন আজকের কালে কে না কি করিতেছে ? ঠক বাছতে গাঁ ওজড় হইবে, বরং শাক দিয়া মাছ ঢাকা ভাল—অধিক খোঁচাখুঁচি করিতে গেলে পাছে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বেরোয়।

বাচস্পতি। প্রাচীন হইলেই প্রায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়—হাঁ! তবে তাঁহার মতে নাস্তিকতার দমন করা কর্ত্তব্য নয় ? মরি, কি সার বুঝেছেন! সে যাহা হউক, এক্ষণে সভার কার্য্য আরম্ভ করুন।

ভবশঙ্কর সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি আপনাদিগের দলপতি, এজন্য দলসংক্রান্ত ভাল মন্দ কথা সকলই আমাকে বলিতে হয়। বাচস্পতি দাদার মত যে, আমাদিগের দল হইতে হরিনাথ দত্তকে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যে যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ঠেলা উচিত। হরিনাথ দত্ত সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম লোক—শিষ্ট শান্ত নম্র সরল সত্যবাদী মিষ্টভাষী সৎ এবং পরোপকারী বটে—কিন্তু "গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়" হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া প্রকাশ্যরূপে ইংরাজদিগের সহিত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ নিবারণ করিলে বলেন, আমি হিন্দু ধর্ম্ম কিছু মানি না—আমি কোন দলের তোয়াক্কা রাখি না—আমি কোন বড়মানুষের খাতির করি না, কেবল সৎ মানুষকেই সম্মান করি—আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে তাহা অবশ্যই করিব! এ সব কথা তো ভাল নয়—এক্ষণে আপনাদিগের মত কি ?

বাচস্পতি। কর্ত্তা বাবু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে বিন্দুবিসর্গ ভুল নাই। ভগবান ভবিষ্যৎ পুরাণে বলিয়াছেন—কলিতে অনেক অত্যাচার ও কুরীতি ঘটিবে, কিন্তু আপদ পড়িলে চেষ্টা ব্যতিরেকে কে উদ্ধার হইতে পারে ? অগ্নি গৃহে লাগিলে বিনা জলে কি নির্ব্বাণ হয় ? রোগী পীড়াতে শয্যাগত হইলে বিনা ঔষধে কি আরোগ্য হয় ? তেমনি বিনা উদ্যোগে—বিনা পরিশ্রমে—বিনা যত্নে—বিনা উদ্যমে—বিনা প্রবল শাসনে কি হিন্দুয়ানি রক্ষা করা যাইতে পারে ? দুষ্ট লোককে শীঘ্রই [illegible] করা কর্ত্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

"দুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন
যুগে যুগে জন্ম লই কুন্তির নন্দন।"

আর আর সকলকে পার আছে, ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম অ[illegible] ভয়ানক। শাস্ত্রে বলে, যদ্যপি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানজ্ঞ [illegible] যোগবলে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন তথাপি লৌকি[illegible] বিরুদ্ধ কর্ম্ম কখন মনেতেও আনিবেন না।

গোস্বামী। (সমস্ত শরীরে হরিনামের ছাপ—মস্তকে নাম[illegible] বান্ধা—গলায় তুলসীমালার গোচ্ছা ও হস্তে একটা প্র[illegible] কুঁড়াজালি—হাই তুলিতে তুলিতে বলিতেছিলেন, "কৃষ্ণ হে [illegible] ইচ্ছা") আহা! বাচস্পতি মহাশয়ের কথাগুলিন বেদবৎ প্রমাণ। কাহার বাপের সাধ্য তাহার তুবচ কাটে। প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেও হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা হইল না, কিন্তু [illegible] বা কি ? যদুপতির সে অযোধ্যা পুরীই বা কোথায় ও [illegible] সে উত্তর কোশলাই বা কোথায় ? সূর্য্যের গমনাগমনে প্র[illegible] আমাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে।

প্রেমচাঁদ। গোসাই মামার শ্মশান বৈরাগ্য দেখে যে আর [illegible] না। উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ দেও—এখন উদ্যমের সময়—আপনার কথাবার্ত্তা শুনিলে উদ্যম ছুটে পালায়। হরিনাথ দত্ত ও তাঁহার বাটীতে যে যে গিয়াছিল, সে সব বেটাকে একঘ[illegible] যাউক।

গোস্বামী। ভবশঙ্কর বাবুর সহিত আমার কেবল পাক [illegible] ভেদ—আমাদিগের একই মন—একই প্রাণ—তিনি যে পথে [illegible] —আমিও সেই পথে যাইব—তিনি যা করিবেন—তাহাতেই [illegible] সম্পূর্ণ মত।

বাচস্পতি। এই তো বটে, না হবে কেন—যেমন [illegible] জন্ম সেই মত কথাবার্ত্তা—ওহে বলরাম, নস্যদানিটা [illegible] ফেলিলাম ? গলাটা শুষ্ক হইতেছে এক ছিলিম তামাক পা[illegible] হইত।

বলরাম। (বাচস্পতির বড় অনুগত, কারণ তি[illegible] ডান হাত) মোশায়ের গলা শুয়েচে এজন্য আমি [illegible] এনেছি।

বাচস্পতি রূপার গ্লাসের ঢাকুনি খুলিয়া দেখেন তাহা[illegible] বরফ ও ব্রাণ্ডি। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলরামকে ইসা[illegible] লইয়া যাইতে বলিলেন।

হেমচন্দ্র দে বাচস্পতির নিকটে বসিয়াছিলেন, [illegible] অতিশয় স্পষ্টবক্তা—গ্লাসের ভিতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা ক[illegible] কি ও ?

বাচস্পতি। আমার পৃষ্ঠে একটা বেদনা হইয়াছে এজন্য [illegible] এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ আনিয়াছিল।

হেমচন্দ্র। ভাল—ভাল—এ যে নূতন রকম এরণ্ড [illegible] ও সৈন্ধব দেখিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে আ[illegible] বুঝি ?

। মহাশয়! হরেকৃষ্ণ বাবু ও রামকৃষ্ণ বাবু টুপভুজঙ্গ দশায় উপস্থিত হইয়াছেন।

চন্দ্র। টুপভুজঙ্গ কি?

স্পতি। "ভুজঙ্গঃ পবনাশনঃ" ইত্যমরঃ। টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পের ন্যায় সতর্ক।

জীব। (সাদাসিদে লোক—কোর কাপ বুঝে না) আজ্ঞে— টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ ভুজঙ্গ ভুজকুড়ি অর্থাৎ মদ্যপানের পর গতিশক্তিহীন অবস্থাপন্ন, ঐ অবস্থায় শরীর জড়সড় থাকে, ঘাড় নেটিয়ে পড়ে ও ছুটি চোখ ঝিময় ও মিট মিট ইচ্ছা হয় যে পক্ষী হইয়া ছাতের উপর হইতে উড়ি। টুপভুজঙ্গ এরা মামাতো পিসতুতো ভাই।

বাচস্পতি। (রাগান্বিত হইয়া) তুমি আপনার কর্ম্মে যাও— অর্থ করা আমার কর্ম্ম, তুমি বাটীর দেওয়ান, তোমার অর্থের শব্দ করা। বড় মানুষের বাটীতে থাকিলে সব দিক চলিতে হয়। পুরুষ সাকুব না হইলে তাহার নানা পড়ে।

হরেকৃষ্ণ। (শরীর টলমল রামকৃষ্ণ বাবুর কাঁধে হাত) ভবশঙ্কর আমি তোমার প্রস্তাবে পোষকতা করিব।

রামকৃষ্ণ। (গোলাবি নেশায় খিলখিল করিয়া হাসিতেছেন) দাদা কিছু বেহিসিবি রকম গিয়াছেন—পূর্ণমাত্রা রাত্রেতেই —আমার একটা গান শুন দেখি—"না দেখে বঁধুকে প্রাণ " —

রামকৃষ্ণ যেমন তেড়ে গান ধরিয়াছেন, হরেকৃষ্ণ অমনি পড়িয়া গেল।

প্রেমচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সম্মানপূর্ব্বক হস্ত ধরিয়া লইয়া দুই জনকে শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিলেন।

হেমচন্দ্র। হরেকৃষ্ণ বাবু পড়লেন কেন?

বাচস্পতি। তাঁহার মৃগীরোগ আছে।

হেমচন্দ্র। তবে তাঁহাকে স্থানান্তর করা ভাল হইয়াছে, তিনি সকলে পোষকতা না করিয়া অগ্রে আপনাকে পোষকতা

প্রেমচাঁদ। এক্ষণে স্থির হইল, হরিনাথ দত্ত প্রভৃতিকে ঠেলা

বাচস্পতি। মহাশয়! আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি নাই।

। কেন তুমি তো নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলে?

। আজ্ঞা আমি সভা দেখিতে গিয়াছিলাম।

। একাদিক্রমে পোনেরো দিবস সেখানে অবস্থিতি

। আজ্ঞা ঐটি আমার ভুল—আমাকে ক্ষমা করুন।

। আচ্ছা বিষ্ণুস্মরণ করিয়া লিখে দেও। আর আর ঠেলা রহিল—বেটাদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

। আমার ইচ্ছা ছিল না যে সভায় কিছু বলি, কিন্তু না করিতে পারি না। আমি কলিকাতায় অনেক দিন আছি—অনেক লোককে জানি, কিন্তু জাতি কি প্রকারে থাকে ও কি প্রকারে যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতার বাটীতে বাটীতে অন্বেষণ করিলে—খানার ও মদের বিল ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইবে, তবে হরিনাথ দত্তের অপরাধ কি?

বাচস্পতি। তোমার মত জন কয়েক লোক হইলেই হিন্দুয়ানি ত্বরায় অন্তর্দ্ধান করিবে। বড় মানুষে গোপনে কে কি করে তাহার নিকাশ লইবার আবশ্যক কি? হরিনাথ দত্তের ন্যায় প্রকাশ্যরূপে হিন্দুয়ানি ঘাতক কর্ম্ম কে করে? অন্যান্য কর্ম্মে পার আছে, কিন্তু এ কর্ম্মে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

হেমচন্দ্র। তা বটে—এক্ষণে হিন্দুয়ানির মাহাত্ম্য বুঝিলাম। লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই—প্রকাশ্যরূপে খাইলেই পাপ। কপটতা পূজ্য—সরলতা নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফেরি জুলম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রী হরণ এ সকল কুকর্ম্ম বলিয়া ধর্ত্তব্য নয়—এ সব কর্ম্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না চমৎকার বিধি! চমৎকার শাসন! ভদ্রলোকে অভদ্র কর্ম্ম করিলে ভদ্র সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। তোমরা যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করিবে—দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীয় আহার ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম্ম নাই, কিন্তু অন্য কেহ দ্বার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিতরূপে করিলে জাতিচ্যুত হইবে—এ রোগের ঔষধ কি?

প্রেমচাঁদ। (কোপিত হইয়া) তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা? মুখ সামলিয়া কথা কহ—ভদ্রলোকের গ্লানি করিস্? শীতল সিংহ!

হেমচন্দ্র। বিচার কর তো বিচার করি—তোমার গুণাগুণ তো সব জানা আছে—আর ঘাঁটাও কেন? শীতল সিংহকে ডাকিলে আমি গরম সিংহ হইব।

প্রেমচাঁদ। দন্ত কড়মড় পূর্ব্বক মেজে আঘাত করিয়া মার মার বলিয়া হেমচন্দ্রের উপর পড়িল। হেমচন্দ্র বলবান, প্রেমচাঁদকে দুই তিনটা পদাঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। বাচস্পতি বিপদ দেখিয়া মনে করিলেন, পাছে ফৌজদারি ঘটে এজন্য কর্ত্তা বাবুকে ইসারা করিয়া আপনি বাটীর বাহিরে শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোশাকুশি লইয়া বম বম বম বম শব্দ করিতে লাগিলেন—অন্য দিকে দেখেও দেখেন না। ভবশঙ্কর অন্তঃপুরে গিয়া পত্নীর অঞ্চল ধরিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গবাক্ষ হইতে দেখিতে লাগিলেন। প্রেমচাঁদ ভাবিলেন অদ্য রাত্রে বেলি গারদে থাকিলে কল্য দেওয়ানী মোকদ্দমার গেরেপ্তারিতে জেলে যাইতে হইবে, এ কারণ গায়ের ধুলি ঝাড়িয়া অধোমুখে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন। গোস্বামী "কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা" বলিতে বলিতে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। সভার অন্যান্য লোক সকল মারামারি দেখিয়া ভয়ে ছুটে পলাইয়া গেল। হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে সভা শূন্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে বলিতে চলিলেন—বাবুদের যেমন হিন্দুয়ানি—যেমন ধর্ম্মের মতি—যেমন বিবেচনা—যেমন মন্ত্রণা—তেমন দৃঢ়তা—তেমন একাগ্রতা—তেমন বল—তেমনি সাহস!

[ক্রমশঃ।

হট্টরত্ন যমকিংকর

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

শ্রীহট্টের পাড়াগাঁয়ে থাকতেন রামকিংকর তর্করত্ন। তাঁর যখন পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে তখন এক দিনের একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে তিনি পরিচিত হলেন 'হট্টরত্ন যমকিংকর' বলে। গল্পের মত সে কাহিনী, কিন্তু গল্প মোটেই নয়, তাই তোমাদের শোনাচ্ছি।

তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ। কালীপূজা, দুর্গাপূজা, আরও এটা-ওটা যাজনিক বৃত্তি ছিল তাঁর। বাড়িতে নিজে টোল খুলেছিলেন। ছাত্রেরা খেতে-পরতে পেত আর তাঁর কাছে থেকে বিদ্যা অর্জন করত। উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন রামকিংকর। তাঁর ছাত্রেরাও কেউ কেউ কৃতী হয়েছেন।

বেশি দিনের কথা নয়। একশ' বছরও হয়নি। আমি ত তাঁকে দেখিনি। আমার বাবার মুখ থেকে তাঁর যে ছবি আমি পেয়েছি তা এঁকে দেখাই :

পুরো পাঁচ হাত লম্বা। কালো কুচকুচে রং। কোঁকড়ানো চুল ছোট করে ছাঁটা, মাথায় গেরো-বাঁধা টিকিতে একটি জবা ফুল, ধবধবে শাদা পৈতে ঝুলছে বাঁ-কাঁধ থেকে ডান দিকে কোমরের নিচ পর্যন্ত বুকের উপর দিয়ে। একেবারেই ভুঁড়ি নেই। হাত-পাগুলো থলথলে নয়, ইস্পাতের মতো সটান সক্ষম। আঙুলগুলো যেন বাঘের থাবার মতো শক্তি রাখে। পায়ে খড়ম, খট্-খট্ করে বেরলেন তিনি গোয়াল-ঘর থেকে তাঁর আদরের গাভীটিকে নিয়ে। গাভীটির নাম সুরভী।

তাঁর পৈতের রঙে আর সুরভীর রঙে এক রঙ। সুরভীকে তিনি মায়ের মতো ভক্তি করেন, ভালোবাসেন, সেবা করেন, যত্ন করেন। সুরভীর চোখের দিকে তাকালেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। সুরভীকে তিনি কখনও বলতেন সুরভী, আর কখনও ডাকতেন মা বলে। সুরভীর ছোটো-খাটো দুঃখ-কষ্টেও তর্করত্নের চোখ দিয়ে জল গড়াতো। এই সুরভীর জন্যই একদিন তাঁর এমন স্নেহকরুণ চোখ দিয়েও আগুন ঠিকরে বেরুল।

সুরভীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন চরে বেড়াবার জন্য সাত-সকালেই। সারাটি দিন গেল সুরভীর দেখা নেই। তা নইলে দুপুরে সে একবার জল খাবার জন্যেও বাড়ীতে আসে; একটু বিশ্রাম করে আবার চলে যায় মাঠে। কিন্তু কি হল? সন্ধ্যে হয়ে যায়, সুরভী আসে না। তর্করত্ন পড়লেন মহা ভাবনায়।

মা হারিয়ে ছোটো ছেলেরা যেমন পাগল হয়ে ওঠে, সুরভীকে হারিয়ে তর্করত্নেরও সেই অবস্থা। সুরভীকে না দেখলে তিনি বাঁচেন না।

খুঁজতে বেরুলেন তিনি। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে, এ-মাঠে ও-মাঠে, এ-খোঁয়াড়ে ও-খোঁয়াড়ে খুঁজলেন। পেলেন না কোথাও। নিরাশ মনে বাড়ী ফিরলেন অনেক রাতে। ঠাকুরাণী তাঁকে খেতে ডাকলেন, তর্করত্ন পাতে বসলেন না সেই রাত্রে। শোবার সময় হলে, বিছানায় পড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলেন। কান পেতে থাকলেন, সুরভী কখন এসে ডাক দেয়, 'হাম্বা'।

বুঝি সুরভী এল। পায়ের শব্দ পাচ্ছেন যেন। ঐ তো খট-খট আওয়াজ। সুরভী আসছে। কিন্তু এমন নিঃশব্দে ত ? বাড়ীতে ঢোকে না! তবুও স্থির থাকতে পারেন না তর্করত্ন। [illegible]লি গায়ে খড়ম পায়ে বেরিয়ে পড়েন।

অন্ধকার রাত। নিজের কালো শরীরটা তিনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন না। নিচে মাটিতে ত কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকালে তবুও একটা-দু'টো তারা তার চোখে জ্বলজ্বল করে ওঠে। তিনি যেন সুরভীর মুখ দেখতে পান। কেউ দেখতে পায় না—উপাধিধারী পণ্ডিত একটা গাভীর জন্যে চুপি-চুপি কাঁদেন!

আবার ঘরে যান, আবার আসেন। আবার বেরবেন না কি। ঘুরে দেখে এলে হয় আরও দু'-চারটে গ্রাম। সুরভী গেল কোথায়? এ যেন স্বপ্নের মতো। ঘুম আসে না তবুও আবার ঘরে ঢুকলেন তর্করত্ন। বিছানাতে গা ছেড়ে দিতেই চোখে আবেশ এল। হঠাৎ যেন কানে বাজল—'হাম্বা'।

তর্করত্ন লাফিয়ে উঠলেন। বেরুলেন, কই কিছুই দেখতে পেলেন না। কান পেতে রইলেন উৎকর্ণ হয়ে, আবার যদি শুনতে পান 'হাম্বা'। হলও তাই, কানে এল আবার 'হাম্বা'! কোন্ দিক থেকে আসছে? মনে হচ্ছে পাশের বাড়ি থেকে। হাঁ, আবার 'হাম্বা'। তিনি ছুটলেন।

কমলকৃষ্ণ জ্ঞাতি খুড়ো। তাঁরই গোয়াল-ঘরের দুয়োরে দাঁড়িয়ে আছেন রামকিংকর। খড়ম পায়ে খটাস্-খটাস্ করে এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন। ভাবছেন কি করবেন। দরজা খুলে ফেললে হয়। সুরভী যে ভিতর থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে!

দরজায় টান দিতেই একটা গড়গড়ে শব্দ হল। কমলকৃষ্ণ জেগে গেলেন। ভিতর থেকে বাজখাই গলায় হেঁকে উঠলেন, 'কে, কে? গোয়াল-ঘরের দরজা ঠেলছে কে?' রামকিংকর বললেন, 'আমি, রামকিংকর। আমার 'সুরভী'কে নিতে এসেছি।' বলেই ঘরে ঢুকে সুরভীর বাঁধন খুলে নিয়ে এলেন বাড়ীতে।

কমলকৃষ্ণ বেরিয়ে দেখেন, গোয়ালের দরজা খোলা। ভিতরে সুরভী নেই। তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন রামকিংকরের উপর। রাগের চোটে তাঁর মাথার বিরাট টিকির চুলের গোছার গেরো খুলে গেল। তিনি চেঁচামেচি করতে করতে রামকিংকরের বা[illegible] চড়াও করে বললেন, 'সুরভীকে ফিরিয়ে দাও। আমার সীমানার মধ্যে এমন সুন্দর কুমড়ো গাছটা মুড়িয়ে খেয়েছে তোমার ঐ গাইটা, আমি আমি ওটাকে এমনি ছেড়ে দেব, না? কাল সকালে আমি ওটাকে নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়ে আসব। তখন তুমি ছাড়িয়ে এনো।'

রামকিংকর কথা বললেন না। চুপ-চাপ ঘরে ঢুকলেন গিয়ে। সুরভীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কত কথা বলতে লাগলেন তাকে। সুরভীও তাঁর মাথা চেটে দিতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। মায়ে-ছেলেতে কত দুঃখের কথা বলাবলি হতে থাকল কমলকৃষ্ণ বাইরে থেকে কিছুই দেখতে পেলেন না। হঠাৎ দরজা ঠেলে ঢুকলেন ভিতরে! সুরভীর গলায় হাত দিলেন, বাঁধন খুলবেন বলে।

রামকিংকর বললেন, 'ফিরে যাও খুড়ো। তোমার কুমড়ো গাছের যা দাম তা আমি মিটিয়ে দেব, তাহলেই ত হল। আমার সুরভীকে তুমি আর কষ্ট দিও না?'

কমলকৃষ্ণ চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার ঘর থেকে বাঁধা গাইটাকে তুমি কার কথায় রাত্রি বেলা গি[illegible] করে নিয়ে এলে? আমি ত

নামে নালিশ করব। ছাড় সুরভীকে। ছাড়। আমি নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখব, তার পর যা করবার তুমি করো।'

রামকিংকর বললেন, 'আমার শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে সুরভীকে নিতে পারবে না এখান থেকে।'

কমলকৃষ্ণ তিন লাফে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একে চেঁচাতে লাগলেন, তাকে ডাকতে লাগলেন। দুপুর রাতে একটা ...য় পাড়া-প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙল, কিন্তু কেউ ঘরের বের ... না।

রাত জেগে সুরভীর পরিচর্য্যা করছেন রামকিংকর। যেখানে ...কে বাঁধন দিয়েছিল সেখানটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর ...ছেন, 'মা, আমার অপরাধ নিবি নে মা! আমি ত আর ... করে এমনটা হতে দিইনি। কেন-বা তুই মুখ দিতে গেলি ... পাষণ্ড ব্যাটার কুমড়ো গাছে?'

সুরভী সব কথা বুঝতে পারে। সটান শুয়ে গলা টান করে দিয়ে ...িয়ে থাকে সেবাইতের দিকে। হ্যারিকেনের আলোটা কাছে ... ধরেন ঠাকুরাণী: দেখেন সুরভীর গায়ে কোথায় কোথায় ...গেছে। সুরভীর চোখে-মুখে কথা বেরুচ্ছে। শোনা নাই বা ...—সুরভী রামকিংকরকে আশীর্ব্বাদ করছে।

...লের ছেলেরা আম-কাঁটাল খাবে বলে ক'দিনের ছুটি নিয়ে ...ছে যে-যার বাড়ীতে। তর্করত্ন এখন ছাত্রদের দায় থেকে একটু মুক্ত। মনটা সুরভীর দিকে সবখানি ঝুঁকে আছে।

সকাল বেলা লেঠেল নিয়ে হাজির হলেন কমলকৃষ্ণ। রামকিংকর ...তে পারেননি, এ কি আরম্ভ করেছেন কমলকৃষ্ণ! একটা ... গাছের জন্য এত হাঙ্গাম? রামকিংকর যেন বিশ্বাসও করতে ...েন না।

কমলকৃষ্ণ ধমকি দেন: 'জোর থাকে ত সুরভীকে রাখো এসে?' ... করে গোয়াল-ঘরের দরজায় গিয়ে হাজির। দরজা ... আর কি?

রামকিংকর বলেন, 'করছ কি খুড়ো, তোমার কি মাথা ...য়েছে?'

কমলকৃষ্ণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বয়সে রামকিংকরের ..., কিন্তু সম্পর্কে বড়। তবে বার্দ্ধক্য এসেছে কমলকৃষ্ণের ... গায়ের মাংস যেখানে-সেখানে ঝুলে পড়েছে। একটিও ... 'বাবা' বলতে 'মামা' বেরয়। ঠোঁটগুলি ভিতরে ... লম্বা নাক আরও লম্বা হয়ে দেখা দেয়। হাত-পা ...। তবু তিনি হেঁকে বলছেন, 'নেবোই নেবো, ... গায়ে জোর থাকে ত কেড়ে রাখ।'

...ের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আজ কমল- ...কিংকরকে জব্দ করতেই হবে—মনে মনে আঁটছেন এই ... প্রায় পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ। সুরভীকে বের করলেন ...

... বললেন, 'এখনও ভালো আছে খুড়ো। বাড়াবাড়ি ... তোমার ঐ লেঠেল-ফেঠেলও আমি ভয় করি নে। ...টি।'

... সামলাতে পারলেন না, বললেন, 'যত বড় মুখ নয় ...থা! তবে দেখ মজা',—বলেই সুরভীর গায়ে বসালেন লাঠির বাড়ি, লেঠেলদের ইশারা করলেন রামকিংকরকে আক্রমণ করতে।

সময় দিলেন না রামকিংকর। সুরভীর গায়ে লাঠি ছোঁওয়ানো মাত্র ছুটে এসে কমলকৃষ্ণের মাথায় দিলেন মুগুরের বাড়ি। কমলকৃষ্ণ লুটিয়ে পড়লেন ভুঁয়ে। একটা কথাও আর বেরুল না তাঁর মুখ থেকে। লেঠেলরা লম্বা দিল যার যেদিকে।

বুঝতে পারলেন না, কি করেছেন রামকিংকর। তবু কমল-কৃষ্ণের লাশটাকে টেনে নিলেন ঘরে। ঠাকুরাণীকে বললেন, 'ভাত রাঁধো। আমি স্নান সেরে আসি।'

তখনও দুপুর বেলা হয়নি। রামকিংকর ভাত খেলেন, তামাক খেলেন। ঠাকুরাণীকে কি কি কথা সব বললেন। বস্তায় পুরলেন কমলকৃষ্ণের লাশ। কাঁধে করে 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

গ্রামের বাইরে এসে বস্তা খুলে লাশটা ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগলেন রামকিংকর। ছুটছেন না তিনি, হাঁটছেনই। তবে সে হাঁটা আমাদের ছোটার চাইতেও বেশি।

বড় হাওর পেরিয়ে জমি। তার পরে পাহাড়ে উঠতেই নূতন রেল-ষ্টেশন-ঘরের ঘড়িতে বাজল টং-টং, টং-টং, টং-টং, টং-টং, টং-টং, টং-টং। রামকিংকর দাঁড়িয়ে শুনলেন—বারোটা বেজেছে।

ঘরের দরজা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন—ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তখন ষ্টেশন-মাষ্টার ডাকলেন, 'ও ঠাকুর, যেয়ো না। থামো।'

রামকিংকর থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কে, ডাকছ, কেন ডাকছ?'

বলেই উঁকি দিলেন জানলা দিয়ে। দেখেন কি দু'টো গেঁয়ো লোক বসে বসে কাঁদছে।

তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাই, কাঁদছিস্ কেন?'

লোকগুলো বললে, 'আজ্ঞে কর্তা, আমাদের যাইতে দেয় না, আটকাইয়া রাখছে মাষ্টার সায়েব।'

রামকিংকর বললেন, 'কেন, তোরা কি করেছিলি?'

ওরা বললে, 'আমরা না কি রেল-লাইনের ভিতর দিয়া আইছি, বে-আইনি করছি।'

রামকিংকর তখন বললেন, 'আরে, এর লাইগ্যা, আয় আয়, বাইরইয়া আয়। দেখি কেডায় কিতা কয়।'

লোক দু'টো তখন ষ্টেশন-মাষ্টারের দিকে তাকাতেই মাষ্টার রামকিংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে ঠাকুর মশায়, আপনিও বে-আইনি করেছেন। আপনাকেও এখানে আটক থাকতে হবে।'

রামকিংকর হাসতে হাসতে বললেন, 'থাকবার লাইগ্যাই ত আইছি। কিন্তু খাইতে দিবা কি? পাঁড়া এক-আধখান মারছ না কি? আমিও পাঁড়া ছাড়া খাই না।'

ষ্টেশন-মাষ্টার ভাবলেন, লোকটার কি মাথা খারাপ? আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

রামকিংকর লোক দু'টোকে বলেন, 'আরে, দেরি হইয়া যায়, বাইর হ'।'

লোক দু'টো বেরিয়ে এল। রামকিংকরের পিছু-পিছু চলল। ষ্টেশন-মাষ্টার ভাবতেই পারেননি, সাহেবি কোম্পানির আওতায়

কারোও এত সাহস কার? আটকে রেখেছেন তবু কয়েদি পালিয়ে যায়। ছুটে বেরুলেন ঘর থেকে। ডাকতে লাগলেন, 'আরে ও ভট্টচাষ্যি মশায়, আরে বে-আইনি করছেন যে? পুলিশ ডাকব না কি?'

লোক ছ'টোকে পথে চালিয়ে দিয়ে রামকিংকর ফিরে এসে বললেন, 'আমিই রইলাম ঐ লোক ছ'টোর বদলে। আমার ওজন দেখে রাখুন। ওদের ছ'জনের সমান নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু খিদে পেয়েছে যে, এক্ষুণি খাবার চাই। কই এখনও খাবার এল না ত থাকব কি মরতে? বলেই আবার চললেন রামকিংকর।

ষ্টেশন-মাষ্টার হাঁকলেন, 'পুলিশ, পুলিশ।'

কিন্তু রামকিংকরের গায়ের লোমও তাতে কাঁপে না। তিনি চলেই যাচ্ছেন। মাষ্টার সায়েব বেয়াকুব হয়ে চেয়ে রইলেন। 'তাই ত লোকটা করল কি?'

লোক ছ'টো রামকিংকরকে কি ভাবে যে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পেল না। যতক্ষণ তারা ছুটে ছুটে তাঁর সঙ্গে চলতে পারছিল ততক্ষণই শুধু ঐ একই কথা—'ঠাকুর মশাই না আইলে আমাদের কি গতি অইত আইজ, আল্লাই জানেন।'

আরও কিছু পথ এগিয়ে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আলাদা আলাদা পথ নিলেন সকলেই।

পাহাড় পেরিয়ে ধান-ক্ষেত আবার। বছরের প্রথমে 'জেঠাজলি' ধান ইছারাঙা হয়ে এসেছে। রামকিংকর সে সব ক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটে চলেছেন।

চাষারা দেখতে পেয়ে তেড়ে আসছে আর পিছু-পিছু ডাকছে, 'ওরে ওই, তুমি কেডাও, আইলে দিয়া যাও না? পায়ের বাড়ি লাইগ্যা ধান পইরা যায় চোখে দেখো না?'

রামকিংকর থমকে দাঁড়ান। লোকগুলো কাছে আসতেই রামকিংকর ধানের ছড়া ক'টি হাতে ধরে ছ'পায়ে ঘষতে আরম্ভ করেন। চোখের সামনে এত ধান নষ্ট করছে এই ক্ষ্যাপা লোকটা—এটা সহ্য হল না লোকগুলোর। তাই লাঠি উঁচিয়ে মারতে যাবে এমন সময় ধরে ফেললেন তাদের হাত লোহার মানুষ রামকিংকর। তাদের হাত থেকে লাঠি ছ'টো ফেলে দিলেন ছুঁড়ে। ছুই বগলে ছ'জনের মাথা ছ'টি চেপে ধরে আবার ছুটতে লাগলেন। লোক ছ'টো তো চেঁচাতে লাগল, 'গেলাম রে, মইলাম রে, দোহাই আল্লার, দোহাই খোদার।'

খেয়াঘাটে এসে ছাড়লেন লোক ছ'টোকে। তারা মরার মতো পড়ে রইল নদীর পারে! রামকিংকর ওপারে না যাওয়া পর্য্যন্ত চোখ মেলেও চাইল না।

তার পর কোন্ পথে গেলেন কি করলেন ও সব খবর কিছুই জানা যায় না।

যখন শ্রীহট্টের সদরে পৌছলেন তখন রাত্রি আটটা বেজেছে। এক উকিল আছেন সেখানে, তর্করত্নের যজমান। তাঁরই বাড়ীতে গিয়ে হাজির। কিন্তু উকিল বাড়ীতে নেই। পড়লেন মহা মুস্কিলে। কি করে কি করবেন?

হাজির হলেন এসে জেলা-জজের বাড়ীতে। ভাব করে নিলেন হিন্দুস্থানী বেয়ারার সঙ্গে। তার হাত দেখে এমন কতগুলো কথা তর্করত্ন বলে দিলেন, লোকটা ভাবলে যে, 'এ ত একদম রামজ্ঞ আছেন। নহী ত কি করে হামারা সব কথা বিলকুল কহি দিলে।'

তর্করত্ন বেয়ারাটাকে বললেন, 'আমি গরীব বামুন জজসাহেবের কাছে কিছু ভিক্ষা চাই। এই নাও এই কাগজখানা। জজ সাহেব যা' দিবেন এতে যেন লিখে দেন। তাহলে আমি অন্য জায়গায় গিয়ে এই কাগজ দেখালে আরও দক্ষিণা পাব।'

বেয়ারা ভাবল, বেশ ত, সে নিজে কিছু না দিয়ে যদি পরের কাছ থেকে আদায় করিয়ে দিতে পারে তাই ভালো। জজ সাহেবকে গিয়ে সে বামুন ঠাকুরের কথা বলল, আর ওই কাগজখানাও দিল।

জজ সাহেব না দিয়ে পারলেন না। আর লিখেও দিলেন ছ'লাইন। জজ সাহেব বামুন ঠাকুরের নামটা জেনে নিয়েছিলেন বেয়ারার কাছ থেকে। দিলেন ৫৲ টাকা। তলায় নাম সই করলেন।

তর্করত্ন ত মহাখুশি। আরও ছ'-এক জায়গায় গেলেন। এক অ্যাডভোকেটের বাড়ী, এক সরকারী উকিলের বাড়ী। তার পর রাত্রিটা কাটালেন একটা হোটেলে।

হোটেলে রাত্রে থাকতে হলে নাম লিখিয়ে নিতে হয় হোটেলওয়ালার খাতায়। তা নইলে কোথাকার চোর-ছ্যাঁচড় এসে কত রকমে লোকসানের ফন্দী আঁটতে পারে ত!

তর্করত্নের নাম লেখা রইল সেই হোটেলে।

দিন পাঁচেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরে এলেন তর্করত্ন। ঠাকুরাণীর কাছে শুনলেন যে, কমলকৃষ্ণের লোকেরা মামলা দায়ের করতে জেলায় গিয়েছে। ঠাকুরাণী বললেন, 'কি হবে?'

রামকিংকরও মনে মনে বললেন, তাই ত কি হবে?

খুনের মামলা! গবর্ণমেণ্ট বাদী। পনেরো দিনের মধ্যেই বিবাদী রামকিংকরের নামে হাজিরার ওয়ারেণ্ট এল।

নিজের ইচ্ছায় রামকিংকর হাজির হলেন। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচারক তাকে প্রশ্ন করলেন, 'জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখ রাত ১০টায় বৈজুড়ি গ্রামের কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে যে আপনি খুন করেছেন, সে কথা কি সত্যি?'

রামকিংকর কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তার পর বললেন, 'আজ্ঞে, ওই তারিখে আমি ছিলাম এই শহরে। গরীব ব্রাহ্মণ, দেশে দেশে ভিক্ষা করে বেড়াই, তা ছাড়া শিষ্য-সেবকও কিছু কিছু আছে কি না।'

বিচারক বললেন, 'কোনো প্রমাণ আছে তার?'

হন্তদন্ত হয়ে রামকিংকর ট্যাঁক থেকে বের করলেন একখানি ময়লা ছেঁড়া কাগজের চিরকুট। বিচারক হাত বাড়িয়ে সেখানি নিলেন। পড়ে দেখলেন, 'পাঁচ টাকা', 'দশ টাকা', 'ছ' টাকা' ইত্যাদি নানা রকম টাকার অংকে কাগজখানি ভরতি—আর তাতে অনেক লোকের নানা রকমের নাম দস্তখত। কাগজখানা উল্টে পাল্টাতে হঠাৎ যেন বিচারকের খুব পরিচিত একটা দস্তখত পেলেন। উৎসুক দৃষ্টিতে সেটির দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন যেন জজ সাহেবের সই, না? পাশে যাঁরা বসেছিলেন উকিল-আমলা তাঁরাও উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ্য করছিলেন বিচারকের হঠাৎ চমকে ওঠা চক্ষু।

হাঁ, জেলা জজেরই স্বাক্ষর বটে। তিনি নিজেই সেই বিদেশী ব্রাহ্মণকে সেই তারিখেই পাঁচ টাকা দান করেছেন।

জ্ঞেস করলেন রামকিংকরকে, 'আর কোনো প্রমাণ ? কার এখানে সে রাত্রে ছিলেন ?' রামকিংকর বললেন, 'আজ্ঞে, ছিলাম। ওই যে কাছারির কাছাকাছি হোটেল।'

নেক কথাবার্তা হল তার পর। সব তো আর শুনতে পাইনি। কে শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা হল না।

ফিরলেন রামকিংকর। পাড়া-পড়শী গ্রামবাসী চোখ তুলে দরদের ভঙ্গিতে বলে, 'পণ্ডিত ঠাকুরের এবার আর উপায় নেই বুঝি! কোনো রকমে ফাঁসির হাত থেকে মুক্তি না একটু চেষ্টা-চরিত্র করে দেখুন না?'

বলেন, 'ফাঁসি হবে না হবে হাতি! কাঁচকলা হবে', হাতের বুড়ো আঙুলটা বেঁকিয়ে বের হয়ে পড়ে তর্করত্নের থেকে।

দিন চিঠি এসেছে। পিওনের হাত থেকে নিয়েই তর্করত্ন 'বেকসুর খালাস।'

গেলেন গোয়াল-ঘরে। সুরভীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর চোখে তখন ভেসে উঠল খুড়ো কমলকৃষ্ণের মূর্তি— হয়ে কমলকৃষ্ণ সুরভীর গায়ে বাড়ি দিতে লাগি লেন।

তর্করত্নের চোখের জলে ভেসে যায় সুরভীর পা। সুরভী ঘাড় ছল-ছল চোখে তাকিয়ে থাকে তার সেবাইতের দিকে। আর মানুষের মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা! কথা যার মুখে কথা বলতে যে পারে সুরভীকে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। উকিল-আমলারা এক জায়গায় হলেই কথা ওঠে তর্করত্নের। বলে কি না আশী মাইল পথ পায়ে হেঁটে মেরে দিলে ঘণ্টায় ? খুনী সে? উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তর্করত্ন— ও খুন করতে পারে?'—এই প্রশ্ন মনে নিয়ে কত রাত নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পায়নি।

কথাটা আইনের কি না! বিচারক ত বে-আইনি করতে পারেন না। আইনের ফাঁকে মিথ্যাও সত্যি হয়ে ওঠে; সত্যিও মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু 'অসম্ভব'কে 'সম্ভব' বলে মেনে নেওয়া আইনের কাজ নয়। তাই ত মুক্তি পেলেন রামকিংকর। আইনের ফাঁকে তাঁর ফাঁসি ফসকে গেল।

জ্ঞাতি-খুড়ো কমলকৃষ্ণকে খুন করে আশী মাইল পথ আট ঘণ্টায় হেঁটেছেন রামকিংকর? নিজেই তিনি এ কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁর শরীরে কি জানি ভর করেছিল এসে? খ্যা, পাহাড়, নদী, উঁচু-নিচু খানা-ডোবা, জংগল সব কিছু মাড়িয়ে তিনি কোন্ শক্তিতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পাড়ি দিলেন এই দীর্ঘ পথ? ভাবেন আর ভাবেন। শিউরে ওঠেন তিনি।

তাঁর বাস্তুভিটেতেও তাঁর কীর্তির কথা পৌঁছল শেষে। পাড়া-গাঁয়ের লোক বলাবলি করে—'পণ্ডিত না কি যেদিন খুন করেছেন, সেইদিনই পৌঁছেছেন জেলার সদরে।'

কেউ বলে, 'অসম্ভব নয়: কেউ বলে, 'হতেই পারে না'। মানুষে এ কাজ করতে পারে না।' কেউ বাধা দিয়ে বলে,

'পণ্ডিতকে তোমরা মানুষ ঠাউরেছ না কি?—সাক্ষাৎ যম! যেমন যমের মতো কালো বিদ্‌ঘুটে চেহারা, কাজেও তেমনি। বাবা, চোখের দিকে তাকালে বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে যেন!' 'তর্করত্ন' উপাধি আর রাখা কেন? পায়ে হেঁটে চরম পরীক্ষায় পাশ করলেন, জীবন ফিরে পেয়ে গেলেন খুনের আসামী হয়েও। এবার তাঁর উপাধি হোক 'হটরত্ন'।'

তাঁর অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে কেউ কেউ শ্রদ্ধা-নিবেদনও করলেন। তাঁরা তাঁকে উপাধি দিলেন 'শ্রীহটরত্ন'।

বৈজুড়ি গ্রামে আজও তাঁর বাড়ীর কাছে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, 'এটা কি রামকিংকর তর্করত্নের বাড়ী?' গাঁয়ের লোক হাঁ করে চেয়ে থাকে। যদি বলা যায়, 'হটরত্ন যমকিংকরের বাড়ী কোনটা?' যে-কোনো লোক এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বলে, 'আমার সঙ্গে আসুন, পথ দেখিয়ে দিই।'

—অণিমা মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

(বড় গল্প)

সুলেখা দাশগুপ্তা

তিন

সকালের দিকে বীণা গা-ভরা আলস্য ও জড়তা ঝাড়িয়া উঠি-উঠি করিয়াও যেন শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমনি সময় মায়ের ডাকে গা মোড়া-মুড়ি দিয়া সব চিন্তা ও জড়তা ঠেলিয়া সে উঠিয়া বসে।

"আজ অফিসে যাবি নে বীণা ?" রান্না-ঘর হইতে মা বলেন।

"হ্যাঁ মা, যাব। না গেলে চলবে কেন ?"

"শরীরটা বলছিলি ভাল নেই, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"রোজ রোজ শরীর খারাপের কৈফিয়ৎ ওঁরা মানবেন কেন ?" বীণা উঠিয়া বসিয়া স্নানের উদ্দেশ্যে খোঁপার কাঁটা টানিয়া টানিয়া খুলিতে থাকে। কে জানে আজও ইন্দ্রাণী অফিসে আসিবে কি না! কত [illegible] হইয়াছে নিজেই একবার ইন্দ্রাণীর বাড়ীতে যায়, কিন্তু এ অবস্থায় কোথাও যাইবার মত বল সে কিছুতেই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। যতটা সম্ভব লোকের দৃষ্টির আড়ালে গা বাঁচাইয়া চলাই ভাল। অতি সাধারণ দৃষ্টিও তার মনে অর্থপূর্ণ চাউনির আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ওর বাড়ীতে কে আছে না আছে তাই বা কে জানে! তাই যাওয়া আর হয় নাই, এর ভিতর তার চিঠির জবাবে ইন্দ্রাণী জানাইয়াছিল, পত্রপ্রাপ্তি সংবাদ। সে নিজে অসুস্থ তাই অফিসে আসিতে পারিতেছে না। দেখা হইলেই সব কথা হইবে। বীণা যেন চিন্তা করিয়া অস্থির না হয়। ভার যখন নিয়াছে ব্যবস্থা একটা করিবে বৈ কি! কিন্তু চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেই কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায়? এ লজ্জা ও কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতির বুঝি পথ নাই! অর্থ ই বা আসিবে কোথা হইতে? ব্যবস্থার ভার—টাকার ভার—এত ভার ইন্দ্রাণীই বা বহিবে কেন ?

ব্যস্ত ভাবে রতন ঘরে ঢুকিয়া বই-খাতা গুছাইতে গুছাইতে বলে, "[illegible]মাইনে দেবে না কি দিদি ?"

[illegible] বালিশের তলা হইতে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া রতনের হাতে টাকা গুনিয়া দেয়। রতন সেগুলো পা'টা গলাইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া যায়, "আজ খেলা আছে দিদি! ফিরতে দেরী হলে চিন্তা করো না।"

···রতনের চেহারাখানা কিন্তু বেশ ফিরিয়াছে।···সে উঠিয়া স্নানের উদ্দেশ্যে যাইবার জন্য পা বাড়াইতেই বাড়ীর দরজায় একখানা গাড়ীর 'ঘ্যাস্' করিয়া থামিবার শব্দে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহে আগ্রহান্বিতা বীণার বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া ওঠে, ইন্দ্রাণী নয় ত!

ইন্দ্রাণীই। সব বুঝিয়া শিবনাথের অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে বীণার সঙ্গে কথা সারিয়া যাইতে। ইন্দ্রাণীকে দেখিয়াই যেন বীণার কান্নায় গলা বন্ধ হইয়া আসিতে চায়। নিজেকে সংযত করিয়া ইন্দ্রাণীর হাত দু'টি ধরিয়া বসাইতে বসাইতে ভাঙ্গা ধরা-গলায় বলে, "সেদিন থেকে অফিসে যাওয়া ছেড়ে দিলি কেন রে ?"

"আর চাকরী করব না।"

"কেন ?" বিস্মিত হইয়া বীণা প্রশ্ন করে।

"ভেরী সুন আই শ্যাল বি এ মাদার।" ইন্দ্রাণী যেন বী[illegible] সেদিনের কথাটাই পাল্টাইয়া বলে।

"সত্যি !" বীণা চেষ্টা করিয়া আনন্দের ভাব দেখাইতে চা[illegible] কি হইবে, কিছুতেই পারিয়া ওঠে না। ইন্দ্রাণী নিজে অসুস্থ হ[illegible] পড়িলে তাহার উপায় কে করিবে ? সে অসহায় সুরে বলে, "[illegible] এত বড় সুখবরেও আনন্দ প্রকাশ করতে না পারাতে অপরাধ [illegible] নে ভাই। নিজ স্বার্থের চাহিদা এত বড় যে, তুই অসুস্থ জে[illegible] আমি যে সব অন্ধকার দেখছি, ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছি না। এখন আমি কি করবো ?" বীণা দাঁত দিয়া কম্পিত ঠোঁট চাপি[illegible] ধরে।

ইন্দ্রাণী নীরবে বীণার কথা শুনিয়া যায়। মুখে তার উদ্বেগ বা সমস্যার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। যেন সব সে সমাধান করি[illegible] ফেলিয়াছে। বীণার কথা শেষ হইলে বলে, "তোর ভেবে স্থির করার সঙ্গে মিল রেখে যখন এত সব ঘটনা ঘটে যায়নি, তখন স্থির করতে না পারার অপরাধে এটাও ঠেকে থাকবে না। আমি শুধু বাড়ী বয়ে আমার খবরই দিতে আসিনি; তোকে কিছু বলতেও এসেছি বৈ কি।"

বীণা একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া বসে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে। তার পর রুদ্ধ নিশ্বাসে ইন্দ্রাণীর সব কথা শোনা হইয়া গেলে নীরবে শুধু তার হাতটা চাপিয়া কিছু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যেন সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টাও এই মহত্বপূর্ণ আবহাওয়ার গাম্ভীর্য্য লঘু করিয়া ফেলিবে! তার পর শান্ত কণ্ঠে বলে, "বেশ, রতনের জন্য বোর্ডিং-এ ব্যবস্থা করে আমি ছুটির দরখাস্ত করছি।"

বীণার ডাকে মা রান্না-ঘর হইতে আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে ঘরে আসিয়া ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হন। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় বসাইবেন, উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন।

ইন্দ্রাণী বলে, "ব্যস্ত হবেন না মাসিমা। আমিও আপনার মেয়েই। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। বীণার শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। একটু হাওয়া বদলে [illegible] হয়ত ভাল হয়ে যাবে। নইলে গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে কত[illegible]।" মা মাথা নাড়িয়া সায় দেন। ইন্দ্রাণী বলে, "তাই বলছিলাম, [illegible] চেঞ্জে যাচ্ছি—চলুন না আপনারাও আমার সঙ্গে? কি [illegible] ব্যবস্থা করি ?"

সম্মত হইতে মা'র মুহূর্ত্ত সময় লাগে না। টাকা-পয়সার প্র[illegible] তুলিতে গিয়াও থামিয়া যান।

বিদায় লইয়া গাড়ীতে বসিয়া ইন্দ্রাণী বলে, "এ পর্য্যন্তই [illegible] মাসিমা'র জানা থাকে। পরে সময় বুঝে বাকীটা বলা [illegible] ওঁকে লুকোনো তো সম্ভব নয়। এখন জানালে অস্থির হয়ে প[illegible] অপরিচিত জায়গায় যখন লোকলজ্জার আশঙ্কা থাকবে না, [illegible] সামলে নিতে পারবেন। আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে জ[illegible] মাসিমাকে নিয়ে তুই রওনা হয়ে পড়বি। কেমন ?" তা[illegible] গাড়ী ছাড়িয়া দিবার মুহূর্ত্তে মুখ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে [illegible] "আমার মা'র কাছে ছু' দিনেই তোর আর কোন সঙ্কোচ থাক[illegible] দেখিস্। আমি কিন্তু আমার মা'ই ছায়া রে!"

ইন্দ্রাণীর গাড়ী চলিয়া গেলে বীণা ঘরে ঢুকিয়া সোজা [illegible] বিছানায় গা ঢালিয়া দেয়। অপ্রত্যাশিত নিশ্চিন্ততার [illegible]

মহানুভবতা যেন তার সমগ্র ব্যক্তিসত্তাটাকেই আচ্ছন্ন ফেলিয়াছে।

একমাত্র মেয়ে ইন্দ্রাণী। তার দুই দাদা সপরিবারে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে। ছেলেদের কারুর সঙ্গে বাস না করিবার পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়া জনিত কারণ শেষকালে সর্বক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়া আসিতেছে তাহা ঘটিবার শঙ্কায় দূরে সরিয়া থাকা। নিজস্ব অর্থের প্রাচুর্য্য না থাক, অভাবও নাই। তাই খুশীমত চলা এবং সময়ে সময়ে চালিত একান্তই অসম্ভব হয় না। নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্বের জ্যোতি আছে, আর আছে সর্ব্ব সংস্কারের ঊর্দ্ধে একটি পবিত্র ধর্ম্মভাব—আশ্রয় দেয়, আশ্রয়হীন করে না কোন কারণেই। তার উপর নির্ভর করিয়াই ইন্দ্রাণীর এই বৃদ্ধা মাতার কাছে আসা। শিবনাথ নিজেই আসিল ইন্দ্রাণীকে পৌছাইয়া চার-পাঁচ দিন থাকিয়া সকল রকম সুব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল। শিবনাথ চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী মাকে ডাকিয়া যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিল, শুনিয়া খানিকক্ষণ মা হইয়াই বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "এ দুঃসময়ে উপকার করবে, সে ত' খুবই ভাল কথা। আমি খুশী তোমায় সাহায্য করব রাণী। কিন্তু তুমি যা স্থির করেছ সবটাতে সায় আমি দিতে পারছি না।"

"কেন মা?"

"এক জনের সন্তানকে মিথ্যে ঘটনা সাজিয়ে অন্যের ঘাড়ে দেওয়াটা অন্যায় রাণী!"

যেন নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলে, "অন্যের দেওয়াটা কি ফেলে দেওয়ার চাইতেও খারাপ মা?"

"নেওয়াটা খারাপ বলছি নে মা। তুমি স্থান দেবে বেশ কিন্তু এ যে শিবনাথকে মস্ত মিথ্যার জালে জড়ানো মন থেকে কিছুতেই এই মিথ্যার পক্ষে সায় পাচ্ছি না।"

"কি করব তবে? তুমিই বল মা। ফেলে দেব? মেয়ে"

মা শিউরে ওঠেন। "অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন ইন্দ্রাণী! আমি কি যদি কোন আশ্রম-টাশ্রমে ..."

"ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। আর থাকলেও তা ফেলে সমান হবে মা!" তার পর মা'র দ্বিধাগ্রস্ত মুখের পানে বলে, "স্নেহের ভাণ্ডার আমাদের বড় ছোট মা! নিজ ছাড়া অপরের জন্য ভাণ্ডার উজাড় করে ঝাড়লেও এক বেরুতে চায় না। তাই এ ভাবে নেওয়া ছাড়া উপায় আমার এ ব্যবস্থাটা গুলিয়ে দিও না মা। ভেবেও কূল পাচ্ছিলাম না। কিন্তু যখন পেলাম ভাববার প্রয়োজন বেশী হয়নি।" ইন্দ্রাণী মাকে "জানলে রাজী করান অসম্ভব। আর না জানিয়ে তো একমাত্র পথ। একটা জীবনকে বৃথা ঘৃণা, অবহেলায় নষ্ট হতে দেওয়ার চাইতে এটা এমন কি মা?" ইন্দ্রাণী ব্যাকুল ভাবে তাকাইয়া থাকে মা'র দিকে উত্তরের জন্য। মা'র মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না ঘুচিলেও মেয়ের এত বড় আগ্রহের কাছে তিনি নীরব হইয়া যান।

অগ্রহায়ণের শেষে সবে মাত্র শীতের আমেজ পড়িয়াছে।

শিবনাথ যখন ইন্দ্রাণীদের বাড়ী গিয়া পৌছিল, তখন সবে শীতের ভোরের আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোট পায়ে-হাঁটা পথটুকুর দুই ধারে বিচিত্র বর্ণের ফুলের গাছ! প্রভাতে মিষ্টি আলোর রশ্মি ছোট্ট বাড়ীখানার গায়ে এখানে-ওখানে ঝিলিক মারিতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চোখ বা মন শিবনাথের নয়, কিন্তু আজ যেন সব-কিছুই তার ভাল লাগিতেছিল। আর একটু অগ্রসর হইলেই দেখা হইবে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে—দেখিবে তার প্রথম সন্তানকে। দ্রুত পায়ে সে অগ্রসর হইয়া চলে। পরিচিত পরিচারিকা তাকে একেবারে ইন্দ্রাণীর ঘরে আনিয়া উপস্থিত করে,—ইন্দ্রাণী ঘুমাইয়া। তৈলহীন রুক্ষ চুলের গুচ্ছ কপোল ও উপাধানে ছড়াইয়া আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর। মুখখানা যেন কিছুটা ম্লান ও পাণ্ডুর—একটা অপরিমিত মমত্ববোধ যেন শিবনাথের মনকে মুহূর্ত্তের জন্য আবিষ্ট করিয়া ফেলে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলাইতে যাইয়া সুঠাম পা দুখানার উপর দৃষ্টি তার স্থির হইয়া থাকে। কিউটেক্স-রঞ্জিত শুভ্র পা দু'খান তাকে ভারি আকর্ষণ করে।

স্বামীর আদরের মাঝেই যেন ঘুম ভাঙ্গিল, ঠিক এমনি ভাবে মাথা তুলিয়া অস্ফুট আনন্দে ইন্দ্রাণী উঠিয়া বসিল। কে বলিবে—গেটের মাথায় শিবনাথকে আসিতে দেখিয়া দোলনা হইতে শিশুটিকে তুলিয়া পাশে শোয়াইয়া ঘুমের ভাণ করিয়া সে শুইয়াছিল!

ছেলে দেখিয়া শিবনাথ ছেলের ছোট গাল টিপিয়া অত্যন্ত নরম হাতে আদর করে। বলে, "দেখতে কেমন হবে, কিছুই এখন বোঝা যায় না ইন্দ্রাণী!"

শিবনাথের আগমন ইন্দ্রাণীর মা জানিতে পান। কিন্তু মিথ্যা প্রবঞ্চনার অপরাধের কুণ্ঠা কাটাইয়া শিবনাথের সম্মুখে যাইতে তাঁর বেশ খানিকটা সময়ই লাগে। সাক্ষাতের পর সামান্য দু'-চার কথায় কর্ত্তব্য সারিয়া দুর্ভাবনা-পীড়িত মন লইয়া তিনি দূরে সরিয়া আসেন। মেয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া জামাই-এর প্রতি অন্যায় করার ক্ষোভ তাঁর মনে গাঁথিয়া আছে। যদি কোন দিন জানাজানি হইয়া যায় এবং শিবনাথ আসিয়া জবাব চায়, তবে কি জবাব তাঁর দিবার আছে?

চা খাইতে খাইতে শিবনাথ একেবারে ইন্দ্রাণীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া বসে। সুস্থ যখন, তখন আর থাকিবার প্রয়োজনটাই বা কি? এবার না লইয়া গেলে তাহার পক্ষে শীঘ্র আর আসা সম্ভব হইবে না। এইটুকু শিশু লইয়া পথে অন্য কাহারও উপর ভার দিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না...ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাওয়া স্থির হইয়া যায়।

পরের দিন আহারান্তে শিবনাথ শয্যা গ্রহণ করিলে ইন্দ্রাণী গাড়ী করিয়া ঝিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়া গাড়ী থামে তাদের একটি ছোট একতলা বাড়ীর কাছে।

বাড়ীখানা নির্জন একটা মাঠের উপর বলিলেই হয়। দু'-এক ঘর যারা এদিকে ওদিকে বাস করে, তারাও কৃষক বা গোয়ালা শ্রেণীর। অনেক খুঁজিয়া ইন্দ্রাণী এ বাসা পছন্দ করিয়াছে বীণাদের থাকিবার জন্য। একটি ঝি লইয়া বীণা ও তাহার মা এখানেই আছেন। ইন্দ্রাণীর মা'র পরিচিত এক জন ক্রিশ্চিয়ান লেডী ডাক্তারের সাহায্যে এ বিপদ মুক্ত হইতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন তাঁহাদের হইতে হয় নাই। তার পর সত্যিই তো টাকায় কি না হয়!

বীণার মা প্রথমটায় শুনিয়া স্তম্ভিত ও হতভম্ব হইয়াছিলেন— এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! দাঁড়াইয়াও ছিলেন বাজ-পড়া মূর্ত্তির মত। দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু ভিতর তাঁর পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে, সামান্য একটু স্পর্শেই যেন ঢলিয়া পড়িবেন। ক্রমে সবই সহ্য হইয়া আসে—এটাও আসিল। মানিয়া লইলেন অদৃষ্ট বলিয়া। এখন আর সে সমস্ত বিপদের ছায়াটুকুও নাই, কিন্তু এ ঘটনা চরম আঘাত হানিয়া গিয়াছে তাঁর সরল মনের উপর। মর্ত্তের মৃত্তিকায় গড়া মূর্ত্তিপূজার আচার-নিষ্ঠার সংস্কারের ঊর্দ্ধে কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নাই—নাই কোন নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব। তাই ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া তিনি যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন—পাপ-পুণ্যের খতিয়ানে নরকবাসের আতঙ্কে ঘুমে-জাগরণে কেবলই শিহরিয়া উঠেন।······কিছু স্বস্তি বোধ করিয়াছিলেন মাত্র সেদিন, যে সময় শুনিলেন, শিশু কাঁদিবার শক্তি লইয়াও ভূমিষ্ঠ হয় নাই—ডাক্তার যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াও শিশুটিকে বাঁচাইতে পারে নাই। শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ ছাই-পাঁশ আবার বাঁচানোর চেষ্টা করা কেন?"

"আমরা ডাক্তার—আমাদের করণীয়, আমরা না করে তো পারি না। মেরে ফেলা তো সম্ভব নয়।" ক্রিশ্চিয়ান লেডী ডাক্তার বলিয়াছিল।

"মেরে ফেলতে না পার মা, যে মরছে তাকে কেন দাঁটাঘাঁটি করা।" ঘৃণায় তিনি মুখ বিকৃতি করেন।

ইন্দ্রাণী ও তার মা চুপ করিয়াই ছিলেন। কথা বলেন নাই—বলেন নাই বৃথা কথা বাড়াইয়া লাভ নাই বলিয়া। তর্কের বিষয়বস্তু নয়, এ দুঃখের বুক-চেরা কথা। কিন্তু সব ভাল বুঝি একসঙ্গে হইবার নয়, তাই বীণা পড়িল অসুস্থ হইয়া। ভাবনার না হইলেও ভোগ করিবার পালাটা চলিবে বেশ কিছু দিন। এখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। হাঁটা, চলা ডাক্তারের নিষেধ আছে, আর পারেও না!

সেদিন ইন্দ্রাণী আসিয়া প্রবেশ করিলে হাতের বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া সে সহাস্য মুখে উঠিয়া বসে।

"কেমন আছিস্ বীণা?" ইন্দ্রাণী বীণার চৌকির পাশে বসিয়া বলে।

"অ—নে—ক ভাল।" বীণা অনেক শব্দটাকে টানিয়া লম্বা করিয়া বলিতে চায় যেন প্রায় সে ভাল হইয়া গিয়াছে।

তার কথার সুর ও টানিয়া বলার ভঙ্গি দেখিয়া ইন্দ্রাণী হাসে। বীণাও হাসে—তরুণী-মনের সহজ সুন্দর হাসি। তাকায় তারুণ্যপূর্ণ প্রাণ-চঞ্চল দৃষ্টিপাতে। মুখে অসুস্থতার চিহ্ন থাকলেও, কিন্তু নাই তা'তে ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার গুরু বোঝার ভার। সে যেন তার আগেকার জীবন ফিরিয়া পাইতেছে। সে জীবনটা যে বীণার এত ভাল, এত সুখের ছিল এবং সে জীবনটা যে এত কাম্য তার, এত বড় ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ভিতর না পড়িলে সে বুঝিতেও পারিত না। ইন্দ্রাণীর হাতটা টানিয়া হাতে লইয়া বলে "বলেছিলি শীগ্‌গিরই চলে যেতে হতে পারে, পরোয়ানা হাজির হয়নি তো?"

"হ্যাঁ ভাই, সশরীরে হাজির। দু'-এক দিনের ভেতরেই চলে যেতে হচ্ছে ভাই।"

"সত্যি!" বীণা যেন নিজেকে সামলায়।

মাও দুঃখিত কণ্ঠে বলেন, "এত শীগ্‌গিরই যাবে মা?"

"শীগ্‌গির কোথায় মাসিমা? কত দিন তো হয়ে গেল। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় কেউ তো নেই! মেয়েরা না থাকলে শত লোক-জন থাকলেও সংসার কি বিশৃঙ্খলই না হয়ে দাঁড়ায় জানেন তো!"

"বাচ্চাটি মাত্র সেদিন হলো যে। বীণার অসুখের জন্য ভাল করে দু'দিন গিয়ে দেখাও হ'ল না।"

"এই এতটুকু বাচ্চা, বেশী কি আর দেখবেন বলুন। বীণাকেও ত সেদিন এনে দেখিয়ে নিয়ে গেলাম। বড় হোক, বেঁচে থাক, দেখবেন বৈ কি।"

মা মাথা নাড়িয়া বলেন, "ষাট্! ষাট্! বেঁচে থাক তোমার বুক ঠাণ্ডা করে। দেখব বৈ কি মা। তুমি যাচ্ছ কার সঙ্গে? জামাই এসেছে?"

"হ্যাঁ, মাসিমা।"

বীণা ও মা প্রায় একই সঙ্গে বলিয়া উঠেন, "এক দিন নিয়ে আস্‌ছ তো এখানে? বীণাকে নিয়ে ত যাওয়ার উপায় নেই।"

ইন্দ্রাণী জানায় সম্ভব হইলে নিশ্চয়ই লইয়া আসিবে, আর যদি না আসিতে পারে তবে যেন তারা দুঃখিত না হয়। কারণ মাত্র একটি দিন মাঝে। পরের দিন ভোরেই ট্রেনের সময়। কাজ জমিয়া আছে অনেক। ব্যবসা সংক্রান্ত কি কাজও যেন আসিবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাই সময় হয়ত হইবে না। তার পর বলে, "আমি চলে গেলেই মা তোদের নিয়ে যাবেন। সেখানেই এখন তোরা মা'র কাছে থাকবি। এ সব ব্যবস্থার কথা তো আমি পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয়ে গেছে।"

বীণা মাথা নাড়িয়া বলে, "হ্যাঁ।"

"তোর যখন কলকাতা যাওয়ার এত অনিচ্ছা আর ডাক্তারটিও আমাদের যখন ভরসা দিয়েছেন তোকে তাঁর নিয়ে নার্সিং শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার, তখন ত আর ভাবনাই নাই। যদি চাস তো ভাল করে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য বিলেত পর্য্যন্ত ঘুরে আসতে পারিস্।"

"কি করে?" বিস্ময়ের সঙ্গে বীণা ইন্দ্রাণীর দিকে তাকায়।

"সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"অনেক ত' গিয়ে···" বীণা কথাটা শেষ করিতে পারে না।

ইন্দ্রাণী বলিয়া ওঠে, "অনেক নিয়েছে! তবু ঋণের কতটুকু হাল্‌কা করতে পোরেছি জানি না। থাক্ ও অবান্তর কথা।

যদি বন্দোবস্ত করতে পারিস্ আমায় জানাতে দ্বিধা করিস ... আচ্ছা, এ বিষয়ে আমিই কথা বলে যাব লেডী ডাক্তারটির ...

... এ প্রস্তাবে কিছু মাত্রও সম্ভাবনার আনন্দে আত্মহারা হইয়া ... স্বাভাবিক সুখ-দুঃখে-ঘেরা ঘরোয়া জীবনযাত্রাটুকু পর্য্যন্ত ...পর্য্যস্ত হইতে চলিয়াছিল, এ সব যে তার পক্ষে আলাদীনের ... প্রদীপ-ঘটিত ঘটনার মত!

...ণার মা কলিকাতায় না ফিরিবার নিশ্চিত প্রস্তাবে স্বস্তির ... ছাড়েন। কলিকাতা আজ যেন তাঁর কাছে এক বিভীষিকায় ... হইয়াছে। ইন্দ্রাণী বীণার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সমাপনান্তে ... লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অস্ফুট স্বরে মা বলেন, "ঘরে ঘরে ... মত মেয়ে জন্মাক, ইন্দ্রাণী।"

...ণাও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল শরীর টানিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। ... কোন কথা বলে না, করে না আজও কোন কৃতজ্ঞতা ... চেষ্টা। ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাইয়া থাকে নীরব ...।

...ণী মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলে, "এমন করে মুখের ... তাকিয়ে কি দেখছিস্, ভাই? ... মুখ নিয়ে একেবারে ... না, আবার দেখা হবে। সে বীণার হাতখানা ... দিয়া হাসিতে চায়; কিন্তু বীণার জল-ভরা চোখের ... দিকে চাহিয়া তারও চোখের পাতা জলে ভরিয়া ... গাড়ী ছাড়িয়া দিলে অপসৃয়মান পথ, গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর ... ইন্দ্রাণীর চোখে পড়ে না। তার চোখে লইয়া চলিয়াছে ... জল-ভিজা স্থিরদৃষ্টির ছবি। ... গভীরতম ভাব-প্রকাশে ... যেই হারাইয়া ফেলে, এমনি করিয়া চোখই বুঝি তখন ... কি আর বলিবার ছিল।

... চলিয়া গেলে বীণা আসিয়া দুর্ব্বল শরীরে আশ্রয় নেয় ...। ইন্দ্রাণীকে ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত পরিস্থিতিটা কেমন যেন ... বলিয়া মনে হইতে থাকে। আবার কবে দেখা হইবে ...! কেন জানি বীণার মনে হয়, ইন্দ্রাণীর রওনা হইবার ... আর আসা সম্ভব হইবে না। চাপা কান্নার সঙ্গে ... দু'চোখ ছাপাইয়া জল আসিতে থাকে।···উপযুক্ত ... ভালবাসার বিনিময় ছাড়া তার চাইতে আকর্ষণীয় ... পৃথিবীতে কিছুই নাই!···বীণার মনে হয়, ইন্দ্রাণীর মনে ... আছে এক ব্যথার গুরুভার! যা তার একান্তই নিজস্ব! ... বলিবে কথা দিয়াও কেন যেন আর তা ব্যক্ত করার ... প্রকাশ করে নাই। এড়াইয়াই গিয়াছে! কিন্তু সে ... এই ব্যথা ও দুঃখের উপস্থিতি অনেক সময়ই টের ...! কিন্তু এত যে দিতে জানে, তার জীবন কখনও ... পারে না। এক দিন সে তার ঈপ্সিত জীবনের ... নিশ্চয়ই পাইবে। গৃহকর্ম্মরতা মাতার সুদীর্ঘ নিশ্বাসের ... বোঝে এ নিশ্বাস ইন্দ্রাণীর বিদায়-ব্যথার নিঃশব্দ নীরবতার মধ্য দিয়াও উপলব্ধি করে নিজের ... বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা একই চিন্তার খাতে বহিয়া ...।

[ক্রমশঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ কথা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

রাজনৈতিক মতবাদ

রাষ্ট্রস্থ জনসাধারণের সার্ব্বমঙ্গলিক উন্নতিসাধনের মৌলিক উদ্দেশ্যটা সাধিত হচ্ছে কি না, তার বিচার গোড়া থেকেই ক'রে আসছেন রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিকরা। তারই গবেষণা চলে আসছে তাঁদের গবেষণাগারে। কিন্তু এ বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকদের, সেই সঙ্গে গবেষণাগারেরও, সংখ্যায় একটু আধিক্য ঘটায় বিংশ শতকের রাজনীতি তাঁদের বিভিন্ন রকম আবিষ্কারের দানে হয়ে উঠেছে জটিল ও বহু সমস্যাপূর্ণ। প্রাচীন হব্‌সের গবেষণার মাটির স্বর্গোপম রাষ্ট্র (earthly paradlse) থেকে ওয়াশিংটনের 'aggregate happiness' যে রাষ্ট্রে সেটা, সেকেলের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র যেটা 'desires to make the people happy', আর আজকের লাস্কির ধারণার স্বস্তি ও শান্তিপূর্ণ গণরাষ্ট্র—এ সবই প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিকদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলোর যখন ফলিত রূপ দেখা গেছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, তখন সে আবিষ্কারের কতটা খাঁটি আর কতটা নকল তা বিচারের চেষ্টাও আত্মপ্রকাশ করেছে আর শক্তি সঞ্চয় করেছে আর এক দল বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাগার থেকে। তাই এগুলোর 'পিওর' (pure) হিসেবে যথেষ্ট দর থাকলেও 'এ্যাপ্লায়েড' (applied) হিসেবে সে দরের কসাকসি হয়ে চলেছে যথেষ্টই। আগেকার রাজতন্ত্রের দর সে জন্যে হারিয়েছে আজকের গণতন্ত্রের দরে। গণতন্ত্রের আবার দর-কষাকষি চলছে সমাজতন্ত্র, ফাসিতন্ত্র, 'কম্যুনিজম্' প্রভৃতির দরে।

রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন মতবাদ যখন রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দেশপ্রেমের খোরাক জুগিয়েছে, তখন সেই নেতারাই এগিয়ে এসেছেন সেই সব মতবাদকে বাস্তব রূপ দিতে। বৈজ্ঞানিকরা সেখানে বিশেষ কিছু করেননি। প্লেটো, এ্যারিষ্টটল্, বেন্থাম, মিল, রুসো—এঁরা গণতন্ত্রের এক-একটা আদর্শ মতবাদ সৃষ্টি করেই গেছেন, কূটনৈতিক রাষ্ট্রপরিচালকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের হাল ধরে সে মতবাদ ফলাতে আসেননি। আর তা করতে আসেননি বলেই সেখানে তাঁদের মতবাদের আদর্শের মধ্যে মিশতে দেখা গেছে ভেজাল। তাই রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও পরিচালন ব্যাপারে একই মতবাদে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন রূপান্তর। এ্যারিষ্টটল ও প্লেটোর গণতন্ত্র আর লাস্কির গণতন্ত্র নামে এক হলেও প্রয়োগ-ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা পৃথক। আজকের গণতন্ত্র আবার দেশভেদে দেখিয়েছে রূপভেদ। মার্কিণ গণতন্ত্র আর বৃটিশ গণতন্ত্র একটু বিভিন্ন, বৃটিশ গণতন্ত্র আর ফ্রান্সের গণতন্ত্র বিভিন্ন, ভারতীয় গণতন্ত্র ঠিক ওদেরটার মত নয়, পাকিস্তানেও একটু অন্য রকম। এর জন্যে অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র পরিবর্ত্তনের প্রভাবটাও স্বীকার্য্য। 'কম্যুনিজমে'র বেলায় রূপান্তর থাকলেও এতটা নয়। কারণ, মার্ক্স লেনিনের মত রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিকদের মতবাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় তাঁদের প্রভাব খানিকটা ছিল বলেই তাঁদের আদর্শে দেখা যায়নি অতটা

গ্লানি। ফাসিবাদের বেলায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মুসোলিনির হাত যথেষ্ট ছিল বলে তাঁর রাষ্ট্রে পার্থক্য লক্ষিত হয়নি। অন্যান্য কোন কোন রাষ্ট্রে কিন্তু ফাসিবাদের বিকৃত আকারের প্রভাব খানিকটা দেখিয়েছেন সমালোচকরা। এই সব কারণে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে এসে পড়েছে এমন একটা বিপর্যয়, যাতে হিমসিম খেয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা নানা রকম মতবাদের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করছেন। তাই দলাদলি ও বাদ-বিসম্বাদ তাঁদের মধ্যে এসে পড়েছে যথেষ্ট, যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে নানা রকম 'ইজম্' (ism) বা তন্ত্র বা বাদ। সে রকম প্রধান দু'-একটাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রসংগঠনের ইতিহাসে আমরা জেনেছি, গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের পরবর্তী তন্ত্র। প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ গঠিত যখন হয়েছিল এক জন নেতার নেতৃত্বে, তখন নেতার কর্তৃত্বই ছিল সার্বভৌম। এ কর্তৃত্ব পরে হয়ে দাঁড়ায় বংশগত অধিকার আর নেতার পরিচয় হয় রাজা নামে। এই ভাবে রাজতন্ত্রের জন্ম। কালক্রমে রাজার কর্তৃত্বের মাত্রাটা যখন অতিমাত্রায় পৌঁছয়, তখন প্রজাদের মাঝে জ্বলে ওঠে অশান্তি যার আগুন রাজতন্ত্রকে একেবারে পুড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় গড়ে তোলে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের জয়যাত্রা এগিয়ে যেতে থাকে জন-বলে গণ-জাগরণের অনুপ্রেরণায়। ১৬৫৩ নাগাদ ইংলণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় চার্লসকে সরিয়ে দিয়ে গড়ে ওঠে ক্রমওয়েলের সাধারণতন্ত্র, ১৭৮৩তে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সেখানে বিজয় ঘোষণা করল গণতন্ত্রের। তার কিছু বছর পরে ফরাসী বিপ্লবের ফলে সেখানে রাজতন্ত্র হার মানল নেপোলিয়ানের প্রজাতন্ত্রের কাছে। এই ভাবে একটা ভিত্তি স্থাপন করে নিয়ে গণতন্ত্র ক্রমেই এগুতে থাকে শক্তিসঞ্চয় ক'রে আর আজ পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে দাবী করতে পারছে অপ্রতিহত ক্ষমতা।

গণতন্ত্রের একটা ভাল সংজ্ঞা আমরা আগেই পেয়েছি লিঙ্কনের কাছে। এটা হচ্ছে গণের, গণের দ্বারা, আর গণের জন্যে গভর্ণমেণ্ট।' গভর্ণমেণ্ট 'গণের আর গণের জন্যে এটা সব সময় সত্যি। কিন্তু গণের দ্বারা বলতে বুঝতে হবে আজকাল সকলেরই নয়, তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যকের। অধিক সংখ্যকের আবার এমন হওয়া চাই যাতে অল্প সংখ্যকের আস্থা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা না হারায়। অধ্যাপক হার্ণশ' (Hearnshaw) গণতন্ত্র বলতে বোঝেন সেটাকে— যেটাতে আমরা দেখব আছে একটা সাম্যবাদী সমাজ, একটা জনগণের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আর এমন এক শাসনযন্ত্র যাতে জনসাধারণের আছে সক্রিয় প্রভাব, সরাসরিই হ'ক আর তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই হক। কাজেই গণতন্ত্র দেখছি দু'রকম জনসাধারণের কর্তৃত্বের দিক থেকে—সরাসরি (Direct) ও প্রতিনিধিত্বমূলক (Representative)। সরাসরি গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল আগেকার এথেন্স, গ্রীকের মত ছোট ছোট রাষ্ট্রে, যেখানে রাষ্ট্রের সব ব্যক্তিই এক জায়গায় সমবেত হয়ে হাত তুলে জানাত তাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের ইতিহাসেও মেলে এ রকম গণতন্ত্রের ব্যবস্থা। বৈদিক যুগে রাজারা 'সভা' ও 'সমিতি' ডেকে প্রজাদের মতানুযায়ী শাসন-কার্য্য চালাতেন বলে জানা যায়। বৌদ্ধযুগের বিদেহ, লিচ্ছবি প্রভৃতি রাষ্ট্রেও ছিল এই নিয়ম। খৃষ্টপূর্ব চারশ' অব্দ থেকে চারশ' খৃষ্টাব্দ অবধি লিচ্ছবিকা, কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি রাষ্ট্রের এ রকম গণতন্ত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে। আজকের যুগেও যে এমন নেই তা নয়। সুইজারল্যাণ্ডের ছোট ছোট ক্যাণ্টন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংলণ্ডের মত ছোট রাষ্ট্রে সরাসরি ব্যবস্থা এখনও অনেকটা আছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্রের আয়তন, লোকসংখ্যা ইত্যাদি সব বিষয়ের বাহুল্য হেতু এসে গেছে এত জটিলতা যে, সরাসরি ব্যবস্থার চিন্তাও সেখানে অবান্তর। তাই এ সব রাষ্ট্রে আছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এ নিয়মে গণতন্ত্রের পবিত্রতা দেখিয়ে রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক ব্লুণ্টশ্লি (Bluntschli) বলেছেন, এতে "the people governs through its officials while it legislates and controls the administration through its representatives।" আদর্শের দিক থেকে খাঁটি গণতন্ত্র সেটাকে বলা যায় যেটাতে দেখা যাবে একটা সুসঙ্গত সামঞ্জস্য গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ আর জনগণের সাধারণ সুসম্মতির (General will) সঙ্গে। এ সামঞ্জস্য যেখানেই আছে সেখানে এর সুফল পাওয়া গেছে যথেষ্ট। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুষ্ঠু দল-প্রথায় চালিত সরকারী শাসন-পরিচালনা হয়েছে সংযত, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাধারণ ব্যক্তি সজাগ ও সচেতন হয়েছে গণতন্ত্রের আবহাওয়ায়, জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে স্বদেশ-প্রীতি যার জন্যে এসেছে ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রী। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স নয়, রুশিয়া, জার্মাণী, ইটালীতেও ছিল গণতন্ত্র। তাছাড়া চীন, জাপান ও প্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রেও গণতন্ত্র ছিল। কিন্তু এ রকম চলল না বেশী দিন। এল ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের এল কঠিন পরীক্ষার সময়। এ যুদ্ধের ভীষণতার ফলে ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রে দেখা দিল দারুণ বিপর্যয় যার সঙ্গে এঁটে উঠতে গিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ করে ফেলল দুর্বলতা। মহাযুদ্ধের পর যে অর্থ নৈতিক সঙ্কট তীব্র আকার নিয়েছিল তাকে ঠিক ভাবে দমন করতে গণতন্ত্র হ'ল অনেকটা অপারগ। তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধায় তার গোদের উপর দেখা দিল বিষফোঁড়া। বড় বড় গণতান্ত্রিক নেতারা চীৎকার করতে লাগলেন, তাঁরা গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্যেই যুদ্ধ করছেন, কিন্তু তাঁদের কার্য্যকলাপ অনেকের কাছে এতই অপ্রিয় হয়ে উঠল যে, তাঁদের পার্লামেণ্ট আখ্যা পেল "Talking shop"। ইটালী থেকে মুসোলিনির প্রতিবাদ এল, "Fascism denies that majority (গণতন্ত্রক প্রথায়)···can direct human society"। হিটলারও বলে উঠলেন, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন-সভা "passes some act or decree which may have the most devastating consequences, yet nobody bears the responsibility for it"। লেনিনও বলেছিলেন, গণতন্ত্রক পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ পোষণ করে, সাম্রাজ্যবাদ আবার বাধিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ যাতে পুঁজিবাদ নিজেই ধ্বংস পায়।

আমরা আগে জেনেছি, রাষ্ট্র যে নীতির দ্বারাই পরিচালিত হ'ক, তার গঠনের মূলে থাকে অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রভাব। গণতন্ত্রেও এ অর্থ নৈতিক অবস্থা গুছিয়ে নিতে হয়েছে ভাল ক'রে। তাই

…র্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নীতি গড়ে নিতে হয়েছে তাকে … করা হয়েছে 'ধনতন্ত্র' বা 'পুঁজিবাদ' বা 'ক্যাপিটালিজম্' …talism) বলে। এটা এমন একটা নীতি যার সমর্থনে যে …ক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুঁজি ক'রে রাখবার অধিকার …ছে। গণতন্ত্রের বিশ্বাস, দেশকে উন্নত করতে হ'লে চাই …র্থিক অবস্থার উন্নতি, যার জন্যে দরকার শিল্পকেন্দ্র ও …খানার দ্রুত উন্নয়ন! এটা করতে হলে চাই প্রচুর টাকা, …সতে পারে জন কয়েক বিচক্ষণ শিল্প-পরিচালক বা …নিয়রে'র (entrepreneur) কর্ম্ম-কুশলতায়। তাঁরাই … কল-কারখানাগুলোতে শ্রম ও মূলধন ঠিক ভাবে নিয়োগ ক'রে … যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলোকে উন্নত করতে। যন্ত্রের ব্যবস্থা …ড়েছে, ততই দেখা দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ …শিল্পক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন ক'রে ব্যবসায় একচেটিয়া …onopoly) আনা। ফলে দেখা গেছে প্রতিযোগিতা, যাতে … পেরেছে বড় বড় 'large-scale' প্রতিষ্ঠানগুলোই …কে পিছনে ফেলে। এতে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে, … শিল্পপতির মুনাফার অংশ ক্রমেই চলেছে বেড়ে, আর অপর … কমে। এক দল পাচ্ছে সব, আর এক দল হারাচ্ছে … ফলে দেখা দিচ্ছে একটা অশান্তি, বিশেষ ক'রে শ্রমিকদের … পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্থাপিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র … দিয়েছে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য, বিভেদ, পার্থক্য, যার সুবিধে নিয়ে …রা আরম্ভ ক'রেছে গণতন্ত্রের জোর অপপ্রচার। তা'ছাড়া … রাষ্ট্রের বিশেষত্ব হচ্ছে, শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা … পতনের চক্র সৃষ্টি করা—যেটাকে বলা হয় 'ট্রেড … Trade Cycle)। এক সময় অনুকূল অবস্থা পেয়ে …খানাগুলো উন্নতির চরমে ওঠে যখন ব্যবসায় উৎপাদন, … নাফা সবই হয় সর্ব্বাধিক! এ অবস্থাকে অর্থনীতির … হয় বুম (boom)। আবার তার পর এমন এক … পন অবস্থা দাঁড়ায় ঠিক বিপরীত। সে অবস্থাকে বলে …ump)। 'বুম' আর 'শ্লাম্প' আসে নিয়মিত ভাবে। … 'শ্লাম্প,' 'শ্লাম্পে'র পর 'বুম'। এই রকম অস্থির … অবস্থাই অনেকটা দায়ী দেশে দারিদ্র্য, অশান্তি, অভাব, … আসতে জনসাধারণের মাঝে। সুতরাং দেশের বৃহৎ … পড়ে, সেই সঙ্গে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে পুঁজিবাদী … সমাজতন্ত্রবাদীরা এ সব যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, "…n contains within itself the seeds of …struction"।

… ধনতান্ত্রিক সমাজের এ রকম অসামঞ্জস্য সুযোগ দিয়েছে … (Socialism) জন্মাতে। ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে … প্রধান অভিযোগ হচ্ছে, পুঁজিবাদ সমাজে এনে দেয় … মত বৈষম্য। ন্যায়, বিচার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সৌন্দর্য্য- …এ পরিপন্থী, আর এর স্বীয় কার্য্য-পরিচালনায় এ …র্ধা। এর মধ্যে প্রথমটাই লেগেছে সব চেয়ে কটু। … সুযোগ-সুবিধের অসাম্য (inequality) এতটা … রূপ নিয়েছে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে, বার্ণাড শ'র …ard Shaw) সাহিত্যিক মনও বলে ফেলেছিল সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে, "Socialism means equality of income and nothing else"। গোল্ডস্মিথের (Goldsmith) মত কবিও বলেছিলেন, এ রাষ্ট্রে "wealth accumulates and men decay"। এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ আবিষ্কারের জন্যই সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি। সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ হচ্ছে, একটা ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ্য ভাব যাতে আসতে পারে না কোন রকম শ্রেণিবৈষম্য, এমন একটা সামাজিক পরিস্থিতি যেখানে আর্থিক অবস্থার পার্থক্য এমন থাকবে না যাতে অবাধ মেলামেশায় বাধা থাকে, উৎপাদনের সামগ্রীগুলো থাকবে জনসাধারণের অধিকারে ও ব্যবহারে, আর থাকবে জনগণের একটা নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ, সকলের সাধ্যমত পরস্পরের সাহায্য ও সেবা করা। এ আদর্শে পৌঁছতে গেলে কল-কারখানার দ্বারা পরিচালিত বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে, আর তা করতে হলে এ চায় গণতান্ত্রিক প্রণালীই প্রয়োগ করতে, এর বিরোধী না হয়ে। 'পার্লামেণ্টারী ডেমক্রেসী'র যে সুফলটা পাওয়া গেছে সেটারই অনুবর্ত্তী হয়ে চলতে চায় সমাজতন্ত্র। তাই গণতন্ত্রের বিরোধী এ নয়। আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে এর প্রাথমিক কর্ত্তব্য হচ্ছে কলকারখানার সংস্কার সাধন করা। সেগুলোতে উৎপাদনের উপকরণগুলো এখন যেমন আছে মুষ্টিমেয় ক'জন পুঁজিবাদী শিল্পপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে, তখন সে রকম রাখলে চলবে না। সেগুলোর কর্ত্তৃত্ব, অধিকার ও পরিচালনার ভার দিতে হবে জনসাধারণের সমষ্টিগত শক্তির উপর। তাতে শ্রমজীবি ও শিল্পপতিদের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানটা এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা আর থাকবে না। শ্রমিকরা যে শ্রম বিক্রি করে তার দাম শুধু তাদের দৈনন্দিন কৃচ্ছ্রতাই, আর তাদের শ্রমার্জ্জিত যে প্রচুর লাভ হয় তা যায় শিল্পপতিদের ঘরে। সমাজতন্ত্র এ নীতি মানতে চায় না। এ অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্যে সমাজতন্ত্রবাদীরা চান নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি (economic plan) প্রস্তুত করতে, যাতে সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য এনে সাধারণ মঙ্গলসাধনের সাহায্য হবে। এ রকম ব্যবস্থা করতে গেলে এক দল সমাজতন্ত্রবাদী আবার অনেক দূর এগিয়ে যেতে চান। তাঁরা শুধু পুঁজিবাদেরই ধ্বংস চান না, বর্ত্তমান আকারের কোন রকম রাষ্ট্র তাঁরা রাখতে চান না, তাঁরা চান শ্রমজীবিদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই হবে কল-কারখানাগুলোর মালিক আর সে রকম ব্যবস্থায় পরিচালিত এক রাষ্ট্র। তাই তাঁদের উদ্দেশ্য 'ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন ক'রে ধর্ম্মঘটাদির দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়তে। তার জন্যে শিল্পকেন্দ্রগুলোতে বিপ্লব চালাতেও তাঁরা প্রস্তুত। তাঁদের এ মতবাদকে বলা হয় সিণ্ডিক্যালিজম্ (Syndicalism)। সিণ্ডিক্যালিষ্টরা মার্ক্সবাদোক্ত শ্রেণিসংগ্রামে (class war) বিশ্বাসী। সুনিয়ন্ত্রিত শ্রেণিসংগ্রামের দ্বারা তাঁরা চান ধনতান্ত্রিক শিল্পপতি ও ভূম্যধিকারীদের দমন করতে। এর জন্যে খোলাখুলি বিপ্লব করতেও সাহস রাখেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁরা কিন্তু সোস্যালিষ্টদের মত 'পার্লামেণ্টারী ডেমক্রেসী'তে বিশ্বাসী। এখানেই মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপের ক'টা রাষ্ট্রে 'সিণ্ডিক্যালিজম্' বেশ কিছু সমর্থন পেয়েছিল, কিন্তু দু'টো মহাযুদ্ধের পর থেকে এ প্রভাব অনেকটা হারিয়েছে। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের গোড়ায় ইংলণ্ডে আর এক মতের সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল হবসনের

(Hobson) নেতৃত্বে। এর নাম 'গিল্ড সোস্যালিজম্' (Guild Socialism)। সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে এর পার্থক্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে। 'গিল্ড সোস্যালিষ্ট'রা চান শিল্প-কেন্দ্রগুলো হবে এক-একটা স্বায়ত্তশাসিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যার কাজ চলবে 'ষ্টেটে'র সনদের বলে। তাই ষ্টেটকে তাঁরাও অস্বীকার করেন না। প্রতিষ্ঠানের নেতা বা কর্ত্তা নিযুক্ত করবে শ্রমিকরা নিজেরাই। কাজেই একটা সাম্যভাব আসবে সহজে, ফলে থাকবে না কোন রকম অশান্তি।

এ-পর্য্যন্ত যে সব মতবাদের পরিচয় আমরা পেলুম সেগুলো মূলত: গণতন্ত্রকেই ভিত্তি করে, তাকে অস্বীকার ক'রে নয়। কিন্তু এবারে আমরা পরিচয় পাব এমন কতগুলো মতবাদের যারা গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। গণতন্ত্রের যে সব কুফল ও দোষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধরা পড়েছে সেগুলোর সুযোগ নিয়েই দেখা দিয়েছে এমন রাষ্ট্র, যেখানে রাষ্ট্রপরিচালনা ও শাসনকার্য্য নির্দ্ধারিত হচ্ছে এক জন অধিনায়কের নির্দ্দেশে, জনমতের নির্দ্দেশে নয়। এ রকম অধিনায়ককে বলা হয় 'ডিক্টেটর' (Dictator)। রাজতন্ত্রের রাজার চেয়ে ডিক্টেটরদের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা অন্য রকম। কারণ 'ডিক্টেটর'রা জনগণের নির্ব্বাচিত, তাঁরা এক-একটা সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পার্টির নেতা। পার্টির বলেই 'ডিক্টেটরে'র বল। ষ্টালিন, হিটলার, মুসোলিনির মত এক-এক জন 'ডিক্টেটর' এক-একটা রাজনৈতিক দলের নেতা। দলের মতানুকূলেই তাঁদের কর্ত্তৃত্ব, যদিও দলের গঠন ও পরিচালনায় তাঁদের নেতৃত্বই অগ্রগণ্য। 'ডিক্টেটর'দের দ্বারা পরিচালিত যে রাষ্ট্র তাকে পরিচিত করা হয়েছে 'টোটালিটারিয়ান' (Totalitarian) রাষ্ট্র বলে। এটা এমন এক রকম রাষ্ট্র, যেটা সব বিষয়ে সব দিক দিয়ে সার্ব্বভৌম। রাষ্ট্রস্থ এমন কিছুই নেই যা এর কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনাধীনে নেই। এমন কি মানুষের নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক বৃত্তিগুলো—যেমন ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, রয়েছে এর চালনায়। এক কথায় এ রাষ্ট্র সর্ব্বগ্রাসী। এ রাষ্ট্রে জনগণের সত্তা সম্বন্ধে মুসোলিনি বলেছেন, এ "accepts the individual only in so far as his interests coincide with those of the state"। সে জন্যে এ রাষ্ট্রগণবিরোধী, ব্যক্তিবিরোধী। এ চায় রাষ্ট্রের চরম উন্নতি, জনসাধারণের উন্নতি রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই, রাষ্ট্রকে ছেড়ে নয়। রাষ্ট্র জনগণের উপরে, জনগণ তার উপরে নয়। এ হ'ল মুসোলিনির মত, অনেকটা 'হেগেলিয়ান' (Hegelian)। হিটলারী 'টোটালিটারিয়ান' রাষ্ট্র কার্য্যত: এ রকম হলেও আদর্শের দিক দিয়ে একটু অন্য রকম। তাঁর মত জনের উপরে রাষ্ট্র তো বটেই, রাষ্ট্রের উপরেও আছে দল ও দলের নেতা। সোভিয়েট রাষ্ট্র আবার আর একটু এগিয়ে যায়। সে চায় রাষ্ট্রের ক্রম অন্তর্দ্ধান (withering of the state)। সেটা যখনই সম্ভব হবে তখন সার্ব্বভৌম ক্ষমতা হাতে আসবে 'প্রোলেটারিয়েট' (Proletariat) বা কায়িক শ্রমজীবিদের। ষ্টালিন ঠিক এ অবস্থাটা আনতে এখনও পাচ্ছেন না বলে স্বীকার করেছেন, পুরো কম্যুনিজম এখনও সোভিয়েট রাষ্ট্রে স্থাপিত হতে পারেনি।

ইটালীর ফাসিবাদ গণতন্ত্রবাদের ঠিক বিপরীত। গণতান্ত্রিক সাম্যবাদ ও সংখ্যাধিক্যের দ্বারা 'গভর্ণমেন্ট' এ একেবারেই মানতে চায় না। এ বাদ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফাসিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা শক্তির দ্বারা। তাই এ বাদ মুসোলিনির মতে, "government for the people, over the heads of the people, and if necessary, against the people"। ইটালীতে ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠা পাবার সাহায্য পেয়েছে তার বিচিত্র ঐতিহাসিক অবস্থা থেকে। কতগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক দিন থেকেই গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে আসছিল। গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল ১৮৭০ থেকে ১৯২২ অবধি নামে মাত্র, কাজে নয়। তাই দেখা গেছিল এমন এক জাতীয় চরিত্র, যেটা পরিচালিত হতে চেয়েছিল এক জন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নেতার দ্বারা, আর এসে পড়েছিল এমন এক অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়, যার থেকে উদ্ধার পেতে জাতি চেয়েছিল একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ও প্রতিজ্ঞা। এই সময় মুসোলিনির মত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এক নায়কের সন্ধান মিলে গেল পথটা দেখবার জন্যে। প্রথম দিকে মুসোলিনি ছিলেন বিদ্রোহী সমাজতান্ত্রিক। পরে তাঁর মতবাদকে আরও শক্ত করে নিয়ে একটা শক্তিশালী দল গঠন করলেন 'ফাসিস্ত দল' (Fascist Party) ১৯১৯ সালে, যার মতবাদকে বলা হয় ফাসিবাদ (Fascism)। ১৯২২এর অক্টোবরে নির্ব্বাচন যুদ্ধে দলটি জয়লাভ করে ও তাঁর শাসন-ক্ষমতা হয় সুপ্রতিষ্ঠি[illegible] মুসোলিনির বলেই ফাসিবাদের বল। তাঁর মত দৃঢ় ও অদ্ভু[illegible] ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার নেতৃত্বেই 'ফাসিষ্ট' পার্টির ও 'ফাসিজমে' শক্তি। তাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে এমন কোন ব্যক্তিই থাকতে পারে[illegible] যে বিরুদ্ধাচরণের সাহস রাখবে। যদি কেউ সে সাহস করে ত[illegible] তাকে শাস্তি পেতে হয় বেশী রকম। একবার এক উৎসবের স[illegible] তাঁর প্রাণ নেবার চেষ্টা করেছিল এক দল ষড়যন্ত্রকারী। তাতে [illegible] গিয়ে তিনি আইন করে দেন, যদি কোন ব্যক্তি ফাসিস্ত দল ছা[illegible] অন্য দলে যোগ দিতে বা অন্য দল গঠন করতে চায় তবে তা[illegible] রাষ্ট্রদ্রোহী বলে বেশী রকম শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক ক্ষে[illegible] শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেসরকারী মালিকত্ব অনুমোদন ক[illegible] হয় ফাসিবাদী রাষ্ট্রে। তবে সে রকম মালিক সব স[illegible] লক্ষ্য রাখবেন জাতীয় স্বার্থের দিকে আর চলবেন রাষ্ট্রের ক[illegible] নির্দ্দেশে। শ্রমিকদের ধরা হয় জাতীয় উৎপাদনের সক্রিয় সহা[illegible] হিসেবে। কিন্তু বেসরকারী মালিকত্বের প্রথা যখন রাখা হ[illegible] তখনই সুযোগ পেয়েছে সেখানে 'ক্যাপিটালিষ্ট'-শ্রেণী মাথা তু[illegible] যার এতটা অপবাদ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। কৃষির ব্যাপারেও ভূস্বামী[illegible] দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট সুবিধে। উৎপন্ন অংশের প্রায় তিনের এক[illegible] ভূস্বামীরা পান খাজনা হিসেবে। এই সব কারণে মুসোলিনির ফা[illegible] রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায় ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আর ফা[illegible] দল যায় ভেঙ্গে।

গত যুদ্ধপূর্ব্ব জার্ম্মাণীর নাজিবাদী রাষ্ট্রও 'টোটালিটারি[illegible] রাষ্ট্র। হিটলারের 'ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট পার্টির (Natio[illegible] Socialist Party) যে মতবাদ তার নাম নাজিবাদ (Nazis[illegible] আদর্শের দিক থেকে নাজিবাদী রাষ্ট্র দাবী করে পবিত্র আর্য্য [illegible] বলে। তাই এ হতে চায় সজীব জাতীয় সংগঠক (liv[illegible] organism of a folk community), যাতে জাতি শুধু [illegible] হয়েই থাকবে না, এগিয়ে চলবে মানব জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধী[illegible]

দিকে আদর্শ বুদ্ধিমত্তার সাধনায়। তাই গোয়েরিং (Goering) সমস্ত জার্মাণ অধিবাসীর কাছ থেকে দাবী করেছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত সত্তাকে বিলিয়ে দেবে নাজি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের কাছে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আবার নাজি দলের ও তার দলপতির কর্তৃত্ব, যার উপরে থাকবে না আর কোন রকম কর্তৃত্ব। হিটলার সগর্বে বলেছিলেন, "We command the State. The leader is the Party and the Party is the leader"। এখানে নাজি পার্টির একাধিপত্যে চালিত রাষ্ট্রের স্বার্থে অন্য সব কিছুই করা হয়েছে বিসর্জ্জিত। ফলে অত্যধিক আঁটনে গেরো ফসকা হয়ে গেছে [illegible] ১৯৪৩-এর পর এ রাষ্ট্রকে পড়তে হয়েছে ধ্বংসের মুখে।

'কম্যুনিজম্', যেটা সোভিয়েট রুশিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে [illegible] সেটা সমাজতন্ত্রবাদের চরম বাদ। কম্যুনিজমের স্রষ্টা কার্ল [illegible] (Karl Marx) বলেছিলেন, 'সোস্যালিজম্' 'কম্যুনিজমে'র [illegible] অবস্থা। মূলতঃ গণতন্ত্রের পুঁজিবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই [illegible] মুনিজমের উৎপত্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এ বলে উৎপীড়নের [illegible], যেখানে চলে শ্রমজীবি শ্রেণীকে কঠোর দমনে চেপে রাখবার [illegible] শ্রেণীদের একটা ষড়যন্ত্র। তাই এ চায় রাষ্ট্রকে একেবারে [illegible] করে দিতে। রাজনৈতিক অর্থনীতির যে মতবাদ মার্ক্স সৃষ্টি [illegible] ছিলেন তাই 'কম্যুনিজম্' নামে খ্যাত। সুতরাং এর গোড়া [illegible] হলে মার্ক্সের সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার। তাঁর জীবনকাল [illegible] থেকে ১৮৮৩। এক জার্মান আইনজীবির পুত্র মার্ক্স তাঁর [illegible] জার্মানীতেই কাটান। তখন তিনি হেগেলের দার্শনিক [illegible] বিশ্বাসী ছিলেন। পরে সাংবাদিক হয়ে তিনি যান প্যারিসে [illegible] তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রাউধন (Proudhon) প্রমুখ [illegible] সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে। এখানেই তিনি পরিচিত হন [illegible] সমাজতন্ত্রী নেতা এঙ্গেলসের (Engels) সঙ্গে যাঁর সঙ্গে তাঁর [illegible] মিল পাওয়া গেল যথেষ্ট। সমাজতন্ত্রের আদর্শকে মার্ক্স [illegible] ভাবপ্রবণ মনে করতেন। তিনি চাইতেন এমন এক [illegible] যেটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পথে প্রযুক্ত হতে পারে বাস্তব [illegible] এই বৈজ্ঞানিক পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি [illegible] রাষ্ট্রসংগঠনকারী ঐতিহাসিক ক্রমবর্দ্ধন (historical [illegible]tion) সম্ভব হয়েছে বিপ্লবের পথেই, সমাজতন্ত্রবাদের [illegible]য়ান' (utopian) আদর্শের পথে নয়। তিনি যখন [illegible] ফেরেন তখন সেখানকার রাজনীতি সাধারণতঃ রিকার্ডো (R[illegible]rdo) প্রমুখ 'ক্ল্যাসিকাল' অর্থনীতিবিদদের মতবাদে [illegible], যেটাই মার্ক্সের মতে 'গণতন্ত্রের কুখ্যাত পুঁজিবাদী [illegible] ও শ্রেণিবৈষম্যের জন্তে দায়ী। তাই তিনি ১৮৪৮ [illegible] প্রকাশিত করলেন 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো (Communist M[illegible]festo)। এতে তিনি কম্যুনিজমের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা [illegible]ন। এই বই আজকের রুশিয়ার পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ, তার [illegible] এর প্রকাশের ফলও ফলেছিল আশ্চর্য্য, ঘটেছিল ১৮৪৮-এর [illegible] উন্মাদনায়। ১৮৬৭তে মার্ক্স লিখলেন 'ক্যাপিটাল' [illegible]ital)। এতে ধনতন্ত্রের আছে বিশদ বিশ্লেষণ যাতে দেখান [illegible] পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি ধ্বংসপ্রাপ্তি। কম্যুনিজমের [illegible] রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে শ্রেণিবৈষম্য ও এক শ্রেণীর দ্বারা অপর উৎপীড়নের যন্ত্র হিসেবে; এ যন্ত্রটা চালিত হয়েছে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে। এ রকম অসামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্র টিঁকতে পারে না। এ অবস্থায়, মার্ক্স বলেন, শ্রেণিসংঘাত অনিবার্য্য। তাতে 'প্রোলেটারিয়েট' শ্রেণীই জয়লাভ করে 'ডিক্টেটরশিপ' চালাবে। সে 'ডিক্টেটরশিপ' আর কিছুই নয়, শ্রেণিহীন সাম্যবাদী এক সমাজ-সৃষ্টি ও পরিচালন। তাতে এমন এক অবস্থা দেখা যাবে যখন সকলে মার্ক্সবাদের নির্দ্ধারিত আদর্শ পথে চলতে শিখবে, আর সমাজে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের জন্তে দরকার হবে না একটা পৃথক ভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনার। তাই তখন গভর্ণমেণ্ট বলে কিছু থাকবে না। এই ভাবে যে সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে রাষ্ট্র ক্রমে অন্তর্হিত হতে থাকবে। এই রকম আদর্শের দিকে 'সোভিয়েট কম্যুনিজমে'র লক্ষ্য। এ আদর্শে পৌঁছতে অবশ্য 'সোভিয়েট রিপাবলিকে'র এখনও অনেক দেরী। এ কথা ষ্টালিন স্বীকার করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'কম্যুনিজম' গণতন্ত্রপ্রসূত পুঁজিবাদী অর্থনীতির একেবারে বিরোধী। এর মতে শ্রমই হচ্ছে দেশের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। তাই শ্রমিকদের রাখতে হবে এমন ভাবে, যাতে তাদের সমর্থনে তাদের সবটা শক্তি প্রযুক্ত হতে পারে তাদের নিজেদেরই পরিচালনায়। তবেই থাকবে না কোন রকম শ্রম-অশান্তি। শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টায় তাদেরই স্বার্থে পাওয়া যাবে দেশের ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এ ব্যাপারটা বোঝেনি বলে সেখানে দেখা যায় শ্রমিকদের অবহেলা ও তাদের স্বার্থের বিনিময়ে অল্পসংখ্যক পুঁজিবাদী শিল্পপতির বিপুল ঐশ্বর্য্য যার বিষফল ফলেছে শ্রেণিবৈষম্য ও আর্থিক অবস্থার চরম বৈষম্য। ধনতন্ত্রবাদের মূল্য (Price) ও বিনিময় (Exchange) নীতি একেবারে বাতিল করতে চায় কম্যুনিজম্। লেনিনের মতে, 'কম্যুনিষ্ট' সমাজে উৎপাদন-শক্তি এতই বেশী হবে যে, প্রত্যেক শ্রমজীবি শ্রম দেবে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী। তখন উৎপন্ন দ্রব্যের এমন আধিক্য দেখা দেবে, যাতে বণ্টন-ব্যবস্থার জন্তে বিশেষ চিন্তিত হতে হবে না। সকলেই পাবে প্রয়োজনানুরূপ ('each according to his needs') সেই উদ্দেশ্যেই সোভিয়েট রাষ্ট্রে উৎপাদনের প্রধান উপাদান ভূমি (Land) ও মূলধনের (Capital) জাতীয়তাকরণ সাধিত হয়েছে। এতে সব রকম পুঁজিবাদী শ্রেণী হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন। কিন্তু তা বলে সেখানে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ পেয়েছে তা নয়, যদিও কম্যুনিজম তা করতে চায়। সকলেই যে একমাত্র মালিক সরকারের অধীনেই কাজ করে তা নয়। এমন ব্যক্তিও আছে যারা নিজেদের ইচ্ছামত উৎপাদন কার্য্য চালাতে পারে ও উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। অনেকের ধারণা, সোভিয়েট রাষ্ট্রে আয়ের পার্থক্য নেই। কিন্তু তা ভুল। সেখানে সাধারণ এমন শ্রমিক আছে যাদের মাসিক আয় একশ' রুবেলও নয়, আবার এমন অনেক উচ্চপদস্থ ও সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁদের মাসিক আয় প্রায় দশ-বার হাজার রুবেল। অবশ্য এ বৈষম্য ধন-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে যত বেশী ততটা নয়, বরং অনেক কম। সোভিয়েট রাষ্ট্র আশা করে, প্রকৃত কম্যুনিজমের প্রভাবে সেখানে অদূর ভবিষ্যতে এ রকম বৈষম্য ক্রমে হ্রাস পেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নাগরিক অধিকার হিসেবে সোভিয়েট নাগরিকদের অর্থনৈতিক বিষয়ক অধিকার ছাড়া গণতান্ত্রিক নাগরিকের মতই প্রায় অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যেমন স্বেচ্ছায় কাজ বেছে নেওয়া, শিক্ষা গ্রহণ করা,

বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দ

ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[পরমহংসদেবের ঘর—দক্ষিণেশ্বর। অদূরে দেখা যাইতেছে নহবৎখানা—যেখানে নীচের একটি ছোট ঘরে 'শ্রীমা' বাস করেন, রাত্রে ঠাকুর ও ভক্তদের জন্য রন্ধনাদি করেন। ঐ পার্শ্বে কুটীরখানা—যেখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া মথুর বাবু (ঠাকুরের প্রথম রসদ্দার) থাকিতেন ও "বাবা"কে দর্শন করিতেন। অদূরে বিশাল "পঞ্চবটীতলা" ও "সাধন-কুটীর"—সম্মুখে ভাগীরথী কলনাদিনী। ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া ঠাকুর মেঝেয় উপবিষ্ট বালক ভক্তগণের সহিত সহাস্যে কথা বলিতেছেন। বাবুরাম, যোগীন, শশী প্রভৃতি। শনিবার—অপরাহ্ণ ৪।৫টা। কিছু পরে সন্ধ্যা নামিল। কালী-মন্দিরে পূজারতির শাঁখ-ঘণ্টা বাজিল। এই ধ্বনি যেন দেবতার আশীষের মত বর্ষিয়া বর্ষিয়া ভাসিয়া দূর হতে দূরান্তরে চলিল। ঘরে ধূপ-ধূনা দেওয়া হইল।]

ঠাকুর। (সকলকে) "জানিস্ তো—যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম, আর যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম!" তুলসীদাসের এই কথা বড় সত্য রে। আমার ভেতরেও একবার কাম-ভাব এসেছিল। মাকে বললুম, 'মা, এমন হলে তবে গলায় ছুরি দেব।' সেই ধারণ করলেই ওগুলো যাবে। কিন্তু ওগুলো তাড়াতে হবে। মেয়ে-মানুষে আছে কি? হাড় মাস রক্ত ইত্যাদি। ওদের মোহিনী মায়ায় সবাই মুগ্ধ। মহামায়ার মায়া ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ে আছে পারি, জীবে কি তা জানতে পারে? আমার সন্তান-ভাব—তাই ব্যাকুল হয়ে বলতে হয়, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়া থেকে আমায় রক্ষা কর।'"

বাবুরাম। কিন্তু ধ্যান করতে বসলেই মনে যত আজেবাজে চিন্তাগুলো এসে সব গুলিয়ে দেয়।

ঠাকুর। ওগুলো প্রথমে দেখা দেয়। গীতার উপদেশে আছে "অভ্যাসযোগেন"। বার বার চেষ্টা করে তাড়াতে হবে। গীতার কথা কাটাবার যো নেই। খুব রোক্ করে লেগে থাকা চাই। মনে কামনা-বাসনার লেশমাত্র চিহ্ন থাকিলে তাঁকে পাওয়া যায় না—যেমন, সূতোর সামান্য আঁশ থাকলে ছুঁচের মধ্যে যায় না। খুব রোক্ চাই।

যোগীন। হ্যাঁ, হয় মন্ত্রের সাধন—নয় শরীর পাতন।

ঠাকুর। ঠিক কথা। মনের অঙ্কট-বঙ্কটগুলো দূর করলে তবে ভগবানে বিশ্বাস দৃঢ় হবে। (পরে মধুর কণ্ঠে নিজে গান ধরিলেন—

"মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ নীল কমলে—
(কালী-পদ, গুরু-পদ নীল কমলে)।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুম সকলে।
মায়ের চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে,
কমলাকান্তের মনের আশা পূর্ণ হোল এত দিনে।
তার সুখ-দুঃখ সমান হোল, আনন্দ-সলিল উথলে।"

মধুর কণ্ঠে গান চলিতেছে। ভক্ত-কল্যাণ চিন্তায় ঠাকুর মা'র নামের মহিমা কীর্তনে বিভোর। ইতিমধ্যে আসিলেন গৃহী ভক্ত "শ্রীম"। প্রণামান্তে ঐ ঘরের মেঝেতে বসিলেন।

ঠাকুর। (শ্রীমকে, সহাস্যে) এই যে তোমরাও এসে পড়েছ যে! বৌমাকে এনেছ তো? (কন্যাকে) কি গো মানকুমারী, ভাল আছো তো?

শ্রীম। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে সব মঙ্গল। নহবৎ-খানায় ওদের পৌঁছে দিয়েছি।

ঠাকুর। (এক জোড়া কাপড় দেখিয়া) তোমাকে যে একখানা আনতে বলেছিলাম, এক জোড়া আনলে কেন? এক জনকে একটা রাঁধবার কড়া আনতে বললায় সে না দেখে ভাঙা কড়া কিনে আনে। তাকে বলি—ভক্ত হবি তা বলে বোকা হবি কেন? (ডেপুটি অধর সেন প্রবেশান্তে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে উনি সহাস্যে বলেন) এই যে, তুমিও এসে পড়েছ? (পরে গম্ভীর ভাবে) দ্যাখো, ভগবানের প্রতি যাদের আন্তরিক টান আছে তাদের এখানে আসতেই হবে।

অধর। (এক বাণ্ডিল গন্ধধূপ রাখিল ও ৩।৪টা ধূপ জ্বালাইয়া প্রণামান্তে) আজ্ঞে সত্য কথা, এখানে না এলে প্রাণের ভেতর কে যেন মোচড় দিতে থাকে। আপনার কথা শোনার ভাগ্য হয় না। সারা দিনের খাটুনির পর শুলেই ঘুমিয়ে পড়ি।

[এই সময়ে সন্ধ্যার আঁধার নামিল, মন্দিরে পূজারতির শাঁখ-ঘণ্টা বাজিল। এই ঘরের হ্যারিকেন লণ্ঠনটি জ্বলিল। ধূপদানে

ধর্ম্মমত পোষণ করা ইত্যাদি। তাই কোন সমালোচকের মতে সেখানে, "Fraternity and Equality already exist on a large scale…but not Liberty"। লেনিন বলতেন, 'লিবার্টি' হচ্ছে "a bourgeois prejudice", "a stupid invention of intellectuals"।

১৯১৭ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবধি 'সোভিয়েট কম্যুনিজমে'র লক্ষ্য করা যায় তিনটে নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়। ১৯১৭ থেকে ২১ অবধি জার-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ লেনিনের আমলে। ১৯২১ থেকে ২৯ অবধি আর একটা যুগ যখন লেনিনের মৃত্যুর পর লালফৌজের (Red Army) প্রতিষ্ঠাতা ট্রটস্কি (Trotsky) ও 'কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতা ও সম্পাদক ষ্টালিনের মধ্যে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যার পরিণতি হয়েছিল ট্রট্স্কির হত্যা ও ষ্টালিনের জয়লাভ। ১৯২৯এর থেকে যে যুগটা সেটা ষ্টালিনের পঞ্চবার্ষিকী 'প্ল্যান'গুলোর যুগ।

আজকের রাজনীতি প্রধানতঃ উক্ত দু'রকম মতবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজনীতি। এক দিকে 'ডেমক্রেসী' আর এক দিকে 'কম্যুনিজম্'। এদের প্রতিযোগিতায়ই বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বাস্তব পরীক্ষা। এ দু'টোর মধ্যে কোনটা মানব সমাজে সার্ব্বমঙ্গলিক শান্তি ও সম্পদ উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মত ও পথ বলে গ্রাহ্য হবে, তা জানাবার ভার থাকল ভবিষ্যতের উপর।

ধূপ জ্বালিয়া ঘরের প্রত্যেক পটের নীচে দেখান হইল। মধু-গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত হইল। পবিত্রতায় গৃহটি পূর্ণ হইল।]

ঠাকুর। (গম্ভীর ভাবে) ব্রাহ্ম মুহূর্তে সকাল ও সন্ধ্যায় সব কাজ ত্যাগ করে তাঁকে ডাকতে হয়। (হাতে তিনবার তালি দিয়া) হরি ওঁ রাম! রাম! দেহ-বৃক্ষ হ'তে সব পাপ দূরে যাক্ (সুর করিয়া, হে রাম, আমাকে তোমার শরণাগত করে নাও! তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আর যেন মুগ্ধ না হই। অষ্টসিদ্ধি চাই না রাম, লোকমান্য চাই না রাম, তোমার পাদপদ্মে অচলা ভক্তি দাও। শরণাগত!—শরণাগত দাস আমি। "ভক্ত, ভগবান, ভাগবৎ" এই তিন এক। (এই সময়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল প্রবেশান্তে ঠাকুরকে।—খুড়ীমা শুধালেন আজ কত জনের মত খাবার হবে ?

ঠাকুর। (বিরক্ত ভাবে) ওসব অত হিসেব আমি জানি না বাপু। তুই গুণে-টুনে জেনে নে। (রামলালের প্রস্থান)। (শ্রীমকে) জানলে, ছেলেবেলায় পাঠশালায় শুভঙ্করী কষতে ধাঁধা লাগতো। চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখলাম না, তাই মুখ্যু হয়ে গেলাম।

(সকলের হাস্য)

অধর। কিন্তু মুখ দিয়ে যে অনর্গল বেদ-বেদান্ত বার হয়। কেশব সেন, শশধর প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতদের ও বিদ্বানদের মুখ বন্ধ করে দেন।

ঠাকুর। ওসব আমার কেপি মায়ের দয়া। মাকে বললুম, "মা, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।" তাই মা পিছন থেকে জ্ঞানের বান ঠেলে দেন। পণ্ডিতগুলোকে মনে হয় যেন খড়কুটো, ওদের কথা কচ্‌কচ্ করে বাটি।

(এই সময়ে ইণ্ডালী-নিবাসী গৃহী ভক্ত মজুমদার মহাশয় (দেবেন্দ্রলাল) আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন—হস্তে রসগোল্লার হাঁড়ি)।

ঠাকুর। (সস্নেহে) অনেক দিন আসনি যে ? তোমায় প্রায়ই মনে পড়ে।

দেবেন্দ্র। ইহকাল নিয়েই ব্যস্ত, তাই পরকালের কথা মনে এলেও জোর হয় না।

যোগান। (দেবেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া) ইনি একটি গুরু-স্তব রচনা করেছেন। বেশ ভাব।

ঠাকুর। (সহাস্যে) বটে! কি গো ?

দেবেন্দ্র। (বিনয় ভাবে) আজ্ঞে, তেমন ভাল হয়নি।

ঠাকুর। একটু শোনাও না।

দেবেন্দ্র গুরু-স্তব সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন—
সঙ্গে সকলে যোগ দিলেন।

"ভবসাগর তারণ কারণ হে।
রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন হে।
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব, দয়া করো দীন জনে।"

ঠাকুর। (সস্নেহে) বাঃ, বেশ ভাব রয়েছে। যেমন ভাব, তেমন লাভ—মূল সে প্রত্যয়। বিশ্বাসই আসল। রাম নামের বিশ্বাস-বলে হনুমান সাগর পার হয়ে গেল। যে শালা নিজেকে পাপী মনে করে সে পাপীই হয়ে যায়। ভক্তিভরে মা'র নাম একবার নিলে সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অজামিল মরবার সময়ে একটি বার তাঁর নাম নিয়ে উদ্ধার হয়ে গেল। তাই রামপ্রসাদের গানে আছে—"এই সংসার মজার কুটি—খাই-দাই মজা লুটি"। কেশব সেন সমাজে প্রার্থনা করবার সময়ে যখন বলেছিল—"হে প্রেমময়, তোমার প্রেম-সাগরে যেন সদা ডুবে থাকি।" তখন আমি বলেছিলাম—"মাঝে মাঝে উঠো। নইলে ভিতর ভিতর যারা আছে তাদের দশা কি হবে ?" (হাস্য) ওরা গান গায় খালি ভগবানের ঐশ্বর্য্য নিয়ে। কিন্তু নরেন্দ্রের গান শুনলে (নিজের বুকে হাত দিয়ে) এর মধ্যে যিনি বাস করছেন তিনি স্থির হয়ে শোনেন। যেমন সাপুড়ের বাঁশী শুনে সাপ ফণা বিস্তার করে চুপ করে থাকে। কই, নরেন্দ্র এখনও আসেনি ?

দেবেন্দ্র। আজ্ঞে এসেছে। বাইরে হাজরা মশায়ের কাছে রয়েছে।

ঠাকুর। (ব্যস্ত ভাবে রাখালকে) যা তো, তাকে ডেকে আন্ তো (রাখালের প্রস্থান)। (গম্ভীর ভাবে) ওর সঙ্গে বেশী মেলা মেশা করা ভাল নয়। ওর কেবল আছে—তার অশান্তি ভাব, ভাবের ঘরে চুরি—মনে-মুখে এক নয়। (পরে অধরকে) আর, নরেনের সংসারে এখন খুব টানাটানি, বাপ মারা গেছে। তুমি একটা কাজের সন্ধান করো। (পরে শ্রীমকে দেখাইয়া) ইনিও ওদের স্কুলে মাষ্টারী জোগাড় করে দেন। কিন্তু সে না কি ভালো পড়াতে পারলো না। অথচ এখানে ওর মুখের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। যেমন গাইতে পারে, তেমনি বাজাতে পারে। কেশব সেনের ভেতরে দেখেছিলাম একটা বাতি জ্বলছে, কিন্তু নরেনের ভেতর ১৮টা বাতি জ্বলজ্বল করছে।

(রাখাল সহ নরেনের প্রবেশ)

ঠাকুর। (নরেনকে) হাজরা কি বলছিল রে ?

নরেন্দ্র। মাড়োয়ারী যখন তোমায় দশ হাজার টাকা দিতে গেল তখন তুমি নাওনি। তাই রাগ করে সে বলছিল—"মা লক্ষ্মী তোমার অত তেজ সহ্য করবেন না। নিজে না হয় না নিয়ে আমাদের মত লোককে দান করতে পারতো। কি হিংসুটে খুঁতখুঁতে স্বভাব, বাবা।" (সকলের হাস্য)

ঠাকুর। (সহাস্যে) আর কিছু ?

নরেন্দ্র। আমাকে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে নিজের দলে টানতে চায়, সে বলে—"ছাখো, তোমার গুণ অনেক। আমি গুণীকে দেখলেই চিনতে পারি। তুমি ওখানে মানে 'তোমার' কাছে বেশী যাও কেন ? ওটা মুখ্যুর ডিম। আমি গুরুর কাছে অনেক কষ্টে বেদান্ত শিখেছি, অনেক সাধন-ভজন করেছি। সব তোমায় শিখিয়ে দেব। মুক্তি আমলকীবৎ করতলগত—ভবসমুদ্র গোষ্পদ। এখন মনটা স্থির করতে পাচ্ছি না, কিছু দেনা হয়ে গেছে কি না। তোমার সঙ্গে তো অনেক বড়লোকের ভাব আছে—তাদের বলে কিছু টাকা আদায় করে ঋণমুক্ত করে দাও। তখন গুরু-শিষ্যে মিলে হিমালয়ে ঘোর তপস্যায় মগ্ন হব। কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর। (সহাস্যে ভবনাথকে) ভাখ্, ওখানে ঐ রূপোর থালায় যে সব মেওয়া খাবার আছে (পেস্তা, কিস্‌মিস্, বাদাম, ক্ষীরের নাড়ু) ওকে খেতে দে। অন্য কেউ ওগুলো খেয়ে হজম করতে পারবে না। (একটু থেমে) ঐ খাবারগুলোর সঙ্গে ঘোর

রমণীর কামনা মেশানো আছে। (নরেন খাইতেছে) টাকা কি মি নিতে পারি রে? ধাতু ছুঁলে (টাকা স্পর্শ করলে) কষ্ট হয় ঠিক যেন সিঙ্গি মাছের কাঁটা হাতে বেঁধে। যখন কিছুতেই নিতে রাজী হলাম না, তখন সেই মাড়োয়ারী রামলালের খুড়ীমার জন্য তে চাইলে। ওর মত জানতে চাইলে, সেও বলে দিলে, "ও ম টাকা নিজের নামে নেওয়া যায় না, কারণ এই টাকা দিয়ে ওঁর জন্য খরচ করতে হবে! আবার সেজবাবু (মথুর বাবু) র একটা তালুক দিতে চাইলে তখন নিতে পারলাম না। বার যে মা আছে—ছেলের সব ভার নিয়েছে। এ কি পাতান ক? এই আসল ব্যাপার। (পরে ভাবাবেশে গান ধরিলেন)—

"আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালী-কল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।"

তান্তে) হাজরার সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা ভাল নয়—ভাব হবে। দেনার জ্বালায় ছটফট্ করছে, বুঝলি। নে এখন গান। (নরেন্দ্র তানপুরা নিয়া গম্ভীর ভাবে কীর্ত্তন স্বরে তান লেন—'চিন্তায় মম মানস চিরঘন নিরঞ্জন।' গীতান্তে আপন অপর একটি গান ধরিলেন—"ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দেখা দাও। করুণাভিখারী আমি, কৃপা করে চাও।" গানি গানে সকলের মন উচ্চস্তরে উঠিয়া বিমলানন্দ উপভোগ তেছে। ঠাকুরের সমাধি ভাব। নেশার ঘোর তখনো সম্পূর্ণ নি।

ঠাকুর। (অর্দ্ধ বাহ্যদশায়) মা, একে সংসারী করিসনি গো! কাজ করবে কে? নিত্যসিদ্ধের থাক। জন্ম থেকেই মুক্ত, জীব নয়। (কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ ভাবে) বেদে আছে হোমা পাখীর। আকাশে খুব উঁচুতে থাকে। ওখানেই ডিম পাড়ে। পড়তে পড়তেই ফুটে ছানা বার হয়। যতই মাটির দিকে তে থাকে ততই সে বুঝতে পারে মাটিতে পড়লে সে ভেঙ্গে চুরমার যাবে, তখন সে ভয়ে ওপরে মা'র দিকে চোঁ-চোঁ করে দৌড় দেয়। ছ'রকম আছে—এক এই হোমা পাখীর মত মুক্ত, আর এক বদ্ধ জীব, সংস্কার নিয়েই মত্ত। মাকড়শার মত আপনার জালে নি বদ্ধ। (পরে নরেন্দ্রকে) আজ রাত্রে এখানে থাকবি? (রাখালাদিকে দেখাইয়া) ওরাও সব থাকবে। কাল রবিবার, দিন, কলকাতার বাবুরা সব আসবে, খুব আনন্দ হবে।

দেবেন্দ্র। (নরেন্দ্রাদিকে দেখাইয়া) এরাই ধন্য! চিরকুমার, সাধুসঙ্গ করছে। নর-পশু জন্ম ঘুচে যাবে। সংসার-চিন্তায় ক জ্বলে পুড়ে মরে।

ঠাকুর। সংসার কি তিনি ছাড়া? "তাঁরই সংসার" এই ভাব করে সংসার করলে জড়িয়ে পড়লে কষ্ট পায় না। জানো তো আছে—"জনক রাজা মহাতেজা সে এদিক-ওদিক দু'দিক খেয়েছিল দুধের বাটি" (হাস্য)। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। সূর্য্য তাঁরই কিরণ। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, সংগুরু লাভ এই তিন ভাগ্যের ফল।

দেবেন্দ্র। এ কথায় সন্দেহ আছে? তবে সংসারে গোটা দেখা যায় না।

ঠাকুর। আসল মানুষ যারা জ্যান্তে মরা তারা, রমণীর সঙ্গে না করে রমণ।

দেবেন্দ্র। একটা কথা নিবেদন করবো?

ঠাকুর। (কোমল ভাবে) কি বলবে বল না গো? তোমরা যে সব আপনার লোক।

দেবেন্দ্র। (করজোড়ে) আপনি কত বার কত ভক্তের বাড়ীতে 'আনন্দবাজার' করেছেন—তাই প্রার্থনা যে—

ঠাকুর। (সহাস্যে) তোমারও ওখানে এক দিন যেতে হবে। কিন্তু তোমার যে তেমন আয় নেই।

দেবেন্দ্র। (সহাস্যে) "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" (হাস্য) যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন।

ঠাকুর। (সস্নেহে) বল কি গো? বেশ তাহলে যেদিন তোমার খুসী জানাবে কিন্তু ওরাও সকলে যাবে যে?

দেবেন্দ্র। আমার পরম সৌভাগ্য। আপনিই বলেছেন—ওদের এক জনকে খাওয়ালেই এক শ' জন সাধুকে খাওয়ানোর ফললাভ হয়। সাধু খুঁজতে বড়বাজারে যেতে হবে না। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর। (সহাস্যে) বেশ। অনেক রাত হোল, এবার ওকে (অধরকে) উঠিয়ে দাও।

অধর। (নিদ্রাভঙ্গের পর প্রণামান্তে) তাহলে আজকের মত বিদায় দিন।

ঠাকুর। (স্নেহার্দ্র স্বরে) ও কথা কি বলতে আছে গা? আবার এসো, নরেনের কাজের কথা যেন মনে থাকে। তোমাদের চৈতন্য হোক্।

(ভক্তদের প্রস্থান, বালক ভক্তগণ ও শ্রীম ব্যতীত)

নরেন্দ্র। (ঠাকুরকে, রাগত ভাবে) কেন তুমি আমার জন্য যার-তার কাছে বল? ওতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

ঠাকুর। (কোমল ভাবে) ওরে, তোর জন্য আমি যে সব করতে পারি, এমন কি ভিক্ষা পর্য্যন্ত! (ভক্তগণ অবাক—পরে খাট হইতে নামিয়া পদচারণ করিতে করিতে) "শক্তি দে মা শক্তিময়ী, মা গো", (পরে নরেনের নিকট আসিয়া দৃঢ় স্বরে) "তোকে দিয়ে মা অনেক কাজ করিয়ে নেবে—তুই পুরুষ আমি প্রকৃতি। (নরেনকে স্পর্শ করিয়া) কি রে মায়ের হুকুম মানবি তো?

নরেন্দ্র। বয়ে গেছে—আমি কোন কাজ করবো না।

ঠাকুর। (স্পর্শ করিয়া) তোর ঘাড় যে সে করবে।

নরেন্দ্র। (বিহ্বল ভাবে চারি দিকে লক্ষ্য করিয়া—বাহ্যজ্ঞান-শূন্য দৃষ্টি—দীপ্ত স্বরে) এঁ্যা এ কি? কেবা আমি? কোথা আমি? জল-স্থল-ব্যোম আমিময়! কোটি সূর্য্য-চন্দ্র হেরি নয়নে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উঠে ভাসে পুনঃ লয় হয় এক অখণ্ড জ্যোতিঃসাগর মাঝে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লয় হয়। আমি ব্যাপ্ত চরাচরে। (পরে ব্যথিত কণ্ঠে) ওগো, আমায় এ কি দশা করে দিলে গো? আমার যে মা আছে, ভায়েরা আছে, সংসার আছে। (একটু থেমে) হাই পেলাম যেন স্বর্গে, কি এক আশ্চর্য্য জগৎ চোখের সামনে খুলে গেল। যেন একটা অখণ্ড জ্যোতির রাজ্য, অনন্ত আলোক-রেখা, অসীমের মধ্যে সীমাহারা। আলোতে এর সুরু আলোতে এর শেষ। স্বর্গের দ্বার গেল খুলে। অবাধ সীমাহীন নিস্তব্ধ অমৃত-জগতে আপনিই দ্রষ্টা। আমি এ সব চাই না—আমার দুঃখিনী মা কষ্ট পাবে।

ঠাকুর। (বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রকৃতিস্থ নরেনকে মৃদু হাস্যে) আচ্ছা, তাহলে এখন থাক, কিন্তু মনে রাখিস চাবিকাটি

রইল, কাজ শেষ হলে ছুটি পাবি। (ভক্তদের) ও যখনই ওর আসল সত্ত্বা বুঝতে পারবে তখন আর দেহ থাকবে না। (নরেনকে) ছাখ্, আজ শনিবার, এখন মন্দিরে মায়ের শয়ন-আরতি হচ্ছে, ওখানে তুই যা। আজ মায়ের কাছে যা চাইবি তাই পাবি। (নরেন স্থিরভাবে বসিয়া আছে দেখিয়া তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া) মাইরি বলছি, যা চাইবি তাই পাবি। (তথাপি না যাওয়ায়) তুই যে আমার মাকে মানিস্ না তাই তোর কষ্ট, যা! আজ যা চাইবি তাই পাবি।

শ্রীম। (নরেনকে) যাও না, উনি কত করে বলছেন।

রাখালাদি। ওঠ না, ওঁর কথা শুনবে না? (নরেন উঠিল ও টলিতে টলিতে প্রস্থান করিল)

ঠাকুর। (ঘরে পদচারণা করিতে করিতে আপন মনে ভাবের সঙ্গে সহাস্যে হাততালি দিয়া) লাগ্, ভেল্কি লাগ্, মা, মা গো শক্তিময়ী! (কিছু পরে নরেনের প্রবেশ, মাতালের মত আচ্ছন্ন ভাব) কি রে? কি চাইলি আমার মায়ের কাছে?

নরেন্দ্র। (ভাবাবেগে বসিয়া) জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি।

ঠাকুর। (সোল্লাসে) বাঃ, বেশ কথা! সংসারীদের মত কাঙ্গালী মন্ত্র পড়লিনি? টাকাকড়ি, মান, ইন্দ্রিয়-সুখ সব তুচ্ছ করলি? আচ্ছা, আর একবার যা তো মায়ের কাছে। মনে রাখিস্, মা আমার কল্পতরু, যা চাইবি তাই পাবি। ওঠ, যা (হাত ধরিয়া তুলিলেন। নরেনের প্রস্থান)। (ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে) দেখলে ওর কাণ্ডটা? ও কি বাজে-মার্কা বেমক্কা লোক যে, কৈবল্যদায়িনীর কাছে কাঙ্গালীপনা করবে? হরির সঙ্গে দেখা হলে হরিকে নেবে, না তার নাচ-দুয়ারে যে মণি-মুক্তা ছড়ান আছে তাই কুড়োবে? দু'হাতে দু'খানা তরোয়াল ঘোরাচ্ছে, একখানা জ্ঞানের, অপরখানা বৈরাগ্যের। (নরেনের প্রবেশ)। ব্যগ্র ভাবে কি রে? এবার কি চাইলি রে?

নরেন্দ্র। (পূর্ববৎ গম্ভীর ভাবে) জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি।

ঠাকুর। (শ্রীমকে) তুমি ওর সঙ্গে যাও তো এবার, মা'র মনে কি করে দেখ। সাবধান যেন পড়ে না যায়। (আনন্দে হাততালি দিয়া নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া) তোর বাসনা মা পূর্ণ করবে। (নরেন্দ্র ও শ্রীমর প্রস্থান)। (বালক ভক্তগণকে) নতুন হাঁড়িতে দৈ পাতলে কেটে যায় না। সংসারীরা যেন রসুনের বাটি, হাজার ধুলে ও গন্ধ থাকে। (শ্রীম'র সাথে নরেনের প্রবেশ) এবার কি চাইলি রে?

নরেন্দ্র। (পূর্ব্ববৎ) জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি! (ধীরে প্রকৃতিস্থ হইয়া চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিয়া), এঁ্যা, আমি কোথা? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

ঠাকুর। (সস্নেহে নিকটে বসিয়া মস্তকে ও বক্ষে বারংবার হস্ত দিয়া স্পর্শ করিয়া) তোর বাসনা মা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে রে! এখন বুঝলি, মায়ের ইচ্ছায় সব হয়? যত কিছু দেখছিস্ সব মায়ের আণ্ডারে (under), কারো বাহাদুরী করবার কিছুই নেই। মা'র দয়ায় তোকে সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না। মোটা ডাল-ভাতের অভাব হবে না। এখন একটু খেটে শক্তি সঞ্চয় করে নে, এর পর সোনার খাটে শুবি।

রামলাল। (প্রবেশান্তে) খাবার তৈরী হয়েছে, বারাণ্ডায় ঠাই হয়েছে।

ঠাকুর। (শ্রীম ও রাখালাদির প্রতি) তোমরা খেয়ে নাও, ও আর খাবে না। (ভক্তদের প্রস্থান) ছাখ্, ওই মাদুরটা পেতে শুয়ে পড়্। (নিজে মাদুর পাতিয়া দিতে গেলে নরেন্দ্র বাধা দিয়া— আঃ, কি হচ্ছে? আমি কি ঠুঁটো? ঠাকুর সহাস্যে নিজ বালিশ মাদুর আনিয়া দিয়া বলেন) শুয়ে পড়্। (পরে একখানি পাখা আনিয়া বাতাস করিতে উদ্যত হইলে নরেন উঠিয়া—ও রকম করলে আমি পালাব ওই পঞ্চবটীতে।)

ঠাকুর। তুই কি ভেবেছিস্ আমি তোকে সারা রাত ঘুমতে দেব? (ইতিমধ্যে শ্রীম ও ভক্তগণের প্রবেশ) খানিকটা সকলে শুয়ে নে। একটু রাত গভীর হলে অন্যান্য রাতের মত সবাই ধ্যান করবি। ভোগীদের রাত যোগীদের দিন! ওরা ঘুমায়—এরা কাজ করে। নে, শো সব। পরে মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন)—

"শ্যামা কি কল করেছে।
এই চোদ্দ পোয়া কলের ভেতর, কত রঙ্গ দেখাইতেছে।
কল বলে আপনি নড়ি জানি না কে ঘোরাতেছে।"

পঞ্চম দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরকে গলক্ষতের জন্য কাশীপুরে একটি বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেছে। প্রাতঃকাল। ঠাকুর কাশিতেছেন। রাখাল তাড়াতাড়ি পিকদানী মুখের কাছে ধরিল এবং মুখ মুছাইয়া শোকার্ত্ত স্বরে—ওঃ! আবার খানিকটা রক্ত বার হোল।

নরেন্দ্র। (বেদানার রস করিয়া ছোট গেলাসে ঢালিয়া ও চামচ হস্তে আসিয়া) এটা খেয়ে নাও।

ঠাকুর। (নরেন্দ্রের প্রতি সদ্যবিবাহিত ভবনাথকে দেখাইয়া) —একে খুব সাহস দে। (ভবনাথকে) খুব বীর হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে যেন ভুলিস্নি। নাকে-কান্নায় মজিসনি। মায়া কান্নায় সবাই মরে। (সকলের হাস্য) ভগবানে মন ঠিক রাখবি। যে বীরপুরুষ, সে পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা বলে, বুঝলি?

(সুরেন্দ্র মিত্রের প্রবেশ—হস্তে কলা-পাতায় জড়ান বেল ফুলের মালা ও খস্‌খসের পদ্দা। ঠাকুরকে প্রণাম ও মালাদান, ঠাকুরও স্বীয় গলদেশ হইতে দু'গাছি মালা খুলিয়া দিলেন। কৃতার্থ সুরেন্দ্রনাথ ভক্তদের কহিলেন)।

সুরেন্দ্র। বোশেখের চড়া রোদে ওঁর কষ্ট হয়, তাই খস্‌খসের পদ্দা টাঙ্গিয়ে দিও। বেশী কথা বলা ডাক্তারের বারণ! [প্রস্থান)

ঠাকুর। (হীরালাল ও পদসেবারত নরেন্দ্রকে) তোমরা দু'জনে একটু কথা কও, আমি শুনি।

হীরালাল। (নরেন্দ্রকে) ভক্তদের দুঃখ-কষ্ট কেন?

নরেন্দ্র। I could have created a better world। এই জগতের বন্দোবস্ত দেখে মনে হয় যেন কোন দুষ্ট শয়তানের কারসাজি (হাত) আছে।

হীরালাল। আবার এ কথাও তো আছে যে, দুঃখবোধ না থাকলে সুখবোধ হয় না। (ঠাকুরকে দেখাইয়া) আপনিই বলুন না, ভক্তদের দুঃখ-কষ্ট কেন হয়?

ঠাকুর। এই দেহের—খোলটার—কষ্ট বুঝতে পারলে?

নরেন্দ্র—গরম জলে হাত পুড়ে গেলে লোকে বলে—আসলে heat (গরমটাই) পোড়ালে, লোকশিক্ষার জন্য ইনি এত দেহ-কষ্ট সহ্য করছেন—কিন্তু ওঁর মনটা ষোল আনাই ঈশ্বরে রয়েছে।

হীরালাল। হ্যাঁ, কথাটা সত্য। চাক্ষুষ প্রমাণও পাচ্ছি Christএর crusification—কাঁটার মুকুট পরিয়ে হাত-পায়ে পেরেক গেঁথে মেরে ফেলার তিন দিন পরে Ressurrection (পুনরুত্থান) হোল। অথচ Bibleএ লেখা আছে Jesus is the only son of God.

(শরৎ, কেদার বাবু (ঢাকা), গিরিশ ঘোষের প্রবেশ ও প্রণামান্তে বসিলেন)

ঠাকুর। (মৃদু হাস্যে, মৃদু স্বরে) তোমরা সব এসেছ? (পরে কেদারকে গিরিশ-এর সঙ্গে তর্ক করিতে ইঙ্গিত করিলেন।)

গিরিশ। (স্বীয় নাসিকা ও কর্ণদ্বয় মর্দ্দন করিয়া সহাস্যে)—এই নাক-কান মলছি, আর ও-পথ নয়। আপনাকে যখন জানতাম না, তখন তর্ক করেছি।

কেদার। (নরেন্দ্রকে) ওঁর (ঠাকুরের) পায়ের ধূলো নাও, সব সন্দেহ দূর হবে।

ঠাকুর। (নরেন্দ্রকে) এখন তর্ক কর, বিচার কর, শেষে হরি নামে গড়াগড়ি দিতে হবে। এঁর (কেদারের) পায়ের ধূলো নাও।

(এবার ভক্তগণ আনীত মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের সামনে রাখা হইল। তিনি কণিকা মাত্র মুখে দিয়া ভক্তগণকে—"তোমরা খাও"। এই সময় Dr. Sirkar (মহেন্দ্রলাল) সাথে শীঘ্র প্রবেশ)

ডাক্তার। (ঠাকুরের নিকট গিয়া কৃত্রিম কোপে) তোমায় না কত বার বারণ করেছি যে, তোমার যে রকম অসুখ, তাতে লোক-জনের সাথে বেশী কথাবার্ত্তা বলবে না? কেবল আমার সঙ্গে কথা বলবে। বলি, আজ কেমন আছ?

জনৈক ভক্ত। কাল ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার এসেছিলেন ও নক্সভমিকা দিয়ে যান। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয়নি। আজও রক্ত উঠেছে অনেকটা।

ডাক্তার। ও ওষুধ কেন খাওয়ালে? আমি তো মরিনি?

ঠাকুর। (সহাস্যে) তোমার অবিদ্যা মরুক!

ডাক্তার। আমার কোন কালেই অবিদ্যা ছিল না।

ঠাকুর। (সহাস্যে) না গো, ও নয়, সন্ন্যাসীর অবিদ্যা। "মা" মরে যায়, বিবেক সন্তান হয়। দ্যাখ, এই অসুখটা একটু ভাল করে দাও, তাঁর নাম-গুণ গান করতে পারি না যে।

ডাক্তার। ধ্যান করলেই পার!

ঠাকুর। সে কি কথা! আমি একঘেয়ে ভক্ত হবো কেন?—আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই—কখনও ঝালে, কখনও ঝোলে, কখনও অম্বলে, কখনও ভাজা। কখনও পূজা, কখনও ধ্যান, কখনও নাম-গুণ গান, কখনও আবার নাম করি নাচি। যখন যেমন ভাব। তোমার ছেলে অমৃত—অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? তিনি সাকার ও নিরাকার দুই-ই। যার যাতে বিশ্বাস তাতেই শরণাগত হওয়া চাই।

ডাক্তার। সে তো তোমারই চেলা।

ঠাকুর। আমার কোন শালাই চেলা নয়। আমিই সকলের চেলা। এক ভগবানই গুরু, চাঁদা মামা সকলেরই মামা।

গিরিশ। (মহেন্দ্র ডাঃকে) আপনার এঁকে কি মনে হয়?

ডাক্তার। As a man I have the greatest regard for him—মানে, এঁকে অবতার বলি না, তবে মানুষ হিসাবে খুব ভক্তি করি। (পরে ঠাকুরকে) আজ গান হবে না?

ঠাকুর। (নরেন্দ্রকে) একটা গান কর না।

নরেন্দ্র তানপূরা লইয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

"সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বরিষে অমৃতধারা জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ-রমণ হে।
গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে,
যখনই তব নাম-সুধা শ্রবণে পরশে,
হৃদয় মধুময় তব নামগানে, হব হে হৃদয়নাথ চিদানন্দঘন হে।"

(গীতান্তে দেখা গেল যে, সকলেরই মুখমণ্ডলে প্রশান্ত ভাব ফুটিয়াছে, যেন মনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়াছে। সকলেই ব্যগ্র ভাবে নরেন্দ্রর দিকে লক্ষ্য করিতেছে, যেন আবার সকলকে তৃপ্তি দেয়। ঠাকুরের ইঙ্গিতে পুনরায় সুললিত কণ্ঠে তান-মান লয়-যোগে নরেন্দ্র ঠাকুরেরই প্রিয় গান ধরিলেন—

"আমায় দে মা পাগল করে,
আর কাজ নেই মা জ্ঞান-বিচারে!
(ওমা) তোমার এ প্রেমের সুরাপানে কর মাতোয়ারা
(মা) ভক্তচিত্তহরা ডুবাও প্রেম-সাগরে।
তোমার এ পাগলা গারদে কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে।
ঈশা বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য (মা) তারা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, মিশে তার ভিতরে।"

(গান যখন চলিতেছে, তখন ঠাকুর শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচে নামিলেন। উদ্দেশ্য গায়কের নিকট যাইবেন, কিন্তু মধ্যপথেই সমাধি, ভক্তগণ ব্যস্ত ভাবে নিকটে গমন করিলেন। ডাক্তার সরকারের সমাধিতে বিশ্বাস নাই। নির্বাকরূপে এই স্বর্গচ্ছবি দেখিতেছেন। গান থামিল—রাখাল, লাটু, যোগেন প্রভৃতিরও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সকলেই যেন নেশার ঘোর বিভোর। ঠাকুরও ধীরে ধীরে অন্তর্দশা হইতে বাহ্যদশায় ফিরিতেছেন, মুখে দিব্য জ্যোতি খেলিতেছে। ধীরে ধীরে শয্যায় বসিলেন, পরে ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে)।

ঠাকুর। তোমার কি এ সব ঢং বলে মনে হয়?

ডাক্তার। যেখানে এত লোকেরই ঐ ভাব হচ্ছে, তখন বলতে হবে যে অস্বাভাবিক নয় আন্তরিক। (পরে নরেন্দ্রকে) কিন্তু তুমি যখন ঐ গানটা গাইছিলে—"দে মা আমায় পাগল করে"—তখন আমি থাকতে পারিনি, দাঁড়াই আর কি? অনেক কষ্টে ভাব চাপলাম, ভাবলাম যে display (লোক-দেখান) হবে না।

ঠাকুর। (সহাস্যে) তুমি যে অচল, অটল, সুমেরুবৎ (সকলের হাস্য)। তুমি গম্ভীরাত্মা! রূপ-সনাতনের ভাব কেউ টের পেত না। কৃষ্ণবিরহে সকলেই কাঁদছে। বৃন্দা শ্রীমতীকে বললে—"সখি, তোর চোখে জল নেই কেন বুঝেছি। বিরহ-অগ্নি তোর বুকে সদা জ্বলছে! তার তাপে চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

ডাক্তার। তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবার যো নেই।

ঠাকুর। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? বিজয়কে এত ভক্তি করি কিন্তু যখন ভাব আসে তখন তারই গায়ে পা দেই। এ কি বল দেখি?

ডাক্তার। এর পর সাবধান হওয়া উচিত।

ঠাকুর। (করজোড়ে) আমি কি করবো? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁস হয়ে যাই। যদি ঢং মনে কর, তাহলে তোমার ও সায়েন্স-মায়েন্স ছাই পড়েছ।

ডাক্তার। মশাই, যদি ঢং মনে করি, তাহলে কি এত আসি? সব কাজ ফেলে এখানে আসতে হয়। কত রোগীর বাড়ী যাওয়া হয় না। এখানে ৪।৫ ঘণ্টা কেটে যায়। অনেক টাকা লোকসান হয়।

ঠাকুর। মেজ বাবু (মথুর বিশ্বাস)কে বলেছিলাম—তুমি মনে করো না যে, তুমি এত বড়মানুষ, আমায় মানছ বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম, ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ যেন খড়-কুটো।

ডাক্তার। তুমি কি মনে করো যে, অমুক তোমায় মানছে বলে আমিও তোমায় মানবো?

গিরিশ। উনি কি আপনাকে মানতে বলছেন?

ডাক্তার। (ঠাকুরকে) তুমি কি বলো যে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা? যদি তাই হবে, তবে তুমি এত বকো কেন?

ঠাকুর। তিনি বলাচ্ছেন তাই বলছি। গানে আছে—"আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।"

ডাক্তার। Free will (স্বাধীন ইচ্ছা) তিনি দিয়েছেন ... মনে করলে duty (কর্ত্তব্য) করতেও পারি আর নাও করতে পারি।

গিরিশ। আপনার ভাল লাগাটাই কাজ করায়, যেমন চাটের ... গুলি খায়। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর। (ডাক্তারকে) এর (গিরিশের) মনের ভাব বুঝেছ তো? প্রার্থনা করো—"ঈশ্বর আমায় সৎ ইচ্ছা দাও, যেন সৎ-কাজে মতি-গতি হয়।"

ডাক্তার। (নরেন্দ্রকে) ওহে, তোমার "নিবিড় আঁধারে"—গানটা গাইবে?

নরেন্দ্র। আপনার দেরী হয়ে যাবে না?

ডাক্তার। হয় হবে। (ঠাকুরকে) তোমার ঐ তিড়িং-মিড়িং করে ওঠা ভাব চেপে রাখতে হবে।

গান

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান করে, হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চির শান্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি॥
মহাকাল রূপ ধরি আঁধার বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে কে তুমি গো একা বসি।
অভয় পদ-কমলে প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্টহাসি।

(যেমন গানের ভাব, তেমনি গায়কেরও মরমী ভাব, আবার শ্রোতাদেরও ধর্ম্মভাব। এই তিন ভাবে মিশ্রিত হয়ে সকলেই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানান্তে যেন পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিল।)

ডাক্তার। It is dangerous to him—এ গানে ওঁর ভাব হলে অনর্থ হবে।

ঠাকুর। (শ্রীমকে) কি বলছে গো?

শ্রীম। ইনি ভয় করছেন পাছে আপনার ভাব হয়।

ঠাকুর। না, না, কেন ভাব হবে? কেন—কোন—কে-কে-কে!

(নিস্পন্দ দেহ, সকলে অবাক্, ডাক্তার উঠিয়া নাড়ী দেখিলেন, নিশ্বাস পড়িতেছে কি না পরীক্ষা করিলেন, পরে সন্তর্পণে বিছানায় মস্তক ঠেকাইয়া পূর্ব্বস্থানে চিন্তিত ভাবে বসিলেন, ধীরে ধীরে ঠাকুর সাধারণ অবস্থায় ফিরিলেন।)

গতি

প্রস্ফুতি দেবী

আমি গাহিতে এসেছি গান
(ভেঙ্গে যাওয়া বীণে ছিন্ন সেতারে) ভগ্ন বীণার ছিঁড়ে যাওয়া তারে
রচিতে এসেছি তান।
(মূক) কণ্ঠে ফোটাব ভাষা (ব্যর্থ) হৃদয়ে ভরাব আশা
অন্ধ আঁখিতে আলো জ্বেলে দেব
মৃত জনে দেব প্রাণ।
আমি গাহিতে এসেছি গান॥

মোরা সবুজ পাখীর দল
শ্যামল পাখার দৃপ্ত গতিতে
ঘুরে আসি নভোতল।
(মোরা) আকাশে তারার বাণি (অশ্রু) মাঝারে দেখাই হাসি
শীতের সমুখে আনি বসন্ত
শীর্ণের মাঝে বল।
মোরা সবুজ পাখীর দল॥

আজ ঘর ভেঙ্গে তোরা আয়
অসীমের কোলে মুক্তির মাঝে
বন্ধন বেঁধে যায়।
(তাই) বাঁধিব নূতন ঘর (বুকে) আনিব সকল পর
অন্তরে আর বাহিরে মিলায়ে
আগমনী সবে গায়
আজ ঘর ভেঙ্গে তোরা আয়॥

বাড়ীওয়ালাকে প্রতি মাসে ক'বস্তা ময়দা দেবে তাই লেখা থাকে এখানকার চুক্তিপত্রে। সাংহাই-এ বড় দাঙ্গা হবার ঠিক আগের ক'দিন এই দাম-বাড়া বাড়াবাড়ির চরমে এসেছিল। এক সের চালের দাম ছিল ৬৲ (আমাদের দেশী টাকা—চীনা 'ফাপি' ডলার নয়)। হঠাৎ তার পর দিন সেই চালের দাম হ'য়ে গেল ৪৮৲। তার পর দিন হ'ল দাঙ্গা—চালের দাম আবার নেমে এল ১২৲ সেরে। এই ভাবে 'ফাপি' নোটের দাম কমতে কমতে যখন আমাদের এক টাকায় বদলে ত্রিরিশ লক্ষ ডলার পাওয়া যেতে লাগল, তখন হঠাৎ এক দিন মহা হৈ-চৈ করে সরকার তাঁদের মুদ্রা নীতির সংস্কার করলেন বলে সারা পৃথিবীতে দামামা বাজালেন। নতুন নোটের নাম দেওয়া হ'ল "স্বর্ণ-নোট"। নানা রকম আইন জারী করা হ'ল এই "স্বর্ণ-নোটের" দাম বাড়াবার জন্যে। আমাদের রূপোর এক টাকার চাইতেও দামী হ'ল এই "স্বর্ণ নোটের" কাগজী এক ডলার। চোরা-বাজার, কালো-বাজার, খোলা-বাজার প্রভৃতি সকলের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযান ক'রে লোকের কাছে সোনা বা বিদেশী মুদ্রা থাকা বেআইনী বলে ঘোষণা ক'রে সারা দেশের বোকাদের সঞ্চিত পুঁজিপাটা সব কাঁচিয়ে নিয়ে আজ তাঁরা জানাচ্ছেন যে, তাঁদের মুদ্রা-নীতির এই সংস্কার যে মাত্র এক মাসের মধ্যেই ব্যর্থ হ'ল, এ কেবল কম্যুনিষ্টদের দুষ্ট প্ররোচনায় মুগ্ধ অসৎ চীনাদের জন্য। সেদিন একটা কাগজে খুব মজার একটা কার্টুন বেরিয়েছে দেখলাম। দর্শক চীনাটি বসে আছে ম্যাজিসিয়ানের সামনে—মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে অসম্ভব একটা কিছু দেখতে পাবার আশা—ম্যাজিসিয়ান্ দাঁড়িয়ে আছেন তার সামনে—দু'হাতে উঁচু করে ধরে আছেন পর্দার মত এক টুকরো কাপড়, কাপড়ের গায়ে লেখা "মুদ্রা-নীতির সংস্কার।" ২ নং ছবিতে আর সবই সেই ১ নং ছবির মত—তবে দর্শকের মুখে ফুটে উঠেছে হতভম্ব হ'য়ে যাবার মত করুণ একটা মুখচ্ছবি। তার সমগ্র দেহে এক টুকরো কাপড়ের চিহ্নও কোথায়ও নেই। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ম্যাজিসিয়ান, মুখে একটু মিষ্টি হাসি—পর্দাটি পিছনে লুকিয়ে রেখেছেন গুটিয়ে—গুটোনো পর্দার ভিতর থেকে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে দর্শকের পরনের পাৎলুন আর টুপি। মাত্র এক মাস আগেও আমেরিকান ডলার নিয়ে কালো-বাজার করার জন্য ধরা হ'ল কত লোককে—এমন কি কয়েকটি চীনাকে ফাঁসী পর্যন্ত দেওয়া হ'ল এই সংক্রান্ত অপরাধে। অথচ আজ সরকার আবার বদলালেন তাঁর নীতি—এখন আমেরিকান ডলার কাছে থাকা আর বেআইনি নয়। এবং আজ সরকারী ব্যাঙ্ক থেকেই আমাদের এক টাকার বদলে পাওয়া যাচ্ছে সেই অপূর্ব্ব "স্বর্ণ নোটে"র প্রায় ৫টি ডলার! কাজেই সাধারণ চীনাদের কাছে এ গভর্ণমেণ্টও যা অন্য গভর্ণমেণ্টও তা। বেশি ক্ষতি আর কি হবে? তবু এর মধ্যেও যে দলাদলি একেবারে নেই তা নয়। এক দল বলছে, "বর্ত্তমান সরকারের যত দোষই থাক, এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে—একে বুঝি—জানি এর দোষ-ত্রুটি কোথায়—গুণও যে আছে কিছু-কিছু, তাও ত অস্বীকার করতে পারি না। সারা দেশটা যখন আফিং-এর নেশায় ঝিমিয়ে ছিল, তখন এই চিয়াং কাইশেকই কি আমাদের সেই মরণ ঝিম থেকে বাঁচায়নি? আইন করে বন্ধ করেনি কি মেয়েদের পা ছোট করার অদ্ভুত অস্বাভাবিক নিয়ম? এই চিয়াং-এর জন্যই জাপানীদের হাত থেকে বেঁচেছি আমরা—এই চিয়াংই আইন করে কেটে ফেলতে বাধ্য করেছে দাসত্বের চিহ্ন পুরুষের মাথার বেণী। "অচেনা মিত্রের চেয়ে চেনা শত্রুও ভালো।" আর এক দল বলছে, "ওঃ, কম্যুনিষ্টদের শাসনে থাকা মানে ত রাম রাজত্বে বাস করা।" "চিম চউ" নামে একটা বন্দর আছে—সেখানে সম্প্রতি হেরে গেছেন আমাদের জাতীয় সরকার। সেখান থেকে পালিয়ে আসা একটি চীনা বললে, সেখানে কম্যুনিষ্টরা না কি আশ্বাস দিয়েছে, জমিদারীতে জমিদাররা ফিরে যেতে (পেতে কি না জানি না) পারবেন। যে সব কারবার ব্যক্তিগত টাকায় চলে, সে সব কারবার ব্যবসায়ীরা নির্ভাবনায় চালাতে পারে—যারা সরকারের সঙ্গে ভাগে কারবার ক'রত, তাদের সমস্ত মূলধন না কি কড়ায়-গণ্ডায় ফেরত দিয়ে দিয়েছেন কম্যুনিষ্ট সরকার। কারুর ধর্ম-বিশ্বাসে হাত না দেওয়াই না কি এই নতুন সরকারের বর্ত্তমান নীতি। বর্ত্তমান যুগে এর চাইতে রাম রাজত্ব আর কি হ'তে পারে?

মুকদেন হচ্ছে চিন্ চউ থেকে আরও উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার একটা বড় সহর—কম্যুনিষ্টরা প্রায় এক বছর ধরে অবরোধ করে রেখেছিল এই সহরকে। সম্প্রতি কম্যুনিষ্টরা এ সহর দখল করেছেন—দখল করার আগে পর্যন্ত এ সহরের যে সব খবর পাওয়া গেছে, সেগুলি গুজব না হ'লেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মুকদেনের অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, ঠিক সেই সময় সেখানে প্লেনে করে গিয়েছিলেন আমাদের একটি আমেরিকান বন্ধু। তিনি বললেন, সেখানকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চোখে ছানির মত সাদা এক রকম ছাতা পড়ে যাচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে। চোখে তারা কিছুই দেখতে পায় না। রাস্তায় লোক চলে ধুঁকতে ধুঁকতে—কত দিন ধরে পেট ভরে খেতে পায় না কে জানে! খনি থেকে যে পরিমাণ কয়লা যে সময়ের মধ্যে তোলার কথা, শ্রমিকেরা তা তুলতে পারছে না। খাটবার শক্তিই তাদের নেই। এ হচ্ছে কম্যুনিষ্টরা দখল করার আগের অবস্থা। দখল করার সময় এবং তার পরের অবস্থা সম্বন্ধে গুজব শোনা ছাড়া আর কোন খবর পাবার উপায় নেই। জাতীয় সরকার যখন তাঁদের "পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী" পাততাড়ি গোটাবার কাজে ব্যস্ত, তখন না কি কিছু কিছু করুণ ঘটনা ঘটেছিল সেখানে। মুকদেন পতনের কিছু আগে বড়কর্ত্তারা পালিয়ে এলেন এরোপ্লেনে চড়ে—এরোড্রামকে ঘিরে ফেলেছে তখন কম্যুনিষ্টরা—তাদের বন্দুক আর মেসিন গানের গুলী ঘন ঘন উড়ে আসছে এরোড্রামের এলাকার ভিতর। বড়কর্ত্তাদের বিদায় দিয়ে ছোট কর্ত্তারা যখন উঠতে যাবেন তাঁদের জন্য ঠিক-করা আর দু'টি প্লেনে—তখন তাঁদের ঘিরে ফেলল এরোড্রাম-রক্ষী—তাঁদেরই নিজেদের সৈন্য দল। তারা বললে, "মরি যদি, এসো সবাই একসঙ্গেই মরি। তোমরা পালিয়ে যাবে, আর তোমাদের পালাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে মরব কেবল আমরা—একা—এতটা অবিচার করার হাত থেকে তোমাদের রেহাই দিতে চাই বলেই যেতে দেব না তোমাদের।"

আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ফরাসী কন্‌স্যুলেট এখনও মুকদেনে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গুজবে প্রকাশ, সহর কম্যুনিষ্টদের অধীনে আসবার পর আমেরিকান কন্‌সাল না কি তাঁর মোটরে করে সারা সহর ঘুরে এসে রেডিও ট্রান্সমিটারে খবর দিয়েছেন যে, সহরের অবস্থা স্বাভাবিক—ভীত বা উদ্বিগ্ন হবার কিছুই নেই।

ইংরেজরা কোন সময়েই ভুলতে পারে না যে, ভাগ্য-বিপর্যয়ে আজ তারা প্রথম শক্তি থেকে তৃতীয় শক্তির পর্যায়ে নেমে গেছে। তাদের শূন্য আসন পূর্ণ করেছেন খুল্লতাত শ্যাম সাহেব। তাই আমেরিকানদের সম্বন্ধে কোন ঠাট্টা করবার সুযোগ ছাড়া তাদের পক্ষে কষ্টকর। সেদিন এসেছিলেন একটি ইংরেজ মহিলা—তিনি নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর ক্লাশ নেন। তিনি খবর দিলেন যে, চীনের জাতীয় বিমান-বাহিনীর সৈন্যদল শত্রুদের বিপন্ন করার জন্য এখনও মাঝে মাঝে মুকদেনে হানা দেয়। এমনই অপূর্ব তাদের তাগ যে, তাদের ফেলা বোমা মুকদেনের সব বাড়ী ছেড়ে পড়ছে কেবল ঐ আমেরিকান কনস্যুলেটেরই বাড়ীতে। আমেরিকায় তৈরী বোমা এ ভাবে নিজের দেশী লোক চিনে নেওয়ায় প্রচুর মজা উপভোগ করছেন আমেরিকানরা বাদে বাকী সকলেই—বিশেষ করে ইংরেজরা। খবরটার সত্যতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের বিশেষ নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, কম্যুনিষ্ট দমনের জন্য পাঠান আমেরিকার অস্ত্র-শস্ত্র প্রচুর পরিমাণে কম্যুনিষ্টদের দ্বারাই ব্যবহৃত হচ্ছে আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে—চীনা জাতীয় সরকারের উচ্ছেদ পরিকল্পে। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় যুদ্ধেই অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দু'-পাঁচ জন করে জাতীয় সরকারের সেনাপতি যুদ্ধের ঠিক আগেই তাঁদের বন্দুক ঘুরিয়ে ধরেন জাতীয় সরকারের দিকে। কম্যুনিষ্টরা না কি যুদ্ধের সময় লাউড স্পীকারে চেঁচিয়ে গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদের বলে "তি স্যঙ্, চিয়াও চিয়াং," অর্থাৎ "ভাই সব, তোমাদের বন্দুক আমাদের দান দাও।" সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সৈন্যেরা না কি ওদের দলে যোগ দেয়। গভর্ণমেণ্ট তরফ থেকে অবশ্য মাঝে মাঝে বড় বড় ইস্তাহার বেরোয় "অমুক অমুক সেনাপতি কম্যুনিষ্ট দস্যু দমনের জন্য নিজের দেশকে রক্ষা করতে শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পাত করে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।" অথচ কম্যুনিষ্ট তরফ থেকে প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ, সেই সব সেনাপতিদের না কি সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয়েছে ওদের শিবিরে।

সমগ্র চীনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারো মনে নেই শান্তি। সব জায়গায় ফুটে উঠেছে একটা অশান্ত উদ্বেগের ছাপ—দুর্দশার ক্লান্ত অভিব্যক্তি। বর্তমান সরকার সরবে গালি দেয় কম্যুনিষ্টদের, "ওদের জন্যেই কিছু করে উঠতে পারছি না আমরা—দেশের উন্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট হচ্ছে কেবল ওদেরই অপচেষ্টায়।" কম্যুনিষ্টরা তাদের রেডিওতে খবর দেয়, "ঐ আমেরিকার চা-পোষা ঘুষখোর চোরা গভর্ণমেণ্টের পাল্লায় পড়ে তোমরা এখন খাচ্ছ "ও থউ।" আমরা যদি আর কিছুই না পারি, অন্ততঃ "শওপিং," তো খেতে দেবই তোমাদের।" 'ও থউ' হ'ল গুঁড়ো ভুট্টার দানা সেদ্ধ-করা এক রকম খাবার, আর 'শওপিঙ' হচ্ছে ময়দার সঙ্গে তিল মিশিয়ে বানান এক রকমের বিস্কুট-বিশেষ। দু'টোই অতি শস্তা-দরের খাবার। তবু এরই মধ্যে নিজেকে অভিজাত শ্রেণীর বলে প্রচার করে 'শওপিঙ' বসতে চায় না 'ও থউ'এর সঙ্গে এক পংক্তিতে।

বাস্তবকে সাদা চোখে দেখতে অভ্যস্ত সহজ দার্শনিক এই হানেরা 'সত্যিকারের উপলব্ধি করেছে—"মনেরে তাই কহ যে ভালো-মন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে।" তাই সবল মনে এগিয়ে চলেছে অনিশ্চয়তাও একসঙ্গে পা ফেলে তার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। প্রফেসারেরা রাত্রি বেলায় রিক্সা টেনে পয়সা উপায় করেন ছেলে-মেয়েদের আধপেটা ভাতের জন্য। একদা যারা সম্রাটের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেতে অভ্যস্ত ছিল সেদিনের সেই অভিজাতেরা আজ আবর্জনার গাদা থেকে আধ-পোড়া কয়লা সংগ্রহের প্রতিযোগিতা করে কোন রকমে বেঁচে আছে। দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে এক জন চীনা সাংবাদিক একটি ভারী চমৎকার উপমা দিয়েছিলেন। গল্পে ছিল, ছেলের স্বত্ব নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল নকল মা ও আসল মা'র মধ্যে। বিচারে যখন স্থির হ'ল ছেলেটিকে কেটে আধাআধি ভাগ করে দেওয়া হবে দুই মায়ের মধ্যে, তখন আসল মা বলেছিল, "ছেলে আমার বেঁচে থাকুক, কাটবার দরকার নেই, পুরোটাই তোমরা অন্য মাকে দাও।" চীনের অবস্থা আজ ঠিক সেই গল্পের ছেলেটির মত। তবে এ আরও দুর্ভাগা। এক জনও যে ওর আসল মা নয়, সেই কথাটাই সপ্রমাণ হচ্ছে এদের প্রাণান্তকর ঝগড়া দেখে। ভাগাভাগি কাটাকাটি যে ভাবে হোক কিছুটা অংশ পেলেই হয়। দেশ বাঁচল কি মরল সেদিকে এদের কারুরই কোন নজর নেই। এত বড় বিরাট দেশ, এত প্রাচীন তার সংস্কৃতি, এত সুপ্রতিষ্ঠিত তার ঐতিহ্য, কিন্তু সত্যিকারের ত্যাগী নেতার অভাবে সারা দেশটা আজ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। জীর্ণ-ভিত্তি প্রাচীন সৌধের মত ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছে তার সমস্ত দেওয়াল। ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে চীন—"সম্ভবামি যুগে যুগে" করে আসবেন কে জানে?

এত দুঃখ—এত দুর্দশাতেও যে এরা এমন শান্ত ভাবে আছে, এতে কখনো কখনো মনে হয়, এ যেন ঝড়ের পূর্বক্ষণের আকাশ! আসন্ন প্রলয়ের প্রত্যাশায় স্তব্ধ-গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে চীনের এই বিরাট ড্রাগন। বহু বর্ষের বহু লাঞ্ছনা সে ভোগ করেছে—সবাই ভাবছে বুড়ো ড্রাগন হয়ত পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে কালের নির্মম কশাঘাতে। জানে না তারা, রুদ্ধ আক্রোশে চুপ করে সে সহ্য করেছে সব—কিন্তু আর নয়—দিন আগত ঐ—তার অগ্নি-নিশ্বাসে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে স্বার্থ-সর্বস্ব অত্যাচারীর দল—বিরাট লেজের ঝাপটায় ভেঙ্গে চুরমার হবে উৎপীড়কের পাষাণ সৌধ, নিরীহ 'হানের' ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মশলায় গড়ে-ওঠা প্রমোদ-প্রাসাদ গুঁড়িয়ে যাবে তার বজ্রদন্তের ক্রূর নিষ্পেষণে। বিপ্লবের সেই অঙ্ক দেখবার প্রত্যাশায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি আজকের পেইপিং-এ, সেই আসন্ন ঝড়ের সন্ধ্যার মুখে।

চীনা ফেরীওয়ালী

পোষ্ট-মর্টেম্

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ডাক্তার রামানন্দ পোষ্ট-মর্টেম্-রিপোর্ট লিখছিলেন :

পোষ্ট-মর্টেম নং—৮১

নাম—অজ্ঞাত

বয়স—একটি সম্পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ

সেক্স্—মেল্

ডেড্ হাউসে আনা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের চৌঠা মে বেলা টার সময় এবং পরীক্ষা করা হয়েছে ১৯৪৭ সালের ৫ই মে বেলা টার সময়।

পুলিশের বিবরণ—এটি পাওয়া গেছে মুশারফ চৌধুরী লেন ও ্যালংকার এভিনিউর মোড়ে। স্থানীয় লোকজনের কাছে খোঁজ য় কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। অনুমান হয়—

এই পর্যন্ত লিখে ডাক্তার রামানন্দ থামলেন, তাঁর ঠোঁটের ওপর হীন এক টুকরো হাসি। দেখতে দেখতে সেটুকু মিলিয়ে গেল। র ও ভাবলেশহীন হয়ে উঠল তাঁর মুখ। ছোঃ! পুলিশ জাতটা বার বড়াই করে! কতটুকু ওদের সাধ্যি! কি-ই বা ওরা জানে! পেছনের ইতিহাসটা ওরা জানে! অথচ লেখার ধরণটি কি রকম জনোচিত! তবু এই সব পুলিশের কৃপায় তাঁদের মত লোকদের থেষ্ট হয়েছে। তথাকথিত অপকর্ম তো তিনি যথেষ্টই করেছেন, কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচনে এ ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হয়তো নই মনোনীত হবেন। অন্তত দাঁড়াবেন যে এ কথাটা তো নিশ্চিত।

ডাক্তারের চওড়া চোয়ালের বাঁ দিকে যে কাটা দাগটি আছে, ওপরে তিনি হাত বুলাতে লাগলেন—এটি তাঁর মুদ্রাদোষ। আগামী নির্বাচনে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। শুধু দাঁড়ানো নয়, তেও হবে তাঁকেই। তার জন্যে সব রকম উপায় তিনি অবলম্বন বেন। দৃঢ় সংকল্পের স্বাক্ষর ফুটে উঠল তাঁর সত্ত কুঁচকে-ওঠা তে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এ কথাটা তিনি মানেন। যার আছে, শক্তি আছে, সে দুনিয়াকে ভোগ করবে, উপভোগ করবে র ঐশ্বর্য—শুধু সোনা-রুপোর ঐশ্বর্য নয়, পৃথিবীর সব রকমের । লোকে বলবে—ব্যভিচার। কিন্তু ডাক্তার রামানন্দ জানেন ছোট বেলায়-পড়া 'শৃগাল ও আঙুর ফল' গল্পের শৃগাল-মনোবৃত্তি। তাঁর মতে বেশীর ভাগ লোকই ঐ শৃগালের মত। আর ড়া যে-সব কাজের জন্য তাঁকে অপবাদ দেওয়া হয় সে-সব কাজকে ঐ অপকর্ম মনে করেন না।

আবার রিপোর্টে মন দিলেন তিনি। দ্রুতগতিতে কলম —বাইরের চেহারা, কোথাও আঘাত লেগেছে কি না, মাথার র মধ্যে কি পাওয়া গেল, থোরাক্স্, অ্যাব্ডোমেন, মাস্ল্স্, ও অস্থিসন্ধি,—শেফার্স্ পেনের সোনালী টুপিটা কাগজের ওপর ছোটাছুটি করছে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল, হাইড্রোষ্ট্যাটিক্ করা হয়নি।

ডাক্তার রামানন্দের ছ'ফুট চেহারাটা খাড়া হয়ে উঠল। হাইড্রোষ্ট্যাটিক্ টেষ্ট করলেন তিনি। পজিটিভ! হুঁ, দুনিয়ার ফোঁটা বাতাস বুকে নিয়েছে তাহলে।

দেখতে হয়েছিল, না মায়ের মত? ছিন্নভিন্ন দেহটাকে জোড়া-তাড়া দিয়ে তিনি দেখতে থাকেন। মায়ের মতই মনে হচ্ছে। না, চোয়ালটা তো বাপেরই মত……

*   *   *   *

'তোমার চেহারার প্রশংসা আমি সব সময়ই করি রাণী। তবু দারিদ্র্যের আঁচে রূপ তোমার ঝ'লসে যাচ্ছে, এক-এক সময় এ জিনিষটা আমার অসহ্য মনে হয়—' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার রামানন্দ তাঁর কথার প্রতিক্রিয়াগুলো রাণীর মুখের ওপরে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

রাণী কি যেন একটা সেলাই করছে—দ্রুতগতিতে চলছে তার হাত। নত মুখের ওপরে স্পষ্ট একটা বিরক্তির ছাপ।

ডাক্তার রামানন্দ সেটুকু লক্ষ্য করেন, বলেন, 'তবু যত অসন্তুষ্ট আমার মনে হোক, আমার করবার কিছু নেই, তুমি আমার বন্ধু-পত্নী—' ডাক্তার নিঃশব্দে একটু হাসলেন—দীনবন্ধুকে তিনি বন্ধু ব'লে স্বীকার করেন না, কিন্তু রাণী তাঁর বন্ধু-পত্নী।

নতমুখে রাণী সেলাই ক'রে যাচ্ছে। নিজের রূপ সম্বন্ধে এ অশিষ্ট প্রশংসা তাকে বিরক্ত ক'রে তুলছে। আর তাছাড়া স্বামীর দারিদ্র্যের কথা অন্য লোকের মুখে শুনতে তার ভাল লাগে না। কিন্তু চুপ ক'রেই থাকতে হবে। রামানন্দ তার স্বামীর বন্ধু, ডাক্তার, রাণীর অসুখের সময় তিনি কি না করেছেন। অথচ একটিও পয়সা নেননি।

এ দুর্বলতার কথা ডাক্তার রামানন্দও জানেন। তিনি এবার অন্য ভাবে সুরু করলেন, 'শুধু তোমার রূপ নয়, তোমার বিদ্যা, তোমার শিক্ষা, তোমার কালচার—' ডাক্তার থামলেন—বড় বেশী বলা হচ্ছে না! 'সত্যি কথা ব'লতে কি, এ তোমার যোগ্য স্থান নয়।'—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'কিন্তু কি-ই বা করার আছে, শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে সুখী করেন, এই অন্ধকারকে তুমি যেন নিজের দীপ্তি দিয়েই দূরে সরিয়ে দিতে পার।'

এতক্ষণে রাণী একটা কথা বললে, 'আমি বেশ সুখেই আছি ডাক্তার বাবু।'

রামানন্দ ঠোঁট বেঁকিয়ে একটুখানি হাসলেন। অর্থাৎ আমি সাইকোলজি-পড়া ডাক্তার, আমার কাছে কিছু লুকোতে এসো না।

রাণীর মুখ সেই হাসির সামনে বিবর্ণ হয়ে গেল। সত্যি কি তাই! সে কি সুখী নয়! ডাক্তারের মুখে বহু দিন শুনেছে মানুষের অবচেতন মনের কথা: '—সচেতন মনের পেছনে মানুষের আরও একটা মন আছে, সেখানকার খবর মানুষ নিজেও ঠিক মত জানে না। সেই অবচেতন মনের অন্ধকার গুহায় অনেক কামনা-বাসনা চিন্তার জন্ম হচ্ছে, আমাদের অজ্ঞাতেই; কিন্তু সেগুলো সচেতন মনের শাসনকে ভয় করে, তাই বাইরে বেরোয় না, অন্ধকারেই তারা লুকিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে সচেতন মনের পাহারা শিথিল হয়, সেই দুর্বল মুহূর্তে এক-আধটা অন্ধকারের প্রাণী এলোমেলো পোষাকে ছেঁড়া-খোঁড়া রূপে আচমকা আমাদের চোখের সামনে এসে হাজির হয়, আমরা চমকে উঠি—এমন চিন্তা কি আমাদের মনের মধ্যে ছিল?…আমাদের মনকে আমরা পুরোটা জানি না।…'

রাণী সেলাই ফেলে ভেতরে চলে যায়। আর সেই দিকে তাকিয়ে ডাক্তার রামানন্দ ভাবতে চেষ্টা করেন, এমন রূপগুণের

প্রশংসা তিনি আর ক'টা মেয়েকে করেছেন।···সেই বেথুন কলেজের মেয়েটার তো নামই মনে পড়ে না,···তার পরে ডলি চ্যাটার্জি, সুষমা সান্যাল···। আত্মপ্রসাদে তাঁর মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে—সব-লোকেই তিনি বৃন্তচ্যুত করতে পেরেছিলেন। অতএব চতুর্থটিকেও পারবেন—সহজ লজিক।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সামনের কাচ-খারাপ ফাটা আয়নার মধ্যে ছায়া পড়ল—তাঁর হাসি-হাসি মুখখানাকে বীভৎস দেখাচ্ছে—চোখ ছোট হয়ে গেছে অস্বাভাবিক রকমের ছোট আর তীক্ষ্ণ, চওড়া চোয়ালটা আরো চওড়া মনে হচ্ছে, বাঁ দিকের কাটা দাগটা অনেকখানি লম্বা, নীচের ঠোঁটটা পুরু। মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগে। সত্যি কি তিনি অমনি? না। দুনিয়াও ঐ কাচ-খারাপ ফাটা আয়নার মত তাঁকে ক্রমাগত কুৎসিত ব'লে অপপ্রচার করছে। কিন্তু কাচটা ভাল হ'লে—

কিন্তু বাণী এখনও আসছে না কেন! অনেকটা সময় তিনি অপব্যয় করেছেন তার জন্যে। সাধারণত তিনি এত সময় ধরে একটা মাছকে খেলান না। হ্যাঁচকা টানে ডাঙায় তোলার চেষ্টা করেন। হয় মাছ উঠবে, নয় মাছের ঠোঁট ছিঁড়ে রক্ত পড়বে।

যথেষ্ট অর্থও তাঁর অপব্যয় হয়েছে। কোন নিকট-আত্মীয় তাঁকে ডাকলে তিনি রুগী দেখার পর বলেন, 'কি টাকাটা কি দেওয়ার ইচ্ছে আছে?' ওপরে হালকা হাসির একটা পাতলা আবরণ থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম রসিকতার আড়ালে যে আসল কথাটি রয়েছে, সেটা বুঝে নিতে কারো দেরী হয় না। ডাক্তার পকেট ভারী করেই বাড়ী ফেরেন।

এ হেন রামানন্দ ডাক্তার এ বাড়ী থেকে পয়সা নেন না, অথচ বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বিশেষ ছিল না। এক ক্লাশে পড়তেন। [illegible] আর ডাক্তারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য তাঁদের দু'জনের মধ্যে ফাঁক রেখেছিল। রামানন্দ ডাক্তারীতে ভর্তি হওয়ার পর সে ফাঁক আরো বাড়ে।

বহু দিন পরে হঠাৎ আবার সাক্ষাৎ। বাণীর অসুখকে [illegible] করে হ'ল একটু ঘনিষ্ঠতা। দীনবন্ধু ভাবলেন, ডাক্তার [illegible]।

কিন্তু তিনি বদলান নি।

[illegible] প্রথম দিনটার কথা তাঁর মনে প'ড়ল। একটু [illegible] হয়েছিলেন তিনি। টাকা নেবেন, এটা তাঁর ঠিকই ছিল। [illegible] চোখ-মুখ নিয়েই ডাক্তার রুগীর ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু [illegible] দিকে চোখ প'ড়তেই তিনি প্রসন্ন হ'য়ে উঠলেন।

[illegible] পর রুগী দেখার পালা। বাণী তো লজ্জায় জড়সড়, মুখটা [illegible]। রামানন্দ আশ্বাস দেন: 'লজ্জা কি? আমায় ঠিক মত [illegible] দিন, আপনার অসুখটা বুঝতে হবে তো, এখন তো [illegible] কষ্ট পাচ্ছেন, সেরে গেলে—'

[illegible] সব কথায় বাণী আরো লজ্জা পেয়ে যায়। আর সেই [illegible] মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মনে মনে বললেন, [illegible]—'

[illegible] তাড়া দেন: 'টিপ, টিপ, নাও—ডাক্তারের [illegible] আরো [illegible], না, কি?'

[illegible]গ-পরীক্ষা শেষ হয়, বারান্দায় সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার সময় ডাক্তার আবিষ্কার করেন যে, তিনি রোগের চেয়ে রুগীকেই বেশী দেখেছেন; কি অসুখ তা দেখেননি, দেখেছেন—কার অসুখ।

দীনবন্ধু টাকা দিতে এলে তিনি বলেন, 'ছিঃ, তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি? বড়লোকদের কাছ থেকে নিই বটে, কিন্তু তুমি গরীব কেরাণী—'

কৃতজ্ঞতায় দীনবন্ধুর মুখে ভাষা জোটে না।

যাওয়ার সময় ডাক্তার বাণীকে আশ্বাস দিয়ে যান: 'কিচ্ছু ভয় নেই, সব ভাল হ'য়ে যাবে, আমি কাল এসে আর একবার দেখে যাব—'

সেই লজ্জাবতী বাণী আজকাল স্বচ্ছন্দে তাঁর সামনে হেসে কথা কয়। এই ক'টা মাসে তার জড়তা অনেক কেটে গেছে। হঠাৎ ডাক্তারের খেয়াল হয়, বাণী এখনও ভেতরে। ডাক্তার কি করবেন ভেবে পান না। বাড়ীর ভেতরেই যাবেন, বাণীর কাছে? না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—সেখানে আঘাত লাগে। কোন মাছকে তিনি এত দিন খেলাননি। অহেতুক সময়ের অপব্যয় তিনি পছন্দ করেন না।

ডাক্তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠলেন। 'হ্যাঁ, ডালহৌসী একখানা—'

দীনবন্ধু যে অফিসে কাজ করেন, সেখানকার কয়েক জন কর্মকর্তা ডাক্তারের বিশেষ পরিচিত। এক জন তো তাঁর তথাকথিত বহু অপকর্মের সাথী। তাকেই বলতে হবে। একটু কলকাঠি নেড়ে দিতে হবে, যাতে দীনবন্ধুর চাকরীটা আর বেশী দিন না থাকে।

কর্মসঙ্গীটিকে অনেক কিছুর লোভ দেখিয়ে রাজি করালেন। তবে মাস খানেক সময় চাই—একটা অজুহাত তো সৃষ্টি করতে হবে।

বেড়াজাল পাতলেন ডাক্তার। শিকারকে ছেঁকে তুলবেন।

কয়েক দিন পরে বাণীর একটা গোপন দুর্বলতা ডাক্তারের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। বাণীর দু'বছরের দাম্পত্য-জীবন তাকে মাতৃত্ব দিতে পারেনি। এ বন্ধ্যা-জীবনের অভিশাপ থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু মুক্তির উপায় সে জানে না, জানতে চাইল ডাক্তারের কাছে, লজ্জার মাথা খেয়ে। আর রামানন্দের কাছে সে লজ্জা তো সে বিসর্জন দিয়েছে সেই অসুখের সময় থেকে।

ডাক্তারের চোখের ওপরে অনেকখানি আলো ঝলকে ওঠে। চোয়ালের কাটা দাগে হাত বুলোতে বুলোতে গম্ভীর গলায় তিনি বলেন, 'কথাটা তোমার হয়তো তেমন ভাল লাগবে না, তবু প্রসঙ্গটা যখন উঠেছে তখন ব'লে ফেলাই ভাল—তোমার বন্ধ্যা-জীবনের জন্যে দায়ী দীনবন্ধু, কোন দিনই বোধ হয় তুমি মা হ'তে পারবে না—'

বাণী শিউরে উঠে। না, না, এ সত্যি নয়। কারুর কোন দোষ নেই। ভগবানের আশীর্বাদ সবাই তো পায় না। পূর্বজন্মের পাপ ছিল তার। ঈশ্বরের অভিশাপই সে মাথা পেতে নেবে।

এমন সময় ডাক্তারের ভগবান ডাক্তারের ওপরে আর একটু প্রসন্ন হলেন। কিছু দিন আগে-পোঁতা বীজের অংকুরোদ্গম হয়েছে। দীনবন্ধুর চাকরি গেল।

ডাক্তার আশ্বাস দিলেন : 'কিছু ভাবতে হবে না, আমি তোমার জন্তে চেষ্টা করব, এত বড় কোলকাতা সহরে একটা চাকরী হবে না? না হয় বাইরে চ'লে যাবে। সব ঠিক ক'রে দেব আমি। তবে আজ না হয় কাল—'

আজ কাল ক'রে তিনটি মাস কেটে গেল। দীনবন্ধুর মাথা খারাপ হবার বিশেষ বাকি নেই। সঞ্চয় তাঁর কোন দিনই ছিল না। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য কোন রকমে বজায় রেখে তাঁর দিন চলত। এখন আয়ের অংকটা দাঁড়িয়েছে শূন্যে। এ শূন্যতার বোঝা তিন মাস টেনে তিনি জীবনের উপান্তে এসে দাঁড়ালেন।

এক দিন হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি ডাক্তারের দরজায় এসে দাঁড়ালেন : 'ডাক্তার, আমি ফুরিয়ে গেছি—একেবারে নিঃশেষ। মৃত্যু বোধ হয় আমার দরজায়। উপকার তুমি আমার করেছ—এ তিন মাস যে বেঁচে আছি সে শুধু তোমারই কৃপায়। কিন্তু তার জন্তে ধন্তবাদ জানালে তোমায় পরিহাসই করা হবে, অপমান তোমায় করতে চাই না। কিন্তু আজ ঠিক করেছি, আর তোমার কাছে হাত পাতব না। না, না, ব'লতে দাও—এর চেয়ে মরাও ভাল—তিলে তিলে আত্মার মৃত্যু অসহ্য—'

বাধা দিলেন ডাক্তার : 'তুমি কি পাগল হ'লে না কি? আরে শোন, আমি তোমার জন্তে একটা চাকরি ঠিক করেছি—এক্ষুণি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম।

'চাকরী! কোথায়!'—চীৎকার ক'রে উঠলেন দীনবন্ধু।

'দিল্লীতে, আমার এক বন্ধু—এই নাও ঠিকানা, আর পথ-খরচা বাবদ এই একশো টাকা নাও—পরে না হয় শোধ দিও—ধার দিচ্ছি। এক্ষুণি হাওড়া চ'লে যাও। দেরী করলে এ ট্রেণটা পাবে না: 'শুভস্য শীঘ্রম্।'

'বাণী—!'

'এক্ষুণি খবর পাঠাচ্ছি আর আমি থাকতে—'

'ডাক্তার, তুমি দেবতা—'

হ্যাঁ, দেবতাই বটে। সেদিন আর ডাক্তার দীনবন্ধুর বাড়ীমুখো হলেন না। বাণী কাঁদুক আজ রাতটা, দেহ আর মন হোক দুর্ব্বল।

পরদিন ডাক্তার আসতেই বাণী কেঁদে লুটিয়ে পড়ল : 'উনি কাল বাড়ী ফেরেননি ডাক্তার বাবু—'

ডাক্তার যেন আকাশ থেকে পড়লেন : 'অ্যাঁ! আশ্চর্য! ...আচ্ছা, দীনবন্ধুর কি বগলের কাছে একটা কাটা দাগ ছিল?'

'হ্যাঁ; কেন? কি হয়েছে, কি হ'য়েছে ডাক্তার বাবু, বলুন, বলুন, চুপ করে থাকবেন না।'

'বলছি, শুনতে তো তোমায় এক দিন হবেই, যত দুঃখেরই হোক সে কথা—' ডাক্তার কাটা দাগের ওপরে হাত বুলাতে লাগলেন।

'বলুন, বলুন ডাক্তার বাবু। থামলেন কেন?'

'মোটর অ্যাক্সিডেন্টে—মুখটা থেঁতলে গিয়েছিল, আমি চিনতে পারিনি, অবশ্য সে যে দীনবন্ধুই, এ কথা—'

'আমার কি হবে—' উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে বাণী ভেঙে পড়ল।

ব্যবস্থা অবশ্য ডাক্তার করলেন। বাণীর সমস্ত দায়িত্বই তিনি নিলেন। মুশারফ চৌধুরী লেনের দোতলা একটা বাড়ীতে রাখলেন বাণীকে। সে প্রথমটা থমকে দাঁড়িয়েছিল—দ্বিধা ছিল তার মনে, ছিল সন্দেহ, আশংকা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বাণী নিরুপায়, বিশ্বাস করে সে ডাক্তারের হাত ধরল, অবলম্বন তো চাই একটা।

তার পরের ছ'মাসের ইতিহাস খুব সরল, জটিলতা নেই এক বিন্দু। উন্মত্তপ্রায় দীনবন্ধু এসেছিল, ডাক্তার তাঁকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন : 'আমি কিছু জানি না, আমি দেখা-শোনা করছিলাম, হঠাৎ এক দিন গিয়ে দেখি বাণী নেই—যত সব চরিত্রহীনা মেয়েলোক—'

ছ'টি মাস ডাক্তার উদগ্র আগ্রহে মুশারফ চৌধুরী লেনে সুধা পান করলেন। আরো কিছু দিন ইচ্ছে ছিল—কারণ তখনও মদের স্বাদ ফোলো হ'য়ে আসেনি। কিন্তু হঠাৎ বাণী এক দিন বললে, 'আমি মা হ'তে চলেছি, তোমার সন্তানের মা—'

সেই দিন থেকেই বাণীকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি স'রে গেলেন। পিতা হবার সখ তাঁর নেই। তাঁর মতে জীবনের পথ বড় সংকীর্ণ—দু'জন গা-ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে চলতে পারে, তাই তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাবের সূচনাতেই তিনি বিদায় নেন।

ভগবানের যে আশীর্বাদ বাণী চেয়েছিল, তা সে পেয়েছে, কিন্তু রাখেনি, নিজে হাতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। আশীর্বাদ কি তার জীবনে অভিশাপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল? তথাকথিত—

* * * *

যাক্, ও-সব ভাববার সময় ডাক্তার রামানন্দের নেই। অতীত সম্পূর্ণ মুছে ফেলে তিনি ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেন, পথ চলার সময় পেছনের পা কোথা থেকে উঠেছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখেন না, নজর থাকে—সামনের পা যেখানে পড়বে—

আরো একটা কাজ রয়েছে হাতে। সেটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়। পুলিশ-রিপোর্ট পড়ে নিলেন তিনি : ভিখিরি গোছের একটা লোককে মৃত-অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া গেছে কাঁসারীপাড়া রোড থেকে। স্থানীয় লোকের কাছ থেকে জানা যায় যে, লোকটা পাগল ছিল—'ডাক্তারকো মার ডালো', 'ডাক্তার লোগ ছুসা...' এই সব ব'লে চেঁচাত—

রামানন্দ একটু হাসলেন—এত বিরাগ কেন বাপু!

—লোকটার কাছে কতগুলো কাগজ-পত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে লোকটার নাম—দীনবন্ধু রায়।

চোয়ালের কাটা দাগে হাত দিয়ে ডাক্তার ভাবলেন, নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তিনি চিনতে পেরেছেন। কিন্তু অপব্যয়ের জন্তে সময় নয়। তাড়াতাড়ি পরীক্ষা ক'রে তিনি রিপোর্ট লিখতে বসলেন—পোষ্ট-মর্টেম নং ৮২।

হাজারমারীর বিভীষিকা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহৃষীকেশ হালদার

বাগান-বাড়ীর জীবন্ত ভূত

বাড়ী ফিরে আমরা আর এক দফা বিস্মিত হলাম। হাজারমারীর মাঠে যাবার আগে আমরা নকল দারোগাটিকে বেঁধে রেখেছিলাম। যে ঘরে সে আটক ছিলো, সে ঘরখানাকে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করতেও আমরা ভুলিনি। কিন্তু এতখানি সতর্কতাকে উপহাস করেই যেন পাখী খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে। তালাটা তখনো দরজায় ঝুলছিলো, ঘর শূন্য—জাল জীবনময় কোথাও নেই।

প্রদীপ বললো: বোধ হয় ওর অনুচরেরা ওকে খুঁজতে এসে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। কারণ, সাঙ্গোপাঙ্গদের না জানিয়ে ও যে একা গ্রেপ্তার করতে এসেছিলো এমন মনে হয় না। এখন এখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। ও যদি আবার তার দলবল নিয়ে আমাদের সন্ধানে এখানে আসে, তাহলে বাধা দেওয়া করা আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হবে।

চন্দ্রিকা সিং বললেন: এখনি সদরের উদ্দেশে সবাই মিলে যাত্রা করি চলো। তার পর সেখান থেকে পুলিশবাহিনী নিয়ে জীবনময়ের সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করতে হবে। ওকে আমাদের হাত এড়িয়ে এত সহজে পালাতে দেবো না।

প্রদীপ মৃদু হেসে বললে: বৃথা আশা মিঃ সিং। এতক্ষণে জীবনময় আর তার সঙ্গীরা থানা থেকে নিশ্চয়ই অনেক—দূরে সরে পড়েছে। আমাদের হাতে ধরা দেবার জন্যে সে বসে নেই। তবে আমাদের কর্তব্য করতেই হবে—সদরে গিয়ে আর সেখান থেকে পুলিশবাহিনী এনে থানা খানাতল্লাস করাটা আমাদের আইনসঙ্গত কর্তব্য।

প্রদীপের ভবিষ্যদ্বাণীই শেষ পর্য্যন্ত সত্য হলো। সদরে পৌঁছে এক পুলিশবাহিনী নিয়ে ফিরতে আমাদের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। থানায় গিয়ে আমরা দেখলাম—সেখানকার কাগজপত্র, জিনিষপত্র সব বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে আছে। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। সদর থেকে আমাদের সঙ্গে আগত নতুন দারোগা থানার ভার গ্রহণ করলেন। কয়েক জন সশস্ত্র প্রহরীও থানায় রইলো, বাকী সকলে আবার ফিরে গেলো সদরে।

বার বার নিষ্ফলতায় আমাদের দেহ-মন অবসাদে ভরে গিয়েছিলো। সে রাত্রিটা কোন রকমে সোনারগাঁয়ে কাটিয়ে পরের দিন ভোরবেলাই প্রথম ট্রেনে কলকাতা যাত্রা করলাম।

প্রদীপের অনুসন্ধানের ধারা সত্যিই একটু স্বতন্ত্র ধরণের। সাধারণ লোকে যা ভাবে, সে ঠিক তার বিপরীত পথেই চলে। হাজারমারীর মাঠে ওদের আস্তানাটার সন্ধান পাবার পর চন্দ্রিকা সিং আর প্রদীপের ইচ্ছা ছিলো সেখানটা ভালো করে তল্লাসী করবার। তার জন্যে, দরকার বোধ করলে সদর থেকে কিছু বেশী করে সশস্ত্র প্রহরী আনিয়ে নিলেই কাজ চলতো। কে জানে, হয়তো ওখানেই আসল জীবনময় আর তাঁর সঙ্গীরা, এমন কি তাঁর আগের দারোগা বাবু সদলে বন্দী হয়ে আছেন। তেপান্তর মাঠের মাঝখানে অমন একটা জায়গায় সব কিছুই সম্ভব। প্রদীপ কিন্তু কিছুতেই হাজারমারীর মাঠে নতুন করে হানা দিতে রাজী হলো না। তার মতে, ওখানে গেলে আর একবার ব্যর্থতা বরণ করতে হবে। তারা ধরা পড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করে নিজেরা কিছুতেই সেখানে নেই; আর জীবনময়, তাঁর আগের দারোগা বা তাঁদের লোকজনকেও নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলেছে।

চন্দ্রিকা সিং কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, অতগুলো লোকজনকে সরিয়ে ফেলতে অনেকখানি সময়ের দরকার। তা ছাড়া লোকজনের চোখ এড়িয়ে তাদের সরানো একান্ত অসম্ভব। হাজারমারীর মাঠের যেদিক দিয়েই ওরা পালাক না কেন, গ্রামের কোন না কোন লোকের চোখে পড়বেই। মাঠটার কোন প্রান্তেই তো আর ধূ ধূ মরুভূমি নেই।

প্রদীপ এ কথার উত্তরে কোন তর্ক করলো না। কেবল মাত্র একটু হেসে বললে: আর যাই হোক, অন্ততঃ আপনার কাছ থেকে এ রকম যুক্তি আশা করিনি মিঃ সিং। তাদের পক্ষে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যেই সরে পড়া সম্ভব। অতগুলো লোককে বেঁধে নিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আপনি সেই উড়ন্ত ভূতটার কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

—তুমি কী বলতে চাও তাদের ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে? চন্দ্রিকা সিং বিস্মিত ভাবে বললেন: তোমার কথাগুলো যেন কেমন হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে প্রদীপ!

—মোটেই হেঁয়ালী নয়, প্রদীপ উত্তর দিলে: আসল ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারবেন, তখন সব রহস্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপাততঃ ব্যারাকপুরে বস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকটিকে একটু নাড়া-চাড়া করে দেখা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

আমরা সকলেই জানতাম, প্রদীপের রহস্যভেদের শক্তি কতখানি। কত বড় বড় ব্যাপারে যখন সকলে হাল ছেড়ে দিয়েছে, প্রদীপ সেখানে তার অক্লান্ত অধ্যবসায়, গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর অপরিসীম কর্ম্মশক্তি নিয়ে নতুন উৎসাহে কাজ সুরু করে দিয়েছে। বিজয়লক্ষ্মী বার বারই তাকে তাই জয়ের মালা পরিয়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রেও যখন আমরা কূল-কিনারা পাচ্ছি না, তখন শুধু প্রদীপই হতাশ হয়ে পড়েনি। তার ওপর অটুট আস্থা ছিলো বলে চন্দ্রিকা সিংও তার মতানুবর্ত্তী হলেন।

কলকাতা ফিরেই প্রদীপ আর চন্দ্রিকা সিং সোজা চলে গেলো গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়াটার্সে। আমি আর অদীপ একটু বিশ্রামের আশায় প্রদীপের বাড়ীতেই স্নানাহার সেরে নিলাম।

ঘণ্টা তিনেক পরে প্রদীপ ফিরলো; মুখে তার একটা বিরক্তির চিহ্ন। কোনো প্রশ্ন করতে হলো না, নিজেই সে বললে: ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে সুধাংশু! জহর সান্যাল লোকটি কেউ-কেটা নয়। রীতিমত এক জন বড় ব্যবসাদার। দান-ধ্যান ক'রে নামও কিনেছেন খুব। পুলিশ-অফিসে বসে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু খবর সংগ্রহ করলাম, তাতে ভদ্রলোককে সব সন্দেহের অতীত বলেই মনে হয়। অনেকে তো আমাকে ভুল পথ ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছি বলে রীতিমত সমঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু···

ভদ্রলোক যদি সব সন্দেহের অতীতই হবেন, তবে হাজারমারীর মাঠে তাঁর নামের কার্ড পাওয়া গেল কেন? বললাম আমি: নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ব্যবসা ফলাও করবার জন্মে ওই সব দুর্বৃত্তদের হাতে নামের কার্ড দেননি।

—আমারও প্রশ্ন তাই। প্রদীপ বললে: কিন্তু ওঁরা বলছেন, কোন লোকের নামের কার্ড কোনো দুর্বৃত্তের কাছে পাওয়া গেলেই যে তাঁকেও দুর্বৃত্ত হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যাই হোক, আজ রাত্রেই আমি আমার সন্দেহভঞ্জন করতে চাই। এ কাজে তোমাকে আর অদীপকে আমায় একটু সাহায্য করতে হবে।

অদীপ চিরকালই কাজ-পাগল। আজই তাকে প্রদীপের নৈশ-অভিযানের সঙ্গী হতে হবে শুনে সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। আমি যদিও চিরকাল একটু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, তবু প্রদীপের পাল্লায় পড়ে এ-পর্য্যন্ত আমাকে অনেক দুঃসাহসিক অভিযানে তার সঙ্গী হতে হয়েছে। এই ভৌতিক ব্যাপারের অন্তরালে কী রহস্য আছে, তা জানবার জন্মে আমার আগ্রহও ছিলো অপরিসীম। কাজেই প্রদীপের প্রস্তাবে আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

রাত তখন ন'টা। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে প্রদীপের ছোট্ট অষ্টিনখানা এসে দাঁড়ালো এমন একটা জায়গায়, যেখানে বসতি মোটেই ঘন নয়। প্রদীপ তার গাড়ীখানাকে পাশের একটা ছোট্ট সরু গলিপথে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে আমি আর অদীপও নেমে পড়লাম। তার পর মিনিট দুই-তিন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে নীরবে যাত্রা।

মস্ত-বড় একটা বাগানবাড়ীর সামনের গেটে এসে প্রদীপ বললে: এই জহর সান্যালের বাড়ী। ভদ্রলোক বড় শান্তিপ্রিয় বলেই না কি এই বাগানবাড়ীতে বাস করেন। রাত মোটে নটা, এর মধ্যেই জায়গাটা কী রকম নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে, দেখছো! বাগান-বাড়ীর ভেতরটা বোধ হয় আরো ঝিমিয়ে পড়েছে, কা[illegible] ওখানে জহর সান্যালের জন দুই মালি আর একটা চাকর, এক [illegible] পাচক ছাড়া আর কেউ নেই। হ্যাঁ, আর আছে একটা ব্লু[illegible] হাউণ্ড কুকুর, ঠিক বাঘের মতই হিংস্র। আশা করছি, রা[illegible] তার দর্শন আমরা এই বাগানের মধ্যেই পাবো। জহর সান্[illegible] হয়তো তাকে বাগান পাহারা দেবার জন্মে এতক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে।

—কিন্তু তুমি এত খবর পেলে কোথায়? প্রশ্ন করলাম আ[illegible]

—ব্যারাকপুরের থানা থেকে এ-সব খবর সংগ্রহ করে [illegible] কোয়াটার্সই আমাকে জানিয়েছে। প্রদীপ উত্তর দিলে: সঙ্গে [illegible] তারা এক জন নিরীহ ভদ্রলোককে এ-ভাবে সন্দেহ করবার [illegible] তিরস্কারও কম করেনি। এখন এসো, পাঁচিল টপ্‌কে বাগ[illegible] ভেতর ঢোকা যাক।

—কিন্তু ব্লডহাউণ্ড···দ্বিধাম্বিত স্বরে বললাম আমি।

—তার ব্যবস্থা আমি করছি। প্রদীপ হেসে বললে. [illegible] পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ি চলো।

বাগানটা মস্ত বড়, তার মাঝখানে একটা প্রাসাদে[illegible] মস্ত বাড়ী, পুকুরও আছে একটা। আর সারা বাগানটাকে [illegible] এক জন মানুষের সমান উঁচু পাঁচিল। অদীপের কাঁধে উঠে [illegible] প্রথমে পাঁচিলে উঠলো, তার পর আমি, সব শেষে অদীপকে [illegible] তোলা হলো। ব্লডহাউণ্ডের ঘ্রাণশক্তি বড় তীব্র। কিন্[illegible] তীব্র তা জানতাম না। আমরা পাঁচিলে উঠতেই পাঁচিলের [illegible] একটা চাপা গর্জ্জন শুনতে পেলাম—গর্-র্-র্······

ব্লডহাউণ্ডটা বোধ হয় আমাদের নীচে নামার প্রতীক্ষা [illegible] নীচে নামলেই লাফিয়ে পড়ে আমাদের টুঁটি ছিঁড়তে তার দে[illegible] না একটুও! এমন সময় প্রদীপ পকেট থেকে একটা কাগ[illegible] কয়েক টুকরো মাংস বার করে নীচে ছুড়ে ফেলে দিলে[illegible] হাউণ্ডটা মাংসের গন্ধে লেজ নাড়তে নাড়তে দু'-এক টুক[illegible] পুরলো। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটা একবার কম্পিত হয়েই [illegible] ওপর লুটিয়ে পড়লো! প্রদীপ মাংসের সঙ্গে কী তীব্র বিষ [illegible] দিয়েছিলো সে-ই জানে।

অতঃপর আমরা একে একে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে [illegible] একটু দূরেই ছোট্ট একখানা একতলা পাকা ঘরের দরজা [illegible] দিয়ে মৃদু আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। পা টিপে-টিপে [illegible] গিয়ে জানলা দিয়ে আমরা দেখলাম ঘরের মধ্যে দু'টো [illegible] হয় বাগানের মালি, জ্বলন্ত উনুনে রুটী সেঁকতে সেঁকতে [illegible] করছে। তাদের অপূর্ব্ব উৎকলী ভাষার যতটুকু কানে ভেসে[illegible] তাতে বুঝলাম, তারা তাদের দেশে অবস্থিত আত্মীয়-পরি[illegible] নিজেদের সুখ-দুঃখের কথাতেই মগ্ন। অতএব তাদের স[illegible] মাথা-ঘামানো নিষ্প্রয়োজন মনে করে আমরা ধীরে ধীরে [illegible] মাঝখানে অবস্থিত বাড়ীটার দিকে এগিয়ে চললাম।

সারা বাড়ীটা অন্ধকারে একটা প্রেতায়িত ছায়ার মত ম[illegible] আশ-পাশের বড় বড় গাছগুলো থেকে বাতাসে একটা অদ্ভুত [illegible] শব্দ উঠছে। ঝিঁঝির দল মহা আনন্দে তাদের গলা সেধে [illegible] আমরা ছাড়া এ-জগতে যে আর জনপ্রাণী কোথাও কেউ [illegible] অপূর্ব্ব পরিবেশে আমরা সে-কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

ফিস্-ফিস্ করে প্রদীপকে প্রশ্ন করলাম: এর পর কী [illegible]

বাড়ীতে ঢুকতে হবে ? দরজা তো বন্ধ দেখছি। বাড়ীও নিশুতি। [illegible] হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

—নিশাচরেরা ঘুমোয় না বন্ধু। প্রদীপ মৃদু হেসে বললে : একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কি না। তোমার কথাই সত্যি হয়, সবাই ঘুমিয়েই পড়ে থাকে, তাহ'লে বাড়ীখানা তল্লাস করবার অনেক সুবিধাই পাওয়া যাবে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একতলার একখানা ঘরে [illegible] ট্রিকের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। আমরা পাশ থেকে [illegible] ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে [illegible] এগিয়ে গেলাম।

[illegible] দেখলাম ?······জানলার ফাঁক দিয়ে যে দৃশ্য আমাদের [illegible] পড়লো, তাতে আমার শরীরের রক্ত যেন হিম-শীতল হয়ে [illegible] ঘরের মধ্যে টেবিলে বসে একটা কঙ্কাল কী লিখে চলেছে, [illegible] কী বীভৎস! মাংসগুলো লাল দগ্‌দগে ক্ষতে ভরা, [illegible] যেন ঝুলে পড়েছে, বড় বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে [illegible] বাইরে। মাথায় চুলের লেশ নেই, সাদা ধব্‌ধবে [illegible] মাথার মত ইলেকট্রিকের আলোয় চক্‌চক্ [illegible]

[illegible] দেখে আমি এতো বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার [illegible] ছিলো না। হঠাৎ সারা দেহে একটা কিসের কঠিন [illegible] করলাম। কে যেন তার লৌহ-কঠিন দু'হাত দিয়ে [illegible] ধরেছে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম—প্রাণপণ [illegible] আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু [illegible]। কে যেন আমায় অবলীলাক্রমে দু'হাতে ধরে শূন্যে [illegible] চললো বাড়ীর ভেতরে। অন্ধকারে ভালো করে কিছুই [illegible] না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম, আমাকে যে-ই [illegible] সে অমিত বলশালী। আমি কোন শক্তিশালী শত্রুর [illegible] বন্দী।

[illegible] সময়ের মধ্যেই আমার আক্রমণকারী আমাকে সেই ঘরের [illegible] ফেললে, যে ঘরের বাইরে থেকে আমরা তন্ময় হয়ে সেই [illegible] দেখছিলাম। আমাকে ধপাস করে ঘরের মেঝেয় ফেলে [illegible] আমার পাশে দাঁড়ালো। সেও একটা কঙ্কাল। [illegible] পরমুহূর্তে প্রদীপও ঠিক তেমনি ভাবে আনীত হলো [illegible] কঙ্কালের ঘাড়ে চড়ে। টেবিলের সামনে বসে আগের [illegible] ঠিক তেমনি করেই তখনো লিখে চলেছে। কিন্তু [illegible]·····অধীপ গেল কোথায় ?······সে কী বন্দী হয়নি এদের [illegible] মধ্যে আশার ক্ষীণ রশ্মি জ্বলে উঠলো। অধীপ যদি [illegible] ভবিষ্যতে সে আমাদের মুক্ত না কোরে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে [illegible]।

[illegible] কঙ্কালটা এবার মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইলে। [illegible] মুখের মধ্যে কালো কালো দু'টো চোখ মিটমিট করে [illegible] দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ কী দেখলে যেন—তার পর অট্টহাস্য [illegible]।

[illegible] রায় না ? না প্রেত-তাত্ত্বিক রাজীব শর্মা ? হো- [illegible] হেসে উঠে বিকৃত কণ্ঠে সেই কঙ্কালটা বলে উঠলো : কী [illegible] তোমায় ?

—তোমার মন বলে। প্রদীপ ততক্ষণে উঠে বসেছে। বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠে সে বললে : আমি বোধ হয় জহর সান্যালের সঙ্গেই কথা বলছি, কেমন ?

—যা তোমার মনে হয়। কঙ্কালটা বিদ্রূপ করে বললে : তোমার সহকারীকে তোমার সঙ্গে দেখছি না যে! বড় আশা করেছিলাম, তাকেও তোমার সঙ্গেই দেখতে পাবো। প্রদীপের বন্ধু অধীপ, গুড়ি, রাজীব শর্মার অনুচর বললো গেল কোথায় ? তার বদলে কোন্ নিরীহ ভদ্রলোককে ধরে এনেছো এখানে ? অবশ্য তাতে ফলের তফাৎ হবে না কিছু। তোমার সঙ্গে ওরও একই গতি হবে।

প্রদীপ কোন উত্তর দিলে না। মনে মনে সে হয়তো আত্মরক্ষার পন্থা স্থির করছিলো, কিন্তু আমাদের সামনেই আমাদের আক্রমণকারী সেই কঙ্কাল দু'টো উদ্যত পিস্তল হাতে অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে পাহারা দিচ্ছে। একটুকু বেচাল দেখলেই ট্রিগার টিপতে তাদের দেরী হবে না।

কঙ্কালটা একটু চুপ করে থেকে আবার বললে : বোকার মরণ ভূতের হাতে—প্রবাদটা কি জানো না রাজীব শর্মা ? মিথ্যে তোমার দুর্বুদ্ধি ধরেছিলো আমাদের পেছনে ধাওয়া করবার। দু'-একটা চোর-ছ্যাঁচোড় ধরে অহঙ্কারে তুমি এত স্ফীত হয়েছিলে যে, আমাদের পেছনে ঘুরোঘুরি করতেও তোমার সাহস হয়েছিলো! কিন্তু আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। এবার তার ফল ভোগ করো।

কথা শেষ করেই কঙ্কালটা এক লাফে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। আমাদের ওপর পাহারা দিতে কঙ্কাল দু'টোও বিভলভারের নলটা আমাদের দিকে ঠিক রেখে পিছু হটে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরের দিকে যেতে লাগলো।

আমরা নড়বার-চড়বার কোন চেষ্টা করলাম না। নিশ্চিত মৃত্যুর মতো উদ্যত রিভলভারের সামনে সে চেষ্টা করাও মূর্খতা। প্রদীপ শুধু চীৎকার করে বললে : একটা কথা বলে যাও জহর সান্যাল। তুমি আমাদের এ-বাড়ীতে আসবার সংবাদ পেলে কী করে ?

—আমার এ-বাড়ী নানা যন্ত্রপাতিতে সাজানো। ঘরের বাইরে থেকে বললে কঙ্কালটা, যে মুহূর্তে তোমরা এই বাগানে পা দিয়েছো, সেই মুহূর্তেই আমার ঘরে লাল আলো জ্বলে উঠে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। কোন্ কায়দায় তোমরা আমার ব্লাডহাউণ্ডগুলোকে চুপ করালে জানি না। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি তোমাদের ইলেকট্রোকিউট (তাড়িতাহত) করে বাগানের মধ্যেই শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু দিইনি কেন জানো ? তুমি এখন আমার বন্দী! হাজার চেষ্টা করলেও আর তোমরা মুক্তি পাবে না কোন দিন! তাই এ রহস্য তোমাদের কাছে ভাঙতে আমার আপত্তি নেই একটুও। তোমাদের যে মেরে ফেলিনি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমার ওপর সে হুকুম ছিলো না।

—হুকুম ? বিস্মিত কণ্ঠে প্রদীপ প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুকুম। বিকৃত সুরে হাসতে হাসতে কঙ্কালটা বললে : বাহতঃ আমি দলের সর্দার হলেও সত্যি সর্দার আর এক জন। তারই হুকুমে আমি আমার অনুচরদের দিয়ে হাজারমারীর মাঠে কাড ফেলে তোমাকে এখানে আসতে প্রলুব্ধ করেছিলাম। আর তুমি এমনি বোকা যে, সেই টোপ গিলে আমার বঁড়শীর শিকার হলে। হাঃ, হাঃ, হাঃ···

—কিন্তু কে, কে তোমার সেই সর্দার? ব্যগ্র কণ্ঠে প্রদীপ প্রশ্ন করলে।

—ইয়োনে নিচি। উত্তর এলো কঙ্কালটার কাছ থেকে।

—ইয়োনে নিচি! বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলে প্রদীপ। এ যে জাপানী নাম! জহর সান্যাল, সত্যি করে বলো তুমি এইমাত্র যা বললে তা কী সত্যি?

কঙ্কালটার তরফ থেকে আর কোন উত্তর এলো না। শুধু একটা বিকৃত হাস্যের তরঙ্গ ভেসে এলো বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে খুট করে একটা শব্দ। বোধ হয় কঙ্কালটা কোন সুইচ টিপে দিলে। মুহূর্তের মধ্যে মেঝেটা কাৎ হয়ে গিয়ে দেওয়ালের এক পাশে অনেকখানি ফাঁকের সৃষ্টি করলে, আর আমরা গড়াতে গড়াতে সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে গলে পড়লাম নীচের দিকে কোন্ অতল গহ্বরে কে জানে।

আমাদের দেহ যে শীতল একটা কিছুর ওপর পড়লো, বেশ বুঝতে পারলাম! কিন্তু তার পর আর কিছুই মনে নেই। মাথায় আঘাত লেগে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

[ক্রমশঃ

বাদলে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ঝুর ঝুর ঝুর বৃষ্টি-নূপুর বাজছে আজি ঐ শোন।
মেঘের বুঝি যাত্রা-পথের ঠিক-ঠিকানা নেই কোন।
দল বেঁধে মেঘ চলছে উড়ে
সাঁঝ-সকালে আকাশ জুড়ে
কেউ পাঁশুটে, কেউ-বা কালো, কেউ-বা ফিকে আসমানি।
কালো বুকে জাগছে কারো বিজলী আলোর চমকানি।

তাল-তমালের হৃদয় জুড়ে জাগছে সে কোন্ ছন্দ রে!
কুঁড়ি কেয়া ছড়িয়ে দিল আপন আপন গন্ধ রে।
ঝরণা-ধারা চলছে নেচে
মরা নদী উঠল বেঁচে
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি গান ধরেছে ঘন তিমির-কুঞ্জে রে।
কত ফুলের মধু ভ্রমর মনের সুখে ভুঞ্জে রে।

বাদল-রাণীর পায়ে দোলা, গলায় কদম-হার দোলে।
মাথার টগর ফুলের মালার গন্ধে সবার মন ভুলে।
পেখম তুলে নাচছে কেকা
কুঞ্জবনে রূপের রেখা
আজ সবুজের ঢেউ উঠেছে ধরার বুকে সবখানে।
সজল হাওয়া শরীর জুড়ায়, আশার বাণী কয় প্রাণে।

আজকে কি আর বলবে খুকু সইকা, কড়া, গণ্ডা রে।
বব খাবে কড়াই ভাজা, গরম লুচি মণ্ডা রে।
পাততাড়ি আজ রইল পড়ে
খুকু মজার গল্প করে
খোকার সাথে পাল্লা দিয়ে ভিজবে সে আজ বৃষ্টিতে।
তাই তো খুকুর ঝরছে খুশী মুখে, চোখের দৃষ্টিতে।

প্রাচীন বাংলার কবি ও কাব্য

(ঘনরাম চক্রবর্তীর কাহিনী)

বিনোদশঙ্কর দাশ

এক সময় আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু কিছু দিন পরে বৌদ্ধদের সে প্রভাব আর [illegible] এল ক্রমে, তাঁরা আচার-ব্যবহারে, ধর্মে-কর্মে অনেকটা হিন্দু [illegible] হয়ে পড়লেন। জল আর মাটি মিশিয়ে আমরা কাল তোয়েরী [illegible] যেমন মূর্ত্তি গড়ি, সেই রকম হিন্দু-ঘেঁষা বৌদ্ধরা এবং বৌদ্ধ [illegible] হিন্দুরা নানা রকম নূতন নূতন দেবতার কল্পনা করেন। [illegible] কি বুদ্ধদেবও ধর্মঠাকুর বা নিরঞ্জন প্রভু নামে পরিচিত হতে থাকে। এই ধর্মঠাকুর বা নিরঞ্জন প্রভুকে কেন্দ্র করে, তাঁর কল্পিত মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তিকথা প্রচার করবার জন্য কয়েক জন কবি কয়েকটি কাব্য লেখেন—যেমন আমাদের রামায়ণ মহাভারত—যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল ধর্ম-মংগল বা নিরঞ্জন-মংগল। এই ধর্ম ঠাকুর [illegible] শিব বা বিষ্ণুর অবতার বলে বাঙ্গালীর কাছে যথেষ্ট পূজো পেয়ে ছিলেন। অনেক রকম ধর্ম-মংগল আজকাল পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেছেন। এবং তার মধ্যে ঘনরামের ধর্ম-মংগলটি [illegible] কিনেছে। তাঁর কাব্য-রচনার পেছনে কিন্তু একটি মজার গল্প [illegible] এখন সেই কাহিনীটি বলব তোমাদের।

ঘনরাম থাকতেন বর্দ্ধমানের তিন ক্রোশ দক্ষিণে কৃষ্ণপুর [illegible] একটি গ্রামে। সেই সময় বর্দ্ধমানের মহারাজা [illegible] ঘনরামকে খুব ভালবাসতেন। ঘনরাম ছিলেন তাঁরই [illegible] ছেলেবেলায় তিনি এক ভটাচার্য্য মশাইর টোলে পড়তেন। সে টোলের নিয়ম ছিল পড়ুয়ারা সব পালা করে প্রত্যেক দিন [illegible] পূজোর ফুল তুলে আনবে। এক দিন ঘনরামের পালা [illegible] তিনি গেছেন ফুল তুলতে, এমন সময় পাতা-শুদ্ধ একটি [illegible] তাঁর পায়ে গেল বিঁধে। ভয়ানক যন্ত্রণা! কি করেন [illegible] পায়েও হাত দিতে পারছেন না। পায়ে হাত দিলে [illegible] যাবে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফুল তুলে টোলে পৌঁছে [illegible] রেখে কাঁটাটি তুলে ফেললেন। পণ্ডিত মশাই পূজো [illegible] দেখেন পাতা-শুদ্ধ কাঁটাটি রামচন্দ্রের মূর্ত্তিটির পায়ের [illegible] রয়েছে। তিনি তো অবাক! কী করে এই কাঁটা দেবতার [illegible] তলায় এল? অবশেষে তিনি খবর নিয়ে জানতে পারলেন ঘনরাম আজ বেগুন-বাড়িতে ফুল তুলতে গেছলেন। ফুল তোলার সময় তাঁর পায়ে এই কাঁটাটি বিঁধে গিয়েছিল। বড় [illegible] পণ্ডিত মশাইর। তিনি আজীবন রামচন্দ্রের পূজো [illegible] কিন্তু রামচন্দ্র তাঁকে কৃপা করলেন না; অথচ এ [illegible] ঘনরাম, তার ওপর কি না দেবতার এত অনুগ্রহ! দুঃ[illegible] পড়ুয়াদের হাতে টোল ছেড়ে দিয়ে যে দিকে চোখ যায় [illegible] তিনি বেরিয়ে পড়লেন বাদশাহী রাস্তা ধরে।

ভীষণ রোদ। গরম বাতাস বইছে। কেউ [illegible] নাই। পণ্ডিত মশাই আর চলতে পারেন না। তখন শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় পড়লেন শুয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] চোখ বুজে এল গভীর শ্রান্তিতে। এমন সময় দু'জন বালিকা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ঠাকুর, পুরী কোন্ পথে যাই

বলতে পারেন ?" ঘুম-জড়ানো চোখে তিনিও উত্তর দিলেন, "এই পথে যাও। আমিও পুরী যাব। একটু জিরিয়ে নিয়ে তোমাদেরই পেছনে যাচ্ছি আমি।" আর একটু পরে আর এক জন বালক তাঁর কাছে উপস্থিত। সে বললে, "আচ্ছা মশাই, এদিকে আমার দাদা বৌদিকে যেতে দেখেছ ?" পণ্ডিত মশাই বল্লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পথে তো তারা এখুনি পুরী গেল ?" ছেলেটি সেই কথা শুনে ছুটল সেই পথে। তার পর কিছুক্ষণ যায় ; এমন সময় এক হনুমান করেছে কি—ঝুপ করে গাছ থেকে পড়বি তো পড় একবারে পণ্ডিত মশাইর কোলে ! পণ্ডিত মশাই ঘুমোচ্ছিলেন ; হঠাৎ হনুমানকে কোলের ওপর পড়তে দেখে চমকে উঠে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলেছেন। আবার হনুমানটা করেছে কি—দাঁই করে একটি চড় বসিয়ে দিয়েছে পণ্ডিত মশাইর নরম গালটিতে। পণ্ডিত মশাই কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমায় মারলে কেন ?" হনুমান বল্লে : "তুমি কি বোকা ! রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এই তোমার সামনে দিয়ে গেলেন, তুমি তাঁদের চিনতে পারলে না, আবার পুরী যাবে বলছ ? যাও, বাড়ি ফিরে রামচন্দ্রের পূজো কর গে।"

পণ্ডিত মশাই আর কি করেন ; বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু পূজো করতে আর সাহস হয় না। তবে কি গৃহ-দেবতার পূজো ব্যর্থ হবে ? অনেক ভেবে তিনি ঘনরামকে ডেকে বল্লেন : "আজ থেকে তুমিই রামচন্দ্রের পূজো করবে আর রামায়ণ লিখবে।" ঘনরাম 'যে আজ্ঞা' বলে কাজ সুরু করে দিলেন। কিন্তু কি মজার কাণ্ড ! ঘনরাম ঠাকুর পূজো করে লিখতে গিয়ে দেখেন সেখানে রামচন্দ্রের বদলে ধর্ম ঠাকুরের ধ্যান ও বর্ণনা লেখা রয়েছে। ঘনরাম তো অবাক। যা হোক, পুঁথি থেকে লেখা তালপাতা ক'টি খুলে আবার নূতন করে রামচন্দ্রের ধ্যান ও বর্ণনা লিখে রাখলেন। ভাবলেন, বোধ হয় ভুল করে কাল লিখে ফেলেছিলেন। রাত্রি বেলা কিন্তু ঘুমোতে ঘুমোতে এক স্বপ্ন দেখলেন, যেন রামচন্দ্র তাঁকে ডেকে বলছেন, "রামায়ণ আর কত লেখা হবে ? অনেকে তো অনেক রকম লিখলো। তা' তুমি ধর্ম-মংগল কাব্য লেখ।" সকাল হোল। ঘনরাম অপূর্ব শক্তি পেলেন। স্নান করে, শুদ্ধ চিত্তে পূজো সম্পন্ন করে পুঁথি পেড়ে কাব্য সুরু করলেন—রামায়ণ নয় ধর্ম-মংগল। কবির লেখনী-স্পর্শে ধর্ম ঠাকুরের কাহিনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো।

এই যে গল্পটি বললাম, এটি যে সত্য ঘটনা নয়, আশা করি সকলেই তোমরা বুঝতে পেরেছ। গল্পটি ঘনরামের ধর্ম-মংগলের পাঠকরা কাব্যটিকে পবিত্রিত করবার জন্য বেঁধেছিলেন। কিন্তু এমন ভাবে গল্পটি রচনা করা হয়েছে যে, মনে হয় একেবারে খাঁটি সত্যি। তাই না ?

কুমারী লতিকা

ইন্দিরা দেবী

সেদিনের কথা মনে পড়ে।

অশোক আর আমি চলেছি মোটর-বাহনে। আবহবিদের মতে গরম কাল। সেটি অনিশ্চিত আকাশের দিন—বোঝা গেল কিছু দূর যেতে না যেতেই। গুরু-গুরু শব্দ শোনা গেল আকাশে। একখানা কালো মেঘ ছুটে এলো পশ্চিম দিক থেকে চোখের নিমেষে। দেখতে দেখতে সব অন্ধকার, তার পরই নামলো প্রবল ধারায় বৃষ্টি। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ এলো নাকে, যেন তৃষ্ণার্ত ধরণীর স্বস্তি নিশ্বাস।

গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে অশোক আপন-মনেই বলতে সুরু করলো : ধরো, মাঝ-পথে একটা রূপকথার রাজপ্রাসাদ পাওয়া গেছে আর আমরা সেইখানে আশ্রয় নিয়েছি, এমন সময়ে হঠাৎ পড়লো একটা বাজ, আর আমরা দু'জনে একসঙ্গে—কথা শেষ না করেই অশোক হেসে ওঠে।

নিষ্ঠুর অশোক !

বৃষ্টির ধারাকে বাঁকিয়ে দিয়ে হঠাৎ দমকা হাওয়া উঠলো। অশোক আরো খুসী হয়ে উঠলো, বল্লে : চমৎকার ! নয় কি ?

উত্তর দেবার মত ভাষা পেলাম না খুঁজে।

ঘূর্ণি হাওয়ার ধমকে যেন পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছি, চমৎকার মধুর আবেশ চারি দিকে। মাঝে মাঝে নরম ঠাণ্ডা হাওয়ার শিহরণে সারা অঙ্গ দুলে উঠছিল।

আমরা যখন আমাদের বাড়ীর বাইরের উঠানে এসে পৌঁছেছি, তখন হাওয়া থেমে গেছে, বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে মুষলধারে। গাড়ী থেকে নেমে আমি সদর দরজায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। অশোক গেল গাড়ীটা গ্যারেজে রাখতে। লক্ষ্য করছিলাম বৃষ্টির ধারা কি চমৎকার তির্যক ভঙ্গীতে এসে পড়ছে—সামনের উঠানে। ইচ্ছে হচ্ছিল নেমে যাই ওই বৃষ্টির মধ্যে।

হঠাৎ আবার জাগলো মেঘের ডাক—সমস্ত আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে। ততক্ষণে অশোক গাড়ী রেখে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ! বললে, আহা, কি চমৎকার আওয়াজ !

সে আমার ঠিক পাশেই দাঁড়ালো ! দু'টি চোখ তার অপলকে চেয়ে আছে আমার দিকে। কি দেখে সে আমার মুখে ?

'লতিকা'—ভারী গলায় অশোক বল্লে : 'অদ্ভুত' !

—কি !

—তুমি !

একটা অহেতুক আনন্দ বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে গেল।

নিজের অন্তরে চেয়ে দেখছিলাম কোথায় অদ্ভুত আমি।

অশোকের চোখে কি যেন অনুনয়ের সুর।

সে আবার বল্লে : তোমায় আমি ভালবাসি কি না, তাই যে তোমায় দেখেও আনন্দ পাই। হলেই বা তুমি অনেক দূরের জন, নাই বা পেলাম তোমাকে আমার কাছে কোনো দিন, তবু একবার জানাতে দোষ কি যে আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি শুধু চুপ করে শুনে যাও, আমায় বলতে দাও, কি চোখে তোমায় আমি দেখেছি, শুধু আমায় দেখতে দাও তোমাকে প্রাণ ভরে। উৎসাহে উচ্ছল হয়ে উঠেছে তার মুখ। বৃষ্টির ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে তার কথাগুলো কানে বাজছিল সঙ্গীতের মত। ইচ্ছে হচ্ছিল দিন-রাত তার মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনে যাই। অশোক বল্লে : এই তো তুমি চুপ করে আছ—সুন্দর ! এমনি চুপ করেই থাকো।

চুপ করেই রইলাম। কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ড, আমার শিরা-উপশিরায় শোণিত-প্রবাহ, তারাও কি চুপ করেছিল ?

অশোককে কি আমি ভালবাসি ?—এ প্রশ্নটি মনে জেগে রইল সমস্ত দিন-রাত্রি !

কি ভাবে দিন কাটলো জানি না, কি ভাবে রাত্রিটা কেটে গেল তা-ও মনে নেই।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো—দেখলাম বিছানায় রোদ এসে পড়েছে। মনে পড়ে গেল গত দিনের সব কথা। জীবন যেন মধুময় হয়ে গেছে, যেন একটা জন্মান্তর। তাড়াতাড়ি স্নান করে বাগানে বের হয়ে পড়লাম।

সময় যেন হাল্কা পাখায় ভর করে চলে যেতে লাগলো। দ্রুতগতি হাল্কা উপন্যাসের যেন একটি অধ্যায়।

শীতকাল এসেছে।

আমরা গ্রাম থেকে চলে গেলাম সহরের বাড়ীতে, অশোক এখানেও আসে-যায় মাঝে মাঝে। ক'দিন এসে অশোক চা খেয়ে গেল। কতক্ষণ ধরে সে চামচে দিয়ে চায়ের পাত্রটাকে তোলপাড় করলো তা বলার নয়। এক-আধ দিন মিষ্টি করে দু'-একটা কথাও অশোক বলতে চাইলো—কিন্তু সহরের পরিবেশে সে কথা বাজলো অত্যন্ত হাল্কা সুরে, যেন নিষ্প্রাণ।

কেন এমন হলো?

ক'দিন পরের কথা।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন ডাকছে। অশোক—হ্যাঁ, অশোক এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আপন মনে বলে উঠলাম, গ্রীষ্মের দিনে এই মাঠকে কি সবুজ দেখেছি, আজ শীতের দিনে এ কি তার রূপ?

অশোক এখন সহরেই বদলী হয়ে এসেছে চাকুরী নিয়ে। বয়স তারও বেড়ে গেছে। অনেক দিন হয়ে গেল, সে আমার কাছে আর আবোল-তাবোল বকে না, মধুর করে কথা বলার ভঙ্গীটাও করে না। কাজে তার মন নেই, তার যেন কোথায় কি একটা হয়েছে, কি যেন হতাশা, জীবনে সে আর প্রত্যাশা করে না, অত্যন্ত শান্ত নিরীহ হয়ে গেছে সে। চুপ করে বসলো সে একখানা চেয়ারে, চেয়ে রইল জ্বলন্ত একটা ধূপকাঠির দিকে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে আমিই প্রশ্ন না করে পারলাম না—বললাম, 'কি'?

—না কিছু নয়! অশোকের বলার কিছুই নেই। আবার নীরব হলাম দু'জনে। মনে পড়লো সেই অতীতের কথা। কি জানি কি হলো। হঠাৎ দেখি, আমার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। নিজের জন্য, অশোকের জন্য কি যেন একটা গভীর বেদনা বোধ করলাম। যা চলে গেছে তা ফিরে পাবার জন্য মন আকুল হয়ে উঠলো। জীবনে অনেক কিছু পাইনি আমি আর অশোক। বুকের ভিতর যে কান্না উঠেছিল তাকে রাখতে পারলাম না। 'এমনি করে জীবন খোয়া গেল'।

আমি ধনীর মেয়ে, বড়-ঘরের মেয়ে, আর সে মাত্র একটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, আমার বাবার দয়ায় মানুষ। তবে কি ছেলেবেলা থেকেই এই দেয়াল আমাদের মধ্যে জেগে আছে? কে জানে? সে যখন সহরে আসতো, সহজ হতে পারতো না, এ যেন আর এক মানুষ! হাসি যেতো তার বাঁকা হয়ে, নয় তো খুব ভারী করে বসে থাকতো, বিশেষ করে যখন অন্য আর কেউ থাকতো সেখানে। সব সময় বড়লোকদের কুখ্যাতিই শোনা যেত তার মুখে। অবশ্য ব্যবধান এমন কিছু কঠিন নয় যে, ভেঙ্গে ফেলা যায় না। কিন্তু সে তো আধুনিক ছেলে। আধুনিক ছেলেদের প্রায়ই দেখা যায় যেমনি অলস, তেমনি মন্থর। জীবনে যদি তারা কিছু করতে না পারে সেই পরাজয়ের গর্ব্বে তারা ধন্য। তারা ভাবে অদৃষ্ট তাদের ছলনা করেছে, জীবনের যুদ্ধে এগোতে চায় না তারা, শুধু বিশ্বশুদ্ধ লোককে হেয় ভাবাই যেন কাজ।

কিন্তু তবু সে যে এক দিন আমায় ভালবেসেছিল সেটাও তো সত্য। মনে হতো, মধুর কিছু একটা ঘটবার আর বেশী দেরী নেই। জীবনে যেন সুর এসেছিল—যদিও জানতাম না, আমি কি কামনা করি বা কি প্রত্যাশার দিন গুণছি। দেখতে দেখতে সময় বেড়ে যেতে লাগলো—কত দিন বৃষ্টি এলো সেই সেদিনের মত, মনে কত সাড়াই জাগলো—কিন্তু কই, যা চাই তা তো পেলাম না।

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটলো—বাবা মারা গেলেন, আমারও বয়স বেশ বেড়ে গেল এক দিন আমায় যা পরম আনন্দ দিত সেই বৃষ্টির ঝরঝরানি, মেঘের গুরু ধ্বনি—সব হয়ে গেল একটি স্মৃতি মাত্র। কোনও জিনিসই যেন মনকে রঞ্জিত করতে পারে না, সব কিছুর মধ্যে দেখি একটা বিবর্ণ ছায়া। চলেছি যেন মরুভূমির মধ্য দিয়ে। সেখানে একটা জীবন্ত মানুষের সাড়া নেই। মনে হয় জীবনে যেন ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে।

অশোক নিঃশব্দে বসে রইল। একবারও বারণ করলো না কাঁদতে। হয়তো বুঝেছিল কান্না আমার দরকার, সময় এসেছে কাঁদবার। তার চোখেও দেখলাম সহানুভূতির ছায়া। আমারও কষ্ট হলো তার জন্য। রাগও হলো তার উপরে। না পারলে তার জীবনকে সফল করতে, না পারলো আমার জীবনকে মধুময় করতে।

অনেকক্ষণ পরে যখন অশোক উঠে দাঁড়ালো, পিছন পিছন গেলাম তাকে এগিয়ে দিতে। হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ালো, আমার হাত দু'খানা ধরে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার কান্না-ভেজা মুখের দিকে। হয়তো মনে পড়লো তার সেই বৃষ্টি-ভেজা দিনের কথা, সেই ঝড়ের কথা, সেই অফুরন্ত হাসির কথা আর আমাদের সেই দিনকার ভালবাসার কাহিনী। কিছু যেন বলতে চাইছিল সে কিন্তু কোনো কথাই বল্লে না। শুধু মাথা নেড়ে আমার হাত দু'টোকে মুঠো করে ধরলো, আর কিছু নয়।

অশোক চলে যেতে আমি আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম। ধূপকাঠিটি পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শীতের রাত্রিরের বুক চিরে উত্তুরে হাওয়া উঠেছে মেতে। তার বাঁশীর শব্দ জাগে দরজা-জানলার ফাঁকে!

কি এসে ভাবলো আমি বুঝি ঘুমিয়ে গেছি—অনেক বার ক তাই ডাকলো অসময়ে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

অমিয়ার বিয়ে

পুরাণী দেবী

অমিয়া। কাকার কাছে থাকতে হয় অমিয়াকে। বাঁচবার খাতিরে। সন্তান-স্নেহে সমাদৃতা নয় সে সেখানে, সেখানে সে অবাঞ্ছিত। কর্ত্তব্য সম্পাদনের স্বরূপ।

এ কথা অমিয়া জানে।···সেই মা-বাবা মারা যাবার পর থেকে এই আশ্রয়ই সে আঁকড়ে আছে। অনাদর, অপমান, অবহেলা তার মনের, তার স্বভাবের তার সব-কিছুরই চতুর্দ্দিকে যেন এক ঘন কালো আবরণ টেনে দিয়েছে।

সব-কিছু সহ্য ক'রেও অমিয়া এই সংসারেই থাকতে চায়। সে যে নিজেকে এর মধ্যেই মিশিয়ে নিয়েছে। আর তার এই দুঃসহ নিজের জীবনকে মেনেও সে নিয়েছে। সবই এখন তার সহ্য হয়ে গেছে।

কিন্তু দেখি, যা সহ্য হয়ে যায় এ সংসারে তা আর নতুন ক'রে সহ্য করবার প্রয়োজন হয় না। নতুন রূপে তখন আবার সহ্যের নতুন পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

অমিয়ারও তাই হ'ল। যে চিন্তা অমিয়াকে অবিরাম সব-চেয়ে বেশী জ্বালা দিত, আজ হঠাৎ তাই বাস্তবে পরিণত হ'তে চলেছে। শীঘ্র না কি তার বিয়ে হচ্ছে। সব ঠিক হয়ে গেছে।

বিবাহের বয়স তার অনেক দিনই হয়েছে। এই নিয়ে সে দুশ্চিন্তাও অনেক করেছে। কিন্তু তবুও সে নিশ্চিন্ত ছিল এ ব্যাপারে তার কাকার উদাসীনতা দেখে।···কিন্তু সব-কিছু কেটে গেছে আজ কঠোর ভাবে।

তবে কি ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে!—শুক্‌নো কাঠের মত? তবেই কি যেটুকু বাকী আছে তা পূর্ণ হবে?···আর এক বিভীষিকা রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল তার সম্মুখে।

সকলের দৃষ্টির অন্তরালে যে ব্যাধি তাকে ঘিরে ফেলেছে তাকে তো আর ঢাকা দিয়ে রাখা যাবে না।···প্রকাশ হয়ে যাবে সবার কাছে তার জন্ম-জন্মান্তরের পাপ। সমস্ত জগৎ যেন তার কাছে বিষিয়ে ওঠে। যে ব্যথার জ্বালা এত দিন জোর ক'রে চাপা ছিল নিজের মনের মধ্যে, আজ যেন তা অসহ্য হয়ে বিকৃত করে দেয় মনের সমস্ত ক্রিয়া।

অমিয়ার মনে হয়—সত্যিই কি তার দেহের সাদা দাগগুলো সারানো যায় না চিরকালের মত? কিন্তু সারবে কি!···বলতে হবে তো কারো কাছে। বলতে যে তার বাধে। এই না-বলতে পারার মর্য্যাদাবোধে যে মন এত স্থির ছিল, আজ সে সেই নিরুপায় রুদ্ধতারই ফেটে যেতে চাইছে···

তবুও সে ভার-মুক্ত করবে তাদের, যারা তার ভার নিতে চায় না।

কষ্টে জর্জ্জরিত বক্ষ আর ক্লেদাক্ত দেহ নিয়ে সে বিবাহের আসরে আসে। যত দূর সম্ভব নিঃশব্দতা এবং সংক্ষিপ্ততার মধ্য দিয়ে কাজ চলেছে। অরক্ষণীয়ার মিলনোৎসব। এক অবাঞ্ছিতার।

তবুও আসে। শুভক্ষণের শুভ-দৃষ্টি। যেমন সবার বেলাতেই আসে। অসহনীয় ধিক্কারে আশ-পাশের লোকদের পরিহাসে সে চেয়ে দেখলে তার সামনের মূর্ত্তির দিকে। দেখলে···সে মূর্ত্তি স্থির গম্ভীর।···সে না কি অন্ধ!···

মনে হ'ল অমিয়ার, যেন একটা দীর্ঘ—দীর্ঘনিশ্বাস বক্ষের প্রতি রক্তবিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল তার সর্ব্বাঙ্গে। নিজের চোখ দু'টোকে অমিয়া নামিয়ে নিলে ধীরে ধীরে শান্ত ভাবে।

প্রাচীন যুগের পদ্মিনী

কুমারী রাজলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের কোন এক দেশে এক অতি দুঃখি[illegible] স্ত্রীলোক বাস করতেন। স্ত্রীলোকটি এতই দরিদ্র ছিলেন তিনি বস্ত্রের অভাবে পদ্মের পাতা লজ্জা নিবারণের জন্য ব্যবহার ক[illegible]তেন। তাই লোকে তাঁকে পদ্মিনী বলে ডাকতো। পদ্মিনীর স্বামী অ[illegible] কিছুই কাজ-কর্ম্ম করতে পারেন না। পদ্মিনী ঘুঁটে কুড়িয়ে, ক[illegible] কুড়িয়ে, তাই বিক্রী করে যা পেতেন তাই দিয়ে অতি কষ্টে কোন র[illegible] দিন কেটে যেত তাঁর আর তাঁর স্বামীর। হঠাৎ এক দিন পদ্মিনী[illegible] দুই জন মহিলা এসে বললেন—"ওগো বাছা, তোমাকে এক জন ঠাকুর[illegible] ডাকছেন, তুমি চল।" পদ্মিনী শুনে খুবই আশ্চর্য্য হোয়ে গেলে[illegible] ভাবলেন, আমাকে আবার ডাকে কে? আমাকে তো সকলেই [illegible] করে, আমার মত লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগিনীর নাম তো ভয়ে [illegible] করে না। যাই হোক, পদ্মিনী মহিলাদের সঙ্গে গেলেন। গিয়ে দেখে[illegible]

ষষ্ঠী ঠাকুরাণী তাঁর জন্তই অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, "মা, আমি তোমাকে এই শ্রীফলের ফুলটি দিচ্ছি, এইটি তুমি বেঁটে খেও, তাহলে তোমার গর্ভে একটি পুত্রের জন্ম হবে, আর সেই পুত্রই তোমার দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করবে।" শুনে পদ্মিনী বললেন, "মা, তুমি কে? আমার পরিচয় দাও।" তখন মা অন্নপূর্ণা নিজের রূপ ধারণ করলেন এবং বললেন, "আমি অন্নপূর্ণা, কাশীতে থাকি। স্বর্গের দেবতা দেবী বসুন্ধর বসুন্ধরা ব্রহ্মার শাপে এই পৃথিবীতে জন্ম নিতে আসছেন। বসুন্ধর তোমার গর্ভে জন্ম নেবেন। মা, তুমি আমার পূজা কোরো, তোমার সব দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হবে।" এই বলে অন্নপূর্ণা জয়া-বিজয়া দুই সখীর সঙ্গে অদৃশ্য হোয়ে গেলেন। পদ্মিনী বাড়ী এসে অন্নপূর্ণার দেওয়া শ্রীফলের ফুলটি বেঁটে খেলেন। যথাসময়ে পদ্মিনীর একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। পুত্রের নাম রাখা হরি হোড়। জাতিতে তারা কায়স্থ। পুত্রের মুখ চেয়ে পদ্মিনী সুখের দিনের কল্পনা কোরতেন। হরি তার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুঁটে কুড়ায় একটি একটি কোরে কত দিন চলে গেলো কিন্তু পদ্মিনীর অবস্থার কিছুতেই উন্নতি হয় না। তেমনি ভাবেই দিন চলে যায়। ক্রমে হরি শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম কোরে যৌবনে পদার্পণ করলো। দুঃখে-কষ্টে-হতাশায় হরির মায়ের এমনই অবস্থা হলো যে, তিনি আর কিছুই পরিশ্রম করতে পারেন না। হরিই ঘুঁটে কুড়িয়ে তার মা-বাবাকে খাওয়াতে লাগলো। এক দিন হরি মাঠে মাঠে ঘুরছে ঘুঁটে সংগ্রহের জন্য, কিন্তু সারাটা দিনই চলে গেল, একখানা ঘুঁটেও সে পেলো না। অবশেষে বেলা শেষ হোয়ে এলো। সূর্য্য তখন সারা দিনের পরিশ্রমের পর আকাশের পশ্চিম প্রান্তে ক্লান্ত হোয়ে ঢলে পড়েছেন। রাখালেরা তাদের গরু-বাছুর নিয়ে বাড়ীর দিকে চলেছে। পাখীরা কলরব করতে করতে ফিরছে তাদের নীড়ে। হরি পাখীগুলিকে দেখে মনে মনে বলছে, পরজন্মে আমি যেন পাখী হোয়ে জন্মাই। আহা, ওদের কত সুখের জীবন! ওদের মা-বাবাকে তো এই রকম সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় না।" বড় দুঃখে কাতর হোয়ে হরি বসে বসে কত কি ভাবছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। আকাশের দীপগুলি সব জ্বলতে সুরু করেছে। হরি বাড়ী ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে। কিন্তু কোন্ মুখে সে বাড়ীতে যাবে? মা-বাবা যে তারই আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন। বার্দ্ধক্যরোগে শরীর তাঁদের জর্জ্জরিত। তার উপর সারা দিন কিছুই পেটে পড়েনি। হরির হৃদয় আজ গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হোয়ে উঠেছে। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ তার মনকে আঁধারে ঢেকেছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেলো, এক বৃদ্ধা সব ঘুঁটেগুলিই কুড়িয়ে নিয়েছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো, কেন সে একখানি ঘুঁটেও কুড়িয়ে পায়নি। সবই যে ঐ বৃদ্ধা কুড়িয়ে নিয়েছে। বৃদ্ধা হরিকে ডেকে বললো, "বাবা, আমার মাথার উপর এই ঘুঁটের বোঝাটা তুলে দেবে? আর যদি তুমি বাজারে নিয়ে যাও তো বিক্রী করে যা হবে তা তুমি আর আমি আধা-আধি ভাগ কোরে নেবো।" বৃদ্ধা আবও বললে, "আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি আর পারছি না।" বৃদ্ধার কথায় রাজী হোয়ে হরি ঘুঁটে নিয়ে চললো বাজারে বিক্রী করতে লাগলো। কিন্তু রাত হোয়ে যাওয়ায় হরির সঙ্গে বৃদ্ধা তাদের বাড়ীতে এলো। বৃদ্ধার চুলগুলি পেকে সব সাদা হোয়ে গেছে, দাঁতগুলিও সব পড়ে গেছে, নাকটি নেমে এসেছে মুখের উপর, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। বৃদ্ধা ঘরের দাওয়ায় বসে বললো, "আমি এই রাত্তে আর কোথায়ও যেতে পারবো না, এইখানেই থাকবো, আমাকে দু'টি খেতে দিস্ বাবা।" হরি তো শুনে অবাক! বললো, "বুড়ী, তুমি বল কি? এখানে মা-বাবা আর আমি অতি কষ্টে থাকি, আমাদেরই জায়গা হয় না, আর তুমি কোথায় থাকবে? তুমি অন্ত জায়গা দেখ। তোমাকে খেতেই বা দেব কি? সারা দিন আমরাই কিছু খেতে পাইনি। আমাদেরই কে খেতে দেয় তার ঠিক নেই।" সব শুনে বৃদ্ধা বললো, "বাবা, তোর মা তো অন্নপূর্ণার পূজা করে, তা মা অন্নপূর্ণার নাম কোরে দেখ তো হাঁড়ীতে ঠিক খাবার পাবি। আর এই ঘুঁটেটি বিক্রী কোরে আয়"—বলে হরির হাতে একটি ঘুঁটে দিল। হরি দেখলো এ তো ঘুঁটে নয়, এ যে সোনা! হাঁড়ী খুলে হরি দেখলো, কত রকম সুখাদ্য সাজান রয়েছে, যা সে কখনও চোখে দেখেনি। হরির মনে গভীর বিস্ময় জেগে উঠলো। হরি বুড়ীকে এসে বললো, "এ কি করে হোল বল তো? তুমি কি কিছু ভোজ-বাজী জান?" বৃদ্ধা বললো, "ওরে না, আমি অন্নপূর্ণা, আজ থেকে আমি তোর বাড়ীতে এলাম। তোর দুঃখ-কষ্ট সব দূরে যাবে।" হরি বললো, "সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। যদি তুমি অন্নপূর্ণা হও, তবে তোমার নিজের স্বরূপ প্রকাশ করো।" তখন মা অন্নপূর্ণা মণিময় সিংহাসনের উপর বারাণসী সাড়ী-পরিহিতা হোয়ে ও বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিতা হোয়ে চারি দিক জ্যোতির আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে এসে বসলেন আর মহাদেব তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। এই মূর্ত্তিতে মা দেখা দিলেন হরিকে। হরি মা-অন্নপূর্ণার দয়া দেখে ভক্তিতে অভিভূত হোয়ে গেল। বললো, "মা, তুমি আমাদের ছেড়ে কখনও যেও না।" মা অন্নপূর্ণা বললেন, "না বাবা, তুই যদি কোন দিন চলে যেতে বলিস্ তবেই যাব।" এর পর থেকে হরির অবস্থা উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হোল। তার কোন দুঃখই আর রইল না।

খুব ধনীর গৃহে জন্ম নিয়েছিলেন বসুন্ধরা। বাবা-মা তাঁর নাম রেখেছিলেন কল্যাণী। কল্যাণীর রূপ ছিল অসাধারণ। রূপের আলোকে কল্যাণী ঝলমল করতো। যে দেখতো কল্যাণীকে, সেই মুগ্ধ হোয়ে যেত। কল্যাণীর বিবাহের বয়স হোয়ে গেলো। বাবা-মা কল্যাণীর বিবাহ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পদ্মিনীর পুত্র হরি হোড়ের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহের ঠিক হোয়ে গেলো এবং বিবাহ হোয়ে গেলো। হরির পুত্র-কন্তা হোল। খুব সুখেই এখন দিন কাটতে লাগলো। হরির পুত্র-কন্তা সব বড় হোয়ে গেলো। এক কন্তার বিবাহ হোলে কন্তা শ্বশুর-গৃহে যাবার আগে বাবার নিকট বিদায় নিতে এসে বললো, "বাবা, যাব?" হরি তখন অন্যমনস্ক হোয়ে বললো, "যাও"। মা অন্নপূর্ণা সেই কন্তার মধ্যে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। হরি তাকে 'যাও' বলায় মা অন্নপূর্ণা হরিকে ছেড়ে গেলেন।

হরির মা-বাবা পূর্ব্বেই মারা গিয়েছিলেন। এবার হরি এবং তার স্ত্রীর শাপ মোচন হোল। তাঁরা উভয়েই এক-সঙ্গে মারা গেলেন এবং বসুন্ধর ও বসুন্ধরা হোয়ে স্বর্গে গমন কোরলেন।

নব চম্পক

বিভা সরকার

চম্পকেরই গোপন রাগে—
বর্ষা উতল হাওয়ায় জাগে—
বাবলা-বনের গন্ধে ভিজে
কোন্ বিরহীর সুর।
কদম্বেরই ফুল্ল ফুলে
মত্ত মধুপ আজকে দুলে
মানব-হৃদয় পাগল হল
আনন্দ ভরপুর।
ইন্দ্রধনু রংয়ের ছটায়
রংয়ের মেলা আজকে ঘটায়
এল কি সেই বৃন্দাবনের
প্রেমের মধুপুর।
কাশের বনের গুঞ্জরণে
পথিক চলে আপন মনে
বাজিয়ে তাহার বাঁশের বাঁশীর
মন-ভুলানো সুর।
কেয়া ফুলের কেশর নিয়ে
দক্ষিণা আজ যায় যে দিয়ে
বাদল দিনের ছন্দে পাগল
হৃদয় পালায় দূর।
বিল্ব পাতায় তরুণ লীলা
আকাশে আজ নীরব নীলা
কে উদাসী চমক লাগায়
মাতায় জগৎপুর।

অতিথি

মীনা চট্টোপাধ্যায়

সহস্র সহস্র দীপ জ্বলছে। দেওয়ালী উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। কোথাও ঢাক বাজছে ট্যাং ট্যাং ট্যাং। নগরীর পীচঢালা রাজপথে প্রতিফলিত হচ্ছে দেওয়ালীর দীপালোক। হঠাৎ আকাশের বুকে কে যেন কালিগোলা ছিটিয়ে দিল। দক্ষিণ কোণ থেকে সন্-সন্ করে বাতাস বইতে আরম্ভ করে। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকায়! অঝোর ধারায় বাদল নেমে আসে নগরীর বুকে—

চিৎপুরের ছোট একটি গলি। রাস্তার বুক পর্য্যন্ত নেমে এসেছে কাঠের ভাঙ্গা দরজাটা। সুবিনীতা স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দেওয়া দেওয়ালীর দীপটা হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নিবে যায়। ওর পাশ দিকে কত পথিক চলে যায়। সেদিকে ওর দৃষ্টি নেই। হঠাৎ এক কাণা পথিক মিটমিটে গ্যাসের আলোকে চোখের উপর হাত দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়—'সুবিদি' যে, কিছু দাও না।

ম্লান হেসে সুবিনীতা করুণ স্বরে বলে—ঠাকুর, আজ যাও।

পথিক আশীষ করে চলে যায়—'জন্ম-এয়োস্ত্রী থাক মা।' ওর বুক ভরে কান্না উপছিয়ে ওঠে। ভাঙ্গা দরজাটা ও চেপে ধরে থাকে।

নগরীর উৎসব বৃষ্টির জন্ত অনেকটা থেমে গেছে। ঝড়, জল, ও বৃষ্টির সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে গ্যাসের আলোগুলির শক্তি কমে আসছে। ওদের তেজ যেন কতকটা নিস্তেজ হয়ে আসে।

ঢং ঢং করে কোন দোকানের ঘড়িটা রাত্রির গভীরতা জানিয়ে দেয়। উপর থেকে জয়া নেমে আসে। সর্ব্বশরীরে ওর ক্লান্তি ও অবসাদ, সুবিনীতার হাতখানা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলে—চল যাই, উপরে যাই।

দাঁড়া সই, ভিজে হাওয়াটা বেশ লাগছে! তুই যা, আমি একটু পরে যাব। জয়া চলে যায়।

ওর মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে। বুকের বাঁ দিকে আজ বহু দিন হতেই একটা ব্যথা। আজও ওর বুকটায় একটু ব্যথা অনুভ[illegible] করে। এক ঝাপটা জল ওর খোলা চুলগুলি ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

রাস্তা দিয়ে কতকগুলি সাদা জামা ও মাথায় লাল পাগড়ী প[illegible] লোক এত ঝড়-বাদলেও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক জন ওদে[illegible] ভেতর থেকে এগিয়ে আসে,—এই, শুনছ, একটা লোককে যে[illegible] দেখেছ? এই কিছুক্ষণ আগে এখান দিয়ে।

সুবি বলে, বাবু, কত লোকই রাস্তা দিয়ে গেল, কার ক[illegible] বলছেন কি করে বলব?

লোকটি মাথা ঝেঁকে বলে ওঠে, না হে, সে তোমাদের [illegible] অতিথি হবার ছেলে নয়। ঝকমারি। আজ [illegible] বছর [illegible] এ লাইনে কাজ করছি, এর জোড়া আর একটিও মিলল না। [illegible] সকাল থেকে পেছনে ঘুরছি। নানা রকম মন্তব্য করতে কর[illegible] লোকগুলি চলে যায়।

সুবিনীতা অর্থশূন্য দৃষ্টিতে ওদের চলে যাওয়া দেখে। ও উপ[illegible] দিকে পা বাড়ায়, হঠাৎ পিছন থেকে ওর আঁচলে টান পড়ে। [illegible] ও পিছন ফিরে তাকায়,—এক জন দ্বাবিংশ বৎসরের মাথায় ঝাঁ[illegible] কালো চুল, পরনে একটা সার্ট ও শতছিন্ন কাপড়। সুতীক্ষ্ণ না[illegible] ডগা, রংটা এককালে বোধ হয় ফর্সা ছিল, আজও তার চিহ্ন বর্ত্তমা[illegible]

কানের কাছে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ওর চেতনা ফিরিয়ে আনে। [illegible] ওর কানে কানে বলে—বন্ধু, রাত্রির অতিথিকে ঘর দেখাও! [illegible] তোমার নাম কি?

ওরা অন্ধকার সিঁড়ির পথে অনেকটা এগিয়ে যায়।—বন্ধু [illegible] উত্তর আসে 'সুবিনীতা!' হঠাৎ রাস্তায় কাদের পায়ের ধুপ-ধাপ [illegible] হয়। ব্যাকুল ভাবে এক জোড়া হাত ভীত ভাবে ওর হাত দু[illegible] ধরে বলে, সুবি,—আমায় বাঁচাও।

অজানিত পুলকে ওর গা শিউরে ওঠে, অন্ধকার রাস্তা[illegible] একখানা হাত ধরে সুবি এগিয়ে যায়, যেন লক্ষ যুগের চেনা [illegible]

হঠাৎ একটা দরজার সামনে ওরা দাঁড়ায়। সুবি আঁচল[illegible] চাবি নিয়ে দরজাটা খোলে। ভিতরে আসবাব-পত্র যে কি [illegible] ছোট দীপালোকে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। ছোট্ট একটা [illegible] এগিয়ে দেয় ওকে বসবার জন্ত! বাইরের অন্ধকারের ভেতর [illegible] যায়।

যাবার আগে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে যায়—পথিক-বন্ধু! [illegible]

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে উত্তর আসে 'সুবিনয়।'

ও একটু হেসে বলে, "বন্ধু পরিচয়ে যখন এতটা মিল [illegible] ছিলে কোথায়?"

ডাক্তার বলেন—

"প্রত্যেক গর্ভিণীরই প্রসবের সময় জীবাণুর হাত থেকে সুরক্ষিত থাকা উচিত"

আপনার ডাক্তার সন্তান প্রসব করানোর সময় সব ক্ষেত্রেই 'ডেটল' ব্যবহার করেন। প্রসবের সময় প্রসব-পথের ঝিল্লীতে অথবা মুখে কোনও ক্ষত হলে দুষ্ট-জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে, ফলে সূতিকা-জ্বর ও দুরারোগ্য অন্যান্য জটিল উপসর্গ এসে দেখা দিতে পারে। তাই প্রসব করানোর সময় আপনার ডাক্তার জীবাণুনাশক 'ডেটল'-এর উপর নির্ভর করেন — 'ডেটল' জীবাণু ধ্বংস করে ও প্রসূতিকে নিরাপদ রাখে। সুস্থ সবল সন্তান জাতির ভবিষ্যতের ভরসা, সুতরাং সব সময়ই এদের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও সংক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা বিশেষ আবশ্যক। শিশুর জামা-কাপড় ধোয়ার সময় জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে নেওয়া স্বাস্থ্যরক্ষার খুব ভালো উপায়। 'ডেটল' মেশানো জলে গা ধুয়ে নিলেও জীবাণুর ছোঁয়াচ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

ছাল উঠে গেলে, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণুর প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আত্মরক্ষার সর্বপ্রথম উপায়

পোকামাকড়ের কামড় অথবা আঁচড় কি ক্ষত থাকলে যদি প্রদাহ, অত্যন্ত জ্বালা বা ব্যথা দেখা দেয় তবে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা। অবিলম্বে তখন 'ডেটল' লাগাবেন — এর জীবাণুধ্বংসী ক্রিয়া সংক্রমণের ভয় থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখে এবং প্রদাহ উপশম করে।

মাথার চুলকানি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথায় টাক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন - - ব্যবহারের নিয়ম শিশির গায়ে লেখা আছে।

• মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য :

'ডেটল' এর ক্রিয়া মৃদু অথচ অব্যর্থ— এজন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এর তুলনা নাই। 'ডেটল' মানব-শরীরের পক্ষে অনুত্তেজক কিন্তু জীবাণুর পক্ষে মারাত্মক। বিনামূল্যে "মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্য-রক্ষা বিধি) নামক পুস্তিকার জন্য লিখুন।

হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য সর্ব্বদাই এক শিশি বাড়ীতে রাখবেন

ANTISEPTIC DETTOL NON-POISONOUS GERMICIDAL

'DETTOL'

TRADE MARK

এ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোঃ বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

ওদিক থেকে আর কোন সাড়া আসে না।

কিছুক্ষণ পর ছোট্ট একটা দীপ হাতে নিয়ে সুবি ফিরে আসে। ক্ষুদ্র আলোকে দেখতে পায়, সুবিনয় একটা কাপড় মুড়িয়ে হাতের নিচে দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মাথার কাছে ছোট একটা চামড়ার খাপে জড়ানো কি যেন একটা পড়ে রয়েছে, আর তার সামনে একটা ছোট বস্তু ঝকঝক করে জ্বলছে।

ধীরে পা দু'খানায় ঝাঁকি দিয়ে ও ডাক দেয়, সুবিনয় বাবু, উঠুন। কিছু খান। ওর হাতের পরশ পেয়ে পথিক জেগে ওঠে, তাড়াতাড়ি শিয়রের বস্তুগুলি ওর বুকের কাছে টেনে নেয়।

সুবিনীতা মৃদু হেসে বলে—সুবিনয় বাবু, ভয় নেই। আপনি যতক্ষণ এখানে আছেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত।

সুবিনয় হেসে বলে—আজ চার দিন কিছু খাইনি। ঘুমও নেই। বুঝতেই পারছ. সুবি জায়গা যখন দিয়েছ, তখন ওদেরও একটা কিছু সংস্থান করে দাও।

সুবিনীতা হেসে উত্তর দেয়,—দেহটার ভার যাদের উপর বইতে দিয়েছেন, অন্ততঃ যতক্ষণ আছেন ওদের ভারও আমায় বইতে দিন।

—বেশ।

একটা আসন করে আঁচল দিয়ে মুছে ছোট একটা রেকাবীতে কিছু রুটী ও চিনি আর এক গ্লাস গরম দুধ ও এগিয়ে দেয়।

শ্রান্ত পথিক নিমেষে সব শেষ করে দিয়ে বলে, আর কিছু নেই? হেসে ও উত্তর দেয়, আজ আর কিছু নেই। কাল সকালে ভাল করে খাওয়াব।

সুবিনয় তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় সংযত করে জিজ্ঞাসা করে, সুবি, রাত্রি কত? বোধ হয় তিনটে।—উঃ, আর সময় নেই। অন্ধকার থাকতেই পথ চলতে হবে। চামড়ার বেল্টটা ও কাপড়ের নিচে বুকের কাছে বেঁধে নেয়। আর সব কোমরে গুঁজে নেয়। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, সুবি পথ দেখাও।

সুবির হাতে সেই সাঁজের বেলার দেওয়ালীর দীপটি মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। এবার আর হাত ধরে নয়, সুবি আগে সুবিনয় পিছনে পিছনে নেমে আসে। আবার দোরগোড়ায় ওরা দাঁড়ায়।

বাইরে টিপ-টিপ করে তখনও বৃষ্টি পড়ছে, নগরীর বুকে অসীম নীরবতা, সুবি প্রদীপটা মাটিতে রেখে বলে, ঠাকুর, দাঁড়াও। সুবিনয় থমকে দাঁড়ায়। গলায় আঁচল দিয়ে সুবিনীতা প্রণাম করে।

হঠাৎ প্রণাম করে উঠবার সময় সুবিনয় ওর হাতখানা ধরে। আর একটি হাত ওর মাথায় দেয়। বিহ্বল সুবিনীতার চোখে নেমে আসে শ্রাবণ-ধারা! অনাঘ্রাত পুষ্পের এই শিশিরসিক্ত অবদান ওর বুকের মাঝে সুপ্ত নারীত্বকে তীব্র কশাঘাত করে। চোখ ওর ঝাপসা হয়ে ওঠে।

দৃষ্টি পরিষ্কার করে দেখে পথিক পথ বেয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে। মাটিতে রাখা সাঁজের দীপটি তখনও মিট্-মিট্ করে জ্বলছিল। হঠাৎ ওর অসতর্ক পদক্ষেপে ভেঙ্গে গেল সাঁজের দেওয়া দেওয়ালীর দীপ।

ভাঙ্গা প্রদীপের একটি টুকরো ও বুকে নিয়ে এগিয়ে যায় অন্ধকার পথে।

তহসিলী জুলুমের ইতিকথা

শ্রীমতী দেবী বনশ্রী রায়

অনেক দিনের পুরানো ঘটনা। কিন্তু বেশ একটু মজার—তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহবুব আলী বাদশার পর তাঁহার পুত্র সপ্তম নিজাম (বর্ত্তমান) ওসমান আলী খাঁর রাজত্বকালের তখন প্রথম ভাগ। চারি ধারেই তাই বেশ একটু বৈশিষ্ট্যের ও নূতনত্বের আমেজ। রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ তাঁহারা অধিকাংশই অবসর গ্রহণের মুখে—বাদ বাকীও অসুস্থ কিম্বা অশক্ত। অতএব তরুণের ভীড়কে কর্ত্তৃত্বে শাসনযন্ত্রের পাশ হইতে সরায় কে! অবশ্য ঐ ভীড় অর্থে তরুণ মুসলমানের ভীড়কেই বুঝিতে হইবে। কারণ, ষষ্ঠ নিজামের আমলে যে কিছু উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের অবসর গ্রহণের পর যাহাতে ঐ পদগুলি পুনরায় হিন্দুগণের দখলে না যায়, তাহার জন্য ভিতরে ভিতরে চেষ্টা চলিতেছিল অনবরত। মনে মনে সকলে দেখিতেছিলেন একটি ইসলামী রাজ্যের ছবি। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের ঐ ছবিখানি কিরূপ আকারে দেশবাসীর সম্মুখে আসিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু ঐ আন্তরিক শুভেচ্ছাটি হঠাৎ পূর্ণ হইবার পথে বাধা-বি[ঘ্ন] ছিল বিস্তর এবং সে গুরু বাধাকে অপসারিত করিতে প্রচুর বা[ধা] জালাইয়াও 'কর্ত্তাগণ' কার্য্যটি পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন না। গত ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা বিষয়ে অবহেলাই না কি ইহার অন্যতম কারণ। কর্ত্তাগণ হিন্দুর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিতে ... নারাজ; কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী নারাজ ছিলেন মূর্খের হস্তে রাজ্যভার তুলিয়া দিতে। এরূপ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বহু ... ও গবেষণার পর স্থির করা হয় যে, ষ্টেটের বাহির হইতে শিক্ষিত মুসলমান আমদানী করা হইবে ও তাঁহাদের দ্বারাই রাজ্য চালিত হইবে, অন্ততঃ যত দিন পর্য্যন্ত না তাহাদের স্থানীয় মুসলমানগণ ... লেখাপড়ায় বিদ্যা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

সার সালারজং অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা ... প্রতিবাদের পর অবশেষে প্রধান মন্ত্রীর পদে মিঃ আলী ইমাম মনোনীত করা নয়। তিনি সেকালের এক জন বিশিষ্ট ... মুসলমান ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা ও ন্যায়পরায়ণতার আলোচনা আমাদের এ কাহিনীর বিষয়ীভূত নহে। যাহাই হউক, এক দিন 'বলহারশাহের' গাড়ীতে উঠিয়া মিঃ আলী ইমাম প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করিতে চলিলেন। তবে তিনি ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধা মানুষ, তাই ষ্টেটের এবং 'ব্যবস্থার' আড়ম্বর আর ... একটি সাদাসিধা ভদ্র যাত্রীর মতই তিনি নিজে ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠিলেন ও খানসামাকে তুলিলেন ইণ্টার ক্লাসে। তখন রাত্রি। ট্রেণ অত্যন্ত দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছিল। একখানি ইংরাজী হাতে মিঃ আলী ইমাম একটি সিটের এক কোণায় বসিয়াছিলেন। প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্যের সাথে চোখে ছিল একটি তরুণ ... বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ চাহনি। কাগজ হইতে চোখ ফিরাইয়া ... তিনি যাত্রীদের উঠা-নামা দেখিতেছিলেন।

মালেগাঁও ষ্টেশনে মাত্র কয়েক মিনিট গাড়ী থামে। কিন্তু রাত্রি হওয়ার জন্যই বোধ হয় লোক-জনের আরোহণটা এখানে

গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় একটা প্রচণ্ড কোলাহলে মিঃ আলী ইমাম তাড়াতাড়ি কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া প্লাটফর্মের দিকে চাহিলেন। এখন তো তাঁহারই কম্পার্টমেন্টের সম্মুখে একটি ছোট-খাটো মেলা। ব্যাপার কি'—মিঃ আলী ইমাম ভাবিলেন—'কোন অ্যাকসিডেন্ট নয় তো?' কিন্তু তাঁহার অনুমান তখনি মিথ্যা প্রমাণিত হইল এবং কম্পার্টমেন্টের মধ্য অত্যন্ত দ্রুত প্রবেশ করিল কয়েক জন লোক। বোধ হয় মুসলমানই হইবে, কিন্তু অত্যন্ত বিচিত্র তাহাদের বেশভূষা; আগাগোড়া দামী এবং বেশ একটু মোগলাই ঢঙের। কিন্তু পোষাক দেখিয়া তিনি যত না বিস্মিত হইলেন, তাহার চেয়ে ঢের বেশী বিস্মিত হইলেন তাহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে। কারণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি (মিঃ ইমামের মনে হইল যে তিনিই মুখপাত্র) হুকুমের সুরে চেঁচাইয়া বলিল, 'আরে আলি নওয়াজ, জলদি গালিচা বিছা দে।' কিন্তু এইরূপ আরামদায়ক গদীর উপর আবার গালিচা বিছানোর কি প্রয়োজন, তাহা সঠিক বুঝিয়া উঠিবার আগে মিঃ আলী ইমাম দেখিলেন যে, গালিচার উপর একটি মখমলের তাকিয়াও পড়িল এবং এক জন গাড়ীর দোলানিতে প্রায় পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে এক বৃহৎ পান-দানি বাড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, 'হুজুর, পান লিজিয়ে।' পান-বীড়া লইয়া প্রভু বলিলেন—'আরে মেহের আলী, আমার কাশ্মিরী লাগাও।' পরে যেন একটু এমনি ভঙ্গিতে তাকিয়ায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন। কোথাকার নবাব-বাদশাহ কিম্বা নবাবজাদা হইবেন—মিঃ আলী ইমাম ভাবিলেন। কিন্তু সহযাত্রীটির এই নবাবীপনায় তাঁহার ঠিক বরদাস্ত হইতেছিল না। শুধু কৌতূহল-ভরে ইহাদের পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সঙ্গেই কাশ্মিরী আসিল। বেশ আরাম করিয়া সুখটান দিবার পর হঠাৎ সহযাত্রীটি তাঁহার দিকে ফিরিয়া ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জনাবের কোথা থেকে শুভাগমন হচ্ছে?'

মিঃ আলী শুধু মাত্র উত্তর করিলেন, 'বোম্বাই।'

'ওঃ তাই'—বেশ একটি আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া সহযাত্রীটি পুনঃ বলিল, 'এখানে এই কি প্রথম আগমন?'

এবারও সংক্ষেপে উত্তর হইল, 'হাঁ।'

এক ব্যক্তি আগাইয়া কিছু বাদাম ও ফল রাখিয়া গিয়াছিল। তাহার কিছু তুলিয়া মুখে দিয়া সহযাত্রী আলাপের সূত্র বজায় রাখিলেন—'সেখানে কি করা হয়?'

এবার মিঃ আলী ইমামের মনে এক মজার ফন্দির উদ্ভব হইল। গাম্ভীর্যের সুরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'এমনি শুধু ওকালতি করি।'

'তাই এই অবস্থা। মিয়া, একবার হায়দ্রাবাদ ছেড়ে যখন এসেছেন দেখে যান এখানে টাকা কি রকম সহজলভ্য বস্তু। তা এখান থেকে ফিরেই যেতে চাইবেন না।'

'তা, আইনের বাজার কি এখানে একই গরম না কি?'

—সহযাত্রী হাসিয়া উঠিলেন—'ওসব আপনাদের ওদিককার। আমাদের এদিকে আইন-টাইন অত খাটে না। আমি বলছিলাম চাকরির কথা—পুলিশি কিম্বা তহসীলদার! অবশ্য জোগাড় করা শক্ত। তা হোক্, আমার সাথে যখন আপনার আলাপ হল সাহায্য পাবেনই। ভাল কথা, আপনি তো মুসলমান?'

'হাঁ, কিন্তু জনাব, ঐ চাকরির কথা যে বললেন তা নিশ্চয়ই আপনি কোন বিভাগের কর্তা। তা যদি দয়া করে আমাকে জানান যে'—

'আরে, হাঁ হাঁ'—পরম সন্তুষ্ট স্বরে সে বলিল—'আমি হলাম এখানকার তহসীলদার। এ তল্লাটে সবাই আমাকে চুন্নু তহসীলদার বলে চেনে।'—কথার শেষে আত্মপ্রসাদের মৃদু মৃদু হাসি হাসিতে লাগিল।

মিঃ ইমামের প্রথম হইতেই যথেষ্ট বিস্ময় বোধ হইতেছিল, কিন্তু চুন্নু মিঁয়ার এই কথার পর যে প্রচণ্ড বিস্ময়ের তরঙ্গ আসিল তাহাতে তিনি প্রায় হাবুডুবু খাইয়া দিশাহারা হইয়া উঠিলেন। এত দিন তহসীলদার সম্বন্ধে তাঁহার কোনই স্পষ্ট ধারণা ছিল না, আর যাহা নমুনা দেখিলেন তাহাতে এই জাতীয় জীব সম্বন্ধে তাহার স্থায় বুদ্ধিজীবিরও বুদ্ধির খেই হারাইয়া গেল। চুন্নু তহসীলদার বোধ হয় প্রথম হইতেই তাঁহাকে একটি নিরেট ঠাওরাইয়াছিল। এবার একটা পানের খিলি আগাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, 'আরে জনাব, এতে তাজ্জবের কি বাত্ আছে? আমাদের সবই খোদার দোয়ায়।'

ততক্ষণে মিঃ আলী ইমাম সামলাইয়া উঠিয়াছিলেন। মুখের সম্মুখে উদ্যত পানের খিলিটি ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহ'লে চাকরি তো এখানকার দেখছি খুব সুখের—মাহিনাটাও নিশ্চয়ই মোটা। তা হজরত আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে'···

চুন্নু যেন তাঁহার মনের প্রশ্নটি ধরিয়া ফেলিল, চট্ করিয়া বলিল, 'না না, আমি কিছু মনে করবো না। মাহিনার কথা কি জিজ্ঞাসা করিবেন—মাহিনা তো সরকার বাহাদুর আমাদের শ্রেফ্ পান-সুপারি খেতে দেন, নাহলে মাহিনা দিয়ে কি আমাদের সম্মান রাখা যায়, না তিনিই উপযুক্ত টাকা দিয়ে সে সম্মান রাখতে পারেন? আমাদের যা-কিছু সব এইতেই পুষিয়ে যায়'—কথার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হাতের দুইটি আঙুল পরস্পর ঠেকাইয়া এরূপ একটি ভঙ্গি করিলেন যাহাতে ব্যাপারটা বুঝিতে মিঃ আলী ইমামের বিন্দুমাত্র বাধিল না। তিনি শুধু মনে মনে বলিলেন, 'ওঃ এত দূর!'

পরবর্তী ষ্টেশনগুলিতেও ভীড়ের অভাব। কিন্তু মিঃ ইমাম দেখিলেন চুন্নু তহসীলদারের সাক্ষাৎকামী অনেকেই তাঁহার কম্পার্টমেন্টে আসা-যাওয়া করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেশ গোপন ভাবে তাহাকে 'সেলামি'ও দিতেছিলেন! দেখিয়া-শুনিয়া তিনি বেশ চিন্তিত হইলেন।

এক সময় প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় আকাশ হাসিয়া উঠিল। আলো নহে, যেন জীবনময়ী ধরিত্রীর প্রাণ! লাইনের দু'ধারের অন্ধকার সরিতেই দেখা গেল অসংখ্য ধান, জোয়ার ও গমের ক্ষেত এবং মধ্যে মধ্যে ভুঁইফোঁড় উঁচু-উঁচু কালো পাথুরে টিলা। দূরে ঘনিষ্ঠ নিবিড় তাল ও খেজুর বনের মাথায় আলতো ভাবে মাখানো সোনালি রৌদ্রের খেলা দেখিতে মিঃ আলী ইমামের স্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরও ভালো লাগিতেছিল। ছুটিতে ছুটিতে ট্রেণ অবশেষে 'কাজিপেট' জংশনের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্লাটফর্মে আজ অসংখ্য মানুষের ভীড়। যত দূর দৃষ্টি চলে ষ্টেশনের আশে-পাশে কেবলই মানুষের মাথা। মিঃ আলী ইমাম গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি জনাব আপনার দেশে কোন মেলা-টেলা আছে না কি?'

চুন্নুও দেখিতেছিল। মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বলিল, 'আপনি জানেন না বুঝি? তা বিদেশী লোক, কি করেই বা জানবেন। আজ আমাদের এখানকার নূতন বড় মন্ত্রীর আসবার কথা ছিলো এই গাড়ীতে, তাই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এরা দাঁড়িয়ে আছে।'

'বটে! কিন্তু আপনি 'ছিলো' বলছেন কেন? তিনি কি আসেননি?'

'নিশ্চয়ই না। কোন সেলুনই এ গাড়ীতে লাগান হয়নি, আর তাছাড়া কোন বন্দোবস্তও দেখলাম না—না হলে চুন্নু তহসীলদার কি এ রকম ভাবে গাড়ীতে যায়?'

'আপনাদের মন্ত্রী মহাশয়রা খুবই খাতির-তোয়াজ পান বুঝি?'

'হাঁ মিষ্টার, কারণ তিনি তো আর হেঁজি-পেঁজি লোক না।'

চুন্নুর শেষের কথাগুলি বাহিরের চীৎকারে শুনা গেল না। গাড়ী থামিবার পূর্ব্বেই ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় জনতা গাড়ীখানির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বড় বড় রাজকর্মচারিগণ 'সেলুন' না দেখিয়া রীতিমত অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, পুলিশেরও পরিশ্রমের সীমা রহিল না। চুন্নু খাঁও তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়াছিল। মিঃ ইমাম আগাইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, তাঁহার খানসামার সঙ্গে প্রায় বিশ-ত্রিশ জন পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার দিকেই অত্যন্ত দ্রুত আগাইয়া আসিতেছেন।

অতঃপর অভ্যর্থনার বিরাট পর্ব্বের পরে যখন গাড়ীখানি প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুনরায় গতিশীল হইল এবং মিঃ ইমাম একটুখানি দম লইবার ফুরসৎ পাইলেন, তখন চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার কম্পার্টমেণ্ট এক দম্ খালি! হামবড়া সহযাত্রীটির কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট নাই!

অতঃপর পরে কি ঘটিয়াছিল পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে তাহা সহজেই অনুমেয়। তবুও এ কাহিনীতে সে ঘটনাটুকু সন্নিবেশিত না করিলে 'তহসীলী জুলুমের ইতিকথা' অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। মিঃ আলী ইমাম প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েক মাস অত্যন্ত জরুরী ও জটিল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ব্যাপারটি প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এক দিন এক সচিবের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তহসীলদারের কথা উঠিয়া পড়ায় ঐ মজা ঘটনাটি তাঁহার মনে পড়িয়া যায়, এবং তিনি তাঁহা[র] নিকট তহসীলদারগণের দুর্নীতির কথা উল্লেখ করিয়া ঐ পর্দা যাহাতে একবারে উঠাইয়া দেওয়া হয় সেইরূপ অভিপ্রায় ব্য[ক্ত] করেন। অতঃপর তখনি এক জন 'সুবেদারকে' ডাকিয়া আ[দেশ] দেওয়া হয় চুন্নু তহসীলদারকে উপস্থিত করিবার। সুবেদার ছিলেন বেশ ঝানু লোক। তিনি তখনি আঁচ করিয়া লন [যে] ভালো-মন্দ কিছু একটা ঘটিয়াছে। চুন্নুকে উপস্থিত করার অর্থ—বহু অপ্রকাশ্য রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়া, যাহার জের অল্প-বিস্তর তাঁহাদেরও স্পর্শ করিবে, অথচ মন্ত্রী মহোদয়কেও সন্তুষ্ট ক[রা] চাই। অনেক চিন্তার পর তিনি এক জন তালুকদারকে ডাকি[য়া] নানা উপদেশ দান করতঃ চুন্নুর তল্লাসে পাঠাইয়া দেন। [সে]ই তালুকদারটি বেশ ভাল ভাবেই চুন্নুকে চিনিতেন। তিনি তাঁহা[কে] তলব করিয়া তাহার নিকট সমস্ত ব্যাপারটি অবগত হইয়া যারপর না[ই] ভর্ৎসনা করেন। অবশেষে 'চুন্নু' অত্যন্ত কাঁদাকাটি করায় ও হাতে পায়ে ধরায় তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট গিয়া জানান যে '[চুন্নু]' নামের কোন তহসীলদারেরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মিঃ আলী ইমাম বিস্মিত হন এবং তিনি সমস্ত (অর্থাৎ ষোলোটি জেলার) তহসীলদারকে দেখিতে চাহেন।

এবারও এ সঙ্কটে সুবেদার ও তালুকদার সাহেব মিলিয়া চুন্নু[কে] উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহারা চুন্নুর স্থলাভিষিক্ত করিয়া যে ব্যক্তিকে মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, শুনা যায় যে, তাঁ[হা]র অভিনয়ের জন্য এত অর্থ দেওয়া হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে সে একখানা বৃহৎ দোকানের মালিক হইতে পারিয়াছিল!

ব্যাপারটি এই ভাবে সরাইয়া ধামা-চাপা দিলেও মিঃ [আলী] ইমামকে নিরস্ত করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং সে যাত্রা [চুন্নুর] চাকুরি বজায় থাকিলেও মিঃ ইমামের পাকাপোক্ত বন্দো[বস্তে] 'তহসীলী জুলুমের' চিরদিনের জন্য ইতি ঘটিয়াছিল।

অসময়

হাসিরাশি দেবী

তোমার স্বপ্নিল সন্ধ্যা নামিল কি দীর্ঘ দিন পরে
আমার পৃথিবী-প্রান্তে, অরণ্যের পল্লবে-মর্ম্মরে
দিক্-চক্রবাল চুমি,—চৈতালী বেলার অবসানে
আনন্দ-মধুর রসে আপনারে পরিপূর্ণ করি,—
ঐ ধীরে ধীরে এলো তোমার ফাল্গুনী বিভাবরী!

আমার মাটির মাঝে কাঁদিতেছে ব্যর্থ অভিলাষ—
শস্যশূন্য তপ্ত বুকে জর্জ্জরিত প্রাণের উচ্ছ্বাস
পিপাসার দাবদাহে বারম্বার হ'য়ে যায় খালি।
নভোনীলিমার বুকে তুমি জ্বালি তারার দীপালী
একে একে—তার পর শেষে,
মোর রৌদ্রদগ্ধ দিনে তুমি আজ দেখা দিলে এসে!

চিত্তে তাই জেগেছে বিস্ময়!
নিভৃত চিন্তার পথে অজানার কুণ্ঠা ও সংশয়—
আজিকে তোমারই লাগি উদ্বেগ অধীর হ'য়ে কাঁপে
কোন্ রুদ্র তপস্বীর উগ্র-অভিশাপে
করিয়া স্মরণ?
কম্পিত, ভয়ার্ত্ত চিত্ত তবু তোমা করিছে বরণ।

MBS
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
প্রখ্যাত গিনিস্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১২৪, ১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন: বি. বি. ১৭৬১
ব্রাঞ্চ—হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১৫৯/১/বি রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা

পদ্মা
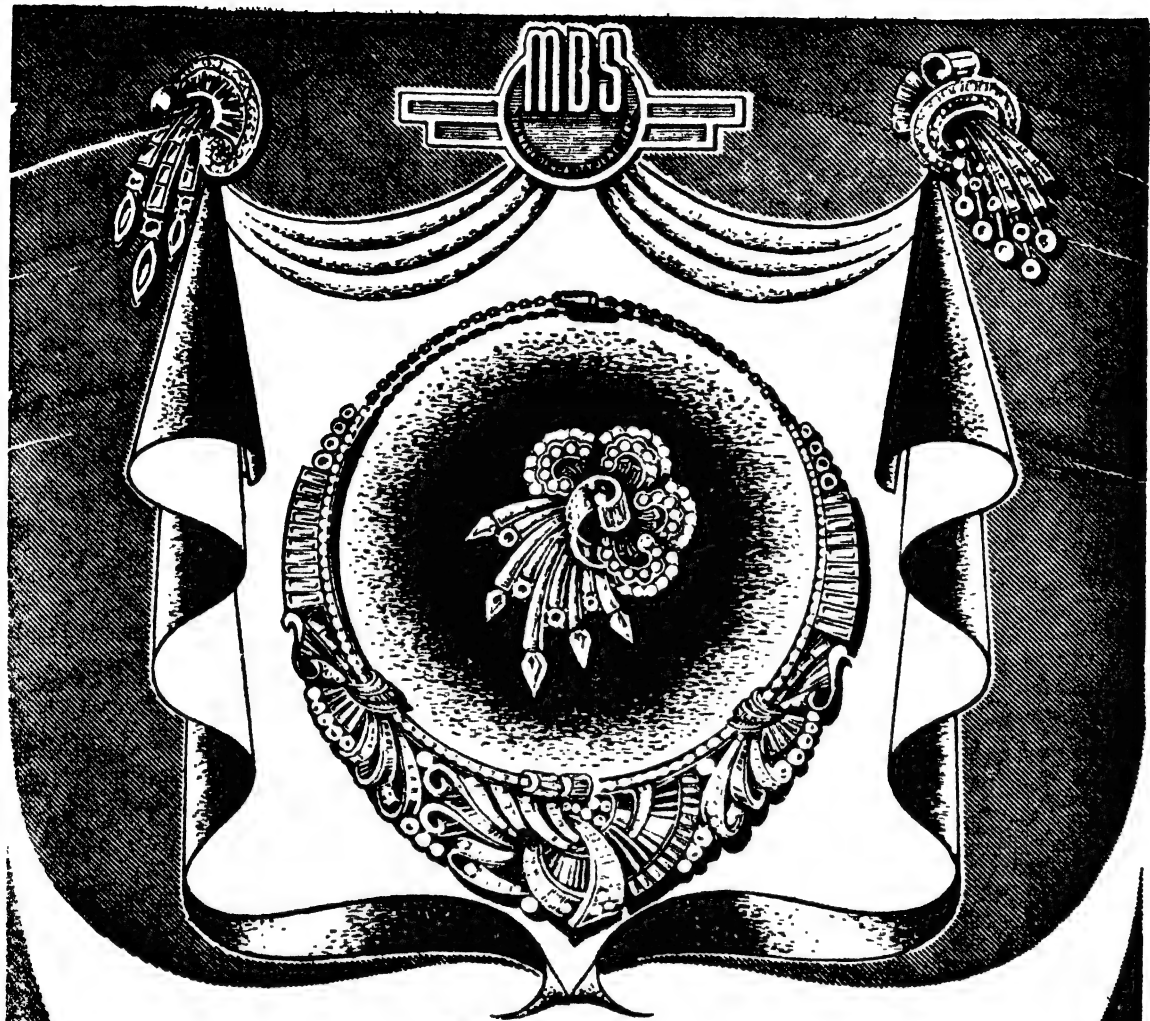
শ্রীমতী সুষমা দেবী

টুকটুক আর বাবলা ছুটে ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকেই মাকে দেখে বলল—"মা, দরজার কাছে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে খালি কাঁদছে। যত বলছি, এখান থেকে চলে যা, তা কিছুতেই শুনছে না।" মিনতি তখন ভাঁড়ার দিয়ে সবে কুটনার ঝুড়ি নিয়ে বসেছিলেন। ছেলে-মেয়ের কথা শুনে তাদের দিকে চেয়ে বললেন—"সকাল বেলা না তোদের পড়তে বলেছি? আবার খেলা হচ্ছে? যা শীগ্‌গির পড়তে বোস।" টুকটুক বলল—"আমি ত পড়তেই বসেছিলাম, মা! দাদাই বললে—টুকটুক, আয় এক দান চোর-চোর খেলে নি।" বাবলা টুকটুকের দিকে চেয়ে রেগে হাত উঁচু করে কিল দেখিয়ে বলল—"না মা, আমি ত পড়ছিলামই; খালি একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। আর ঐ মেয়েটার কান্না কিছুতেই থামছে না বলেই ত এসেছি।" "কাঁদুক গে, তোমরা পড়গে" ব'লে মিনতি কুটনা কুটে চললেন। কুটনা কোটা হয়ে গেলে ঠাকুরকে ডেকে বুঝিয়ে দিয়ে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে পূজায় বসলেন। পূজা শেষ করে উপরে উঠে এসে সবে চা খেতে বসেছেন, এমন সময়ে কান্নার একটা সরু রেশ তাঁর কানে এসে বাজল। চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে বারান্দায় এসে ঝুঁকে নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন—তাঁরই বাড়ীর নীচে ফুটপাথের উপরে একটি আট-ন' বছরের মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। ফুটপাথের সামনে কতকগুলি লোক মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানা প্রশ্ন করছে, কিন্তু সে তার একটিরও জবাব দিচ্ছে না। দেখেই তাঁর মনে পড়ল, তাই ত, এর কথাই তাহ'লে টুকটুক আর বাবলা বলেছিল। ভিতরে গিয়ে এক জন চাকরকে বললেন মেয়েটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবার জন্যে। মেয়েটা চাকরের সঙ্গে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখলেন তার চেহারা ছোট ঘরের মেয়েদের মত নয়। তাছাড়া না খেতে পাওয়ার শ্রীহীনতাও মেয়েটির মধ্যে নেই। অঙ্গে কোনও গহনা নেই। একটি ছিটের ফ্রক পরে আছে। পা থেকে হাঁটু অবধি ধুলায় ভর্ত্তি। কোঁকড়ান চুলগুলি টেনে শাড়ীর পাড় দিয়ে বেড়া-বিনুনি করে বাঁধা। কেঁদে কেঁদে মেয়েটির মুখ-চোখ ফুলে লাল হয়ে গেছে।

মিনতি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই খুকি, তুই কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে রে? রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিস্ বুঝি? বাড়ী কোথা? এই পাড়াতেই, না অন্য কোনও পাড়ার?" মেয়েটি এ-সব শুনে কোনও কথা না বলে মুখের উপর ছোট ছোট হাত দু'টি চাপা দিয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠল। মিনতি তখন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন—"দেখ, তুই যদি অমন করে খালি কাঁদিস তাহ'লে ত আমি কিছুই করতে পারব না। না কেঁদে আগে বল দেখি কি হয়েছে?" মেয়েটি তখন তার কান্নাকে কোনও মতে একটু চেপে কোঁপাতে কোঁপাতে বলল—"আমার মাকে পাচ্ছি না"—বলেই আবার জোরে কেঁদে উঠল। মিনতি বললেন—"তুই যদি ভাল ক'রে না বলিস, আর কেবলই কাঁদিস, তাহ'লে আমি কিছু করতে পারব না। পুলিশে খবর দিয়ে দি, তারা যা পারে করুক গে।" পুলিশের নাম শুনে মেয়েটি যেন আরও ভেঙে পড়ল। সেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে বলল—"পুলিশে আমায় দিও না তোমরা, আমি ত কিছু চুরি করি নাই।" মিনতি মেয়েটির কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে ঠাকুরকে ডেকে দু'খানা পরোটা, একটু গুড় ও এক গ্লাস জল মেয়েটিকে এনে দিতে বললেন। কাছে খাবার রাখাতে মেয়েটি কান্না থামিয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে বসে রইল। মিনতি বললেন—"খুকি, ক্ষিদে পেয়েছে, না? আগে এইগুলো খেয়ে নে দেখি।" মেয়েটি তখন পরোটা দু'খানা হাতে তুলে নিয়ে গুড় দিয়ে খেয়ে জলের গ্লাস শেষ করে নামিয়ে রাখল। তার পর ছোট ছোট গোল-গোল চোখ দু'টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারি দিক চেয়ে দেখতে লাগল। আবার কিছু পরেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মিনতির দিকে চেয়ে বলল—"আমার মাকে যে পাচ্ছি না!" মিনতি এ কথা শুনে বললেন—"দেখ, তোর মাকে খুঁজে দোব। আগে ভাল ক'রে বল কি হয়েছে তবে ত বুঝতে পারব। আচ্ছা, বল দেখি, তোদের বাড়ী কোথায়?" মেয়েটি বলল—"কেন, খুলনা মোল্লাহাটি। আমরা ত কয় দিন হ'ল এখানে চলে এসেছি। সেখানে আমার বাবাকে কেটে ফেলে দিল, সেই জন্য মা আমাকে নিয়ে পালিয়ে এল।" মিনতি জিজ্ঞাসা করলেন—"তোর মা তাহ'লে কোথায় গেল?" মেয়েটি বলল, "কোথাও যায়গা না পেয়ে কাল ত আমরা তোমাদের বাড়ীর নীচের ফুটপাথের উপর শুয়েছিলাম। আজ সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।" তার পর আবার সুর তুলতে লাগল। মিনতি বললেন—"আচ্ছা, দাঁড়া, পুলিশে খবর দিচ্ছি। দেখি যদি তারা তোর মাকে খুঁজে বার করতে পারে"—ব'লে টেলিফোন করবার জন্য অফিস-ঘরে ঢুকলেন।

মিনতির স্বামী সতীনাথ পশ্চিম-বাংলা সরকারের এক জন মধ্য পদস্থ কর্ম্মচারী। সরকারি কাজের জন্যে তাঁকে প্রায়ই মফঃস্বলে যেতে হয়। দু'দিন আগে তিনি মফঃস্বলে গিয়েছিলেন। সেদিন রাত ন'টার সময়ে বাড়ী ফিরেছেন। স্নান শেষ করে চুল আঁচড়াবার জন্য ঘরে গিয়ে দেখেন, তাঁর ছেলে-মেয়ের মাঝখানে অচেনা একটি ছোট মেয়ে শুয়ে আছে। একটু আশ্চর্য হয়ে তিনি খাটের কাছে এগিয়ে গেলেন। মেয়েটিকে ভাল ক'রে দেখে তাকে চেনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না। খাটের পাশেই কাছে মেঝেতে মাদুরের উপর বালিশ দিয়ে একটি খালি বিছানা করা আছে, সেখানে কেউ শুয়ে নেই। খাবার সময়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন—"মিনি, টুকটুক বাবলার কাছে কে শুয়ে আছে? আমি ত চিনতে পারলাম না। বম্বেতে তোমার যে দাদা থাকেন তাঁর মেয়ে বুঝি?" মিনতি অবাক হয়ে বললেন—"খাটের উপর? কেন মেঝেতে ত তার বিছানা করে দিয়েছি। তাতে শোয়নি বুঝি?" সতীনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন—"তা ত আমি কিছু জানি না। আর ও মেঝেতেই শোবে কেন? ও কি তোমার ভাইঝি নয়?" স্বামীর পাশে একটা আসন টেনে নিয়ে বসে মিনতি বললেন—"আজ যা হয়েছে আর বলবার নয়। বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেছি। তুমিও আবার বাড়ী ছিলে না। যাই হোক, এখন এসেছ, হয় ব্যবস্থা কর।" বলে, মেয়েটির সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর কাছে বললেন। তার পর খেতে আরম্ভ করলেন। সব কথা শুনে সতীনাথ বাবু বললেন; "এত রাত্রে কি করা যাবে? কাল সকালে হয় একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বন্যার মত পিল-পিল করে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে যা লোক আসতে আরম্ভ করেছে, তাতে এ রকম ঘটনা হওয়া ত অস্বাভাবিক নয়। গভর্ণমেণ্ট আর কত দেখবে, কত ব্যবস্থা করবে।" খাবার পর শুতে এসে মিনতি মেয়েটিকে ডে

খাটের ওপর তুলে বসিয়ে বললেন—"হ্যাঁ রে পদ্মা, তোর বিছানা মেঝেতে রয়েছে, সেইখানেই ত শুয়েছিলি দেখে গেলাম। আবার এখন খাটের উপর এলি? যা, নেমে গিয়ে শুয়ে পড়।" মেয়েটি তার ঘুমন্ত আধ-বোজা চোখ দু'টি তুলে মিনতির দিকে চেয়ে বলল—মেঝেতে শোব কেন? বাড়ীতে ত আমি খাটের উপরই শুতাম।" মিনতি যখন তাকে হাত ধরে খাট থেকে নামিয়ে মেঝেতে শোয়ালেন, সে আর কোনও কথা না ব'লে তখনই সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল।

ক'দিন হয়ে গেল, তবুও পদ্মা রয়েই গেল। পুলিশে খবর দেওয়া সত্ত্বেও কেউ তার মাকে খুঁজে বার করতে পারল না। সতীনাথ বাবু এক-এক সময়ে স্ত্রীকে বলেন, "কি আর হবে? ওকে কোনও আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। এ সব বোঝা তুমি বইতে গেলে কেন বাপ? যখন প্রথম এসেছিল তখনই ত অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে পারতে। এ কি ছেলেমানুষি না কি? আজকাল নিজেদের ছেলে-পিলেদেরই [illegible] দিতে, লেখা-পড়া শেখাতে সামর্থ্যে কুলিয়ে ওঠে না, তার ওপর তুমি এক ভেজাল জোটালে ভাল!" মিনতি কিছু বলেন না, [illegible] শুনে যান। মনে মনে ভাবেন—সত্যিই ত! অথচ মেয়েটিকে কোথাও পাঠিয়ে দিতেও মন চায় না। পদ্মাকে যদি বলা হয় তাকে অন্য কোথাও পাঠান হবে, সে কেঁদে-কেটে অনর্থ করে। এ [illegible] দেখে মিনতির মায়ের প্রাণ খচ-খচ করে ওঠে। কিছুই বলতে পারেন না বা করতেও পারেন না।

সেদিন সকালে তিনি যখন আগের দিনের বাজারের হিসাব দেখছিলেন, পদ্মা এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে তারই পরা ফ্রকের একটু অংশ [illegible] মুখে পুরে চিবোতে লাগল। হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়তেই বললেন—"এই, জামা চিবোচ্ছিস কেন? খোল মুখ থেকে। [illegible] সকলই অদ্ভুত দেখছি!" পদ্মা থতমত খেয়ে জামাটা হাত থেকে [illegible] দিয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আমি টুকটুক-বাবলার সঙ্গে [illegible] যাব।" মিনতি একটু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন—" [illegible] মানে? তুই স্কুলে যাবি?" পদ্মা স্বর যথাসম্ভব করুণ করে [illegible]—"কেন, আমি ত দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছি! আমি কি [illegible] জানি না? আমাদের দেশের ইস্কুলেই ত পড়তাম।" [illegible] দেখতে দেখতে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মিনতি বললেন—"যা, [illegible] বেলা আমায় জ্বালাতন করিস না।" পদ্মার যাবার কোনও [illegible] দেখা গেল না। গলার স্বর এক পর্দা উপরে তুলে নাকি-[illegible] বলল—"না, আমি ইস্কুলে যাবই।" তখন মিনতি [illegible] "বেশ ত, পড়িস না বাপু। দাঁড়া, তোকে যেখানে পাঠাব [illegible] সব ব্যবস্থা করবে।" এ কথা শুনে পদ্মা গলার স্বর আরও এক [illegible] বলল, "না, আমি কোথাও যাব না, যত দিন না আমার [illegible] আসে। আমি টুকটুকের সঙ্গে থাকব। ওগো, তোমরা [illegible] পাঠিয়ে দিও না গো, তাহ'লে আমার মা এসে আমাকে না [illegible] পেয়ে ফিরে যাবে!" মিনতি রুক্ষ স্বরে বললেন "চুপ কর। কান্না বন্ধ কর। কি কান্নাই শিখেছিস! কথা বলবার [illegible] কান্নার স্বর গলায় এসে যায়! বেশ ত, অন্য কোথাও [illegible] চাস, তোর আপনার লোক কে কোথায় আছে [illegible] তার কাছেই তোকে পাঠিয়ে দোব।" তার পর [illegible] কাছে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে বাবলা, তোর পড়ার পুরোন [illegible] কিছু থাকলে পদ্মাকে দিস ত। সে পড়বার জন্যে কান্নাকাটি করছিল। পড়তে চায় ত ভালই। দুপুরে একলাই ত থাকে। পড়া-শুনো করলে দুষ্টুমি কম করবে।" তার পর কি দরকারের জন্য তখনই আবার ফিরে গেলেন।

সেই দিনই দুপুরে খান কয়েক বই নিয়ে পদ্মা মহা উৎসাহে পড়া আরম্ভ করল। বারে বারে মিনতির কাছে এসে এটা-ওটার মানে কি হবে জেনে নিতে লাগল। মিনতি সেলাই করতে করতে একটু আশ্চর্য্য হয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখেন আর মনে মনে ভাবেন, মেয়েটার বুদ্ধি ত খুব প্রখর দেখছি। একটা জিনিস দু'বার করে জেনে নেবার দরকার হয় না। একবার ব'লে দিলেই যথেষ্ট হয়। খানিকক্ষণ পরে তাকে ডেকে বললেন—"পদ্মা, তুই স্কুলে যাবি?" এ কথা শুনে পদ্মা তার ছোট্ট টুকটুকে মুখখানি হাসিতে ভরিয়ে বলল—"হ্যাঁ মাসীমা, আমি ইস্কুলে যাব। আমার পড়তে বড্ড ভাল লাগে। সব চেয়ে ভাল লাগে অঙ্ক কষতে। জান মাসীমা! আমাদের ইস্কুলে আমাদের ক্লাসের মধ্যে আমিই অঙ্কতে ফার্ষ্ট হয়েছিলাম।" সেলাই-এর কল থেকে ব্লাউজটা বার করে কাঁচি দিয়ে তার ধারের সূতা কাটতে কাটতে মিনতি বললেন—"পদ্মা, তোর আপনার লোক কে কোথায় আছেন, কিছু জানিস্ কি? আমায় বলতে পারবি? খুব ভাল করে ভেবে তবে বলিস কিন্তু।" পদ্মা তার কোঁকড়া চুলগুলো মুখের উপর থেকে টেনে সরিয়ে বলল—"তা ত আমি জানি না। তবে আমার মাসীমা'রা আর পিসীমা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসত। কোনও সময়ে আবার দু'-পাঁচ দিন থাকতেও দেখেছি। তারা যে কোথায় থাকে তা কিন্তু—আমি জানি না।" মিনতি বললেন—"আচ্ছা, তোদের বাড়ীতে যখন গোলমাল হয় তখন তুই কোথায় ছিলি?" জলভরা চোখ দু'টি হাতের উল্টো পিঠে মুছে পদ্মা বলল—"আমি ত ঘুমোচ্ছিলাম। চীৎকারের সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি, আমার বাবা চোখ উলটিয়ে সামনেই দালানে পড়ে আছে। তার সমস্ত শরীর রক্তে লাল। অনেক লোক সব মশাল হাতে নিয়ে চেঁচাচ্ছে চেঁচাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই সময়ে আমার মা হঠাৎ কোথা থেকে বেরিয়ে এল। আমাকে প্রায় কোলে করে পিছন দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁশ-বনের ভিতর নিয়ে গেল। সেখানে একটা ডোবার মধ্যে সমস্ত গা ডুবিয়ে কেবল মাথাটি বার করে সারা রাত্রি ধরে আমায় নিয়ে বসে রইল। তার পর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন আর ঝোপ-ঝাপের ভিতর দিয়ে চলতে আরম্ভ করি। এই রকম ক'রে দিনের পর দিন বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতাম আর সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গলে বসে থাকতাম। তার পর প্রথমেই যে ইষ্টিশান পাই সেখানে গিয়ে আমার মা ইষ্টিশান-মাষ্টারের পায়ে-হাতে ধরে নিজের গায়ের গহনাগুলো খুলে তাকে দিয়ে তবে কলকাতায় আসবার ব্যবস্থা করে।" —বলতে বলতে পদ্মার চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল ঝরতে লাগল। তার কচি বুকখানি কান্নার ভারে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মিনতি নিজের চোখের জল শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে মেয়েটিকে আদর করে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"আয় পদ্মা, তোকে অঙ্ক শিখিয়ে দিই।"

সন্ধ্যা বেলা মিনতি বসে রেডিও শুনছিলেন। স্বামী পাশে ইজি-চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এমন সময়ে টুকটুক,

কাঁদতে কাঁদতে বাবার কাছে এসে বলল—"জান বাবা, তুমি যে নতুন খাতাটা আমায় কিনে দিয়েছিলে হাতের লেখার জন্তে, সেটাতে আমি এখনও লিখিনি—পুরোনো খাতায় এখনও ক'টা পাতা আছে ব'লে। এদিকে পদ্মা কখন এসে আমার সেই খাতাটি চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাতে কি সব লিখেছে। বলছে, ও খাতা আমি দোব না, ওটাতে আমার ইস্কুলের হাতের লেখা করেছি।" মিনতি রেডিওর আওয়াজ কম করে দিয়ে টুকটুককে বললেন, "যা, দেখি, পদ্মাকে ডেকে নিয়ে আয়।" পদ্মা সেই খাতাখানি বুকে চেপে ধরে এসে দাঁড়িয়ে বলল—"আমায় ডেকেছ মাসীমা? আমি কিন্তু এ খাতা কিছুতেই টুকটুককে দোব না। আমার ইস্কুলের লেখা করতে হবে।" মিনতি পদ্মার দিকে ফিরে বললেন—"তুই আগে বলিসনি কেন যে তোর খাতার দরকার? তাহ'লে আমি সকালেই আনিয়ে দিতাম। ওটা টুকটুকের খাতা, ওকে দিয়ে দে।" খাতাটা আরো জোর করে বুকে চেপে ধরে পদ্মা বলল—"না, এটা আমি কিছুতেই ওকে দোব না। ওদের ইস্কুলে খাতা দরকার হয় আমার বুঝি হয় না? কেন?" মিনতি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন—"বাবলাকে বলত টুকটুক, ওর যদি পুরোনো খাতা কিছু থাকে পদ্মাকে একটা দিতে।" রেগে তার ছোট মুখখানি ঘুরিয়ে পদ্মা বলল, "আমি পুরানো খাতা নেব না। আমার বেলা খালি পুরানো, আর ওদের বেলায় সব নতুন, কেন? টুকটুক ইস্কুলে যাবে বাসে ক'রে। আমি যাব হরিয়ার সঙ্গে বেলতলায়। কেন? আমিও কি ডায়োসিসানে পড়তে পারি না?" ব'লে কেঁদে উঠল। মিনতি পদ্মাকে কিছু না বলে টুকটুকের দিকে ফিরে বললেন—"যা, হরিয়াকে বল তোর জন্তে একটা খাতা কিনে এনে দিক।" সতীনাথ বাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। মেয়েরা ঘর থেকে চলে যেতেই স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—"মিনি, তোমায় বার বার বললেও বুঝছ না, তুমি কি ক্ষতি করছ ঐ মেয়েটার। এত ক'রে বলা সত্ত্বেও ওকে কোথাও পাঠাতে পারলে না। ও সব বিষয়েই আমাদের ছেলে-মেয়েদের সমান অধিকার চায়, নিজেকে তাদের সমান মনে করে।" মিনতি একটু চুপ করে থেকে বললেন—"দেখ, সে বুঝি ঐ ছোট মেয়ের হলে আর ভাবনা ছিল না। আর ও ত নেহাৎ ছোট-ঘরের মেয়ে নয়। ধরণ-ধারণ দেখে বুঝতে পার না? সময়ের গুণেই বল, আর বিধাতার অভিসম্পাতেই বল, ও আজ সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। এই সব যখন ভাবি, তখন আমার মনটাকে কিছুতেই ঠিক করতে পারি না।" সতীনাথ বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—"বুঝতে সবই পারি, আমি ত আর ছেলেমানুষ নই। আর কোথায় যে তোমার দুর্ব্বলতা, তাও আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু তুমি যে পদ্মাকে টুকটুক-বাবলার সঙ্গে সব বিষয়ে সমান ক'রে মানুষ করবে এ আমি ভাবতেও পাচ্ছি না। এতে হবে কি জান? ঐ মেয়েটিকে আরো নষ্ট করা হবে। এখন থেকে ওর জানা উচিত ও শেখা উচিত, জগতে আজ ও একাই আছে, ওর কিছুই নেই। এই জেনেই ও নিজের জীবনকে সেই ভাবে গড়ে তুলুক। এখন থেকে যদি সব বিষয়েই জোর বা দাবি চালাতে যায়, তাহ'লে ওর ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার! আমি আবার বলছি ওকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দাও। রাস্তা থেকে মেয়েটাকে কুড়িয়ে এনে এ তুমি কি করছ মিনি?" মিনতি কোনও কথা না ব'লে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তার পর বললেন—"বেশ ত, যেখানে হয় তুমি ওকে পাঠিয়ে দাও না। আমি কি বারণ করেছি? মেয়েটা সব হারিয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই আমার দুর্ব্বলতা।" এই কথা ব'লে মিনতি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেরা যেখানে খেতে বসেছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে খাওয়া ছেড়ে আসন থেকে উঠে পদ্মা তাঁর সামনে এগিয়ে গিয়ে হাতের খাতাখানি তুলে ধরে বলল—"এই নাও মাসীমা, এ খাতা আমার দরকার নেই। তুমি যা হয় একটা দিও আমি তাই নেব" ব'লে খাতাটি তাঁর হাতে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে ... খেতে লাগল।

সেই দিন রাত্রেই আবার এক হাঙ্গামা লাগল। খেয়ে ... পদ্মা তার নিজের বিছানাতে কিছুতেই শোবে না। ছোট ছোট হাত দিয়ে নিজের বিছানাটা এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে খাটের উপর উঠে বাবলার পাশ-বালিশটা জড়িয়ে শুয়ে রইল। বাবলা পাশ-বালিশ না পেয়ে কেঁদে উঠল। কান্না শুনে মিনতি ... খাটের দিকে চেয়ে পদ্মাকে দেখে বললেন—"এই, তুই আবার কেন ওদের সঙ্গে শুয়েছিস? তোর বিছানায় শুগে যা।" ... দু'হাত দিয়ে পাশ-বালিশটা আরো জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবলা ... ওখানে শুক না, আমি রোজ রোজ মেঝেতে শোব কেন?" ... পদ্মার একটা হাত ধ'রে জোর ক'রে খাট থেকে নামিয়ে দিয়ে মিনতি বললেন, "হতভাগা মেয়ে, দিন দিন ভারি দুষ্টু হচ্ছে ... দেখছি! যা, ঘর থেকে বেরিয়ে যা"—ব'লে আবার তাকে টেনে ... পেরিয়ে বারান্দায় বার করে দিলেন। তার পর বাবলার ... একটি চড় মেরে বললেন, "রাত-দিন জ্বালাতন! আমি আর ... না বাপু! দিন-রাত খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া করবে সব।"

রাত্রে শুতে এসে মিনতি দেখেন, পদ্মা বারান্দার মেঝের এক ... শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখে তাঁর প্রাণের ভিতরটা মুচড়ে উঠ... তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে কোলে ক'রে ঘরে ... ছেলেদেরই এক পাশে শুইয়ে দিলেন। তার পর অনেকক্ষণ ... একটা বাজু ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। সতীনাথ বাবু দূর থেকে ... সব লক্ষ্য করে স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—"মিনি, শোবে ... দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" স্বামীর দিকে চেয়ে মিনতি বললেন— ... আমি ভেবে দেখছি, ওকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল, বার ... সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থেকে কি করে আমি ওকে আলাদা ... রাখব? তা আমি পারি না। তার চেয়ে ও দূরেই চলে ... তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজেদের শোবার ঘরে গেলেন।

বাবলা সকাল বেলা খবরের কাগজ হাতে করে বাবার ... গিয়ে বলল, "বাবা, আজ আমাদের দেড়টাতে ছুটি হয়ে যাবে। ... পর আমরা বায়োস্কোপে "পরিবর্ত্তন" দেখতে যাব। ... দিন আগেই ত আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। মা ত ... দেখতে যাবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর মা'র তা হয়ে উঠল ... তুমি আমাদের আজ নিয়ে চল। শুনছি, আসছে সপ্তাহেই ... শেষ হয়ে যাবে।" সতীনাথ বাবু ফাইলের ভিতর থেকে মুখ ... বললেন—"আমায় ব'লে ত কোনও লাভ নেই, তোমার মাকে ... জিজ্ঞাসা কর। তিনি যদি রাজি থাকেন যাও। তাছাড়া, ... শনিবার হ'লে কি হইবে, অফিসে আজ আমার বেশী কাজ ...

...ল সকাল ফিরতে পারব না। কাজেই তোমাদের নিয়ে ...ত পারব না।" বাবলা কাগজটা হাতে ক'রেই মা'র কাছে গিয়ে ...য়োস্কোপে যাবার কথা বলতেই তিনি পান-সাজা ফেলে রেখে ...র কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন—"কেন?—এই ত সেদিন একটা জঙ্গলের ছবি দেখে এলি, আবার কি দেখতে যাবি?" ...লা একটু লজ্জা পেয়ে মাকে বলল—"রাত-দিন রাত দিন ত যাই না! এ ছবিটা সকলে বলে খুব ভাল হয়েছে। ক্লাসে মাষ্টার মশাই ...বলছিলেন ছেলেদের সবাইকে দেখবার জন্যে।" মিনতি কাগজটা ...সোফা পাশে ফেলে রেখে ছেলের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন—...শোনা ছেড়ে সকাল বেলা খবরের কাগজ নিয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন ...য় কি বায়োস্কোপ হ'চ্ছে! পড়া-শোনা যা হ'বে বুঝতেই পাচ্ছি।" ...কোন কথা না ব'লে ম্লানমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই দিনই বেলা তিনটার 'শো'তে ছেলে-মেয়েদের বায়োস্কোপ ... যাবার জন্যে তৈরী হ'তে ব'লে মিনতি চুল বাঁধতে ...লেন। বাবলা মা'র কাছে এসে হাসি-হাসি মুখ ক'রে বলল, ... কে আমাদের নিয়ে যাবে? বাবা বুঝি এক্ষুণি ...?" মিনতি বললেন, "আমিই নিয়ে যাব। উনি ত ... পারবেন না। দেরি না ক'রে তৈরী হয়ে নাও গে দেখি। ...হরিয়াকে অমনি বলে দাও তোমাদের জুতোগুলোয় একটু ...দিয়ে দিক।" টুকটুক ছুটতে ছুটতে এসে মাকে দেখে দাঁড়িয়ে ..."মা, পদ্মাও বুঝি আমাদের সঙ্গে যাবে?" মিনতি বললেন, ...ওকে একলা কোথায় রেখে যাব?" ইতিমধ্যে পদ্মা ঘরে ...র কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—"আমার জামার বোতামটা ...ও ত মাসীমা!" মিনতি বললেন—"এই পদ্মা, ওটা ত ... জামা, ওটা পরলি কেন?" অল্প হেসে মুখটা নবিয়ে পদ্মা ..."...কি করব? আমায় কি একটিও ভাল জামা দিয়েছ! ...আমার এক বাক্স জামা ছিল। মা নিজের হাতে কত ...ক'রে। সে ভাল জামাগুলো সব গেছে"—ব'লেই ম্লান হেসে ... মিনতি পদ্মাকে আর কিছু না ব'লে টুকটুকের দিকে ...বললেন—"যা ত টুকটুক, আমার ঘরে আলনার ওপর ...নতুন জামাটা তৈরী করছিলাম, কাল শেষ করে রেখে ...সেইটে পরে নে! ও যখন প'রেছে আর কি ছাড়বে?" ...র হাতের একটা আঙুল দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ...আমার অমন ভাল জামাটা সুধাদি তৈরী করে দিয়েছিল, ...নে!" মিনতি একটু রুক্ষ স্বরে বললেন—"ওটা ত তোর ...জামা, পরেছে ত হ'য়েছে কি? ও-রকম করছিস কেন? ...ওর ত কিছুই নেই।" তার পর পদ্মার দিকে ফিরে ...যা ত পদ্মা, তোর জন্যে যে নতুন রিবনটা কিনেছি, ...শোফের উপর আছে, সেটা নিয়ে আয়, চুল বেঁধে দিই।"

...যখন বায়োস্কোপের বাড়ীতে হাজির হ'ল, আরম্ভ হতে ...দু'মিনিট বাকি ছিল। বায়োস্কোপ আরম্ভ হতেই ...একমনে ছবির পর্দার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল, ...মিনতিকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—এটা কি— ... বোর্ডিং-এর পেট-মোটা ম্যানেজারকে ছেলেরা ভয় ..., তাঁর ভয় পেয়ে কাঁপুনি দেখে ছেলে-বুড়ো যে যেখানে ছিলেন ...সকলে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। তার পর আবার সকলে চুপচাপ হয়ে ছবি দেখতে লাগলেন। পদ্মা হঠাৎ ব'লে উঠল—"মাসীমা, ঐ ত আমার মা—ওখানে বসে রয়েছে মনে হচ্ছে। যদিও অন্য রকম সাজ-গোজ, কিন্তু আমার মা'র মুখকে ত আমি চিনি। আমি ওখানে যাব।" মিনতি আশ্চর্য হয়ে চারি দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"কোথায় তোর মা? এখন চুপ ক'রে ব'সে ছবি দেখ দেখি, চেঁচামেচি করিস না, আশে-পাশের লোকেরা গালাগালি করবে।" পদ্মা কিন্তু কান্নার সুর টানতে টানতে বলল—"ঐ ত উপরে পাশের বারান্দাতে আমার মা বসে আছে।"—মিনতি উপর দিকে চেয়ে বললেন—"যা, ও তোর মা হতে যাবে কেন? কে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে আছে। ও অমনি তোর মা হ'ল! চুপ করে বসে ছবি দেখবি ত দেখ, নইলে বার করে দোব এখান থেকে।" পদ্মা খানিকটা চুপ করে উপর দিকে সমানে চেয়ে বসে রইল। আবার একটু পরেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—"আমি মা'র কাছে যাব!" আশে-পাশের দর্শকেরা তার কান্নার শব্দে বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠলেন—"খুকি, তুমি যদি ছবি না দেখতে চাও বাইরে যাও, এখানে কথা ক'য়ে কেঁদে আমাদের দেখা নষ্ট কোর না।" মিনতি বিরক্ত হয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বায়োস্কোপের সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার পর পদ্মার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন—"যা, তোর মাকে চিনে নিগে যা। কি বিপদেই আমায় ফেলেছ! নিজে ত কিছু দেখলে না, ছেলে মেয়ে দু'টোকে শুদ্ধ কিছু দেখতে দিলে না। ভাল আপদ হয়েছে আমার।" পদ্মা কাঁদতে কাঁদতে বলল—"আমি কি ক'রে যাব? রাস্তা ত জানি না। তুমি আমায় নিয়ে চল।" মিনতি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন—"আমার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তোকে নিয়ে গিয়ে বক্সে-বক্সে খুঁজে বেড়াই কে তোর মা! এই-খানে দাঁড়িয়ে থাক, এই রাস্তা দিয়েই ত সব যাবে। মাকে পেলে তার সঙ্গে চলে যাস। আমি তাহ'লে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

অল্পক্ষণ পরে বায়োস্কোপ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্যার জলের মত মানুষের স্রোত বেরিয়ে আসতে লাগল। ভিড়ের ধাক্কা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মিনতি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে ফুটপাথের উপর এসে দাঁড়ালেন। তার পরই দেখলেন, একটি পেট-মোটা মাড়োয়ারী, কানে হীরার ফুল, দু'হাত মিলিয়ে পাঁচ-সাতটা হীরার আংটি, একটি বাঙালীর বউকে সঙ্গে করে বেরিয়ে আসছে! বউটির মুখ রং-পাউডারে ভর্তি, আসল-নকল চেনাই মুস্কিল। একটি দামী শাড়ীর উপর কতকগুলি সোনার গহনা পরেছে! সতৃষ্ণ নয়নে সেই বউটিকে দেখে পদ্মা প্রথমে কান্না থামিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। তার পর চীৎকার করে কেঁদে ঝাঁপিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠল—"ও মা, তুমি কোথায় ছিলে এত দিন আমায় ফেলে?" বউটি পদ্মাকে দেখে তার কাজল-মাখা চোখ দু'টি বড় বড় করে চেয়ে তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে নিতে যেতেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি বউটির হাত ধ'রে টেনে গাড়ীতে তুলে নিয়ে পদ্মার দিকে চেয়ে বলল—"কে তোর মা আছে খোকি? এখানে কুছু নেই।" তার পর নিমেষের মধ্যে গাড়ী রাস্তার ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। পদ্মা সেই ফুটপাথের উপর লুটিয়ে পড়ে হাত দিয়ে তার ছোট বুকখানি চেপে ধরে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল—"ওগো মা গো, আমায় নিয়ে যাও গো!"

দিলীপকুমার সান্যাল

শুনিয়াছি, গল্‌ফ খেলা লইয়া যাহারা মাতামাতি করে, বিলাতে লোক-সমাজে তাহাদের সান্নিধ্য সকলে এড়াইতে চেষ্টা করে। একটু আস্কারা পাইলেই 'সপ্তদশ ফোকরে' রাত্রে কি মারাত্মক 'সাট' হাঁকাইয়াছিল কিম্বা ঐ গোছের কোনও নিগূঢ় রহস্য আপনার জ্ঞানগোচর করা চাই। স্থূলবুদ্ধির দোহাই দিয়াও আপনার নিষ্কৃতি নাই। তাই আড্ডায়, মজলিশে সকলে গল্‌ফ-বোবকে দেখিয়া ডরায়। জন্মে গল্‌ফ খেলি নাই; সুতরাং ফাঁড়া কাটিয়া গেল ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু কুক্ষণে বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগে ধরিল। ছেলেবেলায় একটু-আধটু 'ব্যাটবল' খেলিতাম। বিশেষ পারদর্শিতা ছিল না; উৎসাহ যাহা ছিল তাহাও সুযোগ ও অবকাশের অভাবে হয়ত আস্তে আস্তে মিইয়া যাইত—যেমন না কি ঘটে অধিকাংশ ভাবপ্রবণ যুবকের কাব্য-চর্চ্চার ব্যাপারে। কলেজ ম্যাগাজিনের পাতায় অদৃষ্টপূর্ব্বা বা ক্ষণদৃষ্টা যে ভাবের বন্যার সৃষ্টি করেন, কালক্রমে তিনি পরিণীতা হন; তাঁহার অপরিচিত অনুরাগীকেও মাটির পৃথিবীতে আবার পা নামাইতে হয়। ফলে পরীক্ষায় পাশ, চাকুরী লাভ, ব্যাঙ্কে টাকা, ঘরে পুত্র-কলত্র ইত্যাদি ঐহিক সম্পদে মন বেশ নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ছন্দ-সরস্বতীকেও উপাসক-বাৎসল্যে আর বিব্রত হইতে হয় না। আমার ক্রিকেট-প্রীতিরও সেই আবশ্যিক পরিণামই হয়ত ঘটিত; কিন্তু বিধাতা আমার পরিণয়ের ব্যাপারে একটু পরিহাস করিয়া বসিলেন। সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে যে সপ্তদশী আমার সহিত ধর্ম্ম আচরণ করিতে ধর্ম্মত বাধ্য হইলেন, তাঁহার পিতৃদেব শুধু উৎসাহী নন, ক্রিকেটে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য; অল্প বয়সে খেলা ছাড়িয়া না দিতে হইলে তিনি হয়ত সার্ব্বভারতিক প্রতিষ্ঠারও অধিকারী হইতেন। বিবাহের পর কূট অধিনায়ক ডগলাস্ জার্ডিনের নেতৃত্বে এম সি সি দল ভারত বিজয়ে আসিল। আমার নব শ্যালকের মধ্যে যে ক'টি তখন ইডেন উদ্যানে আসিয়া বসিয়া থাকিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের সকলের জন্য ও বাড়ীর আরও কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছোকরাদের জন্য সীজন টিকিট কেনা হইল। আমি নূতন জামাতা। আমার জন্যও একটি টিকিট আসিয়া আমার মাতুলালয়ে হাজির হইল। ইহার পূর্ব্বে ক্রিকেট দেখিয়াছি; কিন্তু তাহার মধ্যে দড়ির ধারে বসিয়া বাদাম ভাজা খাইবার ও বন্ধু-সংসর্গে আড্ডার নেশাই ছিল বেশী। তখনও ভাল বোলিং-এর সময় 'রান' না উঠিলে বিরক্তিই বোধ করিতাম। কোথায় দাঁড়াইলে কাহার কি নাম হয়, হলপ করিয়া বলিতে পারিতাম না। মোটের উপর আর পাঁচ জনের মতই ক্রিকেটকে তখনও পাঁচ রকম বিভিন্ন খেলার একটি বলিয়া জানিতাম। ফুটবলও দেখিতাম; ক্রিকেটও দেখিতাম। ফুটবলই বেশী ভাল লাগিত, এ কথা স্বীকার করিতে আজ আর লজ্জাবোধ করি না। সতের বৎসরে দেখিয়া দেখিয়া ও পড়িয়া পড়িয়া ক্রিকেটের সব রহস্য আজ আমার বুদ্ধিগ্রাহ্য; মাঠে নিজে হাতে-কলমে বিশেষ কিছু করিয়া না উঠিতে পারিলেও যতক্ষণ মাঠে থাকি প্রতি মুহূর্ত্ত উপভোগ করি। ক্লান্তি আসে না। পরের দিন হয়ত একটু খোঁড়াইতে হয়, হয়ত পরিচারককে দিয়া তৈল-মর্দ্দনের প্রয়োজনও অনুভব করি। রান লইতে গিয়া [illegible] ফিরিয়া রক্তপাতও এক-আধটু হয়। চল্লিশোর্দ্ধে নূতন করিয়া ব্যাটিং-এর ক্রীজ সামলাইবার সময় আর নাই জানি; [illegible] প্রতিবার গিয়া শূন্য করিয়া যদিও চলিয়া আসিতে হয় [illegible] যত দিন শরীর পটু ও সক্ষম আছে, তত দিন সবুজ গালিচার [illegible] রাখিয়া মেঘনির্মুক্ত নীলাকাশের নীচে শীতাতপের গলিত [illegible] গায়ে মাখিবার যে উত্তেজনা, তাহা হইতে যেন বঞ্চিত না হইতে [illegible] আর ৮।১০ বৎসর পরে হয়ত মাঝে-সাঝে ব্যাট হাতে লইয়া মা[illegible] মধ্যে দাঁড়াইবার সৌভাগ্যও আর থাকিবে না। যত দিন আ[illegible] তত দিন আমি আমার বিশিষ্ট পূর্ব্বাচার্য্যদের সমধর্ম্মী, সগোত্র; ইহার অধিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনই কি?

সে যাহা হউক, বিগত সতের বৎসরে প্রতি শীত ঋতুর যখন যেখানেই থাকি না কেন, কোনও বড় ক্রিকেট ম্যাচ বাদ পড়ে নাই। কলিকাতায় অধ্যাপক-জীবন যাপন করিবার সময় বেশীর ভাগ বড় খেলাই বড়দিনের অবকাশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। একবার কর্ম্মোপলক্ষে কিছু দিনের জন্য পাবনায় প্রবাসী হইয়াছিলাম; বড়দিন কলিকাতায় কাটাইবার কোনও অসুবিধাই ছিল না। পরে ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজের সঙ্গে বাঙ্গালার ম্যাচ। ছুটি লইয়া কলিকাতা আসিয়াছিলাম। ১৯৪৫ সালে পশ্চিম-পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত লায়ালপুর সহরে ছিলাম। হ্যাসেটের অধিনায়কত্বে অষ্ট্রেলীয় মিলিত বাহিনী একাদশ তখন ভারতবর্ষে 'ভ্রাম্যমান'; লাহোরে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে তাহাদের খেলা। চার দিনের ছুটি লইয়া লাহোর যাইতে হইল। ভগবান দিল্লীতে রুটির ব্যবস্থা করিবার পর ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ আসিল; কমনওয়েলথ একাদশ আসিল; অষ্ট্রেলিয়া আসিবে। তাহার পর আবার এম সি সি। আসাম বা উড়িষ্যায় চাকুরীর চেষ্টা করি নাই। ভবিষ্যতেও করিব না; কারণ শীতকালে ক্রিকেট খেলে না এমন পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে উচ্চাসনে আসীন হওয়া অপেক্ষা সারা বৎসর কায়ক্লেশে কাটাইয়া বৎসরান্তে একবার ৪।৫ দিনের জন্য অহোরাত্রি জীবন্মুক্তির স্বাদ পাইতে আমি উন্মুখ। এই আনন্দ স্বার্থপরের মত একাই গ্রহণ করি নাই। ছেলে, ভাগিনেয় ইহার ভাগ পাইয়াছে। গৃহিণীকে [illegible] কষ্ট অবশ্যই করিতে হইয়াছে। ৩।৪ বা ৫ দিন ধরিয়া সমানে বেলা ৯টার মধ্যে মাধ্যাহ্নিকের আয়োজন করিতে হইয়াছে; সান্ধ্য লাঞ্চের জন্য কিছু জোগাড় করিয়া দিতে হইয়াছে। [illegible] সময়ের মধ্যে সংসারের কোনও চিন্তা আমার মনের মধ্যে আঁ[illegible] কাটিতে পারে না, ইহা বুঝিতে হইয়াছে। এতখানি [illegible] স্বীকার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ স্বীকার করি[illegible]। জার্ডিনের অভ্যুদয়কে উপলক্ষ করিয়া আমার যে ক্রিকেটে [illegible] আমার গৃহিণীর স্বর্গত পিতৃদেবই তাহার হোতা। শুনিয়াছি [illegible] সি কে নাইডু বড় খেলোয়াড়, ছক্কা পেটায় খুব দড়। সেই [illegible] প্রায় আড়াই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুট-ফুট করিয়া ৩৮ রান [illegible] যেদিন ভারতবর্ষকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে পা[illegible] সেই দিন হইতে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। বুঝি[illegible] ক্রিকেট ব্যাটবলের খেলা নয়; ক্রিকেট-দক্ষতাই সব চেয়ে ব[illegible] নয়। নৈপুণ্যে চমৎকৃত করাই ক্রিকেটের উদ্দেশ্য নয়। [illegible] করিতে পারে তাহাকে তাহা অবশ্য করিতেই হইবে; কিন্তু প্র[illegible] হইলে স্বচ্ছন্দে ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারার যোগ্যতাও থাকা [illegible] এখানেই ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য। ফুটবলে যেমন পায়ের গো[illegible] থাকিলে বিপক্ষের গোল-কীপারকে পরাস্ত করাই একমাত্র ধর্ম্ম, ক্রিকেটে ব্যাটের মুখে শিথিলগতি বা তির্য্যকগতি বল পাইলেই তাহাকে

রান করিতে হইবে, এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যে স্বভাবতঃ রানমুখো তাহাকেও সংযত হইতে হয়, ফলে যেমন অবস্থাবিশেষে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন উলে, ট্রামপার, ম্যাকার্টনে, ব্র্যাডম্যান, প্রভৃতি। পক্ষান্তরে অমন যে ধৈর্য্যের হিমালয় হব্‌স্—এক ঘণ্টায় ১০০ রান করার প্রয়োজনের সময় দেখা গিয়াছে তিনিও সেদিন হেণ্ড্রিন্স, ক্রফোর্ড, রঞ্জি, এমন কি জেসপের মতই হু হু করিয়া রান তুলিয়াছেন। অবশ্য শত চেষ্টা করিয়াও নির্ভুল খেলা আয়ত্ত করা যায় না; কারণ হাতে ব্যাট লইয়া একেবারে নির্ভুল খেলা খেলিতে পারিলে কোনও ব্যাটস্‌ম্যান কস্মিন্‌ কালেও আউট হইত না। ভুল সব সময়ে হয়ই; সেই ভুলেই পতন। চোখ ভুল করে, বলটি ঠিক যেখানে আসার কথা তাহার ছ' ইঞ্চি এ-ধারে বা ও-ধারে পড়ে। এগোইয়া কভার-ড্রাইভ করা গেল; ঐ যে ছ' ইঞ্চি বাহিরে পড়িয়াছে তাহার ফলে স্লিপের হাতে ক্যাচ উঠিল। মনে হইল লেগ ষ্টাম্পের পিছনে বল; বেশ গ্লাইড করা যায়। বেয়াড়া লেগ ব্রেক, পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকটির ঘাড় মটকাইতে হইবে; একটু ভিতরে পড়ার ফলে ব্যাটের ঠিক মাঝখানটির সঙ্গে মোলাকাৎ হইল না। ইঞ্চি খানেক উঁচু দিয়া খানিকটা গিয়া পরে গড়াইয়া বলটি বাউণ্ডারীর দিকে যাওয়ার কথা। কোথা হইতে উইকেট-রক্ষক যমদূতের মত এসে ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া বলটি মাটিতে পড়িতে দিল না। এই রকম কোনও না কোনও ভুল হয় বলিয়াই না ক্রিকেটে এত মজা! ...ভুল না করিয়া বাহাদুর পারেন! আবার যখন তাড়াতাড়ি রান তুলিতে হইবে তখন নিখুঁত খেলার চেষ্টা করাই ভুল। আউট না হইয়া সারা দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেও তখন বাহবা নাই। রান তখন চাই। পুঁথিতে যে সব মারের বিশদ বর্ণনা থাকে সেই ড্রাইভ, কাট, পুল, হুক, গ্লাইড, স্কাপ করিয়াই হোক বা অনভিজ্ঞাত যে কোনও উপায়েই হোক রান তখন করিতেই হইবে। বাঁ পা ডান পা কোথায় থাকিবে, বাঁধ কতখানি চওড়া হইবে এ সব লইয়া মাথা ঘামাইবার তখন আর অবসর নাই। লম্বা হইলে সামনে এগোইয়া, হ্রস্বকায় হইলে এক পা পিছাইয়া বল পাইলেই তাহাকে মারিতে হইবে—এক নিতান্ত বেয়াড়া ঠিক মাপের সোজা বল ছাড়া। ...মত বন-বন করিয়া হয়ত আমীর ইলাহি বা এলিস বা ভেরিটি ...র বল ঘুরাইতেছেন। বল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বা শূন্যে থাকিতেই আগাইয়া গিয়া মারিতে হইবে। বিপদ আছে। একটু ...র গরমিল হইলেই হিন্দেলকার, নাভলে, লেভেট, সিসমে, ...ন চক্ষের পলকে আপনাকে কুপোকাৎ করিবেন। তবুও ...শুনিয়াই আপনাকে এই বিপদ বরণ করিতে হইবে। পারেন ...বীর; না পারিলে বোলারের কৃতিত্ব—আপনার মত তুখোড় ...রিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আপনার ... সাফল্যের কথা সব সময়ই ভাবা চলে না। এক সময়ে যাহা ...অন্য সময়ে তাহাই আবার অবশ্যকর্ত্তব্য। ছক্কা পিটাইয়া কখনও ...পাইবেন, কখনও ছিঃ ছিঃ! লেগে হুক করিয়া বাউণ্ডারী ... আপনি যাদুকর; আবার তাহাই করিতে গিয়া ডীপ ফাইন ...হাতে ক্যাচ তুলিয়া দিন, শুনিবেন, আপনি উল্লুক। এই এত সহিয়া যে খেলা খেলিতে, এমন কি দেখিতে শিখিতে হয়, ...করিয়া তাহা আয়ত্ত না করিতে পারিলে, বা আয়ত্ত করার প্রয়োজন বোধ না করিলে আমার বন্ধু পরিমল বাবুর মত আপনিও মাঠে যাইবেন না। নিজেও বাঁচিবেন, যাহারা সত্য ক্রীড়ামোদী তাহারাও বাঁচিবে।

অথচ সতের বৎসরে ক্রিকেট যাহা দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মজাও কি কম দেখিলাম? কলিকাতা, লাহোর, দিল্লী এই তিনটি নগরীতে রঞ্জি-প্রতিযোগিতা ও বিদেশী খেলোয়াড়দের অভ্যুদয়, বিশেষ কোনও আধিভৌতিক কারণ-নিয়ন্ত্রিত বড়দিনে ক্রিকেট মহোৎসব,—এই সব জড়াইয়া কম্‌সে-কম তিরিশটি বড় ম্যাচ দেখিয়াছি। পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া, কখনও বা নিজের হাতে ভরান পুরাতন স্কোর-কোর্ড অবলোকন করিয়া এই সতের বৎসরের ক্রিকেট ইতিহাস মেটল্যাণ্ডী বা ষ্টাবসীয় পদ্ধতিতে রচনা করিয়া নিরীহ পাঠককে ঘায়েল করিয়া দিতে পারি। সে আর এমন কি কথা। ইহাদের সকলেই আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি-গ্রাহ্য। কাহাকে একবার, কাহাকেও দুই বার, কাহাকেও বা বার-বার দেখিয়াছি। যাহাদের কখনও চোখে দেখিলাম না, দেখিতেও পাইব না, বই পড়িয়া পড়িয়া তাহারা আমার অতি পরিচিত। কভার পয়েণ্টের কথা উঠিলেই আমার ভার্ণান রয়েলোর কথা মনে পড়ে, স্লিপে ক্ষিপ্রতার প্রসঙ্গ কেহ অবতারণা করিলে আপনারা হয়ত হ্যামণ্ডের কথা ভাবেন, আমি লোম্যান, গ্রেগরী এশটনের সঙ্গেও যে সুপরিচিত। লিলি-হোয়াইট হইতে আরম্ভ করিয়া হ্যামণ্ড পর্য্যন্ত যতগুলি অধিনায়ক অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া ব্যক্তিগত ও যৌথ যত কিছু কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন সব আমার নখ-দর্পণে। পক্ষান্তরে, মার্ডক হইতে ব্র্যাডমান পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলীয় রথীরাও সকলেই আমার সুপরিচিত। সুতরাং ক্রিকেট ইতিবৃত্ত লইয়া বড়াই করার অভিসন্ধি আদৌ আমার নাই। পড়িয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহার ভাগ যদি আপনারা লইতে চান, যথা সময়ে নিবেদন করিব, যাহা দেখিয়াছি তাহাও বাদ পড়িবে না। এখানে শুধু যাহারা ক্রিকেট দেখিতে যান না, নিজেদের দেখাইতে যান বা গিয়াছেন—এই কথা জাহির করিতে যান তাঁহারাই আমার আলোচ্য।

যাঁহারা নিজেদের দেখাইতে যান, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে অবশ্য মেয়েরা। ক্রিকেটের মাঠে কত মেয়েই না দেখিলাম। ইঁহাদের মধ্যে শুধু দুই-একটি প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়-পরিবারের দুহিতারা ছাড়া আর সকলেই অবশ্য ক্রিকেট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতে একটা দারুময় অস্ত্র আছে; সেইটি দিয়া একটি রক্তবর্ণ গোলক ইতস্ততঃ প্রহৃত হয়, এই জ্ঞান সম্বল করিয়া ইঁহারা মাঠে যান। কাঠি ছিটকাইয়া গেলে না বুঝিয়া উপায় নাই; কিন্তু অন্য কোনও উপায়ে ব্যাটস্‌ম্যানের পতন ঘটিলে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকেন। ব্যাটস্‌ম্যানের চতুর্দ্দিকে যে ব্যূহ রচিত হয়, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল, তাহা হইতে নিষ্ক্রমণের উপায়, বোলারের বলক্ষেপণের কৌশল ইত্যাদি কিছুই তাঁহারা বোঝেন না। বুঝিবার জন্য যানও না। যান দেখাইতে। সাড়ী, ব্লাউস, ওভারকোট, জুতা, প্রসাধন, বিলোল কটাক্ষ এ সবের মূল্য কি কম? মূর্খরা হাঁদার মত সামনে তাকাইয়া কি দেখে? একটু এদিক ওদিক বা পশ্চাতে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে তাহার চেয়ে দর্শনীয় কিছু নাই কি? কেহ বা সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে কিছু সঙ্কুচিত হন; কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা রোদে পুড়িবার পর সঙ্কীর্ণ 'কিউয়ে' দাঁড়াইয়া সাড়ীর পাড়ের সম্বন্ধে অন্য একটি মেয়ের তারিফ শুনিতে পাওয়া, তাহাই কি নারী-জীবনের কম সুকৃতি? কেহ বা

সেই দিনের ম্যাচের কোনও বীরের বাগ্‌দত্তা বা স্বয়ম্বৃতা। মধ্য-যুগে হয়ত প্রাসাদ-দুর্গের গবাক্ষ-পথ হইতেই গ্যালাহাড পার্সিভ্যাল, ল্যানসেলটকে শৌর্য্যে উদ্দীপিত করিতেন; বিরসতর পরিবেশে তাঁহাকে শিফনে জর্জ্জেটে তনুদেহ ঈষৎ অসম্বৃত করিয়া পিগস্কিনের ওয়ালেট হাতে ঝুলাইয়া বিচিত্রবর্ণ শানশেড হাতে করিয়া মাঠের খুব কাছ ঘেঁষিয়া সামনের সারের চেয়ারে বসিতে হয়। বাউণ্ডারীর খুব কাছে বল ধরিতে গিয়া যদি কোনও খেলোয়াড়ের হাত হইতে বল ফস্কাইয়া যায়, উত্তেজিত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিবেন না। এমন হওয়া অসম্ভব নয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চারি চক্ষের মিলন ঘটিয়াছে; শুধু বলই ফস্কায় নাই, বেচারা প্রণয়ীর হৃদ্‌যন্ত্রের দুই-একটি স্পন্দনেরও হয়ত তাল কাটিয়া গিয়াছে? বিধান! আবার ঠিক ব্যক্তিগত পূর্ব্বরাগ ছাড়া অন্য কারণেও হয়ত অনেকে যান। শক্তিরূপিণী নারী। তাঁহারা গেলে যুবকবৃন্দ শক্তিলাভ করিবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াও হয়ত বা কেহ যান। কিন্তু আসল কথা জানিতে পারিলে ইহাদের অভিমানে ঘা লাগিবে। যাহারা মাঠের মধ্যে থাকে তাহারা যতই বিনয়ী হোক দর্শকদের সম্বন্ধে তাহারা সচেতন থাকে না। খুব হাততালি পড়িলে হয়ত একটু কানে যায়; কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। যাহারা দর্শক, তাহাদের মধ্যে রসিক আছেন, পূর্ব্ব-সূরি আছেন, সমালোচক আছেন, পরম সুদর্শনা ও পরমতর সুবেশাও আছেন। কিন্তু যাহারা কুশীলব, তাহাদের কাছে দর্শক-মণ্ডলীর অস্তিত্ব বেশ সুস্পষ্ট নয়। যেমন ধরুন বক্তা। রঙ্গভূমিতে যিনি যাঁহারাই উপস্থিত থাকুন সকলেই বিদ্যাবুদ্ধিতে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট এই পরম আশ্বাস না নিয়া বড় সভার মুখই যে খোলা যায় না। সুতরাং ম্যাকার্টনে আমাকে দেখাইতেই স্কোয়ারকাট মারিলেন (অবশ্য স্কোয়ারকাটের প্যাঁচ বুঝি না) বা ভেরিটি আমার মুখ স্মরণ করিয়াই ম্যাককেবকে ষ্টাম্প করাইলেন, বা আমার মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্যই শর্ট লেগে চ্যাপম্যান অমন ছবির মত নিখুঁত ক্যাচ লুফিয়া ফেলিলেন, ইহা ভাবিয়া যেমন কোনও নীলাক্ষী বা হরিণাক্ষীর পুলকোদ্গম হয়, তেমনি আমাদের দেশেও স্যুটে ব্যানার্জ্জী বা কার্ত্তিক বসু বা বাকা জিলানীর বিজয়-সাফল্যে কোনও সাড়ী-বিলাসিনীর গণ্ডদ্বয় যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য রক্তিম হইয়া উঠে, তাহাকে পূর্ব্বরাগ মনে করিবার হয়ত কারণ নাই। আবার ইহারা ছাড়া পরম স্নেহময়ী বর্ষীয়সীও হয়ত আছেন—যাঁহারা পুত্রের বা জামাতার গৌরবের অধিকারিণী হইতে মাঠে যান। নাই বা বুঝিলেন খেলা; ছেলে একটা কিছু করিলে তাঁহাকে পায় কে? এইরূপ একটি বর্ষীয়সী সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলিব। ইহার পুত্র বাঙ্গালার হইয়া রঞ্জি-প্রতিযোগিতায় খেলিতেন। একটু মেদ-বর্ত্তুল গঠন। তাই দর্শকদের দিক হইতে তাঁহার খেলা বিশেষ তৃপ্তিকর ছিল না। বলও দিতেন। মোটামুটি ভালই; কিন্তু আমার পরম শ্রদ্ধেয় কোনও প্রাক্তন—ক্রিকেটর ইহার ব্যাটিং একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার মধ্য-ভারত দলের সঙ্গে বাঙ্গালার খেলা। কাহার বলে মনে নাই কিন্তু অতি সুন্দর একটি বলে ভদ্রলোক একেবারে কুপোকাৎ হইয়া গেলেন। আমার স্বর্গত আত্মীয় তাঁহার ষাট বর্ষ বয়ঃক্রমের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন সঘন করতালিতে বিভোর, তখন পিছন হইতে ইংরেজী ভাষায় নারী-কণ্ঠে মন্তব্য শুনিয়া তিনি একটু অপ্রতিভ হইলেন। ভদ্র-মহিলার বক্তব্য সুস্পষ্ট। 'ষাট বছরের বুড়ার কাণ্ড-খানা একবার দেখ!' আমার গুরুজন পরে সন্ধান লইয়া শুনিলেন, যাঁহার পতনে তাঁহার উল্লাস, ভদ্র-মহিলা সেই খেলোয়াড়টির মাতা! এই ব্যাপার ঘটিবার পর হইতে আমি বর্ষীয়দের সামনে আমার উৎসাহের কথা চাপিয়া যাই। অতি সুন্দর ছক্কা; সোজা বোলারের মাথার উপর দিয়া উঠিয়া সাদা স্ক্রীন পার হইয়া দর্শকের মনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া প্যাভিলিয়নের কানাচে যা ছাদের উপর গিয়া পড়িল। যুক্ত করদ্বয় সহসা স্তম্ভিত হইয়া যায়—যদি দেখি পাশে কোনও প্রৌঢ়া বসিয়া। কে জানে হয়ত ইনি বোলরের মা মাসী কিছু একটা হন। যাহা হউক, প্রণয় বা পরিণয় বা কল্যাণ যে কোনও সূত্রেই কুলাঙ্গনারা ক্রিকেটের মাঠে সমবেত হন না—ইঁহাদের কাছে সনির্ব্বন্ধ অনুযোগ, তাঁহারা যতক্ষণ মাঠে থাকেন কাননবালার অভিনয়-নৈপুণ্য বা নিজের রূপ-মাধুরী বা মজুমদারের দোকানে ব্লাউসের কাট সম্বন্ধেই যেন আলোচনা করেন, ক্রিকেটের সমঝদারী সাব্যস্ত করিতে গিয়া 'বাঃ, বেশ লেগ-কাট মারল ত!' ইত্যাদি মন্তব্য যেন না করেন। অবশ্য ক্রিকেট ম্যাচ দেখার মজার ইহাই ফাউ; কিন্তু ও-কথাটা অন্তত কোনও পুরুষকে বলিবার সুযোগ দিন। দর্শকদের মধ্যে সে রকম পণ্ডিতের সংখ্যাই কি কম?

পুরুষ যাঁহারা যান তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য সব রকমের লোকই থাকেন। অনেকে অস্তমিত সূর্য্য। অনেকে এক আধটু খেলিয়াছেন। কেহ বা তখনও খেলেন। তবে বেশীর ভাগই কোনও দিন ব্যাট হাতে করেন নাই। ইহার মধ্যে অবশ্য এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা না খেলিয়া থাকিলেও দেখিয়া দেখিয়া ক্রিকেটের সূক্ষ্ম রস উপভোগ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। যেমন ধরুন, কলিকাতার মাঠে জনৈক উৎসাহী সংবাদপত্র-পরিবেশকের কথা। বহু বৎসর তাঁহার কথা কলিকাতার ক্রীড়ামোদীর মনে থাকিবে। কারণ, ভাল একটি মার দেখিলেই বা ফিল্ডিঙ্গের বিশেষ কৃতিত্ব দেখিলেই লোকটি সোৎসাহে ছাতা খুলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিত। নিতান্তই মেঘালোকে কলাপীর পক্ষবিস্তারের মত তাহার সহজ আনন্দ। ক্রিকেট খেলিবার সুযোগ সে ইহজীবনে পায় নাই, তথাপি লোকটির রসবোধ অতি উচাঙ্গের। হয়ত বেশ একটু অশিক্ষিত পটুত্বের ফলে বলটি যেমন-তেমন করিয়া জোরে লাগিয়াছে। [illegible] মাঠের সীমা পর্য্যন্ত সে বলের গতিরোধ করা গেল না। [illegible] হঠকারিতা নিন্দনীয় ইহা না বুঝিয়া চারি দিকে যখন অজস্র উত্তেজিত করতালি, তখন দেখিলেন এই বিহারী শ্রমজীবীটি [illegible] দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। অথচ মুস্তাক লেগে গ্লাইড করিয়া [illegible] রান করিয়াছে; এই অনুরাগীর সে কি নৃত্য! ইহার স্ব[illegible] নৃত্যের সাফল্যের কথা শুনিয়াই না কি উদয়শঙ্কর গাঁজিয়া [illegible] তবে ঠিক বলিতে পারি না! সে যাহা হোক, খবরের কাগজ [illegible] পণ্ডিত দেওধরের মত গুণীর কাছে স্বর্ণপদক-লাঞ্ছিত হইবার সৌ[illegible] আর কে অর্জ্জন করিয়াছে? তবে দর্শকদের অধিকাংশই এ[illegible] আনাড়ি। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বীকার করেন খেলা বো[illegible] না, তাঁহারা নমস্য। কিন্তু অধিকাংশেরই ধারণা, তাঁহারা বোদ্ধা। কেহ কেহ মাঝে-মাঝে বিদেশী বিখ্যাত শিল্পীদের নামও কপচা[illegible] কেহ বা একেবারে সকলকে টেক্কা দিবার জন্য বোলিঙ্গের আলো[চনা] করেন। অবশ্য বেশীক্ষণ তাঁহাদের কথায় ভুল বুঝিবার অব[কাশ]

থাকে না। একটু বাড়াবাড়ি হইলেই ধরা পড়িয়া যান। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করি একটু বেশী বয়সের লোককে বা একেবারে বালককে। অবশ্য দুই জনেই হয়ত দপ্তর বা স্কুল হইতে পলাতক। ষ্টিভেনসনের মতই আমি স্কুল-পালানর পক্ষপাতী। কলিকাতায় অধ্যাপক-জীবনে একবার বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিলাম কলেজের উদ্দেশে; রমেশ মিত্র রোডের মোড়ে ট্রামে না উঠিয়া সোজা পদব্রজে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় চলিয়া যাই। কি আশ্চর্য্য! কোনও পার্থক্যও বোধ করি নাই! যাহা হউক, একটু বেশী বয়সের লোক [illegible] জাহির করিবার জন্য আবার গুগলীর ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ। পুকুরের ধারে যে গুগলী দেখিয়াছেন তাহার সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক আছে কি না তাহাও জানেন না। ও-কথাটি হালে চালু হইয়াছে; পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহার চল ছিল না। ব্যাপারটা [illegible] কি, কিছুই না জানায় দর্শকপ্রবর মাঝে মাঝে একেবারে বেসামাল হন। হয়ত মিডিয়ম পেস বোলার সোজাসুজি অফব্রেক বেসামাল [illegible]। লেগষ্টাম্প ভূমিসাৎ! সমালোচক উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'দেখলে গুগলী'! কখনও বা হাতের মুঠায় বল [illegible] সবাই গুগলী ভাবিয়া ব্যাটস্ম্যান অফব্রেক খেলিতে [illegible] চতুর বোলার হাতের কসরত না বদলাইয়া সোজাসুজি লেগ-[illegible] ছাড়িয়া দিল। ব্যাটস্ম্যানের প্যাডে চপ করিয়া আওয়াজ, [illegible]কীপার ও বোলারের যুগপৎ 'ব্যাপার কি?'র সঙ্গে সঙ্গে [illegible] তর্জ্জনী উৎক্ষেপ দেখিতে না দেখিতে অর্দ্ধ স্বগতোক্তি [illegible] পাইলেন, 'গুগলী!' অভদ্রতার ভয়ে বলিতে পারিবেন না, [illegible] না, শামুক!'

[illegible] ছেলেদের কথা বলিতেছিলাম। তাহাদের ভয় করি অন্য [illegible]। একটু বড় হইলে 'ছেঁচো' বলিয়া ধমকান যায়। [illegible] বেশী ছোট তাহাদের কিছু বলাও যায় না। ভারতীয় [illegible] নিন্দা করিলে ভাবে দেশদ্রোহী; অথচ অনর্গল [illegible] বুকুনী ঝাড়ে। যেমন ধরুন সেই ছেলেটি। জার্ডিনের [illegible] সঙ্গে খেলা। ভারতীয়েরা ব্যাট করিতেছে। যুবক মুস্তাক [illegible] অসি সঞ্চালনের মত ক্ষিপ্র নিপুণতায় যষ্টিবিলাসে [illegible]। তাহাই দেখিব, না শুনিব, 'দেখ দেখ মাস্তাক (sic) [illegible] impetus নিয়ে মারছে!' শিশুটির মাথায় বিলাতী ক্রিকেট-ক্যাপ। শুনিলাম, বাপ-মায়ের সঙ্গে শৈশবে বিলাত [illegible] (গিয়াছিল বটে।)। পরে সেই শিশুই আমার পরম [illegible] হইয়াছিল। এখন তাহার নাম করিলেও সে ক্ষুব্ধ [illegible]। যাক সে কথা। তবে আবার বলি, যদি ক্রিকেট ভাল [illegible] পরিমল রায়ের মত বাড়ীতেই থাকিবেন। মাঠে গিয়া [illegible] দিয়া ধরা পড়া বা খেলার অবস্থা যখন তুরীয় সেই মুহূর্ত্তে [illegible] মত 'জোরসে মার, নয় ত বা বাহিরে যাও!' ইত্যাদি [illegible] উচ্চস্বরে করিয়া রসিকের বিরাগভাজন হওয়া উভয়ই নিরর্থক।

এইবার যাঁহাদের দেখিয়াছি তাঁহাদের কথাই বলি। যাঁহাদের [illegible] নাই তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের, তাঁহাদের কোনও ক্ষোভ নাই। ভিজা মাঠে জনি টীলডস্লের অপূর্ব্ব [illegible] আমিও যেমন দেখি নাই, বিলাতেও এ-যুগের উৎসাহী কেহ [illegible] পান নাই। কলিন ব্লাইদ যদি নেভিল কার্ডাসের গদ্যে [illegible] শ্রদ্ধাঞ্জলিতেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন এ যুগের কেহ বা তাঁহার বাম হস্তের লীলা-বিলাস দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছেন! রেগি স্পুনারের হাতে ব্যাটখানা না কি মালাকার ছড়ির মত দেখিতে লাগিত। কিন্তু ইঁহাদের যেমন দেখি নাই, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দকেও ত দেখি নাই। পক্ষান্তরে, একটু সুযোগ পাইলেই যাঁহারা প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারিতেন, দুঃখ ত তাঁহাদের জন্যই। না-ই বা দেখিলাম ক্লেম হিলকে, আমার যুগে উলেও ত ছিলেন। ম্যাকডোনাল্ডের বা রিচার্ডসনের সিংহবিক্রম দেখি নাই বটে কনষ্টান্টাইন, ফার্ণস, লারউড ত আমারই সমসাময়িক। প্যালেরেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ যদি না-ই হইতে পারিলাম, আমার কালেও কিপ্যাক্স ত ছিলেন। অযথা নামের ফিরিস্তি করিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না। যাঁহারা এত আনন্দ দিয়াছেন তাঁহাদের কথাই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। ইঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বা কৈশোর হইতে পূর্ণযৌবন পর্য্যন্ত দেখিতেছি—যেমন মুস্তাক, সি এস নাইডু, অমরনাথ; কাহাকেও অল্প কালের জন্য খ্যাতির তুঙ্গশিখরে অধিরূঢ় দেখিয়াছি—যেমন অমর সিং; কাহাকেও বা মধ্য-বয়সের স্তিমিত আলোকেই প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছি—যেমন নাইডু, দেওধর; কাহাকেও বা প্রৌঢ় অপরাহ্নের দীপায়িত স্নিগ্ধালোকে অবলোকন করিয়াছি—যেমন রাইডর, ম্যাকার্টনে। কালো, সাদা, তামাটে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; খর্ব্বাকৃতি, দীর্ঘকায়, নাতিহ্রস্ব। ইংরেজ, বাঙ্গালী, লঙ্কাধিবাসী, মহারাষ্ট্র, অষ্ট্রেলীয়, পাঞ্জাবী, গুজরাটি—বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন আকৃতি। কেহ হাস্যচঞ্চল, কেহ পরিহাসমুখর, কেহ বা জার্ডিনের মত দৃঢ়চেতা, জিগীষু। এই এত কাল ধরিয়া এত যে কাণ্ড দেখিলাম, তাহার মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই বলি। স্কোরবুক খুলিয়া কাহাকেও উদ্ধার করিব না। সেঞ্চুরীর মাপে ব্যাটিঙ্গের বিচার করিব না। উইকেটের সংখ্যা গুণিয়া বোলারের বাহবা দিব না। রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রান্তরে দিনের পর দিন বসিয়া থাকিয়া শান্ত চিত্তে যে অনাবিল আনন্দ আকণ্ঠ পান করিয়াছি, তাহাই আমার পুরস্কার।

প্রথম ব্যাটিঙ্গের কথাই বলি। কত সেঞ্চুরীই না জীবনে দেখিয়াছি! চেষ্টা করিলে হয়ত তাহাদের কালানুক্রমে সাজাইতেও পারি। কিন্তু প্রয়োজন কি? আমি ত ইতিহাস রচনা করিতেছি না। এই সেদিন হাজারের ১৪০ দেখিলাম। ইহার পূর্ব্বে হাজারেকে অনেক বার দেখিয়াছি সেই মধ্য-ভারতের দিন হইতে। আগে অনেক বার ভাবিয়াছি, ভাল বটে কিন্তু এত খ্যাতি কেন? এবার নিঃসংশয় হইলাম। সত্যই লোকটি স্কোয়ারকাট করিতে জানে; আর অন-ড্রাইভ! ইহার তুলনা এক ডেনিস কম্পটন। গতবারে দিল্লীতে বীক্স, বালকটের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে মোদির লেগ-গ্লাইড ও লেট-কাট দেখিয়াছিলাম। মোদী শত সংখ্যায় পৌঁছায় নাই, কিন্তু তাহার ৮০ সহজে ভুলিবার নয়। এই রকম আর একটি ৮০ দেখিয়াছিলাম চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে। বাঙ্গালা ও আসামের বিপক্ষে মিকি মাউসের মত হ্রস্বকায় একটি প্রৌঢ়। যৌবনে ইংলণ্ডের যম ছিলেন। সেদিন ম্যাকার্টনে ৮৫ রান করিয়া আউট হন; কিন্তু প্রথমত, গভর্ণর-জেনারেলের বয়স তখন পঞ্চাশ পার হইয়াছে। সুতরাং শর্ট রাণ নেওয়া তখন আর সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেদিন লংফিল্ড ও খুঁটে অত্যন্ত ভাল বল দিতেছিলেন। কিন্তু বোলার ও ফীল্ডারকে এমন নাজেহাল করা

আর দেখি নাই। বেচারা হোজির সে কি দুর্দ্দশা! যেমন ভাবেই ব্যূহ রচনা করেন, ম্যাকার্টনের ব্যাট সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া বলকে ঠিক তাহার লক্ষ্যস্থল প্রান্তরের সীমারেখায় পাঠায়। এই দিক দিয়া ম্যাকার্টনের সমকক্ষ একমাত্র মুস্তাক আলীকে দেখিয়াছি। সত্য বটে, মুস্তাকের অনেক ত্রুটি আছে। তিনি একেবারেই গোঁড়া নন। অহেতুক চাঞ্চল্যে অনেক সময় বিপত্তি ঘটান; লেগে যে বল হুক করা বিপজ্জনক, তাহাই করিতে গিয়া বল তুলিয়া দেন। তথাপি যতক্ষণ মুস্তাক ব্যাট হাতে করিয়া উইকেটের সামনে দণ্ডায়মান, তাঁহার অনায়াস ও সাবলীল ব্যাট-চালনাই পরম আনন্দ। মনে করুন, টেনিসনের টীমের বিপক্ষে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মুস্তাকের সেই সেঞ্চুরী। গভার ও বেলার্ডের যুগ্ম আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া হার্ডষ্টাফের ও এড্রিচের তৎপরতাকে বিভ্রান্ত করিয়া মুস্তাক সেদিন যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা দেখি নাই। সি কে নাইডুর অধিনায়কত্বে মধ্য-ভারতের তরফের আর দুইটি ইনিংসের কথা মনে পড়ে। প্রথম বার, বিকালের দিকে স্মৃটে খুব বাম্পার দিতে থাকেন। মুস্তাক তখন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া স্মৃটের এই ধৃষ্টতায় যথোচিত উত্তর দেন। এক ওভারে ১৭টি রান। দিনের শেষে ৬১ নট-আউট থাকিয়া বিজয়ী বীর পরের দিন সংবাদপত্র আলোড়িত করেন। পরের দিন আসিয়া আর মাত্র ৬ রান বাড়াইয়াই মুস্তাকের পতন ঘটিল। তা অমন ঘটে। আর একবার মনে আছে বেচারা কমল ভট্টাচার্য্যের বিপর্য্যয়। সেবার আর কেহ ছিল না। একা মুস্তাক কুম্ভের নকল বুঁদি-গড় রক্ষা করার কৌশলে বাঙ্গালার বোলারদের যে ভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। মুস্তাকের গুরু নাইডু মহোদয় একবার বাঙ্গালার লাটের একাদশের অধিনায়করূপে ইডেন উদ্যানে যে ক্রীড়াকৌশল দেখাইয়াছিলেন তাহার স্মৃতি আজও অম্লান। ইডেন উদ্যান বড় নাইডুর বিশেষ গৌরবের ভূমি নয়। অন্যান্য সর্ব্বত্র তিনি যত কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় ইডেন উদ্যানে তাঁহার ব্যাটিঙ্গের সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ইডেন উদ্যানে আমরা বরং তাঁহার কূট অধিনায়কত্ব দেখিয়াছি; তাঁহার নিরতিশয় নির্ব্বিরোধী বোলিঙ্গে বিচক্ষণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি, প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করার পরেও তাঁহার দেহের ও পেশীর অবিশ্বাস্য নমনীয়তার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার অপরূপ ফিল্ডিং দেখিয়াছি। তবে এক ঐ উৎসব উপলক্ষে তাঁহার ব্যাটিং দেখিয়া সত্যই মনে হইয়াছিল, এমনটি আর কেহ নাই। দীর্ঘ ঋজুদেহ যাদুকর সেদিন যে কুহকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বুঝিলাম, নাইডুর যৌবনে বোম্বাই কেন তাঁহার নামোল্লেখেই উল্লাসিত হইয়া উঠিত। বহু বার নাইডুর পুল দেখিয়াছি, বলিষ্ঠ মণিবন্ধের ঈষৎ সঞ্চালনে উইকেটের বাহিরের বল কেমন করিয়া স্কোয়ার-লেগ অঞ্চলের শেষ সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া প্রান্তরের বাহিরে আসিয়া পড়ে, বহু বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু সি কে নাইডুকে ব্যাট হাতে দেখিয়া কখনও পরিতৃপ্তি হয় নাই। সর্ব্বদাই মনে ভয় হইয়াছে, এত শক্তি ও এত কান্তির অধীশ্বর যিনি, তিনি যেন ঠিক স্বস্থ নন। জার্ডিনের বিরুদ্ধে অপূর্ব্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া তিনি ভারতবর্ষকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে বাঁচাইলেন; অথচ সেই আত্মসম্বরণের মহাকাব্যও আমাদের অভিভূত করিল না। আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া ৩৮ রান করা মার্চ্চেণ্টের পক্ষে বেমানান নয়, কারণ মার্চ্চেণ্টের উপাধি হইতেই প্রমাণ তিনি হিসাবী। অবশ্য মার্চ্চেণ্ট স্বভাব-কৃপণ নন, কোয়েব স্কটনের মত তিনি শুধু আত্মরক্ষার চৈনিক প্রাকারই নন, তথাপি মার্চ্চেণ্ট বাছিয়া বাছিয়া অনেকক্ষণ পরে অনে ড্রাইভ করিয়া একটি দু'টি রান করিলেও দর্শক তৃপ্ত। তাহারা জানে অটল তাঁহার ধৈর্য্য; যথাকালে এই চারিত্রের কুসুম স্কোর-বোর্ডে প্রস্ফুটিত হইয়া ২০০।৩০০ বা তদূর্দ্ধতর সংখ্যার নির্দ্দেশ করিবে। নাইডুর কথা স্বতন্ত্র; তাঁহার হস্তে ব্যাট মধ্য-যুগের বীর-হস্তে মুক্ত কৃপাণ। তাঁহার বহু ষ্ট্রোক দেখিয়াছি যাহা তাঁহাতে সম্ভব; তবে হিসাবী মন লইয়া কাজ করা তাঁহার ধাতে নাই। তাঁহাকে সাবধানতার বর্ম্মাবৃত দেখিয়া আমরা দুঃখই পাইয়াছি। শুধু এই দিনের ক্রীড়াকৌশল দেখাইবার সময় নাইডুর যৌবনের স্মৃতি হয়ত তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া থাকিবে। বার বার সম... ব্যূহকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া কি তাঁহার ব্যাট-চালনার লীলা-কৌশল! তরুণ যুবক সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাঁচাইয়া রামসিং-এর ব... হস্তোৎক্ষিপ্ত হলাহল নিজে পান করিয়া সে যে কি নীলকণ্ঠের ভূমিকায় তাঁহাকে সেদিন আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম! কখনও অতি ধীরে, কখনও অতি দ্রুতগতিতে রান উঠিতেছে। কভার ও অনে সে কি ড্রাইভ! সে কি প্রলয়ঙ্কর স্কোয়ার-কাট!—শত চেষ্টায় থার্ডম্যান ৪।৫টি কাটের একটিও থামাইতে পারে না। পরিশেষে শত সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর-পর দু'টি ... সে কি দুর্গতি—একটি সোজা বোলারের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া হাইকোর্টের চূড়ার দিকে ধাবমান, পরেরটি সেই বিরুদ্ধ না... পুল যাহার তুলনা দেখি নাই—বলটি অফষ্টাম্পের একটু বাহিরে, নাইডু ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। পিছন হইতে আমরা স্কন্ধদেশে কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম না, বাতও উদ্বেলিত হইল ... মায়াবীর হাতে যাদু-কাঠির স্পর্শে বলটি স্কোয়ার-লেগ ... অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া প্যাভিলিয়নের সামনে আসিয়া পড়িল!

অবশ্য আরও অনেকের কথাই মনে পড়ে। অম... উজীর আলি, কম্পটন, হার্ডষ্টাফ, জয়বিক্রম, হ্যাসেট, ... হাফিজ, ইমতিয়াজ, লিভিংষ্টন, বীক্স, ওল্ডফীল্ড, ক্রি... এবং আরও অনেককে এক বা একাধিক সেঞ্চুরী করিতে দেখি... —কিন্তু আমি ত ঐতিহাসিকের পদ্ধতিকে সপ্তদশ ... সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিতে উদ্যত হই নাই। তাই ... খেয়াল মত এখান-ওখান হইতে আমার স্মৃতির পুঁজি ... খারিজ দিব। সকলের কথা বলার ইচ্ছা আমার নাই। ... অনুল্লিখিত, তাঁহারা বা তাঁহাদের অনুরাগীরা আমায় ... বুঝিবেন না। অমরনাথের কথাই ধরুন। খাঁটি জাত-ক্রি... ধরণ-ধারণ, মার-পাঁচ আর পাঁচ জন বা এক জনকেও স্মরণ ... দেয় না। অমরনাথের বহু বার খেলা দেখিয়াছি—মোটা রান ... নাই এমন নয়। কিন্তু একবার হারান মুখে দক্ষিণ-পাঞ্জাবে ... তাঁহার ৩৭ রান দেখিয়াছিলাম, অনুকূল অবস্থায় বহু সেঞ্চুরীর ... মূল্যবান। আর একবার নাইডুদের একাদশের বিপক্ষে ... ফাস্ট বলে গুরুতর জখম হইয়া তাঁহাকে পি জি হাসপাতালে ... গণ্ডদেশ সেলাই করিতে হইয়াছিল। গাল মেরামতের পর ...

সেটো বাঁধিয়া তিনি যে খেলা খেলিয়াছিলেন তাহার বৈভব অমিত—রানের সংখ্যা দিয়া তাহার নির্দ্ধারণ সম্ভব নয়। এক দিকে তিনি আর এক দিকে বেচারা শাহাবুদ্দীন—বল হাতে দৈত্য, কিন্তু ব্যাট হস্তে একেবারেই শিশু। সেই উপলক্ষ মাত্র সম্বল করিয়া অমরনাথ সদিন যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন মাত্র ৩১ রান তাহার যথেষ্ট পুরস্কার নয়। এবার আর এক জন শতকরের উল্লেখ করিয়া আমি ব্যাটিঙ্গ-পর্ব্বের সমাধা করিব। ইনি ডেনিস কম্পটন। ব্রাডম্যানের অবসর গ্রহণের পর ইনি বর্ত্তমান ক্রিকেট জগতে ব্যাটস্‌ম্যানবাচস্পতি। একবার ক্রিকেট-উদ্যানে ইহার সেঞ্চুরী দেখিয়া মনে হইয়াছিল সত্যই বড় শিল্পী কত অনায়াস। বাহাদুরী নাই, উত্তেজনা নাই, আবার অতি-হিসাবী সতর্কতাও নাই, যেন অতীব নিরুদ্বেগে জটিল একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান। সেই দিনই প্রায় একই সঙ্গে হাডষ্টাকও শতাধিক রান করেন। তাঁহার ভঙ্গিতে প্রতিভার তীব্র ঝলক ছিল, চোখ তিনি ঝলসাইতেছিলেন। কিন্তু কম্পটন যেন নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা—বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ।

বোলিং অবশ্যই ব্যাটিঙ্গের অপেক্ষা আরও বেশী কৌশল, আরও নিপুণতাসাপেক্ষ। কিন্তু প্রথমত, মাঠের ঠিক ভিতরে না থাকিলে বাহির হইতে বোলিঙ্গের কৌশল ততটা প্রত্যক্ষ হয় না; দ্বিতীয়ত, যেদিন বোলারের জয় সেদিন ব্যাটস্‌ম্যানের পরাভব। ও নৈসর্গিক ঘটনা-সংঘাত ছাড়া বোলারের পক্ষে সাধারণত তেমন সুযোগ ঘটে না। বৃষ্টি পড়িয়া গেলে বিপক্ষে যদি ভেরিটি, বা ... বা রাম সিং বা ট্রাইবের মত বোলার থাকেন তাহা হইলে সেদিন তাঁহার যোগসিদ্ধি। তবে শীতকালে আমাদের দেশে ... দুর্লভ, তাই এক ম্যাকার্টনে ৪১ রানে গোটা ভারতীয় দলকে নামাইবার যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক ছিলেন মনে পড়িতেছে। তবে ... কোনও দিনের বিশেষ কোনও কৃতিত্বের কথা স্মৃতির দুরধিগম্য ... কখনও ভেরিটি, কখনও দীর্ঘাকৃতি নাইডু, কখনও নিবাড়িকার ..., কখনও ইঞ্জিনের মত নিকলসের চণ্ড বেগ, কখনও অশ্রান্ত ... সাহেবের সর্ব্বদিনব্যাপী গুরু শ্রম, এই রকম কত ছবি মনের ভিতর ... যাবে। তবে মাঠের ভিতরে কন্দুকটির উর্দ্ধ-সঞ্চার বা ভূমি-... স্তব্ধ করিয়া যাঁহারা পুনঃ পুনঃ ক্রীড়ামোদীদের দ্বারা ... হন, তাঁহাদের কথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়, বিশেষত ... দেশে যেখানে খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও ফিল্ডিঙ্গে শিথিলতা ... করেন। সত্য কথা বলিতে কি, জিলানী, মিচেলের সমকক্ষ ... কমই দেখিয়াছি। নাভলে, হিন্দেলকারের পর তেমন ...কেট-রক্ষকও আর দেখিতেছি না। এই প্রসঙ্গে যে ... কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে, প্রৌঢ়েও তিনি যুবকের সমকক্ষ। ... লুফিয়া তিনি যে ভাবে পরাস্ত করেন আজও আমি স্পষ্ট ... পাইতেছি। ব্যাটের ঠিক সামনে নাইডু দাঁড়াইয়া। ... ব্যাটে বল সামান্য একটু ছোঁওয়া কি না ছোঁওয়া; বলটি ...কের প্যাডে গিয়া লাগে, উইকেট-রক্ষক হকচকাইয়া ... ছাড়িয়া দিয়াছে। নাইডু তির্য্যক্ গতিতে শুইয়া পড়িয়া ... বিস্তারের মত হাত বাড়াইয়া মাটি হইতে ইঞ্চি ছয়েক ... বল লুফিয়া গড়াগড়ি দিয়াও সে বল মুঠা হইতে ছাড়িলেন ... ক্যাচের তুলনা দেখি নাই; বাঙ্গালার মুস্তোফী একবার ... বিপক্ষে স্লিপে ২।৩টি সুন্দর ক্যাচ নিয়াছিলেন, তবে মুস্তোফী নবীন, পক্ষান্তরে নাইডু তখন চল্লিশোর্দ্ধে। কি অপূর্ব্ব তৎপরতা ও দৈহিক স্থিতিস্থাপকতার অধিকারী হইলে এই অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব অর্জ্জন করা যায়। বোধ হয়, এক কনষ্টানটাইন ছাড়া এ বিষয়ে নাইডুর শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আর একবার মনে পড়ে গণেশ বাবুর একটি জোরালো অন-ড্রাইভের দশা। একটু উঠিয়াছে বল—কিন্তু এত জোর মার, আমরা সবাই বাউণ্ডারীর দিকে তাকাইয়া আছি। কুক্ষণে সিলি মিড-অনে নাইডু প্রহরী। জাঁতিকলে ইঁদুর পড়িবার মত তাঁহার মুষ্টিবন্ধের ভিতরে বল বন্দী। আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ। বিরস বদনে গণেশ প্যাভিলিয়নে ফিরিয়া গেলেন। এই রকমের আরও কত ছবি মনের উপর ভাসিয়া উঠে। হঠাৎ ঝলকাইয়া উঠে চোখের সামনে অমর সিংহের সাংঘাতিক একটি ইন-সুইঙ্গ। চকিতের মধ্যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, হাডষ্টাফ বলটিকে ঠিক চাপিয়া মাটিতে ফেলিতে পারিলেন না, ফাইন লেগের দিকে বলটি একটু উঠিতে না উঠিতেই সে দিকে হেলিয়া হিন্দেলকার চিলের মত ছোঁ মারিয়া বলটি করায়ত্ত করিলেন, যেমন সেদিন মোদীর পতন ঘটিল লিভিংষ্টোনের হাতে। আমার সে দিনের কথা মনে পড়ে। যেন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। অমন থাড়ম্যান বড় একটা দেখি নাই। শর্ট লেগে সি এস নাইডুর অসম সাহস ও ক্ষিপ্রতা: তাই বা ভোলা যায় কি? যুবক বলেন্দু শাকে একবার যুক্তপ্রদেশের পক্ষে 'কভারে' দেখিয়াছিলাম। বল ধরার কসরতে ও অসাধারণ তৎপরতায় নাইডুর কথা মনে হইতেছিল। ভায়াকেও দেখিয়াছি, তবে লাল সিংহের জুড়ি আর দেখি নাই। যাহা হউক, আর পুঁথি বাড়াইব না। যাহাদের দেখিয়াছি, তাহাদের বিগত দিনের স্রোত হইতে তুলিয়া খুসী মত মালা গাঁথিয়াছি। এইবার আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। ক্রিকেটে উৎসাহ সঞ্চার হওয়ার পর আর একটি অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করিলাম। আর কোনও ক্রীড়ার কথা জানি না, যাহা ক্রীড়ামোদীর ক্ষণিক উল্লাসের প্রয়োজন মিটাইবার পরও লেখনীর মুখে রস-সঞ্চার করে। সত্যই ক্রিকেট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। পরিচয় না থাকিলে এই ক্রিকেট রচনাবলীর সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য 'লিটরেচর' কথাটি বর্ত্তমান বৈশ্য সমাজে বড়ই হতমান: বীমার ব্যবসারও লিটরেচর আছে। তবে স্নাই হইতে আরম্ভ করিয়া ফিঙ্গলটন পর্য্যন্ত ক্রিকেট-লেখকেরা প্রায় সকলেই বিশিষ্ট খেলোয়াড়। কেহ ব্যাটস্‌ম্যান, কেহ বোলার, কেহ উইকেট-রক্ষক। আমার নিজের সামান্য সংগ্রহের মধ্যে যে সব লেখকের নাম করিতে পারি তাঁহারা (৩০।৪০ জন হইবেন) সকলেই যশের অধিকারী। এ যুগের পেশাদারী ব্যাটস্‌ম্যানেরা প্রায় সকলেই গ্রন্থকার। হবস্, সাটক্লিফ, উলে, হেনড্রেন, হামণ্ড, কম্পটন, এডরিচ, ডিপার, ডুকাট,—আরও অনেকে আছেন। বোলারদের মধ্যে ভেরিটি, লারউড টেট, কট, পার্কিন, ফেণ্ডর, গ্রিমেট, ফার্ন্‌স্, মেলি—সকলেই তাঁহাদের কলা-কৌশলের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সখের খেলোয়াড়দের মধ্যে ফাই নমস্য। হিউবার্ট এশটন তাঁহার নিজের বিদ্যালয়ে ফ্রাইয়ের 'ব্যাটস্‌ম্যানশিপ' ইংরেজী গদ্য-সাহিত্যের পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। অবশ্য বলিতে পারেন এশটন নিজেই ক্রিকেট খেলোয়াড়, তাঁহার পক্ষপাত ছিল। থাকিতে পারে, তবে

মনে রাখিবেন, ফ্রাই ক্রিকেটের যাদুকর ছিলেন না—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্বর জ্যোতিষ্কও ছিলেন বটে! ফ্রাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ওয়ার্নার, জার্ডিন, কার, বায়্যাট, ইয়ার্ডলে—অষ্ট্রেলিয়ায় উডফুল, নোবল, ম্যাকার্টনে, ব্র্যাডম্যান, ফিঙ্গলটন সবাই ক্রিকেট-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কনষ্টানটাইনের ব্যাট-চালনা দেখি নাই, তবে তাঁহার লেখ-শৈলী অতুলনীয়। এই গোষ্ঠীর সংখ্যা-তাত্ত্বিকদের মধ্যে সিসিল কেণ্ট ও রবার্টস্ আছেন। বাহিরে ক্লস হ্যারিস আছেন, রে রবিনসন আছেন, রবার্টসন গ্লাসগো আছেন। পরিশেষে আছেন 'ম্যানচেষ্টার গার্ডয়ানের' 'ক্রিকেটার—মায়াবী নেভিল' কার্ডাস। এই সুপ্রশস্ত সাহিত্য উপভোগ করিতে যখন মন প্রস্তুত থাকিবে, তখন দেখিবেন বুফোঁর উক্তি কত সত্য—সত্যই মানুষটা যা, তার ষ্টাইলও তাই। হবসের রীতি তাঁহার চরিত্রেরই মত উদার, বিনয়-নম্র, অথচ সতর্ক। হেনড্রেনের পরিহাস-মুখর চপলতা ও আত্মসঙ্কোচ তাঁহার পুস্তকগুলিকে অপরূপ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়াছে। উলের লেখনী ক্ষিপ্র; জার্ডিনের মন্থর। ফ্রাই যেন গ্রীক-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতেছেন—মার্জ্জিত রুচি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণে ন্যায়শাস্ত্রের কূট বিচক্ষণতা। পার্কিনের বই পড়িলেই বুঝিবেন, লোকটি কোন বিপদে পড়িয়াছিল, একটু অসংযমী, বে-হিসাবী, বে-পরোয়া বাচাল। এইরূপে প্রত্যেকটি লেখকের ব্যক্তিত্ব তাঁহার বিচার-পদ্ধতি ও রচনা-রীতিকে মণ্ডিত করিয়াছে। বেশী কথা আর বলিব না। ইহাকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন?

"A mid-summer day, with warm, dry turf beneath a cloudless sky. A huge margin smelling of hot canvas and trampled grass, and buzzing faintly with the inevitable wasp. Thistle table groaning under epicurean and unrationed food and olympian selection of iced drinks. Walking to and fro about the field (in glorious teohi flannels) all my hundreds of old friends from Australia, the West Indies. the Lancashire League, the Counties, India, New Zealand."

আপত্তি করিলেন না! বেশ। এবার?

"A strange light from the East flickered in the English sunshine when he was at the wicket 'He is no batsman' said the Australian George Giffen, "he is a conjuror!' When he turned approved science upside down and changed the geometry of batsmanship to an esoteric legerdemain, we were bewitched to the realms of rope-dancers and snake-charmers; this was a cricket of oriental sorcery, glowing with a dark beauty of its own, a beauty with its own mysterious axis and balance."

যে খেলা এই গন্ধ-কাব্য উদ্দীপিত করিতে পারে, তাহাকে অব... করিবেন না। হয়ত এখনও সময় আছে। রবিবারে না হয় ... ছেলের বা ভাগিনেয়ের সহিত লাগিয়া যান। বলি হইতে পা... না। তবে মজা পাইবেন। আমি পাইয়াছি।

আমাদের উপেন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত বাংলার বিপ্লবী দলের কার্য্যকলাপ রীতিমত চলিল। ১৯১০ সালে মাণিকতলার বাগানের প্রথম বিপ্লবী দলের বিচার ফলে তাহাদের দ্বীপান্তর, কারাবাস প্রভৃতি হইবার পর হইতে বাংলার বিপ্লবের কর্ণধারগণ যে সকল ব্যাপারে লিপ্ত হন, তাহার সহিত আমাদের উপেন বাঁড়ুজ্যের কোন সংসর্গ বা সম্বন্ধ ছিল না। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, আমার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পত্র ব্যবহার যা ছিল, তাহাতে বিপ্লবী দলের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহা অত্যন্ত গুপ্ত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যাহা ১৯১৪ সালে আরম্ভ হয়—শেষ হয় ১৯১৮।১৯ সালে—তাহাতে ব্রিটিশের জয় হওয়ায় রাজনৈতিক কারণে যে সকল যুবক বন্দী ছিল তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাহারই ফলে আন্দামানে বন্দীদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হয়। উপেন সে বিষয় তার নিজের মনের মতন বিবৃতি ... "নির্ব্বাসিতের আত্মকথায়" প্রকাশ করে গেছে।

১৯১৪ সালে যে যুদ্ধারম্ভ হয়, জর্ম্মাণী, ভারতে বি... জ্বালাইবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করে, তাহার ফলে যে সকল বি... স্বেচ্ছায় অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হয় তাহার মধ্যে আমি ... এক জন। সেই জন্য যখন আন্দামান হইতে প্রত্যাগত ... বন্ধুরা দেশে ফিরিয়া আসিল, তখন আমার সহিত ... সাক্ষাৎ হইল না। একেবারে ১৯২১ সালের অক্টোবর মা... অজ্ঞাতবাসীদের শনৈঃ শনৈঃ মুক্তিদানের ফলে আমি দেশে প্র... করি। তখন আমার সহকর্মিগণ যারা অজ্ঞাতবাসে ছিল ... মধ্যে এক জন ব্যতীত সকলেই দেশে ফিরিয়াছেন। এ ... সম্বন্ধে যাহা লিখিবার তাহা পরে অন্যত্র প্রকাশিত ...

অজ্ঞাতবাসীদের জীবন লিখিতে যাইলে একটি দীর্ঘ ঔপন্যাসিক ইতিহাস রচিত হইতে পারে।

১৯২১ সালে নবেম্বর মাসে উপেনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সে সাক্ষাতের ও কোলাকুলির আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত! এই অপ্রত্যাশিত মিলন যে কত আনন্দের, তাহা অভিজ্ঞ মাত্র বুঝিবেন। উপেনদের ফিরিবার আশা ছিল, কারণ তাহাদের মিয়াদী সাজা হইয়াছিল—আমার দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন আশাই ছিল না—সম্ভাবনাও ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের ও বন্ধুবর মতিলাল রায়ের চেষ্টাতে ও মধ্যস্থতায় তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

প্রথম দিনেই বন্ধু আনন্দে অভিভূত হইয়া বলিল—এবার আর পাগলামী নয়, কি বলিস! আমি বললাম—পাগল যারা তারা পাগলামী ছাড়তে পারে না কি? তুইও দেখছি লেগে গেছিস। গান্ধীজী যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করছেন তার সঙ্গে ত' তোর বিরোধ! কাজেই পাগলামী ছাড়লি কৈ?

বন্ধু বলে—দূর তোর অহিংস অসহযোগ! ন্যাকামী-ট্যাকামী আর হবে না। অহিংস হয়ে স্বাধীনতা লাভ হবে, চরকায় সূতো কেটে স্বরাজ লাভ হবে এক বৎসরের মধ্যে, এ সব ন্যাকামী বাংলার যারা ফলাচ্ছে তারা আসলে যদি পাগল নাও হয়, নির্ব্বোধ ও ... নিশ্চয়—যাকে বলে বোকা হারামজাদা। তখন উপেন ... বাস করছে। মোহনলাল ষ্ট্রীটে বারীনদা'র আড্ডা।

... বলে—করবি কি? উত্তরে বল্লাম—দিনকতক জিরোব—তার পর, তার পর পথ নির্ণয় করা যাবে। তাড়াতাড়ি কিছু করার ইচ্ছা নেই। তখন সে 'বিজলী'র কথা বললে। তারা ... 'বিজলী' তখন প্রকাশ করছে। অহিংস অসহযোগের ... বেশ বিদ্রূপ-কটাক্ষ চালিয়েছে। সাক্ষাতের পর আমার ইচ্ছা ... একবার সকল বিপ্লবীদের একত্রে মিলন সংঘটন! কারণ পুরাতনদের সঙ্গে নূতনদের আলাপ-পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। ... বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে আমার বাড়ীতে এক দিন বহু বিপ্লবী ... করলাম। সেই দিন বাংলার বহু বিপ্লবী একত্রে মিলিত ... সকলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। বারীনদা কোন কারণে ... পারিল না। উপেন, মতিলাল, যাদুগোপাল, অতুল, ..., শচীন্দ্র প্রভৃতি প্রায় দুই শত বন্ধু ও সহকর্মীরা একত্রে ... হয়।

আই বি অফিস্ না কি এই মিলনকে কুদৃষ্টিতে দেখে এবং ... পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ মনে করে!

... বহু পুরাতন বিপ্লবী বন্ধুদের মিলন-ক্ষেত্রে উপেনের সঙ্গে ... র ও আমার যে পরামর্শগুলি হয় তাহা আজও ভুলিতে ... নাই। পণ্ডিচারীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তখন মতিলাল প্রায়ই কিছু কাল কাটাইয়া আসেন। ক্রমশঃ শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে চন্দননগরের আশ্রম ছাড়িয়া পণ্ডিচারী আশ্রমে যাইয়া ... জন্য বিশেষ জিদ করিতেছিলেন। আমাদের উভয়ের ... চন্দননগরের আশ্রম উঠিয়া গেলে ভবিষ্যতে বাংলার বিপ্লবীদের ... হইবে! মায়ের এ অঞ্চল-ঢাকা ভূখণ্ডটুকু বাংলার ... মহারাষ্ট্রের কত বিপ্লবীর তীর্থক্ষেত্র এবং আশ্রয় হইয়াছিল, ... উঠিয়া যাওয়া উচিত নহে। মতিলাল যদিও সাধনক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথেই চলিতেছিলেন, কিন্তু তবুও যেন তাঁহার পণ্ডিচারীতে চলিয়া যাওয়া আমরা কোন মতেই সমর্থন করিতে পারিলাম না। মতিলালেরও তেমন চন্দননগরের পীঠস্থানটি ছাড়িয়া পণ্ডিচারীতে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কাজেই নিভৃতে তিন বন্ধু উত্তরপাড়ার রাসবিহারী চাটুজ্জে লেনের ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতরে বসিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, মতিলাল প্রবর্ত্তক সংঘের সাধন-পীঠেই থাকিয়া তাঁর সাধনা করিবেন এবং কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করিয়া এই সিদ্ধান্ত তিনি শ্রীঅরবিন্দকে জানাইবেন। এই মিলনের ইহাই সার্থকতা ছিল। অপর কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ ও মিলনক্ষেত্রে হয় নাই। প্রবর্ত্তক সংঘ বাংলার একটি কৃষ্টির পীঠস্থান হইয়াছে। একটি সৌহার্দ্দ ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন যাহাতে ঘটে তাহার কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা হইয়াছিল। বেশ আমোদ-আহ্লাদে সেদিনকার কাজ শেষ হয়।

তার পর আমি কংগ্রেসে যোগদান করিলাম। বারীন উপেন প্রভৃতি প্রথম বৈপ্লবিকগণ কেহই তখন কংগ্রেসে যোগদান করে নাই। যদিও আমি কংগ্রেসে যোগদান করি, কিন্তু আমি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করি নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত উপেনের সঙ্গে যোগ দিয়া 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক কাগজখানি বাহির করিলাম। আমি রহিলাম একেবারে অন্তরালে, উপেন রহিল প্রকাশ্য ভাবে সম্পাদক। 'আত্মশক্তি' শামবাজারের একটি প্রেসে ছাপা হইত ও শঙ্কর ঘোষের লেনের একটি স্থানে কার্য্যালয় ছিল। গোঁদলপাড়ার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার ছাপা-টাপার ভার লইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ এখনও গোঁদলপাড়ায় থাকিয়া দেশের সেবা করিতেছেন। এমন নিস্তব্ধ ও নির্ভীক কর্মী খুব অল্পই দেখা যায়। তিনি ছিলেন মানিকতলার বাগানের কারবার হইতে আমাদের সময়ে সকল কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। গোঁদলপাড়ায় উপেনের হাতে-গড়া কর্মী। শ্রীঅরবিন্দ যখন অজ্ঞাতবাসে যান, তখন গোঁদলপাড়ার আশ্রয়, নরেন্দ্রই স্থির করিয়া তাঁহার সেবা করেন। অবশ্য মতিলালের ব্যবস্থানুসারে এ ব্যবস্থা করা হয়।

ইহার পর 'বিজলী'তে বারীনের লোকসান হয় এবং চেরী প্রেসের কারবারেও লোকসান হয়, তখন তারা অর্থাৎ উপেন ও বারীন উভয়ে স্থির করেন, তাহাদের হাত হইতে চেরী প্রেসের ভার আমার লওয়া। এবং সেই পরামর্শের ফলে আমি কুমার অরুণচন্দ্র সিংহের নিকট হইতে 'চেরী প্রেস' চালাইবার ভার লইলাম। তখন হইতে 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক চেরী প্রেস হইতেই প্রকাশিত হইত। পরিচালনার ভার সম্পাদনায় ভার উপেনের উপর, অর্থ সম্বন্ধে সকল ভার আমার উপর রহিল। চেরী প্রেসের পরিচালনার ভার দিলাম বন্ধু হৃষীকেশ কাঞ্জিলালের উপর—বর্ত্তমানে বিশুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ। আমি অর্থ সরবরাহ ও কাজ যোগাড় করিবার ভার লইয়া বেশ গুছাইয়া বসিলাম। কলেজের তিন বন্ধু আবার ১৯২২।২৩ সালে মিলিত হইয়া নূতন করিয়া দেশের সেবায় রত হইলাম। তখন আমরা হিংসা-অহিংসার কথাই ভাবিতাম না।

ইহার পূর্ব্বেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাঁর স্বরাজ দল প্রতিষ্ঠাকল্পে

দেশময় ভ্রমণ ও প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। চেরী প্রেসে প্রথম সুভাষচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কিরণশঙ্কর রায় এই ত্রিমূর্ত্তি আসিয়া আমাদের মধ্যে আড্ডা জমাইলেন। নিতাই উপেন, আমি, কাঞ্জিলাল, সুভাষ ও শরৎদা বসিয়া নানা বিষয়ে চর্চ্চা করিতাম। চেরী প্রেসের আড্ডা জমিয়া উঠিল বেশ। চেরী প্রেসেই সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ঠিক পরিচয় হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে আমি শিশির ভাদুড়ীর—"সীতা" অভিনয় দেখিয়া আসি। সুভাষকে দেখিয়া আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম—"তোমায় দেখে মনে হয়, তুমি যেন "সীতা" অভিনয়ে লব-কুশের মধ্যে এক-জন।" শরৎদা হেসে বল্লেন, "সাজালে মন্দ হয় না।" তখন উপেনের সঙ্গে সুভাষের আলাপ-পরিচয় কিছু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—সুভাষকে আদর করে উপেন "খোকা" বলিত, কখনও খোকা মহারাজ বলিয়াও আদর করিত। ক্রমশঃ দেশবন্ধু চেরী প্রেসে আসিয়া আমায় বলেন যে, আমি স্বরাজ পার্টি করিতেছি, এই চেরী প্রেসেই স্বরাজ পার্টির আফিস করবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। দেশবন্ধুর সহিত আমার ছিল বহু পুরাতন পরিচয়। তখন No changer prochangerদের মধ্যে কংগ্রেসী দ্বন্দ্ব চলছে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে খুবই ভালবাসা ছিল—উপেনের সঙ্গে, 'বন্দে মাতরম্' যখন ছাপা হয় তখনই পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল।

রাজনীতিক্ষেত্রে অঘটন ঘটিয়া যায়। আজ যে বন্ধু কাল সে পর হয়, আজ যে পর কাল সে আপন হয়। No changerরা হইল প্রবল। দেশবন্ধুর মত লোককে No changerএর দল ও দলপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন মতেই কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ। নিয়মিত দলের ও মতের দলাদলি। দেশবন্ধুর মত লোককে মতের বিভিন্নতায় বাংলায় কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দেয় না দেখিয়া আমরা দেশবন্ধুর পক্ষ হইলাম। উপেনের সঙ্গে নূতন অর্থাৎ মানিকতলার বাগানের দলের পর যাঁহারা বিপ্লবী ছিলেন, তাঁহাদের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কাজেই আমি উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী উভয় দলের সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমাকেই মধ্যস্থ করিয়া সুভাষচন্দ্র এবং উপেন চেরী প্রেসে যাদুগোপাল, অতুল প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া দেশবন্ধুকে তাঁর স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলাম। ১৯২২ সালের ব্যাপার। অবশ্য উপেন বারীনদের সঙ্গে এদের আসার পূর্ব্বেই খুবই পরিচয় হয়েছিল, আমি আসবার পর ঘনিষ্ঠতা হয়।

এক দিন আমরা চেরী প্রেসের আড্ডায় বসে নানান্ কথার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলছি। তখন খিলাফৎ আন্দোলনের অবসান হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বেশ সদ্ভাব। সুভাষ বলে ফেললে যে, পুরাতন বিপ্লবীর দল বড় মুসলমান-বিদ্বেষী, তারা মুসলমানদের দেখতে পারে না। এই ভাবে উপেনকে লক্ষ্য করেই কথাবার্ত্তা চলছিল। সুভাষ মুসলমানদের বড় গুণগান করে চুপ হলে শরৎদা বলে বসলেন, সুভাষ, তুমি ত মুসলমানদের খুবই গুণগান করে উপেনকে চুপ করিয়ে দিলে, কিন্তু বল দেখি, যদি তারা এত গুণবানই হয় তবে তাদের "নেড়ে" বলে কেন? এই কথাতে সকলেই উচ্চস্বরে হেসে উঠল। আড্ডা সেদিন খুব জমে উঠেছে, চা এর পর চা চলছে। সুভাষ বললে, ঐ তো হিন্দুদের দোষ। তারা যা-তা বলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লড়াই লাগায়। আমি কিন্তু মুসলমানদের খুবই ভালবাসি! আজ যদি সুভাষ দেশে থাকত, তা'হলে হয়তো পণ্ডিত নেহরু-লিয়াকৎ আলির প্যাক্টকে সার্থক করে তুলতো!

দেশবন্ধুর সঙ্গে বিপ্লবী দলের প্যাক্ট হ'ল যে, তারা তিন বৎসর কোন প্রকার মারামারির ব্যাপার করবে না, যদিও তারা গান্ধীপন্থী না হয়। আমরা কয় জন তাতে সায় দিলাম—যাদুগোপাল তখন কলকাতার যুগান্তর দলের নেতা!

কংগ্রেস তখন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে। 'Servant' কাগজ তখন No changerদের মুখপত্র। খুব জোর প্রচার-কার্য্য চালাচ্ছে। বন্ধু মাখন সেন, সুরেশ মজুমদার, অমর বসু প্রভৃতি যারা খুবই নিকট-বন্ধু বলেই পরিচিত ছিল, তারা তখন আমাদের বিরোধী বা আমরা তাদের বিরোধী হয়ে পড়লাম। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ secretary কংগ্রেসের। শ্যামসুন্দর সভাপতি বলেই মনে হচ্ছে।

Indian Associationএ কংগ্রেসের মিটিং। দেশবন্ধু পূর্ব্ব দিনে এসে বললেন—অমর, তোমাকে কালকের মিটিংএ জয়লাভ করতে হচ্ছে। উপেন তখন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। বললেন যে—কাল সময় থাকতে গিয়ে ঐ হল দখল করে বসতে হবে। যথা-সময়ে মিটিং-এর কাজ সুরু করে একটা Resolution পাশ করে নিতে হবে। বিপক্ষ দল এসে স্থান না পায়—আর যদি গোলমাল করে—মারামারি—চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি সব রকম করলেও তোমরা কোন মতেই স্থান ত্যাগ না করে সব শেষ পর্য্যন্ত থেকে Resolutionটা পাশ করে জয়ী হয়ে আসবে। Executive Commitee President Secretary Election করে শেষ করে আসতে হবে। পরদিন বেলা ১টায় মিটিং-এর সময়। Dr. Profullya Ghosh মিটিং ডেকেছেন।

পরদিন ১০টার সময় দেশবন্ধু চেরী প্রেসে এসে উপস্থিত হলেন। কিরণশঙ্কর রায়, জে এম সেনগুপ্ত প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এসে আমাদের বললেন, আমি যাব না, এইখানেই বসে থাকব। এ বিষয়ে কিরণশঙ্কর ছিলেন এক জন ধুরন্ধর। সভায় গিয়ে দেখি প্রায় সভাস্থল পূর্ণ, উপেন আর আমি একত্রে। মিটিং-এর পূর্ব্বে বন্ধুবর মাখন সেন আর সুরেশ মজুমদার আমায় প্রায় সমস্ত রাত্রি সতর্ক করলেন যে, মহা ভুল করেছ No changerদের পক্ষ ত্যাগ করে। কিন্তু কংগ্রেসে দেশবন্ধুর স্থান নেই। এ কথা আমি কোন প্রকারে ভাবতেই পারিনি এবং বন্ধুরা কেমন করে ভাবতেন তাও ঠিক বুঝতে পারিনি। যাই হক, মিটিং-এ গিয়ে দেখা যায় মৌলানা আক্রাম খাঁ সভাপতি হয়ে বসে আছেন—হলে "ন স্থানং তিল ধারণে"—১টা হয়-হয়। এমন সময় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রফুল্ল ঘোষ, অমর বসু প্রভৃতি এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে—তাঁরা স্থানচ্যুত হয়ে গেছেন। গোলমাল আরম্ভ হ'ল—উভয় পক্ষে জেদাজেদি হইচইয়ের অবধি নাই। শেষ পর্য্যন্ত আমরা রয়ে গেলাম, তাঁরা সরে গেলেন। আমাদের হাতে সভ্য নির্বাচন ব্যাপার সম্পন্ন করে সেই লিষ্ট নিয়ে দেশবন্ধু Delhi Special Congressএ রওনা হয়ে জয়ী হয়ে এলেন। ভূপতি মজুমদার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের স্থলাভিষিক্ত হলেন—বাংলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী! সভাপতি দেশবন্ধু।

াটির সভাপতিও মনে হয় দেশবন্ধুই হন, নিখিল ভারতের সভাপতি বোধ হয় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু হন। সঠিক স্মরণ নাই।

দেশবন্ধু আমাকে স্নেহালিঙ্গন করে বল্লেন, তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে! উপেনকে নিয়ে ইতিপূর্বে তিনি পূর্ববঙ্গ সফর করে চরকা ও স্বরাজের মহিমা প্রচার করে আসেন। সে ক্ষেত্রেও একটু বিপদ ঘটেছিল—উপেনকে বক্তৃতা দিতে বলায়। বোধ হয় কুমিল্লায়; তবে সেটা আমার গল্প শুনা মাত্র, নিজে শুনি নাই। উপেন না কি গান্ধীবাদের বিদ্রূপে বিদ্রূপে শ্রাদ্ধ করে বসেছিল। অহিংস আন্দোলন আর চরকা তার মেজাজ খারাপ করে দিত। "ঊনপঞ্চাশীতে" এ কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। গান্ধীবাদীরা তাকে একবার ...ার প্রস্তাব করেছিল। সেও বলেছিল, একবার অহিংস ভাবে ...স নেবে দেখুক না!

এই সময়ে যখন 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক উপেনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ করা আরম্ভ হল, তখনই আমি তার লিখিত সব গ্রন্থের copy right কিনে নিয়ে 'আত্মশক্তি' লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ...াম। সে কেনাবেচার কোন দলিল করে হয় নাই, কারণ তার প্রয়োজন ছিল না। ...ই বৎসর পূর্বে সেই পুস্তকগুলি আমি প্রচারের ...্য প্রবোধ সান্যালকে প্রকাশ করতে দিই। এখন প্রবোধ ভায়া ...কথা" "ঊনপঞ্চাশী" বোধ হয় ছেপেছেন। ইতিমধ্যে আমি অসুস্থ ... তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। উপেনের কাছ থেকে পত্র ... সে আমার কাছে আসে—'আত্মশক্তি' লাইব্রেরী পুলিশ সমূলে ...টন করার পর আমি আর তাকে চালান সঙ্গত মনে না করে ...দের বামেশ্বর দেকে, যে পুস্তকগুলি ছিল, বিনা সর্ত্তেই দিয়ে ...। মূল্য কম ছিল না। মন্মথ বিশ্বাস ছিল 'আত্মশক্তি' ...রীর ম্যানেজার। সেই এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য মনে করত ... করত। উপেনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ 'আত্মশক্তি' লাইব্রেরীটিকে ...। উপেন তাকে খুব ভালবাসত, এই জন্য তার সম্বন্ধটা না করা অন্যায় হবে ভেবেই লিখলাম। মন্মথ নিতান্ত ...িক নয়—মন্মথ বিশ্বাস ও বসন্ত বিশ্বাস দুইটি যুবক আমার ... সে বিপ্লববাদে যোগ দেয় ১৯১০ সালে। হার্ডিঞ্জের উপর ...লার অভিযোগে বসন্ত অভিযুক্ত হয়ে ফাঁসি যায়। মন্মথ ... আমার সঙ্গেই ছিল এবং শেষ '৪২ সাল মারা যায় আমার ...ই। উপেন তার জন্য বহু দুঃখ প্রকাশ করত। উপেনের সঙ্গে ... 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক এবং 'আত্মশক্তি' লাইব্রেরীর সম্বন্ধ ... কথা সকলের অজ্ঞাতেই ছিল! জনসাধারণ এবং বন্ধু-বান্ধব ... উপেনই 'আত্মশক্তি'র প্রতিষ্ঠাতা। উপেনের দুঃখ ছিল যে, কাগজে প্রবন্ধ লিখতে হ'লে তাদের মতানুযায়ী লিখতে হয়, ... নিজের মনের মত করে লেখার সুযোগ হয় না—পয়সার জন্য ... আর লোকশিক্ষার জন্য লেখা আর। স্বাধীন চিন্তানুসারে ... সুযোগ সে পেত না বলেই 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠা ...। আমি তাকে সেই সুযোগ করে দিয়ে নিজে সেই সাপ্তাহিকের উপর কোন দাবী রাখি নাই। 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক যে লাভজনক হবে এ আশা উপেনেরও ছিল না, আমারও ছিল না, কারণ বেশী দিন ওরকম সাপ্তাহিক ব্রিটিশ চালাতে দিত না। বিপ্লবীদের কাগজের যে প্রকার ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত পরাধীন দেশে, তাই তার হয়েছিল। পরে এই সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ডের' হাতে উপেনই দিয়ে দিয়েছিল। 'ফরওয়ার্ড' ছিল দেশবন্ধুর ইংরাজী দৈনিক।

১৯২৩ সালে যখন স্বরাজ পার্টি সুপ্রতিষ্ঠিত হল, আর দেশবন্ধু যখন বাংলার কংগ্রেসের নেতৃত্ব করবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের মিটিং-এর পর বাংলার দ্বন্দ্ব মিটাতে গেলেন দিল্লী, সেই সময় সুভাষচন্দ্র আমার উপর দেন "স্বরাজ পার্টির বাংলা মুখপত্ররূপে" 'স্বদেশ' দৈনিক পত্রিকার প্রকাশের ভার। উপেনও আমার সঙ্গে সেই ভার নেন সম্পাদকীয় ব্যাপারের। উপেন শচীন সেনকে 'স্বদেশের' সম্পাদক করে দিলে। ১৯২৩ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর 'স্বদেশ' প্রকাশ করা হল। ৯ই সেপ্টেম্বরে বাঘা যতীনের মৃত্যুর দিন, সেই দিন স্মরণ করেই 'স্বদেশ' দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করা হল। মাত্র ২৫০০৲ টাকা আমায় দেন সুভাষচন্দ্র। সেই সময়ে দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেসে দেশবন্ধুও যান সদলবলে আমার উপর ভার দিয়ে এখান থেকে তিনি লোক পাঠাবার এবং তার জন্য কিছু টাকাও রেখে যান। 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক আর 'স্বদেশ' দৈনিক চেরী প্রেস থেকেই প্রকাশিত হল। কর্ত্তৃপক্ষ বলে বসলেন যে, বিপ্লব পুনর্জীবন লাভ করল।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক কাণ্ড। সন্তোষ মিত্রের দল শাঁখারী-টোলার ডাকঘরে একটি হানা দেয় টাকার জন্য বেলা ১টা নাগাদ অর্থাৎ দ্বিপ্রহরে। পোষ্টমাষ্টার হত হন! পরে ঠিক ইহার পরই আমাদের ৩২ জনকে পুলিশ হানা দিয়ে ধরে নিয়ে গেল। ১৮১৮ সালের রেগুলেশন ৩ অনুসারে আমাকে চেরী প্রেস থেকে আর ৩১ জনকে স্ব স্ব গৃহ হতে ধরে নিয়ে গেল।

দেশবন্ধু দিল্লী কংগ্রেসের বিচারে জয়ী হয়ে ফিরে আসবার পূর্ব্বেই আমরা সব কর্মক্ষেত্র হতে অপসারিত হলাম। ইতিপূর্ব্বে বন্ধু উপেনের সঙ্গে, আর আর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি উত্তরপাড়ায় "বিদ্যাপীঠ" প্রতিষ্ঠা করি! এ বিদ্যাপীঠের সঙ্গে উপেন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখে নাই, কারণ সে আমায় বলত যে, এর দশা মানিকতলার বাগানের মতই হবে। এমনি আর জেলে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তা ত হল না। '২৩ সালে ২৩শে সেপ্টেম্বর আবার তাকে জেলে যেতেই হল। সঙ্গদোষ ত যায়নি! আমরা স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠায় সহযোগী হইলেও স্বরাজ পার্টির সভ্য হই নাই। তবে তখন আমরা সবাই কংগ্রেসের সভ্য! এখন হয়ত বন্ধুরা বলিতে পারেন, দেশবন্ধুকে বাংলার নেতৃত্ব দিয়া ভাল করিয়াছিলাম না মন্দ করিয়াছিলাম।

[ক্রমশঃ।

ধূপছায়া

আমরা ধূপছায়া বড় ভালবাসি। যোগী ধূপছায়ার নামাবলী গায়ে দিয়া ইষ্টমন্ত্র আরাধনে নিরত, যুবতী ধূপছায়ার চেলী পরিধান করিয়া ঠাকুর বরণে বিব্রত, বালক ধূপছায়ার র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া খেলিতে আসক্ত। আমাদের যে দেশে বাস, তাহাতে ধূপছায়ার আদরই সমধিক। শীতপ্রধান উত্তর প্রদেশে কেবল কুয়াসা, হিমানী, বরফ, সেখানে ছায়ার আদর কোথায়? সেখানে লোকে চায় ধূপ। আবার উত্তপ্ত সাহারা খণ্ডের লোক ধূপের জ্বালায় অস্থির, তাহারা চায় ছায়া। আর আমাদের ভারতে,—এই শীত-গ্রীষ্মময় ভারতে,—বেগবতী নদী, ছায়াবতী অরণ্যানী, তুষার-ধবল হিমানী, শ্যামল সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, জলশূন্য তরুশূন্য মরুভূমি-সকুল ভারতে,—আমরা দুই চাই, আমরা ছায়াও চাই, ধূপও চাই; আবার সর্ব্বাপেক্ষা আমরা চাই ধূপ-ছায়া।

এই ধূপছায়া আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। এখন এমনই হইয়াছে যে, আমরা যাহা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহা অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারি তাহার ভিতর ধূপছায়ার ভাব আছে বলিয়া এত প্রীতিকর। আমরা বসন্তের মাধুর্য্যে মোহিত, কেন না বসন্ত ধূপছায়াময়। শীতের তেজ কমিয়াছে, নিদাঘের কাল আসে নাই, এই ধূপছায়ার সময় কাজেই বড় মধুর, মনোমোহন; তাহার পর শরৎ; শরৎ কালের শোভাও আমরা বড় কম ভালবাসি না। বসন্ত ও শরৎ বৎসরের মধ্যে ধূপছায়ার সময়, তাই আমাদের এত প্রীতিকর। নচেৎ নিদাঘের শৌর্য্য, বর্ষার গাম্ভীর্য্য, হিমের প্রাখর্য্য—এ সকল শরৎ বসন্তে ত কিছুই নাই, তবুও যে শরৎ বসন্ত এত প্রীতকর সে সকল ধূপছায়ার গুণে। আবার দিনের মধ্যে গোধূলির সৌন্দর্য্য সকলেই অনুভব করেন। বসন্ত কালের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বাস্তবিকই অপূর্ব্ব মাধুরিময়, মধুরে মধুর; বসন্তের গোধূলি—ধূপছায়ায় ধূপছায়া, তাই এত সুন্দর।

ধূপছায়ার মোহে পড়িয়াই ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস এই চিত্র আঁকিয়াছেন।

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়ম-ক্ষাম-মুখী ধৃতৈক-বেণিঃ।
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি।"

পরনে ধূসর বেশ, একবেণী রুখু কেশ
ব্রত-নেমে ম্লান-মুখী, শুধু শীলা হেন,
আমি অতি নিরমম,— শোভিতেছে প্রিয়া মম,
সুদীর্ঘ বিরহ-ব্রত ছবিখানি যেন।

কোন্ চিত্র এ চিত্রের সমান। কোন্ মূর্ত্তি এই মূর্ত্তি অপেক্ষা সুন্দরী। যিনি কবি, তিনিই ইহার মাধুর্য্যে মোহিত; যিনি ভাবুক, তিনিই ইহার ভাবে বিভোর। বাঙ্গালীর কবিশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই জন্য বলিয়াছেন, "ভৈরবী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী? কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—ঘসা ফানুসের ভিতর আলোর মত রূপের আগুন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।"

এত গেল বাহ্য জগতের ধূপছায়ার কথা। আমাদের অন্তরের ভিতর যে ধূপছায়া লাগিয়াছে, যে ধূপছায়ার বলে আমরা বাঁচিয়া থাকি এবং বাঁচিয়া থাকিব বলিয়া আশাও করি, এক্ষণে সেই ধূপছায়ার কথা বলিতেছি। সকলেই জানেন, আশার বলে জীবিত থাকি। যিনি আসন্ন-মৃত্যু রোগী, তাঁহারও আশা তিনি বাঁচিবেন; যিনি দারিদ্র্যের দারুণ দায়ে জর্জ্জরিত, তাহার আশা এমন দিন থাকিবে না, ভাল দিন শীঘ্রই আসিবে; যিনি বিপন্ন তাঁহার আশা ঈশ্বর কৃপায় বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন; যিনি ইহজন্মে কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, তাঁহার আশা পরকালে তাঁহার ভাল হইবে; যিনি বন্দী, তাঁহার আশা মেয়াদ ফুরাইলেই আবার স্ত্রী-পুত্রের মুখাবলোকন করিবেন; যিনি দাসত্বের লাঞ্ছনায় চির-বিড়ম্বিত, তাহার আশা কোন না কোন দিন পর-সেবার, পদ-সেবার দায় হইতে মুক্ত হইবেন: এইরূপ নিরাশায় আশা সকলকেই অন্তরের ধূপছায়া বলিতেছি। ইহাতেই আমরা বাঁচিয়া থাকি। যদি জানিতাম এ রোগ আর সারিবে না, এ দারিদ্র্য আর ঘুচিবে না, এ বিপদ হইতে উদ্ধার নাই, কষ্টের অবধি নাই, মেয়াদ ফুরাইবে না, দাসত্ব যাইবে না—তাহা হইলে আর এক দিনও বাঁচিতে পারিতাম না। সেই জন্যই বলিতে হয়, আমরা কেবল ধূপছায়ার ধাঁধাতেই বাঁচিয়া আছি। মৃত্যু—জীবনের অভাব-জ্ঞাপক, অথচ আমরা এই ধূপছায়ার শক্তি-বলে "মরিলে বাঁচি।" বোধ হয়, জগতে আর কোন জাতি মরিলে বাঁচে না, মরিলে মরিয়া যায়। কেবল আমরাই মরিলে বাঁচি।

ধূপছায়া আর এক মূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করে। আনন্দের সময় শোকের উদ্দাম, দুঃখের সময়ে সুখের আশ্বাস—ইহাও এক রকম ধূপছায়া। যুবতী রমণী একটি শিশু-পুত্র লইয়া বিধবা হইলেন। সেই শিশু-পুত্রটির মুখপানে চাহিয়া পতিশোক যাপ্য করিলেন, তাহার লালন-পালনে সদা বিব্রত, তাহাকে লইয়াই সংসারে সংসারী। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত, কৃতবিদ্য, যশস্বী, ধনশালী হইল, দুঃখিনী মা'র আনন্দ আর ধরে না। তার পর পুত্রের বিবাহ দিয়া পরম রূপবতী সর্ব্বগুণসম্পন্না পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন, আবার দিন কতক পরে পৌত্র মুখাবলোকন করিয়া ইহজন্মের সাংসারিক সুখের সীমা পাইলেন। এত সুখের সময় কেন তিনি সময় পাইলে বিরলে বসিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন আবৃত করিয়া দুই ফোঁটা গরম জল ঢালেন? কেন তিনি এক-এক সময় মধ্যে-মধ্যে বলেন, "এ দিনে যদি তিনি থাকিতেন"—"হায়, তিনি এ সব কিছুই দেখিতে পাইলেন না!" এত সুখের দিনে মায়ের কষ্ট কেন? চক্ষে জল কেন? ইতিপূর্ব্বে যখন পুত্রের লালন-পালনে কষ্ট পাইতেন, পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য কষ্ট পাইতেন, যখন পুত্রের শিক্ষার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত, তখন তাঁহার মনে আশা জাগরূক, ঈশ্বর দিন দিবেন, এ দুঃখের দিনের অবসান হইবে। এখন সময় ফিরিয়াছে, এখন আশা চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে; এখন সুখ পূর্ণমাত্রা, এখন আর আশার সুখ নাই, এখন স্মৃতিতে কষ্টভোগ। তবে দুঃখের সময় সুখের আশা, সুখের সময় দুঃখময়ী স্মৃতি—ইহাকেই বলিতেছিলাম ধূপছায়ার অপর মূর্ত্তি। কখন সুখের সময় দুঃখের ছায়াময়ী স্মৃতি, আবার কখন দুঃখের তামস মধ্যে সুখের উজ্জ্বল আশা,—আমাদের জীবনের ধূপছায়ারূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। তাহা না হইলে হয়ত আমরা সুখের জ্বলন্ত রশ্মিতে পুড়িয়া মরিতাম, না হয় কষ্টের কঠোর ছায়ায় জমিয়া যাইতাম। সুতরাং ধূপছায়া অন্তরে-বাহিরে আমাদের চিরসহচরী; কাজেই আমরা অন্তরের সহিত ধূপছায়া ভালবাসি। ধূপছায়া সুখের সময় শান্তি-বিধায়িনী, দুঃখের সময় আশাদায়িনী।

—নবজীবন, ১২৯৫

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'আর্য্য' সংবাদ দিতেছেন : "গত দুই দিন হইতে পশ্চিম-বঙ্গের বৃহত্তম চাউল-উৎপাদনকারী জেলা বর্দ্ধমানে ...উলের মণ ২২।২৩ টাকায় উঠিয়াছে। সংবাদে জানা যায়, ...ক দিনের মধ্যে চাউলের মূল্য পঁচিশ টাকায় উঠিবে। স্থানীয় ...পক্ষ চাউলের আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধির কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ...লম্বন না করায় জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি ...য়াছে।"

* * *

'মুর্শিদাবাদ সমাচার'-এ প্রকাশ : "ডোমকল : উক্ত থানায় ...লের ভয়ানক অভাব। বাজারে যে সামান্য চাউল আমদানী ...হয় তাহার বর্ত্তমান দর ২৮, টাকা হইতে ৩০, টাকা। যাহা ...লো সম্প্রদায় খরিদ করিতে পারে। সরকারী ধান্যে গরীবদিগের ...নিবারণ হইতেছে না। মধ্যবিত্তদিগের বর্ত্তমান অবস্থা আরও ...নীয়। সরকার এ-পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য চাল-ধানের কিছু ...করেন নাই। বাজার হইতে অধিক মূল্যে চাউল খরিদ করে, সামর্থ্যও তাহাদের নাই। বাজারে আমদানী চাউলের দর ...ত করিয়া দিলে অথবা রেশন সপ মারফৎ বিলি করিবার ...দিলে মধ্যবিত্ত ও গরীব সম্প্রদায় বর্ত্তমান সঙ্কটের হাত হইতে ...পাইতে পারে।"

* * *

'...নীহার' মন্তব্য করিয়াছেন : "খাদ্যশস্য লইয়া স্থান ত্যাগ—চারি দিকেই খাদ্য-সঙ্কট ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করিতেছে। ...বন্যা ও অতিবর্ষণ। তার উপর খাদ্যদ্রব্য অপসারণ এই ...অধিকতর সঙ্কটময় করিয়া তুলিতেছে। ভারতীয় ...সভার সদস্য পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সেদিন দেশের খাদ্য ...সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, পশ্চিম-বঙ্গ হইতে পৌনে দুই ...মান ধান, চাউল ও অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী লইয়া পাকিস্তানে ...গিয়াছে। মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমিতে শরণার্থিগণ ...ভাবে বসতি স্থাপন করিলেও কৃষির যন্ত্রপাতির অভাবে ...চাষাবাদ করা হয় নাই।"

* * *

'...লীবাসীর' বেদনা : "যুদ্ধপূর্ব্ব ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখন ...৫০ সালে গড়পড়তা সব জিনিষেরই চারি গুণ দাম চড়িয়াছে—মোটামুটি হিসাব। গত সপ্তাহে আমরা পুরাতন 'পল্লীবাসী' ...বৎসর পূর্ব্বের বাজার দর উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন তাহার তুলনায় কত গুণ চড়িয়াছে, মিলাইয়া দেখিবেন। এই চড়া দরও অসাধু ব্যবসায়িগণ আরও চড়াইবার চেষ্টায় আছেন। অবশ্য সরকার এ-বিষয়ে খুবই সজাগ হইয়াছেন, বড় বড় চোরা-কারবারীকে কিছু ধর-পাকড়ও সুরু হইয়াছে। হয়ত খুব বাড়াবাড়ি নাও হইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে যে দর চড়ানো হইতেছে, তাহা ঠেকাইবার উপায় কি? সব চাইতে বড় সমস্যা যে চাউলের সমস্যা। যে ধান্য উৎপাদনের হিসাব করিয়া উৎপাদকদের কহংমত সাড়ে সাত টাকায় সরকার নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, আজ সেই ধান্য যে যত্র-তত্র যাদৃচ্ছিক দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহা রোধ করিবার চেষ্টা কোথায়? যাহারা "ধান্যলর্ড"—যাহারা কৃষি-শ্রমিকদের গোলামী দ্বারা হাজার হাজার মণ ধান্য গোলাজাত করাইয়া রাখিয়াছেন, আজ তাঁহারাই যে ইচ্ছামত চাউলের বাজার তেজ ধরাইতেছেন, ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য। সরকারের সংগৃহীত ২০ লক্ষ মণ বাদে বাকি সব চাউলই তো আজ ঐ সকল "ধান্যলর্ড" রাঘব-বোয়ালদের কবলে! অদৃষ্টের পরিহাস, যে বর্দ্ধমান জেলার চাষী-শ্রমিকেরা লক্ষ লক্ষ মণ চাউল উৎপাদন করিল, তাহাদের অধিকাংশকে আজ দ্বিগুণ মূল্যে চাউল কিনিতে হইতেছে; অথচ সরকারের সংগৃহীত চাউল কলিকাতা প্রভৃতি রেশন অঞ্চলের লোক অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাইতেছে। উহারা সরকারী মূল্যে পাইতেছে বলিয়া কোন অনুযোগ নাই। দুঃখ এই যে, যেখানে উৎপন্ন হইল, সেখানে কোথায় আরও সস্তা হইবে, না, সেইখানেই অসম্ভব দর চড়িতে দেওয়া হইতেছে!"

* * * *

'মুর্শিদাবাদ সমাচার'-এ প্রকাশ : "কাতলামারী : রাণীনগর থানার এলাকাধীন কাতলামারী ইউনিয়নের গ্রাম সমূহে বর্ত্তমানে ধান্য ২৫,।২৬, টাকা ও চাউল ৪০, টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহাও দুষ্প্রাপ্য! লোকের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। অনেকে অনাহারে কাটাইতেছে। চরসরন্দাজপুর, মাঝাড়দিয়াড়, বাঁশপাড়া মৌজাত্রয়ের ২৫।৩০ হাজার বিঘা জমি অদ্যাবধি পাকিস্তানের দখলে থাকা ধান্য-চাউল অভাবের অন্যতম কারণ।"

* * * *

'দামোদর' মন্তব্য করিতেছেন : "স্বল্পাহারী খাদ্য ও কৃষি-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বাদামের খইল খাইয়া উভয় দিক বজায় রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মোটা মোটা বেতনের সরকারী ও

বেসরকারী কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিগণ মাঝে মাঝে উপবাস ব্রত পালন করিবার উপদেশামৃতও বিতরণ করিতেছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মুন্সীজী হইতে সকল দেবতাদের প্রতিই পূর্ণ আনুগত্য রাখিয়া এ দেশের সহরের ও পল্লীর সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু উপবাস ও অনাহার-ব্রত কঠোর ভাবে প্রতিপালন করিয়া চলিতেছে, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। এই সমস্ত সুব্যবস্থা দেখিয়া আমরা একরূপ নিশ্চিন্তই ছিলাম—এইরূপ ভাবেই খাদ্য-সঙ্কট আমরা চোখ বুজিয়া এড়াইয়া যাইব। কিন্তু তাহা হইতে দিল না। ভারতের সর্ব্বত্রই খাদ্যাভাবের সংবাদে সংবাদপত্রগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে। ভরসার কথা, মুন্সীজীর এক বিবৃতিতে আমরা অভয় পাইতেছি 'ভারতের খাদ্যাবস্থার উদ্বেগের কারণ নাই। জরুরী অবস্থার জন্য পশ্চিম-বঙ্গে প্রচুর চাউল মজুত আছে। বর্দ্ধমানের মত ধান্য-প্রধান স্থানে যখন চাউলের মণ ২২৲ টাকা চলিতেছে,—কালনা মহকুমায় ৩০৲ টাকা উঠিয়াছে, তখন জরুরী অবস্থা কখন আসিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি। অর্থ ও বিবৃতির শ্রাদ্ধ করিয়া 'অধিক শস্য ফলাইবার' কর্মফল আরও কত যুগ আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে, তাহাই মুন্সীজীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

* * * *

বর্ত্তমান অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধির যুগে নিম্নোদ্ধৃত মূল্য-তালিকা হয়ত অনেকের নিকট নিছক কাহিনী বলিয়া মনে হইবে।

১৩০৫ সাল ইংরাজী ১৮৯৮ সালের বাজার দর।

১ই আষাঢ়—চাউল ৩৸০, মুগ ৫৲, বুট ৩৲, আলু ১৸০, অরহর ২।০, ঘৃত ৩৫৲, ময়দা ৫৲, গুড় ৫৲, তামাক ৬৲, কলাই ৩।০, খইল ১।০, লবণ ৪৲, তৈল ১১৲, ধান ২।০ মণ। আম্র ১ শত ১৲ টাকা। ১৬ই আষাঢ়—বর্দ্ধমানে কাঁচি ওজন চাউল টাকায় ।৭ সের হইতে ।৭॥০ সের। কালনায় ৮০ ওজন চাউল ৩৸০ মণ। রাণীগঞ্জের চাউল বরিশালের দর ৩।০—৩॥০, মোটা ২৸০—৩৲ টাকা। ২৩শে আষাঢ়—বর্দ্ধমানে ধান কাঁচি ওজন টাকায় ।১ সের, চাউল ।৭॥০ সের। কালনায় ৮০ ওজন ৩৸০ টাকা মণ। ১৯শে শ্রাবণ দেবতার অবস্থা দেখিয়া দিন দিন ধান্য চাউলের বাজার তেজ রাখিতেছে। ধান্য টাকায় ।৮ সের কাঁচি ; চাউল ।৬ হইতে ।৭ সের, রাণীগঞ্জের ভাল চাউলের দর ৩।০ টাকা হইতে ৩॥০ টাকা মণ। রাশি ২৸০—৩৲ মণ। ১৬ই ভাদ্র—চাউলের বাজার কাঁচি ওজন টাকায় ।৫ সের হইতে ।৬।০ সের। ধান্য সময়ের নূতনগঞ্জে ।৮ হইতে ।১ সের ; বাজে প্রতাপপুরে ৸০ সের। ২৩শে ভাদ্র—চাউলের দর পাকি ৩।০ হইতে ৩৷৵০ আনা। ধান্য পাকি ১৸০ হইতে ২৲ ; বর্ষার জন্য গঞ্জ গোলায় চাউলের আমদানী তত নাই। ৩০শে ভাদ্র—কালনার গঞ্জে ৮০ তোলার ওজন মণ প্রতি ধান্য ১।০—১৷৵০, চাউল ৩৲—৩৷৵০ ; কলাই ২৸০ ; পাট ৩।০ ; খইল ১৶০—১।০ ; মাঠে দিবার লবণ ১৶—১৷৵০ ; খাইবার লবণ ৩৸০ খুচরা। বুট ১৸০—২৲। ২০শে আশ্বিন—চাউল ৩।০, কলাই ২৸৵০, অরহর ১৸৵০, পাটনাই বুট ২৸৵০, মুগ ৪।০—৫৲, আলু ২৸০, ঘৃত ৩৭৲, ময়দা ৪।০, পাট ৪৶০, তামাক ১৫৲ সঃ তেল ১০৲। ২৯শে অগ্রহায়ণ—রাণীগঞ্জে কাঁচি ওজন নূতন চাউল ১।০—১৷৵০ মণ, পুরাতন উত্তম চাউল ৩৲ হইতে ৩৵০ ; কাটোয়ায় ।৭ সের ও বর্দ্ধমান সদরে ।৫ হইতে ।৭ সের পাকি। এই জে[...] মধ্যে কালনায় চাউলের দর চড়া। সংবাদদাতাদের দরের স[...] সরকারী গেজেটের দরের তারতম্য হয়। সরকারী পক্ষে ত কনেষ্ট[...] দ্বারাই কাজ চলে। ২৮শে পৌষ—বর্দ্ধমান কাঁচি ওজন পুরাতন চা[...] টাকায় ।১ সের হইতে ॥১ সের পর্য্যন্ত। নূতন চাউলের এখ[...] তেমন আমদানি হয় নাই। পুরাতনের সহিত মিশাল চলিতে[...] মোটা নূতন চাউল টাকায় ॥৪ সের আন্দাজ। নূতন ধান ট[...] টাকা মণ। এইটা পৌষের মন্দা, এ দর থাকিবে না। ২৬ মাঘ—রাণীগঞ্জের উৎকৃষ্ট চাউলের মণ ২৷৵০ হইতে ২॥০ ; রাশি হইতে ২।০ টাকা। গোল আলু ১।০ হইতে ১॥০ টাকা। কা[...] উৎকৃষ্ট চাউল ২৸৵০ ; রাশি ২॥৵০। আলু ১৲, ধান্য ১ হইতে ১॥৵০ আনা ; মুগ ৩৷৵০, বুট ১॥৵০ ; অরহর ১৸ লবণ ৩।৵০ ; কলাই ১৸০—২৵০ টাকা।—'পল্লীবাসী' হই উদ্ধৃত।

* * * *

নিম্নলিখিত পত্রখানির প্রতি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আক[...] করা হইয়াছে :

"মহাশয়,

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ পশ্চিম-বঙ্গে পদার্পণ করি[...] এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা এ[...] পরিবারভুক্ত ছিলেন, ভারত-রাষ্ট্রে আসিয়া হঠাৎ তাঁহারা পরিবারটিকে যথাসম্ভব অধিকতর সংখ্যায় বিভক্ত করিতেছে[...] কারণ, সরকার প্রতি উদ্বাস্তু-পরিবার পিছু ৫০০৲ টাকা গৃহ-নি[...] ও ৫০০৲ টাকা ব্যবসায়-ঋণ পরিবারের প্রধান ব্যক্তির নামে [...] থাকেন। সেই জন্য দেখা যাইতেছে যে, পিতা মাতা পুত্র পুত্র[...] প্রভৃতি লইয়া পাকিস্তানে যে একান্নবর্ত্তী পরিবারটি ছিল, ভারত-রা[...] আসিয়া উদ্বাস্তু নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া "টোকেন" লইবার সময় [...] গেল যে, একটি পরিবার একাধিকে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ [...] এবং তার প্রত্যেক সাবালক পুত্রটি প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ প[...] সৃষ্টি করিয়া সরকারী ঋণের সদ্ব্যবহারের চেষ্টায় রহিলেন। [...] নবসৃষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে কয়েকটির আবার পরিবারের [...] ব্যক্তিই (Head of the family) একমাত্র [...] এইরূপে সরকারকে বঞ্চনা করিবার জন্য বহু নব-নব পন্থা [...] হইতেছে। পরিশেষে কালনার মহকুমা শাসক ও রিলিফ [...] মহোদয়গণকে এ-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিনীত [...] জানাইতেছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সিংহরায় ও শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় না[...]
তত্ত্বাবধায়ক ; বৃদ্ধপাড়া উদ্বাস্তু আশ্রয় কে[...]
পোঃ—অটঘরিয়া, বর্দ্ধমান

—পল্লী[...]

* * * *

'দামোদর' পত্রিকায় জনৈক ভুক্তভোগী লিখিতেছেন— সালের প্রথমেই জেলার বহু ব্যক্তি ভূমি উন্নয়ন ঋণ জন্য করার পর প্রেসিডেন্ট, সার্কেল অফিসার প্রভৃতির তদন্ত ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাস হইয়া গেল। কাজেই ঐ সা[...]

খরচের বালাই রহিল না। এখন নূতন বৎসর পড়িল, আবার গভর্ণমেন্টের মঞ্জুরী চাই, তাহা কমিশনার মহাশয়ের মারফৎ আসিতে হইবে, কাজেই কবে যে মঞ্জুরী আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। শুনা যায়, কালেক্টার সাহেব সমস্ত দরখাস্তের তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া কমিশনার সাহেবের নিকট বৎসরের প্রথম ভাগে পাঠাইয়াছেন এবং কমিশনার সাহেব তাহা পাইয়া ফাইল দুরস্ত কেতায় কালেক্টর সাহেবকে কতকগুলি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। তাহার উত্তর সন্তোষজনক হইলে তবে তিনি গভর্ণমেন্টের মঞ্জুরী জন্য পত্রালাপ করিবেন, কাজেই ১৯৫০ সালেও বোধ হয় দরখাস্তকারীরা ঋণ পাইবেন না। বর্তমান নিয়মাবলীতে কালেক্টর সাহেব ১০০০৲ পর্য্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করিতে পারেন। কাজেই অধিকাংশ দরখাস্ত ২০০০৲ টাকার মধ্যে। কারণ শীঘ্র টাকা পাওয়াই অধিকাংশের কাম্য। কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের কোনই ক্ষমতা নাই এবং দরখাস্তকারীদের ঋণ পাওয়া সুদূরপরাহত। গলদ কোনখানে, তাহা শীঘ্র দূর হওয়া আবশ্যক। ভূমি উন্নয়ন ঋণের সহিত অধিক শস্য ফলাও আন্দোলনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমাদের সরকার কেবল গাল-ভরা বাণী ও পরিকল্পনা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা কিরূপ ... পর, তাহার স্বরূপ এই ব্যাপারেই বুঝা যাইতেছে।"

* * * *

'সীমান্ত' মন্তব্য করিতেছেন: "উদ্বাস্তু সমস্যা যে আমাদের প্রধান সমস্যা এ বিষয়ে দ্বিমত নেই; কিন্তু অলক্ষিত ভাবে আর একটা সমস্যা দিনের পর দিন প্রধান হয়ে উঠছে—সে সমস্যা পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাবের মাত্রা ... বেড়ে উঠছে, তাতে টিঁকে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠছে। ... পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা বাড়ছে, অথচ খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই। ২১৪৭৬ বর্গ-মাইলের এই ভূখণ্ডে ৪০ লক্ষ বহিরাগত এসেছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে এখনও ৮৫ লক্ষ হিন্দু রয়েছেন। যে সকল হিন্দু এখনও পূর্ব্ববঙ্গে রয়েছেন তাঁহারাও পশ্চিমবঙ্গে আসবার জন্ম ... সন্ধান করছেন। মাননীয় প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু সাম্প্রতিক ... বলেছেন, বাঙ্গালীদের বাংলাতেই পুনর্বসতি করান হবে। ... ভূখণ্ডে এত লোকের পুনর্ব্বসতি করা সম্ভব কি? যাঁহারা ... এসেছেন ও যাঁহারা এখানকার আদিবাসী, দুই পক্ষেরই ... মৃত্যু অনিবার্য্য। এ বিষয়ে বাঙ্গালীদের এখন হতে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই সমস্যা বিশেষ করে দেখা ... নদীয়া জেলায়। ১৫০০০ বর্গ-মাইল এই ক্ষুদ্র জেলায় ... গ্রাম আছে। এই সকল গ্রামে ৬ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় ...ছেন ও সহর অঞ্চলে ৩ লক্ষ লোক বসতি স্থাপন করেছেন। ... চাঁদমারী ক্যাম্প, কুপার ক্যাম্প ও ধুবলিয়া ক্যাম্পে এক ...উপর শরণার্থী রয়েছেন। এই জেলা হতে যে দুই লক্ষ ... পাকিস্থানে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকে ফিরে এসেছেন ... ফিরে আসছেন। অবস্থা জটিল হতে জটিলতর হচ্ছে ... বিষয়ে নদীয়া জেলার নেতারা ও সরকার কি কিছুই চিন্তা ... না? আবার সংবাদে প্রকাশ, রাণাঘাটের কুপার ... কি আরও বাড়ান হবে ও নদীয়ায় নতুন ক্যাম্প খোলা

যে দেশে 'বঙ্গাল' মোরা

শ্রীবাস্তব

১

মেঘলা আকাশ। উত্তপ্ত আবহাওয়া। সম্মুখে মেঘের আড়াল থেকে তীব্র অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে চাইছেন সূর্যদেব। একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। তার মাঝেই এলো আহ্বান—সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রবেশ করতে হবে বিমান-পোতের অভ্যন্তরে। উড়বার ঘণ্টা বেজে গেছে, এবার সশব্দে পাখাগুলি বেগসঞ্চার করতে থাকবে।

বিমান-পোতে আরোহণ করে যে-যার স্থান গ্রহণ করলাম। কোমরে কষে নিলাম বেল্ট। এবার উড়ব আমরা।

পাশেই বসেছেন, আকৈশোর বন্ধু জনৈক এডভোকেট। বহু কাল পর হঠাৎ সেদিন অফিসে দেখা,—তিনিও সহযাত্রী। গন্তব্য স্থান একই। মনটা খুশী হল, এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

হ্যাঁ, দমদমের মাটীর স্পর্শ ছেড়ে উঠছি আকাশে—ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে। সুরু হল ছোটবার পালা। বন্ধুটি নড়ে-চড়ে খাড়া হয়ে বসে প্রশ্ন করলেন অকস্মাৎ, তার পর, এবার কি কংগ্রেস ছাড়ছ? যেন ঢিল ছুঁড়ে মারলেন।

প্রস্তুত ছিলাম না এমনি প্রশ্নের জন্যে। তথাপি অপ্রস্তুতও হলাম না। তাঁর মনের কথাও বুঝতে পারলাম। এ কথাও বুঝলাম, কেন এই প্রশ্ন? যে মানসিকতা থেকে এর উদ্ভব, তার পটভূমিকা বিরাট। উত্তর দিলাম: আমি কংগ্রেসের এমন কেউ-কেটা এক জন নই—যার কংগ্রেস ছাড়ায় একটা ইন্দ্রপাত হবে কিম্বা উল্কাপাতও নয়। সুতরাং আমার কংগ্রেস ছাড়া-না-ছাড়ায় কিছু যায়-আসে না। তোমার এ প্রশ্ন তাই অবান্তর।

বন্ধু বললেন: কিন্তু কংগ্রেস আজ কোন্ পথে চলেছে?

বললাম: কেউ বলেন ধ্বংসের পথে, আবার কেউ বলছেন এটাই সত্য পথ, ভারতকে বাঁচাবার, সমৃদ্ধ করে তোলবার পথ। ভবিষ্যৎ প্রমাণ দেবে কারা সত্য। আজ দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। বৃথাই নিজের ছোট মাথা ঘামাব, বড় বড় মাথাগুলি এয়ার-কণ্ডিসনড্ ঘরে বাস করে।

বন্ধু বাধা দিলেন: নিজেকে এতো তফাতে সরিয়ে নিলে চলবে কেন? নির্লিপ্ততার ভাণ করাও সাজে না তোমাদের। মনে করো দেখি, তোমার জেলার লোক অন্ততঃ তোমাদেরই জানত বেশী করে, ভাবত তোমরাই তাদের সত্য পথে নিয়ে যাচ্ছ। দিল্লী-বোম্বাই-কলকাতার সঙ্গে তোমাদের এজেন্সি ছাড়া তাদের পরিচয় ছিল না। আজ তাদের প্রশ্ন—কি দিয়েছ তাদের আর তোমরাই বা কি পেয়েছ? পারমিট, পেন্সন, কন্ট্রাক্ট? এই কি চেয়েছিলে? ওই নীচের দিকে চেয়ে দেখ, পাকিস্তানের দিকে, তোমার দেশ ছিল না ওটা? আজ সেটা কার দেশ? তোমার বলতে পার?

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। উত্তর ছিল না এমন নয়। কিন্তু দেওয়ার অবসর ছিল না। নীচের জগতের কথা মনে হতেই বুকটা সহসা যেন আর্তনাদ করে উঠল। তাই তো! ওই নদী-নালায়, সবুজ মাঠে আর ঘনবসতি পল্লীতেই ছিল আমাদের নাড়ীর স্পন্দন। ওখানকার মাটীতেই এক দিন জন্মেছিলাম, তারই আকাশের সূর্যালোকে চোখ মেলে চেয়ে দেখেছিলাম পৃথিবীকে আর ওখানকা মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার অনুভূতি ছিল আমারও অনুভূতি সেই আমার স্বদেশ কি করে বিদেশ হয়ে গেল?

অতীতের কতো কথা ভেসে উঠল স্মৃতির পাতায়। কো জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছি ঠিক বলতে পারি না। হয়তো এ সে জেলা—যেখানকার কোন কোন অঞ্চলে রাতের আঁধারকে লালে লা করে একদা জ্বলে উঠেছিল হিংসার আগুন। উঠেছিল অগ মানুষের, নর-নারী-শিশুর কণ্ঠে অসহায়ের আর্তনাদ। তারা ছুটেছি দিগ্বিদিকে আশ্রয়ের সন্ধানে। মৃত্যুভয় তাদের সর্বস্ব পেছনে ফে আসতে বাধ্য করেছিল। আজো কান পেতে শুনি, কোন না কণ্ঠে উঠছে কি সতীত্বরক্ষার করুণ কাকুতি? আজো কি চ অনুসন্ধানী অভিযাত্রীরা—খুঁজছে মাঠের ক্ষেতের, নদীর চ ধ্বংসস্তূপের মাঝে, বন-বাদাড়ে—কোথায় আছে নর-কপাল নর-কঙ্কাল?

এই সেদিনেরও কতো কাহিনী এলো ভিড় করে। রাণাঘ বনগাঁ আর শিয়ালদহে নিজের কানে শুনেছি সে ইতিবৃত্ত। বলতে বলতে মূর্ছিত হতে দেখেছি স্বামিপুত্রহারা নারীকে। চোখের সম্মুখে যে সে দেখেছে সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য। দেখেছে স্বামিপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্যে আকুলি-বিকুলি, তাতে পা টলতো কিন্তু মানুষ টলেনি। তার পর মূর্ছিত হয়ে পড়ে সে, জ্ঞান হতে চেয়ে দেখল পড়ে আছে এক আগাছার জঙ্গ কি করে এলো সেখানে জানে না—কি করে এলো তাও যেন স্বপ্ন-কথা। এক ভদ্রলোক, হ্যাঁ, চেহারা ভদ্রলোকই—তাঁকে প্রশ্ন করতে ধমকে উঠেছিলেন, কি আ জানতে চান? আপনারা স্বাধীনতা এনেছেন, ওই দেখুন। চেয়ে দেখলাম, ফ্যাল-ফ্যাল্ করে চেয়ে একটি তরুণী, সহসা সে দু'হাতে মুখ ঢাকল। তার দৃষ্টিই এসে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল আমার সর্বাঙ্গে এ কি স্বাধীনতাই এনেছি আমরা? মেয়েটি হয়তো কাঁদছে কান্না শতপ্রশ্নে উচ্ছসিত! রাজনীতি তারা জানত না, বুঝ কদাচিৎ নেতাদের জয়ধ্বনি করেছে, তাদের গলায় পরাবা গেঁথেছে ফুলের মালা। সেই কি হল অপরাধ?

তথাপি স্বাধীনতার জয়ধ্বনি উঠেছে দিকে দিকে। "The mroal progression of a people can sca begin till they are independent."—নৈতিক প্রগ চলেছে স্বাধীন জগত? যে জগতের—সভ্য পৃথিবীর রাজনীতিতে হত্যা নিত্যসঙ্গী। হত্যাকারীও পাবে সম্মানে শয়তানের সঙ্গেও হবে আপোষ—এও যে রাজনীতি। এ বুঝি শেষ নেই। এই চলবে দুনিয়ায় যত দিন জাতির সৃষ্টি হয়।—কিন্তু কবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের নূতন জাতি জন্ম নেবে? কখনো কি নেবে জন্ম?

চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল, ফিরে এলাম নিজের পারিপার্শ্বি মধ্যে। ট্রে হাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এক তরুণী ড্রিঙ্ক, বিস্কিট, চকোলেট। ডান পাশের সিট থেকে হাত বাড়িয়ে এক মুঠো চকোলেট ও বিস্কিট নিয়ে পুরছেন ভাবটা যেন টিকিটের দাম বড় বেশী, যা আদায় করা যায়।

কাগজের গ্লাসের সরবতে চুমুক দিয়ে ভাবলাম, জাতীয় এ আর এক সমস্যা। সমাধানের পূর্বেই এসে গেল, আগরতলা

আগরতলায় বিশ্রাম নেবার কথা দশ মিনিট, কিন্তু পঁচিশ মিনিট কাটিয়ে তবে আবার উড়লাম আকাশে। এবার একটানা ... যাব গন্তব্য স্থানে—কাছাড়ে। এককালে বলত তাকে হিড়িম্বা রাজ্য। মহাভারতের সেই হিড়িম্বা। সে-রাজ্যেই পাণ্ডব-ঔরসে জন্মেছিলেন ঘটোৎকচ। তারই গা-ঘেঁষে চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুর। ... কাছাড় পার হয়ে দাঁড়ায় বাঙ্গালী-অধ্যুষিত—শ্রীহট্টের সগোত্র। ...-বর্জ্জিত বাঙ্গালী। কাছাড় বহু কাল যাবত ছিল আসামেরই ... অংশ, আজো তাই আছে। মিঃ জিন্নার পাকিস্তানী বাক্সের ... কবল এড়িয়ে বহু ভাগ্যে আত্মরক্ষা করেছে সে, আর রেডক্লিফ ...সের খোস্-খেয়ালে শ্রীহট্টের সাড়ে তিনখানি থানার এক টুকরো ... অঙ্গবৃদ্ধিও ঘটিয়েছে তার। মন্দের ভাল।

সহযাত্রী বন্ধুটি আবার আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্নবাণ ত্যাগ করলেন: এবার কোথায় যাচ্ছ জান?

বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর করলাম: জেনেই তো টিকিট কেটেছি। তোমার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য?

বন্ধু বললেন: মনে করে নেয়া ভাল, যেখানে যাচ্ছ সেখানে ...রা 'ভগনীয়া' আর বাঙ্গালীরা 'বঙ্গাল'। তুমি আধুনিক ... না-হোলেও 'বঙ্গাল' তো বটেই।

বললাম: কিন্তু কাছাড়ে তো বাঙ্গালীদেরই বাস?

... বললেন বন্ধুটি: রাজ্যটি অসমীয়াদের। জনসভায় ...মঞ্জুরী হয়েছে অসমীয়া ভাষা তো শিখতে হবেই, মেয়েদের ... ছেড়ে পরতে হবে মেখলা-উত্তরীয়, পুরুষেরা পাছ-গোঁজা ফেরাবে ... দিকে।

... পড়ে গেল বৎসরাধিক কাল পূর্বে ভারতের সাম্রাজ্যে ...নের সদাবক্তার অভিযোগ, বাঙ্গালী বড় প্রাদেশিক! হায় রে, ... মাথা বাঙ্গালী, তবু তো তুমি টুপি-পাগড়ীর বাজার বন্ধ করে ..., এখনো। হরেক রকম পোষাকের ভারত-তীর্থ বাংলার ...।

২

... বহু-পরিচিত জগত। জানা-শোনা লোক, পরিচিত ঘর-...বাট। কিন্তু সে আত্মীয়তার বন্ধন যেন আর নাই। ... হয়ে গেছি,—সংযোগ ছিন্ন। মাঝখানে পাকিস্তান। ...পথে পাড়ি দিয়ে পৌঁছুতে হয়, সরল স্থল আর জলপথে ... তাই সহজে সে-পথ কেউ মাড়ায় না। নূতন রেলপথ, ...স্তানের পথ—ভিড়ের চাপ, তার উপর নাসিকা স্পর্শ করতে ...ইন করে আসতে হয়।

... মহল অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীরা তথাপি সম্বর্দ্ধনা ...। তাঁদের মুখে শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। চার-... দেখ, আমরা কোন্ রাজ্যে বাস করছি। কিন্তু আমার ...: মনে হল, এই তো স্বাভাবিক। অবাধে অকুণ্ঠিত ভাবে ... হিন্দু-মুসলমান। মনে হচ্ছে এ দেশ শুধু হিন্দুর নয়, শুধু ... নয়। এই তো আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু এক জন ...র মন পাকিস্তানী ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত: এ ...ক নয়। পাশেই তো সিলেট, গিয়ে দেখ সেখানে। ...খানে মুসলমানরা—বলেই তিনি একবার চারি দিকে চেয়ে নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলতে আরম্ভ করলেন, কি-জানি কর্ত্তাদের কানে গিয়ে পৌঁছবে, পুলিশ আসবে ছুটে, বলবে থানায় চল। মুসলমানদের সম্বন্ধে কথা বলতে সাবধানে বলতে হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার! দুর্ব্বোধ্যও অল্প নয়। তা'হলে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি অক্ষরে-অক্ষরে নয়, মর্ম্মে-মর্ম্মে প্রতিপালিত হচ্ছে? কিন্তু চুক্তির পূর্ব্বেই তো কয়েক জন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী বাঙ্গালীকে কারাগারে প্রবেশ করতে হয়েছে? তবে সত্যি সত্যিই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজ্য এই আসাম!

কংগ্রেসী মহলও বিপর্যস্ত। নায়কেরা রণক্লান্ত, হতাশ। একই কাছাড় জেলায় তিন তিনটি জেলা-কংগ্রেস। কাছাড় ছিল পূর্ব্বে বাংলা কংগ্রেসের অঙ্গীভূত—বাঙ্গালীর দেশ বলেই। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র প্রথম যেদিন বিধিবদ্ধ হয়, সেদিন থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছিল। এই সেদিন যখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের চির-স্বীকৃত নীতি মুখে না-হলেও মনে মনে অস্বীকার করলেন কংগ্রেসী কর্ত্তারা, তখন থেকেই কাছাড়ের কংগ্রেসকে আসামের অন্তর্ভুক্ত হতে হল। প্রাদেশিক কর্ত্তারা রাজনীতির খড়্গে শাণ দিয়ে রাখছিলেন, অম্লান বদনে তাকে তিন টুকরো করে ফেললেন। ঐক্যবদ্ধ কাছাড়ের কংগ্রেস দাবী তুলেছিল ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর, কাছাড় ও লুসাই পাহাড়কে নিয়ে স্বতন্ত্র 'পূর্ব্বাচল' প্রদেশের। তাই এই খড়্গাঘাত কি না কে জানে? পরবী বাড়ল তা'তে, খুশী-হয়ে-ওঠার দলও তাই মিলল। কিন্তু তিন টুকরো আবার এক হয়েছিলেন একটি ক্ষেত্রে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিতে উঠছিল ঘন ঘন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি। শলা-পরামর্শও না কি চলছিল রাতের আঁধারে নেতাদের বৈঠকখানায়। আসামের একমাত্র কাছাড়ী ও মুসলমান মন্ত্রীও নাকি জাতীয়তাবাদীতার খোলটা আর বজায় রাখছিলেন না, ভাবছিলেন, সময় এসেছে নিকট বন্ধু···। মুসলমান পুলিশ কর্ত্তা—আগষ্ট-বিপ্লবের বিখ্যাত রণজয়ী না কি বলছিলেন, মা ভৈঃ। দুশ্চিন্তার কারণ আছে বৈ কি? তাই সবাই জোট বেঁধে ছুটাছুটি সুরু করলেন, বাঁচাও কাছাড়কে। মন্ত্রীকে অপসারিত কর, নিয়ে যাও তোমাদের পুলিশ-কর্ত্তাকে। কিন্তু বিধাতারা হাসলেন, করুণার হাসি। বাঙ্গালীর মক্ষিকা-বৃত্তি যাবে না, যাবার নয়। তোমাদের চিরকালই 'অব্যাপারেষু ব্যাপারে'র স্বভাব। ওরা খাঁটি লোক, তোমাদের কথায় আমাদের ঘাঁটি ভাঙ্গব? বাঙ্গালী হিন্দুদের শায়েস্তা করবার ঘাঁটি! দুর্বিনীত বাঙ্গালী। ফিরে এলেন কংগ্রেসী নেতারা, রাজ্য-পরিষদের সদস্যরা। অধুনা তাঁরা বসে বসে ঢোক গিলছেন আর ভাবছেন, অতঃপর?

এক জন নিজের বৈঠকখানায় বসে ভবিষ্যতের একটা ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করলেন। কেন্দ্র যদি উদাসীন থাকেন আরো কিছু কাল, তবে আমরা ডুবেছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা তো অপূর্ব্ব। উড়ে আসতে হলেও আসতে হয় পাকিস্তানের উপর দিয়ে। এক দিন জেলার শাসক বড়কর্ত্তা ডেকে বললেন নেতাদের, শোনা যাচ্ছে মুসলমানেরা সহর আক্রমণ করবে, পুলিশ অপ্রচুর, নিজেরা প্রস্তুত থাকুন। চমৎকার! সন্ধ্যাদীপ আর জ্বলল না সহরবাসী হিন্দুদের গৃহে। গৃহদ্বার বন্ধ রইল সারা রাত। রাস্তায় রাস্তায় পাহারাদার বে-সরকারী মোটরের ছুটাছুটি শুধু বেড়ে গেল। কিন্তু ভাগ্য ভাল, পালে সত্য সত্যই বাঘ পড়ল না। মুসলমানরা-

ওদিকে ঐক্যবদ্ধ, সুসজ্জিত। তারা লৌহ শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরে প্রস্তুত। এ প্রত্যক্ষ করা ব্যাপার। কয়েকটি গ্রাম তারা ভস্মীভূত করে দিয়েছে—ধানের গোলা, ঘর-বাড়ী জ্বলেছে কয়েক দিন ব্যাপী। এইখানেই আগুনের শেষ নয় আরও আগুন সঞ্চিত রয়েছে ওদের মনে। পাকিস্তানকে ওরা ভুলেনি, ভুলতে পারে না। এক দিন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সৈনিক ছিল ওরা। ভেবেছিল, স্থির জেনেছিল, বাংলা ও আসামের আকাশ জুড়ে উড়বে পাকিস্তানের পতাকা। শেষ কালে শ্রীহট্টের সঙ্গে অন্ততঃ কাছাড়কে পাবে বলে ভরসা ছিল। কাছাড়ে তারা সংখ্যায় অল্প নয়। পাশে গা-ঘেঁসে আছে পাকিস্তানী জ্ঞাতি-ভায়েরা। সীমান্তে হানা দিয়ে লুঠপাট করে বার বার তারা জানিয়ে গেছে আমরা প্রস্তুত। মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে পর্য্যন্ত পাকিস্তানীরা এসে ভিড় জমায়। আসামে তাদের আশ্রয় আছে, প্রশ্রয়ও আছে। সুতরাং—

অনেক কথাই বলে গেলেন ভদ্রলোক স্তিমিত কণ্ঠে, জোর-গলায় নয়! কিন্তু সবই কি সত্যি? কেন এতো ভয় আর সন্দেহ? সত্যি সত্যি কারণ আছে তার? আসামের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা না হয় অস্বীকারই করলাম, কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু সদ্দার পেটেলের কেন্দ্রও কি তাই? আর আসামের—এই কাছাড়ের মুসলমান আজও কল্পনা করে—

স্মৃতির পাতায় একটি ছবি ভেসে উঠল। ১৯৪৭ ইংরেজী ১৫ই আগষ্টে শ্রীহট্টের গোবিন্দ পার্কে জনসভার সে ছবি। এক জন বিহারী মৌলানা সভা শেষে 'মোনাজাত' করছেন সে সভায়—সবাই বিড়বিড় করে চলেছে, হয়তো তা পুনরুচ্চারণ করছে। মৌলানা বলছেন, হে মেহেরবান খোদা, তুমিই তো পাকিস্তান 'হাসিল' করেছ, তোমার অনন্ত মহিমা। তথাপি তো পূর্ণ পাকিস্তান আমরা পাইনি,—'তামাম আসামকো পাকিস্তান কর্ দেও মেহেরবান খোদা।' তাঁর গণ্ড বেয়ে পড়ছে জলধারা—এ প্রার্থনা তাঁর মুখের প্রার্থনা নয়, অন্তরের প্রার্থনা। লিয়াকত আলী খাঁ থেকে গোলাম আলী মিয়া পর্য্যন্ত সবাই তাঁরা অকপট।

৩

শ্রীহট্টের কথা আসেই—তাকে উপেক্ষা করলে কাছাড়ের কথা, আসামের কথা বলা চলে না। শ্রীহট্ট অধুনা 'জালালাবাদে' পরিণত হয়েছে। সরকারী এ নামকরণ নয়, বে-সরকারী। প্রবেশ-পথে প্রকাণ্ড বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা হয়ে আছে 'জালালাবাদ'—শাহাজালালের লীলাভূমি। হিন্দুরা বলতেন, সতীর শ্রীহস্ত পড়েছিল শ্রীহট্টে, তাই শ্রীহস্ত থেকে হয়েছিল শ্রীহট্ট। কিন্তু আসলে বোধ হয় নামকরণটা হয়েছিল শ্রীর হট্ট অর্থাৎ লক্ষ্মীর হাট থেকে। মুসলমানরা স্বীকার করতেন না। গৌড় গোবিন্দের দুর্গ-প্রাচীর উড়িয়ে দিয়েছিলেন পীর শাহজালাল না কি মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে 'শিস্ হট্' বলে। তারা আবার 'শ', 'স'কে মুসলমানী রূপ দেন 'ছ' বলে। যেমন সোলতান হল 'ছোলতান'। তাই তাঁরা বলতেন, 'ছিলহট্'। ইংরেজেরা বললেন, সিলেট।

সেই শ্রীহট্টকে নিয়ে আসামের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। একদা আসামের প্রয়োজনেই বাংলার অঙ্গচ্ছেদের পর শ্রীহট্টকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল আসামের সঙ্গে। শ্রীহট্ট ছটফট্ করছিল কাছাড় ও গোয়াল-পাড়ার বাঙ্গালীদের নিয়ে বাংলায় ফিরে আসতে। পরব কালে আসাম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল শ্রীহট্টকে বিদায় দিতে। আসা নায়ক 'কেবিনেট মিশনের' কাছে অকুণ্ঠ-কণ্ঠে অভিমত ব্যক্ত করলে খণ্ডিত বাংলায় যদি পাকিস্তান হয় তবে শ্রীহট্টকে পাকিস্তানের হা তুলে দিতে আসাম কাতর হবে না। যুক্তিও আছে তার, শ্রীহ মুসলমান সংখ্যাগুরু, শতকরা প্রায় সত্তর। সদ্দার পেটেল বুঝে নিলে তাই তো! শ্রীহট্ট আসামের deceased limb—রোগদুষ্ট অং ত' কেটে না-ফেললে আসামের সর্ব্বদেহ রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাব তথাপি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মুখরক্ষা করতেই হবে, তাই হল ' ভোটে'র অভিনয়। সে নাটক সারা রাত্রিব্যাপী অভিনয়ের উপ একখানি বৃহৎ নাটক। সেই অভিনয়ে যবনিকা পড়লে দেখা গে শ্রীহট্ট পাকিস্তানের।

কিন্তু আজ প্রশ্ন আসে, শ্রীহট্টকে অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেই ক রোগ সেরেছে? আসামে মুসলমানের বসতি বিস্তৃত। গোয়ালপ জেলায় অগণিত মুসলমানের বাস। এক দল স্থায়ী, তার চেয়ে বড় দল বহিরাগত অস্থায়ী, স্থায়ী হবার জন্য বদ্ধপরিকর। দরঙ্গ, কামরূপেও তাই। নওগাঁ জেলায় তো মুসলমান যেদিকে ফিরাও আঁ অসমীয়া মুসলমান অল্পই, সবাই সেই পূর্ব্ববঙ্গীয়। এককালে নড়েছিল আসামের, সমস্ত আসাম ছেয়ে যাচ্ছিল মুসলমানে— জমি, গো-চর, সরকারী রিজার্ভ সব যায়গায় উঠেছিল তাদের মাঠে পড়েছিল তাদের লাঙ্গল। স্যার মোহম্মদ সাদউল্লা মুসলীম লীগের কর্ণধার! ব্যবস্থা পরিষদে পর্য্যন্ত তিনি তুলেছেন, পাকিস্তান জিন্দাবাদ! আতঙ্কিত হয়ে উঠে অসমীয়ারা। গেল রাজ্য গেল মান—আসাম বুঝি পাকিস্তান আরম্ভ হ'ল বহিরাগত উচ্ছেদ। হাতীশালার হাতী, ঘোড়া ছুটে গেল তাদের ঘর-দোর ভাঙতে। বন্দুক নিয়ে সিপাহীর দল। তার পরই এলো নব যুগ—স্বাধীনতার যুগ দিল্লীতে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ উৎসব সমাপ্ত হল। চোখের চশমা খুলে যেদিন বৃদ্ধ রাজাগোপাল খোলা চোখে চেয়ে ভারতের মানচিত্রের দিকে, গোটা পাঞ্জাব ও বাংলাকেই ত্যাগ পরামর্শ করেই দিয়েছিলেন তিনি সর্ব্বনাশ এড়াবার জন্যে পণ্ডিত মাত্র অর্দ্ধেক ত্যাগ করেছেন। আসামের প্রধান চেপে বসালেন মাথায়, শ্রীহট্ট বিদায় নিয়েছে, স্বস্তির পড়ল তাঁর। বহিরাগত উচ্ছেদ চাপা পড়ল। সে সমস্যা সমস্যা রইল না। দৃষ্টি গিয়ে পড়ল হিন্দু 'বঙ্গাল'দের ওপর, পুরোপরি অসমীয়া হয়ে পড়, স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা যদি মুসলমান 'বঙ্গাল'রা বলল, আমরা তো অসমীয়া হতেই হিন্দু বঙ্গাল সরকারী কর্ম্মচারীরা ভারতে চাকুরী করবে জানালেও শুনলেন—'ঠাই নাই ঠাই নাই, ছোট এ তরী, সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'—আর মুসলমান বঙ্গালরা পা যাবার সঙ্কল্প জানালেও আবার মত পালটে আসামের দ নিলেন, কারণ ওদের কণ্ঠে শুনলেন, 'পিরিতি করিয়া বাঁধিব, কেন বঁধু ছেড়ে যাবে?'

তথাপি আবার সেদিন 'গেল গেল' করে চেঁচিয়ে উঠেছিল পাঁচ লক্ষ অবাঞ্ছিত মুসলমান না কি আসামে প্রবেশ আসামের মুসলমান অঞ্চলগুলিতে গৃহে গৃহে লিগ,লাল—সাদা

... উঠেছে, এসো পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান এখানে আশ্রয় পাবে। ... ভারত-কেন্দ্রের মাথায়ও বেদনা দেখা দিল। আইন বিধিবদ্ধ ... অবাঞ্ছিত উচ্ছেদের। জানি না, কিসে ওরা হয়েছিল অবাঞ্ছিত। ...ত্রজীব গণতান্ত্রিক রাজ্যে মুসলমান বলেই কি অবাঞ্ছিত হবে ...। তারা কি বলেছিল, আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন 'স্থান', এক দিন ...নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই? এখানেও, যেমন ভাবতে চেয়েছিলাম? ...নে না কিছুই, শুধু ওদের উৎকণ্ঠাই আমরা দেখেছি। কিন্তু ...র উদ্ভব হল নূতন পরিস্থিতির। সীমান্তের ওপার থেকে ছুটে ...তে লাগল অগণিত জনস্রোত—পাকিস্তানের হিন্দু বাঙ্গালীর ...স্রোত। সমস্যা দেখা দিল, কারা অবাঞ্ছিত, আগে যারা এসেছিল ...রা না নবাগতরা? বাঙ্গালী হিন্দু গর্ব্বিত, তাদের ভাষার গর্ব্ব, ঐতিহ্যের গর্ব্ব। বৃহত্তর বঙ্গের পরিকল্পনা তাদের মাথায়। এ-... সহ্য করা যায় না, সহ্য করলে বিপদ আছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ... পর্যন্ত শঙ্কাতুর ওদের জন্যে। তাই—অবাঞ্ছিতরা এস্তেই গেল ...দেশে ঘাঁটিতে। সংবাদপত্র সংবাদ প্রকাশ করলেন, পাঁচ লক্ষ ...স্থিতের মধ্যে মাত্র চার জনের উচ্ছেদ ঘটিয়েছেন সরকার। ...দায়িক উৎপাতে বা উৎপাতের আশঙ্কায় যারা পালিয়ে গিয়েছিল, ...রা আবার ফিরে আসছে দ্বিগুণ-তিন গুণ হয়ে। সাদরে সম্বর্দ্ধিত হচ্ছে ...রা। আর নবাগত হিন্দু বাঙ্গালীরা? তারা বলে উদ্বাস্তু, কেউ ...লে আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থী, আসাম বলে 'ভগনীয়া'—পলায়ন ক'রে এসেছ তোমরা। আশ্রয়-শিবিরেই তোমাদের স্থান, তা'ও ...ই দিনের জন্যে নয়!

হিন্দু বাঙ্গালী কেন আসামে অবাঞ্ছিত—হয়তো তার যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে, হয়তো বা সত্যিকার কোন কারণই নেই। কে জানে সংস্কৃতি ও সভ্যতা-গর্ব্বী বাঙ্গালী নিজেদের কৃতকর্ম্মেই এক দিন ভয়ের উপাদান সৃষ্টি করেছিল কি না? কিন্তু বঙ্গাল-বিদ্বেষ যদি পাকিস্তান-প্রসারী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়? ...জীও হয়তো জানেন সব, হয়তো বা জানেন না। জানলেও ... পারেন, ভয় কি, দৃষ্টিকে এতো সীমাবদ্ধ করে রেখো ... আমি স্বপ্ন দেখছি world federation-এর। সেখানে ... পাকিস্তান, তুর্কিস্তান, উজবেগীস্তান সবই যে এক হয়ে ... সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতার কথা বোলে আমার সে মহাস্বপ্ন ভঙ্গ ...। আমরা সাধারণ লোক, রাজনীতির বেদ উপনিষদ ... নেহাৎ রামায়ণ মহাভারতেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাই ভবিষ্যৎ ...রে উঠি। আর অসহায় হয়ে ভাবি, চরম আঘাত ...ন্ত বুঝি রাজনীতিকদের স্বপ্নভঙ্গ হবে না।

৪

আশ্রয়-শিবির। স্কুল আর মাদ্রাসার সে ঘরগুলি। ...য়েছে ছুটী আর তাদের ক্লাশগৃহগুলিতে পড়েছে ঢালা ... ছোট এক একটি ঘরে গাদাগাদি লোক। নরনারী-...। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত রাত্রি অনেকে কাটায় বারান্দায়, ...রা গাছের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সম্প্রতি ভারত ... নিয়েছেন ওই সব আশ্রয়প্রার্থীর। এ নিয়েও দলাদলি। ...ছেন, আসাম রাজ্যের ওপরই থাক্ ভার, আর এক দল ... পক্ষপাতী। কিন্তু যিনিই ভার গ্রহণ করুন, ওই সব হতভাগ্যদের দিনের আহার জোটে সন্ধ্যায়, রাতের ডাল-ভাত রাত্রিশেষে।

আবার বে-সরকারী স্বেচ্ছাব্রতীদের চুলোচুলিও লেগে আছে। চার-পাঁচটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র সহরে—যেন, 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'। এ বলে আমাকে ছাখ, ও বলে আমাকে ছাখ। আসলে যাদের দেখবার কথা তাদের কেউ ফিরে দেখে না। সমিতির বৈঠকে দুর্গত-সেবার প্রশ্নের কথা ছাপিয়ে ওঠে দলগত সংগ্রামের আস্ফালন। হতভাগ্যরা তথাপি আশায় বুক বেঁধে থাকে। কেউ-কেউ বা চুলোচুলি-কিলোকিলিতে যোগও দেয়।

আশ্রয়-শিবিরের বাইরে লেখা আছে বিনা-অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। কি-জানি, ঘরের কথা ফাঁস হয়ে যাবার ভয় আছে কি না। অনুমতি নিয়েই দেখতে গেলাম ওই শিবিরগুলি। শিবিরের অধিবাসীরা চেয়ে থাকে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি মেলে। এ আবার কে এলো, কোন বাণী নিয়ে? বলতে এসেছে ফিরে যাও তোমরা? অথবা চা-বাগানের জঙ্গলে চালান দিতে চায়? জানে না, আমি গেছি শুধু কৌতূহল নিয়ে আর জানতে কি করে পিতৃপুরুষের ঘর ভাঙল তাদের। 'কোথায় কোন্ গ্রামে ছিল তোমাদের বাড়ী, কি ঘটেছিল সেখানে, এসেছ কতো দিন?' অদম্য কৌতূহল! কিন্তু আঘাত ছিল ওৎ পেতে বসে। একটি লোক, কালো শীর্ণ দেহ, এগিয়ে এলো কাছে। বলল, চিনতে পারেননি আমাকে? এই তো সে-বছর পণ্ডিত জওহরলালকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের অঞ্চলে, তারো আগে একবার সুভাষচন্দ্রকে? আমার ওই মেয়েরা দিয়েছিল পণ্ডিতজীর গলায় গাঁদা ফুলের মালা। পণ্ডিতজী বলেছিলেন, স্বরাজ আসছে, আমরা যেন প্রস্তুত থাকি। কংগ্রেসকে ভোট দিতে আদেশ করেছিলেন তিনি। থামল লোকটি। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, আচ্ছা, পণ্ডিতজী আসবেন না এদিকে একবার? আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ছেলে-মেয়েরা সবাই এসেছে সঙ্গে? কি যেন হল তার, রুদ্ধকণ্ঠে বললে, বড় মেয়েটি ছাড়া সবাই এসেছে। ঘরের ভেতরে একটি মেয়েলোক কেঁদে উঠল, চাপা আর্তনাদ তার কণ্ঠে। লোকটি বলল, কাঁদছে তার স্ত্রী। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম সেখান থেকে। কেন কাঁদছে, কি তার দুঃখ, বেদনা—প্রশ্ন করার সাহস নেই।

হয়তো আমার সমস্ত কৌতূহল সেদিনকার মতো সেখানেই ক্ষান্ত হত, কিন্তু দূরে ওই গাছের তলায় বসে যে লোকটি আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বিড়ি টানছেন, তাঁর তীব্র আকর্ষণ টেনে নিল আমাকে। বহু পরিচিত ওই লোকটি, এক জন স্কুল-মাষ্টার—কবিয়াল। সখের কবিয়ালী করে বেড়াতেন, আসল পেশা ছিল ছেলে মানুষ-করা। তিনিও এখানে? এগিয়ে গেলাম সেখানে, মাষ্টার আপনিও এখানে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি: হ্যাঁ, আসতেই হল! প্রশ্ন করলাম: সবাইকে নিয়ে? তিনি বললেন: তাই, সবাইকে নিয়ে।

আরো ছিলেন দু'জন কবিয়াল, একই দলের। তাঁরাও কে কোথায় ছিটকে পড়েছেন এ কবিয়াল জানেন না। জানতে চাইলাম, এখনো গান আসে, কবির ছড়া? উত্তর দিলেন: না, গাইতে গেলে কান্না আসে।

তাই তো, কান্না আসে। অথচ এককালে এঁদের আসরে উপভোগ করেছি কবিয়ালদের অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি। কি ছিল তাঁদের উপস্থিত-বুদ্ধি। ক'বছর আগে বসেছিল এক সাহিত্য-সম্মেলন। বিকেল তিনটায় কবির পাঁচালীর কার্য্যসূচি। কিন্তু সভাপতি অনুপস্থিত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিয়ে গেছেন আর-একটি সভায় সভাপতি বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিককে। ফিরে এলেন তাঁরা অনেক পরে। ততক্ষণে কবির আসর সুরু হয়ে গেছে। কবিয়ালরা দু'জনেই মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মুখে মুখে রচনা করে গান আরম্ভ করে দিয়েছেন। সভাপতিরা দু'জনে পরামর্শ করে এসেছিলেন, নিজেদের গলার মালা পরিয়ে দিলেন দুই কবিকে। যেন দেরীর কৈফিয়ৎ। তৎক্ষণাৎ এক জন কবিয়াল গানের সুরে বললেন,

'মালা দিল গলে রে ভাই
মালা দিল গলে,
বাসি মালা পেয়ে আমার
সারা অঙ্গ জ্বলে।'

আর এক জন সঙ্গে সঙ্গেই গাইলেন,—

'দুঃখ কি ভাই জানা-কথা
ওরা হলেন পতি,
আমরা উপ চিরকালই
বাসি মোদের গতি।'

কথা-সাহিত্যিক বিস্মিত হলেন, বললেন: আশ্চর্য্য তো! বাংলার কবিয়াল শিল্পীদের এক জন আশ্রয়-শিবিরের একটি গাছের তলায় বসে ভাবছেন। কণ্ঠে তাঁর ভাষা নেই, আছে কান্না। কবিয়াল বললেন অনেক কাহিনী, কি প্রলয় বয়ে গেছে জেলার ওপর। কিসে তাঁরা আজ ঘরছাড়া। সে ঘর আর বিধাতাও বুঝি তৈরী করে দিতে পারেন না। বললেন এক জন তর্কতীর্থ পণ্ডিতের কথা। টোল ছিল তাঁর, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর সব গেছে। অত্যাচারে অত্যাচারে গেছে জাতিও। তাঁকে রক্তাক্ত দেহে পড়তে হয়েছিল 'কলমা'। আজ তিনি উন্মাদ। লুঙ্গী পরে আছেন আর বলছেন, ভগবান তো নেই, খোদা, তুমি কি আছ? অশ্রুজল মুছলেন তিনি, তার পর—কবিয়াল প্রশ্ন করলেন: কি করব এখন বলতে পারেন? চা-বাগানে আমাদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা হচ্ছে। তা'ও ক'জনের। যারা গিয়েছিল, ফিরে পালিয়ে আসছে, মশা-মাছি, রোগ-শোক, বনে বাঘ-ভালুক। তার উপর দা'-কুড়োল হাতে দিয়ে বলা হচ্ছে, ঘর বাঁধ, নিজের হাতে। নিজের পায়ে দা'-কুড়োল হয় তো বসাতে পারি, গাছ-বাঁশে পারি না। আবার নিত্য শুনছি, আসামে যায়গা-জমি নেই, আদিম অধিবাসীরাই অনেকে ভূমিহীন। তাড়া খেয়ে-খেয়ে ফিরছে লোক। এমনি ছুটাছুটি করেই মরব আমরা? কৃষকেরা যদি জমি না পায়, আমরা উপযুক্ত কাজ না পাই, তবে কি করে বাঁচব?

উত্তর আমি দিতে পারি না, দেবেন নেতারা, যাঁরা দেশ ভা[গ] করেছেন। আর আসামে যায়গা হবে না, সে তো জানা কথ[া,] তুমি যে বাঙ্গালী।

পলায়নী-মনোবৃত্তি আমাদের, কেন, দেশ-ভাগ কি শুধু নেতারা[ই] করেছিলেন? আর নেতৃত্ব—আমরা যদি নৈবিদ্যের চাল হয়ে জ[মে] না বসি, তা'হলে মাথায় কলা হয়ে তাঁরা চেপে বসবেন কি করে?

৫

ফেরবার দু'দিন আগে। দেখা হল এক জন মুসলমান ব[ন্ধুর] সঙ্গে। অতি-ব্যস্ত তিনি! লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচন এসে[ছে,] বহু মুসলমান প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেসের টিকিটে। বন্ধু বললে[ন:] ভালই হল, এসেছেন এখানে। সিলেট থেকে যারা এসেছে, তা[দের] ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। সেখানে আর কোন ভয় [নেই।] আমাদের যারা গিয়েছিল, তাদের সবাইকে আমরা ফি[রিয়ে] আনছি।

অসমীয়া এক জন নেতা এসেছিলেন, তিনি বললেন, [অতীত] চিরকালই অতীত। দৃষ্টি রাখতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। [সে] ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করেই পণ্ডিতজী চুক্তি করেছেন। বাঙ্গা[লীকে] পাকিস্তানে গিয়ে সে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। তাই [...] চাই। এখানকার ঐক্য আমরা বিনষ্ট করতে পারি না, [হিন্দু-]মুসলমান ঐক্য। মহাত্মাজী তো সে-স্বপ্নই দেখে[ছিলেন।] আমরা তাঁরই অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করব, মুসলমানদের [...] করব। দুঃখের কথা, এ পথে বাধা পাচ্ছি বাঙ্গালীদের কাছ [থেকে।]

একেবারে দুশ্ছেদ্য দুরধিগম্য যুক্তিজাল! অসমীয়া ব[ন্ধু ...] বলছিলেন অসমীয়ায়, আমি বাংলায়। এককালে ইনি [...] বাংলা বলতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ আওড়াতেন। বা[ংলা ...] ভুলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে ভুলেছেন কি না জানি না[।] [...] দিলাম না, শুনেই গেলাম বন্ধুর কথা।

ফিরে চললাম আসাম ছেড়ে। আবার উড়লাম [...] পনরো দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়েই ফিরলাম। বা[র বার] মনে হতে লাগল, আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আবর্ত্তে প[ড়ে ...] পণ্ডিতজী আজ দিগ্‌ভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত, কিন্তু আসাম কোন্ বা[...] চলছে? দুর্ভাবনার কথাই বটে। কিন্তু আমার ভাবার [...] কি? ভারতীয় বলে?

পাকিস্তানের উপর পড়লাম ঝড়ের মুখে। সে[...]ক কাণ্ড। কয়েক জন ছিটকে পড়ল, এদিকে ওদিকে। কো[...] আটেনি তারা। কারো মাথা ফাটল, কারো ছড়ে গেল [...] সোঁ করে একবার পাতালমুখী নামতে লাগলাম, আবার টা[...] উঠলাম ঊর্দ্ধে।

ভারত তথা আসাম কি এমনি ঝড়ের দিকেই এগি[য়ে ...] আগে থেকে সাবধান না থাকলে পাইলট কি ঝড় কাটি[য়ে] আসতে পারবে মেঘশূন্য আকাশে?

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোলো

কতকগুলি গঠনমূলক ঘটনার ভিতর দিয়া আরও তিনটি মাস নিরুপদ্রবেই অতিবাহিত হইয়াছে। ঘটনারাজির অল্প-বিস্তর বৈচিত্র্য জনসাধারণের অন্তরে যথেষ্ট চাঞ্চল্যও তুলিয়াছে। যথা—

বিভিন্ন পল্লীতে চণ্ডীর শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা কিছু কিছু পরিবর্তিত আকারে কার্যকরী হইয়াছে। উপরন্তু মল্লিকপুরের ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষারও অঙ্গাঙ্গী ব্যবস্থা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। গাঙ্গুলী বাবুদের বিশাল জমিদারীর মধ্যে যে যে অঞ্চলে তহশীলদারীর কাছারী বিদ্যমান—বিঘার পর বিঘা মুক্ত জমি, চারি ধারে ঝিল, বড় বড় বাগান ও পুষ্করিণী-সংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ বাড়ী অধিকার করিয়া জমিদার সরকারের প্রতিনিধিরূপে এক এক তহশীলদার মুহুরী ও পাইক-বরকন্দাজদের সহিত বসবাস ও প্রজা শাসন করিয়া থাকে, সেই সুবিস্তীর্ণ সরকারী জমিতেই প্রস্তাবিত পাঠশালা, পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিবার আয়োজন চলিয়াছে। কয়েক স্থানে গৃহের প্রাচুর্য থাকায়, প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছে ; অন্যান্য স্থানে গৃহ নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। একই স্থানে পাশাপাশি বাড়ীতে বিভিন্ন বিভাগের এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। ডাক্তার রায় স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিবে, তাহাদিগকে শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষার প্রণালীও শিক্ষা দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইবেন। বাগুলীর এক দল শিক্ষিত তরুণ এ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, এবং ডাক্তার রায় কলিকাতা হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন কতকগুলি কৃতী কর্মীকে আনিয়াছেন—চিকিৎসা ব্যাপারে যাঁহাদের মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে, পল্লী অঞ্চলে থাকিয়া আর্ত্তসেবাই একান্ত কাম্য এবং পিছনে কোন আকর্ষণও নাই। ফলে, গ্রামাঞ্চলে রীতিমত একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য, তহশীলদারদের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রার পথে এই সব কর্মচাঞ্চল্য উপদ্রব-স্বরূপ হইলেও, স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কল্পনাও করে নাই যে, কিছু দিন পূর্বে যে সব বড় বড় কথা তাহারা শুনিয়াছিল, সত্য সত্যই এত শীঘ্র তাহা কার্যে পরিণত হইবে।

ওদিকে মাধুরী দেবী সরস্বতী পরগণাটি নিবারণকে দানপত্র দ্বারা অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নিবারণের ইচ্ছা ছিল যে, বাগুলীর সেরেস্তা হইতে তাহার তালুকের সেরেস্ত[া] তুলিয়া তালুক-সংলগ্ন সরস্বতী-কানন নাম[ক] উদ্যান-ভবনে স্থাপিত করিবে। কিন্তু কার্য্য[ত] তাহা হয় নাই। ইহার পিছনে যে কাহি[নী] প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা বিশেষ রহস্যময়।

বৈদ্যনাথ কবিরাজের পরিবারবর্গ দিবানিদ্রায় একান্ত অভ্যস্ত এবং এ ক[...] তৃতীয় প্রহরটি ব্যাপিয়া বৃহৎ বাড়ীখা[না] প্রায়ই নিস্তব্ধ থাকে, এ তথ্য নিবারণে[র] অবিদিত ছিল না। সুতরাং ইদানীং প্র[...] প্রত্যহই এই প্রহরটির প্রারম্ভে বাহিরে[র] রুদ্ধদ্বারে অতি সন্তর্পণে আসিয়া সে দাঁড়াই[বা] মাত্র, বাতায়ন-পথে প্রতীক্ষারত দু'টি বুদ্ধিদী[প্ত] কৌতূহলী চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠিত, এবং পরক্ষণে ভিতর হইতে [...] করিয়া রুদ্ধ দ্বারটি খুলিয়া দিয়া তরুণী তরলা সহাস্যে তাহা[কে] পার্শ্বের ঘরে লইয়া যাইত। পুরুষের উৎপীড়ন হইতে বিবাহি[তা] নারীদের মুক্তি সম্বন্ধে সেখানে তাহাদের বহু বহু পরামর্শ হই[ত]। ডাক্তার মনোনয়ন ব্যাপারে নিবারণের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতাকে [...] নিজের ব্যর্থতা ভাবিয়া বেদনাহত হইলেও, সে মনে মনে স্থি[র] করিয়া ফেলে যে, ঐ ডাক্তারকেই পুনরায় বাগুলীতে আনা[...] উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে দিয়া সকলের তাক লাগাইয়া দি[...] তাহাতেই নিবারণের জিদ প্রকারান্তরেও অন্তত বজায় থা[কি]... মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া নিবারণ ভাবে, এমন ভাবে [...] কেহ তাহাকে উৎসাহ দেয় নাই—সেই কুখ্যাত বিশু ডাক[াত] ছাড়া। উৎসাহদীপ্ত দৃষ্টিতে তরলার আরক্ত মুখের [...] চাহিয়া নিবারণ বলিয়া উঠে—'আপনি যদি আমাকে [...] যুগিয়ে দেন ত আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি।' [...] মুখে বুদ্ধির প্রশংসা শুনিলে আত্মপ্রসাদে অভিভূত [...] পড়ে না এমন মেয়ে পৃথিবীতে অতি বিরল। তরলা ভাবিতে [...], এই জেদী ছেলেটির ঘটে এমন কিছু বুদ্ধি যোগান দিবে যাহা [...] সার্থক হয়। সে জিজ্ঞাসা করে—'বিদ্যা-ভারতীর কাজ [...] গেছে শুনেছেন ত ?'

নিবারণ শুষ্ক স্বরে উত্তর করে—'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা পেলিয়েছে [...] তালুকের মধ্যে অনেকগুলো মৌজা আছে ত, প্রায় [...] মৌজাতেই আগে থেকেই এক-একটা কাছারী খোলা হয়—ঐ [...] যেটা সেরা আর উঁচু জমি, সেখানেই কাছারী-বাড়ী [...] দিকে ঝিল, ভিতরে অনেকখানি করে ফাঁকা জমি, বাগান, [...] তার মাঝখানে কাছারী-বাড়ী। একবারে তৈরী সবই [...] বলা চলে। যদি কখনো সদর থেকে কর্তারা মহাল দেখতে [...] কিছু দিন ওখানে থাকেন, সেই ভেবে কাছারী-বাড়ী[...] মালিকদের থাকবার মত আলাদা মহল প্রত্যেক জায়গা[য়] একই আদলে তৈরী করিয়েছিলেন আমার খেয়ালী বাবা। লোকে মফস্বলের ঐ বিরাট কাছারী-বাড়ীগুলো দেখে কত কথা [...] জানে—ও থেকে আর কিছু নেই, একটা ফাঁকা খান[...] দেখানো ছাড়া ; মাঝে থেকে নায়েব-গোমস্তারাই লাভবান [...] বছর খানেক আগেও আমি কাছারী-বাড়ীর বাইরের দিক[...] বাকি বাড়ী, জমি, দীঘি, ঝিল সব বিক্রি করবার প্রস্তাব তুলে[...]

কিন্তু বাবা তাতে বলেছিলেন—ওগুলো বিলি করলে আয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, আমার মানটা সে তুলনায় একশো গুণ খর্ব হবে। অথচ, আজ নতুন বৌ ক্ষমতা হাতিয়ে নিয়ে তাঁর খেয়াল মত বাজে কাজে সেগুলো লাগাচ্ছেন! এক পয়সা আয় নেই, কিন্তু খরচ যা হোচ্ছে তা কহতব্য নয়। পাঠশালা হবে, লাইব্রেরী হবে, ডাক্তারখানা, তার পর মেয়েদের আব্রু বজায় রেখে শেখাবার ব্যবস্থা—এলাহি কাণ্ড! বাবারও মুখ বন্ধ, বলবার কিছু নেই।'

সেদিন স্তব্ধ ভাবেই তরলা নিবারণের কথাগুলি শুনিয়াছিল। তাহার বুঝিতে অসুবিধা হয় নাই যে, পুত্র হইয়াও নিবারণ তাহার ... পিতাকে বুঝিতে পারে নাই। এক দিন আয়বৃদ্ধি হইবে ... তিনি পুত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অথচ ... সম্পর্কেই ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিদ্যাভারতীর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছুই ... নাই। নিশ্চয়ই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, শেষের ... যে পরিমাণে অপব্যয় হইবে, তাহার শতগুণ উর্দ্ধে উঠিবে ... মান। তরলা ভাবিতে থাকে, এই বিরাট পরিকল্পনার সঙ্গে ... ঘনিষ্ঠ ভাবে সেও সংশ্লিষ্ট ছিল, বিদ্যাভারতী সেদিন তাঁহাকে ... ডান হাত ভাবিয়া আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তার পর ... দিন এক দণ্ডেই এমন ভাবে মতান্তর ঘটিল যে, পূর্বের নিবিড় ... তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া শতছিন্ন হইয়া গেল—সেই যে সে তাঁহার ... হইতে সদর্পে চলিয়া আসিয়াছে, সেখানে পুনর্গমনের পথও ... সঙ্গে বন্ধ হইয়াছে। আজ, সেই পরিকল্পনার রূপ-রেখা বুঝি ... মতই তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে উত্তাপ-... একটা দুঃসহ জ্বালা ধরাইয়া দিতেছে। এই জ্বালার অবসান ... হইলে কোন্ পথে গিয়া তাহাকে আশ্রয় লইতে হইবে—... নিবারণ তাহার যে বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছে—সেই বুদ্ধির ... বাহির করা চাই। তাই নিবারণের কথার উত্তরে ... কণ্ঠে তাহাকে বলিতে হয়—'আপনার খেয়ালী বাবার ... করবার কৌশল উনি জানেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ... এক সময় ওঁর স্নেহটুকু পুরোপুরি দখল করে বসেছিলেন, ... সুযোগই তখন হারিয়ে ফেলেছেন—কিছুই আদায় করে ... পারেননি। কিন্তু আপনার বৌদির কাণ্ড দেখুন, তাঁর বরাতে ... যোগটি আসবা মাত্রই তিনি নিজের কোলে ঝোলটুকুর ঝোল ... নিলেন—ছিটেফোঁটাও আর নেই নেবার মত। তাই ... কে ছেড়ে এখন মাকে ধরুন—যদি কিছু পাবার থাকে ... এখনো আছে।'

... কথায় নিবারণের চক্ষু অমনি খুলিয়া যায়; সেও বুঝিতে ... এখন পর্যন্ত গাঙ্গুলী-বাড়ীর অন্দরে তাহার মায়ের অখণ্ড ... পিতাকেও সে প্রভাবের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। ... কে বড় করিবার জন্য—কৌলিক মর্যাদার সহিত তাহার ... মায়ের প্রচেষ্টাও ত সে সবই জানে এবং উপরন্তু তাহার ... বিপুল আয়সম্পন্ন সরস্বতী পরগণা নামক বিস্তীর্ণ তালুকের ... এ তথ্যও ত তাহার অবিদিত নহে। বাগুলীর গদী ... ত্যাগ করিতেই হয়, তাহা হইলে মাতৃস্বত্বে এই তালুকের ... সে ত প্রতিযোগী ভূস্বামিরূপে নূতন করিয়া ভাগ্যের ... করিতে পারে! এবং তখন হয়ত এই মনস্বিনী ... বুদ্ধির আলোকে সাফল্যের পথটিও চিনিয়া লইতে সমর্থ হইবে। তরলার এই ইঙ্গিতই তৎকালে নিবারণকে মায়ের সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া তোলে এবং অভিমানিনী মাতা পুত্রের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

কার্যোদ্ধারের পর মায়ের দানপত্র এবং সম্পত্তির হস্তবুদ তরলাকে দেখাইয়া নিবারণ যেদিন সহর্ষে বলে—'জানেন, এর বার্ষিক মুনাফা বিশ হাজার টাকা, সাত বছরের মুনাফার টাকা মা'র নামে আলাদা জমা ছিল—সেটাও মা এই সঙ্গে আমাকে দিয়েছেন? আবার ইচ্ছা কি জানেন, নদীর ধারে আমাদের যে বিখ্যাত বাগান-বাড়ী আছে, নাম—সরস্বতী-কানন, ঐখানেই সেরেস্তা বসাব। আপনি কি বলেন?' তরলা বলে—'আমার একটা কথা শোনেন ত বলি।' নিবারণ বলে—'আপনার বুদ্ধিতেই যখন চলতে হবে, শুনবো না মানে? বলুন আপনি।' তরলা একটু ভেবে ব'লতে থাকে—'দেখুন, বিশু ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে সরস্বতী-কাননে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড যখন বাধিয়েছিলেন, এখনই ওখানে কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়; বরং বাগুলীতে থেকেই আপনাকে কাজ করতে হবে।' নিবারণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলে—'ঐ বাড়ীতেই থেকে?' তরলা জানায় —'না। এমন বাড়ী চাই, যার বার-মহলে আপনার সেরেস্তা আর থাকা চলবে, ভিতর মহলে আমাদের সমিতির কাজ হবে।' নিবারণ একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই বলে—'সে ত খুব ভালো হয়, কিন্তু তেমন বাড়ী এখানে পাই কোথা?' মুখ টিপিয়া হাসিয়া তরলা বলে—'এই ত! জমিদার হোয়েও জমির সঙ্গে আপনাদের চেনা-শোনা নেই, রায় সাহেবের হাবেলির কথা ভুলে গেলেন? খালি পড়ে আছে—ঐটে কিনে ফেলুন না?'

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ কে যেন দপ্ করিয়া একটা আলো জ্বালিয়া দিল। নিবারণের মনে পড়িয়া গেল, বৎসর কয়েক পূর্বে কলিকাতা হইতে এক রায় সাহেব আসিয়া বাগুলীর কোন ... অধিবাসীর বাস্তুভিটাসংলগ্ন প্রায় বারো বিঘা লাখরাজ জমি ক্রয় করেন ও সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীত জমির উপর বাগুলীর জমিদার-বাড়ীর আদর্শে হাতাওয়ালা প্রকাণ্ড দেউড়ীযুক্ত এক বৃহৎ অট্টালিকা ফাঁদিয়া বসেন। নদীর দিকেও এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে একটা পাটের কল নির্মাণের পরিকল্পনা করিতে থাকেন। হরিনারায়ণ বাবু সে সময় সস্ত্রীক তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, বাহিরের এক দাম্ভিক শিল্পপতি তাঁহার বুকের উপর বাঁশগাড়ী চাপাইয়া বসিয়াছেন! অর্থাৎ তাঁহারই এলাকায় লাখরাজ জমি অবলম্বন করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতে এমন এক ইমারত বহিরাগত এই মানুষটি গাঁথিয়া তুলিতেছেন, যাহাতে তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে না। তাহার পর যেই শুনিলেন, বাগুলীতে বিরাট প্রাসাদ তুলিয়া উক্ত রায় সাহেবটি সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রায় দুই মাইল পরিমিত স্থান বন্দোবস্ত করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তখন তিনি রীতিমত গম্ভীর হইলেন। বহিরাগত ব্যক্তি তাঁহার এলাকায় আসিয়া বিপন্ন অধিবাসীর বাস্তুভূমি যদি কিনিতে সমর্থ হইল, তাঁহার সেরেস্তা নীরবে তাহা কেমন করিয়া দেখিল, এই কৈফিয়ৎ যখন তিনি দেওয়ানজীর নিকট ...

করিলেন, তাঁহাকেও অপ্রস্তুতের একশেষ হইতে হইল। বস্তুত পক্ষে, ঐ চতুর ব্যক্তিটি চুপি-চুপিই বিক্রয়-কার্যটি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রায় সাহেবের অট্টালিকার নির্মাণকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরিনারায়ণ বাবু নীরব রহিলেন, বাহিরের কেহই এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিল না। ওদিকে রায় সাহেবও স্বীয় পদবী ও ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে হরিনারায়ণ বাবুর দ্বারস্থ না হইয়া আইনসঙ্গত উপায়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে নদীতীরবর্তী অঞ্চলটি রিকুইজিসন করিয়া লইবার জন্য তদ্বির করিতে লাগিলেন। সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া হরিনারায়ণ বাবু আরও গম্ভীর হইলেন।

এদিকে গৃহ নির্মাণের পর রায় সাহেব ঘটা করিয়া গৃহপ্রবেশের আয়োজন করিলেন। বহির্মহলের প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণে সারি সারি পটমণ্ডপ পড়িল উৎসবের পূর্বদিন আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজনের ভোজ ও রাত্রিবাসের জন্য। পরদিন ক্রিয়াকর্মাদির পর শুভলগ্নে নবগৃহে প্রবেশ করিবেন। সেদিন মধ্যাহ্নে বিরাট ভোজেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম প্রহরে—পটমণ্ডপের পাকশালায় পাচকগণ যখন রন্ধনে ব্যস্ত, অপ্রত্যাশিত ভাবে সমস্ত মণ্ডপ ব্যাপিয়া এমনই ভয়াবহ ভৌতিক কাণ্ড সুরু হইল যে, আসন্ন উৎসবানন্দ নিদারুণ এক ব্যসনে পরিণত হইল। তরুণ দলের তাসের আড্ডা, প্রবীণদের সতরঞ্চি খেলার চাল, মহিলাদের গল্প-গুজব একসঙ্গে সব স্তব্ধ হইয়া গেল। প্রথমেই যুগপৎ সমস্ত আলোগুলি নির্বাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক হইতে মুষলধারে ঘোলা জল, পুকুরের পচা পাঁক, ইট-পাথর প্রভৃতি বৃষ্টিধারার মত পড়িতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অদ্ভুত স্বরে একটা সতর্ক-বাণী স্তব্ধ-বিস্ময়ে সকলে শুনিতে পাইল, তাহার মর্ম হইতেছে—এই ব্রহ্মভিটার প্রতিষ্ঠাতার অতৃপ্ত আত্মা এখানে তাঁহার বংশধর ভিন্ন অন্য কাহাকেও তিষ্ঠাইতে দিবে না। এ ভিটায় দীপ জ্বলিবে না, যাগ-যজ্ঞ হইবে না, কেহ পাত পাড়িবে না, বাস করিবে না—সাবধান!

রায় সাহেব দরোয়ানদের ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না—তাহারা সন্ধ্যার পর দেউড়ীর ভিতরে চৌতারায় বসিয়া মহোল্লাসে সিদ্ধির ভাণ্ডারা খুলিয়া দিয়াছিল; দুর্ঘটনার পরে তাহাদিগকে জমিদার-বাড়ীর পাইকবর্গ বাড়ীর বাহিরে একটা ডোবা হইতে বেহুঁস ও বিশ্রী অবস্থায় উদ্ধার করিয়া আনে। পটমণ্ডপ হইতে তুমুল আর্তনাদ শুনিয়া বাগুলীর জমিদার-বাড়ী হইতে সেরেস্তার কর্মচারীরা পাইক-বরকন্দাজদের লইয়া সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়। তৎপূর্বেই ভৌতিক কাণ্ড থামিয়া গিয়াছিল। গ্রামবাসীরাও অকুস্থলে ছুটিয়া আসে। জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে রায় সাহেবের হঠকারিতার নিন্দা করিয়া বলেন—'আপনার উচিত ছিল, এ ভিটে কেনবার আগে আমাদের জিজ্ঞাসা করা। আপনি টাকাগুলি জলে ফেলেছেন, আপনি ত এ ভিটের টিকতে পারবেনই না, সাধলেও কেউ এ বাড়ীতে মাথা গলাবে না।' দৈবজ্ঞের মত মর্মভেদ ভাষায় কথাগুলি শুনাইয়া তিনি যে ভীড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। ভৌতিক উপদ্রবে পাকশালা বিধ্বস্ত ও ভাণ্ডারজাত যাবতীয় বস্তু অব্যবহার্য হওয়ায় পটমণ্ডপ হইতে সকলকেই সম্বর্দ্ধনা করিয়া জমিদার-বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং ভূরিভোজের পর সেখানেই বিশিষ্ট ও সুষ্ঠু ভাবে রাত্রিবাসের সুব্যবস্থা বিপন্ন উদ্বাস্তুদিগকে চমৎকৃত করে। পরদিনই রায় সাহেব সজ্জন হরিনারায়ণ বাবুকে

ধন্যবাদ দিয়া সেই যে বাগুলী হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যান, তাহার পর আর কোন দিন তাঁহাকে বাগুলীর পরিত্যক্ত বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বা পূর্ব-পরিকল্পিত জুটমিল সম্পর্কে নদীতীরস্থ অঞ্চলগুলি রিকুইজিসনের জন্য উদ্যোগী হইতে দেখা যায় নাই। পূর্বোক্ত দুর্ঘটনার পর কলিকাতায় গিয়া রায় সাহেব সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া যে শয্যায় শয়ন করেন আর তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় সে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় নাই—দীর্ঘ ছয় মাস কাল একাদিক্রমে যন্ত্রণাদায়ক রোগভোগের পর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তৎপূর্বে পরিজনবর্গকে নিষেধ করিয়া যান যে, বাগুলীর অভিশপ্ত বাড়ীতে তাঁহার বংশের কেহ যেন কখনও বসবাস করিবার সঙ্কল্প পোষণ না করে। সুতরাং তদবধি উক্ত সুবৃহৎ অট্টালিকা সেই ভাবে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছে—পল্লীর অতি বড় সাহসী লোকেরাও রায় সাহেবের এই ভুতুড়ে হাবেলীর ত্রিসীমায় যাইতে ভরসা করে না।

তরলা-কথিত 'রায় সাহেবের হাবেলী' নামক বাড়ীর ইহাই মোটামুটি ইতিহাস এবং এই নামটি শুনিবা মাত্রই নিবারণের স্মৃতিপথে অতীতের উক্ত রহস্যময় কাহিনী সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অতঃপর তরলার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের স্বরে সে প্রশ্ন করে—'সেই ভুতুড়ে বাড়ীর কথা বলছেন?' তরলা কলকণ্ঠে উত্তর দেয়—'ভুতুড়ে? আপনারাই, ভয়ের কি আছে?' সবিস্ময়ে নিবারণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করে—'এ কথার মানে?' তরলাও তেমনই সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দেয়—'মানেটা কি এত দিনেও আপনি ভেবে ঠিক করতে পারেননি? আমার কাছে কিন্তু জলের মত সোজা হয়ে গেছে নিবারণ বাবু!'

—কি রকম?

—রকমটা হোচ্ছে অবাস্তবের জঞ্জাল থেকে বাস্তব তথ্যটি [illegible] বার করা।

অবাক হইয়া তরলার মুখের পানে চাহিয়া থাকে নিবারণ। [illegible] এক ঝলক হাসিয়া বলিতে থাকে—'দেখুন, ইদানীং মানুষ [illegible] আমার একটা সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই, অনেককেই [illegible] হয় আমাকে, সে পড়ায় সাহায্য করে ঘটনা। ঐ ভুতুড়ে [illegible] গল্প শুনে শুনে আমার মনে কত যে প্রশ্ন উঠেছে কি বলব [illegible] মধ্যে কিন্তু বড় হয়ে উঠেছেন আপনার বাবা। আমি [illegible] ওঁকেই ভালো করে পড়বার চেষ্টা করছি। আশ্চর্য্য, ছেলে [illegible] আপনি যেটা উপেক্ষা করে গেছেন। কিন্তু আপনার [illegible] পরের মেয়ে হোয়েও সেটা ধরে রেখেছেন বলেই ব্যবসা [illegible] চলেছেন; নৈলে তিনি এত সহজে তাঁর কাছ থেকে চাবি [illegible] হাতাতে পারতেন না! তবে ঐটি হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত [illegible] বলেই, আমার পড়া বিদ্যাটি এই ফুরসুতে কাজে লাগাতে [illegible] আমি আপনার বাবাকে ভালো করে পড়তে পেরেছি বলে [illegible] মতন বুঝেছি যে, ও-বাড়ীর ঐ ভুতুড়ে কাণ্ডটি ওঁরই মাথা [illegible] বার-করা মস্ত একটা চাল, আর এ শুধু ওঁর পক্ষেই সম্ভব।'

স্তব্ধ ভাবে নিবারণ কথাগুলি ভাবিতে থাকে; কিন্তু [illegible] উৎসাহের ভঙ্গিতে বলে—'সত্যিই আপনি অদ্ভুত মেয়ে— [illegible] নতুন বৌ-এর সঙ্গে আপনি ঠিক পাল্লা দিতে পারবেন। [illegible] আপনার মতলব বলুন তো?'

তরলা বলিতে থাকে—'কলকাতায় গিয়ে রায় [illegible] ওয়ারিসানদের কাছ থেকে বাড়ীখানা আগে কিনে [illegible]

...য় সাহেব এক দিন ঐ বাড়ীতে বসে বাগুলীর জমিদার বাবুদের ...ঙ্গে রেসারেসি চালাবেন ভেবেছিলেন। মাথাটা তিনি খেলিয়ে-ছিলেন ভালো। একটা মিল খুলতে পারলে হাজার হাজার ...লোক তাঁর তাঁবেয় থাকবে—জমিদারকে তিনি তুড়িতে উড়িয়ে ...দেন। কিন্তু মিল খোলবার আগেই এই বাড়ী কেঁদে জমিদার ...বাবুদের বুকের ওপর বাঁশগাড়ী চাপিয়েছিলেন। তাই বুদ্ধিমান ...জমিদার বুদ্ধির বড়ে টিপে তাঁকে মাত করে দিয়েছিলেন। এখন ...বুঝছি, আমাদের কাজের সুবিধের জন্যেই এ কাণ্ড হয়েছিল। ...আপনি ঐ বাড়ীর বার-মহলে জেঁকে বসুন সেই রায় সাহেবের ...স্বপ্ন নিয়ে; আপনার পিছনে থাকবে সরস্বতী পরগণার ...তালুক। বাগুলীর বুকের ওপর সদর সেরেস্তা বসিয়ে এখান থেকেই জমিদারী চালাতে থাকুন ওদের ওপর টক্কর দিয়ে। আর ঐ বাড়ীর ...ভিতর-মহলটা দিন আমাকে ছেড়ে—আমি ওখানে 'নারী-প্রগতি সমিতি' বসিয়ে বিদ্যাভারতীর সঙ্গে জেদের লড়াই চালাতে থাকি। ...বলুন, ব্যবস্থা কেমন লাগছে? মনে ধরছে?'

নিবারণ আনন্দে অভিভূত হইয়া তরলার বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তির প্রশংসা করিতে থাকে এবং পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া যায়। ফলে, ...বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে নির্মিত বাড়ী ও সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ জমি কয়েক সহস্র মুদ্রায় রায় সাহেবের ওয়ারিসনের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। এই ব্যাপারেও তরলার যুক্তি উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। ...বিক্রেতা পক্ষকে জানানো হয় যে, একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্যই ...উক্ত অপবাদগ্রস্ত বাড়ীটি ক্রয় করা হইতেছে—বসবাসের জন্য নহে; কারণ, ঐ বাড়ীর ত্রিসীমাতেও কেহই যাইতে চাহে না ইত্যাদি। বাড়ী ক্রীত হইলে নিবারণ তরলার পত্র লইয়া শোভাবাজার অঞ্চলের নারী প্রগতি সমিতির কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করে। স্বামি-পরিত্যক্তা এবং ...বিবাহে অনিচ্ছুক কুমারীদিগকে স্বাবলম্বী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান খুলিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া কাজ চালাইয়া আসিতে-ছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত স্থান ও অর্থাভাবে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইবার অবকাশ পায় নাই। তরলা এই সমিতির সভ্যা ...ও নিয়মিতরূপে মাসিক চাঁদা দিয়া থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের ...কর্ত্রী শ্রীমতী সুপ্রভা সেনকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি কলিকাতার ... প্রতিষ্ঠানের সামান্য একটু অংশ রাখিয়া বাকি সমস্ত সভ্যাদের ...লইয়া যদি বাগুলীর প্রতিষ্ঠানে চলিয়া আসেন, ব্যয়ের জন্য ভাবিতে ...হইবে না এবং সেখানকার প্রাসাদতুল্য বৃহৎ বাড়ীতে কাজের বহু ...সুবিধা হইবে। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতার প্রতিষ্ঠানের নামের ...সহিত এখানকার প্রতিষ্ঠানের নামকরণের কোন পার্থক্য রাখা হয় ...না। তরলার প্রস্তাবে সুপ্রভা সানন্দে সাড়া দেয় এবং তাহার ...সংসারের ক্ষুদ্র বাড়ীতে সমিতির অংশ-বিশেষ রাখিয়া বাগুলীতে ...যাইতে সম্মতি দান করে।

...ইহার পর জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ী ও বাগানগুলির সংস্কারাদি শেষ ...করিয়া বাহির-মহলে সরস্বতী মহালের সেরেস্তা, নিবারণের জন্য ...ও স্বতন্ত্র বাসস্থান এবং অন্য দিকে নারী-প্রগতি সমিতির ...জন্য বিভিন্ন বিভাগগুলির অঙ্গসজ্জা ও বিধি-ব্যবস্থা করিতে ...মাস কাটিয়া যায়।

...ইহার কালে বাগুলীর অধিবাসীরা অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে; ...মনে নানা প্রশ্নও উঠে—রায় সাহেবের উত্তরাধিকারীদের পুনরায় এই দুর্বুদ্ধি হইল কেন? কিন্তু ক্রমে আসল কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে তাহাও সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া তোলে। অবশেষে সকলেই জানিতে পারে যে, নিবারণ বাবু তাঁহার মাতৃদত্ত সরস্বতী মহালের একমাত্র মালিক হইয়া এই ভুতুড়ে হাবেলীর একাংশে তাঁহার তালুকের সেরেস্তা বসাইতেছেন এবং বৈদ্যনাথ কবিরাজের কন্যা তরলার কর্ত্রীত্বে নারী-প্রগতি সমিতি কায়েম হইয়া বসিতেছে।

নির্দিষ্ট দিনে খুব ঘটা করিয়া নিবারণ সুসংস্কৃত বাড়ীতে তাহার তালুকের নূতন সেরেস্তার প্রতিষ্ঠা ও পুণ্যাহ উৎসবের আয়োজন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিনই বাড়ীর অপরাংশে নারী-প্রগতি সমিতির উদ্বোধন দিবস নির্দ্ধারিত হইল। একই দিনে প্রায় একই স্থানে দুইটি প্রতিষ্ঠানের উৎসব ধার্য্য হইলেও সময়ের দিক দিয়া কিছুটা পার্থক্য রহিল। নিবারণ তাহার সেরেস্তা পত্তন ও পুণ্যাহ উৎসবের কাল পূর্বাহ্ণের দিকে নির্দিষ্ট করিল, পক্ষান্তরে তরলার বিজ্ঞপ্তি পত্রে প্রকাশ পাইল যে, নারী-প্রগতি সমিতির উদ্বোধন উৎসব আরম্ভ হইবে অপরাহ্ণ পাঁচটায়।

স্বামি-সম্পর্কে তরলার দুরদৃষ্টের কথা বাগুলীর বাসিন্দাদের অজ্ঞাত থাকে নাই। এই অসামান্য রূপবতী ও বিদুষী মেয়েটির তরুণ বয়সে এরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় বাগুলীর মত পল্লীসমাজে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনারূপেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। বিশিষ্ট মহলে তাহার শ্বশুরের সহানুভূতিমূলক আহ্বান-পত্র এবং তৎসম্পর্কে গাঙ্গুলী-বাড়ীর নূতন বধূর যুক্তি ও তাহার সহিত তরলার মতানৈক্যের কথাও অল্পবিস্তর জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা কেহই তরলার মতবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, বরং তিক্ত কণ্ঠে তীব্র ভাবে নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এই মেয়েটিই যে নিবারণের সহিত মিশিয়া তাহাকে নিজের মতবাদে আস্থাশীল করিয়া তলে তলে একটা সমিতি খুলিবার ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং একই দিনে একই বাড়ীতে নিবারণের নবলব্ধ তালুকের পুণ্যাহ উৎসবের সহিত তাহার সর্বনাশা সমিতির উদ্বোধন উৎসবও অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে ঘুণাক্ষরেও কেহ এ-সব কথা জানিতে পারে নাই। এমন কি প্রায় প্রত্যহ দিবাভাগের এক নির্দিষ্ট প্রহরে বৈদ্যনাথ কবিরাজের বহির্বাটীর রুদ্ধ কক্ষে অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সতর্কতা সহকারে ইহাদের আলোচনা বাড়ীর জনপ্রাণীও জানিবার সুযোগ পায় নাই।

কলিকাতায় কাজ গুছাইয়া নিবারণের বাগুলীতে প্রত্যাবর্তনের পর রীতিমত তোড়জোড় করিয়া কুখ্যাত পোড়ো বাড়ীটির সংস্কার কায আরম্ভ হইলে, তরলা এক দিন হঠাৎ অসঙ্কোচে পিতৃ-সমক্ষে তাহার সঙ্কল্পের কথা উত্থাপিত করে। কন্যা যে শ্বশুরালয়ে যাইতে সম্মত নহে—সহৃদয় শ্বশুরের সমীচীন প্রস্তাব তাহার অন্তর স্পর্শ করে নাই ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ীর বধূরাণীর যুক্তিও সে অগ্রাহ্য করিয়াছে শুনিয়া তিনি এতই ব্যথা পাইয়াছিলেন যে, এ সম্পর্কে কন্যার সহিত আলোচনা করাও সঙ্গত মনে করেন নাই। এক্ষণে সেই কন্যা স্বাধীন ভাবে 'নারী-প্রগতি সমিতি'র সহিত যোগ দিবার ব্যবস্থা পাকা করিয়া, নিয়ম-রক্ষার মতই তাঁহার ইচ্ছাটি জানাইলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবেই তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেন—'কাজটা কি ভালো হবে মা?'

স্নিগ্ধ সহজ কণ্ঠেই তরুলা উত্তর করে—'উপস্থিত আমি যে

অবস্থায় পড়েছি, এর চেয়ে ভালো কাজ আমার পক্ষে আর কিছু আছে বলে ত জানা নেই বাবা ?'

অসহিষ্ণু ভাবে পিতা বলেন—'জানা নেই—এ কথা বোল না, সে কথা গাঙ্গুলী-বাড়ীর বৌমা তোমাকে বলেছিলেন, কিন্তু তুমি সে সব পছন্দ করনি।'

গাঙ্গুলী-বাড়ীর বধূর কথা শুনিয়াই তরলার মুখখানি কঠিন হইয়া উঠে, তিক্ত স্বরে সে প্রতিবাদ করে—'একটা চলতি কথা আছে বাবা—যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে! ওঁর পক্ষে যেটা ভালো, আমাকেও যে তাই মেনে নিতে হবে, তার কোন কথা নেই। আমারো বুদ্ধি আছে, বিচার করেই আমি কাজ করি।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পিতা বলেন—'বুদ্ধি থাকলে তুমি শ্বশুরের ডাকে সাড়া না দিয়ে এ ভাবে স্বেচ্ছাচারিণী হতে না মা!'

পিতার কথায় কন্যার দুই চক্ষু বুঝি জ্বলিয়া উঠে, সবলে আপনাকে সামলাইয়া কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া উত্তর দেয়—'আমি মেয়ে বলেই এ কথা আপনি বলতে পারলেন বাবা! যদি আমার কোন ভাই, এমনি একটা সমিতি খুলে তাই নিয়ে মাতামাতি করতেন, কোন দোষ তাঁর হোত না; যোগ দেবার আগে তিনি হয়ত আপনার অনুমতি নেওয়াও দরকার মনে করতেন না। আমি আপনার অনুমতি চাইছি, এই আমার অপরাধ হয়েছে।'

অন্তর্নিহিত বিরক্তি ভাব এবার মুখে ফুটাইয়া পিতা বলেন—'এটা হোচ্ছে তোমার দায়ে পড়ে লৌকিকতা করা! এখানে সমিতি খোলা হোচ্ছে—তোমার মতলবেই তার সব-কিছু কাজ এগিয়ে গেছে, তুমি তাতে মাথা দেবেই—এখন না জানালে নয়, তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমার মত নিতে এসেছ। আমি জানি, আমার মত না পেলেও তুমি যাবেই, আমার তোয়াক্কাই রাখবে না; তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? তোমার যা খুশি তাই কর।'

নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল পিতার মুখের পানে চাহিয়া থাকে তরলা, তাহার পর স্থির অথচ দৃঢ় স্বরে বলে—'তাহলে আজ আমাদের বোঝা-পড়া হোয়ে যাওয়াই আমি ভালো মনে করি বাবা। আমার পক্ষে এখন দু'টো পথ আছে। একটা হোচ্ছে—বাড়ীতে থেকেই সমিতির কাজ করে যাওয়া। আর এ-ও বলি—আমি যে কাজ করবো, তাতে মেয়েদের ভুল ভেঙে দিয়ে জাগিয়ে তোলা ছাড়া এমন কিছু থাকবে না, যাতে আপনার মাথা নিচু হবে। আমার লক্ষ্য শুধু মেয়েদের বড় করে তোলা; কাজেই নিজে কখন ছোট হব না—এ আপনি স্থির জানবেন। এর পর—অন্য পথ হোচ্ছে, আমার কাজে আপনার আপত্তি থাকলে, বাধ্য হয়ে আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে সমিতির বাড়ীতেই আশ্রয় নিতে হবে। এখন আপনিই বলুন আমি কি করব?'

ক্ষণকাল চিন্তার পর পিতা তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেন কন্যাকে—'তুমি বাড়ীতে থেকেই সমিতির কাজ কর মা, তাতে আমার তোমাকে বাধা দেব না।'

তরলা তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া পিতাকে গড় করিতে করিতে গাঢ় স্বরে বলে—'আমিও আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবা, আপনার নামে, বাড়ীর নামে, বংশের নামে দাগ পড়ে, এমন কোন অন্যায় আমি করব না কোন দিন।' ইহাই হইল, সাম্প্রতিক ঘটনারাজির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালীর জনসাধারণের মানসিক চাঞ্চল্যের মোটামুটি উপাখ্যান। চিকিৎসক মনোনয়ন সম্পর্কে উত্তেজনামূলক অবস্থার পর রায় সাহেবের পরিত্যক্ত ভৌতিক হাবেলী বাড়ীকে উপলক্ষ করিয়া এই নূতনতম পরিস্থিতি হইতে যে কৌতূহলের উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহাও সাধারণ উত্তেজনার বিষয় নহে। [ক্রমশঃ।

অস্তরবি

পুষ্প দেবী

হে কবি চলিলে না কি ?
স্বরগ হইতে দেবতা এল কি পরাতে মিলন-রাখী ?
যেথায় তোমার ছিল আনাগোনা
যেথাকার সুধা সুরভির কণা
তোমার বচনে কবিতায় গা'ন দিয়াছ সবায় ডাকি,
আজিকে সেথায় চিরদিন তরে চলিলে মোদের রাখি ?
কাব্যলোকের মধুর কূজন আর কি মর্ত্ত ভ'রে
উঠিবে না কবি তোমার মোহন মধুর কণ্ঠস্বরে
রাখালের বাঁশী শিশুর কামনা
বঙ্গবধূর গোপন বেদনা
মা-হারা যে সেই ভিখারিণী মেয়ে তাহারও মর্ম্মকথা
তোমার লেখনী সবাকার প্রাণে জাগাল গভীর ব্যথা।

সে সুরের মোহে এ হিয়া বিভোর কিশোরী জীবন হতে
কল্পনা-পথে তুমি চিরকাল এলে যে বিজয়-রথে,
মনে হত তুমি নহ তো দূরের
মনের নিভৃত গোপন পুরের
সব সাধ আশা জান যে গো তুমি আপন পরাণ হ'তে,
সবাকার চেয়ে আপন ছিলে,যে তাই এ জীবন-পথে।
শুধু নও কবি ওগো গুরু মোর তুমি যে মর্ম্মসাথী
তোমার কাব্যে হইয়া বিভোর কেটেছে কত না রাতি;
কত বরষার শ্রাবণ-রাতেতে
কত দুঃখের গভীর আঘাতে
কবিতার সনে তুমি ছিলে মনে কনক-আসন পাতি,
তাই বলি শুধু কবি নও তুমি হে মম মর্ম্মসাথী।

ওগো কবিগুরু শেষ যাত্রার আজি এই শুভ দিনে
ঝর-ঝর ঝরে বরষার ধারা
আকুল পরাণ হয়ে তোমা-হারা
তোমারে হেরিতে ছুটে চলে সবে অশ্রু-ব্যাকুল আঁখি
অস্তসারী সে রবির প্রসাদ শেষ জ্যোতিকণা মাগি।

মরীচিকা

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি। যেদিকে দৃষ্টি ফেরান যায় সবুজ প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই—শুধু অন্তহীন রিক্ত শুষ্ক বালি ধূ ধূ করছে চারি দিকে। কিন্তু অর্ধ মাইল দূরে সেই বালির গেরুয়া প্রান্তরে দেখা যাচ্ছে একটি তরঙ্গায়িত নীল হ্রদের স্নিগ্ধ পরিবেশ। অভিযাত্রিক সচকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সন্দিগ্ধ মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। বহু অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত জ্ঞানবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তিনি। এই সীমাহীন মরু-প্রান্তরে হ্রদ আসবে কোথা থেকে? কিন্তু সংশয়-দোলায়িত মন তবুও চোখের এই ভ্রান্তিকে একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারলে না।

ঐ বিস্ময়-রাজ্যে যে সমস্ত প্রাণীরা বিচরণ করছে তাদের চেহারাও কম বিস্ময়কর নয়। লম্বা লম্বা পা—হাঁসের মত এক কিম্ভুত-দর্শন পাখী জলের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর আশে-পাশে ফ্লেমিংগোর মত বিরাট ডানাওয়ালা এক বিচিত্র জীবের জটলা।

অভিযাত্রিক সঙ্গী শিল্পীকে ডেকে এই অপূর্ব দৃশ্যের একটি ছবি নিতে বললেন আর নিজে ছুটে চললেন সেই হ্রদের দিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যতই তিনি এগোতে লাগলেন প্রাণিগুলোও দ্রুত উড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আকার ও আকৃতিরও অদ্ভুত পরিবর্তন হতে লাগল। তার পর সেই অস্বাভাবিক হ্রদটিও ক্রমশঃ ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল এক সময়—অভিযাত্রিক উপলব্ধি করলেন তিনি ধূ-ধূ মরু-প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। আশে-পাশে জলের চিহ্নমাত্র নেই—শুধু দূরে ভয়-চকিত কয়েকটি এ্যান্টিলোপ দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

অভিজ্ঞ অভিযাত্রিক এবার বুঝতে পারলেন যে, তিনি প্রতারিত হয়েছেন—রহস্যময় প্রকৃতি ছলনা করেছে তাঁর সঙ্গে। তিনি যা দেখেছেন প্রকৃতির রাজ্যের তা এক অপূর্ব্ব মায়ার খেলা। অর্থাৎ মরীচিকার মিথ্যা ছলনায় বিভ্রান্ত হয়েছেন তিনি।

অনাদি কাল হতে মরীচিকা এই ভাবে মানুষকে ছলনায় ভুলিয়ে আসছে। মরীচিকা মরুভূমির সেই চিরন্তন রহস্য—মিথ্যা মরূদ্যান, ছায়াশীতল পামকুঞ্জ, প্রাণদ জলধারার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি!

বৈচিত্র্যময় এই মরীচিকা। কার্যকারণের উপযুক্ত মিলন ঘটলে কোন স্থানে যে কোন সময়ে, যে কোন বস্তুর মরীচিকা দেখা দিতে পারে। কতকগুলি মরীচিকা অত্যন্ত ছলনাময়ী। মেরু অঞ্চলে মাঝে মাঝে যে বরফের মায়া-পর্বত ভেসে বেড়াতে দেখা যায়, সমুদ্রচারী জাহাজ তাদের সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে ঠিক পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে অহেতুক বিপদ ডেকে আনে নিজেদের।

যতই অদ্ভুত হোক না কেন, মরীচিকা প্রত্যক্ষ বস্তুর মতই জীবন্ত ও বাস্তব। সার্ভেয়াররা মরীচিকা-পর্বতের নক্‌সা তৈরী করেছেন, অভিজ্ঞ পর্বত-আরোহণকারীরা দৃঢ় মন নিয়ে অগ্রসর হয়েছে এই মায়া-পাহাড় উল্লংঘন করতে, এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়।

মরীচিকার দিকে মানুষ ধাবিত হয়, তার কারণ মরীচিকার ভিত্তি নিছক মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মরীচিকা অসুস্থ মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনাও নয়। মরীচিকা বস্তুতঃ প্রকৃতির অদৃশ্য হস্তের সৃষ্টি এক প্রকার চোখের ধাঁধা—মতিভ্রান্তি এ নয়।

প্রথম যিনি মরীচিকার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন তাঁর নাম গ্যাসপাদ্ মনজ্ (Gaspard Monge)। ফরাসী গাণিতিক ও পদার্থবিদ্ মনজ্ নেপোলিয়ানের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট অভিযানের সময় তিনি নেপোলিয়ানের অনুগমন করেছিলেন। ইজিপ্টের মরুভূমিতে স্বচ্ছ হ্রদের মরীচিকা পিপাসা-ক্লিষ্ট ফরাসী সৈন্যদের বার বার উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছিল। মনজ্ তখন নিজে সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করে এর কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খাড়া করেন। এদিক থেকে বিচার করলেও মনজের কাজ হয়েছে যে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। Mirage কথাটি এসেছে একটি ফরাসী ক্রিয়াপদ থেকে যার সরলার্থ হোল একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা।

মনজ্ পর্যবেক্ষণান্তে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, আবহাওয়ার এলোমেলো উত্তাপের দরুণ আলোকরশ্মি বায়ুস্তর ভেদ করে আসতে বাধা প্রাপ্ত হয় যার ফলেই মরীচিকার সৃষ্টি। সাধারণতঃ বাতাস যত ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী হতে থাকে, তার ঘনত্বও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন ঘনত্ব-বিশিষ্ট বায়ুস্তরের ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মি যেতে গিয়ে প্রতিসরিত হয়ে একটি বক্র রেখায় বেঁকে যায়। ভূপৃষ্ঠের নিকটের বায়ুস্তর ও তার উপরের বায়ুস্তরের ঘনত্বের যত ব্যবধান ঘটবে, আলোকরশ্মির এই বক্রতাও তত ব্যাপক হবে।

মনজ্ তখন ভাবলেন, যদি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের স্বল্প গভীর (shallow) বায়ুস্তর উপরের তুলনায় অধিকতর উত্তপ্ত থাকে,

তাহলে এর আপেক্ষিক ঘনত্বও সেই অনুপাতে কম হবে। সে ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি এই স্তরে এসে নীচের দিকে না বেঁকে উপরের দিকে বেঁকে যাবে।

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক্। মরুভূমিতে দুপুরের খর রৌদ্রে তপ্ত বালুর সংস্পর্শে এসে বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় বলে—বায়ু তপ্ত হলে হাল্কা বা লঘু হয়। সুতরাং মরুভূমির কিছু উচ্চতা অবধি হাল্কা বায়ু অবস্থান করে মরুভূমিতে। আলোকরশ্মির ধর্ম হোল ভারী বায়ুর দিক থেকে হাল্কা বায়ুস্তর বিদ্ধ করলে, তা আরো বেশী হেলে যায় মরুভূমির সমান্তরালে। কাজেই মরুভূমির বায়ুস্তর যখন তলার দিক থেকে উর্ধ অবধি ক্রমশঃ ঘন হয়েছে, তখন কোন গাছপালার মাথা থেকে আলোক-রশ্মি নীচের দিকে কোণাকুণি নামলে ক্রমশঃ হেলতে-হেলতে এই রশ্মি এক সময় এমন কোণে হেলে যায় যে, আরো বেশী হাল্কা স্তরের সম্মুখীন হয়ে তা আর দ্বিতীয় স্তরে বিদ্ধ না হয়ে সেই স্তরেই দিক পরিবর্তন করে। অর্থাৎ নিম্নমুখী রশ্মি তখন উর্ধমুখী হয়ে হাল্কা স্তর থেকে পুনরায় ভারী স্তরে বিদ্ধ করতে সুরু করে। এক সময় এই আলোকরশ্মি মরুচারী কোন ঘোড়সওয়ারের চোখে ঠিকরে বায়ু—আরোহী দেখে নিম্ন কোণে একটি উল্টো গাছের প্রতিচ্ছায়া এবং মনে করে যে, নিশ্চিত কোন জলাশয় আছে সেখানে। আর জলাশয় যদি না থাকবে গাছের ছবি উল্টোই বা দেখাবে কেন? এই ভ্রান্তির নামই মরীচিকা। মরু-তপ্ততার হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে এবং যে স্তরে আলোকরশ্মি দিক্ পরিবর্তন করেছিল, মুহূর্ত পরে আবার সে স্তর পরিবর্তিত হয় এবং জলাশয়ের অবস্থানও চোখের আড়াল হয়ে যায়। তখন আরোহী পিপাসায় ক্লান্ত চিত্তে উন্মত্তের মত ছুটোছুটি করে বেড়ায় ঐ মায়া-সরোবরের জন্য।

মেরু অঞ্চলে কিন্তু বিপরীত ভ্রান্তি ঘটে। অর্থাৎ ভূমিলগ্ন কোন বস্তুর ছায়া সেখানে আকাশ-পটে ঝুলতে থাকে। এই কারণেই আকাশের নক্ষত্ররাজি যখন দিক্-চক্রবালের নিকটবর্তী থাকে তখন সঠিক অবস্থান-বিন্দুর অনেক উপরে তাদের আমরা দেখি এবং অবিরাম বায়ুস্তরের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটায় তারাগুলি দপ-দপ করছে মনে হয়। শীতকালের ভোরে বুড়ো রসুইয়ের উনুনের সামনে দাঁড়ালে বায়ুর এই থর-থর কম্পন স্পষ্ট দেখা যায়।

এখন অভিযাত্রিক যা দেখেছিলেন তা অতি সাধারণ ব্যাপার অর্থাৎ তিন বা চার ফুট পুরু অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুস্তরে নিমজ্জিত এক দল এ্যান্টিলোপকে দেখেছিলেন তিনি। ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করার দরুণ এই বায়ুস্তর নীচের ভূমি-প্রান্তরকে দৃষ্টি থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। জলাশয় বলে যা ভ্রম উৎপাদন করেছিল, তা হোল সুদূর আকাশ হতে আসা মূর্চ্ছিত আলোর বন্যা ছাড়া আর কিছুই নয়! কিম্ভূত-কিমাকার প্রাণীগুলো হোল উত্তপ্ত বায়ুর পাতলা স্তরে ভাসমান এ্যান্টিলোপদের বিকৃত রূপ—তাপ-তরঙ্গে যার বিকৃতি ঘটেছে। এই মরীচিকা খুব স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যখন দ্রষ্টার চোখ লক্ষ্যবস্তু থেকে কিছু দূরে এবং উত্তপ্ত বায়ুস্তরের সামান্য উপরে ন্যস্ত থাকে। অভিযাত্রিক ছুটতে গিয়ে এই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটেরও বেমালুম পরিবর্তন ঘটেছিল।

এই ধরণের মরীচিকাদের বলা হয় হীন মরীচিকা বা ইনফিরি: মিরেজ (Inferior Mirage)। বহু মোটর-চালক এই ধরণে মরীচিকার মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। রৌদ্র-দিনে যখন তাপ-তরঙ্গ লেলিহান জিহ্বার মত রাজপথ থেকে উ: উঠতে থাকে; তখন দূরাগত মোটর গাড়ীগুলিকে দেখলে মনে হ: যেন তারা জলাশয় ভেঙ্গে ছুটে আসছে।

মেরু অঞ্চলে এই ধরণের মরীচিকা নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। বরফে যখন ফাটল ধরে, তখন বারিরাশি আবহাওয়ার তাপে পরিবর্তন ঘটায়—কাজেই বারিবক্ষ-সংলগ্ন বিপুল বায়ুস্ত: ঘনত্বেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। বায়ুমণ্ডলের এই উষ্ণ ও শী: বিচিত্র স্তর-জনিত একটি ছোট্ট বরফ-তাল বিরাট পাহাড়ের ভ্রম উৎপাদন করে।

আমেরিকার ন্যাশানাল হিস্ট্রি মিউজিয়মকে একবার এই প্রকার মায়া-পাহাড়ের পিছনে তিন লক্ষ ডলার মিথ্যা ব্যয় করতে হয়েছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে এই মরীচিকা নানা ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে। ইংলণ্ডে যাবার উত্তর-পশ্চিম সামুদ্রিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত স্যার জেমস রস ও তাঁর খুড়ো স্যার জন বাফিন ল্যান্ডের (Baffin Land) উত্তরে এক সকালে উঠে দেখেন, তাদের চলার পথ বিরাট পর্বতশ্রেণীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁরা ভুল করে এমন পথে চলেছেন যেদিকে যাবার পথ নেই। এই ঘটনার প্রায় এক শতাব্দী পরে এ্যাডমিরাল রবার্ট পিয়ারী পুনরায় রস-উল্লেখিত পর্বতশ্রেণী দেখতে পান, কিন্তু তিনি ভাসমান বরফ-শিলার জন্য অনুসন্ধান-কার্য্য চালাতে পারেননি। কিন্তু তিনি জায়গাটির নাম-করণ করেছিলেন ক্রকার ল্যাণ্ড (Crocker Land) এবং তাঁর আবিষ্কারের কথা জানান মিউজিয়মকে!

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ডোনাল্ড ম্যাকমিলান নামক এক জন মেরু-বিশেষজ্ঞ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হন এ-বিষয়ে পুঙ্খানু-পুঙ্খ অনুসন্ধান চালাতে। এই অভিযানকে এক বিরাট দুঃস্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পিয়ারীর মানচিত্রে যেখানে সুউচ্চ পর্বতের উল্লেখ আছে, তিনি সেখানে দেখতে পেলেন অতলস্পর্শী সমুদ্র, যেখানে পরিষ্কার নদীগর্ভের উল্লেখ আছে, সেখানে জাহাজের তল নিমজ্জিত শৈল-চূড়ার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল। অবশেষে যেখানে থাকা উচিত সেখান থেকে সুদূর পশ্চিমে ক্রকার ল্যাণ্ড দেখা দিল। এবারও সেখানে যাওয়ার পথ বরফে অবরুদ্ধ। ম্যাক-মিলান তখন এক দল বাছাই-করা নাবিককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে অবতরণ করে অগ্রসর হতে লাগলেন সেই দৃশ্যমান পর্বত-শ্রেণীর দিকে! কিন্তু যতই অগ্রসর হন, মনে হতে লাগল; পর্বতশ্রেণী যেন ততই দূরে সরে যাচ্ছে। লোকজনেরা তাদের যন্ত্রপাতি অবিশ্বাস করতে অস্বীকার করল—স্পষ্টই তো তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এক অনড় পর্বতশ্রেণী দিক-চিহ্ন আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এল যখন তারা দেখতে পেলে তাদের তিন দিক ঘিরে ফেলেছে সেই পর্বত— এত উঁচু সে পর্বতশ্রেণী যে নীচে দাঁড়িয়ে তাদের শৃঙ্গ গুনিতে... কিন্তু দুই শৃঙ্গের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে তুষারহীন কালো উপত্যকা— যেখানে অফুরন্ত খনিজ সম্পদের হাতছানি। উত্তেজিত হয়ে তারা ধাবিত হোল সেই দিকে—ঐ উপত্যকার কোন একটিতে ...

কাটাতে হবেই। কিন্তু হায়, সে সুযোগ আর হয়নি জীবনে। যেই উত্তর মেরুর দিক থেকে রথের গতি ফেরালেন, কোথায় হয়ে গেল সেই পর্বতশ্রেণী তার আকাশচুম্বী উচ্চতা নিয়ে—ভিযাত্রিক দল হঠাৎ দেখতে পেল তারা দাঁড়িয়ে আছে এক দিগন্তবিস্তৃত বরফ-প্রান্তরের উপর। যেখানে পাহাড় তো দূরের কথা, একটি ঢিপিও দৃষ্টিকে ব্যাহত করছে না।

এই ধরণের মরীচিকার তুলনায় ঢের বেশী বিরলদৃষ্ট তোল পার্শ্ব-মরীচিকা বা ল্যাটারাল মিরেজ (Lataral Mirage)। রৌদ্রদগ্ধ পাহাড়ের সরলোন্নত খাড়াই অংশ-সংলগ্ন বায়ুস্তর তপ্ত পাহাড়ের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অনেক সময় মরীচিকা দেখা যায়, যাদের নাম হয় 'পার্শ্ব-মরীচিকা'। এ ক্ষেত্রে উত্তপ্ত ও লঘু বায়ুস্তর ভূমি-সমান্তরালে অবস্থান না করে স্তম্ভের মত খাড়া প্রসারিত থাকে। পাহাড়-পার্শ্বে এই ধরণের মরীচিকা একবার একটি লোকের মনে বিশালাকার গ্রিজলী ভাল্লুকের ভ্রম উৎপাদন করেছিল—লোকটার মনে হয়েছিল যেন তার চলার পথের মোড়ে ওৎ পেতে বসে আছে।

আর একটি ক্ষেত্রে মেজর ফ্রেডারিক মার্টিন এই ধরণের মরীচিকার কবলে বিভ্রান্ত হয়ে বিমান-দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের কথা। মার্টিন আলাস্কা পর্বতমালার মধ্য দিয়ে প্লেনে করে উড়ে যেতে যেতে এক সময় পর্বতশৃঙ্গ-পরিবেষ্টিত এক সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্যে এসে পড়েন। তার পর হঠাৎ এক সময় এক সুউচ্চ পর্বতের দেওয়াল পথ রোধ করে দাঁড়ায়। মার্টিন এটাকে কোন মতে পরিহার করে আর একটির গায়ে গিয়ে ধাক্কা খান। সৌভাগ্যক্রমে সামান্য আঘাতের উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে যায় সে যাত্রা। কিন্তু দুর্ঘটনার পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, একটা কাল্পনিক পাহাড়কে এড়াতে গিয়ে সত্যিকারের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছেন তিনি।

বোধ হয় সব চেয়ে রোমাঞ্চকর ও আনবদ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে সুপিরিয়র মিরেজ (superior mirage) বা সুপিরিয়র মরীচিকারা। এ ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের উপরের উর্দ্ধ বায়ুস্তরের উপবিভাগে থাকে একটি অতি শীতল বায়ুস্তর। এই ধরণের মরীচিকায় দু'টো দৃশ্য দেখা যায়—প্রথমটি উল্টান অবস্থায় এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির উপর খাড়া দণ্ডায়মান থাকে।

স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযানের সময় ক্যাপ্টেন স্কটের অনেক সঙ্গী, যিনি বেঁচেছিলেন, পরে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ... জাহাজ টেরা নোভাকে দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে আসার বহু ... দেখা গিয়েছিল। তিনি বলেছেন—"প্রকৃত জাহাজটি তখনও দিগন্তরেখার নীচে ছিল এবং মাস্তুল মাত্র দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক তাদের মাথার উপর সমগ্র জাহাজটিকে উল্টান দেখা যাচ্ছিল আর উল্টান জাহাজের উপর আর একটিকে খাড়া ভাসমান অবস্থায়। টেরা নোভা সত্যই আসছিল—তবে তখনও ত্রিশ মাইল দূরে ছিল।"

প্যারিসে প্রায়ই একটি অদ্ভুত মরীচিকার খেলা দেখা যায়। ইফেল টাওয়ার তার চূড়োয় তারই আর একটি সংস্করণকে উল্টো অবস্থায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রায়শঃই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স আর প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় উত্তর সুইডেন ও নরওয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে দেখতে পেয়েছে যে, এক দল সৈন্য আকাশ-প্রাঙ্গণে মার্চ করে চলেছে, ঠিক যখন শত শত মাইল দূরে সত্যিকারের সৈন্য দল মাটিতে মার্চ করে যাচ্ছিল।

"এ্যাটলান্টিস" "এ্যাভালোন" প্রভৃতি লুপ্ত নগরী সম্বন্ধে যে সমস্ত গল্প-উপকথা প্রচলিত, তাদের উৎস যে দূর-দিগন্তের পারে দৃশ্যমান এই মরীচিকারাই, এ কথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। অন্ততঃ একটি পৌরাণিক রাজ্য সম্বন্ধে এ মন্তব্য তো খুবই খাটে এটিকে একটি নির্দিষ্ট কালান্তে দেখা গেছে। বস্তুতঃ ফ্যাটা মরগান মরীচিকা-দৃশ্যের মধ্যে অতুলনীয়।

রাজা আর্থারের ভগ্নী, কুহকবিদ্যা-পারদর্শিনী মরগান লিফের নামানুসারেই এই মরীচিকাটির নামকরণ করা হয়েছে। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তর মরীচিকাটিকে দেখা যায় সিসিলি ও ইতালীর পাদদেশে ষ্ট্রেটস অফ মেসিনাতে। কিংবদন্তী আছে যে, মরগান লিফে এইখানে সমুদ্রতলায় এক অপূর্ব শ্বেতমর্মর প্রাসাদে বাস করে।

দাসদাসীদের হত্যা করার পর যখন নতুন অনুচরবৃন্দের প্রয়োজন হয়, তখন এই কুহকিনী নারী সমুদ্রচারী জাহাজগুলিকে যাদুমন্ত্রের টানে সেখানে টেনে নিয়ে এসে লোকজনদের বন্দী করে। জাহাজগুলিকে প্রলুব্ধ করার জন্য তার প্রাসাদটিকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখে সে। জাহাজগুলি এই প্রাসাদকে নিরাপদ পোতাশ্রয় মনে করে সহজেই প্রলুব্ধ ও বিপদগ্রস্ত হয়।

এই মরীচিকা দেখা দেওয়ার আগে আকাশে এক ভৌতিক মেঘপুঞ্জের সমাবেশ হয় এবং তার পরই ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে সেই রহস্যময় পোতাশ্রয় নগরীটি। প্রথম নগরীটির দ্বিতীয় আর একটি নগরীও দেখা যেতে পারে—এমন কি তৃতীয় আর একটিকেও দেখা গেছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁরা, তাঁরা না কি শ্বেত পোষাক-পরিহিত পথিকদের ঐ প্রেতপুরীর রাজপথ দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াতে দেখেছেন।

কিন্তু সূর্য যতই ঊর্দ্ধাকাশে ওঠে, এই মোহিনী রাজ্যটিও এক সময় ইতালীর স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলীতে অদৃশ্য হয়ে যায়। বস্তুতঃ ফ্যাটা মরগানার সৃষ্টি আর অন্যান্য সাধারণ মরীচিকার সৃষ্টির কারণ একই কিন্তু আজো পর্যন্ত কেউ সঠিক ভাবে হলফ করে বলতে পারেনি সত্যিকারের কি যে দেখা যায় আকাশপটে।

রত্নমালা

পঞ্চানন শর্ম্মা

জগৎ—সংসার, বিশ্ব, ভুবন, পৃথিবী, পৃথ্বী, অনন্তা, রসা, স্থিরা, বিশ্বম্ভরা, ধরিত্রী, ধরণী, ধরা, কু, ক্ষৌণী, বসুন্ধরা, ভূ, ভূমি, কাশ্যপী, মহী, গোত্রা, সর্ব্বংসহা, জ্যা, বসুধা, ক্ষ্মা, মেদিনী, ক্ষিতি, অবনী, উর্ব্বী, গো, মাতা, বসুমতী।

জঘন—উরুস্থল, নিতম্ব, কটি, কটিদেশ, শ্রোণি, শ্রোণিফল, ককুদ্মতী।

জঙ্গল—বন, শূন্য, কানন, অরণ্য, বিপিন, গহন, অটবী।

জঞ্জাল—আবর্জনা, ওঁচলা, উৎপাত।

জটলা—সংঘট্ট, লোকসমূহ, জনতা, ভীড়, লোকারণ্য।

জটা—জট, জড়িত কেশ, বৃক্ষ-শিকড়।

জটুল—জড়ুল, তিল, আঁচিল, চিহ্ন।

জঠর—উদর, পেট, কুক্ষি।

জড়—মূঢ়, স্থূলবুদ্ধি, চলৎশক্তিহীন।

জড়তা—জড়িমা, মূঢ়তা, জরা, অবসন্নতা।

জড়ীভূত—জমাট, ঘনীভূত. অবশ।

জতু—লা, লাক্ষা, জৌ, গালা, লাবাতী।

জতুমণি—জড়ুল, তিল, আঁচিল, চিহ্ন, তিলক, জটুল।

জনক—পিতা, জন্মদাতা, জনকাদি।

জনন—জন্ম, জনু, উৎপত্তি, উদ্ভব।

জননী—মাতা, জনয়িত্রী. প্রসূ, মা।

জনরব—খ্যাতি, কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি।

জন্তু—জন্যু, জন্মী, শরীরী, চেতন, দেহী, জীবী, প্রাণী।

জন্য—কারণ, হেতু, প্রযুক্ত, নিমিত্ত।

জম্ভন—রতিক্রিয়া, মৈথুন, সঙ্গম, মিলন।

জয়—পরাভব করা, উন্নতি, বৃদ্ধি, বিজয়।

জরা—বার্দ্ধক্য, বুড়ামি, জীর্ণতা, বৃদ্ধাবস্থা।

জরায়ু—গর্ভস্থ প্রাণীর বেষ্টনচর্ম্ম, গর্ভ, গর্ভাশয়, উল্ব, কলল।

জর্জ্জর—অতিজীর্ণ, জর্জ্জরিত, জরাগ্রস্ত।

জল—সলিল, কমল, জল, পয়ঃ বারি, নীর, জীবন, অমৃত, অম্বু, তোয়, পানী, ক্ষীর, উদক, অর্ণ, বন, ভুবন, শম্বর, মেঘপুষ্প, অম্ভঃ, পাথ, পানীয়, পুষ্কর, বারি।

জলদ—মেঘ, জলধর, বারিবাহ, সমুদ্র, সাগর।

জলৌকা—জলিকা, জোঁক, রক্তপা।

জল্প—কথাবার্ত্তা, বৃথা কথা, ঝকড়া, জল্পনা।

জাঁক—সমারোহ, সঙ্ঘট, ঘটা, আড়ম্বর।

জাগন—নিদ্রোত্থান, জাগরণ, চেতন, নিদ্রাত্যাগ, চৌকষী, সতর্কতা।

জাত—জাতক, উৎপন্ন, উদ্ভূত, জনিত।

জাৎ—প্রকার, বংশ, সমূহ. উৎসব।

জাদু—জানামী, গণকতা, কুহক, ভেল্কী, ভোজ।

জানান—প্রচার, জ্ঞাপন, বুঝান, চেতান, বিজ্ঞাপন।

জায়া—পত্নী, স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, দারা।

জালী—ঝালর, ঝর্ঝরী, ছানী।

জালম—ক্রূর, নীচ ব্যক্তি, মূর্খ, অবিবেক।

জিত—পরাজয়ী, পরাস্ত, বশীভূত।

জিব—জিভ, জিহ্বা, জীউ, রসনা।

জীব—আত্মা, বৃহস্পতি, প্রাণ।

জীবন্ত—জীবৎ, জীবিত, বর্ত্তমান, প্রাণ।

জীবিকা—উপজীবিকা, উপজীব্য, বৃত্তি, জীবনোপায়।

জীর্ণ—জর্জ্জরীভূত, পুরাতন, বৃদ্ধ, পরিপক্ক।

জুয়া—পাশক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, জুয়া খেলা।

জুগুপ্সা—নিন্দা, দুর্নাম, কলঙ্ক, অপবাদ।

জুতা—চর্ম্মপাদুকা, উপানৎ, জুতো।

জোনাক—খদ্যোত, জ্যোতিযুক্ত কীট।

জ্ঞাত—অবগত, বিদিত, প্রতীত, বৃদ্ধ, বোধগোচর।

জ্ঞাতি—সপিণ্ড, পিণ্ডভাগী, স্ববংশ।

জ্ঞান—চৈতন্য, অবগম, বুদ্ধি, অনুমান।

জ্ঞেয়—বোধগম্য, জ্ঞাতসার, জ্ঞাতব্য।

জ্যা—ধনুকের গুণ, ছিলা।

জ্যেষ্ঠ—অগ্রজ, শ্রেষ্ঠ, বড়, প্রধান।

জ্যোতিঃ—তেজঃ, কিরণ, রশ্মি, দীপ্তি।

জ্যোৎস্না—চন্দ্রের রশ্মি, চন্দ্রিকা, চন্দ্রভস্ম।

জ্বর—তাপ, উষ্মা, জ্বলা, পীড়া।

জ্বলন্ত—প্রজ্জ্বলিত, ব্যগ্র, ব্যথাকর।

জ্বলা—জ্বালা, দাহ, তাপ, পীড়া।

জ্বালিত—উত্তপ্ত, ব্যস্ত, দগ্ধ, খেদিত।

ঝক্—শীঘ্র, হঠাৎ, ঝটিতি, বৃথা কথা, দ্রুত, ত্বরায়

ঝক্মক্—চক্মক্, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি।

ঝঞ্ঝনা—বজ্র, অশনি, বাজ।

ঝঞ্ঝাট—ক্লেশ, দুঃখ, উৎপাত, মারামারি।

ঝটিকা—ঝড়, ঝড়ি, প্রচণ্ড বায়ু, প্রবলানিল।

ঝণ্ডা—পতাকা, ধ্বজা, বৈজয়ন্তী, নিশান।

ঝম্প—লাফ, লম্ফ, উৎক্রম, ঝাঁপ।

ঝরকা—খিড়কী, গবাক্ষ, বাতায়ন।

ঝরণ—ক্ষরণ, গলন, ধসন, পড়ন।

ঝর্ঝরী—জালী, ব্যবধান, মন্দিরা।

ঝল্‌সান—ভাজন, পোড়ান, দগ্ধকরণ।

ঝাঁটা—সম্মার্জ্জনী, ঝাড়ু, খেজরা, ঝাড়।

ঝিনুক—শম্বুক, শুক্তি।

ঝিল—সরোবর, হ্রদ, জলাশয়।

ঝুলন—ঝোলন, দোলন, লট্‌কন।

ঝুলী—থলী, থৈলী, ঝোলা, আধার।

ঝোড়—ঝোপ, গুল্মবৃক্ষ, গুল্ম।

[ক্রমশঃ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

(১) **তড়িতের অভ্যুত্থান**—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; (২) **আমাদের খাদ্য**—শ্রীনীলরতন ধর ; (৩) **ধরিত্রী**—শ্রীসুকুমার বসু ; (৪) **হর্মোন বা উত্তেজক রস**—শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ; (৫) **পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন**—শ্রীসর্ব্বাণীসহায় গুহ-সরকার।
প্রত্যেকটির মূল্য আট আনা।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত
বিজ্ঞান-প্রবেশ গ্রন্থমালা

(১) **প্রারম্ভ** ; (২) **পদার্থ ও শক্তি, শব্দ** ; (৩) **চুম্বক, তড়িৎ**—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রত্যেকটির মূল্য এক টাকা।

এটা বিজ্ঞানের যুগ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্ব জাতি বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণায় মগ্ন। কিন্তু ভারত তথা বাংলা আজ বহু পশ্চাতে। এর প্রধান কারণ বিদেশী সরকার আমাদের বৈজ্ঞানিক সাধনার পথ পরিষ্কার করে দেয়নি, দেয়নি কোন উৎসাহ। দেবেই বা কেন? বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র তৈরী হতে আরম্ভ করত, আর তাতে তাদের হ'ত প্রচুর ক্ষতি। কোন জাতিকে পরাধীন করে রাখবার সব চেয়ে সহজ উপায় তাদের অজ্ঞ করে রাখা। তাই আমরা জগতের অন্যান্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে তাল রেখে বৈজ্ঞানিক সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারিনি। আজ আমরা স্বাধীন। এখন আর পেছিয়ে থাকলে চলবে না। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সভায় নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সাহিত্য, ললিতকলা, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান গৌরবের। কেবল ভারতে নয়, বিশ্বে। কিন্তু বিজ্ঞানে এত পিছিয়ে পড়ল কি কারণে? বাংলার জনসাধারণ সাহিত্য-রসিক হল, কিন্তু বিজ্ঞান-রসিক হ'ল না কেন? কারণ সাহিত্যসেবী হল বাংলা ভাষায়, মাতৃভাষায়; কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চ্চা চলল বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। দেশের ক'টা লোক বিদেশী ভাষা জানে? শতকরা এক জন বললে খুব বেশী বলা হবে। তাই জনসাধারণের কাছ থেকে বিজ্ঞান রইল অনেক দূরে পড়ে।

জ্ঞান একটা সাধনা-বিশেষ। রহস্যময়ী প্রকৃতি নিজের অন্তরের কথা কাউকে জানতে দিতে চায় না চট করে। কিন্তু একাগ্র সাধনার ফলে শেষ অবধি বর দিতে বাধ্য হয়। প্রকৃত সাধক মেলে ক'টা। লাখে এক জন। সে সাধক জ্ঞানপিপাসু। সমগ্র জীবন-প্রাণ অর্পণ করেছে আপন লক্ষ্যের পানে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। এই নিষ্ঠাই হ'ল বৈজ্ঞানিকের মাপকাঠি।

ভগবানের কথা শুনতে শুনতে, তাঁর লীলামৃত পড়তে পড়তে মানুষ ভক্ত হয়ে ওঠে। তখন সে আরও বেশী জানতে চায়; একে বলে পিপাসা। জানবার জন্য কঠোর সাধনা করে; এর নাম একাগ্রতা। প্রচণ্ড পিপাসাক্লিষ্ট জলের সন্ধান করবেই। হাজার জন চেষ্টা করে, এক জন লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু বাকী লোকেদের চেষ্টা নিষ্ফল যায় না। একটা স্রোত বহিয়ে দেয় জনসাধারণের মধ্যে। সেই রসস্রোতসিক্তগণের মধ্যে থেকেই আরও কয়েক জন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে। কিন্তু এই স্রোত যদি না বয়, তবে সাধক-সৃষ্টির আশা সুদূরপরাহত।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। পাঁচশ' জন একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে, এক জন সাফল্য অর্জ্জন করে। সুতরাং যদি পাঁচ লক্ষ ব্যক্তি এই ভাবে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকে তবে সাফল্যও সেই পরিমাণে বাড়তে থাকবে। জ্ঞানের সমুদ্র অসীম। দু'-এক জন মাত্র তার কতটুকু অর্জ্জন করতে পারে? স্বয়ং নিউটনও বলেছেন—"আমি সমুদ্র-তীরে পাথর নিয়ে খেলা করছি মাত্র।"

বাংলা দেশের কয়েক জন বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত সাফল্য লাভ করেছেন স্বীকার করি, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়! One swallow does not make summer. দু'-চার জন বৈজ্ঞানিকে জাতি বিজ্ঞান-রসিক হয়ে ওঠে না। জনসাধারণকে বিজ্ঞান চর্চ্চা করতে হবে, এই চর্চ্চায় আনন্দ পেতে হবে! আনন্দ না পেলে চর্চ্চা থেমে যাবে। মন বিজ্ঞান-রসে মজবে না। ফলে, জাতির উন্নতি ব্যাহত হবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, জনসাধারণের মনকে বিজ্ঞান-রসে মজাতে না পারলে কিছুই হবে না। কিন্তু এত দিন তা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান চর্চ্চা চলে এসেছে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে—যা দেশের সাধারণ লোক জানে না, বোঝে না। দ্বিতীয়, দু'-চারখানা বই যা বাংলা ভাষায় লেখবার চেষ্টা হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিক টেকনিক্যাল শব্দে এত গুরু-গম্ভীর হয়ে উঠেছে যে, লোকে তা পড়ে আনন্দ পায়নি। তাই চর্চ্চা অগ্রসর হতে পারেনি। রূপকথার গল্প দিয়ে শিশুর মন জয় করলে সে নিজের আগ্রহেই সাহিত্য-রসিক হয়ে ওঠে। এই অত্যাবশ্যক প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। সহজ সরল ভাষায়, গুরু-গম্ভীর টেকনিক্যাল কথার মার-প্যাঁচ এড়িয়ে অথচ বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া পুরোপুরি বজায় রেখে তাঁরা বিজ্ঞানের পুস্তকাবলী প্রকাশ করেছেন। ভাষা সাবলীল এবং বলবার ভঙ্গী মনোরম। পড়তে আরম্ভ করলে মনে হয় যেন গল্পের বই পড়ছি, আর শেষ করবার পর বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, কত নতুন কথা শিখে ফেলেছি! ফলে, একটা বই শেষ করে আরেকটা বই পড়তে ইচ্ছা হয়, আরও জানবার আগ্রহ মনে জাগে। এক কথায় মন আপনা থেকেই বিজ্ঞান-রসে মজে। এরই তো অভাব

ছিল এত দিন। জাতির উন্নতির পথ এঁরা করেছেন পরিষ্কার। প্রথমেই ধরা যাক, লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালার কথা। এর উদ্দেশ্য হ'ল গল্পের ছলে জনসাধারণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এতে যে শুধু কিছুটা জ্ঞান লাভ হবে তাই নয়, আরও জানবার আগ্রহ বেড়ে যাবে। এই গ্রন্থমালার ভাষা অতি সরল; কিন্তু তথ্য আছে অনেক। এই ধরণের বই লেখার জন্য বিলক্ষণ জ্ঞান ও মুন্সীয়ানার প্রয়োজন। বইগুলি ভাষার দিক দিয়ে যেমন জনসাধারণের নাগালের মধ্যে, দামের দিক দিয়েও তাই। প্রতিটির মূল্য আট আনা মাত্র। এই গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক "তড়িতের অভ্যুত্থান।" রচনা করেছেন শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তড়িত সম্পর্কে যা-কিছু জানা প্রয়োজন, সবই আছে এই পুস্তকের মধ্যে। আবিষ্কারের সময় থেকে আরম্ভ করে আজকালকার তড়িতের বিভিন্ন ব্যবহার পর্য্যন্ত। চিত্র ও উপমা দিয়ে বিষয়-বস্তু বেশ সহজ করে বোঝান হয়েছে। দুরূহ তথ্য-সমূহ উদাহরণ দিয়ে এমন ভাবে সরল করে দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও তা বোধগম্য!

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় পুস্তক "আমাদের খাদ্য"। রচনা করেছেন শ্রীনীলরতন ধর। খাদ্য কি, খাদ্যের উপাদান কি, কোন্ খাদ্যের কি উপকারিতা সকল বিষয়ই এর মধ্যে সন্নিহিত আছে। সেই সঙ্গে কি খাওয়া উচিত, কোন্ জিনিষ না খেলে শরীরে কি অপকার হয়, এই সব কথা থাকায় জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া সম্ভব। পুস্তকের শেষে বিভিন্ন খাদ্যের নাম এবং তার পুষ্টি মূল্যের তালিকা দেওয়া আছে। সাধারণ ভারতবাসীর দৈনিক খাদ্য-তালিকা কিরূপ হলে ভাল হয় তারও নির্দ্দেশ পুস্তকের শেষে তালিকায় নির্দ্দেশ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় পুস্তক "ধরিত্রী"। রচনা করেছেন শ্রীসুকুমার বসু। এতে প্রথমেই আছে ব্রহ্মাণ্ডের কথা। তার পর পৃথিবীর। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পর আছে ভৌগোলিক ব্যাখ্যা। আর তার পর পৃথিবীর পৃষ্ঠের কথা। ভূপৃষ্ঠে নিয়ত ভাঙ্গা-গড়া চলছে, পাহাড় উঠছে, ধ্বসে যাচ্ছে, দ্বীপ সমুদ্রগর্ভ থেকে ভেসে উঠছে আবার কোন শুষ্ক ভূমি সমুদ্রের অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এই সব মনোমুগ্ধকর কাহিনী লেখা আছে রূপকথার মত করে। আর আছে পৃথিবীর অভ্যন্তরের সংবাদ।

এই গ্রন্থমালার চতুর্থ পুস্তক "হর্মোন বা উত্তেজক রস"। রচনা করেছেন শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। লেখক হর্মোন সম্বন্ধে পাশুপত অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কথাটা খাঁটি। আমাদের জীবনের যা কিছু খারাপ এবং ভালো, সবই নির্ভর করছে এই হর্মোন সমূহের উপর। আজকাল হর্মোন সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য অনেকেই উৎসুক। এ সম্বন্ধে কোন সহজ বই বাজারে নেই। সেই দিক দিয়ে এই ধরণের বইএর প্রয়োজন ছিল খুবই। লেখক এই পুস্তকে হর্মোন কি, প্রধান প্রধান হর্মোনগুলির উৎপত্তি স্থান এবং ক্রিয়া এবং খাদ্য ও হর্মোন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এতে জনসাধারণের পক্ষে অনেক অজানা কিন্তু নাম-শোনা গ্রন্থি সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জ্ঞান হবে বলে মনে হয়। নারীত্ব ও পৌরুষ এবং শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য যে এই হর্মোনেরই কারসাজি তাও তিনি অতি সরল ভাষায় বেশ সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। চিত্রসমূহ তাঁর বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করতে খুব সাহায্য করেছে।

এই গ্রন্থমালার পঞ্চম পুস্তক "পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন রচনা করেছেন শ্রীসর্ব্বাণী-সহায় গুহ-সরকার। এই দুইটি ধন্বন্তরি সদৃশ ওষুধের নাম প্রায় সকলেই শুনেছে। এই ওষুধের প্রয়োগে মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচতেও অনেকে দেখেছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে লোকের জানবার ঔৎসুক্য বড় কম নয়। সংক্ষেপে কিন্তু যতটা সম্ভব পুরোপুরি ভাবে পেনিসিলিন এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কার, গবেষণা, গুণ ও ধর্ম্ম এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। ব্যবহার ও প্রয়োগবিধির কথাও সেই সঙ্গে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আধু[illegible] কয়েকটি আবিষ্কারের কথা বলাতে জনসাধারণ বুঝতে পারবে, [illegible] দেশে কি ধরণের প্রচেষ্টা চলেছে মানুষকে সুস্থ রাখবার জন্য, [illegible] আমরা কোথায় পড়ে আছি।

এই বার বিজ্ঞান-প্রবেশ সিরিজের কথা আলোচনা করা [illegible] নামেতেই এই গ্রন্থমালার পরিচয়। এতে ধরে নেওয়া [illegible] পাঠকের মন বিজ্ঞানপিপাসু। লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা [illegible] উদ্বুদ্ধ হয়েছে আরও জ্ঞান আহরণের জন্য। এই গ্রন্থমালাও প্রকাশ করেছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং ভাষা ও দামের দিক দিয়ে যাতে জনসাধারণের নাগালের মধ্যে থাকে সে দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। পুস্তক সমূহের দাম করেছেন মাত্র এক টাকা [illegible] রচনা করেছেন শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞান-প্রবেশের প্রথম পুস্তকের নাম "প্রারম্ভ"। এতে [illegible] ব্রহ্মাণ্ড, সূর্য্য ও চন্দ্র, সৌর জগৎ, পৃথিবী, জীব, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর কথা এবং যুগ-যুগান্তর পরে মানুষ, চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর [illegible] ভবিষ্যদ্বাণী। সংক্ষিপ্ত ভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রায় সকল [illegible] মোটামুটি এতে দেওয়া আছে। চিত্রগুলি বিষয়বস্তুকে বোধগম্য [illegible] বেশ সাহায্য করে। আবিষ্কারের সঙ্গে আবিষ্কর্ত্তার পরিচয় [illegible] দেওয়াতে পুস্তকটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

দ্বিতীয় পুস্তক, "পদার্থবিদ্যা" প্রথম খণ্ড। এতে আছে পদার্থ ও শক্তির কথা এবং শব্দের কথা। পদার্থবিদ্যার [illegible] কথা সমূহ স্পষ্ট এবং নির্ভুল ভাবে বোঝান বেশ দুরূহ [illegible] লেখক কিন্তু এই দুরূহ কাজকে সম্পন্ন করেছেন খুব সহজ [illegible] পড়তে গিয়ে কোথাও আটকে যেতে হয় না। কঠিন, তরল [illegible] গ্যাস তিনটি বিষয়ই মোটামুটি ভাবে আলোচিত হয়েছে। [illegible] কথার মধ্যে শব্দে অনুভূতি উৎপত্তি, কাণ ইত্যাদি গোড়াকার [illegible] যেমন আছে, তেমনি আছে শব্দগ্রাহী যন্ত্রসমূহের আলোচনা। [illegible] বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির সূক্ষ্ম ব্যাপারও বেশ সহজ ভাবে বোঝান [illegible]

চতুর্থ পুস্তক "পদার্থবিদ্যা" তৃতীয় খণ্ড। এতে আছে [illegible] ও তড়িতের কথা। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে তড়িত চুম্বকী[illegible] প্রধান। এর জ্ঞান না থাকলে আজকালকার আবিষ্কার[illegible] কিছুই বোঝা যাবে না। পুস্তকে এই দুই বিষয়ই বেশ স[illegible] বোঝান হয়েছে। চুম্বক কি, তার আবেশ, আকর্ষণ এবং [illegible] ও বলরেখা সকল অংশই আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় [illegible] চলৎ তড়িৎ সম্পর্কে বক্তব্যও অতি হৃদয়গ্রাহী। তড়িতের আ[illegible] কথা যেন একটা রূপকথা। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যাখ্যা[illegible] সুন্দর। তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের দুরূহ কথাগুলি বলা হয়েছে [illegible] সহজ ভাষায়। বুঝতে কোন বেগই পেতে হয় না। [illegible] তরঙ্গের মোটামুটি একটা ধারণা করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

প্রসাদ রায়

এই শ্রাবণ মাসে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। সেই কথা স্মরণ ক'রে তাঁর নাটকাবলী নিয়ে আজ কিছু আলোচনা করতে চাই।

গোড়াতেই বলে রাখি, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এবং তিনি যদি একখানি মাত্র নাটকও রচনা না করতেন, তাহলেও কবিরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। রবীন্দ্র-প্রভাবের যুগেও তিনি রবি-প্রতিভার দ্বারা আচ্ছন্ন হননি, নিজের জন্যে একটি সম্যক্‌রূপে স্বতন্ত্র পথ কেটে নিতে পেরেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের যে কোন কবিতার মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর নিজের শীলমোহরের ছাপ। আর এ ছাপ এত স্পষ্ট যে কিছুমাত্র ভুল হবার যো নেই। নাটক-রচনার জন্যে লেখনী ধারণ না করলে তাঁর কবি-মূর্তি যে বৃহত্তর হয়ে উঠত, এ কথা নিশ্চিতরূপেই বলতে পারা যায়। তবে এ কথাও সত্য যে, নাটকের মধ্যেও আমরা পাই কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে।

কিন্তু বিদগ্ধ-সভার বাইরে অপেক্ষা করে যে বিপুল জনসাধারণ, তাদের কাছে তিনি সুপরিচিত হয়েছেন নাটক, হাসির গান ও জাতীয় সঙ্গীত রচনা ক'রে। যে সব বালক-বালিকা তাঁর কোন কবিতাই পাঠ করেনি, তারাও নাম করলেই চিনতে পারে নাট্যকার ডি. এল. রায়কে। আজও তাঁর নাটকাবলীর বহু খরিদ্দার আছে, কিন্তু কারুর হাতেই দেখতে পাই না তাঁর রচিত কবিতা পুস্তক। সন্দেহ হয়, নাটক ও গান না লিখলে সাধারণ জনতা হয়তো তাঁর নাম পর্যন্ত স্মরণ করতে পারত না।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে কিছু-কিছু মিল আছে। দুজনেই ১২৭০ সালে পৃথিবীর আলো দেখেন। দু'জনেই আগে হন কবি, তার পর হন নাট্যকার। দু'জনেই বাহির থেকে রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। এবং দু'জনেরই প্রথম অভিনীত নাটকের মধ্যে আছে পৃথ্বীরাজ ও তারা বাঈয়ের আখ্যান।

আর এক দিকেও দু'জনের মধ্যে মিল আছে। সাধারণ রঙ্গালয় প্রথম অবলম্বন করেছিল মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকগণকে। কিন্তু বাইরের পুঁজি যখন ফুরিয়ে এল, লেখনী ধারণ করতে বাধ্য হলেন তখন রঙ্গালয়ের ভিতরকার নট-নাট্যকারগণ। দর্শকগণের সামনে দীর্ঘকাল অভিনয় ক'রে তাঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাংলা দেশের সাধারণ দর্শকরা সুশিক্ষিত নয়, উচ্চ সাহিত্য বা সূক্ষ্ম সাহিত্যরস ও কাব্যসৌন্দর্যের ধার বড় ধারে না। সেই জন্য নাটক-রচনার সময়ে সাধারণত তাঁরা কাব্য-ঘেঁষা অলঙ্কৃত বা পুষ্পিত ভাষা ব্যবহার করতেন না, সাদাসিধে আটপৌরে ভাষাতেই সংলাপ রচনা করতেন।

কিন্তু রঙ্গালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে এসেও ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেদের কবিসুলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে পারেননি। ভুলে যেতে পারেননি, নাট্যকার হলেও তাঁরা সাহিত্যিক। নাটকের মধ্যে তাঁরা যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী কাব্যরসপূর্ণ অলঙ্কৃত ভাষা। এবং জনসাধারণও যে পরম সমাদরে তাঁদের গ্রহণ করেছে, এটা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করবার দরকার হবে না। হয়তো নাট্য-জগতে তাঁদের আবির্ভাবের সময়ে সাধারণ দর্শকদের রসবোধ হয়ে উঠেছিল সূক্ষ্মতর। ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের আর কোন মিল নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ নাটকই ঐতিহাসিক। শেষের দিকে তিনি দু'খানি সামাজিক নাটক এবং গোড়ার দিকে দু'খানি পৌরাণিক নাটকও লিখেছিলেন। "ভীষ্ম" নামে তাঁর আর একখানি পৌরাণিক নাটক আছে, তার রচনা-কাল জানি না। এ ছাড়া তাঁর রচিত কয়েকখানি কৌতুক-নাট্য ও প্রহসন এবং "সোরাব-রুস্তম" নামে একখানি নাটিকাও আছে। কেবল গদ্যে নয়, সময়ে সময়ে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করেছেন। নাট্য-সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন এবং পঞ্চাশ বৎসর পার হয়েই অকালে ইহলোক ত্যাগ না করলে তাঁর নাট্য-প্রতিভা আরো কতখানি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠত, সেটুকু আমরা কেবল অনুমান করতে পারি।

নিরপেক্ষ সমালোচকের চক্ষে দেখলে বলতে হবে যে, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকারের মত দ্বিজেন্দ্রলালও দেশ ও জাতির সামনে যে-সব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ক সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, সেগুলির সমাধান করবার জন্যে লেখনী ধরেননি। এখানে-সেখানে কিছু কিছু বলেছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। যখন প্রহসনও লিখেছেন তখনও গল্প বলবার ও হাস্যরস সৃষ্টি করবার দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন, মাইকেল ও অমৃতলালের মত সামাজিক ব্যভিচারের উপরে সজোরে চাবুক চালাতে পারেননি। কেবল "বহুৎ আচ্ছা" নামে অভিনীত প্রহসনে এর ব্যত্যয় দেখা যায়। অথচ হাসতে হাসতে ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষেপ করবার শক্তি ছিল যে তাঁর অনন্যসাধারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলির মধ্যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত জনপ্রিয় নাট্যকার হ'লেও তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি এ দেশে সাদরে গৃহীত হয়নি। শিশিরকুমারের আমলে

অভিনীত ও তাঁর দ্বারা লিখিত "সীতা" ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে কয়েক রাত্রি ধ'রে বেশ চ'লেছিল বটে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে তা কি-রকম অভ্যর্থনা লাভ করত, সে পরীক্ষা হয়নি আজ পর্য্যন্ত। তাঁর "পাষাণী"কে শিশিরকুমার অপূর্ব অভিনয়ের দ্বারাও দীর্ঘজীবী করতে পারেননি। এমন কি, দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"র আদর্শে রচিত হয়েছিল ব'লে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর "সীতা"কেও অল্প বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়নি। প্রধানত শিশির-প্রতিভার বিচিত্র ইন্দ্রজালের উপরে নির্ভর ক'রেই সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। যত দূর জানি, দ্বিজেন্দ্রলালের বাকি পৌরাণিক নাটক "ভীষ্ম" অদ্যাবধি সাধারণ রঙ্গালয়ে গৃহীত হয়নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই বিদ্রোহের কারণ, রচনার বা চরিত্র-চিত্রণের দুর্ব্বলতা নয়। "সীতা" ও "পাষাণী"র মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব ও রচনা-কৌশলের কোনই অভাব নেই। কিন্তু তিনি পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীদের যে-চোখে দেখেছেন এবং যে-ভাবে দেখাতে চেয়েছেন, জনসাধারণ তাঁদের সে চোখে দেখতে প্রস্তুত নয়। নাটকের অবস্থা-সঙ্কট (situation) সৃষ্টি করবার জন্যে প্রায়ই তিনি ঐতিহ্য বা চলতি জনশ্রুতিকে মানতে রাজি হননি। এ দেশের সাধারণ লোকরা মূল রামায়ণ বা মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত নয়।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের দ্বারা অনূদিত মূল রামায়ণে দেখি, সীতা দেবী দেবচরিত্র দেবর লক্ষ্মণকে এই ব'লে গালাগালি দিচ্ছেন : "তুই যার-পর-নাই দুষ্ট-চরিত্র। তুই ভরতের নিয়োগক্রমে অথবা নিজেই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করত অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই বনে রামের সঙ্গে আসিয়াছিস। ওরে সুমিত্রাপুত্র! তোর বা ভরতের সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে না।" প্রভৃতি।

অন্যত্র দেখি, মদের নেশায় মেতে রূপসী নর্ত্তকীরা নৃত্য করছে এবং রামচন্দ্র স্বহস্তে সীতাকে মদ্যপান করিয়ে মাংস ও ফল খেতে খেতে নাচ দেখছেন (উত্তরকাণ্ড, দ্বিপঞ্চাশ সর্গ)।

অহল্যার আখ্যানে দেখা যায়, তিনি মুনিবেশধারী ইন্দ্রকে দেবরাজ ব'লে চিনতে পেরেও স্বেচ্ছায় দেহদান ক'রে "মনে মনে আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান" করলেন।

কিন্তু চলতি জনশ্রুতি রাম, সীতা ও অহল্যার এই সব আচরণকে বিন্দুমাত্র আমল দেয় না। ঐ জনশ্রুতির উপরেই নির্ভর ক'রে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের অনেক অংশ রচিত হয়েছে এবং অধিকাংশ বাঙালীই ঐ দুইখানি কাব্যের সঙ্গে সমধিক পরিচিত। রামায়ণ-মহাভারতের বহু পাত্র-পাত্রীকেই তারা দেব-দেবীর মত ভক্তি করে। এমন কি কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, অহল্যা ও দ্রৌপদী পর্য্যন্ত না কি প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা—অথচ ওঁদের কারুর সতীত্বই অক্ষত নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য ক'রেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু অতি-আধুনিক বস্তুতন্ত্র মন নিয়ে পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীদের দেখাতে চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষের মত। সেই জন্যেই পৌরাণিক নাটক হিসাবে "সীতা", "পাষাণী" ও "ভীষ্ম" সার্থকতা অর্জ্জন করতে পারেনি।

তাঁর সামাজিক নাটক "পরপারে"র অভিনয় বেশ জ'মে উঠেছিল এক সময়ে। এর মধ্যে চমৎকার চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা দেখা যায়। নাটকখানি প্রথম খোলা হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু শান্তার ... গণিকা সে যুগেও কেউ দেখেনি, এ যুগেও কেউ দেখতে পাবে ... শান্তাকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়, তার স্রষ্টা তাকে আ... করেছেন আপন কল্পনালোকের মধ্যেই। বাংলা নাটকে ... গণিকার আসল চেহারা দেখাতে পেরেছেন গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল।

দ্বিজেন্দ্রলাল সব চেয়ে সফল হয়েছেন ঐতিহাসিক নাটক ... ক'রেই। তাঁর এই শ্রেণীর নাটকের সংখ্যা হচ্ছে আটখানা; কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষে এ-সব নাটকের বিশেষ কোনই ... নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের অনুবর্ত্তী তো হননি, উপরন্তু নাটকের অবস্থা-সঙ্কট সৃষ্টি করবার জন্যে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করেছেন বহু স্থলেই। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যেও এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, ... এত বেশী মাত্রায় নয়। বিশেষ ক'রে ইতিহাসের অপলাপ দেখ... পাই "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের মধ্যেই। ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তকে দে... এক জন মহামানবের মত। চন্দ্রগুপ্ত হীনবংশজাত নন, তিনি রাজবংশের ছেলে। নন্দই হীনবংশজাত, কারণ তাঁর পিতা ছিলেন নাপিত। আঠারো বৎসরের মধ্যে তরবারির জোরে স্বদেশ থেকে গ্রীকদের তাড়িয়ে চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করবার পর, অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়স হবার আগেই তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হ... রাজমুকুট খুলে ফেলে প্রায়োপবেশন ক'রে তিনি প্রাণত্যাগ করে... তাঁর মন্ত্রী ও গুরুদেব চাণক্যের প্রতি তিনি চিরদিনই শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কারণ তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাঁরই হাতেই, কোন দিনই তাঁকে অপমান করেননি। চাণক্যও কোন দিন মন্ত্রীর পদ ... করেননি, কারণ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালেও ... মন্ত্রিত্ব করতে দেখি। কিন্তু "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক এ-সব কথা বলে ... উল্টো কথাই বলে।

ইতিহাসের কথা ছেড়ে এইবারে নাটকত্বের দিকটা দেখা ... দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের মত হচ্ছে : "নাটকে প্রত্যেক ঘটনার সাথ... থাকা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পা... না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূ... প্রতিকূল হওয়া চাই।···সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার ... চাহিয়া থাকিবে, তাহাকে আগাইয়া দিবে কিংবা পিছাইয়া দি... তবেই তাহা নাটক, নতিলে নয়।" এই উক্তিটি উদ্ধার ক'... নাট্যবোদ্ধা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বলেছেন : "আশ্চ... বিষয় এই যে, কার্য্যকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এই অবশ্য-প্রতিপাল্য নি... লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। এমন কি, ... শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিও এ দোষ হইতে মুক্ত নহে।" তার পর মন্মথ... দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের সব চেয়ে জনপ্রিয় দুইখানি নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" ও "সাজাহান"—নিয়ে দেখিয়েছেন, "চন্দ্রগুপ্তে"র ... "চারিটি স্বতন্ত্র নাটকের অভিনয় একই আসরে একই সময়ে দেখা... হইয়াছে" এবং "সাজাহান নাটক তিনটি নাটকের সমষ্টি।" ... বাবুর আগেও শিশিরকুমার "চন্দ্রগুপ্তে"র ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলে... তাই শিশির-সম্প্রদায়ে যে "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনীত হয়, তার মধ্যে ... পাত্র-পাত্রীদের নাম-গন্ধও থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মোটামুটি বলা হ'ল। এই ...

তাঁর গুণ এবং তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তার অনুসন্ধান করতে পারি।

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক বা স্বাভাবিক হোক্ আর না হোক্, ...ন্দ্রলাল এমন বিচিত্র, অপ্রত্যাশিত ও চিত্তোত্তেজক অবস্থা-সৃষ্টি করতে পারেন যে, নাটক জ'মে উঠতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, অবান্তর ঘটনা বা চরিত্র থাকলেও তাঁর নাটকে যেমন অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া যায়, অন্যত্র তা দুর্লভ। "চন্দ্রগুপ্তে"র ...উকাস ও আণ্টিগোনাস চরিত্র দু'টি অবান্তর! কিন্তু যথাক্রমে ... চৌধুরী ও স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অপরূপ অভিনয়-নৈপুণ্য ঐ দু'টি চরিত্রকে এমন জীবন্ত এবং চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলেছিল যে, সকলেই তাদের দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ...গুপ্ত, কাত্যায়ন ও মুরা—প্রত্যেকটিই শ্রেষ্ঠ নট-নটীর যোগ্য। চাণক্যের ভূমিকাই যে-কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার পক্ষেও লোভনীয়। "সাজাহান" নাটকও ঐ শ্রেণীর। সাজাহান, ঔরংজেব, দারা, জাহানারা ও পিয়ারা—প্রত্যেক ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারেন খ্যাতনামা নট-নটীরা। আরো বেশী দৃষ্টান্ত দিয়ে ...বাড়িয়ে কাজ নেই। যে-সব নাটকে এত বেশী অভিনয়-যোগ্য ভূমিকা থাকে, নাটকত্বের দিক দিয়ে দুর্ব্বল হ'লেও তাদের পরমায়ু ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে না।

তৃতীয়তঃ, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত ও সুর-সংযোজনার শক্তি। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে বৃন্দগায়কদের দ্বারা গীত যে সব জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান থাকত, প্রত্যেক শ্রোতার চিত্তকেই তা উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলত। বহু ব্যবহারের পর পুরাতন ও অতি-পরিচিত হয়ে আজকাল তাদের আকর্ষণী-শক্তি অনেকটা ক'মে এসেছে বটে, কিন্তু গত যুগে তারা ভাবের গম্ভীরতায় ও সুরের নূতনত্বে আমাদের মন একেবারে সমাচ্ছন্ন ক'রে দিত। ধরুন, "ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা" গানখানির কথা। গানটি আজও সর্ব্বজন-...আছে এবং তা থাকবারই কথা। কারণ, এমন মিষ্ট ...গান ভারতীয় কোন ভাষাতেই আজ পর্য্যন্ত রচিত ... আজকালকার পুনরভিনয়েও গানটি গাওয়া হয় বটে, তবে ...অযত্নের সঙ্গে। কিন্তু আগে এ গানটি প্রেক্ষাগৃহের উপরে ...ত মন্ত্রশক্তির মত। তার পর প্রত্যেক শ্লোকের শেষে ...টি শিশু যখন ধুয়া ধ'রে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে ...কো তুমি" প্রভৃতি গাইতে গাইতে নাচের ভঙ্গিতে মণ্ডলাকারে ...কত, তখন ভাব-বিহ্বল দর্শকদের চক্ষু অশ্রুসজল না হয়ে ...। ভুলে যেত সবাই নাটক ও অভিনয়ের কথা—দিবা-দৃষ্টির ...সতে থাকত কেবল ভুবনমোহিনী দেশমাতৃকার মাধুর্য্যময় ...পটি। "চল সমরে দিব জীবন ঢালি, জয় মা ভারত, জয় মা ...", "মেবার পাহাড় শিখরে যাহার রক্ত-পতাকা উচ্চশির", "সধবা ...ধবা" এবং "সেথা গিয়াছেন তিনি" প্রভৃতি গানের সময়েও ...মনি অভিভূত হয়ে যেতেন। আবার জাতীয় ভাবপূর্ণ ...কা চালের দ্ব্যর্থক গানের দ্বারাও দ্বিজেন্দ্রলাল শ্রোতাদের ...য়ে তুলতেন না। যেমন "দুর্গাদাস" নাটকের "পাঁচশো ...নি ক'রে সরে আসছি সমুদায়" গান। বৃন্দগায়কদের দ্বারা ... সঙ্গে যখন এই দীর্ঘ সঙ্গীতটি রঙ্গমঞ্চের উপরে গাওয়া হ'ত, শ্রোতাদের মন তখন কেবল কৌতুক-রসের দ্বারাই আপ্লুত হ'ত না, নিজেদের অত্যাচারিত, অসহায় অবস্থা স্মরণ করে তাঁদের চিত্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠত দুঃখের দীর্ঘশ্বাস।

তিনি কেবল দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার জন্যেই নাটকীয় সঙ্গীত রচনা করতেন না, তাঁর প্রেমের গানগুলিও সাধারণ রঙ্গালয়ে এনে দিয়েছিল অভিনব বৈভব। তাঁর আগেও রঙ্গালয়ের জন্যে সঙ্গীত রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন পূর্ব্ব-যুগের রচনা-রীতিতে অভ্যস্ত। আমাদের নাটকীয় গানে আধুনিক কাব্যসৌন্দর্য্য ও যুগোপযোগী ভাব, ভাষা ও রচনা-ভঙ্গি এনেছেন বিশেষ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালই। অন্যান্য গীতিকারদের অধিকাংশ গান নাটক থেকে বিচ্যুত হ'লে রঙ্গালয়ের বাইরের বৈঠকে অপরূপ মাধুর্য্য প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমস্ত গানই রঙ্গালয়ের ভিতরে এবং বাহিরে সমান উপভোগ্য। কাব্যরসের প্রাধান্যই তার প্রধান কারণ। রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যেও এই গুণটি লক্ষ্য করা যায়। এবং এই বিশেষ গুণের জন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয় গান-গুলিও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে করত মধুবর্ষণ। লোকে বেশ বুঝে নিয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন গীতিকবি বিশেষ ভাবে রঙ্গালয়ের জন্যে লেখনী চালনা করেননি।

তার পর তাঁর গানের সুর। তাঁর আগে আর আর যাঁরা নাটকীয় গান রচনা করতেন, সুর-সংযোজনার ভার দিতেন তাঁরা অন্য ব্যক্তির উপরে। তাঁরা যে বিশেষ ঢঙে বা চালে গানে সুর সংযোগ করতেন, তার নাম ছিল 'থিয়েটারি সুর'। বহু কাল ধরে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়ে তথাকথিত থিয়েটারি সুর নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল কবি নন, বিশেষজ্ঞ সঙ্গীতবিদ্ও ছিলেন, তাই তিনি থিয়েটারি সুরকারদের কাছে ধরনা দিতে রাজি হননি, নিজেই সুর সংযোজন করেছেন নিজের গানে। একে তো গীতিকার আর সুরকার অভিন্ন হ'লে গানের রস জ'মে ওঠে অধিকতর, তার উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের দেওয়া সুরের মধ্যে থাকত এমন বিচিত্র অপূর্ব্বতা, এমন রুচিসম্মত আনকোরা ভঙ্গি এবং এমন নব নব বিস্ময়-মাধুর্য্য যে, তা চিত্তহারী হয়ে উঠত কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এই জন্যেই তিনি দেশপ্রেম বা সাধারণ প্রেম বা ধর্ম্মভাব বা অন্য যা-কিছু নিয়ে গান লিখতেন, প্রেক্ষাগারকে তা পরম স্নিগ্ধ করে তুলত রসধারাপাতে। এক সময়ে তাঁর প্রেমের গানগুলিও বাংলা দেশের ঘরে-বাইরে করত সঙ্গীত-সুধা বিতরণ। তাঁর কোন কোন গানের অংশবিশেষ প্রবাদ-বাণীর মত হয়ে উঠেছে। যেমন—"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান।"

দ্বিজেন্দ্রলালের চতুর্থ দান হচ্ছে, তাঁর ভাষা। নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাষা ব্যবহার করে গিয়েছেন, সর্ব্বপ্রথমেই তার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়। তা হচ্ছে প্রসাদগুণের সঙ্গে পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা। অদ্যাবধি বাংলা দেশের আর কোন নাট্যকারই এই মহা গুণের অধিকারী হতে পারেননি। এই দুর্লভ পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা কেবল তাঁর লেখা ভাষার মধ্যেই পাওয়া যেত না। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, বার কয়েক তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছি এবং সেই সময়েই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি, তাঁর কথ্য ভাষার মধ্যেও

ছিল ঐ একই পুরুষসুলভ বলিষ্ঠতা। সুতরাং বলতে হবে, এই বিশেষত্ব ছিল তাঁর স্বভাবগত। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে সর্বত্রই পাওয়া যায় বীর্য্যবান এবং বীরাঙ্গনাদের শৌর্য্য-কাহিনী, খড়্গে খড়্গে ঝনৎকার ও দেশাত্মবোধের অনুপ্রাণনা, তাঁর ভাষার মধ্যেও তাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে অগ্নিগর্ভ শক্তির উষ্ণ মন্ত্র।

আগেই তাঁর ভাষার প্রসাদগুণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যে ভাষা বীরের উপযোগী, তার মধ্যে প্রসাদগুণ তো থাকবেই। বাক্যজাল বিস্তার ক'রে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মত জাহির করতে চায় কাপুরুষ বা ভীরুরাই। কিন্তু কেবল বীরত্বপ্রধান নাটকে নয়, নানা কবিতা পুস্তকে এবং গদ্যপ্রবন্ধেও দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার এই স্পষ্টতা লক্ষ্য করবার যোগ্য। তিনি ধোঁয়া-ধোঁয়া কিছুই পছন্দ করতেন না। অস্পষ্টতার জন্যে একবার প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকেও।

বীরত্ব ও পৌরুষের দ্যোতনা দিত বটে তাঁর শক্তিময়ী ভাষা, কিন্তু দরকার হ'লেই সে আবার দেখাতে পারত পুষ্পপেলব শান্ত রসের ব্যঞ্জনা। যেমন একই আকাশ দেখায় বজ্রাগ্নিশিখা এবং চন্দ্রকরমালা।

স্বল্প পরিসরের মধ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তার প্রধান প্রধান কারণ নিয়ে আলোচনা করলুম। ঐ কারণগুলির জন্যেই আমাদের নাট্য-জগতে গিরিশচন্দ্রের সবিশেষ প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব হয়েছিল বিস্ময়কর ধূমকেতুর মত এবং কেহই বাধা দিতে পারেনি তাঁর অগ্রগতিকে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা রঙ্গালয় দ্বিজেন্দ্রলালের কাছ থেকে নাটকের পর নাটক উপহার লাভ করেছে। তার আগে তিনি দু'-তিনখানি চুটকি হাস্যনাট্য রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি সফল হ'লেও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। প্রকৃত নাট্যকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-কাল হচ্ছে এক যুগ মাত্র। সেই যুগটা ছিল গিরিশচন্দ্রের নাট্য-জীবনের গৌরবময় যুগ। ঐ সময়ে তিনি এই বিখ্যাত নাটক-নাটিকাগুলি রচনা করেছিলেন: সংনাম, হর-গৌরী, বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, বাসর, মীরকাশিম, য্যায়সা কা ত্যায়সা, ছত্রপতি, শাস্তি কি শান্তি, শঙ্করাচার্য্য, রাজা অশোক, তপোবল ও গৃহলক্ষ্মী। "আলিবাবা" ও "প্রতাপাদিত্য" প্রভৃতি রচনা ক'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে ঐ এক যুগের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছিলেন তেইশখানি নাটক-নাটিকা। তা ছাড়া জনপ্রিয় নাট্যকার অমৃতলাল বসু ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং আরো অনেকেরই লেখনী তখন অলস হয়ে ছিল না। বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলা নাট্য-সাহিত্যক্ষেত্রে তখন রীতিমত সুভিক্ষের দিন, আজকের মত দুর্ভিক্ষ তখন ছিল কল্পনাতীত। আজ আমরা সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর ভিতর থেকে তাদের গঠন ও তাদের আখ্যানবস্তুর অল্প-বিস্তর ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা ভুললেও চলবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মধ্যে এমন সব অভাবিত বিশেষত্ব ও নাট্য-প্রতিভার অভিজ্ঞান ছিল, যার মহিমায় তিনি অনায়াসেই তখনকার বড় বড় রথী মহারথদেরও মাঝখানে একটি প্রধান আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের চেয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা অল্প ছিল না এবং সেই জনপ্রিয়তা যে এত কাল পরেও ক্ষুণ্ণ হয়নি, বার বার তাঁর নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন দেখে সে কথা বুঝতেও দেরি লাগে না। মাত্র এক যুগের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, কিন্তু তবু তিনি অর্জন করেছেন কায়েমী যশ। তাঁকে এক প্রান্তে সরিয়ে রেখে রচিত হ'তে পারবে না বাংলা নাট্য-সাহিত্যের কোন ইতিহাসই। আমাদের মধ্য-যুগের নাট্যসাহিত্যের প্রধান প্রবর্তক হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদই।

দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক সঙ্গীতের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য-জগতে কেবল চারণ-কবির কর্ত্তব্যই পালন ক'রে যাননি, একটা মৃতকল্প জীবন্মৃত জাতিকে সম্যকরূপে জাগ্রত করবার জন্যে তিনি সমুখে দেখিয়ে গিয়েছেন অতীতের ভাস্বর গরিমা ও ভবিষ্যতের স্বর্ণময় স্বপ্ন, সামনে এনে মূর্তিমান করেছেন মানবতায়, বীরত্বে ও মহানুভবতায় শ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্রের পর চরিত্র এবং তাদের কণ্ঠে দিয়েছেন যে দীপ্যমান ভাষার ইন্দ্রজাল, তার স্পর্শ পেলে বুঝি নিস্পন্দ চিত্তাভস্মের মধ্যেও হ'তে পারে নবজীবনের আবির্ভাব!

ইনগ্রিড বার্গম্যান

বিখ্যাত চিত্র-তারকা ইনগ্রিড বার্গম্যান এবং ইটালিয়ান পরিচালক রবার্টো রসেলিনির শিশু-পুত্র জন্যেই যে খ্যাতি লাভ করেছে, তা সাধারণের কাছে দুর্লভ। তার জন্মের পর ১২ দিন তার মা'কে প্রায় অবরোধের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল।

১২ই ডিসেম্বর ইটালীর সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয় যে, শ্রীমতী বার্গম্যান সন্তানসম্ভবা—সেই দিন থেকেই তাঁর বাড়ীর সামনে ফটোগ্রাফারেরা হানা দিতে আরম্ভ করেন। ২২শে জানুয়ারী ইনগ্রিড যখন রসেলিনির সঙ্গে ভ্রমণে বেরোচ্ছিলেন, তখন এক জন ফটোগ্রাফার তাদের পেছনে ধাওয়া করে তাদের তিনটি ছবি তোলেন এবং তার একটি লস এঞ্জেলস-এর 'মিরার' নামক পত্রিকায় ছাপা হয়।

২রা ফেব্রুয়ারী ভিলা মার্গারিটা নামক সেবা-সদনে যখন ইনগ্রিডের সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন বন্ধ লৌহ-ফটকের সামনে সংবাদদাতাদের ভীড় জমতে থাকে। প্রচণ্ড শীতের রাত্রি তাঁরা সেখানে বসেই কাটান। পরদিন তাদের সেবা-সদনের ভিতর প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু ইনগ্রিডের ঘরে যেতে দেওয়া হয় না। এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সংবাদদাতারা সেবা-সদনের ঠিক উল্টা দিকে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ক্যামেরা সাজিয়ে পাহারায় নিযুক্ত হলেন এবং নানা ফন্দি-ফিকির করে ইনগ্রিডের সন্তানের ছবি তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন কি এক জন সংবাদদাতা এ-ও লেখেন যে, গুজব শোনা যাচ্ছে শিশুটি বিকৃত ও বিকলাঙ্গ, গুজব বন্ধ করার জন্য ইনগ্রিডের উচিত ছেলেটির ফটো তুলতে দেওয়া।

অবশেষে ইনগ্রিড ও তাঁর স্বামী তাঁদের সন্তানের নিরাপত্তার জন্য ও নিজেদের চলা-ফেরায় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য ছবি তোলায় সম্মতি দেন।

স্মরণ থাকতে পারে যে, ইনগ্রিড ও রসেলিনি তাঁদের সন্তানের জন্মের পর ২৫শে মে মেক্সিকোর Juaril সহরে বিবাহিত হন। সেখানেও তাঁরা নিজেরা উপস্থিত থাকেননি—প্রতিনিধি দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হয়। Juaril সহরে ইনগ্রিড তাঁর ভূতপূর্ব্ব স্বামী ডাঃ পিটার লিন্ডষ্ট্রম-এর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। এঁদের দু'জনের মধ্যে যে বিচ্ছেদ হতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি।

খাঁচা থেকে জঙ্গলে

বাঘকে খাঁচায় পুরে রাখলে, তাকে খেতে-দেতে না দিলে সেও চায় খাঁচা থেকে বেরিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে। সে তখন ... শান্ত থাকতে পারে না, নিজের হৃত-শক্তির আস্ফালন দেখাতে ... করে, চেষ্টা করে বাইরে বেরিয়ে একবার দেখে নেওয়ার। ... বাইরে বেরোতে না পারলে ভেতর থেকে চিৎকার করে ...। বাঘের ডাকে তখন গগন ফাটে। সারা জু-গার্ডেন ... গেটে পড়বার দাখিল হয়।

কিন্তু বাঘ যদি একবার বেরিয়ে পড়তে পারে কোন রকমে ... তলে আর রক্ষা নেই। সে তখন স্থানীয় বাজার দূরে একবার ... নয়। তখন যারা তাকে ভেতরে রাখতে চেয়েছিল তাদের ... পাত্তা পাওয়া যায় না। তারা তখন বেপাত্তা। বাঘের তখন ... পায়। বাঘ হাসতে হাসতে সে-স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ ক'রে ... যায় স্থানান্তরে। যেখানে তার পরিপূর্ণ খাওয়ার আর খেয়ে ... বেঁচে থাকার কোন বিরুদ্ধ-পক্ষ নেই। আর এ কথা কে না জানে, পৃথিবীতে এমন কোন এক ইঞ্চি পরিমাণও ভূমি নেই যেখানে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেলেও, বাঘে-মানুষে ... বসবাস করে বলে আমাদের অন্ততঃ জানা নেই। সুতরাং বাঘকে তার মনোমত স্থানের জন্যে যেতে হয় বনে-জঙ্গলে। ... খাঁচা থেকে একেবারে প্রকৃতির কোলে।

আমাদের বিদ্রোহী পরিচালক হেমেন গুপ্তও ঠিক এই রকম মুক্তি পাওয়া বাঘের মত না কি কলকাতার বাজার থেকে বোম্বের বাজারে চলে যাচ্ছেন। সত্যি-মিথ্যা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আমরা বাজারে যেমন শুনছি তেমন খবরই আমাদের ... পাঠক-পাঠিকাকে শোনাতে চেষ্টা করি কি না সদা-সর্বদা।

শুনছি প্রতিভাবান বিমল রায় মশায়ও বোম্বের দিকে ... রওনা হয়েছেন। শুনলাম তাঁর স্ত্রী মনোবীণার মুখে।

চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ

...কাতায় সম্প্রতি যে ক'খানা নতুন ছবি মুক্তি পেয়ে দর্শকদের মধ্যে ...বাট আলোড়ন তুলেছে তাদের ভেতর তিনখানি ছবির নাম কর...। যথা, মধু বসুর মাইকেল মধুসূদন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ...লা লাইট রেলওয়ে আর বিমল রায়ের পহেলা আদমী।

... কয়েক বছর ধরে বাঙালীর তৈরী ছবির মেয়াদ সব চেয়ে বেশী হয়েছি... বড় জোর দু'হপ্তা। কিন্তু উক্ত তিনখানি ছবি বাজারে ... হওয়া ... সঙ্গে সঙ্গে সগৌরবে চলতে থাকে হপ্তার পর হপ্তা। 'মাই... মধুসূদন' এবং 'পহেলা আদমী' সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবা...নেই, তারা এখনও সগৌরবে এবং পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলেছে। কিন্তু '...কেনতলা লাইট রেলওয়ে' ছবিখানি এক মাস যেতে না যেতেই ...ই এমন বন্ধ ক'রে দেওয়া হল কেন কলকাতার কয়েকটি প্রেক্ষা...তা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। ...নিজেদের পাঁঠাকে যেখানে ইচ্ছে কোপ বসিয়ে বলি দেওয়া যায়। নিজেদের ছবিকেও কি তাই? বাঁকনতলা চার হপ্তার মধ্যেই বেচারা বন্ধ হওয়াতে আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। মনে হচ্ছে এর পেছনে রয়েছে কোন গূঢ় অভিসন্ধি—যা আমাদের মত সাধারণের জানবার প্রয়োজন থাকলেও অধিকার নেই। প্রেমেনদা আসল খবর জানাবেন কি?

সি-টি-এ-বির নয়া পত্তন

সম্প্রতি কলকাতায় সিনে টেকনিসিয়ান্স অব বেঙ্গল অর্থাৎ বাঙলার চলচ্চিত্র কর্মীদের একমাত্র সঙ্ঘের সাধারণ সভা ও কর্মকর্তা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতিত্ব করেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া। প্রত্যেক ষ্টুডিও, রসায়নাগার, ব্যবস্থাপক, পরিচালক এবং স্বাধীন কলাকুশলীর পক্ষ থেকে দু'জন ক'রে প্রতিনিধি গৃহীত হয়েছে।

আনন্দবাজারে শ্রীপঙ্কজ বলছেন: "সি টি এ বি ভারতের চলচ্চিত্র কলাকুশলী ও কর্মীসঙ্ঘগুলির মধ্যে প্রাচীনতম, কিন্তু সত্যি বলতে সব চেয়ে নিষ্ক্রিয়ও।"

আমরা এ যাবৎকাল বলে আসছি ঐ একই কথা। হয়তো কারও বিশ্বাস হয়নি। এখন জাতীয়তাবাদীর মুখে শুনেও যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে বাঙলার ছায়া-ছবির প্রতি করা হবে বিশ্বাসঘাতকতা। আমাদের তো অন্ততঃ এই বিশ্বাস।

ছায়া চিত্রে ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরামের নাম বাঙালীর মনে থাকবে সদা-জাগ্রত। পরাধীনতার শৃঙ্খল-ঝঙ্কারে ক্ষুদিরামকে স্মরণ করতে হয়েছে, আজ স্বাধীনতা লাভের পর আবার তাকে স্মরণ করতে হল। হিরন্ময় সেন রচিত ও পরিচালিত বাঙলা সবাক চিত্র 'বিপ্লবী ক্ষুদিরামে'র চিত্রগ্রহণের প্রাথমিক কাজ "কল অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডে"র প্রযোজনায় শুরু হয়েছে। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীউল্লাসকর দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমাখনলাল সেন, শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগণেশ বসু এবং আরও অনেক বিপ্লবী কর্মীর সৌজন্যে পরিচালক সেন সংগ্রহ করেছেন বহু বিস্ময়কর এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা।

এখনও পর্য্যন্ত যাঁরা রামরাজত্বের স্বপ্নে মশগুল, তাঁদের চোখে হয়তো এই ছোট্ট রামের ছবি হয়ে দাঁড়াবে চোখ-ফোটানো ছবি। কথায় কথায় যাঁরা বুলি কপচায় সেই দলের পণ্ডিত নেহেরুকে এ ছবি দেখবার আমন্ত্রণ-লিপি যেন পাঠিয়ে দেওয়া না হয়। যাঁর মূর্ত্তির গলায় তিনি মালা পরাতে পেছ-পাও হলেন—ছবিতে তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে কোথায় পিছিয়ে যান সেইটেই আমাদের কাছে তা হলে একটা দেখবার মত ছবি হয়ে উঠবে।

গাধার ডাকাডাকি

যে কাণা নয় তাকে যতই কাণা বলুন না কেন, সে কিছু বলবে না। তেমনি যে খোঁড়া নয় তাকে খোঁড়া বলুন যতই সে যাকে তাকে পা চালিয়ে বুঝিয়ে দেয় না যে, তার পা জলজ্যান্ত বর্ত্তমান—কিন্তু যে গাধা তাকে গাধা বলুন দেখি। সে কি করে একবার ... । গাধা তখন আপন ... ...

...র স্বচ্ছন্দে গান গাইতে চেষ্টা করবে। আম্মো এই রকম ... হাম-bug গাধার লম্বকর্ণে শুনিয়েছিলাম,—মিছে বাড়াবাড়ি ...নে। কবে কে কোথা থেকে কোন দিন মোক্তারের চিঠি ...র তার ঠিক কি? গাধা আমার কথা শুনলে না। সগর্ব্বে ... বাড়া ক'রে চিৎকার ক'রে ডাকতে শুরু করলো। বাবার ... সব পুজনীয়দের ধ'রে ধ'রে বাপ-মা তুলে যাচ্ছেতাই গাল ... লাগলো।... ভাবলো- বুঝি, বাঙলা ছায়া-জগতে মানুষ আর নেই, সবই ছায়া। সবাই বুঝি full-এর রেণু আর মানুষের কঙ্কাল!

শেষ পর্য্যন্ত ঐ কয়েদের হাতেই গাধা ধরা পড়লো। বিচক্ষণ ...নেতা এবং সুদক্ষ পরিচালক নরেশ মিত্র মশায় গাধার বাবার ... গলায় জড়িয়ে গাধাকে এক চিঠি দিয়ে ফেললেন। মোক্তারের চিঠি দেওয়া উচিত ছিল যাকে, তাকে দিলেন উকিলের চিঠি। গাধা এখন দেখছি পর্য্যুদস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একতা ও ঐকতান

এন টি আর এম পি এই দু'য়ে কত তফাৎ। এন টি পুরাকালের ...এম পি একেবারে হালের না হলেও এই সেদিন তার সৃষ্টি। ... আর এম আগে-পিছে হলে কি হবে? আমাদের ছায়া-জগতের ...আগে। তার পর এম। এন থিয়েটার আর এম পিকচার। ...দু'য়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়, এক। একেবারে এক উদ্দেশ্য নিয়েই ... আর এম—শুধুই ছবি দেখানো তাঁদের উদ্দেশ্য।

আমাদের মনে হচ্ছে, পাঠক-পাঠিকারা বোধ করি বুঝতে পারছেন ...যে, কার নামের আদ্য কথা নিয়ে আমরা টানাটানি করছি। নিউ থিয়েটার্স আর এম, পি প্রোডাকসনের কথা বলছি—যাদের ...কর্ত্তা হলেন যথাক্রমে বীরেন সরকার আর মুরলী চট্টোপাধ্যায় ...মশায়—যাঁরা হলেন বাঙলার গৌরব—বর্ত্তমান বাঙলা ছায়া-জগতের ...কিছু আশা-ভরসা।

সেই এন আর এম আপন কাজে সর্ব্বত্র ঐক্যব্রত পালন করুন ...তে বরং আমাদের মহা উপকারই হবে। একতার মধ্যে কাজ করলে কাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোন ভাবনাই থাকে না। কাজ এক হয়ে কাজ করলে কাজ ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। ... তাও যদি হয় দেশের দশের কাজ, তা হলে তো আর কোন কথা থাকে না। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে শুধু একটি কথা নিয়ে... কথাটি হল "বিজ্ঞাপন"।

কিন্তু এই দু'য়ের "বিজ্ঞাপন"ও যদি এমন এক উদ্দেশ্য নিয়ে কাগ... আত্মপ্রকাশ ক'রে যায় তা হলে আমাদের আপত্তির কারণ আ... যথেষ্ট। এমন গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ছাপার অক্ষরে যদি এমন অদ্ভুত কমার্সিয়াল আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যায় দিনের পর দিন, তা হলে আমরা আপত্তি করবো না? আমরা এন আর এম'এ... কর্ত্তৃপক্ষকে এই দিকটা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। নিজে... বাঁশী যে-সুরে ইচ্ছা বাজানো যায়। এমন কি বেসুরো হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু বাঁশীর সুর যদি শোনাতে হয় বাজারের দশ জনে... কাণে, তা হ'লে বংশীধরকে সুর-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করতেই হবে। আমাদের এন টির আর এম পির বাঁশীতে যাদের হাত, সেই নন্দ... আর হেমন্তকে বললে আমরা হয়তো আর বিজ্ঞাপনই পাবো না। সেই জন্যে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি তাঁরা যদি এদিকে একটু নজর দেন।

সরস সুধার প্রেম

নিউ থিয়েটার্স (ইষ্টার্ণ) ডিষ্ট্রিবিউটর্সের দ্বিতীয় বাঙলা ছবি "সুধার প্রেম" এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। অমলা দেবীর (?) কাহিনী অবলম্বনে শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালনা করেছেন। বিভিন্ন অংশে অসিতবরণ, লীলা দাশগুপ্ত, হরেন মুখার্জ্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শ্যাম লাহা প্রভৃতি।

সুধার প্রেম রস-রচনা। একদা 'শনিবারের চিঠি'তে পড়তে পড়তে আমরা হাসি আর চাপতে পারিনি। বুড়োদা'র সুধার প্রেমে যে প্রচুর হাসির খোরাক থাকবে তা আমরা বুড়োদা'কে জানি ব'লে বলছি।—প্র

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
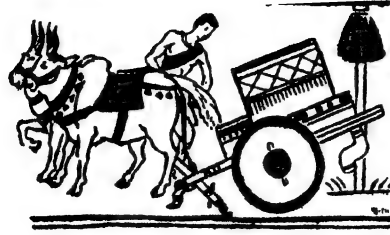
ভারতীয় মোটরযান শিল্প

ভারতের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একটি স্বাধীন মোটরযান শিল্প অপরিহার্য্য। এই জন্যই এই শিল্পের উন্নয়নের প্রতি ভারত সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে বলিতে হয় যে, ভারতের মোটরযান শিল্প এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে এ দেশে—মেসার্স জেনারেল মোটরস্ লিমিটেড এবং মেসার্স ফোর্ড মোটরস্ লিমিটেড—মাত্র এই দুইটি মোটরযানের কারখানা ছিল। বর্ত্তমানে এ দেশে সাতটি প্রতিষ্ঠান মোটরযান নির্ম্মাণ ও সংযোজন কার্য্যে ব্যাপৃত আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ মোটর গাড়ী ও মোটর ট্রাক এই দেশে তৈয়ারী হইত। বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ৮০,০০০ হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে এই শিল্প বিশেষ ভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় মোটরযানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম হিন্দুস্থান মোটরস্; মূলধন ১০ কোটি টাকা। ১৯৪৮ সালের শেষ ভাগে এই কারখানায় কাজ সুরু হয়। বর্ত্তমানে এখানে ১৬,২০০টি বিভিন্ন প্রকারের মোটরযান প্রস্তুত হয়। ইহাদের সবগুলির প্রত্যেক অংশই যে এখানে তৈয়ারী হয় তাহা নহে। ইুডিকার, চ্যাম্পিয়ন, কমাণ্ডার-ষ্টুডিবেকার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের গাড়ী ও ট্রাকের অপরিহার্য্য অংশগুলি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া এখানে একত্র সংযোজিত করা হয়।

১৯৪৬ সালে প্রিমিয়ার অটোমোবিলস্ নামে আরেকটি ভারতীয় মোটরযানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মূলধন ৫ কোটি টাকা। মোটর গাড়ীর অংশবিশেষ এবং এঞ্জিন তৈয়ারী এই কারখানার কার্য্যসূচীর অন্তর্গত।

তৃতীয় ভারতীয় কারখানাটি ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়। ইহার নাম অশোক মোটরস্। বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত অংশবিশেষ সংগ্রহ করিয়া ভারতে অষ্টিন গাড়ী নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কারখানার কাজ আরম্ভ হয়। এখানে বৎসরে ৬,০০০ গাড়ী ও ট্রাক নির্ম্মিত হইতে পারে।

মেসার্স ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটর্স (ইণ্ডিয়া) নামক আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশরক্ষা ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গাড়ী ও ট্রাকের বিভিন্ন অংশ সংযোজনা এবং ক্রমে ঐ সকল গাড়ী ও ট্রাক এই দেশে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটেনের রুটস্ গ্রূপ নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তাহারা সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটি কারখানা ক্রয় করিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। হিলম্যান এবং হাম্বার গাড়ী এবং কমার ক্যারিয়ার এবং হিলম্যান্ ট্রাকের বিভিন্ন অংশ সংযোজন করিয়া পূর্ণাঙ্গ যান নির্ম্মাণই তাহাদের অভিপ্রায়।

জেনারেল মোটরস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, এবং ফোর্ড মোটর কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভারতে অন্যান্য কারখানাগুলির মধ্যে কলিকাতার দি পেনিনসুলার মোটর কর্পোরেশন লিমিটেড, মেসার্স মহীন্দ্র এ্যাণ্ড মহীন্দ্র লিমিটেড, এবং ডেওয়ার্স গ্যারাজ এ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্; বোম্বাইয়ের এ্যালবিয়ন ট্রাকস্ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রোভার্স; এবং ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানী; এবং মাদ্রাজের মরিস্ কারস্ এ্যাণ্ড ট্রাকস্ এবং এ্যাডিসন এ্যাণ্ড কোং লিঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ মোটর ও ট্রাক্টর শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এই সংস্থার রিপোর্ট ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সুপারিশ করা হয় যে, জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্পটি স্থাপনের ব্যবস্থা সরকারের অবলম্বন করা উচিত। প্রথমতঃ, ৮—১০ অশ্বশক্তি এবং ২০—২৫ অশ্বশক্তির যাত্রিবাহী গাড়ী নির্ম্মাণ এবং ১৩৪ ইঞ্চি ও ১৫৮ ইঞ্চি চক্রবিশিষ্ট জনপ্রিয় ট্রাক নির্ম্মাণ কার্য্যেই মনোনিবেশ করা উচিত বলিয়াও উহাতে সুপারিশ করা হয়।

উক্ত সংস্থা মোটরযান নির্ম্মাণের কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। হিসাব করা হইয়াছে যে, আগামী চার বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি ৩০,০০০ মোটরযান ভারতের প্রয়োজন হইবে। ১৯৫৪ সাল হইতে বৎসরে ৪০ হইতে ৫০ হাজার মোটরযান ভারতের প্রয়োজন হইবে। হিন্দুস্থান মোটরস্, প্রিমিয়ার অটোমবিলস্, অশোক মোটরস্, ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটরস্, এবং রুটস্ গ্রূপ—এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠান তাহাদের মোটরযান প্রস্তুতির কর্ম্মসূচী ভারত সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই পাঁচটি সংস্থার মোট উৎপাদন অনুমিত প্রয়োজনের সমান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। [illegible]

গাড়ী ও ট্রাক বিশেষ কিছুই নহে। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়-সামর্থ্যের সীমার মধ্যে মূল্য নিরূপিত না হইলে মোটরযানের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

একটি মোটরযানে ৪,০০০টি অংশ আছে। ভারতের কোনও কারখানায়ই উক্ত সকল অংশ প্রস্তুত হয় না। যদি আমরা উপরে উল্লিখিত ছয়টি কারখানার উৎপাদন একত্রিত করিয়া সুসংহত উপায়ে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারি, তবে শীঘ্রই আমরা মোটরযান শিল্পে স্বাবলম্বী হইতে পারিব।

সংরক্ষণ শুল্কের দাবী

যে সকল মোটরযান প্রতিষ্ঠান মোটরযানের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষ হইতে বিশেষতঃ হিন্দুস্থান মোটরস্‌-এর পক্ষ হইতে ভারত সরকারকে জানান যাইতেছে যে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে তাহাদের পক্ষে মোটরযানের অংশ প্রস্তুত কার্য্য লাভজনক হইবে না। এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিয়া যথোপযুক্ত সুপারিশ করিবার জন্য তদানীন্তন শিল্প ও সরবরাহ-সচিব ১৯৪৯ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। বিভিন্ন মোটরযান প্রতিষ্ঠান, পরিবহন দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর, অর্থ দপ্তর এবং শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। গত বৎসর জুলাই মাসে এই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। কমিটি এই সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। মোটরযানের অংশসমূহের উৎপাদন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন নাই বলিয়া অধিকাংশ সদস্যই অভিমত প্রকাশ করেন। হিন্দুস্থান মোটরস্‌-এর প্রতিনিধি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইঞ্জিন প্রভৃতি অপরিহার্য্য ও মূল্যবান অংশসমূহ প্রস্তুতের ব্যয় এত বেশী যে, প্রস্তুতকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পরে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইতে পারে, এই অনিশ্চিত আশায় উৎপাদকগণ এই সকল অংশ উৎপাদন কার্য্য সুরু করিতে ভরসা পাইবেন না।

কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ভারত সরকার আমদানী শুল্কের হার পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উৎপাদকগণ এবং মোটরযান শিল্পের প্রতিনিধিগণের নিকট ভারত সরকারের সংরক্ষণ শুল্ক পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা উৎপাদন কার্য্যে অগ্রসর হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেট প্রস্তাবে উক্ত পরিবর্ত্তনসমূহ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই পরিবর্ত্তিত আমদানী শুল্কসমূহ এখন ১৯৫০ সালের অর্থ আইনের অন্তর্ভুক্ত।

ভারত সংসদে অর্থ বিলের আলোচনার সময় অর্থ-সচিব এবং শিল্প ও সরবরাহ-সচিব এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, ভারতে মোটরযান শিল্পের যে সকল অংশ প্রস্তুত হয়, সেগুলির যে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিবেন। ভারতে বিভিন্ন অংশ প্রস্তুতের সম্ভাবনার কথাও এই বিশেষজ্ঞ কমিটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারত সরকার মোটরযান শিল্প সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। শিল্প, সরবরাহ ও ডিস্‌পোজালসের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ টি. শিবশঙ্কর আই. সি. এস. এই কমিটির সভাপতি। প্রধান প্রধান মোটরযান নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কতিপয় প্রতিনিধি ইহার সদস্য।

আমদানী নীতি

কিছু কাল পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে, ১৯৫০ সালের জুন মা... পর আমদানী নীতি পরিবর্ত্তন করা হইবে। কিন্তু প্রতি... মোটরযান সমূহ হইতে ভারত সরকারের নিকট আবেদন করায় ... স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান নীতিই ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত বজায় থাকি...

গত কয়েক বৎসরে ভারতে যে, সকল গাড়ী ও ট্রাক আমদা... করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	গাড়ী	ট্রাক	মোট
১৯৪৬-৪৭	১০,৬৮৩	৮,৬৫৪	১৯,৩৩৭
১৯৪৭-৪৮	২১,৭৮৯	১৩,৬৮৫	৩৫,৪৭৪
১৯৪৮-৪৯	১৭,৪৮২	২১,২৩৯	৩৮,৭২১
১৯৪৯-৫০	৫,৪৯৬	১০,৬৪৯	১৬,১৪৫

(১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)।

যে সকল গাড়ী ও ট্রাকের অংশাদি আমদানী করিয়া এ... সংযোজন করা হইয়াছে তাহাদের হিসাব :—

বৎসর	গাড়ী	ট্রাক	মোট
১৯৪৮	১২,৫২২	১৫,৬৪১	২৮,১৬৩
১৯৪৯	৬,৬৭২	১৫,১৩৭	২১,৮০৯
১৯৫০	১,৩৩৭	১,২১০	২,৫৪৭

(জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত)

বৈদেশিক মুদ্রার অল্পতার দরুণ অনেক স্থলেই আমদানী কমা... হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রণ

বর্ত্তমানে মোটরযান বিক্রয় ও বণ্টনের উপর কোনও নি... ব্যবস্থা আরোপিত নাই। কতকগুলি রবারের জিনিষ, ব্যা... কেবল্‌ ও তার এ দেশেই এখন সুচারুরূপে প্রস্তুত হইতেছে ... ঐগুলির আমদানী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

মূল্য

অশ্বশক্তি ও নির্ম্মাণ-কৌশলের বিভিন্নতার দরুণ মোটর... মূল্যের তারতম্য হয়। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য-সঙ্কোচনের ... আমেরিকান গাড়ী ও ট্রাকের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চলতি ... বৎসর হইতে মোটরযানের অংশাদির উপর যে পরিবর্ত্তিত ... আমদানী শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার দরুণ গাড়ী ও ট্র... মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়া নিম্নলিখিত রূপ হইবে :—

	পুরাতন মূল্য	নূতন মূল্য	পার্থক্য
গাড়ী (আমেরিকান)	১১,৬৬৮৲	১২,৩৩৬৲	৬৬৮
গাড়ী (বৃটেন)	১১,৯৪৮৲	১২,৬৩৫৲	৬৮৭
ট্রাক (আমেরিকান)	৯,৩১৫৲	১১,৮৪৪৲	২,৫২৯
ট্রাক (বৃটিশ)	১০,২৩৮৲	১৩,৪৬০৲	৩,২২২

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পরিবর্ত্তিত আমদানী শুল্কে... গাড়ীর মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ট্রাকের মূল্য অনেকটা ... পাইবে। মোটর ব্যবসায়ীদের লাভের অংশ কমাইয়া লইলে ... কিছু কম হইবে। মোটর ব্যবসায়ীদিগকে ইহাতে রাজী করাইবার ... ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হইয়াছে...

সহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের দামও কমে যাচ্ছে বলে মনে হয়। এক একটি মহাযুদ্ধে কোটি কোটি লোকের জীবন-বলি আমাদের মনে বিশেষ কোনও চাঞ্চল্য আনে কি? এক একটি লোকের মৃত্যুর পিছনে এক একটি সংসার বিনষ্ট হওয়ার ছবি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে কি? তা যদি হত, তাহ'লে আমরা মানুষের জীবনকে এতটা অবহেলা করতে পারতাম না। কিন্তু এটাও সত্য যে, একটি প্রাণকে বাঁচাবার জন্য আমরা কি না করি। পীড়িত ও আহত লোকদের জীবনরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টারও অন্ত নেই। কি করলে মানুষ সকল ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ সবল জীবন লাভ করবে, তার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমেরও অভাব নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের জীবনের প্রতি মমতা ও মমতাহীনতা পাশাপাশি বিরাজ করছে।

অস্বাভাবিক কারণে যাতে মৃত্যু না ঘটে, তার ব্যবস্থা করার জন্য মানুষের চেষ্টার শেষ নেই। বৈজ্ঞানিক যুগে অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে ট্রেণ, বিমান ও মোটর-দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুসংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য যান-চলাচল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হয়েছে। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ যদি সঠিক ভাবে করা যায়, তাহ'লে বহু লোকের মৃত্যু নিবারণ করা যেতে পারে।

সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই ট্রেণ, বিমান বা মোটর-দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতে ছোট-বড় প্রায় ৯১টি রেল দুর্ঘটনা হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে রেল দুর্ঘটনায় প্রায় ৪,৬৬০ জন নিহত ও ২৬,২০৬ জন আহত হয়। সুতরাং ট্রেণ চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

বিমান চলাচলের মাত্রাও যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ সমস্যাও একটু একটু করে দেখা দিচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য হয়ত শূন্যে ট্রাফিক পুলিস নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু ট্রেণ ও বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ভাবে যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সহরের রাজপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা। কারণ বড় বড় সহরের রাজপথে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুসংখ্যা অন্যান্য দুর্ঘটনার অপেক্ষা বেশী। এ বিষয়ে লণ্ডন প্রথম। ১৯৪৮ সালে লণ্ডনের রাজপথে যান-বাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনার ফলে ৬০৩ জনের মৃত্যু হয়। ভারতের কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস প্রভৃতি সহরে যানবাহনের সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে কিছু কালের মধ্যে একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে আশঙ্কা হয়।

উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার কথাই ধরা যাক। এই সহরে যানবাহনের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার একটা হিসাব দেওয়া হল :—

	১৯৩৯	১৯৪৮	১৯৪৯
প্রাইভেট মোটর	১৭,০৪৩	২৮,০২৬	২৯,৭৬৭
ট্যাক্সি	১০২৩	১১২৮	১২০৩
লরী	৬৬০০	৯৯৮২	৯৯৯৯
মোটর সাইকেল	৭৩৭	২৩৬৮	২৯২৫
বাস	৭০০	৯০০	৮৮৯
	(১৯৮ ষ্টেট-বাস পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)		
ট্রাম	৩০০	৩৫২	৩৭৫
রিক্সা	৩৭২৫		৬৫০০

১৯৫০ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত প্রাইভেট মোটর ও বাসের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পেট্রল-রেশনিংরহিত হওয়ায় মোটর বাসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির কারণ দেখা দিয়েছে।

নিউইয়র্ক, প্যারিস ও বোম্বাই সহরে বিভিন্ন প্রকার মোটরযানের অনুমানিক সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ১০ লক্ষ, ৩ লক্ষ ১০ হাজার ও সাড়ে ২৮ হাজার। বাই-সাইকেলের সংখ্যা প্যারিসেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্যারিসে বাই-সাইকেলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ এবং কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে যথাক্রমে ২০ হাজার ও ৬৫ হাজার। নিউইয়র্কে ট্রামের সংখ্যা সহস্রাধিক। এ ছাড়া কলিকাতা ও বোম্বাই-এ ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাও কয়েক হাজার হবে।

এই বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচলের ফলে দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনার সংখ্যা ও হতাহতের বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

	দুর্ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত
১৯৪৬	৬৮১৪	২২৫	৩০১৪
১৯৪৭	৮৬১৮	১৮৩	২৮৩৬
১৯৪৮	৮৯৫৭	১০০	৩২২২
১৯৪৯	১২,৮৯৩	১৪৫	৩৮৫৭

অন্যান্য সহরে দুর্ঘটনায় হতাহতের একটা সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল—

১৯৪৮

	দুর্ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত
নিউইয়র্ক	প্রায় ২ লক্ষ	৫৭৬	প্রায় ৬০ হাজার
লণ্ডন	দেড় লক্ষাধিক	৬০৩	প্রায় ২৯ হাজার
প্যারিস	২ লক্ষাধিক	২৬৩	প্রায় ৩৩ হাজার
বোম্বাই	প্রায় ৫৮ হাজার	২১৯	পৌণে ৫ হাজার

এখন দেখা যাক, এই সকল দুর্ঘটনার কারণ কি? কারণ অনেকগুলি; যথা—(১) যানবাহন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ অমান্য করে অসতর্ক ভাবে গাড়ী চালনা; (২) পথচারী নাগরিকদের যানবাহন সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব; (৩) যানবাহনের অত্যাধিক সংখ্যাবৃদ্ধি; (৪) কর্ম্মস্থল একই স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়া; (৫) উপযুক্ত সংখ্যক সুপ্রশস্ত পথের অভাব।

মোটর গাড়ীর চালকদের প্রায়ই যান-বাহন সম্পর্কিত নির্দ্দেশ অমান্য করতে দেখা যায়; যেমন—সম্মুখের গাড়ীকে অতিক্রমের জন্য জোরে গাড়ী চালান, হর্ণ না দিয়ে অতিশয় বেগে গাড়ী চালান বা মোড় ঘোরা, পথচারীর ঠিক পিছনে আসিয়া হঠাৎ হর্ণ দেওয়া, ষ্টপেজের নিকট দাঁড়ানো গাড়ীর পাশ দিয়া জোরে গাড়ী চালান প্রভৃতি।

নাগরিকগণ কর্ত্তৃক পথ-চলাচলের আইন অমান্য করার দৃষ্টান্তও কম নয়। তাঁরা নিরাপত্তার কোন নিয়ম মানা প্রয়োজন বলে মনে করেন না। যেখান-সেখান দিয়া খুসী মত পথ অতিক্রম করাকে অনেকে বাহাদুরী বলে মনে করেন। নাগরিকগণ একটু সচেতন হলে দুর্ঘটনা অনেক নিবারিত হতে পারে। কলকাতার ট্রাফিক পুলিসের সহকারী কমিশনার মিঃ রবিনসন বলেন যে, কলকাতার রাজপথে যান-বাহন চলাচল ব্যবস্থার কোন প্রকার উন্নতির কথা চিন্তা করবার আগে লোক-চলাচল নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান করা দরকার।

কলিকাতার প্রধান কর্ম্মস্থল ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকা। বেলা ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত প্রায় সকল যান-বাহনের লক্ষ্য থাকে একই দিকে। অফিস আরম্ভের ও ছুটির সময় ডালহৌসী-গামী ও সেই দিক থেকে আগত যানবাহনের দৃশ্য অতিশয় আশঙ্কা-জনক। প্রতিদিনই অফিস আরম্ভের ও ছুটির সময় চাকুরীয়াদের বাদুড়ের ন্যায় বাস ও ট্রামের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেতে-আসতে দেখা যায়। এতে যে-কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। কর্ম্মস্থল বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত থাকলে অবস্থা এতটা খারাপ হত না।

উপযুক্ত সংখ্যক সুপ্রশস্ত পথের অভাবও কম নয়। কিন্তু তা করতে গেলে কলিকাতার মানচিত্রকে নতুন করে তৈরী করতে হবে যা বর্ত্তমানে একপ্রকার অসম্ভব। তবে সহরের কতকগুলি রাস্তা, যেমন—চিৎপুর রোড, ষ্ট্রাণ্ড রোড প্রভৃতি রাস্তা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

কিছুদিন থেকে কলিকাতার ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ যানবাহন ও লোক-চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং এ বিষয়ে স্পেশ্যাল কনষ্টেবলগণ ট্রাফিক পুলিসকে সাহায্য করছেন। সকল যানবাহন ও পথচারী যাতে ট্রাফিক আইন মেনে চলেন তার জন্য তাঁরা নানা ভাবে চেষ্টা করছেন। পুলিশ-ভ্যানে লাউড স্পীকারের মারফৎ প্রচার-কার্য্য দ্বারা ও পুস্তিকা প্রচারের দ্বারা চালক ও পথচারীদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে! এতে সুফলও দেখা যাচ্ছে। কারণ সম্প্রতি কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

ট্রাফিক পুলিশ গাড়ী-চালক ও পথচারীদের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা এবং ট্রাফিক আইনকে কঠোর ভাবে কার্য্যকরী করা হলে সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

গাড়ী চালান সম্বন্ধে চালকদের সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি চিহ্ন নিয়ে দেওয়া হইল :—

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
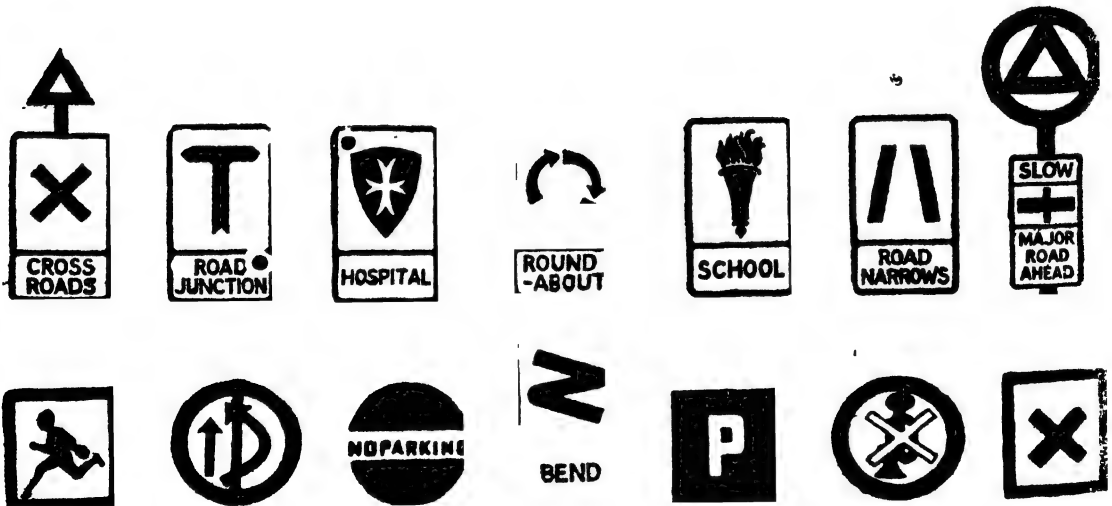
(১) সংযোগ-স্থলের একটি সঙ্কেত। (২) রাস্তার সংযোগ-স্থলের দ্বিতীয় সঙ্কেত। (৩) হাসপাতাল, হর্ণ দিবেন না। (৪) ঘোরা পথ। (৫) স্কুল আছে, সাবধান। (৬) রাস্তা সরু হইয়া গিয়াছে। (৭) সামনে বড় রাস্তা, আস্তে চালান (৮) স্কুলের ছেলেরা রাস্তা পারাপার করে বলিয়া চালকদের প্রতি সতর্ক সঙ্কেত। (৯) একটি চলন্ত গাড়ীকে পাশ কাটাইয়া যাইবেন না। (১০) গাড়ী দাঁড় করান চলিবে না। (১১) রাস্তার বাঁক। (১২) গাড়ী দাঁড় করান যাইবে (১৩) হর্ণ দিবেন না। (১৪) দুই রাস্তার সংযোগ-স্থল আছে, সতর্ক হউন।

নীলকুঠীর নয়না

তারানাথ রায়

আট

সাত পোয়া পথ অনেকখানি কথা। চৈত্রের কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। বিলাসী কিছু দূর গিয়ে আর পারে না। ভাবে, বুড়ো শিবতলায় একটু জিরিয়ে নেয়।

বুড়ো শিবতলার বুড়ো শিব নেই, তাঁর ভাঙ্গা মন্দিরটাই দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট এক অশ্বত্থ গাছ ডাল-পালা বিস্তার করে কত যুগ ধরে ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন। ছায়ার নীচেই একটা মস্ত দীঘির শান-বাঁধা ঘাট। ঘাটের ফাটা কপালের নীচেই দীঘির জলভরা চোখ ছলছল করছে।

বিলাসী গিয়ে বসে সেই শান-বাঁধা ঘাটে। আবার ওঠে। ভাঙা সিঁড়িগুলো দিয়ে নেমে গিয়ে এক হাত দিয়ে একটু একটু করে জল দেয়। একটু করে জল দিতে ইচ্ছে করে তার জখমি কাঁধে, কিন্তু কি ভেবে দেয় না। টন টন করছে হাতখানা—ফেটেই বুঝি যাবে। মনে মনে একটু হাসে। বাঁ হাত দিয়ে হাতখানা আস্তে বুকের উপর তুলে নেয়। নজর পড়ে, বুকের দুধে-আলতা রং-এর উপর দিয়ে লালচে কালোর ধারা যেন সাদাকে আরও সাদা করে তুলেছে। গং বাঁদর লাথির প্রতিশোধ দেগে দিয়েছে। আচ্ছা, বিষে বিষেই ত বিষক্ষয়! রায় মশাই সহায় থাকলে আর ঠগবগের শ্মশান-কালী কৃপা করলে সবই হবে। আবার দু'হাত তুলে প্রণাম করে।

দীঘির ওদিকটায় কেমন শালুক ফুটে আলো করেছে, এপারে আলো করে সন্ধ্যা-মালতীর ঝাড়, গোটা দক্ষিণ ধারটা মঙ্গলচণ্ডীর শাড়ীর সিঁদুর-রাঙা পাড়ের মতন টক-টক করছে।

বিলাসী চেয়ে চেয়ে দেখে। মনে পড়ে সেই একটুখানি ঘর—তার চার পাশে একটুখানি তারই হাতে-রচা ফুল-বাগান—ঝকঝকে তকতকে উঠোন, উঠোনের মাঝখানে তুলসী-মঞ্চ—যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় তার পিদীম দেওয়া, গলায় আঁচল দিয়ে পেন্নাম করা, পেন্নাম করে উঠতেই নিত্যই দেবতার দেখা পাওয়া! আবার পূজো করতে হত অমন স্বামীর রাঙা চরণ দু'খানিতে।

কাঁধটা টনটন করছে—কাঁধের মাংসটা হাঁ করে তার পাপের রক্ত গড়িয়ে দিয়েছে। দুধে-আলতা বুকখানি বয়ে ঝরে গেছে সে পাপের প্রবাহ।

একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওঠে। ফিরতে হবে ত! দু'পা এগুতেই সামনে ও কে, ভাঙ্গা মন্দির থেকে বেরিয়ে এল? এখানে সন্ন্যেসী থাকেন?

চোখ দু'টো কি শান্ত। সন্ন্যেসী এগিয়ে আসে! বিলাসী গড় হয়ে প্রণাম করে। বলে—"আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুর, আমার মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়।"

—হবে।

হবে? ঠাকুর যখন বলছেন, তখন হবে।

সন্ন্যাসীর নজর পড়ে নারীর আহত কাঁধটার উপর। জিজ্ঞেস করেন—চোট্‌ লেগেছে?

বিলাসী মাথা নেড়ে—বলে, হাঁ।

সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেন দ্রুতপদে ভাঙ্গা মন্দিরটার দিকে—বিলাসীকে সঙ্গে যেতে বলেন।

ভাঙ্গা মন্দির। এক কালে হয়ত ওতে দেবতা দিল। এখন কেউ মসজেদ বানাতে চেষ্টা করেছে। ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর উল্‌টে ফেলা হয়েছে হয়ত দু'টি পাথরের দেবতা।

সন্ন্যাসী ভিতরে গিয়ে ডাকেন বিলাসীকে। ওর কাঁধের কাপড় সরিয়ে দিয়ে যত্ন করে ক্ষত ধুয়ে দিতে চান। বিলাসী বারণ করতে চায়, পারে না—সন্ন্যাসী বলেন, ভয় কি মা। খানিকটা উত্তরীয় ছিঁড়ে যত্ন করে পটি বেঁধে দেন। তার পর জিজ্ঞেস করেন—কি হয়েছে বল? বিলাসী সন্ধ্যার ঘটনা সব বলে। কেশবপুরে কুঠীতে ওরা যে তাকে ডুলি করে বয়ে নিয়ে গেছল, তাও বলে। কেমন করে কুঠিয়াল সাহেবের পাহারাওয়ালাদের আক্রমণের সময় সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাও বলে।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হন না। বলেন, তুমি তোমার কুঠীতে ফিরে যাও, লোক সঙ্গে দেব।

বলবা মাত্র মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়ায় একটা অদ্ভুত জানোয়ার। মানুষ সে নিশ্চয় নয়। ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ, পিঠের উপর মস্ত একটা কুঁজ, মাথা-ভরা চুল। মস্ত নাক, নাকের তলা দিয়ে বড় বড় এক সার চকচকে ধারাল দাঁত নীচের পুরু ঠোঁটটা ঢেকে ফেলেছে। দুই চৌকাঠে দু'খানি রোমশ অস্বাভাবিক লম্বা বজ্রের মত হাত রেখে দাঁড়ায়, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিলাসীর দিকে চেয়ে থাকে।

বিলাসী সত্যি ভয় পায়। অদ্ভুত জানোয়ারটা বিলাসীর ভাষায় কথা বলে! বলে,—চল্‌।

কথা নয়, গর্জ্জন!

মন্ত্রমুগ্ধের মত সে এগোয়। বেশ অনুভব করে, লম্বা দু'খানি হাত আন্দোলিত করে কুঁজো দৈত্যটা তার ছোট-বড় পা বাড়িয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসচে। অনুভব করে, তার পিঠটা যেন পুড়ে যাচ্ছে ওর দৃষ্টিতে।

একটা বাঁক ঘুরতেই পেছনে নজর পড়ে। দুশমনটা দন্ত বিকাশ করেছে। দূরে মন্দিরের দোরে সন্ন্যাসী দাঁড়িয়েই আছেন।

একটা উৎকট অট্টহাসিতে চার দিক কাঁপিয়ে তোলে জানোয়ারটা।

বলে—চল্‌ চল্‌।

বলে না ত, ধাক্কা দিয়েই ঠেলে নিয়ে চলে ওর কথাগুলো!

চলতে বিলাসী পারে না। কি একটা আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে পা দু'টো জড়িয়ে যায়।

সূর্য্য পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। আর একখানা মাঠ। মাঠের ওপারের গাছগুলোর ভিতর দিয়ে আবুরী কুঠীর উঁচু চোংগুলো দেখা যাচ্ছে। একটু সাহস হয়। মুখ না ফিরিয়েই বলে—আমি একাই যেতে পারব।

দৈত্য আবার খল্‌-খল্‌ করে হেসে ওঠে। বলে—সেটি হচ্ছে না গোরা বিবি! নাম জানলে কি করে? ফিরে তাকা[illegible] জিজ্ঞেস করে ভ্রুকুটি করে—'কে তুই?'

ও জবাব দেয় না। আবার উৎকট ভাবে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে [illegible] ভালুকের মত লম্বা হাত তুলিয়ে পথের নির্দ্দেশ ক'রে এগিয়ে যাবা[illegible] আদেশ দেয় নীরবে। বিলাসী এগিয়ে চলে। মাঠটা পার হ[illegible] সারবন্দী সুপুরি কোয়ারী ঘেরা মস্ত আম বাগান আবুরী গাঁ[illegible] সীমানা নির্দ্দেশ করছে। সূর্য্য তখন ঢলে পড়েছে আম বাগা[illegible] পেছনে। গাছগুলোর মধ্যে অন্ধকার নীড় বাঁধতে শুরু করেছে।

সেই নির্জ্জন বাগিচায় পেছন থেকে সহসা দু'খানা বজ্র[illegible] আকর্ষণ করে বিলাসীর মাথাটা। বিলাসী ভয়ে চীৎকার ক[illegible] ওঠে। ও খালি তার কানের কাছে তার মূলা-দন্ত বিকশি[illegible] করে কী যেন বলে। বিলাসী হেসে ওর উঁচু কুঁজের [illegible] আদর করে হাত বুলিয়ে বলে, তাই বল্‌!

দৈত্য বলে—আজ রাতে তোমার কুঠীতে যাওয়া হবে [illegible] এখানেই রাত কাটাতে হবে?

—এই আম বাগানে?

—তাই হুকুম!

—ক্ষিদেয় যে নাড়ী সেদ্ধ হয়ে গেল গোমেশ!

—চুপ, চুপ,! গোমেশ মরে গেছে, মুকুন্দ! বস [illegible] কুঁজ, দাঁত আর দস্তানা এখানে রইল। গাঁ থেকে তোমার [illegible] নিয়ে আসি।

দৈত্য হঠাৎ গেঁয়ো চাষী হয়ে আবুরী হাটের দিকে [illegible] যায় গোমেশ।

অন্ধকার জমাট হয়ে আসে। আম বাগানের চার দিক [illegible] ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কার ওঠে। একটা কটকটে ব্যাং মাঝে মাঝে [illegible] করে কাকে যেন সাবধান করে দেয়। ঘন পল্লবের মাঝখান [illegible] বিলাসী শোনে কে যেন আর্ত্তনাদ করতে করতে এগিয়ে আ[illegible] একটা ঝোপে সে আত্মগোপন করে। আর্ত্তনাদ যেন ফি[illegible] সে করুণ ধ্বনি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যায়।

গোমেশ ত ফেরে না। রাত ক্রমে বেড়ে চলে। বিলাসী [illegible] বসে থাকতে পারে না। এক-পা দু'পা করে এগিয়ে যায়। নজরে পড়ে, বাগিচার এক দিকে মশালের আলোর নীচে চার-পাঁ[illegible] জটলা করছে। বিলাসী আবার একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁ[illegible] দেখে, ওরা কি করে। গোমেশ? হাত নেড়ে কি বোঝাচ্ছে, যেখানে সে বসেছিল সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কি যেন দেখাচ্ছে।

নিরাপদ মনে হ'ল না। বিলাসী সেখান থেকে সরে প[illegible] চাইল। যে পথে এসেছিল সে-পথেই সে দ্রুতপদে চলতে লাগল।

বাগান পেরিয়ে আবার মাঠ। জন-প্রাণীটি নেই। উঠেছে। দূর থেকে গাজন-সন্ন্যাসীদের ঢাকের বাদ্য শোনা [illegible] বিলাসী হন্‌-হন্‌ করে আলের পথে চলে। এক একবার [illegible] ফিরে চায়। বাগিচার ভেতর একটা ক্ষীণ আলো তখনও। দ্রুততর করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পা আর ওঠে না। মাথাটা [illegible] করে ওঠে। আলের উপরই বসে পড়ে। বসে পড়ে কিন্তু গতর ওঠে না। বিলাসী ভয় পায়। চুপ করে থাকা ছা[illegible] উপায়ই বা কি?

তন্দ্রা আসে। ঝিরঝিরে বাতাস তার এলোমেলো চুলের

…া করে যায়, মাথায় হাত বুলিয়ে যায়। চাঁদ মাথার উপর … জ্যোৎস্না ঢেলে দেয়। চাঁদের আলোয় কেউ যদি দেখে …ল! কিন্তু শরীর আর উঠতে চায় না। কূল ছাপিয়ে নদী … পাথারে চলে তখন পদে-পদেই ত খানা-ডোবায় তাকে …তে হয়। উপায় কি? সেদিন কি ফিরবে না? না, …বে না। শয়তান ডিক কেশবপুরে তারই মত নারীকে লুঠে …জিদের হাতে দিয়েছে, দশ-দশটা গাঁয়ের সাজান সংসার পুড়িয়েছে। …ত'ল, কেশবপুরে ফিরে যাব। কিন্তু সে ত ঢের দূর, আর …রাত!

মাথার উপর দিয়ে একটা পাখী উড়ে যায়। তার পর সব …নিস্তব্ধ। দূরে একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠে; সঙ্গে আরও দশটা …ন করে ওঠে। আবার সব চুপ।

…র দিকটা তাদের কুঠী। রাতের আকাশের গায়ে তার চিমনীটা … মাথা উঁচু করে আছে। হঠাৎ নজর পড়ে ওদিকটার আকাশ … হয়ে উঠল। হঠাৎ শোনা গেল একটা ভয়ার্ত্ত চিৎকারে …কীদার হাঁক দিয়ে থেমে গেল—সে হাঁকের জবাবে একটা ক্ষীণ … শোনা গেল।

…টা পশ্চিমে নেমে পড়ছে। বিলাসীর মনটা নতুন আতঙ্কে … শিউরে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, বাংলোর দোতলায় তার সাজান ঘর। তোরঙ্গে তার বকমারী শাড়ী, তার সোনার গোট, … কাটাবাজু, তার চন্দ্রহার, কানবালা, ডিকের শেষ বখশিস … কাজ-করা সোনার সিঁথি আর কাটাবাজু। সে জানে … কেউ পারবে না দেয়ালে গাঁথা গুপ্ত সিন্দুক থেকে। তবু … হয়।

আবার হাঁক—জোড়া হাঁক চৌকীদারের—দৌড় হাঁক। হাঁক ছাপিয়ে বন্দুকের আওয়াজ এক-দুই-তিন। তার পর সব চুপ!

…কে ফিরতেই হ'ল। বাগিচার গাছ-পালার মাঝ দিয়ে চাঁদের আবছা আবছা আলোয় সে এগিয়ে চলল। কলাবাগানে পৌঁছে দেখল, তাদের ঝাউ-পথের উপর কে দু'জন পড়ে আছে: বাংলো খাঁ-খাঁ করছে। এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসে: দেখে চৌকীদার জাফ্‌ফা বেহুঁস হয়ে পড়ে, আর তার সামনে দেউড়ীর কাছাকাছি কাল কাপড়ের একটা স্তূপ। দেখে … উঠিয়ে দেখে, তারই গোপাল!

…কণ্ঠে ডাকে—গোপাল! বাবা!

—তোমাকে খুঁজতেই এসেছিলাম মা।

…সী বলে—উঠ্‌তে পারবি?

মা … কাঁধে ভর করে ওঠে সন্তান। সযত্নে কোলে জড়িয়ে ধ'রে মা … ধীরে চলে। হঠাৎ তার সারা গায়ে অদ্ভুত বল ফিরে আসে … বাধে কিছু বেদনা নাই।

… একটা গুলী ডান পায়ের কব্জীতে লেগেছে খালি।

… ঠিকই করল যেমন করে হোক কেশবপুরে না গিয়ে উপায় নেই … গোপালকে জিজ্ঞেস করে, পারবি বাবা?

… আবেষ্টনের উত্তাপে মরা ছেলেও বেঁচে ওঠে, ওর গোড়ালি … হয়ত ছেঁদা হয়েছে। মায়ের উদ্বেগ-আকুল মুখের দিকে … ওর চোখটা কেমন জ্বলে ওঠে। নীরবে … মাথা কাৎ করে।

বেশী দূর যেতে হয় না। স্পষ্ট দেখা যায়, মাঠের ওপার থেকে ছুটে আসছে কারা। সামনে ঘোড়ায় চড়ে কেষ্ট বাগচী। কেষ্ট বাগচী আর লেঠেলরা এসে সেখানে থামতেই, বাগচী ঘোড়া থেকে নেমে গোপালের দিকে এগিয়ে আসে।

'জখম করলে কে রে!'

গোপাল—গং সাহেব কাল রাতে মা'র কাঁধে শড়কী মেরেছিল, তাই দেখতে এসেছিলাম। দেখি, একটা ছোট্ট মশাল হাতে খোদা মল্লিক বাংলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

বিলাসী জিজ্ঞেস করে, দোতলায়?

—হাঁ মা, দোতলায়। দেখি ইজাবদি, তাজু দারোগা আরও পাঁচ-সাত জন বাজারের দিক থেকে এসে জুটল। ওরা উঠে গেল। গা-ঢাকা দিলাম; ওরা একটা সিন্দুক টেনে নামাতে লাগল।

বিলাসী জিজ্ঞেস করে—সিন্দুক? সিন্দুকেই ত তার যথাসর্বস্ব।

ডিকের বখশিস্। একবার তার মন কেমন করে। তার পর হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—যাক গে!

—মশালটা হঠাৎ নিবে যায়। ওরা সিন্দুকটা টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ভাবলাম, মা কোথায় গেল! ওরা চলে যায়। খুঁজে বেড়াই আঁধারে—একটু করে ডাকি, মা আছ? সাড়া নেই। বাংলোর দরজা-জানালাগুলো হাঁ করে আছে। হঠাৎ গোমিশ!……

—গোমেশ?

—হ্যাঁ গোমিশ? মা, তোমার সেই কাল কাঁথাটা আমার দিয়ে বলে, মুড়ি দিয়ে পালিয়ে যা। চৌকীদার বসে আছে কলাবাগানে। কাপড় মুড়ি দিয়ে যেতেই শুনি চৌকীদারের হাঁক। বাংলো থেকে ছুটে বেরিয়ে যাই। চৌকীদার ছোটে। এমন সময়—

গোপাল মায়ের কাঁধে মাথা রেখে একটু চুপ করে থাকে। তার পর বলে—দেখি, কুঠীর দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে সাদা বোরখা-পরা কে যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে। প্রায় পাঁচ গজ দূরে থমকে দাঁড়াই—হঠাৎ মূর্ত্তিটা খল-খল করে হেসে চেঁচিয়ে বলে—হেল্লো উইচ—হাঁ, ঠিক মনে আছে—হেল্লো উইচ—আর সঙ্গে সঙ্গে সাদা একখানা হাত উঁচু করে গুলী চালায়। ঝট করে বসে যদি না পড়তুম মা, তবে আর তোমার সঙ্গে দেখা হত না।

বিলাসী শিউরে ওঠে, বোঝে, এ মরিয়ম ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। মরিয়ম নিশ্চয় ডিকের দুর্দ্দশার প্রতিশোধ নিতে এসেছিল আমায় খুন করে। ভাবে—মলেও ত বাঁচতাম। আমারই পাপে যাদুকে হারাতে বসেছিলাম। মঙ্গলচণ্ডী বাছাকে রক্ষা করেছে। গোপালের মাথায় বিলাসী হাত বুলোয়, আর তার মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

বাগচী গোপালকে তার ঘোড়ার উপর উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। বিলাসী ইঙ্গিত করে, লেঠেলরা তার পেছনে পেছনে চলে বাংলোর দিকে। জাফ্‌রা চৌকীদারটা পড়ে আছে—সে যদি গোপালকে দেখে থাকে? বিলাসী পা ফেলে চলে, লেঠেলরাও পেছনে পেছনে চলে। ঝাউপথে ত কেউ নেই! মাত্র কাল কাঁথাখানা পড়ে। কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে নেয় নয়না। ছুটে চলে জাফ্‌রার ঘরে।

নয়

কেশবনগরে বুড়ো কুঠীয়াল টমসন সে-রাত্রিতে বিশেষ চঞ্চল হয়ে পড়লেন। বন্ধু রীড গেল কোথায়? ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। ছেলে জেমস্‌কে ডেকে পাঠালেন। বরকন্দাজ এসে খবর দিল, ছোট সাহেব রাতে বামন্দী কুঠীতে চলে গেছেন। বড় সাহেব হুকুম দিলেন—এত্তালা দেও!

কিন্তু রীড গেল কোথায়?

ভোর হ'ল। হল-ঘরে বৃদ্ধ চিন্তিত মনে পায়চারী করেন। ভাবেন, তিতুর লোক যখন একবার হামলা করেছে তখন আবার ওরা আসবে নিশ্চয়। লেঠেল সর্দ্দারকে ডাকলেন। ভীমা সর্দ্দার এসে সেলাম বাজাতেই হুকুম হল—'দো হাজার শড়কী, দো হাজার লাঠিয়াল!' ইঙ্গিত ভীমা খুবই বুঝত। "বহুত আচ্ছা হুজুর" বলে কালাকেলো দেহখানা নুইয়ে পেছু হটতে হটতে কুর্ণিস করে তিড়িং করে ঘুরপাক্ দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

কিন্তু রীড? গেল কোথায়?

ফিরিঙ্গী গোমেশটাকে বিদায় দিয়েই ত রীড তাঁর সঙ্গে খানা খেয়ে সোজাসুজি ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করেছিল। বাবুর্চ্চি ত তাই বলল।

বাবুর্চি যাই কেন বলুক না, বড় সাহেবকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। ঘরের দোর মিস্ত্রী ডাকিয়ে খোলা হ'ল। মশারি ফেলাই আছে। তুলে দেখল বড় সাহেব বিছানার উপরে কেউ যে শুয়েছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। খোলা জানলার কাছে বড় আম গাছের একটা ডাল এগিয়ে এসেছে, সে দিকটায় নজর পড়তেই বুড়ো তাড়াতাড়ি জানলার ধারে গিয়ে দেখল একটা দড়ার সিঁড়ি তখনও ঝুলছে। নিশ্চয় এই সিঁড়ি বয়ে নেমে গেছে রীড। কিন্তু কেন? কোথায়?

বুড়ো টমসন আবার ঘরটা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। বসতে পারলেন না। বরকন্দাজের আবার তলব! বরকান্দাজটা তখনও ফেরেনি।

ক্রমে বেলা হয়। আব্দালী এসে খবর দেয়, আবুবী কুঠী থেকে ডিকের জেনানা, আর গুটিকয়েক ছেলে এসেছে, দেখা করবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে।

কালা আনন্দ এসে সাহেবের পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল। রাতের ঘটনা সব জানাল। টমসন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কালা আনন্দ বলল, ডিককে ওরা ধরে নিয়ে গেছে—গোরা আর [illegible] ঘায়েল করেছে। ডিকের ১০ বছরের ছেলে রিচার্ড—কোম্পানী বাহাদুরের দোহাই দিতে লাগল।

বড় সাহেব তার গোমস্তাকে ডাকিয়ে হুকুম দিলেন, [illegible] বিবরণ লিখে ডিকের জেনানাটাকে নিয়ে হার্দ্দি থানায় [illegible] দিতে। এমন সময় ঘোড়ায় চড়ে ছোট টমসন এসে পড়ল। [illegible] শুনে সে একটু হাসল—জিজ্ঞেস করল, 'দোসরা জেনানা?'

কালা তার খবর দিতে পারল না। বুড়ো সাহেবের মনে [illegible] গেল রাতে জখমী জেনানা এসেছিল, বোধ হয় সেই হবে [illegible] জেনানা। ইংরেজীতে ছেলেকে রাতের ব্যাপার জানাল।

ওদের বিদায় দিয়ে দুই সাহেব বৈঠকখানায় গিয়ে [illegible] রীডের রহস্যজনক অন্তর্দ্ধানের কথা শুনে ছোট সাহেব শঙ্কিত হয়ে পড়ল। এ নিশ্চয় দুষমন কালীনাথের কারসাজী। সে [illegible] অপেক্ষা করল না। যে ঘোড়ায় এসেছিল সে ঘোড়া নিয়েই [illegible] পড়ল।

কিন্তু কালীনাথের কারসাজী মোটেই নয়। গোয়েন্দা [illegible]

...নের বেলা খবর পেয়েছিলেন গোমেশের কাছে ডিকের আয়োজনের ...থা, ফরাজীদের আয়োজনের কথা।

রাত তখন নিশুতি। কুঠীর ঘণ্টায় পাহারাওলা বারটা বাজিয়ে ...ল। রীড তাঁর ব্যাগ থেকে ছদ্মবেশ বের করে মোছলমান ...কীর সাজলেন। হাঁরাকষের গুঁড়ো গুলে মুখখানি, হাত ও পা ...মাটে করে ফেললেন। তার পর দড়ীর মইটা জানলার খাটিয়ে ...রবে নেমে পড়লেন।

গভীর রাত। আবুরীতে যেতে চার মাইল পথ—গোমেশ ...েছিল। তা দু'টায় পৌঁছান যাবে।

পথে লোকজন কিছু নেই। মাইল দুই পার হয়েছেন হঠাৎ ...লেন, কতকগুলো লোক মশাল জেলে হল্লা করতে করতে চলেছে। ... কয় জন অশ্বারোহী। ফকীর গা-ঢাকা দিয়ে বসে পড়লেন ...থের পাশে এক গাছতলায়। বসে একটা গাঁজার কল্‌কে বের ... তা সাজবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

এক জন দাড়ীওয়ালা লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নজর পড়ল ...রের দিকে। ফকীর হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তাকে। ...কটা এগিয়ে এসে সেলাম করল। ফকীর হুকুম দিলেন— ...লিম? লোকটা একবার দলের অগ্রবর্ত্তী লোকগুলোর দিকে ... বলল, মাফ করতে হবে, ফুরসৎ নেই।

আবার সেলাম জানিয়ে সে ছুটে চলে গেল।

ফকীর উঠে পড়লেন। যেদিকে লোকগুলো চলে গেল, তারই ...ছনে তিনি ছুটে চললেন, কখনও দৌড়ে।

...কটা মস্ত দীঘি। তার তীরে এসে মশালগুলো থামল। ...রাও থামল। ঘোড়সোয়ার কয় জন এগিয়ে চলেছে, প্রায় দু'শো ... হবে। ঘাড়ে করে কাকে যেন বয়ে নিয়ে চলেছে। ওদের ... পড়া কি উচিত হবে? একটু ভেবে নিয়ে জপমালাটা বের ... মালা ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চললেন।

...দনী রাত। বড় বড় তাল গাছগুলো দীঘিটার ধারে দাঁড়িয়ে ...রা দিচ্ছে। বেশ দেখা যায়, ঘোড়সোয়ার দুই জন সাহেব, ... সোয়ারীরা এদেশী। কাঁধের জিনিষটাকে ওরা পুকুর-পাড়ে ...। ও কি! ও যে মানুষ, ছটফট করছে! ওরা তার উপর ... চালাচ্ছে। সাহেবটি ঘোড়ার উপর থেকে হাত নেড়ে হুকুম ...

রীড ছুটে চলেন। ২০ গজ দূরে একটা কুটীর, তারই আড়ালে দাঁড়ালেন। সবই দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, চীৎকার করছে সাহেবটা—"মারো শালাকে"। কেউ জুতো মারছে, একটা সাহেব ঘোড়ার চাবুক চালাচ্ছে। লোকটার মুখ বাঁধা, তবু চেঁচাচ্ছে—"মর্ গিয়া, জান গিয়া।"

এক সোয়ারী সাহেব বোধ হয় দলপতি—ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল হতভাগ্যের বুকের উপর, ঠোক্কর দিতে লাগল বুটের। চেঁচিয়ে হুকুম দিল—'শালাকো চিল্লাই করো।'

কে বললে—খতম্।

ঝুঁকে পড়ে কয়জন লোকটার বুকে হাত দিয়ে নাকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে।

দলপতি হুকুম দেয়—লে চলো, উঠাও।

আবার মশালগুলো এগুতে থাকে। একটু দূরের মস্ত কুঠীর চিমনীগুলো মাথা উঁচু করে আছে। মশালগুলো ছুটতে থাকে। রীডও ছুটে চলে।

হঠাৎ চার দিক থেকে কয়টি কাল দৈত্য এসে রীডকে ঘিরে ফেলে। কেউ বলে—ফরাজী মোল্লা, বেঁধে ফেল্। কেউ বলে, ফকীর, ছেড়ে দে।

কিন্তু ছেড়ে দেয় না, বেঁধে ফেলে ওরা রীডকে। রীড বাধা দেয় না। একবার চেঁচিয়ে বলে—খোদা খোদা! সব কইকো ভালা কর! ইয়া আল্লা—ইয়া আল্লা!

আল্লার বান্দাকে ওরা পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে যায়। বাগচী বলে—কর্ত্তার কাছে নিয়ে চল্! তাকে একাই তার ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ফেলে। ঘোড়া জোর-কদমে ছুটে চলে। বাগচী অন্য দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। রীডকে ঘিরে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছয় জন রণ-পা পিছু পিছু পাহারা দিয়ে নিয়ে চলে।

এক ঝাঁক শেয়াল এসে মাঠের মাঝখানে মুখগুলো উঁচু করে রাতের শেষ প্রহর হেঁকে যায়—দু'টো কাল প্যাঁচা উৎকট চীৎকার করতে করতে মাঠখানা পাড়ি দেয়। দূর থেকে শকুন-শিশুর আর্ত্তনাদ ভেসে আসে।

গোয়েন্দা রীডকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিয়ে বাগচীর দল দিকচক্রবালে অন্তর্হিত হয়।

[ক্রমশঃ।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী গৃহীত টাটকা গোলাপ ফুলের ছায়াচিত্র মুদ্রিত হইল। এই গোলাপের নাম ব্ল্যাকপ্রিন্স। ইহার রঙ, ঘন রক্তবর্ণ।

আকাশ-পাতাল

[৩১৩ পৃষ্ঠার পর]

অসুখ। সেই ডালিম-রাঙা ঠোঁটে আজ কথা নেই। সে অজ্ঞান হয়ে আছে। অসুখ। ছায়া, লিলি, লিলিয়ানের অসুখ। কি অসুখ!

—কি হয়েছে? সে জিজ্ঞেস করে অবাক্ স্বরে।

অরুণেন্দ্র বললে,—That I know not. তাই তো এসেছি তোমার কাছে। টাকা নিয়ে ডাক্তার দেখাবো। দেখে এসেছি high, high fever. অনেক বেশী জ্বর। Body যেন তার পুড়ে যাচ্ছে।

জ্বর! সে বললে,—তুমি দাঁড়াও। আমি টাকা দিতে বলি।

কাছারী থেকে নায়েব মশাইকে কাছে ডেকে কাণে কাণে যা বলবার তাই বলে দেয় সে। নায়েব মশাই একবার বলেন,—টাকাটা তবে কোন্ খাতায় খরচা ফেলবো?

সে বললে,—দাতব্য খাতে। আগে টাকাটা এনে দিন। বিশেষ জরুরী।

সবই তোমার। চাবিটি শুধু তাঁর হাতে। নায়েব নিমেষের মধ্যে টাকাটা এনে দেন। অরুণের হাতে দিতে দিতে বলে কৃষ্ণকিশোর,—এ টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না। তুমি নিয়ে যাও।

অরুণেন্দ্র দুঃখ-কাতর হাসির সঙ্গে বললে,—তুমি একবার দেখতে যাবে না তাকে? My beloved Lilianকে?

—দেখতে যাবো! তা যাবো'খন। তুমি যখন বলছো নিশ্চয়ই যাবো। যাবো সেই বিকেলে। আমাদের বাড়ীতে আজ কয়েক জন আত্মীয় এসেছেন। কেমন? কৃষ্ণকিশোর কথা বলে যেন শুষ্ক কণ্ঠে। তার চোখে যেন দুশ্চিন্তার চাউনি। কথায় জড়তা।

অরুণেন্দ্র টাকাটা পকেটে পূরে দ্রুত-পায়ে চলে যায় ইংরেজীতে কি একটা ছড়া কাটতে কাটতে। বলতে থাকে—

O! Judgement! thou art fled to brutish beasts
And men have lost their reason!

অরুণেন্দ্রর এই ক্ষোভ বিনয়েন্দ্রের বিরুদ্ধে। ডাক্তার ডাকা লোকটা টাকা দেয় না। তাও তার নিজের মেয়ের জন্যে। বলে কি না income fixed. চিকিৎসার অভাবে যদি লিলিয়ান—

একটা যেন ঝড় বয়ে গেল। চলে গেল অরুণেন্দ্র। কৃষ্ণকিশোর এক বিশ্রী মন নিয়ে ধীরে ধীরে চললো অন্দরের দিকে। সেখানে আবার কি কুরুক্ষেত্র হচ্ছে কে জানে। যেতে যেতে দেখা হ'ল পিশে মশায়ের সঙ্গে। শিবচন্দ্র বললেন,—ও-বেলায় এসে তোমার পিশীমাকে বাবা নিয়ে যাবো। তোমার মা-ঠাকরুণ ছাড়লেন না এখন। আমি চললাম। আমার অনেক কাজ সারা দিনে।

পিশীমা থাকবেন ও-বেলা পর্য্যন্ত। অন্য দিন হলে কত যে সে আনন্দ করতো। কিন্তু আজ? আজ আর সে কিছু বললে না এ কথায়। গমনোদ্যত শিবচন্দ্রের গ্লেসড্ কীডের জুতোর ধুলো নিয়ে শুধু মাথায় ছোঁয়ালে। তার পর আবার চললো অন্দর পানে। তার চোখে তখন সেই ডালিম-রাঙা ঠোঁট আর রহস্যপূর্ণ সেই অদ্ভুত চোখ দু'টো ভাসছে। তারই অসুখ? কি হয়েছে কি!

কি হয়েছে, তা কি আর ভেবে বলা যায়! না দেখে? কি হয়েছে তা তো শুধু ডাক্তারেই বলতে পারে। কৃষ্ণকিশোর ভাবে,—কি বলবে ডাক্তার?

তা কেবল ডাক্তারই জানে! সে শুধু ভাবছে, বিকেল হবে কখন? ঘড়ি তো ঘোড়া নয়। ঘড়ি ঘড়ি। যেতে যেতে সে শুধু ভাবে, বিকেল হবে কখন? কখন হবে বিকেল!

ঘড়ি তো ঘোড়া নয়। ঘড়ি ঘড়ি। বিকেল যখন হবার তখন ঠিক হবে। প্রতীক্ষা-ব্যাকুল মুহূর্ত্তগুলো কি এত চট ক'রে শেষ হয়। বিনিদ্র রজনী?

[ক্রমশঃ

শিয়ালদহ ষ্টেশন

প্রভাত বসু

যাত্রী আসে যায়—
দুই কূলে বাঁধো তুমি সেতু
দেশ আর বিদেশের।

অনেক মমতা দিয়ে গড়া
তোমার ঐ পাষাণ-চত্বর!
যাত্রা-পথ সুরু হয় কারো
কারো শেষ তোমার সীমায়।
তোমার যৌবনদীপ্তি মিলায়েছে আজ,
নিবে গেছে অতীতের আনন্দ-কাকলি;

জেগে আছে পূতিগন্ধময়
বিড়ম্বিত মানুষের বীভৎস দুর্দ্দশা!
আজ তুমি নহ আর রেলপথ-সীমা,
লোহা আর পাথরের সমষ্টি কেবল;
তোমারে জানাই মোর অন্তিম প্রণতি—
বাঙালীর ঐতিহ্যের হে শ্মশানভূমি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কোরিয়ার যুদ্ধ ও পণ্ডিত নেহরুর শান্তি প্রচেষ্টা—

কোরিয়া যুদ্ধের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সত্বর এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়া সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হইয়া সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মার্শাল ষ্ট্যালিন এবং মার্কিণ রাষ্ট্র-দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ ডীন একিসনের নিকট ব্যক্তিগত ভাবে পত্র প্রেরণ করেন। এ সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিতও তিনি নিবিড় সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরুর ১৩ই জুলাই (১৯৫০) তারিখের উক্ত পত্রের মঃ ষ্ট্যালিন যে উত্তর দেন তাহা ১৬ই জুলাই নয়া দিল্লীতে পৌছে। পণ্ডিত নেহরুর পত্র এবং মঃ ষ্টালিনের উত্তর উভয়ই সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রচার করা হইয়াছে। এই পত্র এবং উহার উত্তর হইতে দেখা যায়, নিরাপত্তা পরিষদের মারফৎ কোরিয়া সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু এবং মঃ ষ্টালিন উভয়েই একমত। নিরাপত্তা পরিষদে প্রজাতান্ত্রিক চীনের উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য রহিয়াছে। তবে মঃ ষ্ট্যালিন ইহাও মনে করেন যে, কোরিয়া সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য কোরিয়ার জন-প্রতিনিধিদের বক্তব্যও শ্রবণ করা উচিত। পণ্ডিত নেহরুর শান্তি প্রচেষ্টার জন্য মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া তাঁহার প্রচেষ্টায় সাড়া দিবেন, এ বিষয়ে কোথাও কোন সন্দেহ থাকিলেও তাহা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসন অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় কিন্তু দৃঢ়তার সহিত পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হইলেও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কাহারও কোন সংশয়ই ছিল না। মিঃ একিসন ১৮ই জুলাই (১৯৫০) তারিখে পণ্ডিত নেহরুর উত্তর প্রদান করেন এবং ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর উহা প্রাপ্ত হন ১৯শে জুলাই তারিখে। এই পত্রে পণ্ডিত নেহরুর মহৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা যে করা হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু বরফশীতল সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কোরিয়ার উপর আক্রমণের অবসান ঘটাইয়া ঐ অঞ্চলে শান্তি ঐ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সুদৃঢ় অভিপ্রায় সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে সমর্থন করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিণ জনগণের উদ্দেশ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণ করা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন যে, অন্যায় আক্রমণ অথবা অন্য কোন উপায়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর চাপ দিয়া এ-সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

পণ্ডিত নেহরুর শান্তি প্রচেষ্টার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার [illegible] ঘটিয়াছে। অন্যরূপ ঘটিবার দুরাশা পণ্ডিত নেহরুর মনেও [illegible] স্থান পায় নাই। কিন্তু মিঃ একিসনের পত্রে সম্মিলিত জাতি[illegible] প্রস্তাবের নাম করিয়া যে খোঁচা দেওয়া হইয়াছে তাহার তীব্র [illegible] শান্তি প্রচেষ্টার গৌরবের প্রলেপেও দূর হওয়া কঠিন। নিরা[illegible] পরিষদে রাশিয়া অনুপস্থিত থাকার সুযোগেই দক্ষিণ কো[illegible] সাহায্য দানের প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। রাশিয়া [illegible] উপস্থিত থাকিত এবং ঐ প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করিত, তাহা [illegible] মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ [illegible] বিরত থাকিত কি না এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দান [illegible] জন্য নিরাপত্তা পরিষদের আবেদন করিবার চব্বিশ ঘণ্টা [illegible] প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ঐ আবেদনে সাড়া দিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে [illegible] দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় বিবেচ[illegible] করিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দানের [illegible] সমর্থন করিয়াছেন। এই সমর্থনের সহিত পণ্ডিত নেহরু[illegible] প্রস্তাব যে খাপ খায় না, মিঃ একিসন তাহাই সৌজ[illegible] ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন। শান্তিপূর্ণ উপায় কোরিয়া [illegible] সমাধানের জন্য পণ্ডিত নেহরু কি প্রস্তাব করিয়াছিলেন? [illegible] প্রস্তাব মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত: (১) নিরাপত্তা [illegible] কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণ করিয়া রাশিয়ার নিরাপত্তা [illegible] অধিবেশনে যোগদানের বাধা দূর করিতে হইবে; (২) [illegible] ভাবে পুনর্গঠিত নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামের মধ্যে [illegible] বাহিরে রাশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন অন্যান্য শা[illegible] রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতায় যুদ্ধ বিরতির এবং কো[illegible] সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য একটি ভিত্তি স্থির করিবেন। [illegible] এই প্রস্তাবকে আরও বিশ্লেষণ না করিয়াই ইহা বুঝি[illegible] যাইতেছে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়া সমস্যার সমাধান [illegible] হইলে নিরাপত্তা পরিষদে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণ করা [illegible] তদ্দারা নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার যোগদানের বাধা [illegible] আবশ্যক বলিয়া পণ্ডিত নেহরু মনে করেন। তাই যদি [illegible] হইলে রাশিয়ার অনুপস্থিতিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য [illegible] প্রস্তাব তিনি সমর্থন করিলেন কিরূপে? ইহার কারণ কি [illegible] নয় যে, অন্যান্য সকলের মত তাঁহারও ধারণা ছিল, মার্কি[illegible] কোরিয়ায় অবতরণ করিলেই উত্তর কোরিয়া পলাইবার পথ [illegible] না? কিন্তু মার্কিণ সৈন্য কোরিয়ায় অবতরণ করিবার পরেও [illegible]

...হের মধ্যেও উত্তর কোরিয়া বাহিনীর অগ্রগতি রোধ হওয়া ... দূরের কথা, মার্কিণ বাহিনীই পিছু হটিতে লাগিল। উত্তর ...রিয়া বাহিনী দৈনিক প্রায় পাঁচ মাইল করিয়া অগ্রসর ...ছিল। দক্ষিণ কোরিয়া গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী রাজধানী উত্তর ...রিয়া বাহিনীর দখলে চলিয়া যায় এবং ৯ই জুলাই তারিখে ...রা তেয়োজনের ২৫ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ...মেরিকা প্রচুর বোমা বর্ষণ করিয়াও উত্তর কোরিয়া বাহিনীকে ...ইতে পারে নাই! তেয়োজনের পতন যখন আসন্ন, সেই সময় ... নেহরু শান্তির প্রস্তাব করেন। ইহার পূর্ব্বে ৭ই জুলাই ...০) তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু ...াছিলেন যে, উত্তর কোরিয়ার অভিযান যদি জয়লাভ করে, ... হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব থাকিবে না এবং তৃতীয় ...যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।

মার্কিণ সৈন্যবাহিনী জয়লাভ করিতে থাকিলে পণ্ডিত নেহরু ... প্রস্তাব করিতেন কি না, সে-প্রশ্ন এখন অবান্তর। কিন্তু ... কোরিয়ার সহিত যুদ্ধে আমেরিকার জয় এবং পরাজয় উভয়েরই ...নাম তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলিয়া আশঙ্কা করা অনেকেই উপেক্ষা ... পারেন না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফরমোসা, ইন্দোচীন এবং ...ের সমস্যাকে একই সূত্রে গ্রথিত করায় কোরিয়ায় মার্কিণ ...ষ্ট্রের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কোরিয়া ... দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমেরিকা জয়-... করিলেও উত্তর কোরিয়া বাহিনী যদি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হয়, ... হইলে যুদ্ধকে অষ্টত্রিশ সমান্তরাল রেখার দক্ষিণে নিবদ্ধ রাখা ... হইবে কি? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাই ... উচিত। কিন্তু তাহা হইবে কি? জেনারেল আইসেন... এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, "It may be necessary for the U. S. forces to cross the 38th. Parallel to defeat the North Koreans." 'অর্থাৎ উত্তর ...কে পরাজিত করিবার জন্য মার্কিণ বাহিনীকে অষ্টত্রিশ ... রেখা অতিক্রম করিতেও হইতে পারে।' তিনি এমন ... বলিয়াছেন যে, "The place where the U. S. army has to go will probably be the whole Korean area." অর্থাৎ 'হয়ত সমগ্র কোরিয়াতেই মার্কিণ ...কে যাইতে হইতে পারে।' এইরূপ অবস্থায় রাশিয়া যুদ্ধ ... করিবে, এইরূপ আশঙ্কা তিনি করেন না। কিন্তু সকলের ... ইহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কোরিয়ার যুদ্ধে যদি মার্কিণ ...ের তথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরাজয় হয়, যদি সমগ্র দক্ষিণ ... উত্তর কোরিয়ার দখলে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সম্মিলিত ... নাম করিয়াও আরও যুদ্ধ চালানো বড় সহজ হইবে না। ...খনকার যুদ্ধ শুধু উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইবে না, ...িতে হইবে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া এবং কোরিয়াবাসীর ...য়ী গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দক্ষিণ ... জনগণের উপরেও আঘাত না হানিলে চলিবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে তাহাও করা যদি সম্ভব হয়, ... পৃথিবীর ইতিহাসে উহা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত নেহরু এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই শান্তি প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধে আমেরিকা জয়লাভ করিলেই যে ফরমোসা রক্ষার জন্যও যুদ্ধ করিবে না এবং ইন্দোচীনে বাও দাইকে সামরিক সাহায্য দিবে না সে-সম্বন্ধে কোনই নিশ্চয়তা নাই। মিঃ একিসন ১৮ই জুলাই (১৯৫০) পণ্ডিত নেহরুর পত্রের উত্তর লিখেন। উহা পাওয়া যায় ১৯শে জুলাই। এই ১৯শে জুলাই তারিখেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সমর-সজ্জার জন্য এক হাজার কোটি ডলার মঞ্জুর করিতে এবং সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে তাঁহার হাতে অব্যাহত ক্ষমতা অর্পণ করিতে মার্কিণ কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাহারই কয়েক ঘণ্টা পরে এক বেতার বক্তৃতায় বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রবর্গকে সাবধান করিয়া দিয়া তিনি বলেন, "কম্যুনিষ্টদের কোরিয়া আক্রমণ দেখিয়া আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ আক্রমণ চলিতে পারে!" কোরিয়া যুদ্ধ সমগ্র এশিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্ব-বিস্তারের এক মস্ত অজুহাতে পরিণত হইয়াছে।

কোরিয়া, নিরাপত্তা পরিষদ ও রাশিয়া—

নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি মঃ জ্যাকব মালিক যখন গত ২৭শে জুলাই (১৯৫০) ফোন করিয়া সেক্রেটারী জেনারেল ট্রাইগভি লাইকে জানাইলেন যে, ১লা আগষ্ট হইতে নিরাপত্তা পরিষদের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করিবেন, তখন অবস্থা প্রায় মধুচক্রে লোষ্ট্র-নিক্ষেপের মতই হইয়া উঠিয়াছিল। রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে যোগদান না করায় মনে মনে যাঁহারা খুসী হইয়াছিলেন, কিন্তু মুখে উহার জন্য রাশিয়ার সমালোচনা করিতেন, তাঁহারা রাশিয়ার মতলব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ না করিয়া পারেন নাই। বস্তুতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী চালিত করা সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র জেমস রেষ্টন (Games Reston) গত ২৮শে জুন তারিখে লিখিয়াছেন, "official here agree that their plans were greatly assisted by the Soviet boycot of Security Council's session. If the Soviet representative had been present he would have vetoed the United Nation's resolaution. অর্থাৎ 'সোভিয়েট রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বয়কট করায় তাঁহাদের পরিকল্পনার যে অনেক সুবিধা হইয়া গিয়াছিল, সে-সম্পর্কে এখানকার অফিসিয়ালগণ একমত। রাশিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করিতেন।' যাহা সরল সত্য, জেমস রেষ্টন তাহাই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্যকরী শক্তি সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিশেষ আস্থা ছিল না। কিন্তু কোরিয়ার ব্যাপারে রাশিয়ার অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। ২৫শে জুন (১৯৫০) রবিবার প্রাতঃকালে যখন কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শনিবার রাত্রি আড়াইটা। মার্কিণ রাষ্ট্র-বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ ডীন রাস্ক টেলিফোনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিণ সদস্য মিঃ আর্ণেষ্ট গ্রসকে কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংবাদ জানান এবং মিঃ লাইকে ফোন করিয়া নিরাপত্তা

পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে অনুরোধ করিবার জন্য বলেন। তিনটার সময় মিঃ গ্রস মিঃ লাইকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

রবিবারে (২৬শে জুন ১৯৫০) যখন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইল, তখন রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া আর সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ-বিবতির জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব সহজেই কেন গৃহীত হইল, সে সম্পর্কে জেমস্ রষ্টন বলিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে আরও অনেক বার যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু প্রস্তাব লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এই জন্য সদস্যগণ প্রস্তাব অনুমোদন করিতে আপত্তি করেন নাই। পরে কি হইবে তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন নাই। চব্বিশ ঘণ্টা পরেই যে সামরিক হস্তক্ষেপ করা হইবে তাহা তাঁহাদের কল্পনাতীত ছিল। বস্তুতঃ ২৭শে জুন (১৯৫০) দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দানের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে নিরাপত্তা পরিষদের অপরাহ্ন অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হয়। রাত্রি নয়টায় এবং পরে দশটায় আবার স্থগিত রাখিতে হয় এবং অবশেষে রাত্রি এগারটার সময় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহিত আমেরিকার এই গলাগলি ভাব রাশিয়ার উপস্থিতিতে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

রাশিয়ার প্রতিনিধির উপস্থিতি ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদের শেষ অধিবেশন হয় গত ৩১শে জুলাই। এই অধিবেশনে বৃটেন, ফ্রান্স ও নরওয়ের এক যুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য অসামরিক সাহায্য এবং জেনারেল ম্যাকআর্থারের প্রয়োজন অনুযায়ী যে-কোন ধরণের সাহায্য প্রদান করিতে অনুরোধ করা হয়। এই যুক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য যেন উত্তর কোরিয়ায় কোন সাহায্য না পাঠান। কারণ, উহাতে যুদ্ধ অন্যান্য এলাকায় ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে।

রাশিয়া সাত মাস সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বয়কট করিবার পর গত ১লা আগষ্ট (১৯৫০) রুশ-প্রতিনিধি মঃ মালিকের সভাপতিত্বে নিরাপত্তা পরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার জন্য রাশিয়া দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। একটি রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রতিনিধিত্ব, আর একটি কোরিয়া ব্যাপারের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা। জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব অমান্য করায় উত্তর কোরিয়ার নিন্দা করিয়া এবং কম্যুনিষ্টদিগকে সাহায্য করিতে বিরত থাকিবার জন্য জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যকে অনুরোধ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক প্রস্তাব উত্থাপন করে।

নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াই মঃ জ্যাকব মালিক জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধির চীনের প্রতিনিধি হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত থাকিবার অধিকার নাই বলিয়া এক রুলিং প্রদান করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন উভয়ের প্রতিনিধিই [illegible] রুলিং-এর প্রতিবাদ করেন। ৩—৮ ভোটে সভাপতির রুলিং অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অতঃপর তিন দিনব্যাপী আলোচনার পর গত ৩রা আগষ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবটিই নিরাপত্তা পরিষদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয় এবং রাশিয়ার প্রস্তাবিত কার্য্য-তালিকা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

৪ঠা আগষ্ট রাশিয়া এক নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করে। [illegible] প্রস্তাবে কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি, কোরিয়া হইতে বিদেশী [illegible] অপসারণ এবং কম্যুনিষ্ট চীন ও উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধির [illegible] শ্রবণের দাবী করা হইয়াছে। গত ৮ই আগষ্ট কোরিয়া [illegible] সমালোচনায় এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই বলিয়া সোভিয়েট রাশিয়াকে শাসাইয়া [illegible] যে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়া যদি বাধাদানের নীতি পরিবর্ত্তন [illegible] করে, তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদের কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ স্থির করিবেন।

কোরিয়ার যুদ্ধ ও ফরমোসা—

কোরিয়া যুদ্ধের সহিত ফরমোসা রক্ষার ব্যবস্থার সম্পর্ক [illegible] খুব ঘনিষ্ঠ, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ফরমোসা দখলের অজুহাত সৃষ্টি করিবার জন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে গৃহ-যুদ্ধের উস্কানী দিয়াছে বলিয়া উত্তর কোরিয়া যে অভিযোগ করিয়াছে, তাহা একেবারেই বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে কি? ফরমোসা চীনা জাতীয়তাবাদীদের শেষ ঘাঁটি। কম্যুনিষ্ট চীন ফরমোসা আক্রমণ করিলে মার্কিণ সপ্তম নৌবহর উহা প্রতিরোধ করিবে। জেনারেল ম্যাকআর্থার এই ব্যাপারেই ফরমোসা পরিদর্শনের জন্য ৩১শে জুলাই সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি ফরমোসা রক্ষা সম্পর্কে চীনা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া ১লা আগষ্ট টোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি বলিয়াছেন, ফরমোসার বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন [illegible], কোন শত্রুবাহিনী যদি ফরমোসা আক্রমণের মত বেকুবী [illegible] করিয়া বসে, তাহা হইলে সে-আক্রমণ সফল হওয়া সুদূরপরাহত হইবে। তাঁহার এই মন্তব্য খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনা-বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়করূপে এই কথা বলিয়াছেন [illegible] না, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক জন সেনানায়করূপে বলিয়াছেন, [illegible] বুঝিবার কোনই উপায় নাই। কাজেই, তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেনা-বাহিনীর অধিনায়করূপে এই কথা বলিয়াছেন এ-কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। ফলে ফরমোসা রক্ষার [illegible] কোরিয়া যুদ্ধের একটা প্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে এবং [illegible] কোরিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণের মতই কম্যুনিষ্ট [illegible] ফরমোসা দখলের চেষ্টাও আক্রমণ বলিয়াই গণ্য হইবে। এই [illegible] কায়রো সম্মেলনের ঘোষণার কথা স্বতঃই মনে না পড়িয়া পারে [illegible]

কায়রো সম্মেলনে এই মর্ম্মে ঘোষণা করা হয় যে, "All territories which Japan has stolen from Chinese, such as Manchuria, Formosa and Pescadores, shall be restored to the Republi[illegible] China." অর্থাৎ 'চীনের যে সকল রাজ্য, যথা 'মাঞ্চুরিয়া, ফর[illegible] এবং পেস্‌কাডোরিস'- জাপান চীনের নিকট হইতে কাড়িয়া লই[illegible] সেগুলি চীনা প্রজাতন্ত্রকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।' পটসডাম চুক্তি[illegible] কায়রো সম্মেলনের ঘোষণা অনুমোদন করা হয় এবং জাপানের আত্মসমর্পণের সর্ত্তাবলীতে এই পটসডাম চুক্তি কার্য্যকরী করার [illegible]

আছে। জাপানের আত্মসমর্পণের দুই দিন পূর্ব্বে চুংকিং গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ফরমোসা চীনেরই একটি প্রদেশ মাত্র। বস্তুতঃ জাপানের আত্মসমর্পণের পর হইতে জাতীয়তাবাদী চীন গবর্ণমেণ্ট ফরমোসাকে চীনের অংশ বলিয়াই গণ্য করিয়া আসিয়াছেন। আজ চীনে জাতীয়তাবাদী কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ফরমোসা চীনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং উহা দখল করিবার অধিকার কম্যুনিষ্ট চীনের নাই, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার না করিলেও গত জানুয়ারী মাসেও (১৯৫০) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান স্বীকার করিয়াছেন যে, ফরমোসা চীনের। চীনের গৃহযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গত ডিসেম্বর মাসের প্রস্তাব লঙ্ঘিত হইবার আশঙ্কায় তিনি কুয়োমিণ্টাং চীনের পক্ষ হইয়া সামরিক হস্তক্ষেপ করিতে বা সাহায্য কিম্বা পরামর্শ দিতে রাজী হন নাই। কিন্তু ইহার পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতিতে যে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ সময় এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান নাই। তবে কোরিয়ার সঙ্গে ফরমোসার নিবিড় সম্পর্ক বুঝিতে কষ্ট হয় না। জেনারেল ম্যাকআর্থার কোরিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও মার্কিণ দেশরক্ষা বিভাগ তেমন গুরুত্ব আরোপ করে নাই। কোরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মাস দুয়েক মাত্র পূর্ব্বে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকার তাঁবে না থাকিলে এশিয়ায় আমেরিকার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। ফিলিপাইন হইতে ফরমোসা হইয়া দক্ষিণ কোরিয়া পর্য্যন্ত রক্ষা-ব্যূহের গুরুত্বও বিশেষ ভাবেই দেখা দেয়। নতুবা জাপানকে রক্ষা করাও কঠিন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি কোরিয়া রক্ষা না করিতে পারে, তাহা হইলে প্রাচীতে তাহার মর্য্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হইবে, তেমনি কোরিয়া রক্ষা করাও অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে যদি এশিয়ার অন্যত্রও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্টদের হুমকীকে প্রতিহত না করিতে পারে। জেনারেল ম্যাকআর্থার যে ব্যাপক ভাবে কম্যুনিষ্ট নিরোধের পক্ষপাতী তাহা কাহারও অজানা নাই। তিনি যদি ফরমোসা রক্ষায় চিয়াং কাইশেককে, হংকং রক্ষায় বৃটিশকে এবং ইন্দোচীনে বাও দাইকে সমর্থন ও সাহায্য করার উপর জোর দেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। বস্তুতঃ ২রা আগষ্ট (১৯৫০) চিয়াং কাইশেক যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ফরমোসা রক্ষার জন্য চীন মার্কিণ সামরিক সহযোগিতা সম্পর্কে জেনারেল ম্যাকআর্থারের সঙ্গে তাঁহার এক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, এই চুক্তির ফলেই ত্রয়োদশ মার্কিণ বিমান বহরকে ফরমোসা রক্ষায় নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং মার্কিণ বিমান-ঘাঁটি প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের এই নীতির সহিত অন্যান্য উপনিবেশের মালিকদের যথেষ্ট মিল থাকিবে, ইহাও খুব স্বাভাবিক। সুদূর প্রাচ্যের ফরাসী সেনানায়ক জেনারেল কর্পেণ্টার এতদঞ্চলের রক্ষা ব্যবস্থার জন্য এবং বাও দাইকে নৌ ও বিমান সাহায্য দিবার জন্য সেনানায়কদের এক সম্মেলন হওয়া সমর্থন করিয়াছেন। ইহার পরেই সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ বিমান-বহরের অধিনায়ক স্যার ফ্রান্সিস হোগার্ট ইন্দোচীনের বিমান-ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং একটা বিরাট আয়োজন যে হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কি এই আয়োজনের উদ্দেশ্য?

চিয়াং কাইশেক গত ২রা আগষ্টের বিবৃতিতে বলিয়াছেন "It is our conviction that our struggle against Communist aggression will result in final victory." অর্থাৎ 'কম্যুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ করিব ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।' তাঁহার এই চূড়ান্ত জয়ের অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। তিনি আবার সমগ্র চীনের বাদশা হওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছেন। তিনি যদি আবার চীনের বাদশা হইতে পারেন তাহা হইলে চীনের উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইন্দোচীন সম্পর্কেও অনুরূপ কথাই বলিতে পারা যায়। কোরিয়া যুদ্ধের অজুহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবের আবরণে কম্যুনিজম নিরোধের ধূয়া তুলিয়া এশিয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই বিপুল আয়োজন। আসন্ন ফরমোসা যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকা হারুক আর জয়লাভই করুক, উভয়ের পরিণামই ফরমোসার যুদ্ধ।

গৃহযুদ্ধের ভূমিকা—

কোরিয়া কমিশনরের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাচনের ফলে দক্ষিণ কোরিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় কোরিয়া বিভাগ সম্পূর্ণ হইয়া গেল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া একমত হইয়া অখণ্ড কোরিয়া গঠন করিবে, সে সম্ভাবনাও আর রহিল না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোরিয়ার গুরুত্ব কতখানি, সে-সম্পর্কে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের মধ্যেও মতবিরোধ অনেক দিন পর্য্যন্তই ছিল। মার্কিণ দেশরক্ষা বিভাগ কোরিয়াকে রক্ষা করার উপর কোনই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহাদের মতে কোরিয়াকে রক্ষা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও বিপজ্জনক ব্যাপার। কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্র-বিভাগের ধারণা ছিল অন্য রকমের। তাঁহারা মনে করিতেন, কোরিয়াকে রক্ষা করিতে হইবে এবং উহার জন্য অনেক দিন পূর্ব্বেই পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল। কোরিয়া রক্ষা সম্পর্কে মার্কিণ রাষ্ট্র-বিভাগের সহিত জেনারেল ম্যাকআর্থার ছিলেন একমত। গত মে মাসে (১৯৫০) মার্কিণ কংগ্রেসের হাউস এপ্রোপ্রিয়েশনস্ সাব-কমিটির গোপন অধিবেশনে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৬ কোটি ডলার সাহায্য দানের প্রস্তাবের আলোচনার সময় কোরিয়া রক্ষা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হয়। এই অধিবেশনে দক্ষিণ কোরিয়ায় ই-সি-এ ডিরেক্টর ডাঃ ই, এ, জনসনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোরিয়ার গুরুত্ব ট্রিয়েস্ত বা বার্লিনের মত কি না এবং কোরিয়া ত্যাগ করিলেও অনুরূপ ফল হইবে কি না? উত্তরে ডাঃ জনসন বলিয়াছেন, "We have no standing of any kind in South East Asia, that is where we have lodgement and where we have help. I want to stress, with all the emphasis I can, that abandonment of Korea would have a tragic effect or American prestige in the orient, It would be catastropic."

[illegible]পূর্ব্ব এশিয়ায় এমন কোন স্থান নাই যেখানে আমরা [illegible]ইতে বা সাহায্য পাইতে পারি। আমার যতখানি সাধ্য [illegible]নি জোরের সহিত আমি বলিতেছি যে, কোরিয়া ছাড়িয়া [illegible] প্রাচ্যে মার্কিণ-মর্য্যাদা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। উহা [illegible]শকর হইবে।' গত ২১শে জুন (১৯৫০) কলামিষ্ট ([illegible]lumnist) রবার্ট এলেন উক্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। [illegible]: আমেরিকার দৃষ্টিতে দক্ষিণ কোরিয়ার চিরস্থায়ী স্বতন্ত্র [illegible] যে ক্রমেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সেদিন, গত ১২ই জুন তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের '[illegible]' পত্রিকা লিখিয়াছেন, "There is no need for the U. S to fail Korea for the South Korea can be made a sound political unit. There is every need for the U. S. to stay and succeed.......Failure in Korea would cost America priceless prestige and augur American failure elsewhere." অর্থাৎ 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাশ হইয়া কোরিয়াকে ত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত করা যাইতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের (দক্ষিণ কোরিয়ায়) থাকা এবং সাফল্য লাভ করা একান্তই প্রয়োজন। কোরিয়ায় ব্যর্থ হইলে আমেরিকার অমূল্য মর্য্যাদা নষ্ট হইবে এবং অন্যত্রও আমেরিকার ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা সূচনা করিবে।'

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করিতে যদি চায়ও, তাহা হইলেও কোরিয়ার জনগণ কি চায়, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। বরং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন সম্পর্কে একমত হইতে না পারায় কোরিয়ার জনগণই অখণ্ড কোরিয়া গঠনের দায়িত্ব লাভ করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় কি? ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া উত্তর কোরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণ করে ১৯৪৯ সালের জুন মাসে। সৈন্য অপসারণের পর কোরিয়ার জনগণ কি উপায়ে অখণ্ড কোরিয়া গঠন করিবে, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অর্থাৎ কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার কি রাশিয়া কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কাহারও থাকিতে পারে না। কোরিয়ার দুই অংশে প্রতিষ্ঠিত দুইটি গবর্ণমেণ্টের মধ্যে [illegible]নটিকে তাহারা অখণ্ড কোরিয়ার গবর্ণমেণ্টরূপে গ্রহণ করিবে, তাহা [illegible]ধারণ করিবার অধিকার কোরিয়ার জনসাধারণেরই।

[illegible]রিয়াকে খণ্ডিত করিয়া দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক্ গবর্ণমেণ্ট প্রতি[illegible] হওয়ার পর গৃহযুদ্ধের পথে অখণ্ড কোরিয়া গঠনের প্রয়া[illegible]লিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। কিছু দিন ধরি[illegible]ভয় কোরিয়ার সীমান্তে হাঙ্গামা খুব ঘন ঘনই চলিতেছিল। এই [illegible]ন্ত-সঙ্ঘর্ষ যে-কোন সময়ে আক্রমণের আকার গ্রহণ করিতে পা[illegible]রূপ আশঙ্কা অনেকের মনেই স্থান পাইয়াছিল। এই সকল [illegible]মান্ত-সঙ্ঘর্ষের জন্য উত্তর কোরিয়াই দায়ী, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা [illegible]ষ্টির প্রয়াসও চলিতেছিল। অধিকাংশ মার্কিণ সংবাদপত্রের হেড[illegible]নে এই সংঘর্ষকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি উত্তর কোরিয়ার আক্র[illegible]মিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ২৭শে জুলাই [illegible] 'নিউইয়র্ক [illegible]' একটি সংবাদে যে বিবরণ প্রেরণ করেন, তাহার তৃতীয় প্যারাগ্রাফ হইতে অনায়াসেই বুঝা যায়, আমেরিকার উদ্যোগে দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল। দক্ষিণ কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট অস্ত্রবলে অখণ্ড কোরিয়া গঠনে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ গত ৭ই অক্টোবর সিঙ্গম্যান রী মার্কিণ ইউনাইটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রশিক্ষার সাফল্য সম্পর্কে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া বাহিনী তিন দিনের মধ্যে উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংগিয়াং দখল করিতে সমর্থ। ৩১শে অক্টোবর তারিখে তিনি সশস্ত্র আক্রমণ দ্বারা উত্তর কোরিয়ার ঐক্যসাধনের কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গবর্ণমেণ্ট উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রাজী আছেন, কিন্তু প্রয়োজন শুধু মার্কিণ সাহায্যের। আমাদের যতটুকু মনে পড়িতেছে, একটি বক্তৃতায় তিনি এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, ওয়াশিংটন হইতে নির্দ্দেশ পাইলেই তাঁহার সৈন্যবাহিনী অভিযান আরম্ভ করিবে। এ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী অভিমত অবশ্য জানিবার উপায় নাই। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়াস্থিত মার্কিণ সামরিক মিশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (chief) জেনারেল রবার্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট একবার বলিয়াছিলেন যে, এক লক্ষ অফিসার ও সৈন্য সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়ার মার্শাল সাহায্য পরিচালক (Marshall Aid Adminstrator in South Korea) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'হাউস এপ্রোপ্রিয়েশনস্ কমিটি'র নিকট গত ১৯শে মে (১৯৫০) তারিখে বলিয়াছিলেন যে, মার্কিণ সামরিক মিশন দ্বারা শিক্ষিত এবং মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক লক্ষ সৈন্য যে-কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার দেশরক্ষা সচিব সিন সেন মো গত ৩১শে অক্টোবর (১৯৫০) সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করিবার মত শক্তিশালী (the South Korean troops are strong enough to act) হইয়াছে এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাহারা পিয়ংগিয়াং দখল করিতে পারিবে। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বেও দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় মহাসভায় ডুলেসের উপস্থিতিতে সীঙ্গম্যান রী বলিয়াছিলেন, "If we can not protect democracy in cold war, we shall win in a hot war." অর্থাৎ 'ঠাণ্ডা-যুদ্ধে আমরা যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে সশস্ত্র যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিব।' এই সকল দম্ভোক্তিতে আমেরিকার মনে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্ট হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না।

আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকা সম্প্রতি এক সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, "Most observers now note the 1,00,000 men South Korean Army as the best of its size in Asia.........And no one believes that the Russian trained North Korean Army could pull off a qu'ck successful invasion of the southe without heavy reinforcement." অর্থাৎ '[illegible]

পর্যবেক্ষকরাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এক লক্ষ সৈন্যবলের দক্ষিণ কোরিয়া সৈন্যবাহিনী এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম বাহিনী।......এ কথা কেহই বিশ্বাস করেন না যে, দক্ষিণ কোরিয়ার দ্রুত সাফল্যপূর্ণ অভিযান রাশিয়া কর্ত্তৃক শিক্ষিত উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রচুর সাহায্য ব্যতীত প্রতিরোধ করিতে পারিবে।' এই সকল মন্তব্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, অস্ত্রবলে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনে দক্ষিণ কোরিয়া উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। এই অবস্থায় দক্ষিণ কোরিয়া সীমান্ত বরাবর তিন স্থানে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া যে-অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাকে অত সহজে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

উত্তর কোরিয়াও ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনে উদ্যোগী হইবে, ইহাও খুব স্বাভাবিক। কোরিয়া কমিশনের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় যে নির্ব্বাচন হয়, তাহার প্রত্যুত্তরে উত্তর কোরিয়াও আগষ্ট মাসে (১৯৪৮) সমগ্র কোরিয়াব্যাপী এক নির্ব্বাচনের জন্য উদ্যোগী হয়। অন্ততঃ দক্ষিণ কোরিয়ায় এই নির্ব্বাচন যে গুপ্ত ভাবে (underground election) হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গুপ্ত নির্ব্বাচনে দক্ষিণ কোরিয়ার শতকরা ৭৭ জন অধিবাসী ভোট দিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় একটা বিদ্রোহ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এই গুপ্ত নির্ব্বাচনের ফলের ভিত্তিতে উত্তর কোরিয়াই এই বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিয়াছিল। গত জুলাই মাসে (১৯৪৯) পিতৃভূমিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করা হইয়াছে, এই ঘোষণা করিয়া উত্তর কোরিয়া এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। এই ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট একটি নির্ব্বাচন কমিটি গঠন করে এবং এই কমিটি দাবী করে যে, উভয় কোরিয়ার গবর্ণমেণ্টকেই বাতিল করিয়া সমগ্র কোরিয়াব্যাপী নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবার এবং কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কাজ সম্পূর্ণ করিবার অধিকার তাহাদের আছে। এই কমিটি দক্ষিণ কোরিয়া গবর্ণমেণ্টকে 'জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক' (national traitor) বলিয়া অভিহিত করে এবং দক্ষিণ কোরিয়া হইতে মার্কিণ সামরিক উপদেষ্টাদিগকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়া কমিটিকে বহিষ্কৃত করিবার নির্দ্দেশ দেয়। কার্য্যতঃ এই নির্দ্দেশ অর্থহীন হইলেও ডাঃ অনুপ সিং কোরিয়া কমিটির পক্ষে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই নির্ব্বাচন কমিটি তাহা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়। এই কমিটি কোরিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য অষ্ট্রেলিয়াকে 'A British slave sold to the United States' অর্থাৎ 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বিক্রীত বৃটিশ ক্রীতদাস' বলিয়া গালি দিতেও ত্রুটি করে নাই। কোরিয়া কমিটির অপর সদস্য ভারত সম্পর্কে এই কমিটি বলিয়াছিল, "We do not know why India sends a delegate to unify us when it has been unable to keep its own country united." অর্থাৎ 'ভারত নিজের দেশকেই ঐক্যবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। সে আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।' উত্তর কোরিয়া হইতে রেডিও-যোগে রী গবর্ণমেণ্টকে উৎখাত করিবার জন্য দক্ষিণ কোরিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচারকার্য্যও যে চালান হয় নাই, তাহাও নয়।

গত ১৬ই জুন সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পিতৃভূমি ফ্রন্টের এক অধিবেশনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার দুইদিন পরে উত্তর কোরিয়ার জনগণের পরিষদের (North Korean People's Assembly) প্রেসিডিয়াম উক্ত প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করিয়া 'বিশ্বাসঘাতক সীজম্যান রী-চক্রকে' গ্রেফতার করিবার এবং দক্ষিণ কোরিয়া হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমিশনকে অপসারিত করিবার দাবী করে। কোরিয়া কমিশন উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখার নিকটেই উত্তর কোরিয়ার তিন জন প্রতিনিধির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং ঐক্য-কোরিয়া গঠনের জন্য কোরিয়া-ব্যাপী নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোরিয়া কমিশন তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন। উক্ত প্রতিনিধিত্রয় না কি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐক্য কোরিয়া গঠনের প্রস্তাব লইয়াই দক্ষিণ কোরিয়ায় আসিতেছিলেন। সীমান্ত অতিক্রম করিবার পর দক্ষিণ কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দুই জনকে গ্রেফ্তার করেন। সুতরাং উভয় কোরিয়াই যে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোরিয়ার বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধ তাহারই অনিবার্য্য পরিণতি। কম্যুনিষ্ট শাসনই ভাল, না, রী গবর্ণমেণ্টের শাসনই ভাল, তাহা নির্দ্ধারণ করা গৃহযুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কম্যুনিষ্ট-শাসন পছন্দ না করিতে পারি। কিন্তু কোরিয়ার দুই গবর্ণমেণ্টের কোন্ গবর্ণমেণ্ট জনগণের আস্থাভাজন তাহা নির্ণয় করাই গৃহযুদ্ধের উদ্দেশ্য। অপর কোন রাষ্ট্র এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেই তাহা নির্ভুল ভাবে নির্ণীত হওয়া সম্ভব। অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে, এমন কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষেও কোন্ গবর্ণমেণ্ট কোরিয়ার জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় অপর কোন রাষ্ট্র গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে যে-গবর্ণমেণ্ট জনগণের আস্থা-ভাজন নহে, তাহাকেই সাহায্য করিবার গুরুতর ভ্রম হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে কোরিয়ার জনগণ যে-গবর্ণমেণ্ট চায় না, তাহাকেই সাহায্য করা হইতেছে কি না, তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে?

কোরিয়া যুদ্ধের ভবিষ্যৎ—

আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় যুদ্ধ অত্যন্ত [illegible] সঙ্কটময় অবস্থার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই [illegible] যখন ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবে তখন এই সঙ্কটের [illegible] কোন্ আকার ধারণ করিবে তাহা অনুমান করা সম্ভব [illegible]। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি দক্ষিণ কো[illegible] পক্ষে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইত, তাহা হইলে কো[illegible] গৃহযুদ্ধ অনেক দিন পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু [illegible] কোরিয়া যুদ্ধের পরিণাম অনুমান করা সত্যই কঠিন। নি[illegible] পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, ফ্র[illegible] প্রভৃতি দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দিতেছে। আমরা কিন্তু [illegible]

দিতেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেই। ক্ষুদ্র উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের বিপুল সামরিক শক্তির সমাবেশ করা হইয়াছে। তথাপি যুদ্ধের গতি এখনও উত্তর কোরিয়ার অনুকূলেই চলিতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই দখল করিতে পারিয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই কোরিয়া যুদ্ধের গতি বিশেষ আগ্রহ সহকারেই লক্ষ্য করিতেছেন। কাজেই সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

গত ২০শে জুলাই জেনারেল ম্যাকআর্থার যে ইস্তাহার প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "The North Korean invading forces have missed their chance of victory," অর্থাৎ 'উত্তর কোরিয়ার আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী তাহাদের বিজয় লাভের সম্ভাবনা হারাইয়া ফেলিয়াছে।' কথাগুলি যে খুবই আশাবাদপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের গতি তাঁহার এই আশাবাদ সমর্থন করে না। ৩০শে জুন (১৯৫০) তারিখে উত্তর কোরিয়া হান নদী অতিক্রম করে। ১লা জুলাই ওসান উত্তর কোরিয়ার হস্তচ্যুত হইলেও ৪ঠা জুলাই তাহারা পুনরায় ওসান দখল করিয়াও আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়। ৬ই জুলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় রক্ষাব্যূহে পশ্চাৎ-অপসরণ করে। ১১ই জুলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কুম নদীর দক্ষিণ তীরে 'আর পশ্চাৎ-অপসরণ না করার রক্ষাব্যূহ' (no retreat line) গঠন করে। কিন্তু উত্তর কোরিয়া ১৪ই জুলাই তারিখেই কুম নদী পার হয়। তায়েজন রক্ষা করিবার জন্ম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র খুব বড় যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তায়েজন রক্ষা করিতে পারে নাই। তায়েজনের পতন হয় ২০শে জুলাই। ২২শে জুলাই মার্কিণ সৈন্য ইয়ংডক পুনর্দখল করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরের দিনই উত্তর কোরিয়ার উহা আবার দখল করে। বস্তুতঃ ২৮শে জুলাই তারিখেই কোরিয়ার যুদ্ধ এক সংকট অবস্থায় উপনীত হয়। অতি দ্রুত যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য উত্তর কোরিয়া বাহিনী তৎপর হইয়া উঠে। দক্ষিণ কোরিয়া ক্ষুদ্র ত্রিভূজাকৃতি ভূভাগ মাত্র মার্কিণ বাহিনীর দখলে। উত্তরে উত্তর কোরিয়া বাহিনী পোহনের দিকে, মধ্যভাগে তায়েগুর দিকে এবং দক্ষিণে মাসানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ৩০শে জুলাই তারিখে … চিনজু অধিকার করায় পুসানের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। বস্তুতঃ ৩রা আগষ্ট তাহারা পুসান হইতে মাত্র ৪১ মাইল দূরে আসিয়া পড়ে। এই সময় হইতে উত্তর কোরিয়া বাহিনীর অগ্রগতি অনেকটা মন্থর হইয়া পড়ে। ৬ই আগষ্ট উত্তর কোরিয়া বাহিনী নাকটং নদী অতিক্রম করে এবং তায়েগুর জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই নাকটং নদীই শেষ প্রাকৃতিক বাধা ছিল। ১২ই আগষ্ট তারিখে উত্তর কোরিয়া বাহিনী পোহান দখল করি… বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোরিয়া যুদ্ধের সঙ্কট… সংগ্রাম যে নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সংগ্রাম কোথায় হইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করি… পূর্ব্বে উত্তর কোরিয়া বাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সামরিক সংবাদদাতা মিঃ … সি মুলার গত ৮ই জুলাই (১৯৫০) তারিখে লিখিয়াছেন যে, 'কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকা যে হারিতেছে, তাহা নয়; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কম্যুনিষ্টদিগকে হারাইতে না পারায় সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকার মুখরক্ষা হইতেছে না। তিনি মনে করেন, পার্ল হারবারের পরে আমেরিকার যে-অবস্থা হইয়াছিল, কোরিয়াতে আমেরিকার অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। কোরিয়ানরা জাপানীদের মত একাধিক সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছে না। যদিও তিনি মনে করেন, কোরিয়ান সৈন্যদের মধ্যে জাপানী সৈন্যের মত উন্মত্ততা নাই, তথাপি তাঁহাকে এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কোরিয়ান সৈন্যরা কৌশলপূর্ণ (crafty), সুশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মারাত্মক। উত্তর কোরিয়া দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিবে, এরূপ সম্ভাবনা আমেরিকার মনে স্থান পায় নাই। তা'ছাড়া, পার্ল হারবারের পরে শত্রুর বিরুদ্ধে আমেরিকানদের মনে যেরূপ মারাত্মক ঘৃণা জাগিয়াছিল, কোরিয়ার ক্ষেত্রে সেরূপ ঘৃণা জাগ্রত হয় নাই বলিয়াই মিঃ মুলার মনে করেন। জনৈক আর্মি অফিসার লেঃ কর্ণেল টমাস ম্যাকক্রুয়েড মনে করেন, কোরিয়ার ব্যাপার যত সহজ হইবে বলিয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন, তত সহজ যে নয় তাহা প্রায় সকলেই এখন বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার ধারণা, উত্তর কোরিয়াকে পরাজিত করিতে এক লক্ষ মার্কিণ সৈন্যের এক বৎসর লাগিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রায় চারি বৎসর তিনি কোরিয়ায় ছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা মূল্যবান। তিনি বলিয়াছিলেন, 'দক্ষিণ কোরিয়াবাসীরা আমাদিগকে ঘৃণা করে। অধিকাংশ শ্বেতকায়দিগকেই তাহারা ঘৃণা করে এবং আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ হইল, ধ্বংসাত্মক কার্য্য এবং গুপ্ত আক্রমণ (sabotage and ambushes)। এই বিপদ যে কিরূপ অতর্কিত হইতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "South Koreans will work in rice paddies during the day just as peaceful as you please, but at night they will form into gangs of maruders crippling equipment and killing every American they can." অর্থাৎ 'দিনের বেলায় দক্ষিণ কোরিয়াবাসীরা এমন শান্ত ভাবে ধানের ক্ষেত্রে কাজ করিবে যে, আপনি দেখিয়া খুসী হইবেন। কিন্তু রাত্রিতে তাহারা লুণ্ঠনকারীর দলে পরিণত হইয়া যন্ত্রপাতি নষ্ট করে এবং যে আমেরিকাবাসীকে পায় তাহাকেই হত্যা করে।' লেঃ কর্ণেল ম্যাকক্রুয়েড স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আমেরিকার প্রদত্ত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিতে দক্ষিণ কোরিয়াবাসীদের বিশ্বাস নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, "The South Koreans are not interested in fighting and quite a few of the are communists." অর্থাৎ 'দক্ষিণ কোরিয়াবাসীদের যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ নাই, তাহাদের অল্পসংখ্যকই কম্যুনিষ্ট।'

লেঃ কর্ণেল ম্যাকক্রুয়েডের উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে, দক্ষিণ কোরিয়াবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাহাদের বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে উত্তর কোরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু তিনি মনে করেন, আমেরিকাকে জয়লাভ করিতেই হইবে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন, "Korea is our last foothold on the Asiatic mainland. The Russians aim to kick us out of

Asia. We can not let them do that." অর্থাৎ 'এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে কোরিয়া আমাদের শেষ আশ্রয়-স্থল। রাশিয়া এশিয়া হইতে আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে চায়। আমরা তাহাতে রাজী হইতে পারি না।' কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপের প্রকৃত উদ্দেশ্য অতি সহজ ভাষাতেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

উত্তর কোরিয়া পোহান দখল করায় আর এক নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। পোহানের দিক হইতে পুসানের দিকে অগ্রসর হওয়া যদি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তায়েগু ও মাসান ও রক্ষায় যে মার্কিণ বাহিনী আক্রমণ চালাইবে, সামরিক সরবরাহ কেন্দ্র পুসানের সহিত তাহাদের সংযোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাহারা উত্তর কোরিয়া বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জয়লাভ করিতে হইলে উত্তর কোরিয়া বাহিনীর পুসান দখল প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই প্রতিরোধ সংগ্রাম পুসানে হইতে পারে না। কোরিয়ার শেষ সংগ্রাম পুসানে হইলে ডানকার্কের অবস্থা হওয়া রোধ করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কাজেই উত্তর কোরিয়া বাহিনী পোহান হইতে আর যাহাতে অগ্রসর হইতে না পারে এবং মাসান ও তায়েগু যাহাতে দখল করিতে না পারে, তাহার জন্য প্রবল সংগ্রাম করিতে হইবে। কাজেই দক্ষিণ কোরিয়ার অতি সামান্য অংশই দখল করা বাকী রহিয়াছে, তাহা হইলেও এই সামান্য অংশ দখল করিতে উত্তর কোরিয়াকে যেমন সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে, তেমনি উত্তর কোরিয়া বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য মার্কিণ বাহিনীকেও করিতে হইবে সর্বশেষ কঠোর সংগ্রাম।

উত্তর কোরিয়া বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিয়া মার্কিণ বাহিনী যদি তাহাদিগকে পিছু হটাইতে পারে, তাহা হইলে কোরিয়ার যুদ্ধে নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইবে। এই অবস্থায় উত্তর কোরিয়া বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্ষান্ত হইবে না এবং সমগ্র কোরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলে চলিয়া যাইবে। চীনে এবং রাশিয়ায় উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

কোরিয়ার যুদ্ধে ডানকার্ক যদি না-ও হয়, তাহা হইলেও মার্কিণ বাহিনীর পিছু হটিয়া সমুদ্রে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতে পারে. ইহা অসম্ভব কিছুই নয়। যদি এরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে আমেরিকা কোরিয়ার আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে, তাহা মনে করা অসঙ্গত। আবার কোরিয়ায় অবতরণ করা দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্যের ফ্রান্সে অবতরণ করা অপেক্ষাও অনেক কঠিন ব্যাপার হইতে পারে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে তাহার নৌবহর দ্বারা কোরিয়ার উপকূল অবরোধ করিয়া রাখিবে, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অবরোধ চলিতে পারে না। আমেরিকাকে কোরিয়াতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবেই। ইহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কোরিয়ার উপকূলবর্ত্তী বন্দর এবং সহরগুলিতে ব্যাপক ভাবে বোমা বর্ষণ করিতে হইবে। কোরিয়ার অভ্যন্তরস্থ সহর, সরবরাহ কেন্দ্র, চলাচল ব্যবস্থা, শিল্পকেন্দ্রগুলিতেও যে ব্যাপক বোমা বর্ষণ চলিবে, তাহাতেও বোধ হয় সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিক্রিয়ায় উত্তর কোরিয়াও—কার্য্যতঃ অখণ্ড কোরিয়াও যে উপকূল-অবরোধকারী মার্কিণ নৌবহর এবং জাপানস্থিত মার্কিণ ঘাঁটিগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিতে পারে, এই আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নহে। এইরূপ অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় পরমাণু বোমা ব্যবহার করিবে কি না, এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে।

পরমাণু বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে নৈতিক যুক্তি অবশ্যই আছে; যুদ্ধে জয়লাভের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া নৈতিক যুক্তি যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা কোন দিনই জয়লাভ করিতে পারে না। প্রাক্তন মার্কিণ নৌ-অফিসার মিঃ হ্যানসন বলডুইন পরমাণু বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে শুধু নৈতিক যুক্তিই দেন নাই, রাজনৈতিক, মনস্তত্ত্বিক এবং সামরিক যুক্তিও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোরিয়ায় ইতিমধ্যে পুলিশী কর্ম্ম-তৎপরতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। পরমাণু বোমা ব্যবহারের ফলে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। তা ছাড়া পরমাণু বোমার ব্যবহার মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়া সমস্ত কোরিয়াবাসীকে অধিকতর সংহত করিয়া তুলিবে এবং এখনও এশিয়ায় যাহারা আমেরিকার বন্ধু আছে তাহারাও বিরূপ হইয়া উঠিবে। সামরিক দিক হইতে তিনি বলিয়াছেন যে, আমেরিকার পরমাণু বোমার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ উত্তর কোরিয়ায় এমন কোন শিল্পকেন্দ্র বা সহর নাই, যাহা পরমাণু বোমা বর্ষিত হইবার উপযুক্ত। তৃতীয়তঃ সামরিক দিক হইতে পরমাণু বোমা কার্য্যকরী হইবে না, উত্তর কোরিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবে না। সর্ব্বোপরি পরমাণু বোমা আর আমেরিকার একচেটিয়া নয়। রাশিয়ার ৫টি হইতে ২০টি পরমাণু বোমা আছে। সিনেটর ম্যাকমান কি কোরিয়ার বিরুদ্ধে, কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহারের বিরোধী। ফ্রান্সিস বল্টন প্রতিনিধি পরিষদে বলিয়াছেন, "শুধু কোরিয়াবাসীকে হত্যা করিবার জন্য পরমাণু বোমা ব্যবহার করিলে প্রাচীতে এই ধারণা সৃষ্টি হইবে যে, আমরা প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্যবাসীদের বিরোধী।" কোরিয়ায় পরমাণু বোমা ব্যবহৃত হইবে এরূপ মনে করিবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একবার যদি আমেরিকা কোরিয়া হইতে বহিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে পুনঃ কোরিয়া দখল করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে কোরিয়ায় যে বিপুল পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

দক্ষিণ কোরিয়া দখল শেষ হইলেই কোরিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবে। আমেরিকা তথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে হয় কোরিয়াকে পুনঃ বিভক্ত করিবার জন্য, না হয় সমগ্র কোরিয়া দখল করিবার জন্য কোরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে এই সংগ্রাম চলিলেও এশিয়াবাসীর দৃষ্টিতে উহা সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। তা ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার যে-অংশই উত্তর কোরিয়া দখল করিতেছে সেই অংশেই তাহারা ভূমি-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতেছে। জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইতেছে। জনসাধারণ আর রী গবর্ণমেণ্ট ফিরিয়া পাইতে চাহিবে না। কাজেই সমগ্র কোরিয়াকে এক ধ্বংসাবশেষে পরিণত না করিয়া আমেরিকা উহা দখল করিতে পারিবে কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

দৈনন্দিন
প্রয়োজনে...
Laiju
CASTOR OIL
মলয়
ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী নিজগুণে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে; তাই সর্বদেশে, সর্বকালে সকল বয়সের নরনারীর সৌন্দর্য-চর্চায় ক্যালকেমিকোর প্রসাধনী অপরিহার্য
মলয় চন্দন সাবান
ক্যাষ্টরল সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার
য়ুডিকোলন
লাইজু লাইমক্রীম গ্লিসারিণ

উদ্বাস্তু ও দিল্লী-চুক্তি

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের লইয়া গবর্ণমেণ্টের হৃদয়হীন ছিনিমিনি খেলার ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। আশ্রয়-শিবিরের সংখ্যা এবং সাহায্য কোনটাই পর্য্যাপ্ত নহে। দিনের পর দিন কত নরনারী শিশু শিয়ালদহ ষ্টেশনে পড়িয়া দিন কাটাইতেছে, তাহার হিসাব নাই। কত শিশু খাদ্যাভাবে শুকাইয়া যাইতেছে, কত রোগী পথ্যাভাবে অকালমৃত্যু বরণ করিতেছে, যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের কি শোচনীয় অবস্থা, শিয়ালদহ ষ্টেশনে একবার যাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে! ভারতের স্বাধীনতার অর্থ কি এই? কংগ্রেস বৃহৎ-নেতৃত্ব এবং অন্যান্য দলীয় নেতারা পশ্চিম-বাঙ্গালার উদ্বাস্তু-শিবিরে এবং অন্যত্র বাস্তুহারাদের প্রকৃত জীবন এবং দুঃখের পরিমাণ বহু বার বহু দিন ঘুরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কেবল পর্য্যবেক্ষণেই কি তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইয়া গেল? কেন্দ্রীয় সরকার হয়ত দিল্লীতে বসিয়া বাঙ্গালী বাস্তুহারাদের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইতেছেন না। পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানে যে অর্থ এবং শক্তি তাঁহারা নিয়োজিত করেন, তাহার একাংশও কি পূর্ব্ব-পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের প্রতি নিয়োগ করা সম্ভব নহে? সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় পাকিস্তান ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উদ্বাস্তুদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। সাংবাদিকদের তিনি দিল্লী-চুক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন নাই। না বলিবার কারণ আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু অন্য ভাবে ঘুরাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, যদি সব কিছুই সন্তোষজনক হইত, তাহা হইলে তিনি আর ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়কে অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেন না। উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যাহা কিছু করণীয়, সবই পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টকে করিতে হয়। সরকারী হিসাব মত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ লক্ষ উদ্বাস্তু আসিয়াছে। স্থান এবং অর্থ, কোন দিক দিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ইহার [illegible] ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। উদ্বাস্তুদের পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাহাদের ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টা করা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা ফিরিয়া যাইতেছে তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ তাহা হইলে উদ্বাস্তু-সমস্যা এত কঠিন আকার ধারণ করিত না। তিনি বলিয়াছেন,—"ইহা সহজেই অনুমেয় যে, গভর্ণমেণ্ট যত চেষ্টাই করুন না কেন, উদ্বাস্তুরা পূর্ব্ববঙ্গে নিজেদের গৃহে যে সকল সুবিধা পাইতেন, এখানে [illegible] স্বাভাবিক। তাঁহার উক্তি সমূহের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের সাহায্য দান ও পুনর্ব্বসতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারী মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে তাহারা কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু দিল্লী-চুক্তির সাফল্য প্রমাণ করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া প্রাণ ও মর্য্যাদা বিপন্ন করিতে নারাজ। উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধান করিবার সামর্থ্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের নাই। এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দিল্লী-চুক্তির সাফল্যে পঞ্চমুখ। তাঁহারা চাহেন, উদ্বাস্তুরা পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইয়া প্রমাণ করুক যে, চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কাজেই উদ্বাস্তুরা অনাহারে মরিবার ভয়ে পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতির কার্য্যে উপেক্ষা করা হইতেছে এইরূপ আশঙ্কা কি একেবারেই অমূলক?

যে সকল হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভারতে আসিয়াছে, তাহাদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থাই আমাদের বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা। ক্রমাগত আর্থিক সাহায্যে সরকার ও উদ্বাস্তুদের উভয়েরই ক্ষতি। সরকারের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে; উদ্বাস্তুদের আত্মসম্মান ও কাজ করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইবে। ইহারই মধ্যে তাহাদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শুধু যে উদ্বাস্তুদের মধ্যেই নৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহাই নহে, পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যেও উহা ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালীকে নৈতিক ও সামাজিক মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে হইলে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতির সুব্যবস্থা করা প্রথম কর্ত্তব্য। বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বসতি হইতে পারে, এইরূপ পর্য্যাপ্ত কৃষি-জমি ও শিল্প-ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে নাই। কাজেই উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সমগ্র ভারতকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন অর্থের ও বাসস্থানের। উদ্বাস্তুরা যে সকল সম্পত্তি পূর্ব্ববঙ্গে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার মূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার কম হইবে না। এই টাকা পাওয়া গেলে পুনর্ব্বসতির জন্য অর্থ-সমস্যা আর থাকিবে না। আর এত লোক যে পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে জন্য যদি পূর্ব্ব-পাকিস্তানের নিকট কিছু জমির দাবী পেশ করা যায়, তাহাও বিশেষ অন্যায় হইবে না। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তা, এবং সে দৃঢ়তা ভারত সরকারের নাই বলিয়াই আশঙ্কা হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু-সমস্যার প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি নাই। তাঁহাদের নীতির ফলে সমগ্র ভারতের দৃষ্টিতে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু-সমস্যা তেমন গুরুত্ব লাভ করে নাই এবং সেই জন্য তেমন সহানুভূতি এবং সাহায্যও পাওয়া যায় নাই।

স্বীকৃতি পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। তাঁহারা কেবল দিল্লী-চুক্তির জয়গান করিতেই ব্যস্ত। কিন্তু সত্য চিরকাল ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নহে। ভারতীয় পার্লামেণ্টে শ্রীযুক্ত কামাথের এক প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত জওহরলালের ন্যায় দিল্লী-চুক্তির সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া সমর্থককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে আজ নিরাপত্তার ভাব মোটেই নাই। তিনি ভাঙ্গিবেন তবু মচকাইবেন না। চুক্তির অসাফল্য স্বীকার না করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, নিরাপত্তা-বোধের অভাবের কারণ "সমস্যাটা অংশতঃ মনস্তাত্ত্বিক।" পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা যে আজও শঙ্কিত চিত্তে রহিয়াছেন, উদ্বাস্তু হিন্দুরা যে পশ্চিমবঙ্গে অশেষ কষ্টভোগ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানে নিজেদের গৃহে ফিরিবার ভরসা পান না, তাহার কারণ কেবল অতীত অত্যাচারের বীভৎস স্মৃতিই নহে, বর্ত্তমানের অত্যাচারও বটে। পণ্ডিত নেহরু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, উদ্বাস্তুরা ভারত সরকারের কাছে চুরি, ডাকাতি ও নারী-ধর্ষণের বহু ঘটনার কথা জানাইয়াছেন। দিল্লীর চুক্তির পর নেতৃবৃন্দের প্ররোচনায় যে সব হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা চুরি, ডাকাতি, নারী-ধর্ষণ ইত্যাদি বহু অভিযোগ ভারত সরকারের নিকট হাজির করিয়াছেন। সেগুলির উত্তরে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,—"এ সব অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন; আমরা এই অভিযোগগুলি পাকিস্তান সরকারের কাছে পাঠাইয়াছি।" যাঁহারা প্রমাণিত সত্যকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন, পূর্ব্ববঙ্গের নারীহরণের ঘটনার কথা বেমালুম অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না, পূর্ব্ববঙ্গে "স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করিতেছে" বলিয়া নির্লজ্জ ভাবে বিবৃতি ছাড়েন, তাঁহারা হিন্দু-গৃহে চুরি, ডাকাতি ও নারী-ধর্ষণের কথা স্বীকার করিবেন বলিয়া আশা করা বাতুলতা নহে কি? মোট কথা, শরিয়ৎ-শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুরা কিছুতেই নিরাপদে থাকিতে পারে না, কোন চুক্তিই তাহাদের জীবন ও সম্ভ্রম নিরাপদ করিতে পারে না। এই সরল সত্য স্বীকার করিয়া যদি সরকারী কর্ণধারেরা নীতি পরিবর্ত্তন করিতে অগ্রসর না হন, তবে কেবল পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদেরই নহে, ভারতের ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি আছে।

নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের মনে পাকিস্তান সম্বন্ধে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনা। হিন্দুরা যাহাতে সেখানে গিয়া নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে মান-সম্ভ্রম লইয়া বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। ইহার একাংশও চুক্তির দ্বারা সম্ভব হয় নাই। তবুও সরকারী কর্ত্তারা সাফল্য প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে বহুসংখ্যক হিন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গে বহুসংখ্যক মুসলমান কেন যে বাস করিতে পারিবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমরা যদি ঠিক মত আমাদের কর্ত্তব্য পালন করি, তবে অপরের কর্ত্তব্য পালনের সম্ভাবনা শুধু যে বাড়িবে এমন নহে, তাহাদের কাছ হইতে আমরা কর্ত্তব্য আদায় করিয়া লইতে পারিব। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগান যায়; কিন্তু যে জাগিয়া ঘুমের ভাণ করে, তাহাকে জাগান অসম্ভব। পণ্ডিত নেহরু শুধু আত্মপ্রতারণাই করেন নাই, নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও জিদ বজায় রাখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ হিন্দুর স্বার্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন। তিনি বীর-বিক্রমে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার গভর্ণমেণ্ট যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব তাঁহারা স্পর্শ করিবেন না। এটা না কি তাঁহাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি হরেক রকমের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। পাঞ্জাবে লোক-বিনিময়ের প্রস্তাবে নেহরু গভর্ণমেণ্ট রাজী হন নাই, কিন্তু লোক-বিনিময় তাঁহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। নেহরু গভর্ণমেণ্টের নীতির ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের লোক-বিনিময় হইবে না বটে, কিন্তু একতরফা ভাবে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় সমস্ত হিন্দুই চলিয়া আসিতে বাধ্য হইবেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কংগ্রেস বৃহৎ-নেতৃত্বের ব্যাপার-ব্যবহার দেখিয়া যদি মনে হয় যে, বাঙ্গালীকে ধ্বংস করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তবে তাহা কি অন্যায় হইবে?

বাঙ্গালার পরিস্থিতি লইয়া ভারতীয় পার্লামেণ্টে বিতর্ক-প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লী-চুক্তির ব্যর্থতার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াও শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও এবং শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের চুক্তির সাফল্যের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিতে পারেন নাই। লোকে কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। ইঁহারা পণ্ডিতজীকেও হার মানাইয়াছেন। উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দ্দশার বর্ণনাকে শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও "কাহিনী" বলিয়া অভিহিত করিয়া জনাব লিয়াকৎআলি খাঁকেও লজ্জা দিয়াছেন। ইনিই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী। ভারতের ইহাপেক্ষা দুর্ভাগ্য চিন্তা করা যায় না। শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ সহায় বলিয়াছেন, পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিল-পত্র হইতে পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের কয় জন তাহাদের সম্পত্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, তাহা জানা যায় না। শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু গুপ্ত ছয় সপ্তাহ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়াও পশ্চিমবঙ্গ হইতে পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছে, এমন একটি পরিবারেরও সাক্ষাৎ পান নাই। পাকিস্তান যে ভারতের সহিত চুক্তির সর্ত্ত প্রতিপালন করে নাই, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা যে নিরাপদে, শান্তিতে ও সম্মানের সহিত বাস করিতে পারিবে, সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৮ই এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে ৬৫৭টি ডাকাতি, ২১১টি গৃহদাহ, ১১৪টি অনধিকার প্রবেশ, ১২১টি নারীহরণ ও নারী-ধর্ষণ, ৭০টি নরহত্যা, ৮৩টি গুরুতর জখমের ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ঘটিলে কি হইবে, ইহাতেও দিল্লী-চুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার মনে করিতে পারেন নাই।

ভারতীয় রাষ্ট্রের লৌকিকত্ব যে ভারতের শাসকবর্গের কাছে উন্মত্ততায় পরিণত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত কামাথ শুধু তাহার কঠোর সমালোচনাই করেন নাই, অধিবাসী-বিনিময়ের দ্বারা যে লৌকিক রাষ্ট্রের লৌকিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার অধিবাসী-বিনিময়ের পথে যে প্রবল বাধা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি

জানিতে পারিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শতকরা আশী জন মুসলমানই পাকিস্তানে যাইতে চাহে না। ভারতে মুসলমানরা পরম সুখে বাস করিতেছে। সরকারী বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত। কোন্ দুঃখে তাহারা ভারত ছাড়িয়া যাইতে চাহিবে? কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-নারীর মর্য্যাদা নষ্ট হইতে দেখিয়াও এক জন নারী (শ্রীমতী উমা নেহরু) যখন অধিবাসী-বিনিময়কে "ফ্যাণ্টাষ্টিক" বলিয়া অভিহিত করেন, তখন পাকিস্তানীদেরও লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়। তিনি মনে করেন যে, অধিবাসী-বিনিময় করিতে গেলে পাঞ্জাবের হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি হইবে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অধিবাসী-বিনিময়ের জন্য পাঞ্জাবে হাঙ্গামা হয় নাই, হাঙ্গামা হওয়ার জন্যই অধিবাসী-বিনিময় হইয়াছে। ভারত বিভাগের সময় অধিবাসী-বিনিময়ের প্রশ্নকে কংগ্রেসী নেতারা ধামা-চাপা দিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাঁহারা উদ্বাস্তু-সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। পাকিস্তানকে নিরবচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র করিবার নীতি পাকিস্তানী নেতারা নির্ভয়ে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন; এদিকে ভারতের লৌকিক রাষ্ট্র লৌকিকত্বের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভের কথা, বাঙ্গালার মেয়ে শ্রীমতী রেণুকা রায়ও কর্ত্তাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে যদি হিন্দুরা নিরাপদে বাস করিতে না পারে, তবে উহার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে দোষ দিয়া লাভ নাই। প্রধান মন্ত্রীর স্তুতি করিতে যাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নরনারীর বিপদের প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্য সত্যই বিস্ময়কর!

বিতর্ক-প্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত-পাকিস্তানের ঐক্যের কথা স্পষ্ট ভাবেই তুলিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর মতে ইহার তাৎপর্য্য যুদ্ধ। যুদ্ধের নামে তিনি শিহরিয়া উঠিতেছেন, অথচ এক মহাযুদ্ধের মধ্যে তিনিই আমাদের টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন। যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করিলেই সব সময় যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হয় না। ঘরের পাশে পাকিস্তান দিল্লী-চুক্তির পরও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ পূরা দমে চালাইতেছে। যে মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান অনুসারে পণ্ডিতজী ভারত বিভাগ মানিয়া লইয়া খণ্ডিত ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন, সেই প্ল্যানেরই তৃতীয় প্যারায় বলা হইয়াছে,—"এই প্ল্যানে এমন কিছুই নাই যাহা অখণ্ড ভারতের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনার পথে বাধাস্বরূপ হইবে।" প্ল্যান ঘোষণার পরেই পণ্ডিতজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"হয়ত এই পথেই (ভারত বিভাগের পথে) আমরা অন্য পথ অপেক্ষা অধিক দ্রুততার সহিত অখণ্ড ভারতে পৌঁছিব এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিব।" ১১ দিন পরে ১৪ই জুন ১৯৪৭ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ভারত বিভাগ স্বীকার করিয়া যে প্রস্তাব পাশ হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে,—"কংগ্রেস বরাবর বলিয়াছে, ভারতের অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতেই হইবে। ভূগোল—পর্ব্বতমালা এবং সমুদ্র, ভারতকে তাহার বর্ত্তমান রূপ দিয়াছে। কোন মানুষ তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না এবং তাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জ্জাতিক কারণে ভারতের অখণ্ডত্ব আরও বেশী প্রয়োজন। ভারতের যে চিত্র আমরা পূজা করিয়াছি, তাহা আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত থাকিবেই। এ, আই, সি সি'র আন্তরিক বিশ্বাস, বর্ত্তমান উত্তেজনা যখন কমিয়া যাইবে, ভারতের সমস্যা তখন উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হইবে এবং দুই জাতির মিথ্যা নীতি ভারতে সকলেই পরিত্যাগ করিবে।" আজ সেই মিথ্যা নীতির সব চেয়ে বড় ভক্ত পণ্ডিত নেহরু নিজে।

তিনি যুদ্ধ-বিরোধী, শান্তিকামী বলিয়া নিজের পরিচয় দেন কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার চেয়েও বেশী যুদ্ধ-বিরোধী, তাঁহার চেয়েও লক্ষ গুণ বেশী শান্তিকামী ছিলেন। কেবল বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, প্রাণ দিতেও উদ্যত হইতেন। জীবন বিপন্ন করিয়া নোয়াখালিতে তিনিই গিয়াছিলেন, পণ্ডিতজী যান নাই। সেই গান্ধীজীও বলিয়াছিলেন, "পাকিস্তান তাহার প্রমাণিত ভুল স্বীকার করিতে না চাহিলে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।" পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের জন্য ন্যায়-বিচারের ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের করণীয় কাজ, দয়া দান নহে। গান্ধীজীর ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালের বক্তৃতায় আছে,—"পাকিস্তানের নিকট হইতে সুবিচার পাওয়ার অন্য কোন উপায় যদি না থাকে, পাকিস্তান তাহার প্রমাণিত ভুল যদি কিছুতেই স্বীকার না করে এবং কেবলই যদি উহাকে ছোট করিয়া দেখাইতে চায়, তবে ভারত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে।"

পণ্ডিতজী এ কথা একবারও বলেন নাই যে, তিনি যুদ্ধ চান না। আমেরিকায় তিনি বলিয়া আসিয়াছেন, পৃথিবীর কোথাও কোন ক্ষুদ্র দেশের প্রতি যদি অন্যায় হয়, তবে যুদ্ধ করিতে হইবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলে উত্তর-কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তিনি সমর্থন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে তাহার মধ্যে জড়াইয়াছেন। সেদিনও পার্লামেণ্টে তিনি বলিয়াছেন, কোরিয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা চলিবে না। তবে কি দেশবাসী ইহাই বুঝিবে যে, পৃথিবীর যেখানেই যুদ্ধ হইবে ভারত "ন্যায়ের পক্ষে" যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, কিন্তু পাকিস্তানে যত হত্যা, যত অত্যাচার চলিতে থাকুক না কেন, আন্তর্জ্জাতিক আইনানুসারে প্রতিকারের ক্ষমতা থাকিলেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? যে গান্ধীজীর দোহাই পণ্ডিতজী এবং কংগ্রেসের বৃহৎ-নেতৃত্ব বিপদে পড়িলেই দিয়া থাকেন, তিনিও বার বার বলিয়াছেন, ক্লীব হইও না, বীরের অহিংসা যদি রাখিতে না পার তো হিংস হও, কিন্তু কাপুরুষ কখনও হইও না। তবু আমাদের মনে হয়, ভারতের এই নীতির কারণ কাপুরুষতা হয়ত নয়, ভিতরে আরও অনেক ব্যাপার আছে যাহা জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত। এই রহস্যভেদের ক্ষমতা আমাদের নাই।

রাষ্ট্রপতির বাণী

ভারতীয় পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বহু ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন, যাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেবল এইটুকু বুঝিয়াছি যে, কথার জাল বুনিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন,—"পৃথিবীর বুকে আবার যুদ্ধের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে।" কোরিয়ার যুদ্ধের ছায়া সুদূরে, কিন্তু দেশে যে দুর্ভিক্ষের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার কথা তিনি বলেন নাই। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে অনাহারে, কুখাদ্য আহারে বহু লোক মরিতেছে এবং মরিতে বসিয়াছে। এই দুই ছায়া পরস্পরের সম্পূরক। বাহির না

সামলাইলে ঘর ভাঙ্গিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেই যদি ঘরে আগুন লাগিয়া যায় তখন বাহির সামলাইয়া কোন ফল হইবে না। তখন পাতিয়ের বিশৃঙ্খলা সেই আগুনে ইন্ধনের কাজ করিবে। রাষ্ট্রপতি ঠিকই বলিয়াছেন,—"বিশ্বশান্তির পক্ষে যে নূতন বিঘ্ন দেখা দিয়াছে, তাহাতে সকল দেশই বিপন্ন। উহার দ্বারা আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামো দারুণ বিপর্য্যয়ের মুখে পড়িতে পারে।" এই প্রসঙ্গে তিনি দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সরকারী ব্যবস্থায় রোধ করিতে এবং সর্ব্বত্র সকল বিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে উপদেশ দেন।

আমরা দেশের উপর ঘনায়মান কৃষ্ণ মেঘরাশির কথাই বেশী ভাবি। ইংরেজী আমলে দেশের অর্থ শোষিত হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইত বটে, কিন্তু তখন অন্ততঃ একটা সুশাসনের ভাণ এবং প্রজাপালনের সভ্যজনোচিত যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ছিল। সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে এতটা দুর্নীতি ও কদাচার, দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় এতখানি বে-দরদী উপেক্ষা, জাতির উন্নতি ও গঠনের দিকে এতটা অরজনসুলভ অনাস্থা ও অবস্থা শোষক বৃটিশও দেখাইতে পারে নাই। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি আজ রাজ্যহীন, খেতাবধারী মাত্র। তাঁহার পিছনে সজ্ঘবদ্ধ দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী স্বার্থত্যাগীর দল নাই। আছে স্বার্থপরায়ণ চোরাকারবারী মুনাফাখোর ও ক্ষমতালিপ্সু পার্ষদের দল। সুতরাং কংগ্রেসের সভাপতি আজ গৌরবের পদ নহে। আর ভারতের রাষ্ট্রপতি, তাঁহাকে চলিতে হয় কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বের নির্দ্দেশানুসারে। অফিসিয়াল কংগ্রেসী দলের ক্ষমতালোলুপতা, দুর্নীতি এবং নানা হীন অপচেষ্টার ফলে কংগ্রেস আজ জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়াছে। তাই ভারতের রাষ্ট্রপতির বাণী আজ দেশবাসীর মনে কোনো সাড়াই তোলে না, কোন শ্রদ্ধাই জাগায় না।

সর্দ্দারজীর বাণী

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পার্লামেন্টে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন, কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নূতন যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতেও তাহারা হিংসার পথ ত্যাগ করিতে রাজী হয় নাই। তাহারা সহিংস উপায়ে গভর্ণমেন্টকে উচ্ছেদ করিতে চায়। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট এ ধরণের কোন চেষ্টাই বরদাস্ত করিবেন না, সর্ব্বশক্তি দিয়া ইহা দমন করিবেনই করিবেন। যে কোন গভর্ণমেন্টের পক্ষে এই উক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু গত তিন বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট যে পথে চলিয়াছেন, তাহাতে দেখা গিয়াছে, মুখে কম্যুনিষ্ট দমনের কথা বলিলেও কার্য্যতঃ বিরোধী দল মাত্রকেই পিষিয়া মারা তাঁহাদের লক্ষ্য। এমন কি, কোন কংগ্রেসকর্ম্মীও যদি সরকারী নীতির প্রকৃত সমালোচনা করেন, তবে তাঁহাকে জেলে যাইতে হয়। পার্লামেন্টে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বিলের আলোচনার সময় সর্দ্দার প্যাটেল দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে যে ভাবে বিরোধী পক্ষের উপর চোখ রাঙাইয়াছেন, তাহাতে এই ধরণের সন্দেহ হওয়া অন্যায় নহে।

আমরা স্বীকার করি, আইন ও শৃঙ্খলার যাহারা সত্যই বিঘ্ন ঘটাইবে, তাহাদের শাস্তি হওয়া উচিত। কম্যুনিষ্ট বা যে-ই হউক না কেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহাদের অপরাধ প্রমাণ করিতে হইবে। কর্ত্তারা কিন্তু এই প্রমাণের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে ব্যস্ত এবং এই জন্যই বিনা-বিচারে আটক আইনের মারফৎ বৃটিশ আমলের মত স্বৈরাচারী ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন। অথচ গদীতে বসিবার পূর্ব্বে এই আইনের বিরুদ্ধে ইঁহারাই প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। আজ শত শত লোককে বিনা-বিচারে আটক রাখিয়া শুধু জানাইয়া দিতেছেন যে, এই সব লোক না কি রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিবার সশস্ত্র আয়োজন করিতেছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গভর্ণমেন্ট শৃঙ্খলাভঙ্গকারী হিসাবে এ পর্য্যন্ত এমন অনেক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, যাহাদের পরে হাইকোর্ট নির্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। যদি ইহাদের বিনা-বিচারে আটক রাখা হইত, তবে নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণের কোন সুযোগই ইহারা পাইত না। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন,—"শুধু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইন ও শৃঙ্খলার কোন অর্থ হয় না। তাহার সঙ্গে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকা চাই।" আজ সে সকল কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

কেবল দমন-নীতি চালাইয়া কম্যুনিজম রোধ করা যায় না বরং জনসাধারণকে কম্যুনিজমের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি শেঠ ডালমিয়া এক সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে বুভুক্ষা-পীড়িত লক্ষ লক্ষ নরনারী ও তিলে-তিলে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের দল বিপ্লব করিবে। কিন্তু এ সতর্কবাণী সরকারী কর্ত্তাদের কানে পৌঁছাইতেছে কৈ? চীন, মালয়, কোরিয়ার ইতিহাস দেখিয়াও ইঁহাদের চক্ষু খুলিতেছে না।

পণ্ডিতজীর বাণী

কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইতে অস্বীকার করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন,—"আমি এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যত দিন আমি প্রধান মন্ত্রী আছি, তত দিন কংগ্রেস সভাপতির পদের জন্য নির্ব্বাচন-প্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে উচিত হইবে না।" কথাটা খুবই বুদ্ধিমানের মত হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতির পদের আর পূর্ব্ব জৌলুষ নাই। কংগ্রেস সভাপতির রাষ্ট্রপতি খেতাবটা পর্য্যন্ত বেহাত হইয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীর পদ ছাড়িয়া কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন কোন্ দুঃখে? মধ্যে মধ্যে তিনি যে পদত্যাগের হুমকী দেন, তাহা কেবল তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে হাতে রাখিবার জন্য। তাঁহারা জানেন, পণ্ডিতজী পদত্যাগ করিলে তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমতার আসনে আসীন থাকা আর সম্ভবপর হইবে না। পণ্ডিতজী যদি কখনও পদত্যাগ করেন, তাহা করিবেন ভারতীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য। কংগ্রেসের সভাপতি এক জন তাঁবেদার হইলেই বৃহৎ-নেতৃত্বের সুবিধা। সভাপতি অথবা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতার দৌড় কতটা, তাহা আমরা ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার আমলেই দেখিয়াছি। কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের সহিত কংগ্রেসের কি সম্পর্ক, আচার্য্য কৃপালনীর পদত্যাগেই তাহা প্রকট হইয়াছে।

স্বাধীনতার তিন বৎসরের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা হইতে জনসাধারণ ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে যে, বৃটিশ শাসন ও কংগ্রেসী শাসনের মধ্যে কোনই তফাৎ নাই। বরং বৃটিশ আমলের অপেক্ষা জনসাধারণের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কম্যুনিজম দমনের

ধুয়া তুলিয়া বিরোধী দলের গলা চাপিয়া ধরা হইয়াছে। কংগ্রেসের মূল নীতি পাকিস্তান-তোষণ। পাছে পাকিস্তান বিরক্ত হয়, এই ভয়ে অধিবাসী-বিনিময় অথবা উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতির কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। লৌকিক রাষ্ট্রের নামে তাঁহারা উৎফুল্ল, মত্ত। হিন্দু নামেই তাঁহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাঁহাদের গৃহীত নীতি ভারতকে পাকিস্তানের পথে ঠেলিয়া দিতেছে। তাঁহাদের অর্থ নৈতিক নীতির ফলে সাধারণ মানুষের বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই নীতি অনুসরণ করিতে হইলে তিলক, সুভাষ বোসের মত কংগ্রেস সভাপতি থাকিলে সুবিধা হইবে না, ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া জাতীয় সভাপতির প্রয়োজন।

মুন্সীজীর বাণী

কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী বলেন,—"দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান দেশের নারী সমাজের উপর নির্ভর করে। তাঁহারা যদি আমাদের সাহায্য করেন, তবে আমরা দেশকে রক্ষা করিতে পারিব।" তিনি উপদেশ দেন, সোমবারে চাউল প্রভৃতি রন্ধন না করিয়া শস্য-দিবস পালন করিতে। তিনি বোধ হয় দিল্লী, বোম্বাই ইত্যাদি দু'-চারটি সহরের খাদ্যাবস্থা এবং আর্থিক অবস্থা দেখিয়া এই অমূল্য বাণী দিয়াছেন। পশ্চিম-বাঙ্গালা, মাদ্রাজ এবং বিহারের বর্ত্তমান খাদ্যাবস্থা হইতে তিনি কি এই ধারণা করিয়াছেন যে, জনসাধারণ সপ্তাহে বাকী ছয় দিন নিয়মিত চাউল ও আটা পায়? সমস্যা কি কেবল এই সপ্তম দিবস সম্বন্ধে? পশ্চিম-বঙ্গের শতকরা ৯৫ জন সাধারণ লোক কোন-ক্রমে এক বেলা আধা-পেটা মাত্র আহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। তাহার মধ্যে আবার শতকরা অন্ততঃ ৩৫ জন কোন ক্রমে সপ্তাহে তিন দিন মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য আহার্য্য জোটাইতে পারে। সপ্তাহে প্রায় চারি দিন তাহারা না খাইয়া কাটায়। এই বন্দোবস্ত গত চারি-পাঁচ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। এত করিয়াও খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইয়াছে কি? "শস্য-দিবস" দিল্লী-বোম্বাইবাসীর নিকট মুখরোচক হইতে পারে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বিহারে তাহা উপহাসস্বরূপ নহে কি? গত কিছু কাল হইতে শাকসব্জীর মূল্য সের-প্রতি গড়পড়তা বারো হইতে চৌদ্দ আনায় ঠেকিয়াছে। সেই মূল্যে কালোবাজার হইতে এক সের চাউল অনায়াসে পাওয়া যায় এবং পরিবারবর্গ খাইয়া বাঁচিতে পারে। অর্থের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সরকারী গদীতে বসিয়া ক্ষুধিত দেশবাসীর সহিত এ ধরণের পরিহাস কেন?

পশ্চিম-বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র এবং বিহারের মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে। "অনাহারে এক জন লোককেও মরিতে দিব না"—কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ঘোষণা সত্ত্বেও বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গে বিশেষ করিয়া পূর্ণিয়া জেলায় ও উদ্বাস্তু শিবিরে অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। পর-পর তিন জন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যাবস্থার কোন উন্নতিই করিতে পারেন নাই। উপরন্তু মুন্সীজী এই সকল সত্য ঘটনার প্রতিবাদ করিয়া বিবৃতি ছাড়িয়াছেন যে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা একেবারেই ভিত্তি-হীন। ভারতের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইবার কোনই কারণ নাই। মাদ্রাজ সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন, সরকারের হাতে আর মাত্র ৫ সপ্তাহের চাউল আছে; অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, তিনেভেল্লী, মাদুরা, রামনাদ প্রভৃতি অঞ্চলে রেশন দোকানগুলি রেশন কার্ডের মালিকদেরও খাদ্য সরবরাহ করিতে পারে নাই। আসামে তো অনাহারে উদ্বাস্তুদের মৃত্যুর বহু সংবাদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গে রোজই দু'-চারিটা অনাহারে মৃত্যু ঘটিতেছে। বহু গ্রামাঞ্চলে চাউলের দর ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা হইয়া গিয়াছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এই যে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা অন্যায়, কারণ তাহাতে খাদ্য লইয়া চোরাকারবার ও মজুতদারী সুরু হইবে। ১৯৪৩ সালে বাঙ্গালার লীগ গভর্ণমেণ্টও ঠিক এই ধরণের নীতিই অনুসরণ করিয়াছিলেন; দেশে দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। পথে-ঘাটে অনাহারে লোক মরিতে আরম্ভ করিলে বলিয়াছিলেন, মৃত্যুর কারণ অনাহার নহে, আমাশয়। পূর্ণিয়ার মৃত্যু ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তাই আমাদের আশঙ্কা হয়, আবার কি তেতাল্লিশের মন্বন্তর আসিবে?

গোপীনাথ বড়দলৈ

২০শে শ্রাবণ রাত্রি ২টা ৪০ মিনিটের সময় আসামের প্রধান মন্ত্রী জনপ্রিয় নেতা শ্রীগোপীনাথ বড়দলৈ গৌহাটীতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৯১ সালের ৭ই জুন তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ এবং ল' ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত গৌহাটীতে আইন ব্যবসা করেন। এই বৎসর তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন। ১৯২৪ সালে গৌহাটী লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৪ হইতে '৩৬ সাল পর্য্যন্ত গৌহাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসী দলের নেতা হিসাবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস আইন সভা বর্জ্জন করিলে তিনিও পদত্যাগ করেন। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করার জন্য ১৯৪০ সালে এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন।

তাঁহার মৃত্যুতে এক জন একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবীর জীবনাবসান হইল। তাঁহার শিক্ষা বাঙ্গালা দেশেই। আসামে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন সত্ত্বেও তিনি নিজে কখন প্রাদেশিকতার পরিচয় দেন নাই। চিরকাল বাঙ্গালী ও আসামীদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, চার পুত্র, পাঁচ কন্যা, ও দুই ভ্রাতা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

বর্ষা

(অমল মিত্রের সৌজন্যে)

(একটি দুষ্প্রাপ্য রাজপুতানী বুন্দি চিত্র)

২৯শ বর্ষ, ভাদ্র ঃ ১৩৫৭] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত [১ম খণ্ড ঃ ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরে রতি মতি তত বাড়বে। পূর্ব দিকে যত এগুবে, পশ্চিম দিক তত পিছিয়ে পড়বে। কাশীর দিকে যত যাবে, কল্‌কাতার বাড়ী ততই তফাৎ হয়ে পড়বে।

যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না,—দেহবুদ্ধি না গেলে আত্মজ্ঞান হয় না।

বিষয়াসক্তি গেলে, আত্মা আলাদা,—দেহ আলাদা—এ বোধ জন্মায়। নারকেলের ভিতরের জল না শুকালে, কেটে শাঁস আলাদা ও মালা আলাদা করা ভারি কঠিন হয়ে পড়ে—হয় না। কিন্তু জল শুকিয়ে গেলে, আপনি শাঁস আলাদা হয়ে যায়। নাড়া দিলে নড়্-নড়্ শব্দ হয়—তাকে খোড়ো নারকেল বলে।

যখন দেখ্‌বে, ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু পুলক ও রোমাঞ্চ হয়, তখন জানবে যে, কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে।

শুক্‌নো দেশেলাই একটা ঘস্‌লেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, যদি ভিজে হয় পঞ্চাশটা ঘস্‌লেও জ্বলে না, মন যদি বিষয়-রসে রোসে থাকে, হাজার চেষ্টা কর, সে মনে ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। বিষয়-রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরলাভ হয়।

বাসনার বশে মন সংসারে নোয়ান রয়েছে, বাসনা না থাকলে মনের সহজেই ঊর্দ্ধগতি হয়।

বিষয়-রস শুকোবার একমাত্র উপায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকা। তাঁর চিন্তা যত করবে, ততই সংসারের আসক্তি সব কমে আসবে, নিজের দেহ-সুখে নজর থাকবে না, পরস্ত্রীকে মা বোলে জ্ঞান হবে, স্বদারাকে ধর্ম্মের সহায়—বন্ধু বলে বোধ হবে, পশু-ভাব চলে গিয়ে দেব-ভাব আসবে। সংসারে অনাসক্ত জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।

সংসার ত্যাগ করতে কেন হবে! আপনার মনে ত্যাগ করো—সংসারে অনাসক্ত হয়ে ভগবানকে ডাকো, তাঁকে পাবে।

কর্ম্মফল সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর, নিজের কোনও ফল কামনা করতে নাই।

এক জন সমস্ত দিন আকের ক্ষেতে জল সেঁচে দিয়ে, শেষে দেখলে যে, ক্ষেতে এক ফোঁটাও জল নেই, কতকগুলো 'ঘোগে' (গর্ত্তে) সব জল ঢুকে গেছে। বিষয়-বাসনা—আসক্তি রেখে সাধন-ভজন করাও তদ্রূপ—তাতে কোনও ফলই হয় না।

জালার নীচে যদি একটু ছ্যাঁদা থাকে তবে সব জল পড়ে যায়, সাধকের ভিতরে একটু বিষয়াসক্তি থাকলে সব সাধনা বিফল হয়।

বাসনার লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না—সুতোয় একটু রোঁ থাকতে ছুঁচের ভিতর যায় না।

বাসনা থাকতে ঈশ্বর লাভ হয় না, অথচ সকল বাসনা পূর্ণ হবার উপায়ও নাই; তাই কতক ভোগ ক'রে এবং কতক বিচারে মিটিয়ে নিয়ে বাসনা ত্যাগ করবে।

একটা চিল একটা মাছ মুখে ক'রে উড়ে যাচ্ছে দেখে, শত শত কাক চিল তাকে তাড়া করলে। সে যে দিকে যায়, সবগুলোই সেই দিকে যায়। শেষে সে বিরক্ত হয়ে মাছটাকে মুখ থেকে ফেলে দিলে, সব কাক চিল সেই মাছের দিকে ছুটলো। তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তি ভোগ করতে লাগলো। যতক্ষণ সঙ্গে মাছ (বাসনা-বিষয়াসক্তি) ততক্ষণই ছুটোছুটি—অশান্তি। বাসনা গেলেই নিশ্চিন্ত ও শান্ত হওয়া যায়।

সংসারী জীবের উপায় মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করা আর মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাস ক'রে ঈশ্বর চিন্তা করা এবং তাঁর কাছে ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা করা।

সংসার করছো, এতে দোষ নাই; তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, তা যদি না রাখো, তবে সংসারে জড়িয়ে পড়বে। এক হাতে সংসারের কাজ করো, আর এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকো, সংসারের কাজ শেষ হলে, দুই হাতে তাঁকে ধরবে।

সংসার-যাত্রার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু কাজ করবে। বেশী কাজ জড়াবে না। আর নির্জ্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যেন সেই কাজগুলি নিষ্কাম ভাবে হয়। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে।

কুমীর জলে ভাসতে ভালবাসে, কিন্তু লোকের ভয়ে পারে না, তবু সুবিধামত হুস্-হুস্ ক'রে ভেসে উঠে। সংসারী লোক যদিও সংসারের কাজে থেকে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন করতে পারে না, কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের ঈশ্বরচিন্তা করা, হরিনাম করা কর্ত্তব্য।

বাউল দু'হাতে দু'টো বাজনা বাজায়, আর মুখে গান করে। সংসারী! তুমি হাতে কাজ কর, আর মনে ঈশ্বরকে ডাকো।

ভানুসিংহের পদাবলী

শ্রীকালিদাস নাগ

রবীন্দ্রনাথের সুর-ধর্মী রচনাবলীর মধ্যে "রবিচ্ছায়ার" স্থান ও তাৎপর্য্য নিয়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করেছি। সেটি যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয় ১২৯২ বৈশাখে (১৮৮৫) ছেপেছিলেন। সেই সঙ্গে 'পদরত্নাবলী" রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পাদন হয়ে বেরিয়েছিল (আদিব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে)। তার কিছু আগে (জুলাই ১৮৮৪) "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" দেখা দিয়েছিল সেই সেই আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। ছোট্ট বইখানির উপরে দেখি "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত"; বিজ্ঞাপনে 'প্রকাশক' রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সংগ্রহ করিয়া বাহির করিয়াছি।" সেই ১২৯২ সালেই "নবজীবন" পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় কবি "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" নামক রঙ্গ-প্রবন্ধ বেনামীতে ছেপেছেন:

"ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃঃ ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে⋯আবার কোন কোন মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন" ("নবজীবন" ১ ভাগ ১ সং)।

'ধরাধাম উজ্জ্বল' করেই গেছেন কবি। কিন্তু 'পরিহাস-কেশরে'র প্রিয় শিষ্য হিসাবে কবি তাঁর "রবিচ্ছায়ায়" আমাদের দৃষ্টি বাঁধিয়েও গেলেন. দিনকে মনে হয়েছে রাত, তরুণ প্রভাত-রাগিণীর মধ্যেই তিনি রাত্রির পরোক্ষ-আলাপ করে তিনি যেন আমাদের বিভ্রান্তও করেছেন. যেন মেঘনাদের সঙ্গে অলক্ষ্য যুদ্ধ! বহু বেনামী রচনা তাঁর স্বাক্ষরের অভাবে,—রবীন্দ্রনাথ রচিত বলে—আজ আমরা আর জানতে পারব না. কিন্তু ভানুসিংহের বেনামদার 'প্রকাশক' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা জানি এবং ধরেছি! কারণ স্বয়ং প্রকাশিতেই যেন তিনি এগিয়ে ছিলেন। ভক্ত বেচারীদের বিভ্রান্ত করার শিল্পকলা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব: সেটি ৩০ বছর ধরে দেখে এসেছি। তাই সেই সুদূর কালের "মেঘের কোলে রৌদ্র ছায়ায়" লুকোচুরি খেলায় যোগ দিতে পাঠকদের আহ্বান করি!

মেঘ ও রৌদ্রের অনেক ছায়া ও আলো খেলে গেছে "ভানুসিংহের" উপর। কিন্তু, এত যত্ন করে তাঁর প্রথম ও শেষ 'পদাবলী" ছাপিয়ে, পরে পরিণত বয়সে কবি নিজেই আবার অনেক প্রতিকূল সমালোচনাও করেছেন। তাই শুধু 'ভানুসিংহ নয় অন্য কিছু "অচলিত" রচনা নিয়েও ঝগড়া আমাদের আছে কবির সঙ্গে। 'ভানুসিংহ'কে প্রাচীন পদকর্ত্তা বলে প্রমাণ করে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় "ডক্টরেট" পান—এ নিপুণ পরিহাস উপভোগ্য! নিশিকান্ত যখন জার্ম্মাণী ও রাশিয়া ভ্রমণে ব্যস্ত. (১৮৭৭—৭৮ সালে) তখন ১৬ বছরের তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ যাবেন বিলাতে; তাই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পাঠে যত কিছু ত্রুটি ছিল. তার যেন প্রায়শ্চিত্ত করছেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্ব্ব বন্ধ হতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী থেকে "ভারতী" বার হল (১২৮৪); তার মধ্যে Anglo-Saxon ও Anglo-Norman সাহিত্য নিয়ে কবি প্রবন্ধ লিখছেন ও আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করে চলেছেন কতকগুলি প্রাচীন ইংরেজী কবিতা। তার মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর কাছে শুনছেন Chatterton নামে এক ছোকরা-কবি জ্যাঠামী করে অমর হয়ে গেছেন প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করে! আর রবীন্দ্রকে পায় কে? তিনি "কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন"!

কিন্তু মনে রাখা উচিত যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে ও বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসে পদাবলী উদ্ধৃত করেছেন; তাঁর "এস এস বঁধু এস" বৈকল্পিক পদের (variant) আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কমলাকান্তের মত ভানুসিংহের জবানবন্দী শুনেই বলতে ইচ্ছা করে—"হত বাহু আগে কত আর"! চ্যাটার্টন ছেড়ে চণ্ডীদাসের বাংলায় দেখতে চাই আজ রবীন্দ্রনাথকে. কারণ সেভাবে দেখেই হয়ত সঠিক বোঝা যাবে ভানুসিংহের আবির্ভাব। বিলাত যাত্রার তাগিদে Tennyson, Moore, Chatterton ইত্যাদি পড়বার অনেক আগেই কবি লুকিয়ে সুরু করেছেন পদবৃন্দাবনে তাঁর অভিসার। সেই রবীন্দ্রনাথকেই "নেতা" করে পাঠকরা এগিয়ে চলুন "ভেকধারী" ভানুসিংহের সন্ধানে:

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন আকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম—

"গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে—
বিসরি ত্রাস লোক লাজে—
সজনি, আও আও লো।"

সেই মেঘ-ঢাকা মধ্যাহ্নের তারিখ আর জানা যাবে না, কিন্তু তার ছাপ আমাদের বুকে রেখে গেছেন ভানুসিংহ। হয়তো পারে এইটি তাঁর পদাবলীর প্রথম রচনা; কিন্তু পুরান ভারতীর পাতা উল্টে দেখি ১২৮৪ সালে আশ্বিনে "ছাপা" প্রথম পদ—

"সজনী গো, শাওন গগনে ঘোর ঘন ঘটা
আঁধার যামিনী রে
কুঞ্জপথে সখি কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে"

মল্লার রাগিণীর মীড় কেঁপে কেঁপে উঠছে। আজও শুনলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এ সুর তাঁরই দেওয়া—ধার করা নয়। ষোল বছরের রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদে প্রথম যে সুর দিয়েছিলেন' চন্দননগরের গঙ্গাতীরে, তাতেও মেঘমল্লারের পাকা আলাপ। কিন্তু তারও চেয়ে ছোট বয়সের কৃষ্ণযাত্রায় শেখা ঝিঁঝিট সুর বেঁধে রেখেছেন কবি (অগ্রহায়ণ ১২৮৪) পদাবলীর দ্বিতীয় গানে "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে।" রচনাটি ১৬ বছর বয়সের হতে পারে: কিন্তু হয়ত ছয় বছরের শিশু-রবি এই ঝিঁঝিট-সুর কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন কোন এক যাত্রা পালা শুনে—যার বর্ণনা পাই "ছেলেবেলায়।" সে বয়সে রবীন্দ্রনাথ হয়ত নামে সুর চেনেন না কিন্তু কাজে সুর ধরতে তাঁর মত কে পারত? এই শিশু-কলাবিদের কান বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সেটি মনে করিয়ে দেবার জন্যই দু'চার কথা লিখছি। এই সুরস্বর্গের শিশুকে চিনেছিলেন তাঁর পিতৃদেব ও পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ যিনি তাঁকে সঙ্গে করে বেড়াতেন আর. 'নন্দ-বিদায়' যাত্রার জুড়ি-গানের মতন, সবাইকে শোনাতেন "ময় ছোঁড়ো ব্রজ কি বাস রে"। সেই অতটুকু বয়সেই শিশু রবি সুরের সঙ্গে আয়ত্ত করছেন ব্রজমাধুরী ও "ব্রজবুলী"।

সে আর এক ইতিহাসের পর্ব্ব; কারণ ভানুসিংহ বোধ হয় আধুনিক বাংলার শেষ পদকর্ত্তা; সে মর্য্যাদা তাঁকে আমাদের দিতে বাকী আছে তাঁর বয়সের তারুণ্য ভুলে। যাত্রা-পাঁচালী গানার ভিতর দিয়ে অনেক কিছু তিনি আয়ত্ত করেছেন, তার ভাঙ্গাচোরা ইসারা রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়ে গেছেন। "জল পড়ে—পাতা নড়ে" শীর্ষক কবিতার মধ্যেও তাই তিনি ছন্দ আবিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং মাত্রা, তাল ও সুরে তাঁর জন্মগত অধিকার, সাধারণ শিক্ষায় ত্রুটি যতই থাক না কেন। ১২৮০-তে ১২ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্ন প্রয়াণ, শুনছেন গীতগোবিন্দের বিচিত্র ছন্দ প্রবাহ, জেগে উঠছে কবি হবার "অভিলাষ", কানে শুনছেন "প্রকৃতির খেদ" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মুদ্রিত নাম-হারা রচনা) তাঁর প্রথম নদী-গাথা।

১২৮১তে সুরু হল "প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ" এবং দু'বছর ধরে (১২৮১-৮৩) ছাপা হল (১) বিদ্যাপতি (২) চণ্ডীদাস (৩) গোবিন্দদাস (৪) রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ (৫) কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল। সম্পাদনায় প্রধান উদ্যোক্তা অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) ও প্রবীণ সাহিত্যিক সারদাচরণ মিত্র। যাঁর বিদ্যাপতির "ভূমিকা" আজও পড়ে অনেকে লাভবান হবেন। ১২৮১তেই দেখি বালক-রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতা "হিন্দুমেলায় উপহার" পড়া হয়েছে ও অমৃত বাজার পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। (১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) কিন্তু এ সব কবিতার আগেই দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরুবিক্রম"-ও "সরোজিনী" নাটকে দু'টি গান রচনা করে জুড়ে দিয়েছেন। কবিতা লেখার চেয়ে গান গাওয়া, সুর ধরা ও পদাবলী রচনায় রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ বেশী বই কম হতে পারে না। বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১ম পর্ব্ব) বন্ধ হতেই 'ভারতী' প্রকাশের (১২৮৪ শ্রাবণ) সঙ্গেই দেখি বালকরবি দাদাদের সম্পাদকীয় বৈঠকে 'প্রমোশন' পেয়েছেন: সেই দাদাদেরই কাছ থেকে তাঁর "লোভের সামগ্রী"—প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহগুলি তিনি তন্নতন্ন করে পড়েছেন এবং রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতে এই ১২৮৪ বর্ষাকাল থেকেই "ভানুসিংহের পদাবলী" রচনা সুরু হয়। ঐ বছরে (১২৮৪ আশ্বিন চৈত্র) সাতটি, ১২৮৫তে (বৈশাখ) একটি বার বার সখি বারণ করনু (ইমন কল্যাণ) ১২৮৬ বৈশাখ "মাধব না কহ আদর বাণী" (বাহার) ও ১২৮৭ বৈশাখ, "দেখলো সজনী চাঁদনি রজনী (বেহাগ) কবির বিলাত প্রবাসকালে ছাপা হয়। বিলাত-যাত্রার আগে ছাপা গান: বাজাও রে মোহন বাঁশী (মূলতান)। হম সখি দারিদ নারী (ভৈরবী), সখি রে পিরীত বুঝবে কে? (টোড়ী); সতিমির রজনী সচকিত সজনী (মিশ্র জয়জয়ন্তী), বাদর বরখন নীরদ গরজন (মল্লার)। প্রবাসকালে ছাপা গানগুলিতে রাগ-রাগিণী রবীন্দ্রনাথ নিজে বসিয়ে গিয়েছিলেন অথবা তাঁর দাদারা বসিয়েছেন, আজ স্থির করা কঠিন। কিন্তু বিদ্যাপতির "ভরা বাদর" পদে যিনি অপূর্ব্ব সুর-বিন্যাস করেছিলেন ১৬ বছর বয়সে—সে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'ভানুসিংহে'র সব পদেই পছন্দ মত সুর দেওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়; বিশেষ যখন দেখি যে, পদাবলী'র বেশীর ভাগ গানেই তাঁর প্রিয়তম রাগিণীগুলিরই আবেশ, যথা:—ভৈরবী, টোড়ী, ললিত, খাম্বাজ, কল্যাণ, দেশ মল্লার, বেহাগ (মিশ্র) বাহার, শঙ্করা ইত্যাদি। শেষ পদটি আজও খুব গাওয়া হয়—সবাই জানেন তাই "ভানুসিংহ" সুর-সম্পদের একটু নমুনা দিয়ে গাইয়েদের সতর্ক করতে চাই।—

১২৮৮ (শ্রাবণে) অর্থাৎ প্রায় ৭০ বর্ষ আগে রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরেই ভারতীতে ছাপেন:—

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট
রক্ত কমল কর রক্ত অধর পুট,
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান'
তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

এই গানে এবং শেষ পদ "কো তুঁহু বোলবি মোয়" গানটিতে তখনও রাগ-নির্দ্দেশ করেননি। ১২৯১ (১৮৮৪ খৃঃ) সালে যখন 'পদাবলী' ছাপলেন তখন "মরণ রে তুহুঁ মম" গানেতে পূরবী সুর দিয়েছিলেন।" অথচ ১২৯২ (১৮৮৫) যখন "রবিচ্ছায়ায়" গানটির পুনর্মুদ্রণ হয় তখন পূরবী বদলে "ভৈরবী"র বেদনাবিধুর মাধুর্য্য রবীন্দ্রনাথ ঢেলে দিয়েছেন। সুরের খেয়ালী রবীন্দ্রনাথ এমনি কতবার নব নব মীড় ও মূর্চ্ছনায় আমাদের মুগ্ধ করেছেন, জেনেছি, শুনেছি কিন্তু আজ সজাগ করাতে চাই তাঁদের, যাঁরা রবীন্দ্র সুর-সাগরে অবগাহন করে ধন্য হতে চান। স্বরলিপি করা ছিল সেকালে কঠিন; বেশী পাওয়া যায়নি এ-পর্যন্ত। অনেক সুরই আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে হারিয়ে গেছে। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর ও ৺দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের [illegible] যত্নে তার কিছু রক্ষা পেয়েছে। আর সেদিন কিছু সন্ধান পেলাম কবির মনস্বিনী ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর পুত্র অশ্বিনী চৌধুরীর কাছ থেকে। 'সাধনা' ও 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে 'আনন্দ সঙ্গীত' ও অন্য পত্রিকায় প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবী কী গভীর অনুরাগ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই আদিকালের "ভানুসিংহ" "বাল্মীকি-প্রতিভা" "কালমৃগয়া" ইত্যাদির গান লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। সেকালের সঙ্গীত-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি ভাল করে নাড়লে হয়ত আরো নূতন দলিল পাওয়া [illegible]।

কিন্তু নাট্যাভিনয়াদিতে সঙ্গীত প্রযোজনা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আর এক বিরাট অধ্যায়; সে আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রেখে শুধু "পদকর্ত্তা"—ভানুসিংহ ও রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব সাহিত্যে [illegible] নিয়ে কিছু বলব।

১৮৮১ সালের (১২৮৮) ভারতীতে যে শ্রাবণ মাসে 'মরণ রে' গানটি ছেপেছেন, সেই সংখ্যায় দেখি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিদ্যাপতির তীব্র সমালোচনা (যেটি রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদ বধ সমালোচনা ১৮৭৭—মনে করিয়ে দেয়।)। ঠিক একমাস পরে (১২৮৮) দেখি তার "উত্তর-প্রত্যুত্তর: অক্ষয় পক্ষে তাঁর বন্ধু শ্রী [illegible] নারায়ণ রায় ও বিপক্ষে স্বয় রবীন্দ্রনাথ! সেই ২০ [illegible] আলোচনা যাঁরা পাঠ করবেন তাঁরা কুড়ি বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের পদাবলী-সাহিত্যে অধিকার দেখে অবাক হবেন। 'বিলাত [illegible] হওয়া ত দূরের কথা (ইউরোপ প্রবাসীর পত্র তার প্রমাণ) [illegible] যাত্রার বহু পূর্ব্বে,—শৈশব কাল থেকেই যে পদাবলী পড়ে [illegible] তার ভাব ও ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষায় রবীন্দ্রনাথের [illegible] চেষ্টা ও নিষ্ঠা! তিনি নিজে আমাদের বলেছেন প্রত্যেক পদ

শুধু নয় প্রত্যেক শব্দটির "নির্ঘণ্ট" নিজ হাতে বাল্যাবস্থায় তিনি করেছিলেন। তাই অক্ষয়চন্দ্র যেখানেই গোঁজামিল-ব্যাখার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ অন্য পদকর্তাদের parallel passage থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আসল অর্থ বার করতে চেষ্টা করেছেন। এইখানেই "শব্দতত্ত্ব" রচনার যেন সূচনা দেখি। "শাব্দিক" রবীন্দ্রনাথকে বন্ধুবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "বাকপতি" বলে অর্ঘ্য দিয়েছেন। আজ তাই আমরা নতুন চোখে তাঁর "ভানুসিংহ" ও ব্রজবুলী প্রয়োগটি বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করছি। ১৮৮২তে গ্রীয়ারসন * (Grierson) সাহেব Vidyapati and Maithili Christomathy (Asiatic Society of Bengal 1882) প্রকাশ করেন। সে বইখানি তন্নতন্ন করে রবীন্দ্রনাথ পড়েন তার প্রমাণ আছে। শুধু বিদ্যাপতি নয় সমগ্র পদাবলী সাহিত্য নিয়ে তখন যেন গবেষণায় নেমেছেন কবি এবং উপযুক্ত সহকর্মীও পেয়েছিলেন বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। তাই "ছবিচ্ছায়া"র সঙ্গে—১২৯২ বৈশাখে (১৮৮৫) দেখি—"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত—"পদরত্নাবলী" (আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে)। যার ভূমিকা লিখেছিলেন শ্রীশ মজুমদার আর ছোট 'নিবেদন'টি প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের লেখা মনে হয় :—

"অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী যে বৈষ্ণব কবিগণের পরিচয় গ্রহণ করেন না, আমাদের বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ—বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রের অতি বিস্তৃতি। বাঙ্গলার "পদকল্পতরু" প্রত্যেক সংস্করণে কিছু না কিছু পাঠান্তর লাভ করে; প্রথমতঃ আমরা [illegible] ৪।৫ খান সংস্করণের সহিত শ্রীরামপুরের পদকল্পতরু মিলাইয়া লইয়াছি। পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পলতিকা এবং শ্রীগীতচিন্তামণি হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান সহায়—দানশীলা মহারাণী [illegible] মহোদয়ার গুরুকুল শ্রী[illegible] গোস্বামী মহাশয়দের গৃহে [illegible] কীটদষ্ট হাতের লেখা পুরাণ পুঁথির রাশি। বলা বাহুল্য, তথাপি অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভণিতা [illegible] নাই—দুই একটিতে এক-আধটা লাইনের পর্যন্ত অভাব আছে। কোন বাবা-বৈষ্ণব পাঠকের যদি জানা থাকে অথবা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া যদি কেহ সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তবে ভরসা [illegible] তাঁহার অনুগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণে এবারকার অসম্পূর্ণতা দূর [illegible] পারিবে। বেশী টীকায় রসানুভাবকতার বিঘ্ন করে বলিয়া [illegible]মই সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা হয় নাই।"

[illegible] কুড়ি ভূমিকাদি বাদ দিলে বাকী ১০৮ পাতায় [illegible] সম্পাদকদ্বয় বিদ্যাপতির ১১, চণ্ডীদাসের ১৩, গোবিন্দ-[illegible] ১১, জ্ঞানদাসের ৯, বলরামদাসের ১৭, রায় শেখরের [illegible] বসন্তের ৬, অনন্ত দাসের ৪, মোট ৭৭ এবং আরো পাই [illegible] অন্য কবিদের পদ, যথা : যদুনন্দন, নরোত্তম, যদুনাথ, [illegible], বংশীদাস, নরসিংহ, বিপ্রদাস, যাদবেন্দ্র, মাধব, প্রেমদাস, [illegible], শ্রীনিবাসদাস, জগন্নাথ, বৃন্দাবন দাস, নরহরি ও লোচনদাস।

* গ্রীয়ারসন মিথিলায় যে ৮২টি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [illegible] মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক"—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীপদামৃতমাধুরী। (৪।৪১ পৃঃ)

কীর্ত্তনের সুরে যেমন বিশেষত্ব দেখা দেয় বাঙ্‌লা দেশে তার সঙ্গে ভারতের অন্য দেশের যথা দ্রাবিড় ও দাক্ষিণাত্যের কীর্ত্তনের মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ সুরশিল্পী, এবং প্রত্যেক গানে সুরের নাম দিয়েছেন : মাথর সুহই, ভাটিয়ারি, পটমঞ্জরী, করুণ তোড়ি, মঙ্গল, মণ্ডয়ারি, গান্ধার প্রভৃতি নিজস্ব "কীর্ত্তন"সুর বাদে অধিকাংশ পদাবলীর রাগ-রাগিণী মার্গ সঙ্গীতের ধারাই অনুসরণ করেছে; যথা রামকেলী, ললিত, বিভাস, টোড়ী, ভৈরবী, আশাবরী, বরাড়ি, ধানশী, সিন্ধুড়া, সারঙ্গ, শঙ্করাভরণ কামোদ, কল্যাণ, ইমন ভূপালি, গুর্জ্জরী, জয়-জয়ন্তী, গান্ধার—শ্রীরাগ কানাড়া বিহাগড়া, মল্লার কেদার বেহাগ প্রভৃতি। অবশ্য খোল-করতালের ছন্দে হয়ত এই সব রাগ-রাগিণী ক্রমশঃ কিছু অন্য রূপ নিয়েছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এ বিষয়ে তাঁর "শ্রীপদামৃতমাধুরী"তে সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

জয়দেবের যুগেও বড় বড় রাগ ও তালে পদাবলী গাওয়া হত, তাঁর সংস্কৃত পদগুলিও সে নিয়মের বাইরে নয়। আবার চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনেও রাগ-রাগিণী সুনির্দ্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাই বিদ্যাপতির "ভরা বাদর" পদে নিজ প্রেরণায় মল্লার যোজনা করে সেই প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করেছেন। তাঁর 'শৈশব সঙ্গীতে'র দোসর 'ভানুসিংহের' পদাবলীতেও যেন মার্গ-সঙ্গীত-ঘেঁসা "কীর্ত্তন" শুনি। তাঁর সব ভাবপ্রধান গানই—রাগপ্রধান ত বটেই সে গান "রবি কীর্ত্তন" নাম নিতেও পারে। শান্তিদেব ঘোষও আমার মতের সমর্থক দেখে সুখী হলাম (রবীন্দ্র-সঙ্গীত—পৃঃ ৭৭-৭৮)

বাংলা কীর্ত্তনের ঢপ ও আখরাদি তাদের মধ্যে পূরো না দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সুর-বিন্যাস বাংলার নিজস্ব ভাটিয়ারি কীর্ত্তন ও বাউলের প্রাণশক্তিতে ভরপুর। 'গীতাঞ্জলী' পর্য্যন্ত স্বরলিপিকারদের তিনি কোন বাধা দেননি রাগ-রাগিণী ও তালের নির্দ্দেশ ছাপাতে। তার পর থেকে তিনি এসব নির্দ্দেশ তুলে দিয়েছেন। তবু গাইলেমাত্র চেনা যায় তাদের রাগ-কৌলিন্য, যদিও 'বর্ণসঙ্করের' অভাব নেই। খাঁটি কীর্ত্তনের রীতি ও ঠাট নিয়েও তিনি পরবর্ত্তী যুগে, ধূর্জ্জটিপ্রসাদের সঙ্গে গরাণহাটী মনোহরসাহী রেণেটি প্রভৃতির কীর্ত্তন-শৈলীর অনেক আলোচনা করেছেন। কীর্ত্তনশাস্ত্র-প্রবীণ অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ও স্বীকার করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু পদাবলীর নয়, উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তনেরও একজন পাকা সমঝদার ছিলেন। ১২৮২ সালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করে দেন যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তখন ১৪ বছরের বালক কিন্তু পদাবলী পড়তে শুরু করেছেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি প্রথম সুর যেমন দিয়েছেন বিদ্যাপতিতে (১৮৭৬)। তেমনি ১২৯৩ (১৮৮৬) পর্য্যন্ত দেখি রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির একটি "সংস্করণ" প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বন্ধু—গোবিন্দলাল দত্ত (অক্রুর দত্ত পরিবারের "সাবিত্রী" লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর ঘোষণাপত্রও ছেপেছেন যথা : Peoples' Library থেকে ॥০ আনায় সেই ১৫০ পাতার বই ১৫ অগ্রহায়ণ (১২৯৩) প্রকাশিত হবে এবং প্রায় "দশ (১৮৭৬-৮৬) বৎসরাধিক কাল ধরে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠাদি করার ফলে সেই সংশোধিত সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেছেন।" কিন্তু হঠাৎ এক দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যভরা কারণে সেই বই

আর সাধারণের হাতে আসেনি—এই তথ্যটি বন্ধুবর অমল হোম "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

তার কিছু আগে (১৯৪২) আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ভক্তিভাজন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন বাংলা বইগুলি শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে পরীক্ষা করবার। তিনি প্রথম দেখান গ্রীয়ার্সনের বিদ্যাপতি এবং তার পাতায় পাতায় কবির স্বহস্ত-লিখিত মন্তব্যাদি রয়েছে। হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয় আর একখানি বই আমাকে দেখান অক্ষয়চন্দ্রের "চণ্ডীদাস কৃত পদাবলী" (১২৮৫—১৮৭৮) যেটি রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার হয়ত কিছু আগেই বেরিয়েছিল। পাতা উল্টাবার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করে চমকে উঠেছিলাম: কারণ

(১) বহু পদে পেনসিলে কবি দাগ দিয়েছেন—যেখানে অর্থে বা পাঠভেদে সন্দেহ তাঁর জেগেছে। হয়ত "পদরত্নাবলী" ভাল করে পরীক্ষা করলে তার হদিশ মিলবে।

(২) এই পাঠভেদ ও অর্থভেদ সমস্যা নিয়েই—মনে পড়ল—রবীন্দ্রনাথের প্রবাদ অভিযোগ তিনি প্রকাশ করেন ১৮৮১ সালের ভারতীতে।

(৩) ৩০৬ পাতায় এক চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ দীন চণ্ডীদাসের পদ ১৪৫ পাতায়। অন্ততঃ দুই চণ্ডীদাসে"র ছায়া 'রবিচ্ছায়া"র যুগেই রবীন্দ্রনাথের মনে নেমেছে।

(৪) আমার চরম বিস্ময় যে, ঐ "চণ্ডীদাস" বইখানির এক কোণে রবীন্দ্রনাথের নিজ হাতে আঁকা নায়ক-চিত্র (২৩১ পৃ)—পেনসিলে আঁকা! তাঁর "পদরত্নাবলী" প্রকাশের আগে (১৮৮৫) যদি এ ছবি তিনি এঁকে থাকেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-শিল্পচর্চা সত্তর বছরে (৭০) নয় (যেমন তাঁর প্রবীণ বয়সের ছবি দেখে আমরা ধরে নিয়েছি!) হয়ত ২০।২৫ বয়সেই সুরু হয়েছিল।

বৈষ্ণব ভাবরাজ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিসার যেন এক অভিনব কীর্তনের পালা বলেই মনে হয়। সে রাজ্যের রূপ রস ও গন্ধ, পদ ছন্দ ও সুর সবই তিনি যেন নিজের করে নিয়েছিলেন। তাই ১৮৮১ মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন "ভানুসিংহের পদাবলী" এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস শীর্ষক প্রবন্ধ (ভারতী ফাল্গুন ১২৮৮) ও বসন্ত রায় পদকর্তার আলোচনা ১২৮৯ (১৮৮২) ভারতী পত্রিকায়। ক্রমশঃ দেখি বটতলার ও শ্রীরামপুর সংস্করণ "পদকল্পতরু" ও "কাটদষ্ট হাতের লেখা পুরাণ পুঁথির রাশি" প্রভৃতি নিয়ে গভীর গবেষণা এবং ১২৯২ (বৈশাখ) অর্থাৎ ২৪ বছর বয়সে "পদরত্নাবলী" প্রকাশ। ১২৯৩ (অগ্রহায়ণে) যে "বিদ্যাপতি" তিনি প্রায় প্রকাশ করেছিলেন তার রহস্যজনক অর্ন্তধান বাংলা-সাহিত্যের জটিল সমস্যা থেকে গেল, কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রেরণা চিরন্তন হয়ে রয়ে গেল রবীন্দ্র-সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও শিল্পে। "রবীন্দ্র-সঙ্গীত" গ্রন্থে শান্তিদেব ঘোষ চমৎকার একটি মূল্যবান মন্তব্য এ বিষয় করেছেন, সেটা উদ্ধৃত করি: "জীবনের প্রথমার্ধে রচিত বহু গান গুরুদেবের হাতে পড়ে যে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রিক কীর্তনে পরিণত হয়েছে, এ কথা বাংলার গায়ক মহলে অনেকেই জানেন···

১। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে; ২। আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি। ৩। ওহে জীবন বল্লভ। ৪। কে জানিত তুমি ডাকিবে। ৫। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু। ৬। তুমি কাছে নেই বলে হের সখা তাই—ইত্যাদি গানগুলি প্রচলিত প্রথায় প্রথম জীবনে লিখিত আখর-যুক্ত কীর্তন।"

কাঁচা রচনা কিছু রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়েছেন তা স্বীকার করে শান্তিদেব লিখছেন: "আখর ইত্যাদি বর্জিত, বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের জীবনে যার সূত্রপাত (১৯০০ থেকে এরূপ কীর্তনাঙ্গের গানকেই আমি প্রকৃত রাবীন্দ্রিক কীর্তন বলি"

শুধু পুরান কবিতা বা গানই নয় ছেলেবেলার লেখা বইগুলি কবি "অচলিত" করে দিয়েছিলেন; হয়ত সেই জন্যই এত নূতন রূপে নব নব প্রেরণায় লিখে যেতে পেরেছেন। কিন্তু "রবীন্দ্রগ্রন্থ" পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সেই সব "অচলিত" এখন চালু করতে হবে, তাই ভানুসিংহকে মেঘমুক্ত করে সমাজের সামনে ধরতে চেষ্টা করেছি; ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে শেষ এই পদাবলী ছাপা হয় কিছু পরিবর্তন করে; তার পর দু'একটি গানের টুকরো ছাড়া কিছু দেখা যায়নি। হঠাৎ 'ভানুসিংহ' নাম বহুকাল পরে লোকের মনে পড়ল পদাবলী নয়, বাবুকে লেখা গদ্য "পত্রাবলী" পড়ে! একবছর পরে (অর্থাৎ ১৮৮৪—৮৫) "রবিচ্ছায়ায়" কবি (হয়ত তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনারায়ণের তাগিদে!) কেবল পাঁচটি গান উদ্ধৃত করেছেন:—

১। শুনলো শুনলো বালিকা—ভৈরবী—একতালা
২। সজনি সজনি রাধিকা-লো (পরবর্তী স্থানে) মাজ-একতালা
৩। গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে—ঝিঁঝিট একতালা
৪। আজি সখি মুহু মুহু—মিশ্র বেহাগ—ঝাঁপতাল
৫। মরণ রে —(পরবর্তী স্থানে) ভৈরবী—কাওয়ালী

"রবিচ্ছায়া"য় সুরের কিছু বদল করেছেন, এবং তালের সংকেত দিয়েছেন। কিন্তু সেই ৪।৫ টি গান ছাড়া অন্য ভানুসিংহের গান আজ গাওয়ান বা শেখান কঠিন ব্যাপার, হয়ত শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বেশীর ভাগ জানেন। দীনেন্দ্রনাথ জানতেন, কিন্তু তাঁর শিষ্য অনাদি দস্তিদারও সব জানেন না। এই অবস্থার কিছু উন্নতি করবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। ১৩২৪ সালের "গান", যেটি ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ থেকে ছাপা হয়েছিল, তাতে ভানু-পদাবলী ৪।৫ টি ছাড়া নেই। অথচ ২২।২৩ বছরের রবীন্দ্রনাথের গানের সমজদার যে বেশী ছিল তার প্রমাণ কিছু এবার দেব সেকালের উল্লেখযোগ্য কিছু বিজ্ঞাপন থেকে:—

প্রথম বিজ্ঞাপন সঞ্জীবনী ২০।২৭ বৈশাখ ১২৯২ (২১ মে ১৮৮৫)

"রবিচ্ছায়া"—বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত সিটি কলেজের [illegible] বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত:—রবীন্দ্রবাবু [illegible] পার না হইতেই এক জন বিখ্যাত কবি ও প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ [illegible] বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন···সঙ্গীত প্রণয়নে [illegible] অসাধারণ ক্ষমতা আছে···সঙ্গীতগুলি যেমন সরল সুমিষ্ট [illegible] পূর্ণ, তেমনি মনোহারিণী রাগিণীতে সংবদ্ধ। এমন [illegible] সঙ্গীত বাঙালীর মধ্যে আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন [illegible] আমরা জানি না। সংগ্রাহক মহাশয় রবি বাবুর ইতস্ততঃ [illegible] সঙ্গীতগুলি প্রকাশ করিয়া বাঙালীর সঙ্গীত পিপাসা [illegible] এক বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। রবিচ্ছায়া বাঙ্গালা [illegible] অপূর্ব সৃষ্টি। এ সৃষ্টির জন্য রবি বাবু ও যোগেন্দ্র বাবু [illegible] ধন্যবাদ দিতেছি।"

২২শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২ "সঞ্জীবনী"—

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হন নাই এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। তিনি কবিতা লিখিয়া বঙ্গ-ভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি "রবিচ্ছায়া" নামে মুদ্রিত হইতেছিল···বঙ্গবাসী! যদি কখনও নির্ম্মল পবিত্র আমোদ অনুভব করিবার বাসনা থাকে, যদি কখনও হৃদয় মনকে ক্ষণকালের জন্যও সংসারের অতীত করিতে অভিলাষ হয়, যদি কখনও বিষাদময় অন্ধকার জীবনে জ্যোৎস্নালোক আনয়ন করিতে মানস থাকে, তবে আপনার জন্য সুবিধার সময় আসিয়াছে···

মূল্য কমিল—৮৹ স্থলে ॥৹

১লা চৈত্র ১২৯৯ (১৮৯৩) রবীন্দ্রনাথ নিজে 'বাল্মীকি-প্রতিভা ও গানের বহি' প্রকাশ কালে লিখছেন—

"শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয় আমার কতকগুলি গান নানা খাতাপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া রবিচ্ছায়া নাম দিয়া একটি গানের বহি করেন। সেজন্য পাঠকেরা না হউন আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। সেই গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ও ইতিমধ্যে অনেকগুলি গান নূতন রচিত হইয়াছে। এই কারণে নূতন পুরাতন সমস্ত গান লইয়া বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম······অবশেষে পাঠকদিগের নিকট নিবেদন এই যে, গ্রন্থের অধিকাংশ গানই পাঠ্য নহে। আশা করি সুর-সংযোগে শ্রুতিযোগ্য হইতে পারে"।

তবু তো "রবিচ্ছায়া" প্রায় ১৮৮৫-১৮৯৩ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করেছিল। তবু তিনি যোগেন্দ্রনারায়ণের পোষ্য-পুত্র। কিন্তু রবিচ্ছায়ার দাদা ভানুসিংহকে ১৮৮৪ পৃথিবীতে এনে কেন অজ্ঞাতপুত্র কেন করেছিলেন জানি না। হয়ত দত্তক-পুত্র বলে পরিচয় দিতে সে যুগে অনেকেই লজ্জা হতেন। একজন ত নিশ্চয় হতেন, কিন্তু তিনি অকালে চলে গিয়েছিলেন; তাঁকে স্মরণ করে তাঁর কাছেও আমার অনুযোগ পৌঁছে দেব: ইনি রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌদিদি কাদম্বিনী (কাদম্বরী) দেবী; শিশুকবি মা হারা (১৮৭৫) হওয়ার পর থেকে ইনি মায়ের মত স্নেহে কবিকে পালন করেছিলেন। ছোট বৌদি ও বালক-দেবর মিলে স্বপ্নপ্রয়াণ দেখেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গৃহিণী ও সাহিত্যের সমজদার বলে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও কাদম্বিনী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর "সারদামঙ্গলের" প্রভাব বাল্মীকি-প্রতিভায় আছে, কবি নিজেই স্বীকার করছেন। "কালমৃগয়া" অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্র দশরথ ও রবীন্দ্র অন্ধমুনি হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব আনন্দের দিন যেন পলকে মিলে গেল। ১৮৮৩ ডিসেম্বর মাসে কবির বিবাহ মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। ১৮৮৪ (১২৯১ বৈশাখ) কবির ২৩ বয়সে জন্মোৎসব: ছবি ও গান; নলিনী (নাটক) ইত্যাদি ছাপা হয়ে গেছে; ২৯ এপ্রেল বেরল প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্যকাব্য)—নামের মধ্যেই যেন ভীষণ ইঙ্গিত! ১৯শে মে ১৮৮৪ কাদম্বিনী দেবী অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন—তাঁরই কালো ছায়া "জীবন স্মৃতির" শেষ পাতা যেন ভরে আছে। ঐ মে প্রকাশিত হল "শৈশব সঙ্গীত"—কবির ভাষায় ১৩ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের কবিতা। উৎসর্গ করেছেন এমন ভাষায় বৌদিদিকে যে, আজও মনকে নাড়া দেয়;—

"এ কবিতাগুলি তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে হইতেছে, তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবে"। ঐ বছরেই ১লা জুলাই ১৮৮৪, প্রকাশিত হল ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। উৎসর্গপত্রের ওই কটি ছত্র কী মর্ম্মস্পর্শী বেদনা—

"ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না"। এই সময়ে হয়ত তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা—একটি কবিতা পরে (১৮৮৬) "কড়ি ও কোমলে" ছাপা হয়েছিল "হায় কোথা যাবে?

অনন্ত অজানা দেশ নিতান্ত যে একা তুমি

পথ কোথা পাবে!"

কবিকে যিনি মাতৃহারা অবস্থায় সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর তিরোধানে ভানুসিংহ যেন আবার মাতৃহীন হয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য জগতে প্রবেশ করল। তার সম্বন্ধে আমার দরদ হয়ত সেজন্য একটু বেশী হয়েই তার প্রকাশ পেল। রবীন্দ্র-কাব্যে তার স্থায়ী আসন না থাকলেও রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইতিহাসে ভানুসিংহের পদাবলী উপেক্ষণীয় নয়। তার জন্মবৎসরেই (১৮৮৪) ইংরেজী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ছাপা হয়েছিল "সঙ্গীত মুক্তাবলী"তে—(প্রভাত রবি, পৃ ১১৪)

"এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।··· ইঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সঙ্গীতে অনেক স্থলে নূতন সুর ও নূতন ভাব সম্মিলিত দেখা যায়। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কেবল। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সংগীত-রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, এমন নহে, সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।"

'ভানুসিংহ' প্রকাশের (১৮৮৪ জুলাই) আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'সুগায়ক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ' করেছিলেন, তা'র কিছু প্রমাণ দিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করব।

হিন্দু মেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দু'টি কবিতা পড়েছিলেন—(১৮৭৫ ও ১৮৭৭)। রচনা দু'টি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সে খবর পাকা হয়ে গেছে। অর্থাৎ ১৩ বছর থেকে ১৫ বছরের রচনাও কিছু পাওয়া গেল। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন (জ্যোতিরিন্দ্রের সহপাঠী) ওই মেলায় উপস্থিত হয়ে একটি বিবরণ লিখেছিলেন: "স্মরণ হয় ১৮৭৬ খৃঃ আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ কোনও উদ্যানে "নেশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম······দেখিলাম, সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯ (আপাতদৃষ্টিতে—আসলে ১৩।১৪) শান্ত স্থির। বৃক্ষতলে যেন একটি স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন, 'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ···দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাস্যমুখে করমর্দ্দন শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় [illegible]

...হার দুই একদিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে ...মন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে ...লাম যে আমি "নেশনাল মেলায়" গিয়া একটি অপূর্ব্ব নবযুবকের ...ত ও কবিতা শুনিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি ...দিন একজন প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন। অক্ষয় বাবু ...লেন: 'কে? রবি-ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুর-বাড়ীর কাঁচামিঠা ...ব"। সেই অক্ষয় বাবুই ১৮৮৫ তে 'ভাই হাততালি' প্রবন্ধে যুবক ...নাথকে আশীর্ব্বাদ করলেন, কিন্তু তার প্রায় দশ বছর আগে ...বি নবীনচন্দ্র সেন যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি-বলে বালক রবিকে চিনেছিলেন তাঁরই গৌরব। পকেট থেকে 'নোটবুক' বার করে (এটি তাঁর ...কেলে স্বভাব) একটি দুটি নয়, 'কয়েকটি' কবিতা ও গান রবীন্দ্রনাথ ...য়েছিলেন। সে কোন্ কোন্ গান ও কবিতা? নিজের হতে পারে ...দেরও হতে পারে, কারণ রবি রচিত দুটিমাত্র গান এ পর্য্যন্ত ...য়া ধরতে পেরেছি, ১৮৭৫তে প্রকাশিত 'সরোজিনী' নাটকে ...জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ"। এবং (১৮৭৪) 'পুরু বিক্রম' নাটকে ...বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" ...খাজ একতালা) তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে, সুতরাং বালক- ...হয়ত সে গানগুলি নবীনবাবুকে শুনিয়েছিলেন। কারণ তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু রাজনারায়ণ বসু ঐ গানটি ...ন মেতে উঠে গাইতেন সেকথা কবি নিজেই জীবনস্মৃতিতে ... গেছেন। ভুল করে এ গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে ...ও অনেকে মনে করেন, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নিজেই গানটির ...লিপি ছাপার সময় রবীন্দ্রনাথ রচিত লিখেছেন।

সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথই আবার তাঁর জীবনস্মৃতিতে আর একটি ...র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন—উদ্ধৃত করি: "সঞ্জীবনী সভার ...গণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিচারে আহারেরও একটি বিধি ছিল··· ...এক ব্রাহ্মণ জমিদার-সভ্যের গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাড়ীতে ...র আমাদের একটা প্রীতি-ভোজ হয়···খাওয়া-দাওয়া হইয়া ... খুব এক ঝড় উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে ...ইয়া চিৎকার করিয়া: 'আজি উন্মদ পবনে'—বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ...চত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন"। আসলে গানের ...য়ী বা আরম্ভটা বাদ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে খুঁজে ... দেখি হয়—যা হোক গানটির সুরুতে পাই—

"সজনি গো—
শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা"—ইত্যাদি

প্রথম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' যেটি আশ্বিন ১২৮৪ অর্থাৎ ...ম্বর ১৮৭৭ তে ভারতীতে ছাপা হয়েছিল। সুতরাং 'নব-রচিত' এবং সুরও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় রাগিণী মল্লার—যে সুর তিনি ...গেই বিদ্যাপতির পদে বসিয়েছেন—১৬ বছর বয়সের —সেকথা আগেই লিখেছি। সুতরাং

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত
থর থর কম্পত দেহ।"

...দে ও সুরবিন্যাসে গায়ক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রাজনারায়ণকেও ...য় তুলেছিলেন সে আর আশ্চর্য্য কি? এই প্রীতিভোজের গীতসভার ঠিক এক বছর পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালে— রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রা, কিন্তু তার আগে ভানুসিংহ ছাড়া আরো কিছু গান—যথা: 'বলি ও আমার গোলাপ-বালা' ইত্যাদি, আমেদাবাদে রচনা করেন। ১৮৮০ (এপ্রিল) বিলাত থেকে ফিরেই জ্যোতিরিন্দ্রের 'মানময়ী' গীতিনাটিকায় স্বরচিত গান রবীন্দ্র জুড়ে দিলেন "আয় তবে সহচরী"। শুরু হল বিরাট গীতোৎসবের প্রস্তুতি:—যার অক্ষয় পরিচয় রয়েছে বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) ও কাল মৃগয়ার (১৮৮২) রচনা ও প্রযোজনায়; সে সব পরে আলোচনা করা যাবে।

ইতিমধ্যে দেখি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কলকাতা ছেড়ে বৈদ্যনাথে বসেছেন ও তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছর (১৮৭৯-১৮৯৯) সেখানেই কাটে। সেখানে ধাওয়া করে গেছেন বিলাত-ফেরৎ রবীন্দ্রনাথ ও ট্রেণে বিসর্জ্জনের প্রাথমিক গল্প 'রাজর্ষি' তাঁর মনে জাগে।

১৮৮১ (১২৮৮, ১৫ই শ্রাবণ) রাজনারায়ণের চতুর্থ কন্যা লীলাদেবীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ "সঞ্জীবনী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ। তার নিখুঁত বিবরণ সৌভাগ্যক্রমে লীলা দেবী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এবং তাঁর পুত্র বন্ধুবর সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সেই প্রথম জমকাল বিবাহ-সভা—আচার্য্য হয়েছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং; এবং "নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন জীবনীর রচয়িতা) সুন্দরীমোহন দাস, বেণীমাধব মিত্র, অন্ধ চুণীলাল ও নরেন্দ্র দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) মহাশয়গণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন ···শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়—

'তুই হৃদয়ের নদী' (সাহানা-ঝাঁপতাল); জগতের পুরোহিত তুমি (খাম্বাজ একতালা) শুভদিনে এসেছে দোঁহে (বেহাগ-তেওড়া) —প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।"

লীলা দেবীর ডায়েরী থেকে এ অমূল্য তথ্য পেলাম যে, শুধু কবি নন, গায়কশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবরচিত গান ১৮৮১ সালে সঙ্গত করে শেখাচ্ছেন পাবনা কাটুনিয়া সুন্দরীমোহন দাশকে শুধু নয়, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ-মাতান শিষ্য নরেন্দ্র দত্তকেও, যিনি সেকালের একজন নামজাদা কলাবিৎ—তাঁর গান শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটে আসতেন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায়। অভেদানন্দজীর পাখোয়াজের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গাইতেন সেকথা শুনেছি। কিন্তু রাজনারায়ণ-নন্দিনী লীলা দেবীর খাতায় প্রথম পড়লাম যে, রবীন্দ্রনাথের 'তুই হৃদয়ের নদী' প্রভৃতি গান ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দও মহড়া দিয়ে শিখেছিলেন। নরেন্দ্র দত্ত তখন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহকর্মী। এমনি কত অমূল্য তথ্য এত অল্পদিনেই আমরা ভুলেছি বা হারিয়েছি! সেকালের প্রত্যেক গান তাঁদের সুর তাল পদ সমেত তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা উচিত—তবেই অনেক "লুপ্তরত্নোদ্ধার" হওয়ার সম্ভাবনা।

তাই একটু বড় হয়ে গেল আলোচনা "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" উপলক্ষ্য করে। তার পদকর্ত্তা, সুরকার ও গায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলার সুরলোকে এক বিশিষ্ট স্থান কুড়ি বছর বয়সেই অধিকার করেন—এটি মনে রেখে ভানুসিংহের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন সংস্করণ স্বরলিপি সমেত প্রকাশ করা উচিত।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পনেরো

এ আবার কে এল দক্ষিণেশ্বরে?

গদাধরের খুড়তুতো দাদা, রামতারক চাটুজ্জে। তার নাম রেখেছিল, হলধারী।

হৃদয়ের মত চাকরির খোঁজে এসেছে। তবে হৃদয়ের মত সে মাঠো নয়। পণ্ডিতপ্রধান। ভাগবত আর গীতা, বেদান্ত আর অধ্যাত্ম রামায়ণ তার নখমুকুরে। মস্ত বড় বৈষ্ণব।

'একটা কাজকর্ম যদি কিছু দেন—' হলধারীর মধ্যে লুকোছাপা কিছু নেই, সরাসরি দাঁড়াল গিয়ে মথুর বাবুর দরবারে।

পরিচয় পেয়ে মোহিত হয়ে গেলেন মথুর বাবু। এ তো চাওয়ার মতই পাওয়া হয়ে গেল দেখছি। ঈশ্বরের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে গদাধর। পুজো-আচ্চার আর ধার ধারে না আজকাল। কি যে করে আর কি যে করে না সে জানে আর তার মা-ই জানে।

'ভালোই হল।' মথুর বাবু সহজ মানুষের মত নিশ্বাস ফেললেন: 'তুমি কালীঘরের পুজোর ভার নাও।'

প্রথম পংক্তির বৈষ্ণব, শক্তিপূজার ভার নেবে! এক মুহূর্ত দ্বিধা করল হলধারী। আপত্তি কি! শক্তিও যা বিষ্ণুরতাও তাই। "ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।" আবার শোনো: "শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে, প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" 'না' বলবার কিছু নেই।

কিন্তু আর যাই বলুন, গঙ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাব।

'কেন, গদাধর তো মার প্রসাদ খাচ্ছে আজকাল। তোমার আবার খুঁতখুঁতুনি কেন?' টিপ্পুনি কাটলেন মথুর বাবু।

হলধারী হাসল। কার সঙ্গে কার তুলনা! মনে করুন, গোড়ায় গদাধরও গঙ্গাতীরেই রান্না করে খেয়েছে। এখন সে উঠে এসেছে সাধনার উচ্চস্তরে। এখন সে ইচ্ছে করলে ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ কেন, ছোট জাত কাঙালীরও উচ্ছিষ্ট খেতে পারে। তার সইবে, সে এখন সহিষ্ণুতার সমুদ্র। কিন্তু আমার সইবে না। যেটুকু বা নিষ্ঠা আছে তাও যাবে নষ্ট হয়ে।

তার স্পষ্টতার সারল্যে খুশি হলেন মথুর বাবু।

কিন্তু, এ তো এক রকম হল—এদিকে আবার বলি বন্ধ করবার বায়না ধরলে হলধারী। বহু কালের প্রথা বললেই কি আর বন্ধ করা যায়? ক্ষুণ্ণ হল হলধারী, পূজায় সেই প্রাণঢালা আনন্দ যেন খুঁজে পেল না। খোলা হাওয়ায় না থাকলে মন খোলসা হয় কি করে?

এক দিন, সন্ধ্যা করছে হলধারী, দেবী ভবতারিণী তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধ হয়েছেন মা, মা'র এখন উল্লাসিনী মূর্তি নয়, প্রচণ্ডিকা মূর্তি। বললেন, 'তোকে আর আমার পুজো করতে হবে না। এমনি আধাখেঁচড়া পুজো যদি করিস তো ছেলের মরা-মুখ দেখবি।'

হলধারী গ্রাহ্য করলে না। ভাবলে, চোখে বুঝি ঘোর দেখেছে। হয়তো বা মাথার খেয়াল!

কিন্তু, আশ্চর্য, ক'দিন পরেই খবর এল, মারা গেছে হলধারীর ছেলে।

হলধারী গদাধরের শরণাপন্ন হল। গদাধর বললে, দেবীপূজা ছাড়ান দিন। যেমন করছিল হৃদয়, হৃদয়ই করুক, আপনি যান রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে।

রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে এসে হলধারী মধুর-ভাবের পরিচর্চায় পরকীয়া নিয়ে মেতে উঠল। বৈষ্ণব মতে এও এক রকম সাধনা বটে, কিন্তু অপকৃষ্ট, অধোগত সাধনা। ক'দিনেই নানান কথা রটতে লাগল হলধারীর নামে—সুরু হল নানান কানাকানি।

পাল্টাপাল্টি। বিরুদ্ধতা করে। হলধারীকে সকলকার ভয়। তার মুখ বড় খারাপ। কথায় কথায় শাপ দেয়। আর সে-শাপ ভীষণ ফলে। বাক্‌সিদ্ধ হলধারী।

কিন্তু গদাধরের কানে এলে গদাধর বরদাস্ত করতে পারল না। দাদাই হোক আর যাই হোক, চলবে না এমন কদাচার। হলধারীকে কড়কে দিল গদাধর।

'কি? তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!' হলধারী হুমকে উঠল: 'আমার ভাই হয়ে, আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে তুই আমাকে শাসন করতে এসেছিস? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

আপনি চটছেন মিছিমিছি। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম। পাঁচ জনের কান-কথা থেকে রেহাই পান তারি জন্যে।

হলধারী গুম হয়ে রইল। কথা ফিরিয়ে নিলে না কিছুতেই। যা বলেছি তো বলেছি।

ক'দিন পরে, এক দিন সন্ধের পরে, গদাধরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল সত্যি-সত্যি। কালো, ঘন রক্ত। কতক বেরিয়ে আসছে, কতক জমে থাকছে মুখের মধ্যে। কতক বা দাঁতের গোড়া থেকে ঝুলছে সুতোর মত।

এ কি হল? রক্ত থামছে না যে! ঝলকে-ঝলকে বেরুচ্ছে।

মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল গদাধর। তবু রক্তের নিবৃত্তি নেই। এ কি হল? মা, তুই এ কি করলি?

সবাই ছুটে এল আশ-পাশ থেকে। দ্রুতপায়ে হলধারীও।

'দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কি করেছ দেখ।' ডুকরে উঠল গদাধর।

চোখে দেখে সহ্য করতে পারল না হলধারী। কাঁদতে লাগল। কথা ফিরিয়ে নেবার কথা ওঠে না আর। হাতের তীর আর হাতে নেই। কান্নার মধ্যেও একটু গর্ব মিশে আছে হলধারীর। অব্যর্থবাক্ সে।

চার দিকে হাহাকার পড়ে গেল। সমস্ত বলিদানের রক্ত বুঝি গদাধর দিলে!

'তুমি কি হঠযোগ করো?'

গদাধর চোখ তুলে তাকাল। দক্ষিণেশ্বরে ক'দিন থেকে আছে যে প্রাচীন সাধু, সে।

'দেখি রক্তের রং। দেখি মুখের কোন্‌খানা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই,' সাধু জোর দিয়ে বলে: 'নিশ্চয়ই তুমি হঠযোগ করো। তাই না?'

'করি।'

তবে আর ভয় নেই। সাধনায় সুষুম্নাদ্বার খু[illegible] গিয়েছে। দেহের রক্ত সব মাথায় গিয়ে উঠছি[illegible] আপনা থেকে যে মুখের মধ্য দিয়ে পথ করে নি[illegible] পেরেছে সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে। জানো [illegible] হঠযোগে জড়সমাধি হয়ে যায়। রক্ত যদি [illegible] মাথায় গিয়ে একবার জমতে পারত তা হলে তো[illegible] সমাধি আর ভাঙত না।

সবই মা'র ইচ্ছা।

'একশো বার। মা'র ইচ্ছেতেই তুমি আজ [illegible] গেলে। তোমাকে দিয়ে মা'র কত না জানি কা[illegible] আছে।'

হৃদয়কে কাছে ডেকে নিল হলধারী। বললে, 'আচ্ছা হৃদু, তুই বল এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

কোন্‌টা?

'এ যে কাপড় ফেলে পৈতে ফেলে সাধন কর[illegible]?

হলধারীকে হৃদয়ের বড় ভয়। বললে, '[illegible] না। ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিলে চলে কি করে?'

'বল্ সেই কথা।' উৎফুল্ল হল হলধারী। কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম। সেই ব্রাহ্ম[illegible]কে উনি এক কথায় নস্যাৎ করে দেবেন?'

এক কথায় আর সবাইর মত হৃদয়ও নস্যাৎ করে দিল। বললে, 'পাগল! বদ্ধ পাগল!'

'তবু তোর কথাই যা হোক কিছু শোনে। তুই দৃষ্টি রাখবি, বাধা দিবি, যেন ও-সব অনা[illegible] না করে। দরকার হয় তো বেঁধে রাখবি দড়ি দিয়ে।'

পাগল বলে কেটে পড়তে চাইল হৃদয়। কিন্তু মুখে যাই বলুক, তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে [illegible] না হলধারী। অন্তত যখন পূজা দেখে গ[illegible]র। দেখে উৎসর্গের উন্মাদনা। ঈশ্বরের আবে[illegible] হলে কেউ কি এমন বিভোর হয়ে পূজা করতে পা[illegible]

ছুটে যায় হৃদয়ের কাছে। 'ওরে হৃদু, [illegible]গল নয়। অলৌকিক।'

তাই না কি? হৃদয় বোকা সাজে।

'অলৌকিক না হলে এমন কখনো হতে [illegible]রে! কেউ পুজো করতে পারে এমন ভাবে? [illegible]

খি সত্যি করে ওর মধ্যে তোর কিছু আশ্চর্যদর্শন য়েছে ?'

আমার কী দর্শন হবে ! আমি দর্শনের জানি কী !

'নইলে ওকে তুই রাত-দিন এমন চাকরের মতন া করিস্ কেন ?'

'তবু মনে হয় আরো কেন করতে পারি না।' তবু য়ের মুখে তৃপ্তির তন্ময়তা।

চিনতে পেরেছে হলধারী। আর তার ভুল বে না।

'এবার আমি তোকে ঠিক চিনতে পেরেছি। শ্চয়ই তোর মাঝে দিব্যাবেশ হয়েছে। হিসেবে র ভুল হবে না আমার।'

গদাধর হাসে। আবার কখন 'গোলেমালে পাঠ' হবে তার ঠিক কি।

মন্দিরের কাজ সেরে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে পড়তে সে হলধারী। মাথা পরিষ্কার করবার জন্যে এক টিপ নস্যি নেয়। সেই এক টিপ নস্যিতেই খুলে যায় বুদ্ধি। ভাবে, এত শাস্ত্র-শাসন কিছু পড়েছে গদাধর ? বোঝে কিছু ?

ডাকো গদাধরকে।

'তুই এ সব কিছু জানিস ? বুঝতে পারবি ?'

খুব।'

'কি করে পারবি ? তুই তো আকাট মূর্খ—'

'আমি মূর্খ হলে কি হয়, আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি সর্বজ্ঞান। তিনিই সকল কথা বুঝিয়ে দেন আমাকে।'

'ইস, মস্ত বড় পণ্ডিত এসেছিস ! সব যে তুই , তুই কি অবতার ?' হলধারী গরম হয়ে ওঠে।

'এই যে বলেছিলে, আর গোল হবে না বে—' মনে করিয়ে দেয় গদাধর।

'রাখ্, তোর কথায় আমার গা জ্বলে। শাস্ত্র নি যখন, আমার সঙ্গে কথা বলতে আসিস নে। কল্কি ছাড়া আর অবতার নেই। যা, । ঠিক চিনেছি তোকে। আর ভুল হবে না। স্ত আকাট—'

ট গিয়ে হৃদয়কে ধরে এনেছে হলধারী। । তুই বলিস পাগল হয়েছে, আমি বলি তে পেয়েছে। তা না হলে এমন দশা হয় ?

কিয়ে দেখল হৃদয়। দেখল বস্ত্র ত্যাগ করে গাছের মগডালে বসে আছে। স্তব্ধ হয়ে।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে কালীকে হলধারী তমোময়ী বলে মনে করত। তমোময়ী মানে তমোগুণান্বিতা। যে তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা তার যে অধিষ্ঠাত্রী। অবিবেক বা প্রমাদ মোহের যে উৎপাদিকা। যে 'জঘন্যগুণবৃত্তস্থা'।

এক দিন মুখোমুখি বললে তাই গদাধরকে। 'তুই ও তামসী মূর্তির পুজো করিস কেন ? ওতে কি কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে ? বরং ও তোকে অধোগামী করবে। জানিস না, গীতায় কি বলেছে ? 'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'।

ইষ্টনিন্দা শুনে বিমর্ষ হয়ে গেল গদাধর। কিন্তু সাধ্য কি হলধারীর সঙ্গে সে তর্ক করে। থেকে উদ্ধৃতি দেবারই বা তার বিদ্যে কোথায় ! সে সোজাসুজি মাকেই গিয়ে জিগ্‌গেস করতে পারে, মা, তুই কী ! তোর রূপে যে এত অন্ধকারের ঐশ্বর্য সে কি অজ্ঞানের অন্ধকার ?

মাকে সে তাই বললে সরল ভাবে। বল, তুই কী, তুই কে। তুই না বলে দিলে আমি বুঝব কি করে ? আমি কি শাস্ত্র জানি না ব্যাকরণ জানি ? যখন তুই আমাকে তা শেখালি না তখন নিজে থেকে আমাকে সব দেখিয়ে দে। নইলে হলধারীর সঙ্গে আমি লড়ব কি দিয়ে ? ও শাস্তর-জানা পণ্ডিত, কত শত বচন ওর মুখস্থ। ওর সঙ্গে আমি পারব কেন ? তুই যদি কিছু না বোঝাস, তবে বুঝব হলধারীর কথাই ঠিক। তুই তামসী, তুই—

মা দেখিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, আমি ত্রিগুণাতীত, আবার সর্বগুণাশ্রয়ী। স্বরূপতঃ নির্গুণ আবার মায়ারূপে সগুণ। নির্গুণ সগুণের অধিষ্ঠান। সগুণ নির্গুণের উদ্ঘাটন। সমুদ্রকে আশ্রয় করেই তরঙ্গের লীলা। তরঙ্গকে আশ্রয় করে সমুদ্রের উন্মোচন। আবার আমি আকাশ। সমস্ত গুণের অতীত। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি শূন্য।

'তবে রে—' দ্রুত বেগে ছুটল গদাধর। হলধারী পুজো করছিল, একেবারে তার ঘাড়ে চেপে বসল। 'তবে রে, তুই আমার মাকে তামসী বলিস ? মা আমার সর্ববর্ণময়ী আবার ত্রিগুণাতীতা। এত শাস্ত্র পড়িস আর তুই এটুকু জানিস না ?'

মুহ্যমানের মত তাকিয়ে রইল হলধারী। কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝতে পেল না। মনে হল,

এ যেন গদাধর নয়, তার মাঝে সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব।

ফুল-বেলপাতা হঠাৎ গদাধরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বসল।

হৃদয় কাছেই ছিল। শুনিয়ে দিল টাস-টাস।

'কি গো মামা, বলতে না গদাধর পাগল হয়েছে? এখন? এখন যে নিজেই বড় পায়ে ফুল দিয়ে পূজো করছ?'

'কি জানি, আমিই বুঝি পাগল হয়ে গেলাম।' বিহ্বলের মত বললে হলধারী: 'তার মাঝে আমার স্পষ্ট ঈশ্বরদর্শন হল।'

কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের।

গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখে আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে।

ছুটে গেল হলধারীর কাছে। শুধোলে, 'দাদা, এ কি হল?'

'একে গলিতহস্ত বলে।' বললে হলধারী: তোর ঈশ্বর-দর্শন হয়েছে। ঈশ্বর-দর্শনের পর তর্পণ থাকে না।'

কোনো কর্মই থাকে না সমাধি হলে।

ঠাকুর বললেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে: 'যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে কত কথা। কত গুণগুঞ্জন। যাই তুমি এসে পড়েছ অমনি সব কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তোমার দর্শনেই সুখ।'

যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণই পাখা চালানো। যখন হাওয়া আপনি আসে তখন আর পাখার দরকার কি। তখন তার স্পর্শনেই আনন্দ।

ষোলো

রাসমণির কালীমন্দিরে গদাধর আর পূজো করছে না—কামারপুকুরে চন্দ্রমণির কানে খবর পৌঁছুলো।

কেন করছে না রে পূজো? কী হয়েছে আমার গদাধরের?

মাথা-খারাপ হয়েছে। হারিয়েছে সমস্ত মাত্রা-জ্ঞান। এমন কাণ্ডকারখানা সব করছে যা সব সময় পাগল-ছাগলেও করে না। তোমার ছেলেকে বাড়ি আসতে বলো।

চন্দ্রমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। চিঠির পর চিঠি লেখাতে লাগলেন রামেশ্বরকে দিয়ে। তুই আমার কাছে চলে আয়। ছেলেবেলায় তোর যে রকম অসুখ হত, তাই বোধ হয় আবার সুরু হয়েছে। এখানে গাঁয়ের জল-হাওয়ায় তোর শরীর ভাল হবে, ভাল হবে আমার যত্ন-আত্তিতে। ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়। তোকে না দেখে-দেখে আমার দুই চোখ ক্ষয় হয়ে গেল।

কামারপুকুরে, মার অঞ্চলের ছায়ায় ফিরে এল গদাধর।

কিন্তু এ কী হয়ে গেছে সে! কখনো জড়ের মত উদাসীন হয়ে বসে থাকে, কখনো আপন মনে হাসে, কখনো বা 'মা' 'মা' বলে কেঁদে আকুল। এই ব্যাকুল-করা মা-ডাকেই বেশি কাতর হন চন্দ্রমণি। কি ভাবে প্রতিকার করবেন বুঝতে পারেন না। প্রাণের সমস্ত স্নেহ আর আশীর্বাদ দুই করতলে ডেকে এনে ছেলের বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। একটু বা সুস্থির হয় গদাধর। হাসি-খুশি হয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-গল্প করে।

কিন্তু কতক্ষণ সেই স্বভাবস্থিতি! কিছুক্ষণ পরে আবার সেই ভাবাবেশ। সেই বহির্জ্ঞানশূন্য আচরণে না আছে লজ্জা, না আছে ঘৃণা, না [illegible] ভয়লেশ। একেবারে নির্মুক্ত-নিঃসীম। ঘর-সংসার বলে কিছু আছে, সে সম্বন্ধে চেতনা নেই। লোকলজ্জা বলে কিছু আছে, নেই সেই সংকীর্ণ সংস্কার।

ঠিক পাগল হয়নি। পাগল হলে মা চন্দ্রমণিকে, এত ভালবাসে কি করে, পুরো বন্ধুদের সঙ্গেই বা কেন এত ঠাট্টা-ইয়াকি। তা কথা, উপদেবতা ভর করেছে। ওঝা ডাকাও।

পাঁচ জনার পরামর্শে ওঝা ডাকালেন চন্দ্রমণি। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করলে, মন্তর আওড়ে একটা পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিলে গদাধরকে। বললে, ভূত যদি হয় এতেই পিঠটান দেবে। যদি না হয়—মনে-মনে হাসল গদাধর।

ওতে কিছু হবে না। চণ্ড নামাতে হবে।

এল চণ্ডর ওঝা। মস্ত বড় গুনিন। তন্ত্রে-মন্ত্রে নিপুণ।

চণ্ড নামবে—গ্রাম্য লোকজন এসে ভিড় করে। এবারে অব্যর্থ ব্যাধি-শান্তি হবে গদাধরের। যথা-বিধি পূজো হল, বলি দেওয়া হল চণ্ডকে। চণ্ড এসে

অধিষ্ঠান হল শূন্যে। ওঝাকে উদ্দেশ করে বললে, ওকে ভূতে পায়নি, ওর কোনো আধিব্যাধি নেই—'

পরে সম্বোধন করলে গদাধরকে : 'কি হে সাধু, সাধুই যদি হবে, তবে অত শুপুরি খাও কেন?'

সময় নেই অসময় নেই, শুপুরি খেত গদাধর। থা শুনে সে তো হতবাক্।

'বেশি শুপুরি খেলে কাম বাড়ে। ও খাবে না।' শুপুরি ত্যাগ করল গদাধর।

গ্রামের দুই ধারে দুই শ্মশান—ভূতির খাল আর বুড়ী মোড়ল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়ই শ্মশানবাস করে গদাধর। হাঁড়ি করে মেঠাই নিয়ে যায়, শিবা আর প্রমথদের ভোগ দেয়। যে হাঁড়ি শেয়ালের জন্যে, কোত্থেকে দলে-দলে এসে খেয়ে যায় নিশ্চিন্তে। আর যে হাঁড়ি ভূত-প্রেতের জন্যে তা হঠাৎ শূন্যে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। আধার আধেয় কিছুরই পাত্তা পাওয়া যেত না। কোনো-কোনো দিন বা স্পষ্ট সাক্ষাৎ হত পিশাচদের সঙ্গে। রহস্যও হত কিছু-কিছু।

এক দিন নিশীথ রাত্রেও গদাধরের বাড়ি ফেরার নাম নেই। মা'র কাছে ছোট ছেলে চিরকালই ছোট ছেলে—চন্দ্রমণি শ্মশানে পাঠিয়ে দিলেন রামেশ্বরকে। গদাধরকে গিয়ে ধরে নিয়ে আয়। শেষে কি মা'র ঘর শ্মশান করে শ্মশানেই বসতি করবে?

শ্মশানের প্রান্তে এসে নিঃসাড় অন্ধকারে ডাকতে লাগল : গদাই, গদাই, ওরে গদাই আছিস?

'যাচ্ছি গো দাদা—' প্রতিধ্বনি করল গদাধর। গিয়ে বললে, 'এদিক পানে আর এগিয়ো না। ওদের সঙ্গে তো এঁটে উঠছে না, তাই তোমার অনিষ্ট করবে। তুমি ফিরে যাও।'

শ্মশানে বসতে পেরে অনেক শান্ত হয়েছে মন। একটি বেলগাছ পুঁতেছে। আর বুড়ো অশ্বথ গাছ ছিল ডাল-পালা ছড়িয়ে, তারই তলায় আসন নিলে। সেখানে ঘন-ঘন কালীদর্শন হতে লাগল তার। দেখতে লাগল সে কর্ত্রী-ধাত্রী সংসারৈকসারাকে। যে সাকারশক্তিস্বরূপা বদনা খড়্গমুণ্ডাভিরামা। আগম-নিগম-কল্পময়ী, সর্বার্থপ্রদায়িনী।

শান্ত হয়েছে বটে কিন্তু ঔদাসীন্য যায় না। যায় সংসার-অস্পৃহা। বসনেই আঁট নেই, আর তবে আটা থাকবে? কি করে সংসারে একটু মন পড়বে? মনে কি করে আসবে একটু মোহ-মমতা?

বিয়ে দাও গদাধরের।

রামেশ্বরে আর চন্দ্রমণিতে লুকিয়ে-লুকিয়ে পরামর্শ হচ্ছে। পাছে গদাধরের কানে গেলে সে সব ভণ্ডুল করে দেয়। কিন্তু তুমি দেয়ালের কান এড়াতে পারো, গদাধরের কান এড়াতে পারো না। ঠিক সে শুনে ফেললে।

শুনে তার কেমনতরো ভাব হল না জানি!

'ওরে, আমার বিয়ে হবে!' উল্লাসে উথলে উঠল গদাধর। শিশুর মত উল্লাস। শিশুর মতই নৃত্যানন্দ। বাড়িতে কোনো উৎসব হলে বা প্রিয় আত্মীয়ের আসার সম্ভাবনা ঘটলে শিশু যেমন মাতামাতি করে তেমনি। যেন সব চেয়ে প্রিয় সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কে আসছে তার সংসারে। তার সমস্ত প্রার্থনার প্রতীক, প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী।

বিয়েতে মন আছে গদাধরের। নিশ্চিন্ত হলেন চন্দ্রমণি, নিশ্চিন্ত হলেন রামেশ্বর। ঘটক লাগালেন। ঘটক আর কেউ নয় হৃদয়ের দাদা লক্ষ্মী মুখুজ্জে।

শিয়ড়ে, হৃদয়দের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে গদাধর। যাচ্ছে পাল্কিতে চড়ে। মুক্ত নীল আকাশ আর ঢেউ-খেলানো আদিগন্ত ধান-ক্ষেত দেখতে-দেখতে গদাধরের ভাবাবেশ হল। তার ভিতরে যে আদি-কবি ধ্যানস্থ ছিলেন, তিনি যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু উন্মীলন করলেন। গদাধর দেখল তার দেহ থেকে দু'টি কিশোর বয়সের ছেলে বেরিয়ে এসে মাঠময় ছুটোছুটি করে খেলা করছে। কখনো যাচ্ছে অনেক দূরে চলে, কখনো বা এসে পড়ছে পাল্কির কাছটিতে। নীরব ছায়ার মত ভাসছে না, দস্তুরমতো হাসছে, কথা কইছে, গান গাইছে। কারা এই দু'টি ছেলে? কোন্ দেশের? তার শরীরের মধ্যে বাসা নিল কি করে?

অনেক দিন এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। বছর দেড় বাদে দক্ষিণেশ্বরে বামনিকে প্রশ্ন করেছিল গদাধর : 'ঐ দু'টি ছেলে কে বলতে পারো? আমি ভুল দেখিনি তো?'

'না বাবা ভুল দেখনি। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। তোমার মাঝে এবার চৈতন্য আর নিত্যানন্দ দুই-ই এসে বাসা নিয়েছেন। ঐ দু'টিতেই খেলছিল ছুটোছুটি করে।'

... ... গান হচ্ছে। তাই অনুরাগের ধর্মই হচ্ছে স্মরণ-চিন্তন-অনুধ্যা... সুতরাং

...দেখতে এসেছে গদাধর। ভিড় হয়েছে বিস্তর। অনুরাগের বস্তুতে নিয়তচিত্ত হয়ে থাকা ... ক্ষ।

পুরুষ মেয়ে—আর, সর্বত্রগামী অনুষঙ্গ, ছেলেপিলেও অনেক এসেছে। এক স্ত্রীলোকের কোলে তিন-চার বয়সের এক খুকি। ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে সভার মধ্যে। স্ত্রীলোকটি তাকে রঙ্গ করে জিগগেস করছে: বিয়ে করবি? সম্মতিতে ঘাড় হেলায় মেয়ে। এত লোকের মধ্যে কা'কে বিয়ে করবি? কা'কে তোর পছন্দ? হাত তুলে নিকটে-বসা গদাধরকে দেখিয়ে দিল স্বচ্ছন্দে।

ঐ যে স্ত্রীলোকটি মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে সে শিয়ড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরী। জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এসেছে বাপের বাড়িতে বেড়াতে। কোলে প্রথম সন্তান সারদা।

বাপের বাড়িতে শ্যামাসুন্দরীর তখন অসুখ। এক দিন এল্লা-পুকুরের পাড়ে বাইরে গেছে—ঠাহর নেই—বসে পড়েছে এক বেল গাছের তলায়। কাছেই গাঁয়ের কুমোরদের পোয়ান, যেখানে পোড়ানো হয় হাঁড়িকুঁড়ি। সেখানে হঠাৎ ছোট-ছোট পায়ে নূপুর বেজে উঠল রুনুঝুনু। দেখতে-দেখতে ছোট একটি কচি মেয়ে ছুটে এল নাচতে-নাচতে। শ্যামাসুন্দরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরলে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল শ্যামাসুন্দরী। মনে হল সেই মেয়ে তার পেটে ঢুকেছে।

তেমনি রামচন্দ্র এক দিন দুপুরে ঘুমুচ্ছে, স্বপ্ন দেখল একটি ছোট্ট মেয়ে তার পিঠের উপর পড়ে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরছে। হাতে-গায়ের গয়নায় মেয়ের রূপ যেন আরো খুলেছে। এই গরিবের ঘরে কে মা তুমি? এখানে কি করতে এলে? মেয়েটি বললে, 'এই এলুম তোমার কাছে।'

আটুই পৌষ, বারোশ ষাট সাল, গদাধরের জন্মের প্রায় আঠারো বছর পর, জয়রামবাটিতে শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে হল। নাম রাখলে সারদা।

ঠাকুর বললেন, "এ সরস্বতী। ও সারদা। ও জ্ঞান দিতে এসেছে।"

ভক্তির পথও সত্যি, জ্ঞানের পথও সত্যি। ভক্তি মানে ঈশ্বরে পরানুরক্তি। "সুখানুশয়ো রাগঃ"। বিষয় যত সুখকর তত তীব্র তাতে অনুরাগ। আর যাতে অনুরাগ পরম বা নিরতিশয় তাই ঈশ্বর।

যোগশাস্ত্রের ভাষায় তাই সমাধি। তাই ভক্তি ... যোগে কোনো ভেদ নেই। জ্ঞানও অভিন্ন। ... পরমাত্মবোধ জেগে থাকবে তখনই জ্ঞান। ... শাস্ত্রে তাকে বলে "অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি"। ... বিষয় ত্যাগ করে পরমাত্মাকেই সর্বদা বোধগ... রাখাই প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ।

ভক্তিই বলো যোগই বলো আর জ্ঞানই ব... অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততাই মুখ্যবৃত্তি।

কিন্তু যতই বিচার-আচার করো, মার কৃপা না হলে কিছুই হবার জো নেই। মানুষের কতটুকু শক্তি? কতটুকু সে চেষ্টা করতে পারে? কাম কাঞ্চন ঠিক-ঠিক মিথ্যে জগৎ তিন কালেই ঠিক-ঠিক অ-সৎ মনে-জ্ঞানে এ ধারণা করা কি যে-সে কথা? মা'র দয়া না হলে কি হয়? কথায় বলে, এক একটি জোয়ানের দানায় এককেটি ভাত হজম করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয় তখন একশোটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না। শুধু মাকে প্রসন্ন করো, মা'র কৃপার জন্যে ... থাকো। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

জয়রাম মুখুজ্জের মেয়ে কালীর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে ঘটক। কিন্তু জয়রাম বেঁকে বসল ... না হোক, ক্ষ্যাপা তো বটে—তাকে জামাই কর... কি। তা ছাড়া কোনো-কোনো জায়গায় রামেশ্বর নিজে এগোতে চাইল না। তখনকার দিনে কন্যা-পক্ষেরই পণ নেবার প্রথা। এককে জায়... এমন দর হাঁকল, যা রামেশ্বরের নাগালের বাইরে। তবে? এখনও ইতিকর্তব্য কি?

খুব সোজা। চাষাদের শশার ক্ষেত দেখেছ?

বিরস ও বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন চন্দ্রা... পাশে রামেশ্বর। দু'জনেই চমকে উঠলেন।

যে শশাটি ভাল ফলেছে তাতে চাষা একটি ... বেঁধে রাখে। কুটো বেঁধে চিহ্ন দিয়ে ... ভগবানকে ভোগ দেবে বলে। যাতে ভুলে ... গোলমালে না বিক্রি হয়ে যায়। তেমনি—

তেমনি কি? মা-দাদা উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'তেমনি আমার বিবাহের পাত্রী জয়রাম... গাঁয়ের রাম মুখুজ্জের বাড়িতে কুটোবাঁধা হয়ে আ...' বললে গদাধর, 'মিছে তোমরা এখানে-ও...

...খুঁজি করছ। এতে ভাবনারও কিছু নেই, ...রাণিরও কিছু নেই।'

জয়রামবাটিতে লোক পাঠালেন চন্দ্রমণি। কিন্তু ...র যা এল তা বিশেষ উৎসাহবর্ধক নয়। আর ... মিলেছে বটে কিন্তু পাত্রীর বয়স মোটে পাঁচ ...র।

হোক পাঁচ বছর! গুপ্ত ভাবেই আপ্ত লীলা ...ন্মাতার। হয়তো এই জনকনন্দিনী সীতা। ... কৃষ্ণ-উন্মাদিনী রাধিকা। শিবভাবভাবিনী ...গবতী। চন্দ্রমণি মত দিলেন।

কন্যা-পক্ষের পণ তিনশো টাকা। তা হোক, ...োগাড় করলেন রামেশ্বর। বিয়ের দিন ঠিক হল ...৬৬ সালের বোশেখ মাসের শেষ বরাবর। ...াধর চব্বিশ বছরে পা দিয়েছে, সারদা ছ' বছরে।

জয়রামবাটিতে বিয়ে। জয়রামবাটি কামারপুকুর ...কে মাইল চারেকের পথ—পশ্চিমে। বরবেশে ...দাধরকে না-জানি কেমন দেখাচ্ছে! শক্ত ...রে কসি-বাঁধা সুন্দর ধুতি পরবে, গায়ে কুর্তা, ...লায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনলেপ। ...তিবেশিনীরা এসে সাজিয়ে দিয়েছে গদাধরকে। কিন্তু মেজ বৌঠানের মনে দুঃখ, বাজনা নেই। অন্তত ঢোল আর কাঁসর না হলে বিয়ে কি!

দাঁড়াও, আমিই ঢোল বাজিয়ে দিচ্ছি।

দু'হাতে পাছা বাজিয়ে নাচতে লাগল গদাধর। মুখে বোল তুললে ঢোলের। রঙ্গ দেখে সকলে হেসে ...ন। মেজ বৌঠানের মনেও আর খেদ নেই।

বিয়েতে চলেছে—এমন সময় ঢোলের বাজনা!

বাল্যভাব না ধরলে গদাধরকে বুঝতে পারবে না ...।

খালি পায়ে খোলা গায়ে বরযাত্রী চলেছে সব। ...রে চাঁদর, কাঁধে গামছা, হাতে লাঠি। শিবের বিয়েতে চলেছে সব তাল-বেতাল ভূত-...ের দল। মধ্যে চলেছেন কন্দর্পদর্পনাশী ...কেশ।

...রদার সঙ্গে কেমন না-জানি শুভদৃষ্টি হল ...রের। অপর্ণার সঙ্গে মহাদেবের। শ্রীকৃষ্ণের ...মতীর।

...ধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর ... অভেদ, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ... প্রকৃতির যোগই যোগমায়া। বঙ্কিম ভাব ঐ যোগের জন্যে। এই যোগ দেখার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তো যেহেতু শ্রীমতীর গৌর বর্ণ মুক্তোর মত উজ্জ্বল। শ্রীমতীর বসন নীল বলে পীতাম্বর হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়েও নূপুর। তার মানে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে-বাহিরে মিল। যেমন ধরো আবার শিব-কালীর মূর্তি। শিবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কালী, শিব শব হয়ে পড়ে আছেন পদতলে। আর কালী তাকিয়ে আছেন শিবের দিকে। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্তা। তাই শিব শব হয়ে আছেন। কিন্তু পুরুষের যোগেই প্রকৃতির লীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রাসোৎসব। শিব আর শক্তি ভিন্ন সংসারে আর কিছু নেই।

শিব আর শক্তির চারি চক্ষুর মিলন হল।

সাতাশ কাঠি জ্বেলে এয়োরা বরকে প্রদক্ষিণ করছে, হঠাৎ জ্বালা-কাঠি লেগে গদাধরের হাতের বাঁধা হলুদে-মাখানো মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে গেল।

এটা কি হল?

অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অবিদ্যা-মুক্ত শক্তিকে গ্রহণ করল গদাধর।

ঠাকুর বললেন, 'এই অবিদ্যাকে জয় করবার জন্যেই তো শক্তির পূজা-পদ্ধতি। তাকে প্রসন্ন করবার জন্যেই দাসী ভাবে বীর ভাবে সন্তান ভাবে আরাধনা। রমণ দ্বারা প্রসন্ন করার নাম বীর ভাব। সে বড় উৎকট সাধনা। আমার সন্তান ভাব। স্ত্রীলোকের স্তন আমি মাতৃস্তন মনে করি। মা'র দাসী ভাবে সখী ভাবে ছিলাম দু'বছর। মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। বিয়ের সময় বাংলা দেশে বরের হাতে জাঁতি থাকে, পশ্চিমে থাকে ছুরি। তার মানে, ঐ শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়া-পাশ ছেদন করবে। এটিও বীর ভাব। কন্যা শক্তিরূপা। বিয়েতে বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে। কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।'

বাসর সাজাচ্ছে মেয়েরা। ওদিকে পাত পড়েছে নিমন্ত্রিতদের।

রঙ্গিনীরা ধরলে গদাধরকে, গান ধরো একখানা।

কত রসরঙ্গই যে করছে মেয়েরা, কত লীলা-চাপল্য। দেখতে-দেখতে ভুবনরঞ্জিনীর কণ্ঠ ...

পড়ে গেল গদাধরের। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, গান গাইবে বৈ কি। মুক্ত-উদার গলায় শ্যামাগুণগান সুরু করলে। যারা খাচ্ছিল, খাওয়া ভুলে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। রঙ্গিনীরা রঙ্গ ভুলে পাষাণবৎ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। গদাধর তন্ময়, বিভোর, বাহ্যজ্ঞানহীন। লুটিয়ে পড়ে রঙ্গিনীদের প্রণাম করতে ব্যস্ত। মা, মা গো, সর্বত্র তুই, সর্বত্র তোর আনন্দের ছড়াছড়ি!

মধুর স্বরে নামোচ্চারণ করছেন ঠাকুর। আর বলছেন মাকে: 'ও মা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করে রাখিস নে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা। আমি আনন্দ করব, বিলাস করব! শুঁটকে সাধু আমি হব না।'

সতেরো

ঘর-আলো-করা বউ এসেছে সংসারে।

বরবধূকে দেখবার জন্যে কত লোক এসেছে আনন্দ করে। কত শান্তির দিন আজ চন্দ্রমণির! কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও একটা দুঃখের কাঁটা তাঁর মনের মধ্যে খচ-খচ করছে।

বউয়ের গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

বউকে গয়না গড়িয়ে দেবেন এমন সঙ্গতি নেই চন্দ্রমণির। লাহা বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এসে বিয়ের দিন সাজানো হয়েছিল বউকে। ফিরিয়ে দেবার দিন আজ। লাহা বাবুদের কাছে মুখ থাকবে না নইলে। কিন্তু কোন মুখেই বা ঐ কচি গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নেব?

মা'র মনের ব্যথাটা বুঝতে পেরেছে গদাধর। বললে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমিই খুলে নিতে পারব।

ঘুমিয়ে পড়েছে সারদা। শৈশব শান্তিতে ঘুমিয়েছে।

ডান হাতখানি আলগোছে আলতো করে তুলে ধরছে গদাধর, সন্তর্পণে খুলে নিচ্ছে গয়না। তেমনি এক সময়ে আবার বাঁ হাত থেকে। ক্রমে-ক্রমে একে-একে আর সবগুলি। সারদা যেমন ঘুমে তেমনি ঘুমে।

টের পেলে ঘুম থেকে জেগে উঠে। এ কি, তার গায়ের গয়না কি হল? কে নিল? কাঁদতে বসল সারদা।

চন্দ্রমণির বুক ফেটে যাচ্ছে। সারদাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগলেন। বললেন 'গেলে গেছে। তুমি কেঁদো না, এর চেয়ে ঢে[illegible] ভালো গয়না কত দেবে তোমাকে গদাই।'

সারদা শান্ত হল বটে, কিন্তু তার খুড়ো মেনে নিতে চাইলেন না ঘাড় পেতে। নতু[illegible] বালিকা-বধূকে একেবারে বৈরাগিনী সাজিয়ে দেওয়া যা নয় তাই দিয়ে সাজিয়ে ফের সেই সাজ লুকিয়ে খুলে নিয়ে যাওয়া। এ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি। ঘোর বিরক্ত হলেন। সারদাকে নি[illegible] সোজা ফিরে গেলেন জয়রামবাটি।

'কোথায় আর যাবে?' পরিহাসচ্ছলে মা[illegible] প্রবোধ দিল গদাধর। 'ও ফিরে না আসুক কি[illegible] বিয়ে তো আর ফিরবে না।'

শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপর-হাতে তাবিজ আর নিচের হাতে বালা।

ওরে, বালা কিন্তু ডাইমন-কাটা হবে।

ঠাকুরের দেখি গয়নার নক্সার উপরেও নজর।

ওরে, পঞ্চবটীতে যখন সীতা দেবীকে দেখেছিল[illegible] তখন তাঁর হাতে ডাইমন-কাটা বালা ছিল[illegible] সেই রকম বালা দেব ওকে।

বিষ্ণুঘরের যখন গয়না চুরি গেল, মথুর বা[illegible] ঠাকুরকে খোঁটা দিলেন: 'ছি ঠাকুর, তুমি তোমা[illegible] গয়না রক্ষা করতে পারলে না!'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি[illegible] স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব[illegible] তুমি কী ঐশ্বর্য তাঁকে দিতে পারো? ও গয়[illegible] তোমার পক্ষেই একটা ভারী জিনিস, মস্ত জিনি[illegible] কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মাটির ডালা।'

সেই কথাই আবার বলছিলেন কেশব সেনকে 'তোমরা অত ঐশ্বর্য বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্[illegible] তুমি সূর্য করেছ, চন্দ্র করেছ, আকাশ করেছ—এ[illegible] বলার কী দরকার? শুধু বাগান দেখেই তারি[illegible] করে লাভ কি? বাগানের মালিক বাবুকে দেখ[illegible] না? বাগান বড় না বাবু বড়? নরেন্দ্রকে য[illegible] আমি দেখলাম, তখন আমি শুধু তাকেই দেখলাম[illegible] তার কোথায় বাড়ি, বাবার কি নাম, কি ক[illegible] তারা কটি ভাই ভুলেও এক দিন জিগগেস করল না। আমার অত খবরে কাজ কি? আমি অ[illegible] খেতে এসেছি, আম খেয়ে যাব। বাগানে ক[illegible]

গাছ, কটা তার ডাল-পালা, কত তার পাতা—ও খোঁজে আমার কি হবে? মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসেবে আমার কী দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে গেছে।'

তবে কি জানো? মানুষ নিজে ঐশ্বর্য ভালোবাসে বলে ভাবে ঈশ্বরও বুঝি তাই ভালো-বাসেন। ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। ঈশ্বরের কাছে ও-সব বাজিকরের বাজি। পঞ্চভূতের কুহক-কৌশল।

ঠাকুর যখন কলকাতায় আসতেন হৃদয় তাঁকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শহর দেখাত। এক দিন বললে, 'ওই দেখ মামা, লাট সাহেবের বাড়ি। দেখেছ? কত বড়-বড় থাম!'

ঠাকুর মাকে দেখলেন। মা-ই সব দেখিয়ে দিলেন ঠাকুরকে। দেখিয়ে দিলেন কতগুলি মাটির চাক থাক-থাক করে সাজানো।

শম্ভু মল্লিক মস্ত বড়লোক—মা-অন্ত প্রাণ। মথুর বাবুর মারা যাবার পর মা'র নির্দেশে তিনিই হলেন ঠাকুরের রসদদার। ঠাকুরকে বললেন, 'এখন এই আশীর্বাদ করো, যাতে আমার যা-কিছু ঐশ্বর্য সব তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কী দেবে? কী আছে তোমার দেবার? তাঁর কাছে এ সব ধুলো-মাটি।'

যদি কিছু দিতে চাও ভক্তি দাও, প্রাণঢালা ভক্তি। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ, তিনি ভাবের বশ। তিনি কি তোমার কাছে টাকা-কড়ি ধন-দৌলত চান? তিনি চান ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা।

গদাধর সে বার প্রায় বছর দুই ছিল কামারপুকুরে। শরীর ভালো করে না সারলে চন্দ্রা তাকে কিছুতেই আর যেতে দেবেন না কলকাতায়। এদিকে সারদা সাত বছরে পা দিল। এর মধ্যে একবার গদাধরকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হয়। জোড়ে' ফিরতে হয় বউ নিয়ে।

তাই গেল গদাধর।

সাত বছরের মেয়ে সারদা—তাকে কে বলে কে জানে—ঘটি করে জল নিয়ে এল। নিয়ে এল পাখা। রূপের পুতলি সেই মেয়ে, মাথাভরা এক রাশ কালো চুল পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জল ঢেলে গদাধরের পা ধুয়ে দিতে লাগল সারদা। জল-ভরা ছোট ছোট দু'টি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ের উপর। শেষে হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে মাথার চুলে পা মুছে দিতে লাগল।

পা-ধোয়ানোর পর কাছে এসে দাঁড়াল সারদা। ছোট হাতে পাখা নেড়ে-নেড়ে হাওয়া দিতে লাগল গদাধরকে।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বসেছেন বিষ্ণুর পদসেবায়। কিংবা, সারদা গদাধরের।

এই সেবাতেই নিয়তস্থিতা সারদা। বারো শো একাত্তর সালে দুর্ভিক্ষ লেগেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। সারদার তখন এগারো বছর বয়েস, আছে বাপের বাড়িতে। খিদের তাড়নায় কত লোকই যে আসত কাতারে-কাতারে। রামচন্দ্র, সারদার বাবা, চাল-ডালে খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন হাঁড়ি-হাঁড়ি। বলতেন, 'বাড়ি আর বাড়ির বাইরের সবাই খাবে এ খিচুড়ি। যে আসবে সে। শুধু আমার সারদার জন্যে দু'টি ভালো চালের ভাত করো—'

তাকে তো শুধু খাওয়ানো নয় তাকে একটু ভোগ দেওয়া।

একেক দিন এত লোক এসে পড়ত যে রাঁধা খিচুড়িতে কুলোত না। আবার চড়ানো হত তক্ষুনি। আর সেই গরম খিচুড়ি ঢেলে দিত ক্ষুধার্তদের পাতায়। যেমন তপ্ত খিদে তেমনি তপ্ত খিচুড়ি। সারদা পাখা নিয়ে এসে দুই হাতে বাতাস করত। আহা, শিগগির করে জুড়োক, খিদের অন্ন কতক্ষণ মুখে না দিয়ে থাকা যায়!

এগারো বছরের বালিকা নয়, স্বয়ং বিশ্বমাতা। দুঃখার্ত জীবের ক্ষুধাহরণ করতে এসেছেন।

তার আগে, পাঁচ বছরের যখন মেয়ে তখন থেকে সে সংসারের কাজে সাহায্য করছে। ক্ষেত থেকে তুলো তুলে এনে চরকায় পৈতে কাটছে। মুনিষদের মুড়ি-গুড় দিয়ে আসছে মাঠে। একবার পঙ্গপাল এসে সমস্ত ধান নষ্ট করে দিলে। মাটি থেকে ধান কুড়োবার পালা পড়ল। সারদার ছোট-ছোট দু'টি মুঠিতে কি কম জায়গা? সেও লেগে গেল ধান কুড়োতে। আকণ্ঠ জলে নেমে গরুর জন্যে দলঘাস কাটছে। একবার দলঘাস কাটিতে গিয়া

দেখলে, তারই সমবয়সী আরেকটি মেয়ের হাতে দা, সেও কাটছে দলঘাস। কে মেয়ে, কেন কাটছে, কে বলবে। কাটছে বটে কিন্তু নিচ্ছে না। একটি দল কেটে উপরে রেখে এসে সারদা দেখছে আরেকটি দল কেটে রেখেছে মেয়েটি। সারদাকে আর কাটতে হচ্ছে না।

এমনি আরো কত দেখেছে সারদা। তেরো বছর বয়সে যখন সে আবার কামারপুকুরে যায়, তখন হালদার-পুকুরে একা-একা নাইতে যেতে তার ভয় হত। নতুন বউ, একলা ঘাটে যাবে কি! খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে, আটটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। তারাও নাইতে চলেছে। আর তবে কিসের ভয়! রাস্তায় নামল সারদা, মেয়েছেলেদের চার জন তার আগে, চার জন তার পিছনে। তার সঙ্গে তারাও আগে-পিছে হয়ে স্নান করলে। তেমনি করে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়ি। এমনি শুধু এক দিন নয়, নিত্যি।

কিন্তু কারা এরা, গ্রামের নতুন ছুটুলে বউ সারদা, তার সে কি জানে!

এবার, সাত বছর বয়সে, স্বামীর সঙ্গে 'জোড়ে' এসেছে সে কামারপুকুর। কিন্তু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবার পরেই গদাধর জেদ ধরল, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাব।

চন্দ্রমণি আর পিড়াপিড়ি করতে পেলেন না। গদাধর এখন অনেক সুস্থ হয়েছে, শান্ত হয়েছে। তার পর বিয়ে করেছে সজ্ঞানে। চন্দ্রমণির এখন অনেক আশ্বাস, অনেক জোর। সারদাই তাঁর সেই বল-ভরসা।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ফিরেই গদাধর আবার যে-কে-সে। কোথায় তার মা-ভাই কোথায় তার স্ত্রী-সংসার! আবার, দেখতে-দেখতে, বুক তার লাল হয়ে উঠল, সুরু হল দুঃসহ গাত্রদাহ। আবার চোখের কোণ থেকে ঘুম গেল অদৃশ্য হয়ে। আবার দেখা দিল সেই অসাধ্য রোগ।

আবার সুরু হল মা'র জন্যে কান্না।

'তোকে ডাকার এই ফল হল, মা? শরীরে এই বিষম ব্যাধি দিলি? যায় থাক এই শরীর, তবু তুই আমাকে ছাড়িস্‌নি। তুই আমাকে দেখা দে। আমায় শুধু তুই এইটুকু কৃপা কর। আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই তুই ছাড়া—'

[ক্রমশঃ।

স্বগত

গৌতম দাশ

যতই চেঁচাও! কথাগুলোকে যতই পেঁচাও,
রটনাকে তুমি যতই বানাও ঘটনা,—
পাকা ঘুঁটিকে যতই কাঁচাও!
গোবর-জলে যতই আঁচাও—
যতই তুমি নাচো আর নাচাও—
এ কথা তুমি জানবে দাদা,
একদা ঐ গাধার হাতেই বনবে তুমি গাধা!
জানবে সেদিন, সুরের দোলায় দোলে যত কাঁচাও।

ঋগ্বেদ—রূপান্তর

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৭।৬৩।১৬

সূর্য্য দেবতা—৪½ ঋক্

মিত্রাবরুণ দেবতা—১½ ঋক্

বশিষ্ঠ ঋষি ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ।

উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ
সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্।
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্‌
চর্মেব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি ॥ ১ ॥

উদ্বেতি প্রসবীতা জনানাং
মহান্ কেতুরর্ণবঃ সূর্যস্য।
সমানং চক্রং পর্যাবিবৃৎসন্
যদেতশো বহতি ধূর্ষু যুক্তঃ ॥ ২ ॥

বিভ্রাজমান উষসামুপস্থাদ্
রেভৈরুদেত্যনুমদ্যমানঃ
এষ মে দেব সবিতা চচ্ছন্দ
যঃ সমানং ন প্রমিনাতি ধাম ॥ ৩

দিবো রুক্ম উরুচক্ষা উদেতি
দূরেঅর্থস্তরণি র্ভ্রাজমানঃ
নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতা
অয়ন্নর্থানি কৃণবন্নপাংসি ॥ ৪

যত্রা চক্রুরমৃতা গাতুমস্মৈ
শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ।
প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম
নমোভির্মিত্রাবরুণোত হব্যৈঃ ॥ ৫ ॥

নূ মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্
ত্মনে তোকায় বরিবো দধন্তু।
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

মানবের কাছে সাধারণ সেই দেবতা—
—ঐ সূর্য্য—
ঊর্দ্ধে উদিত হচ্ছেন।
আহা, কী প্রদীপ্ত তাঁর ঐশ্বর্য্য !
মিত্র এবং বরুণের ইনিই প্রকাশক-নেত্র।
এঁর বিচার-নেত্রে
তমসার খণ্ডগুলি
যেন চর্ম্মের শোভা। ১।

ঊর্দ্ধে উদিত হচ্ছেন—
—সেই সূর্য্য—
জাতমাত্রের তিনি প্রসবিতা
কর্ম্মে এবং চেষ্টায়,
মহান্ এক জ্ঞানের
যেন অশান্ত প্রতীক্,
এক-রূপী যেন একখানি চক্র।
সেই চক্রকে
চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত করবার লিপ্সা নিয়ে
উদিত হচ্ছেন সূর্য্য ॥
ঐ দেখ
চক্রধূরিতে সংলগ্ন হয়ে
সূর্য্যকে বহন করে ছুটে চলেছে—
হরিৎ-বর্ণ অশ্বগ্রাম—
—এতশ্ ॥ ২ ॥

উদিত হচ্ছেন সূর্য্য—
উষা-দেবীদের দীপ্ত অঙ্কে।
গান গেয়ে চলেছে—উদ্গানকারীরা—
আনন্দের আনুগত্যে।
আমার এই দেবতা—
এই—জননলিঙ্গ সবিতা—
ছন্দিত করেছেন নিখিলতাকে ;
এঁর তেজঃ-মন্দিরের স্বাধীনতা—
খর্ব্ব হয় না হিংসায় ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষের কণ্ঠ-মণি
ঐ সূর্য্য—
বিশাল-নয়নে শুধু দেখছেন।
তিনি উদিত হচ্ছেন,—হচ্ছেন ॥
বহু দূর, বহু দূর—
চলে গেছে তাঁর বেদনার প্রার্থনা ;
তূর্ণ-তীর্ণতার দীপ্তিময়ী ঐ মূর্ত্তি।
বিপুল-নৈশ্চিত্যে আমরা জানি—
ঐ সূর্য্যেরি বিভাসিত প্রেরণায়,
মানব সাধন করে—
কর্ম্মের মধ্যে যা কিছু রয়েছে মহৎ
যা কিছু রয়েছে বৃহৎ ॥ ৪ ॥

আমাদের প্রাচীন অমৃত-দেবেরা
যে অন্তরীক্ষলোকে সৃষ্টি করে রেখেছেন
সূর্য্যের চলার পথ,
সেই পথ-রেখা ধ'রেই
সূর্য্য চলেছেন
—শ্যেনের মত।
হে মিত্রাবরুণ, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
তোমাদের দু'জনের কাছে
পৌঁছে যাবে আমাদের পূজা
বহন ক'রে নমস্কার
বহন ক'রে হব্য ॥ ৫ ॥

হে মিত্র, হে বরুণ, হে অর্য্যমা,
আমাদের আত্মার জন্য
আমাদের পৌত্রাদির জন্য
তোমরা দাও—
তোমাদের বরণীয়তা,
শুভ-পথ—
সুগম কর বিশ্বের,
সকলকে রক্ষা করুক
তোমাদের সদা-স্বস্তি ॥ ৬ ॥
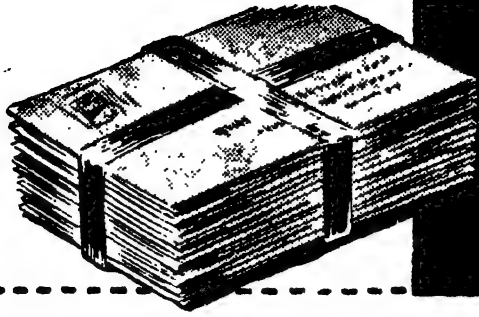
হুতোম প্যাঁচার নক্সার প্রথম ভূমিকা-পত্র

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা

[হুতোম প্যাঁচাকে একদা তাঁর প্রতিপক্ষরা অপাঙ্‌ক্তেয় করতে চেয়েছিল হুতোমের তীব্র শ্লেষ আর কথ্য ভাষা ব্যবহারের দুঃসাহস দেখে। অধুনা বাঙলার সাহিত্যিকেরা সমাজ-চিত্র আঁকতে একেবারে ভুলে গেছেন বললেই হয়। তাঁদের কোন লেখায় বাংলার সমাজ দেখতে পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা কল্পনা-প্রসূত, অলীক ও অবাস্তব বর্ণনা মাত্র।

হুতোম তাঁর সুতীক্ষ্ণ লেখনীতে রচনা করেছিলেন একটি নক্সা—তাতে তদানীন্তন সমাজের এমন বাস্তব চিত্র ও চরিত্র আঁকা হয়েছে যা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। নক্সার ভূমিকা-পত্রটি সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক। সে-যুগের বাবুরা 'ভাঁড়' ব্যতীত এক পা চলতে পারতেন না। ভাঁড় নিয়ত নূতন রস পরিবেশন ক'রে বাবুদের খুশী রাখত। হুতোমের ভূমিকায় সেই ভাঁড়ামির কথাও রয়েছে। আর আছে হুতোমের দরাজ মনের উন্মুক্ত পরিচয়।]

আজ-কাল বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবি দলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে। বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি ক'রে খেলা করে, তেম্‌নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় করেন, যদি এর কেউ ওয়ারিসান থাকতো, তা হ'লে স্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা-নাবুদ্ হতে পেতো না—তা হলে এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাক্‌তেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে, আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল বিষয় নিয়ে জুড়ে বসেছেন—বেশীর ভাগ অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্সাই অবলম্বন হয়ে পড়্‌লো। কথায় বলে, এক জন বড়মানুষ, প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো দ্যাখাবার জন্য, এক জন ভাঁড় রেখেছিলেন; সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড়মানুষ বাবুর মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাকদিন আর সে নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না; শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা-মুটে ভাড়া করে বড়মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত। বড়মানুষ বাবু তাঁরে ঝাঁকা-মুটের ওপোর ব'সে আস্‌তে দ্যাখে বল্লেন,—"ভাঁড়, এ কি?" ভাঁড় বল্লে, "ধর্ম্মাবতার। আজকের এই এক নতুন!" আমিও এই নক্সাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে 'এই এক নতুন' বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্সা প্রচারিত হলো, নক্সাখানির দু' পাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন; কারণ, আমি এই নক্সায় একটি কথাও অলীক বা অমূলক ব্যবহার করি নাই। সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন, তা আমার বলা বাহুল্য। তবে কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি। এমন কি, স্বয়ংও নক্সার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।

নক্সাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম; কারণ, পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফ্যালেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায়, তারই তদ্বির করে থাকেন। কিন্তু নীলদর্পণের হাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না; সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ করবেন।

আশমান
১৭৮৪ শকাব্দা।

কোম্পানীর আদেশনামা

['ক্যালকাটা জর্ণাল' নামক পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বাকিংহাম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইবার পর বিলাতের 'জন বুল' নামক পত্রিকায় তাঁহাকে অভদ্র এবং ইতর ভাবে আক্রমণ করা হইতে থাকে। 'ক্যালকাটা জর্ণাল' নির্ব্বাসিত সম্পাদকের পক্ষ লইয়া বিবিধ প্রকার সম্পাদকীয় মন্তব্যাদি প্রকাশ করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল মন্তব্যাদি তৎকালীন কোম্পানী-সরকারের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। 'ক্যালকাটা জর্ণালের' পাল্টা আক্রমণে কোম্পানীর সম্মানেও আঘাত লাগে। কোম্পানী বাহাদুর 'ক্যালকাটা জর্ণালের' সম্পাদক স্যান্‌ডিজের বিরুদ্ধে নির্ব্বাসন আদেশ দিতে পারিলেন না, কারণ, তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিসাবে ভারতীয় প্রজা বলিয়া বিবেচিত হইলেন। কিন্তু 'ক্যালকাটা জর্ণালের' অন্যতম পরিচালক এবং লেখক মিঃ স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট ইংরেজ এবং তিনি ভারতবর্ষে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বসবাস করিতেছিলেন। তৎকালীন নিয়মানুযায়ী ইহা বে-আইনী। কোম্পানী সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। মিঃ আর্ণটকে তাঁহারা ভারত পরিত্যাগ করিবার নির্দেশ দান করেন। নিম্নলিখিত পত্র কোম্পানীর

আদেশনামার স্বরূপ পাওয়া যাইবে।—পত্রখানি 'ক্যালকাটা জর্ণালের' পরিচালক-সম্পাদকদের নামে জারি করা হয়।]

মহাশয়,

গত ১৮ই জুলাই সরকারী ভাবে আমি আপনাদের যে পত্র প্রেরণ করি, তাহার জবাবে আপনাদের পক্ষে মি স্যানডিজ ২১শে জুলাই 'ক্যালকাটা জর্ণালে' জানান যে, ঐ পত্রিকা নিয়মসঙ্গত ভাবে পরিচালিত হইবে। কিন্তু গত মাসের ৩০শে তারিখে 'কালকাটা জর্ণালে' প্রকাশিত মন্তব্যাদি পাঠ করিয়া সকাউন্সিল গভর্ণর বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়াছেন।

মিঃ বাকিংহামের ভারত হইতে নির্ব্বাসনের ব্যাপার লইয়া যে সকল মন্তব্য এবং সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সরকারের পক্ষে অপমানকর এবং বিদ্বেষমূলক। সংবাদপত্র পরিচালনা বিষয়ে যে সকল নিয়ম-কানুন আছে, তাহাও বহু ভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে। মিঃ বাকিংহাম সম্পর্কে যে সকল মন্তব্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিকৃত এবং ইচ্ছাকৃত পক্ষপাতিত্ব-দোষদুষ্ট।

মিঃ বাকিংহামের নির্ব্বাসন, সরকারের স্বৈরাচার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এ কথাও বলা হইয়াছে যে, সরকার বিশেষ মতলব লইয়া এ কার্য্য অন্যায় ভাবে করিয়াছেন। এই মন্তব্য পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি যাহাতে আকর্ষণ করে, তাহার জন্য লাইনগুলির নীচে ডবল রুল বসানো হইয়াছে। সরকারের প্রতি এই প্রকার অবমাননাকর মন্তব্য প্রকাশের জন্য 'ক্যালকাটা জর্ণাল' প্রকাশ অবিলম্বে বন্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু সকাউনসিল গভর্ণর এতখানি কঠোরতা অবলম্বন করিয়া পত্রিকার অংশীদারদের কোনো প্রকার আর্থিক ক্ষতিসাধন করিতে চাহেন না।

কিন্তু এ কথাও বলা দরকার যে, 'ক্যালকাটা জর্ণালের' সরকার-বিদ্বেষী এবং অপমানকর মন্তব্যাদির উপর কেবল মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া গভর্ণর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সেই কারণে তিনি পত্রিকা সম্পর্ক নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন:

প্রকাশিত যে-মন্তব্য সম্পর্কে সরকার আপত্তি এবং অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সম্পাদকীয় বলিয়া গ্রহণযোগ্য। সম্পাদক এবং পরিচালক হিসাবে মিঃ স্যানডিজ এবং মিঃ আর্ণট ইহার জন্য অবশ্যই দায়ী।

মিঃ স্যানডিজের উপর সরকার কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহেন না, কারণ তাহা করিলে পত্রিকা এবং পত্রিকার সহিত যুক্ত অন্যান্য সকলের ক্ষতি হইবে। মিঃ আর্ণট ইংলণ্ডের অধিবাসী এবং তিনি সরকারের নিকট হইতে কোনো লাইসেন্স কিংবা অনুমতিপত্র না লইয়া এ দেশে বাস করিতেছেন। সেই কারণে সকাউন্সিল গভর্ণর স্থির করিয়াছেন যে, মিঃ আর্ণটকে অবিলম্বে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে।

সকাউন্সিল গভর্ণর আশা করেন যে—এই অবস্থা এবং নির্দ্দেশের ফলে 'ক্যালকাটা জর্ণালের' পরিচালকবর্গ সরকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখিয়া এবং সংবাদপত্র পরিচালনা সম্পর্কীয় আইন-কানুন ভঙ্গ না করিয়া পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র পরিচালকবর্গ, আশা করি, ভবিষ্যতে এখন কোনো কিছু করিবেন না, যাহার জন্য সরকার বাহাদুর তাঁহাদের সংবাদপত্র প্রকাশের লাইসেন্স বাতিল করিতে বাধ্য হয়েন।

জেনারেল ডিপার্টমেণ্ট — ডাবলু, বি, বে.
২৩এ সেপ্টেম্বর, ১৮২৩ — চীফ, সেক্রেটারী টু গভর্ণমেণ্ট

(এত কঠোর নির্দ্দেশ সত্বেও কিছু কাল পরে 'ক্যালকাটা জর্ণালে' লাইসেন্স বাতিল করিতে সরকার বাধ্য হয়েন! 'ক্যালকাটা জর্ণাল'-সাংবাদিক স্বাধীনতা রক্ষার কারণে সরকারী ক্রোধ অগ্রাহ্য করে। বারান্তরে এই বিষয় দু'-একটি পত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।)

নীলদর্পণের ভূমিকা-পত্র

[দীনবন্ধু মিত্র—আমাদের জনগণের প্রথম সাহিত্য-সেবক বলে যথার্থ বলা হয়। নীলদর্পণের রচয়িতা দীনবন্ধু সত্যিকার দীন বন্ধু ছিলেন। নীলকরের অত্যাচারে যখন আমাদের দেশবাসীর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে তখন দীনবন্ধু এই নীলদর্পণ দেশের চোখের সমুখে তুলে ধরলেন। পাদ্রী লং সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন নীলদর্পণের। সেই নীলদর্পণের ভূমিকা-পত্র সাহিত্য দরবারে অতীব মূল্যবান।]

নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখরক্ষা। হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিডনি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর, তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ, কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এবং সুযোগ ক্রমে ঔষধ দেন এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনুবধে পাদুকা দানাপেক্ষা ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ টারপিন্ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেনসারী হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমন বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের ঐরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ যুদা খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীশুকে করাল পাইলেটকরে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রা লাভপরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য

"কিন্তু চক্রবং পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" প্রজাবৃন্দের সুর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে ... দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ...বিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। ... সুবিজ্ঞ সাহসী উদার চরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভর্ণর জেনরল্ ...ছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, ...পালন, ন্যায়পর গ্র্যাণ্ট মহামতি লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর হইয়াছেন ...মশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ইডেন হাবসেল ... বাড়কারা পরিচারকগণ শতদলস্বরূপে সিবিল সরভিস-সরোবরে ...সিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ... দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত ...বগণ যে অচিরাং সদ্বিচারবরূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, ... সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

সমাজ গ্রন্থের উৎসর্গপত্র

[বাঙালীর কাছে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মশায়ের পরিচয় প্রদান ...তা মাত্র। রমেশচন্দ্র বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এক জন Pioneer ছিলেন। ঋগ্বেদ বাঙলায় তর্জ্জমা করেছিলেন। "সমাজ" ... যুগের সুধী-মহলে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নীচে ... "সমাজে"র উৎসর্গ পত্রটি উদ্ধৃত করলাম।]

বঙ্গীয় সাহিত্যকে যাঁহারা নূতন রূপ, নূতন বল,
নূতন সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন,
বঙ্গবাসিদিগের হৃদয়ে যাঁহারা নূতন আশা,
নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন,
পদ্য, গদ্য ও নাটকে যাঁহারা বঙ্গভাষাকে
নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন,—
মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত
ও দীনবন্ধু মিত্র,—
... মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

... বঙ্গাব্দ। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

... সংক্রান্তি

মিখেল এ্যাঞ্জেলোর পত্র

...শ বছর বয়সেই মিগেল এ্যাঞ্জেলো চিত্রকর ও স্থপতি হিসেবে ... অর্জ্জন করেছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ নিপুণ আঙ্গিক ও পরিকল্পনার ...। তৎকালীন রোমের পোপ জুলিয়াস দ্বিতীয় নিজের মহিমার ...র সমাধি-মন্দির নির্মাণ ও তার আলঙ্কারিক কাজের জন্য ...কে নিযুক্ত করার মানস করেন। সে মন্দিরের পরিকল্পনাও ...তিন তলা অট্টালিকায় কেবল ব্রোঞ্জ ও মার্বেলের মূর্ত্তি ই ...শটি, ঠিক হয়।

... প্রধান স্থপতি কিন্তু এই ব্যবস্থায় খুশী হয়নি। ... ভ্রাতুষ্পুত্র র‍্যাফেলকে এই বৃহৎ কাজে নিযুক্ত ...সনা ছিল তাঁর। সুতরাং ফ্লোরেন্স হতে আনীত শিল্পী ... বিরুদ্ধে তিনি পোপের কানে বিষোদগার সুরু করেন। ... এ্যাঞ্জেলো কাজ পরিত্যাগ করে দেশে ফেরেন। তখন ...আদেশ তাঁর কাছে পৌঁছায় ফিরে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। এ্যাঞ্জেলো সে আদেশের উল্লেখ করে আর এক সহযোগী স্থপতিকে নীচেকার পত্রখানি প্রেরণ করেন।]

১৫০৬, ২রা মে,
ফ্লোরেন্স,

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পত্রে অবগত হইলাম যে, আমার অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তনে পোপ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার হস্তে সমস্ত অর্থ প্রদান করিয়া আমাদের মধ্যে স্থিরীকৃত চুক্তি অনুসারে তিনি আমায় কার্য করিতে দিতেও সম্মত হইয়াছেন। আমার আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই, তাহাও জানিতে পারিলাম।

আমার চলিয়া আসিবার মূল কারণ জানাইতেছি। পবিত্র শনিবারে আমি স্বকর্ণে শুনিলাম, এক জন জহুরী ও উৎসব-গুরুর নিকট মহামান্য পোপ বলিতেছেন যে, স্থাপত্যের জন্য অধিক বা অল্প মূল্যের জহরতাদি আর কিছু ক্রয় করিতে তিনি অসম্মত। ইহাতে আমি বিস্মিত বোধ করি। তথাপি আসিবার পূর্বে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা নিবেদন করি। তিনি আমায় সোমবার আসিতে বলেন। সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি আমি তাঁহার সহিত দেখা করি। শুক্রবার সকালে তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন ও দূর করিয়া দেন। যে লোকটি আমায় বিদায় করিয়া দেয়, সে আমায় জানায় যে, আমাকে উত্তমরূপে চিনিলেও তাহার উপায় নাই, কেন না, এই আদেশ স্বয়ং ধর্মগুরু পোপের। শনিবার স্বকর্ণে এরূপ আলোচনা শ্রবণ করিয়া এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যে প্রকৃতই রূপান্তরিত দেখিয়া আমি সকল আশা বিসর্জ্জন দিই। অবশ্য ইহা মূল কারণের অংশ মাত্র। অবশিষ্টাংশটুকু আমি কিছু লিখিতে অক্ষম। অবশ্য এইমাত্র বলিতে পারি, যদি আমায় রোমে থাকিতে হইত তবে মহামান্য পোপের সমাধি-মন্দিরের বহু পূর্বেই আমার নিজের কবর রচিত হইত। আমার আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের ইহাই কারণ।

আপনি মহামান্য পোপের নিকট আমায় কথা নিবেদন করিবেন। আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে, আমাকে অকারণে বিরক্ত না করিলে সর্তানুসারে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার নির্বাচিত ভূমির উপর তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্মিত ও অলংকৃত হইবে। আমার প্রতিশ্রুতি মতই সে মন্দির হইবে অনুপম। যদি সে কার আমি সমাধা করিতে পারি, তবে জগতের মধ্যে তাহা অতুলনীয় হইবে।

মহামান্য পোপের ইচ্ছা থাকিলে ফ্লোরেন্স নগরীতে এক ব্যক্তির নামে, যাহার পরিচয় আমি পরে জানাইতে পারিব, সমস্ত অর্থ গচ্ছিত রাখিতে পারেন। উপরোক্ত অর্থ সম্বন্ধে আমি যে কোন সর্তে সম্মত থাকিব এবং ফ্লোরেন্সে যে কোনরূপ জামিন রাখিব। আর একটি কথা। নানা দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রোমের অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে এখানে কাজ করা যাইবে। যথা শীঘ্র পত্রোত্তর পাইলে বাধিত হইব অধিক কি—ইতি

মিখেল এ্যাঞ্জেলো।

[এ্যাঞ্জেলোকে রোমে ফিরাইবার জন্য ফ্লোরেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি অবধি দিতে হয়েছিল পোপকে। তার পর এ্যাঞ্জেলো যখন এলেন, তখন তাঁকে সমাধি-মন্দির নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হোল না, সিস্টিন গীর্জার আলঙ্কারিকের কাজে তাঁকে ব্যাপৃত করা হোল। শিল্পীর জ্ঞানকল্প ...

তাঁকে দিয়ে ক্রীতদাসের পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হতে লাগল। গীর্জার ছাতে সৃষ্টির আদি হতে এ্যাডামের পতন অবধি অঙ্কিত করেছিলেন শিল্পী অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন ভোগ করে। কিন্তু সিষ্টিন গীর্জায় এ্যাঞ্জেলো যে ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের শিল্পীদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছে !]

এমিল জোলার পত্র

[ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক এমিল জোলার নাম সাহিত্য-জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্বন্ধে তাঁর গভীর বেদনাবোধ ও মমতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হোল তাঁর উপন্যাস "নানা"। পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচলিত বইগুলির মধ্যে নানা অন্যতম। কিন্তু ন্যায়বিচার নামে যে পত্র তিনি প্রেরণ করেছিলেন তদানীন্তন রাষ্ট্র-কর্ণধারের নামে, সেই পত্রখানিই জোলাকে অমর করে রাখবে।]

১৮৯৮, জানুয়ারী

মিঃ প্রেসিডেণ্ট—

এত দিন যে পরম অনুগ্রহ আপনি আমার উপর বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সাহসী হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি, আপনার যে খ্যাতি এত দিন অম্লান ও দীপ্যমান ছিল, তাহাতে এক্ষণে মর্মন্তুদ লজ্জার এক দুরপনেয় কলঙ্ক লাগিবার উপক্রম হইয়াছে।

জঘন্যতম কুৎসা-অপবাদ হইতে আপনি নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ফ্রান্সের জনচিত্ত আপনি জয় করিয়াছেন। স্বজাত্য-প্রীতির মহিমামণ্ডিত আপনি— এ শতাব্দীতে ফরাসী জাতি কর্মে, সত্যনিষ্ঠায় ও স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় যে বিশ্ববোধ জাগ্রত করিয়াছে, তাহারই বিজয় উৎসবে পবিত্র নেতৃত্বের ভার লইয়াছেন। কিন্তু ড্রেফাস ঘটনাবলী আপনার সেই সুনামে—প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম আপনার শাসন কালে—কালিমা লেপন করিয়াছে। আপনার আদেশে সম্প্রতি সামরিক বিচারে কে এক এস্তেরাজী মুক্তি লাভ করিল—সত্যনিষ্ঠা ও বিচারের কি চরম অপমান! সমগ্র ফ্রান্সের ললাটে এ কলঙ্ক লাগিয়াছে। ইতিহাসে লেখা থাকিবে যে, আপনার শাসন কালেই এত বড় সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল।

বিচারের নামে যদি ইহা করার দুঃসাহস থাকে, তবে আমিও সাহসের সহিত সত্য প্রকাশ করিব। বিচার-সভা যদি নিষ্ঠার সহিত আপন কর্তব্য পালন করিয়া না থাকে, সে সত্য প্রকাশ করিতে আমি প্রতিশ্রুত। আমার কর্তব্য সত্য উদ্ঘাটিত করা, কার্যকরী করা নয়। যে নিরাপরাধ আত্মা বিনা দোষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার কথা না বলিলে আমার জীবনের প্রত্যেকটি নিশি দুঃস্বপ্নে কণ্টকিত হইবে।

সাধু ব্যক্তির অন্তরের বলিষ্ঠ বিদ্রোহ-বোধের সহিত আমি আপনার নিকট সেই সত্য প্রকাশ করিতে চাহি। যে সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হইতেছে আপনি হয়ত সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ভিন্ন আর কাহার নিকট আমি দেশ-দ্রোহীদের অপরাধ জানাইতে পারি ?

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়, হয়ত বা আপন অজ্ঞাতেই কর্ণেল প্যাম এই বিচার-ভ্রান্তির সহায়ক হইয়াছেন! গত তিন বৎসর ধরিয়া অসম্ভাব্য ঘৃণ্য উপায়ে আপন জঘন্য কার্যক্রমকে তিনি বাঁচাই[illegible] আসিয়াছেন। আমি জেনারেল মারসিয়েকে অভিযুক্ত করিতেছি,- যিনি ইতিহাসের এই জঘন্য অপরাধের সহকারিত্ব করিতেছেন।

অভিযুক্ত করিতেছি জেনারেল বিলোকে যিনি ড্রেফা[illegible] নির্দোষিতার সাক্ষ্য-প্রমাণের দলিলপত্র গোপন করিয়াছেন [illegible] জেনারেল ষ্টাফের মুখরক্ষা ও নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে[illegible] জন্য কায করিয়া মানবতা ও ন্যায়নিষ্ঠার দরবারে অপরা[illegible] হইয়াছেন।

অভিযুক্ত করিতেছি জেনারেল বোয়াদফারকে এবং জেনা[illegible] গঁসকে—প্রথম জন ধর্মসংস্কারের বশে এবং দ্বিতীয় জন দলের জন্য [illegible] অপরাধে অপরাধী।

জেনারেল পেলিউ ও মেজর রাভারীকে অভিযুক্ত করিতে[illegible] নৃশংস পক্ষপাতিত্বের অপরাধে, যাহাদের দলিল সেই অপরা[illegible] একটি অবিনশ্বর রচনা হইয়া থাকিবে।

ডাক্তারী পরীক্ষায় যদি ক্ষীণদৃষ্টি ও অপরিণত-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রমাণিত না হয়, সে ক্ষেত্রে তিন জন হস্তলিপিবিশারদকেই আমি মিথ্যাভাষী ও জুয়াচোর বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছি। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে জনমতকে ভিন্ন খাতে পরিচালিত করিয়া দপ্তর[illegible] দোষ আচ্ছাদিত করিবার অপরাধে আমি সামরিক বিভাগ[illegible] অভিযুক্ত করিতেছি।

প্রামাণ্য দলিল-পত্র না দর্শাইয়া আসামীকে দণ্ডাজ্ঞা দেও[illegible] অপরাধে অভিযুক্ত করিতেছি প্রথম দফার সামরিক বিচার-সভাকে দ্বিতীয় বিচার-সভাকে অভিযুক্ত করিতেছি, প্রমাণ থাকা স[illegible] সত্যকার আসামীকে মুক্তি দান করিয়া প্রথম বিচার-সভার [illegible] রায়কে অনুমোদন করার জন্য।

এই সকল অভিযোগ করার জন্য আমি আইনতঃ অপরা[illegible] হইতে পারি। আমি সে জন্য আত্মসমর্পণ করিতেছি।

যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ উপস্থাপিত করি[illegible] তাহাদের আমি চিনি না, কখনও চোখেও দেখি নাই—[illegible] কাহারও বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ আমি পোষণ করি [illegible] আমার দৃষ্টিতে তাহারা সামাজিক অবিচারের নিমিত্ত মাত্র। [illegible] ও ন্যায়বিচারের যথার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি এই বিদ্রোহের [illegible] অবলম্বন করিয়াছি।

মানবতার নামে আবেদন করিতেছি, সত্য প্রতিষ্ঠিত হউ[illegible] আমার এই অভিযোগ আমার নিপীড়িত আত্মার ক্রন্দন-ধ্ব[illegible] বিচার-সভায় আমার অভিযোগের বিচার করুন তাহারা, প্রক[illegible] ভাবে বিচার-সভা বসুক। আমি প্রতীক্ষা করিতেছি।

আমার গভীরতম শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

[যাহার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এই ঐতিহাসিক [illegible] লিখেছিলেন, সেই লোকটিকে জোলা কখনও দেখেননি। [illegible] এই পত্রের ফলেই দেশময় এমন আন্দোলন গঠিত হয়েছিল, যা[illegible] পুনরায় অনুসন্ধানের আদেশ এবং দণ্ডাজ্ঞার দু'বছর পরে ভগ্নস্বা[illegible] অপরাধীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং রাষ্ট্র তাকে ক্ষমা ক[illegible] একটি মানুষের অভিযোগে একটি রাষ্ট্র এমনি ভাবেই কম্পি[illegible] হয়েছিল ভিত্তিমূল অবধি।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে জোলা প্রাণত্যাগ করেন।]

গৌতম । শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্কর বেইজ নির্মিত মূর্তি । —নলো মিত্র

য়া —কি দে

পাষাণ —মঙ্গলময় মুখোপাধ্যায়

শঙ্খিনী

—অনিলবরণ

ডঙ্কা-নিনাদ —রণজিৎ রায়চৌধুরী

াষা: —সাগরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অ, আ, ই

মাসের শেষ পক্ষ। বৎসরান্তের সময়

কলকাতা শহর এ সময়টা বড়ই গুলজার হয়ে উঠে।

... ষষ্ঠী, শিবরাত্রি, চড়ক আর গাজনের উদ্যোগে শহরের ঘরে ... পড়ে যায়। রাস্তা লোকে লোকারণ্য। দিন নেই, রাত্তির নেই ... ছোঁড়া টোঁ বাউণ্ডুলের দল হল্লা আর চিৎকারে যে-যার পাড়া মাতিয়ে তোলে। কোথাও চিৎপুরের হর, কারও মাঠে সিদ্ধির ... প্যালা, কোথাও বা মেয়ে-পাঁচালী, আবার কোথাও কোথাও ... কবিদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। মদের দোকানের সদর রাস্তা ... বন্ধ হলেও খিড়কির দরজা খোলা থাকে। ঢাক আর ... শব্দে এ-পাড়া সে-পাড়া মাতোয়ারা। রাস্তার বেকার কুকুর-গুলো ... ঘেউ-ঘেউ রব যেন চাপা পড়ে যায়। মেছোবাজারের ... গোরবাগানের মোড়, জোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, ... বাজার, বটতলা, সোনাগাছির গলি, আহিরীটোলার চৌমাথা ও ... বাগবাজারের গাঁজার আড্ডাগুলো ক্রমে ক্রমে জমায়েৎ হয়। ... সিন্দারা বুঝতে পারে যে একটা বছরের বিদায় নেওয়ার সময় ... এসেছে শিবরাত্রি আর চড়কপূজোর দিন। গাজন আর ...

... বাদ্যি শুনে চড়্কীর পিঠ সড়্-সড়্ করে। কামারেরা ... কি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুতের কাজে লেগে পড়ে। ... ও কামারার দল সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় ... কোমরে চন্দ্রহার ও সিপাইপেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোঁচা ... রঙবেরঙের ছোপানো গামছা কাঁধে নিয়ে কিস্তি বাঁধা ... জড়িয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ে। আনন্দের ... বাবুদের বাড়ীতে গাজন।

... ঢুলে, রেয়ারা, খাড়ি ও কাপড়ারা নূপুর পায়ে উত্তরী ... দিয়ে আপন আপন বীর-ব্রতের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও শলাকি ... ক মদের দোকানে, পতিতালয়ে ও লোকের উঠোনে ঢাক ... বাজতে নেচে বেড়ায়। গুরু মশাশয়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে ... রা ঢাকীর পেছন-পেছন ছুটে বেড়ায়। ঢাকের চামর, ... ঘণ্টা ও ঘুঙুর ধরে টানাটানি করে।

... গানো রেশমী রুমাল গলায় জড়ানো বাবুরা সব ... পায় যে যার বাহন ও মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে যে যার আস্তানার দিকে পা বাড়ান। লোকলজ্জার ভয়ে কেউ বা তাঁর গাড়ীর জানলা খুলতে নিষেধ করেন কোচম্যানকে। কেউ কেউ একেবারে কারও তোয়াক্কা না ক'রেই নিজের শত্রুপক্ষকে তাতাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। বেল ফুলের মালার ভুরভুরে গন্ধে শহরের বাতাসও যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। বরফ আর জল-কচুরীর মূল্য বেড়ে গেছে। যত চাহিদা তত মূল্য।

ভেতরে বসেই জহর আর পান্না প্রস্তাব করলে,—চল না, চড়কের মেলা দেখে আসি। মামীকে বল না।

কৃষ্ণকিশোর কি এক চিন্তায় তখন বিভোর হয়ে আছে। বললে,—এই দুপুরে মা কি যেতে দেবেন?

পান্না ঠোঁটের কোণে হাসি লুকিয়ে বললে,—চল্ না। কত মজা দেখতে পাবি। কত রকমের কত কি। সং, পুতুল-নাচ, ভোজবাজী, আরও কত কি।

জহর সবং কবিয়ে কেন ... বলে,—বুলবুলির লড়াই, খেমটা নাচ, উলঙ্গ শরীর তাণ্ডব নৃত্য।

পান্না বললে,—আঃ, দাদা তুই চুপ কর্ তো। এ সব এখানে বললে মামী কি আর যেতে দেবে?

জহর বললে,—কেন দেবে না শুনি? কলকাতার শহর এ ক'দিন ধরে কি না ফুর্ত্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। আর আমাদের বুঝি ঘরের ভেতরে বসে থাকতে হবে?

দুপুর। দ্বিপ্রহর। প্রখর সূর্য্যতাপ। প্রচণ্ড রোদ্দুর।

মানুষ তৃষ্ণায় কাতর। আকাশে চাতকের ডাক। মাটি উত্তপ্ত। জল চাই, জল। চৈত্রের দাবদাহে বাতাসেও যেন প্রবহমান অগ্নিকণা। তবুও উত্তাপের প্রখরতাকে উপেক্ষা ক'রেই পথে মানুষ চলে। উৎসবের কলকাতার পথে-ঘাটে কাতারে-কাতারে মানুষ। তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও। চতুর্দ্দিক কোলাহলমুখর। চড়ক, শিবরাত্রি, গাজন! ঘন ঘন ঢাকের বাদ্যি!

এই বাজনা শুনেই মন উড়ু-উড়ু ক'রেছে জহর আর পান্নার। ভেতরে আর থাকতে চাইছে না তাই। যেতে চাইছে ফটকের বাইরে। ঐ জন-সমুদ্রের গড্ডলিকায়। ঐ স্রোতে ভাসতে।

যেখানে নিষেধ নেই সেখানে। যেখানে গেলে আর কেউ বাধা দেওয়ার থাকবে না সেই উন্মুক্ত আনন্দের হাটে যেতে চায় জহর আর পান্না। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা নয়। এই মুহূর্তেই।

পিসীমা কুমুদিনীর চোখে জল দেখেছে সে। দেখেছে শরীরে তাঁর আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন। অত্যাচার-ক্লিষ্ট মুখখানায় দেখেছে গভীর দুঃখের ছায়া। দেখেছে সরলচিত্ত ঐ নিরুপায় পিসীমাকে। ক্রন্দনরত।

সে বললে,—বেশ তো যাবি'খন। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে যাওয়া যাবে।

অনন্তরাম কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। কৃষ্ণকিশোরের কথা শেষ হ'তেই বলে,—হ্যাঁ, আমিও সেই কথাটি বলতে এসেছি। তোমার মা বললেন যে, আহার প্রস্তুত। চল সব, খাবে চল। তার পর খেয়ে-দেয়ে যার যেথায় খুসী যাও।

কৃষ্ণকিশোর বুঝতে পারে, অনন্তরামের কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেন এত রূঢ়। কৃষ্ণকিশোর জানে, কি তার পছন্দ আর কি অপছন্দ। কে পছন্দের আর কে নয়। অনন্তরাম সত্যিই মন থেকে চায় না যে, সে ঐ অপোগণ্ড দু'টোর সঙ্গে মিশুক। ঐ অকালপক্ক দু'টোর সঙ্গে—

কৃষ্ণকিশোর বললে,—তোরা মায়ের কাছে যা। আমি স্নান সেরে এখুনি আসছি।

অনন্তরামের কথার ধরণ দেখে জহর আর পান্না নির্বাক্ হয়। রান্না-বাড়ীর দিকে এগোয়।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—অনন্তদা, ভারীকে বল, জল দেবে কলের ঘরে।

অনন্তরাম বললে,—তা না হয় বলছি। কিন্তুক যাওয়াটা কোথায় হবে শুনি একবার?

সে হেসে ফেললো। বললে,—চড়কের মেলা দেখতে।

—আর কিছু নয়? অনন্তরাম বললে।—সে আমি তোমাকে নে যাবো সঙ্গে ক'রে। ওরা যেখানে ইচ্ছে যাক্। বুঝলে?

সে আবার হেসে ফেলে। বলে,—এত বয়স হ'ল, তবুও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হবে?

অনন্তরাম হাসতে হাসতে বললে,—হ্যাঁ। বয়েসটা তোর কত হ'ল শুনি একবার?

কৃষ্ণকিশোর বললে, —এই বৈশাখে সতেরো শেষ হবে। সাবালক হতে আর এক বছর। জানো অনন্তদা?

—জানি না আর, খুব জানি। তাহলে তো দেখছি তোর দু'টো পাখনা গজাবে। অনন্তরাম কথার শেষে হাসে। ক্ষীণ হাসি। সাবালকত্বপ্রাপ্তির এদিক-ওদিক দুদিক মনে পড়ে যায় অনন্তরামের। সুদিক আর কুদিক। ভাল আর মন্দ দিক। তাই হাসি তার ক্ষীণ। খানিক বা ভয়ার্ত বলা যেতে পারে।

বাবুদের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে অনন্তরাম এ জীবনে দেখতে পেয়েছে অনেক কিছু। এ বাড়ীর আনাচে-কানাচে যারা এসেছে, একে একে তাদের দেখেই সকলের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে নেমেছে সে। দার্শনিক বিচারের সিদ্ধান্ত। ও-বাড়ীর যদু সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোসাহেবদের কথায় পরিচালিত হতে গিয়ে মাত্র কয়েক বছরে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি ফুঁকে দিয়েছে। সে-বাড়ীর মধু পিতার মৃত্যুর পরেই ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে দু'-হাতে উড়িয়ে চোখের সামনে ফতুর হয়ে গেল এই সেদিন। মধুর মা[illegible] ভাই শ্যামও বাদ সাধেনি। শ্যাম না কি কাগজের টাকার তৈরী করিয়ে আকাশে উড়িয়েছিল দেওয়ালীর দিনে। শেষে লক্ষ্ণৌওয়ালীর রূপে দিশাহারা হয়ে শ্যাম পাল্লা দিতে চায় এক শেঠজীর সঙ্গে। শেঠজীই শেষ পর্য্যন্ত লাভবান হয়। শ্যা[illegible] খুইয়ে বসে থাকে—পূর্ব্বপুরুষের একখানা জামিয়ার তার সম্বল।

সুতরাং এই শেয়ালটিও যে তাদের ডাকে সাড়া দেবে [illegible] কি কোন স্থিরতা আছে? কৃষ্ণকিশোরও যে এক দিন এমন[illegible] না, তা কেউ কি বলতে পারে? মানুষের মন যখন, [illegible] প্রলোভনের মাঝে থেকে সেও কি পারবে নিজেকে রক্ষা করতে চরম পরিণামের হাত থেকে? পারে যদি সে তো অনেক [illegible] কথা।

—কি, ভাবছো কি এমন চোখ কপালে তুলে? বললে [illegible] কিশোর।

সত্যিই আকাশে চোখ রেখে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে [illegible] অনন্তরাম। ভাবছিল ঐ সব চোখে-দেখা নন্দদুলালদের [illegible] ধারার জীবন-যাত্রার কথা। সবই ঐ এক ধারার। কাঁচা [illegible] খেলা খেলতে গিয়ে কাঁচা ঘুঁটির অকালে পেকে যাওয়ার [illegible] আজকের নবাব আর কালকের ফকিরদের গুপ্তকথা।

—ভাবছি না কিছু। ভাবছি যে, তুই তো সাবালক [illegible] সেই কথাই ভাবছি আর কি। অনন্তরাম কথা বলে কেমন [illegible] আস্তে। বিষণ্ণতার সুরে।

ম্যানেজার বাবুর কথা মনে পড়ে যায়। ছোট বাবুর বাজনা[illegible] খুলতে হবে, তাই ডাকতে এসেছিলেন তিনি। বাজনা তুলে [illegible] হবে যথাস্থানে। বহু মূল্যবান সামগ্রী আছে সে ঘরে, তাই [illegible] একবার দাঁড়াতে ডেকেছিলেন। কৃষ্ণকিশোর বললে,—[illegible] ম্যানেজার বাবুকে বল ঘর খুলতে। আমি আসছি।

বিরক্ত হয় অনন্তরাম। বলে,—এখন আবার কোন্ ঘর [illegible] তাড়া পড়লো।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—কাকার বাজনার ঘর [illegible] বেরিয়েছিল আসরে, সেইগুলো তুলে রাখতে হবে।

অনন্তরাম বললে,—অ। ছোট বাবুর বাজনার ঘর— [illegible] বলতে বলতে থেমে যায় সে। হয়তো অনেক কথা মনে [illegible] ছোট বাবুর কথা, আর ঐ বাজনার ঘরের কথা। অনন্ত[illegible] দিকে এগোয়।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, এও আরেক হেঁয়ালী নয় তো।

নষ্টপ্রাণ অরুণেন্দ্র যে সমাচার তার কানে পৌঁছে দিয়ে[illegible] হয়তো আদপেই সত্যি নয়। মনগড়া কথা। খেয়ালীর প্রলা[illegible] অরুণের বিকৃত মস্তিষ্কের খানিক বিকাশ। তাই এ ঘটনা[illegible] খবরের মতই মনে হয় তার। মনে মনে একেক বার বিরু[illegible] বড় বেশী রেখাপাত করে না এই দুঃসংবাদ। সত্যি [illegible] তাতেই বা তার কি এসে-যায়। কে তারা? কি সম্প[illegible] সঙ্গে? দু'দিনের সামান্য পরিচয়ে কি প্রয়োজন ঘনিষ্ঠতার। যদি বা নিজেদের সমাজের মানুষ হত। তারা যে ধরণের

কোন সমাজ নেই। তাই নেই কোন সামাজিকতার চক্ষুলজ্জা।

বুর বাজনার ঘর—

ন্তরামের বেশ মনে আছে, ছোট কর্ত্তা বলতেন,—এটা ঘর আমার মন্দির। সুরের মন্ত্র পূজা করতে হয় এই মন্দিরে। মন পূজা হলে দেবতাকে লাভ করা যায়। যন্ত্র বাজিয়ে কিয়ে বর্ষণ পর্য্যন্ত হয়। বিষধর সর্পকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। আমার যন্ত্র-মন্দির।

ই বাজনার ঘর খোলা হবে। অনন্তরামের ইচ্ছা হয় একবার দেখে সেই ঘর। দেখে, কে কি অবস্থায় রয়েছে। অনেক ওয়া হয় না সে-ঘরে। গেলে যে মনটা কেমন আইঢাই ছোট-কর্ত্তাকে মনে পড়ে যায়। মাটির মানুষ ছিলেন; ত্যাগী পুরুষ। তাঁদের সংসার ভেঙ্গে যাবে তাই বিয়ে পর্য্যন্ত করেননি। চিরকুমার অবস্থায় চলে গেছেন। দু'টো সংসার হতে দেননি আর।

বিয়ের না কি কথা উঠেছিল কৃষ্ণকান্তর।

কুমুদিনী তুলেছিলেন কথাটা। সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থির করে ফেলেছিলেন। খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজবাড়ীর কোন এক [illegible] রূপসী, এক মোমের পুতুলের সঙ্গে। কথাটা যখন কৃষ্ণকান্তর কানে পৌঁছলো তিনি তখন কাকেও কিছু না ব'লে [illegible] রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। 'সংসার পাতো তোমরা, আমি [illegible] ত্যাগ করব'—এই ছিল না কি তাঁর বক্তব্য।

সেই সংসার শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে হলো কৃষ্ণকান্তকে। [illegible] দাদার বুকে শেল বিঁধিয়ে চ'লে গেলেন। কৃষ্ণচরণের [illegible] জল না কি কেউ চোখে দেখতে পাবেনি। তিনি [illegible] উন্মাদের মত হয়ে গেলেন। শ্রাদ্ধের কাজকর্ম্ম চুকে যাওয়ার [illegible] বুঝতে পারলেন, ভাই না কি তাঁর কোথাও যায়নি। [illegible] গেছে, এখুনি ফিরে আসবে। এই এলো বুঝি।

কৃষ্ণচরণ মুখে অন্ন তুলতেন না।

আহারের আসন হলে দেখতেন, দু'টো আসন আছে না নেই। না থাকলে আসনেই বসবেন না। আসনে ব'সে নীরবে চেয়ে থাকেন [illegible] দিকে চোখ রেখে। যেন প্রতীক্ষা করেন।

কুমুদিনী মিনতি করতেন,—আপনি খেতে শুরু করুন। সে [illegible] পাবে। আমি তাকে খাওয়াবো নিজে বসে থেকে।

কৃষ্ণচরণ সহজ স্বরে বলতেন,—তুমি তো জানো কুমু, আমি [illegible] একলা খেতে বসিনি। সে আসুক, এলে আমাকে ডাকবে।

বলতে বলতে আসন থেকে উঠে পড়তেন কৃষ্ণচরণ। দুর্ব্বল শরীর কাঁপতো ঠক-ঠক ক'রে। লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে ফটকের কাছে চলে যেতেন। সেখান থেকে গলা ছেড়ে শুরু করতেন ভাইয়ের নাম ধ'রে। অনেক ডেকে সাড়া না [illegible] হয়ে ফিরে আসতেন। এসে আর বিছানায় যাওয়ার না, কাছারীর সামনেই ঐ শ্বেত পাতরের মেঝেয় শুয়ে হয়তো কিছুক্ষণের জন্য সম্বিৎ হারিয়ে ফেলতেন।

আমলা আর লোক-জনেরা নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে পড়তো। তাদের চোখ ফেটে জল আসতো। অথচ কারও [illegible]বার সাধ্য নেই যে, এসে খানিক সান্ত্বনা দেবে। এসে [illegible]।

কুমুদিনীও অন্দরের একটা জানলায় পাষাণের মত দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিছু করতে পারতেন না। শুধু অশ্রুপাত করতেন।

অনন্তরাম মাঝ-পথে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিল একটা থাম ধ'রে। কৃষ্ণকিশোর পেছন থেকে বলে এবার,—অনন্তদা, তোমার কি হ'ল বল তো?

চমকে উঠলো যেন অনন্তরাম। আবার চলতে শুরু করলো। বললে,—হবে আর কি! ভাবছি তুই তো এদ্দিনে সাবালোক হচ্ছিস। তাই ভাবছি আর কি!

—তাতে এত ভাবনার কি আছে? কৃষ্ণকিশোর শুধোয়।

অনন্তরাম তার দার্শনিক সিদ্ধান্তের কথা মনে করে। বলে,—না, ভাবনার তেমন আর কি আছে! তবুও একটা তো পরিবর্তন হবে তোর। তুই তখন কি আর এমনটি থাকবি? বদলে যাবি কত।

অনন্তরামের কথার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে না সে। বলে,—সে আবার কি? বদলে যাবো কেন?

হেসে ফেললো অনন্তরাম। বললে,—সবাই যে বদলায় রে। তোরও ভোল বদলে যাবে। তুই-ও কি আর বাকী থাকবি?

সে তবুও বোঝে না, কি বলতে চায় অনন্তরাম। কিসের অদল-বদল? বলে,—আচ্ছা সে দেখা যাবে'খন। তুমি ম্যানেজার বাবুকে ডাকো দেখি। ঘর খুলতে বল।

ম্যানেজার বাবু এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তিনি সেই তখন থেকে চাবির তাড়া হাতে নিয়ে বাজনার ঘরের দরজায় খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি না কি একসঙ্গে দু'টো কাজে হাত দেন না। হাতের কাজ শেষ না হলে অন্য কাজের কথা চিন্তাও করেন না। যেটি ধরবেন সেটিকে আগে শেষ করবেন, তার পর অন্য কথা।

কৃষ্ণকিশোর তাঁকে প্রতীক্ষা করতে বলেছিল। সেই তখন থেকে তিনি প্রতীক্ষাই করছেন। ওদের আসতে দেখে দরজার চাবি খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে। অনন্তরামকে বললেন,—অনন্ত, মাঝের হল-ঘরে বাজনা তিনটে রয়েছে। তাঁবেদারদের বল, বয়ে নিয়ে আসবে একটি একটি। যথাস্থানে রাখতে হবে।

যন্ত্র-মন্দির অন্ধকার। তমসার গহ্বর যেন একটা।

অন্ধকার? ঘরের চারি দিকের জানলা বন্ধ রয়েছে যে। ন'মাসে ছ'মাসেও খোলা হয় না। আর এ-বাড়ীতে এখন কে এমন ওস্তাদ আছে যে, ঐ ঘরে ব'সে আসর জমাবে রাতের পর রাত? কে বুঝবে ঐ যান্ত্রিক মর্ম্মকথা? তাই আর এ-ঘরে কোন ব্যক্তির বড় একটা গমনাগমন নেই।

—একটা জানলা খুলুন ম্যানেজার বাবু! কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কৃষ্ণকিশোর দেখবার জন্তেই বলে কথাটা। কাকার মৃত্যুর পরে সেই কবে কোন্ কালে একবার না দু'বার এ-ঘরের ভেতরে এসেছিল। কি আছে মনে নেই। কেবল মনে আছে শুধু বাজনা। শুধু ঝন-ঝন আর শুধু টুং-টাং।

ম্যানেজার বাবু সন্তর্পণে এগিয়ে একটা জানলা খুলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ এক ঝলক আলো এসে খানিকটা অন্ধকার লুপ্ত করলো। ঘরে এখনও আট জোড়া জানলা আছে। প্রকাণ্ড ঘর।

বাজনা দেখেই যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। লিলিয়ানের বাজনা। সেই যে কোন্ এক ভেতরের ঘর থেকে ভেসে এসেছিল যে বাজনার সুর—পিয়ানো না অর্গান, কিসের কে জানে। হয়তো বা ভায়োলীন বাজিয়েছিল লিলিয়ান। কিন্তু অরুণেন্দু যদি সত্যিই মিথ্যা না ব'লে সত্যি ব'লে থাকে। এ খবর যদি উন্মাদের প্রলাপ আর মাতালের মাতলামি না হয়ে হয় বাস্তব সত্য!

—আর জানলা খুলতে আজ্ঞা করেন? ম্যানেজার বাবু আরও তমসা ভেদ করবার প্রয়াস পান।

—না, আর দরকার নেই। আপনি দেখুন কে আনতে গেলো! হাত থেকে পড়ে যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় না।

কৃষ্ণকিশোর কথাগুলো বলে কি যেন ভাবতে ভাবতে। যে জন্যে জানলা খোলায়, সে কথা আর মনে থাকে না। দেখতে এসে আর দেখার কথা মনে থাকে না। অনেক দিন দেখেনি তাই দেখতে চেয়েছিল। ম্যানেজার বাবু বলেন,—হাঁ, আমি দেখি। বলেন আর বেরিয়ে যান ঘর থেকে। যেন এতক্ষণ যাওয়াই তাঁর উচিত ছিল, এমন একটা ভাব দেখান।

কি দেখবে কি?

দেখে চিনতে পারলে তবে তো। কোন্টা যে কি, সে কি তা জানে না কি! জানে কার কি ব্যবহার? শুধু জানে বাজনা, বাজাতে হয়। এ যেন ভরা-যুবতীর নিঃসঙ্গতা। বাজিয়ে নেই, বাজনা কি হবে। বাঁশী বাঁশুরিয়ার হাতের—শ্রীকৃষ্ণের হাতেই বাঁশরী!

কি দেখবে কি।

ঐ তো পিনাক। তার পাশে আলাপিনী। তার পর মহতী বীণা। তন্তযন্ত্রের সর্ব্ব পুরাতন ও সর্ব্বপ্রধান ঐ বীণা। মহর্ষি নারদ সর্ব্বদা ব্যবহার করতেন। মহতীর অপর নাম তাই নারদী-বীণা। তার পর রয়েছে একটা সুর-বাহার। তার পরে রুদ্রবীণা, বিচিত্রী, আনন্দ-লহরী আর এসরার।

কি দেখতে চায় সে? ঐ সারি সারি বসানো ঐ সব যন্ত্র দেখে কি জানবে সে? পারবে তাদের মুখে কথা ফোটাতে? তাদের বুকের ভাষা? ওপাশে মৃদঙ্গ, ঢোলক। তবলা কয়েক জোড়া। জোড়ঘাই। একটা অনেক দিনের পুরানো ডমরু। ডম্বরু—ডুগডুগি—দেবাদিদেব মহাদেবের বাদন-যন্ত্র। তার পরে—

—একটু পাশ দেবেন দয়া ক'রে। ম্যানেজার বাবু পেছনে এসে বলেন। তাঁর পেছনে আরও তিন জন। তাদের হাতে বাজনা।

কৃষ্ণকিশোর যেন চমকে ওঠে কথা শুনে। অরুণেন্দুর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে কি হবে, সেই চিন্তাই তাকে এখন অস্থির করেছে। একেক বার মনে হয়, যদি সত্যি হয় তাতেই বা কি। তবুও—তবুও কোথায় যেন একটা কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনতে পায় সে। লিলিয়ানের সেই চোখ দু'টোর গোপন ইশারায় কি সাড়া দিতে চায় তার মন। দেখতে চায় লিলিয়ানকে? শুনতে চায় তার মৃদু কণ্ঠের কথা। কিন্তু দিন ফুরিয়ে বৈকালের আগমন না হলে—

ম্যানেজার বাবু যন্ত্রগুলি সাজিয়ে রাখেন যেখানে যার জায়গা। অন্ধকারে ফসফরাসের মত দ্যুতিমান কি ঐগুলো! শিশির-জলে সূর্য্যালোকের মত এমন চিক-চিক করছে! মূর্ত্তি—
—ঢাকাই রুপোর চারটি প্রতিমূর্ত্তি—হস্তিনী, শঙ্খিনী, আর পদ্মিনী। আপন আপন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চার দে… মন্দিরখানে।

অনন্তরাম ঘরের ভেতরে আসে না আর।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। এ-ঘর যার হেফাজ… দিয়েছিলেন ছোট কর্ত্তা, সেই রঞ্জনকে মনে পড়ে। সকলের অ… রঞ্জনের সঙ্গে চলতো তার মনের কথার আদান-প্রদান দু'জনে ছিল পরস্পরের বন্ধু, এ-বাড়ীর নিম্নস্তরের বে… দলের নেতা। ঐ রঞ্জন এক দিন এ-বাড়ীতে অশান্তি বা… নিজের ভুলে। ছোট কর্ত্তার চরিত্রে দোষ দিয়েছিল! ব… কান ভাঙাতে চেয়েছিল ছোট কর্ত্তার বিরুদ্ধে।

কৃষ্ণকান্ত প্রতি দিন ভোরে উঠে বাড়ীর বাইরে … শহর তখনও থাকতো সুপ্তিমগ্ন। পূবের আকাশে সূ… লালিমা ফুটে উঠতো আর কৃষ্ণকান্ত গরদের জোড় প'রে … যেতেন বাড়ী থেকে। একা যেতেন। কা'কেও সঙ্গে নিতেন না।

রঞ্জন বড় কর্ত্তার কানে কথাটা তুলে দিয়েছিল। বলে… ছোট বাবু বোধ করি রাতে আজকাল আর বাড়ীতে থাকছেন না।

—সে কি রে! কৃষ্ণচরণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় … শুনে। হতচেতনের মত হয়ে পড়েন। ভাবেন, বিবাহ না … আত্মতৃপ্তির কি প্রয়োজন? বহুভোগের লালসা? … বলেন,—সে কি রে। সর্ব্বনাশ ক'রেছে!

লুকোচুরির দরকার নেই:

অনুজকে ডেকে সরাসরি বলেছিলেন,—তোমাকে বি… বলা হল, তা করলে না। তুমি কি আমাদের বংশের গৌ… করবে?

কৃষ্ণকান্ত আকাশ থেকে পড়েন। বলেন,—আমি … কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলাম না। কি … চাও তুমি?

কৃষ্ণচরণ বলতে লজ্জা বোধ করেন। অবশেষে … হয়ে বলেন,—তুমি রাতের বেলায় কোথায় যাচ্ছো না … থেকে বেরিয়ে? কোন বারনারীর কাছে?

হেসে ফেলেছিলেন কৃষ্ণকান্ত অগ্রজের বক্তব্যে। হাসতে … বলেছিলেন,—তোমার অবসর হবে এখন?

কৃষ্ণচরণ বলেন,—হ্যাঁ, কেন হবে না।

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—তা হ'লে তোমার গাড়ীতে ঘো… বল। তুমি চল আমার সঙ্গে।

কৃষ্ণচরণ ভেবে-চিন্তে বলেন,—কোথায় যেতে হবে?

কৃষ্ণকান্ত ক্ষুব্ধ মনে বলেন,—কেন, আমি যেখানে যাই।

কৃষ্ণচরণ রুষ্ট চিত্তে বলেন,—সেই বারনারীর গৃহে আ… যেতে চাও! কেন?

আবার হেসে ফেলেন কৃষ্ণকান্ত। এবারে … অট্টহাসি। হাসতে হাসতে বলেন,—চল না, গেলেই দেখতে … বারনারীকে।

কৃষ্ণকান্তর কথামত জুড়ীতে উঠে দু'জনে যাত্রা করেন।

[৭৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রতিক শিল্পবোধের দ্বন্দ্ব

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

২

[illegible]ীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের সহিত আধুনিক যুগের শিল্পদর্শনের আর একটা প্রকাণ্ড অমিল ইতিহাসের সহিত শিল্পীর সম্পর্ক [illegible] সাদাসিধা ভাবে এই, চলিতেছে কে, আর পিছন [illegible]ছেই বা কে? রবীন্দ্রনাথের যেটা বিশ্বাস ছিল তাহাতে [illegible] চলিতেছে ইতিহাস, তাহাকে পিছন হইতে ঠেলিতেছে [illegible] পক্ষের সিদ্ধান্ত, পিছন হইতে নিরন্তর ঠেলিয়া দিতেছে [illegible] ঠেলার বেগে চলিতেছে মানুষ। আমরা এত দিন [illegible] ভাবিতে অভ্যস্ত তাহাতে এই পরবর্তী সিদ্ধান্তটা [illegible] অনেকখানি উল্টা। আমরা এত দিন জানিতাম, [illegible] লইয়া যায়; কিন্তু হঠাৎ যদি একটি প্রবল দল [illegible] পাশ হইতে বলিতে থাকে যে গাড়ীটাই [illegible] লইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে সহসা কথাটাকে [illegible] লাগে। আধুনিক মার্ক্সপন্থী সিদ্ধান্তও আমাদের [illegible] তেমনই বেসুরা ঠেকে। এই দুই পরস্পর-[illegible] কোনও পক্ষের সহিতই নিজেদের একেবারে [illegible] বলা যাইতে পারে, গাড়ীও যে ঘোড়াকে ঠেলিয়া [illegible] একেবারে মিথ্যা নয়। ঘোড়ার ভিতরে [illegible] আছে, তাই বলিয়া ঘোড়া আপনা-আপনিই [illegible] যে গাড়ীটি জুড়িয়া দেওয়া হয়, সেই [illegible] সওয়ার বা লোক সমূহ চাপাইয়া দেওয়া হয় [illegible] প্রভাব (objective condition)-[illegible] উৎপাদন করে, সেই প্রয়োজনগুলিই অদৃশ্য [illegible] নিয়ন্ত্রিত করে। তেমনই জীবনের [illegible] আপনা-আপনি চলিবার ক্ষমতা আছে, [illegible] মানসিক [illegible]বিধ। কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ [illegible] নিজের খেয়ালখুশীতেই চলিয়া বেড়ায় না, [illegible] মানুষের খেয়ালখুশীর চলিয়া বেড়াইবার [illegible] যোগ করিলে যাহা গিয়া দাঁড়ায় [illegible] বলিয়া স্বীকার করা যায় না। [illegible] 'বিধি' জড়ই হৌক বা দৈব হৌক! [illegible] একটি বিরাট সমাজ-জীবনের গাড়ী জুড়িয়া দিয়াছে। [illegible] নিরন্তর এক ভিড় জমিয়া [illegible] প্রভাবগুলি (objective conditions) [illegible] দৃশ্য-অদৃশ্য কতগুলি শক্তি উৎপাদন [illegible] দৃশ্য-অদৃশ্য শক্তির ধাক্কা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে লাগিতেছে [illegible] উপর, তাহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে [illegible]। তাই বলিয়া মানুষ যন্ত্রচালিত নিছক কতগুলি [illegible] সে চেতনাসম্পন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন স্বাধীন জীব। কিন্তু [illegible]ধীনতা শব্দের অর্থ এই যে, সব মানুষই শুধু না [illegible] পিছন হইতে দুর্নিবার ঠেলা খাইয়া চলে না, পিছনে [illegible] করিতেছে তাহাকে জানিয়া-বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সেই [illegible] করিয়া চলে। মানুষের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি [illegible] বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন; সেই বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা দেখা গিয়াছে, এই ইতিহাসের অন্তরে একটা জঙ্গমশক্তি রহিয়াছে; সেই জঙ্গমশক্তির গমনের ধারা কোথাও নেহাৎ খাপছাড়া বা খেয়ালী নয়; ইহার ভিতরে নিয়ম এবং উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এই নিয়ম এবং উদ্দেশ্যবোধের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তে ভাসিয়া আসিয়াছে কতগুলি শ্রেয়োবোধ, একটা পরম কল্যাণের বোধ। এই পরম কল্যাণের আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজশক্তির সকল গতি-প্রকৃতিকে ভালরূপে জানিয়া-বুঝিয়া স্বেচ্ছায় এই বিপুল আবর্তনের ভিতরে নিজের অংশ বাছিয়া লওয়া—ইহাই মানুষের জীবনের চলার পথে সত্যকার স্বাধীন পথ।

বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে যাহা সত্য শিল্প-জীবনের পক্ষেও তাহাই সত্য; সুতরাং মার্ক্সবাদকে স্বীকার করিতে হইলে শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণ এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সহিত ব্যক্তি-জীবনের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা ছিল এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবন-ধারা এবং স্বাধীন মনের লীলাবৈচিত্র্যের উপর ইতিহাসের এই কঠোর নিয়ন্ত্রণের দৌরাত্ম্যকে তিনি তাঁহার জীবনে কখনই বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। এই প্রতিবাদের স্পষ্টতম প্রকাশ রহিয়াছে তাঁহার 'সাহিত্যের স্বরূপে'র 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন,—"···আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত এ-কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর কিছু নই কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়।"

শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, ও-জিনিসটা সকল সমাজ ও ইতিহাস-নিরপেক্ষ শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস—ওটা মানুষের আত্মার ধর্ম। এই আত্ম-ধর্মে মানুষ যাহা কিছু করে ইতিহাস বা সমাজ বড় জোর তাহার ভিতরে কিছু উপকরণ জোগাইয়া দেয়। "সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না।" মানুষকে তৈরি করে সম্পূর্ণ তাহার আত্ম-ধর্ম, শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি তাহার এই আত্মধর্মেরই প্রকাশ, এই আত্মধর্মের প্রকাশেই তাহার শিল্পের চরম সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের মতে তাই শিল্পী অসঙ্গ—সম্পূর্ণ একাকী—কেবল। 'কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে।'

রবীন্দ্রনাথের এই মূল সিদ্ধান্ত হইতে আপনা-আপনি কতগুলি অনুসিদ্ধান্ত বাহির হয়। প্রথমতঃ, শিল্প হইতেছে একান্ত ভাবে অপ্রয়োজনের আনন্দ। ইতিহাসের সহিত—অর্থাৎ বহির্বিশ্বের প্রবল আবর্তনের সহিত যখন শিল্প-সৃষ্টির কোন মৌলিক যোগ নাই, তখন শিল্প-সৃষ্টির মুখ্য কারণ এবং উদ্দেশ্য শিল্পীর আত্মানন্দ।

শিল্পী শুধু আত্ম-লীলামুগ্ধ কিশোরী বালিকার ন্যায় গোধূলির আবছা অন্ধকারে কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে নিজের খেয়াল-খুশীতে অকারণে শিল্পের প্রদীপ ভাসাইয়া দিয়া যায়, তাহার শিল্পের আলোখানিকে আকাশ-প্রদীপ করিয়া অকারণে শূন্যে তুলিয়া দেয়, অথবা লক্ষদীপের সঙ্গে অকারণে দীপালির উৎসবে সাজাইয়া দেয়। এই যে বিশুদ্ধ শিল্পানন্দ—ইহা মানুষের জীবনের একটা উপরি পাওনা—জীবনের ক্ষেত্রে এটা একটা উদ্বৃত্ত বস্তু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এটা হইতেছে—'the surplus in man'। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই, ইহার সৃষ্টি বাঁচিয়া থাকিবার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ আনন্দলীলার জন্য। শিল্পের এই যে আনন্দলোক, ইহার সহিত আমাদের ধূলিক্লিন্ন ঘর্মসিক্ত সংগ্রামক্লান্ত জীবনের কোন যোগ নাই—দৈনন্দিন সংবাদপত্রের কোন 'ব্যাপক ব্যাপার' বা 'গুরুতর পরিস্থিতি' এই আনন্দলোকের অবস্থিতিকে বিশেষ কোন স্থিতিস্থাপকতা দান করে না।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য সৃষ্ট নয়; ইহা মুখ্যতঃ সৃষ্ট শিল্পীর আত্ম-প্রসাদের জন্য। সংসারের বহু জন ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিল না করিল, ইহাতে সমাজের কি উপকার হইল না হইল, অথবা ইহা বহু জনের আনন্দবিধান করিতে পারিল না পারিল শিল্পীর কাছে ইহা বড় কথা নয়; শিল্পীর নিকট বড় কথা, তাঁহার আত্ম-ধর্মের মধ্যে নিরন্তর বিচিত্র ভাবে আত্ম-প্রকাশের ভিতর দিয়া আত্মোপলব্ধির যে একটা তাগিদ রহিয়াছে তাঁহার জীবনের নিরলস সাধনার ভিতর দিয়া তিনি তাহাকে কতখানি সার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই বিচিত্র আত্মোপলব্ধি-জনিত যে আত্মপ্রসাদ ইহাই জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হাসি, 'চিত্রা'র 'সাধনা' কবিতাটির ভিতরে রহিয়াছে এই সত্যেরই ইঙ্গিত। আদর্শের দিক হইতে শিল্প-জগৎটি ছিল তাই সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের নিজের জগৎ। এই নির্জন জগতের ভিতরে তিনি যতটা সম্ভব আত্ম-সমাহিত হইয়া বহুর মতামতরূপ কোলাহলকে এড়াইয়া চলিতে চাহিতেন।

এই প্রবল অন্তর্মুখিতা এবং বহির্বিমুখিতাই রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মকে তাহার সকল রোম্যাণ্টিকতা দান করিয়াছে। আত্মরতিই যেখানে শিল্পের মূল লক্ষ্য সেখানে সমগ্র বহির্জগৎ কবির নিকট শুধু মাত্র আত্ম-প্রকাশের উপলক্ষ বা অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশ্বজগতে যেখানে যাহা কিছু আছে কবি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তাহাদিগকে শুধু গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তঃস্থিত একটি বিশ্বগ্রাসী 'আমি'র ভিতরে সংহরণ করিয়া লইয়াছেন। এই নিরবচ্ছিন্ন সংহরণের ভিতর দিয়া কবির মধ্যে যে একটি বিরাট 'আমি' কেবলই গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ভিতরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংহৃত হইয়াছিল অনন্ত রহস্য—অসীম বিস্ময়ের মূর্তিতে। হৃদয় হইতে সেই রহস্য—সেই বিস্ময় ঢালিয়া ঢালিয়া আবার চলিয়াছে কবির যাহা কিছু শিল্পরূপায়ণ। এই রোম্যাণ্টিক ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিল্পধর্মেরই কোন বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাঁহার মতে ইহাই শিল্পের সাধারণ ধর্ম।

বহুবাদী বহুর নিকট হইতে এবং বহু কোলাহলের বাহির হইতে নিজেকে গুটাইয়া রাখিবার সহজাত স্পৃহা রবীন্দ্রনাথকে জন্ম-পলাতকা করিয়া তুলিয়াছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে 'পলাতকা'কে আমরা আজকাল যত বড় গাল বলিয়া মনে করি না কেন, এই পলাতকা-বৃত্তিকেও তিনি তাঁহার সহজ শিল্পিধর্ম বলিয়াই [illegible] করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ মার্ক্সবাদীর দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতে বসিলে রবীন্দ্র-[illegible] উপরি-উক্ত সকল শিল্পাদর্শের সহিতই গভীর অমিল হইবার [illegible] এই অমিলগুলির কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে [illegible] বলা যায়, শিল্পী তাঁহার শিল্পজগতে একক এবং অসঙ্গ [illegible] মূল শিল্পি-ধর্মেরই বিরোধী; শিল্প অপ্রয়োজনের আনন্দ [illegible] অশ্রদ্ধেয়, জীবন-যাত্রার জন্য আর যাহা কিছুরও যেমনতর প্রয়ো[illegible], শিল্পেরও সেইরূপ অবশ্য প্রয়োজন; শিল্পসৃষ্টি শিল্পীর কল্পনা-[illegible] জনিত খেয়ালখুশীর আনন্দের জন্য নহে, ইহার সৃষ্টি [illegible] জন-গণের জন্য। বৃহৎ জন-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, [illegible] জন-সমাজকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া শিল্পের নামে যে [illegible] রতির আয়োজন উহার সবটাই অপচেষ্টা। শিল্পের সার্থকতা সবটাই সমাজ-জীবনে তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বের দ্বারা। [illegible] কাজ করে—এই যুধ্যমান ঘর্মসিক্ত ধূলিক্লিন্ন সংসারের জন্য [illegible] করে—যেমন সংসারের জন্য কাজ করে ক্ষেতের চাষী—[illegible] কুলী-মজুর—কারখানার শ্রমিক—যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক। শিল্পের নাম করিয়া ইহার ভিতরে যাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্বক পলাতকা [illegible] তাহারা সমাজ কর্তৃকও ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই যে সকল শিল্প-বিশ্বাস এগুলির মূল বিচার [illegible] করিয়া দেখিবার মার্ক্সপন্থীদের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। [illegible] পদ্ধতিতে বিচার করিয়া দেখিলে সংক্ষেপে বলিতে হয়, রবীন্দ্রনা[illegible] জাতীয় সকল বিশ্বাসই ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া পুঁজিবা[illegible] প্রসূত। এই বুর্জোয়া পুঁজিবাদ সবটা স্থানীয় ছিল না, ইহার [illegible] অনেকখানি ছিল সাগর-পারের ঢেউ। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী[illegible] ভাগে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের যে বাড়-বাড়ন্ত রবীন্দ্রনাথের [illegible] প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে ইহারই সহিত যুক্ত; [illegible] এই পুঁজিবাদে[illegible] সূক্ষ্ম সুকুমার ছদ্মরূপ প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবাদে[illegible] দিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিত্য-নূতন আবিষ্কারের ফলে [illegible] লাগিল নিত্য অগ্রগতি; এই অগ্রগতির অনিবার্য প্রভাব [illegible] বাণিজ্যের বাজারে; সেখানে দেখা দিল পারস্পরিক [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সৃষ্ট হইল 'অবাধ[illegible] এই অবাধ-উৎপাদন এবং 'অবাধ-বাণিজ্য' ক্যাপিটালিজ[illegible] একটা চরম রূপ ধারণ করিল তাহা মানুষকে তাহার [illegible] মাতৃদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার [illegible] জাগ্রত করিয়া দিতে লাগিল। সমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছি[illegible] স্বয়ং-স্বতন্ত্র না হইতে পারিলে, অবাধ-উৎপাদন এবং অবাধ[illegible] চরম ফল ভোগ করা যায় না। সুতরাং এই পুঁজিবাদ[illegible] সমর্থনের জন্যই আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিতে লাগিল এই [illegible] জয়গান। পুঁজিবাদ-প্রসূত এই যে স্বাতন্ত্র্যের জয়গান [illegible] ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল কলা-কৈবল্য এবং শিল্পীর একা[illegible] অসঙ্গত্বের মূলে। কারখানার মালিক যে তাহার আত্মর[illegible] চাই এই স্বাতন্ত্র্যবাদ, রাজা-মহারাজা জমিদার-তালুকদার [illegible] আত্মরক্ষার জন্যই চাই এই স্বাতন্ত্র্যবাদ; এই স্বাতন্ত্র্যবাদ[illegible] করিয়া তুলিবার জন্য পিছনে চাই আবার দৈব-অধিকারের [illegible] নতুবা যে সকলের সঙ্গে সমানে ভাগ করিয়া ভোগ করিবা[illegible]

...। শ্রেণীভেদের বনিয়াদটি পাকা করিবার জন্যই তাই চাই ...ধিকার এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের মহিমা। মোটের উপরে ...হইলে দেখা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের যে একাকিত্বের মতবাদ, উহাও উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেণীসংগ্রাম-...। উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ-উৎপাদন এবং অবাধ-বাণিজ্য ... সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই ...য়া তুলিল শ্রেণী-সংগ্রাম। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজ তখন ...ক্ষার বর্ম খুঁজিতেছিল চরম স্বাতন্ত্র্যবাদে। শিল্পীরাও এই ...য়াছে শিল্পোৎপাদন এবং তাহার অবাধ-পরিবেশনের জন্য ... হইয়া এই স্বাতন্ত্র্যের জয়গান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের '...করবী' নাটকেই দেখা যায় নিত্য-নূতন ভাল ভাল সোনা ...নিত হয় যে যক্ষপুরী হইতে, সেই যক্ষপুরীর রাজা নিজেকে ... সর্বদা জালের ভিতরে ঘিরিয়া রাখেন, এবং সেই জালের ...ড়ালে চলে তার অসঙ্গ একাকী জীবন, তাহাতে দুঃখ-কষ্ট আর ... থাক নিজের স্বতন্ত্র ভোগাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বাহিরের ... শ্রেণী-সংগ্রামকেও অনেকখানি এড়াইয়া চলা যায়। মার্ক্সপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কেও হয়ত এই কথা বলিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাত-সংগীতেই দেখি—

রোদন, রোদন, কেবলই রোদন,
কেবলি বিষাদশ্বাস,
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস।
নাই কোন কাজ,—মাঝে মাঝে চাস
মলিন আপনা-পানে,
আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস আপন কানে।
দিবস-রজনী মরীচিকা-সুরা
কেবল করিস্ পান।
বাড়িতেছে তৃষা, বিকারের তৃষা
ছট্‌ফট্ করে প্রাণ।
দাও দাও বলে সকলি যে চাস্
জ্বলিছে ক্ষুধে,
মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পরিস মুখে।

—(আহ্বান-সংগীত)

... সেই যক্ষপুরীর রাজধর্মেরই বিশেষ প্রকাশ? সেই ... জঠরানল—যত পাই, কিছুতেই তৃপ্তি নাই। সেই অতৃপ্ত ...কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে বৃহৎ জনমানব হইতে, ...আত্ম-ভরণ জনিত আনন্দও আছে—আবার আছে নিজের ...ের তীব্র প্রতিক্রিয়া, যেটা হইল বুর্জোয়া পুঁজিবাদের ...আত্ম-দ্বন্দ্ব। যে আত্মঘাতী স্ববিরোধ অনুস্যূত হইয়া ...শ শতাব্দীর বুর্জোয়া আর্থিক ব্যবস্থায়—তাহার সমাজ-... স্ববিরোধই উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পে—তথা রবীন্দ্রনাথের ...রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে শিল্পীর নিজের শিল্পধর্মের ...টি তীব্র প্রতিক্রিয়ায়। তাই কৈশোর হইতেই দেখিতে ...নাথের এই আত্মদ্বন্দ্ব।

নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,
লোক-মাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
ভাসায়ে জীবন-তরী সাগরের মাঝে
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।
পুরুষের মতো যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারি না তো লয়ে নিজ বল,
সহস্র সংকল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।
আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি,
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

—(স্বপ্নরুদ্ধ, কড়ি ও কোমল)

মার্ক্সপন্থীদের মতে এই আত্ম-প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কোন ধর্ম নহে, ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ শিল্পি-ধর্ম। কিন্তু যতই আত্ম-প্রতিক্রিয়া থাক, ঐ অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের 'সূক্ষ্ম রেশমের জাল' কাটিয়া তাঁহারা শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বাহিরে আসিতে পারেন নাই; তাহার কারণও হয়ত এই যে, এক জন কবি নিজের ইচ্ছায় এই সূক্ষ্ম রেশমের জাল কাটিয়া উঠিতে পারেন না, সমাজধর্মের পরিবর্তন না ঘটিলে এই শিল্পধর্মের পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস যে যুগের ধাতুতে তৈরি, সে ধাতুর পরিবর্তন না ঘটায় রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই—

'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।'

এই আক্ষেপই করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের খোলসের ভিতরে বুর্জোয়া পুঁজিবাদ যতই নিরাপত্তা খুঁজুক না কেন, 'অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' এই আত্মকেন্দ্রিকতা, এই আত্ম-রতির ভিতরেই নিহিত আছে তাহার আত্মঘাত। আত্ম-তোষণ এখানে আত্মপ্রতাড়ন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও, শিল্পের ক্ষেত্রেও। এই পুঁজিবাদী-দের সম্বন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়ই বলা যাইতে পারে,—

যত দিন বেঁচেছিল
আমি জানি কি তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ড, ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে
যত হাসে ততই সে দহে।
তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত দহিত তারে, দহিত কেবল।
জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজন তেয়াগি,
তাই আজ ছুটেছে সে নিরন্ত মনের ক্লেশে—
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

—(তারকার আত্মহত্যা, সন্ধ্যাসংগীত)

এই যে একটি তারকার জ্যোতির্ম্ময় তারাপূর্ণ লোককে ত্যাগ করিয়া 'আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি যাত্রা' ইহাই তারকার আত্মহত্যা ; সমষ্টির সমাজ-সত্তাকে এড়াইয়া এই অসঙ্গত্বের লোভই যেখানে পৌঁছাইয়া দেয় তাহা আত্মরক্ষা নয়, আত্মহত্যা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এই জাতীয় মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা আর কে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না ; কিন্তু কবির কানে কোনও-রূপে ইহা পৌঁছিলে তিনি করজোড়ে যে কথাটি অবশ্যই বলিতেন তাহা হইল এই,—"অন্য শত রকমের তাপ তুমি যথেচ্ছ ভাবে দাও ; হে চতুরানন, সে সকলই সহ্য করিব ; কিন্তু এই জাতীয় মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা আমার 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।" কিন্তু কেন ? আপত্তি কোথায় ? আপত্তি একেবারে মূলে—মূল জীবন-দর্শনে। শিল্পের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের যত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা তাহার মূলে রহিয়াছে Dialectic materialism, আর রবীন্দ্রনাথের যে শিল্পের ক্ষেত্রে অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের মতবাদ, তাহার পশ্চাতেও রহিয়াছে তাঁহার একটি দৃঢ়মূল অধ্যাত্ম-বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের কারণ স্বরূপেও হয়ত উনবিংশ যুগীয় অনেক বাস্তব হেতু-প্রত্যয় (objective conditions) খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে ; উনবিংশ শতাব্দীর উৎপাদন-প্রথার বৈশিষ্ট্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদের যে কি কার্য-কারণ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাও হয়ত আবিষ্কৃত হইতে পারে ; কিন্তু যাঁহারা মানুষের এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাসকে শুধুমাত্র উৎপাদন-প্রথাজাত একটা মানসিক বিকার মাত্র মনে না করেন, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অসঙ্গত্ব ও একাকিত্বের অন্য যে ব্যাখ্যা থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া দরকার।

এ ক্ষেত্রেও মার্ক্সপন্থীদের সহিত রবীন্দ্রনাথের একটা জায়গায় গভীর মিল রহিয়াছে, সে মিলটি এই যে, অংশীকে বাদ দিয়া অংশ কখনও সত্য নয় ; সমগ্রতাই সত্য ; সমগ্র-নিরপেক্ষ এক নিরর্থক। এখন প্রশ্ন এই, মানুষের জীবনে একটি মানুষ যদি অংশ হয় তবে তাহার অংশী হইবে কে ? জড়বাদ বলিবে, সমাজ। অতএব সমাজ-নিরপেক্ষ যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কল্পনা উহা ব্যক্তিকে দান করিবে নৈরর্থক্য ; ব্যক্তির সার্থকতা সমাজের সহিত যে তাহার যোগ তাহার নিবিড় অনুভূতিতে। সেই নিবিড় অনুভূতি হইতে উৎসারিত যে শিল্প তাহাই শুধু সার্থক। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে তাঁহার কবিপুরুষের সার্থকতা পৃথিবীর বহুপুরুষের মিলনে সৃষ্ট সমাজের সহিত যোগে নয়, বিশ্বব্যাপী এক পরম পুরুষের সহিত যোগে। এই বিশ্বব্যাপী পরম পুরুষ আদি শিল্পী—শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আসল যোগ এই আদি শিল্পীর সহিত। জনগণ এখানে অস্বীকৃত নয়, অতিক্রান্ত,—অথবা একের ভিতরে—সমগ্রতার ভিতরে সমাহিত ; সুতরাং সেই এককে জানিলে ও জানাইলে সব কিছুই জানাও হয়, সব কিছুকে জানানও হয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পস্রষ্টা হিসাবে যে অসঙ্গত্ব এবং একাকিত্বের ধারণা তাহা তাঁহার ঔপনিষদিক এক পুরুষের ধারণার সহিত যুক্ত ; যিনি শুধু এক নন,—সকলের ভিতরে এক, একের ভিতরে সব। এই একের বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মানসিক পরিমণ্ডলে এই একটা বিশ্বাস জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভাসিয়া বেড়াইত যে, তাহার গানের শেষ লক্ষ্য, সুতরাং আসল লক্ষ্য হইতেছে সেই এক। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

মর্ত্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,
মর্ত্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্য কাজে ; সর্ব কর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমার পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে ;—
কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি !

সংসারকে কবি এখানে একেবারে বঞ্চিত করিতে চাহেন নাই [illegible], কিন্তু শেষ লক্ষ্য অন্য হওয়াতে সংসারের ভার কমিয়া গিয়াছে, [illegible] ফলে কবি সর্বত্র না হইলেও বহু স্থলে সংসারের সকল [illegible], লাভ-লোকসানের প্রতি উদাসীন হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারের [illegible] এই সহজ ঔদাসীন্যের সহিত তাঁহার অসঙ্গত্বের বিশ্বাসের [illegible] পারম্পরিক যোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই যে [illegible] সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্নতা—তাহা নিরালম্ব বিচ্ছেদ [illegible],— বিচ্ছেদের লোকসান অল্প—একের সহিত নিবিড় মিলনের [illegible] অনেক বেশী।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই অসঙ্গত্ব এবং [illegible] ধারণা সর্বত্র যে স্পষ্ট একটা সাধারণে প্রচলিত ধর্মবোধের [illegible] দিয়াছে তাহা নয় ; রবীন্দ্রনাথের গভীর শিল্পবোধ তাঁহার [illegible] সহিত অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত থাকিলেও এই শিল্পবোধ [illegible] আওতায়ই প্রকাশ পায় নাই। 'খেয়া'র 'অনাবশ্যক' [illegible] ভিতরে বা চিত্রার 'আবেদন' কবিতার ভিতরে যে অসঙ্গ [illegible] শিল্প-সাধনার আত্ম-প্রসাদের উল্লাস দেখা যায়, তাহা স্পষ্ট [illegible] ধর্মবোধাশ্রিত নহে। সেখানকার ধরণটা অনেকখানি [illegible] পন্থী (Art for Art's sake)। কিন্তু এই কলাকৈ[illegible] ভাব ও উক্তি রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক ও অন্যান্য লেখার [illegible] বহু স্থানে দেখা গেলেও, রবীন্দ্রনাথের কবি-মনটিকে সমগ্র ভাবে [illegible] করিলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথের এই কলাকৈবল্যবাদ [illegible] নিরালম্ব নহে, 'জীবন-দেবতা'র উপরে তাহার একটা [illegible] রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বহু ভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহার [illegible] সৃষ্টির কারখানায় তিনি একেবারে একা এবং সেখানকার যে আনন্দ তাহা মুখ্যতঃ তাঁহার নিজের। সাধারণ ভাবে বিচার [illegible] এই মতটি শিল্পের মূলধর্মেরই বিরোধী। শিল্প অর্থই [illegible] একটা সৃষ্টি, যাহা মূলতঃ হৃদয়-সংবাদী (Communicative [illegible] কোন শিল্পই তাই শ্রোতা বা দ্রষ্টার অপেক্ষা রাখে। শিল্প-[illegible] তাই মূলতঃ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, একটা সামাজিক [illegible] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথা নিজেই [illegible] অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "একেবা[illegible]

...নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব ...বলেন যে, পাখি যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের ...উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত—পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি ...শুনিয়া থাকেন।

"পাখির গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, ...কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে ত না-ই রইল, ...লইয়া তর্ক করা বৃথা—কিন্তু লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য পাঠক ...।"—(সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্য)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ নিছক 'বাজে কথা' আখ্যা দিয়াছেন। "সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেই রকমের একটা কথা। রচনা বচয়িতার ...জন্য নহে, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে—এবং সেইটা ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।" শুধু তাহাই নহে, জীবনে কোন কিছুর মহিমা প্রকাশ করিতে হইলেই তাহাকে অপরের কাছে বড় করিয়া বলিতে হয়। বড় করিয়া বলিতে হইলেই সুর চড়াইতে হয়; এই সুর চড়ানটাই হইল আসল শিল্পকলা। এই সুর চড়াইতেই লাগে রঙ, রেখা,—লাগে ছন্দ, অলঙ্কার, বিচিত্র ভঙ্গি। শিল্পকলায় যাহা কিছু আয়োজন—যাহা কিছু কলাকৌশল সকলই হইল নিজের কথাকে পাঠক-সমাজে প্রকাশ করিবার জন্য। "এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা দূর করিয়া দেয় তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে তাহা নয়, পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোক প্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।"—(সাহিত্যের বিচারক, সাহিত্য) এই কলাকৌশল শিল্পের পক্ষে কিছুই কৃত্রিম নয়, শিল্পের প্রকাশধর্মের ভিতরেই নিহিত আছে এই কলা-ধর্ম।

প্রকাশ-ধর্মই যদি শিল্পের প্রধানধর্ম হয়, তবে শিল্প কখনও সমাজ নিরপেক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র ভাবে বিচার করিলে মনে হয়, ইহাই শিল্পের চরম কথা নহে, ইহা একটা স্তর-বিশেষের কথা মাত্র। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে 'এতো হয়' বা '...', কিন্তু 'আগে কহ আর'। রবীন্দ্রনাথের শিল্পের আর একটি দিক আছে, সেখানেও হৃদয়-সংবাদ (Communication) রহিয়াছে, কিন্তু সে হৃদয়-সংবাদ মানুষের সঙ্গে নয়, তাহা তাঁহার অন্তর্যামী জীবন-দেবতার সঙ্গে। এখানেও শিল্পের প্রকাশ-ধর্ম রহিয়াছে, কিন্তু জবাবদিহি মানুষের কাছে নয়, জবাবদিহি জীবন-দেবতার কাছে। এই যে মানুষের মুখের দিকে না তাকাইয়া নিজের অন্তরের সত্যস্বরূপের দিকে ফিরিয়া তাকান, রবীন্দ্রনাথের শিল্পের ...স্বাতন্ত্র্য এবং একাকিত্বের ইহাই গভীর তাৎপর্য। ব্যক্তিকেন্দ্রে ... হইয়া যিনি রূপ গ্রহণ করিয়াছেন জীবন-দেবতার, ... তিনিই বিরাজিত বিশ্বদেবতা-রূপে। জীবনের এবং ...বে-মগ্ন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দোসর হইলেন এই বিশ্বদেবতা। ... যে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি ... স্পষ্ট ধর্মমূলক কাব্যগ্রন্থের ভিতরেই পরিস্ফুট ...আছে তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রথম ... পর্বেই এই বিশ্বাসের স্ফুট এবং অস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতির অধ্যাত্ম সুর অতি স্পষ্ট বলিয়া এই কাব্যগ্রন্থগুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়াই আমি রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের কিছু কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। 'ছবি ও গানের' 'পূর্ণিমায়' কবিতাটিতে দেখিতে পাই কবি বলিতেছেন,—

> হে ধরণী, পদতলে
> দিয়ো না দিয়ো না বাধা
> দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও,
> অনন্ত দিবস-নিশি
> এমনি ডুবিতে থাকি
> তোমরা সুদূরে চলে যাও।
> এ কী রে উদার জ্যোৎস্না,
> এ কী রে গভীর নিশি,
> দিশে দিশে স্তব্ধতা বিস্তারি।
> আঁখি দু'টি মুদে গেছে
> কোথা আছি কোথা নামি
> কিছু যেন বুঝিতে না পারি।
> * * *
> অসীমে সুনীলে শূন্যে
> বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
> তারে যেন দেখা নাহি যায়—
> নিশীথের মাঝে শুধু
> মহান্ একাকী আমি
> অতলেতে ডুবিরে কোথায়।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের একটি 'মহান্ একাকিত্বে'র রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধু ধর্ম-জগতের একাকিত্ব নয়, এখানে ধর্ম-জগৎ এবং শিল্প-জগৎ এক হইয়া যাওয়াতে, একের সত্য অন্যের নিয়ামক হইয়াছে। শিল্প-জগতে রূপের পজারী রবীন্দ্রনাথের যে 'বিজন বাস' তাহার একটি গভীর অর্থ ফুটিয়া উঠিয়াছে 'মানসী'র 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায়।

> আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে
> একাকী অসীম ভরা,
> আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
> মিলাবে সকল ধরা।
> আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
> আমার বিজন বাস,
> প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া
> রব আমি বার মাস।

সকল সীমার উর্দ্ধে রূপের অতীতে অসীম রূপাতীতের যে ধ্যান, সেইখানেই কবির বিশ্বাতীত বিজনবাস। এই অসীম এবং রূপাতীত এই কবিতায় অবশ্য একটি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য মূর্তিতেই ধ্যেয়; কিন্তু এই সীমাহীন অথচ সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে অধ্যাত্ম রহস্য লাভ করিয়াছে। সেই অধ্যাত্ম দৃষ্টি স্পষ্ট রূপ পাইয়াছে 'মানসী'র 'ধ্যান' কবিতায়, সেখানে—

বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি ।

* * * *

উদয় শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটি নয়ন সম ;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিকো তাহার সীমা ।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ-পূর্ণিমা ।

'ক্ষণিকা'র 'সমাপ্তি' কবিতায়ও দেখি—

পথে যত দিন ছিনু, তত দিন
অনেকের সনে দেখা ।
সব শেষ হ'ল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা ।

* * * * *

তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে ।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে ।

রবীন্দ্রনাথের মতে তাহা হইলে অনন্তের নিঃসীম রহস্যের মধ্যে অবগাহনই হইল 'একাকিত্বে'র তাৎপর্য। এখানে হৃদয়-সংবাদ সবটুকুই অসীমের সঙ্গে। এই একাকিত্বের রহস্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'র মধ্যে 'একাকী' কবিতাটিতে।

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী—,
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারি শূন্য দিল ঢাকি'।
আমি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথ রাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে,
সে রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহ রস, তাই দিয়ে ভরিয়া আধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার ।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী,
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে-আসা
দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভাষা ।
মিলায়েছ, সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
সে-মুক্তি রয়েছে লীন স্তব্ধতান শান্ত অন্ধকারে ।
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে
জনশূন্য তুষার শিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা কোন্ তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে ঊর্ধ্বে তুলি' আঁখি,
"তুমিও একাকী।"

যিনি অনন্ত তিনি নিজে তাঁহার বিজনবাসে 'একাকী'; যেখানে তিনি সৃষ্টিকর্তা সেখানেও তিনি একাকী; সেই একাকীর ধ্যান হইতেই জাগে বিশ্বসৃষ্টি—আদি শিল্পীর শিল্পায়ন। মর্ত্যের সকল শিল্পী সেই আদি শিল্পীর নিকট হইতেই গ্রহণ করে তাহার দীক্ষা; তাই তাঁহার ধ্যান-সমাহিত রূপেও তিনি একাকী—তাঁহার সৃষ্টিশালায় তিনি একাকী। এই একাকীর আহ্বান কবি যখন তাঁহার অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন তখন—

জানিলাম একাকীর নাই ভয়
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোন লজ্জা নাই
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টি-কর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্য লোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে ।
—(প্রান্তিক, ৮)

এই বিশ্বসৃষ্টি-রূপ বিরাট শিল্পকে রবীন্দ্রনাথ কখনও নটরাজের নৃত্য, কখনও কাব্য, কখনও সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; এই নৃত্য, এই কাব্য, এই কবিতাকেই তিনি আবার নিজের মতন করিয়া গ্রহণ এবং প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তাই—

কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ চলা হল অর্থহীন ।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু ।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। —(প্রমাণ, পত্রপুট)

সৃষ্টির এই সঙ্গীতরূপটি এবং কবি সেই অনন্ত সঙ্গীতের কয়েকটি সুর নিজের বাঁশরীতে ভরিয়া কি ভাবে তাহার কবিজীবনকে সার্থক করিতে চান, তাহার সুন্দরতম প্রকাশ দেখি 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতায়,—

অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সংগীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা ;—
সেথা হ'তে টানি লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।*

---

* তুলনীয়, সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে ।

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন,—

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

*　　*　　*

যে নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়
কবির বাণী অবাক্ মানি
তা'রি নাচের প্রসাদ যাচে।

—(মুক্তি-তত্ত্ব, নটরাজ, ঋতুরঙ্গশালা)

এই নটরাজের বা বিশ্বকবির শিষ্যত্বের গর্ব কবিকে মানুষের মতামত সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন, জবাবদিহি সেই একের কাছে, মানবের কাছে নয়। মানুষের আদেশ-অনুরোধ সবই উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু গুরুর আদেশ লঙ্ঘনীয়। তাই দেখি—

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়,
"তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর, এ কী চপলতা।
কেন হাস্য পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে।"
দিয়েছি উত্তর তাঁরে, "ওগো পক্ককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানবপ্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।
তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে ক্ষমতা,
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা।"

—(উৎসর্গ, সংযোজন, ৭)

এবং এই 'কবিগুরু'ই যে শুধু সেই পরম এক ছিলেন তাহা নহে, কবির শ্রোতাও ছিলেন সেই 'এক', সমঝদারও তিনি।

জানি আমি মোর কাব্য ভালবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন দেওয়া নিধি।

*　　*　　*　　*

ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁ'র আমার বাঁশিতে শুনি বারে বারে।

—(সৃষ্টিকর্তা, পূরবী)

আকাশে তারকা ফুটে, ফুলবনে ফুল,
খনিতে মানিক থাকে, হয় নাকো ভুল—
তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
রেখেছ, কবিও যেন রাখে তার মান।

—(উৎসর্গ, সংযোজন ৬)

আবার,

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃষ্টের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।
ওগো দূরবাসী,
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।

—(দূরের গান, সানাই)

'রোগশয্যায়' বসিয়া কবি যে গান রচনা করিয়াছেন সে সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন,—

যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে
গান বেঁধেছিনু বসি একা
তখনো যে ছিলে তুমি দূরে,
দাও নাই দেখা ;
কেমনে জানিব সেই গান
অপরিচয়ের তীরে তোমারেই করিছে সন্ধান।
দেখিলাম, কাছে তুমি আসিতে যেমনি
তোমার গাতের তালে বাজে মোর এ ছন্দের ধ্বনি ;
মনে হল, সুরের সে মিলে
উচ্ছ্বসিল আনন্দে নিশ্বাস নিখিলে।　　—(৩৪)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই 'তুমি' কে ? ইঁহাকে চিত্রা, বিচিত্রা, অন্তর্যামী, জীবনদেবতা বহু রূপেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতরে পাওয়া যায়। কাব্যের ভিতরে এই 'চির-অপরিচিতে'র কোন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, আছে শুধু আভাস ও ইঙ্গিত। তবু যদি দার্শনিক ভাষায় ইহাকে প্রকাশ করিতে হয় তবে বলিতে হয়, ইহা হইতেছে একটি অনাদি অনন্ত বিচিত্র লীলাময়ী সৃজনী শক্তি। এই শক্তির লীলার একটি বিশেষ ছন্দ আছে : সেই ছন্দের এক দিকে আছে 'একে'র ভিতরে আত্ম-সংহরণ, অপর দিকে বহুর ভিতরে আত্ম-উৎসর্জন। পাশ্চাত্য দার্শনিক বের্গস্-এর মধ্যেও আমরা বিশ্ব-নিখিলের অন্তর্নিহিত একটি সৃজনী-শক্তিতে বিশ্বাস দেখিতে পাই, তিনিও সেই শক্তিকে বলিয়াছেন প্রাণ-শক্তি। কিন্তু এ-শক্তিও জড়শক্তি ; রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি একটি নিত্যবিবর্তনশীল চিৎশক্তি ; এই চিৎশক্তি কবির মনের গভীরে ঔপনিষদিক 'একে'র সহিত মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মবোধ এবং তজ্জাত না হইলেও তৎসহচর বহির্বিমুখতা এবং আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ রবীন্দ্রনাথের শিল্প-জীবনে একেবারে তরঙ্গহীন একটানা পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম জীবনে অন্ততঃ তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সমাজবোধের ভিতরে একটা

ছর্ষ ছিল; কিন্তু তার পরে মনে হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্যবোধে তাঁহার যেন একটা অচল প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল। এই আত্মতন্ত্রের এবং সমাজতন্ত্রের ভিতরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। এখানে দেখিতে পাই, কবির নিজের এই স্বাতন্ত্র্য এবং পলাতকা-বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ। এই কবিতার প্রথম অংশে রহিয়াছে একটি বলিষ্ঠ সমাজবোধের পরিচয়। এই সমাজবোধ কবিকে সমীরে সমীরে না দুলিয়া এবং কোন মোহিনী মায়ায় না ভুলিয়া, বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায় অলস-ঔদাস্যে না বসিয়া থাকিয়া 'ধূসর প্রসর রাজপথে' বাহির হইয়া আসিবার প্রেরণা দিয়াছিল। এখানে আর কবি কর্মহীন অলস জীবন বরণ করিয়া লইতে চান নাই, পরন্তু অতি স্পষ্টাকরেই কবি-জীবনের একটি সামাজিক করণীয় নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। এখানে কবি আর 'মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে' সংসার-সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে চান নাই; এখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

> সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
> তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
> ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
> কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
> শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
> সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
> স্বর্গের অমৃত লাগি',—তবে ধন্য হবে মোর গান,
> শত শত অসন্তোষ মহা গীতে লভিবে নির্বাণ।

কিন্তু 'এই ঘাটে রবীন্দ্রনাথ বেশিক্ষণ সুর রাখিতে পারেন নাই; সহজাত অধ্যাত্মপ্রবণতা তাঁহার মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সুরের মোড় ফিরাইয়া দিতে লাগিল, তীব্র-সমাজবোধ আস্তে আস্তে মোড় ফিরিয়া স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে যেমন বিদ্রোহীর বলিষ্ঠ সুরে নিজেকে কঠিন কর্মে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

> কবি, তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ
> তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
> বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
> বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
> সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

পরে আর সে সুর রহিল না, বৃহতের অস্পষ্ট আবরণে সে ক্রম-বিলীয়মান। কবির-কর্তব্যকে সম্মুখের দুঃখ-ব্যথাভরা, দরিদ্র, ক্ষুদ্র, অন্ধকার কষ্টের সংসার হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কবি তাহাকে যখন বৃহৎ-জীবনের নাম-না-জানা আদর্শের পশ্চাতে অভিসারে পাঠাইলেন, তখন এই বদ্ধ অন্ধকার কষ্টের সংসারের হাত হইতে কবিও আস্তে আস্তে নিষ্কৃতি পাইতে লাগিলেন। আদর্শের এই কঠিন পথ—ধন-মান-প্রাণ সঁপিয়া—সর্বস্ব দানে যেখানে হোম-হুতাশন জ্বালিতে হয়—হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া যেখানে শেষ আহুতি দিতে হয়, তাহাই আবার একটু একটু করিয়া 'নিরুপমা সৌন্দর্য প্রতিমা'র রূপ ধারণ করিল এবং পর-মুহূর্তেই দেখা দিল 'বিশ্বপ্রিয়া'র রূপে। শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই, সেই অজ্ঞাত 'একে'র ভিতরে গিয়াই জীবনের সব সার্থকতা—'তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা।' এই কারণেই সমাজবোধ রবীন্দ্রনাথের নিকট কোন দিনই খুব তীব্র হইয়া উঠিতে পারে না। সমাজবোধ যাঁহাদের খুব তীব্র—শুধু তীব্র নয়—সমাজবোধকেই যাঁহারা পরম শ্রেয়োবোধ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে সমাজই যে পরম সত্য—'তাহার উপরে নাই'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজবোধ [illegible] অধ্যাত্ম 'একে'র যে বোধ তাহার অঙ্গীভূত হইয়া থাকায় কখনও রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে সর্বস্ব-আহুতির দাবী জানাইতে পারে নাই। তাই বলিয়া আমি রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের ভিতরে সমাজ-বোধের একান্ত অপ্রাচুর্যের কথা বলিতেছি না। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমাজ-বোধের পরিচয় অপ্রচুর না হইলেও অস্পষ্ট; অন্যত্র কোন অধ্যাত্মবোধের সহিত যুক্ত না হইয়া স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত জীবন অবলম্বন করিয়া রচিত কবিতাও রবীন্দ্রনাথের কম নহে। কিন্তু তথাপি কবিতার ক্ষেত্রে এই সমাজবোধকে দুর্বল বা অস্পষ্ট স্বীকার করিলেও রবীন্দ্রনাথের এতগুলি উপন্যাস, ছোট গল্প এবং বিবিধ রকমের গদ্য লেখাকে অবহেলা করিলে চলিবে না, এবং ইহার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের যে সমাজ-চেতনার পরিচয় আছে, অন্ততঃ বাঙলা দেশে তাহা বিরল। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের সমাজবোধ তীব্র নয় এ-কথা বলিবার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই যে, এই সমাজ-চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবটুকু শ্রদ্ধা বা চরম শ্রদ্ধা আদায় করিয়া লইতে পারে নাই।

'এবার ফিরাও মোরে' সম্বন্ধে এক দল পাঠক-সমাজে একটা বিশ্বাস আছে যে উহা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে একান্তই একটা সাময়িক আলোড়ন, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে ইহার কোন গভীর স্থান নাই। এ আলোড়নটা অনেকখানি নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের একটা আকস্মিক বিস্ফোরণের মতন। কথাটা সত্য নহে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে যে দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই, অনেক পূর্ব হইতেই এই দ্বন্দ্ব তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কবি-মনের ভিতরে আশৈশব যে একটা রোম্যাণ্টিক বিষাদ ছিল—এবং কেবলই যে

> "লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
> কেবলি কোটরে বাস"—

'প্রভাত-সঙ্গীতে'র ভিতরেই ইহার বিরুদ্ধে কবি-মনের একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ প্রতিক্রিয়া একটা ব্যাধিত (morbid) আত্ম-কেন্দ্রিকতা হইতে বৃহৎ বহির্জগতে আত্ম-প্রসারের জন্য। [illegible] প্রয়োজন ছিল মুক্ত আলো-হাওয়ায় কবি-মনের [illegible] জন্যই। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র অনেক কবিতার ভিতরে [illegible] আত্ম-প্রসারের তাগিদের সহিত সমাজ-চেতনারও পরিচয় [illegible] এই জাতীয় একটি চমৎকার কবিতা 'স্বপ্নরুদ্ধ' আমরা [illegible] উদ্ধৃত করিয়াছি। কৈশোর প্রেমের মদির স্বপ্নবিলাসে বদ্ধ [illegible] বলিয়াছিলেন,—

> কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
> আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন।
> দেখ ওই দূর হ'তে আসিছে ঝটিকা,
> স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
> দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ-শিখা
> দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ-দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয় রাত্রি রহিব নির্ভয়। —(মরীচিকা)

ইহা শুধু কৈশোর প্রেমের মদির বিহ্বলতা হইতে বাহিরে আসিবার আকাঙ্ক্ষা নয়; মদির কাব্য-বিলাস হইতে একটি সবল কাব্যধর্মে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা, তখন পর্যন্ত সমাজচেতনার ভিতরেই কাব্য মুক্তির সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন। কবি অনুভব করিয়াছিলেন, তখন পর্যন্ত যে তাঁহার 'গান রচনা' তাহা—

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন :
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে। —(গান রচনা)

এ জাতীয় জীবন কবির নিজের নিকটেই অভিশপ্ত বলিয়া মনে হইয়াছে, এই অতৃপ্ত আত্মরতির আকাঙ্ক্ষাকে নিজেরই 'প্রেতের পিপাসা' বলিয়া লাগিয়াছে। এ যেন—

দু'টি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা।
মানব-জীবন যেন সকলি নিষ্ফল,
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।

* * * * *

কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়,
কোথারে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়। —(অক্ষমতা)

ইহার পরের কবিতাই হইল 'জাগিবার চেষ্টা'।—

স্বপ্নের সমাধি মাঝে বাঁচিয়া কী হবে,
যুঝিতেছি জাগিবারে,—আঁখি রুদ্ধ হায়।

* * * * *

মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল,
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নবপ্রাণ।
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান?
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ।

নিজের বহির্বিমুখ দুর্বল আত্মকেন্দ্রিকতাকে ধিক্কার দিয়া কবি নিজে বলিয়াছেন—

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা।
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদিনা শরমে।
খাঁচার পাখির মতো গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানব-জনমে।

* * * *

কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান,
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল,
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ-গান দূরে পরিহরি। —(কবির অহংকার)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভবিষ্যৎ কোন্ কবিধর্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইবেন এই 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে রবীন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্নটি নানা ভাবে জাগিয়াছিল এবং বৃহত্তর মানব-সমাজের সহিত সক্রিয় ঐকাত্ম্যের মধ্যে কবি তাঁহার কাব্য-সাধনার প্রতিষ্ঠা খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু এই পথে কবির আর চলা হয় নাই; আস্তে আস্তে মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছেন জীবনদেবতা, এই সংসারের পথ হইতে কবিকে তিনি ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন অন্য পথে। এই অন্য পথে আসিয়াও বিশ্বজীবনের সহিত কবি-জীবনের নিবিড় যোগ রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে যোগসূত্র সেই পরম এক। সংসার স্ব-মহিমায় তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে কম, মহিমা তাহার অনন্তের পরিচয়-লিপিতে,—অসীমের আভাসে। সৌন্দর্যের সংজ্ঞাই তাই রবীন্দ্রনাথের মতে শুধু অনন্তের আভাস—প্রকৃতির ক্ষেত্রে, মানুষের ক্ষেত্রেও। 'সোনার তরী'তে উঠিয়াও মাঝে মাঝে এই বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সহিত অখণ্ডযোগ রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন—

চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে একগতি মোর। —(গতি)

অথবা, বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে? —(মুক্তি)

কিন্তু এই বিশ্বকে—নিখিল মানব-সমাজকে তিনি একান্ত জড়বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া বিশ্বের ভিতর দিয়া এক বিশ্বাতীতই তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সকলের ভিতরেই তিনি অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বিশ্বাতীতের মহিমা।

এই সব কারণে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সাংসারিক প্রয়োজনের দিকটাকে যতটা পারেন অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে স্বীকার করিয়াছেন সেখানেও বড় জোর সেই—'গীতরসধারা কবি সিঞ্চন সংসার-ধূলিজালে'—এই পর্যন্ত—ইহার বেশি নয়। এখানে মার্ক্সপন্থিগণের সহিত যেটা পার্থক্য সেটা জীবনের মূল শ্রেয়োবোধেরই পার্থক্য। মার্ক্সপন্থিগণ শিল্পকে শুধু প্রয়োজনের বলেন নাই, তাঁহাদের মতে আসল শিল্প তাহাই—যাহা একটি বিশেষ দলের হাতে শাণিত অস্ত্র। তাঁহার শ্রেয়োবোধ সম্পূর্ণরূপে জাগতিক বিপ্লবের পথে—যে বিপ্লব মানুষের জীবন হইতে দূর করিয়া দিবে সবপ্রকারের অসাম্যের পাপ,—মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিবে শ্রেণিহীন সমাজে। ইহাকে যদি মানুষের পরম শ্রেয়: বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে এ-কথাও স্বীকার করিতে হয়, তাহাই খাঁটি শিল্প, যাহা বহন করে বিশ্বাতীতের আভাস নয়, বিপ্লবের বহ্নি এবং তাহার ভিতর দিয়া শ্রেণিহীন নবজীবনের সূচনা। যে কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই কথা বলিয়াই তাই শেষ করিতে হয়,—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে যেটা বিরোধ তাহা শিল্পবোধের বিরোধ নয়—জীবনবোধের—শ্রেয়োবোধের বিরোধ।

গ্রহের ফের

(মহারাষ্ট্রীয় গল্প)

অবিনাশচন্দ্র বসু

১

এক শান্ত রৌদ্র-ভরা মধ্যাহ্নে এক জন ডাকপিয়ন হাতে চিঠির তাড়া নিয়ে কিষাণপুরের শহরতলীর রাস্তা দিয়ে চলেছিল। রাস্তার বাঁকে এসে একটি বাগান-ঘেরা বাড়ীর সামনে দাঁড়াল এবং ফটকের দরজা খুলতে লাগল। বাগানের ভেতর থেকে দোতলার বারান্দার ওপর একটা মোটা জাতি ফুলের লতা উঠেছে; রেলিংএর প্রায় অর্দ্ধেকটা তার বাহুজালে ঢাকা পড়ে গেছে, আর তাতে থোপায়-থোপায় অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। ডাকপিয়ন ফটক খুলে বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়ে হাঁকলে—"টপাল" (চিঠি)! মুহূর্ত্ত মধ্যে দরজা খুলে গেল। দেখা গেল, তার শীর্ণ, লোমশ শিরাবহুল কালো হাতটি থেকে একখানা পোষ্টকার্ড গ্রহণ করলে একটি শুভ্র, কোমল, মসৃণ হাত, তার তালুতে পদ্মকোরকের রং। সে-হাতটি সে গৃহের তরুণী গৃহস্বামিনীর। পত্রখানা হাতে নিয়েই সে তা চোখের সামনে ধরলে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার সুন্দর কালো চোখ দু'টি থেকে আনন্দের জ্যোতি ঠিকরে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে সে আনন্দের আভা তার কোমল মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ল। সে আনন্দের স্পর্শে তার রক্তিম ঠোঁট দু'টি বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং তার মাঝখানে দু'পাটি সাদা দাঁত বেরুল। ডাকপিয়ন ফিরে ফটকের দরজা বন্ধ করতে করতে দেখলে তরুণীর সুডৌল গৌর মুখখানি পুলকে উৎফুল্ল।

সে চিঠি পড়া শেষ করে ঘরের দিকে চাইলে। দেখলে তার চিঠির খবর শোনবার কেউ নেই। শুধু পোষা বেড়ালটা মেঝের মাঝখানে বসে একটা দুধের বাটি চাটছে। তরুণী উচ্চ কণ্ঠে ডাকলে, "রাম!" ওপরের ঘর থেকে সাদা পাজামা ও সার্ট-পরা বছর চারেকের একটি ছোট ছেলে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বললে, "কি মা!" মা আনন্দ কতকটা চেপে বললে, "জানিস্, আমার দাদা আসছেন?"

"তোর দাদা কে মা?"

"আমার দাদা আমার বড় ভাই—তুই যেমন শম্ভার বড় ভাই।"

"আজই আসবেন?"

"কাল সকালের গাড়ীতে আসবেন। আমরা তাঁকে আনতে ষ্টেশনে যাব।"

"আমাকে নিবি কি না, বল।"

"নিশ্চয় নেবো।"

"বাবাও যাবেন?"

"তা বাড়ী এলে দেখা যাবে। এখন আমাদের ঘর-দোর সব ঠিক করতে হবে। তুই একবার রাধাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

রাম তার ছোট চপ্পল জোড়া পায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং একটু দূরে গিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে গলি থেকে সে এবং তার পেছনে প্রৌঢ়া ঝি রাধা আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে তার মা আসবাব টানাটানি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঝি এলে উচ্ছ্বাসের সহিত বললে, "রাধা, কাল সকালে আমার দাদা আসবেন, আজ ঘর-দোর সব ঠিক করতে হবে। ঘরের মেঝেগুলো নিকোতে হবে। আজ তোর অনেক কা... বুঝেছিস্?"

প্রত্যেকটি কথা একটা গভীর পুলকে সরস হয়ে উঠছিল। রাধা একটু ক্ষীণ স্বরে বললে, "আজ আমার বাজারে যাবার ক... ছিল, দিদি!"

"আজ নাই গেলি। এক দিনে দোকানের সব শাড়ী কি খালাস হয়ে যাচ্ছে না। আমার দাদা তো আর রোজ আসেন না। লিখেছেন, কাল এসে পরশুই চলে যাবেন। বাড়ীটা কি রকম নোংরা হয়ে আছে, এর ভেতর তাঁকে আনা যায়?"

রাধা মিনিট খানেকে সকল ব্যাপারটা বুঝে নিলে। দেখলে তার শাড়ী কেনার ব্যাপার স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। নেহাৎই অসহায় ভাবে বললে, "আজ যাব না তা হলে দিদিমণি!"

রাম বললে, "মা, রোজ তোর দাদা আসে না কেন?"

"রোজ বুঝি কেউ আসতে পারে?—আচ্ছা, আমার দাদা তোর কি হয় রাম?"

"কা—কা।"

"দূর! তুই ভারি বোকা। আমার দাদা মানে তোর মামা।"

"মা—মা! দিদিরও মামা?"

"দিদিরও।"

"শম্ভারও?"

"শম্ভারও।"

"বাবার?"

"ওঁর মামা হবে কেন?—তুই কাল কোন্ জামাটা পরে যা... রাম?" বলে মনে মনে জামার হিসেব করতে করতে মতিলা ... গেল। সেখানে কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভা মেঝেতে গদীর ওপর ঘুমুচ্ছে। তার দিকে চেয়ে তার পোষাক সম্বন্ধেও মনে মনে আলোচনা করতে লাগল।

শম্ভা বা শম্ভাজি দুই বছরের ছেলে। মায়ের মুখের ... আর মায়ের চাইতেও শুভ্র তার মুখ। কপালের ওপর কালো ... রাশি এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে। বড় বড় চোখের পা..., খাড়া নাক, গোলাপের পাপড়ীর মত ঠোঁট। নগ্ন দেহকান্তি যেন একটি দেব-শিশু! তরুণী পোষাকের কথা ভাবতে ভাবতে ... শিশু-দেহটির দিকে মুহূর্ত্ত কাল অতৃপ্ত ভাবে চেয়ে রইল। ... অন্তরের পুলকোচ্ছ্বাস দ্বিগুণিত হয়ে উঠল।

২

তার পর কিছুক্ষণ এ-তোরঙ্গ ও-তোরঙ্গ খুলে কাপড়-জামা... নাড়া-চাড়া করে আবার সব বন্ধ করে রাখলে। বোধ হল, পরদি... পোষাক পছন্দ হয়েছে। তার পর নীচের তলায় এসে ... শক্ত কাছা মেরে, হাতে ঝাড়নী নিয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়তে লেগে ... ওদিকে রাধা এক ঝাঁকা গোবর এনে রেখে কুয়া থেকে জ... নিকোবার ব্যবস্থা করেছে।

কিছুক্ষণ পরে রঙিন ফ্রক-পরা ছ'বছরের মেয়ে লীলা বইয়ে... হাতে স্কুল থেকে ফিরে ফটকের দরজা না খুলেই ডেকে বললে ... তুই ও-সব কি করছিস্?" মা তখন ইঁদারা থেকে জল ... ব্যস্ত ছিল, কথা বলবার অবসর নেই? রাম বললে, "দিদি, ... দাদা আসবে। আমি যেমন শম্ভার দাদা, সে-রকম।"

লীলা মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তাই না কি গো মা? তোর দাদা আসবে?"

তার মা ইঁদারার চাকা থেকে কলসী নামিয়ে রেখে একটু হেসে বললে, "আজ চিঠি এসেছে।"

"কোথায় চিঠি?"

"শোবার ঘরে, আয়নার কাছে।"

লীলা ছুটে গিয়ে চিঠি হাতে করে জোরে জোরে পড়তে পড়তে এল—"সৌভাগ্যবতী শকুন্তলা বাঈ শঙ্করবাও সবদেসাই, রাওসাহেব শঙ্করবাও মহীপতরাও সবদেসাইর ঘর, শনিবার পেঠ, কিষাণপুর।"

শকুন্তলা হেসে বললে, "বোকা মেয়ে, ও-সব তো ঠিকানা। তুই চিঠি কোন্‌টা জানিস নে?" তখন লীলা কার্ডটা উলটিয়ে ধীরে ধীরে শুদ্ধে-ভুলে সবটা চিঠি পড়ে ফেললে।

তার পর লীলা ও তার ছোট ভাই এসে মায়ের সঙ্গে কাজে যোগ দিলে। কিছু পরে কান্নার শব্দ পেয়ে লীলা ছুটে গিয়ে সর্বকনিষ্ঠকেও বাগানে এনে ছেড়ে দিলে।

শকুন্তলা যখন বাগানের কাজ সেরে কদমাক্ত দু'টি বালতি আর তদধিক কদমাক্ত তিনটি শিশু নিয়ে বাগান থেকে স্নানের ঘরের দিকে চলল, তখন ফটকের দরজা খুলে ঢুকলে বাড়ীর কর্ত্তা শঙ্করবাও। শকুন্তলার নিজের অবস্থাটাও সুবিধের ছিল না। উস্কোখুস্কো চুল, নিখুঁত মুখে ঝুলের দাগ, কোমল হাত দু'টি কাদা মাখা, শাড়ীটা হাঁটুর ওপরে নিয়ে গুঁজানো, তার নিচে উন্মুক্ত দেহে উজ্জ্বল শুভ্রতা।

বাপকে দেখে রাম চেঁচিয়ে বললে, "বাবা, কাল মা'র দাদা আসবে।"

শম্ভা বললে, "মাল্‌ দাদা।"

লীলা ছুটে গিয়ে পোষ্টকার্ডখানা হাতে নিয়ে বললে, "আজ আমাদের বাড়ী ঠিক্‌ঠাক্‌ করা হচ্ছে, বাবা! মা'র দাদার পত্র এসেছে" —বলে জোরে জোরে পড়তে লাগল—"সৌভাগ্যবতী শকুন্তলা বাঈ শঙ্করবাও সবদেসাই—"

শঙ্করবাও স্ত্রীর শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে বললে, "কি ব্যাপার শকু?"

কথায় উত্তর দেবার পরিবর্তে শকুন্তলার নির্মল চোখ দু'টি সুকৃষ্ণ কোণে দীর্ঘ পক্ষরাজি তুলে নীরবে গভীর আনন্দ ব্যক্ত করলে।

৩

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাপাতের সঙ্গে সঙ্গে কিষাণপুরের শহরতলীর কুটিরখানা সৌরভে সৌরভময় হয়ে উঠল। এক দিকে দোতলার ছাদের ওপর রাশি রাশি জাতি ফুল, অপর দিকে থোপে থোপে বেলফুলের কলি সন্ধ্যার স্পর্শে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে স্বামি-স্ত্রী বাগানের ছোট রাস্তার ওপর পায়চারী করতে লাগল।

দাসী রাধা বাসন মাজতে মাজতে লক্ষ্য করছিল লম্বা সোজা চেহারা রাও সাহেবের, তার পাশে, প্রায় তারই সমান উঁচু ... দেহটি, ছায়ার সঙ্গে ছায়া ফেলে চলেছে। রাধা অনেক ...দের বাড়ী চাকরি করেছে, স্বামি-স্ত্রীর মিল-অমিল উভয়ই ... দেখেছে। তার অভিজ্ঞ চক্ষু এ দু'জনের গতির মধ্যে একটা ...কের ছন্দ দেখতে পেল।

শকুন্তলা স্বামীকে বলছিল, "ষ্টেশনে তোমার যাবার দরকার হবে না। আমি লীলাকে ও রামুকে নিয়ে যাব, তুমি শম্ভাকে নিয়ে ঘরে থাকবে।"

শঙ্করবাও বললে, "তুই না হয় গেলি। কিন্তু আমার যাওয়াটা কি উচিত নয়?"

"তুমি গেলে এক টাঙ্গায় বসে এতগুলো লোকে কি করে আসবে? অনর্থক দু'টো টাঙ্গা করতে হবে। তা ছাড়া কাল বাড়ীতে লোক এলে বুঝি বাড়ীর কেউ ভেতরে থাকবে না, শুধু চাকর আর ঝি এসে অভ্যর্থনা করবে?"

শঙ্করবাও এ যুক্তি মেনে নিয়ে বললে, "বেশ, তুই যা বলছিস্‌ তাই করা যাবে।" তার পর ঈষৎ হেসে বললে, "তুই লিলি আর শম্ভাকে নিয়ে ষ্টেশনে যাবি, আমি আর রাম ঘরে থাকব।"

শকুন্তলা স্বামীর কথার রহস্যটা ধরতে পারলে না। সোজাসুজি বললে, "শম্ভাকে কোলে নিয়ে আমি ষ্টেশনে যাব কি করে? শম্ভা ঘরে থাকবে, লীলা আর রাম আমার সঙ্গে যাবে।"

শঙ্করবাও সব স্বীকার করে বললে, "বেশ, বেশ, তাই হবে। তোকে কিন্তু খুব ভোরে উঠতে হবে।"

শকুন্তলা অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত বললে, "তোমাকেও ভোরে উঠতে হবে। তোমার আফিসের সেপাইদের ডেকে আনতে হবে, আর তাদের ব্যবস্থা দেখতে হবে।"

"আর কিছু না?"

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় আসতে শকুন্তলা একটু উত্তেজিত ভাবে বললে, "আর একটা বিষয়। জান, দাদা সিগারেট খান। তিনি যে সিগারেট খান সেটা কিনে এনে রাখতে হবে।"

শঙ্করবাও সহজ ভাবে বললে, "তোর দাদা আর তোর ভরসায় থাকবেন না। ওঁর সঙ্গে ঢের ঢের সিগারেট আসবে।"

"তুমি নিজে খাও না কি না, তাই এ সব জান না। আমাদের বাড়ীতে এসে বুঝি দাদা নিজের কেনা জিনিস খাবে?"

"আচ্ছা বেশ, তুই যা বলিস তাই হবে। তুই তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা করে টাকা নিয়ে বাজারে চলে যাস্‌। সেখান থেকে দেখে শুনে সিগারেট কিনে নিয়ে আসিস্‌।"

এবারও স্ত্রী স্বামীর পরিহাস বুঝতে পারলে না। বললে, "বাজারে গিয়ে ঘুরে আসতে টাঙ্গার ভাড়া কতগুলো লাগবে তোমার জানা আছে? তোমার আফিসের পিয়নকে পাঠাবে, দোকানে গিয়ে সিগারেটের নাম বললেই ঠিক-ঠিক জিনিস দেবে।—এখন প্রশ্ন হচ্ছে সকালে চায়ের সঙ্গে কি দেওয়া যায়?"

"বাসুন্দী না শ্রীখণ্ড?"

"পুরুষ মানুষেরা ও-সব কিছুই জানে না। কাল সকালেই ও-সব কোথায় পাব? আর সকালে বুঝি ওগুলি খায়?"

স্বামী খুব আমোদের সহিত ধীরে ধীরে হাসতে লাগল। স্ত্রীও তার সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেল্লে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার সঙ্গে হাসিটা মিশে গেল।

নীরবে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। তার পর শকুন্তলা স্বামীকে ঘরে পাঠিয়ে রাধার কাছে এসে বললে, "এখনো তোর বাসন মাজা হল না? চল্‌ ঘরে, অনেক কাজ আছে।"

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে শকুন্তলা মনে মনে স্থির করেছে, আজ

রাত্রেই কাল সকালের কতক কাজ করে রাখবে। চায়ের সঙ্গের খাবারটা এখনই তৈরি করে ফেলবে!

রাধা একটু ক্লিষ্ট ভাবে বললে, "রাত যে ন'টা বাজে দিদিমণি!"

"নয়টা খুব বেশি রাত না কি? তোর বাড়ীতে কাজ থাকলে বুঝি আর তুই রাত বারোটা পর্য্যন্ত জাগিস্ নে? চল, কাল দাদার চায়ের জন্তে লাড্ডু, বরফি আর কবজ্জা তৈরি করে রাখি। তাতে সাড়ে দশটা বাজবে। তোর এগারোটাতে ঘরে গেলেই তো হ'ল!"

গৃহস্বামিনী এমন আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সহিত কথাগুলো বলছিল যে, তাতে না বলা ঝির পক্ষে সম্ভব হল না।

৪

রাত্রি দশটা। ঘর নিঝুম। বাগানের ওপর নির্ম্মল জ্যোৎস্না ঢলে পড়েছে। কলার পাতাগুলো তাতে এক-এক বার ঝলসে উঠছে। বাতাস জাতি ও বেল ফুলের গন্ধে ভরপূর। চার দিক নীরব। বাড়ীতে শকুন্তলা আর ঝি ছাড়া সবাই নিদ্রিত। তারা দু'জনে রান্না-ঘরে বসে খাবার তৈরি করছে। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে আলাপ চলেছে।

শকুন্তলা লাড্ডু পাকাতে পাকাতে রাধাকে বলছিল—"এ বিয়ে দাদাই ঠিক করেছিল। আমার মামা আর একটা আলাপ এনেছিলেন, পাড়াগেঁয়ে জমিদার। বাবা বললেন, আমার মেয়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে না। আর একটা আলাপ ছিল, পাত্র শশুরে, ব্যবসা করে, খুব ধনী; কিন্তু রংয়ে কালো। মা বললেন, আমার শকুর কষ্‌খনো কালো বর হতে পারবে না। দাদার আলাপের কথা শুনে বাবা বললেন, "জমি নেই, বাড়ী নেই, শুধু চাকরি। এ কি রকম পাত্র?" দাদা বললেন, "পাশ-করা ছেলে, রাজার চাকরি করে। ভবিষ্যতে বাড়ী, জমি সবই হবে।" মা জানলেন, পাত্রের রং কালো নয়। এক দিন দাদা আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বললেন, "শকু, সরদেসাইকে দেখবি?" আমি বললাম, "সরদেসাই কে?" দাদা বললে, "যার সঙ্গে তোর বিয়ের আলাপ হয়েছে।" আমি বললাম, "তোমার চেয়ে আমি আর বেশি কি বুঝব দাদা?" বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। বোধ হয় দাদা আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ইস্কুলে পড় কি?" আমি ভাবলাম, পাশ-করা ছেলে, আমার পরীক্ষা নেবে না কি? বললাম, "পড়তাম, এখন ঘরে পড়ি।" মনে মনে চিন্তা হল, 'কি পড়?' বললে আমি কি উত্তর দেবো? কিন্তু সে রকম কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বোধ হয় একটা কিছু প্রশ্ন করতে হবে বলে ও-কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

রাধা বললে, "তুমি কিছু জিজ্ঞেস করনি দিদিমণি?"

"আমি সেদিন কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি! কিছু দিন পরে, বিয়ে ঠিক হলে, মাঠের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে দু'-চার কথা জিজ্ঞেস করেছি।"

রাধা কৌতূহলী হয়ে বললে, "কি জিজ্ঞেস করেছিলে?"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাদের কিষাণপুরের বাড়ীতে বাগান আছে কি না। বাড়ী-ঘর পাকা কি না, কলে জল আসে কি না।"

"তিনি কি বললেন?"

তিনি বললেন, "সবই আছে। দরকার হলে মা-বাবার কাছে টেলিফোনে ট্রাঙ্ক কলও দিতে পারবে।"

"তোমরা একাই বেড়াতে রোজ? আর কেউ আসত না?"

"আমার সঙ্গে আমার ছোট ভাই থাকত। সে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি লাফালাফি করত। আমরা দু'জনে একটা পুলের ওপর গিয়ে বসতাম। পাশে একটা বড় শিরীষ ফুলের গাছ ছিল। ফুলের শুকনো লালচে পাপড়ীগুলো মাটিতে বিছিয়ে থাকত। তিনি এক দিন গাছ থেকে তাজা শাদা ফুল পেড়ে দিলেন। আমি বললাম, 'বাড়ী গিয়ে চুলে বাঁধব।' তিনি বললেন, 'বাড়ী গিয়ে বাঁধলে সে শুধু বাড়ীর লোকেই দেখবে।' আমি বললাম, 'তা হলে এখানেই বাঁধছি।' তখন ফুলগুলি খোঁপায় গুঁজলাম। তিনি বললেন, "বেশ দেখাচ্ছে।"

"তোমাকে না ফুলকে?"

শকুন্তলা সলজ্জ ভাবে হেসে বললে, "তা অতো দিন আগের কথা কি মনে আছে?"

রাধার চক্ষু নেচে উঠল। সে বললে, "তোমার কথাই বলেছিলেন দিদিমণি। তোমার মত সুন্দর ক'টি মেয়ে থাকে?"

রাত্রি এগারোটাতে লাড্ডু পাকানো ও গল্প দু'টাই থামলে শকুন্তলা বললে, "কাল ভোরে ছ'টায় আসবি রাধা। একটুকুও যেন দেরী না হয়। সাড়ে সাতটায় গাড়ী, আমায় ষ্টেশনে যেতে হবে।"

রাধা চলে গেলে ঘর-দরজা বন্ধ করে শকুন্তলা সিঁড়ি বেয়ে উপরে শয়ন-ঘরের দিকে চলল অতি সন্তর্পণে—যাতে স্বামী ও শিশুদের ঘুম না ভাঙে। উপরের ঘরের দরজায় পৌঁছে সে মুহূর্ত্ত কাল থমকে দাঁড়াল। মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাধারা এসে বিছানায় নিদ্রিত স্বামী ও পুত্র-কন্যার ওপরে পড়েছে। অপরিসীম পুলকে তার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল যে মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত দিনের ক্লান্তি ধুয়ে-মুছে গেছে।

৫

পরদিন শকুন্তলা ভোর ছ'টার বদলে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে ঘর-দোর আরো কিছু গুছিয়ে, স্নান করে, লিলি, রাম ও শম্ভুকে স্নান করিয়ে, স্বামী ও শিশুদের চা দিয়ে ও নিজে চা খেয়ে ষ্টেশনে যাবার জন্তে প্রস্তুত হতে লাগল। রামকে পরাল চুড়িদার পা-জামা, গলাবন্ধ কোট, জরির টুপী আর জরিদার চপ্পল। লীলাকে পরালে কচি ঘাসের রংয়ের সিল্কের ফ্রক, মাথায় গোলাপী ফিতা আর পায়ে সৌখিন স্যাণ্ডেল। বড় যত্নে লীলার মুখের প্রসাধন করলে। তার পর শম্ভুকে ছোট হাফ-প্যাণ্ট, লেসওয়ালা কোট আর জরির টুপী দিয়ে সাজালে। তার পর তার নিজের প্রসাধন ও পোষাক হল। গোলাপী মুখটাকে স্নো লাগাতে লাগাতে শাদা করে ফেললে। চোখে ঈষৎ কাজল লেপে দিলে। কাছা-দেওয়া শাড়ী না পরে উত্তর ভারতের বারো-হাতি হাল্কা কাপড় পরলে; কাঁচুলির বদলে পুরো হাত-কাটা ব্লাউজ, তার নীচে পেটিকোট। মায়ে-মেয়ের পোষাকের রংয়ে মিল খাওয়ানো হল। পায়ে পরলে রঙিন পটাওয়ালা চটি। পোষাক শেষ করে দু'টি ভ্রূর মাঝখানে একটা ছোট সিঁদুরের টিপ লাগালে। তার পর খোঁপায় বেল ফুল গুঁজলে। গলার সরু সোনার হারের ভেতরে মঙ্গল-সূত্রটি দেখা যাচ্ছিল।

শম্ভুকে শঙ্কররাওয়ের হাতে দিয়ে বললে, "দেখ, দাদা আজই

শম্ভাকে এনো না। আমি বলব, শম্ভা কই? তখন দাদাও যদি বলেন, কই তোর ছেলে? অমনি ঝট করে তাকে সামনে নিয়ে আসবে।"

শঙ্কররাও কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে বললে, "বেশ। তুই এগিয়ে চল। ট্রেণ এসে যাবে।"

শকুন্তলা শান্ত ভাবে বললে, "এখনো আধ ঘণ্টার বেশি বাকী। আমরা পনের মিনিটে চলে যাব।—তুমি এবার শম্ভাকে নিয়ে ওদিকে এগোও, আমাকে যেতে দেখলে আসতে চাইবে।"

বাপ-মায়ের ষড়যন্ত্র ছোট শম্ভা বুঝতে পারলে না। সে বাপের সঙ্গে বাগানে গেল।

তখন সূর্য্যোদয় হচ্ছিল। গাছের আগডালে সোনালী রোদ লেগেছে। আকাশে একটা স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা ছেয়ে আছে। কিষাণপুরের রাস্তায় ধূলির স্তূপ এখন শান্ত গতিহীন, যদিও ঝাড়ুদারের নর্দমা সাফ করার সঙ্গে সঙ্গে এক-এক বার বিশ্রি গন্ধ বেরুচ্ছে। স্থানে স্থানে রাস্তায় ময়লার গাড়ী দাঁড়ানো, মেথরেরা মাথায় করে টিন এনে তার ওপর ঢালছে এবং দারুণ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। শকুন্তলা এ সব পেরিয়ে পুত্র-কন্যা সহ ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এক জায়গায় লিলি ও রাম একটা কৃষ্ণচূড়ার তলায় গিয়ে বড় বড় ফুল সংগ্রহ করতে লাগল, মা তাদের ডেকে ডেকে নিজের সঙ্গে নিলে। প্রভাতে শ্রমী পথিকদের পথ চলা আরম্ভ হয়েছে। এক সাইকেল-চড়া যুবক দুধের ভাঁড় নিয়ে যেতে যেতে শকুন্তলাকে অতিক্রম করেই হঠাৎ গান ধরলে। সামনের দিক থেকে এল এক সর্দার,—ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। অশ্বারোহণের পোষাক, মাথায় বড় পাগড়ী। হঠাৎ দেখা গেল অশ্বের গতির বেগ কমে গেছে, অশ্বারোহীর নিষ্পলক দৃষ্টি সুসজ্জিতা তরুণীর ওপর। শকুন্তলা বিশেষ কৌতূহলের সহিত অশ্বারোহীর দিকে চাইল, দু'য়েতে চোখাচোখি হল, তার পর অশ্বারোহী তাকে অতিক্রম করে গেল।

"আমাকে ঘোড়া কিনে দিস না কেন?"

শকুন্তলা অশ্বের মন্দগতি লক্ষ্য করছিল। অশ্বারোহী পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে চলছিল। লীলা ভাইয়ের কথাটার পুনরুক্তি করে বললে, "মা, রামু ও-রকম বড় ঘোড়ায় চড়তে চায়।"

"মামাকে বলিস্।"

রামু উত্তেজিত হয়ে বললে, "মামা ঘোড়া এনে দেবে?"

"মামা সব দিতে পারে।"

লীলা বললে, "সব?"

"সব।"

শিশুরা অবাক হয়ে মায়ের উৎফুল্ল মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ষ্টেশনে পৌঁছে টিকেট-ঘরে গিয়ে শকুন্তলা সামনে পয়সা রেখে বললে, "একটা পুরো আর দু'টো আধা প্ল্যাটফর্ম-টিকেট দাও।" কেরাণী বিরক্তির সহিত বললে, প্ল্যাটফর্ম-টিকেট আবার আধা হয় নাকি?" শকুন্তলা বললে, "এরা শিশু যে!" কেরাণী চোখ তুলে তার পানে চেয়ে অপ্রতিভ ভাবে বললে, "একটা টিকেট নিলেই হবে মাঈজি, ওদের লাগবে না।"

শকুন্তলা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াল। একটা পোর্টার বড় বড় মাল নিয়ে দ্রুত চলছিল, শকুন্তলা তাকে ডেকে বললে, "গাড়ীর কত দেরী?"

পোর্টার হঠাৎ থেমে মাথা নীচু করে বললে, "বাঈ সাহেব, আজ গাড়ী কতকটা লেট, তুমি ঐ মেয়েদের সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বস।"

"তোদের গাড়ী বুঝি সর্ব্বদাই লেট আসে?"

পোর্টার মুখ কাঁচু-মাচু করে ঈষৎ হেসে ধীরে ধীরে চলে গেল।

রাম চেঁচিয়ে বললে, "মা ত্যাখ্! এঞ্জিন থেকে কেমন ধুঁয়ো বেরুচ্ছে!" এঞ্জিন-সেড্ থেকে একটা এঞ্জিন বেরুচ্ছিল এবং বাহিরে এসে বেশ কতকটা ষ্টীম ছেড়ে দিয়েছিল। শকুন্তলা শিশুদের নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে এসে পৌঁছুল। এঞ্জিনটা এক লাইন মাল-গাড়ীর সামনে গিয়ে লাগল। রাম মায়ের আঁচল টেনে বললে, "ঐ ত্যাখ এঞ্জিন!" এঞ্জিন-ড্রাইভার দরজায় এসে বললে, "যন্ত্র দেখবে, বাবা!" শকুন্তলা শিশুদের নিয়ে এঞ্জিনের পাশাপাশি দাঁড়ালো। নীল প্যান্ট-পরা কৃষ্ণকায় ড্রাইভার বিশেষ আগ্রহের সহিত যন্ত্রপাতি দেখাতে লাগল। এঞ্জিনের সিটি বাজিয়ে দেখালে, নীচের দিক দিয়ে ষ্টীম ছেড়ে দেখালে। শিশুরা খিল-খিল্ করে হেসে উঠল। শকুন্তলার মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হ'ল। সামনের দিকে এক জন পোর্টার সবুজ নিশান দেখাচ্ছিল, কিন্তু ড্রাইভার তা দেখেও দেখছিল না।

তখন ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল। একটি লোক এসে নম্র ভাবে বললে, "গাড়ী আসছে বাঈ!" শকুন্তলা ষ্টেশনের সামনে ফিরে এল। একটু পরে দূরের আকাশে ধোঁয়া দেখা গেল। দেখতে দেখতে কিষাণপুরের ছোট লাইনে ছোট্ট এঞ্জিনে-টানা ট্রেণ হুস্-হুস্ করে প্ল্যাটফর্মের দিকে অগ্রসর হল!

"এই যে দাদা!" শকুন্তলা প্রায় চেঁচিয়ে বললে। গাড়ী তখনও চলছিল। ভাই-বোনের দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। দু'জনের একই রকমের সুডৌল সুন্দর মুখ, গৌর বর্ণ, বড় বড় গভীর কালো চোখ, কাল বাঁকানো ভ্রূ। হাসিতে দু'জনেরই সুন্দর শুভ্র দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে।

বড় বড় আমের ঝুড়ি আর ট্রাঙ্ক-বিছানা সহ দাদা নামল। নেমেই লীলার চিবুক ধরে আদর করলে, রামের পিঠ চাপড়ে দিলে! মিনিট খানেক পরে ভাই-বোনে মত-বিনিময় হ'ল, "মামাটা খুব ভালো।"

শকুন্তলা কুলী ডেকে মাল তোলালে। তিনটে কুলী এসেছিল। শকুন্তলা বললে, "তিন জন কেন, দু'জনই যথেষ্ট।" তখন দু'টি কুলীতে ভারি ভারি আমের ঝুড়ি আর বিছানা ট্রাঙ্ক ব্যাগ ও জলের কুজো নিয়ে ঘাড় নীচু করে মাল বয়ে নিয়ে চলল। তারা প্রায় তিন জনেরই মাল নিচ্ছিল, তবে মুখে কোনও অসন্তোষের ভাব দেখা গেল না।

দাদার কামরা থেকে এক জন সহযাত্রী নামল। গোলগাল চেহারা, মুখে কটা-রংয়ের গোঁফ। সে ভাই-বোন আর শিশুদের চালচলন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। তারা যখন মাল সহ টাঙ্গায় চড়ল, তখন সে সামনে গিয়ে বললে, "নমস্কার!" ভাই-বোন টাঙ্গার পেছন দিকে ও শিশুরা সামনে টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে বসেছিল।

দাদা বললে, "নমস্কার! আপনি আসবেন কিন্তু। ঠিকানা ভুলবেন না।"

লোকটি দৃঢ় স্বরে বললে, "তা ভুলব কেন? নিশ্চয়ই আসব।"

টাঙ্গা ষ্টেশন ছেড়ে চলল। শকুন্তলা বললে, "এ লোকটা কে রে দাদা? তাকে কেন বাড়ী ডেকেছিস্?"

"এ এক জন বড় জ্যোতিষী। অদ্ভুত ভাবে সব অতীত-ভবিষ্যৎ বলে দেয়। আমার অতীতের এমন সব কথা বলেছে যা অন্যের জানা অসম্ভব।"

"তোকে যদি বলেই থাকে তবে আবার ডেকেছিস কেন?" শকুন্তলার লোকটাকে পছন্দ হয়নি।

দাদা বললে, "সে জামাইর হাত দেখবে, বেশ আমোদ হবে।"

দাদা পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটা সিগারেট ধরালে এবং বিশেষ তৃপ্তির সহিত ধূমপান করতে লাগল। বোনের মাথার ওপর দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ বয়ে চলল। বোন বললে, "সিগারেটের মোহটা তোর কাটেনি! আমাদের বাড়ী গিয়ে কিন্তু তোর নিজের সিগারেট খেতে পাবিনে।"

"কি খাব? কিষাণপুরের বিড়ি?"

এ কথায় ভাই-বোন দু'জনেই হেসে উঠল। উভয়েই কিষাণপুরকে একটু হেয় দৃষ্টিতে দেখে।

৬

শঙ্কররাও অতিথির অপেক্ষায় কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভু সহ বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফিরবার কালে দু'টি ক্লাব-বন্ধু তার কাছে দাঁড়াল। এক জন বললে, "আজ নতুন বল্ ঠিক ঠিক চারটায় এসে পড়বে শঙ্কররাও।"

শঙ্কররাও মুখ ভার করে বললে, "তা হয় না, আজ আমার বাড়ীতে অতিথি আসছেন।"

"তা'হলে তুমি আজ ক্লাবে আসছ না?

"হয়ত অতিথিকে নিয়ে আসবো।"

তখন অতিথির সম্বন্ধে প্রশ্নাদি চলল। কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে টাঙ্গা দেখা গেল। বন্ধুরা বিদায় নিলে।

টাঙ্গা দাঁড়াতেই শকুন্তলা নেমে এসে শম্ভুকে কোলে তুলে সগর্ব্বে দাদার সামনে দাঁড়াল। স্বামীকে তার বিষয়ে যে সব উপদেশ দিয়েছিল এখন তা ভুলে গেল।

দাদা মুহূর্ত্ত কাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুন্দর শিশু-কোলে সুন্দরী ভগিনীটির অপরূপ মাতৃমূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। সে যদি চিত্রকর বা ভাস্কর হত তবে মূর্ত্তিটি আলেখ্যে বা প্রস্তরে ফলাতে চেষ্টা করত। তার অভাবে ভাগ্নেটিকে হাসিমুখে আদর করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী-পতির সঙ্গে যথারীতি কুশল প্রশ্নাদি চলল।

শম্ভু ধীরে ধীরে মায়ের কোল থেকে নেমে আমের ঝুড়ির দিকে মন দিলে এবং কয়েক মিনিটের বিশেষ চেষ্টায় ঝুড়ির ভেতর থেকে একটা পাকা আম বের করে মাকে দেখিয়ে বললে, "মা, আম খা-ই।"

দাদা হেসে বললে, "খুব মাতৃভক্ত ছেলে! খাও খাও।" শকুন্তলা তাড়াতাড়ি তার জামা খুলে দিলে।

চা খেতে খেতে ভগিনীপতি ও শ্যালকে বহু আলোচনা চলল। দাদাকে আর এক দিন রাখবার জন্ম বোন ও ভগিনীপতি বহু চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দাদা বললে পরদিন বিকেলের গাড়ীতে যেতেই হবে। শকুন্তলা বললে, সে মনে মনে ভেবে রেখেছে, দাদাকে নিয়ে এক দিন বনভোজন করবে। কৃষ্ণার তীরে একটা অতি সুন্দর জায়গা আছে, শিশুরা সেখানে ছুটোছুটি করে আনন্দ পাবে। অনেক বিবেচনার পর ঠিক হল, পরদিন সকালের বাসে কৃষ্ণার তীরে গিয়ে বনভোজন করবে, তার পর দাদাকে সেখান থেকেই নিকটবর্ত্তী সিংপুর ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হবে।

সে ব্যবস্থায় বোনের শুভ্র মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে [illegible]। শিশুরা সে খবর পেয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

তার পর শকুন্তলা দুপুরের রান্নার কাজে মন দিলো। [illegible] ছেড়ে একটা পাড়হীন বিবর্ণ শাড়ী পরে রান্না-ঘরে ঢুকে গেল। [illegible] একটায় পাত পড়ল। বসবার বড় পিঁড়ি, তার সামনে থালা [illegible] আর একটি করে বড় পিঁড়ি। বাঁ হাতের পাশে ঘটি-ভরা জল [illegible] ওপর জল খাবার বাটি। বড় থালার ওপর নানা প্রকার চাট্নী জাতীয় খাদ্য সাজানো, আর ছোট ছোট কটোরাতে ব্যঞ্জনাদি। থালার মাঝখানে এক বাটি ভাত উপুড় করে রাখা, তার ওপর ডালের সুক্ত ও ঘি ঢেলে খাওয়া আরম্ভ করা হল। ভাতের পর রুটী, শেষে আবার ভাত ও ঘোল। দাদা ও স্বামী বহুক্ষণ ধরে তৃপ্তির সহিত আহার করতে লাগল, শকুন্তলা বার বার অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করে চলল। শিশুদের পূর্ব্বেই খাওয়ানো হইয়াছিল। কর্ত্তাদের খাওয়ার পর চাপরাশীদের খাওয়ানো হল। অবশেষে বেলা দুটার পর শকুন্তলা খেল। পানের বাটা নিয়ে শ্যালক-ভগিনীপতি ওপরের ঘরে বিশ্রাম করতে চলে গেল, শকুন্তলা নীচের ঘরে বিছানা পেতে শিশুদের নিয়ে শুল। পরদিনের বনভোজনের জন্যে কি কি করতে হবে, তা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

৭

ঘণ্টা খানেক পর হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল—লীলা আর রামের যুগপৎ ডাকে। চোখ মেলে দেখে পাশে শম্ভু ঘুমুচ্ছে, দরজার কাছে লীলা ও রাম দাঁড়িয়ে। দু'জনের মুখেই বিশেষ উত্তেজনার চিহ্ন। লীলা বললে, "মা, ষ্টেশনের ঐ গোঁফওয়ালা লোকটা এসেছে, বাবা ও মামার সঙ্গে কথা বলছে।" রাম বললে, "তার লাল চটি দু'টো সিঁড়ির কাছে রেখেছে।"

শকুন্তলা উঠে চোখ রগড়াতে লাগল। ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি। হঠাৎ দরজার কাছে এগিয়ে কান খাড়া করে রইল, তার চোখ দু'টি স্থির হয়ে পড়ল; লীলা কি বলছিল, তাকে থামিয়ে বললে, "চুপ কর, শুনি।" কান পেতে শুনলে ওপরের ঘরে বেশ উচ্চৈঃস্বরেই কথা চলেছে—

"আপনার মিথুন রাশি, রাও সাহেব?"

"হ্যাঁ।"

"আর অশ্বিনী নক্ষত্র। আপনার জীবনে ভাগ্যলক্ষ্মী [illegible] আছে। বাল্যে গ্রহবৈগুণ্য ঘটেছিল, ভগ্নস্বাস্থ্যে কষ্ট পেয়েছেন— খুব গুরুতর অসুখ করেছিল—টাইফয়েড?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক কৈশোরে পিতৃবিয়োগ, অর্থকষ্ট। কিন্তু গুরু সহায় ছিল, তাই সব সঙ্কট তরে গেছেন। তার পর সুদিন এসেছে। সব পাশ-টাশ করে সরকারী চাকরি (হোক্ না রাজার) পেয়েছেন। চব্বিশে কি পঁচিশে বিয়ে করেছেন—"

"ছাব্বিশে।"

"ছাব্বিশে। তা' এক-আধ বছরের প্রভেদ কথায় কথায় হয়ে যায়। অনুরূপা ভার্য্যা, রূপবতী, সুশীলা, লক্ষ্মীমতী।"

শুনতে শুনতে গর্ব্বে শকুন্তলার বুক ফুলে উঠল।

"কিন্তু কিছু কাল একটা দুষ্ট গ্রহ ক্রিয়া করবে। আপনার ভাগ্যে দুটি ভার্য্যা।"

দাদা বলে উঠলেন, "একেবারেই ?"

জ্যোতিষী বললে, "তা নয়। প্রথম পত্নীবিয়োগের পর দ্বিতীয় পক্ষ আসবে।"

শকুন্তলা সোজা হয়ে বসল।

"দ্বিতীয়া ভার্য্যা স্বরূপা না হলেও সুলক্ষণা ও পতিগতপ্রাণা হবে। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আপনার সেবা করবে। ধনে-জনে পূর্ণ করবে।"

শকুন্তলা উঠে দাঁড়াল। কে যেন তার মুখে হঠাৎ কশাঘাত করে চলে গেল। তার চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বেরুতে লাগল। সুরেখ ঠোঁট দু'টি ভেঙে কুঞ্চিত হয়ে পড়ল। গাল দু'টি ফ্যাকাশে হ'ল।

"আপনার ছেলেবেলায়ই অসুখ ছিল। আর কোনও গুরুতর অসুখ নেই, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য।"

"ছেলে-পিলে ক'টি ?" আবার দাদার স্বর।

"প্রথম পক্ষের তিন, দ্বিতীয় পক্ষের চার।"

"ধন-সম্পত্তি ?"

"বাড়ী হবে, পাকা বাড়ী। মোটর গাড়ী হবে। বহু চাকর-বাকর খাটবে। লোকে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে—ওঁর দানধ্যানের জন্যে। যে তাঁর সংস্রবে আসবে সেই সুখী হবে।"

শকুন্তলা কাঠ হয়ে গেল। তার চক্ষু স্থির, নাসিকায় যেন নিশ্বাস বইছে না। হাত কাঁপছে।

ক্ষণকাল সকলে নীরব।

"আমার বোনের কুষ্ঠীটা দেখবেন ?"

"নিশ্চয়, নিয়ে আসুন।"

লীলা ও রাম বাইরে চলে গিয়েছিল। লীলা ছুটে এসে বললে, "মা তোর কুষ্ঠী চেয়েছে।" বলেই মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তো কি হয়েছে মা ?"

"মাথা ধরেছে।"

"আমরা ঘুম থেকে ডেকে তুলেছি বলে ? বড্ড ভুল হয়ে গেছে মা" বলে লীলা মায়ের গা ঘেঁসে অনুতাপ প্রকাশ করতে লাগল। শকুন্তলা মা তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে, তার মুখটা বুকের ওপর চেপে ধরলে। তার পর ঝর-ঝর করে তার সুন্দর বিসাল চোখ দু'টি থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। লীলা মায়ের গভীর ব্যথা অনুভব করলে কিন্তু কারণ খুঁজে পেলে না। বললে, "কাঁদছিস্ কেন মা ?"

ধীরে ধীরে তার মা শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে। বললে, "গিয়ে বল্ আমার কুষ্ঠী এখানে নেই।"

লীলা চলে গেল। ফিরে এসে বললে, "তোর রাশি-নক্ষত্র কি বল্।"

শকুন্তলা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। চোখ শুকনো, বললে, "বলগে আমি রাশি-নক্ষত্র জানি নে।"

তার পর কিছুক্ষণ সে নির্বিষ্ট ভাবে বিছানার ওপর নিদ্রিত শম্ভুর দিকে চেয়ে রইল।

রাম এসে বললে, "মা, বাবা বলেছেন তিন জনের চা চাই।"

শকুন্তলা চা তৈরি করতে রামুর হাতে ধরে রান্না-ঘরে গেল। উনুনে চড়িয়ে, জলের কেটলি রেখে বললে, "রাম, তুই তোর দিদিকে ভালোবাসিস্ ?"

রাম বললে, "বাসি। তবে সে যখন ঝগড়া করে তখন বাসি নে।"

শকুন্তলা যেন সে কথায় কান দিলে না। আবার আগ্রহের সহিত বললে, "শম্ভুকে ভালোবাসিস্ ?"

"খুব ভালোবাসি। তবে কাল সে আমাকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল।"

শকুন্তলা রামকে কোলে টেনে এনে বললে, "তুই লীলাকে, শম্ভুকে খুব—খুব ভালোবাসিস্। শম্ভু দুষ্টুমি করলেও তাকে মারিস নে।"

রাম ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "আমি বুঝি ছোট্ট ভাইটাকে মারি ?"

শকুন্তলা আবেগের সহিত বলে যেতে লাগল—"সে যখন বড় হবে, আর তুই আরো বড় হবি, তখন দুই ভাইয়ে মিলে-মিশে চলিস্। আর লিলিকে ভালোবাসিস্। দেখিস্ নি, আমার দাদা আমায় কেমন ভালোবাসে ?" বলে, শকুন্তলা চোখ মুছতে লাগল। চোখ মুছে স্থির হ'য়ে বললে, "আমি তখন থাকব না। তোরা কে কেমন ভাবে চলিস্ দেখতে পাব না। তোদের সঙ্গে কে কেমন ব্যবহার করে তাও জানব না—"

বলতে বলতে একটা অজ্ঞাত ক্ষোভে তার দৃষ্টি কর্কশ হ'য়ে পড়ল। ক্ষণকাল সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল, তার সুন্দর কোমল ঠোঁট দু'টি প্রায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ল। তার পর বললে, তোরা তিন জনে মিলে-মিশে থাকিস্।"

রাম এ-সব কথা শুনে অবাক। হঠাৎ বলে উঠলে, "কেটলি থেকে ধোঁয়ো বেরুচ্ছে—চা কখন করবি ?"

মা বললেন, "এক্ষুণি করব। তুই শীগ্‌গির ক'রে রাধাকে ডেকে নিয়ে আয়। বল, খব জরুরী কাজ।"

রাধা এলে শকুন্তলা তাকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিলে। নিজে গেল না। লীলা ও রামকে রান্না-ঘরেই চা দিলে। তখন শম্ভু ঘুম থেকে উঠে সোজা মায়ের কাছে চলে এল, এবং মায়ের পেয়ালা থেকে চা খেতে সুরু করে দিল।

শকুন্তলা চুপ করে বসে রইল। তার মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল ভবিষ্যতের একটা দৃশ্য। তার রান্না-ঘরে তারই জায়গায় বসে আছে—আর এক জন পাশে সেই লোকের দু'-তিনটি ছেলে আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করছে। আর লীলা একটা নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরে ঘরের এক কোণে বসে রয়েছে। মুখ মলিন, গালে চোখের জলের দাগ। পাশের ঘরে শম্ভু একা-একা ব'সে কাঁদছে, তাকে দেখবার কেউ নেই। রামকে তার বাবা মেরেছে—বৈমাত্র ভাইকে মেরেছিল বলে—রাম রাগ ক'রে না খেয়ে-দেয়ে বারান্দার টুলের ওপর পড়ে আছে—

শকুন্তলার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হ'য়ে এল।

চা পানের পর জ্যোতিষীকে বিদায় করে তার দাদা ও স্বামী দু'জনে মিলে রান্না-ঘরে এল। দাদা বললে, "কি শকু, তুই এলি না যে ?"

তার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "দাদা কাল চলে যাবে, আর আজই মুখ ভার হ'য়ে গেছে! কি উপায় হবে ?"

সে সন্ধ্যায় শকুন্তলা পরদিনের জন্যে খাবার তৈরি করলে একা বসে, নীরবে। হাত যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যাচ্ছে, প্রাণে উৎসাহ নেই। সে রাত্রে যখন শুতে যাবে তখন বারান্দার দেয়ালে টাঙানো তার বাবার ফটোটার দিকে দৃষ্টি গেল। মনে হল, ওখানে ও-ছবি থাকবে না, তার বদলে আর এক জনের বাবার ছবি ঝুলবে।

শয়ন-ঘরে যেতে যেতে আর একটা চিত্র ভেসে উঠল। শুভ্র শয্যার ওপর জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে; তার নীচে শুয়ে আছে আর এক জনের ছেলেরা—তার লীলা রামু আর শম্ভা নীচের সেঁৎসেঁতে ঘরে মাদুরের ওপর পড়ে রয়েছে; তাদের নোংরা বালিশ, পরনে নোংরা কাপড়। সেই ছেলেদের পাশে শুয়ে আছে তাদের মা, শকুন্তলারই স্থানে। শকুন্তলারই স্বামী সেই জনকে স্নিগ্ধ স্বরে বলছে, "আজ বড্ড খেটেছ শকু—" কি তার নাম দেবে কে জানে? তবে "শকু"র মতই আর একটা ছোট স্নেহের ডাক হবে। সেই জন "শকুর" স্বামীর স্নেহ আদর ভালবাসা পাবে—

হঠাৎ শকুন্তলার চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে মনে মনে বললে, কত বড় আস্পর্দ্ধা!" বললে, "তাকে আসতে দোবো না। আমি মরব না!"

৮

পরদিন সকাল বেলা শকুন্তলা অতি শান্ত ভাবে দাদার যাত্রার ও বন-ভোজনের আয়োজন করতে লাগল। দাদার দুপুরের খাওয়া ও বিকেলের খাওয়া টিফিন-কারিয়ারের মধ্যে পুরলে, ও পরদিন সকালে খাবার জন্য গুটিকতক বরফি রাখলে। দাদার মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেল। সেগুলো ও খাবার ঝুড়ি ফটকের কাছে রেখে সকালে বাসের অপেক্ষা করতে লাগল। ছেলে-মেয়েরা ও শকুন্তলা নিজে ভ্রমণের উপযোগী সাধাসিধে পোষাক পরেছে।

সাতটাতে বাস আসবার কথা ছিল। ক্রমে সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা বাজল, তবু বাসের দেখা নেই। ভাই বোনকে বললে, "দুনিয়া যতই অগ্রসর হোক না কেন, কিষাণপুর কিষাণপুরই থাকবে। এখানে সাতটা মানে আটটা।"

আটটারও পরে বাস এল। বাসের ড্রাইভার নেমে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বললে, পথে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল। একটা গরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে আর একটা বাস উল্টে যায়, তিনটে লোকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, অপর পাঁচটি গুরুতর ভাবে আহত হয়। এ বাস সেই রাস্তা দিয়ে আসবার সময় সে অবস্থার লোকেদের দেখে আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয় ও কর্তৃপক্ষকে খবর দেয়। এ সব কারণে এত দেরী।

দাদা শুনে বললে, "অতি ভাল কাজ করা হয়েছে। এ জন্মে যত দেরীই হোক্ না, তাতে কিছুই এসে-যায় না।"

শকুন্তলা অতি ব্যগ্র ভাবে এগিয়ে এসে মোটর দুর্ঘটনার কথা শুনল। তিন-তিনটা লোক, তার মধ্যে একটি মেয়েমানুষ, অল্পবয়সী —মারা গেছে জেনে সে শিউরে উঠল। হঠাৎ তার মুখে ভাবান্তর দেখা গেল। সে কি ভেবে ধীরে ধীরে বাগান ছেড়ে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

শিশুরা ও-সব খবর বোঝেনি। তারা অতি উৎফুল্ল ভাবে বাসে চড়ে বসলে, তাদের বাবাকে ডেকে পাশে বসালে (পূর্ব্ব থেকে তাদের সীট রিজার্ভ করা ছিল)। মালগুলো ক্লিনার ছাতে তুলে গুছিয়ে রাখলে। দাদা গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় বোনকে না দেখে ঘরের দিকে গিয়ে ডাকলে—"শকু!"

শকুন্তলা ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসে আছে। তার চক্ষু ছল-ছল। সে নিজেকে একটু সামলে শান্ত ও নম্র ভাবে বললে, "আমি যাব না দাদা, তোমরা যাও।"

দাদা অবাক হয়ে বললে, "তার মানে? তোর কি হয়েছে?"

শকুন্তলা ধীর ভাবে বললে, "আমি বাড়ীতেই থাকব।" দাদা অবাক হয়ে বোনের দিকে চেয়ে রইল। বোন নিস্পন্দ।

শঙ্করবাও স্ত্রীর দেরী দেখে বাস থেকে নেমে এসে অসহিষ্ণু ভাবে বললে, "এত দেরী করছো কেন?"

শকুন্তলা দৃঢ়তার সহিত বললে, "আমি যাব না। তোমরা যাও।" "ব্যাপারখানা কি?" "তুমি জান তোমার কুষ্ঠীতে কি লেখা আছে। আমি যদি এখন মরি তবে আমার ছেলে-মেয়ের কি দশা হবে?"

দাদা এ কথায় হেসে উঠে বললে, "এর জন্যে এত ভাবনা। জ্যোতিষী বললেই হ'ল?"

"কেন হবে না? জ্যোতিষীর অন্য কথা তো অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে!"

দাদা বললে, "তা দেখা যাবে। এখন তো চল। এক্ষুণি তো কিছু আর হচ্ছে না।"

"কেন, এ মোটরে যদি দুর্ঘটনা হয়, যেমন অন্যটায় হয়েছিল?"

"'যদি' বলে তুই অমনি বসে থাকবি?"

"ও-সব বিপদের মধ্যে যাওয়া আমার ঠিক নয় দাদা! আমার ছেলেরা অতি ছোট, একেবারে অসহায়।"

নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে শ্যালক-ভগিনীপতি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। রাস্তায় মোটর বাসের হর্ণ বেজে উঠল।

দাদা বললে, "তুই না গেলে আর বনভোজন কি হবে?"

"নিশ্চয় হবে দাদা! ছেলে-মেয়েরা বড় আশা করে আছে। বনভোজনের উত্তেজনায় কাল রাতে তাদের ভাল করে ঘুম হয়নি। না গেলে তারা বড্ড দমে যাবে। তোমরা যাও।" স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, "সব কিছুর যেন ঠিক মত ব্যবস্থা হয়।"

বাসের ড্রাইভার এসে বললে, "বাসের বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

দাদা শেষ যুক্তি দিয়ে বললে, "দুর্ঘটনার কেবল তোরই হতে পারে, ছেলে-মেয়েদের হতে পারে না, আমাদের হতে পারে না?"

শকুন্তলা সহজ ভাবে বললে, "তোমাদের পেছনে তো দুষ্ট গ্রহ নেই দাদা!" দাদা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভগিনীপতি বললে, "চলুন আমরা যাই।"

দাদা বিরক্তির স্বরে বললে, "ঐ জ্যোতিষীই তোর দুষ্ট গ্রহ। কি কুক্ষণে তাকে ডেকেছিলাম!"

শকুন্তলা দাঁড়িয়ে মাথা নইয়ে দাদার পায়ের কাছে হাত দিয়ে ভূমিস্পর্শ করে প্রণাম করলে। বললে, "পৌঁছে চিঠি দিয়ো দাদা।" স্বামীকে বললে, "শম্ভাকে আমার কাছে দিয়ে যাও।"

শম্ভাকে কোলে নিয়ে শকুন্তলা লীলাকে ডেকে বললে, "তোরা বনভোজন করে আয় গে। আমরা বাড়ীতে থাকব।"

শ্যালক-ভগিনীপতি ধীরে ধীরে বাসে গিয়ে বসল। বাস চলে গেল।

সন্ধ্যায় শঙ্কররাও শিশুদের নিয়ে ফিরে এল। বনভোজনের কাহিনী বলতে না বলতে শিশুরা ক্লান্ত দেহে ঘুমে অবশ হয়ে পড়ল। স্বামি-স্ত্রীতে বারান্দায় এসে বসল। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। জাতি-ফুলের চড়া গন্ধে সমস্ত বাড়ীটা আমোদিত হয়ে আছে। শঙ্কর রাও বললে, "কি শকু?" শকুন্তলার সুন্দর মুখমণ্ডলে একটা বিষাদের ছাপ পড়েছে। সে শান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাইল। আজ দু'জনের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান!

মাইকেল আরজিবাসেভ

দশ

আবার দেখা হবে, এই প্রত্যাশায় ইউরাই পরের দিন ঠিক ঐ সময়টিতে গিয়ে পার্কে হাজির হোল। এদিক-ওদিক [illegible] দেখল, ওরা আসেনি। কিন্তু দেখা পেল শ্যাফরফ-এর।

"কি হে, মাথা গুঁজে চলেছো কোথায়?" শ্যাফরফ প্রচুর [illegible] নিয়ে ওকে শুধালো।

ওরা দু'জনই এককালে একই বিপ্লবী সমিতির সভ্য ছিল। ইউরাই-এর পরে ও ঢুকেছিল, তাই ওকে ইউরাই অনেকটা শিক্ষানবীশ [illegible] মনে করতো। ওর কাছে সেই জন্যে বেশ খানিকটা আয়াস [illegible] টেনে-টেনে বললো, "আর বলো কেন? কিছু না করতে পেরে [illegible] ঘুণে ধ'রে গেলো।...যাচ্ছো কোথায়?"

"একটা বক্তৃতা আছে আজকে।" পকেট থেকে বের করলো [illegible] কাগজে মুড়ে-রাখা পাতলা হ্যাণ্ডবিলের মতো এক বাণ্ডিল [illegible]। ইউরাই ওর থেকে একখানা বের ক'রে নিয়ে পড়লো,— [illegible] দিন আগেও পড়েছিল, পরে ভুলে গিয়েছিল,—সোশ্যালিজমের [illegible] একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ।

[illegible] ফেরৎ দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কোথায় বক্তৃতাটা [illegible]"

[illegible] ও ডুবোভা যে স্কুলে পড়ায়, শ্যাফরফ জানালো সেই স্কুলে [illegible] বক্তৃতাটা হবে।

"আমি আসতে পারি?"—ও জিজ্ঞাসা করলো।

ইউরাইকে শ্যাফরফ বিপ্লবী-আন্দোলনের এক জন কেষ্ট-বিষ্টু ব'লেই মনে করতো বরাবর; তাই সে লাফিয়ে উঠে বললো, "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

ওরা যখন গিয়ে বক্তৃতার জন্য নির্দ্দিষ্ট হল-ঘরে গিয়ে পৌঁছুল, দেখলো ইতিমধ্যেই অনেকে এসে গেছে। একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কার্লিয়া ও ডুবোভা।

সীনাকে না দেখতে পেয়ে ইউরাই মন্তব্য করলো, "শ্রীমতী সীনা কার্সাভিনা বোধ হয় এই সব সভা-সমিতিতে আসে না!"

"তাই না কি!"—চমকে ইউরাই ঘুরে তাকিয়ে দেখল বক্তৃতা-মঞ্চের টেবিলের পাশে সীনা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ঘর-ভর্ত্তি লোক; আরো আসছে। ইউরাই লক্ষ্য করলো, ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রী থেকে সুরু ক'রে দু'-এক জন বুড়ো মতন চাষীও এসে জুটেছে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরীতে বক্তৃতা সুরু হোল। বক্তৃতা তো নয়, শ্যাফরফ প্রবন্ধ পাঠ করলো। ওর বলার ভঙ্গি তেমন ভালো না, তবু হল-ভর্ত্তি ছেলে-মেয়ে মজুর-চাষী সবাই নিস্তব্ধ হয়ে শুনল তা; সামনের আসন কয়টিতে যে সব বুদ্ধিজীবিরা বসেছিল, তা'রা উসখুস্ করতে এবং ফিসফিস্ ক'রে কথা বলতে আরম্ভ করলো। শেষটায় যখন গোলমালটা বেশ বেড়ে উঠল, ইউরাই শ্যাফরফ-এর প্রবন্ধটির বাকী অংশটি ওর স্বভাব-উদাত্ত সুরে পাকা বক্তার মতো পড়ে গেলো।

মোটং-এর শেষে ইউরাই সীনা ও ডুবোভার সঙ্গে ওদের বাড়ী অবধি গেলো।

ছোট একটি বাড়ী, বড়ো একটা রুক্ষ মাঠের মধ্যিখানে। বাড়ীর দরজায় পৌঁছে সীনা বললো, "একটু ভেতরে আসবেন না?"... ইউরাই চার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তা' লক্ষ্য করে সীনা বললো, "আপনাকে ঘরের ভেতরই আসতে বলতুম, কিন্তু সেখানকার যা অবস্থা, তাতে আপনাকে ভেতরে গিয়ে বসতে বলতে লজ্জা করছে। সকাল বেলাই বেরিয়েছি কি না, তাই ঘরটা বড়ো অগোছাল রয়ে গেছে।"

সীনা ঘরে গিয়ে ঢুকল, আর ইউরাই বাইরে মাঠের দিকে এগোল। বেশি দূর গেলো না, একটা অজ্ঞাত কৌতূহল নিয়ে সে বাড়ীর বন্ধ-জানালা কয়টার দিকে তাকালো, যেন কোন্ এক মহা রহস্য ঐ জানালাগুলোর ওপারে জড়ো হয়ে রয়েছে,—সুন্দর অদ্ভুত রহস্য সব! এমন সময় সীনা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। এখন আর ওকে যেন চেনাই যাচ্ছে না! কালো রং-এর জামা-কাপড় ছেড়ে এসেছে, এখন ওর গায়ে পাতলা, বুকের কাছটা অনেকটা নীচু ক'রে কাটা, খাটো হাতা একটা বডিস্ এবং নীল রং-এর স্কার্ট।

"এই এসেছি" সহাস্য মুখে সীনা উচ্চারণ করলো।

"দেখলাম।"—এমন একটু চাপা রহস্যপূর্ণ স্বরে ইউরাই বললো, যা একমাত্র সীনাই বুঝতে পারলো।

সীনার ঠোঁটে আবার সেই সুন্দর স্তিমিত হাসি। দূরে মাঠের ওপাশে ঢালু জমির গায়ে নাম-না-জানা অজস্র বুনো ফুল, পথের দু'পাশে স্থলপদ্ম ও উঁচু ঘাস। চেরী গাছগুলোর থেকে একটা কী রকম মাদক এঁঠেল গন্ধ।

"আসুন না, বসি একটু।" সীনা বললো।

ভাঙা বেড়ার কাছে ওরা বসলো। সূর্যাস্তের আকাশের দিকে ওদের মুখ ফেরানো। আনমনে ইউরাই কাছের লিলাক গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিলো, ঝ'রে পড়লো এক রাশ শিশির।

"একটা গান শোনাব আপনাকে?" সীনা জিজ্ঞাসা করলো।

"বাঃ, নিশ্চয়ই!" ইউরাই জবাব দিল।

"ওগো সুন্দর প্রেম-তারকা"—গভীর এক উদাস সীনার গলা। প্রতিবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তা'র সুগঠিত স্তনযুগ হালকা বডিসের আড়ালে ফুলে কেঁপে উঠছিল, যেমন উঠেছিল সেই পিক্‌নিকের রাতে। গলার স্বর ঢেউয়ের মতো সন্ধ্যার আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। সীনা অনুভব করলো—ইউরাই-এর স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি তা'র দিকে ফেরানো রয়েছে। নিজের দু'চোখ বুজে সে গেয়ে চললো, সুর যেন আরো মধুর হোলো, আরো আগ্রহ-মাখা। চমৎকার নিস্তব্ধ পরিবেশ, যেন সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু কান পেতে গান শুনছে। যখন নূতন ফাল্গুনের রাতে নাইটিংগেল গান গায়, কী রকম আশ্চর্য্য শান্ত হয়ে ওঠে তখন গভীর বন,—ইউরাই সেই রকমটা অনুভব করলো।

গান শেষ হোলো।

"চুপ ক'রে রইলেন কেন?"—সীনা ওকে প্রশ্ন করলো।

"বড়ো বেশি ভাল লাগছে।"

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর।"—সীনার চোখে কোন্ স্বপ্নের আভাষ! বললো, "সত্যি কথা বলতে কি, বেঁচে থাকাটাই সুন্দর।"

ইউরাই-এর মনের আকাশে চকিতে একটা অস্বস্তিকর ভাঙা ভাবের চীড় খেয়ে গেলো। দূরে একটা লোক শীষ দিতে দিতে চলে গেলো।

হঠাৎ সীনা জিজ্ঞাসা করলো, "খ্যাফরফ্‌কে আপনার ভালো লাগে?"—এ রকম একটা অবান্তর প্রশ্নে নিজের মনেই নিজে কৌতুক বোধ করলো।

মুহূর্ত্তের জন্য ঈর্ষিত বোধ করলো নিজেকে ইউরাই। কিন্তু সে ভাবটা চাপা দিয়ে বললো, "বেশ, ভালোই তো। কী রকম আত্ম-নিবিষ্ট হয়ে কাজ ক'রে চলেছে!"

মাটি থেকে উঠে আসছে সোঁদাল ভ্যাপ্‌সা ঠাণ্ডা, শিশির-ভেজা ঘাসের ডগায় অস্পষ্ট-বিবর্ণ রঙের পোচ্।

"শীত করছে।" সীনার স্বল্পাবরণ শরীর ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল।

ওর সুডোল, কম-কাঁধের বাঁকের দিকে চোখ রাখতেই ইউরাই কেমন একটু থতমতো বোধ করলো। চোখে চোখ পড়তেই সীনাও বিব্রত হোল। বললো, "চলুন, যাওয়া যাক।"

একটা অস্ফুট ব্যথা দু'জনেই মনে মনে বোধ করলো। ইউরাই-এর মনে হোল, সমস্ত মাঠ, বাগান, গাছ, এবার প্রাণ ফিরে পেলো যেন! শিশির-ভেজা ঘাসের থেকে, গাছের আড়াল থেকে, অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনতর হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তব্ধতার ভেতর কাদের চাপা কথার ফিস্‌ফিস্ শব্দ শোনা যাবে। এখন যদি সীনা তার স্বল্পাবরণের বাধা ছিঁড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে ঐ ঝোপটা যেখানে ঘনায়মান অন্ধকারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—সেদিকে ছুটে চলে, তা হলে ঐ পরিবেশে সেটা বেমানান হবে না। বরঞ্চ সেটাই হবে স্বাভাবিক ও সুন্দর। এই মাঠ, এই বন, তাতে একটুও চমকে উঠবে না, হবে না তাতে তাদের স্বপ্নভঙ্গ। ইচ্ছে হোল ওর মনের এই কথাটা ও সীনাকে বলে, কিন্তু সাহসে কুলোলো না। সে কথা না ব'লে ওরা আলোচনা করলো মিটিং এবং ওদের জানা লোকদের বিষয়

ঘরের দরজায় ওরা এসে দাঁড়ালো।

"ওল্‌গা ফিরে এসেছে।" সীনা বললো।

ওদের সাড়া পেয়ে ডুবোভা ভেতর থেকে বললো, "কে, সীনা না কি?" ওর স্বর কি রকম যেন ভয়-বিহ্বল! "সীনা সীনা, তোমাকে খুঁজছিলাম এতক্ষণ। সেমেনফ্ মারা যাচ্ছে।" নিশ্বাস চেপে ধ'রে ও বললো।

"কী বললে?"—ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে সীনা বললো।

"হাঁ, ও মারা যাচ্ছে। শ্বাস্ ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। হাসপাতালে ওকে নিয়ে গেছে। এত চট্ ক'রে হোল যে, বলবার নয়। রাটিফের বাড়িতে আমরা চা খাচ্ছিলাম, ভারী ফাইন ও নোভিকফের সঙ্গে তর্ক করছিল। হঠাৎ কাসি আসতে উঠে দাঁড়ালো, হাঁপাতে লাগলো,...আর,আর,...রক্ত ছিটকে পড়তে লাগলো..."

ইউরাই জিজ্ঞাসা করলো, "ও নিজে বুঝতে পেরেছে?" কি রকম অস্বাভাবিক কৌতূহল যেন ইউরাই-এর!

"হাঁ।...আমাদের দিকে তাকিয়ে একবার বললো, 'কি হোল এ?'—তার পরমুহূর্ত্তেই বললো, 'এত শীগ্‌গির?'...বাপ্ রে, কী ভয়ানক লাগছে!"

তিন জনেই নিস্তব্ধ।

"মৃত্যু বড়ো ভয়ানক ভীতিজনক!"—পাংশু মুখে ইউরাই বললো।

সীনা অনুচ্চ স্বরে বললো, "আমরা যাবো দেখতে ? না, যাওয়াটা অনুচিত হবে ?—কি বলো তুমি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"চলুন না সবাই।" ইউরাই বললো। "হয়তো দেখা করতে দেবে না। কিংবা—"

"ও নিজেও হয়তো আমাদের দেখতে চাইতে পারে।" ডুবোভা বললো।

হাসপাতালে যেতেই ওরা দেখা পেলো রিয়াজানজেফ্-এর। ওর কাছে ওরা জানতে পারলো যে, সেমেনফ্-এর এখনো জ্ঞান ফিরে আসেনি। নোভিকফ্ এবং অন্যান্য সবাই ওর কাছে আছে।

রিয়াজানজেফ্ বললো, "পাদ্রী ডাকা হয়েছে। আশ্চর্য। কতো শীগ্গির সব শেষ হয়ে এলো! অবশ্য ইদানিং বেশ খানিকটা ভুগে লাগিয়েছিল ও।" বলতে বলতে ওরা সেমেনফ্‌কে যে কামরায় রাখা হয়েছিল সেখানে চলে এলো।

সেমেনফ্‌কে যেন চেনাই যায় না। জীবনের কোন লক্ষণই যেন ওর শরীরে নেই। স্পন্দনহীন সর্বাবয়বে ভেতরে ভেতরে যেন অপ্রতিহত মৃত্যুদূত পদক্ষেপ করছে। মরণোন্মুখ রোগীর ঠোঁটের ওপর বাতির আলো এসে পড়েছে! চার পাশে যারা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তারা এক নিস্তব্ধ, যেন মনে হচ্ছে কী এক মহতী সত্তাকে তারা নিকটে অনুভব করছে, যেন তার উপস্থিতিকে তারা কোনো রকমেই ব্যাঘাত করতে সাহস পাচ্ছে না!

মোটা এবং বেঁটে এক জন পাদ্রী এসে ভিতরে ঢুকলেন। সঙ্গে তার এক জন অনুচর এবং স্যানিন। উপস্থিত সবাইর দিকে তাকিয়ে পাদ্রী অভিবাদন করলো, ওরাও শ্রদ্ধাভরে প্রত্যভিবাদন করলো। স্যানিন এদের থেকে দূরে সরে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সেমেনফ্ এবং ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, পাদ্রী এবং দর্শকদের প্রত্যেকে কে কি মনে ভাবছে এই মুহূর্তে।

পাদ্রী তার মন্ত্র উচ্চারণ করলো! তার সঙ্গীয় অনুচর উপাসনার গান ধরলো। সীনা, ডুবোভা,...একে একে সব ক'টি মেয়েই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু ক'রে দিল!

স্যানিন এই ভেবে বিরক্ত হোলো যে, সেমেনফ্ যদি এই কান্না, ঐ পাদ্রীদের মৃত্যু-বরণের গান শুনতে পায়, ওর মনের অবস্থা আরো ভয়ানক না বিশ্রী হয়ে উঠবে! আর থাকতে না পেরে শেষটায় ও পাদ্রীকে বললো, "অতোটা জোরে নয়!" পাদ্রী ওর দিকে একবার তাকিয়ে আরো জোরে সুরু করলো, অনুচর তীব্র দৃষ্টি হানলো, এবং বাকি সকলে এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে পড়লো ওর কথা শুনে। যেন কি এক ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে! স্যানিন বললো না কিছু, কিন্তু আরো বিরক্ত হয়ে উঠল মনে মনে।

"ওঃ, শীগ্গির শেষ হয় না! ভারী বিশ্রী, নয় কি?"—স্যানিন অনুচ্চ স্বরে বললো।

"হ্যাঁ, সত্যি।" আইভানফ্ উত্তর দিল। সেমেনফ্-এর শুনতে পাবার কথা নয়, কিন্তু অন্য সবাই এ কথায় আহত বোধ করলো। কেউ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেইক্ষণেই সেমেনফ্ এক চাপা আর্তনাদের গোঙানি সুরু করলো। খানিকটা পরেই নীরব হোলো!

"সব শেষ হয়ে গেলো!" মৃদু স্বরে পাদ্রী বললো।

এগারো

একটা স্মৃতি-বাসরের প্রস্তাব ক'রে যখন আইভানফ্ স্যানিনকে ওর বাড়ীতে আমন্ত্রণ করলো, ও সহজেই রাজী হয়ে গেলো। যাবার পথে স্যানিন ভদ্কা মদ এবং ভালো খানিকটা চাট কিনে নিলো। ইউরাইকেও ওরা পথে পেয়ে গেলো।

আইভানফের এক খুড়ো ছিলো, পীটর ইলিচ তার নাম। স্মৃতি বাসরে সে-ই সভাপতিত্ব করলো।

সেমেনফ্-এর মৃত্যু ইউরাই-এর মনে এমন একটা দাগ কেটেছে, যা ও বিশ্লেষণ করে উঠতে পারছিল না। ও বললো, "মৃত্যু একটা ভয়াবহ ঘটনা।"

পীটর ইলিচ বললেন, "কেন? মৃত্যু? ও তো একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। মনে করুন, একটা লোক চিরকালের জন্য বেঁচে রইল—কী ভয়াবহ ভেবে দেখুন তো!"

ইউরাই ভাবলো অনন্ত জীবন কি রকম। কালের বিস্তৃতির দিকে প্রসারিত নিরুদ্দিষ্ট এক ধূসর পথ। বর্ণ গন্ধ শব্দ ও অনুভূতি-হীন একটি প্রবাহ যেন নিস্তব্ধ নিরুদ্বেল সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এ তো জীবন নয়, এ তো চিরন্তন মৃত্যু। এই চিন্তা ওকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। বিড়-বিড় ক'রে বললো, "হাঁ তাই।"

আইভানফ্ বললো, "বোধ হচ্ছে, ওর মৃত্যুতে আপনি বড়ো বিচলিত হয়েছেন।"

"কে-ই বা হয়নি বলুন!—ইউরাই পাল্টা প্রশ্ন করলো। "মৃত্যু একটা ভয়াবহ ঘটনা।"—ও আবার উচ্চারণ করলো।

একটু অবহেলার ভঙ্গিতে আইভানফ্ বললো, "বড্ডো নার্ভাস হয়েছেন দেখছি।"

"আপনি নন কি?"—ইউরাই বললো।

"আমি?" আইভানফ্ উত্তর দিলো।" নিশ্চয়ই না। আমি মরতে চাই না, কেন না, ওতে কোনো মজা নেই; বরঞ্চ বেঁচে থাকতে তা আছে! কিন্তু যদি মরতেই হয়, তা'হলে চাইব তা' যেন দ্রুত হয়, মিছিমিছি হল্লা-হুল্লোড় না ক'রেই যেন তা হয়।"

স্যানিন হেসে বললো, "এখনো তা চেষ্টা ক'রে দেখোনি?"

"না, তা' সত্যি বলেছ।" ইউরাই ব'লে চলল, "ও-রকম মামুলী প্রশ্ন ঢের শোনা গেছে। আপনারা যাই বলুন, মৃত্যু মৃত্যুই, বীভৎস তার রূপ, জীবনকে সব কিছু আনন্দ থেকে বঞ্চিত করাই হচ্ছে তার কাজ। জীবনের মানে কি?"

আইভানফ্ উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠল, "জীবনের কোনো মানেই নেই।"

ইউরাই প্রতিবাদ ক'রে বলল, "না, তা অসম্ভব। সব কিছুই সত্য এবং সৌন্দর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং—"

বাধা দিয়ে স্যানিন বলল, "আমার মতে কোথাও কিছু ভালো নেই।"

"এটা কি বললেন? তা'হলে প্রকৃতি সম্পর্কে বলবেন?"

"বিশ্ব-প্রকৃতি! হাঃ হাঃ হাঃ—" স্যানিন হেসে উঠল। "আমি জানি, বিশ্ব-প্রকৃতি ন্যায় ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এ রকম একটা কথা বলা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের মতোই প্রকৃতিও ভ্রম-প্রমাদে ভর্তি। খুব পরিশ্রম না

করেই আমাদের মধ্যে যে কেউ এর চেয়ে একশো গুণ শ্রেষ্ঠ বিশ্বজগতের কল্পনা করতে পারি। কেন চিরন্তন কাল আনন্দে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ সৌরকিরণোজ্জ্বল পৃথিবী দেখা দেবে না? জীবন সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়, এর খানিকটা মানে আছে। জীবন মানে প্রগতি। তার একটা লক্ষ্য নিশ্চয়ই আছে। তাই যদি না থাকে তা'হলে সমস্তটাই একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু এই লক্ষ্য ও তার সাধন আমাদের অস্তিত্বের বাইরে, মহাজগতের অস্তিত্বকে তা নিয়ন্ত্রিত করছে। সেই মহাজগতের কাছে আমাদের অস্তিত্ব একেবারেই নিষ্ক্রিয়, একেবারেই আপেক্ষিক। কেবল মাত্র বেঁচে থাকাটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। জীবন আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়, সেই জন্য মৃত্যুও আবশ্যকীয়।"

"কেন?"

"আমি কি ক'রে জানব?" স্যানিন বললো, "আর সেটা জানা আমার দরকারই বা কি? আমার কাছে জীবনের মানে হচ্ছে অজস্র অনুভূতি—তা' সুখেরই হোক আর দুঃখেরই হোক। সেই অনুভূতির বাইরে যা' থাকে,—চুলোয় যাক তা' সব! আমরা যে কোনো প্রকল্প করি না কেন, তা' প্রকল্পই র'য়ে যাবে, তার ওপর জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা বোকামী হবে। যার খুসী এ নিয়ে মাথা ঘামাক্, আমার সোজা কথা হচ্ছে এই যে, আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

পীটর বললেন, "কিন্তু আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন তো, কি বলেন? আজকাল দেখি, কেউই কিছু বিশ্বাস করে না, এমন কি যা সব চেয়ে সহজ ও নিরাপদ তাও না।"

স্যানিন হেসে ফেলল, "হাঁ, আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি। যখন শিশু ছিলুম, তখনও করেছি। কেন করি তা' নিয়ে তর্কাতর্কি করার দরকার নেই। ভগবানে বিশ্বাস করাটা হচ্ছে সব চেয়ে লাভজনক। কেন না, যদি ভগবান থাকেন, তিনি আমার আন্তরিক আনুগত্য গ্রহণ করবেন, আর যদি ভগবান না-ই থাকে, আমার ক্ষতি নেই।"

"কিন্তু এই বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এই দুই-এর একটির ওপরই তো জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়?"—ইউরাই প্রশ্ন করল।

স্যানিন দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে হেসে বলল, "না, এ রকম কোনো দর্শনবাদের ওপর আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত নয়।"

"আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আছেন।" স্যানিন জবাব দিল। "যদিও আমি তাঁর অস্তিত্বে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই। তিনি আমার কাছে কি চান তা' আমি জানি না, কিছু চান কি না তাও জানি না, তাঁকেও জানি না। তাঁর ওপর আমার যত বিশ্বাসই থাকুক না কেন, আমার জানার পরিধি তাতে বাড়বে না। ঈশ্বর মানুষ ন'ন, সুতরাং তাঁকে মানুষের নিরিখে যাচাই করা চলে না। তাঁর সৃষ্টিতে ভালো আছে, মন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কুশ্রীতা আছে—এক কথায় সব কিছুই আছে; সুতরাং কোনো বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা একে নির্দ্দিষ্ট করা চলে না। তাঁর নেই মানব-ইন্দ্রিয়, তাঁর ধ্যান-ধারণাও নিশ্চয়ই ভালো-মন্দের বাইরে। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বোধ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে পৃথক হতে বাধ্য। তা হলে বলুন, সমস্তটাই একটা আজগুবি ব্যাপার কি না!"

"তা' হলে বেঁচে থেকে লাভ কি?"—ইউরাই বলল। "মরারই বা মানে কি?"

"একটা কথা আমি জানি—" স্যানিন বলল, "তা' হচ্ছে এই যে, হীন দুঃখময় জীবন আমি চাই না। নিজের সহজাত প্রবৃত্তি[illegible] স্বাভাবিক তৃপ্তিসাধন সর্ব্বাগ্রেই হওয়া দরকার। প্রবৃত্তি, কামনা— এই তো জীবন। নিজের প্রবৃত্তিকে কামনাকে মানুষ [illegible] রোধ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও হত্যাসাধন করে।"

"কিন্তু এই প্রবৃত্তি কামনা,—এ তো মন্দও হতে পারে?"

"হতে পারে।"

"তা' হলে?—"

"তা' হ'লে,—তা' মন্দ।" স্যানিন বলল।

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ; কারো মুখে কোনো কথা নেই। একটা পোকা বন্ধ-ঘরের শার্সির ওপর মাথা ঠুকে মরছিল। তার পাখার গুঞ্জন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। স্যানিনের ঠোঁটে যেন চিরন্তন হাসি লেগে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে ইউরাই যুগপৎ বিরক্ত এবং মুগ্ধ হয়ে উঠল। ভাবলো: কী বুদ্ধিদীপ্ত ওর চোখ!

হঠাৎ স্যানিন উঠে দাঁড়ালো, শাসি খুলে পোকাটাকে জানালার বার করে দিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা কমনীয় বাতাস যেন পোকাটার পাখার ঝাপটে ভেতরে ঢুকে এলো।

ইউরাই সবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

নিঃশব্দ পরিষ্কার আকাশ, চাঁদ এবং ঠাণ্ডা-কোমল একটা পরিবেশ ইউরাই-এর উত্তপ্ত কপালে যেন হাত বুলিয়ে দিল। এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে ও ভাবতে শিউরে উঠল যে, এক বিবর্ণ অন্ধকার ঘরের কোণে একটা টেবিলের ওপর সেমেনফের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। সমস্ত অন্তর তার এক পরম বেদনায় বিস্বাদ হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে পড়ল স্যানিনকে।

'কি ধরণের লোক ও?' নিজের কাছে ও প্রশ্ন করল। 'বাক্‌-সর্ব্বস্ব ছাড়া আর কি! নিছক্ পশুবোধের ওপর জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বসে আছে!'

আবার তার মনে পড়ল সেমেনফ্‌কে। মৃত্যু ওকে ওর কাছে এনে দিয়েছে। এক অবর্ণনীয় দুঃখে ওর চোখে জল এলো। মনে পড়ল সেমেনফ্‌-এর কথা: "তোমরা বেঁচে রইবে, এই জোৎস্না লেবে তোমাদের দেহ-মনকে আপ্লুত ক'রে; আমার নিঃশব্দ সমাধির পাশ দিয়েই তোমরা চলে যাবে।"

"এই মুহূর্ত্তে—" ভাবলো ইউরাই, "আমিও তো মাড়িয়ে যাচ্ছি কতো কঙ্কাল, কতো হৃদয়,...আমার পায়ের তলার মাটি, সেখানে জড়ো হয়ে আছে যুগ-যুগ ধ'রে কতো লোকের দেহ। আমারও ঘটবে মৃত্যু, এমনি ক'রে আমারই মতো কতো লোক আমার সমাধির মাটির ওপর করবে পদপাত!...না, আমিও বেঁচে থাকতে চাই, চাই প্রাণ, চাই আয়ু,...কিন্তু কোথায় পাব সুন্দর [illegible]—"

গুন্-গুন্ ক'রে ইউরাই গান ধরলো:

"বাজিবে না বাঁশী আর
সেধে সেধে সুর তার—"

নিস্তব্ধ অপ্রগল্‌ভ রাত্রির আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জেগে র[illegible]

বারো

নীনা কার্সাভিনা এবং ডুবোভা দিন কয়েকের জন্য শহরের বাইরে চলে যেতে ইউরাই-এর কাছে দিনগুলি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে

বলে মনে হোল। লালিয়া এবং রিয়াজানজেফ, নিশ্চয়ই তাদের আলোচনার সময়ে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি পছন্দ করছে বলে মনে হয় না ; সুতরাং শীগ্‌গির শীগ্‌গির শুতে যাওয়া এবং অনেক বেলা ক'রে ঘুম থেকে ওঠা ও অভ্যাস করতে আরম্ভ করল। সমস্ত দিন হয় ঘরে নয় তো বাগানে বসে বসে ভাবতো, এবং কামনা করতো যেন কোনো একটা প্রেরণা ওকে এই আবদ্ধ আবেষ্টনের বেড়া ভেঙে ফেলে বাইরে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে ঠেলে ফেলে দিক।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়, দেখা দেয় না মানস-দিগন্তে কোনো প্রেরণা।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে ও গেলো এক দিন রিয়াজানজেফ্-এর বাড়ীতে। রিয়াজানজেফ, ওকে টানা-হেঁচড়া ক'রে নিয়ে চললো শীকারে।

গোটা কয়েক হাঁস মেরে ওরা এলো একটি চাষীর বাড়ীতে; তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। উঠানের দিক থেকে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে,—মেয়ে ও পুরুষের সম্মিলিত হাসি। পরিচিত গলার আওয়াজ পেয়ে নিশ্চিত হবার জন্ত জিজ্ঞাসা করতেই রিয়াজানজেফ, বল্‌লো, "আরে, স্তানিন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না!"

ওরা এগিয়ে গেল উঠানের যে দিকটায় আগুন জ্বালা হয়েছে, আর গুটি কয়েক পুরুষ ও মেয়ে তা' ঘিরে বসে খোশগল্প করছিল।

বাড়ীর মালিক বুড়ো কুসুমা ওদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, শীকার কি রকম হোল।

"এই সামান্য কিছু।" বল্‌লো রিয়াজানজেফ। স্তানিনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কি ব্যাপার? এখানে যে!—"

স্তানিন হেসে জবাব দিল, কুসুমা প্রোখোরোভিচ, আমার অনেক দিনের দোস্ত হ'ন কি না।"

কুসুমাও হেসে ওদের বসতে অনুরোধ করল, একটা পাকা তরমুজ এগিয়ে দিল ওদের খাবার জন্ত।

ইউবাই-এর পরিচয় পাবার পর কুসুমা কি শীকার হয়েছে দেখতে চাইল।

থলেটা উপুড় ক'রে ওরা মরা হাঁসগুলো মাটিতে স্তূপীকৃত করল। সবাই ভীড় ক'রে এগিয়ে এলো দেখবার জন্ত। কোঁটা কোঁটা রক্ত ঝরছে তখনও।

ডানা-ভাঙ্গা এই মরা পাখীগুলি,—কী সুন্দর, আর কী বীভৎস হয়ে উঠেছে! বিতৃষ্ণায় স্তানিন মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে স'রে গেল।

ওরা চলে আসবার সময় বেড়ার ধারে দেশলাই-এর আলোয় দেখতে পেলো, স্তানিন বুড়ো চাষীর মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।

"আরে, স্তানিন যে এত তুখোড় ফুর্ত্তিবাজ, তা' তো জানা ছিলো না।" রিয়াজানজেফ, মন্তব্য করল।

বিরক্ত হয়ে ইউবাই জবাব দিল, "ও ধরণের ফুর্ত্তি করতে আমি অভ্যস্ত নই।"

ইউবাইকে নামিয়ে দিয়ে যখন রিয়াজানজেফ, গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যেতে, ও মনে মনে বল্‌লো, "সবগুলোই এক রকম!"

লালিয়ার জন্ত ওর দুঃখ হোল।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—নির্ম্মলকুমার ঘোষ।

রেলগাড়ি

আমরা মনে করি, বিশ্বাসের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া কেবল মাত্র যুক্তির হাত ধরিয়া আমরা জ্ঞানের পথে চলিতে অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ এই বলিয়া গর্ব করেন যে, সমস্ত জীবনে তাঁহারা যত পারি কাজ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাসের কোন হাত নাই। ইঁহারা ইহা বুঝেন না যে, বিশ্বাস না থাকিলে যুক্তি এক দণ্ড টিকিয়া থাকিতে পারে না। যুক্তিকে বিশ্বাস করি বলিয়াই তাহার এত জোর, নহিলে সে কোথাকার কে? যুক্তিকে কেন বিশ্বাস করি, তাহার একটা যুক্তি কেহ দেখাইতে পারে? কেহই না। অতএব দেখা যাইতেছে যুক্তির উপর আমাদের একটা যুক্তিহীন বিশ্বাস, অন্ধ-বিশ্বাস আছে। আমরা দৃশ্যমান পদার্থকে বিশ্বাস করি কোন্ যুক্তি অনুসারে? স্পৃশ্যমান বস্তুর উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করি কোন্ যুক্তি অনুসারে? তথাপি আমাদের বিশ্বাস, যুক্তিই রাজা, বিশ্বাস কেহই নয়। ইহা হইতে একটা তুলনা আমার মনে পড়িতেছে। যুক্তি হচ্ছে ষ্টিম-এঞ্জিন, আর বিশ্বাস হচ্ছে রেলের রাস্তা। বিশ্বশুদ্ধ লোকের নজর এঞ্জিনের উপরে, সকলে বলিতেছে "বাহবা কি কল বাহির হইয়াছে! অত বড় গাড়িটাকে অবাধে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।" নীচে যে একটা রেল পাতা রহিয়াছে, ইহা কারও চোখেও পড়ে না, মনেও থাকে না। বিশ্বাসের রেলের উপর একটা বাধা স্থাপন কর, একটা গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া রাখ, অমনি গাড়ি থামিয়া যায়, দু'টি ক্ষুদ্র নুড়ি রাখিয়া দেও, অমনি গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে, ইহা কেহ মনে ভাবিয়া দেখে না কেন? যেখানে বিশ্বাসের রেল সেইখানেই যুক্তির গাড়ি চলে, যে রাস্তায় রেল পাতা নাই, সে রাস্তায় চলে না, ইহা কাহারো মনে হয় না কেন? তাহার কারণ আর কিছু নয়, ষ্টিম-এঞ্জিনটা বিষম শব্দ করে, তাহার একটা সারথি আছে, তাহার শরীর প্রকাণ্ড, তাহার মধ্যে কত কি কল উঠিতেছে, পড়িতেছে, আগাইতেছে, পিছাইতেছে, তাহার চোখ দিয়া আলো, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে, পদভরে মেদিনী কম্পমান। আর, রেল কত দিন হইতে পাতা রহিয়াছে, কে পাতিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই, অধিক শব্দ করে না, বরঞ্চ শব্দ নিবারণ করে, নিঃশব্দে রাস্তা দেখাইয়া দেয়, বহন করিয়া লইয়া যায়। সে পথ, সে বিঘ্ন-অপহারক, সে ধ্রুব, নিশ্চল, পুরাতন ভাববহ। সে কাহারো নজরে পড়ে না, আর, একটা ধূমন্ত, ফুঁসন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত পদার্থকে সকলে সর্ব্বে-সর্ব্বা বলিয়া দেখে।

রেলের গাড়ির তুলনা যদি উঠিল, তবে ও-বিষয়ে যত কথা উঠিতে পারে, উঠান যাক। সাহিত্যের রেলগাড়িতে ভাবগণ বা ভাবুকগণ আরোহী। যশের এঞ্জিনে কালের রাস্তায় চলিতেছে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে তত উচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, কেহ

ফার্ষ্ট ক্লাশে, কেহ সেকেণ্ড, কেহ থার্ড ক্লাশে। যে যত মূল্য দিয়াছে সে সেই পরিমাণে দূরে যাইতে পারিবে। কোন্ কালে বাল্মীকি ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট লইয়া গাড়িতে চড়িয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাহার ষ্টেশন ফুরায় নাই। আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যতদূর চলে তত দূর চালনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অলঙ্কার দিয়া এইরূপ বলিতে পারি যে, যেখানে কালের Terminus, যাহার ঊর্দ্ধে আর ষ্টেশন নাই, যে ষ্টেশনে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আসিয়া থামিবে, সেই ষ্টেশনে যাইবার টিকিট তিনি ক্রয় করিয়াছেন। গাড়ির গার্ড পাঠক সম্প্রদায়, সমালোচক। ইঁহারা যে নিজের কাজ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া করেন না, তাহা সকলেই জানেন। আরোহীদের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কত শত ভাব তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গোলেমালে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়ে, সকলেই তাহাকে খাতির করে, সেলাম করে, অভ্যর্থনা করে। এমন দু'-এক ষ্টেশন গিয়া কেহ কেহ ধরা পড়ে, গার্ড তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করে, তাহার যথোপযুক্ত গাড়িতে উঠাইয়া দেয়, কেহ কেহ এমন কত ষ্টেশন পার হইয়া যায়, কেহ খোঁজ লয় না। ইহাতে কেবল মাত্র অমনোযোগিতা, কিন্তু গার্ডেরা ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন। আলাপ থাকিলে, বন্ধুতা থাকিলে অনেক থার্ড ক্লাশকে ফার্ষ্ট ক্লাশে চড়াইয়া দেন। এমন ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নালিশ করি কাহার কাছে? যিনি দোষী, তিনিই বিচারক। কত শত মুখচোরা, ভীরুস্বভাব, সঙ্কোচ-পরায়ণ বেচারী ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কিনিয়া ভিড়ে, গোলেমালে, ঠেলাঠেলিতে শশব্যস্ত হইয়া থার্ড ক্লাশে উঠিয়া পড়েন, কত শত ষ্টেশন পার হইয়া সহসা গার্ডের নজরে পড়েন ও তাঁহারা উপযুক্ত শ্রেণীতে স্থান পান। এই সকল বে-বন্দোবস্ত কোন কালে যে দূর হইবে, এমন ভরসা হয় না। সকল বিষয়েই দেখ, জগতে মূল্য দিয়া তাহার উপযুক্ত সামগ্রী খুব কম লোকেই পাইয়াছে, হয় দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়াছে, নয় সে দোকানদারকে ঠকাইয়াছে। এ সকল কেবল অসাবধানতার ফল। যত দিন রেলগাড়ি থাকিবে, তত দিন শত শত ফার্ষ্ট ক্লাশের আরোহী থার্ড ক্লাশে চড়িবে, ইহা নিবারণের উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটা আমার দুঃখ আছে। রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ বিনা টিকিটে সেকেণ্ড ক্লাশে ভ্রমণ করিতে পারেন। তাঁহারা চিরদিন পরের টিকিট সমালোচনা করিয়াই কালযাপন করিয়াছেন, নিজে একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই। ইহা কি সত্য নয় যে, তিনি নিজে আপনাকে যত-বড় ব্যক্তিই মনে করুন না, যতক্ষণে না তিনি ট্যাঁকের পয়সায় টিকিট কিনিবেন, ততক্ষণে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী অপেক্ষাও অল্প সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচকবর্গ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-কেতাদিগের সমতুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন, ও অহঙ্কারে এতখানি ফাঁপিয়া উঠেন যে, পাঁচটা আরোহীর জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়বিরুদ্ধ। অনেকে বিনা টিকিটে অসঙ্কোচে গাড়িতে চড়িয়া বসেন, ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করে, অবশ্য ইহার কাছে টিকিট আছে, কেহ সন্দেহও করে না, জিজ্ঞাসাও করে না। গার্ড দেখিল, তাহার পাকা দাড়ি, পাকা চুল, অনেক দিন হইতে ফার্ষ্ট ক্লাশে চড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিও হইল না, সাহসও হইল না। কাহারো বা হীরার আংটী, ঘড়ির চেন, জরির তাজ দেখিল,—আর টিকিট দেখিল না। সাহিত্য রেলওয়ে কোম্পানিতে এইরূপ বহুবিধ অনিয়ম ঘটিতেছে, আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যত-বড় লোকই হউন না কেন, টিকিট নিতান্ত মনোযোগ সহকারে আলোচনা না করিয়া কাহাকেও ছাড়া উচিত নহে। কিন্তু অত পরিশ্রম করে কে? আবার, কড়াক্কড় করিলেও নিন্দা হয়।

যাঁহারা টিকিট কিনিয়া ট্রেণ মিস্ করেন, তাঁহাদের জন্য বড় মায়া করে। তাঁহারা ঠিক সময়ে আসেন নাই। সময় মাফিক আসিয়াছিল বলিয়া কত থার্ড ক্লাশের লোক গাড়িতে উঠিল, এমন কি, কত লোক টিকিট না কিনিয়াও গাড়িতে উঠিল, অসময়ে আসিয়াছেন বলিয়া কত ফার্ষ্ট ক্লাশের লোক পড়িয়া রহিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যৎ আছে, দ্বিতীয় ট্রেণ আসিলে তাঁহারা চড়িতে পাইবেন। কিন্তু ইঁহাদের অনেকে বিরক্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যান, ষ্টেশনে অপেক্ষা করেন না। এই কত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের টিকিট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, পকেটে পয়সা আনিয়া টিকিট ক্রয় করেন নাই, তাহাদের সংখ্যা গণনা কে করিবে? জেফ্রি যে ট্রেণে গার্ড ছিলেন, বাইরণ সে ট্রেণে আরোহী ছিলেন, সেই ট্রেণ ধরিবার জন্য ওয়ার্ডওয়ার্থ ও শেলী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছে, তাঁহারা ট্রেণ মিস্ করিলেন, দ্বিতীয় ট্রেণ আসিলে পর তাঁহারা স্থান পাইলেন। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্প্রতি যে ট্রেণে চলিতেছে, অনেক বড় বড় ব্যক্তি সে ট্রেণটা মিস্ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেন নিরাশ হইতেছেন? দশ মিনিট সবুর করুন আর একখানা ট্রেণ এল বলে।

বঙ্গীয় সাহিত্য ট্রেণে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাশে আরোহী নিতান্তই কম, অন্যান্য ক্লাশে অত্যন্ত ভিড়। এই নিমিত্ত গার্ডেরা বাছিয়া বাছিয়া দুই-এক জনকে ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিতে দেয়। তাহারা যদিও ফার্ষ্ট ক্লাশে বসিয়াছে, তথাপি গার্ড জানে যে, তাহারা থার্ড ক্লাশের আরোহী। তাহাদের বলে বাঙ্গলার মিল্টন, বাঙ্গলার বায়রণ, বাঙ্গলার ফসেট ইত্যাদি। অথচ মনে মনে সকলেই জানে যে, তাহারা মিল্টন, বাইরণ, ফসেটের সমতুল্য নহে, অনুগ্রহ করিয়া এক ক্লাশে বসিতে দিয়াছে মাত্র। কিন্তু এমন করিবার আবশ্যক কি? ইহাতে বুদ্ধিমান লোকের নিতান্ত সঙ্কোচ জন্মিবার কথা। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই ত ভাল হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য কোম্পানীতে খুচরা টুকরা মাল-বোঝাই গোনা কতক মালগাড়ি অর্থাৎ খবরের কাগজ, এক রকম বেশ চলিতেছে। কিন্তু ভাব আরোহীদিগের জন্য আরোহী শকট অর্থাৎ মাসিক পত্র ভাল চলিতেছে না। গাড়ি চলিবার জন্য এঞ্জিনে খনিজ কয়লার আবশ্যক। কোথায় পাইবে বল! সাহিত্য-এঞ্জিন কেন, দেশে সহস্র এঞ্জিন বেকার পড়িয়া আছে, ভারতবর্ষের রাণীগঞ্জে কয়লা যে নাই, এমন নহে, কিন্তু এত গভীর নিহিত যে, সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর এক উদ্যমের কয়লা আছে, তাহাও বাঙ্গলা দেশে এমন বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার কয়লায় এত অধিক ধোঁয়া হয় ও এত কম আগুন যে, দুই পা গিয়াই গাড়ি চলে না। আমারও কলমের কয়লা ফুরাইয়া গিয়াছে, এইখানেই চলা বন্ধ করিয়াছে, ষ্টেশন যদিও দূরে আছে, কথা যদিও বাকী আছে, কিন্তু আর লিখিতে পারিতেছি না, কয়লা নিবিয়া গিয়াছে।

—ভারতী, ১২৯৮

চার

বাড়ী পৌঁছাইয়া ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইয়া সব ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে। শিবনাথ বাড়ী-ঘর সব নতুন সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। আসবাব-পত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে এ-ঘরেরটা ও-ঘরে—ও-ঘরেরটা সে-ঘরে। কত কিছু অদল-বদলই না করিয়াছে সে! প্রতিটি ঘর যেন প্রভু-পত্নীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্ত প্রভুর নির্দেশে সাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া আছে। শিশুর প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভারই না আনিয়াছে সে কত। শুধু দ্রব্য-সম্ভারই নয়, প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে মেম নার্স পর্য্যন্ত। সমস্ত বাড়ীখানা যেন শিবনাথের ভালবাসার ফুল হইয়া ফুটিয়া আছে ইন্দ্রাণীর হস্ত-শোভিত হইবার আকাঙ্ক্ষায়। সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া শিবনাথের আনন্দের পরিমাপ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রাণী ভাবে, ঘটনা যখন সম্ভাব্য আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহিরে যাইয়া ঘটে তখনই মানুষ প্রকাশের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলে। শিবনাথও কি এরই মধ্যে তাহাদের সন্তান হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল? কিন্তু কেন?

দিন যায়।

পুত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি শিবনাথের। পিতা হইয়া মাতার মন লইয়া সামান্ত অসুস্থতায় চোখ-মুখ ছলছলাইয়া তোলে। আগ্রহান্বিত অপেক্ষায় দিন গোণে—কবে ছেলে হামা দিবে, বসিবে, হাঁটিবে, ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহার হাত ধরিয়া। দোলায় শায়িত পুত্রের দোলা ধরিয়া ঝুঁকিয়া হাতের তুড়ি ও শীষের শব্দে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণের খেলায় সময় পাইলেই সে মাতিয়া ওঠে।

দিন কাটে।

কিছু দিনের ভিতরই শিবনাথের চোখে পড়ে টুকিটাকি অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে ভারী হইয়া চলা ইন্দ্রাণীর চাল-চলন।—চোখের কোলে জমিয়া-ওঠা কালী। মনে হয় গালের রক্তাভবর্ণ যেন তার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিতেছে। চঞ্চল চরণের গতি মন্থর, কাজে আলস্য—এ সব কিছু মিলাইয়া এমন একটা আবেশময় আকর্ষণীয় নতুন রূপ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, যে রূপ অকারণেই কাছে বসিয়া কথা বলিবার ইচ্ছা জাগায়।—কারণ শুনিয়া শিবনাথ খুসী হইয়া ওঠে। সন্তানপরিবেষ্টিতা ইন্দ্রাণী—দৃশ্যটা কল্পনায় আনিতেও মনে তার হাসির আভাস খেলিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রাণীর বিশেষ যত্ন ও পরিচর্য্যার ব্যবস্থা যাইয়া ঠেকে 'বাড়াবাড়ি' পর্য্যায়ে।

সম্ভাবেশের ভিতর অ-বেশের নিঃশব্দ আগমনে আসিয়া নাক ঢুকাইতে খুব বেশী সময়ের দরকার হয় না, তাই বুঝি স্বল্প ব্যথা হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হইয়া ইন্দ্রাণীকে করিয়া ফেলে একেবারে শয্যাশায়ী। কিছু দিন ধরিয়াই প্রথম মাতৃত্বের স্বাভাবিক শঙ্কার ভাবনা তার মনে দারুণ একটা ভয়-ভয় ভাবের সৃষ্টি করিতেছিল। এখন সে ভয়ে ও যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বালিশে মুখ চাপিয়া কাঁদে। শিবনাথ ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠায় সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের কাছে। ডাক্তারের প্রশ্নের জবাব যন্ত্রণা-কাতর মুখ তুলিয়া কোন মতে সে হাঁ না করিয়া শেষ করে। ইন্দ্রাণীর সর্ব্বশক্তি ব্যয়িত হয় যন্ত্রণায় মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইবার চেষ্টায়। এক সময়ে শিবনাথের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া আতঙ্কিত মুহূর্ত্তের সাময়িক দুর্ব্বলতায় ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিয়া বসে: "এবার আমি নিশ্চয়ই বাঁচব না, প্রথম বারই না কি বিশেষ ভয় ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে ডাক্তার বাবু? আমার ভারি ভয় হয়েছে।" যন্ত্রণা-কাতর ঠোঁট ইন্দ্রাণী দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরে।

(বড় গল্প)

স্নেলেখা দাশগুপ্তা

পরীক্ষা-ব্যস্ত ডাক্তার যন্ত্র-আঁটা কানে কোন কথাই শুনিতে পান না। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিতে যাইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে শিবনাথ। এ কি কথা বলিল ইন্দ্রাণী!

কানের যন্ত্র সরাইয়া লইয়া ডাক্তার ইন্দ্রাণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি বলছিলেন?"

ইন্দ্রাণী ততক্ষণে কিন্তু কথাটা সামলাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার কানে আসিয়া স্পষ্ট আঘাত করিয়াছে থমকাইয়া যাওয়া জুতার শব্দ। সে বলে, "না, বলছিলাম যে, বড্ড ভয় হয়েছে এবার। ওবার ত' এ সব উপসর্গ কিছুই ছিল না।"

"ওঃ, হ্যাঁ, এবার ত' আপনার 'সেকেণ্ড টাইম'। আমার যেন কেমন শুধু মনে হচ্ছে—'ফার্ষ্ট টাইম' বলে।"

শিবনাথ আসিয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়াছিল, ইন্দ্রাণীর কথার পরই ডাক্তারের মুখেও এই একই কথা শুনিয়া তার পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন শির-শির করিয়া ওঠে।

ডাক্তার একটু থামিয়া বলে, "এত ভয় পাওয়ার কি আছে বলুন? কিছু মাত্র ভয়ের কারণ নেই। এখন যেমন ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, সময়ে দেখবেন বিনা ব্যথায় মা হয়ে গেছেন। কি বলেন?" ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। শিবনাথও হাসে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে এ হাসি পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো টানিয়া-আনা হাসি।

ডাক্তারকে বিদায় করিয়া ধীর পদক্ষেপে যাইয়া তার অফিস-ঘরে প্রবেশ করে শিবনাথ। এ কি আশ্চর্য্য অবিশ্বাস্য কথা সে আজ হঠাৎ শুনিয়া ফেলিল! প্রথম বারের ভয় ইন্দ্রাণীকে পাইয়া বসিবে কেন? এই কি তার প্রথম? সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? না, মতিভ্রম ঘটিয়াছে তার। শিবনাথ প্রতিটি পদক্ষেপ যেন গণিয়া গণিয়া ফেলিয়া ঘরের এ-মাথা ও-মাথা ঘুরিয়া বেড়ায়। নাঃ এ অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। ইন্দ্রাণী কেন জানাইল ডাক্তারের কাছে তার প্রথম মাতৃত্বের আশঙ্কার কথা! পেছনে হাত রাখিয়া সে ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়ায়। এ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে! এত অভিনয় চাতুরী কি একটি মেয়ের পক্ষে সম্ভব? আর সম্ভব হইলেই বা করিবে কেন? তার চাইতে সম্ভব অসুস্থ সময়ে ইন্দ্রাণীর ভুল বলা। যুক্তিজালের নিশ্চিন্ততার আড়ালে মন কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে চায় না। তার অস্থিরতা বাড়িয়াই চলে।···ডাক্তারেরই বা প্রথম মনে হইবার কারণ কি? এত বড় ডাক্তারের ভুল হইবার কথাও নয়। হয়ত সে সত্যই বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কথার পর আর ওদিকে নজরই সে দেয় নাই।

···শিবনাথ হঠাৎ বাহির হইয়া দোতলায় উঠিয়া গিয়া পুত্রের ঘরে প্রবেশ করে। দোলায় মূল্যবান পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়া শিশু ঘুমাইতেছে। নার্স ব্যস্ত পায়ে হাই হিলের ঠুক্-ঠাক্ শব্দ তুলিয়া এটা, ওটা, সেটা করিয়া যাইতেছে। মাতা অসুস্থ, পিতা সময়ে অসময়ে পুত্রকে দেখিয়া যাইতে আসে, এ বিষয়ে নার্স সজাগ।

সে সাহেবকে কয়দা-মাফিক সম্ভাষণ জানায়। শিবনাথ অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ শিশুটিকে দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসে। না ;—কিছুমাত্র তাহাদের পরিবারের ছাপ নাই। এত তীক্ষ্ণ খাড়া নাক ও পাতলা সরু ঠোঁট তাহাদের পরিবারের চোদ্দ পুরুষের ভিতরও বুঝি নাই।···এ সব মাংসপিণ্ডে আদল দেখতে পাওয়া মানে মনের বাতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ কি রহস্য-জালে জড়াইল সে।···গভীর রাত্রিতে ফিরিল সে মদে চুর হইয়া। বাকী রাতটুকু কাটাইল বাহিরের ঘরে।

ইন্দ্রাণী ভাবিল আর কত দিন!

যদিও ইন্দ্রাণী থামিয়া-পড়া জুতার শব্দ লক্ষ্য করিয়াছিল, তবু সে ভাবিতে পারে নাই, তাহার কথা শিবনাথ শুনিতে পাইয়াছে। তার ধারণা, সে পরবর্তী কথায় আগের কথাটাকে একেবারেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

পরের দিন দু'-একটা মামুলি কুশল প্রশ্নে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথা শেষ করিয়া শিবনাথ কাজের অজুহাতে চলিয়া আসে নীচের অফিস-ঘরে। তুলনা করিয়া চলে এ-বারের সঙ্গে ও-বারের ইন্দ্রাণীর শারীরিক অবস্থার তারতম্য। এবার ইন্দ্রাণী প্রথম হইতেই অসুস্থ। তার হাঁটা চলা বসা খাওয়া সব সাক্ষ্য দেয় তার মাতৃত্বের সূচনার। মুখ যত শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, শরীর হইয়া চলিয়াছে তত ভারী। একটু উপরে-নীচে ওঠা-নামা করিয়া যখন সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া জোরে টানিয়া নিশ্বাস নেয়, সেই টানিয়া-নেওয়া নিশ্বাসের ও শিশুর আহার্য্যের গুরু ভারে ভারাক্রান্ত ও বর্দ্ধিত স্তনের চাপে ব্লাউজের টিপ-হুকগুলা পটপট্ শব্দে খুলিয়া গিয়া সৃষ্টি করে যেন অতি মৃদু একটি মিষ্টি শব্দের মূর্চ্ছনা। মাতৃত্বের সম্ভাবনার আয়োজন-সম্ভারে সমৃদ্ধ রূপের বুঝি তুলনা নাই!···কিন্তু এ সবের একটি লক্ষণও কি সে গতবার দেখিয়াছিল? না! শিবনাথ চেয়ার ছাড়িয়া এক পাক ঘুরিয়া আসে। দৃষ্টিটা বাইরে ছড়াইয়া দিয়া ভাবে—মিথ্যা যতক্ষণ সত্যের আবরণে আসিয়া ঘটনা ঘটাইয়া দিয়া যাইতে থাকে, ততক্ষণ মানুষের মনে কোন সন্দেহই উঁকিটুকু পর্য্যন্ত মারে না। এবং এই নিঃসন্দেহের ছায়ায় গা বাঁচাইয়াই মিথ্যা তার কাজ গুছাইয়া সমাধা করিয়া যায়। কিন্তু সেই মিথ্যার আভাস সামান্য কোন ফাঁক দিয়াও যদি একবার আত্মপ্রকাশ করে, তখন তারই সূত্র ধরিয়া কত প্রমাণই না আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়! তখন মনে হয়, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে না পারাটা হইয়াছে নিজেরই নির্বুদ্ধিতা! শিবনাথেরও আজ নিজেকে নির্বোধ মনে হইতে থাকে। কিন্তু এ রহস্যের অর্থ কি? ইন্দ্রাণী, বিশেষ করিয়া তাহার মা—তিনি তো এ ভীষণ খেলায় মেয়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার মানুষ নন বলিয়া তার ধারণা। তবে? না ;—শিবনাথ ভাবিয়া কিছু কূল-কিনারা ঠিক করিতে পারিবে না। কোথায় পাইল ইন্দ্রাণী এ সন্তান? কিছু একটা কল্পনা করিতেও গা'টা যেন তার কুঞ্চিত হইয়া ওঠে। কোন ঘৃণ্য সন্তান নয় ত! নইলে কে নিজের সন্তান বিলাইয়া দেয়। ইন্দ্রাণী কি তার উপর প্রতিশোধ লইতেছে? শিবনাথের ইচ্ছা করে ছুটিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীর কাঁধ ধরিয়া, ঝাঁকি মারিয়া মারিয়া সব কথা—সব রহস্য টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আসে······ কিন্তু না, সে অসুস্থ, তাকে ব্যস্ত করা চলিবে না। অসুস্থতার উপর জুলুম করিয়া তার যে সন্তান সত্যি আজ আসিতেছে, শিবনাথ তার সে সন্তানের অনিষ্ট হইতে দিবে না। ইন্দ্রাণী সুস্থ হইয়া না ওঠা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতেই হইবে। মিথ্যা প্রমাণ হইলেই ত সকল সমস্যার সমাধান সোজা হইয়া যাইবে। কতক্ষণ সময়ের দরকার হইবে দূর করিয়া দিতে!···কথাটা মনে হইতেই ইন্দ্রাণীর প্রবঞ্চনাময় ব্যবহারের কথা ভাবিয়াই বুঝি বা তাহার বুকের ভিতর হইতে মোচড় মারিয়া কি একটা বস্তু যেন গলার কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতে চায়। না, সে পাগলই বুঝি হইয়া যাইবে···

এমনি ভাবে অসুস্থ স্ত্রীকে অস্থির করিয়া না তুলিবার প্রতিজ্ঞায় নিজে নিদারুণ অস্বস্তি ও অস্থিরতার ভিতর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কাটাইয়া সন্ধ্যায় আর সে ইন্দ্রাণীর সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না। কথাটা পাড়িয়া বসে।

ডাক্তারের ওষুধের গুণেই হোক, বা যে জন্যই হোক সন্ধ্যায় বেশ কিছুটা সুস্থ-বোধ করিতেছিল ইন্দ্রাণী। সে কৌচে বসিয়া একখানা ছবির বই-এর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল। শিবনাথ আসিয়া আর একটি কৌচে আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ এখন?"

ইন্দ্রাণী বই হইতে চোখ তুলিয়া জবাব করে, "অনেকটা ভাল আছি।"

শিবনাথ অল্প হাসিয়া বলে, "ভাল ডাক্তার দেখে ভরসা দিয়ে গেছে বলে, না সত্যি অষুধের গুণে?"

ইন্দ্রাণীও মৃদু হাসিয়া নীরবে ছবির পাতা উল্টাইয়া যায়। শিবনাথ সিগারেট টানিয়া চলে আর ভাবে, কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করা যায়। এগুলা তো আসল বক্তব্য আরম্ভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা মাত্র। দু'-এক টানের পরই সিগারেটটা সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তার পর দ্বিধা ঝাড়িয়া একটু ইন্দ্রাণীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারের কাছে বলা তোমার একটা কথা হঠাৎই আমি শুনে ফেলেছি। জানি, সে কথা আমার কানের জন্য নিশ্চয়ই বলা নয়। কিন্তু কানে যখন এসে গেল তখন আর কি করতে পারি বল? এখন এ কথার অর্থ জানতে চাইলে নিশ্চয়ই অপরাধ নেবে না। এ রকম ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা অসাধারণদের পক্ষেও অসম্ভব, কি বল ইন্দ্রাণী?"—উত্তেজনায় শিবনাথের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে থাকে। যাইতে চায়। জবাবের অপেক্ষা করিতে না হইলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা তার পক্ষে অসম্ভবই ছিল। কিন্তু কোন একটা ভীষণ উত্তেজনার চাপ যে তাহাকে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেও দিতেছে না, তা বোঝা যায় তার নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসার অস্থিরতায়।

ইন্দ্রাণী এই পরিস্থিতির জন্য এতটুকু মাত্রও প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমটায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় স্তব্ধ হইয়া যায়।

তার এই বিমূঢ় স্তব্ধতা দেখিয়া শিবনাথ অপলক দৃষ্টিতে খানিক ক্ষণ ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া স্থির কণ্ঠে বলে, "এ ছেলে তুমি কোথায় পেলে?"

পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইয়া লইতে ইন্দ্রাণীর একটু সময়ের দরকার হয়। দুর্ব্বল শরীর তার উত্তেজনার ধাক্কায় থর-থর করিয়া বুঝি কাঁপিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু বাহিরের স্থির ভাব সে প্রাণপণে বজায় রাখে এবং মুখে একটু হাল্‌কা হাসির ভাব টানিয়া বলে, "এ জানা কথার জবাব কি?"

"জানা কথা নয়। তা যত দিন ছিল জবাব চাইতে আসিনি ইন্দ্রাণী! এর ভেতর গভীর রহস্য ও ষড়যন্ত্র আছে। আমার উপর স্বেচ্ছাচারীর মত 'টর্চার' করা হচ্ছে—সে কি তুমি বুঝতে অক্ষম?" কৌচ ছাড়িয়া এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া বলে, "জানি না, কি করে তুমি তোমার এ অসম্ভব অন্যায় ও অসহ্য অত্যাচার বরদাস্ত করছি! —কিছু দিন আগেও নিজেকে দিয়ে নিজেই কি ভাবতে পেরেছি! এটা সম্ভব বলে? ভগবান তোমার হাতে আমায় হার মানিয়েছেন ইন্দ্রাণী!" অস্থির পায়ে আবার শিবনাথ কয়েক পাক ঘুরিয়া আসে।

ইন্দ্রাণী শেষ চেষ্টা করিবার মত নিরুপায় কণ্ঠে বলে, "অসুস্থ অবস্থায় ভুল কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়াটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যে, সে কথাটাই সত্যি—এমন অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব—একেবারে স্থির করে ফেল্লে! এত উত্তেজিত অবস্থায় এসে হৈ-হৈ করে জবাব চাওয়া চলে?"

শিবনাথের প্রশস্ত ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া ওঠে। ইন্দ্রাণীকে আর মানান সম্ভব হইবে না। সত্য অপ্রকাশিত থাকিয়া চিরকাল দ্বন্দ্বকে সংশয়ের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত করিবে। সত্য জানিবার উপায় নাই বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এই জঘন্যতম মিথ্যাকে? কিন্তু অসম্ভব!···শিবনাথ হাতের মুঠার শক্ত চাপে এমনি ভাবে মাথার চুলগুলা চাপিয়া ধরে যে, হাতের জোর চাপে চুলের গোড়া যেন ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া আসিবে। তাহার মনে হয়, নিতান্ত অবহেলা ভরে ইন্দ্রাণী চূড়ান্ত নৃশংস খেলা তাহাকে লইয়া খেলিতেছে। একবার মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কি যেন গভীর ভাবে চিন্তা করে, আবার আরম্ভ করে অস্থির পদে হাঁটাহাঁটি। একটা সিগারেট অর্দ্ধেক শেষ না হইতেই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আর একটায় করে অগ্নি-সংযোগ···।

ইন্দ্রাণী শিবনাথের অস্থিরতা স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিয়া চলে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে।

হঠাৎ শিবনাথ নার্সকে আহ্বান করিয়া শিশুকে লইয়া আসিবার আদেশ করিতেই, ইন্দ্রাণী অস্ফুট শব্দে কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। স্বেচ্ছাচারী স্বামী হঠাৎ কিছু করিয়া বসিবে না তো! তাহার আশঙ্কিত রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকাইয়া শিবনাথ একটু হাসিয়াই ফেলে। হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলে, "কিছু করব ভাবছ? ছিঃ, না নয়। তোমার মাই দিতে বলব।"

এ রকম একটা পরীক্ষার জন্য ইন্দ্রাণী প্রস্তুত ছিল না। তার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিতে চায়। যে মেয়ে আজ পর্য্যন্তও মা হয় নাই; সে কি করিয়া এ কাজ করিবে!

ইন্দ্রাণীর এই বিব্রত ভাবটা গভীর মনঃসংযোগে দেখিয়া শিবনাথ স্থির হইয়া বসে! অধৈর্য্য ও অধীরতাকে সীমায় বাঁধিয়া রাখিতেই যেন তার এই ক্ষণিকের স্তব্ধতা। তার পর স্থির-গম্ভীর স্বরে বলে, "পারবে না তো? তবু বলতে চাও এ তোমার সন্তান? ইন্দ্রাণী, জীবন ছেলেখেলা নয়। তুমিও সামান্য লোকের স্ত্রী নও। তোমার ছেলে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, তা তিন পুরুষ বসে খেয়ে যেতে পারার সম্পত্তি। খামখেয়ালি, ছেলেমানুষি তোমার সাজে না। আর সাজে না পথ হতে কুড়িয়ে-আনা ঘৃণ্য সন্তানকে এ সবের উত্তরাধিকারী করতে নিয়ে আসা। আভিজাত্যের জ্ঞান থাকা চাই তার। এ কথা মনে হলে আমার মাথা খারাপ হবার অবস্থা হয় ইন্দ্রাণী! কাকে তুমি বাড়ীর বড় ছেলে হবার গৌরব দিতে কুড়িয়ে নিয়ে এলে! ভগবান আমার অল্পে রক্ষা করেছেন।" তার পর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, "সত্য আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার কাছ থেকে এখন শুধু জানতে চাই—এ সবের উদ্দেশ্য কি? তুমি কাউকে প্রবঞ্চনা প্রতারণা করতে পার এ আমি ভাবতেই পারি না—আর সেই তুমিই নিয়ে ফেলেছ আমায় এত বড় মিথ্যা প্রবঞ্চনার ভেতর! কিন্তু কেন? আর চুপ করে থাকা তোমার শোভা পায় না, ইন্দ্রাণী!"···অধৈর্য্য শিবনাথ উঠিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীর নরম হাতটা নিজের অজ্ঞাতে এমনি ভাবে চাপিয়া ধরে যে, পাঁচ আঙ্গুলের রক্ত-চিহ্ন বসিয়া যায়। "এবার বল,—এখনও কি বলবে তোমার···?'

—"না, আমার নয়, কিন্তু তোমার।"

—"আমার? বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া শিবনাথ তাকাইয়া থাকে অবাক দৃষ্টিতে। তার পর বলে, "তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছ ইন্দ্রাণী? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? পরের ছেলে সহ্য হবে ইন্দ্রাণী,—সহ্য হবে না তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটলে—" কথাগুলার সুরে শানাইয়া তুলিতে চায় ঠাট্টা বা বিদ্রূপ, কিন্তু কোন রূপ-না-লওয়া কথাগুলায় কিছুটাও জোর ধরিতে চায় না। মুহূর্ত্ত আগের এত উত্তেজনা আস্ফালন সব যেন মিয়াইয়া চুপসাইয়া আসিয়াছে।

স্বামীর চাপিয়া-ধরা হাত ছাড়াইয়া লইতে ইন্দ্রাণীর চেষ্টা করিতে হয় নাই। তার জবাব শুনিয়া সে হাত আপনিই খসিয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রাণী নড়িয়া-চড়িয়া কৌচে সোজা হইয়া বসে। তার ধৈর্য্যের বাঁধও আর সে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। বলে, "রহস্য এতক্ষণ তুমিও করনি, আর এখন আমিও করছি না। এমন গুরু-গম্ভীর আয়োজন-আড়ম্বরের ভেতর কি আর রহস্য জমানো চলে? তবে এই প্রহসনের সমাপ্তি এত বড় মর্ম্মান্তিক কৌতুকেই করতে হবে যার পর তোমার অবস্থা দেখে লোকে হয় ত কৌতুক বোধ করতেও বা পারে। তবে তার ভেতর আমি নেই। আমি কৌতুক, বিদ্রূপ, রহস্য কিছুই করছি না—করছি না রাগ, অভিমান বা দুঃখ। আমি তোমার জানতে-চাওয়া সত্য শুধু বলে যাচ্ছি। তুমি শুনে যা খুশী তাই করতে পার। কোন জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন ছিল না, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মানিয়ে নিয়ে নিজেই এক দিন সব বলতাম। তোমার আমার দু'জনার পক্ষেই সেটা ভাল ছিল। কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। শোন—"ইন্দ্রাণী বলিয়া চলে: "বীণা—ওঃ, নাম তো তোমার জানবার কথা নয়। তবু ব্যাগ খুঁজে ঠিকানা বের করে মুমূর্ষ মেয়েটাকে উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যখন বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছিলে, তখন হয়ত নামটা জানতে ব্যাগটা সাহায্য করে থাকতেও পারে বা। তবে মনে করে রাখবারই বা এতে কি আছে—সেও তো সত্যিই! কি বলো?" ইন্দ্রাণী কথার শেষে এমনি ভাবে শিবনাথের প্রতি তাকাইল যেন মনের ভাবটা পড়িয়া লইতে চায়।

কিন্তু সে মুখ তখন মৃতের মুখ। এখন কেন—কোন ভাবের প্রকাশ এ মুখে যেন আর এ জীবনে হইবে না।

ইন্দ্রাণী একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া বলে, "মেয়েটি এক জেনে

তোমার গাড়ী চাপল, তুমি ভাবলে আর। কোন রকমেই সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হল না।···বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ও অর্থ সাহায্য করে তার উপকারও যে না করেছিলে তা নয়। শুধু অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে তোমার উপর অবিচার করব কেন? যাক, মেয়েটির তো যা হওয়ার হয়ে গেছে বলে সব গ্লানি ঝেড়ে ফেললো। কিন্তু ঘটনাকে 'যা হবার হয়ে গেছে' বলে অতীতে ঠেলে দিতে দিলে না তোমার ঐ সন্তান। মার দেহ আঁকড়ে সে ঘটনা শুদ্ধ বর্ত্তমান থেকে প্রস্তুত হতে লাগল ভবিষ্যতের জন্য।"—ক্লান্ত ইন্দ্রাণী আবার একটু থেমে দু'বার নিশ্বাস নিয়ে বলে: "অদৃষ্টের পরিহাসে অসহায় মেয়েটা আশ্রয়ের আশায় এবার যার হাত ধরল, সে তার আশ্রয় কেড়ে-নেওয়া লোকটিরই স্ত্রী। স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের গুরুভার স্ত্রীকে টেনে চলতে হলো তাই অবাঞ্ছিত এ অভিনয়ের ভেতর দিয়েই।

বাক্‌শক্তিরহিত মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ দৃষ্টি দেখিয়া যেমন বুঝিতে কষ্ট হয় না সে কি জানিতে চাহিতেছে, শিবনাথের মৃতের মত মুখের ঘোলাটে দৃষ্টি দেখিয়াও ইন্দ্রাণী তেমনি যেন বুঝিতে পারে—দৃষ্টি তার কি প্রশ্ন তুলিতেছে! সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত করিয়া একের পর এক বলিতে থাকে: "বীণা কে? বীণা আমার ছোট বয়সের বন্ধু। তোমার কবলে পড়বার মুহূর্ত্ত আগেও ছিল সে আমারই কাছে। সে ব্যক্তি যে তুমি কেমন করে তা বুঝলাম?" এবার ইন্দ্রাণী হাসিল ম্লান করুণ হাসি। বৈকালিক প্রসাধন-বঞ্চিত রুক্ষ চুলের গুচ্ছ হাত দিয়া জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলে: "বহু দিনের সহবাসে মানুষকে কিছুটা চিনতে পারা এমন কি আর অস্বাভাবিক? আর তোমার গতি-বিধি সম্পূর্ণ না হলেও একেবারে অজ্ঞাত যে নয়, সে তো বুঝতেই পার। তবে সে যে এতটা, এ আমার কল্পনায়ও ছিল না, এ সত্যি।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে: "বীণা: অবিশ্যি সামান্যতম পরিচয় বুঝতে পাবার একটি সূত্রও আমার হাতে তুলে দিতে পারেনি। সে চেষ্টাও হয়ত সে করেনি, ভেবেছে হয়ত কি হবে লোকটার খোঁজে আর খোঁজ পেলেই বা আমি তার কি জানব, কি করব! কিন্তু নিয়তির খেলা,—শেষে নিতান্তই অবহেলা ভরে চিঠির উল্টো কোণায় গাড়ীর নম্বরটা লিখে দিয়েছিল সে। হয়ত সে দিনের সব ভীষণ ভাবে মনের উপর দাগ-কাটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নম্বরটাও এসে গিয়েছিল—আমার জানবার সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ ছোট ক'টি সংখ্যা একত্র হয়ে যে আমার কাছে কতখানি মর্ম্মান্তিক সত্য বলে যাবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। পারলে হয়ত আমার কথা ভেবেই—আমার কাছে এ সত্য সে গোপন করে যেত।··· তার পর বুঝতে আর কষ্ট হওয়ার তো কথা নয়, তোমার গালের ব্যাণ্ডেজটাও আমার স্মরণে ছিল।"

শিবনাথ অস্ফুট শব্দে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া যেন কাতরাইয়া ওঠে।

কিন্তু ইন্দ্রাণীর মায়া হয় না। শুনিতে চাহিয়া এখন মুখ ঢাকিলে চলিবে কেন? সে ত সম্মান ও সহানুভূতির চরম দেখাইয়া তাহাকে দূরেই রাখিয়াছিল। যাহার নিজের উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন নয়, যে নিজে শেখে নাই সহৃদয় ব্যবহার, জানে না অপরের ঘটনাকে সংবেদনশীল মন লইয়া বিচার করিতে—যাহাদের উদারতার পরিধি শুধু নিজেদের ঘটনা লইয়া—তাহাদের উদারতা দেখান মানে ভস্মে ঘি ঢালা! সে নিজের ঝোঁকে বলিয়া চলে: "সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য এক উপায়ে নয় অন্য উপায়ে করতেমই। কিন্তু মনে সন্দেহ রইল না যে, এ তোমারই সন্তান—তখনই বিনা দ্বিধায় স্থির করে ফেললাম, তোমার সন্তানকে তোমার ঘরেই আনব। তোমার কাছে এলেই তার সব পরিচয়। কিন্তু পরিচয়হীন সন্তান নিয়ে একটি মেয়ের জীবন তো অসম্ভব। স্থির করে ফেললাম শিশুটাকে দেব না দশ জনের ঘেন্নার ও অবহেলার সামনে ঠেলে। জড়িয়ে যেতে লাগলাম একের টানে আর এক অভিনয়ে।" সামান্য বিশ্রামে শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলে: "অভিনয় আবার দু'দিকেই, বীণাকেও জানতে দেইনি। সে জানে এ সন্তান আমারই। তার শিশু জন্মেই মরেছে। কারণ, তাকেও যে ফিরে যেতে দিতে হবে তার অনূঢ়া জীবনে একেবারে গা ঝেড়ে।" তার পর গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করে: 'কার শিশু নিয়ে এলে,—কাকে করলে আমার উত্তরাধিকারী'—এ মনে হলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় মানি; কিন্তু এ সঙ্গে এটাও জিজ্ঞাসা করব, কেন মাথা খারাপ হয়ে উঠবে না এ কথা ভেবে যে, আমার অপরাধের ফল কোথায় আশ্রয় পেল—হয়ত আমার সন্তান এক দিন আমারই দরজায় এসে দাঁড়াতে পারে অপরিচিত ভিক্ষুকের মত আমারই পাপের ফলে? পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান ভেবে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করবার আগে কেন মনে হ'বে না পিতৃ-পরিচয়হীন তোমার সন্তানকেও এমনি ঘৃণায় মানুষ লাঞ্ছিত করবে? আশ্রয় দিতেই স্থানের অভাব—স্নেহের অভাব—আশ্রয়হীন করাটাকে বুঝি কোন সমস্যাই মনে হয় না? কি বল?"

প্রশ্নে শিবনাথ চোখ তুলিয়া একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাইয়াই চোখ নামাইয়া লয়। সহ্য করা যেন কঠিন সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা। তাহার মনে হয়, ইন্দ্রাণীর অসুস্থ শরীর উত্তেজনার ধাক্কায় আর খানিক বাদেই যেন লুটাইয়া পড়িবে। ইচ্ছা করে, বুকে তুলিয়া আঁর যত্নে বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। স্নায়বিক উত্তেজনায় অনেক নারীকেই সে কাছে টানিয়াছে, কিন্তু উত্তেজনাহীন শুধু হৃদয়ের শুদ্ধ আবেগে বুকে টানিয়া নেওয়ার একান্ত আগ্রহান্বিত অনুভূতির সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু ইন্দ্রাণীর কাছে অগ্রসর হইতেও তাহার ভয় করে। সে উপলব্ধি করে—এর বিদ্যার চাইতে বেশী শিক্ষা ও বুদ্ধি, বুদ্ধির চাইতে বেশী সংস্কারহীন ধর্ম্মভাব; রূপের চাইতে বেশী ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব—এ মেয়ের জাত আলাদা।

সে কোণের কৌচটায় দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া যেমন স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। এ সব কথার কোন জবাবই যে তাহার নাই তাহা তাহার নির্জ্জীব স্তব্ধতাই বলিয়া দেয়।

নিজের সমস্ত নালিশ উজাড় করিয়া দিয়া ইন্দ্রাণীর উত্তেজনাও তখন পড়িয়া আসিয়াছে। শিবনাথের ঝুঁকিয়া-পড়া মাথার বিস্রস্ত চুলগুলির দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত পলকহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শিথিল পদক্ষেপে ইন্দ্রাণী গিয়া দাঁড়াইল খোলা জানালাটার সামনে, বলিল: "জানতে চেয়েছিলে, এত দিনকার গোপন কথা সব কথাই খুলে বললাম। শুধু বলা হয়নি—ক'দিন ধরে যে নতুন কথাটা থেকে থেকে আমার মনে এসে উঁকি দিচ্ছে সে-কথাটা।"

শেষের এই কথা কয়টিতে ইন্দ্রাণীর ক্লান্ত কণ্ঠ বড় বেশী শান্ত

সামসেদ বাঈ হত্যাকাণ্ড

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

[লাহোরের পঞ্চদশ-বর্ষীয়া নর্তকী সামসেদ বাঈ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বহুবিধ বিচিত্র উপাদান থাকলেও, হত্যাকাণ্ডের ছ'মাস পরে বিচারকার্য শুরু না হওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্রসেবী ও জনসাধারণের মধ্যে সে রহস্য অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল। কেমন ক'রে এই হত্যালীলাকে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়েছিল, সেও এক কাহিনী-বিশেষ। জলের মত প্রভূত অর্থব্যয় করে, এক ধনী জমিদারকে আইনের কবল ও হত্যাপরাধের পরিণাম থেকে বাঁচাবার জন্যে সব দিক থেকে তথ্য নষ্ট করার বহু চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে অর্থব্যয় শেষ পর্যন্ত বৃথা প্রতিপন্ন হয়।

হত্যা কুখ্যাতি লাভ করে নানা কারণে—উদ্দেশ্যের বিশেষত্বে, অসামান্য উপায় অবলম্বনে, ষড়যন্ত্রের জটিলতা ও বৈশিষ্ট্যে, অথবা হত্যা করার পদ্ধতিতে। কতকগুলি নরহত্যা সাধারণের মধ্যে গুরুত্ব অর্জন করে নিহিত ব্যক্তির পদমর্যাদার জন্য, অথবা হত্যাকারীর সম্মান বা উচ্চ পরিচিতির জন্য।

এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জটিলতা যদিও কিছুই ছিল না, তবু একে রহস্যজনক ক'রে তোলার জন্য বহু আইন-উপদেষ্টার কুশলী পরামর্শ ছিল এর পেছনে। সামসেদ বাঈকে যে দার কালানের নবাব মহম্মদ নওয়াজ খান হত্যা করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সম্পূর্ণ বিদ্বেষবশেই হোক বা সাময়িক উত্তেজনাতেই হোক, এটা নিছক হত্যাকাণ্ড; যদিও বিচারের সময় নবাব জোর ক'রে বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে, সামসেদ বাঈকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তাঁর মোটেই ছিল না বরং তাকে বিবাহ করার সঙ্কল্প তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। মহম্মদ নওয়াজ খান উক্ত সামসেদ বাঈকে হত্যা করুন বা না করুন, এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল, তিনি সেই মৃতদেহের পাশে প্রায় দশ বারো ঘণ্টা শুয়েছিলেন, এবং এই মামলায় আরো অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে—পুলিশ, বিচারপতি, আইন-উপদেষ্টা বা এ্যাসেসার, এঁদের কেউই এ-সম্পর্কে তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করেননি যে, একখানি সরু খাটে রক্তাক্ত মৃত ব্যক্তির দেহের পাশে শুয়ে থাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁর কি ছিল এবং তিনি শুয়ে কি করছিলেন।

এই মামলায় যখন মহম্মদ নওয়াজ খান দোষী সাব্যস্ত হন, তখন সংবাদপত্র সমূহ যারা এত দিন নীরব ছিল, তারা তখন প্রদেশের অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর মর্যাদার উল্লেখ ও নানা ভাবে তাঁর চরিত্রের গুণাগুণ প্রচার শুরু করে। এই মামলার রায় নিয়ে বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোকের মধ্যেও মতান্তর ঘটে। চতুর্দিকে রায়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু মামলার শেষ পরিণতির পূর্বেই মহম্মদ নওয়াজ খান মস্তিষ্ক-প্রদাহ পীড়ায় মারা যান এবং তার ফলে বহু লোককে নিরাশ হতে হয়। তাঁর দুর্ভাগ্যের সুবিধা নিয়ে যারা প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন, মহম্মদ নওয়াজের মৃত্যুতে তাঁদের অসুবিধায় পড়তে হয়।

এই মামলার গোড়া থেকেই মহম্মদ নওয়াজ দু'হাতে অর্থব্যয় করেছিলেন। এও শোনা যায় যে, আপীল কোর্টে তাঁর পক্ষে অনুকূল রায় লাভ করবার জন্যেও তিনি না কি প্রচুর অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ সব তথ্য সত্য হোক আর নাই হোক, কোন রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পূর্বেই লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে, সাধারণত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বহু প্রকার ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করে তিনি দেহত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমুক্ত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষে তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয় যে, অর্থ সকলকে কিনতে পারে না, ঈশ্বরের হাত সবার উপরে।]

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ঝাঙ্গে নবাব মহম্মদ নওয়াজ খানের জন্ম হয়। তাঁর পিতা নবাব মেহর হক নওয়াজ খান মারা যান নওয়াজ খানের জন্মগ্রহণের কয়েক বৎসর পরে; মহম্মদ নওয়াজ তখন শিশুমাত্র। মৃত্যুকালে তাঁর পিতা দুই বিধবা পত্নী রেখে যান।

শিশুকাল থেকে তাঁর মা এবং সৎমা দু'জনেই তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন তিনি এবং স্কুলেও বাল্যকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বাল্যকালের কিছু দিন অতিবাহিত হয়েছিল এক বিখ্যাত ইউরোপীয় শিক্ষকের অধীনে। উক্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোকের শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি ত' ছিলই,

---

শুনাইল। এই পরিবর্তনটুকুতে শিবনাথ যেন তার অজ্ঞাতেই আবার একবার মাথা তুলিয়া তাকাইল ইন্দ্রাণীর দিকে। ইন্দ্রাণী জানালার দিকে মুখ করিয়া পিছন ফিরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল, আরও কিছুক্ষণ তেমনি রহিল। তার পর ক্লান্ত দেহটাকে দেওয়ালের আশ্রয়ে এলাইয়া দিয়া বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া অনেকটা যেন আপন মনে বলিতে থাকে: "যেদিন এ দুঃসাহসের বোঝা মাথায় নিয়েছিলাম সে দিন আমি ছিলাম শুধু মাত্র ইন্দ্রাণী—বীণার বন্ধু, [illegible]।" ইন্দ্রাণীর মন্থর কণ্ঠ মুহূর্তের জন্য থামে, তার পর আবার বলিতে শুরু করে: "আজ আমি মা হতে চলেছি। কিছু দিন পরেই আমি আর শুধু ইন্দ্রাণী থাকব না, আমি হ'ব আমারই রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া এমনি একটি শিশুর মা।" ইন্দ্রাণীর বিবর্ণ ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে একটু ম্লান বক্র হাসি যেন নিজেকেই ব্যঙ্গ করিতে: "কে জানে, যে শিশুকে তাড়াতে একটু আগে তুমি উঠে-পড়ে লেগেছিলে, মা হয়ে সে প্রবৃত্তি এক দিন আমার মধ্যেই জেগে উঠবে কি না—।"

ইন্দ্রাণীর কমনীয় মূর্তিও [illegible] শিবনাথের চক্ষে [illegible] একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দেয় যে, নারীর এই [illegible] সে নিজের জীবন সার্থক বোধ করে। সে নিজের সমস্ত অহঙ্কার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাতৃত্বমণ্ডিত শক্তির কাছে [illegible] দিল—তার পর চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া যায় ইন্দ্রাণীর কাছে, সসম্মে একখানা হাত তার কাঁধে রাখিয়া বলে: "সে তুমি পারবে না ইন্দ্রাণী—আমি জানি। কোন অন্যায় তোমাকে দিয়ে যেন কোন দিনও সম্ভব না হয়—উঠতে হলে, তোমার দিকে চোখ রেখেই যে আমাকে এগুতে হবে ইন্দ্রাণী!"

সমাপ্ত

তাছাড়া ছেলেদের সত্যিকার আদর্শ মানুষ ক'রে গড়ে তোলার দিকে তিনি যথেষ্ট নজর দিতেন ব'লে বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানদের শিক্ষা-পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ত তাঁর উপর। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ নওয়াজ এটকিসন কলেজে ভর্তি হন। এই সুপরিচিত বিদ্যায়তনেরও আদর্শ ছিল উগ্র স্বভাব, অসৎ চরিত্র রাজা-রাজড়ার ছেলেদের ভদ্র সুধীর করার চেষ্টা। এই বিদ্যায়তন মহম্মদ নওয়াজকে বিলক্ষণ ভদ্রলোক করবার চেষ্টায় সফলই হয়েছিল, কারণ তাঁর অন্যান্য যে কয়েকটি সদ্‌গুণ ছিল, তার মধ্যে ভদ্রতা ও ভব্যতাই ছিল সব চেয়ে বড়—মহম্মদ নওয়াজ সকল সময়েই অসামান্য ভদ্রলোক বলে পরিচিত ছিলেন। তবে লেখাপড়ায় মোটেই ভালো ছিলেন না তিনি এবং মাত্র সেইটাই ছিল তাঁর সুনামের একমাত্র অন্তরায়। শিক্ষক ও সহপাঠী মহলে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, কারণ সব সময়েই, এমন কি তাঁর সংক্ষিপ্ত উদ্দাম জীবনের শেষ পর্যন্ত, তিনি ছিলেন হাসিতে-খুশিতে-ভরা সকলের সজ্জন বন্ধু।

পিতা নবাব মেহের হক্ নওয়াজের মৃত্যুর পর, মহম্মদ নওয়াজ পাঞ্জাবের একটি প্রধান জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। তাঁর এই বিশাল জমিদারীর আয় অনেক ছোট-খাটো রাজ্যের চেয়েও বেশি ছিল। এবং সেইটাই ছিল উক্ত প্রদেশের একমাত্র ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত পুরুষানুক্রমিক জমিদারী। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর বিবাহের কথা উঠতে থাকে এবং বহু কন্যার উচ্চাভিলাষিণী মায়েদের মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক দিকে তিনি যেমন ছিলেন সুপুরুষ, অন্য দিকে তেমনি বিত্তশালী। জামাই করার পক্ষে এর চেয়ে বেশি যোগ্যতা আর কি থাকতে পারে মেয়েদের মা-বাপের কাছে? সুতরাং নওয়াজ যৌবনসুলভ ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হবার পূর্বেই খ্যাতনামা মহিলাদের এক জন তাঁর এক কন্যার জন্য তাঁকে জামাতা পদে বরণ করে নেবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন। এক দিন অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাঁকজমকের মধ্যে পাঞ্জাবের শিক্ষা-মন্ত্রী ফজল-ই-হোসেনের কন্যার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন মহম্মদ নওয়াজ। সে বিবাহের জলুস আজও স্থানীয় জনসাধারণ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মনে জাগ্রত হয়ে আছে।

জীবনে সাফল্য অর্জন করতে এক জন পুরুষের পক্ষে যা কাম্য, যুবক নবাবের তা সবই ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে অর্থের প্রয়োজন, তার চেয়েও ঢের বেশি ছিল তাঁর ঐশ্বর্য। তাঁর স্ত্রীও হয়েছিলেন অশেষ গুণসম্পন্না। সেই সময়কার সব চেয়ে প্রতিপত্তিশালী ও খ্যাতিসম্পন্ন লোকের সঙ্গেই তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর নিজের রূপ-যৌবন, অর্থ-সামর্থ্য প্রভৃতি সকল দিকের কথা বিবেচনা করলে, তাঁর পক্ষে কোন দিন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী অথবা জেলা মুসলীম লীগের সভাপতি হওয়াও কিছু বিচিত্র ছিল না, এবং অনেকে তাঁর সম্বন্ধে সে ধারণাও পোষণ যে না করতেন তা নয়।

কিন্তু কালের গতিতে, অসৎ দুশ্চরিত্র বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গে পড়ে, মহম্মদ নওয়াজ এক দিন দু'দিন করে ক্রমান্বয়ে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের পথে ভেসে যেতে লাগলেন। যতই দিন যেতে লাগলো—পরদার-গমন, অপরিমিত সুরাপান, জুয়ার নেশা প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী আত্মঘাতী উন্মাদনায় তিনি ততোধিক আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। জীবনে এই সকল নিম্নস্তরের ভোগলালসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজই রইল না। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিবাহিত জীবনও সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ল। দুর্নীতি[illegible] দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে পড়ে গেলেন মহম্মদ নওয়াজ। এমন কি [illegible] সময় একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেও, তার পরাঙ্মুখ পিতাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারেনি। ধূলোর মত টাকা খরচ করে চলেছেন তখন তিনি—ছিনিমিনি খেলছেন টাকা নিয়ে। মাসে বিশ হাজার টাকাতেও মহম্মদ নওয়াজের কুলতো না তখন। এই সব ব্যাপা[illegible] জলের মত টাকা খরচ করতে তাঁর একটুও বাধতো না। [illegible] সময় তাঁদের প্রাচীন প্রাসাদে যে পানোৎসব ও প্রমোদ-বিলাস[illegible] অনুষ্ঠান হ'ত, তার খরচ চালাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে মোটা [illegible] ভূসম্পত্তি বিক্রয় বা বন্ধক দিতে হ'তে লাগলো তাঁকে। জাঙ্গ [illegible] কাছে একঘেয়ে বোধ হলেই প্রাচীন মোগল সম্রাটদের মত ট্রেন-বোঝাই পরিচারক-পরিচারিকা, গায়ক-গায়িকা বাদক ইত্যাদি সহ তিনি বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে পড়তেন, [illegible] বেড়াতেন। অজস্র অর্থ থাকত তাঁর সঙ্গে, আর থাকত নর্তকী, গায়িকা ও অন্যান্য স্ত্রীলোক—যারা তাঁকে খুশি করত। তাদের জন্য দু'হাতে অপরিমেয় টাকা খরচ করতেন তিনি। এই সময় যারাই টাকার জন্যে তাঁর কাছে হাত পাতত, তাদেরই তিনি স্বেচ্ছায় [illegible] বলে দিতেন যে, 'নাও না, এ তো আমার কাছে থাকবে না, তোমা[illegible] কাজে লাগে নিয়ে যাও।' এই মনোবৃত্তিকে যেমন তাঁর [illegible] উল্লেখযোগ্য গুণ বলা চলত, অপর দিকে তেমনি আবার [illegible] বদান্যতাকে দোষ বললেও সে যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত ছিল। [illegible] চেয়ে সহজ ছিল, মেয়েছেলের কথা বলে তাঁর কাছ থেকে [illegible] নেওয়া। ক্রমশঃ মদ, মেয়েমানুষ আর টাকা এই তিনটি [illegible] তাঁর জীবনে এমনই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যে, এ ছাড়া তিনি [illegible] কিছু ভাবতেই পারতেন না।

যে বিষাদ-মলিন পরিণতির ফলে তাঁর জীবনের উজ্জ্বল [illegible] সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই দুর্ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত মহম্মদের [illegible] ছিল অদ্ভুত। তিনি কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলে প্রবেশ [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই 'বন্ধু'দের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত তাঁকে [illegible] নিয়ে। হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় ঢুকেই আগে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব কেউ আছে কি না খোঁজ [illegible] এবং কখনো বা নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখতেন। কারুকে পে[illegible] তাঁর আর আনন্দের অবধি থাকত না, তৎক্ষণাৎ তাকে [illegible] আসতেন নিজের সঙ্গে পানোৎসবে যোগ দেবার জন্য। [illegible] তাকে নানাবিধ সুরা, খাদ্য খাইয়ে ট্যাক্সির ভাড়া হাতে [illegible] গাড়িতে তুলে দিতেন। অনেক বাজে লোকের সঙ্গে [illegible] আলাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তারা বিনামূল্যে মদ্যপানের [illegible] হোটেল রেস্তোরাঁয় তাঁর জন্য অপেক্ষা করত—দেখা [illegible] খোশামুদির কথায় তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করত। কোন-কোন [illegible] তাদের নিয়ে হয়ত রাত্রিবাসও হয়ে যেত সেই সব হোটেলে; [illegible] মেয়েছেলে সংগ্রহ করে নিয়ে আসত, সারা রাত ধরে চলত [illegible] হৈ-হল্লা! দফায় দফায় চলত সুরাপান,—কারুকে এক [illegible] খরচ করতে দিতেন না তিনি—হাসতে হাসতে বলতেন, তুমি [illegible] মাতাল আর হাঘরেদের সব খরচ দেবে নবাব নওয়াজ খান। [illegible] কি হোটেলে তাঁর উপস্থিতির পূর্বে যা যে খেয়েছিল, তার[illegible] বহন করতেন নিজে। এ-সবে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন, এবং

বেশ মজা পেতেন। খোশামুদি তিনি বুঝতেন, মোসাহেবদের বাক্-চাতুরীও তাঁর পক্ষে বোঝার কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু অভ্যাস এমনিই দিলদরিয়া খরচের মেজাজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর, যা থেকে তিনি আর ফিরতে পারতেন না—এই সবের মধ্যেই ডুবে থাকতেন সারা দিন-রাত।

ক্রমশঃ এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁর স্ত্রীর পক্ষে তাঁর সঙ্গে সাংসারিক সম্পর্ক বজায় রাখা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আইনতঃ ছিন্ন হয়। এবং এর কিছু দিন পরে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীও দেহত্যাগ করেন। সহজ মৃত্যুই তাঁকে অব্যাহতি দেয় এই যথেচ্ছাচারী স্বামী নামধারী পুরুষের হাত থেকে।

এই সময় ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ভারতেও তার উত্তাপ অনুভূত হয়। প্রথম পত্নীর বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় পত্নীবিয়োগ তাঁকে বেশ খানিকটা অভিভূত করে ফেলে। তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন-যাপনের জন্য সৈন্য-বিভাগে যোগ দিয়ে রাজ-সনদ লাভ করেন। সৈন্য-সংগ্রহ বিভাগে তাঁর কাজ হয়েছিল। এই কাজের মধ্যে তিনি জীবনে এক নতুন প্রেরণার আস্বাদ পান। নতুন পরিবেশের মধ্যে, উত্তেজনার মধ্যে, নিজেকে ডুবিয়ে রেখে তিনি হয়ত আশা করেছিলেন, এই নব পরিবর্তন তাঁকে সুরা ও কামিনী, পতন ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিছু দিন ধরে এই সকল দুষ্কর্মের বিভীষিকা তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস গ্যালন-গ্যালন হলাহল শরীরে প্রবেশ করিয়ে ক'জন লোক দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবার আশা করতে পারে? কেউ এমন নীলকণ্ঠ মহাপুরুষ থাকলেও হয়ত থাকতে পারেন, কিন্তু বিরামহীন কারণ-পানের এই প্রতিক্রিয়া মহম্মদ নওয়াজের শরীরকে ইতোমধ্যেই ভেঙে এনেছিল। ক্রমশঃ স্পষ্টই তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর শারীরিক ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে আসছে—মোটা, মাংসল, থলথলে হয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর, এবং বয়স অপেক্ষা বেশিই বৃদ্ধ দেখাচ্ছে তাঁকে। ক্রমশঃ কিছু দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা এমনই দাঁড়ায় যে, ডাক্তার, হাকিম এবং যৌনবিশেষজ্ঞদের হাতে তাঁর প্রাণশক্তি জিইয়ে রাখার ভার তুলে দিতে হয় তাঁকে।

এর পর আমাদের ঘটনার পট-পরিবর্তিত হয় লাহোরে। ১৯৬১ সালের ২৩শে অক্টোবর মহম্মদ নওয়াজ লাহোরে যান চিকিৎসার জন্য এবং ফেলেটির হোটেলে গিয়ে ওঠেন। ঘটনাচক্রে সেই সময় সামসেদ বাঈ নামে পঞ্চদশ-বর্ষীয়া এক বালিকা নর্তকীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অল্প বয়সেই নৃত্যকলায় বিশেষ গুণসম্পন্না এই সুন্দরী বালিকা-নর্তকীর আকর্ষণে মহম্মদ নওয়াজ এমনই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাকে সম্পূর্ণ একটি রাত্রি তাঁর কাছে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ৬ই নভেম্বর সামসেদ বাঈ তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করেন। সেই রাত্রের সুখানুভূতিতে অভিভূত নবাব মহম্মদ নওয়াজ তাকে মুক্তহস্তে সহস্র টাকা উপঢৌকন দেন এবং সেই সময়ই সামসেদ বাঈকে তাঁর সঙ্গে মুলতান জেলায় তাঁদের গ্রাম্য জমিদারী খানা বাহাদুর-গড়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

সাধারণতঃ পয়সার প্রতি মমতা বা লোভ পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বহুলাংশে বেশি। বিশেষ করে যেন-তেন-প্রকারেণ পয়সা রোজগারই যে সব মেয়েদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের পক্ষে এই রকম এক জন দিলদরিয়া মেজাজের পুরুষকে হাতের মধ্যে পাওয়া ত' সৌভাগ্যেরই বলতে হয়। বিবিজান সামসেদ বাঈয়ের বয়স অল্প হলেও সৌভাগ্যলক্ষ্মীর এই আমন্ত্রণকে তিনি পায়ে ঠেলতে পারেননি—মহম্মদ নওয়াজের আহ্বান তিনি গ্রহণ করেন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে।

দুই স্ত্রীকে হারাবার পর এমন একটি মনোমত অল্পবয়সী চটুল-চপল সুকুমারীকে হাতের মধ্যে পেয়ে মহম্মদ নওয়াজ আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। পরের দিনই সদলবলে তাঁরা খানা বাহাদুরগড়ে যাত্রা করবেন স্থির করলেন। সামসেদ বাঈয়ের একটি ছোট ভাই ছিল, সেও এই যাত্রায় দিদির সঙ্গে যাবে বলে স্থির হ'ল। যথা সময়ে পরের দিন সন্ধ্যার ট্রেনে মহম্মদ নওয়াজ সামসেদ বাঈ, তার ছোট ভাই তালিব হোসেন ও দু'জন ভৃত্য সমেত খানা বাহাদুর-গড় যাত্রা করলেন। দু'জন চাকর ছাড়া আর সকলেই ছিল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। ৮ই নভেম্বর ভোর চারটার সময় ট্রেন যখন খানা খানেওয়াল এসে পৌছল, তখন মহম্মদ নওয়াজ তাঁর শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে, খানা বাহাদুরগড়ে না গিয়ে জাঙ্গে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। খানেওয়ালে ট্রেন বদল ক'রে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সদলবলে জাঙ্গেই এসে উপস্থিত হন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময়।

জাঙ্গে তাঁদের সেই পৈত্রিক প্রাসাদে তখন থাকতেন তাঁরই নামীয় এক জ্ঞাতি ভাই এবং উত্তরাধিকারী মহম্মদ নওয়াজ। এঁকে এ স্থলে দ্বিতীয় নওয়াজ বলে অভিহিত করলে আমাদের আর কোন গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সেই দলবল যখন লাহোর থেকে জাঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন এই দ্বিতীয় নওয়াজ খুব খুশি হননি এবং তা হবার কথাও নয়। ইতঃপূর্বে প্রথম নওয়াজ সম্পর্কে অনেক কথাই দ্বিতীয় নওয়াজের কানে এসেছিল, এবং তাঁর এই উদ্দাম জীবনযাত্রা—জমিদারী বন্ধক, বিক্রয় ও অর্থের অপব্যয় তিনি মোটেই সমর্থন করতেন না। কাজেই, প্রথম নওয়াজ এই ভাবে বাইরের এক জন নর্তকী স্ত্রীলোককে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হলে, দ্বিতীয় নওয়াজ নিজের সম্মানরক্ষার্থে প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে, বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে এক তাঁবুতে এসে আশ্রয় নেন।

এর পরের ঘটনা আদালতে সাক্ষী-সাবুদের এজাহারের মধ্যে যা পাওয়া যায় এখানে আমরা প্রথমে তারই বর্ণনা করছি। সকলের এজাহার থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ নওয়াজ আর সামসেদ বাঈ প্রথমে এসে সেদিন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বৈঠকখানাতেই থাকেন, তার পর রাত হলে বিশ্রাম করার জন্য তাঁরা উভয়ে শয়ন-কক্ষে গমন করেন। ঐ শয়ন-কক্ষেই তাঁদের রাত্রের আহার পরিবেশন করা হয়। মহম্মদ হোসেন নামক যে পুরাতন ভৃত্য তাঁর সঙ্গে লাহোরে গিয়েছিল, এবং সেখান থেকে তাঁরই সঙ্গে ফিরেছিল, অধিক রাত্রে তাকেও তিনি ছুটি দিয়ে দেন। প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত সার্ভেন্ট-কোয়ার্টারে হোসেন গিয়ে আশ্রয় নেয়।

আদালতে বর্ণিত কাহিনী থেকে আরও জানা যায় যে, গামান নামক তাঁর আর এক ভৃত্য, যে বৈঠকখানার কাছেই ঘুমিয়েছিল, মধ্য-রাত্রে 'মহম্মদ হোসেনকে বোলাও' এই চীৎকারে তার ঘুম ভেঙে

যায়। গামান মহম্মদ হোসেনকে ডাক দেয় এবং সেও মহম্মদ হোসেন তাঁর শয়ন-কক্ষে গিয়ে দেখে,—তাদের প্রভু মহম্মদ নওয়াজ সামসেদ বাঈয়ের সঙ্গে শুয়ে আছেন, কিন্তু বালিশ ও বিছানা রক্তে রক্তাক্ত! মেঝের উপরও রক্তের নদী বয়ে চলেছে এবং একটা রিভলবার পড়ে রয়েছে সেখানে! অভাবনীয় এই দৃশ্য দেখে তারা উভয়েই হতভম্ব হয়ে যায় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দেয় দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজকে। দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজ এই খবর শোনা মাত্র চলে আসেন বটে, কিন্তু বাইরে থেকেই এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহস করেন না। ঘরের ভিতরকার ম্লান বিজলী বাতির আলোতেই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দ্বিতীয় নওয়াজ হোসেন তৎক্ষণাৎ মনোহরলাল নামক স্থানীয় এক উকিলের বাড়ি লোক পাঠিয়ে দেন, তাঁকে ডেকে আনতে।

সেই রাত্রেই ঘটনা-স্থলে মনোহরলাল এসে উপস্থিত হন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তিনিও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহসী হন না, জানালা থেকেই অনুসন্ধান করে সোজা চলে যান ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এবং সেখান থেকে পুলিশ সুপারিন্টেন্‌ডেন্টের বাড়িতে। দ্বিতীয় নওয়াজ এবং মহম্মদ হোসেনও তাঁকে অনুগমন করে। পুলিশ সুপারিন্টেন্‌ডেন্টের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার পর তাঁরা ডেপুটি কমিশনরের সঙ্গেও দেখা করেন এবং ঘটনাটি যথাযথ বিবৃত করেন তাঁদের কাছে। পরে এ কথা জানা যায় যে, জেলার এই সব পদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল, যদি সম্ভব হয় ব্যাপারটা চেপে যাওয়া। কিন্তু এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাবে তখন প্রকাশ করা হয়নি।

তাঁরা তার পর স্থানীয় থানায় গিয়ে তাঁদের বিবৃতি দাখিল করেন রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটের সময়। উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, 'মনোহরলাল মহম্মদ নওয়াজ খানের বাড়িতে গিয়ে ঘরের বাইরে থেকেই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করেন। মহম্মদ নওয়াজকে ডাকাডাকির পর প্রশ্ন করায়, তিনি তাঁকে মাত্র বলেন যে, সামসেদ বাঈ মারা গেছে।' এ-সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ ছিল না। এই বিবৃতিতে আরো একটি কথা বলা হয়েছিল যে, 'মহম্মদ নওয়াজ তখনও সামসেদ বাঈয়ের সঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলেন।'

পুলিশ সাব্‌-ইন্‌স্‌পেক্টর আলি হোসেন উপস্থিত ব্যক্তিগণের ষ্টেটমেণ্ট লিপিবদ্ধ করার পর ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হন সওয়া পাঁচটার সময়। মহম্মদ নওয়াজ তখনও সেই একই ভাবে সামসেদের পাশে শুয়েছিলেন এবং একটা রিভলবার মেঝেতে পড়েছিল। একটি কম বাতির বিজলী আলো তখনও জ্বলছিল ঘরটিতে। সাব্‌-ইন্‌স্‌পেক্টর রিভলবারটা তুলে পরীক্ষা করে দেখেন। রিভলবারটা দেখে বেশ বোঝা যায় যে, অল্প সময়ের মধ্যেই গুলী ছোঁড়া হয়েছে তা থেকে। ছ'টি কার্তুজের মধ্যে চারটি রয়েছে তার মধ্যে, বাকী দু'টি খরচ হয়েছে। 'কাবার্ড প্রেসের' পাশে গুলী-ভরা একটা রাইফেল খাড়া করা ছিল, এবং স্যুটকেশের মধ্যে গুলী-ভরা অপর একটা পিস্তল পাওয়া গেল। বিছানার ধারে মাথার কাছে দু'টো ছোট টেবল ছিল।

পুলিশের উপস্থিতিতেও মহম্মদ নওয়াজের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি তখনও, তেমনিই, সেই যুবতী নর্তকীর রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশে শুয়ে রয়েছেন। রাত্রের অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়লো চারি দিকে—যা ছিল অস্পষ্ট, ক্রমশঃ তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সকাল প্রায় ছ'টার সময় এলেন ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট গোলাম হায়দার। তিনিও এসে মহম্মদ নওয়াজকে সেই অবস্থাতেই দেখলেন। অদ্ভুত এই দৃশ্য! এক জন খুন-হওয়া মৃতদেহের পাশে, ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে এক জন জীবন্ত লোক কি ক'রে এমন দীর্ঘ সময় নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারে তা ভাববার বিষয়। গোলাম হায়দার তন্ন-তন্ন করে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস পরীক্ষা করতে লাগলেন। ভালো ভাবে অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেল যে, রিভলবার থেকে দু'বার গুলী ছোঁড়া হয়েছে। সামসেদ বাঈ যে দিকে শুয়েছিলেন, বিছানার সেই দিককার দেওয়ালে, মেঝে থেকে সওয়া ছ'ফুট উঁচুতে গুলীর দাগ ছিল। ঘরের বিপরীত দিকে জানালার কাছে স্যুটকেশের পাশে একটা কার্তুজের খোল পাওয়া গেল। অপর গুলীটার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বেলা সাড়ে আটটার সময় ফটোগ্রাফার জগন্নাথকে ডাকা হয় ঘটনার কয়েকখানা ছবি নেবার জন্তে। এবং স্বভাবতঃই প্রথম ছবি যা নেওয়া হয়, তা হচ্ছে: জুলিয়েটের পাশে অভিন্ন রোমিও, অর্থাৎ মহম্মদ নওয়াজের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত শ্রীমতী সামসেদ বাঈয়ের করুণ চিত্র।

বেলা ন'টার সময় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ সাফী উপস্থিত হন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে ভৃত্যদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। মহম্মদ নওয়াজ শয্যাত্যাগ করেন বেলা প্রায় দশটার সময়। কিন্তু তিনি কোন জবানবন্দী দেন না। তাঁর কাছে পঁচিশ হাজার টাকার নোট ও একটি দামী ব্রেস্‌লেট পাওয়া যায়। ঐ দিনই সামসেদ বাঈকে হত্যা করার অপরাধে মহম্মদ নওয়াজকে গ্রেপ্তার ক'রে জেল-হাজতে চালান দেওয়া হয়। হাজতে তাঁকে যথারীতি সম্মানের সঙ্গেই রাখা হয় এবং তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর জজের দায়রা জজ কর্তৃক জামীন মঞ্জুর হয়। কিন্তু জামীনের বিরুদ্ধে গুরুতর হত্যাপরাধের অপরাধী হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে জামীন নাকচের আবেদন করা হয় হাইকোর্টে। বিচার-বিবেচনার পর হাইকোর্ট জামীন বাতিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু মহম্মদ নওয়াজের শারীরিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ থাকায় তাঁকে হাসপাতালে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরে ঐ হাসপাতাল থেকে তাঁকে আর জেলে ফিরে আসতে হয়নি —বিধাতার অনুগ্রহে তিনি চিরতরেই সেখান থেকে মুক্তি পান।

যদিও ১৯৪২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী মহম্মদ নওয়াজকে দায়রা সোপর্দ করা হয়, কিন্তু সামসেদ বাঈকে হত্যা করার অভিযোগে তাঁকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৪১ সালের ৮ই নভেম্বর। [illegible] জনসাধারণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকায়, পাছে [illegible] সাহায্যে সাক্ষী বা বিচার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি [illegible] এই আশঙ্কায় লাহোরের দায়রা আদালতে তাঁর বিচারের [illegible] দেওয়া হয়।

[illegible] সিভিল সার্ভিসের দায়রা জজ মিঃ ডি, ফলশ-এর আদালতে লাহোরে এক দিন সাড়ম্বরে এই উত্তেজনাপূর্ণ মামলার বিচার শুরু হয়। মহামান্য জজ সাহেবকে সাহায্য করার জন্য [illegible] বিশেষ সভ্য নিয়ে এই মামলার জন্য একটি সভাসদ-মণ্ডলী [illegible] করা হয়।

সরকার পক্ষ সমর্থন করেন, পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ সিদ্দিকী

এবং তাঁর সহকারী হন জাঙ্গের স্থানীয় বারের কয়েক জন সভ্য। আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন, ফৌজদারী আইনে বিশেষ অভিজ্ঞ, বিখ্যাত লাহোরের মিঞা আবদুল আজিজ এবং তাঁর সহকারী হন জাঙ্গ ও লাহোর বারের কয়েক জন জুনিয়ার মেম্বার। যেদিন এই বিচারের প্রথম শুনানী আরম্ভ হয়, সেদিন এই রহস্যজনক মামলা সম্পর্কে কৌতূহলী ও উৎসুক জনসাধারণ, আইনজীবী ও সাংবাদিকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বিচারালয়টি। আগেকার দিনে সাধারণত বড় ঘরানের রাজনৈতিক বিচারে যেমন হয়ে থাকে, এটিও প্রায় সেই রকম হয়েছিল।

ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী ছিলেন জাঙ্গের সিভিল সার্জন্ ডাক্তার সের সিং। তিনি স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তারই পুনরুক্তি করে বলেন যে, ১ই নভেম্বর সামসেদ বাঈয়ের শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে তাঁর বাঁ দিককার ঘাড়ে সিকি ইঞ্চি মাপের গুলীর ক্ষত তিনি দেখতে পান; গুলীটি বাঁ দিক থেকে বিদ্ধ হয়ে ডান দিকে চলে গিয়েছিল। ডাক্তারের অভিমত এই যে, সামসেদ বাঈকে যখন গুলী করা হয়, তখন সে মাথাটা বালিশের উপর রেখে ডান পাশ ফিরে শুয়েছিল। গুলীটা তিনি খুঁজে পাননি; তাঁর মতে গুলীটা হয়ত ডান কানের মধ্যে দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গিছলো, কারণ সে কান দিয়ে রক্তস্রাব হতে দেখা গিয়েছিল। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, গুলীটা মাথার খুলির কোন অজ্ঞাত খাঁজে আটকে থাকাও বিচিত্র নয়। এই গুলী যা ডাঃ সের সিং পোষ্টমর্টমের সময়ও উদ্ধার করতে পারেননি, তা ৩০শে ডিসেম্বর লাহোরের মিঞা সাহেব কবরখানা থেকে যখন সামসেদের মৃতদেহ তোলা হয়, তখন সহকারী সিভিল সার্জন্ ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ তাফেল কর্তৃক সেই গুলীর খোঁজ পাওয়া যায়।

ডাঃ সের সিং আদালতকে বুঝিয়ে দেন যে, আসামী রাত্রি দশটার সময় সুরাপান করলেও, রাত্রি আড়াইটার মধ্যে সে লক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সেই কারণে তিনি মহম্মদ নওয়াজকে পরীক্ষার সময় তাঁর মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানের কোন বিশেষ লক্ষণ দেখেননি।

ফরিয়াদী পক্ষের প্রধান সাক্ষী হিসাবে মহম্মদ হোসেনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলে সে ২৩শে অক্টোবর চিকিৎসার জন্য আসামীর লাহোরে ফ্লেটিস হোটেলে অবস্থান, মুলতান গমন, খানেওয়ালে মত-পরিবর্তন, জাঙ্গে আগমন এবং রাত্রের ঘটনার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে। জেরার উত্তরে মহম্মদ হোসেন বলে, 'নাওয়াজ খান অত্যন্ত মদ্যপান করতেন। খানেওয়ালে সকাল আটটায় শুরু করে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তিনি ক্রমাগতই মদ্যপান করেছিলেন। চার-পাঁচটা খালি হুইস্কির বোতল বাথরুমে পাওয়া গিয়েছিল, এবং একটা পুরো বোতল শোবার ঘরে ছিল। সে এ কথাও স্বীকার করে যে, প্রথম মহম্মদ দু'-তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করায়, দ্বিতীয় মহম্মদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন। ঘটনার দিন রাত্রে বৈঠকখানা ও শয়ন-কক্ষের মাঝখানের দরজাটা ভেজানো ছিল, খিল দেওয়া ছিল না—এ কথাও সে স্বীকার করে। এই ব্যাপারে এ কথাও সে বলে যে, আসামী মহম্মদ নওয়াজের মাতা তাকে ১১ই নভেম্বর কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন, কারণ ঘটনাটা কোন রকমে চাপা দেবার উপায় অবলম্বন করার পূর্বেই সে পুলিশে খবর দিয়েছিল বলে।'...

বাবুর্চি গামান এবং নেপালী চৌকিদার লাল সিংও একই সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই মামলায় খৈরান ও জোরা নামে আরও দু'জন বারাঙ্গনা সাক্ষী দিয়েছিল। তারা বলে, '৮ই নভেম্বর তাদের গান করবার জন্য ডাকা হয়। সামসেদ বাঈকে ওদের সামনেই গান করার জন্যে মহম্মদ নওয়াজ অনুরোধ করেন, কিন্তু সে অস্বীকৃত হয় এবং তাতে নওয়াজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তার উপর।'...

অন্য উৎস থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, সেদিনকার সেই সান্ধ্য-আসরে বৈঠকখানায় সাধারণ দু'জন বারাঙ্গনার উপস্থিতিতে সামসেদের মর্যাদায় আঘাত লাগে। সে নিজে যে শ্রেণীরই হোক, তবু তার একটা খানদানী আছে,—ওদের সামনে এমন করে নিজেকে বিকিয়ে দিতে অপমানিত বোধ করে সামসেদ। সাময়িক ভাবে নওয়াজের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। ওদের সামনে সুরার পাত্রে সুরা ঢেলে দিতে সে অস্বীকৃত হয়; ঐ নিম্ন-স্তরের নাচওয়ালীদের মাতলামি ও অশ্লীল ব্যবহারের আতিশয্য তাকে অসহিষ্ণু করে তোলে এবং ওদের সামনে নওয়াজের নানা প্রকার অসংযত অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করে। এই সময় একবার নওয়াজ জোর করে তাকে তাঁর অঙ্কশায়িনী করার জন্য চেপে ধরেন, কিন্তু সামসেদ তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে কবলমুক্ত হয়। স্থূলকায় নওয়াজ নিজেকে সামলাতে না পেরে উলটে পড়েন। এই ব্যাপারে খৈরান ও জোরা নেশার ঝোঁকে হো-হো করে হেসে ওঠে। এতে নওয়াজ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে যান এবং তাদের গায়ে সুরা সমেত গ্লাস ছুঁড়ে মারেন। টলতে-টলতে উঠে গিয়ে তাদের শারীরিক আবরণ খুলে দেবার জন্য জিদ ধরেন। খৈরানের একটু বয়েস হলেও, স্বাস্থ্যের অহংকার তার সর্বাঙ্গকে তখনও সজাগ করে রেখেছিল—অত্যন্ত সুগঠিত ও বলিষ্ঠ ছিল তার দেহ। নওয়াজ তাকে প্রায় অসংবৃতা করে ফেললে লজ্জায় সঙ্কোচে সামসেদ প্রথমটা বালিশে মুখ ঢাকে, তার পর উঠে উন্মত্ত নওয়াজকে নিরস্ত করার জন্য বাধা দেয়। সেই অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নওয়াজ তাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু সামসেদের কাছে মদমত্ত নওয়াজের অক্ষমতা সহজেই প্রমাণিত হয়—নিজেকে অনায়াসেই তাঁর কবলমুক্ত করে নেয় ঐ তন্বী তরুণী। সমস্ত চুল তার খুলে যায়, ছিঁড়ে যায় মাথায় জড়ানো মালার ফুল, পরনের বেনারসী—বুকের বৃন্তে আঘাত লাগে।

সঙ্গীতের স্বর বিস্তার, নৃত্যের ছন্দ সমস্ত কিছুরই তাল কেটে যায় ক্ষণিকের মধ্যে। জোরা ও খৈরান তাদের প্রাপ্য নিয়ে সেই অবসরে বিদায় নেয়, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বার-বাড়ি থেকে নওয়াজকে নিয়ে সামসেদ আসে ভেতর-বাড়িতে শোবার ঘরে।

নিহত বালিকার ভাই গালিব হোসেন বলে যে, 'তার ভগিনী রাত্রি আটটা-ন'টার মধ্যে নওয়াজের শয়ন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে আহার করে, তার পর আবার আসামীর কক্ষে ফিরে যায়।' সে আরো বলে যে, 'মহম্মদ নওয়াজ আমার ভগিনীকে সতের বা আঠারশ' টাকা দেন এবং আমরা খুশি-মনেই তাঁর (মহম্মদ নওয়াজের) অনুগমন করি। মহম্মদ নওয়াজের আচরণ সম্বন্ধে আমার ভগিনী আমার কাছে কোন কিছুই অভিযোগ করেনি।'...

ফরিয়াদী পক্ষের এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে একমত কি না এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজকে জেরা করা হয়। ফরিয়াদী পক্ষের তরফ থেকে তাঁকে জেরা করার সময় তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, 'এ কথা খুবই সত্যি যে মহম্মদ হোসেন যখন

আমায় জাগায়, তখন আমি তাঁবুতে অঘোরে ঘুমিয়েছিলাম ;—আমি সামসেদ বাঈকে হত্যা করিনি।'…

মিঞা আবদুল আজিজের জেরার উত্তরে সাক্ষী আরও বলেন যে, 'আসামী লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রী ক'রে সেই টাকা সুরাপান ও নানাবিধ কুৎসিত লাম্পট্যে খরচ করে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রাচীরপত্রের সাহায্যে আমি উচ্চাভিলাষী ক্রেতাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম। আমি নিজেকে আসামীর প্রত্যাবর্তন-সূত্রে উত্তরাধিকারী মনে করি। সম্পত্তি এই ভাবে নষ্ট করা, টাকার অপব্যয় করা আমি বরদাস্ত করি না। আসামীর হয়ে আমি কোর্ট অফ ওয়ার্ডে দরখাস্ত করেছিলাম, এই ভাবে সম্পত্তি উড়িয়ে দেওয়া বন্ধ করার জন্য। আমাদের উভয়ের মধ্যে এই কারণে কিছু দিন যাবং সদ্ভাব ছিল না।…

…'সংবাদ দেওয়া হলে পর লালা মনোহরলাল আমাদের সঙ্গে আসামীর বাড়ীতে এসেছিলেন এবং প্রথম বিবৃতি গ্রহণের সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। আসামীর বিরুদ্ধে আমি যে দরখাস্ত করেছিলাম, সে সম্বন্ধে আমি লালা মনোহরলালের সঙ্গে আলোচনা করি।'…

আদালতে দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজ আরো বলেন যে, 'খুন হয়েছে এ খবর শুনেও আমি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিনি, তার কারণ আমার ভয় হয়েছিল যে, আসামীর সঙ্গে আমার সদ্ভাব না থাকায় যদি আমাকে অহেতুক এই হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলা হয়।'…

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য গৃহীত হলে পর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি আদালতে পাঠ করা হয়। তাতে আসামী ৮ই নভেম্বর বিকালে বর্ণিত সঙ্গীতের সময় তিনি যে সামসেদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এ কথাও অস্বীকার করেন। উল্লিখিত বিভলবার যে তাঁর, সে কথা অবশ্য তিনি স্বীকার করেছিলেন। তিনি যে ৯ই নভেম্বর বেলা ন'টা পর্যন্ত সামসেদের সঙ্গে বিছানায় শুয়েছিলেন, তার কারণ লালা মনোহরলাল তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি বিছানা ত্যাগ করলেই তাঁকে হত্যা করা হবে, তার পর তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যান। বিবৃতি গ্রহণ করবার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, 'এ সকল কথা সত্য কি না?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'হাঁ, এ সব সত্য।'

এর পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কি আর কিছু বলতে ইচ্ছা করেন?'

—'হাঁ, আমি একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ইচ্ছা করি।'

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত সেই লিখিত বিবৃতিখানিও কোর্টে পাঠ করা হয়। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সামসেদ বেগমকে আমি গুলী করিনি। সে রকম কোন অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। আমি তাকে মোটা টাকা দিয়াছিলাম, এবং সেই সঙ্গে একটি মূল্যবান আংটিও। তার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছাতেই তাকে আমি সঙ্গে নিয়ে আসি। আমার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে সে সবই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমার প্রভূত সম্পত্তি হস্তগত করার উদ্দেশ্যেই ঘটনার কয়েক দিন পরে ঐ সকল মিথ্যা সাক্ষ্য রচনা করা হয়।…

'আমার স্ত্রী নেই এবং পুত্র-সন্তানও নেই। আমি প্রভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক; তার কিছু আমি আমার বিমাতার কাছ থেকে পাই। আমার শত্রুপক্ষ আমার এই সকল সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আনবার চেষ্টা করছে।'…

দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজের উপর স্পষ্টতঃ হত্যাকাণ্ডের কোন অভিযোগ না থাকলেও, ঐ লিখিত বিবৃতিতে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত ছিল।

তিনি আরো বলেন, 'মহম্মদ নওয়াজ আমার জ্ঞাতি এবং প্রত্যাবর্তন-সূত্রে সম্পত্তির ওয়ারিসন। প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ তার সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই। উপরে উপরে অন্তরঙ্গের মনোভাব দেখালেও সে আমার সম্পত্তি বিক্রয় বরদাস্ত করত না।'…

সে রাত্রের এই নিদারুণ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আমি সেদিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত মদ্যপান করি। তার পর সামসেদ বেগমের সহিত শয়ন করি। ঘরে কোন আলো জ্বালা ছিল না; চাকর-বাকরেরা যে-যার ঘরে ঘুমিয়েছিল; শোবার ঘরের সংলগ্ন দরজাতেও খিল দেওয়া ছিল না এবং বাথ-রুমের দরজাও খোলা ছিল। রাত্রে আমার ক্লান্তি, পীড়া এবং মত্ততাবশতঃ আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হই। তার পর হঠাৎ গোলযোগে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি মহম্মদ হোসেনকে ডাকি, একটা গুলীর শব্দ শুনতে পাই। আমার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, আতঙ্কে আমি তৎক্ষণাৎ হতবুদ্ধি হয়ে যাই।'…

দায়রা জজের সামনে আসামী মহম্মদ নওয়াজ আর কোন [illegible]তি দেননি। আর কোন রকমের এজাহার তাঁর পক্ষে ক্ষতিকরই হতে পারত। হয়ত তাঁকে এমনই বোঝান হয়েছিল যে, হত্যার প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ যখন তাঁর বিরুদ্ধে নেই, এবং বৈঠকখানা বা বাথ-রুমের ভেতর দিয়ে কোন হত্যাকারীর আগমনের যখন সম্ভাবনা রয়েছে, তখন সন্দেহের অজুহাতে তিনি রেহাই পেতে পারেন। অবশ্য ফরিয়াদী পক্ষ আসামীর আচরণে হত্যার কোন অভিসন্ধি প্রমাণ করতে পারেননি। পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বালিকাকে [illegible] টাকা দেওয়ার ব্যাপারে বালিকা আসামীর অনুগ্রহলাভে খুশিই ছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া এ-থেকে এ-কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মহম্মদ নওয়াজ তাকে বিবাহ না করলেও, প্রচুর অর্থ যে দিতেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত শুনানী শেষ হলে এই মামলায় বিশেষ যে চার জন এ্যাসেসর নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, যেহেতু ফরিয়াদী পক্ষ আসামীকে সন্দেহাতীত ভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেননি, সেহেতু মহম্মদ নওয়াজ তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাগ্যচক্রে দায়রা জজ এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ফরিয়াদী আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত করতে পেরেছে, এবং আসামী ভিন্ন অপর কেউ-ই সামসেদ বাঈকে হত্যা করতে পারে না। অতএব এ ক্ষেত্রে এমন কোন কারণ নেই যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারায় বর্ণিত হত্যাপরাধে অপরাধী করা যায় না।

এই মামলায় বিচারপতি চারটি বিশেষ সম্ভাবনা, অর্থাৎ যা ঘটা সম্ভব, সেই বিষয় সম্পর্কে বিশদ ভাবে যা উল্লেখ করেন তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে :

১। আসামী ইচ্ছা করেই সামসেদ বাইকে গুলী করেছিল।

২। কোন অপর ব্যক্তি বাইরে থেকে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে হয় আসামীকে লক্ষ্য করে কিম্বা ঐ বালিকাকে লক্ষ্য করে গুলী করে থাকবে।

৩। মৃত বালিকা আত্মহত্যা করে থাকবে, অথবা—

৪। আসামী দৈবাৎ উক্ত সামসেদ বাঈ নামক বালিকা নর্তকীকে গুলী করে থাকবে।

তিন ও চার নম্বর অনুমান বাতিল করা প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতি বলেন যে, 'মৃতার আত্মহত্যা করার কোন অভিসন্ধি থাকা সম্ভব নয়, কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুসারে বালিকা সতরশ' টাকা আসামীর কাছ থেকে পেয়েছিল, তাছাড়া আসামীর কাছে তখনও পঁচিশ হাজার টাকা ছিল, এবং তার মেজাজও ছিল খুব দিলদরিয়া —সুতরাং মৃতার অবস্থায় কোন বালিকাই আত্মহত্যা করতে পারে না। সে যদি আত্মহত্যা করত, তা'হলে রিভলবারটা হয় তার হাতে অথবা তার বিছানায় থাকত এবং ক্ষতস্থানে ঝলসানো বা বারুদের কাল দাগও দেখতে পাওয়া যেত।...

—'অকস্মাৎ ভুলক্রমে তাকে হত্যা করার অনুমানও সুদূরকল্পিত সম্ভাবনা। আসামী মহম্মদ নওয়াজ যদি নেশার ঝোঁকে মত্ত অবস্থায় তার রিভলবার নিয়ে খেলা করতে গিয়ে ইচ্ছে করেই গুলী ছুঁড়ত, তা'হলে সে পরক্ষণেই তা প্রকাশ করত। তাছাড়া দু'টি গুলী ছোঁড়া হয়েছিল, অতএব এ অনুমান গ্রহণযোগ্যই হতে পারে না। কারণ, একটাই গুলী দৈবাৎ বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দু'টো গুলী ও' আর দৈবাৎ বেরোয় না—বিশেষ করে যে রিভলবারের ঘোড়া টানতে রীতিমত জোর লাগত।'...

এই দুই অনুমান বাতিল করার পর আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমাদের অন্য দু'টি অনুমান শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নে পর্যবসিত হয় যে, আসামী মহম্মদ নওয়াজ ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে বালিকাকে গুলী করা সম্ভব কি না। ফরিয়াদী পক্ষ বিশ্বাস করেন যে, আসামীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করবার একটি মাত্র দরজা ছিল বাথ-রুমের ভিতর দিয়ে। চাকরেরা যখন তাঁর ডাক শুনে সেদিকে আসছিল, তখনও একটা গুলীর শব্দ শোনা যায়। সুতরাং অপর কোন লোক যদি শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করে বাথ-রুমের ভিতর দিয়ে পালাত তাহলে চাকরেরা তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেত। অবশ্য এই সাক্ষীরা আসামী পক্ষের সুবিধার জন্য তাদের পূর্ব বিবৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে এমন প্রমাণ থাকলেও,—কেউই কোন লোককে বাথ-রুমের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেছে, এমন কথা বলেনি। এখন কোন সাক্ষীর মুখ দিয়ে এ কথা বেরোলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে পালাচ্ছে দেখতে পেলে, তারা নিশ্চয়ই একটা গোরগোল তুলত এবং এই ঘটনা সম্পর্কে আর কোন রহস্যই থাকতে পেত না।

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করবার অন্য কোন দিকে কোন পথ ছিল কি না সে বিষয়ে আদালত বিশেষ অনুসন্ধান করবার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আর কোন পথ ছিল না ; কারণ বৈঠকখানা আর শয়নকক্ষে যাবার দরজাগুলো সবই যে ভিতর দিক থেকে বন্ধ ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো। দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজ বা অপর কোন ভাড়াটে হত্যাকারীর দ্বারা এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে পারত কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সে সম্ভাবনা দ্বিতীয় নওয়াজের উপরই এসে পড়ে, কারণ আসামী জাঙ্গে এসেছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। আদালত সিদ্ধান্ত করেন যে, ভৃত্যদের যোগাযোগ ভিন্ন দ্বিতীয় নওয়াজের দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড সম্ভব নয় ; সুতরাং আদালত সে কথা প্রসঙ্গত বিশ্বাস করবার কোন কারণ দেখতে পান না।

মৃতদেহের পার্শ্বে আসামীর এইরূপ দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকা সম্পর্কে আদালত চিন্তা করেন যে, নিহত রমণীর পাশে অপরাধীর আটন'ঘণ্টা শায়িত থাকাকে কেবল মাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার বললে, সত্যিকার কিছুই বলা হয় না। আসামীর ভৃত্য মহম্মদ হোসেনের সাক্ষ্য অনুসারে—লালা মনোহরলাল আসবার পরও আসামী কেবল 'সে (সামসেদ) মারা গেছে!' ছাড়া আর যে কোন কথা বলেনি,—এ কথা না বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

খৈরান ও জোরা নাম্নী দুই বারাঙ্গনার সাক্ষ্যে,—সামসেদ গান গাইতে অস্বীকার করায় আসামীর যে ক্রোধের উল্লেখ করা হয়েছে, তার উপর গুরুত্ব স্থাপনের কোন কারণ নেই বলে আদালত মনে করেন।

আসামীর উদ্দেশ্য অনুমান বা নির্ধারণ করবার কোনই আবশ্যকতা নেই। কেবল ঘটনাটা যা ঘটেছে সঙ্গত ভাবে তারই অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাত্রে আসামীর মত্ততা চরম সীমায় পৌঁছেছিল এবং মধ্যরাত্রি ও রাত একটার মধ্যে যে-কোন কারণেই হোক আসামী অত্যন্ত চঞ্চল ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠে তার ভৃত্যদের চীৎকার করে ডাক দেয় এবং সেই সময়েই কোন কারণে রিভলবার তুলে সামসেদকে গুলী করে—কি করছে না জেনেই। কোন লোকের মত্ত অবস্থা যখন সে স্বেচ্ছায় আনয়ন করে তখন সেটা দোষ স্খালনের অজুহাত হয় না। এই অবস্থায় ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে হত্যা অপরাধে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়।

প্রাণদণ্ডের আদেশের পরিবর্তে আসামী মহম্মদ নওয়াজের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় এবং আসামীর সামাজিক মর্যাদা এবং উন্নত প্রণালীর জীবনযাত্রার দরুণ সেই সঙ্গে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গ্রহণ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সামসেদ বাঈ হত্যা অপরাধের অভিযোগ সাব্যস্ত হওয়ার পর মহম্মদ নওয়াজ খানকে অবশ্য জেলে যেতে হয়নি। সে সময় কিছু দিন তিনি মেয়ো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন এই মামলার রায় দেওয়া হয়। কয়েক দিন পরেই অবশ্য হাইকোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। কিন্তু ৭ই জুলাই অন্যত্র তাঁর বিচারের ডাক পড়ে—মহম্মদ নওয়াজ খান মানুষের আইনের কবল এড়িয়ে লোকান্তর গমন করেন। প্রধান বিচারপতি স্যার ডগলাস ইয়ঙ্গ কাশ্মীর থেকে ফিরে আপীল শোনবার পূর্বরাত্রেই মেয়ো হাসপাতালে মহম্মদ নওয়াজ দেহত্যাগ করেন।

এ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে মহম্মদ নওয়াজ সন্দেহের অজুহাতে খালাস পেতেন, না দায়রা জজের রায়ই বহাল থাকত, তাও আমরা খানিকটা অনুমান করতে পারি। যথা—আসামীর হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, সেটা ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। দায়রা জজের এ মন্তব্যই ঠিক। তাছাড়া

ইচ্ছাকৃত না হ'লে দু'টো গুলী ছোঁড়া মোটেই সম্ভব নয়। চাকরদের ডাকবার পর একটি গুলী ছোঁড়া হয়, সে কথা অস্বীকার করা হয়েছে। হত্যাকারীকে পালাতে দেখে থাকলে গুলীটা ঘরের ভিতর ছোঁড়া হ'ত না। এ-বিষয়ে মিঃ ফলস্-এর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। মনোহরলালকে ফরিয়াদীর সাক্ষী-তালিকাভুক্ত করা হ'লেও, আদালতে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি—বিরোধী হিসাবে। আসামী নওয়াজও তাঁকে কাজে লাগাতে পারতেন, কিন্তু তিনিও তা পারেননি। মৃতদেহের পাশে আসামীর আট-ন' ঘণ্টা শুয়ে থাকার রহস্য হয়ত মনোহরলালই কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করতে পারতেন, কারণ তিনিই প্রথম ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হন, কি ভাবে ব্যাপারটা বোঝান যাবে সেই উপদেশ দেবার জন্য : কোন হত্যাকারী মহম্মদ নওয়াজ এবং সামসেদ বাঈকে হত্যার অভিপ্রায়ে এসেছিল, এই ভাবে ঘটনাটি সাজাবার জন্য নওয়াজকে চুপচাপ, শুয়ে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়—এরূপ কল্পনা করা খুবই অসঙ্গত নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে এজাহার দাখিলের পর ব্যাপারটা ভিন্নরূপ প্রতীয়মান হওয়ায়, মহম্মদ নওয়াজ সজ্ঞাহীন হওয়ার অজুহাত দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে যে তিনি নির্দোষ তা প্রমাণের পক্ষে কোন সহায়তাই হয়নি। তাঁর ভ্রাতি দ্বিতীয় মহম্মদ নওয়াজের উপর আনীত অভিযোগের ইঙ্গিতও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মোটের উপর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যা দাঁড়াল, তাতে ৮ই নভেম্বর দাব (Dab) পরিবারের প্রাসাদে যখন পঞ্চদশী সামসেদকে হত্যা করা হয়, তখন বাস্তবিক কি পরিস্থিতি ঘটেছিল, কি অবস্থার মধ্যে উক্ত তরুণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন, তার প্রকৃত রহস্য কখনই জানা সম্ভব হবে না, কারণ সে বালিকাও আজ পরপারে এবং আসামী হিসাবে যাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তিনিও আজ নেই। সর্বশেষ তাদের দু'জনকে একসঙ্গে যে জীবিত অবস্থায় দেখেছিল, সে হচ্ছে ভৃত্য গামান। যখন নওয়াজ সামসেদ বাঈয়ের সঙ্গে একই শয্যায় শুয়েছিলেন, তখন সে তার প্রভুর পদসেবায় রত ছিল। দায়রা জজ অনুমান করেন যে, মধ্যরাত্রে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কিছু নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে যা মহম্মদ নওয়াজ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিবৃতি দেবার সময় হয় ভুলে গিছলেন, কিম্বা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেননি। তবে তিনি যে ভুলে গিছলেন এ কথা বিশ্বাস করা মোটেই সমীচীন নয়।

এ সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর পর নানা জনের মুখে নানা কথা প্রকাশ হতে থাকে। তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছ থেকে আরো কিছু গোপন তথ্য জানা যায়। মহম্মদ নওয়াজ নিজেই উক্ত বন্ধুকে নাকি বলেছিলেন, সামসেদের মত সুন্দরী সত্যিই আমার চোখে পড়েনি—শুধু সুন্দরী কেন, নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দরী বললেও অত্যুক্তি করা হয় না; উচ্ছলিত যৌবনের দীপ্তিতে যে-কোন পুরুষের মনে সে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারত। যেমন ছিল তার রূপ, তেমনি ছিল স্বাস্থ্য। নৃত্যের প্রতিটি লাস্যে, হাস্যের প্রতি ভঙ্গিমায়, নয়নের বিস্পষ্ট কটাক্ষে, নিতম্বের সঞ্চলন-বিহারে আমাকে সে মুগ্ধ করে ফেলেছিল কয়েক দিনের আলাপেই। আমি শুধু তার প্রেমেই পড়িনি, তাকে আমার জীবন-ভোর শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পাবারও নিদারুণ লালসা জেগেছিল আমার মনে—আমি তাকে বিবাহ করতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু কি যে হ'ল এক দিন!—এইখানে বলতে গিয়ে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি, কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি আবার যা বলেন, তা হচ্ছে সেই শেষ দিনের কথা। তিনি বলেন, দেশের বাড়ীতে এসে প্রথম দিন রাত্রেই তাঁরা দু'জনে যখন শয়ন-কক্ষে শুয়েছেন, তখন সামসেদ না কি তাঁকে নানা ভাবে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে, উপহাস করে। চুরচুরে নেশায় চোখ তাঁর তখন বুঁজে আসছিল। কামোন্মাদনার চেষ্টা করলেও শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ তিনি তা এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করেছিলেন, সক্ষম হননি। এই অবস্থায় উক্ত মদালসা তরুণী তাঁকে উপভোগ করবার জন্য নানা ভাবে পরিহাস করতে থাকে। নেশার ঝোঁকে, মদান্ধ অবস্থায় তিনি প্রথমটা চটে যান, তাঁর মর্যাদায় ভীষণ আঘাত লাগে। সামসেদকে তিনি ধাক্কা দেন, কোপনা নারী সামসেদও তাঁকে ধাক্কা দেয় এবং তিনি বিছানা থেকে পড়ে যান। তার পরই মাথায় তাঁর খুন চেপে যায়, কয়েক ঘণ্টা পূর্বে চিরজীবনের সঙ্গিনী হিসাবে যে তাঁর অঙ্কশায়িনী ছিল, তাকেই তিনি বালিশের তলা থেকে রিভলবার বার করে হত্যা করেন। এই কথা বলে তিনি আবার পাগলের মত হা-হা করে হেসে ওঠেন এবং বলেন : সামসেদ আর তাঁকে বিদ্রূপ করতে পারবে না।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও 'স্বরাজ'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—এ-যুগের অনেকের কাছেই একটা শ্রুতি-সুখকর গুরুগম্ভীর নাম মাত্র; তিনি কি করিয়াছিলেন, তাঁহার [illegible] কোন্‌খানে, এ-সংবাদ অনেকেই রাখেন না। ১৯০৫ সনে বাংলা দেশে যে-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার জের সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া আজও অল্পবিস্তর চলিতেছে, সম্পূর্ণ শান্ত হইলে—সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরিপূর্ণ ভাবে আমাদের করায়ত্ত হইলে, এই আন্দোলনের নেতাদের আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব। ব্রহ্মবান্ধব ইঁহাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন। [illegible] দীপশিখা প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার হাতে দুইটি প্রজ্বলিত মশাল ছিল; ইহার একটি 'সন্ধ্যা,' অপরটি 'স্বরাজ'। 'স্বরাজে'র সঙ্গে এ-যুগের পাঠকের পরিচয় সাধনই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর জন্ম—১৮৬১, ১১ই ফেব্রুয়ারী; তিরোধান—১৯০৭, ২৭এ অক্টোবর। [illegible] দুইখানি সুলিখিত জীবনী আছে।* এগুলিতে তাঁহার [illegible] জীবনের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একটা [illegible] অভাব আমরা অনুভব করি; উপাধ্যায়ের জীবনের একটা [illegible] দিক্—বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার দানের কথা এই জীবনীগুলিতে [illegible] আলোচিত হয় নাই। তাঁহার রচনাপঞ্জী ত দূরের [illegible] কি তৎসম্পাদিত দৈনিক 'সন্ধ্যা'—যাহার নাম এক [illegible] মুখে মুখে ফিরিত, তাহার প্রথম প্রকাশকালটিও কেহ [illegible] নাই।†

[illegible] অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগণের বোধগম্য [illegible] হইত। শিক্ষিত জনগণের জন্য ব্রহ্মবান্ধব 'স্বরাজ' [illegible] সূচনা করেন। আজকার দিনে এই সকল পত্রিকার [illegible] সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করা সুকঠিন। অবিলম্বে সচেতন না [illegible] সংরক্ষিত আছে, কিছু দিন পরে হয়ত তাহাও বিলুপ্ত [illegible] যাইবে। [illegible]-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দে'র সৌজন্যে [illegible] সংখ্যাগুলি সম্প্রতি আমার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

'স্বরাজ' একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহার আবির্ভাব স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে। ১৯৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, 'সন্ধ্যা'-কার্য্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হয়; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—[illegible] ফাল্গুন ১৩১৩ (১০ মার্চ ১৯০৭), রবিবার। প্রতি [illegible] পরিমাণ ১২-১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য সংখ্যা-প্রতি /০। ইহার [illegible] ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষ বা ১২শ [illegible] তারিখ ১৫ আষাঢ় ১৩১৪; ৬ষ্ঠ, ১ম ও ১২শ সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হয় নাই।

'স্বরাজে'র প্রত্যেক সংখ্যার শীর্ষদেশে ছত্রপতি শিবাজীর আবক্ষ-চিত্র [illegible] অক্ষরে পত্রিকার নাম "হেড্‌-পীস"রূপে শোভা পাইত। 'স্বরাজে' বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, রাণী শঙ্করী, মাতা [illegible]ঙ্গিনী, বিবেকানন্দ ও লালা লাজপত রায়ের চিত্রের সহিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুর, হালিশহরে রামপ্রসাদের আসন ও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের সচিত্র বিবরণও ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে।

"ফেরঙ্গ-সভ্যতা-বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজের শিক্ষাদাতা" বাঙ্গালীর বঙ্কিমচন্দ্রের নামে 'স্বরাজে'র মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। "তাঁহার আনন্দমঠে 'স্বরাজে'র মহামন্ত্র নিহিত আছে—তাই তাঁহার আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার জীবনকথার আলোচনা করিয়া তাঁহার বন্দে মাতরম্‌ গীত গাহিয়া আমরা স্বরাজের মঙ্গলাচরণ করিলাম।"

'স্বরাজে'র প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত "অনুষ্ঠান-পত্রটি" উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে:—

> বিশুদ্ধ ভাষায় বলে—স্বরাজ্য; চলিত ভাষায়—স্বরাজ। অথবা, যে মহিমায় ব্যক্তি—নিজের মহিমায় যাহা বিরাজ করে, তাহাই স্বরাজ। স্বরাজের প্রতিষ্ঠা—মহিমায়। মহিমা—মধুরিমা নহে। ছোট ফুলটি মধুর বটে—মহৎ নয়। মহিমা—বিশালতাও নহে। দশকুশী মাঠ বিশাল বটে, কিন্তু মহিমার স্ফূর্ত্তি সেখানে দেখা যায় না। মহিমা তবে কি? যে পূর্ণতা ভেদ বিরোধে সমন্বয় ঘটায়—যে উদারতা বিষম ছন্দে সুষমা আনয়ন করে, তাহাই মহত্বের ভাব—মহিমা। একটি দৃষ্টান্ত লইলে এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে। মহিমাকে যদি দর্শন করিতে চাও ত হিমাচলে চল। ঐ যে গিরিরাজ দেখিতেছ, উহা অমৃতের ভাণ্ডার—আবার মৃত্যুরও আধার। অমৃতবাহিনী নিঝরিণীকুলের শীতল সঙ্কারে ঐ বিপুল শিলাবক্ষ সদাই স্নিগ্ধ—মৃত্যুভয়নিবারিণী শিলাসোহাগিনীর কুলকুল ধ্বনিতে ঐ হিমকন্দর মুখরিত—মৃতসঞ্জীবন বনস্পতিগণ ঐ পাষাণবিস্তারে সুপরিপুষ্ট। আবার ঐ হিমগিরিকুটে কালকূট ফুল ফুটে—অজগর গরল উদ্গার করে—বিষময় বনরাজি বিরাজ করে। ঐ উত্তুঙ্গ উত্তরাখণ্ড যোগিতাপসদিগের আশ্রম—আবার হিংস্র মার ও শ্বাপদকুলের বিহারভূমি। উহার মেখলায় মেঘের খেলা—শিরোদেশে তপনের জ্বালা। ঐ নগক্ষেত্রে কত সরোবর, কত নির্ঝর—আবার নির্মম-কঠোর পাষাণ-প্রসর। কোথাও বা ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত—কোথাও বা মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোল-আকম্পিত কুসুমবল্লরীর দোল। আবার উচ্চে হিমমণ্ডিত চূড়ারাজির অভ্রভেদ—নীচে তমিস্রাবিজড়িত গুহা-গহ্বরের পাতালবেধ। কি দুর্দ্দম দ্বন্দ্ব—কি ভয়ঙ্কর ভেদ—কি বিচিত্র বিরোধ—কি বিশাল বৈষম্য—ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়। কিন্তু খণ্ডতার ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া বিয়োগদৃষ্টি বর্জ্জন করিয়া যদি যোগদৃষ্টিতে দেখ, তাহা হইলে ঐ নগরাজের অচল প্রতিষ্ঠা তোমার সম্মুখে উদিত হইবে; দেখিবে—উহার অচলতা কাল-ঝটিকার সকল চাঞ্চল্যকে অঙ্গীকার করিয়াছে—উহার উদারতা সমস্ত দ্বন্দ্বের মিলন ঘটাইয়াছে—উহার পূর্ণতা ভেদবহুলতার অভেদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যে যোগ জানে, সে হিমালয়ের বিরোধ-বিষমতায় বিহ্বল হয় না—উহার অমৃত-পানে মদমত্ত হয় না। হিমালয়ের যোগমহিমায় যদি একবার অধিষ্ঠিত হও ত তুমি উহার সকল ভেদ-বিরোধ আদরের সহিত স্বীকার

---

* [illegible] মিত্র: 'উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' (ইং ১৯২২); B. Animananda: 'The Blade' (1949).

† আমি 'সন্ধ্যা'র ১ম বর্ষের ২৩৪ সংখ্যাখানি দেখিয়াছি; ইহার প্রকাশকাল—[illegible]ই কার্ত্তিক ১৩১২ (২৫ অক্টোবর ১৯০৫), বুধবার। ইহা হইতে মনে হয়, ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে 'সন্ধ্যা' প্রথম প্রকাশিত হয়।

করিবে—উহার অমৃত-গরল—উহার সরসতা-কঠোরতা—উহার শুভ্রতা-কৃষ্ণতা—সকল বৈষম্য তোমাকে এক অপার ভূমানন্দে মজাইবে। এই জন্যই হিমালয়কে যোগালয় বলে। ইহাই যোগেশ্বর মহেশ্বরের পীঠস্থান। আর তাঁহার যোগশক্তি যোগমায়া যে হিমাচলকন্যা পার্ব্বতী—সে তত্ত্ব আর বুঝাইতে হইবে না। যোগের পূর্ণতা শূন্যতা নহে। ভেদাভেদ-সমন্বয়-পটুতাই যোগ। যেখানে দ্বন্দ্ব মিলনের যোগৈশ্বর্য্য, সেইখানেই পরম মহিমা বিরাজ করে। এই মহিমান্বিত গিরিরাজের ক্রোড়ে আর এক প্রতিষ্ঠা আছে। উহা অদ্বৈতরসসঞ্জীবিত বৈদিক সংস্কার-পরিপুষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণকমল-সুবাসিত অচল অটল হিন্দু সমাজ। দেখ একবার ঐ অদ্ভুত হিন্দুপ্রতিষ্ঠা। উহা নির্ব্বাণসাগরোন্মুখী আর্য জ্ঞানগঙ্গার বেদগাথাময় কুলুকুলু-ধ্বনিতে চিরগুঞ্জরিত—ভগবল্লীলারসে উহা মজ্জায় মজ্জায় অভিষিক্ত। আবার নাস্তিক বৌদ্ধ-বিষবৃক্ষ উহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে—বেদবিরোধী সাম্প্রদায়িকেরা উহার অন্তরে অন্তরে প্রবৃত্তির বিষ ঢালিয়া দিয়াছে—পাষণ্ড হিংস্র বর্ব্বর জাতিরা উহার তপোবনে কতই না বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। কতই না বিপ্লব-ঝঞ্ঝার বিতাড়ন—পরাজয়-পরাভবের উৎপীড়ন—উৎপাত-নিপাতের নিষ্পেষণ ঐ সনাতন সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়াছে ও করিতেছে। ওদিকে আবার বৃন্দাবন-কুসুম-পরিমল-সেবিত মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল উহার মর্ম্মে মর্ম্মে মধু-মাধুরী ছড়াইতেছে। উহার শ্রীঅঙ্গে কত অভ্যুত্থান অভ্যুদয়ের মহিমা মাখানো রহিয়াছে—কতই না বিজয়-লেখা উহার সুবিস্তৃত ললাটে অঙ্কিত আছে। কতই না শৌর্য্যবীর্য্যের গৌরব-কিরীট উহার শিরোদেশ শোভিত করিতেছে। দেখ একবার—কি বিরোধ-বাহুল্য—কি বিচিত্র-বৈষম্য ঐ অদ্ভুত সমাজ-প্রতিষ্ঠায় বিজড়িত আছে। বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া বিয়োগদৃষ্টির বশীভূত হইয়া ঐ অচল অটল অমর হিন্দু সমাজকে যে দেখে—সে উহার অভেদ মহিমা দেখিতে পায় না। কিন্তু যদি যোগদৃষ্টিতে দেখ ত বুঝিতে পারিবে যে, উহার অচলতায় সকল বিপ্লবচাঞ্চল্য বিলীন হইবে—উহার উদারতায় সকল ভেদ-বিরোধের সমন্বয় হইবে—উহার পূর্ণতায় সমস্ত বৈষম্য সুষমায় পর্য্যবসিত হইবে—উহার যোগমহিমায় সকল সঙ্ঘর্ষ ভূমানন্দের শান্তি লাভ করিবে।

আজ-কাল আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষা চলিতেছে, তাহাতে আমরা কেবলই বিয়োগশাস্ত্রে পটু হইতেছি। ফিরিঙ্গিরা আমাদের সনাতন সমাজতন্ত্র—আমাদের নিবৃত্তিময় সভ্যতা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিশ্লেষণের ছুরিকা দিয়া চিরিয়া চিরিয়া আমাদের সমক্ষে ফেলিয়া দিতেছে—আর আমরা ভাল-মন্দ সমস্তই কুড়াইয়া কুড়াইয়া ঘরে তুলিয়া লইতেছি—আর ঐ সকল টুকরা-গুলির সুখ্যাতি ও অখ্যাতির সমালোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। এই বিশ্লেষণের প্রকোপে আমরা ভালবাসা হারাইয়া ফেলিয়াছি—সেই সর্ব্বময় মহিমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আজ এত সমাজ-সংস্কারের আড়ম্বর ও কুলত্যাগের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আমি জানি—আমার জননী তিলোত্তমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন অথবা জগদম্বার ন্যায় সর্ব্বগুণশালিনী নহেন। কিন্তু তবু তিনি আমার মা। তাঁহার গুণও আছে, দোষও আছে—কিন্তু মাতৃমহিমা ঐ দোষ-গুণের দ্বন্দ্বে এক অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করে। সেই সুষমা সেই শোভা আমায় আত্মহারা করে—আমাকে মায়ের চরণে বাঁধিয়া রাখে। যদি কোন পাষণ্ড ঐ মাতৃমহিমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া সুকুমার বালকের কাছে মায়ের দোষগুলি ও গুণগুলি চিরিয়া দেখায়, তাহা হইলে ভালবাসা প্রীতি পূজা ঐ কোমল হৃদয় হইতে নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হয়। মায়ের সন্তান সমগ্র মাতৃবস্তুকে ভালবাসে—ভাল বলিয়া—বাসে—অঙ্গীকার করে—দোষ-গুণের সমালোচনা করে না। যখন তাহার প্রাণ মাতৃমহিমায় ভরপূর হয়—তখন সে দোষ-গুণ দেখে আর বলে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ। যদি বিমল চন্দ্রিকা ও কলঙ্করেখা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখ তাহা হইলে তুমি শুক্লেন চাঁদেরও নিন্দুক হইয়া উঠিবে। কিন্তু যে চাঁদের মহিমাতে মজিয়াছে, সেই চন্দ্রিকা ও রেখার মিলনতত্ত্ব বুঝে ও উহাতে ডুবে। সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যোগদৃষ্টি হারাইয়া ভেদদ্বন্দ্বে আমরা অভিভূত হইয়াছি—নিজ মহিমা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি—স্বরাজ-ভ্রষ্ট হইয়াছি। কি করিয়া সেই যোগদৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে—সেই অচলপ্রতিষ্ঠ হিন্দুসমাজের মহিমা আবার আমাদের প্রাণ-মনকে পূর্ণ করিবে। যত দিন না এই হিন্দুসমাজ হিমাদ্রির গৌরবে আমরা মাতিয়া উঠি, তত দিন আমাদের শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন সমস্তই মিথ্যা হইবে। ঐ যোগদৃষ্টির পুনরুত্থাপন করিতে—ঐ অভেদ মহিমার পুনরভ্যুদয় সাধিতে আমরা—স্বরাজ পত্র প্রকাশ করিতেছি। এই ক্ষুদ্র পত্রে দেশের যত ঐশ্বর্য্য আছে—জয়-পরাজয়, মিলন-বিরোধ, স্বাদুতা-তিক্ততা, কাঠিন্য-কারুণ্য, বৈষম্য-সুষমা—অতীত ও বর্ত্তমান যত গৌরব-বিকাশ আছে, সমস্তই আমরা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিব। ঋষিজন-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজের মহিমা আমাদের দেবালয়ে চতুষ্পাঠীতে বাণিজ্যস্থানে গড়দুর্গে বিরাজিত রহিয়াছে—পালপার্ব্বণে মেলায়-খেলায় আচার-ব্যবহারে কুলগৌরবে বংশমর্য্যাদায় পিতৃ-পিতামহগণের কীর্ত্তিতে সতীলক্ষ্মীদের আত্মত্যাগে উহা অনুস্যূত আছে। আমরা স্বরাজ পত্রে ঐ সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনীর সমুজ্জ্বল ছবি আঁকিব। আমোদের জন্য নহে—কৌতূহল নিবারণের জন্য নহে—কিন্তু সেই অচল মহিমা উদ্ভাবন করিবার জন্যই আমাদের সকল যত্ন নিয়োজিত হইবে। আমরা যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়া আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বিচরণ করিতেছি। যদি এই সকল ঐশ্বর্য্যের সুবিন্যস্ত চিত্রণ আলোচনা করিয়া সেই সমন্বয়সূত্র ধরিতে পারি—তাহা হইলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কালে কালে ভগবানের যত লীলা প্রকটিত হইয়াছে—সুখে-দুঃখে প্রতিষ্ঠা-বিপ্লবে জয়-পরাজয়ে সম্পদে-বিপদে মিলন-সঙ্ঘর্ষে—উহা সমস্তই যোগের একতায় গাঁথিয়া লইব।—অভেদের ক্রোড়ে সকল বিরোধ মিটাইব—স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিব। বিয়োগের আক্রমণ হইতে যদি বাঁচিতে চাও ত এক সুবিস্তৃত গণ্ডী আঁকিয়া নিজেদের একটি কোট প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই কোটে—সেই গণ্ডীর মাঝে স্বদেশী ঐশ্বর্য্য সাজাও—স্বদেশী শিক্ষাদীক্ষা বিধিব্যবস্থা বাণিজ্য ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত কর—স্বকীয় ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ম সংযম অনুষ্ঠান কর, বিদেশীয় বিশ্লেষ-ছুরিকার আঘাত প্রতিরোধ কর—অন্তর্মুখী

হইয়া সাধন কর—দেখিবে শীঘ্রই সেই বিয়োগবিনাশী যোগ-মহিমা তোমার অন্তরকে পূর্ণ করিবে—তুমি সকল ভেদ-বাহুল্যের অধিকারী হইয়া মহীয়ান্ হইবে—ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে। তোমার অন্তরমুখী সাধনার গুণে এক পাষণ্ডদলনী রিপুসংহারিণী শক্তি জাগরিত হইবে, যাহার বলে যোগবিঘ্নকারীরা প্রতিহত হইবে ও দীনতা স্বীকার করিয়া যোগালয়ের প্রাঙ্গণকোণে আশ্রয় লাভ করিবে—যাহার দোর্দ্দণ্ড তেজঃপ্রভাবে আর্য্যমহিমা আবার প্রকটিত হইবে। এই স্বরাজপত্র ঐ স্বদেশী গণ্ডী আঁকিয়া স্বদেশী কোট প্রস্তুত করিবার উপকরণ যোগাইবে—স্বদেশী ঐশ্বর্য্যের বিন্যাস করিয়া দিবে—বিদ্বেষীদের বিয়োগ-প্রভাব খর্ব্ব করিবে—অন্তর্ম্মুখী সাধনকল্পে সহায়তা করিবে—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা-ব্রতে আত্ম-সমর্পণ করিবে। স্বরাজ পত্রের বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর রণবীরদিগের সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া হইবে। আর তাঁহাদের যত কীর্ত্তি আছে, তাহাও চিত্রিত হইবে। দেবমন্দির তীর্থস্থান পীঠস্থান বিদ্যাস্থান শিল্প-বাণিজ্য-স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র গড়দুর্গ—সমস্তেরই আলেখ্য অঙ্কিত হইবে। আর চিত্রিত বিষয়গুলির ইতিহাসও দেওয়া হইবে। ইহাতে দেশের সংবাদ ও দেশের কথার সমালোচনাও থাকিবে। আমরা এই স্বরাজ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ধনবল জনবল বিদ্যাবল কিছুই নাই। কেবল মায়ের প্রসাদ ও মায়ের সন্তানের আনুকূল্যই আমাদের ভরসা।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন :—"ব্রহ্মবান্ধবের লেখনীপ্রসূত ভাষা গোমুখীনিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় কোটিতরঙ্গে উচ্ছলিয়া যাইত। অমন মিঠে মধুর ভাষা আমি আর পড়ি নাই।" রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা 'স্বরাজ' হইতে ব্রহ্মবান্ধবের দুই-চারিটি নাতিদীর্ঘ রচনা উদ্ধৃত করিব; এগুলিতে তাঁহার জীবনচরিতের কিছু কিছু উপাদানও মিলিবে।

প্রথম সংখ্যায় (২৬ ফাল্গুন, ১৩১৩) "স্বরাজ-গড়" নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে; উহা এইরূপ :—

"আমার ঘর নাই—পুত্র-কলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া—সেই নিভৃত স্থানে ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম কথাটি ভুলিয়া যাইতে—কিন্তু যত ভুলিতে যাই, তত ঐ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

কথাটি কি। ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জ্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে।—নির্জ্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম—আসিয়া দেখি যে, আমারি মত দু-চারি জন ভবঘুরে লোক ঐ দৈববাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা—এত বড় বড় লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধনজনবিহীন গরীবেরাই কেন এই খেয়ালে মজিল।

জানি না—ভগবানের কি উদ্দেশ্য। এই সুসমাচারে সাক্ষ্য আজ আমি দিব। আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবনস্পর্শে যেমন শীতার্ত্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জনসমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীরহৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম। মাদৃশ হীনজনের নিকট এত বড় কথার অবতারণা কেন হইল। কিন্তু যখন দেখিলাম যে, আমি একেলা নই—আরও আমার মত পাগল আছে—তখন বুঝিলাম, আর এড়াইবার উপায় নাই—এখন দল বাঁধিয়া মুক্তির রোল তুলিতে হইবে—যাহা গোপনে শুনিয়াছি, তাহা ভেরী বাজাইয়া বলিতে হইবে। আরও যখন দেখিলাম—স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষেপিয়া উঠিতেছে—মুক্তির সমাচারে শত শত নরনারী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছে, তখন বুঝিলাম—উদ্ধারের দিন সন্নিকট। আবার যখন দেখিলাম—আমাদের ফিরিঙ্গী-ভাব-মুগ্ধ বাবুদের দল মুক্তির সংবাদ সহিতে না পারিয়া আমাদের কত কুৎসা রটাইতে লাগিল—নূতন ভাবের ভাবুকদের কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—তখনই রঙ্গ বাধিল—রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ওরা যতই নিন্দা করে—তাড়না করে—ততই প্রাণে প্রাণে সিংহবল জাগিয়া উঠে—প্রাণ যায় সেও স্বীকার—স্বাধীনতার ধ্বজা ভারত-আকাশে উড়াইবই উড়াইব। এ কি বাতুলের কথা! তোমরা আসিয়া দেখ—আমার মর্ম্মস্থল চিরিয়া দেখ—মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঐ কথাটি লেখা রহিয়াছে—স্বাধীনতা—মুক্তি—স্বরাজ।

তোমরা অত ভয় পাও কেন। তোমাদের প্রাণটা একবার খুলিয়া দেখ দেখি। দেখিতে পাইবে যে, তোমাদেরও প্রাণে ঐ মুক্তি-সঙ্গীত বাজিতেছে। তোমরা যে মায়ের ছেলে—ফিরিঙ্গীকে অত ভয় কর কেন। কপটতা ছাড়িয়া দিয়া—এস, সকলে একবার সপ্ত-কোটী কণ্ঠে বলি—বন্দে মাতরম্—মায়ের ছেলে হইব—স্বাধীন হইব—স্বরাজ স্থাপন করিব।

আমি নর্ম্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি—স্থানে স্থানে স্বরাজ-গড় নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সেই সকল গড় যজ্ঞীয় হোমধূমে পূত হইবে—বিজয় সিংহনাদে ধ্বনিত হইবে—শস্য-শ্যামলতায় পূর্ণ-শ্রী হইবে। এস এস সবে—যাহারা মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ—পুরানো বাঁধন ছাড়িয়া সেই স্বরাজ-গড়ের প্রজা হই। কেন আর ভাব—ভাবনার কি এই সময়? শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যখন বাজে, তখন কি আর ভাবনা থাকে—সৌজন্য ভদ্রতা কি আর রক্ষা করা যায়? ঐ দেখ, রাখাল-বালকেরা বাপ-মা ঘর-দ্বার ছাড়িয়া রাখালরাজের সঙ্গে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঘরের কাজ করিবার সময় হয় না—খাইবার পর্য্যন্তও সময় হয় না। ওরা কোন বাঁধন মানে না—মানিবার প্রয়োজনও নাই—ওরা যে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়াছে—কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াছে।

যখন ভাই, ঘরে আগুন লাগে, [illegible]

হইয়া বসিবার সময় থাকে—তখন কেবল এলোমেলো চাল—কেবল রোল কেবল গোল। তখন আর পুকুরের জল—কি নর্দ্দামার জল—জ্ঞান থাকে না। কেবল—ঢালো ঢালো, নিবাও নিবাও।

শুনেছি মুক্তির সংবাদ! আমার জপ তপ বাঁধন-ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজ গড় গড়িতে—স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান। এস, তোমরাও এস—যদি মুক্ত হইতে চাও—যদি স্বাধীন হইতে চাও ত এস। পুরানো বাঁধন ছিঁড়িয়া এস—নূতন স্বরাজ-গড়ে আসিয়া নূতন তন্ত্র গ্রহণ করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও! আর সংশয় করিও না—সঙ্কোচ করিও না—সংবাদ আসিয়াছে—ভারত স্বাধীন হইবে—বিলম্ব আর নাই।"

তৃতীয় সংখ্যায় (১০ চৈত্র ১৩১৩) "রামকৃষ্ণ-কথা" বিবৃত হইয়াছে। স্থানাভাবে আমরা মাত্র উহার "অবতরণিকা" অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভারতেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। ভারতেই বেদবিহিত আশ্রমধর্ম্মের সুদৃঢ় বেষ্টনে উহা সুরক্ষিত হইয়াছে। আর বিধাতার নির্দ্দেশে পৃথিবীতে যত অশান্তি ভেদবিরোধ আছে, তাহা সমস্তই এই পুণ্যভূমি ভারতে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে পূর্ণতা লাভ করিবে। পরে সেই পূর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ পৃথিবীর সকল জাতিকে নিবৃত্তির আনন্দে সম্মিলিত করিবে। এই কারণেই ভারতে নানা শক্তির নানা জাতির মেলা লাগিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতোপনিষদে ঐ উদার সমন্বয়ের মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্রবলে কতই না নব-নব ভাব-সংঘর্ষ একতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এখন আবার বিরোধ বাধিয়াছে। নূতন নূতন শক্তির টানে নূতন নূতন ভাববিলাসে ভারত আবার আন্দোলিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে—এই আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে? কে আবার ঐ শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত মন্ত্র-বলে এই ভেদবৈষম্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবে?

রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়-বাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছিলেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজ-ভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান্ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না—উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান্ রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।"

স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের (৪ জুলাই ১৯০২) অব্যবহিত পরেই তাঁহারই ব্রত উদ্‌যাপন মানসে ব্রহ্মবান্ধব বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। স্বামীজীর প্রেরণাশক্তিই যে তাঁহাকে সুদূর সাগরপারে আকর্ষণ করিয়াছিল, ৮ম সংখ্যায় (২২ বৈশাখ ১৩১৪) মুদ্রিত "স্বামী বিবেকানন্দ" ও "বিবেকানন্দ কে?" নামে রচনা দুইটি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে :—

"এই অশান্তির দিনে উদাসীন সন্ন্যাসীর কথা লইয়া আলোচনা করা কি সঙ্গত? স্বামীজী কামিনী-কাঞ্চন-বিরক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যথার ব্যথী ছিলেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ফিরিঙ্গি জাতি ভারতের জ্ঞান-বিদ্যা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সভ্যতা-সমাজকে পদদলিত করিতেছে—জগতের নিকটে উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া প্রদর্শন করিতেছে—উহার মূল উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্য স্থূল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর ভারত-সন্তানেরা কোথায় ইহার প্রতিকার করিবে—না আত্মবিস্মৃত হইয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করিতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যথাই তাঁহাকে সাগরপারে সুদূর ফিরিঙ্গিস্থানে লইয়া গিয়াছিল। ঐ মায়াবীদের দেশে গিয়া তিনি একাকী আর্য্য জ্ঞানের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছিলেন। কে এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ইহার স্পর্দ্ধা ত কম নয়—স্থূলবিজ্ঞানদৃপ্ত ফিরিঙ্গির কোটের ভিতরে গিয়া সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন—হিন্দু জাতি জগতের গুরু—একমাত্র হিন্দুর নিবৃত্তিময়ী সভ্যতাই জগৎকে শান্তি ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে।—ঐ বিজয়ভেরীর রব—ঐ সিংহনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ফিরিঙ্গিস্থানের নরনারীরা চকিত স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আর্য জ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই—সকল বিজ্ঞান—সকল কর্ম্মকৌশল—বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব দ্বারায় উৎকর্ষ ও চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বামীজী—আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্প-গাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে—তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয় পদার্থে ভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার অনুষ্ঠিত ব্রতের সমাধা সহজেও হইবে না। কত বাধা বিঘ্ন জয় করিতে হইবে—কত দেববিদ্বেষী নিশাচর সংহার করিতে হইবে—তবে ত উহার সিদ্ধি হইবে। এই ঘোর সংগ্রামে যখন আমি বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক ফিরিয়াই আসিয়া প্রাণমনকে ভরপূর করিয়া ফেলে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভিত্তির উপরে যে স্বরাজ-মন্দির নির্ম্মিত হইবে—তাহার চূড়ায় আর্য্য জ্ঞানের স্বর্ণকলস দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিবে—

উহাতে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বসিবে—উহার প্রাঙ্গণে ফিরিঙ্গিপ্রমুখ জাতিরা সেবাদাস হইয়া মায়ের প্রসাদ লাভ করিবে।"

*　　　*　　　*

"দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইষ্টিশানে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—শুনিবা মাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার ত অনেক উপযুক্ত বিদ্বান্ গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইষ্টিশানে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি আমার মত দীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছু দিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) বা কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে সকল চিঠি আমায় লিখিয়াছেন, তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে, বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল, তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মত। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই, চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—একবার কলিকাতা সহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।—বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্ব্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহারি জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময়—ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা—দেশের জন্য ব্যথা। আর্য জ্ঞান আর্য্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য্য, তাহাই সূক্ষ্মকে উদারবস্তুকে আর্য্যত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই, ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে, উহাতে মার্কিণ ও যুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে। দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়? যদি হয় ত বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সতেরো

উক্ত উৎসবের কয়েক দিন পূর্বে গোবিন্দনারায়ণের মহলের সেই সুসজ্জিত দালানে 'বিদ্যা-ভারতী শিক্ষা প্রসার প্রতিষ্ঠানে'র এক বৈঠক আহূত হওয়ায়, কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। বধূরাণী চণ্ডীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সময় 'বিদ্যা-ভারতী' উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারের সভায় তাঁহারই পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রসার প্রস্তাবকে উপলক্ষ করিয়া যখন প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজ আরম্ভ হয়, সদস্যগণ নামকরণ সম্পর্কে একবাক্যে বিদ্যা-ভারতী নামটি রাখিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যা-ভারতীর একান্ত আপত্তি সত্ত্বেও সদস্যগণের সমবেত নির্বন্ধাতিশয্যে তাহা গৃহীত হয়। সুতরাং সেই নামেই প্রতিষ্ঠানের কাজ চলিতেছে।

পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রীকে সভাপতি করিয়া প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডাঃ রায় ও রাজীব যুগ্ম সম্পাদকরূপে কাজ করিতেছে। সদস্যদের মধ্যে রাধানাথ বাপুলী, গোবিন্দনারায়ণ, বিদ্যাভারতী ও গৌরী দেবী—উপস্থিত এই কয় জনের নাম দেখা যায়। এদিনের বৈঠকে গৌরী দেবীর যোগ দিবার কথা থাকায় তাহাকে আনিবার জন্য শ্যামাপুরে গাড়ী পাঠানো হইয়াছে। গৌরী দেবী ব্যতীত সকলেই উপস্থিত—সে আসিলেই সভার কাজ আরম্ভ হয়।

সকালের দিকেই বৈঠক বসিয়াছে। বৈঠকের পর এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যা-ভারতীর সাগ্রহ অনুরোধে বাহিরের সকলেই সম্মতি দিয়াছেন। এখানে আসিবার পর প্রত্যেককেই প্রাতরাশেও পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

কথা হইতেছিল নিবারণের পুণ্যাহ উৎসব এবং তরলার নারী-প্রগতি সমিতি লইয়া। শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছিলেন: রায় সাহেব গোড়াতেই মস্ত ভুল করেছিলেন। জমিদারদের উপর তাঁর একটা বিদ্বেষ ছিল বলে তিনি হরিনারায়ণ বাবুর মতন জমিদারের বুকে বসে দাড়ি উপড়াবার মতলব করেছিলেন। শিল্পপতিরা যে ভূমিপতির চেয়ে করিতকর্মা আর চালিয়াৎ লোক, সেটা হাতে-কলমে দেখাতে চেয়েছিলেন। চুপি-চুপি জমিদারের এলাকাতেই লাখরাজ জমি কিনে ফেললেন—জমিদারের সেরেস্তায় খাজনা দিতে হবে না, রাজা-প্রজা সম্বন্ধ থাকবে না—এই ভেবে। ইমারতও ফাঁদলেন জমিদার-বাড়ীর ওপর টেক্কা দিয়ে। জমিদার-বাড়ীর দেউড়ীর মাথায় দু'দিকে দু'টো সিংহ, ওঁর দেউড়ীতে বসালেন বাঘ। তার পর নদীর কিনারায় যে অঞ্চলটা অন্য তালুকের এলাকায় পড়ে—আসল তালুকটা নদীর ওপারে, উনি তাড়াতাড়ি সেই অঞ্চলটায় মিল বসাবেন বলে গবরমেণ্টকে ধরে য়্যাকুইজিসানের ফন্দী আঁটলেন। করলেন সব কিন্তু হয়ে দাঁড়ালো সেই বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরোর মতন! জলে বাস করতে নেমে কুমীরকেই কলা দেখাতে গেলেন। সবাই জানে, হরিনারায়ণ বাবুর ধনুর্ভঙ্গ পণ—এ অঞ্চলে জুট মিল বসাতে দেবেন না। রায় সাহেবও জেদ ধরলেন—মিল বসিয়ে তবে ছাড়বেন ওপারে বসে বিধাতা পুরুষও হেসেছিলেন নিশ্চয়ই। তার ফল হলো কি—শেষে ঢাকি পর্যন্ত বিসর্জ্জন হোয়ে গেল। ভূতেই কাণ্ডটা করুক বা রায় সাহেবের দুরদৃষ্টেই সব তছ্‌নছ্‌ হোক, কেউ কিন্তু বলতে পারবে না যে হরিনারায়ণ বাবুই ও-সব করিয়েছেন। এ ব্যাপারে কেউ তাঁকে না রাম, না গঙ্গা—কিছুই বলতে শোনেনি। এমন কি, তাঁরই সেরেস্তার কর্মচারী আর পাইক-বরকন্দাজরা হানবাই হোয়ে পড়ে রায় সাহেবদের উদ্ধার না করলে হয়ত প্রাণে বাঁচতেন না কেউ। তার পর হলো কি না—সুদিনে যে জমিদার-বাড়ীর ত্রিসীমায়ও যাননি, দুদিনে সেখানেই পাত পাড়তে হলো, দুর্যোগের সে রাতটাও ওখানেই কাটালেন। এই জন্যেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, দম্ভ করে কিম্বা কারুর ওপর টেক্কা দিয়ে কোন বড় কাজ করতে নেই।

বাপুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে সহাস্যে বলিলেন: আসলে রায় সাহেব হরিনারায়ণ বাবুর চোখ দু'টোই খুলে দিয়ে গেলেন। রায় সাহেব যে সময় মিল বসাবার জন্যে গ্রামকে গ্রাম য়্যাকুইজিসানের ফন্দী আঁটছিলেন, হরিনারায়ণ বাবু সেই ফাঁকে সমস্ত তালুকটাই কিনে ফেললেন চুপি-চুপি। তাই আজ সরস্বতী নদীর ওপারের সরস্বতী পরগণাও আমাদের এষ্টেটের সামিল হয়েছে। তার পরই তালুকের মধ্যে ঢালাও হুকুম দেন—এর পর লাখরাজ জমি ষ্টেটকে না জানিয়ে কেউ যেন বিক্রী না করে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: সেই জন্যেই ত রায় সাহেবের হাবেলীর দিকে এ অঞ্চলের কেউ ঝুঁকতে ভরসা করেনি। ওটা কিনে বাস করতে যাওয়া মানেই ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে দেওয়া। ভালোই হোয়েছে, নিবারণ বাবু ঐ বাড়ীতে তাঁর মায়ের তালুকের কাছারী ফেঁদে—এ যেন সেই বিষস্য বিষমৌষধি—নয় কি?

বাপুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন: তা বটে! তবে কি জানেন শাস্ত্রী মশাই, বিষ বস্তুটা বড়ই বিশ্রী কি না; যদি গেঁজে ওঠে, তখন সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করবে কে যে নীলকণ্ঠ হবেন, সেও এক ভাবনার কথা। জানেন ত, সমুদ্র-মন্থনে বিষও উঠেছিল, আবার অপ্সরী উর্বশীও উঠেছিল; সেই সঙ্গে লক্ষ্মী যদি না উঠতেন, আর হরিহর না থাকতেন, তাহলে সেই দিনই সব ধ্বংস হয়ে যেত।

শাস্ত্রী মহাশয় সহাস্যে কহিলেন: তা বলে, এখানেও হরিনারায়ণ আছেন, ভয়ের কিছু নেই—শেষ রক্ষা তিনিই করবেন। এদিকেও আছেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আর গোবিন্দ, অতএব মা ভৈঃ।

কথাগুলি বলিতে বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় চণ্ডী ও গোবিন্দের দিকে চাহিলেন।

বাপুলী মহাশয় এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন: আপনি ত সবই জানেন শাস্ত্রী মশাই, চণ্ডীমা'র আগ্রহে আমরা যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলছি, এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই, ঐ যে রায় সাহেবের কথা বললেন—তাঁর মত কোন একটা লোক-দেখানো ভণ্ডামীও এতে নেই; শিক্ষা আর স্বাস্থ্য—এই দুটিরই সুব্যবস্থা এখন পল্লী অঞ্চলে প্রয়োজন, তারই জন্যে যথাসাধ্য আয়োজন আমরা করেছি। আমরা কিন্তু ভাবতে পারিনি যে, কারুর সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, কিম্বা আর কেউ আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। কিন্তু ছোট বাবুর সেরেস্তা, আর বঙ্কিনাথ বাবুর মেয়ে তরলার সমিতি ঐ কুখ্যাত একই বাড়ীতে খোলা হোচ্ছে শুনে সত্যিই আমাদের উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে।

চণ্ডীর দিকে চাহিয়া শাস্ত্রী মহাশয় সহসা প্রশ্ন করিলেন: মা বিদ্যা-ভারতীও কি উদ্বিগ্ন হয়েছেন?

চণ্ডীও এতক্ষণ নীরবেই দুই শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণের সংলাপ শুনিতেছিল। কথা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় এমন প্রশ্ন তাহাকে করিয়া বসিলেন যে, আর তাহার নীরব থাকা চলে না, এবং এই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে চলিয়াছে, ইহাতে তাহার কি অভিমত—তাহা জানিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের আগ্রহও স্বাভাবিক।

আস্তে আস্তে ধীর কণ্ঠে চণ্ডী শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল: আমার কথা যদি বলেন পণ্ডিত মশাই, তাহলে আমি বলব—ঠাকুরপোর সাহস দেখে আমি খুসিই হয়েছি। কুসংস্কার ও বাজে গুজোব আমাদের মন অনেক সময় দুর্বল করে দেয়, আমরা এগিয়ে যেতে ভয় পাই। এই বংশের প্রতিষ্ঠাকে খাটো করবার জন্যে যে বাড়ী এক দিন খাড়া করা হয়েছিল, তার দরজা আর খোলা হয়নি বলে চুপ করে না থেকে ঠাকুরপো যে ঐ বাড়ীতেই ঢুকে বসছেন, এতে উনি বংশের মুখরক্ষাই করছেন। এ বয়সে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা মানেই মনকে ছোট করা—যত সব কুচিন্তাকে মনের মধ্যে ঠাঁই দেওয়া। ওঁর যে রকম স্বভাব, মনের মত লোকের মন্ত্রণা হয়ত নেবেন, কিন্তু কারুর কথা মত বা হুকুম মেনে চলবার পাত্র উনি নন। মায়ের চেয়ে ছেলেকে বেশী কে চিনবে বলুন? ওঁর প্রকৃতি জেনেই মা ওঁকে আলাদা একটা গদীতে বসিয়েছেন, ভালোই করেছেন। এতে যদি মনে ওঁর রেশারেশির ভাব জেগেও ওঠে, সেও আমি ভালো মনে করি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—চুপ করে বসে-বসে মনমরা হয়ে থাকার চেয়ে ডাকাতি করাও ভালো। বাঙ্গালীরা বলে—শয়তান নিষ্কর্মাদের খুঁজে বেড়ায়। তাই বলি, গদিয়ান হোয়ে বসে থেকে হিংসাপনা কুঁড়েমি না করে ঠাকুরপো যদি কাজে ডানপিটে জবরদস্ত হোয়ে ওঠেন, সেও ঢের ভালো।

বাপুলী মহাশয় বলিলেন: শুনলেন ত শাস্ত্রী মশাই, চণ্ডীমা'র কথা? আমরা হয়ত এই নিয়ে একটা খারাপ কিছু হতে পারে ভেবে মনে মনে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম, আর উনি কি না খপ করে বলে ফেললেন—এতে উনি খুসিই হোয়েছেন, ওঁর ঠাকুরপো যা চান, তাই পেয়েছেন—এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: না হয়, তোমার কথাই মেনে নিলাম মা, নিবারণ বাবু বিষয় পেয়ে আর ঐ পোড়ো বাড়ী জমকে বসে ভালোই করেছেন। কিন্তু বঙ্কিনাথের মেয়ে? ওর সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা বল ত মা? ও যে তোমার ওপর টেক্কা দিয়ে একটা সমিতি গড়েছে, শুনছি না কি কলকাতা থেকে কতকগুলো দিগ্গজ মেয়ে নিয়ে এসেছে—তারা লেকচার দিয়ে গ্রামের মেয়েদের বিগড়ে দেবে—এতে তুমি কি বলতে চাও, বল ত মা? ওদের এই আন্দোলন কি সমর্থন কর?

তেমনি ধীর ভাবেই চণ্ডী উত্তর করিল: আমি এই জানি, পণ্ডিত মশাই, আন্দোলন বলতে বোঝায়—চেতনা। মানুষ যখন কোন বিষয় খুব ভালো করে বুঝে নিজেকেও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তখন তার মনে এই সাধ হয় যে, সেটা সবাইকে বুঝিয়ে অবস্থার পরিবর্তন করে। তখনই তার মনে চেতনা আসে। এই চেতনাই তাকে আন্দোলনে মাতায়, আর সে আন্দোলন সার্থক হোতে বাধ্য। এখন দেখতে হবে পণ্ডিত মশাই, যে বিষয় নিয়ে তরলা আন্দোলন চালাতে চাইছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে ঠিক মত চেতনা এসেছে কি না? আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে এইটুকু বুঝতে পেরেছি—রান্না-বান্না আর ঘরকন্না ছাড়াও মেয়েদের যে আরো কিছু করবার আছে, এ-চেতনা সত্যিই তাঁর মধ্যে এসেছে। সেই জন্যেই তাঁকে পেয়ে আমি আশা করেছিলাম, এ অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যেও আস্তে আস্তে উনি এ চেতনা জাগাতে পারবেন, তাদের বোঝাবেন যে, রান্না-বান্না আর ঘরকন্না করতে করতেই আরো অনেক কিছু কাজ করতে পারা যায়। তাতেও জ্ঞান বাড়বে, অনেক জানা-শোনা হবে, তাতে সংসারের সুসারও হবে। এর বেশী কিছু ওঁর কাছে প্রত্যাশা আমি করিনি। কিন্তু উনি গোড়াতেই সমাজ-সংস্কার করতে মেতে উঠেছেন। এ তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার। তার পর, আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে কোন চেতনাই ওঁর মধ্যে আসেনি। বাঙ্গালী মেয়েদের অবস্থা উনি দেখছেন। এদের মনে নেই দুরাশা, জীবনে নেই ষড়যন্ত্র দলাদলি, মনে দুঃখ বিরক্তি বা অসন্তোষ এলে তখনি ঝেড়ে ফেলে, দুরন্তপণা বা মারামারির কথা ভাবতেই এরা পারে না; বড় জোর এরা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ী যেতে জানে, তার পর রাগ পড়ে গেলে ফিরে এসে মিটমাট করে স্বামীর বাধ্য হয়ে থাকে; খুব যারা ভালো মেয়ে—শান্ত শিষ্ট ধীর, নিজেকে স্বামীর সেবিকা ভেবেই সুখী থাকে। এই তো বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনধারার গতি! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এদের মধ্যে কেউই ঠিক বন্ধুর মত স্বামীর সঙ্গী হোতে পারেনি—এখানে স্বামি-স্ত্রী দু'পক্ষেরই ত্রুটি। আমার মনে হয়, এ ত্রুটি তরলার মত শিক্ষিতা মেয়েরও আছে; নৈলে, স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হোত না। নিশ্চয়ই তিনি স্বামীর বন্ধু হোতে পারেননি। এখন বলুন ত, যে দিকটা নিজেই ভালো করে বুঝতে পারেননি, পথ চেনা নয়, কি করে তিনি অগ্রবর্তিনী হোয়ে আর দশ জন মেয়েকে সে পথে নিয়ে যাবেন? কাজেই, এ নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই!

অসহিষ্ণু ভাবে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: তোমার যুক্তি অকাট্য মা, এমন সব কথা আমরাও কোন দিন ভাবিনি। কিন্তু এ আন্দোলনে সমাজের অনিষ্ট হবে জেনেও ব্যস্ত হোতে বারণ করছ কেন, সে ত ভেবে পাচ্ছি নে। আমার মতে, এখন থেকেই বাধা দেওয়া উচিত, যাতে ও আন্দোলন গোড়াতেই বন্ধ হোয়ে যায়।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল: আমাকে ক্ষমা করবেন পণ্ডিত

মশাই, এখানেও কিন্তু আমার ঐ এক কথা—জড়ভরতের মত বসে থেকে মন ভারি করার চেয়ে একটা এমন কিছু করাই ভালো, যাতে বেশ সাড়া পড়ে যায়। কি আছে আমাদের সমাজের মেয়েদের মধ্যে বলুন ত? সাধ করে কি কবিগুরু আমাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

আমার কেবল আছে জানা—
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার
খাওয়ার পরে রান্না-বান্না।

এই তো মেয়েদের অবস্থা? করুক না একটা আন্দোলন, শুনুক না বাইরের মেয়েদের মুখের কথা; শুনে মনের জড়তাও ত কাটবে। তাই বা মন্দ কি? তবে, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই পণ্ডিত মশাই, তরলারা নারী-প্রগতির দিক দিয়ে ও-দেশের অনুকরণে মেয়েদের স্বাধীন করবার জন্যে যত চেষ্টাই করুন আর আন্দোলন চালান, একটা দোলা দেওয়া ছাড়া দলে যে কাউকে ভিড়াতে পারবেন তা মনে হয় না। তার কারণ, অতীতের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ভাবধারার উপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না থাকলে লোকের শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না। তাহলেও তরলার এই চেষ্টা দেখে মেয়েরা একটু ভরসাও ত পাবে, ভাবতেও ত শিখবে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: কিন্তু মা, তুমি যে আদর্শ দেখিয়েছ, এ অঞ্চলে সমাজের সব স্তরেই তাই নিয়ে সবাই ধন্য ধন্য করেছে। বিচারের সঙ্গে যাদের কোন সম্বন্ধই নেই, তারা পর্যন্ত। এর পর তরলার ঐ কু-আদর্শের ফল কি খারাপ হবে না বলতে চাও, মা?

তেমনই ধীর ভাবে আস্তে আস্তে চণ্ডী শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিল: কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে পণ্ডিত মশাই, তরলাও সমাজের মেয়ে; নিজের জীবনে একটা শক্ত আঘাতও সে পেয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজবিরোধী কাজ যদি সে করতে চায় গায়ের জ্বালায়, তার জন্যে আমাদের কোমর বেঁধে তাকে বাধা দিতে যাওয়া কখনই ঠিক হবে না বলেই আমি মনে করি। আপনিই বলুন, যে ক্ষতি তার হোয়েছে, তার কোন প্রতিকারও ত সমাজ করেনি। এখনই তাকে শাস্তি দিতে যাওয়াও কি সঙ্গত হবে? এর ফলে তার রোক আরও উগ্র হোয়ে উঠবে, হয়ত সমাজের বাইরেই চলে যাবে সে। যদি তরলা আমাদের সমাজের মেয়ে না হোত, তাহলে আমরা কখনই চুপ করে থাকতে পারতাম না। আপনারাও শুনেছেন, বিয়ের আগে শ্যামাপুরে মিশনারী স্কুলের খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর কাজে আমি বাধা দিয়েছিলাম, তার কারণ, ভিন্ন সমাজ থেকে এসে তিনি আমাদের সমাজের ক্ষতি করছিলেন। তরলা হোচ্ছেন আমাদের সমাজের মেয়ে, আমরা ওঁকে সমাজের বাইরে যেতে দেব না—সমাজের মধ্যেই ধরে রাখব! ওঁর মনের অবস্থা ভেবে সাময়িক ঔদ্ধত্য আমাদের সহ্য করতেই হবে ওঁরই মুখ চেয়ে। ওঁর জন্যেই আমরা ওঁকে সহ্য করব।

শাস্ত্রী মহাশয় এখন গাঢ় স্বরে বলিলেন: তোমার আসল কথা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি মা! সতিক্ষুতা ও ধীর বুদ্ধিতে তুমি আমার মত প্রবীণকেও হারিয়ে দিলে!

ডাঃ রায় এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনিও সানন্দে বলিয়া উঠিলেন: আপনার কথা আমরা দূর থেকেই শুনেছিলাম; শোনা কথা থেকে মনে এমনি একটা ধারণা জেগেছিল যে, নামের মতই বুঝি আপনার প্রকৃতিও উগ্র। কিন্তু আজকের বৈঠকে বিরোধী দলের প্রতি আপনি যে রকম সহানুভূতি দেখালেন, যে অকাট্য যুক্তি দিয়ে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন, তাতে ঐ ধারণার জন্যে সত্যি লজ্জা পাচ্ছি।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে কথাটার উত্তর দিল: আপনার লজ্জা করবার কিছু নেই প্রতাপ বাবু, বিরোধের মূলে যদি যুক্তি থাকে—তাতে রাগ করবার কথাই আসে না, বরং আনন্দই হয়; কিন্তু দম্ভ আর অন্যায় নিয়ে বিরোধী পক্ষ যদি আস্ফালন করে, উপলক্ষ তার তুচ্ছ হোলেও সেটা সহ্য করা যায় না; তেমন কিছু ঘটলে আপনার লজ্জার জন্যেই হয়ত তখন লজ্জা পাবেন—নামের মত স্বভাবকেই উগ্র হোতে দেখে।

এই গভীর উক্তিটির অর্থ মনে মনেই প্রতাপ বাবু উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তৎপূর্বেই বাপুলী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন: আশ্চর্য, এ সব বিষয়ে কর্তার সঙ্গে বৌমা'র মতের এতটুকু অমিল নেই! প্রথম দেখার দিনেই তিনি ওঁকে চিনতে পেরেছিলেন, তাই ওঁর বিরুদ্ধে নালিশ শুনে বিচার করতে গিয়ে খুসি হোয়ে কুলবধূর মর্য্যাদা দিয়েছিলেন। এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া চণ্ডী মুখখানি ঈষৎ নত করিল। গোবিন্দনারায়ণ অপাঙ্গে পত্নীর দিকে একবার চাহিয়াই পরক্ষণে তাঁহার হাতের গ্রন্থে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। শাস্ত্রী মহাশয়, রাজীব ও নবাগত ডাক্তার রায়ের মুখগুলি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া—এই মনস্বিনী নারীর সান্নিধ্যে আসিবার জন্য প্রত্যেকেরই অন্তরে বুঝি নূতন করিয়া একটা সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হইল।

এই সময় গৌরীকে হলের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চণ্ডী তাড়াতাড়ি তাহার কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া সহর্ষে কহিল: এসো গৌরীদি, আমরা সবাই তোমার জন্যে উদ্‌গ্রীব হোয়ে প্রতীক্ষা করছি।

গোবিন্দনারায়ণ, ডাক্তার রায় ও রাজীব চণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াই ছিল, শাস্ত্রী মহাশয় ও বাপুলীকেও উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া চণ্ডীই সবিনয়ে বাধা দিয়া বলিল: ও কি করছেন—বসুন, বসুন; গৌরীদি আপনাদের মেয়ের মতই যে! আমরাই ওঁকে অভ্যর্থনা করছি।

গৌরী সহাস্যে বলিল: আমাকে অভ্যর্থনা করবার কিছু নেই—যখন দয়া করে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডেকে নিয়েছেন।

অতঃপর চণ্ডী গৌরীকে পরিচিত করিয়া দিল সকলের সঙ্গে—যদিও পাঠাগারের সভায় কাহারও কাহারও সহিত পূর্বেই গৌরীর পরিচয় হইয়াছিল। গৌরী সসম্ভ্রমে শাস্ত্রী মহাশয় ও বাপুলীকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, অপর সকলকে যুক্তকরে নমস্কার জানাইল। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর বৈঠকের কাজ আরম্ভ হইল। নকুল নামে এই মহলের পরিচারক গৌরীর স্যুটকেসটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া গেল।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: অনেকখানি পথ আসতে হয়েছে মা, গাড়ীতে এলেও শ্রান্তি স্বাভাবিক; কাজেই একটু—

মৃদু হাসিয়া গৌরী কহিল: আমরা হচ্ছি চণ্ডীর পাঠশালার মেয়ে, প্রত্যেকেই এক-একটি চামুণ্ডা-বিশেষ। আমাদের দেহ মনে

শান্তি নেই শাস্ত্রী মশাই! একেই দেরী হোয়ে গেয়ে, কাজেই ধূলো-পায়েই বসতে হয়েছে, আর এটা অবিধিও নয়। ধূলো-পায়ে দেবদর্শনের ব্যবস্থা আপনারাই দিয়েছেন, আর এও ত দেবকার্য, দেবালয়। কাজ ত আগে হয়ে থাক, তার পর সব হবে।

বাপুলী বলিলেন: হ্যাঁ, মা চণ্ডীর সখীর মতই কথা বটে!

ইহার পর প্রায় একটি ঘণ্টা ধরিয়া কাজের কথা হইল। নির্দিষ্ট ধারায় অন্যান্য সভার মত বক্তৃতা, বাক্-বিতণ্ডা ও প্রস্তাব লেখালেখি নয়—একেবারে সঙ্গে সঙ্গে কাজের ব্যবস্থা চালু করার জন্যই এই বৈঠক। বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী কাছারীর তৈরী বাড়ীগুলিতে পাঠাগার, পাঠশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপিত করায় সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতীকার করাই এ বৈঠকের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে যে কেন্দ্রগুলিতে কাজ চালু হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা যাঁহারা হাতে-কলমে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে দুই সম্পাদকদ্বয় স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়াছেন বা সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহাদের না-সূত্রে জানা গেল, মোটের উপর কাজ আশাপ্রদ হইয়াছে, অঞ্চলবাসীদের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে মেয়েদের পাঠশালা মেয়েদের দ্বারাই চালাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এমন শিক্ষা কাহারও নাই যে, নিজের বাড়ীর বা পাড়ার মেয়েদের শিক্ষার ভার লইতে পারে। এরূপ কেন্দ্রগুলিতে অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিতে হইবে। চিকিৎসালয় হইতে মেয়েদিগকে সেবার কাজ শিখাইবার জন্যও সেবাকার্যে নিপুণ নার্সের প্রয়োজন আছে। এই ভাবে অভাব ও অসুবিধাগুলি জ্ঞাত হইয়া বৈঠকেই যথাযোগ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা হইয়া গেল। স্থির হইল, ডাক্তার রায় কলিকাতা হইতে এমন কতকগুলি ধাত্রীকে পছন্দ করিয়া আনিবেন, যাঁহারা অন্ততঃ একটি বৎসর পল্লী অঞ্চলে থাকিয়া প্রত্যেক পল্লী পরিদর্শন করিবেন এবং যে সকল মেয়ের মেধা ও সেবা-শুশ্রূষা শিক্ষায় আগ্রহ আছে, তাঁহাদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া সর্বতোভাবে উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযুক্ত কতিপয় শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের ব্যবস্থাও হইল। নূতন গৃহনির্মাণ এবং রাজীবের নির্দেশ মত গ্রন্থ এবং চিকিৎসা বিভাগের ঔষধপত্র সরবরাহের বন্দোবস্তও হইয়া গেল।

অন্যান্য কেন্দ্র সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থার পর চণ্ডী গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিল: এখন তোমার কেন্দ্রের খবর বল। ওখানকার রিপোর্ট তোমার কাছে শুনে তার পর ব্যবস্থা করা হবে বলেই তোমায় আনা হয়েছে।

গৌরী মুখখানা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল: এ সব দিক দিয়ে আমাদের কেন্দ্রের খবর খুব ভালো। চণ্ডী-বিদ্যাপীঠে আমাদের যে ভাবে কাজ চলেছে, তাতে আমাদের কেন্দ্রই আগে বুড়ি ছোঁবে এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি। ওখানে এমন তিনটি শিক্ষয়িত্রী আমরা পেয়েছি, যাঁরা পড়াশোনায় যেমন পাকা, সেবা-শুশ্রূষায় আর শিল্পকলাতেও তেমনি তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর ফলে দশ-বারো বছরের মেয়েরাও লেখাপড়ার সঙ্গে সেলাই বোনা ও সেবা-শুশ্রূষার কাজ শিখেছে। তার পর, মা-চণ্ডীর উপাখ্যান ও-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে মেয়েদের মধ্যে এমনি একটা আগ্রহ জাগিয়েছে চণ্ডী-বিদ্যাপীঠে ভর্তি হবার—যার জন্যে শীগ্‌গির বড় বড় গোটা কতক ঘর তৈরী করে না দিলেই নয়। ভর্তি হোতে এলে, জায়গা নেই বললে তারা শোনে না, বারণ মানে না; বলে—বেঞ্চি না থাকে, আমরা মেঝেয় বসে পড়বো। এই হলো মেয়েদের দিকের কথা।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। চণ্ডী অর্থপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বাপুলীর দিকে চাহিতেই তিনি প্রসন্ন মুখে বলিলেন: কালই আমি মিস্ত্রী নিয়ে শ্যামাপুরে হাজির হচ্ছি। মা-চণ্ডীর বিদ্যাপীঠ যারা মন্ত্রবলে গড়েছিল, তারা অসাধ্য সাধন করবার আর একটা সুযোগ পাক, আর তাতে উপরি লাভও তাদের আছে।

চণ্ডী বলিল: আপনি যখন সেদিনের কথা মনে করে ভারটি নিলেন আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হলাম। এখন গৌরীদি, ওদিককার খবর বল। ওখানকার কাছারী-বাড়ীতে পুরুষদের জন্যে যে সব ব্যবস্থা—

গৌরী এখানে বাধা দিয়া মুখখানা আরও গম্ভীর করিয়া কহিল: ওদিককার খবর বলতে ভয় করছে; সব শুনে পাছে রণচণ্ডী হয়ে ওঠ!

পরিহাসের ভঙ্গিতে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল: অসুর হোয়ে আবার কে এল যে এ কথা গপ করে বললে?

গৌরী কহিল, সে হিসেব তুমিই কর, আমি বলেই খালাস। তুমি ত জানো, শ্যামাপুরের কাছারী সারা গ্রামের চার আনা জুড়ে থাকলেও, বাইরের লোকের কোন সুযোগ সুবিধাই সেখানে নেই। এক খাজনা দিতে যাওয়া ছাড়া কেউ ওখানে ঢুকতেই পারে না। অত বড় দীঘি, চার দিকে ঝিল—কারুর সাধ্য নেই যে, জল স্পর্শ করে। নায়েব মশাই কাউকেই ওখানে আমল দিতে চান না। ওঁর যেখানে যত সব আত্মীয়স্বজন আছে, ঘরগুলোতে তারাই বাস করে। আমি চেষ্টা করে গ্রাম থেকে বেছে বেছে কর্মী ছোকরাদের যোগাড় করলাম, কাজের কথা শুনে তাদের কি উৎসাহ! কিন্তু উনি কেবলই দিনের পর দিন ওদের ফেরাতে লাগলেন। একটা না একটা ওজর তুলে। শেষ কালে সেদিন জানিয়ে দিলেন—ও-সব এখানে হবে না।

গৌরীর বার্তা শুনিতে শুনিতে চণ্ডীর মুখভঙ্গি একবারে বদলাইয়া গেল। বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: নায়েব মশাই এ কথা বলেছেন? সদর থেকে হুকুম পেয়েও? কাকা বাবু, শুনুন আপনার নায়েব মশায়ের আস্পর্দ্ধা?

বাপুলী গম্ভীর ভাবে বলিলেন: একই হুকুম সব কাছারীতেই গেছে; সবাই মেনে নিয়েছে—যদিও স্বার্থের দিক দিয়ে তাদের অসুবিধা বিস্তর হয়েছে তা সত্ত্বেও; কিন্তু উনি হুকুম মানলেন না কেন? আর ও-কথাই বা বললেন কোন্ অধিকারে?

গৌরী বলিল: অধিকারটা না কি মহকুমা হাকিমের কাছ থেকেই পেয়েছেন তিনি, সেই জন্যই—

কথাটা শুনিয়া সকলেই অবাক হইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই দৃষ্টিপাতের মধ্যে চণ্ডীর প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটির অস্বাভাবিক দৃষ্টি বুঝি গৌরীর চক্ষুতে ধাঁধা লাগাইয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের কথা বন্ধ হইয়া গেল। চণ্ডীই
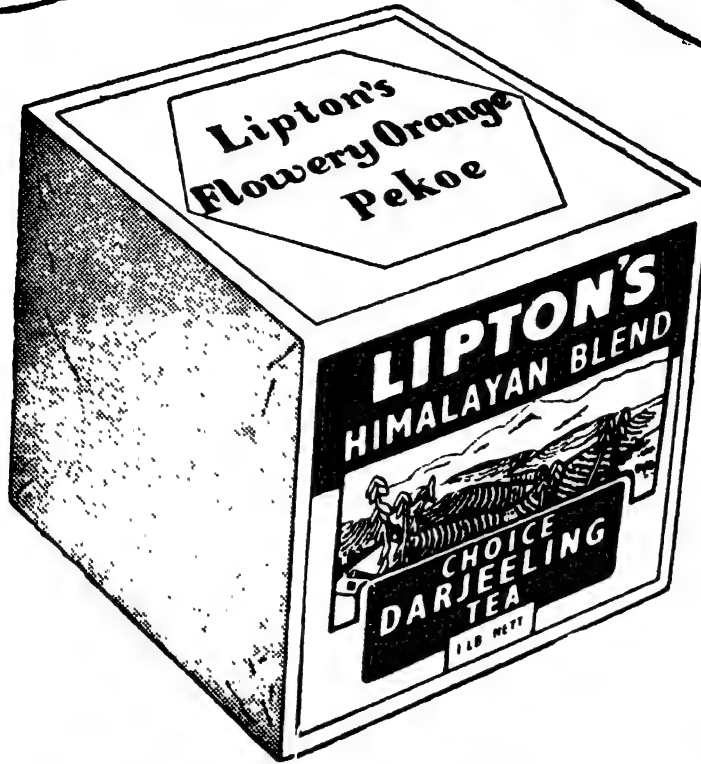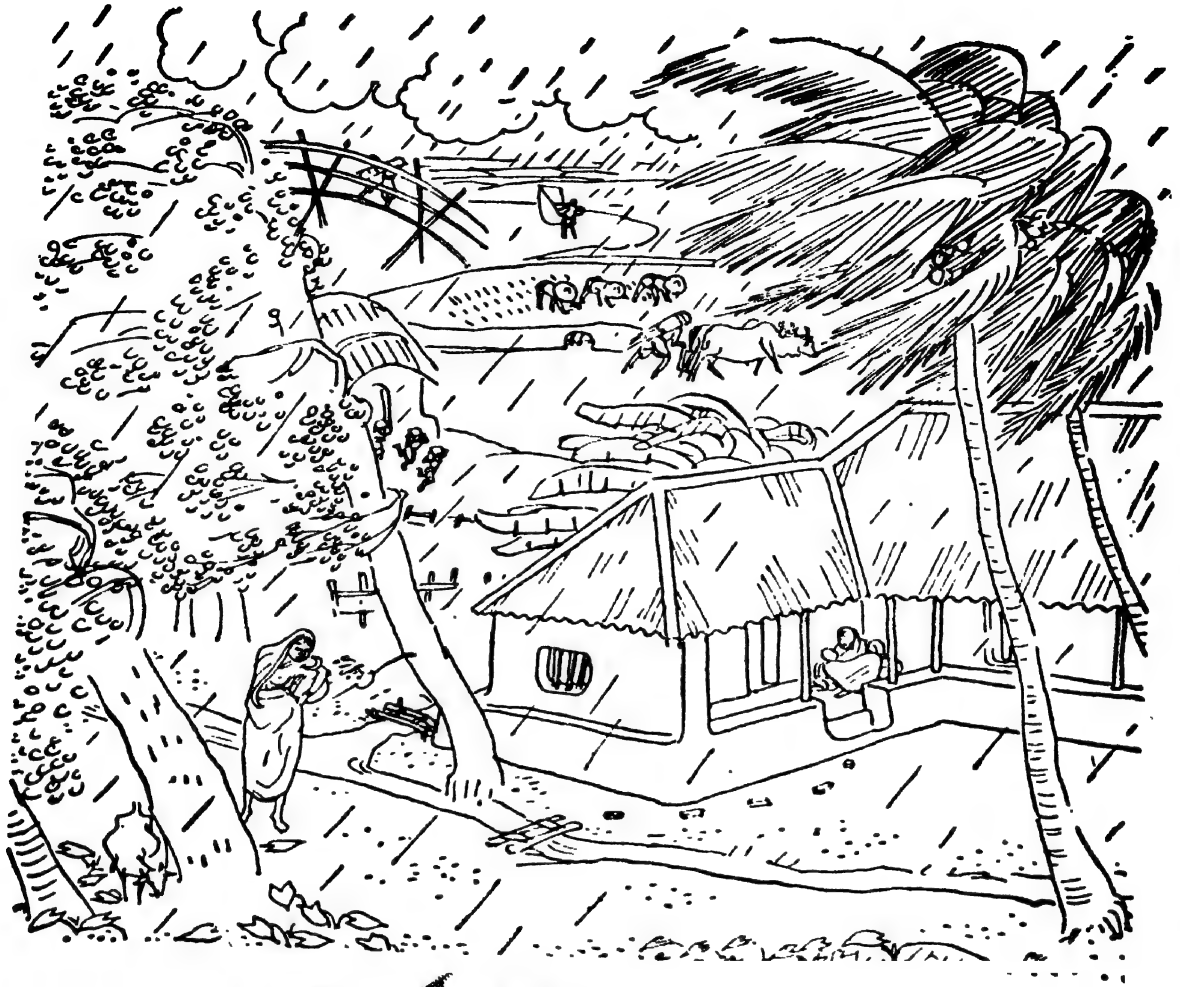
Lipton's Flowery Orange Pekoe
LIPTON'S
HIMALAYAN BLEND
CHOICE
DARJEELING
TEA
1 LB NETT
লিপটন
মানে
ভালো চা

LTX-180
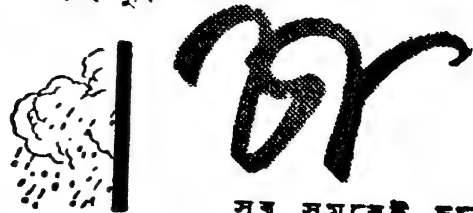
পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল : আমাদের ষ্টেটের কর্মচারীর সঙ্গে মহকুমা হাকিমের কি সম্বন্ধ যে, তিনি তাকে হুকুম দিতে পারেন? আর আমাদের হুকুম ঠেলে হাকিমের হুকুম মানতে যায় সে কোন্ এক্তিয়ারে?

প্রশ্নটা দীপ্ত কণ্ঠে গৌরীকে করিয়াই চণ্ডী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি বাপুলীর মুখে নিবদ্ধ করিল। বাপুলীও তৎক্ষণাৎ গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন : হাকিমের হুকুম পেয়েই নায়েব কি ও-কথা বলেছে মা? কথাটা স্পষ্ট করে বল দেখি, যা-যা শুনেছ?

গৌরী বলিতে লাগিল : ছেলেদের মুখের উপর ঐ কথা বলতেই তারা যখন তাঁকে ধরে ব'সে জানতে চায়—এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হবে না কেন? তখন তিনি বলেন,—কথাটা হাকিমের কানে গেছে, তিনি হুকুম করেছেন—ও-সব সমিতি-ফমিতি করা চলবে না। শেষে কি হাকিমের হুকুম অমান্য করে আমি শুদ্ধ ফ্যাসাদে পড়ব?

চণ্ডী ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। সকলেই অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিল যে, সেই ধীর স্থির শান্ত সহনশীলা নারীর আকৃতি ও প্রকৃতি সাধারণ এই খবরটিকে উপলক্ষ করিয়া পলকে কি আশ্চর্যরূপে বদলাইয়া গিয়াছে? তাহার কণ্ঠের সেই সুমিষ্ট স্বরও কতখানি উগ্র ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে? দুঃসহ ক্রোধে সে যেন আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না, এমনি তার অবস্থা।

বাপুলী জিজ্ঞাসা করিলেন : হাকিম থাকেন সদরে, ও-গ্রামের বাসিন্দা নন যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান খোলবার খবর পেয়েছেন। তা ছাড়া, শুনছি কোন কাজই ওখানে আরম্ভই হয়নি। আমি ত ভেবে পাচ্ছি না—এ অবস্থায় তাঁর কাছ থেকে আপত্তি আসবেই বা কেন?

গৌরী কহিল : আসল ব্যাপারটাও আমি জেনেছি। আগেই বলেছি, নায়েব মশায়ের ইচ্ছা নয় যে, ওঁর কাছারী-বাড়ীতে ও-সব হয়—তাহলে সব দিক দিয়েই ওঁর ক্ষতি। এখন হয়েছে কি, ওঁর এক আত্মীয় ওখানে থাকেন। তিনি হাকিমের সেরেস্তায় চাকরীও করেন। পাছে তাঁকে উঠে যেতে হয় এই জন্যে তিনিই ব্যাপারটা হাকিমকে জানিয়েছেন—তাতেই এই কাণ্ড হোয়েছে।

বাপুলী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন : এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।

বাপুলী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া চণ্ডী বলিল : আপনি এই বুঝেছেন কাকা বাবু, ঐ সুবিধাবাদী মানুষটি—যিনি আমাদের কাছারীর বাড়ীতে অবৈধ ভাবে থাকেন, আর হাকিমের সেরেস্তায় চাকরী করেন—তাঁর কারসাজিতেই এই কাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারছি না, এক জন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর মুখ দিয়ে এ রকম অন্যায় হুমকি বার হলো কি করে? আমরা নিশ্চয়ই মধ্যযুগে বাস করছি না, আর কাজীর শাসনও এখন চালু নেই!

বাপুলী মুখখানার এক অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া কহিলেন : মুস্কিল হোয়েছে কি জানো মা, বিলেত থেকে পাস-করা এমন এক-একটা আই-সি-এস মাঝে মাঝে জেলাকে জ্বালাতে আসে যে, তাদের আহম্মুখী দেখলে পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। ছেলেমানুষের মতন এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে বসে যে, কহতব্য নয়! সেই ছড়া আছে না—'রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করে তা শোভা পায়?' এও হোয়েছে তাই!

চোখের দৃষ্টি রুক্ষ করিয়া গলায় জোর দিয়া চণ্ডী বলিল : তা হ'লে এই অন্যায় মুখ বুজে সইতে হবে, এর কোন প্রতীকার নেই? এই যে মহকুমা হাকিমটা তার অধীনস্থ এক কর্মচারীর কথা শুনে এত বড় বে-আইনী কাজ করেছে, আমরা তা শুনে চুপ করে থাকব? না কাকা বাবু, এ অন্যায় আমি সহ্য করতে পারব না, এর প্রতীকার আমাকে করতেই হবে।

সকলেই স্তব্ধ-বিস্ময়ে চণ্ডীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাঁহারা ভাবিতে থাকেন—প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সরকারের রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ যে আই-সি-এস পদবীধারী পদস্থ রাজপুরুষ এক একটা জেলার জবরদস্ত শাসক, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—বড় বড় ভূস্বামী, খেতাব-ধারী রাজন্য সমাজও যাঁহাদের প্রসাদ ও প্রসন্নতা লাভ করিলে বর্তিয়া যান, সেই দুর্দ্ধর্ষ এক আই-সি-এস হাকিমের প্রতি এই তেজস্বিনী তরুণীর এ কি নির্ভীক উক্তি!

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে গৌরীই আস্তে আস্তে কহিল : আরও একটু কথা আছে; শুধু কর্মচারীর স্বার্থের দিকে চেয়েই হাকিম ও-হুকুম দেননি, এ ব্যাপারে তাঁর নিজের স্বার্থও অল্প-বিস্তর আছে।

আবার সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিল। চণ্ডীর দুই চক্ষুও সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—কোন গূঢ় কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে স্মৃতিপথে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের সার্থকতা আছে। চণ্ডীর মুখ ও ভঙ্গি দেখিয়া গৌরীও বুঝিল, পাঠাগারের সভায় সংক্ষেপে যে অশুভ আভাস সেদিন দিয়া গিয়াছিল, চণ্ডীর মাথার মধ্যে তাহাই এখন জট পাকাইতেছে। তথাপি কথাটা বৈঠকে ব্যক্ত করা বিধেয় ভাবিয়াই সে বলিল : হাকিম সাহেব স্যাণ্ডিন জমি তৈরী করছিলেন। তাঁর বোন খৃষ্টকুমারী এখন হোয়েছেন সূর্পণখা; দাদাকে এই বলে তাতিয়েছেন—'একটা নেটিভের মেয়ে আমাকে সবার সামনে অপমান করলে, টেক্কা দিয়ে স্কুল খুলে আমাদের ইস্কুল বন্ধ করে দিলে, বোনের এ অপমান তুমি সহ্য করবে দাদা?' এই হলো গোড়ার কথা। যখন সে সব হাঙ্গামা হয়, খৃষ্টকুমারীর দাদা তখন সরকারের খরচে বিলেতে আই-সি-এস পড়ছিলেন। সিডিউল্ড কাষ্টের গ্রাজুয়েট ছেলে, তায় খৃষ্টধর্মে ব্যাপটাইজড্ হোয়েছে, তার খোঁটার জোর ত সোজা নয়! একে ত আই-সি-এস পাশ করলেই সেখান থেকে তালিম দিয়ে বাঙলা দেশের সাবডিভিসানগুলো দুরস্ত করতে পাঠানো হয়। তার পর—পড়, ত পড়, আমাদেরই ঘাড়ে। বোনের কথা শুনেই সাহেব একেবারে ক্ষেপে ওঠেন। এত বড় আস্পর্দ্ধা একটা বাঙালীর মেয়ের—রাজার জাতের মেয়েকে অপমান করে! বিশেষ, সে যখন তাঁর মত এক আই-সি-এসের সিষ্টার? এই নিয়েই এখন তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ হোয়েছে—কেন মিশনারী স্কুল বন্ধ হলো, আর চণ্ডী-বিদ্যাপীঠ জেঁকে কেন—কর তার তদন্ত। শুনতে পাচ্ছি, গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে, পুলিশ থানা থেকে তখনকার পুরোনো ফাইল সব তলব করেছেন। এর ওপর সেরা খবর হোচ্ছে—আগামী কাল হাকিম সাহেব তাঁর সেই সিষ্টারকে নিয়ে তদারক করতে আসছেন; আমাদের

কাছারী-বাড়ীতেই তাঁদের ওঠবার, সম্বর্দ্ধনার ও খানাপিনার ব্যবস্থা হবে—সেখানেই দরবার করবেন। গ্রামের সব মাতব্বর ব্যক্তি, বিদ্যাপীঠের শিক্ষয়িত্রী আর মিশনারী স্কুলের পুরোনো ছাত্রীদের থানা থেকে জানানো হোয়েছে দরবারে হাজির হবার জন্যে। কাছারীর নায়েব মশাই এর পাণ্ডা হোয়েছেন, তিনি এখন আনন্দে আর উৎসাহে ফেটে পড়বার মত হোয়ে কাছারী-বাড়ী সাজাতে লেগে গেছেন। এই হোচ্ছে আমার আসল খবর, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে ঠিক কর, এ অবস্থায় কি আমাদের কর্তব্য।

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ ভাবে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন, একটু পরে গোবিন্দনারায়ণের মুখ দিয়া একটি কথা শুধু বাহির হইল : তাই ত!

কথাটা বুঝি চণ্ডীর চিন্তা-জাল ছিন্ন করিয়া দিল ; আপন-মনেই সে বলিয়া উঠিল : সংসারে এমনি করে কত অসম্ভবই সম্ভব হয়ে থাকে। আমি খালি ভাবছি ঐ নায়েবটার কথা। সরকারের মাইনে-করা একটা পদস্থ চাকরের চাপরাস দেখে তার মাথা এমনি গুলিয়ে গেছে যে, আসল মালিকের কোন পরোয়াই করে না—অথচ এই মালিকের ওপর তার অদ্ভুত ভয়-ভক্তি বিয়ের আগেও আমি দেখিছি। এখন বেশ বুঝতে পারছি, আমার জন্যেই এটা হোয়েছে।

বাপুলী বিপন্নের মত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন : এ কথা কেন বলছ মা? ওর স্পর্দ্ধার জন্যে তুমি নিজেকে—

বাপুলীর কথায় বাধা দিয়া চণ্ডী দৃঢ় স্বরে বলিল : আমাকে ভুল বুঝবেন না কাকা বাবু, আমি যা বলেছি তার পিছনে যুক্তি আছে। ও-লোকটা জানে, আমি গরীবের মেয়ে ; তার পর আমার বিদ্যার কথা শুনেছে—যেটা ঐ শ্রেণীর লোকের কাছে বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়। আর, এ খবরও নিশ্চয় রেখেছে ও—আসল মালিক শয্যাশায়ী, ওঠবার ক্ষমতা নেই ; আর আমি স্বাস্থ' আর শিক্ষা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওপর হাকিমের কোপে পড়েছি। তাই ওর এ আস্পর্দ্ধা হোয়েছে, জানে—পিছনে আছে অত বড় সহায়, জমিদার মালিকও যাদের ভয় করে। আমাদের সাধ্য কি ওর কোন ক্ষতি করি! এই এখন অবস্থা কাকা বাবু! তাহ'লে বলুন—আমি কি অন্যায় বলেছি? আমার জন্যেই ও-লোকটা এতখানি বেড়ে ওঠেনি?

বাপুলীর সাধ্য হইল না যে, জোর-গলায় কথাটার প্রতিবাদ করেন, বুঝিলেন, এক দিক দিয়া চণ্ডীর যুক্তি অকাট্য। মনে পড়িয়া গেল, চণ্ডী যখন কুমারী—তাহার দৌরাত্ম্য ও অশিষ্টতার বিরুদ্ধে শ্যামাপুর কাছারীর এই নায়েবই জমিদার-সরকারে নালিশ ঠুকিয়াছিল! সেই নালিশের বিচার করিতে গিয়া জমিদার যে তাহাকে কুলবধূর মর্য্যাদা দিবেন, ইহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, না—এই নায়েবের মত বিরোধী দল এই অঘটন ঘটনায় স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল? সুতরাং বাগুলী ষ্টেটের মালিক হরিনারায়ণ বাবুর কুটুম্ব হইলেও, শ্যামাপুর কাছারীর নায়েবের পক্ষে সে ত শ্যামাপুর গ্রামের নিরীহ গৃহস্থ করালী কবিরাজের কন্যারূপেই চিহ্নিত! সেই অপরিচিতা কন্যাটিকে সে কি সহজে সর্বসমক্ষে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে? এই চিন্তার মধ্যেই একটি সূত্র পাইয়া বাপুলী স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন : যুক্তি ছাড়া তুমি যে কথা বল না, সে আমার জানা আছে মা। কিন্তু এখানে শুধু ঐটিই বড় কথা নয় ; হাকিমের কথাটা ভাবতে হবে বৈ কি! হাকিম-সুবোদের সঙ্গে মহরম-মহরম রাখবার জন্যে বড় বড় জমিদারদের উমেদারীর কথা তো ষ্টেটের কারুর অজানা নেই মা, কাজেই নায়েব যদি হাকিমের নামে চলে পড়ে, ওকে বেশী দোষ দেওয়াও যায় না।

বাপুলীর শেষের কথাগুলি যেন চাবুকের মত চণ্ডীর পিঠে পড়িয়া জ্বালা ধরাইয়া দিল। জ্বলন্ত দৃষ্টি এই শ্রদ্ধাভাজনের মুখে নিবদ্ধ করিয়া সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলিল : আপনার এ কথা সমর্থন করতে হোলে, এই নজীরে এর পর জমিদারী চালানোই আপনাদের পক্ষে দুরূহ হোয়ে দাঁড়াবে কাকা বাবু! এই নায়েবের মত আর সব মহলের নায়েব যদি হাকিমের মুখ চেয়ে আপনাদের হুকুম অগ্রাহ্য করে, কি উপায় তখন হবে? না কাকা বাবু, আমি কখনই এত বড় অন্যায় আর আস্পর্দ্ধা সহ্য করে এ দায়িত্ব নিতে পারব না!

অত্যন্ত সহজ ও শান্ত কণ্ঠেই বাপুলী বলিলেন : বেশ ত মা, তুমি এ-ক্ষেত্রে কি করতে চাও তাই বলো—ওখানকার অবস্থাটা যে ভাবে দাঁড়িয়েছে, সেটা ভালো করে বুঝে দেখলে—

বাপুলীর কথায় বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে চণ্ডী বলিল : এখানে বোঝাবুঝির কিছু নেই কাকা বাবু, সহজ-বুদ্ধিতে আমি এইটুকুই জেনেছি, হাকিমের ঐ চুমকা অন্যায়ের মুখোস ছাড়া কিছু নয়। ভয় দেখিয়ে ওরা এই ভাবে সম্মান আদায় করে। আর, যারা ভয় পেয়ে আসল মনিবকে ভুলে অন্যায়কারীর কাছে এত সহজে আত্মসমর্পণ করে, তারা অমানুষ, বিশ্বাসঘাতক—তাদের অন্যায়ের মার্জনা নেই।

বিস্ফারিত চোখে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া বাপুলী বলিলেন : তুমি বড্ডো উত্তেজিত হয়েছ মা, তোমার কথায় হাকিমকেও তাহলে অন্যায়কারী ব'লে—

তেমনই তেজোদৃপ্ত স্বরে চণ্ডী বলিল : আপনি অত কুণ্ঠিত হোয়ে কথাটা বলছেন কেন কাকা বাবু! হ্যাঁ—আমি ত স্পষ্ট করেই আপনার হাকিমকে অন্যায়কারী বলেছি এবং প্রয়োজন হোলে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখের ওপরে ঐ কথা বলতে প্রস্তুত আছি। ভয় করে কোন দিনই যেন তাঁকে সম্মান করতে না হয়—যত বড় উঁচু পদেই তিনি বসে থাকুন, আর দণ্ড দেবার যত ক্ষমতা নিয়েই তিনি আস্ফালন করুন—আমি কিন্তু তাঁকে অন্যায়কারী বলেই ক্ষুদ্র ভাবব। আমি জানি, তাঁকে ভয় করলে তার চেয়েও ক্ষুদ্র আমাকে হোতে হবে।

চণ্ডীর জ্বলন্ত দু'টি চক্ষুর অগ্নি-জ্বালায় বুঝি বাপুলীর দীর্ঘায়ত চক্ষুর গোল গোল তারা দু'টিও সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরেও উত্তাপের কিছুটা আভাস পাওয়া গেল ; দৃপ্ত স্বরে তিনি বলিলেন : এর পর আর কথা নেই মা। তোমার মুখে আজ নতুন কথা শুনলাম, শুধু শোনা নয়, তার তাপ এত বেশী যে, বৃদ্ধ বয়সের রক্তও গরম হোয়ে উঠেছে। আমি তোমার কথাই না মেনে পারছি না মা ; খাঁটি কথা তুমি বলেছ—অন্যায় যেই করুক, যত ক্ষমতাই তার থাক, তাকে ক্ষুদ্র ভেবে শক্ত হতে হবে। শক্ত হবার মত শক্তি তোমারই আছে মা! বেশ, যা ব্যবস্থা করবার তুমি কর—আমার পূর্ণ সমর্থন তুমি পাবে।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বাপুলীর দিকে চাহিয়া চণ্ডী বলিল : এই ত আমার কাকা বাবুর কথা।

পরক্ষণে সভাপতিকে লক্ষ্য করিয়া সহজ কণ্ঠে চণ্ডী বলিল: পণ্ডিত মশাই, তাহ'লে এখন আমি প্রস্তাব করছি—শ্যামাপুর কাছারী সংলগ্ন বাড়ীগুলিতে আগামী কাল পূর্বাহ্নে এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত পাঠাগার পাঠশালা ও চিকিৎসালয়—এই তিনটি বিভাগের উদ্বোধন করা হোক। আর এই সম্পর্কে উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ ও সর্বময় দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত।

প্রস্তাবটি সমর্থন করতে উঠিল রাজীব। প্রস্তাব সম্পর্কে বিদ্যাভারতীর মানসিক দৃঢ়তার প্রচুর প্রশংসার পর সে বলিল: আমি সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং সবিনয়ে বিদ্যাভারতীকে জানাচ্ছি, প্রতিষ্ঠানের কর্মিরূপে আমি সর্বান্তঃকরণে কল্যাকার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে ইচ্ছুক আছি।

অতঃপর ডাক্তার রায় উঠিয়া এই প্রস্তাব সম্পর্কে বৈঠকে বিদ্যাভারতীর সাহসিকতা ও নির্ভীক প্রচেষ্টার প্রশস্তিবাদের পর বলিল: আজিকার বৈঠকে আমরা নিশ্চয়ই সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যাভারতীর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করছি।

সকলেই সমস্বরে ডাক্তার রায়ের উক্তির অনুমোদন করিলে সভাপতি বলিলেন: বিদ্যাভারতীর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমেই এই বৈঠকে গ্রহণ করা হলো।

গৌরী এই সময় সহাস্যে বলিল: আমার কথাটাই তাহ'লে ফলে গেল!

শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন: হ্যাঁ মা—ঠিক বলেছ তুমি। গোড়াতেই তুমি বলেছিলে—সব শুনলে ওঁকে রণচণ্ডী হোতে হবে; তা যে ব্যাপার দেখছি—মা আমার রণচণ্ডী হোয়েই বাপের বাড়ীর দেশে চলেছেন।

চণ্ডী সহাস্যে বলিল: সে কথা পরে। মাঝে এখনো অনেকটা দিন আর পূরো রাতটা আছে। এখন আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন—খাবার ব্যবস্থা আমরা করি। আয় গৌরী, রান্না-বাড়ীতে যাই—সকলের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।

সকলকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া চণ্ডী গৌরীকে লইয়া ভিতর-মহলে চলিয়া গেল। পরক্ষণে নকুল, সহদেব ও ভৈরব নামে ভৃত্যত্রয় হাত-মুখ ধুইবার সুবাসিত শীতল জল ও কতকগুলি নূতন তোয়ালে লইয়া আমন্ত্রিতদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। [ক্রমশঃ।

নেতাজীর জয়

প্রদ্যোতকুমার রায়

"মানুষের মাঝে আছে ভগবান" যুগে যুগে শুনি বাণী—
তবু কেন মা গো সকল মানুষে করে শুধু হানাহানি?
সারা পৃথিবীর বুকের উপরে আগুনের শিখা শুধু
মানুষেরো বুকে দাবানল জ্বলে মরীচিকা করে ধূ-ধূ!
রাজার গদিতে বসিবে কে আগে এই নিয়ে চলে রেস্
বল্ মা গো বল্ একবার বল্ এর হবে না কি শেষ?
হানাহানি আর মারামারি শুধু এদের সকল কাজে
বল্ মা গো বল্ কোথা ভগবান কোন্ মানুষের মাঝে?

এমন সময় শুনিল খোকন বিরাট সে কোলাহল
মাতা কহিলেন, "খোকন আমার চল্ দেখি ছুটে চল্!
ও কি! ও কি! ও কি! এ কি হেরি আমি ও কি অপূর্ব্ব ছবি!
দীপ্ত মূর্ত্তি হাসি-হাসি মুখ যেন প্রভাতের রবি!"
হাসি-ভরা মুখে জল-ভরা চোখে হাত দু'টি করি জোড়
মাতা কহিলেন, "দেখ, বাছা দেখ, আয় ছুটে কাছে মোর!
ওই দেখ বাছা আসে ভগবান নেতাজী সুভাষচন্দ্র
মানুষের রূপে ভগবান উনি কলির শ্রীরামচন্দ্র!
সারা বাংলার সকল মানুষে সয়েছিল যতো দুখ
সকলের আজ শেষ হয়ে গেল হাসিতে ভরিল মুখ!"
"নেতাজী এসেছে নেতাজী এসেছে" ছুটিয়া চলিল রব
ছুটে ছুটে আসে সকল মানুষে যেখানে যে আছে সব!
শংখে শংখে বাজিয়া উঠিল নেতাজীর জয় গান
জয় জয় জয় নেতাজীর জয় বাংলার ভগবান!

পথের শেষ কোথায় ?

(পার্ল বাক্)

বিখ্যাত হোয়াং-পরিবারের প্রাসাদের প্রবেশ-পথ যেখানে এসে উত্তর ফটকের সঙ্গে মিশেছে, সেই রাস্তায় শেষ কোণে ল্যুচেনের গরম জলের দোকান। সকলেই ল্যুচেনের দোকান আর ঐ রাস্তাটা চেনে, কারণ ঐখানটা বাজারের সব চেয়ে ঘিঞ্জী, দোকান-পাট, লোক-জন, ভোর থেকে দুপুর রাত পর্য্যন্ত জমজমাট থাকে।

শুধু যে সিল্ক-ব্যবসায়ীরা তাদের নানারঙ্গা সিল্কের কাপড় বাইরে সাজিয়ে ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় তা নয়, হোয়াং-পরিবারের প্রাসাদের নীচে বহু বড় বড় লোকদের বাড়ী-ঘর আছে। ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত কেরাণী-চাকরের দল অন্ততঃ পঞ্চাশ বার চায়ের জলের জন্যে বেয়ারা পাঠিয়ে চায়ের জল নিয়ে যায়, বড়-ঘরের ঘরণীরা বিকেল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তাস-পাশা জুয়া খেলে থাকেন, ওর মধ্যে যে কত বার দাসীরা চায়ের জন্যে গরম জল নিতে আসে তার গোণা নেই। এই সব কারণে ল্যুচেনের দোকানের চাহিদা খুবই, দিন-রাত ওর বিক্রী লেগেই আছে।

শুধু আজ কেন, ওর ঠাকুর্দ্দার আমল থেকে এই দোকান [illegible] চলছে, তখন তো আরও সুবিধে ছিলো, কারণ এই দোকান থেকে মাইল খানেক মধ্যে রাজপ্রাসাদ ছিলো, কাছাকাছি [illegible] রাজা-জমীদারদের বাড়ী ছিলো, দোকানে খদ্দেরের অভাব কোন সময় হোতো না।

ল্যুচেন ওর বাবার মৃত্যুর পরে পেয়েছিলো এক থলিভরা [illegible] টাকা আর এই গরম জলের দোকানখানা, এই ওর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি।

[illegible] বিয়ের সময় রূপার টাকাগুলো প্রায় শেষ হ'য়ে যায় [illegible] আর [illegible] দিতে, কিন্তু এই দোকানের আয় থেকেই জমিয়ে জমিয়ে আবার সেটা ভরিয়ে ফেলেছিলো—তাও আবার খরচ হয়ে গেলো একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করাতে,—[illegible] দিতে সব জমান টাকাই প্রায় খরচ হ'য়ে গেলো। আবার ল্যুচেন সেই খালি থলি টাকাতে ভরিয়ে তুলেছে প্রায় ঐ দোকানের আয় থেকেই।

নাতির দৌরাত্ম্যে সর্ব্বদাই অস্থির থাকতে হয় ওকে। ওর নাতির [illegible] অদম্য কৌতূহল। দাদুর ঐ প্রকাণ্ড তামার [illegible], বিরাট মাটীর উনুনটার ওপর ঝোঁক বেশী, ঐখানেই ছুটে আসে বার-বার।

[illegible] দিনের মধ্যে অন্ততঃ বিশ বার নাতিকে বলবে,—"ছাখো [illegible], আমিও এক দিন তোমার মতোই ছোটটি ছিলাম এই [illegible] কড়াতে তখনও জল ফুটতো, কিন্তু আমি তো কখনও [illegible] আসতাম না—আমার বাবার ভয়ে এখানে আসার সাহস হোতো না—আর তোমার মতো মুরগীর বাচ্চার মত ছুটোছুটি [illegible] পারতাম না, আর অত সাহস হোতো না।"

[illegible] ভালো ভালো উপদেশের এক বর্ণও নাতির বোধগম্য হোতো না। কচি শিশু, এখনও মুখে স্পষ্ট কথা বেরোয়নি—তবে [illegible] ওকে মনে-প্রাণে ভালোবাসেন, এটা ওর বেশ জানা ছিলো। শিশু-মনের সহজাত সংস্কার দিয়ে বেশ অনুভব করতো [illegible] মনের ও-ই প্রধান অবলম্বন। তাই দাদু যেখানে নাতিও সেখানে [illegible] বসান ফুটন্ত জলের বিরাট কড়াইখানার [illegible] নিয়ে ওর ছুটোছুটিরও বিরাম নেই, দাদুর মনের অশান্তিরও [illegible] নেই, এখন বা ছেলেটা আগুনে পুড়ে মরে এই ভেবে।

নাতি এতো সব না বুঝতে পারলেও দাদুর শাস্তি দেবার একটা বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলো, বেশী অত্যাচার করলে দাদু ওর কোটের কলার ধরে উঁচু করে তুলে নিয়ে পাশের খুপরীতে বন্দী করে রেখে দিতেন। ঐ শাস্তিটাকেই যা একটু ভয় ছিলো ওর মনে।

ল্যুচেন এক দিন ছেলেকে ডেকে বললেন—"ছাখো বাবা, তোমার ছেলেটির ধরণ-ধারণ আমি কিছুই বুঝি না—তোমরা ওকে গুরুজনদের মান্য করে চলার শিক্ষা দেবে কবে? বড়দের সমীহ করা—এগুলো শেখাবে না?—"

একটি মাত্র সন্তান ল্যুচেনের, কাজকর্ম কিছু করে না, ঘরে বসে থাকে, এদিক-সেদিক আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, মেজাজটা প্রায় বিষণ্ণ থাকে। বাপের কথায় বিরক্ত হ'য়ে বললো—"দিন-কাল বদলে গিয়েছে, এখন আমরা গুরুজনদের আদেশ মেনে চলা, অতিরিক্ত সম্মান দেখান, এগুলোর বেশী প্রাধান্য দিই না। তোমাদের আর আমাদের দিন-কাল অনেক তফাৎ বাবা।"

ল্যুচেন তীব্রদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালো।

ওর ছেলেটি যে প্রকৃতই অলস এ-কথা ও বিশ্বাস করে না। ছেলেকে উপলক্ষ করে রাত্রে বাঁশের মাচায় মশারির ভেতর স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বচসা হয়। ওর স্ত্রী বলে, "যোয়ান বয়সের ছেলেটা আমার, ঘরে বসিয়ে রেখে অকর্মণ্য হয়ে গেলো। কুড়ি বছর বয়স হোল—কাজে লাগিয়ে না দিলে পরে কি আর দায়িত্ববোধ থাকবে? তোমার তো পঞ্চাশ পার হোলো—কোথায় তুমি এখন কাজকর্ম ওর ওপর দিয়ে নিজে আরাম করবে, না নিজেই ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত খেটে মরে সকলের মুখে ভাত যোগাবে? ভাতের যে কতখানি দাম, তা তো ওকে কোন দিন জানতেও দিলে না তুমি? ও কি আর কোন দিন বউ-ছেলের খোরাকীর ব্যবস্থা করতে পারবে? পারবে না। ছোট দোকান, ওতে তো আর দু'জন লোক দরকার হয় না, যা করার তা তুমিই করো। একবার ভার দিয়ে ছাখোই না—চালাতে পারে কী না।"

দোকান নিয়ে কোন কথা উঠলে ওর মেজাজ বিগড়ে যায়। স্ত্রীর কথায় রেগে উঠে গা থেকে মোটা নীল লেপখানা ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসলো। দোকানের ভার ও কখনই ছেলের হাতে ছেড়ে দেবে না—এ সঙ্কল্প বরাবরই ওর মনে ছিলো। রেগে বলতে লাগলো, ও—"হ্যাঁ, ছেলের হাতে দোকান ছেড়ে দেবো, তুমি তো তা বলবেই। জলের কড়াইখানা যদি এক দিন ওকে মাজতে দিই, ও কি সেটাও ঝকঝকে করে মাজতে পারে? পারে আমার মতো মাজতে? কত বলেছি—উনুন থেকে ছাই নিয়ে, একটু জলে ভিজিয়ে কড়াইয়ে মাখিয়ে রাখো, খানিক বাদে শুকিয়ে গেলে ঘষে মেজে ফেলো,—কড়াই ঝকঝক করবে। শোনে ও আমার কথা? ও তাই করবে? যেমন ময়লা, তেমনি থাকবে।"

স্ত্রী বললো,—"তোমারও দোষ, তুমি ওর কোনও গুণই দেখতে পাও না।"

ল্যুচেন উত্তপ্ত হয়ে বললো—"তা নয়, আমার কথা ও শোনে না, যা বলবো তা করবে না।"

স্ত্রী ধীর ভাবে বলে—"তোমার কিছুতেই শান্তি নেই।"

ল্যুচেনের স্ত্রীর লম্বা-চওড়া জাঁদরেল চেহারা—সে নিজে রোগা শুকনো ছোট-খাট মানুষটি, দেখতে বেমানান লাগে। ওর স্ত্রীর ধীরে বিনিয়ে-বিনিয়ে কথাতে ওর যেমন রাগ হয়—ঝগড়ার সুরে ততটা রাগ হয় না।

ও স্ত্রীর এই রকম কথা সহ্য করতে পারে না। উঠে বসে ওর স্ত্রীর ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে রইলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে। বীনের তেলে কুপি জ্বলচে ঘরে, তারই মৃদু আলো এসে পড়েছে মোটা মশারির মধ্যে বিছানার ওপর, আবছা আলো এসে পড়েছে ওর স্ত্রীর পুরু কালো ঠোঁটের ওপর—আধ-বোঁজা চোখের ওপর।

খানিক পরে ও বলে উঠলো—"আমার বাবা আমায় শিখিয়েছে, তাই শিখেছি, যা বলেছেন, তাই মেনে চলেছি!"

ওর স্ত্রী ঘুমে-জড়ান চোখ টেনে বললো—"আচ্ছা তাই বেশ, আমার এ সব কথার দরকার কী? এখন তো ঘুমুতে দাও।"

ল্যুচেন অনেকক্ষণ গজ-গজ করে শেষে খুব ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললো—"দোকানখানা যেন আমারই একার—তোমাকে তো এক দিনও দোকানের ভাল-মন্দ ভাবতে দেখি না—সে কথাও শুনি না।"

এইটে ওর বড় দুঃখ, যে নিজের স্ত্রী, সেও ওর দোকানখানা নিয়ে একটুও ভাবে না, এ বিষয় উদাসীন। ওর স্ত্রী এ কথার কোন উত্তর দিল না, ততক্ষণে ও গাঢ় ঘুমে।

পরদিন ভোরে উঠে দোকানের দরজা খুলে, জলের বিরাট কড়াই দু'খানা ছাই দিয়ে ঘষে ঝকঝকে করে মাজলো—যতক্ষণ সেই কড়াইয়ে ওর মুখের প্রতিচ্ছবি আয়নার মত স্পষ্ট না দেখা যাবে, ততক্ষণ ও মেজেই যাবে এটাই ওর নিয়ম। মনে ইচ্ছে ছিলো, ছেলেকে ডেকে দেখিয়ে দেয় কড়াই মাজা কাকে বলে, কিন্তু দেরী করবার উপায় নেই, এর মধ্যেই ভোর হ'তে হ'তেই বড়-ঘরের দাস-দাসীরা সব পাত্র হাতে হাজির হয়েছে, মনিবদের মুখ-হাত ধোবার জল এখনই চাই, তার পর চায়ের, স্নানের গরম জল এখনই চাই। মাটীর জালা থেকে জল ভরে কড়াই উনুনে চাপিয়ে নীচে আগুন ধরিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ পরেই কড়াই-ঢাকা কাঠের ভেজা ঢাকনীটা চক্-চক্ করে নড়তে লাগলো, এই বারে জল ফুটেছে। দোকানের কায শুরু হ'য়ে গেলো—এখন ওর আর কিছু ভাবার সময় নেই।

নীল রঙের তুলোর ঢিলে-হাত জামা পরা, চুলে পরিপাটী সিঁথি, দু'হাতে চোখ ঘষতে ঘষতে ওর ছেলে দোকানে এসে ঢুকলো, তখন ল্যুচেন তিন কড়াই জল শেষ করে আবার জল চড়িয়েছে। ছেলের চোখে-মুখে তখনও যেন ঘুম জড়িয়ে আছে।

ল্যুচেন ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো, চোখ-মুখ-ভরা বিরক্তি। "ভাখো, আমার যখন তোমার বয়স ছিলো, তখন বাবা ওঠবার কত আগে আমি উঠে ছাই তুলে কড়াই মেজে উনুন ধরিয়ে জল বসিয়ে দিতাম, জল ফুটে যাবার পরে বাবা উঠে আসতেন—"

ছেলে তাচ্ছিল্যের ভাবে বললো,—"এখন কি আর সেদিন আছে? এখন যে বিপ্লবের যুগ।"

ল্যুচেন শুনে অত্যন্ত তিক্ত হ'য়ে থু-থু করে মেঝের ওপর থুথু ফেলে বললো, "ও-সব বাজে কথা ছাড়ো। বিপ্লবের যুগ, না এখন দিন হোল অলস, অকর্মণ্য অবাধ্য ছেলেদের যুগ,—তাদেরই রাজত্ব এখন। তোমার ছেলে তোমায় দেখে কী শিখবে শুনি; সে তো দেখছে তার বাপ হেসে-খেলে গায়ে ফুঁ দিয়ে আড্ডা মেরে দিন কাটাচ্ছে,—একটি পয়সা উপায় করার আজও মুরোদ হোলো না! সে কী শিখবে?'

ছেলে একটু কৃপার হাসি হেসে কোটের বোতাম বন্ধ করে ধীরে-সুস্থে জলের কড়াই থেকে জল তুলে নিলো মুখ-হাত ধোবার জন্যে।

ল্যুচেন ওর দিকে চেয়ে দেখলো, রাগে ওর ঠোঁট কাঁপছে থর-থর করে—"এই দোকানখানার জন্যে আমি প্রাণপাত করছি খেটে-খেটে, এ কার জন্যে করছি, আমার জন্যে না তোমার জন্যে? এ দোকান কি তোমার নয়? দোকানখানা চালু রাখতে পারলে আমার অবর্ত্তমানে তোমার যাতে দু'টো ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয়, তার জন্যে নয়? তোমার পর তোমার ছেলের থাকবে এটা চালু রাখতে পারলে একটা লাভের সম্পত্তি—সেটা ভেবে দেখেছ? আজ ষাট বছর ধরে এই দোকানখানা চলছে, এই জায়গাতেই রয়েছে, কে না এ দোকান চেনে? এর নাম কে না জানে? জলের দোকান তো আরও কতই আছে, কিন্তু আমার দোকানের মতো কাটতি আছে কোন দোকানে? আমার বাবা এই দোকান থেকেই গোটা সংসার চালিয়েছেন, আমিও তাই চালাচ্ছি, তুমি তার পর চালাবে—তোমার পর তোমার ছেলে চালাবে এই আমি চাই। আজ চার পুরুষ আমাদের এই দোকান থেকেই ঘর-সংসার চলছে—"

গরম জলের গামলায় তোয়ালে ভিজিয়ে ধীরে-সুস্থে মুখ-হাত মুছতে মুছতে ছেলে বললো, "সবাই বলছে এইখানটায় নতুন সড়ক হবে।"

ল্যুচেন নতুন রাস্তার কথা এই প্রথম শুনলো, কিন্তু ও ছেলের আর পাঁচটা কথার মতো, এ কথাটাকে কোন আমল দিল না। নতুন রাস্তা—নয়া সড়ক, বললেই হোলো আর কী! কৈ এতো দিন তো কোন রাস্তার কথা ওঠেনি? বিপ্লববাদ দেশে আসা থেকে ছেলের কাছে নিত্য-নতুন খবর শোনা যেতো। ছেলের তো কাযই হোলো যত চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেওয়া আর খবর সংগ্রহ করে এসে বাড়ীতে বলা—আর কায়টা কী!

কী সব অলুক্ষুণে কথা—বিপ্লববাদ, প্রগতি—এ সব কথার অর্থ কী তা ও জানতেও চায় না কোন দিন। জানেও না।

অবশ্য কিছু কাল আগে, ওরও বড় দুরবস্থা গিয়েছে, রাস্তার প্রায় সব দোকান-পাটই লুঠ-তরাজের ভয়ে বন্ধ থাকতো, কেনা-বেচাও ছিলো না। ওর দোকানের বড়-ঘরের খদ্দেররা প্রায় কেউই এখানে ছিলো না, সবাই গিয়েছিলো সাংহাইয়ে, বাড়ী-ঘর তালাবন্ধ করে। শুধু গরীবেরাই যেতে পারেনি, তাদের তো আর যাবার মতো সঙ্গতি নেই, যাবে কোথায়? তাও দোকানের যা সামান্য বিক্রী তা ওদের কাছেই হোতো। সারা দিনে কতই বা আর হোতো? সারা দিনে মাত্র আট-দশ আনা মাত্র, তা বেশী হবেই কি ক'রে—ওদের তো বেশী পয়সা দিয়ে গরম জল কেনবার ক্ষমতা না। টিনের ছোট ছোট কেটলী নিয়ে আসতো, কেউ এক, কেউ দুই পয়সার জল কিনতো। সেই সময় ও শুনেছিলো বটে একবার বিপ্লবের কথা যে, দেশে না কি বিপ্লব, বিদ্রোহ এই সব এসেছিলো, লোক বলাবলি করতো বটে।

ও তো দিবা-রাত্র এই বিপ্লববাদকে শাপমন্যি দিতো। অবশ্য পরে যে এই বিপ্লবের দরুণই ওর দোকানের আয় বেড়ে গিয়েছিলো সে কথা ও অস্বীকার করে না। হঠাৎ সৈন্য এলো—ওরা এসে পথ-ঘাট সব ভরিয়ে দিলো, ওরা কত কত গরম জল কিনতো আর এ্যাতো জলই কি ওদের লাগতো!

পয়সার ওপর সৈন্যদের কোন মায়া নেই দরদস্তুর নেই, যা বলতো তাই দিত ওরা। সেই সুযোগ নিয়েই ওর টাকার খালি থলিটা আবার ভরিয়ে তুলেছিলো। হঠাৎ বাড়ী-ঘর ছেড়ে লোকজন চলে যাওয়া, দোকান-পাট বন্ধ, কেনা-বেচা বন্ধ, দলে দলে সৈন্যদের টহলদারী, দেখে-শুনে ও তো হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলো—এ আবার কী ব্যাপার? সবাই বলতো দেশে না কি বিপ্লব এসেছে, ওর বিপ্লব সম্বন্ধে এই ধারণা, তবে তখন পয়সার থলিটা সৈন্যদের পয়সায় ভরে ওঠার দরুণ ও আর ওই অলুক্ষুণে বিপ্লবটাকে বেশী শাপমন্যি দিতো না, বেশী কিছু তখন ভাবেওনি ওই নিয়ে—ওর কী-ই বা দরকার?

ক্রমে ক্রমে দিন-কাল আবার আগের মতো হ'য়ে এলো—যারা চলে গিয়েছিলো, তারা ফিরে এলো, ওর খরিদ্দার সব ফিরে এলো, বন্ধ দোকান-পাটের দরজা খুললো, ওর দোকানে আবার আগের মতোই বড়-ঘরের দাস-দাসীদের জল নেবার ভীড় জমলো। বরং আরও একটা সুবিধে হোল—এই বিপ্লবের হুজুগে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেলো, ও গরম জলের দরও বাড়িয়ে দিলো। ব্যবসার দিকে ওর বেশ সুরাহা হোলো, সেই বিপ্লবের সুযোগে ও দু'পয়সা করে নিলো, গুছিয়ে নিলো।

এক দিন সকালে ওর ছেলেকে ডেকে বললো—"আচ্ছা বাপু, পথে-ঘাটে, দোকান-বাজারে, সবখানেই যে শুনি বিপ্লব—প্রগতি এর অর্থটা কী? বিপ্লব কাকে বলে? এটা আসে কেমন করে? তুমি তো ইস্কুলে পড়েছ—নানা রকম লেখাপড়া-জানা লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ আলোচনা হয়—এই কথার মানেটা আমায় বুঝিয়ে দাও দেখি। বাবা, এ্যাতো দিন যা অশান্তি গেলো—আমাদের ভাগ্য ভালো যে, বিপ্লবটা এখন দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

ছেলে ওর কথায় অবাক হ'য়ে বললে—কী বলচো বাবা, বিপ্লব শেষ হ'য়ে গিয়েছে? সবে তো সুরু হয়েছে—এখনই কী হ'য়েছে, শুধু অপেক্ষা করো আর দেখে যাও—কী হয়। আমাদের দেশের রাজধানী হবে এই সহর,—আমাদের এই সহর আরও কত কী পরিবর্তন হবে, সবই ওলট-পালট্ হবে—এখনকার মতো কিছুই থাকবে না।"

বুড়ো ল্যুচেন বিশ্বাস করে না—টুক-টুক মাথা নাড়ে—"পরিবর্তনটা কী হবে? অদল-বদল এক-আধটু সে হতে পারে—কেন হবে না? তবে তোমার বিপ্লব,—রাজা মহারাজা মন্ত্রী জমিদার যাই হোক,—যেই আসুক না আসুক, মানুষের গরম জলের আবশ্যক চিরদিনই থাকবে। চা খেতে, মুখ ধুতে গরম জলের দরকার হবেই, তাই আমি আর এ সব দুশ্চিন্তা করি না।"

কিন্তু এই নয়া সড়ক, এটা কী? ছেলের কাছে নয়া সড়ক কথাটা শোনা থেকেই খটকা একটা লেগেই ছিলো,—সেদিনই সামনের জমীদার-বাড়ীর ছুকরী দাসীটা চোখ নাচিয়ে ঠোঁটের ভঙ্গিমা দেখিয়ে ল্যুচেনকে বলে গেলো—"ওহে বুড়ো, কী হবে তা জানো? খবর রাখো কিছু? আমার মনিবের কাছে শুনেছি—এই রাস্তা, দোকান-পাট, ঘর-বাড়ী সব ভেঙ্গে দিয়ে এখান দিয়ে এক বিরাট সড়ক তৈরী হবে—নয়া সড়ক হবে—জানো কতখানি চওড়া হবে? ষাট ফিট—পূরা ষাট ফিট চওড়া হবে সেই সড়ক। তোমার দোকান যাবে কোথায়? তোমার গরম জলের কড়াইগুলো তখন কোথায় যাবে?" ছুঁড়ীর চোখে-মুখে খুসী উপচে পড়ে।

এই ফাজিল ফচকে দাসীর ব্যঙ্গ-ভরা কথায় রেগে উঠলো ল্যুচেন,—ফুটন্ত কড়াইয়ে কাঠের হাতা ডুবিয়ে জল তুলতে খানিক জল ছল্‌কে ওর হাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আগুনে পড়ে ছুস-ছুস শব্দ উঠলো। কোনও উত্তর দিলো না—ওর কথা যে ওর কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মর্ম্মে গিয়ে ঘা দিয়েছে তার আভাস মাত্র না প্রকাশ করে ও মুখ নীচু করে উনুনে ফুঁ দিতে লাগলো। মনে মনে একটা মতলব করে রেখেছে ও—নয়া সড়কের জন্যে যদি ওর দোকান তুলেই দিতে হয় তবে সে এমন চড়া দাম হাঁকবে,—যা দিয়ে ওদের কেনবার সাধ্যে কুলোবে না—দামও দিতে পারবে না,—দোকানও ওর থাকবে—এই ওর মতলব। কিন্তু এই একটা ফচ্‌কে ফাজিল ছুঁড়ী, ওর কথায় কী উত্তর দেবে ও? ও কি কথা কইবার যুগ্যি না কি?

দাসীটা যাওয়ার পরে ওর মনে নানা চিন্তা এলো। কারণ ঐ দাসীটা হোলো সহরের নাম-করা বড়লোক লীচেঙর বাড়ীর দাসী; ঐ লীচেঙর বড় ছেলে সরকারী বিভাগের বড় চাকুরে। তাই মনে হয় দাসীর কথাটা নেহাৎ অগ্রাহ্য করবার নয়। নিশ্চয় ঐ লীচেঙের ছেলেই এসে নয়া সড়কের কথা বলেছে—না হ'লে ঐ দাসীটা এ কথা জানবে কেমন করে?

সরকারী চাকুরের পক্ষে ভেতরের কথাবার্ত্তা জানাটা স্বাভাবিক—তাহ'লে কি কথাটা ঠিক? দোকান-ঘরখানার চারি দিকটা চেয়ে চেয়ে দেখলো, ছাই রং-করা ইটের দেওয়াল, স্যাঁতস্যাঁতে নোনা-ধরা দেওয়ালের গায়ে ফাটা,—এখানে-ওখানে চাপড়া-খসা দেওয়াল—সিমেন্ট-ওঠা মেঝে—জ্ঞান হওয়া থেকে এই ঘরের সঙ্গে ওর পরিচয়।

উনুনের পাশের দেওয়ালটা ধোঁয়াতে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে—ও ছোট থেকে ওখানটা ওই রকম কালোই দেখছে।

ষাট ফিট্ চওড়ার রাস্তা এতো চওড়া হয়? কী অসম্ভব কাণ্ড। অতখানি চওড়া রাস্তা দিয়ে কী দরকার? তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো ওর দোকান যাবে! তবে আর দোকান থাকবে না এ বিষয় আর সন্দেহ নেই। মনকে প্রবোধ দিলো যে, এমন দর চাইবো তা আর দিতে হয় না—দোকান ওর থেকে যাবে—টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে তো? টাকার অঙ্কটা মনে মনে হিসাব করে কতো চাওয়া যায়?—ঠিক হ্যাঁ, দশ হাজার ডলার। দশ হাজারটি ডলার, তার এক পয়সা কমে হবে না! দেখি সরকারের কত টাকা—কত টাকা দিতে পারে।

এতোক্ষণে যেন মনটা একটু ভাবমুক্ত হোলো, স্বস্তি পেলো। ভাবলো, এই তো সামান্য ছোট্ট একটা দোকান, জমী তো মাত্র বারো ফিট আছে, দু'খানা তামার বড় কড়াই এর জন্যে দশ হাজার ডলার দিতে কারই বা দায় পড়েছে? কারই বা এতো টাকা

আছে ? দশ হাজার ডলার—সে যে কতখানি টাকা তা ও জানে না।

বাবার কাছে গল্প শুনেছিলো—যখন ওর বাবার বয়স ছিলো বছর কুড়ি, তখন সম্রাটের ছেলে যুবরাজ না কি দশ হাজার ডলার খরচ করে তার নতুন প্রাসাদ তৈয়ী করিয়েছিলেন—এখনও অনেক বৃদ্ধ সেই গল্প করে থাকেন। এই সব ভেবে-চিন্তে ওর মন থেকে নয়া সড়কের বিভীষিকাটা চলে গেলো। ছেলে তো কত্তোই বলে—ওর কথার আবার মূল্যটা কী ?

দশ হাজার ডলার আর সরকার দিতে পারবে না—ওর দোকানও ওরই থাকবে। আবার ও নিশ্চিন্ত মনে দোকানে কাজ করতে লাগলো। আগের মতোই নাতির দৌরাত্ম্য, ওর বকুনী সবই চলতে লাগলো। আগের নিয়মেই।

এক দিন ঠিক দুপুর বেলা ল্যুচেন দোকানের বাইরে বসে চা খাচ্ছিলো, এই সময়টা বড় খদ্দের বেশী থাকে না, আবার বিকাল থেকে সুরু হবে আসা। এই ফাঁকে একটু চা খাচ্ছিলো—এই একটা সময়, ও একটু ধীরে-সুস্থে মনের মতন আয়েস করে চা-টা খেতে পায়, নাতিকেও ভাগ দিতে হয়। নাতি দাদুর কোলে বসে আছে ছোট্ট মোটা দু'খানি হাত দিয়ে ওর পেয়ালা ধরবার ভঙ্গীটা দেখে হাসছে। এই সময় ওদের দু'জনের খুব ভাব। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা—ধড়াম-ধড়াম ধাক্কা—দরজাটা বুঝি ভেঙ্গেই পড়ে! ল্যুচেন ত্রস্তে উঠে গরম টী-পটটা আগে নাতির নাগালের বাইরে সরিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা খুললো—ভয়ে ভয়ে—শব্দ না হয়! ওর চোখে-মুখে দারুণ আতঙ্ক! কী ব্যাপার! সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এক জন মিলিটারী পোষাকের লোক, বোধ হয় কোন মিলিটারী অফিসার হবে। কোমরে বেল্টে কার্তুজ-ভরা, হাতে ঝকঝকে ইস্পাতের ফলাওয়ালা বন্দুক।

খুব কাতর স্বরে বললো ল্যুচেন—"হুজুরের কি আদেশ গরীবের ওপর ?"

লোকটা ওর দিকে না চেয়ে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পকেট থেকে এক গোছা কাগজপত্র বের ক'রে বললো—"ওহে বুড়ো, তোমার নামটা কী? তোমার এই দোকান ভাঙ্গতে হবে। কী? ও, ল্যুচেন। তা শোনো, এখান দিয়ে নতুন রাস্তা হবে, তোমার দোকান থেকে সুরু করে আরও ত্রিশ ফিট জমী চাই, বুঝলে? তা ছাখো হে ল্যু, আজ থেকে পনেরো দিন তোমায় সময় দিয়ে যাচ্ছি তোমার দোকান তুলে নাও। এই দিন মধ্যে যদি তুমি তোমার দোকান না সরাও তবে পনেরো দিন পরে আমরা তোমার দোকান ভেঙ্গে দেবো।"

কাগজপত্রগুলো আবার পকেটে রাখলো। ওর কায মিটে গিয়েছে। ওর পেছনে আরও তিন জন খাকী পোষাকের—ওরা বোধ হয় কনেষ্টবল হবে। ওরা মিলিটারী লোক, সময় ওরা নষ্ট করে না। ল্যুচেন কী যেন বলতে চাইলো কিন্তু কথা বেরুলো না। তালু শুকিয়ে গিয়েছে, দু'বার ঢোক গিলে নিলো, জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে নিলো, তবু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

এক জন কনেষ্টবল ওর দিকে চাইলো। ওর চাউনীর মধ্যে যেন অনুকম্পা আছে। যেন ওর মনে হচ্ছে, আহা বেচারা! ওর চোখের দিকে চেয়ে ল্যুচেনের যেন একটু সাহস এলো। ততক্ষণে অফিসারটি পিছন ফিরে রওনা দিচ্ছেন। ও হঠাৎ ভাঙ্গা মোটা খড়খড়ে স্বরে [illegible] উঠলো, "দশ হাজার—দশ হাজার ডলার"— "কী বলছে?" অফিসারটি ঘুরে দাঁড়ালো ল্যুচেনের দিকে। ও থতমত হ'য়ে বলে [illegible], "আমার দোকানে দাম দিতে হবে দশ হাজার ডলার—দশ হাজার ডলার।"

অফিসারটি অবাক্ হ'য়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বন্দুকটা হাত দিয়ে চেপে ধরতেই ল্যুচেন ভয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলো—তখনও হুড়কো লাগায়নি। অফিসারটি বন্দুকের ঝকঝকে ইস্পাতের ছুরীর মত ফলাটা দরজার ফাঁক [illegible] ঢুকিয়ে দরজাটা ফাঁক করে কটমটে চোখে ওর দিকে চাইলো। ওর নাতিটা তখন কাঁদছে, ভয় পেয়েছে। ওকে কোলে তুলে নিলো ল্যুচেন। বেচারী দাদুর কোলে উঠে ঘাবড়ে গিয়েছে—[illegible] দাদুর কাছে বকুনী, ঘরে বন্ধ, মার দেওয়া—এইতেই ও অভ্যস্ত। কাঁদলে তো কোলে তুলে নেয় না দাদু!

ল্যুচেন ওকে থামাবার কোন চেষ্টা করছে না—মুখে গুন-গুন [illegible] —শুধু বলে যাচ্ছে "দশ হাজার,—দশ হাজার ডলার,—দশ হাজার—" নির্ব্বোধের মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে বলে যাচ্ছে এক [illegible] অফিসারটি খানিকক্ষণ ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে দগ্ধ করে [illegible] হো-হো করে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতেই বললে—"ও, তুমি দশ হাজার ডলার আমাদের নতুন রাজধানী পত্তনের [illegible] করতে চাও? তা এ তো খুবই ভালো কথা, বেশ কথা—"

দান? কীসের দান, কেনই বা ও দান করবে টাকা! [illegible] কোল থেকে নেমে মাটিতে পড়ে কাঁদছে ছেলেটির [illegible] একবার পড়ে যায় কেউ না তোলা পর্য্যন্ত [illegible] চলবে, [illegible] না—এখন কেই বা ওকে থামাবে কোলে নিয়ে!

অফিসারটি চলে গিয়েছে—ল্যুচেন তখনও চেয়ে আছে [illegible] মতো পথের দিকে। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পিটছে, নিশ্বাস [illegible] নিতে পারছে না।

দোকান ভেঙ্গে দেবে? দোকান যে ওর প্রাণ। প্রাণ [illegible] কি দেহ থাকে? ও তবে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে?

নতুন করে রাজধানী বসবে—নতুন করে রাস্তা তৈরী [illegible] সব উদ্ভট ব্যাপার হচ্ছে কেন? কী করবে ও নতুন রাস্তা [illegible] ও কি বলেছে যে, ওর চাই এই সব? ও তো সামান্য [illegible] দোকানী মাত্র—কী দরকার ও-সব রাস্তা আর সহরে?

ছেলেটাকে মাটী থেকে কোলে তুলে টুলের ওপর বসে [illegible] লাগলো।

দোকান কার জন্মে? এই নাতির জন্যেই তো? [illegible] ওই দোকানে। দোকানখানাও যদি যায় বেচারীর কী [illegible] কী ও করবে বড় হ'য়ে? এখন ভয় চলে গিয়ে রাগ [illegible] রেগে গেলো। নিজ মনেই বলতে লাগলো—দেবো না দে[illegible] আমি কিছুতেই দোকান ছেড়ে দেবো না—দেখি কী করে [illegible] গুলো। হ্যাঁ, তুলে দেবে,—দেখি তোলে কেমন করে? আমি [illegible] বসে থাকবো, নড়বো না, যতক্ষণ মাথার ওপর একখানি চাল [illegible] আমি নড়বো না এই ঘর থেকে—কে আমাকে সরায় [illegible]। প্রতিপক্ষকে অনেকটা কায়দা করে জব্দ করার এই মতলবটা বের

ক'রে ও একটু খুশী হোলো, বেশ একটু খুশী হোলো। উঠলো, আবার নতুন করে উনুন ধরিয়ে কড়াই-ভর্ত্তি জল চাপিয়ে দিলো, বেশী করে জাল দিতেই জল ফুটে উঠলো টগবগ করে।

নানা কারণে মনটা খিঁচড়ে আছে—এই সময় এলো সেই ছুকরী দাসীটা কেটলী নিয়ে, গোলাপী গাল, চটুল চাউনী। ওর দিকে চেয়ে মুচকী হেসে বলল—"দাও বুড়ো, ভ'রে দাও।" ল্যুচেন ওর কেটলী ভ'রে জল দিলো না, কম দিলো, মেয়েটাও ছাড়বে না, ভ'রে নেবেই। কিছুতেই জল ও ভ'রে দিলো না। মেয়েটা বাঙ্গা ঠোঁট কুঁচকিয়ে হেসে বললো—"নয়া সড়কের কাযটা আরম্ভ হলেই আমি খুব খুশী হই বুড়ো। আমার খুব আনন্দ হয় তোমার দোকানটা যাবে আগে—তোমার মতো ডাকাতে ছ্যাঁচড়া বুড়োর উপযুক্ত শাস্তি হবে, সেই তোমার ঠিক হবে।" তবু ল্যুচেন ওর কেটলী ভ'রে জল দিলো না। মেয়েটা চটুল কটাক্ষে চেয়ে হেসে চলে গেলো। মেয়েটা যখন রাস্তায় নেমে গিয়েছে, তখন ও চীৎকার করে বললো, "আমার কাছ থেকে ওরা কিছুই পাবে না, আমার দোকান ভেঙ্গে দেবে, এমন ক্ষমতা কারো নেই—কিছুই করতে পারবে না।"

মেয়েটা ঘাড় বেঁকিয়ে ওর দিকে চেয়ে খিল-খিল্ করে হেসে বুড়োকে আরও রাগিয়ে দিয়ে গেলো—ও মাটীর ওপর থুঃ থুঃ করে থুথু ফেলে চেঁচিয়ে উঠলো, "এই—এই তোমাদের নয়া সড়কের পুরস্কার!"

এমন সময় ওর ছেলে ঘরে ঢুকে চায়ের পটটা গরম আছে কি না দেখতে দেখতে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, "নয়া সড়কের কী কথা হচ্ছে?"

ল্যুচেন উত্তপ্ত হ'য়ে বললো, "এতোক্ষণে বাবুর সময় হোলো আসার। এখন তো আসবেই, খাওয়ার জন্যে বাড়ীতে না এসে যাবে কোথায়? ওটা যোগাড় করবার ক্ষমতা তো আর তোমার নেই? ছিলে কোথায় এতোক্ষণ?"

টী-পটের ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাপের দিকে আড় চোখে চেয়ে বললো, "কিন্তু বাবা, নয়া সড়কের কথাটা ঠিকই, কাজও শীগ্‌গিরই সুরু করবে, এখন আর এতে কোনই সন্দেহ নেই। আমাদের দোকান-ঘর, আর শোওয়ার ঘর দু'খানার অর্দ্ধেকটা জমি ঐ রাস্তায় পড়বে। তাহ'লে এদিকে যাবে তিরিশ ফিট, তাহ'লে দ্যাখো, আমাদের থাকে ঘরের আদ্ধেখানি মাত্তর। তাহ'লে ঐটুকুই আমাদের দখলে থাকে।"

ল্যুচেন ওর দিকে তাকালো। চোখে অবিশ্বাস, রাগ ফুটে বেরুচ্ছে, তখন রাগে ওর চোখও যেন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছেলের হাত থেকে টী-পটটা আছড়ে ফেললো, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেলো চীনেমাটির পট। রাগে ওর গলাও বুঁজে এসেছে, রুদ্ধ স্বরে বললো, "তুমি আসবে, তুমি চা খাবে, ভাত খাবে, আর আ—" কান্নায় ওর গলা বুঁজে গেলো, ছুটে পাশে শোবার ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠলো। মন তিক্ত-বিরক্ত—ছেলের ওপর রাগটাই বেশী। খাওয়ার সময় ছেলে ভাত খাচ্ছে, ও বিরক্ত হ'য়ে চেয়ে দেখছে, খানিকক্ষণ দেখে ভুরু কুঁচকে বললো—"এ বাড়ীতে খাওয়ার লোক কত— তুমি, তোমার বৌ, তোমার ছেলে—এতোগুলো মানুষের তিন বার করে খোরাকী! এ্যাতো ভাত-এর যোগাড় কোত্থেকে হয় সেটা কি ভেবে দেখেছ বাপু?"

মুখে যাই বলুক—ল্যুচেন মন থেকে কিছুতেই মানতে পারছে না যে, ওর দোকানখানা সত্যিই যাবে। ও নিয়মিত দোকানে যাচ্ছে—জল বিক্রী করছে, যেন কিছুই কোন্ দিন হবে না—হয়নি।

সেই নোটীশ দিয়ে যাবার এগারো দিন পরে এক দিন ওর স্ত্রী এলো গম্ভীর বিষণ্ন মুখে, টেনে টেনে বললো—"দ্যাখো নয়া সড়কটা সত্যিই হচ্ছে, রাস্তার দিকে তাকালেই দ্যাখো লোক জন ভাঙ্গাচোরা আরম্ভ করে দিয়েছে। তা একটা দেখবার মতো দৃশ্য বটে! ওগো, তবে আমাদের কী হবে? আমরা যাবো কোথায়?"—ফুঁপিয়ে কাঁদছে ওর স্ত্রী, ওর ভাবলেশহীন মুখের ওপর ছোট ছোট চোখের জল পড়ছে গড়িয়ে।

ল্যুচেনের হাতে-পায়ে যেন বল নেই, বাইরে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। এ কতো সরু গলির মতো রাস্তা—তাতে গায়ে-গায়ে দোকান—দু'ধারের নানা মাপের সাইন-বোর্ড—সিল্কের দোকানের টাঙ্গান নানা-রঙ্গা কাপড়—ছিট-কাপড় ঝুলান, প্রায় অন্ধকারই থাকে রাস্তাটা—আলো প্রায় দেখা যায় না।

সত্যিই তো, হঠাৎ এ্যাতো রদ্দুর এলো কোত্থেকে? যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে, ঐ মনিহারী দোকানটার ওপর রদ্দুর পড়েছে, জিনিষগুলোর ওপর রদ্দুর পড়ে চক্‌চক্ করছে, ওর সাইন-বোর্ডখানা গেলো কোথায়? শুধু ওটা কেন, অনেকগুলো দোকানই যে ফাঁকা, ওদের সাইনবোর্ডগুলো সবই খোলা দেখছি, সব গেলো কোথায়? ও কি, মজুর লোকগুলো বারান্দার টালী, বাঁশ, খুঁটি দেওয়ালের ইট সবই টেনে নামাচ্ছে—রাস্তার ওপর যে স্তূপ জমাচ্ছে! পাহাড়ের মতো স্তূপীকৃত রাবিশ ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুড়ি ঝুলিয়ে গাধা অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

ওর কাছে এসেছিলো যে অফিসারটি সেই তো চলছে রাস্তায়। তার পেছনে চার জন মেয়ে—গিন্নী-বান্নী গোছের মেয়েলোক চার জন—চীৎকার করছে হাউ-মাউ করে, বিকৃত আওয়াজে কী বলছে ওরা—বোঝা যাচ্ছে না। ওদের মুখের ওপর চুল পড়েছে, কথা বোঝা না গেলেও, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ওরা কিছু একটা অনুযোগ জানাচ্ছে। কে জানে, ওদের বাড়ী-ঘর বুঝি ভেঙ্গে দিয়েছে! এইবার শোনা যাচ্ছে ওদের কথা, ওরা চীৎকার করে কাঁদছে, বিকৃত স্বরে শাপমন্যি দিচ্ছে, "আমাদের বাড়ী গেলো, ঘর গেলো, কোথায় থাকবো আমরা? ওগো, আমাদের দোকান গেলো, আমরা খাবো কী? আমরা যাবো কোথা?"—বিলাপ করছে ওরা, আহা!

ল্যুচেন আর সহ্য করতে পারলো না,—এ দৃশ্য দেখা যায় না। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে উনুনের কাছে বেঞ্চটার ওপর থপ্ করে ব'সে পড়লো। হাঁটু দু'টো কাঁপছে, হাত কাঁপছে, চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছে! নির্ব্বোধের মতো ব'সে রইলো।

নাতি ওঘর থেকে দৌড়ে এসে ওর কোল ঘেঁসে দাঁড়ালো। বেচারী দাদুর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে গরম জলের কড়াইখানার কাছে গেলো। ও জানে, ঐ কড়াইখানার কাছে গেলেই ওর দাদু হাঁ-হাঁ করে তেড়ে আসে, কিন্তু অবাক হোয়ে গেলো কৈ, দাদু তো কিছু বলছে না। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কড়াইটা ছুঁয়ে দেখলো। ঐ কড়াইখানার ওপর প্রচণ্ড লোভ—দাদু তবু নির্ব্বিকার ব'সেই রইলো!

ল্যুচেন দেখছে চেয়ে চেয়ে, মনে মনেই বললো—কী হবে? পুড়ে মরবে? না হয় এখন হাত-পাটা পুড়বে—এ আর কী! বাছা, এর পর যে তোমায় না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

দরজায় ধাক্কা।—সেদিনের মতোই জোর ধাক্কা! ল্যুচেন লাফিয়ে উঠে অনেক কষ্ট করে দরজার হুড়কো খুলতেই দেখলো সামনেই সেই অফিসারটি, আর তিন জন সৈন্য সঙ্গে! ওদের চোখ-মুখ দেখে কে বলবে যে একটু আগে এরাই এতো গালাগালি শাপমন্যি পেয়েছে! বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব মুখে, যেন কিছুই হয়নি ওদের। ওর দিকে চেয়ে ল্যুচেনের সহসা মনে হোল, ওর আর বেঁচে থাকার দরকার নেই, এখন মরলেই ভালো, যথেষ্ট দিন বাঁচা হ'য়েছে।

অফিসার বেশ হেঁকে বলে উঠল—"আর চার দিন, ওহে বুড়ো, আর চার দিন, তার পরই তোমার দোকান যাবে—তুমি নিজে দোকানখানা তুলে দিলে ইট-কাঠগুলো তোমারই থাকবে, তা যদি না করো তুমি তাহ'লে আমরাই মজুর দিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেবো, তাহ'লে কিন্তু রাবিশ মাল-মশলা তুমি কিছুই পাবে না—কাঠ বাঁশ, কিছুই তুমি পাবে না—বুঝলে?"

ল্যুচেন বললো—"হাঁ হুজুর, টাকাটার কী রকম ব্যবস্থা হ'চ্ছে?"

অফিসারটি ওর লোহার নাল লাগান ঝকঝকে পালিশ বুট জুতোর ওপর হাতের ছড়িটা দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে বললো,—"টাকার ব্যবস্থা, সেটা কী? টাকা কোথায়?"

ল্যুচেন এবার অত ভয় পায়নি, ও বেশ দৃঢ় ভাবেই বললো—"হুজুর, আমার দোকানখানার জন্যে দশ হাজার ডলার দাম দিতে হবে, এ কথা তো আমি সেদিনই বলেচি।"

ওর কথায় অফিসার হাসলো, এবার ওর গলার স্বরে একটুও উত্তাপ নেই, ধীরে সুস্পষ্ট উচ্চারণে বললো—"এর মধ্যে তো টাকার কোনই কথা নেই বুড়ো, এটা তুমি গণতন্ত্ররাষ্ট্রকে দিচ্ছ, তাদের কাযে তুমি দিচ্ছো, এবার বুঝতে পারলে? দেশের—দশের কাযে তুমি দিচ্ছো।"

ল্যুচেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো, চোখের সামনে এগুলো কী ঝরে পড়ছে? এ কি আলোর ফুলঝুরি? না তো অন্ধকার—দিনের আলো কি নিবে গেলো? পড়তে গিয়ে হাত দিয়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়ালো, রাস্তায় লোকদের হাঁক-ডাক দিয়ে চীৎকার করতে লাগলো, "ওহে তোমরা সবাই এসো, দ্যাখো, তোমরা দেখে যাও, আমার একমাত্র সম্বল আমার ভাত-কাপড়ের একমাত্র পুঁজি এই দোকানখানা—এরা—এই গণতন্ত্রের লোকেরা ডাকাতী করে কেড়ে নিচ্ছে! আমার দোকান কেড়ে নিচ্ছে ওরা! কে এই গণতন্ত্র? কে চেয়েছে—কে গণতন্ত্রকে আসতে বলেছে? গণতন্ত্র কি আমার বৌ ছেলেদের খেতে দেবে? আমাদের ভাত-কাপড় দেবে? ও হো-হো! আমার একমাত্র নাতিটা, সেও না খেয়ে মরবে গো! তোমরা দেখে যাও গো!"—ডুকরে ওঠে।

জামার কোণে টান পড়তে পেছন ফিরে দ্যাখে সেদিনের সেই খাকী-পরা আর্দালীটা, ওর কানের কাছে ফিস-ফিস করে বলল,—"ওহে, আমার কথা শোনো, অফিসার উনি, ওকে চটিয়ে দিও না, ও-রকম করলে তুমি আরও বিপদে পড়বে।" ঘুরে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে মুখ করে শুনিয়ে বলতে লাগলো—"ওহে বুড়ো, তুমি দুঃখ কোরো না—অনুযোগ কোরো না, ভেবে ছাখো, দোকান তোমার যেতোই, হয় আজ নয় দু'দিন পরে—কারণ, গরম জলের জন্যে দোকানের আবশ্যক আর থাকবে না—বুঝেছ? রাজধানী, আর নয়া সড়ক—এগুলো হ'য়ে গেলেই রাস্তায় বসবে গরম জলের কল—কল টিপলেই গরম জল পাবে। তাই তুমি ভেবে ছাখো—তোমার জলের দোকান কি আর চলতো?"

কী যেন বলতে চাইলো ল্যুচেন, কিন্তু ওর ছেলে এসে পেছন থেকে ওকে ধীরে সরিয়ে দিয়ে অফিসারের সামনে এসে দাঁড়ালো। অফিসারকে মাথা নামিয়ে সম্মান দেখিয়ে বিনীত ভাবে বললো,—"মহামান্য হুজুর, এই বৃদ্ধকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার বাবা কিছু জানে না, সুতরাং যা বলবার আমিই বলছি।"

দোকান তুলে দেবার ব্যবস্থা আমি করছি, আমি কথা দিচ্ছি, চার দিন পরে এখানে আর এ দোকান থাকবে না। দেশের জন্যে আমাদের এই সামান্য দোকানখানা যে দিতে পারছি, এতে আমরা কৃতার্থ বোধ করছি।" অফিসারটি হেসে চলে গেলো।

ল্যুচেনের চীৎকার হাঁক-ডাকে রাস্তার ওপর বেশ একটা ভিড় জমে গিয়েছিলো। সবাই যে ওর দুঃখে সহানুভূতি জানাতে এসেছে তা নয়, বেশীর ভাগ এসেছে মজা দেখতে। ওর ছেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাপের মুখোমুখি দাঁড়ালো—মুখে-চোখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ল্যুচেন আগে দেখেনি।

"বাবা, তুমি কি চাও যে আমরা সবাই প্রাণে মারা যাই? তাই তুমি চাও? সামান্য একটা দোকানের জন্যে কি আমরা সবাই পুলিশের হাতে প্রাণ দেবো?"

ল্যুচেন স্ত্রীর পাশের চেয়ারে ব'সে হতাশ হ'য়ে বললো—"মরতে আমাদের হবেই বাপু, সে পুলিশের হাতেই হোক, কি অনাহারেই হোক, আমাদের বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই।"

পাশে বসে ওর স্ত্রী গুন-গুন করে কাঁদছে, একঘেয়ে কান্না, মুখে-চোখে কোন সুখ-দুঃখের ভাব নেই, ওর ছোট ছোট চোখ দিয়ে জলের ধারা নামছে মুখে—পুরু ঠোঁটে, জামার ঢিলে আস্তিন দিয়ে বার বার চোখ মুচছে।

ছেলে বলল, "অতো হতাশ হোচ্ছ কেন বাবা? আমি কাজ যোগাড় করেছি, এই নয়া সড়কের কাজের আমি ওভারসীয়র নিযুক্ত হচ্ছি, কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়ে গিয়েছে।"

ল্যুচেন তেমনি হতাশ ভাবেই বললো, "তোমাকেও ওরা কাজ দিয়েছে?"

ছেলে অস্থির ভাবে কপালের চুলগুলো তুলে দিয়ে বললো,—"ছাখো বাবা, এটা তো বোঝো, এখন এই নিয়ে বিরোধ, অশান্তি ক'রে কোন লাভ নেই? নয়া সড়ক, রাজধানী এ সব যখন হবেই, —হবেই কেন হচ্ছেই, কেউ আটকাতে পারে না—পারবে না, তখন অনর্থক কান্নাকাটি করে কী হবে? ভেবে ছাখো, এই নোংরা গলির মত রাস্তা ভেঙ্গে ফেলে নতুন চওড়া সোজা বিরাট রাজপথ হবে, সেই রাস্তাতে চলবে মোটর গাড়ী। রাস্তার দু'ধারে আলোয় ঝলমল করবে ওঃ, সে কী চমৎকার হবে! আমি ইস্কুলে পড়ার সময় একখানা বিদেশী বইতে এই রকম ছবি দেখেছি, বিরাট চওড়া সোজা রাস্তা—দু'ধারে সাজান ঝলমলে দোকান—মালার সারির মত আলো আর কত রকমের মোটর ট্রাক,

ট্রাম চলছে। আর আমাদের? আমাদের শুধু ঠ্যালা গাড়ী, রিক্সা আর গাধার পাল—রাস্তায় যেমন নোংরা তেমন ভীড়, পথের ওপর দোকান মেলে বসে থাকা কী বিশ্রী—কী কদর্য বলো তো? এই রাস্তা হয়েছিলো ধরো হাজার বছর আগে, তখন হয়তো চওড়া রাস্তার প্রয়োজন ছিলো না; তাই বলে কি চিরদিন তাই থাকবে? আমাদের দেশে কি নতুন কিছুই হবে না? এক রকমই থাকবে?"

ল্যুচেন ভুরু কুঁচকে তাকালো,—"বাপু, মোটর গাড়ীর দরকারটা কী? ওই রাক্ষসের মত অলুক্ষুণে গাড়ী ছাড়াই তো আমাদের এতো দিন বেশ চলেছে এখনই বা কী দরকার?"

ল্যুচেন হালে ঐ হাওয়া গাড়ীগুলো রাস্তায় চলতে দেখেছে—চলে যেন দানবের মতো—ঐ ভয়ঙ্কর গাড়ীগুলো চলে যখন, রাস্তার লোকজন ভয় পেয়ে হুড়োহুড়ি করে কে কার ঘাড়ে পড়ে ঠিক নেই—কেউ বা ঠ্যালা গাড়ী শুদ্ধ নর্দমায় গিয়ে পড়ে। গাড়ী দেখলেই ভয় করে—ও গাড়ীকে ও শুধু ভয় না—দস্তুর মতো ঘৃণা করে। "আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা"—

ছেলে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—"ও কথা বাদ দাও বাবা, সে যা তখন ছিলো—ছিলো; এখন কাযের কথা শোনো। নয়া সড়কের কাযে আমি মাসে পঞ্চাশ ডলার করে পাবো—প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার।"

এক মাসে পঞ্চাশ ডলার? ল্যুচেন অবাক হয়ে এবার ছেলের দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকালো, পঞ্চাশ ডলার? একসঙ্গে পঞ্চাশ ডলার ও কখনও চোখে দেখেনি। সে কত টাকা? ওর স্ত্রীর সেই গুনগুনে একঘেঁয়ে কান্নাটা আর শোনা যাচ্ছে না। ল্যুচেনের মুখখানাও বেশ খুশী লাগছে, একটু ভয়ে ভয়ে বললো—"তা মাসে মাসে এ্যাত্তোগুলো টাকা দেবে কে—এঁ্যা?"

ছেলে গম্ভীর মুখে বললো—"গণতন্ত্র সরকার আমার মাহিনা মাসে পঞ্চাশ ডলার দেবে,—লেখা-পড়া হ'য়ে গিয়েছে এ বিষয়।"

মায়ের চোখে জল, মুখে হাসি—"হ্যাঁ, আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, আমাকে কালো সাটিনের কোট একটা কিনে দিতে হবে। নীলা-মের না—নতুন কোট আমার চাই।"—বলে ও যেন কল্পনায় সেই কোটটা কী সুন্দর হবে দেখতে পেয়ে মোটা গলায় খুক-খুক করে হেসে উঠলো।

ল্যুচেন সারা দিন ধরে ভেবে-চিন্তে দেখলো যে, দোকান নিয়ে দুঃখ অনর্থক। আর ভেবে কোন লাভ নেই, ঐ দোকান থেকে খোরাকীর আশা আর নেই। কী হবে ও দোকান আঁকড়ে থেকে?

আজ ও উনুনে আঁচ দিলো না—এই প্রথম, পঞ্চাশ বছর পর এই প্রথম দিন ওর উনুন জ্বললো না, জল গরম হোল না। ঠাণ্ডা কড়াই—ঠাণ্ডা উনুন! জল নিতে দাসীরা এলেও বেশ শান্ত হয়ে বললো—"আমার দোকানের জল তো আর তোমাদের নেবার দরকার নেই; তোমাদের নয়া সড়ক তৈরী হচ্ছে, গরম জলের পাইপ বসবে, এখন আমার কাষ মিটে গিয়েছে, যত দিন পাইপ না বসে, নিজেরা বাড়ীতে জল করে নাও গে যাও।"

সেই ছুকরী মেয়েটা ওকে টুকটুকে লাল জিব বের করে ভেংচি কেটে চলে গেলো—তা দেখেও ওর না হোলো রাগ, না একটু দুঃখ, ও যেন দেখতেই পায়নি।

পরদিন সকালে ছেলে বললো ওকে—"বাবা, আমি এই সময় জনমজুর ডেকে কায আরম্ভ করি, নাহলে পরে যে আমরা ইট-কাঠগুলোও পাবো না।"

ল্যুচেন হটাৎ রেগে উঠলো, "না, যখন যাবেই, তখন সবই যাক, একেবারেই যাক! আমার দোকানই যদি গেলো, ভাঙ্গা-চোরা দু'পাঁচখানা বাঁশ-কাঠ দিয়ে আমি কি করবো? সব যাক!"

চারটে দিন ও কোথাও বেরুলো না, দোকান-ঘরের মধ্যেই দিন-রাত রইলো। ভালো করে খেলো না, কথাবার্ত্তাও বললো না, দরজাও প্রায় বন্ধ করেই রাখলো, দরজা বন্ধ থাকলেও শব্দ সবই কানে আসছে—ওর দোকান ভাঙ্গছে, দেওয়াল ভাঙ্গছে, হুড়মুড় করে ইট খসছে, ছাত ভাঙ্গছে, ক্রমেই ধ্বংসের শব্দটা কাছে আসছে! একশো বছর থেকে দেওয়ালের খুঁটিগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো, কিন্তু ভাঙ্গতে তো দু'মিনিটের বেশী সময় লাগলো না! অত কোলাহল—চীৎকার কিসের? ওরা কাঁদছে—আর্ত্তনাদ করে বুক চাপড়াচ্ছে, ওদের বিলাপ বন্ধ-দরজা ভেদ করে ওর কানে আসছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ওদের কান্না। ওরও তো ওদেরই মতো অবস্থা, ওদেরও মাথার ওপরকার আচ্ছাদন, ওদের খোরাকীর অবলম্বন ভেঙ্গে পড়ছে, ঝরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ে রাস্তায় রাবিশের স্তূপ বাড়াচ্ছে। ওদের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে,—টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে!

নোটিশ দেবার পনেরো দিন পরে আবার ওর দরজার ধাক্কা! ও তখুনি দরজা খুলে দিলো—জন দশ-বারো মজুর, ওদের হাতে ধ্বংসের অস্ত্র—কুড়োল-শাবল। ও সোজা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বললো—"তোমরা দোকান ভাঙ্গতে এসেছ? বেশ, ভাঙ্গো। তা তোমরা তোমাদের কায করো, আমার তো কিছু করবার নেই! ভাঙ্গো তোমরা।" ও আবার সেই বেঞ্চটায় ওপর বসলো, লোকগুলো হুড়মুড় করে ঢুকলো ঘরে। লোকগুলোর মুখে-চোখে কোথাও একটু দয়া-মায়ায় লেশমাত্র নেই, যেন সব মূর্ত্তিমান ধ্বংস-দূত ওরা! আর তা থাকবেই বা কেন? ওদের কাযই এই। ক'দিনের মধ্যেই অন্ততঃ একশোখানা বাড়ী ভেঙ্গে মাটীতে মিশিয়ে দিয়েছে।

ল্যুচেনের বউ, ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি গিয়েছে ওদেরই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে, সেখানেই ওরা থাকবার ব্যবস্থা করেছে একটা বাসা যত দিন না পায়। ঠ্যালা গাড়ী করে ওরা মাল-পত্তর সবই নিয়ে গিয়েছে, শুধু পড়ে আছে ওর দোকানের বেঞ্চিখানা, আর জল গরম করায় তামার কড়াই দু'খানা।

ছেলে ওকে বলেছিলো, "বাবা, একটা ছোট বাসা আমি পেয়েছি, সেখানে চলো যাই, কোম্পানী আমায় এক মাসের মাহিনা আগাম দিয়েছে।"

ও কিছু উত্তর করেনি, যায়নি, সেই থেকেই বসেই আছে। বিরাট কড়াই, মাটীর সঙ্গে গেঁথে উনুনে বসান আছে, নড়ানর উপায় নেই, দু'জন লোক সেটায় শাবল দিয়ে ঘা দিতে লাগলো।

"এই উনুন আমার ঠাকুর্দ্দা নিজ হাতে করেছিলো, এখন কি কেউ এ রকম মজবুত উনুন করতে পারে? সে আমলের মতো কারিগর কি এখন আছে?"—আর একটিও কথা ও বলেনি, শুধু দেখতে লাগলো,—ছাতের টালী টুকরো হয়ে মেঝের ওপর পড়ছে, ছাত এখন ফাঁকা, রদ্দুর এসে পড়েছে মেঝের ওপর—ভাঙ্গা উনুনটার ওপর। টালী-বসানর বাঁশের ফ্রেমের চৌকো-চৌকো ফাঁক দিয়ে চার চৌকো রদ্দুর ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন ওরা বাঁশের ফ্রেমটা খুলছে—ভাঙ্ছে ওদের তিন [illegible]

কালো বাঁশগুলো, পড়ছে মাটাতে একটার ওপর একটা। ঘর ভরে গেলো—বিকেলের পড়ন্ত রদ্দুরে ভ'রে গেলো ঘর—রদ্দুর যেন ঝরণার ধারার মতো অবাধে এসে পড়েছে ওর মাথায়, গায়ে, ভাঙ্গা-খুঁটি-বাঁশের স্তূপের ওপর—রদ্দুরে ভ'রে যাচ্ছে। এখন আর ওপরে কিছু নেই, শুধু ক্যাড়া দেওয়াল চারখানা।

ক্লান্ত অবসন্ন ল্যুচেন শুধু দেখছে—বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত্রি এলো! ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে বেঞ্চির ওপর বসেই রয়েছে ও। ঘর আর এখন নেই, শুধু টালী ভাঙ্গা বাঁশ-কাঠ, ভাঙ্গাই টের স্তূপ—কড়াই দুখানা তাদের চির অভ্যস্ত ঠাঁই-ছাড়া, পড়ে আছে কাত হয়ে ভাঙ্গা টালীর ওপর।

পাড়া-প্রতিবেশী দু'-চার জন বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে ওকে দেখে যাচ্ছে—বুড়ো কি শেষটা পাগল হয়ে গেলো না কি?

রাত হয়ে গেলে ওর ছেলে এসে অনেক বুঝিয়ে ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো। শেষে বললো ওর ছেলে, "বাবা তোমার নাতি কিছু খাচ্ছে না, দুপুরেও সে কিছু খায়নি, শুধু তোমার জন্যে কাঁদছে, তুমি না খেলে খাবে না, চলো।" শুনে ছেলের হাত ধরে আরেক বার চার দিকটা দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলো।

উত্তর ফটকের ভেতরে ওরা খড়ের চাল, আর বাঁশের বেড়া দিয়ে মাথা গোঁজবার মতো একটু আশ্রয় করে নিয়েছে। এদিকটায় বসত-বাড়ী-ঘর বেশী নেই—দু'-চারখানা; এদিকটা নাবাল-মাটী, ভেজা স্যাঁতসেঁতে। এখানে এসে ল্যুচেনের সব থেকে অস্বস্তি লাগতো এখানকার নির্জ্জন—নিস্তব্ধতা। কোন দিন এ রকম জায়গায় থাকেনি তো, বাজার দোকানের মধ্যে থাকা, সর্ব্বদাই মুখর কোলাহল, পথ-চলতি লোকজন, কর্ম্মমুখর ব্যস্ততার সঙ্গেই ওর আবাল্যের পরিচয়। এখানে সাড়া-শব্দ নেই, এইটে ওকে বড় কষ্ট দেয়। যেদিকে চোখ যায়, শুধু মাঠ আর মাঠ, ভালো লাগে না ওর, মনটাও ওই মাঠের মতোই খালি বোধ হয়।

ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে ও দিন-রাত বসেই থাকে, কাযকর্ম্ম কিছু নেই। শুধু বসে থাকা—শুধু অকর্ম্মণ্য অলস হয়ে বসে থাকা। ও যেন এ কয় দিনেই বুড়িয়ে গেছে। সর্ব্বদা কাযের মধ্যে থাকতো, দেহ মন দুই সক্রিয় ছিলো, এখন ও যেন দিনে দিনে বয়সের ভারে নুয়ে পড়ছে।

মাসের শেষে ওর ছেলে মাহিনার টাকা নিয়ে এলো, ঝকঝকে পঞ্চাশখানা রূপোর ডলার। বাপ-মাকে দেখিয়ে বেশ গর্ব্বিত ভাবে বললো—"দোকান থেকে কত টাকা আসতো? এ্যাতো টাকা, বাবা, পঞ্চাশ ডলার, সোজা কথা?"—এখন ও আর আগের সেই অকেজো আড্ডাবাজ ছেলে তো নয়, এখন ও দস্তুরমতো কাযের লোক, বড় চাকুরে ছেলে, ওর পরনে ঢিলে-ঢালা পোষাক নয়, খাকী পেতলের বোতাম দেওয়া আঁট-সাঁট পোষাক।

ল্যুচেন ছেলের কথায় কিছু মাত্র উৎসাহ দেখালো না,—"আমার ঐ কড়াই দু'খানায় কত জল ধরতো—কম করেও অন্ততঃ কুড়ি গ্যালন জল একবারে ফুটতো!"

এক দিন ওর স্ত্রী এসে দেখালো নতুন সিল্ক-সাটানের কোট, ছেলে কিনে দিয়েছে। ল্যুচেন খুব নিরুৎসাহ দেখিয়ে বললো—"আমার মায়ের যে একটা ছাই-রঙা সাটানের কোট ছিলো, সে রকম কোট তোমরা কখনও দেখোনি, সে রকম জিনিষ এখন চোখেও দেখা যায় না।"

আবার চুপ করে বসে ঝিমোতে লাগলো। কারো সাধ্য নেই, ওকে ঘর ছেড়ে বাইরে নিয়ে যায়। এক পা বাইরে বেরুবে না, ওই বসে বসে ঝিমোবে, মাথার চুল সাদা হ'য়ে গেলো, গায়ের চামড়া ঢিলে, শুকনো, বুড়ো বয়সে যা হয়। দীর্ঘকাল ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত কাযে ডুবে থাকতো, সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকতো, কর্ম্মব্যস্ততায় জরাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলো, আমল ছায়নি—এখন সুযোগ পেয়ে জরা যেন ওকে গ্রাস করে ফেলেছে। চোখ ওর ছোট ছিলো,—কিন্তু দৃষ্টি ছিলো প্রখর উজ্জ্বল অনিসন্ধিৎসু—সেই চোখ হয়ে গিয়েছে বুড়োদের মতো ঘোলাটে ঝাপসা! ওর দুরন্ত নাতিটা মাঝে-মাঝে কাছে এসে মনটাকে নাড়িয়ে দেয়, তাছাড়া সবটা সময় কাটে সঙ্কীর্ণ চারখানি দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্ধ রেখে। শুধু বসে ঝিমিয়ে আর কোন মতে দিন-রাতে তিনবার উঠে দু'টি খেয়ে আসা—সেই খাওয়াতেও কোন আগ্রহ নেই, রুচি নেই—নেহাৎ শরীর রক্ষার জন্যেই খাওয়া। রাত্রে বেশীর ভাগ বাঁশের মাচার ওপরই শোয়, আবার কখনও টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

সাত দিন অনবরত বৃষ্টি পড়ার পর শরতের আগমনী প্রকাশ পেলো আকাশে-বাতাসে সোনালী রঙ্গের ঝলমলানীতে। শরৎ এসেছে, তার পরই পড়বে দুরন্ত শীত। তাই শরৎ যেন এসে জানিয়ে যায়—এই যে ক'দিন আমি আছি, তোমরা একটু আনন্দ উপভোগ করে নাও, হেসে-খেলে নাও, তার পরই তো দুঃখ-কষ্ট দিতে শীত আসছে, দুরন্ত শীতের আগে আমায় দেখে নাও তোমরা। আমি সেই শীতের অগ্রদূত।

বেশ উজ্জ্বল রদ্দুর থাকা সত্ত্বেও আজ সকাল থেকে ল্যুচেন শরৎ কালের গা-ছমছমে স্যাঁতস্যেঁতে ঠাণ্ডা, যেমন শরৎ কালে হয়, অনুভব করছিলো।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের তীব্র সোনালী রদ্দুর দূরের গাছের ওপর খোলা ক্যাড়া মাঠের ওপর যেন ঝরে-ঝরে পড়ছে। সবটাই ঝলমলে লাগছে।

ল্যুচেন ওর ঘরের জানালা খুলে দিলো। ভেজা মাটীর সোঁদা গন্ধে ঘর ভরে গেলো। মাঠের মাঝে এখানে-ওখানে এখনও বর্ষার জল জমে আছে। ওর ইচ্ছে হোল, এই জল নিয়ে ও কড়াই ভর্ত্তি করে রাখে। আগের দিন হলে ও তাই করতো, বৃষ্টির জলে কড়াই ভরে রাখতো। তখন এই বৃষ্টি-জলের কি দাম কম ছিলো?

ওর নাতি ঘরে এলো ঠিক সেই সময়, হাতটা বাড়িয়ে হেসে বললো—"চলো দাদু, চলো বাইরে খেলি গে যাই।" ল্যুচেনের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো, মন্দ কি, একটু বাইরে ঘুরে আসা। আস্তে আস্তে উঠে বাচ্চার হাত ধরে ও বাইরে এলো। বাইরের ঝলমল রদ্দুর, বেশ আরামের। ও সোজা চললো এক পড়সীর বাসায়, খবর-বার্ত্তা কি আছে জানা দরকার, অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি কারো সঙ্গে।

ছেলে তো সবদাই ব্যস্ত, কথাবার্ত্তাই হয় না। বাড়ীর মেয়েরা? —দূর দূর, ওদের সঙ্গে কী কথা কইবে ও?

বাচ্চা নাতির অবিশ্রাম কাকলী, নানা পাখীর কিচিরমিচির শব্দ, উজ্জ্বল রদ্দুর, সব মিলিয়ে যেন একটা গুঞ্জনে আকাশ-বাতাস ভরে রয়েছে। এ কী! এ যে বসন্ত কালের মতো লাগছে, ল্যুচেন টালুথালু করে এদিক চাইছে, কী যেন খুঁজে দেখতে চাইছে। এটা কোন্ জায়গা? ঐ তো দেখা যাচ্ছে. উত্তর ফটক—ঐ তো পথ—ঐ পথের শেষের কোণটায় না ওর দোকান ছিলো? ঠিক বোঝা

যাচ্ছে না তো ? কিছুই নেই সব ফাঁকা, আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবে না কি ? দুঃখে ওর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, তবু এগিয়ে চললো। একটা মোড় ঘুরতেই এসে পড়লো বড় রাস্তার ওপর।

এ কী ? এই কি সেই নয়া সড়ক ? এ কী হয়েছে ক'দিনের মধ্যে —কী হয়েছে ? এ কি যাদুমন্ত্রের ভেল্কী বাজী ? একটা বিরাট ফাঁক একটা বিরাট শূন্যতা, এই নয়া সড়ক ? বিরাট প্রশস্ত এক পথ সোজা চলে গিয়েছে, সহরের মাঝখান দিয়ে—এই নয়া সড়ক ! সরু গিঞ্জী অন্ধকার গলি, দু'ধারে গায়ে-গায়ে লাগানো টালীর বারান্দা বের করা দোকান-ঘর, এই সবের সঙ্গেই ও জ্ঞান থেকে পরিচিত, সেগুলোর চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। এ যেন তীক্ষ্ণধার একখানা তলোয়ার, দু'ধারের সব বাধা-বিঘ্ন কেটে পরিষ্কার করে মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে এই নয়া সড়ক ! অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলো, কেমন ভয় করছে ওর। এ যে এক ভয়ানক কাণ্ড—কী হবে এতো বড় সড়কে ? কী আবশ্যক ছিলো এর ?

রাস্তায় কত জন-মজুর কায করছে, দূরে তাদের দ্যাখাচ্ছে যেন এক সার পিঁড়ড়ের মতো। এতো প্রশস্ত সড়ক হয় ? বাবা, পৃথিবীর সবগুলো লোক যদি একসঙ্গে চলে, তবু কারো গায়ে ধাক্কা লাগবে না—এতো চওড়া ?

শুধু একা ও দর্শক নয়, আরও অনেকেই ওর মতো নয়া সড়কের দর্শক। কত লোকই ওর মতো দেখছে, কিন্তু কৈ, কাউকেই তো বেশ খুশী দেখাচ্ছে না—ওদের চোখে-মুখেও বিষণ্ণ কাতর ক্লিষ্ট ভাব !

পাশের লোকটিকে ডেকে ও বললো—"ওহে, তোমার কি এই সড়কের ওপর বাড়ী ছিলো ?"

লোকটি ওর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো—"আমার কথা আর জানতে চেয়ো না ভাই, আমার সর্ব্বস্ব এই নয়া সড়ক গ্রাস করেছে। আমার বাড়ীর মতো অমন পাকা মজবুত বাড়ী এখানে ক'খানা ছিলো ? সে কি আজকের তৈরী বাড়ী ছিলো ? আমার বাড়ী ছিলো সেই মিংদের আমলের ! ঘরই শুধু ছিলো দশখানা, তা ছাড়া কত বারান্দা, সিঁড়ি, গলি। বুঝতেই পারো সে আমলের তৈরী বাড়ী, সে কি রকম ছিলো। আর এখন আমাকে থাকতে হ'চ্ছে কোথায় জানো ?—গোগলা পাড়ার মাটীর ঘরে আমি আছি। আমার অবস্থাটা ভাই বুঝে দ্যাখো। শুধু কি তাই ? ওই বাড়ীর ঘরভাড়া থেকেই আমার গোটা সংসারটা চলতো।"—বেচারী সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

ল্যুচেন আস্তে আস্তে মাথাটা নেড়ে বললো—"আর ভাই, আমার দোকান ছিলো এখানে, আমার তিন পুরুষের গরম জলের দোকান, সব গিয়েছে আমার"—গলা বুঁজে আসে ওর, কষ্টে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। আরও অনেক কথাই ওর বলার ইচ্ছে ছিলো, বিশেষ করে সেই তামার কড়াই দু'খানার কথা ; কিন্তু লোকটা মোটেই শুনছে না, মন নেই, চেয়ে আছে বোকার মতো নয়া সড়কের দিকে।

কে যেন আসছে, কাছে আসতে দেখলো ছেলে আসছে। হাসিমুখে ওর কাছে এসে বললো,—"বাবা, এখন বলো তো, কী রকম লাগছে নয়া সড়কটা ?"

কথা বলতে গিয়ে ল্যুচেনের ঠোঁট দু'টো থর-থর করে কেঁপে উঠলো, যেন বুঝতে পারছে না হাসবে কি কাঁদবে ? দু'-চার বার ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বললো—"বাছা, আমার মনে হচ্ছে যেন গোটা সহরের ওপর দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গিয়েছে, যা' কিছু ছিলো সব ঝড়ে উড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে।"

ছেলে হেসে বললো—"শোনো বাবা, আমার ওপর কোন্ কোন্ কাযের ভার পড়েছে। এইখানটায় হবে সিমেণ্ট-বাঁধান ফুটপাথ, মধ্যিখানে হবে ইলেক্‌ট্রিক মোটরের ঘর, তার দু'পাশে আবার চওড়া রাস্তা, এ্যাতো চওড়া যে অনেক গাড়ী একসঙ্গে চলবে, তার দু'পাশে সারবাঁধা বড় বড় দোকান-ঘর। ভেবে দ্যাখো দেখি, কী চমৎকার দৃশ্য আমাদের নয়া রাজধানীর নয়া সড়ক ! এই সড়কে পৃথিবীর দেশ-বিদেশী কত মানুষ, কত রকমের গাড়ী চলবে এই নয়া সড়কে ! সুন্দর না বাবা ?" চোখে-মুখে উজ্জ্বল আনন্দ !

ল্যুচেন তখনও চেয়ে আছে রাস্তাটার দিকে—এ্যাতো চওড়া পথ ? না জানি লম্বা কতটা, কেউ বলতে পারে না কতটা লম্বা ! শুধু কি লম্বা-চওড়া ? কোথাও কি একটু বাঁকা আছে ? কোথাও না, একেবারে সোজা, হ্যাঁ, ঠিক তলোয়ারের মতো সোজা ! ওর সত্তর বছর বয়স মধ্যে কখনও কোথাও এ-রকম রাস্তা তো চোখে দেখেনি, শোনেওনি কোথাও এ-রকম রাস্তা আছে ব'লে। হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে দেখছে, যতটা পারে ঘাড় উঁচু করে চোখ কুঁচকে দেখছে, রাস্তাটা চলেছে যত দূর দেখা যায় শেষ নেই, সোজা তলোয়ারের মতো রাস্তা চলেছে,—শেষ সীমা নেই—আশ্চর্য্য, অদ্ভুত এই নয়া সড়ক একটা বিরাট কীর্ত্তি—এ কথা স্বীকার করে মনে মনে—বিরাট কীর্ত্তি। কেউ কি আগে ভাবতে পেরেছিলো এ-রকম আশ্চর্য্য রাস্তার কথা ? কেউ পারেনি—এমন কি সম্রাটরাও তো কই এ-রকম রাস্তা তৈরী করাতে পারেনি। এ-রকম রাস্তার কল্পনাও তারা করতে পারেনি।

নাতির দিকে চেয়ে ভাবলো, ওর কাছে তো এই নয়া সড়কটাকে আশ্চর্য্য লাগবে না। নতুন বলেও ও জানবে না। বর্ত্তমানে যুবা সম্প্রদায় পরিবর্ত্তনকে—নতুনত্বকে কত সহজেই মেনে নেয়—ওদের মন আমাদের বুড়োদের চাইতে অনেক শক্তিশালী। এই যে সর্ব্বনাশটা ঘটলো, দোকান-খানা গেলো, ওদের তিন পুরুষের চলতি দোকানখানা যে ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দিলো, কৈ, ছেলের মনে তা নিয়ে একটু দুঃখও দেখি না তো ! দুঃখ যাক, বরং অতো কালের দোকানখানা ভেঙ্গে শেষ করে তার ওপর দিয়ে যে নয়া সড়ক হচ্ছে, তাতেই ওর কত আনন্দ—কত উৎসাহ ! ওরা পরিবর্ত্তন চায়, ওরা নতুন চায়, পুরোনো চায় না, এই ছেলের দল। এই প্রথম ও মনে করলো দোকানখানা গিয়েছে। এ্যাতো দিন শুধু ভেবেছ, ওরা ডাকাতী করে, অন্যায় করে ওর জিনিষ কেড়ে নিয়েছে। গিয়েছে—দোকানখানা শেষ হ'য়ে গিয়েছে—তার ওর মনে বিশেষ ক্ষোভ নেই, চিন্তাও নেই। নিজের মনেই প্রশ্ন করলো, ওর অকেজো ছেলেটাকে কে কাযের মানুষ করেছে ? এই নয়া সড়কই তাকে কাযের মানুষ করে দিয়েছে, টাকা দিয়েছে, সাহস উৎসাহ দিয়েছে এই নয়া সড়ক। নতুন করে ও উপলব্ধি করলো—ওর মন-প্রাণ সবই সেই দোকানখানা ছিলো, ছেলেরও তেমনি এই নয়া সড়ক। ও দোকানের জন্যে প্রাণ দিয়ে খাটতো, যত্ন নিতো, ছেলেও এই নয়া সড়কের জন্যে ঠিক তেমনিই করছে না কি ?

নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলো নয়া সড়কের ওপর—দাঁড়িয়ে রইলো যেন আত্মসমাহিতের মতো দু'টি চোখ মেলে। এই বিপুল, প্রশস্ত নয়া সড়ক—এর শেষ কোথায় ? কোন্‌খানে ? কোথায় নিয়ে যাবে !

অনুবাদ—ধরিত্রী দেবী

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

একে অমাবস্যার রাত্রি তাতে আকাশমণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, প্রচণ্ড বায়ুতে বৃক্ষাদি দোদুল্যমান, চতুর্দ্দিকে শিবা শব্দায়মান, রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে উরুভঙ্গে কাতর ও সন্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। পরে অর্দ্ধরাত্রিযোগে কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা নিকটে আসিলে অনেক উৎসাহ ও সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ ভবশঙ্কর বাবুর অবস্থা হইল। তিনি অন্তর অভিমানে অপমানে মৃতবৎ হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া মুড়ি কাপড় দিয়া শয়ন করিয়া আছেন—প্রদীপ প্রান্তভাগে মিড় মিড় করিতেছে—বাটী নিঃশব্দ—ভাবনায় বাবুর নিদ্রা হইতেছে না, এপাশ-ওপাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বাচস্পতি, গোস্বামী ও প্রেমচাঁদ আস্তে আস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কি নিদ্রিত আছেন?

ভবশঙ্কর। কেমন করিয়া নিদ্রা হইতে পারে? চিন্তা-সাগরে মগ্ন হইয়াছি—তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া এ কর্ম্ম কেন করাইলে?

বাচস্পতি। তাহাতে হানি কি? আর এমন মন্দই বা কি হইয়াছে? যুদ্ধ করিতে গেলেই যে জয় হয় এমত নিশ্চয় নাই—যুদ্ধে মহা মহা বীরও পরাঙ্মুখ হয়, তবে খেদ কেন করেন—উঠিয়া বসুন।

গোস্বামী। তা বটে তো, মাছ ধরিতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে—তার কথাই আছে—"আমি তো মত্ত বটি, চিড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন"।

প্রেমচাঁদ। ভাল বলিতেছেন—মহাশয় খিন্নমান কেন হন—অপমান তো আমার পিঠের উপর দিয়া গিয়াছে, আমি বেদনায় নিড়তে নাড়িতে পারি না, মহাশয় কেন কাতর হন?

ভবশঙ্কর। তা বটে—কিন্তু আমাকে তো পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাতে হইল—এ কর্ম্ম করিবারই আবশ্যক কি ছিল?

বাচস্পতি। তাতে দোষ কি? দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হয়, আপনি উঠিয়া বসুন—মহাশয় দুঃখিত থাকিলে আমরা কিরূপে প্রাণধারণ করিব? একটা ব্রত উদ্‌যাপন করাইতে হইয়াছিল, এ জন্য আহারের কিছু ব্যতিক্রম হয়—উদরের দোষ জন্মিয়াছে, বলরাম সেই দ্রব্য আনো তো?

বলরাম। (আপনা-আপনি বলিতেছে) শালারা মদও খাবে আবার সভাও করবে ও জাত মারবে।

প্রেমচাঁদ। হেমচন্দ্র দে বেটাকে ধরিয়া আনিয়া ঘা কতক দিলে ভাল হয় না?

বাচস্পতি। পল্লীগ্রাম হইলে হইত—সহরে ছুঁতে মাছি কাটে না কি রে? এখানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে—ধরি মাছ না ছুঁই পানী।

প্রেমচাঁদ। তবে একটা জাল হপ্তম্ করিয়া জব্দ করিলে হয় না?

বাচস্পতি। সে বরং ভাল—কিম্বা মফঃস্বলে দারোগার সঙ্গে যোগ করিয়া কোন ভারি তহমত দাও। "সরলে সরল শৈচব শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" সরল ব্যক্তির সঙ্গে সরল ব্যবহার করিবে, শঠের প্রতি শঠতা করিবে।

বলরাম মদ্য আনয়ন করিয়া দিলে সকলেই প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন।

ভবশঙ্কর। গোঁসাই একটা গান কর দেখি, একটু আনন্দ করা যাউক।

গোস্বামী। ঘাড় বাঁকাইয়া গালে হাত দিয়া ঝিঁঝিট রাগিণীতে গাইতে লাগিলেন, "গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষ—ণে—ণে"—

বাচস্পতি। আর জ্বালাও কেন? পরমায়ু তো অস্ত গ্রাস হইয়াছিল সে কথা আর কেন এক্ষণে রং গাও।

গোস্বামী। ওলো আয় রে ব্রজের নারী এনেছি তরী, তোদের পার করি—ডুডু্ব তো—ডুডু্ব তো—ডুডু্ব তো—"

বাচস্পতির চাদরখানা এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল—পৈতেটা কাণে গোঁজা—বাম হাতে হুঁকা—খেমটার চোট সামালিতে না পারিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমচাঁদ। আমি বলি আজ একটা নূতন আমোদ করা যাউক—এ প্রকার আমোদ তো সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।

গোস্বামী। আমি সব রকম আমোদ জানি। কৃষ্ণলীলা করিতে চাও তাও আমার তুণ্ডাগ্রে—নবনারী কুঞ্জর হইয়াছিল—এসো তাই হউক।

প্রেমচাঁদ। এখানে নয় জন নারী কোথায়?

বাচস্পতি। ওহে! নব নারী ও তিন জন পুরুষ সমান—যদি তা না হয় তবে আমরা কাপুরুষ। কর্ত্তাবাবু স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হইয়া আমাদের উপর আরোহণ করুন।

এই বলিয়া তিনি জন পারিষদ মিলিয়া হস্তীস্বরূপ হইলেন এবং কর্ত্তা বাবু তাঁহাদের উপর বসিলেন। প্রেমচাঁদ করির পৃষ্ঠ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের পৃষ্ঠ পদাঘাতের বেদনায় পরিপূর্ণ, কর্ত্তার ভরে ভারাক্রান্ত হইয়া—গেলাম রে মলাম্ রে বলিয়া চীৎকার করিয়া ভুঁয়ে শুয়ে পড়িলেন, এবং কর্ত্তা বাবু ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতলে চীপ করিয়া পড়িয়া গেলেন। বাটীতে গোল হইল কর্ত্তা পড়ে গেলেন। পরিবার সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া দেখে, কর্ত্তার পড়া সামান্য পড়া নয়। তিনি প্রফুল্ল মনে ভক্তিতে গদগদ হইয়া কৃষ্ণলীলা করিতেছেন।

গরু কেটে জুতা দান

টোলের পণ্ডিত শ্রীহলধর তর্কালঙ্কার ও কলেজের পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন যে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিদ্যারত্ন। আরে তর্কালঙ্কার দাদা যে? ফরিদপুর হতে কবে আসা হলো? আমি দুই-তিন বার আপনার তত্ত্ব করিতে টোলে গিয়াছিলাম, সব মঙ্গল তো? এই বরিষা কাল—এক্ষণে নৌকায় যাওয়া বড় ক্লেশ—কেন এত কষ্টভোগ করিয়া গিয়াছিলেন?

তর্কালঙ্কার। ফরিদপুর যাওনে বড় বাঞ্ছা ছিল না। সংসার চলে না কি করি। ওহে ভাই, কলিকাতা এক্ষণে সে কলিকাতা নাই। পিতামহ ও পিতা স্বস্ত্যয়ন শান্তি ব্রত শ্রাদ্ধ ধারকতা ও

রাজকতায় এত কাপড় বাসন ও টাকা পাইতেন যে, পরিবারের ভরণ-পোষণ হইয়া অনেক উদ্ধৃত হইত, এক্ষণে কষ্টে কালযাপন করিতেছি। কলিকাতায় নূতন নূতন মত—ক্রিয়াকাণ্ড নাই, প্রাপ্তির দফা নবডঙ্গা। ফরিদপুরে রামলাল ঘোষ মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এমত শ্রাদ্ধ তৎকালে হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালীকে টাকা ঢেলে দিয়াছেন। রামলাল বাবুর তুল্য লোক দেখিতে পাই না।

বিদ্যারত্ন। হাঁ—

তর্কালঙ্কার। বড় যে হাঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলে?

বিদ্যারত্ন। আর কি বলিব, আপনি বলিতেছেন রামলাল বাবু বড় ভাল, তাই হউক—সত্য কথা বলা বড় দায়।

তর্কালঙ্কার। আরে বলই না—কথাটাই শুনি।

বিদ্যারত্ন। তবে যদি বলাবে তো বলি। ফরিদপুরে আমি পাঁচ বৎসর ছিলাম। রামলাল বাবুকে ভাল জানি। তিনি বর্দ্ধমানের ৺কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের স্ত্রীব মোক্তাব ছিলেন. লাট ঝ্‌মঝ্‌মির মালগুজারির টাকা লইয়া যান। তিনি জানিতেন ঐ মহলখানি সোণার থাল, এ জন্য মালগুজারিব টাকা আদায় না করিয়া নিলাম করাইয়া আপন নামে মহল খরিদ করেন, তদবধি মহল দখল ও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের পরিবার অন্নাভাবে দেশান্তরি হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিষয় হাতে পাইয়া রামলাল বাবু জোলম ও ফেরেবের দ্বারা অনেক অনেক ব্যক্তির বিষয় কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহারা মকদ্দমা করিতে অপারক।

তর্কালঙ্কার। সে যাহা হউক, রামলাল বাবু বড় পুণ্যবান। আপন পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামের সাত-আটটা পুষ্করিণীর মৎস্য ধরাইয়া বৎসর বৎসর গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করান ও ব্রাহ্মণদিগকে থাল গাড়ু টাকা দেন। কলিকাতায় কটা লোক তাহার মত হে?

বিদ্যারত্ন। রামলাল বাবুর দান করা বড় বিচিত্র নহে। তাহার অনেকগুলি লেঠেল চাকর আছে। গ্রামে যাহাকে শাঁসাল দেখেন তাহারই বাটী লুঠ করাইয়া যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন ও সর্ব্বদাই দাঙ্গা হাঙ্গাম করিয়া ভূমি ও বিষয়াদি কাড়িয়া লন, আর তাঁহার অধীনে কয়েক জন জালসাজ ও বকলিয়া আছে, তাহাদেব দ্বারা প্রায় সকল মকদ্দমাই জেতেন। অতএব রামলাল বাবু যে ভূরি ভূরি দান করেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।

তর্কালঙ্কার। বড় মানুষ বিষয়-কর্ম্মে কে কি করে তাহা জানিবার আবশুক নাই, রামলাল বাবুর তুল্য দুর্গোৎসব কে করিয়া থাকে? পূজা কালীন সাত গ্রামের লোক এক গ্রামে হয়, কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শুনা যায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে।

বিদ্যারত্ন। তিনি কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, আর বল ও ছল পূর্ব্বক কত কত ভদ্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন। এই সকল মহা পাপ করিয়া কেবল নাম কিনিবার জন্য শ্রাদ্ধ ও পূজায় দান করিলে কি পার পাইবেন? সে কেবল গরু কেটে জুতা দান!

কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতায়

আমার কুঁচবেহারে বাস—ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম! বাল্যাবস্থাবধি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—তীর্থ দর্শন করিয়াছি। পিতা আমাকে বিবাহ করিতে পুনঃ [illegible] অনুরোধ করিয়াছিলেন—মাতাও বলিয়াছিলেন বাছা! সং[illegible] হও, উদাসীন হওয়া ভাল নয়, আমি কখন পিতা ও মাতার [illegible] লংঘন করিতাম না, এ জন্মে তাঁহাদের কথায় সংসার আশ্রম [illegible] হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে পিতা মাতার ও স্ত্রীপুত্রের [illegible] হইলে মন অস্থির হইতে লাগিল। দুঃখে না পড়িলে ধর্ম্মে[illegible] ঐকান্তিক শ্রদ্ধা হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত থাকিলে আর [illegible] বিষয়ে মন যায় না। যাহারা ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন, তাহারা [illegible] ধর্ম্মের নিকট যাইতে পারে না। এই সকল পর্য্যালো[illegible] মনোমধ্যে বৈরাগ্য জন্মিল ও সাধুসঙ্গ পাইবার জন্য অনেক [illegible] পর্য্যটন করিলাম এবং অনেক অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আলাপও হইল, কিন্তু শুদ্ধচিত্ত লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হই[illegible] না। অনেকের সহিত আলাপে প্রথম প্রথম ভাল বোধ হয়, কিন্তু [illegible] কালের পর শঠতা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা স্বার্থ [illegible] বুঝা যায়! স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখে এমত লোক প্রায় দেখা যায় না। যাহা হউক, আমি বহু কাল ভ্রমণের পর এক দিন নর্ম্মদা-তীরস্থ একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মনে মনে ভাবি[illegible]ছি—প্রাচীন কালের লোকের সরলতা ছিল, এক্ষণে এত কপট[illegible] কেন হইল? কপটতায় সত্য ভ্রষ্ট হয়, অথচ সেই সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ—যদি সত্য নষ্ট হইল তবে আর ধর্ম্মের উন্নতি কি প্রকা[illegible] হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্তিবোধ হইল। [illegible] মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছিল—সন্ধ্যা কাল উপস্থিত—চারি দিক [illegible] হইয়া আসিল। নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে গায়ের চাদর বিছাই[illegible] তরুতলেই শয়ন করিলাম। ক্ষণেক কাল পরে স্বপ্নে দেখি[illegible]—আমার নিকট একটি প্রাচীন যষ্টিধারী ব্যক্তি আসিয়া আস্তে আস্তে বলিতেছেন—"বাবা উঠ—আমার সঙ্গে আইস।" অমনি চমকিয়া উঠিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।—বোধ হইল তাহার মুখ ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে ও [illegible] চক্ষু দিয়া সূর্য্যের প্রভা নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র আমার ভক্তির উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতঃ, তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমার নাম—জ্ঞান। আমি ইহা শুনিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলাম। নিমেষ মধ্যে [illegible] বিদেশ গিরি গুহা বন উপবন উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গের পথ দিয়া [illegible] লাগিলাম। অনেক অনেক রম্য ও মনোহর দৃশ্য দর্শনগোচর [illegible]। এক এক স্থানে অপূর্ব্ব কানন—নানা জাতীয় লতা—নব নব [illegible]—ফুল-ফলে ডগমগ—নানা বর্ণ পুষ্প, সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। এক এক স্থানে রমণীয় সরোবর—স্ফটিকের ন্যায় [illegible] পবনস্পর্শে দুলে দুলে যেন হাসিতেছে ও সূর্য্যের আভা তাহা[illegible] উপর পড়িয়া ঝগমগ করিতেছে। এক এক স্থানে পক্ষী সকল [illegible] স্থলে কেলি করিতেছে, তাহাদিগের কলরবে কর্ণকুহর জুড়া[illegible]। এক এক স্থানে প্রস্তরময় অট্টালিকা—মণি-মাণিক্যে খচিত—[illegible] অপ্সরা ও কিন্নরেরা সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। [illegible] এক স্থানে পীত শ্বেত নীল ও রক্তবসনা বিদ্যাধরী নৃত্য ক[illegible]ছে। এক এক স্থানে যোগীরা নয়ন মুদিত করিয়া [illegible]াসনে বসিয়া রহিয়াছেন—ত্রৈলোক্য পাইলেও চেয়ে দে[illegible] না। এক এক স্থানে মুনি-ঋষিরা "জয় হরে মুরারে" বলি[illegible]

রিতেছেন। এই সকল দেখিতে দেখিতে এক সহরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

ঐ সহর নদীতীরস্থ—সেই নদী জাহাজে পরিপূর্ণ। রাস্তায় নানা জাতীয় লোক গমনাগমন করিতেছে। জিনিসের আমদানী রপ্তানীর মাল—গাড়ির শব্দ ও লোকের কোলাহলে কাণ পাতা ভার। আমি অগ্রবর্ত্তী জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতা, এ কোন্ সহর? তিনি উত্তর করিলেন, ইহার নাম কলিকাতা, ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী। তোমার দিব্য চক্ষু হইলে সহরে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তুমি আমার গায়ে হাত দেও। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবা মাত্র নানা প্রকার বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাইলাম।

কোনখানে দলপতি বাবুরা রাত্রে খানা ও মদ সেঁটে প্রাতঃকালে মুখ পুছিয়া জাত মারিতে বসিয়াছেন। কোনখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিনের বেলায় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া চণ্ডীপাঠ ও যজমানগিরি কর্ম্ম করিতেছেন ও রাত্রে বাবুদিগের সঙ্গে মজায় ও চোহেলে মত্ত হইতেছেন। কোনখানে অধ্যাপকেরা শাস্ত্রকে কল্পতরু করিয়া দোকানদারি করিতেছেন—ফলের দফা কিঞ্চিৎ হইলেই আবশ্যক মতে বিধি দিতেছেন—রাতকে দিন করিতেছেন—দিনকে রাত করিতেছেন। কোনখানে বলরাম ও রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তানেরা শূদ্রের বাটিতে জলস্পর্শ করে না, কিন্তু বেশ্যার ভবনে এমন করিয়া আহার করিতেছেন যে পাত দেখে বিড়াল কাঁদিয়া মরে। কোনখানে তিলক নামাবলী সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘটা হইতেছে, অথচ পরস্ত্রী গমন ও অপহরণে ক্ষান্ত নাই। কোনখানে দালানে পূজা যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণভোজনের ধুম লেগে গিয়াছে ও বৈঠখানায় জাল জুলুম ফেব ফন্দির শেষ হইতেছে না। কোনখানে সুশিক্ষিত বাবুরা সাহেব-সুবার খাতির রাখিবার ও আপন মান বৃদ্ধি জন্য স্বজাতীয় রীতি ব্যবহার ধর্ম্মের মেতিসেবি নিন্দা করিয়া আপন জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিতেছেন। কোনখানে কেবল যাবনিক আহার ও পানেরই আলোচনা হইতেছে, কি মনেতে, কি কর্ম্মেতে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, সকল কর্ম্মেরই মূল বাহ্যিক বিজাতীয় ভড়ং।

এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, একটু শঠতা দেখিয়া চটে উঠিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বোধ হইল যে, এ স্থ শঠতা ও অধর্ম্মের সমুদ্র। ইতিমধ্যে এক দিক্ থেকে একটা চীৎকা ধ্বনি উঠিয়া আমার কর্ণগোচর হইল—চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম এক দামড়াপেটা আধমরা ষেণ্ড গরু গাঁ-গাঁ করিতে করিতে পালাই পাল ডাক ছাড়িতেছে ও এক জন তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাহার লে ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিতেছে—ওরে তুই গেলে আমি কাকে নি থাকব? তবে আমিও প্রস্থান করি, আর মিছে ছেঁড়া চুলে খোঁপ কেন? তোর জোরেতেই আমার পেট চলে—তুই তো আমা কামধেনু। অন্য এক দিক্ থেকে শ্বেতবসনা ও শান্তবদনা একটি কন্যা স্বর্গ থেকে এক এক বার নামিতেছেন ও বলিতেছেন—জ্ঞান আমাকে সাহায্য কর, এখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। আমি যোড়হাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা, এ-সকল কি? জ্ঞান উত্তর করিলেন—যে গরুটা পালাই পালাই ডাক ছাড়ছে, ইহার নাম জাতি, এ অনেক চোট খাইতেছে আর টিকিতে পারে না। তাহার লেজ ধরে যিনি টানছেন তাহার নাম হিন্দুগিরি। জাতি গেলে তার গুমর যাইবে এজন্য টানাটানি করিতেছেন। আর ঐ যে কন্যা এক এক বার নামছেন ও উঠছেন উহার নাম ধর্ম্ম। বঙ্গদেশে এত অধর্ম্ম যে তিনি আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না, এই কারণে আমাকে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন।

আমি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার একাগ্র চিত্তে দেখিতে লাগিলাম। জাতি এমনি দৌড়িতেছে যে, হাজার টানাটানিতেও থামে না, হিন্দুগিরিও লেজ কসে ধরিয়া পেছনে পেছনে ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে টানাটানিতে হেঁচড়া-হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাস করিয়া ছিঁড়ে গেল ও হিন্দুগিরি বেগে চিৎপটাং হইয়া ঠিকরে পড়িলেন। লেজের জ্বালার চোটে জাতির গাঁ-গাঁ হাম্বা-হাম্বা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে দেখিলাম, নর্ম্মদা-তীরস্থ সেই বৃক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, আমার নিকটে কয়েক জন বৈরাগী বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে।

[ক্রমশঃ।

মাইকেল স্মরণে

শ্রীতপন ঘোষ

হে কবি, ধ্বনিল মরমে যবে
তব সুধা-বাণী
হৃদয়ের স্তরে স্তরে অপূর্ব্ব সে ঝঙ্কারে
পশিল কি জানি।
যে নব রসের ধারা ঝরিল লেখনী হ'তে
হৃদয়ের যে মহা আবেগ,
ওগো তার বেগ
কে পারে রুধিতে হেথা, কে পারে সাধিতে
হেন সুর, হেন ছন্দ কেবা লবে হ'রে?
চিনেছিলে আপনারে, ভুলেছিলে তাই,
লয়ে দীনতার ভার
ছিলে হেন নির্ব্বিকার
পাইয়া গো কবিবর অমৃতের স্বাদ,
লভিয়াছ অমরতা, মাতৃবক্ষে ঠাঁই।
ঝরিল অকালে ফুল ফুটিতে না ফুটিতে,
বঙ্গের এ পুণ্য মাটিতে
চির-নিদ্রাগত তুমি আজিও হে কবি,
তাই দেখ দিবস-শর্ব্বরী
উন্মুক্ত অম্বরতলে সমাধিরে আলো করি
জেগে আছে দীপ্ত শশি-রবি।

বেনারস এক্সপ্রেস

শ্রীলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোলকাতায় যাচ্ছিলুম। রেল-ভ্রমণের ইচ্ছে থাকলেও সুবিধে তো আর নেই? সরকার বাহাদুর ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু ও ক্লাস থ্রি করে মার্ক দিয়ে আমাদের আলাদা করে দিয়েছেন।

চেহারাখানা যদিও ক্লাস ওয়ানে পড়ে, কিন্তু অর্থ? সে যে কোন ক্লাসে ফেলবে জানি না।

ভোর পাঁচটার সময় আসানসোল ষ্টেশনে এসে টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়ালুম। সেখানে বেশ ভীড়, কিন্তু টিকিট-বাবুটি কই? খবর নিয়ে জানলুম, যদিও তিনি হঠাৎ ভয় পাননি, তবুও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত ছোট্ট একটি ঘরের অভিমুখে দ্রুত গমন করেছেন। দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় ওয়াল-ক্লকের দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাচ্ছি, শঙ্কিত ভাবে দেখছি তার বড় কাঁটাটি নির্বিকার ভাবে গন্তব্য পথে এগিয়ে চলেছে, আর এগিয়ে আসছে আমার কোলকাতায় যাবার ট্রেণ। নিজের অজান্তে আমার হাই-হিল জুতো-পরা পা দু'খানাও ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেন। যথা সময়েরও অনেক পরে এসে টিকিট-বাবুটি ধীর মন্থর আলস্যে নিজের কার্য্যভার গ্রহণ করলেন, আর গ্রহণ করলেন আমার প্রদত্ত টিকিটের মাশুল। খটাং করে শব্দ হওয়ার পরে লাল বর্ণের একখানি ক্ষুদ্র টিকিট বেরিয়ে এল ছোট্ট ফোকরখানি দিয়ে, টিকিট না টিকিটের বাচ্ছা ঠিক বোঝা যায় না এত ছোট সেখানা।

ট্রেণের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। সামনে পড়ে আছে চকচকে লাইন, কত দূর থেকে এসে আবার কোথায় কত দূরে চলে গেছে। আশ-পাশে ফেরিওয়ালাদের অল্প-বিস্তর ব্যস্ততা।

গর্জ্জন করতে করতে ট্রেণ এল। ক্লাস টু দেখেই উঠলুম। বলা বাহুল্য, এটা মেয়েদের কামরা এবং সেখাও বাহুল্য, যাত্রিনীতে পরিপূর্ণ। দরজা খুলে গাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই একটি মাঝ-বয়সী ভদ্রমহিলা আমার দিকে চেয়ে সহজ কণ্ঠেই বলে উঠলেন, "এ চটি জোড়াও গেল।"

পূর্ব্বজন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে তাঁকে চেনা দূরের কথা, কখনও দেখেছি বলে মনে হলো না। ভাবলুম, আমাকে হয়ত বলছেন না। কিন্তু দৃষ্টি দেখলুম আমারই মুখের দিকে। নিজের ছোট্ট স্যুটকেসটা রেখে তাঁরই পাশে একটু যায়গা করে বসে পড়লুম। ভদ্রমহিলা এবার স্পষ্টই আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "এই নিয়ে তিন বার, একটা অম্বরে, একটা বেনারসে আর একটা এই গাড়ীতে।" আমি ভাবলুম, কিন্তু ওঁর চটির একটা আজকালকার চাকরদের মতন বেইমানীর কথা আমাকে কেন? আজকাল তো আবার মেয়েরাও পুলিশে চাকরি নিচ্ছে, আমাকে সেই দলের বলে ঠাউরেছেন না কি? বললেন, "অম্বরে কিনলুম ৮৮৲ দিয়ে, বেনারসে কিনলুম ৭৮৶৹ দিয়ে, আচ্ছা বল তো ভাই, এ রকম হারালে কি চলে আমাদের? আমি আবার চটি ছাড়া বাড়ীতেই চলতে পারি না"—বলে নিজের অত্যন্ত ফাটা আলতা-পরা পায় কয়েক বার হাত বুলোলেন। সে শ্রীচরণকমলে যে চটি কোন দিনও স্থান পেয়েছিল দেখলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমি একটু হাসলুম। দেখলুম ভাল করে আমার সহযাত্রিনীকে। নীলাম্বরী জারিপাড় শাড়ী পরা, ঝাঁটাপাড় পুরু ছিটের ব্লাউজ, হাতভর্ত্তি সোনার চুড়ি, গলায় মোটা বিছে হার, মাথার সীঁথিতে নববিবাহিতার মতন সিন্দূরের প্রাচুর্য্য এবং বেশ স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গে ১৭।১৮ বছরের একমাত্র খুকু ও পর্ব্বতপ্রমাণ 'লগেজ'! আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এই তিন হাজার টাকা খরচ হলো মোটে।"

আমি ভাবলুম, চটির দাম তো শুনলুম, তবে আবার তিন হাজার টাকা খরচ হলো কিসে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইবার আগেই বললেন, এই আমাদের বেড়াতে। এখান থেকে জয়পুর, অম্বর, মথুরা, বৃন্দাবন শেষে বেনারস হয়ে আসছি। বোনের বিয়ে কি না, তাই একেবারে বারাণসী শাড়ীও কিনে এনেছি, টাকা অবিশ্যি খরচ হলো, টাকা থাকলেই লোকে খরচ করে, কি বল ভাই?"

বললুম, "তা তো ঠিক, টাকা না থাকলে খরচ করবেই বা কি।"

এদিকে ট্রেণ একটু দুলে উঠে ছাড়লো। আমিও হাঁফ ছেড়ে জানলার বাইরে চাইব কি না ভাবছি, শুনলুম, "দেখবে না কি ভাই, বারাণসী শাড়ীখানা। তোমরা আবার আজকালকার মেয়ে, পছন্দ আছে তো?"

কি আর করি, অগত্যা বললুম, "দেখি।"

অমনি খুকু ও খুকুর মা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক উপরের বাঙ্ক থেকে নামিয়ে আমাকে বারাণসী শাড়ী দেখালেন। শাড়ীখানা ভালই, সুখ্যাতি করলুম। ভদ্রমহিলা পরিতৃপ্তির সঙ্গে বেশ শব্দ করে করে হাসতে লাগলেন।

ট্রাঙ্কে কাপড়খানা তুলে রেখে ভদ্রমহিলা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে আমাকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এলেন। তাঁরা যে টাকায়, বাড়ীতে, গাড়ীতে, নামে, মানে ফেলনা নয়, এই জ্ঞান দান করে তিনি আমার অজ্ঞতা দূর করলেন। চোখ যদিও আমার বড় নয়, তবুও যত দূর সম্ভব বড় করে আমি তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম অবাক-বিস্ময়ে। ট্রেণ পূরো দমে ছুটেছে, সেই সঙ্গে দম রেখে কথার লহর ছুটেছে মহিলাটির মুখে। ট্রেণের দম ফুরোবে কিন্তু এঁকে টাকায় যে দম দিয়েছে তা তো ফুরোবে না! কাজেই নির্বিকার মনে তাঁর মহাভারতের কথা অমৃত সমান শুনে পুণ্য সঞ্চয় করবার দিকে মন দিলুম। নিজের সুদৃশ্য পানের বাক্স বার করে পান নিয়ে জর্দ্দা মুখে ফেলে একটু চাঙ্গা হয়ে ভদ্রমহিলা আবার আরম্ভ করলেন তাঁর কথকতা।—"শোন ভাই, বাবা ছিলেন রেঙ্গুনে। এখানে এসে বাড়ী করে আমার বিয়ে দেন তা সমান ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বাপের বাড়ী হচ্ছে পাঁচ কাঠা জমির উপর। সামনে তিন কাঠা, পেছনে দু'কাঠা আর বাড়ী তিন কাঠার উপর। আর কি মজবুত ভিত্, সে বাড়ীর। সেই যেবার ভূমিকম্প হলো, সবাই রাস্তায় ছুটোছুটি করছে, আমরা কিন্তু টেরই পাইনি বাড়ী যে একটুও নড়েনি! বাবা যে অনেক টাকা খরচ করে সাহেব ইঞ্জিনিয়র দিয়ে বাড়ী করিয়েছিলেন।"

মনে মনে ভাবলুম, বাড়ীটা পড়ে চুরমার হলেই ভাল হতো। মুখে বললুম, "ভূমিকম্প তাহলে টের পেলেন কেমন করে?"

বললেন, "ওমা, তাও জান না? চৌবাচ্ছার জল যে নড়ছে? বাড়ী না নড়ে চৌবাচ্ছার জল কেমন করে নড়ে, বুঝতে না পেরে চুপ করেই রইলুম। মহিলাটি আমার অজ্ঞতায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠলেন।

"তার ক' বছর পরেই তো বাবা গাড়ী কিনলেন ... রে খুকি?"

বেতারের আসর—
কি শহরে, কি পাড়াগাঁয়ে

শহরে কি পাড়াগাঁয়ে যেখানেই থাকুন, বিজলী পান আর না-ই পান, শুধু একটি ব্যাটারী সেট আর 'এভারেডী' রেডিও ব্যাটারী হলেই স্বচ্ছন্দে বেতারের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

একটি 'এভারেডী' ড্রাই ব্যাটারী থাকলে বিজলী যোগাযোগ ছাড়াই নির্ঝঞ্ঝাটে মাসের পর মাস বেতার শোনা চলবে। সুদীর্ঘ ৬০ বৎসরেরও বেশীকালের সাধনা ও অভিজ্ঞতায় তৈরী এই ব্যাটারী — এ অনেক বেশী টেকে, এর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা চলে, আর তাই এর নাম ছড়িয়ে আছে দেশে দেশে।
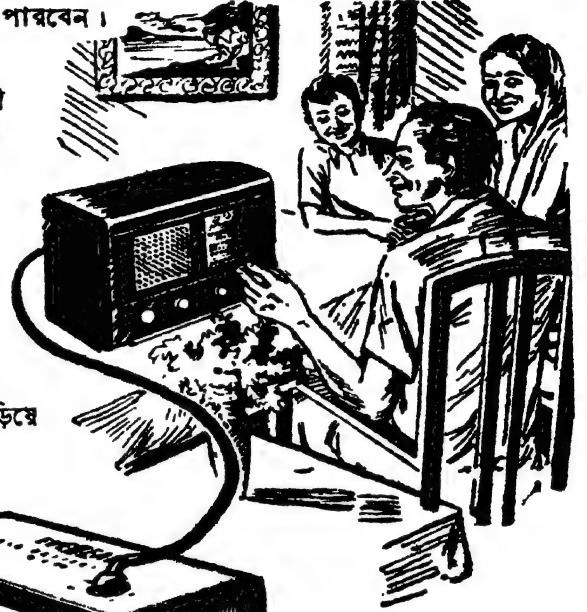
EVEREADY

TRADE-MARK

রেডিও ব্যাটারী

ন্যাশনাল কার্বন কর্তৃক প্রস্তুত

খুকি জানলার বাইরে চেয়েছিল। মা'র চোখের ভাবটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললে, "কে গাড়ী কিনলে মা? তোমার পিসে মশাইএর গাড়ী কেনার কথা বলছ?"

মা বললেন, "না, না, তুই বাইরে দেখ।"—হেসে বললেন, "ছেলে মানুষ কিনা, তাই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিচ্ছে।"

আমি ভাবলুম, ছেলেমানুষ না হয়েও তো আর এক জন অনেকক্ষণ ধরে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন, সে তো আমি জানি। বুদো বেচারার আজ উদোর কত মণ পিণ্ডি বহন করতে হবে কে জানে!

বললেন, "গাড়ী, বাড়ী, মেয়ের বিয়ে সবই তো বাবার হলো। এবার ছেলেদের দিকে মন দিলেন। তা মানুষের মতন মানুষ করেছেন বলতে হবে। আমার যে বড় ভাই সে গেল যুদ্ধে, কারুকে না জানিয়েই নাম লেখালে। আর যে মেজ ভাই, সে একটি রত্ন। সে সকলকে জানিয়ে, বলে যুদ্ধে গেল। সে যে ঐ কি বলে? বাপ্পা না কি? ঐ যে গো সৈন্যদের বড় সাহেব—"

বললুম, "কে, কারিয়াপ্পা?"

বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কারিয়াপ্পা, তার মতন হবেই হবে। এ তুমি দেখে নিও। কি ছেলে, পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হবে বলে কোনও পরীক্ষাই দিলে না। বই কেনার টাকা, স্কুলের মাইনের টাকা দিয়ে সব যুদ্ধের গল্পের বই কিনে আনতো। বাবা বকতে গেলে এমন সব জ্ঞানের কথা বলত যে, বাবা আর বকতেই পারতেন না। মা বললে বলতেন, ওর যুক্তি যে কাটা যায় না, যা বলছে তা তো মিথ্যে বলছে না, আমি পড়ার কথা বলি কি করে? যাই হোক, এই করে লেখাপড়া করলে না বটে, কিন্তু ও যে পাঁচের এক জন হবে, এ আমরা জানি।"

আবার পানের কৌটা বের করে এক খিলি পান খেলেন, জর্দা খেলেন। আমাকে বললেন, "নেবে না কি ভাই এক খিলি? বাড়ীর সাজা, গলা ভেজাবার চমৎকার জিনিষ।"

আমি মনে মনে বললুম, আমার গলা যে রকম শুকিয়েছে সে কি এক খিলি পানের রসে ভিজবে? তার জন্যে চাই কয়েক বালতি জল। বললুম, "না, না, পান আমি খাই না, বড্ড সুপুরি লাগে।"

বললেন, "কোথায় থাক ভাই?"

প্রশ্ন শুনে অবাক হলুম, কারণ নিজেদের জয়গান না করে এই প্রথম তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন। বললুম, "বালীগঞ্জে।"

নিজের মণিবন্ধের দিকে চেয়ে ছোট্ট ঘড়িটা দেখলুম। সময় এখনও অনেক আছে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে। শঙ্কিত হলো অন্তর অফুরন্ত বাক্য-প্লাবনের কল-কল শব্দ শোনবার আশঙ্কায়। জানলার বাইরে চাইলুম মাইল-পোষ্ট দেখবার আশায়, টেলিগ্রাফের তারের পোষ্টের গায় কালো প্লেটের উপরে সাদা হরফে কোলকাতার চেয়ে কত দূরে আছি তারই নিদর্শন লেখা রয়েছে। দেখলুম, এখনও বহু দূরে কোলকাতা। আবার অপরিচিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো আমার পাশে। "সেই সেবার ভীষণ দাঙ্গা হলো? সেই দাঙ্গার সময় আমার মেজ ভাই কি রকম সাহসের পরিচয় দিলে! সারা রাত দোতলার জানলা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতো বাড়ী পাহারা দেবার জন্য। আমরা তো ওর রকম দেখে ভয়ে কাঠ! তখনই দিল্লী চলে গেল লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে ক্যাপ্টেনমেণ্টে এক মস্ত মিলিটারী অফিসারের বাড়ীতে গিয়ে উঠলো। তাঁদের সঙ্গে আমার ভাই-এর খুব আলাপ আছে কি না। অত বড় অফিসারের আমার ভাইকে অবজ্ঞা করবার সাহস হয়নি। তাঁর স্ত্রী ও বোন তখন সেখানে ছিল। তাদেরও কি যত্ন, সম্ভ্রম আমার ভাইকে। ও-রকম হীরের টুকরোকে কে না আদর করবে বল ভাই?"

আমার শুনে হাসিই পেল। বললুম, "হীরের টুকরো কেন? হীরের চাঙড়া বলুন। আপনার ভাই-এর যে রকম গুণ দেখছি, আমাদের দেশের ভাগ্য ভাল, তাই অমন ছেলে পেয়েছে।"

ভদ্রমহিলার ঘাড় তাঁর কাঁধে ঠেকে রইল আমার কথায় "ডিটো" দিতে গিয়ে।—"ঠিক বলেছ ভাই, আমার ভাগ্য তাই অমন ভাই পেয়েছি।" আনন্দাশ্রুতে গলা বুজে এল তাঁর। "দিল্লীর সেই অফিসারের কত গল্প করতো। গেল সাহস করে তো তাঁর বাড়ী? তাঁর স্ত্রী ও বোন ইংরিজি ছাড়া কথাই বলে না, আমার ভাই তাঁদের সঙ্গে সমানে ইংরিজিতে কথা বলেছিল। কত ভুল যে তাঁদের ইংরিজির সে শুধরে দিয়েছিল! তিনি সম্প্রতি কোথায় যেন বদলি হয়ে গেছেন।"

আমি বিস্ময় বোধ করছিলুম কোনও একটা কারণে মনে মনে হাসিও পাচ্ছিল খুব। বললুম, "আপনাদের বাড়ীটা কোথায় বলুন তো?"

উত্তরে শুনলুম, "ওমা, তাও জান না বালীগঞ্জের মেয়ে হয়ে? ঐ তো ট্রাঙ্গুলার পার্কের পাশে, হলদে রং-এর বাড়ী, সামনে তিন কাঠা জমি ও পেছনে দু'কাঠা?"

বালীগঞ্জের মেয়ে হয়ে তাদের বাড়ী কোথায় এবং কত জমি সামনে-পেছনে না জানার জন্য অধোবদনে বসে রইলুম। বললুম, "ও, সেই ফুলের বাগান দেওয়া বাড়ীটা বুঝি?

বললেন, "না, না, ফুলের বাগান কেন হবে? বাবা মোটেই ফুলের গন্ধ পছন্দ করেন না! জমিতে বেগুন, কুমড়া টম্যাটো গাছ লাগিয়েছেন। তিন কাঠা জমি কি সোজা কথা। আর পেছনের জমিতে গরু থাকে। আয় হয় কিন্তু বেশ।"

গাড়ীর গতি মন্দীভূত হতে হতে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ষ্টেশনে ইঞ্জিনটা হাঁফ ছেড়ে তার গতি রুদ্ধ করলে।। ট্রেণ থামাতে রুদ্ধ হলো আমার সহযাত্রিনীর কথা-বলার স্রোত। ষ্টেশন 'চা গ্রাম' পান-সিগারেট, চাই কাচের চুড়ি ইত্যাদি হাঁক'ডাকে মুখরিত হলো। নিজের জায়গা ছেড়ে জানলার বাইরে মুখ বার করে ডাকলুম "কেলনার" কারণ, ভোরে চা খাওয়া হয়নি, গলা শুকিয়ে বাথা মাথা ধরে উঠেছে। মাথায় সাদা উষ্ণীষে কেলনারের চাপরাশ লাগিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। চা টোষ্ট আনতে বলে নিজের জায়গায় আবার বসলুম। এবার একটু ফাঁক পেয়ে অন্য যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার অবকাশ পেলুম। দেখলুম, এক জন মাড়োয়ারী মহিলা ১০।১২টি রূপোর ঘড়া সাজিয়ে নিজেদেরও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শরীরকে আপাদ-মস্তক গহনায় সজ্জিত করে বসে আছে। শুধুই বসে নেই, তাস খেলছে। তাসগুলির চেহারা দেখে মনে হলো, তাদের এ ভবের খেলা আর বেশী দিন খেলতে হবে না। 'এ্যাম্পুটেট'-করা শরীর নিয়ে তারা সচাপটে ঘন ঘন ট্রেণের বেঞ্চের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে লাগলো। কেলনারের বেয়ারা চা নিয়ে এল, নিজের জন্য চা ঢালতে গিয়ে মহিলাটিকে বললুম, "আপনাকেও দেব না কি এক কাপ?"

মহিলাটি শঙ্কিত ভাবে দুই হাত তুলে দুই পা পেছিয়ে গেলেন। বললেন, "উঁহু, রাস্তায় কোনও জিনিষ খাই না। তার পর কাপড়

না ছেড়ে, পূজা না করে চা খাব? দেখছ না ইক্‌মিক্‌ কুকার? নিজের হাতে রান্না করে তবে খাই। তুমি খাও ভাই!"

বললুম, "আপনার খুকু চা খাবে? না, ও বুঝি দুধ খায়?"

খুকু আমার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললে। বললে, "দুধ তো খাই, তবে চাও ধরেছি একটু-আধটু। আজকাল বড় হয়েছি কি না।"

ভাবলুম, বড় তো তুমি আজকাল হওনি, অনেক দিনই হয়েছ। কিন্তু কি করবে বল, বড় হয়েও যে আজকাল ছোট হয়ে থাকবার দিন এসেছে। ছোটবেলায় একটা কবিতায় পড়েছিলুম—'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।'—মুখে বললুম, "ও, চা খাও? আচ্ছা দুধ বেশী দিয়ে এই-চা টা তোমাকেই দিলুম।'

মা খুকুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "ছোট্ট মেয়েদের চা খেয়ে বুড়োমি করা আমি দেখতে পারি না। খাও না বাপু, তোমার জন্যে কত জিনিষ এনেছি। তা না, চা খাব। বড্ড বায়না বেড়েছে তোমার আজকাল। গরম চা, খেতে পারবি তো?"

খুকু ততক্ষণ চা-টা বেশ উপভোগ করে খেতে আরম্ভ করেছে। আমিও এক কাপ ঢেলে খেতে আরম্ভ করলুম। গাড়ীও ছাড়লো। মহিলাটি মুখ টিপে হাসি চেপে বললেন, "জান ভাই, খুকুর আজকাল শাড়ী পরবার সখ হয়েছে। দু'পাশে বিনুনি দোলাবে না, ওর খোঁপা বাঁধা চাই। আরে বাপু, শাড়ী তো পরবিই আর ক'বছর বাদে, তা না, এখনই শাড়ী পরবো জেদ।"

বললুম, শাড়ী আরও কয়েক বছর পরে? তত দিন কি ... বললেন, "জান ভাই, সেদিন দেখি আমার একখানা ... শাড়ী 'লুকিয়ে' পরেছে। ওমা, ঠিক বড়দের মতন গুছিয়ে ...।" বলে মুখে কাপড় দিয়ে ভদ্রমহিলা খুকুর পাকামীতে হাসতে লাগলেন। খুকুও চা খেতে খেতে হাসতে লাগলো মায়ের দিকে চেয়ে।

আমার চা ফুরিয়ে গিছলো, শুধু চা কেন, কলকাতায় যাবার সব আনন্দই ফুরিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। তাই আর এক কাপ চা ... মনকে চাঙ্গা ও নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করলুম। ধ্বনিত ... কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে—"আবার আর এক কাপ চা? ... তুমি আমি যত ইচ্ছে খেতে পারি, আমাদের তো খেতে ... নেই থাকে না, কত কাপ খেলুম। তাই বলে—" কথাটা ... নিজের একমাত্র কৃত্রিম খুকুর দিকে চাইলেন।

আবার আরম্ভ হলো বকুনি, "আমার শ্বশুর-বাড়ী জয়নগরে। জয়নগরের মোয়া খেয়েছ?"

আমি মনে মনে বললুম, মোয়া কেন, জয়নগরের যে ধাক্কা খাচ্ছি, ... এখন কোলকাতায় পৌঁছতে পারলে হয়। মুখে বললুম, "... খেয়েছি।" সেই দিন প্রথম জানলুম, জয়নগরের মতন ... কাছে বাংলা দেশের সমস্ত সহরের পরাজয় স্বীকার করা উচিত। এ রকম প্রগতিশীল, উন্নত সহর না কি আর নেই। সেদিন আমি কিন্তু জয়নগরবাসিনীর কাছে অকপটে পরাজয় স্বীকার করেছিলুম। পৃথিবীতে তো কত রকমের প্রতিযোগিতা আছে। যেমন অবিরাম সাইকেল চালনা, অবিরাম নাচা, অবিরাম সাঁতার; কিন্তু অবিরাম বাক্যের প্রতিযোগিতায় আমার সহযাত্রিনী যে প্রথম স্থান অধিকার করবেন এটা একেবারে নির্ভুল সত্য।

"ইনি আবার স্বদেশী করতেন কি না। বিদেশী জিনিষ আমাদের বাড়ীর চৌকাঠ পেরতে পারেনি। ওঃ, কি সে দুঃখের দিন গেছে আমাদের। একটা পাতলা কাপড় পাইনি পরতে। মোটা-মোটা খদ্দর পরে প্রাণ যায়। ইনি আবার তখন—".

মহিলাটি কথা থামিয়ে কাপড়ের কোণ সরু করে মুখে এক রকম অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে কান চুলকাতে লাগলেন। আমি তাঁর অর্দ্ধ-সমাপ্ত কথা টেনে বললুম, "তখন আপনার স্বামী বুঝি জেলে?"

অসমাপ্ত রইল কান চুলকানো। মুখ গম্ভীর করে বললেন, "জেলে তো নিলে না। কত চেষ্টা করলেন, ঘুরলেন তবুও জেলে নিলে না। নইলে ইনি যদি একবারও জেলে যেতেন, তাহলে আজ ওঁকে বই-এর দোকান করে বসতে হয়? উনি আজ থাকতেন কত বড় চাকরী নিয়ে দিল্লীর মতন সহরে। অবিশ্যি শাপে বর হয়েছে আমার। বই-এর দোকান থেকে আয় তো যথেষ্টর চেয়েও বেশী হয়, আমাদের ঘরে ধরেই না এত। দেখেছ না কি বই-এর দোকান? কলেজ ষ্ট্রীটে?"

বললুম, "হয়তো দেখেছি। য়ুনিভার্সিটিতে যখন যেতুম, তখন কত বই ত কত দোকান থেকে কিনেছি। আপনাদের দোকানও হতে পারে।"

"হতে কেন? নিশ্চয় কিনেছ। সেই যে গলির সামনে তেকোণা করে সাইনবোর্ড লেখা। দোকানটা আমাদের একটু গলির ভেতরে, কিন্তু একটা হাত এঁকে দিয়ে লেখা আছে,—"এই দিকে বই-এর দোকান।"

স্মরণে হল না এমন দোকান থেকে কোনও বই কিনেছি কি না। তবুও বললুম, "ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ঐ দোকান থেকেই তো কত বই কিনেছি, মনেই ছিল না।"

"মহিলাটি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, বললেন, "কিনেছ, কিন্তু ভুলে গেলে কেন? এ ত ভারী অন্যায়! আমাদের দোকানের কাটতি যে তাহলে কমে যাবে? খুকি, বার করতো আমাদের দোকানে কি কি বই আছে তার লিষ্টি। বই কয়েকখানা আছে আমার কাছে, কিনবে না কি?"

প্রমাদ গণিলাম। বললুম, "পড়া তো শেষ করেছি, পড়ার বই আর কিনবো না।"

উত্তরে বললেন, "পড়ার বই কেন হবে, গল্পের বই। তোমরা যদি গল্পের বই না পড়বে তো পড়বে কারা? নে শীঘ্র বার কর খুকি।"

খুকি অন্য সময় খুকি, কিন্তু বই খুঁজে বার করবার বেলায় বর্ষীয়সীদের চেয়েও কর্মপটুতার সঙ্গে দ্রুত কয়েকখানা বই ট্রাঙ্ক থেকে বাইরে টেনে আমার সামনে রাখলে। বললে, "বাবার কাছে ও-কামরায় আরও ভাল ভাল বইগুলো রয়েছে!"

ভাবলুম, খুকি, তার মেয়ে, তাইতেই এই। ও-কামরায় আবার খুকির বাবা আছেন, পাশের কামরার যাত্রীদের জন্য দুঃখ অনুভব করলুম নিজের চেয়েও বেশী। কারণ, তারা বাপের পাল্লায়। বইগুলো দেখলুম। মহিলাটি সহাস্য বদনে সামনে বসে বই বের করে দেখাতে লাগলেন। খুকি খুকিমি করতে লাগলো। ভাল না হলেও নিলুম একখানা বই।

"একখানা নিলেন?" খুকি ন্যাকামি করে প্রশ্ন করলে।

বললুম, "হ্যাঁ, একখানাই নিলুম।"

খুকির মা বললেন, "বেশ তো, তাই নাও। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন নেবে। আমরা বাপু কারুকে বই কেনার জন্য জেদ করি না। যার যেমন অবস্থা সে তেমন নেবে! তুমি একখানা নিলে, আবার আর এক জন পাঁচ খানা নেবে। নে খুকি, বইগুলো তুলে গুছিয়ে রাখ"।

আমি বললুম, "আমার এই একখানা নেবারও সামর্থ্য নেই। নেহাৎ আপনি বড়ই জেদ করছেন তাই নিলুম"।

সে কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না, এমন ভাব দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বই তোলার দিকে নিজের সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলেন। বই তোলা হলে এক গাল হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমরা কি ভাই ?"

বললুম, "আমরা ? মধ্যবিত্ত গেরস্থ।"

তিনি হেসে বললেন, "না, তা জিজ্ঞেস করিনি। তোমরা কি জাত ?"

আমি বললুম, "ব্রাহ্মণ।"

"ও, আমরাও ব্রাহ্মণ। তাই এত ভাব হয়ে গেল এতটুকু সময়ের মধ্যে। তুমিও যা আমিও তাই, তাই এত আলাপ, এত ভাব।"

ভাবলুম, আলাপ তো হয়নি, এতক্ষণ একটানা শুধু প্রলাপ শুনছি ; আর বেশী ভাব হলে আমার না ভাব-সমাধি হয়। কথাটার উত্তর দিলুম সামান্য হাসির দ্বারা।

গাড়ীর গতি আবার কমে আসতে আসতে ক্রমশ বণ্ডেল ষ্টেশনে থেমে গেল। আবার চা-গ্রাম কাচের চুড়ি। এবার দেখলুম বণ্ডেল ষ্টেশনে পাকা কলার প্রাদুর্ভাব। কেলনারের বেয়ারা এসে 'বিল' নিয়ে দাঁড়ালো, তাকে দাম দিয়ে দিলুম। চায়ের খালি ট্রে নিয়ে সে চলে গেল।

এতক্ষণ ভদ্রমহিলাকেই দেখছিলুম। গাড়ী থামতেই ও-কামরা থেকে এবার ভদ্রমহোদয়টি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। রং এক কালে বোধ হয় ফর্সা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত রোদে পুড়ে একটা তামাটে ভাব ধারণ করেছে। গায় কালো গরম কোট, গলায় নেভি ব্লুর উপর সবুজ ষ্ট্রাইপ দেওয়া গরম মাফলার। পরনে ধুতি, পায়ে ব্রাউন রং-এর এলবার্ট সু। মাথার চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে, সীঁথি কেটে চুল আচড়ান যায় না। সামনের একটা দাঁত আধখানা ভাঙ্গা। দেহটি মোটা-রোগার মাঝখানে। ভদ্রমহোদয়টিকে দেখে খুকি আদুরে গলায় বললে, "বাবা, কলা।"

একটু আশ্চর্য্য হলুম। বাবাকে কলা তো সবাই দেখায়। কিন্তু সকলকার সামনে নিঃসঙ্কোচে এ রকম ভাবে বলতে পারে ক'জন ! বোধ হয় আজকালকার এই নতুন ধরণের খুকুরাই পারে। বাবা বললেন, "দেব, খাবি না কি ?" একটু চাপা গলায় বললেন, "ও গিন্নী, ও-কামরায় বই অনেক বিক্রী করেছি। নিতে চায় না বেটারা, জোর করে গছিয়েছি। তুমি ক'খানা বিক্রী করলে ?"

গিন্নী একটু বিষন্ন গলায় বললেন, "একখানা মাত্র। সবাই তো মাড়োয়ারী, তবু এই ইনি একখানা নিলেন। বালীগঞ্জেই যাবেন।"

স্বামীটি বললেন, "তাই না কি ? বালীগঞ্জে যাবেন ?" এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বেশ তো, একলা যাচ্ছেন বুঝি ?"

বললুম, "হ্যাঁ, একলাই যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক এবার বললেন, "এক কাজ করুন, আমাদের অনেক 'লগেজ'। দু'বার আমাদের রেলের লোক প্রায় ধরেছিল। তা ভগবানের দয়ায়, দু'-দু'বার তাদের ফাঁকি দিয়েছি। কিন্তু এবার আর পারবো বলে মনে হয় না। আপনার তো একখানা টিকিট ? আপনার টিকিটে আমাদের কিছু মাল ষ্টেশনের গেট পেরিয়ে নেব, কেমন ? তার পর আমরা ট্যাক্সি করে চলে যাব। আর আপনি যাতে হয় তাতে চলে যাবেন ? কেমন ? আপনাকে বলতুম না, নেহাৎ এক পাড়ায় থাকেন শুনলুম কি না, তাই—"

আমি বললুম "বেশ তাই হবে।"

আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোকটি। কিন্তু গাড়ের বাঁশি তাঁকে বলতে দিলে না। তাঁর বলা ও খুকুর কলা কিছুই হল না। তিনি তাড়াতাড়ি পাশের কামরায় উঠে পড়লেন। গাড়ী এবার বেশ জোরে 'স্পীড' নিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। আমি প্রলাপ শোনবার আশঙ্কায় বইটিতে আত্মনিবেশ করলুম। মহিলাটি কথা বলতে না পেরে উসখুস্ করতে লাগলেন। একটু পরেই শুনলুম, "বই পরে পড়ো ভাই, কেনা তো হল। সময় করে পড়লেই হবে। এস একটু গল্প করি।"

ভাবলুম, তথাস্ত, কেনা তো হলো এখন না পড়লেও হবে। হেসে বইখানা বন্ধ করলুম। মনে আশা, কোলকাতা নিকটবর্ত্তী হচ্ছে, এগিয়ে আসছে আমার নিষ্কৃতি পাবার ক্ষণ। আবার পাঁচালী আরম্ভ হলো— "আমার শ্বশুর-বাড়ীতে দোল, দেল, দুর্গোৎসব সবই হয়। শাশুড়ী এখনও বেঁচে, আমি আবার ছোট বৌ কি না, তাই শাশুড়ী আমাকেই বেশী ভালবাসেন। শাশুড়ী আমার সঙ্গে দেশ দেখতে যাবেন বলে ধরেছিলেন, এর পরের বার নিয়ে যাব বলে অনেক করে বুঝিয়ে রেখে এসেছি। বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছেন, ক'দিন টেকেন, কে জানে !"

মনে করলুম, এর পরের বার দেশ-ভ্রমণের আগেই নিশ্চয় যাবেন।

ট্রেণ পূর্ণ গতিতে ছুটে তার "লেট মেক-আপ" করছে। দেখতে দেখতে লিলুয়াও চলে গেল। বইটি সুটকেসে রেখে উঠে দাঁড়ালুম। কারণ, গাড়ীর গতি কমে আসছে। আর [illegible] ঘড়িটা দেখলুম। মহিলাটি আমার দিকে চেয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন। আমি বললুম, "দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? আপনার মেজ ভাইয়ের নাম কি রুদ্র ?"

বিকট বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু কি করে জানলে ?" খুকি বললে, "মেজ মামাকে কে না চেনে !"

বললুম, "ঐ যে দিল্লী যাবার গল্প করলেন। সেই ক্যান্টনমেন্টের মিলিটারী অফিসারটি আমারই দাদা। রুদ্র একটা চাকরীর চেষ্টায় দিল্লী গিয়ে দাদাকেই ধরেছিল। কিন্তু ভয়েই তো পালিয়ে এল। তখন আমিও যে দাদার কাছে ছিলুম। বললে, বেঙ্গলীর ছেলে, ঘরে শুয়ে বেঁচে থাকব, আমার চাকরীতে কাজ নেই।"

"ওমা, তুমি, এই ইয়ে, আপনি, তা এতক্ষণ বলতে হয়. খুকি, বসতে দে, দাঁড়িয়ে কেন ?"

বললুম, "সব কথা কি বলতে হয় সব সময় ? বলতুম না, নেহাৎ অনেক বলেছেন বলে বললুম।"

গলা বার করে দেখলুম, ট্রেণ 'ইন' করছে, প্ল্যাটফরম আমার দিকেই পড়লো। মা, মেয়ে এবার সম্ভ্রমের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ট্রেণ থামতেই মহিলাটিকে একটি ছোট নমস্কার করে নিজের ছোট সুটকেসটা হাতে করে দরজার হাতল ঘুরিয়ে খুট করে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম।

কাণে এল—"আমাদের মাল যে তোমার টিকিটে যাবে ! ও ভাই, কি যেন তোমার নাম, তা ত ছাই জানি না।"

স্বাভাবিক দ্রুত পদবিক্ষেপে নিজেকে হাওড়া ষ্টেশনের ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে দিলুম। ভগবানের দয়ায় যখন দু'-দু'বার রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়েছেন, তখন তিন-তিন বারও দেবেন।

শোভনা দেবীর মৃত্যু

শ্রীঅঞ্জলী বসু

—মা [illegible]
রাত-দিন চীৎকারের ঠেলায় কান ঝালাপালা হয়ে গেল।—এই কথা বলিতে বলিতে মৃগাঙ্কমোহন অদূরে উপন্যাস-পাঠরতা তাঁহার স্ত্রী মীরা দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—শুনছ, পাগলীটা কোথায় বসে চেঁচাচ্ছে?

—কি জানি, সে খোঁজে আমাদের কি দরকার? তবে বোধ হয় আমাদের পাশের ঘরে চীৎকার করছে। মৃগাঙ্কমোহন স্ত্রীর প্রথম কথাটিতে সন্তুষ্ট হইয়া বেশ সন্তোষজনক উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটিতে যেন তাঁহার পায়ের রক্ত মাথায় উঠিবার উপক্রম হইল। তাড়াতাড়ি করিয়া কোন রকমে পাশের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পাগলী তাঁহাকে দেখিবা মাত্র দ্বিগুণ রাগিয়া উঠিল, ও অনর্গল বক্-বক্ করিতে লাগিল। মৃগাঙ্কমোহন কাজের মধ্যে পাগলীর সহিত ক্ষণিক কথা-কাটাকাটি করিয়া তাঁহাকে আরও বেশী রাগাইয়া নিজের ঘরে গিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন।

উপরোক্ত পাগলী নাম্নী মৃগাঙ্কমোহনের সেজ ভ্রাতৃবধূ। মৃগাঙ্কমোহনের সেজ ভ্রাতা কান্তি বাবু পূর্ব্বে মফঃস্বলে চাকুরী করিতেন। বছর চারেক হইল, তিনি তাঁহাদের বাসস্থানে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। একটি মাঝারি গোছের একতলা বাড়ীতে চার ভায়ের সংসার। যদিও একান্নবর্ত্তী নয়। যাই হোক্, ভাইরা কান্তি বাবুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বোধ হয় দয়াপরবশ হইয়া। কান্তি বাবু উপস্থিত তখন ভাইদের মধ্যে কাহাকে খুসী করিয়া ও কাহারও বিরাগভাজন হইয়া সপরিবারে পৈত্রিক ভিটাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সংসারের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে কান্তি বাবুর স্ত্রী শোভনা দেবীর বিশেষ কষ্টকর হইত। কেন না, তাঁহার প্রকৃতিটা ছিল একটু বিভিন্ন রকমের। তিনি সকলের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। ফলে সকলকে সন্তুষ্ট করা তাঁহার পক্ষে মুস্কিল হইয়া উঠিত। কারণ, ভাইদের মৌখিক মিলের তুলনায় মনের মিল মোটেই ছিল না। যাই হোক, কিছু দিন এই সংসারে বাস করার ফলে শোভনা দেবী একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলেন।

বাড়ীর লোকের মত—শোভনা দেবীর ইচ্ছাকৃত পাগলামী। এই সব যখন কান্তি বাবুর কর্ণগোচর হয়, তখন মনে হয় যেন তিনিও পাগল হইয়া যাইবেন।

তাঁর চোখের সামনে কত চিন্তাজাল ভেসে ওঠে। বেশী দিনকার সে কথা নয়। মেজ জায়ের বড় মেয়ের মেয়ে, শোভনা না হইলে চলিত না। কে-ই বা নান্দীমুখের উপবাস করিবে, আর কে-ই বা কুটুম-বাড়ীর তত্ত্ব গোছাইবে।—শোভনা সেদিন ছিল কর্ত্তব্যপরায়ণা জা, আর স্নেহময়ী কাকীমা। 'ন' জায়ের ছেলের অসুখ, সেজদি কাছে না থাকিলে সাহস পায় না। ছোট জা'র জ্বর হইয়াছে, কে-ই বা দেওরকে রেঁধে খাওয়ায়, আর কে-ই বা কোলের মেয়েকে ভোলায়! তখন ডাক পড়িত শোভনার।

সেদিন শোভনা ছিল পরোপকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, বুদ্ধিমতী তাদের কাছে। এক দিন যে অসীম স্নেহ-ভালবাসার দ্বারা সকলের মন জয় করেছিল, এখন সে অসুস্থ হয়েই সকলের কাছে ভণ্ড নামে পরিচিত।

বহু চিকিৎসা চলিতেছে, কিছুতেই কিছু হয় না। পাড়া-প্রতিবেশী কেহ কেহ কান্তি বাবুকে এ জায়গা ছাড়তে অনুরোধ করেন, বলেন, এ স্থান ছাড়লে উনি নিশ্চয় সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু তা হয়ে উঠে না বোধ হয় কোন কালে। কেন না, কান্তি বাবু এটা ঠিক মত জানেন যে, তাঁকে যখন অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবতে হবে, তখন এ স্থান ছাড়া হয়ে উঠবে না। যেমন করে হোক এখানে থাকতে হবে। এ দিকে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় অপর তিন ভ্রাতা তাঁহার পিছনে লাগিয়াই আছে। কান্তি বাবু হয়ত অপিসে গিয়াছেন, এমন সময় ছেলে খবর লইয়া আসিল,—মা'র সাথে জ্যেঠীমা বা কাকীমা ঝগড়া করছেন, সে জন্য মা আরও চীৎকার করছেন। হয়ত বা খবর আসিল, অমুক কাকা মাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন,—কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তার খোঁজ নাই। কান্তি বাবুর মনের অবস্থাটা তখন তিনি নিজেই কল্পনা করতে পারেন না। আপিসের কাজ ফেলে রেখে দৌড়ে আসেন বাড়ীতে তখন।

পাগলী অনর্থক, কাঁদে, হাসে, গান গায়, চীৎকার করে। কেন যে এ রকম করে, সেটা খোঁজ লইয়া বাড়ীর লোকেরা তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে প্রয়োজন বলে মনে করেন না, উপরন্তু তাঁহাদের নামে পাগলী কি বলিতেছে, তাহা লইয়া পাগলীর সাথে ঝগড়া করিতেছে।

কান্তি বাবু এ সব ব্যাপার দেখিয়া পৃথক্ বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করিতে না করিতে তাঁহার ছেলেমেয়েদের একদম গাছতলায় গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

কান্তি বাবু সেদিন অপিসে গিয়াছেন, শোভনা দেবী উঠানের মাঝখানে শুইয়া অবিশ্রান্ত বক্-বক্ করিয়া যাইতেছে। উঠানের সামনের বারান্দায় বসিয়া অপর তিন জা গল্প করিতেছে। মেজ জা বক্তা আর অপর দুই জন শ্রোতা। গল্পের সার মর্ম্ম এই—মেজ জা'র এক বোনের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সে না কি এক দিন

বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। এই কথা পাগলীর কানে যাইবা মাত্র তার মাথায় এক খেয়াল চাপিয়া বসিল।

পূর্ব দিকের বারান্দায় বসিয়া কান্তি বাবুর বড় মেয়ে নীলা তাহার মাকে লক্ষ্য করিতেছিল, কোন দুর্ব্বল মুহূর্তে সে ওইখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

পাগলী সেই মুহূর্তে উঠিয়া তাঁহাদের ঘরে গিয়া ঔষধের আলমারিটা খুলিয়া খানিকটা স্পিরিট খানিকটা আইওডিন একত্র করিয়া খাইয়া ফেলিল। সেই মুহূর্তে কান্তি বাবু অফিস হইতে ফিরিলেন। যে অবস্থা দেখিলেন তাহা বর্ণনাতীত। শোভনা দেবীকে দেখিয়া মনে হইল, মিনিট দশেক পূর্বে মারা গিয়াছেন, আর নীলা এক পাশে পড়িয়া গোঙ্গাইতেছে ও জোরে জোরে শ্বাস টানিতেছে, মনে হয়, তাহারও মরিবার আর বেশী দেরী নাই। কান্তি বাবু কাউকে কিছু না বলিয়া ঘণ্টা খানেক ঠাঁয় দাঁড়াইয়া অন্য একটি ঘরে গিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিলেন। ছোট ছোট তিনটি ছেলে-মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তায় পড়ল বেরিয়ে—। বন্ধ ঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে কান্তি বাবু চীৎকার করে ওঠেন—আমাকে একটু কেউ বিষ দিতে পার?

সতীদাহ

অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ইহা অতি সুন্দর কথা যে, অতি প্রাচীন কালে আমাদিগের সমাজে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সধবা রমণীগণ স্বামীর চিতানলে স্বেচ্ছায় ও হাসিমুখে তাঁদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়া ভস্মীভূত করিতেন। একদা বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী উজ্জয়িনী নগরে চূড়ালা নাম্নী এক রাজমহিষী কোনও রমণীকে স্বামীর শবানুগমন করিতে দেখিয়া চদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্মশানে শব উপস্থিত হইবার অগ্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া শবের অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী এক বক-হংস-নিনাদিত মনোরম পুষ্করিণীর ঘাট-সংলগ্ন বৃক্ষতলে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন, হরিধ্বনি করিতে করিতে শব-বাহকেরা সেই রমণীর স্বামীকে শ্মশানে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। এবং রমণী স্বামীর প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে অন্নদানার্থে পূর্ণ জলপাত্র হস্তে তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় রাজমহিষী সেই রমণীর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—মাতঃ, আমি আপনার কন্যা-স্থানীয়া ও পরম অনুগতা সেবিকা, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার সন্দিগ্ধ মনকে শান্ত করেন, তাহা হইলে আমার আপনার নিকট আসিবার সমস্ত কারণ ব্যক্ত করি।

তাহা শুনিয়া রমণী বলিলেন, বল বৎসা, তোমার মনের সন্দেহ কি?

রাজমহিষী—ঐ মৃত ব্যক্তি আপনার কে?

রমণী—আমার স্বামী।

রাজমহিষী—আপনি কি আপনার স্বামীর চিতানলে আপনার এই অমূল্য জীবন বিসর্জন দিবেন?

রমণী—বিসর্জন দিব না, পরমাত্মার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দিব।

রাজমহিষী—আপনার স্বামী তো এখন একটি শবদেহ মাত্র, ওর ভিতর পরমাত্মা কোথায়? আর আপনি কি উপায়ে আপনার জীবাত্মাকে উহাতে মিশ্রিত করিবেন?

রমণী—যে উপায়ে ভক্তের ভক্তি-স্রোতে প্রস্তর ও কাষ্ঠমূর্ত্তির মধ্যে ভগবানের অধিবেশন হয়, সেই উপায়ে উহার ভিতরে পরমাত্মা নিশ্চয়ই আছেন। আর যে উপায়ে আমার স্বামী স্বীয় জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিশ্রিত করিয়াছেন, সেই উপায়ে আমি আমার জীবাত্মাকে উহাতে মিশ্রিত করিব।

রাজমহিষী—তিনি তো ধ্যানযোগে আপনার দেহের মধ্যেই পরমাত্মাতে নিজের জীবাত্মাকে মিশ্রিত করেছেন? সে স্থানে আপনিও তো ধ্যানযোগে আপনার দেহমধ্যস্থিত জীবাত্মাকে আপনার দেহস্থিত পরমাত্মার সহিত মিশ্রিত করিতে পারেন?

রমণী—কন্যা, তুমি জ্ঞানের স্বল্পতা প্রযুক্ত একই পরমাত্মাতে স্থিত একই জীবাত্মাকে ভিন্নাত্মা দর্শন করিতেছ। যেদিন তোমার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে, সেদিন তুমিও তোমার জীবাত্মাতে এবং তোমার স্বামীর জীবাত্মাতে অভেদ দর্শন করিবে। [illegible] [illegible], পরস্পরের একই জীবাত্মাতে উভয়ে দ্বিত্ব দর্শন করেন, [illegible] তাঁহাদের জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ পায়, এবং পরস্পরভিন্ন দেহজ্ঞানে আপন আপন রুচি অনুসারে ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া পানীয় ও আহার্য্য গ্রহণ চেষ্টায় রত থাকেন। এবং যে মুহূর্ত্তে যাঁহারই জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি একই পরমাত্মাতে [illegible] জীবাত্মাকে এক দর্শন করেন, এবং চেষ্টারহিত হইয়া [illegible] পানীয় ও আহার্য্য গ্রহণ করিতে থাকেন। এইরূপে তাঁহার সংস্কার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লোপ পাইলেই পরমাত্মাতে মিশ্রিত হইয়া যান। এবং উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু [illegible] ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা ব্রহ্মচর্য্য [illegible] ভোগত্যাগের (ভোগেরও লালসা থাকিবে না, [illegible] থাকিবে না) মধ্য দিয়া ব্রহ্মে লীন হইবার চেষ্টা করিতে থাকে [illegible] যে দম্পতির ঠিক একই মুহূর্তে উভয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, [illegible] পুরুষ সেই মুহূর্ত্তে আপন জীবাত্মাতে মিশ্রিত করিতে পারেন [illegible] রমণীও সেই পরমাত্মার সহিত স্বীয় স্বামীর জীবাত্মাকে [illegible] বিবেচনা করিয়া চিতানলে স্থিত স্বীয় মৃত স্বামীকেই পরমাত্মা [illegible] নিজের জীবাত্মাকে মিশ্রিত করিয়া থাকেন। আরও দেখ, [illegible] স্বামীনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী যখন স্বামীর চিৎস্বরূপ [illegible] নিজের মন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মে স্থিত হইলেন, তখন মাত্র [illegible] অবয়ব যজ্ঞস্থলে পড়িয়া রহিল। বিষ্ণু শঙ্কর [illegible] যখন স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক মোহের বশবর্ত্তী হইয়া সপ্ত সমুদ্র [illegible] মত স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতাল বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন, [illegible] বিধানোদ্দেশ্যে বিধি সমীপে উপস্থিত হইলে, ভগবান ব্রহ্মা [illegible] সেই দেহকে টুকরা টুকরা করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিবার [illegible] প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন যে, ইহা জগৎ-পালকেরই [illegible]। চক্রধারী তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহাই করিতে লাগিলেন। কন্যা! স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে চিতানল বহু প্রকারের?

ইহা শুনিয়া রাজমহিষী বলিলেন,—মাতঃ! আপনার অনুগ্রহে আমার মনের মলিনতা যথাযথ ভাবে নিবৃত্তি হইয়াছে। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, আমিও যেন পূর্ণ জ্ঞানলাভান্তে আপনার পথানুসরণ করিতে পারি।—এই বলিয়া রাজমহিষীও আপন [illegible] বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং রমণীও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া স্বামী-চিতানলে নিজের দেহ বিসর্জন দিলেন।

MBS
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১২৪, ১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : বি. বি. ১৭৬১
ব্রাঞ্চ—হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১৫৯/১/বি রাসবিহারী এভিনিউ · কলিকাতা

চেরা বিনা কি হবে ?

(রোমানফের Without Cherry blossom-এর অনুসরণে)

শ্রীকবিতা সিংহ

প্রিয় বন্ধু,

তোমাকে লিখলাম. চুপ করে বসে থাকতে মন আমার বেদনার্ত্ত হয়ে উঠেছে। আজ সকালে এনাটমির মোটা বইটা খুলে ফেললাম, তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো শুকনো একটি বকুলের মালা। কাল সেগুলো ছিল চন্দনের তারার মত উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম সুকুমার, প্রাকৃতিক ভাস্কর্য্য, আজ সকালে তাদের শ্রীহীন মূর্ত্তি দেখলে মন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে, এই শুকনো বকুলের মালাই নিয়ন্ত্রিত করেছে আমার চিন্তাকে···বন্ধু, তোমাকে কি লিখছি জানি নে···তবু শোনো।···

তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো, পাপছাড়া মনে হবে তবু উত্তরটা স্বচ্ছ মনেই দিও। আচ্ছা বন্ধু, তোমার জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় দিনটিকে কি তুমি অন্য দিনগুলির চেয়ে বিশেষ করে তুলতে চাও না ? সেদিনও কি তুমি তোমার নিত্যকার সাধারণ তালি-মারা ছেঁড়া পোষাকে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তোমার আত্মার আত্মীয়কে বরণ করে নেবে ? তোমার কি ইচ্ছে হবে না এই জীর্ণ বাসকেই একটু পরিচ্ছন্ন করে তুলতে, তোমার শ্রীহীন ঘরের বাতাসকে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধার নিঃশব্দ উপস্থিতি দিয়ে গন্ধবিধুর করে তুলতে ?

সত্যি বন্ধু, ভালো লাগে না এই হোষ্টেলের জীবন। সম্ভ্রান্ত সৎ-পরিবারের মেয়ে আমি। আমার বাবা-মা যদি দেখতেন কত বিশ্রী ধরণের কথা আজ আমার কাছে সাধারণ হয়ে গিয়েছে, কদর্য্য পরিবেশের মধ্যে কত কালিমা পড়ছে আমার দেহ-মনে, তাহলে তাঁরা কত মর্ম্মাহতই না হতেন ! সৌন্দর্য্য আর শালীনতার উপর নিষ্করুণ অবজ্ঞার অভিনয় করে দেহাতীত মননকে অস্বীকার করাই আধুনিক তরুণ সমাজের প্রচলিত মনোভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের হোষ্টেলে তারই প্রতিফলন ছড়ানো আছে এখানে-ওখানে ছেঁড়া কাগজ, কফ, থুতু, পোড়া সিগারেট, ছেঁড়া জঞ্জালে। বিছানাগুলো ময়লা চিট্-ধরা ঘামের গন্ধে কদর্য্য। আবার এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা হচ্ছে বলে হোষ্টেলের ছেলে-মেয়েরা ঘর-দোরের ইচ্ছাকৃত ক্ষতি আরম্ভ করেছে। বন্ধু, এরা যেন এদের প্রতিটি আচরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করতে চায় যে, বাঁচার পর্য্যায় থেকে ভালো করে বেঁচে থাকার পর্য্যায়ে উন্নত হতে চাওয়া যেন এক বিরাট অপরাধ। ওটা যেন একটা দুর্নাই কাজ !

আমাদেরই হোষ্টেলের মেয়েরা সন্ধ্যার পর বাড়ী থাকে না। পুরুষ বন্ধুদের সংগে না ঘুরে আসতে পারাটাই যেন ওদের কাছে অসম্মানজনক ব্যাপার। সৌজন্য আর ভদ্রতা দেখানোকে ওরা চৈনিক অসভ্যতা বলে মনে করে। প্রতি কথায় ওরা অশ্লীল উক্তি করে। তরুণদের মাঝে যে-সব কথা চিরন্তন, তা ওরা বলুক দোষ দিই না, কিন্তু পরস্পরের পাছা চাপড়ে যখন রাস্তার লোফারদের মত শালীনতাহীন ভাষায় ও-ধরণের কথা বলে তখন সত্যিই ভারী নোংরা লাগে। যারা ওদের সংগে ঠিক তাল মেলাতে পারে না, তাদের দুরন্ত করবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা আরো উঠে-পড়ে লাগে।

কিন্তু বন্ধু, আমি এই স্থূল প্রয়োজন তার কলংকিত পাশবিক জীবনকে আজও বরদাস্ত করতে পারিনি। আজও চাঁদের আলো আমার কাছে পবিত্র লাগে, রাত্রির নীল আঁধার আমার মনে স্বপ্ন জাগায়, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভালোবাসা প্রতি রাত্রির মনকে উজাড় করে দেওয়া প্রার্থনায় আজও আনন্দ-নিবিড় হয়ে রয়েছে। তাই আমার বান্ধবীদের মত প্রেমকে শারীরিক প্রয়োজন—যাকে পশু-জীবনে Bilogical urge বলা হয়েছে—শুধু তাই বলে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না। মাঝে কফি আর আনুষংগিক কিছু রেখে ছেলেটি বলে, আমি তোমায় চাই। মেয়েটিও সায় দেয়। তার পর তারা ঘনিষ্ঠতম হয়ে ওঠে, স্থায়িত্ব দু'-তিন দিন বা দু'-তিন সপ্তাহ। তার পর এক দিন যে ওরা এত কাছাকাছি ছিল তার এতটুকু পরিচিতিও পরস্পরকে দেখায় না। এই ধরণের কদর্য্য পরিবেশের মধ্যেও আমার পবিত্র তারুণ্যময় জীবনে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আর অভিশাপের মত নেমে এলো আমার জীবনের প্রথমতম স্বর্গীয় অনুভব। আমার প্রেম।

শমীনকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো। আমাদের মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর নাম-করা ছেলে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, একটু বেশী দীর্ঘ সাধারণের চেয়ে। পোড়া তামার মত গায়ের রং। শরীরের কোথাও পেশীর বাহুল্য নেই, কিন্তু প্রশস্ত কাঁধে সরু কোমরে ছন্দময় ভংগিমায় অমিত শক্তির স্ফুরণ প্রতি মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে যায়। ও যেন একটা তেল-দেওয়া চালু মেশিন। তিরিশ বছরে অপূর্ব্ব তারুণ্য ওর দেহ-ধনুকে প্রতিনিয়তই টংকার দিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধু, তুমি হয়তো প্রশ্ন করবে, শমীনের মত নিজের দেহ সম্বন্ধে অত্যধিক আত্ম-সচেতন উন্নাসিক ছেলেকে আমার মত একটু অন্য ধরণের মেয়ের ভালো লাগলো কেন ? তারই উত্তর তোমায় দেব। তোমরা ওকে দেখেছ অনেকের মধ্যে। সেখানে ও নিজেকে কঠোর বস্তুতান্ত্রিক বলে জাহির করতে ব্যস্ত। তোমরা দেখেছ ওর বেপরোয়া চলা-ফেরা, ওর রুচিহীন স্থূল রসিকতা, ওর চঞ্চল চোখের তির্য্যক কলুষ চাউনী। বেপরোয়া ভাবে ও মেয়েদের সংগে ঘনিষ্ঠ হয়, নির্লজ্জের মত কথা বলে, স্ফুর্তির ভাগ তাদের দাবী করে, দেখাতে চায় ভাবপ্রবণতা ওর কাছে হাসির জিনিষ। যৌবনের প্রয়োজনকে কাপুরুষরা প্রেম নাম দিয়েছে।······তোমরা শমীনকে ভয় করেছ। ও মরুঝড়, ও কালবৈশাখীর ক্ষুধিত বাতাস, ও সুন্দর কিন্তু ভয়ংকর সুন্দর,······ওর সংগে মিলন ?···সে মিলন মরণ সমান !······

তবু বন্ধু, ওকে আমি ভালোবেসেছি। ওর মধ্যে আমি আবিষ্কার করেছি দু'টি মানুষকে—এক জন সাত্ত্বিক, এক জন সম্ভোগী। যখন ও অবসর সময়, ডিসেকশনের ফাঁকে অপারেশন থিয়েটারের বাইরে করিডোরে একা দাঁড়িয়ে থাকে তখন দূর থেকে ওকে দেখেছি আমি। ওর প্রশস্ত কপালে, গ্রীক ধরণের সুন্দর নাকে, তীক্ষ্ণ চিবুকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, অস্ত-সূর্য্যের রক্তাভ আলো ওর সমস্ত মাখিয়ে দিয়েছে ওর সর্ব্বাংগে। তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ দু'টির নীচে অর্দ্ধ-নিমীলিত কালো দু'টি চোখ, নিরুদ্ধ কামনার ফেনিল জ্বালা সেখানে অনুপস্থিত। তার বদলে সেই স্তিমিত চোখে প্রশান্তির আভা, সুদূরের অভিসারে সে দৃষ্টি যেন দেবতার মত। অন্তরের ভাবের প্রতিফলনে ওর অপূর্ব্ব সুন্দর মুখে কি দেহাতীত দ্যুতি খেলা

করে যায় তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না।······কিন্তু পরক্ষণেই আসে ওর বন্ধুর দল······“হ্যালো শমি,······”

দলের 'হিরো' শমীনের মুখ কুশ্রী হয়ে ওঠে। স্থূল পৃথিবীর সংগে সংযোগ ফিরে আসে। যে চোখের দৃষ্টি চলে গিয়েছিল পার্কের ওপাশে খোলা আকাশের ভায়োলেট আভার তলা দিয়ে তালকুঞ্জ ছাড়িয়ে চৈতন্তের রাজ্যে, সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যে-সব মেয়েরা আশ-পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করছে তাদের উপর। তাদের দেহ-গঠনের উপর বিশ্রী মন্তব্য করে বন্ধু-মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি করে শুধু হিরো হয়ে পিঠ চাপড়ানি পাওয়ার লোভেই নয়, নিজেকে নিষ্করুণ সৈনিক বলে প্রচার করবার তীব্র চেতনায়ও। সেই মুহূর্তে আমি আমার চোখ নামিয়ে নিই। কার্বলিকের গন্ধে ভারী অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে ঢুকে পড়ি। অন্তরের নিঃশব্দ শোণিত-ক্ষরণকে রোধ করতে গিয়ে আমার হাত কেঁপে ওঠে।

বন্ধু, ও আমায় চায়। হয়তো তুমি বলবে, তবু তোমার আক্ষেপ ?···কিন্তু ও-চাওয়াকে আমি চাই না। কাফি হাউসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, তারও পরে এক সিনেমার যাত্রী হয়ে আর তারও পরে লেক কিংবা ভিক্টোরিয়া ভেল্‌ভেটের মধ্যে অন্ধকারে খানিকটা স্পর্শ-কামনার সংগী হিসাবে ওর পাশে দাঁড়াতে পারার মত নীচতা আমার আজও আসেনি। ক্লাশে বসে যখন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে, অভদ্রের মত দৃত পাঠায় তখন সত্যি ঘৃণা হয়। ওকে যতটা ভালোবেসেছি, হয়তো তার থেকেও বেশী ওকে ঘৃণা করেছি। এক দিন শীতের উষ্ণ মধ্যাহ্নে কলেজ কমন-রুমে টেনে এনেছিল সুচেতা কি একটা রাজনীতিক মিটিং শুনবে বলে, কিন্তু কমন রুমের অপর কোণে শমীন ম্যাজিক দেখাচ্ছিল, ওকে ঘিরে ছেলে-মেয়েদের ভীড় জমেছে। হেসে ঢলে পড়ছে ওরা শমীনের চেষ্টাকৃত অসাফল্যে, উত্তেজনায় ওদের গাল আর কানের ডগা রঙীন। হঠাৎ চোখ তুলে আমাকে দেখল শমীন, ওর মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে ডাকলো, 'সুচেতা, ডিয়ার, এসো আমাদের আসরে, আর যদি আদর্শবাদিনী দেবী আসতে চান তাহলে···My door is open for all···, হো:-হো: করে হেসে উঠেছিল শমীন। ওর মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বে সুচেতা ভীড়ে গেল। আমি চলে এলাম। সুচেতা একবার ডেকেছিল, সুমেধা, তুমিও এসো,···কিন্তু যেতে পারিনি আমি।

বন্ধু, আর ভুলবো না কালকের কথা···বসন্ত-সন্ধ্যা, ঝিরঝিরে দখিনা হাওয়া দুলিয়ে দিয়ে গেল আমার ঘরের ক্যালেণ্ডারটা, Histologyর খোলা বইটার পাতাগুলো গেলো উল্টে-পাল্টে। রুমমেট সুনন্দার বিছানায় তখন বসেছে তাসের আসর, আর তারও পরে ছেলেদের হোষ্টেলের বসন্তোৎসবে নিমন্ত্রণ। তাকালাম বাইরের দিকে। আকাশের রংটা ভারী ভালো লাগলো। ঠাসা-চাপা আবহাওয়া থেকে সরে যেতে ইচ্ছে হলো। বাথ-রুম থেকে যখন এলাম তখন সুরভি স্নো দিয়ে বলল, ইসস্, গায়ে যে সাবানের গন্ধ ভুর-ভুর করছে! আলমারী থেকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ীটা বার করতে করতে নির্বিকার সুরে বললাম, 'চুলেও তেলের গন্ধ পেতে পারো।' উত্তরে ওরা চটলো। তবু আমার সাজ-গোজের অবিশ্বাস্য ব্যাপারে কৌতূহলী সুস্নাতা রহস্য করে বলে উঠলো, 'তোমার হলো কি সুমেধা, এত দিন পরে কোন glorious mistake করে বসলে না কি?'

পায়ে স্লিপারটা গলাতে গলাতে বললাম, 'ঠিক তাই'···

অন্তিম চেষ্টায় সুলভা বলে উঠলো, 'ছেলেদের উৎসবে তাহলে যাচ্ছ না'···

হেসে বললাম, 'এই অপূর্ব্ব সন্ধ্যায় ভীড়ের মধ্যে গরমে ভালো লাগবে না সুলভা···'সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুভ্রতার মন্তব্য শুনলাম—'এক যুগ পেছিয়ে আছে'···সুগন্ধা বলে উঠলো—“বড্ড বেশী Emotional—'হাসলাম, তার পর নেমে গেলাম তর তর করে···

বাইরে এসে মুক্ত বাতাসে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলাম। আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা মনে হলো, সত্যি যে-সব অনুভূতি আমি অনুভব করেছি যার কোন প্রমাণ নেই তারা অসত্য। যা-কিছু দেহাতীত সবই অস্বীকারের খাতায়···? মার্কসিষ্ট দর্শনের মতে বহির্বস্তুর ছায়াই আমাদের মন, তার প্রতিফলনেই আমরা মনন করি? অন্তর থেকে বাইরে নির্দ্দেশ আসে না ?···এক ঝলক বাতাস বয়ে যায় আমার উপর দিয়ে, আঁচল উড়তে থাকে, কবরীর মায়া কাটিয়ে দু'-চারটি চূর্ণ কুন্তল পড়ে কপালে আর কপোলে। নিজেকে ভারী হাল্কা মনে হয়। মনে হয়, আবার যেন আমি আমার নিষ্পাপ শৈশবে ফিরে গেছি। পার্কের ধারে জলের ফোয়ারার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম এক দল ছেলে জটলা করছে, শমীনও রয়েছে ওদের মধ্যে···আমাকে দেখে একটি ছেলে মন্তব্য করলো, 'চলে নীল শাড়ী নিঙাড় নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর'! শমীন হাসি-ভরা কণ্ঠে যোগ দিল—'সেই হতে মোর হিয়া নহে থির, মনমথ-জ্বরে ভোর'···ঘৃণায় মন এত ভরে উঠলো যে কোন রকম অবমাননার লক্ষণও দেখালাম না। চলে এসে বসলাম পার্কের অপর কোণে একটা খালি বেঞ্চে। আজ পার্কে বেশী ভীড় নেই। বসন্তোৎসবের অপূর্ব সন্ধ্যা, এখনও ত গাঢ় অন্ধকারের রাত্রি নামেনি, এখনও প্রণয়ীদের কাছে কাফি-হাউসের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ, কার্নিভালের মন-মাতানো বৈচিত্র্য, সিনেমার রঙিন অন্ধকারই প্রিয়তর। স্বচ্ছ নীলাভকৃষ্ণ আকাশ, আমার চার পাশে অলিভ কুঞ্জ, মাথার উপর পাম পাতার ঝালরের পাশ দিয়ে তারার কুঁচি দেখা যায়। একটি মেয়ে ফুল বিক্রি করছিল। বকুলের মৃদু গন্ধ ভারী ভালো লাগল, ···একটি বকুলের মালা কিনলাম। কি সুন্দর ফুলগুলো! যাঁর সৃষ্টির আনন্দে এরা অপূর্ব, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় সমস্ত অন্তর আপ্লুত হয়ে উঠলো। মালাটি নাকের কাছে ধরে ঘ্রাণ নিলাম, যেন প্রতি নিশ্বাসে আমি পবিত্রতাকে গ্রহণ করতে চাই।

'সুমেধা, তুমি ভারী ভাব-প্রবণ'···

তাকালাম অবাক হয়ে, শমীনের হাতটা আমার অতি সন্নিকটে, বেঞ্চের পিঠটায়, আমার উপর শমীন ঝুঁকে পড়েছে। 'টাকাটা বুঝি শ্রমিক উন্নয়ন সংঘতে দিলে বাধতো?'

জানো বন্ধু, ও চেয়েছিল তর্ক আর ঝগড়ার অনুরণনে আমার মনের সেতারে বাগেশ্রী বাজাতে,······কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমার একটা হাত টেনে নিল শমীন, 'Do'nt be a fop.' বকুলের মালাটা আমার হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল শমীন···'জীবনের ইংগিতে ধরা দাও, উঠে এসো বলিষ্ঠ চেতনায়; পৃথিবীটা কাব্য নয় সুমেধা'···

মনে মনে ভাবলাম, কথাগুলো সুন্দর, কিন্তু তার নামে যা করো শমীন তা সুন্দর নয়। মুখে বললাম, 'মিঃ সেন, আপনি আমায় তুমি বলবেন না, আপনার সংগে আমি বিশেষ পরিচিত নই'…

'Don't be silly', আরো কাছে সরে এসেছে শমীন। 'তুমি আমায় মনে মনেও মিঃ সেন বলে ডাকো না কি ?'

সরে গিয়ে বললাম, 'সবাইকে তুমি বলে ডাকলে তুমি কথাটার মাধুর্য্য চলে যায়…আপনি আমায় যেতে দিন'…

'না, তুমি বসো, তোমার সংগে আমার আমার কথা আছে'… একটু আহত শোনায় ওর কণ্ঠস্বর। সামনের বেঞ্চে এসে বসলেন একটি তরুণী, কাম-পংকিল দৃষ্টিতে শমীন চেয়ে রইল তাঁর যৌবন-পুষ্পিত দেহের দিকে…অস্বীকার করবো না বন্ধু, আমার একটু দুঃখ হয়েছিল। শমীন তা বুঝতে পেরেছিল। শুনে তো একটু খুসীও হয়েছিল, নিজেকে জাহির করার গর্ব্ব তবু ওর গেলো না।… হেসে বললে, 'নাঃ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ সুমেধা! দেখো, মেয়েদের মেয়ে বলে নাও, ছেলেদের ছেলে বলেই নাও…ছেলেদের মধ্যে বিশেষ এক জনকে নিয়ে বা মেয়েদের মধ্যে বিশেষ এক জনকে নিয়ে স্বপ্ন বোনার চিন্তা এ যুগে অচল।'

অনুভব করলাম, সন্ধ্যার নিবিড়তার সংগে সংগে ওর আলিঙ্গনও আমার চার পাশে নিবিড় হয়ে উঠেছে। ঘন উত্তেজনায় আমার অন্তরও রঙীন হয়ে উঠেছিল। অস্বীকার করে লাভ কি বন্ধু, আমার সারা অন্তর শমীনকে চেয়েছিল…'যাবে আমার বাড়ী, কাছেই'…তার পর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে অর্থপূর্ণ স্বরে বলেছিল, 'কেউ নেই ওখানে'…আমি বুঝতে পারিনি বন্ধু, কান দিয়েই শুনেছিলাম, মন দিয়ে নয়। স্বপ্ন-চালিতের মত ওর গতির সংগে গতি মিলিয়ে পার্ক পেরিয়ে পথে নামলাম।

ছোট্ট বাড়ীতে ওরা ক'টি বন্ধু মিলে থাকে। সামনে বাগান করার মত জায়গা। ফুল গাছ বসালে শ্রী খুলতো কিন্তু ওরা ভাবপ্রবণ নয়, তাই জমিয়েছে ফুল গাছেরই মত অপ্রয়োজনীয় কাগজের স্তূপ। কত দিন দেওয়ালে কলি পড়েনি। ধূলোর স্তূপের উপর আমার শ্রীপায়ের ছাপ পড়েছে। ঘরের মধ্যেটা আরও বীভৎস। ডিমের খোসা, চায়ের পেয়ালা, ময়লা জামা-কাপড়, বই, সিগারেট তালগোল পাকানো। নগ্ন বীভৎস নোংরার মাঝে ওকে যেন আরো ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে…

হয়তো মুখে আমার ঘৃণা ফুটে উঠেছিল…মৃদু হেসে বলে উঠলো, 'দাড়াও, তোমার জন্য খানিকটা কবিত্বের ব্যবস্থা করছি…' খট্ করে আলোর সুইচটা অফ করে দিল, সরীসৃপের মত যে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, সেটা সজোরে ঠেলে বেরিয়ে এলাম। কখন যে বড় রাস্তায় পৌছেছি, সে খেয়ালও আমার ছিল না। সম্বিত যখন ফিরে পেলাম তখন পার্কে এসে গিয়েছি…আস্তে আস্তে পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। চাঁদ তখন আকাশের অনেক উঁচুতে। পার্কের একদিকে [illegible] ছেলেদের হোষ্টেলের উৎসবের মৃদু সুর ভেসে আসছে মাইকে। [illegible] শান্ত প্রকৃতির মাঝে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত বেদনায় চোখে জল এলো, এগিয়ে গেলাম। ধূলোর মধ্যে নতজানু হয়ে কুড়িয়ে নিলাম ফুলের মালাটা, পায়ের চাপে-চাপে ওটা দুমড়ে পিষে গেছে, আমার বুকের মতই…একবার মালাটার দিকে তাকালাম, একবার তাকালাম পথের দিকে, যে পথ দিয়ে এখনও ফিরে যাওয়া যায় শমীনের বাড়ী…তার পরে মালাটা বুকের কাছে ধরে হেঁটে চলে এলাম……

'ওরা জেগে থাকে'……

শ্রীসুধা মুখোপাধ্যায়

দিনের ঝংকার থেমে গেলে,

পথে-ঘাটে লোক কমে এলে,

রাত্রির ওংকার ধ্বনি চারি দিকে তোলে শিহরণ,

ঘুম-পরী কালো বেশে, হেথা-হোথা করে বিচরণ;

দিনান্তের অবসাদ শেষে,

ধনী যারা, বিলাস-শয্যায়,

আনমনে অকারণে মিটি-মিটি হাসে,

তার পরে, গাঢ় ঘুমে চেতনা হারায়—

ঘুমের কোলেতে যা'রা সঁপে দেয় নিজেদের ভার,

তাদের তো আনন্দ অপার!

আর যারা প'ড়ে পথে, যাদের চোখেতে ঘুম নেই,

পৃথিবী ঘুমের বুকে ঢলে পড়ে যেই,

শুরু হয় ব্যর্থতার নগ্ন রোমন্থন;

অনুক্ষণ

জেগে থাকে, কি বা দিনে কি বা রাতে

ঘুম নেই চোখে।

ওরা জেগে থাকে, আর

অব্যক্ত কি বেদনায় গুমরিয়া ওঠে বার বার,

বস্তীর ফুটো ঘরে, আর ফুটপাথে

ওরা শুধু জাগে, আর ধোঁকে

হাজারমারীর বিভীষিকা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহৃষীকেশ হালদার

ভুত নয়—অদ্ভুত

যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলাম প্রদীপের কোলে আমার মাথাটা রয়েছে। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, সারা দেহ ব্যথায় আড়ষ্ট—পাশ ফেরবার চেষ্টা করতেই অসহ্য বেদনায় আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এলো।

প্রদীপ সাগ্রহে আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে ডাকলে: মুখুজ্যে!

সাড়া দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু গলাটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছিলো—একটা বিকৃত স্বর ছাড়া আর কোন কিছুই স্বরযন্ত্র থেকে বেরোলো না।

প্রদীপ উঠে গিয়ে ঘরের কোণে রাখা একটা টিপয় থেকে ছোট একটা পশ্চিমা সোরাই আর একটা কাচের গ্লাস নিয়ে এসে আমায় [illegible] জল পান করালে। এক নিশ্বাসে জলটা শেষ করে দেহে যেন [illegible] পেলাম। ধীরে ধীরে অতি কষ্টে উঠে বসলাম। এবার [illegible] স্বপ্নের মতো সব কথা মনে পড়তে লাগলো। মনে হলো, আমরা ব্যারাকপুরের বাগান-বাড়ীতে বন্দী। কিন্তু কতক্ষণ? রাত কি শেষ হয়ে গেছে, পৃথিবীর বুকে ফুটে উঠেছে দিনের আলো? [illegible] মানুষের দল কি পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন? [illegible] স্পর্শ কি আমরা আর কোন দিন পাবো না? [illegible] কি রচিত হবে আমাদের শেষ সমাধি?

আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা একবার ভালো করে দেখবার জন্য [illegible] দিকে চাইলাম। ঘরখানা নেহাৎ ছোট নয়। মেঝেটা [illegible]—তাই তার ওপর যখন নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, তখন অত [illegible] হয়েছিলো আর আঘাতও লেগেছিলো অত কম।

[illegible] যারা আমাদের বন্দী করেছিলো, তাদের উদ্দেশ্য হয়ত [illegible] মেরে ফেলা নয়—অন্ততঃ সেই কঙ্কালটার কথা শুনে আর [illegible] ব্যবস্থা দেখে তাই মনে হয়। নইলে এখানে শয্যা, [illegible] ইলেকট্রিকের আলো—এ-সব রাখবার কোন অর্থই হয় না। [illegible] থেকে বাইরে যাওয়া-আসার পথ কোন্ দিকে? এক-[illegible] মেঝে দিয়ে আমরা এই মাটির নীচের ঘরে নিক্ষিপ্ত [illegible] সেইটাই এ-ঘরের ছাদ—এ-ঘরের মেঝে থেকে অনেক—[illegible]। কংক্রীটের পিচ্ছিল দেওয়াল বয়ে সেটার নাগাল [illegible] সম্ভাবনাই নেই। আর যদি কোন দিন কোন উপায়ে তার নাগাল পাওয়া যায়ও, তবু তাকে ভেদ করে বাইরে যাবার উপায় কি? যে সুইচের কৌশলে মেঝেটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিলো, সেটা ছিলো একতলার ঘরের বাইরে।

আমার মনে যে সব প্রশ্ন জাগছিলো, প্রদীপের মনেও সে সব জাগেনি এমন নয়। আমি যতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, ততক্ষণ প্রদীপ নিশ্চেষ্ট ছিল না। পড়বার সময় সে অপূর্ব্ব কৌশলে হাত আর পায়ের সাহায্যে সারা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করেছিলো বলে তার আঘাতও লাগেনি আমার মত। তাই তাকে আমি যখনি আমাদের মুক্তির উপায় কি হবে বলে প্রশ্ন করলাম, সে উত্তর দিলে: আমিও সেই কথাই ভাবছি মুখুজ্যে। শুধু আমাদের দু'জনের উদ্ধার নয়, আরো অনেকের উদ্ধারের কথাই ভাবছি। এখানে শুধু আমরা দু'জনেই বন্দী নেই, আরো অনেকেই বন্দী আছে।

বিস্মিত ভাবে আমি ঘরটার চার দিকে চাইলাম। কৈ, এ-ঘরে তো আর কেউ কোথাও নেই!

প্রদীপ আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললে: এখন বোধ হয় অনেকটা সুস্থ বোধ করছো। আমার সঙ্গে উঠে এসো এদিকে, তাহলেই তোমার কথার উত্তর পাবে।

প্রদীপের কথা মত ঘরের একটা পাশে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালাম। প্রদীপ বললে, দেওয়ালটা মসৃণ বটে, তবে সবটাই নীরেট কংক্রীটের নয়। তুমি যখন অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলে, তখন ঠুকে-ঠুকে দেওয়ালটা পরীক্ষা করতে করতে শেষে দেখলাম, এইখানটা ঠং-ঠং শব্দ করে উঠলো। বুঝলাম, এখানে ইস্পাতের পাত দিয়ে দরজা কিংবা ঐ জাতীয় যাতায়াতের কোন পথ করা আছে! দেওয়ালের রঙের সঙ্গে এখানের রঙ এমন ভাবে মেলানো যে, এটাকে দেওয়াল ছাড়া অন্য কিছু মনে করা কঠিন। ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে কয়েক বার ঠুকতেই হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, অপর পার থেকেও কে যেন ঐ জায়গায় আঘাত করছে। আর সে আঘাত বেশ সুসমঞ্জস। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতেই বেশ বোঝা গেল, অপর দিক থেকে মোর্সের সাঙ্কেতিক অনুসারে শব্দ করে প্রশ্ন করা হচ্ছে, ও-পাশে কে? আমিও ঠিক সেই প্রণালীতে শব্দ করে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, ও-পাশে কে? উত্তর যা এলো তাতে অবাক হয়ে গেলাম—দেওয়ালের ও-পাশে আর একটা ঘরে জীবনময়, তাঁর আগের দারোগা আর সঙ্গীরা—যাঁরা সোনারগাঁ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন—তাঁরা সবাই বন্দী আছেন। শুধু তাই নয়, ওই ঘরটার সংলগ্ন আর একটা ঘরে বন্দী আছেন এমন এক জন, যাঁর নাম শুনলে তুমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবে।

—কে তিনি? প্রশ্ন করলাম আমি।

—জহর সান্যাল……

—জহর সান্যাল! বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম আমি : তবে যে তুমি সেই কঙ্কালটাকে তখন জহর সান্যাল বলে সম্বোধন করছিলে?

—তখন তাই ভেবেছিলাম বটে। প্রদীপ উত্তর দিলে : পরে সবই জানতে পারবে। উপস্থিত আমাদের মুক্তির একটা উপায় করা বিশেষ প্রয়োজন।

—অদীপ তো ধরা পড়েনি। বললাম আমি : সে কি আমাদের মুক্তির কোন উপায় করতে পারবে না?

—বোধ হয় না। প্রদীপ উত্তর দিলে : মিথ্যে আশা করে কোন লাভ নেই মুখুজ্যে। অদীপকে আমি বলে রেখেছিলাম, সে যেন একটু দূরে দূরে থেকে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখে। সে আমাদের ওপর লক্ষ্য রেখেছিলো ঠিকই, কিন্তু শত্রুর শক্তি বিবেচনা করে সে একলা কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি। কারণ তাতে তারও আমাদের মতই বন্দী হবার আশঙ্কা ছিলো! আর তার ফলে আমাদের কোন রকম সাহায্য করা তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতো। কাজেই খুব সম্ভব সে নীরবে পাঁচিল টপ্‌কে আমাদের মোটর কারে চড়েই হেড কোয়ার্টার্সের সাহায্য নিতে গেছে। আর তাই যদি হয়, তাহলে হেড কোয়ার্টার্স থেকে যাঁরা এ-বাড়ী তল্লাসী করতে আসবেন, তাঁরা শুধু সারা রাত্রি গোপনে বাড়ীটাকে পাহারা দেবেন—যাতে কোন লোক পালিয়ে যেতে না পারে। ভোর বেলা তাঁরা যথারীতি সারা বাড়ীটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখবেন অবশ্যই; কিন্তু আমাদের সন্ধান পাবেন কোথায়? আমরা তো মাটির নীচের ঘরে বন্দী! সুতরাং আমাদের উদ্ধার করা দূরে থাক, গৃহস্বামীর কাছে শুধু শুধু তাঁকে সন্দেহ করার জন্যে রীতিমত ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁরা সরে পড়তে পথ পাবেন না।

—গৃহস্বামী তো সেই কঙ্কালটা! বললাম আমি। তার কাছে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করবে কি? দিনের আলোয় তাদের দেখা মিলবে কি না সন্দেহ!

—দেখা ঠিকই মিলবে, তবে কঙ্কালরূপে নয়। প্রদীপ হেসে বললে : তোমার আমার মত মানুষ বেশেই সকালে পুলিশ তাদের দেখতে পাবে। আসল ব্যাপারটা তুমি এখনো কিছু বুঝতে পারোনি মুখুজ্যে, তাই এমন হাস্যকর কথা বলছো!

—ব্যাপারটা যে কি তুমিই না হয় খুলে বলো। বললাম আমি : সত্যি বলছি ভাই, রহস্যের এ গোলকধাঁধায় আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। এই বন্দী অবস্থায়ই আমাদের জীবনের শেষ অঙ্কের যবনিকা পড়বে। কিন্তু মরার আগে আমি অন্ততঃ জানতে চাই, আমাদের শত্রুটা কে?

—সময় হলে সবই খুলে বলবো। প্রদীপ আমার কথার এই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আবার ঘরময় অস্থির ভাবে পায়চারী সুরু করলে। তার পর নিজের মনেই বলতে লাগলো : এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার, এমন কি ওপরে যাবারও নিশ্চয়ই কোন পথ আছে। না হলে এ-ঘরে শয্যা বা জল এলো কোথা থেকে? বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ু-প্রবাহ বইয়ে ঘরের বাতাস শুদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে হয়তো, কিন্তু ও-ঘরের বন্দীদের না খাইয়ে এত দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি কিছুতেই।

হঠাৎ প্রদীপ উঠে গিয়ে ঘরের সেই ইস্পাতের আবরণটার ওপর আঘাত করলো ঠক্-ঠক্ করে! ও-ঘর থেকে প্রত্যুত্তরও এলো সঙ্গে। মোর্সের সাঙ্কেতিক আমারও জানা ছিলো। শব্দগুলো তাই মন দিয়ে শুনতে লাগলাম।

প্রদীপ সাঙ্কেতিক শব্দে প্রশ্ন করলো : ও-ঘরে খাবার দেয় পথ দিয়ে?

উত্তর এলো সেই শব্দের সাহায্যে : ওপর দিকে খা জায়গা সামান্য ফাঁক হয়ে গহ্বরের সৃষ্টি হয়, আর দড়ির ঝুলিয়ে দেয় জলের জাগ, খাবার ইত্যাদি। কোন লোককে থেকে কখনো কোন পথে নামতে দেখিনি। খাবার দেও গেলে আবার গহ্বরটা বন্ধ হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে প্রদীপ হতাশ হয়ে বসে পড়লো সেইখা তার পরই আবার উঠে নির্নিমেষ নেত্রে সারা দেওয়ালটা পরীক্ষা লাগলো। আমি শুধু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে নিশ্চে বসে রইলাম; কারণ, আমার মনে তখন দৃঢ় ধারণা জন্মে এখান থেকে আমাদের আর মুক্তির কোন আশাই নেই।

সারা দেওয়ালটা পরীক্ষা করতে করতে প্রদীপ হঠাৎ এক এসে থমকে দাঁড়ালো। ঠিক তার সামনে দেওয়ালে একখানা কালীঘাটের কালীমূর্তির ছবি। এরকম কালীভক্তি কার হয়েছিলো যে, মূর্তিখানা সযত্নে টাঙিয়ে এমন করে? প্রদীপ ছবিখানাকে নামিয়ে আনলো দেওয়াল নইলে ছবির পেছনের দেওয়ালের অংশটুকু অপরীক্ষিতই

—ইউরেকা! আনন্দে চীৎকার করে উঠলো প্রদীপ : এদিকে এসো। একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করেছি।

তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম প্রদীপের কাছে। দেওয়াল ছোট সুইচ দেখিয়ে বললে সে : ছবিটা আসলে এ আড়াল করে রাখবার জন্যেই টাঙানো হয়েছিলো ওখানে। দেবতার ছবির আড়ালে এমন শয়তানী কারখানা কে করবে বলো!

—কিন্তু সুইচটা কিসের? প্রশ্ন করলাম আমি।

—সেটা এখনি বোঝা যাবে। বলেই প্রদীপ সুই নীচের দিকে টেনে নামিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর্‌ঘর্‌ সেই ইস্পাতের আবরণটার ওপরটা ওপর দিকে দেওয়ালের করে একটা দ্বারপথের সৃষ্টি হলো।

—বুঝলে তো মুখুজ্যে, এই সুইচটা ওটা নামার মধ্যে খোলা আর বন্ধ করার উপায় রয়েছে। তাই ছবির আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো।

প্রদীপ এক দৌড়ে সেই দ্বারপথ দিয়ে পাশের করলো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। এক অদ্ভুত দৃশ্য—অনেকগুলো লোক একসঙ্গে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা শুয়ে হয়ত এতক্ষণ আপনাদের চিন্তা করছিলো। আমাদের সেই মুক্ত দ্বারপথে দেখেই সকলে একসঙ্গে আমাদের দিকে দাঁড়ালো। কয়েক জনকে আমি ভালো করেই চিনলাম। সোণা দারোগা, আর তাঁর দলবল—যাঁরা অপহৃত হওয়ার পরই পাঠানো হয় সদলবলে থানার ভার নেবার জন্যে। অপর যে জীবনময় আর তাঁর সঙ্গীরা, তাতে কোন সন্দেহই নেই

...দীপকে আর আমাকে এ-ঘরে আসতে দেখেই সকলে একসঙ্গে ... প্রশ্ন-বাণ নিক্ষেপ করতে সুরু করলেন—কি করে আপনারা বন্দী ... কেমন করে এ-ঘরে এলেন—এমনি সব নানান কথা।

...দীপ এত সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু বললে : পরে সবই জানতে ...ন। আপাততঃ আমাদের এখান থেকে মুক্তির উপায়টাই ...য় বড় প্রশ্ন। সে-সম্বন্ধে আপনারা এত দিন কোন চেষ্টা ...ছেন কি ?

—করিনি আবার! জীবনময় বাবু উত্তর দিলেন : অনেক ... করেছি ; কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে যে এখান থেকে বাইরে ... যাবে, তাই বুঝে উঠতে পারিনি এত দিন। আমাদের ... ঘরের মেঝে ফাঁক করে কোন যান্ত্রিক কৌশলে এখানে ... দেওয়া হয়েছিলো। বোধ হয় এখান থেকে বাইরে যাবার ... পথই নেই।

...দীপ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলো : জহর সান্যালের কথা যে ...কি শব্দের সাহায্যে জানিয়েছিলেন, তিনি কোথায় ?

...তিনি অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। জীবনময় বাবু উত্তর দিলেন : ... বনী আর সুখী মানুষ, তাতে এই বন্দি-জীবন। ওই যে, ... তিনি আছেন।

জীবনময়ের নির্দেশে আমরা ঘরের অপর দিকে চাইতেই পাশে ...একখানা ছোট ঘর দেখতে পেলাম। প্রদীপ তখনি সেখানে ...কে পায়ে পায়ে নিয়ে চললো। দু'খানা ঘরের মাঝে কাঠের ... দরজা। দরজাটা খোলাই ছিলো। সেখানে পৌঁছে ... দেখতে পেলাম, ভদ্রলোকের খুব ফরসা—হয়তো এক সময় বেশ ... ছিলো বলে মনে হয়। কিন্তু ফরসা রংয়ের মধ্যে কেমন ... ভাব, চোখের কোণে কালিমা, দেহ প্রায় শীর্ণ। ... আর সকলে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

—ইনিই জহর সান্যাল। বললেন জীবনময় বাবু।

—ইনি ... বস্ত্র-ব্যবসায়ী ? প্রশ্ন করলো প্রদীপ : ... বন্দী, আর ওঁর নাম নিয়ে কোন ছদ্মবেশী এই বাড়ী... করে আছে !

... সান্যাল আমাদের দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ... : আপনারা বুঝি আবার আমার মত এদের হাতে বন্দী ... সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে দেখছি। হতভাগাদের ... খেলার কি আর শেষ হবে না ?

...শেষ হয়ে এসেছে জহর বাবু। বললো প্রদীপ : সৌভাগ্য- ...আমার হাতঘড়িটা এত হাঙ্গামের মধ্যেও বিগড়ে যায়নি। ... এখন চারটে পঁয়ত্রিশ, ভোর হবার আর দেরী নেই। বাইরে ... আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুক্ত হবো নিশ্চয়ই। ...আগেই হয়তো আমি মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করতে পারতাম ; ... দশটা কি সোয়া দশটায় আমরা বন্দী অবস্থায় ভগছে... ...র পর আমার এই বন্ধুটি বেশ কিছুক্ষণ—প্রায় সাড়ে ...ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকায় এদিকে বিশেষ মাথা ...পারিনি।

...কিন্তু বাইরে যাবেন কোথা দিয়ে ? আমি তো এখান থেকে ...বার পাবার কোন আশাই দেখছি না। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন জহ... ...ল।

—এটা তো আপনারই বাড়ী। বললে প্রদীপ : আপনি কি এ সব গুপ্ত কক্ষের অস্তিত্ব জানতেন না বলতে চান ? না, এখান থেকে বেরোবার কি উপায় আছে তাও জানেন না ?

—কি করে জানবো প্রদীপ বাবু ? জহর সান্যাল উত্তর দিলেন : এই সব ঘরগুলো বা এই সব যান্ত্রিক কাণ্ড-কারখানা আমাকে বন্দী করে অন্যত্র রাখার পর সৃষ্টি হয়েছে। তার পর আমাকে এখানে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আজ প্রায় এক বছর আমি বন্দী, তার মধ্যে মাত্র তিন মাস আমাকে এখানে আনা হয়েছে। এর আগে এক তেপান্তর মাঠের মধ্যে একখানা জঙ্গল-ঘেরা বাড়ীতে আমাকে ওরা আটকে রেখেছিলো।

—হাজারমারীর মাঠে বোধ হয় ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—তা হবে। জহর সান্যাল বললেন : শুনবেন আমার বন্দী হওয়ার ইতিহাস।

—পরে শুনবো জহর বাবু। প্রদীপ সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে : শুধু আপনার নয়, দারোগা বাবুদের কাহিনীও শুনতে হবে। আমারও কিছু বলবার আছে। কিন্তু এখন আমাদের এখান থেকে বাইরে যাওয়া দরকার সবার আগে। বলতে পারেন জীবনময় বাবু, এখানে দেওয়ালে ছবি কিংবা ওই জাতীয় কিছু টাঙানো আছে কি না ?

—একখানা শ্রীকৃষ্ণের ছবি আছে। কেন বলুন তো ?

—এ রকম নির্জন কুঠ-ঘরে হঠাৎ ছবি টাঙাবার সার্থকতা কি বলতে পারেন ? প্রদীপ প্রশ্ন করে।

—খেয়াল! শয়তানরা এখনো হয়তো নাস্তিক হয়ে উঠতে পারেনি। উত্তর দেন জীবনময়।

—ছবিটা কোনখানে টাঙানো আছে ? প্রদীপ আবার প্রশ্ন করলে।

জীবনময় দেওয়ালের একটা অংশে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন : ওই যে, ওইখানে।

প্রদীপ ছবিটা টেনে নামিয়ে ফেললে। কি আশ্চর্য, এখানেও সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি! ছবির অন্তরালে দেওয়ালে একটা ছোট সুইচ। প্রদীপ সুইচটা টিপলে। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের খানিকটা অংশ ফাঁক হয়ে একটা পথ সৃষ্টি হলো। তখন বন্দী ক'জনের মধ্যে যে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস দেখা গেলো, একটা রাজ্য জয় করে কোন সম্রাটেরও বোধ হয় অতখানি আনন্দোচ্ছাস দেখা যায়নি।

গহ্বর-পথটার মুখে একটা সিঁড়ি। আমরা সকলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। উঠতে উঠতে সিঁড়ির ধারে আরো দু'-একখানা ঘর চোখে পড়লো। সেখানে বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। আর একটা জিনিষ যা চোখে পড়লো, তাতে ভৌতিক রহস্যের অনেকখানি সমাধান হলো। প্রদীপ এক রকম জাপানী মুখোস সেখান থেকে তুলে আমার হাতে দিয়ে বললে : কি বীভৎস মুখোস দেখেছো মুখুজ্যে—ঠিক মড়ার খুলির মত! দু'টো অংশ জোড়বার কি সুন্দর ব্যবস্থা—পরলে পরে মুখ, মাথা সব গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়। চোখের কাছে এই দু'টো গর্ত দেখার কাজ চালায়, আর নাকের গর্তটা নিশ্বাস নেবার জন্যে।

—তাহলে এইগুলোই মুখে এঁটে ওরা ভূতের ভয় দেখিয়ে এসেছে! সবিস্ময়ে বললাম আমি।

—শুধু তাই নয়, এইগুলোও দেখো। প্রদীপ একটা অদ্ভুত রকমের পোষাক তুলে নিয়ে বললে: এটা কি অদ্ভুত কায়দায় তৈরী দেখছো! গায়ে দিলে রাত্রে কেন, দিনেও ঠিক অস্থিময় দেহ বলে মনে হবে। এ রকম জামা আর সালোয়ারে গা ঢেকে মুখে ওই মুখোস আঁটলে কার সাধ্য বলতে পারে লোকটা মানুষ! তার ওপর পোষাকগুলোর তলায় নমনীয় ইস্পাতের একটা পাতলা আবরণও আছে, যে জন্যে হাজারমারীর মাঠে আমাদের নিক্ষিপ্ত গুলী ওদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

—ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! জীবনময় বললেন: ঢের ঢের চোর-ডাকাতের দল দেখেছি জীবনে, কিন্তু এমন ভয়ানক শয়তানী কাণ্ড-কারখানা আর কখনো শুনিনি।

—কিন্তু পৃথিবীর অপরাধের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়। প্রদীপ বললে: কঙ্কালের হাতের সাহায্যে হত্যা চীন দেশে প্রাচীন যুগে হামেশাই ঘটতো। জাপানীদের মুখোস-শিল্প কতটা অগ্রসর তা জানেন তো? ঠিক জীবন্ত মানুষের মুখের মত সুন্দর কিংবা বিকৃত মুখোস তৈরী করতে ও দেশের এক দল শিল্পী ওস্তাদ! এটা ওই দেশেরই শিল্পের একটা উন্নত ধরণের নিদর্শন।

—ওদের শিল্প ওদেরই থাক, বললাম আমি: এ-ধরণের সর্বনাশা উন্নতি আমাদের সহ্য হবে না। মানুষ মারবার, মানুষকে ভীত-ত্রস্ত করবার আর্ট এদেশে যেন কখনো উন্নতি-লাভ না করে। এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

আরো খানিকটা অগ্রসর হবার পর সিঁড়িটা ঘুরে গেছে খানিকটা। বাঁকটা পেরিয়ে কয়েক ধাপ উঠতেই মাথার ওপর একটা লোহার পাত ঠেকলো। সেটাকে প্রদীপ আর আমি জোর করে ঠেলতেই পাতটা খটাং করে খুলে গেলো। আমরা তাড়াতাড়ি সকলে বেরিয়ে পড়লাম।

যেখানে আমরা বেরোলাম, সেটা সেই গতরাত্রে দেখা মালীর ঘর। মালী দু'টো ঘরের এক কোণে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো। প্রদীপ তাদেরই দেওয়ালে টাঙানো দু'খানা কাপড় নিয়ে সমস্ত অবস্থাতেই তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে সুরু করে দিলে। আমরাও তাকে সাহায্য করলাম। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে ব্যাপার কি বুঝতে না বুঝতেই তারা বন্দী হলো। পাছে তারা চীৎকার ক'রে তাদের বিপদের কথা বাড়ীর সকলকে জানিয়ে দেয়, সেই জন্যে আমরা তাদের দু'জনের মুখ বাঁধতেও ভুললাম না।

তখন সবে ভোরের আলো রাতের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারকে তরল করে এনেছে। গাছে গাছে পাখীর কাকলি। প্রভাতী-সমীরের সুখ-স্পর্শে মনে হলো যেন আমরা নবজন্ম লাভ করলাম।

প্রদীপ বললে: এখনো আমাদের অনেক কাজ বাকী। যে কেউ দু'জন জহর বাবুকে এখানে রেখে পাহারা দিন, যাতে কেউ কোন দিক থেকে ওঁর কোন অনিষ্ট করতে না পারে। উনি অসুস্থ মানুষ, আমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা সকলে এখন ওই বাগান-বাড়ীটার মধ্যে গিয়ে ওদের মুখোমুখি হয়ে একটা বোঝা-পড়া করতে চাই।

—কিন্তু আমাদের এই নিরস্ত্র অবস্থায়······দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন জীবনময় বাবু।

—নিরস্ত্র নয়, সৌভাগ্যক্রমে আমার আর মুখুজ্যের অস্ত্র ওরা কেড়ে নেবার কথা ওদের মনে হয়নি। প্রদীপ বললে: দুটো ছ'ঘরা রিভলভারের শক্তি কম নয়। তা ছাড়া অধীপ যদি নিরাপদে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পুলিশ হয় বাইরে অপেক্ষা করছে ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী তল্লাসী করে আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে, কিংবা বাড়ীর ভেতর এতক্ষণে তল্লাসী সুরু হয়ে গেছে।

প্রদীপের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো। বাগান-বাড়ীটার সদর দরজার সামনে পৌঁছেই আমরা শুনতে পেলাম বাড়ীর ভেতর চন্দ্রিকা সিং-এর গম্ভীর স্বর। প্রদীপ আমাদের নীরব থাকতে ইঙ্গিত করে সেইখানেই অপেক্ষা করতে বললে। চন্দ্রিকা সিং তখন বলছেন: দু'-দু'টো মানুষ কি তাহলে হাওয়ায় মিশিয়ে গেলো বলতে চান?

উত্তর এলো যে কণ্ঠে, সে কণ্ঠস্বর গতরাত্রে বন্দী হবার সময় আমরা শুনেছি।

—হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কি না কি করে বলবো বলুন? আমি তো বলেছি, আমার বাগান-বাড়ীতে গতরাত্রে কেউ প্রবেশ করেছিল কি না আমি কিছুই জানি না।

—তাহলে অধীপ মিথ্যে খবর দিয়েছে বলতে চান? ধমকে উঠলেন চন্দ্রিকা সিং: কুকুরটা তাহলে মরলো কি করে জানতে পারি কি?

—আপনার মুখেই এই প্রথম শুনছি কুকুরটা মারা গেছে। আমার ধারণা ছিলো সেটা বাগানে এখনো বেড়াচ্ছে।

—চালাকী করে ফল হবে না কিছু! চন্দ্রিকা সিং গর্জন করে উঠলেন: কোথায় তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, সেইটাই আমি জানতে চাই।

—দেখুন ইন্সপেক্টর, আমাকে মিছে ধমকে কোন ফল হবে না। আমি আবার বলছি, গতরাত্রে আমার বাগান-বাড়ীতে আমার জ্ঞাতসারে কেউ প্রবেশ করেনি। যদি করতো, আমি তাদের অনধিকার প্রবেশ করার জন্যে পুলিশের হাতেই তুলে দিতাম নিশ্চয়। কিন্তু আপনি আপনার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। বাড়ীখানা তন্ন-তন্ন করে তল্লাস করেও আপনি কি কিছু বেআইনী জিনিষ পেয়েছেন? তবে আমায় ধমকাচ্ছেন কোন্ অধিকারে? আমি এক জন নিরীহ নাগরিক, আমায় এ ভাবে উদ্বাস্ত করার জন্যে আপনাকে আপনার ওপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমি আজই আপনার নামে কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করবো।

—কিন্তু তার আগে তোমায় হাতকড়া পরতে হবে, কেননা জহর সান্যাল ওরফে হাজারমারীর ভূতের রাজা মশাই! বলতে বলতে প্রদীপ উদ্যত রিভলভার হাতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো। আমরাও তার পিছন পিছন প্রবেশ করলাম। কি আশ্চর্য, যে লোকটা চন্দ্রিকা সিং-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করছিলো, তার চেহারা অবিকল একটু আগে উদ্ধারপ্রাপ্ত জহর সান্যালের মতো। পাশ্চাত্য দেশে, চীনে আর জাপানে ছদ্মবেশের অনেক বৈজ্ঞানিক প্রকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে শুনেছি। এ যদি তা-ই হয়, তবে ভারতবর্ষও পিছনে পড়ে নেই।

লোকটা আমাদের সামনে দেখে যেন চমকে উঠলো। সে হয়তো ভাবতেও পারেনি যে, এমন করে মুক্তি পেয়ে কোন দিন আমরা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবার সুযোগ পাবো। তার পাশে দাঁড়ানো তার অনুচর দু'টিরও ঠিক সেই অবস্থা। তাদের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার সুযোগ নিয়ে চন্দ্রিকা সিং আর তাঁর অনুচরেরা তিন জনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে।

প্রদীপকে মুক্ত দেখে অধীপ আর আনন্দের বেগ সম্বরণ করতে পারলো না। সে ছুটে এসে প্রদীপকে জড়িয়ে ধরলো।

চন্দ্রিকা সিং তখনি একটা পুলিশ-ভ্যানে করে বন্দী তিন জনকে আর মালী দু'টোকেও পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চালান করলেন। বাগানটা আর একবার ভাল করে অনুসন্ধান করতে বাগানের পিছন দিকে খানিকটা সমতল ভূমি পাওয়া গেল—তারই কিনারায় একটা টিনের চালাওয়ালা প্রকাণ্ড গুদাম-ঘর। সেটা খুলতেই তার ভিতরে একখানা প্রকাণ্ড বিমান দেখা গেলো। বিমানখানার আকৃতি অতি অদ্ভুত। ঠিক যেন একটা বিরাটাকার তীক্ষ্ণচঞ্চু বাদুড়!

—ওই আপনার সেই উড়ন্ত ভূত মিঃ সিং! প্রদীপ বললে: আমাদের মাঠে ওটা এই দুর্বৃত্ত দলকে নিয়ে যাওয়া-আসা করতো। পাছে কেউ ওটাকে এরোপ্লেন বলে চিনতে পারে, তাই ওর গড়ন এমন অদ্ভুত রকমের করা হয়েছে। আর ওই সেই লাল লাল কাচের ভাঁটার মত চোখ—যা দেখলে রাত্রে চোখে আগুন জ্বলছে মনে হওয়া বিচিত্র নয়!

—সত্যি ভায়া, কি বেকুবটাই না আমাদের করেছে এত দিন। চন্দ্রিকা সিং খুসীর আতিশয্যে প্রদীপের হাতে একটা ঝাঁকানী দিয়ে বললেন: তাই তো আমরা বলি, প্রদীপের বয়েস কম হলে কি হবে, বুদ্ধি ওর অনেক ঝানু অফিসারের চেয়ে বেশী! এখন চলো, এ পাপ পুরী থেকে বেরিয়ে পড়া যাক্। তার পর জীবন বাবু আর জহর বাবুর কাহিনী সময় মত শোনা যাবে। তা ছাড়া, এত সব যোগাড়-যন্ত্র, খুন, মানুষ গুম্ করার মধ্যে ওদের মতলবটা কি আছে, তাই এখনো বুঝতে পারিনি! আশা করি, তোমার মুখ থেকে সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবো।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। প্রদীপ চন্দ্রিকা সিং-এর উক্তি সমর্থন করে বললে: এখন চলুন, এখান থেকে বেরিয়ে কিছু পেটে দেওয়া যাক্। পেটের প্রাণ 'ত্রাহিমাং মধুসূদন' ডাক ছাড়ছে।

কয়েক জন পুলিশের ওপর বাড়ীটার ভার দিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম নিজের নিজের আস্তানার উদ্দেশ্যে। অসুস্থ শরীরে জহর বাবুকেও এ-বাড়ীতে থাকতে আর রাজী হলেন না। তিনিও আপাততঃ প্রদীপের আতিথ্য স্বীকার করে তার সঙ্গী হলেন।

[ক্রমশঃ।

মাও সে-তুং-এর ছেলেবেলা

সুখেন্দু দত্ত

মাও সে-তুং হচ্ছেন আজ চীনের জনগণের প্রিয়তম নেতা। চীনের মানুস তাঁকে আজ আদর করে ডাকেন "আমাদের চেয়ারম্যান" বলে। চীনের এই প্রিয়তম নেতার ছেলেবেলার গল্প তোমাদের আজ শোনাচ্ছি। দেখবে, গরীব চাষীর ছেলে হয়েও কি অসীম আগ্রহ আর অধ্যবসায়ের বলে মাও মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, মানব-মুক্তির সংগ্রামের জন্য নিজেকে উপযুক্ত সেনাপতি হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

আজ থেকে সাতান্ন বছর আগে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হুনান প্রদেশের সানসিন গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক-পরিবারে চীনের এই প্রিয়তম নেতার জন্ম হয়। সেদিন কেউ কল্পনাও করিতে পারেননি যে, এই শিশুই এক দিন তামাম দুনিয়ায় খ্যাত হয়ে উঠবে!

মাও-এর বাবার নাম ছিল মাও জেন-সেন আর মায়ের নাম ওয়েন চিমেই।

গরীব চাষীর ঘরের ছেলে ছিলেন মাও। ছ'বছর বয়স হতেই বাবা তাঁকে ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দিলেন! ছোট্ট মাওকে সেই অল্প বয়সেই সারা দিন ক্ষেতের কাজে বিষম খাটতে হত।

আট বছর বয়সে মাওকে এক প্রাইমারী স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। এখানে তিনি বছর পাঁচেক পড়া-শুনা করেন। স্কুলে পড়তেন বলে অবশ্য ক্ষেতের কাজ থেকে তাঁর রেহাই ছিল না। সকালে এবং রাত্রে তাঁকে খামারে কাজ করতে হত।

মাও-এর প্রথম স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতাটা কিন্তু মোটেই মধুর ছিল না। স্কুলে মাষ্টার মশাইয়ের মেজাজটা ছিল বড় কড়া, ছাত্রদের বিষম মার-ধোর করতেন তিনি। এদিকে বাড়ীতে বাবার মেজাজও ছিল রুক্ষ। মাওকে তিনি সব সময় কাজ দিয়ে রাখতে চাইতেন। লেখাপড়া ছাড়া অবস্থায় থাকতে দেখলেই তাকে তিনি ক্ষেতের কাজে টেনে নিয়ে আসতেন।

ঘরে-বাইরে এই জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে দশ বছর বয়সে মাও একবার স্কুল ছেড়ে গেলেন পালিয়ে। তাঁর মতলবটা ছিল লুকিয়ে সহরে চলে যাওয়া। দিন তিনেক বাদেই অবশ্য বাড়ীর লোকেরা তাকে ধরে ফেলল। বাড়ী ফিরে মাও দেখলেন যে, বাড়ী থেকে পালাবার ফলটা ভালই হয়েছে। বাবা আর মাষ্টার মশাইয়ের কাছে তাঁর আদরটা এবার বেশ একটু বেড়ে গেছে!

সেই অল্প বয়সেই মাও প্রাচীন সাহিত্য ও কনফুসিয়াসের দর্শন পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। তের বছর বয়সেই তিনি অনেকগুলো প্রাচীন উপদেশমালা মুখস্থ করে ফেললেন। ছেলের এই পাণ্ডিত্য বাপের পক্ষে কিন্তু বিশেষ সুবিধার হল না। বাবার সংগে কোন বিষয়ে তর্ক উঠলেই মাও এই সব উপদেশমালা থেকে বচন আউড়ে তাঁর সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে দিতেন। তাঁর বাবা হয়ত এক সময় রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, "কুঁড়ে কোথাকার, স্বভাবটা একেবারে গোল্লায় গেছে।" মাও অমনি এক শ্লোক আউড়ে বাপকে শুনিয়ে দিতেন যে, গুরুজনদের উচিত হল ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া, এ ভাবে কথায় কথায় রাগ করা নয়! তার পর কুঁড়েমির অভিযোগের জবাবে বলতেন যে, ছোটদের চেয়ে বড়দেরই বেশী খাটা উচিত। তাঁর বয়স আজ মাও-এর তিন গুণ, কাজেই সেই হিসাবে ছেলের চেয়ে তাঁর তিন গুণ বেশী খাটা উচিত! বাপকে ভরসা দিয়ে তার পর মাও অবশ্য বলতেন যে, তিনিও যখন বাবার মত বড় হবেন তখন অনেক বেশী কাজ করবেন। ছেলের এই সোজা হিসাব আর আশ্বাসে বাপ কতটা সান্ত্বনা পেতেন বলা শক্ত, তবে তাঁর মুখের অবস্থাটা যে দেখবার মত হত, আর মনে মনে তিনি যে লেখাপড়ার মুণ্ডপাত করতেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

মাও প্রাচীন চীনা সাহিত্য অনেক পড়েছিলেন বটে, কিন্তু

এগুলো তার মোটেই ভাল লাগত না। তিনি এবার প্রাচীন চীনের রোমান্স আর বিদ্রোহের গল্প পড়তে শুরু করলেন। পড়ার বইয়ে আর মন বসত না তার, এই সব বই পড়েই বেশী সময় কাটিয়ে দিতে লাগলেন তিনি। এমন কি স্কুলেও। মাষ্টার মশাইরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন, ক্লাশে এই সব বই পড়া নিষিদ্ধ করে দিলেন তাঁরা। কিন্তু তাতে মাওকে ঠেকান গেল না। গল্পের বইয়ে পড়ার বইয়ের মলাট লাগিয়ে সে-সব বই তিনি দিব্যি মাষ্টার মশাইদের নাকের ডগার ওপর রেখেই পড়তে লাগলেন।

তের বছর বয়সেই মাও-এর স্কুলের সংগে সম্পর্ক শেষ হল। বাড়ীতে এসে আবার ক্ষেত-খামারের কাজ শুরু করতে হল তাঁকে। সারা দিন খাটুনির পর রাত্রে বাড়ী ফিরে তাঁকে আবার বাবার হিসাব-পত্র লিখতে হত। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মধ্যেও কিন্তু পড়াশুনার নেশা মাওকে পেয়ে বসল। কাজ-কর্মের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই নতুন নতুন বই জোগাড় করে পড়তেন তিনি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলত তাঁর পড়া-শুনা। কিন্তু ঘরের আলো বাবার নজরে পড়ার ভয়ে জানালাগুলো সব বন্ধ করে দিতে হোত তাঁকে।

রোমান্সের গল্প পড়ার নেশা অবশ্য মাও-এর ছুটে গেল অল্প দিনের মধ্যেই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজ্য হারানো, রাজ্য-জয়, সেনাপতি, রাজকন্যা ইত্যাদির গল্প পড়তে পড়তে তাঁর মনে হতে লাগল—প্রাচীন চীনে কি এরা ছাড়া আর কেউ ছিল না, ছিল না মজুর, কৃষক আর সাধারণ মানুষ? তাঁর মনে খট্‌কা লাগল। আস্তে আস্তে অনেকগুলো বই পড়ে ফেললেন মাও। এই সব বইয়ের নতুন ভাবধারা তাঁর ধর্ম্মবোধে প্রচণ্ড আঘাত হানল। ভগবানে অবিশ্বাসী হয়ে পড়লেন মাও।

পড়া-শুনার ফলে কিন্তু ক্ষেত-খামারের কাজে অবহেলা দেখা দিল। এই নিয়ে বাবার সংগে ঝগড়া হওয়ায় মাও বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

এই সময় হুনানের একটা ঘটনা মাও-এর জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিল। সে-বছর হুনানের রাজধানী চাংশায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষগুলো চাংশায় গভর্ণরের কাছে অবিলম্বে দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের ব্যবস্থা দাবী করল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবারণের বদলে সম্রাটের আদেশে "বিদ্রোহী" জনগণকে শাস্তি দেবার জন্য পৈশাচিক অত্যাচার চালান হল। আন্দোলনের নেতাদের অনেকেরই মাথা কেটে বাঁশের মাথায় চাপিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে দেখান হল। এই নৃশংস ঘটনা মাও-এর মনে এক ঝড় বইয়ে দিল, বক্ষে আগুন জ্বলে উঠল তার।

এই সময়ই মাও ঠিক তাঁর মনের মত এক গুরু খুঁজে পেলেন। কোন ধর্ম্ম বা দেবতাই তিনি মানতেন না। তাঁর ছাত্রদের তিনি বলতেন, "দেখ, যত জায়গায় যত দেব-দেবীর মন্দির আছে সব ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেও, আর তার জায়গায় একটা করে পাঠশালা খোল।" বলা বাহুল্য, এই গুরু মশাইটি মাও-এর মনটা একেবারে কেড়ে নিলেন!

ছাত্র-জীবনের সাথে সাথে এর পর মাও-এর রাজনৈতিক জীবনও শুরু হল। এই সময় চীনের বুকে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবল হয়ে দেখা দিল, সমগ্র চীন তখন প্রবল বিপ্লবের মুখে। মাও এই রাজনৈতিক আন্দোলনে সাড়া দিলেন। চীনের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক দিন একটা প্রবন্ধ লিখে সেটা তিনি টাঙিয়ে দিলেন স্কুলের দেওয়ালে। এটাই ছিল মাও-এর লেখা প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ

ছাত্রদের মধ্যে তখন মাঞ্চু সরকারের প্রতি এক প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে। এই বিতৃষ্ণা প্রদর্শনের জন্য তারা প্রায় সকলেই নিজের নিজের চুলের বেণী কেটে ফেলল। মাও তো ফেললেন সবার আগে। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু সহজে তাদের সাধের বেণী বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। এই নিয়ে একদিন এক ছাত্র-বন্ধুর সংগে বিষম তর্ক লেগে গেল মাও-এর। ছেলেটি অকাট্য যুক্তি হাজির করল যে, নখ, চুল, শরীর এবং চামড়া ইত্যাদি সবই আমরা মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছি, কাজেই এই সব জিনিষ নষ্ট করা উচিত নয় কোন মতেই! মাও তাকে অনেক বোঝালেন যে, মাঞ্চুরাজের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ঘৃণার ভাবকে প্রবল করে তোলাই হল বেণী কাটার আসল উদ্দেশ্য। তবু ছাত্রটি বুঝতে চায় না! শেষ পর্যন্ত মাও আর তাঁর এক বন্ধু মিলে জোর করেই তার বেণী দিলেন কেটে।

এই ভাবে স্কুলে পড়ার সংগে সংগে মাও-এর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপও চলতে থাকে। কিন্তু স্কুলের দুর্ব্বোধ্য পাঠ্য পুস্তকে তাঁর মন আর বসছিল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, স্কুলের পড়ার চেয়ে একা একা বই পড়াই তার উন্নতির পথে বেশী সহায়তা করবে। ফলে আবার তিনি স্কুল ছেড়ে হুনানের প্রাদেশিক গ্রন্থাগারে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন। এখানে তিনি অনন্যচিত্তে পুরো ছ'মাস পড়া-শুনা করেন। সকাল বেলা দরজা খোলার সংগে সংগে তিনি লাইব্রেরীতে ঢুকতেন। তার পর দুপুরে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পড়তে বসতেন আর লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত বসে বসে একমনে বই পড়তেন। এই অধ্যয়ন তাঁর মনে গভীর আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।

মাও-এর ছেলেবেলার কাহিনী এখানেই শেষ হল। এর পর মাও নর্ম্যান কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯১৮ সালে সেখান থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বের হন। তার বয়স তখন পঁচিশ বছর।

এর পরই মাও চীনের রাজনীতিতে গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

মাও-এর জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে, চীনের অর্দ্ধশত কোটি মানুষের জীবনে আজ দেখা দিয়েছে নতুন প্রভাত।

নেতাজী

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী

হে মহান্,
অমৃতের আকর সন্ধান—
তোমার সাধনা।
তোমার জীবন-বীণা
চিরদিন করেছে বন্দনা
নব সূর্য্যালোক।
মৃত্যু, জরা, হতাশা ও শোক;
পরাজয় করেছে স্বীকার—
চরণে তোমার।
হে চিরস্মরণীয়—যুগ-শ্রেষ্ঠ হে নেতাজী,
লহ শ্রদ্ধা, প্রণতি আমার!

রত্নমালা

প্রাণতোষ ঘটক

[পাঠক-পাঠিকা, স্থির করিয়াছিলাম আত্ম-প্রকাশ করিব না। অবশেষে বাধ্য হইয়া স্বনাম ব্যক্ত করিলাম। কলিকাতা শহরের যত্র-তত্র দেখিতেছি চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন ও দশাননের কৌতুক-যৌতুক। একটি শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ একমুখে ব্যক্ত করা যায় না, সেই হেতু উক্ত নাম লই। তাহাতে অনেকানেক কথার সূত্রপাত হয়। তজ্জন্য স্বনামের ব্যবহার শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। রত্নমালার বুনন-কার্য্য শেষ হইলে সাহায্যপ্রাপ্ত অভিধানাদির নাম সসম্মানে প্রকটিত হইবে।—সংগ্রাহক।]

ঝকঝক—চকমক, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি।
ঝকমারী—বৃথাবাদী, অনুতাপ, কুকর্ম্ম।
ঝঙ্কার—ভ্রমরাদির ভনভনানি, গুঞ্জন।
ঝঞ্ঝণা—বাজ, অশনি, বজ্র।
ঝঞ্ঝা—ঝড়, ঝটিকা, প্রচণ্ড বায়ু।
ঝঞ্ঝাট—ক্লেশ, দুঃখ, উৎপাত, ঘবরাণী।
ঝণ্ডা—পতাকা, ধ্বজা, বৈজয়ন্তী।
ঝম্প—লাফ, উৎক্রম, ঝাঁপ।
ঝর—পর্ব্বতের জলপ্রবাহ, নির্ঝর, ঝোর।
ঝরণ—ক্ষরণ, গলন, খষণ, পড়ন।
ঝরণা—চালনী, ঝাঁজ্‌র, ঝাড়নী।
ঝরণী—ছাকনী, রক্ত ক্ষরণী।
ঝর্ঝরী—জালী, ব্যবধান, মন্দিরা।
ঝলক—তরঙ্গপাত, অগ্নির তেজ।
ঝলসান—ভাজন, পোড়ান, দগ্ধ করণ।
ঝষ—মৎস্য, মাছ, মীন।
ঝাঁক—ঝুণ্ড, সমূহ, দল, পাল, গোধ।
ঝাঁটন—সম্মার্জন, ঝাড়ন, ঝাড।
ঝাঁটা—সম্মার্জনী, ঝাড়ু, খেঙ্গরা।
ঝাঁপ—তৃণাদি নির্ম্মিত আবরণ, লম্ফ।
ঝাঁপন—আবরণ, ঢাকন, লম্ফন।
ঝাঁপী—পেটরা, পেটক, ঝাইল।
ঝাড়—গুচ্ছ, গুল্ম, থোবা, বংশ, গোত্র।
ঝাপসা—ছানী, জালী, চক্ষুরোগবিশেষ।
ঝামরাণ—আওরাণ, ক্ষরণ, স্রবণ, চোয়ন।
ঝাল—তীব্র, তীক্ষ্ণ, ঝালুয়া, উগ্র, কটু।
ঝিনুক—শম্বুক, শুক্তি।
ঝিমান—নিদ্রা পড়ন, ঢুলন, তন্দ্রা করণ।
ঝিল—সরোবর, হ্রদ, জলাশয়।
ঝিল্লী—ঝিঁঝী পোকা, উচ্চাঙ্গ পোকা।
ঝি—কন্যা, বালিকা, কুমারী, পুত্রী।

ঝুঁটি—ককুৎ, পক্ষীর শিখা।
ঝুড়ী—চুপড়ী, চেঙ্গারী, টোকরা, টুকরী।
ঝুপড়ী—ঝোপড়ী, কুড়িয়া, কুটীর।
ঝুমকা—ঝুমকি, ঝুমকো, কর্ণভূষা বিশেষ।
ঝুলন—ঝোলন, দোলন, লটকন।
ঝুলী—থলী, থৈলী, ঝোলা, আধার।
ঝোড়—ঝোপ, গুল্মীবৃক্ষ, গুল্ম।
টক—অম্ল, অম্লরস, চুক্র।
টঙ্ক—খন্তা, ছুরী, অসি, কুঠার, খাপ।
টঙ্কশালা—টাকা নির্ম্মাণ গৃহ, টাকশাল, মুদ্রা-গৃহ।
টঙ্কা—তঙ্কা, টাকা, রৌপ্যমুদ্রা।
টনক—হঠাৎ স্মরণ, জ্ঞাপক বিষয়।
টলন—হেলন, লড়ন, হটন, দোলন।
টাক—কেশহীন, ইন্দ্রলুপ্ত।
টাঙ্গী—কুঠার, পরশু, কুড়াল, যুদ্ধাস্ত্র।
টান—আকর্ষণ, খেঁচা, নদীর স্রোত।
টিকা—গুল, কপালভূষা, বসন্তাবাহন।
টিকী—ঝুঁটি, মস্তকের কেশগোচ্ছা, শিখা।
টিকটিকী—গৃহগোধিকা, জ্যেষ্ঠী।
টিটকার—অবজ্ঞা, ধিক্কার, নিন্দা।
টিপন—টীপন, খামচান, চাপন।
টীকা—অর্থের বিবরণ, সঙ্কেত, খুঁৎ।
টীপ—চিঠী, হুণ্ডী, অর্থ-সম্বলিত পত্র।
টুঁটী—কণ্ঠ, গলা, গলার নলী।
টুক—টুকি, টুকরা, খণ্ড, কুটি, লেশ।
টুট——ন্যূনতা, ত্রুটি, মূল্যের হ্রাস।
টেড়া—বাঁকা, বক্র, তেচ্চা, ঢাল, আড়া।
টোপ—চার, শিরস্ত্র, বিন্দু, টোল।
টোপর—মুকুট, শিরস্ত্র, টোপী।
টোপী—শিরচ্ছাদন, ঢাকনা।
টোলা—টোলী, পাড়া, মহল্লা, পল্লী :

আনবিক শক্তির ভবিষ্যৎ প্রয়োগ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

আনবিক শক্তির ভবিষ্যৎ প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে তাতে এর কল্যাণকর দিক্‌টা যতই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে ততই আনবিক বোমার ধ্বংসকারী ভীতি এসে একে আবছা করে দিয়েছে। মানব-সভ্যতার পরিপন্থী যে আনবিক অস্ত্র, বিভিন্ন জাতির ভেতর তার নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা দেখে বার বার সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে যে, এই অমিত শক্তিকে কোন দিন মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করা হবে কি না? যে দু'টি প্রশ্ন বার বার সকলের মনকে আঘাত করছে সেটা হচ্ছে এই যে, আনবিক শক্তিকে কি আমরা প্রয়োজনীয় সাধারণ ব্যবহারযোগ্য করার আশা করতে পারি কিংবা মানুষ তার স্বকীয় সৃষ্ট শক্তির দ্বারা নিজের ধ্বংস সাধন করবে?

পারম্পরিক প্রক্রিয়াসম্পন্ন আনবিক পাইল দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন যে, পরমাণু-কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ফলে যে আনবিক শক্তির উদ্ভব হয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ এক কম বিস্ময়-জনক আবিষ্কার নয়—কিন্তু ভাবলে এখনি বৈজ্ঞানিকগণ মেসিন চালাবার মত অবস্থায় আনবিক শক্তিকে আনতে পারেননি, এ কথাও সত্যি। বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের বহু দিন পরে তাকে কাজে লাগিয়ে বাষ্পীয়-পোত চালান হয়েছিল এ তথ্য আমাদের অজানা নয়। আর এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পারম্পরিক প্রক্রিয়ার ফলে শক্তি নির্গমনের জন্য পরোক্ষভাবে আমাদের যে শক্তি ব্যয় করতে হবে তার পরিমাণও খুব অল্প নয়। আবার এতখানি আবিষ্কারের পর এই শক্তিকে কল্যাণময় কার্য্যের উপযোগী করার চিন্তা এবং উপায় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ যে উদাসীন থাকবেন সে কথাও সত্যি নয়। পরমাণু-ভাঙ্গনের ফলে যে তাপ সৃষ্টি হবে, বাষ্প তৈরী করার জন্য তাকে কাজে লাগান নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু এটা এক দিনেই সম্ভব হতে পারে না—হবে স্তরে স্তরে কয়েক বছর সময় নিয়ে। কাজেই আনবিক শক্তি দ্বারা সমুদ্রগামী বিরাট জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনার যে কল্পনা সেটা বাস্তবে পরিণত হবার অদূর ভবিষ্যতে কোন আশা নেই—এটা ঠিক।

উপস্থিত আনবিক বোমার সমস্যাটাই মস্ত বড়। সমগ্র মনুষ্য জাতির কল্যাণকামী যে কোন ব্যক্তির মনে রাজনৈতিক ও মানবতার যে প্রশ্ন এই বোমা উপস্থিত করেছে তা বাস্তবিকই গুরুতর। আনবিক বোমার ধ্বংসকারী ক্ষমতা অতি সাংঘাতিক, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই; কিন্তু এর ব্যবহার সমাজ-জীবনে যে প্রক্রিয়া শতাব্দী ধরে চলছিল তারই চরম পরিণতি—এ কথাও অনস্বীকার্য্য। বিজ্ঞানী নব নব সত্য আবিষ্কার করেন—তাঁদের সেই আবিষ্কারের ফলকে কখন মঙ্গলজনক কখনও বা অমঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে তাঁদের এই আবিষ্কারের অপব্যবহারের জন্য কি তাঁরাই দায়ী? এটা বাস্তবিকই অন্যায় হবে যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের অপব্যবহারের জন্য তার আবিষ্কর্ত্তা বিজ্ঞানীকে দোষী করা হয়। মানুষের নিজেদের ভেতর সৌহার্দ্দ ও সহানুভূতির অভাবের জন্যই ও অশুভ সাধিত হয়—বিজ্ঞানের ভেতর কিছু অশুভ নিহিত আছে তার জন্য নয়। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কোন লোক অস্ত্রাঘাতে অন্য কোন লোককে হত্যা করলে তার জন্য দায়ী তার বিকৃত মানসিক অবস্থা—অস্ত্রকে দায়ী করা বাস্তবিকই হাস্যাস্পদ এবং সে অস্ত্রের কোন কল্যাণকর দিকের বিপক্ষে এ যুক্তি অসার যে, যেহেতু এ মানুষ মারতে পারে কাজেই এর কোন কল্যাণকর দিক থাকতে পারে না। কাজেই ধ্বংসকারী ক্ষমতার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করলে চলবে না—দায়ী করতে হবে মানুষের নিজেদের ভেতর যথার্থ শুভবুদ্ধির অভাবকে।

আনবিক শক্তির কর্ম্ম-ক্ষমতা আলোচনা করতে গিয়ে আনবিক অস্ত্রকে উপেক্ষা করলে অন্যায় করা হবে। কারণ, আনবিক শক্তির সর্ব্বপ্রথম এবং এ পর্য্যন্ত একমাত্র প্রয়োগ হচ্ছে এই আনবিক [illegible]; উপরন্তু এই অস্ত্রের ভয়াবহতা এর যা-কিছু উপকারিতা কল্পনা করা যেতে পারে তাকে এমন ভাবে ছাপিয়ে গেছে যে, [illegible] থেকেও একে আলোচনার পক্ষে উপেক্ষণীয় বলা যেতে পারে না। যদি আবার কোন বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে আনবিক [illegible] এবং অন্যান্য সদ্য-আবিষ্কৃত আয়ুধ, যথা—উড্ডয়ান বোমা [illegible] ব্যবহৃত হবার আশঙ্কা আছে, তাহলে সংগঠনমূলক কাজে [illegible] শক্তির প্রয়োগ সুদূরপরাহত, আর যদি আন্তর্জ্জাতিক [illegible] এমন ভাবে পরিচালিত হয় যাতে করে বিশ্ব-শান্তিভঙ্গের [illegible] আশঙ্কা না থাকে তাহলে মানুষের কল্যাণে এই অপরিমিত [illegible] প্রয়োগ ত্বরান্বিত হবে, কোন সন্দেহ নেই।

এ সমস্যা প্রধানতঃ রাজনৈতিক এবং এ প্রবন্ধে এর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। যুদ্ধক্ষেত্রে আনবিক বোমার ব্যবহার শুধু [illegible] অসাধারণ ধ্বংসকারী ক্ষমতার জন্য তা নয়, এর আর [illegible] সুবিধা হচ্ছে যে, এর স্বল্পাসতন হেতু বহু রকম উপায়ে [illegible] ও প্রয়োগ করা যায় এবং এর বিপক্ষে আত্মরক্ষার উপায়ও [illegible]। কিন্তু যুযুধান শক্তির এ কথা ভুললে চলবে না যে, আনবিক [illegible]

যার ... ান দেশ ধ্বংস করাই সম্ভব, তাকে জয় করে আয়ত্তাধীনে বাখা ...ব নয়। কাজেই আনবিক বোমার প্রয়োগ দ্বারা যুদ্ধের ফলে ...কীয় ধ্বংসলীলারই অবতারণা হবে—আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য বিশে ...কছুই সাধিত হবে না। আনবিক বোমার এই বিশেষ দিব ...কল জাতিরই ভাল করে চিন্তা করা উচিত, কারণ যুদ্ধ- লো ...কোন জাতি যদি এই কথাটি ভাল করে বুঝতে পারে, তাহলে ভবি... যুদ্ধ থেকে আনবিক বোমার প্রয়োগ লুপ্ত হয়ে যাবে।

...ধরা যায় যে, আনবিক বোমা-সঙ্কুল যুদ্ধ-বিগ্রহ আর কোন দিন হবে না। তাহলে কি কি উপায়ে এই বোমাকে কার্য্যকরী করা যেতে পারে? এ প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর এখনও কিছু পাওয়া যায়নি যে ...পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে; কিন্তু এ সমস্যা এত নতুন যে, ...র ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাও যায় না। খনি-সংক্রান্ত ও অন্যান্য এই ধরণের এনজিনিয়ারিং কার্য্যে এই বোমার প্রয়োগের কথা অনেক ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তিনটি বিশেষ কারণের জন্য এ প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। প্রথমতঃ, বিস্ফোরণ কেন্দ্রের চতুষ্পার্শে এমন প্রচণ্ড বাত্যার সৃষ্টি হবে যার চাপে ...য়োজনের অতিরিক্ত ধ্বংস সাধিত হবে এবং এই কারণেই খনি-সংক্রান্ত ব্যাপারে—যেখানে খনিজ দ্রব্যের ভেতর সরু পথসৃষ্টির প্রয়োজন সেখানে এর প্রয়োগ অসম্ভব। নতুবা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে খনিজ-দ্রব্য অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যাবে যে, পরে এর উদ্ধারসাধন একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, আনবিক বিস্ফোরণকে বিশেষ বিশেষ স্থানের ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন ...দেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ন্ত্রণ করা একরূপ দুঃসাধ্য। তৃতীয়তঃ, আনবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মির উদ্গম হয় তা যদি খনির ভেতর থেকে যায় তাহলে তার ভেতর কায করা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সমান।

...সমস্ত বাধা সত্বেও কয়েক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ খুবই সম্ভব। যেমন কোন পর্ব্বতগাত্রে কাটল সৃষ্টি ক'রে কোন নদীপথের ধারা ...অথবা কোন নদীপথের বাধাসৃষ্টিকারী বরফস্তূপের ধ্বংস-সাধন প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রশ্মির কোন ভয় থাকবে না, ... উন্মুক্ত হওয়াতে এবং বহু বিলম্বে অকুস্থানে গেলেও ...না হওয়াতে রশ্মির তীব্রতা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যাবে।

...ক বিস্ফোরণের সম্ভাব্য ব্যবহারের কল্পনাকে বাদ দিয়ে ...সাপেক্ষ আনবিক পারম্পরিক প্রক্রিয়ার কথা ধরা যায় ... যায় যে, এর প্রয়োগের একমাত্র কারণ হচ্ছে এর প্রচণ্ড ...কারী ক্ষমতা। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বাধা আছে। ... হচ্ছে, সে সব বাধা অতিক্রম করে প্রচুর পরিমাণে ... শক্তি সৃষ্টি করলে আমাদের কি লাভ হবে? সর্ব্বপ্রথম ... বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ...ক শক্তি পরিচালিত একটি 'পাওয়ার ষ্টেশন'।

...রণের একটি 'পাওয়ার ষ্টেশন' থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ ... যে-খরচ পড়বে, হিসাব করে দেখা গেছে যে, কয়লা-... বর্ত্তমান ব্যবস্থার চাইতে খুব বেশী কিছু তফাৎ হবে না। ... বিশেষজ্ঞদের একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে ... আমেরিকাতে এই ধরণের বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গেলে ...র চাইতে কিছু বেশী খরচ পড়বে। কয়লার দাম কিছু বেড়ে গেলেই এই দুই খরচার তফাৎ আর থাকবে না। ইংলণ্ডের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁরা দেখেছেন যে, আনবিক শক্তি পরিচালিত ষ্টেশন দ্বারা তাঁরা কিছুটা লাভবান হতে পারেন। ভারতবর্ষের কথা হিসাব করলে মনে হয়, উপস্থিত এর দ্বারা আমরা লাভবান না হতেও পারি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুতের দামের ব্যাপারে আনবিক শক্তি এমন কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আনবিক শক্তির একটি মস্ত সুবিধা হচ্ছে যে, খুব কম রসদ অর্থাৎ ইউরেনিয়াম হলেই ষ্টেশনটি চালু রাখা যায়। ফলে, কয়লার জন্য যেমন রেলগাড়ী অথবা জাহাজের শরণাপন্ন হতে হয়, এখানে সে সব কিছু হাঙ্গামা নেই। এর ফলে ষ্টেশনটি বিদ্যুৎ-গ্রহীতার খুব নিকটে সন্নিবেশ করা যেতে পারে এবং সরবরাহের হাঙ্গামাও অনেক কমে যায়।

তাছাড়া যদি কোন দিন পৃথিবীর সমস্ত কয়লা নিঃশেষিত হয়ে যায় অথবা কয়লার খনিতে কায করবার লোকের অভাব হয়—অর্থাৎ কোন রকমে আর কয়লা না পাওয়া যায়, তখন আনবিক শক্তি পরিচালিত 'পাওয়ার ষ্টেশন'-ই হবে আমাদের একমাত্র নির্ভর-স্থল। কিন্তু তা বলে এখুনি এ কথা বলা ঠিক নয় যে, এর জন্যে অদূর ভবিষ্যতে কয়লার চাহিদা অনেক কমে যাবে। কারণ আনবিক শক্তির প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধানের জন্য যে সময়ের দরকার সেটা বিবেচনা না করলেও, পৃথিবীর অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন আনবার মত যথেষ্ট পরিমাণ আনবিক 'পাওয়ার ষ্টেশন' তৈরী করতে যে সময়ের প্রয়োজন, সেটাও খুব কম নয়। তাছাড়া আনবিক শক্তির পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎ তৈরী করে তার দ্বারা রেল, জাহাজ অথবা গার্হস্থ্য কায চালান বহু সময় সাপেক্ষ। যাই হোক, এ কথা মনে রাখা উচিত যে, ধাতুবিজ্ঞান, রাসায়নিক বিজ্ঞান প্রভৃতি কাযের জন্যও সব সময় কয়লার চাহিদা কিছু না কিছু থাকবেই।

ট্রেন অথবা জাহাজে ব্যবহারযোগ্য ছোট ছোট 'ইউনিট' আনবিক পাইল থেকে সম্ভব কি না, এ সম্বন্ধে বহু যায়গায় বহু রকম আলোচনা হয়েছে। কেহ এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন—কেহ বা স্বপক্ষে জোর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে বলেছেন যে, এমন সব 'পাওয়ার-পিল' বা আনবিক শক্তিপূর্ণ ছোট ছোট কাল বাক্স আবিষ্কৃত হবে যা মোটর কার বা ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দিলেই গাড়ীগুলি অনায়াসে হাজার হাজার মাইল একসঙ্গে চলতে পারবে। কিন্তু কয়েকটি কারণের জন্য ছোট 'ইউনিট' তৈরী অন্ততঃ খরচের দিক থেকে যুক্তি-সঙ্গত হবে না। সর্ব্বপ্রথম বাধা হচ্ছে এর 'বিশিষ্ট' আয়তন। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, পারম্পরিক প্রক্রিয়া সম্ভব করতে গেলে পাইলের একটি বিশিষ্ট আয়তন হওয়া প্রয়োজন এবং খুব অল্প শক্তি পেতে গেলেও যে পাইলের প্রয়োজন তার 'বিশিষ্ট' আয়তন খুব ছোট নয় বরং বড়।

আর একটি প্রচণ্ড বাধা হচ্ছে যে, পাইলের চতুর্দ্দিকে আত্মরক্ষাকারী একটি আবরণ রাখা দরকার এবং হিসাব করে দেখা গেছে যে, সব চাইতে কম ওজনসম্পন্ন আবরণটি ভারী হবে অন্ততঃ একশ' টন। একশ' টন আবরণযুক্ত পাইল মোটর-কার বা ট্রেনে জুড়ে দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু বড় জাহাজে এ ভাব হয়ত খুব বেশী হবে না। তাছাড়া, জাহাজের চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশিকে দিয়ে এই আবরণের কায খানিকটা করিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে ওজন আরো অনেকটা কমে যাবে। কাজেই আনবিক শক্তি পরিচালিত জাহাজ

সম্ভব কি না এ প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তৎসংক্রান্ত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ওপর। কয়লা অথবা তেলের খরচের সঙ্গে আনবিক শক্তি উৎপাদনের খরচ তুলনা করতে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আনবিক শক্তির জন্য চাই বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম—অর্থাৎ ইউরেনিয়াম ২৩৫ অথবা ইউরেনিয়ম ২৩৩। এর খরচ কত হবে সে কথা এখন বলা সহজ নয়। আর একটা কথা লক্ষ্য রাখা দরকার যে, সমুদ্রযাত্রার জন্য যে পরিমাণ ইউরেনিয়ম প্রয়োজন তা খুব সামান্য। কাজেই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার জন্য পুনঃ পুনঃ রসদ যোগাবার কোন হাঙ্গামা আনবিক জাহাজে থাকবে না।

বিমানে আনবিক শক্তি ব্যবহারের কথা বিবেচনা করলে সর্ব্বপ্রধান বাধা হবে ভারী আবরণটি এবং আনবিক বিমান ততক্ষণ সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর আকার বহু গুণ বর্দ্ধিত না করা হচ্ছে। কিন্তু আকার বাড়ালে বিমান-ঘাঁটিতে ওঠা-নামার জায়গা বাড়াতে হবে এবং অন্যান্য আরো বহু রকম সমস্যা দেখা দেবে। কাজেই আনবিক শক্তি পরিচালিত বিমান সম্ভব হবে কি না, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যাই হোক, ভবিষ্যৎ প্রয়োগের কল্পনাকে ত্যাগ করে বাস্তবে পরীক্ষিত আনবিক শক্তির কয়েকটি ব্যবহারের কথা আলোচনা করা যাক। এর ভেতর অন্যতম হচ্ছে আনবিক পাইলের ভেতর পরমাণু-কেন্দ্রিক-ভাঙ্গন-জনিত অথবা নিউট্রন কণার সংঘাত হেতু উদ্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার। পূর্ব্বে চিকিৎসা বিদ্যা, ইনডাষ্ট্রীয়াল রেডিওলজি প্রভৃতিতে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন ব্যবহৃত হয়েছিল এদেরও ঠিক সেই রকম ভাবে ব্যবহার করা যায়। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ খুব দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং এরা প্রচুর পরিমাণে সুলভ ও বহুগুণ-বিশিষ্ট হওয়ায় এদিক থেকে একটা মস্ত অসুবিধা দূর হবে।

এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্য নিয়ে রাসায়নিক ও জীববিদ্গণ এক নতুন শক্তিশালী প্রক্রিয়ার অধিকারী হয়েছেন যা নিয়ে পরমাণুকে চেনা অথবা জটিল রাসায়নিক ও জৈব প্রণালীর ভেতর থেকে তাকে ঠিক ঠিক ভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতির দ্বারা কোন মৌলিক পদার্থের দুটি অণুর ভেতর পরমাণু-বিনিময়ও লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে সাইক্লোট্রোন অথবা অন্যান্য যন্ত্র থেকে তৈরী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপস্ দ্বারা এই ধরণের সন্ধানী কাজ করা হ'ত। যুদ্ধের পরে আনবিক পাইল এই ধরনের পদার্থ বহু পরিমাণে ও বহু প্রকারভেদে সরবরাহ করতে পারবে। সম্প্রতি এই প্রক্রিয়া শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা বিদ্যায় বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের চিকিৎসায় আইয়োডিন কোথা দিয়ে যায় দেখা সম্ভব হয়েছে তেজস্ক্রিয় আইয়োডিনের সাহায্যে। আবার মানুষের শরীর কি করে খাদ্যকে কাজে লাগায় তা পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তেজস্ক্রিয় ফস্ফরাসের সাহায্যে। ধাতুবিদ্গণও লুব্রিক্যাণ্টের ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য আজ-কাল এই প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করছেন।

আনবিক শক্তির ভবিষ্যৎ প্রয়োগ সম্বন্ধে যা বলা হ'ল তা হয়ত খানিকটা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এ হ'তে বাধ্য, কারণ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে যাতে করে নির্ভরশীল তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তবে এ কথা ঠিক, আনবিক শক্তির আবিষ্কার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটি বৃহৎ পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে সেই পথে অগ্রসর হ'লে যে ফল পাওয়া যাবে তাতে পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য বহু গুণ বর্দ্ধিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এমিল ফিসার

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

তিক্ত প্রথম মহাযুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। ক্লান্ত জগৎ যখন নতুন করে সাজতে চায় বিজ্ঞানের সাহায্যে, তখন হঠাৎ খবর এলো ফিসার মৃত। ফিসারের আকস্মিক তিরোধান তৎকালীন বিজ্ঞানীদের কাছে সেই মুহূর্ত্তে একটা বিরাট আঘাত হানলো—বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হোলো সেই সময়।

১৮৫২ সালের ৯ই অক্টোবর ফিসার কলোনের কোনো এক সরকারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্যবসায়ী পিতার মত তিনিও ব্যবসা করবেন বলে প্রথমে ঠিক করেন, কিন্তু পরে ১৮৭. সালে রসায়ন শাস্ত্রে আকৃষ্ট হন। বন্ ও ষ্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৪ সালে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। সেই বছরেই ষ্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবরেটরীতে তিনি Assistant Instructor নিযুক্ত হন, কিন্তু কিছু কাল পরে তিনি তাঁর শিক্ষক অ্যাডলফ, ফন্ বেয়ারের সাহায্যে মিউনিকে লেকচারার নিযুক্ত হন। ক্রমে ১৮৭৯ সালে তিনি ঐখানেই প্রফেসরের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে বেয়ারের লেবরেটরীতে বিশ্লেষণ বিভাগের ভার নিতে হয়। ১৮৮২ সালে প্রথমে আরল্যাংগেন ও ১৮৮৫ সালে উজবার্গ এবং ১৮৯২ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিযুক্ত হন। জীবনের অধিকাংশই তিনি জৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি যখন ষ্ট্রাসবার্গে সহ-শিক্ষক ছিলেন, তখন তিনি [illegible] Hydracines এবং Aldehydes ও Ketones এর উপর Phenyl hydracines এর প্রভাব আবিষ্কার করেন। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি বিভিন্ন প্রকার চিনির আনবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সঙ্গে সংশ্লেষণ প্রণালীর সাহায্যে grape suger তৈরী করার সম্ভাবনা প্রকাশ করেন। চিনি সংক্রান্ত গবেষণার পর তিনি glycocides সমূহের গঠন (structure) ও সংশ্লেষণ সম্পর্কিত গবেষণা ক'রে সফলতা লাভ করেন। এর পর Caffin, Theobromine, Kanthine ইত্যাদি বিষয় নিয়েও গবেষণা করেন। অ্যালবুমিন বিষয়ক গবেষণায় তিনি একটি নতুন [illegible] সন্ধান পান এবং এই কারণে অ্যালবুমিন তৈরী করার সম্ভাবনা প্রথম প্রকাশ করেন।

এর পর তিনি মেরিং নামক আর এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে গবেষণা করে কতকগুলি ভেরোনাল জাতীয় নিদ্রার ওষুধ আবিষ্কার করেন। তাঁর বহু গবেষণা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

সংশ্লেষণ প্রণালীর দ্বারা চিনি ও পিউরিন গ্রুপের কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের প্রস্তুত-পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন এবং এ জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

তাঁর পরিকল্পনা ও নির্দেশ অনুযায়ী বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রসায়নাগার নির্ম্মাণ করা হয়।

বার্লিনের নিকটবর্ত্তী ভানসীতে ১৯১৯ সালে ১৫ই জুলাই তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়।

"পদচিহ্ন"

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

তারাশঙ্করের প্রত্যেকটি উপন্যাসেই তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তার স্পর্শ আছে। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনার বৈশিষ্ট্য তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থেই উদাহৃত। তাঁহার 'পদচিহ্ন' উপন্যাসও তাঁহার প্রতিভার চিহ্নাঙ্কিত। এখানে অতি স্বচ্ছ ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া তিনি নিজ গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের নেতৃত্বের জন্য সংঘর্ষ, গ্রামের ভাগ্য-পরিবর্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রামের প্রাচীন অভিজাত গণ্ডীর বহির্ভূত এক দরিদ্র ব্যক্তি ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া গ্রামের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন—গ্রামের জীর্ণ মধ্য-ইংরাজী স্কুলটিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিয়া গ্রামে নবীন ধারার স্রোতোবেগ প্রবাহিত করিয়াছেন। গ্রামের যে পুরাতন নেতৃবৃন্দ ইঁহা কর্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখেন নাই—ঈর্ষা, অভিমান, গোপন বিরুদ্ধতা, অক্ষম আভিজাত্যের নিষ্ফল আক্রোশে এই আগন্তুকের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করিয়া যে মানব-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে প্রতিযোগিতামূলক শক্তি-পরীক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

এক এক সময় সংশয় জাগে যে, সমালোচনা-শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ সংজ্ঞায় যে জাতীয় সাহিত্য উপন্যাস নামে অভিহিত হয়, তারাশঙ্করের আখ্যায়িকাগুলি ঠিক সেই সঙ্কীর্ণ অর্থে উপন্যাস কি না। অন্ততঃ '[illegible]' হইতে তাঁহার যে নূতন ধারা সুরু হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তি গৌণ, সমাজ-পরিবেশ মুখ্য। তিনি সমাজের সমগ্র চিত্র আঁকিতে গিয়া মানুষকে সেই পরিবেশ-লীন করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার স্বতন্ত্র জীবনেতিহাস অনুসরণ করেন নাই। এই ব্যাপারে তিনি আমাদের সাহিত্যের শাশ্বত ঐতিহ্যের অনুবর্তন করিয়াছেন—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যাহাতে পরিবেশ-সীমা অতিক্রম করিয়া মাত্রাতিরিক্ত গৌরব দাবী না করে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যিকেরা সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। মহাভারতে ভীষ্মের চির-কৌমার্য, কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্তের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্যোধনের দারুণ অভিমান-প্রবণতা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর ভালবাসার সূক্ষ্ম তারতম্য—এইগুলি আধুনিক উপন্যাসের বিষয়-বস্তু হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু মহাভারতকার এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন থাকিয়াও ইহাকে স্বাধীন মর্যাদা দান করেন নাই, ঘটনার বেগবান প্রবাহ, নীতিচক্রের অমোঘ আবর্তন, যুগধর্মের সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে এই ব্যক্তিত্ব-বিক্ষোভের সূক্ষ্ম ও সার্থক ইঙ্গিতটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বর্তমান যুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কর্ণ ও কুন্তী' নাটিকায় সমাজশক্তির নীরব, নির্বিচার অধীনতা হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিয়া তাহার বহু-নিরুদ্ধ অন্তর-বেদনাকে জ্বালাময়ী ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন—কুরুক্ষেত্রের ব্যক্তিত্ব-গ্রাসী মহাসংগ্রামের তুমুল কলরবে একটি যোদ্ধার ব্যক্তিগত জীবনের যে করুণ আক্ষেপের সুরটি চাপা পড়িয়াছিল, তাহাকে আমাদের শ্রুতি-গোচর করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও মোটামুটি এই ঐতিহ্য-ধর্মী, আধুনিক যুগের মানুষের অধিকতর সুপরিণত ব্যক্তিত্বকেও তিনি পরিবেশের সহিত নিবিড় সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইয়াছেন। সমাজ-বৃক্ষের ছায়াতলে বর্ধিত ব্যক্তি তাঁহার উপন্যাসে পরিবেশ-প্রয়োজনে যেটুকু ন্যায্য আত্মসংকোচন করিয়াছে, অতি-আধুনিক সমালোচক-গোষ্ঠীর অসহিষ্ণুতা তাহাকে মনস্তত্ত্বগণের অগভীরতা আখ্যায় তিরস্কৃত করিয়াছে। এখানে লেখকেরই ত্রুটি, কি সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীর অনৈতিহাসিকতা কোনটা বেশী প্রকট হইয়াছে, বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকার আত্মকেন্দ্রিক অসাধারণত্ব ও শরৎচন্দ্রের নর-নারীর অসামাজিক দুঃসাহসিকতা ও অত্যুগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদই বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব-মুকুলকে সমাজ-প্রভাবমুক্ত করিয়া উহাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ও অনিবার্য যুগধর্মে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ক্রমপ্রসারশীলতা ও অভিনবত্বের দিক হইতে মোটামুটি অভিনন্দনযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সময়ের সহিত সমতালে পা ফেলিয়া চলিবার তাগিদে আমরা যে কিছু হারাইয়াছি, সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির মূল উৎস হইতে কিছু পরিমাণে সরিয়া আসিয়াছি, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ ব্যক্তিমানসের বাহিরের আশ্রয় মাত্র—ইহা একটি সংহত, সুরক্ষিত আবেষ্টনের মধ্যে মানবাত্মার অব্যাহত বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। ইহা আত্মার ঠিক অবিচ্ছেদ্য বহিরাবরণ বা অঙ্গীভূত ত্বক্ নহে। নীড়ের আরাম ও উত্তাপ পাখীকে বাহিরের ঝড়-ঝাপ্টা হইতে রক্ষা করে, সময় সময় বা অভ্যস্ত নিরাপত্তার ব্যতিক্রমস্বরূপ ঊর্দ্ধাকাশে বিচরণের ইচ্ছাও জাগাইতে পারে, কিন্তু তাহার কণ্ঠে গানের প্রেরণা দেয় না। বিশেষতঃ এই পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে এমন একটি ক্ষণিকতার উপাদান, এমন একটি ভারসাম্যের অস্থিরতার আমেজ আছে যে, ব্যক্তির মন উহার সমস্ত পক্ষপুট গুটাইয়া ইহার নিশ্চিন্ত নির্ভরের আবেশে আত্মসমর্পণ করে না। আমাদের দেশে সমাজের সঙ্গে

ব্যক্তির সম্বন্ধ একেবারে অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর সংযোগ। স্নেহের প্রশ্রয়, বিধি-নিষেধের কঠোরতা, আদর্শের অনুশাসন, চিত্তরঞ্জনের বিচিত্র উপায়ের আকর্ষণ, অধ্যাত্ম সংস্কারের অলক্ষ্য কিন্তু অবিসংবাদিত প্রভাব—এই সমস্তই ব্যক্তি-জীবনকে শত পাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার প্রকৃতির উপর সমাজ-প্রভাবের অবিস্মরণীয় ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। মন্দিরের সহিত বিগ্রহের যে সম্বন্ধ, আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের সম্পর্ক প্রায় তাহাই—মানুষের যে টুকু একান্ত নিজস্ব, তাহার অন্তরতম মর্মকোষে যে মধু সঞ্চয়, তাহার প্রাণরহস্যের অন্তর্লীন বীজমন্ত্র সমস্তই তাহার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বায়ুমণ্ডলের উপর অপরিহার্য ভাবে নির্ভরশীল। কাজেই এখানে যখন আবেগের দুরন্ত উচ্ছ্বাসে, বিদ্রোহের চরম উত্তেজনায় আমরা সমাজকে অস্বীকার করি, যেন পাশ্চাত্য দেশের মত এই অসাধারণ ব্যতিক্রমকে একটা স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সমাজকে ছাড়াইবার দুর্দম প্রেরণা কোথা হইতে আসিল, মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবের অমোঘ ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইবার অপরিমিত শক্তি কোন্ উৎস হইতে সঞ্চারিত হইল, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল পরিতৃপ্তির দাবী জানায়। এই দাবী উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা অসামাজিক, বিদ্রোহী প্রেমের ছবি আঁকেন তাঁহারা গোড়া হইতেই একটি অবাস্তব বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করেন। মাতৃগর্ভ হইতে অসময়ে নিষ্কাশিত শিশুর মত এইরূপ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা একটি অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতার পরিচয় বহন করে। পরবর্তী আলোচনার তীক্ষ্ণতা, কার্যকারণ শৃঙ্খলার সুনিপুণ বিন্যাস, হৃদয়াবেগের অদম্য গতিবেগের স্ফুরণ, লেখকের সমস্ত শিল্প-কৌশল ও মানব-চরিত্রাভিজ্ঞতা—কিছুই প্রারম্ভিক ভ্রমের সম্পূর্ণ সংশোধন করিতে পারে না। লেখক গোষ্ঠীর প্রতিভা আমাদের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রাবলীর সঙ্গে আমাদের কোথায় একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান রহিয়া যায়।

২

তারাশঙ্করের উপন্যাসে আমাদের দুঃস্থ জীবনধারার স্বাভাবিক ছন্দেরই অনুবর্তন হইয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার কোন উপন্যাসে প্রেমের প্রাধান্য নাই। বাঙ্গালা দেশের সমাজে স্বাধীন প্রেমের অনুশীলনের কোন অবসর ছিল না—আমাদের সমস্ত প্রেম বিবাহোত্তর ও পারিবারিক জীবনের সুনির্দিষ্ট কর্তব্যনিষ্ঠার প্রণালীতে প্রবাহিত। অসাধারণ ব্যতিক্রম যে বিরল ক্ষেত্রে ছিল না তাহা নয়, তবে তাহা রাধাকৃষ্ণের সমাজ-লংঘী প্রেমের প্রভাবে অধ্যাত্ম সাধনার প্রকারভেদ রূপেই গৃহীত হইত। সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যেই প্রেমকে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অঙ্গরূপে দেখান হইয়াছে। হেলেনের রূপবহ্নিতে ট্রয় ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিলাস-প্রদীপ জ্বালিয়া প্যারিসের সঙ্গে তাহার প্রেমলীলার প্রথম স্ফুলিঙ্গ ও তাহার দুঃসহ অন্তর্দাহ দেখাইবার প্রেরণা হোমার অনুভব করেন নাই। আমাদের দেশেও হয়ত নারী লইয়া দুই বিরুদ্ধ ব্যক্তিতে বা পরিবারে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ঐতিহাসিক এই সংঘর্ষটিকেই লিপিবদ্ধ করিয়া উহার মূল কারণটি যথাসম্ভব অন্তরালে রাখিয়াছেন। আমাদের সমাজ-জীবনের বুক চিরিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ যুগ হইতে যুগান্তরে প্রসারিত হইয়াছে, তাহার উপর চলমান পথিক-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রেমের শোভাযাত্রা সমারোহের বিশেষ স্থান ছিল না। এই রাজপথ দিয়া চলিয়াছে ধর্ম-সাধনা, বংশ-গৌরব, কৌলীন্য [illegible] আত্মপ্রতিষ্ঠা, পারিবারিক বিরোধ, রাজনৈতিক বিপ্লব, গার্হস্থ্য [illegible] স্নেহ-প্রেম-আত্মত্যাগ প্রভৃতি সমষ্টিগত জীবনের মুদ্রাঙ্কিত [illegible] ব্যক্তিগত জীবনের অভীপ্সা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর্গূঢ় বেদনা পথিক [illegible] প্রকাশ্যতাকে যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছে। নববধূর [illegible] অবগুণ্ঠনটি আমাদের সমস্ত অন্তরঙ্গ হৃদয়াবেগের উপরই [illegible] হইয়াছে—ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে ঈষৎ-দৃষ্ট সৌন্দর্য-ঝলক [illegible] ব্যক্তিগত জীবনের গোপন রহস্যটি সমষ্টিগত বেষ্টনের আড়াল [illegible] এক অর্দ্ধস্ফুট মোহের আভাস বিকীর্ণ করিয়াছে। আমাদের [illegible] যাত্রার স্বাভাবিক আবহাওয়ায় আধুনিক সমস্যা-বিড়ম্বিত, [illegible] রক্তচ্ছটারঞ্জিত প্রেমের ফুল ফুটে না—ইহাকে ফুটাইতে [illegible] যত্নে ও প্রচেষ্টায় একটি কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করিতে হয়। [illegible] এক অংশ হইতে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের চাপ অপসারণ করিয়া [illegible] শূন্য স্থানে হৃদয়াবেগের ঝটিকাবর্ত প্রবাহিত করিতে হয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই কৃত্রিম ব্যবস্থার কোন প্রশ্রয় নাই।

এই সাধারণ নীতিসমূহ তারাশঙ্করের সদ্যপ্রকাশিত 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে সহজেই প্রয়োজ্য। এই উপন্যাসে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ইতিহাস অবলম্বনে তিনি যুগ-পরিবর্তন পরম্পরার সঙ্কেত [illegible] করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপন্যাসের পাতাগুলিতে যাহার [illegible] অঙ্কিত হইয়াছে, সে ব্যক্তিবিশেষ নিরপেক্ষ অথচ বিভিন্ন [illegible] ভিতর দিয়া ক্রিয়াশীল সমাজ-চৈতন্যের যুগ-প্রসারিত বিবর্তন-[illegible]। পরিবারের উত্থান-পতন, গ্রাম-নেতৃত্বের পরিবর্তন, যুগ [illegible] উদ্দেশ্য-আদর্শ-চিন্তাধারার নূতন নূতন মোড় ও বাঁকের [illegible] তির্যক প্রবাহ, যুগ-সন্ধিক্ষণের দ্বিধাগ্রস্ত, বেদনাপ্লুত [illegible] এই সমস্তের মধ্যে যুগচেতনার অগ্রগতি নিজ যাত্রাপথের [illegible] রাখিয়া গিয়াছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক [illegible] প্রসারশীল যুগ-চেতনা; উপন্যাসের চরিত্রাবলী ইহারই [illegible] তাৎপর্যের বাহন মাত্র। ইহারা মহাকালের রথচক্র [illegible] কণা; কোথাও বা গতিবেগ-সংঘাতের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-দীপ্ত [illegible]। কিন্তু মোটের উপর ইহাদের যে পরিচয়টুকু পাই, তাহা [illegible] গত পরিচয় নহে, এই বৃহত্তর উদ্দেশ্য হইতে বিচ্ছুরিত [illegible] ভাস্বর, প্রতীক্-ধর্মী পরিচয়। ইহারা ব্যক্তি-জীবনের [illegible] করিবার সুযোগ পায় নাই—ইতিহাসের স্রোতোবেগে [illegible] পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের পূর্বেই অলক্ষ্যের দিকে ভাসিয়া [illegible] গিয়াছে। মহাকালের মুখ-ব্যাদানের মধ্যে অর্দ্ধ-পরি[illegible] অন্তর্হিত হইয়াছে। কৃষ্ণ চাটুজ্যের অন্তিম মুহূর্তে কাশী[illegible] ইতিহাসের এক অধ্যায়ের উপর সমাপ্তির যবনিকা [illegible]। উপন্যাস-মধ্যে চাটুজ্যের সার্থকতা এই যুগান্তের ইঙ্গিতদান [illegible] জন্য। লুপ্ত-সম্ভ্রম সরকার-বংশের প্রতিনিধি বংশলোচন [illegible] সূর্যের করুণ, ক্ষণিক মহিমায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসি[illegible] মুহূর্তে দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেলেন [illegible] গেলেন একটি বিষাদ-স্তিমিত স্মৃতির ক্ষীণ আভাস। [illegible] যুগনেতা গোপীচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বযুগের প্রতিনিধি [illegible] স্বর্ণভূষণ—ইহাদের পরিচয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। স্বর্ণভূষণ [illegible] তা দেওয়া মুক্তাদোবটি চারিত্রিক অভিব্যক্তির দিক [illegible] রহিয়াছে। ইহার গোঁফ থাকা সত্ত্বেও ইহাকে শিকারী বিড়াল [illegible]

[illegible] পারা যায় না। পায়ে-চলা-পথে কাঁটা পোঁতার ষড়যন্ত্র ও [illegible] নাসের আলির কণ্ঠ-নিপীড়ন ছাড়া ইহার সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার [illegible] পরিচয়ই মিলে না—ইহার নিষ্ফল আক্রোশ ও অন্তঃরুদ্ধ রোষ [illegible] যাত্রার দলের অভিনয় পর্য্যায়েই রহিয়া গিয়াছে। [illegible] ফুটাইতে না পারা উপন্যাসের একটি প্রধান ত্রুটি; [illegible] মহিমাও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অবাস্তবতায় অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তিনি যেন অনেকটা অনায়াসেই [illegible]নেতৃত্বের সিংহাসনটি দখল করিতে পারিয়াছেন। রাধা-[illegible] অন্তর্জীবন অনেকটা সুপরিস্ফুট—বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রীয় যুগের একটু প্রাচীনগন্ধী রচনা-ভঙ্গীতে লেখা তাঁহার দিনলিপির মধ্যে তাঁহার আত্মগ্লানি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি উজ্জ্বল বর্ণেই ফুটিয়াছে। তাঁহার দাম্পত্য জীবন, পুত্র গৌরীকান্তের উপর অগাধ আস্থা ও লুপ্ত বংশগৌরবের পুনরুদ্ধারের সংকল্প সন্তোষ বাবুর সহিত দার্শনিক আলোচনা—এ সমস্তই তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের কতকটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বহন করে। কিন্তু তথাপি মনে হয়, লেখক তাঁহার কর্ত্তব্য অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়াছেন—প্রাণোচ্ছ্বাসের মূল উৎস ব্যক্তিত্বের যে গভীর, রহস্যময় স্তরে নিহিত, লেখক তত দূর পর্য্যন্ত অবতরণ করিতে পারেন নাই। আভিজাত্য-সুলভ অভিমান ও ভাবাবেগপ্রবণতার মুখোসের তলে রাধাকান্তের আসল মুখটি যেন কতকটা ঢাকা পড়িয়াছে। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আলাপ-আচরণের মধ্যেও শ্রেণীগত জমিদারী চালকে ভেদ করিয়া মানব হৃদয়ের অকৃত্রিম সুরটি আত্মপ্রকাশ করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত [illegible] আর একটি প্রাণধর্ম্ম-সমৃদ্ধ চরিত্র কিশোরের ব্যক্তিত্ব পরিচয় সন্ন্যাস-জীবনের গেরুয়া বসন ও পলায়নী মনোবৃত্তির অন্তরালে আত্মসংকোচন করিয়াছে। মনে হয়, যেন এই জমিদার-শ্রেণী শৌর্য-বীর্য্যের যতই বড়াই করুক না কেন, নূতন যুগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ইহাদের ছিল না—ইহাদের তর্জ্জন-গর্জ্জন-আস্ফালন শরতের মেঘের মত খানিকটা মিথ্যা আড়ম্বর করিয়া যুগান্তরের বাত্যাস্তবের মধ্যে নিশ্চিহ্ন ভাবে বিলীন হইয়াছে।

বাশীর বৌ-এর চরিত্রটির মধ্যে লেখক কতকটা স্বকীয়তার প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলেও এই চেষ্টা তিনি সার্থক ভাবে অনুসরণ করেন নাই। তিনি সাধারণ মেদস্ফীতা আভিজাত্য-গর্বিতা জমিদার-গৃহিণীর [illegible] ঢালা নহেন; লেখক এই ইঙ্গিতটুকু বারে বারে দিতে [illegible]ছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই অসাধারণত্বের প্রত্যাশা পরিপূর্ণ [illegible]। তিনি ঘোমটা খুলিয়া নিজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন [illegible]—কিন্তু এই অনবগুণ্ঠিত মুখ যে সংস্কার-মুক্তি ও দৃঢ়-চরিত্রতার [illegible] রচনা করিয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি অলিখিত রহিয়া [illegible] তাহার আসল কারণ হইল লোকের ব্যক্তিত্বের দিকে [illegible] যুগধর্ম্মের যে দমকা বাতাস ও পারিবারিক জীবনের [illegible] জমিদার-বধূর মুখ হইতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছে [illegible] বাত্যান যন্ত্রের অভ্রান্ততার সহিত তাহারই দিক্ ও প্রবাহ-[illegible] করিয়াছেন—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে তাঁহার [illegible] কৌতূহল নাই।

[illegible] যুগের প্রতীক গোপীচন্দ্রের ব্যক্তি-পরিচয় অনেকখানি [illegible] হইয়াছে। তাঁহার ক্ষমাশীল, স্নিগ্ধ প্রকৃতি, অকৃত্রিম জন-[illegible] উদার, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সহানুভূতির সহিত চিত্রিত

হইয়াছে। তিনি যে নূতন যুগের অধিনায়কত্ব করিবার অধিকারী, আধুনিক ভাবধারার স্রোতোবেগকে গ্রাম্য-জীবনের খাতে প্রবাহিত করিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে, তাহা পূর্বতন যুগের নেতৃবৃন্দের সহিত তুলনায় তাঁহার চরিত্রোৎকর্ষেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তীরা প্রাচীন সংস্কৃতিকে খানিকটা বিকৃত ও নিজের প্রভুত্বাভিমানের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ধার্মিক রাধাকান্ত ও দক্ষ স্বর্ণ তাঁহাদের পুচ্ছ-তাড়নায় অতীতের বদ্ধ জলাশয়ে খানিকটা আলোড়ন তুলিতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যতের আগন্তুক ভাবপ্রবাহে স্বচ্ছন্দ বিচরণের যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। গোপীচন্দ্রই এই নূতন ভাব-বন্যাকে রুদ্ধ মুনির মত আত্মস্থ করিয়া ভগীরথের মত প্রাচীন সমাজের শীর্ণ খাতে প্রবাহিত করিবার শক্তি রাখেন। অবশ্য ইহার পিছনে খানিক সরকারী ইঙ্গিত, রাজশক্তির মনস্তুষ্টি, জনপ্রিয়তার মোহ ক্রিয়াশীল; কিন্তু তথাপি গোপীচন্দ্রের স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি ও রাজোচিত উদারতার সহযোগিতা ভিন্ন কেবল বাহিরের চাপে এ নব ভাব প্রবর্তন কার্য্যকরী হইত না। স্বর্ণ-রাধাকান্ত অতীতের রোমন্থন করেন, গোপীচন্দ্র ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন—এইখানেই তাঁহার যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠত্ব। তথাপি তাঁহার চরিত্রের সামাজিক দিকটাই পরিস্ফুট হইয়াছে; তাঁহার সুবৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া গ্রাম-সমাজের সহিত তাঁহার যে কল্যাণময় অভিভাবকত্বের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার পরিচয় সীমাবদ্ধ। কর্মোন্মাদনার বিপুল গতিবেগই তাঁহার প্রাণশক্তির পরিমাপ করিয়াছে। স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি খুব ভাসা-ভাসা মনে হয়—তাহাদের নিয়ন্ত্রণে তিনি যেন অনেকটা শিথিল ও প্রশ্রয়শীল। সমাজ-নেতৃগোষ্ঠীর সাধারণ ঐতিহ্যের অনুসরণে তাঁহার জীবন বাহিরে বিস্তৃত, ভিতরে সঙ্কুচিত। তাঁহার জীবন-নির্ঝরিণী সমাজ-সেবার সংরক্ষিত তটদেশ আশ্রয় করিয়া মৃদু-মন্দ গতিতে প্রবাহিত, ইহা কোথাও হৃদয়ের গভীরতার উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্ত রচনা করে নাই।

কৃষ্ণ চাটুজ্জে ও গোপীচন্দ্রের অন্তিম অভিযানের রীতি ও আদর্শ পার্থক্যের মধ্যে সমাজধর্মের পরিবর্তনশীলতার পরিমাণটি ব্যক্তিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে কালগত ব্যবধান অনধিক পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে সমাজ-চিত্তের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চাটুজ্জে সমস্ত সংসার-চিন্তা বিসর্জন দিয়া, বৈরাগ্য-শান্ত চিত্ত লইয়া গিয়াছেন কাশী, পরলোকে সদ্গতির আশায়। গোপীচন্দ্র অসমাপ্ত কার্যের অতৃপ্তি ও চিত্তবিক্ষেপ লইয়া গিয়াছেন বিপরীত দিকে, আধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্র কলিকাতায়, নিজ জীবনের মেয়াদ বাড়াইবার জন্য। বাঙ্গালীর সামাজিক চিত্ত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই দুই বিপরীতমুখী আদর্শের প্রান্তসীমার মধ্যে আন্দোলিত হইয়াছে। চাটুজ্জের কাশীযাত্রা দিয়া গ্রন্থের আরম্ভ; গোপীচন্দ্রের কলিকাতা যাত্রা দিয়া ইহার পরিসমাপ্তি—লেখক অতি সুকৌশলে এই দুইটি ঘটনার মধ্যে যুগ-পরিবর্তনের সমগ্র সাঙ্কেতিক অর্থগৌরব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই কাল-ব্যবধানে বাঙ্গালীর সমাজ-চেতনা পরলোককে ছাড়িয়া ইহলোককে আশ্রয় করিয়াছে, স্বর্গলাভের লোলুপতার স্থলে ইহলোকের কর্মসাধনাকে জীবনের নিয়ামক শক্তিরূপে স্বীকার করিয়াছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসের গৌরব তাঁহার সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক তাৎপর্যের প্রতি অতন্দ্র সচেতনতা। উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা, পাত্রপাত্রীর প্রত্যেকটি কর্ম ও চিন্তা ইতিহাসের অলক্ষ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া এক বিরাট অর্থ-ব্যঞ্জনার বাহন হইয়াছে। এই যুগ-প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতে সামান্যও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, বর্তমানের তুচ্ছ সংঘটন মহাকালের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বিচ্ছুরিত আলোকে দৃপ্ত হস্ত-সঞ্চালিত তরবারির ন্যায় তীক্ষ্ণধার ও ভাস্বর হইয়াছে। মুহূর্তের উদ্ভব-বিলয়শীল বুদ্বুদ আবহমান কাল হইতে প্রবাহিত স্রোতোবেগের টানে চঞ্চল। অলস অদৃষ্টবাদ, উদ্ধত বংশাভিমান, ঈর্ষ্যাকুটিল চিত্ত-সংকীর্ণতা এক বিরাট ঐতিহ্য-গৌরবের স্মৃতিমণ্ডিত; মুখর দিনের চপলতার মাঝে সুদূর অতীতের মৌন মহিমা স্তব্ধ ভাবে বিরাজিত। তারাশঙ্করের উপন্যাস এই সাঙ্কেতিক দ্যোতনায় ভরপুর। আমাদের দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব জনসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করে নাই। যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা সমাজ-চেতনায়, অধ্যাত্ম সাধনার আদর্শে, পরিবার-সংস্থিতির চলমানতায়। তারাশঙ্কর বাঙ্গালা দেশের এই সমাজ-বিবর্তন ধারার ঐতিহাসিক। অতীত শতাব্দীতে পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ও জীবনাদর্শের প্রচলন সর্বাপেক্ষা গুরুতর সামাজিক বিপ্লব; কিন্তু ইহার ইতিহাস সাধারণ ভাবে আন্দাজ করা গেলেও অলিখিত। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিঘাত যখন আমাদের চিত্তের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছে, আমাদের জীবন-ব্যবস্থাকে বিচলিত করিয়াছে, তখন এই ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়াইয়া দ্রুত বিলীয়মান প্রাচীন ব্যবস্থার সমস্ত গৌরব, সমস্ত কলঙ্ক ও ইহার তিরোভাবের সমস্ত মর্মান্তিক বেদনা ও বিশৃঙ্খলা তারাশঙ্কর নিজ উপন্যাসে অনুভব ও [illegible] করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে চরিত্র-পরিকল্পনার গভীরতা সম্মিলিত হইলে হয়ত তাঁহার উৎকর্ষের মান আরও বাড়িত। কিন্তু প্রতিভাকে আমাদের ইচ্ছানুসারে ফরমাইস দিয়া গড়া যায় না। তাঁহারা যাহা দেন তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তিনি যাহা দিয়াছেন অপর কেহ তাহা দিতে পারিত না; এবং তিনি যাহা ফাঁক রাখিয়াছেন হয়ত অনাগত ভবিষ্যতে তাহা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে এইরূপ প্রসন্ন, শ্রদ্ধাশীল, আশাবাদী মনোভাবই প্রতিভার বেদীমূলে আমাদের উপযুক্ত অর্ঘ্য।

পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]

বর্ষ-দীপিতা—(১৩৫৭)—প্রকাশক—বিশ্ব[illegible] প্রকাশনী, ১-সি লাইম ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৫ ; ৫২ পৃঃ, মূল্য ৩৷৷০।

বাংলা ইয়ার বুক সম্পাদনায় গতানুগতিকতা পরিহার [illegible] গত বর্ষেই সম্পাদক যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন [illegible] সংখ্যারও তাহা অনুসৃত হয়েছে। শুধু ঘটনাপঞ্জী ও বিভিন্ন [illegible] নেই ইহাকে ভারাক্রান্ত না ক'রে বহু অবশ্য-প্রয়োজনীয় [illegible] সন্নিবেশিত করা হয়েছে। জাগতিক পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়ে [illegible] স্থান কোথায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় সভ্যতার [illegible] শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানের ধারা প্রভৃতি আ[illegible] ভাবে আলোচিত হয়েছে।
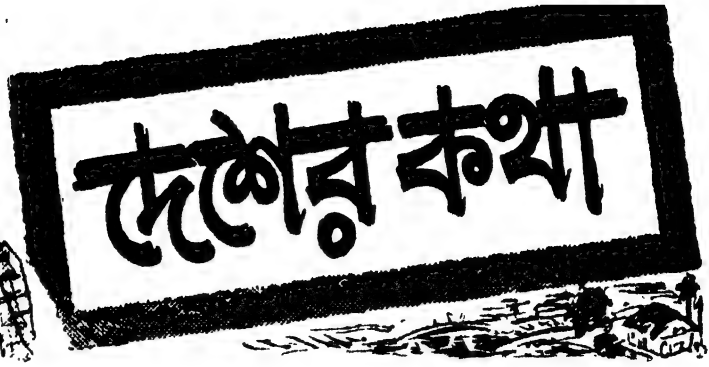
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আসানসোল, ৩০শে আগষ্ট,—'দামোদরের' প্রতিনিধি বিভিন্ন কলিয়ারীতে শ্রমিকদের অবস্থা পরিদর্শন করিতে যাইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, গোরক্ষপুর হইতে যে সমস্ত কুলীদের এগ্রিমেণ্টে কয়লা খনিতে কাজ করিতে আনা হয়, তাহারা যাহাতে পলাইতে না পারে, তাহার জন্য জেলের কয়েদীর ন্যায় তাহাদের পিছনে সর্ব্বদা পাহারা নিযুক্ত থাকে। অন্য কুলীদের ন্যায় ইহাদের কোন স্বাধীনতা নাই এবং ইহারা শ্রমিক সংঘগুলিরও নাগালের বাহিরে থাকে। কং কলিয়ারীগুলিতে উচ্চ বেতনের সুপারভাইজারের তদারকে এবং কোন কোন স্থলে দুই-তিনটি কলিয়ারী লইয়া একটি গ্রুপ সুপারভাইজারের অধীনে তাহাদের রাখা হয়। সুপারভাইজার কুলীদের নিকট কনাগুার নামে পরিচিত। তাঁহাকে কুলীরা যমের ন্যায় ভয় করে। কলিয়ারী কর্ত্তৃপক্ষ কুলীদের জন্য নির্দ্ধারিত চাউল, ডাইল সরবরাহ করেন এবং মাংস ও তরী-তরকারীর জন্য সুপারভাইজার বিল দিলে তাহা মিটাইয়া দেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, উক্ত কুলীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য খাদ্য দেওয়া হয় না এবং তাহাদের উপর অত্যন্ত জবরদস্তি ও অত্যাচার চলে। তাহাদের নালিশ করিবার কোন উপায় নাই। হঠাৎ তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় একই প্রকারের শিখানো বুলি বলে,—"মজেমে হ্যায়"। তাহাদের শরীর অসুস্থ হইলেও রেহাই নাই—জবরদস্ত করিয়া কাজে লাগানো হয়। তাহাদের আবাস স্থল উচ্চ দেওয়াল অথবা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। বাহিরের কেহ অবাধে তাহাদের কোন সংবাদ লইতে পারে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারখানায় আনিয়া তাহাদের চিকিৎসা করানো হয় বটে, কিন্তু চিকিৎসক-নির্দ্দেশিত আহার দেওয়া হয় না। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ঐ সমস্ত কুলীকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া আনা হইয়াছে এবং কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে তাহা জানানো হয় না। পিট কমিটিগুলিতে গোরক্ষপুরী শ্রমিকদের জন্য কোন প্রতিনিধি নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এই অব্যবস্থা চলিতেছে।" সরকারী প্রতিবাদের আশায় রহিলাম।

* * * *

'[illegible]' পত্রিকায় প্রকাশ:—"আসানসোল মহকুমার বার্ণপুর ও কুলটি দুইটি কারখানা হইতে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বিতাড়নের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কর্পোরেশন অব বেঙ্গলের উন্নতির জন্য সাত কোটি টাকা ঋণ বরাদ্দ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত কারখানা দুইটির অর্থনৈতিক উপদেষ্টারূপে মিঃ পুরীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সংবাদদাতা জানাইতেছেন, পুরীর নিয়োগ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের পক্ষে শুভ হয় নাই। আরও প্রকাশ, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ না কি বাঙ্গালীর স্থলে পাঞ্জাবী নিয়োগের এক গোপন সার্কুলার দিয়াছেন।" কারখানা দুইটির মালিক কি বাঙ্গালী? কর্ম্ম নিয়োগ ব্যাপারে কোনো উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর মতামত প্রয়োজন হয় কি?

* * * *

[illegible]।৯।৫০ তারিখের 'দামোদর' মন্তব্য করিতেছেন:—"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম, আমাদের বর্দ্ধমানের মন্ত্রী মহাশয়ের উদ্বৃত্ত মজুত ধান্য ঘরে বসিয়া নয় টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইয়াছে। ধান্য ক্রয় করিয়াছেন মন্ত্রী মহাশয়ের স্বগ্রাম-নিবাসী ধান্য-চাউল চালানকারী জনৈক মাকড় মহাশয়। মন্ত্রী মহাশয় খাস সরকারের লোক এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত দর সরকার অনুমোদিত এজেণ্টের গুদামে তুলিয়া দিলে সাড়ে সাত টাকা। মন্ত্রী মহাশয়েরা কিন্তু বক্তৃতায় সরকারী আদেশ পালন করিতে এবং সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে জনসাধারণকে উপদেশ দেন। উদ্বৃত্ত ধান্য মজুত রাখাও না কি অপরাধ এবং থাকিলে তাহা সাজ করিবার ব্যবস্থাও এই বর্ষার দিনে ব্যাপক ভাবে চলিতেছে। তাহার একটুকু ব্যতিক্রম হইলে সশস্ত্র পুলিশ গিয়া হাজির হয় এবং ধান্য-চাষীকে নানা ভাবে নির্যাতন ও অপমান সহ্য করিতে হয়। বর্দ্ধমানের দুর্নীতিদমন বিভাগ ও এ, আর, সি, পি মহাশয়ের বীরত্ব এইরূপ স্থলে প্রদর্শিত হইলে জনসাধারণ সরকারী আদেশ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে। নচেৎ দেবতার বেলায় লীলাখেলা এবং সাধারণের ক্ষেত্রে তাহা বসনচুরির অপরাধ হইলে আইনের মর্যাদা থাকিবে কেন? বীরত্ব প্রদর্শনের কথা দূরে থাকুক, অন্ততঃ বিষয়টি প্রকাশ্যে তদন্ত করিবার সাহসও কর্ত্তৃপক্ষের হইবে কি?"

* * * *

'দামোদরে' আরো প্রকাশ যে:—"বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, একটি মফস্বল কলেজের ছাত্রাবাসের নামে সরকারী গুদাম হইতে মাসিক ৭৫ মণ হিসাবে চাউল নিয়ন্ত্রিত দরে বহু দিন হইতে দেওয়া হইতেছে। দৈনিক ২০০ জন করিয়া ছাত্র দুই বেলা খাইলে তবে মাসিক ৭৫ মণ চাউল খরচ হইতে পারে। প্রকাশ, উক্ত কলেজের ছাত্রাবাসে ৩০ জনের অধিক ছাত্র থাকে না।"

* * * *

'গৌড়দূত' সম্পাদকীয় :—"দেশ বিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায় ১১০০ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৪ লক্ষ এবং ৮২টি কলেজে ৫০ হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্র বা বিদ্যায়তনের সংখ্যা দ্বারা শিক্ষার পরিমাপ করিলে নিরাশ হইবার কিছু নাই। কিন্তু এই বিরাট ছাত্রমণ্ডলী যে শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহা যে কোন স্বাধীন দেশের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয় কি? ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই, ছাত্রগণ কোন প্রকারে পরীক্ষায় পাশ করুক—ইহাই কামনা করেন। ফলে ছাত্রগণ যে কোন উপায়ে পরীক্ষা পাশ করিতে ব্যস্ত থাকে। বিদ্যায়তনে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু নাই। কার্য্যসিদ্ধির জন্য অকারণে ছাত্রগণকে উত্তেজিত করিয়া ধর্ম্মঘট করাইবার প্রয়োজন বর্ত্তমানে না থাকিলেও, ধর্ম্মঘট করিবার একটা রেওয়াজ ছাত্রগণকে পাইয়া বসিয়াছে। নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুকূল পরিবেশ রচনা না করিলে যে কোন প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায় না—এ কথা কে কাহাকে বুঝাইবে? তরুণ সম্প্রদায়ের হৃদয়, মন ও দেহেই যে দেশের প্রকৃত সম্পদ নিহিত রহিয়াছে—এ কথা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-চালকগণ ভুলিতে বসিয়াছেন। বৃটিশ-শাসকগণ দেশ শোষণ করিবার জন্য যে সকল পন্থা বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরাও সেই নীতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। দেশের যুবশক্তিকে অন্ধকারে রাখিয়া এবং তাহার অপচয় ঘটাইয়া কেবল পরিকল্পনা, ভাষণ, কমিশন বা বাঁধ নির্ম্মাণ দ্বারা দেশ বড় করা যাইবে না। এই পথে চলিয়া গদীতে কিছু কাল তাঁহারা থাকিতে পারিবেন—সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে না। ছাত্রসমাজের দেহ ও মনের বিকাশ, সমাজসেবা, খেলাধূলা, ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃত নাগরিক গড়িবার চেষ্টা কোথায়?" তাহার পর—"সরকারের প্রচার বিভাগ বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের উন্নতির জন্য কত কি করিয়াছেন তাহার খেলো ও ছেলে-ভুলানো বিবরণ মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন। ইহা যে বৃটিশ শাসকদের মিথ্যা propagandaর নিকৃষ্ট অনুকরণ, ইহা কে না বুঝে? একটা দৃষ্টান্তেই ইহা ধরা পড়িবে। লীগ-মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী ছাহেবের আমলে ১৯৪২ সনে শিক্ষকদের জন্য দুর্ম্মূল্য-ভাতা মাসিক ৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পর ৮ বৎসর চলিয়া গেল। কত আবেদন-নিবেদন করা হইল, মন্ত্রী মহোদয় এই দুর্ম্মূল্য-ভাতা বাড়াইয়া ৫৲ টাকা স্থলে ৫৫ পয়সাও করেন নাই। এই সময়ের মধ্যে অফিসের চাপরাশীদের দুর্ম্মূল্য-ভাতা বাড়িয়া ২৫৲।৩০৲ টাকা হইয়াছে। অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বা পঞ্চ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ১০০৲ টাকার জিনিসের দাম ৪০০৲।৫০০৲ টাকা হইয়াছে; কিন্তু যে শিক্ষক পূর্ব্বে ৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন, তাঁহার বেতন ২০০৲ বা ২৫০৲ টাকা [illegible] নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রী মহোদয়ের আমলেই বি-এ পাশ করা শিক্ষ[illegible] মূল্য ৬০টি টাকা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, অথচ ম্যাট্রিকুলেট [illegible] কোনো সরকারী বা সদাগরী অফিসে প্রবেশ করা মাত্র ৮০৲।৯০৲ [illegible] পাইয়া থাকেন। শিক্ষকগণকে হাস্যকর বেতন দেওয়া হয়; শি[illegible] প্রায় হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। জাতির ভবিষ্যৎ যে শিক্ষক[illegible] উপর নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা কি এইরূপ শোচনীয় [illegible] যাপন করিবেন? এই সঙ্কট হইতে পশ্চিমবঙ্গকে কে রক্ষা করিবে?'

* * * *

'মুর্শিদাবাদ সমাচারে' প্রকাশ :—"অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ): সুতী থানার জন-সংভরণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানা গেল যে, পুনর্বসতি কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক নিমতিতা অঞ্চলের উদ্বাস্তুগণের মধ্যে বহু ভুয়া রেশন কার্ড [illegible] করিয়াছেন। এই কার্য্যকে বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটের দিনে [illegible] অপচেষ্টা বলিয়াই এতদঞ্চলে মনে করা হইতেছে। আরও জানা যায় যে, বহু রেশন কার্ডে পরিবারের লোকসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি দেখানো হইয়াছে। রেশনের দোকানে চাউল সংগ্রহ কালে এইরূপ ১০খানি রেশন কার্ডের নমুনা পাওয়া গিয়াছে। রেশন চা[illegible]লের দোকানদার চাউল না দিয়া কার্ডগুলি আটকাইয়া রাখে। ঐ কার্ডগুলিতে ২০ জন পর্য্যন্ত পরিবারের লোকসংখ্যা দেখানো হইয়াছে। এই নিন্দনীয় ব্যাপারে খাদ্য-সমস্যার সমাধান বিষয়ে চিন্তাশীল [illegible] কর্ম্মিগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। জন-সংভরণ বিভাগের কর্ম্মচারী উদ্বাস্তুদের রেশন কার্ডগুলি ভাল ভাবে তদন্ত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।"

* * * *

উপরিউক্ত পত্রের সংবাদ :—"বহরমপুর : কানাইলাল [illegible] নামক সাইথিয়ার জনৈক ব্যবসায়ীকে ভেজাল সরিষা [illegible] অপরাধে, বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীদীনেশচন্দ্র চন্দ, ভারতীয় [illegible] ২৭২ ধারা অনুসারে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৬০০৲ টাকা [illegible] অনাদায়ে ৫ সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক[illegible] অভিযোগে প্রকাশ, উক্ত ব্যবসায়ী ৪৫০ বস্তা ভেজাল সরিষা [illegible] করিবার জন্য আমদানী করে। উক্ত দ্রব্যের মূল্য ১৪০০০৲ [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট সমগ্র ভেজাল সরিষা তাঁহার সমক্ষে বিনষ্ট করারও [illegible] দিয়াছেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী মুর্শিদাবাদ জেলা [illegible] নিকট আপীল করে। কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে।"

দৈনন্দিন
প্রয়োজনে...
Laiju
CASTOR OIL
মলয়

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর। (ডাক্তারকে) 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়'—এ তিন থাকতে নয়। ঈশ্বরের নাম করবে, তাতে লজ্জা কি? "আমি এত বড়লোক, আমি 'হরি হরি' করে নাচবো—অন্য বড়লোকেরা শুনে বলবে কি?" এ সব ত্যাগ করে। কথায় আছে—"মুক্ত হব ক'বে আমি যাবে ক'বে।" শুধু শুনলে কি হবে? করা চাই। "সিদ্ধি সিদ্ধি' মুখে বললেই নেশা হয় না, বেটে খেতে হয়। পেটে পড়লে তবে মজা, বুঝলে?

ডাক্তার। (ঘড়ি দেখিয়া) তা বটে। ত্যাখ, আমায় এখন উঠতে হবে। তোমার কাছে এলে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। (চরণে মাথা রাখিয়া) দাও। (পরে ভক্তগণকে)—তোমরা কি মনে ভাবছো তোমাদের পায়ের ধুলো নিতে পারি না। (সকলকে প্রণাম ও প্রস্থান)।

ঠাকুর। যতক্ষণ কাচা ততক্ষণ শক্ত, সিদ্ধ হলে তবে নরম হয়। অহঙ্কার কি টপ্ করে যায়? মেথরাণী যদি দু'খানা গয়না পরে, তবে সেও সকলকে ধমকে বলে—"সরে যাও"।

কেদার। (গিরিশকে) অন্য পাঁচ জায়গায় ঘুরে খেতেই পাই না, এখানে পেট ভরা পাই।

গিরিশ। একবার মহিম বাবু (চক্রবর্ত্তী) গোঁসাইকে (বিজয়) জিজ্ঞাসা করেন, 'অনেক তীর্থ করে অনেক দেশ ঘুরে এলেন, কিছু বলুন, কি দেখলেন?' তখন গোঁসাই বেশ বললেন—"কি বলবো! অনেক দেখেছি, যেখানে এখন বসে আছি, সেইখানেই সব পাওয়া যায়। কেবল মিছে ঘোরা। কোনখানে আধ আনা, কোনখানে এক আনা, কোথাও দু'আনা কিন্তু এখানে ষোল আনা। তাও আবার নিজে না ধরা দিলে ধরা শক্ত।"

কেদার। ঠিক্ কথা।

ঠাকুর। (নরেন্দ্রকে নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন)—"কি বললুম"

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) বুঝেছি।

ঠাকুর। (ভাবাবিষ্ট ভাবে) তিনি আর এই হৃদিমধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি, যার হাত ভেঙ্গেছিল আর এখন যার অসুখ করেছে সেটা হলো এই খোলটার। কা'কেই বা বলি, কেই বা বুঝবে।

(যবনিকা)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বরাহনগরে একটি ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীর একটি ঘর—"দানদের ঘর" নামে পরিচিত। ঠাকুরের দেহাবসানে বালক ভক্তগণের জন্য গৃহীভক্ত সুরেন্দ্র মিত্র ভাড়া দেন এবং মাসিক খরচার ভার বহন করেন। গৃহমধ্যে দেখা যাইতেছে একটি পুরাতন মাদুরে বসিয়া রাখাল নিবিষ্ট ভাবে জপ করিতেছেন। অদূরে "কালী" তপস্বী। পার্শ্বে দরজা। "ঠাকুর-ঘরে" শশী পড়া [illegible] ছেন। ঘণ্টা ও [illegible] শব্দ শোনা গেল। প্রাতঃকাল]।

প্রসন্ন (প্রবেশান্তে)—শরৎ, বাবুরাম পুরীতে তপস্যা [illegible] গেছে। নিরঞ্জন তার মাকে দেখতে বাড়ীতে গেছে। [illegible] মাঝে মাঝে এখনও বাড়ীতে তার মা'র জন্য যেতে হয়। [illegible] "ঠাকুর" পূজো নিয়ে বেশ আছে। আজ তারকদা, হরিশ ও [illegible] ভক্ত-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। (ক্ষণ পরে—সখেদে) আমার [illegible] কি হবে? পালাতেই হবে। সংসারের অবিদ্যা মায়া ছেড়ে এ [illegible] বিদ্যা মায়ায় জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। তপস্যা করতেই হবে দূরে [illegible] এই বেলা এই চিঠি রেখে সরে পড়ি। নরেন যে বদরাগী, [illegible] যেতে দেবে না। (ঠাকুরের ঘরের উদ্দেশ্য প্রণাম [illegible] দ্বারে চিঠি রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান)।

(পূজান্তে শশীর বাহিরে আগমন ও পত্র খুলিয়া [illegible] 'শ্রীম'র খাবার হস্তে প্রবেশ)।

শশী। আসুন, মাষ্টার মশাই। আপনাদের দেখলে [illegible]নন্দ হয়। (খাবার লইয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ ও পুনঃ বহিরাগম।

শ্রীম। এরা সব কেমন? কাকেও দেখছি না যে?

শশী। এক জন সরেছে। চিঠি পড়ুন। (পত্রপাঠ)

(রবীন্দ্রের উন্মত্ত ভাবে প্রবেশ, রুক্ষ বেশ, খালি [illegible] আধ ময়লা ছিন্ন কাল পাড় ধুতি)।

রবীন্দ্র। (উত্তেজিত ভাবে) আর বাড়ী ফিরবো [illegible] আপনাদের এইখানেই থাকবো। সে বিশ্বাসঘাতক। [illegible] মশাই, পাঁচ বছরের অভ্যাস সেই মদ তার জন্যেই ছেড়েছি [illegible] মাস তাই ছুঁলাম না. শেষে সেই কি না বিশ্বাসঘাতক হ[illegible] আসবার সময় কাপড় ধরে টানাটানি করলে, তাই আধখান [illegible] গেছে। খালি পায়ে কলকাতা থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি

শ্রীম। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও, পরে কথাবার্ত্তা [illegible] গঙ্গাস্নানে যাই।

[উভয়ের প্র[illegible]

(পিয়ন একটি পত্র দিয়া গেল রাখালের নামে। [illegible] দিয়েছে। শশী রাখালকে পত্র দিলে—পাঠ না করিয়া [illegible] মাদুরের নীচে রাখিয়া দিলেন)।

রাখাল। কেন বাজে লিখে পয়সা নষ্ট করে। এখা[illegible] তো কিছুই হলো না। ভগবান দর্শন হলো কৈ? [illegible] তপস্যা করবার মন হচ্ছে। একবার দক্ষিণেশ্বরে যাবার টান

নরেন্দ্র। (সাথে তারক ও হরিশের প্রবেশ) উঃ, [illegible] খাইয়েছে রে। প্রসন্ন কোথা? (শশী পত্র দিলে পাঠান্তে) (রাখাল) যেতে দিলে কেন? ছোঁড়াটা গেল কোথা? [illegible] প্রবেশ) দেখুন, আমার এক মুস্কিল। এখানেও এক মায়া [illegible] পড়েছি। আপনাদের দেখলে তবু মনটা ঠাণ্ডা হয়।

শ্রীম। "মুক্তি ও সাধন" বইখানাতে আছে—'সন্ন্যাসীদেরও ...ঙ্গে বেশী দিন থাকা উচিত নয়—সন্ন্যাসী-নগর হয়ে যায়'। (হাস্য)

শশী। এতই যদি মায়ার ভয় তবে সংসার ছাড়লে কেন?

নরেন্দ্র। রামকে পেলাম না বলে শ্যামকে নিয়ে ঘর করতে ... সংসারী হয়ে কতকগুলো ছেলেমেয়ের বাপ হতে হবে—এমন ... লেখাপড়া আছে? পড়িস্ নি—'দিগন্ত ছাইয়া উড়ে আমার ...র জটাজাল, শুধু মহাকাল হাসে! পলকের লীলা শুধু এক ...ঘাতের খেলা'!

শশী। আমি সন্ন্যাস বা সংসার আশ্রম আলাদা ভাবি না। ...খানে আমার ঠাকুর সেইখানেই আমার তীর্থ। যাই ঠাকুরের ...গ দিতে হবে।

[প্রস্থান।

হরিশ। ওরে, আমার এ ভব-যাতনা আর সহ্য হয় না রে— ...কখানা ছুরি এনে দে রে! (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র। এইখানেই আছে যে—শুধু হাত বাড়িয়ে নিয়ে গলায় বসিয়ে দে রে। (সকলের হাস্য) (আপন মনে পদচারণা করিতে করিতে)—কবি ঠিকই বলেছেন—"জীবন শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল ... মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল!"

(ছুটির দিন—সুরেন্দ্রের খাবার হস্তে প্রবেশ)

সুরেন্দ্র। যাদুরা সব কোথা রে?

নরেন্দ্র। সবাই এখানে স্বশরীরেই বর্ত্তমান, মহারাজ!

(ঠাকুর-ঘরের মধ্যে ঘণ্টার শব্দ হইল, রবীন্দ্র এবার গেরুয়া বস্ত্রে শোভিত হইয়া বাহিরে আসিল ও সকলকে প্রণাম করিয়া ঐ স্থানে বসিল।)

নরেন্দ্র। বেশ হোল!

(সমবেত কণ্ঠে ভজন সঙ্গীত হইল)।

(গীত)

"জয় জয় দেব, জয় মঙ্গলদাতা, জয় মঙ্গলদাতা।
সঙ্কট-ভয়-দুঃখ ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা॥
জয় দেব, জয় দেব।
অচিন্ত্য, অনন্ত, অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু হে।
প্রভু, বিশ্বেশ্বর ব্যাপক, বিভু চিন্ময় পরমাত্মা জয় দেব জয় দেব।
জয় জগবন্ধু দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু নমি তব চরণে
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণে জয় হে, জয় হে
কি আর যাচিব আমরা, করি হে মিনতি, প্রভু
এই লোকে সুমতি দেহ, পরলোকে সুগতি
জয় দেব, জয় দেব।"

(ইতিমধ্যে প্রসন্ন আসিয়া, এক পার্শ্বে বসিল। ভাবাবেশে নরেন্দ্র আ... গান ধরিলেন)—

"... ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা, তু দেওয়ান তু দেওয়ান মে... ইত্যাদি—

...ন্তে শশী ঠাকুর-ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দ্বারের নিকট বসি... গান চলিতেছে)—

"জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার
বিষ্ণু সদাশিব, হর হর মহাদেব—ইত্যাদি

...ে ভক্তিভরে প্রণাম ও মন্ত্র উচ্চারিত হইল)—

"শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং বদামি, শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং ভজামি, শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি, শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং নমামি॥"

[নরেন্দ্রের প্রস্থান।

তারক। (প্রসন্নকে) কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাও। এখানে এমন সাধুসঙ্গ। বিশেষ করে নরেনের মত দুর্ল্লভ সঙ্গ কোথা পাবে?

প্রসন্ন। কি জানেন? মনে ভয়, পাছে বাবা-মার ভালবাসা টেনে নেয়। তাই দূরে যেতে চাই।

তারক। (গম্ভীর ভাবে) গুরু মহারাজের মত কি বাবা-মা ভালবাসতে পারে? মনে পড়ে তাঁর কথা, যাঁর সব সময়েই ব্যস্ততা ছিল কিসে আমাদের সবার মঙ্গল হবে।

প্রসন্ন। তোমার কি কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না?

তারক। (শ্রীমকে) দেখুন, ইচ্ছা হয় নির্জ্জনে সাধনা করি কোনও বাগানে, কিন্তু সংসারীর বাগানে যেতে মন চায় না; টাকার গাদার উপর বসে সুখ নেই, যদি অনির্ব্বাণ আত্মতৃপ্তিতে মন ভরপূর না হয়। শান্তিই একমাত্র কাম্য!

শ্রীম। তা কাঁকুড়গাছিতে রাম বাবুর বাগানে যেতে পারা যায়। ওখানে পরমহংসদেব গেছলেন। বাইবেলেও আছে— নিজের আত্মা নষ্ট করে জগতের প্রভুত্বে কি লাভ?

হরিশ। (হতাশ ভাবে) এ জীবনটাই বৃথা গেল, না হোল জ্ঞান না হোল ভক্তি! কি নিয়ে থাকি?

শ্রীম। জ্ঞানী হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু ভক্ত হওয়া সোজা।

হরিশ। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক ভক্তের মত মনের থেকে কান্না আসে কই?

তারক। পরমহংসদেবকে দেখেছ? ওতেই সব হয়ে যাবে।

শ্রীম। (ভক্তিভরে) অতি সত্য কথা। মহা পুণ্যবলে ঐ পবিত্র সঙ্গ লাভ হয়!

(বুড়ো গোপাল সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ—পশ্চাতে ৪।৫ জন বরাহনগরবাসী)।

নরেন্দ্র। (হরিশকে) এই যে তুইও এসে পড়েছিস্। বড় ভাবছিলাম (ভদ্রলোকদের) গীতায় আছে—'ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়েন মায়য়া'। মায়াবদ্ধ জীব কি ঈশ্বরকে জানতে পারে? কীটস্য কীট তাঁকে ফস্ করে জেনে ফেলবে? তাঁর কৃপা না হলে সাধন-ভজনেও কিছুই হয় না। তাই তাঁর উপর নির্ভর করে শরণাগত ভাব নিয়ে থাকতে হয়। Bibleএ আছে—"Blessed are those who never stumble on me." চলিত কথায় আছে—"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ। তবু না ছাড়িলে আশ, পূরাই মনোবাস।"—(পরে দৃঢ় স্বরে) "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ"। ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করা চাই!

১ম ভদ্রলোক। দেখুন, আজ আপনার সঙ্গে কথা বলে বড়ই তৃপ্ত হলাম। মনের মধ্যে নূতন ভাব জেগে উঠেছে।

নরেন্দ্র। আমি নিজের কথা কিছুই বলিনি। সবই পরমহংসদেবের ভাব। ভগবানের কথা বলেই ভাল লাগছে আপনাদের। তিনি তাই বলতেন—মিছরির রুটি, যেখানেই খাওয়া হোক, মিষ্টি লাগে।

২য় ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করবো।

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) বিরক্ত হবার এতে কিছুই নেই, যখন খুশী

আসবেন। বরং আমরা একঘরে হয়ে আছি। আমরা আত্মীয় পেলে খুসী হবো।

৩য় ভদ্রলোক। আপনাদের উপর পাড়ার সকলেরই অন্ধ ধারণা ছিল। গোটা কতক গুণ্ডামার্কা ছেলে পোড়ো বাড়ীতে আড্ডা নিয়েছে। নিশ্চয় কোন বদ্ মতলব। কিন্তু এখন আমাদের মত বদলে গেছে। এক দিন আমাদের বাড়ীতে আপনাদের ভিক্ষা নিতে হবে।

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) বেশ তো, যেদিন আপনাদের সুবিধা হবে, জানাবেন। সত্যের জয় হবেই। In a changing world nothi·g is constant—এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই স্থায়ী নয়।

৪র্থ ভদ্রলোক। আপনারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, আমরা শুধু গলায় ক'গাছা সুতো পরে বেড়াই।

নরেন্দ্র। দেশকে ভালবাসতে শিখুন, দেশের প্রাচীন রীতি-নীতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখুন। ঐ দু'গাছা সুতোর জোরে আগে প্রকৃত ব্রাহ্মণদের কথায় দেবতারা মর্ত্তে নেমে আসতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে? দেশের মঙ্গল বেশী ভাবলে সরকারের শ্রীঘর বাস। ভয় ভাঙতে হবে, বীর হতে হবে। নিজে জেগে সবাইকে জাগাতে হবে। একার মুক্তি নয়। (হাস্য)

১ম ভদ্রলোক। ভগবান কি প্রার্থনা শোনেন?

নরেন্দ্র। ঠাকুর বলতেন—তিনি সামান্য পিঁপড়ের পায়ের শব্দ শুনতে পান। Efficacy of prayer আছে বই কি? বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। (উত্তেজিত ভাবে) আপনাদের ব্রহ্মণ্য তেজ জাগান। দেখছেন না, ধরিত্রী দেবী সদাই শান্তিহারা। তাই সত্যসুন্দরের অপমৃত্যু হচ্ছে, শুভবুদ্ধির সমাধি ঘটেছে। প্রার্থনা করুন, (সুর করিয়া) 'অসতো মাম্ সদগময়, তমসো মাম্ জ্যোতির্গময়।' (প্রতিবেশিগণ নরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে চেষ্টা করিলে) আমাদের ঠাকুরকে প্রণাম করুন, তিনি কল্পতরু। (শশীকে) এদের প্রসাদ দাও। আবার আসবেন।

[প্রতিবেশিগণের প্রস্থান, নরেন্দ্র, হরিশ, প্রসন্ন ও অন্যান্তের প্রস্থান।

শশী। (দূরে তাঁর পিতাকে আসিতে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন) ওই, বাবা ধরতে আসছেন।

পিতা। (প্রবেশান্তে, পূর্ব্ব-পরিচিত শ্রীমকে) এখানে কর্ত্তা কে? ঐ নরেন ছোঁড়াটাই যত নষ্টের মূল। ওরা তো বাড়ীতে ফিরে বেশ পড়াশুনা করছিল? দল পাকাতে বাড়ী ছাড়ালে।

শ্রীম। (সহাস্যে) এখানে কর্ত্তা তো কেউ নেই। সকলেই সমান, নরেন্দ্রের আর দোষ কি? সে কি করতে পারে? নিজের ইচ্ছা না থাকলে কি কেউ ঘর-সংসার, বাপ-মা ছেড়ে আসে? আমরা কি সব ছেড়ে আসতে পেরেছি?

পিতা। তোমরা তো বেশ করছো গো? দু'দিক রাখছ, এতে কি ধর্ম্ম হয় না? এ রকম ত আমাদেরও ইচ্ছা, এখানেও আসুক আর বাড়ীতেও যাক্। ওর মা-ও কাঁদাকাটি করে।

শ্রীম। আহা, মায়ের প্রাণ!

পিতা। পাজিটা গেল কোথা? বুঝিয়ে বলবে চল, তোমাদের কথা শুনবে। আর তাছাড়া আমি ওকে খুব ভাল সাধুর কাছে নিয়ে যাব—নাম ইন্দ্রনারায়ণ। চমৎকার সাধু, কত চেলা, কত ভক্ত তাঁর।

[শ্রীমর সাথে পিতার প্রস্থান।

রাখাল। (প্রবেশান্তে রবীন্দ্রকে দেখিয়া) এই যে, কখন এ· ? নরেন বেশ বলে—"যতক্ষণ আমার ভিতর কাম, ততক্ষণ স্ত্রীতে , নইলে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ থাকে না।" অনেকে বলে মেয়ে মা· র মুখের দিকে না দেখে ঘাড়টা নীচু করে থাকলেই হয়। সাধুর · ·র ছায়াও স্পর্শ করতে নেই।

তারক। ঠিক কথা। ছোটদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নে·

শশী। (প্রবেশান্তে সহাস্যে) বাবা চলে গেছেন। ··ও অনেক হয়েছে, এবার সকলে প্রসাদ পাবে চল।

[সকলের প্রস্থান

নরেন্দ্র। (সাথে শ্রীম প্রবেশ) আমার আর এ সব কিছু· ··· লাগছে না। কারো সঙ্গে থাকতেও ইচ্ছা নেই। আমার ভেতরের পাগলাটা হুঙ্কার দিয়ে ধমকে বলছে—"সরে পড়"। এবা· ··· করছি, এমন ভাবে সরে পড়বো যে কেউ নাগাল পাবে না, "সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ঃ"। বুদ্ধের বাণী—"হয় মন্ত্রের সাধন নয় শরীর ··ন"। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। আজ দক্ষিণেশ্বরেই রাতটা কাটাতে হবে। যাবেন না কি?

[·স্থান।

শ্রীম। না ভাই, উপায় নেই। দামোদর নদের বুকে যখন বন্যার তোড় নামে তখন জোয়ারে তার দু'কূল ভেসে যায়, তাকে কিছুই বেঁধে রাখতে পারে না। মানুষ কত বাঁধ বাঁধে কিন্তু স· বন্ধন টুটে ভেঙ্গে চুরমার করে সে ছুটে চলে দরিয়ের বুকে মিশতে. সাগরের ডাকের কাছে কোন বাধাই বড় হয় না। (আ· ··· গানের কলি আবৃত্তি করিলেন)—

"ওঠা-নামা প্রেমের তুফানে
টানে প্রাণ যায় যে ভেসে,
কোথা সে যায় কে জানে।
কোথাও বিষম ঘূর্ণপাক,
চোবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে,
দুনিয়া দেখে ফাঁক···"

রাখাল। (প্রবেশান্তে) মনের ঘুম যখন ভাঙ্গে, যখন · সত্যি জাগে—গতিশীল ও জীবন্ত হয়, তখন তাকে চলতি কোনও নিয়মের নিগড়ে বেঁধে রাখা দায়, সে আইন-কানুনের ··· ভেঙ্গে মুক্ত হবেই। ঠাকুর বলতেন—ব্যাকুলতা এলেই অরুণোদ··

(যবনিকা)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রাতঃকাল—বরাহনগর মঠের নিকট—"পরামাণি··" ঘাট, একটি বটবৃক্ষের মূলে যোগীন বিষন্ন চিত্তে আসিলেন—পা··· ···নারীর দল গঙ্গাস্নানে গমনাগমন করিতেছে]

যোগীন। (স্বগত) নরেন, তোর মনে এই ছিল · ফাঁকি দিয়ে সরে পড়লি? ভালবেসে কাঁদালি? মন কেড়ে ··, মন বিলিয়ে দিলিনি রে, পাষাণ? তোর অভাবে সব ·· গেছে। তোকে পেয়ে ঠাকুরের বিরহ-জ্বালাও দূর হতো। ·· অদর্শনে সকলেই শোকে কাতর। সব ফাঁকা, মঠে থাকা · আজ মাধুকরী ভিক্ষার ভার আমার উপর। কিন্তু কিছু· ··· করতে পারছি না। কিছু ভাল লাগছে না। ··· লাজে

ন্নের উদ্দেশ্য। ঠাকুরের উপদেশের ব্যবস্থা এখনও হোল না। কি? কোথা? আচ্ছা, এখানে একটু বসা যাক্। লে বসিল)।

(স্নানার্থীরা আসিল, কেহ ব্যঙ্গ করে চলে গেল, কেহ নিকটে আসিল।)

ম পুরুষ। (সন্ন্যাসীকে) গেরুয়াধারী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, এ চিজ াগে আমদানী হয়নি?

য় পুরুষ। বৈরাগ্য থেকে সন্ন্যাসী a degree higher। কি নকল তাব ঠিক কি?

য় পুরুষ। বেটা কোন দাগী আসামী—পুলিশের চোখে ধুলো খোল বদলেছে।

র্থ পুরুষ। কে বট হে? তুক্-তাকের কিছু জানা আছে? বলায় মিলবে।

ম পুরুষ। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। দেখছ না বুঁদ মেরে বিকেলে আফিস্-ফেরতা তুবিয়ানন্দ চোখে আসল মোলাকাৎ "কলৌ অন্নগতা হি প্রাণাঃ।" এখন চল্।

য় পুরুষ। সেই ভাল, এখন যেতে হবে দেবী নয়, শ্যামের ী ডাকে উভরায়। চাকরী গেলে এই গাছতলা।

য় পুরুষ। শালা বড়বাবু যে চশমখোর, late mark করেও োর্কাটা দেয়।

ম পুরুষ। ঠিক যেন গোদের উপর বিসফোঁড়া—adding ult to injury—চল চল, বেলা বয়ে গেল যে! [প্রস্থান।

োগীন। (স্বগত, সহাস্যে) কি রে শালা যোগে! কেমন জমিদারের ছেলে না? এ সব বসে হজম করতে পারবি? ই আবার মায়ের দল আসছেন। (স্ত্রীলোকদের নিকটে আগমন) দেখা যাক্, মা-লক্ষ্মীরা কি বলেন।

১ম স্ত্রীলোক। (বৃদ্ধা বিধবা সাথে নাতনী, হাতে গঙ্গাজলের ঘটী, ভিজা গামছা মাথার উপর) আহা, কার বাছা রে! কার ঘর আঁধার করে এসেছে রে!

২য়া পৌঢ়া। আহা তাই তো বামুনদি, বাছার মুখখানা শুকিয়ে ছে! সন্ন্যাসীগিরি করা কি ডাল-ভাত-খেকো বাঙ্গালীর দেহে সয়? খাওয়া-দাওয়া নেই। রোদে-জলে-হিমে বাইরে পড়ে থাকতে খোট্টা পশ্চিমে সাধুগুলো তাজা থাকে।

য়া স্ত্রীলোক। কায়েত-গিন্নির কথা মিথ্যে নয়। আমার হয় যে, নিশ্চয় ওর পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

যোগীন। (কৃত্রিম হিন্দুস্থানী কণ্ঠে) তোম্ লোক কা কহতি মায়ী?

৪র্থ স্ত্রীলোক। আঃ মর মুখপোড়া, খোট্টা মেড়ো! ছি দিদি ঘরে সকাল বেলাই অযাত্রা দর্শন হলো, না জানি কি হবে? রাম, রাম!

২য়া স্ত্রীলোক। চোখ দু'টো দেখেছিস্ লা বেণে-বউ? লাল মত ড্যাব-ড্যাব করে নড়ছে।

৩য়া স্ত্রীলোক। গাঁজা-টাঁজা না খেলে ও-রকম চাউনি হয় ? ঝাঁটা মার অমন ভণ্ড সাধুকে।

১মা বৃদ্ধা। বেটা বদমাইসের ধাড়ি। পাড়াতে যে আজকাল চোরের উপদ্রব হয়েছে, এদেরই কাণ্ড। দিনে সাধু গেরস্থর বাড়ী খবর নেয়, আর রাত্রে চুরি করে।

২য়া স্ত্রীলোক। বলি চেলা-চামুণ্ডেরা কোথা? কর্ত্তাকে বলে এক্ষুণি পুলিশে খবর দিতে হবে। এ্যাঁ, এ কি মাড়ালুম গো? ঐ মিনষেটার গয়ার না কি? এই মা! গঙ্গায় শুদ্ধ হয়ে এসে এ কি পাপ হলো? চ দিদি, এ পাপ স্থান থেকে। [সকলের প্রস্থান।

গিরিশ। (প্রবেশান্তে সহাস্যে) বহুত আচ্ছা! কেয়া তোফা! এই শালা সাধু, ক্যায়সা জবর হজমিগুলি মিলতা? ঠিক যেন আকের গুড়ের মত মিষ্টি! কুইনাইনের পিল, নয়?

যোগীন। (সোল্লাসে) আর তুই শালা সব লুকিয়ে দেখে ফেল্লি, সব শুনে ফেল্লি? জানিস্ আমি এখন সাধু-সন্ন্যাসী। যদি আমার রাগ বেড়ে যায়, তাহলে—তাহলে কি যে বলে—

গিরিশ। (সহাস্যে) কি রে শালা সাধু, কথার পুঁজি ফুরিয়ে গেল? ধার নিবি?

যোগীন। ওরে আমার কথার ধুকড়ি রে? আমার ক্রোধ পূর্ণ এবে, ভস্ম করিব তোরে মহেশ্বর প্রায়!

গিরিশ। বেঁচে থাক মোর যাদু মা শীতলাবাসী! এখন চ ডেরায় যাই। কিন্তু মহিম আসছে না?

যোগীন। (সখেদে) হ্যাঁ। কি বলে ওকে সান্ত্বনা দেব! নিজেরাই কাতর। (মহিমের প্রবেশ) মহিম, কেমন আছ? বাড়ীর সব খবর কি? তোমার মা কেমন আছেন?

মহিম। (কাতর স্বরে) বাড়ীর এক রকম অবস্থা। কিন্তু মাকে নিয়েই যত মুস্কিল। ভাল করে খান না, রাত্রে ঘুমোন না। দিন-রাত দাদার জন্য কাঁদেন ও বলেন—"কি শত্রুই আমার পেটে এসেছিল রে। এই বংশে আগেও আর এক জন সংসার ত্যাগ করেছিলেন, এবার তিনিই আমার সোনার চাঁদকে সন্ন্যাসী করে নিলেন।" দাদার কোন খবর পেলেন?

যোগীন। না ভাই, আমরা খুঁজে হয়রাণ হয়েছি, কোনও খবর পেলেই আমরা ছুটে গিয়ে তোমার মাকে জানিয়ে আসবো। তুমি ছেলে মানুষ, কষ্ট করো না।

মহিম। বাড়ীতে টিকতে পারি না; এখানে সকলকে দেখলে থাকি ভাল।

গিরিশ। ঠিক্ কথা বলেছ মহিম, আমি বুড়ো মিনসে, সব কাজ ফেলে ছুটে ছুটে এ শালাদের খবর নিতে আসি। শালারা বেইমান, এ দরদী মন দেখে না।

যোগীন। ঐ দেখ, সব ন্যাংটা বাবাজীর দল আসছে।

(শরৎ, রাখাল, লাটুর প্রবেশ)

গিরিশ। (সোল্লাসে) এই যে সোনারচাঁদরা! চাক্ ছেড়ে সদর রাস্তায় ভন্-ভন্ করতে বের হলে যে? তবে গ্যাঁট হয়ে চেপে sit down কর এখানে। বসে যাও এই গাছতলায়।

(সকলের উপবেশন)

রাখাল। নরেন যখন ছিল তখন কেউই একবারও ঘরের বাইরে যেতে চাইতো না। এখন সবারই উড়ু-উড়ু ভাব। বাইরে বাইরে ঘোরে।

লাটু। জপ-ধ্যানে সময়টা যে কি করে যেত, টের পেতাম না।

শরৎ। মঠের মা ছিল। ঠাকুরের অদর্শনে যখন সকলে কাতর, তখন ওর মুখ চেয়ে আমাদের ঘর-সংসার ছেড়ে এসেও কষ্ট হয়নি। আমার স্থির বিশ্বাস, ওর ভিতর ঠাকুর পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন।

যোগীন। লেটোটা কি কম ধড়িবাজ! নরেনের চেয়ে ও এক ব্লধরের বিচ্ছ; প্রথম রাত্রে ভাল করে নাক ডাকায়। বেশ ভাল শব্দ করেই জানিয়ে দেয় যে, ও ঘুমে অচৈতন্য। তার পর সকলে ঘুমোলে ও উঠে মালা জপতে বসে। এক দিন হাতে-হাতে ধরা পড়েছিল।

গিরিশ। দূর তেরি খোজার দল! আমার মন্তর পড়বি—'খাও, দাও, মজা উড়াও!'

যোগীন। দেখবি রে, শালা, দেখবি পরে। এই খোজার দলই জাতটাকে তোলপাড় করে দেবে। যিশুর সময়ও গোটা কতক খোজাই যেমন সারা দুনিয়াটাকে নিয়ে ভাঁটার মত খেলেছিল, এবারও তেমনি ঠাকুরের দলেরই চাপে ধরাটা টলমল করবে।

শরৎ। ঠিক কথা। Bibleএ আছে—"Some are born unuchs, some make themselves unuchs for the kingdom of heaven."—আত্মবলিদানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যারা মায়ার রাজ্যে ভোগ-বাসনার গণ্ডী ছাড়িয়ে, মোহজয়ী, সুখজয়ী হয়, তারাই অসাধ্য-সাধনকারী, কামনার দাসত্ব করে না—ভোগে সদা উদাসীন, নির্লিপ্ত ভাব, তারাই ধন্য।

রাখাল। আমার বিশ্বাস, ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি আছে সবার প্রতি। তিনি ছিলেন ক্ষুধার অমৃত, তৃষ্ণার মন্দাকিনী, দিব্য জীবন গঠনের অদ্ভুত শিল্পী!

গিরিশ। (দৃঢ় স্বরে) নিশ্চয়ই। তিনি দুর্গতের গতি, তিনি কৃপাময়, পতিতপাবন। আমি তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। (পরে যোগীনকে) হ্যাঁ রে, সেই যে তুই আমার কাছ থেকে বাতি নিতে এসেছিলি, ঘটনাটা মনে আছে?

যোগীন। মনে নেই আবার? সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলুম তিনি কি না আমাকে ফেলে দিলেন তোর মত এক পাঁড় মাতালের মুখে। সেদিন দক্ষিণেশ্বরের বাতি ফুরিয়েছে। আমাকে বললেন—"গিরিশের কাছ থেকে একটা বাতি নিয়ে আয়"। যখন তোমার বাড়ীতে এলাম, তখন দেখি তুমি মদে চুর। লাল চোখে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথা থেকে আসছ?" "কি চাই"? "পরমহংসদেব একটা বাতি চেয়েছেন"—শুনে, তাঁকে অকথ্য গাল পাড়তে লাগলে, আবার সঙ্গে সঙ্গে টিপ্-টিপ্ করে প্রণামও করলে। সন্ধ্যার পর এক প্যাকেট বাতি দিলে। ঠাকুরকে ফিরে গিয়ে যখন বকে বলি—"কোথায় এক মাতালের গাল শুনতে পাঠালে? দোকানে কি বাতি কিনতে পাওয়া যেত না?" ঠাকুর বললেন—"শুধু গালই শুনলি? ওর আসল মনের ভাবটা ধরতে পারলিনি?" আমি অবাক্।

গিরিশ। (সজল কণ্ঠে) শ্রীচৈতন্যলীলায় জগাই-মাধাই উদ্ধার হয়। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় গিরিশ ঘোষ উদ্ধার। সাধে কি শ্রীচরণে বিকিয়ে আছি? তোরা তো সব মার্কামারা গুড্ বয়েজ, তোদের তো ভালবাসবেনই। কিন্তু আমার মত পাতকী, আমার মত নারকী আছে? তাঁকে কত গাল দিয়েছি, কত ব্যথা দিয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। শত দোষ তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেছেন। তিনি ছিলেন মধুময় আনন্দময়, তাই স্নেহময় কোলে স্থান পেয়েছিলুম।

যোগীন। আজ নরেন থাকলে তোমায় নিয়ে কত রঙ্গ চলতো! তোমরা দু'জনে মিললে রসের ফোয়ারা বয়।

গিরিশ। ওরে, তোরা ওর আসল রূপ দেখতে পাসনি। বয়সে ঢের ছোট কিন্তু জ্ঞানে-গুণে সকলের টেক্কা। পরমহংসদেব ... দি ওর বিষয়ে বলেন—"কেশব সেনের ভেতর দেখলাম যে, ৮ ... দি জ্বলছে, আর নরেনের ভেতর ১৮টা বাতি জ্বলজ্বল ... ছে এক দিকে বালকের মত সরল অথচ বীরের মত নির্ভীক ... পাল্লা অমন রসিক, অমন জ্ঞানী, অমন গুণী, অমন সাধক দেখা ... না।

রাখাল। অতি সত্যি কথা।

গিরিশ। সাধনার কথা বলি শোন। শরৎ, তোর মনে আছে কি? যখন এক দিন রাত্তিরে "পঞ্চবটী"তে ধুনী জ্বালি' তুই, আমি আর নরেন বসি? ওখানে ভয়ানক মশার উৎপাত। আমার জপ করা হলো না; চোখ চেয়ে দেখি যে, নরেণ কাঠ ... বসে আছে—সারা গা-টা কাল মশাতে ভরতি! ভয় পেয়ে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে হুঁস্ করাতে সে বললে—"দূর শালা, ভয় কি?"

শরৎ। সত্যি কথা। ঐ পঞ্চবটীতে আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। আমরা দু'জনে জপে বসেছি, ধুনী জ্বলছে। হঠাৎ চোখ মেলে দেখি—একটা বিকট চেহারা এয়া লম্বা-চওড়া ... তেড়ে আসছে! আমি ভয়ে চিৎকার করে দে ছুট। নরেন একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তাকে মারতে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে বললে—"শরৎ, আয় রে, সেটা পালিয়েছে।" বুঝিয়ে দিলে—ওটা পাপ পুরুষ।

রাখাল। নরেন কত বার মরেছে। কাশীপুরের ঘটনা মনে আছে তো? ওপরের ঘরে ঠাকুর অসুখ করে শুয়ে আছেন। নীচের ঘরে কীর্তন শেষে সে ধ্যান করতে বসলো! কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তার হাত-পা সারা দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা, নড়েও না চড়েও না। সকলে ভয় পেয়ে ঠাকুরকে জানাতে তিনি হেসে বললেন—"ভয় নেই"। পরে তার হুঁস হয়।

গিরিশ। ওরে, ছোঁড়াটা বধ করে গেছে আমায় বেশী। তোরা ত সব সমবয়সী, তোদের শোক তো হবেই। কিন্তু আমি বুড়ো মিনসে, কড়া জান, ওর অভাব আমারও চোখে জল আনায়। আমার বইগুলো পাঠাতাম ওর জন্যই। তোদের ... আর যখন-তখন ব্যাখ্যা করে বুঝিতে দিত। ... কি স্মরণ-শক্তি। অনর্গল মুখস্থ বলে যেত! মিলটন, বাইরণ, ... ভারতচন্দ্র, কালিদাস, ভবভূতি। কি বাংলা, কি সংস্কৃত ... সব বিষয়ই তার নখ-দর্পণে। এক দিন তোরা—"মেঘনাদ ... কাব্য" পড়ছিলি যা-তা করে। সে হেসে বললে—"মাইকেল ব ... রা পড়ছে!

যোগীন। সত্যি। কিন্তু বেলা পড়লো। আজ আ ... ভিক্ষা করা হলো না। খাবে কি সব?

গিরিশ! ওরে, আসল কথাই ভুলে গেছি। আজ ... দের পাকড়াও করে বাগবাজারে নিয়ে যেতে এসেছি। চ সব।

যোগীন। (সহাস্যে) দেখ্লি শালা, সাধু-সেবা করতে ... কে ছুটে আসতে হোল।

শরৎ। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—গীতার এই উক্তির ... কি বোঝা গেল।

সকলে—"জয় গুরু মহারাজ কি জয়"!

[... র।

(যবনিকা)

[ক্রমশ ...

"রঞ্জন"

তিন

দেবেশ ডায়েরি রাখে না। ওটা না কি পঙ্গু স্মৃতির সহায়। খোঁড়ার যেমন কাঠের পা। কানার যেমন চশমা। সুস্থের ওতে প্রয়োজন নেই। দেবেশের চশমা না পরে উপায় নেই। জীবন এত দীর্ঘ নয় যে, চশমা ছাড়বার যে চিকিৎসাবিধির কথা সে পড়েছে তার পরীক্ষা করবে। এত অবসর নেই তার। কিন্তু এর বেশী পরনির্ভর হবে না সে। এমনিতেই তার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, দেবেশ নিজেও জানে সে কথা। তাই সে ডায়েরিস্বাধীন। কবে, কোথায়, কখন কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, তা তার কথা দেয়া মাত্র মনে মনে লেখা হয়ে যায়। কদাচ ভুল হয় না।

ভবিষ্যতের চেয়ে আরো বেশি মনে থাকে অতীতটা। এর কিছু ভুলতে পারলে সে বরং খুশি হোতো।

কিন্তু সেদিন বর্ষণসিক্ত রাত্রে ত্রিকোণ পার্ক থেকে দেবেশ যখন বাড়ি ফিরল তখন তার কেবলি মনে হতে থাকল যে, এই সন্ধ্যাটির একটি ইতিহাস লেখার প্রয়োজন আছে, কেন না এ ঐতিহাসিক। এ তো তিনটি ঘণ্টা নয়, এ যে নিরবধি কাল থেকে বিচ্ছিন্ন তিনটি মৃত্যুহীন মুহূর্ত, চিরন্তনী থেকে খসে-পড়া তিনটি পাপড়ি। এ যেন একখানি স্বপ্নগীতি, গাওয়া শেষ হলেও যার সুরের রেশ অনুক্ষণ মনের মধ্যে অনুরণন করতে থাকে। দেবেশের সাধ হোলো এর স্বরলিপি রচনা করবার।

লিখতে বসে দেখল, ভাব কেঁদে মরে, ভাঙা ভাষা। অক্ষম প্রকাশে সে অবমাননা করবে না তার অপরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাসকে। যাহা তার অনির্বচনীয়, সে অনুক্তই থাকবে। লাঞ্ছিত হবে না বাচনের দৈন্যে। কলম হাতে নিয়ে বসে রইল দেবেশ। কাগজ রইল সাদা। মন রইল ধোঁয়াটে।

আসলে গদ্যের সাধ্যই নয় এই অনির্বচনীয়ের যথোচিত প্রকাশ। কচিৎ কখনো যাকে পাওয়া গিয়েছিল "ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে", সে কি ধরা দেবে গজেন্দ্রগমন গদ্যের দু'টি বাক্যে? সুর দিয়ে যার চরণ ছুঁয়ে যাই, কাব্য পারে শুধু দূর থেকে তাকে নমস্কার জানাতে। গদ্যের প্রবেশেরই অধিকার নেই। তবে কি গান গাইবে দেবেশ? হায়, যদি পারতো! তবে কি কাব্যরচনা করবে? কিন্তু তার জন্যে যে-ট্র্যাঙ্কুইলিটি চাই দেবেশের তা কোথায়?

গদ্য নিজে অক্ষম। সঙ্গীতে সে অক্ষম। কাব্য নয় আজকের মনের স্বাভাবিক ভাষা, সীমাবদ্ধ তার বাহনক্ষমতা। তাহোলে কোন্ মাধ্যমে দেবেশ সন্ধান করবে তার অনির্বোধ্য অভিজ্ঞতার যথাযোগ্য প্রকাশ? সাংবাদিকতাই আজকের দিনের সাহিত্য, এই ঔদ্ধত্যটা শুনেছে দেবেশ। মানেনি। জ্ঞানবৃক্ষ সেখানে সংবাদ-অরণ্যে ভ্রষ্ট, উপলব্ধি সেখানে জ্ঞানারণ্যে নিরুদ্দেশ। উভয়ই সাহিত্যের অপরিহার্য উপজীব্য! তবে? দেবেশ একটি-একটি করে প্রত্যেকটি মাধ্যম পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোলো যে, অন্তত তার নিজের জন্যে, পত্রই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পত্রের আবেদন পাত্রবিশেষের কাছে, কিন্তু সেটা প্রাথমিক মাত্র। সাহিত্যগুণসমন্বিত এবং সার্বজনীনতাবিশিষ্ট হলে পত্রের আবেদন উদার বিশ্বে ব্যাপ্ত হতে বাধ্য। তাছাড়া, বর্তমান মুহূর্তে দেবেশ বিশ্ব নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিল না। ব্যক্তিবিশেষে সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হয়েছিল। সে ব্যক্তি মালতী গুপ্তা।

তাই ঠিক হোলো। দেবেশ চিঠি লিখবে মালতীকে। সহস্র বার পড়া মালতীর চিঠিখানি আবার পড়ে নিয়ে লিখতে বসল দেবেশ। সুরু করল তার মনের ট্র্যাংকুইলিটির বর্তমান দৈন্য নিয়ে। তার পর সাড়ম্বর ধন্যবাদ দিল মালতীর সদয় পত্রের ও সান্নিধ্যের জন্যে। সান্নিধ্যের প্রসঙ্গেই এসে পড়ল পত্রলেখকের মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতার কথা। প্রথমে হোলো নিঃসঙ্গতা নিয়ে দার্শনিকতা— সে একবার না কি সত্যি স্থির করেছিল যে, পণ্ডিচেরী যাবে বা ট্র্যাপিষ্টদের খাতায় নাম লেখাবে—এবং তার পরে নিজেরই অজান্তে চলে এসেছিল এমন একটা আলোচনায়, যার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, সান্নিধ্যে মিলয়ে কৃষ্ণ, একা বহু দূর।

শেষ পর্যন্ত দেবেশের পত্র যে-আকার ধারণ করেছিল তা গুরু-গম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের, পত্রের নয়। অনেক দিন পরে, মালতীই এক দিন বলেছিল যে, এই চিঠিখানি দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে কর্ণেল রণেন গুপ্তকে উপহার দিলে কিছুমাত্র বেমানান হোতো না।

কথাটা মিথ্যা নয়।

কিন্তু চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলবার আগে দেবেশের মনে হোলো যে, মালতীর ঠিকানা জানা প্রয়োজন। বাড়িটা সে চেনে, কিন্তু সঠিক ঠিকানাটা কী? ঠিক এই জন্যেই দেবেশ টেলিফোন করল উত্তর মিলল অপরিচিত পুরুষ-কণ্ঠে। দেবেশের সাহস হোলো না, এমন লোকের কাছে মালতীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে, কিন্তু বিনা প্রশ্নেই এটুকু সংগ্রহ করল যে, মালতী পূর্বরাত্রে কলকাতা ত্যাগ করে নৈনিতাল গেছে।

নৈনিতাল? হঠাৎ! কিছু না বলে! দেবেশ চিন্তিত হোলো। উদ্বেগের প্রশমনের জন্যে প্রশ্ন করবার আগেই অপর পক্ষ টেলিফোন রেখে দিয়েছিল পরম বিতৃষ্ণাসহকারে। কিন্তু, দেবেশ টেলিফোন রেখে দিয়ে ভাবল, নৈনিতাল যেতে তো কোনো বাধা ছিল না, বরং জানাই ছিল যে, সে যাবে, তবে এমন আকস্মিক ভাবে, বিনা নোটিশে যাবার কারণ কী? বিপত্তি কিছু ঘটেনি তো? বাড়ি থেকে টেলিফোনের যে উত্তর দিয়েছিল—সে যেই হোক—তার স্বরে উদ্বেগের সুর ছিল না। দেবেশ তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত হোলো। কিন্তু মালতীর আকস্মিক অবিজ্ঞাপিত অন্তর্ধানে দেবেশের মন যে নিদা-

অপ্রীতিকর বিস্ময়ে ভরে উঠেছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

দেবেশ নিজেও জানতো যে, সে ঠিক শান্ত নয়। টেলিফোন রেখে দিয়েই সে তার ঘরে পায়চারি সুরু করেছিল। এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক! নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য-স্থলে পৌছোবার জন্যে নয়, এমনি, শুধু সঞ্চরণের জন্যে। মানসিক চাঞ্চল্যকে শারীরিক চাঞ্চল্য দিয়ে পরাস্ত করবার জন্যে।

কিছুক্ষণ পরেই বিফল দেবেশ চেয়ারে বসল। শারীর স্থিরতা যদি আনে মানসিক প্রশান্তি! হতভাগ্য দেবেশ এই প্রচেষ্টায়ও পূর্বাপেক্ষা সফলকাম হোলো না। চিঠিটা কলকাতার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার পরেও নানা ভাবনা তার মনকে জর্জরিত করতে থাকল।

নিঃসঙ্গতার প্রসঙ্গটা দেবেশের মনকে আলোড়িত করেছে বহু দিন। শৈশবে ও কৈশোরে সে সঙ্গ-সন্ধান করেছে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিতে—জড়ের মূক অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু মেলেনি—, সঙ্গ-সন্ধান করেছে মানুষের বন্ধুত্বে—সেখানেও শীতলতা বা কৃতঘ্নতা ছাড়া আর কিছু মেলেনি দেবেশের ভাগ্যে। বন্ধুদের দোষ দেয় না দেবেশ এ জন্যে। সে জানে যে, শীতলতা তার স্বভাবে, স্বাতন্ত্র্য তার চরিত্রে! সে মিশেছে সবার সঙ্গে, কিন্তু আপন ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে সবক্ষণ, এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে একীভূত করেনি বান্ধবদের সঙ্গে; তার দলের সে সহযাত্রী, কিন্তু সে যেন কম্প্যাস; দলের গতি ও গতি যেদিকেই হোক, তার নিজের নিষ্পলক দৃষ্টি রয়েছে উত্তর দিকে। দক্ষিণে সে গেছে, পূর্বে সে পা বাড়িয়েছে, পশ্চিমে সে তাকিয়েছে, কিন্তু চরম লক্ষ্য নিমেষ মাত্রের জন্যেও উত্তর থেকে বিভ্রান্ত হয়নি। সে-লক্ষ্য তার আত্মাবিষ্কার। দেবেশ আত্মোপলব্ধি কথাটা ব্যবহার করতে ভয় পায়, যদি কোনো মিস্টিক সংস্কার এসে দৃষ্টিকে করে আচ্ছন্ন কিন্তু, সত্য বলতে কি, দ্বিতীয় কথাটার দিকেই তার পক্ষপাত।

এই নিজকে সে কোথায় পাবে? নিজের মধ্যে? চেষ্টা করেছে। আজো পায়নি। আশা ছাড়েনি। ভেবেছে, পরে পাবে। আজ নয়, কেন না সে নিজে তো এখনো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নির্মীয়মান। সামান্য তার জ্ঞান, সামান্যতর তার অভিজ্ঞতা। এই অসম্পূর্ণতার মধ্যে যে-নিজকে পাওয়া যাবে সে কেমন পাওয়া? তা নিয়ে কি দেবেশ তুষ্ট হতে পারে? কত জিনিস, কত জন, কত জানা রইল তার আয়ত্তের বাইরে। তবু সে যতটুকু জানে তাকেই সে জানা বলে মানবে কেমন করে? অত অল্প নিয়ে আর যেই তুষ্ট থাক, দেবেশ থাকবে না। সবার যাতে তৃপ্তি হোলো তাহার তাতে হোলো না।

•

নিজকে ছেড়ে আত্মীয়পণ্ডী অতিক্রম করে দেবেশ প্রথম যার মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে পেলে তার নাম মালতী। সে ছায়া ধরতে যাবার আগেই মিলিয়ে গেল সুদূর দিগন্তে, দেবেশের শূন্য মুঠি ফিরে এলো নৈরাশ্যের সওদা নিয়ে!

কিন্তু এ ফিরে-আসা যেন ঠিক ফিরে আসা নয়। স্থানে আর কালে এই এক বিরাট প্রভেদ। কাল আমি কলকাতা থেকে বর্ধমান যেতে পারি এবং বর্ধমানে হর্ষবর্ধন না হলে কলকাতায় ফিরে আসতে পারি। যে-কলকাতা ত্যাগ করেছিলেম আর যে-কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেম, এ দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ সামান্যই। কিন্তু কালের বেলায় প্রত্যাবর্তন নেই। আষাঢ়ে যে দেবেশ মালতীকে পেয়েছিল, ভাদ্রে সে পারে না মালতীকে হারিয়ে পুনরায় আষাঢ়ে ফিরে যেতে। যে-আষাঢ় বিদায় নিয়েছে সে আর ফিরবে না, তার কাছে দেবেশ ফিরবে কী করে?

শুধু তাই নয়। আষাঢ়ের দেবেশও গেছে আষাঢ়ের সঙ্গে। ভাদ্রের ভরা দেবেশের উপায় নেই আষাঢ়ের ভিখারীর কাছে ফিরে যাবার। আবার দেবেশ একা, কিন্তু আগের মতো নয়। আগে সে ছিল দ্বন্দ্বহীন, বিত্তহীন। আজ সে হৃতবিত্ত, সঙ্গিহীন। দ্বিতীয়ের বেদনা বহু গুণ, কেন না তার সুখস্মৃতি কণ্টক হয়ে বেদনাবোধকে সর্বক্ষণ জাগ্রত করে রাখছে।

বাণী-বিসর্জনকে দেবেশ সাগ্রহে অভিনন্দন জানিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল। বাণী তার জীবনে স্বাগত অভিশাপ হয়ে এসেছিল; অভিশাপ-বিদায়ে তাই সে অশ্রু বিসর্জন করা তো দূরে থাক, খুশি হয়েছিল। পুনরুক্তদার হয়ে দেবেশ পুনর্নবেশ হয়েছিল, ভেবেছিল বাকি জীবন নির্বিঘ্নে নিয়োজিত করতে পারবে অধ্যয়নে, রচনায়, সৃষ্টিতে। যা তার জন্মের সাধ।

কিন্তু পুনর্জন্ম হোলো মালতীর আবির্ভাবে। অল্পই সময় থাকল অধ্যয়নের জন্য। রচনাকে মনে হোলো সুইনার্টন-বর্ণিত দোয়াতে-পড়ে-যাওয়া পোকার বিচরণের মতো নিরর্থক। আর সৃষ্টিকে মনে হোলো অনাসৃষ্টি বলে।

দেবেশ কি সত্যি মালতীর প্রেমে পড়েছিল? মালতী কলকাতায় থাকা অবধি দেবেশ নিজেকে এ-চিন্তাটা মাথায় আনতে দেয়নি। সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ইত্যাদি নানা মিথ্যা ছদ্মবেশে

এই সম্ভাবনাটাকে সে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আজ যখন টেলিফোন করে জানল যে, মালতী নৈনিতালে নিরুদ্দেশ, তখন এই প্রশ্নটা দেবেশের মনকে প্রায় পুরোপুরি অধিকার করে বসল। সত্য উত্তরটা যতই দেবেশের উপলব্ধিতে প্রক্ষিপ্ত হতে থাকল ততই সে সজোরে তাকে প্রত্যাখান করতে প্রয়াস করল। হ্যাঁ বলতে বাধল, কিন্তু না বলতে পারল না কিছুতেই।

হ্যাঁ হোক, না হোক, এ দু'য়ের একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ—নাট্যকার দেবেশের মতে। বিশ্বনাট্যের কর্তা যে নাটক-রচনার সকল অনুশাসন অমান্য করে আপন অভিরুচি অনুযায়ী যদৃচ্ছ নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, দেবেশের এ তথ্য জানা ছিল না। বৃষ্টি-ভেজা ত্রিকোণ পার্কে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীতে মালতী ও দেবেশ যে পূর্ণতার ইঙ্গিত পেয়েছিল, বিধাতার কাছে সেটা মনে হয়েছিল শুধু শুরু বলে। বিপদ হচ্ছে এই যে, নাট্যকার দেবেশ সত্ত্বেও, নাটকের উপর সেখানে যবনিকা পড়ল না। পলায়মানা মালতী দেবেশের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেল না, ফেলে-যাওয়া দেবেশ পারল না নিজের মন থেকে মালতীকে নির্বাসন দিতে।

পরীক্ষাটা দেবেশের পক্ষে তোলো কঠোরতম। গতির বিক্ষেপ, দৃশ্যের পরিবর্তন, চলিষ্ণু বিয়োগের দূরত্বের ক্রমবর্ধমানতা পলায়মানার চিত্তে আনয়ন করে কিছু শান্তির আবেগ, কিছু সান্ত্বনার প্রলেপ। কিন্তু পিছনে যে পড়ে থাকে তার অভিশপ্ত সঙ্গী সে নিজে। আর তার সঙ্গে থাকে ঐ শূন্য চেয়ারটা, ঐ শূন্য পার্কটা, ঐ শূন্য রাস্তাটা—সব কিছু সেই প্রিয়তমার স্মৃতিবিজড়িত। সেখানে পা ফেলতে সূচীবেধ হয়, পা তুলতেও তাই। ইস্কুলে-পড়া কবিতায় দেবেশ মসজিদের সামনে ঘুমিয়ে-পড়া মুসলমানের পদরক্ষণ সমস্যার কথা জেনেছিল। কোথায় খোদা নেই, যেখানে সে পা রাখতে পারে খোদার অবমাননা না ক'রে? এখন দেবেশ যেন অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হোলো।

যাই হোক, চিঠিটা পাঠিয়ে দেওয়া যাক। কলকাতার ঠিকানায় পাঠালে যথাসময়ে নৈনিতালে পৌঁছোবে।

একটু পরেই দেবেশের স্টেনোগ্রাফার এলো এক রাশি কাগজ-পত্র নিয়ে। "স্যার,—"

দেবেশ তৎক্ষণাৎ যেন অপর এক জগতে ফিরে এলো। আত্মানুচিন্তনের অন্ধকূপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেবেশ যেন পেল মুক্ত হাওয়ার প্রাণদায়ী নিশ্বাস। আগেকার জগতে সে ছিল একা, নিরুদ্ধনিশ্বাস। তার পরে মালতী এলো দেবেশের মনের দরজা খুলে। সে দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হয়েছে। রুদ্ধতার চিন্তায় যখন শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল তখন এলো স্টেনোগ্রাফার। এমনিতেই কারণে-অকারণে দেবেশের ধন্যবাদ দেওয়া অভ্যাস। এখন সে আরো বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, "থ্যাংক য়ু ভেরি মাচ্।"

ফাইল খুলেই দেবেশ দেখল স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানলিপি। মনে পড়ল যে, বিশেষ করে এই জন্যেই সে দিল্লী থেকে কলকাতায় প্রেরিত হয়েছিল। বেশির ভাগ অনুষ্ঠানেরই প্রস্তাব সে নিজে হাতে আগে পাশ করেছে, কিন্তু এখন সেগুলির নীচে সে তার নিজের সই দেখে যেন বিস্মিত হোলো। গত কয়েকটা সপ্তাহ অফিসের সব কিছু তার মন থেকে এমন নিশ্চিহ্ন ভাবে অপসৃত হয়েছিল যে, এখন সেগুলিকে প্রায় অপরিচিত বলে মনে হোলো।

প্রেম কাছে আনে, এক জনের কাছে। আর সেই সঙ্গে দূরে সরিয়ে নেয় আর সকলের কাছ থেকে। প্রেম কেবল মাত্র দু'টি প্রাণীকে নিয়ে গড়ে তোলে প্রজাহীন একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য, সেখানে এক জন রাজা আর দ্বিতীয় জন রাণী। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বা বস্তুর প্রবেশাধিকার নেই সে রাজ্যে। সেই স্বপ্নসৌধে অবস্থানকালে এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয় না যে এর বাইরে কিছু আছে, বা যা আছে তার কিছুমাত্র মূল্য আছে। স্বপ্নাবসানে বাস্তবে পরিবর্তন করে চতুর্দিকের পরিবেশকে প্রথমে মনে হয় অপরিচিত, পরে অকিঞ্চিৎকর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেবেশ দ্বিবিধ অবস্থা অতিক্রম ক'রে অনুশোচনার সঙ্গে আবিষ্কার করল যে, ঈশকণ্ঠের কঠোরা কন্যাকে সে অবহেলা করেছে। ফাইলের পাতা উল্টেই দেখল যে, সঙ্গীতানুষ্ঠানের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ ইতিমধ্যেই দিল্লীর দরবারে পেশ করা হয়ে গেছে। শিল্পীদের নাম সমেত সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে "ইণ্ডিয়ান লিসনারে"। এখন সেখানে সামান্য পরিবর্তন-সাধনেরও উপায় নেই। কথিকা বিভাগেরও প্রধান অনুষ্ঠানগুলির সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয়ে গেছে, বাকি আছে শুধু দু'য়েকটা গৌণ অনুষ্ঠান। তা নিয়ে দেবেশ এখন কী করবে? কোথায় প্রকাশ পাবে তার মৌলিক পরিকল্পনাগুলি? কোথায় বিকাশ ঘটবে তার আপন বাক্-প্রতিভার? চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মতো দেবেশও সারা জীবন নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল এই দিনটির দিকে, আজ যখন সেই স্বাধীনতা দিবস সমাসন্ন তখন সে তার আনন্দই বা নিবেদন করবে কোন সুযোগে? ফাইল সই করে কর্মচারীর কর্তব্য সম্পাদন হয়, দেবেশ তা করেছে। কিন্তু সর্বোপরি সে যে শিল্পী। শিল্পী দেবেশের অর্ঘ্য কোথায় স্বাধীনতার আনন্দোৎসবে?

দেবেশের মনে আনন্দ ইতিমধ্যে মালতীর সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ের অন্তর্ধানে প্রথমও হয়েছিল অন্তর্হিত। তাই আজ স্বাধীনতার মতো সর্বজনীন আনন্দোৎসবের সামনে দাঁড়িয়েও দেবেশ রইল তৃষ্ণার্ত; আনন্দের আসন্ন কোলাহলের কেন্দ্রে দাঁড়িয়েও তার নিজের কণ্ঠ রইল মূক। বিষণ্ণ মনে নিরুৎসাহ হাতে সামনের ফাইলটায় দেবেশ লিখে দিল যে বাকী দু'টি অনুষ্ঠান অর্থাৎ মজুর মণ্ডলী ও পনেরই অগাস্টের উৎসবানুষ্ঠানের প্রতিবেদনের ভার সে নিজেই নেবে।

গত কয়েকটা সপ্তাহ দেবেশ ভালো করে খবরের কাগজ পড়েনি। কাগজে যে জগতের খবরাখবর প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে দেবেশের কৌতূহল ছিল অল্পই, কেন না সে নিজে সাময়িক ভাবে স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা হয়েছিল। এখন কাগজটা তুলে নিল দেখতে যে সাত দিন পরে সহরে কী কী অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং কোথায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভের তলায় শূন্য স্থান ইঞ্চি ভর্তি করবার জন্যে যেখানে মনীষীদের বাণীমঞ্জুষা মুদ্রিত হয়, সেখানে হঠাৎ দেবেশের চোখ পড়ল। দেখতে পেল গ্যেটের উক্তি : LIVE IN THE ALL

তখনই দেবেশের মনে পড়ে গেল ঠিক কী অবস্থায় এবং কোন প্রশ্নের উত্তরে জর্মান কবি এ কথা বলেছিলেন। এরই মধ্যে দেবেশ যেন পেল তার বর্তমান সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত, যেন পেল তার ব্যক্তিগত বেদনার সর্বজনীন প্রলেপ।

তাই করবে দেবেশ। এত দিন সে সহস্রের বেদনা বিস্মৃত হয়ে সন্ধান করেছে আপন আনন্দ। আজ সে আপন বেদনার বিস্মরণে সন্ধান করবে সহস্রের আনন্দের মধ্যে। [ক্রমশঃ।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
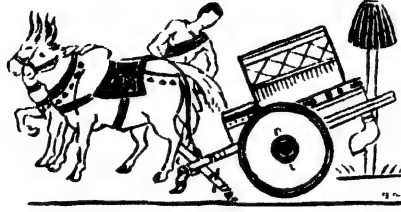
ইতিহাসের পটভূমিতে ভারতের বাণিজ্য-পথ (২)

স্বধাংশু ঘোষ

সতের শতকের গোড়ার দিকে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের হাত থেকে ইংরেজরা প্রাচ্যের বাণিজ্যের বল্গা ছিনিয়ে নেয়। সাম্রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্যের দ্বিমুখী অভিসন্ধি এবং ধর্মান্ধতার মধ্যে পর্তুগীজদের চরম পরাজয় নিহিত ছিলো। গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত ইনকুইজিশনের রক্তের প্রবাহে তাদের বাণিজ্যের স্বপ্ন ডুবে যায়। তবু তারা মাথা তুলতে চেষ্টা করেছিলো, আর ওলন্দাজদের থেকে তারাই ইংরেজদের বাধা দিয়েছিলো বেশি। ওলন্দাজরা ছিলো আরো কূটকৌশলী আর কিছুটা নরমপন্থী। সুসংবদ্ধ ভাবে তারা এগোয়, কিন্তু তবু তারা ব্যর্থ হয়। তখন হাওয়া বইছিলো ইংরেজদের অনুকূলে। অলিভার ক্রমওয়েলের কাছে ওলন্দাজরা চরম পরাজয় মেনে নেয়।

প্রাচ্যের দেশগুলিতে, ইংরেজদের বাণিজ্যের অগ্রগতি এর পর বাধা পায় ফরাসীদের কাছে। কয়েক জন দূরদর্শী ফরাসী ব্যবসায়ী ইংরেজদের শঙ্কিত করে তোলে। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে সজ্ঘর্ষে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের মত ফরাসীদেরও পরাজয় মেনে নিতে হয়। ভারত-সমুদ্রের বাণিজ্য ইংল্যাণ্ডের একচেটিয়া হয়ে পড়ে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র ইংল্যাণ্ড পারস্য উপসাগর থেকে হংকং পর্যন্ত ক্ষমতার সুদীর্ঘ বাহু বিস্তার করে।

সম্পূর্ণ ষোল শতক ধরে ইংরেজরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ষোল শতকের শেষ দিনে এলিজাবেথ একটি সনদে স্বাক্ষর করেন। 'দি গভর্ণর এ্যাণ্ড কোম্পানী অফ মার্চেণ্টস অফ লণ্ডন ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ' নামে এক সমিতি গঠিত হয়। অনেক কারণে আরো কয়েকটি ছোট ছোট সমিতি গড়ে ওঠে, কিন্তু পরে তারা এই মূল সমিতির সঙ্গে মিশে যায়।

পণ্য নিয়ে প্রথম যে বাণিজ্যিক নৌবহর ভারতের দরিয়ায় এসে পৌঁছোয় তাদের সামনে বাধা আসে অসংখ্য। তখন গুদাম নির্মাণের জমি তারা পায়নি, লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষা করবার মত যথেষ্ট ক্ষমতাও তাদের ছিলো না। জমি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধের জন্য আলোচনা করতে দিল্লীতে তারা প্রতিনিধি পাঠায়। ফলে তারা সুরাট প্রভৃতি জায়গায় কারখানা নির্মাণের অনুমতি পায় এবং আত্মরক্ষা করবার সুযোগ-সুবিধে লাভ করে।

১৬০৯ সালে নতুন সনদ স্বাক্ষরিত হয়। ১৬১৩ সালে তারা সুরাটে কারখানা গড়বার রাজকীয় ফরমান পায়। কূটকৌশলী স্যার টমাস রো আজমীরে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সমগ্র দেশে বাণিজ্যিক লেন-দেন চালাবার অনুমতি আদায় করেন।

১৬৩৪ সালে 'দি আসাদা মার্চেণ্টস' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমিতি মোগল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উড়িষ্যার পিপলী বন্দরে বাণিজ্য চালাবার অনুমতি পায়। ১৬৪৪ সালে এই নতুন সমিতি পুরোনো কোম্পানীর সঙ্গে মিশে যায়। ১৬৪০ সালে করমণ্ডল উপকূলের ঐ অঞ্চলের রাজা সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন।

কয়েক বছর পরে সাজাহান ইংরেজদের হুগলী নদীর তীরে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়বার অনুমতি দেন। বাঙলায় ইংরেজদের দুরভিসন্ধি সফল করবার সুযোগ তখনি প্রথম আসে। ১৬৫০ সালে ইংরেজরা কলকাতায় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে।

১৬৯৮ সালে 'দি জেনারেল সোসাইটি ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী এক সনদ লাভ করে। মিঃ এণ্ডার্সন তাঁর 'বাণিজ্যের ইতিহাসে' এই দুই কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আত্মঘাতী বলে বর্ণনা করেন। পাঁচ বছর পরে একটি সম্মিলিত কোম্পানী গঠিত হয়। ১৭১১ সালে রাণী এ্যানের সদনে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' সংহত শক্তি স্বীকৃতি পায় এবং প্রাচ্যের দেশগুলিতে বাণিজ্য চালাবার নতুন সুযোগ-সুবিধে লাভ করে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে উঁচু রাস্তার সাহায্য না নিয়েও গ্রীষ্মকালে যানবাহন চলাচল করতে অথবা গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর চলাচলে কোনো অসুবিধে হতো না। বর্ষাকালে অবশ্য ওই সব প্লাবিত সমতল ভূমিতে পণ্যবাহী উটের দল চলতো না অথবা একান্ত প্রয়োজন না হলে সেনাবাহিনী ঐ সমতল ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে অগ্রসর হতো না। তখন উঁচু পথগুলো দিয়ে তারা চলতো, আর ভারতে এই সুদীর্ঘ পথের সংখ্যা কিছু কম ছিলো না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনেক পথের দৈর্ঘ্য বাড়ায়, অনেক নতুন পথ তৈরি করে এবং অনেক পুরোনো পথের সংস্কার সাধন করে। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ১৪২৩ মাইল পথে ১৪ লক্ষ ২৩ হাজার পাউণ্ড, কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ১০০২ মাইল পথে ৫ লক্ষ পাউণ্ড, মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর পর্যন্ত ২০০ মাইল পথে ৩৭ হাজার ১ শ' ২১ পাউণ্ড, বোম্বাই থেকে আগ্রা পর্যন্ত ৭৩৪ মাইল পথে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬ শ' ৭৬ পাউণ্ড

এবং রেঙ্গুন থেকে প্রোম পর্যন্ত ২০০ মাইল পথে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড কোম্পানীর ব্যয় হয়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান শহরগুলিকে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা-পেশোয়ার ট্রাঙ্ক রোড। দিল্লী থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' নামে পরিচিত এই সুদীর্ঘ পথকে পেশোয়ার পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। নদীতে সেতু নির্মাণ করে এই সব পথের গতি অব্যাহত রাখা হয়; কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ফেরীর সাহায্যে গঙ্গা ও শোণ নদী অতিক্রম করা হতো। কলকাতা থেকে বারাণসী এবং সেখান থেকে মীর্জাপুর, জব্বলপুর ও নাগপুর হয়ে এই পথ বোম্বাইয়ে পৌঁছেছে। মীর্জাপুরের পর থেকে এই পথের নাম দেয়া হয় 'গ্রেট ডেক্কান রোড'।

কোম্পানীর আমলে জলপথেই প্রধানত কলকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। কিন্তু তার পরই স্থলপথে যোগাযোগ স্থাপনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া হয়।

বোম্বাই থেকে পুণা পর্যন্ত দীর্ঘ পথটির যথেষ্ট সংস্কার সাধন করতে হয়। এই পথের ভোরঘাট পর্যন্ত শুধু গরুর গাড়ী, কুলি প্রভৃতি অতিক্রম করতে পারতো। ১৮৩০ সালে তের হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে একে সব রকম যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা হয়। বোম্বাই-আগ্রা রোডের থলঘাটেরও অনুরূপ সংস্কার করতে হয়েছিলো।

লাহোর থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অংশটি ২৭৫ মাইল দীর্ঘ। পাঞ্জাবের সীমারেখা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত এই পথের জন্য ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮ শ' ৮৮ পাউণ্ড ব্যয় হয়। জলন্ধর থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্য্যন্ত পথ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এই সময়ে।

পাঞ্জাবের পথগুলিকে সার হেনরী লরেন্স সামরিক ও বাণিজ্যিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। বাণিজ্যিক পথগুলিকে তিনি আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পথ হিসেবে স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্য বিচারের সময় তিনি পথগুলির প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু সামরিক পথগুলিও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। লাহোর থেকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অংশটিকে তিনি সামরিক পথের শ্রেণীভুক্ত করেন, কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-পথও ছিলো।

সার হেনরী লরেন্স ও সার জন লরেন্স পাঞ্জাবের বহির্বাণিজ্যের জন্য অনেকগুলি পথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। একটি পথে লাহোরের সঙ্গে দেরা ইসমাইলখানকে যুক্ত করা হয়, অপরটি দেরা ইসমাইলখান থেকে সিন্ধু সৌগর দোয়াব ও বড়ী দোয়াব হয়ে উলোহরে দিল্লী রোডে মেশে। এখান থেকে আভ্যন্তরীণ পথ টানা হয় মুলতান পর্যন্ত। এই পথগুলি নির্মাণের পূর্বে গজনী থেকে যে পণ্যবাহী উটের দল দিল্লীতে আসতো, তাদের এক বিপদসঙ্কুল ও জটিল পথ বেয়ে আসতে হতো। দেরা ইসমাইলখানের নিকটে সাবমনী গিরিদ্বার থেকে যাত্রা শুরু করে সিন্ধু সৌগর দোয়াবের রুক্ষ প্রান্তরের অনেক আঁকা-বাঁকা বন্ধুর পথ পেরিয়ে তারা চলতো উত্তরে লাহোরের দিকে; লাহোর থেকে ফিরোজপুর বা লুধিয়ানা অথবা ভাওয়ালপুর ও অন্যান্য কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ডিঙিয়ে তারা পৌঁছোতো মুলতানে। বিভিন্ন এলাকার সীমা অতিক্রম করার সময় তাদের প্রচুর শুল্ক দিতে হতো। সার হেনরী লরেন্স ঝিলাম নদীর তীর দিয়ে পথ টেনে মুলতান ও ঝিলামকে এবং চেনাবের তীর বরাবর পথ টেনে ওয়াজিরাবাদ ও সিয়ালকোটকে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করেন।

পাঞ্জাবের মত প্রদেশের কঠিন মাটিতে পথ নির্মাণের পরিকল্পনার সঙ্গে কূপ-খননের পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে হয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে যখনই এই সব অঞ্চলে পথ নির্মাণ করা হয়েছে, তখনই তার পাশে দূরগামী পথিক ও পণ্যবাহী উটের দলের জন্য অনেক কূপ খনন করতে হয়েছে। পাঞ্জাবে এমন একটি দীর্ঘ পথ নেই, যাকে নিষ্করুণ মরুভূমি পেরিয়ে যেতে হয়নি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে মৌকসী পাট্টা করে বসেছে, পশ্চিমী কেতায় ভারতের সম্পদ শোষণের জন্য জটিল জাল বিস্তার করেছে, তখন অপমানিত দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে নানা দিকে। সিপাহী বিদ্রোহ অন্তত সাময়িক ভাবে ইংরেজদের অনেক পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়।

ব্যক্তিগত মূলধনে ভারতে রেলপথ নির্মিত হয়। কোম্পানী প্রথমে চার হাজার একশ' আটান্ন মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত এক হাজার চারশ' মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করেন। এর শাখা বর্দ্ধমান থেকে রাণীগঞ্জ এবং মীর্জাপুর থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত পৌঁছোয়।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী প্রথমে কলকাতা থেকে পাবনা পর্যন্ত একশ' ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রেলপথ তৈরি করেন। এর একটি শাখা যশোহরে পৌঁছোয়। এই রেলপথকে কিছু দিন পরে ঢাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়।

মাদ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানী মাদ্রাজ থেকে বেইপুর পর্যন্ত চারশ' ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করেন। মাদ্রাজ থেকে কাদাপ্পা ও বেলারী হয়ে তিনশ' দশ মাইল দীর্ঘ আর একটি রেলপথ কৃষ্ণা নদীর কাছে বোম্বাই থেকে আগত একটি রেলপথের সঙ্গে মেশে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা কোম্পানী সর্বপ্রথম বোম্বাই থেকে কল্যাণ পর্যন্ত তেত্রিশ মাইল দীর্ঘ রেলপথ তৈরি করেন। পরে এই রেলপথকে উত্তর-পূর্বে জব্বলপুর পর্যন্ত বাড়িয়ে মীর্জাপুর থেকে আগত একটি রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। একটি শাখা যায় নাগপুর পর্যন্ত। দক্ষিণ-পূর্বে পুণা ও শোলাপুর হয়ে এই রেলপথ কৃষ্ণা নদীর কাছে মাদ্রাজ থেকে আগত একটি রেলপথের সঙ্গে মেশে।

সিন্ধু-পাঞ্জাব রেলওয়ে কোম্পানী করাচী থেকে সিন্ধু নদীর তীরে কোট্রী পর্যন্ত একশ' কুড়ি মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করেন, মুলতান থেকে দুশ' ত্রিশ মাইল দীর্ঘ আর একটি রেলপথ লাহোর ও অমৃতসরে পৌঁছোয়।

বোম্বাই-বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই থেকে সুরাট, বরোদা ও আমেদাবাদ পর্যন্ত তিনশ' ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ করেন। এই সব রেলপথের গতি নির্ণয়ের সময় বাণিজ্যিক, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিকে সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়। বেরার, বোম্বাই, সুরাট, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রধানত উৎপন্ন দ্রব্য সমুদ্রোপকূলে পৌঁছে দেবার জন্য রেলপথ নির্মাণ করা হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শহরগুলির মধ্যে টেলিগ্রাফ সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। প্রথমে খুব অল্প সময়ে তিন হাজার মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো তিন হাজার মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিকে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করতে প্রতি মাইলে গড়ে পঞ্চাশ পাউণ্ড ব্যয় হয়

রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারে টেলিগ্রাফ লাইনগুলি সরকারের বিশেষ কাজে লাগে ; কিন্তু ব্যবসায়ীরাও অবাধে টেলিগ্রাফের সাহায্য নিতো। কিছুমাত্র অতিরঞ্জন না করেই বলা চলে যে, শুধু এই বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইনগুলি ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। এ কথা কোম্পানীর নথিপত্রেই স্বীকার করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে টেলিগ্রাফ সংযোগের অপরিহার্যতা অনেকেই তখন উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে 'টাইমস' কাগজে, এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা চলে। কিন্তু উনিশ শতক শেষার্ধে পড়া পর্যন্তও ভারত-বৃটেন টেলিগ্রাফ-সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

উত্তমাশা অন্তরীপের সুদীর্ঘ পথে যাওয়া-আসা করতে যাত্রীদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তো। এই কারণে এই পথ ব্যবহার করা হতো খুব কম। অল্প দিন পরে আরো শক্তিশালী ষ্টীমার দিয়ে এই পথে যাওয়া-আসার সময় অনেক কমিয়ে দেয়া হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ কর্তারা নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুয়েজের পথে যাওয়া-আসা মেনে নেয়। ওই যোজক বরাবর একটি রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এই স্থলপথে যাওয়া-আসা আরম্ভ হওয়ায়, মিশরের অনেক মৃত শহরের শিরায় আবার রক্তসঞ্চরণ শুরু হয়, মরুভূমির মধ্যে সুদীর্ঘ পথের স্বাক্ষর পড়ে।

এই সময়ে এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়ে নানা দেশে আন্দোলন চলতে থাকে। মঁ ডি লেসেপ্স সুয়েজ যোজক বরাবর নব্বই মাইল দীর্ঘ এক খাল খননের প্রস্তাব করেন। সুলতানের দরবারে ফরাসী সম্রাটের প্রতিনিধি মঁ থোভেনেল অনুমতি ও উৎসাহ দানের জন্য তুরস্কের কাছে এক সরকারী আবেদন পেশ করেন। ১৮৫৮ সালের বসন্ত কালে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। সুয়েজ খাল খননের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার কারণ দেখাবার জন্য অনেকে বৃটিশ সরকারকে চাপ দিলে প্রধান মন্ত্রী পামারষ্টোন পার্লামেন্টে বলেন যে, এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হলে ভূমধ্যসাগরের শক্তি হিসেবে ফ্রান্স প্রাচ্যের দেশগুলিতে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করবে এবং ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত নড়ে যাবে। আর্ল অফ ডার্বির সরকারও পামারষ্টোনের অভিমত সমর্থন করেন। তুরস্কের সুলতান তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করায় এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

সেলুসিয়া থেকে বসরা পর্যন্ত এক রেলপথ নির্মাণ করে ভারতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই পথের দৈর্ঘ্য নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। সিন্ধু রেলওয়ে কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ এণ্ড্রু বলেন যে, এই পথের দৈর্ঘ্য আটশ' মাইল। ওই এলাকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল জেনারেল চেসনী বলেন, ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরের দূরত্ব ছয়শ' ষাট মাইল। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার মঁ জুলেস ফাবোস্কী বলেন যে, এই পথের দৈর্ঘ্য প্রায় চোদ্দশ' মাইল। এই প্রস্তাবিত রেলপথের নাম দেয়া হয় 'ইউফ্রেতিস ভ্যালী রেলওয়ে'। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের পরস্পর-বিরোধী অভিমতের জন্য পরিকল্পনা বাধা পায়। তুরস্কের সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে মতভেদের সৃষ্টি হওয়ায় সুয়েজ খাল খননের আন্দোলন আরো জোরদার হয়।

প্রাচীন কলিকাতার নাট্যশালা

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

[কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজদের বেশ কিছু দিন লেগেছিল এ দেশে থিতিয়ে বসতে। অথচ একটা বিদেশী শক্রর শাসন ও শোষণের আবহাওয়ায় দেশীয় শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি তখন মরণাপন্ন। সুতরাং এ দেশে আনন্দ পরিবেশন ও লোক-শিক্ষার বাহন হিসেবে। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও তাকে জনপ্রিয় করার আদি দায়িত্ব ছিল ইংরেজদের হাতে। তাদের চেষ্টাতেই বাংলা দেশে নাট্যশালার আদিপর্ব সূচিত হয়েছিল। সেই যুগের স্বল্প পরিমাণ মাল মশলা থেকে সংগ্রহ করা এই কাহিনী পাদপ্রদীপের যে-কোন রোমাঞ্চকর কাহিনীর চেয়ে মনোমুগ্ধকর।]

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা নগরীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের পর নিজেদের গুছিয়ে ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতেই ইংরেজদের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে হয়েছে। কাজেই তখন 'চারুকলার চর্চায় মনোনিবেশের সময় বা অবসর ছিল না তাদের, কিন্তু কালক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য ও রসপিপাসু মন এদিকেও দৃষ্টিদান করতে কার্পণ্য করেনি।

কলিকাতার প্রথম নাট্যশালার জন্ম ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে। লালদীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে লিম্পটন ওয়াচ কোম্পানীর ভবনটি যেখানে, কলিকাতার প্রথম নাট্যশালা সেখানেই অবস্থিত ছিল। নাট্যশালার নাম 'দি প্লে হাউস' (The play House)। বস্তুতঃ তখনকার দিনে এই অঞ্চলই ছিল কলিকাতার আমোদ-প্রমোদের স্নায়ুকেন্দ্র এবং এখানেই গড়ে উঠেছিল যত কিছু ক্লাব থিয়েটার নাচঘর রেঁস্তোরা ও ট্যাভার্ণ। নাট্যশালাটি সম্বন্ধে খুব যৎসামান্য তথ্যই জানা গেছে। অ-পেশাদারী অভিনেতারা এখানে অভিনয় করতেন। লণ্ডনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক স্বয়ং এদের অনেককে অভিনয় শিক্ষা দান করেছিলেন। তাঁর এই "ক্লেশ স্বীকারের" জন্য, তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তরা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এ দেশ থেকে "কৃতজ্ঞতার নিদর্শন" স্বরূপ দু'পিপে Madeira (এক প্রকার মদ) উপহার পাঠিয়েছিল তাঁকে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, এই রঙ্গালয়ের প্রাঙ্গণেই কামান বসিয়েছিলেন। কারণ, এখান থেকে প্রাচীন দুর্গের পূব দিকের প্রবেশ-পথটি ঠিক নিশানার মধ্যে পাওয়া যেত। প্রাচীন দুর্গটি তখন বর্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিস, ক্যালকাটা কালেক্টরেট ও ই, আই, আরের প্রধান কার্যালয়-অধিকৃত স্থান জুড়ে ছিল। কলিকাতা অধিকারের যুদ্ধে রঙ্গালয়টি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু কলিকাতা ইংরেজ কর্তৃক পুনরধিকৃত হওয়ার পর সামরিক বাহিনীকে অভিনন্দন দেবার জন্য রঙ্গালয়টি পুনঃ সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা হয়। কিন্তু এর পর রঙ্গালয়টি চালু ছিল কি না, সে খবর পাওয়া যায়নি।

কলিকাতার দ্বিতীয় নাট্যশালা ক্যালকাটা থিয়েটার বা 'দি নিউ প্লে হাউসে'র (The New Play House) জন্ম ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে। জনসাধারণের চাঁদায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই অভিনয়-ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস, প্রথম প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণ রঙ্গালয়ের নির্মাণ-কার্যে মুক্তহস্তে দান করেছিলেন। বার্ণার্ড মেসিঙ্ক নামক এক ভদ্রলোকও এসেছিলেন খাস ইংল্যাণ্ড থেকে নাট্যশালাটির ব্যবস্থাপনার তদারক করতে। সমসাময়িক কালের অপূর্ব তথ্য-ভাণ্ডার "হার্টলি হাউসে" এর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। "হাউসটি আকারে বাথ থিয়েটারের প্রায় সমান, আলোক-সজ্জা ইংরেজী কায়দায় পরিকল্পিত এবং পাদপ্রদীপেরও চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। কাচের শেড দেওয়া বাতীদানগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করত।" বাইটারস্ বিল্ডিং দক্ষিণের বাতাস আসার পথরোধ করত বলে বায়ু-চলাচল দ্বারা রঙ্গালয়টি শীতল রাখার জন্য ছাদে ঘুলঘুলির ব্যবস্থা ছিল। এই রঙ্গালয়ের দ্বাররক্ষকরা সবাই ইউরোপীয় ছিলেন।

"হার্টলি হাউসে"র রচয়িতা এখানে একটি অভিনয় দেখে এত দূর অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি লিখেছিলেন—

"I forgot my Doyly, my native country···and my mother and for the only period of my residence at Bengal was completely happy."

মিসেস্ ফে'র পত্রাবলীতেও এই নাট্যশালার উল্লেখ আছে। একটি পত্রে লিখেছেন তিনি—"রঙ্গালয়টি সাধারণের চাঁদায় তৈরী এবং অতি নিপুণ-হস্তে সজ্জিত। রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটগুলি এ দেশে যত দূর আশা করা যায় তদনুরূপ। অভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁরা কেউ পেশাদারী নয়। অভিনয় যা হয়েছে তাতে হলফ করে বলতে পারি, কোন ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের মানহানির কারণ ঘটবে না।"

এই রঙ্গালয়ে অভিনীত Otway অভিনীত Venice Preserved সে-যুগে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। রঙ্গালয়ে বক্সের টিকিটের মূল্য ছিল এক মোহর; পিটের (Pit) দাম বার সিক্কা টাকা; গ্যালারীর জন্য নেওয়া হোত ছয় সিক্কা টাকা।

কিন্তু কালক্রমে কলিকাতার আনন্দ-উৎসবের কেন্দ্র লালবাজার এলাকা থেকে ক্রমশঃ চৌরঙ্গী অঞ্চলে সরে আসার দরুণ এই নাট্যশালাটিও উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিল। পরে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গোপীমোহন ঠাকুর নাট্যশালাটি ক্রয় করে উক্ত স্থানে একটি বাজার (নিউ চীনবাজার) বসিয়েছিলেন।

প্রাচীন কলিকাতার থিয়েটার-বিলাসীদের আর একটি অতি প্রিয় মিলনকেন্দ্র ছিল মিসেস্ এ্যামেলিয়া ব্রিস্টাউ'র চৌরঙ্গীস্থ নিজ বাটিকায় পরিচালিত রঙ্গালয়। এ্যামেলিয়া কলিকাতার এক নামকরা ব্যবসায়ী হেনরী ব্রিসটাউয়ের পত্নী। এই ভদ্রলোক এক সময় কলিকাতার শেরীফ পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। মিসেস্ ব্রিসটাউ কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম মহিলা অভিনেত্রী আমদানী করেন এবং তিনি নিজেও এক জন নামকরা অভিনেত্রী ছিলেন। এর আগে শ্মশ্রুগুম্ফহীন যুবকেরাই মেয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোত। মিসেস্ ব্রিসটাউয়ের রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে :—"Exhibition……was nearly perfect……the company appeared completely gratified." ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ ব্রিসটাউ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতাবাসিগণ বহু দিন এই বিনোদিনী মহিলার স্মৃতি ভুলতে পারেনি।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করে হেরাসিম লেবেডেফ নামক জনৈক ইউক্রেনবাসী রুশীয় ভদ্রলোক কলিকাতার মাটিতে পদার্পণ করেন। আশ্চর্য হলেও ইনিই বাংলা নাট্যশালার প্রথম প্রতিষ্ঠাতার সম্মান লাভ করেছেন। লেবেডেফ ভারতীয় সংস্কৃতির এক জন গুণমুগ্ধ ছাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতায় এসে সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী শিক্ষার মানসে গোলোকদাস নামক এক পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছিলেন। লেবেডেফ ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীট) একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালাটিই বিখ্যাত ডুমতলা নাট্যশালা বা 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে পরিচিত। বেঙ্গলী থিয়েটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল, ইংরেজী নাটক বাংলায় অনূদিত করে এতদ্দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর দ্বারা মঞ্চস্থ করা হোত। কয়েক বৎসর এ দেশে থেকে লেবেডেফ বিলেত চলে যান এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সেখানে একখানি হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। কি ভাবে বাংলা নাট্যশালা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, এই পুস্তকের ভূমিকায় তার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :—

"[ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে] এই সকল গবেষণার পর আমি The Disguise ও Love is the Best Doctor' নামে দুইখানা ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাসি-তামাসা বেশি পছন্দ করে। সেই জন্যই আমি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই পছন্দ করিয়াছিলাম।

আমার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে পর আমি কয়েক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত ডাকিয়া আনিলাম এবং তাঁহারা খুব মন দিয়া আমার নাটক দুইখানি পড়িলেন। পড়িবার সময় কোন্ কোন্ জায়গা তাঁহাদের কাছে খুব ভাল লাগিল এবং কোন কোন জায়গায় তাঁহারা খুব মুগ্ধ ও বিচলিত হইলেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম। এই উপায়ে আমার অনূদিত নাটক দুইখানির হাস্যরসাত্মক ও গম্ভীর উভয় প্রকার দৃশ্যগুলিরই যে অনেক উৎকর্ষ হইল, এ-কথা বলিলে নিজের সম্বন্ধে অযথা প্রশংসাবাদ হইবে না। নিজের অন্য সৌভাগ্যক্রমে যে শিক্ষক জোগাড় করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা না পাইলে আমি যাহা করিতে পারিয়াছিলাম, অন্য কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে।

পণ্ডিতেরা অনুমোদন করিয়া গেলে পর, আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার নিকট এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্বসমক্ষে অভিনয় করিতে প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এদেশী অভিনেতা-অভিনেত্রী আনিয়া দিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং ইউরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য আমার নাট্যশালার সংকল্প অবিলম্বে সফল করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণর জেনারেল সার জন্ শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিলাম। তিনিও বিনা দ্বিধায় তাহা মঞ্জুর করিলেন।

এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া এবং প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি নিজে নক্শা করিয়া কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ডোমটোলায় (ডোম লেন) একটি বিস্তৃত নাট্যশালা নির্মাণ আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে আমার ভাষা-শিক্ষক গোলোক বাবুকে আমি দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তিন মাসে The Disguise নাটকটির অভিনয়ের জন্য অভিনেতা সংগ্রহ ও নাট্যশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর আমি বাংলা ভাষায় এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় করাইলাম। পর-বৎসর (১৭৯৬) ২১শে মার্চ তারিখেও এই নাটকটি আবার অভিনীত হয়।"

স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই একসঙ্গে লেবেডেফের রঙ্গালয়ে অভিনয় করতেন। অভিনয় সুরু হওয়ার পূর্বে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লেবেডেফের অর্কেষ্ট্রার প্রধান আকর্ষণ—তিনি সর্বপ্রথম ভারতচন্দ্র রায়ের রচনা ইংলিশ ও ভারতীয় যন্ত্র-সহযোগে সংগীতে রূপায়িত করেছিলেন।

প্রথম অভিনয় এত দূর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, ২১শে মার্চ দ্বিতীয় বার অভিনয়ের সময় লেবেডেফ টিকিটের দাম বাড়িয়ে এক মোহর করেছিলেন। কিন্তু লেবেডেফের কলিকাতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাট্যশালাটিরও জীবনান্ত হয়।

এর পর ছোটখাট প্রচেষ্টা হিসেবে হুইলার প্লেসে (বর্তমান গবর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ) উদ্ঘাটিত থিয়েটার (১৭৯৮); ১৮ নং সার্কুলার রোডের এথেনিয়াম থিয়েটার (১৮১২) এবং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ বৈঠকখানা থিয়েটারের (১৮২৪) নামও উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার সুবৃহৎ নাট্যশালা—চৌরঙ্গী থিয়েটারের জন্ম ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর। নাট্যশালাটি বর্তমান থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল এবং যত দূর জানা যায়, রঙ্গালয়-ভবনটি অতি প্রাচীন ও বিশ্রী ধরণের ছিল। এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে জনসাধারণ ও বিশেষ করে গভর্ণরের দান উল্লেখযোগ্য। রঙ্গালয়টির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মাসিক মাহিনা পেতেন এবং অভিনেত্রীরা রঙ্গালয়-ভবনেই বাস করতেন। এই নাট্যশালার প্রাণ ছিলেন

মিসেস্ এসথার লীচ। তিনি মাত্র সতের বছর বয়সে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে কলিকাতাবাসীর মন হরণ করেছিলেন। তাঁকে বলা হোত Indian Siddons। মিসেস্ লীচ এক জন ইংরেজ সৈনিকের কন্যা এবং ভারতের মাটিতেই তাঁর জন্ম। বহু বছর তিনি কলিকাতার নাট্যবিলাসীদের হৃদয়-আরাধ্যা ছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে শেষ রাত্রের দিকে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে চৌরঙ্গী থিয়েটারটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যে জমির ওপর রঙ্গালয়টি অবস্থিত ছিল, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর পরে ১৫,০০০ টাকায় সেই জমিটি ক্রয় করেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মিসেস্ লীচ কিন্তু একটুও ভেঙ্গে পড়েননি। তিনি নতুন উদ্যমে আর একটি রঙ্গালয়-ভবন নির্মাণের চেষ্টা করতে লাগলেন। এদিকে রঙ্গালয়ের নতুন ভবনটি যত দিন না নির্মিত হয়েছে, তত দিন তিনি হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না—গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্টে—বর্তমানে যেখানে এজরা ম্যানসেন অবস্থিত—সেইখানে একটি গৃহে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অভিনয়-ভবনটিই ক্যালকাটা থিয়েটার (১৮৩৯—৪০) নামে প্রসিদ্ধ। যত দূর জানা যায়, মিসেস্ লীচের এ প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যজনক হয়নি।

তদানীন্তন 'ইংলিশম্যান' কাগজের সম্পাদক মিঃ জে, এইচ, ষ্টোকোলের ও মিসেস্ লীচের যৌথ চেষ্টা ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে জনসাধারণের চাঁদায় আশী হাজার টাকা ব্যয়ে লীচের নাট্যশালার নতুন সুবৃহৎ জমকাল ভবনটি নির্মিত হয় এবং তার নাম রাখা হয় সাঁসুসি (San Souci)। গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড এই ভবন নির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দান করেছিলেন। বর্তমান পার্ক ষ্ট্রীটে সেণ্ট জেভিয়ারস্ কলেজের জমিতেই রঙ্গালয়টি অবস্থিত ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ তারিখের রাত্রে সাঁসুসির দ্বার উদ্ঘাটন হয় এবং উদ্বোধন-রজনীতে James Sheridan Knowle-এর লেখা The Wife নামক নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। এই রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী অ-পেশাদারী উভয় শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করতেন এবং মিসেস্ লীচ ছাড়াও ইংলিশ ষ্টেজের বহু নামকরা অভিনেতা অভিনয় করেছেন এখানে। এঁদের মধ্যে মিঃ ব্যারী নামক জনৈক অভিনেতার নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। ভদ্রলোকের এমনই কপাল ছিল যে, যখনই অভিনয়ের ঠিক চরম মুহূর্ত উপস্থিত হোত, তখনই তাঁর গলা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে বসত—কণ্ঠদেশ হতে একটি শব্দও নিঃসৃত হোত না শত চেষ্টা সত্ত্বেও এবং তখন মূক অভিনয় দ্বারা সংকট তরণী পার হতে হ'ত তাঁকে।

কিন্তু অদৃষ্ট মিসেস্ লীচকে ঠিক ছায়ার মত অনুসরণ করছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর অভিনয়-প্রাক্কালে মিসেস লীচ এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় নিপতিত হন। Handsome Husband নামক নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল তখন—মিসেস লীচ Mrs. Wyndham-এর ভূমিকায় নেমেছেন। রঙ্গালয়ের অভ্যন্তর দর্শকবৃন্দে ঠাসা—চারি দিকে প্রচণ্ড উত্তেজনা, উৎসাহের সমারোহ। মিসেস্ লীচ মঞ্চারোহণের পূর্বে প্রম্পটারের সংকেতের জন্য প্রবেশমুখে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় প্রদীপের শিখায় তাঁর পোষাকে আগুন ধরে যায় এবং মুহূর্তে তিনি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হন। মারাত্মক ভাবে দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় (পার্ক ষ্ট্রীটে এখন যে বাড়ীতে রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ বাস করেন) এবং ষোল দিন পরে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

সাঁসুসির আত্মার এই ভাবে অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালাটির জনপ্রিয়তাও দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এর পর বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে রঙ্গালয়টি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কেউই এর পূর্ব জনপ্রিয়তা আর ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হননি। অবশেষে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আর্চবিশপ ক্যারু রঙ্গালয়টি ক্রয় করে সেখানে একটি কলেজ স্থাপন করেন (১৮৪৭)। এই কলেজটি প্রথমে সেণ্ট জোনস কলেজ নামে অভিহিত হোত এবং পরে বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ারস্ কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে।

সাঁসুসির রঙ্গালয়ের সহিত যে ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত, সে হোল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কোন ইংলিশ কোম্পানী কর্তৃক মঞ্চস্থ 'ওথেলো' নাটকে জনৈক বাঙ্গালী কর্তৃক ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয়। অভিনেতার নাম বাবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। আর ডেসডিমনার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তিনি এক জন খাস ইংরেজ মহিলা। এ সম্বন্ধে তদানীন্তন সাময়িক পত্র 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশ—

"গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর সান্‌শশি নামক থিয়েটারে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল, বহু দিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতি মনোরম হইয়াছিল, মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয় অতি সুনিয়মে নির্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোনরূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলা করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধৈন্য ধৈন্য শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহ সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনি বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন......—২১ আগষ্ট ১৮৪৮।"

সে যুগে এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে ওথেলো চরিত্র অভিনয় ক... কৃতিত্ব ও সৎসাহসের পরিচয় নয়।

সাঁসুসির পর যে কয়েকটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদে... সব ক'টিরই আয়ুষ্কাল অতি সংক্ষিপ্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযো... ভ্যান গোল্ডারের "লিরিক থিয়েটার" (১৮৫৭), ময়দানের "... সিয়াম", "লুইস থিয়েটার রয়াল" এবং "অপেরা হাউস"। বাকি "দি ইংলিশ থিয়েটার"। অপেরা হাউসটিই পরবর্তী কালে "দি ... অপেরা হাউস" নামে অভিহিত হোত। বর্তমানে এটি একটি প্রেক্ষা... গৃহে রূপান্তরিত হয়েছে—নাম "দি গ্লোব থিয়েটার"। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ (সপ্তম এডোয়ার্ড) কলিকাতা সফরে এলে এ... প্রেক্ষাগৃহেই তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের টিকিটের যে মূল্য ধার্য হয়েছিল, ভারতী... নাট্যশালার ইতিহাসে তাও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপরে... বক্সের টিকিটের মূল্য নির্দিষ্ট হয়েছিল হাজার টাকা; নীচের বক্স পাঁচশ টাকা এবং ষ্টলের মূল্য ছিল ত্রিশ টাকা।

হাল আমলের কলিকাতায় বিদেশীয় পরিচালিত ও অভিনী... আর একটিও নাট্যশালা নেই এবং আর হবার আশা... সুদূরপরাহত।

নীলকুঠীর নয়না

তারানাথ রায়

কাঠের লম্বা পিলসুজের মাথায় পিদীমটার বুক জ্বলে উঠ্‌ল। তেলন্যাকড়া পোড়া ধোঁয়াটা ফকীর সাহেবের নাকে এসে পৌঁছুতেই তাড়াতাড়ি কোণে এসে খুঁজতেই একটা ছোট ভাঁড়ে একটু তেল তিনি পেলেন। তেল দিয়ে সন্তর্পণে দীপের আয়ু বাড়িয়ে দিতে দিতে তিনি ভাবলেন—এ কোথায় নিয়ে এল ওরা ?

ছোট ঘর। ছাদটা নীচু। সেকেলে কাঠের তীর বরগা। জানালার চিহ্নও নেই। বদ্ধ-ঘরে কেমন একটা ভাপ্‌সা গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসে। এদিক ওদিক নজর দেন—বাইরের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই যেন। ঘরটাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা ছোট দরজাটা যখন বন্ধ করে দেয় তখন আওয়াজে মনে হয়েছিল—পাল্লা দু'টো বেশ ভারী।

স্যাঁৎসেঁতে মেজের উপরই বসে গোয়েন্দা রীড সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলেন। কেবলই মনে হচ্ছিল দীঘির ধারের খুন-খারাবীর কথা। হতভাগ্য লোকটাকে ওরা কি করে 'ঝাঁপে' জড়িয়ে, কাঁধে নিয়ে দৌড়ুতে লাগল। সত্যি মেরে ফেলল ? হতভাগ্যের সাহেবী পোষাক—যে হুকুম দিচ্ছিল তারও। নীলকুঠীর কুঠিয়ালদের এ বোধ হয় প্রতিযোগিতার দাঙ্গা। রীড ফকীরের আলখেল্লা পরে ভাল করেননি। আশা করেছিলেন, এই বেশে তিতু মীরের সাকরেদদের সঙ্গে মিশতে পারবেন। হ'ল উল্‌টো বিপত্তি : এখন কি করা যায় ?

রীড আবার ওঠেন। রাত কতটা বুঝা যাচ্ছে না—হয়ত শেষই হয়ে এল। কিন্তু···

নজর পড়ে লোহার দরজাটার দিকে। দু'টো পাল্লা মোটা মোটা গজালের বর্ম এঁটে একশ' চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বিদ্রূপ করছে। এগিয়ে যান। হাত দিয়ে বেশ করে পরীক্ষা করেন। লোহার নয়, তবে লোহার পাত-মোড়া। টানতে একটু ফাঁক হয়ে এল। বাইরে অতিকায় এক তালা হুড়কার কড়ায় বসে পাহারা দিচ্ছে। ফাঁকের ভিতর দিয়ে নজর যায়, কিন্তু সেদিকটা আরও অন্ধকার।

কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন। একটা পোকাও ডাকে না ! মাথাটা ঝিমঝিম করে। আলখেল্লার ভেতর থেকে একটা শিশি বের করে তা থেকে কি একটা আরক সামান্য মুখে ঢেলে আবার শিশি লুকিয়ে রাখলেন। পিস্তলটা বের করে একবার পরীক্ষা করে সামনে রাখলেন। ভাবতে-ভাবতে একটু তন্দ্রাও আসে, দরজা হেলান দিয়ে কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে। দরজার পেছন থেকে কে যেন মৃদু-মৃদু ঘা দিচ্ছে। পিঠে আঘাতের কম্পন এসে লাগে। চুপ করে বসে থাকেন। আবার কে ঘা দেয় একটু জোরে। গোণেন—এক, দুই, তিন ক'রে সাত বার। আবার চুপ। আবার আঘাত, এক দুই তিন ক'রে এবারও সাত বার। সাত-সাতটে ঘা ?

ঘরটা মলিন আলোয় ভরে গেছে। তাহ'লে অনেকটা বেলাই হয়েছে। দেয়ালগুলো পরখ করেন মৃদু-মৃদু টোকা মেরে। দেয়ালে পলস্তারা করে ঝরে পড়েছে, দুই-এক কোণে এখনও লেগে আছে ধোঁয়ায় কাল দুই-চার চাপ। মিশি মেখে দেয়ালের ছোট ছোট ইটের তামাটে দাঁতগুলো বিদ্রূপ করছে। রীড টোকা মেরে যান। সুবিধে হয় না। দেয়াল নিরেট। মেজের এক কোণে একটা মস্ত কাঠের বাক্স আর ভাঙ্গা কাঠ-কুটোর জঞ্জাল। রীড সেগুলো সরাতে চেষ্টা করেন। একটা শাবল, বেশ ভারী না।

জঞ্জালগুলো সরিয়ে তোরঙ্গটার ভারী ডালাটা অনেক কষ্টে শাবল ঢুকিয়ে ফাঁক করলেন, তার পর টেনে উঠাতে গিয়ে এক ধারের মরচে পড়া কব্জাটা ছেড়ে গেল।

সাদা সব কি ভেতরে। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। পিদীমটা জ্বালিয়ে আনলেন। বাক্সের কাছে নিয়ে যেতেই রীড বাতী ফেলে দিয়ে ছুটে পিছিয়ে এলেন ! কী ও ! সাদা সাদা দন্তগুলো বিকাশ করে আছে একটা নরকপাল। আর তাকে জড়িয়ে চকচকে কাল একটা কেউটে। আলো দেখে তুলেছে ফণা। প্রদীপটা হাত থেকে পড়ে নিবে গেল।

সারা অঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। মৃত্যু নিশ্চিত। বাক্সের খোলা ডালার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মৃত্যুর দূত। মেজে থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তা উদ্যত করে ধরে রইলেন। দোফালা কাল জিভটা লক্‌-লক্‌ করছে, রাঙ্গা চোখ দু'টো চক-চক করছে। রীড মনে-মনে ভগবানকে স্মরণ করে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কৃষ্ণ মসৃণ অঙ্গখানি কুঞ্চিত ও প্রসারিত করে সরীসৃপ নামতে থাকে, একবার বিস্ফারিত ফণা তুলে দেখে নেয় আগন্তুককে, তার পর ফিরে যায় তোরঙ্গের মধ্যে। আবার বাক্সটা বেয়ে উঠে ধীরে ধীরে মেজের কোণ ধরে ঘুরে কোণের আবর্জনার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দেয়, আর দেখা যায় না।

রীড অমনি দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবেন হয়ত মৃত্যু ওখানেই অপেক্ষা করছে। ইংরেজ-শাবকও শিউরে শিউরে উঠতে থাকে। ঘরটাও ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে। ফকীরের আলখেল্লা নীচে তাঁর শ্বেত অঙ্গ বয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। পকেট হাতড়িয়ে দেখলেন, দেশলাই বাক্সটা মেলে কি না ! বাক্সটা আছে। কাঠি দু'-চারটে লাল মশলার টুপি-পরা। দেয়ালে ঘসে জ্বালালেন। প্রদীপটা ত জঞ্জালের মধ্যেই পড়ে গেছে। কি করেন ! আলখেল্লার কয়েকটা রঙিন কানি ছিঁড়ে উরুতে পাকিয়ে নিলেন ভাঁড়টাতে একটু তেল ছিল, তাইতেই ভিজিয়ে ভাঁড়ের কাণায় পলতে ঝুলিয়ে দিলেন। আর একটা কাঠি জ্বালতে হ'ল অভিনব প্রদীপ জ্বালিয়ে রীড পেছন ফিরেই দেখলেন— দোরটা নীরবে খুলে, এক জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে রয়েছে রীডের পিস্তল গুড়ুম করে উঠ্‌ল, লোহার দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে—একটা বিকট অট্টহাসি হো-হো করতে করতে দূর থেকে দূরে সরে গেল।

বাতী জ্বলছে। তার রাঙা শিখা থেকে কাল ধুঁয়ো কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। রীড ভাবেন এখন উপায় ? একটা সারা দিন কেটে গেল। লোকগুলোর কি মমতা পর্য্যন্ত নেই, এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত দেয়নি ! জলের কথা মনে উঠতেই বুকটা শুকিয়ে উঠ্‌ল, ঠোঁট চাটতে আরম্ভ করলেন। অতর্কিতে চীৎকার করে উঠলেন—"পানি ! পানি !" কে আর তা শুন্‌ল ?

বাতীরও আয়ু প্রায় শেষ। তার পর ? কোণের আবর্জনাগুলোর উপর নজর পড়ল। ওখানে মৃত্যুও অপেক্ষা করছে

ভাবলেন, বাতীর আগুনে আবর্জনাগুলো ধরান যায় কি না! গুঁড়টা সন্তর্পণে নিয়ে পাতলা কাঠকুটোগুলো ধরাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে জ্বলে আগুন, বেশ জ্বলে ওঠে। সাপটা পুড়ে মরতেও পারে ত! দাউ-দাউ করে জ্বলে। মড়ার মাথাটা ফাটে—ফট ফট। ঘরটার অসহ্য উত্তাপ সইতে না পেরে লোহার দরজাটার পাশে রীড আবার গিয়ে বসেন আর আকাশ-পাতাল ভাবেন।

ভাবেন, বন্ধু টমসনের অনুরোধে এ কী বিপদে পড়তে হ'ল। কিন্তু ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত নতুন সাম্রাজ্য কি তিতু মীরের লাঠির ঘায়েই চূর্ণ হয়ে যাবে? কিছুতেই নয়। ভাবলেন, ফকীর সাজাটা ভাল হয়নি। যারা তাকে ধরে নিয়ে এল তারাও তিতুর দলের কেউ নয়। আবার মনে পড়ে দীঘির ধারে ইউরোপীয় বেশ-পরিহিত হতভাগ্যটার কথা—আর ইউরোপীয়-বেশী দলপতি অশ্বারোহীর কথা। ওরা বয়ে নিয়ে গেল জোর কদমে। দূরে দেখা যাচ্ছিল কতকগুলো কারখানার চিমনী, নীলকুঠীই হবে হয়ত। কালা খৃষ্টান গোমেশ বলে গেছল রীড জমায়েৎ করেছে মুসলমান লাঠিয়াল, আর হাতিয়ার? কিন্তু ওদের মধ্যে মুসলমান এক জনও ত দেখা গেল না! রীড ওরফে ফিরিঙ্গী বিচার্ড এমিসের বিরুদ্ধেই ত টমসন অভিযোগ করেছিল যে, সে তার চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিতুর দলে যোগ দিয়ে লাঠিয়াল আর হাতিয়ার-পত্র সংগ্রহ করেছে—ওকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানাও তাঁকে বের করে দিতে হয়েছিল।

রাত তখন বোধ হয় অনেক। মনে হল দোরটায় কে ধাক্কা দিচ্ছে আবার। পিঠে তেমনি কম্পন, এক দুই তিন চার করে সাত বার আঘাত। থেমে, আবার। নিশ্চয় এর কোন মানে আছে।

কোণের বাক্স পোড়া কয়লার রক্তচক্ষু তখনও মলিন হয়নি। সাপটা বোধ হয় পুড়েই মরেছে। ঘরটার উপরে ধুঁয়োর মেঘ ছাদে গিয়ে জমে রয়েছে। সাবলটা আনতে গিয়ে দেখে, বড় গরম, ছোঁয়া যায় না। ফকীর সাহেবের আলখেল্লাটা খুলতে হল। আলখেল্লা দিয়ে সাবলটাকে জড়িয়ে ধরে দোরের কাছে নিয়ে এলেন, দরজার ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগলেন। একটা পাল্লা একটু-একটু নড়ে। অনেক চেষ্টায় নীচের দিকের খানিকটা বাঁকা হয়ে এল! হুড়কার গায়ে লাগিয়ে চাড় দিতে দিতে হুড়কার একটা দিক বেরিয়ে গেল।

আলখেল্লায় ঘাম মুছে নিয়ে রীড সন্তর্পণে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বেরিয়ে পড়লেন। যে ঘরে এলেন তা মস্ত হল। আবার জ্বালালেন দেশলাই কাঠি একটা। অস্ত্রে বোঝাই। একটা দোর ভেতর থেকে লোহার হুড়কো দিয়ে বন্ধ। খুললেন। বাইরে অকাট জঙ্গল। একটা বেতের ঝোপে আলখেল্লাটা আটকে গেল। দেয়ালের কিনারা দিয়ে দিয়ে রীড আত্মরক্ষা করে চলতে লাগলেন। একটা শুয়ার ঘোং-ঘোং করে ছুটে গেল। একটু থামেন। গাছ-পালার ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো বনটার স্থানে স্থানে পড়েছে। সেই আলো রীডকে পথ দেখিয়ে দিল। একটা স্থান বেশ ফাঁকা, চার দিকে সুপুরী গাছের কেয়ারী। সুপুরী ফলের গন্ধ ভেসে আসছিল। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাসও রীডের ঘর্মাক্ত কপালে শীতল স্পর্শ করে যাচ্ছিল। মনে হ'ল, কাছে কোথাও জলাধার আছে। এগিয়ে যান রীড। বেশ একটা পুকুর, তাড়াতাড়ি পুকুরে নেমে প্রাণ ভরে জল পান করে মনে হল, শরীরের আর কোন গ্লানি নেই। একটু দূরে একটা বাতী জ্বলছে বলে মনে হ'ল। একটা নয়, অনেক বাতী। দূর থেকে ভেসে আসছে ড্রামের বাদ্য, যেমন বাজতে শুনেছে কলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দিরে। রীড সেই দীপশ্রেণী আর ঢাকের বাদ্য লক্ষ্য করে চলেন পা ফেলে। নগ্ন পদ, কাঁটা দু'-চারটে ফুটছে বৈ কি? কি করা যাবে? এ ফরাজী ফকীর সাজবার বখশিস্।

চলেন আর ভাবেন। টমসন বন্ধু হয়ত কত বা চিন্তিত হয়েছেন, কী বা করছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাও কম হল না! হঠাৎ মনে হ'ল, কালা খৃষ্টান গোমেশ তাকে ভুল সংবাদ দিয়ে গেছে—তার এই বিপদের জন্য দায়ী সে। কিন্তু ওর স্বার্থ? ওর উচিত ছিল সরাসরি ডিকের কুঠীতে তাকে নিয়ে যাওয়া, তা না করে সে কেন ফকীরের আলখেল্লা তাকে দিয়ে গেল, কেন বলে গেল চৌমাথায় অপেক্ষা করতে? দিনের বেলা ডিকের ফরাজীদের সঙ্গে টমসনের দলের এক চোট লড়াই যে হয়ে গেছে, এ সংবাদ রীড পেয়েছিলেন—আর বুড়ো টমসন মলিন মুখে এ কথাও তাঁকে বলেছিলেন যে, বাস্কেল এমিস্ তাদের লাঠিয়ালদের হটিয়ে হাঁকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গোমেশ তাকে ডিকের কুঠীর সহজ পথ ত বাৎলে দেয়নি, কেবল বলেছিল যে, হাজার ফরাজী ফৌজ সমবেত হবে টমসনের কুঠী আক্রমণ করতে।

ঢাকের কোলাহল আর শতকণ্ঠে "শিবো শিবো মহাদে—এ-ব" নিনাদ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আলখেল্লাটা দূরে ফেলে দেন রীড, সর্ট আর গেঞ্জী গায়ে এগিয়ে যান চড়কের নাচনা দেখতে। চড়ক-গাছে দু'জন পাক খাচ্ছে, হাতের চেটোয় তাদের অগ্নিশিখা দাউ-দাউ করে জ্বলছে, আর সেই ঘূর্ণায়মান অগ্নি বেষ্টন করে নরকপাল হাতে গেরুয়া বসন পরে গাজন-সন্ন্যাসীরা তাণ্ডব নাচছে। সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন, কারু নজর নেই। সবাই তন্ময় হয়ে দেখছে, আর মাঝে-মাঝে ধ্বনি দিচ্ছে—"শিবো শিবো মহাদে—এ-ব!"

রীড বেশ চিনতে পারলেন সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক জনকে। রণপায়ে সে তাঁর ঘোড়ার পেছনে পাহারা দিয়ে চলেছিল। পাছে সে চিনে ফেলে, তাই তিনি ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। পথ চেনা নেই, কিন্তু আকাশের চাঁদও তখন ডোবেনি, গাঁয়ের পথ ধরে চলতে লাগলেন।

হঠাৎ মনে হল, একটা সাদা মূর্ত্তি দূর দিয়ে যাচ্ছে। জোর কদমে চলতে লাগলেন। ১০ গজ দূরে সাদা বোরখা পরা মূর্ত্তিটা দাঁড়িয়ে যায়। রীড প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পিস্তল চেপে ধরেন। মূর্ত্তি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রীড এগিয়ে যান। এ কী! এ যে শ্বেতাঙ্গিনী রূপসী! মোমের পুতুলের মত মুখ ঘিরে কোকড়ান-কোকড়ান চুলগুলো স্তবকে-স্তবকে কাঁধে এসে নেমেছে। রীড আরও এগিয়ে আসেন। নারী তার চাঁপা কলির মতন আঙ্গুলগুলো এগিয়ে দেয়, রীড তা স্পর্শ করেন। নারী একটু হাসে—দুষ্ট মিষ্ট হাসি। রীডের হাতখানি ধরে এগিয়ে চলে নিজের পথে। মুখে কারু কথা নেই। ক্লান্ত, বুভুক্ষু রীড। নারীও বোধ হয় ক্লান্ত, কিন্তু এত রাতে কোত্থেকে? কিছু জিজ্ঞেস করেন না। নীরবে চলেন। নারী এক-এক দাঁড়িয়ে যায়, রীডের কাঁধে মাথা রেখে। সুগন্ধি কেশদামের গে

স্পর্শে যুবক রীড শিউরে ওঠে। হয়ত অকারণে, হয়ত অনিচ্ছায় তার আঙুলগুলো যুবতীর গণ্ড স্পর্শ করে! চাঁদের হাসি দু'পাশের ভরা মাঠের উপর রূপের আস্তরণ বিছিয়ে যায়। দু'ধারের মাঠের মাঝখান দিয়ে রাঙা সুরকীর পথ হেসে-হেসে চলে।

পূবের আকাশ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাঙা পথ এসে প্রবেশ করল দু'ধারে বড় বড় গাছের কেয়ারীর মাঝে। গাছগুলোর ঘন পল্লবের ভেতর দিয়ে চাঁদের রোশনাই পথের স্থানে স্থানে পড়েছে। নারী এইবার দাঁড়িয়ে পড়ে। তার টানা-টানা অলস চোখ দু'টো রীডের চোখের উপর ফেলে রাঙা দু'খানি ঠোঁট একটু ফাঁক করে অস্ফুটে কি কথা বলতে চায়।

চায় বিদায়। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—মিঃ রীড?

রীড চমকে ওঠেন। মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানান। নারী বলে তার নাম—মেরী! বলে—অনেক কথা আছে; দেখা হবে!

বিদায় চায়। বলে, সামনেই তার কুঠী—কাতলামারীর কুঠী।

রীড বিস্মিত হন। এত দূরে এসে পড়েছেন? নারী সাদা হাতখানি এগিয়ে দেয়। সযত্নে সে কর-পল্লব ঠোঁটের কাছে তুলে রীড মৃদু চুম্বন করে। নারী বক্র-নয়নে যেতে যেতে একবার চায় রীডের মুখের দিকে। সেই নীরব নিশা শেষে নির্জ্জন পথে যাদুকরী নারীর নয়ন তাকে কী যেন করে ফেলে। নারী হন-হন করে চলে যায়—রীড কেবল চেয়ে থাকেন। নারী অদৃশ্য হয়—রীড তবু অচঞ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে পথের দিকেই চেয়ে থাকেন।

পূব দিক ঈষৎ লাল হয়—যেন মেরীর ঠোঁটেরই রক্তিমা। কিন্তু রহস্যময়ী নারী, তার এই নৈশ ভ্রমণ কি অভিসার? কে জানে?

কত-শত চিন্তা করতে করতে ধীর পদক্ষেপে রীড সেই পথেই ফেরেন।

ভোর হয়। রোদ ওঠে! দুই-এক জন করে লোক পথে চলে, সাহেব দেখে তারা পথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। পল্লী-নারী দু'-এক জন বোধ হয় চলে নীলকুঠীতে কাজ করতে, কারু কোলে সন্তান, কারু মাথায় সামান্য পুঁটলী, সাহেব দেখে তারা পথের প্রান্তে পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

দোকড়ি পরামাণিক তার ক্ষুর-কাঁচির বাটুয়া নিয়ে হন হন করে চলছিল। কত সাহেব সে দেখেছে! রীড তাকে থামতে বলেন, কেশবনগর কুঠীতে পৌঁছে দিতে বলেন—বখশিস মিলবে। দোকড়ি একটু হেসে সম্মতি জানায়। মনে মনে মা-কালীর শ্রীচরণে গড় করে—আজ ঘুম থেকে উঠেই তার সু-সাইৎ।

এগার

কাতলামারীর গ্রামবাসীরা কেউ বলত পদ্মা, কেউ হাউলিয়া নদী বলেই ডাকত। সরকারী দপ্তরে মাথাভাঙ্গা। বর্ষায় দুই কূল দেখা যেত না। মাথাভাঙ্গার উপরেই ওয়াটসনদের কাতলামারী নীলকুঠী। কুঠীবাড়ী দোতলা। দোতলার সামনে তেরটি গোল থামওয়ালা বারান্দা। একতলায় দশটি চৌকোণা থামের উপর বড় বড় খিলান, মধ্যখানে গোল থামওয়ালা গাড়ী-বারান্দা। কুঠীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ইয়ং থাকে দোতলায়—সঙ্গে থাকে তার বোন মেরি, আর একটি নারী। কে জানে কে?

ডিককে যখন ওরা গং সাহেবের তাঁবুতে এনে ফেলল, তখন সবারই ধারণা, ওর প্রাণ বের হয়ে গেছে। খুদি বরকন্দাজ আর রহিম শেখের হেফাজতে 'লাস' রেখে গং সাহেব ত সেই ঘোড়াতেই রামনগর কুঠীর দিকে চলে গেল। খুদিকে হুঁসিয়ার থাকতে বলে পীর আলি গং সাহেবের পেছন-পেছন চলে গেল। আর সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেছে; খুনী মামলার আসামী হবার সাধ কারু নেই।

রাত তখন ঢের। খুদি বললে—রহিম ভাই দেখ ত, একেবারেই সাবাড়, না এর-আধটু জান আছে। আমাদের জন্যেই ত জান দিল!

ফরাজী না হলেও তিতুর দলের কাজে ওদের সায় ছিল। ওরা ঝুঁকে পড়ে ডিকের বুকে কান পাতে। মনে হয়, যেন একটু ধুক-ধুক করছে। তাঁবুতে আলো নেই যে দেখবে। খুদি থাকে, রহিম আলোর সন্ধানে যায়।

কলরব শুনে কুঠীর দোতলায় আলো জ্বলেছিল। পাইক লাঠিয়ালদের কলরব আর গং, পীর আলির হুকুম-হুঙ্কার থেমে গেলেও বাতী নেবেনি। দোতলার বারান্দার রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে গং-এর বোন মেরী, ব্যাপার কি জানতে চাইল বার-বার, কিন্তু তার কথায় কান দেবার ফুরসৎ কারু ছিল না। "ইয়ং! ইয়ং!" বলে মেরী গং সাহেবকে দু'-চার বার ডাকল, উত্তর পেল না। তার পর দেখল, আর কারু সাড়াও নেই শব্দও নেই। মশালগুলো নিবে গেছে। ঘোড়ার টগবগি দূর থেকে দূরে সরে গেছে। কুঠীর চৌকীদার কোঁদে বেরিয়েছে—চেরিয়াব চৌকিদার! তারও লাঠির শব্দ ঠক-ঠক করতে করতে মোড় ঘুরে কুঠীবাড়ীর পেছন দিকে চলে যায়।

খুদি বরকন্দাজের কাশির শব্দ শুনতে পায়। মেরী ডাকে—'কোন্ হ্যায়'! বরকন্দাজ সাড়া দেয়! বলে—"উপর আও।" খুদি উপরে যায়, বলে—ডিক্ সাহেব।

—ডিক! কি হয়েছে?

—জখম। পাকড়ে এনেছে—তাঁবুতে।

মেরী ডিককে সত্যি ভালবাসত। দেশী রক্ষিতা নিয়ে ডিক থাকে, এ সে পছন্দ করত না। ডিক আর ইয়ং যখন একই টমসনের কুঠীতে চাকরী করত, তখন স্কচ ইয়ং-এর সঙ্গে ইংরেজ-ফিরিঙ্গী ডিকের বেশ ভাব ছিল, একসঙ্গে উঠা-বসা, খানা-পিনা, শিকারপুরের জঙ্গলে শিকার করা সব ছিল।

ডিককে মেরী ভালবেসেছিল। অমন সুপুষ্ট সবল দেহ, অমন দুর্দ্দান্ত মন তাকে অভিভূত না করে পারেনি। কালা আনন্দ কালকোলো সন্তান দিয়ে ডিককে খাট করেছিল, এ জন্যে ডিকের মর্য্যাদা সাহেব-মহলে বেশ একটু খাট হয়ে গেছল। কিন্তু গোরা আনন্দ তার রূপে ঝলসে দিয়েছিল ও-অঞ্চলের সব কয়খানা নীলকুঠী, আর তাদের জোয়ান সাহেবদের—টমসন, ইয়ং, রবার্ট, সব্বাইকে। মেরী শুনেছিল, ইয়ং তাকে হাত করতে পঞ্চানন মুহুরীর হাতে পৌঁছে বকশিস পাঠিয়েছিল। মেরী শুনেছিল, গোরা আনন্দ সে বকশিস ঘৃণায় উপেক্ষা করেছিল, ইয়ং-এর মুখে সত্যিকার লাথি মেরে চলে গেছল তার ডিকের কাছে। মেরী তাই ঘৃণা করত, হিংসে করত গোরা আনন্দকে। তাই ইয়ংকে সে ক্ষেপিয়ে তুলত গোরার প্রশংসা করে, কুঠীর পাদরীদের সে যুক্তি দিত ঐ নেটিভ আউরৎকে খৃষ্টান করে ভিন্ দেশে চালান দিতে। কিন্তু গোরা হাত করেছিল ডিক-কণ্টককে; ডিক-কণ্টক দিয়ে—আর তার কলুষীকৃত

[illegible] দিয়ে ইংরেজ কুঠীয়ালগুলোকে বিদ্ধ ও জর্জরিত করবার [illegible] করেছিল।

মেরী সে কথা জানত না। সে বুঝেছিল অবশেষে গোরার [illegible] প্রতিযোগিতায় সে পারবে না। তাই কালা খৃষ্টান গোমেশকে নিযুক্ত করেছিল ডিক আর গোরার মধ্যে বিচ্ছেদ বাধিয়ে দিতে। গোমেশ রাজী হয়েছিল এক সর্ত্তে, যদি মেরী তাকে কৃপা করে। মেরী তার সাথে প্রেমের অভিনয় করত কার্য্যসিদ্ধির জন্তে। [illegible] গোমেশ তাই ডিকের বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছিল। ডিক [illegible] দেশী খৃষ্টানটাকে আর তার বেটা এডোয়ার্ড গোমেশকে দিয়ে [illegible] কাজও করাত। মেরীর কটাক্ষ ও স্পর্শের বকশিস গোমেশকে এমন মজিয়েছিল যে, ডিকের ক্রীতদাস হয়ে থাকতেও [illegible] অসম্মত হয়নি। মেরীর সঙ্গে ডিকের গুপ্ত প্রণয়ের মধ্যস্থ সে ছিল, এ জন্য ডিকও তাকে বিশ্বাস করত অনেকটা। কিন্তু যেদিন মেরী বুঝল, গোটা দেশ ডিকের বিরোধী হয়েছে, যেদিন বুঝল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তিতু মীরের অভিযানকে সে সাহায্য করছে, যেদিন [illegible] এই দাঙ্গাবাজটা ফরাজীদের সঙ্গে জোট করে ইংএর মত [illegible] ইংরেজকে পর্য্যন্ত হটিয়ে দিয়েছে, সেদিন সে শঙ্কিত না হয়ে পারেনি। ডিককে সে এমন করে মরতে দিতে পারে না। অথচ গোরা গ্রাস করে রেখেছে ঐ মাতালটাকে, নজরে নজরে করে রেখেছে নজরবন্দী। তাই গোমেশেরই হাতে গোরা আনন্দকে চিঠি দিয়েছিল—নেটিভ নাগিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে, আর ডিককে ভিক্ষা করে। সেদিন গোমেশও বুঝল মেরী তাকে প্রেমের [illegible] দিচ্ছে মাত্র। ও ডিকেরই, তার হবে না—হতে পারে না। গোমেশ কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছিল। উত্তেজিতা গোরাকে আরও উত্তেজিতা করেছিল ডিকের বিরুদ্ধে। সে বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করে বলেছিল, মেরী আর ডিককে সে তুনিয়া থেকে হটিয়ে দেবে। গোরা আনন্দ তার মনের কথা খুলে বলেনি গোমেশকে, তবে তাকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছিল। গোমেশই তাকে তিতু আর [illegible] ষড়যন্ত্রের সংবাদ দিয়ে আশা করেছিল, ইংরেজ আর তিতুর বিরুদ্ধে ও-অঞ্চলের দেশী মানুষগুলো যে আয়োজন করছে, তাতে তার আন্তরিক সাহায্য সে নেবে।

মেরীর চিঠিখানা গোমেশই রেখে এসেছিল গোরা আনন্দের ঘরে, আর সেই চিঠিখানাই মেরীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে বলে, [illegible] ইংএর হাতে পৌঁছে দিয়ে গোরা ও ডিকের বিরুদ্ধে তাকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

ডিককে পাকড়ে এনেছে শুনে মেরী তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল [illegible] হাতে করে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখল, চোখ বুঁজে [illegible] আছে ডিক চ্যাটাইয়ের উপর। বুকে হাত দেয়, মুখের উপর [illegible] নামিয়ে ডাকে—এমিস্, এমিস্! ডিয়ার!

চোখ বুঝি খুলতে চায়—চোখের পাতায় একটু মৃত্ব কম্পন। [illegible] কথা যেন বলতে চায়—ঠোঁট ত্ব'টো হঠাৎ স্পন্দিত হয়।

বরকন্দাজের দিকে ফিরে বলে—'খুদি! পানি'। ওর ঘর থেকে খুদি জল আনে। লণ্ঠন রেখে মেরী ছুটে উপরে গিয়ে ইংএর ঘর থেকে মদের খোলা বোতলটা নিয়ে আসে। জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঠোঁট ত্ব'টো ফাঁক করে একটু-একটু করে দেয়। জল পেটে যায় না, কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। খুদিকে বলে—হাঁ করাও। ও হাঁ করায় জোর করে। মেরী আবার মদ দেয় ফোঁটা-ফোঁটা। মুখ বন্ধ করিয়ে নাকটা চেপে ধরে।

মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে মেরী। তার ডিক—তারই ডিক। আজ তার এই হাল! কী করবে সে, কী করবে।

ঠোঁট খোলে ডিক। চোখ খোলে ডিক। মেরী আদর করে আবার ডাকে মুখের কাছে মুখ নিয়ে—ডিয়ার! ডিয়ার!

ও-স্বর ডিকের অর্দ্ধলুপ্ত চিত্তও চেনে। অস্ফুট স্বর ঠোঁট দিয়ে বেরোয়—ডিয়ার!

বরকন্দাজ বলে—মিসি বাবা, সরিয়ে না ফেললে—গং সাহেব ফিরে এসে ওকে মেরেই ফেলবে।

"ড্যাম গং!"

হঠাৎ তারই পেছন থেকে—বিকট অট্টহাসি গোটা কাতলামারীর কুঠীটাকেই যেন কাঁপিয়ে তোলে,—হো! হো! হো! হো!

মেরী সভয়ে ফিরে তাকায়। খুদি বরকন্দাজ চোখ ত্ব'টো বড় করে ফিরে তাকায়। কেউ নেই ত! খুদি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে চায়—কে? মেরী দোরের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

আবার! আবার! গোটা কুঠীটা ঘিরে ঘিরে সে অট্টহাসির টহল!

সে ভীষণ হাসি মুমূর্ষু ডিককেও সচকিত করে। সে মেরীর হাতখানি কম্পিত হস্তে ধরতে চায়। মেরীই তার হাত আপনার হাতে নেয়। জড়িয়ে ধরে, ডিককে আবৃত করে।

হঠাৎ ও কি! একটা যেন গোরিলা! বিকট মুখের বিকট দন্তরাজি! বিকট তুই লাল চোখ! বিরাট তার মাথা! বিরাট তুই সবল বাহু হাঁটুর নীচু পর্য্যন্ত এসে ঝুলছে! পিঠে বিরাট কুঁজ! দৈত্যটা আবার হাসে—হো! হো! হো! হো!

মেরী আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে ডিককে। দৈত্যটা তার বজ্র হাত দিয়ে হ্যাচকা টানে ছুঁড়ে ফেলে মেরীকে একটা ছেঁড়া পুতুলের মত। মাংসল ও লোমশ সবল হাতের বজ্র থাবা দিয়ে ডিকের দেহখানা তুলে নিয়ে অনায়াসে কাঁধে ফেলে। আবার বিকট হো-হো ধ্বনি! কাতলামারীর কুঠীকে কম্পিত করে সে অট্টনাদ মাথাভাঙ্গা নদীর দিকে ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায়।

মেরী যখন চেতনা পায় তখন দেখে, অনেক লোক এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। খুদি বরকন্দাজ, রহিম ভীতি-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। একটু চেতনা ফিরলে মেরীর চোখের সম্মুখে সেই দৈত্যেরই ভীষণ মুখ জেগে ওঠে—সে স্পষ্ট শুনতে পায় নরকের অট্টহাসি! আবার সে চেতনা হারায়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জার্ম্মাণী কি দ্বিতীয় কোরিয়া হইবে?

গত মাসে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার সময় কোরিয়া যুদ্ধে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, গত এক মাসে তাহার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। যুদ্ধ-সঙ্কটের এই অচল অবস্থা কত দিন স্থায়ী হইবে তাহা আজ অনুমান করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী কোরিয়া যুদ্ধ যে-সকল আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলি শুধু আন্তর্জ্জাতিক দিক হইতেই নয়, এশিয়াবাসীর দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরিয়া যুদ্ধের গোড়া হইতে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই যুদ্ধ তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হইবে কি না? যদিও গত আড়াই মাসের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইবার কোন লক্ষণ দেখা দেয় নাই, তথাপি এই আশঙ্কা যে দূরীভূত হয় নাই, এ কথাও সত্য। মার্কিণ কংগ্রেস দেশরক্ষার অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বাবদ ১'৫ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করিয়াছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টও দেশরক্ষার অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বাবদ মঞ্জুর করিয়াছে ১০ কোটি পাউণ্ড। এই মঞ্জুরী হইতেই ইহা অবশ্য অনুমান করা সম্ভব নয় যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে ভবিষ্যৎ আশঙ্কা করিয়াই এই ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে না। তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম বর্জ্জন করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কি সোভিয়েট রাশিয়া কেহই তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিতে চাহিবে না। কিন্তু আর কোন দেশে কোরিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে কি না, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর কোন্ দেশে কোরিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে, এই প্রশ্ন আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতই বিভক্ত জার্ম্মাণীর কথা প্রথমেই মনে না পড়িয়া পারে না। বস্তুতঃ জার্ম্মাণীতে গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা নানা ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার জন্য যে আয়োজন-উদ্যোগ একেবারেই চলিতেছে না,—সে-কথাও বলা যায় না। অনেকে এইরূপ আশঙ্কাও করেন যে, জার্ম্মাণীর জন্য পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সংগ্রামাশঙ্কা ক্রমেই চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মাণীকে আবার সামরিক সজ্জায় সজ্জিত করার প্রতি পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনুয়েরের বীতরাগের কথা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু সেই ডাঃ এডেনুয়েরই হঠাৎ দাবী করিয়া বসিয়াছেন যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে মিত্রশক্তিবর্গের, বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি করিতে হইবে। দখলকার শক্তিবর্গ পশ্চিম-জার্ম্মাণীর পুলিশ বাহিনীকে যে-ভাবে শিক্ষা দান করিয়াছেন তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এই পুলিশ-বাহিনীর দক্ষতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। সীমান্ত রক্ষার জন্য তিনি পশ্চিম জার্ম্মাণীতে 'রক্ষা পুলিশ-বাহিনী' (Protective Police) গঠনের দাবীই শুধু করেন নাই, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে পুলিশের সংখ্যা পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর সমান করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে ঐরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতে হইবে। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর পুলিশ-বাহিনীতে কি পরিমাণ লোক আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া জানা যায় না। অনেকে মনে করেন, উহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষের কম হইবে না এবং উহার অন্ততঃ এক-চতুর্থ অংশ ট্যাঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত। পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে যে পুলিশ-বাহিনী আছে, তাহাদের অস্ত্রের মধ্যে আছে শুধু রাইফেল। এই পুলিশ-বাহিনীও আবার পশ্চিম-জার্ম্মাণ ফেডারেল গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে। ইহারা পশ্চিম-জার্ম্মাণ ফেডারেশনের বিভিন্ন রাজ্যের (Lander) অধীন। জার্ম্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদলের নেতা ডাঃ সুমাখেরও এক সময়ে জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনিও এখন পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করিবার পক্ষপাতী। হিটলারের আমলের যে সকল সমর-নেতা রহিয়াছেন এই সুযোগে তাঁহারা আবার মাথা-চাড়া দিয়া উঠিতেছেন। ইহাদের রুশ-বিদ্বেষ খুবই প্রবল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ইহাদিগকে কাজে লাগাইবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বস্তুতঃ আমেরিকান হাই-কমিশনারের অফিসের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন, "The Western World is studing the ways of strengthening the defence of Democracy. As a part of Europe, Germany will obviously play a role." অর্থাৎ 'পাশ্চাত্য জগত গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিবার উপায় চিন্তা করিতেছে। ইউরোপের অংশ হিসাবে জার্ম্মাণী নিশ্চয়ই একটি ভূমিকা গ্রহণ করিবে।'

পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে কি হইতেছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাইতেছে না বটে। তবে অনেকে মনে করেন, আগামী ১৫ই অক্টোবর পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার পর রাশিয়া পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে স্বাধীনতা দান করিবে এবং তাহা

[illegible] একটা সন্ধি করিবে। ইহার পরে জার্ম্মাণীতেও কোরিয়ার মত গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন। অনেকে ইহাও আশঙ্কা করেন যে, আগামী অল্প কালের মধ্যেই এই গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। সুতরাং কোরিয়ার মত অবস্থায় যাহাতে পড়িতে না হয়, তাহার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গও যে প্রস্তুত হইতেছেন না, তাহা নয়। ফন্ মেন্টেউফেল প্রভৃতি পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সমর-নেতা না কি [illegible] হইতে ৩০ ডিভিসন সৈন্যবাহিনী দিতে রাজী আছেন! কিন্তু ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণ বাহিনীতে যাহারা সাধারণ সৈনিক ছিল তাহারা মনে করে যে, পশ্চিম-ইউরোপ রক্ষায় জার্ম্মাণীকেই অধিক সংখ্যায় জনবল জোগাইতে হইবে এবং প্রথম ধাক্কা সামলাইতে হইবে তাহাদেরই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে জার্ম্মাণীর বহু লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে, আর একটি যুদ্ধের শেষে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৫ কোটি। জার্ম্মাণীর সহযোগিতা পাইতে হইলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত না করিয়া উপায় নাই। তৃতীয় মহাসমর ইউরোপেই আরম্ভ হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে এশিয়াবাসী দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত না হইয়া পারে না।

কোরিয়া যুদ্ধ ও জাপানকে অস্ত্র-সজ্জিত করা—

কোরিয়ার যুদ্ধ সুদূর প্রাচীতে যে-সকল প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে জাপানের সহিত সন্ধি ও জাপানকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করা অন্যতম। পটসডামের ঘোষণা অনুযায়ী জাপানকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করা নিষিদ্ধ। এই ঘোষণার সর্ত্তাধীনেই জাপান আত্মসমর্পণ করিয়াছে। জাপানের নূতন শাসনতন্ত্রেও এইরূপ বিধান রহিয়াছে যে, জাপান পদাতিক সৈন্য নৌবাহিনী এবং বিমান-বহর রাখিতে পারিবে না এবং জাপানকে যুযুধান দেশ বলিয়াও গণ্য করা হইবে না। কিন্তু কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় আমেরিকার দৃষ্টিতে এইগুলি অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। আজ যদি জাপানের সৈন্যবাহিনী থাকিত, তাহা হইলে কোরিয়ার যুদ্ধে যে আমেরিকার খুব সুবিধা হইত তাহা মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ যদি গভীর ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? জাপ-সৈন্যবাহিনী বিলোপ করার জন্য এখন তাঁহারা অনুতাপ করিতেছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু জাপানের সহিত সন্ধি না হওয়ায় এবং জাপান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় বলিয়া কোরিয়ার যুদ্ধে যোগদান করার জন্য জাপানকে অনুরোধও করা যাইতে পারে না। অথচ কোরিয়ার যুদ্ধে জাপানের সামরিক সাহায্য পাওয়া গেলে যে কত সুবিধা হইত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে না? সুতরাং জেনারেল ম্যাকআর্থার যখন জাপানকে ৭৫ হাজার লোকের একটি জাতীয় পুলিশ রিজার্ভ গঠনের ক্ষমতা দান করিলেন, তখন এইরূপ আশা হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, জাপানে পুনরায় সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইবে। বস্তুতঃ জাপানের সংবাদপত্র সমূহ এইরূপ ইঙ্গিতও প্রদান করিয়াছেন যে, এই রিজার্ভ বাহিনীর কতক অংশ আর্ম্মার্ড-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী হওয়া আবশ্যক। জাপানের সহিত তাড়াতাড়ি সন্ধি সম্পাদনের কথাও শোনা যাইতেছে।

জাপানকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার প্রকৃত কারণ যে জাপানকে কম্যুনিজম নিরোধের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার মনে এই ব্যাপারে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ রবার্ট মেঞ্জিস্ টোকিওতে গিয়াছিলেন। জাপানের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধিস্থাপন, জাপানকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বাজারে জাপানের প্রতিযোগিতা সৃষ্টিতে আপত্তি করাই ছিল তাঁহার টোকিও যাওয়ার উদ্দেশ্য। সংবাদ যতটুকু পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই আপত্তি করায় অষ্ট্রেলিয়ারই লাভ হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র না কি অষ্ট্রেলিয়াকে সমগ্র দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে রাজী হইয়াছে। ইহা যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিরই একটা নয়া রূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ ইহা নয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে। আসলে যাহা হইবে তাহা এই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয়া হইবে এই নয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির প্রধান পক্ষ এবং নূতন করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জাপান হইবে তাহার ছোট অংশীদার। মার্কিণ নির্দ্দেশ, মার্কিণ ডলার এবং মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বড়কর্ত্তা অষ্ট্রেলিয়া এবং ছোট কর্ত্তা জাপান—ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ লইয়া একটি শক্তিশালী সোভিয়েট-বিরোধী ব্লক গঠন করিবে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার 'হোয়াইট অষ্ট্রেলিয়া' নীতির গ্লানি ও অপমান ভুলিয়া এশিয়াবাসী অষ্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কি না, তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এশিয়ার দেশগুলির কায়েমী স্বার্থবাদীরা ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকে যোগদান করায় সাধারণ মানুষের মনে যে আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আজ কোরিয়ায় যাহা ঘটিতেছে, কাল এশিয়ার যে-কোন দেশে তাহা ঘটিতে পারে। তখন ঐ দেশের মুক্তির জন্য মার্কিণ সৈন্যের সশস্ত্র অভিযান এবং মার্কিণ সুপার ফোর্ট্রেস হইতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ কি চলিবে না?

ডাচ নিউগিনি ইন্দোনেশিয়ার হাতে অর্পণ করিতে ওলন্দাজদের আপত্তি আছে। অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ স্পেণ্ডারও ডাচ নিউগিনি ইন্দোনেশিয়ার হাতে অর্পণ করার বিরোধী। এশিয়ার সাধারণ মানুষ এই সকল কথা ভুলিতে পারে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে তাহার সামরিক ঘাঁটিরূপে রাখিতে চায়। যোশিদা গবর্ণমেন্ট তাহাতে অবশ্যই আপত্তি করিবে না। কিন্তু যোশিদা গবর্ণমেন্ট জাপ জনগণের শক্তিতে নয়, মার্কিণ সামরিক শক্তির সাহায্য-পুষ্ট দক্ষিণপন্থী এবং প্রাক্তন সামরিক প্রভুদের সমর্থনে টিকিয়া আছে মাত্র। সাখালিন দ্বীপে জাপ কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোহের আয়োজনের কথা না হয় আমরা বাদই দিলাম। কিন্তু বৈদেশিক সামরিক শক্তি দ্বারা রাজনৈতিক বিপ্লবকে ধ্বংস করা যায় কি না, তাহা আজও প্রমাণিত হয় নাই।

ট্রুম্যান-ম্যাকআর্থার বিরোধ—

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাকআর্থারকে তাঁহার ফরমোসা সংক্রান্ত বিবৃতি প্রত্যাহার করিতে নির্দ্দেশ দেওয়ায় চারি দিকে একটা 'বাহবা বাহবা' পড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষ এত বাহবা দেওয়ার কারণ সত্যই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কারণ, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দ্দেশ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিণ প্রতিনিধিদের কর্ত্তা মিঃ ওয়ারেন অষ্টিনের নিকট তাঁহার পত্র এবং ফরমোসা রক্ষার জন্য মার্কিণ সপ্তম নৌবহর নিয়োগ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফরমোসা নীতি লইয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং জেনারেল ম্যাকআর্থারের মধ্যে আসলে কোন বিরোধ নাই। তথাপি প্রেসিডেন্ট-ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাকআর্থারকে তাঁহার বিবৃতি প্রত্যাহার করিবার নির্দেশ দিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন নয়।

চিকাগোতে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক যুদ্ধে অভিজ্ঞ মার্কিণ সৈন্যদের সভায় জেনারেল ম্যাকআর্থার এই মর্ম্মে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, সে-দ্বীপটি চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদের অধিকারে রহিয়াছে তাহা যাহাতে কিছুতেই চীনা কম্যুনিষ্টদের দখলে না যায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি এই বাণীতে আরও বলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য ফরমোসা দ্বীপটি মিত্রশক্তির হাতেই থাকা উচিত। তাঁহার বাণীটি প্রচারের জন্য সংবাদপত্রে ও বেতার-কেন্দ্রে দেওয়াতেই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। কারণ, এই বাণীতে সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকার অভিপ্রায় একেবারে খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাণী বা বিবৃতিতে ফরমোসাকে কোরিয়ার যুদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা হইয়াছে। এই দুইটি যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আপত্তির কারণ, মিঃ অষ্টিনের নিকট তাঁহার পত্র বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যদি ফরমোসার নিকটস্থ দরিয়া হইতে সপ্তম নৌবহর অপসারিত করিবার নির্দ্দেশও দিতেন, তাহা হইলে জেনারেল ম্যাকআর্থারের বিবৃতি প্রত্যাহার-নির্দ্দেশের আন্তরিকতা বুঝা যাইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, অধিকন্তু ফরমোসার দরিয়ায় মার্কিণ সপ্তম নৌবহরের অবস্থিতির সমর্থনই করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা 'impartial neutralising action' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার এই কৌশলপূর্ণ উক্তি দ্বারা এক দিকে চিয়াং কাইসেককে ফরমোসায় অধিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আর এক দিকে ফরমোসা রক্ষার ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা হইয়াছে কোরিয়া যুদ্ধের সহিত। তিনি অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ উপায়ে নিরাপত্তা পরিষদের কোরিয়া প্রস্তাবকে ফরমোসার ব্যাপারেও প্রযোজ্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। ফরমোসার উপর আমেরিকার লোভ নাই, এ কথা বলিয়া তিনি ভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক কার্য্যাবলী দ্বারা ফরমোসার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। ইহার স্পষ্টার্থ এই যে, জাপানের সহিত সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণের সময়েই নির্দ্ধারিত হইবে ফরমোসার ভাগ্য। ফরমোসা সম্পর্কে জেনারেল ম্যাকআর্থারের সহিত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আসলে কোন মতভেদ নাই। তফাৎ এই যে, প্রেসিডেন্ট সত্যকে কৌশলপূর্ণ ভাষায় ঢাকিয়া রাখিতে চান।

কোরিয়ার যুদ্ধ ও বিমান-শক্তি—

কোরিয়ার যুদ্ধে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়, কোরিয়ার উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ। মার্কিণ সুপার ফোর্টেসগুলি দৈনিক প্রায় ১০০০ টন হিসাবে কোরিয়ার সহরগুলির উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে। গত দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামেও জার্ম্মাণ বোমারু বিমান হইতে ইংলণ্ডের কোন সহরের উপরেই এক দিনে এত বোমাবর্ষণ হয় নাই। বিমান-শক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য এবং উত্তর-কোরিয়ার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা কোরিয়ায় যুদ্ধে বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বিমান আক্রমণে আমেরিকার প্রাধান্য সম্পর্কে গত ২৪শে জুলাই (১৯৫০) তারিখে 'টাইম' পত্রিকা এবং 'নিউজ উইক' পত্রিকা যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে, বিমান-শক্তিতে আমেরিকা অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করিতেছে। জাপানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলি নিরাপদ। এ-পর্য্যন্ত এই সকল ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষিত হয় নাই। আবহাওয়া কখনও কখনও খারাপ হয় বটে, কিন্তু সব সময় খারাপ থাকে না। কোরিয়ার উপর বিমান আক্রমণে আমেরিকা যেমন নির্ব্বাধ সুবিধা ভোগ করিতেছে, তেমনি আমেরিকার বিরাট বিমান-শক্তির কত অংশ কোরিয়ার যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাও বিবেচনার বিষয়। 'নিউ ইয়র্ক ডেইলী কমপাস' পত্রিকায় মিঃ ওয়ার্ণার (Mr. Werner) লিখিয়াছেন যে, জেনারেল ষ্ট্রেটমেয়ারের অধীনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যকরী বিমান-শক্তির এক-চতুর্থ অংশ রহিয়াছে এবং ৪৭টি গ্রুপের মধ্যে ১২টি গ্রুপ সংগ্রামক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "However, Koria represents no more than 1 per cent of the military power of the Soviet bloc. Korea covers only exactly 0·4 per cent of the area of the European-Asiatic land mass. Thus, little Korea has tied up about quarter of American air power, with the result that this huge investment is still inadequate" অর্থাৎ 'কোরিয়ার সামরিক শক্তি সোভিয়েট ব্লকের সামরিক শক্তির শতকরা ১ ভাগ মাত্র। কোরিয়ার আয়তন ইউরোপীয়-এশিয়াটিক ভূভাগের শতকরা মাত্র ০·৪ ভাগ। তথাপি ক্ষুদ্র কোরিয়াতে মার্কিণ বিমানশক্তির এক-চতুর্থাংশ নিয়োজিত রহিয়াছে। কিন্তু এই বিপুল বিমান শক্তিও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না।' তীব্র এবং ব্যাপক বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও উত্তর-কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই।

বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া দুই দিনেই কোরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর-কর্ত্তাদের মনে এরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসিকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণের পরে জাপান আর যুদ্ধ না করিয়াই আত্মসমর্পণ করায় আমেরিকানদের মনে বোধ হয় এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর আর কোন প্রয়োজন নাই। পরমাণু বোমা না হইলেও ব্যাপক বোমাবর্ষণ করিতে পারিলে যু-

যায় একেবারে জলের মত সহজ হইয়া যাইবে, এইরূপ ধারণা সৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। গাইডেড্ মিসিল, রকেট, জেট, সুপারসোনিক প্লেইন সম্মুখ যুদ্ধকে বাতিল করিয়া দিয়াছে, এই ধারণা সৃষ্ট হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না বটে। কিন্তু দেশজয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ইহা মার্কিণ সমর-কর্তাদের ভ্রান্ত ধারণাই সূচিত করে। বিমানশক্তিতে দুর্বল হইলেও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী যে বিমান-শক্তিতে শক্তিশালী এবং দুর্বল সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা সামরিক দিক হইতে অধিকতর শক্তিমান, কোরিয়ার যুদ্ধে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধে বিমান-শক্তির উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবার দ্বিতীয় কারণ, প্রাচীর লোকদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। 'Oriental' বা 'প্রাচী' এই শব্দটিই পাশ্চাত্য দেশবাসীর কাছে প্রাচীর লোকদের সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার জন্য তাহাদিগকে কতখানি দোষ দেওয়া যায় তাহাও অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। প্রাচীর লোকরা দুর্নীতিপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাহারা নিজের জন্মভূমিকেও বিদেশীর হাতে তুলিয়া দেয়, তাহারা ভীরু, যুদ্ধ করিবার সাহস ক্ষমতা ও দক্ষতা তাহাদের নাই, প্রাচীর লোকদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশগুলির এই ধারণার জন্য প্রাচীর লোকরাও বড় কম দায়ী নয়। জেনারেল ম্যাকআর্থার প্রাচীর লোকদের মনোবৃত্তির এই দুর্বল অংশের সহিতই বিশেষ ভাবে পরিচিত। 'Oriental mind' অর্থাৎ প্রাচীর লোকদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহার ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতার কথাও তিনি গর্ব করিয়া বলিয়া থাকেন।

চারি বৎসর পূর্বে 'চিকাগো সান-টাইমসে'র প্রতিনিধির নিকট জেনারেল ম্যাকআর্থার গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, "The conflict between the Mongol-slav hordes of the East and the civilized people of the West will be resolved on the battle field." অর্থাৎ 'মোঙ্গল-শ্লাভ দলের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্য জাতির বিরোধের মীমাংসা সংগ্রামক্ষেত্রেই হইবে।' Marcelle Hitchmann লিখিয়াছেন যে, গত বৎসর বিলাতের 'ডেইলী মেইল' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট জেনারেল ম্যাকআর্থার বলিয়াছিলেন যে, জাপানে সোভিয়েট মিশনের প্রতি তাঁহার কঠোর নীতি সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই সাফল্য লাভের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন: "......perhaps because the Russian mentality is oriental as it was in the days of Gengis Khan and I have had 50 years' experience dealing orientals." অর্থাৎ 'ইহার কারণ বোধ হয় ইহাই যে, চেঙ্গীজ খাঁয়ের সময় রাশিয়ার মনোবৃত্তি যেরূপ প্রাচ্য-সুলভ ছিল এখনও তাহা-ই রহিয়াছে এবং প্রাচীর লোকদের সহিত কাজ-কারবারের আমার ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে।' প্রাচীর লোকদের মনোবৃত্তি সম্পর্কে এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, দুইটা বোমা ফেলিতে পারিলেই উত্তর-কোরিয়া নতজানু হইয়া পরাজয় স্বীকার করিবে। হিরোসিমা ও নাগাসিকির পরে জাপানের আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্তও তাঁহার মনে উজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে। কিন্তু দুইটা বোমা ফেলিয়া কোরিয়ায় জয়লাভ করা তো দূরের কথা, দৈনিক ১০০০ টন বোমাবর্ষণ করিয়াও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন। কোরিয়ার শিল্পকেন্দ্রগুলিতে, তাহার ব্যবস্থার কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করা সত্ত্বে কোরিয়া বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযান ক্ষুণ্ণ হয় ... সংগ্রামক্ষেত্রে বোমাবর্ষণ করিয়াও উত্তর-কোরিয়া বাহিনীর অগ্র... রোধ করার চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে।

কোরিয়ায় বোমাবর্ষণ ও ভারত—

কোরিয়ায় এত ব্যাপক বোমাবর্ষণ করা হইতেছে যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। গত ২৪শে আগষ্ট (১৯৫০) নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, "We are very much concernd for a variety of reasons. One reason is that innocent people are killed and unnecessary damage is done. The second reason is that it is likely to create more trouble in future. Therefore, we do not like it." অর্থাৎ 'নানা কারণেই আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। একটি কারণ এই যে, বহু নির্দোষ লোক মারা যাইতেছে এবং অপ্রয়োজনীয় ধ্বংসকার্য্য চলিতেছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইহাতে ভবিষ্যতে অধিকতর বিপদ সৃষ্ট হইতে পারে। আমরা তাহা পছন্দ করি না।' ভারতের পক্ষ হইতে উত্তর-কোরিয়ায় রেড ক্রশ মিশন পাঠাইবার চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়াও তিনি জানান। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেও লেকসাকসেসে যাইতে পারেন। কোরিয়ায় ব্যাপক বোমাবর্ষণের পরিণাম ভাবিয়া পণ্ডিত নেহরু যদি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। কোরিয়ার গৃহ-যুদ্ধকে উত্তর-কোরিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতে) যুদ্ধে পরিণত করিতে ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কোরিয়ায় ব্যাপক বোমাবর্ষণের দায়িত্ব ভারতকেও গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। ইহার পর ভারত উত্তর-কোরিয়ায় রেড ক্রশ মিশন পাঠাইতে চাহিলেই উত্তর-কোরিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তাঁহার এই উৎকণ্ঠিত হওয়াটা উত্তর-কোরিয়ার দৃষ্টিতে মায়া-কান্না বলিয়া প্রতিভাত হইলে সত্যই দোষের হইবে কি? সর্বোপরি ভারত গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলেই, এমন কি এই উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নেহরু স্বয় লেকসাকসেসে গেলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় বোমাবর্ষণ করা বন্ধ করিবে, অথবা কম পরিমাণে বোমাবর্ষণ করিবে, ইহা বোধ হয় পণ্ডিত নেহরুও বিশ্বাস করেন না। এদিকে উত্তর-কোরিয়ার জন্য পণ্ডিত নেহরুর সমস্ত উৎকণ্ঠাই মাঠে মারা গিয়াছে বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে কি?

কোরিয়ায় নির্ব্বিচারে বোমাবর্ষণ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রুশ প্রতিনিধি মঃ মালিক নিরাপত্তা পরিষদে যে-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোরিয়ার সহর ও জনবহুল স্থানগুলির উপর বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে বন্ধ করে এবং বিমান হইতে কোরিয়ার শান্তিপ্রিয় জনগণের উপর

যাহাতে গুলীবর্ষণ করা না হয়, তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হউক। তাঁহার এই প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র দুই ভোট এবং বিপক্ষে ৯ ভোট হওয়ায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। ভারতও এই প্রস্তাবের বিপক্ষেই ভোট দিয়াছিল। বিপক্ষে ভোট দেওয়ার কারণ সম্পর্কে ভারতের প্রতিনিধি মিঃ রাও বলিয়াছেন, "কোরিয়ার যুদ্ধ সভ্য রীতি অনুযায়ী পরিচালিত হউক ইহা আমরাও চাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির বিবৃতির পর আরও তদন্ত না করিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে, বোমা-বর্ষণের প্রত্যেকটি অভিযোগই সত্য।" যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতের প্রতিনিধি মিঃ রাওয়ের কাছে বেদবাক্যের মতই অভ্রান্ত বলিয়া মনে হওয়ায় আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিও কোরিয়াতে ব্যাপক বোমাবর্ষণের কথা সোজাসুজি অস্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধ মাত্রেই একটা নারকীয় ব্যাপার। যাহারা ঝড়ো হাওয়ার বীজ বপন করিবে ঘূর্ণি হাওয়ার ধাক্কা তাহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে।" তাঁহার এই উক্তিই কি কোরিয়ায় ব্যাপক বোমাবর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ নয়? কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ভারত যে ভোট দিতে পারে না, এমন কি পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং উৎকণ্ঠা বোধ করিলেও না, এই ব্যাপারে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল। আমেরিকার বোমারু বিমান মাঞ্চুরিয়াতেও বোমাবর্ষণ করিয়াছে। ইহার প্রতিবাদও অবশ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইহা কি ভ্রমক্রমে করা হইয়াছে, না ইহা উদ্দেশ্যমূলক অথবা 'টেষ্ট কেস্' অর্থাৎ পরীক্ষামূলক ব্যাপার?

ভারতের কোরিয়া-নীতির পরিণাম—

কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিবার পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়া সমস্যার সমাধান করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই শান্তি-প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী রাশিয়া নয়। এ সম্পর্কে শ্রাবণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভারত শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। এ সম্পর্কে পরবর্ত্তী চেষ্টা সুরু করিয়াছেন নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বেনেগল নরসিংহ রাও। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচ জনকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট ছয় জন সদস্য লইয়া তিনি যে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাকে 'শেডো সিকিউরিটি কাউন্সিল' (Shadow Security Council) বা ছায়া নিরাপত্তা পরিষদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কায়া যাহা করিয়াছে ছায়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে, ইহা মনে করা অসম্ভব। নিরাপত্তা পরিষদ ২৫শে ও ২৭শে জুন কোরিয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অপহুব না করিয়া ভারতীয় শান্তি-প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ভারত কোরিয়ায় শান্তি-প্রচেষ্টার জন্য একটা কিছু করিতেছে, কোরিয়ার অধিবাসীদিগকে এবং এশিয়ার জনগণকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করাই যদি শান্তি-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও কোরিয়া ও এশিয়ার জনগণের মনে উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

নিরাপত্তা পরিষদের ২৫শে ২৭শে জুনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্যতীত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী কোরিয়া সমস্যা সমাধানের কোন প্রস্তাবে রাজী হইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। ভারত একবার এই দুইটি প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এই প্রস্তাব-দ্বয়ের পন্থা ব্যতীত অন্য উপায়ে কোরিয়া সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের এই শান্তি-প্রচেষ্টার চেষ্টা চলিতে চলিতে কোরিয়ার অবস্থা কি হইবে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি না, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। কোরিয়ার পরিণাম দেখিয়াই এশিয়ার জনগণ ভারতের শান্তি-প্রচেষ্টার মূল্য দিবে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ার মুক্তিদাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-কোরিয়ার মুক্তির জন্য যে-ভাবে ব্যাপক বোমা-বর্ষণ করা হইতেছে, তাহাতে বিজয়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অভিনন্দন করিবার জন্য দক্ষিণ-কোরিয়ার এক জন অধিবাসীও জীবিত থাকিবে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, ফরমোসাকেও নিরাপত্তা পরিষদের কোরিয়া প্রস্তাবের আওতায় আনিবার যে-অভিপ্রায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কোরিয়ার যুদ্ধ কোরিয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হইবে না। অতঃপর অন্য দেশেরও মুক্তিদাতার ভূমিকা যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবে না, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। ভারত তখন কি করিবে? আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কোন বামপন্থী দল যদি ভারতের শাসন-ক্ষমতা দখল করে এবং এই অজুহাতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি ভারতের মুক্তিদাতা সাজিতে চায়, তাহা হইলে কংগ্রেস কি করিবে, তাহা কি সত্যই ভাবিবার বিষয় নয়? ইহার পরিণামে ভারতের কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি সহরের উপর যদি মার্কিণ বোমা বর্ষিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহা হইলে উহা বাঞ্ছনীয় হইবে কি? বস্তুতঃ আজ কোরিয়া প্রস্তাবের আবরণে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এশিয়ায় তাহাদের হৃতগৌরব, মর্যাদা এবং অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধের পরিণামে তাহাদের এই উদ্দেশ্য যদি সত্যই সাধিত হয়, ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি তাহার দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না।

কোরিয়া যুদ্ধের গতি—

গত শ্রাবণ মাসে কোরিয়া যুদ্ধের যে সঙ্কটময় অবস্থার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। উত্তর-কোরিয়ার অগ্রগতি থামিয়া না গেলেও খুবই মন্থর হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা খুবই সত্য। দক্ষিণ-কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট তায়েগু পরিত্যাগ করায় যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। উত্তর-কোরিয়া বাহিনী মার্কিণ বাহিনীকে (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী) কোরিয়া হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে পারিবে কি না অথবা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় 'বীচ্‌হেড' (Beach head) রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না, তাহা কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। Mr. Mercelle Hitschmann লিখিয়াছেন যে, ইতিমধ্যে কেহ কেহ beach

[illegible]কে beach tail বলিয়া মনে করিতেছেন। কোরিয়া যুদ্ধের পরিণাম যাহাই হউক, এই যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিলে যে বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়, তাহা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্তও কোরিয়া ছিল জাপানের অধীন, এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন দেশের মতই সামরিক শিক্ষাবিহীন দুর্বল জাতি। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যেই উত্তর-কোরিয়া সামরিক শক্তিতে এমন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিও তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পাঁচ বৎসরে উত্তর-কোরিয়া কিরূপে এত শক্তিশালী হইয়া উঠিল, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করিয়াছি কি? উত্তর-কোরিয়া যে এশিয়াবাসীর বহু শতাব্দীর কলঙ্ক-কালিমা দূর করিয়াছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? এক দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা কি সত্যই এক অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না? ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই দীর্ঘ দিনের একটা পরাধীন দেশ এইরূপ বিপুল সামরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কিরূপে হইল? আমরা শুনিয়াছি, উত্তর-কোরিয়া এই পাঁচ বৎসর পৃথিবীর নিকৃষ্টতম স্বেচ্ছাচারী শাসনের অধীন রহিয়াছে। উত্তর-কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট রাশিয়ার তাঁবেদার হইতে পারে। কিন্তু এই গবর্ণমেণ্ট উত্তর-কোরিয়াকে যে সামরিক শক্তিতে অভূতপূর্ব্বরূপে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উত্তর-কোরিয়ার সৈন্যরা কোরিয়ার ঐক্য সম্পাদনের জন্য হাজারে হাজারে প্রাণ দিতেছে। কোন স্বৈরতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শুধু দমননীতি চালাইয়া অধিবাসীদিগকে এইরূপ বিপুল আত্মত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে কি না, তাহাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। উত্তর-কোরিয়াকে রাশিয়া সামরিক শিক্ষা দিয়াছে বলিয়া উত্তর-কোরিয়া এইরূপ শক্তিশালী হইয়াছে, এ কথা যদি স্বীকার করাও যায়, তাহা হইলেও দক্ষিণ-কোরিয়াকেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শিক্ষা দিয়াছে, এ কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। দক্ষিণ-কোরিয়ার রী গবর্ণমেণ্টও যে ব্যাপক দমননীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাও আমরা জানি। তাহা হইলে দক্ষিণ কোরিয়া বাহিনী উত্তর কোরিয়া বাহিনীর মত শক্তিশালী হইতে পারিল না কেন?

উত্তর-কোরিয়া যে যুদ্ধ-সংক্রান্ত অতি উৎকৃষ্ট টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা কোরিয়ার যুদ্ধে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহারা ট্যাঙ্ক, কামান প্রভৃতিই শুধু চালনা করিতে পারে না, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা সম্বন্ধে চমৎকার পরিকল্পনাও রচনা করিতে পারে। ব্যাপক বোমাবর্ষণ করিয়াও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উত্তর-কোরিয়ার সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে পারে নাই। এইগুলি শিক্ষাদাতার শিক্ষাদান কৌশলের পরিচায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের শক্তির পরিচয়ও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। উত্তর-কোরিয়া যে আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, দক্ষিণ-কোরিয়া তেমন আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই। অনেকে মনে করেন, এই আদর্শগত প্রশ্ন উত্তর-কোরিয়ার এই জয়লাভের অন্যতম কারণ। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, উত্তর-কোরিয়ার এই অভিযান শুধু সামরিক ব্যাপার নয়, একটা বিপ্লবও বটে। ওয়াল্টার সুলিভান বলিয়াছেন, "United States soldiers have been trained to fight a war but this is a combination of war and revolution." অর্থাৎ 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু ইহা যুদ্ধ ও বিপ্লবের একত্র সমাবেশ।' নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও গরিলা বাহিনীর মধ্যে কোন তফাৎ কোরিয়ায় নাই। সমগ্র কোরিয়ায় এক জাতির লোকের বাস বলিয়া উত্তর-কোরিয়াবাসী ও দক্ষিণ-কোরিয়াবাসীর মধ্যে পার্থক্য বুঝাও সম্ভব নয়। উত্তর-কোরিয়া যে অঞ্চল দখল করিতেছে সেইখানে সৃষ্টি করিতেছে অর্থনৈতিক বিপ্লব। জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হইতেছে। কৃষকরা যদি তাহাদের এই জমি রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে মুক্তিদাতারূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে তাহারা অভিনন্দন করিবে কি? কাজেই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আমেরিকার জয়লাভ করা বড় সহজ হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জই হউক আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই হউক, কোরিয়ার যুদ্ধে যেদিন শেষ বিজয় লাভ করিবে সেদিন হয়ত কোরিয়াবাসীর এক জনও আর জীবিত থাকিবে না, ব্যাপক বোমাবর্ষণে সমগ্র কোরিয়া উপদ্বীপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার মতই হয়ত সাগর-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে।

বাঘা যতীন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বাঘ মেরে নাম বাঘা যতীন বৃটিশ-সিংহে করতে কাত,
তারই মতন দামাল ছেলের সঙ্গে যতীন মিলায় হাত।
প্রথম মহাযুদ্ধে যখন ইংরাজেরা হাঁপিয়ে উঠে,
বীর যতীনের মাথায় তখন বড়ই মজার বুদ্ধি ছুটে।
দূত পাঠিয়ে জারমানিতে অস্ত্র আনার করলে ঠিক,
জাহাজ-ভরা গোলা-বারুদ আসবে হ'তে নানান দিক।
অস্ত্র পেয়ে বিপ্লবী দল ইংরাজেরে করবে তাড়া,
বেয়নেটে আর বুলেটে করবে তাদের ভারত-ছাড়া।
বৃটিশেরি টিকটিকিতে ফেসল ধরে দলকে দল।
বেইমানিতে বেফাঁস হ'ল ফন্দী-ফিকির সব বিফল।
অস্ত্র-জাহাজ পড়ল আটক ব্যর্থ হ'ল সকল কিছু।

তাই বলে কি বাঘা যতীন মুসড়ে গিয়ে হটবে পিছু?
খুঁজছে পুলিশ নানান দিকে নাটের গুরু যতীন কোথা!
শেয়াল-ফাঁকি দিয়ে যতীন করছে আপন কর্ম্ম হেথা।
যতীন ছিল বালেশ্বরে বুড়ি-বালাম নদীর তীরে,
পুলিশের এক মস্ত ফৌজ হঠাৎ তাদের ফেলল ঘিরে।
পাঁচ বাঙালী, নায়ক যতীন করল তারা ভীষণ রণ
খুলবে মায়ের পায়ের শিকল নয় দেবে প্রাণ বিসর্জ্জন।
ঘণ্টা খানেক যুঝল তারা পাঁচশ পুলিশ দলের সনে।
রাখল সে এক অমর কীর্ত্তি বালেশ্বরের রণাঙ্গনে!
শহীদ যতীন প্রাণ সঁপিল দেশের, দশের মুক্তি তরে।
শত্রু হয়েও টেগার্ট সাহেব বীর যতীনে ভক্তি করে।

আকাশ-পাতাল

[৬৭২ পৃষ্ঠার পর]

কোচম্যান আবদুলকে প্রথমেই তাঁর গন্তব্যের নির্দেশ দিয়ে দেন কৃষ্ণকান্ত। গাড়ী এসে দাঁড়ায় চিত্রেশ্বরীর মন্দিরের সমুখে।

গাড়ী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কৃষ্ণকান্ত চিত্রেশ্বরীর পুরোহিতের শরণাপন্ন হন। তাঁকে বলেন,—মশায়, একবার আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনি বলুন তো। আমি ভোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেবীর পূজা করতে আসি। তিনি অনুমান ক'রেছেন, আমি বারনারীর গৃহে যাওয়া-আসা করি।

পুরোহিত কৃষ্ণকান্তকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। দূর থেকে দেখেই ছুটে এসেছেন। কথাটি শুনে জিব কেটে তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। বলেন,—এ কি অসম্ভব উক্তি! চলুন, চলুন, আমি গিয়ে তাঁকে বলছি।

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—দাদা-ভাই, আমি লোক-দেখানো ধর্ম্ম করতে চাই না। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে আসি।

কৃষ্ণচরণ আদ্যোপান্ত শুনে কোন দ্বিরুক্তি করেন না। শুধু বলেন,—আচ্ছা, তুমি গাড়ীতে ওঠ। এই আবদুল, গাড়ী হাঁকাও।

দেবী চিত্রেশ্বরী হয়তো সকলের অগোচরে হাসেন।

দুই ভাই হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরে আসেন।

বাড়ীতে পা দিয়েই বড় কর্ত্তা হুকুম করেন,—শালা শূয়ার-কা-বাচ্ছাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে আন তো যেমন অবস্থায় আছে!

আমলা আর ভৃত্যের দল ঠকঠকিয়ে কাঁপতে শুরু করে। কার প্রতি এই নির্দেশ! এই রোষ-উক্তি?

দু'জন পাইক হাতের বর্শা রেখে আদেশ পালন করতে এগিয়ে আসে। বলে,—কে হুজুর? হুকুম করুন তার গর্দান আপনার পায়ে এনে দেবো।

কৃষ্ণচরণ ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে বলেন,—ঐ হারামীর বাচ্ছাকে। ঐ মিথ্যেবাদীটাকে। ঐ শালা রঞ্জনকে। শূয়োরের বাচ্ছাকে এই মুহূর্ত্তে হাজির করবি এখানে।

কৃষ্ণকান্ত এতক্ষণে বুঝতে পারেন সংবাদদাতার নাম। বিস্মিত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন! বলেন,—দাদা, তুমি মাথা-খারাপ ক'র না। ওকে আমি জবাব দিয়ে দিচ্ছি এখনই।

—জবাব দিবি! গর্জ্জন করে ওঠেন কৃষ্ণচরণ।—এই যে দ্যাখ না কি করতে হয়!

খর্ব্বাকার রঞ্জন বলির পাঁটার মত ভয়ে-ভয়ে এসে দাঁড়ায় কাছারীর সমুখের প্রাঙ্গণে। কৃষ্ণচরণ ক্রোধান্ধ হয়ে তার পেছনে গিয়ে একটা পদাঘাত করেন সজোরে। লাথি মারেন। রঞ্জন চার হাত শূন্যে উঠে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে যায়। জানুতে তার আঘাত লাগে। তার পর থেকে রঞ্জন চলতো খুঁড়িয়ে। চিরদিনের মত একটা অঙ্গ তার আহত হয়ে থাকে। মিথ্যা কথা বলার শাস্তিস্বরূপ।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে থাকে।

সূর্য্য ঠিক আকাশের মাঝখানে। ঘড়ি-ঘরে ঢঙ ক'রে বাজলো একটা। ঘরে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকেই একটু চঞ্চল হয়ে উ[ঠে।] কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে আসছিল, ম্যানেজার বাবু বললেন,—তা [হলে] আজ্ঞা করেন তো কুলুপ এঁটে দিই।

সে বললে,—হ্যাঁ। জানলাটা বন্ধ করে দিন। নয় তো ইঁদুর ঢুকলে আর রক্ষে নেই।

ম্যানেজার বাবু বলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা ব'লেছেন। নিশ্চয়ই বন্ধ ক'রে দেবো।

কৃষ্ণকিশোর চলে যাচ্ছে, ম্যানেজার আবার বলেন,—আর একটি নিবেদন ছিল। বলছিলাম কি, খেয়ে-দেয়ে একবার আদালতে যেতে হবে। ফিরতে সেই পাঁচটা বেজে যাবে আপনার। দলিল-পত্র দেখাদেখিতেই—

কৃষ্ণকিশোর বলে,—কেন বলুন তো?

ম্যানেজার বাবু কুলুপে চাবি দিতে দিতে বলেন,—হুগলীতে হুজুরের কিছু জমি-জায়গা আছে, হুজুর বোধ হয় জানেন না। কতকগুলো মুসলমান প্রজা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। কোন রকমে একটা মকদ্দমা একবার যদি খাড়া করতে পারি তো তাদের জমি ভিটে ছাড়াবার ব্যবস্থা ক'রে তবে ছাড়বো। এখানকার আদালতে এখন বলছে যে, মামলা কলকাতা থেকে হুগলীর আদালতে তুলে নিয়ে যেতে হবে। সেই কারণে আপনার দলিল-পত্র দেখতে চেয়েছে। আর তা ছাড়া এ মামলা লড়বে আপনার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট। ম্যানেজার বাবুর মুখে হাসির রেখা মারে। বলেন,—আপনার বকলমের ছেঁট যারা দেখা-শুনা করছে।

মামলা কেন? কেন কোর্ট-ঘর? রফা হয় না কোন মতে। একটা এমন কোন চুক্তি করা যায় না যাতে আর আদালতে ছোটাছুটি করতে হয় না! কৃষ্ণকিশোর এত কথার উত্তরে বলে না কোন কথাই। শুধু বলে,—তা যাবেন তাতে আর কি!

ভেতর থেকে মায়ের আহ্বান আসে।

জহর আর পান্না আসনে ব'সে প'ড়েছে না কি। আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা ক'রতে পারছে না। এসো তো এসো নয় তো তারা পাতে হাত দেবে বলছে। কথাগুলো বিনোদা এসে বলে—সদরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। বাণের মত যেন কথাগুলো কানে গিয়ে বসায়। কৃষ্ণকিশোরের মনে হয় বিনোদার মুখখানা যেন রামায়ণের ছবির সীতার পাহারা-রত সেই চেড়ীগুলোর চেয়ে একটুও পৃথক্ নয়।

অনন্তরাম এ বাক্যবাণের প্রত্যুত্তর দেয়। বলে,—বলগে [যা] খেয়ে-দেয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাক্। খেতে কে মানা ক'রেছে কে? ইস্—

বিনোদা ফিক ক'রে একবার হাসে। হাসির রেশ টেনে বলে,—তুই মুখপোড়া কথা কচ্ছিস্ কেন! তুই থাম্ না। আমি তোকে বলেছি?

কৃষ্ণকিশোরের পেছনে দাঁড়িয়ে অনন্তরামও সে-হাসির বিনিময় দেয়। অনন্তরামও একটু হাসে। প্রেমের দেবতা মদনও বোধ করি সকলের অলক্ষ্যে একটু হাসেন তার পোড়া কপালের জন্যে তার গোপন প্রেমের এমন পাত্র-পাত্রীর মিলন দেখতে পেয়ে।

বিনোদা হাসির জের টেনে ঘরে চলে যায় অন্দরে। অনন্তরাম পেছন ফিরে-ফিরে তাকায় আর দেখে ঐ গজেন্দ্রগামিনীকে। ঐ

বিনোদাকে নিয়েই একটা দুর্দান্ত রকমের কলহ-বিবাদ হয়ে যায় অনন্তরামের সঙ্গে রঞ্জনের।— তখন ছোট কর্ত্তা জীবিত রয়েছেন। সে আরেক কাহিনী। সে পুরানো কথার আর প্রয়োজন নেই এখানে।

স্নান সেরে গিয়ে দেখলো জহর আর পান্না কখন উঠে পড়েছে। তারা তখন পান মুখে পুরছে। পান আর দোক্তা। কৃষ্ণকিশোরকে দেখেই জহর এগিয়ে এসে বললে,—মামীকে বললুম তোর যাওয়ার কথা। আপত্তি করলেন। বললেন, পিসীমা এসেছেন, আজ আর ও কোথাও যাবে না। তা যাও তোমার পিসীর আদর খাওগে যাও এখন ভাল ছেলেটির মতন। আমাদের কি, আমরা কেমন মজা ক'রে মেলা দেখে আসবো!

তাই যা।

মুখে আর কথাটা বলতে পারে না সে। মনে মনে বলে। সেই বিশ্রী দুঃসংবাদটা শোনা পর্য্যন্ত মেজাজ কেমন যেন তার বিগড়ে রয়েছে। সেই অসুখের সংবাদ শুনে। সেই শান্ত সরল মেয়েটা, যার বড় দু'টো চোখ আর ডালিম রঙের ঠোঁট, সেই মেয়েটার অসুখ! না, তা হয়তো নয়। ঐ অরুণেন্দ্র হয়তো টাকার প্রয়োজনে ব'লেছে এতগুলো কথা—যার মূলে কোন ভিত্তি নেই। আহা, তাই যেন হয়! জহর আর পান্না চলে যায় পান চিবোতে-চিবোতে।

খেতে ব'সে মুখে যেন ভাত ওঠে না।

পিসীমার শরীরে ক্ষতচিহ্ন দেখে আর কি কারণে যেন ইচ্ছা হয় না রোজকার মত ব'সে ব'সে তারিয়ে খেতে। এটা-সেটা নেড়ে-চেড়ে উঠে পড়ে হঠাৎ। কুমুদিনী আহা আহা ক'রে ওঠেন। বলেন,—সে কি, উঠে পড়লে? খেলে না কিছু?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—খেয়েছি, আর পারছি না।

কুমুদিনীর মায়ের প্রাণ। ছেলের মুখ দেখেই বুঝতে পারেন কি একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নেমেছে যেন। কিছু বলেন না।

সে বলে,—পিসীমা কোথায় মা?

কুমুদিনী বলেন,—যাও না তুমি, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো না। বল মা ডাকছেন। কর্ত্তা-দাদুর ঘরে তিনি আছেন। আমি তাঁর খাবার দিতে বলি।

শুয়ে শুয়ে এক খণ্ড 'বঙ্গদর্শন' পড়ছিলেন পিসীমা। কৃষ্ণকিশোর গিয়ে ডাকতেই হেমনলিনী হাসতে হাসতে নেমে আসেন। এই কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি যেন ভুলে গেছেন তাঁর সকল ব্যথা। গত রাত্রির অঘটনের কোন কথাই আর যেন মনে নেই তাঁর। স্বামীর মত্ততা আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মনে-মনে তিনি যা স্থির করেছিলেন, তার সব কিছুর ওলট-পালট হয়ে গেল। হেমনলিনী ভেবেছিলেন, পিত্রালয় থেকে আর ফিরবেন না। বৌঠানের সেবা-দাসী হয়ে প'ড়ে থাকবেন এখানে। লোকে নানা কথা বলবে, তা বলুক। কিন্তু শিবচন্দ্র এসে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে যে ভাবে কাকুতি-মিনতি ক'রে গেলেন, তাতে তাঁর সকল কষ্টের লাঘব হয়ে গেছে। স্বামী পায়ে হাত দিয়েছেন তাতে তাঁর নিজেকে প্রথমে পাপের ভাগী মনে হয়েছিল। মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন,—ক্ষমা করো। তার পরেই মনে পড়েছিল স্বামীর পায় তিনি তো দাসখৎ লেখেননি, শিবচন্দ্রই প্রথম মিলনের দিনে তাঁর পায়ে আলতা দিয়ে লিখেছিলেন আমাদের সেই চিরাচরিত প্রথার দাসত্ব স্বীকারের বাঙলা মন্ত্র। নাম সই করেছিলেন! স্ত্রী তো আর দাসী নয়, দেব-দেবীর সমতুল্য।

হেমনলিনী খেতে বসেন হাসতে হাসতে। কুমুদিনী সমুখে এসে পাখা হাতে বসেন। মাছি তাড়ান। ননদিনীর মুখে খুশীর আভাষ দেখে তিনিও যেন খানিক আশ্বস্ত হন এতক্ষণে। তাঁর মুখেও হাসির রেখা দেখা দেয়।

কিন্তু অরুণেন্দ্রর কথা যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়!

কৃষ্ণকিশোর বিব্রত বোধ করে। অন্দর থেকে সদরের দিকে এগোয় একটা মিঠে পান মুখে দিয়ে। টম কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসে। সেই সকাল থেকে প্রভুর দেখা পায়নি। কোথা থেকে দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। তার পায়ে পায়ে চলে।

তৈলাক্ত অনন্তরাম। বাঙ্গালীর তেলে-জলে প্রাণ। তাই দৈনিক দু'পলা তেল সে নিঃশেষ ক'রে অঙ্গে মাখে। বুকে তেল ডলতে-ডলতে অনন্তরাম বললে,—খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, এখন একটু বিশ্রাম করগে যাও। সেই বিকেল নাগাদ আমার সঙ্গে যাবে চড়কের মেলা দেখতে।

কৃষ্ণকিশোর হাসতে হাসতে বললে,—মেলা দেখবো না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যেও।

সে হাসে কিন্তু তার হাসিতে যেন কৃত্রিমতা। নকল হাসি। বৈঠকখানায় গিয়ে ঝলন্ত ঝাড়গুলোকে দুলিয়ে দিয়ে ফরাসে এলিয়ে পড়লো সে অবলীলায়। হরেক রঙের আভা ফুটিয়ে দুলতে লাগলো আলো। ঠুং-ঠাং শব্দের তরঙ্গ উঠলো ঘরে। টম ফরাসের তক্তাপোষের তলায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

ওরা কারা!

কারা ওরা যে, সে এমন ব্যস্ত হবে এক জনের শারীরিক অসুস্থতায়। দরজার খসখসগুলো ফেলে দিয়ে যায় একটা তাঁবেদার জল ছিটিয়ে দিয়ে যায়। স্নিগ্ধ শীতল হয় ঘরখানা। খসখসের সুমিষ্ট গন্ধ ভাসতে থাকে। চোখে যেন ঘুমের জড়তা নামে। ইতি-উতি ভাবতে ভাবতে কখন হয়তো তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই সকাল থেকে চলেছে একটা চাপা অশান্তির আলোড়ন। ক্লান্তিতে ঘুম আসে তার চোখে। কৃষ্ণকিশোর ঘুমিয়ে পড়ে কখন।

আহারাদির পর খসখস ফাঁক ক'রে অনন্তরাম একবার দেখে যায়। কি করছে তাই দেখে। ঘুমন্ত দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে একা অন্দরের দিকে চলে। অন্দর এখন ফাঁকা। বৌঠান আর পিসীমা ওপরের ঘরে ব'সে ব'সে মনের কথার আদান-প্রদান করেন। দুঃখের কথা। বিনোদা এখন কোথায়?

সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।

ক্রমে ক্রমে দিন দীর্ঘ হয়। সূর্য্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ে। ঘড়ি-ঘরে এক ঘণ্টার অন্তরে যথারীতি বেজে যায় দু'টো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। পাঁচটা বেজে যাওয়ারও অনেক পরে হঠাৎ যেন ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলতেই মনে হয় কৃষ্ণকিশোরের, এ কি রাত ফুরিয়ে যে ভোর হয়ে গেছে!

বিভ্রান্তি। রাত ফুরিয়ে ভোর নয়, দিন ফুরিয়ে প্রায় সন্ধ্যা। এমন ভুল অসম্ভব নয়। দিবানিদ্রার শেষে ঘুম ভাঙলে অনেকেরই এমন ভুল হয়। এ একটা স্বাভাবিক বিভ্রম।

ঘুম থেকে উঠেই অনন্তরামকে দেখে কৃষ্ণকিশোর বলে,—আবদুলকে বল, গাড়ী বের করবে। আমি বেড়াতে যাবো।

—বেশ তো। তুই প্রস্তুত হয়ে নে। অনন্তরাম খুশী মনেই বলে।

—আমি প্রস্তুত। কৃষ্ণকিশোর বলে,—তুমি মাকে বলে এসো, আমি বেড়াতে যাচ্ছি।

মা শুনে বলেন,—ওমনি পিশীমাকে তাঁর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে বল। তিনি তৈরী হয়ে আছেন।

পিশীমাকে তার বাড়ীতে নামিয়ে কোচম্যান জিজ্ঞেস করে তার গন্তব্য। কৃষ্ণকিশোর শেষ পর্য্যন্ত বলে,—সেই রিপন ষ্ট্রীটে চল।

কোচবক্সে অনন্তরাম। সে শুধোয়,—সত্যিই তা হলে মেলা দেখবি না?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—না, দেখবো না। অনন্তদা, জোরে হাঁকাতে বল আবদুলকে।

পথের লোকজনকে থতমত খাইয়ে জুড়ী ঘাড় বেঁকিয়ে দৌড়য়। আবদুলের এক হাতে বল্গা, অন্য হাতে দুরন্ত চাবুক। আর পায়ে বাজায় ঘন-ঘন ঘণ্টা। ঢং, ঢং, ঢং শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে তোলে যেন।

রিপন ষ্ট্রীটে গাড়ী পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। নর্ম্যান লজের ফটকে গাড়ী ঢুকতেই কৃষ্ণকিশোর দেখতে পায় গাড়ী-বারান্দার নীচে কালো পোষাক-পরা অনেক লোক। কালো রঙের এক রকমের পোষাক সকলের। নত-মস্তকে সকলে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। শোকের ছায়া নেমেছে এ বাড়ীর আবহাওয়ায়। তাই যে ঐ শোকের পোষাক। কৃষ্ণকিশোর অবাক হয় দেখে-শুনে। কি ব্যাপার কি?

গাড়ী থেকে নেমে গাড়ী-বারান্দার কাছাকাছি যেতেই দেখতে পায়, কয়েক জন এই রকম কালো পোষাকের লোক, তাঁদের কাঁধে একটা লম্বা কালো বাক্স। কালো কাপড়ের আবরণে ঢাকা। তাঁরা ধরাধরি ক'রে বাইরে নিয়ে আসছেন। তাঁদের পেছনে আসছে ঐ তো অরুণেন্দ্র। ঠিক উন্মাদের মত তার আকৃতি। অশ্রু-সজল চোখ। কান্নার আবেগে ফর্সা মুখখানা যেন তাঁর লাল হয়ে উঠেছে।

কি হয়েছে কি?

বন্ধুকে দেখেই এগিয়ে আসে অরুণেন্দ্র। কম্পিত কণ্ঠে বলে,—Lilian is gone. ঠিক দু'টোর সময়, Just at two, she has left us in grief and sorrow.

স্তব্ধ-বিস্ময়ে অরুণেন্দ্র জিজ্ঞেস করে,—কি হয়েছিল কি?

অরুণেন্দ্র বলে,—Malaria. Dangerous type of Malaria.

ম্যালেরিয়া! সামান্য মশা যে রোগ বহন করে, বাঙলার বৈরী সেই ম্যালেরিয়া! প্রতিদিন কত লোক এই অসুখে মৃত্যুবরণ করছে বাঙলা দেশে। যে অসুখের বাহক ঐ মশককুল।

শবদেহ ফটকের বাইরে চলে যায় দেখতে দেখতে। বিনয়েন্দ্র মুখে পাইপ ধরিয়ে অনুসরণ করেন নত-মস্তকে। তাঁর মত কঠিন প্রকৃতির মানুষের চোখেও জলের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কোন কথা বলে না। নীরবতা, কেবল নীরবতা। শোকার্ত্ত স্তব্ধতা।

অরুণেন্দ্র বললে,—তুমি কি করবে! তুমি বাড়ী ফিরে যাও। একবার Lilian-এর sense ফিরে এসেছিল। তোমার কথা বলেছিলাম। সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজেছিল ঘরের ভেতর। তোমাকেই—

কৃষ্ণকিশোর তাকিয়ে থাকে অবাক-বিস্ময়ে। যেন ঝড় বইছে তার চোখের সামনে। ঝড়, ঝঞ্ঝা আর ঘূর্ণিবাত্যা। অরুণেন্দ্র বললে,—তুমি যাও, বাড়ী যাও। আমাকে যেতে হবে সঙ্গে। কথা বলতে বলতে এগোতে শুরু করে ধীরপদে। সেও এগোয় তার পেছন পেছন। অরুণেন্দ্র যেতে যেতে বলে কি একটা ছড়া, যার এক বর্ণ অর্থ সে বুঝলো না। অরুণেন্দ্র বলে:—

> There is no Death! What seems so is
> transition;
> This life of mortal breath
> Is but a suburb of the life elysian,
> Whose portal we call Death.

বলতে বলতে ফটকের বাইরে যায় অরুণেন্দ্র। দেখে শবদেহ চলে গেছে অনেক দূরে। অরুণেন্দ্র ছুটতে শুরু করে। সে তখন অবাক চোখে দাঁড়িয়ে থাকে খানিক। দেখে, সন্ধ্যা নেমেছে। আর সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে ঐ কালো পোষাকের মানুষগুলি—আর লিলিয়ানের কফিনটা। চার্চের ঘড়িতে তখন মৃদু মন্দ ধ্বনি শুরু হয়েছে। অবিরাম বেজে চলেছে ঘড়ি জল-তরঙ্গের শব্দে। মূঢ়ের মত সে চেয়ে থাকে শুধু। শবযাত্রা অগ্রসর হয় ধীরে ধীরে।

[ক্রমশঃ]
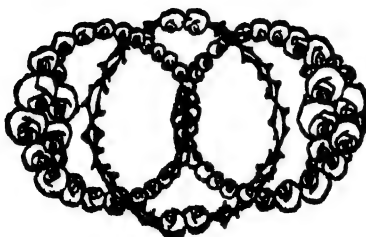
কংগ্রেস সভাপতি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম-দাস ট্যাণ্ডন নির্ব্বাচিত হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করা হইয়াছে। নাসিক কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্ব্বাচনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচনে এইরূপ তীব্র প্রতিযোগিতা ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

ভোটের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল—

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন—১,৩০৬ ভোট, আচার্য্য কৃপালনী—১০৯২ ভোট, শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও—২০২ ভোট। বিভিন্ন প্রার্থীর অনুকূলে মোট ২,৬১৮টি ভোট প্রদত্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৮টি ভোট বাতিল হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস লক্ষ্ণৌয়ে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন "বিগত বহু বর্ষব্যাপী সাধনায় কংগ্রেসের যে ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাই আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে, আমার কার্য্য ও নীতি উহার দ্বারাই প্রভাবিত হইবে। কংগ্রেসের আদর্শ ও ঐতিহ্য উপেক্ষণীয় নহে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এত কাল তিনি যে ভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি কাজ করিয়া যাইবেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সভাপতির নির্ব্বাচনের প্রথা পূর্ব্বে তিন বার ভঙ্গ করা হইয়াছে। প্রথম বার শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীপট্টভি সীতারামিয়া; দ্বিতীয় বার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় এবং তৃতীয়বার ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ও শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন ডাঃ সীতারামিয়ার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ সালে আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও সার্ভেণ্টস অফ পিপলস সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তিনি

কয়েক বার কারাবরণও করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহকর্ম্মিরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি যুক্তপ্রদেশে খাজনা বন্ধ আন্দোলন পরিচালনা করেন। রাওলাট আইন-বিরোধী আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন ১৯৪১ সালে আট মাস কাল জেলে আটক ছিলেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৪ সালের ২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন সম্প্রতি উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারের পদত্যাগ করিয়াছেন। আইন সভার স্পীকাররূপে তিনি যে নির্ভীকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ তাঁহার প্রতি প্রভাবিত হইয়াছেন। অন্যায় ও অসত্যের সহিত আপোষ করিয়া চলা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ১৯১০ সাল হইতে তিনি হিন্দী ভাষার আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। গত জুলাই মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পিত ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি বিরুদ্ধ দলের অন্যতম ছিলেন। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন সারা ভারতে এক জন বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্মপ্রাণ, নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী নেতারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ট্যাণ্ডন সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় কংগ্রেস ও ভারতীয় মন্ত্রিসভায় কোন সঙ্কটের আশঙ্কা ও জটিল অবস্থার উদ্ভবের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতির মধ্যে যে সকল মূল বিষয়ে মতানৈক্য আছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল—

(১) পাকিস্তানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ :
(২) পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান ;
(৩) শরণার্থী সমস্যার সমাধান এবং
(৪) ভারতের রাষ্ট্রভাষা স্বরূপে হিন্দীর প্রবর্ত্তন।

নাসিক কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে উক্ত সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ "পাইব বলিয়া আমরা আশা করি।" তবে ট্যাণ্ডনজী যে কংগ্রেসের মধ্যে কোন সঙ্কট সৃষ্টি করিবেন না, এই বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার বিবৃতিতে চারিটি মূল নীতিগত প্রশ্ন তুলিয়াছেন—পররাষ্ট্র-নীতি, অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িক নীতি এবং নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ব্যবস্থা। নাসিক কংগ্রেসে এই প্রশ্নগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে বলিয়া দেশবাসী আশা করে। কিন্তু যে সমস্ত সমস্যা দেশের জনচিত্ত মথিত করিতেছে, তাহার সমাধানের সন্ধান নাসিক কংগ্রেস দিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের প্রচুর সন্দেহ রহিয়াছে। কংগ্রেস এক্ষণে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যত শীঘ্র উহার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কংগ্রেসী একনায়কত্বের ও স্বৈরতন্ত্রের অবসান না হইলে দেশের জীবন-যাত্রার অনিশ্চয়তা, মূল্যবৃদ্ধি, চোরাকারবার, বেকার সমস্যা ও সর্ব্বব্যাপী দুর্নীতি কখনও দূরীভূত হইবে না। তবে শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের সভাপতি পদের জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর যেমন আতঙ্কের কারণ নাই, তেমনই জনসাধারণেরও বিশেষ কোন উল্লাসের হেতু নাই। হতভাগ্য দেশবাসী যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থাকিবে।

——

পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীবিজয়সিং নাহার পশ্চিম-বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নব নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"যে বিপ্লবী ভাবধারা বাঙ্গালা দেশের রাজনীতিকে পরিচালিত করিয়াছে, সেই আদর্শ গ্রামে গ্রামে রূপ দিবার চেষ্টা বর্ত্তমান প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একমাত্র লক্ষ্য হইবে। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে যে সকল সমস্যা আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে বড় সমস্যা বাস্তহারা সমস্যা। দ্বিতীয় বড় সমস্যা গ্রামকে বাঁচাইবার সমস্যা। যদি গ্রাম ও সহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে শত সমস্যা-সঙ্কুল পশ্চিম-বঙ্গের সমস্যা সমাধান হইবে এবং আমি ইহাও বিশ্বাস করি, এই সমস্যা সমাধানের শক্তি আমাদের আছে।"

নব নির্ব্বাচিত সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, তিনি কংগ্রেসের মধ্য দিয়া যুব-সংগঠনের দিকে বিশেষ করিয়া নজর দিবেন এবং তরুণদের কংগ্রেসের মধ্যে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসে বহু কাল যাবৎ নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় চার-পাঁচ দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এবারের নির্ব্বাচনে একদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, নব নির্ব্বাচিত সভাপতি ও সম্পাদক এবং তাঁহাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি পদে পদে বিরোধিতার আশঙ্কা মুক্ত হইয়া দেশের সত্যকার সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিবেন। জনসেবার ক্ষেত্রে সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

——

পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত অজিতপ্রসাদ জৈন সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। পরে তিনি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, পশ্চিম-বঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদিগকে পশ্চিম-বঙ্গের বাহিরে প্রেরণ করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যান্য রাজ্যে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করা যায় কি না, ভারত গভর্ণমেণ্ট সে সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। আন্দামানেও আরও অধিক সংখ্যক শরণার্থী উপনিবেশ সম্ভব কি না, এই বিষয়টিও তাঁহাদের বিবেচনাধীন আছে। তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিম-বঙ্গের উপর শরণার্থীর যে চাপ পড়িয়াছে, তাহা হ্রাস করা যায় কি না ইহাই তাঁহাদের এখন বিবেচনার বিষয়। বিহার ও উড়িষ্যায় শরণার্থী প্রেরণ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জৈন বলেন যে, বিহার ও উড়িষ্যায় পুনর্ব্বসতির উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বেই শরণার্থী প্রেরণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ দুইটি রাজ্যে নূতন করিয়া শরণার্থী উপনিবেশ স্থাপন করা তাঁহাদের বিবেচনাধীন নহে। কিন্তু যতই পরিকল্পনা করা হউক না কেন, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে আমাদের শাসকবর্গের আন্তরিকতা ও আগ্রহের অভাব বিশেষ ভাবে জনসাধারণের নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে। আসল কথা, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতির পথে যাহা প্রকৃত অন্তরায় তাহা দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের পুনর্ব্বসতি সমস্যা সমাধান হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি সম্পর্কে প্রাক্তন পুনর্ব্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাকসেনা পণ্ডিত নেহরুর নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সাকসেনা তাঁহার রিপোর্টে বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থী সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন প্রদেশের অটুট সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক। সমস্যাটি শুধু পশ্চিম-বঙ্গের এরূপ ধারণা করা ভুল, উহার দ্বারা ভারতের কল্যাণ ও সংহতি নষ্ট হইবে। তিনি আরও বলেন যে, সরকার দিল্লী-চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ভারতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্ততঃ পক্ষে ৫০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সাকসেনা এক বৎসরেরও অধিক কাল পুনর্ব্বসতি সচিবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় তিনি এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? আসল কথা এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বসতি সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয় নীতি সমস্ত পরিকল্পনাই ম্লান করিয়া দিতেছে।

শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত
বসুমতী সাহিত্য মন্দির; ১৬৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলি—১২

(চিত্র-পরিচিতি দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীদুর্গা
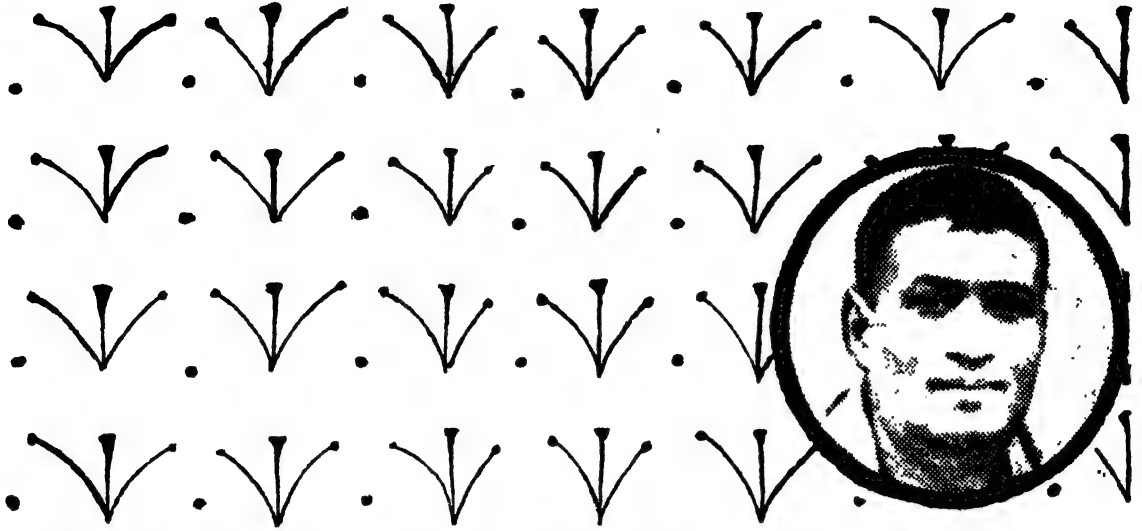
২৯শ বর্ষ, আশ্বিন : ১৩৫৭] সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত [১ম খণ্ড : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

ব্রহ্মের এক শক্তির নাম মায়া। এই শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও অঘটন সংঘটন হচ্চে। মায়া বল্‌তে—ইন্দ্রজাল বা ভ্রম দর্শন। আমরা পদার্থের যে অবস্থা প্রকৃত বা সত্য বলে ধারণা করছি, প্রকৃত পক্ষে তার সেই অবস্থা সত্য নয়, কে জানে কখন তা'র পরিবর্ত্তন হবে।

মায়া দুই প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিবেক ও বৈরাগ্যের কার্য্যকে বিদ্যামায়া এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদির কার্য্যকে অবিদ্যামায়া কহে।

অবিদ্যামায়া জীবকে আমি ও আমার জ্ঞান দ্বারা সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বিদ্যামায়া এই বন্ধন মোচন করে দেয়। এই দুই-ই মায়ার খেলা।

পায়ে কাঁটা ফুটলে, আর একটি কাঁটা দ্বারা তাকে বার করে, পরে দু'টা কাঁটাই ফেলে দেয়। সেইরূপ অবিদ্যামায়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিদ্যামায়ার দরকার হয়; শেষে জ্ঞান লাভ হলে, ঈশ্বর দর্শন হলে, তখন এই দুই মায়াই চলে যায়।

জীবের অহঙ্কারই মায়া। যেরূপ ঘোলা জলে সূর্য্য বা চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ "আমি ও আমার" এই মায়া জ্ঞানযুক্ত জীবের ঈশ্বর দর্শন ঘটে না।

মায়া মেঘের স্বরূপ। যেমন চন্দ্র বা সূর্য্য উদিত থাকলেও সামান্য মেঘাবরণ দ্বারা তাহাদিগকে দেখা যায় না, সেইরূপ স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে আমরা মায়াবরণ বশতঃ দেখতে পাই না।

পানায় ঢাকা পুষ্করিণীর সম্মুখে দাঁড়িয়েও তাহার নীচের জল দেখা যায় না; জল দেখতে হ'লে পানা সরিয়ে দেওয়ার আবশ্যক, সেইরূপ মায়াকে সরিয়ে দিলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়। পানা সরিয়ে

চারি ধারে বাঁশ বেঁধে দিলে, আর পানা সেখানে আসিতে পারে না, তখন জল বেশ দেখা যায়, সেইরূপ বিবেক বৈরাগ্য এবং জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিলে আর মায়া-পানা তাকে অতিক্রম করে এসে, ঈশ্বরকে ঢেকে ফেলতে পারে না ; তিনি সর্ব্বক্ষণ স্বপ্রকাশ থাকেন।

মায়াকে চিন্‌তে পারিলেই মায়া আপনি পালায়। চোর বাড়ীতে এসেছে, যদি গৃহস্থ জানতে পারে, চোর আপনিই পালায়।

যাকে ভূতে পায়, সে যদি জানতে পারে যে তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হলে ভূত আপনিই পালিয়ে যায় ; সেইরূপ মায়াচ্ছন্ন জীব যদি বুঝতে পারে যে, সে কেবল মায়ায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্চে—জগতের ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্চে, তা হলে মায়া তার কাছ থেকে আপনিই পালিয়ে যায়।

বাঘের মুখোস পরে ছেলেদের ভয় দেখালে তারা ভয় পায়, কিন্তু যে মুখোস পরেছে—তাকে যদি চিনতে পারে, তবে আর ভয় করে না ; সেইরূপ এই মায়ার ভিতরে যিনি আছেন—তাঁকে যদি জীব জানতে পারে, তবে আর মায়াকে ভয় থাকে না।

এক গুরুঠাকুরের সঙ্গে এক জন মুচি—চাকর সেজে শিষ্য-বাড়ী গিয়েছিল। গুরুঠাকুর তাকে বলে দিয়েছিলেন যে, তুই কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা কস্ না, তা হলেই তোকে কেউ চিনতে পারবে না। চাকর শিষ্যের বাড়ী এসে কারো সঙ্গে কথা কয় না। এক দিন যখন গুরুঠাকুর সন্ধ্যা-আহ্নিক করছেন, এমন সময় এক জন লোক এসে তাকে গুরুঠাকুরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে। সে কথাই বলে না। তখন সে লোকটা বিরক্ত হ'য়ে বল্লে—তুই ব্যাটা মুচি দেখচি।' যেমন এই কথা শোনা—সে অমনি ব'লে উঠলে 'ঠাকুর মশায় গো। আমায় চিনে ফেলেছে, আমি পালাই'—এই ব'লে সে চলে গেল। মায়াকে চিনতে পারলে মায়া পালিয়ে যায়—আর থাকে না।

আপনাকে জানলেই ঈশ্বরকে জানা যায়।

ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়। তাঁর কাছে আমাদের জোর করা চলে।

সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস,—চাঁদা মামা সকলেরই মামা।

আপনার মা বোধ করে তাঁকে ডাকো। তিনি ত পাতানো-মা, বা ধর্ম্ম মা নন। তিনি আমাদের আপনারই মা। ব্যাকুল হয়ে মা'র কাছে দেখা পাবার জন্য আবদার কর।

ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ যেমন লোহা আর চুম্বক। চুম্বক স্বভাবতঃই লোহাকে টানে, কিন্তু যদি লোহায় কাদা লাগান থাকে, তবে আর আকর্ষণ হয় না। সেইরূপ যতক্ষণ মায়া ও ষড়রিপুর কাদা জীবের গায়ে লেগে থাকে, ততক্ষণ জীব ঈশ্বরের নিকট যেতে পারে না, কিন্তু যদি সেই কাদা ধুয়ে ফেলা যায়, তা হলে জীব তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়।

অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। সীতা স'রে দাঁড়ালেই লক্ষ্মণ রামকে দেখিতে পান। সেইরূপ মায়া ও অহঙ্কার স'রে গেলেই জীব ঈশ্বরকে দেখতে পায়।

ঈশ্বর মায়াবরণ দ্বারা আপনার চক্ষু আপনি বেঁধে, জীব সেজে অন্ধের খেলা খেলছেন। যতক্ষণ মায়ার মধ্যে থাকেন—ততক্ষণ 'জীব', মায়াতীত হলেই 'শিব' বলা যায়।

জীব সচ্চিদানন্দের স্বরূপ। কেবল মায়া বা অহঙ্কার বশতঃ নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, এবং আপনার 'স্বরূপ' ভুলে গেছে।

দুর্গোৎসব ও জাতীয় জীবন

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

দুর্গো সব শুধু আমোদ-প্রমোদের উৎস নহে বা সামাজিক বিলাস মাত্র নহে, ইহার সহিত ভারতের জাতীয় জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কোনও একটি জাতির জীবন-ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইলে তাহার আনন্দ-উৎসব-ধারার সহিত পরিচিত হওয়া প্রথম প্রয়োজন।

সাধারণ আচার-ব্যবহার কোনও জাতির স্বরূপকে কিয়ৎ পরিমাণে গোপন করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু আনন্দ-উৎসবের সময়ে জাতির নগ্নরূপ বাহির হইয়া পড়ে। এ দেশের আদিম অধিবাসিদিগের পৌষ-উৎসবে বা আধুনিক সভ্যতম পাশ্চাত্ত্যগণের বড়দিনের উৎসবে—ঐ সকল জাতির আভ্যন্তরিক রহস্য প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। মদ্যপান 'বল্‌নাচ' এবং কতকগুলি স্বেচ্ছাচার সেই সেই উৎসবে অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ধরা পড়িয়া যায়।

বাঙ্গলার বিশিষ্ট উৎসব—দুর্গাপূজা। ইহাতে যাত্রা, থিয়েটার, কোথাও বা নাচ-গান অনুষ্ঠিত হইলেও আভ্যন্তরিক স্বরূপ হইতেছে মাতৃ আরাধনা। মণ্ডপমধ্যে চিন্ময়ী ভাবনায় যে দুর্গা-প্রতিমা স্থাপিত হয়, তাঁহারই প্রীতি উদ্দেশ্যে সমস্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লোকজন নিমন্ত্রিত হয়, ভোজন করে, কিন্তু প্রায় সমগ্র আহার্য্য দ্রব্য দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত হইয়া প্রসাদরূপে পরিবেশিত হয়। যেখানে যাত্রা, গান নাচ হইতেছে—সেখানেও দর্শনার্থীরা অগ্রে মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া তবে আসরে প্রবেশ করে।

মাতৃ-মূর্ত্তির আগমন শুক্লা প্রতিপৎ হইতে দশমী পর্য্যন্ত—এই দশ দিন এক অপূর্ব আনন্দে প্রত্যেক বাঙ্গালী মগ্ন হয়। এই আনন্দের প্রবাহ বড় বিচিত্র। ইহাতে স্নেহ-প্রবণ বাঙ্গালী গৃহস্থের কন্যা শ্বশুরবাটী হইতে পিতৃগৃহে আসিলে যে উল্লাস-তরঙ্গ গৃহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেরূপ রাজসিক চাঞ্চল্যও আছে, আবার সাধনানিরত শান্ত চিত্তের সাত্ত্বিক স্থিরতাও আছে। জনতার যত আগ্রহ যাত্রা ও সঙ্গীতাদি শ্রবণে, ততখানি উদ্‌গ্রীবতা প্রতিমা-দর্শনে, তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে ও স্তবপাঠে। বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে; উত্তর-ভারতে 'নবরাত্রিব্রত' বহু জন পালন করেন; কিন্তু তাহা হইলেও জনসাধারণের মধ্যে সে দেশের 'দেওয়ালী' ও 'হোলী' প্রধান উৎসবরূপে গণ্য হইয়া আছে। এই দুই উৎসবে অবাঙ্গালী উত্তর-ভারতীয়দিগের যে আভ্যন্তরিক ভাব প্রকট হইয়া পড়ে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে অসহনীয়। হোলীর ফাগু-রঙ, অপেক্ষা হোলীর বাচনিক রঙ্গের বাহার বাঙ্গালীর একান্ত রুচিবিরুদ্ধ। বাঙ্গালী সংস্কৃতির পার্থক্য এ সব স্থলে বেশ উপলব্ধ হয়। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব সমাজের প্রতি-অঙ্গের পরিপোষক। প্রতিমা-গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে ধনীর অর্থ ছড়াইয়া পড়ে। ধনী এই পূজা-পার্ব্বণে যে অর্থ প্রদান করে, তাহাতে অভিমান নাই, শ্লাঘা নাই, অপরকে বাধ্য করিবার চেষ্টা নাই, বরং আছে—দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করার মধুরতা। সমাজের পালন ও পোষণের এমন সৌজন্যপূর্ণ সুন্দর ব্যবস্থা—পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে আজ পর্য্যন্ত অনুসৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাস্কর শিল্পী অর্থ লাভ করে—কিন্তু তাহার ভাস্কর্য্যকে দেবভাবে পরিণত করিবার একটা আগ্রহ পোষণ করে।

মিষ্টান্ন-নির্ম্মাতা পয়সা পায় সত্য কিন্তু দেব-সামগ্রী রচনায় জন্য যত দূর সম্ভব পবিত্র ভাব রক্ষা করে। কুটীরের বস্ত্রশিল্পী পূজোপযোগী বস্ত্র-বয়নের দ্বারা বৈদেশিক যন্ত্র-নির্ম্মিত বসনের প্রসার কমাইয়া দেয়। কুম্ভকার বহুবিধ মাটীর বাসন জোগাইয়া দেশের শিল্পকে সমৃদ্ধ করে। মালাকার মালা গাঁথিয়া ও ফুল দিয়া, বাদ্যকার ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পূজার এক এক অঙ্গ নির্ব্বাহ করে। ফল-মূল, তাম্বুল, কচু, কদলী, প্রভৃতি দেশজ কৃষিসম্পদ্ এই পূজার অপরিহার্য্য উপকরণ। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত,—গোপকুলের ব্যবসায়ের সামগ্রী পূজার একান্ত প্রয়োজনীয়। নবপত্রিকা প্রদান করে নাপিত, পূজার বলিদান নির্ব্বাহ করে কর্ম্মকার। ধামা, ঝুড়ি, চুপড়ি সরবরাহ করে বেণুজীবী, এইরূপে দেবীর স্নানের বহুবিধ দ্রব্য সমাজের অন্যান্য স্তর হইতে সংগৃহীত হয়। যে কোনও উৎসবে আর্থিক বিভাজন—সকল দেশেই আংশিক ভাবে থাকিলেও ভারতীয় উৎসবগুলির বিশেষত্ব এই যে,—প্রায় প্রত্যেক স্তরে আর্থিক সম্বন্ধ প্রসারিত হয় এবং উভয় পক্ষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়াই এই আদান-প্রদান সম্ভবপর হয়। এইরূপ দিব্যভাবে সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলে class ও masaএ বিরোধের সম্ভাবনা অল্পই ছিল। সামান্য একটি দৃষ্টান্তেই এই দিব্যভাব বুঝা যাইবে। সাধারণতঃ ফুল হইতেছে পূজার প্রধান উপকরণ—প্রেমের সহিত স্বয়ং চয়ন করিতে হয়। এ জন্য কেনা ফুলে পূজা করিতে নাই। যদি ক্রয় করা একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দর করিতে নাই, বীর মূল্যে অর্থাৎ বিক্রেতা যাহা বলিবে—তাহাই দিয়া পুষ্প ক্রয় করিতে হইবে। পূজা পার্ব্বণে—সাধারণ ভারতীয় জনতা—দ্রব্য বিক্রয় অপেক্ষা পূজা-কার্য্যে তাহার দ্রব্যের উপযোগ অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিত এবং এখনও করে। ক্রেতাও সময় মত দ্রব্য পাইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। আজ অস্বাভাবিক ভাবে দ্রব্য-মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ায় মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—তথাপি পূজার নামে উৎসবের নামে পুরাতন শোণিতধারা এখনও নাচিয়া উঠে। দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জন। কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইয়া গৃহস্থ যে বিষাদ ও অবসাদ অনুভব করে, সেদিন সেইরূপ একটা চিত্তের বিক্লবতা আসে, তাহা দূর করিবার জন্য 'শাবরোৎসব' প্রচলিত ছিল। এই শাবরোৎসবে লাঠিখেলা, ছোরা-ছুরি খেলা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। এখনও কোনও কোনও পল্লীগ্রামে এরূপ খেলা-ধূলা হইয়া থাকে।

পুরাতন শোণিতধারার কথা আজ স্মরণে আসিতেছে। কোন্ সুদূর অতীত কালে পঞ্চনদে প্রসূত আর্য্যগণ যখন নদনদী-প্লাবিত ফলফুলশোভিত সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত এই ভারতের উর্ব্বর ভূমিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তখন তাঁহাদের হৃদয়ে এক অভিনব বিস্ময় উদ্রিক্ত হইল। কে এই অপূর্ব ভূমি রচনা করিল, কেনই বা এত সমৃদ্ধিশালী, নানাবিধ ভোগ্য-দ্রব্যপূর্ণ মধুর-পেয়-সমন্বিত বিশ্ব প্রকাশিত হইল? এই চিন্তা

করিতে করিতে বিশ্বনির্মাতার অপূর্ব সন্ধান হৃদয়ে স্ফুরিত হইল এবং চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। তখন জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ছিল না, মারামারি, কাড়াকাড়ির সম্ভাবনাও ছিল না, তথাপি তাঁহাদের মনে ফলফুলের জন্য প্রলোভন আসে নাই, শস্য-সম্ভারের জন্য ভোগ-লালসার আকর্ষণ জন্মে নাই—সমৃদ্ধির জন্য স্বার্থ-সিদ্ধির লালসা জাগে নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—ভগবান্ তাঁহার আরাধনার জন্যই এই ভূমিকে যজ্ঞবেদীরূপে, ফলফুল বৃক্ষ-লতা গুল্ম-ওষধি পশু-পক্ষী সমূহকে যজ্ঞের উপকরণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ যজমান এবং স্বয়ং-প্রকাশিত বেদমন্ত্র যজ্ঞসাধন। যজ্ঞাবশিষ্টই মানুষের উপভোগ্য, জীবন-ধারণের উপায়। অন্য সকল জীবের সৃষ্টি—যজ্ঞের জন্য, মানব-জীবনের প্রয়োজন যজ্ঞ-সাধনের জন্য। এই ভাবধারা দৃঢ় ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে অশ্বমেধ, রাজসূয়, বিশ্বজিৎ, সোমযাগ, জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; প্রাচীন বিখ্যাত যজ্ঞস্থান-গুলি—কনখল, ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইল।

আজ সে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান প্রায়শঃ রুদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু 'দুর্গোৎসব'—'কলির অশ্বমেধ' ইহা প্রবাদ-বাক্যের মত চলিলেও সত্যই সেই বৈদিক ভাবধারা এখনও প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন ধন-জন-বল-সম্পন্ন ও বিক্রমশালী রাজার পক্ষেই সম্ভবপর হইত, তেমনই এখন লোকবল ও অর্থবলে বলীয়ান্ ও উৎসাহী গৃহস্থ বা সঙ্ঘের পক্ষেই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই উৎসবের অনুষ্ঠাতা কয় দিন আপনার সত্তা হারাইয়া ফেলে—মাতৃভাবে নিবেদিত-প্রাণ হইয়া উপবাস-ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করে। আত্মভোগে লোভ-লালসা বর্জ্জন করিয়া নিমন্ত্রিতগণের পরিতৃপ্তিতেই আত্মতৃপ্তি বোধ করে। যে পল্লীতে এই উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রতিবেশী সমবেত হইয়া যেন ঋগ্বেদের অন্তিম ভাগের সেই মন্ত্রগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়—'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্'—'আসুন, মিলিত হউন, পরস্পর আলাপ করুন, আমাদের হৃদয়, অভিপ্রায় ও সঙ্কল্প সমান হউক'। এমনই একটা মিলনের মধুরতা—পূজা-মণ্ডপের প্রাঙ্গণে অনুভূত হয়। পূজাস্থানে—মণ্ডপের মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করেন, দেবতাদর্শন করিয়া—দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, মন্ত্র-জপ ও মূর্ত্তি-ধ্যান করিয়া মৃদু-গম্ভীর এক অনাবিল আনন্দ তাঁহারা উপভোগ করেন। এই আনন্দই জাতীয় জীবনের অমৃতস্বরূপ।

সত্য বটে, ভোগে-বিলাসে দৈহিক পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয়, অন্য দিকে অসংযত ভোগের আতিশয্যে জীবন বিপন্নও হইয়া উঠে; কিন্তু কোনও একটি জাতির জীবনকে বলিষ্ঠ করিতে হইলে—ক্ষয়ের পথ হইতে ফিরাইতে হইলে—এই অনাবিল আনন্দ আস্বাদন আবশ্যক।

অন্নবস্ত্রের সমস্যা, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা, স্বার্থ-দ্বন্দ্বে রেষারেষি ও দ্বেষাদ্বেষি—মানবগণকে যন্ত্র-চালিত পুত্তলীর মত শুধু হস্তপদ সঞ্চালনেই সমর্থ করে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় মৃত্যুকেই বরণ করে, বাহিরে দেহ সচল থাকিলেও মানবাত্মার বিনাশ ঘটে। এই আত্মাকে বাঁচাইতে পারে নাই বলিয়াই পাশ্চাত্ত্য জাতি বহু দিন জীবিত থাকিতে পারিবে না, ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য। ভারতের পরাধীন দশায় পরপদদলিত অবস্থাতেও তাহার দুর্গোৎসব রুদ্ধ হয় নাই। তাহার জাতীয় জীবন ঐ উৎসবের অমৃতরসাস্বাদে সঞ্জীবিত ছিল। তাহার দেহ শৃঙ্খলিত, অন্নাভাবে জীর্ণ হইলেও জাতীয় আত্মার মৃত্যু ঘটে নাই।

আজ বলিতে দুঃখ হয়—দুর্গোৎসবের পূজারী—এই অমৃতরসের ভাণ্ডারী বাঙ্গালী জাতিই ভারতের স্বাধীনতা-মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা।

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—'

বঙ্কিমচন্দ্র নিজ গৃহে প্রতি বর্ষে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবের মহিমা উপলব্ধি করিয়াই স্বীয় হৃদয়ে দেশমাতৃকা ও দুর্গামূর্ত্তির অভিন্নতা বোধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর জীবনকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া মা আমার যে রসধারা প্রবাহিত করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে জাতির সমগ্র কল্যাণ-মূর্ত্তি না জাগিয়া পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাময়ী ভাবনা সুভাষচন্দ্রে প্রাণময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সুভাষচন্দ্রও মায়ের অকৃত্রিম ভক্তসন্তান। দেশমাতৃকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেবীর বরপুত্র সুভাষচন্দ্র অমর হইয়া থাকিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আজ ভারত স্বাধীন হইলেও, সেই বাঙ্গালীর গৌরব অপহৃত হইতে বসিয়াছে। তথাপি বলিব,—দুর্গার ঐ মূর্ত্তির মধ্যেই রহিয়াছে বাঙ্গালীর প্রাণের স্পন্দন এবং ভারতীয় সমগ্র জাতির জীবন-চিহ্ন। মাতৃপ্রতিমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, অস্ত্রশস্ত্র, হিংস্র প্রাণী (সিংহ ও সর্প) তাঁহার সঙ্গে থাকিলেও মাতৃমুখে ঈষৎ হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ হাসি লীলাময়ীর প্রসন্নতার নিদর্শন—আত্মতৃপ্তির পরিচয়। শত্রু বিমর্দ্দিত পদতলে লুণ্ঠিত, ইহাই তাঁহার আত্মসন্তোষ। আক্রমণকারী শত্রুর প্রতি অস্ত্রাঘাত, তাহার যে কোনওরূপে নিগ্রহ-সাধন, তাহাকে পদতলে স্থাপন—এই বীরভাব মাতৃমূর্ত্তি হইতে স্ফুরিত হইতেছে।

জাতির জীবন যুদ্ধ যখনই উপস্থিত হইয়াছে তখনই শ্রীদুর্গার উপাসনা দ্বারা তাহার সমাধান হইয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে, কুরু-পাণ্ডবের সমরে, দেবাসুরের সংগ্রামে এমন কি কংস-কৃষ্ণের দ্বন্দ্বেও যোগমায়া শ্রীদুর্গার আবির্ভাব সকল শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাল্মীকি রামায়ণে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও, অন্যান্য পুরাণ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীদুর্গা পূজা প্রমাণিত হয়। এমন কি, দুর্গোৎসবের বোধন মন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা-বিষয়ের উল্লেখ আছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শত্রু জয়ের উদ্দেশ্যে দুর্গাস্তোত্র পাঠের জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। কংসবধের পূর্বেই যোগমায়ার আবির্ভাব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। এই সমস্তের মূল হইতেছে—বেদ-বাণী। বেদের বহু স্থানে নানারূপে দেবীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবীর রূপের বর্ণনা কোথায়ও আছে, কোথাও নাই কিন্তু রুদ্রের হস্তস্থিত ধনুঃ তিনিই যে প্রদান করিয়াছেন, ইহা কীর্ত্তিত আছে। অসুর-বধে

মায়ের রূপ

নিবারণচন্দ্র ঘোষ

মহামায়ার এই বাৎসরিক পূজা—এই শারদীয় বোধন বাঙ্গালী জাতির একটি পরম বৈশিষ্ট। কোন জাতির কোন উৎসব আয়োজনে এতটা প্রাণঢালা আনন্দের রেশ বড় একটা দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গলার নগরের পল্লীতে-পল্লীতে, গ্রামে-গ্রামে, বাঙ্গলার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রতি কেন্দ্রে-কেন্দ্রে আজ এই মহীয়সী প্রতীকের পূজার আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। এ প্রতীকের তুলনা হয় না। এই সর্ব্বশক্তি বিকশিতা, সর্ব্বজয়া মাতৃমূর্ত্তি বাঙ্গলা দেশ ছাড়া আর কোথাও মেলে না। একধার চেয়ে দেখুন, কি অপূর্ব্ব কল্পকলা, কত তপস্যা, কত ধ্যানের মহিমা এই অপরূপ রূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই সিংহবাহিনী ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী দশভূজারূপ মানব সমাজের পূর্ণবিকাশের মূর্ত্ত প্রকাশ। পশুরাজ সিংহ এঁর বাহন, রণোন্মত্ত অসুর এঁর পদানত। দেবীর বোধনে শুধু নরলোক কেন, পশু ও অসুর-লোকও তাদের নিজ-নিজ পূর্ণ সামর্থে জেগে উঠেছে—এই মহা সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলিত ঐক্য এই মূর্ত্তিতে সূচিত হচ্ছে। বামে বীণাপাণি ও কার্ত্তিকেয় নিখিল বিদ্যা ও সামরিক বল, দক্ষিণে সকল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী কমলা ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। পটভূমিকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই জাগরণে সহায়তা করবেন। এই ধ্যানমূর্ত্তির পূজক আমরা, এমন পূর্ণাঙ্গ-শোভিতা, সুসমঞ্জসা, ঐক্যবদ্ধা জাগরিতা মহাশক্তির পূজাধিকার আমাদের বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কত কালের কত যুগের বাঙ্গলার প্রাণধারা এই পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কত সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দেবাবতার বাঙ্গলার এই মাতৃপূজাকে তাদের সাধনায় বার বার সার্থক করে গেছেন। দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সাধক রামপ্রসাদের মাতৃগানের রেশ এক দিন সারা বাঙ্গলাকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর সেই গানে, তাঁর সেই মাতৃরূপ বর্ণনায় বাঙ্গলার যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, এমনটি আর কোথাও মেলে না। সেই গানেরই সুর এক শত বর্ষ পরে মূর্ত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দেশের কি এমন সৌভাগ্য, কি এমন সুকৃতি যে, যুগে-যুগে এই সব পুণ্যশ্লোক সাধক-শ্রেষ্ঠ এই দেশে জন্ম-পরিগ্রহ করে বাঙ্গলার নাম সার্থক করে গেছেন—আত্মিক রাজ্যে বাঙ্গলার উচ্চাসন সৃষ্টি করে গেছেন!

রামপ্রসাদ মাতৃভাবে তন্ময় হয়ে, মনোযন্ত্রে বাস্ত করে ... হৃদিপদ্মে নাচিয়ে গেছেন, যে এলোকেশীকে হৃদয়ে ধরে "গয়া-গঙ্গাকাশী বৃথা" মনে করেছেন; ধ্যানাসনে বসে "মা বিরাজেন সর্ব্ব ঘটে," "মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনা হেতু কায়া" এই সব বিশ্বতত্ত্ব তারস্বরে রটিয়ে গেছেন, "সেই তিমিরে তিমির-হরা" ব্রহ্মময়ী মাকে আজ বাঙ্গলার অন্ধ আঁখি দেখতে পায় না, তাই না চতুর্দ্দিকে এত হাহাকার, এত আর্ত্তনাদ।

বাঙ্গলার এই জাগ্রত সাধনা, এই অপরিমেয় কৃষ্টি আমরা সব ভুলে বসে আছি, তাই না আমাদের এত দুর্দ্দশা, এত হীনাবস্থা। মহাশক্তির পূজার সেই সাত্ত্বিকতা, সেই সজাগ প্রাণধারা ফিরিয়ে আনতে হবে। আজ আমাদের জীবনধারা, আমাদের সকল কাজ, আমাদের সকল অনুষ্ঠান তামস অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত। যেদিকে তাকান যায়, সেই দিকেই এই ঘোর তমসা দৃষ্ট হয়। শক্তির পূজক আমরা, আমাদের এ অবস্থা ত সাজে না। মহাশক্তির পূজারী যারা, তারা ত চির-আলোকে বিরাজ করবে, চিরানন্দে থাকবে! তা হচ্ছে কই? আমাদের পূজায় বিঘ্ন কোথায়? বিঘ্ন আমাদের অন্তরে। পূজায় আমাদের প্রাণ নেই বলেই আমাদের এই প্রাণহীন অবস্থা।

আমাদের সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে—আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'বে, তবেই না আমাদের পূজা সার্থক হবে, জীবন সার্থক হবে, কর্ম্ম সাফল্যমণ্ডিত হবে।

মা, যে তুমি, স্থূলে ব্যষ্টিতে, চিতিশক্তিরূপে, নামরূপে বিশিষ্ট হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছ, সেই তোমাকে প্রণাম! আবার যে তুমি মহতী চিতিশক্তিরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপে প্রকাশ পাচ্ছ, তোমার সেই ঈশ্বরী মূর্ত্তিকে প্রণাম! আবার অনন্ত স্থূল সূক্ষ্মের অতীত অব্যক্ত কারণরূপিণী চিতিশক্তিকে প্রণাম! সর্ব্বশেষে বাক্য-মনের অতীত, নির্গুণ-সগুণের অতীত, নিরঞ্জনস্বরূপকে লক্ষ্য ক'রে নমো নমঃ বলে বার বার প্রণাম করি! মা, আমাদের প্রণাম সার্থক হোক্, আমাদের পূজা সার্থক হোক্। মা, আমাদের অন্তর আলোকিত করো, আমাদের মানুষ করো, আমাদের পূজার যোগ্য ক'রে নাও। ওঁ শান্তিঃ।

উমা হৈমবতীই যে দেবগণের শক্তি দান করিয়াছিলেন, তাহাও কেনোপনিষদে কথিত হইয়াছে। ঋক্ পরিশিষ্টে আছে—দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে—ইহাই ভারতের জাতীয় জীবনের মন্ত্র।

দুর্গোৎসব যে একটি যজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ক্রোধ-লোভাদি অন্তঃশত্রু দমিত হইলে জাতীয় জীবন পবিত্র ও সুখকর হইবে এবং বহিঃশত্রু যদি আক্রমণকারী হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি উপেক্ষা ভবিষ্যতে সর্বনাশ আনয়ন করিবে—সুতরাং তাহার দমন আবশ্যক, বহিঃশত্রু দমনে কাপুরুষতা প্রদর্শন মাতৃ-আরাধনার বিরোধী; আততায়ী শত্রুর সর্বতোভাবে বশীকরণ বা দমন একান্ত আবশ্যক, ইহাই শিক্ষা দেয় বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব!

"এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে" এই বলিয়াই শ্রীদুর্গাকে আমরা আবাহন করিয়া থাকি। আজ বাঙ্গালী বিপর্য্যস্ত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, হে মা দুর্গে—তোমারই অনুগ্রহ-বিন্দু আজ যেন সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে সেইরূপ চেতনা প্রদান করে, যাহাতে ভারতের জাতীয়-জীবন পূর্ণ ও গৌরবময় হইয়া উঠে।

রত্নমালা

প্রাণতোষ ঘটক

ঠক—খল, দুষ্ট, ঠগ, ছলী, প্রতারক, প্রবঞ্চক।
ঠট্ঠা—ব্যঙ্গ, উপহাস, বিদ্রূপ, ঠাট্টা, পরিহাস, মস্করা।
ঠণ্ডা—শীতল, হিমকর, স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা, হিমেল।
ঠমক—প্রাগলভ্য, সমারোহ, আড়ম্বর, ঠাট, ঘটা, ছলনা।
ঠাওরণ—ঠাহরণ, কল্পন, বিবেচনা করণ।
ঠাঁই—স্থান, নিকট, সঙ্গ, পরিবর্ত্তে।
ঠাকুর—প্রভু, দেবতা, গুরু, মান্য, পূজনীয়।
ঠাকুরণ—ঠাকুরাণী, ঠাকরুণ, দেবী, গুরুর মাতা।
ঠাম—চারু, সুরূপ, মনোহর, সুন্দর।
ঠার ইঙ্গিত, সঙ্কেত, ইশারা।
ঠাসন—গাদন, ছানন, মর্দ্দন, দলন।
ঠাহর—চিন্তা, বিবেচনা, বিতর্ক।
ঠিক—নিশ্চিত, প্রকৃত, শুদ্ধ, পূরা।
ঠিকরা—খোলা, খাপরা।
ঠিকা—দিবাসিক বেতনগ্রাহী।
ঠিকানা—বসতি নিশ্চয়, বিশেষ স্থান।
ঠুঁটা—মুলা, হস্তহীন, ছিন্ন বৃক্ষ।
ঠুলি—চক্ষুরোধক দ্রব্য, চক্ষুর আবরণ।
ঠেক্‌না—ঠেকুয়া, ঠেস, অবলম্ব, ঠেকো, আশ্রয়, নির্ভর।
ঠেকার—অহঙ্কার, দর্প, গর্ব্ব।
ঠেঁটা—দুষ্টা, একগুঁয়া, অবাধ্য।
ঠেঙ—চরণ, অঙ্ঘ্রি, পদ, পা।
ঠেঙ্গা—দণ্ড, লাঠী, যষ্টি, মুগুর, গদা।
ঠোঁট—চঞ্চু, ওষ্ঠ, নখন, সেতু, কাঁধ।
ঠোকর—ঠোঁটমারণ, ঠোকন, ঠোকরানো।
ঠৌর—নিশ্চয়, স্থৈর্য্য, ধীরতা।
ডগর—ডম্বরু, ডমরু, ডুগডুগি, ঢক্কাবিশেষ।
ডগা—আগা, অগ্রভাগ, শিখা, হুল।
ডগিরা—বড়, উচ্চ, বৃহৎ।
ডঙ্কা—বৃহৎ ঢক্কাবিশেষ, ধামসা, টিকারা।
ডম্বরু—খঞ্জরীবিশেষ, মৃদঙ্গ, দারা।
ডর—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, আতঙ্ক।
ডলন—মর্দ্দন, ঘর্ষণ, দলন, মলন।
ডলনা—বেলুন, নোড়া, পেষণী।
ডল্লক—চাঙ্গারী, ডালা।
ডহরা—গভীর জল, সরোবর, হ্রদ।
ডাইন—দক্ষিণ, ডাকিনী, খুসনী, ভূতিনী, ডাইনী।

ডাঁট—অপক্ব, শক্ত, নবীন, কাঁচা।
ডাঁটা—কাণ্ড, বৃন্ত, দণ্ড।
ডাঁড়—বটিয়া, দণ্ড, পক্ষীর দাঁড়।
ডাঁড়কাক—বায়স, অভক্ষ্য-ভুক।
ডাঁড়া—রীতি, ধারা, মেরুদণ্ড।
ডাঁড়ী—নৌকাবাহক, দাঁড়ী, ডাঁটা।
ডাঁশ—দংশক, পশুদংশক মক্ষিকা।
ডাক—হাঁক, আহ্বান, চীৎকার, পত্রবাহক, ফুকার।
ডাকাই—বলাৎকার পূর্ব্বক অপহর্ত্তা, ডাকাত।
ডাকাবুকা—ঢেঁটা, দুঃসাহসী, নির্ভয়।
ডাঙ্গা—উচ্চ স্থান, নির্জ্জল ভূমি।
ডাড়—দন্ত, নখ, থাবা, হুল, দাঁত।
ডাণ্ডা—গোলাড়িদণ্ড, স্তম্ভ, ডাতো।
ডাণ্ডী—খুঁটী, নৌকার পালদণ্ড।
ডাব—অপক্ব নারিকেল।
ডাল—বৃক্ষের অবয়ব, শাখা।
ডালি—ভেটী, উপঢৌকন, উপহার, উপায়ন।
ডালিম—ডালিম ফল, দাড়িম্ব।
ডিঙ্গী—ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী, ডুঙ্গী।
ডিণ্ডিম—মৃদঙ্গবিশেষ, বাদ্যযন্ত্র।
ডিবা—কৌটা, কৌট, পাত্রবিশেষ।
ডিম—ডিম্ব, ডিম্ভ, অণ্ড।
ডিম্বজ—ডিম্ভজ, অণ্ডজ, ছা।
ডুকরণ—উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন, হায় ছাড়ন।
ডুব—অবগাহন, স্নান করা, মজ্জন।
ডুবুরী—ডুবুরিয়া, বুড়নিয়া।
ডুবারা—ডুবারু, ডুবু, পক্ষীবিশেষ।
ডুমুর—ডুম্বর, উড়ম্বর বৃক্ষ।
ডুরা—রজ্জু, দড়ি, পাশ, ডোর।
ডুলী—শিবিকা, দোলী পালকীবিশেষ, ডোলী।
ডেঙ্গর—উকুন, কেশকীট।
ডেনা—পক্ষ, পাখা, পাখনা, ডানা।
ডোবা—গণ্ড, পুষ্করিণী, জলা।
ডোরা—রেখা, ইলেক।
ডোল—গোলা, ভাণ্ডার, ধান্যপাত্র।
ডৌল—ধারা, চপ, রূপ, প্রকার।

[ক্রমশঃ
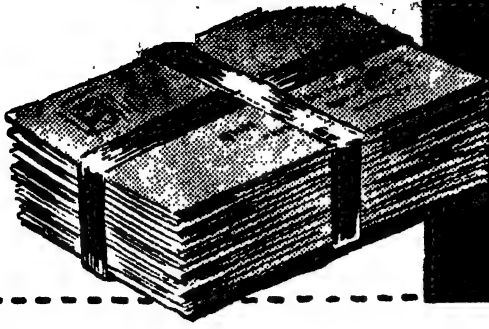
আলেকজান্দারের চিঠি

ডেরিয়াসের পত্রের উত্তরে আলেকজান্দার লিখেছিলেন]

আত্মপ্রতারক সম্রাটশ্রেষ্ঠের সমীপে। স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দারা যার ভয়ে আতঙ্কিত। বিশ্বাসী যার কৃপায় উদ্ভাসিত। অত বড় সম্রাটের কি সাজে আলেকজান্দারের মত অত সামান্য অরাতির ভয়ে ভীত হওয়া ?

সম্রাট ভায়া কি জানেন না যে, ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রেত যে কোন মানুষকে শক্তি ও সাম্রাজ্য প্রদান করতে পারেন ? যে তৃণাদপি তুচ্ছ মনুষ্য অহমিকায় আপনাকে দেবতুল্য এবং স্বর্গজয়ী মনে করে, ঈশ্বরের অমোঘ ক্রোধে তার ধ্বংস হয় অনিবার্য।

মরণশীল ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ দেবতা হবে কেমন করে, যার রাজ্য-গৌরব চিরদিনের নয়, পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্য পরবর্তী মনুষ্যদের জন্য রেখে যাকে বিদায় নিতে হয় ?

সমরাঙ্গনে তোমার সম্মুখীন হবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমি তোমার রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছি। আমি আলেকজান্দার, দুর্বল এবং ঈশ্বরের সেবক মাত্র, প্রভুর চরণে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেন আমি বিজয়ী হই।

তোমার প্রদত্ত প্রত্যেকটি উপহার যা তোমার শক্তিমত্তার নিদর্শন, আমি আমার সৌভাগ্যসূচক লক্ষণ মনে করি। তোমার প্রেরিত এই অর্থ বহন করছে যে, আমি তোমার শাস্তির নিমিত্ত মাত্র হবো ; হবো তোমার শাসক, গুরু এবং নিয়ন্তা। গোলকটির নির্দেশ যে, পৃথিবীর ভূমিভাগ এবং তার পরিধি আমার কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। তোমার প্রেরিত স্বর্ণ-পেটিকায় সূচিত করছে যে, শীঘ্রই তোমার ঐশ্বর্য আমার করতলগত হবে। তোমার প্রেরিত খাদ্যবস্তু আমার কাছে নিন্দনীয় হয়নি।

বিনিময়ে আমি তোমায় সরিষার বীজ ভেট পাঠাচ্ছি। আমার বিজয়ের কটু ঝাঁঝ পাবে তুমি তার স্বাদে। আত্ম-অহমিকায়, রাজত্বের ঐশ্বর্যে তুমি দাম্ভিক হয়ে উঠেছ, ধরাতলে দেবতার আসন গ্রহণ করেছ, জয়ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত করেছ আকাশে যে, তুমিই পরম প্রভু ; যদিও তোমার সেনানী সংখ্যায়, প্রস্তুতিতে আমায় আতঙ্কিত করতে চেয়েছে, তথাপি আমি পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বিধি-নির্দেশের প্রতীক্ষা করছি। ঈশ্বর তোমার অহমিকাকে মানুষের হাত দিয়েই শাস্তি দিবেন। যে পরিমাণ তুমি আত্মনিনাদ করেছ, তত পরিমাণই তিনি তোমাকে লজ্জা দেবেন এবং বিজয়ীর সম্মান দেবেন আমাকে। পরম পরমেশ্বরের উপরই আমার আস্থা ও নির্ভর। ইতি

আলেকজান্দার (ইসকান্দার)

ডেরিয়াসের চিঠি

[মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন দিগ্বিজয়ী। তেত্রিশ বছর অবধি তার দিগ্বিজয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হতে সুরু করে আজ অবধি নর-নারীর চিত্তকে আচ্ছন্ন করে আছে।

গ্রীসের মাসিডনের রাজধানী পেলা নগরীতে তিনশ' ছাপ্পান্ন খৃষ্টপূর্ব কালে জন্মেছিলেন তিনি। গ্রীক দার্শনিক জ্ঞানী এ্যারিষ্টটল ছিলেন তাঁর গুরু। নানা শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করেন তিনি গুরুর কাছে। বাইশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম সামরিক বিজয় পারসিকদের বিরুদ্ধে। তার ফলে এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ রাজ্য আসে তাঁর ছত্র-ছায়াতলে! এই সময় তৃতীয় ডেরিয়াস ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা এশিয়া ভূখণ্ডে। আলেকজান্দারের বিজয় অভিযানের বার্তা যখন তাঁর কানে পৌঁছল, তিনি হুকুম দিলেন সেনাপতিদের, হত্যা কর ঐ বাহিনীর সকল লুণ্ঠনী দস্যুদের আর শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বেঁধে আন তাদের দলপতিকে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে স্বয়ং আলেকজাণ্ডারের কাছে পত্র লিখেন।]

পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যবর্গের রাজশ্রেষ্ঠের রাজধানী হতে। আলেকজাণ্ডারের শিরে সূর্য যত দিন কিরণ বিতরণ করবে, সে দস্যুর যেন ভ্রান্তি না ঘটে যে, ব্রহ্মাণ্ডের পরম শক্তিমান্ ভগবান আমার উপরই পৃথিবী শাসনের ভার অর্পণ করেছেন এবং চতুর্বর্গ ভূমি আমারই কর্তৃত্বাধীনে দিয়েছেন। ভাগ্যদেবীর অনুকম্পায় প্রভূত যশ, কীর্তি, প্রতিপত্তি এবং বিশ্বাসী অনুচর ও সামন্তবর্গ আমি লাভ করেছি।

আমি সংবাদ পেয়েছি যে, বহু সংখ্যক তস্কর ও দুরাত্মা সমবেত ক'রে এবং তাদেরই প্ররোচনায় লুব্ধ হয়ে তুমি রাজমুকুট ও সিংহাসন দখল করতে, আমাদের সাম্রাজ্য বিনষ্ট করতে এবং জনপদ ও প্রজাদের সর্বস্বান্ত করতে চেষ্টা করছ।

রোমের নাগরিকদের পক্ষেই এই প্রকার উদ্ভট কল্পনায় মুগ্ধ হওয়া সম্ভব। আমার এই লিপি পাঠান্তর তোমার উচিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা। নিজের দুষ্কৃতির জন্য তোমার ভীতির কারণ নেই, কেন না, অদ্যাবধি তুমি সম্রাটের রোষের উপযুক্ত পাত্র হওনি। এই সঙ্গে তোমায় একটি স্বর্ণ-পেটিকা প্রেরণ করলাম, যার দ্বারা তুমি আমার শক্তি ও ঐশ্বর্যের ধারণা করতে পারবে। আর পাঠালাম কিছু ক্রীড়া-সামগ্রী, তোমার বয়সের উপযুক্ত আনন্দ-খোরাক। ইতি—

ডেরিয়াস।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি

শুভাশুভপ্রণাগ্রয়

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃপ্রেমাস্পদেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কারের দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্র বাবুর উক্ত বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্রখানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবায় অভিপ্রায় আছে, জানিবে, ইতি। ১০ই বৈশাখ, ১২৮৬ সাল, কলিকাতা।

ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

বিদ্যারত্ন মহাশয় তদুত্তরে যে পত্র লেখেন, তাহা এইখানে নিবেশিত হইল,—

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, 'বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।' এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত; আমার বিবেচনায় এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণ কালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতাল-পঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয় করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি। কলিকাতা। ১২৮৬ সাল, ১২ই বৈশাখ।

সোদরাভিমানিনঃ

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

রাজনারায়ণ বাবু অনেক বিষয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিবেচনাপূর্ব্বক অতি সাবধানে পরামর্শ দিতেন। নিম্নলিখিত পত্রখানি ইহার একটি প্রমাণ,—

"সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

"কয়েক দিবস হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি; কিন্তু নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি নাই, ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

"আপনার কন্যার বিবাহ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি; কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনি দেবেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্ব্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

"উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

"এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্ব্বাংশে ভাল হয়।

"আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি তাং ৬ আশ্বিন।

ভবদীয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ"

১২৮৬ সালের ২০শে কার্ত্তিক বা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া মহারাণীর সরকার হইতে টাকা ধার চাহিয়াছিলেন,—

শুভাশিষঃসন্তু—

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্

আপনি অবগত আছেন বিধবা বিবাহ কার্য্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি ঐ ঋণের ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। দুই

ব্যক্তির নিকট কিছু অধিক ঋণ আছে তাঁহারা ক্রমে লইতে সম্মত নহেন এককালে টাকা পাইবার জন্ত ব্যস্ত করিতেছে এককালে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও কোন ক্রমে চলিতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি দয়া করিয়া আমাকে ৭৫০০ সাত হাজার পাঁচ শত টাকা ধার দেন একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। এই ঋণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই, সন্দেহ থাকিলে কখন আমি এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সহায় ব্যতিরেকে আমার এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিগ্ধচিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও অপ্রস্তুত হইতে হইবেক না আমি এত অসম্ভ্রান্ত ও অপদার্থ লোক নহি যে পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ঋণ করিতেছি অথচ পরিশোধ বিষয়ে অযত্ন করিব কিংবা নিশ্চিন্ত থাকিব আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্তও আশঙ্কা করিবেন না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যত দিন জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার পাইতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার কোন ধনীর সহিত আমার এরূপ আত্মীয়তা নাই যে টাকা ধার চাহিতে পারি। আপনি না থাকিলে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকটেও ধার চাহিতে পারিতাম না। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয় দয়া করিয়া তাহা করিতে হইবেক। না করিলে আমি অপমানিত ও অপদস্থ হইব এই বিবেচনায় যাহা উচিত হয় তাহা করিবেন। অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়িলে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে এরূপে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতাম না জানিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে আমার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ধার করিয়া দিলে আর পূর্ব্ববৎ বার্ষিক সাহায্য করিতে হইবেক না। শ্রীমতী আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ঐ সকল উপকার আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি যে তাঁহার যথার্থ গুণগ্রাহী ও আশীর্ব্বাদক অনতিবিলম্বে তাহার পরিচয় দিব।

আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি। আপনার নিজের ও রাজধানীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২০শে কার্ত্তিক, ১২৭৬ সাল।

[বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্র লিখিয়া টাকা পাইয়াছিলেন এবং যথাসময়ে তাহার পরিশোধ করিয়াছিলেন।]

কোম্পানী বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা

[ভারতের ২য় সংবাদপত্র 'দি ইণ্ডিয়া গেজেট'। এই পত্রিকা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে পত্রের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় মিঃ বি মেসিংক এবং মিঃ পিটার রিড, অনুমতির জন্ত সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন]

সকাউন্সিল মহামান্য ওয়ারেন হেষ্টিংস, এস্কোয়ার,
গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সমীপেষু,
ফোর্ট উইলিয়াম, কলিকাতা, অক্টোবর ৪, ১৭৮০।

মাননীয় মহাশয়, এবং মহাশয়গণ,

আমাদের প্রস্তাবিত সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা আপনাদের অনুমোদন লাভ করিয়াছে জানিতে, পারিয়া, আমরা আপনাদের সমীপে নিম্নলিখিত প্রার্থনা জানাইতে উৎসাহিত হইয়াছি। গ্রাহকদের নিকট আমাদের পত্রিকাখানি বিনা মাশুলে ডাক মারফৎ প্রেরণ করিবার জন্য আমরা আপনার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতেছি। এই অনুগ্রহের জন্য আমরা প্রতি বৎসর পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট আপনার নির্দ্ধারিত পরিমাণ অর্থ জমা দিব। এই সঙ্গে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি, সংবাদপত্র মোড়কের মধ্যে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্র ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রকার মুদ্রিত কাগজপত্র বা পত্রিকা প্রেরিত হইবে না। প্রত্যেক মোড়কের উপর 'ইণ্ডিয়া গেজেট' মুদ্রিত থাকিবে এবং পারস্য হরফে আমার সংযুক্ত স্বাক্ষরও মোড়কে থাকিবে। এই সম্পর্কে আপনাদের অন্যান্য নির্দ্দেশও আমরা মানিতে বাধ্য থাকিব।

এই সঙ্গে আমরা কোম্পানী বাহাদুরের কলিকাতায় মুদ্রাকর নিযুক্ত হইবার প্রার্থনাও পেশ করিতেছি। আমাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে, আমরা সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বপ্রকারে আপনাদের আদেশ পালন এবং মুদ্রণ কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া আপনাদের সন্তুষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস পাইব।

সর্ব্বতোভাবে আপনাদের অনুগত এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য
বি মেসিংক, পিটার রিড্

[মিঃ মেসিংক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি এবং মিঃ পিটার রিড লবণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতে সংবাদপত্র ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ আছে জানিয়া তাঁহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েন। এই কার্য্যে তাঁহারা যথোচিত সাফল্যও অর্জ্জন করেন।]

কোম্পানীর খোলা চিঠি

[ইতিপূর্ব্বে আমরা 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র প্রতি কোম্পানীর আদেশনামা এবং পত্রিকা প্রকাশের বিষয় কোম্পানী যে সকল কঠোর সর্ত্ত আরোপ করেন, সে-বিষয় একটি পত্র প্রকাশিত করিয়াছি। তৎকালীন সরকারের আদেশনামা প্রাপ্তি সত্ত্বেও 'ক্যালকাটা জর্ণাল' তাহা বিবিধ প্রকারে ভঙ্গ করিতে থাকেন। কোম্পানী সরকার সংবাদপত্রের এতখানি স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারেন নাই। ফলে 'ক্যালকাটা জর্ণালে'র মালিকদিগের নিকট সরকারী ভাবে নিম্ন-উদ্ধৃত পত্র প্রেরণ করা হইল।]

মহাশয়গণ,

সংবাদপত্র প্রকাশ এবং প্রচার সম্পর্কে সরকার বাহাদুর যে সকল নিয়মকানুন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, 'ক্যালকাটা জর্ণাল' কি ভাবে এবং কত প্রকারে তাহা ভঙ্গ করিতেছেন, তাহা আমি আপনাদিগকে আমার ১৮ই জুলাই এবং ২৩এ সেপ্টেম্বরের পত্রে জানাইয়াছি! সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেলের মতামতও আপনাদের ঐ দুইখানি পত্রে জানানো হয়। পত্রপ্রাপ্তির পরেও 'ক্যালকাটা জর্ণাল' আদেশ পালনের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। পত্রিকার পরপর কতকগুলি সংখ্যায়, বিলাতে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত বিশেষ একটি পুস্তিকা হইতে এমন সকল বিষয় উদ্ধৃত করা হইতেছে, যাহা সকাউন্সিল গবর্ণর

জেনারেলের আদেশ এবং নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে। এই সকল উদ্ধৃতির দ্বারা, বিগত ৫ই এপ্রিল প্রকাশিত এবং প্রচারিত সরকারী সংবাদপত্র প্রকাশের নির্দ্দেশ এবং নিয়মাবলী স্পষ্ট ভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে। যেসকল বিষয়ে মন্তব্য এবং আলোচনাদি নিষিদ্ধ করা হয়, 'ক্যালকাটা জর্ণাল' তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

এমন অবস্থায়, সকাউন্সিল মাননীয় গবর্ণর জেনারেল, জন্ ফ্রান্সিস্ স্যান্ডিজ এবং পিটার ষ্টোন দ্য রোজারিওকে ক্যালকাটা জর্ণাল অব্ পলিটিক্স অ্যাণ্ড জেনারেল লিটারেচার, এবং রবিবারের জন্য তৎসহ ক্রোড়পত্র নিউ উইকলী রেজিষ্টার অ্যাণ্ড জেনারেল অ্যাডভারটাইজার অব দি ইন্‌টিরিয়ার—প্রকাশের যে-অনুমতি এবং লাইসেন্স প্রদান করেন, তাহা বাতিল করা ছাড়া উপায়ান্তর দেখিতেছেন না। অতএব, আপনাকে এই পত্র দ্বারা জানানো হইতেছে যে—সংবাদপত্র এবং তৎসহ ক্রোড়পত্র প্রকাশের যে অনুমতি-পত্র আপনাকে প্রদান করা হয়, তাহা বাতিল করা হইল। এই আদেশ অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে।

কাউন্সিল চেম্বার, ইতি, আপনাদের বিশ্বস্ত
১০ই নভেম্বর, ১৮২৩। ডাবলু, বি, বেলী
চীফ সেক্রেটারী টু গবর্ণমেণ্ট।

বৈজ্ঞানিক পাস্কালের চিঠি

[পারদ-স্তম্ভের চাপের পরিমাপ সম্পর্কিত এই ছোট্ট চিঠিখানি হয়ত অনেকের নিকট অতি গতানুগতিক, নীরস ও রোমাঞ্চলেশহীন মনে হতে পারে। কিন্তু পত্রটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য, এই ছোট্ট লিপিখানির মধ্যেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, মিষ্টিক ও গণিতিক তাঁর সংক্ষিপ্ত অলংকারহীন অনাড়ম্বর লিপিখানিতে এইটিই দেখিয়েছেন যে, তাঁর প্রতিটি চিন্তাধারা ধারাল যুক্তি ও পুংখানুপুংখ পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করা।

বৈজ্ঞানিক পাস্কালের জন্ম ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত Thoughts on Religious and Evidences of Christianity নামক অমর পুস্তকখানি যেমন তিনি রচনা করেছেন, তেমনি বৈজ্ঞানিক জগতেও তাঁর আসন শীর্ষস্থানীয়। "পাস্কাল ত্রিভুজের" আবিষ্কর্তা তিনিই। প্রোবাবিলিটি (Probability) সম্পর্কিত আধুনিক মতধারার ভিত্তি রচনা করে গেছেন তিনিই। আবার Differential Calculasএর ক্ষেত্রেও পাস্কালের দান অতুলনীয়।

ব্যারোমিটার নিয়ে চাপ-সম্পর্কিত তাঁর নানা পরীক্ষাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পরীক্ষার ফলেই যে বায়ুমণ্ডলের চাপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য।

"পাহাড়ের শীর্ষদেশে বায়ুর চাপ নীচের উপত্যকার বায়ুর চাপের তুলনায় কম হবে"—এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানর পর পাস্কাল বুঝেছিলেন যে, একমাত্র বাস্তব পরীক্ষার দ্বারাই তাঁর যুক্তির সারবত্তা বা অসারত্ব প্রমাণিত হবে! এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি তাঁর শ্যালক ফ্লোরিণ পেরিয়েরকে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

১৫ই নভেম্বর, ১৬৪৭

—"আপনার প্রাত্যহিক বৃত্তীয় কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার স্বাধীনতা গ্রহণ করিতেছি। পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নে আপনাকে বিরক্ত করিতে চাই, কারণ জানি যে, এইগুলি আপনার অবসর মুহূর্ত্তের বিশ্রাম ও শ্রান্তি বিনোদনের নিদান। প্রশ্নটি এই—পারদ ভর্ত্তি টিউব পাহাড়ের পাদদেশে ও পাহাড়ের শীর্ষদেশে লইয়া গিয়া দিনে কয়েক বার একই প্রকার পরীক্ষা চালাইলে উভয় ক্ষেত্রেই পারদ স্তম্ভের উচ্চতা সমান থাকিবে, না ব্যতিক্রম ঘটিবে?......কারণ ইহা অতি সুনিশ্চিত যে, পাহাড়ের শীর্ষদেশের তুলনায় পাহাড়ের পাদদেশে বায়ু অপেক্ষাকৃত ভারী।"

[প্রায় এক বছর পরে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর পেরিয়েরের নিকট হতে নীচের উত্তরটি আসে।]

—"আপনার বহু দিনের অভিপ্রায় মত আমি সেই পরীক্ষা কার্য নিষ্পন্ন করিয়াছি। পাই-ড-দোমের চূড়ায় টিউবে পারদ-স্তম্ভের উচ্চতা ছিল ২৩·২ ইঞ্চি, কিন্তু গীর্জার উদ্যানে সেই উচ্চতা হয়েছে ২৬·৩৫ ইঞ্চি। কাজেই দেখা যাইতেছে, উভয় ক্ষেত্রেই পারদ-স্তম্ভের উচ্চতায় ৩·১৫ ইঞ্চির বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে আমরা বিস্ময় ও প্রশংসায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।"

[বৈজ্ঞানিক পাস্কাল ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।]

—প্রচ্ছদপট

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কলিকাতা সহরের এক বিখ্যাত ছবিঘর মেট্রো" প্রেক্ষাগৃহের বহির্দেশের ছায়াচিত্র মুদ্রিত করলাম। ছবিটি রাত্রিকালে মনো মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত।]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আঠারো

দেখুন দেখি আবার কি হল।

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে গদাধরকে আবার নিয়ে এসেছেন মথুর বাবু।

ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে। এ কি উন্মাদ না মূর্চ্ছারোগ? রা'তে এক ফোঁটা ঘুম নেই, একটা বাঁশ কাঁধে করে মন্দিরের চার দিকে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরকে খেতে দিয়ে তার ভুক্তাবশেষ মুখে পোরে। সর্বাঙ্গে জ্বালা, বুক-পিঠ লাল। আগের ওষুধে তো কিছু হল না। অন্য কিছু ব্যবস্থা করুন।

গঙ্গাপ্রসাদ ভাবতে বসলেন। পাশেই উপস্থিত ছিলেন আরেক জন কে কবিরাজ। কেউ বলেন গঙ্গাপ্রসাদের ভাই দুর্গাপ্রসাদ, কেউ বলেন, পূর্ববঙ্গের এক নামী বৈদ্য। তিনি বললেন, এ রোগ ওষুধে মালিশে সারবার নয়। এ হচ্ছে দিব্যোন্মাদের অবস্থা। এ ব্যাধি যোগজ ব্যাধি—

দিব্যদ্রষ্টা আয়ুর্বেদী। ইনিই প্রথম বুঝতে পারলেন রোগের মূল কোথায়।

কিন্তু তার কথা কে শোনে। বাইরের শাখা-পল্লব নিয়েই সকলের মাথাব্যথা। তেল-বড়ি, ভস্ম-চূর্ণ।

আস্তে-আস্তে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গদাধর। নিজের চোখ দেখে। স্থির, বদ্ধ, নিশ্চল চোখ। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা দু'টো টানতে চেষ্টা করে, নড়াতে চেষ্টা করে। নড়ে না, পলক পড়ে না চোখের। কাচের চোখের মত নিস্পন্দ হয়ে আছে। চোখে খোঁচা মারে আঙুলের। তবু নিষ্পলক।

চন্দ্রমণির কানে খবর পৌঁছুল। নিরুপায় হয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়লেন। আমার গদাধরকে ভাল করে দাও। তার চোখে ঘুম দাও, তার গায়ের দাহ নিবারণ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত না শুনছ আমার প্রার্থনা, জলস্পর্শ করব না আমি।

মুকুন্দপুরের শিবের কাছে যা। সেখানে গিয়ে হত্যে দে!

প্রত্যাদেশ পেলেন চন্দ্রমণি। ছুটলেন মুকুন্দপুর। দু'-তিন দিন পড়ে রইলেন ধন্না দিয়ে, নিরম্বু নিরশনে। স্বপ্নে দেখা দিলেন মহাদেব। পরনে বাঘছাল, মাথায় জটাজুট, হাতে ত্রিশূল। শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই, তোর ছেলে পাগল হয়নি। তার মাঝে ঈশ্বরের সঞ্চার হয়েছে, তাই তার ঐ বৈলক্ষণ্য। বাড়ি যা, মন ঠাণ্ডা করে থাক—

চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হলেন। শিবের পূজো দিয়ে মন খাঁটি করে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরলেন তাঁর কুলদেবতা রঘুবীরের আশ্রয়ে। সেবা করতে লাগলেন প্রাণ ঢেলে। আমার গদাধরকে দেখো। রেখো তাকে বাঁচিয়ে।

কিন্তু গদাধরের মন ঠাণ্ডা হয় না। নিরন্তর জাগ্রত নিষ্পলক দুই চক্ষু দিয়ে দীর্ঘ ধারায় তার জল পড়ে। বলে, মা, মা গো, দুই চোখ আমার নিশ্চল করে দিয়েছিস চোখের সামনে চিরন্তনী হয়ে থাকবি বলে। যাতে এক নিমেষও তোকে না হারাই। যাতে পলক ফেলতে না ফেলতে পালিয়ে না যাস ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু তুই কই? এমনি করে আমাকে জাগিয়ে রেখে তুই শেষে ঘুমিয়ে পড়বি নিশ্চিন্ত হয়ে? এই তোর বিচার? তোর বিবেচনা? রোগের যন্ত্রণায় বিনিদ্র সন্তান ছটফট করলে তার মা কি ঘুমোয়? না তার ঘুম আসে?

এমনি ছ' বছর চোখের পাতা একত্র করেনি গদাধর। ছ' বছর সে পলক ফেলেনি। ঘুমোয়নি এক বিন্দু। দিনে-রাত্রে, আলোতে-অন্ধকারে

নির্জনে-জনতায় সর্বক্ষণ দুই চোখ সে খুলে রেখেছে। একটি তীব্র দৃষ্টিতে আবিদ্ধ করে রেখেছে। স্থির-নিবদ্ধ তীব্র দৃষ্টি।

মা কি পারেন না এসে? ঐ দৃষ্টির আহ্বান, ঐ দৃষ্টির আকর্ষণ এড়াতে পারেন এমন তাঁর সাধ্য নেই। ঐ পাথুরে কান্নাই মমতার নিঝ রিণীকে ডেকে আনে।

বসেন এসে পাশটিতে। বলেন, ওরে আর কাঁদিস নে। আমি এসেছি। ডাকার মত ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি? এখন কি বলবি আমাকে বল। তাকা' কথা ক—

চাই এই একগুঁয়ে ব্যাকুলতা। অবাধ্য উন্মাদনা। যদি দেখা না দিবি তো রাত-দিন চোখ চেয়ে থাকব। দাঁতে কুটোটিও কাটব না। অনশনে দেহপাত করব। যদি বেশি দেরি করিস নিজের গলা কাটব। দেখি তুই টলিস কি না। চাই এই একবগ্‌গা গোঁ।

'মাগ-ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে এক গামলা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? ঈশ্বরের জন্যে কাঁদতে বাবুদের লজ্জা হয়!' বললেন ঠাকুর: 'টাকার জন্যে খুব ছটফটানি। কিন্তু টাকায় হয় কি? ভাত হয় ডাল হয় কাপড় হয় থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। ভগবান লাভ হবে না তো মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন?'

কিন্তু কি করে পাবো ঈশ্বরকে?

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। পড়ে-বুঝে-শুনে কিছুতেই পাবি না। যদি তিনি কৃপা করেন তবেই পাবি। তবে এই কৃপা উদ্রেক করবি কি করে? খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে। ছেলে অনেক ছুটোছুটি করছে দেখে মা'র দয়া হয়। খেলায় এসে মা লুকিয়েছিলেন, এসে দেখা দেন। তাঁরই ইচ্ছে বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হোক। তাঁর এ সংসার যে লীলার সংসার। তিনি যে ইচ্ছাময়ী।

চাই ব্যাকুলতা, চাই আনন্দসান্দ্রা ভক্তি, চাই অচল-অনল বিশ্বাস। তিন টান হলেই তবে দেখা দেন ভগবান। বিষয়ের উপর বিষয়ীর টান, পতির উপর সতীর টান আর সন্তানের উপর মা'র টান। এই তিন টান যদি মেশাতে পারিস তবে ভগবান দটান এসে মিশে যাবেন।

মা'র আঁচল ধরে ছেলে পয়সা চাচ্ছে, ঘুড়ি কিনবে। মা পাড়াবেড়ানীদের সঙ্গে গল্পে মত্ত, লক্ষ্যও নেই ছেলের দিকে। ছেলেও তেমনি নাছোড়, নাকী সুরে সুরু করে কাকুতি-মিনতি। মা তখন ওজর আপত্তি তোলে: না, উনি বারণ করে গেছেন। ঘুড়ি কিনে শেষে একটা কাণ্ড বাধাবি আর কি। বলে আবার ছেঁড়া গল্পের সুতো ধরে। ছেলেও তেমনি ধুরন্ধর। কাকুতি-মিনতিতে যখন কিছু হল না, তখন সে স্রেফ কান্না জোড়ে। গল্প করা মাথায় ওঠে। তখন পাড়াবেড়ানীদের মা বলে, তোমরা একটু বোস ভাই, ছেলেটাকে আগে শান্ত করে আসি। বলে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা ফেলে দেয়। বিরক্ত হয়েছে মা, কিন্তু ব্যাকুলতার কাছে হার মেনেছে।

অনুরক্ত না করতে পারিস, বিরক্ত করে মা'র থেকে আদায় করে নে। যা বিরক্তি তাই তাঁর অনুরক্তি।

তার জন্যে এক অস্ত্র ব্যাকুলতা। তিনি যে কালে জন্ম দিয়েছেন আমাদের, সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। বিষয়ের ভাগের জন্যে ব্যতিব্যস্ত করে তোল তাঁকে, আগেই দেখিস তোর হিস্যা ফেলে দেবেন। মা'র উপর জোর খাটবে না তো কার উপর খাটবে? আগে আমার হিস্যা ফেলে দাও তো দাও, নইলে গলায় ছুরি দেব।

নে বাবা নে তোর হিস্যা, শান্ত হ।

ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়? এক শিষ্য জিগ্‌গেস করলে গুরুকে। গুরু বললে, এস দেখিয়ে দিই। বলে এক পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। এই জলের মধ্যে ঢোকো। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল শিষ্যকে। কতক্ষণ পরে টেনে তুললে হাত ধরে। জিগগেস করলে, কেমন লাগছিল? শিষ্য হাঁফ নিয়ে বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল, যেন প্রাণ যায়। গুরু বললে, যখন ভগবানের জন্যে প্রাণ এমনি আটুবাটু করবে, তখন জানবে দর্শনের আর দেরী নেই।

তোমার ব্যাকুলতা, তাঁর কৃপা। কিন্তু ব্যাকুলতা হয় কি করে?

অনুরাগে। পরম প্রেমভাবে। সে প্রেমভাব কোত্থেকে আসবে? শুধু নামে। নামানন্দে।

তবে কি জানো? ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কাম-কাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে

যখন খেলায় মাতে তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা খাবো'। হৃদের ছেলে পায়রা নিয়ে খেলা করত, পায়রাকে ডাকত, আয় তি-তি, তি-তি। যাই তৃপ্তি হল খেলা, অমনি কান্না ধরল, মা যাবো। কত ভোলাতে চেষ্টা করতুম, সে ভুলত না। খেলা-টেলা আর তার কিছুই ভালো লাগছে না, সন্ধ্যা হয়-হয়, তার এখন মাকে চাই। তাঁকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতুম। এমনিই তো ঈশ্বরের জন্যে কান্না। ছেলে আমার কাছে যাবে না, কিন্তু যেই এক জন অচেনা লোক এসে বললে, চল তোকে তোর মার কাছে দিয়ে আসি, অমনি তার কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

আসলে যত দিন ভোগান্ত না হয় তত দিনই ভোগান্তি।

তার পর আবার উপাধি আছে না? এদিকে পিলে-রুগী, পরেছে কালোপেড়ে কাপড়, অমনি নিধু বাবুর টপ্পা ধরেছে। রোগা লোকও যদি বুট-জুতো পরে, অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, মুখ দিয়ে ফুটফাট ইংরিজি কথা বেরোয়। সামান্য একটু আধার হয়েছে, গেরুয়া পরেছে, অমনি অহংকারে ডগমগ। একটু ত্রুটি হলেই ক্রোধ, অভিমান।

টাকা একটা বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আরেক রকম হয়ে যায়, সে আর মানুষ থাকে না। সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে আছে রে তোর হৃদে? এখানে আসা-যাওয়া করত, বাইরে বেশ বিনয়ী, বেশ সরল-কোমল। সেবার কোন্নগর যাচ্ছি, তুই সঙ্গে আসিস। নৌকো থেকে যাই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ বসে আছে গঙ্গার ধারে। বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলছে, কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন? আমি থমকে গেলুম। তার কথার স্বর শুনেই তোকে বললুম, ওরে হৃদে ওর নিঘঘাৎ টাকা হয়েছে, নইলে গলা দিয়ে অমন সুর বেরোয়? তুই হাসতে লাগলি।

কেশব সেনকে বললেন ঠাকুর: 'যতক্ষণ উপাধি আছে, ততক্ষণ তিনি নেই। উপাধি যতই যাবে ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না, খাল জমিতে জমে। তাই যেখানে অহংকার, সেখানে জমে না তাঁর কৃপাবারি। তাই দীনহীনের ভাব ভালো, নিঃস্ব-নিষ্কিঞ্চনের ভাব।'

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।

সেই শ্যামা এসেছেন গদাধরের কাছে। দুধের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেছেন।

মা গো, কেন এত ছুটোছুটি করিয়ে বেড়াস? তুই যখন হাতের এত কাছে কেন তোকে ছুঁতে দিস না?

বুড়িকে যদি আগে থাকতেই সকলে ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা কেমন করে হয়? খেলা চললেই তো বুড়ির আহ্লাদ। তার মায়াতেই বদ্ধ, তার দয়াতেই আবার মুক্ত। সব যে তার ইচ্ছা, তার খেলা। তার যে খুশি এমনি করেই খেলা হোক। একবার মায়ার খেলা, তার পর আবার দয়ার খেলা।

মা যখন আসেন না তখন গদাধরের শরীর থেকে আরেক জন কে বেরিয়ে আসে। অবিকল আরেক জন গদাধর। পবিত্র-পাবক সন্ন্যাসীমূর্তি। তার যে আত্মস্বরূপ, সে। সেই তার সচ্চিদানন্দ গুরু।

যখন পূর্ণজ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। তখন নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য। বা, তখন গুরুও নেই শিষ্যও নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই। তাই শুকদেব যখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে জনকরাজার কাছে গিয়েছিলেন, জনকরাজা বললেন, আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললেন, আগে জিনিস না পেলে কি করে দক্ষিণা হয়? জনকরাজা হাসতে লাগলেন। বললেন, ব্রহ্মজ্ঞান পেলে কি আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকবে? তখন কে বা জনক, কে বা শুক, আর কী বা দক্ষিণা! তাই বলি, বাপু, দক্ষিণাটি আগে দাও।

এক দিন এক শিবমন্দিরে ঢুকে গদাধর 'মহিম্নঃ স্তোত্র' পড়ছে। পড়তে-পড়তে সেই শ্লোকে এসেছে যেখানে বলেছে শিবমহিমার আর পারাপার নেই। হিমালয় যদি হয় কালির বড়ি, সমুদ্র হয় দোয়াত, কল্পতরুশাখা কলম, সমস্ত পৃথিবী কাগজ আর স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা, তবু সেই কালির দোয়াতে সেই কলম ডুবিয়ে সেই বিস্তীর্ণ কাগজে অনন্ত কাল ধরে লিখে-লিখেও শিবমহিমার কথা সে লেখিকা শেষ করতে পারবেন না।

পড়তে-পড়তে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। দরদরধারে কাঁদতে লাগল। কথা আর পাঠ সব গুলিয়ে যেতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠল আকুল হয়ে: মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব! শুধু নীরবে অশ্রু-বিসর্জন নয়, একেবারে কান্নার রোল তুলল গদাধর। মুক্ত-কণ্ঠের কান্না। আন্তরিকতার আর্তনাদ।

মন্দিরের আমলা-ফয়লারা ছুটে এল চার দিক থেকে। ওরে, ছোট ভটচাজ আবার পাগলামি শুরু করেছে। সেই পেটেন্ট পাগলামি। ভাবলুম বুঝি অন্য রকম কিছু হবে। না রে, আজ কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি। ঐখানে দাঁড়িয়ে আছিস কি; সেজ বাবু আছেন আজ ঠাকুরবাড়িতে, পাগলাকে বেঁধে রাখ। নইলে বলা যায় না শেষ কালে হয়তো শিবের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসবে।

টেনে রাখ, হাত ধরে রাখ কেউ—

গোলমাল শুনে স্বয়ং মথুর বাবু এসে উপস্থিত। দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। শিব-ভাবে বিভোর হয়ে আছে গদাধর। উদাসীন আর উপশান্ত। আত্মবিভূতিতে বৈভবময়।

কিন্তু ওরা ওদিকে সবাই গোলমাল করছে কেন?

'বলছি কি, বিগ্রহের থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখুক কেউ। কি অঘটন করে বসে তার ঠিক কি।'

'খবরদার।' গর্জে উঠলেন মথুর বাবু, কার ঘাড়ে দুটো মাথা ছোট ভটচাজের গায়ে হাত দেয়!'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সবাই চুপ হয়ে গেল।

মুগ্ধ নেত্রে মথুর বাবু তাঁর গুরুকে দেখতে লাগলেন। দুস্তর ভব-সমুদ্রের নিপুণ কর্ণধারকে।

দেবতার চেয়েও গুরু গরীয়ান্। 'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন'।

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল গদাধরের। চোখ চেয়ে দেখল এখানে-ওখানে ভিড় জমে আছে—মাঝখানে সেজ বাবু।

বেসামাল হয়ে কিছু অঘটন করে ফেলেছে হয়ত। গদাধর শিশুর মত ভয় পেল। বললে সেই শিশুর মত সারল্যে: 'কিছু অন্যায় করে ফেলেছি না কি?'

গদাধরকে প্রণাম করলেন মথুর বাবু। বললেন, 'না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে, তাই সকলে শুনছিলাম।'

আরেক দিন।

তার ঘরের উত্তরের বারান্দায় পাইচারি করছে গদাধর, কাছেই 'বাবুদের কুঠি' বা কাচারি-ঘরে কাজ করছেন মথুর বাবু। গদাধরকে দিব্যি দেখতে পাওয়া যায় সেখান থেকে। কাজ করছেন আর একবার তাকাচ্ছেন ওদিকে। গদাধরের সেদিকে লক্ষ্যও নেই। এক বার পশ্চিম থেকে পূবে, আরেক বার পূব থেকে পশ্চিমে টহল দিয়ে ফিরছে। কে তাকে দেখছে বা না-দেখছে তা কে দেখে!

হঠাৎ এ কী অভাবনীয় কাণ্ড! মথুর বাবু পাগলের মত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এসেই গদাধরের পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

গদাধর তো হতবুদ্ধি!

'এ কি, তুমি এ কী করছ। তুমি রাণির জামাই, একটা গন্যিমান্যি লোক, তোমায় এমন করতে দেখলে লোকে বলবে কী? ওঠো, ঠাণ্ডা হও—'

আর কি সে কথা শোনেন মথুর বাবু! কান্না কি আর থামে!

বললেন, 'অপরূপ এক দর্শন হল আজ তোমার মধ্যে। পূব থেকে পশ্চিমে আসছ, স্পষ্ট দেখছি, তুমি নও, মন্দিরের মা আসছেন। আবার যেই পিছন ফিরে পূবে যাচ্ছ, দেখছি, সাক্ষাৎ মহাদেব চলেছেন। ভাবলাম বুঝি চোখের ভুল। চোখ মুছে আবার তাকালাম। আবার সেই শিবকালী—আবার—যত বার দেখি তত বার—' কান্নায় গলে যেতে লাগলেন মথুর বাবু।

'কই বাপু আমি তো কিছু টের পেলুম না। ও সব ধোঁকা—' উড়িয়ে দিতে চাইল গদাধর।

কিন্তু সে-কথা আর কানে নেন না মথুর বাবু। পা ছাড়েন না। তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর জগৎগুরুকে। ভবভয়বৈদ্য সর্বকারণকারণকে।

ভড়কে গেল গদাধর। শেষে এ ব্যাপার কেউ দেখে ফেলে রাণির কাছে গিয়ে লাগাক। রাণি হয়তো ভাববেন, জামাইকে ছোট ভটচাজ গুন করেছে!

অনেক করে ঠাণ্ডা করল মথুর বাবুকে। আমি কে, আমি কি—মা-ই সব দেখিয়ে দিচ্ছেন তোমাকে। নইলে আমারটা তুমি এত করবে কেন, সর্বস্ব দিয়ে কেন ভালোবাসবে আমাকে?

গদাধরের সখ হল 'মাকে পাঁয়জোর পরাবে, মথুর বাবু অমনি গড়িয়ে দিলেন পাঁয়জোর। সখীভাবে সাধন করবার সময় স্ত্রীলোকের বেশ ধরবে গদাধর, মথুর বাবু বেনারসী শাড়ী, ওড়না আর এক সুট ডায়মনকাটা গয়না কিনে দিলেন। শুধু তাই নয়, পানিহাটির উৎসবে যাচ্ছে গদাধর, দারোয়ান নিয়ে গুপ্ত ভাবে সঙ্গে চলেছেন মথুর বাবু। ভিড়েভাড়ে গদাধরের না কষ্ট হয় সেই তদারকে।

ভৃত্য, ভক্ত আর ভাণ্ডারী। মথুর বাবু এক আধারে ত্রিমূর্তি।

বললেন, 'আমার ঠিকুজির কথা ফলল এত দিনে।'

'কি আছে তোমার ঠিকুজিতে?'

'আমার ইষ্টের এত কৃপা থাকবে আমার উপর যে, সে শরীর ধারণ করে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরবে। তুমিই আমার সেই ইষ্ট, আমার অভিপ্রষিত—আমার পরম প্রার্থনার চরম পুরস্কার।'

তুমি কৃপানিধি।

তুমি আগে মায়া, পরে দয়া। আগে মায়ারূপে এসে মনোহরণ কর, পরে দয়ারূপে এসে কর মায়ামোচন। মায়ার পারে এসে তোমার দয়ার জন্যে বসে আছি।

উনিশ

'পদ্ম সই দিলে না?' রাণি রাসমণি কাতর চোখে তাকালেন চার দিকে: 'কেন এমন হল?'

শেষ শয্যায় শুয়েছেন রাসমণি। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

এত বড় কীর্তি করে গেলেন জীবনে, তবু মৃত্যুতে নেই কেন শান্তি? দেবীসেবার জন্যে দু'লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকায় তিন লাট জমিদারি কিনেছেন কিন্তু এখনো দেবোত্তর করেননি সম্পত্তি। চার মেয়ের মধ্যে দু'জন শুধু এখন বেঁচে আছে। প্রথমা পদ্মমণি আর সব চেয়ে ছোট জগদম্বা। দেবতার নামে দানপত্র সম্পাদন করছেন রাণি, সেই সঙ্গে মেয়েরাও একটা একরারনামা দস্তখৎ করে দিক, ঐ সম্পত্তিতে তাদের কোনো দাবি-দাওয়া নেই। জগদম্বা সই করে দিল একবাক্যে। কিন্তু কলম স্পর্শ করল না পদ্মমণি।

সেই ভেবে রাণি বড় অসুখী। মা গো, তোর খেলা তুই জানিস। তোর মনে কি আছে যার জন্যে পদ্মমণির মনে এই নেওয়ালি।

আঠারো শ' একষট্টি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি দানপত্রে সই করলেন রাসমণি। আর তার পরের দিনই স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। সময় আসন্ন হয়ে এলে আদি গঙ্গার পারে তাঁকে নিয়ে আসা হল। অনেকগুলি আলো জ্বলছিল সামনে। হঠাৎ রাসমণি চেঁচিয়ে উঠলেন: 'সরিয়ে দে, নিবিয়ে দে ও সব রোশনাই। অন্ধকার করে দে। এখন আমার মা আসছেন, তাঁর অঙ্গের আলোয় দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে!'

রাত্রি দ্বিতীয় যামে। রাণি সহসা আকুল হয়ে উঠলেন: 'এসেছিস মা? নে, টেনে নে কোলের কাছে। কিন্তু শেষ কথাটা তোকে বলি—পদ্ম যে সই দিলে না!'

মা হাসলেন। তাতে তোর কি। হয়ত ঢের মামলা-মোকদ্দমা হবে তোর দৌহিত্রদের মধ্যে, হয়তো দেবোত্তর সম্পত্তি তছনছ হয়ে যাবে। তার জন্যে তোর ভাবনা কেন? যা থাকবার নয় তা যাক না। তুই থাকবি আর তোর গদাধর থাকবে।

'এ আমার কি স্বভাব হলো বলো দেখি।' গদাধর বললে গিয়ে হলধারীকে: 'জপ করতে বসে কেউ অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি তাকে এক চড় মেরে বসি। সেই কালী-ঘরে রাসমণিকে এক চড় মেরেছিলাম, আজ আবার বরানগরের ঘাটে জয় মুখুজ্জেকে দুই চড় মেরে বসেছি। ঠাট করে জপ করতে বসেছেন, কিন্তু মন রয়েছে অন্য দিকে।'

তুই উন্মাদ। বললে হলধারী।

তাই হবে। তাই হক কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। কাউকে মানি না। বড়লোককে কেয়ার করি না কাণাকড়ি।

দক্ষিণেশ্বরে যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর বেড়াতে এসেছেন। ঠাকুরও গিয়েছেন সেখানে। যতীন্দ্র বললেন, 'আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন তো আমরা কোন ছার।'

করেছিলেন তো করেছিলেন। কথা শুনে ঠাকুরের রাগ হল। বললেন, যুধিষ্ঠির বুঝতে শুধু ঐ নরকদর্শনটুকুই মনে করে রেখেছ? তার সত্য,

ক্ষমা, ধৈর্য, বৈরাগ্য—তার কৃষ্ণভক্তি এ সমস্ত ভুলে যাবে? আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলেন ঠাকুর, হৃদয়ের বড়লোককে বড় ভয়, তাড়াতাড়ি ঠাকুরের মুখ চেপে ধরল।

আর, যতীন্দ্র করলেন কি?

যতীন্দ্র বললেন, 'আমার একটু কাজ আছে।' বলে সরে পড়লেন।

আরেক দিন গিয়েছিলেন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। তাঁকে দেখেই বললেন, 'দেখ বাপু তোমাকে কিন্তু রাজা-টাজা বলতে পারব না। তুমি যা নও তাই তোমাকে বলি কি করে?'

রজোগুণী লোক সৌরীন্দ্র, রাজা না বলাতে ষোল আনা খুশি হলেন না হয়তো। একা-একা কি আলাপ করবেন, যতীন্দ্রকে খবর পাঠালেন। যতীন্দ্র বলে পাঠালেন, 'আমার গলা-ব্যথা হয়েছে, যেতে পারব না।'

তুমি উন্মাদ। বললে কৃষ্ণকিশোর। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর। সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম।

উন্মাদ নও তো পৈতে-ধুতি উড়িয়ে দিলে কেন?

ঠাকুর বললেন, 'তোমার একবার উন্মাদ হয় তা হলে বোঝ।'

হলও তাই। কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ হল। একা এক ঘরে চুপ করে বসে থাকে আর কেবল ওঁ-ওঁ করে। সকলে বললে, মাথা খারাপ হয়েছে, কবরেজ ডাকো। কবরেজ এল নাটাগড় থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে, 'আমার রোগ আরাম করো আপত্তি নেই, কিন্তু দেখো যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।'

নদীয়ায় ন্যায় পড়তে এসেছিল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাড়ি রাজপুতানায়, গুরুগৃহে পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছে। জয়পুরের মহারাজা বড় চাকরিতে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। জ্ঞানের মতন আনন্দ নেই। শাস্ত্র-দর্শন সব তিনি মন্থন করে দেখবেন কোথায় সেই বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মের ঠিকানা। কিন্তু বই পড়ে মন ভরল না নারায়ণ শাস্ত্রীর। অস্তি—তিনি আছেন, শুধু এইটুকুই বলা যায়, তার বেশি আর উপলব্ধি হয় না। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"

শুনলেন দক্ষিণেশ্বরে সেই উপলব্ধির অব্ধি বিরাজমান। ছুটলেন সেখানে। বুঝলেন আহারের চেয়ে আস্বাদ বড় জিনিস। ঠিকানা জানার চেয়ে একখানা চিঠি পাওয়ার বেশি দাম।

কিন্তু এসে দেখলেন কি? গদাধর বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে। কাঙালারা খেয়ে গেলে তাদের পাতা চাটছে মাথায় ঠেকাচ্ছে। কোথাকার বে নীচু জাতের স্ত্রীলোক, খাচ্ছে তার হাতের শাকান্ন। সবাই বলছে, উন্মাদ। কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রী দেখল, জ্ঞানোন্মাদ। পরে দেখল, শুধু জেনে উন্মাদ নয় পেয়ে উন্মাদ।

কিন্তু হলধারী এল মুখসাট মেরে: 'তুই এ-সব করছিস কি? কাঙালাদের এঁটো খাচ্ছিস তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?'

কথা শুনে ক্ষেপে গেল গদাধর: 'তবে রে শালা, তুমি না গীতা-বেদান্ত পড়ো? তুমি না শেখাও জগৎ মিথ্যে ব্রহ্ম সত্য আর সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি? ভেবেছ আমি জগৎ মিথ্যে বলব আর ছেলেপুলের বাপ হব? তোর শাস্ত্র পাঠের মুখে আগুন।'

কি হবে শাস্ত্র পাঠে? ভাবল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাজনার বোল মুখস্থ বলা সোজা, হাতে আনাই দুষ্কর।

রানির মারা যাবার পর সম্পত্তির এক্সিকিউটর হলেন মথুর বাবু। এক দিন গদাধরকে বললেন, 'তোমার নামে কিছু জমি-জায়গা লিখে দি, কি বলো?'

গদাধর রেগে টং। কি, আমাকে তোমার বিষয়ী করবার মতলব? আমিও কি কলাইয়ের ডালের খদ্দের?

ভগবানের আনন্দের কাছে আর কিছু আনন্দ আছে? ভগবানের স্বাদ পেলে সংসার আলুনি লাগে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না।

এ আনন্দ কি বলে বোঝানো যায়? বিয়ের পর অনেক দিন বাদে মেয়ের কাছে তার স্বামী এসেছে। রাত্রিশেষে সখীরা ঘিরে ধরল মেয়েকে। হ্যাঁ লো, কেমন আনন্দ করলি কাল? মেয়েটি বললে, কি করে বোঝাই বল। সে বলে বোঝানো যায় না। যখন তোদের স্বামী আসবে তখনই বুঝতে পারবি, তার আগে নয়।

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে চাতকের। সাত সমুদ্র তেরো নদী খাল-বিল পুকুর-দিঘি সব জলে ভরপুর। অথচ সে-জল সে খাবে না। ছাতি ফেটে

যাচ্ছে, তবু না। স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্যে হাঁ করে আছে। 'বিনা স্বাতী কি জল সব ধুর'।

মিছরির পানা যে খেয়েছে সে কি আর চিটে গুড়ের পানা খাবে?

'কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই—' ত্রৈলোক্য সান্যাল বললেন, 'সঞ্চয়ও দরকার। পাঁচটা দান-ধ্যান—'

'রাখো। কত তোমাদের দান-ধ্যান! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না! তাদের দু'টি চাল দিতে কষ্ট হয়—দিতে-থুতে অনেক হিসেব! খেতে পাচ্ছে না—তা আর কি হবে! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। এ দিকে মুখে বলে, সর্বজীবে দয়া!'

আগে ঈশ্বর লাভ করো, পরে সংসারে থাকো। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার! তখন, কলঙ্কসাগরে ভাসি, কলঙ্ক না লাগে গায়।'

এই দেখ না জয়গোপাল সেনকে। বিস্তর টাকা, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না।

'গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া, হাঁসপাতাল ফেরৎ দারোয়ান। আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দু'টো পচা ডালিম!'

এই তো টাকার কেরামতি!

মথুর বাবুর সঙ্গে ঠাকুর কাশীতে তীর্থ করতে এসেছেন, উঠেছেন রাজাবাবুর বাড়িতে। সেখানেও সর্বক্ষণ বিষয়-আশয়ের কথাবার্তা। ঠাকুর কাঁদতে লাগলেন: 'মা, এ কোথায় আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরেই খুব ভালো ছিলাম। সেখানে বিষয়ের কথা শুনতে হয়নি।'

ছাদের উপর ঠাকুর-ঘর, নারায়ণ পুজো হচ্ছে। বাড়ির গিন্নি-বান্নিরা চন্দন ঘসছে, নৈবেদ্য সাজাচ্ছে, করছে নানান রকম আয়োজন। কিন্তু মুখে একটিও ঈশ্বরের কথা নেই। কি রাঁধতে হবে, আজ বাজারে কিছু ভালো পেলে না, কাল অমুক রান্নাটি বেশ হয়েছিল—এই সব কথাবার্তা।

মথুর বাবু কথা ফিরিয়ে নিলেন। কত লোক তাঁকে আশ্রয় করে ফিরিয়ে নিল অবস্থা। আর এ এমন এক গুণী-গুরু যে তাঁরই অবস্থান্তর ঘটালেন।

'বাবা, তোমার জন্যে এই শাল এনেছি দেখ।'

হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছেন মথুর বাবু। গদাধরের গায়ে নিজেই পরিয়ে দিলেন আদর করে।

শাল গায়ে দিয়ে শিশুর মত সরল আনন্দে নেচে উঠল গদাধর। ডেকে দেখাতে লাগল সকলকে। ওরে শুনেছিস হাজার টাকা দাম!

পরক্ষণেই অন্য চিন্তা মনে এল। এই শালের মধ্যে আছে কি? কতগুলো ছাগলের লোম বই কিছু নয়। তারই এত চটকদারি! শীত ঠেকাতে সামান্য একখানা কম্বলই তো যথেষ্ট। বলি, এই শালে ঈশ্বরস্পর্শ পাওয়া যাবে? বরং বিকার বাড়বে, মনে হবে আমি এক জন মস্ত এলেমবাজ। আর সকলের চেয়ে বড়, একজন কেষ্ট-বিষ্টু। আর জানো না, বিকার হলে কি বলে? বলে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে, আমি এক জালা জল খাবো। বদ্যি বলে, বেশ তো খাবি, নিশ্চয় খাবি। বলে বদ্যি নিজে তামাক খায়। বিকারের পর কি বলবে তারি জন্যে অপেক্ষা করে।

হঠাৎ গা থেকে শালখানি খুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল গদাধর। থুতু ফেলতে লাগল তার উপর, পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘসতে লাগল ধূলোয়। তাতেও ক্ষান্তি নেই, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব এই জঞ্জাল।

কে এক জন ছুটে এসে উদ্ধার করে শালখানি। জানালে গিয়ে মথুর বাবুকে।

মথুর বাবু বললেন, 'বেশ করেছে। ঠিক করেছে। যেমনটি চেয়েছিলাম তাই করেছে।'

এ চমৎকার পরিহাস ঈশ্বরের। গদাধরকে কয়েক দিনের জন্যে নিজের কাছে, জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন মথুর বাবু। সোনার থালায় করে ভাত খেতে দেন, রূপোর বাটিতে করে পঞ্চ ব্যাঞ্জন। যে খাচ্ছে তার কিন্তু থালা-বাটির দিকে নজরও নেই, খাওয়া শেষ হলে চেয়েও দেখে না এঁটো বাসনের কি হল। মথুর বাবুরই যত গরজ। দেখ, ঠিকমত মাজা-ঘসা হল কি না, ভাঙা-ফুটো হল কি না, চোরে নিয়ে গেল না কি চুরি করে! তাঁরই যত হাঙ্গামা পোয়ানো। আর যে ভোজন করে গেল তার কাছে সব কিছুই একটা অসার ভোজবাজি।

চন্দ্র হালদার মথুর বাবুদের কুল-পুরোহিত। আছে বাবুদের আশ্রয়ে কিন্তু গদাধরের প্রাধান্য দেখে

হিংসের ফেটে পড়ছে। কী কৌশলে যে বাবুকে হাত করল তাই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। কোথাকার কে বিদেশী, তার কি না এত প্রতাপ! যাই বলো, আর আস্কারা দেওয়া চলে না। একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। বাইরের ঘরে একা বেহুঁস হয়ে বসে আছে গদাধর, চন্দ্র হালদার কাছে গিয়ে তার গায়ে ঠেলা মারতে লাগল: 'ও বামুন, বল না বাবুকে কি করে বশে আনলি?'

গদাধর নিঃসাড়।

'আহা, ঢং দেখ না! ঝিমুচ্ছে বসে-বসে! বল্ না সত্যি করে, কি করে বাগালি বাবুকে?'

গদাধর নিঃসংজ্ঞ।

'উঃ, খুব ফুটুনি হয়েছে!' বলেই গদাধরকে সে লাথি মারলে। একবার নয়, তিন-তিনবার।

গদাধর চোখও মেলল না। পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তারও চেয়ে বড়। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পায়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তিন ভুবন আবৃত করেছেন। সাধুর হৃদয়ের মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। আর সেই পদচ্ছায়ে অনন্ত সহ্যশক্তি!

সহ্য করে গেল গদাধর। মথুর বাবুকে বললে চন্দ্র হালদার আর আস্ত থাকত না।

ঠাকুর তাই বলতেন হৃদয়কে: 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করবো—তবে হবে। তা না হলে তখন খাজাঞ্চীকে ডাকো।'

যে সয় সেই রয়। যাকে রাখো সেই রাখে।

কুড়ি

বকুলতলার ঘাটে এসে নৌকো লাগল। সকাল বেলা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদাধর ফুল তুলছে। সহসা চোখ পড়ল ঘাটের দিকে। কে এল নৌকোয়?

আশ্চর্য, স্ত্রীলোক! কিন্তু এ কী তার অদ্ভুত বেশবাস! পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, ঘাড়ে-পিঠে অসম্বদ্ধ চুল—এ যে সন্ন্যাসিনী! এ এখানে এল কি করে? এখানে তার কি কাজ? কে তাকে পথ দেখাল?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এল গদাধর। ডাকল হৃদয়কে। ওরে, দ্যাখ গিয়ে, ঘাটে এক ভৈরবী এসেছে। কি তার গায়ের রং, কি তার চোখের ছটা! কি তার ভঙ্গির তেজ! চাঁদনিতে রয়েছে। যা, তাকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

হৃদয় তো অবাক। সে এখানে আসবে কেন? তুমি ডাকলে তার কি?

'তুই যা না। গিয়ে বল আমি এখানে আছি। তা হলেই সে আসবে।'

তাই গেল হৃদয়। গিয়ে দেখল, ঘাটের চাঁদনিতে ভৈরবী বসে আছে চুপচাপ। যেন বা তারই সংবাদের প্রতীক্ষায়। বললে, তার মামার কথা। মামা যেতে বলেছে তাকে।

হৃদয় তো অবাক। এক বাক্যে উঠে পড়ল ভৈরবী। বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করলে।

চলে এল গদাধরের ঘরের দরজায়। গদাধরকে দেখেই আনন্দে আর বিস্ময়ে কেঁদে ফেললে। বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে: 'বাবা, তুমি এখানে? শুধু এইটুকু জেনেছি তুমি গঙ্গাতীরে আছ। সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এত দিনে দেখা পেলাম।'

বছর চল্লিশ বয়েস হবে ভৈরবীর—অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল গদাধর। বললে, 'আমাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, মা? কিন্তু আমার কথা তুমি জানলে কি করে?'

'মা মহামায়া জানিয়ে দিলেন। বললেন, এই তিন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।'

'তিন জন?'

'হ্যাঁ, আর দু'জনের সঙ্গে পূর্ব-বাংলায় দেখা হয়েছে। বাকি তোমাকেই এত দিন খুঁজছিলাম।'

গৃহহারা শিশু যেন মাকে ফিরে পেয়েছে এমনি আগ্রহে গদাধর আঁকড়ে ধরল ভৈরবীকে। কত দিনের কত সুখ-দুঃখের কথা বলতে বাকি। মা গো, সব বলি তোকে বসে-বসে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, অলৌকিক কত কি দেখি-শুনি, সমস্ত গা জ্বলে-পুড়ে যায়, চোখের পাতা এক করতে পারি না। সবাই বলে পাগল হয়ে গেছি। তাই কি সত্যি? রাত-দিন মাকে ডেকে-ডেকে শেষে পাগল হয়ে গেলাম? মাকে ডাকার এই পরিণাম?

'কে তোমাকে পাগল বলে?' ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে অমৃত-আশ্বাস ঝরে পড়ল: 'একে বলে, মহাভাব। এ ভাব চেনে এখানে এমন কারু সাধ্যি

নেই। তাই যেমন সব পণ্ডিত তেমনি সব ভাষ্য।'

'মহাভাব!' গদাধরের দুই উন্নিদ্র চক্ষু জ্বল জ্বল করে উঠল।

'হ্যাঁ, এই ভাব হয়েছিল রাধারাণির, এই ভাব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। ভক্তিশাস্ত্রে এ সব লেখা আছে। আমি পড়ে সব দেখিয়ে দেব তোমাকে। মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখিয়ে দেব।' ভৈরবী তার ঝুলি ঘাঁটতে লাগল। ঝুলিতে খান কয়েক পুঁথি আর দু'-একখানা কাপড়। জীবনের পথবাহনের যা-কিছু সম্বল।

দেবীর কিছু প্রসাদ খাও মা। কিছু মাখন আর মিছরি ভৈরবীকে নিবেদন করল গদাধর। কিন্তু ছেলে না খেলে কি মা আগে খায় কখনো? গদাধর তাই মুখে দিল খানিকটা। তবেই ভৈরবী জলযোগ করলে।

কিন্তু কে মা তুমি সংসারত্যাগিনী? কেন তোমার এই সন্ন্যাসসজ্জা?

কেউ কিছুই জানে না—আমিও না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, যশোর জেলায় আমার বাড়ি আর ব্রাহ্মণের ঘরে আমার জন্ম। যদি কিছু নাম দিতে চাও, বলো, যোগেশ্বরী। এই যোগে বসেই জানতে পেলাম তিন জনকে সাধনায় সাহায্য করতে হবে। প্রথম দু'জনের নাম হচ্ছে চন্দ্র আর গিরিজা—দুয়ের বাড়িই বরিশালে। আর তৃতীয় জন তুমি। চন্দ্র আর গিরিজাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এসেছি, এবার তোমার পালা।

ওরা কী শিখল?

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। ওদেরকে নিয়ে আসব দক্ষিণেশ্বরে। তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দেব। আমার তিন শিষ্য একত্র হবে।

মন্দির ঘুরে সব দর্শন করলে যোগেশ্বরী। গলায় ঝুলছে যে রঘুবীর শিলা এখন তার ভোগের যোগাড় দেখতে হয়। সিধে এল ঠাকুরবাড়ী থেকে। তাই নিয়ে সে পঞ্চবটীতে রাঁধিতে গেল।

মহাভাব! মহাভাব কাকে বলে?

যেমন শ্রীমতীর হত। এক সখী ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলত, ওরে এখন কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ, ছুঁসনি—এঁর দেহের মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব—দেহ-মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা মস্ত হাতি নাড়াকুচির কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকছে। ঘর চুরমার। ঈশ্বরের বিরহ-আগুন প্রলয়ের আগুনের মত। সে কি সামান্য? রূপ-সনাতন যে গাছের তলায় বসতেন, সে গাছের পাতা ঝলসা-পোড়া হয়ে যেত।

'এই অবস্থায় তিন দিন ঠাঁয় অজ্ঞান হয়ে হয়েছিলাম।' বললেন এক দিন ঠাকুর: 'অনড় হয়ে পড়েছিলাম এক জায়গায়। হুঁস হলে বামনি আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার গায়ে হাত ঠেকাবার কি যো আছে! গা মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে। সেই চাদরের উপর দিয়ে ধরলে আমাকে। ধরে নিয়ে গেল গঙ্গায়। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিয়েছিল—'

শ্রীমা বলতেন, 'ঠাকুরের যখন মহাভাব হত, মনে হত বুকের ভিতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে।' বলতে বলতে ভাবারূঢ় হতেন: 'আহা, সে কী গায়ের রং! সোনার ইষ্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে থাকত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে! যখনই কালী-বাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে পড়ত, বলত, ঐ তিনি যাচ্ছেন। বেশ মোটাসোটা ছিলেন। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থসথস করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, রূপের সে কি ঢেউই উঠত! বেড়ার ফাঁকে দাঁড়িয়ে চোখ ভরে দেখতুম। মথুর বাবু একখানা পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলোত না—ছাপিয়ে পড়তেন—'

'আমাকে তিনি কি বলতেন জানো?' বললেন এক দিন শ্রীমা: 'বলতেন, তাঁর দেহ দেখিয়ে বলতেন, আমার এই দেহটি গয়া থেকে এসেছে। তাই তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে তিনি বললেন, তুমি গিয়ে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস। সে কি কথা? পুত্র বর্তমান থাকতে আমি পিণ্ড দেব কি! হবে গো হবে, তুমি দিলেই হবে। বললেন তিনি, আমার কি আর ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরবো? চমকে উঠলুম। কাজ নেই তবে গিয়ে। আমিই যাব। বুড়ো গোপালকে নিয়ে পরে আমিই গিয়েছিলুম গয়ায়।'

রান্না করে রঘুবীরের সামনে ভোগ্য-ব্যঞ্জন রেখে ধ্যানে বসেছে ভৈরবী। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে,

গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দবৃষ্টি। ধ্যানে দেখছে, স্বয়ং রঘুবীর যেন খাচ্ছে সেই তার নিবেদনের অন্ন। আহা, খাক তৃপ্তি করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে।

জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে নিজেই আনন্দে আত্মহারা। যে খাচ্ছে এ ভাত সে গদাধর।

অনাহূত কখন চলে এসেছে পঞ্চবটীতে। চলে এসেছে অদৃশ্য কোন প্রাণের টানে। অদৃশ্য কোন নিমন্ত্রণের সংবাদে।

ভৈরবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই জ্ঞানভূমিতে নেমে এল গদাধর। অপ্রস্তুতের মত বললে, 'কখন কি যে গোলমাল হয়ে যায়, যত সব আজব কাণ্ড করে বসি।'

ভৈরবীর মুখে প্রশান্ত অভয়। বললে, 'বেশ করেছ, প্রাণ যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি করেছ। ধ্যানে যা দেখেছি তাই প্রত্যক্ষ করলাম চোখ মেলে। আমার আর বাইরের পূজোয় দরকার নেই, আমি পেয়ে গেছি আমার রঘুবীরকে।' বলে সে খেতে লাগল সেই উচ্ছিষ্টান্ন। তার দেবতার প্রসাদ।

খাওয়ার শেষে এল গঙ্গাতীরে। কী হবে আর শিলামূর্তিতে। পেয়ে গেছি প্রাণ-স্বরূপকে। এত দিন গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল যে শিলাখণ্ড, নিমেষে তা ফেলে দিলে গঙ্গায়।

মাকে বলত গদাধর : মা আমাকে দেখিয়ে দে, শিখিয়ে দে। তোর ছেলে হয়ে আমি কি আকাট হয়ে থাকব ?

তাকে শেখাবার জন্যেই মা পাঠিয়ে দিয়েছেন ভৈরবীকে, তাঁর জ্ঞানবতী যোগেশ্বরী মেয়েকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে বিধিবেত্তা, বহুদর্শিনী ভৈরবী। পুত্রবৎ পড়াতে লাগল গদাধরকে। কাকে বলে দিব্য-দর্শন, কাকেই বা বলে দিব্যোন্মাদনা, বইয়ের লিখনের সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল। বহু জিজ্ঞাসার সমাধান হল গদাধরের, হল বহু সংশয়চ্ছেদন। পঞ্চবটীতে বইতে লাগল দিব্যানন্দের ঢেউ। 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী'।

দিন সাতেক কেটে গেল অলৌকিক ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু বাইরের সংসার এ ঘনিষ্ঠতাকে কি চোখে দেখছে কে জানে। হয়তো বা ভৈরবীর নামে অজ্ঞায় কিছু রটনা করে বসবে। তাই গদাধর ভৈরবীকে বললে, গাঁয়ের মধ্যে তুমি কোথাও একটু দূরে সরে থাকো না—

ঠিক বলেছ। তবে কোথায় কে জায়গা দেয় কে জানে। তবে যেখানেই থাকি রোজ আসব আমি গোপালকে ননী খাওয়াতে। গোপালকে না দেখে যে আমার সূর্য-চন্দ্র উদয় হবে না।

খানিক দূরে উত্তরে দেবমণ্ডলের ঘাটে বামনি থাকবার আশ্রয় পেল। মণ্ডলরাই সাদরে জায়গা করে দিলে তার। চাঁদনিতে তক্তপোশ পেতে দিব্যি থাকো তোমার খুশি-মত।

গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে দু'দিনেই সকলের মন টেনে নিলে ভৈরবী। যেই কাছে আসে সেই মনে-মনে হাত জোড় করে। মুখে-মুখে মধুরতার রসদ জোগায়। এ বলে আমার থেকে সিধে নাও, ও বলে আমার বাড়িতে এসে থাকো। কারুর সাহস নেই দুর্নামের কাদা ছোঁড়ে।

গোপাল ! গোপাল ! ননী হাতে করে বসে-বসে কাঁদছে বামনি।

প্রায় দু'-মাইল দূর। সে কান্না কালীবাড়িতে গদাধরের কানে এসে লাগে। মা খাবার খেতে ডাকছে শুনে ছেলে যেমন ছোটে তেমনি হঠাৎ ছুট দেয় গদাধর। দু'-মাইল রাস্তা এক নিশ্বাসে পার হয়ে যায়। দম না নিয়েই বামনির হাতের থেকে ননী তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে।

কোন-কোন দিন পোষাক বদলায় ভৈরবী। গাঁয়ের মেয়েদের থেকে শাড়ি-গয়না চেয়ে নিয়ে সাজগোজ করে। ওদেরই সাহায্যে তৈরি করে নানা ভক্ষ্যভোজ্য। থালায় করে সাজিয়ে গান গাইতে-গাইতে চলে আসে কালীবাড়ি। নিজের হাতে খাওয়ায় গদাধরকে, তার গোপালকে।

বলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব।

গদাধরের মনে হয় এ যেন সেই নন্দরাণী যশোদা। বাৎসল্যরসের সুরধুনী।

শুধু জননী নয়, জগৎগুরু। বলে, একে-একে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখাব তোমাকে। মার আদেশ মা'র আশীর্বাদ।

গদাধরের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

ঠাকুরের ধর্মজীবনের প্রথম গুরু নারী। যে নারী মাতৃত্বময়ী মঙ্গলস্বরূপিণী। [ক্রমশঃ]

তারানাথ রায়

১২

কালীনাথ রায় বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। দশখানা গ্রামের ঝি-বৌকে তিতুর ফরাজীরা লুঠে নিয়ে গেছে। দশখানা গ্রামের শত শত গৃহ তিতুর ফরাজীরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। ঘর-পোড়া স্বত-সর্ব্বস্ব মানুষগুলো নায়েবের আটচালায় গুম হয়ে বসে আছে। সাতগাঁয়ের মাঠে খুন-জখমও কম হয়নি। লাসগুলো নিয়ে এখনও শিয়াল শকুনরা কাড়াকাড়ি করছে। ভাগ্যে বিলাসী আগে-ভাগে সংবাদ দিয়েছিল, তা নইলে ডিক আর ফরাজীরা কেষ্টলাল বাগচীর মাথা কেটে নিয়ে হয়ত এতক্ষণ বাদুড়ের পীরের পায়ে নজর দিত। ডিক তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে, তার ফরাজীরা তাঁর নীলকুঠী ভেঙ্গে লুঠে তছনছ করেছে। ইয়ং যদি তার লেঠেলদের নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছত, হয়ত এতটা বিপন্ন কালীনাথকে হতে হ'ত না।

ইয়ং সাহেবের বাচ্চা, ফিরিঙ্গী ডিককে সে ক্ষমা কিছুতেই করবে না। পীর আলিও শপথ করে গেছে—ইংরেজ আর ফিরিঙ্গীদের সে দেখে নেবে। গোপালকে নিয়ে কেষ্টলাল সেই সন্ধ্যায় বেরিয়েছে, এতক্ষণও ফিরল না।

বৃদ্ধ কালীনাথ, কিন্তু তাঁর বাহু দু'খানি ত তখনও বৃদ্ধ হয়নি! ডান হাতখানির পেশীর উপর হাত বুলিয়ে দেখেন, এখনও হাতিয়ার ধরবার শক্তি তাঁর আছে। দেয়ালে ঝুলছে পিতৃপুরুষের সুবৃহৎ খাঁড়া। খাঁড়ার চোখটা ইঙ্গিতে কি বলছে? ও যে জননীর ক্রুদ্ধ নয়ন! বিশ্বনাথ বাবুর তপস্যায় যে মা ঠগবগের শ্মশানে কথা কইত—এ যে তাঁরই চোখ!

কালীনাথ হাত দু'টি যোড় করে দাঁড়ায়—বল বল, মা! কি আদেশ বল! তোমায় অপমান করেছে—চৌদ্দ নারী ওরা লুঠে নিয়ে গেছে। কি করব মা?

কালীনাথ স্পষ্ট দেখতে পান, তাঁর সেই সুপ্রশস্ত বৈঠকখানার কোণে এসে দাঁড়ায় এক-একটি করে বারটা মূর্ত্তি, তেজস্বী মূর্ত্তি! তাদের পুরোভাগে বিশ্বনাথ!

অপলক নেত্রে চেয়ে থাকেন কালীনাথ। দেয়ালে চেয়ে থাকে পূর্ব্বপুরুষের চলচলে খড়্গ। চেয়ে থাকে তাঁর পিতৃ-পিতামহের বিরাট ছবি দু'খানি। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরে। তাঁর নিশ্চল মূর্ত্তির অর্দ্ধ-ভিন্ন ওষ্ঠ দু'টি কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। নায়েবের আটচালায় কে যেন 'হায় হায়' করে আর্ত্তনাদ করে ওঠে। কালীনাথ আর সইতে পারেন না।

—ঠাকুরের আদেশ পালন করব বিশ্বনাথ বাবু! পালন নিশ্চয় করব আমার প্রত্যেক বিন্দু রক্ত দিয়ে।

মূর্ত্তি কথা বলে!

বলে—আমরাও পালন করব!

চমক ভেঙ্গে যায়। দেখেন, দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ আর তাঁর দ্বাদশ সাকরেদ নয়—কেষ্টলাল, গোপাল, আরও কয় জন একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। কালীনাথ ছুটে গিয়ে কৃষ্ণলালকে আলিঙ্গন করেন।

—তোমরা? আমি কি দেখছিলাম জান? বিশ্বনাথ আর তাঁর ১২ সাকরেদ। দেখছিলাম কি জান? ঐ খড়্গের ভেতর জ্বলছে মা জগদম্বার রাঙা চোখ—দেখছিলাম আবার ঠাকুররা চেয়ে আছেন আমার দিকে।

কেষ্টলাল ডিক-বাংলোর ঘটনাগুলো বর্ণনা করে। বলে, ডিককে নিয়ে ইয়ং তার কুঠীর দিকে চলে গেছে।

গোপাল কর্ত্তার পা দু'টো জড়িয়ে ধরে তাঁর মুখের দিকে সজল নয়ন দু'টি তুলে বলে—মা!

—কি রে গোপাল, বিলাসীর কি হয়েছে?

কেষ্টলাল জানায়, ইয়ং বিলাসীর কাঁধে সড়্কি মেরেছে। সে বাংলোয় পড়ে আছে।

কালীনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—আর তোমরা তাকে ফেলে চলে এলে?

গোপালকে তক্ষুণি বিলাসীর কাছে যেতে আদেশ করলেন। গোপাল তিন লাফে বেরিয়ে গেল।

কালীনাথ ফরাসে গিয়ে বসে তাকিয়াটা কোলে তুলে নেন। হুকুম দেন—তামাক।

খানসামা এসে ফরসী নলচের মাথায় সাজা কলকে চড়িয়ে দিয়ে যায়। চিন্তিত মনে কালীনাথ নল মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে ধুঁয়ো বের করতে থাকেন। ঘরটা তামাকের সুগন্ধে ভর্ত্তি হয়ে যায়। কেষ্টলাল সামনে এসে বসে।

—ডিক তা হলে খতম! কি বল?

কেষ্টলাল বলে—কিন্তু তার ফরাজীর এক জনও ধরা পড়েনি।

—এর পর?

—ছোট টমসন।

—না ইয়ং! তারও আগে তিতু।

—তা হ'লে ইয়ং আর টমসনদের হাতে রাখতে হবে ত?

—হাতে রাখতে হবে বৈ কি।

ভোর হতে তখনও দেরী নাই। গোবিন্দ-বাড়ীর মন্দিরে মঙ্গল-আরতির ঘণ্টা বেজে উঠে। হাত দু'খানি তুলে কালীনাথ গৃহ-বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম করেন। কেষ্টলালও প্রণাম করে।

দু'জনেই ভাবছেন সেদিনের কর্ম্ম-তালিকা। হঠাৎ এক জন সর্দ্দার এসে খবর দিল—ধরা পড়েছে এক ফরাজী ফকীর।

—কোথায়?

—রাজার বাগিচায় গুম-ঘরে!

কালীনাথ হো-হো করে হেসে উঠলেন। চোখ দু'টো হিংস্র হয়ে উঠল।

কেষ্টলালের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে হেসে গলে পড়েন।

—কেষ্ট! গুম-ঘরে, বুঝলে! ভোর না হতেই তাহ'লে ডোমের ব্যবস্থা করো। সাতগাঁয়ের মাঠে—শিবা-ভোগ দিতে হবে ত। হা! হা! হা!

লেঠেল-সর্দ্দারকে ট্যাঁক থেকে একটা টাকার থলি খসিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'বিশ্রাম কর, গিয়ে।' সে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে হাতের চেটোয় থলিটা নাচাতে-নাচাতে চলে যায়।

—না কেষ্ট! সাপের ছোবলে মরবার আগে ওর জিভ টেনে কথা বের করে নাও। না না, তুমি পারবে না। তুমি আটচালায়

যাও। ওরা কাঁদছে। ওদের সান্ত্বনা দাও গিয়ে, কেষ্টলাল। আমি যাব পীরের নিকুচি করতে।

কালীনাথ অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হন। খানসামাটা পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার ফিরে আসেন—কেষ্ট—কেষ্টলাল, বিলাসীর খোঁজ আমার চাই চার দণ্ডের মধ্যে।

কর্ত্তাকে বিদায় দিয়ে কেষ্টলাল ধীরে ধীরে কি ভাবতে ভাবতে নায়েবের আটচালার দিকে চলে যায়।

আটচালায় শত শত নর-নারী-শিশু এসে আশ্রয় নিয়েছে। সকলেই হৃতসর্বস্ব। বৌ আর ঝিয়ারী এক জনও নেই। বিপদের ইঙ্গিত পেয়ে তাদের নিবিড় বনের মধ্যস্থিত ভূতের বাড়ীতে কালীনাথ সরিয়ে ফেলে সেখানে পাকা লাঠিয়ালদের পাহারা বসিয়েছিলেন। আধা-বয়সী যে কয় জন গাঁগুলোতে ছিল, মাতাল ডিক আর ফরাজীরা তাদের ইজ্জত যেমন নষ্ট করেছিল, তেমনি পণ্যের মত বেমালুম লুঠে নিয়ে গেছল।

বেলা বাড়ে। আটচালায় শিশুরা ক্ষুধায় আর্ত্তনাদ করে। বাগচী গয়লাপাড়ায় খবর দিতে দুধ এসেছে। ওদের বাটি-বাটি বেঁটে দেওয়া হ'ল। বড়দের জন্য ফলারের ব্যবস্থা হয়েছিল।

দুপুরের মাছ-ভাতের আয়োজনের জন্য আটচালার আঙ্গিনায় বড়-বড় চুলা জ্বালান হয়েছে। জমিদারের কাঠশালা থেকে শুকনো কাঠ এনে আঙ্গিনার এক কোণে স্তূপ করা হয়েছে। ভারীরা জল এনে বড়-বড় তামার জালা পূর্ণ করছে।

কে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে সংবাদ দিয়ে গেল, কেশবনগরের কুঠী ফরাজীরা শেষ রাত্রিতে আক্রমণ করতে গেছল, হটে গিয়ে এদিক পানে আসছে।

এই সংবাদে রীতিমত হট্টগোল পড়ে গেল। চুলাগুলো জ্বলতে থাকল। স্তূপাকার চাল আর বড়-বড় মাছগুলো আঙ্গিনায় পড়ে রইল। যে যেদিকে পারল পালাল। বিপন্ন আতঙ্কগ্রস্তদের আর্ত্তনাদে জমিদার-বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠল। সে আর্তনাদে বিচলিত হয়ে কালীনাথ হন্তদন্ত হয়ে আটচালায় এসে ব্যাপার কি জানতে চাইলেন। কেষ্ট বাগচী খবর নিতে বেরিয়ে গেছে শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়ে সকলকে স্থির হতে বললেন।

রান্নার আয়োজন আবার সুরু হ'ল। কালীনাথ আটচালার সামনে জলচৌকীতে চিন্তাকুল হয়ে বসে ফরসী টেনে যেতে লাগলেন।

চুলাগুলো দাউ-দাউ করে জ্বলছে—কালীনাথের মনেও জ্বলছে আগুন। মাছ কোটা দেখবার জন্য ছোট ছোট ছেলেরা কুটুনীকে ঘিরে দাঁড়ায়। পটকা কে নেবে তাই নিয়ে একটু মারামারিও হয়ে যায়। বুড়ীরা কুটনা কুটে এক দিকে স্তূপ করে—কালীনাথের মনেও কত-শত চিন্তা এসে জমা হয়।

কালীনাথ আকাশ-পাতাল ভেবেই যান। খানসামা এসে বার বার ফরসীর মাথায় কলকের পর কলকে চাপিয়ে যায়। সূর্য্য মাথার উপর উঠে পড়ে! কালীনাথ চিন্তান্বিত হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে থাকেন। বাগচী এখনও ফিরল না। গোপালই বা কোথায়? বিলাসী, আহত মেয়েটির ত কোন খোঁজই কেউ দিল না। ডাকলেন—"কার্ত্তিক!"

আধা-বয়সী দৈত্য, কার্ত্তিক। পাকা বড় লাঠি হাতে, একখানি চার হাতি গামছা তিন কোণা ভাঁজ করে কোমরে এঁটে বাঁধা। ছুটে এসে রায় মশাইকে দণ্ডবৎ করে দূরে হাতযোড় করে আদেশের প্রতীক্ষা করে দাঁড়ায়।

—ব্যাপার কি ঠাহর হচ্ছে?

—ভাল ত মনে হচ্ছে না কর্ত্তা।

—চার জন ভাল রণপা নিয়ে অঞ্চলটা ঘুরে আয়।

মুখের একটা উৎকট আওয়াজ করে সে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিশ্চয় বিপদ। নায়েবকে তলব দিলেন। যা রান্না হয়েছে, তাড়াতাড়ি সবাইকে খাইয়ে দিতে আদেশ দিলেন। খবর নিতে বললেন—ভূতের বাড়ীতে মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে কি না। নিজের স্নান-আহারাদি শেষ করে নেবার জন্য অন্তঃপুরে চলে গেলেন। তাঁর দৃঢ় সবল পদক্ষেপে মনে হল, কি একটা সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছেন।

আশ্রিতের আহার শেষ হয়ে যায়। বৈঠকখানার বিস্তীর্ণ আঙ্গিনাটা হাড়ীর মেয়েরা গোময়-জল দিয়ে ঝাঁট দিতে থাকে। পশ্চিম দেউড়িতে জোড়া তাল গাছের ছায়া লম্বা হয়ে আঙ্গিনায় পড়ে। সহসা লম্বা এক জোড়া রণপা এসে নেমেই মুখে হাত দিয়ে জিগির তোলে।

বৃদ্ধ কালীনাথ রণস্পর্দ্ধী যুবকের আটসাট বেশে এসে দাঁড়ান আঙ্গিনায়। দণ্ডবৎ করে কার্ত্তিক জানায়—রাজার বাগিচা ঘিরে ফেলেছে মুসলমানেরা।

কালীনাথ চমকে উঠে চোখ দু'টো বিস্ময়ে বিস্ফারিত করেন।

—আর বাগচী?

—তাঁর খোঁজ পাইনি।

—খোঁজ পাওনি? গোপাল? বিলাসী?

—গোপালের পায়ে গুলী লেগেছে! বিলাসী আর এক মুসলমান মেয়েকে নিয়ে কৈলাস ভূতের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছে।

—আর ওরা রাজার বাগিচা ঘিরেছে?

—হাঁ কর্ত্তা!

কালীনাথ ভাবেন, রাজার বাগিচার গুম-ঘরে—ফরাজী ফকীরকে এতক্ষণ হয়ত বাস্ত কেউটে নীল করে ফেলেছে। ওর জিভ টেনে ত কথা বের করা আর হ'ল না। ফকীরের খোঁজেই ওরা হয়ত এসেছে। কিন্তু খবর দিল কে? হুকুম দিলেন, পাল্কী!

পাল্কী এল। সঙ্গে সাঁই জোয়ান বেহারা এক কুড়ি। সঙ্গে বল্লমধারী পাইক ও লাঠিয়ালের দল। চার জন বিশ্বাসী রণপা, সন্ধ্যা গড়িয়ে এলে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

হন-হন করে চলে পাল্কী। সামনে পেছনে দু'ধারে ছুটে চলে পাইক লেঠেলরা।

সূর্য্য পাটে বসে। পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা হয়ে ওঠে। ফিকে কমলা আলো পথের দু'ধারের আশু ধান্যের মাঠে সোনার আস্তরণ বিছিয়ে দেয়।

পাল্কী বেহারারা চলে ছুটে। তাদের মুখের হুঁ-হুঁ আওয়াজ দ্রুততর। তাদের বক্র বাহুর আন্দোলন-গতিও দ্রুততর। বাঁক পেরুলেই মহিষকুণ্ডির চর। সন্ধ্যার পর ও-পথে বুনো মহিষ, বন্য শূকর আর বাঘের দৌরাত্ম্য। পাল্কী চলে শিকারপুরের পথে।

কালীনাথ বুঝেছিলেন যে, তিতুর ব্যাপক আক্রমণের গতিরোধ

করতে হ'লে ডিকের অপহরণের পর টমসনদের আর সাহায্য পাওয়া যাবে না, তাই শিকারপুরের ওয়াটসনদের সাহায্য ছাড়া উপায় নাই। আর তিনি এ কথাও শুনেছিলেন যে, শিকারপুর কুঠীতে অনেক গোরা পল্টন এনে জমায়েৎ করা হয়েছে তিতুর অভিযানের প্রতিরোধ করবার জন্যে। রাজার বাগিচা ওরা ঘিরেছে; রাতে যদি ওরা আক্রমণ করে, তবে তাঁর অত হাতিয়ারের আয়োজন সব পণ্ড হবে। গোটা অঞ্চলের একটি হিন্দুও বেঁচে রইবে না। তাই তিনি সোজা শিকারপুরের দিকেই চলছিলেন। এ কথা তিনি শুনেছিলেন যে, শিকারপুর নীলকুঠীর মালিক জন ওয়াটসন একবারে ক্রোধভরে আদেশ দিয়েছিলেন ইয়ংকে যে, ডিকের মাথা কেটে এনে দিলে তিনি হাজার টাকা বখশিস করবেন।

সন্ধ্যা গড়িয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে রণ-পা চার জন এসে যোগ দিয়েছে।

পাল্কী যখন রামনগরের কাছাকাছি এসে পৌছল, তখন এক ভয়ঙ্কর কোলাহল শোনা যেতে লাগল গ্রাম থেকে। কালীনাথ পাল্কী থেকে নেমে পড়লেন আর বেহারাগুলোকে পথের পাশের একটা ঝোপের আড়ালে পাল্‌কী লুকিয়ে রাখতে বলে তাদের সঙ্গে আসতে আদেশ করলেন।

চাঁদ একটু দেরী করেই উঠ্‌বে। চৈৎ-সংক্রান্তিতে রামনগরের বারোয়ারীতলার মাঠে মস্ত মেলা বসে, আর চার দিন ধরে মহা সমারোহে বিরাট এক কালীপূজা হয়।

এক জনকে লাঠি হাতে রক্তাক্ত কলেবরে গ্রাম থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখে কালীনাথের লোক-জন তাকে ঘিরে কর্ত্তার কাছে নিয়ে যায়। লোকটা বলে, ফরাজীরা গ্রাম আক্রমণ করেছে—নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে লোক ডাকতে যাচ্ছে। প্রথম বাধা দিতে সে গেছল।

কালীনাথের ইঙ্গিতে রণ-পা চার জন চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত এক জিগির ছাড়ে। সে তূর্য্যনিনাদের সঙ্গে যোগ দেয় কালীনাথের সঙ্গী লাঠিয়াল আর পাইকরা। দেখতে দেখতে গ্রামে-গ্রামে যুগপৎ শঙ্খধ্বনি হতে থাকে, গ্রামে-গ্রামে শত শত ডঙ্কায় অদ্ভুত রণবাদ্য বেজে ওঠে। দেখতে দেখতে দিক্‌চক্রবালের ধূসর বনানী ভেদ করে প্রতি গ্রামের প্রতি অলক্ষ্য স্থান থেকে, উন্মুক্ত প্রান্তরের আশু ধান্যের মাঠগুলো ভেদ করে সহস্র সহস্র লাঠিধারী বীর এসে সমবেত হয়।

রামনগর গাঁয়ের কোলাহল ক্রমে বেড়ে ওঠে। কালীনাথ ইঙ্গিত করতেই সবাই দৌড়ে চলে গ্রামের দিকে। কালীনাথ ফিরে গিয়ে পাল্কীর মধ্যে বসে রইলেন ঝোপের আড়ালে, একটা গাছের উপর বসে তাঁর প্রিয় কার্ত্তিক সর্দার পাহারা দিতে লাগল।

আগুন জ্বলে উঠে রামনগর গ্রামে। ফট-ফট আওয়াজ! অগ্নির লক্‌-লক্‌ জিহ্বা ওদিকটার আকাশ লেহন করে যায়।

কালীনাথ চুপ করে বসে রইতে পারেন না। বেহারাদের হুকুম দেন, উঠাও পাল্কী। ডাকেন—কার্ত্তিক!

কার্ত্তিক এগিয়ে চলে। বড় একখানা লাঠি তার হাতে। কালীনাথ পাল্কীর ভেতর থেকে তার তলোয়ারখানা খাপ থেকে খুলে হাতে নিয়ে এক বার তার ধার পরীক্ষা করে নেন।

—জোরে চল্‌! চল্‌ ছুটে।

সবাই ছুটে চলে।

রামনগরের বারোয়ারীতলার মাঠে চৈৎ-সংক্রান্তির মেলা ভেঙ্গে গেছে। কালীনাথ কার্ত্তিককে নিয়ে যখন গিয়ে পৌছলেন, তখন এক বীভৎস দৃশ্য দেখে চোখ বুজলেন।

বারোয়ারীতলা জনশূন্য। বিরাট আটচালায় বিরাট মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন। কেষ্ট পুরুত আহ্বান করছেন জননীকে—ইহাগচ্ছ! ইহাগচ্ছ! ইহ তিষ্ঠ···

সামনের নাটমন্দিরে যাত্রার আসর ভেঙ্গে গেছে—অধিকারী বাদ্যযন্ত্রগুলো ফেলে পালিয়েছে। নাট-মন্দির আর কালী-মন্দিরের মাঝখানে বিরাট হাড়িকাঠ। পাশের খুঁটিতে পাঁচ-ছ'টি কৃষ্ণবর্ণ বলির পশু বাঁধা।

কৃষ্ণকিশোর পূজোয় বসেছেন। দীর্ঘবপু বিশাল-দেহ ব্রাহ্মণ। প্রশস্ত ললাটে রক্ত ত্রিপুণ্ড্রক। পরিধানে রক্তপট্ট। বড়-বড় চুলগুলো তাঁর ইন্দ্রলুপ্ত শিরের দু'পাশ থেকে বয়ে কাঁধের নীচে গিয়ে পড়েছে।

কালীনাথ পৌছে দেখলেন সেই শূন্য বারোয়ারীতলায় বিশ-পচিশ জন ফরাজী গো-হত্যা করে চার দিকে রক্ত ছিটোচ্ছে আর কোলাহল করছে।

আর তার-স্বরে কৃষ্ণকিশোর মাকে আহ্বান করছেন—ইহাগচ্ছ—ইহাগচ্ছ—কিন্তু এ কী হল! ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কৃষ্ণকিশোর ফিরে তাকিয়ে দেখেন সেই পাশব তাণ্ডব! একবার আর্ত্ত চীৎকার করে ডাকলেন—মা! মা গো!

মাতৃ-পদতলের বিরাট কৃপাণখানা তুলে নিয়ে কৃষ্ণকিশোর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই বীর সন্তানের কৃপাণ পান করে পশুদের শোণিত। কৃষ্ণকিশোর রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে মুহুর্মুহু চীৎকার করেন—মা! মা! মা গো!

বৃদ্ধ কালীনাথ ছুটে গিয়ে ধরেন কেষ্ট ভট্টচাযকে।

—ভট্টচাজ! ভট্টচাজ!

—তুমি যাও কর্ত্তা! গাঁয়ের জননীদের বাঁচাও গিয়ে। এখানে আমিই রক্ষা করব মাকে।

কালীনাথ কার্ত্তিককে নিয়ে গাঁয়ের ভিতরে ছুটে যান। তাঁর পাইক লাঠিয়ালদের প্রহার খেয়ে তিতুর দল পলায়ন করতে থাকে। বীরদের রণ-উল্লাসে গ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে। পলায়মান এক দল পশু বারোয়ারীতলার মায়ের আটচালায় আগুন ধরিয়ে দেয়, আর অতর্কিত আক্রমণে কৃষ্ণকিশোরকে হত্যা করে।

কোলাহল তখন থেমে গেছে। রামনগর গ্রামের ঘরগুলোর আগুন নিবে গেছে। নির্ব্বাণপ্রায় ভিটেগুলো থেকে খালি ধূম্র-কুণ্ডলী উত্থিত হচ্ছে।

কালীনাথকে সঙ্গে করে কার্ত্তিক আর দলবল মাকে দর্শন করে ফিরে যাবার জন্য বারোয়ারীতলায় এসে দেখে বিশাল কালীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে আর তারই পায়ের তলায় পড়ে আছে কৃষ্ণকিশোরের দ্বিখণ্ডিত দেহ। তারা দেখে—জ্বলন্ত জননীর পদতলে বীর-সন্তানের অফুরন্ত শোণিত-তর্পণ। কেষ্ট পুরোহিতের রক্তাক্ত কেশ-শোভিত বিশাল ললাট আর সেই ললাট-নিম্নের বিশাল নয়ন দুইটি তখনও অপলক দৃষ্টিতে কি যেন দেখছিল সেই বহ্নিমান মাতৃ-মূর্ত্তিতে। মায়ের কৃপাণ তখনও তাঁর মুষ্টিচ্যুত হয়নি।

কালীনাথ কৃষ্ণকিশোরের রক্ত তুলে নিয়ে ললাটে তিলক পরলেন। তাঁর দেখাদেখি সব বীর সেই বীর ব্রাহ্মণের শোণিতে নতুন ক'রে যেন দীক্ষা গ্রহণ করল।

কালীনাথ হুকুম দিলেন—এবার চল্‌ ফিরে! [ক্রমশঃ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অ, আ; ই

রিপন ষ্ট্রীটের দু'পাশে গাছের সারি। গাছের ছায়ায় যেন ঘুমিয়ে আছে যত বাড়ী আর এই রাস্তা। ঘর আর বাহির। দেবদারু, ঝাউ আর অশ্বত্থের পঙ্‌ক্তিতে রিপন ষ্ট্রীটের আঁকা-বাঁকা পথ এখন ঘন অন্ধকার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাছে-গাছে বাসায়-ফেরা পাখীর কূজন শুরু হয়েছে। কাক আর চড়াই। শালিখ আর বুলবুলি। কারও কারও ঘরের চুল্লীতে আগুন প'ড়েছে। চিমনী বেয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশের কোলে। গাছের চূড়ায়। কেউ বা আবার ঘরে লণ্ঠন জ্বেলেছে। কেরাসিন তেলের লণ্ঠন। খোলা জানলা থেকে যাচ্ছে কম্পমান আলোর শিখা।

সারা রিপন ষ্ট্রীটের মানুষ কি আজ স্তব্ধ হয়ে থাকবে!

এ তল্লাটের নেটিভদের সব চেয়ে যে মেয়েটা ভাল ছিল সেই আজ কি না সকলকে ছেড়ে চলে গেল এই মাত্র। চলে গেল শোকের তুফান তুলে। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ নিজেদের ফটকের বাইরে বেরিয়ে প'ড়েছে। দেখছে, শবযাত্রা দেখছে। এক দল কালো পোষাকের নির্ব্বাক্ মানুষ। নত মাথায় এগিয়ে চলেছে। আর তারা বহন ক'রে নিয়ে চলেছে সেই মেয়েটিকে। ঘুমন্ত লিলিয়ানকে।

আর চার্চ্চের ঘড়িটা তখনও পাখীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবিশ্রান্ত বেজে চ'লেছে। কি বিশ্রী শুনতে লাগে আজ ঐ যান্ত্রিক সন্ধ্যা-সঙ্গীত। কিন্তু ঘড়ি তো আর কারও হাত-ধরা নয়। কারও সুখ-দুঃখের অপেক্ষায় থাকবে না। অন্য সন্ধ্যায় ঐ শব্দ-ঝঙ্কার কত মানুষের মনে খুশীর উল্লাস জাগিয়ে তোলে, কত শিশুর নতুন কানে সুরের মূর্চ্ছনা। নীরবতার তাল কেটে দিচ্ছে যেন। বড় বিশ্রী লাগছে শুনতে।

দেখতে দেখতে কৃষ্ণতায় ঢেকে গেল দিগ্বিদিক্। রাত্রির প্রথম পদক্ষেপে অন্ধকারের অদৃশ্য কল্লোল। রাত্রি, সেও তার পক্ষ বিস্তার করবে। ধীরে ধীরে, মৃদুমন্দ ছন্দে নামবে রাত। আলো গতিশীল, সব চেয়ে দ্রুতবন্ত তার বেগ। অন্ধকারের গতি কৈ?

লিলিয়ানের কফিন কতক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেছে পথের বাঁকে।

এই পল্লীর ছায়া, মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। কিন্তু অন্ধকারে এত অপেল পাথর কোথা থেকে এলো! শিশির-বিন্দুর মত টুপ-টুপ যেন ঝ'রে পড়ছে এখান-সেখান থেকে। পাখীরা কি এখন ডাক থামিয়ে কান্না শুরু ক'রেছে। নম্বাণ লজের গাড়ী-বারান্দায় মাধবীর ঝাড়ে কুঁড়ি ফুটছে। বাতাসের পরশ পেয়ে ফুটে উঠছে মাধবীর স্তবক। অপেল, না ঐ গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল!

কিন্তু মাটিতে, রাস্তায়, গাছে আর অন্যের বাড়ীর কিনারায় কি এত মাধবীর ছড়াছড়ি। কোথা থেকে ঝ'রে পড়েছে টুপ-টুপ। স্বর্গ থেকে? দেবশিশুরা পাখা মেলে উড়ে এসেছে স্বর্গ থেকে। মুঠো-মুঠো অপেল লিলিয়ানের যাওয়ার পথে ছড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছে হাসতে হাসতে। অপেলের আসমানী চিকণে কত রঙের ঝিলিক! না না, মণি-মাণিক্যের ছটা নয়, চোখের জলের ফোঁটা। গাছের পাখী আর ঐ স্বর্গের দেবশিশুরা কি কাঁদতে শুরু করলো?

কারও অশ্রুকণাও নয়।

ঐ নতুন-ফোটা মাধবীর স্তবক দেখে মনে পড়েছে লিলিয়ানের সেই মালা। কাণের দুল আর কণ্ঠের মালা!

হঠাৎ কথা শুনে চমকে উঠেছিল কৃষ্ণকিশোর। নম্বাণ লজের ভেতর থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে কে এক জন অতর্কিতে একটা হাত তার ধরছে! তাকে দেখেই চমকে উঠেছে। এ কি বীভৎস নারীমূর্ত্তি! কে? কি চায়? মেরুদণ্ডহীন শরীর, মুখের দাঁতগুলো সব নেই। মাথায় রুক্ষ পক্ব কেশ! কিসের এক জ্বালায় ক্লিষ্ট শরীর তার থরো-থরো কম্পমান। পরনের বসনখানার আঁচল লুটিয়ে পড়ছে। হাত ধরতে ফিরে তাকাতেই বৃদ্ধা বললে,—আইয়ে, ভিতরমে আইয়ে!

বুড়ীর চোখ দু'টোতে জল টলমল করছে! কিন্তু কে এ? কি চায়? আজকে দুপুরে ঠিক বেলা দু'টোর সময় এই বাড়ীর যে মেয়েটি পরলোক যাত্রা ক'রেছে, তারই প্রেতমূর্ত্তি নয়তো। রাশি রাশি বিক্ষিপ্ত অপেল পাথর দেখতে দেখতে এ কি দেখলো সে! কে তার সমুখে এখনও সশরীরে দাঁড়িয়ে এমন কাঁপছে। এখনও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে না। এখনও, এখনও!

কোচবক্স থেকে এতক্ষণ সব কিছু লক্ষ্য ক'রেছে অনন্তরাম। এতক্ষণ শুধু নীরবে দেখেছে—দেখেছে বাড়ীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই কার একটা মৃতদেহ কারা বের ক'রে নিয়ে গেল—দেখেছে সেই উড়ো খৈ ফিরিঙ্গি ছেলেটাকে সবার পেছনে। এতক্ষণ শুধু দেখেছে। বুড়ী এসে হাত ধরতেই গাড়ীর মাথা থেকে হেই-হেই করতে করতে নেমে এসেছে। কৃষ্ণকিশোরের কাছাকাছি গিয়ে ব'লেছে,—এ সব ঝামেলায় আসা কেন? কোথাকার কে মরেছে, তাদের সব ছোঁয়া-ছুঁয়ি করলে তো!

বুড়ীর কান নেই অনন্তরামের কথায়। সে তখন হাত ধ'রে দস্তুরমত টানছে। বলছে,—আইয়ে না, ভিতরমে আইয়ে। কান্নার একটা অস্ফুট শব্দ যেন বুড়ীর কথায়। একেক বার দু'হাতে নিজের কপাল চাপড়ায় আর বিড়-বিড় করে বুড়ী। চোখ দু'টোতে তার জল টলমল করে।

কে এ? ডাকিনী, যোগিনী, প্রেতিনী।

না। এক জন বয়োবৃদ্ধা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই চরম আঘাতে অসহ্য হয়ে উঠেছে সে। যেন ঠিক উন্মাদিনী। প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল অশরীরী কোন আত্মা এই অদ্ভুত রূপে বুঝি দেখা দিয়েছে। কিন্তু আত্মা কি কাঁদে? কাঁদে যে মানুষ। বুড়ো মানুষ, তাই আর থাকতে পারছে না। কি করছে নিজের খেয়াল নেই। ধনুকের মত অবয়ব তার কাঁপছে।

অনন্তরাম কাছে আসতেই আর কোন ভয় থাকে না। অনন্তরাম বুড়ীকে জিজ্ঞেস করে,—তুমি কে? কি চাই?

তার ব্যস্ততা ক্ষণেকের জন্য কমে যায় হয়তো। বুড়ী কেমন স্থির হয়ে যায় যেন। অচঞ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফটকের দিকে। নিজের পরনের কাপড়ের লুটন্ত আঁচলটা খুঁজতে খুঁজতে বলে,—আমি। আমি আয়া আছি। বুড়ী কথার মাঝে থামে। কি যেন ভাবে। বলে,—ঐ যে, কত সব আদমী এসে নিয়ে গেল। ঐ লিলিকে আমি—

কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে। বোধ হয় মনে পড়তেই ছুটে দেখতে গেল শবযাত্রা কত দূরে। কোথায়, লিলি এখন কোথায়। একেই চোখে দৃষ্টি নেই, দূরের বস্তু নজরে পড়ে না। তবুও সে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে—যেদিকে ওরা ঐ লিলিকে নিয়ে চললো।

কোন্ দিকে গেল লিলিয়ান। কোথায় গেল?

আয়ার কথা শুনে তার মনেও প্রশ্ন জাগে, সত্যিই, গেল কোথায়? কৃষ্ণকিশোর এক বার অনন্তরামের দিকে তাকায়। কিছু দেখতে পায় না। অনন্তরামের রঙের সঙ্গে আর কোন পার্থক্য থাকে না অন্ধকারের। এক জোড়া পেঁচা কোন গাছে পালা ক'রে ডাকতে শুরু করলো। অন্ধকারের আমেজ পেয়ে পাখা ঝাপটে বাসা ছেড়ে উড়লো আকাশে। বিপন ষ্ট্রীটের আঁকা-বাঁকা পথে অন্ধকার কেঁপে উঠলো তাদের ডাকে।

এই কয়েক মুহূর্ত আগে থেমে গেছে চার্চের ঘড়ি। এখন শুধু অন্ধকার থম-থম করছে। আর একটা এলোমেলো বাতাস বইছে থেকে-থেকে। পথের ঝরা পাতা খড় খড় ক'রে উঠছে তখন।

বুড়ী ফটক থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসে এবার অনন্তরামের হাতটা ধরলো। কাঁপা গলায় বললে,—ভিতরমে আইয়ে। লিলি ভিতরমে হ্যায়।

সে আবার কি! বুড়ী বলছে কি!

অনন্তরাম হেসে ফেললো, তার কথার ধরণ-করণ শুনে। দুঃখের অকপট হাসি। বললে,—চল্ তো কিশোর। দেখাই যাক্ না কি ব্যাপার। ছুঁয়ে যখন ফেলেছিস—

অনেক দূরে পেঁচা দু'টো আরও কয়েক বার ডাকলো। কর্কশ সুরে।

পায়ের তলায় কি? হঠাৎ চমকে উঠলো কৃষ্ণকিশোর। সরে দাঁড়ালো খানিক। সেখানেও। বালিয়াড়ী পাথর আর নুড়ি। ফটক থেকে গাড়ীবারান্দার নীচে পর্য্যন্ত কাঁকর আর পাথর। পায়ের তলায় নুড়ি পাথরের মর্ম্মর। অপেল কোথায় এখানে।

বৃদ্ধা এখনও অনাহারে রয়েছে।

গত কাল লিলি যখন থেকে আর কিছু মুখে দিলে না, একেবারে ঘুমিয়ে পড়লো, সেই তখন থেকে সেও খেতে ভুলে গেছে। ভুল ক'রে ক'বার জলের কলসীর ঢাকা খুলে ফেলেছিল আজকে। শেষ পর্য্যন্ত না কি খায়নি এক ফোঁটাও জল। কিন্তু কিছু যে দেখা যাচ্ছে না। এমন কি পাশের মানুষকে। নিজেকে। কাকেও কেউ দেখতে পায় না পরস্পর। অনন্তরাম বললে,—চল, কোথায় যেতে হবে।

বৃদ্ধা তখন দরজার মুখে। বলছে,—আইয়ে জী।

ওরা দু'জন এক বার চমকে উঠলো। কখন চলে গেল এখান থেকে! ওরা দরজার কাছে যেতেই বৃদ্ধা চুপি-চুপি বললে,—বাত্তি লিয়ে আসি।

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। অনন্তরাম ফিস-ফিস করলে,—তোমার যত বেলেল্লা কাণ্ড!

কৃষ্ণকিশোরের মুখে কথা নেই। সে নির্ব্বাক্!

আলো নিয়ে আসে বৃদ্ধা। হাতে এক ঝুলন্ত লণ্ঠন। ধোঁয়ার কালো আবরণে কাচগুলো অকেজো। আলো আছে কি নেই। কালি পড়েছে চিমনীতে। সারা রাত ধিকি-ধিকি জ্বলেছে যে। পলে পলে পুড়েছে ঐ লণ্ঠনের শিখা। কাল সারা রাত জ্বলেছে কোথায় কোন ঘরে। লিলিয়ানের জ্বর যখন না কি প্রায় সাড়ে পাঁচ ডিগ্রী। জ্বরের ঘোরে দু'-একটা কথা বলেছে। কি বলেছে কেউ বুঝতে পারেনি। শুনতে পায়নি।

ঐ লণ্ঠনের দীপ্তি পথ দেখায় অন্ধকারে। আয়া আগে-আগে যায়। ওরা তার পেছনে। যেন এক গুহার ভেতরে চলেছে। অন্ধকার গুহা। কোন এক পাহাড়ের তলায়।

আর সত্যিই কি পাহাড়? যেন ঠিক হরিণপোতার জেল-ঘর! হবে নাই-বা কেন? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী। তাদের মনের মত তৈরী। হলের মত ঘর আর বিরাট বিরাট দরজা। যেন দানবপুরী। কোম্পানীর হাত থেকে বেরিয়ে যায় বিলি ব্যবস্থার বন্দোবস্তে। হাতফের হয়। কোম্পানীর হাত থেকে যায় এক ষ্টেটের হাতে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর খাস-দখলে। ইংরেজের পিঠে-ভাগের পুরস্কারে পাওয়া। স্বর্ণময়ী দানের টাকার প্রয়োজনে না কি হাতছাড়া করেন। চৌরঙ্গীর এক সায়েব খবর শুনে

রাতারাতি কিনে ফেলেছিল! নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্রের বাবা কিছু বেশী দিয়ে সেই সায়েবের কাছ থেকে নিয়েছিলেন নিজের বসবাসের জন্য।

একটা ঘরের দরজায় এসে আয়া একবার ফুঁপিয়ে উঠলো। ঘরের ভেতরে অন্ধকার নয়; আলো জ্বলছে। দেওয়ালের বাতিদানে দু'টো বাতি জ্বলছে। আর কারা ওরা বসে আছে সব। কেমন যেন শোকের প্রতিমূর্ত্তি চুপচাপ বসে আছে রাতের ভীরু পাখীর মত। বাতির আলোর চাঞ্চল্যে তাদের চোখের তারা চিক-চিক করছে। আয়াকে আর ওদের দু'জনকে দেখে তারা শুধু দেখলো একবার মাত্র। তার পর দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো ঘরের ঐ শূন্য শয্যায়। যেখানে এখন কেউ নেই, শুধু শয্যা।

আয়া গলা কাঁপিয়ে বললে,—এই লিলির ঘর আছে। এরা সব লিলির বেথুনের বন্ধু। পড়ার বন্ধু।

পাড়ার বন্ধু নয়, পড়ার বন্ধু। সতীর্থ। চার জন, শোকে মুহ্যমান হয়ে বসে আছে নীরবে। তাদের মক্ষীরাণী যে উড়ে গেছে কোন্ আকাশে।

আয়া ঘরের ভেতরে যায়। যারা বসে আছে তাদের এক জনকে দেখিয়ে বলে,—এর নাম ইসাবেলা জি স্যামুয়েল।

নামের অধিকারিণী চোখ তুলে তাকালেন মাত্র। আর কিছু নয়।

আয়া বললে,—এর নাম আছে এমিল নিকোলাস।

যার নাম তিনি ক্ষণেকের তরে একবার স্পন্দিত হয়ে উঠলেন যেন। পাষাণের মূর্ত্তির যেন ঘুম ভাঙলো একবার।

আয়া বললে,—আর এর নাম লেনা, লেনা ঘোষ। লিলির সই।

বাতি আর লণ্ঠনের আলোতে দেখা যায় আয়ার ঘর্ম্মাক্ত কপালে উল্কীর নক্সা। দু'টো উড়ন্ত টিয়া পাখী। আর কতকগুলো ছোট-বড় তারা ছড়িয়ে আছে কপালে।

লেনা ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার বক্ষোদেশ কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। লেনা দেখছিল লিলিয়ানের পিয়ানোটা। ঘরের ভেতরে রয়েছে এক পাশে। যেন এই শোকের সমব্যথীর এক জন, মূক, তাই প্রকাশ নেই। পিয়ানোর আসনটা শূন্য।

আয়া হাতের লণ্ঠন মাটিতে নামিয়ে বললে,—আর এ, এই মেয়েটাকে লিলি নিজে সাজিয়ে দেয়। কোন জঙ্গলের কোন এক রাজপুত্তুরের সঙ্গে সাদি দেয়। এর নাম বেলা ডিভাইন।

বেলার চোখ দু'টো সত্যিই ফুলে উঠেছে। প্রচুর কেঁদেছে সে। এখনও হয়তো কাঁদছে। বেলাই প্রথম মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ফুলের রাশি নিয়ে চলে এসেছে। রাশি-রাশি হলদে গোলাপ। তাজা, টাটকা। তার পরে এসেছে এমিলি আর ইসাবেলা। লেনা সেই দুয়ারে এসে আর ফিরতে পারেনি। যদিও সে থেকেও তার সইকে সে ফেরাতে পারেনি। ঠিক দু'টোর সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রেছে লিলিয়ান। নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্র তখন তার শিয়রে দাঁড়িয়ে যীশুর বাণী শোনাবে, না, সেই শেষ মুহূর্ত্তে সে আবৃত্তি ক'রেছে কি এক ইংরেজী কবিতার পয়ার। তার তখন স্মরণে এসেছে কবি শেলীর দু'টি পঙক্তি।

How wonderful is Death !
Death and his brother sleeep.

চৈত্র-দিনের দিক্‌হারা বাতাসে জ্বলন্ত বাতির শিখা দু'টো টলতে শুরু করলো। বাইরের নিঃশব্দ অন্ধকারে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল হঠাৎ গাছ-গাছড়া দুলছে বাইরে, ঢ'লে পড়েছে পরস্পরে। ঘর্ষণের শণ শণ ধ্বনি ভেসে আসছে। কোথায় কোন দূরের গাছে আবার ডাকছে পেঁচা! তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বর কালপেঁচার। আর ডাকছে ঝিঁ-ঝিঁ; অবিরাম, অবিশ্রান্ত। রাতের পশু, পাখী আর কীট-পতঙ্গ বিবরের বাইরে বেরিয়েছে। যখন অন্যান্য সকল প্রাণী নিদ্রায় অচেতন থাকবে, তখন জাগবে তারা। গভীর তমসায় যখন দৃষ্টি হারাবে কেউ, তখন তাদের চোখে ফিরে আসবে সজাগতা। এখন রাতের প্রথম প্রহর! তাই তাদের কণ্ঠধ্বনি বাতাসে ভাসমান।

লিলিয়ানের সতীর্থদের পরিচয় দেওয়া শেষ হ'তেই আয়া দেখায় একটা আয়না। বেলজিয়াম কাচের একটা ওভ্যাল আয়না। আয়া সেই আয়নার তলদেশের ব্রাকেট থেকে খামচা মেরে তুলে নেয় কি কতকগুলো। দু'হাতে সমুখে মেলে ধ'রে। বলে,—লিলির গয়না।

এক ঝলক আলো ঠিকরোয় যেন। সেই আসমানী চিকণ। সেই অপেলের মালা আর দুল। লিলির বড় সাধের সঙ্গী—সদাক্ষণ প'রে থাকতো। কৃষ্ণকিশোরের চোখ দু'টো ঝলসে উঠলো যেন। আয়া সেগুলোকে রেখে দিল যথাস্থানে। তার পর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কি সব বললো বিড়-বিড় ক'রে। চোখ দু'টোকে মুছে নিল কাপড়ের প্রান্তে। ঘরের চতুর্দ্দিকে দেখলো একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে। আর কি আছে দ্রষ্টব্য! লিলি আর এমন কি ফেলে রেখে গেছে এ ঘরে। আয়ার চোখ প'ড়েছে এবার। যেন ক্ষিপ্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। সঙ্গে-সঙ্গে উঠলো ঝঙ্কার। বেতালা, বেসুরো। আয়া আর কোন কথা বলে না। একটা কালো আবলুস কাঠের পিয়ানোর বুক জড়িয়ে মাথা এলিয়ে দেয় সেখানে। মাথা আর তোলে না। ঐ বেসুরো ঝঙ্কারের রেশ কাটতেই শুনতে পাওয়া যায় গুমরাণি। আয়া কাঁদছে শিশুর মত!

সতীর্থদের নিষ্পলক চোখ এবার ফিরলো ঐদিকে। ঐ পিয়ানোতে। তাদের কেউ কেউ ক্ষণেকের জন্য একবার ফুঁপিয়ে উঠলো যেন। যন্ত্র মূক, তাই, নয় তো তার বুকেও হয়তো চাপা কান্নার উদ্বেগ শোনা যেতো! সেও যেন নিঃসহায়ের মত এক পাশে এই শোকের অংশ গ্রহণ করতে চায়। চেয়ে থাকে নীরবে।

অনন্তরাম বললে ফিসফিসিয়ে,—মরেছেটা কে? কার জিনিস দেখাচ্ছে ও?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—অরুণের বোন। ছায়া, লিলি, লিলিয়ান।

অনন্তরামের বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো শোনা যায় যেন। সে বলে,—আহা। দেখেছিস, বুড়ীর লেগেছে দেখছিস! হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছে যে, লাগবে না।

বাড়ীতে কি আর মানুষ নেই এই ক'জন ছাড়া।

আর কোন ঘরে আলো জ্বলছে না। শুধু এই ঘরের দেওয়ালের বাতিদানে ঐ টলন্ত বাতির শিখা। আর কে থাকবে কে? লিলিকে বাদ দিলে থাকে ঐ নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্র আর তার বাবা। তাঁরা গেছেন গোরস্থানে। লিলির পিছু-পিছু। আর আছে এই আয়া। বয়সের প্রাচুর্য্যে তার শরীর অক্ষম। নয় তো সেও যেতে

চেয়েছিল অধীর আগ্রহে। লিলিয়ানের যে সব আত্মীয়-স্বজনরা তাকে নিয়ে যেতে এসেছিল, তারাই নিষেধ করলো, নয় তো আয়া আর একা থাকতে চায়নি। সে বায়না ধরেছিল,—আমাকেও লিলির সঙ্গে মাটিতে পুঁতে দাও। আমি থাকবো লিলির কাছে।

অনন্তরাম বললে,—চল, এবার ফেরা যাক্। রাত অনেক হ'ল। তোর মা আবার ভাববেন।

কৃষ্ণকিশোর আরেক বার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় এই ঘরের চতুর্দিক্। দেখে নেয় প্রাণ ভ'রে। এই ঘর ছিল তার অদেখা। যেন এক রহস্যপুরীর মত। এই ঘর থেকেই শুনতে পাওয়া যেতো লিলিয়ানের গান। আর ঐ বাজনার সুর-ঝঙ্কার। দেখতে-দেখতে সেও বললে,—হ্যাঁ, এবার চল' অনন্তদা।

কান্না নয়। চোখে জল নেই। তবুও যেন কান্নার এক নিরুদ্ধ আবেগ। এক লুকানো আঘাতের অসহ্য কষ্ট, যার প্রকাশে কোন দোষ নেই, আছে লজ্জা। অধিক ব্যথায় কাঁদে না কেউ-কেউ। চোখে জল আসে না। নিরুক্ত ব্যথায় একা-একা না কি জ্বলে যায় দুঃখের জ্বালায়। বাক্যস্ফূর্তি হয় না মুখে—অন্তর অঙ্গার হয়ে যায়। দু'জনে বাড়ীর বাইরে আসতেই দেখলো নিরন্ধ্র অন্ধকার। কোন দিকে ফটক?

অনন্তরাম বললে,—হাত ধর্ আমার। ঐ যে ফটক ঐ দিক পানে। ঐ তো রাস্তায় তোর গাড়ীর আলো জ্বলছে।

আবার সেই আলোর বিন্দু। অন্ধকারে সোনালী আলো। জ্বলছে না, আবার সেই অপেল দেখছে চোখে। যেদিকে তাকায় সেদিকে। একবার জ্বলছে আবার নিবে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। নিজের ভ্রান্তিতে নিশ্চুপ হয়ে থাকে কৃষ্ণকিশোর। মাধবীর স্তবক? অপেল? খদ্যোৎ—জোনাকি, জ্বলছে আর সঙ্গে সঙ্গে নিবে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে। আকাশের সোনালী তারা নেমে এসেছে এত কাছাকাছি! উড়ে বেড়াচ্ছে মর্ত্যের অন্ধকারে?

গাড়ীর কোচবক্সের দু'পাশে পেতলের লণ্ঠন। অন্ধকারের দিক্-নিশানা! দু'টো জ্বলন্ত চোখের মত দপ-দপ করছিল অদূরে। রিপন স্ট্রীটের জনহীন আঁকা-বাঁকা পথ—দু'পাশে গাছের সারি—সর্পিল গতিতে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারের গহ্বরে। কাদের বাড়ীতে পোষা কুকুর একটা ডাকছিল সরবে। জাতের কুকুর—ডাক শুনেই মালুম পাওয়া যায়। ডাকে তার প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। তার ডাকের সাড়া দিচ্ছে যেন আরেক সে।

—ভেতরে যে এত ব্যাপার তা তো অনুমান করি নাই! স্বগত করলো অনন্তরাম। গাড়ীর দরজা খুলতে-খুলতে।

জুড়ীর একটা ঘোড়া খটাখট্ পা ঠুকলো রাস্তায়।

গাড়ীর ভেতরে আসন নিয়ে সে বললে,—কি আবার ব্যাপার দেখলে?

গাড়ীর দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিয়ে অনন্তরাম বলে, ব্যাপার গুরুতর। ভেতরে যে ছিল একটি, তা তো অনুমান করি নাই। পাখী উড়ে গেল তো?

বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো যেন তার। অনন্তরামের শেষ কথাটা শুনে। পাখী? কার পাখী, কে পুষলো! কি পাখী যে ধরা দিলো আর সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেল আকাশে। কৃষ্ণকিশোর জিজ্ঞেস করে,—ভেতরে আবার কি ছিল?

অনন্তরাম গাড়ীর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে দেখা যায় না। অনন্তরাম হাসে। কাকেও হাতে হাতে ধরে ফেলার নীরব হাসি। বলে,—ভেতরে একটি মেয়ে ছিল। আমাকে লুকিয়ে এই সব হচ্ছে! আমি ভাবতাম যে, ঐ ফিরিঙ্গী ছোঁড়াটাই বুঝি। তা এখন দেখে-শুনে যা বুঝলাম হাতে তোমার—

—চল' চল'। অনন্তরামের কথার মাঝেই সে কথা ধরলো। চল, অনেক রাত হয়েছে। বাড়ীতে গিয়ে কথা হবে।

—তাতে তোমার দুঃখের যথেষ্ট কারণ রয়েছে! তবুও কথা বললে অনন্তরাম। বললে,—তা আমাকে একবার বল' নাই তো? আহা, দেখতে পেলাম না মেয়েটিকে!

ভিখারীর দুঃখই গুপ্তধন। ছিন্ন কাঁথায় তার লাখ বেলাখের স্বপ্ন। নিঃস্ব তো নির্ভয়। হারানো অতীতের দুঃখেই সে মুহ্যমান। রাজা-উজীরের দুঃখ? নিশানা না দেখিয়ে হঠাৎ যাদের দুঃখ দেখা দেয়। সেই অজানা অনুভূতি যখন এক তৃপ্ত হৃদয়কে আঘাত করে তখন। শতেক দিনের ব্যথায় কাতর যে, তার দুঃখ কি? এক দিনের হঠাৎ শোকেই জর্জরিত হয় বিত্তবান। সেই এক দিনের কষ্ট ভোগ ক'রে সারা জীবন-ভোর।

অন্ধকারে নিজেকে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। গাড়ীটা একবার মচমচিয়ে দুলে উঠতেই সে বুঝলো যে, অনন্তরাম উঠে পড়েছে কোচবক্সে। জুড়ীর একটা ঘোড়া বার-কয়েক নাকে-মুখে চিঁহি-চিঁহি করতেই গাড়ী চলতে শুরু করলো পাথরের রাস্তায় খটাখট শব্দ তুলে। রিপন স্ট্রীটের বুকের উপর দিয়ে চললো জুড়ী। ঘণ্টা বাজিয়ে।

গাড়ীর ভেতরে সে একা। খবর পেয়েই দেখতে না আসার নিজের কাছে সে কেমন যেন লজ্জিত। নিজের বিবেকের কাছে! নষ্মাণ অরুণেন্দ্রর মুখের কথা বিশ্বাস না ক'রে যে অন্যায় মনে মনে সে করলো, তার দুঃখ প্রকাশের কোন পথ নেই। গাড়ীতে সে একা। ছুটন্ত গাড়ী। ঠিক এই মুহূর্তের জন্যই সে যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষায় ছিল। কৃষ্ণকিশোর চাইছিল একটু ফাঁকা জায়গা—যেখানে সে খানিক একা থাকতে পারে। আর কেউ থাকবে না, শুধু সে একা থাকবে। একা-একা ব'সে ভাববে ঐ পালিয়ে যাওয়া পাখীকে। কিন্তু পাখী কি ঐ একটি। আরও কত পাখী আছে তো। কত রকমের, কত দেশ-বিদেশের। এত থাকতেও ঐ উড়ে-যাওয়া পাখীর কথাই বারে-বারে ভেসে ওঠে তার কানে। লিলিয়ানের মিষ্টি-মিষ্টি কথা।

গাড়ী ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লো আচমকা, কোচম্যান রাশ টেনে ধ'রেছে তাই রক্ষে। নয় তো একটা মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যেতো এখনই ঘোড়ার পায়ের তলায়। অন্ধকারে ঘণ্টা বাজানো সত্ত্বেও সরে যেতে পারেনি। গাড়ীর একেবারে মুখোমুখি হ'তে তবে ভয়ে সরে গেছে। কোচম্যান আর অনন্তরাম চীৎকার ক'রে উঠেছে। গাড়ী হঠাৎ থামতেই কৃষ্ণকিশোরের চিন্তায় ছেদ পড়লো যেন। জিজ্ঞেস করলো,—কি হ'ল অনন্তদা! গাড়ী থামালো কেন?

এক সাহেব—মাতাল। এই পাড়ার কাছাকাছি কোথায় থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় মদ খেয়ে আর ঘরে ব'সে থাকতে পারে না। লোক হাসাতে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। কোন দিন হাসে, কোন দিন গান গায়, আবার কোন দিন বা মনের দুঃখে কাঁদে রাস্তায় ভিড় জমিয়ে। ইংরেজী ভুলে গিয়ে বাঙলা বলতে শুরু করে। ভাঙা-বাঙলা। কে না কি তাকে মদ খেতে নিষেধ ক'রেছে এবং প্রবোধের সুরে বলেছে, যে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। তাতেই সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের সঙ্গে ঘুষি পাকিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছে। গাড়ীর ঘণ্টা শুনতে পায়নি। আর কোচম্যানও তাকে দেখতে পায়নি অন্ধকারে—তবুও বাঁচিয়েছে একেবারে কাছাকাছি এসে। সাহেবের নেশা ছুটে গেছে জুড়ী ঘোড়াকে দেখে। রাস্তা থেকে পাশে সরে গেছে তৎক্ষণাৎ এক লাফে। সরে গিয়ে বলেছে—Oh, Dog!

Dog নয়। সাহেব নেশার ঘোরে কথাটাকে উলটে নিয়েছে নিজের মনের মত। 'Oh, God!' বলতে গিয়ে বলেছে ঐ কথাটা। গাড়ী তাকে বাঁচিয়ে আবার ছুটতে শুরু করে। চৌরঙ্গীতে এসে আলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দোকানে আর লোকের বাড়ীতে আলো জ্বলছে। মানুষের ভিড় জমেছে এখানে সেখানে। জাত-সাহেবেরা সব বিবিদের হাত ধ'রে বেরিয়ে প'ড়েছে সান্ধ্য-ভ্রমণে। সরকারী পুলিশ আর সিপাইরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে যে যার জায়গায়। কর্জন পার্কে ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা শুরু ক'রেছে। ঘোড়ায়-টানা ট্রামগুলো মন্থর গতিতে মানুষ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎপুর আর হাওড়ার দিকের যত সব যাত্রী। কিন্তু এ সব দেখতে যেন ভাল লাগে না। শুধু ভাল লাগে ঐ উড়ে-যাওয়া পাখীটাকে ভাবতে। পাখীটার কথাই শুধু মনে পড়ে। কত শান্ত আর কত মিষ্টি ছিল তার প্রকৃতি—কত সরল আর কত নম্র।

চৌরঙ্গী পেরিয়ে কলুটোলার চৌমাথায় গাড়ী আসতেই আবার শোনা যায় মানুষের কলরোল। দেখা যায় জনতা। ফেজ আর তাজ্রোয়া। কলুটোলার মসজিদে তখন নমাজের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। যে যার ঘরে ফিরে চলেছে। পাঁঠা, রামছাগল, আর দুম্বাগুলো বেওয়ারিস মালের মত পথে-পথে ঘোরাফেরা করছে। মোরগ আর মুরগীর পাল সপরিবারে রাস্তার আবর্জনা খুঁটে খাচ্ছে তখনও। আস্তাকুড়ে কুকুরের দল পরস্পর কামড়া-কামড়ি করছে সরবে। একটা গাঁটকাটাকে ধ'রে জনা কয়েক মুসলমান বেদম প্রহার দিচ্ছে। জুতোর দোকানের আলোয় নাগরার জরি চিক্-চিক্ করছে, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। পেঁয়াজ আর রসুনের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী। গাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়ে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কোচম্যান্ আর সইসেরা দু'জনে মিলে তারস্বরে চীৎকার করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বলছে—এই সামনাওয়ালা ভাগো!

ভাল লাগছে না এই অবিরাম জনস্রোত। এই হৈ-চৈ আর হুলস্থূল। এই আলোর পথ আর এই পথিকদের। বাড়ী ফিরতে মন চাইছে—বাড়ীতে ফিরে কোথাও একটা নির্জন ঘরে গিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকতে। একা-একা, কেউ আর থাকবে না সেখানে। কিংবা নিজের শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়তে।

কলুটোলার বুকের ওপর বাবুদের সেই মার্কা-মারা জুড়ী দেখতে পেয়ে দোকান ছেড়ে কোন এক দোকানী সরাসরি নেমে এসেছে রাস্তায়। চলন্ত ঘোড়ার লাগাম ধ'রে থামিয়ে ফেলেছে গাড়ী। বাবুদের সেই পুরাতন ভৃত্য অনন্তরামকে দেখতে পেয়েছে সে। ঐ দোকানীর এক সাবেকী খদ্দের এই বাবুরা। বছরে প্রচুর টাকার মাল কিনতেন।

সুর্তি, জর্দা, হিং, জাফরাণ, গোলাপ-জল, কেওড়া, আতর আর ফুলেল তেল। কৃষ্ণচরণ আজীবন এই দোকান থেকে কিনেছেন। যখন যা দরকার হয়েছে কিনেছেন এই মিঞার কাছেই। মিঞা ঠকায়নি কখনও, আসল মাল সরবরাহ ক'রেছে। একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

গাড়ী থামতেই অনন্তরাম বললে,—কি মিঞা, তোমার যে আর পাত্তাই নেই! কেমন আছো কেমন?

মিঞা গাড়ীর দরজায় এসে কুর্নীশ করে। মেহি-মাখানো দাড়ীতে হাত বুলিয়ে বলে,—হুজুর, কিছু দিয়ে দিই গাড়ীতে?

কৃষ্ণকিশোর অনেক দিনের এক পরিচিত মুখ হঠাৎ দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়। কোথায় ছিল বুড়ো এত দিন! মিঞা সাহেব বেঁচে আছে এখনও? বললে,—কি মিঞা সাহেব?

মিঞা দাড়ীতে হাত বুলোয় আর, বলে,—গাড়ীতে হুজুর কিছু দিয়ে দিই? তার পর হুজুরের ওখানে যাবো এক দিন। মাল দেখে পরখ ক'রে দাম দিয়ে দেবেন। মাইজী ভাল আছেন তো?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হাঁ, ভাল আছেন। কিন্তু কি দেবে মিঞা?

কি আর দেবে, খসখস? গ্রীষ্ম দিনের সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি। যার গন্ধের আস্বাদ পেয়ে ঐ মেয়েটা পর্যন্ত আগ্রহে খোঁজ ক'রেছিল। কোন রকম লজ্জা না পেয়ে একান্ত নির্লজ্জের মত হাত পেতে চেয়ে নিয়েছিল সেই লাল রঙের রুমালখানা। সেই লিলিয়ান আজ ঠিক বেলা দুই ঘটিকায় ইহলোক ত্যাগ ক'রেছে, তা কি জানে না কি মিঞা!

মিঞা বলছে,—হুজুর, গুলাব দিই? গাজীপুরের গুলাব। কৃষ্ণকিশোর কি ভাবছিল। মিঞার কথা শুনে যেন ফিরে এলো এই পৃথিবীতে। বললে,—কি দেবে? গোলাপ?

মিঞা বললে,—যা বলবেন হুজুর। গঙ্গামের চম্পা, জৌনপুরের গন্ধরাজ? হাসনাহানা, লক্ষ্ণৌয়ের টাটকা হাসনাহানা ভি আছে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—হাসনাহানা?

মিঞা আবার বলে,—তেহেরাণের কস্তুরী? গাজিপুরের মতিয়া, বেলা, যুঁই ভি আছে। যা হুকুম করবেন।

—বেলা, যুঁই, মতিয়া? বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে না যে কোনটা। মিঞা যা বলছে তারই পুনরুক্তি করছে।

মিঞা থামে না, তার সওদার ফিরিস্তি শেষ করে। বলে,—মহীশূরের চন্দনা দিই হুজুর? দিল্ খুস্ হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই দাও! বললে সে বিহ্বলের মত। মিঞা বললে দিই, তাই সেও বললে,—হ্যাঁ, দাও। তাই দাও।

অনন্তরাম এক লাফে রাস্তায় নেমে পড়লো। বললে,—চল' মিঞা, কি দেবে আমার হাতে দিয়ে দেবে। এই গাড়ীর ভিড়ে তোমাকে আর আসতে হবে না।

মিঞা বললে আদাব জানিয়ে,—যাবো এক দিন হুজুর। বাড়ীতে। কথার শেষে নিজের দোকানের দিকে পেছন ফিরলো। অনন্তরাম মিঞার একটা হাত ধ'রে পেরিয়ে দিলো বাকী রাস্তাটুকু।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ফিরে এলো একটা শিশি হাতে নিয়ে। একটা ছোট শিশি দু' ভরি মাপের ওজনের শিশি। বললে,—মিঞা দিলে। এখন তা হলে বাড়ী ফেরা যাক্?

সে বললে,—হাঁ। গাড়ী তুমি থামালে কেন?

ওপরে উঠতে উঠতে অনন্তরাম বলে,—বুড়ো যে নাছোড়বান্দা। ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ফেললে।

গাড়ী আবার চলতে শুরু করে। কলুটোলার চৌমাথা ছাড়তেই ফাঁকা রাস্তা পাওয়া যায়। কোচম্যান নতুন উদ্যমে চাবুক ঘোরাতে শুরু করে। গাড়ী দৌড়য়।

আর বেশী দূরে নয়, আর নয় বেশীক্ষণ। তবুও যেন এই অলস মুহূর্ত্তগুলো কত অসহ্য। কত ধীরে ধীরে, কত দেরীতে এক-একটা মুহূর্ত্ত শেষ হচ্ছে। মহাকালের গতি কি থেমে যেতে চাইছে!

মুসলমান পাড়ার পর হিন্দু পাড়া। খুশীর উল্লাসে নাচছে। পার্ব্বণের দিনের অফুরন্ত আনন্দে। শিবরাত্রি, চড়ক, নীল-ষষ্ঠী আর গাজনের একত্র উৎসবে। চিৎপুরের রাস্তায় তবু খানিক বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পেঁয়াজ আর রসুন থেকে বেল ফুলের নির্য্যাস এলো কোথা থেকে। উড়ু-উড়ু বাতাসে যুঁই আর বেলের আমেজ। আর হাওয়ায়-হাওয়ায় নূপুর আর তবলার সুর। হারমোনিয়মের।

অনন্তরাম কোচম্যানকে চুপি-চুপি বললে,—চল, চল বেরিয়ে চল। এক ফোঁটা ছেলেটাকে এ পাড়ায় দেখলে আর রক্ষে থাকবে? দাদা-দেইজীরা রটিয়ে দেবে যে—

কিন্তু ঘোড়ার লাগাম যে আলগা হচ্ছে না। আলগা হ'লে দুর্ঘটনার ভয় নেই? মানুষগুলো যে ছিটকে পড়বে দু' পাশে। জুড়ীর খুর-বাঁধানো লাথি খেয়ে সামলাতে পারবে? তাই গাড়ীর বেগ ক'মে যায়। গাড়ীর দোতলায় ব'সে ব'সে অনন্তরাম দু'পাশের বারান্দায় চোখ বুলোয়। বিবিরা সব পালঙের হাত-পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে ইদিক সিদিক তাকাচ্ছেন বাঁকা চোখে। আপন আপন কাকাতুয়া, ময়না, লালমোহন আর টিয়াদের মুখে ছোলা ধরছেন কেউ কেউ। তারা, রাত হয়েছে তাই আর বোল্ বলছে না, শুধু ঠোঁট ফাঁক করে বিবিদের আঙুলে কামড় মারছে। ওদিকে রাত ক্রমশঃ ঘন হচ্ছে আকাশের বুকে।

ওরা আবার কারা?

দেখেই মেজাজটা যেন রুক্ষ হয়ে যায়। এক দল মানুষ, কাছারীর দালানে। কারা ওরা? হাঁ, মনে পড়ে যায়, চণ্ডীমহলের প্রজারা আজ ফিরে যাবে চণ্ডীমহলে। আজ রাতের ট্রেণে। গাড়ী এখনও ফেরেনি, মালিকের সঙ্গে দেখা না ক'রে তারা যেতে পারেনি। তাই অপেক্ষা করছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

ম্যানেজার বাবু এগিয়ে এলেন। বললেন,—এদের তো ট্রেণের টাইম হয়ে যাচ্ছে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তবে যেতে চায়।

চণ্ডীমহলের প্রজাদের মুখে কোন কথা নেই। তারা নির্ব্বাক্। ছেড়ে চলে যাওয়ার বিয়োগ-ব্যথায় তারা নীরব। বাসদেও মাহাতো একবার শুধু বললে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে,—হুজুর, কসুর মাফ করবেন।

তার পর অন্যান্য সকলের মাথা কাছারীর দালানে একবার নত হ'ল। তার পর যে যার বহনের জিনিষ হাতে নিয়ে একে-একে নামলো দালান থেকে প্রাঙ্গণে। বাসদেও মাহাতো বললে,—আসি হুজুর?

সে কিছু বলে না। চুপ-চাপ বসে থাকে। একটা বেতের কেদারায়। বিদায় কালে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাতে হয়, সেটুকুও আর মনে পড়ে না। ম্যানেজার বাবু এগিয়ে যান তাদের ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে। দু'টো পাল্কীতে উঠে তারা যাত্রা করে। পাল্কীদারেরা বাবুদের প্রজাদের কাছ থেকে দু'-চার মুদ্রা বক্শিশের লোভে দ্রুত ছুটতে শুরু করে রাস্তা কাঁপিয়ে।

সম্মুখে অনন্ত অন্ধকার রাত্রি। আর কেউ নেই সেখানে। কেবল দূরের এক দালানে বসে বসে এক বুড়ো পেশকার হিসাবের খাতার পাতা ওল্টাচ্ছে চোখে চশমা এঁটে। তার সামনে একটা লম্ফর শিখা পুড়ে যাচ্ছে দপদপিয়ে।

অনন্তরাম অন্দর থেকে ঘুরে এসে বলে,—মা যে ছেলের খোঁজ করছিলেন। মেলায় যাওয়া হয়েছিল কি না শুধোচ্ছিলেন।

—তুমি কি বললে? বললে সে চোখ দু'টোকে বন্ধ ক'রে। বেতের কেদারার মাথা এলিয়ে দিয়ে।

—বললাম যে, না, যান নাই। মিথ্যে কেন বলব? বলেছি যে এই একটু ফাঁকায় জুড়ি ছুটিয়ে এসেছি, যাই নাই কোথাও।

—মা কোথায় রয়েছেন? চোখ বন্ধ ক'রেই জিজ্ঞেস করলো সে। মাথা না তুলে।

অনন্তরাম বললে,—বৌমা এখন লক্ষ্মীর পাঁচালী শুনছেন। পাড়ার কে এক জন মেয়েছেলে প'ড়ে শোনাচ্ছে। নিজের ঘরে রয়েছেন।

কৃষ্ণকিশোর উঠে পড়লো কেদারা থেকে। চললো মায়ের কাছে। অনেকক্ষণ দেখতে পায়নি মাকে। এখন কেন যেন ঐ মায়ের কাছেই যেতে চায় সে। কেমন যেন আর ভাল লাগে না এই অন্ধকারের রুক্ষতা।

অনন্তরাম পেছন থেকে বললে,—জামা-কাপড় না ছেড়ে যেন মায়ের কাছে যেও না। তিনি শুনলে আমার আর বাঁচোয়া থাকবে না।

মৃতের ঘরে ঢুকেছিল তারা। লিলিয়ানের ঘরে। ছোঁয়াছুঁয়ি। শুদ্ধাচার। অস্পৃশ্যতা। অনন্তরামের কথাগুলোকে কানে নিয়ে সে অন্দরের দিকে চলে। যেতে যেতে এক-এক জায়গায় দেখে আবার সেই অসহ্য অন্ধকার। অন্ধকার, আর অন্ধকার!

[ক্রমশঃ।

জল-প্রপাত —বীরবরণ চট্টোপাধ্যায়

টানেল গর্ভ থেকে -তুষারেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

বিড়লা মন্দির —সুনীল জোয়ারদার

বানর-ভোজন ? —মানিক বসু

গ্রামীন্
-পরিমল গোস্বামী

চতুষ্কোণ ? —সুচারু ভট্টাচার্য

আমরা দু'টি ভাই —জীবনদাস

অস্তাচলে (বালি দ্বীপ) —জগদীশরঞ্জন দেব
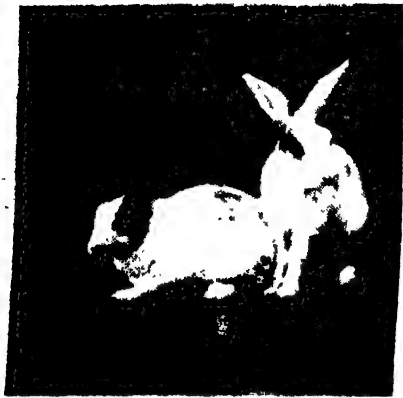
বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য

ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিয়াত্রীচে (Beatrice) বিয়াত্রীচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা! বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবন-কাব্যের নায়িকা! বিয়াত্রীচেকে বাদ দিয়া তাহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রীচেকে বাদ দিলে তাহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রীচের স্তোত্র। বিয়াত্রীচের প্রতি প্রেমই তাহার প্রথম কবিতার উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রথম গীতিকাব্য "ভিটা নুওভা"র (Vita Nuova) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিয়াত্রীচেরই আরাধনা। ইহার কিয়দ্দূর লিখিয়াই তাহার বিরক্তি বোধ হইল,—তাহার মনঃপূত হইল না, পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রীচেকে দূর-স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় বিচিত্র করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। এই কাব্যের শেষ ভাগে তিনি লিখিতেছেন—

"এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আমি এক অতিশয় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম—সেই স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহাতে এই স্থির করিলাম যে, আমি সেই প্রিয় দেবীর বিষয় যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহার যোগ্য নহে—যে পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কবিতা না লিখিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আর লিখিব না। ইহা নিশ্চয়ই যে, তিনি (বিয়াত্রীচে) জানিতেছেন, আমি তাহার বিষয়ে যোগ্যতর কবিতা লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমুদয় জীবের প্রাণদাতা ঈশ্বর-প্রসাদে আর কিছু দিন যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে তাহার বিষয়ে এমন লিখিব, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মহিলার সম্বন্ধে কেহ কখনও লেখে নাই।" এই স্থির করিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য "ডিভাইনা কামেডিয়া" (Divina Commedia) লিখেন ও বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে এমন কথা বলেন, যাহা কোন মহিলা সম্বন্ধে কেহ কখন বলে নাই।

দান্তে তাহার নয় বৎসর বয়স হইতেই বিয়াত্রীচেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান-প্রদান হয় নাই, নেত্রে-নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর-প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতি দূর সাক্ষাৎ—দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতি দূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রীচেকে দেখিতেন, অতি দূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন। যে সভায় বিয়াত্রীচে আছেন, সে সভায় গেলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তিনি কথা কহিতে পারিতেন না, তাঁহার শরীর কাঁপিতে থাকিত! বিয়াত্রীচেকে তিনি তাঁহার প্রেমের কাহিনী বলেন নাই, বলিতে সাহস করেন নাই, বা বলিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি আপনার প্রেমের স্বপ্নেই আপনি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার প্রেম জাগ্রত রাখিবার জন্য বিয়াত্রীচের প্রতিদান আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কাব্য পড়িলে বিয়াত্রীচেকে মানুষ পদবী হইতে উচ্চ-পদবী-গত মনে হয়, তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ ভিন্ন প্রেম প্রত্যাশা করিবার ইচ্ছা মনে এক মুহূর্ত্তও স্থান পায় না। যদিও "ভিটা ও নুওভা" কাব্যের নায়িকাই বিয়াত্রীচে, কিন্তু পাঠকেরা বিয়াত্রীচের মুখ হইতে একটি কথাও শুনিতে পান নাই। বিয়াত্রীচে সর্ব্বদাই তাহার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রীচেকে দান্তে এমন একটী মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চক্ষে এই অস্ফুট মূর্ত্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। দান্তে তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মনে করিতেন, "যে ব্যক্তিই বিয়াত্রীচের নিকট আসিত তাহারই হৃদয়ে এমন গভীর ভক্তির উদ্রেক হইত যে, তাহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাহার সাহস হইত না।" দান্তে বলেন, যখন মনুষ্যেরা তাঁহার দিকে চাহিত "তখনি তাহারা কেবল একটি মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিত।" দান্তে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত পৃথিবী বিয়াত্রীচের পূজা করিতেছে, দেবতারা তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। দান্তের ডিভাইনা কামেডিয়ার নরকের দ্বার-রক্ষকেরা বিয়াত্রীচের নাম শুনিয়াই অমনি সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিতেছে—দেবতারা বিয়াত্রীচের নাম শুনিয়া অমনি স্বর্গযাত্রীদ্বয়কে সহর্ষে আহ্বান করিতেছেন। বিয়াত্রীচের মৃত্যুর পর দান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিলেন, যেন সমস্ত নগরীই রোদন করিতেছেন। বিয়াত্রীচের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনাই ভিটা নওভার আরম্ভ—

"যখন আমার জীবনের আরম্ভ হইতে নয় বার মাত্র সূর্য্য তাহার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এমন সময়ে আমার হৃদয়ের মহতী মহিলা আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। * * তখন তাঁহার জীবনের আরম্ভ মাত্র এবং আমার বয়স নবম বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার শরীরে সুন্দর লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ, একটি কটিবন্ধ ও বাল্য বয়সের উপযুক্ত কতকগুলি অলঙ্কার। সত্য বলিতেছি, তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত নিলয়স্থিত মর্ম্ম পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার প্রভাব আমার শরীরের শিরায়-শিরায় প্রকাশিত হইল। সে (মর্ম্ম) কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ কথাগুলি বলিল, ঐ দেখ, আমা অপেক্ষা সবলতর দেবতা আমার উপর আধিপত্য করিতে আসিয়াছেন, * * সেই সময় হইতে প্রেম আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিপতি হইল। দেবতাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবতাটিকে (বিয়াত্রীচেকে) দেখিবার জন্য প্রেমের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাল্যকালে কত বার তাহার অন্বেষণে ফিরিয়াছি। সে এমন প্রশংসনীয়, তাহার ব্যবহার এমন মহৎ যে, কবি হোমারের উক্তি তাহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে অর্থাৎ "তাহাকে দেখিলে মনে হয় যে দেবতাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, মানুষের মধ্যে নহে।" বিয়াত্রীচের পিতা একটি ভোজ দেন, সেই ভোজে দান্তের পিতা তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যান, সেই সভাতেই দান্তের সহিত বিয়াত্রীচের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এইরূপে বর্ণিত হয়। "উপরি-উক্ত মহান্ মহিলার সহিত সাক্ষাতের পর নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে নিষ্কলঙ্ক-শুভ্রবসনা সখীদ্বয়-পরিবেষ্টিতা সেই বিস্ময়জনক মহিলা আর একবার আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাহার সেই অনির্ব্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্ত্তেই সৌন্দর্য্যের

সর্ব্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম। * * এইবার প্রথম তাঁহার কথা শুনিতে পাইলাম, শুনিয়া এমন আহ্লাদ হইল যে সুরামত্তের ন্যায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আমার নির্জ্জন গৃহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্র-মহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল ও এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম; সেই স্বপ্নের বিষয় সেই সময়কার প্রধান প্রধান কবিদের জানাইব স্থির করিলাম। যাঁহারা যাঁহারা প্রেমের অধীন আছেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়া ও তাঁহাদের সেই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া এই স্বপ্নের বিষয়ে একটি কবিতা লিখিব স্থির করিলাম। সেই কবিতাটি (Sonnet) এই—

প্রেম বন্দী-হৃদি যারা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সঙ্গীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন মোরে অর্থ কি ইহার
যে কালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ
নিশার চতুর্থ-ভাগ হোয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হোলেন প্রকাশ
স্মরিলে এখনও কাঁপে হৃদয়-প্রদেশ
দেখে মনে হোল যেন প্রফুল্ল আনন
মোর হৃৎপিণ্ড রহে করতলে তাঁর,
বাহু পরে শান্ত ভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত হৃদি করিলা আহার!
তার পর চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষন্ন আকার!

এই স্বপ্নের পর হইতে সেই অতি শ্রীমতী মহিলার চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার স্বাস্থ্য এমন নষ্ট হইয়া আসিল যে, আমার আকার দেখিয়া বন্ধুরা অতিশয় চিন্তিত হইলেন; আবার যে গূঢ় কথা সকল কথা অপেক্ষা আমি লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কেহ কেহ অসদভিপ্রায়ে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যুক্তি ও প্রেমের পরামর্শে উত্তর দিলাম যে, প্রেমের দ্বারাই আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার আকারে প্রেমের চিহ্ন এমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল যে, সে গোপন করা বৃথা। কিন্তু যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"কাহার প্রেমে বিচলিত হইয়াছ?" আমি তাহাদের দিকে চাহিলাম, হাসিলাম, আর উত্তর দিলাম না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিয়াত্রীচে দান্তেকে অভিবাদন করিলে দান্তে কি আনন্দ অনুভব করিতেন! কিন্তু একবার দান্তের নামে এক অতি মিথ্যা নিন্দা উঠে, সেই নিন্দা, "সেই অতি কোমলা, পাপের বিনাশয়িত্রী, পুণ্যের রাজ্ঞী স্বরূপার" কানে গেল। দান্তে কহিতেছেন, "এবার যখন তিনি আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন, তখন আমার সুখের এক মাত্র কারণ সেই সুন্দর নমস্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। যেখানে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তাঁহার সেই অমূল্য নমস্কারের আশায় আমি পৃথিবীর শত্রুতা ভুলিয়াছি, আমার হৃদয়ে এমন একটি উদারতা জন্মিত যে, পৃথিবীতে যে আমার যাহা কিছু দোষ করিয়াছে সমুদয় মার্জ্জনা করিতাম।" এ নমস্কার হইতে, তাঁহার সেই প্রেমের এক মাত্র পুরস্কার হইতে যখন তিনি বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইলেন, জনকোলাহল ভেদ করিয়া যেখানে একটি নির্জ্জন স্থান পাইলেন সেইখানেই তীব্রতম অশ্রুজলে রোদন করিতে লাগিলেন! এইরূপে প্রথম উচ্ছ্বাস-বেগ নিবৃত্ত হইলে তাঁহার নির্জ্জন গৃহে গিয়া "কাতর শিশুর" ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একবার কোন বন্ধুর বিবাহ-সভায় তিনি আহূত হন। তাঁহার বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নববধূর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি দেখিলেন তাঁহার অতি নিকটেই বিয়াত্রীচে। তিনি এমন এক প্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে মহিলারা তাঁহার আকার দেখিয়া বিয়াত্রীচের সহিত চুপে-চুপে কথা কহিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজ গৃহে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"যদি এই মহিলা বিয়াত্রীচে আমার অবস্থা জানিতেন, তবে আমার আকার দেখিয়া কখনো তিনি এরূপ উপহাস করিতেন না, বরং তাহার দয়া হইত!"

দান্তে তাঁহার সেই অভিলষিত নমস্কার আর এ পর্য্যন্ত পান নাই। একবার কতকগুলি মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহাকে তুমি ভালবাস, তাঁহার দর্শন মাত্রই তুমি যদি এমন অভিভূত হইয়া পড়, তবে তোমার ভালবাসিবার ফল কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "তাঁহার একটি নমস্কার পাওয়াই এ পর্য্যন্ত আমার ভালবাসিবার একমাত্র লক্ষ্য ও ফল ছিল, তাঁহার নমস্কার আমার ইচ্ছার একমাত্র গম্যস্থান ছিল—কিন্তু তিনি যখন তাহা না দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তখন তাহাই হউক—প্রেম, আমাকে এমন আর একটি সুখে নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা কোন কালেই শেষ হইবে না।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কোন্ সুখ? দান্তে কহিলেন, "আমার মহিলার প্রশংসা-গান।" তাঁহার মহিলার প্রশংসা-গান নিম্নে অনুবাদিত হইল—

রমণি! তোমরা বুঝ প্রেমের ব্যাপার—
মহিলার কথা মোর করহ শ্রবণ—
বোলে ফুরায় না কভু প্রশংসা তাহার—
মন খুলে বোলে তবু জুড়াইবে মন!
পৃথিবীতে যত কিছু আছে গো মহান্—
তাহা হোতে মহত্তর চরিত্র তাঁহার
হেন দীপিয়াছে প্রেমে এ মোর পরাণ,
চির-বল অর্পিয়াছে বচনে আমার!
সাধ যায় করি তাঁর হেন যশো-গান
সমস্ত পুরুষে তার পদতলে আনি—
কিন্তু থাক্ গাব না কো সে সমুচ্চ তান
গাহিতে ক্ষমতা যদি না থাকে কি জানি
আমার এ ভালবাসা অতি সুকোমল,
গাব তাই অতিশয় সুকোমল তানে—
সুকোমল হৃদি ওগো মহিলা সকল!
যে গান লাগিবে ভাল তোমাদের কানে!

স্বর্গের দেবতা এক কহিলা ঈশ্বরে—
"দেখ প্রভু, দেখ চেয়ে এই পৃথ্বীতলে—
মানব হইতে এক হেন জ্যোতি ক্ষরে
নিম্ন দেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজলে !
স্বর্গের অভাব প্রভু নাই কিছু আর
শুধু ওই জ্যোতি, ওই বিমল কিরণ !
তাই দেব অনুনয় শুন গো আমার,
দেবতার মাঝে তারে কর আনয়ন ।"
আমাদের প্রতি দয়া হইল বিধির—
কহিলেন, "ধৈর্য্য ধর, আসুক সময়—
পৃথিবীতে এক জন আছে গো অধীর
কখন হারায় তারে সদা তার ভয় ।"

*　　*　　*

প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ

*　　*　　*

ঈশ্বর নূতন সৃষ্টি করিলা সৃজন !
মুকুতার মত পাণ্ডু বর্ণ তাহার
প্রকৃতির পূর্ণতম শিল্প সেই জন
কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার ।
সুন্দর নয়নে তার সদাই জাগ্রত
এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জ্বল
যে জ্যোতি দর্শক আঁখি করায় মুদিত
সে জ্যোতি ঢালয়ে হৃদে আলোক বিমল !
হাসিতে চিত্রিত যেন প্রেমের আকার—
এক দৃষ্টে কে তাকাবে সে হাসি তাহার ?
তোমারে কহি, হে গান, সন্তান প্রেমের,
তুমি যে যাইবে বহু মহিলার কাছে,
বিলম্ব করো না কভু, বল তাঁহাদের—
দেবীগণ, মোর শুধু এক কাজ আছে
তাঁহার চরণে যাওয়া, যাঁর মহা যশে
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিয়াছে ।"
যদি বা বিলম্ব তব হয় দৈববশে
দেখো যেন রহিও না তাহাদের কাছে—
অসাধু যাদের জানো, মন ভাল নয়—
কেবল রমণী আর প্রেমিকের কানে
খুলিও হে গীত তুমি তোমার হৃদয় !
মহিলা আমার বসি আছেন যেখানে
সেখানে তোমারে তারা যাবেন লইয়া
তাঁরে মোর কথা তুমি দিও বুঝাইয়া !

একবার দান্তে অত্যন্ত পীড়িত হন, পীড়ার সময় সহসা কেমন তাঁহার মনে হইল, বিয়াত্রীচের মৃত্যু হইবে ! কল্পনা তাঁহাকে পাগলের মত করিয়া তুলিল, কল্পনায় তিনি দেখিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে কহিতেছে, "তোমার মৃত্যু হইবে," কেহ বা কহিতেছে, "তুমি মরিয়াছ ।" তিনি দেখিলেন যেন সূর্য্য অন্ধকার, তারকারা রোদন করিতেছে, ভয়ানক ভূমিকম্প হইতেছে, তাঁহার চারি দিকে পাখীরা মরিতেছে ও পড়িতেছে—এই বিপ্লবের মধ্যে কে যেন তাঁহাকে কহিল, "জান না তোমার অনুপম মহিলা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন ?" তিনি যেন বিয়াত্রীচের মৃত্যুকালীন প্রশান্ত মুখ দেখিতে পাইলেন । সেই অজ্ঞান অবস্থায় এমন কাতর স্বরে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন যে, শয্যাপার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারিণী রমণী ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন । অবশেষে জাগ্রত হইয়া ইহা স্বপ্ন জানিতে পারিয়া সুস্থির হইলেন !

এক দিন তিনি মনে করিলেন, এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মহিলার বিষয় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সমুদয় অপূর্ণ হইয়াছে । ক্ষুদ্র গীতির মধ্যে ভাব প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি একটি বৃহৎ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

কত কাল আছি আমি প্রেমের শাসনে,
এখন গিয়াছে সোয়ে অধীনতা তাঁর,
প্রথমে যা দুখ বলে করেছিনু মনে
এখন তা ধরিয়াছে সুখের আকার !
যদিও গো বলহীন হয়েছে পরাণ,
গেছে চলি তেজ যাহা ছিল এই চিতে,
তবু হেন সুখ প্রেম করেন গো দান
মৃত্যুমূল্য দিয়ে চাই সে সুখ কিনিতে !
প্রেমের প্রসাদে মোর হেন শক্তি আছে,
প্রত্যেক নিশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার—
অনুগ্রহ ভিক্ষা চায় মহিলার কাছে
অতি দীন ভাবে অতি নম্র ভাবে আর !
তাঁরে দেখিলেই আসে সে ভাব আমার ।

এই কয় ছত্র লিখিয়াই সহসা গান থামিয়া গেল—সহসা ইহার নিম্নে লাটিন ভাষায় এই কথাগুলি লিখিত হইল—"যে নগরী লোকে পূর্ণ ছিল সে আজ কি নির্জ্জন হইয়াছে ! সমস্ত জাতির মধ্যে যে জাতি মহত্তর ছিল সে জাতি আজ কি বিধবার আকার ধারণ করিয়াছে ! বিয়াত্রীচের মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়াই সহসা যেন তাঁহার সঙ্গীত থামিয়া গেল । এমন একটি মহান্ ঘটনা শুনিলেন যেন তাহা আর ললিত ভাষায় লিখা যায় না, গ্রাম্য ভাষায় লিখিলে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে । এই নিদারুণ দুঃখে তাহার আর কি সান্ত্বনা হইতে পারে ? তিনি বিয়াত্রীচের মৃত্যু ও জন্মতিথি মিলাইয়া তখনকার জ্যোতিষ গণনার অনুসারে স্থির করিলেন—বিয়াত্রীচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় ত্রিমূর্ত্তির (Holy Trinity) কোন না কোন যোগ আছে ।—এই কল্পনাতেই তাঁহার কত সুখ হইল ! তিনি নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে পত্র লিখিলেন, তাহাতে বিয়াত্রীচের মৃত্যুতে নগরের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন—তাহার বিশ্বাস হইল, যেন বিয়াত্রীচের মৃত্যুতে সমস্ত নগরী অভাব অনুভব করিতেছে, অথবা যদি না করে, তবে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের যে অভাব হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের চেতনা জন্মাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ।

ক্রমে ক্রমে দুঃখের অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইতে লাগিল—যখন অশ্রুজল শুকাইয়া গেল তখন স্থির করিলেন অশ্রুময় অক্ষরে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন । এই ভাবিয়া, যাহারা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিবে, তাঁহার দুঃখে যাহারা সহজে মমতা করিতে পারিবে, সেই রমণীদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

এ নয়ন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণায়,
জীর্ণ হোয়ে পড়িয়াছে গেছে শুকাইয়া,—
নিবাতে এ জ্বালা যদি থাকে গো উপায়
(যেন জ্বালা অতি ধীরে যেতেছে লইয়া
ক্রমশঃ এ দেহ মোর কবরের পানে),
তবে তাহা মৃত্যু কিম্বা প্রকাশি এ ব্যথা
যখন মহিলা মোর আছিলা এখানে
আর কারে বলি নাই এ মর্ম্মের কথা,
হে রমণি ! তোমাদের কোমল হৃদয়ে
মরমের কথা মোর ঢেলেছি কেবল
যখন গেছেন তিনি স্বরগ আলয়ে—
রাখিয়া আমার তরে শোক-অশ্রুজল
তখন যা' কিছু মোর বলিবার আছে
হে রমণি ! বলিব গো তোমাদেরি কাছে ।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন—বিয়াত্রীচে উচ্চতম স্বর্গে গিয়াছেন, সেখানে যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি ডাকিয়া লইলেন—ঈশ্বর দেখিলেন—এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী এমন সুন্দর প্রাণীর বাসযোগ্য নহে। সঙ্গীতটি এই বলিয়া সমাপ্ত করিলেন—

যাও তুমি, হে করুণ সঙ্গীত আমার,
যাও সেথা যেইখানে রমণীরা আছে,
আগে যেতে সেথা বহি সুখভার,
কত সুখ পেতে, বহি তাহাদের কাছে !
এখনো তাদেরি কাছে কর গো প্রয়াণ,
বিষণ্ণ ও শূন্য তুমি শোকের সন্তান !

এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেলে পর একবার একটি স্থান দেখিয়া সহসা তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি অতি বিষণ্ণ বদনে পুরাতন কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিষাদ আর কেহ দেখিতে পাইতেছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য চারি দিকে নেত্রপাত করিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন—একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাকে এমন মমতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, দয়া যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে ! এই মমতা পাইয়া দান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই মমতা পাইয়া কেবল কৃতজ্ঞতা নহে, ঈষৎ প্রেমের ছায়াও তাঁহার তরুণ হৃদয়ে পতিত হইল ! সেদিন চলিয়া গেলেন—কিন্তু আবার তাঁহাকে দেখিতে কেমন বাসনা হইল, আর এক দিন সেইখানে গেলেন—আবার তাহাকে দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন তাঁহার বিয়াত্রীচের ন্যায় তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। পাণ্ডুবর্ণকে দান্তে "প্রেমের বর্ণ" নাম দিয়াছেন। দান্তে কহিলেন, "আমার চক্ষু তাহাকে দেখিলে কেমন আনন্দ অনুভব করে।" পরক্ষণেই আবার চক্ষুকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "চক্ষু ! তোর অশ্রুজল দেখিয়া কত লোকে অশ্রু ফেলিয়াছে, তুই আজ কি ভুলিয়া গেলি যে, যে মহিলার (বিয়াত্রীচের) জন্য তুই রোদন করিতেছিস্ সেই মহিলার কথা স্মরণ করিয়াই ঐ রমণী তোর দিকে চাহিতেছেন ?" কিন্তু ঐ তিরস্কার বৃথা ! আপনাকে ভর্ৎসনা করিলেন কিন্তু শোধন করিতে পারিলেন না। যেদিকে মন ধাবিত হয় তাহার অনুকূলে কখনো যুক্তির অভাব হয় না।—অবশেষে স্থির করিলেন, প্রেম তাঁহাকে শান্তি দিবার জন্যই ঐ মহিলাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন—অতএব তাঁহার হৃদয়ের অভাব এই মমতাময়ী মহিলাই পূর্ণ করিবেন। এইরূপে নূতন প্রেম যখন তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে কল্পনার স্বপ্নে এক দিন যেন প্রত্যক্ষ সেই লোহিতবসনা বিয়াত্রীচেকে দেখিতে পাইলেন—ভস্মাচ্ছন্ন পুরাতন প্রেমের বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল ও নূতন প্রেম অঙ্কুরেই শুকাইল !

ভিটা নুওভা কাব্যে বিদেশীয় পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গীতিটি লিখিত আছে—

ধীরে যাইতেছে চলি, ওগো যাত্রী দল
যেন কোন্ দূর বস্তু করি কল্পনা,
মোদের দহিছে যে বিষাদ-অনল
তোমাদের পরশেনি যেন সে যাতনা !
তোমাদের নিজ দেশ এতই কি দূরে ?
এ শোকার্ত্ত নগরীর যাও মধ্য দিয়া
বোধ হয় তবু যেন জান না, এ পুরে
কি মহান্ শোকানল দহিতেছে হিয়া !
তবু যদি একবার দাঁড়াও তেথায়,
কিছুক্ষণ মোর কথা শোন মন দিয়া—
তা হলে বিদায় কালে বিষণ্ণ ব্যথায়
যাবে চলি উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
তিল মাত্র যার কথা করিলে বর্ণন,
তিল মাত্র যার কথা করিলে শ্রবণ
মানুষ কাঁদিতে থাকে ব্যথিত অন্তর,
সেই বিয়াত্রীচে হারা অভাগা নগর !

"ভিটা নুওভা" কাব্যে ইহার পরে আর একটি মাত্র গীত আছে। তাহাতে কবি কহিতেছেন, তাঁহার মন স্বর্গে গিয়াছিল, সেখানে দেখিলেন বিয়াত্রীচেকে দেবতারা পূজা করিতেছেন। সে বিয়াত্রীচেকে দেখিয়া কবি এমন বিস্মিত হইয়া গেলেন যে, ভাবিলেন তাহাকে বর্ণনা করিতে এমন গভীর কথার প্রয়োজন হয় যে, সে কথার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পরেই বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কবিতা লিখিবেন স্থির করিয়া ভিটা নুওভা কাব্য শেষ করিলেন !

বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কাব্য "ডিভাইনা" (Divina Commedia) "ভিটা নুওভা" লেখা শেষ হইলে তাহার অনেক দিন পরে তাহা লিখিত হয়। এই কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে দান্তের কবিতার বহির্ভূত জীবনের বিষয়ে দুই-এক কথা বলিয়া লই।

দান্তের প্রকৃত নাম দুরান্তে আলিঘিয়ারি (Durante Alighieri)। তাঁহার সময়ে দুই দল ছিল। গুয়েলফ ও ঘিবেলীন (Guelf and Ghibelline) শ্বেত ও কৃষ্ণ অর্থাৎ কুলীন ও সাধারণ অধিবাসী, ইহাদের উভয় দলের মধ্যে প্রায়ই বিপ্লব চলিত, এক দল ক্ষমতাশালী হইলে অপর দল নিপীড়িত হইত। দান্তে Guelf অর্থাৎ কুলীন দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গুয়েলফ দলই ক্ষমতাশালী ছিল। ভিটা নুওভা কাব্যে দান্তের প্রেমের

কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোন বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন—মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমস্ত জগতের সমষ্টি বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছুই নাই কেবল বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই—কেবল বিয়াত্রীচের আরাধনা! যখন তিনি বিয়াত্রীচের প্রতি-হাস্তে প্রতি-উপেক্ষায় শিশুর ন্যায় রোদন করিতেছিলেন, প্রতি ক্ষুদ্র নমস্কারে দারিদ্রের রত্ন পাইতেছিলেন, তখন তিনি রাজ্য-শাসন সম্বন্ধেও দারুণ লিপ্ত ছিলেন। ক্যাম্প্যালডিনো (Campaldino) সমরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্যাপ্রোনার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুয়েল্‌ফ দলের মধ্যে যখন আত্মবিবাদ উপস্থিত হয় তখন তিনি বিশেষ উদ্যমের সহিত তাহাদের মধ্যে এক দলের সহায়তা করিতেছিলেন। বিয়াত্রীচের মৃত্যুর পর শাসনকার্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। রাজকার্য্যে নগরীর মধ্যে তিনি এক জন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যের প্রধান শাসক দলভুক্ত হইলেন। কিন্তু এই পদে তিনি দুই মাস কাল মাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল যে শীঘ্রই তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্‌স্ নগরী হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইতে হইল। এই নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল—তখন ফ্লোরেন্‌স্-বাসীরা তাঁহাকে অনুতপ্ত বেশে দোষ স্বীকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চিরজন্ম নির্ব্বাসনের পরপ্রত্যাশী হইয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে যখন বিয়াত্রীচেকে লইয়া হৃদয়ে তাঁহার ঝটিকা চলিতেছিল, তখন বাহিরের রাজ-বিপ্লব-ঝটিকায় তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে। অনেক দিন রাজ্য সম্বন্ধে মগ্ন থাকিয়া বিয়াত্রীচের উদ্দেশে যোগ্যতর কবিতা লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন বিশেষ সময়ে সহসা তাঁহার খ্যাতি-মান-যশের দুরাশা ছুটিয়া গেল ও মহাকাব্য এইরূপে আরম্ভ করিলেন—

> জীবনের মধ্যপথে দেখিনু সহসা
> ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
> সে যে কি ভীষণ অতি দারুণ গহন
> স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত!
> সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক!

জীবনের মধ্যপথে অর্থাৎ যখন তিনি তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছেন—তিনি এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ভীষণ অরণ্য আর কিছুই নহে—সে তাঁহার রাজ-শাসন-কার্য্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তির নিমিত্ত সংগ্রাম। অন্ধ অজ্ঞানের মত হইয়া যখন তিনি এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে একটি চিতাবাঘ দেখিতে পাইলেন—এবং এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে একটি সিংহ ও ক্ষুধাতুরা হইয়া এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী দেখিতে পাইলেন। এ সমস্তই রূপক মাত্র, চিতাব্যাঘ্র সুখ-তৃষা, সিংহ দুরাশা ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী লোভ। এইরূপে এই সকল রিপুদিগের দ্বারা ভীত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন,—

> হেন কালে সহসা দেখিনু এক জন
> বহু দিন মৌন রহি ক্ষীণ স্বর তাঁর—

> "জীবিত বা মৃত আত্মা যে হও না কেন
> দয়া কর মোরে" আমি উচ্চে কহিনু
> সে অরণ্য-মাঝে যবে হেরিনু তাঁহারে।

ইনি আর কেহ নহেন—কবি বর্জ্জিলের প্রেতাত্মা। তিনি দান্তেকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন করাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দান্তে ভয় প্রকাশ করিলেন—

> মহাছায়া কহিলেন, "মিথ্যা আশঙ্কায়
> হৃদয় হোয়েছে তব বৃথা অভিভূত
> পশু যথা ভয় পায় সন্ধ্যার আঁধারে
> হেরিয়া অলীক ছায়া,—তেমনি মানুষ
> মহান্ সঙ্কল্প হোতে হয়গো বিরত
> বৃথা ভয়ে। এ আশঙ্কা করিবারে দূর—
> কহি তোরে কোথা হতে এলেম হেথায়—
> প্রথমে কাহার কথা করিনু শ্রবণ
> তোরে দয়া হোল মোর, কহি তোরে তাহা!
> পরলোকে থাকে যারা সংশয় আঁধারে—
> তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিনু।
> একদা রমণী এক আহ্বানিলা মোরে
> হেন পুণ্যময় মূর্ত্তি এমন সুন্দরী
> দেখেই অমনি তাঁর মাগিনু আদেশ—
> অতিশয় মৃদু আর অতি সুকোমল
> দেবতার স্বরে স্বর বাঁধি, কহিলেন—
> "অয়ি উপছায়া! তুমি যাহার সুযশ
> যেদিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাঁচিয়া—
> এই অনুনয় মোর করহ শ্রবণ!—
> বন্ধু এক মোর, (নহে বন্ধু সম্পদের)
> মহারণ্যে নিদারুণ বাধা-বিঘ্ন পেয়ে
> ভয়ে অভিভূত হোয়ে পড়েছেন তিনি।
> ভয় করি পাছে হন হেন পথহারা
> আর তাঁরে একেবারে ফিরাতে না পারি!
> উদ্দীপনা-বাক্যে তব, যে কোন উপায়ে,
> ফিরাইয়া আন, তবে লভিব বিরাম!
> আসিয়াছি স্বর্গ হোতে বিয়াত্রীচে আমি
> প্রেম উত্তেজনে আমি কৈনু অনুরোধ!

বর্জ্জিল সেই বিয়াত্রীচের অনুরোধেই দান্তেকে ভ্রষ্ট-পথ হইতে ফিরাইতে আসিয়াছেন। দান্তে বর্জ্জিলের সহিত নরক দর্শন করিতে যাইতে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। তৃতীয় সর্গে দান্তে নরকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে—

> মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে
> মোর মধ্য দিয়া যাও চিরদুঃখ ভোগে
> চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত,
> মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে।
> ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্ম্মিত—
> অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
> আমারে পোষণ করা কার্য্য তাহাদের!

মোর পূর্ব্বে আর কিছু হয়নি সৃজিত
অনন্ত পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্ত কাল দহিতেছি আমি।
"হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।"

কবি বর্জ্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া এক স্থানে লইয়া গেলেন—সেখানে

দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ—
তারকা-অবিদ্ধ শূন্য কবিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আব ভয়ানক কথা,
যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ, ক্রোধের চিৎকার
করতালি,—কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ-ধ্বনি—
নিবেড় সে আঁধারের চাব দিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণু সম ফিবিছে সতত!

এইরূপে আরম্ভ কবিয়া কাব্যের প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ ইনফর্ণো, অর্থাৎ নরক—ক্রমাগত নবকেব বর্ণনা: পরে পর্গেটরী—অর্থাৎ যাহাদেব পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে তাহাদের বাসভূমি—পরে স্বর্গ। ক্রমাগত একই পদার্থের বর্ণনাব বিবরণ পাঠকদিগেব নিদ্রাকর্ষক হইবে, এই নিমিত্ত তাহা হইতে বিরত হইলাম। পর্গেটরী কাব্যের শেষ ভাগে বিয়াত্রীচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল। বর্জ্জিল ও দান্তে উভয়েই বিস্ময়ে দেখিলেন একটি আশ্চর্য্য রথে বিয়াত্রীচে আসিতেছেন। সুরবালাবা তাঁহার চারি দিকে এমন পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন যে তাঁহার আকার অতি অস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে, দান্তে সে পুষ্পরাশির মধ্যে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, চিনিতেও পারেন নাই—তিনি কহিতেছেন,

আঁখি মোর দেখে তাঁরে পারেনি চিনিতে,
তবু তাঁর দেহ হোতে এমন একটি
বিকীরিত হতেছিল শুভ্র পুণ্য-জ্যোতি,
তাহাব পরশে যেন পুরাতন প্রেম
হৃদয়ে আমাব পুন উঠিল জাগিয়া।
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন
যে স্বপ্নে হৃদয় মোর আছিল মগন—
যখনি উঠিল জাগি স্বর্গীয় কিরণে,
অমনি আকুল হয়ে ফিরিয়া ধাইনু
কবি বর্জ্জিলের পানে, শিশু সে যেমন
ভয় কিম্বা শোক-ভারে হোল বিচলিত,
অমনি মায়ের বুকে যায় লুকাবারে!
ভাবিনু কাতর স্বরে কহিব তাঁহারে—
"প্রতি রক্তবিন্দু মোব কাঁপিছে শিরায়,
পুরান সে অগ্নি পুন উঠেছে জ্বলিয়া।"
হা—বর্জ্জিল কোথা—হোয়েছেন অন্তর্ধ্যান!
প্রিয়তম পিতা তুমি বর্জ্জিল আমার!

দান্তেকে বর্জ্জিলের এই সহসা অন্তর্ধ্যানে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া বিয়াত্রীচে কহিলেন যে, "দান্তে কাঁদিও না, ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছুরিকা তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে ও তাহার যন্ত্রণায় তোমাকে কাঁদিতে হইবে।" সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি স্থগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুক্ত সূর্য্য প্রকাশ পাইলেন। বিয়াত্রীচে সেই উচ্চ রথের উপরি হইতে কহিলেন, "চাহিয়া দেখ আমি বিয়াত্রীচে।" বিয়াত্রীচের সেই "অটল মহিমায়" দান্তে জননীর সম্মুখে ভীত সন্তানের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিয়াত্রীচে তখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, অল্প বয়সে দান্তের হৃদয় ধর্ম্মে ভূষিত ছিল, বিয়াত্রীচে তাহাব যৌবনময় চক্ষের আলোকে তাঁহাকে সর্ব্বদাই সৎপথে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন, যখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও সৌন্দর্য্যে অধিকতর ভূষিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি দান্তের সে ভালবাসা কমিয়া গেল। বিয়াত্রীচের তীব্র ভর্ৎসনার তিনি অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রুবর্ষণ করিয়া ও স্বর্গের নদীতে স্নান করিয়া তিনি পাপবিমুক্ত হইলেন। তখন তিনি তাহাব প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত স্বর্গ দর্শনে চলিলেন। যখন স্বর্গ-নরক পরিভ্রমণ করা শেষ হইল, তখন কবি কহিলেন—

জাগি উঠি স্বপ্ন যদি ভুলে যাই সব,
তবু তার ভাব যেমন থাকে মনে মনে,
তেমনি আমারো হোল, স্বপ্ন গেল ছুটে
মাধুর্য্য তবুও তার রহিল হৃদয়ে!

—ভারতী, ১২৮৫

মাইকেল আরজিবাশেভ

তেরো

লালিয়াকে ইউরাই জিজ্ঞাসা করলো, সে আনাতোল পাভ্‌লোভিচকে খুব ভালবাসে কি না।

"হাঁ, খুব—" লালিয়া উত্তর করলো।

"কেন?"—নিজের প্রশ্নের ধরণে ইউরাই নিজেই আশ্চর্য্য হোল।

"কী বোকা!···তুমি কখনো কাউকে ভালোবাসোনি?"

"তুমি তা'কে ভালো ক'রে জেনেছ?" ইউরাই বলল।

"আনাতোল আমার কাছে কোনো কথা গোপন করে না।" বিজয়িনীর গর্ব্বে লালিয়া প্রত্যুত্তর দিল।

হঠাৎ লালিয়া পাল্টা প্রশ্ন করলো, "হয়তো তুমি তা'র সম্বন্ধে কিছু জানো!"—ওর স্বরে একটা আশংকামিশ্রিত ভাব।

"না, না, আমি কি জান্‌বো ওর সম্বন্ধে?" তাড়াতাড়ি বললো ইউরাই। "আমি এই সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমি বলছিলাম কি, কতোটুকুই বা আমরা অন্যের বিষয় জানতে পারি! তোমার ধারণা নেই এক-একটা মানুষ কতো নীচ ঘৃণ্য ও হীন হতে পারে। তোমার মতো অল্প বয়সে সব জানা তো সম্ভব নয়!"

"ও, তাই বলো!" পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে লালিয়া বললো, "তুমি কি বলো যে আমি ও-সব কথা ভাবিনি?—হাঁ, আমি ওদিকটাও চিন্তা করেছি। দেখো, আমার এ কথা ভাবতে বড়ো বিশ্রী লাগে যে আমরা মেয়েরা সুনামের জন্য কতোই না আত্মনিগ্রহ করি! এই বুঝি ঠক্‌লাম, এই বুঝি আমাদের পদস্খলন হোল!···আর পুরুষরা এই ব্যাপারটা নিয়েই করে বীরত্বের বড়াই! বিশ্রী না?"

"হাঁ, তাই বটে!" ইউরাই বললো। "দেখো না, যদি কাউকে বলা হয়, 'তুমি অমুক কুলটাকে বিয়ে করবে?'—তা হলে সে নিশ্চয়ই জবাব দেবে 'না'। অথচ একটা কুলটার থেকে পুরুষ মানুষের পার্থক্য কোথায়? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কুলটা নিজের দেহকে ব্যবহৃত হতে দেয়, আর পুরুষ মানুষ নির্লজ্জ ভাবে নিজের লালসাকে করে চরিতার্থ!"

লালিয়া কোনো কথা বললো না।

বাইরে দরদালানে একটা চাম্‌চিকে ফরফর ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছিল; হঠাৎ সেটা বাগানের দিকে চলে গেলো। ওর ডানার আওয়াজ ক্ষীণায়মান হতেই ইউরাই শুনতে পেলো রাত্রির শব্দ,—মোহময়, অনতিস্ফুট, অপরূপ, ছোট-ছোট শব্দ।

ইউরাই আবার বলতে সুরু করলো, "সব চেয়ে নোংরা ব্যাপার এই যে, এরা সবাই এ সব যে শুধু জানে তা নয়, এই সব যে ঘটবেই এটাও তারা ধরে নিয়েছে। ফলে হয় কি? পরস্পরের নিকট বাগ্‌দান করে, এবং একই সঙ্গে ভগবান ও মানুষ—দুইএর কাছেই মিথ্যাবাদী হয়। যে সব মেয়ে সব চেয়ে বেশি সরল ও নিষ্পাপ তারাই সব চেয়ে বেশি ক'রে এই লোচ্চাদের খপ্পরে পড়ে। সেমেনফ এক দিন আমাকে বলেছিল, 'মেয়েটা যতো নিষ্কলুষ হবে, তাকে

ভোগ করবে সে পুরুষ মানুষ হবে ততো বেশি কলুষিত।' সত্যি কথাই বলেছিল।"

"কী বল্‌ছো এ সব ?"—বিকৃত স্বরে লালিয়া উচ্চারণ করলো।

"ঠিকই বল্‌ছি।" ইউরাই বল্‌লো।

"আমি জানতুম না, আমি কিছু জানতুম না।"—লালিয়া প্রায় কেঁদে ফেল্‌লো।

ইউরাই লালিয়ার কথা শুনতে পায়নি। জিজ্ঞাসা করলো, "কি বল্‌লে ?"

"নিশ্চয়ই টোলিয়া—আমার সোনামণি—আর পাঁচ জনের মতো নয়। তুমি মিথ্যে করে বলেছো।" আনাতোলের ডাক-নাম ধ'রে—যে নামে লালিয়া ওকে ডাকতো,—লালিয়া এর আগে কথা বলেনি। হঠাৎ লালিয়া ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করলো।

"লালিয়া, কি করছো!···আমি তোমাকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে ও-সব বলিনি। কেন মন খারাপ করছো?"···ইউরাই লালিয়ার ভিজে চোখের থেকে ওর হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

লালিয়া প্রতিবাদ করে বল্‌লো, "না, না,···আমি জানি তুমি সত্যি কথাই বলেছো।"

ওদের উত্তেজিত স্বরে আকৃষ্ট হয়ে পাশের ঘর থেকে নিকোলাই ইয়েগোরোভিচ্‌, বেরিয়ে এলেন। ভারভারিক্কী লোক তিনি। দরোজার কাছে এসে, লালিয়ার বিশ্রস্ত ভাব দেখে, বিরক্তির সুরে বললেন, "কি হয়েছে ?"

"না, এমন কিছুই না। রিয়াজানজাফ-এর কথা নিয়ে ঠাট্টা করছিলুম। ও কিছু না।" ইউরাই উত্তর দিল।

কঠিন দৃষ্টি নিয়ে নিকোলাই তাকালেন ওদের দিকে। চরম বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট সেই দৃষ্টিতে। বললেন, "কী ইতর কথা বলছিলে ?"—বলেই মুখ ফিরিয়ে সোজা চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

রাগে ফেটে পড়ছিল ইউরাই। অভদ্রের মতো একটা জবাবও ওর জিভের গোড়ায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু একটা অদম্য অসম্মান-বোধ ওর বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দিল। কোনো কথা না বলে ও বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। অজান্তে একটা ব্যাঙ্‌কে ও মাড়িয়ে দিতেই সেটা প্যাক্‌ ক'রে ফেটে গেল। ইউরাই অনেকক্ষণ ধ'রে জুতোর তলাটা মাটিতে ঘস্‌তে লাগ্‌ল। ওর সমস্ত শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে ও বসে রইল। এই মাত্র যে ব্যাঙ্‌টাকে ও পায়ের চাপে মেরে এলো, তার কথা ওর মনে হোল।···কেউ জানল না, কেউ ভাবলো না,···সবাইর অজ্ঞাতে একটা প্রাণের শেষ ঘটলো। নিজের কথা মনে হোল। ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা দুঃখ-বেদনা,··· এদের কোনো দাম নেই বিরাট জগতের কাছে। নিজের চার পাশে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সৃষ্ট একটা আবরণ,—এই নিয়েই তো ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি। মৃত্যু এসে এক মুহূর্ত্তে সব নিঃশেষ করে দেয় নির্ম্মম নির্দ্দয় স্পর্শে সব নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে। কি বাকী থাকে—তখন ?···

সেমেনফ্‌-এর কথা ওর মনে পড়ল। বড়ো-বড়ো চিন্তা, বৃহৎ আদর্শ,—যা কি না ইউরাই এবং ওর মতো অন্যান্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবককে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকে, সেমেনফ্‌ ছিল সে সব সম্বন্ধে একেবারেই নিস্পৃহ, নিঃসম্পর্ক। ও বুঝতে পারতো, সেমেনফ্‌ কেন বৃহৎ আদর্শ ইত্যাদির কথা না বলে ছোট-ছোট সুখ ও আমোদের আলোচনা করতো,—এই যেমন, চাঁদের আলোয় নৌকায় বেড়ানো, কিংবা কোনো সুগঠনা তরুণীর দেহশ্রী,···

ইউরাই এখন উপলব্ধি করলো—এই সব তুচ্ছ ছোট-ছোট ঘটনার সমবায়েই জীবন গড়ে ওঠে, এই সব ছোট সুখ ও আনন্দ নিয়েই জীবন হয়ে ওঠে পূর্ণ জীবন। ভালো-মন্দের মাপকাঠিতে তো তাহলে জীবনের নিরিখ করা কোনো মতেই চলে না! ইউরাই বিচলিত হয়ে উঠল। এত দিনের ভাবধারা ওর বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠল। নিজের জীবনবাদকে যতোই ও প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, ততই ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল।

জীবন যদি মুক্তির সাধনা হয়, তা'হলে তো উপভোগ করা মানুষের সহজাত ধর্ম্ম! তা'হলে তো পবিত্র ও কলুষতা শুক্‌নো ঘাসের মতোই মাটির সত্যকার রূপকে চাপা দিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুই না! তা'হলে লালিয়া বা সীনা কার্সাভিনাকে নিয়ে ছেলে-মহলে যে কলুষিত কামনার আন্দোলন,—তাকে তো অন্যায় বলা চলে না ?

বুদ্ধির দিক থেকে বিচার করবার চেষ্টা ক'রে ও ভাবল, কিন্তু তা ব'লে মানুষ তো আর পশু নয়। প্রবৃত্তিকে জয় করাই তো কর্ত্তব্য। পবিত্রতার ভিত্তিতেই তো প্রবৃত্তিকে স্থাপিত করা উচিত! বিরাট আকাশের প্রান্তে, নক্ষত্রমণ্ডলীর ওপারে কি কোনো ঈশ্বর নেই ?

নারী-হৃদয়ের পবিত্রতা যদি লুপ্ত হয়ে যেত, পৃথিবী তা'হলে তো মুকুরিত বসন্তের সুষমারহিত গীতরিক্ত হিম মরুদেশে পরিণত হয়ে যেত!

আশ্চর্য্য মানুষের মন! অজস্র বিবসনা সুন্দরী তরুণীরা যেন ভিড় করে ইউরাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।' "নাঃ, আমার চিন্তাশক্তি কমে আসছে।"—ভাবলো ইউরাই। "নাই বা হোল লালিয়া রিয়াজানজাফ্‌-এর প্রথম বা একমাত্র প্রণয়িনী।···এই যে আমি সীনা কার্সাভিনাকে মনে-প্রাণে কামনা করছি—" ইউরাই কুণ্ঠিত হোল না ভাবতে, "আমি সত্যিই তাকে ভালোবাসি। কিন্তু ওর আগেও তো আমি অন্য মেয়েকে ভালোবেসেছি। কি হয়েছে তাতে ?···"

"তা'হলে এই দাঁড়ায়—"সিদ্ধান্তে এলো ইউরাই—"হয় আমরা সারা জীবন ধরে" সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধ থাকবো, নয় তো প্রমোদ-উপভোগে স্বাধীন থাকবো। মেয়েরাও যদি তা' করে, আপত্তি কি ?"

"কোনো একটি মেয়ে যেমন চিরকাল আমার মনের ও দেহের খোরাক জোটাতে সক্ষম হতে পারে না,"—ভাবলো ইউরাই, "তেমনি মেয়েদের বেলায়ও তো ঐ কথাই খাটে!···সুতরাং নিষ্পাপ থাকাটা আদর্শের দিক থেকে শোনায় বেশ, কিন্তু সবাই যদি তার অনুশীলন করতো, তা'হলে পৃথিবী হয়ে উঠত অসহ্য।"

ইউরাই এই সিদ্ধান্তে এসে অনেকটা খুসী হোল।

চৌদ্দ

প্রচুর আলো ও উত্তাপ নিয়ে এলো গ্রীষ্ম।

বুকের দিকের সব ক'টি বোতাম খুলে দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে, শ্বারুডিন ঘরে পায়চারী করছিল। সোফাতে শুয়েছিল টানারফ্‌; পঞ্চাশটা রুবল্‌ ওর নিতান্ত দরকার,—বন্ধুর কাছে দু'বার সে

চেয়েওছিল। তৃতীয় বার অনুরোধ করতে ও ইতস্ততঃ করছিল, আশা করছিল হয়ত স্যাকুডিন নিজের থেকেই ঐ প্রসঙ্গে আসবে। কিন্তু স্যাকুডিন গত মাসে জুয়া খেলে সাতশো রুবল্ ঠকেছিল ব'লে আর দান-খয়রাত করতে ইচ্ছুক ছিল না।

এমন সময় ঘরে ঢুক্‌লো আবদালী ; কুর্নিস্ করে জানালো যে, টানারফ্ যে বীয়ার চেয়েছিল, তা' পাওয়া যাবে না, কারণ বীয়ার সব ফুরিয়ে গেছে।

টানারফ্ রাগ করলো ; ভাবলো—নগদ দাম দিতে পারবে না বলে বোধ হয় আর্দালীটা মিথ্যে করে বললো বীয়ার ফুরিয়ে গেছে।

স্যাকুডিন্ উঠে গিয়ে বাক্স খুললো এবং দু'টো রুবল্ ছুঁড়ে দিল আবদালীকে। ও বীয়ার নিয়ে এলো।

বীয়ারে চুমুক দিয়ে স্যাকুডিন্ খানিকটা ধাতস্থ হোল। ওর খোশ-মেজাজ এলো ফিরে। টানারফের সামনে দাঁড়িয়ে ও বললো, "লীডা আবার কাল এসেছিল। বেড়ে মেয়ে।"

টানারফ্ নিজের শোকে কাতর, ওর কথায় কান দিলো না।

স্যাকুডিন টানারফের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না করেই হঠাৎ হেসে উঠল। বললো, "জানো টানারফ্, কালকে আমি ওকে বললাম…(স্যাকুডিন এক অতি অশ্লীল কামোপভোগের বর্ণনা করলো,—বিশেষতঃ মেয়েদেরই পক্ষে সেটা একেবারেই জঘন্য)। ও অবশ্য প্রথমে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু ওর চোখের চাউনি থেকেই… হাঃ হাঃ হাঃ—এমন ফূর্তি আর জীবনে পাইনি সত্যি।"

বাইরে আইভানফের গলা শোনা গেল। "স্যাকুডিন, ঘরে আছ ?—ভেতরে আসব কি ?"

"হাঁ, এসো।"—জানালায় মুখ বাড়িয়ে স্যাকুডিন ওদের আসতে বললো।

এক দঙ্গল ফূর্তিবাজ বন্ধু ওর ঘরে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো। আইভানফ্, নোভিকফ্, কাপ্তেন মালিনওস্কী, স্যানিন,…আরো অনেকে। 'আরো পঁচিশটা রুবল গেলো'—ভাবলো স্যাকুডিন্।

ওরা হৈ-হল্লা করলো, খানিকটা মাতালের হুল্লোড়ের মতো, আর অধিকাংশ সময় ধরে আলোচনা করলো—কুরুচিপূর্ণ আলোচনা—মেয়েলোক নিয়ে। পিটার্স্‌বার্গ থেকে ভোলোশিন্ নামে স্যাকুডিনের এক বন্ধু এসেছিল, সেও যোগ দিল হুল্লোড়ে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছিল লিডাকে নিয়ে,—যদিও তা'র নামোচ্চারণ কেউই করছিল না। স্যাকুডিন এবং নোভিকফ্ তো প্রায় হাতাহাতি করতে উদ্যত হয়ে উঠেছিল।

এমন সময় আবদালী এসে স্যাকুডিন্‌কে খবর দিল যে একটি অল্প-বয়স্কা মহিলা ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

'লীডাই কি ?'—ভাবলো স্যাকুডিন্।

ভোলোশিন্ আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল। "পুরোনো রোগটা দেখ্‌ছি স্যাকুডিনের যায়নি এখনো। ভালো, ভালো !"

ওরা জুয়া খেলছিল। স্যাকুডিন ওর হয়ে টানারফ্‌কে দান দেওয়ার কথা বলে বাইরে পা বাড়ালো।

ম্যালিনওস্কী বললো, "বেশ বাবা বেশ ! মেয়েটিকে একবার আমাদের দেখাও না চাঁদ !"

টানারফ্ ওকে জোর ক'রে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

স্যানিন অনুমান করলো, এ বু সম্ভব লীডা। তা'র অমন সুন্দরী বোনটি,—কী কষ্টেই না পড়েছে ! ভাবতেই ও মনে-মনে অনুকম্পা এবং একটা ঈর্ষা যুগপৎ অনুভব করলো।

স্যাকুডিনের শয্যার এক পাশে লীডা বসেছিল। মনের অস্থিরতা তা'র সর্ব্ব অঙ্গে পরিস্ফুট। তা'র সেই আগেকার গর্ব্বিতা নারীর ভাব নেই, তা'র জায়গায় দেখা দিয়েছে একটা অসহায় নিরুত্তম হতাশার ভঙ্গী। চোখে চোখ পড়তেই স্যাকুডিন বুঝ্‌তে পারলো সেই আগেকার লীডা আর নেই, এখন যে মেয়েটা ওর সামনে বসে আছে সে তা'র কাছে করুণা-প্রার্থিনী মাত্র।

"বাহাত্তুরে মেয়ে !"—সজোরে দরোজার কপাট বন্ধ ক'রে স্যাকুডিন শয্যার দিকে এগিয়ে কথা কয়টা চাপা বিরক্তি নিয়ে উচ্চারণ করলো। গোটা কয়েক চড় লাগাতে পারলেই যেন স্যাকুডিন খুসী হয়। "এক গাদা লোক রয়েছে পাশের ঘরে, তোমার নিজের ভাইও রয়েছে,—আর তুমি কি না বেছে-বেছে এই সময়টিতেই এলে দর্শন দিতে !"

লীডার চোখে চোখ পড়্‌তেই ও নিজেকে সংযত ক'রে নিল। "যাক্ গে সে কথা। তোমার ভালোর জন্যই বল্‌ছিলাম। তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে খুসীই হয়েছি।" ওর কবোষ্ণ হাত দু'খানা তুলে ধরে স্যাকুডিন নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালো।

"সত্যি বলছো ?"—লীডার কণ্ঠস্বরে স্যাকুডিন চমকে উঠ্‌ল। "সত্যি বল্‌ছো আমাকে তোমার ভালো লাগে ?…দেখো আমার দিকে তাকিয়ে—কি রকম বিশ্রী হয়ে গেছি আমি। কী যে হবে আমার !…তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার…"

স্যাকুডিন পুনরায় লীডার হাতে চুমু খেলো। মাত্র দু'দিন আগে এই শয্যায়, এই উপাধানে মাথা রেখে সে লীডার তনুলতাকে বাহু-বেষ্টনে পেয়েছিল। কী অসহ্য আবেগে সেদিন পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছে ওরা। শৃঙ্গার-মুহূর্ত্তে,—সারা জীবনে লব্ধ সমুদয় নারীদেহ উপভোগের চরিতার্থতা,—স্যাকুডিন সেদিন পেয়েছিল লীডার কাছে। আর আজ !—লীডার সান্নিধ্য ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিল ; একটা বিকৃত নোংরা পঙ্কিল আবর্জ্জনার স্তূপে যেন স্যাকুডিনের পা আটকে গেল,—ও বেরিয়ে আস্‌তে চায়, অথচ পারছিল না,—এমনি একটা ভাব ওর মনে এলো।

অসহায়ের মতো ও উচ্চারণ করলো, "উঃ, কী বিশ্রী এই মেয়ে জাতটা !"

দারুণ ভীতি-বিহ্বল হয়ে লীডা ওর দিকে তাকালো। স্যাকুডিনের কথায় ও বুঝ্‌তে পারলো, সব শেষ। ওর কোনো আশা নেই আর। স্যাকুডিনকে ও যা' দিয়েছিল তা'র তুলনা হয় না ;—ওর সৌকুমার্য্য, পবিত্রতা, ওর গৌরব,—সব কিছু সে স্যাকুডিনের পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়েছিল দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত অর্ঘ্যের মতো। বিনিময়ে,—লীডা বুঝ্‌তে পারলো,—একটা পশুর মতো স্যাকুডিন তা' সব কলুষিত ক'রে দিয়ে ওকে নর্দ্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হতাশার বোঝা নিয়ে এই মুহূর্ত্তে ও মাটিতে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে অঝোরে কাঁদতে চাইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রতিহিংসা এবং ঘৃণায় ওর দেহ-মন উঠল বিষিয়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে লীডা বলে উঠল, "বুঝতে পারছ না কতো বড়ো আহাম্মক তুমি ?"

লীডার এই তাকাবার ভঙ্গী এবং কথা,—একেবারেই ওর

চরিত্রের বিপরীতপন্থী। অন্ততঃ লীডার চরিত্রের এ দিকটা স্যারুডিন কল্পনাও করতে পারে না। তাই, ওকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে একটু ঠাট্টার সুরে বল্‌লো, "কথার কি শ্রীই না প্রকাশ করছ!"

"সাজিয়ে বানিয়ে কথা বলবার মতো আমার মনের অবস্থা না।"—লীডা বললো!

স্যারুডিন ওকে শান্ত করতে চাইল। লীডার বাহুমূল ধরে ওকে এক প্রবল ঝাঁকুনি দিতেই লীডা খানিকটা চুপ করলো। সহজাত বুদ্ধিতে ও বুঝতে পারলো, ওর এই ব্যবহার, বিশেষতঃ পাশের ঘরে বন্ধু-বান্ধবদের সামনে,—স্যারুডিনের অবস্থাকে অত্যন্ত কদর্য্য ক'রে তুলছে। মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে ও বললো, "থাক্, স্তোক বাক্যের দরকার নেই।"

"দেখো,"—স্যারুডিন বললো, "প্রত্যেকেরই একটা সহ্যসীমা আছে।"

"আহা, ও রকম ক'রে বল্‌ছো কেনো? আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছু বলো!…" লীডার কণ্ঠস্বর পাগলের মতো, চাপা চীৎকারে ও ফেটে পড়লো।

ভদ্রতার মুখোস খুলে পড়েছে দু'জনেরই। দু'টো পশু যেন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।

এক পাল ইঁদুর যেন ওর মাথার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছে! একবার ভাবলো স্যারুডিন যে, লীডাকে অজাত সন্তানটার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্ম কিছু টাকা দিলে হয়। মোটের ওপর, যে করেই হোক, এই মেয়েটার হাত থেকে ওকে রেহাই পেতেই হবে। ও বললো, "আমি ভাবিনি…এ রকমটা হবে…"

"তুমি ভাবেনি?"—পাগলের মতো লীডা প্রশ্ন করলো। "কেনো ভাবোনি শুনি? কেনো? কে তোমাকে না ভাবার স্বাধীনতা দিয়েছে শুনি?"

"কিন্তু আমি তোমাকে এমন কোনা আশ্বাস কখনো দিইনি যে আমি—"

লীডা বুঝতে পারলো স্যারুডিন কোনো রকমেই দায় স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। ওর হাত দু'টো হয়ে এলো অবশ; দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়ে ও শয্যার উপর বসে পড়ল। নিস্পৃহ ভাবে, যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছে, এমনি ভাবে উচ্চারণ করলো, "কি করবো আমি?…ডুবে মরবো?…"

"না, না, ও কথা বোলো না!"

কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে লীডা বল্‌লো, "আমি জানি ভিক্টর সার্‌গেজেভিচ্, তাতে আপনি অখুসী হবেন না।"

লীডা উঠে পড়লো। আশা করেছিল, যাঁর কাছে ও জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সানন্দে তুলে ধরেছিল, ওর চরম সংকটের সময় তাঁর কাছ থেকেই আসবে প্রথম ও সপ্রেম সহানুভূতি ও সাহায্য; তাই স্যারুডিনের ব্যবহার ও কথাবার্তা ওকে বিভ্রান্ত করে তুলছিল। প্রবল একটা প্রতিশোধের ইচ্ছা ওকে পেয়ে বসছিল। কিন্তু এও ও জানত যে, ও শেষ অবধি স্যারুডিনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধই নিতে পারবে না,—সামান্যতম প্রয়াস করতে গেলে ও নিজেই ভেঙে পড়বে।

"পশু!"—দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো চাপা একটা আওয়াজ ক'রে লীডা বেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল।

পাশের ঘরে জুয়ারীদের মধ্যে প্রায় সবারই জুয়াতে আকর্ষণ কমে আসছিল। খানিকটা পরেই স্যানিন উঠে দাঁড়ালো।

"কোথায় চল্‌লে হে?"—আইভানফ্ জিজ্ঞাসা করলো।

বন্ধ দরোজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে স্যানিন বল্‌লো, "দেখ্‌তে যাচ্ছি ওরা কি করছে।"

"বোকামী কোরো না। বরঞ্চ বোসো। এক পাত্র চালাও—" আইভানফ্ বল্‌লো।

"বোকা আমি না, তুমি।"—স্যানিন মুখের ওপর বললো।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে পাশের একটা সরু গলিতে স্যানিন ঢুকলো। বুনো কাঁটা-লতায় বাড়ীটার বেড়া, অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙ্গিয়ে ও এগিয়ে গেলো স্যারুডিনের শয়নকক্ষের জানালাটার নীচে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেই ও শুনতে পেলো, ঘরের ভেতর লীডার কণ্ঠস্বর—'তুমি বল্‌তে চাও যে তুমি এখনো জান্‌তে পারোনি?

লীডার স্বরের বিকৃতিতেই স্যানিন বুঝ্‌তে পারলো লীডা কি ইঙ্গিত করছে। অমন সুন্দর বোন ওর লীডা,—'পোয়াতি' শব্দটা দিয়ে ওকে বর্ণনা করতে মন চায় না। স্যানিন ওর দুর্দ্দশায় অনুকম্পা বোধ করলো।

একটা শ্বেত প্রজাপতি বাগানের নীচু গাছগুলির ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, স্যানিন চোখ তুলে দেখছিল, কিন্তু কান খাড়া রেখে শুনছিল দেয়ালের ওপাশে ঘরের ভেতরের কথাবার্ত্তা।

যখন লীডা বল্‌লো—"পশু!"—স্যানিন আর দাঁড়ালো না, খুসী মনেই বাগানটা পার হয়ে কাঁটা-লতার বেড়া টপ্‌কে সে বেরিয়ে এলো! কে তাকে দেখ্‌তে পেলো না পেলো তা' নিয়ে ওর মাথা-ব্যথা নেই।

লীডা বাড়ী গেলো না। উল্‌টো রাস্তা ধরলো। গ্রীষ্মের দুপুর, পথে লোক-চলাচল নেই বল্‌লেই চলে। যাঁ'রা দু'-এক জন চল্‌ছিল, তাদের মধ্যে এক জন লীডার পরিচিত। যন্ত্রচালিতবৎ তাঁর সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিয়ে ও এগোলো।

স্যারুডিনের ওপর আর কোনো রাগ নেই ওর। উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ও স্যারুডিনের কাছে গিয়েছিল। দুশ্চিন্তা একলা বহন করবার মতো মনের জোর ওর ছিলো না বলেই, এবং স্যারুডিনকে ছেড়ে একলা থাকার অসম্ভাব্যতার জন্যই ও ওর কাছে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, স্যারুডিন ওর জীবন থেকে চলে গিয়েছে। অতীত এখন মৃত। যা অবশিষ্ট রইল, তা ওকে একলাই বয়ে বেড়াতে হবে, নিজের পথের সন্ধান নিজেকেই করতে হবে।

উষ্ণ মস্তিষ্কে ও চিন্তা ক'রে চল্‌লো, এখন ওর কর্ত্তব্য কি। যে গৌরবময় অতীত ওর ছিল, আর তা ফিরে আসবে না। উঁচু মাথা আর রইল না। সকলের চোখে ওকে হীন, কদর্য্য, ঘৃণিত হয়ে থাকতে হবে।

না, তা' হবে না। দর্প এবং সৌন্দর্য্য—যে ক'রেই হোক, বজায় রাখতেই হবে। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে কেউ ওর কেশাগ্রও ছুঁতে পারবে না।

এই সিদ্ধান্তে যখন ও এলো, দিব্যদৃষ্টিতে লীডা দেখতে পেলো, —ওর চার পাশ ঘিরে রয়েছে প্রাণহীন, সূর্য্যালোকবিরহিত, মানুষের সমাজের বাইরের এক পরিবেশ। হঠাৎ যেন ওর চার পাশে

খাড়া হয়ে উঠল এক অলঙ্ঘ্য পাথরের পাঁচিল, যা' কি না ওকে প্রাণের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত !

নিজের মনেই ও বলে উঠল, "বাঃ, কী সোজা পন্থাই না খোলা রয়েছে !"

রাস্তার ছ'পাশে বাড়ী-ঘর বিরল হয়ে এলো ; ছোট একটা মাঠের পর নদী ; একটা সাঁকো। একটা কুয়াসার আবরণ যেন লীডাকে ঢেকে ফেল্‌ল। কী যে সে করতে চলেছে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, —কোনো কিছুই ওর মাথায় ঢুক্‌ছিল না।

হঠাৎ ওর গাল বেয়ে বড়ো-বড়ো ফোঁটায় চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ! নিজের জীবনের ওপর দুঃখের একটা আবেগ ও অনুভব করলো। সাঁকোর আলসের ওপর শরীরের ভর দিয়ে ও জলের দিকে তাকালো,—একটা হাতের দস্তানা কি ক'রে যেন ফস্‌কে গিয়ে জলে প'ড়ে গেল। আতঙ্কিত বিস্ময়ে ও চেয়ে দেখ্‌ল—ঘোলাটে জলের ঘূর্ণী দস্তানাটাকে আস্তে-আস্তে গ্রাস করে ফেল্‌ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল ওদিকে ; খানিকটা পরেই সব মিলিয়ে গেল, কোনো চিহ্নই রইল না দস্তানাটার ; স্বচ্ছ জলের স্রোত ঘোলাটে জলের ঘূর্ণিটার ওপর দিয়ে তর-তর ক'রে বয়ে চল্‌ল।

"কি ক'রে গেল ওটা দিদিমণি ?"—লীডা চম্‌কে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌ল একটা মোটা চাষী-মেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করছে দস্তানাটা কি ক'রে জলে পড়ে গেল। লীডার মনে হোল,—মেয়েটা বোধ হয় মনের কথা বুঝতে পেরেছে ! একবার ভাবলো মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে ও ওর নিজের মনের দুঃখের কথা সব উজাড় করে বলে দেবে। পরক্ষণেই ভাবলো—না, থাক ! মুখে শুধু জবাব দিল, "না, ও কিছু না।"

ভাবলো লীডা,—না, এখানে অসম্ভব। নিশ্চয় অনেকেই ওকে দেখে ফেল্‌বে ! জল থেকে ওকে তুলে ফেল্‌তে বেশি সময় লাগবে না।

নদীর কিনারা ধ'রে ও এগিয়ে চললো। বুনো ফুল, কাঁটা-লতা, ঝোপ-ঝাড় ডিঙ্গিয়ে চল্‌লো কোনো নির্জন জায়গা পায় কি না তারই সন্ধানে ;—যেখানে ওর আত্মবলি কারো চোখে পড়বে না, কেউ ছুটে আস্‌বে না জলে-ডোবা একটা মেয়ের লাস টেনে তুলতে।

হাঁটু গেড়ে বসে লীডা 'প্রার্থনা' করলো।—"আমার সহায় হও, ঈশ্বর, আমাকে বল দাও—" হঠাৎ একটা গান মনে পড়ে গেলো ওর, যা' ও মাত্র এই সেদিন স্কুলে শিখ্‌ছিল। মা'র মুখ মনে পড়লো। মা'র মুখ ! না, না, না, আর দেরী না, আর দেরী নয়। যত শীঘ্রই হোক্‌, এই অসহ বেদনার হাত থেকে ওকে পরিত্রাণ পেতেই হবে ! যারা ওকে ভালোবেসেছে এত দিন, তা'রা ভালোবেসেছে—ও সত্যিই যা' তা'র জন্ম নয়, ওর ভালো-মন্দ, ওর আশা-নিরাশা, ওর ক্ষয়-ক্ষতি,—এ সব নিয়ে যে ওর অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব,—তা'র জন্ম নয় ; ওরা ভালোবেসেছে ওর ভেতর তাদের নিজেদের কল্পনার প্রতিফলনকে, যা' ওরা চেয়েছে ওর কাছে, তাই নিয়েই তো ওদের ভালোবাসা ! আজকে ও পথভ্রষ্ট, ওকে যারা ভালোবাস্‌ত—তাদের মনোজগতে তো পথভ্রষ্টার সমাদর নেই ! তা'হলে ?—

ভয়, জীবনের প্রতি মমতা, বেঁচে থাকবার আগ্রহ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আশা, ভরসা,—সব কিছুই আজ শেষ হয়ে গিয়েছে ! সামনে প্রসারিত এই নদী,—এই তা'র শেষ শয্যা হোক্‌ তা'হলে···

বিভ্রান্ত চোখের ওপর যেন এক বলিষ্ঠ পুরুষ মানুষের ছায়া পড়লো ! দৌড়ে আস্‌ছে সে, কাঁটা-লতা ঝোপ-ঝাড় ডিঙ্গিয়ে, হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আস্‌ছে ! প্রসারিত দুই বাহু বাড়িয়ে স্যানিন জলে-ঝাঁপিয়ে-পড়্‌তে উদ্যত ওর বোন—লীডাকে জড়িয়ে ধরলো।

"কী পাগলামী করতে চলেছো, ছি !"

কি যে ঘট্‌লো কয়েক মুহূর্ত্ত ধ'রে, তা হৃদয়ঙ্গম করবার মতো সামর্থ্য ছিলো না লীডার। সে সত্যই জলে ঝাঁপ দিতে চলেছিল না ঝাঁপ দিয়েছিল, কিংবা স্যানিনই যে তাকে জড়িয়ে ধ'রে যেন কোন্‌ এক অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছে,—সে কিছুই বুঝ্‌ছিল না। দুঃসহ একটা বোঝার ভারে ওর স্নায়ুগুলি যেন মুষ্‌ড়ে গিয়েছে।

স্যানিন ওকে সরিয়ে এনে একটা ঝোপের পাশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। ভাবলো : কি করা যায় এখন ওকে নিয়ে।

হঠাৎ লীডা স্যানিনকে জড়িয়ে অঝোরে কেঁদে ফেল্‌ল।

মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে স্যানিন বললো, "হয়েছে কি ? এত বিচলিত হচ্ছ কেন ?"

ছোট একটি শিশুর মতো কান্না থামিয়ে লীডা ওর মুখের দিকে তাকালো।

"আমি জানি সব।" বললো স্যানিন, "গোড়া থেকে সবই জানি।"

কে যেন ওর মুখের ওপর চাবুক মারলো। ওর কলঙ্কের ইতিহাস স্যানিনের কাছে অজ্ঞাত নেই জেনে লীডা চম্‌কে উঠল।

"কি হোল ?" স্যানিন বলল। "চম্‌কে উঠলে কেন ? আমি সব জেনে ফেলেছি বললই কি তুমি চম্‌কে উঠলে ? আরে, স্যারুডিন যদি বিয়ে নাই করে তোমাকে, সে তো ভালোই। ওর আছে কি ?—এক সৌন্দর্য্যের বাহার, এই তো ! সে সৌন্দর্য্য তো তুমি পুরো মাত্রায় উপভোগ ক'রে নিয়েছ—"

"না, না,—আমি তা'র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিনি, সেই আমাকে ভোগ করেছে—" লীডা বাধা দিয়ে বলল।

"অবশ্য, ফলভোগ তোমাকে একাই করতে হবে। প্রথমতঃ সন্তানের জন্ম দেওয়াটাই একটা নোংরা, কষ্টকর ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ, লোক-জন তোমাকেই দোষী করবে।"···স্যানিন বলল, "লীডা, হয়েছে কি তাতে ? অন্য কারো কোনো ক্ষতি তো তুমি করোনি—"

একটু বিরক্তি নিয়ে স্যানিন ওকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, "তোমায় এখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি উপদেশ দিতে পারতাম, কিন্তু সে উপদেশ গ্রহণ করবার মতো শক্তি বা মনের অবস্থা তোমার নয়। সে যাই হোক্‌, আত্মহত্যা তো এর প্রতিকার নয়। তুমি মারা গেলে তো সবাই তোমার অবস্থা জান্‌তে পারবে। কি লাভ হবে তাতে তোমার ? তোমার পেটে সন্তান এসেছে বলেই তো তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে না,—লোকে নিন্দা করবে,—এই আশংকায়ই তুমি মরতে চেয়েছিলে। কিন্তু আত্মহত্যায় কি লাভ হোত ? যারা তোমার অনাত্মীয়, অপরিচিত, তারা কি বললো না বললো তাতে তোমার কি যায়-আসে ? যারা তোমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়,—তাদের জন্যই তোমার দুশ্চিন্তা। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, বিয়ে না ক'রে সন্তান পেটে এসেছে, এইটাকে যারা গর্হিত অপরাধ মনে ক'রে তোমাকে শাস্তি দিতে আসবে, তাদের জন্য তোমার মন খারাপ ক'রে লাভ কি ?"

বিস্ফারিত চোখ তুলে লীডা জিজ্ঞাসা করলো, "তা'হলে কি করবো আমি ?"

"তোমার পক্ষে এখন ছ'টো পথ খোলা রয়েছে : প্রথমতঃ—এই অবাঞ্ছিত ভ্রূণকে তোমার নষ্ট ক'রে ফেল্‌তে হবে।—"

"না, না, আমি তা পারবো না" লীডা বলল।

"বেশ, তা' যদি না পারো,—" স্যানিন বলল, "তা'হলে এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে, যাতে লোকে এ না জানতে পারে।··· স্যারুডিন যাতে সহর ছেড়ে চলে যায় তার ব্যবস্থা আমি করছি। আর, তুমি নোভিকফ্‌কে বিয়ে করো। সত্যিই তো, ভেবে দেখো, স্যারুডিনের সঙ্গে তোমার পরিচয় না হলে তো তুমি নোভিকফ্‌কেই বিয়ে করতে—"

"তা' কি করে হয় ?" লীডা কেঁদে ফেল্‌ল। "এ বড় অন্যায়—"

"বাজে বোকো না—" স্যানিন বলল, "অন্যায়টা কি ?—হয়তো অন্যায়। কিন্তু, নোভিকফ্‌, যদি বুদ্ধিমান হয়, তা'হলে এ ব্যাপার নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাবে না।···আর যদি বিয়ে নাই হ[illegible] লীডা, আমি তো আছি। আমরা ছ'জনে এখান থেকে চলে যা[illegible] দূরে, এমন জায়গায়, যেখানে আমাদের কেউ চিনবে [illegible] জানবে না—"

চোখের জল ছাপিয়ে লীডা হেসে উঠল। যেন নতুন শ[illegible] পেয়েছে শরীরে, মনে। বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা ওর দৃ[illegible] উঠল। বলল, "যাই ঘটুক, আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

"বাঃ, এই তো চাই।" স্যানিন বলল। "জীবনের [illegible] লীডা, সব সময়েই জেনো, আমি তোমার পাশে আছি।···কী [illegible] তুমি লীডা ! একটা চুমু দাও—"

একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লীডা অনুভব করলো। স্যানি[illegible] ছুই হাতে জড়িয়ে ধরে ঊর্দ্ধমুখী ফুলের পাপড়ীর মতো ওর [illegible] তুলে ধরলো স্যানিনের আনত মুখের দিকে।

মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ ওর সমুন্নত স্তনযুগের ওপর ছড়িয়ে প[illegible]

| ক্রমশঃ

অনুবাদক—শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

এক বরষার কবিতা

মণিকা দেবী

"আজ এসেছে বরষা বন-প্রান্তর ছাড়ায়ে
ঘন কুন্তলদাম এলায়ে,
রাঙা গোধূলির সোনার বরণে
আলো-ঝলমল হাসির ঝলনে
কৌতুকে হেসে গড়ায়ে।
এসেছে বরষা বন-প্রান্তর ছাড়ায়ে।

তার আঁখি-তট আঁকা নিবিড় মেঘের কাজলে
পদতল ঘেরা বিবশ ব্যাকুল আঁচলে
অঙ্গে অঙ্গে কুসুম-গন্ধ জড়ায়ে,
এসেছে বরষা কৌতুকে হেসে গড়ায়ে।

শ্যাম-সবুজ সায়র তরঙ্গে উঠে আকুলি
ঘন বনবীথে আর্দ্র-বিহগ কাকলি
শত বিরহের স্মৃতিদল দিলো নাড়ায়ে
বধূরা কলস কটিতটে কূলে দাঁড়ায়ে।

দূর-বনে-বনে আজ উদাসী মনের
আঙ্গনে গোপন আঙ্গনে,
কে বিছায়ে দিলো স্বপনে মধুর স্বপনে
শুষ্ক মুকুল ! বল্লরী ফুল দুলায়ে !
এসেছে বরষা বন-প্রান্তর ছাড়ায়ে।

বহে কদম্ব-শাখে পূবালি বাতাস উচ্ছাসি
কোথা বাঁশি বাজে দূর-বনে মন উদাসী
ফিরে গেছে মাঝি তরণী এ-কূলে ভিড়ায়ে
বধূরা কলস কটিতটে কূলে দাঁড়ায়ে।

ওগো বধূরা হোথায় চলেছে কলস ভরণে
বিস্মৃত কতো স্মৃতি জাগে মেঘ বরণে
শূন্য কলস কটিতটে কূলে দাঁড়ায়ে
সজল আঁখির দৃষ্টি সুমুখে ছড়ায়ে।

ওগো এসেছে বরষা তটিনী কিনারে কিনারে
ধ্বনিয়া তুলিছে নব গীত-ঝঙ্কারে
ফিরে গেছে মাঝি তরণী এ-কূলে ভিড়ায়ে
ছুটেছে তটিনী কূলে কূলে ফুল কুড়ায়ে।"

বৌদ্ধ ভারত সন্ধানে

ফা-হিয়ান

পশ্চিমে দ্বাদশ যোজন দূরে বারাণসী। এই নগরীর দশ লী উত্তরে মৃগদাব বিহার। এই মৃগারণ্যে এক তপস্বী বাস করতেন, যার কাছে বন্য হরিণের দল রাত্রে বিশ্রাম নিতে আসত। তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের সপ্ত দিবস পূর্বে দেবগণ এই দৈববাণী প্রেরণ করেন—'শুদ্ধোধনের জাত পুত্র সংসার ত্যাগ করেছেন সত্যোপলব্ধির জন্য। অদ্য হইতে সপ্ত দিবসে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।' এই বাণী শ্রবণ মাত্রই তপস্বী নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। সেই হইতে এই অরণ্য মৃগদাব নামে খ্যাত। সেখানে একটি বিহার নির্মিত হয়েছে উত্তরকালে। এই স্থানে দু'টি সঙ্ঘারামে ভিক্ষুগণ বাস করেন।

এখান হতে উত্তর-পশ্চিম ত্রিশ যোজন দূরে কৌশাম্বী দেশে গোচীরবন। এখানে ভগবান বাস করেছিলেন। এখন হীনযানপন্থী শ্রমণদের বসতি।

দক্ষিণে দুই শত যোজন দূরে দাক্ষিণাত্য দেশে কাশ্যপ বুদ্ধের স্মরণে নিবেদিত এক পর্বত-বিহার। পঞ্চতলবিশিষ্ট এই বিহারটির নিম্নতলে পঞ্চ শত প্রকোষ্ঠ। নিম্নতলটির আকার করীসদৃশ। দ্বিতীয়টিতে চারি শত কক্ষ, আকার সিংহের। তৃতীয়টিতে তিন শত কক্ষ, আকার অশ্বের। চতুর্থে দুই শত কক্ষ, আকার বৃষের। শীর্ষতলে এক শত প্রকোষ্ঠ, আকার শ্বেত কপোত। শীর্ষে যে জলমুখটি অবস্থিত, তার জলধারা প্রত্যেকটি কক্ষ বেষ্টন করে সানুদেশে এসে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রস্তর-প্রকোষ্ঠগুলিতে গিরিগাত্র বিদীর্ণ করে বাতায়ন ও দ্বারপথ রচনা করা হয়েছে আলোক ও বায়ুর জন্য। চারি দিকে প্রস্তরগাত্রে সোপান নির্মিত হয়েছে গিরিচূড়া অবধি।

এ দেশ জনবিরল, ভূমি অকর্ষিত। বহু দূরে যে সকল পল্লী আছে সেখানে যারা বাস করে, তাদের কাছে বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম অথবা কোন অন্য ধর্মাচার অজ্ঞাত। তারা দেখে—এই বিহারে যাঁরা পূজার্ঘ্য নিবেদন করতে আসেন, আকাশে ভর দিয়ে আসেন তাঁরা। একবার এক প্রতিবেশী-দেশ থেকে বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই বিহারে আসার কালে এক পল্লীবাসী তাঁদের প্রশ্ন করে—'আপনারা আকাশে ভর করে আসেননি কেন?' উত্তরে বিনা দ্বিধায় ভিক্ষুগণ বলেন—'আজো আমাদের সে সৌভাগ্যোদয় হয়নি।'

দাক্ষিণাত্য পর্বতসঙ্কুল, বন্ধুর দেশ। যারা এ দেশ জানে, তারাও পথকষ্টে এ দেশের রাজার নিকট উপঢৌকন পাঠান। তখন রাজা পান্থের সুবিধার জন্য সঙ্গী প্রেরণ করেন। ফা-হিয়ান স্বয়ং এ-দেশ পরিভ্রমণ করেননি। তাঁর বিবৃতি লোকমুখে শ্রুত কাহিনীর উপর নির্ভর।

বারাণসী থেকে যাত্রী দল পাটলিপুত্র নগরীতে প্রত্যাগমন করলেন। মুখ্যতঃ বিনয় ও অভিধর্মের মূলসূত্রগুলি অনুলিখন করে নিয়ে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উত্তর-ভারতে এগুলি শ্রুতি মাত্র, লিপিবদ্ধ নয়। মধ্য-ভারতে এক মহাযানপন্থী বিহারে ফা-হিয়ান সেই অনুশাসনের লিপিবদ্ধ গ্রন্থ দেখলেন। ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষুগণ এই বিধানগুলিই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন এবং প্রথম মহাসভা এইগুলিই গ্রহণ করেন।

এই বিনয় গ্রন্থই কনকবিহারে ন্যস্ত আছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির জন্য অষ্টাদশ বিচার বর্তমান, যাদের কতকগুলি মূলের যথাযথরূপে অনুশীলিত, কতকগুলি বা প্রয়োজনানুসারে মুক্ত। এটি ভিন্নও ফা-হিয়ান সপ্ত সহস্র সূত্র-সম্বলিত মূল বিনয়ের অনুলিখন গ্রহণ করলেন, যা সর্বাস্তিবাদ গোষ্ঠী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন এবং যার অনুশাসন চীনে প্রচলিত। এগুলিও শ্রুতি। ষট্‌সহস্র সূত্রের অভিধর্ম, দুই সহস্র পাঁচ শত সূত্রের ইয়েন এবং বৈপুল্য পরিনির্বাণ সূত্রের পাঁচ সহস্র এবং মহাসভার গৃহীত অভিধর্মেরও তিনি অনুলিপি গ্রহণ করেন। এখানে তিন বৎসর বাস করে ফা-হিয়ান সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা করেন এবং বিনয়গুলি লিখন শেষ করেন।

মধ্য-ভারতের শ্রমণদের সংযত জীবনধারা ও স্থবিরদের রীতসী আচরণ অবলোকন করে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে ভাবলেন তাও-চেং, হায়, চীনের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে বৌদ্ধনীতি কত দূর অবজ্ঞাত ও বিকৃত হয়ে পড়েছে। শেষে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন—'যত দিন না বোধি লাভ করছি তত দিন যেন না আর সেখানে ফিরে যেতে হয়।' তাও-চে ভারতেই রয়ে গেলেন, কিন্তু ফা-হিয়ানের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র চীনে বৌদ্ধনীতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান প্রচার করা। কাজেই তাঁকে একাকীই প্রত্যাগমন করতে হোল চীনে।

তীর ধরে গঙ্গার প্রবাহমুখী আঠারো যোজন অতিক্রম করে ফা-হিয়ান গঙ্গার দক্ষিণতীরস্থ চম্পা রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে প্রভু বুদ্ধের এক বিরাট স্তূপ আছে—তিনি ধ্যানস্থ অবস্থায় যেখানে পরিভ্রমণ করতেন। সেখানে চার বুদ্ধ উপবেশন করেছিলেন সেখানেও গেলেন। তখন সেখানে একটি চৈত্য নির্মিত হয়েছে এবং শ্রমণেরা বাস করে।

এখান থেকে পূর্ব দিকে পঞ্চাশ যোজন অগ্রসর হওয়ার পর ফা-হিয়ান তাম্রলিপ্তে এসে উপস্থিত হলেন। তাম্রলিপ্ত একটি বিরাট সামুদ্রিক বন্দর। এখানে চব্বিশটি বিহার আছে। এখানে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব অতি প্রবল ও ক্রমবর্ধমান। ফা-হিয়ান সূত্রগুলি অনুলিখন এবং বৌদ্ধমূর্তির প্রতিকৃতি অংকনে দু'বছর অতিবাহিত করেন তাম্রলিপ্তে।

এই কার্য হলে তিনি জনৈক সওদাগরের সুবৃহৎ অর্ণবপোতে অধিরোহণ পূর্বক শীতের মৌসুমি সুবাতাসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন এবং চৌদ্দ রাত ও চৌদ্দ দিন জাহাজে অবস্থানের পর সিংহলে এসে পৌঁছলেন। সিংহল ভারতবর্ষ থেকে সাত শত যোজন দূরে অবস্থিত। সিংহল একটি দ্বীপময় প্রদেশ—পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর প্রসার পঞ্চাশ যোজন এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ত্রিশ যোজন। মূল ভূভাগটি শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালায় বেষ্টিত এবং প্রতি দ্বীপের মধ্যে ব্যবধান দশ, বিশ, বা দু'শত লী। দ্বীপগুলি কেন্দ্রীয় ভূভাগাধীন। এখানে মুক্তা ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি পাওয়া যায়। বিশেষ করে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দশ বর্গ লী পরিমিত একটি দ্বীপ মণির জন্য প্রখ্যাত। রাজার লোকেরা দ্বীপটি সযত্নে পাহারা দেয়—সংগৃহীত মুক্তার দশ ভাগের তিন ভাগ রাজা গ্রহণ করেন।

এই দ্বীপের আদিম অধিবাসী মানুষ নয়—দ্বীপটি এক সময় যক্ষ-রাক্ষসে অধ্যুষিত ছিল। বিভিন্ন পণ্য বিনিময়ে নিকটবর্তী প্রদেশের সঙ্গে এই দ্বীপের ব্যবসা চলত। আদান-প্রদানের সময় তারা উপস্থিত থাকত না, কিন্তু পণ্যের দাম পণ্যের গায়ে লিখে রেখে যেত। সওদাগরেরা লিখিত মূল্য মত দ্রব্যাদি রেখে প্রার্থিত সামগ্রী নিয়ে প্রস্থান করত। সওদাগরদের আনাগোনার ফলে দ্বীপের

নাম চারি দিকে ঘোষিত হয়—তখন অধিক সংখ্যক লোকের সেখানে আসা-যাওয়া চলতে থাকে এবং এই ভাবে একটি বিরাট জনপদ গড়ে ওঠে। এই দ্বীপের আবহাওয়া অতীব প্রীতিপদ। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সারা বছর গাছপালার মরশুম লেগেই থাকে এবং ভূমিকর্ষণের জন্য অধিবাসিগণকে বিভিন্ন ঋতুর দাক্ষিণ্যের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না।

প্রভু বুদ্ধ এ দেশে আগমন করে যক্ষ-রাক্ষসগণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং তিনি দৈবশক্তির সাহায্যে এক পা নগরের উত্তরে স্থাপনা করেন, আর এক পা স্থাপন করেন আদমের চূড়ায় এবং এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান পনেরো যোজন। নগরের উত্তরে পদচিহ্নের উপর চারশ' ফুট উচ্চ, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নখচিত একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। স্তূপটির পাশেই আছে একটি বিহার—নাম বরাভয় পর্বত। এখানে পাঁচ হাজার শ্রমণের বাস। বিহারাভ্যন্তরে একটি বহুমূল্য রত্নখচিত স্বর্ণ-রৌপ্যমণ্ডিত বৌদ্ধকক্ষে সবুজ প্রস্তরময় তথাগতের একটি মূর্তি আছে। মূর্তিটি সপ্ত রত্নে দীপ্তিমান এবং মূর্তির মুখমণ্ডল বর্ণনাতীত গাম্ভীর্যে মহীয়ান্ ও তেজোদৃপ্ত। মূর্তিটির দক্ষিণ করে একটি অমূল্য মুক্তা শোভিত।

বহু দিবস ফা-হিয়ান স্বদেশ হতে দূরে আছেন। দিন তাঁর কেটেছে নানা বিচিত্র দেশে, বিচিত্র পরিবেশে—যে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা চোখে পড়েছে তারাও অতীত দিনের মত নয়। এই দুর্গম পথযাত্রায় যারা সহযোগী হয়েছিল তাঁর, তাদের সাথেও ঘটেছে বিচ্ছেদ। কেউ থেকে গেছেন এ দেশে এবং কেহ বা এখানেই দেহরক্ষা করেছেন। এখন প্রতিনিয়ত নিজের কায়ার ছায়া চোখে দেখে দেখে মন বিকল ও বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ প্রস্তর-মূর্তির পাশে এক জন সওদাগরকে চীনদেশ থেকে আনীত ব্যজনী উপহার দিতে দেখে ফা-হিয়ান গভীর আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন—চোখ ঝাপসা হয়ে এল জলে।

এই দেশের এক রাজা বোধিবৃক্ষের বীজ সংগ্রহের জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেন মধ্য-ভারতে। সেই বীজ বৌদ্ধ-মন্দিরের চারি পাশে বপন করা হয়েছিল এবং সেই বীজ থেকে অংকুরিত একটি বৃক্ষ আজ দু'শত ফুট উচ্চ হয়ে উঠেছে। গাছটি যখন দক্ষিণ-পূর্বে হেলে পড়ে, রাজা গাছটি ভেঙ্গে পড়ার ভয়ে অভিভূত হয়ে গাছটিকে ঘিরে আট-ন' হাত ব্যাসযুক্ত একটি বেদী নির্মাণ করে দিয়েছেন। বেদীর ঊর্ধ্বাংশ আর গাছটি যেখানে মিশেছে সেখান থেকে বহু ঝুরি নেমেছে—ঝুরিগুলি বেদী ভেদ করে প্রবেশ করেছে মেদিনীগর্ভে। এই ঝুরি থেকে যে শেকড় গজিয়েছে তাদেরও ব্যাস চার বিঘত। বেদীটি যদিও বিদীর্ণ হয়েছে, তথাপি বেদীটিকে অপসারিত করা হয়নি। বৃক্ষের পাদমূলে বৌদ্ধমূর্তি-সম্বলিত একটি স্তূপ আছে, সেখানে জনসাধারণ আর শ্রমণদের নিরবচ্ছিন্ন ভিড় লেগেই থাকে।

নগরে প্রভু বুদ্ধের দণ্ড গ্রহণের জন্যও একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছে। উভয় স্তূপই সপ্তরত্নখচিত।

দেশের রাজা ব্রহ্মের ধর্মনীতি অতি কঠোর ভাবে অনুসরণ করেন এবং নগরবাসিগণের ধর্মনিষ্ঠাও অতি প্রবল। যেদিন থেকে দেশটি সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হয়েছে, সে দিন থেকে দুর্ভিক্ষ বা বিদ্রোহ বিরল এ দেশে। শ্রমণদের ধনভাণ্ডারে আছে বহু অমূল্য রত্ন ও মুক্তা। একদা দেশের রাজা এই রত্ন-ভাণ্ডার দেখতে এলে মুক্তা সংগ্রহে তাঁকে লোভাতুর করে তোলে এবং তিনি বলপ্রয়োগ দ্বারা সেই মুক্তারাজি অধিকারে সচেষ্ট হন। তিন দিন পরে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়, তখন তিনি মুক্তারাজি প্রত্যর্পণ করেন এবং মাটিতে মাথা ঠুকে এই জঘন্য অপরাধের জন্য অনুশোচনা করতে থাকেন। তিনি বললেন—'আমার ইচ্ছা, আপনারা এমন ন্যায়বিধান রচনা করুন, যাতে আজ হতে দেশের রাজারও এই কোষাগারে প্রবেশের পথ চির-রুদ্ধ হোক্—একমাত্র চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ধর্মনিষ্ঠ ভিক্ষু সন্ন্যাসীর এখানে প্রবেশাধিকার থাকবে।'

এই নগরে বহু শ্রমণ ও শ্রেষ্ঠীর বাস। প্রধান শ্রেষ্ঠিগণের বাসগৃহগুলি অতি মনোরম। প্রধান প্রধান পথ ও শাখা-পথগুলি সুসমতল ও পরিচ্ছন্ন। যেখানে চারটি পথ এসে মিলিত হয়েছে, সেই চৌরাস্তার মোড়ে একটি ছোট্ট ভজনালয় আছে সেখান হ'তে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-কার্য চলে। প্রতি মাসের ৮ই, ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে একটি সুউচ্চ মঞ্চ নির্মিত হয় এখানে এবং নানা দিগ্‌দেশ হতে বহু শ্রমণ ও জনসাধারণের সমাগম হয় বৌদ্ধধর্মমতের ব্যাখ্যা শ্রবণের উদ্দেশ্যে। দেশের লোকেরা বলে, সে দেশে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার শ্রমণের বাস এবং তারা প্রত্যেকেই একটি সাধারণ ভাণ্ডার হতে খাদ্য গ্রহণ করে। রাজাও পৃথক্ ভাবে প্রতি পাঁচ-ছ' হাজার শ্রমণের জন্য একটি ভোজনালয় তৈরী করে দিয়েছেন। আহারের সময় প্রত্যেক শ্রমণ নিজস্ব পাত্র হস্তে সেখানে গমন করেন এবং প্রয়োজন মত খাদ্য গ্রহণান্তে ফিরে আসেন।

তৃতীয় চান্দ্র মাসের মাঝামাঝি বুদ্ধের দন্ত নিয়মিত স্তূপাভ্যন্তর থেকে বাহিরে আনয়ন করা হয়। উৎসবের দশ দিন পূর্ব থেকে রাজার নির্দেশে একটি বিরাট ঐরাবতকে বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত করা হয় এবং এক জন বাক্‌পটু লোক রাজকীয় পোষাকে সেই ঐরাবত-পৃষ্ঠে অধিরূঢ় হয়ে ঢক্কা-নিনাদ যোগে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে—'বোধিসত্ত্ব তিনটি অপরিমেয় যুগব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনা করেছেন—দৈহিক কষ্ট বা নিজের জীবনের প্রতিও দৃক্‌পাত করেননি। তিনি স্বদেশ-স্বজন-দারা-পুত্রকে বিসর্জন দিয়েছেন, পরার্থে নিজের নেত্র উৎপাটিত করেছেন, কপোতকে রক্ষার জন্য দেহের মাংস কর্তন করে দিয়েছেন, ভিক্ষামুষ্টি হিসেবে মস্তক দান করেছেন আর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রিণীকে দান করেছেন নিজের দেহ। এই ভাবে জীব-জগতের কল্যাণের জন্য তিনি সবপ্রকার আত্মনিগ্রহ সহ্য করেছেন এবং এই পথেই পেয়েছেন বৌদ্ধত্ব। উনপঞ্চাশ বার তিনি মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হয়ে প্রচার করেছেন বৌদ্ধধর্ম, পাপীকে ত্রাণ করেছেন, ক্লান্তকে দিয়েছেন আশ্রয়—মুক্তি-বঞ্চিতকে দিয়েছেন অপার মুক্তি। মর্তলোকের সম্পর্ক সম্পূর্ণ পরিপূরিত হলে তিনি তিরোধান করেন। চোদ্দশ' সাতানব্বই বছর পূর্বে মহানির্বাণ প্রাপ্তির পর মর্ত্যলোকের নয়ন-দীপ নির্বাপিত হয় এবং জীব-জগত শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। দশ দিন পরে তথাগতের দন্ত স্তূপাভ্যন্তর থেকে বাহিরে আনয়ন পূর্বক বরাভয় পর্বতে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। অতএব শ্রমণ ও জনসাধারণেরা যারা ঐহিক সুখ কামনা করেন, ঐ পুণ্য দিবসের জন্য রাস্তা-ঘাট সুসমতল ও সজ্জিত রাখবেন, পুষ্প-ধূপ-ধুনা ও পূজোপচার সংগ্রহ করবেন প্রতি গৃহে-গৃহে।'

এই ঘোষণা-বাণী প্রচারের পর রাজাধিরাজ স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যে পাঁচ শত বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার প্রতিমূর্তি সমূহ

পথের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত করেন। বুদ্ধের রাজপুত্র সুদনা বা বিদ্যুৎপর্ণা মূর্তি, গজপতি, হরিণ, ঘোটক মূর্তি প্রভৃতি। এই প্রতিকৃতিগুলি এমন নিপুণ ভাবে অংকিত করা হয় যে, দেখলে মনে হবে জীবন্ত প্রতিকৃতি। অবশেষে দন্তটি স্তূপাভ্যন্তর থেকে বাহির করে প্রধান রাজপথ দিয়ে বরাভয় পর্বতে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে অগণিত জনতা অর্ঘ্য অর্পণ করে। পরে বরাভয় পর্বতে বৌদ্ধকক্ষে দন্তটি স্থাপনা করা হয়। সেখানেও শ্রমণ ও জনসাধারণের বিপুল সমাগম হতে থাকে—ধূপ পুড়িয়ে, আলোক-বর্তিকা জ্বালিয়ে দিন-রাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নানা উপচারে পূজার্ঘ্য নিবেদন চলে। নব্বই দিন অতিবাহিত হবার পর দন্তটিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নগরে। উপবাসের দিনগুলিতেও পূজা-নিবেদনের জন্য স্তূপদ্বার উন্মুক্ত থাকে।

বরাভয় স্তূপের পূর্ব দিকে চল্লিশ লী দূরে একটি পর্বত আছে—নাম মিহিন তাল। পর্বতশীর্ষে একটি বিরাট বিহার আছে—নাম ভদ্রিকা। এখানে দু'হাজার শ্রমণের বাস। এদের মধ্যে এক জন শ্রমণ আছেন যাঁর নাম পুণ্যাত্মা ধর্মগুপ্ত। তিনি দেশের লোকের অতীব শ্রদ্ধার পাত্র এবং বিপদের দিনে লোকেরা তাঁর কাছে উপদেশের জন্য আগমন করে। একটি প্রস্তর-কক্ষে তিনি চল্লিশোর্ধ বৎসর কাটিয়েছেন। তাঁর অহিংস আচরণে অহি-নকুল একত্রে বিনা হিংসায় বাস করে।

এ দেশে বাসকালে এক দিন এক উন্নত মঞ্চ থেকে ভাষণ-রত এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুখে ফা-হিয়ান এই বিবৃত শোনেন।

ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষাভাণ্ড প্রথম ছিল বৈশালী নগরীতে, এখন সেটি আছে গান্ধার দেশে। বহু বর্ষ পরে, কত ভুলিয়া গিয়াছেন ফা-হিয়ান, সেটি পঞ্জাব দেশে স্থানান্তরিত হইবে, তাহার সমকাল পরে খোটানে, তার পর কাশ্মীর। এই ভাবে চীন, সিংহল পরিভ্রমণ শেষে সেটি ফিরিয়া আসিবে মধ্য-ভারতে। সেখান হইতে স্বর্গলোকে প্রয়াণ করিলে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় সেটি অবলোকন করিয়া আনন্দিত কণ্ঠে এই কথা উচ্চারণ করিবেন—'শাক্যমুনি বুদ্ধের ভিক্ষাভাণ্ড প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।' তৎপর সপ্ত অহোরাত্র দেবগণ তাহাকে পুষ্প-ধূপাদি নিবেদন করিবেন। তাহার পর সেটি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলে এক জলযক্ষ আপন প্রাসাদে সেটি রক্ষা করিবেন। মৈত্রেয় যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, তখন এক পাত্র চতুরাংশে বিভিন্ন হইবে এবং সেগুলি বিনতক পর্বতে প্রত্যাগমন করিবে।

তখন স্বর্গের চারি দেবরাজ পূর্বাপর বুদ্ধের শরণ লইবেন এবং সর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। সহস্র বুদ্ধও এই নবদেহী পাত্র গ্রহণ করিবেন। পাত্রটির প্রত্যাবৃত্তের পর বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি হইবে এবং মানুষের আয়ু হ্রাস পাইয়া পাঁচ বা দশ বর্ষে সীমায়িত হইবে। অন্ন ও হবি অদৃশ্য হইবে। মনুষ্য দুরাচারী হইবে। হাতের দণ্ডগুলি পরিণত হইবে তরবারিতে এবং হানাহানি চলিতে থাকিবে। ধর্মাচারী মনুষ্য পর্বতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। সমগ্র দুরাচারী মনুষ্য-সমাজ পরস্পর হানাহানি করিয়া আত্মলুপ্ত হইলে পর সাধুজন পর্বতাশ্রয়ে এই ভাবে আলোচনা করিবে। 'ভগবানের বিধানের বিরোধিতা করিয়া দুরাচারী মানুষরা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের আয়ু কাল দশ বর্ষ হ্রাস করিয়াছে। সৎকার্য, করুণা এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি ও কর্তব্য আচরণ করিয়া আমরা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া অষ্ট সহস্র বৎসর অবধি করিব। মৈত্রেয় বোধি লাভের পর প্রথম নির্বাণ দান করিবেন সেই সকল শিষ্যকে, শাক্যমুনি ধর্মাচার শিক্ষা দান করিয়াছিলেন যাহাদের এবং যাহারা শ্রমণ। যাহারা জীবনে ত্রিপিটক, পঞ্চ অনুশাসন এবং উপবাসের নিয়মগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়াছেন।'

এই দেশে দুই বৎসর অবস্থান কালে ফা-হিয়ান বহু সন্ধানের পর চীনে অজ্ঞাত কতকগুলি মূল গ্রন্থের অনুলিপি লাভ করেন। তন্মধ্যে বিনয় ও আগমের প্রামাণ্য কয়েকখানি। অতঃপর একখানি অর্ণবপোতে দুই শত যাত্রীর মধ্যে তিনিও সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। জলযানটি বৃহৎ এবং তাহার সঙ্গী একখানি ক্ষুদ্র পোত বিপদের আশ্রয়স্বরূপ। দুই দিবস শান্ত সমুদ্র-বায়ুতে পূর্বমুখে অগ্রসর হওয়ার পর ঝড়ের সম্মুখীন হলেন তাঁরা। সেই সঙ্গে পোতে ছিদ্রপথে জল প্রবেশ সুরু হল। বণিকেরা বৃহৎ পোত পরিত্যাগ করে ক্ষুদ্রকায়টিতে আশ্রয় নেওয়া মনস্থ করলে, দ্বিতীয়টির আরোহিগণ রজ্জুবন্ধন কেটে দিলেন, যাতে অতিরিক্ত ভাবে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা না হয়। মৃত্যুর মুখে বণিকেরা ভয়ত্রস্ত হয়ে পোতের গুরুভার সামগ্রী সকল জলে নিক্ষেপ করতে সুরু করলেন। ফা-হিয়ানও তার যথাসম্ভব সকল উপকরণাদি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর এই আশঙ্কা হোল যে, বণিকেরা হয়ত বা তাঁর পরম আরাধ্য গ্রন্থগুলি ও মূর্তিসমূহ জলাশ্রিত করে। তখন তিনি দেব কুয়াং ইনের নিকট প্রার্থনা করলেন—'ধর্মের জন্যই এই পর্যটন করেছি প্রভু। ভগবান, আপনার অপরিসীম করুণায় আমাকে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হতে দিন।'

ত্রয়োদশ দিবা-রাত্র এই ঝটিকার সঙ্গে সংগ্রাম করে ভাঁটার সময় পোত এক দ্বীপের নিকটবর্তী হোল যখন, তখন যাত্রিগণ পোতের ছিদ্রপথ নির্দ্ধারণ করতে পেরে সমুচিত প্রতিবিধান করলেন। তার পর আবার যাত্রা সুরু হোল।

এই নৌপথে জলদস্যু মৃত্যুরই প্রতীক। অসীম সমুদ্রে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌ভ্রান্তি ঘটে। আকাশে সঞ্চরণশীল সূর্য, চন্দ্র ও রাশিগুলির নির্দেশেই পোত অগ্রসরশীল। মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে পোত চলে যদৃচ্ছ, বায়ুর অভিরুচির উপর নির্ভর করে। রাত্রির তিমিরান্ধকারে কেবল দৃষ্টিগোচর হয় তরঙ্গে-তরঙ্গে সংঘর্ষজাত আলোক-শিখা, দেখা যায় সঞ্চরণশীল সামুদ্রিক প্রাণী সকল। সেই অতল সমুদ্র মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক দল বিপর্যস্ত। যখন আকাশ মসীমুক্ত হল, দিক্‌নির্ণয় হোল সম্ভব, তখন পোত আবার আপন গতিপথে অগ্রসর হতে সুরু করল। নব্বই দিন পরে তাঁরা পৌঁছলেন জাভায়। সেখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরই প্রতিপত্তি, বৌদ্ধ-ধর্মের চরম অধঃপতিত অবস্থা।

পাঁচ মাস এই দেশে বাস করে আবার সমুদ্র পাড়ি দিলেন ফা-হিয়ান আর একটি বণিক-পোতে? পঞ্চাশ দিনের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চতুর্থ চান্দ্র মাসের ষোড়শ দিবসে যাত্রা সুরু হোল। ফা-হিয়ান গেলেন নিভৃত তপশ্চর্যায়।

ঈশান কোণে অগ্রসর হয়ে অর্ণবপোত পৌঁছবে ক্যান্টন এইরূপ স্থির ছিল। এক মাস পরে এক দিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর এক বিরাট ঝড় উঠল। স্বদেশমুখী বণিক দল সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠায় ফা-হিয়ান আবার দেবতার শরণ নিলেন। সারা রাত্রির পর দিবাগমে

যাত্রী ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় স্থির করলেন—'এই বৌদ্ধ শ্রমণ আমাদের সহযাত্রী বলেই অর্ণবপোতের এই বিপদ। এক জনের জন্ম সকলের বিপদ বরণ করা অপেক্ষা এই শ্রমণকে কোন দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া সমীচীন।' ফা-হিয়ানের এক ধর্মমিত্র প্রত্যুত্তরে বললেন—'যদি তাই স্থির হয় তবে এই ভিক্ষুর সঙ্গে আমাকেও কোন দ্বীপে ত্যাগ করা হোক্‌। আর যদি তা না কর তবে ঐ যাত্রীকে নামানোর পূর্বে আমাকে হত্যা করা উচিত, কেন না জীবিত থাকলে চীন দেশে পৌঁছে আমি চীন-সম্রাটের কাছে সকল তথ্য নিবেদন করব। সম্রাট নিজে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণদের তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন।' এই কথায় বণিকেরা বিচলিত বোধ ক'রে আর সে কাজে সাহসী হলেন না।

ইতিমধ্যে ঘন-ঘটাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পোতাধ্যক্ষ দিশা হারালেন। সত্তর দিবস পরে খাদ্য-পানীয়ের অভাব সুরু হলে সকলে স্থির করলেন যে, পোত ভুল দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন উত্তর-পশ্চিম কোণে আবার নূতন যাত্রা সুরুর পর দ্বাদশ দিবসে তারা পৌঁছলেন লাও পর্বতমালার দক্ষিণে এক স্থানে।

এত বিপদ, দুঃখ এবং ভীতির পর তাঁরা তীরপ্রান্তে পৌঁছলেন যেখানে, সে দেশ মনুষ্য-সমাগমবিহীন বটে—কিন্তু পত্র-গুল্মের আকারে ও প্রকারে যাত্রীরা বুঝলেন যে, এ তাঁদেরই পিতৃভূমির অংশ। কিন্তু স্থান-পরিচয় নিয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল। অবশেষে কয়েক জন ছোট নৌকা নিয়ে তীররেখা ধরে অগ্রসর হলেন এবং বহু সন্ধান শেষে দু'জন শিকারীকে নিয়ে ফিরলেন। ফা-হিয়ান তাদের প্রশ্ন করলেন—'তোমরা কে?' উত্তর হোল—'আমরা ভগবান বুদ্ধের শরণাগত।' তাদের কাছে প্রশ্ন করে বণিকেরা জানলেন, এই তীরভাগ মূল চীন ভূভাগেরই অন্তর্গত এবং প্রখ্যাত লাই বংশের অধীন।

মহাস্থবির লী যখন জানলেন যে, সমুদ্রপারের দেশ থেকে এক জন বৌদ্ধ শ্রমণ ভগবানের অমূল্য গ্রন্থনিচয় ও মূর্তি-বিগ্রহ সকল আনয়ন করেছেন, তিনি স্বয়ং সেই স্থানে আগমন করে সেগুলি গ্রহণ করে আপন আবাসে নিয়ে গেলেন। সেই চী-চাউ দেশে আমন্ত্রিত হয়ে ফা-হিয়ান এক শীত ও এক গ্রীষ্ম অতিবাহিত করলেন। সেখান হতে দক্ষিণে নানকিং গিয়ে তিনি তাঁর আহরিত সম্পদ দান করলেন বিহারে।

চ্যাং-আন থেকে মধ্য-ভারত অবধি যাত্রা-পথে ফা-হিয়ানের কেটেছিল ছ'বৎসর। আরও ছ'বৎসর বাস করে সে দেশে তিনি স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় লেগেছিল তাঁর তিন বৎসর। প্রায় ত্রিশটির অধিক দেশ তিনি এই পর্যটনায় পরিভ্রমণ করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে তিনি ভূর্জপত্রে এবং রেশমের বস্ত্রের উপর তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন এই আশায় যে, সাধু পাঠক সেই বৃত্তান্ত পাঠে তাঁর লব্ধ জ্ঞানের সুধা পান করতে পারবেন।

সমাপ্ত

অনুবাদক—জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী ও শিশিরকুমার সেনগুপ্ত

একটি নিবেদন

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমার কাছে আমার আছে
একটি নিবেদন—
আমার সাথে আমার নিও
সকল বন্ধন।
আমার বাঁধন আমার পায়ে
থাকুক বাঁধা আপন হ'য়ে
(যেন) আমার বাঁধন পরে' কেহ
করে না ক্রন্দন।
আমার স্মৃতি ধরার বুকে
একটুও না রয়—

আমার কথা সকাল-সাঁঝে
কেউ না যেন কয়।
আমার যে সুর হাওয়ায় ভাসে
সেথায় কাঁপন তার না আসে
তোমার সুরে এবার প্রিয়
হোক না তাহা লয়।
চিহ্ন আমার ভিন্ন করে
কেউ না যেন আঁকে
কেউ যেন না নিজের বুকে
আপন করে রাখে

কেউ যেন না আমার তরে
ব্যথায় কাঁদে ধরার 'পরে
ধরার ধুলায়, নবীন ঘাসে
হয় যেন মোর লয়
আমার কথা সকাল-সাঁঝে
কেউ যেন না কয়।

বলিদান

শ্রীসত্যেন আচার্য্য

দোতালা বাড়ী। সবুজ রং। সামনে কেয়ারী-করা ফুলের বাগান। ঘাসের সবুজ আস্তরণের মাঝ দিয়ে লাল রাস্তাটা সুরকীর গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যুঁই-এর লতানে গাছ বারান্দার গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। ফটকের গায়ে শ্বেত পাথরের উপর ক্ষোদিত···রায় বাহাদুর রমানাথ মুখার্জী।

দক্ষিণের গবাক্ষ দিয়ে জয়শ্রী তাকিয়ে ছিল দূরের আকাশে। আকাশটা ঘোলাটে, সবে মাত্র দু'-একটা নক্ষত্র উঠেছে। মুগ্ধ নেত্রে জয়শ্রী দেখছিল আকাশের তারাগুলিকে। ওগুলিও জ্বলছে। মিট মিট করে জ্বলছে। একবার জ্বলে আবার নেবে,—আবার জ্বলে। মুগ্ধ চিত্তে জয়শ্রী তাদের দেখে। এখন সন্ধ্যা। সবে সন্ধ্যা।

পশ্চিমের আকাশে অল্প অল্প মেঘ। ফুর-ফুর হাওয়া বইছে। জয়শ্রীর মন চিন্তায় ভারাক্রান্ত,—স্বামী দরিদ্র বলে কি সে স্বামীর ঘরে যাবে না? ধনীর কন্যা কি কোন দিন······না, বাপের বাড়ী আর সে থাকবে না। ও যাবে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে ও যাবে দরিদ্রের ঘরে। জয়ন্ত কাল আসবে। ও চলে যাবে। বিষণ্ণ মন। ক্লান্ত দেহ। বিষাদ-করুণ মুখ। উদাস দৃষ্টিতে জয়শ্রী তাকিয়ে থাকে দূরে···বহু দূরে···শূন্যে···আকাশের দিকে···ঐ পশ্চিমের আকাশে।

* * * *

তারা মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত তাদের নাম। সংসারের অসংখ্য অজানা লোকের মধ্যে তারা অতি নগণ্য। কোন রকমে নিজেদের তারা শুধু বাঁচিয়ে রাখে। কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, অপমান নেই, আক্ষেপ নেই। অনাচার, অবিচার ও উৎপীড়ন নীরবে সহ্য ক'রে তারা বেঁচে থাকে। ধনীর দাপটে তারা ম্রিয়মাণ। প্রতিবাদের সাহস তাদের নেই। কারণ তারা যে দরিদ্র, নিঃস্ব, মধ্যবিত্ত। জয়ন্ত সেই দলে।

এক দিন জয়ন্তরাও ছিল ধনী লোক। পিতা রামনারায়ণ ছিলেন গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন। সহৃদয়, মহান্ হিসাবে তিনি ছিলেন সকলের নিকট সুপরিচিত। দীন-দরিদ্রের তিনি ছিলেন কাণ্ডারী, আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা, অসহায়ের সহায়। তারিণী দেবী স্বামীকে কত অনুরোধ করেছিলেন—আমাদের অবর্ত্তমানে জয়ন্ত কি পথে দাঁড়াবে? জয়াকে কি বিয়ে দিতে হবে না? কত বার বলেছিলেন, কলসীর জল গড়াতে গেলে বাড়ে না, সে কমেই। তেমনি তোমার এই অজস্র দান এক দিন তোমাকে নিঃস্ব করবেই। জয়ন্ত তখন দাঁড়াবে কোথায়?

রামনারায়ণ মৃদু হাসতেন আর বলতেন, "ও কিছু ভেব না তুমি। ও ঠিক দাঁড়াবে। আর রামনারায়ণও চায় না যে, তার ছেলে পিতৃ-পরিচয়ে বড় হোক! পিতার ধনে, ধনবান হোক। দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে যদি আমার জয়ন্ত বড় হয় তবে তুমি দেখো, ও হবে খাঁটী সোনা। ও বুঝবে দরিদ্রের দুঃখ কতটুকু। দুঃখই যে মানুষকে মহান্ করে।" রামনারায়ণ হঠাৎ থেমে যেতেন। আবার বলতেন, "দুঃখের সঙ্গে লড়াই আছে বলেই তো আমাদের মনুষ্যত্বের গরিমা, নইলে পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকতো কোথায়?" এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলে একটু যেন হাঁপাতেন।

তারিণী দেবী কপট রোষে শুধু বলতেন, "বুঝি না বাপু তোমার ঐ সব কথা।" রামনারায়ণ মৃদু হাসতেন।

দানেই ছিল রামনারায়ণের বিমল আনন্দ। তাই তাঁর মৃত্যুর পরেও দেখা গেল, তাঁর জোত জমা যা ছিল তাও দানপত্র ক'রে গেছেন গাঁয়ের দেবতা চণ্ডী মায়ের সেবায়। সেবাই ছিল তাঁর আজন্ম ব্রত। তাই তাঁর সম্পত্তির যা অল্প আয় সেই আয়ে হ'ল চণ্ডী মায়ের পূজার অর্ঘ। রামনারায়ণের শেষ দান শেষ পূজার ডালি।

* * * *

জয়ন্ত আর জয়া ভাই আর বোন। বিধবা তারিণীর অঞ্চলের নিধি। একমাত্র অবলম্বন।

দারিদ্র্যের মুহুর্মুহু কশাঘাত। তবু ওরা বাঁচে। ওরা বড় হয়। বড় হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট জয়ন্ত আর জয়া। বিধবা তারিণীর একমাত্র অবলম্বন জয়ন্ত আর জয়া। দারিদ্র্য-পীড়িত জয়ন্ত আর জয়া।

তারিণী চণ্ডী মায়ের 'থানে' মাথা কোটে। গলদশ্রু তারিণী প্রার্থনা করে···ওদের বাঁচিয়ে রাখ ঠাকুর।

···মাটির দেবতা নীরব, নিশ্চল।···মানুষের ভগবান হা হা করে।

কালের স্রোতে কয়েকটা বছর গেছে মিলিয়ে। জয়ার হয়েছে বিয়ে। জয়ন্ত এখন কলেজে পড়ে। অভাগিনী তারিণীর দরিদ্র জয়ন্ত এখন কলেজে পড়ে। প্রথম বসন্তে পত্রহীন রক্ত-কাঞ্চনের গাছ হঠাৎ যেমনি ফুলে-ফলে ভরে ওঠে, তারিণীর মন সেইরূপ নানা সুখ-স্বপ্নে ভরে যায়।···'জয়ন্ত কলেজে পড়ে। আমার জয়ন্ত বড় হবে···মানুষ হবে···দশ জন ওকে চিনবে ও রামনারায়ণের সন্তান!' কোন্ এক আবেগে অশ্রুসিক্তা তারিণী রামনারায়ণের ফটোর সামনে দাঁড়ায়। করজোড়ে প্রার্থনা করে···'তোমার জয়ন্তকে আশীর্ব্বাদ করো।'

কোন ক্রমে কলকাতায় মামার আশ্রয়ে থেকে কলেজের পড়াশুনা চালিয়ে নিতে পেরেছে জয়ন্ত। ছাত্রমহলে জয়ন্তর খুব নাম। মেধাবী ছাত্র হিসাবে কলেজের বন্ধুরা ওকে খুব খাতির করে। এমনি এক পরিবেশে জয়ন্তর সঙ্গে জয়শ্রীর হ'ল পরিচয়। ধনীর কন্যা জয়শ্রী জয়ন্তকে ভালবেসে ফেলে। দারিদ্র্যের মাঝে প্রতিপালিত জয়ন্ত ধনীর আবহাওয়া থেকে যেন দূরে থাকতে চায়। ধনীকে সে শুধু ঘৃণা করে না—ভয়ও করে।

জয়শ্রীর জীবন হা হা করে। কটাক্ষ যেন জয়ন্তকে বলতে চায় তার হৃদয়ের অভিব্যক্তি। যেন বলে—গর্ব্বিত জয়ন্ত, তুমি দাঁড়াও। ফিরে তাকাও। আমাকে দেখ। আমি সর্ব্বহারা। তোমার ভালবাসার আশ্রয়ে আমি বাঁচতে চাই।

জয়ন্তর ভ্রূক্ষেপ নেই। ভালবাসা তো তার জন্যে নয়। ধনীর কন্যা জয়শ্রীর সাহচর্য্য তার তো পাওনা নয়। সে যে দরিদ্র, নিঃস্ব, অসহায়ের দলে।

জয়শ্রীর বিক্ষুব্ধ অন্তর যেন বাধা মানে না। ভালবাসার আগুনে অবিরল দগ্ধ হ'তে থাকে ওর অন্তর। ওর যা কিছু নিঃশেষে জয়ন্তকে বিলিয়ে দিতে চায়। মুহূর্ত্তে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে যেন তৃপ্তি পেতে চায়। ভয়বিহ্বল নেত্রে একদা জয়শ্রী বলে—'জয়ন্ত, তোমায় আমি ভালবাসি।' জয়ন্তর অন্তরেও যেন নীরব ভাষা—'বাসি, বাসি, আমিও বাসি।'

রায় বাহাদুর রমানাথের একমাত্র কন্যা জয়শ্রী। উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কোন ধনীর পুত্রবধূ হ'বে জয়শ্রী, রমানাথের এই ছিল লক্ষ্য। তাই রমানাথ সযত্নে মেয়েকে রুচিমার্জ্জিতা, আধুনিকা ও শিক্ষিতা ক'রে তুলছিলেন। দরিদ্রের ঘরে মেয়ের বিবাহ দেওয়া ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে।

সংযমের কঠিন আবরণ ভেঙ্গে জয়শ্রী তার মায়ের কাছে জানালো,—একটি দরিদ্র ছেলেকে সে ভালবাসে।

প্রথমে রমানাথ বিবাদ গণলেন। তাঁর কল্পনা যে এমনি কোন এক ঝঞ্ঝায় সহসা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ভেবে তিনি শিউরে উঠলেন। তবে চির আদরের কন্যা যদি সুখী হয়তো হোক। জয়শ্রীর সঙ্গে জয়ন্তর বিবাহের এই হ'ল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

* * *

বালীগঞ্জের কোন এক পল্লীতে জয়ন্তর ছোট বাসা। দারিদ্র্যের প্রতিটি চিহ্ন তাতে বিরাজমান। বি-এ পাশ ক'রেও জয়ন্ত কোন সুবিধা ক'রে উঠতে পারেনি। দরিদ্র বাঙালীর ভাগ্যে যা জোটে, জয়ন্তরও তাই। কোন ব্যাঙ্কের সে না কি এক কেরাণী।

সাধারণ মানুষের চেয়ে জয়ন্ত একটু ভিন্ন। গরীব হ'লেও বড়লোকের মুখাপেক্ষী সে নয়। নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে চায়। ধনীর আশ্রয়ে বড় হবার ছেলে জয়ন্ত নয়।

অভাবের সংসার। কেরাণীর সংসার। জয়শ্রীর সংসার। জয়শ্রীর পিতা দারিদ্র্যকে দেখতে অভ্যস্ত নন। জয়ন্তও তাঁর বদান্ততায় বড় হ'তে চায় না। রমানাথের সাহায্য নিতে সে নারাজ। জয়শ্রীর অনিচ্ছা সত্বেও অধিক দিন তাই রমানাথ কন্যাকে শ্রীবাড়ীতে এনে রাখেন।

জয়শ্রীর সংসার। অভাব আর অনটন। অভাবের সংসারে জয়শ্রীর মন ইদানিং কেমন যেন অন্যমনা। মাতা-পিতার গঞ্জনা, অভাবের তাড়না, স্বামীর অক্ষমতা অন্তঃসত্ত্বা জয়শ্রীকে কেমন যেন পাগল ক'রে তুলেছে। ওর ধৈর্য্যের বাঁধ গেছে ভেঙে। দারিদ্র্যের তিক্ততায় জয়শ্রীর মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। দৈন্যের গ্লানিতে জয়শ্রীর মনুষ্যত্ব পঙ্গু—মুমূর্ষু।

—"শ্রী!"

—"কেন?"

—"অভাবের সংসারে কত তোমার কষ্ট হয়, না?"

—"যা দৃষ্টির অগোচরে নয়, সে প্রশ্ন অবান্তর।"

—"তুমি তো জান, এত চেষ্টা করেও…"

—"সব বুঝি।"

—"আমি অক্ষম। আমায় ক্ষমা করবে শ্রী?" জয়ন্তর কথায় মিনতির সুর।

জয়শ্রী বলে—"বাবার সাহায্য নিতেই বা তোমার এত বাধে কেন? গরীব যারা তাদের আবার অভিমান? লজ্জা করে না?" কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সব। হঠাৎ যেন মুখরা হ'য়ে উঠেছে। পুঞ্জিত অভিমানে গুমরে-গুমরে উঠছে ওর অন্তর।

—"গরীব ব'লেই তো নিতে বাধে জয়শ্রী! কে যেন বলে, নিস না, নেওয়া অসঙ্গত। হাত পাতিস না। পাতা অন্যায়। তোমরা যে বড়লোক জয়শ্রী! আত্মাভিমান তো তোমাদের জন্য নয়, লোভই যে তোমাদের বড় ক'রে তুলেছে। আত্মসাৎই যে তোমাদের ধর্ম্ম।"

—"আত্মসাৎ আমাদের ধর্ম্ম?"

—"হাঁ, আত্মসাৎই তোমাদের ধর্ম্ম। তোমরা সব কিছুকে লুটে নিতে চাও। শুষে নিতে চাও।"

রাগে ফুলতে থাকে জয়শ্রী। বলে,—"তুমি অপারগ, অক্ষম তুমি। তোমার আশ্রয়ে বাঁচতে আমি চাই না।" জয়শ্রী চলে যায়।…

পাষাণ মূর্ত্তির মতো জয়ন্ত দেখে, জয়শ্রী চলে যায়। সূর্য্য যখন উঠেছিল তখন ছিল তাপ, ছিল উৎসাহ কিন্তু তার মধ্যদিনেই কোথা তাপ, কোথা উৎসাহ—শুধু নিরর্থকতা। বিমূঢ় চিত্তে জয়ন্ত তাকিয়ে থাকে। জয়শ্রী চলে যায়।

দরিদ্র জীবনের ইহাই অভিশাপ! ধনীর কাছে দরিদ্রের এই যে চির পাওনা। জয়ন্ত একটু হাসে…জয়শ্রী চলে যায়।

* * * *

কয়েক দিন কেটে গেছে। জয়শ্রীর কোন খবর নেই। বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, মায়ের শরীর খুব ভাল নয়।

হাফসোল-করা চটিটা পায়ে গলিয়ে জয়ন্ত রাস্তায় নামলো।

এখন সন্ধ্যা। আজ সন্ধ্যায় এ-নগরীর শোভা যেন অপরূপ ঠেকে জয়ন্তর কাছে।

পূজোর বাজার। চার দিকে কেমন একটা চাঞ্চল্য ভাব। দোকানগুলি রকমারী কাপড়-জামায় ভর্ত্তি। মনোরম ভাবে সাজান-গোছান। শো-কেসে বেনারসী, ঢাকাই আরো কত কী! জুতার দোকানে জুতা। গয়নার দোকানে নিউ ডিজাইনের গয়না। দোকানে দোকানে বাজছে এ্যামপ্লীফায়ার, রেডিও। ভীড়ে পা গলান যায় না। পূজোর বাজার।

জগজ্জননী মা আসছেন। চার দিকে তাই এত আনন্দ, এত পুলক-স্পন্দন। মা আসছেন। কেউ হাসছে। কেউ কাঁদছে। মা আসছেন। হাসি-কান্নার রূপ দেখতেই বোধ হয় তাঁর আগমন। যারা কাঁদে তাদের কান্নায় তিনি কি কাঁদেন? ব্যথিত জয়ন্তর অন্তরে প্রশ্ন জাগে,—'তিনি কি কাঁদেন?' হাসি পায় জয়ন্তর। একটু হাসে।—এগিয়ে চলে।

ক্যাঁ…এ্যাঁ…এ্যাঁ…চ। ব্রেক করলো গাড়ীটা। স্যুট-পরা যুবকটি গাড়ীর ভেতর থেকেই বিলেতী কায়দায় জিজ্ঞেস করলো—"How do you do my dear জয়ন্ত?"

—"ওঃ, সমীরণ! আরে, যাচ্ছ কোথায়?"

—"নিউ এম্প্যায়ার। খাসা ডান্স আছে একটা।"

ভ্যাবা চ্যাকার মতো শুধু মুখ তুলে তাকায় জয়ন্ত। গাড়ীটা আবার start করে। জয়ন্ত তাকিয়ে থাকে।

সমীরণ উদ্ধত, অহঙ্কারী, ধনীর সন্তান। কলেজে পড়তে এক দিন জয়ন্তকে বলেছিল,—"জয়ন্ত, তোর লজ্জা করে না?"

—"কেন?"

—"কনসেশনের জন্য 'পিটিশন' করতে?"

—"তা'ছাড়া উপায় কি বল?"

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে শ্লেষের সুরে সে বলেছিল—"গরীব যারা তাদের আত্মহত্যাই বাঞ্ছনীয়।"

এগিয়ে চলে জয়ন্ত। পাশে আসছে একটি যুবক আর একটি যুবতী। যুবতীটির হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। আশমানী রঙের সিল্কের

সাড়ী একটা পরনে। গায়ে সাটিনের হ্যাণ্ডলেস ব্লাউস। কাঁচুলী আঁটা। জামার কাটিংটা মন্দ নয়। ফ্যাসান আছে। স্তনযুগলের মধ্যভাগ বিলক্ষণ প্রতীয়মান। বোধ করি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

—"হানড্রেড এ্যাণ্ড থারটিএইট, তবুও তোমার পছন্দ হ'ল না লীলা ?"

—"যাও, এত স্মল প্রাইসের কি হবে ?"

সমীরণের কথাটা জয়ন্তর মনে পড়ে যায়। "গরীব যারা তাদের আত্মহত্যাই বাঞ্ছনীয়!" একটু যেন হাসি পায় জয়ন্তর। হাসে একটু। এগিয়ে চলে।

চটির একটা ফিতে গেল কেটে। অজস্র চিন্তায় তার দেহ-মন ক্লান্ত। এগিয়ে চলে জয়ন্ত।···সারা দেহ ও মনে অবসাদের গ্লানি। অজস্র চিন্তা তার মনে জট পাকাচ্ছে। যেন রাজ্যের যত চিন্তা তার মগজে জড় হয়েছে।

জয়ন্ত ভাবে, যারা তার দলে তারাও কি বেরিয়েছে এই পূজোর বাজারে ? কই এক জনকেও তো দেখি না।

দু'টো লোক চলে গেল। তাদের কথাবার্তা জয়ন্ত শুনলে,—

—চল না রে, লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। কাপড় রে!"

—ছেলের অসুখ-বিসুখে অনেক খরচ-খরচা হয়ে গেছে ভাই, হাতে পয়সা-কড়ি যে কিছুই নেই।" হতাশার সুর তার কথায়।

—"তা পূজোর সময় একটু নতুন দিবে নে ?"

—"গরীব যারা তাদের আবার নতুন!" কথার শেষে একটা অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করলো লোকটা। বোধ করি ক্ষোভে কি দুঃখে, কি হয়তো বা রাগে।

জয়ন্তর হাসি পায়। একটু হাসে। এগিয়ে চলে।

পূজোর বাজার। দোকানে দোকানে বাজছে ব্যাণ্ড, সানাই। "এবার পূজায় বিপুল আয়োজন" লেখা প্লাকার্ড লটকানো দোকানে দোকানে। পূজোর বাজার। জয়ন্ত চলে। নয়নে অপমানের গ্লানি। বেদনার ইন্ধন সেখানে সহস্র বহ্নিশিখা জ্বলছে। জয়ন্ত চলে। বন্ধু অসিতের কাছে। কাল ও দেশ থেকে এসেছে। মা কেমন আছে তবু খবর পাওয়া যাবে। জয়ার মৃত্যুর পরে তার দু'বছরের মেয়েটাকে নিয়ে মা ভিটেটায় থাকে। গ্রামকে ছেড়ে তিনি আসতে চান না। গ্রামে আজ কাটাকাটি, রাহাজানী···তবুও গ্রামকে ছাড়তে তিনি নারাজ। দেশের মাটিকে যে চিনেছে সেই বোঝে সে মাটির মূল্য কতটুকু। জয়ন্ত খরচ পাঠায়। কোন রকমে চলে যায়।

* * * * *

জয়শ্রীর সাজ-গোজ হয়ে গেছে। বাজারে যাবে। পূজোর বাজার। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। সুগোল, নিটোল দেহাবয়ব। রূপ-যৌবনে পুষ্ট। যৌবন-সম্ভারের স্তূপীকৃত সমারোহ সারা দেহে।

—"বাবা। জয়শ্রী ডাকলো।"

—"কে ?"

—"আমি শ্রী।"

—"কেন মা ?"

—আমি ড্রাইভ করবো গাড়ী ? কথায় আবদারের সুর মেশানো। অনুমতির অপেক্ষায় বড়-বড় চোখ দু'টো তুলে তাকিয়ে থাকলো রমানাথের মুখের দিকে। অনুমতির প্রত্যাশায় জয়শ্রী যেন উদ্‌গ্রীব। ইংরাজি নভেলটার পাতাটা ওল্টাতে ওল্টাতে রায় বাহাদুর সম্মতি দেন। কথার অবসরে পাইপের কুণ্ডলীয়মান রাশীকৃত ধোঁয়া এদিক-ওদিক চার দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

বুইক এইট। চকোলেট কালার।

যৌবন-মদে মত্তা জয়শ্রীর হাইহিল 'সু' এ্যাক্সিলেটরে আঘাত করে। গাড়ী ছোটে···দুর্বার গতি···স্পীড উঠছে···গাড়ী ছুটছে··· বোঁও···ওঃ···ওঃ···।

এই, এই, এই! গেল, গেল, গেল। পথচারীর কণ্ঠস্বর ক্ষণিকে যেন আর্তনাদ করে উঠল। মোড় পার হচ্ছিল লোকটা। জয়শ্রীর গাড়ী লোকটাকে পিষে ফেলে। চকিতে এ কী হ'ল! লোকটা পিষে গেল। থেঁৎলে গেল। লোকটাকে ঘিরে ভীড় জমেছে। জয়ন্তর মাথার ঘিলু তখনো চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে মাটিতে।···ফ্যাকাসে, হলদে···।

জয়শ্রী হতবাক্! স্তব্ধ নেত্র। অশ্রুভারাক্রান্ত। নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকে। হৃদয়ের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হ'য়ে যাবে এখুনি। পাষাণ মূর্ত্তির মতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জয়শ্রী। জয়ন্ত পড়ে আছে। থেঁৎলে গেছে। পিষে গেছে। সেঁটে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জয়শ্রী। জয়ন্ত মারা গেছে। সর্বদেহ অবশ, অসাড়। ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে জয়শ্রী জয়ন্তর দিকে। জয়ন্ত পড়ে আছে। জয়শ্রী নীরব, নিশ্চল। জয়ন্ত মারা গেছে।

* * *

আজ মহাষ্টমী। পূজা-মণ্ডপ জনাকীর্ণ। মহা সমারোহ। আনন্দ-প্লাবন। মহারাজাধিরাজ থেকে কুটীরবাসী ভিক্ষুক পর্য্যন্ত যেন সবাই আনন্দিত···পুলকিত···আত্মহারা···মা এসেছেন।

ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের দল ভীড় জমিয়েছে যূপকাষ্ঠের ধারে। পাঁটা স্নান করানো হয়ে গেছে। শেষ বারের মতো পাঁটাটা ডেকে নিচ্ছে···ভ্যাঃ···এ্যাঃ···এ্যাঃ। কর্কশ, কঠোর তবু যেন আর্দ্র। বড় করুণ। কাত্যান পূজো হচ্ছে। বাজনা বাজছে'ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং।

জয়শ্রী শয্যাগত। ক্ষীণকায়। দুর্ব্বল। মৃত্যুপথের যাত্রী। জ্ঞান এসেছিল। আবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। হঠাৎ উঠে বসে। জ্ঞান আসে। সবাই ধরে শুইয়ে দেয়। জয়শ্রী বলে,···না না না। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও তোমরা।···আমি উঠবো,···আঃ, ছেড়ে দাও না।···আবার মূর্চ্ছা। আবার জ্ঞান ফিরে আসে। বাজনা বাজছে···ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং।

—"মা, মা, মা, কি বাজছে মা ?"

—"বাজনা মা।"

—"কেন ?"

—বলিদান হবে।

—"ওঃ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! বলিদান হবে ? কিন্তু কেন হবে বলিদান ? হ্যাঁ হবে। হবে বলিদান। হবে না হবে। উঃ···!" গভীর বেদনোচ্ছ্বাসের একটি ক্ষীণ আর্তনাদ!···"উঃ···!"

পরক্ষণেই অট্টহাসি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। উল্লাসের হাসি হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। একবার যেন কেঁপে কুঁকড়ে উঠলো সারা দেহটা। তার পর ? তার পর সব শেষ। অবশ, অসাড় তনুলতা জীর্ণ, বিবর্ণ, শীর্ণ!···সব শেষ।

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[হাটরাস ষ্টেশন। নিকটে একটি বৃক্ষ। মধ্যাহ্ন কাল। প্রখর সূর্য্যকিরণে দাবানলের জ্বালা। মুণ্ডিত মস্তক, যষ্টিহস্তে পরিব্রাজক বেশে নরেন্দ্রনাথ—শুষ্ক-মলিন মুখ, রামপ্রসাদের গানের কলি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

নরেন্দ্র। (সুর করিয়া) "ছিলাম গৃহবাসী করলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী, না হয় ঘরে-ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব, মা ম'লে কি তার ছেলে বাঁচে না।"

(গীতান্তে সহাস্যে—অঙ্গবাগাদি খুলিয়া ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে উপবেশন) এটা কি মায়াপুরী—না মৃত্যুপুরী ? কর্ম্মফল বড়, না কর্ম্ম-কর্ত্তা বড় ? এ দুনিয়াটা কার হুকুমে চলছে, কে এর কর্ত্তা ? এটা কি কোন ন্যায়বান ভগবানের রাজ্য, না কোন পাকা সয়তানের খেয়াল-গড়া ব্যাপার ? দেবতা ঘুমাচ্ছে, না বন্দী হয়ে ধুকছে সয়তানের বদ্ধ কারাগারে ? চাঁদিবই কদর ? তেলা-মাথায় তেল ঢালা ! হুঁ, পেট-বাবাজীই সব, এ-কল বিগড়ালে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব লণ্ডভণ্ড। (উচ্চহাস্যে) হাঃ হাঃ, কি মজা ! ওঃ, পেট জ্বলছে—তেষ্টাও পেয়েছে, তার চেয়ে বেশী তেষ্টা এক ছিলিম ! A puff, a pull for a kingdom ! কিন্তু দেবে কে ? শান্তিপুর ডুবু-ডুবু নদে যায় ভেসে ! (হাস্য—অদূরে এক জন নারী কলসী (জলপূর্ণ) লইয়া যাইতেছে দেখিয়া) এ মায়ি, থোড়া পানি পিলাও কৃপাসে !

নারী। (নিকটে আসিল) আপ, সাধুবাবা, হাম কাহার, আপকো কেয়সে দেই ?

নরেন্দ্র। "অপো নারায়ণ"—পিয়াসূকো পানিসে কুছ পাপ না হোবে। দে মায়ি দে (সে অতি কুণ্ঠিত ভাবে জল দিল, মুখ ধুইয়া পান করিলেন) তেরা ভালা হোগা।

[রমণীর প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আমার কেউ নেই, কিছু নেই। যেন একটা রাত-চরা, গৃহহারা, সাথীহারা পাখী রাতের ঝোড়ো হাওয়ায় দিশাহারা ! ঠিক যেন কাকে ঠোকরান আম। না লাগলাম দেবতার ভোগে, না লাগলাম মানুষের কাজে। বেওয়ারিশ মাল—নিরালম্ব ! Ploughing a lonely furrow ! ভাগ্যদেবী কোথায় নিয়ে যায় দেখা যাক ! (পরে) কে আছ, পথ দেখাও পথদিশারী ! (একটু থেমে) জগৎটা যেন পান্থশালা, সং সেজে সংসার-নাট্যে হাসা-কাঁদা ! এক একটা জন্ম যেন ক্ষণিক বিশ্রাম-স্থান। "প্রভাতে দশ দিশো যাস্থি কা কস্য পরিবেদনা !" কপালে লিখেছেন বিধি তবে তোমায় কেন ডাকা ? না কিছুতেই তোমাকে ডাকবো না, না, না, না, কিছুতেই না। (সহাস্যে) আমায় যেন "পরমহংস" পেয়েছে, জোর করে তাড়ালেও ছাড়ে না, দূর কর ছাই, আর চাই না তোমায়। যে ইহকালের হিল্লে করতে পারে না—সে পরকালের ব্যবস্থা কি করবে ? এবার ঠিক করেছি "পাওহরি" বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন করবো। (একটু থেমে—সহাস্যে) আজ বরাতে হবি-মটব ! বেশ, (বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া) ধ্যানমগ্ন ঋষি, শিখাও মোরে সহ্য গুণ। শীতাতপে থাকি যেন তোমা সম অচঞ্চল ! এস, নিদ্রা দেবি—এস, চির শান্তিময়ী —এস, সর্ব্বতাপহারিণী। (শয়ন)

(ধীরে ধীরে পরমহংসদেবের ছায়া-মূর্ত্তির প্রবেশ—নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া)—"অভিমান হয়েছে, কিন্তু জানে না ছায়ার মত সদাই ওর সঙ্গে ফিরি। জেনো মনে, বাছ, জীবনে-মরণে তুই আমার। কার সাধ্য আসে আমাদের মাঝে ? যেতে হবে তোকে বহু দূরে, সাগর-পারে। ওর আহারের ব্যবস্থা করতে যাই।

[প্রস্থান।

নরেন্দ্র। (জাগরিত হইয়া সচকিতে চারি দিক লক্ষ্য করিয়া) শুয়েও নিস্তার নেই ? এখানেও ধাওয়া করেছে দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলাটা ? কাতর-চোখে চেয়ে কি যেন বললে—হ্যাঁ, আমি তোর—তুই আমার ! নিশ্চয় মনের খেলা—আঘাত দিয়ে দূরে থাকতে পার না ? আমি তোমার হতে চাই না—ভুলতেই হবে। মন শক্ত হও। (পুনরায় শয়ন)

(কিছু পরে জনৈক রেল-কর্ম্মচারীর প্রবেশ। হস্তে খাবার ও লোটায় জল। বৃক্ষতলে শায়িত নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া)

রেল-কর্ম্মচারী। সাধু কই ? কিন্তু রামজী স্বপ্নে বললেন, "বড় সাধু এসেছেন। ওর সেবা করলে বহুৎ পুণ্যি হবে।" এখন করি কি ? সাধুজী ঘুমাচ্ছেন। রামজীর নাম নিয়ে ফুকারী। এ তো বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। এ সাধু মহারাজ ! এ সাধু মহারাজ !

নরেন্দ্র। (তন্দ্রাভঙ্গে সহাস্যে) Go easy, my lad ! এ আবার কি ফ্যাসাদ হলো ? পথের কাঙ্গালকে মহারাজ বলে কে ? তুই কে বটে রে ?

কর্ম্মচারী। (জল ছিটাইয়া থালা ও ঘটি রাখিয়া প্রণামান্তে সহাস্যে) আপনার দাস, আমিও বাঙ্গালী, এই রেল-অফিসেই কাজ করি। আজ খেয়ে-দেয়ে একটু গড়াচ্ছিলাম, এমন সময় এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলাম।

নরেন্দ্র। বটে, কি রকম ?

কর্ম্মচারী। আমার উপাস্য দেবতা রামজী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—"ওরে ওঠ, ওঠ, ঐ ষ্টেশনের কাছে একটা গাছতলায় এক জন সাধু শুয়ে আছেন। শীগ্‌গির খাবার ও জল নিয়ে যা, ওকে খাওয়ালে তোর খুব ভাল হবে।

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) বটে, তাই এসেছিস্ ? কিন্তু আমি তো মার্কামারা সাধু নই ?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে, সবটা আগে শুনুন।

নরেন্দ্র। আরো কিছু বাকী আছে না কি ?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রথমে মনে করেছিলাম যে, স্বপ্নটা মনের একটা খেয়াল। এই কাটফাটা রোদে, এই অজানা স্থানে কে সাধু আসবে? তাই ফের ঘুমাতে চেষ্টা করলাম।

নরেন্দ্র। বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিলি, তবে এলি কেন রে?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে, সাধ করে কি? ঐ রামজীর ঠেলায়। একটু নিদ্রা-ভাব এসেছিল, দেখলাম যে, রামজী রেগে কট মট করে আমার দিকে চেয়ে বলছেন—"এখনও যাসনি? খাবার দিগে যা, নইলে এই তীর মারব।" ঘম মাথায় উঠলো। তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম খাবার নিয়ে। দয়া ক'রে সেবা করুন, দাস কৃতার্থ হবে।

নরেন্দ্র। (উচ্চ হাস্যে) হাঃ হাঃ! (স্বগতঃ) টনক নড়েছে, খাব—না ফেরত দেব? (প্রকাশ্যে) ছাখ, তোর রামজীর কথা মিথ্যা হবে না। হয়ত কাছাকাছি কোন আসল সাধু আছেন। একবার খুঁজে দেখ ভাল ক'রে।

কর্ম্মচারী। আমি বেশ করে আগে খুঁজে দেখেছি। আপনি ছাড়া আর এখানে কেউ নেই। এখন দয়া করে সেবা করুন।

নরেন্দ্র। আচ্ছা, তোর রামজীর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! (হস্তাদি ধুইয়া একটু মিষ্টান্ন মুখে দিলেন)

কর্ম্মচারী। অনেক দিন পরে আজ এক জন দেশওয়ালী বাঙ্গালীকে পেয়ে দিলটা বড় ভরপুর!

নরেন্দ্র। (দৃপ্ত ভাবে) একেই বলে স্বজাতি-প্রেম। পরে দেশ-প্রেমে পরিণত হয়।

কর্ম্মচারী। মহারাজ! এই গোলামের জাতের কি শুভ দিন ফের দেখা দেবে না?

নরেন্দ্র। নিশ্চয়ই! এই জাতই আগে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সভ্যতায়, ধর্ম্মে সবার উপর ছিল, আবার সেই গৌরব ফিরে পাবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—এই জাতই ঘুম ভেঙ্গে উঠে বীরদর্পে চলবে। আমি স্পষ্ট দেখছি—হিন্দুর কীর্ত্তি, হিন্দুর গরিমা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে।

কর্ম্মচারী। আপনার এ জগৎ যেন দেখতে পাই।

নরেন্দ্র। হ্যাঁ রে। তোর স্বভাবটা তো বেশ! কি নাম?

কর্ম্মচারী। শরৎ গুপ্ত।

নরেন্দ্র। বাঃ, বেশ নাম তোর। শরতের আকাশের মত নির্ম্মল, প্রসন্ন তোর মন। আজ থেকে তোর নূতন নাম হোল—"সদানন্দ"। হ্যাঁ রে, বে করেছিস্?

কর্ম্মচারী। না মহারাজ! সাঁতার জানি না, গলায় এক মণ পাথর বেঁধে কি শেষে ডুবে মরবো।

নরেন্দ্র। বেশ, বেশ! কত দিন কাজ করছিস্?

কর্ম্মচারী। অনেক দিন।

নরেন্দ্র। ছুটী নিয়ে বাড়ী যাবি না?

কর্ম্মচারী। বাড়ীতে আপনার জন কেউ নেই। মনে মনে প্রার্থনা জানাই—'আর কত দিন রব এ ভব-কারাগারে'।

নরেন্দ্র। এত শীগ্‌গির পালাবি কেন? তোকে যে আরও কিছু কাল থেকে ভাল কাজ করতে হবে। একটা গান শুনবি?

কর্ম্মচারী। দয়া করে যদি শোনান, দিন-রাত এই একঘেয়ে-ভাবে থেকে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে!

নরেন্দ্র। তবে শোন।

"মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।"

(গীত চলিতেছে, মধুর তানে আকৃষ্ট হইয়া পল্লীর নরনারী বালক-বালিকাগণ দূরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে।)

নরেন্দ্র। (গীত শেষে গুপ্তকে) কি রে, কি হলো?

গুপ্ত। (নরেন্দ্রের পদতলে প্রণাম) দয়াময়, গুরুদেব! এত দিন পরে দেখা দিলেন?

নরেন্দ্র। আরে করিস্ কি রে? পা-টা ভাঙ্গবি না কি?

গুপ্ত। বলুন চরণে স্থান দিলেন? নইলে ছাড়ছি নে।

নরেন্দ্র। তোর অফিসের কাজের কি হবে?

গুপ্ত। আর ছলেতে ভুলছি না। আর গোলামীও করছি না। কৃপা করুন।

নরেন্দ্র। ছাখ্, কৃপা-টৃপা বাজে কথা। কৃপায় অন্তরের সুপ্ত শক্তির জাগরণ হয় না, জ্ঞানেই যথার্থ শক্তি ও মুক্তির স্ফুরণ! ঘুমন্ত শক্তিকে জাগা, মৃত্যুকে জয় কর, ব্যর্থতাকে দূর কর। Every inch of ground to be fought out by himself. নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে। এই পুরুষকার চাই। রোক ক'রে লেগে পড়ে থাকলে ইষ্টলাভ হয়। "অন্ধেন নীয়মানাঃ অন্ধাঃ"—নিজে শুতে পায় না আবার শঙ্করাকে ডাকে! নিজের শক্তিতে বিশ্বাস থাকা চাই। স্বাদ্ধাদে মেনাই ভাবগুলো ছাড়্। জাতটা এই জন্যই পড়ে গেছে। Life is jealous and is no patron of loafers.

গুপ্ত। আমি মুখ্যুখ্যু ভিম, কিছু বিদ্যে নেই। মন বলছে কপাল ফিরেছে। আর বুঝেছি, আপনিই আমার ইষ্টদেব। আমায় পায়ে রাখুন।

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) বিদ্যা যদি পেতে চাও ধনি, ঐ চাঁদবদনে মাখতে হবে ছাই!

গুপ্ত। (দৃঢ় ভাবে) রাজি আছি। (পরে নর-নারীর দলকে) তু লোক হিয়া কামেলি মাৎ করনা। সাধুলোককো তকলিফ হোগা। আপনা ঘর জানা।

দলের প্রধান। জি, সরকার! [প্রস্থান।

গুপ্ত। (নরেন্দ্রকে) আমি এখুনি আসছি। [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আশ্চর্য্য রকম সরল। এর উপর মন টানছে। খুব রোক—জমি ভাল। প্রেমের কষ্টিপাথরে একটু যাচাই করতে হবে। (বালকদের নিকটে ডাকিয়া মিষ্টান্নাদি বিতরণ করিলেন) নূতন প্রেমে সন্দেহ হয়। তাপ মনে গেছে। মূল আদর্শ চেনেনি। সাধক ওর জন্ম। তবে সাধনা চাই। হাব-ভাবে যা মনে হয়, আধার ভাল, আশা আছে। Not a benighted soul, spiritual life আছে।

গুপ্ত। (মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া ও একটা হুঁকার মুখে কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে পুনঃ প্রবেশ) এটা বেশ ক'রে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে এলুম। (পরে ছেলেদের মিষ্টি খাইতে দেখিয়া) আপনি কিছু মুখে দিলেন না?

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) বাঃ—তোফা! দে দে! (হুঁকায় টান দিয়া) তা, মুখে-গায়ে ছাই মেখেছিস্ কেন রে?

গুপ্ত। এই যে আপনি আদেশ করলেন একটু আগে।

নরেন্দ্র। বটে! আমি যদি বলি কাজটা ছাড়তে?

(ইতিমধ্যে সমাগত পল্লী বালক-বালিকাদের ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া)—এ লেড়কা, ইধার আও, ডর মাৎ কর। (উহারা আসিলে) তুম লোক দৌড়ানে সেকতা! আচ্ছা, দেখে পয়লা কোন্ হামারা পাশ আনে সেকতা (তাবা ছুটিল, পরে দলপতিকে) এ সর্দার, আও জেরা তামাকু পিও। (সভয়ে নিকটে আসিলে কলিকা দিয়া)—লেও জী, ফূর্ত্তি করো। (গুপ্ত উঠিল) কি রে, আবার কি হোল? কোথা চল্‌লি?

গুপ্ত। আসছি মহারাজ! (ক্ষণমধ্যে ফিরিয়া আসিল, হাতে একটি পুঁটলি ও চিঠি)

নরেন্দ্র। কি ব্যাপার রে?

গুপ্ত। কাজে ইস্তফা দিয়ে এলুম। এইটে Post box-এ ফেলে দিলাম। আর আমার সাহায্যকারীকে কাজ বুঝিয়ে দিলাম। উনি বরখাস্ত করবে। জমান টাকা দেবে না। বয়ে গেল—নেহি মাঙ্গতা হ্যায়। চলিয়ে মহারাজ। তুমি আমার গতি, আমার ইহকাল-পরকাল, আমার ভবিষ্যৎ, আমার সখা, আমার ইষ্ট। ঐ অভয় চরণে ঠাঁই দিও।

নরেন্দ্র। (সাহ্লাদে) তুই প্রেমিক বটে! 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলাল'। প্রেমই the hound to the heaven. জানিস্ তো, অসীম পথে চলতে হলে কত কাঁটা ফুটবে পায়। ও পথটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। আচ্ছা, তোর পুঁটলিতে কি আছে রে? খোল তো দেখি (পুঁটলিতে টাকা দেখিয়া গ্রাম্য বালক-বালিকাদের নিকটে ডাকিয়া—পরে গুপ্তকে) আচ্ছা, যা করতে বলবো করতে পারবি তো?

গুপ্ত। নিশ্চয়! আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে বলেন—যা করতে বলেন তাই করবো।

নরেন্দ্র। বেশ, আপাততঃ একটা কাজ কর্। এই টাকাগুলো সব ওদের দিয়ে দে। (গুপ্ত বালক-বালিকাদের টাকা দান করিল—তাহারা "জয় সাধুবাবাকি জয়" ধ্বনি দিল) (শিশু দলকে)—তোরা বল—'জয় গুপ্ত মহারাজকি জয়'!

[সকলের জয় দিয়া প্রস্থান।

নরেন্দ্র। (বিস্ময়ে) বা রে! You beat me hollow—হারিয়ে দিলি! তুই যে আমায় তাক্ লাগিয়ে দিলি, আমি নিজেই জানি না কি খাবো, কোথায় থাকবো। তোল বেশ, এবার গুরু-শিষ্যে ঝুলি কাঁধে নিয়ে অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করা যাক্। অসীম মাঝে সসীমের লয় হোক!

পরে উদাস মনে গান ধরিলেন।

গীত

"ওরে মুসাফির, উঠাও রে গাঁটরি
বহু দূর যানে হোগা রে।
আজভি যানা, কালভি যানা
আখের মে যানা তেরা হোগা রে।"

পরে—

"উঠাও সন্ন্যাসী উঠাও সে তান।
হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে গান।"
বল—ওঁ তৎসৎ ওঁ।

(অগ্রে নরেন্দ্রনাথ, পশ্চাতে গুপ্ত ধীরে ধীরে গমন করিল।)

(যবনিকা)

[ক্রমশঃ।

কেন তবে পূজা করি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অনেক হাজার বৎসর কেটেছে অনেক হয়েছে পূজা
কত ভক্তের হৃদয়-রক্তে রাঙা হোল শতদল;
তবু জাগিলে না কল্লারম্ভে হায় মা গো দশভূজা
দেবীসূক্তের মন্ত্র কি মা গো, হোল বাক্-সম্বল?
ধ্যানের আসনে ছিলে মহাদেবি, মানস-পটের ছবি
পুরোহিত পড়ে পূজার মন্ত্র শুনিলাম কত বার,
রূপকার গড়ে মাটির প্রতিমা মাটি হয়ে যদি র'বি
সন্তান তোর কেন না সহিবে আঘাত লাঞ্ছনার?
তুলির লিখনে আঁকা প্রতিমার উজ্জ্বল ত্রিনয়ন
সে নয়নে নাই দিব্য দৃষ্টি তাই কি সমুখে তোর
অসহায় নর-বলিদান চলে, দশ হাতে প্রহরণ
দিব্য মানায়,—ছেদিতে পারে না অসুরের মায়া-ডোর।
মানুষ ডুবিছে রসাতলে আর দেবতা সিংহাসনে
নিশ্চল দেহ পাষাণ মূর্ত্তি, মুখে মৃত্যুর হাসি,
ম্লান হয়ে যায় অর্ঘ্য-কুসুম এ পূজার প্রহসনে
অশ্রুপাথারে মঙ্গল ঘট অলক্ষ্যে চলে ভাসি।

কত দিন বল আর কত দিন মাটির পুতুল হয়ে
সারা বিশ্বের শ্লেষ-কটাক্ষে রহিবি অচঞ্চল,
রত্নমুকুট দীপ্তিবিহীন, কলঙ্ক বোঝা বয়ে
দেবী-মাহাত্ম্য শক্তিপূজায় হ'বে মা গো নিষ্ফল?
স্বপ্নকালে তোর সুপ্তি ভাঙার অকাল বোধন মা গো
লক্ষ কণ্ঠে রোদনের রোলে হোল না মনঃপূত—
দীরাষ্টমীর অগ্নিমন্ত্রে একবার তুমি জাগো,
মহিষাসুরের বক্ষ রক্তে কর তুমি আপ্লুত।
দশ হস্তের দশ প্রহরণ; তরাসে কম্পমান
নর-পাষণ্ড নত মস্তকে করুক অঙ্গীকার
ফিরাইয়া দিবে মানুষের ঘরে অপহৃত সম্মান,
মানব ধর্ম্ম করিবে না আর কখনও অস্বীকার।
তা' যদি না পার প্রতিমা গড়িয়া কেন তবে পূজা করি
সারা বৎসর মিথ্যা আশায় আত্ম-প্রবঞ্চনা,
ইষ্টমন্ত্রে বৃথা তোরে মোরা ডাকিলাম শঙ্করি,
দেবতারে পূজি' সহিবে মানুষ যদি হেন লাঞ্ছনা!

আমাদের উপেন

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৩ সালে ১ই সেপ্টেম্বর দৈনিক 'স্বদেশ' চেরী প্রেস হইতে প্রকাশিত হইল। স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠা দেশবন্ধু করিয়াছেন—বাংলার কংগ্রেসের নেতৃত্ব তিনি লাভ করিয়াছেন—কলিকাতার কর্পোরেশনের কর্ণধারও দেশবন্ধু হইয়াছেন। সেই দিন বাঘা যতীনের মৃত্যুবার্ষিকী, সেই জন্য 'স্বদেশে' ঐ দিন তাহার জীবনী নানা দিক হইতে আলোচিত হইয়া প্রকাশিত হইল। উপেন তার পশ্চাতে, তার সম্মুখে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদক। এই সংবাদ-পত্রখানি সেই বৎসরে যে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব হয়, সেই নির্ব্বাচনের সহায়তার জন্যই প্রকাশিত হয়। অর্থ সম্বন্ধে আমাকে ভার দিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই সংবাদপত্রের ভাণ্ডারী বা কোষাধ্যক্ষ রহেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এর লীলার অবসান হইল। বস্তুতঃ অল্প দিনের জীবনেই যেটুকু কাজ করিল, তাহাতেই তার সার্থকতা। প্রথম যতীনের জীবনী সাধারণের গোচরীভূত হওয়ায় বাংলায় যুবকদের মনে নব শক্তির, নব সাহসের, নবীন উৎসাহের সঞ্চার হইল এবং নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বের চরম সাফল্য হইল—জননেতা ৺সুরেন্দ্রনাথকে ডাঃ বিধানচন্দ্র এবং ব্যারিষ্টার এস আর দাসকে শ্রীসাতকড়িপতি রায় পরাভূত করায়। অবশ্য এ কাজটি সুশোভন হয় নাই সত্য, তবে রাজনীতির দলাদলিতে শোভন অশোভনে বালাই থাকে না।

আমরা ২৩শে সেপ্টেম্বর ৩২ জন কলিকাতা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অপসারিত হলাম। এ অপসারণের কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম—'ইংলিশম্যান' ও 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় বিপ্লবীদের পুনরুত্থান সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও ইহার বিরুদ্ধে প্ররোচনা—দ্বিতীয় শাঁখারিটোলা পোষ্ট অফিস লুণ্ঠন ব্যাপারে পোষ্ট-মাষ্টারের হত্যা—যাহা অবশেষে সন্তোষ মিত্রের দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রচারিত হয় ও তৃতীয় রুশিয়া হইতে সাম্যবাদের প্রচারকার্য্য যাহা এম এন রায় তাঁর 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার দ্বারা সাধিতেছিলেন এবং অবনী মুখোপাধ্যায়ের গোপনে কলিকাতায় আগমন—কর্ম্মী এবং নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ! প্রকৃত পক্ষে আমরা দেশবন্ধুর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, পুরাতন বিপ্লবীরা কোন প্রকার প্রকাশ্য বিপ্লবের কার্য্য তিন বৎসর করিবে না! সুতরাং আমাদের বিপ্লবী কার্য্যের জন্য বা ষড়যন্ত্র করার জন্য আমাদের কারারুদ্ধ করা হয় নাই, যদিও চার্জ্জ তাই ছিল।

২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে বহু বাড়ী ঘেরাও করিয়া, পুরাতন বিপ্লবীদের প্রাতঃকালে লালবাজারে জমা করিয়া, বেলা ১১টা নাগাইদ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের নরক গুলজার করিয়া তুলিল। লালবাজারে আমিই প্রথম আসামী, কারণ চেরা প্রেস বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে লালবাজার থানা সন্নিকট; পরে পরে এক জন দুই জন করিয়া ৩২ জন আসামী জমায়েৎ হইল। বন্ধু উপেন আসিয়া হাসিয়াই খুন! বলে—'বা! বা! বেশ জমায়েৎ করল যে এরা!' জ্যোতিষ ঘোষ চুঁচুড়া হইতে আসিল। যুগান্তর দল বলিয়া যাহারা অভিহিত হইত এবং এখনও পরিচিত, তাহারা প্রায় সকলেই আনীত হইল।

জেলে যাইয়া যথানিয়মে জেলের খাতায় নাম লিখিয়া ফলাও করিয়া সব ভিন্ন-ভিন্ন জেলে আমাদের রাখিল। আমাদের রাজবন্দী হিসাবে ধরিয়াছিল, কারণ আমাদের বিরুদ্ধে কোন দোষ প্রমাণ করিবার উপায় ছিল না—রেগুলেশন ৩, ১৮১৮ সালের আইনে রাজবন্দী হিসাবে কারারুদ্ধ করা হইল। সেই দিনই জন কতককে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করিল। পরদিন আমাকে প্রেসিডেন্সি জেলে একাকী নির্জ্জন সেলে আবদ্ধ রাখিল। সুতরাং বন্ধুর সহিত বিপদে একত্র থাকিবার সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম। উপেন রহিল সেণ্ট্রাল জেলে—আলিপুরে। কিছু কাল পরে—এক মাস বা দেড় মাস পরে আমাকে আবার সেণ্ট্রাল জেলে আনিয়া একত্রে বহু সহকর্ম্মীদের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইল এবং আমার বন্ধু উপেন্দ্রের সঙ্গে একত্রে থাকার সুযোগ হইল। আমার আনন্দ এই—আমার আবদ্ধ থাকার দুঃখ দূর করিল। বন্ধু আমাকে রক্ষা করিয়া দশ বৎসর আন্দামানে দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে একত্রে কারার দুঃখভোগ করিবার আনন্দও আমরা উভয়ে লাভ করিলাম। ইচ্ছা করিলে তখনও আমাকে সাথী করিতে পারিত। তাদের স্বীকারোক্তি করার ঘটার কথা স্মরণ করিয়াই এ কথা লিখিলাম।

জেলে প্রথম দিন স্নানাহারের সময় বন্ধুর মুখে হাসি আর ধরে না। আন্দামানের সেলুলার জেলের কষ্ট স্মরণ করিয়া বন্ধু বলে—"এ কি জেল রে! এমন এত জল খরচ করে সুখে স্নান এত বৃটিশের জেলের নিয়ম নয়! খাবার সময় ভাল অন্ন, মৎস্যাদি তরকারি প্রভৃতি পাইয়া রাত্রে লুচি-মাংস-দুগ্ধাদি পাইয়া বন্ধু আনন্দে আটখানা। বলে—"তবে এমন জেল ত সারা জীবন বহন করা যায়—তোফা বিছানা, তোফা খাওয়া-দাওয়া—এটা জেল কি রে! এ যে শ্বশুর বাড়ী, শুধু কনে নেই!" জেলে থাকবে ওয়ার্ডারদের গুঁতানি। সুপারের গালাগালি—কথায় কথায় চপেটাঘাত, ঘুষি, লাথি—ঘানী টেনে কোমর আড়ষ্ট, শরীর শুয়ে যাওয়া, কারুর সঙ্গে কথা কইতে পাবে না, কইলেই চড়—এ সব না হলে বৃটিশের জেল! কথায় কথায় ডাণ্ডাবেড়ী, চটের পোষাক!"

ইতিমধ্যে পূর্ব্বেই বলেছি যে, সরকার আমায় প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করে নির্জ্জন কারাবাসের সুখের অভিজ্ঞতা দিলেন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন—না বলিলে একটু অন্যায় হইবে। আমার শরীর তখন অসুস্থ ছিল—ডাঃ হ্যামিল্টন প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট—তিনি সুপণ্ডিত ডাক্তার এবং অত্যন্ত ভদ্র-সজ্জন ব্যক্তি। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া তিনি আমায় সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া নিয়মিত খোঁজ-খবর লইয়া অচিরে আমাকে স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিলেন। তাহাকে আমি বহু ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। তিনি ছিলেন জার্ম্মান পণ্ডিত। বৃটিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এ সৎকার্য্য কোন মতেই করিতেন না, কারণ তাঁরা ছিলেন বিপ্লব-বিরোধী। আইরিশ এবং জার্ম্মান সুপারিনটেণ্ডেণ্টরা সত্যই ভারতের বিপ্লবীদের সম্মান দেখাইতেন।

কিছু কাল পরে আমায় আবার সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়ায় যে অংশে রাজবন্দীরা ছিল, তার একতলায় উপেন থাকিত, আমি তাহার পাশেই আমার আসন লইলাম। দুই বন্ধুতে বহু সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার কথা কহিতাম। পড়াশুনাও করিতাম।

এই ক্ষেত্রে একটি বেশ মজার গল্প না বলিলে অন্যায় হইবে। উপেনের একটি পোষা বিড়াল ছিল—ছোট বাচ্চা—সেটিকে সে খুব আদর করেই খাওয়াত, নিজের বিছানার পাশেই শোয়াত। আমি আসার পর আমার কাছে একটি বিড়ালী বাচ্চা জুটল—তাহাদের লইয়া আমরা বেশ খেলা-ধূলা করিতাম। অবশেষে দেখা গেল যে,

পশু দু'টি উভয়ের প্রেমে পড়িয়াছে! বিড়ালটি বিড়ালীটির আশে-পাশেই ঘরে। আমরা উভয়ে তাদের প্রেমের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিবার জন্য একটিকে বিছানার ভিতর লইয়া শুইতাম। যেদিন বিড়ালটি উপেনের বিছানায় মশারির মধ্যে শুইত, বিড়ালী সারা রাত মশারির আশে-পাশে ঘুরিয়া ডাকিয়া বেড়াইত। আবার যেদিন আমি বিড়ালীকে মশারির ভিতর লইতাম—বিড়ালটি মশারির আশে-পাশে ঘুরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত। প্রাতঃকালে মিলন হইত উভয়ের এবং তাহাদের আনন্দের অংশও আমরা উপভোগ করিতাম। আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়া গেল। বিড়ালটি তার পুত্র, বিড়ালীটি আমার কন্যা—তার পুত্রবধূ ও বিড়ালটি আমার জামাতা। আমাদের বহু ফালতু ছিল—ফালতু অর্থে যে সকল সাধারণ কয়েদীর মধ্য হইতে আমাদের কাজ-কর্ম ও সেবা করিতে নিযুক্ত হইত তাহাদের নাম ফালতু। সেই ফালতুদের মধ্যে দুই জন ছিল ফকির আর মতি, আরও অনেক ছিল। ফকির আর মতি আমাদের সেবা করিত। ফকির ও মতি আমায় বাবা বলিয়া ডাকিত এবং উপেনকে বলিত, বুড়ো বাবু! তাহারাই এ বিড়ালের বিবাহ দিয়া আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল। মতি বেশ কীর্তন গাহিত, বুড়ো বাবুকে বৈরাগিকের মত গান শুনাইতে হইত।

জেলে আমাদের সহকর্মী বন্দীদের আহারের ব্যবস্থার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। খাওয়াইতে তখন কোন চিন্তাই ছিল না, কারণ তখন বর্তমানের দুরবস্থা ছিল না দেশে। তাছাড়া মাথা-পিছু খাইবার খরচ যাহা দিত, তাহাতে সকলের আস্বাদ মত তৃপ্তিসাধনের যোগ্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে কোনই কষ্ট ছিল না। বন্দীদের মধ্যে আবার একাদশী অমাবস্যা করার লোকও ছিল। খাদ্য-সামগ্রী আনানোর ভার ও তাহা হইতে রান্না করিয়া আহার্য্য প্রস্তুতির ভার আমার উপরই ছিল—অবশ্য মাংসাদি রান্নার সময় অতুল ঘোষ মনমোহন ভট্টাচার্য্যও ভার লইত। ফালতুদের মধ্যে মোদকও (ময়রা) ছিল। উপেন সর্বদাই খাইতে বসিয়া বলিত, "যতই রন্ধনপটু হও তুমি—শুক্ত যা বাঁধ সেটি হবার জো নাই—ও হাতে চুড়ী-শাঁখা-বালা না দিলে শুক্ত রান্না হবার উপায় নাই।" তার "আত্মকথায়" আন্দামানে কুইনাইন ঢালিয়া তিত শুক্ত রান্নার গল্প লিখেছে। ফালতু যারা ছিল, রান্নাঘরের ভাণ্ডারের ভার নিয়ে তারা খুব শ্রদ্ধা সহকারে খুব যত্ন করেই রাঁধত ও আমাদের পরিতৃপ্ত করে খাওয়াত। উপেন থেকে থেকে গেয়ে উঠত, 'ওরে ও পাগলা ভোলা—দে রে দে প্রলয় দোলা!' তখন আমাদের মধ্যে যারা গান গাইতে পারত তারা সবাই গাইত—আমাদের নারাণ বাঁড়ুজ্যের গান শুনতে খুবই ভাল লাগত—উপেনেরও নারাণ বাঁড়ুজ্যের গান শুনতে খুবই ভাল লাগত। নারাণ বাঁড়ুজ্যে বেশ গান গাইত। তার কথা এর পরে লিখব।

এমনি কোরে কিছু কাল কাটল—উপরে আমাদের বয়সে ছোট যারা ছিল, তাদের মধ্যে নেতা ছিল ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় যিনি এখন রাঁচিতে ডাক্তারি করছেন। তার সঙ্গে সব যুবানরা ছিল, তারা রাত্রে খুব দাপাদাপি করত, কাজেই আমরা নীচে একটু সেই তাণ্ডব নৃত্যের জ্বালায় বিব্রত হতাম। উপেন বলত, এদের কি করা যায় বল ত? ছোঁড়ার দল বললেও শুনবে না! এক দিন ভেবে-চিন্তে বললে, দেখ, তোকে এরা খুব মানে, তোর সামনে কেউ দেখি চুরট তামাক খায় না—আমায় তেমন সমীহ করে না ত, তাই, তুই না হয় ওদের সঙ্গে উপরে থাকগে যা, তাহ'লে ওরা এ নৃত্য আর কোরবে না—তখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব। সেই কথাই ঠিক হল, আমি উপরে থাকার ব্যবস্থা করলাম—আমার জন্য ইতিমধ্যে খুব এক বড় খাট বিছানার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই খাটখানি ও বিছানা দেখে টেগার্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন এক দিন, Whom is this elaborate bedstead for? কার জন্য এই প্রশস্ত খাট-বিছানা? উত্তরে আমি বললাম—Who has got an elaborate body: যার বিরাট দেহ আছে তার জনই। শুনিয়া হাসিলেন। জেলে আমাদের বেশ ভাল রকম poultry গজিয়ে উঠেছিল। উপেন জেলের সুখটা খুব ভরপুর উপভোগ করে বলত—"বাঃ, বৃটিশের জেলের এমন সুখ জানিলে ঝোন্ শালা বাড়ীতে থাকত, বৌগুলোকে সঙ্গে রাখলেও ত পারত।" আমি তাকে বলেছিলাম, একটা petition করে দেবো তোর হয়ে? বৌরা বাড়ীতে থাকায় তাদের একটা Family allowance দিচ্ছে, এখানে এনে রাখলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে!

এক দিন Colson এল chargesheet আমাদের জানাতে অর্থাৎ কেন আমাদের ধরেছিল—কি আমাদের অপরাধ, এই কথা আমাদের জানান আইন ছিল। আমাকে আর উপনকে আফিসে ডেকে পাঠালে। উভয়েই গেলাম। Colson প্রথম বেশ ভদ্র ভাবেই আমাদের সম্ভাষণ ক'রে যখন আমায় chargesheet দেখালে—আমি তাকে বললাম যে, এক বড় মিথ্যার জাহাজ তোমরা আর তোমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তা জানতাম না! এতে এক বিন্দু সত্য নাই। আমি কি করি না করি কি কি করেছি না করেছি, আমি জানলুম না, তোমরা জেনে ফেললে! It is not worth the paper in which the charges are written যে কাগজে এই চার্জ্জ লেখা হয়েছে—সে কাগজের যোগ্য এ চার্জ্জগুলি নয়। একেবারে মিথ্যা। আমাকে সহি করতে বলায় আমি অস্বীকার করলাম, তাতে Colson সাহেব বেশ রেগে গেল। উপেন আমায় টিপে বললে, "আরে রাগিস কেন, মজাই দেখ না, ওরা ত কথাই বলবে, তা না হলে ওদের ব্যবসা চলবে কেন?" কলসন রেগে বললে, সহি না করলে সাজা হবে জান? আমি বললাম, যাও সাহেব, তোমার বড় সাহেবদের ডেকে নিয়ে এস, মিথ্যাবাদীর দল! সে থম খেয়ে গেল। গোঁজ হয়ে বসে উপেনকে একখানি চিঠি দেখালে—বললে, এই চিঠিখানি গয়া থেকে তোমায় অবনী মুখার্জী লিখেছিল—দেখ দেখি, এখানি চেনো কি না। উপেন মুখটুক সিঁটকে বলে উঠল, "সাহেব ক'দিন, ধরে ডিসেন্ট্রিতে ভুগছি, বসতে পারছি না, বাহ্যে পেয়েছে, তুমি আজ যাও, আমার বলবার অবসর নেই, বলেই উঠে পড়ল।" আমিও উঠে পড়লাম। Colson ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে হেসে ফেললে—বললে, যাও আজ, আর এক দিন আসব। তার পর আর আসেনি।

এই অবনী মুখার্জির কথাটা সম্বন্ধে একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অবনী এসেছিল রাশিয়া থেকে গোপনে, এসে খুব আসর জমকে বসেছিল। কমিউনিষ্ট দেশের দূত বলে সে নিজেকে পরিচিত করে মুজফর আহম্মদ কুতবুদ্দিন প্রভৃতির কাছে বেশ

আদৃত হয়েছিল—তার চেষ্টা ছিল এখানকার বিপ্লবীদের কাছ থেকে শিখিয়ে নিয়ে যাবে যে,সে ভারতের বিপ্লবীদের রুশিয়ার প্রতিনিধি। তার কলকাতা আসার সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। উপেনের সঙ্গে তার আলাপ হওয়ায় সে গোপনে থাকতে চায়। এদিকে তাকে পাবার জন্য বহু বিপ্লবী নেতারা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। উপেন, একটা চিরকুটে লিখে পাঠায়—"গোবিন, এ লোকটিকে গোপনে রাখতে হবেই, কিছু বিচার না করে তোমার উপর ভার দিলাম—কারণ গোপনে থাকার সন্ধান ও রাখার সন্ধান তোমার খুব ভাল রকম জানা আছে।" ভদ্রলোক যখন এলেন তখন আমি কলকাতা যাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—রাস্তার এক জন আমায় বললে, এই ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করছেন। পত্রখানি পড়ে আমার কলকাতা যাওয়া হল না—আমি বিদ্যাপীঠে রেখে নরেন বাঁড়ুজ্যেকে ভার দিলাম, তার আড্ডায় থাবে থাকবে! অবনীর নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক নাই। ৩।৪ দিন থেকে চলে যাবে। নরেনের তখন মিলন-মন্দির বলে এক আড্ডা উত্তরপাড়ায় হয়েছিল। নরেন সে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিল। এই অবনী আমার বলে—আমায় লিখে দিতে যে, আমি বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধি। আমি জানতাম—রুশিয়াতে এম এন রায় বৈপ্লবিক কাজে রত, তার Vanguard পত্রিকা পড়ে সাম্যবাদী তৈরী হচ্ছে। তাই বলেছিলাম—কেন—নরেন ভট্টাচার্য্য ত সেখানে আছে! সে সুবিধা না পেয়ে বিদায় নিলে। পরে গয়া থেকে উপেনকে পত্র লিখেছিল—সেই পত্র কনসন দেখালে।

ফিরে গিয়ে জেলের ভিতর উপেন হেসেই আকুল, "শালারা খাস করেছে রে?" তখন সে বুঝতে পারলে, কেন তাকে ধরেছিল। সাম্যবাদীদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ একটু-আধটু হয়েছিল যখন আমরা চৌধুরী প্রেসের ভার নিয়ে 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিক প্রকাশ করি। মুজফ্ফর আহম্মদ কুতুবুদ্দিনের দলেরা তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। এক দিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাত্রি ১১টার সময় মিলন কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট হয়। আমায় বলে, "তুই যাস।" আমি বলি, ওসবে আমি নেই, যেতে হয় তুই যাস—নয় ত যাসনি। যখন জেলে যেতে এখন ইচ্ছা নাই, তখন আর ওসবের মধ্যে নাই বা গেলি। তার পর বোধ হয় গিয়েছিল। অবনীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ এমনি করে হয়েছিল, আর তাই এই চিঠি। এর পূর্ব্বে বা পরে ঠিক মনে নেই, সে সাম্যবাদী কমরেড প্রাউকে আমার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠায়। এক দিন ময়দানে এক সভায় আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি খুব সতর্ক হয়ে তার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কই। সে উপেনকে গিয়ে বলে, তুমি আমাকে এক ঠাকুরদাদার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলে!

এমনি করে হাসতে-খেলতে জেলে আমাদের দিনগুলি কাটত। জেলে আমাদের ঘরের ভিতরে বসে খেলার মধ্যে দাবা, পাশা, তাস ছিল। যার যা ইচ্ছা তা খেলত। মনোমোহন দাবা খেলায় দক্ষ ছিল। এক দিন উপেন আমায় বললে আয়, তোতে আমাতে দাবায় বসি। যে জিতবে সে দু'টো সন্দেশ দু'টো রসগোল্লা বেশী পাবে! আমি ঠাট্টা করে বললাম, তোকে ত চার-পাঁচ চালে হারিয়ে দেব—দেখ না! কিন্তু আমি জানতাম, সে-ই জিতবে। আমার দাবা খেলার অবসর হয়নি কখনও, কাজেই ভাল [illegible] না। কিন্তু খেলতে বসে দেখলাম, সত্যই উপেন পাঁচ চালের মধ্যেই মাত হয়ে গেল। সেই যে হেরে গেল, তার পর সে আর কখনও আমার সঙ্গে দাবা খেলতে বসেনি! বলত,—তোর সঙ্গে চালে যখন বৃটিশ হেরে গেছে, তখন দাবার চালে আমি ত হারবই! আর তুই দু'টো-চারটে সন্দেশ-রসগোল্লা বেশী করে খাস—ও তো তোর নিজের হাতেই আছে। আমাদের জেলের মধ্যে ময়রা নিত্যই সন্দেশ রসগোল্লা, গজা যোগাই তৈরী করত—আমি বসে থেকে করাতাম।

খোলা হাওয়ায় খেলার মধ্যে ছিল আমাদের ব্যাডমিণ্টন, পরে টেনিসও হয়েছিল। এ খেলাতেও আমার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল, আর নিপুণ ছিল বর্ত্তমানে মাননীয় সেচ-মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার। বেশ ভাল খেলত। মনোমোহনও মন্দ খেলে না। উপেন আমার পক্ষেই থেকে সর্ব্বদা খেলত। একটা short ছোট প্যাণ্ট পরে গেঞ্জি পরে যখন সে প্রথম দিন খেলতে নামল, তার আনন্দ কত—হেসেই খুন! এই ভাবে আমাদের আনন্দে কাটছিল জেলে দিনগুলি। সুখ-দুঃখের কথায়—দেশের ভবিষ্যতের কথায়, সাংসারিক কথায়—দুই বন্ধুতে বহু সময় কেটে যেতো। পড়াশুনাও বেশ চলত। আমি জেলে দু'টো বিদ্যাচর্চ্চা করতাম। ছবি আঁকা আর সামুদ্রিক বিজ্ঞান। বই বা ছবি আঁকার জন্য সরঞ্জাম গভর্ণমেণ্ট হতেই সরবরাহ করা হত আমাদের প্রাপ্য টাকা হতে। খাদ্য ও পরিধেয়ও ছিলই তার উপর নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সম্ভার, প্রসাধন দ্রব্য এবং শিল্পচর্চ্চার ও সামুদ্রিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা পুস্তকাদি সবই দিত। বহু কয়েদীর হস্তরেখা দেখিবার সুবিধায় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। চিত্রাঙ্কনেও হাত বেশ খুলেছিল, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা না থাকায় ঠিক হত না। উপেন বলত—"তুই যেদিন আমার এই বাজখাঁই নাকটি আঁকতে পারবি, সেই দিন তুই সত্যই আর্টিষ্ট হবি।" সত্যই তার নাক আমি কোন মতেই আঁকতে পারিনি।

এই জেলে থাকা কালেই দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সংবাদ এল—তাঁর শবাধার কেওড়াতলায় আনার ঘটার কথাও জেলে শুনলাম। সেই দিন বন্ধুর চোখে জল দেখেছিলাম। সে কেঁদেই বললে, "দেখ, এ দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য। যে লোকটার মুখের দিকে লোকে চেয়ে আশার আলো পায়, সেই লোকটাকেই সরিয়ে নিয়ে যায়। গান্ধীকে ঠিক রাখতে পেরেছিলেন এই দেশবন্ধু। আজকে সে নাই—বল দিকি, বাংলার ভবিষ্যতের হাল ধরবে কে?" আমি বলেছিলাম, কেন সুভাষ? মহাত্মা কিন্তু দিয়ে গেলেন তিন মুকুট—দেশপ্রিয় যতীন্দ্র সেনগুপ্তের মাথায়! অন্যায় করেননি নিশ্চয়! তাতে অবশ্য Big five খুব চটেছিলেন—কিন্তু মহাত্মার মানুষ চেনার শক্তির পরিচয় এই নির্ব্বাচনে পেয়েছিলাম। সুভাষ তখন মান্দালয় জেলে! মুক্ত থাকলে কি হত বলা যায় না।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আমরা সবাই উৎসাহহীন হয়ে পড়লাম। মন-মরা হয়ে শোকার্ত্ত হৃদয়ে কিছু কাল কেটে যাবার পর আবার এল দুঃসংবাদ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ! এ যেন এক-একটি বস্তুর অবসান হয়ে গেল! বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রইল বলেই মনে হতে লাগল!

ইহার পর এলেন টেগার্ট সাহেব জানতে—আমাদের মন বদলেছে কি না। কথাবার্ত্তা কয়ে চলে গেলেন। হঠাৎ এক দিন এলেন স্তর হিউ ষ্টিভেনসন। তিনিও জানতে এলেন মনের কথা, কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হল কি না! তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আর এ প্রসঙ্গে দিলাম না। ফলে হল, হঠাৎ আমার অন্তরীণের আদেশ। অর্থাৎ মনের পরিবর্ত্তন হয় নাই!

আমাকে বর্দ্ধমান জেলার ম্যালেরিয়ার ডিপো মঙ্গলকোট থানায় 'অন্তরীণ' হয়ে থাকবার জন্ম আদেশ হ'ল। আমি বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে চলে গেলাম। উপেন বললে, যা! একটু হাওয়াটা বদলে আয়! তোমায় ছাড়ছে না, বড় কষ্ট দিয়েছ ওদের, সহজে তোমায় ছাড়বে?

ইহার পর আবার ছয় মাস বাদে ঐ সেন্ট্রাল জেলেই আমাকে এনে আবদ্ধ রাখলে।

উপেন এক দিন বললে, সত্যি এত দিন ধরে Palmisty পড়লি, কিছু সত্য আছে না কি? আমি বললাম—সত্যি-মিথ্যে জানি না, বই যা বলে তা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সত্যি হতে পারে। তবে হস্তরেখা বদলায় মনের চিন্তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সে হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "দেখ দেখি, মরব কত কালে?" আমি বললাম—"এ বিষয় ত ঠিকই আছে, মৃত্যু এক দিন আসবেই, জানবার প্রয়োজন কি, তাকে কি রোধ করবি, বরং বৌঠান সাবিত্রীর মত যমের পথ রুদ্ধ করতে পারবে। তোর আমার কি সাধ্য, ওটা সাবিত্রীদের রাজ্য!" তবু কেমন জিদ ধরলে, বলতে বাধ্য করলে! আমি বললাম, তোর মৃত্যু ৬০ থেকে ৭০ বৎসর নাগাদ হওয়ার সম্ভাবনা। সে বলেছিল যে, ঠিকই ধরেছিস, আমার কোষ্ঠীতে আছে ৬৪।৬৫। এর পর থেকে অনেকেই হাত দেখাতে আসে! এক দিন পুলিশ কমিশনার রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—যিনি আমাদের দেখাশুনা করতেন, প্রায়ই আমাদের বন্ধু মনে করে আমাদের সঙ্গে এসে গল্প-গুজব করতেন, তিনি, উপেন, আমি, আরও কয় জন বসে আছি হঠাৎ বলে বসলেন—উপেন বাবু, বাঁড়ুজ্যে মশাই তিন বৎসর ধরে যে সামুদ্রিক বিজ্ঞান শিখলেন তার একটা পরীক্ষা দিন না, আমার হাতটা দেখে দিন না—কবে মৃত্যু হবে! উপেন বললে, "আমার ত একটা ব্যবস্থা করেছে। তা দেখুন না, আপনার ব্যবস্থা কি করে।" তিনি হাতটি বাড়িয়ে আমার সামনে দিলেন।

আমি হাতটা দেখে চমকে উঠলাম। বললাম—ভূপেন বাবু, আপনি বেদান্ত চর্চ্চা করেন। বলেন যে, আপনি বৈদান্তিক, মৃত্যু নাই এ কথাই বেদান্তের কথা না—ন জায়তে ন ম্রিয়তে কদাচিৎ? তিনি বললেন—"হাঁ সত্য! আমার মৃত্যু-ভয় নাই, যেমন আপনাদেরও নাই। যা সত্য দেখবেন তাই বলবেন। একটুও দ্বিধা করবেন না।"

আমার নিয়ম ছিল—যার আয়ু বেশী তার হস্তরেখা দেখা। ভূপেন বাবু রায় বাহাদুর তার আয়ু-রেখা দেখে বুঝলাম, তাঁর কাল সংক্ষেপ। আমি তাঁকে বললাম, সত্য শুনতে ভীত হবেন না ত? আপনার মৃত্যু নিকটে, বেশী বিলম্ব নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে মৃত্যু হবে? আমি বলিলাম—তা বলতে পারব না, কারণ সে আবার বড় গণনা করতে হয়, তবে you must be ready to pack off—আপনার যাবার সময় হয়েছে! তিনি বললেন, ভাল কথা, আমি আহ্বানের জন্য প্রস্তুত! তিনি নাকি diaryতে এই কথা লিপিবদ্ধ করতেন তাহা হলে আমাকে বিপন্ন হতে হত, কারণ উপেন এবং আমার মুক্তির কিছু কালের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর দলের ছেলেরা জেলের ভিতর তাঁকে লোহার ডাণ্ডা দিয়া হত্যা করেন, বেশী দিন বাদে নয়—আমাদের মুক্তির ৩০ দিনের মধ্যেই ঘটে।

[ক্রমশঃ

যৌগিক ব্যায়ামের বিশেষত্ব

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

যৌগিক ব্যায়ামের বিশেষত্ব কি? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে ব্যায়ামের উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ব্যায়ামবিদ্‌গণ এবং তাঁহাদের অনুকারী ভারতীয় ব্যায়ামবীরগণের মতে মাংসপেশীর পুষ্টিসাধনই ব্যায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য। আমেরিকার ম্যাকফেডন, ইংলণ্ডের স্যাণ্ডো ও মুলার এবং ভারতের রামমূর্ত্তি, ভীম-ভবানী, শ্যামাকান্ত, গোবর ও নেতোয় রায় প্রভৃতি ব্যায়ামবীরগণের পেশীপুষ্ট দেহ এই জন্য এত প্রশংসিত। ডন, বৈঠক, কুস্তি, মুগুর, মুষ্টিযুদ্ধ, ডাম্বেল, ভারোত্তোলন প্রভৃতি উদগ্র ব্যায়াম উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ। এই সকল ব্যায়াম এবং ফুটবল, ভলিবল ও গলফ প্রভৃতি ক্রীড়া শীতপ্রধান দেশের উপযোগী হইলেও গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের সাধারণ নরনারীর পক্ষে উপযোগী নহে।

মাংসপেশী পরিপুষ্ট হইলেই দেহের পূর্ণ স্বাস্থ্য বা রোগমুক্তি লাভ হয় না। তাই বড়-বড় কুস্তিগীর বা পালোয়ানগণ হৃদ্‌রোগে বা রক্তচাপে আক্রান্ত হন। দীর্ঘকাল শ্রমসাধ্য ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে শক্তিক্ষয় বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের অনেকে দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই। কিন্তু যৌগিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টিসাধন এবং দেহস্থিত যন্ত্রগুলির স্বাস্থ্যবিধান। স্নায়ুমণ্ডলী দেহযন্ত্রকে চালিত করে এবং মস্তিষ্ক হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আদেশ বহন করে। ইহাদের দ্বারাই মাংসপেশীর ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন অঙ্গের একটি মাত্র স্নায়ু নিষ্ক্রিয় হইলেই অঙ্গটি অচল হইয়া পড়ে। যৌগিক ব্যায়ামের ন্যায় অন্য কোন ব্যায়াম স্নায়ুগুলীকে এত পুষ্ট করিতে পারে না। স্নায়ুজাল সুস্থ ও সবল থাকিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। কুস্তি প্রভৃতি উদগ্র ব্যায়ামের দ্বারা অনেক সময় স্নায়ুজাল বা মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দেহের ও মনের শক্তিক্ষয় নিবারণে যৌগিক ব্যায়াম অদ্বিতীয়। কিন্তু অন্যান্য ব্যায়াম-প্রণালী উগ্র বলিয়া শক্তিক্ষয় বৃদ্ধি করে। এই জন্য যাঁহারা মানসিক পরিশ্রম করেন তাঁহাদের পক্ষে যৌগিক ব্যায়াম বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য ব্যায়াম-পদ্ধতিতে মাত্র কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

ব্যায়াম হয়। কিন্তু যোগাসনের দ্বারাই দেহের সর্বাঙ্গীণ ব্যায়াম সম্ভব।

স্বামী কুবলয়ানন্দ তাঁহার 'আসন' নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকে বলেন, যোগাসনের দ্বারা সমগ্র শরীরের যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক ও ফুসফুসাদি প্রধান যন্ত্র সবল হয়। মানব-দেহের সকল যন্ত্র তন্তুনির্মিত। তন্তুর (tissue) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক (১) প্রয়োজনীয় পুষ্টির নিয়মিত সরবরাহ এবং নালীহীন গ্রন্থিসমূহের (এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড) আভ্যন্তরীণ রস নিঃসরণ, (২) যথাসময়ে মল-মূত্রাদি অসার দ্রব্যের অপসারণ এবং (৩) স্নায়ুসংযোগগুলির সতেজ ক্রিয়া। তন্তুসমূহের পুষ্টির জন্য প্রোটিন, ফ্যাট (স্নেহজাতীয় পদার্থ), শর্করা, লবণ এবং অক্সিজেন আবশ্যক। এগুলি রক্তের দ্বারা তন্তুতে প্রেরিত হয়। প্রথম চারিটি দ্রব্য ভুক্ত ও পীত খাদ্য হইতে এবং পঞ্চমটি ফুসফুসে প্রবিষ্ট বায়ু হইতে গৃহীত হয়। সুতরাং পরিপাক-যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র সুস্থ সবল না থাকিলে তন্তু পুষ্ট হয় না। ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয় (pancreas) এবং যকৃৎ ক্রিয়াশীল হয়। এই চারিটি যন্ত্রই তলপেটের (pelvis) উপরে অবস্থিত। এই পরিপাক-যন্ত্রচতুষ্টয় প্রাকৃতিক বিধানে দিবা-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা স্বতঃক্রিয় মৃদু মর্দন পাইতেছে। প্রত্যেক প্রশ্বাস ত্যাগের সময় তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া উপরোক্ত যন্ত্রগুলিকে ভিতরের দিকে ও উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। আবার নিশ্বাস গ্রহণের সময় বক্ষঃস্থল ও কুক্ষির মধ্যবর্তী পেশী (diaphragam) তলপেটকে নীচের দিকে ও সম্মুখের দিকে চাপ দেয়। এইরূপে নিশ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস ত্যাগের সময় প্রত্যেক মিনিটে চৌদ্দ হইতে আঠার বার পরিপাক-যন্ত্রগুলি তলপেটের মাংসপেশীসমূহের দ্বারা মর্দিত হয়। এই স্বাভাবিক মর্দন তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

যাহাদের হজমশক্তি ক্ষীণ তাহাদের তলপেটের পেশীগুলি কঠিন ও দুর্বল হয়। পরিপাক-কার্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তলপেটের পেশীগুলিকে সবল ও নমনীয় থাকা দরকার। ইহা একটি স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন দ্বারা পেশীগুলির কর্মশক্তি ও নমনীয়তা বাড়ে। ভুজঙ্গাসন, শলভাসন ও ধনুরাসন দ্বারা তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি সম্প্রসারিত এবং পশ্চাতের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়। যোগমুদ্রা, পশ্চিমোত্থান ও হলাসন দ্বারা তলপেটের সম্মুখস্থ পেশীগুলি সঙ্কুচিত এবং পশ্চাদ্বর্তী পেশীগুলি প্রসারিত হয়। এই ছয়টি আসন দ্বারা তলপেটের সম্মুখস্থ ও পশ্চাদ্বর্তী পেশীসমূহের যথেষ্ট সঞ্চালন হয়। তদ্রূপ বক্রাসন, অর্দ্ধমৎস্যেন্দ্রাসন দ্বারা তলপেটের দুই পাশের পেশীগুলির ব্যায়াম হয়। শলভাসন দ্বারা diaphragam-এর প্রচুর ব্যায়াম হয়। যখন আমরা উড্ডীয়ান ও নৌলীর আলোচনা করিব তখন যৌগিক ব্যায়ামের প্রকৃত বিশেষত্ব বুঝিতে পারিব। উক্ত আসন দুইটির দ্বারা তলপেটের পেশীগুলির লম্ব ভাবে ও দুই পার্শ্বে ব্যায়াম হয়। এই দুইটি আসনের সমকক্ষ অন্য কোন ব্যায়াম নাই।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রক্ত সঞ্চালন দ্বারা তন্তুসমূহে পুষ্টি বাহিত হয়। হৃৎপিণ্ড, ধমনী (artery), শিরা (vein), কৈশিক (capillary) দ্বারা সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডই রক্ত সঞ্চালনের প্রধান কেন্দ্র। ইহার সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ দ্বারা সর্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট পৈশিক উপাদানে গঠিত। উড্ডীয়ান ও নৌলীর দ্বারা হৃৎপিণ্ডকে আরও সবল ও সক্রিয় করা যায়। ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, ধনুরাসন, সর্বাঙ্গাসন ও হলাসনে হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলির উপর খুব চাপ পড়ে। রক্ত-সঞ্চালক যন্ত্রসমূহের মধ্যে শিরাগুলি সর্বাপেক্ষা দুর্বল। অথচ তাহাদিগকে দেহের সমস্ত স্থান হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চালাইতে হয়। এই কঠিন কার্য্যের জন্য শিরাগুলি অনেক সময় দুর্বল হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাহাদিগকে বহিঃসাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। শীর্ষাসন ও সর্বাঙ্গাসন দ্বারা শিরাসমূহ আবশ্যকীয় বিশ্রাম পায়। উক্ত বিশ্রাম ক্ষণস্থায়ী হইলেও ইহা তাহাদের স্বাস্থ্য বিধানে পর্য্যাপ্ত।*

অক্সিজেন তন্তুসমূহের অন্যতম পুষ্টিসাধক পদার্থ। রক্ত-সঞ্চালক প্রণালীর দ্বারা ইহা তন্তুসমূহে বাহিত হয়। প্রোটিন স্নেহ জাতীয় পদার্থ, শর্করা ও লবণ পরিপাক-প্রণালী হইতে রক্তে গৃহীত হয়। কিন্তু অক্সিজেন শ্বাসযন্ত্র দ্বারা রক্তে মিশ্রিত হয়। এই জন্য ফুসফুসের স্বাস্থ্যরক্ষা বিশেষ আবশ্যক। প্রতি তিন মিনিটে শরীরের সমস্ত রক্ত ফুসফুসের মধ্য দিয়া একবার প্রবাহিত হয়। কারণ, নাড়ী-বিজ্ঞানের মতে এক মিনিটে সুস্থ শরীরে বাহাত্তর বার নাড়ীর স্পন্দন হয়। প্রতি নাড়ী স্পন্দনে চার আউন্স এবং প্রত্যেক মিনিটে নয় পাউণ্ড ছয় আউন্স রক্ত ফুসফুসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। শরীরের যত ওজন তাহার এক-ত্রয়োদশাংশ রক্ত। যে শরীরের ওজন ১৫৬ পাউণ্ড তাহাতে ১২ পাউণ্ড রক্ত আছে। এই ১২ পাউণ্ড রক্ত ফুসফুসের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতে মাত্র তিন মিনিট সময় লাগে। সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টায় শরীরের সমস্ত রক্ত ৪৮০ বার ফুসফুসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। অতএব অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ফুসফুসের ব্যায়াম বিশেষ আবশ্যক। ফুসফুস বায়ুকোষ সমূহ দ্বারা গঠিত। যদি কোন বায়ু-কোষ অলস না থাকে তাহা হইলে ফুসফুসের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয়। অথচ ফুসফুসের মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ আমরা সাধারণতঃ ব্যবহৃত করি এবং অবশিষ্ট পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ অব্যবহৃত থাকে। এই অব্যবহৃত অংশে বীজাণু সঞ্চিত বা সংগৃহীত হইয়া যক্ষ্মা, হাপানী, কাশি প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়। শলভাসন এবং ময়ূরাসনে গভীর নিশ্বাস গ্রহণ দ্বারা যে বায়ু ফুসফুসে গৃহীত হয় তাহা প্রত্যেক বায়ুকোষকে সক্রিয় করে।

বায়ুকোষগুলি একবার সক্রিয় হইবার পর চাপ বাড়িলে বা কমিলেও আর নিষ্ক্রিয় হয় না। শলভাসন ও ময়ূরাসনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটিতে ফুসফুসে বায়ু ধারণ অপরিহার্য্য এবং দ্বিতীয়টিতে ইচ্ছাধীন। কারণ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বায়ু কুম্ভক না করিয়াও ময়ূরাসন করিতে পারেন। প্রত্যহ তিন বার হইতে সাত বার শলভাসন করিলে শ্বাসযন্ত্রের তন্তুসমূহ বেশ নমনীয় এবং বায়ুকোষগুলি (air cells) সক্রিয় থাকে। শ্বাসক্রিয়ার অবাধ গতির জন্য শ্বাসনালী পরিষ্কার থাকা দরকার। উক্ত নালী

---

* মৎপ্রণীত "সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম" পুস্তকের প্রকাশমান পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তৃততর আলোচনা প্রদত্ত।

টনসিল ফোলা, পুরাতন সর্দি প্রভৃতি দ্বারা রুদ্ধ হয়। কিন্তু সর্বাঙ্গাসন, বিপরীতকরণী, • মৎস্যাসন ও সিংহমুদ্রা টনসিল ও সর্দি • প্রভৃতি যাবতীয় গল-রোগ ও নাসা-রোগ দূরীকরণ দ্বারা শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখিতে সমর্থ। সুতরাং তন্তুর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ পাঁচ প্রকার আহার্য্য সরবরাহ করিতে যোগাসন সর্বতোভাবে সুনিপুণ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তন্তুর পুষ্টিসাধন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নালীহীন. গ্রন্থিগুলির আভ্যন্তরীণ রস নিঃসরণ উত্তমরূপে হওয়া দরকার। এখন আমরা উক্ত গ্রন্থিসমূহের আলোচনায় মনোনিবেশ করিব।

মানব-দেহে দুই প্রকার মাংসগ্রন্থি (gland) আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি নালীহীন (ductless), আর কতকগুলি নালীযুক্ত। লালাস্রাবী গ্রন্থি (salivery gland), ঘর্মবহা গ্রন্থি (sweat gland), অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি (lachrimal gland) এবং যকৃত (liver) প্রভৃতি নালীযুক্ত মাংসগ্রন্থি। লালা নিঃসারক গ্রন্থি মুখের মধ্যে আছে। ইহা হইতে নিঃসৃত লালা খাদ্যের সহিত মুখে মিশ্রিত হইয়া খাদ্যকে পরিপাকের উপযোগী করে। ঘর্ম নিঃসারক গ্রন্থি ত্বকের নীচে থাকে। আমাদের দেহে যে ঘাম নির্গত হয় তাহা উক্ত গ্রন্থি-নিঃসৃত রস। অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি চোখের কোণে থাকে। ইহা হইতে ক্ষরিত রস অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়ে। যকৃৎ গ্রন্থি উদরে অবস্থিত। ইহা হইতে নিঃসৃত পিত্তরস ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে।

মূত্রাশয় (kidney) প্লীহা (spleen), অণ্ডকোষ (testis), থাইরয়েড, ডিম্বাশয় (ovaries), পিটুইটারী, পিনীয়াল ও আড্রিনাল প্রভৃতি নালীহীন গ্রন্থি। ইহাদিগকে এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি বলে। এই সকল গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রসের নাম হরমোন (Hormone)। হরমোন রক্তের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হয়। সকল ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের পুষ্টি, ক্রিয়া ও স্বাস্থ্য হরমোনের উপর নির্ভর করে। নালীহীন গ্রন্থি-মণ্ডলীর অধিপতি থাইরয়েড। ইহা গলনালীর দুই পার্শ্বে অবস্থিত। পিটুইটারী গ্রন্থি আকারে একটা বড় বাদামের মত এবং মস্তিষ্কের মধ্যে চারি পাশে অস্থিনির্মিত ঘরে থাকে। পশুর শরীর হইতে পিটুইটারীর সম্মুখ অংশ বাদ দিয়া বা নষ্ট করিয়া দেখা গিয়াছে, পশু-দেহের আকার ছোট হইয়া যায়। শিশুকালে যদি পিটুইটারী অধিক সক্রিয় হয়, তাহা হইলে দেহের হাড় আকারে খুব বাড়িয়া যায়। সে বয়স্ক হইলে খুব দীর্ঘকায় বা খর্বাকৃতি হয়। তখন শিশুকে গরিলা বা দানবের মত দেখায়। পিনীয়াল গ্রন্থির প্রভাবে বালকদের মুখে দাড়ি-গোঁফ উঠে না। পিটুইটারীর ন্যায় পিনীয়াল গ্রন্থি মাথায় অবস্থিত। যাহাদের পিটুইটারী অধিক বর্ধিত তাহাদের হাত-পা অধিক লোমশ হয়। অণ্ডকোষ হইতে নিঃসৃত রস রক্তে মিশ্রিত হইয়া পুরুষ-দেহকে যৌবনান্বিত করে। পুরুষ-দেহে যৌনবোধ আসিবার পূর্বে অস্ত্রোপচার দ্বারা অণ্ডকোষ বাদ দিয়া দেখা গিয়াছে, সেই পুরুষের জননেন্দ্রিয় তেমন ভাবে পুষ্ট হয় না, তার মুখে দাড়ি-গোঁফ দেখা দেয় না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভরেন হফ (Voren Hoff) অণ্ডকোষ-বিহীন জন্তুর দেহে অন্য জন্তুর দেহ হইতে অণ্ডকোষ কাটিয়া আনিয়া লাগাইয়া দেখাইয়াছেন, কি আশ্চর্য্য ফল হয়। অণ্ডকোষ শরীরের মধ্যে লাগাইয়া দিবার পর পশুটির প্রজনন-শক্তি ফিরিয়া আসে। বৃদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে নূতন অণ্ডকোষ দিলে পুনরায় তার যৌবনের ক্ষমতা জাগ্রত হয়।

পিটুইটারীর প্রভাব যাহাদের উপর কম থাকে তাহারা সহজে আত্মবিশ্বাস হারায় ও সামান্য দুঃখে ভয় পায়। যাহাদের উপর পিটুইটারীর প্রভাব বেশী তাহারা খুব দুঃসাহসী ও আক্রমণকারী হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে নেপোলিয়নের উপর পিটুইটারীর প্রভাব অত্যধিক ছিল। সেই জন্য তিনি প্রায়ই মাথার অসুখে ভুগিতেন এবং মাঝে মাঝে বমন করিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। তাঁহার মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করিয়া ডাঃ হেনরী দেখিয়াছেন, তিনি পিটুইটারী-প্রধান লোক ছিলেন। শেষ জীবনে তাঁহার দেহে পিটুইটারীর অভাব হইয়াছিল। তাই সেন্ট হেলেনার বন্দি-জীবনে তিনি খুব অবসন্ন থাকিতেন এবং পেটে ক্যান্সার হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মানব-দেহে রক্তের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম আছে তাহার অস্তিত্ব মুখ্যতঃ এই নালীহীন গ্রন্থিগুলির উপর নির্ভর করে। থাইরয়েড হইতে নিঃসৃত রসকে থাইরক্সিন বলে। ইহা হইতে ক্ষরিত রস কম-বেশী হইলে মানব-দেহের হাড়ের নানারূপ বিকৃতি ঘটে এবং বাহিরের চেহারাও পরিবর্তিত হয়। মাথার টাক পড়া এবং চক্ষু কোটরগত ও স্ফীত হওয়ার কারণও ইহাই। থাইরয়েড শক্তি নিস্তেজ ও দুর্বল হইলে দেহ স্বাস্থ্যহীন ও ব্যাধি-মন্দির হয়। গ্রীন সাহেব যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "থাইরয়েড হইতে রস নিঃসরণের ব্যাঘাত হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, চর্মরোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, চিন্তা ও বাক্যের মন্দগতি, দৈহিক ওজনের হ্রাস এবং চর্বির আধিক্য প্রভৃতি রোগ জন্মে। শিশুদেহে থাইরয়েডের ক্রিয়া নিস্তেজ হইলে মানসিক দুর্বলতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থূলতা, উদরের মেদ বৃদ্ধি, দৃষ্টিক্ষীণতা, বধিরতা প্রভৃতি অসুখ হয়।" গ্রীন সাহেব তাঁহার উক্ত গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন, "পশুদেহে এই গ্রন্থিগুলি তুলিয়া ফেলার পর দেখা গিয়াছে, তাহাদের পেশীগুলি সঙ্কুচিত ও দুর্বল হইয়া যায়।" মানব-দেহে হস্তপদ-মুখাদির সঙ্কোচন প্রভৃতি দেখা দিলে উহাকে টিটানী রোগ বলে। টিটানী, মৃগী ও মূর্চ্ছাদি রোগও এই কারণে উৎপন্ন হয়। পুষ্টিকর আহারের অভাব, শুক্রতারল্য, কঠিন রোগ, কঠোর পরিশ্রম বা অসংযত জীবন যাপনের ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি দুর্বল হয়। যাহাদের শরীর হইতে কোন কারণে অস্ত্রোপচার দ্বারা থাইরয়েড তুলিয়া ফেলা হইয়াছে তাহাদের অকালবার্ধক্য আসে। তাহাদের স্বাস্থ্য চিরতরে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহারা মৃতবৎ জীবন ধারণ করে। স্নায়ুমণ্ডলীর তন্তুসমূহের কোষগুলি থাইরয়েডের রসেই পরিপুষ্ট হয়। থাইরয়েড নিস্তেজ হইলে ক্ষুধামান্দ্য, শিরঃপীড়া, নিদ্রালুতা, সর্দি প্রভৃতি অসুখ লাগিয়া থাকে। এম, এম, লিওপল্ড লেভি এবং এইচ, ডি, রথচাইল্ড নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, থাইরয়েড নিষ্ক্রিয় হইলেই শরীর জরাগ্রস্ত হয়।

এইজন্য ইংলণ্ডের মূলার এবং আমেরিকার ম্যাকফেডেন প্রভৃতি ব্যায়াম-বীরগণ থাইরয়েডকে সজীব ও সতেজ রাখিবার জন্য নানা ব্যায়াম উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্ভাবিত ব্যায়াম অপেক্ষা যৌগিক সর্বাঙ্গাসন সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর। অষ্ট্রীয়ার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভরেন হফ, মনুষ্য-দেহ হইতে

নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ থাইরয়েড গ্রন্থি অস্ত্র সাহায্যে তুলিয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্ত্তে বানরের গল-গ্রন্থি বসাইয়া অনেককে পুনর্যৌবন দান করিয়াছেন। ভারতের কোন কোন ধনী অজস্র অর্থব্যয়ে বিদেশে যাইয়া স্বীয় থাইরয়েডের স্থলে বানরের থাইরয়েড বসাইয়া দীর্ঘ জীবন ও পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই কার্য্য অতিশয় ব্যয়সাধ্য ও বিপজ্জনক। পশুর মাংসগ্রন্থি মানবদেহে পাশবিক প্রবৃত্তি উৎপন্ন করে। নৈতিকতার দিক দিয়াও ইহা অনিষ্টকর। কিন্তু সর্বাঙ্গাসনের এমন অদ্ভুত শক্তি আছে যে, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে দুর্বল থাইরয়েড সবল, সতেজ, ও সক্রিয় হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। অণ্ডকোষে শুক্র জাত হয়। এই অণ্ডকোষের সহিত থাইরয়েডের নিকট-সম্বন্ধ। সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসের দ্বারা থাইরয়েড সজীব ও সুস্থ হইলে স্বপ্নদোষ, শুক্রহীনতা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ও সিংহমুদ্রার দ্বারা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য দীর্ঘকাল অটুট থাকে। শীর্ষাসন দ্বারা পিটুইটারী ও পিনীয়াল গ্রন্থি-দ্বয়ের উত্তম ব্যায়াম হয়। পুরুষদের অণ্ডকোষ ও নারীদের ডিম্বাশয়ের (গর্ভকোষের) উত্তম ব্যায়াম সর্বাঙ্গাসন, উড্ডীয়ান, নৌলীর দ্বারা হয়। প্লীহা মানব-দেহে বৃহত্তম নালীহীন গ্রন্থি। দেহে যে সকল রোগবীজাণু সৃষ্ট বা সংক্রামিত হয় সেগুলি প্লীহার রসে বিনষ্ট হয়। শ্বেত রক্তকণিকাগুলি প্রধানতঃ প্লীহাতে সৃষ্ট হইয়া দেহের নানা অংশে ছড়াইয়া পড়ে। রক্তে রোগবিষ (toxin) নাশ করিতে প্লীহা অদ্বিতীয়। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগে প্লীহা ফুলিয়া উঠে। ইহার কারণ, প্লীহা শরীরে প্রবিষ্ট বীজাণুগুলি টানিয়া নিজ অঙ্গে সংহত রাখে, অন্য অঙ্গে যাইতে দেয় না। প্লীহার উপর থাইরয়েডের প্রভাব সমধিক। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, সর্বাঙ্গাসনে দুর্বল প্লীহা সবল হয়। স্বামী কুবলয়ানন্দ সর্বাঙ্গাসনের দ্বারা ষোল বৎসর বয়স্ক কোন বালকের জীর্ণ প্লীহা ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য করিয়াছিলেন। ছয় মাস সর্বাঙ্গাসন করার ফলে বালকটি ম্যালেরিয়া ও প্লীহা রোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়াছে। সর্বাঙ্গাসন অভ্যাস করিলে এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ এবং যকৃতের রোগাদি হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে বহু বৎসর যকৃৎ রোগে ভুগিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকাল বার্দ্ধক্য হইয়াছিল। দুই বৎসর নিয়মিত ভাবে সর্বাঙ্গাসন অভ্যাসের ফলে তাঁহার যকৃৎ রোগ সারিয়া যায় এবং তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তন্তুসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শরীরের অসার পদার্থ যথাসময়ে নির্গত হওয়া দরকার। মল, মূত্র, কার্বন ডাইঅক্সাইড, দূষিত কফ, পিত্ত ও বায়ু, ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড প্রভৃতি অসার পদার্থ অতিশয় বিষাক্ত এবং অতিরিক্ত সময় দেহে থাকিলে নানা বিশৃঙ্খলা ও ব্যাধি সৃষ্টি করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড শ্বাসযন্ত্র দ্বারা, পিত্তাদিযুক্ত মল মলদ্বার দিয়া এবং ইউরিয়া (urea) ও ইউরিক এসিড (uric acid) প্রভৃতির সহিত মূত্র মূত্রদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মল-মূত্র-নিঃসারক যন্ত্রদ্বয় ও শ্বাসযন্ত্র সুস্থ থাকিলে অসার পদার্থ দেহ হইতে যথাসময়ে বাহির হইয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে অর্শ, ভগন্দরাদি দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে। আমেরিকার কোন হাসপাতালে একবার ২৮৬ জন রোগী সুচিকিৎসা সত্ত্বেও মারা যায়। ডাক্তারগণ এই সকল রোগীর অস্ত্রোপচার দ্বারা দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে ২৫৬ জনের মলভাণ্ড পুরাতন মলে পরিপূর্ণ। মূত্র যথাসময়ে নির্গত না হইলেও বাত রোগাদি জন্মে। এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় দেড় সের মূত্র ত্যাগ করে। মূত্রের পরিমাণ শীতকালে বাড়ে ও গ্রীষ্মকালে কমে। মূত্র-নিঃসারক যন্ত্র প্রধানতঃ দুইটি বৃক্কদ্বয় (kidneys) এবং মূত্রাশয় (sladder)। বৃক্কদ্বয় রক্তের অতিরিক্ত জলীয়াংশের সহিত অন্যান্য দূষিত পদার্থ ছাঁকিয়া আনে এবং মূত্রাশয়ে প্রেরণ করে। বৃহদন্ত্র ও মলভাণ্ডাদি মলনিঃসারক যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র এবং বৃক্কদ্বয় ও মূত্রাশয়াদি মূত্রনিঃসারক যন্ত্রের চমৎকার স্বাস্থ্য উড্ডীয়ান ও নৌলীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়।

তন্তু-সমূহের স্বাস্থ্য স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড স্নায়ুমণ্ডলীর প্রধান দুইটি অংশ। এই দুই স্থান হইতে প্রসারিত স্নায়ুজাল শরীরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। শরীরে একটিও তন্তু (tissue) নাই যাহার সহিত স্নায়ু (nerve) সংযুক্ত নয়। স্নায়ু সংযোগ শিথিল হইলেই তন্তুর কার্য্য ব্যাহত হয়। মলভাণ্ডের সহিত সংযুক্ত স্নায়ু দুর্বল হইলে মলভাণ্ডের তন্তু কার্য্যক্ষম থাকে না ও তাহার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। মুখ-মণ্ডলের একটি স্নায়ু অসাড় হইলেই মুখ এক দিকে বাঁকিয়া যায়। শীর্ষাসন মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তপ্রবাহ আনিয়া এই স্নায়ুকেন্দ্রটিকে সুস্থ রাখে। উক্ত আসনে মেরুদণ্ডের সুন্দর ব্যায়াম হয়। ভুজঙ্গাসন, শলভাসন ও ধনুরাসনাদি দ্বারাও মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেহের সকল যন্ত্র তন্তুনির্মিত এবং স্নায়ু-চালিত। স্নায়ুজাল ও তন্তুসমূহ সুস্থ রাখিলে দেহ নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান্ থাকে। স্নায়ুজাল ও তন্তুসমূহ সুস্থ ও সবল রাখিতে যৌগিক ব্যায়াম অতুলনীয়।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, যৌগিক ব্যায়ামে মাংসপেশীর ব্যায়াম হয় কি না। এক কথায় ইহার উত্তর এই যে, পেশীর সাধারণ গঠন ও শক্তি যৌগিক ব্যায়ামে সম্ভব। অসাধারণ পৈশিক পুষ্টি ও শক্তি সাধন যৌগিক ব্যায়ামে হয় না। মানব-দেহে পাঁচ শতাধিক পেশী আছে। যৌগিক ব্যায়াম দ্বারা ইহাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ হয়।

পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও স্বস্তিকাসনাদির দ্বারা শারীরিক ব্যায়াম না হইলেও দেহের ও মনের প্রচুর উপকার হয়। উক্ত আসন-সমূহে মেরুদণ্ড সরল থাকায় তলপেটে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয়। তজ্জন্য তলপেটের যন্ত্রগুলি অচিরে রোগমুক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফলে দেহে কার্বন ডাই-অক্সাইড সামান্য মাত্র উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ, এই সকল আসনে পৈশিক কার্য্য সামান্য মাত্র হয়। সেই হেতু পৈশিক শ্রম অতি অল্পই হইয়া থাকে। অন্যান্য যৌগিক ব্যায়াম এবং ডন, বৈঠকাদি শ্রমসাধ্য ব্যায়াম অথবা কুস্তি করা, দাঁড় টানা ও দৌড়ান প্রভৃতি ব্যায়ামে ফুসফুসের কার্য্য অত্যধিক হয়। তজ্জন্য দেহে কার্বন ডাই-অক্সাইড অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শারীরবিজ্ঞানের একটি পরীক্ষিত সত্য এই যে, ফুসফুসের কার্য্য কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টির সমানুপাতিক। যতই কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হইবে ততই ফুসফুসের ক্রিয়া বাড়িবে। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড কম পরিমাণে উৎপন্ন হইলে ফুসফুসের গতি

এক মধু-রাতের গল্প

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

—কি-কি খেয়ে এলে বাবা ?"

বেশ আড্ডা জমিয়েছিলাম পুকুর পাড়ে…চায়ে মাছও এসে জমেছে—পিছন হতে সইমা'র কথায় ফিরে চাইলাম !…নিজে হাতের কাষ ফেলে খোঁজ নিতে এসেছেন আমার খাওয়া যথারীতি হয়েছে কি না।

বনেদী ঘর…কিন্তু যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ তাঁরা শূদ্র ; তাই তাদের গৃহে আমার অন্নগ্রহণ চলবে না, অন্ততঃ বুড়ো কর্ত্তা যত দিন বর্ত্তমান আছেন ! এই নিয়ে সইমা'র কত না আফশোষ…নিজের ঘরে—নিজেদের হেঁসেলে কত কি ভাল-মন্দ হয়—বাছা আমার দু'-চার দিনের জন্য আসে, তাকে আশ মিটিয়ে খাওয়াতে পারি না !

…খাওয়াটা তিনি ব্যবস্থা করেছেন পাশেই বামুনপাড়ায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে—যথারীতি তরি-তরকারী-মাছ ইত্যাদি দিয়ে পাঠিয়ে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তবু খেয়ে আসার পরই সহসা প্রত্যেক দিনই খোঁজ করেন যথারীতি আমার খাওয়া হয়েছে কি না !…

…শরতের হাওয়া লেগেছে মুক্ত উদার প্রান্তরের বুকে…ময়ূরাক্ষীর একটা মজা নদীর উপরই গ্রামখানার…সবুজ শ্যামল ধানক্ষেতের সীমা দেওয়া বাংলার শ্যামল একটি গ্রাম ! আখের সবুজ পাতার ইসারায় বেণুবনসীমা মাথা নেড়ে সায় দেয় ! পুরোনো আম গাছের বনে নেমে আসে রাতের অস্পষ্ট অন্ধকার…শিউলীর দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে শরতের আকাশ ! ঢাক-ঢোল আর কাঁসরের শব্দ মুখর সন্ধ্যার আরতিক বাদ্য ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে চেঁচুরির বিলের জলে, সচকিত হয়ে ওঠে বালিহাঁসের ঝাঁক ! দু'-একটা ক'রে ফুটে ওঠে পাণ্ডুর মিনতি-মাখা সন্ধ্যার তারার চাহনি। শাদা কাশবনের বুকে জাগে রাতের দিক্‌হারা বাতাস !

…প্রথম সেদিন খেতে যাই কিনুদের বাড়ী, বেশ যেন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল…ছেলেটি নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। মাটির কোঠা-ঘর ঝকঝকে তকতকে করে নিকোন, উঠানের মাঝে তুলসী-মঞ্চের কাছে ঘেরা দেওয়া সামান্য একটু জায়গা—দুই আরও কি সব তরি-তরকারী হয়েছে ! অভ্যর্থনা জানান বর্ষীয়সী এক জন মহিলা !

—"এসো বাবা ! অনেক বেলা হয়ে গেছে !"

—"না—না ! কি আর এমন বেলা হয়েছে !"

…খেতে বসলাম ! সারা ঘরে বেশ একটা ঝকঝকে তকতকে ভাব…যেন সুনিপুণ হাতে কেউ অন্তরালে থেকে এ সব ঘড়ির কাঁটার মত করে চলেছে ! জল খাবার গেলাসটি পর্য্যন্ত সুন্দর করে মাজা ! বৃদ্ধা নিজেই কাছে বসে তদারক করে চলেছেন !

"কই, মুগের ডাল যে পড়ে রইল বাবা ! মাছের ঝোলটা ভাল লাগছে না ?"

বলে উঠি, "না—না, চমৎকার হয়েছে ! কিন্তু খাব আর কত ?"

বৃদ্ধার মুখটা যেন একটু মলিন হয়ে আসে ! বলে ওঠেন, "কি আর খাওয়াচ্ছি বাবা ! এক দিন ছিল যেদিন লোককে খাইয়েই আনন্দ পেতাম। আর আজ— "একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসে তাঁর বুক চিরে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বার হয়ে আসছি হঠাৎ একটি ভদ্রলোকের ডাকে ফিরে চাইলাম।…"শোন—শোন !"

এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে, ভদ্রলোক নেমে আসেন দাওয়া থেকে। জিজ্ঞাসা করেন—"ট্যাটেনহ্যাম সাহেবকে চেন ? শালা শূয়ারকা বাচ্চা।"

গালাগালটা কার উদ্দেশ্যে—আমার না সেই ট্যাটেনহ্যামের উদ্দেশ্যে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার কণ্ঠস্বরে বাড়ীর মধ্য হতে সেই বর্ষীয়সী মহিলা বার হয়ে আসতেই তিনি আবার ঘরের মধ্যে চলে যান। বলে ওঠেন মহিলাটি—"তুমি কিছু মনে করো না বাবা, ও ওই রকমই অমনি না হলে আমাদের এই হাল হয়।"

"না—না, আমি কিছু মনে করিনি। যান, আপনি বাড়ীর মধ্যে যান।"

ব্যাপারটা সমস্তটাই প্রকাশ পায় পরের দিন। খেতে বসেছি—সেদিন খেতে-খেতে মুখ তুলেই দেখি একটি মেয়ে। নীল রঙের শাড়ীতে সুগৌর রংটা মানিয়েছে চমৎকার…কালো চোখের তারায় লজ্জার সলজ্জ আভা। সুডৌল পুরুষ্টু হাতে কাচের দু'গাছি চুড়ি। কেন জানি না, মুখ নীচু করে খেতে থাকি।

সব নীরব। হাতের চুড়ি যেন তার অকারণেই বেজে ওঠে।

মন্থর হয়। এই জন্য নিদ্রিত বা শায়িত অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তজ্জন্য ফুসফুস প্রচুর বিশ্রাম পায়। আবার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সহিত ফুসফুসের গতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। ফুসফুসের ক্রিয়া বাড়িলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বাড়ে এবং ফুসফুসের ক্রিয়া মন্থর হইলে হৃৎপিণ্ডের গতিও মন্থর হয়।

সুতরাং পদ্মাসন প্রভৃতি ধ্যানাসন অভ্যাস কালে কার্বন ডাই-অক্সাইড অত্যল্প মাত্রায় উৎপন্ন হয় এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস প্রচুর বিশ্রাম লাভ করে। পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বসিলে নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি ধীর এবং হৃৎস্পন্দন কমিয়া যায়। তখন শ্বাসক্রিয়া প্রধানতঃ তলপেটেই চলে। এই সকল আসনে দেহের সমস্ত কার্য্য স্থগিতপ্রায় এবং নিশ্বাস-গতি মন্থর হওয়ায় সুনিদ্রা অপেক্ষাও অধিক বিশ্রাম লাভ হয়। কোন ধ্যানাসনে কিছুক্ষণ বসিলেই বোঝা যায়, মন সম্পূর্ণরূপে দেহভার হইতে মুক্ত। মানসিক বিশ্রাম ও সংযম লাভের জন্য এই সকল আসন অভ্যাস অত্যাবশ্যক।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনী বর্ণনা কালে তাঁহার 'ভারত পথিক' গ্রন্থে (৬৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "কতকগুলি যোগাসন এবং বিশেষ প্রক্রিয়া ও ধ্যানের সাহায্যে যৌন-প্রবৃত্তির সংযম আমার কাছে যৌবনে সহজসাধ্য হয়ে এসেছিল।" স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, জেলে অবস্থান কালে যোগাসন অভ্যাসের দ্বারা তিনি দেহ-মনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

"আর কি দোষ আপনাকে? মায়ের শরীর খারাপ তাই আমাকেই পাঠালেন জিজ্ঞাসা করতে।"

মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায়। জিজ্ঞাসা করি, "এ সব রান্না কার?"

"আমারই করা।" জবাব দেয় মেয়েটি।

ঝোলের বাটিটা···দু'-একটা তরকারী পাত হতে সরিয়ে দিই ঠেলে। মুখের ভাবখানা এমন করে উঠি যেন তুমিই আজ ডোবালে আমার খাওয়াটা!

উপরের দিকে আর চোখ তুলি না। কোন রকমে খাওয়া সেরেই উঠে পড়ি, হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, মেয়েটি তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে—কালো-কালো ডাগর দু'টো তারায় যেন জল চিক-মিক করছে। নিজেকে যেন অপরাধীই বোধ করেছে সে। পান এগিয়ে দেয় একটা। নীরবে নিয়ে বার হয়ে পড়ি। মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে। মনে যেন একটা আঘাত পেয়েছে সে! বেশ যেন জব্দ করা গেছে তাকে!

দুপুরে রোজকার মত খিড়কীর ঘাটে ছিপ ফেলা হয়েছে। সেদিন বোধ হয় অষ্টমী তিথি হবে। বাড়ীতে পূজো-মণ্ডপ তখনকার মত নীরব। চাকর-বাকরদের কোলাহলও থেমে গেছে। আমি, সইমা'র বড় ছেলে সাতন আরও দু'-এক জন মাছ ধরছি। নীরব মধ্যাহ্ন···গ্রামের শেষ সীমানা! খিড়কীর কালো জলে শরতের সোনালী রোদ হলদে হয়ে আসে পড়ন্ত বেলায়—ওপারের ঘন বেণুবনে দু'-একটা গরু অলস ভাবে জাবর কাটছে বসে-বসে। বাঁশ গাছের সবুজ পাতার মাঝে থোকা-থোকা হলদে বউড়ী ফুলের উপর ল্যাজঝোলা টুনি পাখী ঠোকর মেরে চলেছে···দিগন্তের দিকে শ্যামলের ঢেউ তোলা আস্তরণ··· দু'টো কালো চোখের তারায় ঝিকিমিকি করে অশ্রুর ইসারা!··· না! বেচারাকে এমন করে মিছি-মিছি জব্দ না করলেই ভাল হত! হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে সাতন—"নীপুদা···নীপুদা··· শেতো ছাড়···বড় মাছ!"

মাছটা যে এমন অতর্কিতে আক্রমণ করবে ভাবতেই পারিনি! কি সব ভাবছিলাম যা-তা···এমন সময়েই এই কাণ্ড! টানের চোটে জলেই পড়তাম আর কি! কোন রকমে সাতনের হাতে ছিপটা দিয়ে রক্ষা পেলাম! সেই···অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে তুলল মাছটা. বেশ পাকা একটা রুই···সের পাঁচ হবে!

হঠাৎ সাতনের প্রশ্নে ফিরে চাই, বলে ওঠে সে—"কি এত ভাবছিলে বল ত নীপুদা!"

একটু যেন হকচকিয়ে উঠি। বলে উঠি—"না—না! এমনিই!"

তার সন্ধানী চোখ যেন এড়াতে পারি না! দু'জনেই এক-বয়সী প্রায়···সুতরাং দু'জনের মনের খবর আমরা দু'জনেই জানি! তবুও সাতনের সামনে কেমন যেন দুর্বলতা চেপে রাখবার চেষ্টা করি।

মজা নদীতে বানের জল খুব বেশী আসে না! সামান্যই আসে··· সেদিন বোধ হয় ময়ূরাক্ষীতে জল বেড়েছিল তাই মজা নদীতেও স্রোত বয়ে চলেছে—প্রায় এক-বুক জল! গৈরিক জলধারা বেগে ছোট-ছোট ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে—আমি, সাতন আরও দু'-চার জন ছেলে নদীর জলে স্নান করতে গেছি—

হঠাৎ নদীর জলে আরও কাদের স্নান করতে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে যাই···নদীর পার হতে গাছ-কোমর করে কয়েকটি মেয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে···তাদের মধ্যে অণিমাও রয়েছে। হঠাৎ আমাকে দেখে সে যেন কেমন হয়ে যায়—ঝাঁপ দেওয়া আর তার হল না! সঙ্গের অন্যান্য মেয়েরা একটু বিস্মিত হয়ে যায়—"কি হল রে তোর অণি?"

অণিমা কোন কথা বলল না। তাড়াতাড়ি করে চলে গেল স্নান সেরে। ঘটনাটা সাতনের চোখ এড়ায় না; সে কিছুই বলে না, কিন্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে ব্যাপারটা।

সেদিন খেতে বসতেই দেখতে পাই অণিমাকে···মা বসে রয়েছেন ঝোলের বাটির পাশে আর একটা বাটি এনে নামিয়ে দেয় সে। মুখ দিতেই সারা মুখ যেন জ্বলে ওঠে—অসম্ভব ঝাল! চোখ বুজে জলের গেলাসটাতে চুমুক দিই। চোখ দিয়ে জল ঠেলে বার হয়ে আসছে। মুখ তুলতেই দেখি···অণিমা নীরবে এক বাটি পায়েস এনে নামিয়ে দিয়ে যায়—তার চোখের কোণে বেশ একটা দুষ্টুমি-ভরা চাহনি। কালকের শোধটা আজ সে নিয়েছে।

নিবারণ বাবু রেল-কোম্পানীতে কাজ করতেন,···বহু দিনের চাকরি। অণিমা, কিন্তু আর তার মা তিন জনেই বাবার সঙ্গে বাইরেই থেকে এসেছে চিরকাল! কি একটা কারণে নিবারণ বাবুর সঙ্গে তাঁর বড় সাহেব মিঃ ডার্নেনহাম-এর সঙ্গে মনোমালিন্য বাধে, সাহেবও কি একটা গালাগাল দেয় তাকে! নিবারণ বাবু আচ্ছা করে সাহেবকে ঘা-কতক কসে দিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে আসেন। তার পরই সুরু হয়েছে অভাব-অনটন! নিবারণ বাবুর মাথার গোলমাল দেখা দেয়! আজও তা বাড়তির দিকে চলেছে। অণিমার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে কোন্ দিন—এ নিয়ে পাড়ায় ঘরে কথাও শুনতে হয়, কিন্তু কিই বা করেন তাঁরা।

সেদিন অণিমাই বলে চলে তাদের অতীতের কাহিনী! রেলওয়ে স্কুলে পড়ত সে ক্লাস সেভেন-এ, সেইখান হতেই পড়ার শেষ হয়ে গেছে! এই পাড়াগাঁয়ে—কি করেই বা পড়বে আর পড়েই বা কি হবে!

কতক্ষণ সে গল্প করছিলাম জানি না! খাওয়া-দাওয়ার পর বার হয়ে যাব হঠাৎ অণিমা এসে হাজির। মুখের জ্বালা তখনও থামেনি! বলে ওঠে সে—"কাল আমার চোখ দিয়ে জল বার হয়ে গিয়েছিল! ভাল জিনিসকে এমনি করে কেউ খারাপ বলে?"

বলে উঠি, "আজ কি তারই শোধ নিলে আমার চোখ দিয়ে জল বার করে?"

হেসে ফেলে অণিমা! চোখের কোলে মধুর হাসির রেশ··· পরন্ত গালের টোলের মাঝে যেন কোন সুপ্ত যৌবনের লহর তোলে! পানটা এগিয়ে দেয়! হাতের স্পর্শে সারা দেহ-মন উদগ্র হয়ে ওঠে··· একটু সামান্যতম স্পর্শ. ব্যাকুল মন তাই নিয়ে ভরিয়ে তোলে তার সঞ্চয়ের মণিকোঠা!—"ভরদুপুরে গিয়ে কি করবেন! বড্ড রোদ—"

সারা বাড়ীর লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপুরের ক্লান্ত রোদ শয়ন বিছায় মিশ-কালো তেঁতুল গাছের মাথায়···কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে অলস তানে···মধ্যাহ্ন উদাস হয়ে ওঠে! তাম্বুল-রাগে লালিমা মাখা পাতলা দু'টো ঠোঁটের ফাঁকে যেন কত দিনে-রাতের কত কামনামদির কাহিনী কথা সন্ধান করে ফেরে কোন অতীতের শিল্পী! সেদিনের প্রতিটি মুহূর্ত যে কোন দিকে কেটে গেল

জানতে পারিনি। অণিমার চোখে যেন কোন্ অতীতের স্বপ্ন-সুখের দিন!

"কত দিন কাউকে বলতে পারিনি আমার কথা···আমার হারানো দিনগুলোর স্মৃতি একাই মনে করে রয়েছি! আজ বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—আমরাও গরীব! কি করে আমার বিয়ে দেবেন তাও এক সমস্যা···"

তাকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা আমার জানা নাই।

ওকে বলতে দিই ওর সমস্ত কথা! হঠাৎ বাইরে কার ডাকে চমক ভাঙ্গে! অণিমা উঠে পড়ে খাট হতে। কে যেন ডাকছে!

বার হয়ে আসি। সাতন নিজেই এসেছে ডাকতে।

"মা তোমার খোঁজ করছিল—বললাম, তুমি খেয়ে-দেয়ে বৈঠকখানার দোতলায় ঘুমুচ্ছ।"

"মিথ্যা কথা বলে এলে মাকে?"

বলে ওঠে সাতন—"না হয় সত্যি কথাটা তুমিই বলবে চল। ওটা আর আমি বলি কি করে?"

নীরব হয়ে গেলাম। মনের কোণে যেন উঁকি মারে কি একটা অন্যায় কাজই করে ফেলেছি! শুধু সেটুকু তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছি তার বিনিময়ে আমি—এ অন্যায়ের যদি কোন শাস্তি পেতে হয়—তা গ্রহণ করতে রাজী আছি।

ক'টা দিন যে কোন দিকে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না! কালীপুরের আকাশ-বাতাস—মজা নদীর ধারে আম বাগানের কালো আবছা অন্ধকার···সেগুনের ইঙ্গিতমাখা ধানের ক্ষেত···সবই যেন পরিচিত হয়ে গেছে। পরিচিত হয়ে গেছে আর একটি প্রাণী···যাকে হয়ত কোন দিনই ভুলতে পারব না! মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে তার স্মৃতি!

পূজো চলে গেল···আকাশে সোনালী রংএর আলোয় শীর্ণ শুভ্র মেঘের ভেলায় এল শরতের মধু-মাস···শিউলী শতদলের মালিকা পরে কোন অতনু কুরঙ্গিনীর নূপুর-নিক্কণে ধ্বনিত হল আকাশ-বাতাসে কার আগমনী···আবার আজ কোন বিয়োগ-ব্যথায় কেঁদে ওঠে সারা ক্রন্দসী!

চণ্ডীমণ্ডপে বিজয়ার আয়োজন হয়ে গেছে। বৃদ্ধ গোলক দত্ত বছরের পর বছর এই দিনটির প্রতীক্ষা করে থাকে। বিদায়ের মনে অশ্রুসজল নয়নে চেয়ে থাকে—পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন—পুনরাগমনায় চ—

আবার শরৎ আসবে, আসবে আবার মায়ের মধুর হাসির বরাভয় ···সেদিন কি বৃদ্ধ গোলক থাকবে! থাকবে এই ধরণীর মৃত্তিকায়! হয়ত বহু বৎসরের পরিচিত এই পৃথিবী হতে সে চলে যাবে দূরে—বহু দূরে! অশ্রুসজল হয়ে আসে দু'চোখ, কণ্ঠ হয় অশ্রুরুদ্ধ, প্রণাম করে বৃদ্ধ—

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।"

টপ্-টপ্ করে ঝরে পড়ে বৃদ্ধের দু'চোখ হতে অশ্রুধারা।

মজা নদীর বুকে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসেছি সবাই! জোৎস্নার মুক্ত ধারায় সবুজ ধান-ক্ষেত আগের প্রহরা-ঘেরা বাঁশ বন···শালুক ভরা খালের জল, সব যেন কোন এক মায়াময় হয়ে ওঠে। ···দূর-দিগন্তের গ্রাম-সীমা হতে ভেসে আসে আকাশে বিসর্জনের বাজনার শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে। পশ্চিম আকাশের সন্ধ্যা-তারার চাহনিতে আজ কার বিরহবিধুর নিথরতা!

অণিমাদের বাড়ীতে যখন এলাম রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। সাতন প্রণাম করে বার হয়ে এসেছে! আমিও আসছি। হঠাৎ কার ডাকে থমকে দাঁড়ালাম! জায়গাটা প্রায়ান্ধকার—ঝাঁকড়া তেতুল গাছটার বুক ভেদ করে ভীরু শিশু চাঁদের আলোকজাল নীচে পড়তে পায়নি! ···আবছা আলো-আঁধারিতে ভরিয়ে রেখেছে ঠাঁইটা। দাঁড়ালাম।

অণিমা একটা প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিল। আমি একটু বিস্মিত হয়ে যাই! বলে ওঠে সে—"প্রণাম করলে আশীর্বাদ করতে হয়, কি আশীর্বাদ করলেন?"

"তুমি সুখী হও, শীগ্‌গির বেশ ভাল ঘরে বিয়ে হোক!"

তার মুখের হাসি যেন মুছে যায়! চোখের কোলে দেখতে পাই আবছা অন্ধকারে টলটলে অশ্রু-রেখা! বলে সে—"সবই জানেন, ও-সব বলে লাভ কি?"

···নিজেও একটু লজ্জিত হই!···হঠাৎ কোন্ দিকে কি হয়ে গেল বুঝতে পারি না!···অণিমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি—"আমাকে ভুল বুঝো না, অণি! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও!"

ডাগর কালো তারায় কার তৃপ্তির ছোঁয়া দ্রুত নিশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করতে পারি—তার সারা দেহ যেন কাঁপছে কোন দুর্বার উত্তেজনার আবেশে! হঠাৎ দূরে কাকে আসতে দেখি···তাড়াতাড়ি নিজেদের সামলে নিই! অণিমা চলে গেল বাড়ীর ভিতর, আমিও সামনের দিকে পা বাড়াই!

ঘটনাটা সাতনের নজর এড়ায় না।

চলে এলাম কালীপুর থেকে।···যে সহজে প্রবেশ করেছিলাম গ্রামের সীমানায়, চলে আসবার দিন সারা মন যেন হাহাকার করে ওঠে কোন বিরহ-বেদনায়, কোন আত্মার আত্মীয়কে পিছনে রেখে যাচ্ছি। সেই শ্যামছায়াঘন নদীতীরে, কাশফুলের মধু মেলা, সবুজ ক্ষেতে ঘেরা হৈমন্তিক পর্ণশোভার আভাস, মজা নদীর দু'ধারে শিবশিয়ালের গতির আশেপাশে রাশি রাশি আকন্দ ফুলের বুকে পথিক ভ্রমরের আনাগোনা···বিগত বর্ষার স্মৃতিভারাক্রান্ত বাদশাহী সড়ক ধরে ধীর-মন্থর গতিতে আমাদের গাড়ীখানা গ্রামের মায়া কাটিয়ে পড়ল পথের সীমানায়! পিছন হতে চেয়ে দেখি, তালীবন সীমান্ত-ঘেরা গ্রামের বুক হতে কার ডাগর কালো দু'টো সীমাহীন চোখের কোনও সন্ধান মেলে কি না!

···সাতন বলে ওঠে—"কিছু ফেলে এসেছ না কি নীপুদা!"

"না, এমনিই।"

* * * *

এর পর আর হয়ত ওর সঙ্গে দেখা না হলেই ছিল ভাল! কিন্তু তা হল না!···মনের মৃন্ময়ীকে আবার যেদিন দেখলাম জীবনের দিক হতে···সে দুর্ঘটনা না ঘটলেই ছিল ভাল। কিন্তু গল্পের দিক হতে হয়ত এর প্রয়োজন ছিল, যেমন প্রয়োজন ছিল কোন নিষ্ঠুর বিধাতার তার আমার সঙ্গে আবার দেখা করানোর।

···কয়েক বৎসর কেটে গেছে!···ডাক্তারি পাশ করে বার হয়ে হাসপাতালে রয়েছি। সার্জারি, ব্যাণ্ডেজ, আর

রোগী-পত্তর নিয়েই দিন কেটে চলেছে। সকাল হতে রাত্রি পর্য্যন্ত সেই রুটিন মাফিক কাজ…এক মুহূর্ত্তও অবসর নাই। হাঁপিয়ে উঠি,—প্রাচীর-ঘেরা হাসপাতালের আশে-পাশে কয়েকটা সুপারী গাছ আর একটা বকুল গাছ,…গ্রীষ্মের শেষে ওর তলায় বিছিয়ে পড়ে অলস বকুল-দল…কোণের শিউলী গাছের বুকে আসে শরতের নিমন্ত্রণ! বৃষ্টিভেজা শরত-রাতে তারার আলোয় শিউলী ফুলের সুবাস মনকে নিয়ে যায় কোন স্বপ্ন-দেখা এক দেশে…সবুজ ধানক্ষেতের প্রহরা-ঘেরা গ্রামসীমা…এমনি এক মধু-রাতে কার ডাগর কালো চোখে কোন সুদূরের আমন্ত্রণ…কিন্তু সে সব আজ স্বপ্ন! সইমা নেই, স্নেহময়ী নারীর শ্যাম স্পর্শ-মধুর সংসারের আমন্ত্রণ আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে… গোলক দত্ত বিদায় নিয়েছে এই ধরণী হতে, কে জানে কাশীপুরের মরা নদীতে আজও বানের উতরোল আসে কি না? বাড়ীতে উঠোনের শিউলী গাছটা হয়ত মরে গেছে…নিঃশেষ হয়ে গেছে ঘন বেণুবনসীমা-ঘেরা খিড়কীর পুকুরের মাছ ধরার আয়োজন!…মিছে এ স্মৃতিশোক—তবু মন মানে না, যারা নেই কোন দিনই ফিরে আসবে না, তাদিকে ত ভুলতে পারি না!

বেলটা বেজে ওঠে, আপিসে নেমে যাই! একটা এ্যাকসিডেন্ট কেস! লরী-ড্রাইভারকে আনা হয়েছে…রক্তাক্ত দেহ! জ্ঞান ফিরে আসেনি! কিডনী ফেটে গেছে ছিটকে পড়ার জন্যই! একেবারে ছিঁড়েই গেছে—তবুও শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ি না! ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অপারেশন রেডি হয়ে গেল!…

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে কোয়ার্টারে ফিরলাম রাত্রি তখন প্রায় একটা! শরতের নির্মল আকাশে—চাঁদের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে এক-একখানা পেঁজা তুলোর মত মেঘ! বাতাসে শিউলীর সুবাস… খালের ওপারে দিগন্ত ছোঁয়া জলো মাঠে কাশের শুভ্র অমলিন হাসি! একখানা অন্ধকার কালো মেঘ ঢেকে দেয় চাঁদের আলো…!

বেড নম্বর সতের মারা গেছে!…ব্লাডার আর জোড়া লাগেনি! আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল! বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা… চোখের উপর এখনও মুখখানা ভাসছে। ওয়ার্ডে বার হয়েছি হঠাৎ কার কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম। বেড নম্বর সতেরোর স্ত্রী এসেছে!…তারই আর্ত্তনাদ…এগিয়ে যাই, হঠাৎ বাইরের জানলার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। সামনে সাপ দেখলেও মানুষের মনের অবস্থা এমন হয় না!…সারা শরীর অবশ হয়ে আসে! পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে! নীরবে ফিরে এলাম, এগিয়ে যাবার সাহস আমার হল না।

সহকারী ডাক্তার ছোকরাটি বলে চলেছে—"ওর স্ত্রীকে দেখলে দুঃখ হয় স্যার! বেচারার অল্প বয়স, এই সময়েই সব হারাল!…

আমি যেন স্বপ্ন দেখছি! শ্যামল এক গ্রামের বুকে এমনি এক শারদ সন্ধ্যায় কার স্বপ্ন-বিভোর দু'টো কালো ডাগর চোখের চাহনি …হাসির ঝলক যেন উছলে পড়ে তার গালের টোল বয়ে। হঠাৎ কান্নার শব্দ কানে যেতেই যেন চেতনা ফিরে আসে; বলে উঠি—"নিরঞ্জন, বেড-নাম্বার সতেরোর স্ত্রীকে বলে দাও, এটা হাসপাতাল…কাঁদবার জায়গা নয়—অন্য রোগী রয়েছে!"

…সারা মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসে আমার: উঠে চলে এলাম বাসার দিকে, নিরঞ্জনও অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখে!

…সন্ধ্যার আবছা আলো-আঁধারি, চারি দিকে কেন জানি না আজ আনন্দ-কোলাহল। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছি ডেক-চেয়ারে!

…কেন জানি না, আজ বার-বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাশীপুরের কথা…সইমার স্নেহমাখা মুখখানা…এমনি চাঁদের হাসিমাখা এক দল শিউলী ফুলের সুবাস-ব্যাকুল এক রাত্রি… অণিমার উষ্ণ প্রথম পরশ…

হঠাৎ পায়ে কার হাত ঠেকতেই চমকে উঠি! স্ত্রী প্রণাম করছে!

—হঠাৎ প্রণাম কেন?"

বিস্মিত হয়ে ওঠে সে—"বা রে—, আজ যে বিজয়া! প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করতে হয় জানো না? কি আশীর্বাদ করলে?"

…চমকে উঠি! আশীর্বাদ আর কাউকে করতে চাই না…এমনি এক রাত্রে আশীর্বাদ চেয়েছিল এক জন…আজ তার সব হারানোর ব্যাকুল ক্রন্দনের সাড়া সারা আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে। …তার সামনে যাবার সাহস আমার নাই!

স্ত্রী বিস্মিত হয়ে ওঠে—"কি এত ভাবছ বল দেখি!"

"কেন জানি না, মনটা ভাল নেই!"

…বার-বার এমনি এক মধু-রাত্রের কথা মনে পড়ে…সে রাতে …ছিল চাঁদ…ছিল শিউলীর হাসি…আর ছিল দু'টি কিশোর মনের মন দেওয়া-নেওয়া খেলা…আজ আমি শুধু স্মৃতির পসরা নিয়েই শ্মশানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি কাঙ্গালের মত! সামনে যাইনি… সেদিনের নীল শাড়ী…সুডোল দু'টো সুন্দর হাত…আর ডাগর চোখের চাহনি ভরা, অণিমাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই না, সে থাক অক্ষয় হয়ে আমার মনের মণিকোঠায়…কোন অপরূপ রূপে…আজ তার সবহারা নিরাভরণা মূর্ত্তি দেখতে আমি চাই না…। সত্যকে হারিয়েছি…স্মৃতিটুকু হারাতে আমি চাই না! কাঙ্গাল-মনের সম্পদরূপে ও আমার একান্ত নিজেরই হয়ে থাক!

একশ ছ ঘণ্টা

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত
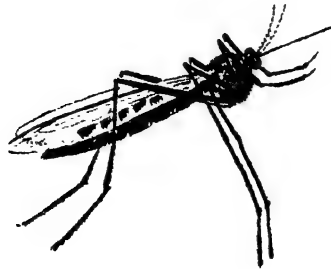
বয়লারের পাশে আমরা দু'জন কুঁকড়ে বসে আছি।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে যে এইমাত্র খুন করে আমরা বোধ হয় মুহূর্তের জন্য এখানে আস্তানা নিয়েছি, একটু সুবিধা পেলেই এখুনি জলে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করব! কিন্তু এই দুরন্ত শীতের রাত্রে কোন মানুষ বোধ হয় প্রাণের ভয়েও নীচের ঐ তর-তর জ্যোৎস্না-গলা জলে লাফিয়ে পড়তে চাইবে না।

দু'টি হাত অনবরত ঘষছি আমরা। একটু গরম হলেই ছেড়ে দিচ্ছি। আবার তখুনি ঠাণ্ডা হিম হয়ে আসছে। অবিরত ঘর্ষণের জন্যে কনুই দু'টো কনকন করছে। ঠাণ্ডাতেও বটে।

বয়লারের গায়ের তাপেও শরীর গরম হচ্ছে না। সত্যেন এক বার হাত ঠেকিয়েছিল। বাপ বলে দু'হাত পিছিয়ে আসতেও দেরী হয়নি। কিন্তু সেই আগুন-খেকো গনগনে রাক্ষসের গায়ের ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের দু'টো মনুষ্য-দেহ ঠকঠক করে কাঁপছে এ যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

সত্যেন বিড়বিড় করে বকছে। বকছে, না, ঠাণ্ডায় ওর কাঁপুনি ধরে চোয়াল দু'টো মুখের ভেতরে ঠোকাঠুকি করছে ঠিক ঠাহর করতে পাচ্ছি না। লেপ মুড়ি দিয়ে কাকে নিয়ে যেন আরাম করার কথা বলছে সত্যেন। মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছে!

আর মাথা-খারাপের দোষও নেই। মাঘ মাসে এবার শীতও পড়েছে দুরন্ত। ফাঁকা গঙ্গার ওপর উত্তুরে হাওয়ায় রাত্রি তিনটায় আমরা যা ভোগ করছি তাকে কি বলে জানি না, তবে জ্ঞানী লোকেরা তাকেই বলেন মায়া। আহা মা ভোগবতী, না না, মা ভাগীরথী যেন এই মাঘ মাসের রাত্রের শেষ প্রহরে মৃত্যুহিম দু'টি ব্যগ্র বাহু মেলে তার আতুর অনাথ ছেলেদের কোলে তুলে নিতে আসছেন। আর মায়াবদ্ধ জীব আমরা, মায়ের সেই মৃত্যুহিম হাত থেকে পালিয়ে বরং ঐ আগুন-খেকো রাক্ষসের গা ঘেঁসে বাঁচার চেষ্টা করছি।

..এরই নাম মায়া! এরই নাম জীবন! এরই নাম প্রাণ রাখার জন্য প্রাণান্ত!

ক্রেণের ডাণ্ডাটা উঁচু হয়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। বড়ো-বড়ো কাঠের গোলা তুলে নিচ্ছে হাতির শুঁড়ের মত, তার পর নামিয়ে দিচ্ছে নীচে জমিতে। দু'জন লোক সেই কাঠ আলতো হাতে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে আর কেমন তেকোণা উঁচু হয়ে উঠছে। বাহাদুর কুলিগুলো। সেই তেকোণা যত উঁচু হচ্ছে তারাও উঁচু হচ্ছে। এমনি করে চেষ্টা করে গেলে ওরা হয়ত গিয়ে স্বর্গের ছাতে পৌঁছতে পারবে।

জমির ওপর কতকগুলো কুলি মোটা মোটা কাঠ দিয়ে সেগুলোকে এমন ভাবে আটকে ফেলছে যাতে কোন রকমে সেই বাড়ন্ত কাঠের স্তূপ হড়কে না যায়। কাঠের গোলায় গেছেন যারা; দেখেছেন দাঁড়িয়ে সেখানকার কাজ—তাদের ধারণা হবে সহজে।

জামার পিছনটা ধরে টান মেরে চুপি-গলায় বললে সত্যেন—'বাঘ!' অর্থাৎ ক্যাপ্টেন, এই দিকেই আসছে। ও লোকটারও বোধ হয় এ রাত্রে চোখে ঘুম ধরেনি আর নয় ত—

আমরা আরো ঘেঁসে দাঁড়িয়েছি অন্ধকারে।

'হ্যালো' দুই হাতে আমাদের দু'জনের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ক্যাপ্টেন সামনে খাড়া দাঁড়াল। 'হোয়াট বাগার্ড এ্যাট্ দিস ডেড্ অফ নাইট' (এ রাত দুপুরে কারা বাবা তোমরা?)

'আমরা' কাঁধের হাড়টা পাঁজরের নীচে নেমে গেছে যেন।

তার পর সাহেব বললে, আহা, কণ্ঠে যেন মধুবর্ষণ করলে—'একটু রাম খাবে। শরীর গরম হয়ে উঠবে। শ্রান্তি শীত ভুলে যাবে প্রভু যীশুর নামে।'

আমরা রাম চাই না, এখন সজ্ঞানে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলে বাঁচি!

সাহেব মুখে তুতু করছে আর দোটানা ঝড়ে দোলা-লাগা অশ্বত্থের মত এপাশ ওপাশ করছে। রাম-লক্ষ্মণের সৌরভ বেরোচ্ছে বদনের রন্ধ্রপথে। আর কী মমতা-মাখান কণ্ঠ—কি প্রীতি!

'আমি জানি না কত কষ্ট তোমাদের? এই শীতে যখন জন্তু-জানোয়ার অবধি সব বাসায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে তখন তোমরা—প্রভুর কি নির্দয় হুকুম, তোমরা কাজ করছ পেট-ভাতার জন্যে।'

'হাঁ, সাহেব! একটানা ছিয়ানব্বই ঘণ্টা চলছে।'

কী নোংরা কথা কথা বলছ তোমরা। ছিয়ানব্বই ঘণ্টা একটানা! ছুটি পাও না?'

'দয়া করো সাহেব। এ নরক-কষ্ট আর সহ্য হয় না। আমাদের তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

'আমি কি করতে পারি? তোমরা প্রভু যীশুর স্মরণ নাও। তিনিই আসল পরিত্রাতা! আমেন।' বলে সাহেব বুকে ক্রুশ করল।

সাহেব আবার সামনে পা বাড়াল। দু'-পা এগিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে সত্যেনের মুখের কাছে নাক এগিয়ে বললে—'তোমরা আমার সঙ্গে ইংলণ্ড যাবে? তোমাদের খুব ভাল হইবে।'

আনাড়ির মত ভ্যাবাচাকা খেয়ে সত্যেন বললে—'না—না।'

সাহেবের সে কি অট্টহাসি! সে হাসিতে আমাদের পাঁজরের কাঁপুনি যে শুধু বেড়ে গেল তা নয়, যেন নিশীথ রাত্রির বাতাসের হাহাকার ক্ষেপে উঠল!

দুলে-দুলে হেসে শেষে আমায় দেখিয়ে বললে সাহেব—'ওর ঘরে বুঝি বৌ আছে—নতুন কনে-বৌ। তাই দূর-বিদেশে যেতে চাইছে না। আমারও বয়স কালে মন পড়ে থাকত সাসেক্সের এক গাঁয়ে। মেরী—আমার নয়নমণি সেই গাঁ আলো করে থাকত। আর আমি ভীত পশুর মত পৃথিবীর বন্দরে-বন্দরে ছুটোছুটি করে বেড়াতাম। এখন ভাবি' বললে ক্যাপ্টেন—'এখন ভাবি, কি বেবাক বোকা ছিলাম তখন।'

'বোকা? বোকা কিসের ক্যাপ্টেন? সুন্দরী মেরি বুঝি তোমার বৌএর নাম।'

'হত বটে। উনিশ বছরের মেরী গাঁয়ের সেরা সুন্দরী ছিল। যত ছোকরা ছিল দেশে, সবাই মেরীকে নিয়ে হনিমুন করার জন্যে কত ছল-কৌশল করে সে কথা তাকে জানিয়ে দিত। কিন্তু মেরী বড়ো যীশু-ভক্ত মেয়ে ছিল। সে আমায় কথা দিয়ে রেখেছিল, তোমায় পাই ত বিয়ে করব, নয় ত গীর্জায় গিয়ে আশ্রয় নেবো।'

'যে বছর ঝড়ে মেরীদের বাইরের ঘরগুলি পড়ে গেল, তার বাপ আমায় বললে, তুমি যে মেরীকে বিয়ে করব বলছ, তা বাপু তোমার মুরোদ কি? আমিও কম যাই না, বুক বাজিয়ে বললাম, ছবি যা আঁকতে শিখেছি, তাতে লণ্ডন থেকে ডাক পড়তে আমার দেরী হবে

॥ সে বছর আমার একখানা ছবি লণ্ডনে পনেরো পাউণ্ড পুরস্কার জিতেছে। আর সে কি ছবি! কুয়োর ধারে একটি মেয়ে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে ফুলে-ফুলময় চেরী-শাখা। মেরীর প্রতিমূর্তি সেই ছবি যখন লণ্ডনের এক দোকানদার কিনে নিয়ে গেল তখন মেরীর সে কি কান্না! বললে, অমন কতো টাকা আমি তোমায় দিতাম, যদি ওখানা আমায় দিতে। কিন্তু সত্যি বলো ত, প্রভু যীশুর নামে, আমার প্রিয়তমার কাছে আমি কি টাকা নিতে পারি? সেই ত আমার প্রেরণা।'

একটু থেমে যেন সাসেক্সের বাতাস টেনে নিলে সাহেব।

'তার পর পারিবারিক বিপর্যয়ে আমার লণ্ডন যাওয়া কপালে ঘটল। কিন্তু আমার সাধের আর্টস শেখার জন্য নয়, লণ্ডন ডকে কাজ শিখবার জন্যে। যেদিন আমি চলে আসি, সেদিন মেরী আমার হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে বলেছিল, আমি তোমারই রইলাম। শীগ্‌গির ফিরে এসো। আট বছর বাদে যখন সাসেক্সের গাঁয়ে ফিরলাম, তখন মেরী আমার সঙ্গে দেখাও করলে না।'

আমাদের ভেজা-ভেজা বাঙালী-মন ডুকরে কেঁদে ফেলছে তখন। বলে ফেললাম—'সে কি সত্যিই মঠে গিয়ে উঠেছিল?'

ক্যাপ্টেন বিকট কণ্ঠে হেসে উঠল, না, বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে-ভেঙ্গে পড়তে লাগল ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের অট্টরোল ছাপিয়ে আর একটা নিদারুণ বজ্রপাতের মত শব্দ আমাদের কানে পৌছল। তিন জনে আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম—তার পর ছুট।

ভগবান যখন মারেন, এমনি করেই মারেন। ভূমিকম্পে যেমন মেদিনী ফাঁক হয়ে মানুষ পশু ঘর-বাড়ী গ্রাস করে নেয় গহ্বর, ঠিক তেমনি ভাবে দু'টি লোক লোপাট হয়ে গিয়েছে।

নীচেকার কাঠের গোঁজা কি ভাবে সরে গিয়ে দু'টি লোক কাঠের ফাঁকে ঢুকে গিয়েছে। সবাই থতমত, কি করবে সেই চিন্তায় বিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত। আমরা যখন গিয়ে দাঁড়ালাম তখন মাল-খালাস অফিসের কর্তা নিজে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কঠিন কণ্ঠে হুকুম দিচ্ছেন, 'কুছ পরোয়া নেহি, আগে মাল খালাস হবে তার পর যা করবার আমি করব।'

অনেকে গাঁই-গাঁই ক'রে বললে—'সে কি স্যার, ততক্ষণে ওরা যে সাবাড় হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, সাবাড় হবার আর বাকী আছে কি না, বেয়াকুব কাঁহাকার।'

'বেয়াকুব হোক, একবার দেখতে দিন আমাদের চেষ্টা করে। যদি বেঁচে থাকে।'

'যদি বেঁচে থাকে! যদি চিঁ-চিঁ করে জলের তেষ্টা জানায়, তবে শূয়োর, কান পেতে বসে থাক পাশে আর নয় ত তোকেও তলায় নামিয়ে দি, গিয়ে দেখে আয়। ও-সব কোন কথা শুনতে চাই না। কাল বেলা বারোটায় জাহাজ পোর্ট লিভ করবে, কাজ শেষ করা চাই-ই। ভাগো, ফালতু আদমি, ভাগ যাও। কাম সুরু করো। জলদি!'

ক্যাপ্টেনও হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'বলে রাগ। ক্লিয়ার আউট। নইলে গুলী করব।'

মুহূর্তে ভীড় পাতলা হয়ে গেল। সেই হাড়-কাঁপুনি শীত, সেই থমথমে আবহাওয়া, সেই মত্ত শ্বেত-পুরুষের রক্তিম লোচন [illegible] কারুর আর মুখে রা করবার সাহস রইল না।

ক্যাপ্টেন গট-গট করে এগিয়ে এল। তার পর পাগলের মত চেঁচাতে লাগল—'কুলি, কুলি।'

ঢিলে প্যাণ্ট হুঁদোল গুটিয়ে সাহেব যেন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। তার পর সে কি অমানুষিক লড়াই!

দশটা কুলি আর সাহেব মিলে সেই স্তূপ করা কাঠের পাহাড় সরিয়ে যখন তলাকার পাটাতন দেখা গেল, তখন দু'টি শরীর দুমড়ান হোল। মেরে ছিঁড়ে করে ফেলার কথাটা ভীরু লোকের মুখের আস্ফালন বলেই জানতাম এত দিন, এবার স্বচক্ষে তা দেখলাম। মাথা থেকে পা অবধি লোক দু'টো রক্তাক্ত, থেঁৎলান!

আর সে কি মৃত্যু! ভারত-বর্মা সীমান্তে গভীর অরণ্যানী। পাহাড়ী নদী সেই অরণ্যের পদতলে বর্ষায় খরস্রোতা। উপর থেকে ঢল নামে যখন সেই নদীর বুকে, তখন ক্ষমতা নেই কারুর শালতি করে পার হয়। ঠিক সেই সময় বৃহৎ বনস্পতিদের কাল ঘনিয়ে আসে। মানুষের হাতের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্তব্ধ বন কেঁপে ওঠে প্রতিধ্বনিময় শব্দ-তরঙ্গে। সারা দিন ধরে কাজ করে কাঠুরেরা। ডাল-পালা খসিয়ে তবে মূল গুঁড়ির গায়ে হাত দিতে হয়। বহু বরষের সাক্ষী এই সব বনস্পতিদের গায়ে অস্ত্রের আঘাত দেবার সময় হাত কেঁপে ওঠে, তাই কাঠুরেরা দু'বার ভূমিস্পর্শ করিয়ে নেয় হাতিয়ারকে। তার পর কোপ দেয়। আবার কোপ দেয়। এক দিকে কোপ দেয় এক দল আর এক দিকে এক দল মোটা দড়ি দিয়ে গাছকে টেনে ধরে রাখে বিপরীত দিকে। নইলে হঠাৎ যদি টলে পড়ে তবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মজুরদের জীবন বিপন্ন হতে দেরী হয় না।

তার পর খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর তর-তর জলে ভেসে আসে সেই সব গুঁড়ি। হাতির শুঁড়ে দড়ি বেঁধে সেই কাঠ টেনে ডাঙায় ওঠানো হয়—অনেক নীচে যেখানে রেলওয়ের সুবিধা আছে কাছাকাছি। তার পর ষোলো চাকার গাড়ীতে খোলা ওয়াগনে মোটা টাকা নিয়ে সেই পাহাড়ী বনস্পতিদের কঙ্কাল-স্তূপ চলে আসে বন্দরে। তার পর আমাদের এই ডক। বিদেশী জাহাজদের ভীড়। দিন-রাত সরগরম। মাল ওঠা-নামা। একশ' ঘণ্টা একটানা কাজ। কাজের শেষে ঘরে ফেরা। আবার নিয়মিত জাহাজ খালাস-ভর্তির অফিসে খোঁজ নেওয়া—হাঁ' গা, কবে জাহাজ আসবে। কবে ঠিকে কাজে লাগাবে। হপ্তা শেষে টাকায় দু'আনা কেটে নিয়ে কবে তোমাদের বাবু পেমেণ্ট করবে? কবে চাল-ডালের দাম দোবো? মেয়েটোর জন্যে পথ্যি নিয়ে আনতে যাচ্ছি বলে সেই যে চলে এসেছি, তার পর চার দিন কেটে গেল। বাড়ী গিয়ে তাকে কি দেখতে পাবো?

কে কাকে দেখবে সংসারে? চারি দিক থেকে পাখীর দল সন্ধ্যা বেলা এসে আশ্রয় নিয়েছে এক বৃক্ষে। সকাল হলেই কে কার? যে যেদিকে পারলে চলে গেলো। মনেই রাখলে না।

কুলি দু'টি পুরোনো। বহু দিন ধরে এই জেটি-বৃক্ষে আমরা এক-সঙ্গে রুটি রোজগার করেছি। মাল খালাসের কর্তা আমাদের খেঁচিয়েছে, আমরা কুলিদের মুখ খারাপ করেছি। সেই নগণ্য ঘৃণ্য কুলি দু'টো এত দিন সংসার-নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে প্রপঞ্চময় মায়ার খেৎলে গেলো!

একটি-একটি করে সেই থেৎলানো শরীর দুই হাতে তুলে ধরে সাহেব এদিককার ধারে নিয়ে এল। আমরা বোকার মত দাঁড়িয়ে দেখলাম।

আজ মনে হচ্ছে, সে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। গঙ্গার কূলে রাত্রির শেষ ক্ষণে যখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়া চাঁদের ম্লানাভ আলোর শর্বরী দুঃস্বপ্নগ্রস্ত, তখন বোধ হয় ক্লান্ত ক্ষুধা-খিন্ন শরীর ও মনের সে একটা ভৌতিক উন্মত্ততা!

ধীরে-ধীরে আবার নিজেদের কাছে যে যার ফিরে গেল। আমরাও উঠে এলাম ওপরে।

ভাঙা প্যাকিংবাক্সের পাশে অনুকূল ঠেস দিয়ে গ্ন করে ঘুমুচ্ছে। ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

সব আবার শান্ত হয়ে এসেছে। মৃত্যুর কালো ছায়াটা এতক্ষণে জেটির ওপর থেকে সারা গঙ্গায় ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ রাতের এপার ওপার ঢাকা কুয়াসা তখন কাছের মানুষকে আড়াল করে দিতে সুরু করেছে।

কড়া সুরের গানে শীষ জুড়ে দিয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেন। মৃত্যু আর মৃতদেহ নিয়ে সারা জীবন যে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তার পক্ষেই হয়ত সম্ভব এই নির্বিকল্প সমাধি ভাব।

সত্যেনের ঠেলায় অনুকূল চোখ খুলেছে। অবাক হয়ে বলল—'তোরা কোথায় গেছলি রে? কি দেখলি বল ত?'

'কুলি দু'টো কি ভাবে মরে গেল দেখলে না তো?'

'মরার আবার দেখবার কি আছে? আমার বড় ছেলেটা যখন ধড়-ফড় করে মরল, কে ক'বার দেখতে গেছলি রে। ভাবি কেন, যদি দু'টো টাকা ধার চেয়ে বসি। সেই ভয়ে ত ও-পথ মাড়ালি না। সব জানা আছে রে।'

'হ্যাঁ, সব জেনে বসে আছ?' সত্যেনের গলায় অল্পবয়সী রোমান্টিকতা প্রকাশ পেল। তাতে তার লজ্জা হোল না। সে আরো কি বলতে যাচ্ছে দেখে অনুকূল তাকে ধমকে উঠল—'ফক্কড় ছোকরা—বাজে বোকো না। কাজে যাও, কাজে যাও।'

আমার দিকে ফিরে বললে—'একটা কেস ড্যামেজ ছিল। শালাকে খুলে ফেলেছি। দেখি কি ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুট। বসে বসে এক টিন প্রায় ঝেড়েছি। তোরা খাবি?'

'দাও, দাও, ও-কথা আবার জিজ্ঞেস করে? কখন খেলে?'

'তোমরা যখন মরা দেখছিলে, আমি তখন বাঁচার চেষ্টা করছিলাম। এরই নাম দুনিয়া, বুঝলে বাপধন!' বলে সত্যেনের দিকে টিটকিরি দিয়ে হাসলে অনুকূল।

'আমরা দু'জনে বাকী একটা টিন সাবাড় করলাম।'

কুলিগুলো মাল নিয়ে ছুটোছুটি করছে। তাদের তদারক করার কি যে ঝঞ্ঝাট, তা যাদের অভিজ্ঞতা নেই, তাদের বোঝানো যাবে না।

'এ রামধনিয়া, তু ক্যা করতা রে? উধার সে মাল ইধার লে আয়া কাহেকো? তুম একঠো বুদ্ধু হ্যায়। চল্, ঠিকসে কাম বানাও।'

'সামাল, সামাল, উ তরফ নেহি। বহুৎ দামী চিজ, হায় না উসকি অন্দর, দেখতা নেহি উদ্দু কেহা লিখা হায়—'

'পারব না মশাই আপনার অত ইনভয়েস মিলিয়ে কাজ করতে ইনভয়েস দেখতে দেখতে ওদিকে যে মাল ঝপাৎ ক'র ফেলে এক দফা গুঁড়িয়ে দেবে, তখন সে দায়িত্ব নেবে কে?'

চারটের ভোঁ বাজল। কানের ভেতর তালা লেগে যায়। পর-পর তিন দিন আজ ভোঁ শুনলাম। এসেছি মঙ্গল বার বিকেলে, আজ কি বার?

টাইম-কিপার বাবু বলেছিলেন—'নিজেরা এমনি করে জুড়ে বসে থাকলে অন্য লোকে চান্স পাবে কি করে?'

'সে কথা সত্যি। পরের জাহাজের তারিখ পেয়েছেন কিছু?'

'না।'

'তবে ছাড়ব কি করে? এ মাসে যদি আর জাহাজ না আসে?'

টাইম-কিপার বাবুর আর দাঁড়াবার সময় নেই। সকাল ছ'টায় পাল্টা লোক আসবে। গেটের ধারে তার ডিউটি। একটু চা খেতে পারলে ভালো হতো। শরীরটায় যেন জুৎ পাচ্ছি না আর। পাঞ্জাবীর দোকানটা এখান থেকে মাইল খানেক। যেতে আসতেই আধ ঘণ্টা। যদি বাবুরা জানতে পারে, আমি কাজের তদারকে নেই?

শেষ রাতের বৌ-কুয়াসা সর্বাঙ্গ ঘিরে ধরেছে। ব্রীড়াময়ী নতুন বৌয়ের মত ভোরের আগে যেন গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। শেষ রাতে যখন বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে অচেতন, তখন সে যেন সাহস করে কানের কাছে তার মন্ত্র জপছে। সাহস করে বলতে পারছে, 'একটু আদর করো না গো! আর কত ঘুমুবে?'

আবার ও যেদিন গিন্নী হবে, সংসারে কর্তৃত্ব বিস্তার করবে, ছেলে-মেয়ে পুষ্যি-পরিবার নিয়ে সর্বময়ী হবে, সেদিন প্রথম রাতেই স্বামীর পায়ে হাত দিয়ে সেবা করার ছল করে চেনা ডাকে সাড়া দেবে। তখন রাতের প্রথম দিকের কুয়াসার মত আচ্ছাদন করবে আমাকে। তাকে বলব গিন্নী-কুয়াসা।

নিরাপদ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে দেখলাম। ফিরি ফিটফাট চেহারা।

'কি রে, ও কখন জয়েন করল?'

'শালারা আমার সঙ্গে দুষমণি করলে এমন এবারে, ইচ্ছে করে মুখ গুঁড়িয়ে দি। তিন দিন ধরে শালা আমাকে ঘোরাচ্ছে। কতক্ষণ থাকবে রে জাহাজ?'

'শুনছি না কি বেলা বারোটায় পোর্ট লিভ করবে।'

'তবে আর দু' ঘণ্টায় কি পাবো?'

তবু নিরাপদ কাজে গেলো। খুদ-কুঁড়ো যা খুঁটে পাওয়া যায়।

মনে পড়ছে, ভোর পাঁচটায় এসে হাজির দিয়েছিলাম অফিসে। তার আগে কত লোক দাঁড়িয়েছে। এবার তার আমায় দিতে হবে। কত লোককে ফেরাচ্ছে বাবু। বলছে, ওবেলা এসো দেখা যাবে, সব ভর্তি হয়ে গেছে এ শিফটে।

তারা মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার তার পরেই আর এক জনকে টিকিট দিয়ে দিচ্ছে। এরা বারাবায়ু করতে পারছে না। বাবুকে চটালে আমাদের প্রাণ-বায়স ছড়ানো ভাত পাবে না। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

সুতরাং ওবেলা এসে আবার হানা দিলাম। স্যার নিয়ে নিন। বেকার বসে আছি। বড়ো টাকার দরকার।

দয়া হোলো না, টিকিট পেলাম না। কতক্ষণ ডাল ধরে ঝুলে রইলাম। বাবুর যদি দয়া হয়। যদি ভাতের দানা পাই।

বাসের পয়সাটাই মারা গেল। শ্যামবাজার থেকে খিদিরপুর আসার সময় পয়সা খরচ করতে গায়ে বাজে না। কিন্তু ফেরার সময় অপরাধী মনে হয় নিজেকে। বোনের জমানো পয়সা থেকে মা বার করে দিয়েছিলেন। সে জানতে পারলে কেঁদে-কেটে অনাসৃষ্টি করবে। কিন্তু উপায় কি!

পরের দিন ভোরে আবার সেই সমস্ত পথ অতিক্রম করা। আবার সেই অফিস। টানাটানি। দিন না, দিন না স্যার— আপনার পায়ে ধরছি। দয়া করুন স্যার গরীবের দিকে—

আচ্ছা, যান।

আঃ, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যে লোকটাকে কাল অবধি নোংরা ঘৃণ্য পশুর অধম মনে হয়েছিল, আজ তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। সামনের দু'টো দাঁত ভাঙা, গালটা তোবড়ান। মুখখানা পিশাচের মতো। জাহাজী অফিসে মাইনে পায় তিয়াত্তর টাকা। কথায়-কথায় হডসন সাহেবের কথা তোলে।

কিন্তু এখন সেই মানুষটিকে কত ভালো লাগল। ভোর বেলা টাকার পথ যে খুলে দেয় সে ত দেবদূতের চেয়েও দয়াময়!

তিন নম্বর ডেকের প্রহরী লোকটা জান-পয়ছান। রাম-রাম বলে সেলাম ঠুকলে।

ভোর বেলায় গঙ্গার ধার সত্যি মনোরম। মন একটা অদ্ভুত উল্লাস অনুভব করে যা কথায় বোঝানো যায় না। শরীর লঘু মনে হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় খাটুনিতে কষ্ট হয় না, বেজার ধরে না।

বেলা বারোটায় রুটি-মাংস খেয়ে এসে আবার কাজ। সমস্ত দুপুর সূর্য মাথার ওপর রোদ দেয়। ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে শরীর। চোখের উপর হলদে রঙের আলোর কণা ঘুরপাক খায়। সব যেন ঝিম-ঝিম করতে থাকে। কিন্তু কাজের বিরাম থাকে না। আর থাকে না হৈ-হৈ, কলরব, গালি-গালাজের বিরতি। দুম-দাম পেটি ফেলে কুলিরা, ঠেলা লোহার গাড়ীতে ঘড়-ঘড় করে মাল ঠেলে নিয়ে যায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, ক্রেণের ঘড়-ঘড়, গোলমাল, জাহাজের ভোঁতে যেন দুপুর শব্দময় হয়ে ওঠে।

এক সময় সূর্য ঢলে। গঙ্গায় জোয়ার থেমে ভাঁটায় টান ধরে। জলে-ডোবা পাড় দেখা যায়। পশ্চিম পাড়ের জলে ঝিমঝিম করে আলো-ছায়ার ঝাড়-লণ্ঠন। যেন ঐ ভিন পাড়ের কিশোরী মেয়ের দল ছায়া-ঢাকা দেশ থেকে প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়েছে জলে। যেন জলপরীরা রাশি-রাশি আকাশ-প্রদীপ তুলেছে জল-বাজার ওপর আকাশে। তাদের আলো কাঁপছে জলের ঢেউয়ে।

যাদু লাগে, মনে যাদু লাগে। শুধু মনে হয় ক্ষিদে পাচ্ছে। সেই কখন বেলা বারোটায় খেয়েছি। টাইম-বাবুর কাছে আবার হাজিরা-খাতায় নাম টুকিয়ে দিয়ে খেয়ে আসি।

রাত্তির ঘনিয়ে আসছে গঙ্গার ওপর। টিপ-টিপ আলো জ্বলছে নৌকার গলুইতে। অন্ধকার আচ্ছন্ন গঙ্গার জলে জোনাকি পোকা জ্বলছে উপর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতিচ্ছায়াতে।

খেয়ে এসেছি এই মাত্র। পেটের ভেতর অস্বস্তি লাগছে কেমন। মাথাটা টিপ-টিপ করছে। আজ রাত্রে আর বাড়ী যাওয়া হোলো না। মা বসে থাকবেন অনেকক্ষণ কান পেতে। ভাতের থালা নিয়ে জেগে থাকবেন আমার কড়া-নাড়ার অপেক্ষায়। যতক্ষণ না যাবো ততক্ষণ নিজে খাবেন না।

আজ রাত গভীর হয়ে আসবে, মায়ের চোখ ঢুলে আসবে, কত বার চমকে উঠবেন গলিতে খসখস জুতোর আওয়াজ পেয়ে। শেষে হয়ত নিশ্চিন্ত হবেন যে আজ আর রাত্রে সে ফিরবে না। তখন ভাত খেয়ে নেবেন। শেষ গ্রাসটি মুখে তুলে একবার বুঝি আনমন হয়ে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলবেন।

মা জানেন না, জাহাজ-ঘাট কেমন, জাহাজ কেমন। শুধু জানেন, দূর-দূর দেশ থেকে এ যুগের চাঁদ সওদাগরদের ময়ূরপঙ্খী জাহাজ আনাগোনা করে আমাদের এই গঙ্গার কূলে। মাল খালাস হয়, মাল তোলা হয়। তার ছেলে সেই মাল ওঠা-নামার তদারক করে। সাহেব তার ছেলেকে নিয়েছেন কাজে।

কবে ফিরবে কে জানে? এক দিন, দু'দিন, তিন দিন, চার দিন। প্রত্যেক বার দোকানে পাঠাবেন বোনকে আর ভয়ে-ভাবনায় আঁতকে উঠবেন পয়সার জন্যে। খাবেন না, তবু ত মধ্যবিত্ত জীবনের ত্রাস ছাড়াতে পারবেন না। ধার করে চালাবার মত মনের জোর নেই, কারুর কাছে হাত পাততে সম্ভ্রমে ঠেকবে, বাধ্য হয়ে হাতের কলি পাঠাবেন পাশের বাড়ীর শশাঙ্ক কাকাকে। তিনি খুসী হয়ে যা দেবেন।

সত্যেন কোন্ ফাঁকে সরে পড়েছে। বোধ হয় আবার কোথাও প্যাকিং-বাক্সের আড়ালে শুয়ে ঝিমোচ্ছে। ওর চোখ দু'টো হলদে হয়ে আছে। বাইশ বছরের ছেলেটা দিব্যি আঁটসাঁট রসাল ছিল যখন আলাপ হয়েছিল। এখন দড়ির মত পাকিয়ে গেছে। কেবল ভিতরের স্নিগ্ধ ছেলেমানুষী মরেও মরছে না।

ভোরের আলো উঠে গেছে। তবু এখনও শুকতারাটি সূর্যের তির্যক রশ্মি শরের ভয় না করে দপ-দপ করছে শূন্য আকাশে।

জাহাজের মাতাল ক্যাপ্টেনটা উপরের নিজের ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে লাল রঙের জরি-বসানো ভারী কোট। বড়ো-বড়ো সোনালী বোতাম সারা বুকের ওপর ঝকঝক করছে। মাথায় টুপি নেই। বাদামী চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। রাত্রি জাগরণ ও মদ দুইয়ে মিলে মুখখানা ফোলা-ফোলা। তাকিয়ে দেখছে দক্ষিণে, সমুদ্রের মোহানার দিকে।

দেখতে দেখতে মনে হোল, বহু দিন আগে দেখা নীবোর ছবি। দুই করতল রেলিং-এর উপর থাবা দিয়ে রাখা, শরীরটা সামনে ঈষৎ ঝোঁকান। হয়ত দাঁড়িয়ে সুন্দরী মেরীর কথা ভাবছে। সাসেক্সের কোনো গাঁয়ে কুঞ্জের তলায় পিছনে ফুল-ফুলময় চেরী-শাখা রেখে যে উদাসিনী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তরুণ শিল্পী প্রিয়তমের সামনে। আট বছর বাদে যার দেখাও পায়নি ক্যাপ্টেন।

জীবনের সব গল্পের শেষ জানা যায় না। বেলা বারোটায় জাহাজ এ বন্দর ছেড়ে যাবে আর সেই সঙ্গে গঙ্গার মোহনা পার হয়ে ভেসে যাবে ক্যাপ্টেন ও মেরীর শেষ-না-জানা কাহিনী।

আবার কাজ শুরু হয়েছে। হৈ-চৈ-এর মধ্যে আর কোন খেয়াল রইল না বেলার। রোদ যখন গায়ে পড়ল তখন মনে হোল, শরীরের ভেতর বুঝি জাহাজের বয়লারটা ঢুকেছে। গঙ্গার জলে

মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিলাম। কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডায় কি হবে। একশ' ঘণ্টা একটানা গেল এই শরীরের উপর দিয়ে।

'শুনছেন ?'

কার গলা পেয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছি। হাতের খাতাটার পেনসিলটা ঢোকানো ছিল, সেটি বার করে নিয়ে মাল গোণার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিলাম, এমন সময় সাড়া পেয়ে দেখি এক জন পুলিশ অফিসার আর জাহাজ-অফিসের কর্তা।

'আমায় বলছেন স্যার !'

'হ্যাঁ, নিরাপদ মজুমদার কোথায় ?'

'নিরাপদ ? সে ত ডিউটিতেই আছে স্যার।'

'তা জানি। আপনার সঙ্গেই ত তার ডিউটি। কোথায় সে ?'

'এই ত ছিল স্যার। বোধ হয় মুখ ধুতে গেছে। এখুনি আসবে স্যার। আমি দেখব একটু ?'

'কতক্ষণ আগে গেছে ?'

'এই ত স্যার এখুনি ছিল। কাজের মধ্যে অত খেয়াল নেই, কখন চলে গেছে।'

'বাজে কথা ছাড়ুন। কতক্ষণ তাকে দেখতে পাচ্ছেন না, ঠিক করে বলুন।'

আমি আমতা-আমতা করছি দেখে সাহেব সবুট পা ঠুকে বললে—'মিথ্যেবাদী—হারামবাগ। ধাপ্পা দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। ডেকের পুলিশের দয়া-মায়া নেই। জানেন ত ?'

ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সমস্ত শরীরে কাল-ঘাম ছুটছে। 'আমি কিছু জানি না—আমি কিছু—'

'চলুন আমার সঙ্গে।'

যেমন করে ফাঁসীর আসামীকে সামনে-পিছনে-পাশে প্রহরী বেখে নিয়ে যায়—আমাকেও এরা তেমনি করে আফিসে নিয়ে এল।

ঘরের ভেতর দু'টো চীনে আর নিরাপদ মাটিতে বসে আছে। তাদের হাতে হাত কড়া। পাশে বন্দুকধারী পুলিশ।

'এদের চেনেন ?'

'ঐ ত নিরাপদ ! আমায় তবে—আমায় কেন এমন করে ধরলেন—আমি কি করেছি—'

'রিভলভার চালান দিচ্ছিলেন এই অপরাধে ওরা ধরা পড়েছেন। আপনি সাক্ষী দেবেন।'

'রিভলভার—সাক্ষী—'

নিরাপদ খ্যাঁক করে উঠল—'ও কি সাক্ষী দেবে ? নিজের বোনের জন্যে যে একখানা বিলিতি বিস্কুট পকেটে করে নিয়ে যেতে পারে না, সে সাক্ষী দেবে রিভলভার চুরির। ওর মত ভীতু মানুষ আছে না কি ?'

অফিসার দাবড়ে বললেন—'চুপ কর। কে কি আমরা জানি। এ দরওয়াজা, গাড়ী বোলাও।'

পুলিশের গাড়ীতে চালান হবার নামে আমার দু'চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। মায়ের কথা মনে পড়ল। ভাই, বোন, অনাহার।

কোমরে দড়ি বাঁধা, হাতে হাতকড়া, ওদের তিন জনকে বেঁধে লাঠির গুঁতোয় আগে তুলল সেপাইরা। তার পর তিন জন সেপাই উঠল। আমি পুলিশ-অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছি মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে। দয়া করুন, দয়া করুন।

গাড়ীতে ওঠার সময় অফিসার আমার পিঠ থাবড়ে বললেন—'ভয় নেই, আপনার কোন ক্ষতি করতে চাই না আমরা। তবে দরকার হলে খবর পাঠাব।'

পুলিশের গাড়ী কখন চলে গেছে আমার মনেও নেই। গভীর সমুদ্রের উদ্বেগ ঢেউয়ের ঝাপটায় শরীর-মন তখন এমনি অসাড় হয়ে গেছে যে নিরাপদ পাড়ে দাঁড়িয়েও সাহস পাচ্ছি না।

সকাল আটটায় ভোঁ বাজল। আর শরীর বইছে না। ভগবান, আরো কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখো, অনেকগুলো টাকা পাবো।

শেষ সময়ের হুড়োহুড়ি কাজ আরম্ভ হয়েছে। শরীর যত কাহিল হচ্ছে, কাজের বোঝা তত ভারী বোধ হচ্ছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে সুরু করছে। গলা শুকিয়ে উঠছে। জিভ টানছে ভেতর দিকে। আঙুলের ফাঁকে পেনসিলটা আটকে গেছে। নড়াবার ক্ষমতা নেই দেহে। তবু ছুটছি, এখান থেকে ওখানে। এই বসছি, এই দাঁড়াচ্ছি। ছুটোছুটি, লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি। ক্রমান্বয়ে মেহনৎ করে যাচ্ছি।

ঈশ্বরের নির্দেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের রুটি-রোজগার ! ঈশ্বরের করুণার বালাই নিয়ে তাই করছি পুরো দমে।

বেলা দেড়টায় আমার অফ্ হয়ে গেল। বিকেল চারটের জাহাজ দূর-সমুদ্রে পাড়ি দেবে। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর পেরিয়ে জাহাজ এগোবে সপ্ত সাগর ডিঙিয়ে। কত বন্দর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাবে—ভিড়বে গিয়ে দেশের বন্দরে।

বিদায়, ক্যাপ্টেন ! তোমার সুন্দরী মেরীর গল্পটা শেষ হয়নি ! নাই বা হোল।

বিদায় রামখিলান আর জগুয়া ! হঠাৎ খেতলে যাওয়া তোমাদের জীবন-প্রহসনেরও শেষ হয়নি। থাকই না বাকী।

কি-ই বা তাতে আসে-যায়।

নিগ্রো সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস
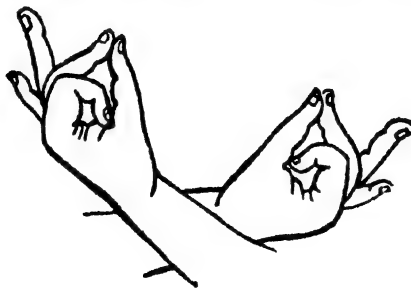
আনন্দ দে

নিগ্রোরা আজ আমেরিকার সমাজ-জীবনে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী এবং প্রয়োজনীয়ও। নিগ্রোদের বাদ দিয়ে আজ তাই আমেরিকার কোনো ওজন চলতে পারে না। শুধু আমেরিকার নয়, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সামগ্রিক সংস্কৃতির মান যেন নেমে যায় সবিশেষ। বিশেষ করে নিগ্রো সাহিত্যের ইতিহাস, তার রূপ ও স্বরূপ আমরা যদি না জানি। যদি না জানি তার আনুপূর্বিক ইতিহাস।

সাহিত্যক্ষেত্রে নিগ্রো-মানসের যে প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম দেখা যায়, তা অনেকখানিই, না, সবখানিই কাব্যিক আত্মপ্রকাশ। সবই তার কবিতার আংগিকে আর ঢঙে, ভংগীতে। এবং এই কবিতার আংগিক আর বাণীনির্মাণ শুভ্রাংগ আমেরিকার প্রভূত প্রভাব-সমৃদ্ধ। আফ্রিকার আরণ্যক মানুষ নতুন পরিবেশে এসে হঠাৎ এতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো যে, সপ্রাস্ত কথায় আত্মপ্রকাশের জন্যে দু'হাত জোড় করে দাঁড়াতে হলো গৃহকর্তার দ্বারে। ১৭৯০ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে যে সাহিত্য-সম্ভাবনা দেখা গেল, তার অধিকাংশ জন্ম নিলো ধর্মীয় আয়তনের হোমধূমপূত পরিমণ্ডল থেকে। জুপিটার হেমন্‌কে নিগ্রো কবিতার প্রথম কবি বলা চলে। তাঁর সম্বন্ধে আজ বিশেষ কিছু জানা যায় না। লং দ্বীপের এক শ্বেতাংগের কাছে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। সামান্যতম লেখাপড়া শিখেছিলেন তিনি। আমেরিকার নতুন পরিবেশে তিনিই নিগ্রো-মানসকে কবিতার মধ্য দিয়ে স্ফুট করেন। গদ্য-সাহিত্যে তাঁর যা দান তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এ কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা। হেমনের সমসাময়িক কবি শ্রীমতী ফিলিস হুইটলে বোষ্টনের এক বণিকের কাছে বিক্রীত ছিলেন। হুইটলে পুরোপুরি ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর কবি-কীর্তি অসাধারণ কিছু ছিল না। বরং বলা যায়, হেমনকে তিনি অদ্ভুত ভাবে অনুকরণ আর অনুসরণ করেন। ভারনন লোগিনস্ তাঁর কবিতা সম্বন্ধে বলেন, তাঁর কবিতা অনেক মার্জিত, অনেক শালীন, হেমনের মতো স্বতস্ফূর্ত নয়। সব চেয়ে বড়ো কথা, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কবিতার সংগে তাঁর কবিতার পার্থক্য বোঝা ত যেতোই না, উপরন্তু নিগ্রো মহিলার কবিতা বলাও প্রায় অসম্ভব ঠেকতো। কবিতায় ধর্মীয় চেতনা থাকবেই, এ ত জানা কথা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিগ্রো-মনে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল, ফলে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ক'জন নিগ্রো-সাহিত্যিক কাঁচা গদ্যে কলম চালালেন। এই কলম চালনায় ভাবাবেগ ছিল না, কেবল ছিল প্রচুর চিন্তাশীলতা। বেঞ্জামিন ব্যানেকার তাঁদের মধ্যে প্রধানগণ্য। ১৭৯০ সালে কিন্তু সাহিত্য-প্রচেষ্টায় নিগ্রোদের নয়া প্রচেষ্টা সুরু হয়। তখন শুভ্রাংগ সমাজ থেকে পৃথক্ হয়ে নিগ্রোরা নিজেদের জন্য পৃথক্ ধর্মীয় আয়তনের জন্যে গড়া-পেটা করছেন। সেই সমস্ত ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এক কালে ছিলেন ক্রীতদাস। তাঁরা নিজেরাই স্বকীয় সাধনায় লেখাপড়া শেখেন; তাঁদের প্রচারিত পত্রিকা-পুস্তিকায় শ্বেতাংগ গীর্জায় নিগ্রোদের অবমাননাকর অবস্থার বিরুদ্ধে বিশেষ জোরদার ভাষায় লেখেন এবং সেগুলো নিগ্রো জন-মনে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে তখন থেকেই নিগ্রোদের মধ্যে জাতি-চেতনা মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে যাঁদের গদ্য-সাহিত্য বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাঁদের মধ্যে রিচার্ড অ্যালেন ও এ্যাবসালোম জোন্‌সের নাম বিশেষ বিখ্যাত। নিউ ইয়র্ক সহরে যিনি ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে সে সময়ে সব চেয়ে সাহসিকতার সংগে সংগ্রাম করেন তাঁর নাম ডেভিড রুগেল্‌স্। ডেভিড রুগেল্‌স্ এক জন সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনিই নিগ্রো-পরিচালিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'মিরর্ অব লিবার্টি' প্রকাশ করেন। উচ্ছেদ-আন্দোলন যখন চলতে থাকে তখন ডেভিড ওয়াকার প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা "আবেদন"। এই "আবেদন" সমগ্র জাতিকে প্রাণবন্যায় উদ্‌বুদ্ধ করার আবেদন। জর্জিয়া রাজ্য তাঁকে জীবন্ত বা মৃত ধরে আনতে পারলে মোটা রকম পারিশ্রমিক দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। এই আন্দোলনের সময় বহু নিগ্রো নারীর অকৃপণ সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল। বিশেষ উল্লেখ্য হেরিয়েট টাব্‌ম্যান, যাঁকে ধরার জন্যে চল্লিশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এই ধরণের সংগ্রামমুখীনতা থেকে নিগ্রো গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টি-প্রেরণা জাগে। নিগ্রো জনগণকে অবহিত করার জন্যে নেতারা সংবাদপত্র প্রকাশ পর্যন্ত করেন। ১৮২৯ সালে একটি ক্রীতদাস জর্জ হরটন "স্বাধীনতার আশা" নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। কবিতাগুলো প্রেম-মৃত্যু-ধর্ম-প্রকৃতি নিয়ে লেখা। রবার্ট বার্ণস্-এর কবিতার সমপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "নগ্ন প্রতিভায়" 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত জীবনটাকে তিনি সুন্দর ভেবেছেন। হেমনের কবিতার মতো স্বতস্ফূর্ত না হলেও, আবেদন আবেগ নিতান্ত কুলীন।

কিন্তু ১৮৪০ সাল থেকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত যে যুগ, তখন নিগ্রো কবি-মানস সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে আত্ম-প্রকাশ করে। ১৮৪০ সালে দাসত্ব-প্রথা নিয়ে দেশব্যাপী আলোড়ন। এই আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা কিন্তু কলেজে শিক্ষিতও নয়। এই সময়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার ক্রুমেল অন্যতম। তাঁর লেখা গৃহযুদ্ধের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রকাশিত হয়। নিগ্রোদের সাহিত্যিক প্রয়াসের জন্যে ক্রুমেলের দান সগৌরবে উচ্চারিত হয়। তাঁরই সমসাময়িক সাহিত্যিক ব্রাউন তাঁর যে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন নিগ্রো-আত্মজীবনী সাহিত্যে তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বলতে পারার গুণে এ নিজেই সাহিত্য হয়ে গেছে! দাসপ্রথা উচ্ছেদ সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন, আর লিখেছিলেন য়ুরোপ ঘুরে এসে একখানা উপন্যাস। তিনি নিগ্রোদের একখানা ইতিহাসও লেখেন। এই যুগে আরও এক জন নিগ্রো সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রেডারিক ডগ্‌লাস তাঁর নাম! উচ্ছেদ-আন্দোলনে তিনিও কেউ-কেটা ছিলেন না। বক্তৃতায় তিনি সত্যিকারের প্রতিভাবান্ বলে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীও ব্রাউনের আত্মজীবনীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। চোখা যুক্তির সংগে অত্যন্ত দরদী প্রাণ নিয়ে যে কাহিনী তিনি নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে বলে গেছেন, তাতে তাঁর সাহিত্যিক-মানসের পরিচয়

পাওয়া যায়। তাঁর দু'খানা আত্মজীবনীর প্রথমখানা বেরুবার প্রায় তিন বছর পরে দ্বিতীয়খানা বেরোয়। এই যুগে নিগ্রো মনীষীদের মধ্যে যে সাহিত্য-বোধ, সেটা নানা কারণে সাংবাদিকতার আশ্রয়ে বৃদ্ধি পায়। সমস্ত নিগ্রো জাতিকে আবেদন করতে, উদ্বুদ্ধ করতে সাংবাদিকতাই উপযুক্ত মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়। ডগলাস্‌ও 'নর্থ ষ্টার' নামে একখানি পত্রিকা বার করেন। নিগ্রোদের ইতিহাস লেখার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন উইলিয়াম নীল; ডাঃ ডেলানী নিগ্রোদের সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুরু করেন। নিগ্রো-চার্চের বিবর ও সমস্যা নিয়েও গবেষণামূলক লেখার প্রচেষ্টা হয়। এই সময়ের কবিদের মধ্যে মহিলা কবি হারপারের নাম করা উচিত বিশেষ ভাবে। এই সময়ে কবিতার মধ্যে ব্যক্তি-মনের যতোখানি বিকাশ লক্ষ্য করেছি ততোখানি জাতিগত বা সমষ্টিগত চেতনার পরিচয় পাইনি। সাধারণ নিগ্রো জনগণের জন্যে তেমন ভাবনা চোখে পড়ে না। কিন্তু সমালোচক পার্ক বলেন, যে জাতীয় গাথা ও গীতিকা তখন প্রচলিত ছিল, তার মধ্য দিয়ে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে নিগ্রো-মন নিজেকে প্রকাশ করেছে। নিগ্রো দাসদের মনের অন্তঃপুরের কথা এই লোকগাথায় আপনাকে প্রকাশ করেছে। এই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু যদিও নিগ্রো লোক-গাথায় তদানীন্তন কর্কশ দাস-জীবনের রূপারোপ দেখতে পাই, এই লোকগাথার প্রভাব ততটা নিগ্রো-জীবনে দেখা যায়নি, যতোটা দেখা গেছে নিগ্রো স্পিরিচুয়েলসের। নিগ্রো স্পিরিচুয়েলস নিগ্রো লোক-গাথা বা সংগীতেরই এক অংশ। নিগ্রো-মন বাইরের দৈন্যে, আঘাতে-প্রতিঘাতে ওপরওয়ালা ভগবানের সমীপে আত্মনিবেদনে শান্ত হতে চেয়েছে। এই স্পিরিচুয়েলস ঘৃণ্য দাস-জীবন থেকে মুক্ত হয়ে ওপারে সুখ-সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখার কাব্যিক প্রকাশ। এই স্পিরিচুয়েলসে তাই গোটা নিগ্রো-মনের স্বাক্ষর মেলে। তাদের আশা-আকাংখার পুরোপুরি রূপটা ধরা পড়ে। এ যুগটা ঠিক মার্কিণ গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত আগের যুগ। যুদ্ধের পরে নিগ্রো জননেতারা সাহিত্যের পথে পা না বাড়িয়ে এগিয়ে সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁকেন। আর লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করতে থাকেন সমগ্র নিগ্রো জাতিকে। এই সময়ে যতোটুকু কাব্য-প্রচেষ্টা ঘটেছিল, তা অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টাকৃত মনে হয়, অনেকখানি পাণ্ডিত্য-প্রকাশসুলভ। এর পর বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের যুগ পর্যন্ত যে সময় তখন নিগ্রো জন-মন যথেষ্ট আলোকিত। কর্মবীর বুকার-টি ওয়াশিংটন নিগ্রো জনগণের নেতা। অবশ্য তাঁর নেতৃত্বে প্রচুর গলদ ছিলো। আপোষী মনো-ভাবের জন্যেও বটে আর তিনি নিগ্রো-চরিত্রের মন্দের দিকটা বেশী করে তুলে ধরতেন, কর্তব্যের দিকে যে ভাবে আঙুল তুলতেন, সে ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন না বলেই তাঁর নেতৃত্ব স্থায়ী হতে পারলো না। নিগ্রো-সমাজ তথা বুদ্ধিজীবীদের নেতা হয়ে উঠলেন ডাঃ ডু-বয়ের মতো সমাজতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ। এই যুগে সাহিত্য যতটা উন্নত হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী এগিয়ে গিয়েছিল সমগ্র নিগ্রো জাতি শিক্ষায়-দীক্ষায়। সাংবাদিকতার দিকে নিগ্রো বুদ্ধিজীবীদের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। ডাঃ ডু-বয়ের মতে ১৮১৮ সালেই নিগ্রো-পরিচালিত ও সম্পাদিত তিনটে মাসিক, তিনটে দৈনিক, ১১টা স্কুল ম্যাগাজিন আর ১৩৬খানা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচার ছিলো। জ্ঞানপ্রসারের ফলেই এটা সংঘটিত হয়েছে। এই যুগে নিগ্রো-সাহিত্যের দিকপাল হলেন ঔপন্যাসি চার্লস্‌ চেষ্টনাট ও কবি পল ডানবার। গল্পলিখিয়ে হিসেবে চেষ্টনাট সাহিত্যিক-জীবন সুরু করেন। তাঁর গল্পগুলো নিগ্রো লোকগাথার কাহিনী নিয়ে রচিত। শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে তাঁর গল্প বেশ উচ্চাংগের। 'দি কন্‌জিওর ওমান' তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ।

কবি পল্‌ ডান্‌বার নিগ্রো-মনের সংঘাত, যে তীব্র অসন্তোষ তা বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করেছেন। সহমর্মিতার সংগে তিনি নিগ্রো জাতটাকে দেখেছেন, আর প্রকাশও করেছেন। নিগ্রো সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে তাঁর একটা নামধন্য স্থান আছেই। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিনিই প্রথম নিগ্রো কবি বলে সুপরিচিত হন। নিগ্রো-মানসের রূপ ও স্বরূপ তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে সুডৌল ভাবে ফুটে উঠেছে এটা স্বীকার করতে হবে। সে রূপ ও স্বরূপ গ্রামীণ নিগ্রো-মানসের। প্রসংগত বলে রাখি, ডান্‌বার কবি হিসেবে খ্যাতিমান হলেও সাহিত্যের অন্যান্য বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি হাত দিয়েছিলেন। ডান্‌বারের পরে এক জন কবির নাম করা চলে, যাঁর Lift Ev'ry Voice and Sing নিগ্রোদের আজ জাতীয় সংগীত হিসেবে সভা-সমিতিতে গাওয়া হয়। নাম তাঁর জেমস্‌ জনসন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক বা তার অব্যবহিত পরে—নিগ্রো জাতীয়-জীবনে যে চেতনার প্রবাহ এলো, তাকে নিগ্রো রেনেসাঁ বলা হয়। দক্ষিণ দিক থেকে নিগ্রোরা উত্তর দিকে সরে আসতে লাগলো লাখে-লাখে। এই বিরাট সামাজিক ভূ-সংক্ষোভের ফলে নিগ্রো-জীবনের প্রচলিত পরিচিত সরণীতে দেখা দিলো নয়া মূল্যমানের হিসেব-নিকেশ। সুধী আলেন লক্‌ এই প্রসংগে বলেছেন, "The younger generation has achieved an objective attitude toward life.···Our pacts no longer have the hard choice between an over-assertine and an appealing attitude."—(the New Negro Ed. by Alain Locke) কথাটা ঠিকই। জীবনের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলে সাহিত্যে তার প্রকাশও রূপান্তরিত হবে। এই সময় কবিরা "Seek and find art's intrinsic values and satisfaction—and if America were deaf, they would still sing." আমেরিকায় নতুন পরিবেশে তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না। আদিম আরণ্য দিনের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আবার তারা ফিরিয়ে আনতে চায়। কবি কাউণ্টি কুল্লেন আর ল্যাংষ্টন হিউসের বলদৃপ্ত কণ্ঠ শোনা গেল নিগ্রো কবিতায়, আত্মসচেতনতার ভারী গলা। কবিতা তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসে গেল আভ্যন্তরী গ্রামীণতা। নতুন জাতীয় চেতনার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই সময়ে প্রকাশিত নিগ্রো সংবাদপত্রের অধিকাংশে নিগ্রোদের নিজের সমস্যার কথাই থাকতো বেশী। চার্লস্‌ জনসনের সম্পাদনায় 'অপারচুনিটি' পত্রিকা রীতিমতো একটা সাংস্কৃতিক সংগঠনকেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগে নিগ্রোদের রাজনীতি এক হয়ে গেছে বলেই নিগ্রো সংবাদপত্র চিরকাল নিগ্রো-কৃষ্টির বাহক হয়ে এসেছে। গণতন্ত্রের জন্যে চিরকাল অকুণ্ঠ আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে যতো কমই সুবিধে লাভ ভাগ্যে ঘটে থাকুক না কেন, নিগ্রো-মানসের উজ্জ্বল দুর্বারতার পরিচয় পাওয়া

দাঁড়াচ্ছে। ১৯৪০ সালে নিগ্রো সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিলো ১৬৮খানা। আজ যে প্রতি ছাব্বিশ জন নিগ্রোর মধ্যে এক জন National Association for the Advancement of Coloured People-এর সভ্য, তা এই সংবাদপত্রের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। আজ নিগ্রোদের মধ্যে nationalityর চেয়ে racialism মনোভাবটাই বড়ো আর বেশি কার্যকরী। বোধ হয় এই racialism না থাকলে নিগ্রোরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এতো বড়ো হয়ে উঠতে পারতো না। নিগ্রোদের অভ্যুত্থানের গোড়া থেকেই এই জাতি-সচেতনতা সাধারণ নিগ্রো সমাজে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে এই নিগ্রো সংবাদপত্রগুলি। শুধু শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধে তা শেষ হয়নি, সংগাঠনিক কাজেও সমভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। নিগ্রো রেনেসাঁর যুগে নিগ্রো মনীষীদের একনিষ্ঠ দাবী ছিলো মার্কিণ সংস্কৃতির ভাঁড়ারঘরে আমাদের সমান অধিকার চাই। নিগ্রো রেনেসাঁর অব্যবহিত পরে তাই নিগ্রো কবিতা ও উপন্যাসে এই মনোভাবের একান্ত রূপারোপ দেখতে পাই। রিচার্ড রাইটের উপন্যাসে, বিশেষতঃ আন্‌কল-টম্‌স্‌-চিলড্রেনএ নিগ্রো-চরিত্রের এই দিকটার পরিচয় বেশ পরিস্ফুট। আমেরিকার সমাজ ও সংস্কৃতি-জীবনের সংগে নিগ্রো-মানসের যে সংঘাত, তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় রিচার্ড রাইটের বিভিন্ন উপন্যাসে। তাঁর ব্ল্যাক-বয় উপন্যাসে নিগ্রোদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নজির মেলে। কি ভাবে ছোট থেকে বড়ো বয়সে তার মনের পরিবর্তন ঘটে তার হিসেব। কিন্তু যদিও নিগ্রো-অভ্যুত্থানের গোড়ার দিকে সাদা-কালোর বিভেদ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র মনোভাব নিগ্রোদের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল, শেষে অর্থাৎ আজ তাদের ঠিক সেই খাতে সমস্তটা মন, আবেগ বয়ে যায়নি। আজ আমেরিকার জীবনযাত্রার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা দেখা দিয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই স্বতন্ত্রপরায়ণতা নেই, বরং আমেরিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের প্রভাব রেখে যাওয়ার প্রচেষ্টাটা বড়ো বেশী প্রকট। বিশেষত ১৯৪১ সালে 'ওয়াশিংটন চলো' আন্দোলন হলো এই নয়া চেতনা আর সংস্কৃতির থেকে গড়ে-ওঠা। আজ নিগ্রো সাহিত্যিক, নিগ্রো জনগণ আগে নিজেদের আমেরিকান ভাবেন, পরে নিগ্রো ভাবেন। এই প্রত্যয় সাহিত্যের, সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় প্রকাশ পেয়েছে। পল রবসন শ্বেতাংগ-মঞ্চে অভিনয় করেন, নিজেকে নিগ্রো ভেবে সেদিন তিনি দূরে সরে থাকেননি। নিজেকে তিনি আগে আমেরিকান বলে পরিচয় দেন। ফ্রাঙ্ক আরবির উপন্যাসেও দেখি, জাতি-সমস্যার কথা অনুল্লেখ রয়ে গেছে; অধিকাংশ উপন্যাসে, কাব্যে এই চেতনা। জাতিবিভেদের স্থান অধিকার করেছে, আজ শ্রেণীবিভেদ। নিগ্রো-সংস্কৃতি আজ সেই পুরোনো চেতনা থেকে কতো দূরে চলে এসেছে। ওয়াশিংটন-নিউ ইয়র্কের কাছে দাবী আদায় করতে গিয়ে গায়ের রঙের কথা ভুলে গিয়ে বা না তুলে সমান অর্থনৈতিক অধিকার দাবী করছে নিগ্রো-মানস। নিগ্রো উপন্যাস ও নাটকে তাই শুধু নিগ্রো থাকছে না, ইতালী ও ইহুদীদের কথাও থাকছে। তার মার্কিন সাহিত্যে নিগ্রো-জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছু পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় সমস্ত পৃথিবীর নিচু স্তরের মানুষের জন্যে মরমিতা। আগে নিগ্রো নেতারা পিতৃভূমি আফ্রিকার সংগে আত্মীয়তা বোধ করতেন, সে রোমান্টিক মন আজ আর নেই। সমগ্র পৃথিবীতে আজ তাদের ঘর। এই প্রত্যয় সম্ভবত পূর্ব-য়ুরোপের রাজনৈতিক ভাবধারার সংস্পর্শে এসে ঘটেছে। এই জীবনবাদ ও বোধ নিগ্রো-সংস্কৃতিকে বিশ্ব-সংস্কৃতির আসরে দিয়েছে অন্যতম প্রথমগণ্য আসন। আমি এই প্রসংগে তুলে দিই নিগ্রো সমাজের অবিসংবাদিত পণ্ডিত ও নেতা ডাঃ ডুবয় ১৯৪৫ সালে যা বলেছেন:

"The present war has made it clear that we can no longer regard Western Europe and North America as the world for which civilization exists; nor can we look upon European culture as the norm for all peoples. Henceforth the majority of the inhabitants of earth, who happen for the most part to be coloured, must be regarded as having the right and the capacity to share in human progress and to become co-partners in that democracy which alone can ensure peace among men, by the abolition of poverty, the education of the masses, protection from disease and the scientific treatment of crime."—(ভূমিকা, Colour and Democracy গ্রন্থ)। ঐ গ্রন্থেই তিনি আলোচনা প্রসংগে বলেছেন, যাঁরা রাশিয়াকে জুলুম-জবরদস্তির প্রধান ক্ষেত্র বলে ক্রমাগত তারস্বরে ঘোষণা করছেন, তাঁদের নিজেদের দেশে গত ৩৫ বছরের মধ্যে লিঞ্চিং করে আনুমানিক ৩০৪৭ জন নিগ্রোকে মেরে ফেলা হয়েছে, এবং সে নিয়ে কোনও অনুতাপ, কোনও শাস্তিপ্রদান করা হয়নি। গণতন্ত্রী আমেরিকার এ হেন বর্বর ব্যবহারের জন্যে সমগ্র নিগ্রো জাতিটা নিরীশ্বর চেতনার মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে। ধনশালী সমাজের পক্ষপুটে আর শান্ত থাকতে পারছে না। নিগ্রো কবিতার, সাহিত্যের আধুনিক রূপ তাই-ই ঘোষণা করে। এই বিশ্বমানবতা-বোধ আমেরিকার জন-জীবনে আগামী দিন নিশ্চয়ই প্রচুর প্রভাব বিস্তার করবে। সেদিন খুব অদূরে নয়। তিনশ' বছর ধরে যে জাতি চোখের জল ফেলছে তার আনন্দিত নন্দনলোক কাছে—খুব কাছে।
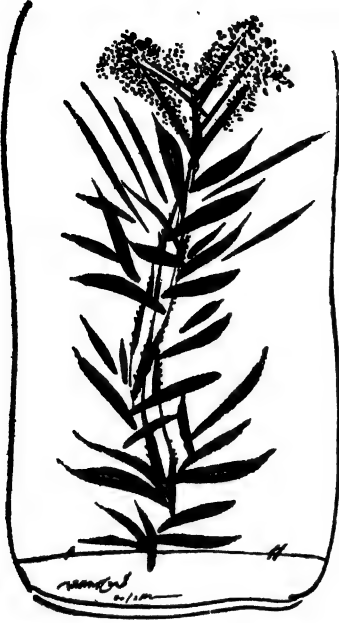
রবীন্দ্র-উপন্যাসে নারী

শ্রীকরুণাময় চক্রবর্ত্তী

প্রতিভা এমনি বস্তু—এ যাকে স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বমুখী প্রতিভা বঙ্গ-সাহিত্যকে এক অভিনবত্ব দান করে গিয়েছেন, ঐশ্বর্য্যের অসীমতা আমাদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। কি নাটকে, কি উপন্যাসে, কি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নতুনের আস্বাদ আমাদের দিয়েছেন! উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা এক অভিনব নতুনত্ব। সাহিত্যের পথে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"এক একটি ইংরাজী নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্ব্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রা গান করার মত। প্রাচীন কালেই ওটা শোভা পেত। তখন ছাপাখানা ও প্রকাশক সম্প্রদায় ছিল না, তখন একখানা বই নিয়ে জাওর-কাটার সময় ছিল। এমন কি, জর্জ এলিয়েটের নভেল যদিও আমার খুব ভাল লাগে, তবু এটা আমার বরাবর মনে হয়, জিনিসগুলো বড়ো বেশি—এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভাল হতো··· জর্জ এলিয়েটের এক-একটি নভেল এক-একটি 'সাহিত্য-কাঁটাল' বিশেষ।"

তাই রবীন্দ্রনাথের মতে উপন্যাসে কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আগাগোড়া তর্কে প্রয়োজন নেই—মীমাংসার প্রয়োজন নেই—শুধু গীত, নৃত্য ও আভাষই যথেষ্ট। মনের ঘাত-প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহে ঢেউ তোলা এই হচ্ছে নাটক-নভেলের মূল বস্তু। ইংরাজি নভেল সম্বন্ধে কবি বলেন—"কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, Analysis-এর উপর Analysis—কেবল মাত্র মুচড়ে নিংড়ে চুকে মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি ও নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।"

রবীন্দ্রনাথের [illegible] রবীন্দ্রনাথে উপন্যাস সম্বন্ধে ধারণা—এ

এখানে আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারী-শক্তির বিকাশ। প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথ জানেন—"মানুষের সমাজে প্রেম সব জায়গাতেই অসীম-প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে।" আর এই প্রেমের বাহন নারী, তাই নারী ভারতবর্ষের আদর্শে 'আদ্যাশক্তি' কিন্তু—"নারী প্রেমের এক পারে চোরাবালি, আরেক পারে ফসলের ক্ষেত!" তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত করতে পারে কিন্তু সে প্রেম যদি 'শুক্লপক্ষের' না হয়ে 'কৃষ্ণপক্ষের' হয় তবে তার মালিন্যের তুলনা নেই। পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যাই—নারীর প্রেমে; ত্যাগধর্ম, সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো—এই দু'য়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আরেক সুরও বাজতে পারে—মদন-ধনুর জ্যায়ের টংকার সে মুক্তির সুর, না সে বন্ধনের সঙ্গীত। তাতে তপস্যা ভাঙ্গে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত করে।···স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েছেন! মুক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তি সাধনার যে মন্দির বহু দিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেছে—পূজারিণী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাবার ভার পেলো। সে কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মৎস্যের হাটে বেচতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হলে মর্ত্তের মর্ম্মস্থানে যে অমরাবতী আছে—তার পরাভব ঘটে; পুরুষ যায় প্রমত্ততার রসাতলে আর নারীর হৃদয়ে যে রসপাত্র আছে তা ভেঙ্গে গিয়ে সে রস ধূলাকে পঙ্কিল করে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর লেখনী দ্বারা 'অমরাবতীর নারী' ও 'ভোগবতী নারী' এই দুই বিভিন্ন নারী-চরিত্র অঙ্কন করেছেন। নারীর 'প্রিয়া মূর্ত্তি' ও 'মা মূর্ত্তি' এই দুই নারী-প্রবণতাকে কবি নিপুণ তুলিকা দিয়ে এঁকে তুলেছেন। কবি নিজেই বলেছেন—"মেয়েরা দুই জাতের—এক জাত প্রধানতঃ মা, আর এক জাত প্রিয়া।" ঋতুর সঙ্গে তুলনা করে কবি বলেছেন—'মা' হলেন বর্ষা ঋতু, জল দান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর 'প্রিয়া' বসন্ত ঋতু। গভীর রহস্য আর মধুর তার মায়া মন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের মণিকোঠায়, যেখানে বীণার একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝঙ্কারের অপেক্ষায়। যে ঝঙ্কার বেজে ওঠে সর্ব দেহে, মনে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী।"

কবির "দুই বোন" উপন্যাসে এই দুই নারী-প্রকৃতির বিকাশ দেখতে পাই। শশাঙ্ক তার স্ত্রী 'শর্মিলার' যত্নে, তার আগ্রহে সংসার-সমুদ্রে হলো জয়ী। উন্নতি সে করলো। শশাঙ্কের জীবন বেশ সহজ সাবলীল গতিতে বয়ে চলল। এই শর্মিলা (স্ত্রী) মায়ের জাত। কিন্তু হঠাৎ এই শশাঙ্কের সহজ জীবনে এলো 'ঊর্মিমালা', শশাঙ্ক হারাল তাঁর বাইরের ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তার অন্তরে চলল নানা রঙের খেলা।

শশাঙ্ক ঊর্মির হাত চেপে ধরে বলল—"তুমি নিশ্চয় জানো তোমাকে আমি ভালবাসি। আর তোমার দিদি তিনি তো দেবী···তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমনটি করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক ঊর্দ্ধে।"

সংসারে এই দুই নারী আছে—এক জন ভালবাসা আর দরদ দিয়ে দাবী করে ভক্তি, আর এক জন মায়ার কুহেলীতে চোখে লাগায় ঘোর। শর্মিলার কাছ হতে সব পেয়েও এক যায়গায় ছিল শশাঙ্কের শূন্যতা। এই শূন্য হলো ঝঙ্কারের অভাব। 'শর্মি' সব দিয়েও এই ঝঙ্কারে তুলতে পারেনি···এই ঝঙ্কার তুলল 'উর্মিমালা,। এই দুই জাতের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্র-উপন্যাসে পরিস্ফুট।

'মালঞ্চে'র সুরও এই একই তালে বাঁধা। আদিত্য সরলাকে ভালবেসে ফেলল। 'নীরজা'র কাছ হতে সব পেয়েও 'সরলা'র স্থান অপূর্ণ ছিল। তাই আদিত্য সরলাকে বলল—"উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না, ভালবাসি তোমাকে। এ কথা আজ এত সহজ করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।"

দুই বোনের মধ্যে লেখকের মনে কিছুটা সঙ্কোচ ছিল যার জন্য উপন্যাসের শেষ করতে হয়েছে—উর্মিমালাকে বিলেতে সরিয়ে দিয়ে। 'মালঞ্চে' সে সঙ্কোচ লেখক কাটিয়ে উঠেছেন, 'সরলা' রাজি হলো আদিত্যকে গ্রহণ করতে।

'চার অধ্যায়ে' দেখতে পাই 'এলা' নিজেকে সমর্পণ করল 'অতীনে'র কাছে। 'অতীন' ঢুকল 'এলা'র মহামায়ায়। অতীন বলে—কি আশ্চর্য্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির 'নীহারিকা' সৃষ্টি করে।

এ ছাড়াও রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর একটা রূপ আমরা দেখতে পাই, যেমন 'যোগাযোগের' কুমুদ। সে 'প্রিয়া' নয়, 'মা' নয়—সে নারী। নারীত্বের দাবী তার কাছে অধিকার—পরের অনুগ্রহ নয়। ক্ষুদ্রতাকে সে সহ্য করতে পারে না। ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ। তাই দেখতে পাই, এক জায়গায় কুমু স্বামীকে বলছে—"দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো কিন্তু ছোট হোয়ো না।" স্বামীকে শ্রদ্ধা সহকারে কোন দিন আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। এই শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণ তার কাছে গ্লানির বস্তু।

'গোরা'তে গোঁড়া গোরা, নারী-বিদ্বেষী গোরা—করলো পরাজয় স্বীকার। সুচরিতার সাহচর্যে গোরা পেলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। আর সুচরিতার প্রেম গোরা নিরর্থক হানিকর বলে প্রত্যাখান করতে সাহসী হলো না। প্রেমের আহ্বানের কাছে সব-কিছু হেয় প্রতিপন্ন হলো। ললিতাও প্রেমের জোরেই জয় করল বিনয়কে।

রবীন্দ্রনাথের এই নারীর প্রেম—সর্বব্যাপী ইঙ্গিত পেলো শেষের কবিতায়। শেষের কবিতা গদ্যে-ঢালা কাব্য। এর গতি, এর ঝঙ্কার অভাবনীয়। লাবণ্য-চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। লাবণ্য সাধারণ নারীর মত পরের দাবী মেটাতে রাজি নয়। শচীন বাবু সত্যিই বলেছেন—'লাবণ্য' 'কোমল'—ভালবাসার তাপে; লাবণ্য 'কঠিন'—ভালবাসার জোরে। লাবণ্য দেবীর জাত—সেকি এঞ্জেলের জাত নয়?"

রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন—মানুষের অন্তরের ভালবাসার সীমা নেই—সে যে আলো। লাবণ্য শোভনলালকে বিয়ে করল—তার জন্যও তার প্রেম পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রেম বেচা-কেনার প্যাক্-করা মাল নয় যে এক হাটে এক জনার কাছে বিক্রি করলে নিঃস্ব হয়ে যাবে, এটা কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নয় যে এক জনার কাছেই মর্টগেজ বাঁধা চলবে।" লাবণ্যের প্রেম অসীমতায় ব্যাপ্ত। মিতার প্রতিও তার অন্তরে কোন [illegible] নেই,—শোভনলালের প্রতিও নয়। তাই বিদায়-বাণীতে লাবণ্য বলতে পেরেছে—

"মোর লাগি করিও শোক—
আমার রয়েছে বিশ্ব আমার রয়েছে কর্মলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি, কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে—
সেই ধন্য করিবে আমায়।
তোমারে যা দিয়েছিনু—
তার পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার
হেথা মোর তিলে তিলে দান
করুণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান—
হৃদয় অঞ্জলি হ'তে মম
ওগো তুমি নিরুপম
হে ঐশ্বর্য্যবান
তোমারে যা দিয়েছিনু—সে তোমারি দান—
গ্রহণ করেছো যত, ঋণী তত করেছো আমার
হে বন্ধু বিদায়—"

বর্ত্তমান সঙ্কটের রূপ

অনিলা গোস্বামী

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অনেক দিক দিয়ে অনুকরণ করেছে ১৩৫০ বঙ্গাব্দকে,—যেমন, ব্যাপক ভাবে গৃহহারা, সর্ব্বহারা, বখাটে (loompen proletariat), ঘরোয়া বেশ্যার আবির্ভাবের দিক দিয়ে। প্রথমটির পটভূমি হচ্ছে বঙ্গ-বিচ্ছেদঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয়ের পশ্চাতে ছিল কালোবাজারের কীর্ত্তি ও মন্বন্তর। এঙ্গেলস্-এর ভাষায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ঘটনাগুলিকে যদি বলি বিয়োগান্ত নাট্য, তাহ'লে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের কাহিনীগুলিকে বলতে হবে পুনরাবৃত্তের প্রহসন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ ১৩৫০ বঙ্গাব্দকে যেন বিদ্রূপ করছে।

মন্বন্তর কালের এবারে তীব্রতর হয়ে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক নৈরাজ্যতন্ত্র (economic anarchy)। নানা দিক দিয়ে এই নৈরাজ্যতন্ত্র প্রকট হচ্ছে, দলে-দলে উদ্বাস্তু আগমন একে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমত জীবিকা-বিপর্য্যয়। জীবিকার ব্যাপারে নির্ব্বাচন স্বাধীনতা নামীয় গণতন্ত্রের ঢাকে-ঢোলে প্রচারিত অধিকারটি দিন দিন ছেঁদো কথায় পর্য্যবসিত হচ্ছে। অবস্থা-সঙ্কট যাকে যেমন জীবিকা বেছে দিচ্ছে তাই সে গ্রহণ করছে প্রতিবাদ না করে। যে যে-কাজের যোগ্য নয় সে সেই কাজ করছে, অথবা পূর্ব্বের জীবিকা বজায় রাখতে না পেরে নূতন জীবিকা খুঁজে নিচ্ছে। উদ্বাস্তুরা এ ধরণের প্রচুর উদাহরণ সৃষ্টি করছে। পূর্ব্ববঙ্গাগত উকীল বাবু হয়ত ছাত্র পড়াতে শুরু করেছেন, এক কালের নামে চলে ভাগ্যবান মাস্টার বাবু নিজের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে মুদীর দোকানে হিসাব-রক্ষক হয়েছেন, ভাগ্য-বিড়ম্বিত মাষ্টার মহাশয় ইস্কুল-মাষ্টারী সংগ্রহ করতে না পেরে কুটীর-শিল্প পুনরুজ্জীবনে মনোনিবেশ করেছেন। এখানেই

শুধু নয়, পূর্ব্বতম সামাজিক বা বংশ-মর্য্যাদা থেকে নিম্নাবতরণের কাজটিও চলেছে অলক্ষিতে ব্যাপক ভাবে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে উদ্বাস্তু ঘোষ—বসু—গঙ্গোপাধ্যায়—মুখোপাধ্যায়-তনয়েরা পূর্ব্ব মর্য্যাদা ভুলে রেষ্টুরেণ্ট-বয়, হোটেলের অন্ন-পরিবেশক, আলীপুর-বটতলার ব্যবহারাজীবের টাউট, বা চানাচুর-বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অনভ্যস্ত কাজে হাত পাকাতে তারা চেষ্টা করছে। এতদ্ব্যতীত রিক্সাওয়ালা, ফিরিওয়ালা, ফুটপাথের দোকানদার, বিড়ি-মজুর, কুলী-মজুর, জীবন-বীমার দালালের সংখ্যা বেড়ে চলেছে নবাগতকদের বেপরোয়া ভাবে যে-কোন রকমের জীবিকা গ্রহণের ফলে। সরকারী অনুগ্রহ-বঞ্চিতেরা পরিবার ভরণ-পোষণের তাগিদে চাকরীর প্রশ্নেও দিগ্বিদিক্‌শূন্যের মত আচরণ করছে, বড়বাজার থেকে শুরু করে লালদীঘি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সওদাগরী সরকারী বেসরকারী অফিসগুলিতে হানা দিচ্ছে। চাকরীর চেয়ে চাকরীর উমেদারেরা সংখ্যায় বেশী হয়ে পড়ছে, ক্ষুদে ভগবানের অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্তার শুভ দৃষ্টি না হলে নোকরি-ভাগ্য খোলে না, বেকারী-মোচন হয় না। কিন্তু নোকরিতে নিযুক্তেরা এই অবস্থার মধ্যেই ভাগ্যবানের শ্রেণীভুক্ত, বেকারেরা তাদের ঈর্ষার চোখে দেখে। বেকারীর কোন মাসিক পুরস্কার মেলে না তো। এরই নাম কি ডামাডোলের বাজার? এখানে বড় কথাটি হয়ে উঠেছে সুযোগ-সুবিধা। দক্ষতা শ্রমের পুরস্কারের মাপকাঠি আর নয়; সুযোগ-সুবিধাই মাপকাঠি। এর জোরে অদক্ষ (unskilled) কর্ম্মীর ভাল মাস-মাহিনার চাকরী যেমন মিলে যেতে পারে, তেমনি এর অভাবে দক্ষ কর্ম্মীর বেকারী অদৃষ্টের লিখন হতে পারে। জীবিকার ক্ষেত্র সঙ্কোচন, কর্ম্মপ্রার্থীদের ক্রমিক সংখ্যাবৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার ফল ফলছে, ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম জগতের অদৃষ্টবাদ(fatalism) আর্থিক জগতে সূচিত হচ্ছে; অর্থাৎ নৈরাজ্যতন্ত্রের বুলি হয়েছে—"সুযোগ-সুবিধা" এবং অদৃষ্টবাদ। কোন নিয়ম-বাঁধনের বাইরে চলে যাচ্ছে সমগ্র সমাজ,—উচ্চবিত্ত স্বীয় অবস্থা থেকে পতনের ভয় করেন না, নিম্নবিত্ত আরও নীচের দিকে নেমে চলেছে, মধ্যবিত্ত মধ্যবর্ত্তীর স্থানটিতে থাকবার মিথ্যা চেষ্টা করছে। মধ্যবর্ত্তী ত্রিশঙ্কুদের টেঁকে থাকা যেন একালের অভীপ্সিত নয়। মাঝামাঝি স্থানটিতে নয়, হয় ঊর্দ্ধে কিংবা নিম্নে গতি নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থাগত পরিবর্ত্তনে ব্যক্তিগত অদৃষ্টকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। "অদৃষ্টের" ফলে গরীবী বা বেকারী আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের তিন-চতুর্থাংশের। উদ্বাস্তুদের বৃহৎ অংশটি ক্রমশ নীচের দিকে নামছে আর্থিক দিক দিয়ে, অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের তারা হয়ত কালে-কালে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াবে এবং স্বকীয় অবস্থায় টেনে নামাবে। ত্রিশঙ্কুদের দিনও কি ঘনিয়ে আসছে না স্বর্গের বাসিন্দাদের মূল্য-বৃদ্ধি পরিকল্পনার ফলে?

১১৫০ সাল স্বীয় মহিমায় জীবিকা-গত মর্য্যাদা-বোধকে যেমন আঘাত করছে এমন আর কোন দিন লক্ষিত হয়নি। বাসস্থান-গত রুচিবোধও নির্ম্মম ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তার পরিচয় বৃহৎ কলিকাতার আনাচে-কানাচে গলি-ঘুঁজিতে পাওয়া যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও সুযোগ-সুবিধার অভাব যাদের তারা ভাড়াটিয়া সেজেছে গোয়াল-ঘর মোটর গ্যারেজ, বা আস্তাবেলর। আরও দুর্ভাগাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম্ম এবং সর্ব্বশেষ আশ্রয়-স্থলটি হচ্ছে সরকারী রিলিফ ক্যাম্প। বাণিয়া-সভ্যতায় ভগবান যার অদৃষ্টে যেমন লিখছেন তেমনি জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। জীবিকা-সঙ্কটের জুড়ী বাসস্থানের সঙ্কট। উভয়তই বাছ-বিচার অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই প্রমাণিত হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিও শুধু কথায়-কথায় দাঁড়িয়েছে। স্থায়ী বাসস্থান, নিশ্চিত জীবিকা, সন্তান-সন্ততির জন্য জমানো পুঁজির কথা কেউ ভাবতে পারে না। অধিকাংশ লোক হয়ে উঠেছে বর্ত্তমান-সর্ব্বস্ব, ভবিষ্যতের কোন চিন্তা করে না। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং আরও নীচের শ্রেণীভুক্তদের একাকার হয়ে যাওয়ার সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে বর্ত্তমান কাল। গরীবীকরণ যে দ্রুততালে চলেছে তার পরিণাম হচ্ছে এই যে, গরীবদের কোন জাতবিচার আর চলবে না। গরীবের সঙ্গে বেকার, বেকারের সঙ্গে লুম্পেন এবং পারিবারিক বেশ্যাবৃত্তির শিক্ষানবীশেরা এসে যোগ দিচ্ছে। দল ভারী হচ্ছে। ১১৫০'র প্রহসন-অভিনয় বেশ জমে উঠেছে সামাজিক দ্বিধা-বিভজনের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ অতি-ধনী ও অতি-গরীবের মাঝের স্থানগুলি ধীরে-ধীরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে "অদৃষ্টের" নির্দ্দেশে।

সামাজিক নির্বিত্তকরণ (panperisation) উদ্বাস্তু আগমনে যে এক বিশেষ স্তরে ক্রমে পৌছেছে তা পরিস্ফুট হচ্ছে যৌন ইজ্জতের বিনিময়ে গৃহস্থ মেয়েদের রুজি-রোজগারের প্রবৃত্তি দেখা দেওয়ার মধ্যে। ইতিহাস কি এদের নিয়ে ব্যঙ্গ করছে না? যৌন ইজ্জত খোয়াতে না চেয়ে পাকিস্থান ছেড়ে এসেছে যারা তারাই সভ্য-ভব্য রাজধানীর বুকে হয়ে উঠেছে নূতন মানুষ, তাদের নিয়ে যে ব্যবসায় চলেছে তার অনুরূপ ঘটনা বিগত মন্বন্তর কালেও দেখা গিয়েছে। তারা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষের জীবনের মূল্য, বংশ-মর্য্যাদার মূল্য, যৌন-পবিত্রতার মূল্য প্রভৃতি বিলোপমুখীন। নারীর জন্য গরীবীর পুরস্কার যৌন ব্যবসায়, পুরুষের জন্য লুম্পেন-বৃত্তি। সামাজিক অব্যবস্থা গরীবদের আর কি প্রকারে পুরস্কৃত করতে পারে? জীবিকা বাসস্থান বিষয়ে চরম অনিশ্চয়তা পারিবারিক নীতিগুলিকে ফেলছে টুকরো টুকরো করে। অন্তঃপুরের সম্ভ্রম, যৌন-শুচিতাকে যেন অস্বীকার করতে উন্মত্ত বাজারিয়া পণ্যতন্ত্র;—এই ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়েই পণ্যের সামিল; নারীর শুচিতা, পুরুষের শ্রমশক্তি যে কোন বিনিময়-হারে বিক্রীত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে না কি? পশ্চিমবঙ্গে নবাগত "ইসরাইলেরা" পণ্যতন্ত্রের ছদ্মবেশ শুধু খুলে দিচ্ছে মাত্র। "ঘটনার হাতে পুতুলনাচের নটেরা" মধ্যশ্রেণীর চোখের উপর থেকে রঙীন পর্দ্দা সরিয়ে নিচ্ছে, যা ছিল তার শেষ সম্বল। তার আশা-মরীচিকাকে বাঁচিয়ে রাখেনি কি লটারীর ব্যবসায়, সিনেমা-গৃহ এবং গোয়েন্দা উপন্যাস? ১১৫০'র প্রহসনের প্রথম পর্য্যায়ে তার মোহনিদ্রা টুটে যাচ্ছে, শেষ পর্য্যায় এখনও আসেনি।

গঙ্গা-যমুনা

শ্রীমতী সুষমা দেবী

নুলিয়ার হাত ধ'রে প্রায় এক ঘণ্টা কাল সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লাফালাফি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে জল ছেড়ে তীরের উপর উঠতেই এনা সেন দেখল এক জন যুবক ও একটি তরুণী তার দিকেই আসছে। তরুণীর পরিধানে ফিকে বেগুনী রং-এর স্ল্যাকস আর তারই সঙ্গে রঙ-মেলান উলের বোনা হাতকাটা টাইট জাম্পার। মাথায়

লগুলি ছোট করে ঘাড় অবধি ছাঁটা। গায়ের রঙ মাঝামাঝি হ'লেও মুখ-চোখ বেশ ভাল, যদিও মেক-আপের চাপে তার বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। গাঢ় লাল রঙ-করা চকচকে ঠোঁটের মধ্যে এক পাশে সোনার সিগারেট-হোল্ডার মায় জ্বলন্ত সিগারেট। যুবকেরও সাধীন বিলাতী সাজ। আলগোছা ভাবে তার কোটের আস্তিনের উপর দিকটা ধ'রে তরুণী চলছে। এনার সামনে পৌঁছে তরুণী সিগারেট-হোল্ডারটি মুখ থেকে এনামেল-করা লম্বা নখ-শোভিত আঙুল দু'টির মধ্যে সরিয়ে ব'লে উঠল—"হেল্-লো এনা," সঙ্গে-সঙ্গে ঠোঁটের এক পাশ থেকে খানিক সিগারেটের ধোঁয়া বার করে দিল। অপরিচিত এক জন যুবককে দেখে এনা তার অতি সংক্ষিপ্ত স্নানের পোষাকের উপর তাড়াতাড়ি একটা বাথ-গাউন চড়িয়ে বলল—"আজ যে হঠাৎ এদিকে এলে, নেলি? আমি ত জানতাম তুমি বীচে বেড়াতে ভালবাস না।" নেলি হলডার (ওরফে নীলিমা হালদার) ঈষৎ হেসে যুবকের জামার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল—"তুমি ঠিকই বলেছ এনা। এই বিরাট বালি ঠেলে নামা-ওঠা আমার মোটেই ভাল লাগে না। তার পর, তুমি যে আজ বিকেলে জলে নেমেছ?" মাথার রাবারের ক্যাপটা খুলে মুলিয়ার হাতে দিয়ে চুলের ভিতর আঙুল চালাতে-চালাতে এনা উত্তর দিল—"সত্যি ভাই, বিকেলে আমি স্নান করি না। কিন্তু আজ সমুদ্রটা একটু বেশী রকম ঠাণ্ডা দেখে কেমন লোভ সামলাতে পারলাম না! জলে নেমে পড়লাম। তা' কত দূর যাবে?" যুবকের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে নেলি বলল—"এঁকে বীচ দেখাতে এসেছি—কাজেই আরো খানিক দূর গিয়ে তার পর ফিরব। নতুন মানুষ, আজই মোটে এসেছেন। বাধ্য হয়ে আমাকেই গাইড হতে হ'য়েছে।" মৃদু হেসে এনা বলল—"এঁরই বুঝি সেদিন আসবার কথা ছিল?" নেলি উত্তর দিল—"হ্যাঁ ভাই। দেখলে ত সেদিন আসব বলে চিঠি লিখে আমাদের অনর্থক কি ভোগানটা ভোগালেন। আজ আবার ঠিক উল্টো! সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় শুয়েই বেড-টী খাচ্ছি, এমন সময়ে গেটের বাইরে মোটরের হর্ণ শুনলাম। তার পর বালিশ থেকে মাথা তুলে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি ইনি সশরীরে এসে হাজির!" যুবক ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলল—"সেদিন আসব বলে না আসতে পারাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, মিস্ হলডার, নিতান্ত অকস্মাৎ একটা জরুরী কাজে আটকে প'ড়ে গিয়েছিলাম, তারই ফলে ট্রেণটা মিস করলাম। ভেবেছিলাম সাক্ষাতেই আপনার কাছে মাপ চাইব, তাই আর চিঠি লিখিনি।"

নেলির এতক্ষণে মনে পড়ে গেল যে, এনার সঙ্গে যুবকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। সে বলে উঠল—"আই সে এনা, আই এ্যাম একস্ট্রীমলি সরি, তোমার সঙ্গে ত এঁর পরিচয় করিয়ে দিইনি। ইনি আমার ফ্রেণ্ড মিষ্টার বাশীর হোসেন—আর ইনি আমার ক্লাসফ্রেণ্ড মিস্ এনা সেন।" এনা হাত তুলে ছোট একটি নমস্কার করল। বাশীর ঈষৎ মাথা নীচু ক'রে প্রত্যভিবাদন জানালেন। নেলি আবার বলল—"তোমাকে আর ডিটেন্ করব না। যাও তুমি চেঞ্জ কর গে! আমরা আমরা আর একটু বেড়িয়ে আসি। সো-লঙ!" "সো-লঙ" ব'লে এনাও মুলিয়াকে সঙ্গে ক'রে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

এনার বাবা-মা বাড়ীর সামনে তৃণাচ্ছাদিত 'লনে'র উপর বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছেন। বাচ্চা কুকুর 'জনি' তাঁদের পায়ের কাছে স্থির হয়ে বসে আছে। এনা স্নানের কাপড় ছেড়ে শাড়ী পরে তাঁদের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে জনিকে নিয়ে আদর করতে লাগল। মিসেস্ সেন মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন—"দেখেছ এনা, নতুন স্যামন্ রঙ-এর বুগেন্ ভালিয়াগুলো কি সুন্দর ফুটেছে?" এনা বললে—"হ্যাঁ মাম্মা, ক্যানাগুলোর রঙ ঠিক যেন ম্যাচ ক'রেছে। কিন্তু তোমার ওই বুড়ো মালিটা এত ওআর্থলেস্ যে সমস্ত সীজন ফ্লাওয়ার এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। ওটাকে বিদেয় করে দাও না কেন?" মিসেস সেন একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "তুমি কি করে ও-রকম কথা বললে, এনা? বেচারা বুড়ো মানুষ! ছোট বেলা থেকে আমাদের কাছে আছে। আমরা যখন এখানে থাকি না, তখন একলা ও-ই ত সমস্ত দেখাশোনা করে। ওর প্রাণপাত করে আমাদের ভাল করবার চেষ্টা করে।" এনা তার পাতলা ঠোঁট একটু উলটে মিষ্টার সেনের দিকে চেয়ে বলল—"দেখেছ ড্যাডি, মাম্মার ওই দুর্ব্বলতা কিছুতেই যাবে না। পুরোনো লোক, অতএব তাকে তাড়ান চলবে না!" একখানা সচিত্র বিলাতী সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মিষ্টার সেন উত্তর দিলেন, "তা ও-বিষয়ে একটু দুর্ব্বলতা ত ওঁর বরাবরই আছে। আর ভেবে দেখতে গেলে সেটা কিছু দোষেরও নয়। আগে যখন বুঝতাম না তখন এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে অনেক কথা কাটা-কাটি হয়েছে।" এনা আর কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তার পর জনিকে নিয়ে ঘাসের উপর ছুটোছুটি করতে লাগল।

মিসেস্ সেন একটু চিন্তিত ভাবে স্বামীকে বললেন—"মেয়েটার জন্যে সত্যিই ভাবনার ব্যাপার হয়ে উঠল। কনভেণ্টে পাড়িয়ে কি যে সং তৈরি হল বলবার নয়। বুড়ো বয়সে মেয়ে হল। আমাকে দিয়ে যে সব সখ মেটাতে পারনি, এনার ওপর দিয়েই সে সব মিটিয়ে নিচ্ছ। লোরেটো থেকে বি-এ পাস করলে—আর কত পড়বে? বিয়ের কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে নিজে দেখে বিয়ের ঠিক করবে! এখন সখ হয়েছে বি, টি, পড়বে! অথচ মাষ্টারি ও কখনই করবে না।" মিষ্টার সেন একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন—"ভাবছ কেন? ও-সব ঠিক হয়ে যাবে। ইংরেজ মেয়েদের হাতেলে থেকে অল্প বয়স থেকে মানুষ হয়েছে, তাই ধরণ-ধারণ একটু অন্য রকম হয়েছে। সে ত হওয়াই স্বাভাবিক। তা এনার যদি আরও পড়তেই ইচ্ছে থাকে, তা'হলে কলকাতায় বি, টি, না পড়ে কেমব্রিজে ইংলিশ ট্রাইপস্টা একবার চেষ্টা করে দেখুক না?" মিসেস সেন আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন—"এখনও সখ মেটেনি? ভাল, আমি কোনও কথা বলতে চাই না।" বলে উঠে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন।

কয়েক দিন পরে এক দিন সকাল বেলা এনা "মাম্মা মাম্মা" বলতে বলতে অন্দর-বাড়ীতে এল। মিসেস্ সেনের উত্তর শোনা গেল—"কি এনা, ডাকছ কেন? আমি রান্নাঘরে।" এনা ঘরে না ঢুকে দরজার কাছ থেকে দাঁড়িয়ে বলল—"রান্নাঘর, রান্নাঘর! ওখান থেকে বেরিয়ে এস দেখি।" শাড়ীর আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে মিসেস্ সেন জিজ্ঞাসা করলেন—"কি

"হল আবার ?" এনা কপাল কুঁচকে বলল—"না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বাবুরচি-মশালচির মত এই গরমে রান্না-ঘরে কি করতে ঢুকেছিলে ?" মিসেস সেন বললেন—"তোমার বাবার শরীর খারাপ. ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। তার ওপর বাবুর্চির রান্না হাঁসমোষ খাওয়া চাই। ও-সব বন্ধ করে আজ থেকে ওঁর জন্যে আমি ঝোল-ভাতের ব্যবস্থা করেছি। ঠাকুরকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একটু পলতার ঝোল তৈরি করাচ্ছিলাম।" "চুলোয় যাক পলতার ঝোল! এখন শাড়ীটা বদলে স্লিপারটা পায়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি একবার এস দেখি। নেলি এসেছে আমাদের নেমন্তন্ন করতে। ড্রইংরুমে বসে আছে!" সাজ-পোষাক সম্বন্ধে মেয়ের উপদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মিসেস সেন যে বেশে ছিলেন সেই বেশেই ড্রইংরুমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘরে ঢুকে মিসেস্ সেন একটু চমকে গেলেন। নেলি হলডার গাঢ় নীল বীচ পায়জামা.আর উৎকট হলদে রং-এর ছোট হাতওয়ালা ব্লাউজ প'রে সোফার উপর বসে আছে। আর তার নিতান্ত গা ঘেঁসে এক জন অপরিচিত যুবক বসে সিগারেট টানছে। যুবকের অঙ্গেও বিলাতি সাজ। মিসেস্ সেনকে দেখে নেলি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"এঁকে দেখে লজ্জা করবার কিছু নেই, আণ্টি। ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, মিষ্টার বাশীর হোসেন। মূলার কম্প্যানির লাণ্ডন অফিসে কভেন্যাণ্টেড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। অল্প দিন হল পাটনাতে তাঁদের সেল্‌স-ম্যানেজার হয়ে জয়েন করেছেন। এক মাস ছুটি নিয়ে ওয়াল্‌টেয়ারে বেড়াতে এসেছেন। এঁকেই মীট করবার জন্য মাম্মা আজ সন্ধ্যে বেলা মাঝারি রকমের পার্টির মত দিচ্ছেন। আপনাদের সবাইকেই যেতে হবে।" সদ্য ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাশীর হোসেন দাঁড়িয়ে উঠে ইংরেজি কায়দায় মিসেস্ সেনকে 'বাউ' করলে। মিসেস্ সেন দু'হাত তুলে তাকে নমস্কার করলেন। তার পর নেলিকে বললেন—"জান ত নেলি, ওঁর শরীর মোটেই ভাল নেই? ক'দিন ব্লাডপ্রেসারটা বড্ড বেড়েছে। এ অবস্থায় কোনও পার্টিতে যাওয়া ত ওঁর সম্ভব নয়। আর ঐ রুগ্ন মানুষকে একলা ফেলে আমিই বা কি ক'রে যাব! তোমার মাকে আমার হয়ে একটু বুঝিয়ে বোলো যেন দুঃখ না করেন। ইনি একটু ভাল হলে বরং এক দিন গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে বিলেতের গল্প-টল্প শুনে আসব। কি বল।"

নেলি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলল—"আই এ্যাম সরি, আণ্টি! যাই হোক, আশা করি অন্তত এনা আমাদের পার্টিতে আসবে।" ঈষৎ গম্ভীর হয়ে মিসেস সেন বললেন—"সে কথা এনাকেই জিজ্ঞাসা কোরো।" তার পর বাশীরের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনারা বসুন, একটু বাড়ীর তৈরি কেক্ আর এক পেয়ালা কফি খেয়ে যান।" বাশীর উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করছে দেখে নেলিই ব'লে উঠল—"বহু ধন্যবাদ আণ্টি, কিন্তু আজ আমরা বসতে পারব না। কিছু মনে করবেন না। এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে। এমনিই দেরী হয়ে গেছে।" তার পর বাশীরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠল। নেলি ড্রাইভিং-সীটে বসল, বাশীর তার বাঁপাশে বসল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই এঞ্জিন্ ষ্টার্ট করে নেলি টু-সীটার গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।

অবরুদ্ধ ক্রোধে এনা তখন ফুলছিল। নেলিরা চলে যাওয়া মাত্র মাকে বলে উঠল—"এত করে বললাম, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসতে সেটুকু আর তোমার দ্বারা হল না! হোপলেস্! নেলি আর হো[illegible] তোমার দিকে কি রকম করে তাকাচ্ছিল দেখলে ত? কি ভা[illegible] বল দেখি? আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। তুমি সত্যি একেবারে ইম্‌পসিবল, মামি।" মৃদু হেসে মিসেস সেন বললেন—"আমাকে যদি তোর পছন্দ না হয়, মা বলে পরিচয় না দিতে পারিস্! কিন্তু তা বলে তোর কথায় আমি কাপড় ছেড়ে স্লিপ পরে তোর ওই না-মেয়ে না-পুরুষ নেলির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। রুচি ত সকলের সমান হয় না! আমি যা আছি তাই আছি তোদের লজ্জা হবে বলে আমি এই বুড়ো বয়সে নকল ফিরিঙ্গি হতে পারব না। এ সব বিষয়ে খবরদার আমায় উপদেশ দিবি না।" "সে আমি জানি। ড্যাডিই তোমার মতের বিরুদ্ধে আজ ভাল কিছু করতে সাহস করেন না!" বলে মুখ ভার করে এনা চলে গেল।

বিকাল বেলা এনা মিষ্টার সেনকে বলল—"ড্যাডি, সারা দিনই ত ঘরে বসে আছ। তোমার বিরক্তি লাগে না? চল না, আজ নেলিদের বাড়ী ককটেল পার্টিতে। মনটা ভাল হবে—পাঁচ জন লোকের সঙ্গে দেখা-শোনা হলে ভালই লাগবে।" স্বামী কোনও কথা বলবার আগেই মিসেস্ সেন বলে উঠলেন—"উনি সেখানে কোথায় যাবেন? ও-সব গোলমাল ওঁর সহ্য হবে না। একেই ত আজ ওঁর সকাল বেলা থেকে মাথা ধরে রয়েছে। আর তোমারও সেখানে যাওয়াটা আমার পছন্দ নয়, এনা।" এনা উত্তেজিত হয়ে বলল—"ড্যাডি যান আর নাই যান, আমাকে ত যেতেই হবে। নেলি নিজে এসে বলে গেছে।" তখন মিষ্টার সেন স্ত্রীকে বললেন—"তার চেয়ে তুমিই বরং যাও না ওর সঙ্গে?" মিসেস সেন বললেন—"যা হয় না সে কথা কেন মিছামিছি বল? আমরা সেকেলে ধরণের মেয়ে, ও-সব জায়গায় গিয়ে আমরা কি করব? তা ছাড়া আজ আমাকে এখনই মণিকে বিলেতে চিঠি লিখতে হবে। গত সপ্তাহে লিখতে পারিনি। এবারেও খবর না পেলে চিন্তিত হয়ে সে 'কেবল' করবে। তোমার শরীর ভাল নয় সেই জন্যে সে এমনিই সব সময়ে চিন্তিত থাকে।"

নেলিদের বাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকতেই এনার কানে গেল পিয়ানোর টুং-টাং ও অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষের কথাবার্ত্তা ও হাসির শব্দ। একবার নিজের শাড়ী ও জুতার দিকে চেয়ে নিয়ে এনা যখন ড্রইংরুমে ঢুকল তখন অতিথিরা অনেকেই এসে গেছেন। নেলির মা উঠে এসে এনাকে হাত ধ'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। দু'-চার জন অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—"এনা, এঁরা সকলেই তোমার গান শোনবার জন্য অপেক্ষা করছেন। নেলি এখনই আসছে। সে ও-ঘরে অতিথিদের ড্রিঙ্কস্ অফার করছে!" বলতে বলতে নেলি এসে এনার হাত দু'টি ধরে ব'লে উঠল—"কি চার্মিং তোমায় দেখাচ্ছে এনা, ঠিক যেন রাণীর মত।" এনা মৃদু ভাবে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে নেলি বলল—"যাক, এখন তোমায় কি অফার করতে পারি বল? একটা অরেঞ্জ গিমলেট্, কি বল?" এনা ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিল, "না ভাই, নিতান্তই যদি কিছু খেতে হয়, তা হ'লে শুধু অরেঞ্জ-স্কোয়াশ বা টোমাটো-জুস দাও"। নেলি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ক'রে বলে উঠল—"তুমি একটি বেবি!" তার পর ভৃত্যকে আদেশ দিল মিস্ সাহেবকে নারেঙ্গি-পানি দিতে। অনেকের অনুরোধে এনা পিয়ানোর সঙ্গে

একটি মিষ্টি সুরের স্কচ্ ব্যাল্যাড গান করল। বাশীর হোসেন এনার গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। তার পর একটি সুদর্শন গৌরবর্ণ মাদ্রাজি যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যুবকের নাম মিষ্টার পটনি, বিলাতের পাশ-করা এঞ্জিনীয়ার। নিজামের রেলওয়েতে বড় কাজ করেন। ছুটি নিয়ে ওয়ালটেয়ার বেড়াতে এসেছেন। খানিক তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রে এনা তাঁরই সঙ্গে পাশের ঘরে গেল। সেখানে গ্র্যামোফোনের রেকর্ডের সঙ্গে পাঁচ-ছ' জন যুবক সমান সংখ্যক যুবতীদের সঙ্গে যুগলে-যুগলে নৃত্য করছেন। নেলি বাশীর হোসেনের সঙ্গে নাচছে। এনার এ জিনিষটা খুব ভাল লাগত না। তবুও অনুরোধে পড়ে একবার পটনির সঙ্গে ও একবার বাশীরের সঙ্গে পায়ে পা' মিলিয়ে কয়েক মিনিট নৃত্যের অভিনয় করতে বাধ্য হ'ল। তার পর সকলে একসঙ্গে বসলে বাশীর সিগারেট-কেস খুলে সবাইকে সিগারেট 'অফার' করল। এনা এবারেও 'না' বলাতে নেলি তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠল—"তুমি সত্যিই হোপলেস, এনা!" নেলি অবশ্য নিজের হাত-ব্যাগ থেকে হোল্ডার বার ক'রে তাতে সিগারেট লাগিয়ে দিয়ে হোল্ডারটা দাঁত দিয়ে চেপে বাশীরের দিকে এগিয়ে দিল। বাশীর 'লাইটার' দিয়ে নেলির সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে, নিজেও একটা সিগারেট ধরাল। তার পর এনা ও পটনির দিকে পিছন ফিরে তারা দু'জনে চাপা-গলায় হাসি-গল্প করতে লাগল। পটনি এ-কথা সে-কথা ব'লে এনাকে প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এনার আর তখন কিছুই ভাল লাগছিল না। ন'টা বাজতে না বাজতেই সে মিসেস্ হলডারকে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। পটনি ব্যস্ত হ'য়ে এসে প্রস্তাব করল যে তার ছোট টুসীটার মোটরে এনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে। বিশেষ আপত্তি না ক'রে এনা গাড়ীতে উঠে পড়ল। যথাসম্ভব ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে পটনি এনার সঙ্গে পাঁচ রকম বিষয়ে গল্প করতে করতে চলল।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময়ে বাশীর হোসেনের গায়ে ন্যাপকিনটা ছুঁড়ে ফেলে নেলি বলে উঠল—"ননসেন্স! ও-সব বন্ধ কর, মাম্মার কানে যাবে।" খপ ক'রে নেলির একটা হাত ধ'রে বাশীর বলল—"সত্যি বলছি নেলি, তোমায় ছেড়ে থাকা আমার সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি মত দাও।" টোষ্টে মাখম মাখাতে মাখাতে নেলি একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই বলল—"ও-রকম কথা সকলেই বলে। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।" উত্তেজিত স্বরে বাশীর উত্তর দিল—"তুমি একেবারে হৃদয়হীনা, নেলি! এ কথা তুমি বলতে পারলে? কিসের আশায় এত দিন আমি বসে আছি বল? তোমায় পাব বলে আশা করি শুধু এই জন্যে।"

বাইরে সামান্য একটা গোলমাল শুনে নেলি আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেসা করল কি হয়েছে। সে জানাল এক জন বাংগালী বাবু মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান—তার কার্ড নেই, নাম বলছে 'নেড়েন' হালদার। নেলি ব্যস্ত হয়ে ভৃত্যকে তখনই আগন্তুককে ভিতরে আনতে আদেশ দিল, আর নিজে মা'র সন্ধানে গেল।

অনেকক্ষণ পরেই ভৃত্য এক জন সৌম্য-মূর্তি ভদ্রলোককে নিয়ে খাবার-ঘরেই পৌঁছে দিল। ভদ্রলোকের পরনে সনাতন বাঙালীর সাজ। কাপড়-চোপড়ে তেমন পারিপাট্য নেই। মিসেস্ হালদারও সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন। আগন্তুক তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। মিসেস্ হালদার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি, নীরেন ঠাকুরপো যে! তুমি কোথা থেকে এলে? ম্যাড্রাস থেকেই আসছ না কি?" ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, ম্যাড্রাস থেকেই আসছি। তবে এখানে ক'দিন আগেই পৌঁচেছি। তোমরা যে এখানে বেড়াতে এসেছ, তা জানতাম না। সেদিন নীলিমাকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে দেখে বুঝলাম যে তোমরা এখানে আছ। আজ সন্ধান নিয়ে বাড়ী খুঁজে এসেছি। তার পর যা তোমাদের চাকর-বাকর! আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিতেই চায় না। বিশ্বাসই করবে না যে আমি তোমাদের আপনার লোক!"

ইতিমধ্যে নেলি আবার এসে খাবার-টেবিলে নিজের পরিত্যক্ত আসনে বসল। নীরেন বাবুর দিকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে চেয়ে বললে—"হ্যালো, আঙ্কল! আপনি যে এখানে?" তার পর প্রাতরাশে ও সেই সঙ্গে বাশীরের সঙ্গে কথাবার্তায় মন দিল।

বাশীরকে দেখে নীরেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"ইনি কে, বৌদি? এঁকে ত চিনতে পাচ্ছি না।" মিসেস্ হালদার কিছু বলবার আগেই নেলি বলে উঠল—"ইনি আমার ফ্রেণ্ড, মিষ্টার বাশীর হোসেন, এখানে বেড়াতে এসেছেন।" বাশীর একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে নীরেন বাবুর দিকে ফিরে মাথা নীচু করল। নেলি একটা সিগারেট ধরিয়ে বাশীরকে বলল—"এস বাশীর, এমন চমৎকার সকালটা নষ্ট না ক'রে একটা ড্রাইভ দিয়ে আসা যাক।"

নীরেনের চোখে এ দৃশ্যটা একটুও ভাল লাগছিল না। তিনি মিসেস্ হালদারের দিকে চেয়ে গলাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললেন—"কিছু মনে কোরো না, বৌদি, কিন্তু নীলিমাকে কি ভাবে তৈরি করেছ? এ কি দাদার মেয়ে? এ রকম শিক্ষা-দীক্ষা দেখে যে একে আমাদের বংশের মেয়ে বলে মনে করতেও লজ্জা করে। ছি!"

বিরক্তিতে মুখখানা বেঁকিয়ে মিসেস্ হালদার বললেন—"তোমাদের সে সব যুগ আর নেই, নীরেন ঠাকুরপো। এ কথাটা ভুলে যেও না। আজকালকার উচ্চশিক্ষিতা ইংরেজদের কলেজে পড়া বড় মেয়েরা নিজের মতেই চলতে চায়। আর সেটা কিছু অস্বাভাবিক বা খুব অন্যায়ও নয়। তাদের স্বাধীন মতামতে আমরা কেন অকারণ বাধা দিতে যাব?"

নীরেন স্বরটা একটু উঁচু করেই বললেন—"দাদা না হয় বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন—আর একমাত্র সন্তানকে আদর দিয়ে মাথায় তুলছেন। কিন্তু ভুলে যেও না যে আমরা ন্যায়রত্ন-বংশের ছেলে। আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। অল্প বয়সে দেবতার ভোগ রান্না করে আর ঠাকুর-ঘর পরিষ্কার ক'রে তোমারও হাতে কড়া পড়েছিল। সেই তোমারই এই পরিবর্তন! সত্যিই আমায় অবাক করলে বৌদি!"

ক্রোধে অপমানে মিসেস্ হালদারের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—"তুমি কিন্তু বড্ড বেশী বল, নীরেন ঠাকুরপো! তুমি কি ঝগড়া করতেই বাড়ী ঢুকেছ?"

নীরেন অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে উত্তর দিলেন—"না বৌদি, ঝগড়া করতে আসব কেন? নিতান্ত গায়ে লাগে বলেই অপ্রিয় কথাগুলো বলতে হল। তবে এটুকু জোর করেই বলছি—যে তোমাদেরও

এক দিন চোখ ফুটবে। তখন বুঝবে নীরেন হালদার ভাল কথাই বলেছিল। সে থাক গে, দাদা আসছেন কবে?"

মিসেস্ হালদার বললেন—"উনি শীগ্‌গিরই ফিরবেন—হয়ত আসছে সপ্তাহের মধ্যেই। তা, একটু চা-টা খাও? আমাদের এক জন ভাল জাতের চাকর আছে, সেই করে দেবে।"

নীরেন বললেন—"সে জন্যে ব্যস্ত হোয়ো না। আমি চা খেতে আসিনি। যে হিন্দু হোটেলে উঠেছি, সেখানেই ফিরে খাব। আজ আসি, বৌদি, পারি ত যাবার আগে আর এক দিন দেখা করে যাব।" তার পর নীচু হয়ে বললেন—"চটি খুলে পা'টা একটু বাড়িয়ে দাও। তোমার ঐ চটির ধুলো নিতে ইচ্ছে করে না!"

একটা খোলা চিঠি হাতে করে এনা তার মার কাছে এসে বলল—"মাম্মা, দেখ, মিষ্টার পট্টনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে মোটরে এক দিন আউটিং ও পিক্‌নিক্‌এ যেতে। নেলিও যাচ্ছে।" মিসেস্ সেন তখন চিঠি লিখছিলেন। তাঁর স্বামী কাছেই একটা 'সেটি'তে বসে একখানা ইংরেজি উপন্যাসে মগ্ন। মেয়েকেই বললেন চিঠিটা পড়ে শোনাতে। চিঠিটা পড়া হলে তিনি বললেন—"এতে আর আপত্তির কি আছে? আমরা বুড়ো হয়েছি, আমাদের কথা আলাদা। ওরা ছেলে মানুষ। এখানে কোন রকম এ্যামিউজমেণ্ট নেই। যাক না, বাইরে বেড়িয়ে এলে মনটাও ভাল হবে।" এনা আনন্দে বাবার মাথার উপরে চুমু খেয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—"তোমার মত কন্‌সিডারেট্ বাবা হয় না! তাই ত তোমায় এত ভালবাসি, বাবা।" মিসেস্ সেন 'হাঁ,' 'না', কিছুই বললেন না। স্বামী জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাঁর দিকে তাকাতে সংক্ষেপে বললেন—"তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমি কোনও মত-প্রকাশ করতে চাই না।"

মোটরে 'আউটিং'-ও মুক্ত আকাশের তলে পিকনিক ভাল ভাবেই হল। যাবার সময়ে এনা ও নেলি একই গাড়ীতে গেছল। কিন্তু ফেরবার সময়ে নেলি হঠাৎ বাশীরের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে এনাকে ফেলেই সরে পড়ল।

এনা রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ল। এমন সময়ে পট্টনি এসে তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করল। কতকটা বাধ্য হয়েই এনাকে তাই করতে হল—যদিও পট্টনিকে সে অপছন্দ করত না। পট্টনির প্রতিভা-দীপ্ত মুখ-চোক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মার্জিত আচরণ, বিশুদ্ধ নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণ তাকে যেন একটা সহজ আভিজাত্য দিয়েছিল। পট্টনির পাশে বসে মোটরে যেতে এনার ভালই লাগছিল। মধ্যে-মধ্যে গাড়ীর ঝাঁকানিতে পট্টনির বাঁ হাতটা এনার গায়ে ঠেকে যাচ্ছিল—তাতে তার সর্বশরীরে যেন একটা আনন্দের শিহরণ লাগছিল। কিছুক্ষণ যাবার পর পট্টনি গাড়ীর গতি খুব মন্দ করে দেওয়াতে এনা তাকে অনুরোধ করল একটু বেশী জোর চালাতে, কারণ বাড়ীতে তার অসুস্থ বাবা রয়েছেন, দেরী হলে মা-ও খুব ব্যস্ত হবেন। পট্টনি গাড়ীর বেগ সেই রকমেই রেখে মৃদু হেসে বললেন—"মিস্ সেন, আপনি অকারণে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এমন সুন্দর চাঁদের আলো, ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে, দূরে সমুদ্রের একটানা গর্জন আর নির্জন পথে আমরা দু'টি যাত্রী—যেন কোন্ অজানা পথে চলেছি। এতে কি আপনার প্রাণে কিছু আবেগ আসছে না? আপনার কি হৃদয় বলে কিছু নেই? আপনার বাবা-মা জানেন যে আপনি আর বেবি নেই। যার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, সেও যুবাপুরুষ। তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেই পাঠিয়েছেন যে আমরা জীবনের দুর্লভ এই রোমাণ্টিক মুহূর্তগুলি একটু উপভোগ করব। ঐ দেখুন, সমুদ্রের জলে চাঁদের আলো পড়ে কি স্বপ্নলোক রচনা করেছে! এ সব দেখতে আপনার ভাল লাগছে না?" এনা কোনও উত্তর না দেওয়াতে পট্টনি আবার বলে চলল—"দেখুন মিস্ সেন, আপনাকে আমার সত্যিই বড় ভাল লাগে। আপনাকে সেদিনকার পার্টিতে দেখবার পর থেকে সব সময়েই আপনাকে একটি বার দেখবার জন্যে আমার মন বড় ব্যস্ত হয়। আপনারও কি সেই রকম আমাকে দেখতে ইচ্ছা হয় না?"

মৃদু হেসে এনা বলে উঠল—"দেখলেন, হঠাৎ আকাশে একটা উল্কাপাত হল! চাঁদের আলোতে সাধারণত এ রকম দেখা যায় না।" পট্টনি ডান হাতে গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে বাঁ হাতটি সন্তর্পণে এনার হাতের উপর রেখেই চমকে উঠলেন। "এ কি? আপনার হাত এমন বরফের মত ঠাণ্ডা কেন? কোনও অসুখ করেনি ত?" তার পর হঠাৎ নিজে থেকেই হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "ও বুঝতে পেরেছি। ভয়ে আপনার হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! আপনি এত ভীতু কেন? দেখুন দেখি মিস্ তলওয়ারকে। তাঁর ত প্রায় এমন পুরুষ-বন্ধু নেই যার সঙ্গে তিনি ফ্লার্ট ক'রে না বেড়িয়েছেন। মাফ করবেন, আমি ভুলে গেছলাম যে তিনি আপনার বান্ধবী। আমি কিছু মনে করে তাঁর উদ্দেশে বলিনি কিন্তু।"

ততক্ষণে এনা কতকটা সামলে নিয়েছে। সে স্বাভাবিক গলায় ছলে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, মিষ্টার পট্টনি, আপনি কত দিন আগে মোটর চালাতে শিখেছেন?"

পট্টনি হেসে বললেন—"অনেক দিন—বিলেতে যাবার আগেই।" তার পর বলল—"আপনি কিন্তু খুব চালাক, মিস্ সেন! আমি আপনাকে যে কথা বলতে চাইছি, সেটা কেবলই অন্য কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। তা কিন্তু চলবে না।"

এনা তার দিকে মুখ ফেরাতেই পট্টনি তার ডান হাতটা জোর করে ধরে বললেন—"মিস্ সেন, আমি আপনাকে ভালবাসি। আমার হৃদয় আপনাকে চায়। পৃথিবীতে অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু আপনার মত কাউকে দেখিনি। আমাদের ভাষা বা জাতি ভিন্ন হতে পারে কিন্তু প্রাণ প্রাণের ভাষা নিশ্চয়ই বুঝবে। বলুন দয়া করে, আমার এ আশা কি শুধু আকাশ-কুসুমই হবে? আপনি ভরসা দিলে আপনার বাবা-মা'র অনুমতি চাইতে পারি। কিন্তু সবার আগে চাই আপনার সম্মতি।"

এনা উত্তরে কিছু বলবার আগেই মোটর গিয়ে তাদের বাড়ীর সামনে থামল। পট্টনি গাড়ীর দরজা খুলতে-খুলতে বললেন—"এই ত আপনার বাড়ী এসে গেছে। আমি এখন আসি। কিন্তু মনে রাখবেন আমার নিবেদনটি। আমি একটা উত্তর চাই।" কতকটা তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হয়ে নিজের হাতটা পট্টনির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এনা বলল—"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে।" পট্টনি ব্যস্ত হয়ে বললেন—"কিন্তু ঐ বলে আমার অনুরোধটি এড়িয়ে যাবেন না। আমি চিঠি লিখব। আশা করি উত্তরে আপনার মনের কথা জানাতে কৃপণতা করবেন না। গুড নাইট, মিস্ সেন!"

বিকালে মিষ্টার হালদার ড্রইংরুমে বসে একটা মোকদ্দমার নথি দেখছিলেন। তাঁর স্ত্রী কতকটা শুষ্ক ও চিন্তান্বিত মুখে তাঁর কাছেই বসে একটা জামা বনছিলেন। একটু ইতস্তত করে স্বামীকে বললেন—"কাজ নিয়ে যদি সব সময়েই থাকবে তাহ'লে এখানে এলে কেন ?"

স্বামী উত্তর দিলেন—"কি করব ? খুবই দরকারি কাজ হ'তে ছিল। তবুও নীরেনের চিঠি পেয়ে বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল। সে নেলির সম্বন্ধে খুব বাগাবাগি করেই লিখেছিল।"

বোনা বন্ধ রেখে মিসেস্ হালদার বললেন—"তা তোমার ভাই কি লিখেছিল, শুনি ? নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপারের কথা লিখেছেন ?"

মোকদ্দমার নথি সরিয়ে টেবিলের উপর রেখে মিষ্টার হালদার একটু চাপা-গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—"নেলি কোথায় ?" তাঁর স্ত্রী বললেন—"আমি ঠিক জানি না. বাশীরকে নিয়ে কোথায় বেরিয়েছে। ব'লে গেছে ফিরতে দেরি হতে পারে।"

মিষ্টার হালদার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"নেলি সিগারেট খায় তা নীরেন দেখলে কি করে ? ওর সামনে নেলির স্মোক করাটা কি উচিত হয়েছে ? তুমি তার মা, এ সব জিনিষগুলো তোমারই শেখাবার কথা। আমি কত দিন বারণ করেছি সিগারেট খেতে। কিন্তু তোমার প্রশ্রয় পেয়ে ওর এতখানি সাহস হয়ে গেছে যে আমার পর্য্যন্ত কথা কানে তোলে না।"

আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মত মুখ করে মিসেস্ হালদার বললেন—"আমি তোমাদের মত সব প্রাচীন ও পচা প্রেজুডিস মানতে প্রস্তুত নই। মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। এখনও তাকে কচি খুকীর মত প্রত্যেকটি ছোট ব্যাপারে বাধা-নিষেধের নিগড় দিয়ে বেঁধে রাখা আমি উচিত মনে করি না। তার নিজের ত একটা স্বাধীন মতামত আছে। ভুলে যেও না, আমাদের সে যুগ আর নেই।"

একটু পরে স্বামীর আরো কাছে গিয়ে বসে বললেন—"দেখ, একটা কথা বলব, রাগ কোরো না। কাল রাত্রির বেলা নেলি আমায় বললে যে বাশীর তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। নিজের সম্পূর্ণ মত থাকলেও নেলি তার কোনও উত্তর দেয়নি, কেবল বলেছে আমাদের জিজ্ঞেস করবে। তা বাশীর ত সত্যিই ভাল ছেলে। যেমনি স্মার্ট তেমনি সুদর্শন। বড় বিলিতি ফার্মে কভেন্যান্টেড এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হ'য়ে ঢুকেছে। অল্প দিনের মধ্যেই মাইনে বেড়ে ছ'শ' টাকা হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি পার্টনার না-ও হয়, অন্তত একটা ডিপার্টমেণ্টের ভার নিশ্চয়ই পাবে! পাঁচ-ছ' হাজার টাকা মাইনেই পাবে। তাছাড়া নেলি ত আমাদের একমাত্র সন্তান। আমাদের যা-কিছু আছে, সবই ত ওর হবে। আমি অবশ্য তোমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে কোন কথা দিতে পারিনি। তাহলেও নেলি মনে-মনে জানে যে তার মাম্মার এ বিয়েতে সত্যি-কার আপত্তি কিছু নেই। এখন তোমার সম্মতি পেলেই ওদের জানিয়ে দিতে পারি।"

আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ-চোখ লাল করে মিষ্টার হালদার বলে উঠলেন—"তোমার একেবারে মতিচ্ছন্ন হয়েছে সরলা! এ কথা তুমি বামুনের মেয়ে আর হালদার গ্রামের হালদার-বাড়ীর বৌ হয়ে বললে কি করে ? আমার দেহে প্রাণ থাকতে এত বড় আউট্‌রেজ আমি সহ্য করব না। একটা কোথাকার অপদার্থ ভ্যাগাবণ্ড, তোমাদের যে কি করে যাদু করেছে তোমরাই জান! সমর্থ মেয়েকে কি বলে তুমি ওটার সঙ্গে মিশতে দিলে ? শুনেছি ত ওটার মামা যুদ্ধের সময় চামড়ার কারবারে কালোবাজারি ক'রে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে, আর সেই টাকাতেই ভাগনেকে 'বেলাত' পাঠিয়ে সাহেব তৈরি করেছে। মসলেম লীগের দৌলতে বড় বিলিতি ফার্মে চাকরিও হ'য়েছে। কিন্তু আসলে ওটার মূল্য কি! এক কাণা-কড়িও নয়! তাছাড়া টাকার লোভে তোমার মেয়েকে এখন বিয়ে করে পরে যে সনাতন শরিয়তী বিধানে দু'-তিনটি নিজের জাতের বিবি নিকা করবে না, তাই বা তুমি জানলে কি করে ? ছি, ছি! ও-সব কথা ভাবলেও ঘৃণা হয়। আর শুধু তোমারই মাত্রাহীন প্রশ্রয়ে এত দূর গড়িয়েছে।" এই কথা বলে তিনি ড্রইংরুম ছেড়ে শোবার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মিসেস্ হালদার সেইখানেই গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

ঘরে ঢুকে মাকে সেই ভাবে বসে থাকতে দেখে নেলি বলে উঠল, "হ্যালো, মাম্মা, তোমার মুখ এত শুকনো কেন ? কি হ'য়েছে ?"

"কই, কিছুই না"—বলে মিসেস্ হালদার জোরে একটা নিশ্বাস ফেললেন। এদিক-ওদিক দেখে নেলি জিজ্ঞাসা করল—"ড্যাডি কোথায় ?"

মিসেস্ হালদার বললেন—"তিনি ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। খুবই শকড্ ও মর্মাহত হয়েছেন।" তার পর একটু থেমে আবার বললেন—"কাজ নেই, নেলি, তুমি মত পরিবর্ত্তন কর। তোমার ড্যাডির একেবারে ইচ্ছা নয় যে তুমি বাশীরকে বিয়ে কর। হাজার হলেও তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে ত ?"

ফরাসী কায়দায় কাঁধ দু'টো ঈষৎ উঁচু করে নেলি ব'লে উঠল—"হোপলেস্! তুমিও দেখছি ড্যাডির মত ইম্পসিবল্ হয়ে পড়ছ মাম্মা! যা হয় না, সে কথা বোলো না। ড্যাডির মত থাকল বা না থাকল, তাতে আসলে কি-ই বা আসে যায় ? ভুলো না, আমি বাশীরকে ভালবাসি।"

মিষ্টার হালদার সেই যে সকালে ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন, সে দরজা আর সারা দিন খোলেননি। তাঁর স্ত্রী এবারে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনিও স্বামীকে ডাকতে সাহস করেননি। সারা দিন নিজের ঘরে চুপ করে শুয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি মুখ-হাত ধুয়ে ড্রইংরুমে গিয়ে বোনা নিয়ে বসলেন। রাত ন'টা বাজলে ভৃত্যকে ডেকে নেলির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, মিসি বাবা ছোট সাহেবের সঙ্গে দুপুরের আগেই বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি, কিন্তু গাড়ী নিয়ে যাননি।

অস্থির মনে মিসেস্ হালদার ঘড়ির দিকে চেয়ে কোনও মতে এক ঘণ্টা কাটালেন। যখন রাত দশটা বেজে গেল তখন আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। সারা দিনের উপবাসে আর দারুণ উৎকণ্ঠায় তাঁর ভীষণ মাথা-ব্যথা করছিল। এক হাতে কপাল টিপে ধ'রে তিনি দরজা ঠেলে নেলির ঘরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে দেখেন নেলির কাপড়-চোপড় প্রায় কিছুই ঘরে নেই। দু'-তিনটা স্যুটকেসও ঘরে নেই। আর দেখবার টেবিলের উপর

সাদা খামের মধ্যে একটা চিঠি রাখা রয়েছে। এক মুহূর্ত্তে খামখানা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা পড়তে পড়তে তাঁর মুখখানা ফেকাশে হয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল—"মাম্মা, আমরা চললাম। বিয়ের পরে ফিরব। কিছু মনে কোরো না। তোমারই নেলি।"

পাগলের মত দিশাহারা হয়ে মিসেস্ হালদার তখন স্বামীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। বিরক্ত হ'য়ে দরজা খুলে মিষ্টার হালদার বেরিয়ে এসে বললেন—"কি হয়েছে? এত রাত্তিরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন?" হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে নেলির চিঠিখানা স্বামীকে দিয়ে মিসেস্ হালদার বললেন—"এই দেখ!"

চিঠিটাতে চোখ বুলিয়ে সেটা পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মিষ্টার হালদার বললেন—"গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে আর কি হবে?" ব'লে আবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সকাল থেকে বাদল নেমেছে। সেদিন কেউ বাড়ীর বাইরে যেতে পারেননি। সর্বাঙ্গে ব'লাপোষ মুড়ি দিয়ে লম্বা চেয়ারে বসে মিষ্টার সেন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছুঁচ-সূতা দিয়ে স্বামীর জামায় বোতাম লাগাচ্ছিলেন। একটা চিঠি এনে মিষ্টার সেনের হাতে দিয়ে এনা বলল—"ড্যাডি, ক'দিন থেকেই একটা কথা তোমায় বলব ভাবছি, কিন্তু আর না বললে চলে না। মিষ্টার পটনি আমায় বিয়ে করতে চান! চিঠি লিখে প্রোপোজ করেছেন। এই দেখ।"

মেয়ের কথায় চমকে ওঠাতে মিষ্টার সেনের হাত থেকে চিঠিটা মেঝেতে পড়ে গেল। সেটা কুড়িয়ে তাঁর হাতে এনা আবার দিল। ধীরে-ধীরে সেটা মিষ্টার সেন গোড়া থেকে শেষ অবধি পড়লেন। তার পর গম্ভীর ভাবে এনাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার কি মত?"

এনা উত্তর দিল—"আমার ত অমতের কোনও কারণ নেই, ড্যাডি! মা'র হয়ত আপত্তি হতে পারে ভাষা আর জাত ভিন্ন ব'লে। কিন্তু ইংরেজি ত আমাদের সকলেরই ভাষা, আর জাতে ত আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান, তা ছাড়া হিন্দু। আমরা বৈদ্য, মিষ্টার পটনিরাও নায়ার। ব্রাহ্মণ ছাড়া এত সম্মান দক্ষিণে অন্য কোনও হিন্দুর নেই। স্বাধীন ভারতে আর এ সব ছোট-খাটো প্রাদেশিকতার স্থান থাকা উচিত নয়।"

তার কথায় সায় দিয়ে মিষ্টার সেন বললেন—"কথাটা অন্যায় বলোনি এনা। আর ছেলেটি সত্যিই সব দিক দিয়েই ভাল। তবে ভাষাটার ব্যাপারে আমার মন একটু খুঁত-খুঁত করছে। ভাবছি এনা কি এ বিয়েতে প্রকৃত সুখী হতে পারবে?"

মিসেস্ সেন যেন নির্লিপ্ত ভাবে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন ও নিজের হাতের কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি এইবার সেলাইএর জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বারবান রামসিংকে ডাকলেন। সে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াতেই বললেন—"আমি আজ কলকাতা যাব। এখনই গাড়ীর ব্যবস্থা কর; আর আমার বিছানাটা তাড়াতাড়ি বেঁধে দাও।" তার পরই তিনি সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। তাঁর ভাব দেখে পিতা-পুত্রী পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করে নিলেন। দু'জনেই বেশ একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী এসে গেল। রামসিং মিসেস্ সেনের বিছানা ও বাক্স গাড়ীর পিছনে বেঁধে দিল। ট্রেণের আর বেশী সময় নেই। মিসেস্ সেন কোনও দিকে না চেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা মোটরের দিকে চললেন। এনা এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে কেঁদে বলল—"মা, আমায় এবারটি ক্ষমা কর। তুমি চলে যেও না।" মিসেস্ সেন মেয়েকে তুলে গালে চুমু খেয়ে বললেন—"মাকে ত তোমাদের দরকার নেই, এনা! মা থাকলেই তোমাদের নানা কাজে বাধা হবে। তাই আমি ঠিক করেছি বেনারস চলে যাব। সেখানেই বাস করব। এ সব আর আমার ভাল লাগে না।"

মিষ্টার সেন স্ত্রীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—"রাগ করছ কেন মৃণাল? তোমার অমতে কি আমি সম্মতি দেব, না এনাই বিয়ে করবে? যত ফিরিঙ্গিয়ানাই সে শিখুক না কেন, তোমার রক্ত তার শরীরে আছে ত? তোমার দেওয়া শিক্ষা তার সম্পূর্ণ বৃথা হয়নি।"

পিতার কথা শুনে এনা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে মার বুকে মুখ লুকিয়ে বলল—"মা, আর আমি তোমার অবাধ্য হব না।" মিসেস্ সেনও আর স্থির থাকতে পারলেন না। চোখের জল মুছতে-মুছতে ড্রইংরুমে এসে এনাকে কোলের কাছে টেনে বললেন—"তোরা সেই শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বাড়ীতেই ফিরিয়ে আনলি? কাশী বাস আমার অদৃষ্টে নেই দেখছি!" তার পর রামসিংকে ডেকে বললেন মোটর থেকে বিছানা ও বাক্স নামিয়ে আনতে ও ড্রাইভারটাকে কিছু বখসিস দিয়ে বিদায় করে দিতে। আর একবার পিতা-পুত্রীতে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল। কিন্তু এবারে তাঁদের দু'জনেরই মুখে-চোখে দারুণ উৎকণ্ঠার পর একটা পরম স্বস্তি ও শান্তির ছবি ফুটে উঠল।

বিদ্রোহী নজরুল

শ্রীলীলা দাস

—বিদ্রোহী নজরুল
চির-লাঞ্ছিতা ভারতের বুকে ছিলে তুমি "বুলবুল",
বন্দিনী মা'র বেদনা ভোলাতে গাহিলে আশার গান,
অগ্নি-বীণায় দিলে সুরদোলা, বাঁশীতে ধরিলে তান।
কম্বু-কণ্ঠে কভু বা হাঁকিয়া স্বদেশের যত বীরে
কহিলে দাঁড়াতে প্রদীপ্ত চিতে, চির উন্নত শিরে।
ডাকিলে যতেক বীর-সন্তান, যতেক নওজোয়ান
শৃঙ্খলিতার মুক্তির লাগি' দিতে প্রাণ বলিদান।
স্তব্ধ সে কণ্ঠ রুদ্ধ আজিকে, স্মৃতি ও শক্তিহীন,
হে চারণ-কবি তোমার বিহনে সুরহারা বেণু-বীণ।
তাই তোমা ডাকি ওগো সুর-সাকী জেগে ওঠো আর বার
বিস্মরণের মদির নেশায় ঘুমায়ে থেকো না আর।
জাগো জাগো কবি—বিদ্রোহী কবি আবার ওঠো গো জাগি,
সুরের মায়ায় রচো মায়াজাল মুক্ত ভারত লাগি।

জীবাণু-সংক্রমণ কাকে বলে ডাক্তারবাবু ?

তরুণী বধূটি জিজ্ঞাসা করলেন—

ডাক্তার তখন জীবাণু-সংক্রমণের

খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন ঃ আমাদের শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে রোগবাহী জীবাণুরা এই ক্ষতস্থান দিয়ে শরীরের ভেতরে গিয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথম থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে এই বিষক্রিয়া সুরু হয়ে যায় ও সারা শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে। রোগবাহী জীবাণুগুলি আকারে এত ছোট হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। এই দেখুন, একজাতীয় জীবাণুর চেহারা -- স্বাভাবিক আকারের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো ক'রে এই রকম দেখা যায়।

কেটে বা ছড়ে গেলে 'ডেটল' লাগাবেন ঃ

ছাল উঠে গেলে, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণুর প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আত্মরক্ষার সর্বপ্রথম উপায়

চতুর্দ্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়—'ডেটল' আপনাকে নিরাপদ রাখবে ঃ

সংক্রমণের বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক থাকা উচিৎ বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়। এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচা করলে মুখ ও গলা জীবাণুমুক্ত হয়, গলার ঘায়ের যন্ত্রণা কমে ও ঘা শুকিয়ে যায়।

মাথার চুলকানিতে ঃ

মাথার চুলকানি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথায় টাক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন — ব্যবহারের নিয়ম শিশির গায়ে লেখা আছে।

এই পুস্তিকাটির জন্য লিখুন—বিনামূল্যে পাবেন ঃ

'ডেটল'-এর ক্রিয়া মৃদু অথচ অব্যর্থ — এজন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এর তুলনা নেই। বিনামূল্যে "মডার্ণ হাইজিন ফর উওমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্য লিখুন।

'ডেটল' জীবাণুর হাত থেকে মুক্ত রাখে এবং সংক্রমণের বিপদ ঘটতে দেয় না

'DETTOL'

TRADE MARK

এ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা

হাজারমারীর বিভীষিকা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীহৃষীকেশ হালদার

রহস্যের অন্তরালে

ব্যারাকপুরের ঘটনার দিন দুই পরে সোনারগাঁর দুই দারোগা, প্রদীপ, অধীপ, চন্দ্রিকা সিং আর জহর সান্যাল এক দিন ছোট একটা সম্মেলনে গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টার্সে মিলিত হলেন। গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্ত্তা স্বয়ং এবং আরো অনেক বিশিষ্ট কর্ম্মচারীও হাজারমারীর মাঠের রহস্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে সেই সম্মেলনে যোগ দিলেন। আমিও এ-ব্যাপারে জড়িত থেকে অনেক খানি অংশ গ্রহণ করেছি বলে আমাকেও উপস্থিত থাকবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, আমি সে অনুরোধ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলাম।

সকলে প্রদীপকে এ-রহস্যের মূল উদ্ঘাটন করতে অনুরোধ করায় প্রদীপ বললে : সবার আগে আমাদের জহর বাবুর বন্দিত্বের ইতিহাস জানা দরকার।

জহর সান্যাল তাঁর কাহিনী আরম্ভ করলেন : আমার বন্দিত্বের ইতিহাস এমন বিচিত্র কিছু নয়। এমন কি, কেন যে আমাকে এত দিন বন্দী করে রাখা হয়েছিলো, তাও আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি। আমি বরাবরই একটু নির্জ্জনতাপ্রিয়, তাই সারা দিনের কাজ-কর্ম্মের পর অবসর নেবার জন্যে ব্যারাকপুরের বাগান-বাড়ীটাই আমার পছন্দ হতো সবার চেয়ে বেশী। ওখানে লোকজনও বেশী ছিল না, আমার অধিকাংশ কর্ম্মচারী, চাকর-দারোয়ান থাকতো কলকাতার বাড়ীতে। ওখানে থাকতো মাত্র একটা মালী আর এক জন চাকর। সেই চাকরটাই আমার হাট-বাজার করতো, রান্নাও করতো সেই। এক কথায় সেই ছিলো বাগান-বাড়ীতে আমার সব কাজের সহায়। এক দিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো কিসের শব্দে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি আমার সেই প্রভুভক্ত চাকরটি বাড়ীর উঠোনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, আর রক্তাক্ত ছুরি হাতে একটা কঙ্কাল তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। আর একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করছে। তখন তো আর জানতাম না ওরা প্রেতাত্মা নয়,—মানুষ! কাজেই অমন একটা বীভৎস দৃশ্য দেখে আতঙ্কে আমি চীৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে দণ্ডায়মান কঙ্কালটা ছুটে এসে একখানা ক্লোরোফর্ম্মসিক্ত রুমাল আমার নাকে চেপে ধরলো। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন আমার জ্ঞান হলো, আমি দেখলাম, আমাকে একটা প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে একটা বিরাট বাড়ীতে বন্দী করে রাখা হয়েছে। দিন-রাত আমাকে ওরা একটা ঘরে চাবী দিয়ে বন্ধ করে রাখতো। সময় মত খেতে দিতে ত্রুটি হতো না ওদের। সে বাড়ীতে ওদের অনেক লোক প্রায়ই আসতো-যেতো। ওদের বাহন ছিলো বিরাট বাদুড়ের আকৃতিবিশিষ্ট এরোপ্লেন। তার পর প্রায় ন'মাস বন্দী থাকার পরে আমাকে ব্যারাকপুরের বাড়ীতে ওই এরোপ্লেনে করে নিয়ে আসা হয়। প্রদীপ বাবু আমাকে উদ্ধার করবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি যে ওখানেই বন্দী ছিলাম, সে তো আপনারা জানেন। আমার বাগান-বাড়ীর গুপ্তঘর, এরোপ্লেন রাখার জায়গা—সবই আমাকে বন্দী করার পর কখন যে তৈরী করেছে আমি তার কিছুই জানি না।

জহর সান্যালের কাহিনী শেষ হলে প্রদীপের অনুরোধে জীবনময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দারোগা তাঁর নিরুদ্দেশের কাহিনী সকলকে শোনালেন। যদু মণ্ডলের ছেলে তুলোর লাস পাওয়ার পর, আর রাত্রে হাজারমারীর মাঠে নানা রকমের আলো দেখা যায় শুনে সদলবলে তিনি রাত্রি বেলাই মাঠে সরেজমিন তদন্ত করবার জন্যে যান। ভূতের কথাটা তাঁর বিশ্বাস হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন, এর মধ্যে কোন অজ্ঞাত রহস্য আছে। গভীর রাত্রে হাজারমারীর মাঠে পৌঁছে কিন্তু তাঁরা কোন রং-বেরঙের আলো কিংবা জন-মানবের সাড়া পান না। সমস্ত মাঠটা যেন নিস্তব্ধ, নিশুতি। অগত্যা তাঁরা যখন ফিরে আসবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় তাঁদের চার দিকে জ্বলে উঠলো অতি তীব্র সার্চলাইটের লাল নীল হলদে আলো; আর সঙ্গে-সঙ্গে এক দল কঙ্কাল যেন ক্ষুধিত বাঘের মতো তাঁদের ওপর লাফিয়ে পড়লো। তাঁরা আত্মরক্ষার কোন রকম চেষ্টা করবার আগেই তাঁদের পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়। সাহায্যের জন্যে তাঁরা প্রাণপণে চীৎকার করেছিলেন অবশ্য। কিন্তু সেই তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে সে চীৎকার গ্রামের কোনো লোকের কানে পৌঁছয়নি। তার পর তাঁদের ওই একই এরোপ্লেনে করে স্থানান্তরিত করা হয়।

দারোগা বাবুর কাহিনী শেষ হলে জীবনময় তাঁর নিজের আর তাঁর সঙ্গীদের দুর্ভোগের ইতিহাস শোনালেন সকলকে। সদর থেকে নিরুদ্দিষ্ট দারোগার বদলে যখন তাঁকে সোনারগাঁ থানার চার্জ্জে পাঠানো হলো, তখন তিনি খুব সতর্ক হয়েই সেখানে আসছিলেন। কিন্তু ট্রেণ যখন ষ্টেশনে পৌঁছলো, তখন রাত আটটা। সেই রাত্রেই থানায় পৌঁছনো চাই। অথচ এ অঞ্চলের পথ-ঘাট কিছুই তিনি চেনেন না। ষ্টেশন থেকে এক জন ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় তাঁদের সঙ্গ নিলেন। তিনিও না কি সোনারগাঁয়েই যাবেন। থানার

সামনে দিয়েই তাঁকে যেতে হবে। জীবনময় তাঁকে পেয়ে খুসীই হলেন।

জীবনময় বলে চললেন। পথ দেখিয়ে ভদ্রলোক আগে আগে যাচ্ছিলেন। গ্রামের রাস্তা ছেড়ে যখন তিনি একটা ধু-ধু মাঠের পথ ধরলেন, তখন আমরা বিস্মিত হলাম। কিন্তু তিনি বললেন, এই পথ দিয়েই সোনারগাঁ যাচ্ছে হবে। আমাদের তখন কোন সন্দেহ হয়নি। কারণ সে একা, তার ওপর নিরস্ত্র। আর আমরা সকলেই সশস্ত্র। ভাবলাম, যে পথ দিয়েই হোক, তাড়াতাড়ি থানায় পৌছতে পারলেই হলো। কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেই বলেন, এই যে, এসে পড়লাম বলে। এমনি করে প্রায় ঘণ্টা তিনেক হাটার পর একটা জঙ্গল-ঘেরা বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। ভদ্রলোক হঠাৎ একটা পেচকের মত স্বরে কাকে কী ইঙ্গিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটার মধ্যে থেকে এক দল লোক বেরিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করলো। বাধা আমরা অবশ্য দিয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারাই জয়ী হলো। আমাদের জন তিনেক লোক মারা গেল, বাকী সকলে অল্প-বিস্তর আহত অবস্থায় বন্দী হলাম। সেই রাত্রেই ওই অদ্ভুত প্লেনখানায় তুলে আমাদের ব্যারাকপুরের বাগান-বাড়ীতে চালান করা হলো। সেখানে আমরা কী অবস্থায় ছিলাম, তা তো প্রদীপ বাবু দেখেছেন।

জীবনময়ের কথা শেষ হলে গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্ত্তা বললেন: প্রদীপ, এবার তোমার পালা। আমরা এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না —কেন এত ষড়যন্ত্র, এত বিপুল অর্থ ব্যয় করে মানুষ খুন করা, থানা দখল করা, লোক জাল করা। ওদের আসল উদ্দেশ্যটা ছিলো কী?

—ওরা জাপানের গুপ্তচর। উত্তর দিলে প্রদীপ: আসলে এ দেশের সমর-প্রস্তুতি সম্বন্ধে সব খবর সংগ্রহ করে জাপানে পাঠানোই ওদের উদ্দেশ্য।

—গুপ্তচর? সবিস্ময়ে সকলে পরস্পরের মুখ চেয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন বার বার: গুপ্তচর!

—হ্যাঁ, গুপ্তচর। সোজা পথে যে এই যুদ্ধের সময় এ দেশের সব গোপন তথ্য বিদেশে পাঠানো সম্ভব নয়, এ কথা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। প্রদীপ বললে: তাই ওদের এমন দু'-চারটে গুপ্ত আড্ডার দরকার, যেখানে ওরা নিরাপদে বেতার যন্ত্র বসাতে পারবে, দলের লোকদের আশ্রয় দিতে পারবে। তাই ওরা হাজারমারীর মাঠটাকে বেছে নিলে ওদের কার্য্যক্ষেত্র হিসেবে। কিন্তু সহরের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ না রাখলে খাবার জোগাড় করা, ব্যাঙ্কের মারফৎ টাকাকড়ি আদান-প্রদান বা নানা রকম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ওরা এমন এক জন লোককে বন্দী করলে, যিনি সকলের সন্দেহের অতীত। জহর সান্যাল বিখ্যাত ধনী আর নির্জ্জনতাপ্রিয়। তাঁকে সরিয়ে প্রায় তাঁরই মত এক জন লোককে জহর সান্যালের নামে চালানো হলো। চেহারার মধ্যে যেটুকু অমিল ছিলো, সেটুকু পূরণ করা হলো ছদ্মবেশ ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে। তার পর তাঁর বাগান-বাড়ীটাকে নিজেদের প্রয়োজন মত একটা শয়তানীর আড্ডাখানায় পরিণত করতে বেশী দেরী হয়নি। দলটাকে ওরা বেশ গুছিয়ে ফেলেছিলো, কিন্তু একটু বুদ্ধির দোষে ওরা ধরা পড়ে গেলো।

হাজারমারীর মাঠ সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার ও অঞ্চলের গ্রাম্য লোকদের মনে বদ্ধমূল ছিলো। ওখানে না কি অসংখ্য প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায় গভীর রাত্রে। ওরা ভাবলে, যদি হাজারমারীর মাঠ সম্বন্ধে আর একটু আতঙ্কের সৃষ্টি করা যায়, তবে ওর ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁসবে না। ফলে ওদের আড্ডাটা অনাবিষ্কৃত আর নিরাপদ থাকবে। তাই ওরা হাজারমারীর মাঠে গভীর রাত্রে নানা রঙের তীব্র আলো জেলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে, যাতে হাজারমারীর মাঠের ভুতুড়ে বদনামটা আরো বেশী করে ছড়িয়ে পড়লো। সেই সঙ্গে আবার প্রায় প্রতিদিনই ওই অদ্ভুত আকারের প্লেনটার হাজারমারীর মাঠ থেকে ব্যারাকপুরে গতিবিধি থাকায় উড়ুক্কু ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রামের লোকের আর কোন সন্দেহই রইলো না।

যদু মণ্ডলের ছেলে দু'টো রোজই ক্ষেত-খামারে রাত থাকতে উঠে কাজ করতে যায়। এক দিন ওই রকম সব বিচিত্র আলো দেখে তারা ব্যাপার কী বোঝবার জন্যে মাঠের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেলো। ছেলে দু'টো বড় ডানপিটে আর দুঃসাহসী; আর পাঁচ জন গাঁয়ের লোকের মতো ভূতের ভয় তাদের মোটেই ছিলো না। মাঠের মধ্যে তাদের উপস্থিতি দুর্বৃত্তদের ভাবিয়ে তুললো। পাছে তাদের আড্ডাটা তারা আবিষ্কার করে ফেলে, এই ভয়ে দু'ভাইকেই ওরা খুন করলো। কিন্তু এখানেও ওরা হিসেবে একটু ভুল করেছিলো। লাস দু'টোকে ওরা মাঠের মধ্যে কোথাও না পুঁতে মাঠের ধারে গ্রামের প্রান্তে পুঁতে রাখলে—যার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই লাশ দু'টো আবিষ্কৃত হলো, আর তার তদন্ত করতে গিয়ে দারোগা বাবু কেমন করে নিরুদ্দেশ হলেন, সে কথা তো এইমাত্র আপনারা শুনেছেন। তাঁর পরিবর্ত্তে জীবনময় বাবু থানার চার্জ্জ নিতে গিয়ে যে ভাবে বন্দী হন, তাও আপনাদের অজানা নেই।

সৌভাগ্যক্রমে নকল জীবনময়কে আমরা চিনতে পেরেছিলাম, তাকে বন্দীও করেছিলাম। সে পালিয়ে গেলো বটে, কিন্তু থানা নকল জীবনময়ের কর্ত্তৃত্ব থেকে রেহাই পাওয়ায় ওদের ষড়যন্ত্রের জাল বেশ খানিকটা গুটিয়ে এলো।

ওদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে হাজারমারীর মাঠে জহর সান্যালের নামের কার্ড ফেলে ব্যারাকপুরের বাগান-বাড়ীতে যেতে আমাদের প্রলুব্ধ করা। ওদের ফাঁদে আমি সহজেই পা দিয়েছিলাম এই ভেবে যে, এ ভাবে ছাড়া ওদের ষড়যন্ত্রের মূলে প্রবেশ করার আর কোন উপায় ছিল না। এতে আমার প্রাণের ভয় ছিলো অবশ্য; কিন্তু সে ভয়ে পেছিয়ে এলে এ সব কাজে সাফল্যলাভ করা কোন দিনই সম্ভব নয়। অধীপকে সেই জন্যেই আমি জানিয়ে রেখেছিলাম, সে যেন একটু দূরে দূরে থেকে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখে, আর আমাদের কোন বিপদ ঘটতে দেখলে যেন সে পালিয়ে গিয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে। আমাদের মধ্যে অন্ততঃ এক জন মুক্ত থাকলে সে বাইরে থেকে সাহায্যের চেষ্টা করতে পারবে।

তার পর যা' যা' ঘটেছে, সবই আপনারা জানেন। আর একটা নতুন খবর সকলকে জানাচ্ছি। বাগানের মালী দু'টো ওদের দলের লোক হলেও স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত নয়—কেবল পেটের দায়েই ওদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলো। এখন ধরা পড়ে তারা বুঝতে পেরেছে যে, কত বড় অন্যায় তারা করছিলো দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কাজেই তারা ক্ষমা পাবার আশায়

রাজসাক্ষী হয়ে দুর্বৃত্ত দলের যে সন্ধান দিয়েছে, চন্দ্রিকা সিং সেই সন্ধান মত সকলকেই গ্রেপ্তার করেছেন। দলের পাণ্ডা তো ব্যাংকপুরের বাগান বাড়ীতে আগেই ধরা পড়েছিলো। আশা করা যায়, বিচারে তাদের অপরাধ সপ্রমাণ হয়ে যথাযোগ্য শাস্তি হবে।

—তাহলে হাজারমারীর বিভীষিকা এখানেই শেষ হলো, ভূতুড়ে কাণ্ডেরও শেষ!—প্রদীপের কথা শেষ হলে হাসতে হাসতে এক জন প্রবীণ অফিসার মন্তব্য করলেন।

—তা হলো বটে, প্রদীপ উত্তর দিলে: কিন্তু এত বড় কাণ্ডটার আসল নায়ক যে, যার মস্তিষ্ক-বলে নকল জহর সান্যাল তার দল পরিচালনা করতো, তার কোন সন্ধানই এখনো মেলেনি। কে জানে সে নতুন করে আবার কোন ষড়যন্ত্র সুরু করবে কি না!

—কে সে? প্রশ্ন করলেন আর এক জন অফিসার।

—ইয়োনে নিচি। জাপানী গুপ্তচর। প্রদীপ শান্ত শীতল কণ্ঠে বললে: তার টাকা, পরিকল্পনা আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যেই চলতো অত বড় দলটা। নকল জহর সান্যাল তার নির্দেশেই সর্দার সেজে দল চালাতো, কাজেই তাকে দলের কোন লোকই চেনে না, তার কোন সন্ধানও রাখে না। একমাত্র নকল জহর সান্যালই তাকে চেনে। কিন্তু সে যে কিছুতেই ইয়োনে নিচির সন্ধান দেবে না, এটাও ধ্রুব সত্য। কাজেই আবার ভবিষ্যতে ইয়োনে নিচির নতুন ধরণের উপদ্রব সুরু হওয়া বিচিত্র নয়।

সেদিনের মতো এইখানেই পরামর্শ-সভা ভঙ্গ হোলো। কিন্তু প্রদীপের ভবিষ্যদ্বাণী যে কতখানি সত্য, অল্প দিনের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো ভালো ভাবেই। কিন্তু সে আর এক কাহিনী। হাজারমারীর ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।

সমাপ্ত

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

অনেক দিনের কথা···। সূর্যের তরুণ লোহিতাভ কিরণরাশি ডোভার পর্বতের শৃঙ্গে যখন রজত-শুভ্র কিরীট পরাইয়া দিতেছিল, ঠিক সেই সময় লণ্ডনের একটি বিরাট প্রাসাদের একটি কক্ষে এক জন রাজবংশীয় মহিলা কোন একটি বিশেষ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন।

সহসা কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

"কে?···মহিলাটি প্রশ্ন করিলেন।

"আমি।" বলিয়া তাঁহার চাকরটি সম্মুখে দাঁড়াইল।

"কি প্রয়োজন?"

"এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী।"

"যাও। তাঁকে পাঠিয়ে দাও গে।"

"যো হুকুম।" বলিয়া চাকরটি চলিয়া গেল।

চাকরটি চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে এক জন প্রৌঢ় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

'বসুন' বলিয়া মহিলাটি তাঁহার সম্মুখস্থ একটি শূন্য চেয়ারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

"বসবার সময় নেই মহারাণী! আপনি শীঘ্র এইটাতে সহি করুন।" বলিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তিটি তাঁহার সম্মুখে একখানি কাগজ খুলিয়া ধরিলেন।

পড়া শেষ হইলে মহিলাটির চোখ দু'টি ছল্ ছল্ করি তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—এই সৈনিকটির বিষয় বলবার কিছু নেই?"

"না, মহারাণী! এই সৈনিকটা ইতিপূর্বে তিন বার করিয়াছিল এবং তাহাকে তিন বারই ক্ষমা করা হইয়াছিল। এই তিন বার ক্ষমা করা সত্ত্বেও সে পুনরায় দোষ করিয়াছে।"

"তা' হোক। কিন্তু এই লোকটার কি কোন সদ্‌গুণ নাই"

"না, মহারাণী!"

"না? দয়া করে একটু ভাবুন।"

তাহার পর প্রৌঢ় ব্যক্তিটি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন— "সে যে এক জন খারাপ সৈনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সে এক জন চরিত্রবান্ পুরুষ এবং আশা করা যে, সে ভবিষ্যতে হয়ত এক জন ভাল লোক হতে পারে।"

ইহা শুনিবা মাত্র মহিলাটি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"আপনাকে সহস্র বার ধন্যবাদ।" বলিয়া সেই দয়ালু মহিলাটি সেই মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার উপর বড় বড় অক্ষরে "ক্ষমা করা হইল" লিখিয়া নিম্নে নিজের নাম স্বাক্ষরিত করিলেন।

নিশ্চয়ই আপনাদের এই দয়াবতী মহিলার নাম জানিতে ইচ্ছা হইতেছে? এই মহিলাটি হচ্ছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর প্রৌঢ়টি ডিউক অব ওয়েলিংটন।

ভূমিকম্প

উমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

গত ১৫ই আগষ্ট আসামে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। তোমরা যারা রোজ খবরের কাগজ পড়ছো, এই ভূমিকম্পের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী নিশ্চয়ই তাদের গভীর ভাবে দোলা দিচ্ছে।

আমাদের সভ্য মানবের ইতিহাসে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় পৃথিবীর পাঁচটি ভীষণ ভূমিকম্পের অন্যতম এবং আসামের ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় ভীষণ। ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখের পর আসামে এতো বড়ো ভূকম্পন আর হয়নি।

তোমরা জানো, আমাদের পৃথিবী মুহূর্ত্তের জন্যেও নিশ্চল হয়ে নেই। শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই—সে আপনার কর্মাদিষ্ট কক্ষপথে অনবরত ঘুরছে, করছে সূর্য প্রদক্ষিণ, যার ফলে দিন-রাত্রি হচ্ছে, ঘটছে ঋতুতে বিচিত্র পরিবর্ত্তন। কিন্তু সে হলো প্রাকৃতিক ব্যাপার আর এ হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এর বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কতকগুলো। কোন সক্রিয় আগ্নেয়গিরির উৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সেই প্রবল বেগ ধারণ করতে না পেরে অনেক সময় থর-থরিয়ে কেঁপে ওঠে। প্রবল ভূকম্পনে এক মিনিটের মধ্যে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। ঘর বাড়ী পড়ে যায়, গাছপালা ভেঙ্গে যায়, কোথাও বা মাটি ফেটে পাতাল থেকে জল ওপরে উঠে আসে, কোথাও নদী বা সাগরের জলে বান ডাকে। কোথাও মাটী বসে যায় আবার কোন কোন স্থানের মাটি অনেক উঁচু হয়ে ওঠে। ভূমিকম্পের ফলে মানুষ ও জীব-জন্তু জলে ডুবে বা ঘর-বাড়ী চাপা পড়ে মারা যায়, সহর, নগর, গ্রাম, জনপদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। কোন কারণে কোন কোন স্থানের ভূভাগ বসে গেলেও ভূমিকম্প হতে পারে।

কিন্তু ভূমিকম্পের প্রধান কারণ অন্য রকম। পৃথিবীর উপরিভাগে মাটি এবং মাটির তলায় নানান রকমের শিলা ধাপে-ধাপে সাজানো আছে। কোন কারণে পৃথিবীর ভেতরের উত্তাপ কমে যেতে থাকলে ভূ-ত্বক্ কুঁকড়ে যায় এবং তার ফলে ঐ সব শিলা-স্তর কোন কোন স্থানে ভেঙ্গে যায়। সেই ভাঙ্গা স্তরের বড়ো-বড়ো অংশ খসে এদিক ওদিক সরে গেলে তখন ঐ সমস্ত স্থানের ভূমি কেঁপে ওঠে।

প্রাক্-বিজ্ঞান যুগে ভূমিকম্পকে একটা উপদেবতার ব্যাপার বলে মনে করা হতো। বাইবেল পুঁথিতে আমরা ভূমিকম্পের প্রথম লিখিত বিবরণ পাই। খৃষ্টজন্ম পূর্ব ৪৮৪-৪২৪ অব্দে হেরোডোটাসের লেখা এবং ৪৬৭ খৃষ্টপূর্ব অব্দে প্লিনীর লেখা পড়লে তোমরা জানতে পারবে ভূমিকম্প সম্পর্কে তৎকালীন লোকের কি বিচিত্র ধারণাই না ছিলো। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের পৃথিবীর তলায় কোন একটা জন্তু-জানোয়ার আছে সেই তার খেয়াল-খুশী মতো পৃথিবীকে নাড়িয়া দিয়া মজা করে। জাপানীরা মনে করে মাটির তলায় একটা ইয়া-বড়ো মাকড়শা আছে তার নাম 'বিসিন-মুসি'। সে যখন গা মোড়া দেয়, তখনই ভূমিকম্প হয়। মঙ্গোলিয়ানরা এবং সেলিবিস দ্বীপের বাসিন্দারা বলে, ভূমিকম্প মাটির তলাকার একটা শূয়রের কাণ্ড। উত্তর আমেরিকাবাসীরা ভূমিকম্পের দায়িত্ব চাপায় একটা কচ্ছপের ঘাড়ে। আমাদের ভারতীয় হিন্দুগণের মতে ভূমিকম্পের কারণ হচ্ছেন হাজার ফণাধারী শেষ নাগ; তিনি তাঁর ফণার ওপর বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ ক'রে আছেন। তিনি যখন এক ফণা থেকে আর এক ফণার ওপর পৃথিবীটা পালটে নিতে যান তখনই ভূমিকম্প হয়। মুসলমানদের মতে এটা একটা হাতীর কুকীর্তি।

আমাদের আধুনিক যুগের মানুষেরা নিজেদের সুসভ্য বলে গর্ব করি। আমরা ভূমিকম্পের পরিমাণ ও গতি নির্ণয় করবার জন্যে 'সাইসমোগ্রাফ' বলে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছি কিন্তু তা'হলেও আমরা আজো কখন ভূমিকম্প হবে তা স্থির করতে পারি নে। অনেক জীবজন্তু এ ব্যাপারে আমাদের ওপর টেক্কা দিয়েছে। তারা আগে থাকতেই ভূমিকম্প হবে বলে টের পেয়ে যায়। কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া এ সব জন্তু না কি অনেক সময় ভূমিকম্পের আগে অত্যন্ত অস্থিরতা দেখায়। 'কারাকাসের' বাসিন্দারা এই সমস্ত জন্তুকে দৈববাণী-কথক প্রাণী হিসেবে পালন করে থাকে। ১৮১২ সালে কারাকাসে যে ভূমিকম্প হয়, একটি স্পেনদেশীয় পাদ্রের ঘোড়া না কি আগে থাকতেই তা বুঝতে পেরে আস্তাবল থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ১৯০৬ সালে সানফ্রান্সিসকো ভূমিকম্পের আগের রাতে সেখানকার কুকুরগুলো না কি তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিয়েছিলো।

মহাবিদ্রোহী

শ্রীচুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্রোহী আমি, মহাবিদ্রোহী, নয়নে আমার অগ্নিশিখা,
ললাটে রয়েছে ভস্ম-বিভূতি, ধ্বংসের জয়টীকা।
ধূর্জটী আমি, কাল-বৈশাখী, হাতে মোর জয়ডঙ্কা,
ধ্বংসের গান গেয়ে অবিরাম জাগাই ভুবনে শঙ্কা।
চিরযৌবন মাতন আমার, আমি দেব মহারুদ্র,
আমি শঙ্কর প্রলয়ের হোতা; ধ্বংসের বীরভদ্র।
ধূলি-ধূসরিত তনুখানি মম, বাঘ-ছাল কটিবন্ধ;
প্রলয় আমার নৃত্যের তাল, ধ্বংস আমার ছন্দ।
নটরাজ আমি চির বিদ্রোহী, আমি চির চঞ্চল,
মহামরণের দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাসি আমি খল-খল।
ধূমকেতু আমি, উল্কা পতন, সৃষ্টির মহাত্রাস,
আকাশের বুকে ঝড়ের মাতন মোর অন্তর-উচ্ছ্বাস।
বিষধর নাগ মোর শিরোশোভা, আমি কালান্ত কাল,
কোটি ভাস্কর হার মানে লাজে নেহারিয়া মোর ভাল।
ধরণীর বিষ কণ্ঠে ধরিয়া আমি দেব নীলকণ্ঠ,
(আমি) চির দুর্বার কালের খেয়াল ন্যায়ের বজ্রদণ্ড।
ধ্বংস লইয়া যুগে যুগে আমি ধরার ধূলায় আসি,
চির পুরাতনে বিদায় করিয়া বাজাই নবীন বাঁশী।
ঘন তিমিরের আঁধার ভেদিয়া আমার দিগ্বিজয়,
চির প্রভাতের অরুণ উদয়ে আমার অভ্যুদয়।
অত্যাচারীর করলে পড়িয়া মাগিছে যাহারা ত্রাণ,
শত চেষ্টায় মেলে না যাদের বাঁচিবার সন্ধান;
আপনারে ভোলা চির বিস্মৃত ভালমানুষের দল,
এগিয়ে চলিতে জীবনের পথে যারা হীন-সম্বল;
তাদেরই লাগিয়া যুগে যুগে মোর রুদ্রের অভিযান,
চির বঞ্চিতে চির লাঞ্ছিতে দিতে মানুষের সম্মান।
(তাই) চির নির্ভীক, চির বিদ্রোহী, আমি চির দুর্জয়,
যুগে যুগে ধরা লভিয়াছে মোর শক্তির পরিচয়।

চিঠির কথা

আরতি রায়

পত্রলিখন সম্ভবতঃ সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বাধিক অনাড়ম্বর বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাছাড়া এ রকম অসংখ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁরা কেবল মাত্র পত্রলিখন চর্চা ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনও বিভাগে কোনও দিন হস্তক্ষেপ করেননি বা করবেনও না। সুতরাং পত্ররচনাকে সাহিত্যের নানা বিভাগের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত বলেও ধরা যায়। আধুনিক যুগে মহাকাব্য বা দর্শনের নবপ্রস্থান লেখকের সন্ধান মেলে খুব কমই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ নর নারী সারা জীবনে হয়তো কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখবার চেষ্টাও করেন না। কিন্তু চিঠি? চিঠি মাত্রেই যদি সাহিত্য পদবাচ্য হয়, তাহ'লে বর্তমান যুগে অক্ষর-পরিচয়-সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই সাহিত্যিক।

চিঠি লেখা ব্যাপারটা ব্যাপক অর্থে সামাজিক মেলা-মেশার অন্যতম অঙ্গ। ধরুন কোনও দোকান থেকে আমার কিছু জিনিষ-পত্র খরিদ করতে হবে; দোকানীর কাছে স্বয়ং না গিয়ে আমি আমার প্রস্তাব পত্র মারফৎ তাকে জানাতে পারি। কোনও প্রিয় বন্ধুকে দেখতে ইচ্ছা হ'ল অথচ দেখা করবার উপায় নেই; তখন তাকে চিঠি লিখি। এক শ্রেণীর চিঠি আছে যার কোনও বিশেষ বক্তব্য নেই। প্রিয় বন্ধুকে দেখে খুসী হয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করার মধ্যে যে নীরব আনন্দ আছে—এই শ্রেণীর চিঠিও সেই নীরব আনন্দ ও ঘনিষ্ঠতার প্রকাশ [illegible]

বলে না। গোড়ায় প্রিয়জনকে প্রীতি-সম্ভাষণ "প্রিয় অমুক" আর শেষে লেখকের নাম-স্বাক্ষর "একান্ত তোমারই অমুক" এইটুকুর মধ্যেই, এই সব চিঠির যা কিছু বলবার, লুকানো থাকে। বাকীটুকু যা লেখা হয় তা বাহুল্য মাত্র।

চিঠি সাহিত্যের অঙ্গ হলেও, তা রচনার ঠিক কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। পত্র-সাহিত্যের আর্টের সংজ্ঞা সঠিক ভাবে এখনও নিরূপিত হয়নি, কখনও হবে কি না সন্দেহ। সমাজে প্রধানতঃ পত্রের মাধ্যমেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ ঘটে থাকে। সুতরাং পত্র-সাহিত্যের ইতিহাস বলতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস বোঝায়। এ ইতিহাস সংকলন করা দুরূহ, এক হিসাবে অসম্ভব ব্যাপার, কেন না লিখনক্ষম সব মানুষের কাহিনীই এর অন্তর্গত।

জগতের স্বনামধন্য পত্র-লেখকদের পত্রগুলি পাঠ করবার সর্বাপেক্ষা বড় আনন্দ এই যে, তাতে আমরা তাঁদের সাহিত্যিক কৃতিত্ব অপেক্ষা তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় বেশী করে পাই। এ যেন সেই মানুষগুলির ছবি দেখা। অন্যান্য লিখিত গ্রন্থ, লেখকের ব্যক্তি-স্বরূপের আভাষ তেমন করে দেয় না। পত্রের মাধ্যমে মানুষ সাধারণতঃ আপন অন্তরকে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। ফলে পত্র-সাহিত্যে এমন একটি অন্তরঙ্গতার সুর লাগে, যা সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রে দুর্লভ। এর মধ্যে যুক্তি-তর্কের প্রাধান্য নেই, বক্তৃতার বাহুল্য নেই, উৎকর্ষ সাধনের কোনও সচেতন প্রয়াস নেই—উপস্থিত কেবল মাত্র লেখক স্বয়ং—তাঁর সর্বাবরণ-মুক্ত মনটিকে নিয়ে। এইখানেই পত্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, এইখানেই তার আকর্ষণ।

তা'বলে পত্র-সাহিত্যের সৃষ্টি মোটেই সহজ কাষ নয়। সাধারণতঃ মানুষ নানা মতবাদের কুজ্‌ঝটিকার আবরণে নিজেকে এমন ভাবে আচ্ছাদিত করে রাখে যে, তার মনের আসল ছবিটি দৃষ্টিগোচর করানোটা তার পক্ষে অতি কঠিন হয়ে পড়ে। মন্টেইন বা সামুয়েল পেপিসের মত সংবলীল আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা কয় জন লেখকের আছে? সাধারণ মানুষের প্রশ্ন ত ওঠেই না: কেন না সে আদর্শ তার ধরা ছোঁয়া অতীত। যুগোপযোগী পদ্ধতিতে পত্রে যতটা সম্ভব নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা ছাড়া এ ক্ষেত্রে তার অন্য কিছু করণীয় নেই। প্রত্যেক যুগে মানুষের মনোভাব প্রকাশের কতকগুলি চলতি নিয়ম থাকে। বিভিন্ন যুগের এই পদ্ধতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা আজ পর্যান্ত বিশেষ করা হয়নি। কিন্তু এ কাজে কেউ ব্রতী হলে আনন্দ পাবেন। সাহিত্যিক পদবাচ্য কোনও পত্রলেখকের পত্রের মধ্যে অবশ্য সব চেয়ে বড় আকর্ষণের বস্তু লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কিন্তু অতি সাধারণ লোকের, অত্যন্ত অযত্নপ্রসূত দ্রুত-লিখিত পত্রও অন্য কারণে মূল্যবান! লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় সেখানে না থাকলেও, যুগে যুগে নিয়ত পরিবর্তনশীল সামাজিক মেলা-মেশার রীতি-নীতির ধারাবাহিক ইতিহাসে এর স্থান আছে। কোনও একটি যুগের ও সমাজের এই বিশিষ্ট পরিচয়টি বহন করে বলেই তার মূল্য।

সাধারণতঃ পত্র, লেখকের পরিচিত অন্তরঙ্গমণ্ডলীর বিশেষ কোনও একটি মানুষের উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে। এর পাঠক বা শ্রোতা সংখ্যায় মাত্র এক জন। সুতরাং লেখকের বক্তব্যও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগ[ত] হওয়ার কথা। যে সংবাদ স্বচ্ছন্দে রয়টারের প্রতিনিধির কা[ছে] দেওয়া চলে বা যে কথা চড়া-গলায় জনসাধারণকে হেঁকে ব[লা] যায়, পত্রে তা একেবারেই অবান্তর। কোনও প্রকার "খোলা চিঠি তাই পত্র-সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। "জনসাধারণের উদ্দেশ্যে" "সরকারের উদ্দেশ্যে" লিখিত পত্রাবলী ইংরাজী সাহিত্যে Junius Letters বা গোল্ডস্মিথের "Letters from a Chinise Philosopher" প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এগুলিকে প্রব[ন্ধ] বা বক্তৃতা বলাই সঙ্গত। কোন ক্রমেই এদের পত্র আখ্যা দেওয়[া] চলে না। এক জনের পড়বার জন্যই পত্রের সৃষ্টি, তা সর্বসাধারণে[র] সম্পত্তি নয়। এই প্রসঙ্গে কবি কুপারের দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। তি[নি] যাঁদের উদ্দেশ্য করে পত্র লিখতেন, অনেক সময়ে তাঁদের অনুরো[ধ] জানাতেন, পড়া হয়ে গেলে চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলতে। যাঁকে লেখা—সেই এক জন পাঠ করলেই পত্রের সার্থকতা; তাঁর পাঠ-সমাপ্তির পরে পত্রের অস্তিত্বের কোনও মূল্যই নেই, এই ছিল কুপারে[র] মনোভাব।

বার্ণাড শ'য়ের জন্মদিনে

অরুণা মিত্র

দুর্দ্ধর্ষ কালের নির্দ্দেশ করে' অবহেলা
হে নির্ভীক, হাসিমুখে বিলায়েছ
নিজের সৃজনী,
বিশ্ব-দরবারে।
পারে নাই নির্ব্বাপিতে, তব অগ্নিবাণী,
শ্রেষ্ঠ-স্বর মুখোষ-পরা নিশাচরের দল;
ক্লান্তকণ্ঠ, সত্য বটে,
তবু, তুমি অচল অটল।
যবনিকার অন্তরালে ঘ'টে থাকে যা,
প্রকাশিছ দ্বিধাহীন মনে,
সত্যের সন্ধানে;
মুক্ত তরে
অক্টোপাশ সমাজের লোহার বাঁধন।
হে শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী!
আনিয়াছ যুগান্তর প্রতি মনে-মনে,
বর্ত্তিকা জ্বালিয়াছ এক নব প্রেরণায়,
যার রেখ প্রাতিভাত
সাগরের এপার ওপারে।
হে শান্তিকামী!
হে সৎস্রষ্টা;
হোক তব জয়
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
সারি বেঁধে চলুক সকলে,
অন্ধকার পিছে রেখে ঠেলে,
নূতনের আকুল সন্ধানে।
তুমি ছড়ায়েছ বাণী
পূর্ণতার ভার—এখন আমাদের 'পরে।

অস্ত্রোপচার

সুনীলকুমার রায়

আর্ত চীৎকারে মুখর হয়ে উঠল গিনিপিগটা। রুদ্ধদ্বার ঘরের ভেতর আর্তনাদ পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। পূর্ব-দক্ষিণের আধ-খোলা শার্সির ফাঁক দিয়ে আসা মধ্যাহ্ন-সূর্যের একটি রৌদ্র-ঝলকই শুধু গিনিপিগের এই ব্যথাতুর ক্রন্দনের সাক্ষ্য রইল।

অরুণ ডাক্তার শাণিত-ফলা অপারেশন-ছুরিখানা আমূল বসিয়ে দিয়েছে দুগ্ধ-শুভ্র গিনিপিগটার কচি কোমল হৃৎপিণ্ডে। ঝলক-ঝলক রাঙা রক্তের ধারায় রোমশ দেহটা টকটকে লাল হয়ে উঠ্‌ল। টানা-টানা নিশ্বাসগুলো ক্রমেই মন্থর আর প্রেতায়িত হয়ে উঠ্‌ছে। থাবাগুলো কিছু একটা ধরবার প্রত্যাশায় যেন আকুপাকু করে উঠল কয়েক বার। গোটা শরীরটা তার থির্‌থির্‌ করে কেঁপে উঠ্‌ল। দু'টো হেঁচকি তুলে একেবারে স্থির হয়ে গেল প্রাণটা। সব শেষ!

ছুরি-কাঁচিগুলো বাগিয়ে ধরে ডাক্তার। গিনিপিগটার হার্ট থেকে এইবার একটা স্লাইস্‌ কেটে নিতে হবে। কিন্তু,—রক্তের ঝলক এসে কেবলই অস্পষ্ট করে দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডের নিখুঁত অবস্থিতি। বড় একটা স্পঞ্জের টুক্‌রো নিয়ে বার কয়েক সন্তর্পণে গিনিপিগের বুকের উপর চেপে ধরল অরুণ ডাক্তার। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ রক্ত বন্ধ হল না। বিরক্তিতে কাঁধের পেশী দু'টোকে ঝাঁকিয়ে ওঠে ডাক্তার, বাপস্‌, এত রক্তও আছে এই এতটুকু একটা গিনিপিগের শরীরে!

বাঁ হাতে বড় একটা সিরিঞ্জ টেনে নেয় অরুণ রায়। তার পর আস্তে আস্তে প্রায় তিন সিরিঞ্জ রক্ত পাম্প করে নিল সদ্যমৃত গিনিপিগটার দেহ থেকে।

এবারে হৃৎপিণ্ড থেকে একটা প্রমাণসই স্লাইস্‌ কেটে নেয় ডাক্তার। তার পর টুক্‌রোটাকে একটা কাচের স্লাইডে চড়িয়ে মাইক্রোস্কোপের ষ্ট্যাণ্ড-এর উপর টেনে নিল অরুণ।

বড় স্ক্রুটাকে ঘুরিয়ে আই-পীসের উপর চোখ রাখল সে। অণুবীক্ষণের ম্যাগনিফিকেসন্‌ ডায়ালের উপর গিনিপিগের কর্তিত বক্ষের অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠছে। ফাইন-স্ক্রুটিকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকে অরুণ ডাক্তার। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ছে স্লাইসটার গঠন-বৈচিত্র্য। ডাক্তারের চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

তীব্র জিজ্ঞাসা চক্‌চক্‌ করে ফুটে উঠ্‌ল ডাক্তারের কালো চোখের তারায়-তারায়। ডায়ালের বুকে দেখা দিয়েছে অসংখ্য জীবকোষ—প্রোটোপ্লাজ্‌ম, ন্যুক্লিয়স আর ন্যুক্লিওপ্লাজ্‌মের গ্রন্থিল ঘূর্ণিজাল···

ল্যাবোরেটারির বারান্দায় এসে দাঁড়ায় অরুণ ডাক্তার। ধূসর দ্বিপ্রহর। তীক্ষ্ণ সাদা রৌদ্রের ঝলকানি মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পিচঢালা রাস্তার উপর এসে পড়ে দিবা-সূর্যের আরক্ত ভ্রূকুটি। পিংগল আকাশটাকে মনে হয় একটা 'কিয়ারস্কুরো', ধূপছায়া রঙে রঙীন একটা ল্যাণ্ডস্কেপের মত। র‍্যাফায়েল কিংবা ভ্যান্‌ ঘোঘের চাইতেও কোন বড় শিল্পীর তুলির টানে প্রমূর্ত!

বারান্দার সিলিঙে দু'টো পায়রা ডানা ঝটপট করে উঠল। আনমনে সেদিকে চোখ তুলে তাকায় অরুণ।···চমৎকার! চঞ্চু-চুম্বনে পারাবত-দম্পতি এই খর দুপুরের সাদা আলোতেও প্রণয়চর্চায় প্রবৃত্ত। মৃদু হাসি ফুটে ওঠে ডাক্তারের অধরে আর ওষ্ঠে।

···শর্মিলা? শর্মিলা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক চটে আছে!

রেলিঙের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে রৌদ্র-ভরা পথের দিকে তাকায় অরুণ।···শর্মিলা কেন যে এমন হয়ে গেল! সনিশ্বাসে এক থাটা না ভেবে পারে না ডাক্তার। প্যাথোলজির এক্স্‌পেরিমেণ্টের নামে ওর দারুণ ভয়, বিজাতীয় একটা বিতৃষ্ণা। ওর ধারণা, জীবন্ত প্রাণীগুলোকে প্যাথোলজির গবেষণার নামে যে ভাবে দিনের পর দিন সে হত্যা করে চলেছে, তাতে করে অরুণের পাপের ভারা এত দিনে নিশ্চয়ই টইটম্বুর হয়ে উঠেছে!

অর্থহীন সেণ্টিমেণ্ট! কোন মানে হয় না এর। শর্মিলা কেন বোঝে না যে, দু'টো গিনিপিগ আর পাঁচটা খরগোসের চাইতে একটা মানুষের প্রাণের দাম অনেক—অনেক বেশী! অরুণের নাকের ডগাটা কুঁচকে ওঠে। যে ইঞ্জেক্‌সনটা সে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে, সেটা তৈরী করতে পারলে কি মানুষের একটা বড় রকমের উপকার হবে না? য়ুইল্‌ দ্যাট্‌ নট্‌ হীল্‌ হিউম্যানিটি?

কিন্তু শর্মিলা তা বুঝবে না কিছুতেই। কিছুতেই না। বাঙালিনীর সেই চিরন্তন ভাবপ্রবণতা। গিনিপিগের দুঃখেই অশ্রু-সজল হয়ে উঠল শর্মিলা! অ্যাবসার্ড। কোন মানে হয় না এর।

অথচ আশ্চর্য! বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিল শর্মিলা। শুধু তা-ই নয়, মেডিসিনের ছাত্রী ছিল সে। আক্ষেপে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অরুণ ডাক্তার! মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্ট হয়ে এই ধরণের ন্যাকামোর কোন অর্থ হয় না কি শর্মিলার? কোন অর্থ হয় না!

অথচ—অথচ মেডিক্যাল কলেজের সংগ-নিবিড় দিনগুলোতে যে প্রতিজ্ঞা তারা গ্রহণ করেছিল তা হারিয়ে গেল কোথায়? ব্ল্যাড্‌ ব্যাংকের ছায়া-ভরা সিঁড়ির পথে, ইডেনের অলিন্দে আর অংগনে যে প্রতিশ্রুতি গড়ে উঠেছিল তা-ও কি হল উধাও?

হারিয়ে-যাওয়া সেই সব দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকে অরুণ ডাক্তার। না ভেবে সে পারে না।

সামনের ঐ রৌদ্রসিক্ত পিচঢালা পথের মতই ঝকমকে মেয়ে ছিল শর্মিলা সেন। কেমন করে আর কোন্‌ লগ্নে ওর সংগে পরিচিত হয়েছিল অরুণ, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। কিন্তু এ কথা আজও কোন মতে অস্বীকার করতে পারে না ডাক্তার যে, ঐ টয়লেট আর ক্রীম-পাউডারে এনামেল-করা মুখশ্রীর পিছনে ছিল যে সুপ্ত কুমারী মন, তাকে প্রথম পরশ করেছিল সেই-ই! স্মিত হাসির রেখায় আরক্ত হয়ে ওঠে ডাক্তারের অধরোষ্ঠ। সেদিনের রৌদ্র-ঝলকে কি আজকের চাইতে বেশী দীপ্তি ছিল? ছিল বেশী চমক?···হয়ত ছিল না। কিন্তু—কিন্তু তবু কত বেশী আতসী উজ্জ্বল ছিল সেই দিনগুলো, ছিল কত বেশী 'আলট্রা ভায়োলেণ্ড্‌'! প্রভাতী সূর্য দেখেছে অরুণ, দেখেছে অলক্ত-রাঙা সন্ধ্যার সিন্দুর-স্পন্দন। তেমনই একটা মধুর আলোক সম্প্রপাতে হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওঠেনি কি তাদের দিন আর রাত্রি, সময়ের অমন্থর মধুর মুহূর্তগুলি? সত্যি, প্রিজ্‌মে বিশ্লিষ্ট বর্ণালীর মতই অনুরাগের ইংগিত কত সুন্দর হয়েই না ফুটে উঠত শর্মিলার টলটলে আঁখির কোণে-কোণে! কত দ্রুত হল ওদের মন-জানাজানির পালা!

কিন্তু এই যে প্রণয়, যাকে ওরা পরিণয়ের বাঁধনে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার পিছনে ছিল না কি একটা ইডিওলজির অংগীকার? ছিল না আদর্শবাদের এক দৃঢ় প্রতিশ্রুতি?···কত বার—কত বার ওরা অভিধ্যা গ্রহণ করেছে যুগ্ম প্রচেষ্টায় জীবনভোর তারা করবে মেডিসিনের চর্চা, ডাক্তারী গবেষণায় ঢেলে দেবে নিজেদের সকল

পরিশ্রম। রোগজীর্ণ মানবতার শুশ্রূষার প্রতিশ্রুতিই কি সেদিন গ্রহণ করেনি তারা, গ্রহণ করেনি তাদের গোটা অন্তর দিয়ে ?

তিক্ত হয়ে ওঠে অরুণের মন। কিন্তু শর্মিলা যে ছাড়া পেতে চাইছে! হায় রে, সেই ইডিওলজি কি এত শীঘ্র তার মূল্য হারালো শর্মিলার কাছে!

কিন্তু কেন এই এস্‌কেপিজম শর্মিলার ? এই পলায়ন-প্রবণতা ? মা হতে চলেছে শর্মিলা, তাই কি এত হালকা হয়ে গেল সে, এত তরল-মতি ?

এ কথা স্বীকার করতে দুঃখ হয় অরুণের। এমনি করে সাধারণ সাংসারিকতার মধ্যে ঘটবে ওর আত্মবিলোপ! মা হবার অলস স্বপ্নেই হারিয়ে যাবে বিজ্ঞানী শর্মিলা, সাল ফরটি-ফাইভের মেডিক্যাল স্কলার ?

কিন্তু এ কথাটা অস্বীকার করবার মত সুযোগ রাখল কই শর্মিলা! প্যাথোলজির এই এক্‌সপেরিমেন্টটা শুরু করবার পর থেকে ল্যাবরেটরিতে আসাই ছেড়ে দিয়েছে সে। ভুলেও আর সে এ পথ মাড়ায় না।···দিনের পর দিন সাদা চোখে জল্লাদের কারিকুরি দেখবার মত বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি না কি তার নেই!

জল্লাদ! হাসি পায় অরুণের। রবার্ট কক্‌ আর অ্যাসফের মত লোকপূজ্য প্যাথোলজিষ্টদেরও কি তাহলে হত্যাকারীর কাঠগড়ায় তুলতে চায় শর্মিলা ? সবাইকেই করতে চায় ফাঁসীর আসামী ?··· এ জোলো দার্শনিকতার মূল কোথায় ওর ? ফিলসফি না মেডিসিন, কিসের ছাত্রী ছিল ও ?—সত্যিই আজ সন্দেহ জাগে অরুণের।

অবশ্য, প্যাথোলজি ত দূরের কথা, সার্জারিটাকেই কোন দিন সুনজরে দেখেনি শর্মি! পিওর মেডিসিনেই ওর প্রবণতা বেশী। কিন্তু তাই বলে এগুলোকে কি একেবারে বরবাদ করে দিতে হবে! ডাক্তারী ট্রিটমেন্টকে কি ও 'বিনা কাটা-ছেঁড়ায় ভগন্দরের চিকিৎসা' করে তুলতে চায় না কি!

রাস্তার ওপাশে মিত্তির-বাড়ীর লনে শন্‌শন্‌ করে করোষ্ণ বাতাস বইছে পাম আর অর্কিডের পাতায়-পাতায়। ওদের বাড়ী থেকেই ভেসে এল একটা গানের সুর। রেডিওর চাবি খুলে দিয়েছে কে যেন।

দীর্ঘ একটা প্রশ্বাস ছাড়ে অরুণ। এমন করে আর ত চল্‌তে পারে না। চলা উচিতও নয় আর। শর্মিলার সংগে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। শুধু মা হওয়াতেই কি সব শেষ হয়ে যাবে শর্মিলার, বিজ্ঞানী শর্মিলার চরম সার্থকতা কি শুধু সেইখানেই! শর্মিলার গর্ভে আজ সন্তান এসেছে বলে তার জীবন-সাধনাকেই সে করবে অস্বীকার ? কই, তা ত করেননি মাদাম কুরী বা বেলজা ক্লিথের মত জননীরা!···না, শর্মিলাকে এ ভাবে ফুরিয়ে যেতে দেবে না সে।

ল্যাবোরেটরির দিকে পা বাড়ায় অরুণ। ল্যাবোরেটরির টেবিল-চেয়ারগুলো ঝাড়ছিল বেয়ারা রামকিবিত। বাঁকা হাসির রেখায় বর্তুল হয়ে ওঠে অরুণের অধরোষ্ঠের দক্ষিণ কোণটি।···এদিকে এখনও দৃষ্টি আছে শর্মিলার ? গৃহকর্ত্রীর নির্দেশ না থাকলে ল্যাবোরেটরির তদারক করবে রামু বেয়ারা, এত কর্তব্যনিষ্ঠ সে কোন কালেই নয়। ভাল করেই তা জানে ডাক্তার।

রামুকে বলে অরুণ, 'মাইজিকো বোলাও রামু।'

'কাঁহা-পর বোলায়গা হুজুর ?' ঈষৎ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে রামকিরিত।

ইংগিতটা সুস্পষ্ট। ল্যাবোরেটরিতে যে আজকাল আর আসে না শর্মিলা, এ কথাটা অজানা নয় আজ ঐ রামু বেয়ারাটার কাছেও। অরুণের কানের পাশ দু'টো আতপ্ত হয়ে ওঠে। কর্কশ কণ্ঠে বলে সে, 'ইহাঁ। লাব্রোটারীমে।'

'জী হুজুর।' পালিয়ে যাবার ভংগীটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর দ্রুত অপসৃয়মান পদপাতে।

খাঁচার মধ্যে ডানা ঝটপট্‌ করে ওঠে টিয়া পাখীগুলো। বন্দী-জীবন ওদের বোধ হয় আর ভাল লাগছে না। কিন্তু মুক্তি ত ওদের প্রত্যাসন্ন। অরুণ ডাক্তারের অপারেশন ছুরিকার তীক্ষ্ণ ফলামুখে ঘটবে ওদের চরমতম মুক্তি। হাসির আমেজ ফুটে ওঠে অরুণের ঠোঁটে-ঠোঁটে।

কুঁৎকুঁৎ করে চাইছে গিনিপিগ দু'টো। এই ত কাল পর্যন্তও ওরা ছিল তিনটি। তাদের একটি আজ কোথায় হারিয়ে গেল, সে কথাই ভাবছে না কি ঐ প্রাণী দু'টো ?

আজকের এক্‌সপেরিমেন্ট-চার্টটায় চোখ বোলাতে থাকে অরুণ ডাক্তার।

ঘরে ঢোকে শর্মিলা। বলে, 'ডেকেছ আমায় ?'

মুখ তুলে তাকাল অরুণ। কিন্তু চোখ তুলতেই যে জিনিষটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর কাছে, সে হল শর্মিলার সুন্দর মুখে বিদ্রোহের নির্ভুল সংকেত। সহযোগিতা না করবার মনোবৃত্তি নিয়ে যেন প্রস্তুত হয়েই এসেছে সে। মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে অরুণের মন।

কিন্তু আরও একটা জিনিষ এড়াল না অরুণের দৃষ্টি। হঠাৎ যেন বড় বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছে শর্মিলা, হয়ে উঠেছে অনেক বেশী পৃবস্তু। ফলভারনম্রা রসালের মতই আসন্ন মাতৃত্বের দাক্ষিণ্যে টলটলে হয়ে উঠেছে ওর তনু-দেহের কূল-উপকূল। অরুণের তপ্ত দৃষ্টি যেন আপনা থেকেই কোমল হয়ে আস্‌তে চায়।

কিন্তু না,—তর্কের সংকেতে আবার রূঢ় হয়ে ওঠে ওর চোখের চাউনি। শর্মিলাকে আজ কনভার্ট করতেই হবে, ফিরিয়ে আন্‌তে হবে ওকে ওর পূর্ব-প্রবৃত্তিতে।

'ল্যাবোরেটরিতে আসা তুমি যে একেবারে ছেড়েই দিলে শর্মিলা ?' অরুণের কথায় বিদ্রূপের ইংগিতটা ঢাকা থাকে না। 'এর কারণটা জানতে পারি কি ?'

'কারণটা তোমার অজানা নয়।' শর্মিলার উত্তর দেবার ভংগীটা বড় বেশী ঋজু বলে মনে হয়। 'তোমার মত কসাইয়ের চোখ দিয়ে ডাক্তারী বিদ্যাটাকে বিচার করতে শিখিনি আমি। তোমার ল্যাবোরেটরিতে বসে তুমি যত খুসী গিনিপিগ কোতল করতে পার, আমি একটি কথাও কইতে আসব না। শুধু আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া না করলেই খুশী হব।' শেষের দিকে গলাটা যেন একটু কেঁপে যায় শর্মিলার, বুঝি বা একটু অভিমানের রেশও বেজে ওঠে তাতে।

'হুঃ।' অরুণের কণ্ঠ কিন্তু তেমনিই তির্যক, তেমনই ইংগিতার্থক। বরং আরও একটু বেশী তিক্ত। 'এত শীঘ্র ফেড আপ হয়ে গেলে শর্মিলা ? কিন্তু তা-ই যদি হবে, তবে মিথ্যে একটা ইডিওলজির ফাঁদ পেতে আমাকে ঠকাবার কি প্রয়োজন ছিল তোমার ?' উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অরুণ। অপারেশন-নাইফের মতই ধারালো হয়ে উঠল ওর বাচনভংগী। 'নিছক ঘরকন্নাতেই যদি তোমার মতি, যদি শুধু ম্যাডোনা হবার সাধই ছিল তোমার, তাহলে আমাকে শিকার করে অত্যন্ত ভুল করেছ তুমি।'

ক্ষেপে গেল না কি অরুণ ? তা না হলে শর্মিলাকে এই কঠিন আঘাত হান্‌ল ও কেমন করে ? এত দিনের মধুর পরিচয়কে এক মুহূর্তে অস্বীকার করতে চায় না কি ডাক্তার ?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বুজে আস্‌তে চায় শর্মিলার কণ্ঠ। 'এ সব কি বলছ তুমি ?'

'ঠিকই বলছি। জোলো ঘরকন্না পাতবার মীন্‌স হিসাবে আমাকে আর ব্যবহার করতে পারবে না তুমি !'

আরও কত সইবে শর্মিলা ? ব্যথাভরা চোখ তুলে চাইল সে। এম্‌নি করে তাকে ভুল বুঝল অরুণ ! উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে অরুণকে বোঝাতে চায় সে। 'আচ্ছা, এমন করে অবোধ প্রাণীগুলোকে হত্যা করতে কি একটুও হাত কাঁপে না তোমার ? তোমার সন্তানের মংগলের কথাও কি ভাববে না তুমি ? মুমূর্ষু প্রাণীগুলোর অভিশাপ কি লাগবে না তোমার সন্তানের গায়ে ?'

'সন্তানের মমতা ! আই কেয়ার এ ফিগ ফর দ্যাট্‌ !' অরুণের কণ্ঠ বিষাক্ত আর ঈর্ষাতুর হয়ে ওঠে। 'আমি বুঝতে পেরেছি তোমার পেল্‌ভিস্‌-এর ঐ শিশুটাই যত নষ্টের মূল ! আমার এক-এক সময় কি ইচ্ছে করে জানো শর্মিলা ! ইচ্ছে করে অপারেশন করে ঐ মাংসপিণ্ডটার মমতা থেকে তোমাকে চিরদিনের মত মুক্ত করে দিই !'

যেন চাবুক খেয়ে চম্‌কে চায় শর্মিলা। ওর চোখের চাউনি দেখে এবার-ভয় পেয়ে যায় অরুণ। শাবকহারা বিড়ালীর হিংস্র দৃষ্টি ওর দুই চোখে ! খেয়াল হয় কতখানি পাশবিক আঘাত ও করেছে শর্মিলাকে।

কিন্তু ততক্ষণে আহতা ফণিনীর মত ঝিঁকিয়ে উঠেছে শর্মিলা। 'ব্রূট্‌ ! তোমার অপমানের শেষ দেখতে চাই আমি ! দেখি কতখানি আঘাত আমাকে করতে পারো তুমি !'

উৎক্ষিপ্তার মত ছুটে গিয়ে খাঁচা থেকে টিয়া পাখীগুলোকে উড়িয়ে দেয় সে। গিনিপিগের খাঁচার দরজা দেয় খুলে। এক্‌সপেরিমেণ্ট টেবিলের উপর এবার চোখ পড়ে তার। অপারেশন ট্রে টাকে দু'হাতে তুলে ছুঁড়ে দেয় শর্মিলা। ছুরি-কাঁচিগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে ছড়িয়ে পড়ে চারি দিকে।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখতে থাকে অরুণ। এ কি করছে শর্মিলা ? পাগল হয়ে গেল না কি ও !

কিন্তু শর্মিলা ততক্ষণে হাত বাড়িয়েছে এক্‌সপেরিমেণ্ট-চার্টগুলোর দিকে। অরুণের এত দিনের গবেষণার ফল। ওগুলোও নষ্ট করবে না কি ও ? হঠাৎ যেন একটা আশংকা আর আক্রোশে উদগ্র হয়ে ওঠে অরুণ। ছুটে গিয়ে এক্‌সপেরিমেণ্ট-টেবিলের কাছ থেকে এক ধাক্কায় শর্মিলাকে সরিয়ে দেয় সে। অস্ফুট একটা আর্তনাদের সংগে ছিটকে পড়ে শর্মিলা।

কিন্তু পরক্ষণেই শর্মিলার দিকে দৃষ্টি পড়তে আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে ডাক্তার। রক্ত—টল্‌টলে রাঙা রক্তে ভিজে উঠেছে শর্মিলা। বুঝতে কিছুই বাকি থাকে না ডাক্তারের। প্রেগন্যাণ্ট ছিল শর্মিলা। অরুণেরই নিষ্ঠুর ধাক্কায় ঘটেছে এই আকস্মিক বিপদপাত ! এই মারাত্মক মিস্‌ক্যারেজ !

কিন্তু—কিন্তু—অরুণ এখন কি করবে ! উঃ ভগবান, এ কি করল সে ! আক্ষেপ আর অনুশোচনায় ভিজে উঠতে চায় ওর দু'টো চোখ। শর্মিলার এত দিনকার প্রণয়ের এম্‌নি করেই প্রতিদান দেবে না কি অরুণ ?

কিন্তু শর্মিলাকে ত বাঁচাতেই হবে। এমনি করে অরুণকে ভুল বুঝে যেতে পাবে না শর্মিলা !···ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নেয় অরুণ। 'বড়বাজার, ফাইভ জিরো সেভেন জিরো ?' মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার সান্যালকে ফোন করে দেয় সে। সান্যাল আসুক, একা একা আর হাত উঠছে না অরুণের।

কিন্তু এ কি করল সে ! শর্মিলার কাছে গিয়ে হঠাৎ ছেলে-মানুষের মতই কেঁদে ফেলে অরুণ ডাক্তার। 'ভুল বুঝো না, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না শর্মি···'

ইডেন হস্‌পিট্যালের অপারেশন থিয়েটার। বন্ধ দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অরুণ ডাক্তার। দু'চোখ ভরা ওর আশংকা আর উদ্বেগ। পাংশু মুখে অনুশোচনার করুণ প্রতিভাস।···শর্মিলাকে অপারেশন করছে ওরা। কিন্তু বাঁচবে ত, বাঁচবে ত শর্মিলা ?

থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে অরুণের ওষ্ঠাধর। 'তোমাকে বেঁচে উঠতেই হবে শর্মিলা !'···শর্মিলাকে জানাতেই হবে যে অরুণের ভালবাসায় ঘুণ ধরেনি আজও··· ···

পাঁচ মিনিট···পনেরো মিনিট···আধ ঘণ্টা ! বড় বিলম্বিত তালে চলে সময়। উদ্বেগ-ব্যাকুলতায় স্তব্ধ সময়ের সুমন্থর পদপাত।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন ডাক্তার সান্যাল। সান্যালের দু'টি হাত আশংকার আবেগে জড়িয়ে ধরে অরুণ রায়। 'কেমন আছে শর্মিলা ?···কথা বলছ না কেন সান্যাল ? অপারেশন সাক্‌সেসফুল হয়েছে ত ?'

'অপারেশন ফেইল করল ভাই। ইউটিনাস্‌ র‍্যাপ,চারটা এত জটিল হয়ে পড়েছিল যে, হাঁচ, করে আর কিছুই করবার ছিল না।' অরুণের অপারেশন-নাইফের চাইতে কম ধারালো, কম শাণিত নয় সান্যালের কথাগুলো। 'এই মাত্র এক্‌সপায়ার করলেন বৌদি। কিন্তু তুমি অত উতলা হোয়ো না রায়···'

না, উতলা হবে কেন অরুণ ! সে-ই ত শেষ করে দিয়েছে শর্মিলাকে ! অরুণের অপারেশন-নাইফের তীক্ষ্ণ ফলা-মুখেই প্রাণ দিয়ে গেল না কি শর্মিলা ?

একটা ব্যথার পিণ্ড যেন দলা পাকিয়ে উঠল অরুণের কণ্ঠ-নালীর কূলে-কূলে। সজোরে দরজাটাকে ঠেলে একেবারে অপারেশন টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল সে।

সাদা চাদরের আড়ালে ঐ ত লুকিয়ে আছে শর্মিলা। কিন্তু ওটা শুধুই একটা দেহ। প্রাণ নেই, ওতে আর প্রাণ নেই ! আর কোন দিন কথা কইবে না শর্মিলা, অরুণের সংগে মতের অমিলও হবে না আর কোন দিন।

অস্ফুট আর্তস্বরে হঠাৎ চাদরটাকে তুলে ফেলে অরুণ ! শেষ বারের মত ও একবার দেখে নেবে না শর্মিলাকে ?

কিন্তু পরক্ষণেই যেন ভূতগ্রস্তের মত দু'পা পিছিয়ে আসে অরুণ ডাক্তার। শর্মিলার উন্মুক্ত মৃত্যুহিম দুই চোখে ও কিসের দৃষ্টি ? এ দৃষ্টি দেখেছে অরুণ ! দেখেছে আজই সকালে অপারেশনের পর নিহত সেই গিনিপিগটার ছোট্ট দু'টো চোখের তারায়। যেন শিউরে ওঠে অরুণ ডাক্তার। ঠিক তেমনই চাউনি আজ ধরা দিয়েছে শর্মিলার ওই দু'টো নিস্পন্দ চোখের তারায়। তেমনই মৃত্যুহিম নিথর বোবা দৃষ্টি !

হোমশিখা

রেখা মজুমদার

ছোট পাহাড়ী নদী ডিলি খরস্রোতে বয়ে চলেছে। কোন্ পাহাড়ের শিখর হতে তার জন্ম তা কারো জানা নাই—জানবার জন্যে কারো ব্যগ্রতাও নেই। শুধু মানুষ দেখে তার গতির বিভিন্নতা, তার চঞ্চলতা, আকুলতা আর উচ্ছাস-ভরা ধ্বনি। কখনো কল-কল শব্দে নদীর তীর ভরিয়ে দিয়ে সে নিজেকে ভরিয়ে তোলে আকুল উচ্ছাসে। সামাল সামাল পড়ে যায় চার দিকে। আবার কখনো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সে অতি ধীরে বয়ে চলে তার তখনকার অতি শান্ত নির্লিপ্ত বিষাদ-ভরা রূপে। এই নদী থেকে একটু দূরেই অনিমেষের বাংলো। খোদ গভর্মেন্টের বনবিভাগের বড় অফিসার সে। অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন মেধাবী তরুণ অফিসার। আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় সে ভরপূর। সুন্দর ছোট বাংলোটি, সামনেই ফুল-বাগান। বিলাতী মরসুমী ফুলের সারির মধ্য দিয়ে ছোট এক ফালি রাস্তা চলে গেছে বাংলোর দিকে। বাবুর্চি বেয়ারা তকমাধারী দরওয়ান বাংলোর শোভাবর্দ্ধন করছে। তবু অনিমেষ একা। তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী কর্ম্মজীবন।

ডিলি নদীর অপর পারে হিমঝোরা চা-বাগান। আগে যেখানে ছিল শুধু সবুজ জঙ্গল। বাঘের ডাকে নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশ গম্‌গম্ করতো। বুনো জাতি তার দলবল নিয়ে নেমে আসতো পাহাড়ী নদীর বুকে। কোনো মানুষের অস্তিত্বও তাদের ছিল অজানা। আজই এই বিজ্ঞানের যুগে সেখানেই গড়ে উঠেছে এই হিমঝোরা বাগান, যন্ত্র-দানবের প্রতাপে প্রকৃতির আত্মবলিদানে এই নূতন সৃষ্টি। অতীতের চা-বাগানের সাথে বর্ত্তমান চা-বাগানের প্রভেদ অনেক। ম্যানেজারের অন্যায় অত্যাচার-জর্জ্জরিত কুলির রক্ত-নিংড়ানো চায়ের স্বাদ এখন আর চা-পিপাসুদের পেতে হয় না। অনুভব করতে হয় না তাদের বুকভরা হাহাকার ধ্বনি। কুলিরাও এখন তাদের দাবী বুঝে নিতে শিখেছে। জানতে পেরেছে তারাও বাগানের অপরিহার্য্য প্রধান অধ্যায়। তাদের অবর্ত্তমানে বাগান শুধু অচল নয় অতলে তলিয়ে যাবে। বুঝতে শিখেছে, সাধ্য নেই ম্যানেজার ডিরেক্টার বা বাবুদের তারা ভিন্ন এক পা এগোবার। সুতরাং ভয় তারাই করবে না, তাদেরও করতে হবে। তারা এখন কুলী নয়, মজদুর শ্রমিক—শ্রমের উপযুক্ত মূল্য বুঝে নিতে তারা পিছ-পা নয়।

হিমঝোরা বাগানের ম্যানেজার রঞ্জিত রায়। বয়সে একেবারে তরুণ না হলেও প্রবীণ নয়। তারুণ্যে জোয়ার না থাকলেও ভাঁটা পড়তে এখনো দেরী আছে। বাইরে অতি কড়া রাসভারী লোক। কেমন যেনো সব-কিছুতেই বেপোরোয়া ভাব। কিন্তু অন্তরে তিনি শিশুর মতন কোমল, সহজ এবং সুন্দর। বিশেষতঃ তাঁর সকল ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য গাম্ভীর্য্যকে হারিয়ে ফেলেন সুন্দরী পত্নী রত্নার কাছে। ম্যানেজারের বিরাট বাংলোতে বাস করেন তিনটি প্রাণী—রঞ্জিত রায়, পত্নী রত্না, ভগিনী রীতি। রঞ্জিত রায় প্রায় সব সময়ই ব্যস্ত থাকেন বাগানের কাজে। তিনি এই অচল বাগানটিকে সচল করে তুলেছেন তাঁর কর্ম্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং অধ্যবসায়ের জোরে। তাই তাঁর প্রভাব সারা বাগানের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে গভীর ভাবে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে না বলেই তাঁর শক্তির ওপর এত আস্থা। কুলীরা তাকে শুধু ভয়ই করে না, ভালবাসে অন্তর দিয়ে। পত্নী রত্নার দিন কাটে বিরাট বাংলোর তদারকে, ঝাড়া-পোঁছা, বেয়ারা-বাবুর্চ্চিদের কর্ম্মসূচির পরিচ্ছন্নতা এবং দক্ষতার হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে বাকীটুকু সুসজ্জিত ফুল-বাগিচার নবতম রূপ বিধানের চেষ্টায়। শান্তস্বভাবা তরুণী রীতির সময় কাটে সত্তলব্ধ তরুণ লেখকদের নভেলের মধ্য দিয়ে, কখনো বা অকারণে এ-ঘর ও-ঘর আনাগোনায়, বাকীটুকু তার অতি প্রিয় সেতারের সুরসাধনায়।

শরতের এক মধুর অপরাহ্ণ। ম্যানেজার সাহেব তাঁর বাংলোর সবুজ লনটির ভিতর পায়চারী করছেন আনমনে। কতকগুলি জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় তিনি চিন্তাকুল। বাগান অপর্য্যাপ্ত চা-পাতায় ভরে উঠেছে। অথচ সেই পরিমাণে কুলী সংগ্রহ হয়ে উঠছে না। পেরে উঠছে না কুলীরা সামাল দিতে, পাতার ভারে তারা নুয়ে পড়ছে। ম্যানেজারের নির্দ্দেশে কুলীদের কর্ম্মসূচীর তালিকা পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। কিন্তু তারা জানাচ্ছে—তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এত সকালে কাজে বের হওয়া—অসম্ভব তাদের পক্ষে সাঁঝের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাজ করা। শরীরের তাগদকে নিঃশেষ করে দিয়ে রূপিয়া সংগ্রহে তারা রাজী নয়। ম্যানেজারের কানে তাদের অসন্তোষের রেশ আজ কিছুটা ভেসে এসেছে। তাই তিনি আজ এত চিন্তাকুল। বৈকালিক আহার্য্যের প্লেট এবং চা নিয়ে এলো বেয়ারা। পিছনে পত্নী রত্না। রত্না স্বামীর চিন্তাকুল ভঙ্গি দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো, পরে প্রশ্ন করলো—"তোমার আজ কি হয়েছে—এত ভাবছো কেন?" রঞ্জিত রায় উত্তর দিলেন, "কতকগুলো জটিল ব্যাপার নিয়ে বড্ড চিন্তিত হয়ে পড়েছি।" তার পর তারা দু'জনে দু'টি বেতের চেয়ারে গিয়ে বসলো। রত্না চা তৈরী করতে করতে বললো—"কি নিয়ে এত ভাবছো, একটু বল না, আমার দ্বারা যদি সুরাহা হয়।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রীতি এসে পড়লো চায়ের আসরে। রত্নার অনুরোধে তাকে তিনি সব কথাই খুলে বললেন। রত্না একটু ভেবে বললে, "এক কাজ কর না, ওদের ঠিকা হাজরিটা একেবারে ডবল্ করে দাও, তাতে হয়ত এতটা গায়ে লাগবে না ওদের।" "ওরা যে রূপিয়ার পরোয়া করছে না, তা তো আগেই শুনলে সুতরাং ওটা অবাস্তর।" "তাহলেও ওরা যখন শুনবে উপরি কাজের মূল্যটাও একেবারে ডবল্ হয়ে গেছে, তখন ওরা মেহনতের জন্য এতটা দরদ অনুভব করবে না—অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য। তা ছাড়া প্রতিটি লোক যেন প্রত্যহ কাজে বের হয় তার প্রতিও কড়া নজর রাখা প্রয়োজন।" রত্নার বাক্যের যথার্থতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন রঞ্জিত রায় কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে। এমনি সময়ে বেয়ারা একটি ভিজিটিং কার্ড নিয়ে সাহেবের টেবিলে রাখলো। সাহেব সেটি তুলে নিয়ে নাম দেখে হুকুম দিলেন, "সাহেবকে সেলাম দেও।" মিনিট দুই-এক ভেতরই অনিমেষ ব্যানার্জ্জী এসে ঢুকলেন। রঞ্জিত রায়ের সাথে নমস্কার-বিনিময়ের পর রত্নার সাথে পরিচিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অনিমেষ চমকে উঠলো—শ্লথ হয়ে গেলো তার নমস্কারের ভঙ্গী—আর রত্না ফ্যাকাশে ভাবে তাকিয়ে রইলো অনিমেষের দিকে। কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্য। পরমুহূর্ত্তে সামলে নিলো দুই জনেই দুই জনকে। মৃদু হাস্যের ভেতর দিয়ে তারা পরিচিত হলো নূতন ভাবে। পর মুহূর্ত্তেই হাস্যোজ্জ্বল সপ্রতিভ দৃষ্টিপাতে রীতির সাথে পরিচিত করলেন নিজেকে। শান্তস্বভাবা রীতি স্বচ্ছ দৃষ্টিপাতে অভিনন্দিত করলো অনিমেষকে। এ যেন

ম্লান আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক্। রঞ্জিত রায় খুসী হয়ে উঠলেন অনিমেষকে পেয়ে। "আপনি বোধ হয় মাস দেড়েক এখানে এসেছেন কিন্তু আপনার ওখানে যাবো-যাবো করে যাওয়া হয়ে উঠল না, তার জন্য আমি সত্যই লজ্জিত।"—বললেন রঞ্জিত রায়। অনিমেষ উত্তর দিলে, "আমারও আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে বেশ কিছুটা দেরী হয়ে গেলো, অবশ্য দোষটা ঠিক আমার নয়, নদীটা বড় বেয়াড়া হয়ে উঠেছিলো কিছু দিন ধরে। যেদিনই আসবো ভাবি সেদিনই নদীর রূপ হয়ে ওঠে ভীষণ। কেনো যে তার বাধা দেবার —" বলেই অসমাপ্ত বাক্যের ছেদ টানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন অন্য বাক্যের অবতারণায়। রত্না এর মধ্যে নিঃশব্দে কখন উঠে গেছে কেউ টের পায়নি। শুধু অনিমেষ অনুভব করেছিল তার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে থাকার চেষ্টা। রীতি একাগ্র চিত্তে শুনছিল তাঁদের কথাবার্ত্তা। প্রথম পরিচয়ের পর্ব্ব শেষ করে তায় সাথে কেক্ এবং সন্দেশ সহকারে চা পান করে অনিমেষ যখন তার বাংলোতে ফিরল তখন সন্ধ্যার প্রথম আলো ঝিকমিক্ করছে ডিলি নদীর বুকে। বাংলোয় ঢুকে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগলো অনিমেষ। এ যেনো হারিয়ে-যাওয়া গানের সুরকে নূতন করে ফিরে পাওয়া। কিন্তু ফিরে পাওয়া গানের সুরকে নতুন করে গাইবার তার কোনো অধিকার নেই। আছে শুধু সুরের রেশটির স্মৃতিকে মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রাখবার অধিকার।

অনিমেষের নিঃসঙ্গ জীবনকে প্রাণময় করে রেখেছে কর্ম্ম আর ঐ স্মৃতিটুকু। নিজের জীবনের বাহ্যিক রিক্ততা ব্যর্থতাকে সে অনেকখানি জয় করে ফেলেছে। পারেনি অন্তরের নিঃস্বতাকে ভরাতে। ব্যর্থ হয়েছে অন্তরের দৈন্যকে নতুন কিছুর রূপ দিতে। এইখানেই তার সব চেয়ে বড় পরাজয়! দরিদ্র অনিমেষ আজ তার মেধার জোরে নিজেকে অনেকখানি উঁচুতে তুলে ধরেছে। আজ সে খোদ্ গভর্মেণ্টের একটি নাম-করা অফিসার। পাত্র হিসেবে এমনি লোভনীয় যে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস্ রায় তাঁকে তার সুন্দরী কন্যাদানের জন্য ব্যগ্র, অথচ অনিমেষের সামনে ভেসে উঠলো সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা। দরিদ্র অনিমেষ ভালবেসে অন্যায় করেছিল ধনীর দুহিতা রত্নাকে। কলকাতা সহরে পাশাপাশি দুইখানি বাড়ীতে তাদের ছিল বাস। দুইটি কিশোর-কিশোরী একই সাথে খেলা-ধূলা পড়া-শোনার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছিল। তাদের আবাল্যের প্রীতি প্রেমে রূপান্তরিত হতে দেরী হয়নি। কিন্তু অনিমেষের দারিদ্র্যই তাদের মিলনের পথে হয়ে দাঁড়ালো প্রধান বাধা। রত্নার ধনী পিতা দম্ভের সাথে অস্বীকার করলেন অনিমেষের প্রস্তাব, তাচ্ছিল্য-ভরা কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, —অনিমেষের এ রকম প্রস্তাব শুধু অসমীচীন নয়, তাঁর স্পর্দ্ধার জলন্ত নিদর্শন, এবং তখনই তার ওপর কড়া আদেশ জারী হয়—সে যেনো ভবিষ্যতে কখনো তাঁদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় না আসে। সেই দিন লাঞ্ছিত অনিমেষ যখন ফিরে আসছিল তখনই রত্নার সাথে হয় তার শেষ দেখা। রত্না অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে তার হাতখানি চেপে ধরে বলেছিল, "তুমি আমায় ভুলে যেও অনিমেষ!" নিমেষে অনিমেষ প্রদীপ্ত হয়ে উঠে উত্তর দিয়েছিল, "তোমার প্রেমকে তুমি নিঃশেষে মুছে ফেলে দিও, সেটাই তোমাকে ভোলবার পক্ষে যথেষ্ট প্রেরণা দেবে।" "তাই হবে অনিমেষ"—ব্যথাভারাক্রান্ত নয়নে উত্তর দিয়েছিল রত্না।

অনিমেষের হঠাৎ কেমন যেনো হাসি পেতে লাগলো, তার রত্না আজ মিসেস্ রায়, আজ মিঃ ব্যানার্জ্জী মিসেস্ রায়ের সাথে নতুন কোরে পরিচিত হলেন। এর মাঝে রত্না-অনিমেষের স্থান নেই। হঠাৎ রত্নার সীঁথির মাঝে ছোট্ট লাল সিঁদূরের রেশটি জ্বলজ্বলে করে উঠলো অনিমেষের চোখে, ঐ একটুখানি সরু রেখা এত তীব্র—এত উজ্জ্বল। এ যেনো নতুন ভাবে রত্নাকে জানিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

সেদিন রাতে রত্না বিছানায় শুয়ে কেমন যেনো অবসাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবছিল সেদিনকার বেলা-শেষের কথা। অনিমেষকে দেখে প্রথমটা কেমন যেনো হতবাক্ হয়ে পড়েছিল সে—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তার হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেনো উছলে উঠতে চাইছিলো মুখমণ্ডলে! কত কষ্টে যে সে নিজেকে সংবরণ করেছে তা সেই জানে। রত্না আজ মিসেস্ রায়—কিন্তু অনিমেষ আজও নিজেকে মুক্ত রেখেছে সংসারের বন্ধন থেকে। হয়ত আজও সে ভোলেনি রত্নাকে, ভাবতে ভাবতেই রত্নার হৃদয় ভরে উঠলো কেমন যেনো একটা সূক্ষ্ম সুখোচ্ছ্বাসে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই শক্ত হয়ে উঠলো সে। কি অকৃতজ্ঞা হৃদয়হীনা সে······অনিমেষ আর রঞ্জিত রায় পাশাপাশি দু'টি চিত্র ফুটে উঠলো তার সম্মুখে। স্বামী হিসেবে সে যাকে পেয়েছে সে তো তুচ্ছ নয়, সে যে অতি মহান্, তার উদারতা, স্নেহ, প্রেম সবই রত্নাকে ভরিয়ে রেখেছে সব দিকে। কোন দিকে এতটুকু ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, প্রেমের বলিষ্ঠ রূপ রত্নাকে সময় সময় অভিভূত করে দেয়। তার প্রথম প্রেমের নিঃস্বতা রিক্ততা নূতন ভাবে ভরে উঠতে চাইলেও কোথায় যেনো ক্ষীণ বাধা অনুভব করে রত্না। অনিমেষের প্রেম তো তার পাওয়া নয়—সে যে তার চাওয়ার ফল। কত কষ্টে কত যত্নে কত আগ্রহে সংশয়ে তাকে তিল-তিল করে সংগ্রহ করতে হয়েছে রত্নাকে। ত্যাগ ও সাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রেম আপনার মহিমায় আপনি পরিপূর্ণ; খাদশূন্য স্বর্ণের মতনই উজ্জ্বল, তীব্র, মূল্যবান। স্বামীর প্রেম—সে তো তার অর্জ্জিত ধন নয়; সে তো তার দাবীর ডোরে বাঁধা; কোনো বিচারের অপেক্ষা রেখে এ আসেনি। মন্ত্রের শক্তি আর স্বামীর প্রেমের মহিমাই তাকে বেঁধেছে তাঁর প্রেমের ডোরে। ভালবাসে সে তার স্বামীকেও আকুল ভাবে, তাঁর এতটুকু অমঙ্গল আশঙ্কায় সে হয়ে ওঠে ব্যাকুল —স্বামীর কল্যাণ-কামনায় সে দেবতার কাছে প্রত্যহ জানায় তার আকুল প্রার্থনা। কিন্তু এ তো তার মণিকোঠায় তুলে রাখবার ধন নয়—এতে আছে দৈনিক প্রয়োজন, দীর্ঘ দিনকার অদর্শনে রত্না অনিমেষকে যেটুকু ভুলতে পেরেছিল, আজ এই এতটুকু দেখাতেই সে নূতন ভাবে জেগে উঠলো রত্নার কাছে। কিন্তু তার আচ্ছন্ন চেতনাকে তীব্র ভাবে ধাক্কা দিলো তার সংস্কারবোধ। সে যেনো নিজেকে বাঁচাবার জন্য জড়িয়ে ধরলো স্বামীকে আকুল ভাবে, এইখানেই বুঝি তার সব চেয়ে বড় আশ্রয়। স্বামী সপ্রেম আবেগে তাকে টেনে নিলেন নিজের বুকে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে রত্না ঘুমিয়ে পড়লো।

সেদিন অনিমেষ চলে যাওয়ার পর থেকে রীতি কেমন যেনো

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল অনিমেষেরই কথা। অনিমেষ এতটুকু পরিচয়েই যে তার হৃদয়ে দোলা দিয়েছে তা সে অস্বীকার করবে কি করে? তরুণী রীতির যদি তরুণ অনিমেষকে ভাল লেগে থাকে, তবে অন্যায় কোথায়? অনিমেষের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অবয়ব, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। লাজনম্রা শান্তস্বভাবা রীতির কাছে এ যেনো অভিনব।

অল্প কয়েক দিন পর রঞ্জিত রায় রত্না এবং রীতির কাছে অনিমেষের বাংলোতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। রত্না শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে প্রস্তাবে আপত্তি জানালো। রীতি একলা যেতে রাজী হবে না অনুমান করে তার মতামত জানতে চাইলেন। কিন্তু আজ আর রীতি আপত্তি জানালো না। বরং মাথা নেড়ে সম্মতিই জানিয়ে দিলো। তার কিছু পরেই ম্যানেজার সাহেব ভগিনী সহ বেরিয়ে পড়লেন অনিমেষের বাংলোর উদ্দেশ্যে। সেদিন বৈকালিক মধুর আলাপন সমাপনান্তে তাঁরা যখন বাগানে ফিরলেন, তখন সন্ধ্যা নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে ঘন আঁধারের বুকে। পথ চলতে চলতে রঞ্জিত রায় রীতিকে প্রশ্ন করলেন, "আজকের বিকেলটা বেশ কাটলো, কেমন?" রীতি অকারণে লাল হয়ে পড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু স্বরে বললো, "হ্যাঁ।" "অনিমেষকে কিন্তু আমার এই অল্প পরিচয়েই খুব ভালো লেগে গেছে, যেমন সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, তেমনি সহজ সুন্দর সুমার্জ্জিত ব্যবহার আর জ্ঞানের ভাণ্ডারও বুঝি অসীম।" বলে রঞ্জিত রায় অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা করতে লাগলেন।

রাত্রে শোবার সময় রঞ্জিত রায় রত্নাকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, অনিমেষের সাথে রীতির বিয়ে দিলে কেমন হয় বলতো?" এ রকম একটা সম্ভাবনা উঠতে পারে রত্নাও আশঙ্কা করছিল, কারণ রীতি বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে—তারা দু'জনেই তার জন্য একটু চিন্তিত এবং ব্যস্ত। স্বামীর প্রশ্নে একটু বিব্রত ভাবে সে উত্তর দিল, "রীতির সব দিক দিয়ে উপযুক্ত হবেন কি তিনি?" রঞ্জিত রায় হেসে বললেন, "ও-কথা বল না রত্না, বরং রীতিই ওর বোধ হয় উপযুক্ত নয়। প্রথম দিনই আমার ভাল লেগেছিল, কিন্তু আজ ওর সাথে আলাপে বুঝেছি অনিমেষ একটি হীরের টুকরো—আমার মনে হয়, রীতির এর চেয়ে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দুষ্কর। তুমিও মিশে দেখো তোমারও খুব ভালো লাগবে।" অনিমেষের প্রশংসায় রত্নার হৃদয় উদ্দাম হয়ে উঠলো। স্বামীর মনও স্পর্শ করেছে অনিমেষ। সত্যই ও-যে কমল হীরে! জহুরী মাত্রই চিনবে ওর আসল রূপ।

এর পর পর-পর দুই বার চায়ের নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত হলো অনিমেষ রঞ্জিত রায়ের বাংলায়, পরিচিত হতে হলো অনিমেষকে এঁদের সাথে গভীর ভাবে। কিন্তু রত্না ও অনিমেষকে দেখে কারো এতটুকু বোঝবার উপায় নেই যে, এদের উভয়ের অন্তর এক দিন ছিল একই সুরে, একই তারে বাঁধা।

রীতির জীবনে এলো নূতন ধ্বনি। অনিমেষের উপস্থিতি তাকে করে তোলে উজ্জ্বল, নিজেকে প্রকাশ করবার সম্ভাবনায় সে যেনো এখন ভরপূর। অপেক্ষা শুধু অনিমেষের আহ্বানের। সেদিন বৈকালে রঞ্জিত রায় বললেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না মিঃ ব্যানার্জ্জী, রীতি ভারী চমৎকার সেতার বাজায়, তার চেয়েও সুন্দর ওর মিষ্টি-গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত। অনিমেষ আগ্রহান্বিত কণ্ঠে রীতিকে অনুরোধ করলো একটি গানের জন্য—রীতি একটু ইতস্ততঃ করে পিয়ানোর কাছে বসলো। সুর ধরলো মিষ্টি-গলায়—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার
সাধের সাধনা
শূন্য গগনবিহারী,
আমি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—তুমি আমারি
তুমি আমারি।"

মুগ্ধ হয়ে সবাই শুনছিল তার প্রাণ-ঢালা সঙ্গীতের ধ্বনি। সুরের মুর্চ্ছনা ড্রইংরুমের আনাচে-কানাচে আছড়ে পড়ছিল আকুল ভাবে। গান শেষ হলে অনিমেষ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলো, "সত্যই রীতি দেবী, অপূর্ব্ব আপনার গান—অনেক দিন মনে থাকবে আপনার এই মিষ্টি সুরের ধ্বনি।" রীতির লাজ-নম্র মুখ আরক্ত হয়ে উঠলো। রত্না অনুভব করলো মনের কোথায় যেনো এক ক্ষীণ, সূক্ষ্ম বেদনা-বোধ!

সে দিনই রীতির অনুপস্থিতিতে রঞ্জিত রায় অনিমেষের কাছে প্রস্তাব তুললেন রীতিকে গ্রহণ করবার জন্য। রঞ্জিত রায়ের প্রস্তাবে অনিমেষ প্রথমে কি উত্তর দেবে ভেবে পেলো না, পরে একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিলে, "আমি জীবনে বিয়ে করবো না এই আমার ইচ্ছা।" মিঃ রায় হেসে উত্তর দিলেন, "ও-রকম প্রতিজ্ঞা অল্প বয়সে প্রায় সকলেই করে থাকে মিঃ ব্যানার্জ্জী, কিন্তু সেটা ধোপে টেকে না। তবে আপনি যদি রীতিকে আপনার অনুপযুক্ত বোধ করেন তবে অবশ্য আলাদা কথা।" অনিমেষ বিব্রত ভাবে কি বলবেন খুঁজে না পেয়ে রত্নার দিকে চাইলেন আসন্ন বিপদ হতে উদ্ধার পাবার আশায়। রত্না কিন্তু মৃদু হেসে বললে, "আপনার বিয়ে করবো না এই অজুহাত ছাড়া অন্য কোনো কারণ আছে কি?" অনিমেষ বিব্রত ভাবে উত্তর দিলে, "না, তাছাড়া অন্য কোনো বিশেষ কারণ নেই।" "তবে না হয় আমরা আপনার ইচ্ছা-পরিবর্ত্তনের আশায় অপেক্ষা করবো।" এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল কোন জরুরী দরকারে কয়েক জন কুলীর সর্দ্দার সাহেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী। রঞ্জিত রায় অনিমেষের সাথে আলাপের ভার রত্নার ওপর দিয়ে ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন। অনিমেষও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি তাহলে আসি মিসেস্ রায়।" "তা হয় না মিঃ ব্যানার্জ্জী, আপনি বসুন, আপনার সাথে আমার কয়েকটি কথা আছে।" অনিমেষ তার স্থির দৃষ্টি তুলে বললে—"এখনও এমন কি বলবার প্রয়োজন থাকতে পারে?" "তুমি রত্নাকে বিয়ে করো এই আমার অনুরোধ।" "মিসেস্ রায়ের মিঃ ব্যানার্জ্জীকে ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ জানাবার কোন অধিকার আছে কি?" নিমেষে রত্না ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো—পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "এক দিন বলেছিলে, 'আমি আমার প্রেমকে নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেললেই তুমি আমায় ভুলে যাবে'—কথাটা ভোলনি নিশ্চয়।" "কিন্তু সত্যই কি তুমি আমায় একবারে ভুলে গেছো রত্না?" "সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই জেনো!"—স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে উত্তর দিলো রত্না। নিমেষে অনিমেষ হয়ে উঠলো ফ্যাকাশে বিবর্ণ রক্তহীন। যেটুকু সম্বল নিয়ে বেঁচেছিল, আজ সেটুকুও

হারাতে হলো তাকে। কোথা থেকে পাবে সে বাঁচবার প্রেরণা, কে হবে তার শক্তির আধার, তার এগিয়ে চলবার পাথেয় হবে কি? শূন্য—সব কিছু শূন্য আজ তার। স্মৃতির মণিকোঠায় যেটুকু মূলধন রেখেছিল তার অর্দ্ধেকের বেশী খালি হয়ে গেলো আজ। তার প্রেম—সে তো তার নিজস্ব ধন, তার মাঝে নতুনত্ব কোথায়? কিন্তু রত্নার প্রেম তার অর্জিত ধন, তাকে হারালে যে তার সবটুকুই হারিয়ে যায়—ঐটুকু সম্বল করেই সে চলার পথে এগিয়ে চলেছিল। রত্না অনিমেষের ভাবান্তর লক্ষ্য করে—কথার মোড় ঘোরাবার জন্ত বললে, "তাছাড়া রীতি আপনাকে ভালবাসে।" "এইটুকু শোনাবার জন্যই কি আজ তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে রত্না?"—বলে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলো অনিমেষ। রত্না স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মিনিট খানেক, পর মুহূর্ত্তেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো শোফার ওপর।

তার এক সপ্তাহ পরে অনিমেষের চিঠি এলো রত্নার নামে—

রত্না—

তোমাকে শেষ চিঠি লেখবার ধৃষ্টতা ক্ষমা করো, সেদিন সন্ধ্যায় তোমার কাছ হতে ফিরে আসা অবধি নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা সুস্পষ্ট করে নিয়েছি—আশা করি আমার ভুল হয়নি। এত দিনকার দ্বিধা-সংশয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছো তুমি। হয়ত তোমার সবটুকু বলা হয় নাই—হয়ত সবটুকু বোঝা হয় নাই, হয়ত বা তোমার প্রতি অবিচার করলাম—তবু যা বুঝেছি, তাই আমার কাছে একান্ত সত্য। এ সত্যের মাঝে এতটুকু বঞ্চনা, ছলনা যেন খুঁজে না পাই—তার জন্যই আমার এই অভিযান। এর পরবর্ত্তী লাভ এবং ক্ষতির হিসাব তুমিই করো। আমার আর অপেক্ষা কিংবা যাচাই করবার অবসর নাই। জীবনের চরম সত্যকে জানা হয়ে গেছে। একবার মনে হয়েছিল যেটুকু মূলধন করে বাঁচতে চেয়েছিলাম, তাকে না হারালেই ভালো হতো। কিন্তু এখন বুঝেছি, মিথ্যার ছলনায় সত্যকে ঢেকে রাখবার চেষ্টাই বাতুলতা। চরম সত্য মিথ্যার কাছে প্রকাশিত হবেই তা যেমন ভাবেই হোক্ না কেন। তোমাকে ভোলবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আমার জীবনে তুমি বিচ্ছিন্ন সত্তা নও, তুমি আমার জীবনেরই একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ—দেহের অস্থি, মজ্জা, সারাংশের মত। সুতরাং তোমার কাছে আজ আমি মিথ্যাবাদী। তাই আজ পৃথিবীর বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছি, এর জন্ত অভিযোগ কারো উপরেই নেই। এ আমার নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া। শুনেছি আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু এ তো আমার আত্মহত্যা নয়, এ চরম সত্যের কাছে নিজেকে আহুতি দিয়ে নূতন ভাবে বাঁচবার প্রচেষ্টা। এ আমার আত্মাহুতি। বিদায় রত্না। ইতি—

অনিমেষ।

জ্ঞানহারা রত্না নরম কার্পেটের উপর লুটাইয়া পড়িল—পরদিন খবরের কাগজে বাহির হইল—বনবিভাগের খ্যাতনামা তরুণ অফিসার অনিমেষ ব্যানার্জ্জী বিভলবারের গুলীতে তাঁর শয়নকক্ষে আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মহত্যার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

"ডা'নন্‌জীয়ো"

শ্রীকনককুমার বসু

যে সব কবি ও সাহিত্যিক 'ইতালী'র সাহিত্য ও কাব্যকে জগতের আসনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, অমর কবি "গ্যাব্রিয়েল ডা'নন্‌জীয়ো" তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এই মহাকবি নানারূপ ভাবে স্বদেশের সাহিত্য ও কাব্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনেরো বৎসর বয়স কালে তাঁহার প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'Primo Vere' প্রকাশিত হয়। তখন ১৮৭৯ সাল। তাঁহার এই বাল্য রচনা ইতালীর তৎকালীন সাহিত্য-কলাবিদ মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মাত্র একখানি কাব্যগ্রন্থ তাঁহাকে সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত করিয়া দিয়াছিল। ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৮২ সালে তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'Conto Nouvo' যখন প্রকাশিত হইল, তখন দেশবাসী তাঁহাকে 'কার্দুসী'-প্রমুখ তৎকালীন ইতালীর শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য রচয়িতাগণের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎকালীন ইতালীর শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন যে, এই কিশোর কবি কালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগণের এক জন বলিয়া পরিগণিত হইবেন। 'ডা'নন্‌জীয়ো'র যৌবন কালে সেই ভবিষ্যদ্‌-বাণী সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'It Piocere' যখন প্রকাশিত হয় তখন সমালোচকগণ বলিলেন, "গী দ্য মোঁপাসার অনেক ঊর্দ্ধে ডা'নন্‌জীয়ো'র স্থান হইবে।" ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'Il Trion fo della Morte" শীর্ষক পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল; এই পুস্তকটি লিখিবার পর তাঁহার সমুজ্জ্বল যশঃপ্রভা ইতালী অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যিকগণকে উদ্‌ভাসিত করিয়াছিল।

এই সময় হইতেই বিশ্ববাসী এই ক্ষণজন্মা কবি ও সাহিত্যিকের যাবতীয় রচনা সাগ্রহে পাঠ করিতে লাগিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি "Fuoco" নামক পুস্তকটি রচনা করেন। তাঁহার এই পুস্তকটি সম্ভবতঃ সাহিত্য-শিল্পের দিক দিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এই সময় হইতেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু এই নূতন ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'La Gloria', 'La Citta mora', 'La Giocanda', ও Fran cesca de Rimini,' প্রভৃতি নাটকগুলি সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইলেও 'La Neva' ও 'Fedra" এই দুইখানি নাটক সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।

প্রায় দীর্ঘ দশ বৎসর কাল তিনি নাটক, অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রোমের কিছু দূরে 'আলবেনো' হ্রদের তীরে তিনি একটি আদর্শ রঙ্গালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, সেখানে কেবল মাত্র বসন্ত কালে নাট্যাভিনয় হইবে, কারণ 'ডা'নন্‌জীয়ো' বলিতেন যে "বসন্ত কালই বৎসরের 'কাব্য-ঋতু'!". মহাকবির এই আদর্শ নাট্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে 'আমেরিকা'র দুইটি কাব্যপ্রিয়া 'মিস

মরগ্যান', ও 'মিসেস্ কুজভেল্ট' স্বেচ্ছায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের উৎসাহ না পাওয়ায় এবং নিজের নানা প্রকার বৈষয়িক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

ইতালীর দৃশ্যকাব্যের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের সেই অপূর্ব্ব করুণ রসধারা পুনঃ প্রবাহিত করিবার জন্য তিনি যে বিপুল চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশের লোক যখন তাঁহার সাধু চেষ্টার গুণ সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তাঁহার রচিত নাটকগুলি অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও অসহ্য কষ্টকর বলিয়া মন্তব্য করিতে লাগিল, তখন মনঃকষ্টে 'ডা'ননজীয়ো' তাঁহার লেখনী বন্ধ করিয়া দিলেন। লেখনী বন্ধ করিবার পর শেষ কয়েক বৎসর তিনি মানব-জীবনের সর্ব্ব প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই অপরিমিত বিলাস-লালসালিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের ফলে শীঘ্রই তিনি প্রভূত ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। ১৯১০ সালে যখন তাঁহার ঋণের পরিমাণ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার উপর হইল, তখন পাওনাদারগণ তাঁহার অমূল্য শিল্পসম্ভার ও আসবাব-পত্রসমূহ ক্রোক করিয়া লইল। গভীর দুঃখে কবি দেশত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের অন্তর্গত 'ভার্সেল' নগরে চলিয়া গেলেন। ১৯১১ সালে তিনি তাঁহার শেষ নাটক "The Martyrdom of St. Sebastian" রচনা করেন এবং উহা 'প্যারিস'এর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এই সময় প্যারিসের 'আর্কবিশপ' উক্ত নাটকের ঘোরতর নিন্দা করিয়া উহা ঘৃণিত ও দণ্ডনীয় বলিয়া, ধর্ম্মের নামে 'খৃষ্টান'-জগতের নিকট উহা বর্জ্জন করিবার জন্য এক আবেদন-পত্র প্রচার করেন। জীবনের পথে ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধিক বার তিনি এই ভাবে লাঞ্ছিত ও শাসিত হইয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে তাঁহার "Laus Vitae" নামক পুস্তকখানি পাঠাগারসমূহে বর্জ্জ্য ও অপাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল; কারণ উক্ত পুস্তকে তিনি যীশু-মাতা অক্ষতযোনি "কুমারী মেরী ধূম্রশিখার ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া যাউন, এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তিকে খানায় ফেলিয়া দেওয়া হউক" ইত্যাদি নাস্তিক্য মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার শেষ কবিতাগুচ্ছ "Laude" প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরেই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। যুদ্ধের প্রারম্ভে এই অসীম প্রতিভাশালী, চঞ্চলমতি অসাধারণ কবি নব স্বরভিযুক্ত আতর প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'Mignonette', 'Citronella' এবং 'Amber' সংক্ষেপে এক প্রকার নবতম গন্ধদ্রব্য আবিষ্কার করিবার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেশবাসীকে অবাক করিয়া দিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "মাত্র এক বৎসর তিনি জীবিত থাকিবেন এবং তাহার পর এমন এক আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি দেহত্যাগ করিবেন যে তাঁহার দেহের আর কোন চিহ্নই থাকিবে না।

স্বদেশবাসীর দ্বারা লাঞ্ছিত ও শাসিত হইয়া, জগতের মূঢ়তায় আন্তরিক বিরক্ত হইয়াও বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাপনে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া তিনি যখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন,— অকস্মাৎ সেই সময়ে ইউরোপে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। ডা'ননজীয়োরও আর মরণকে বরণ করা হইল না।

সমগ্র পৃথিবী-পরিব্যাপী এই মহাযুদ্ধে ডা'ননজীয়ো উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। বৈচিত্র্যহীন জীবন হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি জীবনের সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ বিস্মৃত হইয়া প্রচণ্ড যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইলেন।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যরথিগণের অন্যতম, সাহিত্য যুগের এক জন মুকুটমণি, সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানী ও চারুশিল্পের পরম উপাসক, রেশমী ও জরিদার পোষাক-পরিচ্ছদের একান্ত ভক্ত, নিয়ত শত পরকীয়া প্রণয়িনীর প্রিয়তম পাত্র, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ-বিলাসের অপরিমিত উপাসক, এই ভোগ-বিলাসী সৌখীন কবি, যুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিনেই, সমগ্র ইটালীবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া সৈন্যদলে সর্ব্বপ্রথম নাম লিখাইলেন। অসাধারণ মনীষা ও অসীম প্রতিভা-সম্পন্ন এই কবি-সৈনিক বিমান আক্রমণে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলেন। অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে বার-বার বিমান আক্রমণের অভিযানে আশাতীত সাফল্য লাভ করিলেন। এই বিপদসঙ্কুল আকাশ-যুদ্ধে তিনি আশাতীত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। সামান্য সৈনিকের পদ হইতে তিনি লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যুদ্ধের পর শান্তি-সভার অধিবেশনে যখন 'ফিউম' শত্রুকে প্রত্যর্পণ করা স্থির হইল, তখন মহাকবি ডা'ননজীয়ো সর্ব্বপ্রথম প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করিলেন। সরকার পক্ষ সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন দেখিয়া তিনি শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অসংখ্য অনুচর সংগ্রহ করিয়া দোর্দ্দণ্ড সাহসের সহিত বিপুল বিক্রমের সহিত 'ফিউম' পুনরধিকার করিলেন। যাহাদের ধারণা যে কবিদের কোমল মনে কেবলই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও তরুণীদের কথা আলোড়িত হয়—এই ঘটনায় তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে।

অসংখ্য সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া তিনি যেদিন 'ফিউমের' তোরণ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজকীয় সৈনাধ্যক্ষ "পিট্যলুগা" সৈন্য সহ তাঁহাকে বাধা দিলেন। কবিকে সম্বোধন করিয়া সেনাপতি কহিলেন—"হে কবি, তুমি এ কি করিতেছ? তোমার জন্য কি শেষে 'ইটালী'র সর্ব্বনাশ হইবে?" জলদ-গম্ভীর স্বরে কবি জবাব দিলেন—"সেনাপতি, যাহারা অধিকৃত দেশ শত্রুর হস্তে সমর্পণ করে দেশের সর্ব্বনাশ তো সেই সকল কাপুরুষের দ্বারাই সাধিত হয়!" সেনাপতি আরক্ত মুখে উত্তর করিলেন,—"কবি, আমি সম্রাটের ভৃত্য মাত্র; আমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেছি।" ডা'ননজীয়ো কহিলেন, "উত্তম, এস! প্রথমে তোমাদের ভ্রাতাদের বক্ষেই অস্ত্রাঘাত কর! সর্ব্বাগ্রে আমাকেই হত্যা কর।" এই বলিয়া কবি তাঁহার নগ্ন বক্ষ বিস্তৃত করিয়া দিলেন। সেনাপতি তখন সানন্দে কবিকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চ কণ্ঠে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া বলিলেন, "জয় হোক কবি, তোমারই জয় হোক! ইটালী অমর হোক!"

অতঃপর কবি ডা'ননজীয়ো 'ফিউম' অধিকার করেন।...ইহা কিছু কাল পরেই কবি পরলোক গমন করেন।

'ইটালী'র জনৈক বিখ্যাত লেখকের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি যে—"ইটালী ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু ডা'ননজীয়োর অবিনশ্বর ভাস্বর প্রতিভা চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে।"
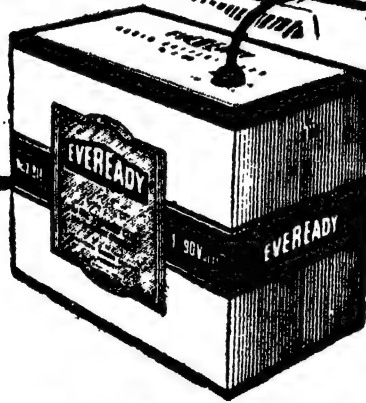
বৌদ্ধ সংঘ ও সংগঠন

সুনীতিকুমার পাঠক

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এদেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে যে জিনিষটার অভাব সব চেয়ে বেশী করে ধরা পড়েছে, সেটা হোল আমাদের সংহতি আর সংগঠন। এই দু'টোই জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করে তুলে। ভারতের রাষ্ট্র ও জনগণ ঐ দু'টো জিনিষের অভাবেই যখন বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তখনই এ দেশ পরাধীন হয়। তা না হলে মহম্মদ ঘোরী আর রবার্ট ক্লাইভ এত বড় দেশকে এত সহজে পরাধীন করতে পারতেন কি না সন্দেহ।

এখন সমস্যা হ'লো যে, আমাদের দেশের সংগঠন গড়ার কি কোন নিজস্ব উপকরণ আছে? অনেকের ধারণা, পশ্চিমের লোকেরা নানা রকমের সংগঠন (organisation) গড়েন, তাই তাঁদের থেকে এর বিজ্ঞান শিখে এলে তবেই সংগঠন গড়া হবে। এ কথাটা সত্য; কিন্তু সেই সংগে প্রাচীন স্বাধীন ভারতের যে সংগঠন ব্যবস্থা ছিল, তাও জানা দরকার।

বিদেশের আমদানী করা উপকরণে আমাদের জনমন গড়ে তোলার অসুবিধে যে কতো, তা আজকে যে কোন সংগঠনের অধিনেতা জানেন। প্রত্যেক দেশে লোকের কাছে তার নিজের দেশের মত করে যে কোন জিনিষ বলতে হবে, তা না হ'লে কোন কাজ হয় না। আজ এ কথা বললে অনেকে আছেন যাঁরা বলে উঠবেন—ভারতের সংগঠন বিজ্ঞান আবার কোথায়? আর যদিই বা থাকে, তা দিয়ে কখনও আজকার সমস্যার সমাধান হতে পারে? এ প্রসংগে এ প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক, এর উত্তরে বলা যায়—প্রাচীন স্বাধীন ভারতে সংগঠনের অভাব ছিল না। তাই এর সংগঠন বিজ্ঞানও অনেক আলোচনা হয়েছে। সেগুলো রয়েছে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে, জৈন গ্রন্থমালায়, কৌটিল্য প্রভৃতি লেখকদের অর্থশাস্ত্রে, প্রাচীন পুরাণে আর ব্রাহ্মণদের ধর্মশাস্ত্রে ও গৃহ্যসূত্রে। যদি কেউ বলেন যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা গৃহ্যসূত্র ছাড়া বাকী ত সব ধর্মগ্রন্থ। তাঁদের এ কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি যে, ভারতবর্ষ তার ধর্মের ভিতর দিয়েই জীবনের ছোট-বড় সমস্যা, আর নিত্য-নৈমিত্তিক সুখদুঃখ সকল দিককে বুঝতো বলেই তাঁরা সকল কিছুকেই ধর্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বলে গেছেন। ভারতবর্ষে সর্বাই আজও এটা জানে যে, ধর্মই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। ধর্ম মানে এখানে ($\sqrt{}$ধৃ + মন্), যাকে আশ্রয় করে মানুষ বেঁচে থাকে। তাই যৌন কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, চৌরশাস্ত্র, সবই এদেশে ধর্মশাস্ত্র হয়ে গেছে।

এ নিয়ে এখানে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখন দেখা যাক প্রাচীন ভারতের সমস্যা নিয়ে যে সব বই লেখা, সেগুলি কেমন করে আজকার দিনের সমস্যা সমাধান করতে পারে? এর উত্তরে একটা কথাই বলব—মানুষের সমস্যা দু-রকম। একটা সাময়িক আর একটা চিরন্তন। সাময়িক—যেমন মাসের শেষ দিন সকালবেলা রেশন নেই। আর চিরন্তন হোল এক জনকে ফাঁকি দিয়ে মিছে কথা বলে দু'পয়সা কামিয়ে নেবার প্রবৃত্তি। এই ধরণের বুদ্ধি মানুষের মাথায় চিরদিন খেলছে। এ হোল মানুষের জন্মগত আদিম স্বার্থান্বেষণ প্রবৃত্তি। নিজের জন্যে অন্য সকলকে কষ্ট দিতে বা বঞ্চিত করতে সবাই চায়।

প্রাচীন ভারতের নানা সমস্যা

প্রাচীন ভারতের মনীষীরাও কতকগুলো সাময়িক সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন। যেমন তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে যে গুণ-কর্মগত শ্রেণীভেদ ছিল (যা পরে জাতি নাম দিয়ে সংগঠনকে ভেঙে দিয়েছিল), তাদের প্রত্যেককেই শিক্ষা নিতে হোত। তার মানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছিল। শিক্ষার নিষ্ঠা ও মনের সংযম রক্ষার জন্যে কতকগুলো ব্রত পালন করতে হোত। তার একটা হোল যেমন, দণ্ড। অনেকেই হয়ত হেসে উঠবেন, ছেলে পড়তে এল, হাতে তার লাঠি আর ঘটী (কমণ্ডলু)। স্মরণ রাখবেন, তখন এদেশে রেলগাড়ী নেই, সারা দেশময় তাদের হেঁটে হেঁটে বেড়াতে হোত। নানা বিপদের সম্ভাবনা আশে-পাশে থাকত। তাই দণ্ড সংগে রাখতে হোত তাঁদের আত্মরক্ষার জন্যে। আর কমণ্ডলু পানীয় জল বইবার জন্যে। তা যাই হোক, প্রাচীন মনীষীরা দেখলেন, যে একই রকমের দণ্ড থাকলে ত সমাজে নানা রকম অসুবিধে। তাই তাঁরা ভিন্ন রকম দণ্ডের ব্যবস্থা দিয়ে সাময়িক সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

আবার চিরন্তন সমস্যার সমাধান—যেমন মানুষ সব সময় অপরকে ঠকাতে চায়। তাই তাঁরা এমন কতকগুলো বিধান দিলেন, যাতে আপনা থেকেই মানুষ সেগুলো দমন করে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে।

শুধু তাই নয়, তখন যে ভারতীয় সমাজের একক বা গোষ্ঠীজীবনে বর্তমানের তুলনায় সমস্যা কম ছিল তা মনে করার কোন হেতু নেই। তখনও ভারতের রাষ্ট্রাকাশে বহু বিদেশী গ্রহের মত আবির্ভূত হতো। এদিকে আবার আর্যেতরদের উপর শস্ত্র দিয়ে পরাজিত ও কৃষ্টি দিয়ে অভিভূত করতে সচেষ্ট। ভারতের বন্য প্রকৃতিকে তখনও ভারতীয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে পারেনি। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির অভাব ছিল না। রোগ ব্যাধি যথেষ্টই ছিল। তখনও বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে মানুষ এত বেশী প্রবল হয়ে উঠেনি। সেই রকম একটা সময়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে প্রতিষ্ঠান শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বনস্পতির আকারে সমগ্র ভারতের জনগণকে হিত ও কল্যাণের ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিল তার কর্ম-পদ্ধতি আজ জানা দরকার।

প্রাচীন ভারতের সমস্যায় বুদ্ধদেব

সেই দুর্দিনে যিনি সেকালের রুগ্ন ও ভগ্ন সমাজ-দেহে নূতন প্রাণ শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, তিনি ভারতের অন্যতম আদর্শ নেতা ও মহামানব বুদ্ধদেব। তিনি দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তে স্থির থাকতে পারেননি। তাই তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন মানুষের চোখের জল মুছাতে। আর ধর্ম প্রচার করেছিলেন "বহু জন হিতায়, বহু জন সুখায়।" তিনি দেখেছিলেন এ দেশকে যদি জাগাতে হয় তবে ধর্মের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে; কেন না ধর্মকে বাদ দিয়ে এদেশ বাঁচতে পারে না। তাই তিনি আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন-পদ্ধতির কথাও ধর্মের নাম দিয়ে প্রচার করলেন।

তিনি সংগঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে যে এক সংহতিশীল চরিত্রবান কর্মীর দল গড়ে তুললেন, তাই হোল "সংঘ"। সেই সংঘের কর্মীদের বলা হোত "ভিক্ষু"—অর্থাৎ যাঁরা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকেন। তাঁদের

নিজেদের প্রয়োজন ছিল স্বল্পতম। নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বিশ্বজনের হিত ও কল্যাণ করাই হোল তাঁদের জীবনের সাধনা। ঐ সংঘের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি ও গঠন-প্রণালীর মধ্যে যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানসিক উদারতা রয়েছে, তেমনই ভারতের শাশ্বত গোষ্ঠী-জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান রয়েছে।

সংঘ শব্দের অর্থ

বৌদ্ধেরা 'সংঘ' কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করতেন, তা হোল একটি মিলনক্ষেত্র, যেখানে কোন উচ্চ নীচের প্রশ্ন নেই। যা সবাইকে এক সংগে যুক্ত রাখে, তাই হোল 'সংঘ'। এই অর্থে ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্যে সংঘ-কথা পরে এসে গেছে। কৌটিল্য ও পাণিনি এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সংঘ বললে যে কেবল বৌদ্ধাবাসের ভিক্ষু গোষ্ঠীর সংঘ বুঝায় তা নয়। পরবর্তীকালে যে-কোন সম্মিলিত সংহতিশীল প্রতিষ্ঠানকে সংঘ বলা হয়েছে। আরও সংঘ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে—বৌদ্ধেরা যে নীতি অনুসরণ করে তাঁদের সংঘ গড়ে তুলেছিলেন, তা যে কেবল তাদেরই নিজস্ব বা কেবল সে যুগের উপযোগী ছিল, তা নয়। একটা যে-কোন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্মিলিত গণ-প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে যে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার, তার প্রত্যেকটি অনুসৃত হয়েছিল।

বৌদ্ধসংঘ ও গণপ্রতিষ্ঠান

বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, বহু জনের হিতসাধন ও বহু জনের কল্যাণসাধনই সংঘের মূল লক্ষ্য। তাই যখনই সংঘের কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে, বুদ্ধদেব তাঁর আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—সংঘের বিপক্ষদের স্বপক্ষে আনা আর সংঘের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধাচরণ না করাই হোল কর্তব্য। এর আগেই বলেছি যে, ভগবান বুদ্ধদেব সেকালের রুগ্ন সমাজদেহকে সবল ও দৃঢ় করার জন্যে ধর্ম ও নৈতিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে যে সংস্কার করেছিলেন, তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ এই সংঘ-গঠনের মধ্যে রয়েছে। তিনি দেখলেন যে, তাঁর অপার মহান সাধনাকে যদি মানব-সমাজের কল্যাণে আনতে হয়, তবে হিংসোন্মত্ত স্বার্থলোলুপ সংসারে হিত ও কল্যাণের বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তাই তিনি ভিক্ষু-সমাজের সৃষ্টি করলেন। তাই বলে এই ভিক্ষুগোষ্ঠী বৃহত্তর মানব-সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়েও বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁদের জীবনচর্চা সাধারণের জীবনাচরণের থেকে ভিন্ন হলেও সাধারণ সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিল ও যোগ রেখে তাঁরা চলতেন। অতএব ইহা স্পষ্ট যে, বৌদ্ধসংঘ কেবল একটি সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্মাচরণের সম্মিলন নয়, এটা একটা সামাজিক জন-প্রতিষ্ঠান।

কোন সংগঠন বা জনপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই আসে যিনি সংঘ গড়েন অর্থাৎ অধিনেতা। আর সেই সংগঠন যাদের নিয়ে গড়া হয়, সেই ব্যক্তি সংস্থা। ঐ একক সংস্থা সংঘদেহের জীবকোষ। জীবকোষের স্বাস্থ্য ও সরলতায় যেমন শরীর দৃঢ় ও পুষ্ট হয়, তেমনই ঐ একক সংস্থার উন্নতির উপর সংঘের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই কোন সংঘ বা জন-প্রতিষ্ঠান যাদের নিয়ে গড়া হয়েছে, তাদের ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ ও ভাবধারার উপরে সবার আগে নজর দিতে হবে।

তাই বলে উন্নত সদস্যগোষ্ঠীও নিজে নিজে চলতে পারে না, যদি তাদের মধ্যে নেতা বা নায়ক না থাকেন। 'নেতা' বা 'নায়ক' শব্দটির অর্থই হোল 'যিনি নিয়ে চলেন'। সুস্পষ্ট জীবকোষ সম্মিলিত সক্রিয় ও জীবন্ত থাকতে পারে না, যদি না তার মধ্যে জীবনী-শক্তি থাকে। নায়ক বা নেতা হলেন সেই সংঘের জীবনীশক্তি। নায়ক বা সাধারণ সদস্যের সংযোগ যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। নায়কশূন্য সংঘ প্রাণহীন শরীর। সংঘশূন্য নায়ক অশরীরী প্রাণ।

তার পর হোল সংঘ ও সংঘের বাইরে বৃহত্তর জনসমাজ। নায়ক-পরিচালিত সংঘ হোল যেন চলন্ত যান বা গাড়ী। কিন্তু সেই যানের গতি বিকাশের পথ দরকার, যার উপর দিয়ে সংঘের রথচক্র তার উদ্দেশ্য তথা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই সমাজকে বাদ দিয়ে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকতে পারে না। যে জন-প্রতিষ্ঠানের সমাজের উপর কোন প্রভাব নেই, সেটা অনেকটা গ্যারেজে চাবিবন্ধ মোটরের মত একঘরে।

বৌদ্ধসংগঠনের অধিনেতা

সংঘের নায়কের সম্মান ও গৌরব যেমন, দায়িত্ব আর কর্তব্যও তেমনি। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ যেমন রাষ্ট্রনায়কের উপর বহুল ভাবে নির্ভর করে, তেমনি কোন সংঘনায়কের ব্যক্তিত্বের উপর তার প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অবনতি নির্ভরশীল। ভগবান বুদ্ধদেব এ কথা ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি যত দিন বেঁচেছিলেন তত দিন সংঘস্থবির পদের সৃষ্টি করে যাননি। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর পরিনির্বাণকালে বলে গেলেন, "হে, আনন্দ, তোমাদের মনে হতে পারে যে, আমাদের প্রবচনের শাসক অর্থাৎ উপদেশক চলে গেলেন; আমাদের আর কেহ শাসক নাই, এরকম মনে করো না। আমি যে ধর্ম ও বিনয়ের উপদেশ দিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি আমার অভাবে তাই তোমাদের শাসক হবে।"

আরও তিনি দীঘনিকায়ে এক স্থানে বলেছেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে সব বিধান করিনি, যতদিন ভিক্ষুরা সে সব বিধান করবে না; যা আমি বিধান করেছি, যতদিন পর্যন্ত তার উচ্ছেদ করবে না; আমি যে সকল উপদেশ বাক্য বলেছি, সেই সকলকে অবলম্বন করে যতদিন পণ্ডিতরা চলবেন হে ভিক্ষুগণ, ততদিন তোমাদের উন্নতি হবে, কোন ক্ষতি হবে না।"

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভগবান বুদ্ধ কোন উপযুক্ত স্থবিরকে সংঘস্থবির পদে নিযুক্ত করে গেলেন না কেন? কেন না তিনি জানতেন মানুষ যতদিন না নিজের সকল দুর্বলতা দূর করতে পারছে ততদিন মানুষ তার স্বার্থের লোভ ছাড়তে পারবে না। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষ দোষগুণের ঊর্দ্ধে নয়। সুতরাং তিনি যদি কোন মানুষকে নির্বাচন বা নিযুক্ত করে যান, একদিন হয়ত ভবিষ্যতে ভিক্ষু-সমাজের কাছে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও রক্ষণশীল মনের ভিক্ষুদের পক্ষে তাকে পদচ্যুত করা সম্ভবপর হবে না। আর সেই লোকটিও আপন পদমর্যাদার গৌরবে নিজেই ত্যাগ ও নিষ্ঠার পথে সব সময় নাও থাকতে পারে। তাই লোক নির্বাচনের ভারটা ভিক্ষুসমাজের উপর রেখে তাঁর অশরীরী বাণী-প্রতীককে তিনি

বুদ্ধশাসনের নায়ক ও শাসক করে গেলেন। গুরুর দ্বারা নির্বাচিত সংঘনায়কদের সংগে সেকালের সংগঠনে ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল, তা দূর করতেই তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

কিন্তু স্বার্থসন্ধিৎসু দেবদত্ত তাঁর এই দূরদর্শিতা বুঝে উঠতে পারেননি, তাই তিনি অনেক সময়েই বুদ্ধের অবর্তমানে সংঘনায়কত্ব বা সংঘস্থবির পদের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ও বুদ্ধদেবকে হত্যার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।

আজকাল দিনে পদমর্যাদা ও নেতৃত্বের কাড়াকাড়ি নিয়ে যে অযথা দলাদলি ও রণঝটাপটি চলেছে, তার মূলে মানুষের শাসন সম্মানলোলুপতার প্রবৃত্তি রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ সেই হীন মনোবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর বেশী জোর দিয়ে গেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে তাঁর বাণীর উপর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার আধিক্য প্রকাশ করে বলেছেন—যে শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করে কর্ম করে, সে সুখ, সিদ্ধি ও পরাগতি লাভ করে না। শাস্ত্রের মধ্যে যা কর্তব্য ও যা অকর্তব্য বলে বলা হয়েছে, তাকেই মেনে নিয়ে কাজ করা উচিত।

ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর সংঘে ভেদ ও কলহ নিরোধ করতে গিয়ে তাঁর সংঘের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ কি সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছেন' এ রকম প্রশ্ন মনে হতে পারে। কারণ তিনি অনেকটা এই কথাই বললেন যে, তিনি যা বলছেন তা বাদে এক পা অগ্রসর হওয়া ভিক্ষুকদের পক্ষে নিরাপদ নয়। এই রকম সংকীর্ণ ও স্থাবর বুদ্ধির ফলেই কি তাঁর প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছল, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তর তিনি পরিনির্বাণকালে বলে গেলেন যে সংঘ যদি মনে করেন তবে ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে তাঁর ক্ষুদ্র ও অনুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ বিধানাবলী পরিবর্তন করতে পারে। এতে সমস্যার সব সমাধান হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ অনুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কি কি তা নিজে বলেননি' তার তাঁর পরিচারক আনন্দ ও তাঁকে প্রশ্ন করেননি। এই ত্রুটির জন্যে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে আনন্দকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির বিধান করা হয়েছিল। যা যাই হোক, বুদ্ধের উপদেশের অনেকাংশই আজ পরিবর্তিত করা হয়েছে। চীনদেশের বহু আচার-পদ্ধতির সহিত এদেশের ভিক্ষুর আচারে অনেক গরমিল।

সংঘস্থবির ও ভিক্ষুসমাজ

ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর অবর্তমানে সংঘনায়কের এই ব্যবস্থা করে গেলেন যে, সমগ্র ভিক্ষু-সমাজ যে ভিক্ষুকে জ্ঞান' শীল ও চর্যায় উপযুক্ত বলে মনে করবেন, সকলের সম্মতিক্রমে তিনিই 'সংঘস্থবির' হবেন। গুণ ও কর্মের যোগ্যতার মানদণ্ডে বিচার করে সংঘস্থবির নির্বাচন করার পদ্ধতিই বুদ্ধের অবর্তমানে এ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নিরঙ্কুশ গতিতে বৌদ্ধসংঘকে দেশ-দেশান্তরে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছল।'

সংঘের মধ্যে এই সংঘস্থবির আর সাধারণ একজন ভিক্ষু সংঘের মধ্যে সমান মর্যাদা পেতেন। একজন ভিক্ষুর আপত্তিতে সংঘস্থবিরের প্রস্তাবও বাধা দেওয়া হোত, জীবন-যাত্রার দিক দিয়ে সংঘস্থবির ও ভিক্ষুর মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য ছিল বলে মনে হয় না। একটা বিধান নিয়ে যদি মতভেদ দেখা দিত তবে ভোটের ব্যবস্থার দ্বারা তার মীমাংসা করা হোত। এর নাম হোল "শমথাধিকরণ। কোন্ কোন্ বিরোধের জন্য কি কি বিধানে মীমাংসা করা হবে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা যায় যে, ভগবান বুদ্ধদেব যে নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে এই মীমাংসার বিধান দিয়েছেন তা আজও অনুকরণের যোগ্য।

সংঘস্থবির হওয়ার যোগ্যতা ও গুণাবলীর কথা বিনয়ে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। তাঁর দায়িত্ব হোল সংঘের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে বহু জনের হিত ও কল্যাণ সাধন।

প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতিতে সংঘস্থবির মহাকশ্যপ বললেন, "বিনয়ই বুদ্ধদেবের শাসন বা উপদেশের আয়ু, বিনয় থাকলে বুদ্ধশাসন থাকবে।" বিনয়ের অনুসরণেই নির্বাণের প্রথম সোপানে আরোহণ করা যায়, একথাও বলা হয়েছে। বিনয় হোল বৌদ্ধসংঘের ভিক্ষুজীবনের বিধানাবলী, যেমন আমরা যে যেখানেই থাকি আমাদের রাষ্ট্রের বিধানাবলী পুরোভাগে রেখে অনুসরণ করে চলি, তেমনই বৌদ্ধসংঘের যে কোন ভিক্ষু পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, বিনয় সম্বন্ধে সবাই একমত।

সংঘের বিধানাবলী (বিনয়-পিটক)

বিনয়ের নিয়মাবলী রচনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ভগবান বুদ্ধ যখনই কোন একটা বিষয়ে বৌদ্ধসংঘের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করতেন, তারই বিরুদ্ধে তিনি নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন বিধান রচনা করতেন। এই নিয়ে বিনয়ের মহাবগ্গ, (মহাবর্গ) চুল্লবগ্গ (ক্ষুদ্রবর্গ) ও সুত্তবিভঙ্গে (সূত্রবিভঙ্গ) অনেক গল্প মিলে। তার কোনটা কতদূর সত্যি তা আজ বিচার করা শক্ত। কিন্তু সেই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে সেই সময়ের জনসাধারণের মনোবৃত্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা আজকালকার থেকে কোন অংশে কম জটিল বলে মনে হয় না। ঐ সকল মানুষের চিত্তকে জয় করে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে তোলার জন্যে ভগবান বুদ্ধ যে বিধান করলেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নেতৃত্বজনোচিত দূরদর্শিতা, মনস্বিতা ও সমাজ-চেতনার কথা ভাবলে কৌতূহলের অবধি থাকে না। ঐ সকল নিয়মাবলীর কতক নিয়ম সম্ভবত সংঘস্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় করতে হয়েছিল। যেমন কেউ ব্রহ্মচর্য নষ্ট করবে না, কেউ চুরি করবে না, কেউ কাউকে হত্যা বা হত্যার কার্য করবে না, কেউ আত্মপ্রচার করবে না। এই সকল বিধান যারা লঙ্ঘন করবে তাদের সংঘ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ঐক্য ও সংহতির দিকে চেয়ে তিনি বিধান করলেন যে ব্যক্তি সংঘের মধ্যে কোনরকম শৃঙ্খলা নষ্ট করে সংঘ ভেদ করতে চাইবে বা সেই বিষয়ে ষড়যন্ত্র করবে, তাকে প্রথমে সেই বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে হবে, যদি তাতে প্রতিনিবৃত্ত না হয় তবে তাকে যে শাস্তি দেওয়া হোত তাহার নাম ছিল "সংঘাদিশেষ", অর্থাৎ সাময়িক ভাবে তাকে সংঘের মধ্যে একঘরে করে রাখা হোত।

"বিনয়" যদি কেবল বৌদ্ধ-সমাজের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির বিধান পুস্তক বলে ধরা যায় তবে ভুল হবে। বৌদ্ধসংঘের গঠন ও কার্য প্রণালীর আদর্শের সংগে সামঞ্জস্য রেখে বিনয়-পিটকের এই বিধানাবলী রচনা করা হয়েছিল।

বৌদ্ধসংঘ যে নীতির উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র ভারত শুধু

ময় বৃহত্তর ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়া অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল, তা হোল সংঘের গণতান্ত্রিকতা। সংঘের প্রত্যেক ভিক্ষুকেই একক সংস্থা বলে স্বীকার করা হোত। সংঘের প্রত্যেক কাজেই প্রত্যেক ভিক্ষুর পূর্ণ সমর্থন দরকার। যদি কোন একজন ভিক্ষুও তার বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করতেন তবে তা বন্ধ করা হোত। বিহারের সমগ্র ভিক্ষুদের সম্মিলনে যে সভা বসত তার মধ্যে এক জনকে স্থবির বলে নির্বাচন করা হোত। আজ কাল স্থবির শব্দের সাধারণ অর্থ হোল বৃদ্ধ, যিনি অবথব হয়ে পড়েছেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকেন, বেশী নড়তে চড়তে পারেন না। কিন্তু বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্থবির মানে হোল যিনি জ্ঞানে বৃদ্ধ। সত্যমন্ত্রের সাধনা করে যিনি সত্যব্রত হয়েছেন, মিথ্যার পথে চলেন না। সেই স্থবিরকেই সেই স্থানীয় সভার নেতা করা হোত। সারা ভারতে বহু বিহার ছিল। সেই সমগ্র বিহারের স্থবিরদের নিয়ে যে সম্মিলন হোত তাতে যিনি স্থবির অর্থাৎ চরিত্রে মহান ও জ্ঞানে বৃদ্ধ বলে পরিচিত হতেন, তিনিই মহাস্থবির, সে কথা আগেই বলেছি। রাজর্ষি অশোকের সময়ে এই ধরণের গণতান্ত্রিকতার স্পষ্ট চিত্র বৌদ্ধ-সমাজে মিলে। এই ভাবে কেন্দ্রীয় ভিক্ষুপরিষদের অধীনে সারা ভারত জুড়ে বহু সংখ্যক আবাসিক ভিক্ষু পরিষদ গড়ে উঠে।

বৌদ্ধ-সংঘের গণতান্ত্রিক দৃষ্টি

সংঘের সভার কার্য-পরিচালনের বিধানও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ছিল। কোন একটা নূতন প্রস্তাব সংঘের মধ্যে আনতে হলে কোন দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু আগে সমগ্র সংঘকে উদ্দেশ করে তার প্রস্তাব জানাতেন। তার নাম ছিল 'জ্ঞপ্তি' বাক্য। সেই জ্ঞাপ্তি বাক্য শুনে স্থবির বা অন্য কোন সুদক্ষ ভিক্ষু সমগ্র সংঘকে উদ্দেশ করে সেই প্রস্তাবের সমর্থন চাইতেন। যদি তাঁরা সবাই মৌণ হয়ে থাকতেন তবে সর্বসমর্থিত বলে মেনে নেওয়া হোত। যদি তাঁদের কেউ কোন রকম প্রতিবাদ করতেন তবে তাকে অধিকরণ ব্যবস্থায় নিয়ে যাওয়া হোত।

অতএব এখন খুবই সুস্পষ্ট যে সংঘস্থবিরের সংগে ভিক্ষুর সম্বন্ধ আজকালের প্রজাতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক দেশের শাসক ও জনসাধারণের সম্পর্কের চেয়ে যেমন অধিক অনুগত, ঘনিষ্ঠ, তেমনি অধিক স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন। সংঘস্থবিরকে প্রয়োজন হলে সংঘবিরোধী ও অন্যায় বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার দায়িত্ব ও অধিকার সাধারণ সংঘের ছিল। সংঘ যখন কোন সেবার কার্যে বা সাময়িক কোন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যেতেন, তখন ঐ সংঘস্থবিরের আনুগত্য মেনে নিয়ে তাঁরা ধর্মসৈনিকের মতই অগ্রসর হবার বিধান করেছিলেন। শ্রাবস্তীর দুর্ভিক্ষের সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্মতৎপরতা ও বিনয়-পিটকে রোগী সেবার বিধানে তাঁদের সেবাপরায়ণতার পরিচয় মিলে।

বৌদ্ধসংঘ ও সেকালের সমাজ

সংঘের সংগে সমসাময়িক সমাজের যোগ যে কত অবিচ্ছেদ্য ছিল, তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সমাজকে বাদ দিয়ে কোন জন প্রতিষ্ঠানের চলা অসম্ভব বললেও বেশী বলা হয় না। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ভারতের যে চিত্র মিলে, তাতে ভারতের ব্রাহ্মণ-সমাজের তুলনায় ব্রাহ্মণেতর সমাজের ছবিই বেশী পরিস্ফুট। তার কারণ, ব্রাহ্মণ সমাজে জন্মগত ও বংশগত সূত্রে ব্রাহ্মণত্বের ছাপ ব্যতীত সাধারণের প্রবেশদ্বার সেখানে রুদ্ধ ছিল বললেও মিথ্যা বলা হয় না। কিন্তু বৌদ্ধসংঘে সে জাতীয় কোন নিষেধই ছিল না। বহুজনের হিত ও কল্যাণ সাধনায় যে কোন মানুষ মানবতার শ্রেষ্ঠ অধিকার নিয়ে এগিয়ে আসতো, বৌদ্ধসংঘ তাকেই সাগ্রহে আহ্বান জানাত। তাই সংঘের মধ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মানবতার দাবীতে সমান বলে গ্রহণ করা হোত। সেই সংগে তাদের মধ্যে সমজাতীয়তা ও ঐক্যবোধের জন্য সমান আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, ভাষা ও শিষ্টাচার বিধানের দ্বারা মানুষকে তার মহান্ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে পূজনীয় করে তোলার আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল।

আরও, সমাজ ও সংঘ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর না ক'রে চলতে পারে না। সংঘের জীবনক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র হোল সমাজ। সংঘ হোল সমাজের শক্তি ও আদর্শের আধার। সাধারণ মানুষের পক্ষে সকলপ্রকার স্বার্থ ও রিপুকে জয় করে বিশ্বজনের কল্যাণ সাধনা ও বিশ্বমৈত্রীর চিন্তা করা সম্ভবপর নয়। তাই একশ্রেণীর লোক দরকার, যারা নিজের প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে সেই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মোৎসর্গ করতে পারবে। যে কোন সংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই দিক দিয়ে সমান। তাই সাধারণ লোক যে কোন সংঘের অন্তর্বর্তী লোককে যতটা শ্রদ্ধা করে, অপর সাধারণ লোককে এতটা করে না। আবার সংঘকেও তাদের জৈবিক প্রয়োজনের জন্যে জনসাধারণের উপর নির্ভর করতেই হয়। প্রাচীন ভারতের কৃষ্টিমান সম্প্রদায়ের সংগে সাধারণের যোগ এমনি ভাবেই ছিল। সন্ন্যাসীরা দিতেন গৃহীদের তাঁদের কৃষ্টি, আর পেতেন গৃহীদের থেকে জীবন ধারণের উপযোগী সংস্থান।

বলা প্রয়োজন, প্রাক্‌বুদ্ধ ভারতে ব্রাহ্মণ-সমাজের একদল যাঁরা আজীবন তপস্যা নিয়ে পর্বত অরণ্যে বাস করতেন, তাঁরা বাদে বাকী সাধারণ ব্রাহ্মণেরা জাগতিক স্বার্থলোলুপ হয়ে ব্রাহ্মণের মর্যাদা নষ্ট করেন। ফলে তাঁরা জনসাধারণকে কৃষ্টি দিবার তুলনায় চাপ দিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে চাইতেন। বুদ্ধদেব-এর প্রতিবাদেই বললেন,—ভিক্ষুদের সংঘজীবন সমাজের উপর চাপ দিয়ে চলবে না। তারা ভিক্ষা করে উদর পূরণ করবে। বৃক্ষতলে বিশ্রাম করবে। শ্মশানের পরিত্যক্ত চীর বা চীবর বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করবে। আর গোমূত্র গোময় দিয়ে ব্যাধি দূর করবে। জীবনের স্বল্পতম প্রয়োজনটুকু নিয়ে বেঁচে থাকার যে পরিকল্পনা ও আদর্শ ভগবান বুদ্ধসংঘের জীবনে আরোপ করেছিলেন, তা শুধু সে যুগের নয়, চিরকালের আদর্শের বস্তু।

বৌদ্ধসংঘের সনাতন আদর্শ

আত্মিক উন্নতি ও বিশ্বসেবার মহান্ ব্রতে দীক্ষা নিয়ে যাঁরা সংঘে প্রবেশ করতেন, তাঁদের কাছে জগতের যে কোন সুখভোগ বিষময় ও বিষাদ। তাই তাঁরা দীনতম ভাবেও বেঁচে বিশ্বের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতেন। এই আদর্শের উপর যদি কোন সংঘ বা জনপ্রতিষ্ঠান না নির্ভর করে, তবে জোর ক'রে বলা যায়, তারা কোনদিন তাদের উদ্দেশ্যপথে অগ্রসর হ'তে পারবে না। আজকে দেশে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। কিন্তু অভাব

হয়েছে, ঐ আদর্শের।° যার ফলে আজ প্রতিষ্ঠান গঠন একটা প্রহসনে রূপ নিয়েছে।

শুধু মহান্ আদর্শের বুলি বক্তৃতা দিয়ে কাজ করা যায় না। সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে যে জিনিসটা চাই, সেটা হোল খাঁটী কর্মীর চরিত্রবল। চরিত্রশক্তি বলতে, আত্মসংযম ও কল্যাণ-বুদ্ধিকে সাধারণত বুঝায়। ভারতের শিক্ষার প্রথম সোপান হোল আত্মসংযম। আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মপরীক্ষাই আত্মসংযমের শ্রেষ্ঠ পথ। বৌদ্ধসংঘ তাই এই দুইটি বিষয়েই চাপ দিয়েছিল। আত্মপরীক্ষণের দ্বারাই প্রতি মাসে দুই বা ততোধিক বার প্রাতিমোক্ষ পাঠ দোষক্ষালনের ব্যবস্থাই রক্তমাংসের দেহে গড়া মাটীর মানুষকে ক্ষমা, দয়া ও প্রেমের মূর্তপ্রতীক, স্থবির ও ভিক্ষু ক'রে গড়ে তুলতে পারে। প্রতি মাসে একবার করে নিজেদের দোষ স্খালন করে প্রাতিমোক্ষ পাঠের ব্যবস্থাই সংঘকে পবিত্র ও বীর্যবান ক'রে তুলেছিল।

আবার গোড়ার কথাই বলি, ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর সংঘের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর সকল প্রকার সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও জৈবিক সমস্যা সমাধানের এমন একটা শাশ্বত ইংগিত দিয়ে গেলেন, যাতে পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের লোকের পক্ষেই যে কোন সময়ে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। মূল কথা হোল এই যে, মানুষের মনকে যদি বদলান যায় তবেই সকল সম[illegible] সমাধান হয়। আজ তারই অভাব।

পরিশেষে বলি, যে সময় ভগবান বুদ্ধদেব ভারতের এসেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। পরিনির্বাণের দু'এক শতাব্দী পরেই অশোক ভারতের অন্যতম রাজর্ষি। সুতরাং সেদিনের ভারতের চিত্র আজও ভারতীয়দের [illegible] স্বপ্নের ও আদর্শের জিনিষ। আর প্রাচীন স্বাধীন যুগের ভারতীয়[illegible] যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে তাঁদের জীবনের সমস্যাকে সমাধান করেছিলে[illegible] তার থেকে আজও আমরা কি কি জিনিষ গ্রহণ করতে পারি, ত[illegible] আজকের এই দুর্বল আত্মক্ষয়ি ভারতের পক্ষে আলোচনার বস্তু। প্রসংগত এ কথা বলা চলে যে, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যখন ভারতীয়েরা ইংরেজদের পদলেহনে শশব্যস্ত, সেই সময় যে যে আদর্শ-নেতা সংঘবদ্ধভাবে আত্মবিস্মৃত জনসাধারণকে সজাগ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, স্বামী দয়ানন্দের আর্য-মিশন উল্লেখযোগ্য। তাঁরা যে সংঘের আদর্শ ও সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে এগিয়েছিলেন, তাতে প্রাচীন ভারতের সংঘ-জীবনের প্রভাব ও আদর্শ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দের বেলুড়মঠ ও ভগবান বুদ্ধের সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা এক[illegible] বললে অত্যুক্তি হয় না।

নেহরু-গভর্ণমেণ্টের নীতি

শ্রীনীহাররঞ্জন ধরচৌধুরী

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট এমন কতগুলি দুর্বল নীতি গ্রহণ করেছে, যার জন্যে আজ কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টকে হতে হয়েছে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন—অগণিত নির্দোষ নর-নারী হয়েছে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, পিতৃ-পিতামহের আবাস হতে চিরদিনের জন্যে হয়েছে বিতাড়িত। তাদের আর্তনাদে ভারতের আকাশ-বাতাস আজ বিদীর্ণ। কি অমানুষিক বর্বরতা—কি পৈশাচিক অত্যাচারের ঝড় গিয়েছে তাদের উপর দিয়ে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে এক দিন যাদের কোন অভাব ছিল না, আজ কেন তাদের এ দুরবস্থা? আজ কেন তারা এক মুষ্টি অন্নের জন্যে অন্যের দ্বারে ভিখারী? কি তাদের অপরাধ? কে দায়ী তাদের এ হৃদয়বিদারক দুরবস্থার জন্যে? যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতার জন্যে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করেছে ও কংগ্রেসের যে সকল নেতৃবৃন্দ আজ ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছেন বিলাসপ্রিয়, সেই কংগ্রেস ও তার নেতৃবৃন্দই দায়ী এ লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ, শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের দুরবস্থার জন্যে। ক্ষমতা লাভের লোভে তারা ভুবনমোহিনী ভারত জননীকে করল বিকলাঙ্গ।

সুদীর্ঘ দিন সাম্রাজ্যবাদ দৈত্যের সাথে সংগ্রাম করে বিজয়-দুর্গের কাছে এসে কংগ্রেস হয়ে পড়ল ক্লান্ত। ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো প্রবল। রণক্লান্ত হয়ে তারা একান্ত ভাবে কামনা করল আরাম। আর তারা পেলোও তাই। আজ ভারতের সর্বত্র চলেছে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একাধিপত্য ও স্বৈরাচার। সুদীর্ঘ দিনের মহান্ আদর্শ বিজয়-দুর্গের কাছে এসে কংগ্রেস দিল ডালি[illegible] কংগ্রেসের আদর্শ ছিল অবিভক্ত ভারত···অবিভক্ত ভারত হতেই বৃটিশের অপসারণ···অবিভক্ত ভারতেই স্বাধীনতা-সূর্য্যের অভ্যুদয়। কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শ হলো চূর্ণ-বিচূর্ণ···ভারত হলো দ্বিখণ্ডিত··· এলো বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা···জনসাধারণের স্বাধীনতা ন[illegible] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা···টাটা, বিড়লা, ডালমিয়ার স্বাধীনতা··· আর জনসাধারণ রইলো পূর্বের মতোই প্রদীপের খাড়া হয়ে। গরম তেল গড়িয়ে পড়ছে তাদের গায়ে। স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী হলো স্বাধীনতার অমৃত থেকে বঞ্চিত। কি মর্মন্তুদ এ দৃশ্য!

মুসলিম লীগের দাবী নয়, বৃটিশের একগুঁয়েমী নয়, ভারত বিভাগের জন্যে দায়ী কংগ্রেসের দুর্বল নীতি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি প্রকৃত রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করতে পারত, তবে মুসলিম লীগের দাবী মেনে যেত···লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অচিরেই হতো অবসান। দশ কোটি লোক কি সাহসে ত্রিশ কোটি লোকের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে? লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কংগ্রেসের দুর্বল নীতিরই ফল। বৃটিশ ভাল ভাবেই এ দুর্বল নীতির সুযোগ গ্রহণ করল। যাবার সময় ভারতকে তারা করে গেল তাদের দাবা-খেলার ক্ষেত্র। সে চমৎকার দাবা-খেলা আজ সুরু হয়েছে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অধিত্যকায়।

কাশ্মীর সমস্যা, হায়দ্রাবাদ সমস্যা ও বাস্তুহারা সমস্যা এই তিনটি সমস্যা ভারত বিভাগের প্রত্যক্ষ ফল। বহু অর্থ ও শক্তি ক্ষয় করে

ভারত গভর্ণমেণ্ট হায়দ্রাবাদ সমস্যার করেছেন সমাধান। কিন্তু কাশ্মীর ও বাস্তুহারা সমস্যা নেহরু-কেবিনেটকে খাওয়াচ্ছে নাকানি-চুবানি! সমস্যা-সমুদ্রের তাঁরা পাচ্ছেন না কোন কূল কিনারা। নিজেদের সৃষ্ট সমস্যা হতে তাঁরা বেহাই হতে পারেন না। কিন্তু এ ভুলের জন্যে নেতাদের হয়নি কিছু। জনসাধারণ করছে এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নিজেদের রক্ত দিয়ে। তারাই আমাদের স্বাধীনতার প্রকৃত নিঃস্বার্থ শহীদ।

পণ্ডিত নেহরুর আন্তর্জাতিকতা সর্বজনবিদিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের পণ্ডিতজী অন্যতম। বিশ্বে সুনাম-কস্তুরী বিস্তারের জন্যে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত; এদিকে তাঁর কোন ত্রুটি নেই; অবশ্য এতে বিদেশে আমাদের দেশের বাড়ছে গৌরব। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র বর্তমানে শিশু। শিশু যশ ও গৌরবের কি-ই বা বুঝে। যৌবনে পদার্পণ করেই সে যশঃ অর্জ্জন করতে চায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের শিশু-রাষ্ট্র (কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অভিহিত) আজ যশের জন্যে লালায়িত। দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় থাকলেই বহির্বিশ্বে সুনাম বিস্তারের চেষ্টা করা শোভা পায়। এদিকে পণ্ডিত নেহরুর চেষ্টা অবিরাম। আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জ্জন ও রক্ষার জন্যে তিনি অনাহারে থেকেও ঘরের অন্ন অন্যকে দিতে প্রস্তুত। কাশ্মীরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এ মন্তব্যের যাথার্থ্য মিলবে। ভারত বিভাগের পর কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করার কাশ্মীরের অবস্থা তখন ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পাকিস্তানের মদৎ-পুষ্ট দুর্দ্ধর্ষ উপজাতীয়দের আক্রমণে কাশ্মীর বিধ্বস্ত। পরে পাকিস্তানও আক্রমণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং পাকিস্তান তা স্বীকার করতেও বাধ্য হয়। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরের সমস্ত অংশ শত্রুর কবল হতে পুনরুদ্ধার করবার পূর্বেই ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'উনো'র হলো দ্বারস্থ কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্যে। স্বার্থান্বেষী দেশগুলি স্বার্থসিদ্ধির পেলো পথ। পাকিস্তান কাশ্মীরে স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকা-নির্বিশেষে সকলের উপর করেছে অকথ্য অত্যাচার···গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগরকে করেছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দুঃখের বিষয়, এই আক্রমণকারী রাষ্ট্র স্বার্থলোভী দেশের চক্রান্তে আজ বিশ্বের দরবারে হয়েছে আক্রান্ত রাষ্ট্রের সমতুল। ইহা নেহরু-গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতারই ফল। যে সমস্যা তাঁরা নিজেরাই আড়াই বৎসর পূর্বে সমাধান করতে পারতেন, শুধু তাঁদের অদূরদর্শিতা ও সুনাম অর্জনের চেষ্টার জন্যে আজও সে সমস্যার হয়নি কোন সমাধান। 'উনো'র হস্তক্ষেপ ছাড়া হায়দ্রাবাদ সমস্যার কি সমাধান হয়নি? কাশ্মীর সমস্যার কি ঠিক একই উপায়ে সমাধান করা যেত না? স্বার্থান্বেষী দেশের সমবায়ে গঠিত 'উনো'র উপর এ জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের জন্যে নির্ভর করা একান্ত অনুচিত। রাজনীতির ক্ষেত্রে সরলতা ও উদারতার কোন স্থান নেই। কিন্তু ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সরলতা ও উদারতা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষ পাকিস্তানের প্রতি অত্যন্ত সরল ও উদার। আর পাকিস্তান ভারতের সরলতা ও উদারতাকে করছে পদদলিত। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের ভার 'উনো'র উপর ন্যস্ত করাও পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সরলতা ও উদারতার পরিচায়ক। পাকিস্তানের প্রতি উদার নেহরু-গভর্ণমেণ্ট 'উনো'তে যাবার ভুল আজ বুঝতে পারছে। তাই সর্দারজী বলেছেন,—"The mistake we made was ever to go to the Assembly (U. N. O.). We should have solved the matter overselves as we could have done."

কাশ্মীরের অবস্থান শুধু বর্তমান সময়ে নয়, সকল সময়েই গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীর ছাড়া ভারত চলতে পারে না···কাশ্মীর হস্তচ্যুত হলে ভারতের স্বাধীনতাও হবে বিপন্ন। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, আফগানিস্থান, রুশিয়া, চীন—এই পাঁচটি দেশের দ্বারা কাশ্মীর পরিবেষ্টিত হওয়ায় বর্তমান সময়ে ইহার strategic importance অত্যন্ত বেশী। পাশ্চাত্য দেশগুলি কাশ্মীরকে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্যে ব্যস্ত। বৃটেন ও আমেরিকার স্বার্থ যেদিকে 'উনো'ও সেই দিকে। সুতরাং 'উনো'র থেকে সুসমাধান আশা করা বাতুলতা মাত্র। 'উনো' কখনও কাশ্মীর সমস্যার সুসমাধান করতে পারবে না। কাশ্মীর হয় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত হবে, নতুবা ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সুরু হবে যুদ্ধ, যার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে সমগ্র বিশ্বে।

বর্তমান ভারত গভর্ণমেণ্টকে হতে হয়েছে পর্বতপ্রমাণ উদ্বাস্তু-সমস্যার সম্মুখীন। ভারত বিভাগের পর পশ্চিম-পাঞ্জাব হতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিজেদের জীবন ও সম্মান রক্ষার্থে ভারতে আসতে আরম্ভ করে মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে। একান্ত বিপদে না পড়লে কেহ কখনও পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয়প্রার্থী হয় না। পাকিস্তানে হিন্দুদের নেই কোন স্থান··· নেই কোন অধিকার···নেই কোন স্বাধীনতা···সম্পত্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের স্বাধীনতা—সমস্ত হতেই আজ তারা বঞ্চিত। পাকিস্তান ঐস্লামিক রাষ্ট্র, হিন্দুর তথায় কোন স্থান নেই। পাকিস্তানের হিন্দুদের বাঁচবার দু'টি পথ আছে—(১) ভারতবর্ষে চলে আসা, নতুবা (২) পাকিস্তানে মুসলমানের গোলাম হয়ে থাকা। তারা গ্রহণ করল পূর্ব উপায়। ভারত বিভাগের পর পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত হিন্দুই ভারতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুর এক বিরাট অংশ তখনও তথায় পূর্বের মতো বসবাস করবার জন্যে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। আর তাদের উপর চলে মুসলমানদের অবর্ণনীয় অত্যাচার। তাদের অত্যাচার তৈমুরলঙ্গ ও চেঙ্গিস খাঁর অত্যাচারকেও করে দিয়েছে ম্লান। দেশ-বিভাগের সময় ভারতবর্ষ পাকিস্তানের হিন্দুদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতামত্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ তাঁদের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছেন। পাকিস্তানের হিন্দুদের সাথে তাঁরা করেছেন বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁদের প্রতিশ্রুতিতেই হিন্দুরা দেশ-বিভাগে সম্মত হয়েছিল। পাকিস্তানের হিন্দুদিগকে রক্ষা করবার জন্যে নেহরু-গভর্ণমেণ্ট বিশেষ কিছুই করেনি। হিন্দুদিগকে রক্ষার জন্যে পাকিস্তানের সাথে কয়েকটি চুক্তি করেছে মাত্র। কিন্তু পাকিস্তান চুক্তিকে এক টুকরা কাগজের বেশী মূল্য দেয়নি। পাকিস্তানের সাথে ভারতের চুক্তি পাকিস্তানে হিন্দু-নিধন যজ্ঞে ঘৃতাহুতি। চুক্তির ফাঁকে-ফাঁকে মুসলমানগণ পাকিস্তানকে করেছে হিন্দুশূন্য···হিন্দুর বিশাল সম্পত্তি করছে উপভোগ। ভারতের সংখ্যালঘুগণ যখন থিয়েটার-কক্ষে বা চলচ্চিত্র-গৃহে আনন্দ উপভোগে মত্ত, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুগণ তখন ভয়ে-উৎকণ্ঠায় কেহ অপেক্ষা করছে পাকিস্তানী

বর্বরদের আক্রমণ, কেহ বা হচ্ছে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই এপ্রিল গান্ধী-জিন্না যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তা ব্যর্থ হয়। তার পর পাকিস্তানের সাথে চুক্তি হয় ১৯৪৮এর এপ্রিল ও ডিসেম্বরে। এই চুক্তিগুলির মৌলিক উদ্দেশ্য একই—উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের বিষয় নিয়ে। কিন্তু পাকিস্তান একে-একে সব চুক্তিই ভঙ্গ করেছে। তথাপি ভারত গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তানের সাথে চুক্তি করেই পাকিস্তানের হিন্দুদিগকে রক্ষা করতে চায়। তাই পণ্ডিত নেহরু আবার পাকিস্তানের সাথে চুক্তি করেছেন গত ৮ই এপ্রিল। এই চুক্তিও পাকিস্তানে হয়নি কার্য্যকরী। আজও পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর চলেছে অকথ্য অত্যাচার…ডাকাতি, নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, হিন্দুর সম্পত্তির উপর অধিকার বিস্তার করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ডাঃ মুখার্জি নেহরু-কেবিনেট হতে পদত্যাগ করবার সময় পার্লামেণ্টে বলেছিলেন যে, এই চুক্তি দ্বারা পাকিস্তানের হিন্দুদের কিছুই লাভ হবে না, বরঞ্চ ভারতের দুর্বল নীতির জন্যে তারা আরো নিগৃহীত হবে। ডাঃ মুখার্জির ভবিষ্যদ্বাণী আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ডাঃ মুখার্জি সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, চুক্তির পর ৯ই এপ্রিল হতে ৩১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর ৫০২টি অত্যাচার হয়েছে। অপর একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, ১লা মে হতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর আরো ৬৩০টি অত্যাচার হয়েছে। এখন আমরা নিঃসঙ্কোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি যে, দিল্লী-চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে…পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। পাকিস্তান ভারতের সাথে এই চুক্তি করত না যদি না তার অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হতো। পাকিস্তান হিন্দুদের রক্ষার জন্যে চুক্তি করেনি; চুক্তি করেছে তার অর্থনৈতিক কাঠামো শক্ত করবার জন্যে। কিন্তু আমাদের নেহরু-গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তানের এ কৌশল বুঝতে পারেনি।

হিন্দুরা পাকিস্তানে ভারতের প্রতিভূ-স্বরূপ। মুসলমানগণ এক-এক বার তাদের উপর অত্যাচার করবে, আর ভারত হতে প্রয়োজনীয় জিনিষ আদায় করবে। প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ ওরাই। যেন-তেন-প্রকারেণ জয়লাভই রাজনীতির বিশেষত্ব। রাজনীতির মূল জিনিষ আমাদের নেতাদের অজ্ঞাত। পূর্ব-পাকিস্তা[ন] অবশিষ্ট হিন্দুর ভাগ্য নির্ভর করছে কাশ্মীরের উপর। পাকি[স্তান] যদি কাশ্মীরে ভোটে হেরে যায়, তবে পাকিস্তানে আর হিন্দুর চি[হ্ন] থাকবে না। নেহরু-গভর্ণমেণ্টের নীতি আমাদিগকে কি দুর্যো[গের] সম্মুখে নিয়ে যাচ্ছে, একমাত্র ভবিতব্যতাই জানেন।

নেহরু-গভর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতা লক্ষ্য করবার বিষয়। বিলা[স]প্রিয়তা ও অমিতব্যয়িতা হয়ে উঠেছে নেহরু-গভর্ণমেণ্টের নি[ত্য] সহচর। বিলাসী নেহরু আজ কন্যা-সমভিব্যাহারে সাত স[মু]দ্রের নদী পেরিয়ে যাচ্ছেন ভোজনবিলাসীর দেশে। আমাদের ম[া] ভাই ও ভগিনীরা যখন বর্বরের নিষ্ঠুর হাতে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়ি[ত], দেশের পুনর্গঠনের জন্যে যখন প্রয়োজন বিপুল অর্থ, সহস্র সহ[স্র] লোক যখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে যাপন করছে তাদের দিন, দেশে[র] অর্থ অপচয় করে পণ্ডিতজী তখন যাচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ায় কন্যা-পুত্র সমভিব্যাহারে; প্ল্যানিং কমিশান গঠন ও রেল-লাই[ন] বিভাগ করে অযথা খরচ করছেন অর্থ।

ভারত বিভাগ সমর্থন করে কংগ্রেস যে অপরিণামদর্শিতা[র] পরিচয় দিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে, ভারত বিভাগ মাইনরিটি সমস্যার করবে সমাধান। কিন্তু হলো বিপরীত; সৃষ্ট হয়েছে বহুবিধ জটিল সমস্যা; পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চলেছে রেষারেষি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা, পাকিস্তানের প্রতি উদারতা ও উদাসীনতা, বিলাসপ্রিয়তা ও অমিতব্যয়িতা নেহরু-কেবিনেটকে দিন-দিন করে তুলছে অপ্রিয়। তাঁদের দুর্বল ও সামঞ্জস্যহীন নীতি দেশকে নিয়ে যাচ্ছে এক মহা দুর্যোগের সম্মুখে। আজ তাঁদের এই নীতির চাই আমূল পরিবর্তন। নতুবা জনসাধারণের ধৈর্য্য শেষ সীমায় পৌঁছালে যে প্লাবনের সৃষ্টি করবে, তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না কারো—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাচারী কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ভেসে যাবে সে অভূতপূর্ব প্লাবনের দুর্বার স্রোতে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেনার হিসাব

ট্রেডস এসোসিয়েসান ৫০০৲, বাবু কালিচরণ ঘোষ ৫০০০৲, টালিগঞ্জের মথুর কুণ্ড ৪০০০৲, গোবিন্দচন্দ্র দে, বহুবাজার ৩০০০৲, দ্বারকানাথ মিত্র ২৫০০৲, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, শ্যামবাজার ১১০০৲, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর ১৬০০৲, রাজেন্দ্র দত্ত ডাক্তার, চন্দননগর ২০০৲, কেদার ডাক্তার ২০০৲, গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ১০০০৲, লালা, বড়বাজার ৮৫০০, গমেজ সাহেব ৫০০৲, বিশ্বনাথ লাহা ১০০৲, দে কোং ১০০৲, মানভূম ৫০০৲, ম.নরুদ্দিন ৪০০৲, আমিরণ আয়া ২০০৲, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ৩৬০০৲, বেনারসের রাজা ১৫০০৲, মতি-চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০৲, উমেশচন্দ্র বসু ও মুনসীর মিহি আনা ৫০০৲, বাটী ভাড়া ৩৯০৲, চাকরের মাহিনা ৭০০৲।

পশু-পক্ষীর মিলন-খেলা

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

ময়ূর আমার নাচে রে—

বনমাঝে তরুশাখে বিবাগিনী ময়ূরী ফুল-বিছানো তরুতলে ময়ূর নাচে! রঙের মণিকোঠা ময়ূরকণ্ঠী কণ্ঠ দুলিয়ে, বিচিত্রিত পেখম ছড়িয়ে ঘুরে-ফিরে, তালে-তালে ময়ূর নাচে!

ময়ূরের মনমাতানো যে নাচে কবির মনে ভাবের দোলা,—কবি গেয়েছিলো—

'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে।'

নীরব নাচের সাথে ময়ূরের মুখে যেন ভাষা ফুটে ওঠে,—ওগো প্রিয়া, বসন্ত যে ডাক দিয়েছে, শুনতে পাওনি? এসো প্রিয়া, এসো, এসো—দু'জনে আজ ঋতুরাজ বসন্তের আবাহন-গান গাই—

'আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে, শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণ মদিরা—'

এদের মনের উচ্ছ্বাস শুনে জীববিদের মনেও ভাবের হাওয়া বয়। জাগে তাদেরই মধ্যে কয়েক জনের মনে প্রশ্ন,—ময়ূরীর তুলনায় ময়ূরের দেহে এই অপূর্ব বর্ণ-সমাবেশের কারণ কি? ময়ূরের মতো ময়ূরীর পেখমই বা নেই কেন? তার পর বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ময়ূরের এই যে মনোরম নৃত্য, এরই বা উদ্দেশ্য কি?—এ সবের কি কোন মানেই নেই?

লাগে খুঁজতে তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর। তার পর দীর্ঘকাল-ব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পর অভিমত প্রকাশ করলো যে, ময়ূরের দেহের এই বর্ণাধিক্য ও পেখম প্রিয়াকে আকৃষ্ট করবার জন্যই এবং পেখমের বিস্তার সহ এই যে নাচ, তাও ঐ একই কারণে,—প্রিয়ার মন-ভোলানো,—উদ্দেশ্য যৌন-মিলন।

অন্য অনেক জাতের পাখীর ময়ূরের অনুরূপ রঙ ও আকৃতিগত বৈষম্যের উদাহরণ দিয়ে তারা তাদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলো। তার পর পক্ষি-জগতের বাইরে পশু-জগতের অধিবাসীদের কোন জাতির মধ্যেও অনুরূপ যে সব ব্যতিক্রম দেখা যায়, তারও উল্লেখ করে তাদের সিদ্ধান্তকে মোক্ষম ও অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করলো। তারা বুঝিয়ে দিলো যে, মৃগ বা ঐ জাতীয় অন্যান্য জীবের পুরুষের মাথার শিং ও রঙের পার্থক্য, সিংহ ও বানর জাতীয় পুং-বেবুনের গ্রীবার কেশর, বেবুনের জ্ঞাতি পুং-ম্যানড্রিলের মুখের ও দেহের স্থানবিশেষের রঙের আধিক্য ও ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি বিভিন্ন অনেক জাতের জীবের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ন্যূনাধিক মাত্রায় বর্ণগত বা আকৃতিগত যে সব পার্থক্য দেখা যায়, সে সবেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রিয়ার মনোরঞ্জন। তারা এই সব বিশেষত্বগুলিকে অপ্রধান বা যৌনগত আনুসঙ্গিক বিশেষত্ব বলে উল্লেখ করলো। যৌন-মিলনের আগে পুং-পক্ষীর নর্তন কুর্দন প্রভৃতি হাবভাবগুলিকে ভাবাবেশ বা মনের উচ্ছ্বাস বলে উল্লেখ করে তারা এই অভিমতও প্রকাশ করলো যে, এরাও,—অর্থাৎ মনুষ্যেতর জীব-জগতের অধিবাসীরাও মানব জাতির স্ত্রী-পুরুষের অনুরূপ রাগ, বিরাগ, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি ভাবাবেগের অধিকারী।

অন্য এক দল জীববিদ্ অন্য রকমের যুক্তি দেখিয়ে প্রথম দলের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিলো। এরা বললো যে, মানুষের,—বিশেষ করে কবি বা কবিভাবাপন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সব বিশেষত্ব পুং-জীবকে অধিকতর সৌন্দর্যশালী করে তোলে বটে,—অর্থাৎ তাদের চোখে এই সব বিশেষত্বের অধিকারীদের বেশী সুন্দর দেখায় বটে, কিন্তু এগুলির সঙ্গে যৌনগত কোন সম্পর্কই নেই। মৃগ বা ঐ জাতীয় পুং-পশুর মাথার শিং এবং সিংহ বা বেবুনের কেশর যথাক্রমে যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধকালে প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ থেকে গ্রীবাদেশ রক্ষণের বর্ম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এরা আরও বললো যে, এই সব বিশেষত্ব পুং-জীবের পক্ষে উচ্চতর শক্তি-সামর্থ ও জীবনীশক্তির পরিচায়ক, যার জোরেই অন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বীর প্রতিযোগিতায় সঙ্গিনী লাভে সমর্থ হয়।

এরা এ কথাও বললো যে, পাখীদেরও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বর্ণ বা আকৃতিগত যে সব বৈষম্য দেখা যায়, তার সঙ্গেও যৌনগত কোন সম্পর্কই নেই। বর্ণগরিমায় মহিমাময় পুং-পক্ষীর তুলনায় নিজ নিজ জাতের সঙ্গিনীদের বর্ণ-নিকৃষ্টতার আসল কারণ হলো—বিপদসঙ্কুল আরণ্য অবস্থায়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের পৃথিবীর আলোয় আনবার আগে ডিম্বাবস্থায় দেহতাপ দেবার সুদীর্ঘ কালটুকু

শিম্পাঞ্জী

সর্পমিথুন

নিরাপদ করা,—অর্থাৎ নীড়ের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিজেদের দেহের সামঞ্জস্য রক্ষা করে শত্রুর লক্ষ্য থেকে আত্মগোপন করা। এটা যদি তাদের না করতে হতো, তবে স্ত্রী-পক্ষীদেরও নিজ নিজ জাতের পুংপক্ষীদের অনুরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই দেখা যেতো।

তার পর ময়ূর বা নৃত্যকলা-পটীয়ান্ অন্যান্য জাতীয় পুংপক্ষীর নৃত্য ও বর্ণচ্ছটা প্রদর্শন প্রিয়ার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে হৃদয়াবেগের পরিস্ফুরণ বলে মনে হোলেও, দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রিয়ার মনে কোন রেখাপাত করে না, বেণাবনে মুক্তা ছড়ানোর মতোই তা অপচয়ের সামিল হয়। পুংপক্ষীর এই সব কসরতে পক্ষিণীর মনোভাবের কোনরূপ বহিঃপ্রকাশই হয় না,—এমন কি সে সেদিকে নজর পর্যন্তও দেয় না। তাছাড়া পুংপক্ষীর এই দেহলাবণ্য প্রদর্শনও নর্তন-কুর্দন-কূজন প্রভৃতির অভিব্যক্তি যৌন-মিলন কাল ছাড়া অন্য সময়েও হতে দেখা যায়।

তারা আরও বললো যে, প্রকৃতির নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষের আঙ্গিক বা যৌন-মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো গর্ভসঞ্চার,—তথা বংশবিস্তার। এই মিলনের মূলে আছে একটা অদমনীয় জৈব তাগিদ। মানব জাতির সৃষ্টির সেই আদিযুগে বন্য অবস্থায় থাকা কালে স্ত্রী-পুরুষ অরণ্যবাসী অন্যান্য জীবজন্তুর মতোই এই জৈব তাগিদের তাড়নাতে,—অর্থাৎ সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির বশেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতো; কিন্তু ক্রমবিকাশের ফলে তাদের মস্তিষ্কের ক্রমোৎকর্ষতার জন্য তারা ক্রমেই এই জৈব তাগিদকে সংযমন করতে শিখলো এবং সেই সঙ্গে প্রেম, অনুরাগ, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তির আবরণ দিয়ে সেই মিলনকে সুষমা-মণ্ডিত করে তুললো। এর আরও পরে পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠিতে পরস্পরের জীবনের সাথী নির্বাচনের সুযোগের প্রচলন করে তারা মিলনকে আরও প্রগাঢ়, আরও প্রদীপ্ত করে তুললো।

মৃগ

কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে এটা আজও সম্ভবপর হয়নি। তারা আজও এই জৈব তাগিদের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নতি স্বীকার করে যৌনপ্রবৃত্তির ইঙ্গিতেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও যৌন-মিলনে প্রবৃত্ত হয়। প্রাণীজগতে প্রত্যেকটি জাতের পশুর যৌন-মিলনের একটা নির্দিষ্ট ঋতু বা সময় আছে, যে সময় উপস্থিত হোলে এই জৈব তাগিদের বশে এবং সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির প্রেরণায় যে কোন স্ত্রী-পশু নিজ জাতের যে কোন পুংপশুর সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হয়,—এমন কি সে সময়ে পছন্দ-অপছন্দের বালাই পর্যন্ত থাকে না। সেই সময়ে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা একাধিক হোলে, স্ত্রীপশু কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত অবস্থায় প্রেমপ্রার্থীদের মধ্যে যুদ্ধের পরিণতি লক্ষ্য করে যায় এবং যুদ্ধ অবসানে বিজয়ীর গলাতেই বরমাল্য অর্পণ করে।

পশু-পক্ষীর বর্ণগত বা আকৃতিগত বিশেষত্বগুলির সঙ্গে যৌনগত কোন সম্পর্ক না থাকলেও, পাখীদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা বলে কোন কিছুই নেই বললে বেশ কিছুটা অন্যায় করা হবে। পক্ষি-জগতের অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি জাতির প্রেমের কাহিনী আজ উপমা স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চখাচকী, হংস প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি জাতের পাখীর দাম্পত্য প্রেমের তুলনা নেই। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই মিলন অনাবিল ভাবেই অক্ষুণ্ণ থাকে,—এমন কি একটির মৃত্যুর পর অন্যটি মৃত-সাথীর দেহালিঙ্গন করে অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়, যত দিন না মৃত্যু এসে তাকে তার সাথীর আত্মার সঙ্গে পুনর্মিলনের সুযোগ দেয়।

এদের মধ্যে এই যে অপূর্ব মনোমিলন তা প্রেম-ভালবাসার স্পর্শ ব্যতিরেকে কি সম্ভবপর হতে পারে? তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এদের মনে প্রেমের স্পর্শমণি কে ছোঁয়ালো? জাতি-প্রজাতি-নির্বিশেষে মনুষ্যেতর প্রত্যেকটি জীবের মস্তিষ্কের নিকৃষ্টতা সত্ত্বেও

স্বপ্ন

সুনীল ঘোষ

সারা সন্ধ্যা তারই প্রতীক্ষায় উন্মনা হয়ে বসেছিলাম। পর্দা ঠেলে চায়ের পেয়ালা হাতে যখন সে ঘরে প্রবেশ করল, তখন কিন্তু এক নিমেষেই সমস্ত ভাবনা-চিন্তা তাল-গোল পাকিয়ে গেল। প্রতি দিনের মত আজও তার সর্বাঙ্গ জড়ানো সোনালী-পাড়-বসানো সাদা কাপড়ে। স্বচ্ছ বস্ত্রাবরণে আবৃত মুখের প্রতিটি রেখাও দৃশ্যমান। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসতে লাগল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলাম। চোখ তুলে একবার নিশ্চয় তাকাবে। মনে হল, ওর চোখের তারায় অনেকখানি আবিষ্কার করতে পারব। কিন্তু একটি বারের জন্যও সে তাকালো না চোখ তুলে। অতি কাছাকাছি এসে টেবলের উপর চায়ের পেয়ালা রেখে দিল আলগোছে। তার সাড়ীর খসখসানি আর দেহের সৌরভে সহসা বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, ঝিম-ঝিম করে উঠল স্নায়ুতন্ত্রী। এক মুহূর্ত। আবার সে পেছন ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সারা সন্ধ্যা বসে-বসে যত কিছু করব বলে ভেবে রেখেছিলাম, সবই ব্যর্থ হতে চলল। নাঃ, আজ আর কিছুতেই ছাড়া চলবে না। ওকে জানতেই হবে ভাল করে।

ডাকলাম—শুনুন।

মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল কিন্তু মুখ ফেরালো না। তার পর আবার পা বাড়ালো বাইরের দিকে।

—শুনুন, আপনাকেই ডাকছি আমি।—দৃঢ় কণ্ঠে বললাম। হঠাৎ আমি কোথা থেকে যেন ফিরে পেলাম আমার স্বাভাবিকতা।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সে। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

—চায়ের কাপটা একটু বদলে দেবেন দয়া করে। গায়ে ময়লা লেগে আছে।

এবার সে ফিরে তাকালো। তার দু'টি আয়ত চোখের তারায় বিদ্যুতের প্রেরণা ছিল। আমার শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত হল তার তরঙ্গ। ধীর পদক্ষেপে সে এগিয়ে এল আমার টেবলের সামনে। হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা ধরতে যাবার আগেই আমি তার সুডৌল কব্জি মুঠির গ্রন্থিতে বেঁধে ফেললাম। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসু-নয়নে আমার মুখের দিকে তাকালো সে। তার চাপা ঠোঁটের কোণটা একটু কঠিন হয়ে উঠল।

—আপনাকে আমি চিনি, বলুন তো কোথায় দেখা হয়েছে এর আগে?

—আমায়?—তার চোখে-মুখে দারুণ বিস্ময় ফুটে উঠল।

—হ্যাঁ, আপনাকেই।…আপনার মুখের সজীব স্নিগ্ধতা, আপনার দু'টি কালো চোখ…সুদীর্ঘ কেশের নিবিড়তা…

হঠাৎ পিছন ফিরে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। যাবার আগে [illegible] ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসির যে রেখা ফুটে উঠেছিল, সে আ[illegible] দৃষ্টি-বিভ্রম নয়। গা শিরশিরিয়ে উঠল লজ্জায়। জানলা [illegible] বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে বোকার মত বসে রইলাম। সাম[illegible] শুকনো নদীর বালিয়াড়ী সুদূর দিগন্তস্পর্শী। চাঁদের আলোয় চিক-[illegible] করে জ্বলছে বালুকণা। হঠাৎ ঝিম ধরে গেল মেজাজে। শার্ট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এপ্রিলের চাঁদিনী রাতে ফাঁকা মাঠের ঠাণ্ডা বাতাসে নেশা ধ[illegible] গেল একটু-একটু করে।

কৈশোরে কোন ঘুম-ভাঙ্গা রাতে ইথারের ঢেউ বেয়ে-আসা কো[illegible] সুরের ঝঙ্কার অসহ্য আবেগে অধীর করে তুলেছিল আমার হৃদয়কে। সে সুর আজও আমাকে অস্পষ্ট অনাস্বাদিত চেতনার দিকে এগি[illegible] নিয়ে যায়। সে সুর যেন অনন্ত রহস্যের প্রতীক। আমার মনে[illegible] প্রাঙ্গণে কত কল্পনার ভাঙ্গা-গড়া তাকে কেন্দ্র করে।…মনে হ[illegible] যেন প্রচণ্ড প্রেমে থরো-থরো কাঁপছে আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা। এ এক সর্বব্যাপী অনুভূতি—মাঝে-মাঝে এমন হয়। এ বিরা[illegible] বিশ্বে একান্ত করে আমারই জন্য লুকিয়ে আছে কোন আকু[illegible] অনুরাগ। আমি তার স্পর্শ পাই আবার হারাই।……

—কি ভাবছেন অত?

পেছনে নারী-কণ্ঠ খিল-খিল করে হেসে উঠল। চমকে ফি[illegible] তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হবার উপক্রম হল।

—আশ্চর্য, আপনি হাসতে পারেন?

—নিশ্চয়ই পারি। [illegible] পারি। চলুন নদীর পাড়ে গিয়ে বসি।

উঠে দাঁড়ালাম। তার সাজ-পোষাকের বহর দেখে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। এত রঙ-চঙ, জাঁক-জমক আগে কখনও দেখিনি। এক দিন একসঙ্গে থাকার পর হঠাৎ এই গায়ে-পড়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারটা মোটেই হজম করতে পারছিলাম না।

চলতে চলতে হঠাৎ সে বলল, আপনি আমায় নিয়ে ভারী বিপদে পড়েছেন—তাই না?

যত দূর সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে বললাম, আপনাকে ভারী চেনা-চেনা মনে হয় অথচ কিছুতেই চিনতে পারি না—সমস্যাটা এই। বলুন তো, কোথায় আপনাকে দেখেছি?

—বলুন তো কোথায়? উজ্জয়িনীতে? রেবা নদীর তীরে?

পাখীদের মধ্যে এই ব্যতিক্রম কি করে ঘটলো,—তাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা কি করে বাসা বাঁধলো, যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে তার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ কে করবে? দর্শন শাস্ত্রের অবোধ্য অনেক কিছুর মতো এটাও কি চিরদিন অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে?

তবে একটা কথা এই যে, পশু-জগতের অধিকাংশই বহুপত্নীক। মনুষ্যেতর জীবের যৌন মিলন প্রসঙ্গে আগে যে সিদ্ধান্তের কথা আলোচিত হয়েছে, তা এই বহুপত্নীক জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু পক্ষি-জগতের অধিকাংশই একপত্নীক। এই একপত্নীক প্রথার চলন থাকাতে বিহঙ্গ-দম্পতি পরস্পরের যে অবিচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকালব্যাপী সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করে, তার জন্যই হয়তো তাদের মধ্যে মানুষের অনুরূপ প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছে। কিংবা হয়তো এগুলি প্রকৃতির সৃষ্টি-ব্যতিক্রমের নমুনা হিসাবে এই সব পাখীর মধ্যে অনাদি-অনন্ত কাল ধরে বিদ্যমান আছে,—আর আমরা হয়তো তাদেরই অনুসরণ করে এই স[illegible] কোমল মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছি।

পূজা-মাঙ্গলিক
সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,— শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
দানের আনন্দ একান্তভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা
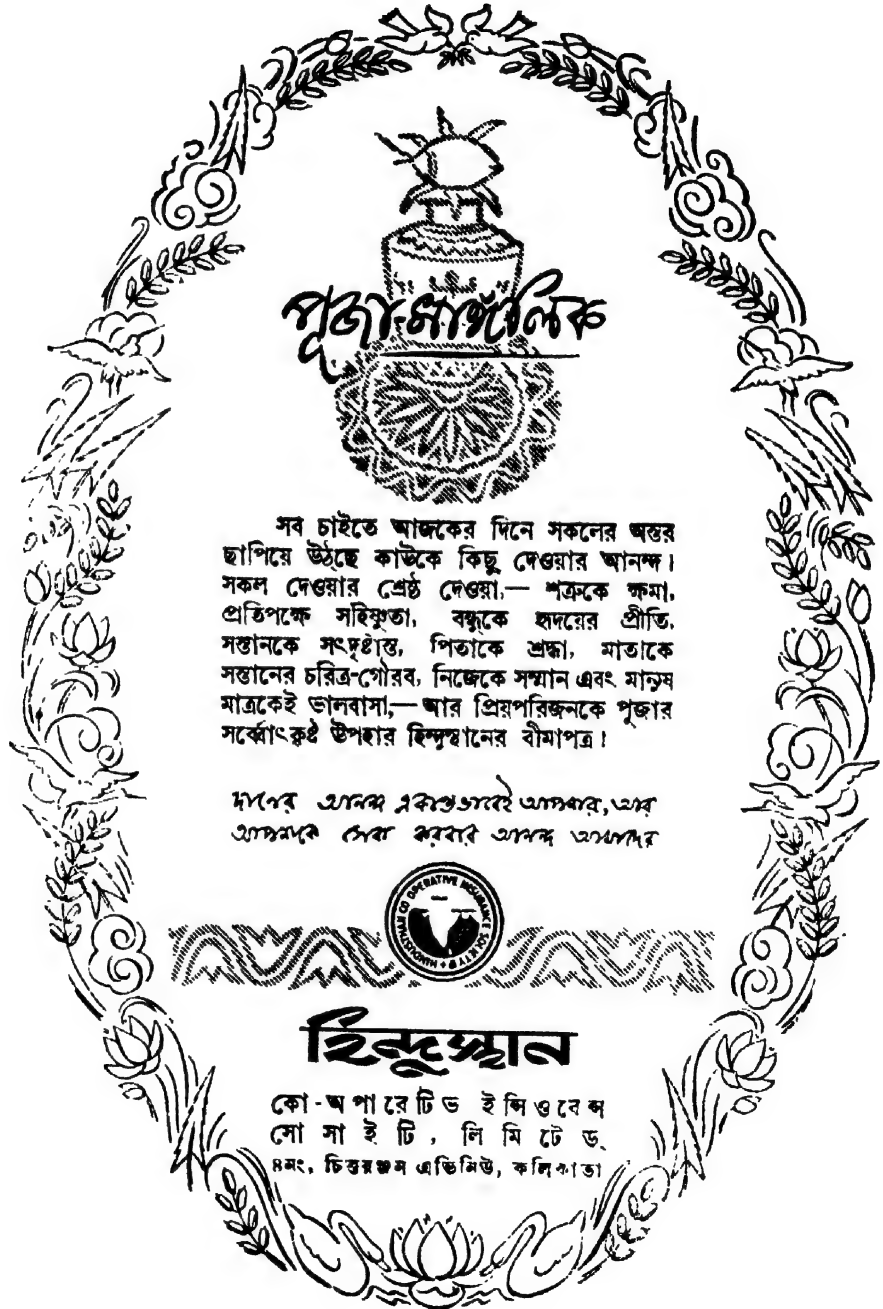
তার উচ্ছ্বসিত হাসির এলোমেলো ছন্দে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। বলল, আমার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না।

না—না—না, চিনতে পারলাম না। পারবোও না কোন দিন। সত্যিই তো আর ও আমার পরিচিত নয়। ও শুধু আমার কল্পনাকে রূপ দিয়েছে মাত্র। কিন্তু ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে অস্থির হয়ে উঠলাম মনে-মনে।

—না না আপনাকে কোন কালেই চিনি না—an illusion—please excuse me.

উঁচু গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। তার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল।

—বাঙলা দেশের একটি মেয়ে এক দিন সমাজ-সংসার ত্যাগ করে জানতে বেরিয়েছিল পৃথিবীতে বিয়ে ছাড়া মেয়েদের আর কিছু করবার আছে কি না। চেনেন তাকে?

বাঙলা দেশের কোন্ মেয়ে কবে সমাজ-সংসার ত্যাগ করেছে কোন্ উদ্দেশ্যে, তার সব খবর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বললাম, কি করে চিনব বলুন? আমি তো আর সর্বজ্ঞ নই?

—তা তো বটেই, কিন্তু আপনি তাকে চেনেন। যদি তার নাম হয় সন্ধ্যা…

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। সমাজপতির লালসার শিকার হতে চায়নি। তাই তারই ষড়যন্ত্রে বিয়ের বাসরে মেয়েটির হবু-স্বামী উধাও হয়েছিল, আর তার প্রেমিক শেষ মুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ছে। শরৎ বাবু সেই বামুনের মেয়ে সন্ধ্যাকে ঘর ছাড়া করিয়েছিলেন, কিন্তু তার পর থেকেই সে নিরুদ্দেশ…

—যদি হঠাৎ তার দেখা পেয়ে যান?

বিদ্যুৎ-স্পর্শের মত ফিরে তাকালাম মেয়েটির দিকে। তার কৌতুকময় উৎসুক নয়ন আমার মুখের উপরই নিবদ্ধ ছিল। বললাম, তাহলে তাকে বলতাম, ওগো সন্ধ্যারাণী, তুমি চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবার যে সঙ্কল্প নিয়েছ, তাতে আর যাই হোক, তোমার জীবন সার্থকতায় ভরে উঠবে না। আধ্যাত্মিকতার পথে মরীচিকার পিছনে ছোটা ছাড়া আর তো কিছুই মিলবে না। বিবাহের চেয়েও বড় কিছু করবার কঠিন পণ নিয়ে বাড়ী ছেড়েছ, কিন্তু আসল পথটাই খুঁজে পাওনি। যারা তোমায় মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের ধ্বংস করে তোমার মর্যাদার সামিল একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু তুমি তা করনি। তুমি অপরের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছ নিজের উপরেই। একে বলে আত্ম-পীড়ন, বিদ্রোহ নয়।

—শুধু এই কথাই বলতেন? আর কিছু না?

—আরও কিছু হয়ত বলতাম, কিন্তু তা তো শোনাবে রাজনৈতিক বক্তৃতার মত, কিন্তু এই মুহূর্তে…ইচ্ছে করছে না।

দু'জনে চুপ-চাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। মনে হল গভীর চিন্তায় মগ্ন মেয়েটি। আমি বালির উপর আঙুলের ডগা দিয়ে দাগ কাটতে লাগলাম। তার অঙ্গের মৃদু সুগন্ধি পরিবেশে অনির্বচনীয় এবং রোমান্টিক মাদকতা সৃষ্টি করেছিল। তা অঙ্গাবরণের সোনালী জরির উপর প্রতিফলিত জ্যোৎস্না এ বিচিত্র সৌন্দর্যের আবেশে ভরিয়ে তুলেছিল আমার মন।

হঠাৎ সে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, আপনার কথাই ঠিক অরুণ বাবু। সন্ধ্যার পথ-নির্বাচনে সত্যিই ভুল হয়েছিল। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় এক দিন সে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে প্রকৃত পথের সন্ধান। কি বলুন?

—পেলে আমি খুশীই হব।

—সত্যি হবেন?

—তার প্রশ্নের মধ্যে আকুল আগ্রহ লক্ষ্য করে আমি দস্তুর মত বিস্ময় বোধ করলাম। একটি কল্পিত মেয়ে সম্পর্কে এত উৎসাহ কেন ওর? বললাম, একটা মন-গড়া মেয়ের সম্বন্ধে আপনার এত আগ্রহ কেন বলুন তো?

—না-ও তো হতে পারে মন-গড়া। আমাকে তো আর আপনি চেনেন না।

উদাস কণ্ঠে সহজ ভাবে বলল মেয়েটি। বেশ একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি। আসলে ওর বক্তব্য কি?

—কিন্তু যাক ও-সব কথা, হঠাৎ বলে উঠল মেয়েটি,—আজ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি অরুণ বাবু। এক দিন ইচ্ছে করেই আমি আপনার সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলেছি। গত দু'বছর ধরে আপনার বউদির কাছ থেকে আপনার গল্প শুনতে শুনতে আমার মাথায় আপনার সম্বন্ধে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। তার পর যেদিন প্রথম আপনাকে দেখি পর্দার আড়াল থেকে, সেদিন ঠিক আপনার মত আমারও মনে হয়েছিল, যেন আপনাকে আমি চিনি অথচ কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলাম না, কোথায় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। I was also illusioned. তাই কিছুতেই সহজ হতে পারছিলাম না আপনার কাছে। কাল সকালে আপনি চলে যাবেন, তাই মরিয়া হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

আমি হাসি চাপতে পারলাম না। প্রসঙ্গটা এড়িয়ে বললাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি এখনও।

—আমার তো পরিচয় নেই। আমি আপনার দাদার ক্লিনিকের নার্স এবং আপনার বউদি'র পাতানো বোন। আপনার দাদার বাসায় থেকে পড়া-শোনা করি। অতীত পরিচয় মুছে ফেলেছি। ভবিষ্যতে কোন পরিচয় অর্জন করলে জানতে পারবেন নিশ্চয়ই। চলুন এখন ফেরা যাক। অনেক রাত হয়েছে।

অনেক দিন বাদে আর একটা বিনিদ্র রজনী কেটে গেল। একটি নারীকে কেন্দ্র করে জীবনের অনেক রহস্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাই না আমি। আমার কাছে চিরকাল দুর্জ্ঞেয়ই থেকে যাক এই রহস্য। আমি তাই-ই চাই। এ এক অনাস্বাদিত বিচিত্র অনুভূতি। আমার সমস্ত সত্তা আকুল আগ্রহে সাড়া দিয়েছে সেই রহস্য-চেতনায়।

আকাশে চাঁদের শেষ রেখা অস্তমিত। কোটি কোটি তারার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে ঊর্ধ্ব শূন্যতায়। ঝিল্লি-মুখর প্রান্তর বেয়ে ভেসে

আসা স্নিগ্ধ বাতাসে রাত্রির নিবিড় সুবাস গভীর আবেগে ভরিয়ে তুলেছে স্পর্শ-উন্মুখ হৃদয়।

কত সন্ধ্যা রাত্রির তিমির তলে নিঃশেষে লুপ্ত হয়েছে। আজকের সন্ধ্যা···হঠাৎ আমার চেতনার ভাবালুতা মুছে যেতে লাগল। মনে মনে অনেক খুঁজেছি নিরুদ্দিষ্টা সন্ধ্যাকে। বিগত সন্ধ্যার নায়িকাই যদি সেই সন্ধ্যা হয়, তাহলে ক্ষতি কি?

১৯৪৮ সালের এপ্রিলে কলকাতা থেকে হাজার মাইল দূরে সাহারাণপুরে ঘটেছিল ঘটনাটা। কলকাতার হাসপাতাল থেকে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে দাদার কাছে বেড়াতে গিয়ে, সেই যে মেয়েটির সংস্পর্শে এসেছিলাম, তার কথা ভুলতে পারছিলাম না কিছুতেই।

তার পর কেটে গেছে অনেক দিন। আকাশে অনেক মেঘ গলে জল হয়েছে। ১৯৫১ সালের এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় এমার্জেন্সীর একটি অপারেশন কেস আমার হাতে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে জনতার মিছিলের সংঘর্ষে আহত একটি রাজনৈতিক মেয়ের দেহ থেকে বুলেটের টুকরো বার করতে হবে।

অপারেশন চেম্বারে রক্তাক্ত মেয়েটির শায়িত দেহ দেখে চমকে উঠলাম। তার চঞ্চল দু'টি চোখের পাতা নিমীলিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে চিনতে কষ্ট হয়নি। সেই রুক্ষ চুল, শ্যামল লাবণ্য, প্রশান্ত অধর, সুদীর্ঘ গড়ন····

সাহারাণপুর থেকে কলকাতা হাজার মাইলের ব্যবধান। কয়েক মুহূর্ত বিস্মিতের মত তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। কেমন করে সম্ভব হল? সেদিনের সেই কথার মধ্যে সত্যিই কি এত বড় একটা সত্য লুকিয়েছিল?···কিন্তু না: আর দেরী করা উচিত নয়।

ছুরি-কাঁচিগুলো বীজাণুমুক্ত করতে আরম্ভ করলাম। মন যে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তা টের পেলাম হাতের কাঁপুনি দেখে। এ রকম উৎক্ষিপ্ত মন নিয়ে অপারেশনে হাত দেওয়া উচিত কি না, তাই ভাবতে লাগলাম অন্যমনস্ক ভাবে।

হঠাৎ অস্ফুট কাতর-ধ্বনি প্রবেশ করল কানে। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, তার প্রসারিত দু'টি চক্ষু সম্পূর্ণ ভাবে উন্মীলিত। চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ একটা বিষণ্ণ আবেশের সৃষ্টি করেছে। আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোলাটে দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল মেয়েটি। ধীরে ধীরে তার চোখে একটা ম্লান কৌতুক-রেখা ভেসে উঠল। এ শুধু একান্ত করে এই মেয়েটিরই নিজস্ব সৌন্দর্য—অতুলনীয় অদ্ভুত! পাণ্ডুর দু'টি অধরোষ্ঠ নড়ে উঠল—আপনি!···উঃ ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। সত্যি বলুন তো, বাঁচবার কোন আশা আছে?

অত্যন্ত মমতার সঙ্গে আমি তার কপালের এলোমেলো চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিয়ে হাসিমুখে বললাম, নিশ্চয়ই বাঁচবেন। কিছুই তো হয়নি আপনার। দু'দিনেই সেরে যাবে। দেখুন না এক্ষুনি সব সারিয়ে দিচ্ছি।

—Thank you doctor.

আশ্চর্য, এত বড় বিপর্যয়ের মুখেও মেয়েটি তার স্বাভাবিক রহস্য-প্রিয়তা বজায় রেখেছে।

—এবার বোধ হয় সন্ধ্যা পথ ভুল করেনি?
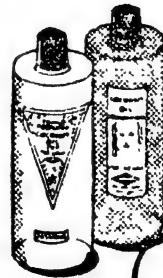
মেয়েটির মুখে সুস্পষ্ট হাসি লেগেছিল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না। কিন্তু ওর পক্ষে এখন আর কথা বলে শক্তি ক্ষয় করা উচিত নয়। ইতিমধ্যেই শরীরের অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। বললাম, ও-সব কথা পরে হবে। এখন চুপটি করে লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে থাকুন, কেমন ?

আবার হাসল সে ম্লান ভাবে, তার পর চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে রইল।

বুলেটের টুকরোগুলো বার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমি তাকে পাঠিয়ে দিলাম ওয়াড়ে।

মাঝ রাতে শুতে যাবার আগে হাসপাতালে এসে দেখলাম গভীর নিদ্রায় মগ্ন মেয়েটি। অবস্থা বেশ ভালই নার্সের মতে।

পরদিন অনেক আগ্রহ সত্ত্বেও ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে দেখা করলাম না, কারণ, দেখা হলেই গল্প করার সখ হতে পারে অথচ ওর পক্ষে এখন কথাবার্ত্তা বেশী বলা একেবারেই অনুচিত।

তৃতীয় দিনে হাসপাতালে এসে শুনলাম আমার রোগী নিরুদ্দেশ। সমস্ত হাসপাতাল তোলপাড় হচ্ছে। পুলিশ অফিসাররা ওয়ার্ডের নার্স আর রোগীদের জেরা করে নাস্তা-নাবুদ করে ছাড়ছেন। কি গভীর রাত্রে কখন যে সে তার রুগ্ন জখম শরীর নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে, সে কথা কেউই বলতে পারল না।

আমার মেজাজটা এক দম বিগড়ে গেল। দাদার কাছে সাহারাণপুরে ট্রাঙ্ক-কল করলাম। কোন খবরই পাওয়া গেল না। সাহারাণপুর থেকে মাস ছয়েক আগেই উধাও হয়েছে। খোঁজ-খবর করার মত পরিচয়টুকু কোন দিনই সে না কি দাদা-বউদি'র কাছে প্রকাশ করেনি। তার উপর উধাও হবার সময় একটা চিঠি লিখে সে তার খোঁজ-খবর করতে নিষেধ করেছিল। কাজেই দাদা কিছুই বলতে পারেন না তাঁর বর্ত্তমান গতিবিধি সম্পর্কে।

সমস্ত দিনটা উদ্বেগ এবং মনস্তাপে কেটে গেল। পালিয়ে সে ভালই করেছে, নইলে হাসপাতাল থেকে সরাসরি তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে চলে যেতে হত। কিন্তু অত রুগ্ন শরীর নিয়ে পালাল কেমন করে ?

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আউটরামের ধারে বসে আর একটা সন্ধ্যার স্মৃতি আমায় মনকে মথিত করতে লাগল।

কূর্দ-বিদ্রোহ

ললিত হাজরা

গত ৫।৯।৫০ তারিখের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেশ বড় ক'রে একটা ছোট্ট সংবাদ বের হ'লো : "তেহরাণ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, অত্র সরকারী সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, ইরাক সীমান্তের সন্নিকটে ইরাণ সরকারের সীমান্ত-রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে কূর্দ উপজাতীয়গণের যুদ্ধ বাধিয়াছে। তেহরাণ হইতে হারিকেন যুদ্ধ-বিমান ও বহু সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। জাভানরৌদি উপজাতীয়গণ ইরাণের সৈন্য বিভাগের চূড়ান্ত নির্দেশ "অস্ত্র ত্যাগ কর" প্রত্যাখ্যান করিবার পর শনিবার হইতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই উপজাতির সংখ্যা হইল বিশ সহস্র। গত ১৯৪৮ সাল হইতে ইরাণ সরকার এই উপজাতীয়দিগকে অস্ত্র পরিহার করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে।"—(পি টি-আই—রয়টার)। ইহার পর আর কোন সংবাদ সংবাদপত্রে দেখা গেল না। হতভাগ্য কূর্দদের জন্যে সংবাদপত্রে আধ ইঞ্চি স্থান মিলল না।

রয়টার-পরিবেশিত সংবাদে শত চেষ্টা সত্ত্বেও কূর্দদের প্রতি আক্রোশ চাপা পড়ে নাই, তা' বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারছেন। এই বেয়াড়া কূর্দ জাতি সুসভ্য ইঙ্গ-মার্কিণ মানব প্রেমিক সরকারের তাঁবেদার ইরাণ সরকারের নির্দেশে অস্ত্র ত্যাগ করছে না। অসভ্য, বেয়াদপের হাতে অস্ত্র থাকা কি সুসভ্য মানুষ সহ্য করতে পারে ? প্রশ্ন উঠবে, কূর্দরা অস্ত্র ত্যাগ করছে না কেন ? এর কারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শোষণে চিমসে-মারা এশিয়াবাসীদের জানা নেই, এমন কথা কেহই জোর-গলায় বলতে পারেন না। কূর্দদের এই লড়াই নতুন নয়। আর এরা উপজাতীয় দস্যু নয়। তা হ'লো পূরা মাত্রায় রাজনৈতিক লড়াই অর্থাৎ মুক্তি-যুদ্ধ। এ লড়াই-এর পিছনে বেশ জোরাল ইতিহাস আছে। সেইটে আগে জানতে হবে।

এক প্রাচীন ও সামরিক জাতি হিসাবে ইতিহাসের পাতায় কূর্দদের এক বিরাট ইতিহাস আছে। ইহুদিদের মত এরা নির্য্যাতিত। নিজের কোন রাষ্ট্রও নেই। কয়েক শতাব্দী ধ'রে এরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা অত্যাচার সহ্য ক'রে টি'কে আছে। বাস করছে বলা যায় না। মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায়—সোবিয়েং আর্মেনিয়ায় কিছু, তুরস্কে ১৫ লক্ষ, ইরাকে ৭ লক্ষ আর ইরাণে ৫ লক্ষ কূর্দ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দী হ'তে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত জার-শাসিত রাশিয়ায় কূর্দরা অত্যাচারে নিষ্পেষিত হ'য়েছে। আর বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তুরস্ক, ইরাণ ও ইরাকে অত্যাচারিত হ'য়ে আসছে। তুরস্ক আরও এক ধাপ এগিয়েছে—তুরস্কের শাসকেরা ধরা-পৃষ্ঠ হ'তে এদের উৎসাদন করার ব্যবস্থা ক'রেছেন। এই অত্যাচারের মাত্রা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম ক'রেছে তখনই এরা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। এই বিদ্রোহ দমনে যত দূর পারা যায়—শাসক সম্প্রদায় অত্যাচার চালিয়েছেন। বিদ্রোহ দমন তাঁ'রা ক'রেছেন। ১৮৮০ সালে সেখ ওবায়দউল্লা ও ১৯০৮ সালে ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে কূর্দরা তুরস্কের স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই সময়ে তুরস্ক ও ইরাণের শাসকদ্বয়ের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব চলতে থাকা সত্ত্বেও উভয়েই একজোট হ'য়ে কূর্দ অভ্যুত্থান দমন করেন। নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস থাকলেও কূর্দ-বিদ্রোহ দমনে কখনও ইরাণ ও তুরস্কের শাসকদ্বয়ের মধ্যে অনৈক্য পরিলক্ষিত হয় নাই। আজও না।

১৯১৪ সালে সমগ্র ইউরোপে মহাসমর বেধে উঠার পর তুরস্ক জার্মেণীর পক্ষাবলম্বন করে। তুরস্কের সাহায্যে জার্মেণী ভারত

আক্রমণ করতে পারে, এই আশংকায় বৃটেন এক কূটনীতির চাল দিল। রাতারাতি বৃটেন দলিত নিষ্পেষিত কূর্দদের দরদী সেজে গেল।° তুরস্কের বিরুদ্ধে কূর্দদের বিদ্রোহ করার উৎসাহ দিয়ে কূর্দদের গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য দিতে লাগল। শুধু কি তাই? এমন প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত দিয়ে ফেলল যে—যুদ্ধান্তে কূর্দদের স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনে বৃটেন আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করবে। অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল—কূর্দদের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে মধ্য-প্রাচ্যে স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। এই উদ্দেশ্য হাসিল করার মতলবে মিত্রপক্ষ ও তুরস্কের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় কূর্দ সেনাপতি শেরিফ পাশাকে বৃটেন দালাল নিযুক্ত করে। এই দালালের প্রচেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হয় আর ১৯২০ সালে সেভার্সে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যাই হোক, এই সন্ধিপত্রে কূর্দদের স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনের অধিকার স্বীকৃত হয় ও এই জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। এই সময়ে তুরস্কের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে কামাল পাশার আবির্ভাব হয়। কামাল পাশা সেভার্স সন্ধিপত্রের সর্তাবলী অগ্রাহ্য করলেন। মিত্রপক্ষের সাথে আবার নতুন ক'রে সন্ধি হ'লো। এই সন্ধিপত্র "লুজেন সন্ধি" নামে পরিচিত। এই সন্ধি-পত্রে কূর্দদের স্বাধীন রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলবার কোন অধিকার ত দিল না—উপরন্তু তুরস্ক, ইরাণ ও ইরাকের মধ্যে এদের ভাগ ক'রে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। লুজেন সন্ধিপত্রে এ কথা স্বীকৃত হ'লো যে, তুরস্ক • সংখ্যাসমিষ্ঠ কূর্দ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক অধিকার স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু কোন দিনও এ অধিকার তুরস্ক স্বীকার ক'রে নাই। সর্ত-পালনের পরিবর্তে কূর্দদের সমূলে উৎখাত করার যাবতীয় সম্ভাব্য পন্থা গ্রহণ ক'রেছে। বৃটেন কিন্তু স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এত বড় পৈশাচিক কাণ্ডের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করে নাই। কূর্দদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ তুরস্ক সরকার নিষিদ্ধ ক'রেছেন; কুখ্যাত 'লেবার কোরে' কূর্দদের জোর ক'রে নিযুক্ত করা হচ্ছে ও কূর্দদের আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করা হ'য়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে কূর্দদের অত্যধিক মাত্রায় কর দিতে হয়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯২৫ সালে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে কূর্দরা সেখ সৈয়দের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রবল পরাক্রান্ত কামাল পাশা কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার অপরাধে সেখ সৈয়দ, ডাঃ ফুয়াদ ও আরও ৪৬ জন কূর্দ-নেতার প্রাণদণ্ড হয়।

ইরাকেও কূর্দ সম্প্রদায়ের অবস্থা একই ধরণের। ইরাকী শাসকের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে সেখ মহম্মদ বারজানজীর নেতৃত্বে কূর্দরা বহু বার বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। অবশ্য বিদ্রোহ দমন করতে ইরাকী সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নাই। ১৯৩০ সালে এক ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এখানেও দেখা যায় ভণ্ডামীর পুনরভিনয়। এই চুক্তিপত্রেও কূর্দদের রাষ্ট্রীক ও সাংস্কৃতিক অধিকার স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইরাকী সরকার এই চুক্তি মত কাজ করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় নেই। ইরাণে রেজা শাহের অনুসৃত কঠোর কেন্দ্রীয়করণের ফলে কূর্দদের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার নষ্ট হ'য়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, নির্বাসন ও হত্যা করতে রেজা শাহ কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

সোভিয়েট আর্মেনিয়ায় কয়েক লক্ষ কূর্দের অবস্থা পূর্ববর্ণিত অবস্থার ঠিক বিপরীত। সেখানে তা'রা মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন ক'রেছে। আর্মেনিয়ার রাজধানী এরিভান শহরই কূর্দি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আধিমানসিক প্রগতির কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে।

১৯৪১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন উত্তর-ইরাণের কিয়দংশ আর ইরাণী আজারবৈজান অধিকার করে। এই সময়ে কূর্দ-অধ্যুষিত অঞ্চলে এক নতুন জীবনের সূচনা হয়। সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কূর্দি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ও কূর্দ জাতীয় আন্দোলন গ'ড়ে উঠে। বহু কালের এই সুপ্ত জাতির জাগরণে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ স্বভাবতঃই ভীত হ'য়ে উঠে। কূর্দ জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ঘোষণা করল, তাদের মাতৃভূমি হবে মধ্য-প্রাচ্যের তৈল-সম্পদে পরিপূর্ণ মসুল ও কিরকুক অঞ্চল। এই উভয় স্থানেই আছে বৃটেনের তৈল-খনি। এই দাবী উত্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইরাকের পার্লামেণ্টে কূর্দ-নেতা মজিদ বে মুস্তাফা ঘোষণা করলেন: "এ কথা সুনিশ্চিত যে, কূর্দদের প্রতি রুশীয়দের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা সমগ্র কূর্দ জাতি আজ জানতে পেরেছে। এই জন্যেই সর্বত্রই কূর্দিরা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প'ড়েছে।" আর যায় কোথায়? ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ এক জোটে ইরাণে কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। আজারবৈজানের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইরাণের আজ্ঞাবহ সরকারকে আজার-বৈজানের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল। এতেও যখন কাজ হ'লো না, তখন চলল সামরিক অভিযান। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ এই সুযোগে প্রচার করতে লেগে গেল এই ব'লে যে, কূর্দিরা দস্যু। এদের জাতীয়তাবাদ নেই, তা আর আন্দোলন! এরা দস্যু। লুণ্ঠন করা হলো এদের পেশা। সঙ্গে সঙ্গে "নরহত্যা ও পাশবিক" অত্যাচারের কাহিনী আবিষ্কার ক'রে দুনিয়াকে শোনাতে লাগল। জনমত বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু কূর্দ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন মরে নাই। সে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এবারে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে নেমেছে। গণতন্ত্র কি না! জনসাধারণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্যে যীশু—ট্রুম্যান, ম্যাকআর্থার, আকিসন, মার্শাল প্রভৃতি অবতারদের ধরাধামে পাঠিয়েছেন! গণতন্ত্রের দপ্তরের এঁরা না কি চিরস্থায়ী মন্ত্রী। সাম্প্রতিক কূর্দ-বিদ্রোহে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনা আছে। কূর্দদিগকে বিপথে চালনা করে ইরাণকে যুদ্ধে নামাবার উদ্দেশ্যে এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম ডগলাসই এই সাম্প্রতিক বিদ্রোহের জন্য দায়ী। "মার্কিণ সমর-দপ্তর হইতে ডগলাসের ইরাণ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁহার ভ্রমণ-তালিকার মধ্যে কূর্দিস্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপজাতি-মহলে ডগলাসের প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ, বিশেষতঃ প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ চালাইবার জন্য ডগলাসের বিভিন্ন বক্তৃতার ফলে ইরাণের সরকারী মহল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইরাণের কোন কোন সংবাদপত্রে কূর্দ-বিদ্রোহের জন্য আমেরিকাকে দায়ী করিয়াছে।" —(ইউ-পি-এ—১৬।৯।৫০)। সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্য-প্রাচ্যে কূর্দদের নিয়ে কি চমৎকার খেল আরম্ভ করেছে! কথা হচ্ছে—কূর্দরা কি এই ভাঁওতায় ধরা পড়বে? অন্ততঃ পক্ষে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের বাসনা চরিতার্থ করতে বুকের রক্ত ঢালবে না।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের ইতিহাসে প্রেম অপেক্ষা ঘৃণার প্রাধান্য বেশী। অন্ততঃ বাইরে থেকে যা দেখা যায়, তাতে তাই মনে হয়। Spengler বলেছেন: "Whoever cannot hate is not a man, and history is made by men." ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে যে ঘৃণা জেগে ওঠে, তার যথার্থ কারণ সব সময় না থাকলেও তাকে নিন্দা করা চলে না। কারণ, দেখা গেছে কেন যে এক জনকে ভালোবাসি এবং আর এক জনকে ঘৃণা করি, তার কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। কিন্তু একটা জাতি কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা শিক্ষা ও সভ্যতার পরিপন্থী।

অথচ হাজার হাজার বছর ধরে আমরা তাই করে আসছি। যারা আচারে, ব্যবহারে, ধর্মে, পোষাকে, ভাষায়, দেহের বর্ণে আমাদের মতো নয়, তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকে। আর এই বিরূপতা পার্থক্যের স্তরভেদে ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। মানুষ শুধু ঘৃণা করেই চুপ করে ব'সে থাকে না; ঘৃণার বস্তুকে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চায়। তাই মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

ভিন্ন গোষ্ঠী বা জাতির প্রতি এই বিদ্বেষ শুধু ঐ যুগের অভিসম্পাত নয়। মানব-সভ্যতার উষা কাল থেকেই এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে অবশ্য জাতি-বিদ্বেষ আজকের দিনের মতো প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। অন্ততঃ ভারতবর্ষে তো নয়-ই। মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত বিদেশাগত ভাগ্যান্বেষীদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত বেধেছে, এবং এই সংঘাতের অন্তরালে বিজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ জেগে উঠতেও মাঝে-মাঝে দেখা গেছে। কিন্তু ক্রমশঃ শক, হুণ সবাই এক ভারতীয় মহাজাতির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল। বিদ্বেষ বেঁচে থেকে অত্যাচারের কোঠা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।

অপরের প্রতি ঘৃণার মূল কারণ আত্মগরিমা। প্রাচীন কালের অহঙ্কারী মানুষ বলত, আমার জাতি শিক্ষায়-সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তোমরা হীন, তোমরা ঘৃণ্য। সে যুগের মিশরীয়েরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য দেহ লাল রঙ দিয়ে রঞ্জিত করত। ওদেশে যে সব বিদেশী ছিল, তাদের লাল রঙ ব্যবহার করবার অধিকার ছিল না।

অ্যারিষ্টটলের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও জাত্যভিমানের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, উত্তর-ইউরোপের অধিবাসীরা শারীরিক শক্তির অধিকারী বটে, কিন্তু অত্যধিক শীতের প্রকোপে তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি বড় একটা নেই। এশিয়ার লোকদের শক্তি ও উদ্দীপনার অভাব। সুতরাং বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও শক্তিমত্তায় শ্রেষ্ঠ গ্রীক জাতিই পৃথিবী শাসন করবার উপযুক্ত। স্বয়ং প্রকৃতি প্রভুত্ব করবার উপযোগী করেই গ্রীকদের সৃষ্টি করেছে। আলেকজান্দার যখন অন্য জাতির সহিত গ্রীকদের বিয়ের অনুমতি দিলেন, তখন অ্যারিষ্টটল দুঃখিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, অনুলোম বিয়ের ফলে গ্রীকদের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব হবে।

এর কিছু কাল পরে রোমান কর্তৃত্বের স্বপক্ষে Vitruvius ঠিক কেউ নেই, সুতরাং একমাত্র তারাই পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করবার অধিকারী। আরব জাতির পক্ষ থেকে ইবণ খালদুনও অনুরূপ দাবি জানিয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিসারো (Cicero) উপদেশ দিয়েছেন, ব্রিটেন থেকে যেন ক্রীতদাস সংগ্রহ করা না হয়। কারণ ব্রিটনদের বুদ্ধি এমনি নিরেট যে, তাদের ক্রীতদাসের কাজটা শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত কঠিন। কালক্রমে এক দিন এই ব্রিটিশ জাতি সমগ্র পৃথিবী জয়ের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল এবং ভূ-চিত্রে লাল রঙ ক্রমশঃ বেড়েই চলল। ইংরেজরা অ্যারিষ্টটল প্রভৃতির মতো স্পষ্টবাদী নয়। তাদের বিবেক বলে একটা বালাই আছে, সুতরাং অন্য দেশের উপর রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক প্রভুত্ব করতে গিয়ে একটা কৈফিয়ৎ এনে বিবেককে চোখ ঠারতে হয়েছে। ইংরেজরা "কালা আদমীদের" পরাধীন করে রেখেছে তাদেরই মঙ্গলের জন্য। এটা white man's burden.

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত তীব্র জাতিবিদ্বেষ বড় একটা ছিল না। মধ্যযুগে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। জেরুজেলামের ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা জুড়ে আছে। আবার খৃষ্টান ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরোধের শেষ ছিল না। ধর্মের নামে কত যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বিজ্ঞান ধর্মান্ধতাকে ধীরে ধীরে দূর করে দিচ্ছে। ধর্মের স্থানে প্রাধান্য পাচ্ছে জাতি-বিদ্বেষ। কোনো জাতি শ্রেষ্ঠ, অন্য জাতিগুলি হেয়, এই তত্ত্ব প্রচারের জন্য প্রধানতঃ দু'জন লেখক দায়ী। এঁরা হলেন Count Arthur de Gobineau এবং Houston Stewart Chamberlain.

কাউন্ট আর্থার দ গোবিনো (১৮১৬—'৮২) বংশ-মর্যাদা সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই সজাগ ছিলেন। বড় হয়ে নিজের পরিবারের আভিজাত্য প্রমাণ করবার জন্য এ সম্বন্ধে চর্চা আরম্ভ করেন। এই চর্চা ক্রমশঃ তাঁকে নিজের পরিবারের গণ্ডী থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে যায় এবং তারই ফলে ১৮৫৩—'৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চার খণ্ডে তাঁর গবেষণা "Essai surl' Ine´galite´ des Races Humaines" নামে প্রকাশিত হয়। গোবিনো এই মতবাদ প্রচার করলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্বেতকায় জাতিগুলিই শ্রেষ্ঠ এবং শ্বেতকায় জাতির বিশিষ্ট গুণগুলি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে আর্য জাতির মধ্যে; জার্মাণরা আবার আর্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। গোবিনো আক্ষেপ করেছেন যে, জার্মাণরা তাদের রক্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করছে না। অবশ্য এই বই পড়বার পর থেকে তারা সচেতন হয়ে উঠল।

হাউষ্টন ষ্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (১৮৫৫—১৯২৭) জাত্যভিমানকে জনপ্রিয় ক'রে তোলবার জন্য দায়ী। ইনিও জার্মাণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রে "Foundations of the Nineteenth Century (1899)" নামক গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, "The less Teutonic a land is the more uncivilized it is." অর্থাৎ, যে দেশে টিউটনিক প্রভাব যত কম সে দেশ তত বেশী অসভ্য। স্বভাবতঃই এই মতবাদ জার্মাণীতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করল। কাইজার উইলহেলম চেম্বারলেনের বই জার্মাণীর প্রত্যেক লাইব্রেরীতে রাখবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

হিটলার তাঁর দেশবাসীকেও ঠিক এই কথাই শুনিয়েছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে জার্মাণরা শ্রেষ্ঠ জাতি। অপর সব জাতি অপেক্ষাকৃত হীন। সুতরাং জার্মাণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হ'লে অন্য জাতির সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন বন্ধ করতে হবে।

বর্তমানে পৃথিবীর সব চেয়ে তীব্র জাতি-বিদ্বেষ রয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। এমন নগ্ন বিদ্বেষ ইহুদীদের বিরুদ্ধে হিটলারও বোধ হয় কল্পনা করেননি। এর পরেই বলতে হয় যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো-বিদ্বেষের কথা। নিগ্রোরা ধর্মে ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে আমেরিকানদের থেকে বড় একটা পৃথক্ নয়। কিন্তু দেহের বর্ণে ও আকৃতিতে পার্থক্য থাকায় নিগ্রো জাতি শ্বেতকায়দের হাতে অত্যাচারিত হয়।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতাকেও ছাড়িয়ে গেছে! পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রসার লাভ করায় ধর্ম সামাজিক জীবন থেকে ক্রমশঃ ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীতে নির্বাসিত হতে বসেছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞানে আজও আমরা পিছিয়ে আছি বলেই বোধ হয় ধর্মের ধ্বজাকে কলহের শস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করি না। এ জন্ম আমরা অনেকে লজ্জা অনুভব করি এবং বিদেশীরাও আমাদের লজ্জা দেয়। কিন্তু আসলে ধর্ম নিয়ে কলহ করা ততটুকুই লজ্জার, যতটুকু লজ্জার দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের ঠ্যাঙানো। তার বেশী নয়। কলহ ধর্ম নিয়ে বা রাজনীতি নিয়ে হোক, তাতে কি যায়-আসে? মূলে সেই মানব-বিদ্বেষ।

জাতি-বিদ্বেষ ও ধর্ম-কলহের পরিণতি অনেক সময় গুরুতর হয়ে পড়ে। একে কেন্দ্র ক'রে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু এ ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনের ছোট-খাটো বিদ্বেষ মন বিষিয়ে তোলে। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে যে প্রাদেশিকতার অভিশাপ দেখা দিয়েছে, তা এই পর্যায়ে পড়ে। এগুলো কখনো যুদ্ধের কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা হয় না; কিন্তু প্রতিদিন ঈর্ষ্যা ও অশান্তির সৃষ্টি করে চলেছে।

আমি হিন্দু বলে মুসলমানরা আমাকে ঘৃণা করবে, অথবা বাঙালী বলে আসামীরা আমার উপর মারমুখী হয়ে উঠবে, এর পেছনে কোনো যুক্তি নেই। বিদ্বেষ মানুষের মনের একটা অন্ধ প্রবৃত্তি, যুক্তির পথে সে চলে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষের কোনো একটা সরল কারণ খুঁজে বের করা যায় না। মানুষের মনের গতিবিধির মতোই ঈর্ষ্যার প্রবৃত্তি দুর্জ্ঞেয় এবং জটিল। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নানাবিধ কারণের সঙ্গে কুসংস্কার মিলে কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর উপর আমাদের মন বিরূপ হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই দু'টো জগৎ আছে। একটা অতি পরিচিত প্রত্যক্ষ জগৎ, অন্যটা প্রত্যক্ষের বাহিরে। 'প্রত্যক্ষের বাহিরে' কথাটা এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, আধ্যাত্মিক অর্থে নয়। শিশুকাল থেকে চার পাশে যা দেখে আসছি তাই স্বাভাবিক মনে হয়। যে ভাষা, যে পোষাক আচার-ব্যবহার দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, সেটা ছাড়া অন্য কিছু সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারি না। যে জগৎটা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, তাকে সন্দেহের চোখে দেখাই মানুষের অভ্যাস। শিক্ষা আমাদের মনে যে ঔদার্য্য এনে দেয়, তার

সাহায্যে পরিচয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডী ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে! যে ব্যক্তি যত শিক্ষিত তাঁর জগতের বিস্তৃতির তত বেশী।

অবশ্য শিক্ষিত লোকের মধ্যেও সংকীর্ণতা কম নেই। তার কারণ, মনের মধ্যে যে কুসংস্কার ছেলেবেলা থেকে দাগ কেটে ব'সে যায়, তা সহজে দূর করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ভলটেয়ার বলেছেন, সংস্কার হচ্ছে নির্বোধের যুক্তি। কিন্তু বিজ্ঞ লোকেরাও সংস্কারমুক্ত হতে সহজে পারেন না। এই বিংশ শতাব্দীতেও অনেককেই হাঁচি-টিকটিকি মেনে চলতে হয়। তেমনি শিশুকাল থেকে যে জাতি বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিদ্বেষের দাগ কেটে বসে যায়, তা বড় হয়ে শিক্ষার সাহায্য নিয়েও দূর করা সম্ভব হয় না। এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত পাচ্ছে। এক বার জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির এক জন বৈজ্ঞানিক নিগ্রো এবং শ্বেতকায় আমেরিকানদের মস্তিষ্কের তারতম্য নিয়ে গবেষণা করেন। দুই শ্রেণীর মস্তিষ্ককে পৃথক পৃথক্ ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তুলনায় নিগ্রোদের মস্তিষ্ক নিকৃষ্ট। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কারণ খুঁজে না পেয়ে বৈজ্ঞানিকের মনে সন্দেহ হলো। তিনি মস্তিষ্কগুলো এমন ভাবে এলোমেলো ক'রে আর একবার পরীক্ষা আরম্ভ করলেন, যাতে বাইরে থেকে বুঝতে পারা না যায় কোন্‌টা নিগ্রোর। আশ্চর্য, এবার কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাওয়া গেল না; সবগুলো মস্তিষ্কই সমগুণসম্পন্ন।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে বাঙালী-বিদ্বেষ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী শিক্ষিত লোকের দ্বারাই আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষা ও যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ বাঙালীরা থাকতে চাকুরী ও ব্যবসায়ে (ওকালতী, ডাক্তারী, ইঃ) তারা অবাধ সুযোগ পাবে না। তাই কৌশলে জনসাধারণের মধ্যে বাঙালী-বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আজকের উৎকট হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলেও রয়েছে মুষ্টিমেয় মুসলিম নেতার দ্বি-জাতি তত্ত্বের মোহ। প্রায় একই কারণে আমরা মাড়োয়ারীদের উপরে রুষ্ট। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করবার অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্যই যেন ওদের ক্রটিগুলি বড় করে দেখবার উদ্দেশ্যে সর্বদা সচেষ্ট হয়ে আছি।

খানিকটা আত্ম-গৌরব জাতির উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। গর্ব থেকে আত্ম-বিশ্বাস আসে এবং তাই থেকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাওয়া যায়। কিন্তু আত্ম-গরিমার অর্থ অন্য দেশ বা জাতিকে একটু ছোট করে দেখা। যখন বলা হয়, ভারতবর্ষ এশিয়ার নেতৃত্ব করবে তখন বুঝাতে চাই যে, এশিয়ার অন্য জাতিগুলি অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ। আত্ম-গৌরব মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যে বিপদ ঘটতে পারে, তার দৃষ্টান্ত জার্মাণী। হিটলার জার্মাণদের শোনালেন, তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের ধমনীর রক্ত পবিত্রতম। এই আত্ম-গৌরবের বাণী সমগ্র জার্মাণ জাতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলল; অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তারা আশ্চর্য রকম শক্তিশালী এক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু তা টিকলো না বেশি দিন; কারণ এর ভিৎ দাঁড় করানো হয়েছিল আত্ম-গরিমার চোরা-বালির উপর।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কম-বেশী অত্যাচার চলে। জাতি-বৈরিতা এর একমাত্র কারণ নয়। দুর্বলের উপরে অত্যাচার করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, তার হাত থেকে খুব কম লোকই মুক্ত থাকতে পারে। সংখ্যালঘুরা, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তুলনায় দুর্বল। সুতরাং নানা রকম লাঞ্ছনা তাদের সহ্য করতে হয়। পূর্ববংগে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের নামে কিংবা লাভের আশায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হয় না? অর্ধ-শিক্ষিত জনগণ সন্ত্রস্ত, দুর্বল গোষ্ঠীকে লাঞ্ছিত ক'রে এক প্রকার অমানুষিক আনন্দ লাভ করে। সংখ্যালঘুদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের নির্দোষ কাজের মধ্যেও কু-মতলব খুঁজে বের করা হয়। এবং মাইনরিটি গ্রুপের কেউ যদি সত্যি কোনো অন্যায় করে, তাহ'লে এক জনের জন্য সমগ্র সম্প্রদায়কে দায়ী করা হয়ে থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি শিক্ষা ও যোগ্যতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবে এমন আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহ'লে বিদ্বেষটা হয় তীব্রতর। পূর্ববংগে হিন্দুদের, যুক্তরাষ্ট্রে উত্তরাংশের শিল্পাঞ্চলে নিগ্রোদের এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা খানিকটা এই কারণেই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

যদিও বিপরীতটাই আমরা আশা করি, তবু সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে বিভেদ বেড়েই চলছে। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ এই বিদ্বেষ-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমানে প্রচার-পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় ভালোর সঙ্গে খারাপটাও সাহিত্য, সংবাদপত্র, বেতার ও ছায়া-ছবির মাধ্যমে প্রচার লাভের সুযোগ পায়। গত মহাযুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে জার্মাণদের ঘৃণ্য প্রমাণ করতে অসংখ্য বই বেরিয়েছে। ভালো লেখকের হাতে পড়লে ঘৃণাও অমরত্ব লাভ করে। শেক্সপীয়র শাইলকের মধ্য দিয়ে ইহুদী জাতির প্রতি আমাদের বিদ্বেষকে চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। অথচ আশ্চর্য এই যে, যত দূর প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় শেক্সপীয়র হয়তো তাঁর জীবনে কখনো ইহুদী দেখেননি। শেক্সপীয়রের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন শত বছর আগে ইহুদীদের ইংল্যাণ্ড থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল; এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বছর পর থেকে ইহুদীরা আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসতে থাকে। শেক্সপীয়রের সময় এক জন মাত্র ধর্মান্তরিত ইহুদী ছিল; সে কিন্তু মহাজনী ব্যবসা করত না। তার নাম ডাঃ লোপেজ, রাণী এলিজাবেথের চিকিৎসক। মনে হয়, শেক্সপীয়র প্রাচীনদের মুখে ইহুদী কুসীদজীবীদের কাহিনী শুনে শাইলকের চরিত্র এঁকেছেন।

পৃথিবীব্যাপী যে সব যুদ্ধ বাধে, তার ফলে জাতি-বিদ্বেষ আলোড়িত হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষ অপর পক্ষকে হেয় করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। কারণ, মনের ঘৃণা হাতের হাতিয়ারের চেয়ে শক্তিশালী; তাছাড়া, পেছনে ঘৃণা না থাকলে অস্ত্রের আঘাতেও প্রচণ্ডতা আসে না। একেকটা বিশ্বযুদ্ধ যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তার আয়ু নিঃশেষ না হতেই আর একটা সংগ্রাম বেধে ওঠে। এমনি করেই বিদ্বেষের পাপচক্র ঘুরে-ঘুরে চলে, থামবার সুযোগ পায় না।

শান্তির দিনেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টগুলি তাদের বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে সরকারী প্রচার-যন্ত্রের সাহায্য নেয়। কখনো কখনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে সরকারই বিভেদ সৃষ্টির সহায়তা করে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন

ক'রে ভারতের যে সর্বনাশ সাধন করে গেছে, তা কারো অবিদিত নেই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার বাঙালীদের অসামরিক জাতি বলে প্রচার করেছিল, এবং তার ফল আজও আমরা ভোগ করছি। এই বিংশ শতাব্দীর এক সভ্য সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতি-বিদ্বেষকে চিরস্থায়ী করবার আয়োজন করছে।

বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। সমান সুযোগ পেলে জাতিনির্বিশেষে সব মানুষই উঁচুতে উঠতে পারে, আবার সব জাতির লোককেই জঘন্যতম অপরাধ করতে দেখা গেছে। আসলে আমাদের জন্ম হয় সমান গুণাবলী নিয়ে; পরে মানুষে-মানুষে যে প্রভেদ দেখা যায়, সেটা হলো তাদের স্বোপার্জিত কালচারের জন্য। সুতরাং কোন জাতি বড়, কোন জাতি ছোট—জাতি-বিদ্বেষের এই গোড়ার কথাটাই বিজ্ঞান অস্বীকার করে। ইউনেস্কো কর্তৃক নিযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এই ব্যাপারে অনুসন্ধান ক'রে সম্প্রতি তাঁদের অভিমত জানিয়েছেন যে, জাতিগত ভেদ-বিচার অস্বাভাবিক এবং অবৈজ্ঞানিক। এই সব মতবাদ প্রচারিত হলেও অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা যায় না। কারণ, বিদ্বেষ মানুষের মনের একটা মূলগত প্রবৃত্তি। কৌশলী লোকেরা এর সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে একে আরো জটিল করে তোলে। মানব-চরিত্রের খানিকটা পরিবর্তন হলেই ভেদ-বুদ্ধি হ্রাস পাবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

কিন্তু একই দেশের সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে যে বিদ্বেষ, তাকে দূরীভূত করা অসম্ভব নয়। আগেই বলা হয়েছে, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সুপরিচিত পারিপার্শ্বিকের বাইরে সব কিছুর উপরেই সে সন্দিহান। যার শিক্ষা যত অল্প তার গণ্ডী তত ছোট। আমাদের এক বাঙালী সমাজের মধ্যেই কত সহস্র রকম বিভেদ। ঘটি-বাঙালের বিরোধ ছেড়ে দিলেও জেলায় জেলায় পর্যন্ত প্রভেদ। বাঙালরা গোঁয়ার, ঢাকার লোক শিক্ষিত, বরিশালের লোকদের মেজাজ গরম,—এমনি ধরণের কত মন্তব্য পথে-ঘাটে কানে আসে। আজকাল বাইরে থেকে এই প্রভেদগুলো বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে বসে এখনো পুরানো সংস্কারগুলোকে আমরা স্বীকার করে চলি।

বাঙালী সমাজের অন্তর্বিরোধ ক্রমশঃ কমে আসছে। তার কারণ, বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মেলা-মেশার ক্রমবর্ধমান সুযোগ। পূর্বে আমরা ছিলাম যে যার গ্রামে আবদ্ধ। কলকাতার মতো আন্তর্জাতিক সহর এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এমনি করেই যদি ছাতুখোর বিহারী ও মাছখেকো বাঙালীর সঙ্গে ভাবের ও রক্তের আদান-প্রদান আরো নিবিড় করে সম্ভব হয়, তবেই প্রাদেশিকতার বিষ পাকাপাকি ভাবে দূর হতে পারে।

এই বিজ্ঞানের যুগেও আমরা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানব-গোষ্ঠীর বিচার করি। অর্থাৎ, ব্যক্তির গুণাগুণ যাচাই না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বকল্পিত জাতি-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তটা ব্যক্তির সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হয়। অথচ এর বিপরীতটাই হওয়া উচিত। ব্যষ্টির অন্তরংগ পরিচয় থেকে সমষ্টি সম্বন্ধে ধারণা করা সংগত। একটা জাতির উপর বিদ্বেষ থাকলেও সেই জাতির ব্যক্তিবিশেষের সহিত বন্ধুত্ব হতে পারে। গত মহাযুদ্ধে জাপান ও জার্মাণীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচার সত্ত্বেও মার্কিণ সৈন্যরা ঐ সব দেশের পরিবারের সঙ্গে মিশেছে, তাদের মেয়েদের ভালোবেসেছে এবং বিয়ে করে স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে যাবার জন্য তাদের গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করেছে। বিহারীদের সম্বন্ধে আমাদের কারো-কারো মনে যে ধারণাই থাক, বাঙালী ধনীরা বিহারী দারোয়ানদের লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও বিশ্বাস করে। সাম্প্রদায়িক হাংগামার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশীকে প্রাণ বিপন্ন করেও রক্ষা করেছে। বিদ্বেষের জন্ম অপরিচয়ের অন্ধকারে। মানুষে-মানুষে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হবে, বিদ্বেষ হার মেনে ততই দূরে পালাবে।

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
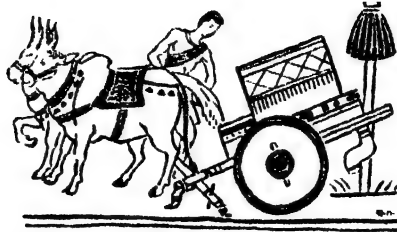
বাইসিকেল বা দ্বিচক্ররথ

চারুকৃষ্ণ মজুমদার

আজকাল য়ুরোপীয় ও আমেরিকান সভ্য-জগতে বাইসিকেলের ব্যবহার একরূপ ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত নরনারী সখের ষ্টীমার, গাড়ী, ঘোড়া ত্যাগ করিয়া এখন বাইসিকেলের আদর করিতেছেন। এই সখের ঢেউ আমাদের দেশেও আসিয়াছে। বাঙ্গলায় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বাইসিকেল চড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রাত্যহিক ব্যায়ামের পক্ষে বাইসিকেল প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহাতে শারীরিক সমস্ত অঙ্গের চালনা হয় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উপযুক্তরূপ ব্যায়াম হইয়া থাকে। যান সম্বন্ধে দেখিতে গেলে ইহা অতি সুন্দর ও শীঘ্রগামী। আমরা যাহাকে বামুনের গরু বলি, ইহা এক রকম তাহাই। পরিচালক চাকরের দরকার নাই—কিছু খাইতে দিতে হইবে না অথচ ঘোড়ার মত এমন কি তাহা অপেক্ষাও বেশী কাজ দিবে।

গত দশ পনের বৎসরের মধ্যে বাইসিকেলের বহুল প্রচার হইয়াছে। পূর্ব্বে একখানি প্রকাণ্ড চক্র ও তৎপশ্চাৎ একখানি অতি ক্ষুদ্র চক্র-বিশিষ্ট যে বাইসিকেল গাড়ী প্রচলিত ছিল তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহাতে আরোহণ করা বড়ই বিপদজনক ছিল এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকেই তাহা ব্যবহার করিত। ইহা চালানও বড় কষ্টসাধ্য ছিল।

দুইখানি সমান আয়তন-বিশিষ্ট চক্র-সম্বলিত সুদৃশ্য যে সকল গাড়ী আজকাল ব্যবহার হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় কলিকাতার ময়দানে দলে দলে নর-নারীগণ যেরূপ সুখোপবিষ্ট হইয়া রথারোহণে ভ্রমণ করেন, তাহা বড়ই মনোরম। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণও এই আরোহণ-বিদ্যায় পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহারাও নিজ নিজ রথকে এরূপ দক্ষতার সহিত সুচারুরূপে চালনা করেন যে, নির্জীব রথ সজীব পদার্থের ন্যায় নিজ প্রভুর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে।

ইংরাজ জাতি সর্ব্বপ্রকার সাহসিক কার্য্যে অগ্রগণ্য। বাইসিকেল চড়িয়া হাওয়া খাওয়া অথবা আফিস যাওয়া কিম্বা দুইচারি ক্রোশ দূরে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করা প্রভৃতি সামান্য ভ্রমণে তাঁহারা পরিতুষ্ট নহেন। মিঃ ফ্রেজার, লো এবং লান নামা তিন জন ইংরাজ দ্বিচক্র রথে চড়িয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। গত শীতকালে লাহোর হইতে তাঁহারা ট্রাঙ্করোড (Grand Trunk Road) ধরিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এ দেশ হইতে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান ভ্রমণ করিয়া আমেরিকা গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাহারা চিকাগো নগর ছাড়াইয়া চলিতেছেন, আর অল্প দিন মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই তিন মহাত্মার সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা ভূয়সী প্রশংসনীয়।

আজকাল প্রধানতঃ দুই প্রকার বাইসিকেল প্রচলিত হইতেছে—প্রথম চেন অর্থাৎ সিকলিযুক্ত ও দ্বিতীয় চেনবিহীন। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলের দিন দিনই উৎকর্ষতা সাধিত হইতেছে। নির্ম্মাতাগণ স্ব স্ব বুদ্ধিবলে নানা প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া নূতন-নূতন নামকরণ করিতেছেন। কিন্তু সে সকল লিখিয়া পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। বাইসিকেল যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের মোটামুটি নাম ও তাহাতে আরোহণ করা বিষয়ে দুই-চারি কথা বলাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জীন (Saddle) যেখানে আরোহী বসিয়া থাকেন। এই অংশ ইচ্ছামত খুলিতে পারা যায়। লৌহ-শলাকা দ্বারা পশ্চাৎবর্ত্তী চক্রের উপর ইহা সংযুক্ত।

হাতল (Handle) আরোহী দুই হাতে ইহা ধরিয়া গাড়ী চালাইয়া থাকেন। ইহা নৌকার হালের মত গাড়ী পরিচালন করে, সম্মুখস্থিত চক্রের উপরিভাগে লৌহ-শলাকা দ্বারা ইহা সংযুক্ত থাকে।

টায়ার (Tyre) গাড়ীর দুই চাকাই মোটা রবার দ্বারা মণ্ডিত। ইহা থাকাতে গাড়ী চালানের বিশেষ সুবিধা হয়। পূর্ব্বে অতি সামান্য আয়তনের রবার দ্বারা চক্র দুইটি মণ্ডিত থাকিত, তাহাকে সলিড টায়ার (Solid Tyre) বলে। এই টায়ার সাধারণতঃ ⅞ ইঞ্চ আয়তনবিশিষ্ট। এক্ষণে নিউম্যাটিক (Pneumatic) টায়ার অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়। ইহা খুব মোটা, সমস্ত পরিধিটিই (Rim) বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহার ভিতর ফাঁপা একটি রবারের নল থাকে, যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে তাহাতে বায়ু প্রবিষ্ট করাইলেই সমস্ত টায়ারটি ফুলিয়া উঠে। নিউম্যাটিক টায়ারযুক্ত গাড়ী চালনা করা বড়ই আরাম। কিন্তু ফাঁপা বলিয়া নিউম্যাটিক টায়ারের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, সামান্য আঘাত লাগিলেই ফুটিয়া যায় এবং মফঃস্বলে তাহার মেরামত করাও সুবিধাজনক নহে। নিউম্যাটিক, টায়ারের অনুকরণে একরূপ সলিড টায়ার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাকে কুশন টায়ার (Cushion Tyre) বলে। তাহা বাহ্যিক আকারে দেখিতে ঠিক নিউম্যাটিক

টায়ারের মত, অথচ ফাঁপা নহে। মফঃস্বলবাসী অনেকে নিউম্যাটিক টায়ারের পরিবর্ত্তে এই নূতন কুশন টায়ার পছন্দ করেন।

পেডাল অর্থাৎ পদ-রক্ষণ স্থান বা পদাধার, ইহার উপর পদস্থাপন করিয়া চাপ প্রয়োগ করিলে পশ্চাতের চক্রে গতি উৎপাদিত হইয়া গাড়ী চলিতে থাকে। পেডাল দুইটি সাধারণতঃ দুই চাকার-মধ্যস্থলে স্থাপিত থাকে। দুইটা লৌহ-শলাকা দ্বারা ফ্রেম এবং হাতলের সহিত ইহা সংযুক্ত থাকে। বাইসিকেল যন্ত্রের প্রধান কল এই পেডালের নিকট অবস্থিত। একটা দণ্ডবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃত্ত এই পেডালদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত, পশ্চাৎ-চক্রের কেন্দ্রেও ঐরূপ একটি ক্ষুদ্রায়তন দণ্ডবিশিষ্ট বৃত্ত দৃঢ়-সন্নিবিষ্ট আছে। চেন-বিশিষ্ট গাড়ীতে একটি হারের ন্যায় চেন দ্বারা এই দুই ক্ষুদ্র বৃত্ত বেষ্টিত থাকে। পদাধারে চাপ প্রদান করিলে নিকটস্থ বৃত্ত ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং চেন কর্ত্তৃক সেই বেগ পশ্চাতের চক্রের কেন্দ্রস্থিত বৃত্তে নীত হইয়া পশ্চাতের চক্রে গতি উৎপন্ন করে। তখনি গাড়ী চলিতে থাকে। চেনবিহীন যন্ত্রের গঠন-প্রণালীও প্রধানতঃ এইরূপ, তবে চেনের পরিবর্ত্তে একটি দৃঢ় শলাকা দ্বারা ক্ষুদ্র বৃত্তদ্বয় সংযুক্ত থাকে। ইহার নির্মাণ-প্রণালী অধিক লিখিয়া প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। চেনবিহীন যন্ত্রের আজিও শৈশবাবস্থা। নির্ম্মাতাগণ যদিও ইহাকে চেনযুক্ত যন্ত্র অপেক্ষা একাধিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলেন, তথাপি দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে ইহার যথার্থ গুণাগুণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না। তবে অনেকে চেনবিহীন যন্ত্রাদি শীঘ্র বিকল হয় না, অনেকে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী চেনযুক্ত যন্ত্র অপেক্ষা সরল এবং মেরামত অনায়াসসাধ্য।

উপরে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয় লিখিত হইল, তাহা ব্যতীত ব্রেক, মাডগার্ড, ঘণ্টা, আলো প্রভৃতি দ্বারা গাড়ীর অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের উপযোগী গাড়ী অপেক্ষাকৃত আয়তনে ছোট ও পশ্চাতের চক্রের উপরার্দ্ধ সূক্ষ্ম রেশমী তার দ্বারা আবরিত, তাহাতে আরোহীর বসন গমনশীল চক্রে আবদ্ধ হইতে পারে না।

শিক্ষিত আরোহিগণ যখন সবেগে গাড়ী চালাইয়া গমন করেন, কেহ বা দুই হস্ত ছাড়িয়া দিয়া সুখোপবিষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাদের ইচ্ছামত গমন পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় হয়ত বাইসিকেল চড়া খুব সহজ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাতে চড়িতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শারীরিক ভার-সমতা (balance) নির্ণয় করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকারে বাইসিকেলে আরোহণ করা হয়। পশ্চাতের চক্রের কেন্দ্রের বাম ভাগে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একখানি লৌহখণ্ড সংযুক্ত আছে। আরোহী গাড়ীর পশ্চাৎ দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে হ্যাণ্ডেল-বার ধরিয়া ঐ লৌহখণ্ডে বাম পদ স্থাপন করেন। পরে ভূ-সংশ্লিষ্ট দক্ষিণ পদ দ্বারা কয়েক পদ সম্মুখে অগ্রসর হয়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানিও চালনা করিয়া লইয়া যান। এরূপে গাড়ী গতিযুক্ত হইলে

লৌহখণ্ডস্থিত বাম পদে ভর দিয়া জীনের উপর উঠিয়া বসেন এবং পেডালে পদস্থাপন করিয়া চাপ দিলে সবেগে গাড়ী চলিতে থাকে, তখন হ্যাণ্ডেল সাহায্যে তাহাকে যদৃচ্ছা বাম ও দক্ষিণে এবং পদ দ্বারা সবেগে ও ধীরে পরিচালনা করা আরোহীর ইচ্ছাসাপেক্ষ। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে একা-একা ঐরূপ করিয়া চড়িতে যাওয়া বিপদসঙ্কুল। প্রথম শিক্ষার্থী অন্যের সাহায্য ব্যতীত একক আরোহণের চেষ্টা করিবেন না। কলিকাতায় ব্যবসাদার বাইসিকেল শিক্ষক পাওয়া যায়, তাহারা পারিশ্রমিক লইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে চড়িতে শিখায়। মফঃস্বলবাসিগণ বাইসিকেল-বিশারদ বন্ধুর সাহায্যে শিখিতে পারেন কিন্তু প্রথম শিখিবার সময় কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমে শিখিতে হইলে অল্প উচ্চ একখানি গাড়ী যোগাড় করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ মাটি হইতে পদদ্বয় যত কম উপরে থাকে ততই বিপদের আশঙ্কা কম। সাধারণতঃ পুরুষদিগের ব্যবহারোপযোগী গাড়ীগুলির ফ্রেম ২২ ইঞ্চি হইতে ২৬ ইঞ্চি উচ্চ হইয়া থাকে। ফ্রেমের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে পশ্চাতের চক্রের কেন্দ্র হইতে জীনের নীচে পর্য্যন্ত যে লৌহ-শলাকা অবস্থিত আছে, তাহার দৈর্ঘ্য মাপিতে হয়। চক্রের ব্যাস প্রায় ২৮ ইঞ্চি হয়। সুতরাং পুরুষদিগের ব্যবহারের গাড়ী সাধারণতঃ ৩৫।৩৬ ইঞ্চি হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের গাড়ী ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন। শিক্ষার্থী একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া প্রথমে জীনে বসিয়া দুই হস্তে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ব্যালান্স্ ঠিক করিতে চেষ্টা করিবে। কোন অল্প ক্রম-নিম্ন (slope) স্থানের উপর গাড়ী রাখিয়া জীনের উপর বসিবে এবং দুই হাতে হ্যাণ্ডেলটি সমান ভাবে রাখিবার চেষ্টা করিবে। মাটী হইতে পা উঠাইয়া লইলেই গাড়ী অমনি ঢালের দিকে চলিবে তখন হ্যাণ্ডেলটা সোজা রাখিলেই গাড়ী সোজা চলিবে; কিন্তু প্রথম প্রথম হ্যাণ্ডেল প্রায়ই সোজা থাকিবে না ও গাড়ী এদিক-ওদিক বেঁকিয়া পড়িবে। গাড়ীর উচ্চতা কম হইলে তখনই পা মাটীতে ঠেকিবে ও পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। গাড়ীর বেগে হয়ত সময় সময় ইহাতেও আরোহীকে পড়িয়া যাইতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক গাড়ীর সম্মুখের চাকায় ব্রেক লাগান আছে। দক্ষিণ হস্তের হ্যাণ্ডেলের নীচেই ব্রেকের হ্যাণ্ডেল অবস্থিত। এই ব্রেক চাপিয়া ধরিলেই একবারে গাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া যায়। শিক্ষার্থী যদি এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হইবা মাত্র এই ব্রেক চাপিয়া ধরেন, তাহা হইলে আর কোনরূপই বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

প্রথম কয়েক দিন এইরূপ অভ্যাস করিয়া ভারসমতা সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে, তখন আর গাড়ী এপাশ-ওপাশ হেলিয়া পড়িবে না। গাড়ীর নির্ম্মাণ-কৌশল ও টায়ারবেষ্টিত রবারের স্থিতিস্থাপকতা হেতু ক্রম-নিম্ন স্থানে গাড়ী আপনিই অনেক দূর যাইবে। হ্যাণ্ডেল-বার সমান করিয়া ধরিয়া থাকিলে পড়িবার আশঙ্কাও থাকে না, এই সুযোগে সাবধানে পা দু'খানি পেডালের উপর স্থাপন করিতে পারিলেই পেডালের সঙ্গে-সঙ্গে পা উঠিবে ও নামিবে এবং তখন তাহাতে চাপ দিতে হইবে, তাহা হইলেই গাড়ী যদৃচ্ছা চলিবে। কিন্তু এইটুকু অভ্যাস করিতে অনেক পড়িতে হইবে। সঙ্গে যে-কোন লোক থাকিলেই পতনের সময় রক্ষা করিতে পারে। শিক্ষিত সহচর পার্শ্বে থাকিলে আরোহণের কৌশল শীঘ্রই শিখিতে পারা যায়। আমার প্রথম বাই-সিকেল শিক্ষা কিরূপে হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব, ভরসা করি, প্রথম শিক্ষার্থীর তাহাতে অনেক সাহা[য্য] হইবে।

আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা—আমার কনিষ্ঠ ভ্রা[তা] কলেজের অবকাশ উপলক্ষে একখানি বাইসিকেল গাড়ী ল[ইয়া] বাড়ী আসিলেন। এক দিন প্রাতে তাহাতে আরোহণ ক[রিয়া] পরিচালন-কৌশল দেখাইলেন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে বাইসিকে[লে] চড়িবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। ভ্রাতার গাড়ী দেখিয়া সে ইচ্ছা আ[রও] বলবতী হইল। আমার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই অন্যান্য অনেকে গাড়ী চড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদের দুর্গতি দেখিয়া ভাবিলাম আমি অশ্বারোহণ-পটু, হয়ত চড়িবা মাত্র আমি গাড়ী চালাইতে পারিব। আরও দেখিলাম, অধিক বেগে চালাইলেই গাড়ী সোজা থাকিতেছে, আমিও তাহাই করিব ইহা মনস্থ করিয়া গাড়ী চড়িতে গেলাম। শিক্ষিত আরোহীর মত কায়দা করিয়া দুই হাতে হ্যাণ্ডেল ও বাম পদ লৌহখণ্ডে দিয়া দাঁড়াইলাম। আমার প্রগল্‌ভতা দেখিয়া ভ্রাতা সহাস্যবদনে দূরে দাঁড়াইলেন। বিপদ যে এত দূর দাঁড়াইবে হয়ত তিনি তাহা ভাবেন নাই। আমি ভাবিলাম, সজোরে দক্ষিণ পদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া জীনের উপর উঠিয়া বসিব ও পেডাল চালাইতে আরম্ভ করিব। আমার প্রগল্‌ভতার ফল ফলিল। গাড়ী চালাইয়া জীনের উপর বসিতে না বসিতে গাড়ী ডান দিকে হেলিয়া পড়িল এবং আমি পড়িয়া গেলাম। পেডাল ও চেনে পা আটকাইয়া গেল। পূর্ব্ব-প্রদত্ত বেগে গাড়ী মৃত্তিকায় আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। সকলের সাহায্যে উঠিয়া দেখি আমার ডান পা পড়িবার সময় মচ্‌কাইয়া গিয়াছে। আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল যে, প্রায় দুই সপ্তাহ আমাকে অকর্ম্মণ্য হইয়া শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনার পর স্বতঃই মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, হয়ত কখনই আর বাইসিকেল চড়িতে পারিব না।

গত শীতকালে চেনবিহীন গাড়ীর নূতন আবিষ্কারের কথা পড়িয়া ভ্রাতার জন্য বিলাত হইতে একখানি চেনবিহীন গাড়ী আনাইতে পাঠাই। আজকাল সমস্ত গাড়ীই নিউম্যাটিক টায়ার বেষ্টিত থাকে, কিন্তু আমাদের বিশেষ আদেশ অনুযায়ী এই গাড়ীতে দেড় ইঞ্চি আয়তনের কুশন টায়ার দেওয়া হয়। কয়েক মাস এই গাড়ী আসিয়াছে। ইহার নাম chainless quadrant strong roadster, গাড়ীখানি দেখিতে বড়ই সুদৃশ্য। নূতন গাড়ী দেখিয়া ও নিজের অক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু ভ্রাতার আগ্রহে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার আগ্রহ, চেষ্টা ও যত্ন না থাকিলে আমি কখনই কৃতকার্য্য হইতাম না। ভ্রাতার আগ্রহ ও যত্নে আমি অপেক্ষাকৃত অল্প দিনেই বাইসিকেল চড়িতে শিখিয়াছি এবং ভরসা করি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে অনেকেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অভ্যাস করিতে পারিবেন। প্রথম দুই দিন কোন বিশেষ উন্নতি উপলব্ধি হইল না। দুই জন দুই পার্শ্বে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ও জীন ধরিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, আমি সাক্ষীগোপাল হইয়া জীনে বসিয়া থাকি, যেদিকে একটু হস্তচ্যুতি হয়, অমনি সেই দিকে পড়িবার উপক্রম হয়। চতুর্থ দিনে ভ্রাতা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন—গাড়ীর জীন খুলিয়া ফেলিয়া উচ্চতা কম করা হইল। জীনের নিম্নস্থ লৌহখণ্ডে বসিলে দুই পা মাটী স্পর্শ করে।

পরে পেডাল দুইটি খুলিয়া রাখা হইল, কারণ কাপড়ে পেডাল জড়াইয়া যাওয়া সম্ভব। একটি ক্রম-নিম্ন স্থানে গাড়ী স্থাপন করা হইলে আমি লৌহদণ্ডে উপবেশন করিলাম ও দৃঢ়মুষ্টিতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া থাকিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা চেষ্টা করার পর অন্যের বিনা সাহায্যে প্রায় ৮০ ফুট চলিতে পারিলাম। পঞ্চম দিনে পেডালে পা দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অন্যের বিনা সাহায্যে গাড়ীতে চড়িতে পারি নাই, তবে চড়াইয়া দিলে সোজা চালাইতে পারি মাত্র। অল্প সাহায্যে আরোহণ অভ্যাস হইল। ক্রম-নিম্ন স্থানে গাড়ী স্বভাবতঃ যে বেগ পাইতেছিল বাম পদ পশ্চাৎচক্রের লৌহখণ্ডে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পদে তদ্রূপ বেগ দিয়া জীনের উপর উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী চলিলে হ্যাণ্ডেল সাহায্যে তাহার গতি সোজা (regulate) করিয়া লইলাম, তখন আর পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ পেডালে পদস্থাপন করিতে অসুবিধা বোধ হইল না। এইরূপে আমি ষষ্ঠ দিনে অন্যের বিনা সাহায্যে গাড়ী চালাইতে পারিয়াছিলাম।

আরোহণের সময় জীনে বসিবা মাত্র তাড়াতাড়ি পেডালে পদস্থাপনের চেষ্টা না করিয়া প্রথমে হ্যাণ্ডেল সাহায্যে গাড়ীর গতি পরিচালনা করিয়া পরে পেডালে পদস্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। অনেকে লৌহখণ্ডে পদস্থাপন না করিয়া গাড়ী ঈষৎ হেলাইয়া একেবারে জীনের উপর চড়িয়া বসেন। এইরূপ করিয়া চড়িতে হইলে গাড়ী বাম পার্শ্বে হেলাইয়া প্রথমে দক্ষিণ পদ দিয়া জীনের উপর বসিয়া পেডাল স্পর্শ করিতে হয়। গাড়ী এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যেন দক্ষিণ পার্শ্বের পেডাল উপর দিকে থাকে। পরে মৃত্তিকাস্থিত বাম পদ দ্বারা ঈষৎ জোর দিলেই গাড়ী সোজা হইয়া দাঁড়াইবে ও পেডাল করিলেই চলিতে থাকিবে। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর এইরূপ চেষ্টা না করাই উচিত।

এইরূপে আরোহণ ও চালনা অভ্যস্ত হইলেই উপলব্ধি হইবে যে গাড়ী যত দ্রুত চালনা করা যাইবে ততই সোজা হইয়া চলিবে; ধীরে চালাইলে পতনের আশঙ্কা বেশী। পরে যতই অভ্যাস করা যাইবে, ততই নানারূপ কৌশল উপলব্ধি হইবে। সুশিক্ষিত আরোহীর নিকট অশ্ব প্রভৃতি সজীব যান যেরূপ আরোহীর ইচ্ছামত চালিত হইয়া থাকে, নির্জ্জীব বাইসিকেলও শিক্ষিত আরোহীর নিকট সেইরূপ চলে। সুবিধা থাকিলে গাড়ী ভাড়া লইয়া অভ্যাস করাই ভাল। পরে অভ্যাস হইলে নিজ মনোমত গাড়ী পছন্দ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সখের খাতিরে কম দামে বাজে গাড়ী না লইয়া ভাল নির্ম্মাতার গাড়ী একটু বেশী দাম দিয়া লওয়াই ভাল।

বাইসিকেলের সম্মুখের চাকার দুই পার্শ্বে দুইখানি অনতিদীর্ঘ লৌহখণ্ড আছে। আরোহী ক্লান্ত হইলে তাহার উপর পদস্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। পর্ব্বত কিম্বা অন্য কোন ক্রম-নিম্ন স্থানে অবতরণ কালে ঐরূপ পদস্থাপনা প্রয়োজন হয়। নিম্নস্থ গাড়ী আপন বেগেই চলিতে থাকে, তখন আর পেডাল করার দরকার হয় না। বাইসিকেল আরোহিগণ তাঁহাদের ভাষায় ইহাকে "coasting" বলেন। পর্ব্বতাদি অবতরণ কালে অনেক সময় এরূপ "কোষ্টিং" বিপদজনক।

বাইসিকেলের সুবিধা দেখিয়া বিলাতে বাইসিকেল-আরোহী সৈন্যদলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব বাইসিকেলে বন্দুক রাখিবার স্থান করা হইয়াছে। পশ্চাতে জীনের নীচে যোদ্ধা আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইতে পারেন। যোদ্ধৃগণ যুদ্ধকালে নিজ নিজ পার্শ্বে মৃত্তিকায় বাইসিকেল স্থাপন করিয়া বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করেন। মার্কিণ রাজ্যে বিজ্ঞাপন বিতরণকারী, ফেরীওয়ালা প্রভৃতি অনেকেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশেও ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে। এ দেশে ডাক বিভাগে ও পুলিশ বিভাগে এক্ষণে ব্যবহার হইতেছে। মহামান্য ছোট লাটের পিয়নগণ বাইসিকেল চড়িয়া পত্রাদি বিলি করিয়া থাকে। সোয়ারের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত ব্যয় লাঘবতা হইয়া থাকে।

কলিকাতায় Bengal Cyclists Association নামক একটি সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অনুষ্ঠাতাগণ বাইসিকেল দৌড়, পরিভ্রমণ ইত্যাদি আমোদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মেম্বরগণ এক খণ্ড রৌপ্যপদক পাইয়া থাকেন তদ্দ্বারা হোটেল ও রেলে তাঁহাদের গতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এই সমিতির মেম্বরগণ অধিকাংশই ইংরাজ, দেশীয়দের সংখ্যা অতি অল্প। অল্প দিন হইল মুসলমান বাইসিকেল আরোহিগণও তাঁহাদের এক সমিতি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ আজ পর্য্যন্ত এইরূপ কোন অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন নাই। বাইসিকেলে আরোহণ অতি বিশুদ্ধ ব্যায়াম। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইহা শিক্ষা করা উচিত।

—পুণ্য, ১৩—৪।

মদ খাওয়া বড় দায়

জাত থাকার কি উপায়

৺প্যারীচাঁদ মিত্র

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

এং যায় বেং যায় খল্‌সে বলে আমিও যাই। কায়েত বামুনেরা জাত মারামারি করে—তাঁতিরা বলে আমরা চুপ করে থাকি কেম? যাহারা কর্ম্ম কাজ করে তাহাদিগের সময় কাটাইবার উপায় আছে—যাহারা কেবল ঘরে বসিয়া থাকে তাহারা মোড়লগিরি না করিয়া কি করে? স্ত্রীর কাছেও বলা চাই আমি হেন-করলাম তেন করলাম—তেন করলাম—আর বাহিরেই বা মান বাড়িবার কি উপায়? কোন ভাল রকম চর্চ্চা নাই—অথচ সময় কাটানও চাই—গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লগিরিও করা চাই, এজন্য এখানে খোঁচা ওখানে খোঁচা দিয়া বেড়ায়—একটা গোল বাধিলে ও বকাবকি চলিলে—ঘোঁট চলিল—হতে কর্ত্তে যত দিন যায় তাহার পরে ডিক্রি হউক বা ডিস্‌মিস্‌ই হউক, তাতে বড় ক্ষতি নাই।

কলিকাতা নিবাসী অম্বিকাচরণ সেট বাবু লেখাপড়া শিখিয়া দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা কলম পিসে-পিসে সারা হয়—কেরানিগিরি কেরানিগিরি বই আর কথা নাই এবং আফিস মাষ্টারের চোখ রাঙ্গানি ও গালাগালি তাহাদিগের অঙ্গের আভরণ। অর্থ উপার্জ্জন যে কেবল কেরানিগিরিতে হয় তাহা নহে—অর্থ উপার্জ্জন নানা প্রকারে হইতে পারে। চাকরি করা কর্ম্মটি পরাধীন—সওদাগরি করা স্বাধীন। দুয়েরই দোষ গুণ আছে কিন্তু সওদাগরি ভালরূপে শিখে করিতে পারিলে অনেকাংশে ভাল। এই বিবেচনা করিয়া অম্বিকা বাবু কলিকাতায় সওদাগরি কর্ম্ম কিছুকাল দেখিয়া শুনিয়া বিলাতে রেসম ও চা খরিদ করিয়া পাঠাইবার জন্য চীন দেশে জাহাজে গমন করিলেন। যৎকালীন বাবু যাত্রা করেন, তৎকালীন তাঁহার পাল্লায় অনেক টাকা ছিল, সুতরাং সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরা আসিয়া বলিলেন, সওদাগরি কর্ম্ম বড় ভাল, দশ জন লোক প্রতিপালন হয়, আর আপনার কর্ম্ম আপনার চক্ষে না দেখিলে হবে কেন? কিছুকাল পরে কর্ম্মক্রমে বাবুর লোকসান হইল, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে তাঁহাকে ঠেলিবার ঘোট হইতে লাগিল। দলোরা বলিয়া উঠিল, অদি দত্ত জিঞ্জির হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল—তিনি যেমন জাহাজে গিয়াছিলেন, অম্বিকা বাবুও তেমনি জাহাজে গিয়াছিলেন, তবে অম্বিকা বাবুকে কেন খারিজ দেওয়া যাইবে? পৃথিবীর মজা এই যে এক বিষয়ে প্রায় একমত হয় না। কয়েক জন দলোর দেখাদেখি ও খাতিরে কতকগুলি তাঁতি তাহাদিগের মতে মত দিলেন—বাকি তাঁতিরা বলিয়া উঠিল, জাহাজে গেলে জাত মারা হইতে পারে না—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সওদাগরি কর্ম্ম করিতেন। সে পদ বজায় রাখা উচিত—এ-দেশ থেকে ও-দেশে না গেলে সওদাগরি কর্ম্ম কেমন করিয়া হইতে পারে? এক্ষণে প্রায় সকলেই গোলামী করিতেছে—অম্বিকা বাবু সওদাগরি কর্ম্মের নিমিত্তে যে অন্য দেশে ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন এ জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা উচিত—তাঁহার জাতি মারিতে গেলে ঘোর তেঁতে বুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। দলোরা এ কথায় কাণ দিল না—তাহারা রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রুটি, ঘণ্ট, ফির্ণে ও মেটো ত্যাগ করিয়া শেয়ালের যুক্তি করে—অনেক তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়—অনেক ছিলিম তামাক পোড়ে—অনেক হাত নাড়ানাড়ি ও মাথা বকানো হয়—এ একবার চীৎকার করে—ও একবার রাগ করে—কিন্তু কিছুই শেষ হয় না—আসল কথা মাকড় মারিলে ধোকা হয়। এক দিবস তাহাদিগের নিকটে এক জন স্পষ্টবক্তা ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন—তাহাদিগের পাক চক্র দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—অগো সেট বাবুরা—অগো বসাখ বাবুরা—এ বুদ্ধি কেন? তোমাদিগের সুখে থাকিতে কি ভূতে কিলয়? আর যদি যথার্থ জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত দিয়া কথা কহ—পূর্ব্বে যে সময় ছিল, এক্ষণে তাহা নাই—আপন আপন বাটীর ভিতর কি হইতেছে তাহা দেখিয়া চুপচাপ মেরে থাকাই ভাল—আর কি জাত আছে? জাত গাঁ-গাঁ করিয়া পালিয়া গিয়াছে। জাত কি কোন দেশে গেলেই যায়? ব্রাহ্মণের স্পষ্ট কথায় দুই এক জন দলো খেপে উঠিয়া বলিল, বাবুর বেটারাই সব সার্‌লে—এ বেটারাই আমাদিগের মজাবার মূল। ব্রাহ্মণকে ঘাঁটান বড় দায়—একবার খেপে উঠিলে একটা না একটা কাণ্ড অবশ্যই করে। কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাত নেড়ে নেড়ে এই কবিতা পাঠ করিলেন।

> খয়ে বন্ধন, ঘোর বন্ধন, কর কাটন গো।
> উলুবন, সন্তরণ, কূল পাওন গো।
> মশা দর্শন, লাঠি মারণ, হস্ত নাশন গো।
> প্রাণি মারণ, গুস্তি করণ, ঠিক দেওন গো।
> জাতি মারণ, ঘোঁট করণ, খয়ে বন্ধন গো।
> তাঁতি জ্ঞান, কিবা জ্ঞান, মশা মারণ গো।

বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার

ফুলে খড়দহ বল্লবী সর্ব্বানন্দি—কি চমৎকার মেল! ইহারা যে চারি বেদ, আর আদান প্রদান উল্‌টি পাল্‌টি কি গৌরবও সুখজনক! অবলা নারীগণ মরুক আর বাঁচুক তাহা বিবেচনা করণের কোন আবশ্যক নাই—তাঁহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হউক বা না হউক তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি? কৌলীন্য রক্ষা হইলেই পুরুষের মান রক্ষা হইল। লোকসমাজে পৈতের গোচ্ছা বাহির করিয়া আমি কামদেব, রুদ্ররাম, বলরাম অথবা রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান এই পরিচয়েতেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল হয়। সৎচরিত্র ও সদাচার এই দুই প্রকৃত জাতি ও কৌলীন্যের মূল কিন্তু এমত জাতি ও কৌলীন্য প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। ধনলোভ অথবা ভ্রমাধীন আত্মগৌরব রক্ষার্থ কেবল কতকগুলিন কল্পিত ব্যবহার লইয়া গোলযোগ করিলে কি হইতে পারে? যাহার অন্তরে ভ্রষ্ট মতি, তাহার বাহিরে সতীত্ব আচার করিলে ঐ কুটিলতা কি অপ্রকাশ থাকিবে? না সতীত্ব ধর্ম্ম বৃদ্ধিশীল হইবে?

রঙ্গপুরের রামানন্দ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। জন্মাবধি পিতাকে কখন দর্শন করেন নাই, লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জনক অমুক, সুতরাং সেই মত পরিচয় দিতেন। গ্রামস্থ ভাইপো সম্পর্কীয় কেহ কেহ এই কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন। রামানন্দের বিদ্যাশিক্ষা যৎসামান্যরূপ হইয়াছিল। বাল্যকালে লেখাপড়া

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী
সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল
কিনিবার সময় আসল জিনিষ দেখিয়া লইবেন
La-bonny
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ কলিকাতা-২৯

করিতে বলিলে অমনি বলিয়া উঠিতেন, আমরা কুলীন, লেখাপড়া কেন করিব? বুদ্ধি ও বিষয় না থাকাতে কৌলীন্যের গৌরবে গর্ব্বিত হইতে লাগিলেন। মনে করিতেন, আমি যেখানে যাইব গুরুপুত্রের ন্যায় পূজ্য হইব—লোকে আমাকে টাকা দিতে পথ পাইবে না—বাস্তবিক সমস্ত বঙ্গভূমিই আমার জমিদারী—আমি এমন নিকষ কুলীন যে কষ না থাকিলেই আমার জন্য রস নির্গত হইবে—আমি যদি দশটা খুন করি তাহাতেও আমার দণ্ড হইবেক না। রামানন্দ এইরূপে মনে মনে সদানন্দ হইয়া আত্ম মানবৃদ্ধি জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত করিয়া বেড়ান ও স্বীয় মাহাত্ম্য বিষয়ে অন্যকে অন্ধ দেখিলে বিজাতীয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন, আমি যে কি পদার্থ তাহা যে না চিনে সে বেটা হিন্দু নহে। গ্রামে ভদ্র ভদ্র লোকের বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, তিনি ভবনে উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে যৎপরোনাস্তি সম্মান করে। কিন্তু কাহার বাটীতে আহারাদি করা দূরে থাকুক, নূতন ছিলিমে গঙ্গাজল পূরিয়া না আনিয়া দিলে তামুক পর্য্যন্ত খান না। যদিও কালে ভদ্রে আহার করিতে সম্মত হয়েন, তথাপি কেবল অনাচমনীয় গ্রহণ করেন ও অপর লোক সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলেন, কি করি, আত্মীয়তা অনুরোধে বসিয়াছি, হিশাব মত শূদ্রের জলস্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পিরিতে কি না হয়? স্বয়ং রামচন্দ্র গুহচণ্ডালের বাটীতে কেমন করিয়া গিয়াছিলেন। যদি রামানন্দের কেবল এইরূপ ভাণ্ডামি থাকিত, তাহা হইলে অন্যান্য লোকে চোকমটকানি, গা টেপাটিপি, মুচকেহাসি ও সময়ে সময়ে দুই একটা অম্বল মধুর ঠাট্টা করিয়া চুপচাপ রহিত, কিন্তু ভাণ্ডামির সহিত ষণ্ডামি থাকাতে আপামর সাধারণ লোকে তাঁহার কথা সর্ব্বদা আন্দোলন করিত। সকলেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িয়াছিল, সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহার গুণাগুণ প্রকাশ হইতে লাগিল।

রামানন্দের মাতার সেই গ্রামে একজন সপত্নী ছিলেন। যদিও শৈশবাবস্থায় রামানন্দ তাঁহার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, তথায় ধ্রুব মহাশয়ের ন্যায় গহন বনে কঠোর তপস্যার্থ না গিয়া মাতামহ দত্ত ভিটায় বসিয়া সকলের মামলা-মোকর্দ্দমা ডিগ্রি ডিসমিস্‌ করত কি জাত্যভিমান, কি সরদারিত্ব কি বল বিক্রমে সকলেতেই প্রকাশ করিতেন যে "পদ্মপলাশ লোচন" আমার হাতের ভিতর। আপন বিষয়ের মধ্যে কেবল বিগে কত জমি—হাজা শুখা না হইলে মাস কয়েকের ধান্যের ঠিকানা হইতে পারিত। সংসারের অন্যান্য খরচ কেবল মুখভারতীতে নির্ব্বাহ হইত। প্রতিদিন বাজারে গিয়া তোলা তুলিতেন ও জিনিষের নমুনা চাই বলিয়া কোন কোন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় অথবা ব্যবহার করিতেন। যদি কোন উঠ্‌নাওয়ালা টাকার তাগাদা করিতে আসিত, তবে তাহার গলায় পইতাটা ও মস্তকে পায়ের ধূলা দিয়া বলিতেন—আমি লোকটা কে জান? আমি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান। উঠ্‌নাওয়ালা বলিত—মহাশয় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তানই হও আর কৃষ্ণ ঠাকুরের সন্তানই হও আমরা দুঃখী মানুষ, উঠ্‌না খেয়েছ, এত তাড়াতাড়ি কর কেন? অন্যান্য লোকের নিকট জিনিষপত্রটা চাহিয়া আনিয়া বন্ধক অথবা বিক্রয় করিতেন। তাহারা চাহিতে পাঠাইলে রাগান্বিত হইয়া বলিতেন, ভাল—দেওয়া যাবে, এত ব্যস্ত কেন, আমি কি জিনিষ লইয়া খেয়ে ফেলেছি? এ প্রকারে অনেকের ঘটীটা-বাটিটা হাওয়াখানা ধুতি চাদর রেজাই সাল রুমাল দেখিতে দেখিতে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দোকানি পসারিরা তাঁহাকে দূর থেকে দেখিলে ভয়ে ঝাঁপ বন্ধ করিত। কিছু কাল এইরূপে কাটাইয়া তিনি গুরুমহাশয়গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলেদিগের লেখাপড়া যত হউক বা না হউক, তাহাদিগের নিকট হইতে পরব পার্ব্বণে পয়সা ও দ্রব্যাদি লইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু পড়াইবার সময় হইলে যুক্তাক্ষর শব্দের অর্থ অথবা কসামাজাতে ভারি বিপত্তি হইত। পরে আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হইলে পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছু কাল বেত হাতে করিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে মশা তাড়াইয়াছিলেন। পিতা পিতামহের ন্যায় স্থানে স্থানে বিবাহ করিয়া ধন সঞ্চয় করিবেন এই মানসে পাণি গ্রহণ করিতেও কসুর করেন নাই। কিন্তু সে পাণি গ্রহণে বাস্তবিক পাণি গ্রহণ হয় নাই, যেখানেই যাইতেন সেখানেই তাঁহার রাত্রিবাস লাভকরণ স্বভাব দেখিয়া প্রায় সকলেই অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিত। তাঁহার বাটীর নিকটে ভজহরি ঘোষ নামে একজন প্রকৃত মুখ্যী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই জপ তপ সন্ধ্যা আহ্নিক পুরশ্চরণ উপবাস ব্রত নিয়মে নিযুক্ত থাকিতেন, ও কুলশীলের কথা লইয়া নিকটস্থ লোক সকলকে উপদেশ দিতেন। কে কনিষ্ঠ, কে ছভায়া, কে মধ্যাংশ, কে মধ্যাংশ দ্বিতীয়পো, কাহার পান দোষ, কাহার পশ্চাৎ দোষ, কাহার দেবীদাস দোষ, কাহার গঙ্গাদাসী দোষ, কে উলই, কে সহজ, কে কোমল, কাহার আদ্দিরসের ঘর, কে গোষ্ঠীপতি, এই সকল কথা লইয়া বিতণ্ডা করিতেন। ভজহরির সর্ব্বাঙ্গে ছাপ, গায়ে নামাবলী হাতে হরিনামের মালা, দৃষ্টি মাত্রে বোধ হইত, তিনি বড় শুদ্ধচিত্ত লোক, কিন্তু গ্রামের যাবতীয় গলতি কর্ম্মে সংগোপনে মূলীভূত থাকিতেন। দালানে আহ্নিক করিতে বসিলে নিকটে নানা প্রকার মন্দ লোক আসিত। আহ্নিক করিবার সময়ে অপর লোক থাকিলে ভঙ্গিক্রমে পরামর্শ দিতেন নতুবা তাহাদিগের কাণে কাণে গুরুমন্ত্র প্রদান করিতেন। যদি কেহ ধরা পড়িত অথবা কোন মামলায় দারোগা সুরৎহাল করিতে আসিত, তিনি জিজ্ঞাসিত হইলে মালা জপিতে জপিতে বলিতেন, আমি ইহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না—আমি উদাসীন, কেবল গোবিন্দের চরণারবিন্দ ধ্যান করি। এখন তোমরা এই আশীর্ব্বাদ কর যে, ভবনদী পার হয়ে সেই পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাই আর যেন আমাকে জন্মগ্রহণ না করিতে হয়। এ সব কথা যাহারা শুনিত তাহাদিগের এই বিশ্বাস হইত যে, ঘোষজ সাংসারিক বিষয়ে কোন প্রকারে লিপ্ত নহেন, কেবল পারমার্থিক বিষয়ে আসক্ত। রামানন্দের সহিত ভজহরির ক্রমশঃ বিজাতীয় আত্মীয়তা জন্মিল। দুই জন দুই জাতির টেকা কুলীন—দুই জনেরই জাত্যভিমান অসাধারণ—দুই জনেই কপট ভণ্ড ও বিটল—দুই জনেই ধনলোভী—দুই জনেরই অর্থ উপার্জ্জনে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, সুতরাং এত ঐক্যতায় আত্মীয়তা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। কি জালে, কি অপহরণে, কি ফেরেবে, কি পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করণে, কি মিথ্যা শপথ দেওয়াতে দুই জনেই বিলক্ষণ পটু, কিন্তু এমন বর্ণচোরা আবের মত থাকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করে। পরন্তু গ্রামের যাবতীয় লোক ক্রমে ক্রমে টের পাইতে লাগিল। রামানন্দ ষণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু ভজহরির সহবাসে এক্ষণে অন্তঃসলিলা বহিতে আরম্ভ করিল। দুই জনেই অন্যান্য লোকের সমীপে কেবল

কৌলীন্য গৌরব ও বৈষ্ণব তন্ত্রের মাহাত্ম্য আন্দোলন করেন, এবং অশেষ বিশেষ রূপে ইহা প্রকাশ করেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাদের কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তাহাদিগের সচল বচল দেখিয়া আপামর সাধারণ লোকের আরো সন্দেহ জন্মিল ও ঐ মহাত্মাদ্বয়ের বিষয় বিভব বৃদ্ধি হওয়াতে কুমতির বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নদীতীরে কয়েক ঘর ডোম বাস করিত। রামপ্রসাদ নামে এক জন ডোম আপন পরিবার রাখিয়া বিদেশে গমন করিয়াছিল। তাহার পত্নী প্রান্তে মজুরি করিতে যাইত। হয়তো দুই তিন দিবস কর্মক্রমে বাটী আসিত না। তাহার এক পরমাসুন্দরী বিধবা কন্যা গৃহে থাকিয়া কাটনা অথবা পাট কাটিত। সে প্রায় লোকালয়ে বাহির হইত না ও পুরুষ মাত্র দেখিলে সকলকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিত। আপন বিশ্বাসানুসারে ধর্মকর্মে সর্ব্বদা রত থাকিত ও পিতামাতাকে কি প্রকারে সুখী করিবে তদর্থ প্রাণপণে যত্ন করিত। রামানন্দ ও ভজহরি ঐ যুবতী কন্যাকে কুপথগামিনী করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা ঐ প্রস্তাবকে কর্ণে স্থান না দিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেন—আমি নীচ জাতি—যখন পতির বিয়োগ হইয়াছে তখন আমার সংসারের সকল সুখ ঘুচিয়া গিয়াছে; এক্ষণে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইতেছি—প্রাণ সত্বে সতীত্ব ছাড়া হইব না—আমাকে ধনলোভ দেখান বৃথা—আমি প্রতিদিন পরমেশ্বরকে বলি, প্রভু! আমি অনাহারে মরি সেও ভাল যেন শুদ্ধ চিত্তে ও পবিত্র শরীরে তোমার চরণ ভাবিতে ভাবিতে মরি। এই কথা রামানন্দ ও ভজহরি শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য করত যুক্তি করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর অন্ধকার—মেঘগর্জ্জন করিতেছে—বিদ্যুৎ চমকিতেছে—বজ্র ঝণ ঝণ শব্দ করিতেছে। নদীর জল তোলপাড় হইতেছে, নিকটস্থ এক একটা গাছের উপর নানা জাতি পক্ষী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে—ডোংগাড়েরা টোকা মাথায় দিয়া তামুক খাইতে খাইতে বলিতেছে, "সালার বাদল বড় করিলে। ডোমকন্যা মাতার অনাগমনে অসুখী হইয়া পিতাকে স্মরণ করত আত্ম দুরবস্থায় কাতর হইয়া স্বামীর প্রিয় বাক্য মনে করিতেছে ও এক এক বার নয়নবারি অঞ্চল দিয়া মোচন করিতেছে। গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের শব্দে চমকিয়া দেখিল, দুই জন চোয়াড় পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইতেছে। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, বাবা তোরা কে? আমাকে কেন ধরিস্? চোয়াড়েরা তাঁহার বাক্যে একটু বিমোহিত হইয়া থম্‌কিয়া পরে পরস্পর মুখাবলোকন করত কিছু উত্তর না করিয়া, ধরিয়া লইয়া চলিল। ডোমকন্যা চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্রন্দনে নিকটস্থ সজাতীয়দিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহারা সকলে আস্তেব্যস্তে দৌড়িয়া আসিয়া দুইটা চোয়াড়কে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিল ও কন্যাকে উদ্ধার করিয়া সকলে ঘিরিয়া রহিল। কন্যা উদ্বৃত্ত হওন কালীন বলিলেন, যাহারা আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাদিগের বিচার পরমেশ্বর করিবেন।

দৈবাৎ রামপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রী দুই জনেই পরদিন প্রত্যাগমন করিয়া আপনাদিগের দুঃখিনী কন্যার সকল কথা অবগত হইল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত বলবান ও সাহসী, আপন রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, রামানন্দ ও ভজহরির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভজহরি চরণামৃত পান করিয়া মস্তকে হাত পুচিতেছেন ও রামানন্দ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত ফুসফুস করিয়া মালা জপিতেছেন। রামপ্রসাদ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের দুইজনের চূলের টীকি ধারণ পূর্ব্বক জুতার চোটে পিট একেবারে রক্তিমাবর্ণ করিয়া দিল। নিকটে দুই-চার জন দরোয়ান ছিল তাহারা রামপ্রসাদকে ব্যাঘ্ররূপ দেখিতে লাগিল ও আত্মরক্ষার্থে অন্তরে পলায়ন করিল। গ্রামের ছেলে বুড় যুবক, যাবতীয় লোক প্রফুল্ল বদনে বলিল—ভাল মোর বাপ রামপ্রসাদ, এত দিনের পর কুলীন মহাশয়দিগের কুল রক্ষা হইল।

লোকের যখন দুর্গতি হয়, তখন নানা প্রকারেই হইয়া থাকে, একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে নদীর তোড়ের ন্যায় অচিরাৎ সব ধস্কে দেয়। রামপ্রসাদি পদের পর রামানন্দ ও ভজহরি কোন প্রসাদ অন্বেষণ না করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে থাকিলেন, কিন্তু তাহাদিগের কর্ত্তৃক চুপচুপি গলতি কর্ম্ম সমুদ্র বিশেষ—তাহার অসীম নদ নদী স্রোত বিল খাল সোঁত চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, কখন কাহার বাঁধ ভেঙ্গে উপপ্লাবন করে, তাহা অতিশয় অনিশ্চয়। উক্ত দুই কুলীন মহাত্মার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, অগস্ত্যের মত এক গণ্ডুষেই উদরস্থ করেন, অথবা পশুপতির ন্যায় জটাজুটের ভিতরে রাখেন। দেখিতে দেখিতে একটা জাল মকদ্দমায় তাহাদিগের বেনাকরি প্রমাণ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়া চালান হইলেন। ঐ সময়ে এক জন ঢুলি রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, একটু আহ্লাদিত হইয়া দম্ভে হাত নেড়ে নেড়ে বাজাইতে লাগিল "জামাই ভাত খেসে রে, তোর শ্বশুর নাই ঘরে" ও মল্লেশ্বরপুরের ঠাকুর সুপণ্ডিত রমাপতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, তোমরা তো চলিলে, এক্ষণে কি লইয়ে যাবে? বিস্তর ভোগ করলে—বিস্তর ভোগ করালে, এক্ষণে কর্ম্মভোগ কে নিবারণ করিতে পারে? তোমরা যে তপ জপ করিয়াছ তাহাতে বোধ হয়, আর ফিরিয়া আসিতে হবে না—ওগো তোমরা প্রকৃত মানুষ নও, তোমরা বাহিরে গৌরাঙ্গ, অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

সমাপ্ত

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠারো

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর অভ্যাগতদের প্রস্থানকালে চণ্ডী বাপুলী মহাশয়কে একান্তে ডাকিয়া বলিল: আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন হলেও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কাকা বাবু, শ্যামাপুর কাছারীর নায়েব সম্পর্কে ঐ সব কথা, আপাততঃ বাবাকে জানানো হবে না। এ বাড়ীতে এসে অবধি বাপের বাড়ী যাইনি, সেই থেকে স্কুলটিও দেখা হয়নি, গৌরী নিতে এসেছে, এই জন্যেই যাচ্ছি; এই সব কথাই ওঁকে বলা হয়েছে।

বাপুলী জিজ্ঞাসা করিলেন: তাহ'লে বাপের বাড়ী যাবার কথা এরই মধ্যে কর্ত্তা বাবুকে বলা হয়ে গেছে?

চণ্ডী উত্তর করিল: হ্যাঁ—কাকা বাবু! বুঝছেন ত কাজ কত, আর সময় কি রকম কম। তাই তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে সব। আপনাদের খেতে বসিয়েই, ওরই ফাঁকে গৌরীদিকে বাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিই—এই আমার গৌরীদি, যাঁর হাতে বিদ্যাপীঠের ভার দিয়ে আসি বাবা! গৌরীদিকে পেয়ে বাবাও মহাখুসি—এতক্ষণে গৌরীদি যা বলবার সব বলেছেন নিশ্চয়ই; বাবাও অমত করবেন না মনে হচ্ছে।

বাপুলী সহাস্যে বলিলেন: তোমার কথা অমান্য করবার সাধ্য কি ওঁর আছে মা, তবে তোমাকে ছেড়ে এখন থাকা ওঁর পক্ষে অসম্ভব, এই ভেবে যদি না ছাড়তে চান। আমার ত জানতে কিছু বাকি নেই মা!

চণ্ডী বলিল: একটা দিনের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি যে কাকা বাবু! কেমন জমিদারের বাড়ীর বৌ আমি—তড়ি-ঘড়ি ব্যবস্থা আমারো কোষ্ঠীর লিখন যে! ওস্তাদের মারের মতন প্রথম ঘা দিয়ে যদি বাজিমাৎ না করতে পারি, তাহলে বৃথাই বাগুলীর গাঙ্গুলী-বাড়ীর বৌ হয়ে এসেছি।

বাপুলী চণ্ডীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার তেজোদৃপ্ত কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কথার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন: তোমার মনের উত্তেজনা চেপে রাখলেও তার আভা চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যে মা! আমার নজরেই যখন ধরা পড়ছে, কর্ত্তার সঙ্গে কথা বলবার সময় তিনি কিন্তু সন্দেহ করবেন মা, তা বলে রাখছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, শ্যামাপুরের ফয়সলা না-করা পর্যন্ত তুমি শান্তি পাচ্ছ না।

চণ্ডীর মুখেও হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল; হাসিমুখেই সে বলিল: বাইরে যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব যখন চলে কাকা বাবু, সেই সময়েই ত মনের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়—যুদ্ধক্ষেত্রে তার করবার কিছু থাকে না তখন। বেশ, আপনার কথা আমার মনে থাকবে কাকা বাবু, সতর্ক হয়েই বাবার সঙ্গে কথা বলব। আপনাকে আর আটকে রাখব না—আপনার ঘাড়েও ত কাজ কম চাপাইনি! ওঁদের বলে দেবেন—রাত্রি ঠিক নয়টায় সময় আমাদের বৈঠক হবে।

'হ্যাঁ মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক—সে সব ঠিক আছে'—বলিয়া বাপুলী চলিয়া গেলেন।

শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিয়াই চণ্ডী সবিস্ময়ে দেখিল, শুধু গৌরী নহে, তরলাও তাহার পাশে বসিয়া আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে সমাসীন হরিনারায়ণের সহিত আলাপ করিতেছে এবং একটু দূরে মাধুরী দেবী একখানি সোফায় বসিয়া কর্ত্তার সখের শালের টুপিতে জরির কারুকার্য করিতে করিতে ইহাদের সংলাপ শুনিতেছেন, আর মৃণালিনী তাঁহার পাশে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পিসিমাকে সাহায্য করিতেছে—জরির সুতাগুলির পাক খুলিয়া দিয়া। চণ্ডী প্রবেশ করিতেই কক্ষ মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ চাঞ্চল্য অনুভূত হইল। গৃহস্বামী সোজা হইয়া বসিলেন, গৃহিণী একটি বার চাহিয়াই হাতের কাজের দিকে দৃষ্টি গভীর ভাবে নিবদ্ধ করিলেন, মৃণালিনী তরলার দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গি করিল, তরলা হাতযোড় করিয়া নমস্কার করিল এবং গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া চণ্ডীকে বলিল: এতক্ষণে বুঝি ছুটি হলো?

তরলার নমস্কারের উত্তরে সহাস্যে ডান হাতখানি তুলিয়া আশীর্বাদের মত একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি করিল চণ্ডী। পরক্ষণে গৌরীর দিকে চাহিয়া সে বলিল: ছুটি হয়েছে অনেকক্ষণ, তবে এমন পদও থাকে, কামাই-ছুটির বালাই যেখানে নেই—কাজ সারা নিয়ে কথা।

হরিনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন: কথায় আমার বৌমার সঙ্গে পেরে ওঠবার যো-টি নেই গৌরী-মা!

মৃণালিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল: তার ওপরে পিসে মশায়ের মতন বুনো কথাবিদকে বৌদি যখন উকিল পেয়েছেন!

গৌরীর ইঙ্গিতে তাহার পাশের আসনে বসিতে বসিতে চণ্ডী বলিল: কিন্তু হাকিমকে তোমরাই উকিল বানিয়ে ছেড়েছ, সে কথা ভুলে যেও না ঠাকুরঝি!

মুখখানা শক্ত করিয়া মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিল: তার মানে?

চণ্ডী বলিল: এ সব কথার মানে জিজ্ঞাসা করতে নেই, বুঝে নিতে হয়।

মৃণালিনী মুখখানা ভার করিয়া এবং চণ্ডীর দিকে খর দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা মৃদু হুঙ্কার তুলিল: হুঁ!

হরিনারায়ণ সহাস্যে বলিলেন: এই ত মৃণাল! ইটটি নিজেই ছুঁড়লে আগে, আর পাটকেলটির ঘা সইতে পারলে না বাছা! আরে ওর মানে ত পড়েই রয়েছে। বৌমার নামে নালিশ যখন তুলেছিলে ভাই-বোন—হাকিম বলে পিসে মশাইকে মানছেই ত হবে। হাকিম শেষে খোদ আসামীকেই ওকালতি করতে দেখে

এজলাস ছেড়ে নেমে এসে উকিলের পেশাই নিয়েছে। ঐ দেখ, তোমার পিসিমা তাই তাড়াতাড়ি উকিলের মাথার মাপ নিয়ে সামলা বানাতে বসে গেছেন।

কথাটা শুনিয়াই মাধুরী দেবীর দুই নেত্রমণি একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল; চকিতের মত একবার সে দৃষ্টি হরিনারায়ণের মুখে ফেলিয়াই পরক্ষণে কণ্ঠস্বর সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া বলিলেন: আমার এ সামলা উকিলের জন্যে নয়—আসামীর জন্যে।

হরিনারায়ণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে সহাস্যে বলিলেন: সর্বনাশ! উকিলকে তুমি আবার আসামী বানাবার ফিকিরে আছ না কি?

মাধুরী দেবী গম্ভীর মুখে হাতের কাজে আরও গভীর ভাবে মন নিবিষ্ট করিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। হরিনারায়ণও বুঝিলেন, কৌতুক কথারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তিনি অতঃপর চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: তরলা মা'র সঙ্গে এতক্ষণ ওঁদের সমিতির সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল বৌমা, তুমি বোধ হয় শুনেছ, ওঁরা—

চণ্ডী বলিল: হ্যাঁ বাবা, ওঁদের সমিতির বিজ্ঞাপন দেখেছি।

তরলা বলিল: বিজ্ঞাপন আপনাকে সাধারণ ভাবে পাঠানো হয়েছিল, আজ আমি বেরিয়েছি নিজে নিমন্ত্রণ করব বলে। এখান থেকেই আপনার কাছে—

চণ্ডী বলিল: এখানেই যখন দেখা হলো, আর আপনার কষ্ট করবার প্রয়োজন হবে না। আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই নিলাম।

তরলা প্রত্যাশা করে নাই যে, চণ্ডীর নিকট হইতে এরূপ উত্তর পাইবে অর্থাৎ তরলার কাজে সে শ্রদ্ধা জানাইবে। পুলকিত হইয়া তরলা জিজ্ঞাসা করিল: তাহলে ও-দিন আপনি যাচ্ছেন ত?

চণ্ডী বলিল: আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি গ্রহণ করেছি। এর পরের প্রসঙ্গ পরে—এখন তাই নিয়ে আলোচনার কোন সার্থকতা আছে কি?

হরিনারায়ণ বলিলেন: তরলা মা আমাকে ধরেছেন, ও-দিন ওঁদের সভার উদ্বোধন আমাকেই করতে হবে। আমি ওঁকে আমার শরীরের অবস্থা জানিয়ে তোমার কথাই বলেছি মা—বৌমা'র মত যদি আদায় করতে পারো, আমার আপত্তি নেই।

তরলা বলিল: ওঁর উপরে আমার দাবী আছে বলেই আমি এই আবদার করেছি। সেবার আমি এখানকার মেয়ে-স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হলে উনি এক সভা করে আমাকে সোনার পদক পুরস্কার দিয়েছিলেন। এখন আমি এ অঞ্চলের মেয়েদের উন্নতির জন্যে সভা করছি, সে সভা উনি উদ্বোধন করবেন—এই অনুমতি আমি নিতে এসেছি। ওঁর অনুমতি পেলেই আমরা নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপতে দেব। আপনার বৌমার ওজরে আমাকে ফেরালে চলবে না জেঠা বাবু!

হরিনারায়ণ অম্লান বদনে বলিলেন: আমি ত আগেই বলেছি তরলা মা, আমার দেহের উপরে নিজের কোন কর্তৃত্বই নেই। দেহরক্ষার ব্যবস্থাগুলোর সব ভারই নিয়েছেন বৌমা। এমন কি, শুনলে তুমি অবাক হবে, কথাবার্তার ব্যাপারেও আমাকে ওঁর দেওয়া গণ্ডীর মধ্যেই থাকতে হয়। কাজেই আমার যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যবস্থা ওঁরই হাতে।

তরলা ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিল, তাহার পর দুই চক্ষুর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল: বৌমা'র হাতে আপনার স্টেটের ভার দিয়েছেন এ কথা আমরা শুনেছিলাম; কিন্তু উনি যে আপনার দেহের পাহারাওলা হয়েছেন, এ খবর জানা ছিল না। এখন আবেদনটা আপনার সামনেই ওঁর কাছে করলে চলবে, না লোকের আড়ালে ওঁর এজলাসে গিয়েই—

তরলাকে কথাটা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই চণ্ডী তাড়াতাড়ি উত্তর দিল: আপনার নিমন্ত্রণ যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছি, আবেদনটির উত্তরেও তেমনি সবিনয়ে জানাচ্ছি—কোন সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া ত অনেক দূরের কথা, এই ঘর থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানোও ওঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। আপনি নিজে ত বদ্যির মেয়ে, শ্বশুরও নাম-করা বৈদ্য—আপনিই বিবেচনা করে বলুন, আমার কথাটা সঙ্গত কি না!

তরলা গম্ভীর মুখে বলিল: মাপ করবেন, বাবা বদ্যি, শ্বশুর বদ্যি বলে আমাকেও যে ওঁদের পেশা নিয়ে বিদ্যে চটকাতে হবে, এ ধারণা আমার নেই। আপনি জেঠা বাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রকম ভয় দেখালেন, বাইরে থেকেও আমরা তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু আজ কাছে এসে ওঁর সঙ্গে কথা বলে ভাবি—ওঁর চেয়ে সুস্থ বুঝি আমরাও নই।

চণ্ডী হাসিয়া বলিল: সেই জন্যেই ত বদ্যির চোখ নিয়ে ওঁকে দেখতে বলি, যে কথা শুনেই আপনি চটে গেলেন। বাইরে থেকে ওঁকে সুস্থ রেখেছে ওঁর বলিষ্ঠ ও সুস্থ মন, এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? এমন বৃদ্ধ অনেক দেখা যায়, বয়েস অনেক হয়েছে, চুল-দাড়ি পেকে গেছে, কিন্তু ভিতরটা তারুণ্যে ভরা। আবার এমন তরুণও অনেক দেখতে পাবেন, বয়েসে তরুণ হলেও মন তার বুড়িয়ে গেছে, তরুণ হয়েও তা'রা বৃদ্ধ। আপনার জেঠা বাবুর সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনের ছাপ দেখেছেন ওঁর দেহে, আসলে কিন্তু স্বাস্থ্য একবারে ভেঙে পড়েছে—ওঁর এখনো বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে।

চণ্ডীর যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি উপলব্ধি করিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তরলার আচরণ ও মুখভঙ্গিতে, বরং সে বিরক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা গেল। চণ্ডীর কথার উত্তরে বিদ্রূপের সুরেই সে বলিল: পাহারাওয়ালারা অতি মাত্রায় সাবধানী হয়, এ ত জানা কথাই। আপনি যখন ওঁর স্বাস্থ্যের রক্ষক হয়েছেন, তখন ত সাবধানী হবেনই।

চণ্ডী তেমনই সহাস্যে বলিল: আপনি আমার উপর বৃথা রাগ করছেন। আমি কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, আপনার বাবা যদি দয়া করে এসে ওঁকে পরীক্ষা করেন, সভায় যাওয়া সম্বন্ধে আমার মতেরই সমর্থন করবেন তিনি।

মুখখানা কঠিন করিয়া তরলা বলিল: আপনি কি আমাকে এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন ভেবেছেন যে, আমার বাবাকে ডেকে এনে ওঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তবে আপনার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হবে?

চণ্ডী বলিল: তাহ'লে ত আমি যে কথা বলেছি, তার উপরে আর কথা বলাই আপনার উচিত নয়।

তরলা বলিল: বেশ, আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি—একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আমি জেঠা বাবুকে আমাদের সভায় উদ্বোধকরূপে পাবার প্রত্যাশা ত্যাগ করছি।

হরিনারায়ণ বলিলেন: আমি তোমাদের সভার সাফল্য কামনা করছি। আর, আগে থেকেই এই আশীর্বাদ করছি—তোমাদের

ধর্মে মতি হোক ; প্রগতি বলতে তোমরাও যেন মেয়েদের উন্নতিই বোঝ—সেইটিই হোক তোমাদের সমিতির লক্ষ্য।

তরলা বলিল : আপনার আশীর্বাদ সম্বন্ধে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে জেঠা বাবু! যদি অভয় দেন ত বলি।

হরিনারায়ণ বলিলেন : সচ্ছন্দে তুমি বল মা, এখানে যখন চণ্ডীমা আছেন, তোমার কথা যত শক্তই হোক, তার ব্যাখ্যা করাও শক্ত হবে না। বল তুমি।

তরলা বলিল : এই যে আপনি বললেন জেঠা বাবু—তোমাদের ধর্মে মতি হোক, এটা কি শুধু কথার একটা মাত্রা নয়, এর কি কোন সার্থকতা আছে এই ধর্ম কথাটাকে আমাদের জীবনে টেনে এনে?

হরিনারায়ণ বলিলেন : প্রশ্নটা কিন্তু শুনেই কানে বাধছে মা! তুমি কি ধর্মকে শুধু কথার একটা মাত্রা বলেই মনে কর মা—আর কিছু নয়?

তরলা বলিল : না জেঠা বাবু—আপনিই বলুন না, ধর্মকে আমাদের জীবনে টেনে আনার মানেটা কি?

হরিনারায়ণ চণ্ডীর দিকে চাহিয়া বলিলেন : তুমি কি মনে কর বৌমা? তরলা মা যে কথা বললেন, তার কোন মানে নেই?

সহজ কণ্ঠে চণ্ডী বলিল, উনি যা বললেন, তার মানে খুব সোজা—ধর্মকে আমাদের কাজের মধ্যে টেনে আনা মানেই আমাদের কাজকে বরণীয় করা। ধর্ম বলতে আমরা বুঝি ঈশ্বরকে। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরানুভূতিও তেমনি স্বাভাবিক করে নিতে পারি আমরা ধর্মকে আমাদের জীবনে টেনে এনে।

হর্ষোৎফুল্ল মুখে হরিনারায়ণ বাবু বলিলেন : শুনলে ত তরলা মা, তোমার ঐ বাঁকা কথার কেমন সোজা জবাব দিলেন চণ্ডী মা!

হরিনারায়ণ লক্ষ্য করিলেন, তরলার চোখে যেন তীব্র দৃষ্টির এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সে ভ্রূ দু'টি কুঁচকাইয়া বলিয়া উঠিল : কিন্তু আমি যদি ধর্মকে ঈশ্বর বলে স্বীকার না করি?

কথাটা শুনিয়া চণ্ডীর চোখেও একটা রহস্যময় দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, ঠোঁটের কোণেও চাপা হাসির চিহ্ন দেখা গেল। পরক্ষণে মুখখানি প্রফুল্ল করিয়া চণ্ডী বলিল : ঈশ্বর বলে না মানেন, সত্য বলে মানবেন ত?

সত্য বলে?

হ্যাঁ—সত্যকে ত না মেনে পারবেন না! যদি বলি ধর্ম হচ্ছে সত্য—মানবেন?

তরলা প্রশ্ন করিল : সত্য কি?

চণ্ডী বলিল : সত্য হচ্ছে ঘটনা—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটছে।

চোখের দৃষ্টি তীব্রতর করিয়া তরলা কহিল : আমি ধর্ম-কর্ম শাস্ত্র-মন্ত্র কিছুই মানি না, মানি কেবল বাহিরের দু'টো চোখকে আর আমার অন্তরকে।

মৃদু হাসিয়া চণ্ডী বলিল : কিন্তু বাহিরের ঐ দু'টো চোখে যা দেখবেন, অন্তরের মধ্যেও জানবেন, সেখানেও আর একটা চোখ লুকিয়ে আছে। বাইরে-ভিতরে যেখানেই তাকাবেন ঘটনারূপী সত্য নজরে পড়বেই। আমরা ওকেই ঈশ্বরের প্রকাশ বলে আনন্দ পাই। আপনি যে দিক দিয়েই যান, সত্যকে স্বীকার করতেই হবে; আর ঈশ্বর হচ্ছেন সেই সত্যের স্বরূপ।

হরিনারায়ণ বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন : আচ্ছা তরলা মা, ঈশ্বর, ধর্ম, শাস্ত্র—এ সবের উপর অবিশ্বাসের যে আভাস দিলে তোমার কথায়, সে কি সত্যি? তোমার মনও কি এ কথা বলে? না—চণ্ডী মা'র উপর রাগ করে এই সব কথা বললে? আর একটা কথা, মেয়েদের উন্নতির জন্যে সমিতি খুলেছ, সভা করছ, তাহলে কি এই শিক্ষাই ওদের দেবে—ওরা যাতে বিশ্বাস করে ঈশ্বর, ধর্ম, শাস্ত্র সব মিছে?

তরলা মুখখানা অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল, হরিনারায়ণ বাবুর কথার উত্তর দিল না। একটু পরে চণ্ডী সহাস্যে বলিল : সেই যে একটা কথা আছে, চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া—ওঁরও হয়েছে তাই! ওঁর স্বামীকে জব্দ করবার জন্যে উনি ইদানীং এমনি হয়েছেন। নৈলে ওঁর সঙ্গে ত কথা বলেছি, মিশিছি আগেও—এ ধরণের কথা কোন দিন ত শুনিনি ওঁর মুখে! কিন্তু একটা কথা উনি ভুলে যাচ্ছেন, বিশ্বাস জিনিসটা সহজেই জন্মায়—জন্মের সঙ্গেই জন্মায়। আর অবিশ্বাসকে গড়ে তুলতে হয়। কাজেই, সহজাত বিশ্বাসকে মন থেকে মুছে ফেলে, অবিশ্বাসকে সেখানে ফুটিয়ে তোলা বড় চাড্ডিখানি কথা নয়—সভা করে বক্তৃতা দিয়েও তা হয় না। আমার একটা অনুরোধ আপনার কাছে—আপনি মেয়েদের কানে যে মন্ত্রই দিন—তাদের স্বাধীন করুন, স্বাবলম্বী করুন, সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলুন, যা আপনার অভিরুচি করুন, তাতে কিছু আসে-যাবে না, কিন্তু ঈশ্বর নেই, ধর্ম মিথ্যে, শাস্ত্র বাজে—আপনার নিজের মন-গড়া বা এক শ্রেণীর অনাচারী নীতিদ্রোহী সর্বনাশা দলের রচা কথা মুখস্থ করে মেয়েদের মধ্যে প্রচার করবেন না। হয়ত, আপনার এই অপপ্রচার পাগলের প্রলাপ বলে আমাদের দেশের মেয়েরা উপেক্ষা করবে, তবুও মেয়ে হয়ে আপনি মেয়েদের দশের চোখে ছোট করবেন না।

হরিনারায়ণ বাবু সহর্ষে বলিলেন : বা! বা! খাসা কথা বলেছেন আমার বৌমা! তরলা মা, কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছ ত? সত্য বলছি, আমিও তোমাকে মা, এই কথাই বলছি—তোমার কাছে ঠিক এই অনুরোধই করছি।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চণ্ডীর মুখের দিকে একই ভাবে তাকাইয়া তরলা কথাগুলি শুনিতেছিল। চণ্ডীর কথার পর হরিনারায়ণ বাবু তাঁহার কথা বলিতে থাকিলে কটমট দৃষ্টিতে আর একবার চণ্ডীর দিকে চাহিয়া পরক্ষণে মুখখানা হরিনারায়ণের মুখের দিকে ফিরাইয়া তরলা একটু বিকৃত স্বরেই বলিল : দেখুন জেঠা বাবু, আপনার স্বাস্থ্য পাহারা দেবার ভার বৌমা'র উপর দিয়েছেন ব'লে তা থেকে এটা বোঝায় না যে, বাঙালীর মেয়েদের মনগুলোর উপরেও তিনি চৌকি দেবেন। একটু আগে উনি যেমন বললেন, মনের চোখ আছে ; আমিও তেমনি বলতে চাই—মন সবারই স্বাধীন, পচা পুরানো সনাতনকে বাতিল করে নতুনকে মেনে নেবার অধিকারও তার আছে। কাজেই, আমাকে আগে থেকেই ও-ভাবে সাবধান করে দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। আর আপনিও জেঠা বাবু, মৃণা দিদির কথাটি যে অতি সত্য, সেটা জানিয়ে দিলেন আপনার বৌমা'র হয়ে ওকালতী করে।

তরলার এই বক্রোক্তি কক্ষের সকলকেই সচকিত ও বিরক্ত করিয়াছে, এরূপ আভাস পাওয়া গেল। মাধুরী দেবী এতক্ষণ নীরবে একই ভাবে হাতের টুপিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাজ

শুনিতেছিলেন ; তিনিও এতক্ষণে মুখ তুলিয়া তীব্র কটাক্ষে এই প্রগতিবাদিনী মেয়েটিকে দেখিয়া লইলেন। হরিনারায়ণও যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মুখভঙ্গিই তাহা ব্যক্ত করিতেছিল। চণ্ডীর মুখের হাসিও যেন মুখের মধ্যেই মিলাইয়া গেল ; সেই নিরস মুখেই একটা দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া এবং চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া চণ্ডী বলিল : মেয়েদের পক্ষ থেকে তাদের মঙ্গলের জন্যে আমি এই অনুরোধ করেছি বলে আপনি কি রাগ করেই ও-কথা বললেন ! না ঐগুলো করাই আপনার মনের জেদ ?

তরলাও মুখখানা কঠিনতর করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল : আমার বলা ত হয়ে গেছে—আমি এখন উঠছি। আর যাবার আগে আবার বলে যাচ্ছি যে, মনে রাখবেন, মেয়েদের মনগুলো আপনাদের সম্পত্তি নয় যে, পাহারাওলার মতন চৌকি দেবেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে তরলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী দেবীও কোলের উপর হাতের বস্তুগুলি রাখিয়া ডান হাতের তর্জনীটি তুলিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন : একটু দাঁড়াও ; তোমার কথা ত মনে রাখতে বললে, এখন আমাদের কথাগুলোও মুখস্থ করতে করতে যাও—শুধু চৌকি দেওয়াই পাহারাদারের কাজ নয়, অন্যায় দেখলেই ঘাড় ধরে হিড়-হিড় করে টেনে এনে হাতে হাতকড়া পরিয়ে হাজত-ঘরে পোরাও তার কাজ। যাও—আমার বলা হয়ে গেছে।

মাধুরী দেবীও যে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এই দুর্বিনীতা মেয়েটিকে এ ভাবে কঠোর আঘাত দিবেন, কেহ তাহা ধারণাও করে নাই। স্তব্ধ ভাবে প্রত্যেকেই তাঁহার দৃপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তরলার পক্ষেও ইহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মাধুরী দেবীর প্রত্যেক কথাটি যেন বর্শা-ফলকের মত তাহার অঙ্গে বিদ্ধ হইয়া একটা অসহ্য জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু তথাপি সে বিহ্বল হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিল না—জ্বালাময় দৃষ্টিতে মাধুরী দেবীর মুখের পানে আর একবার চাহিয়া নীরবে নিরুত্তরে, এমন কি কোন-রূপ অভিবাদনের অভিনয় না করিয়াই সবেগে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে মাধুরী দেবী বলিলেন : এ জেঠা মেয়েটার রোগ বৌমা কিন্তু আগেই ধরেছেন। স্বামীর ওপরে ওর যত কিছু রাগ এখন সমাজের ওপরে ঝাড়তে চায়। পরক্ষণে স্বামীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া বলিলেন : আর তুমিও ত দিব্যি মানুষ, বৌমা'র ওপরে নিজের ঝক্কি চাপিয়ে নিজে তফাতে বসে মজা দেখছিলে !

মুখ টিপিয়া হাসিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন : তোমার বৌমা'র ক্ষমতা ত আমার জানতে বাকি নেই, এখন—

মাধুরী দেবী স্বামীর মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন : ওর ক্ষমতা কতখানি, সেটা জানবার জন্যে বৌমা'র সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখছিলে ! তোমার এ স্বভাব ত আমার জানতে বাকি নেই।

হরিনারায়ণ বাবু প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে চণ্ডীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তোমার গৌরীদি'র সঙ্গে আলাপ করে ভারি খুসি হয়েছি বৌমা ! বিয়ের পরদিন অবিশ্যি দেখেছিলাম, কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে। তার পর বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে ওঁর কৃতিত্বের কথা ভালো করেই জেনেছিলাম। দেখা করবার খুব ইচ্ছাও ছিল, লাইব্রেরীর সভায় উনি এসেছিলেনও—কিন্তু সেখান থেকেই সরাসরি চলে যাওয়ায় ভারি দুঃখ হয়েছিল—

চণ্ডী সবিনয়ে বলিল : সে কথা ত আপনাকে বলেছি বাবা, স্কুলের জরুরী কাজের জন্যে ওঁকে সেদিন আটকে রাখা সম্ভব হয়নি।

হরিনারায়ণ বলিলেন : যাক্, আজ উনি এখানে আসায় আমার সে দুঃখ যেমন নেই, তেমনি এসেই উনি ক্ষণিকের আনন্দ দিয়ে আর এক গভীর বিষাদের যে আভাসও দিয়েছেন, আমার অন্তর মন তারই ভাবনায় ভরে রয়েছে। সেই যে কথা একটা আছে না— বেনো জল পুকুরে ঢুকে তার নিজস্ব জল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল; আমারো এখন হয়েছে তাই ! তুমি মা এসেছ আমার বৌমাকে নিয়ে যেতে। অবিশ্যি এতে আমার আপত্তি করবার কিছুই নেই, কিন্তু এ-বাড়ীর সবাই জানে—বৌমাকে ছেড়ে সুস্থ-সচ্ছন্দ ভাবে দিনযাপন করা আমার পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয় !

হাসিমুখে দু'জনেই কথাগুলি শুনিতেছিল, শেষের দিকে চণ্ডীর মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গিয়া মুখখানিকে যেন অন্ধকার করিয়া দিল। গৌরী বলিল : আমি সব জানছি বাবু, চণ্ডীকে ছেড়ে আপনার পক্ষে থাকা যেমন কষ্টকর, চণ্ডীরও ঠিক সেই অবস্থা, ওর মন-প্রাণ সমস্ত এই বাড়ী জুড়ে রয়েছে। কাজেই আমিও ত একটি দিনের জন্যে ওকে চেয়েছি, তাও ওরই কাজে ওরই স্কুলের জন্যে। এই এক দিনের ছুটি আপনাকে হাসিমুখে মঞ্জুর করতেই হবে।

হরিনারায়ণ বলিলেন : তোমায় ও-কথা মা, সত্যিই বুকে বাজে ! বিয়ের পর বৌমাকে এনে আমরা নিজেদের স্বার্থই সিদ্ধ করে আসছি ; বৌমারও যে বাপের বাড়ী আছে, বাপ-মা ভাই-বোন সব আছেন—তাঁদের প্রতি শুধু বৌমার নয়, আমাদেরও কর্তব্য আছে—সে সব জেনেও মুখ বুজিয়ে থাকতে হয়েছে মা ! আজ আমার বৌমার নাম সমস্ত পরগণায় ছড়িয়ে পড়েছে, সেই বৌমা আমার যাবেন বাপের বাড়ী—এ কি 'ওঠ ছুঁড়ী তোর বে' মা !—যে, এক দিনের কড়ার ব'লে যেমন-তেমন ক'রে গেলেই হলো—লোকে জানবে না যে, হরিনারায়ণ গাঙ্গুলীর পুত্রবধূ চলেছেন, বিয়ের পর ঘর-বসত করতে এসে এই প্রথম ফিরে চলেছেন বাপের বাড়ীতে।

কথাটা শুনিয়া গৌরী ও চণ্ডী দু'জনেরই বুকের ভিতরটা যেন ঝাঁৎ করিয়া দুলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের অনুভব-শক্তির সঙ্গে আসন্ন সম্ভাবনার এই অদ্ভুত সাদৃশ্যে উভয়েই যুগপৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিল—ইনি যদিও অনবগত যে, ইঁহার অজ্ঞাতেই কুলবধূর এই এক দিনের আকস্মিক যাত্রার পিছনে অতি সংগোপনে যে সামরিক আয়োজন চলিয়াছে ও এক দিনেই তাহার কাহিনী সমগ্র জেলাবাসীর অন্তরে চাঞ্চল্যের কিরূপ শিহরণ তুলিবে—তথাপি তাঁহার অন্তরেও কি স্বাভাবিক ভাবেই এই আড়ম্বরময় কৌলিক খানদানির কথাই জাগ্রত হইতেছিল ? বৃদ্ধের এই চিন্তাই যে নেপথ্যে চিন্তার অতীত এক সাংগ্রামিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল, সে কথা তাঁহাকে কে বলিবে ?

সহসা মনে মনে কি ভাবিয়া হরিনারায়ণ মাধুরী দেবীর দিকে চাহিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন : তরলা এসে বাজে কথা তুলে অনেকটা সময় আমার নষ্ট করে গেলেন। তুমি এখন সামলা ছেড়ে বৌমার

যাবার ব্যবস্থা করে দেন। শুনলাম, খুব ভোরেই তারাপুরে গিয়ে না পৌঁছলে ওঁদের কাজের শুভক্ষণটি পাবেন না।

মাধুরী বলিলেন : আমার ব্যবস্থা ঠিক আছে, তুমি ওদিককার তোড়-জোড় যা করবার বাপুলী মশাইকে ডেকে বরং বলে দাও। বৌমা ত আর নিজের যাবার আয়োজন নিজে করবেন না ?

গৌরী বলিল : দেখুন, আপনাদের ও-সব খানদানি ব্যাপার এখন নাই বা করলেন। শুনলেন ত, স্কুলের কাজে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে, ও-সব না হয় পরে—

মাধুরী দেবী বলিলেন : সে কি হয় মা ? স্কুলের কাজে গেলেও আমরা বুঝবো, বৌমা বাপের বাড়ীতেই যাচ্ছেন, আর এই ওঁর প্রথম যাওয়া। কাজেই নেম-কর্ম আমাকে করতে হবে বৈ কি মা ! তবে একটা কথা বলি, বৌমার তুমি যখন বোনের মত দরদী, তোমার সামনেই বলছি—এখন বৌমাকে যেন আটকে রেখ না মা, এর পর ধীরে-সুস্থে গিয়ে না হয় দশ দিন থাকবেন। কিন্তু এখানে এখন কি রকম শিবে-সংক্রান্তি অবস্থা—এইমাত্র ত শুনলে মা ? বৌমা এ-বাড়ীতে প্রথম যখন আসেন—নিজের মুখেই বলছি মা, অবুঝ ছেলের পক্ষ নিয়ে ওঁকে খাটো করতে চেয়েছিলাম। তার ফলও হাতে-হাতে পেয়েছি। কিন্তু মা, ছেলের মুখ চেয়ে সম্প্রতি নিজের হাতে যে গাছ পুঁতেছিলাম, আজ সেই গাছে বিষের ফল ধরেছে। আজ ঐ বিষবৃক্ষ আমার সমস্ত দেহ-মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে, এখন শাশুড়ী বৌকে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে ঐ বিষ থেকে এই সংসার, এই গ্রাম, এই সমাজকে রক্ষা করবার জন্যে। এক দিন ছেলের হয়ে বৌমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চেয়েছিলাম, আজ বৌমাকে নিয়ে সেই অবুঝ ছেলেকে [illegible] কন্যার গ্রাস থেকে বাঁচাতে হবে মা, সেই জন্যেই বাপের বাড়ীর [illegible] কাটিয়ে বৌমাকে সত্ত্ব-সত্ত্বই ফিরতে হবে মা !

চণ্ডীর সমগ্র অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া অপূর্ব এক পুলক-প্রবাহ যেন বহিয়া গেল। তাহার মনে হইল, শ্বশুরের সহিত বোঝা-পড়া শেষ করিয়া সর্বসমক্ষে অভিনবরূপে স্বামীর সুপ্রকাশের দিন যে আনন্দ তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল, আজ সেই পরম পূজনীয় শাশুড়ীর সমক্ষে এ বাড়ীর গৃহিণীর মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার অন্তর্নিহিত এই দরদ ভরা অভিব্যক্তিও তাহাকে সেইরূপ আনন্দে অভিভূত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই পদনখরপ্রান্ত হইতে সীমন্তের সিন্দুর-রঞ্জিত কেশাগ্র পর্যন্ত আনন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। চণ্ডী পরক্ষণে তাহার অঞ্চলটি গলায় দিয়া মাধুরীর পদতলে হেঁট হইয়া বসিয়া ভাবার্দ্র কণ্ঠে বলিল : মা ! আজ অতি শুভক্ষণে আমার পক্ষে রাত্রি প্রভাত হয়েছিল, আজ বুঝেছি—শ্বশুরবাড়ী আসা আমার সার্থক হয়েছে, আমি আজ আমার মাকে ফিরে পেয়েছি। এখন আমি এক মায়ের পায়ে গড় করে আর এক মায়ের কাছে মুখ উঁচু করে যেতে পারবার মত শক্তি পেয়েছি। আমার জীবন আজ ধন্য, সাধনাও পূর্ণ হলো মা ! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলি বলিতে বলিতে সে মাধুরী দেবীর পদতলে মুখখানি নিচু করিয়াছিল ; তিনিও পাগলিনীর মত ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া দুই হাতে বধূকে তুলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫০) হইতে নিউ ইয়র্কে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে উত্তর-আটলান্টিক কাউন্সিলের যে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, কার্য্যতঃ এই দুইটি অধিবেশনের গুরুত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন অপেক্ষাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, ইহা মনে করিলে খুব বেশী ভুল হইবে না। এই দুইটি অধিবেশনের গভীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে ইহার পটভূমি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। গত মে মাসে (১৯৫০) লণ্ডনে যে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের সম্মেলন হয়, তাহাতে উত্তর-আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলিত বাহিনী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন সকলেরই মনে হইয়াছিল যে, আর একটি সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে সোভিয়েট রাশিয়ায় অন্ততঃ আরও চার পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পাঁচ বৎসর সময় পাওয়া যাইবে, এইরূপ একটা ধারণা পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ২৫শে জুন (১৯৫০) কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সমস্ত হিসাবই বানচাল হইয়া গেল। শুধু পশ্চিম-ইউরোপের শক্তিবর্গই নয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তাহার পররাষ্ট্র-নীতি নূতন করিয়া বিশ্লেষণ এবং পুনর্গঠন করিতে আরম্ভ করিল। কোরিয়া যুদ্ধের তাৎপর্য্যকে তাহারা যে-দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিল, তাহাতে তাহাদের রক্ষা-ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রাশিয়ার তুলনায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামরিক শক্তির অবস্থা কিরূপ? তাহাদের সামরিক সজ্জার অগ্রগতি কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর তাহারা সন্ধান করিল কোরিয়া যুদ্ধের আলোকে।

রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা প্রচলিত আছে। সর্ব্বোচ্চ হিসাব অনুযায়ী রাশিয়ার ২০০ ডিভিশন সৈন্য আছে। কিন্তু যে-হিসাবটা প্রায় সকলেই মানিয়া লইয়াছেন তদনুযায়ী ১৭৫ সক্রিয় (active) ডিভিশন সৈন্য রাশিয়ার আছে এবং উহার এক-তৃতীয়াংশ সাঁজোয়া গাড়ী দ্বারা সুসজ্জিত। রাশিয়ার ট্যাঙ্কের সংখ্যা ২৫ হাজার। রাশিয়ার বিমান বাহিনীতে ১৯ হাজার বিমান আছে। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে রাশিয়া ২৭ ডিভিশন সৈন্য রাখিয়াছে এবং তন্মধ্যে ১৫টিই সাঁজোয়া বাহিনী। একা রাশিয়ারই সামরিক শক্তির এই পরিমাণ। ইহা ব্যতীত রুশ-ব্লকের অন্তর্গত দেশগুলিরও সৈন্যবাহিনী আছে। অনেকে মনে করেন, সমগ্র রুশ-ব্লকের আছে ২৫০ ডিভিশন সৈন্য। রুশ ব্লকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে রাশিয়ার তাঁবেদার বলিয়া ঘৃণা করা সহজ, কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধের পরে তাহাদের সামরিক শক্তিকে তাচ্ছীল্যের দৃষ্টিতে দেখা চলে না। দীর্ঘ দিনের পরাধীন ক্ষুদ্র কোরিয়ার অর্দ্ধাংশ উত্তর-কোরিয়া যদি স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিপুল সামরিক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে পূর্ব্ব-ইউরোপে রাশিয়ার মিত্র-রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তিকে তুচ্ছ করা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু রুশ-ব্লকের এই বিপুল সামরিক শক্তির তুলনায় পশ্চিম-ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তি কিরূপ, তাহা পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভাবে বিবেচনা না করিয়া পারে নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমর-সজ্জার পরিকল্পনা যে-ভাবে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে আগামী এক বৎসর দেড় বৎসরে বড় জোর ৩৫ ডিভিশন সৈন্য গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। তাহাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছয় ডিভিশন সৈন্য দিবে, এই হিসাব ধরিয়া। উত্তর-কোরিয়ার যুদ্ধ শক্তিকে যদি মাপকাঠি ধরা যায়, তাহা হইলে সমগ্র রুশ-ব্লকের আক্রমণ-শক্তির সম্মুখে এই ৩৫ ডিভিশন সৈন্য যে কিছুই নয়, তাহা বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

ফ্রান্স ১৯৫৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র আরও অতিরিক্ত ১৫ ডিভিশন-সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। হল্যাণ্ড ১৯৫১ সালের মধ্যে তিন ডিভিশন সৈন্য গঠন করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করে। ১৯৪৮ সালের ব্রুসেল্‌স্ চুক্তি অনুসারে বেলজিয়ম ৫।৬ বৎসরে তিন ডিভিশন সৈন্য সংগ্রহ করিতে রাজী হইয়াছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ কমন্স সভায় যে সমর-সজ্জা পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে, তদনুসারে ৩৬৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার কাল ১৮ মাস হইতে করা হইয়াছে দুই বৎসর। মিঃ শিনওয়েল বলিয়াছেন, আগামী বৎসরের মধ্যে জরুরী অবস্থায় বৃটেন ১০ ডিভিশন সৈন্য যোগাইতে পারিবে। তথাপি ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে পশ্চিম-ইউরোপের সামরিক শক্তি যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহাও নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া বৃটেনের সমর-সজ্জার পরিকল্পনা যে কার্য্যকরী হইতে পারে না, তাহা মিঃ এটলীও স্বীকার করিয়াছেন। পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য ৬০ ডিভিশন সৈন্য দরকার। ইহা মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ শিনওয়েল উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ শিনওয়েল ইহাও বলিয়াছেন যে, ১৯৫৩ অথবা

১৯৫৪ সালের পূর্ব্বে এই ৬০ ডিভিশন সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এত দিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব ? যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অতি সত্বর রক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার উপায় কি ?

কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। সমগ্র জুলাই মাস ধরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেমন এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছে, তেমনি বৃটেন ও ফ্রান্সও যে চিন্তা করে নাই, তাহাও নয়। বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়েই গত আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এ-সম্পর্কে স্মারক-লিপি প্রেরণ করে। ১৭ই আগষ্ট তারিখে ফ্রান্স দ্বিতীয় স্মারক-লিপি প্রেরণ করে। এই স্মারক-লিপিতে ফ্রান্স যে সকল বিষয় জানিতে চাহে, তন্মধ্যে সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী গঠন, আর্থিক সাহায্য এবং সম্মিলিত সেনাবাহিনীর নায়কত্ব প্রভৃতি প্রশ্ন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই স্মারক-লিপি পাওয়ার পনের দিনের মধ্যেই মিঃ একিসন এক পরিকল্পনা রচনা করিয়া ফেলেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট এই পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয় ২৮শে আগষ্ট তারিখে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মিঃ একিসনকে ঢালা হুকুম প্রদান করেন। বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের প্রথম দিনের অধিবেশনেই মিঃ একিসন এই পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। এই পরিকল্পনাকে কেহ কেহ বিপ্লবাত্মক বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এক দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহাকে বিপ্লবাত্মক না বলিয়া উপায় নাই। এই পরিকল্পনার মূল কথা চারিটি। পশ্চিম ইউরোপ রক্ষার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্যবাহিনী প্রদান করিতে রাজী আছে। জার্ম্মাণীতে দখলকার শক্তি হিসাবে আমেরিকা এই সৈন্যবাহিনী প্রদান করিবে না, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় উহা হইবে আমেরিকার স্থায়ী সাহায্য। ইউরোপের অস্ত্র-সজ্জার জন্যও আমেরিকা প্রচুর সাহায্য দান করিবে। অর্থ-সাহায্য তো দিবেই, তা ছাড়া যত অস্ত্র-শস্ত্র লাগে সমস্তই দিবে। তৃতীয়তঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য এক জন Supreme Commander বা সর্ব্বাধিনায়কত্ব প্রদান করিবে। কিন্তু আমেরিকা এই যে তিনটি সাহায্য দান করিবে, তাহা পাইতে পশ্চিম-ইউরোপে পর্য্যাপ্ত এবং পরিপূর্ণ সামরিক বাহিনী থাকা প্রয়োজন। এই সামরিক বাহিনী শুধু কাগজে-পত্রে থাকিলেই চলিবে না, উহা বাস্তব রূপ গ্রহণ করা চাই। পশ্চিম-ইউরোপের উৎপাদন-শক্তিও ইউরোপীয় যুদ্ধ উৎপাদন বোর্ড (European War Production Board) কর্ত্তৃক সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমেরিকার এই পরিকল্পনার তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। মার্শাল পরিকল্পনা যে বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা অঙ্কুরিত হয় উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তির মধ্যে এবং মিঃ একিসনের এই পরিকল্পনার মধ্যে তাহা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পুরাপুরি উপনিবেশে পরিণত হইতে যেটুকু বাকী ছিল, মিঃ একিসনের পরিকল্পনা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিল। রুশ আক্রমণাশঙ্কার অজুহাতে সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হইল। একটু অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে লইয়া। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি অর্জ্জন ফ্রান্সকে যে চিন্তিত করিয়া তুলিবে, ইহা স্বাভাবিক। হয়ত বৃটেনও আদর্শগত দিক হইতে জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি অর্জ্জন পছন্দ করে না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতের বিরুদ্ধে চলিবার সামর্থ্য কি বৃটেন কি ফ্রান্স কাহারও নাই।

রক্ষা-ব্যবস্থা ও পশ্চিম-জার্ম্মাণী—

পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ যে কার্য্যতঃ মার্কিণ সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা মাত্র, এই গুরুতর বিষয়টি কি বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয় সম্মেলন, কি উত্তর-আটলাণ্টিক কাউন্সিল কাহারও দৃষ্টিতে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথবা পড়িলেও কম্যুনিজমের ভয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে সামরিক আধিপত্যও তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়াছে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত করার প্রশ্নে। মিঃ একিসন তো স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই সুবৃহৎ পরিকল্পনা হইতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না। সম-মর্য্যাদার ভিত্তিতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে পশ্চিম-ইউরোপে গ্রহণ করিতেই হইবে এবং রক্ষা-ব্যবস্থায় জার্ম্মাণী সৈন্যবাহিনী যোগাইবে, এই ব্যবস্থাও মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত না করিয়া কিরূপে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত এবং পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর সমকক্ষ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে গঠন করা যায়, ইহাই দাঁড়াইয়াছে প্রশ্ন।

পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্য প্রাথমিক যে-সকল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) পররাষ্ট্র-সচিবত্রয় সম্মেলনে সে-সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে: (১) পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে বা পশ্চিম-বার্লিনকে কেহ আক্রমণ করিলে সেই আক্রমণকে বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের উপর আক্রমণ বলিয়া গণ্য করিবে; (২) জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধাবস্থা অবসানের জন্য ত্রিশক্তির গবর্ণমেণ্টসমূহ প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিবেন; (৩) পশ্চিম-জার্ম্মাণীতে এক জন পররাষ্ট্র-সচিব নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু কোন্ কোন্ দেশের সহিত পশ্চিম-জার্ম্মাণী কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে, তাহা স্থির করিবেন দখলকার রাষ্ট্রত্রয়ের হাই-কমিশনারগণ। তবে ওয়াশিংটন, প্যারী এবং লণ্ডনে আপাততঃ পশ্চিম-জার্ম্মাণীর কোন রাষ্ট্রদূতাবাস স্থাপিত হইবে না; (৪) পশ্চিম-জার্ম্মাণীর পুলিশ বাহিনীতে লোকসংখ্যা বাড়ানো চলিবে। এই পুলিশ বাহিনী লেণ্ডরদের অর্থাৎ প্রদেশগুলির অধীনেই থাকিবে বটে, কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট জরুরী অবস্থায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই পুলিশ বাহিনীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন; (৫) পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণী যাহাতে সাহায্য করিতে পারে, তাহার জন্য তাহাকে অধিক পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ারীর অনুমতি দেওয়া হইবে।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী বারটি দেশের পররাষ্ট্র-সচিবগণ পশ্চিম-ইউরোপ রক্ষার জন্য সম্মিলিত বাহিনী গঠনের যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন,

জার্ম্মাণীকে অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত করা সম্পর্কে একমত হওয়ার প্রথম সোপান, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই বাহিনী থাকিবে একজন সর্ব্বাধিনায়কের অধীনে। এই সর্ব্বাধিনায়ক যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই যোগাইবে, সে-কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সম্মিলিত বাহিনীকে এরূপ শক্তিশালী করা হইবে যে, উহা শুধু আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেই সমর্থ হইবে না, পশ্চিম-ইউরোপকে রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবে। কিন্তু এইরূপ শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিতে হইলে উহার সৈন্যসংখ্যা অন্ততঃ রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যার কাছাকাছি হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জনশক্তিকে বাদ দিয়া তাহা সম্ভব নয়। উত্তর-আটলাণ্টিক পরিষদ এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনে পশ্চিম জার্ম্মাণীকেও অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে। কাজেই নীতিগত দিক দিয়া পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্র-সজ্জিত করার প্রশ্ন মানিয়াই লওয়া হইতেছে। এখন শুধু প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে এই যে, জার্ম্মাণীর সৈন্যবাহিনীকে কি ভাবে পশ্চিমী মিত্রশক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইবে। সর্ব্বাধিনায়ক যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যোগায়, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান কঠিন হইবে না।

ত্রিশক্তির পররাষ্ট্র-সচিবগণ শুধু পশ্চিম-ইউরোপ রক্ষার ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্তই করেন নাই, ইউরোপ ও এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও ভাবিয়াছেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) তাঁহারা যে ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে জানাইয়াছেন যে, বৃহৎ শক্তিত্রয় আটলাণ্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী আরও নয়টি রাষ্ট্রের সহিত এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, ইউরোপ ও এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। তাঁহারা ইহাও জানাইয়াছেন যে, শান্তি যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তির সমস্ত প্রচেষ্টা সমর্থন করা হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে শান্তি পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছে উল্লিখিত ঘোষণা যে তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়া আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়া পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করা হইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব করিয়াছে তাহাও কার্য্যতঃ রাশিয়ার আক্রমণ আশঙ্কাকে ভিত্তি করিয়াই। রাশিয়া শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যই নয়, নিরাপত্তা পরিষদেরও স্থায়ী সদস্য। এই বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশন—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) ফ্লাশিং মিডোজে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের যে পঞ্চম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যে অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ অধিবেশন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার স্বল্প জীবনকালের মধ্যে এরূপ দুর্যোগের সম্মুখীন আর হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই দুর্য্যোগ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন। ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে পথে আগাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার অস্তিত্বের বিলোপ ঘটিবে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই আশঙ্কা সত্য কি না, তাহা এই অধিবেশনেই প্রমাণিত হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের কর্ম্মসূচীতে ৭৩টি বিষয় স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় বিস্ফোরক পদার্থের মতই ভয়ানক। এই সকল বিস্ফোরক বিষয়ের সান্নিধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নিপীড়নের প্রশ্ন এবং কাশ্মীর সমস্যার গতি কি হইবে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিত্ব, এবং ফরমোসা সমস্যা সত্যই বিস্ফোরক পদার্থ। উহাদের যে কোন একটি যে-কোন সময়ে বিদীর্ণ হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জীবন নাশ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত আছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পৃথক পৃথক শান্তি প্রস্তাব। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দাবী করিয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বলাধানের জন্যই এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। মার্কিণ-প্রস্তাব এবং রুশ-প্রস্তাব লইয়া শুধু মুখে বাদানুবাদ হইবে না, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বলাধান করিবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উহার জীবনান্ত ঘটাইতে পারে। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অবিশ্বাসের ভিত্তির উপরেই এই প্রস্তাবকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং সোভিয়েট ব্লকের অন্যান্য রাষ্ট্রকে যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

জাতিপুঞ্জ ও কম্যুনিষ্ট চীন—

কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ হইতে বঞ্চিত রাখায় এবং উদ্বাস্তু জাতীয়তাবাদী চীন গবর্ণমেণ্টকে সদস্য পদে বহাল রাখায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' নামের মর্য্যাদা কি সত্যই ক্ষুণ্ণ হয় নাই? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চাহে না বলিয়াই কম্যুনিষ্ট চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইতে পারিতেছে না, এ কথা কাহারও পক্ষেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভোটের সংখ্যাধিক্যে কম্যুনিষ্ট চীন যদি জাতিপুঞ্জের সদস্য হইতে পারে তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি নাই, এ কথাও অর্থহীন। এ কথা কাহারও অজানা নাই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তাহা জানে। সাধারণ পরিষদের বিদায়ী সভাপতি ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ রমুলো পরিষদের উদ্বোধন প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিমণ্ডলীর অধিনায়ক ডাঃ সিয়াংকে চীনের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন। ডাঃ সিয়াং আসন গ্রহণের জন্য যখন মঞ্চের দিকে গমন করেন, তখন তুমুল হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল। ইহার অর্থ বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদের প্রথম দিনের অধিবেশনেই কম্যুনিষ্ট চীন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে অবিলম্বে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের জন্য ভারতের প্রতিনিধি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। পরের দিন এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে
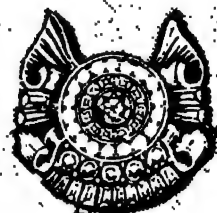
অলঙ্কারে আভিজাত্য
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সুখ্যাত গিনিসোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১২৪, ১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ফোন: বি, বি, ১৭৬১
ব্রাঞ্চ— হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ
১০৯/১/বি রাসবিহারী এভিনিউ • কলিকাতা
MBS

দেখা গেল, প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র ১৬টি ভোট হইয়াছে এবং বিপক্ষে হইয়াছে ৩৩টি ভোট। এই ৩৩টি ভোটের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চীনের ভোট আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উদ্বাস্তু জাতীয়তাবাদী চীন গবর্ণমেণ্টের চীনের ৪৭ কোটি ৫০ হাজার অধিবাসীর হইয়া কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। অবশিষ্ট যে ৩২টি দেশ ভারতের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে, তাহাদের অধিবাসীর সংখ্যা ৪১ কোটি ২০ লক্ষ এবং যে ১৬টি দেশ ভারতের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে, তাহাদের অধিবাসীর সংখ্যা ৮০ কোটি ১০ লক্ষ। এই হিসাব উল্লেখ করিয়া মিঃ রাও বলিয়াছেন যে, অধিবাসীর ভিত্তিতে বিবেচনা করিলে বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দৃষ্টিতে এই যুক্তির কোন মূল্যই নাই।

মার্কিণ বোমারু বিমান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়াতে বোমা বর্ষিত হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনকে আহ্বান করা হয় নাই। অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক কমিশন গঠনের প্রস্তাব করে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট চীন গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া দেন যে, কম্যুনিষ্ট চীনকে জাতিপুঞ্জের সদস্যরূপে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত উক্ত কমিশনকে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। অবশেষে আমেরিকার এই প্রস্তাবে রাশিয়া ভেটো প্রদান করে। অবশ্য ফরমোসায় মার্কিণ আক্রমণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনার সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য কম্যুনিষ্ট চীনকে আমন্ত্রণ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তবে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইকুয়েডর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়াতেই এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে এবং আগামী ১৫ই নবেম্বরের পূর্ব্বে ফরমোসা সংক্রান্ত বিতর্ক হইবে না, এই সর্ত্তে ইকুয়েডর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে রাজী হয়। ইকুয়েডরের এইরূপ সর্ত্ত আরোপ করার কারণ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে কোরিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কোরিয়া সম্পর্কে কি প্রস্তাব গৃহীত হইবে এবং কম্যুনিষ্ট চীনে উহার প্রতিক্রিয়াই বা হইবে কিরূপ তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়।

কোরিয়া যুদ্ধের নূতন পর্য্যায়—

অবশেষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে উত্তর কোরিয়া পরাজিত হইয়াছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৫০) সিউল হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে ইনচন বন্দরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যখন অতর্কিতে বিপুল সৈন্য অবতরণ করাইতে সমর্থ হইল, তখনই উত্তর-কোরিয়ার পরাজয়ের সূচনা হইয়াছিল। ব্যাপক বোমা বর্ষণ করিয়া উত্তর-কোরিয়ার শিল্প-কেন্দ্রগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ ধ্বংস করিবার পরই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইনচনে সৈন্যাবতরণ করানো সম্ভব হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে শক্তিশালী বিমান বাহিনীর সহযোগিতা ভিন্ন মার্কিণ নৌবাহিনী ইনচনে সৈন্যাবতরণ করাইতে পারিত না। ইহার পরেই অতি দ্রুত উত্তর-কোরিয়ার পরাজয় হইতে বুঝা যায়, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার জন্য উত্তর-কোরিয়া মোটেই প্রস্তুত হইতে পারে নাই। পশ্চাৎ দিকের এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাকে অতি দ্রুত দক্ষিণ-পশ্চিম সমরাঙ্গন হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিতে হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাব্যূহের উপর তাহার আক্রমণ অত্যন্ত দুর্ব্বল না হইয়া পারে নাই। ফলে তাইগু রণাঙ্গনে উত্তর কোরিয়ার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্বিংশ ডিভিশন তাইগুর উত্তরে কম্যুনিষ্টদের সুদৃঢ় ঘাঁটি ওয়াইগোয়ান দখল করিয়া তায়েজোনের পাশ কাটাইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

ইনচনে অবতরণ করিয়াই মার্কিণ বাহিনী নৌবহর হইতে গোলা-বর্ষণ এবং রকেটবর্ষী বিমানের সহায়তায় প্রচণ্ড বেগে সিউলের প্রান্তসীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সিউল রক্ষার জন্য উত্তর-কোরিয়া বাহিনী যে সংগ্রাম করিয়াছে, একমাত্র ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য রাশিয়ার সংগ্রামের সহিতই তাহার তুলনা চলিতে পারে। কিন্তু অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হওয়ায়, মার্কিণ সৈন্যবলের আধিক্য এবং শক্তিশালী বিমান-বাহিনীর আঘাতের সম্মুখে ক্ষুদ্র উত্তর-কোরিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। 'উত্তর-কোরিয়া সিউলের প্রতি রাজপথে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছে। এমন কি, সিউল রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে মেয়েরা পর্য্যন্ত। বস্তুতঃ সিউলের প্রতি ইঞ্চি দখল করিতেও মার্কিণ বাহিনীকে প্রবল প্রতিরোধ-শক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সিউল দখলের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে যেমন অত্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তেমনি সিউলও প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "But the price paid has been too big. On this narrow front, no wider than the width of a road and flanking houses too many marines died fighting their way slowly forward." অর্থাৎ 'কিন্তু যে মূল্য দিতে হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বেশী। রাজপথ যতখানি প্রশস্ত ততখানি প্রশস্ত ফ্রন্ট, তাহার এক পাশে গৃহশ্রেণী। এই ফ্রণ্টে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য বহু মেরিণ সৈন্যকে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছে।' ওয়ার্ড প্রাইস সিউল হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) লিখিয়াছেন, "The capture of Seoul is costing the Americans dear. Colonel Puller estimates the casualties suffered by his Regiment since it landed at 600 out of 2400 men." অর্থাৎ 'সিউল দখল করিবার জন্য আমেরিকাকে অত্যন্ত বেশী ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। কর্ণেল পুলারের হিসাব অনুযায়ী অবতরণের সময় তাঁহার রেজিমেণ্টে সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৪০০ জন, তন্মধ্যে ৬০০ জন নিহত হইয়াছে।' এলান হামফ্রেস্ ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) সিউলের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "This city looks today like the city of London after a fire bomb raid at the end of 1940. Quite a number of small houses escaped damage, but they were hardly noticeable among the miles of shattered and burned buildings." অর্থাৎ '১৯৪০ সালের শেষভাগে অগ্নি-বোমা বর্ষিত হওয়ার পর লণ্ডনের যে অবস্থা হইয়াছিল, এই সহরটি (সিউল) ঠিক সেইরূপ দেখাইতেছে। ছোট ছোট অনেকগুলি

বাড়ীর কোন ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু দীর্ঘ মাইলব্যাপী বিধ্বস্ত এবং ভস্মীভূত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে ঐগুলি আর চোখে পড়ে না।' তিনি আরও বলিয়াছেন, "Everywhere there were the dreadful remnants of battle." অর্থাৎ 'সর্ব্বত্রই যুদ্ধের ভীতিপ্রদ চিহ্নসমূহ ছড়াইয়া রহিয়াছে।'

২৬শে সেপ্টেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনী সিউল দখল করে। এদিকে মার্কিণ সৈন্যের একটি শাখা ইনচন হইতে সিউয়ানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ওয়েগোয়ান হইতে যে একটি মার্কিণ বাহিনী ত্বরিৎগতিতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা আসিয়া উক্ত বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর মার্কিণ সাঁজোয়া বাহিনী যখন সিউলের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া পৌঁছে, সেই দিনই সাম্‌বকে আর একটি বাহিনী অবতরণ করে। ফলে সমস্ত উত্তর কোরিয়া বাহিনী দক্ষিণ-কোরিয়ায় আটক হইয়া পড়ে। এই ভাবেই অতিদ্রুত উত্তর-কোরিয়ার পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র উত্তর-কোরিয়া এই যুদ্ধে যে শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা সমগ্র এশিয়াবাসীর গৌরবের বিষয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির নিকট উত্তর-কোরিয়ার এই পরাজয় অপ্রত্যাশিত ছিল না, সকলেই ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিপুল সামরিক শক্তি লইয়াও সহজে উত্তর-কোরিয়াকে পরাজিত করিতে পারে নাই। তিন মাস ধরিয়া প্রবল সংগ্রামের পর উত্তর-কোরিয়াকে পরাজিত করিয়া আমেরিকা দক্ষিণ-কোরিয়া দখল করিতে পারিয়াছে। মার্কিণ দেশরক্ষা বিভাগ ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হতাহতের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, কোরিয়ার যুদ্ধে ২,৪৪১ জন মার্কিণ সৈন্য নিহত, ১১,০৫০ জন আহত এবং ৩,৯৫০ জন নিখোঁজ হইয়াছে। মোট সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ১৭,২১০ জন। দক্ষিণ-কোরিয়ায় উত্তর-কোরিয়ার যে-সৈন্যবাহিনী আটক পড়িয়াছে, তাহাদের অবস্থা কি? সংবাদ যে-টুকু পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, উত্তর-কোরিয়ার যে-দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী এত দিন প্রাণপণে প্রবল সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা যেন মুহূর্ত্তে উবিয়া গিয়াছে। কি ভাবে এই অঘটন ঘটিল তাহা অনুমান করা সহজ নয়। হয়ত অনেকেই সাধারণ পোষাক পরিয়া আত্মগোপন করিয়াছে। দক্ষিণ-কোরিয়াবাসী হইতে উত্তর-কোরিয়াবাসীকে চিনিবারও উপায় নাই, তাহাদের বহু আত্মীয়-স্বজনও দক্ষিণ-কোরিয়ায় রহিয়াছে। সুতরাং আমেরিকা দক্ষিণ-কোরিয়া দখল করিলেও গরিলা যুদ্ধের আশঙ্কা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রধান প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, মার্কিণ বাহিনী অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করিয়া উত্তর-কোরিয়ায় প্রবেশ করিবে কি না? দক্ষিণ-কোরিয়ায় উত্তর-কোরিয়া বাহিনীর পরাজয়ের পরে আমেরিকা বৃটেন প্রভৃতি সকলেই কোরিয়ার ঐক্যের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সিংম্যান রী পর্য্যন্ত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিয়াছেন, অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখা বলিয়া কিছু নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুগ্রহে আবার দক্ষিণ-কোরিয়া ফিরিয়া পাওয়ার পর তাঁহার এই উদ্ধত উক্তি বিশ্ববাসীর মনে শুধু হাস্যরসেরই সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু উত্তর-কোরিয়ায় অভিযান চালাইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অভিপ্রায়ের গুরুত্ব উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোরিয়ায় ঐক্য কোন্ পথে—

কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অষ্টত্রিংশ সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করিয়াও অভিযান চালান আবশ্যক। এই ভাবে সমগ্র কোরিয়া দখলের পরই শুধু আমেরিকা ও বৃটেনের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন সম্ভব। কিন্তু এই পথে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন করিতে যাওয়ার তাৎপর্য্য ও পরিণাম দুই-ই বিবেচনা করা আবশ্যক। এ সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন এই যে, উত্তর-কোরিয়ায় অভিযান চালাইতে হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নূতন করিয়া সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন কি না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর সম্মতির প্রয়োজন নাই। কোরিয়া সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে যে-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট এবং তাহার বলেই উত্তর-কোরিয়াতেও অভিযান চালাইতে পারা যাইবে। কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ লোক দেখাইবার উদ্দেশ্যেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মতির অপেক্ষা করিবে, ইহা মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। বিশেষতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেখানে মার্কিণ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করে না, সেখানে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে উত্তর-কোরিয়ায় অভিযান চালাইতেই আমেরিকার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। ভারত সুস্পষ্ট পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিনী উত্তর-কোরিয়ায় প্রেরণ ভারত সমর্থন করে না। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতের সমর্থক কয় জন, তাহা কাহারও অজানা নাই।

নিরাপত্তা পরিষদ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে। এই সাব্যস্ত করিবার সময় উত্তর-কোরিয়ার বক্তব্য তাঁহারা শুনিতে রাজী হন নাই। উত্তর-কোরিয়া স্পষ্টই অভিযোগ করিয়াছিল যে, দক্ষিণ-কোরিয়াই প্রথমে আক্রমণ করে। কাজেই নিরাপত্তা পরিষদের এই এক তরফা সিদ্ধান্ত দ্বারা ন্যায়বিচারের মূল নীতিই ভঙ্গ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর-কোরিয়া ও দক্ষিণ-কোরিয়ার মধ্যে সংঘর্ষকে তাঁহারা গৃহযুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কারণ, স্বীকার করিলে কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইত না। কিন্তু কোরিয়ার গৃহযুদ্ধকে তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করায় কার্য্যতঃ উত্তর-কোরিয়া রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই অবস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি উত্তর-কোরিয়া দখল করিয়া ঐক্য-কোরিয়া গঠন করেন, তাহা হইলে উত্তর-কোরিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিলোপ করা হইবে। কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুবিধার জন্য উত্তর কোরিয়ার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-সত্তা একবার স্বীকার করিয়া আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে উহার অস্তিত্ব ধ্বংস করিবার অধিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জেরও থাকিতে পারে না। উত্তর-কোরিয়া যুদ্ধাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র সত্তা বিলোপ করা যাইতে পারে না। জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে কোরিয়া—এক এবং অবিভাজ্য; সুতরাং সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন করিতে অধিকারী, এই দাবী করা হইলে, উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার সংঘর্ষ গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এ কথা অবশ্যই স্বীকার

করিতে হইবে। এ কথা স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ অন্যায়, অসঙ্গত এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বে-আইনী হইয়াছে। হস্তক্ষেপ করিবার সময় উত্তর-কোরিয়ার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার, আবার উত্তর-কোরিয়া অভিযানের জন্য কোরিয়ার অখণ্ডত্ব স্বীকার, ইহা অপেক্ষা স্ববিরোধী ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উত্তর-কোরিয়া কমিশন তাহাদের বার্ষিক রিপোর্টেও উত্তর-কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া অখণ্ড স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া গঠন করার সুপারিশ করিয়াছেন। বৃটেন, কিউবা, ব্রাজিল, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, ফিলিপাইন এবং নেদারল্যাণ্ডস্ মিলিয়া ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার একটা পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও আছে। তাহা হইলে প্রকৃত ব্যাপারটা কি দাঁড়াইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক।

প্রথমে উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়াকে পৃথক্ রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হইল এবং উত্তর-কোরিয়াকে সাব্যস্ত করা হইল আক্রমণকারী! ইহাতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রও কোরিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পাইল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তর-কোরিয়া যেমনি হারিয়া গেল, অমনি কোরিয়ার সমস্ত অধিবাসীকে এক নেশান বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল এবং ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠনের আগ্রহ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু মার্কিণ সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক উত্তর-কোরিয়া দখলের পরেই শুধু অখণ্ড কোরিয়া গঠন করা সম্ভব, তাহার পূর্ব্বেই নয়। ইহা ছাড়া আর পথ নাই।

অখণ্ড কোরিয়া গঠনের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী, এ কথা যেমন স্বীকার করিতে পারা যায় না, তেমনি 'গণতান্ত্রিক কোরিয়া' কথাটাও বিতর্কমূলক। গণতন্ত্রের অর্থ লইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের সহিত সোভিয়েট ব্লকের মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক মনে করে, তাহাদের শাসন-পদ্ধতিই একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু সোভিয়েট ব্লক তাহা স্বীকার করে না। তাহারা তাহাদের শাসন-পদ্ধতিকেই গণতান্ত্রিক বলিয়া মনে করে। গণতন্ত্রের এই দুইটি রূপের মধ্যে কোনটি খাঁটি, তাহা ঘোষণা করিবার অধিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করিতে পারে না। কোরিয়াবাসীর কোন্ গণতন্ত্র গ্রহণ করা উচিত, তাহাও নির্দ্দেশ করিবার অধিকার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নাই। কারণ, যেমন ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক, তেমনি সোভিয়েট ব্লকও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য। এই অবস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি ঘোষণা করিতে পারে যে, পশ্চিমী গণতন্ত্রই খাঁটি গণতন্ত্র, সোভিয়েট গণতন্ত্র গণতন্ত্রই নয়। এইরূপ ঘোষণা করার অর্থ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিলোপসাধন। অথচ কোরিয়ার ব্যাপারে যদি উল্লিখিত ৮টি রাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক ইঙ্গ-মার্কিণ গণতন্ত্রকেই একমাত্র বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম গণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া গঠনের উপায় কি?

আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে, অখণ্ড, স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া গঠনের দুইটি মাত্র উপায় আছে। এক উপায়, অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতীত গৃহযুদ্ধ। দ্বিতীয় উপায়, অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ-সমন্বিত গৃহযুদ্ধ। কোরিয়ার ঘটনাবলী এই দ্বিতীয় পথেই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কোন দেশের গৃহযুদ্ধে অপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিলেও উহা আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরিণত না হইয়া পারে না। ফরাসী বিপ্লবে প্রুশিয়া ও অষ্ট্রীয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়াই ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। উত্তর-কোরিয়া দখলের অভিযান চলিলে উহার পরিণতি তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের মধ্যে পরিস্ফুট হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

কোরিয়া যুদ্ধ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—

উত্তর-কোরিয়া বাহিনীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে অষ্টত্রিংশ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার নির্দ্দেশ দিয়া অষ্ট-শক্তির উত্থাপিত প্রস্তাব ৭ই অক্টোবর তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হওয়ার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নাই। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কোরিয়া যুদ্ধের যে নূতন পর্য্যায় সুরু হইল, তাহার তাৎপর্য্য শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, উহার পরিণতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষা করা অসম্ভব। এই প্রস্তাবের অনুকূলে হইয়াছে ৪৭ ভোট এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র ৫ ভোট হইয়াছে। যে-সাতটি সদস্য-রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল, ভারত তাহাদের অন্যতম। ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর উত্তর-কোরিয়া অভিযান অনুমোদন করেন না বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, উক্ত প্রস্তাবে ভারতীয় প্রতিনিধি ভোট না দেওয়ায় উহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইল। কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের জন্য সাত জন সদস্য লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, উহার সদস্য হইতেও ভারতের অস্বীকার করা তাৎপর্য্যহীন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। ভারত কি কারণে এই কমিশনের সদস্য হইতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহা আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। কিন্তু জেনারেল ম্যাকআর্থারকে উত্তর-কোরিয়া অভিযানের নির্দ্দেশ দান এবং কমিশন গঠন যে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, অষ্টশক্তির উত্থাপিত যে-প্রস্তাবটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইয়াছে তাহা আসলে অখণ্ড কোরিয়া গঠনের প্রস্তাব ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রস্তাবে মোট ছয়টি দফা আছে। প্রথম দফায় কোরিয়ার স্থায়িত্ব আনয়ন করিবার অবস্থা সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আছে। এই ব্যবস্থা যে কি, তাহা বলা হয় নাই বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী দফা আলোচনা করিলেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তাবের দ্বিতীয় দফায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীনে কোরিয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান এবং ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা করিবার কথা আছে। কিন্তু উত্তর-কোরিয়া দখলের পূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান এবং ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গবর্ণমেণ্ট গঠন যে অসম্ভব, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধেও বুঝিতে পারে। আবার উত্তর-কোরিয়া দখল করিতে হইলে জেনারেল ম্যাকআর্থারের উত্তর-কোরিয়া অভিযান করা যে অপরিহার্য্য তাহাতেও সন্দেহ নাই। কাজেই অষ্টশক্তির প্রস্তাবে উত্তর-কোরিয়া অভিযানের নামগন্ধ না

Lipton's
Flowery Orange
Pekoe
LIPTON'S
HIMALAYAN BLEND
CHOICE
DARJEELING
TEA
লিপটন
মানে
ভালো চা

প্রতিফলিত কার্য্যত: এই প্রস্তাব জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারকে উত্তর-কোরিয়া অভিযানের নির্দ্দেশ দান ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারকে উত্তর-কোরিয়া অভিযানের নির্দ্দেশ দেওয়ার সুদূর-প্রসারী পরিণামের কথা ভাবিয়াই যে ভারত এই প্রস্তাবে ভোট দেয় নাই, তাহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না। জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারের বাহিনী উত্তর-কোরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিলে চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টের এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনা উপেক্ষার বিষয় নয়। পরিণামে কোরিয়া যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামে পরিণত হইবে কি না এবং এই তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামে কে জয়লাভ করিবে, এই সকল প্রশ্ন বাদ দিলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত অষ্টশক্তির প্রস্তাবের কূটনৈতিক পরিণতির কথা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাহাকে বলে তাহা লইয়াও মতবিরোধ আছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যত দিন রাশিয়া এবং রুশ-ব্লকের অন্যান্য রাষ্ট্রও সদস্য থাকিবে তত দিন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পশ্চিমী গণতন্ত্রকেই একমাত্র বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিবে এবং কোরিয়াবাসীর উপর তাহা চাপাইয়া দিতে পারেন কি? যদি পারেন তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব বজায় থাকিবে কি? কোরিয়াবাসী কিরূপ গণতন্ত্র চায় তাহা একমাত্র তাহারাই স্থির করিতে অধিকারী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও তাহাদের ঘাড়ে কোন রাষ্ট্ররূপ চাপাইয়া দিতে পারেন না।

জাতি, ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক হইতে কোরিয়াবাসীরা এক জাতি এবং কোরিয়া বিভাগটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পাবে না। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন করিতে একমাত্র কোরিয়াবাসীরাই অধিকারী। কোরিয়াবাসীরা কিরূপ গণতন্ত্র চায়, কোন পথে ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া তাহারা গঠন করিতে চায়, তাহাও কোরিয়াবাসী ছাড়া আর কেহ, এমন কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও নির্দ্দেশ করিতে অধিকারী নহেন। যদি গৃহযুদ্ধের পথে ছাড়া ঐক্যবদ্ধ কোরিয়া গঠন এবং কিরূপ গণতন্ত্র তাহারা চায় তাহা স্থির করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেই গৃহযুদ্ধে অপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়ও এক সময়ে গৃহযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সে-দিন পর্য্যন্তও ম্যাক্‌সিকোতে অনেক বার গৃহযুদ্ধ হইয়াছে। অপর কোন রাষ্ট্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। চীনের গৃহযুদ্ধেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিতে বিরত ছিলেন। কিন্তু কোরিয়ার ব্যাপারে তাহার অন্যথা হইল কেন? এশিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও স্বার্থ রক্ষা করা ব্যতীত তাহার আর কোন কারণ দেখা যায় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেও সেই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহাতে এশিয়াবাসী সত্যই বিস্মিত হইবে কি? ১৯৪৫ সালে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, "The security of the British Empire and Commonwealth is bound up with the success of the United Nations." অর্থাৎ 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথের নিরাপত্তা' জড়িত রহিয়াছে। আজ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে বটে, কিন্তু আসলে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীই অভিযান চালাইতেছে। এশিয়াবাসী আজ দেখিতেছে, কোরিয়ায় এশিয়াবাসী পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সৈন্যের সহিত লড়াই করিতেছে। কোরিয়ার যুদ্ধে তাহারা ইহাও দেখিয়াছে যে, এশিয়ার অতি নগণ্য এবং দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা হইতে মুক্ত একটি দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়াছে বীরবিক্রমে। উত্তর-কোরিয়ার যুদ্ধও এশিয়ার একটি দেশের সৈন্যবাহিনীর সহিত মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই হইবে না। এই অবস্থায় ভারত অষ্টশক্তির প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট না দিয়া ক্ষতি সঙ্গত কাজই শুধু করে নাই, ভারত যে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের হুকুমবরদার নহে তাহাও প্রমাণিত করিয়াছে। এশিয়ায় হইয়াছে ভারতের মুখরক্ষা।

ইন্দোনেশিয়া—

ইন্দোনেশিয়াকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তটির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মিঃ নাৎসির মন্ত্রিসভা গঠন করায় ইন্দোনেশিয়া ইসলামিক রাষ্ট্রের পথে অগ্রসর হইতেছে কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। ইন্দোনেশিয়ায় যে তিনটি মুসলিম দল আছে, তন্মধ্যে মজুমি দলই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। মিঃ নাৎসির এই দলের নেতা। অপর দুইটি মুসলিম দল 'দারুল ইসলাম' এবং 'পারতাই সেরিকত ইসলাম ইন্দোনেশিয়া'। এই দুইটি দলের প্রতিনিধিও এই মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছে। কোন জাতীয়তাবাদী এই মন্ত্রিসভায় নাই।

পরলোকে ফিল্ডমার্শাল স্মাটস্—

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ফিল্ডমার্শাল স্মাটস্ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর হওয়ার পূর্ব্বেই বোওর রিপাবলিকের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভে পরিণত হইয়াছিলেন। শেষ ক্রুগার গবর্ণমেণ্টের তিনি এক জন সদস্য ছিলেন। ১৯১১ সালে জেনারেল লুই বোথারের মৃত্যু হইলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচালন ভার প্রাপ্ত হন। ১৯২৪ সালের নির্ব্বাচনে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। ১৯৩২ সালে জেনারেল জেমস হার্টজগের সহিত তিনি কোয়ালিশন গঠন করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। ১৯৪৮ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি পরাজিত হন এবং ডাঃ মালান সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন।

প্রসাদ রায়

নাট্যজগতে নব যুগ

এদেশে নাট্য-জগতে নব-যুগের কথা তুললেই লোকের মনে পড়ে, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রথম রঙ্গাবতরণ। কিন্তু বাংলা দেশের সংকীর্ণ নাট্য-জগতের কথা আজ আমাদের আলোচ্য নয়, আমরা বলতে চাই বিশ্ব-নাট্যকলার কথা। য়ুরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে যে নাট্যকলার চর্চা হয় এবং যার ছোট ছোট ঢেউ মাঝে মাঝে এদেশে এসেও অল্প-বিস্তর নূতনত্ব সৃষ্টি করে, আমরা এখন তারই কথা বলব। তারই কথা বলার মানে হচ্ছে, গোড়ার কথা বলা। কারণ পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ের আদর্শেই গঠিত হয়েছে বাংলা রঙ্গালয়। গোড়ার দিকে এখানে যাঁরা রঙ্গালয় সংগঠন করেছিলেন, এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকলা সম্পর্কীয় ঐতিহ্য নিয়েই ছিল তাঁদের প্রধান কারবার এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে যে অল্প-স্বল্প দেশী যাত্রার বিশেষত্ব ছিল না, এমন কথাও বলতে পারি না। এলিজাবেথের দেশেই এখন এলিজাবেথীয় ঐতিহ্য অচল হয়ে পড়েছে, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ে এখনো তার প্রভাব আছে প্রায় বারো আনা। সুতরাং বাংলা নাট্য-জগতের নব যুগ বলতে বিশেষ কিছুই বোঝায় না। এদেশের আর সকলের তুলনায় শিশিরকুমার সব চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু ওদেশের অনেকের তুলনায় তিনি কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন?

গর্ডন ক্রেগ, ষ্টানিস্লাভ্স্কি ও রাইনহার্ড প্রভৃতির কথা নিয়ে এদেশেও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। অ্যাডলফ্ আপ্পিয়ার প্রসঙ্গ নিয়েও আমরা অন্যত্র দু'-চার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম। আধুনিক নাট্য-জগতে এঁদের অকুণ্ঠ দানের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু যিনি এঁদেরও চেয়ে অগ্রগামী এবং সর্বপ্রথমে যাঁর প্রতিভা নাট্য-জগতে এনেছিল নব যুগের আলো, সেই ডিউক অফ সেক্স-মিনিন্জেনের প্রসঙ্গ নিয়ে কোন নাট্য-সমালোচকই এদেশে আজ পর্য্যন্ত আলোচনা করেননি। কেবল এদেশেই বা বলি কেন, আমেরিকার "থিয়েটার আর্টস্ ম্যাগাজিনে"র বিখ্যাত সম্পাদক সেলডন্ চেনে সাহেব ৫৫৮ পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তার মধ্যে আলোচিত হয়েছে তিন হাজার বৎসরের পাশ্চাত্য নাটক, অভিনয় ও মঞ্চশিল্পের কথা; অথচ ঐ গ্রন্থের নির্ঘণ্ট-পত্রের কোথাও ডিউক অফ সেক্স-মিনিন্জেনের নাম পর্য্যন্ত স্থান পায়নি! বৃহত্তর পৃথিবীর অধিকাংশেরই কাছে সেক্স-মিনিন্জেনের ডিউক অদ্যাবধি

গত প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত মিনিন্জেন ছিল জার্ম্মাণীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। শহরটির আকার ছোট, বাসিন্দার সংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার। তার স্বাধীন রাজার নাম দ্বিতীয় জর্জ্জ; উপাধি 'ডিউক'। তাঁর জন্ম ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। ডিউক কেবল নাট্যকলাবিদ্ ছিলেন না, ছবি আঁকতেও পারতেন। সখের খাতিরে তিনি একটি নিজস্ব নাট্য-সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। নিজেই করতেন সেখানকার অভিনয় পরিচালনা, দৃশ্যপট ও পাত্র-পাত্রীর সাজ-পোষাক পরিকল্পনা। কিন্তু তিনি সাধারণ পরিচালক বা পরিকল্পক ছিলেন না। নাট্যকলার দিকে দিকে কত সম্ভাবনা থাকতে পারে, তা নিয়ে তিনি স্বাধীন ভাবে মস্তিষ্ক চালনা করতে পারতেন এবং তাঁর সমসাময়িক নাট্যবোদ্ধাদের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তিতেও নিজের অতুলনীয়তার প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন।

ডিউকের মতামতের কিছু-কিছু পরিচয় দিচ্ছি। তিনিই সর্বাগ্রে প্রচার করেন, আগে দৃশ্যপট এঁকে বা দৃশ্যবিন্যাস ক'রে তার পর পাত্র-পাত্রীদের আহ্বান করা উচিত নয়। আগে দেখা উচিত, নট-নটীরা একক বা দলবদ্ধ ভাবে রঙ্গমঞ্চের উপরে কি ক'রে প্রবেশ ও প্রস্থান করবে, চলবে-ফিরবে, উঠবে-বসবে। ডিউক নিজে পেন্সিল দিয়ে দৃশ্য-সংস্থানের ছবি আঁকতেন এবং তার মধ্যে মানুষদের মূর্ত্তি এঁকেও বিশদ ক'রে বুঝিয়ে দিতেন যে, কোথায় কে কোন্ ভঙ্গিতে অবস্থান করবে। ঐ সব নক্সা দেখলে উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না যে, মঞ্চের উপরে দৃশ্যপটের কোন স্বাধীন অস্তিত্বই নেই এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৃশ্য-সংস্থান সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না পাত্র-পাত্রীরা তার মধ্যে এসে স্থান গ্রহণ করে। আগে পাত্র-পাত্রীর গতিবিধি স্থির হোক, মঞ্চশিল্পী তুলি ধরবেন তার পর।

গতিবিধিই (movement) নাটকীয় ক্রিয়াকে জমিয়ে তোলে। নটের খুব সাধারণ গতিবিধিই অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। একখানা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানো, আর একখানা চেয়ারে গিয়ে ব'সে পড়া, একটা দরজার কাছে যাওয়া, জানলা দিয়ে বাইরে তাকানো, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাওয়া এবং আবার ফিরে আসা, এই সবের সাহায্যে অনেক মর্ম্মস্পর্শী ভাব ফুটানো যায়। অভিনেতা কেবল অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে কথা বলবে না, তাকে যেতে হবে স্থান থেকে স্থানান্তরে। অভিনেতা যদি স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে থাকে, তাহ'লে নাট্যাভিনয়

১৮৭০ থেকে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপের প্রধান প্রধান রঙ্গালয়ে অভিনয় বলতে প্রধানতঃ বুঝাত, সংলাপ উচ্চারণ করা। তার মধ্যে যেটুকু গতিবিধি থাকত, তা অনুসরণ করত গীতি-নাট্যাভিনয়ের ক্রিয়ার ঐতিহ্য (ওদেশে গীতিনাট্যে মৌখিক ভাষণ থাকে না।)

ডিউকের মিনিন্‌জেন থিয়েটারে অভিনেতারা মৌখিক ভাষার সাহায্য না নিয়েও কেবল গতিবিধির ভিতর দিয়ে কতখানি মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় করতে পারত, বিশ্ববিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাট্যাচার্য্য ষ্টানিস্‌লাভস্কি তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মিনিন্‌জেন থিয়েটার মস্কো সহরে অভিনয় করতে গিয়েছিল এবং অভিনেয় নাটক ছিল শিলারের "The Maid of Orleans" বা "জোয়ান অফ আর্ক"।

ষ্টানিস্‌লাভস্কি বলছেন: "একটি দৃশ্যের কথা কখনো আমি ভুলতে পারব না। শীর্ণ-বিশীর্ণ, হতাশ ও সকরুণ রাজার (ফ্রান্সের) মূর্ত্তি প্রকাণ্ড এক সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট; তাঁর শীর্ণ পদযুগল শূন্যে ঝুলছে, কক্ষতল পর্য্যন্ত পৌঁচচ্ছে না। সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে বিভ্রান্ত সভাসদগণ, প্রাণপণে চেষ্টা করছে রাজ-মহিমা বজায় রাখবার জন্যে।......এক জন রাজার এই শোচনীয় অধঃপতনের পটভূমিকায় এসে দাঁড়াল ইংরেজ রাজদূত—দীর্ঘকায়, মহিমান্বিত, সাহসী, উদ্ধত।... দুঃস্থ রাজা এক জন সভাসদকে ডেকে এমন এক আদেশ দিতে বাধ্য হলেন, যা তাঁর রাজমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। সভাসদ রাজার পক্ষে অপমানকর সেই আদেশ পেয়ে সভা ত্যাগ করবার পূর্ব্বে, আদব কায়দা অনুসারে দেহ নত ক'রে রাজাকে অভিবাদন করতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু দেহকে উচিত মত নত না ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত; তার পর সে সোজা হয়ে দাঁড়াল নতনেত্রে। পর-মুহূর্ত্তে তার দুই চক্ষু ভ'রে উঠল অশ্রুজলে এবং পাছে সভার মাঝখানে আত্মসংবরণ করতে না পারে, সেই ভয়ে সে দ্রুতপদে দৌড়ে পালিয়ে গেল বাইরে।

সভাসদের দেখাদেখি কাঁদতে লাগল প্রেক্ষাগারের দর্শকরা এবং আমারও চক্ষু শুষ্ক রইল না। মঞ্চ-পরিচালকের উদ্ভাবন শক্তি যে ভাব সৃষ্টি করলে, তা ফুটিয়ে তুললে নাটকের আত্মাকেও।"

ডিউকের পদ্ধতি ছিল এমন অপূর্ব্ব যে, দূর-সম্পর্কীয় ঘটনাও অভিভূত ক'রে তুলত দর্শকদের। ষ্টানিস্‌লাভস্কি রুশ দেশের মানুষ, তবু তাঁর কাছে নগণ্য এক ফরাসী রাজার অসহায়তা ও অপমান দেখে তিনি না কেঁদে থাকতে পারেননি। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলুম, এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে। মিনিনজেন নাট্য-সম্প্রদায় য়ুরোপের যে দেশে গিয়েছে সেইখানেই দর্শকদের মুগ্ধ করেছে এমনি সব অভিনব কৌশলে। বাংলা দেশে একমাত্র শিশিরকুমারের সম্প্রদায়েই এই শ্রেণীর কলা-কৌশল দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মিনিনজেন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল গত শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে, আর এটা হচ্ছে অতি-আধুনিক যুগ। তখন যে পদ্ধতি ছিল আনকোরা, এখন হয়ে গেছে তা পুরাতন। মিনিন্‌জেন সম্প্রদায় নানা বিভাগে নানা নব প্রথা প্রবর্ত্তন ক'রে গিয়েছে, আজ তা গৃহীত হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশের রঙ্গালয়ে। লোকে যখন নদীর জল পান করে তখন তার উৎস কোথায় এ খোঁজ যেমন রাখে না, তেমনি মিনিন্‌জেন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি গ্রহণ ক'রেও তার উদ্ভাবক কে, সে কথাও অনেকেই জানে না।

মিনিন্‌জেনের ডিউক রঙ্গমঞ্চের সমতল একঘেয়েমি পছন্দ করতেন না। দরকার হ'লেই তিনি রঙ্গমঞ্চকে নতোন্নত ক'রে অভিনয়-কার্য্য চালাতেন। মঞ্চ-জনতার দিকে থাকত তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। এর প্রয়োজনীয়তা তিনিই বুঝেছিলেন সর্ব্বপ্রথমে। সেই জন্যে তাঁর সম্প্রদায় যে দেশেই যেত, সৃষ্টি করত বিপুল বিস্ময়। এই জনতাকে উচিত মত নিয়ন্ত্রিত করা যে কঠিন, আধুনিক যুগেও প্রত্যেক পরিচালকই তা জানেন। আজও বাংলা দেশের রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা জনতা নিয়ে মাথা ঘামাতে শেখেননি। প্রতি রাত্রেই জনতার দৃশ্যে দেখা যায় হয়তো নূতন নূতন লোক, যারা দাঁড়িয়ে থাকে কাঠের পুতুলের মত, হয়তো নির্দ্দিষ্ট লোকের অভাবে শেষ মুহূর্ত্তে যাকে-তাকে ধ'রে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রঙ্গমঞ্চের উপরে। কিন্তু মিনিন্‌জেনের ডিউক এ সব বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। নট-নটীর সঙ্গে জনতার প্রত্যেক লোককে তিনি নিয়মিত ভাবে মহলা দিতে বাধ্য করতেন। প্রত্যেক লোকের জন্যে থাকত নির্দ্দিষ্ট স্থান, নির্দ্দিষ্ট পোষাক। প্রত্যেক লোকই কেবল ভাবাভিনয় করত না, পরস্পরের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা-বার্ত্তাও বলত। জনতাকে নানা দলে বিভক্ত করা হ'ত এবং প্রত্যেকের উপরে নির্দ্দেশ থাকত, কেউ যেন রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে না যায় বা দর্শকদের দিকে না তাকায়। বাংলা রঙ্গালয়ে সুনিয়ন্ত্রিত জনতা দেখেছিলুম মাত্র একটি নাট্যাভিনয়ে। "সীতা" নাটক যখন খোলা হয় তখন প্রথম প্রথম তার শেষ দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চের উপরে উপস্থিত থাকত প্রায় একশো জন ক'রে লোক এবং তারা মাটির মূর্ত্তির মত অবস্থান করত না, অভিনয়ও করত।

ডিউক সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতেন, যে শৃঙ্খলের দ্বারা দৃশ্যের পর দৃশ্য—এমন কি এক মুহূর্ত্তের সঙ্গে আর এক মুহূর্ত্ত—বাঁধা আছে তার সবটাই সমান মজবুত কি না। এতটুকু খুঁটিনাটি তাঁর নজর এড়াতে পারত না, মহলার পর মহলায় সমস্তই নিখুঁত ক'রে তোলা হ'ত। যত দিন না কোন পালা পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হ'ত তত দিন সমান ভাবে চলত মহলা। প্রত্যেক দিন বেলা চারটে কি পাঁচটায় মহলা সুরু হয়ে মধ্য-রাত্রের আগে বন্ধ হ'ত না। ডিউকের সুযোগ্য মঞ্চাধ্যক্ষ ও সহকারী ছিলেন ক্রোনেগ। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল—"যে কোন ওজর রঙ্গালয়ে অচল।" এক দিন জনৈক অভিনেতা হাজিরা দিতে কয়েক মিনিট দেরী করেছিল। দণ্ডস্বরূপ কিছু কালের জন্যে তার সমস্ত ভূমিকা কেড়ে নেওয়া হ'ল এবং সে নামতে বাধ্য হ'ল জনতার দৃশ্যে।

এ-সবের তুলনায় বাংলা রঙ্গালয়ের মহলা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য হবে না। অনেক সময়ে দুই-তিন দিন মহলার পরই এক-একখানি বড় বড় নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। প্রত্যেক নট-নটী নিয়মিত সময়ে হাজিরা দিতেও চান না। এখানে নিয়ম ভঙ্গ করতে অনেকেই প্রস্তুত। এ সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

মিনিনজেন সম্প্রদায়ের দৃশ্যপট, গৃহসজ্জা, আসবাব ও সাজ-পোষাক সমস্তই মহলার প্রথম দিন থেকেই প্রস্তুত রাখা হ'ত—বাংলা রঙ্গালয়ে যা অশ্রুতপূর্ব্ব কথা। তার অবশ্যম্ভাবী ফলও স্বচক্ষে দেখেছি বহু বার। অভিনয়ের আগের দিন (কখনো কখনো

অভিনয়ের দিন) পর্য্যন্ত দৃশ্যপট আঁকা চলেছে, তার পর যথাসময়ে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেখা গেল, দৃশ্যপট নাটকীয় ক্রিয়াকে বাধা দেয়। অভিনয়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ব্যতিব্যস্ত নট-নটীরা আবিষ্কার করলে, জামা গায়ে হচ্ছে না, জুতোর মাপ পায়ের চেয়ে বড় বা ছোট প্রভৃতি।

মিনিনজেন সম্প্রদায়ে অভিনয়কে গ্রহণ করা হ'ত ব্যাপক ভাবে। প্রত্যেক অংশ বা খণ্ডকে দেখা হ'ত সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে। এক-এক জন বড় অভিনেতা মঞ্চের মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে কথার পর কথার তুবড়ী ফুটিয়ে যাচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখা যেত না সেখানে। ছোট ও বড় ভূমিকা ছিল তুল্যমূল্য। শ্রেষ্ঠ নটের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে প্রয়োগকর্ত্তা বা পরিচালকের প্রাধান্য বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল, আজ যে রীতি গৃহীত হয়েছে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই। এক জন মাত্র সুপরিচিত প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার সাহায্য না নিয়েও মিনিনজেন সম্প্রদায় যে রূপ সৃষ্টি করত, তার তুলনা নেই। ডিউকের মত ছিল, আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর যে রস ঘনীভূত হয়ে ওঠে, অতি তুচ্ছ কোন ত্রুটির জন্যে তা মাঠে-মারা যেতে পারে! পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত পালাকে ত্রুটিশূন্য ক'রে তুলতে পারলেই সফলতা অর্জ্জন করা যায়।

ডিউক ঘোষণা করলেন, তাঁর সম্প্রদায় বার্লিনে অভিনয় করতে যাবে।' বার্লিনের বাসিন্দারা তাঁর দুঃসাহস দেখে অবাক! জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, যেখানে বড়-বড় রঙ্গালয় আছে পথে পথে, যেখানে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা আছে দলে দলে, সেখানে পল্লীগ্রামের তুল্য আট হাজারী মিনিনজেনের একটা অজানা সম্প্রদায় আসরে অভিনয় দেখাতে?

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পয়লা মে। বার্লিনে মিনিনজেন রঙ্গালয়ের প্রথম অভিনয়ের তারিখ। প্রথম রাত্রের কৌতূহলী দর্শকরা এল কৌতুক দেখতে, কিন্তু যৌতুক পেলে স্বপ্নাতীত ঐশ্বর্য্য! নাট্য-রসিকদের মুখে জয়-জয়কার! রঙ্গালয়ে জনতার তরঙ্গের পর তরঙ্গ! নাট্য-জগতে যুগান্তর! এবং নব যুগের প্রবর্ত্তক ব'লে ডিউকের নাম ফিরতে লাগল লোকের মুখে-মুখে। বিশেষজ্ঞরা বললেন, ডিউক আধুনিক নাট্য-জগতে বিপ্লব এনেছেন।

বার্লিনের পর ভিয়েনা ও বুডাপেষ্ট। তার পর সমগ্র য়ুরোপে—লণ্ডন, আমষ্টারডাম, রটারডাম, কোপেনহেগেন, ষ্টকহলম্, ব্যাসেল, ওয়ারস, সেণ্টপিটার্সবার্গ, মস্কো, ওডেসা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সম্প্রদায় আটটি দেশের আটত্রিশটি সহরে নব যুগের বীজ বপন করেছে। বার্লিনে অভিনয় করেছে ৩৮৫ বার এবং অন্যান্য দেশে ২,২০৬ বার। সম্প্রদায় আমেরিকায় যায়নি বটে, কিন্তু নাট্যরথীদের মুখে শুনে সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব ও বিশেষত্বের সঙ্গে পরিচিত হ'তে আমেরিকারও বিলম্ব হ'ল না। ডিউকের নূতন উপাধি হ'ল, "য়ুরোপের স্কুল-মাষ্টার"।

মিনিনজেন নাট্য-সম্প্রদায় পরিণত হ'ল পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্ব-প্রধান রঙ্গালয়ে তথা নাট্য-বিদ্যালয়ে। নাট্যকলা-চর্চ্চার জন্যে বিখ্যাত কোন দেশই তার প্রভাব এড়াতে পারলে না।

ফরাসী দেশে প্রথম আধুনিক রঙ্গালয় (Theatre Libre) স্থাপন করেন অ্যাণ্টয়ন। মিনিনজেন রঙ্গালয়ের প্রয়োগ-কৌশল দেখে তাঁর চোখ খুলে গেল। ডিউকের সহকারী ক্রোনেগ সম্প্রদায় নিয়ে যখন রুশিয়ায় যান, তখন মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ষ্টানিস্লাভস্কি তাঁদের অভিনয় দেখে লিখেছিলেন: "মিনিনজেন নাট্য-সম্প্রদায়ের একটি মাত্র অভিনয়ও আমি দেখতে বাকি রাখিনি। আমি কেবল দেখতে যেতুম না, সেই সঙ্গে শিখতেও যেতুম। সম্প্রদায়ের অভিনয়ে ক্রোনেগ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, আমিও তার অনুকরণ করতুম। তার পর দেখতে দেখতে রুশিয়ার অধিকাংশ রঙ্গালয়ের পরিচালকই আমার অনুকরণ করতে লাগলেন।"

মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রমাণিত করেছিল, রঙ্গালয়ের পক্ষে এমন এক জন পরিচালকের বিশেষ আবশ্যক, যিনি আলোকপাত, সাজ-পোষাক, ছদ্মবেশ ও দৃশ্যপট প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের তুচ্ছ খুটিনাটিটি পর্য্যন্ত নিজের নখদর্পণে রেখে সমগ্র পালাটি একসূত্রে গেঁথে দেবেন; যিনি অপরিমেয় নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনার সাহায্যে কোন একটি নাট্যানুষ্ঠানকে এমন ভাবে প্রস্তুত ক'রে তুলবেন, যাতে ক'রে তা প্রকাশ করতে পারে নাটকের আত্মা বা মর্ম্মবস্তুটিকে; যিনি সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হয়ে ওঠবার জন্যে দীর্ঘকাল ধ'রে অশ্রান্ত ভাবে মহলার ব্যবস্থা করবেন এবং প্রধান প্রধান অভিনেতাদেরও জনতার দৃশ্যে ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করবেন না। মিনিনজেন সম্প্রদায়ের এই সব ঐতিহ্য পরে পরিণত হয়েছিল মস্কো আর্ট থিয়েটারের ঐতিহ্যে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মিনিনজেন সম্প্রদায় যখন দ্বিতীয় বার রুশিয়ায় যায়, ডিউকের সহকারী ক্রোনেগের দেহ হঠাৎ ভেঙে পড়ে এবং আর তিনি লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে পাননি। জরার আক্রমণে ডিউকের দেহও অপটু হয়ে পড়েছিল, সুযোগ্য সহকর্ম্মীর অভাবে তিনিও আর নাট্য-পরিচালনার গুরুভার গ্রহণ করতে সাহসী হলেন না। নাট্য-রসিক বন্ধুগণ তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন, চরম গৌরবের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বার্লিনে আর একবার যেন নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়। ডিউক জবাব দিলেন, "তার আর দরকার নেই! যা কিছু শেখা উচিত, জার্ম্মান থিয়েটার তা শিখে নিয়েছে।"

কেবল জার্ম্মান থিয়েটার নয়, প্রতীচ্যের সমস্ত রঙ্গালয়ের আধুনিক পরিচালকদের ডিউকের মন্ত্রশিষ্য বললে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না। এমন কি, আমেরিকার বিখ্যাত অতি-আধুনিক রঙ্গালয়ের ("থিয়েটার গিল্ড") অভিনয়েও ডিউকের মতামতের প্রভাব লক্ষ্য করা কঠিন হবে না।

নাট্য-জগতে প্রসিদ্ধ গর্ডন ক্রেগ বলেছেন: "নাট্যকলা বলতে অভিনয় বা নাটক বুঝায় না,—দৃশ্যপট বা নৃত্যও নয়। কিন্তু যে সব উপাদানে ঐ সব জিনিব গঠিত, নাট্যকলার মধ্যে সে সমস্তই আছে। ক্রিয়া—অভিনয়ের যা আত্মা; বাক্য—নাটকের যা দেহ, রেখা ও রং—দৃশ্যপটের যা প্রাণ; ছন্দ—নৃত্যের যা সার। পটুয়ার কাছে যেমন সব বর্ণই এবং গায়কের কাছে যেমন সপ্ত স্বরই সমান দরকারি, তেমনি এর কোন একটি অঙ্গটির চেয়ে বেশী দরকারি নয়।.........যেখানে একাধিক মস্তিষ্ক কর্ত্তৃত্ব করে, সেখানে কলা-সম্মত কোন অনুষ্ঠান অসম্ভব।.........রঙ্গালয়ের কর্ত্তা হবেন মাত্র এক জন। একমাত্র লোক—যিনি উদ্ভাবনায় ও মহলা দিতে সক্ষম; দৃশ্যপট ও সাজ-পোষাকের পরিকল্পনায় পারগ; দরকার হ'লে গানে সুর দিতে সুপটু; আবশ্যকীয় এবং আলোকপাতের যন্ত্রাদি উদ্ভাবনায় সমর্থ।" এ সব হচ্ছে মিনিনজেনের ডিউকের মতামতেরই প্রতিধ্বনি!

যে বৎসরে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে, সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মিনিনজেনের নাট্য-ধুরন্ধর ডিউক দ্বিতীয় জর্জ্জ অতি প্রাচীন বয়সে পরলোকে গমন করেন।

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, সম্পাদিত ও অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়, সারদা কুটীর, কুড়মিঠা গ্রাম, বাতিকার ডাকঘর, জিলা বীরভূম। মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

"বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে—"

খৃষ্টীয় বারো শতকের শেষভাগে কোনও এক শুভক্ষণে জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচিত হইয়া যাইবার পরে, কি বঙ্গদেশ, এবং কি বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতবর্ষ, এই অপূর্ব কাব্যগ্রন্থকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে নাই—সাড়ে সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা-জোড়া ও ভারত-জোড়া গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তা ; ইংরেজী ও অন্য বিদেশী ভাষার মাধ্যমে এই ভারত-জোড়া লোকপ্রিয়তা এখন বিশ্বজোড়া হইতে চলিয়াছে। (বছর খানেক হইল সিংহলের গভর্ণর বা ড্যচ্ বংশীয় শিল্পী জর্জ কাইট নিজের রেখাচিত্র ও রঙ্গীন চিত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত গীত-গোবিন্দের একখানি নূতন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন—স্যর এডুইন আর্নলড্-এর সুপরিচিত ইংরেজী অনুবাদের পরে এই অনুবাদটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়)। জয়দেবের স্বপ্রদেশবাসীরা কখনও তাঁহাকে ভুলে নাই। এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহাকে কবিগুরুর পদ হইতে ভক্ত শিরোমণির পদে উন্নীত করিয়াছে, ভক্ত-রূপেও জয়দেবের নাম সারা ভারতবর্ষময় সমাদৃত ও সম্মানিত। মধ্যযুগের এবং আধুনিক কালের ভারতীয় তাবৎ ভাষার সাহিত্যে, যেখানেই সংস্কৃত সাহিত্যের হাওয়া বহিতেছে, সেখানেই জয়দেবের কবি-প্রতিভা সূর্য্য-কিরণের মত প্রতিফলিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের কবি, কাব্যরসিক এবং বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধক এই কয় শতক ধরিয়া গীতগোবিন্দকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। প্রাচীন কবিদের হাতে গীতগোবিন্দের বঙ্গভাষায় বহু অনুবাদ হইয়া গিয়াছে, গীতগোবিন্দের ছায়া বহু বৈষ্ণবপদের উপরে ও অন্য কবিতায় পড়িয়াছে। গীতগোবিন্দের প্রায় ৪০খানি টীকা ইহার নিখিল ভারতব্যাপী প্রসার ও প্রভাবের পরিচায়ক। সমগ্র ভারতে প্রায় ১৫ জন কবি গীতগোবিন্দের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণেতর বিভিন্ন দেবতাকে অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। আধুনিক কালে বাঙ্গালী কবিরাও গীতগোবিন্দের ...জন নূতন অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র ... রায়ের অনুবাদ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, গীতগোবিন্দের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কালিদাসের পরে বা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে, একখানি বইয়ের দ্বারা এরূপ জনপ্রিয়তা ভারতে আর কোনও সংস্কৃত কবির ভাগ্যে ঘটে নাই।

জয়দেব সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙ্গালায় অনেক পুস্তক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। যত দূর জানি, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের সম্পাদিত এবং দীর্ঘ ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থের ন্যায় এরূপ সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আর কোথাও হয় নাই। এই বই ১৩৩৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া অপ্রাপ্য থাকার পরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ অর্থ-সহায়তায় ইহার পুনঃপ্রকাশন এত দিনে সম্ভবপর হইল। বাঙ্গালীর তথা ভারতের সংস্কৃতির, কাব্যকলার এবং আধ্যাত্মিক রসোপলব্ধির প্রতীক-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার আংশিক ভাবে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার লইয়া বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূর উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন।

গীতগোবিন্দের মূল সংস্কৃত, পূজারী গোস্বামীর বালবোধিনী নামে সংস্কৃত টীকা, ও বাঙ্গালা অনুবাদ—এই ভাবে মূল কাব্য ছাড়া, বইখানির প্রধান আকর্ষণ ও গৌরব হইতেছে ইহার মূল্যবান ভূমিকা। বাহ্য বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান এবং সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তর রসবস্তুর প্রকাশন, এই দুইয়ের সমাবেশে ভূমিকাটিকে সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট রোচক করিয়াছে। বিগত দশ-বারো বৎসর ধরিয়া জয়দেব সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহার ফলে জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্পর্কে কতকগুলি নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক সেগুলির সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হইয়া তাঁহার ভূমিকার দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলিকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার এই অতি উপাদেয় ভূমিকার প্রসার ইহা হইতে অনুমিত হইবে—ইহা ২৩টি অধ্যায় বা পর্য্যায়ে বিভক্ত। সব দিক হইতে জয়দেব ও তাঁহার কৃতিত্বের সার্থক বিচার ইহাতে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত সাধনার দিক এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক আলোচনা ইহাতে যেমন এক দিকে আছে, অন্য দিকে ঐতিহাসিক লেখ ও পুস্তকাদির প্রমাণে বৈষ্ণব ধর্মমতের ইতিহাসের বর্ণনাও আছে। জয়দেব ছিলেন যেমন এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত যুগের শেষ মহাকবি, তেমনি অন্য দিকে তিনি হইতেছেন আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ও পথনির্দেশক ; প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে তিনি যেন সংক্রম সেতু। বাঙ্গালা সাহিত্যে না বলি, বাঙ্গালীর সাহিত্যে তিনি অন্যতম আদি-কবি ; মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের দুইটি ধারা—ভাব-প্রকাশক "পদ" বা কবিতা এবং উপাখ্যানমূলক "মঙ্গল" বা কাব্য—

শ্রীগোবিন্দ একাধারে মধুর কোমল কান্ত পদাবলীময়, এবং উজ্জ্বল-রীতি অর্থাৎ প্রেমরসের গীতিপূর্ণ মঙ্গল কাব্য। সেদিকের বিচারও সম্পাদক করিয়াছেন। এই সুলভ গ্রন্থ সর্বদা কাছে রাখিবার মতন, ইহা সাহিত্যিক, কাব্য-রসিক, ছাত্র—সকলেরই কাজে লাগিবে। জয়দেবের অমর কীর্ত্তির সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত এই পুস্তকের ভূমিকাকে, জয়দেব-চর্চ্চা ও বৈষ্ণব-চর্য্যার একটি সম্পুট বলা যায়। সহৃদয় সাহিত্যরসিক, ভক্তজন, ঐতিহাসিক, সকলেই এই ভূমিকার মহত্ত্ব স্বীকার করিবেন।

আশা করি, এই গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর দেখাইয়া, পূর্ব্বের স্থায় বঙ্গীয় পাঠক সমাজ নিজ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন।
ইতি পিতৃপক্ষ, ১৩৫৭।২০০৭।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাখনাঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ডি এম লাইব্রেরি, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলকাতা ৬। দাম আড়াই টাকা।

নিতান্ত দরিদ্র মুচির মেয়ে তুফানি। এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটায় তার ডানা গজালো। উড়ে যেতে চাইলো সে প্রতিদিনের ক্লেদকীর্ণ পরিবেশ থেকে। কিন্তু তার আকাশ-পরিক্রমার ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ। নেমে আসতে হয় তাকে নিষ্করুণ মাটির ক্লিন্ন পরিবেশে। আর যে আকাশে তার বিহার, তাও বিবর্ণ। নিঃসীমতার ইঙ্গিত সেখানে নেই। সেই মুচির মেয়ের সরস-তীক্ষ্ণ, করুণ-রঙিন কাহিনী 'পাখনা'।

অচিন্ত্যকুমার কথা বলেন না, যেন ঝড় বয়ে যায়। আর সে ঝড় সুনিয়ন্ত্রিত। আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় সে ঝড়ের বল্গা তিনি ধরে থাকেন। মাত্র দেড়শ' পাতার ছোট উপন্যাস 'পাখনা'র পাত্র-পাত্রীদের তিনি অজস্র কথা বলিয়েছেন। প্রতি কথায় ছড়া কাটা চাই, শ্লোক জুড়ে দেয়া চাই। না হলে তাদের বক্তব্য যেন জোরদার হয় না, বলা হয় না যেন কিছুই। আসলে গুছিয়ে কথা বলতেই শেখেনি। তাই অগুন্তি বিচিত্র ছড়া আর শ্লোক দিয়ে তারা প্রয়োজন মেটায়।

অচিন্ত্যকুমার সাহিত্য-সৃষ্টির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছেন। নতুন মানুষ আর পটভূমি বেছে নিয়েছেন তিনি। পনের বছর আগেকার লেখকদের আত্মকেন্দ্রিকতার মৃণালভোজী অবসাদ থেকে তিনি মুক্ত। 'রতনবিবি', 'কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী', 'পাখনা' তাঁর এই উত্তরণের স্বাক্ষর। তাঁর আঙ্গিক, তাঁর বিচিত্র শব্দ-যোজনা নতুন রূপ পেয়েছে, নতুন ঐশ্বর্য পেয়েছে।

তবু 'পাখনা' পড়ে একটা চিন্তা বারে-বারে উঁকি দিয়ে গেল। মেহনতি মানুষের জীবন-সংগ্রামকে অচিন্ত্যকুমার তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। কিন্তু তাদের জীবনের প্রাত্যাহিকতার গণ্ডী ডিঙিয়ে কতটুকু গভীরতায় নামতে পেরেছেন তিনি? তাদের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা ফোটোগ্রাফের মত। শিল্পীর তুলিতে যে প্রাণ ধরা দেয় সে প্রাণ এখানে অনুপস্থিত। নতুন পথে মোড় নিয়ে অচিন্ত্যকুমার বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতা তাঁর দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আশ্চর্য মুন্সিয়ানা আর আঙ্গিকের সূক্ষ্মতম কলাকৌশল সত্ত্বেও 'পাখনা' যেন হৃদয়কে স্পর্শ করে না, কেমন এক বিষণ্ণ অবসাদ মনের ওপর ধূসর ছায়াপাত করে যায়। নতুন বাঁক ঘুরে এসে তিনি যে ক'খানা বই লিখেছেন, তার মধ্যে 'পাখনা'য় এই অভাববোধ সব চেয়ে প্রকট। এ কথা তো ভুলতে পারি না যে, করুণা আর আত্মসমীকরণ, সহানুভূতি আর সমানুভূতি এক নয়।

ডায়গনসিস

পুষ্প দেবী

মা'র অসুখ চলছে। সাত দিন একটু-একটু জ্বর। একশোর ওপর ওঠে না, আবার রেমিশানও হয় না। চিকিৎসায় সেবায় বাড়ী শুদ্ধ লোকের মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই। কিন্তু সব চেয়ে বিপদ হল শুভার্থী পরামর্শদাতাদের নিয়ে। একেই তো কলকাতার ডাক্তারদের নিয়ে পারা দায়। এ কি পাড়াগাঁয়ে রোগ হল? এক জন এম-বি ডাক্তার এলেন, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে চিকিৎসা করলেন তিনি, তার পর যা অদৃষ্টে আছে হল। প্রথমেই এক জন ডাক্তার এসে লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। "দেখুন ব্লাডটা একবার দেখা দরকার, ষ্টুল আর ইউরিনটা থরোলি একজামিনেসান করাও উচিত। আর একটা এক্স-রে করে লাংস আর গলভ ব্লাডারটা দেখে নিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ততক্ষণ পেনিসিলিনটা চলুক, সেপটিক ফোকাস কোথাও একটা আছেই।"

আমাদের মনে হয়, মাত্র সাত দিন জ্বরে এত কাণ্ডর প্রয়োজন কি? তাও টেম্পারেচার ১০০ ওপর ওঠেনি কোন দিন। পরদিন বিকেলে মামা এক জন ভালো ডাক্তার নিয়ে এলেন। তিনি বলেন, কী সর্ব্বনাশ! গলদ তোলো কিডনীতে আর গলভ ব্লাডার এক্স-রে করে কী হবে? কিডনীর বরং একটা পাইলোগ্রাফী করতে পারলে হয়। সন্ধ্যায় এলেন বাড়ীর জামাই সুরেশচন্দ্র, তিনি এসেই বলেন, চিরকাল জানি মা'র হার্ট বরাবর উইক। ব্রহ্মচারীকে এনে কার্ডিওগ্রাফটা আগে করিয়ে নিন দাদা, এ সবে গাফিলতি করতেই নেই। হার্টটাই হল আসল, ওটা ফেল হলে আর চারা নেই। গাফিলতি করা যে উচিত নয়, সেটা আমরাও বুঝি কিন্তু কোন্‌টা যে আগে করি, তা বুঝি না। ইতিমধ্যে পিসে মশাই এসে বলেন, না না, কবিরাজী করান বৌদি। আমার মেজ ভায়ের বাঁচার কিছু ছিল না—হারাণ

...এসে দাঁড় করিয়ে দিলো। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। সারা গা ফুলল, ঢোল, গলায় এক ফোঁটা জল গলে না। মা বর্ণনা শুনে রীতিমত আতঙ্কিত হন। পিসে মশাইকে বলতেও পারি না যে, ও-সব কথা মা'র সামনে বলে কাজ নেই। এমন সময় বাঁচালো রামু চা নিয়ে এসে। ভাবলুম, মুখ বন্ধ হয়ে যদি পিসে মশায়ের গল্পে ভাঁটা পড়ে। ওমা, তা নয়, পিসে মশাই চায়ে চুমুক দিয়ে আরো জাঁকিয়ে বসে গল্প আরম্ভ করলেন। শেষে শুনি, মা নাকি রুনুকে বলছেন, আমার পাটা টিপে দেখতো টোল খায় কি না?

পরদিন মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে স্বয়ং দাদা মশাই এসে হাজির। তখন তেত্রিশ লক্ষ পেনিসিলিন সবে শেষ হয়েছে। ডাক্তাররা রক্তে কিছু পাননি, ষ্টুল ইউরিনেব কোন দোষ ধরা পড়েনি। এক্স-রের রিপোর্টও নির্দ্দোষ। তবু ডাক্তারদের সন্দেহ আর যায় না। তাঁরা এখন বলছেন, না পেলেই যে নেই তা বলা যায় না।

দাদামশাইকে দেখে মা তো কেঁদেই ফেললেন। ব্যাপার দেখে, শুনে দাদামশাই তো রেগেই আগুন, বলেন, এ কী কাণ্ড! সাত দিনের জ্বরে গা ঝাঁজরা করে ফেলেছ তোমরা? এ চিকিৎসা না ছাই? এই তোর মার'ই সে-বার ২৩ দিন জ্বর, আমাদের পাড়ার বিপিন ডাক্তার এক ফোঁটা ডালকামরা দিয়ে সারিয়ে দিলেন। ও-সব ছেড়ে দাও। হোমিওপ্যাথিক দাও, নির্দ্দোষ হয়ে সেরে উঠুক!

দুপুরে বড় মাসী এসে হাজির! তিনি তো এসেই কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন, "এ কী কাণ্ড প্রফুল্ল! আমাদের কত দুঃখের মোহিনী—তা এত দিন ভুগছে, একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কিছু করাসনি? যাক্, শনির পুজো করা দেখি সব বিপদ কেটে যাবে। কাল আমি জ্যোতি ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেব'খন। তোর মেসোর জন্যেও তো করিয়েছিলুম।" বলতে ভরসা পাই না যে, ফল বিশেষ ভাল হয়নি। মেস মশাই গত হয়েছেন। মাসিমা বলেই চলেন, একসঙ্গে শনি আর রাহু পুজো করলে খরচ অনেক কমে হবে। শুধু শনি পূজো ১৫৲ আর শনি ও রাহু একত্র ২৫৲ টাকাতেই হবে। বিকেলে ডাঃ ব্রহ্মচারী আসেন কার্ডিওগ্রাফ করতে, ওধারে মাসিমার জ্যোতি ঠাকুর ফর্দ্দ নিয়ে হাজির। কারুকেই চটাতে পারি না। শনি পুজোর ফর্দ্দ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠি। মহিষ-মূল্য বলে পুরোহিত দাগ দিয়েছেন।—ওতেই তো ২০০৲ টাকা অন্ততঃ লাগবে। অথচ মাসিমা ২৫৲ খরচ হবে বলে ভরসা দিয়েছেন।

পুরুত তো নির্ভয়ে বলে চলেছেন ফুল, বেলপাতা, মহিষ, ভোজ্য, সিন্দুর, কালো কাপড়, রত্ন, লৌহমূর্ত্তি! আমার কাছে তো কোনটাই সহজপ্রাপ্য নয়। সুবিধের মধ্যে বাড়ীতে বেকার তিন ভাই। কিন্তু তারা এখন বেকার নয়। কারণ বড় ডাক্তারদের প্রেসক্রুপসনের ওষুধ কোন ডাক্তারখানাতেই সহজে মেলে না। আবার অনেক সময় ওষুধ জোগাড় হতে হতে রুগীদের অবস্থা যায় বদলে। এর মধ্যে তাদের কাছে মহিষের কথা বলতে পারি না, ক্ষেপে যাবে হয়ত? যাক, নিজেই সব কেনা-কাটা করি। মহিষের ব্যাপারে জ্যোতি ঠাকুর কিন্তু বড় সহজে নিশ্চিন্ত করেন। মহিষ-মূল্য ২০০৲ টাকা পরিবর্ত্তে ২ টাকা ধরে নেন। কিন্তু অত সহজে নিস্তার নেই। ঠাকুমা আছাড় কেঁদে পড়েন, তোদের এ কী কাণ্ড প্রফুল্ল! শনির পূজো করালি, অথচ শনির দান দিলি না, এতে শনি রক্ষে রাখবে?

এদিকে সবে বিপিন ডাক্তারের হোমিওপ্যাথিক আর... হয়েছে। এ ধারে লাহোর থেকে মেজ কাকা এসে হাজির। তি... তো হেসেই অস্থির। বলেন, এর চেয়ে হরিদ্বারে এক ফোঁ... গঙ্গার জল ফেলে আদি-গঙ্গায় এক গণ্ডুষ খেলেই হয়। ...তো এক রকম অচিকিৎসাই বলা চলে? তার চেয়ে এক কা... করো, চিকিৎসাই যদি করাতে হয় সাহেব ডাক্তার ডাকো জার্ম্মাণ জু ডাক্তার। ডাক্তারের সেরা। ইংলণ্ডে রাজার অসুখ হ... ওরাই তো চিকিৎসা করে। পরদিন সাহেব ডাক্তার আসেন বলেন কেসটা খুব ইণ্টারেষ্টিং, আমরা জার্ণালে বের করবো। এত... সম্মানেও খুসী হতে পারি না। ভয়ে ভয়ে জিগেস করি, সারবে তো যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ডাক্তার বলেন, তা কি করে বলবো? সমারো... সহকারে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। এদিকে পথ্য নিয়েও তেমনি বিভ্রাট কেউ বলেন দুধ একমাত্র পথ্য, কেউ বলেন দুধ খেলে আর রক্ষা নেই ভয়ে মা কিছুই খেতে চান না। রোলাণ্ড টিনের মাংস খেতে বলে... কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের যে ওসব চলে না! তাঁর মাথা ঢোকান যায় না। মামা বলেন, তুই শুধু ফলের রস খা মোহিনী মেজ কাকা বলেন, খবরদার বৌদি, ফলের রস খেয়েছ কি মরেছ শুধু ড্রাই জিনিষের ওপর থাকো। ঠাকুমা শটীর পালো খাওয়ানো জন্যে কান্নাকাটি করেন। ইতিমধ্যে কাশী থেকে গুরুদেব এ... হাজির। তিনি বলেন, প্রফুল্ল, কি নাস্তিকই তোমরা হয়েছ বাবা— এত কাণ্ড করেছ আর প্রায়শ্চিত্তটি করাওনি! প্রায়শ্চিত্তর ক... মা'র কানে ওঠে, মা আর ওষুধ খেতেই চান না। রোলাণ্ড ছা... পেয়ে বাঁচে। বলে, "ওষুধ চলা বা বন্ধতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, শু... ওয়াচ করে যান।" জার্ণাল এক কপি পাঠিয়ে দেব আপনাদের আচ্ছা, গুড বাই।

আবার বিপিন ডাক্তার আসে। আমাদের অনেক গালাগা... দিয়ে লক্ষ নম্বর নাক্সভোমিকা দিয়ে আবার চিকিৎসা আর... করেন। খুড়তুতো ভাই যদু তাই শুনে রেগেই আগুন, সে স... হোমিওপ্যাথিক এম-ডি পাশ করেছে। সে বলে, এমন রোগীকে লক্ষ নম্বর ওষুধ দেওয়াও যা, গলা-টিপে মেরে ফেলাও তাই। এক ডো... নেট্রাম মিউর দিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। খবর পেয়ে পাড়... ডাক্তার বিভূতি বাবু আসেন, তাঁর মা মা'র গঙ্গার ঘাটের ব... তিনি বলেন, ও তো সোজা ফসফরাসের কেস, এক ডোজ ফসফরা... ওয়াস্তা।

হঠাৎ অসুখটা খারাপ দিকে টান নিলো। রাত্রে মাথ... যন্ত্রণা হয়ে ডেলিরিয়াম আরম্ভ হল, সকালে সব শেষ। দুঃখ কর... কি, সকলের কাছে আবার একপালা বকুনি খেলাম। সর্ব্ববা... সম্মতি ক্রমে ঠিক হল, আমার বুদ্ধির দোষেই মা গেলেন।

পিসে মশাই বললেন, বাঁচা-মরা ভগবানের দান বাবা, ... কবিরাজীটা একবার ট্রায়াল দিলে ভালো করতে। পাড়... বামাচরণ ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিতে এসে বললেন—অ... ডাক্তারই তো আনলে প্রফুল্ল, কিন্তু রোগটাই ডায়গন... হল না। ব্যাপারটা হয়েছিল ব্রেনে।

ব্রেনে যে তা আমিও জানি, কিন্তু কার সেটাই বুঝলুম না।

আনন্দময়ীর আগমনে

নিরানন্দময় বাঙ্গালীর গৃহে আনন্দময়ীরূপে মায়ের শুভাগমন হইতেছে। সারা বৎসর ধরিয়া দিন গণিয়া গণিয়া আমরা আনন্দময়ীর আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু আজ আনন্দময়ীর আগমনে বাঙ্গালীর অন্তর যে কেন আনন্দের রঙে রঙীন হইয়া উঠিতেছে না, তাহার কারণ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। নিরানন্দময় বাঙ্গালীর গৃহ-প্রাঙ্গণ আর উচ্ছল আনন্দের অজস্র প্লাবনে দুই কূল প্লাবিত হইয়া উচ্ছলিত হইয়া উঠে না। সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য, অসীম দীনতা ও অসহায়তার ভারে বাঙ্গালী আজ জর্জরিত। সৃষ্টিতে যিনি স্থিতিরূপা, যিনি শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণা, তাঁহার আগমনে বাঙ্গালার দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হউক, বাঙ্গালা আবার অন্নে, বস্ত্রে, স্বাস্থ্যে, সুখে, শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। মহাশক্তির মহাপ্রকাশ আমাদের মধ্যে সাধনার দ্বারাই করিতে হইবে।

"এ শুভ লগনে জাগুক গগনে অমৃত বায়ু
আসুক জীবনে নব জনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা কিছু যাহা কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন
নব আলোকের স্নানে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

নাসিক কংগ্রেস

পুণ্যতোয়া গোদাবরী-তীরে রামায়ণের অমর কাহিনী বর্ণিত রাম-সীতার চরণরেণুপূত তীর্থরাজ নাসিকে রাজর্ষি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের পৌরোহিত্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৬তম অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। ট্যাণ্ডনজী তাঁহার অভিভাষণে পণ্ডিতজীর ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্তুতি করিয়াছেন, হিন্দী ভাষার ওকালতি করিয়াছেন, পণ্ডিতজীর বৈদেশিক নীতি ও কমনওয়েলথে প্রবেশ সমর্থন করিয়াছেন, বাস্তুহারাদের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, অর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মতে যে অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য অভিনন্দন জানাইয়াছেন, কন্ট্রোলের ও কুটীর-শিল্পের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং খাদির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কংগ্রেস-সভাপতি রাজর্ষি শ্রীপুরুষোত্তম ট্যাণ্ডন [illegible] চালু হইয়াছিল, তাহা অসুবিধার সৃষ্টি করিলেও প্রয়োজনীয়। এই কন্ট্রোল প্রথা সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতে হইলে সংহতি ও শক্তির প্রয়োজন হয়, ছোট-খাটো সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহা হইতে বঞ্চিত। ইহাই দুর্নীতির জন্ম দেয়। কন্ট্রোলের ফলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে বলিয়াই মহাত্মা গান্ধী উহার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কন্ট্রোল তুলিয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের খাতিরে কন্ট্রোলের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, সমাজের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। এমন ভাবে উহা করিতে হইবে, যাহাতে লোকের ব্যক্তিগত জীবনে হাত না পড়ে এবং সমাজের নৈতিক মানের অধোগতির কারণ দূর হয়। যখন একান্ত আবশ্যক একমাত্র তখনই যেন গভর্ণমেণ্ট কন্ট্রোল চালু করেন। ট্যাণ্ডনজী ইহাই কন্ট্রোল সমস্যা-সমাধানের যুক্তিসঙ্গত পন্থা বলিয়া মনে করেন।

পররাষ্ট্র-নীতি

বিশ্বের দুইটি বৃহৎ শক্তি-গোষ্ঠীর কোনটিতেই যোগ না দেওয়া সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যে পররাষ্ট্র-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ট্যাণ্ডনজী তাহা সমর্থন করেন। তবে তিনি বলেন যে, এই নীতির যেমন কতকগুলি সুবিধা আছে, তেমনিই কতকগুলি অসুবিধাও রহিয়াছে। সুবিধাগুলি এই যে, ভারত বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্মুখে ন্যায়পরায়ণতা ও সমীচীনতার আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারিবে এবং অপরকে এই পথ অনুসরণে প্রণোদিত করিতে পারিবে। এই পন্থাই এক দিন সকলকে বিশ্বরাষ্ট্রের আদর্শ উপলব্ধির কাজে সহায়তা করিবে। ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র-নীতির অসুবিধাগুলি এই যে, বিশ্বের দুইটি পরাক্রমশালী শক্তি-গোষ্ঠীর কেহই ভারতকে তাহার পূর্ণ মিত্র-রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করে না এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। কেন না, অনেক রাষ্ট্রই পাকিস্তানকে ভাবী মিত্ররাষ্ট্ররূপে পাইবে বলিয়া ধরিয়া লইয়া স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঠিক পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং পাকিস্তানের পক্ষে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

আসামের ভূমিকম্প

আসামের ভূমিকম্পের উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন—ভূমিকম্পের ফলে আসামে যে বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে তথাকার অধিবাসীরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হইয়াছেন। সমগ্র দেশ [illegible]

... পারে। ভূমিকম্প ব্যতীত বন্যায় দেশের নানা স্থানে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন দেশবাসীকে সাহায্য করিবার জন্য আমাদের গভর্ণমেণ্ট তৎপর হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইতেছে বিপন্নদের সাহায্য করিবার জন্য আন্তরিক সহানুভূতির সহিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করা।

উদ্বাস্তু সমস্যা

উদ্বাস্তদের কথা উল্লেখ করিয়া ট্যাণ্ডনজী বলেন, "আমাদের জাতীয় নীতির ফলেই উঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই জাতি কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির ফলে উঁহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, প্রয়োজনানুসারে সেই ক্ষতি পূরণের দায়িত্বও জাতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তরা যে সম্পত্তি ফেলিয়া আসিয়াছেন, খুব কম করিয়া ধরিলেও তাহার মূল্য সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু উদ্বাস্তদের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের জন্যও আমাদের কয়েক শত কোটি টাকার প্রয়োজন এবং একমাত্র সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা দ্বারাই এই অর্থ সংগৃহীত পারে। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উদ্বাস্ত সম্মিলনে একটি জাতীয় করধার্য্যের জন্য তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বলেন—ইহা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে-বলিয়াই আমি মনে করি। গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে, ইহা কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে না, তবে উদ্বাস্তদের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমি গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে আমাদের গভর্ণমেণ্ট" গত তিন বৎসরে যে সাহস ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন, কংগ্রেস সভাপতি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানান।

বর্ত্তমান সমস্যা

"বর্ত্তমান সমস্যা" সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় বলেন—দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গঠনকারী যে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরা তিন বৎসর পরিশ্রম করিলাম, তাহা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে চালু হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য গণ-পরিষদের সদস্যগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। দেশ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ট্যাণ্ডনজী বলেন—আমাদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আমাদের গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মনিরপেক্ষ। আমাদের পুরাতন দেশকে বিভক্ত করিয়া এক অংশের উপর ইসলাম ধর্ম্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়া উহার উপর সরাসরি একটি সাম্প্রদায়িক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের ধর্ম্মনিরপেক্ষতার কথা বিশেষ ভাবে ঘোষণা করিতে হইয়াছে। আমাদের শাসনতন্ত্র অথবা গভর্ণমেণ্ট কোন একটি বিশেষ ধর্ম্ম অনুসরণ করে না। সকল নাগরিককে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়াই আমি মনে করি। আমাদের শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় মৌলিক আদর্শ হইল এই যে, দেশের বিভিন্ন অংশ স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার মঙ্গলজনক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া একটি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মাধ্যমে পরস্পরের সহিত জড়িত থাকিবে এবং পরস্পরের নিকটতম হইবে। একমাত্র এই ভাবেই আমাদের দেশ শক্তিসংহত করিয়া বিশ্বের সম্মান লাভ করিবে।

হিন্দী ভাষা প্রচলন

কংগ্রেস-সভাপতি বলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময় ১৫ বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই সরকারী কাজকর্ম্মের জন্য ইংরাজীর পরিবর্ত্তে জাতীয় ভাষা হিন্দীর প্রচলন হওয়া উচিত। তার পর সুযোগ-সুবিধা মত কোন এক সময়ে আমরা শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া লইতে পারিব।

কোরিয়া

কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে ট্যাণ্ডনজী বলেন—আজ আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিয়াছে কোরিয়ায়। বর্ত্তমানে দক্ষিণ ও উত্তর-কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উত্তর-কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং এই আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য আমেরিকা তাহার ফৌজ পাঠাইয়াছে। আমাদের দেশও বৃটেন ও আমেরিকার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেও কোন ফৌজ প্রেরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের গভর্ণমেণ্টের এই নীতি ন্যায়সঙ্গত। আমি ইহা সমর্থন করি।

শ্রমিক-সমস্যা

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রমিকদের সম্বন্ধে বলেন যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সক্রিয় ভাবে কারখানা-শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন মজুরী নির্দ্ধারণের প্রশ্নও বিবেচিত হইতেছে। কয়েকটি আইন ও পাশ হইয়াছে।

কংগ্রেসের অধোগতি

পরিশেষে কংগ্রেস সভাপতি রাজর্ষি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ট্যাণ্ডন বলেন যে, কংগ্রেসী নিয়মতন্ত্রে গলদের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতিকার প্রয়োজন। এক-একটি জেলায় লক্ষ লক্ষ সক্রিয় এবং গুণসম্পন্ন কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহ করা হইতেছে। আমাদের কর্ম্মীদের মৌলিক সততা যে কত নীচে নামিয়াছে ইহা তাহারই পরিচয়। তিনি বলেন যে, কংগ্রেসকর্ম্মীদের নিকট কংগ্রেস একটি দেশসেবার প্রতিষ্ঠান-স্বরূপ ছিল। এখন ইহা ক্ষমতা লাভের উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অনেক লোকই প্রধানতঃ ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই উহাতে প্রবেশ করিয়াছে। তবে দেশরক্ষা ও দেশের সেবাই যাহাদের প্রধান লক্ষ্য, এইরূপ বেশ কিছু সংখ্যক কর্ম্মী থাকিলেই কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। তিনি বলেন, "আমি সবিনয়ে জানাইতে চাই যে, কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাসও যদি পায়, তবুও ভবিষ্যতে আমাদিগকে ঐ ভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাঁহারা সততার সহিত কংগ্রেসে প্রবেশ করিবেন এবং সততার সহিত চলিবেন, একমাত্র তাঁহাদিগকেই কংগ্রেসে গ্রহণ করা হইবে। কেবলমাত্র এই উপায়েই কংগ্রেসের প্রভাব রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং উহার লক্ষ্য অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে।" ট্যাণ্ডনজীর অভিভাষণে দেশবাসিগণ কোনই আশা-ভরসা পান

নাই। সাধু ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরূপে ট্যাণ্ডনজী এ যাবৎ যে সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিয়াছেন, নাসিকে তাহার অবসান হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, ট্যাণ্ডনজী নেহরুর নীতিকেই সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহাতে কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর ডিক্টেরেশিপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতায় কংগ্রেস-সভাপতি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অধিনায়ক জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রাজর্ষি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় উপনীত হন। কলিকাতা মহানগরীতে কংগ্রেস-সভাপতিরূপে ট্যাণ্ডনজীর এই প্রথম আগমন উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনসমাবেশ হয়। হাওড়া ষ্টেশন হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে ট্যাণ্ডনজীকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আনা হয় এবং তথায় তিনি বিরাট জনসমাবেশে "বন্দে মাতরম্‌" ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত এক সভায় কলিকাতার মুসলমান নাগরিকদের প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনার উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় মুসলমানদিগকে দেশের সহিত কৃষ্টি মিলাইয়া না ফেলিতে অনুরোধ করেন। কংগ্রেস সভাপতি মুসলমানদিগকে নিজেদের ভারতীয় বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন, আমরা সকলেই ভারতীয়, ভারত আমাদের জন্মভূমি এবং উহার কল্যাণে আমরা সমবেত ভাবে আত্মনিয়োগ করিব। তিনি বলেন, কংগ্রেস বরাবর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য কাজ করিয়াছে, কিন্তু মুসলিম লীগ পৃথক জাতিত্বের দাবী উত্থাপন করিয়া পার্থক্যমূলক মনোভাব ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগ্রত করে। পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী ও উহা গৃহীত হইবার পর ভারতে সাম্প্রদায়িক রোগের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশ বিভক্ত হয়। দেশবিভাগের ফলে হিন্দু ও মুসলমান দুঃখ ভোগ করিতেছে। উহা কখনই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করিতে পারে না।

কাশ্মীর সমস্যা

কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে সার ওয়েন ডিক্সন নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কাশ্মীরে পাকিস্তান আক্রমণকারীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে—সার ওয়েন ইহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। কাশ্মীরে অনধিকার প্রবেশ করিয়া পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়াছে, এই কথা স্বীকার করিয়াও সার ওয়েন কাশ্মীর বিভাগকেই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার মাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকগণের হাতে নিরাপত্তা পরিষদে সার ওয়েন ডিক্সনের রিপোর্ট সম্পর্কে এক লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত বিবৃতিতে

তিনি বলিয়াছেন, "কাশ্মীরের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সম্মানজনক ভাবে মীমাংসা করিতে হইলে পাকিস্তানকে তাহার মনোভাব পরিবর্তন করিয়া অধিকারের দাবীর পরিবর্তে সমীচীনতা অবলম্বন করিতে হইবে।" প্রধান মন্ত্রী জোর করিয়া বলেন, "পাকিস্তানের শাসানিতে ভারত কাশ্মীর বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে তাহার নীতি হইতে বিচ্যুত হইবে না। ভারত শান্তির পথই অনুসরণ করিবে। তবে যদি শান্তি কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে বসে, তাহা হইলে পূর্ণ আস্থা ও শক্তি লইয়া ভারত সে বিপদের সম্মুখীন হইবে।"

ভারত-পাকিস্তান সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা ইংরেজ বা আমেরিকা কাহারও অভিপ্রেত নহে। এই জন্য পাকিস্তানকে অন্যায়কারী জানিয়াও তাহারা প্রশ্রয় দিতেছে এবং ভারত-পাকিস্তান বিরোধ জীয়াইয়া রাখিতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছে। কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা নিরাপত্তা পরিষদ করিবে না। আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্র-নীতি বজায় থাকিতে আমরাও করিতে পারিব না।

পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গে গভর্ণর মাননীয় ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন উদ্বোধন করিয়াছেন। উদ্বোধন-ভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ কাটজু আসামের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দিল্লী চুক্তি, উদ্বাস্তু পুনর্বসতি, খাদ্য-পরিস্থিতি, সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সরকার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বিবৃত করেন। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে নার্সিং হোম, মেটার্নিটী হোম, ফিজিক্যাল থেরাপী এষ্টাব্লিসমেন্ট, এবং ক্লিনিক্যাল লেবরেটারী সমূহের বাধ্যতামূলক রেজিষ্ট্রেশন এবং লাইসেন্স গ্রহণের বিধান করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রেক্ষাগৃহ ও পাবলিক হলে ধূমপান নিষেধ বিলও গৃহীত হইয়াছে।

ইডেন উদ্যান

পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সায়েন্টিফিক পাবলিসিটী সিণ্ডিকেটকে ইডেন গার্ডেনে শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয়। পরে ঐ সময় আরও দুই মাস বৃদ্ধি করা হয়। গার্ডেনটি ইজারা অথবা ভাড়া দেওয়া হয় নাই। তিনি বলেন, সমগ্র ইডেন উদ্যানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে। ইহার অর্দ্ধাংশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত উদ্বাস্তু ছাত্রাবাস দ্বারা অধিকৃত। এই অংশে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ! নিখিল ভারত প্রদর্শনীর দ্বারা ইডেন উদ্যানের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাপ নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট পার্টিকে ক্ষতি পূরণ করিতে বলা হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-দিবস

গত ২রা অক্টোবর সোমবার পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে কলিকাতা ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর ৮২তম জন্ম-দিবস উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন দেশবাসীকে গান্ধীজীর গ্রাম-সংগঠন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আদর্শ অনুসরণ করিতে আহ্বান জানান। বারাকপুরস্থ গান্ধীঘাটে কংগ্রেস-সভাপতি জাতির জনকের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন প্রসঙ্গে বলেন—"মহাত্মা গান্ধীর মানবতার আদর্শ আমাদের সম্মুখে দীপ্ত রাখিতে হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডাঃ কাটজু বলেন—"মানব-সেবা, গ্রামোন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রভৃতি গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ কার্য্যে রূপায়িত করাই এখন আমাদের কর্তব্য।" গান্ধী-জয়ন্তী উপলক্ষে লাটভবনে ডাঃ কাটজুর পৌরোহিত্যে সূত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।

পাক-সচিব জনাব যোগেন্দ্র মণ্ডল

অবশেষে পাকিস্তানের আইন-সচিব জনাব যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাকিস্তানের আইন-সচিবের পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হইতেই পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেও তিনি অবিচলিতই ছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের হাঙ্গামার মর্মান্তিক ঘটনাবলীর মধ্যেও তিনি অচল ও অটল ছিলেন। বোধ হয় ক্রমশঃ পাকিস্তান মন্ত্রিসভা তাঁহার পক্ষে উত্তপ্ত কটাহের মতই হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি পাকিস্তান মন্ত্রিমণ্ডলী হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীযুক্ত মণ্ডল পাক-প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী খানের নিকট যে সুদীর্ঘ পত্র দিয়েছেন, তাহাতে অন্যান্যের মধ্যে তিনি বলেন—গভীর ভাবে দীর্ঘ ও বিশেষ বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, পাকিস্তান হিন্দুদের পক্ষে বাসোপযোগী স্থান নহে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ ধর্মান্তরকরণ ও উচ্ছেদের কৃষ্ণছায়ায় তমসাচ্ছন্ন। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রিত্বের গদী আঁকড়াইয়া থাকিলে হিন্দুদের কোন উপকার হইবে না—এই সত্য আমি যখন উপলব্ধি করিয়াছি তখন স্থিরমস্তিষ্কে পাকিস্তানের হিন্দু ও বিদেশের জনসাধারণের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে দিতে পারি না যে, হিন্দুগণ পাকিস্তানে সসম্মানে এবং তাহাদের জীবন, ধন ও ধর্ম সম্পর্কে নিরাপদচিত্তে বাস করিতে সক্ষম।

দিল্লী চুক্তির ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বর্তমান অবস্থা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মণ্ডল বলেন যে, তাহাদের অবস্থা কেবল অসন্তোষজনক তাহা নহে—একান্ত নৈরাশ্যজনক এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ ঘন তমসাচ্ছন্ন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে আস্থা মোটেই ফিরিয়া আসে নাই। কিছু সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু—ইহাদের অধিকাংশ তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক—পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছে! তাহাদের মনে আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই যে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিতেছে তাহা নহে, উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ কষ্ট তাহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কেশ
পুষ্মাল
মরকত কান্তি পুষ্পাদিবাসিত
স্নিগ্ধ-কেশ তৈল
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর